দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্বিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৪৩

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ,—১৩৪৩

লেখ সূচি—(বর্ণানুক্রমিক)

চিত্র সূচি (মাসানুক্রমিক)

আষাঢ়—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৪৩

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৪৩

জন্ম—১২৫০ সাল, ১৭ই ভাদ্র　　চন্দ্রনাথ বসু　　মৃত্যু—১৩১৭ সাল, ৬ই আষাঢ়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রথম খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বাগর্থ বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ

সূচনা

বাক্য ও অর্থের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জানিয়াই মহাকবি কালিদাস একদিন পার্ব্বতী মহেশ্বরকে বাগর্থের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সর্ব্বদা স্থির নহে। বাক্য অনেক সময় অর্থকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং অর্থও সকল সময় বাক্যের বন্ধন মানিয়া চলে না।

পশ্চিমের শাব্দিকগণ বাগর্থ সম্বন্ধের ভঙ্গুরতা দেখিয়া এ বিষয়ে চর্চ্চা করিতেছেন। আমাদের দেশেও কিছু কিছু কাজ হইতেছে কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতা ও গুরুত্বের অনুপাতে কাজের পরিমাণ নিতান্ত অল্প।

সংজ্ঞা

ইংরাজিতে বিষয়টির নাম দেওয়া হইয়াছে Semantics বা Rhematology। এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর প্রচলিত। গ্রীক ভাষায় Rhema শব্দের অর্থ 'উক্ত' অর্থাৎ 'যাহা বলা হইয়াছে' এবং Semaino শব্দে অর্থ 'সূচিত করা'। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশ তাঁহার "ভাষাতত্ত্ব ও বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস" নামক পুস্তকে এই বিজ্ঞানটির "শব্দার্থতত্ত্ব" এই বাঙ্গালা না প্রস্তাব করিয়াছেন। 'অর্থতত্ত্ব' শব্দটিই তিনি অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু Politica Economy সম্পর্কে অর্থ শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত থাকায় (১) অর্থ শব্দের স্থানে শব্দার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহা যুক্তি যে সমীচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন 'শব্দ' কথাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে প্রথমত 'শব্দ' কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আমরা অর্থে উহা ব্যবহার করিতে চাই তদপেক্ষা অনেক বেশি ভা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আছে। ঠিক যে কারণে 'অর্থ শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিবার কারণ আছে সে

(১) যেমন; অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র।

কারণেই 'শব্দ' কথাটির ব্যবহারেও আপত্তি উঠান যায়। কিন্তু ইহাই প্রধান আপত্তি নয়। প্রধান আপত্তি এই যে 'শব্দ' কথাটির মূল অর্থ ধ্বনি। আমরা 'শব্দ'কে Speech অর্থে প্রয়োগ করিতে চাই। অবশ্য সে অর্থেও উহার যথেষ্ট প্রয়োগ আছে একথা অস্বীকার করিতেছি না এবং অধিকতর উপযোগী শব্দ না পাইলে ইহাকেই আমরা সানন্দে গ্রহণ করিতাম ইহাও মানি।

আমার প্রস্তাব Semanticsএর বাঙ্গালা সংজ্ঞা 'বাগর্থ বিজ্ঞান' দেওয়া হউক। Semantics কথাটির অর্থ ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, The Science of Meaning। প্রস্তাবিত পরিভাষায় এই অর্থ কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে দেখা যাউক।

পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে সকল শব্দের উপযোগিতা সমান নয়। বহুল প্রচলিত শব্দ অপেক্ষা অনতি-প্রচলিত শব্দই পরিভাষার ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিভাষা বস্তুত একটা চিহ্নমাত্র। এই চিহ্ন যতদূর স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র হয় ততই ভাল। পরিভাষার উপযোগী উল্লিখিত গুণগুলি 'শব্দার্থ' অপেক্ষা 'বাগর্থ' শব্দের অধিক আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। 'শব্দার্থ' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবেও 'শব্দ' এবং 'অর্থ' ইহাদের ব্যবহার কিছু কম নয়। কিন্তু 'বাগর্থ' শব্দের ব্যবহার অতি অল্পই। অধিকন্তু 'বাক্' বলিয়া কোন শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহারই হয় না। 'বাক্' পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত না হইলেও সমস্তপদে ইহার দেখা পাওয়া যায়। 'বাগ্‌বাদিনী' 'বাগ্‌দেবী' আমাদের আরাধ্যা দেবতা। সুতরাং 'বাক্' শব্দ অব্যবহৃত হইলেও একেবারে অপরিচিত নয়।

'বাক্' শব্দটি আমাদের অভিপ্রেত অর্থ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ অর্থে 'বাক্' শব্দের প্রয়োগ আছে। (১)

পরিভাষা সংজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিরুক্তি ব্যতীত কোন সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়। Rhematologyই বলি, আর Semanticsই বলি—বিনা ব্যাখ্যায় কোন নামই অভিপ্রেত অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তবে যে সংজ্ঞাটি বক্তার অল্পতম আয়াসে অধিকতম ভাব বহন করিতে পারে তাহারই যোগ্যতা সকলের অপেক্ষা বেশি। সম্ভবত এই কারণেই Rhematology অপেক্ষা Semantics কথাটি অধিকতর প্রচলিত হইয়াছে।

বাগর্থ শব্দের মধ্যে Rhema ও Semaino এই দুইটি শব্দের অর্থই অংশাঅংশি ভাবে বজায় আছে। সুতরাং ইংরাজি দুইটি পরিভাষার যে কোনটি অপেক্ষা বাঙ্গালা পরিভাষাটি অধিকতর অর্থ বহন করিবে। সে কারণেও প্রস্তাবিত শব্দটি গ্রহণীয়।

শ্রুতিমাধুর্য্য পরিভাষার অন্যতম গুণ হওয়া আবশ্যক। যে সংজ্ঞা দুরুচ্চার্য্য এবং শ্রুতিকটু তাহা সহজে চলে না। শব্দার্থতত্ত্ব অপেক্ষা 'বাগর্থ-বিজ্ঞান' কথাটি শুনিতে ভাল লাগিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেই জন্য তত্ত্বের পরিবর্ত্তে 'বিজ্ঞান'শব্দটির প্রয়োগ করিতে চাই। ইহাতে অর্থের দিক দিয়াও কোন ক্ষতি হইল না—অথচ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুশ্রাব্য করিয়া তুলিল।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে 'বাগর্থ' শব্দটি কালিদাস যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা প্রায় সেই অর্থেই ব্যবহার করিতে চাই। 'শব্দার্থ' দ্বারা সে কাজ সুষ্ঠুতররূপে নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কালিদাস 'বাগর্থ' শব্দটি নির্ব্বাচন করিতেন না। একটি মহাকাব্যের প্রথম শ্লোকে যে শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি যাহাতে না থাকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই তিনি চিন্তা করিয়াছেন। ভবভূতির ন্যায় পণ্ডিতও তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

এখন এই সংজ্ঞাটির যোগ্যতা কতদূর, বিদগ্ধ সমাজের উপরই তাহার বিচারের ভার রহিল। (১)

অর্থের পরিবর্ত্তনশীলতা

কোন ভাষায় কোন শব্দ চিরকাল একই অর্থ বহন করে না। নানা কারণে শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইতে

(১) বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥ রঘুবংশ
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ। উত্তররামচরিত
লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

(১) শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় লিখিত "Intellectual laws of Language and the Bengali Semantics"—শীর্ষক প্রবন্ধটি এই সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষাতত্ত্বানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। কিন্তু প্রবন্ধটি ইংরাজিতে রচিত বলিয়া ইহার সহিত বাঙ্গালী পাঠক সম্প্রদায়ের পরিচয় অতি অল্পই।

থাকে। ভাষার মূল সূত্রগুলি কি—তাহা জানিলে এই পরিবর্ত্তনের ধারাটির সন্ধান পাওয়া যায়।

ভাষার সহিত মানব-মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভাষা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য এই কারণেই আবশ্যক। কোন জাতির সাহিত্য ও ভাষার মধ্য দিয়া তাহার ইতিহাস উদ্ধার করা যেমন অনেকটা সম্ভব হয়, তেমনি তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় জানা থাকিলে সেই জাতির ভাষা অধ্যয়নও সহজ হয়। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করি।

ঋগ্বেদে অসুর শব্দটি প্রাণদ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইন্দ্র (১,৫৪,৩), বরুণ (১,২৪,১৪), অগ্নি (৪,২,৫; ৭,২৩), সবিতা (১,৩৫,৭), রুদ্র (৫,৪২,১১) প্রভৃতি দেবতা অসুর বিশেষণে সম্মানিত হইয়াছেন। কখনও কখনও দেবতাগণ অর্থে বহুবচনে 'অসুর' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (১,১০৮,৬)। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থলে অসুর শব্দ ভাল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত অর্থেও 'অসুর' শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দুই এক স্থলে মাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এবং অথর্ব্ববেদে বর্ত্তমান অর্থে 'অসুর' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও অসুর পুরাতন অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। পৌরাণিক যুগে পুরাতন অর্থ আর কিছুমাত্র রহিল না, শুধু আধুনিক (দানব বা রাক্ষস) অর্থেই অসুর শব্দের ব্যবহার হইতে লাগিল। তাহার ফলে একটি নূতন শব্দ জন্ম লাভ করিল। এই নূতন শব্দটি হইতেছে 'সুর'। 'অসুর' এবং 'দেবে'র মধ্যে নিয়ত যে যুদ্ধ হইতে লাগিল তাহার ফলে 'অসুরে'র অর্থ হইয়া গেল 'দেব-বিরোধী' এবং তাহা হইতে অর্থ হইল দেবেতর অর্থাৎ যাহারা দেব নয়। অসুর শব্দের প্রথম বর্ণ অ থাকায় ইহাকে নঞ্ স—ধরিয়া লওয়া হইল এবং তাহার ফলে 'অসুর' শব্দের দেবেতর অর্থ আরও দৃঢ় হইল। সুতরাং 'সুর' শব্দকে পৃথক্ শব্দ কল্পনা করার মধ্যে আর কোন বাধা রহিল না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সুর' শব্দ দেব অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'অসু' (যাহার অর্থ প্রাণ) শব্দ হইতে যে 'অসুরে'র উৎপত্তি, তাহা লোকের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

প্রাচীন জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম্মের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের পক্ষে অসুর শব্দের অর্থান্তর লাভের কারণ উপলব্ধি করা কিছুই কঠিন নয়। পারস্যের মজ্দা উপাসক এবং ভারতের বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে যে যোগ ছিল তাহার প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বেদ এবং অবেস্তার ভাষা এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এই মিলই উভয় জাতির সংযোগের নিদর্শন। মজ্দা উপাসকগণের প্রধান দেবতা অহুর-মজ্দা বা অসুর। অবেস্তা 'অহুর' এবং সংস্কৃত 'অসুর' অভিন্ন। সেইজন্যই ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে 'অসুর' শব্দ দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে উভয় জাতির মধ্যে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। সেই বিরোধ ক্রমশ ঘৃণা ও বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হইল। তাহার ফলেই ভারতীয় আর্য্যগণ পারসীক আর্য্যদের দেবতাকে নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্রমশ দেবতা বলিয়া অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সদর্থক 'অসুর' শব্দ (প্রাণদ) নঞর্থক (দেবতা নয়) হইল। পুনরায় সদর্থক হইল বটে, কিন্তু অর্থ হইয়া গেল ঠিক বিপরীত। যে 'অসুরে'র অর্থ প্রথমে ছিল দেব, পরে তাহারই অর্থ হইল রাক্ষস। (১)

আবার অন্যদিকে পারসীকগণ হিন্দুর 'দেব' (অবেস্তা-দএব) কে তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দানব এই অর্থ দিয়া প্রতিশোধ লইল। অবেস্তায় 'দেব'শব্দের অর্থ দানব বা রাক্ষস। তাহাদের স্মৃতিশাস্ত্রের নাম বিদএব ধাতম্ অর্থাৎ দেববিরোধী বিধান।

উল্লিখিত উদাহরণ দুইটির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে শব্দের অর্থ স্থানকালপাত্রাদি অনুসারে পরিবর্ত্তন লাভ করে

পরিবর্ত্তনশীলতা অনিয়ত

যে কারণে এক শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইল, ঠিক সেই কারণেই যে সকল শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইবে এমন কোন

(১) সংস্কৃত 'বিধবা' শব্দেরও ঐরূপ ইতিহাস আছে। অ্যাংলো স্যাক্সন widwe শব্দ (যাহা হইতে ইংরাজি widow শব্দের উৎপত্তি) এবং সংস্কৃত 'বিধবা'র 'বি'কে উপসর্গ মনে করিয়া স্বতন্ত্র 'ধব' শব্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইলেন। তাহার ফলে 'সধবা' শব্দের উৎপত্তি হইল। রবীন্দ্রনাথ দ্বিস্বামিকতা অর্থে 'দ্বৈধব্য' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

মানে নাই। 'অসুর' শব্দ বেদে প্রথমে ভাল এবং পরে মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই যে 'দেব' শব্দও অবেস্তায় প্রথমে ভাল এবং পরে বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হইবেই এমন নয়। বস্তুত তাহা হয়ও নাই। অবেস্তায় 'দেব' শব্দ পূর্ব্বাপর দৈত্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

'হস্ত' শব্দ হাতীর শুঁড় অর্থে প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং 'শুণ্ড' শব্দ মানুষের হাত অর্থে কেন ব্যবহৃত হইবে না ইহা বলিয়া তর্ক করা নিরর্থক।

মানুষের মন যন্ত্র নয় এবং তাহার কাজকর্ম্মও যন্ত্রের মত সুনিয়ন্ত্রিত নয়। সেই কারণেই ভাষাবিজ্ঞান নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ভাষার গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। মনের ধারা অনুসরণ করিয়া ভাষা স্বতই জন্মলাভ করিয়া থাকে। ব্যাকরণ সেই ধারাটির সন্ধান দেয় মাত্র। কিন্তু সেই ধারাও সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র একই পথে প্রবাহিত হয় না, মধ্যে মধ্যে পথ বদলায়। ভাষারও রূপ তখন বদলাইয়া যায়—তখন আবার নূতন করিয়া ব্যাকরণ তৈয়ার হয়।

ফার্সী 'খুন' শব্দের অর্থ রক্ত। কিন্তু বাঙ্গালায় ঐ শব্দ হত্যা অর্থে প্রযুক্ত হয়। তথাকথিত মাদ্রাসা বাঙ্গালার প্রচারকগণ এবং গজল গানের রচয়িতারা 'খুন' শব্দকে রক্ত অর্থে যতই ব্যবহার করুন না কেন, অদূর ভবিষ্যতে সাধু বাঙ্গালায় উহার ঐ অর্থে ব্যবহার হইবে বলিয়া মনে হয় না, অন্তত এখন পর্য্যন্ত ত হয় নাই। কেন হইল না বলিয়া যদি 'ফার্সি-বাঙ্গালার' লেখকগণ আক্ষেপ করেন—ত সে আক্ষেপ নিষ্ফল।

কোন শব্দের অর্থ কেন এরূপ হইল, তাহা বলিয়া দেওয়াই শব্দবিজ্ঞানের কাজ। কোন বিশেষ শব্দের আকৃতি ও অর্থ যদি স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকূল হয়, শব্দতাত্ত্বিকগণ তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ঠিক অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ শব্দের আকৃতি ও প্রকৃতি ঐ ভাবের পরিবর্ত্তন লাভ করিবে কি না—একথা তাঁহারা বলিতে পারেন না। ভাষা যদি বাঁধাধরা নিয়মে চলিত, তাহা হইলে কোন ভাষার ব্যাকরণে 'নিপাতন' বা 'আর্ষ' প্রয়োগ বলিয়া কিছু থাকিত না।

বাগর্থ ও চিন্তাধারা

জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি ও চিন্তাধারার সহিত ভাষার যোগ খুব নিকট।

'পঙ্কজ' শব্দটি প্রথমে 'পঙ্ক' হইতে জাত—এই অর্থে বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পরে তাহা পুষ্পবিশেষের বিশেষণরূপেই বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে। ক্রমশ পুষ্পটি উহ্য হইয়া গেল এবং কেবল বিশেষণটিই তাহার কাজ চালাইয়া লইতে থাকিল। এই-ভাবে 'পঙ্কজ' পদ্ম অর্থে চলিত হইয়া গেল। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের রসরচনায়, নাট্যকারের নাটকে শামুক বা গুগ্‌লি অপেক্ষা পদ্মেরই আদর এবং প্রয়োগ অধিক। কাজেই উহারা পঙ্কজাত হইলেও 'পঙ্কজ' শব্দে উহাদের বুঝাইল না।

'আন্নাকালী' (১) 'চায়না' (২) 'ক্ষান্তমণি' (৩) প্রভৃতি শব্দ নামরূপে ব্যবহৃত হইবার মূলে যে কারণটি নিহিত আছে বঙ্গবাসীমাত্রই তাহা জানেন। সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া এই শব্দগুলির উপর কি রকম প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা সুন্দররূপে দেখা যায়। কৌলীন্য প্রথার যুগে বহু কন্যার পিতা হওয়ার মত দুঃখ আর কিছু ছিল না। কুল গিয়াছে, কিন্তু কৌলীন্য এখনও যায় নাই। তাই আমরা নবজাত দুহিতাকে 'চাই না' বলিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করি।

আবার 'কেনারাম' (৪) 'ফেলারাম' (৫) 'তিনকড়ি'

(১) আন্নাকালী=আর+না+কালী। হে মা কালী, আর (কন্যা দিও) না।

(২) চায়না=চাই+না। 'Not wanted'

(৩) ক্ষান্তমণি। ক্ষান্ত (বিরত হও অর্থাৎ কন্যাজন্ম তোমার আগমনের সহিতই যেন শেষ হয়) মণি (আদরে)।

(৪) কেনারাম। মৃতবৎসা রমণীর বিশ্বাস তাঁহারই পাপের ফলে সন্তান জন্ম হইয়া বাঁচে না। তিনি যদি স্বীয় সন্তানের সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেন তাহা হইলে বিধাতা মাতার পাপে সন্তানকে আর কাড়িয়া লইবেন না। সেইজন্য পুত্রের জন্মকালে ধাত্রীর নিকটে মাতা নবজাত সন্তানকে দান করিয়া দিতেন। পরে কিছু অর্থ দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে তাহাকে ক্রয় করিয়া লইতেন। ইহাতে প্রসূতী ও সন্তানের মধ্যে যে মাতা পুত্র সম্বন্ধ ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল এবং আত্মজ পুত্র জননী পুনরায় পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। কেনারামের অর্থ—যে সন্তানকে ক্রয় করা হইয়াছে। 'কেনারাম' নাম দেখিয়া বিধাতা বুঝিবেন, এ সন্তান ঐ রমণীর নিজের পুত্র নহে, সুতরাং তাহাকে তিনি ত্যাগ করিবেন। নামের মধ্য দিয়া বিধাতাকে ফাঁকি দেওয়ার কি চমৎকার চেষ্টা।

(৫) ফেলারাম। দুর্ভাগিনী রমণীর ধারণা মূল্যবান্ বস্তুর উপরই

(১) প্রভৃতি শব্দ এবং উহাদের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে সমাজের আর একটা দিক প্রতিফলিত হয়। বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা রমণীর নিকটে সন্তানের জন্ম ও দীর্ঘজীবন যে যে কিরূপ কামনার, এই শব্দগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। যাহার কিছু নাই বা আসিযাই বিদায লয তাহার কাছে একটি কন্যা আসিলেও অনাদর করিতে ভরসা হয না। সেই জন্য কন্যার নামও 'থাকমণি' (২) দেওয়া হয়।

ঐ নামগুলিব পশ্চাতে একটি অন্ধসংস্কাবেব ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন আছে। (৩), 'কাঙালী' (৪), 'মেথরা' (৫) 'শুযে প্রভৃতি নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিদেশযাত্রাকালে আত্মীযস্বজন 'এস' বলিযা বিদায দেন। এই 'এস' শব্দ যাও অর্থে ব্যবহৃত হয। প্রাচীন বাঙ্গালার 'মেলানি' শব্দটিও এরূপ। এগুলিও দেশের অবস্থা এবং জাতিব চিন্তাধাবাব পবিচয দেয।

যথাকাল

কোন বিশেষ শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইবাব মূলে যে সকল কারণ ক্রিযা কবে—সময তাহাদের অন্যতম। হিন্দু মাত্রেই বন্ধুজনবিচ্ছেদকে চিরকাল অশুভ বলিযা মনে কবেন। তাহাব কাবণও সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে যান-বাহনাদিব অসুবিধা এবং দস্যু তস্করেব প্রাদুর্ভাবেব জন্য কেহ একবার বিদেশ যাত্রা কবিলে আত্মীযস্বজন তাহার প্রত্যাগমনেব আশা একরূপ ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু ছাড়িয়া দিব বলিলেই ত মা পুত্রের আশা, স্ত্রী স্বামীব আশা আপন আপন হৃদয হইতে একেবাবে নির্ম্মূল কবিযা দিতে পাবেন না। পাইব না—এই আশঙ্কা হয় বলিয়াই পাইবার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া যায়। এইরূপ যখন মনের অবস্থা তখন দেখা গেল—লোকে প্রিয়জনের বিদায়কালে বারম্বার ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সেই অনুরোধ ও আকুলতার বাড়াবাড়িতে 'যাইবার অনুমতি' চাপা পড়িয়া গেল। লোকে দেখিল, যাইবার কথা ত কেহই উচ্চারণ করিতেছে না। যেখানে 'যাও' বলিবার কথা, সেখানে 'এস' বলাটাই এইভাবে রীতি হইযা দাঁড়াইল। এই রীতি প্রাচীনকাল হইতে চলিযা না আসিলে আজিকার দিনে হযত জন্মলাভ করিত না। সুতবাং দেখা যাইতেছে যে, নূতন শব্দের জন্মলাভ বা পুবাতন শব্দেব নূতন অর্থোৎপত্তির মূলে উপযুক্ত কালের অনেকখানি কর্ত্তৃত্ব আছে।

বাগর্থ ও ব্যাকরণ

পূর্ব্বেই বলিযাছি জীবন্ত ভাষা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদা ব্যাকরণ মানিযা চলে না। যে ভাষা অন্ধেব মত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিযা চলে সে ভাষার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃতই তাহাব প্রমাণ। অথচ প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইযা আজ পর্য্যন্ত সজীবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকগণ ব্যাকবণেব অননুমোদিত পদ ও ভাষার ব্যবহাব কবেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিত হইযা যায। রবীন্দ্রনাথ গাহিব অর্থে কোথাও কোথাও 'গাব' (৬) লিখিযাছেন। দিলীপবাবু "নবগান 'গেতে' (৭)" লিখিযাছেন। শবৎচন্দ্র সাধু ভাষায় 'লইযাছি'র স্থলে 'নিযাছি' (৮) প্রয়োগ

ভগবানের দৃষ্টি পড়ে। যাহাকে অধিক ভালবাসি ভগবান তাহাকেই অকালে ছিনাইয়া লন। এইজন্য সন্তানকে তুচ্ছার্থক নাম দেওয়ার রীতি। 'ফেলারাম শব্দের অর্থ যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১) তিনকড়ি—তিন কড়া মূল্য দিয়া যাহাকে ধাত্রীর নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

(২) থাকমণি। মায়ের ধারণা তাহারই আদরের অভাবে সন্তান থাকে না। তাই তাহাকে আদর করিয়া নাম দেওয়া হইল 'থাক' অর্থাৎ আর যাইও না।

(৩) কাঙালী—অর্থ ভিখারী, দুঃখী।

(৪) মেথরা—অর্থ মেথর, ঝাড়ুদার।

(৫) শুয়ে—শু+ইয়া, শুইয়া, শুয়ে।

উপরোক্ত তিনটির অর্থ পূর্ব্ব পৃষ্ঠার (৫) এর অনুরূপ।

(৬) গাব। ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষে গাহ ধাতুর সাধু ভাষায় রূপ হইবে 'গাহিব', চলিত ভাষার রূপ হইবে 'গাইব'। মূল ধাতুর হ চলিত ভাষায় লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ই থাকে। ঐরূপ নাহ্ হইতে নাইব—সহ্ হইতে সইব ইত্যাদি। কিন্তু মূল ধাতুতে হ না থাকিলে অন্যরূপ হইবে। যেমন পা ধাতু হইতে 'পাব', যা ধাতু হইতে 'যাব' ইত্যাদি। 'যাব' 'পাব' প্রভৃতি পদের সাদৃশ্যে 'গাব' 'নাব' এইরূপ লিখিলে চলিত ব্যাকরণের বিচারে ভুল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) গেতে'। ব্যাকরণ অনুসারে 'গাইতে' হওয়া উচিত।

(৮) লওয়া ধাতু সাধুভাষার ধাতু, ইহার চলিত রূপ নি।—ইয়াছি সাধুভাষার বিভক্তি, উহার চলিত রূপ—এছি। সুতরাং সাধু লি+ইয়াছি—লইয়াছি এবং চলিত ভাষায় নি+এছি—নিয়েছি। 'নিয়াছি'

উল্লিখিত পদগুলি অধুনা প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে অচল হইলেও, পরবর্ত্তীকালে যে ব্যাকরণ রচিত হইবে তাহাতে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেইজন্যই ভবভূতি বলিয়াছেন—

"লৌকিক সাধুরা অর্থ অনুসারে বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু আদ্য ঋষিগণের বেলা অন্যরূপ। তাঁহারা ইচ্ছামত বাক্য প্রয়োগ করেন, ভাব তাহার অনুবর্ত্তন করে। ইহার ভাবার্থই এই যে, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা ভাষায় যাহা প্রয়োগ করিবেন তাহাই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাই অর্থ প্রকাশ করিবে।

অর্থ পরিবর্ত্তন

মনের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ়, তাহা জানিলে বাগর্থ পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন প্রণালীর অনুসরণ করা সহজ হইবে। সেইজন্যই এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল। আমরা দেখিলাম দেশ কাল পাত্র এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থা মনের উপর যেরূপ ক্রিয়া করে শব্দার্থও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থ পরিবর্ত্তনের মোটামুটি তিনটি ধারা আছে,—(১) সাম্প্রসারণ, (২) সঙ্কোচন এবং (৩) আরোপণ।

(১) সম্প্রসারণ

যে শব্দের যখন উৎপত্তি হয় তখন তাহার একটি স্বতন্ত্র অর্থ থাকে। সেই শব্দটি তখন বিশেষ কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই নিয়োজিত হয়। কালক্রমে দেখা যায় তাহা পুরাতন অর্থের বন্ধন না মানিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন অর্থ অধিকার করিয়া বসে। ইহাকেই অর্থ সম্প্রসারণ বলা হয়।

'কপাল' বলিতে ললাট বুঝায়। ঐ অর্থেই প্রথমে 'কপাল' শব্দের ব্যবহার হইলেও পরে 'অদৃষ্ট' এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুদের সংস্কার এই যে, মানুষের জীবনে যাহা যাহা ঘটিবে বিধাতাপুরুষ তাহা জীবনের প্রারম্ভেই ললাটে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংস্কার বশত হিন্দুরা ললাটলিপি বা কপালের লেখা বলিতে অদৃষ্টকে বুঝে। পরে লিপি বা লেখা উঠিয়া গেল। শুধু ললাট বা কপাল অদৃষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল।

'এঁঠো' শব্দ সংস্কৃত 'আমৃষ্ট' হইতে আগত। ইহার অর্থ—যাহা ঘাঁটাঘাঁটি বা চটকান হইয়াছে। আমরা যাহাকে 'সকড়ি' বলি, 'আমৃষ্ট' শব্দ কতকটা সেই অর্থ সূচনা করে। কিন্তু 'আমৃষ্ট' শব্দের তদ্ভবরূপ 'এঁঠো' বাঙ্গালা দেশে আরও একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বিতীয় অর্থ উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট। এখানে 'এঁঠো' শব্দের অর্থ সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে।

আমাদের 'পরশু' শব্দ অর্থ-সম্প্রসারণের আর একটি নিদর্শন। এই শব্দ সংস্কৃত 'পরশ্ব' হইতে প্রাপ্ত। পরশ্ব শব্দের অর্থ আগামী কল্যের পর দিবস। কিন্তু বাঙ্গালায় 'পরশু' শব্দ শুধু ভবিষ্যদ্বাচী নয়, উহা অতীত কালও সূচনা করে। আমরা 'পরশু' বলিলে গত কালের পূর্ব্ব দিবসও বুঝিয়া থাকি। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সেইজন্য আমরা 'গত পরশ্ব' 'আগামী পরশ্ব' এইরূপ কৌতুকজনক পদ প্রয়োগ করি। হিন্দী 'পরশু' শব্দেও ঠিক বাঙ্গালার ন্যায় অর্থ-সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ওড়িয়াতেও 'পরশু' শব্দের অর্থ বাঙ্গালার অনুরূপ।

'বোতল' 'গেলাস' প্রভৃতি শব্দ আধারবাচক হইলেও অনেক সময় আধেয়কেও বুঝাইয়া থাকে।

নামবাচক শব্দ বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া অনেক সময় অর্থের বিস্তার ঘটায়। ছেলেরা দুগ্ধাভাবে 'ওলিক' খায়। 'বাতাবিয়া' দেশে উৎপন্ন বলিয়া ফল বিশেষেরও ঐ নাম হইয়াছে। অবশ্য মূল শব্দটি কিছু বিকৃত হইয়া 'বাতাপি'তে পরিণত হইয়াছে। 'ডি গুপ্ত' ব্যক্তি বিশেষের নাম, তাহা হইতে একটি প্রসিদ্ধ জ্বরের ঔষধ ঐ নাম পাইয়াছে। 'গঙ্গা' নদী বিশেষের নাম, কিন্তু 'গঙ্গা'র অপভ্রংশ 'গাঙ্' বা 'গাঙ্' নদী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নঞের অর্থ পরিবর্ত্তন

শুধু নঞ্ শব্দের অর্থ কত রকম পরিবর্ত্তন গ্রহণ করে তাহা লক্ষ্য করিলে শব্দার্থ প্রসারণের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। নঞ্-এর মূল অর্থ 'না'। কিন্তু ক্রমশঃ ঐ শব্দ

শব্দে চলিত ধাতুর সহিত সাধু বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ নহে। আবার কেহ যদি সাধুভাষার ধাতুর সহিত চলিত ভাষার বিভক্তি যোগ করিয়া 'লয়েছি' লিখেন, তাহাও ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অভাব, অল্পতা, অন্যত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কখনও কখনও নঞের স্বার্থে প্রয়োগও হইয়া থাকে।

শব্দের সহিত নঞর্থক উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতির যোগে নেতিবাচক শব্দেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। যেমন—আদি নাই যাহার—সে অনাদি। সীমা নাই যাহার—সে অসীম। ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই যাহার—সে অভাব। এইরূপ জন নাই যেস্থানে, সে স্থান নির্জ্জন। কড়ি নাই যাহার, সে নিকড়ে। ঘৃণা নাই যাহার, সে নিঘিন্নে।

কিন্তু নঞের অর্থ চিরকাল না রহিল না, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

অল্পতা

'অভাব' শব্দটির কথাই প্রথমে ধরা যাউক। ইহার মূল অর্থ না থাকার ভাব। যেমন আলোর অভাব—অন্ধকার। কিন্তু এই অর্থ বদলাইয়া অভাবের নূতন আর এক অর্থ হইল অল্পতা। যেমন ;—অন্নের 'অভাব', ভিক্ষার 'অভাব' ইত্যাদি। আবার তাহা হইতে 'অভাব' শব্দ দারিদ্র্য অর্থেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যেমন ;—'অভাবে' স্বভাব নষ্ট।

'অবুদ্ধি' শব্দের অর্থ অল্পবুদ্ধি। 'অবুঝ' শব্দেরও ঐ অর্থ। 'অগেয়ানী' মানেও যাহার জ্ঞান বা বোধশক্তি অল্প।

অন্যত্ব

'অসুখ' বলিলে বাঙ্গালায় ঠিক সুখের অভাব বুঝায় না। যদি বা বুঝায়, তাহা গৌণত। কিন্তু প্রধান অর্থ হয় রোগ। এইরূপ 'অসিত' শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। যেমন ; অসিতবরণী শ্যামা। 'অপার্থিব', 'অলৌকিক' প্রভৃতি শব্দের নঞ্ ও ঐ ধরণের।

বৈপরীত্য

'অসুর' বলিলে কেবল সুরবিরোধী রাক্ষসই বুঝায়। মানুষ ত সুর নয়। কিন্তু অসুর বলিলে মানুষ বুঝাইবে না। তেমনি 'অমিত্র' বলিলে মিত্র ভিন্ন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে না, কেবল শত্রুকে বুঝাইবে।

অপ্রাশস্ত্য

কদর্থে নঞ্ প্রয়োগের অনেক উদাহরণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। 'অঘাট' বা 'আঘাটা' বলিলে খারাপ ঘাট বুঝায়। 'অকাল' শব্দের অর্থও অপ্রশস্ত কাল। 'অকাজ' শব্দ কুকাজ অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'অমানুষ' 'অসময়' 'অপথ' প্রভৃতি শব্দের 'অ'ও নেতিবাচক নয়, মন্দবাচক। রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্রে দেখি ;—

"অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যান।"

আবার ভারতচন্দ্রের একটি ছত্র উদ্ধৃত করি ;—

"যত করে মুসলমান সকলি অকাজ।"

অব্রাহ্মণ বলিলে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বুঝাইবে। 'অকথ্য' শব্দের নঞেও মন্দার্থ দেখা যায়।

নিষেধ

মদ্য 'অপেয়' বলিলে পেয় নয় এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আবার মন্দ পেয় বলিলেও সুরা পানের যে অপরাধ, তাহার গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যায়। এখানে সেই কারণে 'অপেয়' শব্দ নিষিদ্ধ পেয় এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। গোমাংস অভক্ষ্য বলিলেও নিষিদ্ধ ভক্ষ্যই বুঝায়।

স্বার্থ

খাদ্য পরিবেশনের সময়ে আমরা যে "না—না" বলি, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু সব সময় না নয়। সেইজন্য ব্যাঘ্রঝম্পনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভোক্তার অন্নপাত্রে আহার্য্য দিবার ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ স্বার্থে প্রযুক্ত নঞের উদাহরণ বাঙ্গালায় অনেক আছে।

"আঘোর পাপে তোর বেআপিস গা।" কৃঃ কীঃ। এখানে আঘোর শব্দের অর্থ ঘোর। 'নাবালক' শব্দের নাকেও অনেকে স্বার্থে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করেন। এই শব্দের আলোচনা স্থানান্তরে করিয়াছি।

"আছুক লাভ মোর মূলত আকার।" কৃঃ কীঃ—মূলত আকার—ইহার অর্থ, মূলেই ফাঁক। √ ফার্ (বিদারণে) হইতে ফাঁক অর্থে 'ফার' শব্দ। আ স্বার্থে প্রযুক্ত। ঐরূপে 'আবাল' বালক অর্থে, 'আবালী' বা 'আবালি' বালিকা অর্থে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় বালিকা অর্থে 'অকুমারী' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। মন্দার্থে 'অমন্দ' শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালার পল্লীতে এখনও বিরল নহে। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের

'খিচুড়ি', 'বাড়ী', প্রভৃতি শব্দে 'যা মানেই তা' সকলেরই মনে প্রক্রিয়ার কথা।

(২) সঙ্কোচন

শব্দের মূল অর্থের ব্যাপকতা কখনও কখনও কমিয়া যায়। ইহাকেই অর্থ সঙ্কোচন বলা যায়। 'অন্ন' শব্দ √অদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার মূল অর্থ খাদ্য। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত বলিয়া 'অন্ন' শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া এখন কেবল ভাতই বুঝায়।

'মুনিস' ও 'মিনসে' মনুষ্য শব্দের অপভ্রংশ হইলেও মানব সাধারণ অর্থে উহাদের ব্যবহার আর হইবে না।

বাঙ্গালায় চলিত বহু বিদেশী শব্দে অর্থসঙ্কোচ ঘটিয়াছে। 'ইষ্টিশেন' 'পিওন' 'টিকিট' 'ডাক্তার' প্রভৃতি শব্দ তাহার নিদর্শন। ইষ্টিশেন বলিলে কেবল Railway Station বুঝায়। 'পিওন' বলিলে 'ডাক পিওন' বুঝায়। 'টিকিট' রেলের কিম্বা ডাকঘরের। 'ডাক্তার' (Doctor) শব্দটির অর্থ কোন বিষয়ে পণ্ডিত বা পারদর্শী। Doctor of Philosophy, Doctor of Science প্রভৃতি উপাধি তাহার প্রমাণ। কিন্তু আমরা ডাক্তার অর্থে কেবল চিকিৎসকই বুঝি।

'পাউডার' বলিলে মুখে মাখিবার একপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য বুঝায়। 'এসেন্স' শব্দের অর্থ সার। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহার অর্থ পুষ্পসার।

'পৈতা' পবিত্র শব্দজাত। কিন্তু বহুবিধ পবিত্র দ্রব্যের মধ্যে কেবল উপবীতকেই বুঝায়।

'মৃগ' শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে পশুকে বুঝাইত, 'মৃগেন্দ্র' 'মৃগরাজ' প্রভৃতি শব্দে সেই অর্থ বর্ত্তমান। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে 'মৃগ' শব্দ পশুজাতিকে না বুঝাইয়া বিশেষ এক জাতীয় পশুকেই বুঝাইল। বাঙ্গালাতেও সেই অর্থই প্রচলিত। অবেস্তা ভাষায় মরেঘ শব্দের অর্থ পক্ষীজাতি। এই শব্দ হইতে ফার্সী 'মুর্ঘ' শব্দ আসিয়াছে, তাহা হইতেই বাঙ্গালা 'মোরগ' এবং 'মুরগী' শব্দের উৎপত্তি। এই 'মোরগ' বা মুরগী শব্দে অর্থসঙ্কোচ ঘটিয়াছে। ইহা সমগ্র পক্ষীজাতিকে না বুঝাইয়া বিশেষ এক জাতীয় পক্ষীকেই বুঝায়।

কাগজ বলিলে সকল প্রকার কাগজকেই বুঝায়; কিন্তু আজিকার 'কাগজ' বলিলে খবরের কাগজ ভিন্ন অন্য কোন কাগজের কথা মনে হয় না। এখানেও কাগজ শব্দের অর্থ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। পূর্ববঙ্গীয় ছাত্ররা কাগজ না বলিয়া এই স্থলে প্রায় শুধু paper বলেন। ফার্সী 'চাকর' শব্দের অর্থ বেতনভুক্ কর্ম্মচারী। কিন্তু 'চাকর' শব্দ কেবল ভৃত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার 'চাকরি' বলিলে ঠিক চাকরের কাজ বুঝায় না। 'চাকরে স্বামী' বলিলে যে স্বামী 'চাকর'— তাহাকে বুঝাইবে না।

(৩) আরোপণ

কখনও কখনও শব্দের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন অর্থ দেখা দেয়। ইহাকেই অর্থ আরোপণ বলে। এক অর্থের স্থানে অন্য অর্থ আরোপিত হয় বলিয়াই এইরূপ নামকরণ।

'বুজরুকি' শব্দের অর্থ আমরা জানি ভণ্ডামি এবং 'বুজরুক'এর অর্থ ভণ্ড বা ছলনাকারী। কিন্তু ফার্সি 'বুজুর্গ' শব্দ, যাহা হইতে 'বুজরুক' পাই, ভাল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ,—সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানী।

'জ্যেঠামি' শব্দটিও অর্থারোপের দৃষ্টান্ত। মেয়েটা ভারী 'জ্যেঠা' বলিলে 'জ্যেঠা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না। সংস্কৃতে 'কৃপণ' শব্দের অর্থ কৃপার পাত্র—বাঙ্গালায় উহার অর্থ ব্যয়কুণ্ঠ। 'ওঝা' (√ উপাধ্যায়) শব্দের মূল অর্থ পণ্ডিত বা শিক্ষক। বর্ত্তমান অর্থ রোগ চিকিৎসক। 'হঠাৎ' সংস্কৃতে বুঝায় অবিমৃষ্যকারিতা বশত —বাঙ্গালায় ইহার অর্থ অকস্মাৎ।

অর্থ পরিবর্ত্তনের কারণ

শব্দের অর্থ যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন লাভ করে তাহার কারণ কি? কারণ আছে, কিন্তু সেগুলি মানুষের মনে। মানব মনের চিন্তারাশির সংজ্ঞা এবং সংখ্যা দেওয়া যেমন অসম্ভব, অর্থ পরিবর্ত্তনের কারণসমূহেরও সেইরূপ। তবে ভাব সংসর্গই (association of ideas) সকল কারণের মূলে ক্রিয়া করে—এই কথাটি সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক শব্দের মধ্যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ভাবের আভাস থাকে। কিন্তু শব্দটি শুনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির মনে যে একই রূপ ভাবের উদয় হইবে, এমন নয় কেহ শব্দটি শুনিয়া সব কয়টি ভাবই গ্রহণ করিল, কেহ বা কতকগুলি মাত্র বুঝিল। কাহারও মনে আবার অন্যরূপ

অন্য ভাবের উদয় হইল। এইগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্থ পরিবর্ত্তনের মূল সূত্রটি ধরা যাইবে।

অনেকগুলি শব্দ আলোচনা করিয়া দেখিলে অর্থ পরিবর্ত্তনের কয়েকটি মোটামুটি কারণ নির্ণয় করা যায়। শ্রেণীবিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

(১) আলঙ্কারিক প্রয়োগ
 (ক) উপমান ও উপমেয়
 (খ) লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ
(২) সৌজন্য ও শিষ্টাচার
 (ক) মুসলমানী আদবকায়দা
 (খ) বৈষ্ণবীয় বিনয়
(৩) বক্রোক্তি
 (ক) অপ্রিয়তা নিবারণ
 (খ) অন্ধ সংস্কার
(৪) ব্যাজোক্তি
(৫) পরিবেষের অনৈক্য (অবস্থাভেদ)
 (ক) স্থানগত
 (খ) কালগত
 (গ) পাত্রগত
 (ঘ) সমাজগত
 (ঙ) বস্তুগত
(৬) ভাবাবেগ
(৭) ব্যষ্টি স্থলে সমষ্টি
(৮) সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি
 (ক) দেহের পরিবর্ত্তে অঙ্গের নাম
 (খ) এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনার সম্বন্ধে ইঙ্গিত
(৯) অনবধানতা
(১০) অর্থ সৃষ্টি
(১১) অর্থের অনির্দ্দিষ্টতা
(১২) গৌণার্থ প্রাধান্য

(১) আলঙ্কারিক প্রয়োগ

আমরা বাক্যের ভাব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্য অনেক সময় বিশেষণ উপমা প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। একই শব্দের মধ্যে একাধিক ভাবের অস্তিত্ব থাকে। বক্তা যখন ভাববিশেষের প্রতি শ্রোতার মন আকর্ষণ করিতে চান তখন এইরূপ উপমাদির প্রয়োজন হয়। সুশ্রাব্য এবং মনোহারী করিবার জন্যও অলঙ্কারের প্রয়োজন। এইরূপ প্রয়োগে শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হয়।

ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ পারাবার ॥ ভারতচন্দ্র

যাঁর নামে পার করে ভব পারাবার
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে কবে পার ॥ ভারতচন্দ্র

হৃদয় ডুবে যায় হরষ পারাবারে। ব্রহ্মসঙ্গীত

অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার। ধাত্রীপান্না

উপরোক্ত চারিটি স্থলেই 'পারাবার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহার পার নাই—'পারাবার' শব্দের এইরূপই অর্থ। তাহা হইতে 'পারাবার' শব্দ কেবল সমুদ্রার্থেই প্রযুক্ত হয়। সমুদ্রের নাম করিলেই মানুষের মনে নানা ভাবের উদয় হয়। সমুদ্রে জল আছে, তরঙ্গ আছে, মকর কুম্ভীর আছে। সমুদ্র কখনও প্রশান্ত কখনও বিক্ষুব্ধ। সমুদ্র কাহারও নিকট রমণীয়, কাহারও নিকট ভয়ঙ্কর। উহা গভীর, গম্ভীর, বিপুল এবং মহান্। সমুদ্র নামের সহিত এই সকল এবং আরও নানাবিধ ভাব জড়িত। তাই শুধু 'পারাবার' শব্দে বিশাল জলরাশি বুঝাইলেও উপরোক্ত উদাহরণসমূহে 'পারাবারে'র কয়েকটি বিশেষগুণই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। প্রথম উদাহরণে 'পারাবার' শব্দে আধিক্য বুঝাইতেছে। সমুদ্রে জল অধিক। সেই আধিক্য-গুণটার প্রতিই কবির লক্ষ্য। এই কারণে সুখ-পারাবার শব্দে অত্যধিক সুখ বুঝায়। উত্তাল তরঙ্গ, ভীষণ গর্জ্জন, সীমাহীন নীলিমা প্রভৃতি সমুদ্রের অন্যান্য যে সকল গুণ আছে সে সকলের কথা এই প্রসঙ্গে মনে উদিত হয় না। আবার দ্বিতীয় উদাহরণে 'পারাবার' শব্দ দুস্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রের প্রশান্ত মহিমা, গম্ভীর সৌন্দর্য্য, অমূল্য রত্নরাজি—এ সকলের কিছুই এখানে কবির মনকে আকর্ষণ করে নাই। কেবল উহার সীমাহীন বিস্তারের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া দেখিলে ইহাই পারাবার শব্দের আক্ষরিক অর্থ। আবার তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'পারাবারে'র গভীরতা এবং গৌণত উহার (অর্থাৎ উহার জলের)

তারল্যও কবির লক্ষ্য। ডুবিবার জন্য গভীর তরল বস্তুরই প্রয়োজন। সর্ব্বশেষ উদাহরণে 'পারাবারে'র দুইটি গুণ কবি নিজেই তুলিয়া দিয়াছেন। তাহার অতল গভীরতা এবং অপার বিস্তার এই দুইটি গুণ ভিন্ন আর কোন গুণের প্রতি কবি এখানে দৃষ্টিপাত করেন নাই। উপমার দ্বারা একই 'পারাবার' ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করিল।

হৃদে 'বিষ' মুখে 'মধু' জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। কবিকঙ্কণ

উদ্ধৃত ছত্রে 'বিষ' বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। প্রাণের মত প্রিয় বস্তু মানুষের ত আর কিছুই নাই। বিষ সেই প্রাণ নাশ করে। সুতরাং মানুষ তাহাকে অনিষ্টকারী জানিয়া ঘৃণা করে, ভয় করে। আবার হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি যে সব প্রবৃত্তি মানুষের মনকে নিয়ত পীড়িত করে সেগুলিও অনিষ্টকারী। 'বিষ' এবং 'দ্বেষ'—অনিষ্টকারিতা ইহাদের সামান্য গুণ। তাই ইহাদের একটা উক্ত হওয়াতে অন্যটাও বুঝাইতেছে। 'মধু' সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। 'মধু' রসনার পক্ষে প্রীতিকর। প্রিয়বচন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রীতিকর। প্রীতিকরত্ব উভয়েরই সামান্য গুণ। তাই 'মধু' বলায় প্রীতিপূর্ণ বচন বুঝাইতেছে।

'মুখমিষ্টি', ঠোঁটপাতলা,' 'হাড়কালি' (১) এই তিনটি কথার প্রথমটিতে 'মিষ্টি' শব্দ রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ষড়্‌রসের অন্যতম মধুর রসকে বুঝাইতেছে না। যে সুন্দর কথা বলে, তাহার মুখকে 'মিষ্টি' বলা হইতেছে।

'ঠোঁট-পাতলা' লোকের ঠোঁট পাতলা নাও হইতে পারে। যে ব্যক্তি কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকে 'ঠোঁটপাতলা' লোক বলা হয়। 'পাতলা' বস্তর ধর্ম্মই এই যে তাহা সহজেই ছিঁড়িয়া যায় অর্থাৎ তাহা সহজ-ভেদ্য। তাহার দ্বারা কোন জিনিস আবৃত রাখা নিরাপদ নহে। কারণ আবরণ ভেদ করিয়া তাহা অনায়াসেই বাহির হইয়া আসিতে পারে। বিপরীত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, যাহার মধ্য দিয়া কোন বস্তু সহজে নির্গত হইয়া আসে তাহা 'পাতলা'। সেই কারণেই যাহার ঠোঁটের মধ্য দিয়া সহজেই কথা বাহির হয় তাহার ঠোঁটকে 'পাতলা' আখ্যা দেওয়া হইল। 'পাতলা' শব্দের উৎপত্তির মূলেও উপমা আছে। যাহা পাতার ন্যায় তাহাই 'পাতলা'।

দুঃখের সংস্পর্শে দেহমধ্যস্থ অস্থি কাল হইয়াছে। এই কল্পনাই 'হাড়কালি' শব্দে 'কালি' শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছে। আবার 'লাল কালি' শব্দে কালির অর্থ আর একপ্রকার। সে আলোচনা স্থানান্তরে করা হইয়াছে।

উপমান ও উপমেয়

উপমার দ্বারা উপমেয় যেমন অর্থ পরিবর্ত্তন করে, উপমানের অর্থও তেমনি বদলাইয়া যায়।

আনন্দ 'অমৃত'-রূপে উদিবে হৃদয় আকাশে। ব্রহ্মসঙ্গীত

এখানে 'অমৃত' শব্দে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; সুতরাং উপমান চন্দ্র উহ্য থাকিলেও চন্দ্র যে অমৃতার্থক বা অমৃতময় তাহা পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হয় না (১)। 'আকাশ' শব্দের উল্লেখ থাকাতে 'অমৃত'কে একবার উপমেয় বলিয়া ধরিলাম। আবার আনন্দ শব্দের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে হইলে 'অমৃত' উপমেয় নয়, উপমান।

'নুন খাই যার, গুণ গাই তার।' প্রবাদ বাক্য

এখানে 'নুন' উপমান; উপমেয় ক্ষুদ্র উপকার বা ঐরূপ কোন শব্দ উহ্য। কিন্তু সেই উহ্য উপমেয়ের দ্বারাও 'নুনে'র বাচ্যার্থ বদলাইয়া গিয়াছে। এখানে 'নুন' শব্দের অর্থ অতি সামান্য উপকার।

আবার পরস্পরের সাহচর্য্যে উভয়েই অর্থ বদলায়। তবলার বাদ্য শুনিতে শুনিতে যখন বলি—তবল্‌চির হাতখানি মিঠে—তখন 'হাতে'র অর্থ হয় বাদ্য এবং 'মিঠে'র অর্থ সুশ্রাব্য।

লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ

মূল কথা শব্দের শক্তি অসীম। এই কথার মধ্যে অসংখ্য ভাবের ব্যঞ্জনা থাকে। বাচ্যার্থ ব্যতীতও অন্যান্য যে সব অর্থ প্রতি শব্দের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে আলঙ্কারিক প্রয়োগের দ্বারা সেগুলি প্রকাশিত হয়। তখনই শব্দের

(২) মাস হয়েছে ভাজা ভাজা, হাড় হ'য়েছে কালি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। ছেলেভুলান ছড়া।

(১) সুধাকর, সুধাধার প্রভৃতি শব্দ চন্দ্রার্থক। উহাদের অর্থ অমৃতের পাত্র বা আকর।

নূতন অর্থ জন্মলাভ করিল বলি। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে— অর্থ ত্রিধা বিভক্ত ;—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ।

আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোয়াইল ডাল।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন

এই ছত্রে ডাল বাচ্যার্থ বৃক্ষশাখা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু—

যে 'ডালে' করো মো ভর সে 'ডাল' ভাঙ্গিঞা পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এখানে 'ডাল' শব্দ ব্যঞ্জনার দ্বারা আশ্রয় এই অর্থ বুঝাইতেছে। পাখীর পক্ষে 'ডাল' আশ্রয়। এস্থলে পাখীর নাম না থাকিলেও 'ডাল' শব্দের দ্বারা আশ্রয় এই ভাবটি বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা জন্মে না। এইখানে ডালের যে অর্থ তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলা হয়।

'বৈকুণ্ঠ' শব্দে আমরা বিষ্ণুলোক বুঝি, কিন্তু—

শুধু 'বৈকুণ্ঠে'র তরে বৈষ্ণবের গান। রবীন্দ্রনাথ

এই ছত্রে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণকে বুঝাইতেছে।

বাচ্যার্থ ব্যতীতও শব্দের লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ প্রকাশের শক্তি আছে বলিয়াই উপমাদির দ্বারা শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হয়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

"পথ যদি রয় বাকী"

শ্রীহাসিরাশি দেবী

যে পৃথিবী তব ডুবেছে বন্ধু হৃদয়-সাগর তলে
যাহারে পাবে না ফিরে,—
তাহার-লাগিয়া-জ্বালিয়া রেখ' না প্রদীপ নয়ন-জলে
ধূলার ধরণী ঘিরে ;
হেরিয়ো না কভু বসি আনমনে,
তোমার সুদূর সান্ধ্য-গগনে
ক্লান্ত-বিহগ প্রসারিয়া পাখা আপনারে বহি-ধীরে,
লক্ষ্য-হারা-সে একা চলিয়াছে মরণ-তমসা-তীরে।

কল্পলোকের সোনার ঘাটেতে ভিড়েছিল যেই তরী
সওদা হ'লো না কেনা,
পথের পাথেয় ফুরালো যাহার জীবন শূন্য করি ;
সে কিছু কি লইবে না ?
যদি নাহি মিলে সাগরের কূল,
যদি হয় পথ বারে বারে ভুল,—
সেই ভয়ে ভীতু আর কোনো দিন তরণী কি ভাসাবে না ?
যে ধরণী চির আনন্দহীন, ছলে তারে হাসাবে না !

দূর গগনের মেঘের দেউলে নিভিয়াছে আঁখি তারা,
দুঃখ নাই তার লাগি,
চির পথিকের সমাধি নহেক' শান্তির মোহ-কারা—
বন্ধু, ভুলেছ তা-কি !
শূন্য তোমার ভিক্ষার ঝুলি,
পুনরায় নাও দুই হাতে তুলি ;
যদি বা ফুরায় সে পাথেয় তব, আবার লইয়ো মাগি',
আশার আলোকে আবার চলিয়ো,—পথ যদি রয় বাকি॥

লক্ষ্মীর বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—শঙ্করের পরীক্ষা

ক্ষান্তমণির কল্পনাতে যখন সুকৃতি ও শঙ্করের বিবাহ কথাটা বড় হইয়া উঠিল, তখন তিনি সহজে তাহাকে ক্ষান্তি দিতে চাহিলেন না। কিন্তু স্বামীর কাছে একেবারে উৎসাহ না পাইয়া অভিপ্রায় ঠিক সরল পথে—সিদ্ধির পথে চলিল না।

নটবর ছিলেন অসামান্য পুরুষ। তাঁহার সংসারে গভীর বিতৃষ্ণা ছিল, যদিও খরচপত্র তিনি দিতেছিলেন। সে খরচ দেওয়ার বিধিও ছিল অসামান্য। পোনর বৎসর পূর্ব্বে তিনি হিসাব করিয়া সংসারের খরচ ঠিক করিয়া সমস্তই ক্ষান্তমণিকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই পোনর বৎসর তোমাদের প্রতিপালনের ভার আমার। এটা সংসার ধর্ম্ম করার দণ্ড আমার। কিন্তু এর পর আমার সঙ্গে তোমাদের কোনও সংস্পর্শ থাকবে না জেনো। আমাকে কখনও যদি বিরক্ত কর, তবে সবাইকে সেই দিনই বিদায় করে দেব। সে পোনর বৎসরের প্রায় এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষান্তমণির পুত্রদ্বয় অত্যাচার করিয়া তাঁহার সমস্ত পুঁজি নিঃশেষিত প্রায় করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যত ভাবিয়া নটবরের পত্নী বিভীষিকা দেখিতেন। ছেলেরা বলিত "ভয় কি, বাবাকে খুন ক'র্‌বো!"

স্বামীর কাছে উৎসাহ পাইলেন না দেখিয়া ক্ষান্তমণি পুত্রদের বলিলেন। পুত্ররা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "দাও গে। চুলোয় বিয়ে দাও গে। আমাদের কি?" বড় মন্তব্য করিলেন, "একেবারে Villageman (পাঁড়াগেয়ে)"। ছোট বলিলেন, "নট্‌ ওয়ান ইংলিস্‌ (not one English) ছ্যাঃ!"

ক্ষান্তমণি বিরক্তভাবে কহিলেন, "তবে ভাল পাত্র দেখে দে না তোরা। খেয়ে দেয়ে আড্ডা মেরে বেড়াস—বাড়ীর একটা কাজ ক'র্‌তে পারিস না!"

পুত্র দুইজন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হোয়াট্‌।"

ক্ষান্তমণি কহিলেন, "ভট্‌ ভট্‌ কি করিস্‌? সত্যি কথা যা তাই বলি। যেমন বাপ তেমনি সব ছেলে! আমার কপাল! মলেই এখন বাঁচি।"

বড় পুত্র কহিলেন, "দ্যাট্‌স্‌ ইট্‌! বাপ ভদ্রলোকের মত হ'লে আমরাও হ'তুম!" ছোট বলিলেন, "এমনিতে আমরা ঢের সিভিলাইজড্‌।"

ক্ষান্তমণি আর বিতর্ক করিলেন না। আপন মনে বকিতে বকিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন, সমস্তই তিনি অজ্ঞাত বিধাতা পুরুষের দয়ার উপরই দিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিবাহের প্রশ্নে তাহা করিয়াও করিতে পারিলেন না।

সুকৃতি সমস্ত শুনিত, মুখে কিছু বলিত না। তাহার ভাবিবার বয়সও হইয়াছিল—সংসারের আবহ সে বুঝিতে পারিল। নটবরের প্রকৃতি ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে তাহার মাঝে মাঝে গভীর সংশয় হইত। কিন্তু সে নিরুপায়। তাই তার মনের ভিতর বহু দিবসাবধিষ্ট অনেক বিতৃষ্ণা, অনেক বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। শঙ্কর আসার পর নির্দ্দোষ শঙ্করের উপর সময়ে অসময়েই এই পুঞ্জীভূত বিরক্তি ও বিদ্বেষ সে বাক্যে প্রকাশ করিত। তাহার সহিত বিবাহের কথাটাকে সুকৃতি আপন মনে অনেক বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখিল। তাহাতে সে শঙ্করের উপর অকস্মাৎ ক্রুদ্ধই হইয়া উঠিল। বিশেষত যখনই তাহার সেই লক্ষ্মীর কথা মনে পড়িত, সে যেন ধৈর্য্য হারাইত। তদবধি সে শঙ্করকে দেখিলেই একটা কিছু করিয়া বা বলিয়া শঙ্করকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিত।

যে দিন দিগ্বিজয় আসিয়া নটবরকে লক্ষ্মীর সংবাদ দিয়া গেল, সে দিন বিকালে চারটা নাগাদ যখন শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সুকৃতি আসিয়া পুনরায় দেখা দিল। সে সুকৃতিকে দেখিয়াই ভীত হইল, কেন না তখনও তাহার পকেটে মুখুয্যে মশায়কে লেখা

চিঠিখানা ছিল। পূর্ব্বে একদিন মুখুয্যেমশায়ের চিঠিখানি সুকৃতি লইয়া গিয়াছিল, ফেরত দেয় নাই; এখন আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছে সে বুঝিতে পারিল না। সুকৃতি তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার ইতস্তত দেখিয়া লইয়া বলিল, "পড়াশোনা ক'রতে যাবে? এতদিনে কি পড়েছ, দেখি।"

শঙ্করের মুখ শুকাইল। সুকৃতির নিজের বিদ্যার দৌড় দ্বিতীয় ভাগের মাঝামাঝি হইলেও সে বটতলার নভেল পড়িতে পারিত। শঙ্কর তাহাকে মাঝে মাঝে নভেল পড়িতে দেখিত, তাই সে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল, "এখনও সব বই শেষ হয় নি।"

সুকৃতি প্রথমে বলিল, "ঢেঁকি!" তারপর বলিল, "কি পড়া হ'য়েছে? কতটা পড়া হ'য়েছে? কোথায় পড়্তে যাও দুবেলা? ইস্কুলে?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "ভট্‌চাজ মশায়ের কাছে পড়তে যাই; তবে সব দিন পড়া ঠিক হয় না কি না, তাই বই পড়া হ'য়ে ওঠে না।"

সুকৃতি আবার বলিল, "ঢেঁকি!" শঙ্কর ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে সুকৃতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুকৃতি শঙ্করের হাত হইতে শ্লেট, বোধোদয় ও শুভঙ্করী কাড়িয়া লইয়া শ্লেটখানা নীচে ফেলিল, শুভঙ্করীর পাতা উল্টাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, বোধোদয়ের মলাটের উপর চক্ষু বুলাইয়া ভিতরের পাতা দেখিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "বস্তু কাহাকে বলে?"

বস্তু সম্বন্ধে শঙ্করের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনও জ্ঞান ছিল না। "বোধোদয়" সে কিনিয়াছিল, কিন্তু কোনও দিন খুলে নাই। সে "হাঁ" করিয়া সুকৃতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুকৃতি পুনরায় প্রশ্ন করিল, "উদ্ভিদ কাহাকে বলে?"

শঙ্কর "উদ্ভিদের" কথা শুনিয়াছিল বটে একদিন—কবে বাল্যকালে—কিন্তু উদ্ভিদ্ কি তাহা তখন তাহার স্মরণ হইল না।

সুকৃতি নূতন বোধোদয়খানি শঙ্করের মুখের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ঢেঁকি!" তারপর সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

শঙ্করের এরূপ অবস্থা কখনও আর পূর্ব্বে ঘটে নাই। সে কিছুকাল বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভূপতিত "বোধোদয়"খানি তুলিয়া লইল। তাহার পশ্চাতের পৃষ্ঠাখানি আঘাতের ফলে বিধ্বস্ত হইয়াছে দেখিয়া সে দুঃখিত হইল। না পড়িলেও পুস্তকের উপর শঙ্করের একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তারপর সে ভিতরের পাতাগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার মধ্য হইতে "বস্তু" বা "উদ্ভিদ্" কিছু বাহির হয় কি না। কিন্তু কিছুই বাহির না হওয়াতে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া সে আবার শ্লেট ও শুভঙ্করীখানি তুলিয়া ঝাড়িয়া লইয়া ভট্টাচার্য্যের গৃহাভিমুখে গেল।

সেখানে পৌছিয়াই সে প্রাত্যহিক নিয়মমত সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইল। নানারূপ বিস্ময়ের আঘাতে শঙ্কর ক্রমশ মরিয়া হইয়া উঠিতেছিল, সে স্ত্রীলোকটি তাহার অভ্যস্ত আলাপ ও প্রশ্ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শঙ্কর বলিল, "বস্তু কি? উদ্ভিদ্ কাহাকে বলে? বল দেখি?"

স্ত্রীলোকটি মোড়ার উপর বসিয়া বিস্মিতভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "বল শীগ্‌গির! বস্তু কি? উদ্ভিদ্ কাহাকে বলে? আজ তোমাকে কিছু বল্‌তেই হবে!"

স্ত্রীলোকটি ইঙ্গিতে তাহার হাতের শ্লেট ও বই দেখাইল। শঙ্কর অগ্রসর হইয়া তাহার শ্লেট ও বই স্ত্রীলোকটিকে দিতেই সে বই দুইখানি ফেলিয়া দিয়া ইঙ্গিতে পেন্সিল চাহিল। শঙ্কর পেন্সিল দিল। তখন স্ত্রীলোকটি প্রায় এক ইঞ্চি হরফে লিখিল—"শ্রীমতী রাধারাণী দাসী। গ্রাম মধুপুর, জেলা রঙ্‌পুর।" প্রায় সারা শ্লেট ভর্ত্তি হইয়াই গেল, আর অত্যন্ত মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত অক্ষরগুলি অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইল।

লেখা শেষ হইলেই শ্লেটখানি শঙ্করের হাতে ফিরাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া অন্ধকার দালানের পর গলিপথে অদৃশ্য হইল। শঙ্কর একবার হস্তস্থিত শ্লেট ও একবার সেই অন্ধকার পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতেছে, ঠিক পশ্চাতেই ভট্টাচার্য্যের আগমন বুঝিতে পারিল।

ভট্টাচার্য্য তাহাকে বলিল, "এই যে এসেছ, শঙ্কর! বেশ করেছ! বোস, বোস, মোড়া ত পাতাই আছে। তারপর শুভঙ্করী শেষ হ'য়ে এলো এইবার, আর কি চাই?

হিসাবে খুব দড় হয়ে গেলে। ব্যবসাতে লেগে যাও। লোহা লক্কড়ের ব্যবসাই খাঁটি ব্যবসা। অনেক টাকা—বুঝেছ? অনেক। মিত্তিরজার যত, তত!"

তারপর সে শঙ্করের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, "আচ্ছা, হিসাব কর, পৌনে তিন কোয়াটার স্কুরূপের দাম ৬ টাকা সওয়া ১৪ আনা, ৭ হন্দর ১৯ কোয়াটারের দাম কত পড়্‌বে?"

শঙ্কর হাতের শ্লেটখানি অত্যন্ত সযত্নে গোপন করিয়া অন্য হাতে বোধোদয় ও শুভঙ্করী লইয়া বলিল, "এ বাড়ীর পিছন দিকে কি আছে, ভট্‌চাজ মশায়?" ভট্‌চাজ মশায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সেই মোড়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "মিত্তিরজাকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আমি কি করে জান্‌বো? বাড়ীর পিছন সুমুখ জানা কি আমার কাজ? আমার কাজ নকল করা, হিসাব করা।"

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "আমি যাবো? দেখে আস্‌বো?"

ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত বিচলিত ও শঙ্কিত হইলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "আমার বড় জরুরী কাজ আছে; শীগ্‌গির বাইরে যাবো। কাল এসো—সব পড়া ঠিক করে দেব। এই রকমে আর মাস খানেকেই তুমি হিসাবে আর নকলে লায়েক হ'য়ে যাবে। তারপর মিত্তিরজার জামাইও হ'তে পার। মিত্তিরজার অনেক টাকা—অনেক!" সঙ্গে সঙ্গে ভট্‌চাজ অন্ধকার সেই পথে অদৃশ্য হইল।

শঙ্কর কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্‌চাজের অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলেও তাহার ভয়ও হইতে লাগিল। নানারূপ নূতনত্বের আঘাতে তাহার মাথাও কেমন অপ্রকৃতিস্থ বোধ হইতে লাগিল। শেষে সে তাহার বাসা বাড়ীতেই ফিরিতে মনস্থ করিল, কিন্তু সযত্নে—শ্লেট-লিখিত অঙ্করগুলিকে লুকাইয়া লইয়া চলিল।

নটবরের বাড়ীতে সে যখন প্রবেশ করিতেছে, তখন দিগ্বিজয় বাহির হইতেছে। দুইজনে দুইজনকে দেখিলেও কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না।

শঙ্কর আপন কক্ষে গিয়া শ্লেটখানিকে সযত্নে প্রথমে এক স্থানে লুকাইয়া রাখিল ও তারপর আবার বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। পরীক্ষার পর মনটা তাহার অস্থির হইয়াছিল। কিছুদূর যাইতেই সে দেখিল—দিগ্বিজয় দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক-ভাবে নটবরের বাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। সে কাছে আসিতেই দুইজনের পুনরায় দৃষ্টি মিলিত হইল, দিগ্বিজয় এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, নটবরবাবুর পুত্র?"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, "না। আমি শঙ্কর!"

দিগ্বিজয় ভাল করিয়া শঙ্করকে দেখিয়া লইয়া বলিল, "তুমিই শঙ্কর! হরিনারায়ণের পুত্র? ত্রিশবিঘার? সেই শঙ্কর? ওঃ! শঙ্কর?"

শঙ্কর মস্তক আন্দোলনে জানাইল, সে তাহাই।

দিগ্বিজয় দাঁড়াইয়া আবার শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিল; তারপর কহিল, "লক্ষ্মীর উপর ফের কোনও অত্যাচার করেছ শুনলে তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেব। বুঝেছ?"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া দিগ্বিজয়ের বলিষ্ঠ, হ্রস্ব দেহের ও মুখের ভঙ্গী দেখিতে লাগিল। এ ব্যক্তি লক্ষ্মীর কথা কি কহিতেছে?

দিগ্বিজয় আপনার ভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ইডিয়ট! মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব, বুঝেছ? চাত্‌রার ছেলে দিগ্বিজয়, তা জান?" সে উত্তেজিত হইয়া মুষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শঙ্করের দিকে অগ্রসর হইল।

শঙ্কর বিমুগ্ধের মত দিগ্বিজয়কে দেখিতেছিল। ছোট ঝুল, বড় হাতাওয়ালা পাঞ্জাবী-পরা, লাল নাগরা পায়ে। মাথায় ছোট করিয়া চুল ছাঁটা—ক্রুদ্ধ দিগ্বিজয় তাহার কাছে নূতনতম আশ্চর্য্য।

দিগ্বিজয় মুষ্টিবদ্ধ হাত শঙ্করের মুখের কাছে আগাইয়া অতি নিকটে উদ্যত করিয়া ধরিয়া বলিল, "একেবারে গুঁড়ো। বুঝেছ?" বদ্ধমুষ্টি প্রায় শঙ্করের নাসিকা স্পর্শ করিল। শঙ্কর এইবার মাথা নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে। তখন দিগ্বিজয় হাত নামাইয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মনে থাকে যেন! আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাব। বুঝেছ? চাত্‌রার ছেলে! হুঁ!"

তারপর সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

শঙ্কর মুগ্ধদৃষ্টিতে যতক্ষণ দেখা যায় দেখিল। সে ভাবিল—সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—মুখুয্যেমশায় ও গড়ের মাঠ

মুখুয্যেমশায় লক্ষ্মীকে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বলিলেন, "কাঁটাপুকুর চল, নটবর মিত্তিরের বাড়ী।"

তিনি কলিকাতায় বহুদিন পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার কিছুই জানাশোনা ছিল না। তা ছাড়া কলিকাতা বৎসরে বৎসরে নূতন হইতেছে—গত বৎসরের কলিকাতাকে এই বৎসরের কলিকাতা হইতে খুঁজিয়া চিনিয়া বাহির করিতে যথেষ্ট সময় লাগে।

মুখুয্যেমশায় ও লক্ষ্মী গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিল। গাড়ীর উপরে কোচ-বক্সে দুইজন লোক ছিল—একজন গাড়ীওয়ালা ও অন্যটি সম্ভব তাহারই বন্ধু। গাড়ী ষ্টেশনের বাহিরে পুলের উপর উঠিতেই গাড়ীওয়ালার সম্ভব আর এক বন্ধুও পিছনের পা দানিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুখুয্যমশায় ও লক্ষ্মী বাহিরের বিপুল জনস্রোত ও নূতন কলিকাতা দেখিতেছিলেন, মুখুয্যেমশায় লক্ষ্মীকে গঙ্গার পুল কেমন করিয়া খুলে ও জোড়া দেয় রোজ, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। গাড়ী পুল পার হইল, তারপর ষ্ট্রাণ্ড রোড ধরিয়া ধর্ম্মতলার দিকে চলিল, তারপর চৌরঙ্গী ধরিয়া টালিগঞ্জ চলিল। এদিকটা মুখুয্যেমশায়েরও অজ্ঞাত। তিনিও নিবিষ্ট মনে সব দেখিতে লাগিলেন—লক্ষ্মীর ত কথাই নাই। গাড়ী ভবানীপুর কালীঘাট ছাড়াইয়া টালিগঞ্জে পড়িল।

লক্ষ্মী বলিল, "কতদূর, জ্যেঠামশায় ? এ যে রাস্তা শেষ হয় না।"

মুখুয্যেমশায় উত্তর দিলেন, "কল্‌কাতা কি তোর ত্রিশ-বিঘারে, লক্ষ্মী ! এর এদিক ওদিক কিছু নেই। একেবারে অকূল সমুদ্র।"

লক্ষ্মী ভাবিল—এই অকূল সমুদ্রে সন্তরণজ্ঞানহীন শঙ্কর কিরূপে পাড়ী দিতেছে। গাড়ী টালিগঞ্জ পার হইয়া গড়িয়াহাটার দিকে ছুটিল। ক্রমে সমস্ত বসতি শেষ হইল ; পথের দুইধারে বিস্তীর্ণ জনহীন মাঠ।

লক্ষ্মী কলিকাতার ভিতরে মাঠ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "একি, জ্যেঠামশায়, এ যে পাড়াগাঁ !"

মুখুয্যেমশায় হাসিয়া বলিলেন, "এ পাড়াগাঁয়ে মাঠ নয় রে ; এর নাম"—তিনি মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া বাক্য সমাপ্ত করিলেন,—"এর নাম গড়ের মাঠ !" তারপর তিনি ডাকিলেন, "ওহে, ও কোচমান !"

কোচমান গাড়ী থামাইয়া তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া বলিল, "কি কর্ত্তা ?"

মুখুয্যেমশায় প্রশ্ন করিলেন, "এটা গড়ের মাঠই ত !"

কোচমান ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা !" সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুইটি বন্ধু অন্যদিক হইতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুখুয্যের ও লক্ষ্মীর মুখে কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল ও একজন মুখুয্যেমশায়কে দুই হাতে তুলিয়া নীচে পুনরায় লাফাইয়া পড়িল। অন্যটি গাড়ীর ভিতরেই রহিল। কোচমানও তৎক্ষণাৎ কোচবক্সে উঠিয়া দ্রুতগতিতে গাড়ী ছুটাইয়া দিল। পাঁচ-মিনিটের ভিতর সব শেষ হইল।

মুখুয্যেমশায় ত্রেত্রিশকোটি দেবতা স্মরণ করিয়া একটু সাহস সঞ্চয় করিলেন। যে লোকটি দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলেন। লোকটি প্রশ্ন করিল, "ঠাকুর, গড়ের মাঠ দেখ্‌লে ?" মুখুয্যে উত্তর দিলেন না। সে লোকটি তখন বলিল, "ঠাকুর, এই নাও তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার ট্রেণ ভাড়া। যে পথে এসেছো—এই পথেই সোজা যাবে—ট্রামের ডিপো পাবে। তাইতে চড়ে বসো, আর হাওড়াতে নেমো। বুঝেছ ? ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তে চাই না।" লোকটি মুখুয্যের সম্মুখে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া আর একটু হাসিয়া মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল।

মুখুয্যেমশায় মুখের বন্ধন বহুকষ্টে খুলিলেন, তারপর উঠিয়া টাকাটি মাটি হইতে উঠাইয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে ট্রামের ডিপোর সন্ধানে অগ্রসর হইলেন। সরলমতি ব্রাহ্মণ, অতীব নিরীহ, সংসারে কোনও শত্রুই তাঁহার নাই। এই দুষ্কৃতির প্রধান কারণ যে নটবর—তাহা তিনি নিশ্চিত স্থির করিলেন। নচেৎ তাঁহার মত দরিদ্র ও লক্ষ্মীর মত অসহায় স্ত্রীলোকের উপর কাহার দ্বারা এই অত্যাচার হইতে পারে ?

তিনি বহুক্ষণে ট্রাম ডিপোতে পৌছিয়া ট্রামে উঠিয়া কাঁটাপুকুর শ্যামবাজারের টিকিট করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে অনেক সন্ধানের পর তিনি নটবরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ভৃত্যকে দিয়া সংবাদ পাঠাইতেই নটবর স্বয়ং দ্বিতলের কক্ষ হইতে বৈঠকখানাতে নামিয়া আসিয়া মুখুয্যে মশায়কে অভ্যর্থনা করিলেন। মুখুয্যেমশায় বৈঠকখানাতে বসিলে নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, লক্ষ্মী কৈ, মুখুয্যেমশায় ?" মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "নটবর, সে সংবাদ তুমিই জান !

আমি সেই জন্যই তোমার কাছে এসেছি। আমাকে এ প্রতারণা ক'রে তোমার কি লাভ ?"

নটবর ভৃত্যকে তামাকু ও ব্রাহ্মণের হুঁকা ও হাত-পা মুখ ধুইবার জন্য জল আনিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য ! বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতিভ্রম হ'য়েছে। না— আমার চিঠিতে বিশ্বাস ক'রতে না পেরে, আগে দেখ্‌তে এসেছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি কি না !" তাঁহার শ্লেষ ভাষাতে সুপরিস্ফুট হইল।

মুখুয্যে মশায় নীরব রহিলেন। ভৃত্য আদেশ মত সমস্ত উপস্থিত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। নটবর কহিলেন, "এখন হাত-মুখ ধুয়ে তামাক খেয়ে মাথা ঠিক করুন; তারপর কথাবার্ত্তা হবে। আপনি অবাক্ করে দিয়েছেন আমাকে! কিন্তু লক্ষ্মীকে না এনে ভাল করেন নি। আমার বিবাহের উদ্যোগটাই মাটি হবে দেখ্‌ছি!" মুখুয্যে মশায় উঠিলেনও না, হাত মুখও ধুইলেন না, তামাকুও সেবন করিলেন না। শুধু একবার প্রশ্ন করিলেন, "শঙ্কর কোথায় ? তাকে একবার দেখ্‌তে চাই।"

নটবর মিত্র আবার ভৃত্যকে ডাকিয়া শঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল ও শুনাইল যে শঙ্কর প্রভাতে পড়িতে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই।

মুখুয্যেমশায় শুনিয়া চুপ করিয়া আবার বসিলেন, নটবর ঘন ঘন মুখ-হাত ধুইবার ও তামাকু সেবন করিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন।

শেষে মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "নটবর, আমি চল্‌লুম। গরীব ব্রাহ্মণ ও অসহায় কন্যার উপর অত্যাচার ক'রে তোমার মঙ্গল হবে না। আমি কোনও দিনই তোমার অমঙ্গল চাহি নাই, আজও চাহি না। স্বর্গীয় রাধাবল্লভ কি হরিনারায়ণ তোমার মঙ্গলই করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজে করিতেছ। এমন অন্ধ তুমি!"

নটবরের হিসাব বোধ হয় এইখানে মিলিল না। তিনি তাই শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি পাগলের মত বক্‌ছেন ? আপনার হ'ল কি ?"

মুখুয্যেমশায় উঠিয়া বলিলেন, "অর্থ অনর্থের মূল। অর্থবান্ হ'য়ে তুমি ধর্ম্ম ও ন্যায়কে তুচ্ছ করেছো নটবর,— কিন্তু অর্থ তোমাকে শেষে বাঁচাতে পারবে না। বড় ভুল ক'রছ নটবর, বড় ভুল ক'রছ।"

মুখুয্যেমশায় নটবরকে আর বাক্যবিন্যাসের সময় না দিয়া প্রস্থান করিলেন। নটবর দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া আবার উপরে নিজের কক্ষে গেলেন, যাইবার সময় ভৃত্যকে আদেশ দিয়া গেলেন—যেন ঐ ব্রাহ্মণকে আর কোনদিনই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেয়, কিম্বা তাঁহার আসার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ না করে।

মনটা তাঁহার কিন্তু কেমন একটু অস্বস্তিতে বিষণ্ণ হইল। তিনি আপন কক্ষের দ্বার প্রথামত ভেজাইয়া টেবিলের ধারে বসিয়া—টেলিফোন যন্ত্র উঠাইয়া লইয়া কাহাকে স্মরণ করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেউ ফিরেছে ?" কি উত্তর পাইলেন তিনিই জানিলেন। তারপর কহিলেন, "টাকা পৌঁছে যাবে। হাঁ, কুমোরটুলির বাড়ীতেই। ভট্‌চাজ্‌কে বলে দিয়েছি। সে ব্রাহ্মণ এইমাত্র এসেছিল। সম্ভব মোড়ের কাছে পৌঁছেছে। তার উপর নজর রাখা চাই। সে যদি বাড়ী ফিরে যায়, তবে যেতে দিয়ো। আর যদি না যায়, নজর রাখতে হবে।"

তারপর টেলিফোন্ নামাইয়া রাখিয়া নটবর তামাকুর জন্য ভৃত্যকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টি বাজাইলেন।

কিন্তু ভৃত্য না আসিয়া দ্বারদেশে দেখা দিলেন ক্ষান্তমণি। বিরক্তচিত্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে নটবর বলিলেন, "কি চাই ? এখানে কেন ? তোমাকে না পাঁচশ বার মানা করেছি—এদিকে এসো না, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নেই।" ক্ষান্তমণি ভীত সঙ্কুচিত হইয়া ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিলেন, "এখনই চলে যাবো। একটা কথা বল্‌তে এসেছি মাত্র।" নটবর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে পুনরায় ঘণ্টি দিলেন।

ভৃত্য আসিয়া তামাকু দিয়া গেল।

ক্ষান্তমণি কহিলেন, "মোহন পরশু থেকে আসে নি।"

নটবর উত্তর দিলেন না। তামাকুই সেবন করিয়া চলিলেন। ক্ষান্তমণি পুনরায় বলিলেন, "সে আমার টাকার বাক্সও নিয়ে গেছে, গহনাপত্রও যা দুএকখান ছিল তাও নিয়ে গেছে! সুকৃতি দেখেছে!"

নটবর নিরুত্তর। ক্ষান্তমণির চক্ষুতে অশ্রুধারা বহিল। স্বামীর অসন্তোষের ভয়ে তাহা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়াও শেষ করিতে পারিলেন না। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি ক'রবো ?"

নটবর উত্তর দিলেন, "গলায় দড়ি দাও না। যাও—আমার সুমুখ থেকে! get away"

ক্ষান্তমণি কাতর স্বরে বলিলেন, "সংসারে একটি পয়সাও নেই। এখনি সব খেতে আসবে। আজ কাল দুদিন না হয় চল্‌বে—কিন্তু তারপর?"

নটবর মুখ হইতে নল সরাইয়া একটু উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "তোমাকে পোনর বছরের খরচ দিয়েছিলুম কি না? বস্‌, পোনর বছরের আগে আর একটি পয়সাও পাবে না। সাত ভূতে উড়াবে বলে এত কষ্টে পয়সা উপায় করি নি আমি, বুঝেছ? তারপর হিসাব করিয়া বলিলেন, "পোনর বছরের এখনও চার বছর বাকী আছে! যাও—বিরক্ত ক'রো না। get away." তবুও ক্ষান্তমণি গেলেন না দেখিয়া নটবর উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষান্তমণি বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে আপনার রন্ধন-শালার দিকে পুনর্গমন করিলেন। ভিতরে যাইবার পথে তিনি দেখিলেন সুকৃতিও আগে আগে যাইতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—এ কোথায়?

লক্ষ্মী প্রথমটা বিলক্ষণ ভীত ও বিমূঢ় হইল। তাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ভয়ার্ত্ত চক্ষুতে সে সম্মুখের লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল। লোকটি বিলক্ষণ মোটা, গায়ে আধময়লা একটা রঙিন সার্ট, কপাল গিয়া কেশহীন মস্তকের মধ্যে উঠিয়াছে—কিন্তু মোটের উপর লোকটিকে দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া লক্ষ্মীর মনে হইল না। লোকটি গাড়ীর দুই দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সকৌতুকে লক্ষ্মীকে দেখিতে লাগিল।

ক্রমে লক্ষ্মীর সাহস ও সহজবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। সে মুখের বন্ধন খুলিতে উদ্যত হইল। লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ! ও কাজ ক'রতে মানা আছে। ক'র না। কোনও ভয় নেই। শুধু চুপ করে থাক্‌তে হবে একটু, তা আর পারবে না? এত বড় সেয়ানা মেয়ে তুমি!"

লক্ষ্মীর হাত বন্ধন বস্ত্র হইতে নামিয়া আসিল। লোকটি সন্তুষ্ট হইয়া আবার লক্ষ্মীকে দেখিতে লাগিল। গাড়ী গড়িয়াহাটার পথ ছাড়িয়া আবার বালিগঞ্জ ও কলিকাতার দিকে মোড় ফিরিল। লক্ষ্মী চুপ করিয়াই রহিল। সে বুঝিতে পারিল, কোনওরূপ বলপ্রয়োগ ও অস্থিরতা প্রকাশে লাভ নাই। ভয় তাহার যথেষ্ট হইতেছিল—কিন্তু তাহা দমন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, প্রায় ষোল সতের বৎসর তাহার পল্লীগ্রামে কাটিয়াছে—তার প্রাণ মন দেহ সবই সবল সুস্থ ছিল। হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া নিজের অমঙ্গল ঘটাইয়া তুলিবার মত দুর্ব্বুদ্ধি তাহার হইল না। সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে গাড়ী আসিয়া এক জায়গায় থামিল। ভিতরের লোকটি বলিল, "খাসা মেয়ে তুমি! এখন মুখের বাঁধন খুলে ফেল, কিন্তু গোলমাল করা মানা তা জানই ত। তারপর তাহার কাণে কাণে মৃদুস্বরে বলিল, "কোনও ভয় নেই তোমার আমি থাকতে!" তারপর চুপি চুপি বলিল, "সাহেবরাও জানে না!"

লক্ষ্মী বিস্মিত হইয়া অনুমতি পাইয়া মুখের বন্ধন খুলিল। লোকটি একদিকের দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া বলিল, "এসো। কোনও ভয় নেই।"

লক্ষ্মী নামিল। দেখিল একটা সরু গলি, আবর্জ্জনাতে পূর্ণ। তাহার সম্মুখেই একটা পুরান একতলা বাড়ীর খোলা দরজা।

লক্ষ্মীকে লোকটি অঙ্গুলি সঙ্কেতে ইসারা করিয়া সেই দরজাতে প্রবেশ করিতে বলিয়া তাহাকে আগাইয়া দিল ও নিজে পিছনে পিছনে চলিল। গাড়ী চলার শব্দে লক্ষ্মী বুঝিল, গাড়ী চলিয়া গেল। সে কম্পিত পদে চলিল।

লক্ষ্মী কিছু দূর গিয়া একটি কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোকটি হাত দিয়া চারিদিক দেখাইয়া বলিল, "এইখানে থাক্‌বে। এই ঘর তোমার, এই বারান্দা তোমার, ও পাশের ঐ ছোট ঘরটা তোমার। চারিদিকে আলো হাওয়া, এখানটা একটু অন্ধকার বটে—কিন্তু ভয় নেই। তুমি ঐ পাশের ঘরে যাও, জলের বাল্‌তি, তেল, গামছা সব পাবে। কাপড়ও আছে। স্নান করে নাও। কোনও ভয় নেই।" তারপর যে পথে তাহারা আসিয়াছিল, সেই পথে সে লোকটি প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মী নির্ব্বাক হইয়া সব দেখিতেছিল। লোকটি চলিয়া গেলে সে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিল যে লোকটি মিথ্যা বলে নাই, দালানটি ছোট হইলেও মন্দ নয়। ঘরটি বড়ই—তবে সেকালের মত। জানালা নাই—শুধু দুইটা ঘুলঘুলি মাত্র আছে। দালানের সম্মুখে খুব খানিকটা পোড়ো জমী—

তার প্রান্তে খুব উচ্চ একটা বাড়ীর বিবাদহীন মজবুত প্রাচীর। দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মী বারান্দার একধারে বসিয়া পড়িল। সে পলাইবার চেষ্টাও করিল না, কেন না সে বুঝিতে পারিল যে যাহারা এত কাণ্ড করিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়াছে তাহারা তাহার পলায়নের পথ খুলা রাখিবে না।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল সে কি করিবে! সে যে অত্যন্ত বিপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিপদ কিরূপ তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিল না। বৃদ্ধ মুখুয্যেমশায়ের জন্য তাহার দুঃখ হইল, কিন্তু সে দুঃখ অনাবশ্যক বলিয়াই তাহার মনে হইল। সে ত দুঃখ করিয়া মুখুয্যেমশায়ের কোনও উপকার করিতে পারিবে না। তবে সে কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারিতেছিল না। সে শুনিয়াছিল, কলিকাতাতে এরূপ কাণ্ড প্রায়ই ঘটে; দুরদৃষ্ট-বশতঃ তাহারও ভাগ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা কতদূর গড়ায় তাহা না দেখিলে সে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া স্নানের ঘরে গেল, স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া ভিতর হইতে দ্বারে অর্গল লাগাইয়া শুইতে গেল। ভাবিল, একটু ঘুম হইলে ভাবিবার শক্তি আসিবে, তখন দেখা যাইবে মুক্তির কি ফন্দী মাথাতে আসে। তাহা ছাড়া করিবারও তার কিছু নাই। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন বেলা ৩টা হইবে। সে উঠিয়া দরজাতে কাণ পাতিয়া শুনিল, কোনও সাড়াশব্দ নাই। আস্তে আস্তে বাহিরে পা দিয়া দেখিল, একখানা ভাতের থালা রাখিয়া সেই মোটা কাল লোকটি নিদ্রিত অবস্থাতে শুইয়া। লক্ষ্মীর পদশব্দে সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এই যে—এসো, খাও!'

লোকটির গায়ে আর আধময়লা পাঞ্জাবী নাই—নগ্ন গাত্রের উপর উপবীতসূত্র।

লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া রহিল।

লোকটি বলিল, "খাসা মেয়ে! চমৎকার! কোনও ভয় নেই। খেতে বস।" লক্ষ্মীর ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে খাইতে বসিল। না খাইয়া বলক্ষয় করিয়া নিজেকে দুর্ব্বল করা সে উচিত মনে করিল না। কেন না—হয় ত শারীরিক বলের প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্য হইতে পারে।

খাইতে খাইতে লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কি?"

লোকটি উত্তর দিল, "আমার নাম ভট্‌চাজ্। তুমি খাসা মেয়ে ত! তোমার মত আমার এক ব্রাহ্মণী ছিলেন—কিন্তু—" সে চুপ করিল।

লক্ষ্মী পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কিন্তু কি? কি হ'য়েছে তাঁর?"

ভট্‌চাজ্ কহিল, "নেই। সে মারা গেছে। একেবারে মারা গেল। তখন—"

লক্ষ্মী অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভট্‌চাজ বিগত পত্নীর শোকে মুহ্যমান হইয়া অধোবদনে রহিল। লক্ষ্মীর পরম বিস্ময় ও কৌতুকানুভব হইতেছিল। সে একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা শুনছেন?"

ভট্‌চাজ মাথা তুলিল। লক্ষ্মী বলিল, "আমাকে এনেছেন কেন? আমি ত আর ব্রাহ্মণী হ'তে পারবো না। আমি যে কায়স্থ কন্যা!" সে উঠিয়া পার্শ্বের ছোট ঘরে হাতমুখ ধুইতে গেল। ফিরিয়া আর ভট্‌চাজকে দেখিতে পাইল না। সে দাঁড়াইয়া ইতস্তত দেখিয়া বুঝিতে পারিল না, সে কোথায়। দালানের পর গলি পথের কিছু দূরে গিয়া ভয়ে আবার প্রত্যাগমন করিল; চারিদিকে কোথাও আর নির্গমনের পথ নাই। এ যেন একেবারে পাতালপুরী—। সে শুনিয়াছিল কলিকাতাতে দিনরাত শব্দ কোলাহল, জনারণ্য। কিন্তু এই কারাগৃহে তাহার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ কি কলিকাতার বাহিরে কোথায়? লক্ষ্মীর মনে হইল সে পাড়াগায়ের মত মাঠ পথ, গাছপালা দেখিয়াছিল—হয় ত ইহা কোনও এক অজ্ঞাত পাড়াগাঁ। এখান হইতে বাহিরে যাইবার পথ নাই—সে এখানে মরিলেও তাহার খবর পর্য্যন্ত জগতে কেউ পাইবে না। সে ব্যাকুলচিত্তে কক্ষের ভিতর পুনপ্রবেশ করিয়া অবসন্ন-ভাবে বসিয়া পড়িল।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল, পলায়নের এক উপায় ঐ মোটা কাল ব্রাহ্মণ। উহাকে যদি কোনরূপে হাত করা যায়, তবেই রক্ষা। কিন্তু কি উপায়ে সে হাত করিবে? তাহার কাছে ত কিছুই নাই। টাকা কড়ি যাহা আনিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে সে কি করিবে? সে কি শেষে ঐ ব্রাহ্মণকে লোভ দেখাইবে—সে যদি মুক্তি পায় তবে সে তাহার ব্রাহ্মণী হইবে? চিন্তা

মাত্রেই তাহার হাসি পাইল। কিন্তু ঐ লোকটি তাহাকে ত বোকা বানাইতেছে না? সে যে সত্য কথা বলিতেছে তাহারই বা বিশ্বাস কি? বোকারাই অনেক সময়ে অসম্ভব চালাকির কাজ করিয়া বসে। তবুও লক্ষ্মী একবার মুক্তির চেষ্টা করিবে স্থির করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—শঙ্করের সমস্যা

যে দিন লক্ষ্মী অবরুদ্ধ হয়—সেদিন প্রভাতে শঙ্কর ভট্‌চাজের বাড়ী গিয়া যথাপূর্ব্ব দেখিল ভট্‌চাজ নাই। সেই স্ত্রীলোকটি যথাভ্যস্ত ভাবে মোড়া বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে বসিতে বলিতেই, সে গিয়া মোড়াতে বসিল। এ কাজ সে পূর্ব্বে কখনও করে নাই। স্ত্রীলোকটি ইহাতে এত বিস্মিত হইল যে সে তাহার যথানিয়মিত প্রশ্নগুলি করিতেও পারিল না। দুইজনে নীরবে কিছুকাল পরস্পরকে দেখিতে লাগিল। শেষে শঙ্কর বলিল, "আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। আমাকে কিছু টাকা দিতে পার? আমি পালাই তা হলে। একেবারে সব ছেড়ে পালাই—যেখানে কেউ নেই এমন জায়গাতে।"

স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিতেই লাগিল। কোনও উত্তর করিল না। শঙ্কর কহিল, "আচ্ছা, সাধু সন্ন্যাসী-হ'লে কেমন হয়? তুমি বল্‌তে পার? আমার কোষ্ঠীতে আছে আমি সন্ন্যাসী হবো। জান তুমি?"

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে জানে।

শঙ্কর অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে বিস্ময়ের তাহার অবধি ছিল না এমনিতেই, কিন্তু শঙ্কর সন্ন্যাসী হইবে তাহাও সে জানিয়াছে শুনিয়া সে কিছুকাল হতবাক্ হইল।

স্ত্রীলোকটি হঠাৎ আস্তে আস্তে বলিল, "তা সন্ন্যাসী হও নি কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর দিতে পারিল না। ভবিষ্যতে সে হইবে যে উপায়েই হোক্, কিন্তু বর্ত্তমান ও অতীতে সে সন্ন্যাসী না হইয়া কেন আছে তাহা সে বিদিত ছিল না। প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

স্ত্রীলোকটি শঙ্করের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্‌চাজমশায় কোথায়?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "সন্ন্যাসী দেখ্‌লে ভয় করে। তুমি সন্ন্যাসী হ'য়ো না।"

শঙ্কর সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "হ'তেই হবে। কোষ্ঠীতে লেখা আছে। সেইজন্যই ত লক্ষ্মীর সঙ্গে বিয়ে হ'ল না। লক্ষ্মীকে দেখেছ? তাকে দেখ্‌লে আমার ভয় হ'ত। কিন্তু সে বড় ভাল। আমায় কিছু টাকা দিতে যদি পার, তবে লক্ষ্মীকে দেখে আসি। তারপর কোথাও চলে যাই। তুমি যাবে?"

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিল, "টাকা-ত নেই। সব মিস্তির নিয়েছে। তা না হলে যেতুম তোমার সঙ্গে। মিস্তির ছাড়া আর লোক পেলে না তুমি?" যেন ইহার উত্তর সে পাইতে পারে না ভাবিয়াই তারপর স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে সুরু করিল।

শঙ্করের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল। কাহারও কান্না সে দেখিতে পারিত না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি চললুম; ও বেলা আস্‌বো। তুমি কেঁদ না। আচ্ছা, সন্ন্যাসী হবো না এখন, তুমি কেঁদো না।" কিন্তু স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেই লাগিল ও যতই তাহার ফুঁপাইয়া কান্না চলিল, ততই শঙ্কর অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে সে সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

রাস্তায় কিছু পথ চলিয়া তাহার মনের ভার ও বেদনা যেন কিছু কমিল। সে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিল। বাগবাজারের পুলের কাছে আসিয়া সে পুলের উপর দাঁড়াইল। তারপর নিবিষ্টমনে সে খালের ভিতর বোঝাইকরা পাটের নৌকা দেখিতে লাগিল।

প্রায় দুইঘণ্টা এইরূপে কাটাইয়া সে বাসাতে ফিরিবার কথা মনে করিল। তখন আবার ফিরিয়া বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নিজের সঙ্গের বই দুইখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে ভিতরে ক্ষান্তমণির কাছে গেল। কিন্তু রন্ধন-গৃহে ক্ষান্তমণিকে দেখিতে পাইল না। দেখিল সুকৃতিকে, সে এক দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দুই পা ছড়াইয়া বই পড়িতে-ছিল। শঙ্কর তাহাকে দেখিয়া তখনই ফিরিতেছিল, কিন্তু সুকৃতি ডাকিল, "এ দিকে এসো, শোন।"

শঙ্কর দাঁড়াইল। সুকৃতি বলিল, "কাল দাদা টাকা

চুরি করে পালিয়েছে। মা বিছানাতে পড়ে কাঁদছে। রান্না হবে না। খেতে পাবে না আজ।"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। সুকৃতি বলিল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই হবে? কারও ক্ষিদে পায় না? এত বড় ছেলে কিছু যোগাড় ক'র্‌তে পার না? ঢেঁকি!"

শঙ্কর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তাই ত! কি ক'র্‌তে হবে?"

সুকৃতি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "আমার মাথা খেতে হবে, পার্‌বে?"

শঙ্কর সুকৃতির দীর্ঘকেশাচ্ছন্ন মাথার দিকে চাহিয়া তাহা ভক্ষণের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উত্তর দিল, "তা কি পারি? আর তুমি কি খাবে তবে, সুকৃতি? প্রকৃতি কি খাবে? কাকীমা কি খাবে? কাকাবাবুর কাছে পয়সা চাও গে না। আমি চেয়ে আস্‌বো?"

সুকৃতি মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা করা কেন, যাও না দেখি—কত যোগ্যতা। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?" প্রশ্নপরম্পরার সদুত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া শঙ্কর নিঃশব্দে প্রস্থান করিতেছিল, সুকৃতি আবার ডাকিল। শঙ্কর নিকটে আসিলে বলিল, "আমার মরণ হ'লে বাঁচি!" শুনিয়া শঙ্কর বিষণ্ণভাবে সুকৃতির মুখের দিকে চাহিল। সুকৃতি আবার বলিল, "এ বাড়ী শ্মশান হ'লেই ভাল!"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না, "কেন?"

সুকৃতি তাহার উত্তরে কাঁদিতে সুরু করিল।

শঙ্কর বুঝিল আজ প্রভাত তাহার অশুভক্ষণেই হইয়াছিল। যতরকম অশুভ ঘটিতে পারে ঘটিয়াছে। সে পলায়নের জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু পা বাড়াইতেই সুকৃতি ডাকিল, "শোন!"

শঙ্কর হতাশ হইয়া দাঁড়াইল। সুকৃতি এদিক ওদিক চারিদিকে তাকাইয়া লইয়া দেখিল—কেহ কোথাও নিকটে নাই, তখন বলিল, "বাবার ঘরে টাকা আছে—সিন্ধুকে। বিছানায় বালিশের নীচে চাবি থাকে। বুঝেছ?"

এই সরল কথা শঙ্কর না বুঝিয়া পারিল না। সে মাথা নাড়াইয়া জানাইল—সে বুঝিয়াছে।

সুকৃতি বলিল, "সিন্ধুক খুলে টাকা আন্‌তে হবে তোমাকে। না খেয়ে ত মরতে পারি না। তোমার কি কোনও যোগ্যতা নেই? পার্‌বে ত?"

কিন্তু এইবার শঙ্করকে পরাজয় মানিতে হইল; সে বলিল, "তা কি করে পারি? কাকাবাবু যে সমস্তক্ষণ ঘরে বসে থাকেন।"

উত্তর শুনিয়া সুকৃতি পা ছড়াইয়া আবার কাঁদিতে বসিল। শঙ্কর মহা বিব্রত হইয়া আশ্বাস দিল, "আচ্ছা, আনছি, তুমি কেঁদ না। কান্না আমি দেখ্‌তে পারি না।" সে আবার প্রস্থানোদ্যত হইল। কিন্তু সুকৃতি তখনই আবার কান্না স্থগিদ রাখিয়া ডাকিল, "শোন!"

শঙ্কর দাঁড়াইল। সুকৃতি জিজ্ঞাসা করিল, "পারবে ত?"

শঙ্কর পলাইতে পারিলে বাঁচে। সে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া তখনই নিজের ছোট ঘরে পলাইয়া আশ্রয় লইল। সেখানে সে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। সুকৃতি এত পারে ও জানে যখন—তখন সিন্ধুক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইলেই ত পারিত। তাহাতে এমন মুস্কিলের কথা কি আছে?

কিছু পরেই সুকৃতি তাহার জন্য ভাতের থালা লইয়া সেই ঘরেই আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এরূপ ঘটনা শঙ্করের ভাগ্যে ঘটে নাই। রোজই সে ভিতরে জ্যাঠামণির ঘরের সম্মুখেই খাইতে যাইত, এই অসাধারণ ব্যাপারে আজ সে আরও শঙ্কিত হইল। কিন্তু বিনাবাক্যে খাইতে বসিল।

সুকৃতি দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "ঘরের কোণে সিন্দুক আছে, বিছানার নীচে চাবি আছে। পারবে ত?"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

সুকৃতি আবার কিছুকাল নীরব রহিল। তারপর পুনরায় বলিল, "ঘরের—"

শঙ্কর বাধা দিয়া কহিল, "পারবো, পারবো। দাও তোমার চাবি। এখনই যাবো।" সে উঠিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সুকৃতির চোখের দিকে চাহিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

সুকৃতি তাহার খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুই বলিল না। আহার সমাপ্ত হইলে সে থালা উঠাইয়া চাপা গলাতে বলিল, "মনে থাক্‌বে ত?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "থাক্‌বে!" সুকৃতি থালা লইয়া চলিয়া গেলে সে আবার অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল। ভাবিল, আর কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকা নয়। সুকৃতিকে দেখিলেই তাহার হৃৎকম্প হইতে সুরু হইয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—মুখুয্যেমশায়ের প্রতি সন্দেহ

মুখুয্যেমশায় অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে নটবরের গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া গলির মোড়ে দাঁড়াইলেন। কোন কাজই তাঁহার হইল না। লক্ষ্মীর উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। কিই বা তিনি করিবেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। শেষে তিনিই যে লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন, এই চিন্তা তাঁহাকে অসহ্য পীড়া দিতে লাগিল।

কিছুকাল দাঁড়াইয়া এই সব চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "মধুসূদন!" তারপর গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা অনুভব করিলেন। তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরিবার কোনওরূপ ইচ্ছা তাঁহার হইল না। গ্রামে ফিরিলেই হইবে—তাড়া কি? গিয়া তিনি সকলকে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? গৃহিণীকেই বা কি উত্তর দিবেন? বসু বা রায় গোষ্ঠীর ভগ্ন শূন্য অট্টালিকার দিকে কি করিয়া চাহিয়া দেখিবেন?

তিনি পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গঙ্গাভিমুখে গেলেন। সেখানে মদনমোহনের ঘাটে পৌঁছিয়া তিনি স্নানাদি সমাপন করিলেন। তারপর উঠিয়া আসিয়া অন্যমনস্কভাবে পথে পড়িলেন।

হঠাৎ একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল, "ঠাকুর যে! বাড়ী যাচ্ছেন না কি? চলুন হাওড়াতে পৌঁছে দিই। তিনটের গাড়ীতেই বাড়ী যেতে পারবেন।"

মুখুয্যে অবাক হইয়া কিছুকাল লোকটিকে দেখিলেন। বেশ ভদ্রলোকের মত জামা কাপড় পরা। দেখিতেও ভদ্র। তারপর বলিলেন, "তুমি কে, বাবা? হঠাৎ তোমার আমার জন্য মাথাব্যথা কেন?"

লোকটি বিনীতভাবে উত্তর দিল, "চিনতে পারছেন না? অনেক দিন দেখেন নি কি না, তাই। আমি ত্রিশবিঘারই ছেলে। আপনি ঠিক সেই রকমই আছেন কি না—তাই চিনেছি।"

মুখুয্যে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তা হবে। তবে আমার জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। হাওড়া আমি চিনি। ঠিক যাবো। তিনটে না হোক, ৬টার গাড়ীতে যাবো। তোমার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।"

লোকটি হাসিয়া কহিল, "ব্যস্ত হই নি। মনে হ'ল আপনি যদি যান, তবে একসঙ্গেই যেতুম। বহুদিন দেশে যাই নি! তা প্রণাম, আমার একটু কাজ আছে। আমিও সেরে সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতেই যাবো।"

লোকটি পাশের একটি গলি ধরিয়া প্রস্থান করিল।

মুখুয্যে সন্দিগ্ধভাবে চলিলেন। আপনা হইতেই তাঁর পা ষ্টেশনের দিকে চলিল। তিনি নিতান্তই অন্যমনা হইয়া চলিতেছিলেন, নচেৎ পশ্চাত ফিরিলে দেখিতে পাইতেন যে ত্রিশবিঘার সেই ছেলেই তাঁহার খুব কাছে কাছে অনুসরণ করিতেছে। তিনি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ত্রিশবিঘার টিকিট কিনিবার পর তবে সে লোকটি ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পুল পার হইয়া কলিকাতাতে ফিরিল।

৫।০টা বাজিবার সময় মুখুয্যে প্লাটফর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময় কে তাঁহাকে ডাকিল, "মুখুয্যে মশায়, না?"

সচকিত হইয়া মুখুয্যে মশায় ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই দিগ্বিজয়। চাতরার মাসীর সেই পুত্র। মুখুয্যে তাড়াতাড়ি আবার প্লাটফর্ম্মের দিকে চলিলেন। কিন্তু দিগ্বিজয় ছাড়িবার পাত্র ছিল না। সেও দ্রুতগতিতে আসিয়া মুখুয্যে মশায়কে ধরিয়া বলিল, "একটা কথা আছে, মুখুয্যে মশায়!"

মুখুয্যে নিরুপায় হইয়া দিগ্বিজয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। দিগ্বিজয় তাঁহাকে টানিয়া প্লাটফর্ম্ম হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়া বলিল, "লক্ষ্মীকে বলেছেন আর?"

মুখুয্যে উত্তর দিলেন, "সব বলেছি বৈ কি!"

দিগ্বিজয় বলিল, "হাঁ, বলবেন আবার! তা লক্ষ্মী ত আপনার কাছেই আছে? নটবরের কাছে যায় নি?"

মুখুয্যে মশায় কহিলেন, "সেইখানেই গেছে।"

দিগ্বিজয়কেও মুখুয্যে সন্দেহ করিতেছিলেন। তাই কোনও রকম কথা ভাঙ্গিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন।

দিগ্বিজয় বলিল, "বলেন কি? সত্যি? তাহলে—" সে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। মুখুয্যে বলিলেন, "গাড়ী যে চলে যাবে হে। শেষে কি ট্রেণটা ফেল করাবে না কি? এর পর আবার সেই ৭টাতে গাড়ী।"

দিগ্বিজয় কহিল, "আরে, শুনুন না। গাড়ী ত অনেক আছে। কথাটা হ'চ্ছে এই—যে লক্ষ্মী যদি নটবরের বাড়ীতে

থাকে—সেই শঙ্করা ছোঁড়াটাও আছে—তবে?—না, আমাকে এখুনি দেখ্‌ছি নটবরের বাড়ীতে যেতে হবে।"

মুখুয্যে দেখিলেন, ৫॥০টার ট্রেণ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "লক্ষ্মীকে গুণ্ডাতে আজ ধরে নিয়ে গেছে সকালে!"

দিগ্বিজয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "গুণ্ডা? এ সেই শঙ্করের কাজ? নিশ্চয়ই সে শঙ্করার কাজ? আচ্ছা, দেখাচ্ছি—তাকে মজাটা।"

মুখুয্যে হাসিয়া বলিলেন, "সে কেন ক'রতে যাবে এই কাজ? ইচ্ছে ক'রলে সে ত কবে লক্ষ্মীকে বিয়ে ক'রতে পারত। সেটা একেবারে পাগল, তাই না?"

কিন্তু দিগ্বিজয় তখন সে কথা শুনিতে চাহিল না। বলিল, "বার ক'র্‌ছি পাগ্‌লামি। লক্ষ্মীকে নিয়ে পাগ্‌লামো? বটে?"

সে তখনই মুখুয্যেকে ছাড়িয়া নটবরের বাড়ীতে যাইতে উদ্যত হইল। মুখুয্যে মশায় শঙ্করের জন্য প্রমাদ গণিলেন। বলিলেন, "না হে, শঙ্কর লক্ষ্মীকে চায় না।" কিন্তু দিগ্বিজয় তাহা বিশ্বাস করিল না; সে বলিল, "আমি নটবরবাবুর কাছে চল্লুম। দেখি কি হয়?" সে তখনই মুখুয্যে মশায়কে ষ্টেশনে একলা রাখিয়া ঝড়ের মত চলিয়া গেল। মুখুয্যে ষ্টেশনে ৭টার ট্রেণের অপেক্ষাতে রহিলেন।

দিগ্বিজয় বাসে করিয়া শীঘ্রই নটবরের বাড়ী পৌছিয়া সংবাদ পাঠাইল। কিন্তু নটবর দেখা দিলেন না। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে বাবু বড় ব্যস্ত—এখন কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিবেন না। দিগ্বিজয় মনঃক্ষুণ্ণ হইল; কিন্তু জিদ্‌ ছাড়িল না। সে পুনরায় বলিয়া পাঠাইল—সে নিশ্চয়ই দেখা করিতে চাহে, বড় জরুরী দরকার আছে। বিরক্ত হইয়া নটবর বাহিরে নীচে আসিয়া বৈঠকখানাতে দেখা দিলেন। দিগ্বিজয় তাহার বক্তব্য সমস্ত শেষ করিয়া বলিল, "লক্ষ্মীর উদ্ধারের উপায় ত এখনই আপনাকে ক'রতে হচ্ছে।"

নটবর শ্লেষের সহিত কহিলেন, "তোমার মাথাব্যথা যে ভয়ানক হে। সে যা কর্ব্বার কর্ম্মাবার আমি বুঝ্‌বো। তোমার এত দুর্ভাবনার ত কারণ দেখি না। তোমার সঙ্গে তার কিসের সম্বন্ধ যে একেবারে এত আত্মহারা হ'য়ে পড়েছ?"

দিগ্বিজয় ইহার উত্তর সহজে দিতে পারিল না। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "সে আমার আত্মীয় কন্যা!"

নটবর হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি না আর আমি! তা বলে আমার সময় নষ্ট করে আর দরকার নেই। তুমি যেতে পার। তোমার মত বেহায়া ছেলে হলে আমার, তাকে কবে বাড়ী থেকে বার করে দিতুম। যাও! এ বিষয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আর আমাকেও বিরক্ত ক'রতে এসো না। লক্ষ্মী হারিয়ে গেছে—না তোমার মুণ্ড হ'য়েছে! ঐ বুড়ো মুখুয্যের মিথ্যা কথাতে ভুলে গেছ সব? ছোকরাদের যদি কোনও বুদ্ধি থাকে? এত বড় কলকাতা সহর, লোক গিজ্‌গিজ্‌ ক'র্‌ছে—পায়ে পায়ে, মাথায় মাথায় ঠোক্কর লাগে, এখানে দিন দুপুরে লক্ষ্মীকে লুঠে নিয়ে গেছে এ কথা তোমার মত নির্ব্বোধরাই বিশ্বাস করে! আর শঙ্কর ত বাড়ীতেই আছে। তার ওপর নজর রেখেছি খুব।"

দিগ্বিজয় এতটুকু হইয়া গেল। সত্যই ত; এ অসম্ভব কাণ্ড। মুখুয্যে কি তাহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছে? সে লজ্জিত হইয়া বলিল, "বুঝেছি! মাফ করুন। এ মুখুয্যেরই চাল সম্ভব। আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি তাকে! সে তখন আবার ঝড়ের মত চলিয়া গেল। তবু সে ভাবিল, নিশ্চয়ই মুখুয্যে ও শঙ্কর মিলিয়া এই কাজ করিয়াছে।

ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া মুখুয্যের সন্ধান করিয়া দিগ্বিজয় তাঁহাকে পাইল না। তখনও সাতটার গাড়ীর আধঘণ্টা দেরী। সে অপেক্ষা করিল। ক্রমে ৭টার গাড়ীর সময় হইল। দিগ্বিজয় প্লাটফর্ম্মের ফটকে দাঁড়াইয়া সন্ধান করিল, মুখুয্যেকে পাইল না। সে ভিতরে গিয়ে প্রত্যেক কামরাতে সন্ধান করিল, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াও রহিল—তবু মুখুয্যের দর্শন মিলিল না। শেষে সে স্থির করিল, ইহা নিশ্চয়ই মুখুয্যের কোনও একটা চাল—নটবর ঠিকই বলিয়াছে। নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া সে সেই ট্রেণে চড়িয়া শ্রীরামপুর ফিরিল। মনটাতে তাহার এতটুকুও সুখ ছিল না। লক্ষ্মী গেলে সে কি করিবে? লক্ষ্মীর সম্বন্ধে কি করিবে তাহা সে স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া বড়ই বিপন্ন হইল। এমন কি সে রাত্রে তাসের আড্ডাতেও গেল না ও পরদিন মিথ্যা অসুখের অজুহাতে ডাক্তারের সার্টি-ফিকেট পাঠাইয়া আফিস কামাই করিয়া ত্রিশবিঘাতে

গিয়াও মুখুয্যেকে না পাইয়া তার মনটা অত্যন্ত অশান্ত হইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—শঙ্করের বৈরাগ্য

দিগ্বিজয় মুখুয্যে মশায়কে যখন ষ্টেশনে খুঁজিতেছিল, তখন নটবরের বাড়ীতে অন্য একটা ব্যাপার ঘটিতেছিল।

শঙ্কর সেদিন আর ভট্‌চাজ্জের বাড়ী যায় নাই। দিনটা খারাপ বলিয়া সকাল হইতে তাহার মনটা নানা কারণেই বিগ্‌ড়াইয়া ছিল। সকালের নানাবিধ ঘটনার পর—সে আর বাহিরে যাইতে সাহস করে নাই। চুপ করিয়া শুইয়াই ছিল।

সন্ধ্যার একটু আগে তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া সুকৃতি প্রবেশ করিল, শঙ্কর চকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুকৃতি দরজা ভেজাইয়া দিয়া শঙ্করের কাছে গিয়া বলিল, "মনে আছে ?"

শঙ্করের মনে কিছুই ছিল না। তবু উত্তর দিল, "আছে। খুব আছে। তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না।"

সুকৃতি তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "ঘরের কোণে সিন্দুক, বিছানার নীচে সিন্দুকের চাবি—"

শঙ্করের এইবার মনে পড়িল। সে উঠিয়া বসিল।

সুকৃতি বলিল, "ঘরের দরজাতে তালা আছে—এই নাও চাবি তার।" সে শঙ্করের হাতে একটি তালার চাবি গুঁজিয়া দিল। শঙ্করের হৃৎকম্প হইল। সে বলিল, "তুমিই যাও না! এমন কি শক্ত কাজ!"

উত্তরে সুকৃতি বসিয়া পড়িল; তার পর দুই পা ছড়াইল; তার পর শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া কান্না সুরু করিল।

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া চাবি লইয়া উঠিয়া বলিল, "কাঁদতে হবে না, এখনি এনে দিচ্ছি বাপু!" সে মরিয়া হইয়াই চলিয়া গেল। সুকৃতির কান্না থামিল।

সোজা সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল। গিয়া দেখিল নটবরের দ্বারে তালা লাগান। বুঝিল, নটবর বাহিরে গিয়াছে। কিন্তু তাহার তখন অন্য কোনও কথা মনে হইল না। সে দরজার তালা খুলিয়া ভিতরে গেল। এ ঘরের ভিতরে কেহ যাইত না, সে জানিত। একবার ইতস্তত দেখিয়া সে বিছানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া চাবির সন্ধান করিল। শেষে নটবরের মাথার বালিশের তলে চাবি পাইল।

চাবি লইয়া সে সিন্দুক খুলিতে চেষ্টা করিল—প্রথমটা পারিল না। সে তাহাতে দমিল না। অনেক চেষ্টার পর সিন্দুক খুলিল। সে দেখিল সম্মুখে কতকগুলি টাকা ও নোট।

নোট ও টাকাগুলি লইয়া সে ভাবিল, এইবার নীচে যাওয়া যাক্। তখনই সমস্ত তদবস্থাতে ফেলিয়া সে নীচে নামিতেছিল, কিন্তু তাহার ভয় হইল, যে হয় ত এই অবস্থাতে সব রাখিয়া গেলে সুকৃতি আবার একটা হাঙ্গামা বাধাইবে। সে আবার ফিরিল। সিন্দুকের ভিতর আরও টাকা আছে কি না দেখিতে গেল। একটা টানা ছিল, সেটা সে দেখে নাই। এইবার দেখিল যে তাহাতে কতকগুলি কাগজপত্র। কি ভাবিয়া সেগুলিও সে লইল।

তার পর সে সিন্দুক যথাপূর্ব্ব বন্ধ করিয়া, বিছানা ঠিক করিয়া পাতিয়া মাথার বালিসও যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার নীচে সিন্দুকের চাবি রাখিল। শেষে আর কোথায়ও কিছু ভুল করিয়াছে কি না তাহা দাঁড়াইয়া দুই চারি মিনিট দেখিয়া লইল। টেবিলের উপর ছড়ান কাগজ পত্রও একটু দেখিল। এক পার্শ্বের টেলিফোনটাও নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। সব দেখা হইলে সিন্দুকের দলিল দস্তাবেজ শঙ্কর সমস্তই তাহার কোঁচার কাপড়ে পুরিয়া ঘর হইতে বাহির হইল ও ঘরের দ্বারে তালা লাগাইয়া নীচে বাহিরে চলিয়া গেল। এই কাজে তাহার এতটুকু ভয় বা সন্দেহ কিছুই হইল না। তাহার বিশ্বাস হইল যে নটবরের সম্মুখেও সে ঠিক এইরূপে সমস্ত লইয়া যাইতে পারিত, কিছুমাত্র সঙ্কোচ ঘটিত না। তাহার মনেই হইল না একবারও—যে সে চুরি করিতেছে। শুধু সুকৃতির কথা ভাবিয়াই সে দরজা বন্ধ করা বা গোপন করার সমস্ত চেষ্টাটা করিয়াছিল। সোজা ভাষাতে সে ইহাই বুঝিয়াছিল যে নটবর টাকা থাকা সত্ত্বেও কাহাকেও খাইতে দিতেছে না যখন, তখন তাহার টাকা লওয়াই উচিত, ইহাতে অন্যায় কিছু নাই।

সমস্ত কোঁচার কাপড়ে লইয়া সে নীচে আসিয়া নিজের

ঘরে গিয়া সুকৃতির সামনে তাহা ঢালিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও! যাও, আর কেঁদ না। অনেক টাকা আছে—খুব খাও গে।"

তাহার ঘরের দরজাও বন্ধ করে নাই সে। সুকৃতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রথমে দরজা বন্ধ করিল—তারপর হঠাৎ শঙ্করের গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

শঙ্কর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জোর করিয়াই তাহাকে পৃথক করিয়া বলিল, "আরে গেল!" তারপর কহিল, "অমন ক'র্‌লে এখনই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।"

সুকৃতির ভাবাবেগ তখন একটু প্রশমিত হইয়াছে। সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে নিম্নকণ্ঠে বলিল, "না, না। তুমি আর যাবে না। যাবে ত আমিও যাবো। না হয়, এই টাকা নিয়ে চল আমরাও দাদার মত পালাই, যেখানে হয় পালাই, এ বাড়ীতে নয়। যাবে?"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "তোমার কথাতেই নাকি? না। যাবার দরকার নেই। আর যাই ত আমি একলাই যাবো। কাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো না। আরে গেল যাঃ।"

সুকৃতি জোর করিয়া কহিল, "আমি যাবোই। আমি তোমার সঙ্গে যাবোই—কিছুতেই ছাড়্‌বো না। জান তুমি, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? সবাই জানে। বিয়ে তোমাকে কোর্ত্তুম না—কিন্তু এখন ক'রবো। কেন আমাকে বিয়ে ক'র্‌বে না?" সে হঠাৎ আবার উত্তেজিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

শঙ্কর বিব্রত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবেখন। তুমি টাকাকড়ি নিয়ে এখন যাও—কাকীমাকে দাও গে। পরে দেখা যাবে।"

সুকৃতিরও আত্মস্থতা পুনরায় ঘটিল। সে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিয়া টাকা ও নোট উঠাইয়া, দলিলপত্র ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কহিয়া গেল, "রাত্রে আস্‌বো ফের।"

সে রাত্রে আসিবে শুনিয়া শঙ্করের মনে নূতন আতঙ্ক হইল। ব্যাপার ত বড় ভাল হইয়া দাঁড়াইতেছে না। এ মেয়েটার স্বভাবের কোনও রকম ঠিকানা সে পাইতেছিল না। সব মেয়েরই এই রকম কর্তৃত্ব করা স্বভাব—লক্ষ্মীও শঙ্করকে এইরূপে আদেশ করিতে দ্বিধা করিত না, এখানেও এই সুকৃতি। শঙ্করের বাঁচিয়া তবে লাভ কি? শঙ্কর ভাবিল সে এখানে আর কিছুতেই থাকিবে না। এমন দেশে যাইবে যেখানে স্ত্রীলোক নাই।

তখনই সে বাহির হইবার ব্যবস্থা করিল। বস্ত্রাদি তাহার যাহা ছিল তাহার সঙ্গে লইল, মেঝের উপর দলিলপত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহার কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে সেগুলিও বাঁধিয়া কাপড়ে লইল, বোধোদয় ও শুভঙ্করী ও শ্লেটখানাও যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিল—তারপর আস্তে আস্তে নটবরের গৃহত্যাগ করিল।

কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া সে কোথায় যাইবে জানিত না। একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে সে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। দ্রুতপদেই সে সাধারণত চলিত, আস্তে চলিতে পারিত না। এক ঘণ্টার ভিতরই সে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করিবে এমন সময় মুখুয্যে মশায়ের সহিত তাহার দেখা হইল। মুখুয্যে মশায়ও ট্রেণ ধরিতে আসিতেছিলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটু পূর্ব্বে আহার্য্যের সন্ধানে গিয়াছিলেন—কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্নিকের লোভ সামলাইতে পারেন নাই। তাহাতেই ও তাহার পরে জলযোগে এত সময় নষ্ট করিয়াছিলেন যে ৭টার ট্রেণও ছাড়িয়া যাইবার প্রায় ২০ মিনিট পরে ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলেন।

শঙ্করকে হঠাৎ দেখিয়া মুখুয্যে মশায় ডাকিলেন, "শঙ্কর!"

শঙ্কর ও থামিয়া কহিল, "মুখুয্যে মশায়, আপনি!"

মুখুয্যে মশায় কহিলেন, "কোথায় চলেছিস্‌?" শঙ্কর উদাসস্বরে বলিল, "যে দিকে চোখ যায়! এখানে আর না! কোথাও আর না!"

মুখুয্যে তাহাকে ধরিলেন ও তারপর বলিলেন, "চল, গাঁয়ে যাই।"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া কহিল, "উঁহু! পয়সা নেই।"

মুখুয্যে মশায়ের কাছেও পয়সা ছিল না। টিকিট কেনা হইয়াছিল দেখিয়া তিনি বাকী পয়সাতে জলযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবীণ তিনি, কিছুতেই হতাশ হইলেন না। বলিলেন, "চল, হেঁটে যাই। দুদিন লাগ্‌বে। পথে ভিক্ষে করে খাবো। পার্‌বি না?"

শঙ্কর বলিল, "হাঁটতে পারবো, ভিক্ষে ক'র্‌তে পারবো, জ্যেঠামশায় !"

মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "আচ্ছা চল, এখন কলকাতাতেই আজ থাকি কোনও বাসাতে—ধর্ম্মশালাতে—কাল পরশু বাড়ী থেকে টাকা আনিয়ে ব্যবস্থা ক'র্‌বো।"

তিনি শঙ্করকে ছাড়িয়া দিতে ভরসা করিতে পারিলেন না। দুজনে পুল পার হইয়া নিকটের এক ধর্ম্মশালাতে উঠিলেন ও অনেক মিনতি করিয়া দ্বারবানের কাছ হইতে একটি অপ্রশস্ত কক্ষ চাহিয়া রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলেন।

পরদিন অতি প্রভাতে উঠিয়া মুখুয্যে স্ত্রীর নামে এক বেয়ারিং চিঠি লিখিয়া জানাইলেন—যে উপায়েই হোক্ যেন বিশ্বাসদের বাড়ীর সাধুকে দিয়া অন্তত ২৫৷৩০ টাকা পত্র পাঠ পাঠান হয়। ধর্ম্মশালার ঠিকানা দিলেন ও আরও লিখিয়া দিলেন—দরকার হইলে তাঁর ও শঙ্করের বাড়ীর জিনিসপত্র রাধা কৈবর্ত্তের বাড়ী বাঁধা দিয়াও টাকা যেন পাঠান হয়। নচেৎ বাড়ী ফিরিতে পারিবেন না। চিঠি ডাকে দিয়া আসিয়া মুখুয্যে শঙ্করকে বিছানা হইতে তুলিলেন ও তাহার সঙ্গে কি আছে দেখিতে লাগিলেন। শঙ্করের কাপড়ের মধ্যে কাগজপত্র দেখিয়া তিনি তাহা বাহির করিতে করিতে বলিলেন, "এ সব কি কাগজ রে, শঙ্কর ?" কাগজ দেখিয়া শঙ্করের মনে ভয় হইল, শঙ্কর উত্তর দিল, "জানি না।"

মুখুয্যে মশায় কাগজপত্র পড়িতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত নানাবিধ হিসাবের কাগজ—তাহা মুখুয্যে বুঝিতে পারিলেন না। দুইখানি কাগজ তাঁহার কাছে একটু রহস্যময় লাগিল। একখানিতে এক রাধারাণী দাসী নটবরের নামে তাহার সমস্ত বিষয় ও অর্থ লিখিয়া দিয়াছে ও অন্য একখানিতে এই বিষয়ের ও অর্থের একটা তালিকা রহিয়াছে। সে তালিকা বেশ বড়।

মুখুয্যে সেই কাগজ দুইখানি লইয়া বার দুই পড়িয়া শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, "রাধারাণী দাসী বলে নটবরের বাড়ীতে কে আছে রে ?"

শঙ্কর তখন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল—ভট্‌চাজের বাড়ীরই কথা। সে চমকিত হইয়া মুখুয্যের মুখের দিকে তাকাইল। মুখুয্যে পুনরায় তাঁহার প্রশ্ন করিলেন। শঙ্করের যেন একটা কি মনে পড়িয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইতস্তত দেখিয়া তাহার বোধোদয়, শুভঙ্করী ও শ্লেটের বোঝা আনিয়া শ্লেটখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যে দিকে এক ইঞ্চি হরফে লেখা ছিল—"শ্রীমতী রাধারাণী দাসী—গ্রাম মধুপুর,—জেলা রংপুর"—সেদিকটা মুখুয্যে মশায়কে দেখাইল। মুখুয্যে মশায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে ?" শঙ্কর জবাব দিল, "ঐ !"

তারপর সে মুখুয্যের হাত হইতে কাগজ দুইখানি লইয়া মনোযোগপূর্ব্বক পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্ত পড়িয়া উঠিতে পারিল না।

মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "ব্যাপারটা খুলে বল, শঙ্কর ; তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি কখনও কিছু হবে না রে ? এ নটবরের কে হয় ?"

শঙ্কর একটু ভাবিয়া উত্তর দিল, "ও কেউ না। ভট্‌চাজের বাড়ীতে থাকে। অতি অদ্ভুত লোক জ্যেঠামশায়।"

মুখুয্যে দেখিলেন—প্রশ্ন করিয়া এমন কোনও উত্তর পাওয়া যাইবে না যাহাতে তিনি কিছু বুঝিতে বা জানিতে পারিবেন। তাই তাহা বন্ধ রাখিয়া কাগজ দুইখানি ভাঁজ করিয়া সযত্নে নিজের পুরাতন কোটটির পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "চল, দেখি টিকিটখানা বেচে কিছু পয়সা পাই যদি, আজ দু'জনের চলে যাবে। ষ্টেশনে বিক্রয় হবেই আজ। ত্রিশবিঘার না হয়—ব্যাণ্ডেলের লোক পাবোই। তবে কালকের টিকিট আজ বিক্রি হবে কি না জানি না। না হয় টিকিটঘরেই জমা করে দিই গে।"

তিনি শঙ্করকে লইয়া টিকিট বেচিতে বাহির হইলেন—কিন্তু আসলে তিনি একটু ভাবিতেই চলিলেন বাহিরে। নটবরের সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ক্রমশ খুব বেশী হইতেছিল—তিনি নটবরের দুষ্কৃতি সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—লক্ষ্মীর আশা

লক্ষ্মী মুক্তির জন্য নানা উপায়ের কথা ভাবিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থির করিতে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই পারিল না। বেশী ভাবিল আপনার দুরদৃষ্টের কথা। সে কি ও কিসের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা ভাবিয়া তাহার কান্না আসিল। কি অভিশপ্ত জীবনই তাহার। ইহার ভিতর একমাত্র উজ্জ্বল

রেখা তাহার শঙ্করের প্রতি স্নেহ। স্নেহ-ই সে এবং তাহা অনুরাগে কখনও পরিণতি পায় নাই। পরিণতি পাইতে পারিত—যদি শঙ্কর এতটুকু বুঝিত। পাগলা শঙ্করকে লইয়া ৺হরিনারায়ণ ও যত সহ্য করিয়াছে, লক্ষ্মী তদপেক্ষা বেশীই করিয়াছে। সে স্পষ্টরূপে জানিত যে যদি কোষ্ঠীর বিচারে না বাধিত—তবে হরিনারায়ণ শঙ্করের সহিত তাহার বিবাহ দিত। বিবাহ দিলে নিতান্ত অসুখী লক্ষ্মী হইত না। সে ত জন্মাবধি আর কাহারও কথা ভাবে নাই, অন্যত্র বিবাহ হইবে বড় হইয়া কল্পনাও করে নাই। হরিনারায়ণের মৃত্যুর পরই না সমস্ত কেমন উল্টাইয়া গেল। সেও ত তাহারই ভাগ্য। ইহার জন্য সে কখনও কখনও শঙ্করের কোষ্ঠীকারদের উপর বিরক্ত হইয়া মনে মনে তাহাদের মুণ্ডপাত করিত—সে নিজে কোষ্ঠীতে একটুও বিশ্বাস করিত না—কিন্তু তাহার বিশ্বাসে বা ক্রোধে কি আসে যায়? শঙ্করের মনটা যে সাধারণ লোকের মত নয় তাহা সে জানিত—আর জানিত বলিয়াই শঙ্করের প্রতি তাহার আকর্ষণ একটা ছিল। সেই কেবল এই সন্ন্যাসী-প্রকৃতির বয়স্ক বালকটিকে মানাইয়া চলিতে শিখিয়াছিল।

এই প্রকার চিন্তাতে তাহার সময় কাটিয়া গেল। শেষে সে নিতান্ত ক্লান্ত বিরক্ত হইয়া উঠি উঠি করিতেছে—ঘরের ভিতর তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—তখন দরজাতে করাঘাত হইল। লক্ষ্মী ভাবিল শঙ্করের সেই বিনোদ ভট্চাজ আসিয়াছে—তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে কাহার কণ্ঠে উত্তর আসিল, "দরজা খোল লক্ষ্মী"—সে বিনোদ নহে তাহা লক্ষ্মী বুঝিল। দরজা খুলিবে কি না সে ভাবিতেছে এমন সময় বাহিরের কণ্ঠ বলিল, "আমি নটবর, দরজা খোল।"

লক্ষ্মীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে আর দ্বিধা না করিয়া দরজা খুলিল। দেখিল স্বয়ং নটবর ও তাহার পশ্চাতে লণ্ঠন হাতে বিনোদ ভট্টাচার্য্য।

নটবর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিনোদকে লণ্ঠনটি রাখিতে বলিলেন। তারপর মেঝের শয্যাতে বসিয়া লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছ লক্ষ্মী, না?"

লক্ষ্মী উত্তর দিল না। নটবর হাসিয়া বলিলেন, "তা হবার কথা। কিন্তু কল্‌কাতা শহরে এমন কিছু ঘটে না—যার নিশানা নটবর মিত্তির ক'র্‌তে পারে না। আজই সকালে মুখুয্যে এসে সব কথা বলে—আর দেখ্‌ এরই মধ্যে তোর ঠিকানা বার করেছি। শুধু বার—একেবারে বদ্‌মাসগুলোর হাতে হাতকড়া! এতক্ষণ সব ঘানি টান্‌ছে।"

লক্ষ্মী বিনোদ ভট্চাজকে একবার দেখিয়া লইল। তাহার এই দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া নটবর কহিলেন, "ঐ ত আমার সহায় রে—ওকে ধরাতে পারি? ব্রাহ্মণ বদ্‌মাসের দলে থাক্‌লেও মনটা ওর ভাল। ঐ আমাকে গিয়ে দুপুরে খবর দেয়। "ভট্চাজ লোক ভাল—বড় সরল।"

এত লোকের মধ্যে নটবরকেই বাছিয়া এই ভাল মানুষ বদ্‌মাস ব্রাহ্মণ কেন খবর দিতে গেল লক্ষ্মী তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আপনার মনের কথা সে গোপন করিয়া বলিল, "বাঁচিয়েছেন কাকাবাবু, আমার যে কি ভয় হ'য়েছিল? আপনি না থাক্‌লে রক্ষে পেতুম না নিশ্চয়। আপনার চিঠি পেয়ে এসেছিলুম আমরা—।" তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া নটবর সহাস্যেই বলিলেন, "বিয়ের নামে আর তর্‌ সয় নি তা জানি রে! তা ভালই। এখন আর কোনও হাঙ্গাম নেই। তোর কোনও ভয় নেই। কালই বিয়ের ব্যবস্থা হবে। কেমন তা হলেই ত হবে? অ্যাঁ?"

লক্ষ্মী লজ্জায় মাথা নত করিল।

নটবর কহিয়া চলিলেন, "বিয়ের সময় বর ক'নে এক বাড়ীতে থাক্‌তে নেই—তা জানিস ত? তাই তুই এইখানেই থাক্‌—আর কোনও ভয় নেই। এ ভট্চাজ্‌ ভাল লোক। তা ছাড়া বাইরে আমি আমারও দুচার জন লোক রেখে যাচ্ছি। আর পুলিসের লোক রোজ এসে খোঁজ নিয়ে যাবে। কাল বিয়ের পর আমার বাড়ী যাস্‌—কেমন? তর্‌ সইবে ত? মুখুয্যে ত ভয়ে সকালেই দেশে পালিয়েছে—তা না হ'লে তাকেই পাঠাতুম, তোর কাছে এসে থাকতো দুদিন।"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে বলিল, "যা ভাল বোঝেন করুন আপনি।" নটবর হাসিয়াই বলিলেন, "ভাল যাতে হয় তাই ত ক'র্‌ছি ও ক'র্‌বো। আমার আর কোনও রকম স্বার্থ এতে কি, বল? যাক্‌—আর আমাকে আস্‌তে

হবে না ত? কাল বিয়ে হবে—তখন বর নিয়ে আস্‌বো, কেমন?" তারপরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "অবশ্য এ ত সব তোর মনোমত আয়োজন হবে, কিন্তু তোর ও শঙ্করের পিতৃবন্ধু হিসাবে একটী কথা বল্‌তে চাই, লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

নটবর বলিলেন, "শঙ্করের সঙ্গে কি দেখে বিবাহ দেব তা জানি না। সত্য সে স্বাভাবিক পুরো মানুষ নয়। তার না আছে বুদ্ধি, না আছে অর্থ। এই এতদিন আমার কাছে সে রয়েছে—একটা কিছুই আজও শিখতে পারে নি। লেখাপড়াও অষ্টরম্ভা। এ অবস্থাতে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, আর তোকে জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। আমার মনে হ'চ্ছে, আমি সত্যি বড় মহাপাতক ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি।"

লক্ষ্মী ইহার উত্তরে ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। এ কথা সর্ব্বথা সত্য। নটবর বলিয়া চলিলেন, "এত বড় বংশের মেয়ে তুই, বয়স্কা, বুদ্ধিমতী ও দেখ্‌তেও কুশ্রী নও—তোর ভবিষ্যৎ জীবনটা নষ্ট ক'রতে যাচ্ছি এ ভাবনা আমাকে অন্তরে অন্তরে পীড়া দিচ্ছে। তোর চাত্‌রার মাসীর পুত্রটি শঙ্করের চেয়েও পাত্র হিসাবে ভাল বটে—তবুও সে তোর উপযুক্ত নয়। সেও অবশ্য এখনি বল্‌লে বিয়ে করে তোকে। কিন্তু তাই বা দিতে পারি কৈ? বড়ই চিন্তাতে পড়েছি। দায়িত্ব নিয়ে ভাল করি নি।"

লক্ষ্মী চুপ করিয়াই রহিল। নটবর চিন্তান্বিত হইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্, তোর অভিলাষ পূর্ণ হ'লেই হ'ল। আর কি চাই? কিন্তু পরে আমাকে দোষ দিস্ নি। এ কথা আগে থেকেই সাফ্ বলে রাখি।"

নটবর উঠিলেন ও ভট্‌চাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভট্‌চাজ, কাল রাত্রে ১১॥০টাতে যে লগ্ন আছে তাতেই বিয়ে হবে। সমস্ত জোগাড় করে রাখ্‌বে, যা যা দরকার হয় আমি পাঠিয়ে দেব। যেন ভুল না হয়।"

ভট্‌চাজ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। নটবর লক্ষ্মীকে আর একবার নির্ভয়ে থাকতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মী নটবরকে এতকাল সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল ভাবিয়া আজ অনুতপ্ত হইল। সে দেখিল, নটবর সত্যই তাহাদের প্রতি সদয়। অপরে এত কি করিত কখনও? সে রাত্রে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইল; তাহার মন অনেক কাল পরে অত্যন্ত হালকা হইয়াছিল। অবশ্য নটবর শঙ্কর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। লক্ষ্মীও যে তাহা ভাবে নাই, তাহা নহে। সকল কথাই ভাবিবার মত বুদ্ধি তাহার হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করার কথা সে মনেই আনিতে পারিত না। শঙ্কর হইতে তাহার বিশেষ কোনও ভরসা নাই; তবে তাহাদের ত পুত্র কন্যা হইবে। সেই অনাগত পুত্রকন্যার উপরই লক্ষ্মীর ছিল সমস্ত নির্ভরতা। তাহারাই যে বসু ও রায়বংশের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল করিবে তাহাতে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না।

রাত্রে ভট্‌চাজ তাহাকে যখন আহার দিতে আসিল, তখন তাহার মন এই কারণে অতি প্রফুল্ল। সে চাহিয়া কৌতুকভরে ভট্‌চাজকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু ভট্‌চাজের মুখে যেন একটা গভীর উদ্বেগের ছায়া। লক্ষ্মী খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্‌চাজ মশায়, নটবরকাকা যা বলে গেলেন তা সত্যি ত?"

ভট্‌চাজ ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল, তারপর অসংলগ্নভাবে উত্তর দিল, "হাঁ, মিত্তিরজা যখন বলেছে—কিছু ভয় নেই!"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "আপনি ওঁকে কেমন করে চিন্‌লেন? আর আমি যে ওঁর বাড়ীতেই যাবো—তা জান্‌লেন কি ক'রে? এ বড় আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে সব।"

ভট্‌চাজ কিছুকাল চুপ করিয়া লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তর দিতে যেন সাহস করিল না।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছেন? ব্রাহ্মণী ক'র্‌তে পারেন কি না? কিন্তু আমার কথার ত জবাব দিলেন না। নটবরকাকার কাছে এত লোক থাক্‌তে গেলেন কেন? আপনার দলেরই বা বাকী সব কোথায় গেল? সবাই জেলে গেছে, সত্যি? পুলিসে ধরেছে?"

ভট্‌চাজের মুখ শুকাইল, তাহার চক্ষু ছোট হইল, তাহার স্বর আর্দ্র হইল। সে বলিল—কম্পিত স্বরে—"পুলিস? জেল? কৈ? না, না, আমি কিছু জানি

না—সব মিত্তিরজাই জানে। আমাকে বলেছিল তাই না"—সে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ সরু গলিতে অন্তর্হিত হইল।

লক্ষ্মীর কাছে ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর হইল। সে ভাবিল, ভট্‌চাজ নিশ্চয়ই পাগল। পাগল না হইলে এইরূপ ব্যাপার কখনও করে ?

সে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া লইল। পাছে ব্রাহ্মণ ভট্‌চাজ তাহার ভাতের এঁটো থালা লইয়া যায়, তাই সে থালা পাশের ঘরে লইয়া গিয়া মাজিয়া ধুইয়া দিল। তারপর সে আবার সেই ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইতে যাইবার উদ্যোগ করিল।

নিঃশব্দে ভট্‌চাজ পুনরায় দেখা দিল। লক্ষ্মী তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিল মাত্র। ভট্‌চাজ থালা উঠাইয়া লইয়া লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিয়ে ক'র না। পালাও !"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে ক'রবো বলেই ত এসেছিলুম কলকাতাতে ! এখন পালালে চল্‌বে কেন ?"

ভট্‌চাজ যেন সে কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া সে আবার চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী দ্বার বন্ধ করিয়া শুইল। তাহার চিত্তের লঘুভাবহেতু সে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। আর তাহার ভয় করিবার কিছু নাই।

কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল, নটবরের সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। শঙ্করের সহিত নহে। শঙ্কর দাঁড়াইয়া শুধু দেখিতেছে মাত্র। তৎক্ষণাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে আপন মনে বলিল, "ধ্যেৎ !"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ—নটবরের সংসার ত্যাগ

মুখুয্যে মশায় হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া টিকিট বেচিতে পারিলেন না। টিকিট জমাও করাইতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি কাতর হইলেন না। ইতিমধ্যে তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন যে এই রাধারাণী দাসী—গ্রাম মধুপুর ও জেলা রংপুরের সহিত নটবরের জীবনের একটা রহস্য জড়িত আছে। পরদিন টাকা লইয়া বিশ্বাসদের মধু আসিলেই তিনি এই সূত্রের সন্ধান করিবেন। একবার নটবরকে হাতে পাইলে লক্ষ্মীর উদ্ধারের কোনও বিঘ্ন হইবে না—তাহা তিনি যেন স্পষ্ট অনুভব করিলেন।

ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় তিনি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কাছে নটবর কিছু লিখিয়ে নিয়েছে কি রে, শঙ্কর ?" শঙ্কর জানাইল, "না"। মুখুয্যে তখন বলিলেন, "খবরদার, বোকামি করে যেন কিছু লিখে পড়ে দিস্ নি। আর সেই ভট্‌চাজের বাড়ী কোথায় ?" শঙ্কর বলিল, "ঠিকানা জানি না, তবে বাড়ী চিনি।" মুখুয্যে কিছু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা পরে হবে। তুই এখন নটবরের বাড়ীতেই ফিরে যা। আমি এসে খুঁজে নেব আবার—বুঝেছিস্ ? আর যতক্ষণ না আমি ফিরছি, তুই কোথায়ও যাস্ নি। তারপর সন্ন্যাস নিতে হয় নিবি, যেখানে যেতে হয় যাবি। বুঝ্‌লি ?"

শঙ্করের মনটা প্রভাতোদয় হইতেই নটবরের ও ভট্‌চাজের বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। মুখুয্যেও নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি একদিন উপবাস করতে পারিবেন—ব্রাহ্মণকে অমন কত উপবাস করিতে হয়—কিন্তু ঐ বালক শঙ্কর কিরূপে উপবাস করিবে ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন।

শঙ্কর আবার তাহার বোধোদয়, শুভঙ্করী, শ্লেট ও কাপড়ের পুঁটলি লইয়া কাঁটাপুকুরে ফিরিল।

নটবরের বাড়ী পৌঁছিয়া সে দেখিল—বাড়ীতে প্রলয়কাণ্ড চলিতেছে। নটবর সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখেন—টাকা নাই, বহুমূল্য ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র নাই। তখনই তিনি বাড়ীর প্রত্যেককে ডাকিয়া পাঠান, প্রত্যেককে জেরা করেন, কিন্তু কেহই কিছু স্বীকার করে নাই, কিম্বা দেখিয়াছে কিছু—তাহাও বলে নাই। তখন শঙ্করের সন্ধান হওয়াতে, তাহার ঘরে কিছু নাই জানিয়া সন্দেহ তাহার উপরই পড়ে। নটবর তাহাকে খুন করিবে বলিয়া বিলক্ষণ তর্জ্জন করিতেছিলেন—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শঙ্করও বই শ্লেট লইয়া উপস্থিত হইল।

তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভৃত্যেরা নটবরের সম্মুখীন করিল। নটবর চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ কোথায় টাকা দলিল রেখেছিস ? না হলে—" তিনি ক্রোধের উত্তেজনাতে—বাক্য সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। শঙ্করের হাতে তখনও শ্লেট-বই ; সে একটু হতবুদ্ধিভাবে বলিল, "টাকা খরচ হ'য়ে গেছে,—অত টাকা থাক্‌তে কেউ খেতে পাবে না সেটা কি ভাল, কাকাবাবু ?

আর দলিল—সে গঙ্গাতে ফেলে দিয়েছি। পুরাণো কাগজ বৈ ত নয়।"

নটবরের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "চোর, পাজী, বদমাস কাঁহে কা—আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন—" তিনি কক্ষের এক কোণের এক মোটা লাঠি লইয়া শঙ্করের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সুকৃতি কোথা হইতে আসিয়া ধাক্কা দিয়া শঙ্করকে সরাইয়া দিল। উদ্যত দণ্ড সুকৃতির মাথাতে ও হাতে পড়িল। নটবর তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া শঙ্করের দিকে আবার চলিলেন। সুকৃতি শঙ্করকে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "মাথা খাও, পালাও শীগ্‌গির!" সুকৃতি সঙ্গে সঙ্গে গিয়া নটবরকে আবার জড়াইয়া ধরিল। নটবর সাধ্যমত নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, লাঠির আঘাতে আঘাতে সুকৃতির মাথায় ক্ষতের পর ক্ষত রক্তে রঞ্জিয়া উঠিল, তাহার মুখ বিক্ষত হইল, হাত ভাঙ্গিবার মত হইল, তবু সে ছাড়িল না। শেষে যখন নটবর শ্রান্ত হইয়া লাঠি ফেলিয়া বসিয়া পড়িলেন—তখন সুকৃতিও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। একা শঙ্কর ব্যতীত কেহই সেখানে ছিল না।

নটবরের উপর শঙ্করের বিজাতীয় ক্রোধ হইতেছিল—কিন্তু সে অগ্রসর হয় নাই। এখন দ্রুতপদে আসিয়া মূর্চ্ছিতা সুকৃতিকে উঠাইয়া লইয়া শঙ্কর তাহার নিজের কক্ষে লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

দম লইয়া নটবর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভৃত্যদেব গাড়ী আনিতে বলিলেন—গাড়ী আসিলে নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ লইয়া গাড়ী করিয়া নূতন এক বাসাতে গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"এ বাড়ীর কেউ আমার নয়। আমি আজ থেকে একলা। সব এরা আমার শত্রু।"

ক্ষান্তমণি শুনিয়াও শুনিলেন না। তিনি গিয়া বিছানা লইলেন। প্রকৃতি স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বাড়ীতে কোনও ভৃত্য রহিল না। সবাই নটবরের সঙ্গে গেল। শঙ্কর তখন বাহিরে যাইয়া কল হইতে জল লইয়া আসিয়া আপনার বস্ত্র ছিঁড়িয়া তাহা দিয়া সুকৃতির মাথা মুখ পরিস্কার করিয়া দিল। তার পর সমস্ত ক্ষতে জলপটি বাঁধিয়া দিয়া, সে মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর সুকৃতির জ্ঞানসঞ্চার হইল। সে চাহিয়া দেখিল। শঙ্কর ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল, "সুকৃতি! সুকৃতি!"

সুকৃতি তাহার মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া যেন তবে চিনিতে পারিল। তার পর হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখমণ্ডল ব্যথাতে আড়ষ্ট হইয়াছিল তাই হাসিতে পারিল না। সে আবার চক্ষু মুদিত করিল।

শঙ্কর আবার ডাকিল, "সুকৃতি!"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই সুকৃতি উত্তর করিল, "উঁ!"

শঙ্কর বলিল, "আমার জন্যই তোমার এই দণ্ড হ'ল? আমি কি ক'রবো? কেন তুমি আমাকে ঠেলে দিলে? আমি মার খেতুম, তোমায় ত এমন ক'রে মার খেতে হ'ত না!"

সুকৃতি চোখ চাহিয়া সকৌতুকে শঙ্করের ব্যথিত মুখের দিকে চাহিল; তারপর বলিল, "তা হ'লে তোমারও এই দশা হ'ত যে। সে ঠিক হ'ত না—এ জান ত? না—তাও জান না? টাকা ত তুমি নাও নি—আমিই নিয়েছি; আমি তোমাকে না বল্‌লে, চাবি জোগাড় করে না দিলে, তুমি কি নিতে পার্‌তে?—না?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "তা হোক্! তবু আমি মার খেতে পারতুম। তুমি তোমার কি দুর্দ্দশা ক'রেছ দেখ দেখি। মাথা থেকে পা অবধি কিছু বাকী নেই।" সুকৃতি একটু ভাবিয়া প্রশ্ন করিল, "এখানে আমাকে আন্‌লে কে? তুমি?" শঙ্কর মাথা নাড়িয়া জানাইল, সেই আনিয়াছে। সুকৃতি কিছুক্ষণ শঙ্করের দিকে অদ্ভুতভাবে চাহিয়া বলিল, "মার খেয়ে আমার তবে লাভই হ'য়েছে। তা ছাড়া আমার দোষেই যখন সব ঘটেছে, তখন তুমি মার খাবে কেন? সেটাই অন্যায় হ'ত।"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা হ'ক্! আমি মার খেতে পারতুম। না, না, তুমি বড় অন্যায় করেছ, সুকৃতি!"

সুকৃতি আবার চোখ বুজিয়াই বলিল, "বেশ ক'রেছি, তুমি খুব সাধু! কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবে না ত? কাল রাত্রে কতক্ষণ যে তোমার ঘরে এসে অপেক্ষা করে গেছি তা জান? কোথায় গিছ্‌লে? আর যাবে না ত?"

শঙ্কর এইবার প্রমাদ গণিল। তবু বলিল, "না যতদিন না তুমি ভাল হও, ততদিন নিশ্চয়ই থাক্‌বো। এখন ডাক্তার আন্‌বো? এই মোড়ে এক ডাক্তার থাকেন।"

সুকৃতি উত্তর করিল, "না। কিছুরই দরকার নেই। তুমি আমার কাছে বসে থাক। একটু হাওয়া কর। আমি ভাল হ'য়ে উঠ্‌বো।" তারপর আবার একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "রান্নাঘরে সব রান্না আছে, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তুমি গিয়ে খেয়ো, আর প্রকৃতিকেও দিয়ো। মার জন্য সাগুও তৈরি করে রেখে এসেছি—দিয়ো।"

শঙ্কর বলিল, "আচ্ছা, তুমি ঘুমোও। আর যন্ত্রণা হ'চ্ছে না ত?" কি ভাবিয়া সুকৃতি উত্তরে কহিল, "না।" অল্পক্ষণ পরে সুকৃতি ঘুমাইয়া পড়িল; শঙ্কর তাহার কাছে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ কিসের একটা প্রবল আকর্ষণে সুকৃতির রক্তাঙ্কিত শুষ্ক ম্লান মুখের উপর অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি চুম্বন দিয়াই চোরের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় দরজাতে শিকল তুলিয়া দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ—লক্ষ্মীর বিবাহ

লক্ষ্মীর বিবাহের ঘটা নাই, সুতরাং তাহার আয়োজনের জন্য ভট্‌চাজকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় নাই। সে পুরুত নাপিত সহজেই সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার অধিক কাহাকেও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। লক্ষ্মী এই বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল। ইহাতে তাহার দুঃখের চেয়ে স্বস্তিই বেশী অনুভব হইতেছিল। জটলা ও ঘটা করিয়া বিবাহের মত অবস্থা তাহার ছিল না—নটবর তাহা করিলেই লক্ষ্মীকে লজ্জিত ও বিপন্ন হইতে হইত। কোনগতিকে বিবাহ হইয়া গেলেই সে বাচে। নাপিত পুরোহিতই দরকার—এয়ো পাচ জন নাই বা হইল।

সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া লক্ষ্মীর কাটিল। আকাশ-বাতাস সেদিন তাহার কাছে সব সুখকর, সঙ্গীতময়। সে নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়াও কতক ভাবিল। না—দুঃখের কিছু নাই। তবে শঙ্কর সেই বিবাহ করিলই—আগে হইলে কত আনন্দের হইত। এত অনর্থ ঘটিত না। বিবাহের পর সে দেখিবে—শঙ্করের কোষ্ঠী বদ্‌লাইতে পারে কি না। কেমন শঙ্কর তাহাকে ত্যাগ করিয়া—গৃহত্যাগ করিয়া যায়, সে দেখিবে। তাহার গৃহের কথা মনে হইল—তাহার গৃহ শঙ্করের গৃহ—রায় ও বসুবংশের মিলনের মহাতীর্থ ত্রিশবিঘার সেই বাড়ী। হৌক ভগ্ন—তাহারা ইহার সংস্কার করিয়া লইবে; চারিদিকের বৃক্ষ-কুঞ্জের মধ্যে, পল্লীর শ্যামল শ্রীর বেষ্টনীতে, শান্তির ক্রোড়ে সেই গৃহকে সে লক্ষ্মীশ্রীতে ভরাইয়া তুলিবে। লক্ষ্মী আপনার ভবিষ্যতের সুখের চিত্রে নানারকম রং তুলিয়া তাহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ভট্‌চাজ আসিয়া বিবাহের সজ্জা-বস্ত্রাদি দিয়া গেল—যাহা যাহা প্রয়োজনীয়। প্রভাতে সেই গাত্রহরিদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহার বিশাল মুখে কপালে কোথাও প্রসন্নতার—সুখের লেশমাত্র নাই—যেন সে নিজের বধ্যভূমিতে যাইতেছে—এইরূপ তাহার ভাব। তব্‌ লক্ষ্মী তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহার চক্ষুতে ভট্‌চাজের হাস্যলেশহীন গম্ভীর মুখও যেন প্রসন্ন বলিয়াই মনে হইল।

ভট্‌চাজ ভাঙ্গা গলাতে বলিয়া গেল, "তৈরি হ'য়ে নাও, লক্ষ্মী। সময় মত যেন ঠিক থেক। বুঝেছ? মিস্তিরজা বলে গেছে। না হলে রক্ষে থাক্‌বে না।"

লক্ষ্মী উত্তর করিল, "আচ্ছা।"

ভট্‌চাজ কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিল না।

লক্ষ্মী কক্ষ হইতে আর বাহির হইল না। যখন তাহার কেহই নাই, তখন নিজেকেই সব করিতে হইবে বৈকি। একবার ভাবিল, নটবর মিস্তিরের গৃহিণী ত আছেন—তিনিই বা একবার এলেন না কেন? তাঁর আসাতে দোষ কি ছিল? কিন্তু ভাবিল, হয় ত ব্যস্ত আছেন, না হয় পীড়িত। সে মনে মনেই তাহার একটা সুসঙ্গত কারণ স্থির করিয়া লইল। মন তাহার আর কু গাহিতে চাহিতে-ছিল না।

ক্রমে রাত্রি আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীর অনুমানে প্রায় ১০টা ১০॥০টা হইবে। বাহিরের বারান্দাতে পুরোহিত নাপিত প্রভৃতি ২।৪ জনের কথাবার্ত্তার সংবাদও সে পাইতেছে। সে প্রস্তুত হইল। বস্ত্রাদি যাহা পারিল, তাহা পরিধান করিল। এগারটা বাজিল সম্ভব। আরও পাঁচ সাত দশ বিশ মিনিট গেল। এমন সময় নটবর আসিয়া বাহিরে পুরোহিতকে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, "লগ্নের দেরী কত?" লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর হঠাৎ কাঁপিতে লাগিল।

পুরোহিত—সম্ভব পুরোহিতই হইবে—উত্তর করিলেন, "লগ্ন সমাগত, মিত্তির মশায়।"

নটবর লক্ষ্মীর কক্ষদ্বারে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, দরজা খোল, বড় বিপদ।"

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিল। নটবর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিপদ দেখ। শঙ্করকে এত করে বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক কল্লুম, সব হ'ল, আর এই শেষ মুহূর্ত্তে সে নাই। কোথাও খুঁজে পাই না। একেবারে উধাও হ'য়েছে। এখন উপায়?"

লক্ষ্মীর বুকের ভিতর তখন হিম হইয়াছে। সে উত্তর করিতে পারিল না।

নটবর উষ্মার সহিত বলিলেন, "হতভাগা, পাজি, মেয়ের জাত মার্‌বার ফন্দী! এমন আহাম্মক আমি জীবনে দেখি নি। কি করি এখন আমি?" তিনি হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। নাপিত পুরোহিত ভট্‌চাজ প্রভৃতি সকলে কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া গেল। লক্ষ্মীর শরীরও অবসন্ন হইল, তাহার মস্তকের ভিতর যেন কার তাণ্ডবনৃত্য সুরু হইল। সকলে কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল।

শেষে পুরোহিত মশায় বলিলেন, "লগ্নে কন্যার বিবাহ না হ'লে কন্যার জাত যাবে। মিত্তির মশায়! এক কাজ করুন! বয়স্কা কন্যা—আপনিই উহাকে গ্রহণ করুন। এতে দোষ নাই।"

নটবর মাথা নাড়িয়া প্রবল আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তা কি হয় কখন, পুরোহিত মশায়? আপনি ক্ষেপেছেন না কি? এই বৃদ্ধ বয়সে আমি নূতন দারপরিগ্রহ ক'র্ত্তে পারি কি? না, না, সে কথা বল্‌বেন না। আর লগ্ন কি নেই? তা হ'লে আরও খুঁজে দেখ্‌তুম।"

পুরোহিত বলিলেন, "না, আর লগ্ন নেই। আপনাকেই এ কাজ কর্ত্তে হবে! অন্য পাত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে এই রাত্রে?"

নটবর হতাশ হইয়া লক্ষ্মীর দিকে তাকাইলেন।

লক্ষ্মীর মুখ হইতে বাহির হইল, "না।" তাহার বিহ্বল মস্তিষ্কের ভিতর হঠাৎ যেন একটা পরিষ্কার বুদ্ধির ও বিচার শক্তির আভাষ জাগিয়া উঠিল। পুরোহিত কহিলেন, "না, কেন? জাত যাওয়ার মত অনর্থ কি আছে? পতিত হবে যে? মিত্তির মশায়—সর্ব্বথা যোগ্য পাত্র; তাঁর বয়স এমনই বা বেশী কি? আর তোমার মত বয়স্থা কন্যার পক্ষে ঐ ভাল। অমত ক'র না।"

লক্ষ্মী পরিষ্কারকণ্ঠে এইবার বলিল, "না।" তারপর সে বসিয়া পড়িল।

নটবর মিনতির সুরে কহিলেন, "শোন লক্ষ্মী, আমার দোষেই তুমি এই পতিত হবার মত হ'য়েছ। আমার কর্ত্তব্য তোমাকে বাঁচান। আমি অপাত্র, আমি অযোগ্য তা জানি। কিন্তু উপায় কি? অন্য উপায় আমার হাতে থাক্‌লে তোমাকে পতিত হ'তে দিতুম না। আমার গৃহিণী আছে বটে, কিন্তু সে না থাকারই সমান। তার জন্য তোমার কোনও কষ্ট পেতে হবে না, কোনও অসুবিধা হবে না। আর দেরী ক'রো না—যা হয় মত কর।"

লক্ষ্মী অবিচলিত কণ্ঠে একটু হাসিয়া বলিল, "না।"

নটবর অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পতিত হবে? সেটাই ভাল? কেউ কখনও যে তোমাকে স্পর্শও ক'র্‌বে না।"

লক্ষ্মী উত্তর দিল, "না করুক।"

এইবার নটবর রাগিলেন। এত সহজে তিনি রাগিতেন না; কিন্তু সকাল হইতে তাঁর আজ মেজাজ ভাল ছিল না। রাগিয়া বলিলেন, "তোমার জিদ্‌ই কি জিদ্। দেখি তবে!" তারপর তিনি হুকুম করিলেন, "একে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্প্রদানের জায়গাতে বসাও। আমিই একে বিবাহ ক'র্‌বো।"

দুইজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তখনই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল ও লক্ষ্মীকে অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়া গিয়া দালানের মধ্যে একখানি পিঁড়িতে বসাইয়া দিল। লক্ষ্মী উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই তাহারা বলপূর্ব্বক তাহাকে বসাইয়া রাখিল। নটবর নিজে সামনের পিঁড়িতে বসিতেই, পুরোহিত সম্প্রদানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী মাথা উঁচু করিল না, চাহিয়া দেখিল না, ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে বিবাহের প্রহসন ঘটিতে লাগিল—কিন্তু সে ইহার দর্শকও হইল না। এইরূপ আধ ঘণ্টা চলিবার পর তাহার উপর হইতে লোক দুইটির হাত উঠিল, তাহার কাণে আসিল, কে বলিতেছে, "বিবাহ শেষ হইয়াছে—যথাশাস্ত্রই হ'য়েছে।"

লক্ষ্মীকে কে আদেশ করিল, "ওঠ, যাও!"

লক্ষ্মী নিদ্রিত-জাগ্রতের মত উঠিয়া তাহার সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াই, পড়িয়া গিয়া চেতনা হারাইল। বাহিরে বিবাহের উৎসবের জের তখনও মিটে নাই। নটবর মিত্র হয় ত তখনও তাহার অনুচরদের কি সব উপদেশ ও আদেশ দিতেছিলেন। (ক্রমশঃ)

কৈবর্ত্তরাজ দিব্য

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি

উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় বৎসর বৎসর কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির স্মরণে উৎসব করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের নেতৃত্বে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় স্থিত ধীবরদীঘির কূলে এই উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পৃথিবীপ্রসিদ্ধ মোগল ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, ডি লিট্ মহোদয়ের নেতৃত্বে রাজশাহী জেলার নওগাঁ সাবডিভিশনে সিদ্ধপুর গ্রামে "ভীমসাগর" * তীরে এই উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। রায় বাহাদুর চন্দ ১৯৩৫ সনের মার্চ্চ মাসের Modern Review পত্রিকার ৩৪৭ এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন। Modern Reviewতে প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম—Election of the early kings of Bengal. সরকার মহাশয়ও বর্ত্তমান বৎসরের April মাসের Modern Review পত্রিকায় ৪৩৩ পৃষ্ঠায় Two elected kings of Bengal নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

চন্দ মহাশয় বলেন :—The very scanty materials relating to the early political history of Bengal include accounts of two unique events and reveal to us in outline the figures of two rulers of men of a type rare in the east. The first of these events is the election of Gopala Deva, the founder of the Pala dynasty, as king by the people themselves··; the second event is a political revolution provoked by the oppressive measures of king Mahipala II and the *election* of Divya as king by the revolutionaries in the fourth quarter of the eleventh century A. D."

এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—

"When people make a man their king, the action is called the election of the king.

প্রবন্ধের নামকরণ হইতে এবং এই সকল মন্তব্য হইতে বুঝা যায়, চন্দ মহাশয়ের ধারণা এই যে গোপালকে যেমন প্রজারা রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল, দিব্যকেও তেমনি প্রজারাই, অন্ততঃ পক্ষে বিদ্রোহীগণ, রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল।

মহীপাল সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"Vigrahapala III was succeeded by his son Mahipala II (about 1075 A. D.)···Mahipala "follwed the wrong course of conduct." "He always undertook measures that were opposed to right policy." "He disregarded truth and right line of action." Mahipala put his younger brothers Surapala and Ramapala in chains and shut them up in prison. According to the commentary on the Ramacharita, I, 31, all the chiefs *(ananta-samanta-chakra)* advanced against the king with a great army. ···Mahipala disregarding the advice of his wise and experienced minister, plunged in battle with them accompanied by a small body of demoralised troops. He was defeated and slain."

এই পর্য্যন্ত দিব্যের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। চন্দ মহাশয়ের মতে মহীপাল—

১নং—followed the wrong course of conduct—অন্যায় আচরণ করিতেন।

২নং He always undertook measures that were opposed to right policy সর্ব্বদাই মহীপাল ন্যায়পথের বিরোধী কার্য্য প্রণালী গ্রহণ করিতেন।

৩নং He disregarded truth and right line of action মহীপাল সত্য মানিতেন না এবং ন্যায়সঙ্গত কার্য্য-প্রণালীও মানিতেন না।

এই তিনটি অভিযোগ মূলতঃ একই এবং মনে হইতেছে, ইহার মূল রামচরিতের (১·৩১) "অনীতি-কারম্ভরত" শব্দটি। যদি তাহাই হয়, তবে চন্দ মহাশয় শব্দটির প্রকৃত অর্থ প্রণিধান করেন নাই, বলিতেই হইবে। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে। অতঃপর দিব্যের

* এই ভীমসাগর নামটি প্রচীনকাল হইতে প্রচলিত নাম, অথবা হালে মহারাজ ভীমের স্মরণার্থ প্রদত্ত নাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার মতাবলি প্রণিধান করা যাউক। চন্দ মহাশয় বলেন—

"About Divya and his part in the revolution, it is said (I, 38), he was a servant of the king of a very high rank. Perhaps, he was the wise minister, who advised king Mahipala not to give battle to the army of the rebel chiefs with a small body of undisciplined men. But after Mahipala's defeat and death, it was Divya, who "Like a robber took possession of the fatherland (of the Pala king) as Ravana abducted Sita." But the poet, draws the line of distinction between Ravana and Divya, by a significant epithet *upadhivrati*, "disguised as one observing a vow." * Ravana abducted Sita disguised as a religious mendicant ; Divya took possession of Varendri, disguised as a rebel. The meaning appears to be, Divya was not a rebel himself, but *was elected king by the rebel chiefs* after they had defeated and slain Mahipala II."

এই তবে দিব্যের তথাকথিত নির্ব্বাচন! রামচরিতে কোথাও দিব্যের নির্ব্বাচনের কোন কথাই নাই। দেখা গেল, চন্দ মহাশয়ের মত এই—যে বিদ্রোহী সামন্তগণ দিব্যকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। এই ঘটনার বিবরণের একমাত্র মূল রামচরিত। উহা অতিক্রম করিয়া কাহারও কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই। চন্দ মহাশয়ের কথা-মতই উহাতে দেখা যায়, দিব্য প্রতারণা বা ছলনা করিয়া দস্যুর মত বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাকে যদি নির্ব্বাচন বলিতে হয় তবে কালকে অনায়াসে সাদা বলা চলে।

শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বর্ত্তমান সনের এপ্রিল মাসের Modern Reviewতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মুখবন্ধ স্বরূপ B. N. B. স্বাক্ষরিত একটি উপক্রমণিকা আছে। লেখক সম্ভবতঃ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস লিখিয়া অর্জ্জিতযশা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি লিখিয়াছেন, দিব্যের অভিষেক নাকি ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় হইয়াছিল ("believed to have taken place")। এই বিশ্বাসের মূলে প্রমাণ কিছু আছে বলিয়া আমার জানা নাই। B. N. B. মহাশয় আরও বলেন, এই অভিষেক নাকি ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। অথচ উপরে দেখা গিয়াছে, চন্দ মহাশয়ের মতে উহা ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন বৎসরে সংঘটিত হইযাছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৩০০ শত বৎসরের এমন একটা মোটা ভুল কেমন করিয়া করিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।

অতঃপর সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করা যাক্। মহীপাল রাজা হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সুরপাল ও রামপালকে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কারারুদ্ধ করিলেন —এই বিবরণ লিখিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"Then freed from all fear, Mahipala gave rein to his vice and tyranny. No subject's honour or womenfolk was safe under him. No kind of misdeed was left unattempted by him. Maddened by his oppression, the people resolved to depose him or perish in the attempt···The rash king (Mahipala) blindly rushed into battle and was defeated and slain. ···After this victory, the leaders of the rebel confederacy decided to elect Divya as their king···Who was this Divya ?···He was the commander-in-chief of Mahipal's father and had won great fame by leading expeditions on behalf of his master to many provinces."

সরকার মহাশয় প্রবীণ ঐতিহাসিক, সারাজীবন তিনি মোগল এবং মোগলপরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রাক্‌মুসলমান যুগের ইতিহাসের চোরাবালিতে পা দিবার পূর্ব্বে তাঁহার আর একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল না কি? দিব্যস্মৃতি-উৎসবে নেতৃত্ব করিতে যাইয়া দিব্যকে প্রশংসা করিতে হইবে বলিয়া মহীপালের অযথা নিন্দা করিতে হইবে, ইহা কি সঙ্গত? মহীপালের অত্যাচারের বিবরণ তিনি কোথায় পাইলেন? কোন পাপ করিতেই যে মহীপালের বাধিত না, তাঁহার রাজত্বে যে স্ত্রীলোকের মানমর্য্যাদা নিরাপদ ছিল না—এই সমস্ত তথ্য রামচরিতে আদৌ নাই, এগুলি

* "উপধিব্রতী" শব্দের এই ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত, পাঠকগণের বিচার্য্য। "ব্রতচারীর ছদ্মবেশে" এই ব্যাখ্যা কি করিয়া আসে, বুঝিতে পারিলাম না। উপধি মানে, ছল, চাতুরী, প্রতারণা। উপধিব্রতী শব্দের সোজা অর্থ ছলাবলম্বী, চাতুরী বা প্রতারণাপরায়ণ।

সরকার মহাশয়ের নিছক্ কল্পনা। দিব্য যে বিগ্রহপালের আমলে প্রধান সেনাপতি ছিলেন, অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন—এই সমস্তই কল্পনা এবং ভাষার উচ্ছ্বাস মাত্র। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, চন্দ মহাশয়ের মতে তিনি ছিলেন মন্ত্রী। আসলে, রামচরিতে তাঁহাকে শুধু 'ভৃত্য' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছে। সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"Bhima's capital named Damara is described by the poet as *upapura*. i. e. a suburb; it was evidently a new city founded by him outside the old and decayed capital like the New Delhi of our own days. Large tanks, raised paths, palaces and temples—connected by tradition with Bhima—still exist in North Bengal."

এইখানে আবার সরকার মহাশয় চোরাবালিতে ধরা পড়িয়াছেন। রামচরিতের ১ম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে ডমর শব্দটি আছে। ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন—

স রামপালো ভবস্য সংসারস্য আপদং বিপদং ডমরং উপপুরং শক্রকৃতং অলাবীৎ।

অর্থাৎ, সেই রামপাল সংসারের বিপদস্বরূপ শক্রকৃত ডমর বা উপপুর নষ্ট করিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন :—

"Bhima built a Damara, a subuarban city close to the capital of the Pala empire···The allied army threw a bridge of boats on the Ganges, crossed the river and advanced and destroyed the Damara and took Bhima a captive."

সরকার মহাশয়ও শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভূমিকা অনুসরণ করিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন। কয়েক বছর আগে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক্ মহাশয়, যতদূর মনে পড়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায়, দেখাইয়াছিলেন যে শাস্ত্রী মহাশয় এইখানে পাঠোদ্ধারে ভুল করিয়া উপপ্লবং শব্দটিকে উপপুরং পড়িয়াছেন। এইরূপে এক অলীক ডমর নামক উপপুরের কথা বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। ডমর শব্দের অর্থ অভিধানেও উপপ্লব বা উৎপাতই লিখে। ঐ টীকার সোজা অর্থ এই যে রামপাল শক্রকৃত পৃথিবীর আপদ ও উপদ্রব দূর করিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় হাল নাগাদ খবর না রাখিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রমের অনুসরণ করিয়াছেন।

দেশের ইতিহাস আলোচনায় যাঁহারা পথপ্রদর্শক, তাহাদেরও লেখায় এই প্রকার গলদ দেখিয়া মনে হয়, রামচরিতে দিব্যের সিংহাসনারোহণ-ব্যাপার ঠিক ঠিক কি ভাবে বর্ণিত আছে, সাধারণ্যে তাহার বিবৃতির প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনে রাম-চরিত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পরে ৩২ বছর চলিয়া গিয়াছে। পুস্তকখানি একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটিও আর ইহা ফিরিয়া ছাপিবার উদ্যোগ করিতেছেন না। কাজেই পুস্তকখানি আর এখন সহজপ্রাপ্য নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিনজনে মিলিয়া মূল পুথির সাহায্যে রামচরিত পুনরায় সম্পাদন করিয়াছেন। সকলেই জানেন, রামচরিতের মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থকারকৃত টীকা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাকী অংশের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ অংশের টীকার অভাব। নবীন সম্পাদকত্রয় এই দ্ব্যর্থ দুরূহ গ্রন্থের অটীক অংশেরও টীকা প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে অনুরাগী মাত্রেই এই পুস্তক প্রকাশের পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু জানিতে পারিলাম, অটীক অংশের ব্যাখ্যায় বসাক ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের মধ্যে মতভেদের জন্য পুস্তকের প্রকাশ থামিয়া আছে। চতুর্থ ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানিয়া মতভেদ মিটাইয়া ফেলিয়া সম্পাদকগণ এই পুস্তকের অবিলম্ব প্রকাশে অবহিত হউন, ইহাই প্রার্থনা। আপাততঃ আমরা রামচরিত অনুসরণ করিয়া দিব্যের সিংহাসন প্রাপ্তির বিবরণ বুঝিতে চেষ্টা করি।

সকলেই জানেন, রাম-চরিত দ্ব্যর্থ কাব্য—প্রত্যেক শ্লোকেরই একবার রামপক্ষে, আবার রামপাল পক্ষে—এই দুই রকম ব্যাখ্যা করা যায়। রামপক্ষের ব্যাখ্যায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। রামপাল পক্ষের ব্যাখ্যাই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে। টীকানুযায়ী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, প্রয়োজনমত মূল টীকাও উদ্ধৃত হইল। প্রথম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের ইতিহাস আরম্ভ। যথা :—

সহসা বিতরণজিতকর্ণঃ ক্ষৌণীং যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্ত দানবারাতিশয়ো যো ভূদ্বৃষানুচরঃ॥ ১-৯

টীকানুযায়ী অনুবাদ। যে বিগ্রহপাল (দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা) যৌবনশ্রীর সহিত পৃথিবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যিনি বলদ্বারা রক্ষিত (দাহলাধিপতি) কর্ণকে রণে জয় করিয়াছিলেন। যিনি (ভূমি, কাঞ্চন, করী, তুরঙ্গ ইত্যাদি) অশ্রান্ত দান দ্বারা ধর্ম্মের অনুচর (বলিয়া খ্যাত) হইয়াছিলেন।

অথ তস্য মহীপালঃ সুরপালোপি
পুরুষোত্তমো রামঃ।
স্ফুরদ্দ্যুশৃঙ্গসম্ভাবিতরূপশ্চারুভাগ্যসম্পন্নঃ॥
জগদবনৈকধুরীণঃ সাময়িকমহোমহানলো ভরতঃ।
অপি লক্ষ্মণোপি শত্রুঘ্নলক্ষ্মণো জজ্ঞিরে তনয়াঃ॥
১—১০।১১

টীকানুযায়ী অনুবাদ। সেই বিগ্রহপালের মহীপাল, সুরপাল এবং পুরুষোত্তমরাম নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিল। (এই রামপালের) রূপ জ্যোতির্ম্ময়, প্রভাবসমৃদ্ধ ছিল। ইনি চারুভাগ্যসম্পন্ন ছিলেন। ইনি জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সামরিক তেজে মহান্, আলোভরত, শ্রীমান্ এবং শত্রুবধের লক্ষণশালী ছিলেন।

জ্যেষ্ঠস্তেষু বিরেজে রামো লঙ্কেনভরনিমগ্নায়াঃ।
উন্নময়িতা ধরায়াঃ বলিধামক্ষিদিব কাদিষু মুখেষু॥
১—১২

টীকানুযায়ী অনুবাদ। এই তিনজনের মধ্যে রামপাল প্রশস্ততমরূপে বিরাজিত ছিলেন। ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতাগণের মধ্যে বলিধামক্ষয়কারী বিষ্ণুর মত তিনি কুৎসিত অধিকারী বা প্রভু কৈবর্ত্ত নৃপতির ভরে নিমগ্ন ধরার উন্নময়িতা হইয়াছিলেন।

মন্তব্য। ইহার পরে আরও নয়টি শ্লোকে রামপালের প্রশংসাবাদ আছে। এই শ্লোকগুলিতে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছু নাই।

লোকান্তরপ্রণয়িণো দুর্নয়ভাজোঽগ্রজন্মনো
ব্যসনাৎ।
পতিতান্ধকারবত্যাস্তভাবাদুদহারি গোতমী তেন॥
১—২২

টীকানুযায়ী অনুবাদ। তিনি (রামপাল) লোকান্তরগত দুর্নীতিঅবলম্বনকারী অগ্রজের ব্যসনে পতিতা এবং অন্ধকারবতী পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন।

মন্তব্য। দুর্নীতি বলিতেই আমরা বর্ত্তমানে immorality বা দুশ্চরিত্রতা বুঝি। এই দুর্নীতি তাহা যে নহে, তাহা পরের এক শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইবে।

ইহার পরে আরও ছয় শ্লোকে রামপালের প্রশংসা চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২৬নং শ্লোকে ভীম নৃপতির নাম আছে এবং রামপালের বাহু যে সর্ব্বদা ভীমের প্রাণাকর্ষণের জন্য কণ্ডুয়ন করিত, এই কথাটি আছে।

হত্বা রাজপ্রবরং ভূয়ো ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ।
স নিরাস্থদস্ত্রকলয়া সহস্রদোর্বিবদ্বিষঃ স্বাস্থ্যম্॥
১—২৯

টীকানুযায়ী অনুবাদ। নৃপতিশ্রেষ্ঠ মহীপালকে হত্যা করিয়া রাজ্যের প্রচুর অংশ অধিকার করিয়াছে যে শত্রু কৈবর্ত্ত নৃপতি, রামপাল সহস্রবাহু হইয়া অস্ত্রকলাদ্বারা তাহার সৌষ্ঠব নিরাকৃত করিয়াছিলেন।

মন্তব্য। ইহার পরে আর একটি শ্লোকে রামপালের প্রশংসা আছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া টীকাকার মন্তব্য করিয়াছেন:—(অনুবাদ) "ইহার পরে কুলক অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত শ্লোকাবলি। আটটি শ্লোকে রাবণকর্ত্তৃক হৃতা সীতা বর্ণিতা হইতেছেন। তাই এখানে কিরূপ সময়ে কিরূপ ঘটনা সমাবেশে কি উপায়ে সীতা হৃতা হইলেন, তাহাই কথাক্রমে বলা হইতেছে।"

পাঠকগণের মনে রাখা আবশ্যক যে এই রামচরিতকাব্যে রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণের সহিত দিব্যকর্ত্তৃক বরেন্দ্রীহরণ উপমিত।

প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারম্।
বিভ্রত্যনীতিকারংভরতে রামাধিকারিতাং দধতি॥
১—৩১

টীকাকারের মন্তব্যের অনুবাদ। তথা, রামপালপক্ষে এই আটটি শ্লেষযুক্ত শ্লোকের কুলক দ্বারা বরেন্দ্রী দিব্বোক দ্বারা গৃহীত হইল, তাহাই বুঝান হইবে। রাজ্যভার ধারণকারী অসীম শৌর্য্যশালী রামপালের রাজ্য শত্রু হরণ করিল, ইহা যেন জীবন্ত ব্যাঘ্রের দংষ্ট্রাঙ্কুর উৎপাটন চেষ্টার

মত অসমসাহসিক কাজ। ইহা কি প্রকার চেষ্টা দ্বারা সাধ্য হয়, সেই সন্দেহ নিরাকরণে ইচ্ছুক হইয়া, পূর্ব্বকথার অবতারণাপূর্ব্বক বলা হইতেছে এই যে—

টীকানুযায়ী অনুবাদ। পূর্ব্বে পিতা বিগ্রহপালের মৃত্যু হইলে পর ভ্রাতা মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অনীতি-কারম্ভরত হইতে রামপালের মনে ব্যথার উদয় হইল।

মন্তব্য। টীকাকার "অনীতিকারম্ভরতে" কথাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—"অনীতিকে নীতিবিরুদ্ধে আরম্ভে উদ্যমে রতে সতি"। নীতিবিরুদ্ধ কি রকম? না, রাজনীতি বিরুদ্ধ। কি প্রকার?—"মহীপাল ষাড়্-গুণ্যশলাস্য মন্ত্রিণো গুণিতমবগুণয়ম্ উপষ্টম্ভারভটীমাত্রা-দীষত্ গ্রহণেন মিলিতানন্তসামন্তচক্রচতুরচতুরঙ্গবলবলয়িতবহল-মদকলকরিতুরগতরণীচরণ চারুভটচমূসংভারসংরম্ভনির্ভরভয়--ভীতরিক্তমুক্তকুন্তলপলায়মানবিকলসকলসৈন্যেন স্বতঃ ক্ষয়াতি-শযমাসেদুষা সহ সহসৈব বলদ্বিপর্য্যয়কোটিকষ্টতরসমর-সারভ্য নিরমজ্জত।" এই হইল তবে মহীপালের "অনী-তিক" বা ২২শ শ্লোকে পূর্ব্ববর্ণিত দুর্নীতিক কাজ। তিনি অল্পবুদ্ধি বা গোঁয়ার লোক ছিলেন। অসংখ্য চতুর সামন্ত একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সামন্তগণের সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা ছিল। তাঁহাদের বহু মত্তহস্তী ও তুরঙ্গ ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নৌকাও অনেক ছিল। তাঁহাদের পদাতিক সৈন্যও ছিল অসংখ্য। মহীপাল—"উপষ্টম্ভারভটীমাত্রাদীষত্ গ্রহণেন"—অর্থাৎ, উপষ্টম্ভ = বল আরভটী = সাহস, শৌর্য্য, = সংগৃহীত বা প্রাপ্তব্য শৌর্য্যশালী সৈন্যগণ হইতে অল্প কিছুমাত্র লইয়া এই মিলিত সামন্ত চক্রের সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ষড়্গুণশালী মন্ত্রিগণ তাঁহাকে এই রকম 'অনীতিক' বা দুঃসাহসী কার্য্য করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। মহীপাল তাহা শোনেন নাই। ইহাই হইল তাঁহার অনীতিক বা রাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ। তিনি আরও রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন। কি রকম? সামন্তগণের সৈন্যবল দেখিয়া তাহার সঙ্গের অল্প সেনা ভয় পাইয়া গেল। তাহারা কেহ কেহ হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিল ('রিক্ত')। তাহাদের লম্বা চুলের বেণী খুলিয়া গেল। (সৈন্যগণের মধ্যে দীর্ঘ চুল রাখা বোধ হয় সেই আমলের ফেশান ছিল)। ভয়ে কেহ কেহ পলাইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সঙ্গের অল্প সৈন্যও দ্রুত ক্ষয় পাইতে, হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থায় মহীপালের যুদ্ধ করা উচিত ছিল না। পিছনে হঠিয়া তাঁহার মূল সৈন্যদলের সহায়তা পাইতে চেষ্টা করা উচিত ছিল। গোঁয়ার রাজা তাহা করিলেন না, সামন্তচক্রের বল তুচ্ছ মনে করিলেন। তাঁহার ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়াই বিদ্রোহী প্রজাগণকে শাসন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহাই তাঁহার "অনীতিক" কার্য্য, দুশ্চরিত্রতা নহে। ফল যাহা হইবার তাহা হইল, তিনি ডুবিলেন।

রামপাল এই সময় কোথায় ছিলেন? কোথায় এই সংবাদ পাইয়া তিনি মনে ব্যথা পাইলেন? টীকাকার বলিয়াছেন, তিনি এই সময় কারাগারে বদ্ধ ছিলেন। কি ভাবে কারাগারে বদ্ধ হইলেন, পরে দেখা যাইবে।

রামেতু চিত্রকূটং বিকটোপলকুট্টিমকঠোরম্।
ভূমিভৃতমাপতিতে তপস্বিনি মহাশয়েঽসহনে॥ ১-৩২

অনুবাদ। বিকট উপলখণ্ড মণ্ডিত কুট্টিম অর্থাৎ মেজে যাহার, এমন যে কঠোর ভূমিগর্ভস্থ বিচিত্র কারাগার, তাহাতে দুঃসহ শয্যায় শয়ন করিয়া রামপাল তপস্বী অর্থাৎ অনুকম্পার্হ দশাপন্ন হইলেন।

মন্তব্য। রামচরিতে এই শ্লোকের যে টীকা আছে তাহাতে 'ভূমিভৃত' অর্থে মহীপাল বলা আছে। মহীপাল অর্থ ধরিয়া কোন মতেই শ্লোকটির সঙ্গত অর্থ করা যায় না।

অপরভ্রাত্রাধিবসতি কষ্টাগারং মহাবনং ঘোরং।
হতবিধিবশে নবায়সকুশীলতাভেদ্যকুচজানৌ॥ ১-৩৩

টীকানুযায়ী অনুবাদ। হতবিধিবশে রামপাল অপর ভ্রাতার (সুরপালের) সহিত ভয়জনক কারাগৃহে বাস করিতে-ছিলেন এবং তাহাই তাঁহাদের মহা আশ্রয়স্থল (অবনং = রক্ষণং) হইয়াছিল। তথায় নূতন লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন কাটিয়া কাটিয়া তাঁহাদের শরীরে বসিয়া গিয়াছিল, জানু-সঙ্কোচ পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতে পারিতেন না।

মন্তব্য। ইহার পরে আর দুইটি শ্লোকে রামপালের দুর্দ্দশা বর্ণিত আছে। এই শ্লোক দুইটিতে কোন ঐতিহাসিক খবর নাই।

বিজনাবস্থানব্যূহে ভূতনয়াত্রাণযুক্তদায়াদে।
বিদ্যুদ্বিলাসচঞ্চল মায়ামৃগতৃষ্ণয়ান্তরিতে॥ ১-৩৬

টীকানুযায়ী অনুবাদ। রামপাল বিজনে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সত্য এবং ন্যায় রক্ষণে নিযুক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী মহীপাল বিদ্যুদ্বিলাসচঞ্চল লক্ষ্মীর অলীক মায়ায় অর্থাৎ রামপাল আমার লক্ষ্মী হরণ করিবে, এই অলীক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া রামপালকে অন্তরিত অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ কারাগারে গুপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

মায়িধ্বনিনা শঙ্কিতবিপদো ভর্ত্তুর্ভুবঃ প্রভুতায়াঃ।
নিকৃতিপ্রযুক্তিতো রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথাপন্নে॥

১-৩৭

টীকানুযায়ী অনুবাদ। মায়ী অর্থাৎ খলস্বভাব লোকের কানকথা শুনিয়া—যথা, "এই রামপাল ক্ষমতাশালী, রাজ্যের অধিকারী, সর্ব্বজনপ্রিয়, কাজেই মহারাজের রাজ্য হরণ করিবে"—এইরূপ চুকলিতে বিশ্বাস করিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া, যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল মহীপালের রক্ষার কারণ হইতে পারিত, এই প্রকাব বিপন্ন অবস্থায় পতিত সেই রামপালের শঠতা প্রয়োগে বধচেষ্টা মহীপাল করিতে লাগিলেন।

মাংশভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতাবাসালংকৃতিরহারি কান্তাস্য॥

১-৩৮

টীকানুযায়ী অনুবাদ। এই রামপালের জনকভূমি কান্তিমতী বরেন্দ্রী যাহা সীতা অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতি বা চাষ এবং বাস অর্থাৎ জনগণের নিবাস দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল—অর্থাৎ যাহা উত্তমরূপে কর্ষিত হইত এবং যাহাতে বহু লোক বসবাস করিত, এমন বরেন্দ্রী—তাহা দিব্য নামক ছলব্রতী দস্যু কর্ত্তৃক হৃত হইল। এই দিব্য মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর অংশভোগী ছিলেন। ইনি উচ্চদশাপন্ন ছিলেন অর্থাৎ ইহার অবস্থা খুব ভাল ছিল।

মন্তব্য। এইখানে দিব্য সম্বন্ধীয় কথা যাহা টীকায় আছে তাহা এই :—"দিব্যাহ্বয়েন দিব্যনাম্না দিব্বোকেন মাংশভুজা লক্ষ্ম্যা অংশং ভুঞ্জানেন ভৃত্যেনোচ্চৈর্দশকেন উচ্চৈর্মহতী দশা অবস্থা যস্য অত্যুচ্ছ্রিতেনেত্যর্থঃ দস্যুনা শত্রুণা তদ্ভাবপন্নত্বাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ছদ্মনি ব্রতী।" দেখা যাইতেছে, দিব্য রাজ্যলক্ষ্মীর অংশভোগী ছিলেন, ভৃত্য ছিলেন এবং উচ্চ অবস্থায় অধিরূঢ় ছিলেন। ইহাতে এক বুঝা যায় যে তিনি মহারাজার অধীনে রাজ্যখণ্ডের মালিক ছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা অত্যুন্নত ছিল। আর ইহাও বুঝাইতে পারে যে তিনি রাজার একজন বড় কর্ম্মচারী, কাজেই লক্ষ্মীর অংশভোগী ছিলেন এবং তিনি রাজ্য মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন।

টীকাকার বলিয়াছেন,—"দস্যুনা শত্রুণা তদ্ভাবপন্নত্বাৎ।" ইহাতে বুঝা যায়, দিব্য আসলে রাজবংশের শত্রু ছিলেন না, কিন্তু ঘটনাধীনে শত্রুভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। "উপধিব্রতী" শব্দের সোজা অর্থ ছলনাব্রতী। টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী।" অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে যিনি কর্ম্ম বা ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গোপনে অথবা আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া ছল অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই প্রতিভাত হইতেছে যে—অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে তিনি মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন এবং তলে তলে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। যতদূর বুঝিতেছি, এই বিদ্রোহের কারণ জনপ্রিয় রামপাল ও সুরপালের উপর মহীপালকৃত অত্যাচার—মহীপালের দুশ্চরিত্রতা নহে। মূল এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, যদি অন্য কোন কারণ কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন, দেখুন না? প্রশ্ন হইতে পারে, রামপালের উপর অত্যাচারই যদি এই বিদ্রোহের কারণ হয়, তবে বিদ্রোহ শেষে রামপাল রাজা না হইয়া দিব্য রাজা হ'ন কেন? বোধ হইতেছে, রামপালের হিত করিবার ছলে দিব্য মহীপালের মৃত্যুর পরে নিজে রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। তাই রামচরিতের কবির দিব্যসম্বন্ধীয় বিশেষণগুলিতে এত শ্লেষ। তিনি উপধিব্রতী, তিনি দস্যু, তিনি রাবণ যেমন সীতা হরণ করিয়াছিলেন তেমনি বরেন্দ্রী হরণ করিয়াছিলেন। তিনি নৃপতিশ্রেষ্ঠ মহীপালকে হত্যা করিয়া রাজ্যের প্রচুর অংশ দখল করিয়াছিলেন। রামপাল এই জবর-দখল মাথা নোঁয়াইয়া সহ্য করেন নাই। তিনি অস্ত্রকলা দ্বারা এই মহীপালের হত্যাকারী কৈবর্ত্ত নৃপতির শ্রী নষ্ট করিয়া ছিলেন। (১—২৯ শ্লোক) কিন্তু দিব্বোক

থাকিতে তিনি আর বরেন্দ্রী উদ্ধার করিতে [illegible]ই।

উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্তরাজত্বের পরবর্ত্তী ইতিহাসে এবং ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রামপালের বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনীতে আমাদের প্রয়োজন নাই। কৈবর্ত্তরাজ দিব্য সম্বন্ধে রামচরিতে যাহা আছে তাহাই সব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম। এখন বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া বাহির করুন, বিদ্রোহী সামন্তগণকর্ত্তৃক বা প্রজাগণকর্ত্তৃক দিব্যকে রাজা নির্ব্বাচনের বিবরণ ইহাতে কোথায় আছে। তিনি রাজ্যমধ্যে অথবা রাজতন্ত্রে নিজের উন্নত অবস্থার সুযোগে ছলে ও কৌশলে বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, ইহা ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত যদি করা সম্ভব হয়, তবে করুন।

আর একটি বিষয়ের এখানে স্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক। অনেক লেখক এই বিদ্রোহকে "কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ইহা প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ, অন্তত সামন্তচক্রের বিদ্রোহ। কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য নিজের উন্নত অবস্থার সুযোগে ইহার ফলভাগী হইয়াছিলেন মাত্র। পরবর্ত্তীকালে আকবরের অভিভাবকত্ব ছলে বৈরাম খাঁ যেমন রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছিলেন—অথবা মারাঠা-রাজ্যে রাজ্যের মন্ত্রী পেশোয়াগণ যেমন রাজ্যের প্রকৃত রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন, এ যেন কতকটা তেমনি ব্যাপার। তবে রামপাল বরেন্দ্রী হইতে সম্পূর্ণ অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন, এই যা প্রভেদ।

মহারাজ দিব্য কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন, রামচরিতে দিব্যের জাতি সম্বন্ধে ইহা ছাড়া অন্য কোন কথাই নাই। দিব্যের প্রাদুর্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সমসাময়িক এবং ঐ সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোষকারগণ এই শব্দটির কি অর্থ বুঝিতেন, দেখা যাক্।

এই আমলের বৈজয়ন্তী অভিধানে আছে :—

কৈবর্ত্তো ধীবরো দাশো নৌজীবী জালীমার্গরৌ।
মৎস্যধানী কুবেনী স্যাদ্বলিশম্মৎস্যবেধনম্॥

ভূমিকাণ্ড, শূদ্রাধ্যায়, Ed. Oppert. p, 139

কাজেই বৈজয়ন্তী মতে নৌচালনা এবং মাছধরাই কৈবর্ত্তের প্রধান ব্যবসায় ছিল এবং কৈবর্ত্ত ও ধীবর সমানার্থক।

ঐ সময়েরই হলায়ুধ প্রণীত অভিধান-রত্নমালায় আছে :

কৈবর্ত্তো ধীবরো দাসো মৎস্যবংধী চ জালিকঃ।
আনায়ঃ কথ্যতে জালং কুবেনী মৎস্যবংধনী॥

Ed. Aufrecht. P. 63.

বৈজয়ন্তী ও অভিধান-রত্নমালা—দুই সমসাময়িক অভিধানে এক কথাই বলিতেছে।

প্রাচীনতর এবং প্রামাণ্য অভিধান অমরকোষ বলে—(বারিবর্গ, ১৫শ শ্লোক) :—

কৈবর্ত্তো দাশ ধীবরৌ।

কাজেই কৈবর্ত্তরাজ দিব্য যে ধীবর বা নৌজীবী জাতীয় ছিলেন, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট মহকুমায় বালুরঘাট হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে প্রকাণ্ড এক দীঘি আছে। দীঘির মধ্যে সাধারণতঃ নাগকাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া দীঘির অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নাগকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে এই দীঘিতে প্রকাণ্ড এক প্রস্তর স্তম্ভ প্রোথিত আছে। রায় বাহাদুর চন্দ বলেন, এই স্তম্ভের উচ্চতা ৪১ ফিট। (Modern Review, March—1935. P. 347)। এত উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ বাঙ্গালা দেশে তো আর নাই-ই—গোটা ভারতবর্ষেও বেশী নাই। বিশ্ববিখ্যাত অশোকের স্তম্ভগুলির মধ্যে দিল্লী-তোপ্‌রা স্তম্ভ ইহার অপেক্ষা মাত্র ১ ফুট ৭ ইঞ্চি বেশী উচ্চ এবং রামপুরোয়া স্তম্ভ মাত্র ৩ ফুট ৯½ ইঞ্চি বেশী উচ্চ। অশোকের অন্য স্তম্ভগুলি ইহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। এই দীঘির মধ্যস্থিত স্তম্ভটি এখনও ভাল করিয়া মাপা সম্ভবপর হয় নাই, কারণ কেহই এ পর্য্যন্ত ইহার চারিদিকে বাঁধ দিয়া জল সেঁচিয়া ফেলিয়া ইহার গোড়ার অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। করিলে ইহার গোড়ায় কোন লিপি আছে কিনা দেখা যাইত। এই স্তম্ভের প্রকৃত উচ্চতাও নির্ণীত হইতে পারিত।

যাহা হউক, এমন প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও প্রকাণ্ড দীঘি যে সম্ভবতঃ কোন প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজার কীর্ত্তি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন বছরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বুকানন সাহেব বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের

প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের জরীপ করিয়াছিলেন এবং এই সকল স্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই বিরাট জরীপের আংশিক বিবরণ Martin সাহেব Eastern India নাম দিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৬৬ পৃষ্ঠায় এই দীঘির নিম্নরূপ বিবরণ আছে :—

"Towards the north-west extremity of this division is Dhivor Dighi, which was examined by the Pandit. He reports that it may have contained 40 or 50 Bighas of land and is said to have been dug by a Dhivor Raja, who lived about a thousand years ago. In its centre is a stone-pillar… "

রায় বাহাদুর চন্দকৃত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে এই স্তম্ভের একখানি ছবি আছে। ছবির পরিচয়ে নীচে লেখা হইয়াছে —"কৈবর্ত্ত-রাজের প্রতিষ্ঠা স্তম্ভ।" গৌড়রাজমালার ভূমিকায় ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন— "বরেন্দ্রমণ্ডলের এই ক্ষণস্থায়ী প্রজা-বিদ্রোহের একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও সমুন্নতশিরে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।" এই স্তম্ভটিকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রায় বাহাদুর চন্দও লিখিয়াছেন :—

"Late Mr. Akshoy Kumar Moitra suggested the recognition of this pillar as a. monument of Divya from the name of the tank and the adjoining village. (Modern Rev March 1935, P. 347). কাজেই দেখা যাইতেছে মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে এই দীঘি ও স্তম্ভ কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের কীর্ত্তি। সওয়া-শ' বছর আগে লোকে ইহাকে যে ধীবর রাজার কীর্ত্তি বলিয়া জানিত, ইহাতে মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমান সমর্থিতই হইতেছে।

অধুনা হালিক কৈবর্ত্তগণ মহারাজ দিব্যকে নিজেদের জাতীয় বলিয়া দাবী করিয়া দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার অভিষেক-স্মৃতি-উৎসব করিতেছেন। ভালই করিতেছেন, কিন্তু উপরের বিচার মতে দেখা যায়, দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন এবং জালিক কৈবর্ত্তগণেরও এই উৎসবে যোগ দেওয়া উচিত। কৈবর্ত্তগণ বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের প্রধানতম মেরুদণ্ড। এখনও দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হালিক—জালিক ভেদ করিয়া—হালিককে জলচল এবং জালিককে জল-অচল করিয়া এই বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ বিরাট কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে ক্ষয় ও ভেদের বিষ ঢুকাইয়াছিলেন —কর্ণাট দেশ হইতে আগত বিদেশী সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেন। বল্লাল সেন অমনি ভেদের বিষ ঢুকাইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যসমাজে সমান মর্য্যাদার পরিবারসমূহের মধ্যে নিতান্ত জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও কুলীন করিয়া, কাহাকেও হীনতর করিয়া—বাঙ্গালার প্রবলপ্রতাপ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-সমাজকে একেবারে পদানত নির্বীর্য্য করিয়া নিজের মুষ্টিগত করিয়াছিলেন। সেই মিঠা-বিষে সমাজ আজিও জর্জ্জরিত—আজিও আমাদের মধ্যে নিতান্ত নিরর্থক ভেদের আর অন্ত নাই। আমার স্পষ্ট বোধগম্য হয়, বল্লাল সেন অমনি একটা চাল চালিয়া এই প্রবলপ্রতাপ কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে গৃহবিবাদের বিষ ঢুকাইয়া তাহাদিগকে আয়ত্তে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কারণ কৈবর্ত্তরাজ দিব্যকর্ত্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার বল্লালের পিতা বিজয় সেনের জীবনকালেই ঘটিয়াছিল এবং মিলিত কৈবর্ত্ত জাতির ক্ষমতা কত, বল্লাল তাহা জানিতেন এবং উহাকে ভয় করিতেন। সওয়া-শ' বছর আগে বুকানন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন :—

"Ballal sen raised the Kaibarttas to the rank of Pure Hindus." Eastern India—II. P. 735.

"Because, the Kaibarttas were only raised to the rank of purity by Ballal sen."

Eastern India III. P. 520.

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে (১৮৮৩ খ্রীঃ) ডাক্তার জেম্‌স্ ওয়াইজ্ সাহেব তাহার অমূল্য পুস্তক "Tribes and Castes of Eastern Bengal" মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য—রিজলি সাহেবের Tribes and Castes of Bengal এই ওয়াইজ সাহেবের পুস্তককে ভিত্তি করিয়াই লিখিত। ওয়াইজ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"In Bengal, again, there was a powerful tribe called Kewat, whom Ballal Sen in after years raised to the grade of pure Sudras," P. 298.

১৯১২ সালে প্রকাশিত দিনাজপুর গেজেটিয়রে ষ্ট্রং সাহেব লিখিয়াছেন :—

"The principal occupation of this (Kaivartta) caste appears originally to have been fishing, but this has been abandoned and in Dinajpur, they hold a good position among the cultivators." P. 40.

বল্লাল সেনের এই বিষম ভেদনীতি বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিল। মাছ মারাটাকে তাঁহারা বিষম অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণের কোনদিনই উদ্ধার নাই, তাঁহারা এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন।* মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণকে, পৈত্রিক ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ না করিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় দেওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ হইয়া গেল।† এই অত্যাচারের ফল কি হইয়াছে সওয়া শ' বছর আগের বুকাননের বিবরণ হইতেই তাহা দেখুন :—

"The Keyots of Kamrup, like the Kaibarttas are divided into two classes ; the one called Heluya, from cultivating the ground retains the worship of Krishna ; the others are fishermen and without having relinquished their name or profession, have entirely become followers of Muhammed, yet they keep themselves distinct as a caste and will not eat the rice prepared by another Moslem."

Eastern India. III. P. 530

এই বিচিত্র নামে-মাত্র-মুসলমান জালিক কেবট জাতি সম্বন্ধে বুকানন স্থানান্তরেও লিখিয়াছেন :—

"A tribe of fishermen which has been converted to the (Muslim) faith still retains in full force the doctrine of the caste ; and as members, neither eat, drink, nor intermarry with other Moslems."

Eastern India. III. P. 517.

ইহা হইল রঙ্গপুর জেলার অবস্থা। আসামেও কেবট জাতির অবস্থা একই প্রকারের :—

"In Assam, the Kewats have separated into two sects, the Halwa, who are cultivators worshipping Krishna and Jaliya or fishermen following the tenets of Muhammadanism. (Robinson's Assam, P. 263), Buchanon records the curious fact that the Kewats have become Muhammadans in Rangpur. Equally strange, the Dacca Kewats have become the followers of the Nanak Shahi Faith."

Wise's "Tribes and Castes of Eastern Bengal." P. 319.

দেখা যাইতেছে, ডাঃ আমবেদকার নূতন কিছু করিতেছেন না, ঢাকায় কেবটগণ বহু পূর্ব্বেই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু জাতের মায়া সহজে যায় না, তাই রঙ্গপুর ও আসামের লাখ দুলাখ কেবট আজও নামে মাত্র মুসলমান—আজও তাহারা মুসলমানের ছোঁয়া খায় না, মেয়েরা কপালে সিন্দূর দেয়, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে—সমস্ত রকম হিন্দু আচার মানিয়া চলে। তবু ইহাদের দুঃখ বুঝিবার দরদী আজও হিন্দুসমাজে মিলিল না।

যে জালিকগণের কতক এইরূপে সমাজের অত্যাচারে যেন রাগ করিয়াই হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইয়া নামে মাত্র মুসলমান হইয়া রহিয়াছে, কতক শিখধর্ম্মে যোগ দিয়াছে—ওয়াইজ সাহেব অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের কিরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন দেখুন :—

"In Bengal, the fisher castes are remarkable for strength, nerve and independent bearing. The finest examples of Bengali manhood are found among them and their muscular figures astonish those accustomed

---

* "Twenty one kinds of people, will, on account of their evil deeds, fall into the lowest hell. By performing good works, nineteen of these will be released. But the hunter and the fishermen, let them attend Pagodas, listen to the Law and keep the five Commandments, to the end of their lives, still they cannot be released from their sins." Buddhaghosa's Parables.

Translated by Captain Rogers. London. 1870. P. 183.

† বৌদ্ধ "আদি কর্ম্মবিধি" নামক বৌদ্ধাচার পদ্ধতির গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'রাজন্য কাণ্ড" নামক গ্রন্থের ১৯৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত।

মেঘ ও পর্ব্বত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

to the feeble and effeminate inhabitants of the towns."

Tribes and Castes of Eastern Bengal. P. 281.

বল্লালসেন যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন—প্রবলপ্রতাপশালী বিরাট কৈবর্ত্ত সমাজকে ভাগ করিয়া দুর্ব্বল করিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, গত ৩০।৪০ বছরের মধ্যে তাহা নবপুষ্পিত হইয়া উঠিতেছে, চাষী কৈবর্ত্তগণ ইচ্ছা করিয়া আবার সেই ফাঁদে ভাল করিয়া জড়াইতেছেন। মাহিষ্য নাম ধারণ করিয়া তাঁহারা জালিক কৈবর্ত্তগণ হইতে একেবারে ভিন্ন হইয়া যাইবার প্রবল চেষ্টা করিতেছেন। আমার কথা চাষী কৈবর্ত্তগণের অনেকেরই রুচিকর হইবে না, জানি। কিন্তু এমন দুই একটি চিন্তাশীল লোকও কি কৈবর্ত্ত সমাজে পাওয়া যাইবে না, যাঁহারা বিরাট কৈবর্ত্ত-সমাজের প্রকৃত হিত ক্ষুদ্র দলাদলির ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারেন? তাঁহাদিগকে আমি বলিতে চাহি, বল্লাল-সেনের পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত সমাজে হালিক জালিক ভেদ ছিল না, বল্লাল সেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে Divide and Rule Policy অনুসারে কৈবর্ত্তসমাজে এই ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করেন। চাষী কৈবর্ত্ত সমাজ নিজেদের উন্নতি করিতেছেন ভাবিয়া আজ ৩০।৪০ বছর যাবৎ যে মাহিষ্য আন্দোলন অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।

ঐতিহাসিক তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিল—এইবার যাহার ইচ্ছা, যত ইচ্ছা তাহাকে গালি দিন্, সে আর কথাটি কহিবে না।

নৌকাডুবি

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছিল, কয়েকদিনের জ্বরেই হঠাৎ একদিন মরিয়া গেল। চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কেহ আসে নাই জানি, আমাদেরও একদিন মরিতে হইবে তাহাও সত্য, কিন্তু নিতান্ত কাঁচা বয়সে এমন করিয়া মা-বাপের চোখের সুমুখে, হে ভগবান, কাহাকেও তুমি মারিয়ো না।

কাহাকেও কিছু বলিবার নাই, কাহারও বিরুদ্ধে এত-টুকু অভিযোগ করিবার নাই!

যে রহিবার সে-ই মাত্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। আমরা আবার নূতন ষ্টেশনে বদ্‌লি হইয়া চলিয়া গেলাম। রেলের চাকরি। দু'দিন বসিয়া বসিয়া কাঁদিবারও অবসর পাইলাম না।

এখন রহিল মাত্র আমার তিন বৎসরের কন্যা টুনু। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, কালো কালো ঢলঢলে দুটি চোখ, কোঁক্‌ড়ানো একমাথা থোলো থোলো চুল, যেমন গড়ন তাহার, তেম্‌নি সুন্দরী! নিজের মেয়ে বলিয়া বাড়াইয়া বলি নাই। টুনুকে আমার যে দেখিয়াছে সে-ই ভাল বাসিয়াছে।

তিন বছরের ছোট্ট এই মেয়েটিই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে যেন আমরা আরও বেশি করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিলাম।

ব্র্যাঞ্চ লাইনের ছোট একটি জংসন-ষ্টেশনে আসিয়াছি। দু'বৎসর হইতে চলিল, বদ্‌লির নোটিশ এখনও পাই নাই। তিন বৎসরের টুনু এখন পাঁচ বৎসরের হইয়াছে।

চারিদিকে শাল মহুয়া আর পলাশের জঙ্গল; তাহারই মাঝখানে আমাদের এই পিয়ারমুটি জংসন। জায়গাটি চমৎকার। সারাদিনে ও রাত্রে মাত্র ছ'খানি ট্রেণ, জন দশ-বারো ওঠে, জন দশ-বারো নামে। তবে বছরের যে-সময়টায় শালের জঙ্গলে গাছ কাটা সুরু হয়—দূর দূরান্তের কাঠের ব্যাপারীরা সেই সময় ক্রমাগত আসা-যাওয়া করিতে থাকে এবং শুধু তাহাদেরই জন্য মাস চার-পাঁচ ধরিয়া জায়গাটা বেশ সরগরম হইয়া ওঠে। তাহার পর আবার যে-কে সেই! আবার সেই বসিয়া বসিয়া সময় কাটানো! আবার সেই টুনুর সঙ্গে খেলা! আবার সেই রাঙা-রাঙা পলাশের ফুলে টুনুর আঁচল ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া!

এখানে আসিয়া টুনু তাহার একটি সঙ্গী পাইয়াছে।

শুদামবাবু পরাশরের কন্যা পাঁচী তাহার সমবয়সী। সে-ই তাহার খেলার সাথী।

দক্ষিণদিকের জঙ্গলটা পার হইলেই পিয়ারসুটি গ্রাম। প্রতি রবিবার সেখানে হাট বসে।

ছোটবাবুকে ষ্টেশনে বসাইয়া দিয়া কিছু তরি-তরকারি কিনিবার জন্য নিজেই সেদিন হাটে গিয়াছিলাম। টুনু আমার সঙ্গ ছাড়িল না। বলিল, 'বাবা, আমিও যাব।'

জঙ্গল পার হইয়া এতটা পথ হাঁটাইয়া টুনুকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু পাঁচীর মত একটি পুতুল হাট হইতে আজ সে কিনিয়া আনিবে, ইহাই ছিল তাহার বাসনা।

বলিলাম, 'আমি কিনে আনবো, তুমি থাকো।'

কিন্তু কিছুতেই সে থাকিবে না। পুতুল সে নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিবে।

ষ্টেশনের একজন খালাসীকে সঙ্গে লইলাম। টুনু চলিল তাহার কোলে চড়িয়া।

পাঁচ পয়সা দামের একটি পুতুল! তাহাই পাইয়া টুনুর সে কি আনন্দ!

মার-কাছে গিয়া বলিল, 'এই ছাখো মা, আমার মেয়ে ছাখো!'

'কই দেখি!' বলিয়া মা তাহার পুতুলটিকে একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর আদর করিয়া চুমা খাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'বাঃ, বেশ খুকুমণি হয়েছে! এটি বুঝি তোমার মেয়ে?'

ঘাড় নাড়িয়া মাথার চুল দুলাইয়া খুব খানিকটা হাসিয়া টুনু বলিল, 'হ্যাঁ মা, আমার খুকুমণি।'

'হ্যাঁগা, আমাদের তাহ'লে কে হচ্ছে? নাৎনী, না?'

বুঝিলাম প্রশ্নটা গৃহিনী আমাকেই করিয়াছে।

বলিলাম, 'হ্যাঁ, আমাদের নাৎনী হ'লো।'

টুনুর মা বলিল, 'সেই কখন্ খেয়েছিস্ মা, আয় চারটি খাবি আয়!'

টুনু বলিল, 'বা-রে, আমার খুকুমণি খাবে না?'

এই বলিয়া সে নিজে খাইবার আগে তাহার খুকুমণিকে খাইতে বসাইল।

পরদিন দেখিলাম, আমাদের সেই পাঁচ বছরের টুনু রীতিমত মা হইয়া বসিয়াছে।

যখনই দেখিতে পাই, দেখি—টুনু তাহার মেয়ে লইয়া ব্যস্ত। কখনও দেখি পুতুলটিকে সে কোলে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুম পাড়াইতেছে, কখনও দেখি তাহাকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াইতেছে, কখনও দেখি ভালবাসিতেছে, কখনও বা শাসন করিতেছে।

সেদিন অম্‌নি খুকুমণিকে সে তিরস্কার করিতেছিল, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওকে এত বক্‌ছো কেন মা টুনু, কি করেছে কি?'

টুনু বলিল, 'তুমি চুপ কর বাবা, তুমি চুপ কর! আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের আমার মাথাটি তুমি খেলে।'—বলিয়াই খুকুমণিকে এক চড়!—'খালি-খালি কাঁদছে, খালি-খালি কাঁদছে! দুধ খাবে না—কিচ্ছু না, রাস্তায় খেলা করতে গিয়ে গায়ে এক-গা ধুলো মেখেছে ছাখো না! আমি আর পারি না বাপু, মরণ হয় ত' বাঁচি!'

জোরে জোরে হাসিবার উপায় নাই। জোরে জোরে হাসিলে টুনু হয়ত' অপ্রস্তুত হইয়া পড়িবে। ভাবিলাম কথাগুলা টুনুর মাকে একবার শোনাই। কিন্তু হাসির শব্দে মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখি, রান্নাঘরের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া মা তাহার হাসিতেছে।

বলিলাম, 'শুনেছ? খেটে খেটে মেয়ে তোমার হায়রাণ হয়ে গেল যে!'

টুনুর মা বলিল, 'হবে না? অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, কাল রাত্তিরে বিছানায় মুতেছে।'

ভাবিলাম—কথাটা বলা তাহার উচিত হয় নাই। টুনু হয়ত' লজ্জা পাইবে। কিন্তু দেখিলাম, লজ্জা সে পাইল না। এখন সে মা হইয়াছে। মায়ের আবার লজ্জা কিসের? শুনিলাম, সেই কথাটারই জের টানিয়া টুনু বলিতেছে, 'যাই আবার কাঁথা-বিছানা সব রোদ্দুরে শুকোতে দিই গে!'

কয়েকদিন পরে, টুনুর খুকুমণির কথা একরকম ভুলিয়াই

গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন সকালে টুনু আসিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। বলিল, 'বাবা, কাল তোমার নেমন্তন্ন।'

'কিসের নিমন্ত্রণ গো?'

গম্ভীরভাবে টুনু বলিল, 'কাল আমার মেয়ের বিয়ে।'

'সে কি গো? কোথায় বিয়ে?'

টুনু বলিল, 'পাচীর ছেলের সঙ্গে।'

কিন্তু ইহারই মধ্যে মেয়ের তাহার বিবাহের বয়স হইল কেমন করিয়া বুঝিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মেয়ে তোমার ক'বছরের হ'লো টুনু?'

টুনু ঠিক হিসাব রাখিয়াছে। বলিল, 'ষোলো বছরের মেয়ে, কাল সতেরোয় পড়বে।'

বয়সের রহস্যটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। কারণ একদিনে যে তাহার এক বৎসর হয় সে কথা আমার জানা ছিল না।

সারাটা দিন দেখিলাম, টুনুর আর বিশ্রাম নাই। কাল যাহার কন্যার বিবাহ, আজ তাহার বিশ্রামই-বা থাকে কেমন করিয়া!

টুনু ঘন-ঘন পাচীদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

টুনুর মেয়ে—আর পাচীর ছেলে।

বৈকালে দেখিলাম, বৌ'এর গায়ে-হলুদের তত্ত্ব লইয়া পাচী নিজেই আসিয়াছে। হলুদে-ছোপানো দুটি ছোট ছোট ন্যাকড়া, কয়েকটি পলাশের ফুল, দুটি বাতাসা—আর একমুঠা চিনি!

পরদিন বিবাহ।

বর লইয়া সকালে পাচী নিজেই আসিল। দেখিলাম, রাংতার টোপর আর হলুদরঙের কাপড় পরাইয়া পুতুলটিকে তাহারা বর সাজাইয়াছে। টুনুর কন্যাও সাজিয়াছে চমৎকার।

সারাদিন ধরিয়া তাহাদের বিবাহের উৎসব চলিল। বরের মা আর কনের মা—এই দু'জন ছাড়া আর লোক নাই। না থাক্, তাহারা একাই একশ'।

বরের মা পাচী সন্ধ্যায় বাড়ী যাইবার সময় কনের মা টুনুকে বলিয়া গেল, 'দেখো ভাই বেয়ান্, কাল সকালেই মেয়ে-জামাইকে পাঠিয়ে দিও যেন।'

টুনু বলিল, 'দেবো। কিন্তু মেয়ে আমার ছেলেমানুষ ভাই, বেশি দিন রেখো না।'

টুনুর কন্যার বিবাহ চুকিয়া গেছে। আজ তাহার খুকুমণির শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন।

কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। কাল রাত্রি হইতে আকাশে মেঘ করিয়াছিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছিল, গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল, সকালে চারিদিক অন্ধকার করিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে বাদল নামিল।

বলিলাম, 'আজ আর তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাজ নেই টুনু।'

টুনুও বোধ করি সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। অবিরাম বৃষ্টিধারার দিকে তাকাইয়া শুষ্কমুখে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৈকালের দিকে বৃষ্টি একটুখানি ধরিল বটে, কিন্তু আকাশের মেঘ তখনও কাটে নাই।

ছুটিতে ছুটিতে পাচী আসিল আমাদের বাড়ী। টুনুর কাছে গিয়া মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিল, 'মেয়ে জামাই এখনও গেল না কেন শুনি?'

টুনু বলিল, 'কেমন করে পাঠাই বল ত'? বৃষ্টি হচ্ছে যে!'

পাচী বলিল, 'হোক্ না বৃষ্টি! নৌকো করে পাঠালেই পার্‌তে!'

সে কথাও সত্য। নৌকার কথা টুনুর মনে ছিল না। পাহাড়-জঙ্গলের গড়ানে জল পাছে আমাদের কোয়ার্টারে আসিয়া ঢুকে, সেই জন্য আমাদের কোয়ার্টারের সুমুখে জঙ্গলের পাশ দিয়া প্রকাণ্ড একটা নালা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই নালা এখন জলে ভর্ত্তি। বর্ষার দিনে এই নালার নদীতে কতদিন তাহারা কচু ও পলাশ পাতার নৌকা ভাসাইয়া খেলা করিয়াছে।

কথাটা এতক্ষণে টুনুর মনে পড়িল। বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, ঠিক বলেছ। যাও তুমি—তোমাদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়াওগে যাও, আমি পাঠাচ্ছি মেয়ে-জামাই।'

পাচী চলিয়া গেল। টুনু ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিল।—কাগজের একটি বড় নৌকা তৈরি করিয়া দিতে হইবে, পাতার নৌকায় কাজ চলিবে না।

ষ্টেশনের পুরানো খাতা ছিঁড়িয়া—দিলাম একটি চমৎকার নৌকা তৈরী করিয়া।

বৃষ্টির জল তখন মাটির নালায় দু'কানা বহিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকার উপর মেয়ে-জামাইকে চড়াইয়া সজলচক্ষে টুনু তাহার কাগজের নৌকা সেই জলের উপর ভাসাইয়া দিল।

চীৎকার করিয়া বলিল, 'পাঠিয়েছি বেয়ান্!'

ওদিক হইতে পাঁচীর জবাব আসিল, 'বেশ।'

হেলিয়া দুলিয়া নৌকা চলিল পাঁচীদের বাড়ীর দিকে।

জলভরা চোখে একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকাইয়া খালের কিনারে টুনু দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু অদৃষ্ট বড় মন্দ, নৌকা তখনও পাঁচীদের দরজায় গিয়া পৌঁছে নাই, এমন সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল।

নামুক্ বৃষ্টি, মেয়ে-জামাই যাহার মাঝ-দরিয়ায়—বৃষ্টির দিকে মন দিতে গেলে তাহার চলে না। টুনু সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই ভিজিতেছিল, তাহার মা তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাত ধরিয়া চড়্ চড়্ করিয়া টানিয়া আনিল।

কিন্তু বাড়ীতে আসিয়াও তাহার মন পড়িয়া রহিল সেইখানে। দুরন্ত বৃষ্টি থামেও না ছাই! বাহিরের দিকে তাকাইয়া টুনু বলিতে লাগিল, 'হে ভগবান, হে মা কালী, হে মা দুগ্গা, বৃষ্টিটা থামাও! একটি বারের জন্য বৃষ্টি থামাও!'

বৃষ্টি থামিল অনেকক্ষণ পরে। ইহারই জন্য টুনু অপেক্ষা করিতেছিল। ছুটিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে পাঁচীও আসিল ছুটিতে ছুটিতে।

'নৌকো ধরেছ ভাই?'

পাঁচী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

টুনুর দুচোখ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। দু'জনেই ছুটিয়া গেল খালের ধারে। কিন্তু কোথায় নৌকা? বৃষ্টির মাঝে হঠাৎ কোথায় নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে, নৌকাও নাই, বরও নাই, কনেও নাই!

কাঁদিতে কাঁদিতে পাঁচী তাহার বাড়ী ফিরিয়া গেল। কিন্তু টুনুর কান্না কিছুতেই আর থামে না! মেয়ের শোকে সে তখন পাগল হইয়া গেছে।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া তাহাদের এই বিপদের বার্ত্তা শুনিলাম। টুনুর মা বলিল, 'কান্না ওর কিছুতেই আমি থামাতে পারছি না, তুমি এসো।'

টুনুর কাছে গিয়া তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম। বলিলাম, 'কেঁদো না টুনু, চুপ কর। আসছে রবিবারের হাটে আবার একটা ভাল মেয়ে তোমার কিনে দেবো।'

কিন্তু না, টুনুর সেই মেয়েই চাই!

পুরা আঠারোটি দিন ধরিয়া যে-মেয়েকে সে তাহার মাতৃস্নেহ দিয়া লালন করিয়াছে, ভাল বাসিয়াছে, তিরস্কার করিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে, সে-মেয়েকে কিছুতেই সে ভুলিতে পারিল না।

থাকে থাকে আর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে!

আমি বুঝাইলাম, তাহার মা কত বুঝাইল—'ওর চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে তোমার এনে দেবো টুনু, কেঁদো না, চুপ কর।'

কিন্তু কান্না তাহার কিছুতেই থামাইতে পারিলাম না।

নালার জল হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথায় যে তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে কে জানে! রবিবারের হাট ছাড়া সে রকম পুতুল আর পাইবারও উপায় নাই। ওদিকে পাঁচী কি করিতেছে জানি না। বনানীপ্রান্ত অন্ধকার করিয়া আবার ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ ডাকিতেছে। এই দুর্য্যোগের ভয় দেখাইয়া অনেক কষ্টে টুনুকে আমার কোলের উপর ঘুম পাড়াইয়াছি। কিন্তু ঘুমের ঘোরে এখনও সে মাঝে-মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

আঠারো দিনের স্নেহে-যত্নে মানুষ-করা মেয়ে! হায় হায়, আঠারো বছরের স্নেহে-যত্নে মানুষ করা ছেলে আমাদের হারাইয়া গেছে! টুনুর সেই অশ্রুম্লান সুন্দর মুখখানির পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সেই কথাই ভাবিতেছি। ভাবিতেছি—আঠারো দিনের মেয়েটিকে পাঁচ বছরের টুনু আজ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না, কিন্তু আমাদের এই পাঁচ বছরের বুকের রক্ত দিয়া মানুষ-করা টুনু যদি দুঃখদিনের ঝড়ে-বাদলে হঠাৎ কোনোদিন তাহার পুতুলের মতই হারাইয়া যায় ত' আমরা তাহাকে ভুলিব কেমন করিয়া!

গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

টুনুকে তাড়াতাড়ি বুকের উপর চাপিয়া ধরিলাম। হে ভগবান!—আমারও চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণের বিরাম নাই। সে বৃষ্টি সহজে থামিবে বলিয়াও মনে হইল না।

উর্দ্ধাশা

(Aspiration)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিশ্র কীর্ত্তন—ত্রিতালী ও একতালা (তালফের)

মাগো—
এসো অন্ধ তুফানে উষানন্দ সমা—
ঝলি' পুণ্য বিহানে নিশারণ্য অমা।
এসো জীবনে
রূপ- দীপনে—
ছবি- ছন্দিতা, সুন্দরী, তিলোত্তমা !
এসো বিদ্রোহী টঙ্কারে শিখাতে নতি—
করি' মন্দির-ঝঙ্কারে দীনতা-ব্রতী।
ফুল- ঝরা-ভয়,
মধু- পরাজয়—
খর দাহ যত—বরাভয়ে শমিয়ো সতী !

এসো যুগ-ঘুম-নাশা মরি, আলো-চেতনা !—
ঝরি' ঝলক-দুরাশা—পরিমল-মেলনা।
তব মলয়ে
এসো প্রণয়ে—
হিম- বন্ধ টুটিয়া—দলি' কালো বেদনা।

রহে জড়িমা-তৃপ্তি-বুকে মুগ্ধ হৃদি :
করো নীলিমা-দীক্ষা-সুখে মুক্ত-প্রীতি।
ছায়া বাসনা
মায়া- • আসনা—
হোক প্রেম-মূর্চ্ছনা-মণি-দীপ্ত গীতি।

কথা ও সুর—দিলীপকুমার স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

ত্রিতাল

II০ ১ + ৩
গা গমা | মা পা পা পা | পা পা পা পধা | পমা ধা পা পা | পমা পা মগা০ মা |
এ সো অ ন্ ধ তু ফা নে উ ষা ন ন্ দ স মা - এ সো

০ ১ + ৩
গমপা ধনর্সা না ধা | পা পা পা পধা | পমা ধা পা পধা | পমা পা গা মা |
অন্ - ধ তু ফা নে উ ষা ন ন্ দ স মা - ঝ লি

০ ১ + ৩ ॥
রা মা মা মা | গা রগা রসা সা | সা রা পা মা | গা -া গা মা |
পু ন্ ন বি হা নে নি শা র ন্ ন অ মা - য দি

০ ১ + ৩ ০
মা পা পা পা | পা -া ধা না | পনা ধনা ধপা -া | -া -া র্সা র্সা | না র্রা র্সা র্সা |
ঝ ন্ ঝা তু ফা ন্ আ সে এ সো মা - - - নি শা ব নে ত ব

১ + ৩ ০ ১
না ধনা ধপা মা | গা মা গধা -া | -া -া পা পা | পা না ধা র্সা | নর্সা নধা না র্সা |
উ ষা হা সি হে সো মা - - - এ সো জী ব নে - - - রূ প

+ ৩ ০ ১ +
ধা না র্রা -া | র্সর্রা র্সনা না র্রা | র্গা -া র্রা না | র্রা -া র্সা ধা | না পা না ধা |
দী প নে - - - ছ বি ছ ন্ দি তা সু ন্ দ রী তি লো ত্ ত

৩ ০ ১ + ৩
না -া র্সা র্সা | না র্রা র্সা না | র্সা র্সনা নধা ধপা | মা পা র্সা -া | -া গা II সা রা |
মা - ছ বি খা নি হো য়ে ব রা ভ য়ে এ সো মা - - - এ সো

০ ১ + ৩ ০
গা পগা পা ধা | র্সা -া না ধনা | পা ধা র্সণা ধা | পা -া পা ধা | র্সা -া র্সা র্সর্রা |
বি দ্ রো হী ট ঙ্ কা রে শি খা তে ন তি - ক রি ম ন্ দি র

১ + ৩ ০ ১
না র্সা না ধনা | পা পদা পা পমা | পা -া পা ধা | ধা না ধপা -া | -া -া পা না |
ঝ ঙ্ কা রে দী ন তা র তী - ফু ল ঝ রা ভ য় - - ম ধু

+ ৩ ১ +
ধা র্সা না র্রা | -া -া র্সা র্মা | র্গা র্রা না র্গা | র্রা র্সা ধা র্রা | র্সা না পা র্রা |
প রা জ য় - - থ র দা হ্ য ত ব রা ভ য়ে শ মি লো স

৩ ০ ১ + ৩

র্সা -া না র্সা | ধনা র্সর্রা র্গর্রা র্সনা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্সর্গা র্রা র্রা | র্সা ধর্সা ধা পা |

তী - এ সো মা - - - - - ক ল ফু ল প রা জ য়ে ব রা

০ ১ + ৩ ০

পা ধপা গা মা | পা -া গা পা | পা ধা ধা না | র্সনা ধপা ধা না | ধপা -া পা পসা |

ভ য়ে ধী রে মা - এ সো অ ভ য় প্র ণ য় তী রে মা - তু লি

১ + ৩ ০ ১

সা রা রা গা | রগা মগা পা পা | পা ধা র্সণা ধা | পা ক্ষপা মা গা | মা ধা পা মা |

ঝ ঙ্ কৃ য়া ম ন্ দি রে দী ন তা শ ঙ্ খ টি রে শ র ণ অ

+ ৩ ০ ১ +

গা রসা রা গা | রসা -া ধ্সা সা | সরা রমা মা মা | মা মা মা মপা | গমা গা -া -া |

স্ কু নী রে মা - এ সো ব রি ব হ্ দ য় তী রে মা - - -

৩ ০ ১ + ৩

গা -া মা পা | গমা মা গা গমা | রগা রসা রা গা | রসা -া -া -া | -া -া II রা সা

- - - - শ র ণ ব র ণ তী রে মা - - - - - এ সো

তালফের—একতালা

০ ১ + ৩ ০ ১

II সা -া রা | রা -া গা | মা ধা পা | পক্ষা পা মগা | গা মা পা | ধপা ক্ষপা পসা |

যু - গ ঘু - ম না - শা ম - রি আ - লো চে - ত

+ ৩ ০ ১ + ৩

পা -া -া | -া পা ধা | ধা র্সা র্সা | র্সা -া র্রা | না র্সা না | না -া ধপা |

না - - - ঝ রি' ঝ - ল ক - ডু রা - শা প - রি

০ ১ + ৩ ০ ১

গমা পধা না | র্সনা ধপা ধা | পা -া -া | -া পা পা | পা ধা ধা | ধা পধা নর্সা |

ম - ল মে - ল না - - - এ সো আ লো চে ত না -

+ ৩ ০ ১ + ৩

ধনা -া -া | -া পা ধা | ধা র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা র্সনা | না র্সা ধা | ন্না ধপা -া |

- - - - এ সো টু টি' ঘু ম ঘো র কা টি মা য়া ডো র

০ ১ + ৩ ০ ১

গা না ধা | পক্ষা পা -া | -া -া -া | -া গা মা | রা গা পা | ধপা র্সা -া |

দু য়ে খে কো না - - - - - জা গ র ণ ঝ র ণা -

+ ৩ ০ ১ + ৩
-া -া -া | -া র্সা র্রা | র্সর্জ্ঞা র্রা র্সা | না র্সা -া | পা না র্সা | র্রা নর্সা -া |
- - - - ফু ল বা স মে ল না - মা - - এ সো -

পুনরায় গাহিয়া যুগ····· মেল
+ ৩ ০ ১ + ৩
| পা -া -া | -া ধপা মা | গা পা ধপা | র্সা র্সা না | ধনা র্সনা ধপা | -া মা গমা |
| না - - - ত ব ম ল য়ে - এ সো প্র ণ য়ে - হি ম

তালফের—ত্রিতালে প্রত্যাবর্ত্তন

০ ১ + ৩
রা গা গা মা | মা পা ধা না | পা না র্সনধপা ধা | পা -া গা গমা |
ব ন্ ধ টু টি য়া দ লি কা লো বে দ না - ও গো

০ ১ + ৩ ০
গা রসা রা গা | ধসা -া II ঠায়লয়ে সা সা | সা মা মা মা | -া না মা মগা | পা হ্মা
মু ক্ তি র মা - র হে জ ড়ি মা তৃ প্ তি বু কে মু গ্

১ + ৩ ০ ১
পা ধা | পমা -া মা মা | মা র্গা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্সা র্সা | না র্সা ধা না | র্সা -া
ধ হু দি - ক রো নী লি মা দী - ক্ষা সু খে মু ক্ ত প্রী তি -

+ ৩ ০ ১ +
র্সা না | র্রা -া ধা -া | -া -া র্সা র্রা | র্গা রর্গা রর্সা -া | -া -া র্সা -া | র্সা র্সা ধা -া |
দা ও মু ক্ তি - - - মো হ মু ক্ তি - - - দা ও জ ড়ি মা র

৩ ০ +
পা পা গা গা | রা গা হ্মা না | ধপা -া { সা র্সা | র্সা র্গা র্রা র্সা | -া ধা পা ধা
কা রা হো তে মু - - ক্ তি - দা ও নী লি মা দী - ক্ষা ব্র তে

০ ১
গা পা ধা হ্মা | র্সা -া } র্সা র্রা
মু - - ক তি - য ত

তালফের—পুনরায় একতালা কিন্তু ঠায়

+ ৩ ০ ১ + ৩
না না র্সনা | ধা পা -া | গা মা মা | মা পা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা রর্সা |
ছা য়া বা স না - মা য়া আ স না - তো মা র চ র ণে

০ ১ + ৩ ০ ১
না র্সা না — ধনা ধনা ধপা | পা মা পা | ধা নপা -া | র্সা র্সা র্সা | র্সা না ধনা |
যা চু ক মু ক্ তি প্রে ম সা ধ না - ও গো প্রে ম ম ণি

\+ ৩ ০ ১ +
পা র্রা র্সা | না ধপা -া | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা র্সনা | না র্সা না |
সিং হা স না - বা স না কা লো - বা সু ক

৩ ০ ১ + ৩
র্সনা ধপা -া | মা পা -া | পা পধা না | পা না র্সনা | ধা পা -া |
ভা লো - তো মা র গা নে র বা ধ না আ লো -

০ ১ + ৩ ০
র্সা -া র্সা | র্সা র্সর্রা র্সনা | না র্সা না | না ধপা -া | গা মা মা |
লো ক প্রে ম মূ র্ ছ না - ম ণি - দী প্ ত

মা পা -া | পা ধা ধা | ধা ধা না | পা না র্সনা | ধা পা -া |
গী তি অ - প্রে ম সু র লো ক মা ম ধু র

\+ ৩ ০ ১ + ৩
গা মা মা | মা পা ধা | মপা -া -া | -া -া -া | -া -া -া | -া -া -া
সু র আ র তি - - - - - - - - - - - -

তালফের—ত্রিতালীতে প্রত্যাবর্ত্তন

০ ১ + ৩
সা রা রা গা | গা মা পা ধনা | পা না র্সনা ধা | পা -া -া -া |
হে - - - - - - - - নি - রু প মা - - -

০ ১ + ৩
নর্রা র্সনা ধর্সা নধা | ধনা পধা ধনা পা | পধা ধনা র্সনা পধা | মপা -া II
এ - সো - মা - - - এসো এসো এসো এসো মা -

কীর্ত্তনের আরও আঁখর এ গানটি দেওয়া চলিবে। কেবল মূল সুরের ঈষৎ য়ুরোপীয় ভঙ্গীটির বৈশিষ্ট্য রাখা প্রয়োজন। এ-ভঙ্গির কতক প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলালের "ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী" শ্রেণীর গান হইতে পাওয়া। তবে কীর্ত্তনের সহিত এ ভাবে নানা ভঙ্গির মিশ্রণ সম্ভবত বাংলা সুর-রচনায় বড় কেহ করেন নাই—অন্ততঃ এ ভাবে ছন্দোবদ্ধ আঁখরের সহিত না। ইতি—সুর-কার।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভিয়েনা *

ভিয়েনায় আমাদের ট্রেন পৌছতে, কতকগুলি ভারতীয় যুবককে ষ্টেশনে দেখা গেল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার পূর্ব্বপরিচিত—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমিয়নাথ সরকার—ইনি ইতালিতে শিক্ষালাভের জন্য যান, অর্থশাস্ত্রে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে একটি ইতালীয় আপিসে কাজ ক'রছিলেন; ইতালি আর ইউরোপের অন্য দেশের ভারতীয় ছাত্রদের সভা-সমিতি প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, ইংলাণ্ডের বাইরে ইউরোপের ভারতীয় ছাত্রমহলে কর্ম্মশক্তি আর সংঘশক্তির উদ্বোধনে ইনি বিশেষ চেষ্টিত হ'য়েছিলেন; এঁকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল। স্নেহাস্পদ শ্রীমান অমিয় তখন ভিয়েনাতে বেড়াতে এসেছিলেন। ডাক্তার পি-এন্ কাট্যার ব'লে উত্তর ভারতের—বোধ হয় কনোজের—অধিবাসী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভিয়েনায় ইনি ডাক্তারী শিখ্ছেন, স্থানীয় ভারতীয়-পরিষদের সম্পাদক,—এঁর নাম ঠিকানা পেয়ে আগেই এঁকে আমি চিঠি দিয়েছিলুম, ভেনিসে এঁর চিঠির জবাবও পাই—ইনিও ষ্টেশনে র'য়েছেন দেখলুম। সুরেন্দ্র সিংহ ব'লে উত্তর ভারতের আর একজন ডাক্তার, আর তা ছাড়া আরও দু'তিন জন ভারতীয়। ভিয়েনা ষ্টেশনে এতগুলি ভারতীয় এসেছিলেন, শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা দেবী চিকিৎসার্থ ভিয়েনায় আস্‌ছেন শুনে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। আমাদের এই ট্রেনেই সরাসরি তাঁরা ভেনিস থেকে আসছেন অনুমান ক'রে, এই ট্রেনেরই অপেক্ষায় তাঁরা ষ্টেশনে সমবেত হ'য়েছিলেন। আমাদের কাছ থেকে যখন শুনলেন যে ত্রিয়েস্ত্ বন্দরে কমলা দেবী আর তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার অটল নেমেছেন, সেখান থেকেই ট্রেনে ক'রে ভিয়েনায় আসছেন, আর সে ট্রেনের আসবার আধ ঘণ্টা দেরী আছে, তখন তাঁরা আমাদের ট্যাক্সীতে তুলে দিয়ে, কুলীদের ঝঞ্ঝাট থেকে আমাদের বাঁচিয়ে, হোটেল দ্য ফ্রাঁস ব'লে এক হোটেলে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন,—আর নিজেরা নেহরু-পত্নীর জন্য ষ্টেশনেই র'য়ে গেলেন।

Sued Bahnhof 'স্যুদ্-বানহফ্' বা দক্ষিণ-ষ্টেশন থেকে শহরের একেবারে মধ্যখানে Schotten-ring 'শট্‌ন্-রিঙ' রাস্তায় আমাদের হোটেল। মোটর ক'রে ছুটে যেতে যেতে প্রথম দর্শনে, ভিয়েনার রাস্তার সৌধসমৃদ্ধি আর ভিয়েনার চত্বরের মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হ'ল। অনেকটা পারিসের মতন; বড় বড় বিরাট আকারের সব ইমারৎ, আর বাগানে, রাস্তার ধারে অজস্র সুন্দর সুন্দর ব্রঞ্জ আর পাথরের মূর্ত্তি। সরকারী বাড়ীগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হ'য়েছে যাতে দর্শনমাত্রই তাদের সৌষম্য আর গাম্ভীর্য্য দর্শকের চোখে ফুটে উঠে। তবে পারিসের তুলনায় মনে হ'চ্ছিল, এই জরমান জাতির হাতের কাজে সৌকুমার্য্যের চেয়ে শক্তির ব্যঞ্জনাই একটু বেশী। বড় বড় প্রাসাদ—রেনেসাঁস যুগের বাস্তুরীতি, গ্রীক আর গথিক রীতির অষ্টাদশ শতকের ও উনবিংশ শতকের অনুকৃতিময় বাস্তুরীতি; পাথরের অথবা বালীর কাজ করা ইটের বাড়ী—হাওয়া বৃষ্টি আর রোদ্দুরে কালো

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিগত ১৯৩৫ সালের জুন-জুলাই-আগষ্ট মাসে বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। জুলাই মাসে ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের ভারতীয় বিভাগের সভাপতি-রূপে আমন্ত্রিত হওয়ায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উক্ত সম্মেলনে তাঁহাকে প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঠানো হয়। ইতিপূর্ব্বে তের বৎসর আগে সুনীতিবাবু বিলাতে—লণ্ডনে, পারিসে ও অন্যত্র—তিন বৎসর ছাত্র হিসাবে যাপন করেন। ইউরোপের আধুনিক সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক পরিস্থিতি তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুশীলন করেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রবন্ধাকারে তিনি প্রকাশিত করিতেছেন। প্রথম কয়েকটী প্রবন্ধ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। —সম্পাদক, 'ভারতবর্ষ'।

হ'য়ে গিয়েছে ; কিন্তু রেখাসুষমায় অপূর্ব্ব সুন্দর। অনেক বাড়ীর সদর দরজার দুধারে একটী একটী ক'রে দুটী, কোথাও বা দুটী দুটী ক'রে চারটী Atlas বা Caryatid অর্থাৎ স্তম্ভমূর্ত্তি—বিরাট বিশাল-কায় স্ফীতপেশী শ্মশ্রুমান পুরুষ, কিংবা দীর্ঘকায় পুষ্টদেহা নারী, অতি মানব আকৃতির দানব বা দেবতার মতন বড় বড় বাড়ীর ছাতের ভার মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। পথে যেতে যেতে ভিয়েনার বিখ্যাত অপেরা-হাউসের সুন্দর প্রাসাদটী বাঁয়ে প'ড়ল ; আর তার

'রাৎ-হাউস' বা পৌরজনসভাগৃহ

পরে এল একটী বিরাট প্রাসাদ—সরু রাস্তার ধারে কাল্‌চে রঙের বাড়ী, সাম্‌নে একটু খোলা জায়গা, তার ধারে ফটক, ফটকের পাশে বিরাট আকারে চারটী মূর্ত্তি-পুঞ্জ হাতে গদা নিয়ে গ্রীক বীর হেরাক্লেস গ্রীক পুরাণ বর্ণিত যুদ্ধময় দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যাবলী ক'রছেন—মূর্ত্তিগুলিতে প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ নাটুকে ভাবে প্রকটিত।

আসাম থেকে আগত সহযাত্রী চলিহা ও দত্ত মহাশয়দ্বয় আমার সঙ্গে হোটেল্‌-দ্যু-ফ্রাঁস্‌তেই উঠ্‌লেন ; আর নাগপুরের ডাক্তার চোলকর গেলেন একটি pension পাসিঁয়ঁতে। এই পাসিঁয়ঁগুলি কম দামের হোটেল বিশেষ—ভদ্রগৃহস্থ বাড়ীতে paying guest হ'য়ে থাকার মতন এখানকার ব্যবস্থা। হোটেল-দ্য ফ্রাঁস্‌-এ পৌছে সেখানে একটি ইংরেজী সাইনবোর্ড লট্‌কানো দেখলুম—Hindusthan Association of Central Europe ; আর চীনা আর জরমান ভাষায় আর একটী সাইনবোর্ড, তা থেকে জানা গেল, সেই হোটেলটী ঐ অঞ্চলের চীনা ছাত্রদেরও কেন্দ্র। চীনারা সাইনবোর্ডে চীনা অক্ষর ব্যবহার ক'রে তাদের জাতীয়তা বজায় রেখেছে। ভারতীয়দের সাইনবোর্ডে কেবল ইংরিজি,—ভারতীয় ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। একটা ভারতীয় ভাষার কিছু লেখা থাকা উচিত ছিল—তা দেবনাগরীতেই হোক বা রোমানেই হোক্ ; সাইনবোর্ড—কতকটা decorative বা

অলঙ্করণের ব্যাপার; এরূপ স্থলে দেবনাগরীই প্রশস্ততর হয়।

যাক্, ঘরটর ঠিক ক'রে নেওয়া গেল। হোটেলটী খুব দামী নয়, কিন্তু ব্যবস্থা ভাল। প্রত্যেক ঘরের দরজায় দুই প্রস্থ কপাট, ঠাণ্ডা আর গোলমাল আটকাবার জন্য। ঘরে দেওয়ালে আঁটা হাত মুখ ধোবার জায়গা, ঠাণ্ডা আর গরম দু রকমের জলের কল সমেত। আসবাবপত্রও ভদ্র। ঘরের ভাড়া, প্রতিদিন সাত শিলিঙ—পঁচিশ বা ছাব্বিশ অস্‌ট্রিয়ান শিলিঙে এক পাউণ্ড—আমাদের টাকা চারেক আন্দাজ। বিলে যত টাকা হবে, তার শতকরা দশ ভাগ চাকর-বাকরদের বক্‌শীশের জন্য বেশী ক'রে ধ'রে নেবে—এই হ'চ্ছে এখানকার হোটেলের দস্তুর। খাওয়ার খরচ পৃথক্; ইচ্ছা হয়, হোটেলের লাগাও রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে খাও, খাবার পরে নগদ দাম দাও (বা সই দাও, পরে বিলের সঙ্গে যোগ ক'রে দেবে);—ইচ্ছা হয়, বাইরে যেখানে খুশী খাও। হোটেলে ঘর ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে, দত্ত ও চলিহা মহাশয়দের সঙ্গে একটু গল্প ক'রতে ক'রতে, ডাক্তার কাট্যার প্রমুখ সকলে হোটেলে এসে আমাদের খবর নিলেন। এঁদের সকলকার সৌজন্য বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী হ'ল। এঁরা নেহরু-পত্নীকে তাঁর চিকিৎসার উপযোগী বাসায় তুলে দিয়ে তবে ফিরলেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য অবস্থান ক'রছিলেন জানা ছিল। তাঁর খবর নিলুম, শুনলুম তাঁর একটা অস্ত্রোপচার হ'য়ে গিয়েছে, তিনি সবেমাত্র হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়েছেন। বহুপূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তখন তিনি সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এবারও অবশ্য ভিয়েনাতে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল।
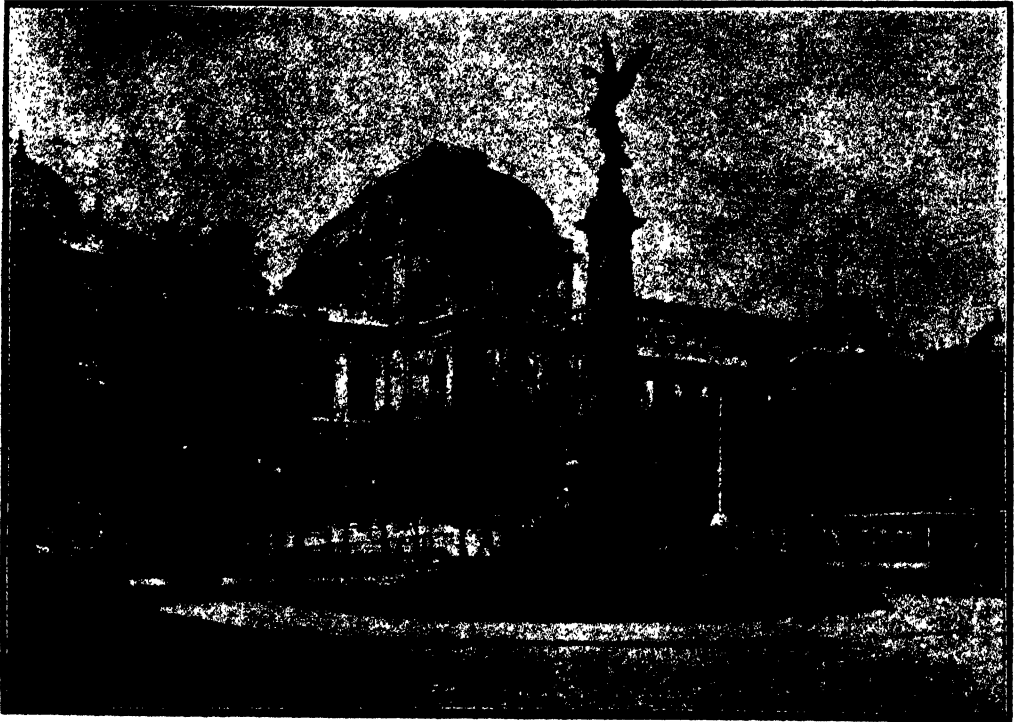
বিশ্ববিদ্যালয় সম্মুখে ফন্-লীবেন্‌বর্গ্ স্মৃতিস্তম্ভ

এইবারে একটু শহর বেড়াতে হবে, মধ্যাহ্নাহার সেরে নিতে হবে। সঙ্গে দত্ত ও চলিহা মহাশয়দ্বয় আছেন—আমরা হোটেলের পোর্টারের কাছে খোঁজ ক'রে একটা নিরামিষ রেস্তোরাঁয় গিয়ে উঠ্‌লুম, আমাদের হোটেলের পাশের এক

বড় রাস্তার উপর ছিল। আহার্য্য নানা প্রকারের। আমরা যা বেছে নিয়ে খেলুম তা কিন্তু বিশেষ মুখরোচক বোধ হ'ল না। খালি এদের কফীটা লাগ্‌ল চমৎকার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রান্নার মধ্যে বোধ হয় কেবল ইতালি আর ফ্রান্সের রান্নাতেই ভারতীয় রুচি তৃপ্ত হ'তে পারে।

তার পরে ইচ্ছামত শহর বেড়াতে বেরুলুম। কোনও শহরের সঙ্গে পরিচিত হবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়—'সব দেখ্‌বো এই মতলব নিয়ে' সকালে আর বিকালে কখন কোথায় যাবো সব ঠিক ক'রে নিয়ে, পেশাদারী ভবঘুরেরা যে ভাবে ঘোরে,—আবার এঁরা দলবদ্ধ হ'য়ে বেরোন, সঙ্গে গাইড বা পাণ্ডা নিয়ে—সে ভাবে ঘোরা নয়; এভাবে শহর দেখা আমার পোষায় না। আমি হাতে শহরের এক নক্সা আর পকেটে একখানা গাইড-বুক এই নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেই ভাবে বেরিয়ে পড়ি, ঘুরে ফিরে যা কিছু নজরে আসে দেখি—তা বাড়ীই হোক্, আর সংগ্রহশালাই হোক, আর নগরের নরনারীর প্রবহমান জীবনলীলাই হোক্। এইভাবে ঘুরে ঘুরে ভিয়েনা শহরের কিছুটা, মায় শহর-তলীতে শ্যোন্‌ব্রুন প্রাসাদ আর বাগান, আর কোবেন্‌ৎস্ল পাহাড়, আট দিনে দেখে নিই। একটা দিনে আবার ভিয়েনার বাইরে ম্যোডলিং আর বাদেন অঞ্চলের বনস্থলীও একটু ঘুরে আসি।

ভিয়েনা শহরের কেন্দ্র হ'চ্ছে শহরের মধ্যের একটি অংশ, তার তিন দিক বেড়ে Ring 'রিঙ্' এই নামযুক্ত একটি প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা, আর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দানুব নদীর একটি খাল। এই রাস্তাটি Schotten-Ring, Ring der 12 November (এই অংশের পুরাতন নাম ছিল Franzen Ring), Burg Ring, Opern Ring, Kaerntner Ring, Schubert Ring ও Stuben Ring—এই কয় অংশে বিভক্ত। এই রিঙ্-সড়ক আর দানুবের খাল—এরই মধ্যে ভিয়েনার প্রাচীনতম অংশ; শহরের প্রাচীনতম গির্জ্জা, রাজপ্রাসাদ, ভিয়েনার গৌরব ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান অপেরা-হাউস, প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান বাড়ী আর বাগিচা এই অংশেই। এ ছাড়া, রিঙ্-সড়কের লাগাও বা তার খুবই কাছে-পিঠে, ভিয়েনার Rathaus 'রাৎ-হাউস্' বা মিউনিসিপাল আপিস, অস্ট্রিয়া দেশের পার্লামেণ্ট, ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান আদালত, বড় বড় কয়টী মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা—এক একটী ক'রে বিরাট প্রাসাদ আশ্রয় ক'রে আছে। রিঙ্ সড়কের খানিকটা অংশের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে রাস্তাটী যেন ভিয়েনার বাস্তু-শিল্পের একটি প্রদর্শনীক্ষেত্র।

ভিয়েনার মিউনিসিপাল আপিস আধুনিক কালের গথিক রীতিতে তৈরী; ভিয়েনার পার্লামেণ্ট-বাড়ীর সামনেটা শুদ্ধ গ্রীক রীতিতে প্রস্তুত, বড় বড় করিন্থিয়ান ছাঁদের

'আথেনা দেবী' ফোয়ারা

মাথাওয়ালা সব থাম; পার্লামেণ্টের সামনে একটি ফোয়ারা, তাতে নানা অন্য মূর্ত্তি পরিবেষ্টিত গ্রীক দেবী আথেনার এক অতি সুন্দর বৃহদাকার মূর্ত্তি আছে;—স্থির প্রসন্ননেত্রে শিল্প, জ্ঞান ও শৌর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী এই কুমারী দেবী দণ্ডায়মানা, মস্তকে কিরীট, বাম হস্তে বিরাট ভল্ল, দক্ষিণ হস্তে গোলকের উপরে বিরাজমানা বিজয়মাল্যহস্তে পক্ষযুক্ত

বিজয়া দেবীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। গ্রীক দেবতারা এক আশ্চর্য্য সুন্দর কল্পলোকের অধিবাসী, গ্রীক জাতির অসাধারণ, লোকোত্তর কল্পনার সৃষ্টি; ইউরোপীয় ও অন্যদেশীয় সভ্য ও শিক্ষিত চিত্তকে এই দেবতাদের মনোহর ও মহীয়সী কল্পনা এখনো স্বপ্নাবিষ্ট ক'রে রেখেছে। রিঙ্‌ সড়কের এক অংশে একদিকে পার্লামেণ্ট, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়; আর এক অংশে, রাস্তার একধারে বিরাট রাজবাটী। এখন রাজা নাই, এই প্রাসাদকে অংশতঃ নৃতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহশালায় পরিণত করা হ'য়েছে। আর এই প্রাসাদের সামনেই অপর দিকে দুইটী বিরাট মিউজিয়ম, মিউজিয়ম বাড়ী দুইটির

অস্‌ট্রিয়ার পার্লামেণ্ট গৃহ

মাঝে অস্‌ট্রিয়ার বিখ্যাত সাম্রাজ্ঞী মরিয়া-তেরেসার মূর্ত্তি। অধিকাংশ বাড়ী 'বারক্' রীতিতে তৈরী।

শিল্প সংগ্রহশালা ও নৃতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহশালা ভাল ক'রে দেখা গেল। শেষোক্ত সংগ্রহশালার পরিচালকদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে, এঁদের একজন আমায় সব খুঁটিয়ে দেখালেন। নিগ্রো শিল্পের কতকগুলি চমৎকার জিনিস—বেনিনের ব্রঞ্জ মূর্ত্তি—এখানে আছে। শিল্প সংগ্রহশালার মিসরীয় ও গ্রীক ভাস্কর্য্যের কতকগুলি বিশ্ববিশ্রুত নিদর্শনের সঙ্গে এবার চাক্ষুষ পরিচয় হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইহুদী-জাতীয়া অস্‌ট্রিয়ান ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়, ইংরেজী ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন ইংরেজী প্রভৃতি বিষয় প'ড়ছে, ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। এই ছাত্রীটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে আমায় নিয়ে গেল, দুই চার জন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। এর কাছে ইহুদীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গেল। ইহুদীদের অবস্থা এখন মধ্য ইউরোপে কোনও দেশে সুবিধার নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যাকে তাকে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হয় না। দরজার গোড়ায় দরওয়ানে আটকায়, কার্ড দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঢুকতে হয়। আমার কালো রঙ্‌ যেতে দেখে, আর আমার পথপ্রদর্শক ছাত্রীটির কৈফিয়ৎ শুনে, আমাকে দিলে।

বিরাট ইমারৎ। বড় বড় বারান্দা, উঁচু উঁচু মস্ত মস্ত সব ঘর। প্রাসাদের উপযুক্ত সিঁড়ি, প্রশস্ত সব আঙ্গিনা। বিভিন্ন বিভাগের Seminar বা আলোচনা গৃহ; ছাত্রদের বিশ্রাম বা বিশ্রম্ভালাপের জন্য ঘর; বড় বড় সব lecture-room বা ব্যাখ্যাপক প্রকোষ্ঠ; বিরাট গ্রন্থগৃহ,—তার প্রসারই বা কি, আর ভাস্কর্য্যে অলঙ্করণে রঙীন মর্ম্মর প্রস্তরে তার শোভাই বা কি; ছাত্রদের ব'সে অধ্যয়ন করার জন্য চমৎকার সব পাঠগৃহ। বিদ্যামন্দিরের ঐশ্বর্য্য আর জাঁকজমক দেখে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা বিল্ডিং এর পুরাতন অন্ধকারময় অপ্রশস্ত পাঠগৃহের কথা স্মরণ ক'রে, এখানকার ছাত্রদের সৌভাগ্য দেখে মনে ঈর্ষ্যা হ'ল। আবার সঙ্গে সঙ্গেএ চিন্তাও এল—কোথায় এরা, আর কোথায় আমরা! এদের স্বাধীন জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-সুবিধার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-সবের সুবিধাও তো থাকবে।

কিন্তু rift in the lute অর্থাৎ 'দুগ্ধকলসে গোময়-বিন্দু'ও আছে। ছেলে-মেয়েরা বারান্দায় চলাফেরা ক'রছে। সবাই যার যার ক্লাশে যাচ্ছে—বেশ একটা চটপ'টে ভাব, ফুর্ত্তির ভাবও খুব। কিন্তু প্রত্যেক লম্বা লম্বা বারান্দায়, আর আঙ্গিনায়, দু'চার জন ক'রে সান্ত্রী বন্দুক নিয়ে ঘুরছে।

প্রাচীন হিন্দু-যুগে, বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের রাজারা যখন গ্রাম দান ক'রতেন, তখন তাম্রপটে গ্রামের চৌহদ্দী ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস-বাক্য থাকৃত, যে

প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালা

গ্রাম "অ-চট-ভট-প্রবেশ" হবে—রাজার সেপাই (চট) বা চাকর (ভট) গাঁয়ে ঢুকে উৎপাত ক'রবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাহারাওয়ালা বা সেপাইয়ের হল্লা—এটা এখনকার মত তখনও সকলের অরুচিকর ছিল। সরস্বতীর নিকেতন "অ-চট-ভট প্রবেশ" হওয়া উচিত। ভিয়েনার বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়েও atmosphere of pure study কোথায় হবে—এখানে সেপাই কেন? ইহুদী ছাত্রীটী বল্লেন, ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়, তাই সরকার থেকে সেপাই মোতায়েন করা হ'য়েছে, যাতে ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে দাঙ্গা-ফেসাদ না করে।

তারপরে সব শুনে বুঝ্লুম, মারামারির 'মারি'টা আর হয় না, মারটাই হয়। হিটলারের জরমানির মত, অস্ট্রিয়ায় জরমানদের মধ্যেও ইহুদী-বিদ্বেষ বাড়ছে। ছাত্র-ছাত্রী অর্থাৎ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই ইহুদী-বিদ্বেষটা বিশেষ প্রবল। অস্ট্রিয়ার লোকসংখ্যার মধ্যে মাত্র শতকরা দু'জন নাকি ইহুদী; কিন্তু সংখ্যার কম হ'লেও, বুদ্ধিতে সঙ্ঘশক্তিতে কৌশলে এরা সব বিষয়ে জরমানদের, অর্থাৎ খ্রীষ্টান জরমানদের পিছনে ফেলে যাচ্ছে। যত উচ্চশিক্ষা-লভ্য ব্যবসায়ে ইহুদীদের প্রাধান্য; সরকারী চাকুরীতে তাদের সংখ্যার অনুপাতে ঢের বেশী ইহুদী কাজ করছে; ব্যাঙ্কের কাজ, কতকগুলি বুদ্ধিজীবী ব্যবসায় ইহুদীদের একচেটে। খ্রীষ্টান জরমানরা আর এটা পছন্দ ক'রছে না। তারপরে, খ্রীষ্টান জরমানদেব বিশ্বাস, ইহুদীরা জরমানভাষী হ'লেও, তাদের মনোভাব জরমান নয়,—তারা জরমান জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী, তারা "জরমানিকতা"র বিরোধী—তারা হ'চ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদী। এইজন্য, এবং অর্থ-নৈতিক নানা কারণের জন্য, জরমানরা ইহুদীদের সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে;

অপেরা বা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতশালা

এখন ক্রমে সে সন্দেহ ভীষণ বিদ্বেষে পরিণত হ'য়েছে। বহু পুরুষ ধ'রে জরমানি বা অস্‌ট্রিয়ায় বাস ক'রলেও, এদের

যোসেফ-চত্বর—বামপার্শ্বে স্তম্ভমূর্ত্তিযুক্ত প্রাসাদ

আর জরমান ব'লে স্বীকার ক'রতে চাইছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ মনোভাব খুবই প্রকট। খ্রীষ্টান ছেলেরা ইহুদী ছাত্রদের মারপিট প্রায় করে—তারা ইহুদী দোকান-পাট ক'রবে, সুদে টাকা ধার দেবে, তারা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে? মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতেই এমন মারধর হ'য়েছিল, যে একটি ইহুদী ছেলের চোখ কাণা ক'রে দিয়েছিল। ঐ সব ব্যাপারের পর থেকে, অস্‌ট্রিয়ান সরকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে সেপাই বসিয়েছে, যাতে ইহুদী ছেলেরা মার না খায়।

'ওস্‌ৎ-উন্ত্‌-স্যুদ্‌-বানহফ্‌' পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ষ্টেশন

খাঁটি জরমান, অর্থাৎ ইহুদী যারা নয়, এমন ছেলেমেয়েরা সভা-সমিতিতে ইহুদীদের সঙ্গে আর মেশে না। তারা একটু জোর

গলায় নিজেদের Arier বা আর্য্য বল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে; তারা ঘৃণ্য Semite বা ইহুদী নয়। তারা যে খাঁটি অস্‌ট্রিয়ান, পোষাকেও এইটে প্রকাশ করবার জন্য, অনেক ছেলে কলেজে আসে, অস্‌ট্রিয়ার পাহাড়ে' অঞ্চলের গাঁয়ের পুরুষদের পোষাক প'রে—শ্যাময়-হরিণের চামড়ার হাফ-প্যান্ট-পরা, গায়ে শ্যাময় চামড়ার সেকেলে ফ্যাশানের কোট জামা, মাথায় পালখওলা টুপী, হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পশমের-মোজা। সুদৃঢ়, দীর্ঘকায় জরমান যুবকদের এই পোষাকে চমৎকার দেখায়—তাদের দেহের গঠনের তারিফ না ক'রে পারা যায় না। মেয়েরা তাদের ইহুদী-বিরোধিতা প্রকাশ করে, সাদা মোজা প'রে—সাদা পশমের মোজা, জুতোর উপরে গোড়ালীর কাছে জড়িয়ে আছে, ঘাঘরার ঘের থেকে এই জড়ানো মোজা পর্য্যন্ত পায়ের খানিকটা অনাবৃত। পুরুষদের আর মেয়েদের ইহুদী-বিদ্বেষ প্রচারক এই দুই ফ্যাশানের কথা আমার পরিচিত এই ছাত্রীটী অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ ক'রছিল।

দেখে শুনে মনে হ'ল, অস্‌ট্রিয়ায় ইহুদীদের দুর্দ্দশা ক্রমে জরমানিরই মতন হবে। অন্য দেশেও এরূপ অবস্থার দিকে যে ঘটনাচক্র গতি নিচ্ছে—পরে হঙ্গেরীতে গিয়ে আর পারিসে গিয়ে তা দেখলুম। ইহুদীদের কেমন কতকগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে ক'রে তারা এতদিনে বিভিন্ন জাতির লোক যাদের সঙ্গে বসবাস ক'রছে তাদের প্রীতি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রতে পারলে না। তবে তাদের জাতীয় চরিত্রে বা দোষ গুণ যাই থাক, বেচারীদের প্রতি এখন বেশ অত্যাচার হ'চ্ছে তা বোঝা যায়। আমি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমনোভাবযুক্ত অথচ হিটলারী মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক জরমানের সঙ্গে আলাপ ক'রেছি,—ইহুদীদের বিরুদ্ধে যা যা বলা যেতে পারে সে সব শুনেছি;—আর মনে হয়, খাঁটি জরমানদের রাগের কারণও আছে যথেষ্ট। কিন্তু তবুও, সব সত্য হ'লেও, বেচারীদের উপরে শাস্তির মাত্রাটা বেশী হ'চ্ছে ব'লে মনে হয়। তবে আমরা বাইরের লোক, ওদের ঘরোয়া কথা সব হয় তো আমরা বুঝ্‌তে পারবো না—যেমন আমাদের ঘরোয়া কথা ওদের পক্ষে অনধিগম্য; ইউরোপের লোকেদের কথা ছেড়ে দিই,—আমাদের বাংলার কথা, হিন্দু বাঙালীর সুখ দুঃখের কথা, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকেরাই বা কতটুকু বুঝ্‌তে পারে? তাই এ পক্ষ ও পক্ষ দু'পক্ষ সম্বন্ধে আমাদের মত না দেওয়াই ভালো।

এখানকার অধ্যাপক বারন হাইনে-গেল্‌ডর্‌ন্‌ ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ক'রছেন। কিছুকাল হ'ল, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভিয়েনা-প্রবাসী সুভাষবাবুর কাছে আমার এক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেন। সুভাষবাবু "আনন্দ বাজার পত্রিকাতে সে কথা লেখেন।" সেটী প'ড়ে, অধ্যাপক গেল্‌ডর্‌ন্‌-এর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা আমার হ'য়েছিল। অধ্যাপক গেল্‌ডর্‌ন্‌-এর বাড়ীতে চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ হ'ল। শুন্‌লুম, ভদ্রলোক বিখ্যাত জরমান কবি হাইনে-র দৌহিত্র, এবং সেই সূত্রে বারন পদবীর অধিকারী। ভদ্রলোকের বাড়ীর বাগানটী চমৎকার—বাড়ীর পিছনে বাগানটী, কি একটী বড় গাছ, লম্বা আঁকা-বাকা ডালপালা আর ঘন পত্র-সমাবেশে চমৎকার ছায়াশীতল ক'রে রেখেছিল জায়গাটা; ভিয়েনায় তখন দুর্জ্জয় গরম—ভারী আরামপ্রদ আর নয়নাভিরাম লাগ্‌ছিল। বাগানের উপরেই দোতলার বারান্দায় ব'সে চা-পান আর নানা আলোচনা চ'ল্‌ল। চা-পানের পরে, অধ্যাপক আমাকে এঁদের নৃতত্ত্ব-পরিষদের একটি সভায় নিয়ে গেলেন, সেখানে মোহেন্‌-জো-দড়ো যুগের গৃহপালিত পশু সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা হ'ল জরমান ভাষায়—সব বুঝতে পারলুম না—কিন্তু পর্দ্দার উপরে প্রচুর ছবি ফেলা হয়েছিল, তাতে বিষয়টী বুঝতে কষ্ট হ'ল না। আলোচনাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। মোহেন্‌-জো-দড়োর মুদ্রা বা সীলমোহরে যে সব জন্তু-জানোয়ারের ছবি পাওয়া যায়, আর তা ছাড়া ওখানকার নগরের ভগ্নাবশেষে যে সব গৃহপালিত পশুর হাড় পাওয়া গিয়াছে, সে-সবের আধারের উপরে এই আলোচনা। এশিয়ার অন্যান্য দেশের পশু ও পশুপালন সম্বন্ধেও তুলনামূলক আলোচনা দ্বারায়, প্রাচীন ভারতের মোহেন্‌-জো-দড়ো যুগের কথা বিশদ ক'রে তোলা হ'ল। মোহেন-জো-দড়োতে ছাগল ভেড়া গোরু কত জাতির ছিল, সে সম্বন্ধে বেশ একটি ধারণা তখন হ'ল; আর একটা খবর পেলুম—তখন এক প্রকারের হরিণও গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল। বছর কয়েক পূর্ব্বে একবার সাসারাম শহরে শের-শাহের সমাধি দেখ্‌তে গিয়ে

দেখি, একজন ফকীর একটা নীল-গাই হরিণের পিঠে জীন দিয়ে ঘোড়ার মতন ক'রে চ'ড়ে শহরে এসেছে; শুনলুম, লোকটা পাহাড়ে থাকে, সেখানেই এই নীল-গাইকে পোষ মানিয়েছে। গৃহপালিত হরিণ গোরুর মত কাজে লাগানো হ'ত কি না জানা যায় না, তবে ব্যাপারটি বেশ কৌতুকপ্রদ বটে।

ছুটি অস্ট্রিয়ান যুবক, নৃতত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে গবেষণা ক'রছে, তাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তারা আসামে এসে সেখানকার নাগাদের মধ্যে থেকে কাজ ক'রবে—এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের সভ্যতার মূল কথা হয় তো কিছু কিছু এই সব আদিম জাতিদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রলেই মিলবে। আমাদের হোটেলে আসাম থেকে আগত দুইটি ভদ্রলোক আছেন শুনে তারা অধ্যাপক হাইনে-গেল্ডরন্-এর সঙ্গে আমাদের হোটেলে এল, চলিহা আর দত্ত মহাশয়-দ্বয়ের সঙ্গে আমি এদের পরিচয় করিয়ে দিলুম। আসামে গেলে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়, চলিহা মহাশয় তা যথাশক্তি ক'রবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিষ্টাচার ক'রলেন।

সুভাষবাবুর সঙ্গে ভিয়েনায় পৌঁছুবার দু তিন দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ল। ভদ্র, শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট অস্ট্রিয়ান-সমাজে সুভাষবাবুর খুবই সম্মান, প্রতিষ্ঠা আর আদর-আপ্যায়ন আছে দেখলুম। Indian-Central European Association ব'লে একটি সমিতি হ'য়েছে; উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষ, আর অস্ট্রিয়া হঙ্গেরী প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাবের আর বাণিজ্যের আদান-প্রদান ঘনিষ্টতর ক'রে তোলা। কতকগুলি বড় বড় অস্ট্রিয়ান বণিক, আর সরকারী কর্ম্মচারী এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায়ের প্রসারটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু জরমান জাতির মনে ব্রাহ্মণ্যের ধারা অনেকখানি আছে—এরা পুরোপুরি বৈশ্য বা বেণে হ'তে চায় না, বা পারে না; তাই এই বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু ভাব-গত আদান-প্রদানের কথাটা বাদ দেয় নি, বা দিতে পারে নি। ভাব-গত সংস্পর্শের দিকটা বজায় রাখ্‌বার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বিশিষ্ট অধ্যাপক—বিশেষ ক'রে সংস্কৃত আর প্রাচ্য ইতিহাস আর সংস্কৃতির অধ্যাপক জন-কয়েক—এতে যোগ দিয়েছেন। একদিন বিকালে এঁদের সমিতির এক অধিবেশন হ'ল; নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরাও যাই। প্রায় ৪০।৫০ জন ভারতীয় এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন; জারমান বা অস্ট্রিয়ানও অনেক ছিলেন। ভারতের আর অস্ট্রিয়ার সাহচর্য্য যে উভয় জাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে, এই আশয়ে কতকগুলি বক্তৃতা হ'ল—জরমানেই বেশী। সুভাষবাবু প্রধান অতিথি-স্বরূপে আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, তিনি ইংরেজীতে তাঁর অভিভাষণ প'ড়লেন। তার পরে জরমানে তার অনুবাদ পড়া হ'ল।

জরমান ভাষার ঝঙ্কার পূর্ব্বে জরমানি ভ্রমণকালে কানে বহুবার গিয়েছে—কিন্তু ভিয়েনায় যে জরমান শুনলুম তা বড় মিঠে লাগ্‌ল। বের্লিনের জরমান যেন এর কাছে একটু কর্কশ শোনায়। জরমান-ভাষীদেরও মত তাই। ভিয়েনায় জরমানের একটা উপভাষা প্রচলিত আছে, অশিক্ষিত লোকে তাই বলে, সে উপভাষা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত। কিন্তু ভিয়েনার শিক্ষিত লোকে ভদ্র বা সাধু জরমানের চর্চ্চা অনেকদিন ধ'রে ক'রে আস্‌ছে; এখন ভিয়েনার লোকেরা তাদের জরমানের গৌরব ক'রে থাকে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক Karl Luick কার্ল্ লুইক্-এর ক্লাসে একদিন গিয়ে তাঁর পড়ানো শুনে আসি; আমার বেশ লেগেছিল। বিষয় ছিল, ইংরেজ কবি চসার-এর Troilus and Criseyde-কাব্যের পাঠ। অধ্যাপক লুইক প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরেজী সম্বন্ধে একজন নামী পণ্ডিত। ক্লাসে গিয়ে দেখি, ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীই বেশী—ইংলাণ্ডেও তাই দেখেছিলুম, ভাষা বিষয়ক শ্রেণীগুলিতে মেয়েদেরই ভীড় বেশী; ছেলেরা বেশীর ভাগ এখন বিজ্ঞানের দিকেই ঝুঁক্‌ছে। অধ্যাপক এসে ব'সলেন, তার পর একটী ছাত্র বা ছাত্রীকে ডাকলেন। সে উঠে গিয়ে অধ্যাপকের কেদারার কাছে বই হাতে ক'রে দাঁড়াল, তার পরে প্রাচীন উচ্চারণ-মোতাবেক চসার-এর মধ্যযুগেয় ইংরেজীতে রচিত 'মতন্' বা মূল প'ড়ে গেল; তার পরে জরমানে অনুবাদ ক'রলে। তার পর অধীত আর অনূদিত অংশ নিয়ে আলোচনা চ'ল্‌ল। ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ছন্দ, সাহিত্যরস—কিছুই বাদ গেল না। বিষয়টি আমার জ্ঞাতপূর্ব্ব, সুতরাং জরমান ভাল রকম না জান্‌লেও, মোটামুটি রসগ্রহণে বাধা হ'চ্ছিল না; আর সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ছিল, অধ্যাপক লুইকের মুখে আর ভিয়েনার এই সব ছাত্রীদের মুখে এই সাধু জরমান ভাষার উচ্চারণ।

ভিয়েনাতে স্থায়ী ভাবে খুব কম ভারতীয় বাস করে। প্রতি বৎসর ভারত থেকে জনকতক ক'রে রোগী যান, চিকিৎসার জন্য। ডাক্তারীতে উচ্চ অঙ্গের গবেষণা করবার জন্য দু' পাঁচ জন ছাত্র থাকেন। সুভাষবাবুকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় অনেক কাল ধ'রে থাকতে হ'য়েছিল, তাই তিনি ভিয়েনায় সুপরিচিত হ'য়ে ওঠেন, আর তাঁকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয়গণের সামাজিক জীবন একটু জ'মে উঠেছিল। "হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন" ডাক্তার কাট্যার আর তাঁর বন্ধুরাই চালাচ্ছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য—অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে ভারতীয়দের মেলামেশার আর সংস্কৃতি-গত ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা ক'রে দেওয়া। ভিয়েনা-প্রবাসী ভারতীয়েরা প্রায় সকলেই বেশ জরমান ব'লতে পারেন, কাজেই এঁদের দ্বারায় এ কাজটা বেশ হয়। ভারতবর্ষ থেকে কেউ এলে, যদি তাঁকে দিয়ে ভিয়েনার শিক্ষিত-সমাজের উপযোগী কোনও বক্তৃতা দেওয়ানো যেতে পারে, তার ব্যবস্থা এঁরাও ক'রে থাকেন। তবে বেশী ভারতীয় ভিয়েনায় না থাকায়, "হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন" তেমন জম-জমাট নয়।

আমি ভারতীয় চিত্র-কলার ইতিহাস বিষয় বক্তৃতা দেবো স্থির ক'রে দেশ থেকে শতখানেক স্লাইড নিয়ে গিয়েছিলুম। সুভাষবাবু সে কথা শুনে, "হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন"এর তরফ থেকে বক্তৃতার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। আমাদের হোটেল-দ্য-ফ্রাঁস-এ বক্তৃতা হ'ল। খবরের কাগজে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসেছিলেন জনকতক, আর স্থানীয় জরমান মেয়ে পুরুষ অনেকগুলি এসেছিলেন। ইংরেজী-জানিয়ে লোকই বেশীর ভাগ। অধ্যাপক আর শিক্ষাজীবী, আর চিত্রশিল্পী কতকগুলি ছিলেন। জরমান জাতীয় লোকের তথ্যলিপ্সার আগ্রহ অসাধারণ। আমি সাড়ে আটটা থেকে দশটা—এই দেড়ঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা দিই; খান পঁচাত্তর ছবি দেখাই—এক নিঃশ্বাসে প্রৈতিহাসিক যুগের গিরিগাত্রে অঙ্কিত চিত্র থেকে, অজন্তা সিগিরিয়া বাঘ, সিত্তন্নবসল এলোরা, নেপালী পুঁথির চিত্র, জৈন পুঁথির চিত্র, রাজপুত মোগল, মায় অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল পর্য্যন্ত—ছবি সব যুগের দেখিয়ে ব'লে যাই; আর আমার শ্রোতারা ধীরভাবে সব শুনলে, আর তার পরে কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রলে। ভিয়েনায় তখন ভীষণ গরম; জনাকীর্ণ বক্তৃতার ঘর, হাওয়া নেই,—ওদেশে বিজলীর পাখা অজ্ঞাত, কিন্তু যে গরম পেয়েছিলুম তাতে মনে হ'ত, ওদেশে পাখার রেওয়াজ থাকলে ভাল হ'ত—কালো কাপড়ের গরম পোষাক প'রে আমার তো গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থা, কিন্তু শ্রোতাদের তার জন্য চিন্তা নেই, নোতুন বিষয়, তারা মন দিয়ে শুনছে, ছবি দেখছে। আমার বক্তৃতায় সুভাষবাবু সভাপতি হয়েছিলেন, আর তিনি শ্রোতাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জরমানরা এক হিসেবে খুব কৃতকর্ম্মা আর হিসেবী জাত। আমাদের দেশে চাল-কড়াই-ভাজা না চ'ললে যেমন আষাঢ়ে' গল্প জমে না, আর আধুনিক দলে চা না থাকলে যেমন তর্ক বা আলোচনা ফিকে লাগে, জরমানেরা এই যে পেশাদার বক্তৃতা-শুনিয়ের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে শুনে যেতে পারে, তার একটী ঠেকো বা অবলম্বন ক'রে রাখে। সাধারণের উপযোগী এই রকম বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের পান-ভোজন চলে। তাতে শ্রোতারা বল পায়, বক্তৃতার তোড়ে তারা ভেসে যায় না। অনেক হোটেলে আমাদের হোটেলের মতন একটী ক'রে বড়ো ঘর থাকে, যেখানে এই রকম বক্তৃতা দেওয়া যেতে পারে। ঘর বা হল ভাড়া ব'লে হোটেলওয়ালারা কিছু নেয় না, তবে হোটেল থেকে কফি, বিয়ার, লেমনেড, কেক এই সব সরবরাহ করে, শ্রোতারা কিনে খান আর বক্তৃতা শোনেন। হলের এক দিকে সভাপতি আর বক্তার স্থান—তাঁদের চেয়ার টেবিল; আর হল জুড়ে শ্রোতাদের বসবার চেয়ার আর ভোজ্য আর পানীয় রাখবার সব ছোট ছোট গোল টেবিল। চার জন ক'রে এক একটী টেবিল দখল ক'রে বসে; ইচ্ছা-মত অর্ডার দিয়ে পান ভোজন করেন, নিজেরাই দাম দেন। এইরূপে যা বিক্রী হয়, তা থেকেই ঘরভাড়ার টাকাটাও উঠে যায়। এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। এদের শ্রোতা আর হোটেলের খানসামা—বক্তৃতার কালে কেউই টুঁ শব্দটীও করে না।

সুভাষবাবু একদিন রাত্রে ডিনারের পরে স্থানীয় একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এঁর নাম Fetter; ইনি অস্ট্রিয়ান শাসন-পরিষদে কি একটা বড় পদ অধিকার ক'রেছিলেন এখন আর সে পদ নেই। স্বামী স্ত্রী দুজনে খুব উচ্চ-শিক্ষিত, উদার মতের। আরও দু তিনটী ভদ্র পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। গল্প ও আলোচনার অনুপান

ছিল—সরবৎ, ফল, মিষ্টান্ন সেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা জ'মে উঠছিল। আধুনিক সভ্যতার গতি; সেকেলে মনোভাবের শক্তি ও সৌন্দর্য্য; আধুনিক জগতে ধর্ম্ম-সঙ্কট; বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম; হিন্দু আদর্শের বৈশিষ্ট্য; সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথ; গাঁধীজী; চীনা সাহিত্য ও শিল্প; এই সব মানসিক আর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিষয়ে আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সদালাপ ক'রে, তাঁদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিই। ভিয়েনাতে এই সংস্কৃতি-পূত চিত্ত-বিশিষ্ট দম্পতীর সঙ্গে আলাপ আমার কাছে একটি আনন্দের স্মৃতি হ'য়ে থাকবে।

কোনও জাতির সংস্কৃতি আর রীতিনীতির সঙ্গে, বিশেষতঃ তার সামাজিক অবস্থার সঙ্গে, আট নয় দিনে বেশী পরিচয় সম্ভবপর নয়। শহর দেখতেই আর মিউজিয়মগুলি ঘুরতে ঘুরতেই দিন কেটে গেল। রাস্তায়ও এদের সামাজিক জীবনের কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—আমি যখন ভিয়েনায় ছিলুম তখন এক দিন সকালে দেখি, রাস্তায় মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর যাচ্ছে, খুব ফুল দিয়ে গাড়ী, ঘোড়ার সাজ সব সাজানো; প্রায়ই সাদা রঙের ফুল। আমাদের বরের গাড়ী সাজায় যেমন ক'রে, তবে পাতার চেয়ে ফুলই বেশী। আর গাড়ীতে আছে একটী দুটী ক'রে কমবয়সী মেয়ে ব'সে—১৩।১৪ বছর বয়সের হবে—সাদা পোষাক পরা, মাথায় সাদা ফুলের মুকুট; সঙ্গে ভাল কাপড় চোপড় প'রে মেয়ের মা আর অন্য আত্মীয় র'য়েছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, এই সব মেয়েদের গির্জ্জায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে, Confirmation নামে একটি ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান বা সংস্কার-পালনের জন্য। অস্ট্রিয়ার রোমান কাথলিকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ধর্ম্ম-সংস্কার পালন করে। শিশু অবস্থায় ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্টান ধর্ম্মে "বাপ্তিস্ম" বা অভিষেক হয়, তখন তাদের ধর্ম্মপিতা বা ধর্ম্মমাতা তাদের হ'য়ে খ্রীষ্টানী কবুল করে। পরে ছেলে মেয়েরা ১২।১৩।১৪ বছরের হ'লে, এতদিন যে খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম বিষয়ে তারা শিক্ষালাভ ক'রছিল সেই শিক্ষার পরিচয় গির্জ্জায় গিয়ে দেয়, আর পাদ্রী তখন তাদের লাটিন-মন্ত্র প'ড়ে আশীর্ব্বাদ করে; তখন থেকে তারা খ্রীষ্টান রূপে confirmed বা স্বীকৃত হ'ল, সমাজে তাদের পুরাপুরি অধিকার হ'ল। আদিম যুগের সমাজে ছেলেমেয়েদের পূর্ণবয়স্কত্ব প্রাপ্তিতে যে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান হয়, যাকে ফরাসীতে Rites de Passage বলে, এই Confirmation সেই প্রকারের অনুষ্ঠান—খ্রীষ্টানী ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা এসে এর বাহ্য ভাব বা আদর্শ একটু অন্য ধরণের ক'রে দিয়েছে, এই যা।

রবিবার দিন, ৯ই জুন, ভিয়েনার খবরের কাগজ Neues Wiener Tagblatt ("নব-ভিয়েনা-দিনপত্র") একখানা কিনে, চোখ বুলিয়ে' যেতে যেতে হঠাৎ কতকগুলি বিয়ের বিজ্ঞাপন নজরে এল'। বিজ্ঞাপনগুলি বিশেষ কৌতুককর, আর এই বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে ভিয়েনার সমাজের যে পরিচয় মিল্‌ল, তা বহুদিন ধ'রে ভিয়েনায় থেকে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রেও হ'তে পারত কি না সন্দেহ। মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে যখন ধরা দেয়, তখনই তার ঠিক স্বরূপ, তার প্রকৃতি বেরিয়ে পড়ে। এই বিজ্ঞাপনগুলি সমাজের জীবনধারা, স্ত্রীপুরুষের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করে।

রবিবারের কাগজ—এতে প্রায় ৩০০ বিয়ের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প'ড়ে মনে হয়, মানুষের মন আর মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, কামনা সব দেশেই এক। এই সব বিয়ের বিজ্ঞাপনেই আজকাল মেয়ে দেখানোর কাজ অনেকটা চুকিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ে-দেখানো ব্যাপারটাকে আমরা আজকাল মেয়েদের পক্ষে অপমান-জনক ব'লে মনে ক'রতে অভ্যস্ত হ'চ্ছি এবং একথাও সত্য যে, অনেক সময়ে অত্যন্ত অভদ্রভাবে আমাদের সমাজে বর-পক্ষ ক'নের রূপগুণ পরখ ক'রে নেন। আগে ছেলে-দেখাও ছিল; কিন্তু এখনকার তরুণেরা অনেক ক্ষেত্রে পাত্র-হিসাবে কন্যা-পক্ষের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হ'তে লজ্জা বোধ করেন। যাহোক্, অস্ট্রিয়ান সমাজের বর-ক'নের রূপগুণ সম্বন্ধে কি কি প্রার্থিত, কত টাকা যৌতুক বর-পক্ষ আশা করেন, সে সব কথা স্পষ্টভাবে বিজ্ঞাপনেই দিয়ে দেন; ছেলে বা মেয়ে দেখাটা প্রথম প্রথম ছবির মারফৎই সারা হয়। পাত্র স্বয়ং বিজ্ঞাপন দেন, আবার প্রাচীন ধারায় পাত্রের পিতা বা অন্য স্বজনও বিজ্ঞাপন দেন; তবে শেষোক্ত রীতি অপ্রচলিত হ'চ্ছে। একটি জিনিস নূতন ঠেকবে—এটী আমাদের কাছে নোতুন লাগবে তো বটেই, ইউরোপেও নোতুন লাগবে—মেয়েরাও নিজ বিবাহের জন্য

বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। শুনেছি, কোনও ইউরোপীয় মহিলা—ইংরেজ নন—ভারতের কোনও সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, তিনি কন্টিনেন্টের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা এবং পি এচ্-ডী-ডিগ্রি-প্রাপ্তা, বয়সে তরুণী, বিবাহেচ্ছু কোনও উচ্চ-শিক্ষিত ও উচ্চ-পদস্থ ভারতীয় ভদ্রলোকের সহিত পত্র-ব্যবহার এবং ফোটোগ্রাফ-বিনিময় ক'রতে প্রস্তুত। এইরূপ বিজ্ঞাপনও ভিয়েনায় দুর্লভ নয়। নীচে ভিয়েনার কাগজ থেকে কতকগুলি বিয়ের বিজ্ঞাপনের অনুবাদ দেওয়া গেল; সামাজিক পরিস্থিতি কতকটা এই থেকে বোঝা যাবে। (অনাবশ্যক বোধে মূল জরমান বিজ্ঞাপনগুলি আর দিলুম না; জরমান-থেকে অনুবাদ ক'রতে প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ আমায় সাহায্য করেছেন)।

[১] মফঃস্বলের শহরের সিনেমার মালিক, ২৮ বৎসর বয়স, সৎ ও হৃদয়বান্ মানুষ, শীঘ্রই বিবাহ করিতে চান। চাই—মিতব্যয়িতা, নম্র প্রকৃতি, কিছু নগদ টাকা। খুঁটিনাটি কথা পত্র মারফৎ জ্ঞাতব্য; পল্লী অঞ্চল থেকে সম্বন্ধও গ্রাহ্য। এই নামে চিঠি দিতে হইবে—"নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ, ২৬৩৯ সংখ্যা"।

[২] শিল্পকলা-প্রিয় ৩৩ বৎসর বয়স্ক তরুণ, কোনও দোকানের উত্তরাধিকারী, মাঝারী-আকার, পরে বিবাহের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বয়স ও চেহারার আর্য্যজাতীয়া (অর্থাৎ ইহুদী নহে এমন) মহিলার সহিত পরিচয় করিতে চান। বিবাহার্থিনীর ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৯-এর পল্লীতে কোনও বড় রাস্তার উপরে সুগন্ধি ও গৃহকর্ম্মের জিনিসের চল্‌তি ও ঋণমুক্ত দোকানের মালিক হওয়া চাই; আর নিজে এই দোকান চালাইতে বা দোকানের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁর ঝোঁক না থাকা চাই। বিবাহার্থিনীর চেহারা দোকানের উপযুক্ত হওয়া চাই; গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, শিল্প-কলায় অনুরাগ, আর খোলা জায়গায় ঘোরাফেরা করার দিকে টান থাকা চাই। যাঁরা সত্যসত্যই বিবাহ চান তাঁরা "ভবিষ্যৎ ১০৩০" এই নামে চিঠি দিন।

[৩] গ্রন্থকার, পারিবারিক কোনও বন্ধন নাই, পূর্ণবয়স্ক, সুগঠিতকায়, প্রিয়দর্শন, নিজের বাটী আছে, অবস্থা ভাল; ছিপ্‌ছিপে অথচ সুপুষ্টদেহা অসামান্য সুন্দরী মহিলার সহিত পরিচয় করিতে চান। উচ্চ শিক্ষিতা এবং সহৃদয়া, ও স্বভাব-চরিত্রে লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার যুগের (vorkriegs-charakter) হওয়া চাই, এবং বয়সে ৩৫ বৎসরের নীচে নহে। আর ৪০ থেকে ৬০ হাজার শিলিঙ নগদ থাকা চাই। ভিয়েনার কাছে-পিঠে একখানি বাগান বাড়ী থাকে তো ভাল, কিন্তু এটী না হইলে চলিবে না এমন কথা নয়। ফোটোর সহিত "মহানুভব মহিলা-চরিত্র ১১৯৬৭ সংখ্যা" এই নামে দরখাস্ত দিন।

[৪] স্বচ্ছল অবস্থার, ব্যবসায়-কর্ম্মে নিযুক্ত, এবং গুণবতী ও সুন্দরী কন্যা বিদ্যমান এমন খ্রীষ্টান পরিবারের সহিত আমার পুত্রের পরিচয় করাইতে চাই। পুত্রটীর বয়স ২৫ বৎসর, উচ্চ-শিক্ষিত, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, লম্বাই ১৮০ সেন্টিমিটার, ব্যবসায়-কর্ম্মে (বস্ত্র-বাণিজ্যে) নিযুক্ত। কন্যাটী সুদর্শনা, বয়সে ২৩ বৎসরের উপর নহে, উচ্চ-ইস্কুল পর্য্যন্ত পড়িয়াছে—এমন হওয়া চাই। আমি কন্যার পিতামাতার সহিত পরিচয় করিতে চাই। ঘটক বা দালালের দরকার নাই। সমস্ত কথা অপ্রকাশিত থাকিবে, এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমার বন্ধু ও পরিচিতদের সকলেরই পুত্রসন্তান বিদ্যমান, সেই জন্য বিজ্ঞাপন দিতেছি। ফটো চাই; দেখিয়াই ফেরত পাঠাইব। "স্বয়ংগচ্ছ ৮২৯" এই ছদ্ম-নামে চিঠি দিবেন।

[৫] ২২ বৎসর বয়স, দোকানের মালিক, বিবাহের উদ্দেশ্যে রন্ধন-কর্ম্ম-নিপুণা ও বেশ বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছুক। "G ১০৯০" এই নামে চিঠি দিন।

[৬] তরুণ-বয়স্ক বিপত্নীক, নিজ বাটী আছে, ৩৪ বৎসর বয়স, স্কুলে যায় তিনটী ছেলেমেয়ে;—এই শিশুদের মাতা হইবার জন্য স্নেহশীলা পত্নী চান। তাঁর কিছু টাকা থাকা চাই (৩০০০ থেকে ৫০০০ শিলিঙ), বয়স ৩৫ থেকে ৪০এর মধ্যে। বিবাহের উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র সম্ভব পরিচয় করিতে চান। ফটো পাঠাইবেন। "B. J. ১৫৪০" এই নামে পত্র দিন।

[৭] সরকারী কর্ম্মচারী, ছেব্‌লা নহে, কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত, জাত্ আর্য্য, একক, তিরিস বছরের উপর বয়স; তিনি হৃদয়বতী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সৎস্বভাবের মেয়ের সহিত পরিচয় করিতে চান। একাধারে তন্বী ও পুষ্টদেহা, কটা বা সোনালি চুল, আমুদে ও সদ্যপ্রফুল্ল প্রকৃতি, আর্য্য-জাতীয়া, ভিয়েনাবাসী সদ্বংশীয়া—কন্যার এইসব গুণ চাই। "পরিশিষ্ট ১৩৫৮", এই নামে পত্র দিন।

[৮] আমি সহৃদয় ও স্বাস্থ্যবান্ কোনও ভদ্রলোককে বিবাহ করিতে চাই। দেশ-ভ্রমণে উৎসুক, ও খাঁটি চরিত্রের মানুষ হওয়া চাই; প্রকৃতিতে শান্ত অথচ উচ্চ মনোভাব ও রসবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই; তাঁহার জীবনে সততা ও চারিত্র্যের প্রমাণ থাকা চাই; এবং আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন যতদূর সম্ভব কম হওয়া চাই। আমার বয়স ৩৩, আমি ইহুদী-কন্যা, সুন্দরী, মাঝারী চেহারার, তন্বী কিন্তু রোগা নহি; প্রকৃতিতে কৃত্রিমতা নাই, সকলের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারি; এবং অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যযুক্তা। আমার ১০,০০০ শিলিঙ্ ও নিজ বাড়ী আছে। সত্যকার প্রার্থীর আবেদন খুঁটিনাটির সহিত আহ্বান করিতেছি। "বিবেচনা ও সহানুভূতি, ১৫২৬" এই নামে পত্র দিন।

[৯] আমাকে মোটর-চালকের চাকরী পাওয়াইয়া দিবেন, অথবা একখানি মোটর গাড়ী কিনিবার মত সঞ্চিত অর্থ যাঁহার আছে এমন ২২ বৎসরের অনধিক বয়স্কা কন্যাকে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। "শোফার ২৪৫৬" এই নামে চিঠি দিন।

[১০] গরীবের ঘরের মেয়ে, ২৪ বৎসর বয়স, রোমান-কাথলিক, কোনও অতীত ইতিহাস নাই, বিবাহের উদ্দেশ্যে কোনও ভদ্র ও সৎপদস্থ পুরুষের সহিত পরিচিত হইতে চান। "কেবল ভদ্র ও সদুদ্দেশ্যযুক্ত, ১২৯৩ সংখ্যা" এই নামে চিঠি লিখুন।

[১১] আদর্শবাদিনী, উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, স্বর্ণ (হিরণ্যকেশা), সুগৃহিণী,—সহৃদয় ৪৩ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক জীবন-সঙ্গী চান। "আর্য্য ২৫৫২" এই নামে চিঠি দিন।

[১২] ৪২ বৎসর বয়স্কা কুমারী, সুগৃহিণী, পাকা কাজের পুরুষের সঙ্গে বিবাহের জন্য পরিচয় চান। "৫০০০ S, সংখ্যা ১৯৬২" এই নামে চিঠি দিন।

[১৩] ৬০ বৎসর বয়স্ক ইহুদী, পাকা কাজে বহাল আছেন, বিষয়-কর্ম্মে নিযুক্ত কোনও মহিলার পরিচয় চান। "কোনও আর্থিক স্বার্থ নাই, ১৪৩৫" এই নামে···ঠিকানায় লিখুন।

এইরূপ বিবাহের বিজ্ঞাপন ছাড়া আরও এমন বহু বিজ্ঞাপন আছে, যে সবের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না; "উইক্-এণ্ড" বা "হপ্তা-শেষ" অর্থাৎ শনি-রবিবার শহরের বাইরে যাবে, সঙ্গের সঙ্গিনীর জন্য বিজ্ঞাপন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই প্রকার বিজ্ঞাপন যে সুপ্রতিষ্ঠিত খবরের কাগজে স্পষ্ট ভাষায় আজকাল দেওয়া হ'চ্ছে, তা থেকে ইউরোপের স্বাধীন-বৃত্ত মেয়েদের অবস্থা কেমন দাঁড়াচ্ছে বা দাঁড়িয়েছে, তার অনেকটা অনুমান করা যায়।

ঝড়ের রাতে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মধ্য রজনীতে জাগি'
শুনিতেছি ঝড়ের প্রলাপ
নিঃসঙ্গ একাকী।
কোন্ সিন্ধুপারে আজি জাগিল প্রলয়
তাহারি দুর্ব্বার রোষ গাছে গাছে শাখে শাখে গৃহের অঙ্গনে
কুঞ্জে কুঞ্জে লতিকা-বিতানে
ফিরিতেছে যেন লক্ষ মত্ত গজসম,
মসী-কৃষ্ণ মেঘে মেঘে সর্প-জিহ্বা মেলি' বজ্রদল
শ্রবণ বধির করে কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ কুলিশ-নিনাদে,
বার বার শত বার পুনঃ বার বার
অট্টরোল তুলি' আসে ফিরি' ফিরি' প্রভঞ্জন-বায়ু
তবু নাহি ক্লান্তি মানে—না চাহে বিশ্রাম—
যেন পৃথিবীর বক্ষ চিরিয়া ফাঁড়িয়া ঝাড়িয়া কাড়িয়া নেবে
সকল সম্পদ,
তারপর ফিরে যাবে কোন্ শান্ত দূর সিন্ধুতলে
নিমজ্জিত শৈলাবাসে আপন গুহায়
রোষ-শান্ত এবারের মতো—
মধ্য রজনীতে জাগি'

শুনিতেছি এই মতো ঝটিকার প্রলয়-মাতন
নিঃসঙ্গ একাকী।

এমনি ঝড়ের রাতে
নিঃসঙ্গ একাকী
মনে পড়ে অতীতের কথা
শৈশব কৈশোর কাল—
বিস্মৃতির কোন্ যেন গহন অতল তল হ'তে
উঠে আসে ধীরে ধীরে একে একে আলেখ্যের মালা
মানস-নয়ন আগে :—
কোথা কবে আম্রশাখে বাঁধিয়া ঝুলনা
দুলিয়াছি সকৌতুকে কত সাথী সাথে,
তারপর উঠেছে কলহ বুঝি কথায় কথায়—
ক্ষণে হাসি ক্ষণে অশ্রু অবোধ শিশুর!
কবে কোন্ বৃষ্টিসনে ঘন শিলাপাতে
কুড়ায়েছি শিল যত উচ্ছল উল্লাসে
না শুনি মায়ের মানা অধীর বিলাসে,
নিশীথ-ঝড়ের শেষে উঠিয়া প্রত্যুষে
ছুটিয়াছি দেখিবারে কোন্ বৃক্ষ রহিল পড়িল
কত বা বাড়িল জল পল্বলে পল্বলে—
কবে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে খর রবি তাপে
ঘাটে বাটে ফিরিয়াছি, ফিরিয়াছি প্রান্তরে প্রান্তরে,
সুশীতল আম্রছায়ে নিয়েছি বিশ্রাম,
স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বসি' ঘন-গন্ধ বকুলের তলে
একে একে একে একে পরায়েছি ফুলগুলি মালার বন্ধনে
অদূরে আমের বনে অলিদলে তুলিয়াছে মধুর গুঞ্জন,—
অতীতের ক্ষণগুলি আজি আসিয়াছে' যেন ছবির বন্ধনে
তাই হেরিতেছি একা এই মত্ত প্রলয়-নিশীথে।

অতীতের সেইদিন সেই ক্ষণগুলি
অনন্ত কালের বুকে কোথাও কি আছে তারা
মোর স্মৃতি ধরি'—
একটী শিশুর স্মৃতি—একটী আপন-ভোলা শিশুর হৃদয়!
সেই যত ক্ষণগুলি
কখনও কি মনে মনে বলে—
"আমাদের বক্ষ জুড়ি' আছে এক শিশুর পরশ
অনন্ত কালের মাঝে সত্য যার হবে না মলিন,
আমাদের সাথে সাথে নিত্য হ'য়ে রবে সেই শিশুর শৈশব
শাশ্বত কালের বুকে আঁকা তার শাশ্বত পুলক।"
কিম্বা শুধু অর্থহীন মায়া-মরীচিকা
সে-শৈশব গেছে মুছি' কালের সাগর-বুকে জলের বুদ্বুদ্,
চিহ্নমাত্র নাহি তার কোনোখানে কোনো মনে
কোনো বিশ্ব-বুকে—
মোরা শুধু স্বপ্নমাঝে করি আনাগোনা স্বপনের
আনন্দ-বিলাসে
শৈশব কৈশোর কিম্বা যৌবন-মায়ায়,
অর্থহীন দুদিনের হাসি অশ্রুজলে
আমরা প্রলাপ বকি' মিশাই বাতাসে,
দুদিনের প্রেম দ্বেষ বিরহ মিলনে
একটী ছায়ার খেলা খেলি ছায়ালোকে!

একটী ছায়ার খেলা—হয় যদি হোক্।
তবু সেই ক্ষণগুলি দুর্ব্বার বিস্ময়-ভরা গহন পুলকে
আছিল অজেয় বিশ্বে—
একমাত্র সত্য যেন অবাস্তব মাঝে!

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(১৫)

গঙ্গাবতী পেশাদার ভিক্ষুণী! ভিক্ষা করতে বহুবার চেষ্টা করেছিল—কোনবার কৃতকার্য্য হতে পারে নি। মুষ্টি ভিক্ষায় পেট চলে কোন ভাবে, অভাব মোচন হয় না। ভিক্ষায় যা পেত তাতে খাওয়া চলতো, ছেলের চিকিৎসা চলতো না, অসুস্থ শিশু ভিক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েছিল—এর পর কি ভিক্ষে করা চলে, না সংস্কার বাঁচানো যায়। শিশু যখন মৃত্যুশয্যায় ঢলে পড়ে—তখন কাঁটাময় চাবুক গঙ্গাবতীর ওপর সপাং সপাং করে ঘা মারতে থাকে, চাবুকের তাড়ায় বাধ্য হয়েছিল সতীত্বের দর্প, স্পর্দ্ধা চূর্ণ করতে। সে দর্প চূর্ণ হলো, ঘুর্ণিহাওয়ায় উড়ে চললো; কোথায় কেউ জানতো না, কেউ বুঝতো না। হঠাৎ দেখা গেল—রাস্তায় এক বৃদ্ধা থমকে থমকে চলছে, দাঁড়ায় দোরে দোরে, হাত পাতে, কি যেন বলে! তার আলোড়নে বাতাস কাঁপে, ইথার কাঁপে, নীলাকাশে কাল রেখা ছড়ায়। কি বিশ্রী রেখা! কি নিকষ-কাল রূপ! কি ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ! কেউ জানে না, কেউ বুঝে না! ইতিহাস নেই, কথিত গাঁথা নেই, স্মৃতিপট নেই। আছে শুধু মহাশূন্য আকাশ। থাক্, সেখানেই থাক্! যার যেথা স্থান—সেইখানেই জমা হয়ে থাক্। গঙ্গাবতীদের দীর্ঘনিঃশ্বাস সেখানেই জমা হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে, হ'ক না ভবিষ্যতে! হবে যখন হ'ক। একদিন কি শূন্য আকাশ ভরে যাবে না, একদিন কি স্পন্দনে স্পন্দনে আলোড়িত হবে না! হবে, নিশ্চয় হবে। আলোড়িত হবে, ঘর্ষণে হবে বিদ্যুৎ। সে বিদ্যুৎ কি ক্ষমা করবে? কখনও ক্ষমা করবে না। অবিচার, অত্যাচার, পক্ষপাতিত্ব ধ্বংস করবে। প্রতিশোধ নেবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে। সৃষ্টি করবে নতুন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি করবে নতুন ব্রহ্ম।

গঙ্গাবতী ভিক্ষা করে। ব্যবসা ভালই চলছে, প্রথম অবস্থায় ব্যবসা বড় মন্দা চলেছিল, এখন ভেক ধরা শিখেছে, কায়দা কানুন, অভিনয়, খুব ভাল করে শিখে ফেলেছে। যখন যে অবস্থায় সাজতে হবে ঠিক সে অবস্থায় নিখুঁতভাবে সাজতে পারে। তাকে সর্ব্বত্র মেলে ঠিক সেস্থানের উপযুক্ত ভূষণে। কি নিখুঁত তার মুখোস! এর পূর্ব্বে কেউ অর্থলোভে জোরজবরদস্তিতে একটি মিথ্যা কথা বলাতে পারে নি, এখন সে নিজের থেকে পট্ পট্ করে মিথ্যা কথা ঘটা করে বলে, একটুকু সঙ্কোচবোধ করে না, একটুকুও মুখে বাধে না। সত্য মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই, যখন যেখানে যা বলা কার্য্যকরী হবে তাই বলে বসে, এখন আর মনে মনে ভাবতে হয় না। লোককে ঠকিয়ে, মিথ্যা কথায় ছলিয়ে অন্তরালে শ্লেষের হাসি হাসে না, জয়ের গৌরব অনুভব করে না, তত হীন হ'তে পারে নি, অবশ্য অনুতপ্তও হয় না। তার ধারণা এই চরম পথ, এই শেষ পথ এদের মত লোকের।

লোকের মন আকৃষ্ট করবার জন্য আকর্ষণীয় ঢঙ্ করে, করুণা উদ্রেক করে কথার সৌন্দর্য্যে, দয়া অনুগ্রহ আনে বিষাদ অভিনয়ে। গঙ্গাবতীর অভিনয় প্রায় সবলোকই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তার রঙ বেরঙ দেওয়া কথা শুনে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি পয়সা না দিয়ে পারে না, কোমলহৃদয় লোকরা গোপনে অশ্রু ফেলেন। মর্ম্মস্পর্শী মিথ্যা কথা, এত সুন্দর, এত নিখুঁত মিথ্যার অভিনয় বুঝি ইতিপূর্ব্বে কেউ করতে পারে নি।

কখনও ভিক্ষে করতে বের হয় অন্ধ সেজে; চলে হাতড়িয়ে, ঠেকে ঠেকে; কখনও খোঁড়া সেজে চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কখনও হয় মূক; কখনও হয় বধির, কখনও আবার অন্ধ খোঁড়া দুই-ই হয়। লোকচরিত্র বুঝে ভাল; লোকের চেহারা দেখেই বুঝতে পারে সে কি ধাতের লোক। সে ঠিক তেমনি অভিনয় করে। দুর্ব্বলচিত্ত লোকের নিকট ভেউ ভেউ করে কেঁদে-কুটে ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়। ব'লে চলে—তার স্বামী রোগে শয্যাগত, মর মর অবস্থা; টাকার অভাবে না হচ্ছে চিকিৎসা, না পড়ছে অষুধ পথ্য; চারটি সন্তান না খেতে পেয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, লতাপাতা খেয়ে আর কতদিন বাঁচতে পারে, না খেতে পেয়ে মারা যায় অবস্থা। একদানা খাবার নেই—যা কারও মুখে

তুলে দিতে পারে।…প্রমত্ত প্রেমিকাকে যুবকদের মাঝে বা যুবতীদের মাঝে চালিয়াৎ প্রেমিক যুবককে বেশি বক্তৃতা দিতে হয় না—যুবতী পয়সা দিলে যুবকরা বেশি করেই পয়সা দেয়, আবার যুবক পয়সা দিলে যুবতীরা যুবকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ফিস্ ফিস্ করে কানাকানি করে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও পয়সা দিতে বাধ্য হয়। প্রৌঢ়মহলে যুবকদের নিকট প্রথম ভিক্ষা চায়, যুবক ভদ্রলোকদের সুমুখে নিজকে উন্নত করবার জন্য বা প্রৌঢ়দের অবস্থা অসুবিধাজনক বিশ্রী (awkward) করে দেয়—তখন প্রৌঢ়রা মনে মনে যুবকের মুণ্ডপাত করে—গঙ্গাবতীকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য হয়। গঙ্গাবতী মানুষের দুর্ব্বলতা কোথায় কোন স্থানে বুঝে, সর্ব্বদা দুর্ব্বলতায় হাত দেয়। প্রগতি আন্দোলনে মত্তা নারীদের নিকট বলে স্বামীর অত্যাচার—পুরুষের অত্যাচার। স্বদেশী আন্দোলনের নরনারীদের নিকট বর্ণনা করে—মিলের অন্যায় অবিচারের কাহিনী, অর্থশালী ক্ষমতাশালী লোকদের পীড়নের কাহিনী।…গঙ্গাবতী জীবন-কাহিনী বল্‌তে বল্‌তে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে, কখনও পেঁচিয়ে বলে বানিয়ে বলে যে সে অবস্থাপন্ন ঘরের বউ ছিল, রোজগারে স্বামী মৃত (বা নিরুদ্দেশ), উপযুক্ত ছেলেরা মাসাধিক যাবত শয্যাগত, এতদিন জিনিষপত্তর ধার বন্ধক বেচে কোন ভাবে চিকিৎসা পথ্য করিয়েছে, এখন আর একটি পয়সা নেই যে পথ্য যোগাড় করতে পারে।…সে গেরস্থ ঘরের বউ ছিল, দুর্বৃত্তরা জোর করে বম্বে শহরে নিয়ে আসে, সে ছলচাতুরী করে পালিয়ে যায়, স্বামী সমাজের ভয়ে ঘরে নিতে চায় নি—তাই তার এ দুরবস্থা। এতদিন শক্তি ছিল, গতরে খেটে পেট চালিয়েছে, এখন আর গতর খাটাবার শক্তি নেই, কেউ কাজ দেয়ও না—তাই তার ভিক্ষে মাত্র সম্বল, পোড়া রূপযৌবন নিয়ে কি কম ভুগতে হয়েছে, কত কষ্টে যে সে আত্মরক্ষা করেছে তা একমাত্র ভগবান জানেন।…চরিত্রহীন, মাতাল, ক্ষমতাশালী লোকদের ভয়ঙ্কর হাত থেকে কি করে রক্ষা পেয়েছিল, কি করে ওদের চাবকিয়ে, পদাঘাত করে আত্মরক্ষা করেছে। তা বর্ণনা করতে করতে বৃদ্ধ বয়সেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, হাত পা নেড়ে তাড়া করে, স্তিমিত নয়ন থেকে বহ্নি অনল বের হয়। বীরত্ব-কাহিনী সত্য বলে এত আকর্ষণীয়, এত সুন্দর, এত হৃদয়-স্পর্শী হয় যে শ্রোতারাও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বউ-ঝিরা গঙ্গাবতীকে ছাড়তে চায় না, খুঁটে খুঁটে কেবল কথা শুনতে চায়, ছেলেমেয়েরা যেমনি দিদিমার নিকট রূপকথা শুনে এবং সর্ব্বদা রূপকথা শুনতে চায়—তেমনি বউঝিরা গঙ্গাবতীর নিকট গঙ্গাবতীর জীবন-কাহিনী শুনে অন্যদিন আসবার জন্য অনুরোধ করে। ধার্ম্মিক লোকরা রাগ, দুঃখে কেঁদে ফেলেন, এ কাহিনী শুনে কঞ্জুষরাও পয়সা না দিয়ে স্থির থাকতে পারে না।

গঙ্গাবতীর দিন বেশ ভালই চলছে অর্থাৎ খাওয়া পরা অস্বচ্ছলের রাজ্যে বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলছে। তার মস্ত বড় অসুবিধা যে ছেলেকে কারও নিকট একদণ্ডের জন্য রাখবার উপায় নেই। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বের হতে হয়, যে দিন ঝড়বাদল নামে কিম্বা বেশ ঝাঁঝালো রোদ উঠে—সেদিন ছেলেকে নিয়ে রাস্তায় বেরুতে সাহস পায় না; শীতকালে কাঁথা চাপা দিয়ে চলতে পারে। খাওয়া পরার দুঃখ নেই তার, দুঃখ হ'ল ছেলেকে নিয়ে। এতটুকু ছেলে কোথায় সুখে স্বচ্ছন্দে আরাম করে দিন কাটাবে—তা না তাকেও গঙ্গাবতীর সঙ্গে সঙ্গে দোরে দোরে ভিক্ষা করতে যেতে হয়। মস্ত বড় মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন জাগে যে অবোধ শিশুর ভিক্ষে করতে যাওয়া কি অভিশাপ নয়? শিশু কি অভিশাপের জন্য মনে মনে বিদ্রোহ করে না? কিন্তু উপায় কি; তার যে দু'দিকই পথ বন্ধ, বাড়ী রেখেও যাওয়া যায় না—অথচ সঙ্গেও নেওয়া চলে না। সঙ্গে নিতে হয়, নতুবা খালি বাড়ীতে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতে হয়। ছেলে কখন ঘুম থেকে জেগে উঠে, একা একা কাঁদে, আবার ঘুমায়, কেউ দেখবার নেই। নেই কোন বন্ধু, নেই কোন দরদী, কেউ নেই ব্যথার ব্যথী, নেই কেউ একদণ্ডের সাহায্যকারী।

বলিষ্ঠ ঋজু দেহ দুর্ব্বল বঙ্কিম হয়ে গেছে, চুল হয়েছে রুক্ষ কটা জটা, নয়ন হয়ে গেছে অতি স্তিমিত, আঁধারে হয় দীপ্তিহীন—যাকে কথিত ভাষায় বলে রাতকানা। শক্তি সামর্থ্য নেই, কুঁজ হয়ে চলে, বেশিক্ষণ এক স্থানে দাঁড়াতে পারে না—লাঠি ভর করে পন্ পন্ করে কেবলই চলে। ক্রমাগত আঘাত পেয়ে মেজাজ হয়েছে বড় রুক্ষ কর্কশ, কথা বেচে জীবন চালাতে হয় বলে বাজে পাঁচালীর ঝর্ণা হয়ে পড়েছে, সব্বার সঙ্গে বেশি বেশি করে কথা বলায় এখন এমন স্বভাব হয়েছে যে নিজের মনে দিন রাত্তির একা

একা বিড়্ বিড়্ করে কত কি কথা বলে, কত কাহিনীর হয় পুনঃ অভিনয়। গঙ্গাবতীর হাবভাব দেখলেই মনে হবে যে তার মাথার ঠিক্ নেই, পাগলিনী বল্‌লে অতিরিক্ত হবে না ; তবে তার স্বার্থপর কার্য্যকলাপে দৃঢ়তা আছে, বিচার-বুদ্ধি আছে, সুখশান্তির মাঝে বেঁচে থাকবার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। তার কাজে কর্ম্মে, ব্যবহারে, হাবভাবে বেশ স্পষ্ট প্রতীত হয় যে সে বড় স্বার্থপর। সে স্বার্থপরতা পাগলামীর দোষে আত্মগোপন করে আছে—গঙ্গাবতী বজ্রের মত দৃঢ়, এগিয়ে চলতে চায় অপ্রতিহত শক্তিতে, এই চলাকে জয়মণ্ডিত করবার জন্য জীবন করেছে পণ। এতদিনে সে সুখের পথ পেয়েছে—চিরজীবনে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে এতদিনে প্রকৃত পথ পেয়েছে। এই তার ঠিক পথ, এই তার জয়মণ্ডিত হ'বার সহজ সোজা শেষ পথ। এখন নেই যৌবনের বিপত্তি, এখন নেই স্বামীর অত্যাচার, এখন নেই বিধাতার ক্ষুদ্র মনের পাপময় প্রভাব, এখন নেই প্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত। যেমন পাহাড়, জঙ্গল, নদীর ওপর তৈরি পথে রেলগাড়ী নির্ভিকভাবে অতি সহজে চলে—তেমন সেও তৈরি পথে অপ্রতিহতভাবে চলে। দৈহিক শক্তি নেই, তাই মনের আশ মেটে না। জীবনে একটিমাত্র তার উদ্দেশ্য, একটিমাত্র কারণে তার খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, কাজকর্ম্ম, বেঁচে থাকা। লোক যেমন স্বার্থের জন্য অম্লানবদনে, নিঃসঙ্কোচে অপরের গলায় ছুরি চালায়—ঠিক তেমনি সে অপরের সর্ব্বনাশ করতে পারে নিজের স্বার্থে।

তার এত বড় অধঃপতন কেন হ'ল? কেন সে এত নীচ, এত হীন, এত কূট, হেয় স্বার্থপর হ'ল? যার স্থান ছিল দেবীর আসনে—সে কেন পাপীয়সীর আসনে স্বেচ্ছায় নামলো? এত বড় ব্যবধানে না হয় আত্মশোচনা, না হয় গ্লানি, না হয় দুঃখ, না হয় অনুতাপ, না বোধ করে সঙ্কোচ ; বরঞ্চ যুক্তিতর্কে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করে, এ পথই বরণীয় বলে বিশ্বাস করে। তার মত অবস্থার লোকদের এই ভাল পথ। সর্ব্বদা প্রার্থনা করে এমনিভাবে যেন জীবন কাটে। তার নেই ব্যক্তিত্ব, নেই কোন চাহিদা, নেই কোন ছোট বড় অভিলাষ। সে জানে, তার দৃঢ় ধারণা যে সে ধরার মানুষ নয়, তার দেহ আছে, নেই প্রাণ, নেই মন বিবেক ; তার চেতনা নেই, কোন অনুভূতিও নেই। যদি তার এত বড় বিচ্ছেদই হয় তবে কি করে সে বাঁচে? ঘোর উন্মাদের কি অত বড় বিচ্ছেদ ঘটে? তার ছেলে ত' বেশ বড় হ'য়েছে, তবে আর কেন? এ প্রশ্ন কি তার মনে জাগে না? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রশ্ন ত' তৈরি হতে পারে না—যদি প্রশ্নের পুর্ব্বেই উত্তর জন্মে। রাজার কি অন্ন-সমস্যা হয়?···মাতৃত্ব গঙ্গাবতীকে সকল সমস্যার বাইরে নিয়ে এসেছে। তার নিকট আর কোন সমস্যা জাগে না, আর তাকে ব্যতিব্যস্ত করে না, দিবানিশি কণ্টকশয্যায় শায়িত করে নরকযন্ত্রণা দেয় না। তার নিকট কোন প্রশ্ন নেই, কোন সমস্যাও নেই।

কিন্তু আমায় বল্‌বে কে? আমার প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? আমার দুর্ব্বল মনে প্রশ্ন জাগছে, এ পাপ—না পুণ্য? এ ন্যায়, না অন্যায়? এ ঠিক্, না ভুল? এ ভাল, না মন্দ? এ কি দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী, না সব কিছুর বাইরে? এ কি চিরন্তন সমস্যা হয়ে রইলো?

* * * * * * * * * *

গঙ্গাবতী প্রকৃত পক্ষে পাগলিনী নয়, লোকে পাগলিনী বলে, ছোট ছেলেমেয়েরা পাগলিনী মনে করে ক্ষেপায়। গঙ্গাবতীর চেহারা দেখে ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম ঠাট্টা করত, এঁকে বেঁকে চলার অনুকরণ করে আমোদ করত, গঙ্গাবতী কোন ভ্রূক্ষেপ করত না। কিন্তু যার মাথায় একটু ছিট আছে তাকে সর্ব্বদা ক্ষেপালে চটে যায়, কথার প্রতিবাদ করে, ঝগড়া করে দুষ্ট ছেলেদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে চায়। এমনি বাদ প্রতিবাদে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়।

এক প্রকার লোক আছে, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি ধনী, কি গরিব, কি উচ্চ নীচ—তারা অপরকে ক্ষেপিয়ে গালাগাল শুনে খুব কৌতুক পায়, অশ্লীল কথা শুনে খুব আমোদ পায়। আজ অনেক দিন পরে একটি কথা মনে পড়লো। একদিন কলকাতায় শ্যামবাজারের কোন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়েছিল একটি আবেশময় কোলাহল। আমোদের কারণ ছিল একটি অর্দ্ধ উলঙ্গ পাগলিনী। পাগলিনীকে নিয়ে দুষ্ট লোকরা মজা করছিল। একটি পড়া মাঠ, চারধারে ভদ্রলোকদের বাড়ী, বহু ভদ্রলোক ছেলেমেয়েসহ মজা দেখছিলেন, কেউ কোন প্রতিবাদ করেন নি—বরঞ্চ উৎসাহ দিচ্ছিলেন। পাগলিনী

উত্যক্ত হয়ে একবার ওদের মনের আশ পূরণ করল—ছিন্ন বস্ত্রখানি অপসারিত করে অশ্লীল ভঙ্গিমা করল। একটি পরিবার সে অশ্লীল দৃশ্য লজ্জারক্ত নয়নে নিরীক্ষণ করছিল। ছেলে-মেয়েসহ দেখবার দৃশ্য বটে! এরা কি জানতেন না পাগলিনীর স্বভাব? এ পাগলিনীটি কি এ পাড়ায় নতুন এসেছিল? থাক্ এ সব ঘরের কালিমা! এ প্রকৃতির সর্ব্বনেশে লোকরাই মানুষের মহা সর্ব্বনাশ করে। ভাল মানুষকে এরাই পাগল করে দেয়। লোকই লোককে পাগল করে বেশি, বহু ভদ্রলোক নির্লিপ্ত ভাবে পাগল করবার সাহায্য করেন।

লোকের অনিচ্ছাকৃত চেষ্টায় গঙ্গাবতী সত্য পাগল হয়ে পড়লো, অবশ্য তার উদ্দেশ্য থেকে এক পদ সরে পড়ে নি। গঙ্গাবতী ভাবের পাগলিনী নয়, কোন দাগার পেষণেও পাগলিনী হয় নি, অসম্ভব রকম কোন অবস্থার অত্যাচারেও হয় নি, ব্যক্তিগত বা প্রকৃতির দৈব ঘটন অঘটনেও পাগলিনী হয় নি। তার ওপর দিয়ে যে ঝড়োহাওয়া বয়ে গেছে তাতে পাগল বা আত্মঘাতী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। দুরাত্মাদের চেষ্টা চরিত্রে পাগল হ'তে হ'ত না। কিন্তু নারী-চরিত্র একটু আলাদা ধরণের। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে মস্তিষ্ক-বিকৃতা হয় কম নারীই। মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে পুরুষ যত বেশি বেপরোয়া হয়, মানসিক শক্তি হারায়—নারী তত হারায় না। এর একটা প্রধান কারণ—নারীদের দায়িত্ব-জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ। ঝড়ো-দোলায় লতা হেলে-দুলে কখনও এক বৃক্ষ থেকে অপর বৃক্ষে আশ্রয় করে বাঁচে, খুব বড় রকম হলে মাটি আঁকড়ে লতিয়ে চলে, মরতে হয় না, কিন্তু বৃক্ষরাজ অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারে না বা হেলে-দুলে ঝড়কে এড়িয়ে মাটি আশ্রয় করে ত্রাণ পায় না।··· আর্থিক বা প্রিয়জনবিয়োগে অল্প নারীই উন্মাদ হয়, করুণ ওদের sentiment (এখানে sentimentএর মানে বাঙ্গালায় বলা কঠিন। অনুভূতি বললে কতকটা হয়। রসপূর্ণ অনুভূতিও বলা চলে।), খুব প্রখর ও ক্ষণস্থায়ী। এরা যত সহজে মুশড়ে পড়ে—আবার তত সহজে উঠে পড়ে। এরা জলের মত বাতাসের দোলায় অতি সহজে উঠে দোলে, আবার অতি সহজে শান্ত হয় সহজ হয় বাতাসের প্রভাব দূর হতেই। নারীরা চরিত্র হারিয়ে, এমন কি বেশ্যা হয়ে যখন অনুতপ্ত হয়—তখন অনুতাপের দহনে পাগল হয় না। এরা ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে মাথা খেলায় বা শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য রক্ষা করে চলে বলে পাগল হয় না এলোমেলোতে, এরা পাগল হয় অতি তুচ্ছ কারণে, অতি নগণ্য কারণে। এখানে আমি অশিক্ষিত কুসংস্কার-অন্ধ নারীদের কথা বলেছি প্রধানতঃ। পাগলতত্ত্ব লেখার উদ্দেশ্যে এত কথার ভনিতা করি নি, হয়ত' চিকিৎসাশাস্ত্র একবারে মূল্যহীন করে দিতে পারে—কারণ বহু কারণেই পাগল হয়—যা আমি বাদ দিয়েছি, প্রকারান্তরে অস্বীকার করাও হয়েছে। পাগল-তত্ত্ব যখন নয়, তখন গঙ্গাবতী কেন পাগল হলো এবং নারীরা কেন পাগল হয় তা বলায় জবাবদিহি করতে হবে না। তবে যে কথা বলেছি তা কেউ বাস্তব উদাহরণে নিজের অভিজ্ঞতা অস্বীকার করে আমায় জবাবদিহি করবেন না—এ জোর আমার আছে।

উপরি উপরি তিন চারটি উপযুক্ত সন্তান হারিয়ে, স্বামীকে হারিয়ে মস্ত বড় আঘাত পেয়েও নারী উন্মাদ হ'য় না, একবেলা খাবারের সংস্থান নেই—তবু বাঁচে, তবু সংসারী হয়, এমন উদাহরণ একটি দুটি নয়—বহু বহু উদাহরণ আছে। এমন অবস্থায় বহু পুরুষ পাগল হয়ে যায়, সংসারত্যাগী বৈরাগী হয়ে যায়, আত্মহত্যাও করে। নারীর বাহিরটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, আলোছায়ায় আবার ধীরে ধীরে ভাল হয়ে পড়ে—কিন্তু পুরুষদের ভেতরে ক্ষত-বিক্ষত হয়, বাহির থেকে বুঝা কঠিন, হঠাৎ দেহধ্বংস করে দেয়—তখন আর প্রতিকার চলে না। দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে এ বিষয়ে নারীরা পুরুষের চেয়ে উঁচুতে।

ঘাতপ্রতিঘাতে গঙ্গাবতী পাগল হয় নি। তার মাথার দোষ কি করে হলো তা অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ। অথচ এই তুচ্ছ সাধারণ কারণে শত শত নারী পাগল হয়। আমি অন্যধারার পাগলদের কথা বলচি নে, হয়ত' অনেকে ভীষণভাবে চটে উঠে পাগলতত্ত্ব বই নিয়ে ছুটে আসবেন—ভুল সংশোধন করাতে। আমি বলচি সাধারণ পাগলদের কথা—যারা পথে ঘাটে ঘুরে ফেরে, খাওয়া পরা কোন ভাবে চালায়, চেষ্টাও করে, বেশি কথা বলে, রাস্তাঘাটে ঝগড়া-বিবাদও করে। যেমন গঙ্গাবতী রাস্তায় বের হয় ভিক্ষে করতে, নিত্যি ঝগড়া-বিবাদ করে লোকের সঙ্গে, পাগলের মত বাজে কথা বলে, পাগলের মত ছটপট করে, নানা ভঙ্গিমা করে আপন মনে।

গঙ্গাবতী একটু বেশি কথা বলতো, কেবলি ছট্‌পট্‌ করতো, কোথায়ও একদণ্ড চুপ করে থাকতে পারতো না, মেজাজ হয়েছিল রুক্ষ, মনোমত কথা না হলেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতো, সব কথাতেই কথা বলতো—হয়ত' কি কথা হচ্ছিলো তা জানতো না। সবাই গঙ্গাবতীকে বেশি কথার জন্য, সম্মদারী স্বভাবের জন্য, অল্পতে ক্ষেপে যাওয়াতে—ধমকাতো, সব ছেলে বুড়োরা তাই নিয়ে হৈ-হৈ করে উঠতো, টিট্‌কারী দিতো—আর গঙ্গাবতী তেলে-বেগুনের মত জ্বলে উঠতো। গঙ্গাবতী একা সকলের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারতো না, তাই অবস্থা দাঁড়াতো আরও সঙ্গীন। গঙ্গাবতীর পাগলামীর দু'তিনটে নমুনা দিয়ে তার কাহিনী শেষ করি।

হয়ত' কতিপয় লোক সমাজের কোন একটা কলঙ্কের বা কারও নিন্দা করছে—এমন সময়ে গঙ্গাবতী চুপ করে এসে পাশে দাঁড়ায়। ভাল করে সব বিষয় শুনে নি, হঠাৎ বলে বসে—'কিষণের কথা বলচো? ওর মত লোকের শাস্তি হওয়া উচিত। বউটার প্রতি এত অত্যাচার করে—'

'চুপ কর্ মাগী! বুঝুক বা না বুঝুক—সব কথাতে ভেঁ-ভেঁ করা চাই।'

বস্তির মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, গঙ্গাবতী প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না, মুখ কাল করে চুপ করে যায়। লোকের শ্লেষ হাসিতে মনে মনে চটে যায়। কোন দিন মনে মনে বিড়্ বিড়্ করতে করতে সরে পড়ে, কোথাও গিয়ে বকাবকি করে মনের ঝাল মেটায়, কোন কোন দিন দাঁড়িয়েই থাকে, হঠাৎ আবার প্রতিবাদ করে—'যত দোষ সব ওর না? ওর ও মেয়েমানুষ কি-না, তাই যত অন্যায় যত দোষ সব ওর হয়ে গেল। যত সব সাধুর দল এসে জুটেছে!'

'ফের আবার কথা বলিস্!'

'বল্‌বে না! পক্ষে না বল্‌লে যদি টাকা-কড়ি ধার না দেয়, সাহায্য না করে।'

গঙ্গাবতী বলে—'আমি কাউকে খাতির করে কথা বলিনে, হুঁ-উ! উচিত কথা বলতে বাপকেও ছাড়ি নে। এ আর কেউ নয়, হুঁ-উ।'

'কি আমার উচিত-বক্তা রে! সারা জীবনটা ত' ছিনালী করে কাটালি, বুড়ী হতে চল্‌লি তবু লজ্জা সরম হয় না।'

'কি—কি বল্‌লি? আমি ছিনাল? জানি না আমি তোদের কথা। ঘর থেকে তোর বউকে যে টেনে বের করে নিয়ে যায় তা' জানি না? কি কলঙ্ক! কি কলঙ্ক!'

'হারামজাদী মাগী! মুখ সামলিয়ে কথা বলিস্। চাপার দাঁত আর থাকবে না।'

'কি অত ডর দেখাস রে হারামজাদা! আমি কি জলে ডুবে গেচি?'

চেঁচামেচি শুনে লোক জড় হয়। কেউ ভাল করে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে না, গঙ্গাবতীর নাম বিকৃত করে, হৈ-হৈ করে উঠে, গঙ্গাবতী খুব ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ করে, ছেলেরা সুবিধে পেয়ে আরও চটায়, গঙ্গাবতী শরীরের নানা ভঙ্গিমা করে প্রতিবাদ করে, গালি দেয়। এমনি ব্যাপার দাঁড়ায় যে গঙ্গাবতী রাগের মাথায় হয়ত' কোন শব্দ ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে নি, সেই শব্দটা বিকৃত করে লোকে গঙ্গাবতীকে যেখানে দেখে সেখানেই বলে; একবার, দু'বার হয়ত' গঙ্গাবতী সহ্য করে—তার পর আর নিজেকে সামলাতে পারে না, চটে যায়, অতএব কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। গঙ্গাবতীকে যদি 'বুড়', 'হেঁ-হেঁ', 'আমার ছেলে', 'আমার বুকে দুঃখ' 'তবে রে ছোঁড়া' ইত্যাদি বলা যায়, তবে গঙ্গাবতী ক্ষেপে যায়।...

গঙ্গাবতী হয়ত' ভিক্ষে করতে বের হয়। দিনের অবস্থা ভালো নয় তাই সঙ্গে ছেলেকে নেয় নি। আপন মনে বিড়্ বিড়্ করে চলে, অন্যমনস্ক তাই যা ভাবে তা ভাষায় ফুটিয়ে চলে। ওর কথা শুনলে নিশ্চয় মনে হবে যে সে কারও সঙ্গে আলাপ করে চলছে। লোকে যা মনে মনে ভাবে ও বলে—গঙ্গাবতী তা আপন মনে বলে চলে, অবশ্য সে বুঝতে পারে না যে তার মনের কথা লোকে শুনছে ও তার ভঙ্গিমা লোকে দেখছে। কেউ যদি তার ভুল ধরিয়ে দেয় তবে সে বুঝতে পারে এবং লজ্জিত হয়; কিন্তু আবার যখন অন্যমনস্ক হয় তখন আর খেয়াল থাকে না।...রাস্তার ধারে ছেলেরা ডাংগুলি খেলছে, হঠাৎ গঙ্গাবতীকে দেখে খেলা ছেড়ে পিছু লাগলো।

'এ পাগলি! ও পাগলি! পাগলি, ছাগলি!'

গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় না, এড়িয়ে চলতে চায়।

'হেঁ হেঁ-হেঁ বুড়ী! আমার ছেলে যা—অমন কি আর আছে, রাজ-পুত্তুর।'

গঙ্গাবতী দ্রুত হাঁটে, রাগে জ্বলে উঠে, তবু এড়াতে চায়।

'তবে রে ছোঁড়া? আমার বুকে দুঃখু উঠেছে। ও পাগ্‌লি! ও বুড়ী!'

'নির্বংশের ছেলেদের জ্বালায় এক পা চলা যায় না' গঙ্গাবতী আর সহ্য করতে পারে না, মুখ খিঁচিয়ে বলে 'দূর হ'—দূর হ'—নির্বংশের গোষ্ঠী।'

'এ পাগলি! তোর মাথায় বিড়ালের বাচ্চা।'

'হারামজাদা ছেলেরা মরেও না। মর্, মর্! আজই যেন মরিস্।'

'এই বুড়ী! তোর থলেতে কি?'

'থলেতে তোর মার বাচ্চা।'

ছেলেরা ঢিল ছোঁড়ে, গঙ্গাবতী অকথ্য ভাষায় বকাবকি আরম্ভ করে দেয়। গঙ্গাবতী অশ্লীলভাবে বকে, অভিশাপ দেয়, ধীরে ধীরে সরে পড়ে।···

'এই পাগলি! তুই নাকি ডাইনী বুড়ী?'

'তুই নাকি রাক্কুসী, আস্ত মানুষ খাস্?'

গঙ্গাবতী তেড়ে যায় মারতে, হাত নেড়ে বলে 'হারামজাদারা—'

'ও বুড়ী, ও ডাইনী, ও রাক্কুসী!'

'মর্ মর্, এখনি মর্, তোর বুকের রক্ত খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।'

ছেলেরা সুর ধরে বলে—'ও রাক্কুসী রে! পাগল ছাগল রে।'

'আমি কেন পাগল হবো, পাগল তোর বাপ্, পাগল তোর মা, পাগল তুই নিজে'—গঙ্গাবতী কুঁজো হয়ে মাথাটা তিন ঝুঁকি দিয়ে বলে—'পাগল তোর চোদ্দ-গোষ্ঠী।'

যুবকরা চোখ ইসারা করে ছেলেদের উৎসাহ দেয় ঢিল ছুঁড়তে, নিজেরাও সুবিধে পেলে ঢিল ছুঁড়ে। গঙ্গাবতী বেঠিক জন্মের যতগুলি অশ্লীল গালি আছে তা বলে, মনের আশ মিটিয়ে অভিশাপ দেয়। ছেলেরা যুবকরা হৈ-হৈ করে, ঢিল ছুঁড়ে। গঙ্গাবতী চক্রের মাঝে পড়ে দিশে পায় না, একজনের পিছু নিলে, পেছনের ছেলেরা ঢিল্ ছুঁড়ে বা কাপড় ধরে হেঁচকা টান মারে, গঙ্গাবতী আবার এদিকে তাড়া করলে অন্যদিকের ছেলেরা পেছন থেকে আক্রমণ করে। চক্রব্যূহে পড়ে গঙ্গাবতীর অবস্থা মারাত্মক হয়ে পড়ে। কোন কোন দিন গঙ্গাবতী আহত হয়, অবশ্য ছেলেরা কৌতুক করে, কেউ জোরে ঢিল ছুঁড়ে না, মারধরও করে না।

বয়স্ক লোকরা গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে আসে রঙ্গ করতে।

গঙ্গাবতী অকূলে কূল পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে সাহায্য চায়, বলে—'দেখ ত' বাবারা! আমি কি পাগল-ছাগল মানুষ। গরীব মানুষ—ভিক্ষে করে খাই, যাচ্ছি ভিক্ষে করতে—আর নির্বংশের গোষ্ঠীরা লেগেছে পেছনে। ভাল হবে এদের? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! দেখতো, দেখতো! বাচাধনরা! কি করেছে আমার!'

বয়স্করা কৃত্রিম রোষে বলে—'এই ছোঁড়ারা! তোরা বড্ড পাজী হয়ে গেছিস্! ভাগ এখান থেকে! ফের যদি এর পেছনে লাগবি তবে ভাল হবে না। যাও বুড়ী, সরে পড়ো, আর কিছু বল্‌বে না। এদের মত কি খারাপ ছেলে আর আছে!' চোখ ঈসারা করে আবার ছেলেদের উৎসাহ দেয়।

কোন ছেলে হয় ত' ভিক্ষের ঝুলি টান মেরে ছুড়ে ফেলে দেয়, অন্য ছেলেরা হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠে।

গঙ্গাবতী লাফিয়ে, নানা ভঙ্গিমা করে অভিশাপ দেয়—মর্—মর্! নির্বংশ হ'। তোর বাপ মার বুকে চিতার আগুন জ্বলুক (শ্মশানে চিতার আগুন যেমন নিভে না, একটা নিভে অন্যটা জ্বলে, তেমনি প্রাণে—যেন জীবনব্যাপী' শোকের আগুন জ্বলে। পল্লীগ্রামে বা ছোটলোকদের মাঝে এ একটা খুব মারাত্মক অভিশাপ)। তোর মুখে যেন তোর মা-বাপ্ ত্রিসন্ধ্যেয় আগুন দেয়। মর্ হারামজাদারা, গোষ্ঠীশুদ্ধ মর্। মড়ক লাগুক। কলেরায় নেয় না কেন? বসন্ত, প্লেগ, মরণ-জ্বরে নেয় না কেন? আজই নিয়ে যাক্!'

গঙ্গাবতী একা পারে না, ভেউ ভেউ করে কাঁদে, কোন ভাবে পালায়। এক দল ছাড়ে ত' অপর দল পিছ্ ধরে। ছেলেদের পিছু নিতে পথ খুঁজতে হয় না, গঙ্গাবতী নিজেই মনে করিয়ে দেয়। পথ দেখিয়ে দেয়। এক পাড়া থেকে যখন অন্য পাড়ায় পালায়—তখন বক্‌তে বক্‌তে, অভিশাপ দিতে দিতে চলে, অন্য পাড়ার ছেলেরা 'কি হয়েছে' বলে খবর নিতে আসে, গঙ্গাবতী মনের দুঃখে সব বলে, ছেলেরা তখন আরাম পাবার জন্য গঙ্গাবতীর পেছনে লাগে। কোন

কোন সময় গঙ্গাবতী বর্ষিয়সী মহিলা বা ক্ষমতাশালী লোকদের নিকট এসে অভিযোগ করে, আশে-পাশের ছেলেমেয়েরা গঙ্গাবতীকে দেখতে পেলেই গোল আরম্ভ করে, অবশ্য ওরা ছেলেমেয়েদের সত্য সত্য বকুনি দেন।···

প্রায় দিনটাই এমন ভাবে কাটে, কোন দিন অবস্থা খুব গুরুতর হয়—কোন দিন অবস্থা গুরুতর হয় না। তবে রোজই ছেলেরা পেছনে লাগে। ছেলে-যুবারা তাকে নিয়ে করে আমোদ, সে আমোদে প্রাণান্ত হয়ে উঠে গঙ্গাবতীর।

গঙ্গাবতী রাস্তায় বের হলে শুধু পাগলামি করে না, বাড়ীতেও পাগলামি করে। লোক না থাকলে মাথার ছিট বেড়ে যায়। দিন রাত বিড়্ বিড়্ করে, কত কি পাঁচালী আপাঁচালী বকে, পাক্ দিয়ে দিয়ে ঘর বাহির হয়, হাত নেড়ে মুখ বাঁকিয়ে অদৃশ্য শত্রুকে গালি দেয়, অভিশাপ দেয়। এক কথা হয়ত' একশ বার বকে, কখনও মনের দুঃখে কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও রেগে হয় আগুন। ছেলের সঙ্গেও সর্ব্বদা মাথা ঠিক রেখে কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার করতে পারে না।

কোন দিন দুষ্ট লোকরা গঙ্গাবতীর কুঁড়ে ঘরের চালে ঢিল ছুঁড়ে, গঙ্গাবতী লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে, কাউকে পায় না, তখন গলা ছেড়ে বকাবকি আরম্ভ করে; গঙ্গাবতীর অকথ্য গালাগাল শুনে লোক জড় হয়, আসর বেশ ভাল করে জমে উঠে, সুযোগ মত দুষ্ট ছেলেরা গঙ্গাবতীকে ক্ষেপায়, ব্যাপার বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। দুষ্ট ছেলে বা যুবারা যখনই গঙ্গাবতীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যায়—তখন গঙ্গাবতীকে চটিয়ে গালাগালি অভিশাপ শুনবার জন্য একটা না একটা ক্ষতি করেই। অনেক সময় যুবকরা বা প্রৌঢ়রা গভীর রাত্রিতে স্ফূর্ত্তি করবার জন্য গঙ্গাবতীর বাড়ীতে ঢিল ছোঁড়ে বা দরজাতে জোরে জোরে ঘা মারে, গঙ্গাবতী বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠে 'মারলো—মারলো। জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। ষণ্ডা, গুণ্ডা, বদমাইসগুলা আমার সতীত্ব নষ্ট করে ফেল্লো। জোর করে আমার সতীত্ব নষ্ট করে ফেলছে, কে আছো, বাঁচাও।'···প্রথম প্রথম পাড়াপড়সী সাহায্য করতে আসত, অবলা নারীকে বাঁচাতে আসত। এখন আর আসে না—কারণ তারা বুড়ী পাগলিনীর পাগলামি বুঝতে পেরেছে। পাগলের প্রলাপে নিদ্রাভঙ্গ হয় বলে রীতিমত চটে যায় পাড়াপড়সিরা। আমরা কিন্তু জানি—এ পাগলের প্রলাপ নয়, যৌবনের বিভীষিকা।···

এমনই করে চলে অভিশপ্ত জীবন। এ যেন একটা খেলা, শুধু মূল্যহীন খেলা মাত্র। নেই তার উদ্দেশ্য, নেই কোন আদি, অন্ত, নেই কোন ভিত্তি। হয়তো স্বপনের ঘোরে অলীক কল্পনার ভয়াবহ বিভীষিকা। করুণাময়, দয়াময়, সর্ব্বমঙ্গলময় দেবতাকে চিনি নে, বুঝিও না, অবশ্য চেষ্টাও করি নে। বুঝি নে দার্শনিক তত্ত্ব। লোকের রচিত দর্শনতত্ত্ব শুনলে মনে হয় শুধু তোষামোদ, শুধু নিরুপায়ের আত্মবঞ্চনাময় হতাশ সান্ত্বনা। হয়তো আমার ভুল, ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার দোষ। কিন্তু গঙ্গাবতী ত' ভুল নয়! এই যদি তার চিরন্তন খেলা, বিশেষত্ব—তবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর পাপী কে? হয় তো ইহা তাঁর রহস্য, অস্তিত্বহীন মানুষের জীবন ধোঁয়া, সুখ দুঃখ নাম মাত্র মনের সংস্কার, ভুল! যদি তাই হয়, তবে বাস্তব এত বড়, এত দৃঢ় কেন? বাস্তব যদি কিছু নয়—তবে পাপ, পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ব্যবধান অনুভূতি কেন? এত বৈচিত্র্যই বা কেন? স্বপ্ন অলীক জানি, কিন্তু দুঃস্বপ্নের আঘাত ত' অলীক নয়। অসীম বাস্তবতার মাঝে অতি সূক্ষ্ম দর্শনের রেখাপাত করা—কি করুণাময়ের দয়াবশতঃ সান্ত্বনা দেওয়া—না পথ পরিষ্কার রাখার ধূর্ত্ত চাতুরি?

(১৬)

আগাছার কি করে শিকড় গজালো, উর্ব্বর মাটি আঁকড়ে ধরে সজীব হতে লাগলো, তা আপনাদের বলেচি। কি করে ডাল শাখা ফুল পাতার বাহার ছড়ালো, হয়তো অলিও মুঞ্জরিয়ে উঠতে পারে এমনই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে; তা বলতে চাই নে। আগাছাই হোক বা অন্য কিছুই হোক, ভূমিকায় ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল, সুতরাং মাঝ পথে থাকাও স্বাভাবিক—তবে বাঁচলো কি করে? যাই হোক, যে ভাবেই হোক বেঁচেছে, ক্রমে বেড়েও চলছে। আগাছা এখন বৃক্ষ, উপেক্ষা করা যায় না। উর্ব্বর মাটির এমন গুণ; আগাছার বীজটা যদি এদিক কি ওদিক একটু সরে পড়তো, তবে হয়তো বৃক্ষ হতো না; শুকনো নীরস মাটির, নিরপেক্ষতায় বা শোষণে বীজ অবস্থায়ই শেষ হতো।

গঙ্গাবতীর ছেলেকে দেখ্‌চি তের চোদ্দ বছরের

কিশোর। নাম তার বনয়ারী। দেহ ঋজু নয়, মাংসপেশী দৃঢ় নয়, হেংলা, শরীর ঈষৎ মলিন, শরীরের বিশেষ শক্তি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ ভুজদ্বয়, চেহারায় একটু বিশেষত্ব আছে, উপেক্ষা করা যায় না, কৌতূহল হয় তাকাবার জন্য, বেশ লাগে দেখতে, তৃপ্তি মিলে ঐ ধীর, স্থির, গম্ভীর ছেলেটিকে দেখে। ওর মুখে যেন এই কথাটিই লেখা আছে যে সে সাধারণ নয়; তার চাহনিতে আছে সরলতা, তীক্ষ্ণতা; অপক্ক, কচি ললাটে আছে লেখা যে সে অতি দৃঢ়চিত্ত। অথচ তার না আছে নিয়ম-কানুন, না আছে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি (principle)। কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রয়োজন বলে কোন কিছু নেই। হেঁয়ালী ছোকরা খেয়াল বশে চলে। যখন যা সুবিধে হয় তাই করে, নিজের কোন স্বার্থ নেই, তাই কোন অন্যায় করতে হয় না। বেশ স্বাধীনচেতা, অথচ যাযাবরের মত অসংলগ্ন জীবন তার।

বনয়ারী ছেলেবেলায় এমন ছিল না, বছর দু'এক যাবৎ এমন ধারার হয়েছে। দু'বছর হলো তার মাতার মৃত্যু হয়েছে। গঙ্গাবতী মৃত্যুর পারে যাত্রা করে চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে ছেলেকে তার নিজের, স্বামীর কথা ও বনয়ারীর জন্ম-কাহিনী বলে যায়। পিতার কথা, মাতার কথা ও নিজের কথা যেদিন জানতে পারলো সে দিন থেকেই বনয়ারীর জীবনধারা বদলে যায়। মনুষ্য জীবনের ওপর একটা বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় জননীকে হত্যা করে পিতার নিকট পশু আখ্যা পেয়েছিলেন, বনয়ারী সে দিন জনকের সন্ধান পেলে পিতৃহন্তা হ'তো, হয়তো তার জননী তাকে ক্ষমা করতেন না, তবু সে পিতাকে হত্যা করতো, একটু দ্বিধা একটু সঙ্কোচ বোধ করতো না, এমন তার মনের অবস্থা হয়েছিল।

অভিশপ্ত ভাই-বোনদের জন্য পড়েছিল দীর্ঘনিঃশ্বাস, ভক্তিতে অবনত হয়েছিল মস্তক দেবী কিশোরী বাঈর চরণ উদ্দেশে। মাতার ওপর ঘৃণা হয় নি, ক্রোধ হয় নি, হয়েছিল মমতা, পড়েছিল সহানুভূতির নিঃশ্বাস, কিন্তু মাতার অপত্য-স্নেহকে সে ক্ষমা করতে পারে নি। যুধিষ্ঠির যেমন কর্ণের জন্ম-কথা শুনে কুন্তীদেবীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তেমনই বনয়ারিও মাতার অপত্য-স্নেহকে অভিশাপ দিয়েছিল। অপত্য-স্নেহে অন্ধ না হলে তার মৃত্যু হতো সুনিশ্চিত, ক্ষতি কি ছিল, সে অবস্থায় মৃত্যুই যে শ্রেয় ছিল; কত বড় একটা মহা উপকার হতো তাতে। জননীকে অত ছোট, অত হীন হতে হতো না, তার নিজের জীবনের প্রারম্ভে অত বড় একটা বোঝা মাথায় চাপতো না। এ ভারি বোঝা কি আর এ জীবনে খসবে?

বনয়ারীর জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। অন্ন-সমস্যা ভিন্ন অন্য কোন সমস্যা ছিল না, গরীবের গরীব-পণার কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না। গরীব দুঃখীরা দুঃখ কষ্ট সইবে, কুলি মজুরী করেই জীবন কাটাবে। নিরাশ্রয় গরীব দুঃখীর যখন তখন দুঃখ কষ্ট হবেই, সকলেরই হয়—তারও হবে, হওয়াটাই স্বাভাবিক, জগতের নিয়ম। অবশ্য মাতার জীবিতকালে কোন দুঃখ তাকে ছুঁতে পারে নি, মার সঙ্গে রাগারাগি করেও বৃদ্ধা জননীর শারীরিক পরিশ্রমে ভাগ বসাতে পারে নি, খেলাধূলা করে সময় কাটাতে হতো, কুলি মজুরদের রাত্রির স্কুলে পড়তে যেতে হতো, তবে সে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ছিল। সে জানতো—তার পিতা জীবিত নেই, তার কোন ভাই বোন নেই, কোন দিন ছিল কি-না তাও জানতো না, জানতো শুধু তার মাকে, মার অপত্য-স্নেহকে; চিনতো না কিন্তু গঙ্গাবতীকে। মুমূর্ষুর মুখে যখন সব কথা একটি একটি করে জানতে পারে তখন বিশ্বাস করে নি, প্রথম ভেবেছিল রোগীর প্রলাপ। কিন্তু প্রলাপ ত' এমন হয় না। একি এক প্রহেলিকা! সুষুপ্তির স্বপ্ন নয়, জাগ্রত স্বপ্নও নয়! এ যে সত্য! পিতা থেকেও পিতা নেই, অথচ তার বিষাক্ত, ভয়ঙ্কর প্রভাব চারিদিক ঘিরে রয়েছে, কেন সে পিতৃহীন হয় নি। একটি একটি করে তার চারটি ভাই বোন মারা গেল, কিশোরী বাঈ মারা গেল, জগতে কত লোক মারা যাচ্ছে পলে পলে; শুধু কি তার জন্য, পিতার জন্য মৃত্যুর অসীম দয়া, কি অসীম অনুগ্রহ, দয়া! এক একবার টেনে নেয় আবার ফিরিয়ে দেয়! জননী? জননীর কথা ভাবতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, মন প্রাণ জড় অসাড় হয়ে যায়। উঃ! এত বড় দুঃখিনী, এত বড় অভিশপ্তা কি কখনও এই বৈচিত্র্যময় বহুরূপীর দুনিয়াতে জন্মেছে! পতিতা চরিত্রহীনা নয়—তবু পতিতা চরিত্রহীনার অধম। মিথ্যাবাদিনী জোচ্চোর নয়—তবু মিথ্যাবাদিনী জোচ্চোরের শীর্ষা। কেন? এর উত্তর—সে নারী; তার দুর্ব্বলতা, তার

মাতৃত্ব! বনয়ারী মানুষ দেখলেই ক্ষেপে যায়, জননীর কোলে সন্তান দেখলেই শিউরে উঠে।···ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে জগতের মাতৃত্ব মুছে ফেলতে, তা যদি সম্ভবপর না হয় তবে যেন অপত্য-স্নেহ না থাকে। জননী শুধু সন্তান গর্ভে ধারণ করবে, তার পর অবস্থা বুঝে গলা টিপে ধরতে একটুও কুণ্ঠিত যেন না হয়। সন্তান শুধু সন্তান, রক্ত-মাংস বিশিষ্ট নর বা নারী, এসেছে আলাদা—যাবে আলাদা—এই সম্পর্কই থাকবে সর্ব্বদা।

বনয়ারী যেন স্রোতের ফুলে, অজানা-অচেনা, অনির্দ্দিষ্ট; ভেসে এসেছে—ভেসে চলছে এই তার পরিচয়। দুনিয়ার প্রতি না আছে মমতা, না আছে লোভ, না আছে ক্রোধ, না আছে আক্রোষ। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, সৌহার্দ্দ্য, ভক্তি প্রেম সে জানে না—অনুভূতির সীমানায় টলবার মত স্বাভাবিক প্রকৃতিও নেই। দুনিয়াটাকে বিশ্বাসও করে না; আগাগোড়া আদি অন্ত সবই যেন ফাঁকি। এখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ওখানে যায়, ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে অন্য পথে যায়। বাঁধন আঁটে না; রেখা কাটে না, আঁচড় লাগে না, কাঁটা ফোটে না। কোন কিছুই তাকে অভিভূত করতে পারে না; কোন কিছুই তাকে নাগাল পায় না, সে বড় উঁচুতে উঠে বসেছে। কেউ তাকে আঘাত দিলে সে আঘাতের প্রতিশোধ নেয় না; দাগা দিলে দাগার জ্বালা অনুভব করবার ইন্দ্রিয়কে খুঁজেও পায় না; ব্যথিত হয় নিজের জন্য নয়, ওর বোকামোর জন্য, ওর ভুলের জন্য।

দুনিয়ার ভুলের ফাঁদকে ফাঁকি দেবার জন্য বনয়ারী সাধু সন্ন্যাসীর পিছনে বনজঙ্গলেও বছর দেড়েক কাটিয়েছে—পথ পায় নি, সত্যের সন্ধান পায় নি, শান্তি পায় নি, মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে নি, বিভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে এসেছে। দুঃখ কষ্টের প্রভাব ক্ষমতাহীন, অকর্মণ্য।

যখন কাজ করবার আবশ্যক হয়, জঠর জ্বালাকে নিতান্ত আর দমিয়ে রাখা যায় না, তখন গতরে খাটে। হাতের কাছে কাজ জুটলে কাজ করে, যে যেমন খুশী মজুরী দেয়, কোন আপত্তি করে না; বিরক্ত হয় না, বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। কাজ মেলে ত' করে, নতুবা কাজ নিয়ে অপরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে না। চাহিদা জিনিষটা তার নিতান্ত নেই, একটু অন্যমনস্কই থাকে সর্ব্বদা। শীত, গ্রীষ্ম ফুটপাতে মাঠে এখানে সেখানে কাটায়, বর্ষাকালে গাড়ী বারান্দায় বা কোন আবরণের নীচে স্থান না হলে জলে ভেজে; ভেজা জামা কাপড় গায়ের উত্তাপে শুকায়।

সে কারও অনুগ্রহ চায় না; সাহায্য চায় না। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বনয়ারীকে সাহায্য করতে চান, নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দিতে চান, সে কোন সাহায্য নেয় না; বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। অপরের অনুগ্রহ স্বীকার করে সে কেন নিজকে হীন করবে, অপমান করবে? অপরের অনুগ্রহ নেবার যে তার ক্ষমতা নেই, কোন যুক্তিতে সে নিতে পারে, সে ত' অক্ষম নয়।

বনয়ারীর নিকট গরীব ধনী, উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ অধম নেই, সবাইকে একটু অনুকম্পার চোখে দেখে। এটা হয়ত' স্পর্দ্ধার কথা, দাম্ভিকতার পরিচয়, তবে সে দাম্ভিক নয়, মনে এতটুকু মলিনতাও নেই। স্বেচ্ছায় সে পতিতারও উপকার করে, সুযোগ পেলে সতী দেবীরও সাহায্যে স্বেচ্ছায় নেমে আসে।

এমনই চলছিল তার জীবন, চলছে ক্ষতি কি, চলছে যখন চলুক না তার খেয়াল মত; প্রকৃতির অমন বাধ্য শান্ত-শিষ্ট শিশু দুনিয়াতে আর যোড় মিলে না। না আছে বিদ্রোহ; না আছে গোল। যেন মাধ্যাকর্ষণের মত স্বাভাবিক। মাধ্যাকর্ষণকে না পারা যায় অনুভব করা, না থাকতে হয় সতর্ক—অথচ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রভাব। পরস্পরের বাঁধন একটু শিথিল হলে কেউ পড়ে ছিট্‌কে গাছ থেকে—কেউ বা শূন্য থেকে। তার ছিঁচড়া-ছিঁচড়িতে সর্ব্বদা সতর্ক—অথচ তার কথা ভাববার সময় পায় না, মনেও রাখে না; পড়ে যাবার ভয়টা কিন্তু থাকে। মানুষের সঙ্গে, জীব-জন্তু জড় পদার্থের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের যেমনই সম্পর্ক—তেমনই বনয়ারীর সঙ্গে তার জীবন ধারার সম্পর্ক ছিল। এখন সে কোথায়, কি ভাবেই বা তার জীবন চলছে জানি নে। হয়তো সে জগতে নেই, হয়তো জগতেই আছে, হয়তো সংসারে নেই, হয়তো সংসারেই ঠাঁই খুঁজছে, খুব সম্ভব পিতৃভূমিতে আশ্রয় খুঁজছে। বনয়ারীর জন্য দুঃখ হয়, বড় কষ্ট হয়, আপনাদের প্রাণেও হয়ত ঘা দিয়ে থাকবে তার মনের আকস্মিক ঘাতপ্রতিঘাত। প্রার্থনা করবেন, আমিও সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করচি—এমনি মনস্তত্ত্ব যেন বাস্তবে আর কখনও না মিলে। কিশোরীর যোড়া কচিৎ মিলে; কানাই পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে।

কবে ঘরে ঘরে কিশোরীকে পাব—আর কানাইকে কখনও পাব না ? গঙ্গাবতীর ওপর কোন কথা বলবার আমার ক্ষমতা নেই, আমার মন বিবেক বিচার বুদ্ধি এ স্থলে জড়, আপনাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে একটু সান্ত্বনা পাবার আশা করি।···

বনয়ারী তার পিতৃভূমিতে যেতে পারে—কেন সন্দেহ করেছি তা আপনাদের বলছি। একদিন বনয়ারীর সঙ্গে কানাইর দেখা হয়, পরিচয় হয় এক গলির মোড়ে। তারপর দিন থেকেই বনয়ারী ফেরার—অবশ্য আমাদের নিকট। সন্দেহের কারণটা—

সাঁজের আঁধার, আরও আঁধার, জমাট কুচকুচে আঁধার হ'য়েছে—পাহাড়ের মত শির তুলে কাল মেঘ হুড়াহুড়ি করে আকাশ ছেয়ে ফেলছে বলে। প্রচণ্ড বেগে ঠোক্কর খাচ্ছে, আগুনের হলকা ফস্ করে জ্বলে উঠে এঁকে বেঁকে শীতল জলে নিবে যাচ্ছে, বজ্র বজ্র-নিনাদে হুঙ্কার দিচ্ছে। এমন এক দুর্য্যোগে বনয়ারী একটা বিশ্রী গলির ভেতর দিয়ে চলছিল। রাস্তায় এক বৃদ্ধকে মৃত্যু-যন্ত্রনায় গোঙাতে দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠে, প্রলয়ের ঝড় বাদলকে উপেক্ষা করে সে যায় বৃদ্ধের সেবা করতে। বৃদ্ধ তখন প্রলাপ বকছিল, জীবনের মহাপাপের অনুতাপে মৃত্যু-ভীতির চেয়ে বেশি ছট্‌ফট্ করছিল। তার কাতরতা অনুতাপ দেখলে পাষাণের পাষাণ-হৃদয় গলে যায়। এক এক করে তার জীবন-কাহিনী বলে যাচ্ছিল আর অসহায় শিশুর মত কাঁদছিল, গঙ্গাবতীর নিকট ক্ষমা চাইবার মত ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে বলে তার প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল।

বনয়ারী পাষণ্ড নর-পিশাচের পরিচয় পরে ভুলে গেছিল, হারিয়ে ফেলেছিল নিজকে, রক্ত হয়েছিল চঞ্চল, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল খুনী রক্ত মুহূর্ত্তের তরে। অসহায়, নিরাশ্রয়, অনুতপ্ত মুমূর্ষুকে ত্যাগ করতে পারে নি। প্রাণ দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেছিল। অদৃশ্য প্রভাবে।

ভেবেছিল কোন পরিচয় দেবে না, কিন্তু পারলে না। যে সম্বন্ধ বিশ্বাস করতে কষ্ট পেত, এড়িয়ে চলত, উপেক্ষা করত, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে না। আসন্ন যৌবন-মুখী কিশোর বনয়ারী তখন নিতান্ত শিশুর মত হয়ে গিয়েছিল। অনুতপ্ত, অসহ্য জ্বালায় ক্লান্ত, বিভ্রান্ত মুমূর্ষুকে সেবা করতে করতে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল—'পিতা, পিতা' বলে কানাইকে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হয়েছিল।

উঃ! কি করুণ সে দৃশ্য। মুমূর্ষু ছেলেকে শিথিল হস্তে উত্তপ্ত বক্ষে চেপে ধরে এমনি ভাবে ক্ষমা করতে বাধ্য হল। রক্তের টান, রক্তের প্রভাব কি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন! মৃত্যু তুমিই শ্রেষ্ঠ! তোমার পরশ যদি না ছড়াতে তবে কি বনয়ারী ক্ষমা করতো? রক্তের টান কি ব্যর্থ হতো না?···

কানাই যাবার বেলায় বলে গিয়েছিল—বনয়ারী যেন পিতৃভূমিতে গিয়ে বাস করে, কুলি মজুরের পেশা যেন না নেয়। শহরের কুলি মজুরের চেয়ে পল্লীগ্রামের চাষীদের জীবন অনেক ভাল। চাষীরা স্বাধীন, ওদের টাকা-কড়ি নেই—কিন্তু ওদের জীবন স্বচ্ছন্দভাবে চলে। ওদের ক্ষমতা অল্প, আবার আকাঙ্ক্ষা চাহিদাও অল্প, তাই তাদের জীবনে তৃপ্তি সুখ প্রচুর পরিমাণে মিলে। যুবকরা টাকার লোভে শহরে ছুটে আসে—ক্ষণিক মোহে বুঝতে পারে না, নগদ টাকার লোভে কুলি-মজুর-পেশা সাদরে গ্রহণ করে। মজুরীর টাকা পায়, মদ খেয়ে আমোদ করে। এত পরিশ্রমের পর মদ না খেয়ে পারে না। এদের জীবনে যে আনন্দ উৎসব নেই—তাই এদের দল বেধে মদ খাওয়াটা মস্ত বড় আমোদ, স্ফূর্ত্তি। কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পর উপযুক্ত খাদ্য পায় না, নোংরা বাসস্থান বলে স্বাস্থ্য হারায়, সাংসারিক অর্থ টানাটানিতে ধৈর্য্য হারায়, মদের মাতাল-মোহে চরিত্র হারায়, দ্রুত অধঃপতনের চরম শিখরে নেমে যায়। পল্লীবাসীদের চরিত্রও দেবতুল্য নয়, স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নয়, আমোদ উৎসবও বেশি নেই, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও তেমন ভাল নয়—তবে কুলি-মজুরদের তুলনায় অনেক ভাল। এরা মোটা ডাল রুটির রীতিমত সংস্থান করতে পারে, নির্ম্মল হাওয়া পায়, জীবন অতি সাধারণ ধারায় চলে বলে ওদের তুলনায় অনেক সুখকর—ভাল। দু'দলই শুকনো কাঠের মত; একটায় ঘুনে দ্রুত ধ্বংশ করে, অপরটা করে না। শহরে যত কুলি মজুর আছে ওদের অধিকাংশরই দেশে জমি-জমা থাকে, ওতে বেশ জীবন চলতে পারে—কিন্তু অর্থের লোভে মিলে ফ্যাকটারীতে চাকরি নেয়—তারপর দ্রুত ধ্বংশের মুখে চলে।

বনয়ারী আত্মহত্যা করে মরে নি, কুলি-মজুরও হয় নি, সাধু-সন্ন্যাসী হয় নি। চাষী হতে চেষ্টা করছে, না এখন খেয়ালী হেঁয়ালপূর্ণ ভবঘুরে আছে—তা ত' জানি নে!

সমাপ্ত

চন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবর্ণযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে কয়টি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিজ নিজ কক্ষ-পথে পরিভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ অপূর্ব্ব আলোকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছিল, তন্মধ্যে চিন্তাশীল লেখক ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু অন্যতম। আজ 'ভারতবর্ষ' সাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সেবকের স্মৃতির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছে।

১২৫১ বঙ্গাব্দে ১৭ই ভাদ্র শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সীতানাথ ও পিতামহ কাশীনাথ উভয়েই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান হিন্দু ছিলেন এবং চন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচীন হিন্দু আদর্শের পরম অনুরাগী হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ তাঁহাকে বহুদিন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই।

পঞ্চমবর্ষে যথারীতি 'হাতে-খড়ি' হইবার পর তাঁহাদের বাটীতেই অবস্থিত পাঠশালায় চন্দ্রনাথ উদয় নামক এক গুরুমহাশয়ের নিকট নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ছয় মাস মাত্র এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পর তিনি গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর শাখা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি শাখা বিদ্যালয় হইতে মূল বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন। তখন ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর মূল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়। চন্দ্রনাথ ইঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার সহপাঠিগণ প্রথমে তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছিল এবং বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করিয়া তাঁহাকে ক্ষেপাইত—

"চতুরঙ্গের কিবা ছিরি মরি হায় হায়

পেট মোটা গলাসরু, বেটা যেন বামনের গরু" ইত্যাদি

কিন্তু শীঘ্রই তাহারা তাঁহার গুণ-পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইয়াছিল।

বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট একটি ছাত্র-সভা ছিল—তাহার নাম ওরিয়েণ্ট্যাল ডিবেটিং ক্লাব। চন্দ্রনাথ এই সভায় ইংরাজী প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন এবং তর্ক-বিতর্ক করিতেন।

বাল্যকালে চন্দ্রনাথ অঙ্কে ও বাঙ্গালায় অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন। সেই জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কোনও প্রকারে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত করাইয়া দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করেন, কারণ মাসে দশ টাকা বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিবার তাঁহার অবস্থা ছিল না। কিন্তু এই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ এট্‌কিন্সন সাহেব ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী হইতে উত্তীর্ণ একটি বালককে একটি ছাত্রবৃত্তি দিবেন। চন্দ্রনাথ এই ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই স্থানে তিনি 'বাঙ্গালার আর্ণল্ড' প্যারীচরণ সরকার, অধ্যাপক কাউএল প্রভৃতি বিচক্ষণ অধ্যাপকগণের নিকট ইতিহাস পাঠ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এফ্-এ পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান অধিকার করেন,—প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালেও সেখানে ছাত্রদিগের সভায় চন্দ্রনাথ ইংরাজী প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠ করিতেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময় তিনি তাঁহার সহপাঠী (পরে নিজাম রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ) মৌলবী সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামির সহযোগিতায় Calcutta University Magazine নামে একটি ইংরাজী মাসিকপত্র বাহির করিতেন। কাগজখানি পনের মাস চলিয়াছিল। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় উক্ত পত্র সম্পাদনে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং স্বীয় মুদ্রাযন্ত্রে উহা মুদ্রিত করিয়া দিতেন। সংসারানভিজ্ঞ বালক-সম্পাদকগণের কার্য্যে

বিশৃঙ্খলার জন্য যথারীতি মূল্য আদায় হইত না এবং প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ছাপাখানার প্রায় চারিশত টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল। সরকার মহাশয় উহার জন্য কখনও পীড়াপীড়ি করেন নাই এবং প্রফুল্লচিত্তে এই ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন।

এই মাসিক পত্রে On the importance of the study of history অর্থাৎ "ইতিহাস আলোচনার উপকারিতা" সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যে একটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ইংলিশম্যানপত্র প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উহা একজন দেশীয় লেখকের রচনা।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা দিয়া চন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন, স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ ইতিহাসে এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসরেই এম্-এ পরীক্ষায় স্যর রাসবিহারী ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ বি-এল পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় স্যর রাসবিহারী প্রথম এবং চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

অতঃপর চন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হেনরি উড্রোর নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন। উড্রো সাহেব অত্যন্ত সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া কটক কলেজে একটি দুই শত টাকা বেতনের অধ্যাপকের পদ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু বলিলেন "আমি যদি তোমার পিতা হইতাম তাহা হইলে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম, এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।" এই সময়ে চন্দ্রনাথ কৃষ্ণদাস পালের সুপারিসে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের একটি পদ পাওয়াতে তাঁহাকে অধ্যাপকতায় প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন "ডেপুটীর পদে যাইতেছ যাও, কিন্তু টিঁকিতে পারিবে না।" হইলও তাহাই। ঢাকায় নিযুক্ত থাকা কালে চন্দ্রনাথ পুলিশের কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার মত সমর্থন করিলেন না। ছয়মাস ডেপুটীগিরি করিয়া চন্দ্রনাথ কার্য্যে ইস্তফা দিলেন।

অতঃপর চন্দ্রনাথ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অনুরোধে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। তখন রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকৃতপক্ষে জয়পুরের রাজা এবং তিনি চন্দ্রনাথকে কিছুদিন পরে শাসন বিভাগে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং" বঙ্গের বাঙ্গালী চন্দ্রনাথের নিকট জয়পুর ভাল লাগিল না, তিনি ছুটী লইয়া জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। ছুটীর মধ্যেই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ললার সাহেবের মৃত্যু ঘটিল। চন্দ্রনাথের পরমহিতৈষী কৃষ্ণদাস পাল সেই কর্ম্মের জন্য শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্যর এলফ্রেড ক্রফ্‌টের নিকট দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণদাস পাল পূর্ব্বেই ক্রফ্‌টকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে ঐ কর্ম্ম পান। পদের বেতন ছিল ২০০৲ হইতে ২৫০৲ এবং চন্দ্রনাথের প্রতিভার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু স্বল্পে সন্তুষ্ট চন্দ্রনাথ উহাতেই খুসী হইয়াছিলেন।

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ ঘটিলে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে চন্দ্রনাথ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। সতের বৎসর এই শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাঁহার ১৭৫৲ টাকা মাত্র পেন্সন প্রাপ্য হয়। কিন্তু উহা অত্যন্ত অল্প বিধায় সেক্রেটারী অব ষ্টেটের বিশেষ অনুমতি লইয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত পেন্সন দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ছাত্রাবস্থায় চন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় কাঁচা ছিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি আচার্য্য ৺কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট কিছু বাঙ্গালা এবং (পাঠ্য না হইলেও) কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার দিনে ইংরাজী রচনার দ্বারাই বাঙ্গালী যুবকগণ যশোলাভের চেষ্টা করিতেন। চন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে ইংরাজী রচনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন

যে যখন বি-এ পাশ করেন নাই তখন হইতেই ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বেঙ্গলী" কাগজে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন। এম্-এ পাশ করিয়াই তিনি "On the life and character of Oliver Cromwell" নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয় কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত উহার একটি সুদীর্ঘ প্রশংসাসূচক সমালোচনা আমরা পাঠ করিয়াছিলাম।

সেকালে কলিকাতায় 'বেথুন সোসাইটী' ও 'বেঙ্গল সোশিয়্যাস সায়েন্স এসোসিয়েশন' নামে দুইটি প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য-সভা' ও 'সমাজ বিজ্ঞান সভা' ছিল। 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রথমোক্ত সভায় সাহিত্য ও দর্শন বিভাগের সম্পাদক এবং শেষোক্ত সভার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। চন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার 'শিক্ষা বিভাগে'র অন্যতম সম্পাদক এবং 'ব্যবস্থা শাস্ত্র বিভাগে'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি এই সভায় অনেকগুলি সুন্দর ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	প্রবন্ধের নাম	বক্তৃতার তারিখ
(১)	What is the best practicable method of educating Hindu Women ?	৩০শে জানুয়ারি ১৮৬৮
(২)	The present system of Education in the University of Calcutta	৩১শে মার্চ্চ ১৮৬৮
(৩)	On the present social and economical condition of Bengal and its probable future	১৮৬৯
(৪)	A few points connected with the Registration of Assurances	১৮৭০
(৫)	Some University matters	১৮৭২

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন এবং উক্ত বৎসর ১৬ই নভেম্বর কলিকাতার টাউন হলে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ ইংরাজ ও দেশীয় মনীষিগণ এক বিরাট শোকসভার আয়োজন করেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতি চন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং এই সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। গিরিশ-চন্দ্রের স্বর্গারোহণের পরে এবং নয় বৎসর পরে "বেঙ্গলী" স্যর সুরেন্দ্রনাথের হস্তে যাইবার পূর্ব্বে যে সকল মনীষী 'বেঙ্গলী' পত্রখানি সুচিন্তিত সন্দর্ভাদি দ্বারা সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন তন্মধ্যে চন্দ্রনাথ অন্যতম ছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে এপ্রিল 'বেথুন সোসাইটী'তে চন্দ্রনাথ "High Education in India" নামে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহা পরে পুস্তিকা-কারে প্রকাশিত হইয়া সুধীসমাজে আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে Oriental Miscellany নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইংরাজীতে সুলেখক চন্দ্রনাথ উহাতে লিখিতে অনুরুদ্ধ হন এবং উক্ত বৎসরের অক্টোবর সংখ্যায় "Durga Puja in my Boyhood" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বাল্যস্মৃতিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। উহাতে তিনি "দুর্গাদাস" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকগণ উহা চন্দ্রনাথের "পৃথিবীর সুখদুঃখ" নামক আত্মচরিতের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত দেখিতে পাইবেন।

এ পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় কোনও প্রবন্ধ লিখেন নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বাঙ্গালায় মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন বটে এবং চন্দ্রনাথ সানন্দে ও সাগ্রহে মাতৃভাষার উন্নতির জন্য বন্ধু বঙ্কিমের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিতেছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় লিখিতে সাহসী হন নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়া তিনি বাঙ্গালা গ্রন্থাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে এবং 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকে গ্রন্থগুলির ইংরাজী ভাষায় সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'-এর সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথকে বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে। চন্দ্রনাথ

১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে 'বঙ্গদর্শনে' "অভিজ্ঞান শকুন্তল"-এর ধারাবাহিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই প্রবন্ধ রচনার পূর্ব্বে রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত চন্দ্রনাথ সাহিত্য, শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তখনও প্রস্তাবটি 'বঙ্গদর্শনে' 'সমাপ্ত' হয় নাই—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাবিত্রী লাই-ব্রেরীতে পঠিত "বাঙ্গালা-সাহিত্য" নামক বক্তৃতায় বলিয়া-ছিলেন, "চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল, তিনি বহুকাল কলিকাতা রিভিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।"

বাস্তবিকই চন্দ্রনাথ 'ইংরেজি ত্যাগ করিয়া' বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃ-ভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখের নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি তাহা সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি ; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।"

১২৯০ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' চন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব রসরচনা "পশুপতি সম্বাদ" প্রকাশিত হয়। শকুন্তলা-তত্ত্বের ন্যায় ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যৌবনে চন্দ্রনাথ ইংরাজী শিক্ষার গুণে (?) দেবদেবীতে বিশ্বাস এবং হিন্দু নীতি ও আচারে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের ও আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন এবং তাঁহার সন্দর্ভ-সমূহে এই শ্রদ্ধা সুপ্রকটিত হইয়াছে। তিনি বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে শকুন্তলা-তত্ত্ব, ফুল ও ফল, ত্রিধারা, হিন্দুত্ব, সাবিত্রী-তত্ত্ব, সংযম শিক্ষা, পৃথিবীর সুখ দুঃখ, পশুপতি সম্বাদ, বেতালে বহু রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত "কঃ পন্থাঃ," বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" প্রভৃতি প্রবন্ধও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া সুধীসমাজে প্রশংসালাভ করিয়াছিল। চন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এই জন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম এদেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই।"

চন্দ্রনাথ প্রেমময় স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যও আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি অমায়িক, বিনয়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্বাধীনচিত্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম অনুরাগী ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাস্তবিকই তিনি বঙ্গসাহিত্যকে যাহা দিয়া গিয়াছেন, আর কেহ তাহা দেন নাই। সেইজন্য ১৩১৭ সালের ৬ই আষাঢ় তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে কখনও তাহার পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

মধুরেণ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ ছুটি ছিল। তারিণী চাটুয্যে সকালে চারটি মুড়ি আর এক-কপ্ চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর বেরুনো মানেই—কন্যা শৈলর জন্য পাত্র খুঁজতে বেরুনো। তিনি আজ তিন বছর এইরূপ বেরুচ্ছেন।

এক-পা ধুলো নিয়ে সন্ধ্যার ফিরে—মাথায় হাত দিয়ে বাড়ীর রোয়াকে তিনি বসে পড়েন। পত্নী নবদুর্গা তাড়াতাড়ি মাদুরখানা এনে পাশেই পেতে দেন—উঠে বসতে বলেন। গরমের দিন—পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসেন। তারিণীবাবুর মুখে ম্লান হাসি না ফুটতেই দীর্ঘশ্বাসে তা মিলিয়ে যায়। বলেন—'আমাকে আর যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা কেন!"

শৈল আজ তিন বছর বাপের এই অবস্থা দেখে আসছে, আর ওই-কথা শুনে আসছে।—সে পনের উত্তীর্ণ হল—এইবার 'ম্যাট্রিক্' দেবে। ওটা নাকি সর্ব্বাগ্রে দরকার,—তারিণীবাবু পাত্র খুঁজতে যেখানেই যান, প্রথম শুনতে হয়—'ম্যাট্রিক্' পাস্ কি না। তিনি যেন কেরাণী-গিরির দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছেন। তাই আধপেটা খেয়েও শৈলকে পড়াতে হচ্ছে।

শৈল গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, সংসারের সকল কাজেই মাকে সাহায্য করে। এখন সংসারের সকল চিন্তায় যোগ দেয়, সব বোঝে ও ভাবে।

তারিণীবাবু রেলে চাকরি করেন, মাইনে ৩৫ টাকা। সন্ধ্যার পর মাড়োয়ারীদের গদিতে গিয়ে ইংরাজি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম লিখে দেন—তাঁদের মালখালাসও করে দেন। তাতেও কিছু পান।—কাকারিয়া বিশিষ্ট ধনী, গরীব ব্রাহ্মণকে ভালবাসেন,, দয়া করে কাজকর্ম্ম দেন। এই পাঁচ রকমে তাঁর সংসার চলে।

একদিন সকালে কাকারিয়ার মোটর তারিণীবাবুর ভাড়াটে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। বেরিয়ে এসে শেঠ কাকারিয়াকে সপরিবারে নামতে দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন।

কাকারিয়া সহাস্যে বলেন—"বাড়ীতে একটি বিবাহোৎসব আছে, আমার স্ত্রী কন্যা তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন—তাঁরা বাড়ীর মধ্যে যাবেন।"

শুনে তারিণীবাবুর কথা যোগাল না। ইতিমধ্যে—দাসীর হাতে একখানি সরাতে মিষ্টান্নাদি—পশ্চাতে স্ত্রী কন্যা বাড়ীর ভিতর গিয়ে উপস্থিত।

দুঃখের সংসারে তারিণী চাটুয্যের এত বড় বিপদ কোন দিন ঘটে নি। একতালা আড়াইখানি স্যাঁৎসেঁতে কুটুরি, তার তদুপযুক্ত আসবাব—ময়লা ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, মাটির হাঁড়ি, কলসী, সরা!—সে দিন "তৃণাদপি সুনীচেন" একবার তাঁর মনেও পড়ে নি, পড়লেও বোধ হয় শান্তি দিত না। তিনি ন যযৌ অবস্থায় কাকারিয়ার মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'একটি বিনয় বচন ভিন্ন কথাই কইতে পারেন নি, তাঁকে নামতে বলতেও পারেন নি—কোথায় বসাবেন?

প্রৌঢ় কাকারিয়া তাঁর অবস্থাটা বুঝে অন্য কথা পাড়েন। বললেন—"তারিণীবাবু—যে কাজ জানি না বুঝি না, এমন একটা কাজে হাত দিয়ে ফেলেছি। অনেক টাকার কাজ, তাতে ফ্যাসাদও বহুৎ। তোমার সাহায্য আমার দরকার—অনেক লেখাপড়া করতে হবে। বিলেত থেকে মালপত্র মেসিনারি এসে পড়েছে, খালাস করতেও হবে। এখন ভগবতী মাই যা করেন।"

তারিণীবাবু কথা কইবার অবলম্বন পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"কি কাজ শেঠজি?"

কাকারিয়া হাসিতে হাসিতে বলেন—"বাইসকোপ্—তসবির ঘর। তসবির বনবে"—

তারিণীবাবুকে আর কথা কইতে হয় নি; কাকারিয়ার স্ত্রী কন্যা তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে উঠেন।

"আচ্ছা—কথা পরে হবে" ব'লে শেঠজির মোটর বেরিয়ে যায়।

তারিণীবাবুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো—তিনি সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। কাকরিয়ার কথাগুলি তাঁর কানে গেলেও প্রাণে পৌছয়নি।—বড়লোকের সদ্ব্যবহারও গরীবদের উপভোগ্য হয় না, স্বচ্ছন্দ দেয় না!

নবদুর্গা ডাকায় তাঁর চমক ভাঙে।—"এ সব আবার কি? আমাকে খবরটা দিতে হয়? আমি এই ছেড়া কাপড় প'রে শাক সড়সড়ি চড়িয়েছি—মেয়েটা ঐ কাপড়ে ডালের খুদ্ বাটছিল—তাড়াতাড়ি তোমাকে দু'খানা বড়া ভেজে ভাত দেব বলে; এমন সময় ছি ছি"...

শৈল বললে—"তাতে কি হয়েছে মা? যে যা—তার তাই থাকাই তো ভাল। আমি সাটিনের সাড়ী পরে বাটনা বাটলে—কেমন দেখাত!—ওঁদের আসায় আর অন্যায়টা কি হয়েছে মা। বড় লোক যদি আদর ক'রে আসেন, সেটা কত মিষ্টি!"

নবদুর্গা বলেন—"আমি কি ওঁদের দুষ্‌ছি? হঠাৎ কি না—তাই অপ্রস্তুত পড়তে হয়।—এই দেখ না—কত রকমের মেঠাই, আবার পাঁচ টাকা নগদ দিয়ে গেছেন। আমাদের তো"...

শৈল বলে—"তুমি বুঝি তাই ভাবচো মা?—ওঁরা বড় লোক—ওঁদের মত কাজ ওঁরা না করলে সমাজে নিন্দে আছে। আমরা গেলেই ওঁরা খুসি হবেন।—তুমি আজ একবার যেও বাবা"।

শুনে তারিণীবাবুর মনটা শান্ত হয়। তাঁকে ভাত-বেড়ে দিয়ে নবদুর্গা বলেন—"তোমার মেয়ে তাঁদের সঙ্গে এমন কথা কইলে গো—যেন কত কালের চেনা! তাঁদের মুখেও শৈলর কথাবার্ত্তার রূপের সুখ্যাত ধরে না!"

"আর রূপের সুখ্যেত! তা'তে টাকার কামড় তো কমে না!" বলে উদাস ভাবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারিণীবাবু উঠে আপিসে চলে যান।

স্ত্রী-কন্যাও যথাসময়ে কাকারিয়া ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসেন। শেঠ-কন্যা রুক্মিণীবাঈ শৈলর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে—তার সঙ্গে সখি সম্পর্ক পাতায়।

(২)

উল্লিখিত ঘটনার পর তারিণী চাটুয্যে এই প্রথম পাত্র-খোঁজা 'টুর্' থেকে হতাশ শ্রান্ত অবস্থায় ফিরে নবদুর্গাকে ব্যস্ত হয়ে বাতাস করতে দেখে—দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ম্লান হাসি মিশিয়ে যখন বলেন—"আমাকে আর যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা কেন"!—শৈল তা শুনেছিল।

কষ্টের এরূপ মর্ম্মন্তুদ অনেক কথা অনেকবার শুনেছে এবং নিভৃতে নীরব অসহায়ের মত কেঁদেছে। এখন সে কেবল কষ্টই পায় না—তার আত্মাভিমান বিদ্রোহ করে ওঠে, সে দারুণ লজ্জা ও অপমান বোধও করে।

আজ আর সে থাকতে পারলে না। বাপকে সবিনয়ে জানিয়ে দিলে—"তুমি আমার জন্য পাত্র খুঁজতে আর যেও না বাবা। এ সব পাঁচ বছর আগে সম্ভব ছিল—তখন আমার জ্ঞান হয় নি। এখন কিন্তু তোমার অপমান—আর তার সঙ্গে নিজেরও আমাকে অত্যন্ত লাগছে। প্রত্যেক-বারই শুনছি ও বুঝছি—কোন ভদ্রলোকই তো নগদ দু' হাজার টাকার কমে ছেলে ছাড়বেন না—ছেলেও নিজের সম্মান সেই টাকার ওজনে যখন সপ্রতিভভাবেই মেপে রেখেছেন, তখন ও বৃথা চেষ্টা আর কেন বাবা! দু' আড়াই হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে। ভদ্রলোকে কি চুরি-ডাকাতি করবে? যাঁরা চান, তাঁদের ক'জন তা বার করতে পারেন? তিন বছরে কাকাবাবুদের পাওনা পচাত্তর টাকা দিতে পারা গেল না দেখে দাদা লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। কাকা (রিয়া) বাবুরা ভালবাসেন—যাই আসি, কিন্তু মুখ তুলে রুক্মিণীর সঙ্গেও কথা কইতে পারি না। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। তুমি আর ভেব না; পাত্র খুঁজতেও আর যাওয়া হবে না বাবা। এবার গেলে কিন্তু"—

তারিণীবাবু অবাক হয়ে শৈলর কথাগুলি শুনছিলেন। শৈল বরাবরই শান্ত ও অল্পভাষী। আজ তার কথার মধ্যে এমন একটা সত্য ও দৃঢ় সুর ছিল, যা তাঁকে বিচলিত করে দিলে। তাঁর মুখ থেকে সরব চিন্তার মত বেরিয়ে গেল—"সমাজ যে রয়েছে—সে কি বলবে"?...

শৈল তেমনি ধীরভাবেই বললে—"সমাজের যদি 'বলা' ছাড়া আর কোনও কাজ না থাকে, তবে সে সমাজের

জন্ম নিছে ভেব না। ওই সমাজই অন্য পক্ষের সমাজ নয় কি? নিৰ্জ্জীব কেন—সেখানে বলার কিছু নেই কি? যাক্—সমাজ বলুক না বলুক, আমি কিন্তু বাবা তোমাকে আজ বলছি—এইবার তুমি আমার জন্ম পাত্র খুঁজতে গেলে—তার পর, আর যাতে না যেতে হয় তা আমায় করতেই হবে। এ কষ্ট, এ অপমান—তোমাকে আর সইতে দেব না"—

নবদুর্গার হাতের পাখা থেমে গিয়েছিল। শৈল রান্নাঘরে চলে গেল।

তারিণীবাবু স্তব্ধ উদাস দৃষ্টিতে মূঢ়ের মত বসে রইলেন। ক্ষণপরেই সহসা বলে উঠলেন,—"হ্যাঁ—ঠিক্—আর যাব না রে শৈল। যা করবার ভগবান করবেন।—ঠিক্ বলেছিস"···

(৩)

বেচু, নেপেন আর তারিণীবাবুর ছেলে বিজয়—তিন বেকার বন্ধু। কলেজ ছেড়ে কলকাতায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে—ক্লান্ত, হতাশ। তিনজনেই সমদুঃখী, দুঃখের সমবায়ই তাদের দুঃখের সান্ত্বনা হয়েছিল।

বেচুর বিদ্‌কুটে চেহারাই শেষ তার কাজে লাগল, qualificationএ দাঁড়াল। নাক নাই বললেই হয়—চেপটে সে মুখের অনেকখানি দখল করেছে। ব্যাক্-ব্রাস করা লম্বা চুল। তা'তে কান দুটি—খোলা ফটকের দু'টি পাল্লার মতই দেখাত। নাকের নীচে সযত্নে দু'ধার কামান গোঁফের মধ্যমাংশটুকু যেন নাকের ডাঁটি কামড়ে রয়েছে।

বেচু জন্তুজানোয়ারের স্বর—হুবহু নকল করতে পারে এবং করেও। কেরাণী হওয়া সম্বন্ধে হতাশ হলেও সে বলত—"জগতে আমারও দরকার আছে রে—ভগবান মিছিমিছি কিছু করেন না।"

ভগবানকে ওই সার্টিফিকেট দিয়েই হ'ক্ বা যে কারণেই হ'ক,—কথাটা তার ফলে গেল। অষ্ট্রেলিয়ার এক সার্কাস্‌পার্টি কলকেতায় খেলা দেখাচ্ছিল, বেচু তাদের নজরে পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে সাঙ্‌হাই যাবার সময় বললে—"I. Sc. পড়ে ক'টা বছর কি নষ্টই করেছি"!

বিজয়ের কাছে সংবাদটা পেয়ে শৈল মৃদুহাস্যে বললে—"এইবার তার বাপও দু' হাজার হাঁকবে।—নেপেনদা বি-এ না পড়ে যদি···! ওঁদের বড় কষ্ট! বাপ বিয়ের যুগ্যি একটি মেয়ে ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেন নি।"

নেপেনের চেহারা ভাল,—সুগঠিত পউনে ছ' ফিট দেহ, সুপুরুষ যুবা—সচ্চরিত্র। বাপ তাকে গ্রাজুয়েট্ বানাতে, গোয়ালের গরু পর্য্যন্ত বিক্রি করে' গিয়েছেন। বি-এ পাস করবার পর খিদিরপুর স্কুলে বছর দেড়েক একজনের বদ্‌লী মাষ্টারি করেছিল। অধুনা বেকার।—ওয়াটগঞ্জ থিয়েটরে হীরো (Hero)—রোজগার জিরো। প্রাইভেট-টিউসনি করে' টাকা পনের পায়। কাকারিয়ার নব-প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম-হাউস্—'মরীচিকা-মঞ্চে' ঢোকবার উমেদারী করছে।

শৈল যখন থার্ড্-ক্লাসে পড়ে তখন নেপেনদার বাড়ীতে, পড়া বলে নিতে যে'ত—তাই তাদের অবস্থা জানে। নেপেনের ভগ্নী মনোলোভা তার সমবয়সী—আলাপী, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই—বয়স উভয়কেই বেরুতে বাধা দেয়। মন ছুটোছুটি করে।

নেপেন বিবাহ করবে না—দুঃখের উপর সে কষ্ট বাড়াতে চায় না। কন্যাপক্ষেরা এলে তার মাও বি-এ পাস্ ছেলের যে নজরাণা আশা ক'রে আছেন, তা শুনে—মধ্যবিত্তদের চিত্ত চমকে যায়।

৪

তিন মাস ধ'রে কাকারিয়ার "মরীচিকা" মঞ্চে একখানি সামাজিক নাটকের মহল্লা চলছে।

কাকারিয়ার অর্থের অভাব নেই। নামী অভিনেত্রীদের—যারা নৃত্য গীত ও অভিনয়ে সুপরিচিতা—স্বদেশী তারকা—তাদের মোটা টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে। কাকারিয়ার ধারণা—সেরা সেরা সুন্দরীরাই ফিল্মের প্রধান আকর্ষণ। পুরুষের পার্টে লোকাভাব নেই—পচিশ থেকে পঞ্চাশ দিলেই হীরো (hero) মেলে। সুতরাং সুন্দরী সংগ্রহের ব্যয়টা—এইতে পুষিয়ে যাবে।

শেঠের অদৃষ্ট বাধা-বিঘ্ন কেটে চলে। প্রথম প্রচেষ্টার মুখেই ঘটেও গেল তাই।—নানা সদুদ্দেশ্যে সভ্য জগৎ আজকাল ভারতের আচার ব্যবহার প্রথাপদ্ধতি জানবার জন্য উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব। কাকারিয়ার ভাগ্যে য়ুরোপের এক ফিল্ম কোম্পানির মালিক ভারত ভ্রমণে এসে—ভদ্র-

বিরহী যক্ষ

সুরেন্দ্রনাথ বাগচী
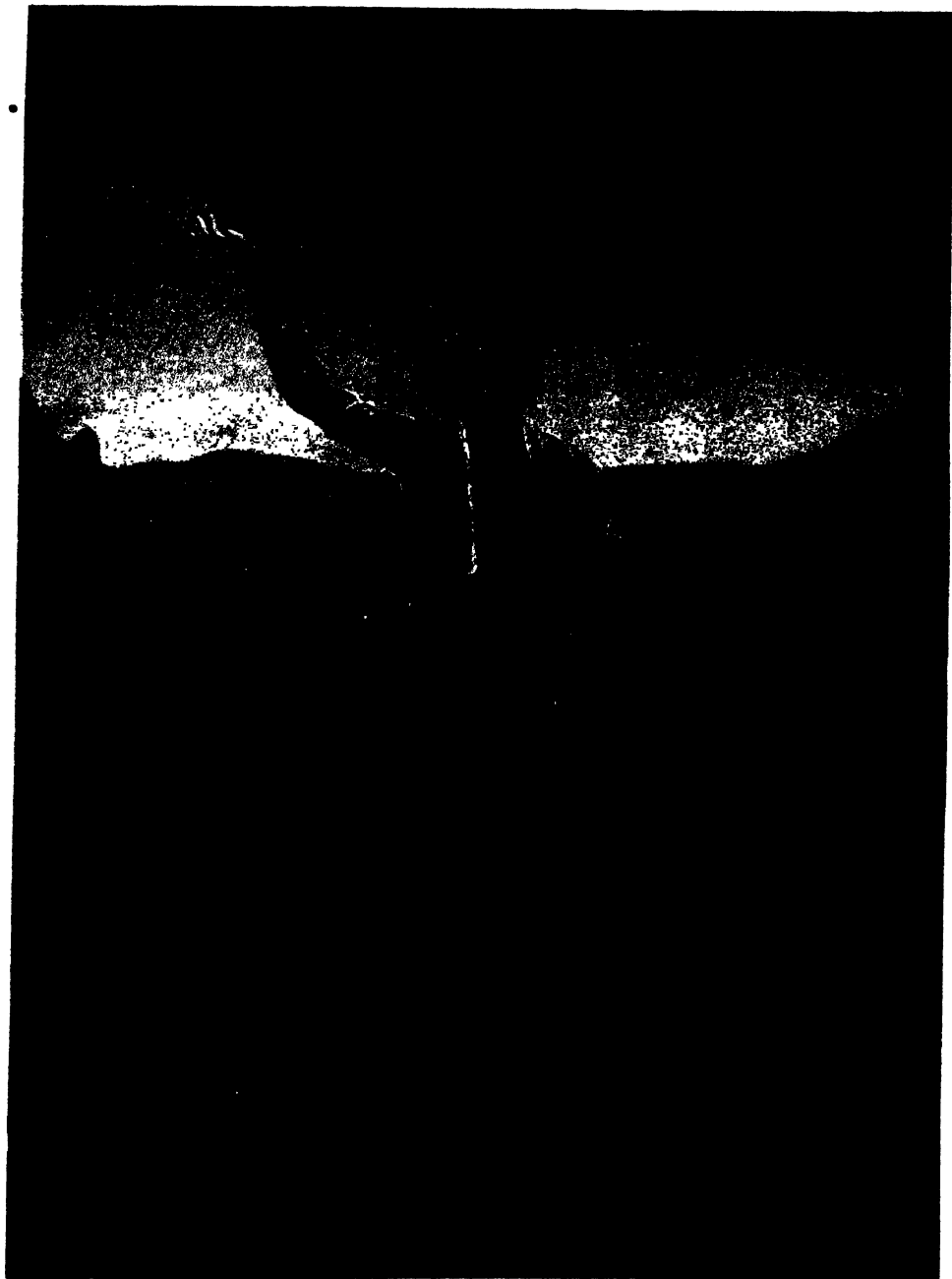
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

হিন্দুদের বিবাহ পদ্ধতিটার নিখুঁৎ ছবি বিশেষ মূল্যে সংগ্রহ করতে চান এবং কাকারিয়ার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করেন।

সুযোগ বুঝে কাকারিয়া অভাব-পীড়িত নেপেনকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ও ভবিষ্যতের বড়-আশা দিয়ে চট্ করে একখানি নাটিকা লিখিয়ে নেন।

তারই জোর রিহার্সেল চলছে। ক্রেতা বসে আছেন—কণ্ট্রাক্ট মত দিনে তাঁর পাওয়া চাই, নচেৎ তিনি নেবেন না। জাহাজের টিকিট কিনে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। কাল ফিল্ম তোলা হবে।

নাটিকাখানির বিষয় বস্তু—দুই জমিদারের বহু দিনের পোষা বিরোধ ও শত্রুতা, একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ের অভাবনীয় প্রণয় আকর্ষণে, শেষ—তাদের বিবাহের মধ্য দিয়ে শুভ মিলনে মিটে গেল।

দুই জমিদারের প্রত্যেকেই অপরের প্রতিযোগীভাবে ঐশ্বর্য্য বিকাশের আয়োজনে মুক্তহস্ত—শিল্পে, সৌন্দর্য্যে ও আড়ম্বরে। সমবায়ে এ সবই ফিল্মটিকে অলঙ্কৃত করবে। বিবাহ সভায় নৃত্য গীতাদির জন্য—বোম্বাই, মহীশূর, মণিপুর, কাশ্মীর হতে নর্ত্তকীরা এসেছে। বাংলার প্রসিদ্ধরাও আছেন—প্রধানতঃ তাঁরাই বাসরের আনন্দ বর্দ্ধন করবেন।

ফল কথা—কাকারিয়া তাদের সৌন্দর্য্যের সাহায্যে তাঁর 'মরীচিকা' মঞ্চকে সাফল্যমণ্ডিত করে নাম কিনতে ও আমদানীর পথ করে নিতে চান।

ষ্টুডিওতে ফিল্ম তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে—প্রথম শ্রেণীর। সে জন্য বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করাও হয়েছে।

আবার দেশের খ্যাতনামা বিশিষ্ট পদস্থদের দর্শকরূপে নিমন্ত্রণ করাও হয়েছে। তাঁরা সজীব অভিনয়টা দেখবেন এবং তাঁদের অভিমত মত কাটছাঁট পরিবর্ত্তনও চলবে। কারণ ক্রেতার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কণ্ট্রাক্ট মধ্যে এসব সর্ত্তও আছে।

শৈলর সঙ্গে কাকারিয়া-কন্যা রুক্মিণীর সাক্ষাতের পর থেকে—তাদের সখিত্ব এখন ঘনিষ্ঠ—দেখা-শোনা প্রায়ই হয়। ষ্টুডিওতে অভিনয়াদি থাকলে শৈলকে আনিয়ে উভয়ে গোপনে দেখে। 'মধুরেণ' নাটকখানির খাতা তাকে দিয়ে লুকিয়ে পড়িয়ে শোনে। আজও তাকে আনিয়েছে।

শৈলরও অভিনয়াদি দেখবার সখ্ স্বাভাবিক। বিশেষ—লেখাপড়া জানা মেয়ে—নিজেও ভালমন্দ বুঝতে আরম্ভ করেছে। কি হলে বা কি করলে স্বাভাবিক ও ঠিক হয়, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে। কুমকুম নাম্নী যে সুন্দরী তরুণীটি—'পাত্রীর' মহলা দিতে আসে, তার দোষ-গুণ সমালোচনা করে। বলে—"ও-ভাবে দাঁড়ানটা ভুল, ও-কথাটি ও-সুরে বলাটা মানায় না" ইত্যাদি।

শুনে—রুক্মিণী হাসতে হাসতে বলে—"একদিন তুমিই ক'রে আমাকে দেখাও না ভাই। আমি কসম্ খেয়ে বলতে পারি, কুমকুমের চেয়ে তোমাকে ঢের বেশী মানাবে—ভাল দেখাবে। ওরা কেবল সেলাবতে থাকে, ঘষে মেজে চটক্ রাখে। সত্যি বলতে—না আছে সৌষ্টব, না সাইজ্। সরম রাখে না বলেই পুরুষদের অত ভাল লাগে।"

রুক্মিণীর কথা শৈল উপভোগ করে, হাসে। বলে—"ওইটাই ঠিক্ বলেছ, আমাদের সরমে বাধে, আড়ষ্ট হ'য়ে পড়বার ভয় থাকে। নইলে—শক্তটা আর কি, অনায়াসেই পারা যায়!" ইত্যাদি শুনলে মনে হয় ভদ্র ঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়েদের অভিনয়ের সাধ যে হয় না, এমন কথা বলা যায় না।

আজ সারা দিন কাকারিয়ার ষ্টুডিও কম্পাউণ্ডে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছে। গেট, মঞ্চ, উদ্যান, লতা-মণ্ডপ—সবই জীবনে যৌবনে যেন স্পন্দিত হচ্ছে—অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করেছে। বিচিত্র বর্ণের আধার বিদ্যুতালোক-দীপ্তি বিচ্ছুরিত করবার অপেক্ষা করছে। কর্ম্মীরা উত্তেজনা-চঞ্চল।

আজ 'মরীচিকা' মঞ্চের উদ্বোধন বললে হয়। আজকের সাফল্যের উপর কাকারিয়ার এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। উৎসাহ উত্তেজনার অন্ত নাই।

এইরূপ আসন্ন সময়ে শেঠজিকে না দেখতে পেয়ে কর্ম্ম-চারীরা চঞ্চল ও চিন্তিত হয়ে এদিক ওদিক চাইছিলেন।

কাকাবাবু হঠাৎ নিজের কোয়াটার থেকে বিশৃঙ্খল

এলোমেলো বেশে, অবিন্যস্ত কেশে, চিন্তামাখা মুখে তারিণী-বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।—"চলো একবার বম্বে থিয়েটরের মালিকের কাছে যেতে হবে, তাঁদের—'ফিমেল-ড্রেসার' আছেন।" এই বলতে বলতে তারিণীবাবুকে মোটরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর চাঞ্চল্য দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চাহি করলে।—"এ আবার কেন ?"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁরা ফিমেল ড্রেসার রেশমী-বাঈকে নিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে ফিরলেন ও তাঁকে নিয়ে বাড়ী ঢুকলেন।

এদিকে—সময়ের কিছু পূর্ব্বেই বিশিষ্ট দর্শকেরা আসতে আরম্ভ করেছিলেন। কাকাবাবু সহাস্য উৎফুল্ল মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সকলকে অভ্যর্থনা ও আদরআপ্যায়নে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন। রৌপ্যাধারে—আতর, গোলাপ, পান, জর্দ্দা, এলাচ, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ঘুরতে লাগলো।

৫

মঞ্চ পুষ্পলতার পারিপাট্যে মালঞ্চে পরিণত ও আলোকোজ্জল। বরাসনে বর ও সভাশোভন বেশে বর-যাত্রীরা উপবিষ্ট, কন্যা যাত্রীরাও উপস্থিত।

উভয় পক্ষের গুণী গায়কদের সঙ্গীতালাপাদি ও নর্ত্তকী-দের নৃত্য পর্য্যায়ক্রমে—শ্রোতা ও দর্শকদের নয়ন-মন-রঞ্জনে সচেষ্ট।

দেব-দর্শন বরের মুখশ্রী, দেহসৌষ্ঠব ও সজ্জা, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ও মহিলাদের চিত্ত-হরণ করছে।

লগ্ন উপস্থিত। বিবাহ কার্য্য একে একে যথারীতি পর্য্যায়ক্রমে চলিল—উৎসর্গ, স্ত্রী-আচার, কন্যা সম্প্রদানাদি।

তন্মধ্যে স্ত্রী-আচার দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য ও উল্লেখ-যোগ্য। বিজলী জ্যোতি-সমুজ্জল প্রাঙ্গণে নানা বর্ণের বিদ্যুতের মত সুবেশা—পুলক-চঞ্চলা তরুণী ও যুবতীরা কলহাস্যে রহস্য-মুখরা ও সুযোগ মত বরের কর্ণমর্দ্দন-তৎপরা। নিরীহ বর আজ মৃদুহাস্যে সবই সইছেন। অলঙ্কার ও বেনারসীর বিজ্ঞাপনের মত প্রৌঢ়া সুন্দরীর সুকোমল হস্তের বরণ বৈচিত্র্য ও বরকে চিরতরে ইঙ্গিতানুগামী পোষা পশুটি বানাইয়া রাখিবার প্রক্রিয়া ও প্রবচন—সকলের পরিজ্ঞাত হলেও বেশ উপভোগ্য হ'ল।—ক'নেকে সাতপাক্ ঘোরাবার পর—শুভদৃষ্টি।

বর ও কন্যা, উভয়ে উভয়ের সুপরিচিত ;—রিহার্সেল ক্ষেত্রে নিত্য দেখা ; সুতরাং পরস্পরের make up চাতুর্য্য দেখার ঔৎসুক্য ছাড়া, শুভ দৃষ্টির আগ্রহ বড় ছিল না। উভয়েই ভাবলে—বাঃ কি সুন্দর দেখাচ্ছে! কনের ঘোমটা খুলে দেওয়ায়—দেখে মেয়ে পুরুষ সকলেই রূপ-মুগ্ধ হলেন। কেহ কেহ ভাবলেন—বাংলা দেশ সজ্জা শিল্পে কি অভাবনীয় উন্নতিই করেছে—কুনকুমকে তো পূর্ব্বেও দেখেছি, এ যেন সে নয়!

এইবার হাফ্‌টাইমের অবকাশে, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী-দের রাজসূয়ের ব্যবস্থামত—ভূরি ভোজন আরম্ভ ও সমাপ্ত হল।

পরে কয়েকটি ছোটখাট 'আচার', উপভোগ্যভাবে শেষ হলে—বরবধূর "উজ্জলিত নাট্যশালাসম" বাসর ঘরে প্রবেশ।—রমণীকণ্ঠের সুমধুর রহস্যালাপ, নৃত্য-গীত। বরকে মধুর পীড়ন ও যুগলকে মধুর নির্য্যাতন চলিল। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে রমণীরা বাধাহীন—স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল—যা ইচ্ছা বলতে পারেন।—বরের অঙ্কে বধূকে তাঁরা বসাবেনই, বধূ কিন্তু নারাজ —লজ্জানত।"

বধূকে বর চুপি চুপি বললেন—"ও কি করছ, রিহার্সেল—মত হচ্ছে না যে, এসো" বলে হাত ধরে টানতেই একেবারে গায়ে গায়ে! অবগুণ্ঠিতা বধূ ধীর কাতর অথচ বিরক্তি-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন—"পায়ে পড়ি, ছাড়ুন, বড্ড মাথা ঘুরছে।"

বর চমকে গেল,—"এ কার কণ্ঠস্বর?"—পরে রমণীদের প্রতি—"একটু বাতাস করুন—শুতে দিন—শরীর ভাল নয়…"

শুনে কেউ হাসলেন, কেউ অবাক হয়ে বললেন—"এর মধ্যে এত? খুব নাবার শরীর যে!"

কেহ বললেন—"এর পর আর সাধাসাধি করতে হবে না, মাথাও ঘুরবে না।—মাথা ঘোরাবার জন্য নিজেই ঘুরে ঘুরে করে ঘুরবেন!"

পরক্ষণেই সুন্দরীদের নৃত্যগীতে বাসর জমে উঠলো। ও-সব ক্ষণিকের বিঘ্ন ফিল্মের কোনও অনিষ্টই করলে না—বাসরের স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই লোক বুঝলে।

সুন্দরী-নির্ব্বাচন ও অর্থব্যয় সার্থক ভেবে শেঠ কাকাবাবু উৎফুল্ল।

বরের মন কিন্তু নৃত্যগীতাদিতে ছিল না। তিনি

ভাবছিলেন—এত কুমকুম নয়, কুমকুম নির্দ্দিষ্ট অভিনয়ে এত আপত্তি করবে কেন! একটু আপত্তির ভাব থাকবে বটে—তারপর তো···। তবে এ সুন্দরী কে? স্বর যেন পরিচিত"···

পদস্থ অভিজ্ঞ দর্শকেরা কাকারিয়ার পিঠ চাপড়ে—প্রশংসাবাদ শোনাতে শোনাতে রাত তিনটার পর সব ফিরলেন।

ফিল্ম-ক্রেতা নিজে উপস্থিত থেকে সবই দেখলেন শুনলেন।

কুশণ্ডিকা বা বাসি-বিয়ে শেষ করলে—বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে। সকালে আবার কাজ চলল। বর্ত্তমান রুচি-বিরুদ্ধ হলেও তার আনুসঙ্গিক সব খুঁটিনাটিই তোলা হ'ল। নচেৎ কণ্ট্রাক্ট খারিজ হয়ে যাবে। ক্রেতা উচ্চবর্ণের হিন্দু-বিবাহের নিখুঁৎ চিত্র চায়।

কিন্তু দু'একটি স্থলে অসহায়া বধূ দর্শকদের লক্ষ্য বাঁচিয়ে চাপা গলায়—বরকে সংযত হতে বলতে বাধ্য হন।

স্বর শুনে বিস্মিত বর বধূর দিকে চম্‌কে চাইলেন। দিনের আলোয় চিনতে আর বাধল না। অশ্রুসিক্ত পল্লবে বধূকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে! বর মুগ্ধবৎ বলে ফেললেন—"তুমি!—দুঃখ কেন, অভিনয় সার্থক হয়েছে শৈল,·· তাই ত' বলি, এত রূপ আর কার!"

ছবি তোলা সুচারুভাবে শেষ হয়ে গেল।—শেঠজির আনন্দের সীমা নাই।—শৈলকে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন—মঞ্চের বাইরে গাঁঠছড়া বাঁধা অবস্থায় বরবধূ কথাবার্ত্তায় মগ্ন। তিনি কন্যা রুক্মিণীকে দেখাবার জন্য ডাকতে গেলেন।

৬

রুক্মিণী প্রচ্ছন্ন থেকে শুনলে—

শৈল বরকে বলছে—"এখন আমায় এই বেশেই আপনাদের বাড়ী নিয়ে চলুন—নেপেনদা। আমি আর এখন বাপের বাড়ী যেতে পারি না—যাব না। সে যেমন নিয়ম আছে সেই মত হবে"···

নেপেন ঠাট্টা ভেবে—কথা কইতে গেল।

শৈল তাকে দৃঢ়ভাবেই বুঝিয়ে দিলে—ঠাট্টা নয়।—"আপনি জানেন—বাবা সরল সাদাসিদে লোক, গরীব। কুমকুমের হঠাৎ 'কলিক্' চাগায়, কাকাবাবু বিপন্নভাবে বাবাকে বিপদ জানিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন।—কণ্ট্রাক্ট যায়, মান-সম্ভ্রম যায়, ভবিষ্যৎ যায়, মুখ রক্ষা করুন। শৈলকে মাত্র সেজে দাঁড়াতে দিন, মেয়ে ড্রেসার সাজিয়ে দেবে, কেউ চিনতে পারবে না। বিপদের সময় ব্যাপারটার গুরুত্ব কেউ ভাববার অবকাশ পান নি। বড়লোকের অনুরোধ গরীবদের এড়ানো বড় কঠিন। বাবাকে জানেন, তিনি অত শত ভাবেন নি। কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে—অভিনয় হলেও বিধি ব্যবস্থামত মন্ত্রপুত বিবাহ আমাদের যখন হয়ে গিয়েছে—আর তার ছবিও সাক্ষী হয়ে রইল, তখন আমায় আর বিবাহ করবে কে? ওঁরা কেউ তলিয়ে ভাবেন নি—পতিতা নিয়ে তো এ কাজ করা হয় নি!—একে আমার বাবা গরীব, অর্থাভাবে আমার বিবাহ দিতে পারছিলেন না; এখন দশগুণ দিলেও কেউ আমাকে বিবাহ করবে কি? আপনি জ্ঞানবান গ্রাজুয়েট হয়ে আমার দশা কি করলেন!—আমি কিছু জানতুম না—এই সাফায়ে নিজেকে বাঁচাবার পথ পেতেও পারেন,—কিন্তু আমাকে এ ভাবে ডুবিয়ে আত্মপ্রসাদ পাবেন কি?"

শুনে নেপেনের জিভ শুকিয়ে গেল—শৈলর কথা তো একটুও মিথ্যা নয়! সে চিন্তিতভাবে বিমর্ষমুখে বললে—"আমরা নিজেরাই খেতে পাই না, নচেৎ এখানে বিশ পঁচিশ টাকার লোভে সেজে অভিনয় করতে আসবো কেন? তোমাকে সুখী করা দূরে থাক, খেতে পরতে দেওয়াও যে আমার অবস্থায় অসম্ভব"···

শৈল বললে—"দুঃখের সংসারে আমি আজ তিন-চার বছর অনেক দুঃখ কষ্টের কথাই শুনে আসছি—আর তা বুঝতেও হয়েছে। তার মধ্যে একটা কথা—সংসারে সকলেই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে।—আমি কি কোন ভাগ্যই নিয়ে আসি নি"!

নেপেন নীরব।

শৈল শেষে বললে—"অভিনয়ের মধ্যে অনুচিত ও অভব্য ব্যাপারও বাদ যায় নি—যা সাধারণ অভিনেত্রীদের সঙ্গেই সাজে। এর পরেও কি আপনি গরীব হিন্দুর মেয়েকে ঘরে না নিয়ে, মরণের পথে ঠেলে দিতে চান?—তা ভিন্ন এখন আর আমার কোন পথ রইলো?" একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শৈল নীরব হ'ল।

সান্ত্বনা স্বরে—"চল বাড়ী যাই—চল শৈল" বলে নেপেন তার হাত ধরলে।

রুক্মিণী গোপনে থেকে শঙ্খধ্বনি করলে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু
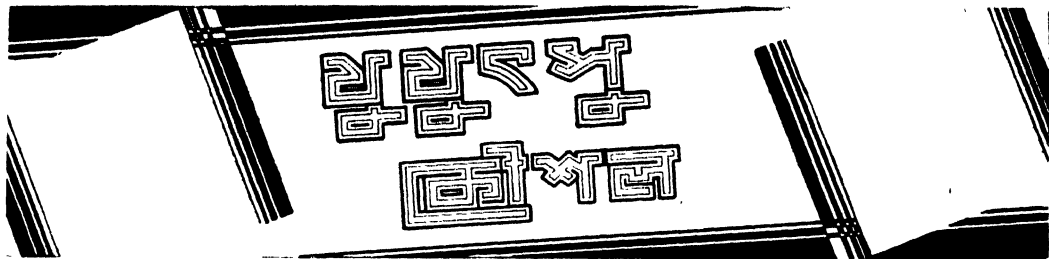
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮৩নং প্যাঁচ

যদি অপরের ডান পায়তারা থাকে, তবে তাহার ডান কব্জীটি (কিম্বা তাহার ডান হাতের জামাটি বা তাহার ডান কনুইয়ের কাছে) বাঁ হাত দিয়া জোরে ধরিয়া লইয়া, ডান হাতটি তাহার ডান বগলের নীচ দিয়া (বা তাহার হাতের উপর দিয়া) লইয়া গিয়া 'গুলির' কাছে চাপিয়া

৮৩নং প্যাচের প্রথম চিত্র

৮৩নং প্যাচের দ্বিতীয় চিত্র

ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিয়া ও সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া (৮৩নং প্যাচের ১ম ও ২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

জাপানীতে এই প্যাচটিকে "Kakaeshi," ইংরাজীতে "Cross Hook" বলে। ইহা ভারতীয় কুস্তির "বাগাল্লী" প্যাচের ন্যায়।

৮৪নং প্যাঁচ

যদি অপরে ডান পায়তারা করিয়া ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া যদি তাহার ডান হাতটি কনুই হইতে

উপরে মোড়া অবস্থায় থাকে তবে ডান হাতটি তাহার কনুইয়ের নীচে রাখিয়া (৮৪নং প্যাচের ১ম চিত্র) তাহার হাতটি কনুই হইতে মুড়িয়া উপরে তুলিয়া নিজের কনুইটি তাহার ডান বগলে রাখিয়া আটকাইয়া বাঁ হাতে ধরা মুঠোটি মোচড়, কব্জীটি চাড় দিতে দিতে নিজের দিকে টানিয়া 'মোড়াতে' চাড় দিবার (৮৪নং প্যাচের-২য় চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক

প্যাচের প্রথম চিত্র

৮৪নং প্যাচের তৃতীয় চিত্র

৮৪নং প্যাচের দ্বিতীয় চিত্র

৮৫নং প্যাচের প্রথম চিত্র

দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিয়া ও সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া (৮৪নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৮৫নং প্যাঁচ

যদি অপরে ডান পায়তারা করিয়া ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া, যদি তাহার ডান হাতটি কনুই হইতে উপরে মোড়া অবস্থায় থাকে তবে ডান হাতটি তাহার ডান

৮৫নং প্যাঁচের দ্বিতীয় চিত্র

৮৫নং প্যাঁচের তৃতীয় চিত্র

৮৬নং প্যাঁচের প্রথম চিত্র

৮৬নং প্যাঁচের দ্বিতীয় চিত্র

বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া (৮৫নং প্যাচের-১ম চিত্র) তাহার ডান কব্জীটি ধরিয়া তাহার মোড়াতে ও কনুইয়ে

৮৬নং প্যাচের তৃতীয় চিত্র

৮৬নং প্যাচের চতুর্থ চিত্র

মোচড় এবং বাঁ হাত দিয়া তাহার ধরা ডান মুঠোটি মোচড় ও কব্জীটি চাড় দিবার (৮৫নং প্যাচের-২য় চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া জোরে

৮৭নং প্যাচের চিত্র

পিছনে তুলিয়া ও সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া (৮৫নং প্যাচের-৩য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৮৬নং প্যাচ

যদি অপরের ডান পা-বতারা থাকে, তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান কব্জীটি ধরিয়া, তাহার ডান হাতটি একটু

৮৮নং প্যাচের চিত্র

তুলিয়া এবং নিজে নীচু হইয়া মাথাটি তাহার ডান হাতের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া নিজের ঘাড়ের উপর তাহার ডান

৮৯নং প্যাঁচের চিত্র

কনুইটি চিৎ করিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটি তাহার চিবুকে লাগাইয়া (৮৬নং প্যাঁচের-১ম চিত্র) কিম্বা

৯০নং প্যাঁচের প্রথম চিত্র

ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের একটু নীচে ধরিয়া (৮৭নং প্যাঁচের-২য় চিত্র) নিজে সোজা হইয়া তাহার ডান কনুইয়ে চাড় ও কব্জীতে মোচড় দিবার (৮৬নং প্যাঁচের-৩য় চিত্র) সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিয়া ও সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া (৮৬নং প্যাঁচের-৪র্থ চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৮৭নং প্যাঁচ

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে তবে তাহার জামার কোমর-বন্ধটির দুইধার দুই হাতে ধরিয়া লইয়া বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান ধার দিয়া লইয়া গিয়া পিছনে আটকাইয়া তাহার ডান পা-টি টানিয়া লইয়া সামনে

৯০নং প্যাঁচের দ্বিতীয় চিত্র

ঝোঁক দিয়া (৮৭নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৮৮নং প্যাঁচ

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে তবে তাহার ডান হাতটি বাঁ হাত দিয়া ধরিয়া লইয়া ডান হাতটি তাহার ডান বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া 'গুলির' কাছে চাপিয়া ধরিয়া টানিবার (কিম্বা ডান হাত দিয়া তাহার ডান কনুইয়ের কাছের জামাটি ধরিয়া টানিবার) সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-টি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান পা-টি টানিয়া লইয়া সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া (৮৮নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৮৯নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে দুই হাত দিয়া গলাটি টিপিয়া

ধরে এবং যদি তাহার বাঁ পা-টি আগান থাকে তবে বাঁ হাতটি তাহার চিবুকে (কিম্বা বাঁ পুর বাহুটি তাহার গলার নলীতে) লাগাইয়া এবং ডান হাতটি তাহার কোমরের পিছনে ও ডান পা-টি তাহার বাঁ পায়ের বাঁ দিক দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া তাহার বাঁ পা-টি টানিয়া লইয়া সামনে শরীরের ঝোঁক দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোমরটি টানিয়া ও চিবুকটি ঠেলিয়া দিয়া (৮৯নং প্যাচের-চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯০নং প্যাঁচ

নীচু হইয়া দুই হাত দিয়া অপরের দুই হাঁটুর একটু উপরে জড়াইয়া ধরিয়া (৯০নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) তাহার পা দুইটি টানিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (৯০নং প্যাঁচের-২য় চিত্র) নিজে যে পায়তারা করিয়া প্যাঁচটি করিতে যাইবে মাথাটি সেই দিকেই রাখিতে হইবে ও তাহার পা-দুইটি বিপরীত দিকে টানিতে হইবে।

মৃত্যু !!!

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্‌-এম্‌-এস্‌

(১)

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। উৎসন্নপ্রাপ্ত একটি ধনীর দুলাল আর্থিক ও শারীরিক চরম দুর্গতি লইয়া আমার শরণাপন্ন হন। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া আমি তাঁহার আত্মীয়-দিগকে সতর্ক করিয়া দিবার ৫।৬ দিনের মধ্যে, এক সন্ধ্যায়, বাক্‌রোধ ও জ্ঞানলোপের সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদির আক্ষেপ হইয়া, "সব শেষ" হইয়া গেল। এ "রায়" যে সুধু আমিই দিলাম তাহা নহে, একজন প্রবীণ প্রথিতযশঃ বিজ্ঞ চিকিৎসকও দিলেন। ক্রন্দনের রোল উঠার সঙ্গে সঙ্গে অবধৌতমতে চিকিৎসক প্রতিবেশী একটি ভদ্রলোক কি সামান্য চূর্ণ "মৃতের" জিহ্বায় লাগাইয়া দিলেন। তিন চার মিনিটের মধ্যে, প্রায় একটি কলস-প্রমাণ প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে "মৃত" ব্যক্তিটি চক্ষু মেলিল ও আমি বুঝিলাম—কি মারাত্মক ভুলই করিয়াছিলাম! কিন্তু এ পুনরুদ্দীপনা বারো ঘণ্টার জন্য—তাহার পরে সত্য সত্যই সমস্ত শেষ হইল!

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্যামবাজারের কোনও উদীয়মান উকীলের পত্নী সুধু "মৃতা" হন নাই, শ্মশানেও নীতা হইয়াছিলেন। ঐ "মৃতার" শ্বশুরমহাশয় পরম নাড়ী-তত্ত্ববিৎ ছিলেন—তিনি স্বয়ং দাহের আয়োজন করিবার পরামর্শ দেন। ঐ ব্রাহ্মণী শ্মশানে পুনরুজ্জীবিতা হইয়া গৃহে নীতা হন এবং প্রায় দুই মাস পরে সত্য সত্যই মৃতা হন।

তৃতীয় ঘটনা—আমার পরম সুহৃৎ ডাঃ মিত্র (এক্ষণে স্বর্গগত, অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন) স্বয়ং যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা এই :—"......সালে আমার বিসূচিকা ব্যারাম হয়, ও মৃতবোধে আমাকে বাড়ীর উঠানে নামান হয়। তখন বিসূচিকায় হৃৎপিণ্ডের স্থানে ও পেটে বেলেস্তারা প্রয়োগের প্রথা ছিল; কিন্তু দেহ মধ্যে লবণাক্ত জল প্রবিষ্ট করিবার প্রথা ছিল না। যাহা হউক, আমি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যেন ঘুমাইয়া পড়িতে লাগিলাম; আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দনরোল যেন ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর ও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল;—অথচ আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আত্মীয়স্বজনকে বুঝাইতে—যে আমি মরি নাই;—কিন্তু পরে শুনিলাম যে, আমার কল্পিত সমস্ত চেষ্টাই বাহিরে অপ্রকাশিত ছিল! যাহা হউক, এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ যে যে স্থানে বেলেস্তারা বসান হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে প্রথমে সুড়্‌সুড়ি, পরে পর্য্যায় ক্রমে—কণ্ডূয়ন, অস্বস্তি, জ্বালা, বৃশ্চিক দংশন ও অগ্নিদগ্ধের অনুভূতি হইতে লাগিল; এবং শেষে, জ্বালার চোটে, আমার চক্ষু-পল্লব প্রথমে আন্দোলিত, পরে মুক্ত হইয়া গেল; ক্রমে দূরাগত ক্রন্দনের রোল স্পষ্টতর হইতে লাগিল। এই ভাবে আমি বাঁচিয়া গেলাম।" এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে তিনি আমাকে ইহা বলেন।

এই তিনটি দৃষ্টান্তই আপাততঃ যথেষ্ট। মৃত্যু কি?

এই প্রশ্নই ইহার পরে উঠে। মৃত্যু কি, উত্তর দিতে গেলে প্রাণ কি ও কোথায় থাকে, সেই প্রশ্নই আগে উঠে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, এই দুইটি প্রশ্নের কোনটিরই সদুত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সত্য বটে যে, আমরা নাড়ী ধরিয়া ও শ্বাসকার্য্য চলিতেছে কি না—এই দুইটি পরীক্ষা করিয়াই "জবাব দিই"। কিন্তু এই পরীক্ষাদ্বয় যে কত হাল্কা ও কত ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল, তাহা উপরের দৃষ্টান্তত্রয় হইতে ও অপর কয়েকটি বিষয় হইতে সুপ্রকট হইবে।

(২)

বোম্বাই প্রদেশে ডাঃ ভি, জি, রীলি তৎপ্রণীত "মায়াময়ী কুণ্ডলিনী" নামক ইংরাজী পুস্তকে "দেশবন্ধু" নামক একটি লোকের বিবরণ দিয়াছেন। বক্ষো-পরীক্ষা যন্ত্র ষ্টেথস্‌কোপ, ক্ষীণ শব্দ স্পষ্টতর-কারী ফনেণ্ডস্কোপ, রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া, বোম্বাই সহরের চিকিৎসকমণ্ডলী দেশবন্ধুকে পরীক্ষা করেন। দেহের যেখানে ইচ্ছা, ফরমাইস মত, সে অংশের নাড়ী স্পন্দন বন্ধ করা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করাই ছিল এই ব্যক্তির বিশেষত্ব। আবার মজা এমনি যে, বাহুতে নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ করিলেও মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যাইত। যাহা হউক এই দেশবন্ধু বোম্বাই-এর চিকিৎসকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিলেও, রঞ্জন রশ্মি পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গিয়াছিল যে, এক সেকেণ্ডের জন্যও হৃৎপিণ্ডের আসল কায বন্ধ হয় নাই—তবে বাহিরে, অর্থাৎ বক্ষোপরি, হৃৎপিণ্ডের এতটুকু স্পন্দনও তখন বুঝা যায় নাই—রঞ্জন রশ্মি যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছিল যে, হৃৎপিণ্ডটি ক্রমশঃই আকৃতিতে ক্ষুদ্র ও স্পন্দনে লঘু হইতেছিল। দুঃখের বিষয়, তখন Electro-cardiogram যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, যখন মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ পঞ্জাবাধিপতি ও লর্ড ড্যালহৌসি ভারতের শাসনকর্ত্তা, তখন সর্ব্বজন সমক্ষে সিন্দুকের মধ্যে হরিদাস সাধুকে পুরিয়া, গভীর গর্ত্তের মধ্যে ৪২ দিন প্রোথিত রাখার পরে, উঠাইয়া সামান্য চেষ্টা করাতেই তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে "বসুমতী" আপিসে, স্বর্গগত যোগানন্দ স্বামী (ইন্দুভূষণ লাহিড়ী) ও বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীমান উমাপদ মুখোপাধ্যায় অনুরূপ পরীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ও ১০ই জুন এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বরের "অমৃত বাজার পত্রিকায়" এবং ভিন্সেণ্ট অ্যাণ্ডার্সন প্রণীত "Land of miracles—India" গ্রন্থে আরো পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের Popular Mechanics-এ বার্লিন সহরে অষ্টাহ প্রোথিত থাকার পরে পুনরুজ্জীবিত হইবার কাহিনী বর্ণিত আছে।

ষ্টেথস্‌কোপ আবিষ্কারের পূর্ব্বযুগে, পাশ্চাত্য দেশে কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড নামক একজন সৈনিক পুরুষ "স্বেচ্ছামৃত্যুর" পরীক্ষা দিতে দিতে একবার সত্যকার মৃত্যুমুখে পতিত হন। এডিনবরার ডাঃ ডান্‌কান্ একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরও ঐরূপ ক্ষমতার পরিচয় লিখিয়া গিয়াছেন।

(৩)

উলিয়াম্ টেব্ ও কর্ণেল ই, পি, ভোলাম্ প্রণীত "Premature Burial" নামক পুস্তকে বহু বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে—সমাধিপ্রাপ্ত এবং কফিন্ নামক শবাধারে বদ্ধ বহু "শব" প্রোথিত হইবার পরে কফিনের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছে, জামা-কাপড় ছিঁড়িয়াছে, কফিন্ ভাঙিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য দেশে এ দেশের মত দ্রুত সমাধি দেওয়া হয় না; হিন্দুমতে অন্যূন দ্বাদশ দণ্ড (প্রায় ৫।০ ঘণ্টা) অতীত না হইলে শব স্থানান্তরিত করা হয় না এবং কেহ মরিলে তাঁহার আত্মীয়কে শবের পার্শ্বে শব স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিবার যে অনুজ্ঞা এদেশে আছে তাহা অতীব বিজ্ঞানসম্মত প্রথা—যদি না ছোঁয়াচে ব্যারামে লোকটির মৃত্যু হইয়া থাকে। মুসলমানদের মধ্যে শবকে ধুইয়া মুছিয়া শব বাহির করিতেও অন্যূন ছয় ঘণ্টা লাগে। পার্শীরা মৃতের পার্শ্বে আগুন জ্বালাইয়া রাখেন এবং পালিত কুকুর দ্বারা শোঁকাইয়া মৃত কি মৃতপ্রায় তাহা বুঝিয়া লন এবং তাঁহাদের Tower of Silence-এ শব রাখিলেও, শকুনি গৃধিনীরা নাকি শব স্পর্শ করে না, যতক্ষণ সেটি পচিতে আরম্ভ করে। এদেশে খৃষ্টানদের মধ্যে, ঘটনা চক্রে ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টা শবটিকে ঘরে রাখিতে হয়। বৌদ্ধরা মৃত্যুর দ্বাদশ ঘণ্টা পরে শবের সৎকার করেন। পাশ্চাত্য দেশে, অন্যূন চার দিন ঘরে শব রাখিবার নিয়ম;—তাহার পরেও ২।৫ দিন রাখা চলে—পচন আরম্ভ হইবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত।

দেশাচার মত, কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের শব কতক্ষণ রাখা হয়, তাহার তালিকা দিলাম।

কলেরা (ওলাউঠ), মৃগী, সর্দ্দিগর্ম্মি, ইনফ্লুয়েঞ্জা; ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা চৈতন্যাপহরণের পরে, জলে ডুবিলে, উদ্বন্ধনের পরে. শৈত্যাধিক্যের মধ্যে অনাহারে থাকার পরে; অহিফেন, ডিজিটেলিস্, গঞ্জিকা, অ্যাট্রোপীন্, ক্লোরাল হাইড্রেট্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে; প্রসবের পরে অতিমাত্রায় "রক্ত ভাঙ্গার" পরে, অতিশোকে বা অত্যুল্লাসের পরে মোহগ্রস্ত অবস্থায়; এবং জন্মিবার পরক্ষণেই বা দন্তোদ্গম-কালে আক্ষেপের পরে;—এই এতগুলি অবস্থায়, মানব জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে বহুক্ষণ থাকিতে পারে;—বিজ্ঞ চিকিৎসকরাও সকল ক্ষেত্রে যথাযথ অবস্থা নির্ণয়ে অক্ষম হইতে পারেন—অন্যে পরে কা কথা? জলে মগ্ন হইবার পরে মৃতপ্রায় দেহ লইয়া এক টানা ৮॥ ঘণ্টা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস কার্য্য চালানর পরেও দেহে প্রাণ আসিয়াছে।

আবার ইহাদের উল্টা অবস্থারও পরিচয় লউন। টেলারের Medical Jurisprudenceএর প্রথম খণ্ডের ২২৬ পৃষ্ঠায় একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে—মুণ্ডচ্ছেদনের পরেও পনর মিনিট ধরিয়া হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়াছিল।

(৪)

অনেকে কুম্ভকর্ণের বিবরণ ও ওয়াশিংটন্ আর্ভিংএর Rip Van Winkleএর গল্প পড়িয়াছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার ইলিনয়েসবাসী Patricia Macguireএর বিবরণ মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত হয়; তখনও তিনি এক বৎসর পনর দিন নিদ্রাতুরা। হঠাৎ তিনি নিদ্রিত হন ও কেহই তাঁহাকে জাগাইতে পারে নাই।

শীতপ্রধান দেশে ও প্রচণ্ড শীতের সময়ে অনেক দেশেই, খাদ্যের দারুণ অভাব ঘটে বলিয়া কাঠবিড়াল, শৃগাল, বাদুড়, শামুক, খরগোশ, ভল্লুক, ভেক, কচ্ছপ, সাপ, মৌমাছি, পিঁপড়া প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণী শীতের অনতিপূর্ব্বে অতিমাত্রায় ভোজন করিয়া বেশ স্থূলকায় হইয়া লইয়া কোন গুহায় বা অন্যত্র যোগনিদ্রায় (Hibernation) অভিভূত থাকিয়া শীত কাটায়। সাধারণতঃ জলে ডুবাইলে বাদুড় স্বল্পকালের মধ্যেই মরিয়া যায়। কিন্তু ঐভাবে যোগনিদ্রাভিভূত একটি বাদুড়কে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শীতল জলে ডুবাইয়া রাখার পরে স্বস্থানে তাহাকে পুনঃ স্থাপিত করা হয়। যোগনিদ্রার অবসানে (গ্রীষ্মের প্রাক্কালে) সে বাদুড়টি বাঁচিয়া ছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল—যোগনিদ্রাকালে বাহিরের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য একরকম বন্ধই থাকে।

কতকগুলি প্রাণী যেমন শীতকালে ঘুমায়, গ্রীষ্মকালে নদীর জল কমিলে কোথাও কোথাও কুমীররাও ঐভাবে যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। ইহাকে hibernation না বলিয়া, Æstivation বলা হয়। ফলে উভয় অবস্থাই এক;

এই সঙ্গে কীট জীবনে মূক-কীটাবস্থা (pupa or imago stage)—প্রজাপতির গুটিকাবস্থা (cocoon stage)ও স্মরণযোগ্য।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যখন একজন কৃষক কয়েকটি মেষ লইয়া ইংলণ্ডের উত্তরাংশে কোন প্রান্তর পার হইতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ প্রচণ্ড তুষারবাত্যা (blizzard) উপস্থিত হওয়ায় কৃষকটি কোনও গতিকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে; কিন্তু সমস্ত মেষপাল বরফ চাপা পড়ে। প্রায় একমাস পরে, বরফ সরাইয়া সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করার পরে প্রত্যেক মেষটিই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।

এই যোগনিদ্রাকালে প্রাণীরা মরে না; নিশ্চল নিস্পন্দ থাকায় তাহাদের দেহের ক্ষয় অতীব সামান্য হয় এবং এই সময়ে তাহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ও শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্যও এত সামান্যভাবে চলে—কিন্তু সত্য সত্যই চলে—যে বাহ্যতঃ তাহার প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর।

(৫)

এই প্রসঙ্গে Catalepsy নামক একটি বায়ু রোগের (hysteriaর) কথাও উল্লেখ করিতে চাই। এটি খুব অসাধারণ ব্যাধি—আমি মাত্র একটি রোগিণী পাইয়াছিলাম। এ ব্যারাম স্ত্রীলোকদেরই হয় এবং এরূপ অবস্থায় ঠিক পূর্ব্বক্ষণে স্ত্রীলোকটি যেমন হাবভাবে ছিলেন তদবস্থায় "কাঠ" হইয়া যান—তাঁহার সমস্ত ঐচ্ছিক ক্রিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়—শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে কি না, তাহা সময়ে সময়ে বুঝা দুরূহ হয়, দেহ দ্রুত শীতল হইয়া যায়। এই অবস্থা কয়েক মিনিট হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। Dementia নামক মনোভ্রংশ ব্যাধিতেও

katatonia নামক অনুরূপ অবস্থা সময়ে সময়ে দেখা যায়। ইহা মৃত্যু নয়—মৃত্যুর খুব কাছাকাছি অবস্থা বটে।

(৬)

উপরে জীবিত ও মৃত—জীবন ও মরণ—উভয়ের সন্ধিস্থলের বহু প্রকারের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। কিন্তু প্রাণ কি, তাহা বলিতে পারি নাই—প্রাণ কোথায় থাকে তাহাও জানি না: তবে মৃত্যু হইয়াছে কি না হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন নয়। পাশ্চাত্যমতে দেহের প্রত্যেক কোষই প্রাণময়; তবে ব্রেণ ও মেডালা অবলংগেটা (সহস্র দল পদ্মেই) প্রাণ-ক্রিয়ার মূল স্থান।

পাশ্চাত্য চিকিৎসামতে মৃত্যু দুই প্রকারের—লৌকিক মৃত্যু (general death) ও দৈহিক মৃত্যু (cellular বা somatic death)। প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে বহুক্ষণ হৃৎপিণ্ড চলে। একসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শেষ হওয়াই লৌকিক মৃত্যু (general death)। কিন্তু তখনও সারা দেহের সমস্ত কোষগুলি বাঁচিয়া থাকে। ১৯৩৪ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ফ্রেডারিক্ ওয়াট্‌সনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তিকে ক্লোরোফর্ম্ম শোঁকানর ফলে তাহার হৃৎপিণ্ডের কায বন্ধ হয়: পুরা পঁয়তাল্লিশ মিনিট heart massageএর পরে তাহার হৃৎপিণ্ড পুনরায় ধাতস্থ হইতে পারিয়াছিল, কারণ তাহার হৃৎপিণ্ডের কোষগুলি ও দেহের তাবৎ কোষসমূহ জীবিত ছিল বলিয়া। যদি লবণাক্ত শীতল জলে রাখা যায়, ত' ভেকের রক্তের শ্বেত কণিকাকে (white corpuscles) এক বৎসর কাল জীবিত রাখা যায়। "মৃত্যুর" আঠারো ঘণ্টা পরেও মানুষের হৃৎপিণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করা গিয়াছে (New Health, May, 1935)। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ অস্ত্রবিশারদ অ্যালেক্‌সিস্ ক্যারেল্ উষ্ণ লবণ জলে একটি মুরগী শাবকের হৃৎপিণ্ডের কিয়দংশ রাখিয়াছেন; একটা মুরগী সাধারণতঃ ১০।১২ বৎসর না বাঁচিলেও ঐ হৃৎপিণ্ডের মাংসখণ্ড এখনো যথারীতি স্পন্দিত হইতেছে। গত বৎসরে (১৯৩৪ কি ১৯৩৫ ঠিক স্মরণ নাই) একটি মার্কিণ চিকিৎসক সদর্পে বলিয়াছিলেন যে সত্যিকার (লৌকিক) মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পরে পর্য্যন্ত তিনি দুইটি সূক্ষ্ম তার হৃৎপিণ্ডে লাগাইয়া বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় লোককে প্রাণ-দান করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার আহ্বানে কেহ সাড়া দেন নাই। সাধারণ মৃত্যুর পরেও দেহকোষ সমূহের মৃত্যু (somatic death) হয় না বলিয়াই, গ্যালভানি বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর লক্ষণগুলিকে সাধারণতঃ তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়; যথা—

(১) সম্ভাবিত (Probableones):—
   (ক) হৃৎপিণ্ডের কায বন্ধ;
   (খ) শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ;
   (গ) নানারূপ কষ্টকর উত্তেজনা সত্ত্বেও চর্ম্মের বোধশক্তির লোপ;
   (ঘ) চর্ম্ম—বিবর্ণ হওয়া;
   (ঙ) চক্ষু ঘোলাটে হওয়া, বসিয়া যাওয়া;

(২) নিশ্চিত (Positiveones)
   (ক) দেহ কঠিন হইয়া যাওয়া;
   (খ) দেহ ক্রমশঃ শীতল হওয়া;
   (গ) রক্ত দলা বাঁধা;
   (ঘ) দেহের সর্ব্ব নিম্ন স্থানগুলি বিবর্ণ হইয়া যাওয়া।

(৩) সুনিশ্চিত (Surestone)
   (ক) দেহে পচন ধরা।

পাশ্চাত্য দেশে, যতক্ষণ কোনও সুচিকিৎসক বা করোনার সার্টিফিকেট না দেন, ততক্ষণ শব প্রোথিত করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। ফাঁসির আসামীর হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসক্রিয়ার স্তব্ধতা ব্যতীতও শিরাচ্ছেদ দ্বারা রক্ত মোক্ষণের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়; অর্থাৎ, যতক্ষণ "প্রাণ" থাকে, ততক্ষণ ধমনীর (arteryর) রক্ত ছিট্‌কাইয়া পড়ে (in spirts),—মৃতের রক্ত গড়াইয়া পড়ে। Morgue বা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদাগারে সাধারণতঃ দেহ আড়ষ্ট না হইলে ও অধিকাংশ সময়ে পচন আরম্ভ না হইলে, শব ব্যবচ্ছেদ করা হয় না।

মৃত্যুর মত ধ্রুব অপর কিছুই নহে—অথচ মৃত্যুর মত ভীষণ ব্যাপারও আর কিছু নাই। ইহার বিভৎসতা জানিয়াও যে মৃত্যুর আলোচনা কেন করিলাম, তাহা জানি না। বস্তুতঃ "চালে ডালে এক করা" ছাড়া যে বেশী কিছু করিতে পারিয়াছি, তাহা মনে হয় না।

ভাবনির্ণয়ে বিভিন্ন মত

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম-এ

ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্রগুলি প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; যথা—মেষাদি দ্বাদশটি রাশি, তন্বাদি দ্বাদশটি ভাব এবং নয়টি গ্রহ (অধুনা ১২টি)। এই তিনের সমবায়ে জাতকজীবনে ও অন্যান্য গণনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফল কল্পনা করা হইয়া থাকে। এ সকলের মধ্যে দ্বাদশটি ভাব (The Houses) এবং ভাব বিভাগ-প্রণালী এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই ভাব বিভাগ লইয়া পাশ্চাত্য দেশে বহুপ্রকার আলোচনা ও গবেষণার ফলে তথায় ভিন্ন ভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যাহা হইয়াছিল তাহার কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানকালে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনও স্বাধীন চিন্তাধারা নাই। তাহার ফলে আমরা আমাদের প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রচিত সারণী (table) অনুসারে ভাবনির্ণয় করিয়া ফলাদেশ করিতেছি। ভাবনির্ণয়ে এই প্রকার নির্ব্বিচারে পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুসরণ যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হইতেছে কি না, তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য বিষয়। অবশ্য কোন্ মত গ্রহণীয় ও কোন্ মত পরিত্যাজ্য সে বিষয়ে স্থির নির্দ্দেশ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রতি মতের দোষগুণ বিচার করিয়া তাহার যৌক্তিকতা অনুসারে সুধীগণ স্থির করিবেন যে, কোন্ মত গ্রহণ করিলে ফল মিলিবার সম্ভাবনা অধিক।

গ্রহগণ সব সময়েই খগোলে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু শিশুর জন্মকালে জন্মস্থান হইতে খগোলের যে অংশে যে গ্রহকে অবস্থিত দেখা যায়, তদনুসারেই গ্রহ-দেবতারা জাতকের উপর ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আকাশের এই অংশ বিভাগ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ খগোলকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাগকে 'ভাব' বলা হয়। যেমন পূর্ব্বক্ষিতিজ সংলগ্ন অংশ লগ্ন ভাব, মস্তকো-পরিস্থিত অংশ দশম ভাব ইত্যাদি। এই প্রকারে কতকগুলি রেখা (বা বৃহৎ বৃত্তাংশ) দ্বারা প্রতি ভাবের জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই রেখাগুলিকে ভাবের সীমারেখা বলা যায়। পূর্ব্বক্ষিতিজরেখাই (eastern horizon) লগ্নভাবের সীমারেখা, তদ্রূপ ঊর্দ্ধ যাম্যোত্তর বৃত্ত (upper meridian) দশম ভাবের, পশ্চিমক্ষিতিজ সপ্তম ভাবের এবং অধঃ যাম্যোত্তর বৃত্ত চতুর্থ ভাবের সীমারেখা। কিন্তু এই সীমারেখা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত এক নহে। পাশ্চাত্য মতে এই সীমারেখা বাস্তবিকই সীমাজ্ঞাপক রেখা, এই রেখা হইতেই ভাবের আরম্ভ ; যেমন লগ্নভাব পূর্ব্বক্ষিতিজ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০° অংশ নিম্ন অবধি বিস্তৃত। উক্ত স্থানের মধ্যে কোন গ্রহ থাকিলে সে গ্রহ লগ্নস্থ। যখনই সে গ্রহটি উদিত হইল অর্থাৎ ক্ষিতিজের উপরে আসিল, তখনি উক্ত গ্রহ লগ্নভাব পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশভাবে আসিয়া পড়িল। হিন্দুমতে কিন্তু উক্ত রেখাকে সীমারেখা না বলিয়া ভাবের কেন্দ্ররেখা (বা মধ্যরেখা) বলা উচিত ; কেন না ক্ষিতিজের প্রায় ১৫° অংশ ঊর্দ্ধ হইতে প্রায় ১৫° অংশ নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানকে হিন্দুমতে লগ্নভাব বলা হয়। এ বিষয়ে হিন্দুমতই বোধ হয় অধিকতর সত্যাভিমুখী। কোন্ মতে অধিক ফল মিলে তাহা অবশ্য ফল বিচারে সুদক্ষ পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা হইতে স্থির করাই ভাল। যাহা হউক, ভাবনির্ণয়ে পাশ্চাত্য মতেরই আমরা আলোচনা করিব, কেন না প্রাচ্যমতসমূহও পাশ্চাত্যের মধ্যেই নিহিত ; সেই জন্য ভাবের কেন্দ্ররেখা সংজ্ঞা ব্যবহার না করিয়া ভাবের সীমারেখা সংজ্ঞাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহার করা হইবে।

গ্রহগণ রাশিচক্রে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে। রাশিচক্র একটি রেখা নহে ; ক্রান্তিবৃত্তের (ecleptic) উভয় পার্শ্বে ৭॥০ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানকে রাশিচক্র বলা হয়। গ্রহের যখন শর (celestial latitude) থাকে না, তখন সে গ্রহ ক্রান্তিবৃত্তের উপরে অবস্থিত। গ্রহের উত্তর বা দক্ষিণ শর থাকিলে, ক্রান্তিবৃত্ত হইতে সেই পরিমাণে উত্তরে বা দক্ষিণে গ্রহটি অবস্থান করে। সেই গ্রহের স্থান হইতে ক্রান্তিবৃত্তে লম্বপাত করিলে যে বিন্দু পাওয়া যায় তাহাই গ্রহের ক্রান্তিবৃত্ত স্থান ; এই বিন্দুর অবস্থানই পঞ্জিকাতে গ্রহস্ফুট বলিয়া উল্লিখিত হয়। এখন কথা হইতেছে, ফলিত জ্যোতিষে গ্রহের বাস্তবিক অবস্থান গ্রহণ করিতে হইবে, না গ্রহের ক্রান্তিবৃত্ত স্থান লইতে হইবে। জন্মকালে গ্রহগণ খগোলের বিভিন্নস্থানে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রকারে জাতকের শুভাশুভ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, সুতরাং গ্রহগণের বাস্তবিক অবস্থানই যে ফলপ্রদাতা সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না। অপর পক্ষে, গ্রহ হইতে কাল্পনিক রেখা ক্রান্তিবৃত্তে (বা অপর কোনও বৃত্তে) গ্রহের প্রভাব নামিয়া আসিয়া তথা হইতে আমাদের নিকট চলিয়া আসে অর্থাৎ গ্রহের ক্রান্তিবৃত্ত স্থানই ফলপ্রদাতা, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে যাহা হউক, জ্যোতিঃশাস্ত্রকারগণ গ্রহগণের বাস্তবিক অবস্থান হইতে ফলপ্রদানের মূলতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কেন না সূক্ষ্ম গণনার সময়ে গ্রহগণের প্রকৃত ভাবাবস্থান (exact house position, ভাবের সীমারেখা হইতে প্রকৃত গ্রহের দূরত্ব) নির্ণয় করিবার নিয়ম রহিয়াছে। আবার দেখা যায় যে, Direction (গ্রহ-চালন) গণনার সময়ে গ্রহের বাস্তবিক অবস্থানের বিষুবাংশ (Right Ascension) লইবার ব্যবস্থা আছে, গ্রহের ক্রান্তিবৃত্তস্থানের বিষুবাংশ লইবার কথা নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ফলিত জ্যোতিষে গ্রহগণের ক্রান্তিবৃত্তস্থান না লইয়া বাস্তবিক অবস্থান লওয়াই কর্ত্তব্য।

এখন দেখা যাউক, লগ্ন ও দশম ভাব কাহাকে বলে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি গোলাধ্যায়ে এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বোঝান আছে—"যত্র লগ্নমপমণ্ডলং কুজে তদ্‌গৃহাত্তমিহ লগ্নমুচ্যতে। প্রাচি পশ্চিমকুজেহস্তলগ্নকং মধ্যলগ্নমিতি দক্ষিণোত্তরে॥" অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশ পূর্ব্বক্ষিতিজে সংলগ্ন হইয়াছে বা what is rising তাহাই লগ্ন বা Ascendant। অতএব যে গ্রহ পূর্ব্বক্ষিতিজ সংলগ্ন অর্থাৎ যে গ্রহ উদিত হইতেছে তাহাই প্রকৃত লগ্নস্থ। দশমকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মধ্যলগ্ন বলিয়াছেন, এবং ইংরাজীতে উহাকে M. C. (medium cœli) অর্থাৎ Mid-Heaven বা খ-মধ্য বলে। সুতরাং যদি কোনও গ্রহ ঠিক খ-মধ্যে (Zenith) উপস্থিত হয়, তবে সে গ্রহ প্রকৃত দশমবিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু গ্রহ যদি খ-মধ্য দিয়া অতিক্রম না করে, তবে যে কালে গ্রহটি খ-মধ্যের নিকটতম হয়, তখনই তাহাকে প্রকৃত দশমস্থ বলিব। ইহাই মূলতত্ত্ব হিসাবে মানিয়া লইয়া লগ্ন ও দশমবিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ভাববিভাগের বহুপ্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেই লগ্ন ও দশম বিভাগ উপরি উক্তরূপে গ্রহণ করিয়া অন্য ভাবগুলিকে বিভিন্নপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মতগুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান মতের কথা বলা হইল।

১। রেজিওমণ্টেনাসের (Regiomontanus) নিয়ম।
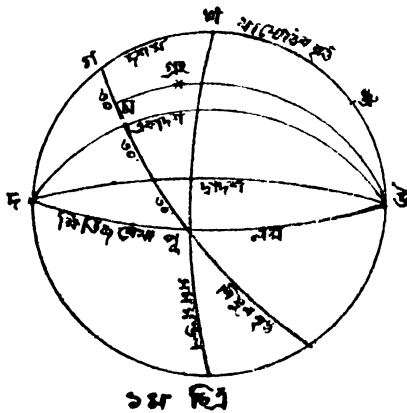
১ম চিত্র

বিষুববৃত্ত (celestial equator) ও ক্ষিতিজরেখা পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিন্দুতে মিলিত হয়। পূর্ব্ববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া বিষুববৃত্তের উপরে ৩০° ত্রিশ অংশ অন্তরে একটি করিয়া চিহ্ন দাও; এই চিহ্নিত বিন্দুগুলির সহিত বৃহৎ-বৃত্তাংশ দ্বারা ক্ষিতিজের উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দুর সংযোগ কর। এই সংযোগকারী রেখাগুলিই ভাব-সীমাজ্ঞাপক রেখা (১ম চিত্র দ্রষ্টব্য)। এইপ্রকারে দ্বাদশটি ভাবেরই সীমারেখা অঙ্কন করা যায়। এ নিয়মে পূর্ব্ববৎ উর্দ্ধ ও অধঃ যাম্যোত্তর বৃত্ত দশম ও চতুর্থ ভাবের সীমা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ক্ষিতিজরেখা লগ্ন ও সপ্তম ভাবের সীমা।

ইংরাজী মতে দশম ভাবের সীমা ও একাদশ ভাবের সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানই দশম ভাব। ঐ স্থানের মধ্যে কোন গ্রহ অবস্থান করিলে তাহা দশম ভাবে ফলপ্রদান করিবে। এইপ্রকারে দুই সীমারেখার মধ্যবর্ত্তী-স্থানই এক একটি ভাব। এই ভাবের মধ্যে গ্রহ থাকিলেই গ্রহ যে সমান ফলপ্রদান করিবে তাহা নহে; ভাবের বিভিন্ন অংশে অবস্থিতি হেতু গ্রহ প্রদত্ত ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। সীমারেখার সন্নিকটস্থ গ্রহ দূরস্থ গ্রহ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদান করে। এই কারণে সীমারেখা হইতে গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভাবের সীমারেখা হইতে গ্রহের দূরত্ব নির্ণয় করা আবশ্যক হয়।

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত বিভিন্ন; বিষুববৃত্তের সহিত ২৩।২৭´ কোণ উৎপন্ন করিয়া ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত। ভাবের সীমারেখাগুলি ক্রান্তিবৃত্তকে যে যে বিন্দুতে ছেদন করে সেই সেই বিন্দুর স্ফুটাংশই তৎ তৎ ভাবের স্ফুট (অবশ্য ইহা হিন্দু মতে পাশ্চাত্য মতে এগুলিকে ভাবসন্ধি বলা হয়), যেমন পূর্ব্বক্ষিতিজ ও ক্রান্তিবৃত্তের ছেদ বিন্দুই লগ্নস্ফুট ইত্যাদি। এই ভাবস্ফুট ও গ্রহস্ফুট দৃষ্টে গ্রহ কোন্ ভাবে অবস্থিত তাহা স্থির করা হয়। যদি গ্রহের শর না থাকে তবে এই উপায়ে গ্রহের ভাবাবস্থান প্রকৃতই নিরূপণ করা যায়। কিন্তু প্রায় সব সময়েই গ্রহের উত্তর কিম্বা দক্ষিণ শর থাকে; সে ক্ষেত্রে উপরি উক্ত উপায়ে প্রকৃত ভাবাবস্থান সর্ব্বদা স্থিরীকৃত হয় না। কেন না, গ্রহের শর রেখা ক্রান্তিবৃত্তোপরি লম্বভাবে পতিত, কিন্তু ভাবের সীমারেখাগুলি ক্রান্তিবৃত্তের সহিত বিভিন্ন কোণ উৎপন্ন করিয়া রহিয়াছে। সেইজন্য গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান স্থির করিতে হইলে ভাবের সীমারেখা হইতে প্রকৃত গ্রহের দূরত্ব জানা আবশ্যক। যাম্যোত্তর বৃত্ত হইতে প্রথমে এই দূরত্ব নির্ণয় করিয়া প্রতি ভাবের জন্য ৩০ অংশ করিয়া বাদ দিয়া দেখিতে হয় যে, গ্রহটি কোন্ ভাবে পতিত হইল এবং সেই ভাবের মধ্যে কতদূর অগ্রসর হইল।

রেজিওমণ্টেনাসের নিয়মে ভাববিভাগ করিয়া গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নির্ণয় করিতে হইলে উত্তর বিন্দুর সহিত গ্রহের সংযোগ করিয়া সেই রেখা বিষুববৃত্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হইবে। মনে কর, এই রেখা ঘ' বিন্দুতে বিষুববৃত্তকে ছেদন করিল (১ম চিত্র)। এখন গ ঘ দূরত্বই দশম ভাবসীমা হইতে গ্রহের প্রকৃত দূরত্ব।

যাহা হউক, রেজিওমণ্টেনাসের নিয়মের বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহা দেখা যাউক। খ-মধ্য ও ক্ষিতিজের পূর্ব্ব পশ্চিম বিন্দুর মধ্য দিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত অঙ্কন করা যায়, তাহাকে সমমণ্ডল (Prime Vertical) বলে। চিত্রে পূ খ রেখা দ্বারা সমমণ্ডল প্রদর্শিত হইয়াছে। রেজিওমণ্টেনাসের ভাবরেখাগুলি বিষুববৃত্তকে সমান দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করে, কিন্তু সমমণ্ডলকে যে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করে সেগুলি পরস্পর সমান নহে। সুতরাং উত্তর বিন্দুতে ভাবরেখাসমূহ মিলিত হইয়া যে সকল কোণ উৎপন্ন করিয়াছে, সেগুলি সব সমান নহে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভাববিভাগের জন্য খ-গোলকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হয় নাই; এক ভাবের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা অন্য ভাবের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আয়তনে ভিন্ন। ইহাই রেজিওমণ্টেনাসের বিপক্ষে প্রধান আপত্তি।

২। ক্যাম্পেনাসের (Campanus) নিয়ম।

২য় চিত্র
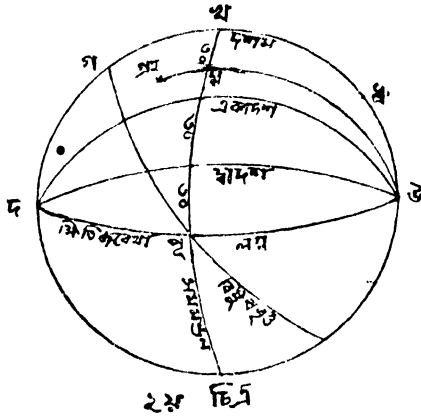
চিত্রে উ পূ দ পূর্ব্বক্ষিতিজ খ খ-মধ্য, পূগ সমমণ্ডল। পূর্ব্ববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া সমমণ্ডলের উপরে ৩০° অংশ অন্তরে একটি করিয়া চিহ্ন দিয়া, সেই চিহ্নিত বিন্দুগুলির সহিত বৃহৎ বৃত্তাংশ দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দুর সংযোগ কর। এই সংযোগকারী রেখাগুলিই ক্যাম্পেনাসের মতে ভাবসীমা। এ ক্ষেত্রেও পূর্ব্ববৎ যাম্যোত্তর বৃত্ত দশমভাবের সীমা এবং পূর্ব্বক্ষিতিজ লগ্নভাবের সীমা। ক্যাম্পেনাসের সীমারেখাগুলি উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দুতে মিলিত হইয়া যে সকল কোণ উৎপন্ন করে সেগুলি পরস্পর সমান (অর্থাৎ প্রত্যেকে ৩০°) এবং এই রেখাগুলি খ গোলকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করে। এই প্রকার সমবিভাগ করিবার জন্য ক্যাম্পেনাসের নিয়মকে অতীব যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

রেজিওমণ্টেনাসের রেখাগুলি বিষুববৃত্তকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করে, পক্ষান্তরে ক্যাম্পেনাসের রেখাগুলি সমমণ্ডলকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করে—কিন্তু বিষুববৃত্তকে অসমান ভাগে ছেদন করে।

ক্যাম্পেনাসের নিয়মে ভাববিভাগ করিয়া গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নিরূপণ করিতে হইলে বৃহৎ বৃত্তাংশ দ্বারা উত্তর বিন্দুর সহিত গ্রহের সংযোগ করিতে হইবে। এই বৃত্তাংশ রেখা মনে কর ঘ বিন্দুতে সমমণ্ডলকে ছেদন করিল (২য় চিত্র), এখন খ ঘ দূরত্বই দশম ভাবসীমা হইতে গ্রহের প্রকৃত দূরত্ব।

আমরা সাধারণতঃ যে Tables of houses বা ভাবসারণী ব্যবহার করি তাহা কিন্তু এই ক্যাম্পেনাসের নিয়মে প্রস্তুত নহে। Semi-Arc-System অনুসারে সেগুলি গঠিত। কিন্তু ক্যাম্পেনাসের নিয়ম যুক্তি-যুক্ততায় এত চিত্তাকর্ষক যে Sepharial সাহেব তাঁহার Manual of Astrology গ্রন্থে (৩০ পৃঃ) ভাববিভাগের কথা বলিতে যাইয়া প্রচলিত Semi-Arc-System এর কথা না বলিয়া ক্যাম্পেনাসের নিয়ম বিবৃত করিয়াছেন—'There are twelve celestial "Houses" in Astrology. They are derived from an equal division of the circle of observation into twelve parts. What is this circle of observation? It is an imaginary line passing from the eastern horizon, through the point immediately overhead, through the western horizon, the point immediately beneath our feet, round to the eastern horizon again. ইত্যাদি'

৩। প্ল্যাসিডাসের (Placidus) নিয়ম বা Semi-Arc-System এ প্রচলিত ভাবসারণীসমূহ এই নিয়মে প্রস্তুত।

কোনও গ্রহ বা ক্রান্তিবৃত্তস্থ কোনও বিন্দু যত সময় ক্ষিতিজের উপরে থাকে তাহাই তাহার উদিত কাল, আর ক্ষিতিজের নিম্নে যতকাল থাকে অর্থাৎ যতকাল অদৃশ্য থাকে, সেইকালই তাহার অস্তকাল। উদিত কালের অর্দ্ধকে Semi-diurnal Arc এবং অস্তকালের অর্দ্ধকে Semi-nocturnal Arc বলে। আকাশস্থ যে কোনও বিন্দুর উদিত-কাল ও অস্তকাল যোগ করিলে ২৪ ঘণ্টা হয়। নিরক্ষবৃত্তের (Terris-trial Equator) উপরিস্থ যে কোনও স্থানে প্রত্যেক গ্রহেরই উদিত-কাল ও অস্তকাল সমান। কিন্তু নিরক্ষবৃত্ত ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে উক্ত কালদ্বয় সমান নহে। যেমন, যে গ্রহের উত্তর ক্রান্তি (Declina-tion) প্রায় ২৩॥০ অংশ, ইংলণ্ডে তাহার উদিতকাল প্রায় ঘঃ ১৬।২৪ মিঃ এবং অস্তকাল ঘঃ ৭।৩৬ মিঃ, অর্থাৎ তথায় সে গ্রহ উদিত হইবার ঘঃ ১৬।২৪ মিঃ পরে অস্তমিত হইবে।

কোনও গ্রহের বা ক্রান্তিবৃত্তস্থ কোনও বিন্দুর উদিতকাল নির্ণয় করিবে এবং সেই উদিতকালের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবে। সেই গ্রহ বা বিন্দু যে সময়ে উদিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষিতিজে দেখা দিয়াছে, সেই সময়ের সহিত উক্ত ষষ্ঠাংশ ক্রমান্বয়ে যোগ করিয়া গেলে যে যে সময় পাওয়া যায়, সেই সেই সময়ে উক্ত গ্রহ বা বিন্দু যথাক্রমে ১২শ, ১১শ, ১০ম, ৯ম, ৮ম ও ৭ম ভাবসীমায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। অস্তকালের ষষ্ঠাংশ নির্ণয় করিয়া তাহা উক্তপ্রকারে অস্তমিত হইবার সময়ের সহিত পর পর যোগ করিয়া গেলে অপর ৬টি ভাবের সীমা অতিক্রমকাল পাওয়া যাইবে। মূলতঃ এ নিয়মটি এই যে, কোনও গ্রহ উদিত হইয়া ঠিক সমকাল পরে ১২শ, ১১শ ইত্যাদি ভাবসীমা অতিক্রম করিতে থাকে এবং অস্তের পরেও উক্তরূপে ৬ষ্ঠ, ৫ম ইত্যাদি ভাবসীমা অতিক্রম করে; কিন্তু প্রথম ৬ ভাবের প্রতিভাব অতিক্রমকাল ও দ্বিতীয় ৬ ভাবের প্রতিভাব অতিক্রমকাল সমান নহে। প্রচলিত যে কোনও ভাবসারণী লক্ষ্য করিলেই এ বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। যেমন, ৪০।৪৩´ উত্তর অক্ষাংশ যুক্ত স্থানে ২৩°।২৭´ উত্তর ক্রান্তিযুক্ত কোনও গ্রহ বা ক্রান্তিবৃত্তস্থ বিন্দু (কর্কটের আদি) নিম্নরূপ বিষুবকালে (Sidereal time) ভাবসীমাসকল অতিক্রম করে, যথা—লগ্নভাব—ঘঃ ২২।৩৪, ১২শ ভাব—ঘঃ ১।৩, ১১শ ভাব—ঘঃ ৩।৩১, ১০ম ভাব—ঘঃ ৬।০, ৯ম ভাব—ঘঃ ৮।২৯, ৮ম ভাব—ঘঃ ১০।৫৮, ৭ম ভাব—ঘঃ ১৩।২৮, অর্থাৎ প্রতি ভাব অতিক্রম করিতে প্রায় ঘঃ ২।২৯ মিঃ করিয়া সময় লাগিতেছে; তার পর ৬ষ্ঠ ভাব—ঘঃ ১৪।৫৮, ৫ম ভাব—ঘঃ ১৬।২৯, ৪র্থ ভাব—ঘঃ ১৮।০ ইত্যাদি। এখানে কিন্তু প্রতি ভাব অতিক্রম করিতে ঘঃ ১।৩১ মিঃ করিয়া সময় লাগিল। এই প্রকার অসমান বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নহে। যত সময় গ্রহটি ক্ষিতিজের নিম্নে ছিল, তখন তাহার

ভাব অতিক্রমের কাল ছিল ঘঃ ১।৩১, আর যখনই গ্রহটি ক্ষিতিজের উপরে উঠিল অমনি উক্ত কাল হঠাৎ বদলাইয়া ঘঃ ২।২৯ হইয়া গেল। এ প্রকার ভাব বিভাগ প্রণালী বিচারসহ নহে। আবার যে কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবস্ফুট নির্ণয় করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের প্রভেদাঙ্ক Continuous নহে। Semi-Arc Systemএর বিরুদ্ধে ইহাও এক যুক্তি।

Semi-Arc Systemএ পূর্ব্বের ন্যায় ভাবসীমাজ্ঞাপক কোনও রেখা সহজ উপায়ে অঙ্কন করা যায় না। কেবলমাত্র লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমের রেখা অঙ্কন করা যায়, কেন না উক্ত রেখা ক্যাম্পেনাস ও রেজিওমণ্টেনাসের নিয়মের মত ক্ষিতিজ ও যাম্যোত্তর বৃত্ত দ্বারা সূচিত হয়।

এই Semi-Arc-System অনুসারে কোনও গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নির্ণয় করিতে হইলে গ্রহটি কতকাল পূর্ব্বে যাম্যোত্তর বৃত্ত লঙ্ঘন করিয়াছে বা কতকাল পরে উহা লঙ্ঘন করিবে তাহা স্থির করিবে, ইহাকে নতকাল বলে। তৎসহ ইষ্টস্থানে গ্রহটির উদিতকালও স্থির করিয়া লইবে। তৎপর নিম্ন প্রকার অনুপাত দ্বারা ঈপ্সিত অংশ নির্ণয় করিবে, যথা—

উদিতকাল : নতকাল = ১৮০° : ঈপ্সিত অংশ। এই ঈপ্সিত অংশ দশমবিন্দু হইতে গ্রহের দূরত্ব। প্রতি ৩০° অংশে এক এক ভাব ধরিয়া ঈপ্সিত অংশ হইতে গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান স্থির করিবে। ক্ষিতিজের নিম্নে গ্রহ অবস্থিত হইলে, গ্রহের অস্তকাল ও অধঃ যাম্যোত্তর-বৃত্ত লঙ্ঘন কাল হইতে অনুরূপ নিয়মে গ্রহের ভাবাবস্থান নির্ণয় করিবে।

Semi-Arc Systemএর সমালোচনায় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী Alan Leo নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—সুপ্রসিদ্ধ Casting the horoscope গ্রন্থের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় "The Semi-Arc method seems unsound in theory to begin with, since·· and it seems unsound to argue that any given Zodiacal degree after crossing the ascendant must necessarily arrive at the cusp of houses XII, XI, after a lapse of time represented by one third and two thirds of its semi-diurnal arc respectively. This for the following reason : One semi-rotation of the Earth, 180, carries the degree from I. C. to M. C; this Semi-circle is at the horizon unequally divided into two parts, namely, the semi-nocturnal and semi-diurnal arcs of the said degree. And therefore it seems illogical to divide each of these respectively into three equal parts,—if the whole equatorial arc of 180° be divided unequally, why should each unequal portion be then straightway divided equally? No satisfactory answer to this objection has as yet been forthcoming, and ··"

সুতরাং Semi-Arc System অনুসারে ভাবকুণ্ডলী প্রস্তুত করিবার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ দেখা যায় না। ইহা অপেক্ষা বরং ক্যাম্পেনাসের নিয়ম ভাল।

৪। Porphyryর নিয়ম বা প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতি।

পূর্ব্বোক্ত সকল নিয়মেই ক্রান্তিবৃত্তের সহিত ক্ষিতিজবৃত্তের ছেদ-বিন্দুদ্বয়ই লগ্ন ও সপ্তম বিন্দু এবং যাম্যোত্তরবৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয়ই দশম ও চতুর্থ বিন্দু। উক্ত প্রচলিত নিয়মে প্রথমে লগ্ন, দশম, সপ্তম ও চতুর্থ বিন্দুগুলির স্ফুট (অর্থাৎ ভাবস্ফুট) নির্ণয় করিয়া লগ্ন ও দশমের অন্তর স্থির করিবে। দশম স্ফুটের সহিত উক্ত অন্তরের এক তৃতীয়াংশ যোগ করিলে একাদশ স্ফুট এবং দুই তৃতীয়াংশ যোগ করিলে দ্বাদশ স্ফুট লব্ধ হইবে। এই প্রকারে লগ্ন চতুর্থ, চতুর্থ সপ্তম ও সপ্তম দশম হইতে অন্যান্য সকল ভাবস্ফুটই নির্ণীত হয়।

এক্ষেত্রে লগ্ন হইতে দশম পর্য্যন্ত প্রতিভাবের বিস্তৃতি সমান এবং দশম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত প্রতিভাবের বিস্তৃতি সমান, কিন্তু দশমের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ভাব তাহার পরবর্ত্তী কোনও ভাবের সহিত সমান নহে। এই প্রকারের সমান ও অসমান বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে, সেইজন্য প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতির কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। Semi-Arc-System যে দোষে দুষ্ট, Porphyryর নিয়মেরও সেই দোষ। একটিকে পরিত্যাগ করিতে হইলে অপরটিও পরিত্যাজ্য।

৫। টলেমির নিয়ম বা সমবিভাগ মত (modus equalis)

প্রথমে সাধারণ নিয়মে লগ্ন স্থির করতঃ তাহার স্ফুটাংশের সহিত ৩০° অংশ বা ১ রাশি যোগ করিলে দ্বিতীয় ভাবস্ফুট, ২ রাশি যোগ করিলে তৃতীয় ভাবস্ফুট ইত্যাদি ক্রমে সকল ভাবস্ফুট লব্ধ হইবে। রাশিচক্রকে যেমন সমান দ্বাদশটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশটি রাশি হইয়াছে, সেইরূপ আবার লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিচক্রকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বাদশটি ভাব পাওয়া যাইবে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত টলেমি (Ptolemy) এই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই মতে ভাবনির্ণয় অতি সহজ বলিয়াই বোধ হয় অনেকে ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন না অনায়াসলভ্য বস্তুর প্রতি লোকে সাধারণতঃ হতাদর হয়। যাহা হউক, এই মতটি আমরা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

৩য় চিত্র
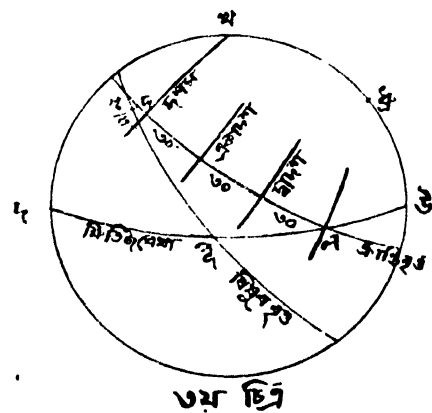
প্রত্যেক ভাব ৩০° অংশ করিয়া হইলে, দশম হইতে লগ্নের দূরত্ব ৯০° অংশ অর্থাৎ লগ্ন হইতে ৯০° অংশ পশ্চাতে দশম স্ফুট। সেইজন্য

দশমকে ত্রিভোন-লগ্ন বলা যায়। পূর্ব্বক্ষিতিজ ও ক্রান্তিবৃত্তের ছেদবিন্দুই লগ্ন (চিত্রে ল দ্বারা প্রদর্শিত)। খ—খমধ্য বা Zenith, দ—ত্রিভোন-লগ্ন। খল=৯০° এবং দল=৯০°। সুতরাং খ দ রেখা ক্রান্তিবৃত্তের উপরে লম্বভাবে পতিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোনও স্থানের খ-মধ্য হইতে ক্রান্তিবৃত্তের উপরে লম্বপাত করিলে যে বিন্দু পাওয়া যায় তাহাই ত্রিভোন-লগ্ন। আবার লম্বই ক্ষুদ্রতম দূরত্ব জন্য ত্রিভোন লগ্নই খ-মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বিন্দু অর্থাৎ দ বিন্দুই ক্রান্তিবৃত্তের সর্ব্বোচ্চ বিন্দু। যদি বহুগ্রহ ক্রান্তিবৃত্তের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকে, তবে ত্রিভোনলগ্নস্থ গ্রহই খ-মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, M C. বা Mid Heavenকে তদভাবে তাহার অতি সন্নিকটস্থ বিন্দুকে দশম বলে তাহা হইলে ত্রিভোন লগ্নকে প্রকৃত দশম বলিব না কেন?

এই দশমের অন্য এক প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়। কদম্ববিন্দু (pole of the ecliptic) হইতে জন্মস্থানের খ-মধ্য দিয়া রেখা অঙ্কন করিলে তাহা ক্রান্তিবৃত্তের যে বিন্দুতে পতিত হয় তাহাই দশমবিন্দু। অতএব ক্রান্তিবৃত্তে খ-মধ্যের স্ফুটাংশই (longitude) উক্ত দশম বা ত্রিভোনলগ্ন। এই নিয়মে ভাবের সীমারেখাও অতি সহজে অঙ্কন করা যায়। লগ্ন বা দশম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রান্তিবৃত্তের উপরে প্রতি ৩০° অংশ অন্তরে একটি চিহ্ন দিয়া সেইস্থানে ক্রান্তিবৃত্তের উপরে লম্বরেখা অঙ্কন করিলেই ভাবসীমাজ্ঞাপকরেখা হইল। এই রেখাগুলি বর্দ্ধিত করিলে কদম্ববিন্দুতে যাইয়া মিলিত হইবে এবং তথায় ৩০° অংশ করিয়া কোণ উৎপন্ন করিবে। এই ভাবসীমাগুলি খ-গোলকে সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করে।

গ্রহের প্রভাব গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মস্থানে জাতকের ভবিষ্যৎ ভাগ্য গঠন করে। জন্মকালে পৃথিবীর বহিঃস্থ গ্রহদিগের মধ্যে ত্রিভোন-লগ্নস্থ গ্রহেরই অতি সন্নিকটে Mid-Heaven বা খ-মধ্য অবস্থান করে, সুতরাং ত্রিভোন-লগ্নস্থ গ্রহকেই দশম ভাবারূঢ় বলা উচিত। ফলিত জ্যোতিষে ক্রান্তিবৃত্তই fundamental plane বা প্রাথমিক তল, গ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্ত অবলম্বন করিয়াই আবর্ত্তন করে; সুতরাং খ-মধ্যের ক্রান্তিবৃত্তস্থানকে অর্থাৎ ত্রিভোনস্থ লগ্নকে দশম বলা যুক্তিযুক্তই হইবে।

রেজিওমণ্টেনাসের নিয়ম, ক্যাম্পেনাসের নিয়ম বা Semi-Arc-Systemএ যে ভাববিভাগ করা হইয়াছে, সেই বিভক্ত ভাবে গ্রহ অবস্থিতি দ্বারা ফল প্রদান করিয়া থাকে, ইহা প্রবন্ধের প্রথমেই দেখান হইয়াছে। ক্রান্তিবৃত্ত ভাবসীমাজ্ঞাপক রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদন করে তাহাই ভাবসন্ধি (Cusp of a house)। এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধি পর্য্যন্ত এক এক ভাব। গ্রহের স্ফুটাংশ যে ভাবের অন্তর্বর্ত্তী, সাধারণতঃ গ্রহকে সেই ভাবস্থ বলা হয়। কিন্তু গ্রহের শর থাকার জন্য প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। অনেক সময় গ্রহের স্ফুটাংশ ও বাস্তবিক গ্রহ, এমন কি, বিভিন্ন ভাবে পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। এই পার্থক্য নিরাকরণ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান (exact house-position of a planet) নির্ণয় করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃত ভাবাবস্থান নির্ণয় করিলে কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, এখন দেখা যাউক।

ধরা গেল, লণ্ডনে যখন মেষ লগ্নের (সায়ন) প্রথম বিন্দুর উদয় হইতেছে তখন কোন বালকের জন্ম হইল এবং সেই সময়ে মেষের ১৫° অংশে কোন গ্রহ অবস্থিত এবং সেই গ্রহের উত্তর শর ৫° অংশ। লণ্ডনের অক্ষাংশ ৫১।৩২´ ধরিয়া গণনা করিলে দেখা যায় যে, তৎকালে গ্রহটি ক্ষিতিজের নিম্নে নাই, ক্ষিতিজের কিঞ্চিন্নূন এক অংশ উপরে উঠিয়াছে। সুতরাং তৎকালে গ্রহটি দ্বাদশভাবে অবস্থিত। Semi-Arc-Systemএ রচিত প্রচলিত ভাবসারণীতে দেখা যায় যে তৎকালে লগ্নভাবস্ফুট মেষের ০° অংশ এবং দ্বিতীয় ভাবস্ফুট বৃষের ২০° অংশ। তাহা হইলে গ্রহটির ক্রান্তিবৃত্তস্থান লগ্নভাবের প্রায় প্রথম তৃতীয়াংশে, কিন্তু বাস্তবিক গ্রহ দ্বাদশভাবে অবস্থিত।

লগ্নের দিক্ হইতে ত এই দেখা গেল, এবার দশমের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয় দেখা যাউক। কেন না, "কর্ম্মণ্যেব প্রধানে চ গ্রহাঃ সর্ব্বে ফলপ্রদাঃ। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন কর্ম্মস্থানং বিচিন্তয়েৎ॥" সেইজন্য কর্ম্মস্থানটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধরা যাক, কলিকাতায় বৃষের ১৯° অংশ (সায়ন) দশম লগ্ন। তৎকালে একটি গ্রহ বৃষের ২০।৮´ কলায় অবস্থিত এবং তাহার উত্তর শর ৪।৫০´। অপর একটি উত্তর শর বিশিষ্ট গ্রহ বৃষের ১৯° অংশে অবস্থিত। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় গ্রহটিই প্রকৃতপক্ষে দশম বিন্দুতে অবস্থিত এবং প্রথম গ্রহটি দশমভাবে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু গণনাদ্বারা জানা যায় যে প্রথম গ্রহটি তৎকালে কলিকাতার খ মধ্যে অবস্থিত সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই গ্রহটিই দশম বিন্দুতে উপস্থিত এবং দ্বিতীয় গ্রহটি যাম্যোত্তরবৃত্ত লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিমে নত হইয়াছে সুতরাং উহা দশমভাব পরিত্যাগ করিয়া নবমে অবস্থান করিতেছে। গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নির্ণয় না করিলে অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকার বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ফলবিচার করিতে হইলে গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যকীয়। অথচ ফলিত জ্যোতিষ চর্চ্চাকারিগণ কেবলমাত্র ভাবস্ফুট ও গ্রহস্ফুট হইতেই ফলাদেশ করিয়া থাকেন। গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নির্ণয় করা একটু কষ্টসাধ্য, সেইজন্যই বোধ হয় ভাবাবস্থান নির্ণয় করিবার সূত্রসমূহ মাত্র গ্রন্থের শোভাই বর্দ্ধন করিয়া থাকে। নিজেদের শ্রম লাঘবের জন্য কোন কোন জ্যোতিষী বলিয়া থাকেন যে গ্রহের প্রকৃত স্থান ফলপ্রদাতা নহে, গ্রহের ক্রান্তিবৃত্তস্থানই শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এ উক্তির যে কোনও মূল ভিত্তি নাই, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

এখন বক্তব্য এই যে, ভাবনির্ণয়ে আমরা যে নিয়মেরই অনুবর্ত্তী হই না কেন, সেই নিয়মের বিধিসমূহ সম্যক্‌ভাবে প্রয়োগ করিয়া তদনুসারে গণনা করা কর্ত্তব্য। সুবিধামত কতক নিয়ম অনুসরণ করিব এবং সহজসাধ্য নহে বলিয়া অপরগুলি উপেক্ষা করিব তাহা কখনই হইতে পারে না। রেজিওমণ্টেনাসের নিয়ম, ক্যাম্পেনাসের নিয়ম অথবা

Semi-Arc-System যে নিয়মেই ভাবনির্ণয় করি না কেন, গ্রহের প্রকৃত ভাবাবস্থান নিরূপণ করিতেই হইবে, নতুবা এসব নিয়ম পরিত্যাগ করা উচিত।

সমবিভাগ মত অনুসারে গণনা করিলে আমাদিগকে কিন্তু এ প্রকার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না। লগ্নস্ফুট নির্ণয় করতঃ ১ রাশি করিয়া যোগ করিয়া গেলেই ধনাদির স্ফুট পাওয়া যায়। আবার কদম্ববিন্দু হইতে ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত ভাবরেখাসমূহ অঙ্কিত হয় বলিয়া গ্রহের স্ফুটাংশই তাহার ভাবাবস্থান নির্দ্দেশ করে। যে গ্রহ খ মধ্যে উপস্থিত তাহার স্ফুটাংশই তৎকালে ত্রিভোনলগ্ন বা সমবিভাগমতে দশম; অর্থাৎ বাস্তবিকই যে গ্রহ প্রকৃত দশমে, তাহার স্ফুটাংশও দশম স্ফুটের সহিত সমান। ত্রিভোনলগ্নস্থ গ্রহের যদি শর থাকে, তবে সে গ্রহ অন্তদিকে অপসৃত না হইয়া প্রকৃত দশমাভিমুখেই অপসৃত হইয়া থাকে।

প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের মধ্যে এই সমবিভাগ মত প্রচলিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা কি করিতেন তাহাই এবার দেখা যাউক।

সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে ও সূর্য্যসিদ্ধান্তে আমরা যাহাকে দশম বলি তাহাকে মধ্যলগ্ন বলা হইয়াছে। যথা গোলাধ্যায়ে—'মধ্যলগ্নমিতি দক্ষিণোত্তরে', সূর্য্যসিদ্ধান্তে—'তদা লঙ্কোদয়ৈর্লগ্নং মধ্যসংজ্ঞং যথোদিতম্'। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ত্রিভোনলগ্ন ও মধ্যলগ্নের পার্থক্য সর্ব্বত্র ঠিক রাখিতে পারেন নাই, কেন না সূর্য্যগ্রহণ গণনার প্রথমেই বলিয়াছেন 'মধ্যলগ্নসমে ভানৌ হরিজস্য ন সম্ভবঃ' অর্থাৎ মধ্যলগ্নে রবি আসিলে তাহার কোন লম্বন থাকে না। এক্ষেত্রে মধ্যলগ্ন না হইয়া ত্রিভোনলগ্ন হইবে। যাহা হউক, ফলিত জ্যোতিষে মধ্যলগ্নের ব্যবহার বোধ হয় পূর্ব্বে ছিল না। গ্রহগণের যাম্যোত্তরবৃত্ত লঙ্ঘনকাল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং সূর্য্যগ্রহণ গণনার জন্য মধ্যলগ্নের প্রয়োজন হয়। এই মধ্যলগ্নকে পরবর্ত্তী যুগে জ্যোতির্বিদগণ গাণিতিক উৎকর্ষতা দেখাইবার জন্য ফলিত জ্যোতিষে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দশমলগ্ন অর্থে ঠিক দশম (অর্থাৎ tenth) বা ত্রিভোনলগ্নই বুঝাইত।

সমবিভাগ মতানুসারে যে রাশিতে লগ্ন হয়, তাহার পর পর রাশিতে ঠিক একই অংশে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ভাব হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষে দ্বাবিংশ দ্রেক্কাণ অনুসারে মৃত্যুবিষয়ক ফলবিচার আছে। সমবিভাগ অনুসারে অষ্টম স্ফুটের দ্রেক্কাণই দ্বাবিংশ দ্রেক্কাণ আর মৃত্যু সম্বন্ধে কোন বিচার অষ্টমের স্ফুটাংশ হইতেই হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমবিভাগ অনুসারে গণনা করিয়াই ঐ দ্বাবিংশ দ্রেক্কাণের কথা লিখিত হইয়াছে। কেন না সমবিভাগ ভিন্ন অন্য কোনও মতে অষ্টম স্ফুট সব সময় দ্বাবিংশ দ্রেক্কাণে পতিত হয় না।

পরাশর তাঁহার গ্রন্থে বিভিন্নভাবের অধিপতি অনুসারে প্রত্যেক লগ্নের পক্ষে শুভাশুভ গ্রহ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যেমন মেষ লগ্নের পক্ষে 'শুভৌ গুরুদিবাকরৌ' অর্থাৎ রবি (৫ম পতি) ও বৃহস্পতি (৯ম পতি) মেষ লগ্নের পক্ষে শুভ। তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি সম-বিভাগ মতানুসারেই ভাগবিভাগ করিয়া লইয়াছেন। কেন না একমাত্র সমবিভাগ মতেই মেষ লগ্নের পক্ষে সর্ব্বদা সিংহ ও ধনু ৫ম ও ৯ম হইয়া থাকে। অন্য কোনও মতে গণনা করিলে পূর্ব্বে হইতে ঐ প্রকার গ্রহের শুভাশুভত্ব নির্দ্দেশ করা যায় না।

আবার দেখা যায় দম্পতি-ঘাতক যোগে উক্ত আছে 'লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে। কন্যা হরতি ভর্ত্তারং ভর্ত্তা ভার্য্যাং হনিষ্যতি॥' অর্থাৎ চতুর্থে, দ্বাদশে ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে মঙ্গল থাকিলে তাহা দম্পতি ঘাতক হয়। চতুর্থে ও দ্বাদশে থাকিয়া সপ্তমে দৃষ্টি দ্বারা ঘাতক হইতেছে। চতুর্থ ও সপ্তমের দূরত্ব ৯০° অংশ বা ৩ রাশি এবং দ্বাদশ ও সপ্তমের দূরত্ব ৭ রাশি না হইলে লগ্নের সপ্তমে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রেও সমবিভাগ মতই সমর্থিত হইতেছে।

জৈমিনীয়সূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ; তাহাতে ভাবস্ফুটের উল্লেখ নাই, পর পর রাশিই ধনাদি ভাব। এইরূপে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে বর্ত্তমানকালের ন্যায় দশম নির্ণয় করিয়া ভাবস্ফুট স্থির করিবার বিধি ছিল না। আমাদের জ্যোতিষের মূলসূত্রসমূহ আর্য্য ঋষিগণ দ্বারা নিরূপিত, সুতরাং তাঁহারা যে প্রকারে গণনা করিতেন আমাদেরও সেই প্রকারেই গণনা করা উচিত। তাঁহাদের গাণিতিক জ্ঞানের অভাব বশতঃ যে তাঁহারা মধ্যলগ্ন নির্ণয় করিতে পারিতেন না, তাহা মনে হয় না। কেন না কোনস্থানের লগ্নখণ্ডা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমেই লঙ্কোদয় খণ্ডা বা দশমখণ্ডা প্রস্তুত করিতে হয়। তাঁহারা লগ্ন নির্ণয় করিতেন, কিন্তু দশম নির্ণয় করিতেন না, ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই সমবিভাগ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব জ্যোতিষে ফলবিচার করিতে হইলে, সমবিভাগ মতানুসারে গ্রহের ভাবাবস্থান নিরূপণ করিয়া ফলাদেশ করাই বোধ হয় সমীচীন।

আমরা যেরূপ জীবনের শুভাশুভ কাল নির্ণয় করিবার জন্য দশা গণনা করিয়া থাকি, পাশ্চাত্যমতে সেইরূপ Direction (গ্রহচালন) গণনাদ্বারা শুভাশুভ কাল নির্দ্দেশ করা হয়। এইমতে গ্রহের উদয়াস্ত ও যাম্যোত্তর বৃত্ত লঙ্ঘনকালদ্বারা জীবনে যে বয়স নির্দ্দেশিত হয়, তৎসময়ে জাতকজীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই গণনা পদ্ধতির সহিত ভাবনির্ণয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়। সমবিভাগমতে ভাবগণনা করিয়াও প্রচলিত মতে Direction গণনা করা যাইতে পারে।

খাস-মুন্সীর নক্সা *

৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

হুগলী জেলায় সোমড়া সুখরীয়া গ্রামে সম্ভবতঃ ১৮১৭—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আমার পিতার জন্ম হয়। তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান। পিতামহ মহাশয় শ্বশুরালয়ে "ঘরজামাই" ছিলেন। পিতৃদেবের পাঁচ ভাই। শুনিতে পাই পরিবার বৃহৎ, দুই বেলা গৃহে প্রায় ৫০খানা পাত পড়িত। বড় জ্যেঠামহাশয়ের সময়ে সে কালের হিসাবে অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইয়াছিল। তিনি সোমড়া গ্রামের মুস্তফী জমীদারদের সংসারে চাক্‌রী করিতেন। বেতন যদিও সামান্য ছিল, কিন্তু এখনকার মত জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য ছিল না বলিয়া এক প্রকার বেশ চলিয়া যাইত। আমার বড় জ্যেঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র জমীদারী কার্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার কৃত একটি পুষ্করিণী সুখরীয়ায় এখনও বর্ত্তমান। উহার নাম "পদ্ম-পুকুর"। তাঁহার নাম ছিল পদ্মলোচন। তাঁহার নামে পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। আমরা বহুকাল দেশছাড়া। আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ কেবল একবার জীবনে এই পূর্ব্বপুরুষদের জন্মভূমি দেখিতে গিয়াছিলাম। পরিচয়ে কেহই চিনিতে পারিল না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেশ জঙ্গল হইয়া গিয়াছে এবং পুরাতন লোক প্রায় সকলেই মরিয়া গিয়াছেন; সুতরাং দেশান্তরিত লোকের সন্তানদের কে চিনিতে পারিবে? কেবল একজন ৬০।৭০ বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে, ছেলেবেলায় অমুক চট্টোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছিলাম বটে। এই 'অমুক' আমাদের পিতামহ।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যে বন্যা হয়, সেই সময় আমাদের বড় জ্যেঠা লোকান্তরিত হন এবং আমাদের পুরাতন ভিটা গঙ্গাগর্ভে লীন হয়। সে সময় আমাদের পরিবারে অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব ও সেজ জ্যেঠামহাশয় শেষাবস্থায় কখনও কখনও তাহার গল্প করিতেন এবং সেই কষ্ট মনে করিয়া অশ্রুপাত করিতেন; ইহার কিছুদিন পরে গ্রামস্থ জমীদারমহাশয়দের অত্যাচারে সেজ জ্যেঠামহাশয় পশ্চিমদেশে আগমন করেন। মেজ জ্যেঠামহাশয় বিবাহের এক বৎসর পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমার পিতৃদেব ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গ্রামের জমীদার কাশীগতি মুস্তফী মহাশয়ের সহিত নৌকাযোগে পশ্চিমোত্তর দেশে আগমন করেন এবং প্রয়াগে সেজ জ্যেঠামহাশয়ের নিকট রহিলেন। এখানে আসিয়া প্রথম ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেজ জ্যেঠার বেতন সামান্য; সুতরাং তিনি যে কনিষ্ঠকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেন এরূপ সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সুতরাং অতি অল্পকালমাত্র যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া পিতৃদেবকে উদরান্নের চেষ্টা করিতে হয়। প্রথমে অহিফেনের কুঠীতে ১৫৲ টাকা বেতনে একটী চাক্‌রী প্রাপ্ত হইলেন। এই চাক্‌রী তাঁহাকে ৮।১০ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতার কাশীতে বিবাহ হয়। আমার মাতামহ বিখ্যাত দেশমান্য রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান—মুখ্য কুলীন। তাঁহার নিবাস গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। তিনি শান্তিপুরে নেদেরপাড়ার মহেশনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবীকে বিবাহ করিয়া স্বকৃতভঙ্গ হন। এই হিসাবে আমরা স্বকৃতভঙ্গের দৌহিত্র। বিবাহের অল্পকাল পরেই মাতামহী দেবী বিধবা হন। তখন আমার মাতৃদেবী নয় মাস গর্ভে। মাতামহী দেবী ভ্রাতাদিগের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কখনও শ্বশুর ঘর করেন নাই। পরে তিনি আমার মাতৃদেবীকে লইয়া অতি দীন-হীনভাবে কাশীতে আসেন এবং পুরাতন কাশীবাসী মহেশ কেরাণীর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় মহেশবাবুর কাশীতে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তখন কেরাণীগিরি চাকুরী এখনকার মত হেয় হয় নাই। সুতরাং মহেশবাবু ইংরাজের চাকর বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

---

* এই নক্সার কিঞ্চিৎ অংশ বহুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাতৃদেবীর বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।" আমার যেমন দরিদ্র পিতা, ততোধিক দরিদ্রের কন্যা মাতা। পিতা ১৫টী টাকা মাহিনা পান। মাতামহীর এমন সামর্থ্য নাই যে একখানি ভাল কাপড় পরাইয়া কন্যাটীকে দান করেন। শুনিয়াছি, দিদিমা একখানি জেলেকাচা কস্তাপেড়ে কাপড় পরাইয়া মাতাকে পিতৃদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। এ কথা আমার যখন মনে পড়ে, তখন আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। আমি তাঁহাদের অতি মূঢ় ও অযোগ্য সন্তান। তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় আমি তাঁহাদের কোনরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। তাঁহারা এখন স্বর্গধামে। জগতের সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত। আমি ঘোর পাপী, অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি এবং তাঁহাদের শ্রীচরণে সর্ব্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অত্যন্ত দারিদ্র্যনিবন্ধন মাতামহী দেবী পিতৃদেবেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিবাহের পর পিতৃদেব প্রয়াগের নিকট ফতেপুর নামক স্থানে বদলী হন এবং জজের আদালতে ২৫৲ টাকা বেতনের চাকরী পান। এই জজের আদালতের চাকরী তিনি ৩০ বৎসরাবধি করিয়া শেষে ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে ২০৲ টাকা মাত্র পেন্‌সন্ পাইয়া কাশীবাস করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কাশীতে আমার জন্ম হয়। ভ্রাতা ভগিনীতে আমরা ৪।৫টী ছিলাম; কিন্তু সকলেই অমৃতময়ের ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা কেবল দুই ভাই অবশিষ্ট। আমি কনিষ্ঠ, তিনি জ্যেষ্ঠ। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে কোনও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অল্প বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া কাশীস্থ বাঙ্গালীটোলার প্রিপ্যারেটারী স্কুলে প্রবেশ করি। প্রায় এক বৎসর এই খানে পাঠ করিয়া মাতার সহিত ফতেপুরে পিতার নিকট গমন করি। জ্যেষ্ঠ ও মাতামহী কাশীতেই রহিলেন। ইহার পর আমার পিতৃদেব ও মেজ জ্যেঠামহাশয় পৃথক হন। বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে গেলে ২৫৲ টাকা আয়ে দুই স্থলের খরচ চলে না। মাতামহীর নিকট ৩০০৲ টাকা ছিল। তিনি সেই টাকায় একখানি ক্ষুদ্র বাটী ভোগ-বন্ধক রাখেন। এই বাটীতে আমার জন্ম। তৎপরে অসাধারণ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মাতৃদেবী ও মাতামহী উভয়ের সমবেত চেষ্টায় ১১০০৲ টাকা দিয়া একখানি বাটী খরিদ করেন। আমি যখন ফতেপুরে যাই তখন জ্যেষ্ঠ ও মাতামহী এই বাটীতে রহিলেন। আমার মাতার প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর ও নম্র ছিল। কিন্তু আত্মমর্য্যাদা-রক্ষায় তিনি সতত তৎপর থাকিতেন। আমার মাতামহীর প্রকৃতি অন্যরূপ। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ দূরদৃষ্টি ছিল। উভয়েই সমান কষ্টসহ ও মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহাদেরই কষ্ট সহিষ্ণুতা ও দূরদৃষ্টির বলে পিতৃদেব এত অল্প আয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন।

ফতেপুরে যাওয়াতে আমার পাঠের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। বেশ একভাবে কাশীতে পড়িতেছিলাম, তাহাতে বাধা পড়িল। ফতেপুরে তখন একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু পুস্তকাদি সমস্ত অন্য রকমের এবং পাঠের ব্যবস্থা তত ভাল ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা না করায় বিশেষ গোলে পড়িতে হইল। গৌরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন প্রধান শিক্ষক। পরে তিনি ওকালতী পাস করিয়া কাশীতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন; অল্প দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই এক বৎসর আমার পড়ার সম্পূর্ণ ক্ষতি হইল। ফতেপুরে বাসকালে আমার একটি ভগিনী জন্মগ্রহণ করে; এটি পিতা-মাতার শেষ সন্তান। সূতিকাগারে মাতৃদেবী ভয়ঙ্কর পীড়িতা হন। তাঁহার বাঁচিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। আমার পিতৃদেব সেকালের নিষ্ঠাবান হিন্দু। ডাক্তারী চিকিৎসায় তাঁহার আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহা ছাড়া ডাক্তারী চিকিৎসা করিতে গেলে পয়সা চাই। আমরা দরিদ্র। জজের কোর্টে একজন মুসলমান উকীল ছিলেন। তিনি হাকিমী চিকিৎসায় বিলক্ষণ পরিপক্ব। তাঁহারই চিকিৎসায় মাতৃদেবী এক মাস কি দেড় মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। আমার বয়স তখন সাত কি আট বৎসর। আমার নিজের বয়সোচিত আমি মাতৃদেবীর বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, এইটুকু মনে করিয়া আমি মনে একটু শান্তি পাই. নচেৎ আমার মনে শান্তি নাই। আমায় শান্তি-পাগল বলিলেই হয়।

ভগিনীটি ৪।৫ মাসের হইলে পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া

আসি। পিতৃদেব আবার পূর্ব্বের ন্যায় একাকী ফতেপুরে রহিলেন। আমি সাংসারিক মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে মাতৃদেবী ও মাতামহীদেবীকে সমস্ত প্রশংসা অর্পণ করিয়া একটু অন্যায় করিয়াছি। আমার পিতৃদেবও অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। আমরা তাঁহার ন্যায় কষ্টসহ হইতে পারি নাই এবং একালে তাহা ত দেখিতেই পাই না। তেমন নিষ্ঠবান্ বিশুদ্ধ ভাবটি আর আমি দেখিতেই পাই না। সেরূপ সরলপ্রকৃতিও আমি দেখি নাই। ফতেপুরে প্রবাসকালে দেখিয়াছি, পিতৃদেবের নিকট যে দাসী ছিল, সে তাঁহার কাছে ক্রমাগত ২৫ বৎসর ধরিয়া চাকুরি করিয়া পরলোকগমন করে। আমি যখন তাহাকে দেখি, সে তখন অতি বৃদ্ধা। কার্য্যে এক প্রকার অক্ষম বলিলেই হয়। কিন্তু পিতৃদেব তাহার কার্য্যেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহার নাম ধূদী। ধূদীর ন্যায় বিশ্বস্ত দাসী আমার নয়নগোচর হয় নাই। সে আমাদের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত। বাবার নাপিত, বাবার গয়লা কেহই নূতন ছিল না, সবই পুরাতন। কেহ ১৫ বৎসর, কেহ ২০ বৎসর, কেহ বা ৩০ বৎসর ধরিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। ৩০ বৎসরের মধ্যে তিনি কেবল একবার বাটী বদলাইয়াছিলেন। বিষয়টি তুচ্ছ হইলেও ইহা দ্বারাই তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবার কষ্টসহিষ্ণুতার কথা শুনুন। এতদঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সকালে কাছারী হইয়া থাকে। সকালে কাছারী নামমাত্র। দিনের কাছারী অপেক্ষাও তাহা ভয়ঙ্কর। এতদপেক্ষা দিনের কাছারী শতগুণে ভাল। সকালে কাছারী হইলে আমলাদের বেলা ৭টার সময় কাছারী যাইতে হইত এবং বেলা দুইটার সময় কাছারী হইতে গৃহে আগমন। এতদঞ্চলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা একটা দুইটার সময় কি ভয়ঙ্কর "লু" নামক গরম হাওয়া চলে এবং চতুর্দ্দিকে কিরূপ অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকে তাহা যিনি এতদ্দেশে বাস করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ অবগত। পিতৃদেব সেই বেলা সাতটার সময় অনাহারে পদব্রজে কাছারী যাইতেন এবং বেলা দুইটার সময় পুনরায় পদব্রজে গৃহে আসিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন। বাটী হইতে কাছারী প্রায় দুই মাইল। পেন্সন লইবার তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার সমভাবে গিয়াছে। আমিও তাঁহার ন্যায় কষ্টসহ হইয়াছি। আজকাল ২০।৪০ টাকার চাকুরী হইলেই প্রথম পাচকব্রাহ্মণের অনুসন্ধান। আমার একজন সেকালের ধরণের পূজ্য আত্মীয় প্রায়ই আমার কাছে বলিতেন যে, এখন হইয়াছে—"দেখ পৈতা, মার ভাত।" জাতি বিচার ভাল কি মন্দ, তাহা আমি বলিতেছি না। জাতি-বিচার থাকা উচিত কি অনুচিত, তাহাও আমি বলিতেছি না। তবে পুরাতন রীতি ত্যাগ করায় আমাদের সমাজের যে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম ক্ষতি—আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে, অল্প আয়ে আর আমরা সংসার চালাইতে পারি না। দ্বিতীয় ক্ষতি—আমরা আর আমাদের পিতৃ-পিতামহের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। অত্যন্ত শ্রমকাতর হইয়া পড়িয়াছি।

এ কালের লোকের তাঁহাদের ন্যায় সাহস দেখিতে পাই না। এ কালের যুবকরা প্রবাসে চাকরী করিতে গেলে প্রায়ই একলা বাটীতে থাকিতে পারেন না। রাত্রিতে অন্ততঃ একজন চাকর থাকা চাই। আজকাল সকল স্থলে নানা কারণে সস্তায় চাকর পাওয়া দায়। সুতরাং প্রবাসে গিয়া নূতন চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়াই যুবকদিগকে চাকর লইয়া এক মহাগোলে পড়িতে হয়। আমাদের "ধূদী" প্রাতে সাতটার সময় আসিত এবং রাত্রি আট ঘটিকার সময় গৃহে চলিয়া যাইত। পিতৃদেব একলাই বার মাস সেই বাটীতে থাকিতেন। পিতৃদেব কেন, সে কালের লোকমাত্রই ভূত প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। পিতৃদেবও সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন। যে বাটীতে তিনি বাস করিতেন সেই বাটীতে রন্ধনশালার দালানের পার্শ্বে একটি গৃহে এক জন মুসলমানের গোর ছিল। পিতৃদেব বলিতেন যে, সৈয়দ বাবার গোর। তাঁহার মুখে কতবার শুনিয়াছি যে, তিনি সৈয়দ বাবার প্রেতাত্মাকে দেখিয়াছেন। অথচ কখনও ভয় পান নাই। ২৫।৩০ বৎসর ক্রমান্বয়ে সেই বাটীতে কাটাইয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সৈয়দ বাবাকে এক পয়সার রেউড়ী সিন্নী দিতেন। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীটি সেই বাটীতে জন্মগ্রহণ করে। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া সে পিতার কিছু বেশী স্নেহের পাত্রী ছিল। বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে সে "বাহানা" ধরিয়া পিতৃদেবের নিকট দৌরাত্ম্য করিলে পিতা হাসিয়া বলিতেন, ইহার ঘাড়ে "সৈয়দ বাবা"

চাপিয়াছেন। আজ-কালকার অনেক যুবক ভূত প্রেতের নাম শুনিলে গৃহিণীদের অঞ্চল ধারণ করিয়া থাকেন।

এই ত গেল এক ধরণের সাহস। আবার অন্য ধরণের আর একটি সাহসের কথা বলি। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পিতৃদেব ফতেপুরে থাকিতেন। ফতেপুর, কাণপুর ও এলাহাবাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কাণপুরে নানা সাহেব বিদ্রোহী হইলে পর বিদ্রোহী দল ফতেপুরে সমবেত হইল। ফতেপুরের লোকও তাহাদের সহিত যোগ দিল। ফতেপুরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। বিদ্রোহীরা একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে নবাব করিল। জেলার কালেক্টর প্রভৃতি সমস্ত ইংরাজ রাজকীয় খাজনা ইত্যাদি ফেলিয়া প্রয়াগাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দেশীয় সমস্ত আমলারা হাকিমের এই "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতির অনুসরণ করিল। থাকিলেন কেবল পিতৃদেব ও তাঁহার প্রভু জজ সাহেব। এই জজ বিখ্যাত টক্কর সাহেব। স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে ফতেপুরের এই জজ টক্কর সাহেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন জেলা হাকিমশূন্য হইল—আর অন্যান্য বিদ্রোহীরা আসিয়া ফতেপুর দখল করিল, তখন পিতা টক্কর সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে জেলা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর হাকিমদের ন্যায় প্রয়াগে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাহেব কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। বলিলেন—"তুমি কাশীতে যাও, আর এখানে থাকিও না। আমি সরকারী খাজনা ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আমার প্রাণ থাকিতে আমি সরকারী খাজনা বিদ্রোহীদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না। অতএব তুমি আমার ভরসা করিও না, তুমি এখান হইতে কাশী চলিয়া যাও। যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমাকে আমি এরূপ করিয়া যাইব যে, তোমার পুত্রপৌত্রদের আর চাকরী করিয়া খাইতে হইবে না।" পিতা কোনও মতেই ফতেপুর-ত্যাগে সম্মত হইলেন না। এই বলিয়া গৃহে চলিয়া আসেন যে আপনি না গেলে আমি ফতেপুর ত্যাগ করিতে পারি না। আমি গৃহে যাইতেছি, তবে প্রত্যহ আসিয়া আপনার খবর লইব। তিনি কোনক্রমে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলেন, বিদ্রোহীরা টক্কর সাহেবের বাংলা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। টক্কর সাহেব একাকী, বিদ্রোহীরা পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য; তথাপি সাহেবের ভয় নাই। বাংলাটি দ্বিতল। কালেক্টর পলাইবার পরই তিনি সমস্ত খাজনা নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন বিদ্রোহীরা আসিয়া বাংলা ঘিরিয়া ফেলিল, তখন সাহেব উপরতলে গিয়া ক্রমাগত বন্দুক চালাইতে লাগিলেন। ১০।২০ জন বিদ্রোহীকে একাকী ভূতলশায়ী করিলেন। ইতিমধ্যে একটি গুলি আসিয়া সাহেবের দক্ষিণহস্তের কব্জিতে লাগিল। এইবার প্রমাদ হইল। সাহেব আর বন্দুক চালাইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা সাহেবের বাংলায় আগুন ধরাইয়া দিল। বাংলায় একটি মধুমক্ষিকার 'চাক' ছিল। ধূমবশতঃ অসংখ্য মধুমক্ষিকা উড়িয়া সাহেবের মুখে, হস্তে, সর্ব্বাঙ্গে হুল বিদ্ধ করিতে লাগিল। সাহেব যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মুখে রুমাল দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিদ্রোহীরা সাহেবকে আর দেখিতে না পাইয়া "সাহেব কহাঁ গযা ?" বলিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে কাহারও সাহসে কুলায় না। ১০।২০ টাকে ভূমিশায়ী করিয়া টক্কর সাহেব বিদ্রোহী দলের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ সিঁড়ির ২।৪ ধাপ উঠিয়া আবার নামিয়া পড়ে। এইরূপ কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিবার পর এক জন পাঠান সাহসে ভর করিয়া উপরে উঠে এবং সাহেবকে মুখে রুমাল দিয়া তদবস্থ থাকিতে দেখিয়া লাফাইয়া শাণিত অসি দ্বারা এক আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে। বেলা ১১।১২টার সময় পিতৃদেব বিদ্রোহীদের এই পৈশাচিক ব্যবহারের সংবাদ পাইয়া আর সেখানে থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাত্রিকালে পলায়ন করেন। পথে সন্ন্যাসীর বেশে, কতক বা পদব্রজে, কতক বা গরুর গাড়ীতে, অশেষবিধ কষ্ট পাইয়া ৭।৮ দিবস পরে কাশী আসিয়া উপস্থিত হন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ টক্কর সাহেবের মৃত্যুতে পিতৃদেব মর্ম্মাহত হইয়া সমস্ত আশা ভরসায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। আমরা যে তিমিরে—সেই তিমিরেই রহিলাম। নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে!

বিদ্রোহ শান্তির পর পিতৃদেব পুনরায় ফতেপুরে স্বীয় চাকরীতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাছারী ছিল না; বিদ্রোহীরা পুড়াইয়া দিয়াছে। নূতন জজ সাহেব রাজপথের ধারে তাঁবু

খাটাইয়া বিচারে বসিয়াছেন। আসামীদের 'সময়োচিত' বিচারের পর হুকুম হইতেছে—"লট্‌কাও।" যেমন "লট্‌কাও" উচ্চারণ, অমনই পথের ধারের বৃক্ষশ্রেণীর শাখায় ফাঁসি। দিনের মধ্যে এত "লট্‌কাও" হইত যে পিতৃদেব বলিতেন, রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি "লট্‌কাও—লট্‌কাও" শব্দ শুনিতেন।

পিতৃদেবের সাহস-বর্ণনায় আমি আত্মকাহিনী হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কাশীতে আসিয়া পুনরায় বাঙ্গালীটোলার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। দেড় বৎসর এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত বেশ পাঠ করিলাম। তখন আমার বয়স নয় বৎসর। ইতিমধ্যে আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। সেই নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এখনও তাহাতেই ভুগিতেছি। স্নেহময়ী মাতা এই সকল দেখিয়া চিন্তিতা হইলেন। সূতিকাগারে তিনি পীড়িতা হইলে যে হাকিম তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিল তাহার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। মনে মনে আমায় পিতার নিকট চিকিৎসার্থ পাঠাইবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে আমার এক জ্যেঠতুতো ভগ্নীপতি কাশীতে আসিয়াছিলেন। তিনিও ফতেপুরে চাকরী করিতেন। তাঁহার সহিত মাতৃদেবী সাশ্রুনয়নে আমায় বিদায় দিলেন। তখন আমি বালক। মাতা ও মাতৃস্নেহ যে কি বস্তু তাহা জানি না। বাবার কাছে ফতেপুরে যাইব, আবার অনেক দিন পরে রেলে চড়িতে পাইলাম, এই আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আমি গৃহ হইতে বাহির হইলাম। তবে যাইবার সময় মাতৃদেবী যে ক্রমাগত অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, সে বিষয়টী এখনও আমার মনে আছে; পরে মাতামহীর মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে, আমার ফতেপুর যাইবার পর মাতৃদেবী পাগলিনীর মত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা আমার নাম করিয়া রোদন করিতেন। আমি নিষ্ঠুর, তাঁহার অযোগ্য সন্তান, যাইবার সময় একবারও ভাবি নাই যে, জননীর স্নেহ ও ভালবাসা পাইবার দিন আমার অদৃষ্টে শেষ হইয়া আসিতেছে। তাই আমিও মধ্যে মধ্যে ভাবি, মা আমার আজ ৩৫ বৎসর হইতে চলিল স্বর্গধামে গিয়াছেন; এ দীর্ঘকাল আমায় না দেখিয়া সেখানে কি করিয়া রহিয়াছেন? তিনি আমায় একবারও মনে করেন না! এমন নিষ্ঠুর কেন হইলেন?

নির্ব্বিঘ্নে ফতেপুরে গিয়া পঁহুছিলাম। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসের কথা। মাসটি ঠিক মনে নাই। পিতৃদেব আমার হাকিমী-চিকিৎসা না করাইয়া এক জন তদ্দেশীয় ভাল বৈদ্যের নিকট হইতে বসন্ত-মালিনী ও অন্যান্য কিছু ঔষধ লইয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকাল থাকিব বলিয়া তথাকার স্কুলে আর প্রবেশ করা হইল না; কিন্তু পাঠের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। তখন সে জ্ঞান নাই। আমি প্রতিভা লইয়া এ সংসারে আসি নাই। তবে খেলার দিকে মনটা কিছু বেশী দৌড়িত এবং দৌরাত্ম্য করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলাম। মাতৃদেবীকে বিস্তর জ্বালাতন করিয়াছি। পিতৃদেব কাছারী চলিয়া গেলে আমি বাটীতে স্বল্পমাত্র লেখাপড়া করিতাম, তৎপরে ক্রমাগত খেলা। এইরূপে ফাল্গুন চৈত্র কাটিয়া গেল। বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। তখন রৌদ্রের উত্তাপে দুই প্রহরের সময় বাহির হইতে পারি না বটে, কিন্তু বেলা চারিটার সময় বাহির হইতাম এবং পিতৃদেব যে পর্য্যন্ত আফিস হইতে বাটী না ফিরিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ খেলা ও দৌড়াদৌড়ি করিতাম। তাঁহার আসিবার সময় হইলে বাটীতে আসিয়া ভদ্র বালকটীর ন্যায় বসিয়া থাকিতাম। তখনও পিতৃদেবের প্রাতঃকালের কাছারী হয় নাই। একদিন আমি আমার নিয়মমত বৈকালিক দৌরাত্ম্য করিতেছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ পিতৃদেব আসিয়া পড়িলেন এবং আমার তদবস্থ দেখিয়া যথেষ্ট রাগান্বিত হইয়া তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন—এরূপ দৌরাত্ম্য করিলে কাশী পাঠাইয়া দিব।

রাত্রিকালে যথাসময়ে আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাল্যাবস্থায় সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করা যায় বলিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, তজ্জন্য বালকদের রাত্রিতে নিদ্রাটিও বিলক্ষণ ঘোর হয়। আমিও নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তখন জানিতে পারি নাই যে, মনঃশান্তির এই আমার শেষ দিন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ পিতৃদেব আমায় জাগাইলেন এবং বলিলেন যে, উঠ—প্রস্তুত হও, কাশী যাইতে হইবে। আমি সেই রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থা হইতে উঠিয়া পিতার সহিত বাটী হইতে বাহির হইলাম। কিছু ভাবগতিক বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, পিতৃদেব সন্ধ্যার সময় আমায় যে বলিয়াছিলেন—"কাশী পাঠাইয়া দিব" তাই কি ক্রোধান্বিত

হইয়া আমায় কাশী লইয়া যাইতেছেন? কত কি ভাবিলাম কিছুই কূল-কিনারা পাইলাম না। অথচ পিতৃদেবকেও বিলক্ষণ চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখিলাম। কিন্তু পিতাকে মুখ ফুটিয়া কাশী-যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইল না। পিতৃদেব আমাদের আজীবন স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। গায়ে হাত তোলা দূরের কথা, আমরা দুই ভ্রাতা জীবনে অতি অল্প সময়ই তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছি। আমি জীবনে তাঁহার নিকট কোনও আব্দার করিয়াছি এরূপ আমার মনে পড়ে না। আমি "মুখচোরা" ছিলাম। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। সমস্ত পথ তিনি ও আমি উভয়ে নিস্তব্ধ-ভাবে আসিলাম। পরদিন বৈকালে কাশীর রাজঘাটের ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। এখন কাশীতে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়া রেল-গাড়ী যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে; তখন তাহা ছিল না। কাশীর অপর পারে রাজঘাট নামক ষ্টেশনে নামিতে হইত; তথা হইতে নৌকাযোগে কাশী আসিতে হইত। ইহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিত। আমরা পিতাপুত্রে বেলা পাঁচটার সময় নিজ বাটীর নিকটস্থ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বারাণসীতে দরিদ্রা, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা অনেক নারী আছে, যাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে কলসী করিয়া গঙ্গার জল প্রদান করাই উপজীবিকা। তাহাদের "জলভরণী" কহে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী উভয়জাতীয় স্ত্রীলোকেরই এ কার্য্য করিয়া থাকে। এখন জলের কল হইয়াছে বলিয়া কাশীতে এই ব্যবসায়ী লোকের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে এবং অনেক দরিদ্র বিধবার অন্ন মারা গিয়াছে। একটী পরিচিত "জলভরণী"কে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর কি খবর?" সে উত্তর দিল, "বাঁচিয়া আছেন, তবে রোগ সাঙ্ঘাতিক।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, কেহ পীড়িত তাই আমরা ফতেপুর হইতে আসিয়াছি। তখন আর আমি থাকিতে পারিলাম না, মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার অসুখ?" জল-ভরুণী বলিল, "তুমি জান না?—তোমার মার।" আমার মস্তকে তখন বজ্রপাত হইল। ঘাটের সন্নিকটেই আমাদের বাটী। পিতা পুত্রে বাড়ীতে গিয়া দেখি, মাতৃদেবীকে নিম্ন-তলের একটী ঘরে রাখা হইয়াছে। তিনি জ্ঞানশূন্য, কখনও উঠিতেছেন, কখনও বসিতেছেন, কখনও বলিতেছেন, "যাই, —উঠি, সন্ধ্যা হইল, ঘরে প্রদীপ দিই।" এখন সেই সকল কথা মনে করিয়া নির্জ্জনে যখন অশ্রুপাত করি, তখন বুঝিতে পারি যে সে সময় তাঁহার ঘোর বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আমি সাড়ে নয় কি দশ বৎসরের বালক, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাতামহী দেবী মাতার নাম করিয়া ডাকিয়া আমার নাম লইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার অমুক আসিয়াছে।" মাতার যেন তখন একটু চেতনা হইল। বলিলেন, "বাবা এসেছিস—আয়!" বলিয়া আমাকে বক্ষঃস্থলে মুহূর্ত্তকালমাত্র ধারণ করিলেন। মাতৃদেবীর অমৃতময় স্নেহমাখা বাক্য সেই আমার শেষ শ্রবণ। মাতৃদেবীর স্নেহময় ক্রোড়ে সেই আমার শেষ শয়ন!

কিছুকাল মাতৃদেবীর নিকট থাকিয়া বাহিরে আসিয়া আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর অনুসন্ধান করিলাম। তাহাকে পাইয়া কোলে লইলাম। তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত অধিক স্নেহ ছিল। সেও আমায় আন্তরিক ভালবাসিত। তখন তাহার বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। গায়ে একটি কোর্ত্তা পর্য্যন্ত আচ্ছাদন নাই। তাহার ললাটদেশে একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কুমো! তোমার এখানে কি করিয়া লাগিয়াছে?" কুমো আধ-আধ স্বরে বলিল, "ছোটদাদা, খাট থেকে পড়িয়া গিয়া একটি চৌকির কোনে লাগিয়াছিল।" তাহার অবস্থা ও মাতৃদেবীর পীড়াবশতঃ অযত্ন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহাকে অনেকক্ষণ কোলে লইয়া রহিলাম এবং তাহাকে খেলা দিতে লাগিলাম।

কাশীতে সে সময় দত্তবংশীয় একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। হোমিও-প্যাথিটা "বেওয়ারিশ" মাল। একখানা রঙ্গের গোটাকতক পাতা উল্টাইতে পারিলেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইতে পারা যায়। সে ডাক্তারটিও তদ্রূপ। এরূপ না-পড়া ডাক্তার কাশীতে অনেক পাওয়া যাইত এবং এখনও বোধ হয় অনেক পাওয়া যায়। আমাদের ন্যায় দরিদ্র গৃহস্থের ইহারাই কাণ্ডারী। মাতৃদেবীর চিকিৎসা তিনিই করিতে-ছিলেন। আয়ুর্ব্বলই মহাবল; তবে মাতৃদেবীর যে ভাল চিকিৎসা হয় নাই তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রাত্রিতে রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রত্যুষে মাতৃদেবীর

অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইল। আমার বোধ হয়, বেলা ১০।১১টার সময় দাদা মহাশয় ও পিতৃদেব জানিতে পারিয়াছিলেন যে আর বেশী বিলম্ব নাই; তাই আমাকে ও আমার ছোট ভগিনীটিকে আমার সেজ জ্যেষ্ঠতাতের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের বাটী আমাদের বাটীর অতি নিকটে। আমি সেখানে ভগিনীটির সহিত এক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। তখন হঠাৎ আমার মন এমন বিচলিত হইল এবং মাতৃদেবীকে দেখিবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইলাম যে আর আমি সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না। ভগিনীটির হাত ধরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীর দিকে ধাবমান হইলাম। বাটীর প্রাঙ্গনে পঁহুছিবামাত্র যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ ৩৬ বৎসর হইতে চলিল আজিও সমভাবে আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এই দুঃখ-কষ্টময় সংসারে আসিয়া এই জীবনে কত যে যাতনা সহ্য করিয়াছি এবং করিতেছি, সে সমস্তই সময়ের গুণে বিস্মৃতসাগরে ভাসিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে; কিন্তু কঠোর বিস্মৃতি আমার হৃদয়পট হইতে সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যটি এখনও পর্য্যন্ত মুছিতে দেয় নাই। বরঞ্চ সমস্ত জীবন সেই দৃশ্য আমার মনে জাগাইয়া রাখিয়া শোকানলে দগ্ধ করিতেছে।

প্রাঙ্গণে আড়াই বৎসরের কনিষ্ঠা ভগিনীটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিলাম! পূর্ব্বরাত্রে মাতৃদেবী রুগ্নাবস্থায় যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের সম্মুখস্থিত দালানে তাঁহাকে বাহির করা হইয়াছে। মাতৃদেবীর পূর্ব্ব দিকে মস্তক ও পশ্চিম দিকে পদযুগল। দক্ষিণ দিকে তাঁহার মুখ এবং উত্তর দিকে পৃষ্ঠ। পিতৃদেব তাঁহার সম্মুখে মুখের কাছে বসিয়া রোদন করিতেছেন।—পৃষ্ঠভাগে দাদা-মহাশয় বসিয়া রোদন করিতেছেন।—আর মাতামহী দেবী?—তাঁহার অবস্থা বর্ণনার অতীত। এই কন্যাটিকে আশ্রয় করিয়া তিনি সংসারে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। তিনি পায়ের দিকে আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। মাতৃদেবীর সীমন্তে পিতৃদেব সিন্দুর পরাইয়া দিয়াছেন।

বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ দালান প্রতিবেশীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। মাতার প্রকৃতি অত্যন্ত মধুর ছিল বলিয়া প্রতিবেশিনীরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুণ্যবতী জননী আমার, আজ এই নবসাজে সজ্জিত হইয়া স্বামীহস্তে সীমন্তে সিন্দূর পরিয়া চিরকালের জন্য স্বর্গধামে চলিয়াছেন, তাই দেখিবার জন্য সমস্ত প্রতিবেশিনীরা একত্র হইয়াছেন এবং অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন! এই শোকাবহ দৃশ্যের মধ্যে রোদন করিতে করিতে আমি ভগিনীর হাত ধরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া "এখান হইতে যা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি বাল্যাবস্থা হইতেই দাদাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। ভয়ের কারণ, আমি দৌরাত্ম্য করিতে ছাড়িতাম না; তিনিও প্রহার করিতে ছাড়িতেন না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ভগিনীটির হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আবার জ্যেঠা মহাশয়ের বাটীর দিকে চলিলাম। মৃত্যুকালে স্নেহময়ী জননীকে একবার ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতেও পাইলাম না! দাদা আমার সহিত কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, আমরা বালক, সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিলে অত্যন্ত হেদাইব। কিন্তু আমি যে চিরকাল সেই দৃশ্য মনে করিয়া দগ্ধ হইতেছি বা আমায় দগ্ধ হইতে হইবে, তাহা ভাবিলেন না!

জ্যেঠা মহাশয়ের বাটীতে সিঁড়ির উপরে উঠিয়াই একটি দালান। সেই দালানে দাঁড়াইয়া আমি ও আমার ক্ষুদ্র ভগিনীটি উচ্চৈঃস্বরে বেলা ১০টা হইতে ২॥ কি ৩টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত রোদন করি। আমার ঠিক মনে নাই, জ্যেঠাই-মা তখন বাটীতে—কি আমাদের বাটীতে। জ্যেঠা মহাশয়ের কথাও মনে নাই। তবে এটুকু ঠিক মনে আছে যে, আমরা দুইটিতে এই আড়াই ঘণ্টা কাল ক্রমাগত ক্রন্দন করিয়াছি; এ হতভাগ্য মাতৃহীন দুটি ভাইভগিনীকে সে সময়ে কেহ একটু সান্ত্বনাও দেয় নাই। আমি ত দূরের কথা, আমার সেই দুগ্ধপোষ্য ভগিনীটিকে কেহ একবার কোলে করিয়া একটি মিষ্ট কথাও বলে নাই। ক্রমাগত এইরূপে কাঁদিবার পর বেলা আড়াইটা কি তিনটার সময় আমাদের বাটীর একটি স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের লইয়া যায়। বাড়ী আসিয়া সমস্ত শূন্য দেখিলাম। উপরে মাতামহী দেবী এক স্থলে সংজ্ঞাহীনের ন্যায় পড়িয়া আছেন। আমাদের দুইটিকে দেখিয়া তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি আছড়িয়া মায়ের নাম করিয়া পুনরায় কাঁদিতে

লাগিলেন। আমরাও দুইটিতে সেই সঙ্গে যোগ দিলাম। তিনি আমাদের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া কত যে ক্রন্দন করিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

বেলা পাঁচটার সময় স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে চিরকালের জন্য মণিকর্ণিকার ঘাটে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীজলে সমর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃদেব শূন্য গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া মাতামহী দেবীর শোকানল পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাকে ধরিয়া রাখা ভার। দেবোপম পিতৃদেবের তখন চক্ষে জল নাই; ধীর গম্ভীর মূর্ত্তি! তিনি আমাদের উভয়কে কোলে টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"বাবা, ভয় কি? আমি আছি।" আমি সেই দিন হইতে পিতৃদেবকে একাধারে পিতা-মাতা বুঝিলাম। আমার চিরারাধ্য হরগৌরী তদবধি একত্ব লাভ করিলেন। আজ প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পিতৃদেব স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এখনও ভীষণ বিপদ ও দুশ্চিন্তার সময়ে তাঁহার সেই মধুর সান্ত্বনা-বাক্য "বাবা ভয় কি—আমি আছি"—আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা গরীব। উদরান্নের সংস্থান নাই। পিতা আর কত দিন ঘরে বসিয়া থাকিবেন? তিনি আমাদের রাখিয়া অন্ন-চেষ্টায় ফতেপুর গমন করিলেন। কারণ তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। বাটিতে রহিলাম আমি, আমার জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠা ভগিনী এবং জীবন্মৃতা মাতামহী-দেবী। সেই বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী দিদিমার আর সে বুদ্ধি নাই, আর সেই পাকা কথা নাই; আর সে কার্য্যসৌষ্ঠব নাই। আমাদের না খাওয়াইলে নয়, তাই একবার উঠিয়া রাঁধিয়া থাকেন। নিজের উদরে কিঞ্চিৎ না দিলে উঠিয়া কায করা অসম্ভব, তাই দিনান্তে অন্নের কাছে একবার আসেন।

এই ভয়ঙ্কর সাংসারিক অবস্থাবিপর্য্যয়হেতু আমার স্কন্ধে কতকগুলি নূতন কার্য্য আসিয়া পড়িল। দাদা মহাশয় তখন কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিম্নশ্রেণীতে পাঠ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন—সময় অল্প। ছোট ভগিনীটিকে খাওয়ান, কাপড় পরান—সব কাজের ভারই পড়িল আমার উপর। একদিন মাতামহী বড়ীর কাঠিন্যে বিরক্ত হইয়া শীলের উপর নোড়া দিয়া বড়ী ভাঙ্গিতেছেন, এমন সময় এক প্রতিবেশিনী আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমার নাম লইয়া বলিলেন, "অমুকের মস্তক চূর্ণ করিতেছি। কোনরূপেই ইহা গলে না, তাই ভাঙ্গিতেছি।" প্রচলিত কথা আছে "আসল অপেক্ষা সুদের মায়া বেশী।" আমি বোধ হয় তাঁহার নিকট পূজনীয়া জননীদেবীর অপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্র, কিন্তু আমার সম্বন্ধেও যখন তিনি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন দুহিতৃ-বিয়োগ-শোকে তাঁহার মানসিক-বৃত্তি-নিচয়ের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ এই গল্পটি পড়িলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

সারাদিন এইরূপ গৃহকার্য্য ও ভগিনীটির লালনপালনে ব্যস্ত থাকায় লেখাপড়ার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইল। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। লেখাপড়ার বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত হইল না। একদিন দাদামহাশয় হঠাৎ আমার পাঠ দেখিতে বসিলেন। পুরাতন পাঠ সমস্তই ভুলিয়াছি, কিছুই মনে নাই। বিলক্ষণ প্রহার হইল। এখন আমায় স্কুলে দেওয়া দাদার মত হইল। বাঙ্গালীটোলার স্কুলে দেওয়া তাঁহার মত, কিন্তু মাতামহীদেবীর ছোট স্কুলে দেওয়া মত হইল; কারণ সেখানে মাহিনা কম দিতে হইত। এখানে ছোট স্কুলের ও বড় স্কুলের একটু কৈফিয়ৎ দিয়া রাখি। সেকালে কাশীর সরকারী কলেজ অর্থাৎ Queens College কাশীর বাঙ্গালীটোলার মেয়ে মহলে বড় স্কুল নামে পরিচিত ছিল। আমার দাদামহাশয় এই সরকারী কলেজে পড়িতেন। তথাকার মাহিনা কিছু বেশী, তাহাই যোগাইতে আমাদের কষ্ট হইত। আর ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় ১৮১৮ অথবা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার পরিচালনের ভার ও কিছু অর্থ ইংরেজ পাদরীদের হস্তে দিয়া গিয়াছেন। এই স্কুলটির প্রকৃত নাম Joynarain College শুনিয়াছি, ঘোষাল মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় এই বিদ্যালয়স্থ বালকদের পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত অর্থ হইতে দেওয়া হইত। আমি যখন এই স্কুলে প্রবেশ করি, তখন এখানে First Arts পর্য্যন্ত পড়ান হইত এবং তখনও দরিদ্রবালকদের নিম্নশ্রেণীতে লিখিবার কাগজ ও কলম

দেওয়া হইত। কাশীর বাঙ্গালী মেয়ে-মহলে এই বিদ্যালয়টি ছোট স্কুল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দরিদ্র বালকরাই এখানে অধিক পাঠ করিত। কারণ নামমাত্র বেতন দিতে হইত।

মাতামহীদেবীর ইচ্ছানুসারে আমি এখন এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য ও ভগিনীর তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া স্কুলে যাইতাম। আবার সন্ধ্যার সময় প্রাতঃকালের ন্যায় রন্ধনের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। সুতরাং সকালে সন্ধ্যায় আমার পাঠ বা পুস্তকাদির আলোচনা প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। কোনও কোনও দিন সমস্ত দিনের খাটুনীর পরও পাঠ করিতাম। তবে অধিকাংশ দিন রাত্রিতে আহারাদির পর ঘুমাইয়া পড়িতাম। ভগিনীটিও আমার নিকট না হইলে শুইত না এবং ঘুমাইত না। আমি কোনও কালেই প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলাম না। বিশেষ গণিতে আমার অগাধ বিদ্যা। গণিতের নাম শুনিলে আমার জ্বর আসিত। যাহা হউক, এই সকল বাধা সত্ত্বেও বাৎসরিক পরীক্ষায় কোনরূপে কৃতকার্য্য হইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হই। মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্টে এইরূপে প্রায় এক বৎসর গেল। যত দিন যাইতে লাগিল মাতামহী-দেবীর মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর তত মন্দ হইতে লাগিল। লোকে বলিয়া থাকে,—"Time is a great healer" —সময়ে সকল বেদনাই সহিয়া যায়। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর মাতামহীদেবী দুই বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে আমি সমভাবে শোকে অভিভূত দেখিয়াছি। এক দিনের জন্য মাতৃদেবীর নাম করিয়া রোদনে নিবৃত্ত দেখি নাই। তাঁহার মানসিক বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খাটিয়া মরি, অথচ তিরস্কার ও গালাগালি হইতে কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাই না। আবার মধ্যে মধ্যে দাদামহাশয় পরীক্ষায় ভাল পড়া বলিতে না পারিলে বিলক্ষণ প্রহার করিতেন। তখন আমার বয়স প্রায় ১০।।০ বৎসর। ঈদৃশ কষ্টভোগে মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। বাটীতে থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না। বাটী আমার বিষতুল্য হইয়া দাঁড়াইল। অথচ যাই কোথা? ইহসংসারে স্থান নাই। পিতৃদেবের নিকট যাইতে সাহস নাই, পাছে তিনিও ক্রুদ্ধ হন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমা অপেক্ষা ২।৪ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ একটি সতীর্থ ও বন্ধুর নিকট রোদন করিতে করিতে একদিন সমস্ত কথা গোপনে বলিলাম। উভয়েই বালক, তবে আমা অপেক্ষা তিনি বয়সে একটু বড়; তিনি আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীর সন্নিহিত মির্জাপুরে চাকরী করেন। চল, সেইখানেই পলাইয়া যাই। আমরা সেইখানে পড়িব এবং একত্র থাকিব। আমিও বালক-সুলভ চাপল্যে সেই মতে মত দিলাম। এখন পাথেয়ের কথা উত্থিত হইল। তিনি আমায় বলিলেন, যদি তুই ৫৲।৭৲ টাকা যোগাড় করিতে পারিস—আমার কাছে ২৲।৩৲ টাকা আছে, তাহা হইলে উভয়ের মিলাইয়া ১০৲।১২৲ টাকা হইলেই আমরা বেশ যাইতে পারি। মির্জাপুর কত দূর, রেলের ভাড়া কত, পথখরচই বা কি হইবে, এ সকল আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। আমাকে মাতামহীদেবী প্রত্যহ জলখাবারের একটি করিয়া পয়সা দিতেন। কোন দিন ভগিনীটিকে খাওয়াইতাম, কোনও দিন বা জমা করিতাম। এইরূপে ২৲।৩৲ টাকা আমার সঞ্চিত হইয়াছিল। মাতামহীদেবী সেকালের স্ত্রীলোক। এ কালের মত পয়সা কড়ি রাখিবার তাঁহার বাক্স ইত্যাদি ছিল না। তিনি চালের কলসী, ডালের হাঁড়ী, এই সকল স্থলে পুঁটুলী করিয়া টাকা পয়সা রাখিতেন। রন্ধনের জন্য চাল ডাল বাহির করিবার সময় ঐ সকল টাকাকড়ি আমার হস্তে পড়িত। দিদিমাকে দেখাইলে বা বলিলে তিনি বলিতেন, "থাক যাহা আছে, ঐখানেই রাখিয়া দে, খবরদার নিস নে।" আমিও যাহা পাইতাম, তত্তৎস্থানে পুনরায় রাখিয়া দিতাম। সুতরাং বন্ধুর পরামর্শমত টাকা সংগ্রহ আমার পক্ষে কষ্টকর হইল না।

একটি পুঁটুলী হইতে ৫৲।৭৲ টাকা লইয়া এবং আমার নিজের কাছে যে ২৲।৩৲ টাকা ছিল, তাহা মিলাইয়া ১০৲।১১৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া বন্ধুর নিকট যাইলাম। তিনি ২৲।৩৲ টাকা সংগ্রহ করিলে পর তাঁহার বাটী হইতে উভয়ে স্কুলে যাইবার ছলে বাহির হইলাম। আমার পক্ষে ভগিনীটিকে ছাড়িয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য কষ্টের কথা মনে হওয়ায় যাওয়াই স্থির হইল। আমি রাস্তা-ঘাট বড় একটা জানিতাম না। আমি ও বন্ধু প্রথমে কাশীর চকে গেলাম। সেখান হইতে দুইটি ছাতা খরিদ করিয়া পদব্রজে রাজঘাট ষ্টেশনে

চলিলাম। রাজঘাট চক হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। বেলা দুই প্রহরের সময় গঙ্গাবক্ষে নৌকায় সেতু পার হইয়া ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সে সেতু আর এখন নাই। তখন গ্রীষ্ম ও শীতকালে নৌকায় সেতু প্রস্তুত হইত এবং বর্ষাকালে ভাঙ্গিয়া যাইত। এখন রেলের পাকা সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহারই উপর দিয়া গাড়ী যাতায়াত করে। রাজঘাট ষ্টেশনে তখন শিবচন্দ্র মিত্র 'ষ্টেশন-মাষ্টার' এবং তাঁহার অধীনে কতকগুলি অন্যান্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। সে সময় এতদঞ্চলে বাঙ্গালীদেরই রেলের কার্য্য একচেটিয়া। আমার নিকট দ্রব্যাদি কিছুই নাই; দুই জনে দুইটি ছাতা হস্তে চলিয়াছি দেখিয়াই রেলের বাবুরা ধরিয়া ফেলিলেন যে, আমরা পলায়ন করিতেছি। আমার বন্ধুটি তাঁহাদের সহিত নানারূপ তর্ক করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন যে আমরা পলাইতেছি না; কিন্তু তাঁহাদের আর জানিতে বাকি রহিল না। আমি নিজ অবস্থা চিন্তা করিয়া কিছু নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাব ধারণ করিয়াছিলাম।

যথাসময়ে গাড়ী চড়িয়া বেলা ৪।৫টার সময় মির্জ্জাপুর পঁহুছিলাম। সেখানেও আবার সেই উৎপাত। আমার বন্ধুবরের জ্যেষ্ঠের একটি বন্ধু ষ্টেশনে আমাদের সেইরূপ অবস্থায় নামিতে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন—"তোরা নিশ্চয়ই পলাইয়া আসিয়াছিস।" বন্ধুবরের জ্যেষ্ঠ মির্জ্জাপুরের Civil Surgeonএর Mortuary Clerk. আমরা চিকিৎসালয়ে গিয়া নামিলাম। তিনিও আমরা পলায়ন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং আমার ও বন্ধুবরের নিকট যাহা কিছু টাকাকড়ি ছিল সমস্ত কাড়িয়া লইলেন।

আমরা তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার এক মাসী গৃহিণী। তিনি আমাদের অতি যত্নপূর্ব্বক আহারাদি করাইলেন। তাঁহারা উভয়ে—অর্থাৎ মাসী ও বন্ধুর জ্যেষ্ঠ আমাদের চোখে চোখে রাখিতেন। ভয়, পাছে সেখান হইতেও পলায়ন করি। বিশেষতঃ আমার জন্যই তাঁহাদের চিন্তা। কারণ আমি পরের ছেলে, তাঁহার ভ্রাতার সহিত পলাইয়া আসিয়াছি।

তিন চারি দিবস এইরূপে গেল। চতুর্থ কি পঞ্চম দিবসে আমরা দুই জনে আহারাদির পর হাস্পাতালে বসিয়া আছি। বেলা ১টা কি ২টা হইবে। এমন সময়ে দেখি পিতৃদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত। আমায় পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। আমি একেবারে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলাম। কোনও কথাটী নাই। মনে অত্যন্ত ভয় হইল, না জানি পিতৃদেব কতই তিরস্কার করিবেন, বিশেষ টাকা লইয়া আসিয়াছি। এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পিতৃদেব সেই চিকিৎসালয়ে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। বন্ধুর ভ্রাতা তাঁহার আহারাদির জন্য বিশেষ যত্ন পান, কিন্তু পিতৃদেব পরম নিষ্ঠাবান। তিনি অপরের হস্তের পক্ব অন্ন গ্রহণ করেন না। কিছু জলযোগ করিয়া বেলা ৩টা ৩৷০টার সময় আমাকে লইয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। বন্ধুবরের ভ্রাতাকে বলিলেন—"বাবা, আমার ছুটী নাই, কল্যই কাছারী করিতে হইবে; সুতরাং পরবর্ত্তী গাড়ীতেই আমাকে যাইতে হইবে।" তিনি আমায় যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতৃদেব অজস্র আশীর্ব্বচনে তুষ্ট করিলেন। তিনিও আমার নিকট হইতে যাহা কিছু টাকা কড়ি লইয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন আমার সম্মুখে সমস্ত পিতৃদেবকে বুঝাইয়া দিলেন।

হাসপাতালের গণ্ডী ছাড়াইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িলাম। আসিবার সময় বন্ধুবরের সহিত আর একলা সাক্ষাৎ হইল না। ভয়ে তখন হতবুদ্ধি, না জানি পিতা কতই তিরস্কার করিবেন। কিন্তু তিনি আমায় কিছুই বলিলেন না, বরঞ্চ সস্নেহে পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আর চক্ষে জল রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। এই সকল ব্যাপার শুনিয়া পিতার অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। স্ত্রী-বিয়োগজনিত কষ্ট, প্রাণসম সন্তানদের এই সকল দুর্দ্দশা—তাঁহার হৃদয়কে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। পিতাপুত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে পদব্রজে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে পিতৃদেব কি করিয়া জানিতে পারিলেন যে আমি মির্জ্জাপুরে অবস্থান করিতেছি। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, কাশীর রাজঘাট ষ্টেশনে ২।৪ জন বাঙ্গালী রেল-কর্ম্মচারী যখন আমাদের ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন যে আমরা পলাইয়া যাইতেছি, সেই সময় আমাদের সহযাত্রী এতদ্দেশীয় ২।৩টি হিন্দুস্থানী সেই তর্ক-বিতর্ক শুনিয়াছিলেন এবং কতক কতক বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহারা বোধ হয় কাণপুর যাইতেছিলেন। আমি স্কুল হইতে বাটীতে না ফেরায় দাদামহাশয় পিতৃদেবকে টেলিগ্রাফ করেন। সেই তারের খবর পাইয়া পিতৃদেব ফতেপুর ষ্টেশন আসিয়া সমস্ত গাড়ী অনুসন্ধান করেন। হঠাৎ সেই দুটী আরোহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহারা আমার সন্ধান বলিয়া দেয় এবং সংবাদ দেয় যে, আমরা মির্জ্জাপুরে নামিয়াছি। জজ সাহেবের নিকট অনুমতি লইয়া পিতৃদেব এই সূত্রের অনুসরণ করিয়া মির্জাপুরে আসেন এবং তথায় নামিবামাত্র আমার বন্ধুবরের জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনিই হাসপাতালের ঠিকানা ও আমাদের আসিবার সংবাদ পিতৃদেবকে বলিয়া দেন।

যথাসময়ে ফতেপুরে পঁহুছিলাম। সেই বাটী, সেই ঘর, সেই নাপিত, গোয়ালা, পিতৃদেবের সমস্তই সেই; নূতনের মধ্যে দেখিলাম, "ধুদি" দাসীটী নাই। অতি বৃদ্ধা হইয়া পিতৃদেবের চাকুরী করিতে করিতে সে পরলোক গমন করিয়াছে। এখন তাহার স্থলে তাহার পুত্রবধূ কার্য্য করে। ২।৪ দিবসের পর বাবার প্রমুখাৎ শুনিলাম, তিনি ২।৪ মাস পূর্ব্বে পেন্সনের আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি জজসাহেবের কৃপাদৃষ্টিবশতঃ তিনি আবেদনপত্রখানি সদরে পাঠান নাই। ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন জেদ ও তাগাদা করিয়া আবেদনপত্র ও পেন্সন ঘটিত অন্যান্য কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। বুঝিলাম আমাদের কষ্ট আর পিতৃদেবের সহ্য হইল না। তিনি এখন পেন্সন লইয়া গৃহে বসিতে ইচ্ছুক। ভাবিলাম ৪০৲ টাকা মাহিনাতেই আমরা অতি দীনভাবে চালাই; ইহার অর্দ্ধেকে এখন কি করিয়া চলিবে? কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

এ গুলি বৈশাখ মাসের কথা। আষাঢ় মাসে পিতৃদেবের পেন্সন মঞ্জুর হইয়া আসিল। পিতৃদেব আমায় বলিলেন, তুই যদি দিন পনের একা থাকিতে পারিস তাহা হইলে আমি একবার মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসি; কারণ কাশীতে প্রবেশ করিয়া আর আমার কাশী ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। তোর নিকট রাত্রিতে ধুদির পুত্রবধূ শুইয়া থাকিবে। আর তুই তোর জ্যেঠতুতা বড়দাদার বাটীতে খাইয়া আসিবি। আমি সম্মত হইলাম। পিতৃদেব মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিতে চলিয়া গেলেন।

১৫।২০ দিন পরে পিতৃদেব ফিরিয়া আসিলেন এবং আমরা পিতাপুত্রে দুই জনে ফতেপুর হইতে চিরকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিলাম। এই ফতেপুরে আমার পিতৃদেব, জ্যেষ্ঠতাত, অপর এক জ্যেষ্ঠতাত-তনয়, জ্যেষ্ঠতাত-জামাতা প্রভৃতি আমাদের পরিবারস্থ অনেকেরই চাকুরী ব্যপদেশে ৩০।৪০ বৎসর হইতে বাস। আমাদের আজ সেই বহুকালের সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। আমার বালক হৃদয়ই যখন ফতেপুরের জন্য সে সময় কাতর হইয়াছিল, তখন পিতার অন্তঃকরণে—যে ফতেপুর-বিচ্ছেদজনিত গভীর বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অশ্রুপাত করিতে করিতে পিতৃদেব পুরাতন বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তদ্দেশীয় প্রতিবাসীবর্গ পিতৃদেবকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং মান্য করিত। তাহারা সকলেই ক্ষুব্ধ-অন্তঃকরণে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় দিল। এইরূপে পিতৃদেব আমাদের দুটী ভ্রাতার ও কনিষ্ঠা ভগিনীর মায়ায় চাকুরী ও ফতেপুর ত্যাগ করিলেন। ১৮৭০ সালের শ্রাবণ মাসে আমরা পিতাপুত্রে বারাণসীধামে আসিলাম। তৎপরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পিতৃদেব কাশী হইতে একপদও সরেন নাই।

সংসারের ভার এখন পিতৃদেবই গ্রহণ করিলেন। মাতামহীদেবী কখনও রন্ধনশালায় যান, কখনও বা যান না। সন্ধ্যার সময় ত তিনি যাইতেনই না। আগে যেমন আমি মাতামহীদেবীকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিতাম, এখন পিতৃদেবকে করিতে লাগিলাম। তবে কষ্টের ভার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লঘু হইল এবং মাতামহীদেবীর তাড়না হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইলাম। কনিষ্ঠা ভগিনীটিও এখন পিতৃদেবের অনেকটা 'নেওটা' হইল। এই অবসরে আমি বাঙ্গালীটোলার স্কুলে পুনরায় চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম।

অধুনাতন কালে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও স্কুলসমূহের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে বা মধ্যসময়ে হইয়া থাকে আমাদের সময়ে সেরূপ হইত না। তখন বাৎসরিক পরীক্ষা শীতকালে পৌষ অথবা মাঘ মাসে হইত। সুতরাং আমি শ্রাবণ মাসের শেষভাগে স্কুলে প্রবেশ করায় পাঠে অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। সে বৎসর বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ইংরেজী ভাষা,

বাঙ্গালা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলাম, কিন্তু গণিতে চিরকালই আমার বিদ্যার দৌড় অধিক। সুতরাং উক্ত বিষয়ে ফেল হইলাম। নিজের দোষ ত ছিলই, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষক মহাশয়ও একটু অদ্ভুত প্রণালীর পরীক্ষা লওয়ায়, বোধ হয়, অকৃতকার্য্য হইলাম। তিনি তিনটিমাত্র অঙ্ক দিলেন এবং বলিলেন যে প্রত্যেক অঙ্কে ৩৩ নম্বর দিব। ৭০ নম্বর পাইলে পাস, নতুবা ফেল। যাহার দুইটি শুদ্ধ হইল, সে একেবারে ৬৬ নম্বর পাইল; যাহার একটি মাত্র শুদ্ধ হইল, সে বেচারী একেবারে মাটী হইল—৩৩এর অধিক পাইল না। আমি এই ৩৩এর দলভুক্ত হইলাম। আবার হাতের লেখার পরীক্ষায় এই পরীক্ষক মহাশয় ততোধিক অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, "সকলে আপনার শ্লেটে নিজ নিজ নাম দস্তখত করিয়া দেখাও, যাহার ভাল হইবে সেই ফার্ষ্ট হইবে।" লেখায় আমি ফার্ষ্ট হইলাম। কিন্তু পরীক্ষা-প্রণালী কি ন্যায়সঙ্গত হইল? আমার বিবেচনায় ত কোনও মতেই নহে। বাল্যকালে অনেকের নিজের নাম দস্তখত ও উহা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিবার একটা বাতিক থাকে। অনেকের হাতের সাধারণ লেখা ভাল না হইলেও নামটা দস্তখত করিবার সময় অক্ষরগুলা একটু সুন্দর ও পরিপাটী হইয়া থাকে; আমার যদি তাহাই হইয়া থাকে। সুতরাং আমি বাস্তবিক ফার্ষ্ট হইবার উপযুক্ত ছিলাম কি না তাহা বলিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সময়ে নিম্নশ্রেণীতে কিরূপ শিক্ষা দান হইত, তাহার একটু বর্ণনা এখানে দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। আমরা এখন প্রায়ই চতুর্দ্দিকে প্রাচীনদের মুখে এইরূপ শুনিতে পাই যে, এখন যে সকল ছাত্র স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইতেছে, তাহারা আর লেখাপড়ায় সেরূপ "পোক্ত" নহে; যেমন পুরাতন হিন্দুকলেজ অথবা সিনিয়র-জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া বাহির হইত। কথাটা সত্য হইলেও সকলের মুখে অনুযোগই শোনা যায়, কিন্তু এই দোষের প্রতীকারার্থ কাহাকেও ত তর্জ্জনীমাত্র তুলিতেও দেখি না। গবর্ণমেন্টের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ ত আছেই, কিন্তু কেবল শাসনকর্ত্তাদের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিলেই কি এ দোষ যাইবে? ইহাতে আমাদের দেশের ও সমাজের যে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে তাহা কি কেহ বুঝিতেছেন না? অথচ এ দোষপরিহারার্থ আমাদের যতটুকু শক্তি আছে সেটুকুও ত আমরা ব্যয় করিতেছি না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাইতেছি না, আমাদের দৃষ্টি আপাততঃ কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়। আমাদের মতে তিনটি দোষ প্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে; যথা—(১) বিষয়বাহুল্য ও পরীক্ষা-বাহুল্য (২) পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন (৩) শিক্ষক। ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষার প্রথম যুগে অর্থাৎ হিন্দুকলেজের সময় নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ-শ্রেণীতে বিষয় বাহুল্য ছিল না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজী দর্শন—ছাত্রেরা এইগুলি লইয়াই থাকিত। এমন কি গণিতেরও বিশেষ চর্চ্চা ছিল না। পরে দ্বারিকানাথ মিত্রের সময়ে বেথুন সাহেব গণিতের বেশী চর্চ্চা বাড়াইয়া দেন। বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়া দেশীয় ছাত্রেরা সাহিত্য প্রভৃতি যাহা পাঠ করিত সেইগুলিতে বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিত। আবার পাঠ্যনির্ব্বাচন বিষয়ে তখন বিশেষ সাবধানতা দেখা যাইত। পুস্তকাদির তখন বহুল প্রচার ছিল না; কিন্তু যাহা ছিল তাহা অতি উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল। সে কালের নিম্ন শ্রেণীতে প্রায়ই Enfield's Speaker পড়ান হইত। আমার নিকট অতি পুরাতন একখানি Enfield's Speaker ছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে এখন ঐ পুস্তকখানি আমার নিকটে নাই। আমার মনে পড়ে, ঐ পুস্তকখানি ইংরেজী সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক সকলের অংশবিশেষ লইয়া সঙ্কলিত। Shakespear এর নাটকাদি হইতে Goldsmith-কৃত প্রবন্ধনিচয় পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার অতি উৎকৃষ্ট ভাবনিচয় উহাতে নিবিষ্ট ছিল। এই পুস্তকখানি সেকালে অতি যত্নের সহিত অধীত হইত। এখন নানা মতের নানা বেশের পরীক্ষা হইয়াছে। নামই পরীক্ষার কত। Upper Primary, Lower Primary, Middle, ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। দুগ্ধপোষ্য বালকদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা দিতে দিতেই প্রাণান্ত। সেকালে ইহা ছিল না। তাহার পর সর্ব্বোপরি ডিরোজিও বা ডি এল, রিচার্ডসন বা বালান-টাইন প্রমুখ উৎকৃষ্ট শিক্ষক এখন কোথায়? এই মনীষিগণ আপনাদের ছাত্রদের সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া শিষ্যদের হৃদয়ে নিজেদের উচ্চ মনের ভাব ঢালিয়া দিতেন। এখন কি তাহা হইয়া থাকে? এখনকার শিক্ষক মহাশয়রা নিজ শিষ্যদের সহিত পরিচিত কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বকালের শিক্ষায় যে দোষ ছিল না তাহা আমরা বলিতেছি না। তখন যেমন অঙ্গহীন শিক্ষা ছিল, এখনও তেমনই অঙ্গহীন। তবে সেকালে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, সেটুকু বেশ "পোক্ত" রকমের এবং ভিত্তিটুকু বেশ দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এখন যাহা কিছু করা হয়, সমস্তই কম-জোর ভিত্তির উপর। কাজেই এমারতটি সকল সময়েই টলমল করিতেছে।

লর্ড ড্যালহাউসীর স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় হইতে ভারতবর্ষে যে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, যদিও লোকশিক্ষার উগা একটা প্রকৃষ্ট পথ, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষাবিভ্রাটও বিস্তর ঘটিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের পর হইতেই বিষয়বাহুল্যে ও পরীক্ষাবাহুল্যে ছাত্রদিগকে ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তারা যখন তখন আমাদের বিদ্রূপ করিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ছাত্ররা সবই "মুখস্থ করে।" প্রভুরা ভাবিয়া দেখেন না দোষটী কাহার। সেকালের ছেলেরা নিম্নশ্রেণীতে একটু গণিত ও ইংরেজী ভাষা লইয়া থাকিত। এখনকার ছাত্ররা নিম্ন-শ্রেণী হইতেই বিষয়বাহুল্যের চাপে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে। কাজেই পুঁথিগত বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে ছিল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী; এখন আবার হইয়াছে প্রথম ষ্টাণ্ডার্ড, দ্বিতীয় ষ্টাণ্ডার্ড, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাই শ্রেণী বিভাগই এখন বোঝা ভার। বালকদের বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দিতেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। বিষয়-বাহুল্যের ব্যাপারটি একবার বুঝুন। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীতেই ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গণিত, ভূগোল, আবার একটুখানি নক্সা-টানা। গণিত বড় কমটি নয়, সমস্তই পাটীগণিত। দশম অথবা একাদশ-বর্ষীয় বালকরা পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ করে। এই দুগ্ধপোষ্য বালকদের প্রতি এরূপ অত্যাচার। পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনও কেমন চমৎকার! ভারত হইলেন—বিলাতী নিকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্তাদের অধমতারণ। ম্যাকমিলান কোম্পানী ছাই ভস্ম যাহা কিছু প্রস্তত করিয়া পাঠাইবেন, ভারতে সব চলিয়া যাইবে। আমাদের সময় পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনে এত বিভ্রাট ছিল না। প্যারীচরণ নিম্নশ্রেণী একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিষয়বাহুল্য দেখা দিয়াছিল, তবে এখনকার মত এত নহে। যে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীতে এখন সমগ্র পাটীগণিতটি উদরস্থ করা হইতেছে, আমাদের সময়ে উক্ত শ্রেণীদ্বয়ে Vulgar fraction পর্য্যন্তই ছিল। পরীক্ষা-বাহুল্য ছিল না, তবে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছিল। আমার মনে আছে আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন প্রথম Departmental Examination দেখা দেয়—ইহাই পরে Middle Class Examinationএ পরিণত হইয়া পশ্চিমোত্তর দেশে স্বীয় অধিকার বিলক্ষণ বিস্তৃত করে এবং নানা সাজে সজ্জিত হইয়া কত রকম লীলা খেলা করিয়া এখন যেন একটু শ্রান্তি অবসানে সুখ ভোগ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত Departmental Examinationএ আমাকে প্রেরণ করা হয়। আমার বেশ মনে আছে কাশীর Joy Narain Collegeএর অধ্যক্ষ Leupolt নামক এক পাদরী পুঙ্গব এই পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষক। প্রশ্নপত্র পাইয়া দেখি Scott's Lay of the Last Minstrel এবং Milton's Paralise Lost হইতে কতকগুলি কবিতা তুলিয়া সংক্ষেপে ভাব বুঝাইতে দেওয়া হইয়াছে। আমার বয়স তখন কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশ বর্ষ। আমি সে বয়সে Scott অথবা Miltonএর নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই; তাঁহাদের কাব্যরসের আস্বাদন করা ত বহু দূরের কথা! বিদ্যাবাগীশ Leupolt মহোদয় Departmental পরীক্ষার ছাত্রদের উপর যে উৎকট বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার ন্যায় শত শত বুদ্ধিহীন ও প্রতিভাহীন ছাত্রকে যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইয়াছিল। তবে তখন "মিডিল" পাশ না করিলে ১০৲ টাকার সরকারী চাকুরী পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে না অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইবে না, এরূপ উৎকট নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম, নতুবা আমার বিদ্যা-শিক্ষা সেইখানেই শেষ হইত।

আমাদের সময়ের শিক্ষকদের একটু পরিচয় দিই। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি যে আমি সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে উদ্দেশ করিয়া কোনও কথা বলিতেছি না। কারণ আমি দরিদ্রের সন্তান। সরকারী বিদ্যালয়ে আমি বাল্যকালে বিদ্যালাভ করি নাই। আমি নিজে গরীব, তাই আমায় গরীব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। আমার বক্তব্য, প্রাইভেট অথবা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি লইয়া। আমাদের দেশে সরকারী বিদ্যামন্দির কয়টা? বেশীর ভাগই প্রাইভেট,

অথবা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত। আমি যে বাঙ্গালীটোলার স্কুলে পড়িতাম, সেটীও সাহায্যকৃত। কতকগুলি মহৎ-প্রকৃতি বাঙ্গালীর চেষ্টায় এই স্কুলটী স্থাপিত হয় এবং কাশীস্থ বাঙ্গালীদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সময় এই স্কুলে যে সকল ভয়ানক দোষ ছিল, সেগুলি এ স্থলে না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এখন উক্ত বিদ্যালয়ে সে সকল দোষ আছে কি না তাহা বলিতে পারি না। যদি থাকে তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের বিষয়। আমাদের সময়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে দুইজন শিক্ষক ছিলেন একজন ভট্টাচার্য্য—অপরজন বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়ই বৃদ্ধ। বয়স ৫০এর অতিরিক্ত। উভয়ই গবর্ণমেণ্টের পেন্সন-ভোগী। তবেই বুঝিতে হইবে যে, পেন্সন লইয়া তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাস করিতে আসিয়াছিলেন। অবকাশ ছিল সুতরাং যে কয়টা টাকা স্কুল হইতে পাওয়া যায়। তাঁহারা জীবনে কখনও শিক্ষকতা করেন নাই; এখন বৃদ্ধ বয়সে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। সুতরাং শিক্ষাদানের রীতিও তদনুরূপ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যের পাঠগুলির মানে শিখাইয়া দিতেন—আমরা বাটী হইতে মুখস্থ করিয়া আনিয়া উদ্গার করিতাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অঙ্ক কষাইতেন। গণিতের উদ্দেশ্য (principle) ইত্যাদি ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করান কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। বরঞ্চ পাটীগণিতের প্রত্যেক অধ্যায়ের principle গুলি তিনি নিজে বুঝিতেন এবং জানিতেন কি না সন্দেহ। অঙ্ক দিলে না কষিতে পারিলেই প্রহার। তাঁহার বেত্রাঘাতের ভয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হইতাম। এই ত গেল পাঠের ব্যবস্থা। তাহার উপর যদি এই সকল মহাত্মার নৈতিক চরিত্র দেখা যায় তাহা আরও ভয়ঙ্কর। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি সেবাদাসী ছিল। তিনি একক—সেবাদাসীটি সমস্ত গৃহকার্য্য করিত এবং রাত্রিতে হয় ত পদসেবাও করিত। আবার আমাদের যিনি সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, সেই পণ্ডিত মহাশয় একজন উড়িষ্যানিবাসী; বিদ্যালঙ্কার উপাধি। কোন টোলে বা সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিয়া বিদ্যালঙ্কার উপাধিগ্রস্ত —কি বারাণসীধামে বিনা পয়সায় বা কিঞ্চিৎ পয়সায় (ইহার বৃত্তান্ত পরে দ্রষ্টব্য) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। হঠাৎ কোনও কার্য্যোপলক্ষে একবার তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি নয়, দুইটি নয়, সেবাদাসীর এক দল দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বিরাজ করিতেছিলেন। যখন এই সকল কথা আমার মনে পড়ে, তখন চরিত্র ঠিক রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করিয়া সংসারযাত্রা যে নির্ব্বাহ করিতেছি ইহাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

যাহা হউক, চতুর্থ শ্রেণীতে পুনরায় পাঠ চলিতে লাগিল। এই বৎসর গ্রীষ্মকালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার মাতামহীদেবী কাশীলাভ করিয়া মাতৃদেবীর বিয়োগজনিত ভয়ঙ্কর শোক হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি শোকদুঃখের অতীত অনন্তধামে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আমাদের আবার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত। আমাদের সংসার এখন সম্পূর্ণ শ্রীহীন। চারিটি প্রাণী লইয়া আমাদের সংসার—যথা আমি, পিতৃদেব, আমার জ্যেষ্ঠ এবং চারি বৎসর বয়স্কা আমার কনিষ্ঠা ভগিনী। সংসারের রূপ ও অঙ্গসৌষ্ঠব—গৃহিণী অথবা অন্য স্ত্রীজাতীয় পরিজনবর্গ—তাহা আমাদের কেহই নাই। পিতৃদেবের ও আমার হস্তের বেড়ি আর কোন ক্রমেই খসে না। কষ্টেরও সীমা আছে। আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন পিতৃদেব জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুনরায় বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন জ্যেষ্ঠ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং এফ-এ পাঠ করেন। পুনরায় বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া পাঠক মহাশয়েরা আশ্চর্য্য হইবেন। কারণ পূর্ব্বে দাদার বিবাহের আমি কোনও উল্লেখই করি নাই। আমার বয়স যখন ৪।৫ বৎসর, তখন জ্যেষ্ঠের বয়স ১৩ বৎসর। সেই সময় মাতামহীদেবী ও মাতৃদেবী দাদার বিবাহ দেন। সে ১৮৬৬।৬৭ সালের কথা। সে বিবাহের কথা আমার ছায়ামাত্র মনে আছে। সেকালের স্ত্রীলোকদের একটা অদ্ভুত সাধ ছিল। ক্ষুদে পুত্রবধূ আসিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়াইবে—দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই সাধের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার মাতামহীদেবী পিতার অসম্মতিতেও জ্যেষ্ঠের বিবাহ দেন। সকলের অমতে বিবাহ দিবার ফল অতি শোচনীয় হয়। বিবাহের পর দেখা গেল, নূতন বধূ কঠিন সঙ্কিত রোগে আতুরা। সুতরাং সে বিবাহ দাদামহাশয়ের নামমাত্র হইয়াছিল।

হাটের শেষে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বাসুদেব রায়

& P

এখন আমাদের নিজের সংসার চলা ভার, বধূঠাকুরাণীর সেবা শুশ্রূষা করে কে? তিনি প্রায় সর্ব্বদাই শয্যাগত। এ জন্ত পিতৃদেব সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া দাদামহাশয়ের পুনরায় বিবাহ দিলেন। এই বিবাহকার্য্যে পিতৃদেব যেরূপ নিঃস্পৃহতার প্রমাণ দেখাইলেন, তাহা এখনকার সময়ে আদর্শস্থল। দাদামহাশয় তখন এফ-এ পাঠ করেন, ইচ্ছা করিলেই পিতৃদেব তখন বিবাহে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কারণ সেই ১৮৭৪।৭৫ সালেও বরের বাজার গরম হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু পিতৃদেব কন্যাপক্ষ হইতে অর্থ গ্রহণ করাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইহার প্রমাণ পরে আরও দিব।

কালীঘাটের সন্নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের একটি সদ্বংশজাতা দীনা বিধবার পৌত্রীর সহিত এই পরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহ কাশীতে হইল। বিধবাটির গ্রামে যাহা কিছু অত্যল্প জমী ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পৌত্রীটিকে লইয়া কাশীতে আসিয়া দাদার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমাদের সংসারে গৃহকর্ত্রীর মত রহিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। আমরাও উভয়ে প্রকৃত ও কৃত্রিম সুবাদে তাঁহাকে 'ঠাকুরমা' বলিতে লাগিলাম। তখন তিনি আসাতে আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছিল। তাহার দুরবস্থার অবসান দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। এখন দুইবেলা রাঁধা ভাত খাইবার সুবিধা হইল; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? তখন জানিতাম না—অমৃতেও গরল আছে। এইখানেই আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিলাম। এতদিন আমাদের সংসার-স্রোত একটানা বহিতেছিল; এখন স্রোত অন্যদিকে ফিরিল। (ক্রমশঃ)

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"

এস, আর, কর্ম্মকার এম-এ

বাদল-মুখর আজ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"
নিরালা নির্জ্জন ঘরে শূন্যমনে আছি একা বসে।
গভীর কাজল মেঘ আবরিছে নিখিল গগন;—
তা'রি সাথে মিশে যায় সীমাহীন আমার বেদন;
ঝর্ ঝর্ অবিরল বারিধারা ঝরে দিবানিশি;—
তা'রি সাথে অশ্রু মোর প্লাবিয়া চলিছে দশদিশি।
থাম তুমি ওগো বন্ধু আধুনিক কবি কালিদাস!
কোন ছন্দে রচি মোর সকরুণ অশ্রু-ইতিহাস
অমর হইতে চাও। ভুলে যাও অসম্ভব আশ;
পারে কভু প্রকাশিতে এ বিরহ মানবের ভাষা?
এ ঘর কি রামগিরি? আমি কিগো যক্ষ সাধারণ?
বিরহার্ত্ত যক্ষ আজি বক্ষে মোর কাঁদে অগুণন।
হে মরমী কবি, তুমি সত্য কথা জেনে রেখো স্থির!—
চিত্ত মোর নাহি চায় তুচ্ছ প্রেম মর্ত্ত্য মানবীর।
যেই দূর অলকার তীর্থমূলে একাকিনী বসি,
রূপরসে বর্ণগন্ধে মালা রচে আমার প্রেয়সী,
সে আশ্রম প্রান্ত হ'তে অনাহুত অতিথির প্রায়
তোমার কল্পনা কবি মর্ম্মাহত ফিরে আসে হায়।
যে দেশ দেখেনি কেহ দিবারাত্রে প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কোন মন্ত্রে মেঘদূত পাঠাইবে বল না সেথায়।

সরস তরল প্রাণ সঙ্গোপনে আমূল মথিয়া
রচিয়া তুলেছি যেই অপরূপ তিলোত্তমা প্রিয়া

তাহারে চেননা তুমি। আজি তার রূপ মাধুরিমা,
আভাসে জানাল মোরে আকাশের কাজল নীলিমা

ইন্দ্রধনু বর্ণরাগে ফোটে তা'রি অতনু কিরণ;
বুলবুল মাদোলে ওই শুন তা'রি নূপুর গুঞ্জন।
কেয়া কুঞ্জে, নীল শাখে, শাল তাল তমালের শিরে
শ্যামল পরশ তা'রি ভাঙ্গি পড়ে সজল সমীরে;

ধারাস্বনে, কেকারবে, তটিনীর কলহাস্য গানে
আগমনী বাজি উঠে সচকিত নিখিলের প্রাণে।

বাদল ধুসর আজ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"
সাজিয়াছে বঁধু মোর ভাবমন বহু-রূপ রসে,

আমি তাই একা বসি তন্দ্রাতুর ঘোর বরষায়,
রচিতেছি বরমাল্য অগণিত অশ্রু-মুকুতায়।

সুদান মরুপ্রদেশ

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

সুদান মরুপ্রদেশ!...আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি ইহার শীর্ষে এবং প্রায় এক লক্ষ বর্গ-মাইল ক্ষেত্রফল নিয়ে এই দেশটীর
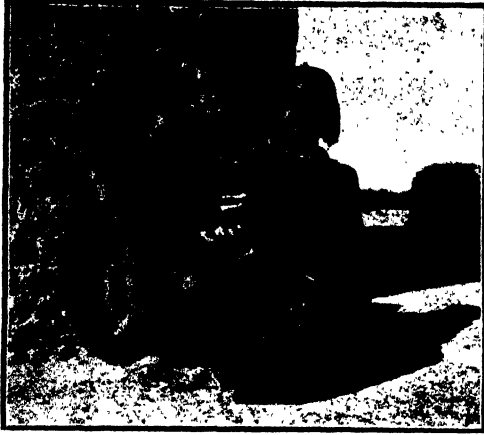
মাতা ও কন্যা

সৃষ্টি হয়েছে।...সাহেবরা বলে সুদান 'কালা আদমীর দেশ'—আর আরবরা বলে Bilád-es-Sudán অর্থাৎ যাকে

কয়েকটী বালিকা

ইংরাজীতে বলা চলে 'Country of Blacks'; উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সুদানের সম্বন্ধে কেউ কোন খবর রাখ্‌ত না, মাত্র যা দু'চার জন দুঃসাহসিক আবিষ্কারক হিসাবে এদিকে একটু অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে দিনের পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।...আজকাল বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক সুদানের মরুপ্রদেশে এবং নদ-নদীতে বিচরণ করে আনন্দ লাভ করেন। কত বিভিন্ন বিষয়ক জিনিষ এখানে দেখা যায়!—উত্তরে মরুপ্রান্তর, দক্ষিণে কোথাও বা জলা-ভূমি, প্রবল-প্রতাপ-গর্ব্বিত আরব সর্দ্দার—আবার কোথাও বা অসভ্য বন্য লোক, বাঘ, ভাল্লুক নানাজাতীয় পশু পক্ষী...কত কি!...

সুদানের উত্তরে ঈজিপ্ট, পূর্ব্বে লোহিত সমুদ্র, ইরিট্রিয়া
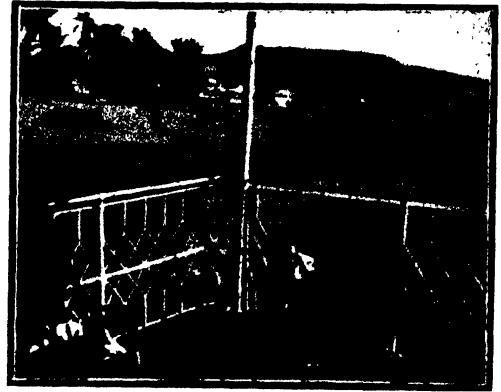
ওয়াদি হালফায় নদীতীর

ও হাবসীরাজার দেশ, দক্ষিণে কেনিয়া, ইউগাণ্ডা ও বেল-জিয়ান কঙ্গো, পশ্চিমে ফরাসী ইকুইটোরিয়াল আফ্রিকা। এখানকার নিগ্রোজাতি, আদিম জাতি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লেখাপড়া জান্‌ত। তারা পূর্ব্বপ্রদেশে গিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করে এসেছিল। আরবগণের প্রভাব এবং মুসলমান ধর্ম্ম উত্তরসুদানপ্রদেশে নবম এবং একাদশ শতাব্দীতে বিশেষ পরিলক্ষিত হোতো। খ্রীষ্টান ষ্টেটগুলির প্রভাবে পূর্ব্ব-সুদান-প্রদেশে সহজে মুসলমান ধর্ম্ম স্থান গড়ে নিতে পারে নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে

সর্ব্বত্র ধর্ম্মে ইউরোপীয় নীতির প্রভাব এবং প্রসার দেখা যায়।

কিছুই জন্মে না। দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর স্থান Nile Alberta, এবং Blue Nile নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানটী।
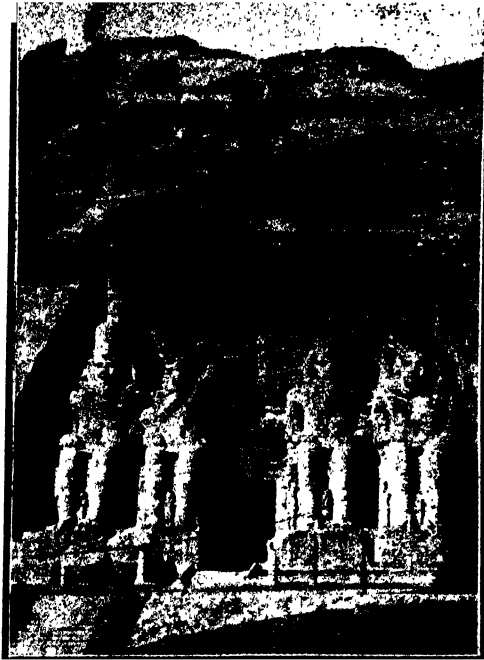
আবু সিম্বল মন্দির

দেশীয় যোদ্ধা

দেশের ছোট ছোট রাজ্যগুলি নানা ভাবে বিভক্ত। সেগুলি এইরূপ। (১) নাইজার নদী উত্তরভাগের রাজ্যগুলি একত্র (২) নাইজার এবং চাঁদ-হ্রদের মধ্যে রাজ্যগুলি সংযুক্ত (৩) নীল নদীর তীর এবং চাদ হ্রদ (৪) উপর নীল নদীর তীর সমস্তই স্বতন্ত্র।

নীল নদীর তীরের নিকটেই 'নিউবিয়ান মরুভূমি'। কিন্তু নীল নদীর এ-পার ও-পারে মাঝে মাঝে ছোটখাট চাষবাসের উপযোগী ভূখণ্ড পাওয়া যায় ···সেখানে কিছু কিছু চাষবাসও চলে। কিন্তু নীল নদীর পশ্চিমে এমন বহু স্থান আছে যাহা 'নিউবিয়ান মরুভূমি' অপেক্ষাও জনহীন। সেখানে

তুলার ক্ষেত

দেশের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়! এমন কি উর্ব্বর প্রদেশগুলিতেও জনসংখ্যা নিতান্ত অল্প। গত বারের

কয়েকটী শিশু

আদম-সুমারী হতে জানা যায় (১৯২৬ খৃঃ) যে, জনসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। উত্তর প্রদেশে আরব যাযাবরগণই থাকে

অসভ্যগণের যুদ্ধসজ্জা

বেশী। খার্টুমে নীল নদীর নিকট নানা জাতির নিউবিয়ান-গণ বসবাস করে। উষ্ণতম মরুপ্রদেশে এক শ্রেণীর অসভ্য দল থাকে তাদের বলে ব্যাগারণ (Baggaran); 'শিলুক' নামে এক জাতও আছে। নীল ও কঙ্গোর কাছাকাছি স্থানে এক শ্রেণীর লোক থাকে তাদের গায়ের রং অপেক্ষাকৃত ফর্সা।…

এদেশের লোকরা অত্যন্ত অলস। এদের জীবনে আকাঙ্ক্ষা বলে কিছু নাই—কাজেই অভাবও নাই। সামান্য শতছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে তারা দিন কাটিয়ে দেয়। ঘরের আসবাবপত্র কিছুই নাই, সামান্য দু' একটী বাসন থালা আর শয়নের জন্য একটী মাদুর! ইহাই যথেষ্ট। তারা বলে তারা মরু-প্রদেশের স্বাধীন সন্তান।…তাদের মধ্যে জাতীয়-গরিমা পরিস্ফুট। ক্রীতদাস ব্যবসা এই সমস্ত পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। যদিও ইংরাজ শাসনের
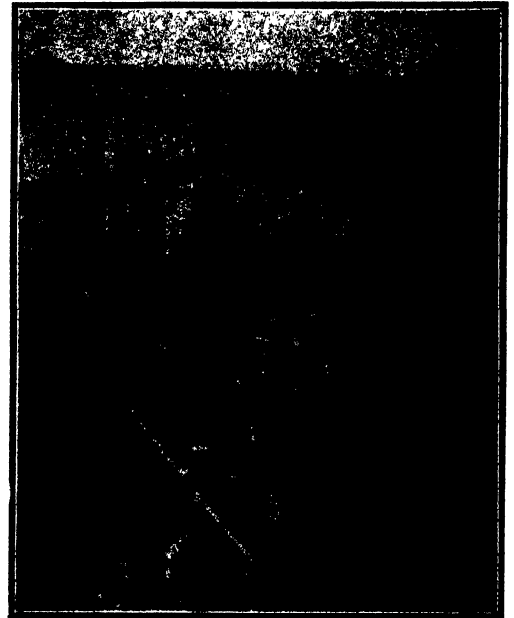
অসভ্যগণের জলবিহার

ফলে এ বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, তবুও সুবিধা মত অনেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে এ ব্যবসা চালায়। লেখা-

পড়ার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি নাই। মাত্র যে শ্রেণীর লোকেরা আরব ভাষায় কথা বলে, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে একটু উৎসাহ দেখা যায়।…তাদের নৈতিক চরিত্র অসভ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। দেশে 'ডন্‌গোলিস' (Dongolese) নামে এক শ্রেণীর জাত আছে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। আরবগণ সাধারণতঃ ইসলাম ধর্ম্মপন্থী। তারা ধর্ম্মবিষয়ে বড়ই গোঁড়া। তাদের ধর্ম্ম ছুঁয়ে কিছু বল্‌লেই বিশেষ গোলমাল করে থাকে। অনেক নিগ্রো আছে যারা কোন ধর্ম্ম মানে না। উত্তর প্রদেশের নিগ্রোরা অবশ্য ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী।

একটী সুন্দরী

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে লেখাপড়ায় এদেশ পূর্ব্বে বড়ই পিছনে পড়ে ছিল। এখন অবশ্য ইংরাজশাসনের ফলে একটু উন্নতি হয়েছে। সাধারণতঃ আরবীই এখানকার পুস্তকের ভাষা। 'Kuttabs' বা পাঠশালায় ছাত্রদের আরবী শিক্ষা দেওয়া হয়। সহরে ইংরাজী স্কুলে আজকাল ইংরাজি, আরবী, অঙ্ক, জমি-পরিমাপ ইত্যাদি শেখান হয়। খার্টুমের গর্ডন কলেজে অর্থকরী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। এ-দেশেও আমাদের দেশের মত, বহু মিশনারী এসে আড্ডা করেছে। তারা অনেক সময় অসভ্য জাতির ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিয়ে জনশিক্ষার প্রসার করছে।

দেশের সর্ব্ব অনর্থের মূল হচ্ছে ক্রীতদাস ব্যবসা। John Patherick হচ্ছেন যে সমস্ত ইংরাজ ব্যবসার দৃষ্টি নিয়ে
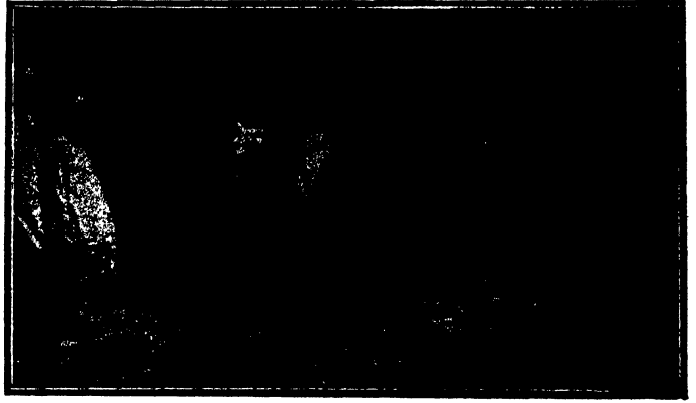
একটী বধূ

নীল হোটেল—হালফা

সুদানে আসেন—তার মধ্যে প্রথম। এদেশে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল হাতির দাঁত। তিনি এ বস্তুটী এখান থেকে সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দিয়ে বহু অর্থ লাভ করতেন। কিন্তু তিনি এখানে কিছুদিন থাকবার পর দেখলেন, হাতির দাঁত অপেক্ষা ক্রীতদাসের ব্যবসাই লাভজনক। তাই এ

ব্যবসা ছেড়ে তিনি ক্রীতদাসের ব্যবসা ধরলেন ! অবশ্য শেষ জীবনে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ ক্রীতদাস ব্যবসা চরম সীমায় উপস্থিত হয়।

শ্বেত নীল নদীবক্ষে

হালফা সহর

নাইলে দ্বিতীয় Cataract

ইউরোপীয় বণিকগণ তখন অনেক স্থানীয় দল-নেতাদের আধিপত্য দিয়াছিলেন—তার ফলে তারা দেশের মধ্যে ভয়ানক অত্যাচার সুরু করে দিয়েছিল। তখন সুদান ছিল ঈজিপ্টের অধীন। 'ইসমাইল পাশা' যখন ঈজিপ্টের বড়লাট হলেন তখন তিনি ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন ; কিন্তু তিনি সে কাজের পরিবর্ত্তে শেষ পর্য্যন্ত ঈজিপ্টের রাজ্যবিস্তার ছাড়া আর কিছু করে যেতে পারেন নি। ইহার পর ১৮৭০ খৃঃ 'বেকার' এই স্থান অধিকার করেন। তিনিও কিছুদিন এই প্রথার পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। তারপর ১৮৭৪ খৃঃ যিনি এই স্থান অধিকার করলেন তিনি হচ্ছেন বিশ্ব-বিশ্রুত জেনারল গর্ডন। তিনি এইবার এই চিরন্তন কুপ্রথার বিরুদ্ধে বহু চেষ্টা করলেন। তাঁকে নানা অসুবিধা ভোগ করতে হোল। জোবিয়ার পাশা (Zobier Pasa) নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করলে। জোবিয়ার ছিল তখনকার সর্ব্বপ্রধান ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। সে তার দল গঠন করে গর্ডনের বিপক্ষে চল্‌তে লাগল। তার পর কিছুদিনের জন্য জেনারল গর্ডন উপস্থিত ছিলেন না। সেই সময় মাধি (Madhi) নামে এক ইসলাম ধর্ম্ম-নেতা দেশে এক উত্তেজনার সৃষ্টি করলে। 'মাধি' অর্থ ভগবানের প্রতিনিধি। সে বললে সমস্ত ধর্ম্ম অর্থহীন। মাত্র মাধিবাদ জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মাধি নিজের এক দল গড়ে ফেলে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চল্‌তে লাগল। শেষে জেনারল গর্ডন এ কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মাধিরা খার্টুম সহর আক্রমণ করল। গর্ডন সৈন্যসামন্ত নিয়ে

তাদের বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হোল। ইহা ২৫ জুন ১৮৮৫ খৃঃ কথা।...

সুদানে প্রবেশ করবার তিনটী প্রধান পথ আছে।

নদী হতে স্বর্ণ সংগ্রহ

পল্লীবালা

উত্তরে ঈজিপ্টের দিকে (১) ওয়াদি হালফা। পূর্ব্বে (২) সুদান বন্দর (৩) দক্ষিণে জুবা, (কেনিয়া, ইউগাণ্ডা, বেলজিয়ান কঙ্গোর দিকে)। বর্ত্তমান সময়ে সুদান বন্দরে, ইংলণ্ড, মর্সেলিস, জেনোয়া প্রভৃতি বহু স্থান হইতে জাহাজ এসে থামে। কাজেই ইউরোপের সহিত আদান-প্রদানের বিশেষ সুবিধা হয়ে গেছে।

সুদানে শেলাল (Shellal) প্রদেশ নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশে ষ্টীমারে যাওয়া যায়। নদীতে যেতে যেতে দেখা যায়—কোথাও বা নদী বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে, পর্ব্বতের পদতল দিয়ে এঁকে-

মরুভূমিতে সরকারী পাহারা

বেঁকে বালুস্তুপের মাঝে আপনার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে —আবার কোথাও বা নদীর বিস্তৃত জলরাশি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'পাশে তটভূমি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—মাঝে মাঝে খেজুর গাছের ছায়া-ঢাকা শ্যামল পল্লী নদীর স্থির জলের উপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে।

'নাইল-উপত্যকা' ঐতিহাসিক দিক দিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। শেলাল ও হালফা প্রদেশে বহু প্রাচীন স্থাপত্য

নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে 'ফাইলেই'-র (Philae) মন্দির কালাবশার নিকট রাজা আগাষ্টাসের মন্দির, সিবুয়ার মন্দির প্রসিদ্ধ। (ইহা খৃঃ পূঃ ১২৯২

যোদ্ধা

তৈয়ারী)। আবু সিম্বেলের মন্দিরটী সৌন্দর্য্যের দিক হতে শ্রেষ্ঠ। ইহা ২য় জেমস্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

'নীল প্রদেশে' ষ্টীমারে বেড়াইলে নানারূপ জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। নীলের জলে অসভ্য জাতিরা সাল্‌তি চড়ে মাছ ধরে, আশ-পাশে জঙ্গল থেকে জন্তু-জানয়ার ধরে আগুনে পুড়িয়ে খায়। নদীর জলে স্থানে স্থানে Sudd নামে এক শ্রেণীর শৈবাল ষ্টীমারের গতি রোধ করে দাঁড়ায়। আরবীগণ নীল নদীর জলকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখে। তারা বলে "He who has once drunk the waters of the Nile, must return."...

(আগামীবারে সমাপ্য)

পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য বাউল

শ্রী অনাথগোপাল সেন বি-এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত

পাগল, পাগল, সবাই পাগল, তবে কেন পাগল খোঁটা ?
দিল-দরিয়ায় ডুব দিয়া দেখ্, পাগল বিনা ভাল কেটা ?

কেউবা মানে, কেউবা ধনে,
কেউবা পাগল অভাব টানে,
কেউবা পাগল ঘরের কোণে, ভেবে মনে এইটা ওইটা।

কেউবা রূপে, কেউবা রসে,
কেউবা পাগল ভালবেসে,
কেউবা পাগল কান্দে হাসে, ঐ পাগলামীর বড় ঘটা।

সবাই বলে পাগল, পাগল;
পাগলামী কি গাছেরই ফল ?
তুচ্ছ করি আসল নকল, সমান সকল তিতা মিঠা,—
হতে গিয়ে ঐ সে পাগল,
মনোমোহনের * গেছে সকল,
বাকী আছে গাছের বাকল, ছেলের হাতে খেতে ইটা।

* মনোমোহনের দেহতত্ত্ব সম্পর্কীয় সঙ্গীতগুলি ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার পল্লীতে পল্লীতে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। ঐ সব জেলার অধিবাসীমাত্রই এইসব গানের সহিত শুধু পরিচিত নহে, ইহাদের ভাব তাহাদের মজ্জাগত।

স্ত্রী-চরিত্র

"বনফুল"

এক

গভীর রাত্রি।

মশারির মধ্যে শুইয়া শ্রীমতী সুনন্দা একটি মাসিক পত্রিকায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাশেই শ্রীযুক্ত তমালকান্তি পাশ-বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া নাক ডাকাইতেছেন। বলা বাহুল্য হইলেও বলিব, ইহারা স্বামী স্ত্রী। এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। সন্তানাদি এখনও কিছু হয় নাই।

সুনন্দা রোজই এইরূপ করে—অর্থাৎ শুইবার সময় একখানা বাঙ্‌লা বই লইয়া মাথার শিয়রে আলো জ্বালাইয়া বিনিদ্র নয়নে পড়িতে থাকে। তমালকান্তিও রোজ এইরূপ করে অর্থাৎ নির্ব্বিবাদে ঘুমায়।

মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাইতে উলটাইতে হঠাৎ সুনন্দার নজরে পড়িল একটি গল্পের নাম "গল্প নহে"! আশ্চর্য্য নাম ত। লেখকের নাম নাই। সুনন্দা পড়িতে সুরু করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ সুনন্দার মন নির্ম্মলা নাম্নী মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ছোকরাটির উপর সুনন্দার প্রথমটা রাগ হইয়াছিল, কিন্তু সে রাগও বেশীক্ষণ টিকিল না। বিশ্বনাথ যখন বিদায়কালে নির্ম্মলার দুটি হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন সুনন্দার রাগও জল হইয়া গেল। বিশ্বনাথ নির্ম্মলাকে পাইল না—পাইল কাদম্বিনীকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—

"বিশ্বনাথ নামক যুবকটি গ্রীষ্মের ছুটিতে মাতুলালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে অন্য কোন কাজ না থাকায় বিশ্বনাথ পুষ্করিণী-তীরে গিয়া আড্ডা গাড়িল। উদ্দেশ্য মাছ ধরা। এক দিন ফাৎনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেচারা প্রায় অন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছে এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ফাৎনা ডুবিল এবং বিশ্বনাথ মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড এক খ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া বঁড়শি তুলিয়াই একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল!

"ওগো—মা গো—"

সচকিত বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখে বঁড়শি একটি কিশোরীর কাপড়ে গিয়া আট্‌কাইয়াছে। বলা বাহুল্য কিশোরী আর কেহ নহে—নির্ম্মলা।

এই সুরু।

তাহার পর ভদ্রভাবে যত প্রকারে প্রেমালাপ করা সম্ভব তাহা ইহারা করিয়াছে এবং করিত যদি না বিশ্বনাথের মাতুল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধকস্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ প্রথমটা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বনাথ বেচারা একা কি করিবে। সে বড় জোর মাতুলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে কিন্তু সমস্ত সমাজকে ঠেকান তাহার সাধ্যাতীত। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ এবং নির্ম্মলা কায়স্থ। সুতরাং নির্ম্মলার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিল না।

বেশ লিখিয়াছে গল্পটি। নির্ম্মলার জন্য সুনন্দার ভারি কষ্ট হইতে লাগিল। আলো নিভাইয়া সুনন্দা যখন শয়ন করিল, তখন নির্ম্মলার দুঃখে একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়নে টলটল করিতেছে। কি নিষ্ঠুর সমাজ।

দুই

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে তমালকান্তি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে তুমুল কাণ্ড। বেচারা "ডেলি-প্যাসেঞ্জার"; সকালে উঠিয়াই স্নানাহার করিয়া আটটা সাতান্নর 'লোকাল' ট্রেণে আপিস চলিয়া যায় এবং সাতটা বিয়াল্লিশের 'লোকাল'-যোগে ফিরিয়া আসে।

সুনন্দার এমন ভাবান্তর ইতিপূর্ব্বে সে লক্ষ্য করে নাই। মুখখানি তোলো হাঁড়ির মত করিয়া সুনন্দা বসিয়া আছে। তমাল আসিয়া ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল।

মুখে একটিও কথা নাই। জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে তমাল ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার কি !'

মিনিট পাঁচেক পরে এক পেয়ালা গরম চা হস্তে সুনন্দা প্রবেশ করিল। মুখ তখনও তোলো হাঁড়ি।

তমাল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল—"দেখ, আজ গাড়ীতে 'পুষ্পস্মরভিসার' বলে একটা মাথার তেল বিক্রি করছিল। রোজই করে। কাল মনে করছি কিনে আনব এক শিশি। গন্ধটাও ভাল, আর আমাদের মল্লিক মশাই বলছিলেন যে মাথাও না কি বেশ ঠাণ্ডা রাখে !"

সুনন্দা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

তমাল বুঝিল গতিক সুবিধার নহে। হঠাৎ হইল কি! চা নিঃশেষ করিয়া তমাল বাহিরে গিয়া দেখে সুনন্দা তাহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত উলের মাফ্‌লারটা লইয়া বুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তমাল হাসিয়া বলিল—"আজ এত গম্ভীর যে! সমস্ত মুখখানা আজ এমন থম থম করছে কেন? ব্যাপার কি!"

সুনন্দা আর আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—

"আমার কাছে সোহাগ জানাবার দরকার কি? যাও না তোমার নির্ম্মলার কাছে, যার হাত ধরে বিয়ের আগে কেঁদে বলেছিলে—আমার মন তোমায় দিয়ে গেলাম নির্ম্মলা! বিয়ে করতে চলল এই দেহটা। সমাজের নিষ্ঠুর হাড়-কাটে বলি দিতে চল্লাম নিজেকে!"

বিস্মিত তমাল কহিল—"নির্ম্মলা কে! পাগল হয়ে গেলে না কি তুমি!"

সুনন্দা কিছু না বলিয়া "গল্প-প্রভাকর" নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিখানি স্তম্ভিত তমালের হস্তে তুলিয়া দিল। সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছে—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'গল্প নহে' নামক গল্পটি এই মাসে প্রকাশিত হইল। এক সংখ্যা 'গল্প-প্রভাকর'ও আপনার নামে অদ্য পাঠাইলাম। গল্পটি প্রকাশ করিতে নানা কারণে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আর একটি গল্প চাই। ইতি

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ তালুকদার।

বিদ্যুৎ ঝলকের মত তমালের মনে পড়িয়া গেল যে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গল্পটি সে "গল্প-প্রভাকরে" পাঠাইয়াছিল বটে। তাহার পর তমালের বিবাহ হইয়াছে, চাকরী হইয়াছে, সাহিত্য-চর্চ্চা সে বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই গল্পটির কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল! আজ হঠাৎ এ কি আকস্মিক বিপদ!

আমতা আমতা করিয়া তমাল বলিল—"ওটা একটা গল্প লিখেছিলাম বটে, অনেকদিন আগে। তাতে হয়েছে কি?"

"গল্প? তুমি ত নিজেই লিখে দিয়েছ "গল্প নহে"!"

তমাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ওটা একটা—ইয়ে—ষ্টাইল—বুঝলে কি না—"

সুনন্দা কিছুই বুঝিল না। বুঝিতে সে চায়ও না। নির্ম্মলার ঠিকানাটা জানিতে পারিলে একবার গিয়া দেখিত মেয়েটি কেমন রূপসী। স্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন ঠিক সেইরূপ কি না!

ঈর্ষায় তাহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল। অথচ এই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই নির্ম্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিল।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

জ্যৈষ্ঠ মাসের স্মৃতি-তর্পণে বলেছি কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা পরলোকগত বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আজ তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ করব।

"বঙ্গবাসীর" কার্য্য ত্যাগের দুইদিন পরেই উপেন্দ্রবাবু আমাকে আশ্রয় দান করেন। এতদিন স্মৃতি-তর্পণ লিখছি, কিন্তু সময়ের কথা মোটেই বলতে পারি নি, কারণ সাল তারিখ বার কিছুই আমার মনে নেই, সুধু ঘটনাগুলিই মনে আছে, আর কয়েক দিন পরে তাও মনে থাকবে না। এবার তাই মনে করেছিলাম এই স্মৃতি-তর্পণে একটু সময়-নির্দ্দেশের চেষ্টা করব। সেই জন্য 'বসুমতী'র বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর উপেন্দ্রবাবুর সুযোগ্য পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজীকে কয়েকটী ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করে দিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করেছেন। কিন্তু অনেকগুলি ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করতে গিয়ে তিনি "সম্ভবতঃ" বলেছেন। কাযেই পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দুই চারিটি ব্যাপারের সম্ভবপর সময় নির্দ্দেশ করতে হয়েছে।

এই অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারলাম যে, আমি ১৩০৪ সালের শেষে অথবা ১৩০৫ সালের প্রথমে 'বসুমতী' আফিসে প্রবেশ করি। এই সময় নির্দ্দেশে আমার প্রধান সহায় হয়েছেন 'প্লেগের' প্রথম আগমন।

১৩০৪ সালে 'প্লেগ' মহাশয় জাহাজ থেকে বোম্বাই সহরে প্রথম নামেন। গবর্ণমেণ্ট প্লেগ দমনের জন্য সেখানে বিপুল আয়োজন করেন। সেই আয়োজনের ভয়ে বোম্বাই অঞ্চলের লোক কোথায় পলায়ন করবে তাই ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিল। অনেকে সহর ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। প্লেগ মহাশয় যখন বোম্বাইয়ে আগমন করেছেন, তখন রেলমাশুল না দিয়েই অতি সত্বরেই যে বাংলা দেশে তাঁর আবির্ভাব হবে—এই ভেবে কলিকাতা সহরবাসী নরনারী আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় আমি প্রথম 'বসুমতী' পত্রিকায় পাঁচকড়িবাবুর সহকারী হয়ে প্রবেশ করি।

'বসুমতী' আফিস তখন বিডন ষ্ট্রীটে—বীডন বাগানের সম্মুখে একটা বাড়ীতে ছিল! সহকারী সম্পাদক আর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। সংবাদপত্রের সহকারী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি খুব লিখতে পারতেন। 'বসুমতী'র অর্দ্ধেক কায পূর্ণবাবুই করতেন, আর অর্দ্ধেক পাঁচকড়িবাবু ও আমি করতাম। এ ছাড়া ব্যোমকেশ মুস্তফি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি অনেকে সম্পাদকীয় কার্য্যে আমাদের সহায়তা করতেন। 'বসুমতী' তখন সাপ্তাহিক; তার সম্পাদনার জন্য আমরা তিনজনই যথেষ্ট। বিশেষতঃ, পাঁচকড়িবাবুর মত ব্যক্তি একদিনেই একখানি 'বসুমতী' লিখে ফেলতে পারতেন।

বন্ধুবর উপেন্দ্রবাবুর জীবন-কথা লিখতে আমি বসি নি। তাই এই স্মৃতি-তর্পণে তাঁর পূর্ব্ব-জীবনের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে। 'বসুমতী'র কার্য্য উপলক্ষে আমি যখন তাঁর সংসর্গে এলাম তখন থেকেই আমার স্মৃতির আরম্ভ। আমি দেখতাম এক অমিত-শক্তিশালী, উৎসাহের অবতার, কার্য্যকুশল যুবক বাংলার সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। বটতলার পুঁথিপত্তর ও সেকেলে ছাপাখানার ভিতর থেকে এমন প্রতিভাশালী ও অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তির আবির্ভাব কেমন করে হোলো, তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। আমি হিন্দুর ছেলে। পূর্ব্বজন্ম মানি। আমার মনে হয় এ শক্তি উপেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে অর্জ্জিত। নইলে আহারী-টোলার যদু পণ্ডিতের বাংলা স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শেখা, নিমু গোস্বামীর লেনে মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত, বটতলার সংসর্গে লিপ্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী' সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হবেন কি করে? থাক সে কথা। আমি উপেন্দ্রবাবুর স্মৃতি-তর্পণই করি।

পূর্ব্বেই বলেছি, বাংলা দেশে প্লেগের আগমনের কিছুদিন আগেই আমি 'বসুমতী'তে প্রবেশ করি। দেখতে দেখতে প্লেগের আগমন ঘোষিত হোলো। বোম্বাইয়ের মত

কোয়ারাণ্টাইন্ কলকাতা সহরেও হবে—এই আতঙ্কে কলিকাতা সহরবাসীগণ মহা ভাবনায় পড়লেন। মফঃস্বলে যাঁর যেখানে আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব ছিলেন, অনেকেই সপরিবারে সেই সব স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে গেলেন। যাঁরা তিন পুরুষ মফঃস্বলের বাড়ী-ঘর ছেড়ে কলিকাতায় আস্তানা করেছিলেন তাঁরা সেই সকল জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তুভিটা পরিষ্কার করে খড়ের চালা তুলে পরিবারবর্গের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হলেন। প্লেগের ভয়ে কলিকাতায় অর্দ্ধেক না হোক, ছয় আনা রকম লোক সহর ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমরা খবরের কাগজওয়ালা—আমাদের মরশুম পড়ে গেল। শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেসন হতে লোক পালাবার বিবরণ, কলকাতার কোন্ পাড়ার, কোন্ বস্তিতে, কার বাড়ীতে প্লেগ হোলো,—আমাদের রিপোর্টারেরা সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করতে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে পড়লেন। আমরা 'বসুমতী'র আকার ও পত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েও সব সংবাদ দিয়ে উঠতে পারতাম না।

সেই সময় আমরা 'বসুমতী' আফিসে এক বিরাট বিপুল আয়োজন আরম্ভ করে দিলাম। প্রস্তাবটা কে প্রথম করেছিলেন তা মনে নেই, কিন্তু আমরা সকলেই সেই প্রস্তাবানুসারে কাব করবার জন্য মেতে উঠলাম। আমাদের মনে হোলো প্লেগ নিবারণের ঔষধি আমরা আবিষ্কার করেছি। উৎসাহের অবতার উপেন্দ্রবাবু সর্ব্বান্তঃকরণে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। আমরা কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল গড়তে আরম্ভ করলাম। সহর ও সহরের উপকণ্ঠে নানা স্থানে গিয়ে আমরা হরিনামের দল গঠন করতে লাগলাম। সমস্ত দলের নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ করলাম। প্রতিদিন কোন পাড়ায় না কোন পাড়ায় আমাদের সমস্ত দলের সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হতে লাগল। যেখানে যে দল গঠিত হয়েছিল সকলকেই 'বসুমতী' আফিসের সম্মুখস্থ বিডন উদ্যানের সামনে সমবেত হবার জন্য আমরা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতাম। সেখান থেকে সমস্ত দল শোভাযাত্রা করে যেদিন যে পাড়ায় যেতে হবে সেইদিন সেই পাড়ায় যেতাম। সত্যসত্যই আমরা কলিকাতা সহরে একটা বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলাম। দুই তিন মাস এই হরিনামে সহরের গগন পবন মুখর হয়ে উঠেছিল। হরিনামের গুণে এই ধর্ম্মোন্মাদে লোকের মন থেকে প্লেগের ভয় অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তার সুফলও হয়েছিল। কলিকাতা সহরে ও উপকণ্ঠে প্লেগের আক্রমণ তেমন ভীষণ হতে পারেনি। বলা বাহুল্য যে এই প্লেগ উপলক্ষে 'বসুমতী'র প্রচার এত বেড়ে গেল যে বিডন ষ্ট্রীটের সেই ক্ষুদ্র গৃহে আর আমরা স্থান সংকুলান করতে পারলাম না। সেই পুরাতন ছাপার কল আর আমাদের চাহিদার যোগান দিতে পারল না। আমরা তখন চিৎপুর রোড ও গ্রে ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলের নিকট গ্রে ষ্ট্রীটেরই উপর প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভাড়া করলাম। নূতন মেশিন এলো। কায কর্ম্মের নূতন ব্যবস্থা হোলো। আমাদের আর আনন্দ ধরে না। উপেন্দ্রবাবুর উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে উঠলো। সত্যসত্যই গ্রে ষ্ট্রীটে গিয়েই 'বসুমতী' বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যাঁর কায তিনি করলেন—আমরা নিমিত্ত মাত্র, কেবল পরমোৎসাহে কায করতে লাগলাম।

১৩০৬ সালের প্রথমেই গ্রে ষ্ট্রীটে 'বসুমতী' আফিস বসিয়ে আমাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য কায হোলো 'বসুমতী'র পুরাতন ও নূতন গ্রাহকদিগের মধ্যে উপহার বিতরণ করা। 'বসুমতী' এই প্রথম উপহার বিতরণের কার্য্যে অগ্রসর হলেন। আমরা সেবার পূজার প্রায় ২০ দিন পূর্ব্ব হতে মাইকেলের গ্রন্থাবলী উপহার দিবার ব্যবস্থা করলাম। নামমাত্র মূল্য নিয়ে দুই হাতে মাইকেলের গ্রন্থাবলী বিতরণ আরম্ভ করা গেল। আমরা মনেও করিনি যে, আমাদের এই উপহার বিতরণ এমন সফলতা লাভ করবে। প্রতিদিন গড়ে ৪।৫ শত নূতন গ্রাহক আসতে লাগলো। সারাদিনই গ্রাহকের সমাগম, বিশেষতঃ অপরাহ্ণ পাঁচটার পর থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত নূতন গ্রাহক আসতে লাগলেন। এত সাফল্য আমরা মোটেই আশা করি নি।

পূজা কেটে গেল। আমরা অবকাশান্তে এসে কার্য্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিতভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হোলো, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হোলো। উপেন্দ্রবাবুর স্বভাব এক দিকে যেমন শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়পূর্ণ ছিল, অপর দিকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তাও অপরিসীম ছিল।

পাঁচকড়িবাবুর সঙ্গে উপেন্দ্রবাবুর মনোমালিন্যের সমস্ত সংবাদই আমি জানি, কিন্তু এতকাল পরে সেই অপ্রীতিকর

প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা আমি অশোভন বলে মনে করি। এইমাত্র বলতে পারি—এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়ি বাবু 'বসুমতী' থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থানে আমি সম্পাদক নিযুক্ত হলাম।

সে সময়ে 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে পাঁচকড়ি বাবু ও আমি ছিলাম। গ্রে ষ্ট্রীটে আস্‌বার আগেই পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় চলে যান। এখন পাঁচকড়িবাবুও গেলেন। অত বড় একখানা কাগজ আমি একলা কি করে চালাই।

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক পরলোকগত পূজনীয় ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি 'বসুমতী'তে চাকুরি করতে সম্মত হলেন না, তবে প্রতি সপ্তাহে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক নিয়ে কিছু কিছু লেখা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। এইটুকু ব্যবস্থাতেই তো অত বড় একখানা কাগজ চলে না! আমার তখন মনে হোলো সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তাঁরা দুইজন ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেন্দ্রবাবুর কাযকর্ম্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রাণখুলে আলাপ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, এ কথা আমি জানতাম। আমি তখন উপেন্দ্রবাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ পনর দিনের মধ্যে, কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে তিনিও হাঁপ ছাড়লেন—আমিও হাঁপ ছাড়লাম।

আমি তখন বাগবাজার মদনমোহন-তলার সম্মুখস্থ শক্ ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা মেসে থাক্‌তাম। এই মেসে আমাদের গ্রামেরই কয়েকজন থাকতেন। বাইরের লোকের মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর ভাই জিতেন্দ্রনাথ থাকতেন। মহেন্দ্রবাবু তখন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের হিসাব আপিসে চাকরি করেন এবং জিতেন্দ্রনাথ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের ওভারসিয়ার ছিলেন। এই মহেন্দ্রবাবুই পরে আমার বৈবাহিক হন।

দীনেন্দ্রবাবুকে আমাদের এই মেসে স্থান করে দিলাম। আমার আর কোন ভাবনা রইল না। এক দিকে দীনেন্দ্র-বাবুর মত অবিশ্রান্ত লিখিয়ে, আর এক দিকে ক্ষেত্র দাদা মহাশয়ের মত বিশ্বকোষ। 'বসুমতী' সগর্ব্বে গন্তব্য পথে অগ্রসর হতে লাগলো। তার গতি প্রতিহত করবার অনেক হীন চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সবই বিফল হয়।

এইখানে একটা অবান্তর কথার অবতারণা করতে হচ্ছে। এই বৃদ্ধ দাদার প্রসিদ্ধ চুরুট-খোর বলে যে একটা সুনাম বা বদনাম রটে গিয়েছে, সেই চুরুট ধরিয়েছিলেন কে জানেন?—'বসুমতী'র মালিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'বসুমতী' আফিসে প্রবেশ করবার দুইতিন মাসের মধ্যেই তিনি প্রথম আমার হাতে চুরুট তুলে দেন। এ নেশার তিনিই আমার গুরু। কিন্তু চারপাঁচ মাস যেতে না যেতেই শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। গুরুর যদি ছয়টা চুরুটে দিন-রাত চলতো—শিষ্যের বারটা লাগতো। সুখের কথা এই যে যতদিন 'বসুমতী'তে কায করেছি, এই চুরুট কিনবার জন্য একটি পয়সাও আমাকে ব্যয় করতে হয় নি, উপেন্দ্রবাবু সমভাবে এই দীর্ঘকাল চুরুট জুগিয়ে এসেছেন। তাই এখনও যেদিন 'বসুমতী' আফিসে গিয়ে শ্রীমান সতীশচন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করি, তখন তিনি মামুলী অভ্যর্থনা 'আসুন বসুন' না বলে আমাকে দেখবামাত্রই—'ওরে কে আছিস শীগ্‌গির চুরুট নিয়ে আয়' বলে আমাকে অভ্যর্থনা করেন। এই প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা তাঁর পূজনীয় পিতৃদেবকেই আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাক সে কথা। ১৩০৬ সাল কেটে গেল। ১৩০৭ সালে পূজার সময় আমরা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী উপহার দিলাম। মাইকেলের গ্রন্থাবলীর মত দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীও গ্রাহকগণের আগ্রহ উদ্দীপিত করে তুললো।

এইখানে উপেন্দ্রবাবুর একটা খেয়ালের পরিচয় দিই। ১৩০৭ সালে পূজার সময় ষষ্ঠীর দিন বেলা দুইটার মধ্যেই লোকজনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে আফিসের হিসাবপত্র ঠিক করে আমি আর উপেনবাবু হাত-পা ছড়িয়ে বসেছি, দীনেন্দ্রবাবু তার দুই দিন পূর্ব্বেই বাড়ী চলে গিয়েছেন। আমি তখন আর মেসে থাকি নে। আমার ছোট ভাই শশধর তখন কলিকাতায় নর্ম্ম্যাল স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছেন। আমরা দুই ভাই মিলে বাগবাজার মদনমোহন-তলার অদূরবর্ত্তী রাধামাধব গোস্বামীর লেনে বাস করি।

আমরা দুইজন বিশ্রাম করছিলাম। উপেন্দ্রবাবু সহসা বলে উঠলেন—এই দশ দিনের ছুটিতে কি করা যায় বলুন ত। আমি বললাম—কি আর করা যাবে—হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম।

তিনি বল্লেন—না তা হবে না। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। আমি বললাম কোথায় বেড়াতে যাবো। তিনি বল্লেন—কোথায় আবার—একটু তীর্থ করে আসা যাক। চলুন আজই রাতের মেলে সটান বৃন্দাবন। সেখানে পাঁচছয় দিন থেকে আবার ঘরে ফিরে আসা। আর কোথাও যাওয়া নয়। আপনি উঠুন, বাড়ীতে গিয়ে ছোট একটা বিছানা—আর একটা ব্যাগে খানকয়েক কাপড় নিয়ে আসুন। আমিও বাড়ী যাই—ঐ রকমই কিছু নিয়ে সন্ধ্যার সময় আফিসে আসছি। আর দ্বিরুক্তি নয়, উঠুন, একেবারে স-টান বৃন্দাবন!

তাই করা গেল। হাওড়া ষ্টেসনে গিয়ে দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাসের রিটার্ণ টিকিট করে বৃন্দাবন যাত্রা করা গেল। তাড়াতাড়িতে এক শত চুরুটের একটা বাক্‌স না কিনে পঞ্চশটা চুরুটের একটি বাক্স উপেনবাবু কিনে নিয়েছিলেন। পরদিন আমরা যখন তুণ্ডলায় পৌছলাম তখন উপেনবাবু বাক্‌সটি উপুড় করে বল্লেন—একটাও নেই অর্থাৎ এই দুইজন নেশাখোর এইটুকু পথ আস্‌তে পঞ্চাশটি চুরুটের শ্রাদ্ধ করেছেন।

আমাদের ব্যবস্থা ছিল যে বৃন্দাবনে কয়েকদিন কাটিয়েই সোজা বাড়ী ফিরে আসব। কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে তিন চারটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁদের অনুরোধে আগ্রারও দুদিন কাটাতে হয়েছিল। তার পর ফিরে এসে—সেই শিক, সেই দাঁড়—সেই এক ঘর।

১৩০৭এর উপহার মিটে গেল। ১৩০৮ এল—কি উপহার দেওয়া যায় আমরা আর ভেবে পাইনে। মাইকেল দীনবন্ধুর পর দিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র দিতে হয়। কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হবার সাহস আমরা পেলাম না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলির তখন বাজারে বেশ কাট্‌তি ছিল। এ অবস্থায় তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রগণের কাছে এ প্রস্তাব করতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করলাম।

দিন কাটতে লাগলো। কোন কিছুই স্থির করতে পারলাম না। মনে হোলো সেবার বুঝি উপহার দেওয়া হয় না। তখন পূজার পঁচিশ ছাব্বিশ দিন বাকী। এমন সময় গুপ্তচরের কাছে সন্ধান পাওয়া গেল যে 'হিতবাদী'র 'বিশারদ দাদা' বঙ্কিমবাবুর কন্যা ও দৌহিত্রগণের সঙ্গে গ্রন্থাবলী উপহারের কথা চালাচ্ছেন। তাঁরা সম্মতি দানও করেছেন, সুধু দেনা-পাওনা নিয়ে গোল চলছে।

যে দিন সংবাদ পাওয়া গেল, সেইদিনই রাত্রি নয়টার পর প্রতাপ চাটুয্যের ষ্ট্রীটে আমি আর উপেনবাবু গিয়ে হাজির। বৈঠকখানায় তখন আমাদের পরমবন্ধু সু-কবি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় এলে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতেই থাকতেন, কারণ বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্ররা সকলেই তাঁর ছাত্র ছিলেন।

নবকৃষ্ণ বাবুর কাছেই শুনতে পেলাম—দেনা-পাওনার গোলযোগের কথা। নবকৃষ্ণ বাবু সংবাদ দিতেই বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্ররা এলেন, তাঁর কন্যাও কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা যা চেয়েছিলেন এবং বিশারদ যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন—সে কথা নবকৃষ্ণবাবুর কাছে পূর্ব্বেই আমরা শুনেছিলাম। আমি একেবারে সোজাসুজি বলে বসলাম—আপনারা যা চাইছেন—তাই আমরা দেব। তাঁরা সম্মত হলেন। পরদিনই দলীল লেখাপড়া ও সই হয়ে গেল।

এই সংবাদ পেয়ে বিশারদদাদা বলেছিলেন—কারও সাধ্য নেই যে পনর দিনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহৎ গ্রন্থাবলী বের করে। সে চালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছিলাম। গ্রে ষ্ট্রীট অঞ্চলের চার পাঁচটা প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঠিক পনর দিনের দিন—প্রকাণ্ডকায় বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী বের করেছিলাম। সারাদিন তো খাটতামই—এই পনর দিনের দশ রাত্রি ঘরেই যেতে পারি নি। কি জেদই হয়েছিল। যথাসময়ে গ্রন্থাবলী বের হোলো। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আমাদের এই সাফল্যের জন্য ভগবানের চরণে প্রণাম করলাম।

'বসুমতী'র কার্য্যকালের মধ্যে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ১৯০৩এর লর্ড কার্জ্জনের দিল্লী দরবার। সে দরবারে 'বসুমতী'র পক্ষে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। রহস্যের ব্যাপার এই যে আমার যিনি মনিব, সেই উপেনবাবু আমার কাগজের রিপোর্টার হয়ে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কার সাধ্য ধরে যে তিনি আমার মনিব ও আমি তাঁর কর্ম্মচারী।

তিনি এমন ভাবে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন যে অপরিচিত লোকে দেখে বুঝতেই পারতেন না যে তিনি আমার মনিব। আমি তো তাঁর ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। তার পর থেকে এমন হোলো যে আমরা মনিব চাকর সম্বন্ধ ভুলে গেলাম। তিনি আমার পরমাত্মীয় হয়ে উঠলেন।

এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই আমাদের আত্মীয়তার স্বরূপ সকলে বুঝতে পারবেন। পূর্ব্বেই বলেছি উপেন্দ্রবাবু আহিরীটোলার নিমু গোস্বামীর লেনে তাঁর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। মাতুল নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হন। মাতুলানীর সমস্ত স্নেহ উপেনবাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইয়ের উপরেই পতিত হয়। মামী ঠাকুরাণীই গৃহের কর্ত্রী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণী—শ্রীমান সতীশচন্দ্রের জননী, যতদিন মামীঠাকুরাণী বেঁচে ছিলেন, ততদিন বধূরূপেই জীবন কাটিয়েছেন। উপেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনের পর থেকে তিনি একরকম সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। কাশীতেই থাকেন—আর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তীর্থভ্রমণ করে বেড়ান। অমন সতী সাধ্বী মহিলা আমি অতি কমই দেখেছি। আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী হলেও আমি তাঁকে প্রণাম করছি।

এখন ঘটনাটা বলি। উপেনবাবুর মামী তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশের নিয়ম ছিল—এখন আর নেই—যে মেয়েরা তীর্থভ্রমণ করে এলে যাঁর যেমন সাধ্য তিনটী, দ্বাদশটী বা ততোধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন করান। উপেনবাবুর মামীঠাকুরাণী তীর্থ থেকে যে ফিরে এসেছেন সে সংবাদ আমি জানতাম না। যেদিন ফিরে এসেছেন সেইদিনই সন্ধ্যার সময় উপেন্দ্রবাবু আমাকে বললেন—কাল দুপুর বেলা আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—সে সেখানে গিয়েই হবে। আর এ নিমন্ত্রণও আমার নয়। মামীঠাকুরাণী আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

পরদিন বেলা বারোটার সময় উপেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি—দ্বিতীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কেউ নেই—আমিই একা। উপেনবাবুর মামী এলে—আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—দেখ বাবা, তীর্থ-ভ্রমণ করে এলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হয়। আমি অনেক ভেবে দেখলাম—তোমাকে ভোজন করালেই আমার শত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হবে। তাই তোমাকে কষ্ট দিয়ে এনেছি। আমি তো অবাক্। এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যা বলেন কি ?

উপায়ান্তর ছিল না। সে মহাপাপের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হোলো। নব-বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করে ভোজন শেষ করলাম! বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যা যখন দক্ষিণা দিতে এলেন, তখন আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললাম—আমার অপরাধ যথেষ্ট হয়েছে, আর বাড়াবেন না। ও দক্ষিণার টাকা গরীব দুঃখীকে দিয়ে দেবেন। এই থেকেই সকলে বুঝতে পারবেন—আমি উপেন্দ্রবাবুর সংসারে কি শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলাম।

এইবার আমার ঘোর বিপদের কথা বলি। ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনাই ঘটে নি যার কথা লিপিবদ্ধ করতে পারি। 'বসুমতী' সগৌরবে চলে এসেছে। ভেবেছিলাম এমনি আনন্দেই দিন কেটে যাবে। কে জানতো যে নিয়তি আমার জন্য ধীরে ধীরে বজ্র সংগ্রহ করছেন।

১৩১২ সালের শেষ ভাগে ফাল্গুন চৈত্র মাসে কলিকাতায় ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। সহরবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হোলো। চৈত্র মাসের ৮ই কি ৯ই তারিখে আমার কনিষ্ঠ সহোদর—একমাত্র ভাই—স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে এলেন। আমাদের প্রাণ চমকে উঠল। পরদিন গায়ে আসল বসন্ত দেখা দিল। এ ব্যাধিতে সকলেই সন্ত্রস্ত হন। আত্মীয় বন্ধুরা কেউ বাড়ীতে আসেন না, দূর থেকে সংবাদ নিয়ে যান। স্থির করেছিলাম বাড়ীর মেয়েদের সব সরিয়ে দেব। আমার স্ত্রীকে সন্তানাদি সহ আমার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। শশধরের স্ত্রী অর্থাৎ বউমা কিছুতেই যেতে সম্মত হলেন না। রোগীর ঘরে তাঁর বা ছেলেদের প্রবেশ নিষেধ হোলো। আমি ও আমার দিদি কুড়ি দিন পর্য্যন্ত যমের সঙ্গে লড়াই করলাম। দিশীমতে চিকিৎসা করালাম। কিছুতেই কিছু হোলো না। ১৩১৩ সালের শুভ ১লা বৈশাখ অশুভ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। বেলা ১২টার সময় আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন শশধর চলে গেলেন। উপেনবাবুকে সংবাদ পাঠালাম। তিনি কয়েকজন কম্পোজিটার পাঠিয়ে দিলেন। আমার বাসা থেকে কাশী

মিত্রের ঘাট অতি নিকটে। সন্ধ্যার পর শব শ্মশানে নীত হোলো। রাত্রি দশটার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

মনে করলাম—এই বুঝি শেষ। আমার যা ছিল সবই তো কাশী মিত্রের ঘাটে রেখে এলাম। নিয়তি অলক্ষ্যে থেকে বললেন—আরও আছে।

বাসা ভেঙ্গে দিলাম। ছোট বৌমাকে তাঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। আমার বাড়ীর সম্মুখস্থ মহাত্মা রাধামাধব গোস্বামীর পুত্রপৌত্ররা আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেইখানে বিগ্রহের প্রসাদ দুইবেলা পাই, তাঁদের বৈঠকখানায় রাত কাটাই। কেমন করে কাটাই ভগবান জানেন। দিনের বেলায় আফিস করি। কাজকর্ম্ম করবার শক্তি সামর্থ্য আমার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি আফিসে গিয়ে চুপ করে বসে থাকি, আর ভাবি—এ কি হোলো। বন্ধুবর দীনেন্দ্রবাবু না থাকলে কায একেবারে অচল হয়ে যেত।

শশধরের পরলোকগমনের পর চোদ্দ দিন যেতে না যেতেই বাড়ী থেকে সংবাদ এল—আমার একমাত্র ভগিনী—যিনি প্রাণপণে শশধরের শুশ্রূষা করেছিলেনন, তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হোয়েছেন।

ছুটে গেলাম বাড়ী। দুই দিন পরে তিনিও চলে গেলেন। ভগ্নহৃদয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। বৈশাখ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত যে কি করে কাটলো তা ভগবান জানেন। মনে করলাম পূজার ছুটীর পর এসে সব শোক-তাপ ঝেড়ে ফেলে—পূর্ব্বের মত "বসুমতী" সেবায় একাগ্রচিত্ত হব। নিয়তি অলক্ষ্যে থেকে বললেন, তা আর হয় না।

পূজার পর এসে যথাসময়ে 'বসুমতী' আফিসে উপস্থিত হলাম। দিন দশেক কাজ করবার পর একদিন সন্ধ্যার সময় আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে তারের খবর এলো, আমার একমাত্র কন্যা অচলা কলেরা রোগে আক্রান্ত। সেই রাত্রির গাড়ীতেই ছুটে গেলাম আমার শ্বশুরবাড়ী। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলাম—১২ শিশির একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স, আর প্রতাপ মজুমদারের একখানা বাংলা বই।

গিয়ে যা দেখলাম—ভীষণ ব্যাপার। গ্রামের ঘরে ঘরে কলেরা। দুইতিন ঘণ্টা পর পরই শুধু "বল হরি, হরি বোল"। ভয়ে শিউরে উঠলাম। পরদিন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করলাম। আমার স্বগ্রামবাসী পরম হিতৈষী ডাক্তার শ্রীমান দেবপ্রসাদ সান্যাল সংবাদ পাওয়া মাত্র উপস্থিত হলেন। দুই একটা ওষুধ দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পরেই কলিকাতায় চলে গেলেন, বলে গেলেন রোগিনীর বাঁচবার কোন আশাই নেই।

আমার মেয়েটীর যিনি শুশ্রূষা করছিলেন আমার সেই সম্বন্ধী—সেইদিন সকাল থেকেই কলেরায় আক্রান্ত হন। রাত্রি দশটায় মেয়েটী গেলেন, বারটায় আমার সম্বন্ধী গেলেন। সে রাত্রিতে শবদাহের কোন ব্যবস্থাই হোল না। প্রাতঃকালে বহু কষ্টে কয়েকজন লোক সংগ্রহ করে শবদাহ করে এসেই দেখি আমার স্ত্রীও ঐ রোগে আক্রান্ত। বুঝলাম এইবার সব শেষ।

ছেলে তিনটিকে পূর্ব্বেই আমার বড় বৌদিদি সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী রওনা হয়ে যান, নইলে তাদেরই বা কি হোতো কে জানে। চিকিৎসার সম্বল আমার সেই ১২ শিশির বাক্স। চিকিৎসার কিছুই জানি নে। মাথার ঠিক নেই, তবুও যা হয় একটা ওষুধ দিলাম। কোন ফলই হোলো না। সন্ধ্যার পর দেখা গেল রোগিনীর সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছে। নাড়ী বসে গিয়েছে। বুঝলাম রাত্রি আর কাটিবে না।

সেই উন্মত্ত অবস্থায় আবার বই নিয়ে বসলাম। উপসর্গ মিল্‌লো কি মিল্‌লো না—তা বলতে পারিনে। ভগবানের নাম করে একটা ওষুধ স্থির করে এক ফোঁটা সুগার অব মিল্কের সঙ্গে মিশিয়ে কোন রকমে মুখের ভিতর পূরে দিলাম। ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই সেই এক বিন্দু ঔষধ মন্ত্রৌষধির মত কায করল। মনে হোলো নাড়ী ফিরে এসেছে, মনে হোলো শরীরের নীল বর্ণও কেটে যাচ্ছে।

দুইদিন অনাহারে অর্দ্ধাহারে অনিদ্রায় যমের সঙ্গে লড়াই করে আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুললাম। আরও দুইদিন সেখানে থাকলাম। তার পরই ডায়মণ্ড হারবারের পথে ছেলে তিনটির আসবার ব্যবস্থা করে আমার রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে দেশে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছে দেখলাম সুরেশ (সমাজপতি), নলিনীভূষণ (গুহ) ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা সেই রাত্রের মেলেই আমাদের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

গাড়ীতে উঠলে সুরেশ বললেন—দাদা, আবার কবে আসছেন।

আমি বললাম—ভায়া, এই হয় তো আমার শেষ যাত্রা। শরীর মন অবসন্ন, নিয়তি আমার জন্য হয় কলেরা, না হয় বসন্তের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তা না হলেও কিছুদিন আমি বাড়ী থেকে নড়ছিনে।

এদিকে 'বসুমতী'র কার্য্য আর অমনভাবে চলতে পারে না। উপেন্দ্রবাবু তাঁর এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দীনেন্দ্রবাবুকেই সম্পাদকের কার্য্যভার সমর্পণ করলেন। তিনিও আমাকে জবাব দিলেন না, আমিও তাঁকে জবাব দিলাম না। যেমন বন্ধুভাবে 'বসুমতী'তে প্রবেশ করেছিলাম, তেমনি বন্ধুভাবেই 'বসুমতী'র বন্ধন ছিন্ন করলাম।

কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর স্নেহের বন্ধন তাঁর জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত আমি ছিন্ন করতে পারি নি। ১৩২৫ সালের ১৭ই চৈত্র ৫০ বৎসর বয়সে সুধী কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ তাঁর নিমু গোস্বামীর লেনের বাড়ীতে যে দিন দেহত্যাগ করলেন সেই দিনই তাঁর স্নেহপাশ ছিন্ন হোলো।

আজ এতকাল পরে আমার সেই পরম বন্ধু কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা উপেন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণ করে পরম তৃপ্তিলাভ করলাম।

নব মেঘে এল না আষাঢ়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নব মেঘে এল না আষাঢ়
এল না বিদ্যুল্লতা ফুটাইয়া শিরীষ কুসুম
বলাকার মালা গাঁথা ভুলিয়াছে মেঘ-বালিকারা
বরষার অগ্রদূত নৃত্যপরা ময়ূর-ময়ূরী,
সুনীল গগন পানে হতাশায় মেলিছে নয়ন
নিদাঘ আতপ তাপে রামগিরি পর্ব্বত জ্বলিছে
এল না শ্যামল ঘন বন মেঘে এল না আষাঢ়।

কারে দিয়ে পাঠাই বারতা
আমার প্রাণের কথা নির্ব্বাসিত এ যক্ষের ব্যথা
মেঘ-বার্ত্তাবহ বিনে কারে দিয়ে প্রিয়ারে জানাই,
কোথায় সে শিপ্রাতটে উজ্জয়িনী সৌধ-কিরীটিনী
কলহংস কলধ্বনি মুখরিত শৈল-বাপীতট
মঞ্জরিত কদম্বের পরাগ-আস্তীর্ণ তৃণভূমে
করবী রঙনে রাঙা পেলব চরণ চিহ্ন তা'র
এবার জাগেনি বুঝি —আষাঢ়ের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ?
এল না মন্থর মেঘ, কারে দিয়ে পাঠাই বারতা ?

সানুনয়ে মিনতি জানাই,
সলিল-মারুতবাহী ধূম্রজ্যোতি ওগো নব মেঘ
সানুমান শৈল ঘিরি' বপ্রক্রীড়া করিও না আর।
কোথা গতি মন্দাক্রান্তা, সঞ্চরণে মেদুর সুন্দর
রামগিরি আশ্রমের বার্ত্তা লয়ে বিদিশা নগরে
কবে আর যাবে বল ? কান্তা মোর বিরহ-বিধুরা,
বিশীর্ণ হয়েছে দেহ, ক্ষীণ কটি, খসিছে মেখলা
লোধ্ররেণু মুছে গেছে, হাতে তার লীলা-শতদল ;
কোনও মতে বেঁচে আছে, আমার কুশলবার্ত্তা লাগি',
বিলম্বে ঘটিতে পারে বিরহী যক্ষের সর্ব্বনাশ।
তোমার গমন-পথ অবগাঢ় নীলিমায় দূরে
তাই ত তোমারে সখা, সানুনয়ে মিনতি জানাই।

ওগো মেঘ, নেমে চল ধীরে,
প্রোষিতভর্ত্তৃকা মোর পথ চাহি' রবে কতকাল,
—কতকাল গত হ'লে—শেষ হ'বে নির্ব্বাসন মোর ?
সহস্র যোজন দূরে মহাকাল-মন্দির-চূড়ায়
কতদিনে ওগো মেঘ বিছাইয়া দিবে ঘনমায়া
কতদিনে ওগো বন্ধু উত্তরিবে ভেটিতে বান্ধবী ?
আপনার মাঝে তুমি ঘনাইয়া দীর্ঘ কালো ছায়া
গগন সীমান্ত হ'তে, ছেয়ে ফেল' যাত্রা পথ তব ;
বিরহী যক্ষের ব্যথা অন্তর্গূঢ় ঘন ঘনিমায়
নিঃশেষে উজাড় করি' ঢেলে দাও নীপবীথিতলে
বিরহ-কাব্যের দূত, ওগো মেঘ নেমে চল ধীরে।

'জংলা সাড়ী'

প্রবোধকুমার সান্যাল

কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া চলিতেছিলাম। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু আগে বর্ষা নামিয়াছিল, পথে এখনো জল শুকায় নাই; গ্যাসের আলোগুলিতে বৃষ্টির ছাট লাগিয়া এখনো ঝাপসা হইয়া আছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশে মেঘের আয়োজন কমে নাই।

শশধর আর আমি, দু'জনে চলিতেছিলাম। বৃষ্টি-বাদলের দিনে পথে পথে বেড়াইতে আমরা দুইজনেই পছন্দ করি। কোঁচার খুঁট হাতে তুলিয়া ডালমুট কিনিয়া চিবাইতে চিবাইতে গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছিলাম। জামা কাপড় কিছু ভিজিয়া গিয়াছে, মাথার চুল দিয়া জল পড়িতেছিল, জুতা ভারি হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু টাট্‌কা ডাল-মুটের নেশায় মশগুল হইয়া আমরা চলিয়াছি। আমি একজন কেরাণী এবং শশধর এক মোটরের কারখানায় য়্যাপ্রেন্টিসগিরি করে, তৎসত্ত্বেও এই বর্ষার রাত্রে পথে চলিতে চলিতে আমরা দুইজনে রবিঠাকুরের বর্ষা-কবিতার আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন কেরাণী, অন্যজন মিস্ত্রি, অতএব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পথ আমরা মাড়াই না, তাই এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছি যে, রবিবাবু বড়লোক বলিয়াই ভালো কবিতা লিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের এই ধারণা গ্রহণযোগ্য কি না, তাহা পর জন্মে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর হইয়া বিবেচনা করিব।

গল্প করিতে করিতে চিত্তরঞ্জন আভেন্যুর কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, বাবু, শুনচেন?

পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। একটি ছোক্‌রা আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স বছর ত্রিশ হইবে, চেহারাটা মন্দ নয়। গায়ে একখানা চাদর জড়ানো, মাথায় বড়ো বড়ো কোঁকড়ানো চুল, খালি পা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গোঁফ। এমনি চেহারার বর্ণনা রুশীয়-সাহিত্য হইতে চুরি-করা বাংলা মাসিক পত্রের ছোট গল্পে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল। ভাবিলাম তরুণ কবিও হইতে পারে। কিন্তু আমরা ত স্ত্রীলোক নই, তবে সে পিছু পিছু আসিল কেন? কাব্য আলোচনা করিতেছিলাম, হয়ত শুনিয়া থাকিবে, হয়ত বা কবিতা শুনাইতেই আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ!

ছোকরা একবার এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর কহিল, সাড়ী কিনবেন বাবু?

সাড়ী! অবাক হইলাম। বৃদ্ধ হইয়াছি, সাড়ীর প্রতি এখন আর লোভ নাই। একদা অনেক সাড়ী কিনিয়াছি অনেকের জন্য, তখন মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া রাজত্ব করিতেন। ঝাপ্‌সা গ্যাসের আলোয় ছোকরার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—

শশধর কহিল, না হে, সাড়ী-টাড়ী আমাদের দরকার নেই, অন্য কোথাও ভাখো। বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল।

চ'লে যাচ্ছেন বাবু? পছন্দ না হ'লে না নিতেন, কিন্তু একবার দেখেই যান্ না। ভালো জংলা সাড়ী, মুর্শিদাবাদ সিল্কের, দেখুন না একবার—

টাকাকড়ি আমাদের কাছে নাই, ফিরিবার সময় পুনরায় ডালমুট কিনিবার মতো আর দুইটি পয়সা শশধরের কাছে আছে। আমি কেরাণী, সুতরাং মাসের সাত তারিখ হইতেই আমার পকেটে পয়সা থাকে না। বলিলাম, এত অনুরোধ কোচ্ছ, আচ্ছা খোলো দেখি—কিন্তু ব'লে রাখছি, কিন্‌তে-টিন্‌তে পারবো না।

সে কি বাবু, আপনারা বড়লোক—এই বলিয়া সে চাদরের ভিতর হইতে একটা মোড়ক বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি খুলিতে লাগিল।

বড়লোক বলিয়া সে ভাবিয়াছে ইহাতে আনন্দ পাইলাম। শশধরের গায়ে একটা টিপ দিয়া সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বলিলাম, আর ভাই, এ বছর খাজনা-পত্তর আদায় নেই, জমিদারির অবস্থা শোচনীয়—কি বলো হে শশধর?

আমারো ভাই সেই অবস্থা, ভাবছি গাড়ীখানা বিক্রি ক'রে দেবো।—বলিয়া শশধর যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। আমার ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারিয়াছে!

বলিলাম, তোমার আর ভাবনা কি হে, তুমি ত ঠাকুর-বাড়ীর ছেলে!

শশধর কহিল, তুমিই বা কম কি, সন্তোষের অংশীদার!

আমাদের এই মিথ্যা-বিলাস ছোক্‌রা শুনিল কি না কে জানে। সে মোড়ক খুলিয়া সাড়ী বাহির করিল। লতা-পাতা আঁকা সুন্দর সিল্কের সাড়ী, বারো চৌদ্দ টাকা দাম হইতে পারে। সাড়ীর দুইটা পাট সরাইয়া সে দেখাইয়া দিল, ইহার সহিত ব্লাউস-পিসও আছে। দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, দামটা কত একবার শুনেই যাই?

ছোক্‌রা কহিল, আপনারা বড়লোক, আপনাদের কাছে কিছুই নয়। আট টাকা দেবেন···শুনুন বাবু, চ'লে যাবেন না, আপনারা কত দেবেন ব'লেই যান্ না?

চলিতে চলিতে শশধর কহিল, দু'টাকা পাবে।—বলিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। সে রাজি না হইলেই আমরা বাঁচি, মাস-কাবারের পূর্ব্বে টাকার চেহারা দেখিবার মতো ভাগ্য আমাদের হইবে না। এক হাতে ডালমুট, অন্য হাতে কোঁচার খুঁট্ ধরিয়া দ্রুতপদে চিত্তরঞ্জন আভেন্যুর ফুটপাথ ধরিয়া চলিলাম। শশধর কহিল, দু'টাকা শুনে লোকটা গাল্ দেয় নি এই রক্ষে।

বলিলাম, দুটো গালই না হয় দিত, অপমান ত' আর করতো না?

বড় রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি। চলিতে চলিতে বৌবাজারের মোড় পার হইয়া গেলাম। আকাশে বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে। বাঁ-হাতি একটা রেস্তঁরার সুগন্ধ নাকে আসিয়াছে, এমন সময় শশধর কহিল, ওহে, লোকটা পিছু পিছু আসছে, মতলব কি বলো ত?

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। ছোকরা আবার কাছে আসিল। তাহার ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। বলিলাম, কি হে, তুমি যে নাছোড়বান্দা? আমাদের কি ঠাউরেছ বলো দেখি?

সে কহিল, আর কিছু বাড়িয়ে দিন্ বাবু, এমন ভালো সাড়ী, বাজারে এর দাম বারো টাকা।

শশধর কহিল, চোরাই মাল কোথা থেকে এনেছ শুনি?

ছোক্‌রা কহিল, বুঝতে পারেন ত বাবু, গরীব লোক—

আমি বলিলাম, ছাখো, ভালো কথায় বলছি, দু'টাকা পাবে। যদি ইচ্ছে হয় দিয়ে যাও—নৈলে পিছু পিছু এসো না, পুলিশে ধরিয়ে দেবো। চোরাই মাল বিক্রি করা তোমার বার কোরবো। বদ্‌মায়েস!

সে কহিল, এমন সাড়ী বাবু—জংলা সাড়ী—

কী যন্ত্রণা! এমন বর্ষার রাত্রিটা মাটি করিয়া দিবে দেখিতেছি। কিন্তু ততক্ষণে কি জানি কেন, সাড়ীটার প্রতি মোহগ্রস্ত হইয়াছি। বলিলাম, আচ্ছা, শেষ কথা বলি। দু'টাকার বেশি কিছুতেই দেবো না, তবে তুমি যখন এতদূর ধৈর্য্য ধ'রে এসেছ, তখন আর চার আনা বক্‌শিস দেবো,—কি করবে বলো?

শশধর কহিল, আমি বলি সাড়ী নিয়ে কাজ নেই হে।

আমারো না নেবার ইচ্ছে। যাও হে তুমি যাও, জোর ক'রে ত আর কাপড় গছানো যায় না।

ছোকরাটা অনেক চিন্তা করিয়া শেষে পিছু পিছু আসিয়া কহিল, আচ্ছা, তবে তাই দিন্ বাবু, কি আর করবো। গরীব লোক, সামান্য টাকার জন্যে বিপদে পড়েছি। দিন, ন'সিকে দিয়েই নিয়ে যান্।

রাজি হইতেই আকাশ ভাঙিয়া মাথায় পড়িল। এই রাত্রে টাকা পাইব কোথায়? কে ধার দিবে? এখন না হয় কোথাও ধার করিলাম, কিন্তু মাসকাবারে বেতন হইতে দুই টাকা চার আনা দেনা শোধ করিলে আর বাকি থাকিবে কি? সারা মাস কি আঙুল চুষিয়া থাকিব? কিন্তু আর উপায় নাই, কথা দিয়া ফেলিয়াছি, জংলা সাড়ী কিনিতেই হইবে। অনেক ভাবিয়া বলিলাম, খোলো দেখি আর একবার, এখানে বেশ আলো আছে। জাপানী সিল্ক হ'লে কিন্তু নেবো না, ব'লে রাখছি।

ছোকরা পুনরায় মোড়ক খুলিল। তাহার চাদরের নীচে বগলে আর একটা মোড়ক দেখিয়া বলিলাম, ওটায় কি আছে হে?

আজ্ঞে, এরই জোড়া, একই কাপড়। সব সুদ্ধ দুখানা নিয়ে বেরিয়েছি।

শশধর কহিল, বেশ করেছ, লক্ষী ছেলে। কতদিন থেকে চুরি শিখেছ শুনি? সত্যি বলো ত, চোরাই মাল কিনা?

সে কহিল, আজ্ঞে বাবু, সবই ত জানেন।

মোড়ক খুলিয়া উজ্জ্বল আলোয় সাড়ী দেখিলাম। সত্যই কাপড়খানি সুন্দর। রাত্রির আলোয় জংলা সাড়ী যে এমন চমৎকার দেখায় তাহা আগে জানিতাম না। পুনরায় মোড়ক বাঁধিয়া নিজের হাতে লইলাম। কে ব'লে সাড়ীর প্রতি আজও আমার লোভ নাই? কে ব'লে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি? বলিলাম, পটলডাঙ্গা পর্য্যন্ত তোমাকে যেতে হবে ভাই একটু কষ্ট ক'রে, এক বন্ধুর কাছে টাকা নিয়ে তোমাকে দেবো, আমাদের কাছে এখন নেই কি না—

ছোক্‌রা খুশি হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে যে ভদ্র এবং বিনয়ী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চোরাই মাল বিক্রয় করিয়া রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, এই ছোক্‌রা তাহাদের চেয়ে কম ভদ্র নয়। কেবল তাই নয়, ইহার আচরণে যে ঈষৎ সাম্যবাদের গন্ধ পাইয়াছি তাহার জন্যও ইহাকে সম্মান করিবার কথা।

পনেরো মিনিটকাল হাঁটিবার পর আমার এক বন্ধুর মেসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে আমারই বন্ধু, শশধরের সহিত তাহার পরিচয় নাই। পথের এদিকটা অন্ধকার, দূরের একটা গ্যাসের আলো সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। মোড়কটা শশধরের হাতে দিয়া বলিলাম, এটা রাখো তোমার কাছে, ভেতরে নিয়ে গেলে সবাই দেখতে চাইবে। আমি এখুনি আসবো।

শশধর তাড়াতাড়ি কহিল, চোরাই মাল হাতে নিয়ে আমি ভাই দাঁড়াতে পারবো না, যে দিনকাল, পুলিশের কাণ্ডকারখানা! ওর হাতেই থাকুক, ওকে নিয়ে দাঁড়াই, তুমি যাও।

বন্ধুর নিকট ন'সিকে ধার করিবার জন্য তাড়াতাড়ি মেসের দরজার ভিতর দিয়া আমি ঢুকিয়া পড়িলাম। সাড়ীটা আর আমি ছাড়িতে পারিব না। উহা কোনো আত্মীয়ের নিকট চড়া-দামে বিক্রয় করিয়া ইতিমধ্যে কিছু লাভ করিবার ফন্দি আঁটিয়াছি!

•

টাকা পাইয়া সাড়ীখানা আমার হাতে দিয়া ছোক্‌রা চলিয়া গেল। তাহার ভয় ছিল পাছে আমরা তাহাকে ধরাইয়া দিই। দ্রুতপদে সে এক গলি হইতে অন্য গলি দিয়া অদৃশ্য হইল। জীবনে অনেক দিকে বঞ্চিত হইয়া আছি, তাহার জন্য চিত্তদাহ কম নাই, কিন্তু আজকের দিনে যে সত্যই লাভবান হইলাম তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। জ্যোতিষীকে একবার হাতখানা দেখাইয়া লইব, এতদিনে বোধ করি সুদিন আসিয়াছে। ছোটবেলায় একবার শুনিয়াছিলাম, আমি পরের ধন লাভ করিব।

শশধর চলিতে চলিতে কহিল, সাড়ীখানা দুজনে মিলে নেওয়া যাক্, কি বলো? আমি তোমাকে এক টাকা দু' আনা দেবো।

বলিলাম, তার মানে?—তাহার প্রস্তাবে রাগ হইল।

শশধর কহিল, তোমার স্ত্রী আর আমার স্ত্রী দুজনেই পরবে। ধরো আমার কাছেই যদি সাড়ীখানা থাকে?

তোমার কাছে থাকবে? তোমার স্ত্রী যদি গোপনে বেশি ব্যবহার করেন? ওটি হচ্ছে না শশধর, শেষকালে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ন'সিকের সাড়ীর জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ সইবে না।

শশধর কহিল, তবে তুমি আমার কাছে তিনটাকায় বিক্রি করো, মাসে আট আনা ক'রে শোধ ক'রে দেবো।

তাহার এই কদর্য্য প্রস্তাবে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলাম, এঃ—বউকে জংলা সাড়ী পরাবার কত সখ! যাও, গামছা পরিয়ে রাখো গে।

মোড়কটা হাতে ছিল, সেটাকে বাঁ হাতে বুকে চাপিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। শশধর কহিল, ধর্ম্মতঃ ওখানা আমারই নেবার কথা, আমিই প্রথমে দু'টাকা দর বলে ছিলুম। বুকে হাত দিয়ে বলো ত সত্যি কি না?

বলিলাম, বটে! কিন্তু মনে রেখো শশধর, পাখীকে যে ধরে পাখী তার নয়, যে বাঁচিয়ে রাখে পাখী তারই!

ধমক খাইয়া শশধর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, যাক গে। ভালো কথা, ছোকরাটার কাছ থেকে কিন্তু খুব বাগানো গেছে, কি বলো?

বলিলাম, চুরির মাল, যা পায় তাই লাভ!

হ্যাঁ, তুমি যাবার পর অনেক গল্প করলে, শুনছিলুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কাপড়ের দোকানে ছোঁড়া চাকরি করে, কুড়ি টাকা মাইনে পায়। চোরাই মাল বিক্রির ভাগ দোকানের সব কর্ম্মচারীই পায়, সবাই খুশি থাকলে চুরি ধরা পড়বে না। তার পর হাত সাফাইয়ের ফন্দিও

চমৎকার। নিজেদের লোক আসে মাল কিন্‌তে, তার মোড়কের মধ্যে চোরাই মাল পাচার ক'রে দেয়। বাইরে এসে বিক্রি করে। বাস্তবিক, এ ছোক্‌রাকে দেখলে দয়া হয়। বড় গরীব। বাড়ীতে স্ত্রী, দুটি ছেলে মেয়ে, বুড়ো মা, ঘর ভাড়া, রোগ ভোগ—কুড়ি বাইশ টাকা মাইনেয় কি হয় বলো ত? চুরি করবে না ত কী করবে? সমাজের কত বড় অবিচার বলো দেখি? ওর অবস্থার জন্য তুমি দায়ী, আমি দায়ী।—বলিতে বলিতে শশধর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পরের দুঃখে বিগলিত হইয়া সে আমাকে অভিভূত করিতে চায়, তাহার অভিসন্ধি বুঝিতেছি।

বলিলাম, থামো শশধর, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এখুনি সাপ বেরুবে। আচ্ছা শোনো, সাড়ীখানা পাঁচ টাকায় বেশ সহজে বিক্রি করতে পারি, নয়?

শশধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তারপর কহিল, ছ' টাকাতেও বিক্রি করতে পারো, যে কিন্‌বে তার লোকসান হবে না।

আনন্দিত হইয়া কহিলাম, যদি ছ'টাকায় বিক্রি হয় শশধর, তবে চাচার দোকানে তোমাকে একদিন কট্‌লেট্ খাইয়ে দেবো।

শশধর কহিল, কিন্তু বিক্রিই বা করবে কেন? স্ত্রীকে কি তোমার জংলা সাড়ী পরাতে ইচ্ছে করে না?

উত্তেজিত হইলাম। তার পায়ে সর্ব্বস্ব দিয়েছি, এ সাড়ীখানা নাই বা দিলুম! তুমি জানো শশধর, বাবা মরবার সময় আমার কী সর্ব্বনাশ ক'রে গেছেন! বিয়ে না করলে আজ আমার ভাবনা কি? আমি বিলেত যেতে পারতুম, কিম্বা পাটের কারবার ক'রে লক্ষপতি হ'তে পারতুম, কিম্বা দেশের নেতা হ'য়ে অন্ততঃ জেলেও যেতে পারতুম।

শশধর সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে কহিল, তা সত্যি, তোমার অনেক সম্ভাবনা ছিল। এই দ্যাখো আমারই কী দুর্দ্দশা! রুগ্ন স্ত্রী, মাসের মধ্যে দশদিন ম্যালেরিয়ায় ভোগে, সেদিন ত ধড়াস ক'রে একটা কানা-মেয়ে প্রসব করলে! তার ওপর ঝগড়াটে, কথায়-কথায় বাপের বাড়ী চ'লে যাবার ভয় দেখায়। তবে হ্যাঁ, চেহারাটা ভালো এই যা। ভালো কাপড় চোপড় পরালে···ধরো যদি তুমি দিতে জংলা সাড়ীখানা তাহ'লে—

মনে মনে শশধরের ফিকির বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। লোকজনের ভিড়ে পথে চলিতে চলিতে সাড়ীর মোড়কটা সযত্নে ধরিয়া আছি। সোজা বাসায় লইয়া যাইব, এমন কি আর কাহাকে দেখিতেও দিব না। কিন্তু মনে দুঃখ হইতে লাগিল, আমি শশধরের জন্য এত করিয়া থাকি, কিন্তু আমার এই লাভটুকু তাহার প্রাণে সহ্য হইতেছে না। মুখে কেবল বলিলাম, ভালো চেহারায় ভালো সাড়ী না পরলেও ক্ষতি নেই। ফুলের পাপড়িতে কেউ ছবি আঁকে না, বুঝলে?

শশধর কহিল, তা জানি, তবে কি জানো, একটু খুশি রাখবার চেষ্টা করি—নৈলে যে রেঁধে দেবে না।

আসল কথাটা ভাবিয়া ভয় হইতেছে। সাড়ীটা স্ত্রীর হাতে পড়িলে আর বাহির করিতে পারিব না। সুতরাং এখন বাসায় না ফিরিয়া যদি অন্য কোথাও বিক্রয় করিবার চেষ্টা করি তবে ভালো হয়। শশধর সঙ্গে আছে, যদি তাহারই সম্মুখে বেশি দামে বিক্রয় হয় তবে তাহাকে এখনই চাচার দোকানে কট্‌লেট্ খাওয়াইতে হইবে, কথা দিয়াছি। কিন্তু সামান্য কথার মূল্য কতটুকু? এই দুঃখের পয়সা বাজে খরচ করিব? শশধর কি আমার শ্যালক? না, তাহা পারিব না। লটারির টাকা পাইলে তাহাকে কট্‌লেট্ খাওয়াইব, শশধর বাঁচিয়া থাকুক। বরং বাসায় একদিন তাহাকে তালের বড়া খাওয়াইয়া দিব!

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হাঁটিতে হাঁটিতে রাস্তা ফুরাইল। শশধরকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, ওহে, একটা কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, আমাকে একবার ছোট পিসিমার ওখানে যেতে হবে। তোমাকে এখানেই গুড্ নাইট্ করবো।

শশধর কহিল, তোমার আবার ছোট পিসিমা কে? কই, এতদিন ত বলোনি?

বলিনি? আশ্চর্য্য! পুঁটিবাগানের ভেতর দিয়ে যাবো, লোহাপটির পাশ দিয়ে, চাটুয্যেদের বাড়ী—আচ্ছা, তাহ'লে এখান থেকেই কেটে পড়ি, কেমন?—বলিয়া একটা গলির ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিলাম।

শশধর কহিল, আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে। কিন্তু একটা কথা রাখো ভাই, সাড়ীখানা মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীকে পরতে দিয়ো। এক-একবারে না হয় দু'আনা ক'রে ভাড়াই দেবো।

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরের কথা, দেখা যাবে। তোমার স্ত্রী কি আর আমার পর।

শশধর চলিয়া গেল।

অনেক চেষ্টা করিলাম, সুবিধা হইল না। পথে দু'একজনকে ধরিলাম, তাহারা চোরাই মাল বলিয়া ভ্যাংচাইয়া চলিয়া গেল। আমাদের পাড়ার অন্নদা মুদীকে ধরিলাম, সে জানাইল তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। অবশেষে গুঁইদের বাসার তাসের আড্ডায় আসিলাম। দরজার বাহির হইতে ইসারার পঞ্চাননকে ডাকিয়া সাড়ীখানার কথা বলিলাম। সে নূতন বিবাহ করিয়াছে, তখনই লইতে রাজি হইল। মোড়কটা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, কিন্তু সাতটাকার কম দিতে পারবো না ভাই, বাজারে এখানার দাম পনেরো টাকা।

পঞ্চানন তাসের নেশায় মশগুল হইয়াছিল। অত সহজে সে স্বীকার পাইবে তাহা ভাবি নাই। একটু সন্দেহ হইল। সে কহিল, কাল সকালে আমার বাড়ী যাস, টাকাটা দিয়ে দেবো।

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একবার পঞ্চাননের সহিত রাণিং ফ্লাশ খেলিয়াছিলাম, সেই জুয়াখেলার দরুণ পাঁচ আনা পয়সা সে আজও শোধ করে নাই। তাগাদা দিতে দিতে পাঁচ মাস হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আর বিশ্বাস করি না। বলিলাম, কাল সকালে? না ভাই—বলিয়া মোড়কটা তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইলাম, বলিলাম, আজ রাত্রেই আমার টাকার দরকার। স্ত্রীর অসুখ।

তবে অন্য কোথাও গ্যাখ্, সস্তার কাপড় যে কেউ নেবে।—বলিয়া পঞ্চানন আবার ভিতরে চলিয়া গেল।

চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কপালে লাভ নাই। ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। পাগ্‌লীর ভাগ্য ভালো, সাড়ীখানা তাহারই হইল। সংসারে যা কিছু তাহারই পায়ে ঢালিয়া দিয়াছি, এ কাপড়খানাও দিব। পায়ের শব্দ করিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। ছেলেমেয়ে তিনটিকে লইয়া উনি বোধ করি ঘুমাইয়া আছেন। ডাকিলাম, ওগো?

হঠাৎ তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, থাক্, মিষ্টি গলায় আর ডাকতে হবে না। কেলেঙ্কারীর কথা মনে নেই?

ভুলিয়া গিয়াছিলাম বিকালবেলা ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়াছি। ঝগড়ার কারণটা সামান্য। তাঁহার জন্য সোণার একজোড়া ঝুমকো গত বৎসর আনিয়া দিয়াছিলাম, আজ সকালে তাহা কেমিক্যালের তৈরী বলিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমি না কি তাঁকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি। সোণা না হয় কেমিক্যালে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ভালোবাসাটা ত আর ফিকা হয় নাই! মেয়েমানুষ প্রেমের মূল্য কী বুঝিবে?

বলিলাম, আরে সেই জন্যই ত ডাক্‌ছি। এই নাও তার ক্ষতিপূরণ, পরো দেখি এখনি জংলা সাড়ীখানা? নাও, ধরো। সাড়ীর মোড়কটা ছুঁড়িয়া তাঁহার নাকের কাছে ফেলিয়া দিলাম। অলঙ্কার-আভরণ দিয়াই স্ত্রীলোকের মন কিনিতে পারা যায়। এই যে এত কষ্ট করিয়া সাড়ী বহিয়া আনিয়াছি, জানি আমার এই আন্তরিকতার মূল্য কিছুই পাইব না। বাস্তবিক, জীবনটা আমার মরুভূমি! আমি সুইসাইড্ করিব।

বাহিরে আসিয়া বসিয়া তামাক ধরাইতেছিলাম, এমন সময় গৃহিণী তীব্র ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমার হাত হইতে কল্‌কে পড়িয়া গেল। চীৎকার করিতে ক'রতে তিনি বাহিরে আসিলেন—চিরজীবন আমাকে তুমি ঠকিয়ে এসেছ, তোমার মুখ দেখতে নেই। তুমি জোচ্চোর—বাট্‌পাড়—চামার—

চুপ, চুপ, হোলো কি শুনি আগে?

আমার সঙ্গে রসিকতা? নচ্ছার, ইতর, চামার—আমি আফিং খেয়ে মরবো।—তাঁহার চীৎকারে পাড়া জাগিল।

তাড়াতাড়ি ঘরে আসিলাম। তিনিও পিছনে পিছনে আসিয়া মোড়কটা আমার কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, বার করো এর মধ্যে সাড়ী কোথায়, নৈলে আজ তোমার রক্ষে রাখবো না।

সাড়ী নেই? তবে কি?—বলিয়া মোড়কটা এলাইয়া কম্পিত হস্তে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতরে ছোট ছোট দুই টুক্‌রা পা মোছা চট্ পাট করা রহিয়াছে, আর কিছু নাই! জংলা সাড়ী কোথায় অন্তর্হিত হইল?

কি করিব, কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। কথা বলিতে গেলাম, আওয়াজ বাহির হইল না, তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেছে। গৃহিণী অপমান করিতেছেন কিন্তু তাহা কানে ঢুকিতেছিল না। কোন্ ফাঁকে প্রতারিত হইয়াছি তাহাই বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

বাংলা বানানের নিয়ম

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট)

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের সকলের বানানের রীতিও এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুসৃত পন্থা কোন্‌টি তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই।

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়—যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান-সংস্কার করা। প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাঁহাদের অভিমত সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ আছে, সেইরূপ মতভেদ সমিতির সদস্যগণের মধ্যেও আছে। বিভিন্ন পক্ষের যুক্তি-বিচারের পর সদস্যগণের মধ্যে যতটা মতৈক্য ঘটিয়াছে তদনুসারেই বানানের প্রত্যেক বিধি রচিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যে নিয়মাবলী সংকলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিবেন—বানানের যথেষ্ট সংস্কার হয় নাই, কেহ-বা ভাবিবেন—প্রচলিত রীতিতে অযথা হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। বানান-নির্ধারণের প্রথম চেষ্টায় এইরূপ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সুখের বিষয়, বহু ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেষ্টায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যদি সাধারণে সংকলিত নিয়মাবলী গ্রহণ করেন তবেই অনেক বাংলা শব্দের বিভিন্ন রূপ অপসৃত হইবে এবং তাহার ফলে বাংলা ভাষা-শিক্ষার পথ কিছু সুগম হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলী-সম্মত বানান গৃহীত হইবে। আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে পারিবে।

সমিতির রিপোর্ট

গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় দুই শত উত্তর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহুপ্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি সমস্ত অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ যত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা বেশি হইবে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু সাধারণ লেখায় তাহা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে

অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই, যথা—'গণ, বন, ঘন; জলখাবার, জলযোগ; আষাঢ়, গাঢ়; সহিত, গলিত; অশ্বতর, হ্রস্বতর; একদা, একটা; অচেনা, অদেখা'। এইপ্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের যদি বানান-সংস্কার করিতে হয় তবে বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা-সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দসম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এইপ্রকার শব্দের বাংলা রূপ এখনও বদ্ধ হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেচ্ছতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। বহু স্থলে সংস্কৃত রীতিতেই সমাস-সন্ধির দ্বারা নূতন শব্দ গঠন করা হয়। এজন্য সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

কেবল বর্তমান লেখক ও পাঠকগণের লাভালাভ হিসাব করিয়া বানানের নিয়ম গঠন করিলে সুবিচার হইবে না। ভবিষ্যতে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের যদি অধিকতর সুবিধা হয় তবেই নিয়ম-গঠন সার্থক হইবে।

শব্দকোষ ভিন্ন সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। এই প্রবন্ধে বানানের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে, যথা—'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক'। অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

শেষোক্ত স্থলে রেফের পর দ্বিত্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারে বিকল্পে সিদ্ধ, না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়। হিন্দি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় এই দ্বিত্ব হয় না।

২। সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, শংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত, স্বয়ংভূ' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলার সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পরে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, কারণ বাংলায় অনুস্বারের উচ্চারণ ঙ-র সমান।

৩। বিসর্গান্ত পদ

বাংলায় বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জিত হইবে, যথা—'আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, সদ্য'। কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গসন্ধি যথানিয়মে হইবে, যথা—'আয়ুষ্কাল, পুনঃপুন, প্রাতঃকাল, পুনরাগত, মনোযোগ, সদ্যোজাত'।

'আয়ুঃ, চক্ষুঃ, মনঃ, দুর্বাসাঃ' প্রভৃতি সংস্কৃত পদ বাংলায় প্রায়শ বিসর্গ না দিয়া লেখা হয়। কিন্তু অব্যয় শব্দে কেহ বিসর্গ দেন, কেহ দেন না, যথা—বিশেষতঃ, বিশেষত'। সর্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়।

৪। হসন্ত পদ

হসন্ত সংস্কৃত পদের (বা শব্দের) শেষে হস্ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, যথা—ত্বক্, দিক্, সম্রাট্, উপনিষৎ, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদ্, বিদ্বান্, শ্রীমান্'।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৫। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

অসংস্কৃত শব্দে এইরূপ দ্বিত্ব সর্বত্র বর্জনীয়, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, কার্বা, ফর্মা, জার্মানি'।

৬। হস চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণত হস্ চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্ চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ

অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্ চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, তখ্‌ত্, জেম্‌স্, বণ্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা—'পট্‌কা, তদ্‌বির, এক্স্‌প্রেস'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্ চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌ কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত, অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই সকল সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। সাধারণত অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্ চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্ চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্ চিহ্ন বিধেয়।

৭। ই ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, কুমির; শীষ, শিষ; রানী, রানি; ময়রানী, ময়রানি; পাখী, পাখি; শাড়ী, শাড়ি; ঊনিশ, উনিশ; চূন, চুন; পূব, পুব'। কিন্তু তদ্‌ভব ও তৎসদৃশ ভিন্ন অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব ই বা হ্রস্ব উ হইবে, যথা—ঝি, দিদি, মাসি, পিসি, কাকি, মামি, ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, দুটি'।

বহু লেখক তদ্‌ভব শব্দে মূল অনুসারে ঈ ঊ বজায় রাখিতে চান, পক্ষান্তরে অনেকে সর্বত্র ই উ লেখা উচিত মনে করেন। সেজন্য তদ্‌ভব ও তৎসদৃশ শব্দে বিকল্প বিহিত হইল। অন্য শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৮। ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'।

৯। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়, যথা—'যত, মত (সদৃশ), কাল (সময়, কল্য, কৃষ্ণ), ভাল (কপাল, উত্তম), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দালি, শাখা), এত, এখন, কে, দেখা, খেলা'।

'তো, হয়তো' বানান বিধেয়।

'কোন, এখন, কখন, তখন' প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে এইরূপ বানান বিধেয়—'কোন্ লোক? কোন কোন লোক বর্ণান্ধ। কোনও লোক আসে নাই। কখন্ হইবে জানি না। কখন মেঘ কখন রৌদ্র। এমন কখনও হয় না।'

ইয়া উয়া প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের চলিত (ও আধুনিক সাধু) রূপ এই প্রকার হইবে—'একঘরে, জটে, কটমটে, ছটফটে; জলো, মদো, ঘরো, পড়ো, পটো, খড়ো, ঝড়ো'। উপান্ত্য বর্ণে ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'একঘ'রে, জ'লো'।

১০। ং ঙ

'বাঙালি, আঙ ল, রঙের' প্রভৃতি বানান বিধেয়। যদি স্বরচিহ্নযোগ না হয় তবে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান। 'বাঙ্গালি' ও 'বাঙালি'র উচ্চারণও সমান নয়।

১১। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস

(শস্য), মশা (মশক), পিসি (পিতৃঃস্বসা')। দেশজ শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'সরেস, করিস, ফরসা (-শা), উশখুশ'। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স ও sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, খাস, জিনিস, সাদা, সবুজ, মাস্থল, মসলা, পেনসিল, সিমেণ্ট, পুলিস, ক্লাস; শরবৎ, শরম, শহর, খুশি, পোশাক, পেনশন, বার্নিশ, শার্ট, শেক্স্পিয়র'।

তদ্ভব ও দেশজ শব্দে শ ষ স প্রয়োগের যে নিয়ম দেওয়া হইল তাহা প্রচলিত রীতির অনুযায়ী। প্রায় সকল লেখকই এই রীতি বজায় রাখিতে চান। অধিকাংশ বিদেশী শব্দের প্রচলিত বানানে মূল উচ্চারণ অনুসারে শ বা স লেখা হয়, যথা—'আসল, সবুজ, ক্লাস; চশমা, পশম, পেনশন'; কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে, যথা—মাশুল, মশলা; সরবৎ, সরম'। নবাগত বিদেশী শব্দের বাংলা রূপে অনেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ বজায় রাখার চেষ্টা করেন। সামঞ্জস্যের জন্য সকল বিদেশী শব্দেই মূল উচ্চারণ-অনুসারে শ স প্রয়োগ সমীচীন হইবে।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়।

১২। চন্দ্রবিন্দু

কতকগুলি শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ-সম্বন্ধে লেখকগণ একমত নহেন এবং অনেকে সংশয়গ্রস্ত। বিশিষ্ট লেখকগণের অধিকাংশের মত অনুসারে নিম্নলিখিত বানান নির্ধারিত হইল—

কুচি (টুকরা)। কুঁচি (শূকরাদির লোম)
কুঁজা (কুব্জ, সোরাই)
কুঁদা (লাফান, কুঁদ যন্ত্রে কাটা, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি)
কুড়ে (অলস)। কুঁড়ে (কুটীর)
খোঁপা (কবরী)
ছুঁচ (সূচ)
ছোড়া (নিক্ষেপ করা)। ছোঁড়া (ছোকরা)
টেঁকা (স্থায়ী হওয়া)
পুঁথি (পুস্তিকা)
বাটা (পেষণ করা)। বাঁটা (বণ্টন করা)
বেজি (নকুল)।

১৩। ক্রিয়াপদ

সাধুভাষার ক্রিয়াপদের বানানে অধিক মতভেদ দেখা যায় না। অনেকে 'করানো, পাঠানো' লেখেন, কিন্তু অধিকাংশ লেখক 'করান, পাঠান' বানানের পক্ষে। ও-কার অনাবশ্যক, অর্থ হইতেই উচ্চারণবোধ হয়, সেজন্য 'করান, পাঠান' ইত্যাদি বানান বিধেয়। 'করিয়ো, দিয়ো' ইত্যাদি বানানে য় অনাবশ্যক, 'করিও, দিও' বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। অতিরিক্ত ও-কার, উর্ধ্ব-কমা বা হস্‌ চিহ্ন অনাবশ্যক; কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে ' চিহ্ন বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে। সাধু ক্রিয়াপদের -লাম বিভক্তি স্থানে চলিত ক্রিয়াপদেও -লাম বিধেয়, কারণ ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিক রূপে প্রচলিত এবং সাধুরূপেরও অনুযায়ী।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হস (হ'স), হই। হচ্ছে। হয়েছে। হোক, হোন, হও, হ। হল (হ'ল), হলাম। হত (হ'ত)। হচ্ছিল। হয়েছিল। হবে। হয়ো, হস (হ'স)। হতে (হ'তে), হয়ে, হলে (হ'লে), হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে, খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাবে। খেও, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে, শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোবো। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্‌-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্‌। করলে (ক'রলে), করলাম। করত (ক'রত)। করছিল। করেছিল। করবে। করো

(ক'রো), করিস। করতে (ক'রতে), করে (ক'রে), করলে (ক'রলে), করবার, করা।

কাট্-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান।

১৪। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিতরূপ মৌখিকরূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জ্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। সাধারণ বাঙালির ইংরেজি উচ্চারণ ইংরেজের সমান নয়, তথাপি তাহাতে কাজ চলিতেছে। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াই শিখিতে হইবে।

১৫। বিবৃত অ (cut এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet); সার্কস (circus); ফোকস (focus), অগস্ট (August), রেডিয়ম (radium), ফস্ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)'।

১৬। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat = हैट)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার লাগাইলে ও (ओ) হয়, সেই রূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৭। ঈ উ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ উ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ উ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট্ (east), উস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৮। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট

(foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৯। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

২০। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রযোগ বর্জ্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড', না লিখিয়া 'এড্ওআর্ড, ওঅর-বণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

২১। s, sh

১১ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২২। st

ইংরেজির st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্‌ট বিধেয়, যথা—'স্‌টেশন'।

২৩। z

z স্থানে জ্র বা জ বিধেয়।

২৪। হস্ চিহ্ন

৬ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বাঙ্গালী হয়ে যেথায় থাকে
বাঙ্গলা তাহার সঙ্গে যায়,
মনকে তাহার আকুল করে
শ্যামলী মার শ্যাম আভায়।
যেথায় থাকুক নাইক ক্ষতি,
সঙ্গে থাকেন হৈমবতী,
কালিদহের কাহিনী কয়
সিংহলেরি রাজসভায়।

২

থাক যে বেশে যাক্ যে দেশে
সপ্ত সাগর লঙ্ঘি' সে,
কাশীদাস আর কৃত্তিবাসে
পায় যে চির সঙ্গী সে।
বাউল নাচে তাহার মনে,
নয়ন গলে সংকীর্ত্তনে।
চিন্তা তাহার নয়ন জলে
গ্রামের পথে পথ হারায়।

৩

কোথায় ব্রেজিল কোথায় গিনি
অষ্ট্রেলিয়া ট্রান্সভাল,
যেমন ভাবে যেথায় রাখে
দগ্ধোদর ও ছার কপাল।
আয় চাঁদ আমার আয়রে আরে
বঙ্গমাতা ডাক্‌ছে তারে,
বৃন্দাবনের কাছেই তাহার
নদীয়া যে দিন দাঁড়ায়।

বিদেশী বীমা-কোম্পানীর দাদন বা লগ্নী প্রথা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ডে সম্প্রতি ৪০টি বীমা-কোম্পানী বাড়ী খরিদ ব্যাপারে টাকা লগ্নী করিতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জনসাধারণের দাবীও এই দিক দিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া এই বন্ধকী কারবারে লিপ্ত হইতেছেন।

মিঃ ই. এল্‌ডিস্‌ এ-সি-আই-আই বার্ম্মিংহাম সহরে ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটে (Birmingham Insurance Institute) এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—

Not only does it provide the offices with a sound investment for some of their funds at a rate of interest which cannot at present be easily obtained on other high class securities considered suitable for a life office, but it is also a valuable asset for obtaining good ordinary···business. Further it is invariably good business—business which remains in force for many years, as the Policy-holder is bound to keep his policies in force whilst the mortgage is in existence."

—অর্থাৎ এই বাড়ী খরিদ বাবদ ঋণদানের ব্যবস্থা কোম্পানীকে বিশেষ নিরাপদভাবে তহবিলের কিয়দংশ লগ্নী করিবার সুযোগ দেয় এবং তাহাতে যে প্রকার উচ্চহারে সুদ অর্জ্জন করা যায়—জীবনবীমা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত তথাকথিত অতি উচ্চ শ্রেণীর দাদনে তাহা পাওয়া সম্প্রতি কখনই সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে বীমার নূতন কাজ সংগ্রহের পক্ষেও ইহা বিশেষ সহায়ক ; এই বীমার কাজ উৎকৃষ্ট ধরণের এবং উহা দীর্ঘদিন 'চল্‌তি' থাকে—কারণ বন্ধকের মেয়াদ পর্য্যন্ত বীমাকারী তাহার 'পলিসি' বা বীমাপত্র সর্ব্বপ্রযত্নে চালাইয়া যায়।

পরিকল্পিত চুক্তি

যে ভাবে এই প্রকার লগ্নী বা দাদনের পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা আদৌ জটিল নহে। অতি সহজ ও সরল তাহার ব্যবস্থা।

জমি ও বাড়ীর অর্থাৎ সমগ্র সম্পত্তি-মূল্যের কতকটা অংশ—কোম্পানী ঐ সম্পত্তি বন্ধকে নির্দ্ধারিত সুদে ধার দিয়া থাকে—ঐ পরিমাণ টাকার একটি মেয়াদী বীমাপত্র ঋণ-গ্রহীতার নিজের নামে লইতে হয়। গৃহীত বীমাপত্রখানিও কোম্পানীর নিকট বাঁধা রাখিতে হয়। যাহাতে মেয়াদ অন্তে অথবা মেয়াদ মধ্যে ঋণ-গ্রহীতার মৃত্যু হইলে উক্ত ঋণ আপনা হইতেই পরিশোধ হইয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রকার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ বীমার মেয়াদ পূর্ণ হইলে বীমার টাকা হইতেই বন্ধকী খালাস হইল অথবা যদি মেয়াদপূর্ণ হইবার আগেই ঋণ-গ্রহীতার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলেও বীমার চুক্তি অনুসারে বীমাকৃত সমস্ত টাকাতে ঋণ পরিশোধিত হইল। বাঁচি বা মরি—আমার পরিবারবর্গ এই বাড়ীর মালিক হইবে, আমি মেয়াদ অন্তে জীবিত থাকিলে আমিও বাড়ী ভোগদখল করিয়া যাইতে পারিব, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন অভিভাবক বা উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির পক্ষে—ইহা বাস্তবিকই আকর্ষণীয়।

আমাদের এই দেশে গৃহ-সংসারের প্রতি আকর্ষণের উৎপত্তিই হইতেছে ঘরের মায়ায়। আমরা 'ঘর' বাড়ী বলিতে, নিজের সংসার বলিতে যাহা বুঝি—অন্য কোনও জাতি তেমন ভাবে বুঝে না। যে সকল দেশে রাত্রে ঘুমাইবার জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়, যে দেশে "শয়নং যত্র তত্র, ভোজনং হট্টমন্দিরে"—এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে বড় জোর ফ্ল্যাটে মাসিক ভাড়া দিয়া "হোম লাইফ্‌" উপভোগ করার মত বড় চাকুরের সংখ্যায় যে দেশের আদমসুমারী ভারাক্রান্ত—সে দেশে যদি বীমা-কোম্পানী এই ঘর বাড়ীর উপর দাদন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকে—তাহা হইলে আমাদের দেশে কোনও বীমা-কোম্পানীকে বিশেষ নিরাপদে ও লাভজনক উপায়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ নির্ম্মাণ বা ক্রয়ের ব্যবস্থায় টাকা দাদন করিতে দেখিয়া আমাদের দেশের লোকের জাতীয়তা-বোধে আঘাত লাগে কেন ? জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে তাঁহারা

এমন একটি জনহিতকর সৎকার্য্যে—দাদন ব্যাপারের নিন্দা করেন কেন ? এ রহস্য বুঝা কঠিন।

বন্ধকী দাদনের প্রণালী

ইংলণ্ডের এই ৪০টি বীমা-কোম্পানীর মধ্যে অধিকাংশই সম্পত্তি-মূল্যের (Valuation) ৭৫% কর্জ্জ বা দাদন দিয়া থাকেন—কোম্পানীর নিজের লোক দ্বারা সম্পত্তির মূল্যাবধারণ (valuation) করা হইয়া থাকে—তাহারই ৭৫% ধার দেওয়া হয়—বাড়ী খরিদ করিতে প্রকৃতপক্ষে যে টাকা লাগে অর্থাৎ খরিদ মূল্যের ৭৫% নহে। দুই একটি কোম্পানী "কোলেটারল সিকিউরিটি" (Collateral Security) বা আবদ্ধ জামানত বন্ধকে অথবা তাহাদের নিকট ঋণ-গ্রহীতার পুরাতন চল্‌তি 'পলিসি' থাকিলে তাহা বন্ধক রাখিয়া ৭৫%এর অধিক টাকাও ধার দিয়া থাকেন। মিঃ এল্‌ডিস বলেন—৮০%এর বেশী কখনই ধার দেওয়া উচিত নয়—কারণ সম্পত্তিমূল্যের মাত্র ২০% কম ধার দিয়া অনেক সময় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবার প্রয়োজন হইলে মাত্র ২০% 'মার্জ্জিনে' পর্য্যাপ্ত জামিন রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব সম্পত্তি বন্ধকের সহিত দীর্ঘ দিনের বীমাপত্র বন্ধক রাখারও প্রয়োজন আছে।

কোম্পানীর অভিজ্ঞতা

তাঁহার মতে এরূপভাবে টাকা আদায় করিবার প্রয়োজন—দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধকী সনদের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। তখন ঋণের টাকার উপর গৃহীত বীমাপত্রের জন্য অধিক দিন প্রিমিয়াম বা চাঁদা দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহার প্রত্যর্পণ মূল্যও (Surrender value) তেমন জমে না। কাজেই বীমাপত্র যাহাতে চল্‌তি (In force) থাকে সে বিষয়ে কোম্পানীর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং কর্জ্জকারী নির্ব্বাচন করিবার সময়েও সেজন্য বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিতে হইবে। উপার্জ্জনের পরিমাণ ও তাহার আর্থিক সঙ্গতির কথাও সেইজন্য প্রথমেই বিবেচ্য। মিঃ এলডিসের এ অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিকপক্ষে এই প্রকার ঋণদানের ব্যাপারে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যে গৃহনির্ম্মাণ সমিতি (Building Soceity) যে ব্যবস্থায় টাকা লগ্নী করিয়া থাকে, তাহাতে প্রতি বৎসরে আসল টাকারও কিয়দংশ উশুল হইয়া আসে। তাহা ছাড়া ইহাও দেখা যায় যে বীমা কোম্পানী অপেক্ষা গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতিতে মেয়াদের পূর্ব্বে সম্পত্তি বিক্রয়ের সংখ্যাও বেশী। বিলাতের গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি অনেক ক্ষেত্রে ৯০% ধারও দিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ঋণের টাকার ৯০%এর উপর একখানি বীমাপত্র করাইয়া তাহা বাঁধা রাখে, এই প্রকার বীমার চাঁদাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এককালীন দেয় হয়। কাজেই মোটের মাথায় বিলাতী কোম্পানীগুলির লগ্নী কারবারের কর্জ্জ দিবার হার দাঁড়াইতেছে ৮০%।

আমাদের দেশে এই সম্পর্কে দুই একটি বড় কোম্পানী গৃহ নির্ম্মাণ বা ক্রয়-ব্যবস্থায় লগ্নী করিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে ২৭।২৮ বৎসরের একটি বৃহৎ কোম্পানীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি আরো দুই একটি নাম-করা বীমা কোম্পানী এই ভাবে তহবিলের কিয়দংশ লগ্নী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কোম্পানীকে এ প্রণালীর লগ্নী কারবারের জন্য এ পর্য্যন্ত বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু মজার কথা এই যে, বাহিরে সমালোচনার পাত্র হইলেও এই প্রকার লগ্নী কারবারে উক্ত কোম্পানী প্রভূত লাভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশের বীমা-কোম্পানী এই প্রকার লগ্নী ব্যাপারে আর একটা বিষয়ের উপরও জোর দিয়া থাকেন, যথা—ঋণ-গ্রহীতা আবদ্ধ সম্পত্তির মধ্যে নিজস্ব কিছু অর্থও খরচ করিবেন। দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডের কোম্পানী-পরিচালকগণও এ বিষয়ে ভাবিয়াছেন—

"One of our best safeguards is the fact that the borrower shall have a reasonable amount of his own money at stake in the property."

দাদন বা লগ্নী পরিচালন ব্যপদেশে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন—

—My own office attaches as much importance to the personal covenant of the borrower as it does to the valuation—

যাহারা গৃহ নির্ম্মাণ এবং জমি ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি

ব্যাপারে লগ্নী করিতে যাইবেন তাঁহাদের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মেয়াদের চুক্তি

ইংলণ্ডের কোম্পানিগুলির মত আমাদের দেশীয় উক্ত কোম্পানীগুলিও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ধার্য্য করিয়াছেন, ২০ বৎসর বা ১৫ বৎসর—অর্থাৎ তৎসম্পর্কিত পলিসি বা জীবন-বীমার মেয়াদ পর্য্যন্ত। অনেক কোম্পানী ২৫০০০ পাউণ্ডের বেশী মূল্যের সম্পত্তির উপর কর্জ্জ দেন না—তাঁহাদের মতে ইহার অধিক মূল্যের সম্পত্তির বাজার সকল সময়ে পাওয়া যায় না—কিন্তু ছোট খাটো সম্পত্তি বিক্রয়ের বা আদান প্রদানের সুযোগ সকল সময়েই আছে এবং ২০ বৎসরব্যাপী একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ অর্জ্জন করা বীমা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা ও লাভজনক।

আমাদের দেশের অভিজ্ঞতাও এই অভিমতের সমর্থন করে। বড় বড় মিউনিসিপাল টাউনে ছোট ছোট বাড়ী বিক্রয় ও ভাড়া খাটান খুব সহজ—বড় বাড়ীর খরিদ্দার পাওয়া যেমন কঠিন—বেশী ভাড়ার ভাড়াটিয়ার সংখ্যাও তেমনি কম।

সুদের হার

সম্প্রতি ইংলণ্ডে বন্ধকীসূত্রে আয়কর বাদে দাদনের নিট্ net সুদের হার গড়পড়তা ৪½%এর বেশী নয়, যদিও এই ৪০টির মধ্যে দুই একটি কোম্পানী এখনও পর্য্যন্ত ৫% সুদ আদায় করিতেছেন। একটি কোম্পানীর সুদের হার ৩¾%, আর একটির ৪%; গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতিগুলি (Building Soceities) ৪½% হারে সুদ আদায় করিতেছেন।

একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া ঋণ-গ্রহীতার পক্ষে অনেক সুবিধাজনক—কারণ তাহাতে ট্যাক্স বা ব্যাঙ্কের সুদের হারের ওঠা-নামার উপর অনিশ্চয়তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় না।

এই সুদ, ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক কিস্তিতে দেয়—কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তিও মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু কখনও বার্ষিক কিস্তিতে লওয়া হয় না; যদিও গৃহীত বীমার চাঁদা বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক কিস্তিতে দিবার রীতি আছে।

আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীগুলির গৃহনির্ম্মাণে এবং জমি ইত্যাদি ক্রয় ব্যাপারে সুদের হার ৭%—৯%। বিদেশী কারবারের তুলনায় ইহা অত্যধিক বলিয়াই মনে হয় এবং নির্দ্দিষ্ট হারে বন্ধকী কবুলতি হওয়ার দরুণ—বর্ত্তমানের ব্যাপক আর্থিক দুর্গতি এবং ব্যাঙ্কের সুদের হার ও কোম্পানী কাগজের মূল্য ও সুদের হার অত্যধিক কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও—বীমা কোম্পানীর এই প্রণালীর লগ্নী কারবারে সুদের হার সমানই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে বীমা কোম্পানীগুলির এই প্রণালীর বন্ধকী কারবারের চুক্তিমূলে ঋণ-গ্রহীতার স্বার্থের পরিপন্থী একটি বিশেষ অসুবিধাজনক সর্ত্ত আছে। তাহা এই;—ষাণ্মাসিক কিস্তিতে সুদ না দিতে পারিলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গণনা করা হয়। ইহাতে ঋণ-গ্রহীতার পক্ষে সম্পত্তি খালাসের সম্ভাবনার অনেকটা অন্তরায় ঘটে। কাজেই দেখা যাইতেছে—বিলাতী বীমা কোম্পানীগুলি খাতক বীমাকারীগণের জন্য যতটা সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন—আমাদের দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহাদিগকে খাতক বা অধমর্ণের মতই দেখিয়া থাকেন;—অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ মত বীমা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও সাধারণ খাতক অপেক্ষা তাঁহাদিগের জন্য অন্য কোনও প্রকার সুবিধা করিবার রীতি নাই। এদিক দিয়া আমাদের দেশের বীমা পরিচালকগণকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। খাতক হইলেও বীমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করাই বীমা-পরিচালন নীতির আদর্শ হওয়া উচিত।

স্কটলণ্ডের একটি উদাহরণ

এতক্ষণ ইংলণ্ডের কোম্পানীগুলির কথা বলিয়াছি। নিম্নে স্কটলণ্ডের একটি কোম্পানীর উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

এডিনবরার 'স্কটিশ প্রভিডেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন' (Scottish Provident Institution) নামক বীমা কোম্পানীর ৯৮তি বাৎসরিক অধিবেশনে চেয়ারম্যান মিঃ এ, ডি, ম্যাক্‌লাগানের সম্প্রতি প্রকাশিত-অভিভাষণে দেখা যায় যে এই কোম্পানী হইতে গৃহ-ক্রয় সম্পর্কে ঋণ দান (House Purchase Loans) করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে এই

প্রকার ঋণ দানের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাদের বিলম্বই হইয়াছে, তবুও তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানিতে পারি যে অল্পকাল মধ্যেই এই ঋণ দান প্রথা বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে, ইহাঁরা সম্পত্তি মূল্যের ৭৫% টাকা ধার দিতেছেন এবং সুদ আদায় করিতেছেন মাত্র ৩½%। ইংলণ্ডের মত এখানেও যত টাকার ঋণ সেই পরিমাণ টাকার ১৫ বা ২০ বৎসরের একটা মেয়াদী বীমা-পত্র গ্রহণ করিতে হয়। এ কথা বলাই বাহুল্য যে ঋণ-গ্রহীতার বা প্রধানতঃ তাহার উত্তরাধিকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই প্রকার জীবন-বীমা গ্রহণ করিবার রীতি আছে। এখানে বীমার চাঁদা এবং সুদ একই সঙ্গে মাসিক কিস্তিতে দিতে হয়। ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের কোম্পানীর সহিত ইহাঁদের ব্যবস্থার পার্থক্য এইখানে।

আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে যাঁহারা এই প্রকারে টাকা লগ্নী করেন তাঁহাদের রীতি পদ্ধতিও মূলতঃ এক। কিন্তু তাঁহারা সম্পত্তি মূল্যের ৫০% বেশী ধার দেন না এবং ন্যূনকল্পে ৬% কমও সুদ গ্রহণ করেন না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমাদের দেশে এই প্রকার লগ্নী ব্যাপারে লিপ্ত কোম্পানী খুবই সতর্কতার সহিত টাকা ধার দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জানি সম্পত্তি মূল্যের ৫০% অধিক ধার না দিয়া এবং ন্যূনকল্পে ৬% সুদ অর্জ্জন করিয়াও সমালোচকের তীব্র নিন্দার হাত হইতে নিস্তার পাইবার সুযোগ নাই। কল্পনাবলে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি নিম্নমূল্য অবধারণ করিয়া দেশবাসীর মনে কোম্পানীর সারবত্তা বা বীমা-তহবিলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অকারণ ত্রাসের সঞ্চার করার উদাহরণও আমাদের দেশে একেবারে বিরল নহে।

উপসংহার

বিলাতি বীমা কোম্পানীর দাদন-ব্যাপারের বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বীমা-কোম্পানীর পক্ষে গৃহ নির্ম্মাণে বা খরিদ-বিক্রয় ব্যাপারে দাদন করা—অসমীচীন ত নহেই—বরং অধিক লাভ ও সমাজ-কল্যাণ বিধানের দিক দিয়া ইহার একান্ত প্রয়োজন আছে। কোম্পানী পরিচালকগণেরও বীমা-তহবিলের টাকা খাটান বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে। কোম্পানীর কাগজে লগ্নীর পরিমাণ ৩০% রাখিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহার কিছু কম রাখিলেই যে 'ভাগবৎ অশুদ্ধ' হইবে তাহাও আমরা মনে করি না; তবে—যে ভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলির দাদন ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় যতটা সম্ভব সেই অনুসারেই চলা ভাল। শুধু কোম্পানীর কাগজের মোহে অন্ধ হইলে চলিবে না। সময়ের পরিবর্ত্তনে নিত্য নূতন আর্থিক অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহার প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, ভালমন্দ সব দিক বিবেচনা করিয়া, সবার উপর বীমা-তহবিলের নিরাপত্তা বিধান করিয়া বীমা-কোম্পানীর লগ্নী ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।
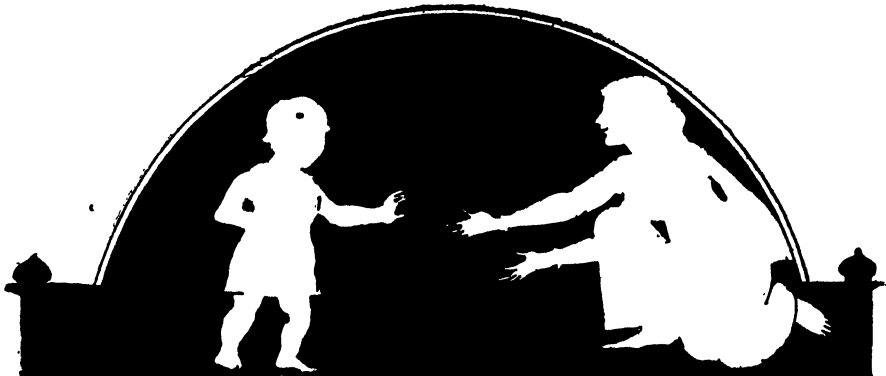
শোক-সংবাদ

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যে বয়সে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে, সে বয়স অধিকাংশ বাঙ্গালীরই হয় না। প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে সম্মান, সম্ভ্রম ও সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে তিনি জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গত ১৫ই মে রাত্রিতে পরলোকগত হইয়াছেন। এইরূপ মৃত্যু যে মানুষ মাত্রেরই কাম্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু যে তাঁহার জন্য বাঙ্গালা আজ শোকার্ত্ত তাহার কারণ, বাঙ্গালার যে দিকে তিনি দিক-পালরূপে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার অভাবে সে দিক যেমন শূন্য হইল, বাঙ্গালায় তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত লোকের তেমনই অভাব। ২৪ পরগণার ভ্যাবলা গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছিল। তাহার পর অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। কাজেই তাঁহাকে যে নানা অসুবিধার মধ্যে শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার মাতা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই তাঁহাকে পরিণীত করেন। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে জীবন-সংগ্রাম তখনও বর্ত্তমান সময়ের মত প্রবল হয় নাই বটে, কিন্তু তখনও মাতা ও পত্নীর প্রতিপালন জন্য রাজেন্দ্রনাথকে কম সংগ্রাম করিতে হয় নাই। এঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া ক্রমে তিনি বাঙ্গালা দেশে অনন্যসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশীদার ও পরিচালক হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু ইহাই রাজেন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য নহে। তিনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার সদ্ব্যয়ও করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তিনি বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু বাঙ্গালার অতি অল্প জনহিতকর প্রতিষ্ঠানই তাঁহার অর্থসাহায্যে বঞ্চিত হইয়াছে। কিঞ্চিন্যূন অর্দ্ধ-

শতাব্দীকাল তিনি যেমন বাঙ্গালায় ব্যবসায়ী-শিরোমণি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তেমনই দাতাদিগের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার প্রায় সকল জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সাহায্য বর্ষিত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বেকার-সমস্যা বাঙ্গালায় কিরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির আবশ্যক পরিবর্ত্তন সাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে এই কৃষিপ্রধান দেশে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া কেবল ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণে কাজ করিলে সে কাজ কখনই সফল হইবে না।

ব্যবসায় ব্যাপারে তিনি যেমন প্রতীচ্য দেশের ব্যবসায়ীদিগের পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, সামাজিক জীবনে তেমনই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকে তিনি কখনও অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন নাই এবং স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়—এই বাক্য স্মরণ রাখিয়া স্বগৃহে দেবীমূর্ত্তি রক্ষা করিয়া পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজাধিকারে যদি কোন ভারতবাসী ব্যবসা ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে সে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ব্যবসা-বিমুখ বাঙ্গালীর ব্যবসা-নৈপুণ্যের যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, সেজন্য বাঙ্গালী তাহার কলঙ্ক মোচনে যেমন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, তেমনই তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিলে এই বিভাগে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত ও সুগম করিয়া লইতে পারে। দেশের এই বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির সময় বাঙ্গালায় যদি রাজেন্দ্রনাথের আদর্শ অনুকৃত হয়, তবে যে তাহাতে বাঙ্গালীর অনেক দুর্গতির অবসান হইবে তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

তিনি কখনও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি-চর্চ্চায় যোগ দেন নাই বটে. কিন্তু ব্যবসা ব্যাপার রাজনীতির সহিত বিজড়িত বলিয়া যেখানেই প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই অকুতোভয়ে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেজন্য ইংরাজদিগের অপ্রীতিভাজন হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পরে আর্থিক দুর্গতি মোচনের চেষ্টায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ব্যয়-সঙ্কোচের পন্থা নির্দ্ধারণ জন্য তাঁহাকেই সভাপতি করিয়া এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কমিটীতে তাঁহার সহিত সার ক্যাম্বেল রোডস্‌, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি সদস্য ছিলেন। এই কমিটী দেখাইয়া দেন যে বাঙ্গালা সরকার ইচ্ছা করিলে বার্ষিক ব্যয় দুই কোটি টাকা হ্রাস করিতে পারেন। ব্যয়-সঙ্কোচের পথনির্দ্দেশে তিনি গভর্ণরের বডিগার্ড বর্জ্জনের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। ইহাতে ইউরোপীয়রা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন বটে এবং বলিয়াছিলেন যে উহা গভর্ণরের সম্ভ্রমের অঙ্গ—কিন্তু সার রাজেন্দ্রনাথের মত তাহাতে বিচলিত হয় নাই। এদেশে সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার যখন ব্যবসায়ীদিগকে মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন, তখন যে সকল কোম্পানী ঐ কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যুদ্ধের পরে সরকার তাহাদিগকে মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার ঠিকা না দেওয়ায় তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটে। সে সময়েও সার রাজেন্দ্রনাথ এই ব্যবসায়ীদিগের পক্ষ হইয়া সরকারের নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার বহু ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন। তিনি ইউরোপীয় বলিয়া তাহাদিগকে কোনদিন অতিরিক্ত সম্ভ্রম দেন নাই। ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি স্বজাতিবৎসল এবং স্নেহশীল ছিলেন। অল্প বয়সে পত্নী বিয়োগের পর তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যারা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লেডী যাদুমণির সন্তান। প্রতি রবিবারে তাঁহার জামাতা কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতিকে তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতে হইত। শুনিয়াছি, যাইবার সময় প্রত্যেকেই এক একখানি চেক লইয়া যাইতেন। আমরা এই অনন্যসাধারণ বাঙ্গালীর বিয়োগে তাঁহার পরিজনবর্গকে আমাদিগের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার আন্সারী—

কিঞ্চিন্ন্যূন ৬০ বৎসর বয়সে দিল্লীর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত ডাক্তার আন্সারী অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ডাক্তার আন্সারী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের যে পরিবারে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিবারের চিকিৎসা ব্যবসা বহুদিনের। এই পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য স্বধর্ম্মানুরাগ। তিনি শিক্ষালাভের জন্য হায়দ্রাবাদে প্রেরিত হইয়া সিকান্দ্রাবাদে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাতে গমন করেন। তথায় তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তিনি লণ্ডনে একটি হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসকের কাজ করিয়া শিক্ষায় আরও উন্নতিলাভের সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। ৭ বৎসর বিলাতে অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দিল্লীতে চিকিৎসা-ব্যবসা করিতে থাকেন। তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় এবং দিল্লীর বাহিরে নানা স্থান হইতে—বহু সামন্ত রাজ্য হইতেও তাঁহার চিকিৎসার জন্য আহ্বান আসিত। সেই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তিনি ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন—বিশেষ তাঁহার অতিথি সৎকারে প্রাচুর্য্য এত অধিক ছিল যে, তাহা বিলাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তুর্কীর সহিত ইটালীর যুদ্ধকালে তিনি "মেডিক্যাল মিশনে" তুর্কীতে যাইয়া যে কায করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি "মিশনে" তুর্কীতে যাইয়া যে স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার সেই অনুরাগ যে অন্ধ ও স্বার্থপর ছিল না সেই জন্যই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধি ও আদরলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বাস্তবিক মুসলমান নেতৃগণের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয়তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, ডাক্তার আন্সারী তাঁহাদিগেরই অন্যতম ছিলেন। তিনি বহুদিন হইতে কংগ্রেসের সহিত সংস্রব রাখিয়াছিলেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিপদে বৃত হয়েন। এইবার সভাপতির অভিভাষণে তিনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া বলেন :—

"আমি যে হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধের এত বিস্তৃত আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ—এই বিরোধ সর্ব্বব্যাপী রোগ-বীজাণুর মত আমাদিগের জাতীয় জীবনের সকল অংশে সংক্রামিত হইয়াছে।"

তিনি তাঁহার মত অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করিতেন। বিনা বিচারে লোককে আটক রাখার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

"এই বন্দীদিগকে যদি মুক্তিদান করা হয়, তবে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ-নিয়ন্ত্রণে নূতন ভাবের উদ্ভব সূচনা হইবে। কেবল বন্দীদিগের মুক্তি-ব্যবস্থা করিলেই হইবে না; যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতবাসীর নাগরিক—ব্যক্তিগত, বক্তৃতা সম্বন্ধীয়, সঙ্ঘবদ্ধতা বিষয়ক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে না পারে, আইনের দ্বারা তাহার ব্যবস্থাও স্থির করিয়া লইতে হইবে।"

ডাক্তার আন্সারী

রাজনীতিক কারণে তিনি ২ বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

যে অল্পসংখ্যক মুসলমান নেতা এখনও কংগ্রেসের আদর্শ ত্যাগ করেন নাই, আজ তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের তিরোভাব হইল।

কয় বৎসর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি আর রাজনীতিক কার্য্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। গত ৯ই মে দিল্লীতে প্রত্যা-

গমনপথে ট্রেণে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি বুঝিতে পারেন—সেই শেষ। তিনি বলেন—"আমি বাঁচিতে চাহি; কিন্তু আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত।" ট্রেণেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আজ যখন হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পথে বিষম বিঘ্ন স্থাপন করিতেছে, তখন ডাক্তার আন্সারীর মত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার তিরোভাব যে বিশেষ দুঃখের কারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত—

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত অকালে পরলোকগত হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় ৺কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত

ইনি বিক্রমপুরের স্মার্ত্তপণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্নের পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জগচ্চন্দ্র শিরোরত্নের নিকট ব্যাকরণ ও রামমোহন সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর বারাণসীতে যাইয়া তিনি মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উত্তরকালে চট্টগ্রামে জগৎপুর আশ্রমের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হয়েন। তথা হইতে বহু ছাত্র কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপকরূপেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'আর্য্য-প্রতিভা' নামক সংস্কৃত পত্র প্রবর্ত্তন ও পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি টীকাটিপ্পনি সহ 'ভাষা পরিচ্ছেদ', 'মালতীমাধব নাটক', 'পিঙ্গল ছন্দ সূত্র' প্রভৃতির উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার প্রণীত 'অনিরুদ্ধ বৃত্তির' তত্ত্ববোধনী টীকা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালায় সংস্কৃত চর্চ্চার বিশেষ ক্ষতি হইল।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য—

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পাবনার দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশেষ চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিয়া এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রতী হয়েন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মমতে আকৃষ্ট হইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন ও পরলোকগত সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠা ভগিনী সুবালাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ২ পুত্র ও ১ কন্যা—পুত্রদ্বয়ের একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় পুত্র ও জামাতা উভয়েই সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছেন।

চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। স্বয়ং দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি দরিদ্রের ব্যথা বুঝিয়াছিলেন এবং সমগ্র জীবন দরিদ্র ছাত্রদিগকে নানারূপে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর প্রায় পক্ষকাল পূর্ব্বে তিনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে ডাকাইয়া পাঠান এবং তাঁহাকে বলেন, তিনি আর পক্ষকাল বাঁচিবেন। তাহার পর তিনি তাঁহার অন্তরের কামনা ব্যক্ত করেন—

তিনি সিটি কলেজে কয় হাজার টাকা দিতে ইচ্ছা করেন; ঐ টাকার সুদ হইতে ১৬ জন দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইবে। তিনি এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পুত্রদিগকে নির্দ্দেশ দান করিয়া পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরা পিতার এই অন্তিম কামনা কার্য্যে পরিণত করিয়া পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া ধন্য হইবেন।

তিনি সমগ্র বাঙ্গালায় আচার্য্যদিগের তালিকা সংগ্রহ

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

করিতেন এবং কোথায় কোন আচার্য্য বিপন্ন থাকিলে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য দিতেন।

তিনি স্বদেশীর অনুরাগী ছিলেন এবং যখন বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন সেই আন্দোলনে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে সময় যাঁহারা তাঁহার সহিত কায করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই বলিবেন—তাঁহার স্বাভাবিক আন্তরিকতা সেই আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। স্বদেশীর প্রতি অনুরাগ-হেতু তিনি অনেক ক্ষতিও সানন্দে স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সার নীলরতন সরকারকে আদর্শ করিয়া তিনি ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় অবহিত হইয়াছিলেন এবং ফলে যেমন এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তেমনই এম-এ পরীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েন।

জীবনে কোন কোন বন্ধুকে সাহায্য করিয়া তিনি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে কেহ কখন আক্ষেপ করিতে শুনে নাই। তিনি সে কথায় হাসিয়া বলিতেন, উপার্জ্জিত সব অর্থই ভোগে লাগে না—যাহা তাঁহার ভোগ জন্য কল্পিত হয় নাই, তিনি তাহা কিরূপে রক্ষা করিবেন? তিনি সদাপ্রফুল্ল ছিলেন এবং তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য তাঁহাকে যশ ও অর্থ আনিয়া দিয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি চিকিৎসা ব্যবসা একরূপ ত্যাগই করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম আচার্য্য ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু হারাইলাম এবং বাঙ্গালার সমাজ একজন শ্রদ্ধাভাজন লোক হারাইলেন।

পূরণচাঁদ নাহার—

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৭২ বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ কোবিদ ও শিল্পসমালোচক পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। পূরণচাঁদবাবু আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমীদার নাহার পরিবারের রায় বাহাদুর খিতাবচাঁদ নাহার মহাশয়ের অন্যতম পুত্র। এই জৈন পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল পূর্ব্বে ব্যবসা ব্যপদেশে বাঙ্গালায় আসিয়া মুর্শিদাবাদের সান্নিধ্যে ভাগীরথীর কূলে আজিমগঞ্জে বাস করিয়া ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঐ গঞ্জ এক সময় ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ও বহু ধনীর বাসস্থান ছিল। পূরণচাঁদবাবু বাল্যাবধি অধ্যয়নানুরাগী ছিলেন। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও এটর্ণী হইবার জন্য পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আফিসে শিক্ষানবিশী করেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগ তাঁহাকে ওকালতী বা অন্য কোন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে দেয় নাই। তিনি এক দিকে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন এবং অপর দিকে ভারতের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে থাকেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুস্তক, পুঁথি ও পট প্রভৃতি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বিভাগে তাঁহার সংগ্রহ যেমন বিরাট, তেমনই মূল্যবান। তাঁহার বিদ্যানুরাগ তাঁহাকে ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোর্টে" শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ওসয়াল জৈন সম্মিলনে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি জৈন শ্বেতাম্বর শিক্ষা বোর্ড, এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নাগরী প্রচারিণী সভা, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটী প্রভৃতি বহু বিদ্যাপীঠের সদস্য ছিলেন ও

পূরণচাঁদ নাহার

সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তিনি জৈন শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা তাঁহার অসাধারণ গবেষণার, অনুসন্ধিৎসার ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

পারিবারিক কারণে নাহার পরিবার কয়বৎসর পূর্ব্বে আজিমগঞ্জ হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং পুরণচাঁদ বাবুরা কয় ভ্রাতা ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক নাহার-পল্লী রচনা করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্থানেই তাঁহার অকাল-নির্ব্বাপিত-জীবন-দীপ ভ্রাতার নামে "কুমার সিং হল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গৃহ নির্ম্মাণের ফলে কলিকাতার ঐ অঞ্চলে সভাসমিতির জন্য আবশ্যক গৃহের অভাব মোচন হইয়াছে।

পুরণচাঁদ বাবু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং জৈন দর্শনে তিনি বিশেষজ্ঞ বলিয়া লোক তাঁহার মতই প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি নানা পুরাকীর্ত্তি-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া একটি মূল্যবান সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুরাকীর্ত্তির পুণ্যক্ষেত্র রাজগীর (রাজগৃহ) তাঁহার অতি প্রিয় ছিল এবং তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া বাসজন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অতিথিশালায় সাদরে আতিথ্য স্বীকার করিয়া বহু ব্যক্তি পুরাবস্তুর আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতের নানাস্থানে পুরাকীর্ত্তি দর্শনে অসীম আনন্দানুভব করিতেন বলিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইতেন। কয় মাস পূর্ব্বে তিনি দক্ষিণ ভারতে বহু তীর্থস্থান দর্শন করিয়া ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়াছিলেন বলা যায়। প্রত্যাবর্ত্তনের পরই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন।

তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের একজন প্রকৃত পণ্ডিতের তিরোভাব হইল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে তাঁহাদিগের এই দারুণ শোকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী—

হাস্যকৌতুকের অভিনয় দ্বারা যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির জীবিকার্জ্জন হইতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশের লোকের তাহা মনে করাই অসম্ভব ছিল। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রসরাজ অমৃতলাল বসু ও কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উৎসাহে চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় যখন কৌতুকাভিনয় জীবিকা-হিসাবে আরম্ভ করেন, তখনও লোকে তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন নদীয়া জেলার শান্তিপুরের লালমোহন গোস্বামীর পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাশ করিয়া তিনি পিতার কর্ম্মস্থল সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ে চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ২৫ বৎসর বয়সে তিনি কর্ম্মত্যাগ

করিয়া কৌতুকাভিনয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। জীবনে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার অভিনয় দেখেন নাই—এমন লোক খুব কমই আছেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। তিনি বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত—

ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত লাহোরে উড়োজাহাজের ঘাঁটিতে গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিতেছিলেন। তথায় গত ২৬শে এপ্রিল ঘাঁটি হইতে মোটর সাইকেলে বাসস্থানে ফিরিবার পথে মোটরলরীর সহিত সংঘর্ষ হয়। তাহাতে আহত হইয়া পরদিন প্রাতে লাহোর মেয়োহাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ঢাকা নগরীতে বিভূতির জন্ম হয়—মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ১৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বিভূতি ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল এয়ারওয়েজ সার্ভিসে যোগদান করেন। প্রথমে দিল্লীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি লাহোর যান, তথা হইতে কয় মাসের জন্য তাঁহাকে করাচীতে যাইতে হইয়াছিল। লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই এই দুর্ঘটনা। প্রবাসে দুর্ঘটনায় যুবক পুত্রের মৃত্যু—

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

বিভূতির পিতাকে তাঁহার এই শোকে সান্ত্বনা জানাইবার ভাষা নাই।

হরিপদ মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চক্ষুচিকিৎসক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষুচিকিৎসাবিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে মে ৭২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ার অধিবাসী। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তিনি বহু কষ্টে লেখাপড়া শেখেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যে বৃত্তি তিনি পাইতেন তাহা সংসারের জন্য খরচ করিতে হইত। কাজে কাজেই তাঁহার নিজের অধ্যয়নের জন্য একাদিক্রমে দুই তিনটী করিয়া ছেলে পড়াইতে হইত। এই ভাবে তিনি এফ. এ. ও বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পাশ করার পর তিনি তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।

স্কুলের শিক্ষকতা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলিকাতার সিটী কলেজে আইন পড়িতেন। আইন পরীক্ষায় পাশ হইবার পর তিনি হুগলী জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ সেখানে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি তেলিনীপাড়া গ্রামে অনাথ ভাণ্ডার স্থাপনকারীদের অন্যতম। দেশসেবাও তিনি করিতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র সুশীলকুমারের অনুরোধে ওকালতী ব্যবসা ত্যাগ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরকাল ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তেলিনী-পাড়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্য-

হরিপদ মুখোপাধ্যায়

ব্যবসায়ে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইরা নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গিকী

নববর্ষ—

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' 'ভারতবর্ষ' হস্তে লইয়া আমরা আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে অভিনন্দন করি। যিনি 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা সেই অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল পত্রিকাপ্রকাশের কয়েক দিন পূর্ব্বেই অকস্মাৎ পরলোকগত হন—প্রথম সংখ্যাও তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা সেইদিন হইতেই 'ভারতবর্ষ'-সেবার ভার গ্রহণ করি। এই সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর অসংখ্য লেখক-লেখিকার উৎসাহে ও সাহচর্য্যে আমরা 'ভারতবর্ষ' পরিচালন করিয়া আসিতেছি। আজ সে চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহারা এতদিন 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সাহচর্য্য ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আমরা নববর্ষে সকলকে অভিবাদন করিতেছি।

দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুজামুঠা পরগণার কাজলাগড় গ্রামে বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রভক্তগণ তাঁহার স্বর্গারোহণ তিথিতে মহাসমারোহে স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন মেদিনীপুরে বন্দোবস্তি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন এই কাজলাগড়ের বকুলতরুবেষ্টিত বাঙ্গলায় কয়েক মাস অতিবাহিত করেন এবং বকুলবৃক্ষতলে বসিয়া অনেক কবিতা রচনা করেন। কবিবরের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঐ অঞ্চলের দ্বিজেন্দ্রভক্তগণ সেই বকুল বীথিকায় একটী স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; বিগত বর্ষে প্রথম স্মৃতি-উৎসব হয়, এবার দ্বিতীয় উৎসব। মুগবেড়িয়ার স্বদেশহিতব্রত জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চন্দ বি-এ বেদান্ততীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সুললিত সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত একটী 'দ্বিজেন্দ্র প্রশস্তি' পাঠ করেন। সভায় বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। আমরা সুজামুঠা পরগণার দ্বিজেন্দ্রভক্তগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিবাদন করিতেছি। আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম যে ঐদিন হাওড়া জেলার বালী সরস্বতী পাঠাগার হলেও বালী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় বহু মনীষী দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কবি সকল দেশেই অমর, কাজেই কবির স্মৃতিপূজা দেশে যত বাড়িবে, কবির কাব্য উপলব্ধি করিয়া দেশ ততই সমৃদ্ধ হইতে থাকিবে।

বৈমানিক জি, সি, দত্ত—

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাজীবী শ্রীযুত এ, সি, দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জি, সি, দত্ত বর্ত্তমানে নয়া দিল্লীতে

শ্রীমান জি, সি, দত্ত

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এয়ারওয়েজ লিমিটেডের এসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার। তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙ্গালী এই পদ

প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীমান ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে এরো-নটিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ও এয়ার পাইলটের লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিলাতী উপাধিও আছে। আমরা এই যুবকের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ব্যবসায়ী সম্মানিত—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুত রাজেন্দ্র সিংহ সিংঘী সম্প্রতি কলিকাতায় পোলাণ্ডের কন্সাল বা বাণিজ্য-দূত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সিংঘী বংশ মুর্শিদাবাদ জেলায় ধনী, ব্যবসায়ী ও জমীদার হিসাবে বহু দিন ধরিয়া সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীযুত বাহাদুর সিংহ সিংঘী বোলপুর বিশ্বভারতীতে জৈন দর্শন অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ পরলোকগত ডালচাঁদ সিংঘী চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ১০ সহস্র টাকা এবং গত মহা যুদ্ধের সময় ৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ৩২ বৎসর হইলেও তিনি দেশের

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিংহ সিংঘী

শিল্পোন্নতিকার্য্যে বিশেষ অবহিত এবং কয়েকটি সুবিখ্যাত লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালক।

প্রবাসে বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব—

ঢাকা মানিকগঞ্জনিবাসী পরলোকগত সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুধীর দাশগুপ্ত এবার, এলাহাবাদ

শ্রীমান সুধীর দাসগুপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পলিটিকাল সায়েন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি বক্তৃতায় এবং প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমান সুধীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্‌স পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েসনের ও বঙ্গ সাহিত্য সংসদের সম্পাদক-রূপে এবং অন্যান্য সমিতির বক্তা ও কর্ম্মী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মোহাম্মদীর সাম্প্রদায়িকতা—

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কেহ যখন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলাপোক্তি আরম্ভ করে, তখন সকলে তাহাকে নির্বোধ আখ্যা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু যখন কোন প্রকৃত সুধী ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন সেজন্য আন্তরিক দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। সম্প্রতি মৌলানা (শব্দটি সম্মান-

সূচক—আশা করি অতীতের মত ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে) মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সম্পাদিত মোহাম্মদীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা কাগজখানি "ইউনিভার্সিটী সংখ্যা" হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৭২ পৃষ্ঠায় যে ১৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই একমাত্র হিন্দুবিদ্বেষ প্রচারের জন্য লিখিত হইয়াছে। আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধগুলি একাধিকবার পাঠ করিয়াছি—কোনরূপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কেহ যে এরূপ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন, তাহা আমাদের কিছুতেই মনে হইল না। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান-কেরাণী নিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে বহুবার এ বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(ইনি তখনও ভাইসচ্যান্সেলার হন নাই)—সকলের সম্মুখে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুর দানের তুলনায় মুসলমানের দান কত সামান্য ও উপেক্ষণীয়। আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে, কোন মুসলমান তাহার পর আর এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বহুদিন দেশসেবা করিবার পর এই পরিণত বয়সে মৌলানা সাহেবের মত লোকেরও মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়াছে। কোন উদ্ধত যুবকের উক্তি হইলে আমরা এগুলিকে ঘৃণার সহিত অবজ্ঞাই করিতাম, কিন্তু তাহা নহে বলিয়াই আমাদিগকে এই অতি উপেক্ষার যোগ্য বিষয় সম্বন্ধেও কিছু লিখিতে হইল। আজ মুসলমান সমাজ কি সাম্প্রদায়িক বিষে এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছে যে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনও ইহার তীব্র প্রতিবাদে অগ্রসর হইতেছেন না? আমরা জানি—বাঙ্গালা বাঙ্গালীর, হিন্দুরও নহে—মুসলমানেরও নহে। এ দেশে যখন উভয় সম্প্রদায়কে প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে হইবে, তখন হিন্দু যদি বাঙ্গালাকে "হিন্দুর বাঙ্গালা" বলিতে যায়, তাহাও যেমন পাপ, মুসলমান যদি বাঙ্গালাকে "মুসলমানের বাঙ্গালা" বলিতে যায়, তাহাও তেমনই হারাম হইবে। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের এ হীন চেষ্টা কেন? ইহা তাহাদের জীবনের কোন ধারাকেই উন্নতির পথ দেখাইতে পারিবে না—বরং মোহাম্মদী আজ যে বিষ সমগ্র দেশে বিসর্পিত করিতেছে, তাহা হিন্দুসমাজের পক্ষে যেমন অনিষ্টজনক হইবে, মুসলমান সমাজের পক্ষেও তেমনই অহিতকর হইবে।
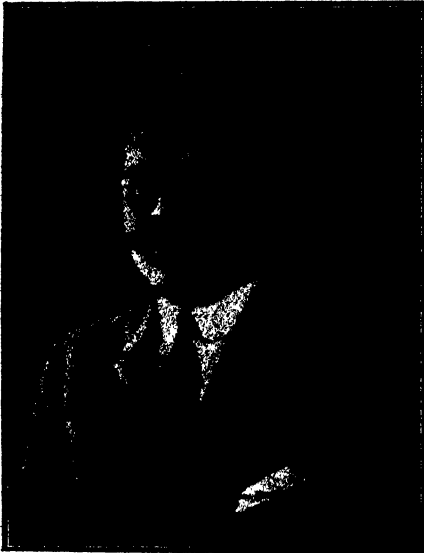
ভারতে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পরমুহূর্ত্ত হইতে এক তৃতীয় দল যে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এইরূপে বিরোধ বাধাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে, তাহা কি বৃদ্ধ মৌলানা সাহেব জানেন না? গত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কে বা কাহারা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল? কংগ্রেসের প্রথম কয়েকটি অধিবেশনের পর কাহারা মুসলমান সমাজের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পুরোভাগে লইয়া কংগ্রেস ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইয়াছিল? আমরা মুসলমান সমাজকে এখনও ধীরচিত্তে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এই স্বজাতিদ্রোহিতা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে নিবেদন জানাইতেছি।

নিমায়ার রিপোর্ট—

সার অটো নিমায়ার প্রস্তাবিত শাসন পদ্ধতিতে ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের আর্থিক-সংস্থান যেরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা গত সংখ্যায় দিয়াছি। এই নির্দ্ধারণ মেষ্টনী বন্দোবস্তের মত বাঙ্গালার প্রতি অবিচার না করিলেও, বাঙ্গালার অবস্থা বিবেচনায় যে সুব্যবস্থা করে নাই, তাহাও আমরা বলিয়াছি। বাঙ্গালা সরকারও এখন সেই কথা বলিতেছেন। বাঙ্গালার প্রয়োজন যেমন অধিক, তাহার আয়করজনিত টাকাও তেমনই অধিক। অথচ বাঙ্গালা তাহার প্রয়োজনানুরূপ পায় নাই এবং আয়করের কোন অংশই সে এখন পাইবে না। এতকাল বাঙ্গালা কেন্দ্রী-সরকারের তহবিলে যে টাকা দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহাতে সেই সকল প্রদেশের শস্যসম্ভার বৃদ্ধি পাইয়া সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়াছে। বাঙ্গালার হাজা মজা নদীর সংস্কার হয় নাই এবং তাহার সেচের জন্য যে সব জলসঞ্চয়ের বাঁধ প্রভৃতি ছিল সে সব সংস্কারাভাবে নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার সেচের খাল খনিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের কথা। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা কত শোচনীয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, সেজন্য বিপুল অর্থব্যয় প্রয়োজন। এই অস্বাস্থ্যের সঙ্গে সেচের সুব্যবস্থার সম্বন্ধ যদি ঘনিষ্ঠতম হয়, তবে আহার্য্যের

সম্বন্ধও যে ঘনিষ্ঠ নহে, এমন বলা যায় না। আজকাল একটি মত বিশেষভাবে প্রচারিত হইতেছে, বাঙ্গালীর খাদ্যই যত অনিষ্টের কারণ—বাঙ্গালী যে আহার্য্য আহার করে, তাহা মানুষের শরীরের সব প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই মতের প্রতিবাদে বলা যায়—এই আহার্য্যই এতকাল বাঙ্গালীকে শৌর্য্যবীর্য্য বুদ্ধিতে বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সহসা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় কেন? শত বর্ষাধিক কাল পূর্ব্বে কোন ইংরাজ বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"I never saw so handsome a race. They are much superior to the Madras people whose form I admire also. Those were slender. These are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. Their features are of the most classic models with great variety at the same time."

এই শতবর্ষে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল একটি মত এই যে, এখন আর বর্ষার বা বন্যার জল ধান্যের ক্ষেত্রের উপর দিয়া অবিরাম বহিয়া যায় না বলিয়া ধানের শস্যে পুষ্টিকর অংশ কম হয়। কিন্তু বাঙ্গালী কি যথেষ্ট আহার্য্য পাইয়া থাকে? বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত বটে; কিন্তু ভাতের সঙ্গে সঙ্গে সে যে প্রচুর পরিমাণ মাছ, দুধ ও ফল খাইতে পাইত, তাহা কি আর পায়? মৎস্য এখন দুষ্প্রাপ্য; খাল বিল শুকাইয়া গিয়াছে—পুষ্করিণীর অবস্থাও সেইরূপ; আবার মাছের চাষও ভাল হয় না। গোজাতির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবে না। এবার বাঙ্গালা সরকারও সে কথা বলিয়াছেন। ফলও বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় না। ফলে সে দুর্ব্বল হয় এবং তাহার রোগরোধ ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না হইয়া যায় না।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন যে ব্যয়সাধ্য তাহা স্বীকার করিয়া প্রাদেশিক সরকার বলিয়া থাকেন, অর্থাভাবে তাঁহারা পঙ্গু হইয়া আছেন। বাঙ্গালা মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনাবধি কিরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাও ভারত সরকার ও বিলাতের সরকার জানেন—তাঁহারা তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। এই সব বিবেচনা করিয়া বলিতে হয়—সার অটো নিমায়ার অন্যান্য প্রদেশের সহিত একভাবে বিচার করিয়া বাঙ্গালার প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—

এবার বাঙ্গালার দিকে দিকে দুর্ভিক্ষ। বোধ হয় শতবর্ষাধিক কাল মধ্যে বাঙ্গালায় এমন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। বাঙ্গালা সরকার এবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত পশ্চিমবঙ্গে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাদি কাজের জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তিনি কোন সংবাদপত্রে যে বিবরণ দিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম :—

"সংপ্রতি যে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্র চাষের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ফলে প্রায় সকল জেলাতেই (প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগদ্বয়ে) সাহায্য-কেন্দ্রে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। কৃষকগণ আমনধানের বপনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু এখনও পক্ষকাল পূর্ব্বে রোপণকার্য্য আরম্ভ হইবে না। যদি আর কোন বিপদ না ঘটে তবে আর তিন সপ্তাহ পরে সাহায্য কেন্দ্র-গুলিতে কায বন্ধ করা যাইবে। কারণ, চাষের সময় যথা-সম্ভব লোককে চাষের কাযে নিযুক্ত করাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু মাসাধিককাল পরে আবার কতক লোকের অন্নাভাব ঘটিবে এবং বোধ হয়, তখন আবার কতকগুলি সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবে কতগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইবে, তাহা এখন বলা যায় না।

"এদিকে দয়াদত্ত দানপ্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতায়ও দেখা গিয়াছে, বর্ষার সময় দয়াদত্ত সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এখন লোকের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক বাঙ্গালার জমীদার সভা যে সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে আশানুরূপ অর্থাগম হয় নাই। ২৪ পরগণা ও বীরভূম ব্যতীত কোন জেলাতেই স্থানীয় সাহায্যের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই।

"বীরভূমে একদল অবৈতনিক কর্ম্মী দয়াদত্ত সাহায্য বণ্টনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ২৫টি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন গ্রামসমূহে সাহায্য দানের সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন। তাঁহাদিগের আদর্শ অনুকরণযোগ্য।

"এবার একটি বৈশিষ্ট্য—সরকার যখন প্রথম সাহায্যদান কার্য্য আরম্ভ করেন, তখনও কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি এই কার্য্যে আকৃষ্ট হয় নাই। সুখের বিষয় তাহার পর কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে অবহিত হইয়াছেন।

"দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা বর্ত্তমানে কৃষি ঋণদান কার্য্যে সমধিক ব্যাপৃত আছেন। এই ঋণে কেবল যে উপস্থিত দুঃখমোচন হয়, তাহাই নহে; পরন্তু স্বাভাবিক অবস্থা সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য হয়। প্রায় একমাস পূর্ব্বে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, লোক কৃষি ঋণ চাহিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না। কিন্তু এখন তাহারা যেন ঋণ গ্রহণ জন্য পাগল হইয়াছে। ইহার কারণ, এক মাস পূর্ব্বেও লোক মনে করিয়াছিল, তাহারা এই ঋণ গ্রহণ না করিয়াই চালাইতে পারিবে। এখন দেখা যাইতেছে, সে আশার অবকাশ নাই।

"অনেক জেলাতেই সাধারণ কৃষিশ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিক ২ আনার অধিক নহে। পারিশ্রমিকের এই হার অতি অল্প এবং ইহা অন্ততঃ ৪ আনায় না উঠিলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কষ্টের অবসান হইবে না।"

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিহারের কয়টি জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়, তখন দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাহ্নে ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সে কথা ভারত সরকারকে জানান। তখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতের বড়লাট। তিনি এই নীতি প্রবর্ত্তিত করেন যে, অনাহারে কোন লোক যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। তদনুসারে তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত লোককে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ছোটলাটের কার্য্যকাল শেষ হইলে উক্ত কর্ম্মচারীই (সার রিচার্ড টেম্পল) বাঙ্গালার ছোটলাট হইয়াছিলেন। বড়লাট সেবার সিমলায় গমন না করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালায় ছিলেন এবং ছোটলাট কয় মাস দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে থাকিয়া কার্য্যনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবার গভর্ণর ও তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যরা দার্জ্জিলিংএ থাকায় তাহা সংবাদপত্রে বিশেষরূপ সমালোচনার বিষয় হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের অর্থ-সামর্থ্য যে অধিক নহে, তাহা সকলেই জানেন। সেইজন্য অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার এই দুর্দ্দশা দুঃখাপনোদন জন্য ভারত সরকার যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আবশ্যক অর্থপ্রাপ্তি কেন যে অসম্ভব হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার পর আবার অন্যান্য প্রদেশে সময় সময় দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইলেও শত শত বর্ষ মধ্যে বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই এবং বাঙ্গালায় এই তহবিলের কোটি টাকা এ পর্য্যন্ত ব্যয়িত হয় নাই। এই তহবিল ভিন্ন "ফেমিন ট্রাষ্ট" নামক আর একটি তহবিলও ভারত সরকারের হস্তে আছে। তাহা হইতে মাত্র ২৫ হাজার টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে—প্রয়োজন হইলে আরও ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। এই ২৫ বা ৫০ হাজার টাকা প্রদান কি প্রয়োজনানুপাতে তপ্ত মরুভূমিতে বিন্দু বর্ষণ ব্যতীত আর কিছু বলা যায়? মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষকালে গভর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম এবং তাহার পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষে লর্ড বড়লাট লর্ড কার্জ্জন সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিদেশ হইতেও অল্প সাহায্য পাওয়া যায় নাই! এবার কিন্তু সেরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা হয় নাই! বড়লাট তাহা করেন নাই; এমন কি বাঙ্গালার গভর্ণরও সেরূপ কোন আবেদন করেন নাই। তাঁহার দ্বারা যদি সেরূপ কোন আবেদন প্রচারিত হইত, তবে যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এবং অন্যান্য দেশ হইতে সাহায্য পাওয়া যাইত, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে।

বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সাহায্যদান কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সকলেরই ক্ষমতা অল্প। বিশেষ একযোগে কায করিলে যে সুবিধা হয়, কেহই সে সুবিধা গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালা সরকারও যে এই বিপদে প্রজাসাধারণের সহযোগ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাও নহে!

ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

বিলাতে ভারতীয় দল দশটি খেলা (ফ্রি ম্যানের দলের সঙ্গে খেলা বাদে) খেলেছেন। চারটি খেলা 'ড্র' হয়েছে এবং ছ'টি খেলায় তাঁরা বেশ বিশেষরূপেই পরাজিত হয়েছেন। একটি খেলাতেও জিততে পারেন নি। ভবিষ্যতে যে পারবেন খেলা দেখে সে আশাও করা যায় না। ব্যাটস্‌ম্যানরা যদিও কিছু সুবিধা করলেন কিন্তু বোলারদের অকৃতকার্য্যতায় বিপক্ষদল রান তুললে প্রচুর। বিভিন্ন রকমের যোগ্য বোলারের অভাবই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। সি এস নাইডু 'গুগ্‌লি' বোলার, ব্যাটস্‌ম্যান ও ফিল্ডার হিসাবেও ভালো, অথচ তাঁকে নির্ব্বাচন না করাতে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। মধ্যে গুজব রটে যে তিনি বিমানযোগে ইংলণ্ডে প্রেরিত হবেন। পরে এ গুজবের প্রতিবাদও হয়। এখন রয়টারের সংবাদে জানা গেছে যে তিনি ১০ই জুন বিমানযোগে রওনা হয়ে ১৫ই জুন লণ্ডনে পৌছুবেন। এতদিনেও যে কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্য হয়েছে সেও ভালো। ফিল্ডিংএর জন্যও ভারতীয়দের পরাজয় হ'চ্ছে। ভায়ার মতন ফিল্ডারও ভারতীয়দল থেকে নির্ব্বাচনে বাদ পড়লো, যাকে ম্যাকার্টনের ন্যায় প্রবীণ খেলোয়াড়ও 'দলের সম্পদ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

হব্‌স্‌ ও মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম ভারতীয়দের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে পরামর্শ করছেন

ভারতীয়দের ভাগ্যও ভাল নয়। ইতিমধ্যেই দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা অসুস্থ ও আহত হওয়ার জন্য খেলতে পাচ্ছেন না। এখনও প্রায় দু'মাস তাঁদের সেখানে খেলতে হবে। অধিনায়কত্বের দোষও তাঁদের হারের আর একটি কারণ। মহারাজকুমার এ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে পারছেন না। বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়ার আবশ্যক। কিন্তু দলে বেশী লোক না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

অমরনাথ একই খেলার দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করে সকলকে বিস্মিত করেছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি তিন বার শতাধিক রান করেছেন। বোলার হিসাবেও তিনি প্রথম যাচ্ছেন, সুটে ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় যাচ্ছেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট ১৫১ রান বিশেষ কৃতিত্বের

সঙ্গে করেছিলেন, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ আহত হওয়ায় খেলতে পারছেন না।

শক্তিশালী এম সি সি দলের সঙ্গে হার না হয় সহ্য করা যায়, কিন্তু অন্যান্য ছোট ছোট কাউন্টির কাছেও হারায় ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক বলে মনে হচ্ছে। যদিও লণ্ডনের কাগজগুলি লিখেছেন,—'ভারতীয় দলের এই খেলা খারাপ বলে সমালোচনা করা ন্যায়সঙ্গত নয়; কারণ মার্চেন্ট এবং হুসেন আঘাতের জন্য খেলতে সক্ষম হন নি।' টাইমস লিখেছেন—"যদিও শক্তিশালী এম সি সি দল ভারতীয় দলকে হারিয়েছেন এবং যদিও তাদের আরম্ভ অতি নৈরাশ্যজনক হয়েছে, তবুও তাদের ভবিষ্যৎ খেলা ভাল হবে বলে তারা আশা করে।' নিউজ ক্রনিকেল লিখেছে—'ভারতীয় দলের ইংনিস পরাজয় থেকে উদ্ধারের কৃতিত্বপূর্ণ চেষ্টা, সত্যই আনন্দদায়ক।'

মাস্তাক আলি

বিলাতের সমালোচকদের মতে ভারতীয়দের ফিল্ডিং নিকৃষ্ট—ক্যাচ ফস্কেছে, স্লিপে বল চলে গেছে। উষ্টার্সের সঙ্গে খেলায় অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে মিষ্টার রবার্টসন-গ্লাসগো বলেছেন,—"উষ্টার্স'রা যখন ৪ উইকেটে ২৪, তখন নিসারকে সরিয়ে নেওয়া হয়। সম্ভাবত ইহার জন্যই ভারতীয়দের ঐ খেলায় হার হলো। তিনি ঐ পরিবর্ত্তন উচিৎ বলে মনে করেন নি।"

অমরনাথ

মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম এম সি সির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন এবং ভারতীয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড়গণ বিলাতে অবস্থানকালে এম সি সির অবৈতনিক সদস্য থাকবেন।

ভারতবর্ষ—প্রথম ইনিংস—৩৫২ ও ১০৩ (৫ উইকেট)

অক্সফোর্ড—২০২ ও ২৯৭

সমগ্র ভারত ১৪৮ রান করলে জয়ী হবে। তাঁরা পিঠিয়ে রান তুলতে প্রথমে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উইকেটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকায় বোলারদের সুবিধা হতে লাগলো দেখে এবং ঐ আবশ্যকীয় রান সংখ্যা তোলবার সময় না থাকায় তাঁদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো।

এলেন (ক্যাপ্টেন)
এম সি সি

ফিল্ডিং ভাল হয়েছিল। সময়াভাবে খেলাটি ড্র হলো। ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষ ৮ উইকেটে অক্সফোর্ডকে হারিয়েছিল। ভারতবর্ষ—৩২৪ ও ৩২ (২ উইকেট) অক্সফোর্ড—১৩২ ও ২১৯।

সোমারসেট—৪৯৬ ও ৮৯ (১ উইকেট)

ভারতবর্ষ—২২৮ ও ৩৫৬

সোমারসেট ৯ উইকেটে জিতেছে। ১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—২৮৫ ও ২৩৪ (৭ উইকেট); সোমারসেট— ১৭৭ ও ১৭৯; ভারতবর্ষ—১৬৩ রানে জয়ী হয়েছিল।

ভারতবর্ষ—৪০৫ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

এস্ ব্যানার্জ্জি

নর্‌দাণ্টস্—২৪২ ও ২৭৫ (১ উইকেট)

খেলা 'ড্র' হয়েছে। নর্‌দাণ্টসদের ১৩ রানের জন্য ফলো-অন্ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে বেক্ওয়েল—

নট আউট ১০০, গ্রিমস—নট আউট ৭৩ ও এলেন ৯০ করেছেন। ১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—৩০৮; নর্দ্যাম্পটস্—১৫৫ ও ১৫১; ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ২ রানে জয়ী হয়েছিল।

এম সি সি—৩৮২ ও ৩৬ (০ উইকেট)

ভারতবর্ষ—১৮৫ ও ২৩০

এম সি সি ১০ উইকেটে জিতেছে। ভারতবর্ষ ফলো অন্ করতে বাধ্য হয়। এস্ ব্যানার্জ্জি পর পর তিনটি উইকেট বোল্ড্ করেছেন ৭০ রান দিয়ে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৭ (নট আউট) থেকেছেন। মহম্মদ হুসেন ও মার্চ্চেন্ট আহত হওয়ার জন্য দুই ইনিংসেই খেলতে পারেন নি। মহম্মদ হুসেন প্রথম ইনিংসে ৮ করে আঘাতের জন্য চলে যেতে বাধ্য হন। ভারতবর্ষকে ইনিংসের হার থেকে বাঁচাতে খুব চেষ্টা করতে হয়েছিল। জাহাঙ্গীর খাঁ ও এস ব্যানার্জ্জির খেলার জন্যই ইহা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের মোট ২৩০ রান ২৩০ মিনিটে হয়—অর্থাৎ মিনিটে এক রান হয়েছিল।

১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—২২৮; এম সি সি—২০০ (৭ উইকেট); বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হওয়ায় ড্র হয়েছিল।

লিসেষ্টারর্স—৩২৭ ও ৪৭ (০ উইকেট)

ভারতবর্ষ—৪২৬ ও ১৭১ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

বৃষ্টির জন্য বন্ধ হওয়ায় খেলা ড্র হয়েছে।

অমর সিং

বাকাজিলানী ১১৩, অমর সিং ৭৭ করেছেন। মাত্র এই খেলাটিতে ভারতীয় দলের জয়াশা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বরুণদেব বাদ সাধলেন। ২৭১ রান ১৬৫ মিনিটের মধ্যে করলে তবে লিষ্টারর্স পরাজয় থেকে বাঁচতে পারতো যাহা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ছিল। আধ ঘণ্টা খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে তারা মাত্র ২৮ রান তুলতে পেরেছিল। ৪৭ রান হবার পর বৃষ্টি আসায় খেলা বন্ধ হতে তারা নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার পেলে এবং ভারতীয়দের জেতা খেলাটি ভাগ্যদোষে ড্র হলো।

বাকাজিলানী

১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—৪১২ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); লিসেষ্টারর্স—১০৬ ও ২৯১; ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ১৫ রানে জিতেছিল।

মিডলসেক্স—১৭৩ ও ৯৬ (৬ উইকেট)
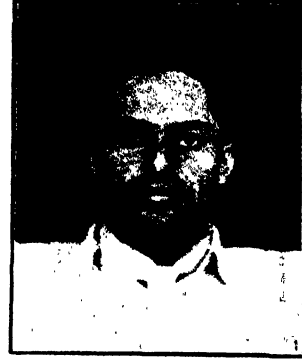
ভারতবর্ষ—১১০ ও ১৫৮;

মিডলসেক্স ৪ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

প্রথম ইনিংসে, ব্যানার্জ্জি ৩২ রানে ২ উইকেট ও নিসার ৪৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। অমরনাথ ১৩.২ ওভারে ৫৫ মেডেন করে ২৯ রানে ৬ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে মিডলসেক্সকে ৯৬ রান করতে ৬ উইকেট খোয়াতে হয়েছে। ব্যানার্জ্জি ১৩ রানে ২ উইকেট ও নিসার ৩৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—৪০৯ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); মিডলসেক্স—২৫৩ ও ২৯২; বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হওয়ায় ড্র হয়েছিল।

ভারতবর্ষ—৮৪ ও ২২৭

এসেক্স—৩৫১ ও ৬১ (৩ উইকেট)

ভারতীয় দল ৭ উইকেটে পরাজিত হয়েছেন।

প্রথম ইনিংসে, অমরনাথ ১৩০ রান ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে করেছেন, তাতে ১৮ বার ৪ ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি পুনরায় ১০৭ করে রেকর্ড করেছেন। বিলাতে তাঁর তিনটি সেঞ্চুরি হলো। দু' ইনিংসেই অমরনাথ একটিও 'চান্স্' দেন নি কিম্বা একটিও ভুল বা বিপদজনক ষ্ট্রোক করেন নি। ব্যানার্জ্জি বেশ সুদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত খেলেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় দলে গ্রিমেট, ও'রেলী, বালাস্কাস্ কিম্বা ভেরিটির মতো বোলার না থাকায় তাদের হার

হচ্ছে। ইহা সত্য কথা যে,—'It is not Bradman that wins fhe match for Australia,—but Grimmett.'

এসেক্সের পক্ষে প্রথম ইনিংসে কাটমোর ১৩৭ ও পিটার স্মিথ ১০৫ করেছেন।

১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—৩০৭ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); এসেক্স—১৬৯ ও ১৪২ (১ উইকেট); ড্র হয়েছিল।

ভারতবর্ষ—১৬১ ও ৩ (০ উইকেট)

কেম্ব্রিজ—২১৭

জাহাঙ্গীর খাঁ

ভীষণ বারিপাতের জন্য তৃতীয় দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিত বলে ঘোষিত হয়েছে।

জাহাঙ্গীর খাঁ কেম্ব্রিজ পক্ষে বল দিয়ে ২২ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন, অমরনাথ ৩৬ রানে ৩, নিসার ৭৫ রানে ৩, গোপালন্ ৩৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ওয়াজির আলি এতদিন পরে প্রথম খেলতে নেমে ৮৫ রান করে নট-আউট ছিলেন।

১৯৩২ সালে, ভারতবর্ষ—৩০৩ ও ৫৯ (১ উইকেট); ৯ উইকেটে ভারতবর্ষ জয়ী হয়।

ভারতবর্ষ—৮৬ ও ১১৫

ইয়র্কসায়ার—৩৫২

ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ১৫১ রানে পরাজিত হয়েছেন। এরকম ভীষণ হার পূর্ব্বে হয় নি।

নিসার ৭৪ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। ইয়র্কসায়ার পক্ষে, ভেরিটি ৯৬ (নট আউট), স্মাইলস্ ৭৭, টার্ণার ৪১, সাট্‌ক্লিফ্ ৩১। প্রথম ইনিংসে, স্মাইলস্ ২৬ রানে ৪ উইকেট, বাউস্ ১৮ রানে ৩, ভেরিটি ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় দল কেম্ব্রিজের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আটটি কাউন্টি ম্যাচ ও এম সি সি দলের সহিত একটি ম্যাচ খেলেছে। ফ্রীম্যানের দলের খেলা সরকারীভাবে স্বীকৃত নহে, উহা বাদে নয়টী খেলার গড়পড়তা দেওয়া হলো :—

ব্যাটিং

খেলোয়াড়ের নাম	কয় ইনিংস খেলেছেন	যতবার আউট হন নি	ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান	মোট রান সংখ্যা	ইনিংসে গড়ে রান
জাহাঙ্গীর খাঁ	২	১	৮০	১১০	১১০
ওয়াজির আলি	১	১	৮৫*	৮৫	৮৫
বিজয় মার্চ্চেণ্ট	৭	১	১৫১	৩৬৬	৬১
অমরনাথ	১৬	১	১৩০	৫৫৪	৩৬'৯৩
সি কে নাইডু	১৫	০	৮৩	৪৫৬	৩০'৪০
এস ব্যানার্জ্জি	১১	৪	৪৭*	১৯৮	২৮'২৮
পি ই পালিয়া	১২	২	৬৩	২৪২	২৪'২০
মহারাজকুমার	১৫	০	৬০	২৭৯	১৮'৬০
হুসেন	৭৮	১	৫৫	১২১	১৭'২৮
পি রামস্বামী	৭	১	৩০	১০০	১৬'৬৬
মাস্তাক আলি	১৫	১	৪৭	২০৯	১৪'৯২
হিন্দেলকার	১১	০	৪৬	১৬৪	১৪'৯০
গোপালন	৩	১	১৮	২৯	১৪'৫০
আমীর ইলাহি	১০	০	৩৫	১৪০	১৪'০০
মেহেরমজী	৪	১	১৭	৩৫	১১'৬৬
নিসার	১২	২	২৪*	৬৩	৬'৩০
এল পি জয়	৬	১	১৯	২৫	৫'০০

* নট্-আউট্

বোলিং

বোলারের নাম	যতগুলি উইকেট নিয়েছেন	মোট রান সংখ্যা	গড়ে কত রানে এক উইকেট নিয়েছেন
অমরনাথ	৩১	৫৭১	১৮'৪১
এস্ ব্যানার্জ্জি	২১	৪৬৩	২২'০৪
নিসার	২৮	৭৩৭	২৬'৩২
গোপালন	৪	১৭০	৪২'৫০
বাকা জিলানী	৪	১৭৪	৪৩'৫০
জাহাঙ্গীর খাঁ	২	৯৪	৪৭
মার্চ্চেণ্ট	২	৯৮	৪৯
পালিয়া	২	১০০	৫০
নাইডু	৯	৪৫২	৫০'২২

ামীর ইলাহি	৫	২৭৫	৫৫'০০
াস্তাক আলি	১	৯৬	৯৬

ইহা ছাড়া রামস্বামী পালিয়া মহারাজকুমার বল দিয়েছেন কোনও উইকেট পান নি।

লীগ খেলা ঃ

লীগ খেলার প্রথমার্দ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধেরও কয়েকটি ম্যাচ হয়েছে। মহমেডানস্পোর্টিং

মোহনবাগান—মহমেডান স্পোর্টিংএর খেলায় মোহনবাগানের ক্যাপটেন সতু চৌধুরী রেফারির সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

এখনও অপরাজেয় আছে। তাদের মোহনবাগানের সঙ্গে খেলাটি চ্যারিটি করা হয়েছিল। মাত্র ৬২০০৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল। জনসমাগম তেমন হয়নি। হিন্দু ও মুসলমানের ছু'টি জনপ্রিয় দলের খেলায় এরূপ অ জনসমাগম হবে বলে কেহ আশা করে নি। ছু' কারণ ছিল, একটি আবহাওয়া, অপরটি লীগ চ্যাম্পিয় দল অনায়াসে জয়ী হবে এই ধারণা অনেকের মনে হয়েছিল

অত্যন্ত ভিজা কর্দ্দমাক্ত মাঠে ছু'টি ভারতীয় দলে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বুট পরে খেলতে নামলো। মোহন বাগান পক্ষে তিনজন খালি পা। এবং মহমেডানদের পক্ষে মা। একজন। মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন দলকে বিশেষ বেগ দিয়েছে। প্রথমার্দ্ধে যদি তাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড রায় চৌধুরী ছু'টি অব্যর্থ গোল নষ্ট না করতো এবং ক্যাপটেন সতু চৌধুরী পেনালটি সটে গোল করতো তবে তারাই চ্যাম্পিয়নদের প্রথম হারাবার সম্মানলাভ করতে পারতো।

বেণীপ্রসাদ
(মোহনবাগান)

মহমেডানরা একটা সুযোগও নষ্ট করে নি। যেটি পেয়েছে সেইটাতেই গোল করেছে। এ গোলটি করবার সুযোগও রেফারি করে দিয়েছিলেন। সফি ও বেণীপ্রসাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। সফির বিরুদ্ধেই ফাউল দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রেফারি বেণীর বিপক্ষে ফাউল দিলে সেই সট থেকেই ঐ গোলটির উৎপত্তি হয়। সার্জ্জেণ্ট পিজ্জিয়নের রেফারিং ভালো হয় নি। কতকগুলি ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল দেওয়া হয় নি। মোহনবাগানের গোলরক্ষক কে দত্ত অত্যাশ্চর্য্য খেলেছে। তার জন্যই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বেণী গোল হতে পারে নি।

আশ্চর্য্য—মোহনবাগান পেনালটি পেয়ে nervous হয়ে পড়লো—কেউই সট করতে যেতে চায় না। সতুর সট করতে যাওয়া উচিত হয় নি। সন্মথ বা রায় চৌধুরী এমন কি কে দত্তকে সট করতে দিলেও গোল হ'তো।

মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গলের রিটার্ণ ম্যাচটি বেঙ্গল অলিম্পিক ফণ্ডের সাহায্যার্থ চ্যারিটি করা হয়েছিল। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের মাঠে খেলাটি হয়। টিকিটের মূল্য কম করা হয়েছিল। তাতে ফল ভালই হয়েছে। কোথাও স্থান ছিল না। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান

স্পোর্টিংদের মেম্বারদের কনসেসন মূল্যে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। এই সুবিবেচনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ; লোকপ্রিয় দলদের খেলাগুলি চ্যারিটি না করলে টিকিট বিক্রয় ভালো হয় না এবং বারংবার ঐ একই দলের খেলাগুলি চ্যারিটি করলে তাদের মেম্বারদের প্রতি অবিচারই করা হয়। অতএব তাদের মেম্বারদের একটু সুবিধা দিতে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। মোহনবাগান-মহমেডানের ম্যাচটিতেও যদি ঐরূপ করা হতো তবে অর্থাগম বেশীই

মোহনবাগানের গোলরক্ষক কে দত্ত মহমেডানদের মাথার উপর থেকে বল বাঁচাচ্ছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

হতো। ভবিষ্যতে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন বলে আশা করি।

মহমেডান স্পোর্টিং ও ই বি আরের খেলায় সামাদের খালি গোলে গোল করতে না পারা এবারকার লীগ খেলায় অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। কিরূপে যে এই গোল হলো না তা' সাধারণের বোধগম্য হয় নি। মোনা দত্ত জুম্মা খাঁকে কাটিয়ে ওসমানকে গোল থেকে বের করে নিয়ে সামাদকে বল পাস করে দিলে, গোলে লোক নেই, সামাদ তবুও গোল করতে পারলে না, আউটে বল মেরে দিলে। মাঠ শুদ্ধ লোক তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। মনে হয় যেন গত বৎসরেও সামাদ মহমেডান স্পোর্টিংএর বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পারে নি, গোল দিতে পারি নি। সামাদ কেন

মুরগেস্ (ইষ্টবেঙ্গল)

কাইজার (ইষ্টবেঙ্গল)

মহমেডানদের হয়েই খেলে না? ই বি আরই বা কেন তাকে তাদের দলে এখনও খেলতে রেখেছে। তাদের তাকে ছুটি দেওয়া উচিত।

অনেক খেলোয়াড়ের এইরূপ বার বার অকৃতকার্য্যতা—বিশেষত মহমেডানদের বিরুদ্ধে খেলাতে—দেখে সাধারণের এই ধারণা দাঁড়াচ্ছে যে মুসলমান খেলোয়াড়রা মহামেডানদের বিপক্ষে খেলবার সময় ঠিক খেলোয়াড় জনোচিত খেলা খেলতে পারে না। এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়লে মুসলমান খেলোয়াড়দের অন্য সাধারণ দলে খেলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথচ মুসলমানদের (আমাদের যতদূর জানা আছে) নিজেদের ক্লাব মাত্র দুটি আছে। এই

ডালহৌসী-মহমেডান-স্পোর্টিংএর খেলায় ডেভিস একটি শক্ত সট রক্ষা করেছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

দুটি ক্লাবে মুসলমান সমাজের তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়দের স্থান সঙ্কুলান হওয়া একেবারে অসম্ভব। উদীয়মান

খেলোয়াড়রা খেলতে না পেলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তা'হলে মুসলমানদের আরো ক্লাব গঠনের দিকে এখন থেকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। একটা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব নিয়ে থাকলে চলবে না।

লক্ষীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল)

চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে খেলায় দু'বারই ইষ্টবেঙ্গলের ভাগ্য বিপর্যায় ঘটেছে। প্রথমবার ইষ্টবেঙ্গল ভালো খেলেও দু' গোলে পরাজিত হয়েছেন। দ্বিতীয়বারও ভাগ্য ও রেফারিং এর দোষে তাঁদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। Drop shotএ লক্ষীনারায়ণের গোলটি কি করে যে অফ্-সাইড্ হলো তা' বোঝা গেল না। নিতান্ত কাণা না হলে একে অফ্-সাইড বলতে পারে না। বেশীর ভাগ সময়ই ইষ্টবেঙ্গল চেপে খেলেছে এবং খেলোয়াড় মনভাবাপন্ন হয়ে খেলেছে। কিন্তু মহমেডানরা ফাউল করেছে, তাদের দু'জন খেলোয়াড় মাসুম ও রসিদকে রেফারী সতর্ক করেছে। রসিদ অনেক খেলাতেই warning পেয়েছে ফাউল করার জন্য তার মতন সুদক্ষ খেলোয়াড়ের পক্ষে ইহা শোভা পায় না। মহমেডানরা এ খেলায় সুবিধা করতে পারে নি, বিশেষ সৌভাগ্যবলে খেলায় জয়ী হলেও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা তাদের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট হয়েছিল।

মোহনবাগানের খেলা মোটেই ভাল হচ্ছে না। তাঁরা কালীঘাটের কাছে দু' গোলে

মোহনবাগান-ক্যালকাটার খেলায় মোহনবাগানের সুদক্ষ গোল-রক্ষক একটি গোল রক্ষা করছেন

ছবি—জে কে সান্যাল

ইষ্টবেঙ্গল ছবি—জে কে সান্যাল

হেরেছেন। দ্বিতীয় খেলায় তাঁরা ভাল খেলেছিলেন। ডালহৌসীর সঙ্গে খেলায় বেশীর ভাগ সময় তাদের আক্রমণ করেও গোল দিতে পারেন নি, তাঁদের ফরওয়ার্ডের দুর্ব্বল সুটের জন্য এবং কতকটা রেফারির একচোকমির জন্যে।

ক্যালকাটা ছবি—জে কে সান্যাল

রেফারি ম্যাল্কম ডালহৌসীর ফাউল হ্যাণ্ডবল কিছুই দেখতে পান নি। 'দু'টো হ্যাণ্ডবল পেনালটি স্থানের মধ্যে হয়েছিল। দর্শকরা রেফারিকে jeer করলে, তিনি আঙ্গুল তুলে তাদের শাসিয়েছিলেন। তিনি কি মনে করেন দর্শকদের উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতাও তাঁর আছে। তারা খেলোয়াড়দের মধ্যে নয়, এটা মনে রাখা তাঁর উচিত ছিল। বুড়ো মানুষের ভুলচুক তো হবেই, দর্শকদের 'ক্ষ্যামাঘেন্না' করা উচিত বলে তাঁর ধারণা ছিল বোধহয়।

ইষ্টবেঙ্গল-ব্ল্যাকওয়াচের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক ব্ল্যাকওয়াচের ফরওয়ার্ডের পা থেকে বল তুলে নিয়ে গোল বাঁচাচ্ছেন —জে কে সান্যাল

মহমেডানদের কালীঘাটের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় অতি কষ্টে একগোলে জিত্তে হয়েছে। কালীঘাটকে একজন কমে খেলতে হয়েছিল। তাদের রাইট-ইন্ রামাস্বামী ডান হাত ভেঙে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও'ডিয়া বিশ্রামের পূর্ব্বে একটি অমূল্য সুযোগ নষ্ট করেছে।

এ খেলাতেও সার্জ্জেন পিজিয়নের রেফারিং ত্রুটিশূন্য হয় নি। মিজ্জার সেণ্টার থেকে পাগ্সলে বল সমেত গোলরক্ষককে ঠেলে লাইনের ভিতরে দিলে রেফারি গোল নির্দ্দেশ না করে খেলা চলতে দিলেন। এ সরকারের রসিদকে বৈধ ধাক্কাকে পেনালটি দেওয়া কখনই উচিত হয় নি। সেই পেনালটিও যখন এস্ ব্যানার্জ্জি আটকালেন, রেফারি পুনরায় পেনালটি সট্ করতে দিলেন, অজুহাত যে বল মারবার পূর্ব্বে

গাগ্সলে
(কালীঘাট)

ব্যানার্জ্জি নড়েছিলেন। দ্বিতীয়বারও গোলরক্ষক ঐ রকম করেছিলেন এবং সে সটও বাঁচিয়েছিলেন; তা'-হলে আবার সট্ করতে আজ্ঞা দেওয়া উচিত ছিল। খেলা শেষ হবার একটু আগে কালীঘাটের বিপক্ষে আবার একটি পেনালটি দিলেন। ইহা কোনরূপেই পেনালটি হতে পারে না। সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল, এমন কি ক্যালকাটার মেম্বাররাও প্রতিবাদ করেছিল। ব্যানার্জ্জি আবার এটিও বাঁচিয়েছেন।

ব্ল্যাকওয়াচ দল ছবি—জে কে সান্যাল

এ বৎসর রেফারিং যে কেমন উচ্চদরের হচ্ছে তা' এই কয়টি নমুনা থেকেই বেশ বোঝা যায়।

রেফারি এসোসিয়েশন কি করছেন! তাঁরা কি এই সব অযোগ্য রেফারিদের অক্ষমতা ও একচোখোমি দেখতে

বিখ্যাত এফ এ কাপ্ বিজয়ী আর্সেনাল দলের ক্যাপ্টেন এলেক্স জেম্স্ (এফ এ কাপ হস্তে) তাঁর দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকরা তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ছবি—জে কে সান্ন্যাল

পান না! প্রায় প্রত্যেক খেলাতেই একটা না একটা মারাত্মক ভুল হয়।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

ভায়েনাতে ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল খেলায় ইংলণ্ড ২—১ গোলে অষ্ট্রিয়ার কাছে হেরে গেছে। অষ্ট্রিয়ার লেফ্‌ট আউট ও রাইট আউট একটি করে গোল দেয়। ইংলণ্ড তার পরে অষ্ট্রিয়ার গোল ভীষণ ভাবে অবরোধ করে এবং বহু সুযোগ নষ্ট করে ৫৪ মিনিট খেলার পরে শেষকালে একটি গোল দিতে সক্ষম হয়।

ব্রুসেল্‌সেও ইংলণ্ড ৩—২ গোলে বেলজিয়ামের কাছে হেরেছে। ইংলণ্ডের পক্ষে ক্যামসেল খেলা আরম্ভের তৃতীয় মিনিটে প্রথম গোল দেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বেলজিয়াম ফরওয়ার্ডরা ভীষণ খেলে ইংলণ্ডের রক্ষণভাগদের বিপর্য্যস্থ করে তিনটি গোল দেয়। খেলা শেষ হবার তিন মিনিট থাকতে ইংলণ্ড পক্ষে হিবস্‌ মাত্র একটি গোল শোধ দিতে পারে।

মল্লযুদ্ধ ঃ

রেঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, ভারতের প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা ছোট গামা ১৯৩২ সালের অলিম্পিক বিজয়ী রুমেনিয়াবাসী মল্লযোদ্ধা আনল্ড কক্‌সিস্‌কে ছ' মিনিটের মধ্যে পরাজিত করেছেন।

প্রফেসনাল বিলিয়ার্ড ঃ

৬ই জুন ১৯৩৬ তারিখে বিলাতের থারষ্টন হলে ব্রিটিস্‌ প্রফেসনাল বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নসিপ্‌ ফাইনাল খেলায় জো ডেভিস্‌ টম্‌ নিউম্যানকে হারিয়ে দিয়েছেন। জো ডেভিস্‌ ২১,৭১০ পয়েণ্ট ও টম্‌ নিউম্যান ১৯,৭৯০ পয়েণ্ট করেছেন।

মুষ্টি যুদ্ধ ঃ

ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার লাইট হেভি চ্যাম্পিয়নসিপ্‌ মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পুনরায় প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগী ছিলেন, গান্‌বোট জ্যাক (যুক্তরাষ্ট্র) ও সার্জেণ্ট টাইগার ফ্রি ম্যান (কলিকাতা পুলিস)।

বর্ত্তমান চ্যাম্পিয়ন গান্‌বোট জ্যাক দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বহু মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায়

অবতীর্ণ হয়ে দশ বৎসরে তিনশত মুষ্টি যুদ্ধ (knock out) বিজয়ী হয়েছেন। সিম্যান হল (ভূতপূর্ব্ব গ্রেট বৃটেন লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন), ব্যাট্‌লি-কিড লুইস্, প্যাট্ মিলস্, গানার মেল্‌ভিল্, আর্থার সোয়ারিস্, অল্ রিভারস্, কিড ডি' সিল্‌ভা, ওয়াট গার্নেস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মুষ্টি যোদ্ধাদের

গান্‌বোট জ্যাক্

হারিয়েছিলেন। সম্প্রতি কেবল গানার মেল্‌ভিল ও ইয়ং ফ্রিস্কোর নিকট পরাজিত হয়েছেন। ইহার বয়স ৪৬ বৎসর।

ফ্রিম্যান ভারতবর্ষে এসে অগিল্‌ভি, লরী কার, জে আর হিউস্, আর্থার সোয়াস´ প্রভৃতি বিশিষ্ট মুষ্টি যোদ্ধাদের হারিয়েছেন। ইনি কৈয়াস ক্লাবের সভ্য, বিলাতের মিডল ওয়েট নভিস্ প্রতিযোগিতা ও হারোড বক্সিং ক্লাবের ইণ্টার মিডিয়েট ওয়েট চ্যাম্পিয়নসিপ্ বিজয়ী। ইহার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর।

প্রথম রাউণ্ডে কেহই জোরে লড়েন নি। ফ্রিম্যান গানবোট অপেক্ষা ভাল যুঝেছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ডে গানবোট অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে তলপেটে

"টাইগার" ফ্রিম্যান

'আপার কাট' ও মাঝে মাঝে চোয়ালে 'রাইট স্যুয়িং' মেরেছেন। পঞ্চম রাউণ্ডে ফ্রিম্যান উন্নতি করে 'লেফট হুক' করেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম রাউণ্ডে ফ্রিম্যান বেশ উত্তেজিত হয়ে লড়তে থাকেন। অষ্টম রাউণ্ডে গানবোট বিশেষ দক্ষতা দেখান। নবম ও দশম রাউণ্ড পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা খুব জোরে চলিতে থাকে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী প্রণীত গল্প পুস্তক "বিলেত দেশটা মাটির"—১৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পদ্মা নদীর মাঝি"—১৷৷৹

রসচক্র সাহিত্য সংসদের দ্বাদশ জন সাহিত্যিক কর্ত্তৃক লিখিত বারোয়ারী উপন্যাস "রসচক্র"—২৲

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শোভাযাত্রা"—১৲

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত "মাদাম হালিদা এদিবের জীবন স্মৃতি"—১৲

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা প্রণীত পশুপতিনাথ তীর্থযাত্রা কাহিনী "নেপালের পথ"—।৹

শ্রীনীরদবিহারী সরকার লিখিত ডিটেকটিভ উপন্যাস "দাগাবাজের গৈবী চাল"—৷৷৵৹

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "বহুবল্লভ, স্বপ্নভঙ্গ, দুধারা"—২৷৷৹

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী "পশ্চিম প্রবাসী"—৩৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু লিখিত ডিটেকটিভ উপন্যাস "খুনদরিয়ার অথৈ জলে"—৷৷৵৹

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত ছোটদের জন্য "মহারাজ গুহ"—৵৹

বন্দে আলী মিয়া প্রণীত ছেলেদের বই "রাবেয়া"—৶৹

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত ছেলেদের বই "শিলাদিত্য"—৵৹

বন্দে আলী মিয়া প্রণীত ছেলেদের বই "চাঁদ সুলতানা"—৶৹

শ্রীআশালতা দেবী রত্নপ্রভা সাহিত্যভারতী প্রণীত উপন্যাস "ছন্দ পতন"—১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ছলনাময়ী"—২৲

হরিমোহন মান্না প্রণীত কৃষি পুস্তক "ফলের বাগান"—১৷৹

Editor :—

RAY JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta
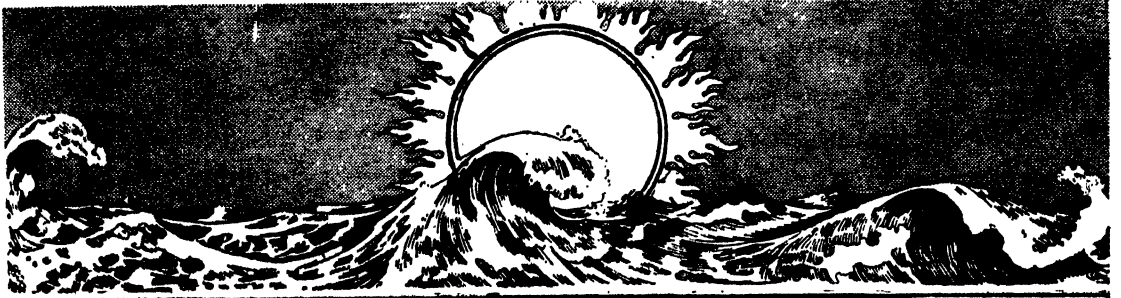
প্রথম খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাগর্থ বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ

সৌজন্য ও শিষ্টাচার

বয়স্ক এবং মান্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে অনেক সময় শব্দের মূল অর্থ বদলাইয়া যায়। উত্তম পুরুষে গৌরবার্থক যে সর্ব্বনাম পদটি আমরা ব্যবহার করি তাহার মূল অর্থ কিন্তু অন্য রকম ছিল। 'আপনি' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুক-জনক। সংস্কৃত আত্মন্ শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে (১)। আত্মন্ শব্দের অর্থ নিজ। আপন-পর, আপন-খাওয়া, আপনা-আপনি প্রভৃতি বাক্যে 'আপন' বা 'আপনি' শব্দের মূল অর্থ এখনও বর্ত্তমান। প্রাচীন বাঙ্গালায় নিজ অর্থেই বরাবর 'আপন' শব্দের ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই (২)।

(ক) আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। চর্য্যাপদ
(খ) অপনে অপা বুঝ তু মিঅ মণ। চর্য্যাপদ
(গ) সম্বে জাণিল আপনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
(ঘ) নাহি জাণ এবে তোঁ আপনার নাশ।

চর্য্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে 'আপণ' শব্দের প্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইল। (ক) এবং (ঘ) চিহ্নিত উদাহরণে মধ্যম পুরুষ সর্ব্বনাম 'তু' এবং 'তোঁ'র সহিত আপন শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

আপন শব্দের অর্থ নিজ বা নিজে। সুতরাং তিনি নিজে, তুমি নিজে, আমি নিজে প্রভৃতি অর্থে সকল পুরুষের সর্ব্বনামের সহিতই ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু মধ্যম-পুরুষের সর্ব্বনামের একটা বিশেষ গুণ এই যে, কথোপ-কথনের কালে উহা উহ্য থাকিলেও অর্থপ্রকাশের পক্ষে কোন বাধা জন্মে না। কখন আসিয়াছ?—বলিলে তুমি কথাটি উচ্চারণ করা অনাবশ্যক। কিন্তু, কখন আসিয়াছে?—বলিতে হইলে কর্ত্তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

---

(১) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থের ৮৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) হিন্দীতে 'আপ্' শব্দ প্রথম পুরুষেও ব্যবহৃত হয়। "আপ্ কোন হ্যায়"—বলিলে 'আপনি কে' এবং 'ইনি কে' দুইই বুঝাইতে পারে।

কথাবার্ত্তার সময় মধ্যম পুরুষের কর্ত্তা সাধারণত একজনই হইয়া থাকে। প্রথম পুরুষের কর্ত্তা অনেকে হইতে পারে। এই কারণেই মধ্যম পুরুষের কর্ত্তার সহিত 'আপনি' শব্দ প্রযুক্ত হইতে হইতে কর্ত্তা স্বয়ং উহ্য হইয়া গেল এবং আপনি একাই তাহার অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে 'আপনি' নিজেই মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামরূপে নূতন অধিকার গ্রহণ করিয়া বসিল। কিন্তু নিজ অর্থও ত্যাগ করিল না।

'আপনি' করিলে দূর আপন মহত্ব। কবিকঙ্কণ
আপন সাক্ষীতে সাধু হরিল 'আপনি'॥ „ „

উপরোক্ত উদাহরণ দুইটিতে নিজ এই অর্থেই 'আপনি' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। তবে ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং অন্বয় দেখিয়া গৌণ অর্থটি তুমি অথবা সে তাহা নির্ণয় করা যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী পর্য্যন্ত দেখি, একলা 'আপনি' তুমি অর্থে বসে নাই।

পরিচয় দেহ আগে কে বট 'আপনি'। ভারতচন্দ্র
শিব যদি যান কভু কুচুনির বাড়ী।
ভাবই 'আপনি' কত কর তাড়াতাড়ী॥ „ „

উপরোক্ত দুই উদাহরণে 'আপনি' আর একটি আপন শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও বসিয়াছে এবং একাকীই তুমি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য অন্বয় এবং ক্রিয়াপদের দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রথম উদাহরণের 'বট' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'কর' এই দুই ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের পদ।

তুমি অর্থ কোন রকমে প্রকাশ করিলেও গৌরবসূচক অর্থ এখনও পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সাহিত্যে না প্রবেশ করিলেও ভাষায় ইহার নূতন অর্থ সম্ভবত ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছিল।

গুরুজনকে কিম্বা মান্যব্যক্তিকে প্রথম পুরুষে মহাশয় বা ঐরূপ কোন শব্দের দ্বারা সম্বোধন করার রীতি সংস্কৃতে আছে। 'ভবৎ' শব্দের ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। ইংরাজি your honourও ঐ ধরণেরই প্রয়োগ। আমরা পল্লীগ্রামে এখনও শুনি ;—মশায়ের নিবাস ?—অর্থাৎ আপনার বাড়ী কোথায় ? কবে আসা হ'ল ? এখন কি করা হ'চ্ছে ? প্রভৃতি প্রয়োগে 'তুমি' কথাটি উচ্চারণ না করিয়া কাজ চালাইয়া লইবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস অনেক সময় প্রকট হইয়া পড়ে। যখন শ্রোতাকে তুমি বলিলে শ্রোতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, আবার আপনি বলিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবার মত উদারতাও যখন বক্তার থাকে না, তখনই ভাববাচ্যে বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার রূপ প্রথম এবং মধ্যম পুরুষে সমান থাকে বলিয়াই এইরূপ প্রয়োগের প্রচলন।

গৌরবে মধ্যম পুরুষকে প্রথম পুরুষের শব্দের দ্বারা সূচিত করার পদ্ধতি উর্দ্দু ভাষাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। 'হুজুর' শব্দের প্রয়োগ তাহার দৃষ্টান্ত (১)।

বাঙ্গালায় 'তুমি'র পরিবর্ত্তে 'আপনি' ব্যবহারের মূলে এইরূপ একটা সম্ভ্রম এবং শিষ্টাচারের ভাবই ক্রিয়া করিয়াছে। আর 'আপনি' শব্দটা তৎপূর্ব্বে ভাষায় 'তুমি আপনি' রূপে 'তুমি'র সহিত ব্যবহৃত হইতে থাকায় মধ্যম পুরুষের ভাবও প্রকাশ করিতেছিল। সুতরাং ঐ অর্থে সহজেই প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু মূলে যে আপনি প্রথম পুরুষের শব্দ তাহা উহার ক্রিয়া পদ হইতেই বুঝা যায়। তিনি শব্দ যে ক্রিয়া পদ গ্রহণ করে, 'আপনি' শব্দের পাশেও ঠিক সেই পদই বসে।

যেমন ;—'তুমি কর' কিন্তু 'তিনি করেন' এবং 'আপনি করেন'। 'তুমি যাও' কিন্তু 'তিনি যাবেন' এবং 'আপনি যাবেন' ইত্যাদি।

(ক) মুসলমানী আদব-কায়দা

মুসলমান জাতি শিষ্টাচারের জন্য বিখ্যাত। বক্তা যখন শ্রোতাকে নিজের বাড়ীর কথা বলেন তখন তাহা হয় 'গরীবখানা', কিন্তু শ্রোতার বাটী 'দৌলতখানা' বলিয়া বর্ণিত হয়। কার্য্যতঃ 'গরীবখানা'ও প্রাসাদ হইতে পারে এবং মৃৎকুটীরের পক্ষেও 'দৌলতখানা' আখ্যা লাভ বিচিত্র নয়। বক্তা 'আর্জ্জি' করেন এবং শ্রোতা 'ফরমাস' করেন। আইন সংক্রান্ত শব্দটি মুসলমানী রীতির প্রভাবে অনেকস্থলে অর্থ

(১) রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতায় এই ধরণের একটি প্রয়োগ দ্রষ্টব্য :

এ কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

'তুমি' দিয়া কবিতা আরম্ভ করিয়াও তোমার অর্থে 'সম্রাটের'—এই প্রথম পুরুষের পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। একই বাক্যের মধ্যে তোমার অর্থে 'তব' শব্দেরও প্রয়োগ আছে।

পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাই আমরা আবেদনপত্রে 'অধীনে'র নিবেদন জানাই।

পত্রের পাঠে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা অধিকাংশ-স্থলেই কেবল রীতিরক্ষার জন্য। মুখামুখি দেখা হইলে যাঁহাকে একটি মাত্র প্রণাম করি, চিঠিতে তাঁহাকে 'শতকোটী ভূমিষ্ঠ প্রণাম' জানাই। যাঁহাকে 'মান্যবর' বা 'মাননীয়' বলিয়া সম্বোধন করি তিনি যে প্রকৃতই সম্মানের অধিকারী একথা আমরা ভাবি না। পত্রপ্রেরক নিজেকে যখন 'সেবক' বলিয়া উল্লেখ করেন তখন সেবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে না। এই সকল শব্দ সম্ভ্রম, সৌজন্য, বিনয় এবং শিষ্টাচারবশত অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে আমরা যখন কাহাকেও আহারের নিমন্ত্রণ জানাই তখন 'শাকান্নে'র আয়োজন হইয়াছে এই কথাই বলি। কিন্তু মুখ ফুটিয়া যাহাই বলা হউক না কেন শ্রোতার কাছে তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। তাহা না হইলে আহ্বানকারীর গৃহে অতিথি সমাগম হইত না, ইহা নিঃসন্দেহ। আজকাল আমরা যখন 'চায়ের নিমন্ত্রণ করি' তখন শুধু 'চা'য়ের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হই না।

(খ) বৈষ্ণবীয় বিনয়

বৈষ্ণবগণের বিনয় অনেক সময় মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তাই কেহ কেহ বৈষ্ণবীয় বিনয়কে 'বিনয়তা' বলিয়া পরিহাস করেন। আধিক্যতা (> আদিখ্যেতা)র সাদৃশ্যেই এই পদের উৎপত্তি হইয়াছে কি না জানি না। মহাপ্রভুর 'দাসানুদাস'গণ যখন শিষ্যের বাড়ীতে 'পায়ের ধূলো দেন' তখন অন্তত পাঁচ সাত 'মুক্তি'র দর্শন পাওয়া যায়। 'ভোগ' প্রস্তুত হইলে রাধাশ্যামকে 'ভোগ দেখাইয়া' তাঁহারা 'সেবা করেন'। পাতে কিছু থাকিলে গৃহস্থ প্রসাদ পায়। পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের 'আবির্ভাব' হয়। 'লীলাবসানে' তাঁহারা 'দেহরক্ষা করেন' বা 'তিরোহিত হন'। আমরা সাধারণ জীব—'জন্ম' 'মৃত্যু'র হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাই না।

'বৈষ্ণবীয় বাঙ্গালায়' বিনয় এবং গৌরব দুইই আছে। অপরের সম্বন্ধে গৌরব এবং নিজের প্রসঙ্গে বিনয় রক্ষা করিতে হইবে—কথাবার্ত্তার কালে বক্তার এই সচেতন ভাব ভাষার মধ্যে কতকগুলি শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এ ধরণের প্রয়োগ সাধারণত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। তবে কোন বিশেষ সম্প্রদায় যখন সমগ্র জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সেই জাতির ভাষাও সমগ্রভাবেই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

(৫) বক্রোক্তি

সাদাসিধা ভাবে না বলিয়া প্রকারান্তরে যে কথা বলা হয় তাহাকেই বক্রোক্তি বলা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দীক্ষাদানকারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে পরিহাসচ্ছলে 'কাণফুঁকা বাবাজী' বলিয়া থাকে। 'কাণফুঁকা' শব্দের অর্থ—কাণে যে ফুঁ দেয় অর্থাৎ নিঃশব্দে মন্ত্রোচ্চারণ করে। ইহা একটি বক্রোক্তির উদাহরণ। মুরগীর স্থলে 'রামপাখী', শুয়ারের স্থলে 'শুঁড়কাটা হাতী' প্রভৃতি শব্দের মধ্যেও বক্রোক্তি আছে।

(ক) অপ্রিয়তা নিবারণ

পরিহাসের উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে ঘুরাইয়া কথা বলা হয় বটে, কিন্তু বাক্যের রূঢ়তা এবং অপ্রিয়তা নিবারণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্রোক্তির কারণ। সত্য হইলেও অপ্রিয় কথা বলিতে নাই—এই উপদেশটি বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেই পালন করেন। তাহার ফলে অনেক শব্দ আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রিয়জনের বিদায়কালে 'এস' শব্দ যাও অর্থ সূচনা করে। প্রাচীন বাঙ্গালার মিলনার্থ 'মেলানি' শব্দ বিদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'হরিজন,' 'দরিদ্র-নারায়ণ,' 'নমোশূদ্র'(১) প্রভৃতি শব্দের মধ্যে একটি সহৃদয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। যে মনোবৃত্তির প্রভাবে অন্ধকে অন্ধ এবং খঞ্জকে খঞ্জ বলিতে দ্বিধা বোধ করি, এই শব্দগুলির মূলেও সেই মনোভাব বর্ত্তমান। কলিকাতায় ঝাড়ুদারকে 'জমাদার' বলিয়া সম্বোধন করি। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে পাচককে 'ঠাকুর' বলিয়া ডাকা হয়। উত্তর

(১) এখানে 'নমো' 'শূদ্রে'র গৌরব বাড়ায় নাই। নমোশূদ্র' 'নমো' নামেই অধিকতর প্রচলিত। সংস্কৃত 'নমস্' শব্দের সহিত ইহার কোন যোগ সম্ভবত নাই। 'শূদ্র' অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতি। সেই জন্য 'নমো'র সহিত 'শূদ্র' যোগ করিয়া উহাদিগকে 'শূদ্রে'র পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে।

পশ্চিম অঞ্চলে পাচক ব্রাহ্মণ 'মহারাজ' সম্বোধনে আপ্যায়িত হন। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে এবং উড়িষ্যায় পাচক ব্রাহ্মণকে 'পূজারি বামুন' বা শুধু 'পূজারি' বলিয়া ডাকা হয়।

ঘুস অনেকে দিয়াও থাকেন, সুবিধা পাইলে লইতেও আপত্তি করেন না। কিন্তু ভদ্রসমাজে সে কথা উচ্চারণ করিলেই যত গণ্ডগোল। তাই বড়বাবুকে 'ভেট' দিই এবং অবান্তর কর্ম্মচারীদিগকে 'পান' খাইবার জন্য কিছু দিয়া থাকি। জার্ম্মাণ ভাষায় অনুরূপ অর্থে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার অর্থ—'মদ খাইবার টাকা'। 'ঘুস' শব্দের রূঢ় নগ্নতা নিবারণের জন্য অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ নানা ধরণের উক্তি প্রচলিত আছে।

দারিদ্র্যের মত কলঙ্ক মানুষের আর কিছুই নাই। তাই ভদ্রসমাজস্থ দরিদ্র ব্যক্তিকে দরিদ্র না বলিয়া 'তাঁহার অবস্থা ভাল নয়' বলি। আবার কন্যার পিতা কৃষ্ণবর্ণ কন্যাকে 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ' বলিয়া ঘোষণা করেন; ইহা হইতে সেই 'আশমান গোলা'র গল্প মনে পড়ে। বনিয়াদী বংশের দুই বন্ধু—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নবাব বাদশাহ ছিলেন। বন্ধুদ্বয়ের কিন্তু বংশগৌরব ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। একদিন একজন দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—কি দিয়া ভাত খাওয়া হইল? দ্বিতীয় উত্তর করিলেন;—বিশেষ কিছুই হয় নাই, শুধু 'আসমানগুলা কী চাট্‌নি' আর 'ভূঁই আণ্ডা কা কাবাব' হইয়াছিল। এই দুইটি মাত্র ব্যঞ্জন দিয়াই আহার সমাপ্ত হইয়াছে। বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন বাদশাহবংশধর কচু অর্থে 'ভূঁই আণ্ডা' এবং আমড়া অর্থে 'আসমান গুলা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

স্বামী স্ত্রী এদেশে পরস্পরকে নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। তাই একজন যখন অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চান তখন 'ওগো' বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালী পাঠককে সত্যেন্দ্রনাথের 'ওগো' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। একজন অপরের উদ্দেশ্যে কথা বলিলে 'উনি' 'তিনি' প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার পুত্র কন্যার নাম করিয়া 'অমুকের বাবা' 'অমুকের মা' বলিয়াও স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর কথা বলেন। একটি গ্রাম্য গানের একছত্র উদ্ধৃত করি!—

আর শুনেছ 'খোকার বাপে'র চাকরি হবে।

পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের কালেও 'অমুকের মা' বলিয়া কাজ চালান। অনেক সময় 'অমুকের পো' বলিয়া পুরুষকে এবং 'অমুকের ঝি' বলিয়া স্ত্রীলোককে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পিতার নাম না করিয়া পদবীর উল্লেখ করা হয়। যেমন;—'দাসের পো' 'ঘোষের ঝি' ইত্যাদি। পিতার পদবীর স্থলে বৃত্তির উল্লেখও করা হয়। যেমন;—'ডাক্তারের পো', 'মাষ্টারের পো'। এইরূপ প্রয়োগ কখনও কখনও স্বার্থেও হয় অর্থাৎ যে নিজে ডাক্তার এবং যাহার পিতা কখনও ডাক্তারি করেন নাই—এরূপ ব্যক্তিকেও পল্লীগ্রামে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা 'ডাক্তারের পো' বলিয়া ডাকেন।

(খ) অন্ধসংস্কার

অন্ধসংস্কার এবং ভয়বশত অনেক সময় প্রকৃত শব্দ উচ্চারণ না করিয়া অন্য শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুকে বুঝান হয়। শিশুরা রাত্রিকালে সাপ বলে না 'লতা' বলে। ঐ কারণে ব্যাঘ্রের নাম হইল 'দক্ষিণ রায়', গাছে 'ভূত' আছে না বলিয়া 'দেবতা' আছেন বলা হয়। আমরা বসন্ত রোগকে 'মায়ের অনুগ্রহ' বলিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করি। ওলাউঠার 'ওলাদেবী'-ত্বের মূলেও ভয় এবং অন্ধবিশ্বাস পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। ভাঁড়ারে চাল না থাকিলেও নাই বলিতে নাই। নাই বলিলে যদি চিরকালই না থাকে—এই আশঙ্কা। তাই চাল 'বাড়ন্ত' বলিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থ বুঝাই। সধবা স্ত্রীলোক শাঁখা খুলিয়া রাখেন না, 'ঠাণ্ডা করিয়া' বা 'শীতলাইয়া' রাখেন। যেমন;—কঙ্কণাদি আভরণ 'শীতলিয়া' রাখে—শিবায়ন। খুলা—শব্দ উচ্চারণ করিলে যদি সত্যই চিরদিনের জন্যই খুলিয়া ফেলিতে হয় এই ভয়ে শাঁখা বা লোহা সম্বন্ধে এই শব্দ ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ (১)।

(১) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 'শিথিল' শব্দ হইতে উচ্চারণ সাদৃশ্যে 'শীতল' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। খুলিয়া রাখার সহিত শীতল করার কোন যোগ নাই। কিন্তু প্রাচীনাদের মুখে 'ঠাণ্ডা করা' কথাটি সবিশেষ প্রচলিত। অবশ্য ঐ কথার উপর জোর দিয়া বিশেষ কিছু বলা চলে না। শিথিল হইতে উচ্চারণসাম্য বশতঃ শীতল এবং তাহার পর শীতল শব্দেরই প্রতিশব্দরূপে 'ঠাণ্ডা' চলিয়া যায়। এমনও হওয়া অসম্ভব নয়।

'আন্নাকালী', 'ফেলারাম' প্রভৃতি নামের মধ্যেও অন্ধসংস্কারজাত বক্রোক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টিপাত-কারী বা তাহার অমঙ্গলকামীর মৃত্যু কামনা করিয়া অথবা দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সন্তানের স্বাস্থ্যাদির উল্লেখ করার মেয়েলি প্রথা এদেশে প্রচলিত। তাই আমরা বলি,—'শত্রুর মুখে ছাই দিয়া' অমুক ভাল আছে, 'ষেঠের কোলে' অমুকের বয়স এত বৎসর ইত্যাদি। গুজরাট প্রদেশেও এইরূপ একটি রীতি আছে—প্রাসঙ্গিকবোধে তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তির অসুখ হইয়াছে তাহার নাম না করিয়া অনেক সময় তাহার শত্রুর অসুখ হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। রামের শত্রুর জ্বর হইয়াছে—এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে রামের জ্বর হইয়াছে।

যাহা প্রার্থনীয়—নাম করিলে পাছে সে না আসে—এইরূপ আশঙ্কায় নাম ঘুরাইয়া বলা হয়। মেঘ করিলে ছেলেরা শিল পড়িবে না বলিয়া 'থৈ' পড়িবে বলে। এখানে 'থৈ'এর অর্থ ই শিল।

কোন কোন জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস এমনই উৎকট যে অধর্ম্ম আশঙ্কায় তাঁহারা অনেক কথা উচ্চারণ করেন না। বৈষ্ণবরা জবাফুলের নাম করেন না। অন্য নাম করিয়া ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়া দেন। 'কাটা' শব্দ তাঁহাদের উচ্চারণ করিতে নাই। 'কাটা'র স্থলে তাঁহারা 'বানান' বলেন। এই সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প আছে। "দুর্গানগরের মাঠে বেলগাছের তলায় একটি ছাগ শিশুকে দুই খণ্ড করিয়া কাটা হইয়াছে। রক্তে মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে"—এই ঘটনাটি জনৈক বৈষ্ণব অপরের নিকট বিবৃত করিতেছেন ;—

হাতীশুঁড়োর মা-নগরের মাঠে তেপাতা-গাছের তলায় বাছাকে দু'খানা করে বানিয়েছে। রসায় মাঠ ভেসে গেছে।

(৪) ব্যাজোক্তি

কোন ভাব শ্রোতার মনে ভালরূপে প্রবেশ করাইবার জন্য আমরা অনেক সময় এমন শব্দ ব্যবহার করি যাহার আক্ষরিক অর্থ লক্ষ্যার্থের ঠিক বিপরীত। যে বোকা তাহাকে 'অতিবুদ্ধি' বলা হয়। যেমন ;—'অতিবুদ্ধি'র গলায় দড়ি। বাঙ্গালায় 'দেড়চালাকি' বলিয়া একটি শব্দ আছে। উহার অর্থ অতি চালাকি বা বোকামি। গুজরাটিতেও 'দোঢ়চতুর' শব্দ অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহাও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃতে 'মহাব্রাহ্মণ' 'মহাবৈদ্য' প্রভৃতি শব্দে যে অর্থপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাও ব্যাজোক্তি সমুদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। 'বুদ্ধির ডিপো' বলিয়া যাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করি সে ব্যক্তিকে নির্ব্বোধ বলিয়াই মনে করি। মিথ্যাবাদী লোককে 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলিয়া গালাগালি দেওয়া হয়। পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ মনে করিবার জন্য অনেক মহাত্মাকে 'শ্রীঘরে' বাস করিতে হয়। 'মামাবাড়ী'র আদরও তাঁহাদের অদৃষ্টে দুর্ল্লভ নয়। পুলিশের লোক 'পূর্ণচন্দ্র' গ্রহণ করিয়াও 'অর্দ্ধচন্দ্র' দিয়া সম্মানিত করে।

(৫) পরিবেষের অনৈক্য

পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত শব্দার্থ-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ খুব নিকট। স্থান-কাল, রীতি নীতি প্রভৃতি বদলাইলেই শব্দের অর্থও বদলাইয়া যায়।

(ক) স্থান গত

উত্তরপশ্চিম ভারতের 'বিচ্ছু' এবং এদেশের বিছা একই শব্দ হইতে জাত ; কিন্তু সেদেশে বিচ্ছু বলিলে 'কাঁকড়া বিছা' বুঝায় আর এ দেশে 'বিছা' শব্দ লম্বা তেঁতুলে-জাতীয় বিছাকেই বুঝাইয়া থাকে। আমাদের 'শাক' এবং হিন্দী 'শাক' (বা সাক) একই শব্দ, কিন্তু অর্থ পৃথক্। আমরা 'শাক' বলিলে অপক্ব 'শাক' বুঝি, হিন্দীতে উহার অর্থ পক্ব ব্যঞ্জন। পূর্ব্ববঙ্গে 'বালাম' শব্দে এক ধরণের নৌকা বুঝায়। 'বালামে' করিয়া যে চাল আসে তাহাকে পশ্চিমবঙ্গের লোক 'বালাম'-চাল নাম দিল। এইরূপে চাল বিশেষের নাম-

---

ঠাকুরকে সন্ধ্যাবেলা যে 'শীতল' দেওয়া হয়, তাহার সহিত বিশ্রামার্থ তুলিয়া রাখা এইরূপ একটা ভাবের কি যোগ নাই! শীতল দেওয়া বলিলে ভোগ দেওয়া বুঝায় বটে—কিন্তু দিবসের ভোগ বুঝায় না, কেবল সায়ংকালীন ভোগ বুঝায়। ইহার অর্থ কি?

কেহ পরিশ্রান্ত হইয়া আসিলে আমরা বলি 'ঠাণ্ডা' হও। ইহার অর্থ বিশ্রাম কর। এ সকল স্থলে ত শিথিল শব্দের সহিত কোন সম্বন্ধ কল্পিত হয় না।

রূপেই 'বালাম' শব্দ প্রচলিত হইতে লাগিল, মূল অর্থ অন্তর্হিত হইল। ফার্সী 'দরিয়া' শব্দের অর্থ নদী, বাঙ্গালায় 'দরিয়া' শব্দ সমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত। কলিকাতা অঞ্চলে অমুকের মেয়ে বলিলে কন্যা বুঝায় বাঁকুড়া জেলায় স্ত্রী বুঝাইবে। আমরা 'ক্ষীর' বলিলে ঘন দুগ্ধ বুঝি। ভারতের অনেক প্রদেশে পায়স অর্থে 'ক্ষীর' শব্দের ব্যবহার হয়।

(খ) কালগত

এককালে কড়ির দ্বারাই ক্রয় বিক্রয় চলিত। তখন 'কড়ি' শব্দ অর্থ রূপে ব্যবহৃত হইত। 'নিকড়ে' শব্দে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন 'কড়ি' শব্দ পৃথক্‌ভাবে ব্যবহার করিলে কেবল কপর্দ্দক বুঝায়। 'দুপুর' (< দ্বিপ্রহর) বলিলে সাধারণত দিবা দ্বিপ্রহর বুঝায়, কিন্তু রাত্রিকালে যদি বলা হয়—'এখন দুপুর' তাহা হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহর বুঝা যাইবে।

কালের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ খুব নিকট। কালের পরিবর্ত্তনে সাময়িক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং সামাজিক অনৈক্য আলোচনা প্রসঙ্গে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(গ) পাত্রগত

একই শব্দ সকলের কাছে সমান অর্থ বহন করে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কার, সভ্যতা অনুসারে শব্দের অর্থান্তর ঘটে। 'ধর্ম্ম' শব্দ শুনিলে গ্রাম্য কৃষক তাহার এক ব্যাখ্যা দিবে, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিকট তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। ব্রহ্মবাদীর নিকটে একই শব্দের তৃতীয় অর্থ শুনিতে পাওয়া যাইবে। 'সত্য-মিথ্যা,' 'সুখ-দুঃখ,' 'পাপ-পুণ্য,' 'ন্যায়-অন্যায়,' 'দোষ-গুণ,' 'ভাল-মন্দ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ সকলের কাছে সমান নয়। সুতরাং জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা যে সকল বিষয় অনুভব বা উপলব্ধি করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ের অনুভূতির মধ্যেও পার্থক্য থাকিবে। আবার জ্ঞান ও বুদ্ধির পার্থক্য যেখানে যত বেশী, সুখ দুঃখাদির ভাব সম্বন্ধেও ধারণা ততই বিভিন্ন।

অহিংসার বাণী যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক প্রথম প্রচার করেন তাঁহাদের 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে সকল পুণ্যকামী মৎকুন-সমাকুল খাটিয়ায় শয়ন করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জীবগুলিকে স্ব স্ব দেহের শোণিত এবং খট্টাধিকারিগণকে দক্ষিণা প্রদান করেন তাঁহাদের 'জীবে দয়া' যে কি নিদারুণ—তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। 'সতীত্ব' শব্দের অর্থ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াছে। যদি কোন নারী বিবাহিত পতি ভিন্ন অপর কোন পুরুষের অনুরাগিনী না হন—অন্য বহুবিধ দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি 'সতী' হইবেন। তিনি চোর হইলেও 'সতী', মিথ্যাবাদী হইলেও 'সতী', এমন কি পুত্রঘাতিনী হইলেও 'সতী'। আত্মহত্যা মহাপাপ—কিন্তু দেহ পবিত্র রাখার জন্য যে আত্মহত্যা তাহাকে আমরা 'মহাপুণ্য' বলিয়া মনে করি। এইরূপ 'কর্ত্তব্যে'র আদর্শ পাত্রভেদে বিভিন্ন। 'সৌন্দর্য্যে'র আদর্শ রুচি ভেদে বিভিন্ন। 'মনুষ্যত্বে'র আদর্শ মনুষ্যভেদে বিভিন্ন।

(ঘ) সমাজগত

সামাজিক আচার ব্যবহার সকল দেশে এক প্রকার নয়। সেইজন্য সম্বন্ধবাচক শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি অপরিচিতা কোন স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না। এখানে মাতৃ শব্দের ব্যবহার খুব ব্যাপক। আমরা 'ভাই' বলিলে কেবল ভাইকে বুঝি না। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে 'বাবু' ও 'ভাই' এই দুই সম্বন্ধে পল্লীবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন করিয়া লই। ইংরাজি brother শব্দও শুধু সহোদর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ইহা এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে বুঝায়। 'শালা' সম্বন্ধ এদেশে পরিহাসের সম্বন্ধ। 'শালা' বলিয়া পরিহাস করিতে করিতে উহা ক্রমশ গালাগালিতে পরিণত হইয়াছে। গালাগালিতে পরিণত হইবারও একটা কারণ আছে। এই শব্দটির মধ্যে একটি আত্মাবমাননার ভাব আছে। আমাদের দেশে কন্যাগ্রহণ করাটাই গৌরবের কাজ। কন্যা যে দেয় সে যেন মহা অপরাধী। তাই যখন 'শালা' বলি তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ভগ্নীকে গ্রহণ করিয়াছি এইরূপ মনোভাববশত নিজে গৌরব বোধ করি এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করে। পূর্ব্ববঙ্গে বন্ধুরা পরস্পরের মধ্যে 'বেটা' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিম বঙ্গে 'বেটা'

শব্দের এরূপ ব্যবহার করিলে সাধারণের রুচিকে আঘাত করা হইবে। 'শালা' শব্দ বাঙ্গালাদেশে গালিবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে, এখন পরিচয় দিবার সময়ও অনেকে এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন। সম্ভবত ইহার ফলেই 'সম্বন্ধী' শব্দের এত বেশী প্রচলন। 'শালা'র অর্থ বদলাইয়াছে বলিয়া 'সম্বন্ধী'র অর্থও বদলাইয়া গেল। আমার জনৈক অবাঙ্গালী বন্ধু কোন ভদ্রলোকের নাম করিয়া একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধী কি না! সে ভদ্রলোকের যে বয়স তাহাতে তাঁহার পক্ষে আমার শ্যালক হওয়া অসম্ভব, তাই বন্ধুর কথাকে অভদ্রজনোচিত পরিহাস বলিয়াই প্রথমে ভাবিয়াছিলাম। পরে বুঝিলাম তিনি নির্দ্দোষ। 'সম্বন্ধী' শব্দ তিনি আত্মীয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

'বৌ' শব্দের অর্থ নব-বিবাহিতা কন্যা। কিন্তু 'বৌ' শব্দের ব্যবহার শ্বশুরালয়ে অথবা শ্বশুরের দেশেই সীমাবদ্ধ। পিত্রালয়ে কোন কন্যাই 'বৌ' নয়, সকলেই 'ঝি'। বিবাহিতা কন্যা এই অর্থ হইতে বৌ শব্দ স্ত্রী অর্থও গ্রহণ করিয়াছে। শ্বশুর পুত্রবধূকে 'বৌমা' বলেন। আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃ-তুল্য বলিয়া ভাশুরও ভ্রাতৃবধূকে 'বৌমা' বলিয়া সম্বোধন করেন। অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে 'ঠাকুর' বলিলে দেবতা বা ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ে 'ঠাকুর' শব্দে শ্বশুরকেও বুঝাইতে পারে। ঠাকুরপো বা ঠাকুরঝি শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য শ্বশুরকেও পুত্রবধূরা 'বাবা' বলিয়া থাকেন। ভাশুর সম্মানে শ্বশুরের সমান, তাই তাঁহাকেও 'ঠাকুর' বলার রীতি ছিল এবং এখনও আছে। বটঠাকুর (বড় ঠাকুর), মেজঠাকুর প্রভৃতি আখ্যায় ভাশুরদের উল্লেখ করা হয়।

জ্যেষ্ঠতাত বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। পিতাও তাঁহাকে মান্য করেন। ঠাকুরদাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ সে কেবল আব্দারের। তাঁহাকে ভয় না করিলে চলে। কিন্তু জ্যেঠা-মহাশয়ের সহিত সেরূপ সম্বন্ধ নয়। এই জন্যই কোন ছোট ছেলের মুখে বড় কথা শুনিলে তাহাকে 'জ্যেঠা' ছেলে বলি।

এককালে কন্যা নিজে পাত্র পছন্দ করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেন সেইজন্য পাত্রের নাম হইয়াছিল বর। কিন্তু এযুগে পাত্রই কন্যা পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতেছেন। প্রথা বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই বর শব্দের অর্থও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৬) বস্তুগত

আমরা প্রতিনিয়ত যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের আক্ষরিক এবং উদ্দিষ্ট অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে শব্দ পরিবর্ত্তনের আর একটি বিশেষ কারণ দেখা যাইবে। 'কাপড়' শব্দ প্রথমে কার্পাসজাত বস্ত্রকেই বুঝাইত। কিন্তু এখন আমরা রেশমি বস্ত্রকে 'রেশমি কাপড়' এবং পশমি বস্ত্রকে 'পশমি কাপড়' বলি। উপাদান নূতন হইয়াছে কিন্তু পুরাতন উপাদানের নাম বদলায় নাই। আজকাল সধবা স্ত্রীলোকগণ 'সোনার নোয়া' পরিয়া থাকেন। আমরা 'কাঁসার গেলাসে' জল খাই। 'ঘড়ি' বা 'ঘড়ী' শব্দের অর্থ —সময় নিরূপণের যন্ত্র-বিশেষ। এই নামের পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে ছিদ্রযুক্ত ঘটে বালুকা বা জল রাখিয়া সময় নিরূপণ করা হইত। এইরূপ ঘটকে ঘটীযন্ত্র বলা হইত। এইরূপে 'ঘটী' শব্দের সঙ্গে সময়-জ্ঞাপকতা ভাবের একটা সংযোগ স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার ফলে শুধু 'ঘটী' শব্দই কালনিরূপক যন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল (১)। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে স্প্রিংয়ের সময় নিরূপক যন্ত্র 'ঘটী'কে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার নামটি নিজে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 'ঘড়ি' ঘটীর রূপান্তর হইলেও তাহার অবয়বগত কোন সাদৃশ্যই ইহাতে নাই। তখনকার দিনে 'ঘটী'কে ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইয়া যাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিত না। আজকাল আমরা 'হাত ঘড়ি' 'টেঁক ঘড়ি' স্বচ্ছন্দে বহন করি। ফার্সী পোলাও শব্দ ঘৃতপক্ক ভাত বুঝায় কিন্তু আমরা যে 'ছানার পোলাও' খাই তাহাতে ভাতের কোন সংস্রব নাই। 'ঘৃত' বলিলে গবাদি পশুর দুগ্ধজাত এক প্রকার স্নেহদ্রব্যকে বুঝায়, কিন্তু 'ভেজিটেবিল ঘি'

(১) নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে পুরু কাংস্যময় পাতে হাতুড়ির ঘা দিয়া বাজান হয় তাহারও নাম 'ঘড়ি'। ক্লক সময় নিরূপণও করে এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজিয়াও থাকে। সুতরাং তাহার পক্ষে 'ঘড়ি' নামটি গ্রহণ করা আরও সহজ হইল।

সম্পূর্ণ নিরামিষ বলিয়াই শোনা যায়। যে 'তুলি' দিয়া চিত্রকর ছবি আঁকেন তাহা কোন কালে হয়ত তুলার দ্বারা প্রস্তুত হইত কিন্তু এখন উহা পশুলোমে নির্ম্মিত হয়, তুলার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। তৈলসিক্ত কাপড়ের পলিতা দিয়া প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা অতি পুরাতন। ঐ পলিতার নাম 'বাতি'। সংস্কৃত বর্ত্তিকা হইতে বাতির উৎপত্তি। 'বাতি' শব্দ ক্রমশ পলিতা হইতে প্রদীপ অর্থ গ্রহণ করিল। উহা হইতে আমরা বৈদ্যুতিক আলোককেও 'বাতি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। হিন্দীতেও 'বিজলী বাতী' বলে।

মোটর গাড়ীর প্রচলনের পূর্ব্বে লোকে ঘোড়ার গাড়ী 'হাঁকাইয়া' চলিত। মোটরে 'হাঁক' দিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তথাপি বড়লোকে মোটর 'হাঁকাইয়া' চলেন। ইংরাজিতেও রেল, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রযানের চালনা সম্বন্ধে drive শব্দের প্রয়োগ অনেকটা ঐ প্রকারের।

(৬) ভাবাবেগ

'মারাত্মক' অপরাধ, 'অসম্ভব' কথা, 'অদ্ভুত' আচরণ, 'ভীষণ' সমস্যা, 'ভয়ঙ্কর' গোলমাল প্রভৃতি কথায় বিশেষণগুলির আক্ষরিক অর্থ যত 'ভয়ানক'—ব্যবহারিক অর্থ তত নহে। আমরা স্বভাবতই সব কথাকে কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে চাই। ক্রোধ, ভয়, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাবের আতিশয্য ঘটিলে এইরূপ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে উপরোক্ত প্রকারের শব্দসমূহের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সন্দেশটা কি 'ভীষণ' মিষ্টি! ছেলেটা 'ভয়ানক' দুর্দ্দান্ত হ'য়েছে! এই ধরণের প্রয়োগ সচরাচর শোনা যায়।

যিনি পত্নীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন;—তোমার হাতে যদি জল খাই ত 'আমার নামই অমুক নয়'—তাঁহার নাম প্রকৃতই যে বদলাইয়া যায় তাহা নহে, যদিচ পত্নীর হাতের জল রাগ পড়িয়া গেলেই তিনি পান করেন। এই সকল শপথ বাক্যের যে জোর—অতিব্যবহারের ফলে তাহা কমিয়া যায়। 'মা কালীর দিব্যি,' 'মাইরি' প্রভৃতি যে সব শপথ বাক্য পথে ঘাটে শুনিতে পাওয়া যায়, উহাদের উপর আস্থা স্থাপন করে কয়জন?

লোকটা 'দারুণ' খাওয়া পেয়েছে বলিলে 'দারুণ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ রক্ষিত হয় না। মারের চোটে 'পিতার নাম ভুলাইয়া দিবার' কথা তথাকথিত ভদ্রলোকের মুখেও শোনা যায়। "এসেছ?—তবে আর কি?—একেবারে আমার মাথা কিনেছ।" "কি করবে?—এই আমার 'শ্রাদ্ধ!'" "কচুপোড়া আগে খাওনা" প্রভৃতি বাক্যে ক্রোধবশত যে সব কথার ব্যবহার হইয়াছে যথা অর্থে সেগুলির প্রয়োগ হয় নাই। ইংরাজি awfully sorry, marvellous girl প্রভৃতি কথায় awfully, marvellous প্রভৃতি পদগুলির ব্যবহারও অনুরূপ। অতএব বিস্ময়াদি ভাবের উচ্ছ্বাসে যে সকল বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সেই বিজল্পিত বচনগুলিকে কেহ যেন সর্ব্বত্র পরমার্থরূপে গ্রহণ না করেন।

(৭) ব্যষ্টি স্থলে সমষ্টি

সন্ধ্যার মূল অর্থ সন্ধিকাল। প্রাতঃ সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, সায়ং সন্ধ্যা প্রভৃতি কথায় সেই মূল অর্থই রক্ষিত হইয়াছে। দুই 'সন্ধ্যা' দুই মুঠা খাই—এরূপ প্রয়োগও বিরল নহে। কিন্তু শুধু 'সন্ধ্যা' বলিলে এখন আমরা কেবল দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালকেই বুঝি। এই অর্থে সন্ধ্যা শব্দের সমধিক ব্যবহারই উহার অর্থের সঙ্কোচসাধন করিয়াছে। লিখিবার জন্য আমরা যে 'কালি' ব্যবহার করি তাহা সাধারণত কৃষ্ণবর্ণ—এই কাল রঙের জন্যই উহার 'কালি' নামকরণ, যদিচ লিখিবার কালি ছাড়াও অনেক বস্তুরই রঙ্ কাল (১)। মহারাষ্ট্র রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে স্ত্রীলোকের নামের সহিত 'বাই' শব্দ যোগ করার রীতি আছে (২)—যেমন, মীরাবাই, অহল্যাবাই ইত্যাদি। ঐ সকল দেশের নর্ত্তকীরাও দেশাচার অনুসারে নিজ নিজ নামের সহিত 'বাই' শব্দ যোগ করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল পেশাদার নর্ত্তকী বাঙ্গলাদেশে আসিয়া নৃত্য-গীতের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন তাঁহারা বাই নামেই পরিচিত হন। 'বাইনাচ' অথবা 'বাইজি নাচ' শব্দে তাহা লক্ষ্য করা যায়। 'বাই' বলিলে প্রকৃতপক্ষে ঐ সব দেশের সকল রমণীকেই বুঝান উচিত। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সহিত তত্তৎ-দেশের রমণী সমাজের সম্যক্ পরিচয় নাই। বাঙ্গালাদেশ উত্তর পশ্চিমের নারী জাতির একটি সম্প্রদায়কে মাত্র

(১) এই প্রসঙ্গে 'সমষ্টিস্থলে ব্যষ্টি' শীর্ষক অধ্যায় ও দ্রষ্টব্য।

(২) যেমন আমরা 'দেবী' যোগ করি।

দেখিয়াছে। সুতরাং সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত যে পদবী, তাহা কেবল সেই সম্প্রদায়েরই পদবী ইহা মনে করিয়াছে। 'লালপানি' বলিলে রক্তবর্ণ জল মাত্রকেই বুঝান উচিত, কিন্তু তাহা না বুঝাইয়া উহা রক্তবর্ণের তরল পদার্থ বিশেষকে বুঝায়।

(৮) সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টি

অনেকের দ্বারা যেমন একের অর্থ প্রকাশিত হয় তেমনি একের দ্বারাও অনেকের অর্থ সূচিত হয়। 'কালি' শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বিশেষ। কিন্তু লাল নীল সবুজ প্রভৃতি যে কোন রঙের তরল পদার্থকেই আমরা 'কালি' আখ্যা দিই। 'বাই' শব্দে এক সম্প্রদায়ের নর্ত্তকী বুঝায়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী নর্ত্তকীর নাচকেও 'বাইনাচ' বলি। হিন্দী 'ঢব্' শব্দে এক প্রকার চর্ম্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র বুঝায়। ইহার সহযোগে গীত হইবার জন্য এক প্রকার সঙ্গীতের নাম হইল 'ঢব্' বা 'ঢপ্' সঙ্গীত। তাহা হইতে অন্যান্য আরও কয়েক প্রকারের সঙ্গীতের 'ঢপ' সঙ্গীত নাম হইয়াছে, যদিচ সে সকল সঙ্গীতে 'ঢপ্' যন্ত্র ব্যবহার হয় না। বাঙ্গালা দেশের পুলিস্ কন্‌ষ্টেবলরা কোট, হাফ্‌প্যাণ্ট এবং লাল পাগড়ি পরে। কিন্তু শিরোভূষণটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। তাই আমরা 'লাল পাগড়ি' বলিয়া কন্‌ষ্টেবল বুঝাই। তাহা হইতে 'লাল পাগড়ি' শব্দ আরও ব্যাপকভাবে পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রকেই বুঝায়। অথচ সকল পুলিস কর্ম্মচারীই যে লাল পাগড়ি পরে তাহা নয়। তথাপি 'লাল পাগড়ি' বলিলে সকলের কথাই মনে পড়ে। পুলিস বিভাগের মধ্যে 'লাল পাগড়ি' পরিহিত ব্যক্তিদের সহিতই আমাদের পরিচয় বেশী। পথে বাহির হইলে তাহাদের দর্শন মিলে। এই জন্যই অর্থের প্রসার এবং আরোপ দুইই হইয়াছে।

(ক) দেহের পরিবর্ত্তে অঙ্গের নাম

প্রধান অঙ্গ বিশেষের নাম করিয়া অনেক সময় সমগ্র দেহকে বুঝান হয়। এই ধরণের অর্থ পরিবর্ত্তনও কতকটা উপরোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ।

আমরা যখন কাহারও 'শ্রীচরণ' দর্শন মানসে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়ি তখন শুধু শ্রীচরণ দুইটিই দেখিতে চাই না। রাগ করিয়া যাহার 'মুখ' দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি সে যদি মুখ ঢাকিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে রাগ বাড়ে বই কমে না। যাঁহার 'পাণি' প্রার্থনা করি তাঁহাকে সম্পূর্ণ এবং সমগ্র ভাবেই কামনা করি। হাফিজ সত্য সত্যই শুধু প্রিয়ার গালের 'কৃষ্ণ তিলটির' মূল্য স্বরূপই সমরকন্দ আর বোখারা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন? দীন দরিদ্রের বাড়ীতে যখন বড়লোক 'পা'য়ের ধূলো দেন তখন সশরীরে আসিয়াই দেন। লোক মারফৎ প্রেরণ করেন না।

(খ) এক ঘটনার দ্বারা আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত।

অঙ্গ বিশেষের দ্বারা যেমন সমস্ত দেহ সূচিত হয়, তেমনি প্রধান বস্তু বিশেষের দ্বারা আনুষঙ্গিক অনেক বস্তুকেই বুঝায়। এক ঘটনা তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য ঘটনার কথা প্রকাশ করে।

আমরা 'পান' খাই বলি, কিন্তু চূণ খয়ের সুপারির কথা উহ্য রাখি। 'ভাত' খাইয়াছি বলিলে ডাল তরকারিও খাইয়াছি ধরিতে হইবে।

'লালবাতী জ্বালা'র অর্থ দেউলিয়া হওয়া। 'ধামা ধরা'র অর্থ খোসামোদ করা। 'পায়ে পড়া'র অর্থ মিনতি করা।

(৯) অনবধানতা

অজ্ঞতা ও অনবধানতা হেতু শব্দের নানাবিধ অপপ্রয়োগ এবং অর্থান্তর ঘটে। ঔদাসীন্য অথবা প্রয়োগকারীর প্রতি সম্ভ্রমবশত জনসাধারণ অনেক সময় তাহা মানিয়া লয়। বিধবা শব্দ 'ধব' এই কল্পিত শব্দের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া ইহাকে ভাষায় চালাইয়াছেন। ইহার অর্থ হইয়াছে স্বামী। ঐরূপ অসুর শব্দ হইতে 'সুর' শব্দের উৎপত্তি। 'সুর' শব্দের অর্থ দেব।

আমরা 'সুতরাং' 'তথাচ' 'হঠাৎ' প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত অব্যয় ব্যবহার করি তাহাদের অধিকাংশই মূল অর্থ হারাইয়া নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। সংস্কৃতে 'এবম্' শব্দের অর্থ এইরূপ, বাঙ্গালায় 'এবং' ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যে বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানে না অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না তাহাকেই 'নাস্তিক' বলা হইত। কিন্তু এখন যে ব্যক্তি দেশাচার বা লোকাচার মানে না

তাহাকেই নাস্তিক বলা হয়। 'ম্লেচ্ছ' শব্দ প্রথমে কোন বিশেষ জাতি এবং দেশ অর্থে ব্যবহৃত হইত। এখন 'ম্লেচ্ছ' বলিলে কদাচারী বুঝায়। 'পাষণ্ড' শব্দে এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বুঝাইত। কিন্তু এখন উহার অর্থ হইয়াছে নিষ্ঠুর। 'বুজরুক' (ফার্সী বুজুর্গ) শব্দটি বাঙ্গালায় কিরূপ অর্থান্তর লাভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'পায়নাফুলি' নামে এক প্রকার নক্সাওয়ালা শাড়ি বাজারে পাওয়া যায়। 'শেওড়াফুলি' 'বেগুণফুলি' প্রভৃতির সাদৃশ্যে লোকে 'পায়নাফুলি'কে এক প্রকার অপরিচিত ফুল বলিয়াই মনে করে কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। ঐ শব্দটি ইংরাজি pine appleএর অপভ্রংশ। কাঠের এবং লোহার মিস্ত্রীরা ইংরাজি rivet শব্দের স্থানে 'রিপিট' উচ্চারণ করে। 'রিপিট' (repeat) কথার মূল অর্থ যাহাই হউক না কেন, মিস্ত্রী সমাজে উহার অর্থ লইয়া কখনও অনর্থ বাধিবে না। আমরা 'আরাম চেয়ারে' (arm chair) বসিয়া বসিয়া এমনই আরামে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহার arm (হাত রাখিবার স্থান) দুইটি আছে কিনা সে দিকে দৃক্পাত করি না। তাই arm বিহীন চেয়ারকেও 'আরাম চেয়ার' বলি।

কিছুদিন আগেও চিঠিপত্রে বিধবা বুঝাইতে স্ত্রীলোকের নামের শেষে 'দেব্যাঃ' (ব্রাহ্মণের পক্ষে) এবং 'দাস্যাঃ' (শূদ্রের পক্ষে) লেখার রীতি ছিল। আইন সংক্রান্ত দলিল পত্রে এখনও এ রীতি বর্ত্তমান আছে দেখা যায়। এই রীতির মূলে একটি ইতিহাস আছে। সঙ্গে টীকায় দ্রষ্টব্য (১)।

(১) অর্থ সৃষ্টি

শুধু অনবধানতা বা অজ্ঞতা নয়, লেখকের বা প্রয়োগকর্ত্তার স্বেচ্ছাচারিতাও অনেক সময় অর্থ পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী হয়।

'বারুণী' শব্দের এক অর্থ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও মধুসূদন ঐ শব্দকে কেবল শ্রুতিমধুর হইবে বলিয়া বরুণের স্ত্রী অর্থে প্রয়োগ করিলেন।

'প্রদোষ' শব্দের অর্থ রজনীমুখ, কিন্তু বহির্মুখ অর্থেও রবীন্দ্রনাথ ঐ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

জানালা (পর্টুগীজ জানেলা) শব্দের ধ্বনিসাম্যে এবং বাতায়নের আকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথ 'জালায়ন' শব্দ চয়ন করিয়াছেন। জাল নির্ম্মিত অয়ন অর্থাৎ গতিপথ এই ব্যাস বাক্যে জালায়ন শব্দের সমাস নিষ্পন্ন করিলে উহার আক্ষরিক অর্থ হয় জাল পথ বা জালের রাস্তা। তাহা হইতে উহার গবাক্ষ এই অর্থ দিয়াছেন।

স্বেচ্ছাচার মাত্রই নিন্দনীয় নয়। এইরূপ নূতন শব্দ সৃষ্টি ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধিই করিবে।

(১১) অর্থের অনির্দ্দিষ্টতা

এমন অনেক শব্দ আছে যাহারা বিশেষ একটা সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না। 'ভদ্রলোক' ও 'ভদ্রমহিলা' এই শব্দদ্বয় ইংরাজি gentleman ও lady এই দুই শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজি শব্দ দুইটির ব্যবহার যেমন অত্যন্ত ব্যাপক, বাঙ্গালা শব্দ দুইটিরই তাহাই। সুতরাং 'ভদ্রলোক' বলিলে ভদ্রাভদ্র সকলকেই বুঝায়। 'ভদ্র' শব্দের আক্ষরিক যে অর্থ 'ভদ্রলোকে' তাহা রক্ষিত না হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল রাজাকে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে তাঁহাদিগের অনেকের রাজত্ব হয়ত পঞ্চগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজচরিত্রের বর্ণনায় শুধু বাঙ্গালী কবিরাই যে এইরূপ অর্থহীন বিশেষণ প্রয়োগ

---

(১) অমুকের লেখা এই অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার। এখনও পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা অমুক শর্ম্মণঃ বলিয়া অনেক লেখার শেষে নাম স্বাক্ষর করেন। 'দেব্যাঃ' 'দাস্যাঃ' পদবীর মূলেও ঐ ব্যাপার। কিন্তু কেবল বিধবার নামের সঙ্গে ইহার যোগ হইল কেন? সধবা ও কুমারীর নামের সহিতও ত হইতে পারিত?

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন পূর্ব্বকালে ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহাও নিতান্ত অল্প। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা চিঠিপত্র একরকম লিখিতেনই না। লিখিবার দরকারও হইত না। কেবল পতিপুত্রহীনা অনাথাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য কাগজ পত্র লিখিতে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখাইতে) হইত। দলিল পত্রে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিবার বেশী প্রয়োজন হইত। পুরুষের পদবী (শর্ম্মণঃ দাসস্য প্রভৃতি) র নজীরে তাঁহাদের নামের শেষে 'দেব্যাঃ' ও 'দাস্যাঃ' লেখা হইতে লাগিল। কিন্তু বিধবার নামই অধিক লিখিত হওয়ায় এই পদবীগুলি বিধবার পদবী বলিয়াই অনুমিত হইয়া গেল। পরে সধবা ও কুমারীরা যখন লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখন 'দেব্যাঃ ও দাস্যাঃ' হইতে পৃথক করিয়া 'দেবী' ও 'দাসী' শব্দ বিনা বিভক্তিতেই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এখন দাসী উঠিতে বসিয়াছে, সকলেই 'দেবী' হইয়াছেন।

করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ শব্দাড়ম্বরের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "কাদম্বরী চরিত্র" সমালোচনায় ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "যদিও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে শূদ্রক বিদিশা-নগরীর রাজা, কিন্তু অপ্রতিহতগামী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে, তিনি—চতুরুদধিমালামেখলয়া ভুবোভর্ত্তা। আবার সেকালের কবিরা চাটুকারিতায় যেমন মুক্তকণ্ঠ ছিলেন, নৃপতিবর্গও উপাধি বিতরণে তেমনি অকৃপণ ছিলেন। কিন্তু সেই সকল উপাধির দ্বারা উপাধিধারীর বৈদগ্ধ্যের পরিমাণ যথাযথভাবে নিরূপণ করা যায় না। কবি-কঙ্কণ, রায়-গুণাকর, বিদ্যাদিগ্‌গজ, বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধিই তাহার সাক্ষ্য।

রাজদত্ত উপাধি অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সেই সব শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, কার্য্যতঃ কেবল একটা বিশেষ বংশ বা পরিবারের পরিচয় দিয়া থাকে। 'চক্রবর্ত্তী' পদবীধারী অনেক লোক আছেন যাঁহারা দুইবেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থানও করিতে পারেন না। বংশের কোন ব্যক্তি অগাধ পাণ্ডিত্যবশত হয়ত 'পণ্ডিত' উপাধি পাইয়াছিলেন। বংশধরেরা তাঁহার গুণ পাইল না কিন্তু উপাধিটি পৈত্রিক সম্পত্তির সহিত অধিকার করিয়া রহিল। কাজেই তাহারা না পড়িয়াও 'পণ্ডিত' হইল। 'মজুমদার' শব্দের অর্থ রাজস্বের হিসাবরক্ষক। মুসলমান আমলে যাঁহারা রাজসরকারে ঐ কর্ম্ম করিতেন তাঁহারা 'মজুমদার' বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তাহা হইতে উহা 'কুল পদবী'-রূপে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সুতরাং অর্থ পরিবর্ত্তিত হইল।

'বিলাত' শব্দের অর্থ বিদেশ। তাহা হইতে উহা ইংলণ্ড অথবা আরও ব্যাপকভাবে ইউরোপকেও বুঝায়। বিলাতী কায়দা বলিলে ইউরোপীয় হাবভাব বুঝায়। আবার 'বিলাতী' জিনিস বলিলে কেবল ব্রিটিশ দ্রব্যকে বুঝায়। জাপানী জিনিস বিলাতী নয়, কিন্তু টম্যাটোর নাম 'বিলাতী' বেগুণ। গোল আলুকেও অনেক সময় 'বিলাতী' আলু বলা হয়।

আজকাল ইংরাজি friend শব্দের অনুকরণে 'বন্ধু' শব্দটা খুব প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ অধ্যাপকও ইউরোপীয় প্রথায় নবীন ছাত্রকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন। বিলাতী আদব কায়দার প্রভাবে 'বন্ধু' শব্দের অর্থ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অমুক অমুকের 'বন্ধু'—এই কথা বলিলে তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রীতি বন্ধন থাকিতেই হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

কিছুদিন আগেও বাঙ্গালা দেশে কেবল ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকগণই নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেন। এখন 'দেবী' শব্দের ব্যবহার জাতি বিশেষে নিবদ্ধ নহে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের রমণীরাই আজকাল নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেছেন। এখন থিয়েটার বায়স্কোপের অভিনেত্রীরাও দেবী। বিদেশী মহিলারাও মধ্যে মধ্যে সখের ভারতীয় নাম লইয়া প্রান্তে একটি 'দেবী' সংলগ্ন করেন। ইংরাজিতে নামের শেষে যে Esq লেখা হয় তাহাও প্রথমে আমাদের 'দেবী'র মতই সমাজের একটা বিশেষ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এখন Esq-এর গৌরব এদেশীয় 'দেবী'র মতই একাকার হইয়া গিয়াছে।

'খাওয়া' ধাতুর মূল অর্থ ভোজন করা। কিন্তু ইহার অর্থ ক্রমশ কিরূপ সীমাহীন ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। খাবি, মাথা, মার, ধাক্কা, হোঁচট, ঘুস এমন কি ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাইবার ব্যবস্থাও বাঙ্গালা ভাষায় আছে।

'লাগা'র অর্থ সংলগ্ন হওয়া। কিন্তু রসগোল্লা যখন মিষ্টি লাগে এবং মেয়েটিকে যখন মন্দ 'লাগে' না, তখন অর্থ সুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

(১২) গৌণার্থ প্রাধান্য

শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কখনও এক বা একাধিক গৌণ অর্থও দেখা দেয় এবং সেই গৌণ অর্থটাই ভাষায় চলিত হইয়া যায়।

'মোট কথা' শব্দে মোটের অর্থ বোঝা যায়। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, যতগুলি কথা বলা হইয়াছে তাহার অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া সারাংশ যতটুকু, কেবল সেইটুকুই। 'মোট' শব্দের মূল অর্থ সমষ্টি, কিন্তু গৌণ অর্থ অত্যাবশ্যক।

'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ গৃহ। কিন্তু এখন কেবল দেবালয় অর্থেই ইহার ব্যবহার একরূপ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাসর (< বাসহর < বাসঘর < বাসগৃহ) শব্দের অর্থ থাকিবার ঘর। তাহা হইতে ইহার অর্থ হইল—বরবধূ প্রথম যে কক্ষে শয়ন করে সেই কক্ষ।

'হিন্দু' শব্দটি সিন্ধু শব্দজাত। প্রাচীন পারসীকগণ সিন্ধুকে 'হিন্দু' (১) বলিতেন। তাহা হইতে সিন্ধু নদী যে প্রদেশে প্রবাহিত তাহার নাম হইল 'হিন্দু' এবং তদ্দেশের অধিবাসীরা 'হিন্দু' নামেই পরিচিত হইল। ফার্সী ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ কৃষ্ণবর্ণ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কালে অনেক ভারতীয়কে বন্দী করিয়া পারস্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে দাসরূপে বিক্রয় করা হয়। তাহার ফলে ফার্সীতে 'হিন্দু' শব্দ ক্রীতদাস অর্থেও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। 'হিন্দু' শব্দ যে প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইত তাহার প্রমাণ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। কিন্তু দেশ অর্থে 'হিন্দু' শব্দ ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া গেল, তাহার ফলে আবার নূতন করিয়া 'হিন্দুস্থান' শব্দের উৎপত্তি। 'হিন্দুস্থান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ—হিন্দবাসীর দেশ।

যে কারণগুলি উল্লিখিত হইল উহাদের শ্রেণীবিভাগ সুসম্পূর্ণ হইতে পারে না। প্রধান কারণগুলিকে যতদূর সুশৃঙ্খলভাবে পারা যায় সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সাজাইবার পদ্ধতিও যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

উদাহরণ স্বরূপ যে সকল শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি যথাস্থানে বসাইবারই চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাদের অনেকগুলি স্থানান্তরেও বসান চলে, কারণ একই শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনে অনেক সময়েই একাধিক কারণ বর্ত্তমান থাকে।

(সমাপ্ত)

(১) সংস্কৃত স = ফার্সী হ

সনেট

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

বনানীর বিকম্পিত স্নিগ্ধ শ্যামলতা,
জ্যোছনার জ্যোতির্ম্ময় সুধা সুকুমার,
মলয়ের হিল্লোলিত গন্ধ-গীতি আর
কোকিলের কুহরিত অন্ধ অধীরতা ;
কাননের কুসুমিত মুগ্ধ অজস্রতা ;—
এরা সবে সৃজিয়াছে তনিমা তোমার ;
কিন্তু হায়, প্রাণ তব রচনা কাহার,
রূপ তারে দানিয়াছে কোন্ কঠিনতা ?

ভঙ্গিমার মায়া তব হাসির শোভায়,
আঁখির মাধুরী আর সঙ্গীতের মোহে
সমগ্র হৃদয়খানি অর্ঘ্য সম বহে
প্রাণ মোর উচ্ছ্বসিয়া তব পানে ধায়।
প্রাণের প্রসাদ তব সে তো নাহি পায়,
ব্যর্থতার ব্যথা তারে নিরন্তর দহে।

সনেট

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তুমি চলি' গেলে যবে, মনে হলো নিঃশব্দ রজনী
তোমার গমন-পথে, মৃত্যু-পথে হলো নিরুদ্দেশ।
কম্পিত তারার শিখা শূন্যতলে কাঁদে একাকিনী
তব পদচিহ্ন ধরি' পৃথিবীর আয়ু হলো শেষ !

তোমারে বাসিনু ভালো, এই বুঝি তা'রি অভিশাপ ?
মদির নয়নে তব খুঁজেছিনু মধুর স্বপন ;
সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, জীবনের এ যে অপলাপ
কল্পনার পরপারে কবিতার মৃত্যুর মতন।

যে স্বপ্ন ঝরিয়া গেল রজনীর শ্লথবৃন্ত হ'তে
পুষ্প হ'তে ঝরে পড়া পক্ষহীন ভ্রমরের মত—
ছন্দ তার ভেঙ্গে গেল শুধু অর্দ্ধ-গুঞ্জনের পথে
জীবনের তন্দ্রা তার অতি রুক্ষ আলোকে আহত।

তবু তুমি চলি' গেলে, মনে হলো রজনী আমার
তোমার হৃদয় সম আলোহীন স্তব্ধ অন্ধকার॥

লক্ষ্মীর বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

একবিংশ পরিচ্ছেদ—মুখুয্যেমশায়ের নিষ্ফল চেষ্টা

যথাসময়ে বিশ্বাসদের মধু ৪০ টাকা লইয়া ধর্ম্মশালাতে মুখুয্যেমশায়ের নিকট উপস্থিত হইল। মধু যুবক, বলিষ্ঠ—তন্তুবায় জাতীয়। গ্রামে সে চৌকিদারের কাজ করিত আগে—মুখুয্যেমশায়ের অত্যন্ত অনুগতও ছিল।

মুখুয্যেমশায় টাকা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মধুকে লক্ষ্মীসংক্রান্ত সমস্ত খবর দিয়া বলিলেন, "মধু, একবার এই নটবরের পঞ্জিকাখানা উল্টে দেখ্‌তে হবে। কি বলিস্?"

মধু বলিল, "যে আজ্ঞে, ঠাকুর!"

মুখুয্যেমশায়—একটু হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু রংপুর কোথায়? কোন দিকে তা ত জানি না। তবু মনে হোচ্ছে এ পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও হবে, চল্, দেখি।" তিনি পথে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রংপুরে যাইতে হইলে শিয়ালদহের ষ্টেশনে টিকিট করিতে হইবে। "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া—মুখুয্যে তাহার জন্যই প্রস্তুত হইলেন, লক্ষ্মীর ভাবনা এই বৃদ্ধকেও উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

দুইজনে টিকিট করিয়া—রংপুরে পৌঁছিল। তারপর অনেক সন্ধানের পর, অনেক কষ্টে মধুপুর গ্রামে উপস্থিত হইল।

গ্রামটি ছোট হইলেও এখানে পাটের একটা বাজার আছে। বাহির হইতে অনেক মহাজন যায় ও সময়ে ভিড় জমায়। তখন পাটের বাজার ছিল না—অসময় বলিয়া। মুখুয্যেমশায় পৌঁছিয়াই রাধারাণীর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

প্রথমটা কোনরূপ কিছু সন্ধান পাইলেন না। কে রাধারাণী দাসী—গ্রামের কেহই বলিতে পারিল না। একজন স্ত্রীলোকের নামে অত শীঘ্র কিছু সংবাদ পাওয়া দায়। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "রাধারাণীর বাপের নাম কি?"

মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "তা'ত জানি না, বাছা।" তারপর তিনিও জিজ্ঞাসা করিলেন, "নটবর মিত্র বলে কি কেউ কখনও এখানে এসেছিল?"

লোকটি জানাইল—কত লোক মরশুমের সময় পাট কিনিতে আসে তাহাদের সকলের নাম ধাম ঠিকানা মনে রাখা অসম্ভব।

হতাশ হইয়া মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "তাই'ত! বৃথাই তবে এতটা পথ এলুম।"

গ্রামের লোকটি একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "ঠাকুর, যদি সব খবরটা খুলে বলেন, তবে হয় ত খবর মিল্‌তে পারে।"

সব খবর মুখুয্যেমশায়ও জানিতেন না, তিনি কল্পনা-প্রবণও ছিলেন না যে তৎক্ষণাৎ কিছু বানাইয়া বলিবেন। সুতরাং কোনও কিছু খবর পাইলেন না। নিরাশ হইয়া দুইজনে আবার রংপুরে ফিরিলেন। সেখানে বাজারের এক আড়তে তিনি রাত্রিবাস করিবেন স্থির করিলেন। রাত্রে—সেই আড়তদারের সহিত কথাবার্ত্তায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরের এ দিকে আসার—হেতু?"

মুখুয্যে বলিলেন, "হেতু আর তেমন কিছু নয়। এক রাধারাণী দাসীর খোঁজে এসেছিলুম। মধুপুর গ্রামের সন্ধানে। তা সন্ধান কিছু হোল না।"

আড়তদার কহিল, "মধুপুরের রাধারাণী দাসী? ও নাম শুনেছি বটে—কিন্তু মধুপুরের সঙ্গে কি সম্বন্ধ তা জানি না। এইখানে একটা স্ত্রীলোক ছিল, কুসুমকুমারী নামে তার একটা মেয়ে ছিল বটে—রাধারাণী তার নাম, কুসুম ছিল এখানে দুর্গাবাবু উকীলের রক্ষিতা—অনেক টাকা কুসুম পেয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু এই সব নষ্টা স্ত্রীলোকের পয়সা কি থাকে? কোথা থেকে—কল্‌কাতার একটা লোক এসে তা'কে ও তা'র মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। শুনেছি লোকটা নাকি মেয়েটাকে বিয়ে করেছে ও সব টাকাকড়িও পেয়েছে।"

মুখুয্যে নিবিষ্টমনে সব শুনিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটিকে দেখেছিলে কখনও—কি রকম দেখ্‌তে ছিল।" আড়তদার চিন্তিতভাবে একটা বর্ণনা দিল—তাহা নটবরেরই বর্ণনা। মুখুয্যেমশায়—পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "বিয়ে করেছিল? কতদিনের কথা!"

লোকটি জানাইল—এ ঘটনা বহুদিনের, দশ বৎসরের হইবে।

নটবরের ধনী হওয়ার উপায়টা মুখুয্যেমশায় কতক বুঝিলেন, কিন্তু তাহাতে নটবরের দুষ্কৃতি কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। বেশ্যার কন্যাকে যদি বিবাহ করিয়াই থাকে —তবে না হয় জাতচ্যুত হোয়েছে—কিন্তু বিশেষ অপরাধ তা'তে আর নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কুসুমকুমারী জীবিত আছে?"

আড়তদার উত্তর দিল, "তা' কি ক'রে জান্‌বো, ঠাকুর? আমরা থাকি রংপুরে, সে গিছ্‌লো কলকাতায়!"

আর কোনও খবর না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে মুখুয্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধুকে বলিলেন, "মধু, লক্ষ্মীকে উদ্ধারের কি হবে? কি করে একলা ফিরে গ্রামে যাবো?"

মধু কহিল, "এখানে কোরবেনই বা কি, ঠাকুর? লক্ষ্মীকে পাওয়া গেলেও কি আর জাতে রাখা যাবে? যদি ধরুন সত্যিই সে বদ্‌মাসদের হাতে পড়ে থাকে! তা' হ'লে?"

মুখুয্যেমশায় ভাবিলেন, মধু সত্য কথাই বলিতেছে। কিন্তু তবু তাঁর মন বুঝিল না। তিনি বলিলেন, "মধু, দু'চারদিন আরও দেখা যাক্‌। নটবরের উপর সন্দেহ আমার মন থেকে যাচ্ছে না। তুই ত—গ্রামে চৌকিদারি কোরেছিস্‌—দু'চার দিন তা'র বাড়ীর ওপর নজর রাখ্‌তে পারিস্‌? কি রকম লোক আসা যাওয়া করে—নটবর কোথায় যায় আসে—খবর নিতে পারিস?"

মধু গ্রামের চৌকিদার। শহরে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তবু দু'এক দিন কল্‌কাতা দেখার সুযোগে সে সম্মত হইল। জীবনে শহরে আসা তার এই প্রথম।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া মুখুয্যে শ্যামবাজারের এক হোটেলে উঠিলেন—ও মধুকে নটবরের বাড়ী দেখাইয়া দিলেন।

মধু সারাদিন নটবরের বাড়ীর অদূরে থাকিয়াও কাহাকেও আসিতে বা যাইতে দেখিল না। মুখুয্যেমশায়কে গিয়া সেই খবর দিল।

মুখুয্যে মশায় ভাবিয়া বলিলেন, "শঙ্কর আছে ও বাড়ীতে, তুই তাকেই একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

মধু পুনরায় গিয়া নটবরের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক দেখিল। তাহার মনে হইল বাড়ীতে কেহ নাই। সে তবু সাহস করিয়া ডাকিল, "শঙ্কর দাদা? দাদাবাবু?" এক ছোট কুঠ্‌রীর দরজা খুলিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া মধুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে, মধু? কবে এলি?"

মধু উত্তর দিল, "মুখুয্যে মশায় আপনাকে ডাকছেন একবার।"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া জানাইল, "আমার সময় নেই। বড় ব্যস্ত আমি, মধু।"

মধু বলিল, "তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা কোর্‌ছেন!"

শঙ্কর পুনরায় কহিল, "আমার যাওয়ার সময় নেই। কাল পরশু যাবো। মুখুয্যে মশায়কে না হয় আস্‌তে বোল্‌গে। এ বাড়ীতে কেউ নেই।"

মধু গিয়া মুখুয্যে মশায়কে এই সংবাদ দিতে বিস্মিত হইয়া তিনিই আসিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে বলিল, "কি, জ্যেঠামশায়?"

মুখুয্যে ব্যস্ত না হইয়া—ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিয়া নটবরের বাড়ীর উপস্থিত সংবাদ সমস্ত গ্রহণ করিয়া কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তার'পর মনে মনে বিচার করিলেন, শঙ্কর সম্বন্ধে কি করা যায়—আর লক্ষ্মী সম্বন্ধেই বা কি করা যায়। কিছু স্থির করিতে না পারিয়া শেষে হতাশভাবে বলিলেন, "শঙ্কর, চল গাঁয়ে যাই।"

শঙ্কর কহিল, "তা' কি হয়? সুকৃতি তা হোলে এক-দিনেই মরবে। কাকীমারও অবস্থা ভাল নয়। কেউ নেই। তা' ছাড়া আমার সময়ই নেই। আপনি যান্‌। আমি দু'একদিন বাদে যাবো—সুকৃতি ভাল হোলে।"

মুখুয্যে মশায় জানিতেন—আর কিছু বলা শঙ্করকে বৃথা হইবে। তিনি তাই নিরস্ত হইলেন, একবার তাই শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই রাধারাণীর বাড়ী কোথায়?"

শঙ্কর বলিল, "বাড়ী কাছেই। কিন্তু এখন আমার যাবার সময় নেই, আর একদিন যাবো।"

মুখুয্যে মশায় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। তিনি সেই দিনই—মধুকে লইয়া গ্রামে ফিরিলেন। যাহার ভাগ্যে যাহা আছে ঘটিবে—তিনি কি করিবেন? কিন্তু এক মাসের ভিতর তিনি যে শঙ্করকে লক্ষ্মীর দুর্ঘটনার সংবাদ দেন নাই, তাহা তাঁহার স্মরণও রহিল না। গ্রামে ফিরিয়া তিনি রায় ও বসু পরিবারের একেবারে নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ একটা কার্য্য করিলেন, নিজেও মধু দুইজনে মিলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে লক্ষ্মীর সহিত শঙ্করের বিবাহ দিয়া আসিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—সুকৃতি

শঙ্কর সুকৃতিকে লইয়াই এ কয়দিন অতিশয় ব্যস্ত ছিল।

সুকৃতির আঘাতের ফলে প্রথম দিনের পরই অত্যন্ত বেশী জ্বর হইল, যন্ত্রণাও অত্যধিক হইল। শঙ্কর কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। বাড়ীতে সে একা। নটবরের পুত্র মদনও অন্তর্হিত হইয়াছে। সে বাপকে একবার দেখিয়া লইবে—এইরূপ একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে। ক্ষান্তমণি শয্যাগত। প্রকৃতি—একেবারে ভয়-বিহ্বল হইয়াছে, কে কাহাকে দেখে ও কে কাহার মুখে জল দেয় তাহার স্থিরতা নেই। শেষে শঙ্কর সুকৃতির যন্ত্রণা আর দেখিতে না পারিয়া ডাক্তার আনিল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "এতদিন কি কর্‌ছিলে সব? কে মেয়েটিকে এমন করে খুন করেছে?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "নটবর মিত্র।"

ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ আনিয়া ইন্‌জেক্‌সন করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "পুলিসে খবর দাও গে। মর্‌লে পরে কি ক'র্‌বে? এ নটবর মিত্রটি কে? তুমি তার কে হও? সে'ত বড় ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি।"

শঙ্কর জানাইল—সে কেহ-ই হয় না, আর নটবর মিত্র সুকৃতির বাপ।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "পুলিসে এই বেলা খবর দাও গে। সম্ভব এ বাঁচবে না, তখন তোমার হাতে দড়ি পড়বে। এ একেবারে খুন! তার জেল হওয়া উচিত।"

শঙ্কর অতিশয় শঙ্কিত হইল। পুলিসে কি করিয়া সে খবর দিবে? দিলেই বা তাহাকে বিশ্বাস করিবে কে? হয় ত সেই খুন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে ফাঁসি দিবে। কিন্তু সুকৃতির কাছে বসিয়া সে সব কথাই ভুলিয়া গেল, কেবল তাহার এই এক ভয় হইতে লাগিল যে সুকৃতি বাঁচিবে না। এমনিতেই তিনদিন যাবৎ অচৈতন্য অবস্থাতে কাটাইতেছে—কতপ্রকার প্রলাপ বকিতেছে—ইহার উপর অচিরে সুকৃতি মরিবে—এই চিন্তাতে শঙ্কর ব্যাকুল হইল।

আরও একদিন সে ডাক্তার ও বাড়ী করিল। ডাক্তারকে মিনতি করিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবু, সুকৃতিকে বাঁচান।" ডাক্তার তখনও ইন্‌জেক্‌সনই দিতেছিলেন—বলিলেন, "চেষ্টার ত ত্রুটি নেই। সেই নটবর লোকটি বদ্‌মাস, সে খুন করে পালিয়েছে—তুমি বাবু নিরীহ ভদ্র-সন্তান—পুলিসে খবর দাও, না হোলে শেষে বড় বিপদে পড়্‌বে।"

কিন্তু শঙ্করের কাছে সুকৃতির মৃত্যুই তখন সবচেয়ে বড় বিপদ।

পরদিন সুকৃতির হঠাৎ চমক হইল। জ্বরও একটু নামিল। সে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিল। শঙ্কর জল দিলে সে তাহা পান করিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেমন জব্দ?"

শঙ্কর সুকৃতিকে এতদিন পরে কথা বলিতে দেখিয়া আনন্দে বলিল, "সুকৃতি, তুমি ভাল হোয়ে উঠ্‌বে না? শীগ্‌গির ওঠ। কেমন?"

সুকৃতি বলিল, "ছাই উঠ্‌বে! ভাল হ'লে তুমি যদি পালাও!"

শঙ্কর দ্বিধা না করিয়া কহিল, "পালাবো না, কখ্‌খনো না। তুমি ভাল হও, সুকৃতি।"

সুকৃতি হাসিল। তারপর বলিল, "কাছে এসো, চুপি চুপি একটা কথা বলি—খুব চুপি চুপি! কাণে কাণে!" শঙ্কর মুখ কাছে লইয়া গেল। সুকৃতি তাহার মুখে একটা চুম্বন দিয়া বলিল, "ঠিক বল্‌ছো পালাবে না? পালাও ত' মাথা খুঁড়ে মোর্‌বো, তা' জেনো।"

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিল। সুকৃতি বলিল, "এইবার তা হলে ভাল হোয়ে উঠ্‌বো।"

শঙ্কর তাহাকে জানাইল যে ডাক্তার পুলিসে খবর দিতে

বলিয়াছে। সুকৃতি ভাবিয়া বলিল, "না। এখন না। যদি মরি—তখন!"

সেইদিন হইতে সুকৃতি ভাল হইতে সুরু করিল। শঙ্কর একটু স্বস্তি অনুভব করিল। ডাক্তার আসিয়াও আশা দিয়া গেলেন যে এইবার বাঁচিতে পারে। শঙ্কর আরও উৎসাহে সুকৃতির সেবাতে লাগিয়া গেল। সুকৃতি তাহাতে আনন্দ অনুভব করিয়া বলিল, "ভাল হোলেই তুমি পালাবে জানি! ভাল হোতে ইচ্ছে নেই—জান? যদি কখনও পালাও—আমি ম'রবো।"

শঙ্কর তাহা শুনিয়া শুনিল না।

যখন সুকৃতি বেশ একটু সারিয়াছে—তাহার জ্বর গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গের ক্ষত শুষ্ক হইতে সুরু করিয়াছে—তখন তাহার মনে হইল ভট্‌চাজের বাড়ীর কথা। কিন্তু সুকৃতির কাছে সে তাহার এই চিন্তা প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। ভাবিল ডাক্তার-বাড়ী যাওয়ার নাম করিয়া সে একবার ভট্‌চাজের বাড়ী ঘুরিয়া আসিবে। সেই দিনই অপরাহ্নে সে বাহিরে যাইবে বলিয়া সুকৃতির অনুমতি লইবে ভাবিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল, "নটবরবাবু! নটবরবাবু আছেন নাকি?"

শঙ্কর বাহির হইয়া দেখিল যে—যে লোকটি একদিন তাহাকে ঘুষি মারিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছিল সেই লম্বা হাতা, ছোট-ঝুল-ওয়ালা-পাঞ্জাবী-পরা লোকটি।

শঙ্কর তাহাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল। সে লোকটি—দিগ্বিজয়। দিগ্বিজয়ও সম্মুখে শঙ্করকে দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। সে এক লাফে গিয়া শঙ্করকে ধরিল। বলিল, "তবে রে, ঘুঘু! ফাঁদ দেখ নি আজও! দেখাচ্ছি।"

শঙ্কর ফাঁদ দেখিবার জন্য ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া বলিল, "কৈ?" দিগ্বিজয় উচ্চস্বরে কহিল, "বল্ লক্ষ্মী কোথায়? না হোলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব আজ।" সে মুখ বিকৃত করিয়া ঘুসি পাকাইয়া শঙ্করের নাসিকার উপর ঘুসি ধরিল।

শঙ্কর চক্ষুর কোণ দিয়া ঘুসির দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর বলিল, "লক্ষ্মীর কি হোয়েছে? কি চাও? তুমি কে?"

দিগ্বিজয় কহিল, "কি হোয়েছে? কি চাই? আমি কে? এক ঘুসীতে তা জান্‌তে পার্‌বে। এখন বাঁচতে চাও ত' বলে ফেল লক্ষ্মীকে কোথায় সরিয়েছ। ও রকম ন্যাকামি ঢের দেখেছি।"

শঙ্কর বিপন্নভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিল। শেষে বলিল, "আমি জানি না।"

ভিতর হইতে সুকৃতি উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কে? কার সঙ্গে কথা কইছ?"

দিগ্বিজয় ভাবিল, ইহাই লক্ষ্মীর গলা। কিন্তু নটবরবাবুর বাড়ীতে বসিয়া এই শঙ্কর এবং এইখানেই লক্ষ্মীকে আনিয়াছে—ইহাও তাহার কাছে বিসদৃশ ঠেকিল। সে তাই জিজ্ঞাসা করিল, "নটবরবাবু কোথায়? না বল্‌লে—" সে আবার ঘুসি পাকাইল।

শঙ্কর উত্তর দিল, সে জানে না। নটবর ঐ বাড়ীতে থাকে না। দিগ্বিজয় মুষ্টি খুলিল।

দিগ্বিজয় সহজেই বিশ্বাস করিল; বাহিরে সে "N. Mitter Esq" ইত্যাদি বোর্ড দেখে নাই। তাই বলিল, "ওঃ! বুঝেছি! ও ঘরে কে? ঠিক বল্‌বে, না হোলে—" সে আবার ঘুসি পাকাইল।

শঙ্কর জানাইল, ঘরে সুকৃতি।

সুকৃতি ততক্ষণ কোনওরূপে হামাগুঁড়ি দিয়া দরজার কাছে আসিয়াছে। সে দরজা খুলিয়া বাহিরে উদ্যত-ঘুসী দিগ্বিজয় ও বিস্মিত শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোচ্ছে? মারামারি কেন?"

দিগ্বিজয় সেই দিকে চাহিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা শীর্ণ মেয়েটির দিকে তাকাইয়া অবাক্ হইল।

সুকৃতি শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ভিতরে এসো! ও কে? এখানে কি চায়?" ফাঁক পাইয়া শঙ্কর তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দিগ্বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল। সেও ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। এ মেয়েটি লক্ষ্মী নয় নিশ্চয়ই। নটবরও নিশ্চয়ই বাড়ীতে নাই। তবে কি নটবরই তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে? সে চিন্তিত হইয়া প্রস্থান করিল। ঐ ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছোট মেয়েটি কে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

সুকৃতি কক্ষমধ্যে শঙ্করকে প্রশ্ন করিল, "ও কে? তোমাকে মার্‌তে উঠেছিল কেন?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "জানি না।" সুকৃতি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মীর কথা ও কি বল্‌ছিল?"

শঙ্কর কহিল, "তাও বুঝ্‌তে পাল্‌ু'ম না, সুকৃতি। লক্ষ্মীকে আমি কোথা রেখেছি তাই জিজ্ঞাসা কোরছিল। আমি কি কোরে তা জান্‌বো ?"

সুকৃতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রেখেছ ? কি রকম ?"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। সুকৃতিও চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল। তার একটু পরে শঙ্করের গলা জড়াইয়া বলিল, "তুমি যাবে না, আমাকে ছেড়ে যাবে না—গেলে আমি সত্যি বল্‌ছি, মাথা খুঁড়ে মরবো।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—লক্ষ্মী নিরুপায়

বিবাহের সেই প্রহসনের পর লক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। নটবর সে রাত্রে আর অধিক অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করিলেন না। লক্ষ্মীকে এখন হাতে পাইয়াছেন, সুবিধামত এখন অপেক্ষাও করিতে পারেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল—সমস্ত স্ত্রীলোকই মূর্খ। তাহারা যতই কেন বুদ্ধির স্পর্দ্ধা করুক না, আসলে তাহাদের বুদ্ধি নাই, শুধু বুদ্ধির অহমিকা ও অভিমান মাত্র আছে। লক্ষ্মী যে ক্রমশঃ তাঁহারই কাছে নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিবেই—তাহাতে তিনি আর সন্দেহমাত্র করিলেন না। তাই তাঁহারই অর্থপুষ্ট নাপিত পুরোহিতকে বিদায় দিয়া ভট্‌চাজকে একটা ছুটো আদেশ দিয়া তিনি তাঁর নূতন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তবে লক্ষ্মীকে যে সত্বর ঐ বাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতে আনিয়া তুলিতে হইবে সে বিষয়ে তিনি স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। এখন নূতন বাসাতে তাঁহার কোনও চিন্তা নাই। পুরাতন সংসার তাঁহার যে একেবারে গিয়াছে—ইহাতে তিনি মনে মনে সন্তুষ্টই হইলেন। ভাবিলেন, নির্ব্বুদ্ধি শঙ্কর সুরু হইতেই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দ্বারা কেবল তাঁহারই ভাল করিতেছে। সামান্য কয়েকটা টাকা গেলেই বা। দলিলপত্রও যে শঙ্করের বুঝিবার ক্ষমতা নাই—ও হয় ত সেইজন্যই যে সে তাহা গঙ্গাতে ফেলিয়াছে—তাহা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। সমস্ত পুরাতনকে ফেলিয়া অগ্রসর হওয়াই পুরুষের ধর্ম্ম। অতীতকে তিনি ফেলিয়া আসিয়াছেন—তাহার সম্বন্ধে আর তাঁহার কোনও দায়িত্ব নাই।

কিন্তু মানুষের সমস্ত কল্পনার, সমস্ত যুক্তির ভিতর কোথায়ও না কোথায়ও একটু খুঁত থাকিয়া যায়ই।—সব সঙ্কল্প একেবারে নিখুঁত হয় না। নটবরের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। নটবর অতিমানব হইলেও তাহা সত্য। তবে সে ত্রুটি তাঁহার নহে, তাহা স্বাভাবিক নিয়মের শত্রুতার ফল। লক্ষ্মী যে মানুষ—তাহারও যে হৃদয় বলিয়া একটা পদার্থ আছে—তাহা নটবর কিছুতেই ভাবেন নাই।

লক্ষ্মীর সে রাত্রে চৈতন্যোদয় হইলে, সে প্রথমে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিয়া জলপান করিল। তারপর একটু সুস্থ হইয়া ভাবিল। সমস্ত ব্যাপারটা যে নটবরের সাজান ব্যাপার, তাহা বুঝিতে তাহার দেরী হইল না। তাহার মনই তাহাকে এ বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়াছিল, তবুও সে ভুল করিয়াছিল। এখন সে কি করিবে ? সত্যই কি নটবরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে ? লক্ষ্মী তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিল। সে বরং আত্মহত্যা করিবে। কিন্তু সে ত পরের কথা—উপস্থিত সে কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিবে ?

প্রভাত হইল। লক্ষ্মী প্রতিমুহূর্ত্তে আশঙ্কা করিতে লাগিল, নটবর আসিবে—তাহার উপর অত্যাচার সুরু হইবে। কিন্তু সে অপেক্ষা করিলেও নটবর আসিল না। দ্বিপ্রহরে ভট্‌চাজ আসিয়া ডাকিয়া আহার করিতে বলিল, লক্ষ্মী দ্বারও খুলিল না, আহারও করিল না। ভট্‌চাজ বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া, বহু মিনতি করিয়াও তাহাকে দিয়া দ্বার খুলাইতে পারিল না। সন্ধ্যা হইল—আবার রাত্রি আসিল। ভট্‌চাজ আবার আসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া আহারের জন্য সাধিল। কিন্তু লক্ষ্মীর অবিচলিত প্রতিজ্ঞা—দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ না করিলে কেহ তাহাকে পাইবে না। রাত্রিও গেল—নটবরের আগমন হইল না। পরদিন প্রাতেই কিন্তু নটবর আসিলেন। তিনি বাহির হইতে করাঘাত করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, কেন বৃথা আপনার নিগ্রহ কোরছো। এখন তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমার কাছে তোমার কোনও কষ্ট হবে না, কোনও কিছুই তোমাকে আমার অদেয় নাই। তোমার যে জাত-ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌লু'ম—এই কি তার প্রতিদান !"

লক্ষ্মী দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া রহিল—উত্তর দিল না।

নটবর পুনরায় বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় কথা। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিতে এখনি পারি। কিন্তু

আইনের জোরে তোমাকে ঘরেও আন্‌তে পারি। তা' জান, বুঝ। তুমি নির্বোধ নও। মুক্তি চাও কি? বল। আমি জোর কোরতে চাই না।"

লক্ষ্মী বলিল, "আমি একেবারে মুক্তি নেবো।"

নটবর একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "বেশ, আজ ও কাল দু'দিন তোমাকে সময় দিলুম। তুমি ভেবে চিন্তে দেখ। জোর কর্লে তুমি বাধা দিতে পারবে না, কিন্তু আমি জোর কর্ত্তে চাই না। আমি তোমার সহজ প্রীতি চাই। তুমি নিজের অবস্থা বেশ করে ভেবে-চিন্তে দেখ। নির্বোধের মত জেদ করে আত্মনিগ্রহ ও আত্মহত্যা করো না। কেমন রাজী ত?"

লক্ষ্মী উত্তর দিল, "আমি কোনকালেই রাজী হবো না। সে ভয় নাই।"

নটবর ক্রুদ্ধ হইলেন। তবুও আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, দুদিন ভেবে দেখ। তারপর যা হয় হবে। হঠকারিতা আমি কোর্‌তে চাই না।"

তিনি প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মীর ভাবনা কমিল না, বাড়িলও না। আত্মহত্যা সে করিবে বলিল বটে—কিন্তু তাহাও যে সে শেষ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে তাহা মনে হইল না।

সে ভাবিতে লাগিল, শঙ্কর কোথায়? সে কি সত্যই তাহাকে এই বিপদে ডাকিয়া আনাইয়া শেষে পলাইল। অবশ্য শঙ্করের মত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের সবই সম্ভব। লক্ষ্মীর পুনরায় শঙ্করের উপর অত্যন্ত ক্রোধ হইল। সে যদি দোষী নাও হয়—তবুও লক্ষ্মীর এ বিপদে সে কি করিতেছে? সে ত এই কলকাতাতেই আছে, অন্তত ছিল। জানিয়া শুনিয়াও কি তাহাকে এত উপেক্ষা করিতেছে? তা যদি হয় তবে নটবর কি দোষ করিল, নটবর হয় ত ভাল লোকই—লক্ষ্মী তাহার উপর অবিচার করিতেছে। নটবর বৃদ্ধ—তা হোক্—সেই কোন বালিকা মাত্র। অনেকেই ত দ্বিতীয় পক্ষকে বিবাহ করে। পুরুষ-মানুষ সবাই সমান—কাহারও উপর একান্তভাবে বিশ্বাস করা যায় না। নারীকে সকল পুরুষই একচোখে দেখে। সে ক্ষেত্রে নটবর আর শঙ্করে প্রভেদ কোথায়? লক্ষ্মী একলা চিন্তা করিতে করিতে বিচলিত হইল। আবার পর-মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল, এই রকম একলা রাখিয়া নটবর বুদ্ধির, চতুরতার পরিচয়ই দিয়াছে। মানুষ আপনার মনের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতে পারে না—এক না এক মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাগ্যকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। নটবরের এ বড় চতুরতা। লক্ষ্মীকে এইরূপে জয় করিতে কিন্তু সে পারিবে না—কিছুতেই নহে।

সেদিনও দিনরাত অনাহারে আপনার মনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পরদিন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইল। তাহার দেহও মনের শক্তি কমিয়া গেল। সে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। তখন তাহার মন আর ক্লান্ত হইয়া চিন্তা করিতে পারিল না। ভাগ্যকেই প্রবল ভাবিয়া সে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল। তাই সেদিন তখন ভট্‌চাজ নিয়মমত আহারের জন্য অনুনয় করিতে আসিল, সে তাহাকে ফিরাইল না। উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ভট্‌চাজ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে কম্পিত হইল। দুই দিনেই তাহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়াছে। সে ভাতের থালা নামাইয়া বলিল, "তুমি—না ভাল কোরছ না। ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে বার করে দেব—চুপি চুপি। কেমন?"

লক্ষ্মীর মনে আশার উদ্রেক হইল। সে এই প্রথম আহারে বসিল। যথাসম্ভব আহারের পর সে মুখ তুলিয়া দেখিল, ভট্‌চাজ তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বার করে দেবেন কবে?"

ভট্‌চাজ চুপি চুপি বলিল, "আজ—কাল, সুবিধে পেলেই। তা না গেলে তোমাকেও বিষ দেবে মিত্তিরজা! রাধারাণীর মত।"

লক্ষ্মী শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "রাধারাণী কে?"

ভট্‌চাজ একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর উত্তর দিল, "তা আমি কি জানি? মিত্তিরজাকে জিজ্ঞাসা করো। সে জানে। সে সব জানে। তারপর আর অপেক্ষা না করিয়া সে ভাতের থালা উঠাইয়া লইতে গেল। লক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণ হোয়ে আমার ভাতের এঁটো থালা উঠাতে হবে না আপনাকে। যান্ আপনি। আমি বার করে দিচ্ছি।" ভট্‌চাজ বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল বটে—কিন্তু কিছু বলিল না। উঠিয়া চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী দ্বার বন্ধ করিল। সেইদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নটবর পুনরায় আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "কি ঠিক করেছ, লক্ষ্মী?" লক্ষ্মী বলিল, "কিছু ঠিক কোর্‌তে পারি নি।"

এক কথাতেই উত্তর পাইয়া নটবর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ। ভেবে দেখ।"

লক্ষ্মীর মন অব্যবস্থিত হইতেছিল; সে এইবার বুঝিল, এইরূপে অনাহারে থাকিলে তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী। তাই সেদিন রাত্রেও ভট্‌চাজ আসিলে সে খাইতে দ্বিধা করিল না। ভট্‌চাজ তাহাকে করুণনেত্রে দেখিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া তাহা দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ বার করে দেবেন না? কবে দেবেন?"

ভট্‌চাজ চুপি চুপি বলিল, "আজ—কাল—সময় হোলেই।"

লক্ষ্মীর ইহাতে আর আশা হইল না। সে কহিল, "শীগ্‌গির না দিলে যে আমার সর্ব্বনাশ হবে!"

ভট্‌চাজ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের কথা লক্ষ্মীর বুঝিবার সাধ্য ছিল না। শেষে লক্ষ্মী মরিয়া হইয়া প্রশ্ন করিল "শঙ্করকে চেনেন?"

ভট্‌চাজ এইবার বিস্মিত হইল; কিন্তু উত্তর করিল, "চিনি। সেই যে বাঙলা আর শুভঙ্করী শিখ্‌তে আসে ত। তাকে বাঙলা শিখিয়েছি আমি—শুনবে—" হাত মাথা নাড়িয়া ভট্‌চাজ আরম্ভ করিল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীরচূড়ামণি, চলে যবে গেল যমপুরে—কোন বীরবরে—।"

লক্ষ্মী বিস্ফারিতনেত্রে দেখিতেছে দেখিয়া ভট্‌চাজ চুপ করিল।

লক্ষ্মী তখন জিজ্ঞাসা করিল, "শঙ্করকে গিয়ে খবর দিতে পারেন? আমার কথা? বলবেন যে আমার বড় বিপদ! পার্‌বেন?"

ভট্‌চাজ চুপ করিয়া রহিল। লক্ষ্মীর আহারাদির পর সে চলিয়া গেল।

পরদিন বেলা ৮টা নাগাদ ভট্‌চাজ আসিয়া দরজাতে শব্দ করিতেই লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?' উত্তর পাইয়া দরজা খুলিয়া প্রশ্নপূর্ণদৃষ্টিতে ভট্‌চাজের মুখের দিকে তাকাইল।

ভট্‌চাজ বলিল, "পালাবে ত পালাও। কেউ বাড়ী নেই—এই বেলা।"

লক্ষ্মী এতকাল পলাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু মুক্তির আকস্মিকতাতে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভট্‌চাজ ভগ্নস্বরে বলিল, "পালাও না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

লক্ষ্মী কোথায় পলাইবে? সে এই বিশাল কলিকাতার কি জানে? এই বিপদ হইতে বাহির হইয়া আবার কোন অজানা বিপদে আপনাকে ফেলিবে? সে নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ভট্‌চাজ ব্যথিত, শঙ্কিত, বিহ্বল হইল। তারপর কিছু না বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেই গলিতে অন্তর্হিত হইল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে লক্ষ্মীর চমক ভাঙ্গিল। তখন সে পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া ভট্‌চাজের জন্য চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। আজ সে সেই গলির পথে পা বাড়াইল, অনেকটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়াই। একটি এইরূপ গলির পর সে এক ছোট উঠানে পড়িল। কেহই তাহাকে বাধা দিল না। সেই উঠানের উপর দালান ও তাহার ব্যবহৃত অংশের অনুরূপ অংশ—ঠিক সেই রকম ঘর, একটি ছোট ঘর—ইত্যাদি। অবাক্ বিস্ময়ে সে চারিদিক দেখিয়া কাহাকেও প্রথম দেখিতে না পাইয়া দালানে উঠিয়া গিয়া সেই ঘরের ভিতর উঁকি মারিল। সেখানে সে দেখিল একটি ২৪।২৫ বছরের স্ত্রীলোক মাটিতে সতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়া রহিয়াছে। সে অগ্রসর হইতেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়া উঠিল ও সম্মুখে একটি মোড়া দেখাইয়া দিয়া মাটিতে রাখিয়া বলিল, "এই যে এসেছ, এসো, বসো!"

লক্ষ্মী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রীলোকটি একটি হাসিয়া বলিল, "একটু বস্‌লে কি তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে? ভট্‌চাজ গঙ্গাস্নানে গেছে—কখন আস্‌বে জানি না।" লক্ষ্মী আরও ভয়ে কঠিন হইল—এ পাগল নাকি? স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "এত লোক থাক্‌তে মিত্তিরের ও ভট্‌চাজের কাছে এসেছ কেন?" স্খলিতকণ্ঠে লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?" তাহার ভয় হইল এও তাহারই মত নটবরের কাছে নির্য্যাতিতা রমণী। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল ভট্‌চার্য্য রাধারাণীর নাম করিয়াছিল—এ সেই রাধারাণী

নয় ত? বিষ দিয়া ইহাকেই পাগল করে নাই ত? লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রাধারাণী?"

রাধারাণীর নামে স্ত্রীলোকটি পরম বিস্মিতের ভাব দেখাইল। তার পর সে আস্তে আস্তে শ্লথভাবে উচ্চারণ করিয়া বলিল, "হাঁ, আমি রাধারাণী।"

লক্ষ্মীর তখন সাহস ফিরিতে সুরু করিয়াছে। সে বলিল, "চল, আমরা পালাই!"

রাধারাণী ইহাতেও যেন স্তম্ভিত হইল। কিছুকাল বিমূঢ়ের মত থাকিয়া বলিল, "পালাবে? চল। টাকা আছে? আমার সব টাকা মিত্তির নিয়েছে। আর কিছু নেই।" লক্ষ্মী বলিল, "আমার আছে, চল।"

স্ত্রীলোকটি উৎসাহিতভাবে উত্তর করিল, "চল, চল। তবে আর দেরী না।" সে তখনই লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া অন্ধকারের পথে চলিল। কিন্তু ঘুরিয়া সে ও লক্ষ্মী আবার নিজের ঘর ও বারান্দাতে ফিরিল। বাহিরে যাইবার পথ পাইল না। সে বুঝিল—বাড়ীর নির্ম্মাণ বড় কৌশলের; ইহার ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া যায় না। অন্তত বাহিরের একটা পথ আছে—সে পথ না জানিলে বাহিরে যাওয়া অসম্ভব। সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। আবার চেষ্টা করিবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় পদশব্দ শুনিতে পাইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—নটবরের অনুনয়

পদশব্দে লক্ষ্মী ও রাধারাণী মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, নটবর। ভট্চাজের রকম দেখিয়া একটু পূর্ব্বে তাহার লোকেরা গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মী ও রাধারাণীকে একত্র দেখিয়া নটবর একটু চমকিত হইল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। লক্ষ্মীকে বলিলেন, "একে কোথায় পেলে, লক্ষ্মী?" লক্ষ্মী রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এইখানেই।" নটবর তখন রাধারাণীর দিকে ফিরিয়া কঠিনভাবে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রাধারাণী মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু লক্ষ্মী তাহাকে বাধা দিল, ধরিয়া রাখিল।

নটবর বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও, লক্ষ্মী। ও যাক্।"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে বলিল, "না।"

নটবর ভূমিতে পদাঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "না, ও যাবে। ওকে এদিকে কে আস্তে দিয়েছে? ভট্চাজ? দেখাচ্ছি তাকে তামাসা!"

ক্রোধে নটবরের মুখ বিকৃত ও বীভৎস হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীর মনে হইল এই লোকটি মনুষ্যের আকারে নারকী জীবমাত্র। সে রাধারাণীকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিল।

নটবর ডাকিল, "কে আছিস?" তখনই তিনচার জন লোক আবির্ভূত হইল, তাহাদের দেখিয়া লক্ষ্মীর মুখ শুকাইল, রাধারাণী কাঁপিতে লাগিল।

নটবর বলিল, "নিয়ে যা পাগলটাকে। আর ভট্চাজকে এখানে হাজির কর্।"

একব্যক্তি আসিয়া রাধারাণীকে ধরিল। লক্ষ্মী হতাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সে ইহাদের বিরুদ্ধে কি করিবে?

নটবর দাঁড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এইবার তোমার পালা! এতদিন ঢের সেধেছি—কিন্তু আর না। তুমি মনে করেছ কি? এখনও আমাকে চেন নি—না?"

লক্ষ্মী রুখিয়া বলিল, "কিন্তু আমি পাগল নই, কিছুই নই। সেটা মনে রাখ্বেন। আরও মনে রাখ্বেন যে ধর্ম্ম আছে, ঈশ্বর আছেন?"

নটবর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসি শেষ হইলে কহিলেন, "ধর্ম্ম? ঈশ্বর? আমার এত বয়সে আমি কিছুই দেখি নি। ও সব মেয়েছেলেদের আজগুবী কথা। এখন তোমার কি অভিপ্রায় বল। আমি পারতপক্ষে জোর-জবরদস্তি কোর্তে চাই না। কিন্তু দরকার হোলে সবই পারি—তা মনে রেখো।" তা'রপর হঠাৎ স্বর নামাইয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন, "কেন কষ্ট পাচ্ছ লক্ষ্মী, আর আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? সত্যি বিশ্বাস কর যে আমি তোমাকে কোনও কষ্ট দিতে চাই না। যেদিন তোমাকে প্রথম হরিনারায়ণের মৃত্যু-দিনে দেখি, সেইদিন থেকে চেয়েছি। আমার বয়স হোয়েছে—আমি ছেলে-ছোকরাদের মত অবুঝ নহি। ভেবে-চিন্তে দেখলুম, আমার তোমাকে প্রয়োজন। জীবনে অর্থ অনেক সঞ্চয় করেছি—কিন্তু সুখ পাই নি। সংসার করা আমার বৃথাই হোয়েছে।" নটবর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

লক্ষ্মী অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই নটবর আর পূর্ব্বমুহূর্ত্তের নটবর নহে। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিল না। পাছে কথাতে এই আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ পায় এইজন্য চুপ করিয়া রহিল। নটবর কিছুক্ষণ তা'র উত্তরের অপেক্ষাতে রহিলেন। তার'পর বলিলেন, "শঙ্করকে কি সত্য তুমি ভালবাস? সে না হলে কাকেও চল্‌বে না? তোমাদের মধ্যে ত বিধিমত বাগ্‌দান কিছু হয় নি?"

লক্ষ্মী বলিল, "না হোলেও তার সঙ্গেই বিবাহ হোতে পারে, অন্যত্র নয়!"

নটবর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সে যদি বিবাহ না করে? সে ত কোরবেই না—এটা স্থির জেনো। তা'হলে কি কোর্‌বে?"

লক্ষ্মী সে বিষয়ে চিন্তা করে নাই। সে তাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

নটবর বলিলেন, "নভেলে নাটকে যা ঘটে, জীবনে তা' ঘটে না, লক্ষ্মী। গল্প কথাতে সব শোভা পায়। কিন্তু তা' খাটে না কাজে। মনে কর শঙ্কর তোমাকে বিয়ে কোর্‌লে না একেবারে, তুমি গাঁয়ে ফিরে গেলেও কেউ ঘরে জায়গা দেবে না, পৃথিবীতে তোমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই—তা'র ওপর কুলোকের অসদভিপ্রায় আছে, অত্যাচার আছে, তোমার বয়সও অল্প—এই সব ভেবে কি মনে কর না যে আমার ঘর-করা তোমার পক্ষে গর্হিত কাজ কিছু হবে না, ভালই হবে? ভেবে-চিন্তে দেখ, মত স্থির কর। আমি তোমার জন্য আলাদা বাড়ী ঠিক করেছি—লোকে ত দুতিন বিবাহ করেই—সেটা এমন মহাপাতক নয়—তবে আমার কথার ভিতর অপরাধ কি?"

লক্ষ্মী ইহার কোথাও কোনও অপরাধ পাইল না। নটবরের যুক্তির ভিতর কোনও খুঁত ছিল না। খুঁত যা' ছিল তাহার নিজের মনে। নিজের মনকে সে রাজী কিছুতেই করাইতে পারিতেছিল না। সে নিরুত্তর রহিল।

নটবর কিছুকাল পরে বলিলেন, "বেশ করে ভেবে দেখ। কাল একটা ব্যবস্থা করে ফেল, লক্ষ্মী। এ বাড়ীতে তোমার আর থাকা চলে না। এ দুর্বৃত্তদের বাসা। আর এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও অন্য পথ তোমার নেই। আমি কাল প্রাতেই আস্‌বো—না হয় আজই সন্ধ্যাতে আস্‌বো। তুমি প্রস্তুত থেকো। শঙ্করকে তুমি ভালবাসতে—তা'তে অপরাধ নেই। আমাকে শ্রদ্ধা করা বা ভালবাসার কথাও আমি তোমার উপর জোর কোরে বল্‌তে চাই না। অন্য কোনও দাবী কোর্‌তে চাই। শুধু তুমি আমার স্ত্রী—সেই কথাই মেনে নেব। তুমিও নাও। এতে তোমার ভাল ছাড়া মন্দ হবে না।"

নটবর তাহাকে একলা রাখিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সে একবার ভাবিল যে ডাকিয়া বলে, সে প্রস্তুত। কিন্তু লজ্জাতেই প্রায় আপনাকে সংযত করিল। শুধু বলিল, "আপনি ত সব বল্‌লেন। আমি দু একটা কথা জিজ্ঞেস করি—সত্য উত্তর দেবেন।"

নটবর কহিলেন, "বল।"

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, "এই পাগল স্ত্রীলোকটি কে? উহার সহিত আপনার কি সম্বন্ধ?"

নটবর একটু ভাবিয়া বলিল, "আজ নয় লক্ষ্মী, দুদিন পরে তুমি যখন আমার গৃহে গৃহিণী হবে, তখন সব তোমাকে খুলে বল্‌বো। তোমার কাছে কিছু লুকাবো না।" তাহার কথার ভিতর প্রতারণার কোনও উদ্দেশ্যের চিহ্ন লক্ষ্মী পাইল না।

নটবর আরও একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীর মনকে বড়ই অব্যবস্থিত করিয়া রাখিয়া গেলেন, লক্ষ্মী যেন আর কিছুতেই ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল না। তবে সে মনে মনে স্থির করিল, ভাল করিয়া সব না জানিয়া শুনিয়া, তাহার প্রকৃত অবস্থা কি তাহা পরিশেষে না বুঝিয়া সে কিছুতেই নটবরকে আত্মসমর্পণ করিবে না।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম্-এ

শস্য বিক্রি না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষক শস্য উৎপাদন করিবার জন্য যে টাকা ব্যয় করে তাহা তাহার হাতে ফিরিয়া আসে না। অথচ শস্য উৎপাদন করিবার জন্য এবং নিজের ও পরিবারের লোকজনের ভরণপোষণের জন্য তাহার অর্থের প্রয়োজন। যদি সে সঙ্গতিপন্ন হয় তাহা হইলে নিজস্ব মূলধনের সাহায্যেই এই সব ব্যয়ভার বহন করিতে পারে। কিন্তু সে যদি অবস্থাপন্ন না হয় তাহা হইলে কৃষিকার্য্য ভালমতে চালাইবার জন্য অন্যের নিকট হইতে তাহার টাকা ধার করার প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা একেবারেই সচ্ছল নহে। তাই কৃষককে বাধ্য হইয়াই ঋণ গ্রহণ করিতে হয়।

মোটামুটি ভাবে এই কথা বলা চলে যে তাহার দুইপ্রকার ঋণের দরকার। প্রথমতঃ, ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য তাহার অল্পকালের মেয়াদে টাকা ধার করা প্রয়োজন। বীজ, সার, হাল ইত্যাদি ক্রয়, জমি কর্ষণ করিবার জন্য সকল প্রকার আনুসঙ্গিক খরচ যোগান এবং পরিবার প্রতিপালন করার জন্য তাহার টাকা চাই। এই প্রকার ঋণ সে সাধারণতঃ ফসল বিক্রি হওয়ার সাথে সাথেই পরিশোধ করিতে পারে এবং তাহা করাও উচিত; অর্থাৎ শস্য-উৎপাদন করিতে অল্প সময়ের জন্য তাহাকে দেনা গ্রহণ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকালের জন্য টাকা ধার করিবার প্রয়োজনও তাহার আছে। সে যদি জমি বা কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বা পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে চায় অথবা জমির বা কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি-প্রয়াসী হয় তাহা হইলে তাহাকে দীর্ঘকালের জন্য টাকা ধার করিতে হইবে। কারণ এই প্রকার ঋণ সে কিস্তি হিসাবে তাহার বর্দ্ধিত কৃষিজ আয় হইতে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে পারে।

কৃষকদের অল্প সময়ের জন্য যে টাকার দরকার তাহা যোগাইবার পক্ষে কৃষি-ঋণ-দান সমিতিগুলিই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। আমরা এই কথা বলিতে চাহি না যে বঙ্গের ক্রেডিট্ সোসাইটীগুলি কৃষকের অল্প সময়ের জন্য যত টাকার দরকার তাহা সম্পূর্ণভাবে যোগাইতে সক্ষম। আমরা জানি যে এই সমিতিগুলির উন্নতির ও প্রতিষ্ঠার পথে অনেক অন্তরায় ও অসুবিধা আছে।

তবু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে কৃষকদের প্রথম-প্রকারের ঋণদানের পক্ষে এইগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিষ্ঠান নাই এবং আশা করা যায় যে কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের অল্পমেয়াদী ধারের অসুবিধা দূর হইবে।

কিন্তু ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের কৃষকদিগকে অল্প সুদে দীর্ঘ সময়ের জন্য টাকা ধার দিবার মত অধিক-সংখ্যক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। মহাজনগণ বা লোন কোম্পানীগুলি অবশ্য কৃষকদিগকে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহাদের সুদের হার খুব উচ্চ। তাই এই প্রকার ঋণদ্বারা কৃষিজ আয় বর্দ্ধিত হইলেও তাহার অধিকাংশই সুদ দিতে ব্যয় হইয়া যায়। আবার এই প্রকার ঋণদ্বারা কৃষিজ আয় বর্দ্ধিত হইতেছে কি না তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু মহাজন বা লোন-কোম্পানী সন্তোষজনক বন্ধক পাইলেই টাকা দিতে স্বীকৃত। এই টাকার সাহায্যে কৃষকের আর্থিক উন্নতি হইতেছে কি না এই প্রশ্ন তাহাদের চিন্তনীয় নহে।

১৮৮৩ সালের Land Improvement Loan's Act অনুসারে গভর্ণমেণ্ট ২০ বৎসরের জন্য শতকরা ৬¼ টাকা হারে কৃষিকার্য্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে টাকা ধার দেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কৃষক অতি সামান্য টাকাই সরকারের নিকট হইতে ধারস্বরূপ পাইয়াছে। আবার গভর্ণমেণ্ট কৃষকের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে টাকা ধার দিবেন না এবং এ জন্য এই আইন সত্ত্বেও কৃষকের যথার্থ উন্নতি অসম্ভব।

কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অথচ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘকালের জন্য অল্প সুদে প্রচুর পরিমাণ আমানত

টাকা পায় না। তাই দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দেওয়া ক্রেডিট্ সোসাইটীগুলির পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। আর যৌথ ব্যাঙ্কগুলি তো জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবেই না।

তাই বলিতেছিলাম যে বাঙ্গালাতে দীর্ঘকালের জন্য কৃষকদিগকে ঋণদান করিবার মত কোন উপযুক্ত ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান এতদিন পর্য্যন্ত ছিল না। অথচ এই প্রকার ঋণ না পাইলে দরিদ্র কৃষক তাহার কৃষিজ আয় বাড়াইতে পারে না। এই অভাব দূর করিবার জন্য নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনেক কাল যাবত অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন। ইউরোপের নানা দেশেই Land Mortgage Bank কৃষকদিগকে এই প্রকার সাহায্য করেন। Land Mortgage বা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজ হইতেছে—জমি বন্ধক রাখিয়া স্বল্পসুদে দীর্ঘকালের জন্য টাকা ধার দেওয়া ও ছোট ছোট কিস্তি হিসাবে খাতককে টাকাটা পরিশোধ করিবার সুযোগ প্রদান করা। এইজন্য এই প্রকার ব্যাঙ্ক অল্পসময়ের জন্য টাকা আমানত লইয়া কারবার চালাইতে পারে না। বহু বৎসর মেয়াদী "ডিবেঞ্চার" বিক্রয় করিয়াই ইহারা মূলধন সংগ্রহ করে এবং এই ব্যাঙ্কসমূহ যে শ্রেণীর কারবার করে তাহা বিবেচনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে "ডিবেঞ্চার" বাহির করিয়া টাকা যোগাড় করাই এই ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে প্রশস্ত এবং ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ও বোধ হয় নাই।

অন্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালাতেও আপাততঃ পরীক্ষার হিসাবে পাঁচটী জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির প্রধান উদ্দেশ্য সঙ্গতিপন্ন কৃষক, ছোট ছোট ভূস্বামী ও স্বল্পঅর্থশালী ব্যক্তি—অর্থাৎ যাহারা কৃষিজ আয় হইতে নিজ সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সুদ ও কিস্তির টাকা নিয়মিতভাবে দিতে পারিবে—এই প্রকার লোকদিগকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য টাকা ধার দেওয়া :—

(ক) পুরাতন ঋণ পরিশোধ ;

(খ) জমি বা কৃষি পদ্ধতির উন্নতি সাধন ;

(গ) ক্ষেত্রের সুবিধা বা কৃষিকার্য্যের ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে নূতন জমি ক্রয়।

প্রথমতঃ আমরা এই ব্যাঙ্কগুলির গঠন পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সমস্ত খাতকদিগকে ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে ও শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে। শেয়ার বা অংশ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে ও ব্যাঙ্কের সঞ্চয় ভাণ্ডারে যে টাকা থাকিবে, তদুভয়ের ২০ গুণ টাকা ব্যাঙ্ক ধার করিতে পারিবে। যতদিন কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের একটী স্বতন্ত্র জমিবন্ধকী বিভাগের সহিত যুক্ত থাকিবে এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কই "ডিবেঞ্চার" বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিবে এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে ধার দিবে। যতদিনের জন্য "ডিবেঞ্চার" বাহির করা হইবে ততদিনের সুদের জন্য সরকার দায়ী থাকিবেন।

সভ্য যত টাকার শেয়ার ক্রয় করিবে, তাহার ২০গুণ পর্য্যন্ত টাকা ধার করিতে পারিবে। তবে সাধারণতঃ কাহাকেও ২৫০০৲ টাকার অধিক ধার দেওয়া হইবে না। যে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া হইবে তাহার মূল্যের শতকরা ৫০৲ টাকার অথবা যে সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হইবে সেই সময়ের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের শতকরা ৭৫৲ টাকার অধিক ঋণস্বরূপ দান করার ক্ষমতা কোনক্রমেই ব্যাঙ্কের থাকিবে না। আবার প্রত্যেক খাতককে দুইজন সদস্য জামীন দিতে হইবে এবং কিস্তি অথবা বার্ষিক হিসাবে ২০ বৎসরের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিবার সর্ত্ত থাকিবে।

এখন আমরা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে কয়েকটী মোটা কথা আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গভর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্ক কৃষকদের মধ্যে স্বপ্রচেষ্টায় উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিবে না। যৌথ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক কৃষকদের যথার্থ উপকার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অশিক্ষিত ও অপরিণামদর্শী কৃষককে শুধু অল্প সুদে দীর্ঘকালের জন্য টাকা ধার দিলেই তাহার প্রকৃত উপকার করা হইবে না। সেই টাকা তাহার কৃষিজ আয় বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতেছে কি না সেই দিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি। সমবায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে বলিয়া অনেকেই আশা করেন। সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক সন্তোষজনক ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আমাদেরও

বিশ্বাস। সুতরাং এই প্রকার জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কৃষি-ঋণদানসমিতিগুলির মত এই ব্যাঙ্কগুলি সমবায় নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। কারণ অংশীরা স্ব স্ব অংশের মূল্য অপেক্ষা অধিক টাকার জন্য দায়ী নহেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে প্রত্যেক খাতককে ব্যাঙ্কের অংশীদার ও সভ্য হইতে হইবে এবং দুইজন সদস্য জামীন দিতে হইবে। এই জন্যই নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক গুলিকে সমবায় অনুষ্ঠানের পর্য্যায়ে ফেলা হয়।

গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কোন দেশেই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই; আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের অধিকাংশ মূলধন "ডিবেঞ্চার" বাহির করিয়াই সংগ্রহ করিবে। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত "ডিবেঞ্চার" জনপ্রিয় হইবে না। তবে এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "ডিবেঞ্চার" খরিদ বা 'ডিবেঞ্চারে'র সুদ এবং আসলের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার দরকার নাই বলিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মতপ্রকাশ করিয়াছেন। যতদিনের "ডিবেঞ্চার" বাহির করা হইবে ততদিনের সুদের জন্য সরকার দায়ী থাকিলেই চলিবে এবং এই দায়িত্ব বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আজকাল স্বল্প-অর্থশালী লোক তাহাদের সঞ্চিত টাকা দ্বারা Postal Cash certificate ক্রয় করিয়া থাকেন। Insurance Company গুলিও সুবিধাজনকভাবে টাকা খাটাইবার বন্দোবস্তের অভাবে অল্পবিস্তর কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া থাকে। আবার অনেক সাবধানী সঞ্চয়ী তাহাদের অর্থ এমনভাবে খাটাইতে চান যে তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সুদ পান এবং যখন ইচ্ছা টাকাটা উঠাইয়া নিতে পারেন। এই তিন শ্রেণীর লোকের নিকট এই প্রকার "ডিবেঞ্চার" খরিদ লাভজনক ও নিরাপদ মনে হইবে।

সরকার অন্যভাবেও নূতন জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিতেছেন। কিছুকাল ব্যাঙ্কগুলির সকল ব্যয় সরকারই বহন করিবেন এবং সরকারের লোক ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন করিবেন। আবার ডিবেঞ্চার-গুলিকে Trustee Security'র শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। তাই জীবনবীমা কোম্পানীর পক্ষে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ক্রয় করার আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না এবং "ডিবেঞ্চার" খরিদকারীরা দরকার মত "ডিবেঞ্চার" আমানত রাখিয়া Imperial Bank বা অন্যান্য Joint Stock Bank হইতে সহজেই টাকা ধার করিতে পারিবে। এইভাবে নানা প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া ও সাহায্য প্রদান করিয়া বাঙ্গালার সরকার শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনা করিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন এবং কৃষক শ্রেণীর প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার দেওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; যাহাতে যথাসময়ে সুদ ও কিস্তির টাকা আদায় হয় এবং খাতক যথেচ্ছভাবে অন্য স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে না পারে সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা হইবে। অনেকের মনে হইতে পারে যে এইপ্রকার 'অতিরিক্ত' সতর্কতার ফলে ব্যাঙ্ক আশানুরূপ দ্রুতগতিতে কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব ও 'ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের' স্বার্থ সংরক্ষিত করিয়াই দীর্ঘকালীন শোধের মিয়াদে টাকা ধার দেওয়া হইবে এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ধার দেওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন এবং কিস্তির টাকা যথাকালে আদায় ব্যতীত জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কিছুতেই সুচারুরূপে ও লাভজনকভাবে কাজ করিতে পারিবে না। পাঞ্জাবে যথেষ্ট কড়াকড়ি সত্ত্বেও ১৯২৯-৩০ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত শতকরা ৩৯জন খাতক সময়মত কিস্তির টাকা দেয় নাই। আমাদের প্রদেশেও যদি কর্ম্মচারীদের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের ত্রুটির জন্য পাঞ্জাবের অবস্থার পুনরভিনয় হয় তাহা হইলে এই ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন দেখা দিবে।

তাই আমাদের মনে হয় না যে—যদিও এ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদিগকে প্রচুর পরিমাণে টাকা ধার দিতে পারে নাই—তবু ইহাদের ভবিষ্যৎ আশাশূন্য। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক যে আর্থিক সমস্যার সমাধান করিবে তাহা একদিনে বা অল্প সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। এক কথায় এই সব আর্থিক ব্যাধির প্রতিকারও সময়-সাপেক্ষ। আর এই কথা ভুলিলে চলিবে কেন যে নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহ পরীক্ষার হিসাবেই স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের ঋণদান নীতি যে

সাবধানতা ও সতর্কতাযুক্ত হইবে তাহা অসম্ভব নহে। কারণ এই পরীক্ষার সাফল্যের এবং সন্তোষজনক ফলের উপর বাঙ্গালার কৃষি ও কৃষকের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। দীর্ঘকালে শোধের মেয়াদে টাকা ধার দেওয়ার উদ্দেশ্য—কৃষকদের স্থায়ী উন্নতিসাধন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করা না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি অসম্ভব। ঋণগ্রস্ত কৃষকের কৃষিজ আয় বর্দ্ধিত করিবার আকাঙ্ক্ষা খুবই অল্প। কারণ তাহার সর্ব্বদাই এই ভয় থাকে যে জমির বা কৃষিপদ্ধতির উন্নতির আয় হয়ত দেনাদারই ভোগ করিবে। দ্বিতীয়তঃ এই অবস্থায় তাহার পক্ষে নূতন ঋণশোধের জন্য রীতিমত কিস্তি দেওয়া এক সমস্যা। আবার তাহাকে ব্যাঙ্কের নিকট জমি বন্ধক রাখিয়াই ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন বিশেষতঃ পুরাতন জমি বন্ধকী ঋণ পরিশোধ না হইলে সেই জমি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবে না। তাই প্রথমাবস্থায় ব্যাঙ্কের খাতকগণ যে টাকা ধার নিবে তাহার অধিকাংশই পুরাতন ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে এবং এই ঋণভার লাঘব হইলেই ব্যাঙ্কের টাকা কৃষিজ আয় বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে।

কিন্তু এইস্থানে আর একটি কথা বলা দরকার। নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহ 'ক্ষুদ্র' অথবা দেউলিয়া কৃষকদিগকে আপাততঃ কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। অথচ এই প্রকার কৃষকের সংখ্যাই বাঙ্গালাতে অধিক। আমাদের মনে হয় যে তাহাদের আর্থিক উন্নতির পথের প্রথম সোপান —ঋণ সালিসি সমিতি (Debt Conciliation Board) ও একটি Rural Insolvency Actএর সাহায্যেই নির্ম্মিত হইবে। এইভাবে তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইলে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে।

জমিদারবর্গ ও মহাজনদিগের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহায়তা ব্যতীত জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা দেখা গিয়াছে যে যদিও এই পর্য্যন্ত "ডিবেঞ্চার" বাহির করা হয় নাই, তথাপি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত সমস্ত টাকা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক শতকরা ৯½ সুদেও কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিতে পারিতেছে না। যে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করা হইবে তাহার সমস্ত অংশীদারগণ জমি বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইতেছে না। এই কারণে ব্যাঙ্ক অনেক দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে এবং অনেক উপযুক্ত খাতক টাকা ধার করিতে পারিতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিতে হইলে এই প্রকার কৃষকদিগকে যৌথ সম্পত্তি (Joint property) হইতে তাহাদের অংশ বিভক্ত করিবার জন্য সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করা দরকার। আমাদের মনে হয় যে যদি জমিদারগণ এই শ্রেণীর কৃষককে সহজে, অল্পসময়ে এবং কোন ফিস (Mutation Fee) গ্রহণ না করিয়া তাহার অংশ বিভাগ করিতে সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া সহজ হইবে।

জমিদারগণ অন্যভাবেও তাঁহাদের সহৃদয়তার পরিচয় দিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আপাততঃ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্যই টাকা ধার দেওয়া হইতেছে। প্রথমতঃ মহাজন কত টাকা নগদ গ্রহণ করিয়া কৃষককে ঋণ মুক্ত বলিয়া স্বীকার করিবে ইহা স্থির করা হয়। এই জন্য মহাজনের ঔদার্য্য ও ১৯৩৩ সালের Bengal Money Lenders Actএর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়। তারপর স্থিরীকৃত টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক কৃষককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু যাহাতে বন্ধকী জমির উপর জমিদারের কোন দাবী না থাকে সেই জন্য তাহার প্রাপ্য সমস্ত খাজনা পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য কৃষককে বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে সহজেই বাকী খাজনা জমিদারের হাতে আসিতেছে। এই কথা বিবেচনা করিয়া যদি জমিদারগণ বাকী খাজনার নালিশের জন্য ক্ষতিপূরণ বা সময়মত খাজনা না দেওয়ার জন্য কৃষকদের নিকট সুদ দাবী না করেন তাহা হইলে তাহাদের খুব উপকার হয়। এক কথায় আমরা বলিতে চাই যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক যে সকল দরিদ্র কৃষকের আর্থিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত।

অবশ্য আমাদের বক্তব্য ইহা নহে যে নূতন জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইবার জন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তন

অনাবশ্যক। কিন্তু তাহাদের দোষ-ত্রুটির আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব না। তবে ইহা ঠিক—যে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে বাঙ্গালার কৃষকদের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অধিকসংখ্যক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক কার্য্যকরী অবস্থায় থাকা দরকার। তাহা না হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ইহাদের প্রভাব একেবারেই আশানুরূপ হইবে না। তবে আমাদের মনে হয় যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা শুধু তাহাদের কার্য্যের পরিমাণের পরিমাপ (Quantitative standard) দ্বারা নিরূপণ করা ঠিক নহে। ইহাদের কার্য্যের গুণের পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ (Qualitative analysis) ও দরকার। গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় Court of wardsএর অধীনে থাকিয়া অনেক ভূস্বামীর সম্পত্তির ঋণশূন্য হওয়ার পরও আবার ভূস্বামীদের পরিচালনায় ঋণগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে। সেইভাবে ব্যাঙ্কের সাহায্যে পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিয়া কৃষক আবার যদি অধিকতর ঋণজালে জড়িত হয় তবে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সার্থকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে—সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে ইহাও মনে রাখা দরকার যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক বাঙ্গালার কৃষকদের সকলপ্রকার আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে অবশ্যই পারিবে না। এই প্রদেশের লোক-সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি, অধিকাংশ প্রদেশবাসীর কৃষি-কার্য্যের উপর জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নির্ভরতা, বৃষ্টিপাতের সহিত কৃষিকার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শ্রমজীবীদের স্বল্প-পরিশ্রমিক, যানবাহন ও গমনাগমনের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি সমস্যাও বাঙ্গালার কৃষকের বর্ত্তমান অবনতির কারণ। ইহা বলাই বাহুল্য যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক এইপ্রকার সকল সমস্যার প্রতিকার করিতে অসমর্থ। তবু কৃষকদের একশ্রেণীর আর্থিক ব্যাধির প্রতিকারার্থে এবং অসুবিধা দূরীকরণার্থ এইপ্রকার ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতা ও দক্ষতা ইউরোপের নানা দেশেই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং সেইদিক হইতেই বাঙ্গালার কৃষকের প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে এই জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কাম্য। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাঙ্গালার আর্থিক নবজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রয়াস অবলম্বিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

খাস্-মুন্সীর নক্সা

৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়—পাঠ্যাবস্থা

ইতিমধ্যে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীটিরও বিবাহ হইয়া যায়। কলিকাতায় তাহার বিবাহ হয় বটে, কিন্তু আমার ভগিনী-পতি অত্যন্ত কঠোর স্বভাব ছিলেন। শুনিয়াছি, বিবাহের পর লইয়া গিয়াই সেই দুষ্ট ভগিনীপতি আমার ভগিনীর উপর নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিল। বিবাহের পরবর্ত্তী শীতকালে দাদামহাশয় কোনও সূত্রে কলিকাতায় গমন করিয়া ভগিনীটীকে আনয়ন করেন। এক মাস কাল আমাদের নিকটে ছিল, তৎপরে পুনরায় আমায় গিয়াই তাহাকে সেই পাষণ্ডের নিকট পঁহুছাইয়া আসিতে হয়। ভগিনীটীর মমতায় সেই পাষণ্ডের আলয়ে অবস্থিতি, তাহার অন্নজলগ্রহণ এবং তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিতে হইল। কি করি, নিরুপায়। কন্যা অথবা ভগিনী দিলেই আমাদের সমাজের নিয়মানুসারে খাটো হইতেই হইবে। এই সকল সমাজ-বিভ্রাটের কারণেই রাজপুত ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের তেজস্বী স্বভাববশতঃ কন্যাহনন করিতেন। সময়ে সময়ে বাস্তবিকই অপমান অত্যন্ত অসহ্য হইয়া পড়ে। আমাদের সদাশয় গবর্মেণ্ট অতি কঠিন কন্যা-হনন আইন (Infanticide Law) প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ক্ষত্রিয়দের

মধ্যে এ কার্য্য এখনও বিলক্ষণ চলে। এ বিষয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক; সুতরাং সময়মত ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

এই বৎসর আমি যেন তেন প্রকারেণ এফ্-এ পাশ হই এবং কাশীর কলেজেই বি-এ পাঠ আরম্ভ করি।

আমার ব্রাহ্মণীর সহিত ভগিনীর অত্যন্ত প্রীতি হয়। আমাদের সমাজে ননন্দা ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে যেরূপ বিরোধ ও বিসংবাদ হইয়া থাকে, তাহা আদবেই ছিল না। কিন্তু এ প্রীতি বিধাতা অনেক দিন থাকিতে দেন নাই। ভগিনী যখন কাশীতে পিতার নিকট আসিয়াছিল, তখন পিতৃদেবের নিকট আবদার করিয়া একছড়া স্বর্ণ চিক চাহিয়াছিল। পিতা পরবর্ত্তী শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে অতি কষ্টে ৬০৲।৭০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আমাদের অবস্থানুযায়ী এক ছড়া চিক প্রস্তুত করাইলেন এবং আশ্বিন মাস পড়িতেই মাতৃহীনা ভগিনীটী পূজার সময় তাহার সাধের জিনিসটী অঙ্গে ধারণ করিবে বলিয়া তাহার শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চিক পাঠাইবার এক মাস দেড় মাস পূর্ব্ব হইতেই সে দুঃখিনীর পত্রাদি আসা বন্ধ হয়। আমি ও পিতৃদেব অনেকগুলি পত্র তাহাকে লিখি, কোনও পত্রেরই উত্তর পাই নাই। চিক পার্সেল করিয়া পাঠাইলাম; পত্রও সেই সঙ্গে গেল। পার্সেলটা দিব্য লওয়া হইল, কিন্তু পত্রের উত্তর নাই। শঙ্কিত-হৃদয়ে আশ্বিন মাস কাটিয়া গেল। কার্ত্তিক মাস পড়িল। ভগিনীর কোনও সংবাদই পাই না। পিতৃদেবের চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। তিনি আমায় এক দিবস ভগিনীর এক খুড়তত ভাশুর ছিলেন—তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। এই লোকটী অতি সজ্জন। তিনি এক সময়ে বায়ুপরিবর্ত্তনমানসে আমাদের বাটীতে মাসাবধি বাস করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ প্রীতি হয়। তাঁহাকে আমি পত্র দিলাম। অগ্রহায়ণের প্রারম্ভে পত্রের উত্তর পাইলাম। তাহাতে এই নিদারুণ কথা লিখিত ছিল :—"your sister is no more." তোমার ভগিনী ইহজগতে নাই। এই শোকাবহ সংবাদ পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত। পিতৃদেবকে কি বলিব তাই ভাবিতেছি। পিতৃদেব প্রত্যহ ডাকের পথ দেখেন। পত্র আসিলেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িয়া বক্ষঃস্থল চাপড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা ভার হইল। বর্ষা ঋতুর সময় হঠাৎ বেগবতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিলে কাহার সাধ্য সে স্রোতের মুখে দাঁড়ায়, অথবা সে জল আটক করে? আমার দুঃখী পিতার আজ ঠিক সেই অবস্থা। ৬০।৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ মাতৃহীনা অশেষবিধকষ্টে প্রতিপালিতা কন্যাটীর জন্য হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ করিতেছেন। মাতৃদেবীর অকালমৃত্যু, আমাদের ও শিশু ভগিনীটীর কষ্ট দেখিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাটী আগমন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আমাদের বাল্যকালে প্রতিপালন, সেই সকল কষ্টের কথা একে একে তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল এবং তিনি শোকে অভিভূত হইয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর এক এক বার আমার নাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অমুক বাবা, আমার বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দে, আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি অতিকষ্টে সেই মাতৃহীনাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম। মৃত্যুকালে তাহাকে একবার দেখিতেও পাইলাম না—।" আমি পিতৃদেবের এই অবস্থা দেখিয়া নিজের ক্রন্দন ভুলিয়া গেলাম এবং নানারূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে বেগ রুদ্ধ করে, কাহার সাধ্য। জানি না, আমার নিষ্কলঙ্ক, সারল্যের আধার, শিবতুল্য পিতৃদেব কি পাপ করিয়াছিলেন, যাহার কারণ বৃদ্ধ বয়সে এরূপ কষ্ট পাইলেন।

এই পত্র-প্রাপ্তির কিছুদিন পরে লোকপ্রমুখাৎ শুনিতে পাওয়া গেল যে আমার সেই পাপিষ্ঠ নরাধম ভগিনীপতি শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসে কোনও কারণে আমার ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। কি দোষ করিয়াছিল, যাহার জন্য তাহাকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হয় তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা কেহ জানিতে পারি নাই। পরম্পরায় শুনিয়াছি, এই ঘটনায় পুলিসের মহা হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। ভগিনীপতি মহাশয়ের ৫০০৲।৭০০৲ টাকা খরচ হয় এবং গ্রামস্থ প্রবল জমীদারদের সাহায্যে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই সকল কারণে তাহারা কেহই আমাদের ২।৩ মাস ধরিয়া পত্র দেয় নাই। পাছে এই খুনে মকর্দ্দমা লইয়া আমরা কোনরূপে তাহাদের দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করি।

আমার পিতৃদেব অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব আদবেই কোপন ছিল না। এই নিদারুণ দুহিতৃহত্যার সংবাদ পাইয়া মহাদেবেরও পদস্খলন হইয়াছিল। তিনি একদিন আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমরা গরীব লোক, আমাদের সঙ্গতি নাই; তাই সে (জামাইয়ের নাম করিয়া) আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়া অব্যাহতি পাইল। আমি ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া তোকে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, তুই একবার সেখানে গিয়া জেলার হাকিমের কাছে এ সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া তাহাকে জব্দ করিতে পারিস? সে আমার নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বালিকা কন্যাকে হত্যা করিয়াছে; তাহার কোনও শাস্তি হইবে না?" তাঁহার এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমি অশ্রু-রুদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে পরামর্শচ্ছলে অনেকরূপ বুঝাইলাম এবং পরে যখন বলিলাম, "বাবা, আপনি বুঝিয়া দেখুন, সে স্থলে আমরা বিদেশী; গ্রামস্থ লোক, এমন কি জমীদার পর্য্যন্ত সকলেই তাহাদের পক্ষ। সুতরাং সেখানে আমাদের সফল হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। এতদ্ব্যতীত এ কাণ্ড আজ দুই তিন মাস হইল হইয়াছে; এতদিন পরে প্রমাণ সংগ্রহ করা অতি কঠিন কথা।" পিতৃদেব বহুকাল জজের আদালতে কার্য্য করিয়াছিলেন, আইন ইত্যাদি অনেক-পরিমাণে বুঝিতেন। ভাবিয়া বলিলেন, "তুই ঠিক কথা বলিতেছিস।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমরা শাস্তি অথবা দণ্ড দিবার কে? সে আমার অসহায়া ভগিনীকে এরূপ পৈশাচিকভাবে যখন হত্যা করিয়াছে, ভগবান তাহাকে দণ্ড দিবেন। পিতার শাস্তি দিবার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল। তিনি অতি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তবে দুহিতৃবিয়োগজনিত শোকে মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

আমাদের স্বদেশবাসীরা পশ্চিমোত্তরদেশবাসী বাঙ্গালীদের একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং "উপো" বাঙ্গালী বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ভগিনীর মৃত্যুর পর সে সংবাদ গোপন রাখিয়া চিক ছড়াটী পরিষ্কার উদরস্থ করা বোধ হয় অতি উচ্চদরের আদর্শ।

পরবৎসর ১৮৮০ সালে আমার প্রথমা কন্যা জন্মে। এ কন্যাটী পিতার বড়ই আদর ও স্নেহের পাত্রী হইয়াছিল। ইহার দ্বারা তিনি কতকটা দুহিতৃ-বিয়োগজনিত শোকের অপনোদন করেন। ভগবানের লীলা অপার! আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব। তাঁহার লীলা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। একটীকে কাড়িয়া লইয়া অপরটীকে যেন পূর্ব্বশোক ভুলিবার জন্য দিলেন। তবে আমার পক্ষে এই প্রথম কন্যার জন্ম অত্যন্ত চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। একে আমাদের অবস্থা মন্দ, তাহাতে আমার পাঠ্যাবস্থা, এক পয়সা আনিবার ক্ষমতা নাই, তদুপরি এই কন্যার জন্ম। কন্যা পার করা আমাদের সমাজে যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষতঃ যদি ভাল লোকের হস্তে না পড়ে, তাহা হইলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা স্বচক্ষেই স্বীয় ভগিনীর ভাগ্যতেই বিলক্ষণ দেখিলাম। তখন হইতেই আমার মনে নানারূপ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিলে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার বিলক্ষণ ভুক্তভোগী হইলাম। এতদ্ব্যতীত আমাদের "ঠাকুরমা"-রূপিণী গৃহিণীর কোপ আমার ব্রাহ্মণীর প্রতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নানারূপ দুশ্চিন্তায় আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইতে লাগিল। মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। মনের বেদনা কাহাকেও জানাইয়া যে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইব, এরূপ লোক ছিল না। সে সময় আমার নিভৃতে রোদন ভিন্ন অন্য গতি ছিল না। ফল কথা, আমি এফ্. এ. পাস হইবার পর ২।৩ বৎসর অত্যন্ত মানসিক কষ্টে কাটাই। আমার ব্রাহ্মণীর দুর্দ্দশা ইহা অপেক্ষাও অধিক। ফল হইল যে, প্রথমবার বি. এ. পরীক্ষায় ফেল হইলাম। কষ্টের উপর কষ্ট, কি করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তখন এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, একবার ফেল হইলে পরবর্ত্তী বৎসরে কেবল ছয় মাস মাত্র পাঠ করিয়াই পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারিত। এই নিয়মানুসারে আমি আর কলেজে ভর্ত্তি হইলাম না। গৃহেই পুরাতন পাঠ দেখিতে লাগিলাম। ইচ্ছা ছিল, বৃদ্ধ পিতার যতটুকু পারি ভার লাঘব করি। কিন্তু ভগবান আমায় আর গৃহে থাকিতে দিলেন না। ১৮৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে "ঠাকুরমা" আমার উপর এরূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন যে তাহা অসহ্য হইল। আমি গৃহত্যাগের সংকল্প করিলাম। সংকল্পানুযায়ী ভগবান সুবিধাও করিয়া দিলেন। কাশীর সন্নিহিত একটি স্থানে

মিশন-স্কুলে ৪০৲ টাকা মাসিক বেতনে একটি চাকুরী পাইলাম। এ মন্দ নহে! লোকে বলে,—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। এ ত দেখিতেছি "নরাণাং জনকক্রমঃ।" পিতৃদেব ৪০৲ টাকায় সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন! আমিও সেই ৪০৲ টাকায় প্রবেশ করিলাম। আমাদের কি ৪০৲ টাকার গণ্ডী পার হইবে না? দেখা যাউক, ভবিষ্যৎগর্ভে কি আছে। কালবিলম্ব না করিয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলাম। তদবধি আমি কাশীত্যাগী প্রবাসী। আমার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই কঠোর সংগ্রামে জয়ী হইলাম অথবা হারিলাম, তাহা পরে পাঠকগণের বিচার্য্য। আপাততঃ আমি সংসারসমুদ্রে ভাসিলাম। জানি না, কূল কিনারা পাইব কি না? কেবল ভগবান ভরসা। এ জগতে সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, মুরুব্বি নাই। আপাততঃ উদ্দেশ্য শিক্ষকতা করিয়া সেই সঙ্গে কোনও ক্রমে বি. এ পাশ করা। প্রকৃতপক্ষে আমার পঠদ্দশার এইখান হইতে শেষ। সুতরাং এ অধ্যায়েরও এইখানে শেষ।

চতুর্থ অধ্যায়—জীবন-সংগ্রাম।

শিক্ষকতা করিয়া কোনও ক্রমে বি এ. পাস হইলাম। মিশনরী মহাশয়েরা আমার ৫৲টি টাকা মাহিনা বাড়াইলেন। এইবার ৪০৲এর গণ্ডী পার হইলাম। মনে মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। যিনি এ গণ্ডী পার করিয়াছেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে কিছুই অসম্ভব নহে। এই বৎসর আমার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্মী আমার প্রতি বাম, বাগ্দেবী ততোধিক, কিন্তু জরা রাক্ষসীর বিলক্ষণ সুদৃষ্টি। সেই সঙ্গেই চিন্তার স্রোতও খরতর হইতে লাগিল। ৪৫৲ টাকা মাসিকে কোনও ক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একজন অতি উচ্চপদস্থ স্বদেশীয়ের জামাতা মিশন-স্কুলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি বড়লোকের ছেলে, আবার বড়লোকের জামাতা। সুতরাং বিদ্যাবুদ্ধি যত দূর তীক্ষ্ণধার হওয়া উচিত, তাহা সমস্তই ছিল। এণ্ট্রেন্স ক্লাসে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের গৃহে আমার ডাক পড়িল। প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল আমি উক্ত স্থানে বাস করিয়াছি। একবারও সেই উচ্চপদবীস্থ মহাত্মা এ পর্য্যন্ত আমার কোনও সংবাদ লন নাই। গরজ বড় বালাই। আজ গরজের খাতিরে উপর্য্যুপরি আমার বাসায় তক্‌মাধারী পেয়াদা আসিতে লাগিল। আমার জন্মকাল হইতেই বড়লোক দেখিলে কি রকম যেন একটু ভয় ও সঙ্কোচ হয়। গরীব বলিয়াই হউক অথবা বাঙ্গালী জাতি স্বভাবসিদ্ধ একটু ভীতু বলিয়াই হউক. এ রোগটি আমার ছিল এবং এখনও আছে। বড়লোকের সংস্পর্শে যাইতে সে ভয়-ভয় রোগটি যায় নাই। কিন্তু কি করি, নাচার হইয়া আমায় "ডেপুটী বিভূতির" নিকট যাইতে হইল। প্রথমটা বেশ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর জামাতাটিকে গৃহে দুই তিন ঘণ্টা পড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার বাটিতে গিয়া পড়াইতে অসম্মত হওয়ায় আমার বাসায় আসিয়া বাবাজী পড়িবেন, এই স্থির হইল। বেতন ইত্যাদির কোনও কথারই উল্লেখ নাই। তৎপরে আমায় কিঞ্চিৎ আপ্যায়িত করা হইল। আমার নাম লইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি বি এ পাস করিয়া ৪৫৲ টাকায় একটা পাদরীদের স্কুলে কেন পড়িয়া আছেন?" আমি বলিলাম, "কি করি, আমার সহায় নাই, মুরুব্বী নাই—কাজেই সরকারী চাকুরীর আশা ত্যাগ করিয়াছি।" তখন বলিলেন, "আহা, আমায় এতদিন বলেন নাই কেন? আমি জানিতে পারিলে কবে করিয়া দিতাম।" আউধের একটা জেলার নাম করিয়া বলিলেন, "সেখানকার কমিশনর মেকোনিশী সাহেব আমার হাত-ধরা, এলাহাবাদ বোর্ডের সাহেব আমার হাত-ধরা। এবার পূজার ছুটীর সময় আমি প্রয়াগে আপনাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া যাহা হয় একটা নিশ্চয়ই করিব। ইতিমধ্যে আপনি একটু একটু আইন অধ্যয়ন করুন।" এই বলিয়া বৃহৎ দুই খণ্ড টীকা-টিপ্পনী-সংবলিত Civil Procedure Code আমায় দেওয়া হইল। আমি ভাবিলাম, হবেও বা; লোকটা পরোপকারী, আমার কষ্টে হয় ত মন ভিজিয়াছে। ভগবানের কৃপায় হয় ত ইহারই দ্বারায় আমার একটা কোনও কিনারা হইতে পারে। আশায় উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম। তাঁহার জামাতা বাবাজীকে পরদিন হইতে প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া অতি যত্নে বাসায় শিক্ষা দিতে লাগিলাম। এক মাস দেড় মাস পরে জামাতা বাবাজী এক দিবস ৮৲টি টাকা আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "শ্বশুর মহাশয় এই দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন পরে আরও পাঠাইয়া দিবেন।" আমি মদা কণটা তাঁহাকে ফেরত

দিয়া বলিলাম, "আমি বেতনের প্রত্যাশায় তোমায় পড়াইতে স্বীকৃত হই নাই। তোমার শ্বশুর মহাশয় আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং আমায় যথেষ্ট আশা দিয়াছেন। সেই আশা দেওয়াতেই আমি নিজেকে উপকৃত বোধ করিতেছি। সুতরাং সে উপকারের প্রত্যুপকার আমার করা উচিত। কিন্তু আমি দীন, হীন, দরিদ্র; কায়িক পরিশ্রম ব্যতীত আমার প্রত্যুপকারের অন্য কোনও উপায় নাই। এই জন্য আমি বেতন লইতে পারি না।" এই বলিয়া টাকা ফেরত দিলাম।

তিন মাস জামাতা বাবাজীকে নিজ বাসায় পাঠ দিই। তৎপরে তিনি মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইবার পর অমাবস্যার চন্দ্রমার ন্যায় একেবারে অদৃশ্য হইলেন। শুনিতে পাইলাম, এলাহাবাদ অথবা কাশীধাম হইতে ২।১টী বাঙ্গালী অবিদ্যা আসিয়াছে তিনি সেইখানে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যালাভ সেই পর্য্যন্তই হইল। তৎপরে প্রায় দেড় বৎসর আমি তথায় ছিলাম। কিন্তু ডেপুটী বাবু আর কখনও আমার কোনও "খোঁজ খবর" লন নাই—যে লোকটা আছে না মরিয়াছে। কিছুকাল পরে তাঁহার দত্ত Civil Procedure Code আমিও ফেরত দিলাম। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সে পুস্তকখানি লইলেন। আমার সরকারী চাকুরী করা শেষ হইল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। আমার ভাগ্যে আর মেকোনিশী সাহেব অথবা প্রয়াগের সদর বোর্ডের সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

এই সহরে আমার একটি আত্মীয় ছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে আমি প্রথমে গিয়া আশ্রয় লই। মাসাবধি তাঁহাদের নিকট থাকিয়া পরে বাসা করি। তাঁহারা আমায় অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই আত্মীয় মহাশয়দের একটি পরমাত্মীয় ছিলেন। তিনি একজন গঞ্জিকাসেবী নিরক্ষর লোক বলিলেই হয়। মরি ব্রুয়ারী কোম্পানী এই সহরে একটি শাখা মদিরার কারখানা খুলিবার প্রয়াসী হন। পরমাত্মীয়টি কোনও প্রকারে তাঁহাদের বড় বাবু হইলেন। কারখানা খুলিবার পূর্ব্বে জমী খরিদ হইল। পরমাত্মীয় মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যথেষ্ট; সুতরাং আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই আমি করিতাম। প্রায় এক বৎসর তাঁহার জন্য পরিশ্রম করি। ইতিমধ্যে শ্যামাপূজার সময় আমি কাশী যাই। তিনি আমায় ২০৲ টাকা দেন। নিজের দুই শ্যালকপুত্রের শীতবস্ত্র কাশী হইতে খরিদ করিয়া আনিতে বলেন এবং সেই সঙ্গে আমার জন্য একপ্রস্থ শীতবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে বলেন। তদনুসারে আমি নিজের জন্য যেরূপ বস্ত্র ক্রয় করি, ঠিক সেইরূপ বস্ত্র তাঁহার শ্যালকপুত্রদের জন্য আনিয়া দিই। পরম্পরায় পরে শুনি যে, বস্ত্র তাঁহার পছন্দ হয় নাই এবং ঐ ২০৲ টাকা হইতে কিছু আমি উদরসাৎ করিয়াছি এরূপ অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, "আমার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে।" "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।"

জজের আদালতে এক জন ক্ষত্রী-(ক্ষত্রিয় নহে)-জাতীয় হেডক্লার্ক ছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন, জজের হেড বাবুর প্রধান কার্য্যই মকদ্দমার নথি সকল ইংরাজীতে অনুবাদ করা। সাহেবের কৃপাদৃষ্টিতে উক্ত মহোদয় হেডবাবু হইয়াছিলেন। পেটে তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি ছিল না। অনুবাদ কার্য্য অতি দুরূহ। তাঁহার দ্বারা চলিত না। তজ্জন্য তাঁহার এক জন লোকের সাহায্য আবশ্যক হয়। তিনি আসিয়া আমায় ধরিলেন যে, প্রত্যহ রাত্রিকালে তাঁহার বাসায় গিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টা তাঁহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে। মাসিক ১৫৲ তিনি আমায় দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণী ও পুত্র কন্যা আমার নিকট। দুঃখে কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। ভাবিলাম, অর্থকষ্ট যথেষ্ট যদি শারীরিক পরিশ্রমে ১৫৲টা টাকা মাসে পাই মন্দ কি? এই কার্য্য স্বীকার করিলাম। অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণী ও দুইটী শিশুসন্তানকে রাত্রিতে একা বাড়ীতে রাখিয়া ৫।৬ মাস ধরিয়া তাঁহার সেবা করি, কিন্তু তিনি কখনও ১০৲ টাকার অধিক আমায় মাসে দেন নাই। এই গতিক দেখিয়া পরে উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিলাম। দীনবন্ধু, তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি কিছুই এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। পরিশ্রম করিয়া খাইব, তাহাতেও বাধা। লোকে খাটাইয়া পয়সা দেয় না—এ কিরূপ ন্যায়? আবার এইখানে এমন কতকগুলি লোক দেখিতেছি, যাহারা কিছু জানে না। বিদ্যা বুদ্ধি কোনও বিষয়েই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, অথচ ৮০৲।৯০৲।১০০৲ মাসে উপার্জ্জন

করিতেছে এবং আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠভাবে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছে। ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্যে এ বৈষম্য কেন? তখন এ সমস্যার পূরণ করিতে শিখি নাই, এখন শিখিয়াছি। যাহা হউক, এইরূপ নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক ক্লেশে তথায় তিন বৎসর কাটাই।

এই সহরে অবস্থানকালে কখনও কখনও এরূপ ভাব আমার মনে উদিত হইত যে, যদি দেশীয় রাজ্যে কোনরূপ চাকুরী পাই, তাহা হইলে হয় ত উন্নতি করিতে পারি। ইংরেজ রাজ্যে আমার সহায়, সম্পত্তি, মুরুব্বীর জোর নাই, সুতরাং একটা নগণ্য কেরাণীগিরিও জোটা ভার। আমায় কি এইরূপেই ৪০৲।৪৫৲ টাকায় চিরকাল কাটাইতে হইবে? শুনিতে পাই, দেশীয় রাজ্যে তত প্রতিযোগিতা নাই, তজ্জন্য উন্নতির পথ সহসা পরিষ্কৃত হইতে পারে। কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লোক দেশীয় রাজ্যে স্কুলমাষ্টার হইয়া গিয়া পরে উচ্চ পদ লাভ করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। আমিও যদি এইরূপ স্কুলের শিক্ষক হইয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে পারি; কিন্তু কি করিয়া সুবিধা হয় তাহার কোনও পন্থাই ঠিক করিতে পারিলাম না। কাশীস্থ উমাচরণ বাবু ধোলপুর রাজ্যে গিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। আমার ভাগ্যদেবী আমার প্রতি কত দিনে সুপ্রসন্না হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। হইবেন কি না, তাহাও জানি না। আজ কাল মনুষ্য-জীবনের উর্দ্ধসীমা ৫০ বৎসর। তন্মধ্যে আমার ২৩।২৪ বৎসর ত অতীত হইল। প্রায় অর্দ্ধেক জীবন অতিবাহিত হইল। ইহা ত বৃথাই গেল। সন্তান সন্ততি হইতে লাগিল। যাহা পাই, তাহাতে পেট চলা ভার। সঞ্চয় করা দূরের কথা। কন্যাটী ক্রমশঃ বড় হইতে চলিল। বিবাহের বাজার যেরূপ, তাহাতে ইহাকে কি করিয়া পার করিব তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এইরূপ মানসিক চিন্তায় আমার দেহ ও মন সতত দগ্ধ হইতে লাগিল। কোনরূপে আর কূল কিনারা পাই না। আমি নির্ব্বোধ, জানিতাম না যে আমার এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার অনেক পূর্ব্বে আমার জীবনগতি নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। যিনি জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, তিনি কি আর সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমরা মূর্খ অজ্ঞান, এ সকল বিষয় জানিয়াও অহরহঃ প্রতিনিয়ত নিজ সম্মুখে দেখিয়াও আমাদের জ্ঞান হয় না। সময়মত সমস্তই ভুলিয়া যাই। বৃথা চিন্তায় শরীর ও মনকে ক্লেশ দিই।

ঈদৃশ নানারূপ কষ্টে তিন বৎসর অতিবাহিত করি। ইতিমধ্যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের কিছুদিন পূর্ব্বে প্রয়াগ-ধামের সুপ্রসিদ্ধ "পাইওনীয়র" পত্রে দুই কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। প্রথমটী কোনও একটী দেশীয় রাজ্যের প্রধান শিক্ষকের পদ এবং অপরটী একটী পাদরীদের পাঠশালায় দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ। প্রথমটীর বেতন ৬০৲ টাকা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ১০০৲ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়টীর মাত্র ৮০৲। উভয় স্থলেই আবেদন করিলাম। উত্তরের আশায় উদ্‌গ্রীব রহিলাম। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। উত্তর আর পাই না। এ দিকে স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ হইল। নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মণী ও দুইটী শিশুসন্তানকে সঙ্গে লইয়া গ্রীষ্মাবকাশ কাটাইবার জন্য অগত্যা কাশীতে পিতৃদেবের নিকট যাইলাম। জগজ্জননী, কেন আমায় ছলনা করিতেছ? এ ভাবে আমায় আর কত দিন কাটাইতে হইবে? আবার কি আমাকে গ্রীষ্মাবকাশের পর সেই ৪৫৲ টাকায় ফিরিয়া আসিতে হইবে? আমার জীবনটা কি এইরূপেই যাইবে? কূল কিনারা কি পাইব না? সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিহীন-অন্তঃকরণে গৃহাভিমুখে পরিবার লইয়া চলিলাম।

প্রায় অর্দ্ধেক অবকাশ এইরূপ বিষণ্ণমনে কাটিয়া গেল। আমিও চাকুরী দুইটী পাইবার আশা এক প্রকার ত্যাগ করিলাম। কিন্তু ভগবানের এমনই কৃপা—যখন আমি নিরাশ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময় করুণাময় আমার কষ্টে যেন ব্যথিত হইয়া অকূল সাগরের কাণ্ডারীরূপে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। এইবার বলিয়া নহে, আমার দুঃখময় ও বিপদসঙ্কুল জীবনে আমি শত শত বার ভগবানের এরূপ কৃপা দেখিয়াছি এবং পাইয়াছি। Man's extremity, God's opportunity—আমি শত শত বার এই নগণ্য জীবনে দেখিয়াছি।

গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন অতি জঘন্য ইংরেজী অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত একখানি নিয়োগপত্র পাইলাম। একটী দেশীয় রাজ্যের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইবার জন্য যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলাম, পলিটিকেল-এজেন্ট মহাশয়

এতদিন পরে তাহা গ্রাহ্য করিয়া বিদ্যালয়ের সম্পাদক দ্বারা আমায় সংবাদ দিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, পিতৃদেবের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, এক প্রকার চিরজীবনের জন্য আমার বাল্যের ও যৌবনের লীলাভূমি অতি আদরের কাশীধাম ত্যাগ করিলাম।

মিশনরীদের স্কুলের শিক্ষকতার সময়ে ভগবানের নিকট অনেকবার হৃদয় খুলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন দেশীয় রাজ্যে একটী চাকুরী পাই। ভগবান্ আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন এবং আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। কিন্তু তখন জানিতাম না যে, দেশীয় রাজ্যের চাকুরী 'দিল্লীর লাড্ডু', খাইলেও অনুতাপ করিতে হয়, না খাইলেও পস্তাইতে হয়। তখন অতি উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া কাশী হইতে যাত্রা করিলাম। এখন হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল। ভগবান এই সূত্রে আমায় দেশীয় রাজ্যের একটা কীট করিয়া দিলেন। সেই অবধি সমস্ত জীবনটাই দেশীয় রাজ্যের রাজদরবারের কাণ্ড কারখানা দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলে কাশীবাসীর জীবন-অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়—নূতন জীবন

জুন মাসের শেষভাগে আমি এবং আমার একটী সমবয়স্ক পরম বন্ধু দুই জনে কাশী ত্যাগ করিলাম। আমি কোনও হিন্দু রাজার রাজ্যে চলিয়াছি। আমার বন্ধুটি নিমকমহলের বড় কর্ত্তা—কোনও একটী বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাটীতে তাঁহার সন্তানদের শিক্ষক-রূপে চলিয়াছেন। সুতরাং উভয়েই এক উদ্দেশ্যে বহুদূর এক সঙ্গে চলিলাম। যথাসময়ে বন্ধুর গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলাম। পরদিন বন্ধুর সহিত তাঁহার নূতন মনিবের বাসা খুঁজিয়া তাঁহাকে সেখানে কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া ছোট লাইনের গাড়ী চড়িয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিলাম। বন্ধুবরের সহিত বিদায়কালে গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। বন্ধুবর এখনও জীবিত আছেন। কখনও কখনও তাঁহার স্নেহপূর্ণ পত্রাদিও পাই। কিন্তু জীবনের স্রোত এমনই বিভিন্ন মার্গে চলিয়াছে যে, সেই বিদায়ের পর আর তাঁহার সহিত আজ পর্য্যন্ত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার সেই হাস্যপূর্ণ মুখ আর দেখি নাই, রঙ্গ-বিদ্রূপ-পূর্ণ পাগলামীর কথা এ পর্য্যন্ত আর শুনিতে পাই নাই। ইহজগতে আর যে শুনিতে পাইব, তাহার আশাও করি না।

ছোট লাইনে এই আমার প্রথম ভ্রমণ। অর্থের অল্পতা-বশতঃ অবশ্য রাজ শ্রেণীতেই (Royal class, তৃতীয় শ্রেণী) চাপিতে হইল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ বাদশাহী লাইন। যেমন সুন্দর গাড়ীগুলি, তেমনই—তখনকার প্রত্যেক গাড়ীতে লৌহ-গরাদে থাকাতে—জনতার অনেকটা লাঘব হইত। ছোট লাইনের তৃতীয় শ্রেণী ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। গরাদে একেবারে নাই। তাহা ছাড়া ছোট ছোট গাড়ী এবং জনতা এত বেশী যে, কে কার স্কন্ধে পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই। তখন আবার একখানি ডাক ও একখানি প্যাসেঞ্জার মাত্র ছিল। সুতরাং জনতার মাত্রাটা আরও কিছু বেশী ছিল। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীতে অতি-নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা গতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া গরীব ভদ্রলোকের তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক ছিল। কি করা যায়, পয়সা না থাকিলে সব কষ্টই সহ্য করিতে হয়। দেখিতে দেখিতে অনেক দূর ছাড়াইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া নিজ তৈজসপত্রগুলি লইয়া টিকিটখানি ফেরত দিয়া ষ্টেশনের বাবুদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, অমুক রাজধানী এখান হইতে কত দূর?" তাঁহারা বলিলেন, "এখান হইতে ৬০ মাইল।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাইবার কোনও যান পাওয়া যায় কি না?" বলিলেন, "সরাইয়ে গমন করুন, সেখানে এক্কা পাওয়া যাইবে।" তখন প্রায় বেলা একটা হইবে। বিমর্ষভাবে ভাবিতে ভাবিতে ষ্টেশনের সীমা ছাড়াইয়া নিকটবর্ত্তী বাজারে গিয়া পঁহুছিলাম এবং সরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। সেক্রেটারী মহাশয় যে উৎকৃষ্ট ইংরেজী ভাষায় আমার নিয়োগপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমার একটা ধারণা হইয়াছিল যে ষ্টেশন হইতে রাজধানী কেবলমাত্র ১৭ মাইল এবং এক্কাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং আমি ভাবিয়াছিলাম যে ১৭ মাইল এক্কায় যাওয়া এমন বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এখন সরাইয়ে এক্কা-চালকদের নিকট তদন্ত করায় তাহারা বলিল, "মহাশয়, ৬০ মাইল দূর নহে; তবে এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে রাজধানী।" এ সঠিক সংবাদও

বিশেষ আশাপ্রদ হইল না। ৬০ ও ৫০এ তফাৎ বড়ই অল্প। আমি এখন উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। কি করি, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেছি না। রেলে আসিতে উভয় পার্শ্বে যেরূপ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়াছি এবং একা-চালকদের নিকট রাস্তার যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম তাহাতে আমার মন খুব দমিয়া গেল। পাঠকগণ ভাবিতে পারেন, কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলেই হইত। সুতরাং ইহাতে আবার উভয় সঙ্কট কি? আমি পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিতে একটু ভুলিয়াছি। একটু উভয়-সঙ্কট ছিল; সে কারণ আমায় যথেষ্ট চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যখন আমি কাশীধামে নিয়োগপত্র পাই, তখন মিশনরীদের কার্য্য ত্যাগ করি নাই। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে ছিলাম। প্রায় দুই মাসের বেতন প্রাপ্য ছিল। জিনিসপত্র সমস্তই কর্ম্মস্থানে ছিল। এই সূত্রে সেই সময়ে একবার ২।১ দিবসের জন্য আমাকে কর্ম্মস্থলে যাইতে হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ পাদরী-পুঙ্গবের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে নূতন কর্ম্মের বিষয় জানাইয়া বিনা বেতনে ছয় মাসের অবকাশ প্রার্থনা করি। দেশীয় রাজ্যে নূতন কার্য্য, আমার দ্বারা চলিবে কি না তাহা জানি না। এ নিমিত্ত অবকাশ-প্রার্থনা। এই ন্যায্য অনুরোধ পাদরী পুঙ্গব গ্রাহ্য করিলেন না। পদত্যাগের পূর্ব্বাহ্নে নোটিশ দাও নাই বলিয়া চাপ দিলেন এবং ১৫ দিনের বেতন কাটিয়া লইলেন। আমি অসদ্ব্যবহারে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রাপ্য বেতনের মধ্যে যাহা তিনি ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দিলেন, তাহাই লইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম বি. এ পাস করিয়াছি; যদি এই নূতন স্থানে একান্তই না টিকিতে পারি, তাহা হইলে কি ৪০৲ টাকা মাহিনার আর একটা চাকুরী জুটিবে না? ৪০৲টা টাকা পাইলেই আমার আপাততঃ মোটামুটি শাক অন্ন চলিয়া যাইবে। বিচারবিহীন ধর্ম্ম-প্রাণ পাদরী-পুঙ্গবের অধীনে ৪৫৲ কেন, ৫০৲ টাকা বেতনের কার্য্যও করা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া কার্য্য ত্যাগ করি এবং ৬০৲ টাকা মাহিনার নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চলিয়াছি।

ষ্টেশনের নিকটস্থ সরাইয়ে যে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, তাহার ইতিবৃত্ত উপরে লিখিত হইল। পূর্ব্বেই চাকুরী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, নূতনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই এই ধোঁকা। রাস্তা মনে করিলেই শরীরের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। একা-চালকদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু! রাজধানীতে কখন পঁহুছিব?" তাহারা বলিল, "বাবু! আজ আমরা এখান হইতে বেলা চারিটার সময় যাত্রা করিয়া ১০ মাইল দূরে একটি চটী আছে সেইখানে রাত্রিবাস করিব। পরদিন প্রত্যূষে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বেলা তিনটার সময় রাজধানী পঁহুছিব।" হৃদয় সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান। যাই, কি না যাই। যদি ফিরিয়া যাই, তবে পূর্ব্ব চাকুরী ত্যাগ করিয়াছি সুতরাং "পুনর্ম্মূষিকো ভব" গোছ হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে। আবার সেই ঠাকুরমা-রূপিণী কর্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। যদি গন্তব্যস্থলে যাই, তবে এই নিদারুণ রাস্তায় রাত্রিযাপন এবং দস্যু তস্করের হস্তে প্রাণ যাইলেও কেহ বাঁচাইবার নাই। কি করি, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময়ে একা-চালকরা বলিল, "বাবু! আপনি যদি রাজধানীতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একখানি একা ভাড়া করিয়া ফেলুন। নচেৎ পরে আর একা পাইবেন না। সমস্ত একা চারিটার সময় এখান হইতে চলিয়া যাইবে।" অগত্যা তিন মুদ্রা দিয়া একখানি একা ভাড়া করিলাম এবং সরাইয়ের একখানি ভগ্ন 'খাটিয়া'য় পড়িয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আমার মনে পড়িল :—

> মা! আমায় কোথায় আনিলে।
> অগাধ জলধি-জলে আমায় ভাসালে॥
> কোথা রহিল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
> প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা, বন্ধু সকলে॥

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা চারিটার সময় আমরা কতকগুলি লোক পাঁচ ছয়খানি একায় আরোহণ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রেলের ষ্টেশন হইতে কিছু দূর আসিবার পর এক বৃহৎ পাহাড়ী নদী পাইলাম। পাড় পাকা একটি মাইল। জলের লেশ নাই। যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল বালুকাময়ী মরুভূমির ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই বালুকা-ক্ষেত্র দিয়া

আরোহী সহিত ঘোড়ার পক্ষে একা টানা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তজ্জন্য আরোহীবর্গকে একে একে নামিয়া পদব্রজে বালি ভাঙ্গিয়া যাইতে হইল। নদীটি বর্ষাকালে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। পাহাড় অঞ্চলে অতিবৃষ্টি হইলে নদীগর্ভ জলে ভরিয়া যায়; কিন্তু পাড় অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া জল কোনও স্থলেই কোমর অথবা বক্ষঃস্থলের অধিক হয় না। কিন্তু স্রোত এত খরতর যে, কটিদেশ পর্য্যন্ত জল হইলে কাহার সাধ্য হাঁটিয়া নদী পার হয়। সুতরাং বর্ষাকালে পথিকদের বড় অসুবিধা ঘটে; অনেক সময়ে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায় এবং হয় ত নদীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থলে দুই চারি দিবস পড়িয়া থাকিতে হয়। ভাল আশ্রয়স্থল না থাকায় অত্যন্ত কষ্টও পাইতে হয়। শুনিয়াছি, এক সময়ে এক জন সাহেব হাকিম বর্ষাকালে এই দেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এই নদীর তীরে কয়েক দিন পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। সাহেব শ্রাবণ মাসে উক্ত দেশ পরিদর্শনার্থ যাইতেছিলেন। নদীটি সাহেবের পথ আটক করিল। নদীতীরে কোনও স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক রাত্রি কাটাইতে হয়। সাহেব দুর্ভাগ্যবশতঃ Tiffin Basket (জলযোগের ঝুড়িটি) ভুলিয়া আসিয়াছিলেন। জনবুলের সব সহ্য হয়, কিন্তু ক্ষুধা সহ্য হয় না। কি করেন? মহা বিপদ উপস্থিত! নিকটস্থ এক গোঁয়ার-গোবিন্দ গুজর-জাতীয় লোককে দেখিয়া তাঁহার খানসামা কিছু খাদ্য অন্বেষণ করে। এতদঞ্চলে গোয়ালাকে গুজর বলে। সে বলিল, "আমার নিকট রাবড়ী আছে; সাহেব বাহাদুরকে দিতে পারি।" সাহেব ক্ষুধার্ত্ত; তাহাতেই সম্মত। পাঠক! উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ক্ষীরকে রাবড়ী বলে। এ সে রাবড়ী নহে। এ রা-ব-রী। এ অঞ্চলের প্রস্তুত-প্রণালী অতি সহজ। গো অথবা মহিষের দুগ্ধের ঘোল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে বাজরা নামক শস্যের আটা ফেলিয়া দিলেই "রাবরী" হইল। সাহেব কখনও এ উপাদেয় আহার্য্য আহার করেন নাই! গুজর বেচারী একটি পাত্র রাবরী-পূর্ণ করিয়া সাহেবের নিকট আনিয়া ধরিল। সাহেব ক্ষুধার চোটে প্রথমে কতকটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন; তৎপরে যখন "রাবরী"র প্রকৃত স্বাদ পাইলেন, তখন উক্ত "রাবরী"-পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গুজরকে মারিতে দৌড়িলেন; চীৎকার করিয়া তাহাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও বদমাস, তু হামকো—খিলায়া।" সে গরীব যত হাত যোড় করিয়া বলে, "না হুজুর, হামনে রাবরী খিলায়ী", সাহেবের ক্রোধ-বহ্নি ততই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং চীৎকারের মাত্রাও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল!

নদী পার হইয়া আমরা একটী গ্রামের বহির্ভাগে সরাইয়ে (চটীতে) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। সে রাত্রি তথায় স্থিতি। আমি ক্ষুধার্ত্ত। এক জন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, এখানে কিছু খাদ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়?" সে বলিল, "হাঁ বাবু, নিকটস্থ গ্রামে কলাকন্দ প্রভৃতি সমস্ত মিঠাই পাওয়া যায়, একটু অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।" কলাকন্দ দ্রব্যটা কি, জানিবার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। সুতরাং গ্রামের দিকে চলিলাম। গ্রামের বাজারে "কলাকন্দ" তল্লাস করাতে একটা দোকানদার "বরফী" বাহির করিয়া দিল। তখন বুঝিলাম, এ দেশে বরফীকে কলাকন্দ বলে।

নূতন দেশে নূতন শিক্ষা আরম্ভ হইল। সরাইয়ে সে রাত্রি কোনরূপে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথ আর ফুরায় না। ক্রমাগত একা ছুটিয়াছে এবং এক একবার একার ধাক্কায় শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় আমার গন্তব্য রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে একার যন্ত্রণা আরও বর্দ্ধিত হইল। এই স্থান হইতে পাহাড় ও বৃহৎ বৃহৎ নালার আরম্ভ। কখনও একা শত হস্ত নিম্নে নামিতেছে, কখনও বা শত হস্ত উচ্চে উঠিতেছে। চলিতে চলিতে যখন আমরা রাজধানী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন সম্মুখে একটি পাহাড়ী নদী দৃষ্টিগোচর হইল। একদিকে উচ্চ পর্ব্বত, অপরদিকে উচ্চ মাটীর টিপি। ইহার মধ্য দিয়া স্রোতস্বতী চলিয়াছে। পর্ব্বতের উপর হইতে একা প্রায় ১৫০ হস্ত নিম্নে নামিয়া নদীগর্ভ দিয়া চলিল; যেন কোনও ক্রমে পাতালপুরীতে নামিয়া নদীর ভিতর চলিলাম। এমন সময়ে পর্জ্জন্যদেব বিশেষ কৃপা করিলেন। আকাশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বলাই বাহুল্য, সমস্ত বস্ত্রাদি

সিক্ত হইয়া গেল। আমার কষ্টে যেন ইন্দ্রদেব অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন! সঙ্গে তৈজসপত্রের মধ্যে একটি পুরাতন কানপুরী চর্ম্মনির্ম্মিত ট্রাঙ্ক। সেটাকে পেন্‌সন দিলেই হয়। কানপুরী ট্রাঙ্কের ডালাগুলা গোল। কিন্তু আমার এই ভ্রাতৃ-দত্ত ট্রাঙ্কটীর ডালাখানি পূর্ব্বে মালের চাপে গোলত্ব ত্যাগ করিয়া চেপ্টা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুঃখীর উহাই পথের সম্বল। উহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি সমস্ত ভিজিয়া গেল। বেলা দেড়টা অথবা দুইটার সময় অশেষবিধ পথকষ্ট ভোগ করিয়া রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন আমার মনে যে সকল যৌবনসুলভ নূতন ভাবের উদয় হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমি এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক জগতে আসিয়া পড়িলাম। কল্পনায় কত শত নূতন ভাবের লহরী আমার মনে উদিত হইতে লাগিল তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। সম্মুখে এক নূতন ধরণের সহর। চতুর্দ্দিকে রক্তবর্ণ প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর নগরটীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং পথিকদিগকে হিন্দুদিগের পুরাতন গৌরব অতি গর্ব্বিতভাবে যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হিন্দুরা আট শত বৎসরের অধিক হইল স্বাধীনতা হারাইয়া "পরদাসখত" স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমি আজ যেন এই হিন্দুরাজার নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে একটু স্বস্তিলাভ করিলাম। তখন যেন বোধ হইল, অদ্য আমি স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের রাজ্যে আসিয়াছি। মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইল। তখন ভাবি নাই যে আমার আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। তখন ভাবি নাই যে এ কেবল নামমাত্র হিন্দুর রাজ্য; ইহার সহিত ন্যায়পরায়ণ ইংরাজের রাজ্যের কোনও সাদৃশ্য নাই। তখন জানিতাম না যে হিন্দুর রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা বৃটিশ রাজ্যে বাস করা বা ইংরাজের অধীনে চাকুরী করা শতগুণে শ্রেয়ঃ ও বাঞ্ছনীয়।

সম্মুখে বৃহৎ ফটক। ফটক পার হইয়া আমাদের এক্কাখানি নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও এইখানে এ অধ্যায় শেষ করিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।—সবই নূতন।

নগরে প্রবেশ করিয়া সবই নূতন দেখিলাম। রাস্তা নূতন, বাটী নূতন, বাজার নূতন, নগরবাসী স্ত্রী পুরুষদের পরিচ্ছদ নূতন, কথাবার্ত্তা নূতন, ভাষা নূতন; এমন কি, আমিও যেন নূতন নূতন বোধ হইতে লাগিলাম। রাস্তাগুলি সমস্তই পাথর দিয়া বাঁধান, বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, সমস্তই রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। বাটীগুলি সমস্তই এক নূতন ধরণের, লিখিয়া তাহা পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করান একটু কঠিন। এ প্রদেশ বালুকাময়, সুতরাং এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী অতি বিরল। নাই বলিলেই হয়। অন্যান্য রাজ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যেখানে আসিয়াছি সেখানে ইষ্টক অথবা কাঁচা মৃত্তিকার ঘর বাড়ী একেবারে নাই। বেলে মাটী, সুতরাং মৃত্তিকায় ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বাটীর দেওয়াল প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রস্তর খণ্ড খণ্ড নহে। এক একখানি ৪।৫ হাত লম্বা এবং দেড় হস্ত চওড়া প্রস্তর খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া চুণ দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাদে কড়ি বরগার নামমাত্র নাই। বৃহৎ বৃহৎ লম্বা প্রস্তর, যাহাকে এখানে চলিত ভাষায় "চিড়ী" বলে—তাহারই দ্বারা ছাদ আচ্ছাদিত হয়। হিন্দুর রাজ্যে বেশী পরদা, সুতরাং বাটীর ভিতর গবাক্ষ ইত্যাদির কোনও বালাই নেই। বাটী একেবারে সিন্দুক বলিলেই হয়। আবার এ প্রদেশের গ্রীষ্ম জগৎপ্রসিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে এই প্রস্তরনির্ম্মিত বাটীগুলি যখন প্রখর সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে বাস করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

নগরটি অতি ক্ষুদ্র। প্রায় ২২।২৩ হাজার লোকের বসতি। সুতরাং রাজবাটীও অতি ক্ষুদ্র। দোকানগুলি কিছু নূতন ধরণের অর্থাৎ কতকগুলি পাকা দোকান আছে, আবার কতকগুলি লোক পাকা রোয়াকের উপর বসিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে।

স্ত্রী পুরুষও নূতন অর্থাৎ ইহাদের পরিচ্ছদাদি সমস্তই নূতন ধরণের। নীচ জাতীয় পুরুষের বস্ত্রপরিধানপ্রণালী প্রায় পশ্চিমোত্তরদেশীয় হিন্দুস্থানীদিগের সহিত মিলে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের অথবা বণিকগণের বস্ত্র-পরিধান-রীতি একটু নূতন ধরণের। তাঁহারা হাঁটুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু পায়ের ডিমের দিকে বস্ত্রখণ্ড এক অদ্ভুত রকমে পাকাইয়া দিয়া থাকেন। ভারতখণ্ডের কুত্রাপি এরূপ ধরণের বস্ত্রপরিধান-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না। মস্তকে সকলেই উষ্ণীষ ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও একটু নূতন ধরণের।

অর্দ্ধ মস্তকে উষ্ণীষ এবং অর্দ্ধেক মস্তক প্রায় দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা। বাম পার্শ্ব কর্ণ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়, এই নিমিত্ত অনেক ক্ষত্রিয় কর্ণে কুণ্ডল ব্যবহারের সময় এক কর্ণেই পরিয়া থাকেন। উষ্ণীষ প্রায় ৩০।৩২ হাত লম্বা। উষ্ণীষ সম্বন্ধে শুনিলাম, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণ। এক রাজ্যের বন্ধন-প্রণালী অপরের সহিত মেলে না। প্রত্যেক রাজ্যের লোকেরা নিজ নিজ রাজ্যের রীত্যনুসারে বিভিন্ন প্রকারে উষ্ণীষ বাঁধিয়া থাকেন। কোট ইত্যাদির বড় একটা ব্যবহার নাই। অধিকাংশ লোকই লম্বা আংরাখা ব্যবহার করেন। এই ত গেল পুরুষদের নূতনত্ব। আবার স্ত্রীলোক বস্ত্র ব্যবহার আদবেই করেন না। সকলেই ঘাগরী ব্যবহার করেন। এলাহাবাদের কিঞ্চিৎ পশ্চিম হইতে ঘাগরীর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। তবে ফতেপুর, কানপুর, ইটাওয়া, আগ্রা—এ সমস্ত জেলায় ঘাগরী ব্যবহার কতকটা "পোষাকী" রকমের, "আটপৌরে" রকমের নহে। কিন্তু এ প্রদেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে ঘাগরীর "আটপৌরে" ব্যবহার। ইঁহাদের সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ "ঘাগরী", বক্ষঃস্থলে কাঁচুলী এবং শরীর-আচ্ছাদনার্থ এক দোপাট্টা; তাহাকে "ফরিয়া" এবং "লুগড়ী" বলে। আমরা যেমন বিবাহের সময় কন্যাকে "শাঁখা" অথবা "নোয়া" পরাইয়া দিই, সেইরূপ এ দেশে বিবাহের সময় কন্যা যে কাঁচুলী ধারণ করেন, তাহা আমরণ পরিতে হয়। ঘাগরীটী প্রায় নাভীস্থলের নিম্নদেশে পরিধান করা হয়। বক্ষঃস্থলে কাঁচুলী থাকায় বক্ষঃস্থল পুনরায় দোপাট্টা দিয়া আবৃত করিবার পক্ষে তত দৃষ্টি নাই। ফল কথা, দোপাট্টা সরিয়া গেলে উদর ও কাঁচুলী দ্বারা আবৃত বক্ষঃস্থল দেখা গেলেও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর নাভির নিম্নভাগে ঘাগরী পরার কারণ—উদর প্রায়ই বৃত্তাকার ও কদর্য্য দেখায়। এখানকার স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ এই পরিচ্ছদ-বিপর্য্যয় হেতু যেন একটু নির্লজ্জ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এ সমস্তই আমার চোখে নূতন ঠেকিল। আমি কেন, সকল বাঙ্গালীর চোখেই নূতন ঠেকিবে।

আবার কথাবার্ত্তাও একটু নূতন ধরণের। সমস্ত কথার শেষভাগ ওকারান্ত করিয়া বলা হয়; যথা—লিজ্যো, দিজ্যো, অইয়ো, যইয়ো, খইয়ো ইত্যাদি। পশ্চিমোত্তর দেশে ঐ ঐ কথাগুলি লেনা, দেনা, আনা, জানা, খানা রূপে ব্যক্ত করা যায়। আবার কতকগুলি কথা এমন আছে যাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, যথা—স্ত্রীলোককে "বইয়র বাগি" বলিবে। অল্পকে "নেক" বলিবে। "নেক" কথাটা অনেকের উল্টা। অনেকের অ উড়াইয়া নেক হইয়াছে। অনেক—অধিক, নেক—অল্প। আবার লোক অর্থে পুরুষ, লোগাই অর্থে স্ত্রীলোক। এ সমস্ত নূতন ভাষা। এখানকার লোকের লিঙ্গজ্ঞান অতি চমৎকার দেখিলাম। বড় ছোট লিঙ্গভেদে হয়, যথা—বেলা, বেলী; অর্থাৎ বেলা বলিলে বড় বাটী বুঝাইবে, বেলী বলিলে ছোট বাটী। হবেলা বলিলে বৃহৎ অট্টালিকা বুঝিতে হইবে, হবেলী বলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন। পথরৌটা বলিলে বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র বুঝাইবে, আবার পথরৌটী বলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে, যাহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ এবং বাঙ্গালার সহিত বেশ মেলে। যেমন বালককে এখানে সকলেই "বালক" বলে। দাদা কাকা, এগুলি বেশ বাঙ্গালার মত ব্যবহৃত হয়। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি একই "বাবা" শব্দে ব্যক্ত করা হয়। "বাবা" বলিলে জেঠাও বুঝাইতে পারে, অথবা পিতামহ কিংবা মাতামহও বুঝাইতে পারে। রক্তালু শব্দ হইতে রতালু উৎপন্ন হইয়াছে। আটাকে এ দেশে চূণ বলে। এ শব্দটি চূর্ণ শব্দের অপভ্রংশমাত্র। আর কলি-চূণকে চুণা বলে। সুতরাং এখানকার ভাষা ও কথাবার্ত্তা নূতন। উপরি-উক্ত উদাহরণগুলিতে পাঠকগণ দেখিবেন, আমি যে সবই নূতন দেখিলাম বলিয়াছি তাহা মিথ্যা নহে। চতুর্দ্দিকে সমস্তই নূতনের মধ্যে পড়িয়া আমিও নূতন নূতন বোধ হইব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাঙ্গালীর নামগন্ধ এ দেশে নাই। এ রাজ্যে সমগ্র হিন্দুসমাজপূজ্য জগৎপ্রসিদ্ধ এক বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহের সেবার্থ রাজ্য হইতে প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকার জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। এই বিগ্রহের সেবক ও মোহান্ত বাঙ্গালী। তাঁহারা এ দেশে প্রায় দুই শত বৎসর হইতে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের আকার প্রকার, ভাষা পরিচ্ছদ, আহার ব্যবহার, সমস্তই এদেশীয়দের ন্যায়! আকার ইঙ্গিত ও বাহ্য ব্যবহারে কোনও প্রকারেই তাঁহাদের বাঙ্গালী বলিয়া চেনা যায় না। সম্পূর্ণ আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন। এই জন্য 'বাঙ্গালীর নামগন্ধ' এ দেশে নাই লেখা হইল। সকলের সঙ্গেই উদয়াস্ত হিন্দী ভাষায় কথা, কাজেই আমিও

এক নূতন জীব হইয়া পড়িলাম। আজ ২৮।২৯ বৎসর এই রাজ্যে নানারূপ সুখ দুঃখে এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কাটাইলাম এবং উদয়াস্ত "জনাব" "জনাব" করিয়াছি ইহা সত্বেও যে মাতৃভাষা আমার কথঞ্চিৎ মনে আছে, যখন এ কথা মনে পড়ে তখন আমি নিজের অবস্থা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই।

বেলা ১৷৷০টা অথবা ২টার সময় নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্তই ত নূতন দেখিলাম। তাহা ছাড়া একটু নূতন ঘটনায় পড়িলাম। সেক্রেটারী মহাশয়ের নিয়োগপত্র পাইবার পর কাশী হইতে আমি তাঁহাকে অমুক তারিখে পৌছিব এরূপ পত্র লিখি। তাঁহার বাসা জানা ছিল না বলিয়া একাখানি স্কুলে লইয়া গেলাম এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের অনুসন্ধান করায় জানিতে পারিলাম দুই দিবস পূর্ব্বে কার্য্যান্তরে তিনি অন্যত্র গিয়াছেন এবং আমার থাকিবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। ইহাও একটু নূতন বোধ হইল। এখন বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা? স্কুলে একটী হিন্দী পণ্ডিত থাকিতেন, তিনি আমায় সাদরে আহ্বান করিলেন এবং আপাততঃ স্কুলেই বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। আমারও আর দাঁড়াইবার স্থল নাই, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলাম। এখন স্কুলটীর একটু বর্ণনা করি। এরূপ স্কুলের বাটী আমি কখনও দেখি নাই। এই আমার প্রথম দর্শন। যখন সবই নূতন, তখন এটাই বা নূতন না হইবে কেন? একটী চতুষ্কোণ হাতা। তিন দিকে উচ্চ রোয়াক। উপরে ছাদের আচ্ছাদন। মধ্যে মৃত্তিকাময় উঠান। চতুর্থ দিকটিতে ফটক। যদি উচ্চ রোয়াক না থাকিত, তাহা হইলে ঠিক সারি সারি অশ্ব বাঁধিবার "আস্তাবল" বলিলেই চলিতে পারিত। সেই রোয়াকের এক দিকে এক স্থলে তিন চারিখানি বেঞ্চ ও একটি ভাঙ্গা টেবিল স্কুলের অস্তিত্ব জগতে ঘোষিত করিতেছে। ব্যাপার দেখিয়াই ত আমার চক্ষুঃস্থির!

আপাততঃ সে চিন্তা ছাড়িলাম। বেলা প্রায় ২৷৷০টা হইয়াছে। এখন ক্ষুধার চিন্তা অতি প্রবল। পণ্ডিতজীর তখনও আহার হয় নাই। রোয়াকগুলির পরেই এক একটা ঘর। ঘরগুলি—যেমন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি—এক একটি সিন্দুক এবং অন্ধকারময়। তাহারই মধ্যে একটিতে পণ্ডিতজীর দ্রব্যাদি থাকে এবং অপরটিতে তাঁহার রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। দেখিলাম তিনি রন্ধনে প্রবৃত্ত এবং পাক প্রায় শেষ হইয়াছে। আমাকে আমন্ত্রণ করিলেন। আমি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতিদানে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলাম। পর্জ্জন্য দেবের অনুকম্পায় পথে দিব্য স্নান হইয়াছিল; আর আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়াই আহারে বসিলাম। আটার বৃহৎ বৃহৎ মোটা মোটা পুরী জঠরানলের অনুকম্পায় বিলক্ষণ গলাধঃকরণ করিয়া পণ্ডিতজীকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া আচমন করিলাম। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে বেলা প্রায় ৪৷৷০টা বাজিয়া গেল। তৎপরে পণ্ডিতজীর সহিত খানিক সদালাপ—খানিক বা নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে সন্ধ্যা হইল। সে রাত্রি আর আহার হইল না। প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, বৃহৎ পুরীখণ্ডগুলি উদরে তখনও যুদ্ধ করিতেছে। স্কুলের সেই মৃত্তিকাময় উঠানে পণ্ডিতজী-দত্ত একখানি খাটিয়া পাতিয়া সে রাত্রি কোনও ক্রমে যাপন করিলাম। নূতন চাকুরীর স্থলে এইরূপে আমার প্রথম রাত্রি গেল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রথম প্রশ্ন—শৌচক্রিয়া। স্কুলে পায়খানা নাই। এ নগরটিতে দেখিলাম, অধিকাংশ লোকই স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে নগর-প্রাচীরের বাহিরে জঙ্গলে গিয়া শৌচ করেন। আমার আজন্ম তাহা অভ্যাস নাই। মহা-বিপদ উপস্থিত। অবশেষে পণ্ডিতজী আমার কষ্টে ব্যথিত হইয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

এখন স্কুলের অবস্থা একটু বলি। গ্রীষ্মকাল। প্রাতেই পাঠশালা বসিয়া থাকে। দেখিলাম একটি মুসলমান চাকর আসিয়া স্কুলের দালানগুলি ঝাঁট দিতেছে। তৎপরে একটা কুঠরী হইতে বৃহৎ বৃহৎ জাজিম বাহির করিয়া পাতিয়া দিল। ক্রমশঃ বালকদের আগমন আরম্ভ হইল। প্রায় ১০০ অথবা ১২৫টি বালক সমবেত হইল। তাহারা আসিয়া জাজিমে বসিতে লাগিল। স্কুলে চারিটি বিভাগ দেখিলাম। হিন্দী, ফারসী, সংস্কৃত এবং ইংরাজী। ইংরাজী শ্রেণীতে গুটি ১০।১৫ বালক। তাহারা আসিয়া সেই তিন চারিখানি বেঞ্চ, আর ভাঙ্গা টেবিলটি দখল করিয়া বসিয়া আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৯।১০ জন শিক্ষক। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি নাই। চারি বিদ্যারই শিক্ষা মহারাজের

বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়া থাকে। আবার ইহাও দেখিলাম, পার্শী শ্রেণীতে ফরাস বিছানায় মৌলবী সাহেব বসিয়া গুলেস্তাঁ পড়াইতে লাগিলেন এবং কিঞ্চিৎপরে পূর্ব্বকথিত মুসলমান চাকরটি দিব্য এক কলিকা তামাকু সাজিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল। মৌলবী সাহেব কতকটা আলবোলার ন্যায় গুড়গুড়িতে দিব্য তামাকু সেবন করিতে করিতে আপনার সাগরেদদের গুলেস্তাঁ, বোস্তা, আনওয়ার, সোহেলী ইত্যাদি পুস্তক হইতে পাঠ দিতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ-কাল পরে নিজের মহকুমা পরিদর্শন করিলাম।

দেখিলাম ইংরাজীতে ১০।১৫টী বালক; কেহ Christian Societyর Primer পড়ে; কেহ বা আমাদের পুরাতন গুরু প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ফার্ষ্ট বুক আরম্ভ করিয়াছে; কেহ বা থানিক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গণিত ইত্যাদিও তদনুরূপ। ব্যাপার দেখিয়া আমার চক্ষুঃস্থির! ভাবিলাম, এ মন্দ নহে। বি. এ. পাশ করিয়া এখন পুরাতন গুরুর সেবা করাই আমার যোগ্যতার উপযুক্ত পারিতোষিক। হিন্দুরাজার অধীনে চাকুরী করা সযত্নপোষিত একটি সাধ। ভগবান তাহা সমুচিতরূপে পূর্ণ করিয়াছেন। স্কুলে যেমন বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদের পাঠ দিয়া থাকেন, চারি বিভাগের মধ্যে কোনটিতেই তাহার চিহ্নমাত্র দেখিলাম না। যে যাহা ইচ্ছা পাঠ করিতেছে এবং শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাই পড়াইতেছেন। মাহিনা পাইব কেন ভাবিয়া, বেলা ১০টা পর্য্যন্ত আমার ইংরাজী-পাঠী ছাত্রগুলিকে বি-এল্-এ—ব্লে পাঠ দিয়া স্কুল বন্ধ করিলাম। তৎপরে পণ্ডিতজীর কৃপায় দ্বিতীয় দিবসও তাঁহারই নিকট উদর পূর্ণ করিয়া নিজ অবস্থা চিন্তা করিতে বসিলাম। কোথায় আসিলাম, কাহার নিকট আসিলাম? সেক্রেটারী মহাশয়ের ব্যবহারও অদ্ভুত দেখিতেছি। স্কুলের অবস্থা ত এই। আমিই একমাত্র ইংরাজী-শিক্ষক; তাহার উপর এই প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক পড়াইতে হইবে। দরিদ্র পিতৃদেব পেট ভরিয়া নিজে না খাইয়া আমায় উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন; তাহা যদি এই ফার্ষ্ট-বুক পড়ানতে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে যাহা কিছু শিখিয়াছি তাহা ২।১ বৎসরের মধ্যে ভুলিয়া যাইব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এক অতি কদাকার স্থলে আসিয়া পড়িলাম। তাহার উপর যে কার্য্য করিতে আসিয়াছি, তাহার অবস্থা এই। ও দিকে পূর্ব্ব চাকুরীও ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানারূপ দুশ্চিন্তার হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলাম। দূর দেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে একা নির্জ্জনে পড়িয়া ক্রমাগত ভাবিতেছি; ভাবনার আর কূল কিনারা নাই। পাঠক যদি কখনও আমার অবস্থায় পড়িয়া থাক, তবে আমার সে সময়কার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। আমায় শত সহস্র চিন্তারূপী বৃশ্চিক দংশন করিতেছে; আমি জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। আমায় একটু সাহস দেয়, এমন একটি লোক নাই। আমি তখন নিরাশা-সাগরের অন্তস্তলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এক একবার ভগবানের নাম লইতেছি। এক একবার মনে মনে ভাবিতেছি, যদি এখনও দ্বিতীয় আবেদনপত্রের উত্তর পাই, তাহা হইলে এ দেশ হইতে প্রস্থান করি। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায়, আমি দেশীয় রাজ্যে নিজের অধিকাংশ জীবন কাটাইব। সুতরাং দ্বিতীয় আবেদনপত্রসম্বন্ধীয় কোনও নিয়োগপত্র তখন আসিল না।

স্কুলের 'চার্জ্জ'ই বা কাহার নিকট হইতে লইব, তাহাও জানি না। পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, পূর্ব্বে একজন চৌবে-জাতীয় ব্রাহ্মণ প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্কুলটীর মস্তক বিলক্ষণরূপে চর্ব্বণ করিয়া আজ দুই মাস হইল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিলাম, আজ দুই মাস হইতে বিদ্যালয়টি একপ্রকার মস্তকশূন্য। তজ্জন্য যাহা কিছু জীবনীশক্তি ছিল, তাহাও লোপ পাইয়াছে। পরদিন আবার প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি শেষ করিয়া গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ন্যায় প্যারীচরণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে সেক্রেটারী মহাশয় আসিয়াছেন; তিনি আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আফিসে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার আবার আফিস কি? তদন্তে জানিলাম, তিনি হস্পিট্যাল-এসিষ্ট্যাণ্ট পর্য্যায়ের একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার। এখানকার মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী এবং স্কুলেরও সেক্রেটারী। তাঁহার আফিস অর্থে এখানে মিউনিসিপাল আফিস বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহার উদ্দেশে গমন করিলাম। তিনি অতি সাদরে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার ভদ্র

ব্যবহারে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম। পরিচয়ে ক্রমশঃ অবগত হইলাম তিনি একজন ক্ষত্রিয়, কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পুরাতন মিলিটারী শ্রেণীর হস্পিটাল-এসিষ্টাণ্ট বিভাগে শিক্ষিত। ১৮৬৮ সালে পাস করিয়া পরীক্ষায় প্রথম হইয়া এ দেশে আগমন করেন এবং তদবধি এতদ্দেশেই আছেন। বৎসর দুই হইল, একটি বৃহৎ রাজ্য হইতে বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। প্রথমে এখানে কলেরা-ডিউটিতে আগমন করেন; তৎপরে নগর অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকায় তৎপ্রতি এজেণ্ট সাহেবের দৃষ্টিপাত হয়। তিনি একটি মিউনিসিপাল বোর্ড স্থাপিত করিয়া উক্ত ডাক্তার মহাশয়কে উহার সেক্রেটারী এবং হেল্থ-অফিসার নিযুক্ত করেন। কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ডাক্তার মহাশয় একটু বাঙ্গালী-ঘেঁসা এবং শিক্ষিত বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহাকে বিলক্ষণ নিরহঙ্কার ও অকপটহৃদয় দেখিলাম। বলিতে কি, তাঁহার সহিত আমার সেই দিন অবধি এমন বন্ধুত্ব জন্মিল যে সেই বন্ধুত্ব আজ ২৮।২৯ বৎসর সমভাবে যাইতেছে। উভয়ের মস্তকোপরি কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে একদিনের জন্যও মনোমালিন্য ঘটে নাই। আমি তাঁহার নিকট কত বিষয়ে ঋণী, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।

প্রথম আলাপের পর তিনি স্কুলের চার্জ্জ আমাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, স্কুলের অবস্থা দেখিয়া আপনি অবশ্যই আশ্চর্য্য হইয়াছেন; কিন্তু আপনাকে ঐ স্কুলটী নূতন করিয়া খাড়া করিতে হইবে। যাহাতে স্কুলটী একটি আদর্শ স্কুলে পরিণত হয়, সে বিষয়ে আপনাকে যত্নবান হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি প্রথম প্রথম অত্যন্ত নিরাশ হইবেন। কিন্তু নিরাশ হইলে কাজ চলিবে না। আমি আপনাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবেন না। যখন আমি আপনাকে আনিয়াছি, তখন ইহা নিশ্চয় জানিবেন আমি আপনার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকরূপে দাঁড়াইয়া আছি এবং প্রাণপণ যত্নে আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আপনি দেশীয় রাজ্যে কখনও কার্য্য করেন নাই। এখানকার জলবায়ু অন্যরূপ। কিন্তু কোনও বিষয়ে আপনি ভীত হইবেন না। আমি সমস্ত বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আপনাকে অভিজ্ঞ করিয়া দিব। এইরূপে উৎসাহ দিয়া তিনি আমায় প্রথমে স্কুলটী খাড়া করিবার জন্য কি কি আবশ্যক, তাহার একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি রিপোর্ট লিখিতে সম্মত হইয়া উপস্থিত একটি বিপদের বিষয় তাঁহাকে জানাইলাম। আমি বলিলাম, রিপোর্ট আমি ইংরাজীতে লিখিব। আপনাদের কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা ইংরাজী জানেন না; আমি যদিও ছাত্রাবস্থায় গৃহে উর্দ্দুর চর্চ্চা করিয়াছিলাম, তথাপি সে ভাষায় এত পরিপক্ক হই নাই যে উর্দ্দুতে রিপোর্ট লিখিয়া দিই। তিনি বলিলেন, তাহাতে কোনও চিন্তা নাই। আপনি ইংরাজীতে লিখুন; আমরা উভয়ে মিলিয়া অনুবাদ করিয়া লইব। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া আমি প্রথমে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম যে, এই পরোপকারিতার মূলে একটু স্বার্থ ছিল। তাহার বিস্তৃত বর্ণনা পরে করিব। যাহা হউক, মূলে স্বার্থ থাকিলেও তিনি যে একজন উন্নতচেতা মহৎপ্রকৃতির লোক, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। কেবল ফার্সী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া মনুষ্য এরূপ উন্নতচিত্ত হইতে ও উদারপ্রকৃতি লাভ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখিলাম।

এখন প্রতিদিন আহার তাঁহার বাটীতেই চলিতে লাগিল। আমি কতবার তাঁহাকে আমার জন্য অন্য একটি বাসা করিয়া দিতে অনুরোধ করি, কোনও মতেই তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন না। এইরূপে প্রায় এক মাস ক্রমাগত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবশেষে আমি জেদ করিয়া অন্য বাসায় থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় ছাড়িয়া দেন। ইতিমধ্যে আমার বিস্তৃত রিপোর্ট লেখা চলিতেছে। তিনি সঙ্গে লইয়া আমাকে এখানকার প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি হিন্দী ও উর্দ্দু জানি বটে, তবে এ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী সভ্য-সমাজে বেশী মিশিবার অবকাশ না পাওয়ায় উক্ত সমাজের নানারূপ আদব কায়দায় ততদূর পরিপক্ক ছিলাম না। তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় সমস্ত শিখাইতে লাগিলেন। ভদ্রমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ-সময়ে একটি মহা-গোলে পড়িলাম। আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের কোনও

মস্তক-আবরণ নাই। পুরাতন রীত্যনুসারে আমি খোলা মস্তকেই এ দেশে আসিয়াছি। আমার খোলা মস্তক দেখিয়া এ দেশের লোকরা নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সেক্রেটারী মহাশয় আমার জন্য তাড়াতাড়ি একটি টুপীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আবার এখানকার এই নিয়ম যে, উচ্চপদস্থ অথবা রাজপরিবারভুক্ত কোনও মহাশয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অথবা রাজবাটীতে যাইতে হইলে, খোলা মাথায় ত যাওয়া হইতেই পারে না, কিন্তু টুপী পরিয়া যাওয়াও নিষিদ্ধ। উষ্ণীষ ধারণ করিয়া যাওয়া উচিত। আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। সেক্রেটারী মহাশয়ের ইচ্ছা, আমার সহিত স্কুল-কমিটীর সভাপতি যুবরাজের আলাপ পরিচয় এবং সাক্ষাৎ করান। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে মস্তকে "পাগড়ী" বাঁধিয়া যাইতে হইবে। আমি বাল্য-কালাবধি পাগড়ীর ধার ধারি না; সঙ্গেও আনি নাই। সেক্রেটারী মহাশয় নিজে পাগড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে আমার শিরে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া "যুবরাজের" নিকট লইয়া গেলেন। যুবরাজ সুপুরুষ, ২৪।২৫ বৎসর বয়সের ক্ষত্রিয়। তিনিই এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। বর্ত্তমান মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু পোষ্য-গ্রহণ করায় রাজপুত্র। ভবিষ্যতে এই রাজ্যের অধিপতি হইবেন বলিয়া কোনও সূত্রে কিছু কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে কমিটীর সভাপতি করিয়া দিয়াছেন। দেখিলাম, তাঁহার স্কুলের কার্য্যের দিকে যতটা মনোযোগ হউক বা না হউক, পুরাতন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের রীত্যনুসারে শিকারের প্রতি যথেষ্ট টান। যতক্ষণ আমি বসিয়াছিলাম, আমার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া ও সেক্রেটারীর সহিত ২।৪টি স্কুলের কথা কহিয়া তাঁহার সহিত ক্রমাগত বন্দুক ও শিকারের কথা কহিতে লাগিলেন। যুবরাজের হাস্যমুখ দেখিয়া ও সারল্যপূর্ণ কথা শুনিয়া অনেকটা প্রীতিলাভ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু সমস্ত দিন "জনাব জনাব"—বাঙ্গালীর মুখটি পর্য্যন্ত দেখিবার উপায় নাই, আর এই টুপী ও পাগড়ীরূপী গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়া আমার জীবনটা কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। মন আর এখানে কোনও মতেই টেঁকে না। অন্য উপায় নাই বলিয়া যেন দায়গ্রস্ত হইয়া হিন্দুর রাজ্যে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

এ রাজ্যের রাজা বৃদ্ধ। তাঁহার রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা সরকার বাহাদুর নিজ হস্তে লইয়াছেন এবং পাঁচটি সভ্য সমবায়ে এক কৌন্সিল স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত চলিতেছে। এই ব্যাপারঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত পরে আমূল বর্ণন করিব। ৫জন সভ্যের মধ্যে তিনজন পুত্তলিকাবৎ; অপর দুইটির মধ্যে একটি মুসলমান, অপরটি হিন্দু। মুসলমানটি লেখা-পড়ায় ও আইন কানুনে বেশ দক্ষ, তবে ইংরাজী শিক্ষা না থাকায় কিছু পুরাতন ধরণের। হিন্দুটি লেখাপড়া কতক কতক জানেন, তবে মুসলমানের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষ নহেন। এই দুজনে একদল। মুসলমান খাঁ সাহেব বলিয়া পরিচিত। অতি স্থূলকায় দেহ বলিয়া 'মোটা খাঁ' নাম পাইয়াছেন এবং হিন্দুটি 'দেওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কিয়দ্দিবস পরে সেক্রেটারী মহোদয় খাঁ সাহেবের সহিত পরিচিত করাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং বলিলেন, তিনি এ রাজ্যের এখন প্রধান ব্যক্তি; তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করা উচিত। আমি সম্মত হইলাম এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত তাঁহার গৃহে গমন করিলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। তিনি বড় একটা ভাল করিয়া আলাপ করিলেন না। তখন আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। পরে কারণ অবগত হইয়া বিস্ময়ের লোপ হইল। কিছুদিন পরে দেওয়ানের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। তিনি খাঁ সাহেব অপেক্ষা একটু ভাল করিয়া আলাপ করিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ আন্তরিক সহৃদয়তা পাইলাম না।

এই সকল আলাপ পরিচয় সাক্ষাতাদির মধ্যে আমার স্কুলের রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। কমিটীতে পেশ্ হইয়া মঞ্জুর হইয়া গেল। স্কুলে চারি বিভাগেই শিক্ষা চলিতে লাগিল। অন্যান্য বিভাগগুলি—যথা সংস্কৃত, পার্শী ও হিন্দীতে যথেষ্ট শিক্ষক ছিল; সুতরাং কার্য্য এক প্রকার বেশ চলিতে লাগিল। ইংরাজী বিভাগে আমিই একা, তাই একটু গোলযোগে পড়িতে হইল। ইংরাজীপাঠী ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া চারিটি শ্রেণী করিলাম। চারি শ্রেণীতে বালক-সংখ্যাও কিছু কিছু বেশী হইতে লাগিল। সুতরাং একা সমস্ত স্কুল পরিদর্শন এবং চারি শ্রেণীতে পড়ান একটু কষ্টকর হইল।

রাম-সীতা
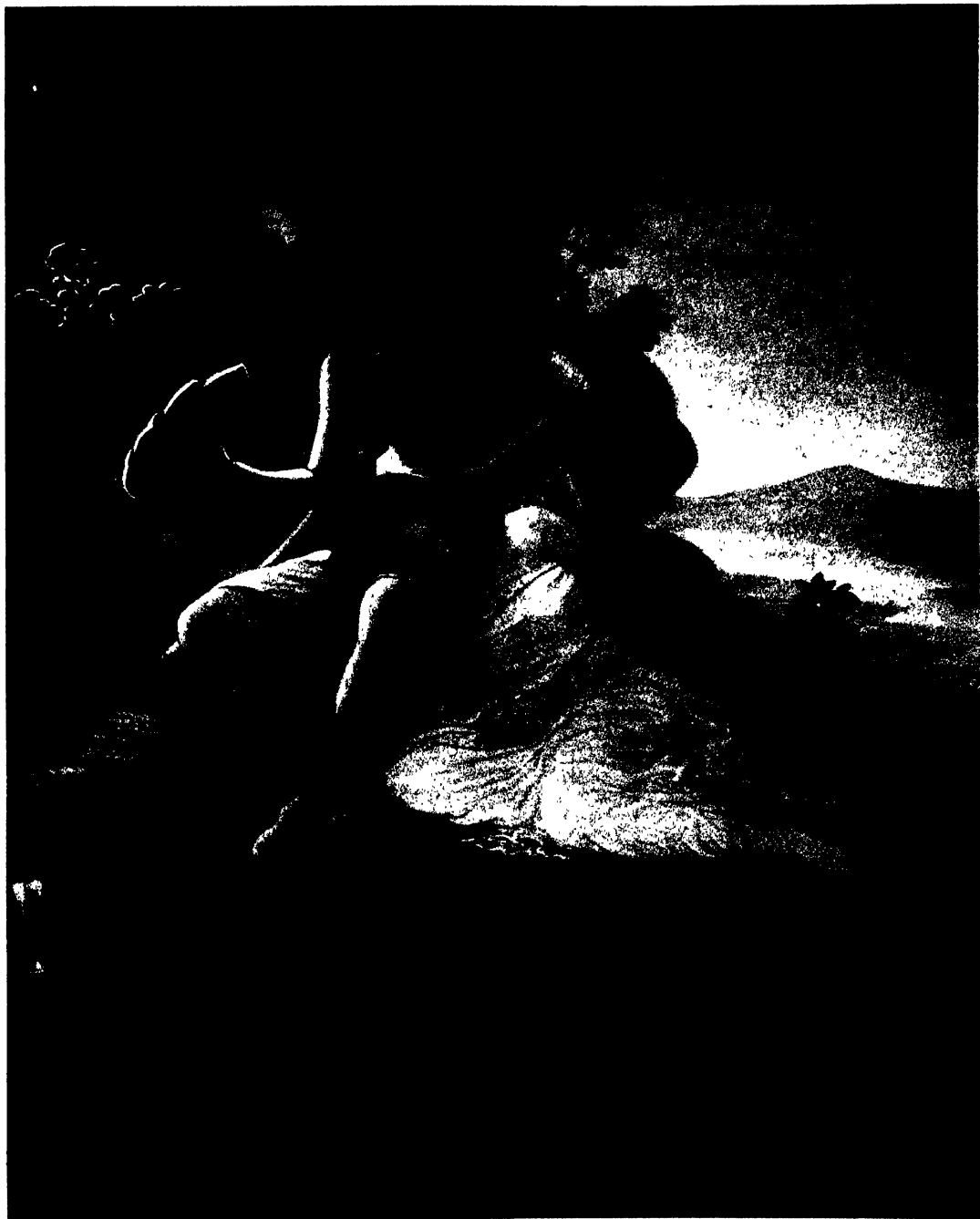
শিল্পী— এস্ এন্ দাস

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

খাঁ সাহেব ও দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর সেক্রেটারী মহাশয় আমার সহিত আর একটি লোকের পরিচয় করাইয়া দেন। ইনি এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট। একজন পণ্ডিত-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিতজীর সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। প্রথম সাক্ষাতে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমায় যথেষ্ট সাদরসম্ভাষণ করেন। জানিতে পারিলাম সেক্রেটারী মহাশয়ের তিনি একজন বিশিষ্ট বন্ধু। আমাকে এখানে আনাইবার একজন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং সেক্রেটারী মহাশয়ের ন্যায় মূলে ইঁহারও একটু স্বার্থ ছিল। যাহা হউক, বিদেশে বন্ধু-বান্ধবহীন স্থানে এই দুই মহানুভব আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়স্থল হইলেন। বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, প্রায় এক মাস হইতে চলিল আমি এখানে আসিয়াছি; কিন্তু আমার মন কোনও ক্রমেই তিষ্ঠিতেছে না। পিঞ্জরের পক্ষীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। বিশেষতঃ মস্তকে পাগড়ী বাঁধা ও সমস্ত দিন বিজাতীয় হিন্দী অথবা উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইতিমধ্যে স্কুল লইয়া একটু ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি উৎপন্ন হইল; তাহাতে ক্রমে ক্রমে এখানকার সমস্ত গূঢ় রহস্য ভেদ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমিই একা ইংরাজী শিক্ষক এবং চারি শ্রেণীতে একা শিক্ষা দিতে হয়। কিছুদিন পরে কার্য্য চলা কষ্টকর দেখিয়া আমি স্কুল-কমিটীতে একজন ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ সহকারীর জন্য বাধ্য হইয়া আবেদন করি। ইতিমধ্যে অস্থায়ী এজেণ্ট সাহেব রাজ্য-পরিদর্শনার্থ ৩।৪ দিবসের জন্য এখানে আগমন করেন। এই রাজ্যের সহিত আরও ২।৩টি রাজ্য মিলিত করিয়া একটি এজেন্সী হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি কখনও এই রাজ্য, কখনও বা অপর রাজ্যগুলি মধ্যে মধ্যেই পরিদর্শন করিয়া বেড়ান।

আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ। আমি বাঙ্গালী, তাহাতে আবার দেশীয় রাজ্যে চাকুরী লইয়াছি। এজেণ্ট মহাশয়দের স্বভাব চরিত্রের আভাস সংবাদপত্র পাঠে কতকটা যাহা জানা ছিল, তাহাতে আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল। তজ্জন্য সন্দিহানচিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, আমার পূর্ব্ব সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। সংবাদপত্রপাঠে আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা সমস্তই অলীক। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অত্যন্ত সরলহৃদয়ে ও অকপটচিত্তে কথা-বার্ত্তা কহিলেন। ইহার পরে এই সাহেব দুই তিনবার আমাদের রাজ্যের এজেণ্ট হইয়া আসিয়া একাদিক্রমে ২।৩ বৎসর ধরিয়া থাকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কখনও আমি ইঁহাকে রুক্ষস্বভাব দেখি নাই। আমার প্রতি ইঁহার বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি ছিল এবং মহারাজার সহিতও অত্যন্ত সুহৃৎভাব ছিল। ইঁহার ন্যায় দয়াশীল এজেণ্ট আমি অল্পই দেখিয়াছি।

স্কুলের সমস্ত অবস্থা এবং আসিয়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা আমি করিয়াছি, সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি আমার নিকট অতি ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। আমার কার্য্যে আনন্দ-প্রকাশ করিয়া নানারূপ সৎপরামর্শদানে উৎসাহিত করিলেন; তাঁহার কয়েকটি কথা আমার এখন পর্য্যন্ত মনে আছে। স্কুলটিকে এক প্রকার ভাঙ্গিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমায় উৎসাহ দিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "Virgin soil, promising rich crop"। পরে বিদায়গ্রহণকালে আমায় বলিয়া দেন, আমি যখন এখানে আসিব তুমি আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিবে এবং তোমার স্কুলের যাহা যাহা আবশ্যক আমায় বলিবে। এই সূত্রে আমি নিজ সহকারীর বিষয়ও তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া বলি যে, আমি কমিটীতে আবেদন করিয়াছি।

সাহেবের সহিত সাক্ষাতের পর দিনেই কমিটীর অধিবেশন হয়। খাঁ সাহেব এবং দেওয়ানজী কমিটীর ক্ষমতাশালী সভ্য। পণ্ডিতজীও সভ্য বটে, তবে খাঁ সাহেব ও দেওয়ানের ন্যায় তাঁহার পড়তা ভাল নয় বলিয়া, তিনি একটু টিপিয়া চলেন। পাঠকগণ ক্রমশঃই সমস্ত অবগত হইবেন। পরদিন শুনিলাম আমার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। খাঁ সাহেব এবং দেওয়ানজী এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুই দুই মুদ্রা প্রাত্যহিক বেতন দিয়া শিক্ষক আনান হইল (পাঠক মনে রাখিবেন, আমার বেতন ৬০৲ মুদ্রা অর্থাৎ প্রত্যহ দুই টাকা হিসাবে পাইতেছি, ৩১-এমাসের হিসাব এখানে ধর্ত্তব্য নহে!) আবার সহকারী কেন? আমরা এই রাজ্যের নিমকে প্রতিপালিত; রাজ্যের অর্থ এরূপ অন্যায়ভাবে অপব্যয় করিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

কথা ও সুর ঃ -কাজী নজরুল্ ইস্লাম্ স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

জয়জয়ন্তী—কার্ফা

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায় কাজল আকাশ ঘিরে।
তুমি এসো ফিরে ॥
উঠ্‌ছে কাঁদন্ ভাঙন্-ধরা নদীর তীরে তীরে,
তুমি এসো ফিরে ॥
বন্ধু তব বিরহেরি অশ্রু ঘনায় গগন ঘেরি'
লুটিয়ে কাঁদে বন-ভূমি অশান্ত সমীরে।
তুমি এসো ফিরে ॥
আকাশ কাঁদে আমি কাঁদি বাতাস কেঁদে সারা,
তুমি কোথায় কোথায় তুমি পথিক পথ-হারা।
দুয়ার খুলে নিরুদ্দেশে
চেয়ে আছি অনিমেষে,
আঁচল ঢেকে রাখ্‌বো কত আশার প্রদীপ্‌টি-রে।
তুমি এসো ফিরে ॥

II {পা -ধা ণা র্সা | ণধা -র্সণধা -পা -া I মা -পধা পধপা পমা | মা -া -গমগা রা I
স ০ জ ল হা০ ০০ও য়া ০ কেঁ ০০ দে০০ বে ড়া ০ ০০০ য়্

I সরা -গমা মগা রা | সরা মগা -মগরা রা I সা -া -া -া | ৷ ৷ ৷ ৷ I
কা০ ০০ জ ল আ০ কা ০শ্ ঘি রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রমা -রমা মপা -া | পা না না না I নর্সা -া -া -া | ণর্সণা -ধণধা -পা -া } I
তু ০০ মি০ ০ এ ০ সো ফি রে ০ ০ ০ ০০০ ০০০ ০ ০

I পা -ধা ধপা মা | মগা -রা -া -া I রা সরা জ্ঞা রা | সা -া -া -া I
উ ঠ্ ছে কাঁ দ০ ০ ০ ন ভা ঙ০ ন্ ধ রা ০ ০ ০

I ᵐমা -রমা মপা -া | পা -ধা ণা ধা I পা -া -া -া | া া া া I
ন ০০ দী০ র্ তী ০ রে তী রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পনা -া না -া | না র্সা র্সা র্সা I নর্সা -নর্সা -র্রা -া | র্সর্রর্সা -ণর্সণা -ধণধা -পা II
তু ০ মি ০ এ ০ সো ফি রে০ ০০ ০ ০ ০০০ ০০০ ০০০ ০

[র্রা -া র্সা র্সা না -া -ধা -পা]
II {পা না না না | নর্সনা -ধনধা -পা -া I প্সর্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া -া -া I
ব ন্ ধু ত ব০০ ০০০ ০ ০ বি ০ র হে রি ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্রা র্রা | র্সর্রা -া -র্সণা -ধপা I পধা ধর্সা র্সর্রা র্রা | র্সর্রা -র্জ্জা -া -া } I
অ ০ শ্রু ঘ না০ ০ ০০ ০য়্ গ০ গ০ ন০ ঘে রি০ ০ ০ ০

I র্রা র্রর্মা -র্জ্জা র্রা | র্রর্সা -া -া -া I র্সধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
লু টি০ য়ে কাঁ দে ০ ০ ০ ব ০ ন ভু মি ০ ০ ০

I মা মপা -ধা পা | মা গা রা -া I ণা -া ধণধা -পা | পা -ধা ধপা মগা I
অ শা০ ন্ ত স মী রে ০ তু ০ মি০০ ০ এ ০ সো ফি০

I রগা -রগমা -া -া | -া -া া া I সরা -গমা মগা রা | সরা রগা -মগরা রা I
রে০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কা০ ০০ জ ল আ০ কা ০শ্ ঘি

I সা -া -া -া | া া া া II
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II রা রপা -মা গা | রা -া -া -া I সরা জ্জা রা রসা | সা -া -া -া I
আ কা শ কাঁ দে ০ ০ ০ আ ০ মি কাঁ০ দি ০ ০ ০

I সরা -জ্জরা রণ্ ধ্ া প্ া | প্ া রা রা রগা I রগা -মা -া -া | -গমগা -রগরা -সা -া I
বা০ ০ তা০ স্ কেঁ ০ দে সা০ রা০ ০ ০ ০ ০০০ ০০০ ০ ০

I রমা -রমা মপা পা | পা -া -া -া I পনা না র্সা র্সা | র্সা -া -া -া I
তু ০০ মি০ কো থা ০ ০ য়্ কো০ থা য়্ তু মি ০ ০ ০

I নর্সা নর্সা -র্রা- জ্ঞর্রা | -জ্ঞর্রা জ্ঞর্ণা -ধণধা -পা I পা -ধা পা পমা | মা -গমগা -রা না I
পং থিং ০ ০ ০ ০ ০০০ কৃ প ০ থ হা রা ০০০ ০ ০

I না না -া না | নর্সনা -ধনধা -পাধ I ধর্সা র্সা -া র্সা | র্সা -া -া -া I
তু য়া র্ খু লে ০ ০০০ ০ নিং রু ০ দ্দে শে ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্রা র্রা | র্রর্গা -র্রর্গর্মা -র্গর্মর্গা -র্রা I র্রা -র্গা র্গর্রা র্সর্না | নর্সা -া -া -া I
চে ০ য়ে আ ছিং ০০০ ০০০ ০ অ ০ নি মেং ষে ০ ০ ০

I না নর্সা -া র্সা | নর্সা -র্রজ্ঞর্রা -জ্ঞর্ণা -ধপা I পা -ধা ধপা মা | মগা -রা -া -া I
আঁ চ ০ ল্ ঢে কেং ০০০ ০ ০০ রা খ্ বো ক তং ০ ০ ০

I সরগা -মা গা রাগ | সরা রগা -া রা I সা -া -া -া | । । । । I
আং ০ শা র্ প্রং দীং প্ টি রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রমা -রমা মপা -া | পা না না না I নর্সা -া -া -া | -ণর্সণা -ধণধা -প -া II II
তু ০০ মিং ০ এ ০ সো ফি রে ০ ০ ০ ০০০ ০০০ ০ ০

ইস্পাতের ধাতবীয় অঙ্গে ফস্ফরাস ও ভারতীয় কয়লা

শ্রীরমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

অধিকাংশ ভারতীয় খনিজ কয়লা হইতে যে কোক কয়লা উদ্ভূত হয়, লৌহ নিষ্কাশন কার্য্যে তাহার ব্যবহার হইতে ইস্পাত নির্ম্মাণ বিষয়ে কয়েকটি অসুবিধা অনুভূত হইয়া থাকে। ফস্ফরাস-নিয়ন্ত্রণ ইস্পাত ঢালাই কার্য্যে এক জটিল সমস্যা। পিগ লৌহ বা ঢালাই লৌহের মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২৬০ হইতে ৫০০ ভাগ ফস্ফরাস বর্ত্তমান থাকে; ঐ ফস্ফরাস বহুলাংশে, নিষ্কাশন কার্য্যে যে কোক ব্যবহৃত হয় তাহা হইতেই লৌহের মধ্যে চালিত হয়। ইস্পাত শিল্পে ভারতীয় কয়লার কোকের অনাদরের ইহাই বোধ হয় মুখ্য কারণ। নমনীয়তার দিক থেকে ইস্পাতের মধ্যে শতকরা ·০৫ অংশের নিম্নেই ফস্ফরাস থাকা বাঞ্ছনীয়; নতুবা ব্যবহার ক্ষেত্রে সেই ইস্পাত পরিত্যক্ত হইবে। তিন প্রকার চুল্লীতে গলিত লৌহ ফুটাইয়া ইস্পাতের পাক চলে; (১) খোলা ভাঁটী (Open hearth) (২) Bessemer's Converter (বেসেমার্স কন্‌ভার্টার) (৩) Electric Furnace (ইলেকট্রিক ফার্ণেস)। সব জায়গাতেই ফুটন্ত লৌহের মধ্যে ঘন ঘন চুণের পাথর প্রয়োগ করিতে হয়। দ্রবমান লৌহ হইতে চুণ ফস্ফরাসকে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটরূপে দূরীকৃত করিয়া ইস্পাতের সংশোধন করিতে থাকে। গাদএর সঙ্গে যাহাতে যথাযথ ভাবে ইহা চলিয়া যায়, তাহার জন্য ভাঁটার তাপের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাপ ও গ্যাসের চাপ কমতি হইলেই ইস্পাতের মধ্যে ঐ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট গাদের সহিত মিশিয়া যায়, তখন তাহাকে আলাদা করা এক

গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়; প্রায় সারাক্ষণই ইস্পাত-নির্ম্মাতাদের ভাঁটী হইতে নমুনা বাহির করিয়া বিশ্লেষণাগার মুখে ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। ফস্ফরাস যতক্ষণ শতকরা ·০৩ অংশের নিম্নে না থাকে ততক্ষণ অন্য মিশ্রিত ধাতুর অবস্থা যতই সন্তোষজনক হউক না কেন—ঢালাই চলিতে পারে না। ইস্পাতের শ্রেণীবিচার চলে কার্ব্বণের মাপ-কাঠিতে। কাজেই ঢালাইএর সময় প্রবহমান ধাতুস্রোতের মধ্যে কোক ব্যাগ ও Ferro-Manganese ব্যাগ-হিসাব মত ছুঁড়ে দেওয়া হয়—যাহাতে উহা বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রক্ষিপ্ত কোক ও ম্যাঙ্গানিজ হইতেও ইস্পাতের মধ্যে ফস্ফরাসের বৃদ্ধি হয়—তার উপরে Slag সংমিশ্রণের সম্ভাবনা ত আছেই। ঢালাইএর শেষ হওয়া পর্য্যন্ত 'বেল্‌চে' ভরতি চূণ-পাথর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চালাতে হয়। ইস্পাত ভাঁটীর ২য় প্রণালীর কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রচলন অধুনা বেশ হ'য়েছে। এই প্রণালীতে সুবিধা এই যে দ্রবমান ধাতুর মধ্যে হাওয়া blow করে Carbon, Sulphur, Silicon ও Manganese প্রথমটা উড়িয়ে দিয়ে পরে হিসাবমত ঐগুলি প্রয়োগ করলে চলে, Phosphorusএর অসুবিধা কিন্তু পূর্ব্ববৎ রহিয়া যায়। Basic Convertorএর উদ্ভব এই থেকেই হয়। (Converter দু রকম acid ও basic)। ইহার সাহায্যে Phosphorus বিদ্রাবিত হয় বটে কিন্তু কখন কখন মাত্রা এমন ভাবে ছাড়াইয়া যায় যে Ferro-Phosphate নামক খনিজ ধাতুর প্রয়োগে সাম্যতার মাত্রা ফিরাইয়া আনিতে হয়। শ্রম ও উৎকণ্ঠার কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যয়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই Phosphorus নিয়ন্ত্রণ এক ক্লেশকর ব্যাপার হইয়াই চল্‌ছে।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক জগতে এক মতবাদের উদ্ভব হ'য়েছে যে Phosphorus বিদ্রাবণের জন্য আয়াস তথা ব্যয় আদৌই আবশ্যক হবে না। শতকরা ·৩ অংশের উপর যদি Phosphorus বাড়িয়া না যায় তবে ইস্পাতের অঙ্গে ইহা এক পরম বাঞ্ছনীয় পদার্থ বলে গণ্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। ইস্পাতের জিনিষের পরম শত্রু হ'য়েছে মরিচা; জল, হাওয়া ও রোদের প্রভাবে ধাতু সহজেই oxidised হইয়া ইস্পাতের গায়ে এই মরিচার সৃষ্টি করে; Aluminium, chromium প্রয়োগে কখনো বা বাইরে lead paint মাখাইয়া রক্ষা কার্য্য করবার প্রয়াস চল্‌ছে। এখন কথা উঠেছে যে অতি কম্‌তি মাত্রায় Carbon ও চড়া মাত্রায় Silicon প্রয়োগে যদি ইস্পাত তৈরী হয় এবং Phosphorus—·৩%এর মধ্যে থাকে তবে ductility বা নমনীয়তার দিকে সন্তোষজনক test দিয়েও ইস্পাত রক্ষা কার্য্যে এই Phosphorus সাহায্য করতে পারে। ব্যবহারিক জগতে এ তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে ভারতীয় কয়লার অঙ্গে সহজাত স্বাভাবিক উচ্চ Phosphorusএর জন্যই শিল্পী জগতে ইহার আদর ও চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। সর্ব্বনিম্ন ব্যয়ে উন্নততর পণ্য উৎপাদন—এই তথ্য হিসাবে অথচ সহজ উপায়ে ইহার আদর দিন দিনই বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। তথ্যবিদ্‌গণ বিশেষতঃ কয়লার খনির মালিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতার হয়ত বা খানিকটা সমাধান হ'তে পারে।

মিলন ও বিরহ

শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায়

নয়নের কাছে যবে রহ তুমি
　　মনে তোমা নাহি পাই,
নয়ন হইতে দূরেতে রহিলে
　　মনোমাঝে তব ঠাঁই।

মন ও নয়ন—এ দু'য়ের মাঝে
　　সার গণি তাই মনে,
মিলনের চেয়ে বিরহে সতত
　　মিলায় প্রাণের ধনে।

হিপ্নোটিজম্ ও মেস্‌মেরিজম্‌এর যথার্থ স্বরূপ

প্রফেসার রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র

হিপ্নোটিজম্ ও মেস্‌মেরিজম্—যাহা সম্মিলিতভাবে "সম্মোহনবিদ্যা" নামে অভিহিত হইতে পারে, তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কি উপকারে আসিতে পারে সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট কোন ধারণা নাই। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, এই বিদ্যার প্রতি তাঁহাদের আদৌ কোন আস্থা নাই—অর্থাৎ উহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করেন না। কেহ কেহ আবার উহাকে 'মিথ্যা' 'ফাঁকি,' 'বাজে জিনিষ' ইত্যাদি নামেও আখ্যা দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে অপর এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, ইহার সাহায্যে জগতের সকল কার্য্যই সম্পন্ন করা যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, এই শ্রেণীর লোকরা সকলেই চরমপন্থী এবং অত্যন্ত ভ্রান্ত। তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ এই বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার ভুল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে।

এই বিদ্যার প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস নাই এবং যাঁহারা ইহাকে 'মিথ্যা', 'ফাঁকি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কখনো যথার্থ hypnotic or mesmeric feats প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা খুব নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে। যে সকল লোক উক্ত কারণে হউক বা কোন অনভিজ্ঞ লোকের কল্পিত মিথ্যা কাহিনী শুনিয়াই হউক ইহার প্রতি ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ লেখকের প্রদর্শিত hypnotic and mesmeric নানা প্রকার কার্য্যকলাপ দর্শনকরতঃ আপনাপন ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ নিজেরাও সম্মোহিত হইয়া নিজেদের শরীর ও মনের উপর এই বিদ্যার প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় এরূপ ঘটনা বহু স্থানে অনেক ঘটিয়াছে। আর যাঁহারা ইহাকে 'মিথ্যা' বা 'ফাঁকি' বলিয়া অভিহিত করেন বোধ হয় তাঁহারা কেবল 'হিপ্নোটিজম্' বা 'মেস্‌মেরিজম্' নামে আখ্যা প্রাপ্ত বাজিকরগণের নানা প্রকার হাত-সাফাইর (sleight of hand) কৌশল বা ম্যাজিকই দেখিয়াছেন। প্রকৃত ম্যাজিক অতি উচ্চাঙ্গের জিনিষ; ইহা উচ্চতর গুপ্তবিদ্যার অন্তর্গত (belongs to higher occultism)। যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর যোগী বা প্রখর-ইচ্ছাশক্তিশালী, যথার্থ ম্যাজিক করার ক্ষমতা কেবল তাঁহাদেরই আছে। একমাত্র তাঁহারাই প্রখর ইচ্ছাশক্তি-বলে অন্তর ও বহিপ্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ইচ্ছামাত্র নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে পারেন। রঙ্গালয়ে ক্রীড়া প্রদর্শক কোন বাজিকর বা ম্যাজিসিয়ানের পক্ষে তাহা সম্পাদন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উক্ত স্থানাদিতে সাধারণতঃ যে সকল বাজির খেলা দেখা যায়, সেগুলি আসল ম্যাজিকের নকল মাত্র। বাজিকরগণ তাহা প্রদর্শন করিতে অক্ষম বলিয়া তাহারা হস্ত বা যান্ত্রিক কৌশলে উহাদের নকল মাত্র দেখাইয়া থাকে এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে দর্শকগণের মনে উচ্চ ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ঐ গুলিকে 'হিপ্নোটিজম্' বা 'মেস্‌মেরিজম্,' 'স্পিরিচুয়ালিজম্' ইত্যাদি বড় বড় নামে আখ্যা দিয়া থাকে। রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত যাবতীয় ম্যাজিক খেলাই যে মিথ্যা বা ফাঁকি, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই সহজে বুঝিতে পারেন। যদি তাহারা সত্যই কোন মানুষ বা পশু-পক্ষীর মাথা বা জিভ্ কাটিয়া পুনরায় জোড়া লাগাইতে পারিত, একটা নোট বা টাকাকে দুইটায় পরিণত করিতে পারিত, শূন্যের উপর নিরালম্বাবস্থায় গুরুভার পদার্থ সকল স্থাপন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত, তবে তাহারা সংসারে অনেক অঘটন ঘটাইতে পারিত এবং বাড়ী বসিয়াই সহস্র সহস্র টাকা বা নোট তৈয়ার করিয়া ধনবান হইতে পারিত এবং তাহাদের আর খেলা দেখাইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার আবশ্যক হইত না। সরল বিশ্বাসী অনভিজ্ঞ লোকরা এই শ্রেণীর নানারকমের খেলা দেখিয়াই এই বিদ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সকল হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। সময় সময় কোন কোন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকেও উক্তরূপ ভুল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে দেখা গিয়াছে।

কলিকাতার রাস্তায়, গড়ের মাঠে, মফঃস্বলের সহর-

গুলিতেও আজকাল এক শ্রেণীর বাজিকরকে একপ্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। তাহারা নিম্নোক্তরূপ খেলা দেখাইয়া প্রথম দর্শকদিগের মন আকৃষ্ট করে, তৎপরে তাহাদের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কৃত (?) 'সর্ব্বরোগহর' তাবিজ-কবচ বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের সকলের খেলাই প্রায় একরূপ। খেলাটা এই;—বাজিকর তাহার দলের এক যুবক বা বালককে তথা-কথিত হিপ্নোটিক্ বা মেস্‌মেরিক্ নিদ্রায় নিদ্রিতকরতঃ তাহাকে মাটির উপর চিৎ করিয়া শায়িত করে, তৎপরে একখানা কম্বল বা চাদর দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ দেহটি ঢাকিয়া দেয়। পরে তাহার আবৃত দেহের উপর একটা তাবিজ রাখিয়া দেয়। এতক্ষণ কোন দর্শক ঐ বাজিকরকে দেখাইয়া কোন একটা জিনিষ তাহার হাতের মুঠার ভিতর রাখিলে ঐ শায়িত লোকটা উহার নাম বলিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে সে বহু লোকের এই রকমের নানা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়া থাকে। ইহাতে দর্শকগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায় এবং উক্ত তাবিজের গুণেই যে তাহার ঐ শক্তির বিকাশ হইয়াছে এরূপ মনে করিয়া থাকে। তাহার ফলে উক্ত তাবিজ—যাহা যথার্থই অতি তুচ্ছ পদার্থ—তাহা দর্শকদিগের মধ্যে তাহাদের বিক্রয়ের সুবিধা হইয়া থাকে। এইরূপে তাহারা সিকি পয়সা মূল্যের একটা নগণ্য জিনিষ কয়েক আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। যদি ঐ তাবিজের যথার্থই উক্তরূপ কোন গুণ থাকিত, তবে উহার এক একটি হাজার টাকা দামেও ক্রয় করিবার লোকের অভাব হইত না। এই খেলাটার আগাগোড়া সমস্ত ফাঁকি এবং ইহা একটা তৃতীয় শ্রেণীর চালাকি মাত্র। এই কৌশলটা শিখাইয়া দিলে একটি আট বৎসরের বালকও উহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারে। যে সকল লোক উক্ত তাবিজ বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ফাঁকিবাজি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। এরূপ লোকের দ্বারা genuine hypnotic or mesmeric phenomena উৎপাদিত হওয়া কখনও সম্ভব নয়। হিপ্নোটিজম্ বা মেস্‌মেরিজম্ সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাহারা বিশেষরূপে ইহা অবগত আছেন যে, মোহিত ব্যক্তি মেস্‌মেরিক্ নিদ্রার তৃতীয়স্তরে উপনীত হইলে তাহার শরীর স্বতঃই বোধরহিতাবস্থায় (anaesthetic condition) পরিণত হয় এবং তখন তাহার শরীরে সূচ, হ্যাট্‌পিন ইত্যাদি বিঁধাইয়া দিলে কিম্বা ছোট রকমের অস্ত্রোপচার করিলেও সে উহাতে বিন্দুমাত্র জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে না। এই অবস্থায় সময় সময় বড় বড় অস্ত্রোপচারও (major operations) বিনা যন্ত্রণায় সম্পন্ন হইতে পারে। ১৭৮০ খৃঃ অঃ ডাক্তার এস্‌ডেইল (Dr. Esdail) নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার (surgeon) এই কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে বহুসংখ্যক রোগীকে মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন করতঃ তাহাদের শরীরে যন্ত্রণা-বিহীন ছোট বড় নানা প্রকার অস্ত্রোপচার করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে এখানকার চিকিৎসকমহলে বেশ একটা চাঞ্চল্য অনুভূত হইয়াছিল। ডাক্তার এস্‌ডেইল যাহা করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যকুশল যে কোন মেস্‌মেরিষ্টই সম্পন্ন করিতে পারেন। যাক্ সে কথা। উক্ত বাজিকরদিগের উৎপাদিত ঐ অবস্থা যদি সত্যই মোহ নিদ্রা হয়, তবে তখন ঐ বালক বা যুবকের শরীর নিশ্চিতরূপে বোধরহিতাবস্থায় (anaesthetic) পরিণত হইবে এবং তখন তাহার শরীরে সূচ বা হ্যাট্‌পিন বিঁধাইয়া দিলে উহাতে তাহার বিন্দুমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হইবে না এবং উহা ফুটাইবার সময়ও তাহার কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য বা ভয় উপস্থিত হইবে না; তখন সে উহাতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিয়া নির্লিপ্তের ন্যায় আরামে নিদ্রা উপভোগ করিতে থাকিবে। যদি বাজিকরগণ তাহাদের সাথী ঐ বালকের শরীরে সূচ বা হ্যাট্‌পিন বিঁধাইতে দেয় এবং তাহাতে তাহার কোনরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত বা চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, তবে তাহাকে সত্যই মোহনিদ্রাচ্ছন্ন (mesmerised) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, অন্যথায় উক্তাবস্থা তাহার একটা প্রকাণ্ড ভাণমাত্র। এস্থলে ইহা খুব নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, উক্ত শ্রেণীর কোন বাজিকরই তাহার কোন দর্শককে তাহার সাথীর শরীরে সূচ বিঁধাইতে সম্মতি দিবে না। দ্বিতীয় কথা, যখন সেই বালক দর্শকগণের নানাপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, তখন যদি বাজিকরের অজ্ঞাত (কোন দর্শকের হস্ত বা পকেটস্থিত কোন জিনিষ যাহা বাজিকর দেখে নাই) জিনিষসকলের নাম বলিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার ঐ শক্তিকে "দিব্য দর্শন" (clairvoyance) বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; অন্যথায় উহাও

একটা ফাঁকি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল বাজিকরেরা সাধারণতঃ নানারকমের সংকেত, ইসারা বা code-word দ্বারা দর্শকগণের জিজ্ঞাসিত বস্তুসকলের নাম তাহাদের ঐ সাথীর নিকট জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

উক্ত প্রকৃতির বাজিকর পাশ্চাত্যদেশে বহু আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা বেশী ওস্তাদ, তাহারা সতর্ক বৈজ্ঞানিকগণকেও সময় সময় ফাঁকি দিয়া থাকে। যাহারা Society for Psychical Researchএর রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন, তাহারা উক্ত প্রকৃতির দুই-চারজনের নাম অবশ্যই জানিয়াছেন—যাহারা অতি সূক্ষ্ম উপায়ে তাহাদের সাথীকে সংবাদ প্রদান করিয়া তথা-কথিত "থট্-রিডিং" (thought-reading) "দিব্য-দর্শন" (clairvoyance) ইত্যাদি বিষয়ক নানা প্রকারের পরীক্ষা সম্পাদন করিয়াছে।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দক্ষ ম্যাজিসিয়ানগণ যে সকল আশ্চর্য্যজনক খেলা দেখাইয়া থাকেন—যেমন ফুটবলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিতলের ফাঁপা বল, লাঠি বা অপর কোন জিনিষ কিম্বা কোন মানুষকে ইচ্ছানুরূপভাবে নিরালম্বাবস্থায় শূন্যে স্থাপন করিয়া রাখা ইত্যাদি। এই রকমের ক্রীড়া সকল দেখাইবার সময় ক্রীড়াপ্রদর্শক যে পাস দিবার ভাণ করিয়া থাকে, তাহাতে দর্শকেরা মনে করে উহা হিপ্নোটিজম্ বা মেস্‌মেরিজম্ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থই নিরালম্বাবস্থায় শূন্যে অবস্থিত থাকিতে পারে না, যদি ঐ বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব উহার অবস্থিতি-স্থানের বায়ু অপেক্ষা পাতলা না হয়। বাজিকরগণ উহাকে "ariel suspension" বলেন। ইহা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কৌশলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাঁহারা উক্ত কৌশল সকল জানিতে আগ্রহান্বিত তাঁহারা Prof. Hoffmanএর "Modern Magic" নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে (বোধ হয় কোন রাজার বাড়ীতে) একজন ভারতীয় ঐন্দ্রজালিক একটা দড়ির খেলা দেখাইয়াছিল। সেই স্থানে তখন উপস্থিত সকল লোকই উহা দেখিয়াছিল। দর্শকদিগের মধ্যে পদস্থ কয়েকজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীও ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই এই খেলার কথা পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। খেলাটা এই—একজন ঐন্দ্রজালিক রঙ্গমঞ্চে (মুক্ত প্রাঙ্গণে) উপস্থিত হইয়া ২৫।৩০ ফুট লম্বা গোলাকারে জড়ান একটা দড়ির এক অংশ নিজের হাতে রাখিয়া অপর অংশ উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাতে উহার জড়ান প্যাচগুলি খুলিয়া গিয়া দড়িটা সম্পূর্ণ নিরালম্বাবস্থায় লোহার শিকের ন্যায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে সে তাহার সহকারী বালককে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য ঐ দড়ি বাহিয়া স্বর্গে যাইতে আদেশ করিল এবং তদনুযায়ী ঐ বালক একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরি লইয়া ঐ দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দড়িটা তখনও লোহার শিকের ন্যায় কঠিনরূপে দাঁড়াইয়া রহিল। বালক কিয়দ্দূর উঠিবার পরই অদৃশ্য হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার হাত পা গুলি খণ্ড খণ্ডাকারে উপরের কোন অদৃশ্য স্থান হইতে মাটিতে পড়িতে লাগিল। উক্তরূপে তাহার দেহপিণ্ড এবং সর্ব্বশেষে তাহার খণ্ডিত মস্তক পতিত হইল। তৎপরে ঐন্দ্রজালিক খানিকক্ষণ কান্নাকাটার ভাণ দেখাইবার পর, বালকের দেহের সমস্ত খণ্ডিত অংশগুলি একত্রিত করিয়া একটা বাক্সে পুরিয়া রাখিল এবং উহার একটু পরে সে বালকের নাম ধরিয়া ডাকামাত্র ঐ বালক উক্ত বাক্স বা দর্শকদিগের মধ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দিল। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ "ভারতীয় দড়ির খেলা।" এই খেলা ইউরোপে দেখিবার জন্য তথাকার লোকরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত এবং তজ্জন্য তাহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বরের "Rangoon Times"এ Reuter সংবাদ দিয়াছিল যে বিলাতের "Magic circle"এ Lord Amthill একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন যে উক্ত ভারতীয় দড়ির খেলা লণ্ডনে দেখান সম্ভব কি না, এই বিষয়ে তর্ক হওয়াতে আত্মিকতত্ত্ববিৎ Dr. Alexander Cannon লণ্ডন সহরেই উহা দেখাইবার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড চাহিয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে ঐন্দ্রজালিককে আনার ও পৌছাইবার ব্যয় এবং আরও অন্যান্য খরচ দাবি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেবল তজ্জন্য ৫০০শত পাউণ্ড খরচ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধে পরে যে কি হইয়াছে তাহা আর জানা যায় নাই।

এই খেলাটা যে কোন্ শক্তি বা কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে

নাই; অনেকে নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন মাত্র। কাহার কাহার ধারণা উহা হিপ্নোটিজম্ বা মেস্‌মেরিজম্ বিদ্যা বলে সম্পন্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু উহা এই বিদ্যা সাহায্যে সম্পাদিত হইবার জিনিষ নয়। কেহ বলেন, উক্ত ঐন্দ্রজালিক হয় কোন শক্তি, আর না হয় কোন কৌশল দ্বারা দর্শকগণের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়াছিল—ভিন্ন কথায় optical illusions উৎপাদন করিয়াছিল; আসলে ঐরূপ কোন ঘটনাই ঘটে নাই—অর্থাৎ কোন দড়িকে লোহার শিকের ন্যায় দাঁড় করাইয়া রাখা হয় নাই এবং কোন লোকও আদৌ ঐ দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই ইত্যাদি। উহা দর্শকগণের একটা নিছক ভ্রান্তি মাত্র। যদি এই ধাঁধাঁ কোন শক্তি বলে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তবে হয় তাহা মনঃশক্তি, আর না হয় উহা মন্ত্রশক্তি। মন্ত্রশক্তিবলে লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগান যায় তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আর মনঃশক্তি বলে ত উহা সহজেই সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু তদ্রূপ ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই আছে। যাঁহারা ইচ্ছাশক্তিকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, ভিন্ন কথায় যাঁহারা যোগী—একমাত্র তাঁহারাই তাঁহাদের কোন কল্পিত বিষয়কে যথার্থ সজীব বা সত্যকারের বস্তুর ন্যায় সকলকে দেখাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ইহাপেক্ষা আরও অধিক আশ্চর্য্যজনক দৃশ্যও দেখাইতে সমর্থ; অপরের সে ক্ষমতা নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা কখনও এরূপ কোন খেলা দেখাইতে স্বীকৃত হন না। যেহেতু উহা দ্বারা তাঁহাদের শক্তি অপব্যবহার হয় এবং তাহার ফলে উহা নষ্ট বা অন্তর্হিত হইয়া যাওয়ার ভয় আছে। এই রকমের কোন অসাধারণ বা অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইলে, উহা বাস্তব কি ধাঁধাঁ, তাহা ফটো ক্যামেরার সাহায্যে ধরিতে পারা যায়। কারণ মানুষের চোখকে প্রতারণা করা যায়, কিন্তু ফটো ক্যামেরাকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে স্থানে কোন বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কোন ঐন্দ্রজালিকের কোন কার্য্য দ্বারা যদি সেখানে কোন পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তখন ক্যামেরার সাহায্যে সেই বস্তুর ফটো লইবার চেষ্টা পাইলে যদি plateএ উহার ছবি উঠে তবে উহা সত্য, অন্যথায় উহা চোখের ধাঁধাঁ মাত্র। আমরা ছোটবেলা বুড়াদের নিকট শুনিয়াছি যে, যাহারা ভেল্‌কি বাজি দেখায় তাহাদের ভেল্‌কিগুলি নাকি একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। যাহারা ঐ গণ্ডীর ভিতরে থাকে কেবল তাহারাই ঐ ভেল্‌কি দেখে, গণ্ডীর বাহিরের লোকরা উহা দেখিতে পায় না—অর্থাৎ তাহাদের উপর উক্ত ভেল্‌কি কোন কায করিতে পারে না। ইহা সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করার কোন সুযোগ হয় নাই; তবে অনেকেই ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সম্মোহকও মোহিত ব্যক্তিদিগকে নানা প্রকার ভেল্‌কি দেখাইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেগুলির কোন অস্তিত্ব বাহিরে প্রকাশ পায় না; উহারা কেবল তাহাদের মনের উপরই কার্য্য করিয়া থাকে।

সময় সময় কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, "জনতা সম্মোহন" (mass hypnotism) সম্ভব কি না? এমন কোন হিপ্নোটিষ্ট্ বা মেস্‌মেরিষ্ট্ আছেন কি না, যিনি দৃষ্টিমাত্র সকল লোককে তাহাদের অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহিত করিতে সমর্থ? তদুত্তরে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। আবার কখনও কখনও অনেককে বলিতে শোনা যায় যে, প্রফেসর অমুক রাত্রি ১০টার সময় খেলা দেখাইতে আসিয়া রঙ্গালয়ে উপস্থিত সকল দর্শককেই তাহাদের আপনাপন ঘড়িতে '৮টা' সময় দেখাইয়াছিলেন। উক্ত প্রফেসারের নাম বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কহিয়া থাকেন। কেহ বলেন থারষ্টন, কেহ বলেন গ্রসি, কেহ বলেন কারটার, কেহ বলেন গণপতি, আবার কেহ বলেন প্রমথ গাঙ্গুলী ইত্যাদি। এই খেলা নাকি অনেকেই দেখিয়াছেন—আমি দেখি নাই। কেহ কেহ আবার না দেখিয়াও "দেখিয়াছি" বলিয়া অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। ইহাতে যে তাহাদের কি লাভ তাহা তাহারাই জানে। এই অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন ম্যাজিসিয়ান আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহার ম্যাজিক শিক্ষার গুরুর গুরু প্রফেসার প্রমথ গাঙ্গুলীই নাকি "বেলভেডিয়ার হাউসে" এই খেলা দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নাকি রাত্রি ৮টায় খেলা দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ১০টায় সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কয়েকজন দর্শককে তাহাদের আপনাপন ঘড়িতে '৮টা' সময়ই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই ব্যাপারটা নাকি এত অতিরঞ্জিত হইয়া

সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে ম্যাজিসিয়ান প্রত্যেক দর্শককেই তাহার নিজের ঘড়িতে '৮টা' সময় দেখাইতে পারিয়াছিল। ইহাও যে কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ বাঙ্গালার লাট সাহেবের বাড়ীতে রাত্রি ৮টায় খেলা দেখাইবে বলিয়া সেখানে তাহার ১০টায় উপস্থিতি, নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ভদ্র মণ্ডলীর তাহার জন্য দুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সে যাহা হউক, যদি ইহা বাস্তবিক সত্য হয়, তবে যে ইহা হিপ্নোটিজম্ ও মেস্‌মেরিজম্ ভিন্ন অপর কোন শক্তি বা কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিদ্যা দ্বারা এরূপ কখনও করা যায় না, অথচ অনেকেই উহা বিশ্বাস করিয়া থাকে।

ডাক্তার মেস্‌মারের য়্যানিমেল ম্যাগ্নেটিজম্ (মেস্‌মেরিজম) বা ডাক্তার ব্রেইড্‌এর হিপ্নোটিজম দ্বারা ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না তাহা নিশ্চিত। সম্মোহনবিদ্যার ব্যাপকার্থে উহাদিগকে হিপ্নোটিজম্ বা মেস্‌মেরিজম্‌এর খেলা বলিয়া সাধারণ লোকরা অভিহিত করিলেও উহা তাহা নয়। উক্ত ব্যাপারগুলি যদি কোন যান্ত্রিক কৌশলে সম্পাদন করা হইয়া থাকে তবে তাহা কখনও উক্ত নামে আখ্যা পাওয়ার যোগ্য নয়; উহা ফাঁকি মাত্র। কিন্তু সম্মোহনবিদ্যা সত্যকার জিনিষ। সম্মোহন করিতে যে সকল নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, উহাদিগকে যদি কৌশল বলিয়াও অভিহিত করা যায়, তথাপি উহাদের মূলে কার্য্যকারকের মনঃশক্তির একটা প্রভাব বিদ্যমান থাকে—যাহা ব্যতীত সম্মোহন কখনও সম্ভবপর হয় না। উত্তর গো-গৃহে বৃহন্নলার সম্মোহন শরে সমগ্র কৌরববাহিনীর মোহনিদ্রা, কংস কারা-গৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের পলায়ন সময়ে কারারক্ষিগণের মায়ানিদ্রা, কিম্বা কোন মন্ত্র বা ঔষধি দ্বারা উৎপাদিত ব্যক্তিবিশেষের অচেতনাবস্থাকে যদি কেহ hypnotic বা mesmeric sleep বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন তবে তাহা কখনও যথার্থরূপে উক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না। প্রকৃত সম্মোহননিদ্রা (hypnotic or mesmeric sleep) ইঙ্গিত বা আদেশ; পাস এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন অপর কোন উপায়ে উৎপাদিত নিদ্রা উহার অনুরূপ হইলেও উহা তাহা নয়। হিপ্নোটিক নিদ্রার সহিত শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিদ্রার কোন পার্থক্য নাই, কেবল মেস্‌মেরিক্ নিদ্রা স্বভাবতঃ গাঢ়তর হয় বলিয়া উহার লক্ষণসকল বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে।

সম্মোহনবিদ্যাবলে যথার্থরূপে যাহা সম্পাদন করা যায়, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উহার আলোচনা করা হইল। এতদ্বারা তাহারা এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্থূলভাবে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন। এই বিদ্যাবলে একব্যক্তি তাহার মনঃশক্তি দ্বারা অপর লোককে সম্মোহিত বা বশীভূত করতঃ তাহার দ্বারা নিজের ইচ্ছামত নানা প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। যদি ঐ সকল কার্য্য তাহার রুচি বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ না হয়, তবে সে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। যে সকল কার্য্যে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, অথচ অভ্যাস বা অন্য কোন কারণে তাহা সে কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম, সেই সকল কার্য্যেও তাহাকে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায়। আর যাহাতে তাহার অপ্রবৃত্তি নাই, তাহাও সে বাধ্যতার সহিত পালন করিয়া থাকে। কিন্তু সে নীতি-পরায়ণ হইলে তাহার নৈতিক শিক্ষার বিরোধী কোন কার্য্য বা অপর কোন কর্ম্ম যাহাতে তাহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই, তাহা সে পালন করে না। যাহাদের নৈতিক চরিত্র দূষিত এবং সুযোগ পাইলে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতি করিতে ভীত বা পশ্চাৎপদ নয়, কেবল তাহাদের দ্বারাই কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্মোহকরা কোন কোন পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু চরিত্রবান লোকদিগকে কখনও ঐরূপ কোন কার্য্যে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং যাহারা মনে করে যে, সম্মোহনবিৎ সকল লোককেই তাহার শক্তি বলে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, নরহত্যা, জাল-জুয়াচুরি ইত্যাদি করাইতে বাধ্য করিতে পারে, তাহাদের ধারণা বহুল পরিমাণেই ভুল। সময় সময় হীনস্বার্থে প্রলোভিত হইয়া নীচমনা সম্মোহকেরা যে দুষ্ট-প্রকৃতির লোকদের দ্বারা সমাজের অনিষ্টকর কার্য্যাদি সম্পাদন করে, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রাদিতে বা লোকের মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং তাহাতে অনেক সরল বিশ্বাসী লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এজন্য তাহারা এই বিদ্যাকে ভীতির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। কোন সৎ লোক যদি সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার ফলে কোন অপকর্ম্ম করিয়া বসে, তবে সে তাহার

মোহিতাবস্থায় যেরূপ অকপটে উক্ত কর্ম্মের স্বীকারোক্তি করিবে, মন্দ কার্য্যে নিয়ত অভ্যস্ত লোকরা তাহ করিতে স্বীকৃত হইবে না—বিশেষতঃ যখন সে বুঝিতে পারে যে স্বীকারোক্তির ফলে তাহার সমাজ বা রাজদণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে সে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকে। কাহার কোন গুপ্ত মনের কথা জানিবার প্রয়াস পাইলেও সে ঐরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে সত্য কথা বলিলে লজ্জা বা ভয়ের কোন কারণ নাই, সেই সব ক্ষেত্রে মোহিতব্যক্তি সর্ব্বদা সত্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। পাকা চোর অপেক্ষা আনাড়ি চোরদিগকে এই বিদ্যা প্রভাবে স্বল্পায়াসে সত্য বলিতে বাধ্য করা যায়। খুব চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে পাকা চোর-দিগের নিকট হইতেও প্রকৃত কথা বাহির করা যায়। এক ভদ্রলোক তাহার যুবতী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া তাহার গুপ্তপ্রণয় ব্যাপার সকল জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া সম্মোহনশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, যদি তাহার স্ত্রী প্রকৃত কথা বলিলে সে তাহাকে ক্ষমা করিবে বলিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা করে, তবে তাহাকে সম্মোহিতা করিয়া ঐ সকল কথা বাহির করার চেষ্টা পাওয়া যাইবে। তাহাতে সে সম্মত হইলে সেই স্ত্রীলোকটিকে সম্মোহিতা করা হইয়াছিল এবং সে উক্তাবস্থায় অকপটে সকল কথাই ব্যক্ত করিয়াছিল এবং সে তজ্জন্য অনুতাপকরতঃ ভবিষ্যতে সচ্চরিত্রতার সহিত জীবন-যাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; তাহার মন হইতে ঐ সকল পাপকর্ম্মের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আর কোন খারাপ কথা শোনা যায় নাই। মোহিতাবস্থায় কেহ কোন প্রতিজ্ঞা করিলে, সে তাহা সর্ব্বদাই দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকে। কোন মন্দ অভ্যাস কর্ত্তৃক আক্রান্ত কোন লোককে মোহিত করণান্তর উক্ত অভ্যাস ত্যাগ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে আদেশ করিলে সে তাহা করে এবং উক্ত প্রতিজ্ঞানুযায়ী কায করিয়া থাকে। সম্মোহন শক্তি বলে লোকের নানা প্রকার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় বা তাহার জীবনের কোন একটা বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাসকলের বা বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের স্মৃতি বিলোপ করিতে পারা যায়, কিম্বা তাহার মনে কোন একটা নূতন ধারণা চিরকালের জন্য বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারা যায়। কোন বিশেষ দুই ব্যক্তির মধ্যে অবাঞ্ছনীয় ভালবাসা বা শত্রুতা থাকিলে তাহা বিদূরিত করা যায়। বালক ও যুবকদিগের নানা প্রকার অভ্যাস বা চরিত্রদোষ বিদূরিত এবং তাহাদের স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি, লেখা বা বলার শক্তি, গান গাহিবার শক্তি বিকশিত করিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে যাহাদের প্রবন্ধাদি বা কবিতা রচনা কিম্বা বক্তৃতা দেওয়ার স্বভাবদত্ত শক্তি আছে, তাহাদের উক্ত শক্তি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যায়; কিন্তু যাহাদের উহা আদৌ নাই, তাহাদিগকে কোন উপকার করা যায় না। তোতলামী অভ্যাস, মনোবিকার ম্যানিয়া (mania), হাইপোকণ্ড্রিয়া (hypochondria), সূচীবাই ইত্যাদিও এই শক্তিবলে আরোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু এই সকল ব্যাধি কঠিন বা বেশীদিনের পুরাতন হইলে আরোগ্য করিতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ উপযুক্ত সময় ধরিয়া রোগীকে পুনঃ পুনঃ সম্মোহিত করণান্তর আদেশ (suggestion) দিতে হয়। এই সকল বিশ্রী রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ামাত্র সম্মোহন চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য করা যায়, অন্যথায় আরোগ্য কঠিন বা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

সম্মোহন চিকিৎসা জনসাধারণে বিস্তৃতরূপে প্রসারিত না হওয়ার কারণ অজ্ঞতা। অধিকাংশ লোকেরই এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান নাই। এজন্য তাহারা সহসা একটা অপরিচিত প্রণালীতে চিকিৎসিত হইতে ভরসা পায় না। দেশেও উপযুক্তসংখ্যক অভিজ্ঞ সম্মোহন চিকিৎসক নাই, যাহাদের সাফল্য দর্শনে তাহারা ইহার প্রতি বিশ্বাসী হইতে পারে। ইদানীং অনেকেই সম্মোহন-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই ক্রীড়া প্রদর্শনের দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যায়। যদি তাঁহারা তৎপ্রতি অধিক আগ্রহান্বিত না হইয়া তাঁহাদের অধীত বিদ্যা আন্তরিকভাবে চিকিৎসাকার্য্যে নিয়োগ করিতেন, তবে ইহার কার্য্যকারিতা দর্শনে অনেক লোক এই চিকিৎসার পক্ষপাতী হইত এবং তাহাতে সমাজের যথার্থ কল্যাণ হইত। ভারতবাসী আমরা, জগতের প্রগতি-

শীল অপরাপর জাতির তুলনায় অনেক বিষয়েই পশ্চাৎপদ ; এই সকল দেশে কোন এক বিষয়ের চর্চ্চা যখন পুরাতন হইয়া যায়, তখন আমাদের দেশে উহা আরম্ভ হয়। নতুবা যে চিকিৎসার সাহায্যে বিগত ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতি বৎসর শত শত রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য ও উপকৃত হইয়া আসিতেছে, সেই তুলনায় আমাদের দেশে ইহার উপযুক্ত চর্চ্চা হইতেছে কি ? যদিও ভারতবর্ষই এই বিদ্যার আদি জন্মস্থান এবং এদেশ হইতেই ইহা অপরাপর দেশে প্রসারিত হইয়াছিল, তথাপি নানা কারণে এখানে উহার চর্চ্চা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছিল ; পরন্তু অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ইয়ুরোপে যাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চর্চ্চা ও অনুসন্ধানের ফলে ইহা উন্নত এবং একটি নবকলেবরপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে সেই পুরাতন জিনিষই পাশ্চাত্য সাজে সজ্জিত হইয়া পুনরায় ইহার জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাক্ সে কথা।

ডাক্তার মেস্মার যিনি য়্যানিমেল ম্যাগ্নেটিজম বা জৈব আকর্ষণী বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন, তিনি একজন দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন। যদিও তাঁহার সময়ে অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মেণী ও ফ্রান্সের কতকগুলি ক্ষুদ্রমনা চিকিৎসক তাঁহার "ম্যাগ্নেটিক চিকিৎসার" অসাধারণ সাফল্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া দলবদ্ধভাবে ঘোররূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তথাপি তাঁহাদেরই সমব্যবসায়ী কতিপয় কৃতবিদ্য ও উন্নতমনা ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের এই সাহায্য বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপের নানা দেশীয় চিকিৎসকগণ এই বিজ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেই এই বিজ্ঞান উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ এই বিষয়ে তাঁহাদের দান যথার্থই অসাধারণ। ডাক্তার মেস্মার এই বিদ্যাকে প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতবাদ একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল ; তৎপরে উপরোক্ত চিকিৎসকগণের অক্লান্ত চর্চ্চা ও অনুসন্ধানের ফলে সমস্ত সভ্য জগতে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। ডাক্তার ব্রেইড (Dr. Braid) যিনি হিপ্নোটিজম্-এর আবিষ্কার-কর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, তিনি মেস্মেরিজম্-এর চর্চ্চা-ফলেই উহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার মেস্মারের মৃত্যুর পর মেস্মেরিজম ও হিপ্নোটিজম্ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদির জন্য কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক কর্ত্তৃক দুইটি বিভিন্ন সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইলেও তাঁহারা ডাক্তার মেস্মারের মতবাদ পূর্ণভাবে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, উক্ত চিকিৎসকগণের ম্যাগ্নেটিক্ ও হিপ্নোটিক্ প্রণালীর চিকিৎসায় নানা স্থানে শত শত দুরারোগ্য রোগীর আরোগ্য লাভের ফলেই পাশ্চাত্য জগতে জনসাধারণের মধ্যে এই বিজ্ঞান যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় কোন কোন মেডিকেল স্কুল ও কলেজে এই বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে যে এই চেষ্টা সফল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু সত্য কখনও কাহার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না—উহা সূর্য্যালোকের ন্যায় আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে এই বিদ্যার তেমন আদর হয় নাই। ইহার কারণ চর্চ্চার অভাব। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কাহার কাহার এই বিদ্যার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অল্পাধিক জ্ঞান থাকিলেও যে পর্য্যন্ত তাঁহারা চাক্ষুষ ইহার রোগারোগ্যের শক্তি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, ততদিন তাঁহারাও ইহার প্রতি সম্যক্‌রূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশে যদি উপযুক্তসংখ্যক সম্মোহন-চিকিৎসক থাকিত তবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই চিকিৎসার প্রসার হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে যে দুই চার জন সম্মোহন চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদের নিকট যে সকল রোগী চিকিৎসিত হইতে আসে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই উপযুক্ত ধৈর্য্যের অভাব দেখা যায়। যে সকল রোগী দীর্ঘকাল নানা প্রকারের চিকিৎসাতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাও সম্মোহন চিকিৎসকের কাছে আসিয়া ২।৪ দিনের মধ্যেই নিরাময় হইতে চায়। অবশ্য স্থলবিশেষে ২।৪ দিনেও কোন কোন কঠিন রোগ আরোগ্য হইয়া থাকিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহা আশা করা যায় না।

লেখক তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন যে, যে সকল রোগী মাত্র ২।৪ দিন এই চিকিৎসাধীনে থাকার পর ফল না পাইয়া চলিয়া যায়, তাহারা ধৈর্য্যের সহিত কিছুদিন অপেক্ষা করিলে যে তাহাদের অধিকাংশই আরোগ্যলাভ বা সমধিক পরিমাণে উপকৃত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যদেশীয় অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক ইহাকে উৎকৃষ্টতর প্রণালীর চিকিৎসা বলিয়া গণ্য করতঃ যেরূপ আন্তরিকতার সহিত উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন, যদি উহার এক দশমাংশ চেষ্টাও আমাদের দেশীয় চিকিৎসকগণ করিতেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে রোগারোগ্যের শক্তি ভেষজ অপেক্ষা মনোবলের কম নয়—বরং বেশী। কিন্তু তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তাঁহাদের অনেকে হয়ত রোগ চিকিৎসায় মনঃশক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়া থাকেন—কিন্তু উহার ব্যবহারিক প্রয়োগে তাঁহারা উদাসীন। যাহা হউক, যাঁহারা সম্প্রতি মেডিকেল স্কুল বা কলেজ হইতে পাস করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে নূতন ব্রতী হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এই বিদ্যা শিক্ষার একটা আন্তরিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ইহাতে আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এই বিদ্যার উপযুক্ত চর্চ্চা হইবে এবং তাহার ফলে জনসমাজের মঙ্গল হইবে।

পুতুল নিয়ে খেলা

শ্রীভুপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ

এক দেশে আছে আজো এক যাদুকর—
বয়সে কিশোর ;
কেবল পুতুল নিয়ে খেলে দিনভর।
খেলিতে খেলিতে রাত হ'য়ে আসে ভোর।

যাদুকর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ;
ভাঙা হোক গুঁড়া হোক
যত সে পুতুল পায় পথে,
দুইহাতে তাহাই সে, কেবল কুড়ায়—
পুতুলে ভরিয়া তোলে ঘর।
একদা শুধাই তারে, "ও হে যাদুকর ;
রাজ্যের পুতুল নিয়ে ঘরে ;
কি হ'বে তোমার ?"
যাদুকর কহে মোরে মুখ করি' ভার ;
"খেলিতে খেলিতে এই পথে
একটি পুতুল আমি হারায়ে ফেলেছি একদিন
তারে আমি খুঁজি রাত্রিদিন।
কোথায় হারায়ে গেছে, পারি না বলিতে।
শুধু জানি খেলিতে খেলিতে,
এ পথেই হারায়েছি আমার পুতুল।
সারা ঘর ভরি'
রাজ্যের পুতুল যদি একত্র না করি
কেমনে বুঝিব বল কোনটি আমার ?
একই পথে তাই লক্ষবার
খুঁজিয়া আকুল।
এ খোঁজা হ'বে না শেষ,
যতদিন না পাইব আমার পুতুল।"

আমি শুধু কহিলাম তারে
"যে অশ্রু হারায়ে' গেল অনন্ত সাগরে,
হায় রে' পাগল !
অনন্ত সাগর খুঁজি
কেমনে পাইবি সেই
এক বিন্দু নয়নের জল ?"

শরীরচর্চ্চায় বাঙ্গালীর উদ্যম

শ্রীকরুণাদাস মজুমদার এম-বি

শরীরচর্চ্চার আন্দোলন যে আমাদের দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালার ছেলেমেয়েরা যে আজ বুঝিতে পারিয়াছে উত্তম স্বাস্থ্য ও দেহের শক্তি ভিন্ন সভ্যজগতে স্থান পাওয়া খুব কঠিন—তাহা খুবই আনন্দের কথা।

গত মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিন দিন যাবৎ নিখিল বঙ্গ শরীর চর্চ্চা আন্দোলনের বিভিন্ন সভার অধিবেশন হইয়াছে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন সার নীলরতন সরকার; তিনি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মানুষের মত জীবন ধারণ করিতে গেলে চাই সবল দেহের ভিতর সবল অন্তঃকরণ। সম্বর্দ্ধনা সভার সভাপতি সার হরিশঙ্কর পালও বর্ত্তমানে শরীরচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। যে দেশের লোকের আয়ু গড়ে ২৩ বৎসর, যে দেশের স্ত্রীলোকদের উপর দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে সে দেশের ছেলেমেয়েদের আর ভগ্নস্বাস্থ্য ও হীনবল হইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। এই শরীরচর্চ্চা সম্মেলনের অধিবেশন ঠিক্ উপযুক্ত সময়েই হইয়াছে। বাঙ্গালীর এই নূতন উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

শরীরচর্চ্চা—উৎপত্তি ও প্রচলন

খুব পুরাকালে যখন দেশে 'পুলিশের' সৃষ্টি হয় নাই তখন দুর্বৃত্ত ও চোরডাকাতের হাত থেকে দেশের লোকদের নিজেদের বাহুবলে মা, বোন, স্ত্রী ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, তখনকার দিনে বাহুবল ও লাঠিই ছিল 'পিনাল কোড্' (Penal code)। লোকে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দৈনিক নিয়মানুযায়ী লাঠিখেলা, সাঁতার, ডন-বৈঠক প্রভৃতি শরীর সাধনা করিত।

পুরাতন জোয়ান স্বর্গীয় আশানন্দ ঢেঁকির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি নদীয়ানিবাসী এক ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁহার দেহে এত বল ছিল যে তিনি লাঠির বদলে ঢেঁকি ঘুরাইয়া চোর-ডাকাত তাড়াইতেন।

ঢাকার স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন বড় শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামাকান্তবাবুর পর আর কে বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন জানেন? তিনি আমাদেরই বাঙ্গালার ছেলে আদর্শ ব্যায়ামবীর মাষ্টার বসন্ত (ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাঁহার শুধু হাতে বন্য 'রয়েল বেঙ্গল' ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই 'বাঘের সহিত ঐতিহাসিক যুদ্ধ' (Historic fight with a Royal Bengal Tiger) বলিয়া সুপরিচিত। মাষ্টার বসন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে উপাধি পেলেন তখন 'বাঘা-বসন্ত'। স্বনামধন্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ক্যাপ্টেন্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে কিরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। অদ্যাবধি বাঙ্গালার শরীর চর্চ্চার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণেরাই শক্তি-সাধনা ও ব্যায়ামের জন্মদাতা এবং শরীরচর্চ্চা ক্ষেত্রে ইহারাই অগ্রণী।

দেশ ইংরাজ-শাসনাধীনে আসিলে যখন 'পুলিস-পদ্ধতি' সৃষ্টি হইল, দেশের লোকরা শরীরচর্চ্চায় ক্রমশঃ উদাসীন হইতে লাগিলেন এবং এইরূপে কিছুকাল চলিয়া লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। তৎপরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালী পুনরায় উপলব্ধি করিল যে শরীরচর্চ্চার অভাবে জাতি ধ্বংসের মুখে যাইতেছে—তাই তাহারা শরীর রক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের জন্য আবার ব্যায়ামের অনুশীলন করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চন্দ্র ও বটকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে জিম্‌নাষ্টিকের 'আখড়া' খুলিলেন এবং যশোহর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে মনোহর চক্রবর্ত্তী, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশনাথ ঘোষ জিম্‌নাষ্টিকের ও কুস্তির আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিলেন। অম্বু গুহ তাঁহার দর্জ্জীপাড়ার বসতবাটীতে একটি কুস্তির আখড়া করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে শরীর চর্চ্চা রীতিমত চলিতে লাগিল।

তারপরে শরীরচর্চ্চা ক্ষেত্রে আসিলেন শ্রীযুক্ত গৌরহরি মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল বসাক। কৃষ্ণবাবু বোষ্টম বসাকের কাছে শিক্ষা করিয়া সার্কাসের খেলোয়াড় হইয়া যান এবং বহু টাকা উপার্জ্জন করেন। গৌরবাবু ইংরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আহিরীটোলায় একটি সমিতি গঠন করেন এবং তাহার নাম দেন 'Ahiritola model amateur athletic Association'। এই 'association' আহিরীটোলা হইতে শোভাবাজার বেনিয়াটোলায় স্থানান্তরিত হইয়া গৌরবাবুর প্রিয়শিষ্য শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলিতে থাকে। এই সমিতি হইতেছে এখনকার জগদ্বিখ্যাত „বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি"। এই আদর্শ ব্যায়াম সমিতির বর্ত্তমান কর্ণধার হইতেছেন ৺রাসবিহারীবাবুর প্রিয়শিষ্য ও ভাগিনেয় বিশ্বব্যায়ামবীর ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমিতির শাখা প্রশাখা আজ শুধু সারা বাঙ্গালায় কেন, ভারতবর্ষের বহুস্থানেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

গৌরবাবু বলেন 'ব্যায়াম' ও 'যোগ-সাধনা'র মূল হইতেছেন আমাদেরই দেশের 'ব্রাহ্মণ-জাতি'—যাঁহাদের কাছ থেকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এই জিনিষটা লইয়াছেন। এই যে 'জিম্‌নাষ্টিক্' কথাটা যে টা আমরা জানি 'গ্রীস্' বা 'রোম' দেশ থেকে উৎপন্ন—তাহা গৌরবাবুর মতে সম্পূর্ণ ভুল। 'জিম্‌নাষ্টিক্' কথাটা আমাদের দেশের 'জন্মন্যাস' কথা থেকে

তৈয়ারী করা। 'জিম্ শব্দের অর্থ হইতেছে 'শরীর চালনা' এবং 'ন্যাস' শব্দের অর্থ হইতেছে শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন। আর এই জিম্‌নাষ্টিক্ কসরতেই এই দুইটি প্রক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সংশাধিত হয়।

বর্ত্তমান যুগে 'জিম্‌নাষ্টিকের রাজা' বসন্তকুমার জিম্‌নাষ্টিক্ চর্চ্চায় যে যুগান্তর আনিয়াছেন এবং দেশে দেশে শরীর চর্চ্চা মূর্ত্তিময়ী করিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাহা দর্শনে বৃদ্ধ গৌরবাবুর মনের একটা বহু দিনের হতাশা ঘুচিয়া গিয়াছে। তাই তিনি বসন্তকুমারকে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে আশীর্ব্বাদ করেন।

আমাদের চিরতরুণ অক্লান্তকর্ম্মী ব্যায়ামবীর মাষ্টার বসন্ত আজ ব্যায়াম জগতকে নূতন আলোক দান করিয়াছেন. এবং বাঙ্গালার নরনারীকে তাঁহার ব্যায়ামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 'বাঙ্গালী হীনবল' এই অপবাদ ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই আদর্শ উদ্যম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শরীরচর্চ্চা হিসাবে 'জিম্‌নাষ্টিকের' উপকারিতা যে কতখানি—তাহা ভাষায় বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর বড় বড় শরীরচর্চ্চাবিদ্ 'জিম্‌নাষ্টিক' চর্চ্চাকে ব্যায়ামের শ্রেষ্ঠ চর্চ্চা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আমার মনে পড়ে একবার কলিকাতার কোন এক শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে প্রসিদ্ধ বায়স্কোপ-অভিনেতা 'ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কসের' একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ফেয়ারব্যাঙ্কসের মতেও শরীরচর্চ্চার যত সব প্রণালী আছে তাহাদের মধ্যে 'জিম্‌নাষ্টিক' চর্চ্চাই সব চেয়ে বড়। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া 'জিম্‌নাষ্টিক' কসরৎ করিয়াই তিনি বায়স্কোপের অভিনয়ে এতখানি সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন। বায়স্কোপ বা থিয়েটারের অভিনেতাদের পক্ষেও যে 'জিমনাষ্টিক' খুব উপকারী, বসন্তকুমার অনেকবার তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। বহুবার অনেক অভিনেতা ও অভিনেতৃ—যাহাদের অবয়বের কিছু না কিছু দোষ থাকার জন্য অভিনয়ে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছিল—বসন্তকুমারের অধীনে লঘু জিম্‌নাষ্টিক্ শিক্ষা করিয়া তাহাদের সে সব ত্রুটির সংশোধন হইয়াছে।

কুস্তিও একটা ভাল শরীর চর্চ্চা এবং পুরাকাল থেকে এই চর্চ্চা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কুস্তি সাধারণের প্রিয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কুস্তিগীর শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র গুহ। ইনি বাঙ্গালীর ছেলেদের নিত্য তাঁহার জিম্‌না-সিয়ামে কুস্তি শিক্ষা দিতেছেন।

বক্সিং, দৌড়ঝাঁপ ও লাঠি খেলায় যাহাতে বাঙ্গালীর ছেলেরা পার-দর্শিতা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন বলাইদাস চাটুয্যে (বলাই চাটুয্যে) এবং পুলিনবিহারী দাস।

গত শরীরচর্চ্চা সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সম্মেলনের প্রধান উপকরণ ছিল শরীরচর্চ্চার বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি-কল্পে আলোচনা। স্বাস্থ্যশিক্ষা, শরীর গঠন, ব্যায়াম, ক্রীড়া কৌশল, কুস্তি, সাঁতার, মু [illegible] খেলা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। এই আলোচনায় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সার হরিশঙ্কর পাল, রায় বাহাদুর হরিনাথ ঘোষ, ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়, ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (মাষ্টার বসন্ত), শ্রীযুক্ত শান্তি পাল, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ পাল, শ্রীযুক্ত সন্তোষ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (গোবর বাবু) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ।

বর্ত্তমানে আমরা দেখি যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগই কোন না কোন দেহের গঠন দোষে (Bodily defects) আক্রান্ত—যাহা তাহাদের জীবনের উন্নতির পথে একটা বড় অন্তরায়। তাই খুব সময়োপযোগী ও বিশেষ নীতিপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল ডাক্তার বসন্ত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—যিনি "সাধারণ দৈহিক গঠনদোষ ও শরীর চর্চ্চার দ্বারা তাহার প্রতিকার" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন কর্ম্মকারের 'শরীরের চর্ব্বি কমান' সম্বন্ধে আলোচনাও উপযুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ পাল, শ্রীযুক্ত শান্তি পাল, শ্রীযুক্ত পুলিন দাস ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ দত্তের ফুটবল্, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠি খেলা ও সাঁতার সম্বন্ধে আলোচনা ও সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বামী যোগানন্দের সভাপতিত্বে যে দৈহিক গঠন সম্বন্ধে অধিবেশন হয় তাহাতে প্রথম বক্তৃতা করেন ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালার ছেলেমেয়েদের তাঁহার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার আহ্বানে সকলকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া রাখেন। তিনি বলেন 'ভাই ভগিনীগণ, আর ক্ষণকাল সময় নষ্ট না করিয়া শরীরচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ কর. দেশ ও দশের সেবার জন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জ্জন কর"। শরীরচর্চ্চাকারীদের তিনি উপদেশ দান কালে বলেন যে ব্যায়ামের সময় তাঁহারা যেন সংযত হইয়া ব্যায়াম করেন, মাত্রার বাহিরে যাইলে শরীর খারাপই হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম সাধনার দ্বারা শরীরের সকল পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসাধনের উপর কতখানি মনের প্রভাব বিস্তার করা যায় তাহার কিছু পরিচয় দেন বসন্তবাবু তাঁহার কতিপয় উদীয়মান শিষ্যের দ্বারা। স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এই ব্যায়াম চর্চ্চা দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং বসন্তবাবুকে তাহার শিক্ষা নৈপুণ্যের জন্য একটী এবং বালক ব্যায়ামবীর শিবপদকে তাঁহার ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য একটি—দুইখানি সুবর্ণ পদক দান করা হয়।

শ্রীযুক্ত নীলমণি দাসের বারবেল ব্যায়ামের প্রদর্শনী এবং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কাবাসীর ভার উত্তোলন সম্বন্ধে আলোচনাও খুব উপভোগ্য হয়।

শরীরচর্চ্চার উন্নতির প্রয়োজন

ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে গভর্ণমেণ্ট যে যত্ন লইতেছেন তাহা সুখের বিষয়। তরুণ বাঙ্গালার শরীরচর্চ্চার আন্দোলনের গোড়ায় গোড়ায় তারুণ্যের নব প্রতীক্ মাষ্টার বসন্ত দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউনিসিপাল কেন্দ্রের শাসনাধীনে কি করিয়া সহজ উপায়ে বাঙ্গলার ছাত্রছাত্রীদের শরীর-চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করা যায় তাহার সহজ প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন। এমন কি সাংসারিক মহিলাদের শরীর চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউনিসিপাল প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে 'মা' ও 'শিশুর'

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যবতী মাতা ও স্বাস্থ্যবান সন্তানের জননীকে ভাল ভাল পুরস্কার দানের ব্যবস্থার জন্ত তাঁহার বহুমূল্য অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি প্রায়ই সংবাদপত্রের সাহায্যে ও সভাসমিতিতে বলিয়া থাকেন যে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ব্যায়াম নির্ভর করে—মা বাপের উপর এবং জনমণ্ডলীর শরীরচর্চ্চার উন্নতি নির্ভর করে বেশী ব্যায়াম সমিতি, স্কুল, কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটী, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর।

গত ৫ই মার্চ্চের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় তাহার 'Physical Culture Conference' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"I am of the opinion that every child's promotion from one inferior stage to the higher, throughout his or her entire period of education, should be made dependent on simultenious progress, physically and academically. For this purpose, it is necessary to lay down, age by age, the minimum amount of physical development that every pupll should satisfy his examiner about, before he or she is eligible for promotion to the next higher class,"

বাস্তবিকই শরীরচর্চ্চা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঠিকভাবে প্রচলন করিতে হয় তাহলে শরীরচর্চ্চাবিদ্ বসন্তবাবু ও ডাক্তার রমেশবাবুর মতানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে তাহা আশু কার্য্যকরী হইবে। আমি বাঙ্গালার সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে একটু বেশী করিয়া মাথা ঘামাইতে অনুরোধ করিতেছি।

হংসবলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কল্পনা করুন বাংলার একটি পল্লীগ্রাম। ষ্টেশন থেকে যে রাস্তাটা বাঁ দিকে চ'লে গেছে সেটা নয়। সেটা গরুর গাড়ীর রাস্তা। আপনি যদি মেয়েছেলে নিয়ে নামেন তাহ'লে অবশ্য ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু সঙ্গে মেয়েছেলে যদি না থাকে তাহ'লে ও ঘুরপথে যাবেন না। যাবেন ডান দিকেই লাইন ধ'রে সোজা উত্তর দিকে,—ডিষ্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল পর্য্যন্ত। সময়টা যদি বর্ষাকাল হয় তাহ'লে একটু পা টিপে টিপে যাবেন, আর রাত্রে একটা হারিকেন নিশ্চয়ই সঙ্গে রাখবেন। কারণ বৃষ্টিতে লাইনের এঁটেল মাটি অত্যন্ত পিছল হয়। একটু অসাবধান হ'লে সড়্ সড়্ ক'রে নীচে পড়বেন। আর রাত্রে সাপ-খোপের ভয়ও বড় বেশী। লাইনের স্লিপারের তলায়, পাথরের আড়ালে সাপ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু বরাবর লাইন ধ'রে আপনাকে যেতে হবে না। ডিষ্ট্যাণ্ট সিগ্‌নালের নীচেই যে বড় আল রাস্তা কোণাকুণি গিয়েছে সেইটে ধ'রে সোজা তিন কোয়ার্টার গেলেই যে বড় গ্রামখানা তারই কথাই বলছি।

গ্রামে ঢোকার মুখেই পড়বে দীঘি। গ্রামের যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলেই দীঘির ইতিবৃত্ত জানতে পারবেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কোনো হিন্দু অমাত্য তাঁর গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই দীঘিটা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। কথাটা সম্ভবত সত্য। এত বড় দীঘি সুবে বাংলার নবাবের অমাত্যের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া জলা। চারিদিকে প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু পাড়। তিন দিকের প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটে অতীত দিনের শিল্প-চাতুর্য্যের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান। তবে আর যে বেশী দিন বিদ্যমান থাকবে এমন ভরসা কম। কিন্তু গ্রামের লোকের সেদিকে কোনো লক্ষ্য না থাকলেও দীঘির এই স্বচ্ছ জলের, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেই বিস্মৃতনামা অমাত্যের এবং তাঁরই গুরুদেব প্রভুপাদ নরোত্তম আচার্য্যের গর্ব্ব সকল সময়েই ক'রে থাকে। অতীত দিনের গৌরবে তাদের বর্ত্তমান নগণ্যতা ডুবিয়ে দিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

দীঘির ঘাট থেকে একটা মেটে রাস্তা গ্রামের মাঝ দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে অপর প্রান্তের জেলা বোর্ডের রাস্তায় পড়েছে। গ্রামখানি বড়। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় মাইল দুই লম্বা। আর ওই রাস্তাটাই গ্রামের বড় রাস্তা। সেকালে, বোধ হয় ঘন ঘন রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কায় লোকে রাস্তা বড় করার পক্ষপাতী ছিল না। এ রাস্তাও সেজন্যে বড় নয়। কোনো কোনো জায়গায় দু'খানি গরুর

গাড়ী যেতে পারে। অধিকাংশ জায়গাতেই তাও পারে না, একখানি যাবার মতো চওড়া। মনে হয়, গোটা রাস্তাটাই পূর্ব্বে দু'খানি গরুর গাড়ী যাবার মতো চওড়া ছিল। উৎসাহী লোকের গৃহনির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের কল্যাণে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। সরকারী রাস্তা, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সুতরাং কেউ যদি এক হাত রাস্তা নিজের বসতবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেয়, অন্য লোকে বাধা দেবার চেষ্টা করে না। বরং সুযোগমত তারাও এক হাত ক'রে নিজের নিজের বসতবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেয়। কেবল নিতান্ত নিরীহ যারা, কিম্বা দুর্ব্বল তারাই পারেনি। তাদেরই বাড়ীর সামনের রাস্তা এখনও আগের মতো চওড়া আছে।

গ্রামখানি লম্বায় যত বড়, চওড়ায় তার সিকিও নয়। বলতে গেলে, ওই বড় রাস্তার ধারে ধারে দু'পাশে ছোট ছোট, নীচু নীচু মাটির ঘর,—কোনোটা কোঠা, কোনোটা একতালা। চাল খড়ের। মাঝে মাঝে দু'একখানা দালান-বাড়ীও আছে। অন্ধকার রাত্রে খড়ের চালের ঘরগুলো কেমন বুকচাপা মনে হয়। মনে হয়, মাথাটা একটু নীচু ক'রে না চললে বুঝি মাথায় ঠেকবে।

বর্ষাকাল। সন্ধ্যারাত্রে এক পশলা ফিস্ ফিস্ বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠেছে। গাছের বৃষ্টি-ধোয়া চিকণ পাতায়, কচি কচি ধান গাছে তারই কিরণ প'ড়ে চমৎকার শোভা হয়েছে। সে আলোয় সমস্ত মাঠ রূপকথার মায়াপুরীর মতো ধপ্ ধপ্ করছে। লোচন মাঝি কবি নয়। তবু দীঘির পাড়ে উঠে একবার পিছনের অবারিত মাঠের দিকে ফিরে চাইলে। ধানের গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে। আশশ্যাওড়া, বনকুলের ঝোঁপগুলি ভালুকের মতো দেখাচ্ছে। বাগানের গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো প'ড়েছে। মনে হচ্ছে যেন একটি অবগুণ্ঠিতা নারী স্থির হ'য়ে কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ষ্টেশনের সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এত দূর থেকে ষ্টেশন ভালো ঠাহর হচ্ছে না। কিন্তু ডিষ্ট্যাণ্ট্ সিগ্‌নালের লাল আলোটা জলছে যেন প্রেতের চোখের মতো।

লোচনের ডান হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, আর বাঁ হাতে হারিকেন। স্বল্প বৃষ্টিতে পথ পিছল হয়েছে। পা টিপে টিপে এসে ঘাটের সিঁড়িতে হারিকেন আর লাঠি রাখলে। মাথার পাগড়ি খুলে মুখটা একবার মুছলে। তারপর দীঘির জলে নেমে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা বেশ ভালো ক'রে ধুয়ে ফেললে। ইচ্ছা হচ্ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীঘির ঘাটে ব'সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। কিন্তু রাত একটা বেজে গেছে নিশ্চয়। বারোটার ট্রেণ দেখে ফিরছে। এই কাদায় এবং পিছল রাস্তায় এতটা পথ আসতে নিশ্চয়ই এক ঘণ্টা লেগেছে।

লোচনের আর বসা চলল না। পাগড়িটা আবার মাথায় বেঁধে, লাঠি আর হারিকেন হাতে নিয়ে উঠল। বেচারা সমস্ত দিন মাঠের খাটুনি খেটেছে। সন্ধ্যের একটু বিশ্রাম পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাও পায়নি। এতক্ষণ তবু বেশ ছিল। দীঘির ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ধুয়ে ক্লান্তি খানিকটা ঘুচলেও চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। টলতে টলতে লোচন চলল।

ডাইনে ঠাকুর বাড়ী। ক'দিন আগে রথ গেছে। এখনও যেন তার আভাষ রয়েছে। লোচন মোড়টা ঘুরেই থামল। সমস্ত গ্রামের মধ্যে এইখানটায় যেমন কাদা হয় এমন আর কোথাও নয়। ক'দিন বাঁ দিকে গৌর ঘোষের বৈঠকখানার দাওয়ার উপর দিয়ে লোকে যাওয়া-আসার পথ ক'রে নিয়েছিল। মেটে দাওয়া, অত লোকের অত্যাচারে আধখানা তার ধ্বসে গেছে। বাকী আধখানা এখন সে খেজুরের কাঁটা দিয়ে এমন ক'রে ঘিরে দিয়েছে যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। ডান দিকের পাঁচীলের গা দিয়ে খুব কষ্ট ক'রে এইটে পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু রাত্রে আলো-টালো নিয়ে পা পিছলে প'ড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

লোচন আর ভাবলে না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ছপ্ ছপ্ ক'রে, সেটুকু তো বটেই, বাকী রাস্তাটাও যেন রাগ ক'রে কাদার উপর দিয়েই পার হ'য়ে গেল। পাড়া-গাঁয়ের রাত্রি একটা, চারিদিক যেন থম্ থম্ করছে। কিন্তু লোচন অবাক হ'য়ে গেল রায়েদের বৈঠকখানার আড্ডা তখনও ভাঙেনি দেখে—এখানকার বৈঠক অবশ্য একটু রাত্রেই ভাঙে, কিন্তু এত রাত্রি এক দুরন্ত গ্রীষ্ম ছাড়া কখনও হয় না। লোচন একটু পা চালিয়েই চলল।

—এই যে! সুকুমার আসেনি?

গোমস্তা অকিঞ্চন দত্তের কণ্ঠস্বর। অনাবশ্যক বিবেচনায় লোচন আর এর জবাব দিলেন না। ঈষদুন্মুক্ত দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। ঘরে একটা আলো জ্বলছে। রায়েদের কর্ত্তাবাবু মনোযোগের সঙ্গে সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পাঠ করছিলেন। লোচন অনুমান করলে, বৃদ্ধ শুধু তারই প্রতীক্ষায় এখনও বাইরে রয়েছেন। দৈনন্দিন হিসাব লিখে তহবিল মেলাতে তাঁর এগারোটার বেশী হয় না। তার পরেও যদিচ বৈঠকখানার আড্ডা চলে, কিন্তু তিনি আর থাকেন না।

কর্ত্তাবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে একবার লোচনের দিকে চেয়ে আবার নিঃশব্দে সংবাদপত্রে মন দিলেন। একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করলেন না। অথচ ওঠবারও কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

অকিঞ্চন দত্তের জবাব দিলেন বাঁড়ুয্যে মশাই। বললেন, আমি বলিনি দত্ত, সুকুমার আসবে না? যেদিন সে আসবে লিখবে সেই দিনটি ছাড়া আর যে কোনো দিন আসতে পারে।

বাঁড়ুয্যে মশাই লোচনের জন্যে কল্‌কেটা কম্বলের বাইরে এগিয়ে দিলেন। কল্‌কেটায় একটা টান দিয়েই লোচন সেটা উপুড় ক'রে ঢেলে ফেললে। আপন মনেই বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে বললে, হুঁঃ! বামুন-চোষা কল্‌কে, আর··

—আর কি বল? বাঁড়ুয্যে মশাই হো হো ক'রে হেসে ফেললেন,—আর কায়েৎ-চোষা গাঁ, এই তো? তা বাপু, মিথ্যে বলনি।—ভদ্রলোক খক্‌ খক্‌ ক'রে কাশলেন,—তার সাক্ষী জ্বলজ্যান্ত আমি। তোমাদের কর্ত্তাবাবুর কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকা ঋণ ক'রেছিলাম। তাতে দিয়েছি সাড়ে তিনশো। সে তো গেলই, আরও চারশো টাকার দায়ে জমি-জায়গা, বাগান-পুকুর সব গেল। পৈত্রিক ভিটেটা যে নিলেন না, এতেই লোক ধন্য ধন্য করতে লাগল।

কর্ত্তাবাবু একবার গলাটা ঝাড়লেন।

তাঁর উদ্দেশে বাঁড়ুয্যে মশাই বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আর কিছু বলব না, এই চুপ করলাম। দেখি হে কল্‌কেটা?

লোচন খুশী হয়ে কল্‌কেটা এগিয়ে দিলে। বাঁড়ুয্যের কথায় তারা খুব আমোদ অনুভব করছিল। তারা নিজেরা রাশভারী কর্ত্তাবাবুর মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস করে না। তারা তো নয়ই, আর কেউও নয়। কেবল পাগলা বাঁড়ুয্যে মশাইকে কর্ত্তাবাবু কিছু বলেন না, হাসেন। বোধ হয় একটু ভয়ও করেন। ভয় করার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ভিতরে ভিতরে তিনিও নিঃশেষ হয়ে এসেছেন। এ গ্রামের এবং চার পাশের আরও নানা গ্রামের যারাই তাঁর কাছে একবার তমসুক কেটেছেন, তাদের দেনা আর শেষ হয়নি। এক এক ক'রে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কুক্ষিগত হয়েছে। এইভাবে নানা প্রকারে বহু বিষয়-সম্পত্তি তিনি ক'রেছেন বটে, সেও আর বুঝি থাকে না। কতক নতুন নতুন আইনের কল্যাণে, কতক বা ক্রমাগত মামলা মোকদ্দমা করার ফলে তাঁর আয় যত বেড়েছে, দেনা তার চতুর্গুণ বেড়েছে। সে সব দেনার খবর আর কেউ না জানলেও তিনি নিজে তো জানেন। তাই কিছুতে আর যেন তেমন জোর পান না। অন্য লোকে তাঁকে ভয় করে। মামলাবাজ লোককে আর কে না ভয় করে! কোথা থেকে কি ক'রে কার সর্ব্বনাশ যে ক'রে বসেন, তার ঠিক তো নেই। কিন্তু আজ ভিতরে ভিতরে তিনি এমন তলায় এসে ঠেকেছেন যে, সাহস ক'রে কেউ যদি বাঁড়ুয্যে মশায়ের মতো স্পষ্ট কথা বলে, তিনি বাঁড়ুয্যে মশায়ের কথার মতো তার কথাও হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ভিতরের কথা কেউ জানে না ব'লেই সাহস করে না। আর সাহস করে না বলেই রক্ষা। কিন্তু শেষ রক্ষা আর বুঝি হয় না। দেনার পরিমাণ সুদে আসলে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। এক ভরসা সুকুমারের। কিন্তু সে বেচারাও আজ বছর চারেক হ'ল এম, এ, পাশ করেছে। এখনও পর্য্যন্ত স্থায়ী চাকরী কোথাও হ'ল না। গোটা দু'য়েক ট্যুইশান পেয়েছে, তাই মেস-খরচটা কোনো রকমে চ'লে যায়। নইলে উপরের চাকচিক্য কর্ত্তাবাবু যতই বজায় রাখুন—এ শক্তি আর তাঁর নেই যে সমানে সুকুমারের কলকাতা থাকার খরচ জুগিয়ে যান। বর্ত্তমানে এইটুকুই যা ভাগ্যের কথা।

সুকুমারের সম্বন্ধে সকলেই আশা রাখে। স্কুলের এবং কলেজের পরীক্ষাগুলো সে ভালো ক'রে পাশ ক'রেছে। সে সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। উদার হৃদয়। বাপের মতো কুটিল এবং কুচক্রী নয়। নিজে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচজনকে বড় করার আকাঙ্ক্ষা রাখে। আজও অবশ্য নিজের কোনো সুবিধা করতে পারে নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হয়েছে

তখন জীবন-সংগ্রামেও একদিন যে উত্তীর্ণ হবে এমন আশা সকলেই পোষণ করে। তবে দু'দিন আগে আর পরে।

বোধ হয় এই কথা ভেবেই বাঁড়ুয্যে মশাই একটা নিশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন, তা হোক, বড় ভালো ছেলে। বাবাজি আমার গরীবের দুঃখ-দরদ বোঝে।

হুঁকোয় দুটো টান নিয়ে বললেন, হবে বই কি! চাকরী একটা নিশ্চয়ই হবে। আজ না হয়, কাল। ভগবান অমন ছেলেকে কখনও দুঃখ দেবেন না।

অকিঞ্চন দত্ত সে প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে একটু কাশলেন। আর কর্ত্তাবাবু যেমনভাবে নাকের ডগায় দড়ি-বাঁধা নিকেলের চশমাটা ঠেলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তেমনিভাবে প'ড়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মন যে খবরের কাগজে নেই—অত্যন্ত অমনোযোগী দর্শকের পক্ষেও তা বোঝা দুষ্কর নয়।

অকস্মাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো শঙ্খ কর্ত্তাবাবুর অন্দর থেকে মুহুর্মুহু বেজে উঠল। চকিতে কর্ত্তাবাবুর হাতের খবরের কাগজ মেঝেয় পড়ে গেল। তিনি একবার চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্দরের দিকে চাইলেন। ভিতরের দিকের দ্বার বন্ধ। কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটি তাঁর উৎকর্ণ হওয়ার লক্ষণ। বাঁড়ুয্যে মশাইও হাতের হুঁকো নামিয়ে একবার শঙ্খধ্বনি শুনলেন। অকিঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর লোচন সোৎসাহে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। কর্ত্তাবাবু আবার খবরের কাগজে মন দেবার চেষ্টা করলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই নিম্নস্বরে বললেন, পুত্রসন্তানই হবে। যে রকম ঘন ঘন···

কথাটা আর তিনি শেষ করলেন না। নিবিষ্টচিত্তে তামাক টানতে লাগলেন।

কর্ত্তাবাবুর নিজেরও সেই প্রকার অনুমান। বাঙালীর ঘরে পুত্রসন্তান না হ'লে এত সমারোহ হয় না। তবু আশঙ্কায় তাঁর বুক ঢিপ ঢিপ করছে। সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, তাঁর ওই একটিমাত্র সন্তান—সুকুমার। নাতির মুখ দেখার জন্যে বড় সাধ ক'রে তার ছেলেবেলাতেই বিবাহ দিয়েছিলেন। সুকুমার তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে। তারপরে প্রায় এগারো বছর কেটে গেছে। সকলে ছেলে হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। যা তাঁর অদৃষ্ট, কি যে হবে কে জানে। পাপ? হ্যাঁ, সংসার করতে গেলে অনেক পাপই করতে হয় বই কি! তাঁরও পাপের মাত্রা কম নয়। হয়তো সেই পাপেই···

কর্ত্তাবাবু এবং গৃহিণী কোনো দেবতার দোরে মানৎ করতে আর বাকী রাখেন নি। মাদুলিতে আর কবচে সুকুমারের স্ত্রী মণিমালার বাহুতে আর জায়গা রইল না। এর ওপর সন্ন্যাসী আছে। কত সন্ন্যাসীর পাদোদক, জটা ধোয়ার জল, ধূনীর ছাই, গাছের শিকড় এবং আরও কত কি যে তার পেটে গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মণিমালা লেখাপড়া জানা একালের শহুরে মেয়ে। কিন্তু ভয়ের কাছে বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞানের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। কেউ গোপনে, কেউ বা প্রকাশ্যেই গৃহিণীর কাছে বলতে আরম্ভ করলে, ছেলের আবার বিয়ে দাও। ও বাঁজা বৌ নিয়ে কি করবে? বংশ রক্ষা করতে হবে না? পিতৃ-পুরুষের মুখে এক গণ্ডূষ জল দিতে হবে না? বৌএর ওপর দয়া দেখাতে গিয়ে কি ধর্ম্ম খোয়াবে বাছা! আমার মেজ মেয়ের এক দেওরঝি আছে, দুগ্‌গা পিতিমের মতো রূপ! বল যদি—

শুনে মণিমালার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। গৃহিণী কিছুই বলেন না বটে, কিন্তু কথাটা তিনি যে ভাবছেন তা বোঝা যায়। ভেবে আর মণিমালা কূল পায় না। কোথায় গেল বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান, কোথায় গেল সুকুমারের হাস্যময় আশ্বাস, যেখানে যে কেউ ফিসফাস করে; সে ভাবে তারই কথা হচ্ছে। শেষে তার নিজেরই বিশ্বাস হ'ল, সত্যই তো, এত বড় বংশকে সে যদি কুলপ্রদীপ সন্তান না দিতে পারে—সুকুমার বিয়ে করবে না তো কি? সংসারে স্ত্রী আর কিসের জন্যে? তার নিজেরই এই বিশ্বাস হ'ল। কাউকে সে দোষ দিতে পারে না। মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরে, আর নির্জ্জন ঘরে দেবতার উদ্দেশে মাথা কোটে, ঠাকুর সন্তান দাও, সৃষ্টিধর কুলপ্রদীপ সন্তান দাও। এমন ক'রে সবদিক দিয়ে আমাকে পথে বসিও না।

সেই মণিমালা অবশেষে সন্তানবতী হ'ল। কে জানে পুত্র, কি কন্যা! যাই কেন না হোক দেবতা মুখ তুলে

চেয়েছেন। ক্লান্ত, অবসন্ন মণিমালা চোখ মেলতে পারছে না—কেবল মেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বাইরে বহু-কণ্ঠে অনর্গল প্রশ্ন হচ্ছে, কী ছেলে গো, কী ছেলে? দেখি, দেখি।

—ব্যাটা ছেলে গো, ব্যাটা ছেলে। খাসা ছেলে হয়েছে।

—কই দেখি, দেখি!

ছেলের পিতামহী বললেন।

দাই বেঁকে বসেছে। তার কিছু পাওনা হবে,—কিছু নয়, বেশ মোটা রকমই। কত আরাধনার ছেলে! দেবে না?

বললে, দেখাব কেন বাছা? অমনি দেখাব কেন?

না দেখাক। বাড়ী শুদ্ধ খুশীতে তখন টলছে। শঙ্খের শব্দে কান পাতা দায়। বাইরে কর্ত্তাবাবু তখন দুরু দুরু বক্ষে সেইদিকে কান পেতে রয়েছেন। গাছের পাতার শব্দে চমকে উঠছেন। কে জানে কী সংবাদ কে দেবে! হয় তো কন্যা। হয় তো তাঁর সারা জীবনের সদসদ্‌ বহুভাবে অর্জ্জিত সম্পত্তির এই পরিণতি। পরের ভোগেই লাগবে। তাঁর গলা শুকিয়ে উঠল। পরিষ্কার করবার জন্যে একবার কাশলেন,—এত মৃদুভাবে যে, সে শব্দ তাঁর নিজের কানেই ভালো ক'রে গেল না। অথচ তিনি যে কি রকম উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন, আনন্দের আতিশয্যে সেই কথাটাই ভিতরের পরিজনগণ বিস্মৃত হ'য়েছে। তারা কেবলই হুলুধ্বনি দিচ্ছে, আর শঙ্খ বাজাচ্ছে, আর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঠাকমাও এদেরই মধ্যে। কিন্তু বুড়ো মানুষের মন বেশীক্ষণ আনন্দ সহ্য করতে পারে না। এত আনন্দের মধ্যে তাঁর বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ ক'রে উঠল।

—ওরে, থাম থাম। আর বাজাতে হবে না। এক রত্তি মাটির ডেলা ও আবার বাঁচবে, তার আবার···

ঠাকমা কথা শেষ করতে পারলেন না, দু' ফোঁটা চোখের জল ফেললেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শাঁখও বেজে চলল, হুলুধ্বনিও বন্ধ হ'ল না। আনন্দের সময় মেয়েদের থামানো সহজ কথা তো নয়।

—ওমা, দিব্যি ছেলে হয়েছে! চাঁদপানা ছেলে!

—ও গিন্নি, দেখুন, দেখুন,—এতখানা ছেলে! ঘর যেন আলো ক'রে রয়েছে!

—হবে না! বাপ সুন্দর, মা সুন্দর, ছেলেও তেমনি হয়েছে।

—আহা, বেঁচে থাক। সৃষ্টিধর ছেলে, কালো কুৎসিত হ'লেও দোষ ছিল না। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আমার মাথায় যত চুল তত বচ্ছর পেরমাই হোক। ও আমার বাঁচুক।

প্রতিবেশিনীরা কলরব করতে করতে বৈঠকখানার সামনে দিয়ে ফিরে চলল।

অকিঞ্চন দত্ত উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ব্যাটাছেলে হয়েছে।

ব'ললে যেন হাওয়াকে।

কর্ত্তাবাবু একবার শুধু কাশলেন। চশমাটা একবার কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিলেন। হয় তো ঝাপ্‌সা দেখছিলেন। চোখে দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রুও জমতে পারে। খবরের কাগজ একপাশে ঠেলে রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কি যেন ভাবতে বসলেন। অবশেষে দাঁড়িয়ে উঠে চটি জুতো জোড়া পায়ে দিতে দিতে বললেন, অকিঞ্চন, কাগজখানা তুলে রাখ। আর কাল সকালে একখানা পোষ্টকার্ড আনিয়ে রেখ।

কর্ত্তাবাবু পৌত্রের জন্ম সংবাদ জানিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন যথাসময়ে সুকুমারের কাছ থেকে তার জবাব এল। দু'খানা—একখানা পোষ্টকার্ড, একখানা খাম। কর্ত্তাবাবুকে পোষ্টকার্ডে সুকুমার এইটুকু মাত্র জানিয়েছে যে, তাঁর চিঠি পেয়ে সে সুখী হয়েছে। নবজাত পুত্রের সম্বন্ধে পিতাকে কিছু লেখা পাড়াগাঁয়ে বেয়াদবি। সুকুমার সে সম্বন্ধে কোনো কথা উল্লেখ করেনি। শুধু গত সপ্তাহে কিছুতে বাড়ী যেতে না পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছে। আর জানিয়েছে, যথাসম্ভব শীঘ্র সে বাড়ী যাবার চেষ্টা করছে।

আর খামের পত্রখানি বেশ দীর্ঘ। এখানি লিখতে তার অনেক সময় গেছে। ছ'দিনের দিন স্নান ক'রে এসে মণিমালা পড়লে:

কল্যাণীয়াসু

মণিমালা, বাবার পত্রে নবকুমারের জন্ম সংবাদ পেলাম। এক কাল ছিল, যখন শত পুত্রের জনক হও ব'লে মানুষ মানুষকে আশীর্ব্বাদ করত। সৌভাগ্যবশতই হোক, আর দুর্ভাগ্যবশতই হোক, সে কাল আর নেই। এখন আর সে আশীর্ব্বাদ করতে অতি বড় শত্রুও দ্বিধা করে। শত পুত্রের কথা ছেড়ে দাও, প্রথম পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনলেও অত্যন্ত দুঃসাহসী লোকের মুখ শুকিয়ে যায়। এমনি দিন-কাল পড়েছে!

খোকার জন্ম সংবাদে আমি কত খুশী হয়েছি? কিছুই খুশী হই নি। কি ক'রে হব? শুনলাম, খোকা খুব সুন্দর হয়েছে। কত সুন্দর? তোমার মতো? তা'হ'লে তোমার দুঃখ ঘুচল। ওর চাঁদ মুখখানি মুখের কাছে এনে, ওর কচি-কচি, রাঙা-রাঙা পা দু'খানি বুকে চেপে ধ'রে তুমি পাবে স্বর্গসুখ। কিন্তু আমার? খোকাকে স্নেহ দিয়ে, মায়া দিয়ে, মমতা দিয়ে তোমার কর্ত্তব্য শেষ হবে। মায়ের কর্ত্তব্য এর বেশী আর কি বল? তোমার কোলে খোকা এল শুধু আনন্দ আর আশা নিয়ে। তারই সঙ্গে হয়তো একটুখানি উদ্বেগও রয়েছে,—ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ। তাব বেশী নয়। কিন্তু আমার কাঁধে পড়ল বহু প্রকারের দায়িত্ব। ও কি হ'তে পারবে সে অবশ্য নির্ভর করবে ওর নিজের ওপর। কিন্তু ও যা হ'তে চাইবে তাই হ'তে সাহায্য করার সকল দায়িত্বই যে আমার। সে দায়িত্ব কি সোজা ভাব?

অবশ্য, তুমি বলবে, আজই কিছু সে দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়ছে না। আগে তো সে বাঁচুক। বড়ই হোক। তারপরে আমারও কিছু চিরদিন এমনি যাবে না। লেখা-পড়া যখন শিখেছি তখন কোথাও একটা গতি লাগবেই। এখন থেকে এ দুর্ভাবনা কেন? সত্যি। কিন্তু দুর্ভাবনা তো কেউ পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনে না। যুক্তি-তর্ক দিয়েও তাড়ান যায় না। দুর্ভাবনা অযাচিত আসে, আর অহেতুক কষ্ট দেয়।

তাছাড়া, কি জান, আত্মীয়-পরিজনহীন দূর প্রবাসে থেকে মায়া মৃগের পিছনে ঘোরা আমারও তো কম দিন হোল না। কোথাও যেন আশা দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আমি নই, আমার মতো এমনি লক্ষ লক্ষ ছেলে লক্ষ্যহারা ঘুরছে। ভগ্ন মন, শূন্য হাত। মেসে-বোর্ডিংয়ে, স্কুলে-কলেজে, গৃহস্থের গৃহে লক্ষ লক্ষ ছেলে, কারও মুখে হাসি নেই, নেই যৌবনসুলভ সতেজতা, নেই আনন্দ, নেই উৎসাহ। কেমন যেন সব ঝিমিয়ে আসছে, নিবিয়ে আসছে, এলিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঝাড়া দিয়ে উঠি। মাঝে মাঝে ভাবি আমরা যেন একটি বিপুল হংসবলাকা। চলেছি মানস-সরোবরের দিকে, দুস্তর মরুভূমি পার হয়ে, আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে। সবাই কিছু এই দিকচিহ্নহীন, ছায়াহীন, ধূ-ধূ-করা বালুভূমি পার হ'তে পারব না। তবু কেউ কেউ পারবে। দুর্দ্দান্ত মানুষের এত বড় যাত্রা একে-বারে বৃথা যাবে না। অবশেষে কেউ কেউ লক্ষ্যে এসে পৌছুবেই।

ভাবি। আবার ভাবি, তাতে আমার কি? আর আমার মতো আরও লক্ষ লক্ষ যারা পৌছুতে পারবে না,—যাদের শুধু যাত্রা করাই সার হবে, আর দুঃখ পাওয়া,—তাদের তাতে কি সান্ত্বনা? দেশেরই বা কি? একটি কবির কবিতা বিশ্বের দরবারে সমাদর পেয়ে এল। তা থেকে এ কথা কেউ বুঝবে না যে, দেশের বাকি লোকও অত বড় না হোক ছোট-খাটোও কবি। একটি লোক নুনের ব্যবসা ক'রে কোটিপতি হ'ল। তা থেকেও কেউ এ কথা বুঝবে না যে, তার প্রতিবেশীরা কোটিপতি না হোক সহস্রপতি, নিদেন পক্ষে শতপতিও। বড়মানুষের গৌরব নিয়ে তার গা ঘেঁষে বেঁচে থাকার একটা সান্ত্বনা হয়তো আছে, কিন্তু সে মরা জাতের সান্ত্বনা। আমরা লক্ষ কোটি লোক অশেষ দুঃখ পেয়ে একদিন কীটের মতো ফুরিয়ে গেলাম,—un-wept, unhonoured, unsung,—আর একটি জীবন কোথায় সার্থক হোল, চরিতার্থ হোল—তাতে আমাদের কী সান্ত্বনা! কী সান্ত্বনা চাঁদের আলোয় তারারা পায়, তারার আলোয় জোনাকীরা! এত দুঃখ আমাদের, বুঝলে মণিমালা, এত দুঃখ আমাদের। না আশা, না সান্ত্বনা।

তবু তোমায় বলি, খোকার আগমনে আমি যে খুব দুঃখিত হয়েছি তাও নয়। উদ্বেগ এবং আশঙ্কা ষোলো আনাই রইল, কিন্তু তারই মধ্যে কিছু আনন্দও আছে। খোকা আমাদের জীবনের ধারা। এই পৃথিবী থেকে যখন আমাদের সমস্ত চিহ্ন মিলিয়ে যাবে তখন ওরই মধ্যে আমরা থাকব বেঁচে। আমাদের আশা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা,

আমাদের প্রবৃত্তি ওরই মধ্যে থেকে আমাদের ঈপ্সিত কাজ ক'রে চলবে। ওর জীবন হয়তো আমার মতো ব্যর্থ হবে না। ও হয়তো লক্ষ্যে পৌঁছুবে। তখন সে চরিতার্থতার আনন্দের আমরাও অংশ পাব। আবার ওরও জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ওর পরবর্ত্তীয়দের রক্তে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমে দুর্ব্বল হ'তে হ'তে একেবারে নিশ্চিহ্নও হয়ে যেতে পারে। তখন হবে আমাদের সত্যিকার মৃত্যু।

যাদের ঐশ্বর্য্য আছে, আছে ছেলের হাতে দিয়ে যাবার মতো বহু ধন, সন্তানেব কামনা যে শুধু তারাই করে তা নয়। আমার মতো যারা নিঃস্ব, বিত্তহীন, সন্তানের হাতে যারা শুধু দিয়ে যেতে পারে অচরিতার্থ কামনার অপরিমিত স্বপ্ন, তার বেশী নয়, সন্তান কামনা তাদেরও কম নয়। নাই বা রইল বিত্ত, মৃত্যুর পরেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার যে আদিম প্রবৃত্তি, সে প্রবৃত্তি যাবে কোথায়! অনন্তকাল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার এই যে উদগ্র ক্ষুধা, এই ক্ষুধাই হ'ল সন্তানের বিধাতা।

যে পুঁজি নিয়ে সংসারে এসেছিলাম তার অনেক বিকৃতি ঘটেছে। কর্ম্মদোষে কিছু গেছে ক্ষয়ে, কর্ম্মবলে কিছু বা বেড়েছে। তারই কিছু রইল তোমার ছেলের কাছে। আমি জানি, মহাকাশে ওড়বার পক্ষে সে কিছুই নয়। বাকি পাথেয় সে আপন শক্তিতে অর্জ্জন ক'রে নিক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

উপসংহারে আরও অনেক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আলোচনা এবং কুশল প্রশ্ন ও কুশল কামনা ক'রে সুকুমার চিঠি শেষ করেছে। চিঠি প'ড়ে মণিমালার রাগও যত হ'ল, হাসিও তত এল। সুকুমার কী ছেলেমানুষ! কথায় কথায় তার পণ্ডিতি করা চাই। কেবল লম্বা-লম্বা কথার জাহাজ, বোঝে না একরত্তি।

মণিমালা ছেলের গাল টিপে আদর করতে করতে বললে, না রে খোকন, বোঝে না একরত্তি! না রে?

মণিমালা হাসলে। আপন মনেই বললে, আসুক তো একবার, তারপর পণ্ডিতি বের করছি।

ব'লে এমনভাবে কোমরে কাপড় জড়াতে লাগল, যেন এখনি স্বামীর সঙ্গে লড়াই করবে। ক্রমশঃ

সাগরতলের সচলদীপ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অকূল পাথারে অথৈ জল! তার গভীর অতল অন্তরে নিরন্ধ্র অন্ধকার। পাতালের মত আঁধার সে পুরী, অথচ অসংখ্য জলচরের বাস সেখানে। তারা কেউ অন্ধ নয়।

স্বয়ংপ্রভ মৎস্য

সবারই চোখ আছে। কিন্তু তাদের সে চোখের সার্থকতা কি? আলো না পেলে ত' দৃষ্টি খোলে না! তিমির ঘন তমসার রাজ্য সে। সেই নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টি-শক্তি ত' কোনো কাজেই আসে না! তবে কেন সে তমাচ্ছন্ন অতলবাসীদের প্রত্যেককে দুটি ক'রে চোখ দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা?

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বৈজ্ঞানিকেরা এর কারণ অনুসন্ধানে একান্তভাবেই গবেষণা করেছিলেন। অতল অন্তরের অন্ধকারে আলোর সন্ধানে ফেরা আজ তাঁদের সার্থক হয়েছে। একথা অবশ্য সকলেরই জানা আছে যে সূর্য্যালোক অতি অনুকূল অবস্থাতেও সমুদ্রগর্ভে অধিক দূর প্রবেশ করতে পারে না। এমন কি, মেঘনির্মুক্ত নির্মল দিনে নিদাঘ দ্বিপ্রহরের প্রখর দিবাকরও সমুদ্রগর্ভে মাত্র চারশো হাত ভিতরে পৌঁছতে পারে কিনা সন্দেহ।

অথচ এই সাগরতলের পরিমাপ কোথাও পনের হাজার, কোথাও বা বিশ হাজার হাত গভীর। সেখানে চারশো হাত মাত্র ভিতরে আলো যাওয়া মানে সমুদ্র বক্ষেই খেলা করা। •তাছাড়া, সাগর সন্ধানীরা এটাও আবিষ্কার করেছেন যে সমুদ্র বক্ষ সর্বদাই আলোকদীপ্ত থাকে। এই আলোকের ঔজ্জ্বল্য ও গাঢ়তার স্থান বিশেষে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু এই পার্থক্যের কারণ কি তা' আজও বৈজ্ঞানিকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সমুদ্রের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা জানেন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রে এক একদিন নীলাম্বুর আলোকচ্ছটা নীলাম্বরের নক্ষত্র দীপ্তিকেও নিষ্প্রভ ক'রে দেয়। আকাশকে সেদিন প্রদীপ্ত সমুদ্রের সঙ্গে তুলনায় মনে হয় অঙ্গার সদৃশ কালো! প্রতি তরঙ্গভঙ্গ যেন জীবন্ত আলোকের

ভীষণ দংষ্ট্রাযুক্ত দীপঙ্কর মৎস্য

দীপ্ত-ঝর্ণাধারা! তপ্ত কাঞ্চন বর্ণে সাগরলহর লীলায়িত হ'য়ে ওঠে!

এই জ্যোতিরুদ্ভাসিত জলরাজ্যে অতি ক্ষুদ্রতম মৎস্যেরও গতিবিধি অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। শুধু দেখাই যায় না, মাছগুলির প্রকৃত আকারের চেয়ে তাদের অনেকটা বড়ই দেখায়। এই বড় দেখানোর প্রধান কারণ ঐ তরঙ্গ নিহিত আলোকচ্ছটায় তাদের চঞ্চল বিচরণ। একটি প্রকাণ্ড তিমি মাছ যখন মন্থর গমনে সাগরজলে আলোড়ন তুলে চলে যায়, তার পিছনে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক দীর্ঘ সবুজ আলোক-মালার মৃদু-দীপ্তি সমুদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে! এই আলোকচ্ছটার উৎস অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে এর মূলে আছে অতি ক্ষুদ্রকায় অগণিত "অগ্নিতন্তু" (Pyrosoma) ও "জ্যোতির্বীজাণু" (Noctiluca) জাতীয় সামুদ্রিক জীবাণু। এদের পরমাণু সদৃশ আকৃতি অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সুস্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু জোনাকীর মত এদের সেই ক্ষুদ্রতম অঙ্গ হ'তেও নিয়ত আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে, যার দীপ্তি তাদের সেই ক্ষুদ্রতম দেহের তুলনায় আশ্চর্য্য রকম উজ্জ্বলতর!

এই অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীবাণুর অঙ্গদীপ্তি অনেকটা 'ফস্ফরসের' মতই অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। হাতে করে ঘাঁটলে তাদের দেহের জ্যোতিকণা আঙুলের উপর কতকটা লেগে যায় এবং বিদ্যুৎ বিন্দুর মতো ঝিক্‌মিক্ করে! অথচ
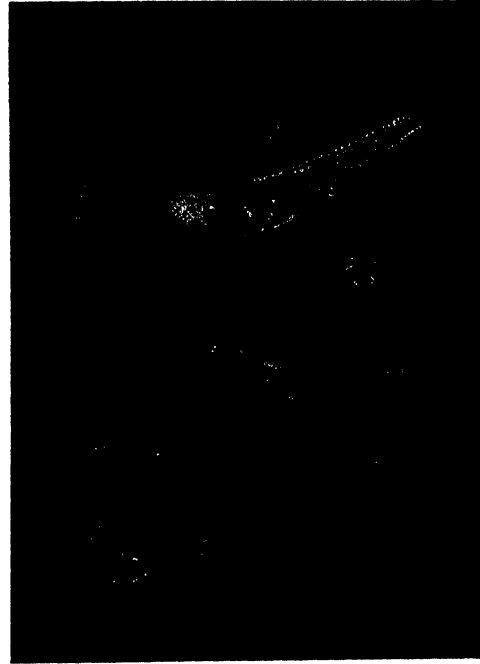
(উপর থেকে নীচে) প্রথম—"চন্দ্রনাসা মৎস্য", দ্বিতীয়—'দীপ্ত অজগর' মৎস্য, তৃতীয়—'আলোকোজ্জ্বল পুঁটি' মৎস্য, চতুর্থ—'জ্যোতির্ময় কাক্রি"

যার আঙুলে ঐ জ্যোতিকণা সংক্রামিত হয়, সে কিছুই উত্তাপ বা বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করতে পারে না। এই সব নানা কারণে লোকে এই দীপ্ত সামুদ্রিক জীবাণুকে বহুকাল থেকেই ভুল ক'রে 'ফস্ফোরেসেন্স্' বা 'স্ফুরক' নামে অভিহিত করে আস্‌ছে। অতএব চিরপরিচিত ও অভ্যস্ত ওই নামটা তাড়াতাড়ি বাতিল ক'রে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং সাগর জলে ঐ দীপ্ত সামুদ্রিক

জীবাণুর অথবা "ফস্ফোরেসেন্সের" আলোক রশ্মির স্থানে স্থানে এমন তারতম্য ঘটে কেন—সে রহস্যও আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হ'লো না। কারণ সাগর-সন্ধানী বিশেষজ্ঞেরাও কেউ আজ পর্যন্ত এর হদিশ পাননি এবং আর একটা তথ্যও এখন তাঁদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে এই যে—এই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য প্রদীপ্ত সামুদ্রিক জীবাণুসমুচ্চয় সাগর গর্ভের কতখানি পর্য্যন্ত আলোকিত ক'রে রাখে ?

তবে, কিছুদিন হ'ল একটা নূতন খবর জানতে পারা গেছে যে, গভীর সাগরতলের অতল অন্ধকার বিদূরিত করবার জন্য সেখানে একাধিক সচল দীপের অস্তিত্ব বিদ্যমান ! এই সচল দীপগুলি বৈদ্যুতিক আলোক প্রণালীর ন্যায়, কিন্তু স্বতন্ত্রীয়, অর্থাৎ আলো জ্বালা বা না জ্বালাটা সম্পূর্ণ তাদের নিজেদেরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ সংবাদটা
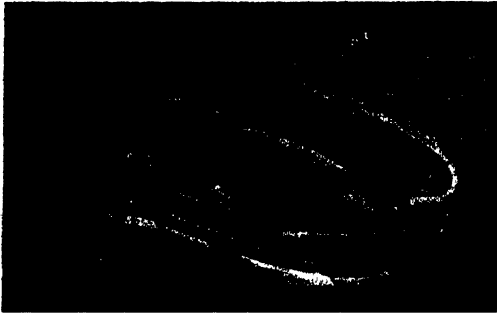
বঁড়শীমুখ উজ্জ্বল মৎস্য (নিম্নে ঐ জাতীয় আর এক প্রকার মাছ)

এখনো জানা যায়নি যে এই সচল দীপাবলীর আলোক বিচ্ছুরণের শক্তি কতখানি এবং তাতে সমুদ্রগর্ভের কতটুকু অংশে মাত্র আলোকপাত হ'তে পারে ? কারণ, গভীর জলের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, গভীর জলের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কোনকালে কখন আস্‌মানতারার মত আলোক বিচ্ছুরণে সক্ষম নয়। সমুদ্রগর্ভের অতি বীভৎস ও কুৎসিত আকারের মৎস্যগুলিই যে কেবল আলোকসম্পাতে অক্ষম এরূপ মনে করবারও কোন কারণ নেই, যেহেতু অনেকগুলি শান্ত নিরীহ ও ভালোমানুষের মত চেহারার মাছও এই স্বতস্ফূর্ত্ত আলোকদীপ্তি থেকে বঞ্চিত। তারা অন্ধকারেই সমুদ্রগর্ভে ঘুরে বেড়ায়। আবার যে সকল আলোকদীপ্ত মৎস্য সমুদ্রবক্ষে ভাসমান অবস্থায় খেলা করে তাদের সঙ্গে সমুদ্রগর্ভের গভীর জলের আলোক বিকীর্ণকারী মীনসম্প্রদায়ের কোনো দিক দিয়ে এতটুকু মিল নেই। উপরে ভাসে যারা তাদের সর্বাঙ্গ উজ্জ্বল ! কিন্তু গভীর জলের মীনাঙ্গ হ'তে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে যে আলো—তার উদ্ভব পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ 'বিজলী বাতী জ্বালারই প্রণালী' বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন ঐ অদ্ভুত ছোট্ট মাছ-গুলিকে—বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মত যাদের দেড়গজী নাম—Collettia refinesquei ! বাংলায় "সুচারু মণিবন্ধনিকা" না বলে শুধু 'কলেতিয়া' বলা যাক্ ওদের। আমেরিকা যুক্তপ্রদেশের সমুদ্রোপকূল হ'তে অল্প দূরেই এদের দেখা পাওয়া গেছে—সাগর গর্ভের প্রায় আঠারো হাজার ফুট নিম্নে ! এ মাছগুলির দেহের অনুপাতে চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়ো ! দেখতে এদের আকৃতি অনেকটা 'ম্যলেট' জাতীয় মাছের ন্যায়। এদের পেটের তলায় কতকগুলি ছোট ছোট প্রদীপ আছে, প্রদীপগুলির ক্ষুদ্র ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের মত গোল মাথা। সেগুলি মাছের কান্‌কো থেকে লেজ পর্য্যন্ত লম্বা ভাবে অবস্থিত। পাশে পাশে আবার ছোট ছোট পাখ্‌না সারিবন্দি সাজানো।

এই মাছের অঙ্গসংযুক্ত দীপকোষগুলির ব্যবস্থা দেখে এটা বেশ বোঝা যায় যে, নিজ দেহের এই আলোক-বিকীরণ-শক্তি তারা শিকার-সন্ধানে বা আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করে না। তবে এ আলো নিয়ে তারা কি করে ? এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে এখনো তা জানা যায় নি। অতল গর্ভের গভীর প্রদেশবাসী এই সকল মীন-দীপঙ্করদের জীবনযাত্রা-রহস্য আজও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি। এরা আপন অঙ্গ বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় সমুদ্র-গর্ভের যে অংশটুকু আলোকিত ক'রে ধীর সঞ্চরণে ঘুরে বেড়ায়, তাতে এদের নিজেদের কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হোক বা না হোক, অন্যান্য দীপশূন্য মৎস্যবৃন্দের যে সমূহ উপকার সাধিত হয় এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। ভূমধ্য-সাগরেও এই জাতীয় মৎস্যের সন্ধান মেলাতে এদের সম্বন্ধে আর একটু বেশী জানা গেছে এই যে—এদের বাস অতল সাগর গর্ভের সর্ব্বত্র !

এই দীপধর আর এক জাতীয় মহিমান্বিত মৎস্য আছেন যাঁদের নামও নেহাৎ মন্দ নয়। লাতিন ভাষায় তাদের বলে —Æthroprora-effulgens, বাংলায় বলা চলে "চন্দ্রনাসা" অর্থাৎ চন্দ্রচূড়ের পরিবর্ত্তে নাসাগ্রে যাদের এক উজ্জ্বল পিণ্ড

(উপরে) বাণমাছের ন্যায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল মৎস্য (এরা নিরীহ জীব) মধ্যে ভয়াল দীপধর মৎস্য। (নীচে) গুলেমাছের ন্যায় আকারবিশিষ্ট দীপ্তশির মৎস্য

বিদ্যমান! এদের আকৃতি নিতান্ত সাধারণ মৎস্যের ন্যায়ই, কেবল পেট ও পিঠের সীমারেখায় সুদীর্ঘ লম্বা বৈদ্যুতিক আলোক শ্রেণী এবং পেটের পাশের দিক ঘেঁষে দীপমালা জলে। এদের কিন্তু প্রধান বিশেষত্ব ঐ উজ্জ্বল নাসা! ঐ

দীপ্ত সামুদ্রিক ভেট্‌কী (এরা সমুদ্রের মধ্যে অল্প-জলে ও গভীর-জলে উভয় প্রদেশেই আরামে থাকতে পারে)

দেদীপ্যমান নাকটির জন্যই এদের এমন কাব্যিক নাম হ'য়েছে "চন্দ্রনাসা"! এরা যখন জলের মধ্যে সাঁতার কেটে চলে তখন দূর থেকেই তার সাগরাভ্যন্তরস্থ প্রতিবেশীরা জানতে পারে যে 'চন্দ্রনাসা' চলেছে! এই 'চন্দ্রনাসা' মাছ প্রথম ধরা পড়ে এক মার্কিন জাহাজের চেষ্টায় গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সাগর জলে প্রায় দশ হাজার ফুট নীচে।

নিউগিনির দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট নিয়ে এক ভীষণাকৃতি মৎস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাকৃত-রহস্যবিদেরা এর নাম দিয়েছেন Cyclothone elongata, বাংলায় এর নাম দেওয়া চলে 'উল্কাচ্ছদ' বা 'চক্রতুণ্ডী'। যদিও প্রচণ্ড উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সাদৃশ্য নেই তবু প্রাকৃত বিজ্ঞানের ভাষায় এর এই নামকরণ হয়েছে; কারণ, এই জাতীয় মৎস্যের কানকোর ঢাকনা প্রকাণ্ড গোলাকার এবং মাথার উপর থেকে ঘেরাটোপের মতো ঝোলে। 'চক্রতুণ্ডী'র মুখগহ্বরও

প্রথম—অনামী উজ্জ্বল মৎস্য। দ্বিতীয়—বিদ্যুৎ-গতিবিশিষ্ট দীপ্ত মৎস্য

প্রকাণ্ড। এরা যখন মুখব্যাদান করে, তখন নীচেকার ওষ্ঠ নেমে পড়ে প্রায় বুকের উপর। এদের দুই চোয়াল-ভরা ভীষণ দংষ্ট্রাবলী কুম্ভীরকেও লজ্জা দেয়। এরা বিদ্যুৎবেগে জলের মধ্যে বিচরণ করতে পারে। বান্দা সাগরের দু'হাজার ফুট নীচে এবং অতলান্ত মহাসাগরের উত্তরে পাঁচ হাজার ফুট থেকে তেরো হাজার ফুট নীচে পর্য্যন্তও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের শরীরে যে দীপমালার সন্নিবেশ আছে তা' বিশেষ জটিল নয়। মাত্র দু' লাইন দীপের সার পেটের দু'ধারে সাজানো এবং ল্যাজের কাছে মাত্র এক লাইন। দীপগুলি কিন্তু আকারে অন্যান্য দীপঙ্কর মৎস্য অপেক্ষা বৃহৎ এবং দ্যুতিও উজ্জ্বলতর।

Astronesthes niger বা 'জ্যোতির্ম্ময় কাব্রী' নামে

আর এক প্রকার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য দেখতে পাওয়া গেছে যাদের আকৃতিকে 'ভয়ঙ্কর' ছাড়া আর কিছু বিশেষণে অভিহিত বা ব্যক্ত করা চলে না। এদের শরীরের নিম্ন ভাগে দু'সারি উজ্জ্বল আলোক বিন্দু আছে এবং এরা যে অত্যন্ত শিকারপটু জীব এ তথ্যটুকুও জানা গেছে। অতল তলের অধিবাসী যতগুলি জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে এই 'জ্যোতির্ম্ময় কাক্রী'র মুখেই সর্ব্বপ্রথম ঝুমকোর ন্যায় একটা মোটা শোঁয়া দেখা গেছে। নিম্নের চোয়াল বা চিবুকে এই শোঁয়া গভীর জলের মৎস্যগুলির একটি বিশেষত্ব বলা চলে।
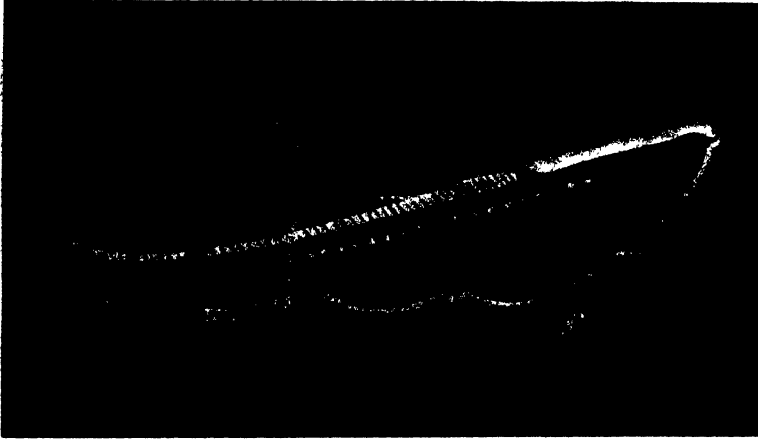
এই "জ্যোতির্ম্ময় কাক্রী"দের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বিবরণ এখনও জানা যায়নি। সাগরতলের নানাদিক অনুসন্ধান ক'রে মাত্র দ্বাদশ প্রকার এই জাতীয় মৎস্য সংগ্রহ হ'য়েছে, এই বারোটি মাছকে আবার বিশেষজ্ঞেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এই মাছেরই একটিকে পাওয়া গেছে এক প্রকার সামুদ্রিক ভেট্‌কী মাছের পেট থেকে। এ মাছটি ধরা পড়ে সাগর গর্ভে প্রায় দুই হাজার ফুট নীচে। এই আবিষ্কারের ফলে জানা গেল যে "জ্যোতির্ম্ময় কাক্রী"র আকৃতি যতই ভয়ঙ্কর হোক্‌না কেন এবং এর দংষ্ট্রাপাতি যতই ভীষণ ও ক্ষুরধার হোকনা কেন, মানুষ এদের দেখে ভয় পেলেও বৃহত্তর মাছেরা এদের ভয় করেনা, বরং বাগে পেলে ধ'রে উদরস্থ ক'রে নেয়!

অদ্ভুত দীপধর মৎস্য (এরা মীনবিদ্‌গণের এক বিস্ময়! সর্ব্বাঙ্গ এদের জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু এরা চক্ষুহীন!)

এই "জ্যোতির্ম্ময় কাক্রী"দের ন্যায় ভীষণ দংষ্ট্রাযুক্ত আর একপ্রকার উজ্জ্বল মৎস্য দেখতে পাওয়া গেছে; তাদের নাম "ষ্টোমিয়াস্" (Stomias) বা দীপ্ত মৎস্য! এই শ্রেণীর এক জাতীয় মৎস্যকে বলে "দীপ্ত অজগর" (Stomias Boa) এরা জলের মধ্যে অত্যন্ত মন্থরগতিতে বিচরণ করে, দ্রুতবেগে সন্তরণ দিতে পারে না। এদের অঙ্গের যে জ্যোতি সে কেবল শিকারকে প্রলুব্ধ ক'রে তাদের বিরাট মুখ গহ্বরের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসার কাজে লাগে মাত্র!

একবার শিকার যদি এদের মুখের মধ্যে এসে পড়ে তাহ'লে আর তার পরিত্রাণের উপায় নেই; কারণ, এদের দাঁতের গঠন এমন প্যাচোয়া যে শিকার প্রবেশ করে অনায়াসে—কিন্তু নির্গত হবার পথ পায় না। দাঁতগুলি একেবারে যাঁড়াসীর মত এমন আঁকড়ে ব'সে যে বেরিয়ে আসার কোনই উপায় থাকেনা। এদেরও রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং আকার অবিকল সর্পের ন্যায়। উত্তর অতলান্ত মহাসাগরে গ্রীনল্যাণ্ডের তীর থেকে ভূমধ্যরেখা পর্য্যন্ত পরিধির মধ্যে এক হাজার থেকে দশহাজার ফুট নীচেও এদের দেখতে পাওয়া গেছে।

আর এক প্রকার অদ্ভুত আকারের উজ্জ্বল মৎস্য এই উত্তর অতলান্ত মহাসাগরে দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার ফুট নীচে দেখতে পাওয়া গেছে যাদের এখনো কোনো নির্দ্দিষ্ট নামকরণ করা হয়নি। এদের অঙ্গের দীপ্তি বেশ উজ্জ্বল, নিম্নের চোয়ালের গঠন ঠিক বঁড়শীর' মতো বাঁকা এবং থুঁতনির নীচে "জ্যোতির্ম্ময় কাক্রি" ও "দীপ্ত অজগরের" ন্যায় ঝুমকো বা শোঁয়া আছে। এরা একটু স্থূলকায় এবং নিরীহ জীব। এদের লেজ নেই ব'ললেই হয়, অর্থাৎ এত ক্ষুদ্র যে সে লেজের দ্বারা যে তাদের কোনো কাজ হয় এমন মনে হয়না। এদের স্থূল দেহ নিয়ে এরা মোটে নড়তে চড়তে পারে না, সুতরাং অনুমান হয়, এরা মুখের সামনে যা পায়

তাই খেয়েই জীবন ধারণ করে। তা'ছাড়া এদের দাঁতের অবস্থা এতই অকিঞ্চিৎকর যে বেশ বোঝা যায় এরা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে কিছু খেতে পারেনা, যা খায় তা গিলেই খায় এবং পেটের মধ্যে পাকস্থলীর সাহায্যে তা হজম করে।

এই সকল দীপঙ্কর মৎস্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম জীবের অঙ্গ হ'তে বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা সুরু হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে মাছের অঙ্গে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপ সংযুক্ত থাকে তার সমাবেশ প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজানো মনে হ'লেও, তার মধ্যে একটা নিয়ম বর্তমান আছে। এই যে সুনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা এটা অবশ্য কোনো কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া এই দীপগুলির সন্নিবেশ-রীতি ও দীপ্তির তারতম্য অনুসারেই এই মৎস্য সম্প্রদায়ের জাতি নির্বাচিত হয়।

গভীর সাগর তলের নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এই সকল সচল দীপমালার অস্তিত্ব ও তাদের অঙ্গ-বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মির প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বিশেষজ্ঞরা স্থির করেছেন যে শিকার-সন্ধান, খাদ্যান্বেষণ, পথ নির্ণয়, শত্রুর-ভীতি উৎপাদন ইত্যাদি ছাড়া সেই ঘন-তমসার রাজ্যে মিত্রবর্গকে কোনো কিছু ইঙ্গিত করার প্রয়োজন হ'লেও তারা এই দীপমালার সাহায্যেই তা ব্যক্ত ক'রে। এ তথ্য যদি সত্য হয় তাহ'লে বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এ এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

ক্ষান্ত আমার হ'ল যাওয়া সেদিন বিদেশিনী

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার সে গানখানি—
কোন খেয়ালী উদাসতানে,
উঠ্‌ল' বেজে আমার প্রাণে,
মুগ্ধ তোমার সে গান দানে
ওগো অচিন্-রাণী!
শিশির-ভেজা সেদিন প্রাতে,
কুয়াষ-ভরা পথের মাথে,
শুনেছিনু প্রাণের সাথে
তোমার সে রাগিণী!
কি যেন মোর চির-চাওয়া,
হঠাৎ যেন হ'ল পাওয়া,
ক্ষান্ত আমার হ'ল যাওয়া
সেদিন বিদেশিনী!

শেয়ের

শ্রীলালমোহন পাঠক

(উর্দ্দু হইতে)

(১)

মিলন-যামিনী সুখ-উৎসবে নিভাও প্রদীপমালা,
এতো আনন্দে, কিবা প্রয়োজন দীপের দহন জ্বালা।

(২)

(তুমি আমার কেমনতরো বঁধূ)
শত্রু সেও তোমার চেয়ে ভালো,
পরমঘৃণায় আমায় ত সে স্মরে,
কুসুম হ'তে কাঁটাও ঢের ভালো,
চল্‌তে যখন আঁচল্ টেনে ধরে।

* রকিব অর্থাৎ প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা সাহিত্যে এর চলাচল নেই তাই শত্রু লেখা হল।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার এক সঙ্গে তিন-চারজন আমার পরম শ্রদ্ধেয় খ্যাতনামা মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করব। ধারাবাহিক হিসাবে বলতে গেলে প্রথমেই পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম বলতে হয়। তার পরেই 'হিতবাদী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মৃতি-তর্পণ করতে হয়।

ইঁহাদের মধ্যে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী দিনের। কিন্তু এ সকল কথা বলবার পূর্ব্বেই আর একজনের নাম না করলে এই বিবরণের ধারাবাহিকত্ব রক্ষা পায় না—তিনি আমার পরম বন্ধু 'সন্ধ্যা' কাগজের সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়!

এই সকল মহানুভব ব্যক্তির স্মৃতি-তর্পণ করবার পূর্ব্বে আমার নিজের কথা একটু বলতে হচ্ছে।

'বসুমতী'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সপরিবারে দেশে চলে গেলাম, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু দেশে গিয়ে বসে থাকব—আর পরিবার প্রতিপালিত হবে, তার সংস্থান যে আমার ছিল না—তখন সে কথা আমার মনেও হয়নি।

জোত-জমা ছিল না, সঞ্চিত অর্থও কিছু ছিল না যে তাই দিয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করব। পূজনীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিমাসে পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব থেকে কিছু কিছু পাঠাতেন, আর বড়দাদার পেন্‌সনের টাকা,—এই দিয়ে কোন রকমে তিনচার মাস চলে গেল। কিন্তু সে ভাবে আর কত দিন চলতে পারে?

বড়দাদা অবসর নিয়ে বাড়ী এসে বসেছেন। আমি তাঁর সেবা করব, সংসারের সমস্ত ভার মাথায় নেব—এই তো আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তা না করে তাঁর শেষ জীবনের অবসর-বৃত্তি আমার জীবন-ধারণের জন্য ব্যয় হবে—তিনচার মাস বাড়ী বসে থেকে সে ব্যবস্থা আর আমার ভাল লাগল না।

তখন স্থির করলাম—আবার কলকাতায় ফিরে আসব। 'বসুমতী'র কার্য্যে আর যোগ দেব না কারণ তার সু-ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। দেখি এত বড় সহরে আর কোথাও বিধাতা আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন কি না। সেবার কলকাতায় এসে আর সুরেশের আশ্রয়ে গেলাম না বা অন্য কোন বন্ধুরও গলগ্রহ হলাম না। আমাদের গ্রামের শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ সান্যাল তখন কলিকাতার ছোট আদালতের উকীল। তখন তাঁর প্রসারপ্রতিপত্তিও খুব বেশী, আয়ও যথেষ্ট। তিনি আমার কলকাতায় আসবার কয়েকদিন পূর্ব্বে বাড়ী গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করে বল্লেন—দাদা, এমন করে বাড়ী বসে থাকলে আপনার শরীর মন কিছুই ভাল হবে না। আপনি কলকাতায় চলুন। আমার বাসায় থাকবেন, আমি আপনার সেবা করব।

রাধিকাপ্রসাদের এই সাগ্রহ অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। কলিকাতায় এসে নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে তাঁর প্রবাস-ভবনে অধিষ্ঠিত হলাম।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন খাই-দাই আর ঘুরে বেড়াই। যাওয়ার স্থান বড় বেশী ছিল না। 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক পরলোকগত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে অনেকদিন পূর্ব্ব থেকেই আমার পরিচয় ছিল এবং সে পরিচয় বিশেষ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছিল। কখনও 'হিতবাদী' অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, কখনও বা তাঁর বাড়ীতেও যেতাম।

'হিতবাদী' অফিসে বিশারদ দাদার সঙ্গেও সর্ব্বদা দেখা হোতো। তিনি প্রায়ই বলতেন, ওরে, অমন করে ঘুরে বেড়াসনে। যা হয় একটাতে লেগে যা। আমি বলতাম—দেখি, যা হয় একটা করব। কিন্তু তাঁর সেই কথা অল্পদিন পরেই তাঁরই উপর দিয়ে ফলে যাবে, এ কথা তখন স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁর অনুরোধে সে সময় দু' চারটে প্রবন্ধও 'হিতবাদী'তে লিখেছিলাম।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গেও আমার পূর্ব্ব থেকেই পরিচয় ছিল। মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে তাঁর 'সন্ধ্যা'

অফিসে আড্ডা দিতে যেতাম। প্রাতঃকালের চা-পান 'সন্ধ্যা' অফিসেই হোতো, আর খুব আড্ডা জম্‌তো।

সেই সময়ে একদিন উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন —দেখুন *জলধরবাবু—আপনার তো এখন কোন কায নেই। প্রত্যহ সকালবেলা 'সন্ধ্যা' অফিসে আসুন না কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন—আর 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্য এক কলম কি দু-কলম যা হয় লিখবেন। বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব না। 'সন্ধ্যা'র সে শক্তি নেই। নগদ দুটী করে টাকা দেব। আমি ভাবলাম—মন্দ কি? বসেই তো আছি, যেদিন আসবো চা-যোগ তো হবেই, আর 'সন্ধ্যা' কাগজের এক কলম দু-কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণা নগদ দুটী টাকা—যথা লাভ।

একটা মানুষের মতন মানুষ ছিলেন—এই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়—একেবারে খাঁটী সোনা। একটুও খাদ তাঁতে ছিল না। কবির ভাষায় বলতে গেলে—এমন মানুষ —"লাখে না মিলয় এক।"

উপাধ্যায় মহাশয়ের রাষ্ট্রনীতি এবং স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ থাকলেও আমি এ'কথা স্পষ্ট বাক্যে বলতে পারি—তাঁর মত দর্শন ও বেদান্তে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, তাঁর বালকের ন্যায় সরল স্বভাব, তাঁর ত্যাগ, তাঁর সংযম, তাঁর পরদুঃখকাতরতা, সর্ব্বোপরি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা—আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভক্তি করতাম,—এক কথায় তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে 'সন্ধ্যা' আপিসে আসতেন। প্রত্যহই তাঁকে কিছু লিখতে হত না। পাঁচকড়ি বাবু, নরেন শেঠ, "গোবর-গণেশ" হরিদাস হালদার প্রভৃতি বড় বড় লিখিয়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সন্ধ্যা আপিসে জমায়েৎ হতেন এবং সকলে পরামর্শ করে যাকে যা লিখতে হবে তা ঠিক করা হ'ত। এ লেখার অংশ আমিও পেতাম।

শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (কালা বীরেন) প্রুফরিডার ছিলেন এবং দৈনিক সংবাদাদি তিনিও লিখতেন। চা মুড়ি ও বেগুনি খেতে খেতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঐটুকু 'সন্ধ্যা' কাগজের সব লেখা শেষ হয়ে যেত। এক-একদিন উপাধ্যায় মহাশয় বলতেন—আজ আমি একটু ঝাল-নুন বাড়িয়ে দি। সে যে কি সুন্দর লেখা—অমন সরল সহজ ভাষায়, অমন হাসি তামাসা করতে করতে মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ, ঐ একা ব্রহ্মবান্ধবই পারতেন। যেদিন ঝাল-নুন একটু বেশী থাকতো —সেদিন বেলা একটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত 'সন্ধ্যা' ক্রমাগত ছাপা হত। কাগজ বাজারে পড়তে পেত না। যাঁরাই পড়তেন তাঁরাই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন—এই দেখ না কাল সকালেই ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যায়।

অনেকবার এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়েছিল। অবশেষে একদিন সত্য সত্যই বাঘ আসিল। 'সন্ধ্যায়' দুইটী প্রবন্ধ বের হয়। সে দুইটীর মধ্যে একটির নাম আমার মনে আছে, সেটি—"এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।" এই দুই প্রবন্ধের জন্য ব্রহ্মবান্ধব ও মুদ্রাকরকে অভিযুক্ত করা হল। তাঁরা জামিনে খালাস রইলেন। সরকারপক্ষ থেকে আমাকে সাক্ষী মান্য করা হল। উপাধ্যায় মশায়ই যে 'সন্ধ্যার' স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সেই কথা প্রমাণ করবার জন্য সরকার পক্ষ আমাকে ডেকেছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই লালবাজার পুলিশ আদালতে হাজির হলুম। মিঃ কিংস্‌ফোর্ড তখন প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট। কাউকে কোন সাক্ষ্যই দিতে হল না। উপাধ্যায় মহাশয় এক ষ্টেটমেণ্ট দাখিল করে বল্লেন, তিনিই 'সন্ধ্যা'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। যে দুইটী প্রবন্ধের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে—তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন। আদালতে তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থন করবেন না, আর একটি কথাও বলবেন না। আইন-কর্ত্তাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বললেন—এর পর আর সাক্ষ্য প্রমাণের কিছুই দরকার নেই। ১০।১৫ দিন পরে রায় দেবার দিন স্থির হল।

উপাধ্যায় মহাশয় অনেক দিন থেকে হার্ণিয়া রোগে ভুগছিলেন। এই সময় সে রোগের যন্ত্রণা এমন বেড়ে গেল যে সত্বরই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হোলো। তিনি দুই একদিনের মধ্যেই ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করালেন এবং সেইখানেই শয্যাগ্রহণ করলেন। আমরা প্রতিদিন অপরাহ্নকালে তাঁকে দেখতে যেতাম। শুয়ে শুয়েই কত গল্প কত হাসি-তামাসা করতেন। একদিন দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন—আমাকে আর জেলে দিতে হয় না—আমি এই দেখিয়ে চলে যাবো।

এ যে ভবিষ্যদ্বাণী তা আমরা বুঝতে পারিনি। তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে আমরা সেদিন চলে এলাম। কিসে কি হোলো ভগবান জানেন—পরদিন বেলা ১০টার সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল—উপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নেই। মহাত্মা পূর্ব্বদিনেই সে কথা বলেছিলেন—আমরা বুঝতে পারিনি।

সংবাদ পাওয়া মাত্র সহরের চারিদিক থেকে লোক ছুটলো ক্যাম্বেল হাসপাতালে। সেখান থেকে শবদেহ বহন করে প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক একবার সন্ধ্যা অফিসের সম্মুখে শবাধার নামালেন। তার পর নিমতলার শ্মশান ঘাটে আমরা উপাধ্যায় মহাশয়ের নশ্বর দেহ চিতা-ভস্মে পরিণত করে এলাম। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র মুখাগ্নি করলেন।

উপাধ্যায় মহাশয় যে দেশপূজ্য রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র একথা সকলেই জানেন। একাদশ দিনে কালীঘাটে আমরা সকলে মিলে উপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করেছিলাম। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সন্ধ্যার তহবিলে সেদিন ৭৸০ সাত টাকা তের আনা ছিল। তাই নিয়ে আমরা ২৫।৩০জন কালীঘাটে শ্রাদ্ধ করতে গেলাম। রাস্তার মধ্যে আমরা চার পাঁচ জন নেমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ী যাই। তিনি ৭৸র কথা শুনে তখনই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিলেন, আর বল্লেন—শ্রাদ্ধ তো হবেই—আর দরিদ্র নারায়ণের সেবা হবে। আমি এখনই আপনাদের সঙ্গে যেতে পারছিনে। হাইকোর্টে আমার একটা জরুরী মোকদ্দমা আছে। আমি সেখানে গিয়ে জজেদের বলে মামলা মুলতুবী নিয়ে কালীঘাটে যাচ্ছি—আপনারা এগোন।

তারপর যে কি হোলো তা বর্ণনার অতীত। চারিদিক থেকে অযাচিত ভাবে দ্রব্যসম্ভার আসতে লাগলো; এমন কি এই শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার জন্য স্বয়ং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তিনশো কি পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন আমরা তাঁর শেষ কার্য্য মহা-সমারোহে শেষ করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে আমি অশৌচ গ্রহণ করেছিলাম। এই একাদশ দিন নগ্নপদে হবিষ্যান্নে কাটিয়েছিলাম—আজ এত কাল পরে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করলাম।

যখন আমি 'সন্ধ্যা' অফিসে আড্ডা দিতাম—সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে দেউস্কর মহাশয় 'সন্ধ্যা' আফিসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বল্লেন, উপেনবাবু (স্বর্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়) আমাকে তলব করেছেন। অকস্মাৎ উপেন-দাদার তলব—আমি কারণ জান্‌তে চাইলাম। সখারাম বল্লেন, সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে দেখা করলেই কারণ জানতে পারবে; সখারাম আর কিছুই বল্লেন্ না।

সন্ধ্যার পর 'হিতবাদী' আফিসে গেলাম। শ্রীমান মনোরঞ্জন বাবাজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে উপেনদাদার বৈঠকখানায় হাজির করে দিলেন। সেখানে উপেনদাদা ও তাঁহার বড় ভাই দেবেনদাদা বসে ছিলেন। উপেনদাদা কাজের লোক; ভূমিকা বা ভণিতা না করে তিনি সোজাসুজি বলে বস্‌লেন "দেখ জলধর, তোমাকে হিতবাদীর ভার নিতে হবে।" আমি ত অবাক্—এ কি প্রস্তাব। আমি বল্‌লাম, "আমার দ্বারা হবে না দাদা!" তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হোলো। অবশেষে আমি বল্‌লাম, "আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, তা হ'লে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।" উপেনদাদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্‌লেন "ভেবে দেখি। তুমি কাল একবার এসো।" পরের দিন গেলাম। তিনি বল্‌লেন "তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হলাম। আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দাও।" তাঁর আদেশে সেই দিন থেকেই আমি 'হিতবাদী'র সেবক হলাম। সখারাম হলেন কর্ণধার, আর যোগেন্দ্রবাবু, মণীন্দ্রবাবু, পাঁচুবাবু, মনোরঞ্জন, আর আমি হলাম সেবক।

এইস্থানে বিশারদ-দাদার কথা একটু বলি। বিশারদ-দাদা বিচিত্র-কর্ম্মী মানুষ ছিলেন। তিনি শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, আমাদের দেশের অসংখ্য কাজের বোঝা তিনি তাঁর সুস্থ সবল মস্তকে তুলে নিয়েছিলেন এবং তার কোন একটিকেও তিনি অবহেলা করেন নাই—তাঁর কর্ত্তব্যবোধ এমনই প্রখর ছিল!

কিন্তু মানুষেরই শরীর ত! বিশারদ-দাদা তাঁর শরীরের দিকে মোটেই চান নাই; তার ফল এই হোল, অমন যে স্বাস্থ্য, অমন যে তীক্ষ্ণ প্রতিভা, অমন যে অতুলনীয় কার্য্য-দক্ষতা—অত্যধিক পরিশ্রমে, অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনায় তিনি অবশেষে অবসন্ন হয়ে পড়লেন, এত পরিশ্রম তাঁর সইল না।

বন্ধুবান্ধবগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি বিশ্রামলাভের জন্য সমুদ্র-যাত্রা কর্‌লেন। অমন কর্ম্মী পুরুষ কি বিনাকাজে বেশীদিন চুপ করে থাক্‌তে পারেন—বিশারদ-দাদা গৃহাভিমুখী হলেন। সমুদ্রের মধ্যেই তাঁর চির-বিশ্রাম লাভ হোলো; সাগরের নীলাম্বুতলে আমাদের বিশারদ-দাদার নশ্বর দেহ সমাহিত হোলো। আমরা তাঁর রোগ-শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াতেও পার্‌লাম না। পড়ে রইল তাঁর 'হিতবাদী', পড়ে রইল তাঁর পুত্র মনোরঞ্জন, পড়ে রইল তাঁর অসংখ্য অসমাপ্ত কাজ—বিশারদ-দাদা সাধনোচিত ধামে চ'লে গেলেন।

*　　*　　*　　*　　*

সেবার সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হবার ব্যবস্থা হয়েছিল; সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন, সার রাসবিহারী ঘোষ। কলকাতা থেকে অনেক প্রতিনিধি সুরাটে গিয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ যে গিয়েছিলেন, সে কথা না বল্‌লেও চলে; উপেনদাদাও গিয়েছিলেন।

যেদিন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হবার কথা, সেদিন অপরাহ্নে আমরা তাড়িৎবার্ত্তার দিকে চেয়ে ছিলাম। তখন 'দৈনিক হিতবাদী' খুব জোরে চল্‌ছে। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে তার এলো—কংগ্রেস ভেঙ্গে গিয়েছে, দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হয়েছে, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ একদল এই যজ্ঞভঙ্গের নেতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আদেশ করা হয়েছে, তিলকের এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা কর্‌তে হবে। এই আদেশ শুনে হিতবাদীর কর্ণধার, মারাঠাসন্তান সখারাম একেবারে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—"আমার উপর যতক্ষণ হিতবাদীর ভার আছে, ততক্ষণ তিলক মহারাজের বিরুদ্ধে এক লাইনও লেখা হবে না, তাতে আমার কার্য্য ত্যাগ করতে হয় তাও করব।" তিনি তখনই সে কথা তারযোগে উপেনদাদাকে জানালেন।

সাতটা বাজলো, আট্‌টা, ন'টা হয়ে গেল—সখারামের তারের জবাব আর আসে না। আমরা মহাসঙ্কটে পড়লাম। পরদিন প্রাতঃকালে যথারীতি 'দৈনিক হিতবাদী' বাজারে দিতে হবে ত!

দশটার একটু আগেই তারের জবাব এলো। তার মর্ম্ম এই যে, কার্য্যত্যাগই মঞ্জুর হোলো; তাঁহাদের ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমাকে কাগজ চালাতে হবে। তাই হোলো। দুই দিন পরে সুরেন্দ্রবাবু, উপেনদাদা প্রভৃতি ফিরে এলেন। নূতন কোন ব্যবস্থাই তাঁরা কর্‌লেন না; সেই তারের খবর "জলধর কাগজ চালক"—ঐখানেই শেষ। কিন্তু তা চল্‌ল না! তখন—

"মরা গাঙে বান ডেকেছে
জয় মা, বলে ভাসাও তরী।"

তখন সুরেন্দ্রনাথের অমর লেখনী 'বেঙ্গলী'র পৃষ্ঠায় অনল-বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমার ধাতুতে অনল ত ছিলই না, উত্তাপও হয় ত ছিল না। আমি এ দামোদরের বানের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব কেন? হিতবাদী বল্‌তে লাগ্‌লেন "ভাসাও তরী—কিন্তু ধীরে!"

সর্ব্বনাশ! হিতবাদীর পরম শুভানুধ্যায়ীরা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চুপ করে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হতে লাগলো, আমি বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ কর্‌ছি। যে বিশারদ দাদাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এ অভিযোগ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌লাম না—আমি তখন বিশারদ দাদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তাঁহার হিতবাদীর সেবা হ'তে অবসর গ্রহণ কর্‌লাম। এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে, আমি যতদিন হিতবাদীর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, ততদিন দেবেনদাদা, উপেনদাদা, তাঁহাদের পুত্রগণ ও শ্রীমান মনোরঞ্জনের নিকট থেকে যে অনুকম্পা লাভ করেছিলাম, সে কথা আমি কোনদিন ভুল্‌ব না।

তার পর যাঁহারা হিতবাদীর ভার নিলেন, তাঁহারা হিতবাদীর বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে গেলেন। তার ফলে হিতবাদীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হোলো। কে সম্পাদক, তা আদৌ প্রমাণ হোলো না, হাতে-কলমে ধরা পড়্‌লেন নিরীহ মুদ্রাকর—নীরদবাবু। তাঁকে মাস কয়েকের জন্য কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তে হোলো। আর 'দৈনিক হিতবাদী'র জামীন তলব হোলো। এইবার হিতবাদীর কর্ত্তারা সত্যসত্যই বিশারদ-দাদার বৈশিষ্ট্য রক্ষা কর্‌লেন; তাঁহারা স্পষ্ট বললেন, দৈনিক হিতবাদী বন্ধ কর্‌তে হয় তাও কর্‌ব, জামিন দেব না। তাই হোলো; জামিন দেওয়া হোলো না, দৈনিক হিতবাদী বন্ধ হয়ে গেল। সাপ্তাহিক হিতবাদী এখনও চল্‌ছে।

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রদাদা ও উপেন্দ্রদাদা আমার প্রতি যে

কেমন সদয় ছিলেন তার একটা দৃষ্টান্ত না দিয়ে আমি তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ শেষ করতে পারছিনে।

আমি প্রতিদিন বেলা এক টার সময় 'হিতবাদী' আফিসে যেতাম। আমার ফিরতে রাত ১২।১টা বেজে যেত। আর সকলে সন্ধ্যার পরই চলে যেতেন। আমি একা থাকতাম। আমি তখন শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ সান্যালের বাসা ছেড়ে স্কটীশ চার্চেস কলেজের পেছনে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতাম। সব দিন রাত্রিতে আমার আহার হোতো না। অত রাত্রে আহার্য্য দ্রব্য থাকলেও খেতে ইচ্ছা করত না, সুতরাং উপবাসেই কাট্‌তো। পথশ্রম আমি গ্রাহ্য করতাম না, কলুটোলা থেকে হেদুয়া —এমন কিছু দীর্ঘ পথ নয়।

হিতবাদী আপিস যে ফুটপাথে তার অপরদিকেই কবিরাজ সেন মহাশয়দিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ফুটপাথের উপরেই তার বিস্তৃত বারান্দা। সেখান থেকে আমাদের আপিস বেশ দেখা যায়। একদিন রাত্রি ১০টা ১০।।০টার সময় উপেনদাদা সেই বারান্দায় বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি 'হিতবাদী' আপিসের দিকে পড়লো। তিনি দেখলেন —আমি একলা বসে কি লেখাপড়া করছি। তখনই লোক পাঠিয়ে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। দেবেনদাদা তখন সেই বারান্দায় বসেছিলেন। আমি যেতেই উপেনদাদা বল্লেন—জলধর, তুমি এখনও বাড়ী যাওনি। আমি বললাম—এখনও তো সময় হয়নি, আমি ১২।১টার কমে যাইনে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন— রাত ১২।১টা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাক? আর তার পর? এই গ্যাঁড়াতলা দিয়ে বাসায় যাও? ভয় করে না?

আমি বিনীতভাবে বল্লাম, অনেকদিনই রাত্রে অনাহারে থাকতে হয় দাদা। আর, পথের কথা যা বলছেন,—আমি গ্যাঁড়াতলা দিয়ে যাইনে, বরাবর কলুটোলা দিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজের সামনে কলেজ ষ্ট্রীট ও সেখান থেকে বরাবর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে হেদোয় যাই।

তিনি বল্লেন, না, না! অমন করে একলা যেও না— গাড়ী করে যেও। তোমার সে গাড়ী-ভাড়া আমিই রোজ দেব। আমি হেসে বল্লাম—দাদা, ভুলে যাচ্ছেন— আমি হিমালয়-ফেরত। তিনি আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লেন—আরে না, না! শেষে গুণ্ডার হাতে পড়ে প্রাণ হারাবে নাকি?

তার পর দেবেনদার দিকে চেয়ে বল্লেন—আচ্ছা দাদা— আমিই না হয় নানান্ ধান্ধায় ঘুরে বেড়াই। তুমি তো বাড়ীতেই থাকো! এই যে ভদ্রলোকের ছেলেটী সেই দুপুর বেলায় আসে, আর রাত ১২টা ১টায় যায়—এর দিকে কি একবারও চেয়ে দেখ না। দেখ, আজ থেকে রোজ রাত্তির ন'টার সময় হিতবাদী অফিসে জলধরের খাবার পাঠিয়ে দেবে। ভুলে যেও না।

দেবেনদা বল্লেন—সত্যিই অন্যায় হয়েছে জলধর। আমার শরীর ভাল নয় তা তো জানো—সব দিক দেখে উঠতে পারিনে।

তার পর যতদিন 'হিতবাদী'তে ছিলাম, রাত ৯টার সময় আমার খাবার আসতো। কিন্তু আমি গাড়ী-ভাড়ার পয়সাও নিইনি, গাড়ী-ভাড়া করেও বাড়ী আসিনি।

কয়েকদিন পরে উপেনদা একদিন আমাকে ডেকে বল্লেন—কই হে জলধর—তুমি তো গাড়ী-ভাড়ার পয়সা নাও না। আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি তখন 'হিতবাদী'র ম্যানেজারকে ডেকে আদেশ দিলেন—এই মাস থেকে জলধরের ২০৲ কুড়ি টাকা মাইনে বাড়ল।

এই অযাচিত স্নেহে সেদিন আমার চোখে জল এসে-ছিল—আমি একটি কথাও বলতে পারিনি। আজ এতকাল পরে তাঁদের সেই স্নেহ ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে আবার আমার চোখে জল এল। এই চোখের জলেই আজ তাঁদের দুই ভাইয়ের স্মৃতি-তর্পণ করলাম।

সাহিত্যিকের বৌ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক? শেষ পর্য্যন্ত একজন দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবে নাকি?—এই বিস্ময় বিবাহের আগে কতদিন অমলাকে অভিভূতা করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে : মোটামুটি তিনমাস। কারণ, স্বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্য্যকান্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়ার মাস তিনেক পরেই শুভ-বিবাহটি সম্পন্ন হইয়াছিল।

ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া তারপর বাড়ীতে লেখা-পড়া, গান-বাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, সংসারের কাজকর্ম্ম, ঝগড়া-ঝাঁটির কৌশল ইত্যাদি শিখিতে শিখিতে যে সব মেয়ে আত্মীয়-স্বজনের সতর্ক পাহারা ও অসতর্ক রক্ষণাবেক্ষণে বড় হয়, অমলা তাদের একজন। অতএব বলাই বাহুল্য যে লাইব্রেরী মারফৎ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অমলার ভাল-রকম পরিচয়ই ছিল। প্রথমে লুকাইয়া আরম্ভ করিয়া তারপর ঘরের কোণ আশ্রয় করার মত বয়স হওয়ার পর হইতে প্রকাশ্যভাবেই সে সপ্তাহে চার পাঁচখানা গল্প উপন্যাসের বই ও মাসে তিনচারখানা মাসিকপত্র নিয়মিত ভাবে পড়িয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে স্কুল ছাড়িবার পর বাড়ীতে তার পড়াটা দাঁড়াইয়াছে এই এবং লেখাটা দাঁড়াইয়াছে চিঠি লেখা। সূর্য্যকান্তের লেখা পাঁচখানা উপন্যাস, তিনখানা গল্প-সঞ্চয়ন ও একখানা নাটক সে তার সঙ্গে ভদ্রলোকের বিবাহের প্রস্তাব হওয়ার অনেক আগেই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। তখন কি সে জানিত হৃদয়ের ভাব-প্রবণতাগুলিকে পরম উপভোগ্যভাবে উদ্বেলিত করিয়া রাখা, কখনো হাসানো কখনো-কাঁদানো এই কাহিনীগুলির জন্মদাতা একদিন স্বয়ং তিনটি বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখিতে আসিবে এবং দেখিয়া পছন্দ করিয়া যাইবে!

বড় খাপছাড়া মনে হইয়াছিল ব্যাপারটা অমলার। সাহিত্যিকরা, বিশেষতঃ সূর্য্যকান্তের মত সাহিত্যিকরা কি এ রকম রাম শ্যামের মত জীবনসঙ্গিনী খুঁজিয়া নেয়? তার মত পর্দ্দানশীন সাধারণ মেয়েকে (সাধারণ মেয়ে অবশ্য সে নয় কিন্তু একদিন খানিকক্ষণ শুধু চোখে দেখিয়া, কয়েকটা একখানা গানের সিকি অংশ শুনিয়া তার কি পরিচয় ওরা পাইয়াছিল শুনি?) পছন্দ করে? এ জগতে পুরুষ ও নারীর প্রেম তো একরকম ওরাই ঘটায় এবং শেষ পর্য্যন্ত মিলন হোক আর বিচ্ছেদ হোক—ওদের ঘটানো প্রেমের অগ্রগতির কাহিনী পড়িতে পড়িতেই তো যতটুকু মন কেমন করা সম্ভব ততটুকু মন কেমন করে মানুষের? কয়েকটি ছোট গল্প ছাড়া সূর্য্যকান্তের কোন লেখাটি সে পড়িতে পারিয়াছিল যার মধ্যে দু'এক জোড়া নরনারীর জটিল সম্পর্ক তাকে দুশ্চিন্তা, আবেগ ও সহানুভূতিতে পরবর্ত্তী বইখানা পড়িতে আরম্ভ করা পর্য্যন্ত অন্যমনা ও চঞ্চলা করিয়া রাখে নাই? সেই সূর্য্যকান্ত একি করিতে চলিয়াছে? একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়া প্রথম পরিচয় এবং কতগুলি জটিল ও বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যস্থতায় প্রেমের জন্ম হইয়া না হোক, অন্ততপক্ষে জানাশোনা মেয়েদের মধ্যে একজনকে খুব সাধারণভাবেই একটু ভালবাসিয়া তারপর তাকে বিবাহ করা তো উচিত ছিল সূর্য্যকান্তের? তার বদলে একটা অজানা অচেনা মেয়েকে সে গ্রহণ করিতেছে কোন যুক্তিতে? জীবনে এ অসামঞ্জস্য সে বরদাস্ত করিবে কি করিয়া? ওর বইগুলিতে কত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসিতে পারে নাই, জীবনটা তাদের ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিজের বেলাও সেরকম কিছু ঘটিতে পারে—এ ভয় সূর্য্য-কান্তের নাই?

এসব গভীর সমস্যার কথা ভাবিবার সময় অমলা পাইয়াছিল তিনমাস। তিনমাসে উনিশ বছরের একটি মেয়ে যে কত চিন্তা আর কল্পনায় মনটা ঠাসিয়া ফেলিতে পারে, কত রোমাঞ্চকর রোমান্স অনুভব করিতে পারে, উনিশ বছরের মেয়েরাই তা জানে। একটা কথা অমলা বেশী করিয়া ভাবিত : প্রেম-সংক্রান্ত বিরাট ব্যাপার কিছু একটা যদি সূর্য্যকান্তের জীবনে নাই ঘটিয়া থাকে—ও-সব বিষয়ে এমন গভীর ও নিখুঁত জ্ঞান সে পাইল কোথায়, আর ওরকম কিছু ঘটিয়া থাকিলে বিবাহে তার রুচি আসিল

ভাঙ্গিবার রোমাঞ্চকর অপূর্ব্ব ইতিহাস যদি সূর্য্যকান্ত ভুলিয়া গিয়া থাকে, এত দুর্ব্বল যদি তার হৃদয়ের একনিষ্ঠতা হয় যে ইতিমধ্যে ভাঙ্গা বুকটা আবার লাগিয়া গিয়া থাকে জোড়া, মানুষ হিসাবে লোকটা তবে কি অশ্রদ্ধেয়! ছি ছি, শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা স্বামী তার অদৃষ্টে ছিল যে ভালবাসে, কিন্তু ভুলিয়া যায়? আবার অন্য সময় অমলার মনে হইত, সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে হয়তো কখনো ভালবাসার ছাপ পড়ে নাই, আসলে লোকটা খুব জ্ঞানী আর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বলিয়া অন্য-লোকের জীবনের ঘটনা ও মানসিক বিপর্যয় দেখিয়া শুনিয়া অনুমান ও কল্পনা করিয়া নর-নারীর হৃদয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা-গুলি সে আহরণ করিয়াছে। ভালবাসিলে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী অনিবার্য্য, একথা জানে বলিয়াই বোধ হয় ভাল না বাসিয়া বিবাহ করাটা সে মনে করিয়াছে ভাল? তা যদি হয়, অমলা ভাবিত, তাতেও ওকে তো শ্রদ্ধা সে করিতে পারিবে না। দুঃখ পাইবে বলিয়া যে ভালবাসে না, সে আবার মানুষ নাকি! একেবারে অপদার্থ জীব! আবার সময় সময় অমলার মনে হইত, নিজের ভালবাসার নির্ম্মম পরিণতির স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে না বলিয়া অসহ মনোবেদনার তাড়নাতেই সূর্য্যকান্ত এই থাপছাড়া কাণ্ডটা করিতেছে। অমলা কি জানে না ওরকম অবস্থায় কতলোকে কত কি অদ্ভুত কাণ্ড করে? কেউ মদ খাইয়া গোল্লায় যায় (সূর্য্যকান্তের 'দিবাস্বপ্ন' 'ঘরের বাহিরে পথ' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কেউ সন্ন্যাসী হয়, কেউ কেউ হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া যশ ও টাকা করে (নাম মনে নাই), কেউ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে (মাগো!)। সূর্য্যকান্ত একটা বিবাহ করিবে তা আর বেশী কি? এই কথাগুলি ভাবিবার সময় ভাবী-স্বামীর জন্য বড় মমতা হইত অমলার। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে বলিত, আহা, আমি কি ওকে এতটুকু শান্তি দিতে পারব?

যত পরিবর্ত্তনশীল এলোমেলো কল্পনাই মনে আসুক একথা কিন্তু অমলা কখনো ভুলিত না—যে সাধারণ উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, চাকুরে, ব্যবসাদার বা ওই ধরণের কারো সঙ্গে তার বিবাহ হইবে না, স্বামী সে পাইবে অসামান্য: দেশ শুদ্ধ লোক যার নাম জানে, দেশ শুদ্ধ লোক যার লেখা পড়িয়া হাসে কাঁদে।

প্রায় ত্রিশ বছর বয়স সূর্য্যকান্তের। ঠিক সুপুরুষ তাকে বলা যায় না, তবে চেহারায় একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে। কথাবার্ত্তা চলা ফেরায় সে খুব ধীর ও শান্ত—অনেকটা বৃহৎ সংসারের আকণ্ঠ-সংসারী বড়-কর্ত্তাদের মত। কারও সঙ্গে কথা বলিবার সময় সে এমনভাবে নিরপেক্ষ নিরুত্তেজ হাসি হাসে যে মনে হয় আলাপী লোকটির মত অসংখ্য লোকের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং যে কথাগুলি লোকটি বলিতেছে কতবার যে এসব কথা সে শুনিয়াছে তার সংখ্যা হয় না। কেবল মানুষ নয়, এ জগতে কিছুই যেন সূর্য্যকান্তের কাছে মৌলিক নয়, কিছুই তাকে আশ্চর্য্য করিতে পারে না। পুরাণো জুতার মত হইয়া গিয়াছে—মানুষ, ঘটনা, বস্তু, বাস্তবতা, কল্পনা ও জীবনের খুঁটিনাটি; —তার অভিজ্ঞতায় এমন বেমালুম খাপ খায় যে ফোস্কা পড়া দূরে থাক—অস্পষ্ট একটু মচ্‌মচ্‌ শব্দ পর্য্যন্ত যেন করে না। যা কিছু আছে জীবনে সমস্তের সমালোচনা করিয়া দাম কষা হইয়া গিয়াছে—আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনা আনন্দ উচ্ছ্বাস আবেগ কল্পনা সমস্ত হইয়া আসিয়াছে নিয়ন্ত্রিত: নালিশও নাই, কৃতজ্ঞতাও নাই। বাহুল্য-বর্জ্জিত একটা আরাম বোধ করা ছাড়া বাঁচিয়া থাকার আর কোন অর্থ সে যেন খুঁজিয়া পায় না। পাকা সাঁতারুর মত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সে সাঁতার কাটে জীবন সমুদ্রে, প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িয়া ফেনিল আবর্ত্ত সৃষ্টি করে না।

জীবন সমুদ্র? অমলা তো একেবারে থতমত খাইয়া গেল। এ যে গুমোটের দীঘি! একি শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষ! ভাব কই, তীব্রতা কই, উচ্ছ্বাস কই? অন্যমনস্কতা, ছেলেমানুষী, খাপছাড়া চালচলন, রহস্যময় প্রকৃতির ছোট বড় অভিব্যক্তি—এসব কোথায় গেল? মানুষের মধ্যে সে যে একজন অত্যাশ্চর্য্য মানুষ—দিনে রাত্রে কখনো একটি-বারও এ পরিচয় সে দেয় না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বরং যতটুকু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চরিত্রগত মৌলিকতা থাকে, তাও যেন তার নাই। তার অসাধারণত্ব যেন এই—যে সাধারণ মানুষের চেয়েও সে সাধারণ। গম্ভীর নয়, বেশী কথা বলে না। বেশভূষার দিকে বাড়াবাড়ি [illegible] নাই, অবহেলাও করে না। সুখ সুবিধা যতখানি পাওয়ার কথা

না পাইলে কারণ জানিতে চায়, বেশী পাইলে খুসী হয়, অতিরিক্ত উদারতাও দেখায় না, স্বার্থপরের মত ব্যবহারও করে না। ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায়, রাগ হইলে রাগে, হাসি পাইলে হাসে, ব্যথা পাইলে ব্যথিত হয়,—এই কি অমলার কল্পনার সেই আত্মভোলা রহস্যময় মানুষ? এসব সাধারণ ব্যাপারে শুধু নয়, বৌএর সঙ্গে পর্য্যন্ত সে হাসে, গল্প করে, বৌকে রাগাইয়া মজা দেখে, বৌকে আদর করে স্নেহ জানায়—একেবারে সহজ স্বাভাবিক ভাবে, আর দশজন বাজে লোকের মত। একটা অপূর্ব্ব ও অসাধারণ সম্পর্ক তাদের মধ্যে যেন সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে না: আঙুলে আঙুলে ঠেকিলে দুজনের যাতে রোমাঞ্চ হয়, চোখে চোখে চাহিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তারা যাতে আবিষ্কার করিতে পারে পরস্পরের নব নব পরিচয়, যাতে শুধু অফুরন্ত শিহরণ।

গোড়ার একদিনের কথা—যখন পর্য্যন্ত স্বামীর প্রকৃতির এরকম স্পষ্ট পরিচয় অমলা পায় নাই—অমলার মনে গাঁথা হইয়া আছে। বিকালে কোন কাগজের বিপন্ন সম্পাদক জরুর তাগিদ দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পর শোবার ঘরে সূর্য্যকান্ত লিখিতে বসিয়াছিল গল্প। বাড়ীতে অনেক লোক: বিবাহ উপলক্ষে আসিয়া অনেক আত্মীয়-স্বজন তখনো ফিরিয়া যায় নাই। কত যে বাধা পড়িতে লাগিল লেখায়, বলা যায় না। এ অকারণে ডাকে, সে কি দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করে, ছেলেরা হট্টগোল করে ঘরের সামনে বারান্দায়, রান্নাঘরে ডাল-সম্ভার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে সূর্য্যকান্ত। ঘরে আসিয়া দেখিয়া যাইতে না পারিলেও অমলা টের পাইয়াছিল স্বামী তার লিখিতে বসিয়াছে। ঘরে গিয়া স্বনাম-ধন্য লেখক সূর্য্যকান্তকে প্রথমবার লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল অমলার এবং একথা ভাবিয়া মনটা তার ক্ষোভে ভরিয়া গিয়াছিল যে এই হাঁকাহাঁকি গণ্ডগোলের মধ্যে এক লাইনও সে কি লিখিতে পারিতেছে? বাড়ীর লোকের কি এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নাই? তার যদি অধিকার থাকিত, সকলকে ধমকাইয়া সে আর কিছু রাখিত না। সূর্য্যকান্ত লিখিতে বসিলে সমস্ত বাড়ীটা তো হইয়া যাইবে স্তব্ধ—পা টিপিয়া হাঁটিবে সকলে, কথা বলিবে ফিস্ ফিস্ করিয়া, ডালে সম্ভার পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না। তা নয়, আজই যেন গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে বাড়ীতে—একি অবিবেচনা সকলের, ছি!

রাত সাড়ে দশটার সময় সে যখন ঘরে গেল, সূর্য্যকান্ত তখনও লিখিতেছে। টেবিলে সাত আটখানা লেখা কাগজ দেখিয়া অমলা অবাক হইয়া গিয়াছিল। অত বাধা ও গোলমালের মধ্যেও সূর্য্যকান্ত তবে লিখিতে পারে? তা ছাড়া, কত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরে আসিয়াছে লিখিতে লিখিতে তবু তো সে তা টের পাইল! এবার সূর্য্যকান্তের বিরুদ্ধেই অমলার মনটা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বাস্, আজ এই পর্য্যন্ত, বলিয়া কলম রাখিয়া দু'হাত উঁচু করিয়া বিশ্রী ভঙ্গিতে গা-মোড়া দিয়াছিল সূর্য্যকান্ত, আরও বিশ্রী ভঙ্গিতে তুলিয়াছিল হাই। তারপর হাসিমুখে কাছে ডাকিয়াছিল অমলাকে। বিষণ্ণমুখে অমলা গিয়া টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল, আচ্ছা, আপনি কি করে লেখেন?

গলার আওয়াজে তার কৌতূহল ছিল এত কম, আর বলার ভঙ্গিতে ছিল এত বেশী অবহেলা—যে মনে হইয়াছিল সে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছে সূর্য্যকান্তের মত লোক যে লিখিতে পারে এটা সম্ভব হইল কি করিয়া? সূর্য্যকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা বলা যায় না, চেয়ার ঘুরাইয়া বসিয়া সে ধরিয়াছিল অমলার একখানা হাত, তারপর তাকেও বসাইয়াছিল নিজের চেয়ারে। সাহিত্যিক বলিয়া অবশ্য নয়, নতুন-বৌ টেবিল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ওরকম একটা প্রশ্ন করিলে প্রথম নিঃশব্দ জবাবটা এভাবে না দিয়া কোন স্বামী পারে? তারপর একটু হাসিয়াছিল সূর্য্যকান্ত, বলিয়াছিল, তুমি যেমন করে লেখো ঠিক তেমনি করে, কাগজের ওপোর কলম দিয়ে। কিন্তু অমলারাণী, আর কতদিন আমায় আপনি বলবে?

অমলা অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, বারণ তো করনি আগে।

কেন করিনি জান? তুমি নিজে থেকে বল কিনা দেখছিলাম। কেন বলনি বল তো?

লজ্জা করে না বুঝি? অভিমান হয় না বুঝি?

যে অধিকার হইতে স্বামী তাকে এক সপ্তাহ বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, অধিকার পাওয়া মাত্র লজ্জাও থাকে নাই অমলার, অভিমানও থাকে নাই। সে ভাবিতেছিল,

ঠিক দিয়েছি তো জবাবটা? এমন অবস্থায় এমন জবাব তো দিতে হয়? না, আর কিছু বললে ভাল হত? আচ্ছা, একথা বলব, তুমি কি বুঝবে তোমাকে তুমি বলতে বলনি বলে কি গভীর ব্যথা লেগেছিল আমার মনে? মুখের দিকে তাকিয়ে আছ একদৃষ্টে! আর কিছু না বলে মুখ নীচু করাই বোধ হয় ভাল এবার।

সূর্য্যকান্ত সত্যসত্যই কয়েক মুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মুখের মৃদু লালিমার মধ্যে সে যেন পরিমাণ করিতে চাহিয়াছিল তার লজ্জা ও অভিমানের। বই লিখিবার সময় যতবড় মনস্তত্ত্ববিদ হোক সূর্য্যকান্ত, অমলাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। স্বামীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ভাব জমানোর জন্ম অমলার ঔৎসুক্য তার কাছে অল্পে অল্পে ধরা পড়িতেছিল বটে, কিন্তু ভাব জমানোটাই যে তার অধীরতার কারণ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নয়—তাও বেশ বোঝা যাইতেছিল। ঠিক ভাবপ্রবণতা যেন নয়, কি যেন অমলা জানিতে ও বুঝিতে চায় তার সম্বন্ধে: সব সময় কি যেন বিস্ময়কর সে প্রত্যাশা করে তার কাছে। এমন নাটকীয় ধরণে কথা বলে অমলা! কথার পিছনে প্রকৃত নাটক থাকে না অথচ একেবারেই। হৃদয়াবেগ ও মস্তিষ্ক মিশিয়া যেন তৈরী হয় তার ব্যবহার ও মুখের শব্দগুলি। কাঁচাপাকা আমের মত নতুন বৌকে সূর্য্যকান্তের লাগিতেছিল মিষ্টি আর টক। তার দোষ ছিল না। ওইরকম ব্যবহারই করিতেছিল অমলা। তিন মাস ধরিয়া তপস্তার মত সে যে ভাবিয়াছে—কি কি কারণে সূর্য্যকান্তের মত লোক তার মত মেয়েকে এমন সাধারণভাবে বিবাহ করে, এখন বিবাহের পর সে জানিবার চেষ্টা করিবে না সেই কারণগুলির মধ্যে কোনটা তার স্বামীর বেলা প্রযোজ্য? তিন মাসের গভীর গবেষণা তার বিফলে যাইবে?

তবে আজ ও বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের ইচ্ছাটা তার ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, অতীত জীবনে যত বিপর্য্যয় সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে ঘটিয়া থাক, সে কথা আজ না ভাবাই ভাল। তাকে লইয়া একটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ হোক সূর্য্যকান্তের জীবনে। আপনা হইতে সে তুমি বলিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্ম অপেক্ষা ভালবাসিতে আরম্ভ করে কিনা দেখিবার জন্মও সে অপেক্ষা করিয়া আছে? হায় অমলার অবোধ স্বামী! এতবড় সাহিত্যিক তুমি, তোমাকে ভাল না বাসিয়া কি অমলা পারে? এইসব ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে অমলা নিজেকে ও স্বামীকে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল সূর্য্যকান্তেরই একখানা বইএর একজোড়া নব-দম্পতীর মত। যদিও বইএর ওরা দু'জন, শঙ্কর ও সরযূ, প্রায় তিন বছর ধরিয়া অনেক ভুল-বোঝা, কলহ বিবাদ ও বাধাবিপত্তির পর একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে নবদম্পতী হইয়াছিল, কিন্তু তাতে কি আসিয়া যায়? তেমন বৈচিত্র্যময় তিনটা বছর কাটাইবার পর তাদেরও মিলন হইয়াছে এটা কল্পনা করা এমন কি কঠিন? অন্ততঃ সূর্য্যকান্তের পক্ষে একটুও কঠিন নয়—সেই তো লিখিয়াছে বইটা।

অমলা (এখন সরযূ) তাই ধীরে ধীরে গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল সূর্য্যকান্তের (এখন শঙ্কর), 'স্মৃতির কাতরতা মেশানো অবর্ণনীয়-পুলকের স্বপ্ন' ঘনাইয়া আসিয়াছিল তার দুটি অর্দ্ধনিমীলিত চোখে, 'তিন বছর যে কণ্ঠস্বরে লুকানো ছিল গোপন অশ্রুর সজল সুর তাতে প্রথম মোহকরী আনন্দের আভাষ মিশিলে যেমন শোনায়' তেমনি কণ্ঠস্বরে সে বলিয়াছিল—হ্যাঁ গো, তুমি কি কখনো ভাবতে পেরেছিলে তুমি আর আমি কোনদিন এত কাছাকাছি আসতে পারব?

যে সব গহনা দাবী করা হইয়াছিল বিবাহের সময়, আজ অমলার হাতে তার অতিরিক্ত একজোড়া ব্রেসলেট ছিল। সূর্য্যকান্ত জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল ও গহনাটি কে দিয়াছে। অবাক হইয়া সে বলিয়াছিল, তার মানে?

অমলা বলিয়াছিল, আমার মনে হচ্ছে কতকাল যেন ভাগ্য আমাদের জোর করে তফাৎ করে রেখেছিল। আরও দু'এক বছর দেরী করে যদি আমাদের বিয়ে হত, তাহলে হয়ত আমি—

সূর্য্যকান্তের মুখ দেখিয়া অমলা থামিয়া গিয়াছিল। এত অভিনয় নয়, সত্যই বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল তার, আবেগে সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল ছোট ছোট। মধ্যবিত্ত সংসারের অনভিজ্ঞা, কোমলমন, ছেলে-মানুষ মেয়ে, জীবনে প্রথমবার [illegible] সঙ্গে পাকা

ফুলাই যে কেন! আবেগ, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস ও হঠাৎ একেবারে জন্মের মত কথা বন্ধ করিয়া সূর্য্যকান্তের বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলিতে যাওয়ার মত যে গভীর লজ্জা এখন অমলার আসিয়াছিল, তার কোনটাই বানানো নয়।

সূর্য্যকান্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল, তোমার বয়স কত বল ত?

উনিশ বছর।

বিয়ের আগে শুনেছিলাম ষোল চলছে। তোমার নাকি বাড়ন্ত গড়ন।

একি অচিন্তিত আঘাত! আশ্বিনের রাত্রি, আকাশে হয়ত জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি—পরশু সন্ধ্যায় সূর্য্যকান্তের এক বন্ধুর বৌ যে একরাশি ফুল দিয়াছিল, ঘর ভরিয়া সেই বাসি ফুলের গন্ধ। শুধু তাই নয়। প্যাডে সূর্য্যকান্তের অসমাপ্ত গল্পটির শেষ কয়েকটা লাইন অমলা আড়চোখে পড়িয়া ফেলিয়াছিল,—অবনী নামে কে যেন অনুপমা নামে কার ছদ্মবেশ-পরানো গোপন ভালবাসা জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিয়াছে তার মুখ, আর অনুপমার অনুপম চোখ দুটিতে দীপশিখার মত দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহ—প্রথার বিরুদ্ধে, দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে, কে জানে আরও কিসের বিরুদ্ধে! এমন সময়, অবনী ও অনুপমার ওরকম উত্তেজনাময় মুহূর্ত্তগুলির কথা লিখিতে লিখিতে বৌকে বুকে লইয়া একি রূঢ় বাস্তব মন্তব্য সূর্য্যকান্তের! সম্বন্ধ করার সময় দু'বছর কি আড়াই বছর বয়স ভাঁড়াইয়াছিল তার বাপ মা, এই কি সে কথা তুলবার সময়?

অবনী ও অনুপমার গল্পটা পরে অমলা অনেকবার পড়িয়াছে। সেদিন যেখানে সূর্য্যকান্ত লেখা বন্ধ করিয়াছিল, প্রথম হইতে সে পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রত্যেকবার অমলার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর ও পর্য্যন্ত লিখিয়া, সেদিন রাত্রে সূর্য্যকান্ত অমন নিরুত্তেজ আবেগহীন অবস্থায় কি করিয়াছিল? কি প্রবঞ্চক সূর্য্যকান্ত!

আজকাল স্বামীর প্রবঞ্চনাকে অমলা মাঝে মাঝে আত্ম-সংযম বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। এটাও সে জানিয়াছে যে সূর্য্যকান্ত সবদিক দিয়া যতই সাধারণ হোক—বাস্তব জীবনে, কি যেন আছে লোকটার মধ্যে, অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত, যার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সাফল্যলাভ করিবার আগে প্রতিভাবানের প্রতিভা যেমন থাকিয়াও থাকে না, সেইরকম একটা অস্তিত্বহীন বিপুল ব্যক্তিত্ব যেন সূর্য্যকান্তের থাকিয়াও নাই—অন্ততঃ অমলার কাছে। তাই, মাঝে মাঝে বিনয়ে তার হৃদয়টা কেন এতখানি ভরিয়া আসে যে সূর্য্যকান্তের কাছে মাথা নত করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সে ভাল বুঝিতে পারে না। বশ মানিতে সাধ হয় অমলার। স্বামী তার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়, কল্পনাস্রোত রুদ্ধ করে, আশা অপূর্ণ রাখে, নিজেও যথোচিত ভাবে ভালবাসে না, [illegible] বাসিতে দেয় না—তবু!

আজকাল—মানে বিবাহের মাস আষ্টেক পরে—বসন্তের শেষে যখন গ্রীষ্ম সুরু হইয়াছে—গরমে অমলার ঘন ঘন পিপাসা পায়—সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যকান্তের অবাস্তব কবিত্বময় ভালবাসার জন্য তার যে পিপাসা সব সময় জাগিয়া থাকে, গ্রীষ্ম তার কারণ নয়, সেটা স্বাভাবিকও নয়। একদিন, একটা দিনের জন্যও সূর্য্যকান্ত যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত!—যদি আবোল তাবোল কথা বলিত অমলাকে, আবেগে অদ্ভুত ব্যবহার করিত, পাগলের মত মাতালের মত এমন ভালবাসিত তাকে—যে বাস্তব জগৎটা আড়াল হইয়া যাইত প্রেমের রঙীন পর্দ্দায়! কিন্তু সূর্য্যকান্ত একমিনিটের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইতে জানে না। এমন কি, অমলা নিজেই যদি একটু বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস আরম্ভ করিয়া দেয়, সৃষ্টি করিয়া লইতে চায় একটি মোহকরী কাব্যময় পরিবেষ্টনী, সূর্য্যকান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এসব ছ্যাবলামি শিখলে কোথায়?

রাগের মাথায় অমলা বলে, তোমার কাছ থেকে শিখেছি, তোমার বই থেকে।

সূর্য্যকান্ত বলে, তোমাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম বিয়ের আগে, মনে হয়েছিল তুমি বুঝি খুব সাদাসিদে সরল—এসব পাকামি জানো না। তুমি যা শিখেছ অমল, আমার কোন বইএ তা নেই। যদি কখনো লিখে থাকি, ঠাট্টা করে খোঁচা দিয়ে লিখেছি; এরকম কবিত্ব যারা করে তাদের যে মাথার ব্যারাম থাকে তাই দেখাবার জন্য।

সূর্য্যকান্তের লেখার সমালোচকরা একথা শুনিলে তাকে

মিথ্যাবাদী বলিত, অমলা রুদ্ধশ্বাসে শুধু বলে, ভালবাসা বুঝি মাথার ব্যারাম ?

ভালবাসার তুমি কি বোঝ শুনি ?

অমলা স্তব্ধ হইয়া যায়। রাগে অভিমানে প্রথমে তার মনে হয় এর চেয়ে মরিয়া যাওয়াও ভাল। ভালবাসার কিছু বোঝে না সে ? বেশ, চুলোয় যাক ভালবাসা! সে বুঝিতে চায় না। সে কি চায় তাতো সূর্য্যকান্ত বোঝে ? হোক এসব তার ছ্যাবলামি, কি দোষ আছে এতে, কি ক্ষতি আছে ? তার সঙ্গে এই ছ্যাবলামিতে সূর্য্যকান্ত একটু যোগ দিলে কি বাড়ীর ছাদটা ধ্বসিয়া পড়িবে, না পুলিশে ধরিয়া তাদের জেলে পুরিবে ? ক্ষতি তো কিছু নাই-ই, বরং লাভ আছে অনেক—এই সব মনান্তর ও মনোকষ্টগুলি ঘটিবে না। অকারণে কেন এরকম করে সূর্য্যকান্ত তার সঙ্গে ? কি সুখটা তার হয়, বৌকে এত কষ্ট দিয়া ? অমলার কান্না আসে। কুঁজোটা হাতখানেক সরাইয়া রাখা, টেবিল গুছানো, বই ও কাগজপত্রগুলি একটু ভিন্নভাবে সাজানো, এই ধরণের খুঁটিনাটি কাজ করিতে করিতে সে চোখের জল ফেলিতে থাকে। সূর্য্যকান্ত যে দেখিতে পাইতেছে যে সে কাঁদিতেছে, তাতে অমলার সন্দেহ থাকে না।

সূর্য্যকান্ত বলে, একগ্লাস জল দাও তো।

অমলা কাঁচের গ্লাসে জল দিলে এক চুমুক পান করিয়া হাসিয়া বলে, তুমি জল দিলে আমার মনে হওয়া উচিত—জল খাচ্ছি না, সুধা পান করছি—না অমলা ?

ঠাট্টা! সে কাঁদিতেছে দেখিয়াও এমন রূঢ় পরিহাস! বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া এবার অমলা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। আছড়াইয়া পড়ার ধাক্কায় সূর্য্যকান্তের হাত হইতে গ্লাসটা পড়িয়া গিয়া বিছানা ভাসিয়া যায়। গ্লাসটা তুলিয়া সরাইয়া রাখিবার পর মনে হয় অমলার চোখের জলেই বিছানাটা এমনভাবে ভিজিয়াছে।

সূর্য্যকান্ত বিব্রত হইয়া বলে, তোমার সঙ্গে পেরে উঠলাম না অমল, সোজা সহজ জীবনে তুমি খালি বিকার টেনে আনছ। এই বয়সে এরকম হল কেন তোমার ? অনর্থক দুঃখ তৈরী করো কেন ? কি হয়েছে তোমার, ছেলে মরেছে, না স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে ? খেতে পরতে পাচ্ছ না তুমি ? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সইছে না তোমার ? দিব্যি হেসে খেলে মনের আনন্দে দিন কাটাবে তুমি, তা নয়, সব সময় একটা কৃত্রিম ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আছ। বিয়ের আগে আর কারো সঙ্গে তোমার ভালবা[illegible] হয়ে থাকলেও বরং ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম। তাও তো নয়। তোমার যত ব্যথা বেদনা সব আমাকে নিয়েই। কেন বলত ? তোমাকে আমি অবহেলা করি, আদর-যত্ন করি না ? আজ তোমাকে হাসাবার কত চেষ্টা করলাম তুমি হাসলে না, রাগাবার চেষ্টা করলাম রাগলে না, বললাম এসো দুজনে একটু ব্যাগাটেলি খেলি, তার বদলে তুমি—

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে অমলা উঠিয়া বসে, অশ্রু-প্লাবিত মুখখানা গুঁজিয়া দেয় স্বামীর পায়ের মধ্যে, বলে, আমায় মাপ কর, মাপ কর। আমি তোমার উপযুক্ত নই।

সূর্য্যকান্ত বলে, এই তো! এই দ্যাখো আবার কি আরম্ভ করলে!

এই ধরণের দাম্পত্যালাপের যখন ইতি হয় এবং উত্তেজনা কিছু জুড়াইয়া আসে, অমলার মনের মধ্যে তখন যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া গজরায় ও গুমরায়—তার মধ্যে প্রধান হইয়া থাকে অভিমান। দুরন্ত অভিমানকে জয় করিয়া তাকে ঘুম পাড়াইতে একেবারে হায়রাণ হইয়া যায় ঘুমের পরীরা। সকালে থাকে বিষাদ। সংসারের কাজ করিতে করিতে সে অন্যমনা হইয়া যায়। বড় জা, বিধবা ননদ, দুটি দেবর এবং আরও যারা বাড়ীতে থাকে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সকলে মুখের দিকে তাকায় অমলার, মেয়েরা ফিস ফিস করিয়া নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করে। তারপর সূর্য্যকান্ত আপিসে চলিয়া গেলে নিজের অজ্ঞাতেই এমন ব্যবহার করে অমলা বাড়ীতে যেন আর মানুষ নাই, বাড়ী খালি হইয়া গিয়াছে।

দেবর চন্দ্রকান্ত বলে, মাথা ধরেছে মেজ বৌদি ?

কই না ?

তবে দয়া করে শুয়ে না থেকে একবার শুনো এসে দিকি—দিদি ডাকছে কেন ? এমন সময় মানুষ শোয়!

তখন অমলার মনে পড়ে আজ তার রান্নার পালা ছিল, কিন্তু রান্না সে শেষ করে নাই। তার জন্য হয়ত হেঁসেল আগলাইয়া একজন বসিয়া আছে! হায়, যে স্বামী পদে

পদে অপমান করে, আপিস যাওয়ার সময় যার জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে কাঁপা গলায় 'কি করে সারা দুপুর কাটাব?' বলার জন্য যার পরিহাসের আঘাতে আজই তাকে বিছানা আশ্রয় করিতে হইয়াছে, দশটা হইতে বেলা একটা পর্য্যন্ত সেই স্বামীর কথাই ভাবিয়াছে বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া।—কি করা যায় এখন? সকলের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় শুইয়া থাকার?

অমলা হঠাৎ কাতরকণ্ঠে বলে, ঠাকুরপো, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আমি আজ খাব না।

উপবাসী হৃদয়ের কাণ্ডকারখানায় দিনটা অমলার উপবাসে কাটে। বিকালের দিকে ক্রমবর্দ্ধনশীল উত্তেজনায় সে হইয়া থাকে বোমার মত উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরক। সূর্য্যকান্ত বাড়ী আসিলেই বলে, শোন, ওগো শোন, কাছে এস না? এইখানে এসে শোন। একমাসের ছুটি নেবে? কোথাও নিয়ে যাবে আমাকে? যেখানে হোক, যেদিকে দু'চোখ যায় চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়। যাবে? বল না, যাবে? তাজমহল দেখে ফিরব। একদিন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে অপর্ণার মত আমি তোমাকে শেষবার জিজ্ঞেস করব—

আপিস ফেরত ঘর্ম্মাক্ত সূর্য্যকান্ত গলা হইতে অমলার হাতের বাঁধন ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয়। তারপর খোলে জামা।

জিজ্ঞাসা করে, অপর্ণা কে?

ওমা, ভুলে গেছ? তোমার অপর্ণা গো!

আমার অপর্ণা?

তোমার রামধনু বইএর। যে বলেছে, মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত একজনকে ভালবাসা, সে রাজা হোক, পথের ভিখারী হোক—

ও, সেই অপর্ণা?—জুতা জামা খুলিয়া সূর্য্যকান্ত তফাতে চেয়ারে বসে। গম্ভীর চিন্তিত মুখে অমলার মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে বলে, সামনের শনিবার ছুটি নিয়ে তোমাকে বাপের বাড়ী রেখে আসব কিছুদিনের জন্য।

স্তম্ভিতা অমলা বলে, কেন?

এখানে থাকলে তুমি ক্ষেপে যাবে।

এ আঘাতে অমলার উচ্ছ্বাসের বোমা ফাটিয়া যায়, কান্নার বিস্ফোরণে। সূর্য্যকান্ত নিষ্ঠুর নয়, মিনিটখানেকের মধ্যে তার ঘামে-ভেজা বুকখানা অমলার চোখের জল আরও ভিজাইয়া দিতে থাকে। বড় ম্লান দেখায় সূর্য্যকান্তের মুখখানা।

স্ত্রীকে নার্ভটনিক খাওয়ানোর বদলে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠানোই সূর্য্যকান্ত ভাল মনে করিল। এখানে থাকিয়াই সে নার্ভটনিক খাইতে পারিবে শুধু এই ভয়ে নয়। অমলা অনেকদিন বাপ মাকে দেখে নাই। কুমারী-জীবনের আবহাওয়ায় কিছুদিন বাস করিয়া আসিলে হয়ত বিবাহিত জীবন-যাপনের কৌশলগুলি সে কিছু কিছু আয়ত্ত করিতে পারিবে। উনিশটা বছর অমলা সেখানে ছিল, সবগুলি বছর বোধ হয় সঙ্গে আনিতে পারে নাই, তাই এরকম ছেলেমানুষী করে। তাছাড়া একটু বিচ্ছেদ ভাল। বিরহের তাপে ওর প্রেমের অস্বাভাবিকতার বীজাণুগুলি একটু নিস্তেজ হইতেও পারে।

যাইতে রাজী হইল বটে অমলা, সে জন্য কাণ্ড করিল কম নয়। রাজী হওয়ার রাত্রে অনেকক্ষণ গুম খাইয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে সইতে পারছ না বলে পাঠিয়ে দিচ্ছ না তো?

না গো, না।

আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে?

করবে না? তুমি বুঝি ভাব তোমাকে আমি ভালবাসি না? একা একা বিশ্রী লাগবে অমল।

শুধু বিশ্রী লাগিবে! অমলা জোর দিয়া বলিল, একা একা আমি মরে যাব।

একমাস বাপের বাড়ীতে থাকিয়া অমলা ফিরিয়া আসিল। মরিয়া যাইতে অবশ্য সে পারিত, কারণ সেখানে দিন সাতেক সে খুব জ্বরে ভুগিয়াছিল। আশ্চর্য্য জ্বর। একশো এক ডিগ্রিতে পৌছিলেই অমলা বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে সুরু করিত (সজ্ঞানে) এবং তার চারটি বৌদির মধ্যে ছোটজনকে চুপি চুপি জানাইয়া দিত যে জীবনটা তার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ছোটবৌদি বলিত ছোট-দাদাকে, তিনজা'কে এবং দুই ননদকে। জ্বরের সাতদিনে বাড়ীর বিশেষ আদরের ছোট মেয়েটির জীবনের ব্যর্থতার সাত

রকম দুর্বোধ্য কাহিনী শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোক এমন দুঃশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল বলিবার নয়। জ্বর সারিবার পর সকলের প্রতিনিধি হিসাবে বাড়ীর বড়-বৌ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল অমলাকে। লোক ভাল নয় অমলার শ্বশুরবাড়ীর সকলে? কি করে অমলাকে তারা? বকে? গঞ্জনা দেয়? খাইতে দেয় না? খাটাইয়া মারে? এমনি মারে? তা যদি না হয় তবে সূর্য্যকান্ত বুঝি—

প্রশ্নগুলির জবাব শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা পরিণত হইয়াছিল অবাক হওয়ায়। কি জন্য তবে জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তার? কত খুঁজিয়া সূর্য্যকান্তের মত জামাই তারা সংগ্রহ করিয়াছে অমলার জন্য! পণই যে দিয়াছে ষোলশ টাকা! বাড়ীশুদ্ধ লোক যদি বাড়ীরই একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ হওয়ার মত বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে ধাঁধাঁয় পড়িয়া যায়, মেয়েটির বিপদের সীমা থাকে না। সকলের ব্যবহার চিন্তায় ফেলিয়া দেয় তাকে। তার মনে হয়, তবে কি সেই ভুল করিয়াছে? সত্যই কি তার আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাগুলি অকথ্য রকমের উদ্ভট? মনের রোগ?

অমলার প্রতিহত উন্মাদনা, পৃথিবীতে আকাশ-কুসুমের বাগান করার অপূর্ণ কামনা ও বিবাহিত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা—সূর্য্যকান্তের কাছ হইতে সরিয়া আসিবার কয়েক-দিন পর হইতেই তার মনে কাজ করিতেছিল। তা ছাড়া, বইএর যদি প্রভাব থাকে বাস্তবতার ঘনিষ্ট সম্পর্কবঞ্চিত কল্পনা-প্রবণ মনে, বই যারা লেখে তাদের কি প্রভাব নাই? কাছে থাকিবার সময় স্বামীকে তার সাধারণ মানুষের মত মনে হইত বলিয়া, স্বনামধন্য সাহিত্যিক বলিয়া চেনা যাইত না বলিয়া যে আপশোষ ছিল অমলার মনে, সাতদিন জ্বরে ভুগিবার সময় ছাড়া এখানে যেন সে আপশোষ ধীরে ধীরে উপিয়া যাইতেছিল। মনে হইতেছিল, ওরকম সাধারণত্ব কি মানুষ মাত্রেরই থাকে না? ভুল দিকে সে স্বামীর অসাধারণত্ব খুঁজিয়া মরিয়াছিল। অনেক বিষয়ে অসামান্য ছিল বৈ কি সূর্য্যকান্ত! তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসীম জ্ঞান, উদ্দেশ্য বুঝিয়া মানুষের ভালমন্দ কাজের বিচার করা, কোলাহল-ভরা সংসারের বাস্তবতার মধ্যে থাকিয়াও অমন সুন্দর সব গল্প উপন্যাস রচনা করা, এসব কি অসাধারণত্ব নয়? সারা-দিন আপিস করিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত লেখার পর এক একদিন কি বড় শ্রান্ত মনে হইত না সূর্য্যকান্তকে? সেই শ্রান্তিকেই কোনদিন অবহেলা, কোনদিন সংসারের চিন্তা, কোনদিন মানুষটার নির্জীবতা মনে করিয়া সে কি নিজের রাগ দুঃখ অভিমানের পাহাড় সৃষ্টি করিত না, রোমাঞ্চকর ভালবাসার খেলা চাহিয়া শেষে মনোবেদনার সুরু করিত না কান্না? রামধনুর অপর্ণার মত লাখ লাখ মেয়েকেও যে সৃষ্টি করে ওরকম শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায়—সে কি ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে বলিয়া বৌএর সঙ্গে ছাদে গিয় মুগ্ধ ও বিহ্বল হইতে পারে? ঘুমানোর সুযোগ দেওয়া বদলে কথা বলিয়া অভিমান করিয়া কাঁদিয়া রাত দুটে পর্য্যন্ত সে তাকে জাগাইয়া রাখিত!

এই ধরণের অনেক কথা ভাবিয়াছিল অমলা এক মা ধরিয়া—সূর্য্যকান্তের ব্যক্তিত্ব, সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার ও উপদেশগুলি তলে তলে কাজ করিতেছিল এবং জ্বরের টনিক একটু শান্ত করিয়া দিয়াছিল অমলাকে। জ্বরের পর কিছু দিন একটু চুপচাপ শান্তিতে থাকিতে কে না চায়? তাই শুধু রোগা হইয়াই নয়, একটু বদলাইয়া অমলা এবার স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সূর্য্যকান্ত বলিল, এমন রোগা হয়ে গেছ!

জ্বরে ভুগলাম যে?

জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল সূর্য্যকান্তের। 'রো হবনা? একমাস তোমাকে ছেড়ে—' এই রকম এক জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হোক, সোজা কথ সোজা জবাব দিতে যদি অমলা শিখিয়া থাকে, ভালই তাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নাই।

অমলা বলিল, তুমিও রোগা হয়ে গেছ।

সূর্য্যকান্ত বলিল, হবনা? একমাস তোমাকে ছে থেকেছি একা একা।

এ জবাবটা খাপছাড়া মনে হইল অমলার। 'রো হয়েছি? কদিন যা খাটতে হয়েছে অমলা—' এই র একটা জবাব সে প্রত্যাশা করিতেছিল। যাই হো সাধারণ কথার মিষ্টি জবাব দিতে যদি সূর্য্যকান্ত শিখি থাকে, ভালই। তাতে পুলকিত হওয়ার কিছু নাই।

এই হইল তাদের প্রথম দেখা, অপরাহ্নে এবং আ রাত্রে যখন আবার দেখা হইল, চাঁদটা পৃথি অপর পিঠে জ্যোৎস্না চালিতেছে। একটু অমিয়া ও উ

দ্বিপ্রহরে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত তারপদ বসু মল্লিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সূর্য্যকান্ত ঘরে পায়চারি করিতেছিল। আকাশ-ঢাকা মেঘগুলি এমন গুমোট রচনা করিয়াছে যে ফ্যানটা প্রাণপণে ঘুরিয়াও ভালমত বাতাসের সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না। শুধু টেবিলে খোলা প্যাডটার পাতাগুলিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

অমলা নালিশ করিল, সন্ধ্যে থেকে মেঘ করেছে, এখনো বিষ্টি নামল না। নামলে বাঁচি।

মেঘ করেছে নাকি ?

টের পাওনি ? কবার যে বিদ্যুৎ চমকালো, মেঘ ডাকলো ?

সূর্য্যকান্ত এক নতুন দৃষ্টিতে অমলাকে দেখিতেছিল, পরীক্ষার সময় ছেলেদের প্রথম প্রশ্নপত্র দেখার মত। তার-পর একটা প্রশ্নেরও জবাব না জানা ছেলের মত সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে গল্প লিখবার চেষ্টা করছিলাম অমল।

সত্যি ? নতুন গল্প ! দেখিতো কতটা লিখলে ?—অমলা তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে গেল, কাগজ-চাপাটার তলে একটিও লেখা কাগজ না দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্যাডটার প্রথম পাতায় শুধু হেডিং, সূর্য্যকান্তের নাম আর পাঁচ ছ'লাইন লেখা।

সন্ধ্যা থেকে শুধু এইটুকু লিখেছ ?

সূর্য্যকান্ত ধপাস্ করিয়া বিছানায় বসিয়া বলিল, না, অনেক লিখেছি। ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটটাতে পাবে।

অমলা সবিস্ময়ে বলিল, ওমা, ছেঁড়া কাগজে যে ভর্ত্তি ! সব আজকে লিখে লিখে ছিঁড়েছ ?

সায় দিয়া সূর্য্যকান্ত একটা হাই তুলিল। শ্রান্তি ? অমলা তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল, ঘুম পেয়েছে ? ঘুমোও তবে। দাঁড়াও বালিশটা ঠিক করে দি'।

সূর্য্যকান্ত বলিল, না, ঘুমোব না। এক মাসের মধ্যে এক লাইন লিখতে পারলাম না—ঘুমোব !

শুধু আজ ? কতদিন ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটটা এমনি ভাবে ভর্ত্তি করেছি তার ঠিক নেই। তুমি আমাকে কি করে দিয়ে গিয়েছ তুমিই জানো, লিখতে বসতেও আর ইচ্ছে করে না, বসলেও লেখায় মন বসে না, জোর করে যা লিখি সব ছিঁড়ে ফেলে দিই। উপন্যাসের ইনষ্টলমেণ্টটা পর্য্যন্ত লিখে দিতে পারি নি।

সূর্য্যকান্তের বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কষ্ট হয়। অমলার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল, দু'চোখ বড় বড় করিয়া সে চাহিয়া রহিল। বিবাহিত জীবনের এই পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বাপের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা সহজ ও শান্ত ভাবটুকু অমলার ঘুচিয়া যাইতেছিল। এ ঘরের আবহাওয়ায় সে একা যত বিদ্যুৎ ঠাসিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তার দেহ-মন যেন আবার তাহা শুষিয়া লইতেছে। তবু এবার হয়ত একটু সংযত থাকিতে পারিত অমলা, হয়ত সূর্য্যকান্ত যে রকম চাহিয়াছিল সেই রকম হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত—সূর্য্যকান্ত যদি এমন ভাব না দেখাইত আজ, এমন ভাবে কথা না বলিত। তার সুদীর্ঘ কুমারী জীবনের শেষ ক'মাসের কল্পনার মত হইয়া উঠিয়াছে যে সূর্য্যকান্ত আজ ! আঙ্গুল চালাইয়া চালাইয়া চুল এলোমেলো করিয়া দেওয়ায় কি বন্যই আজ তাকে দেখাইতেছে ! চোখের চাহনিতে যেন বিপন্নতার সঙ্গে মিশিয়া আছে বিদ্রোহ, কথা বলিবার ভঙ্গিতে যেন শোনা যাইতেছে পরাজিত ক্ষুব্ধ আত্মার নালিশ, বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে হঠাৎ উঠিয়া ভয়ানক কিছু করিবার এটা ভূমিকা মাত্র। তা ছাড়া, তারই জন্য এক মাস সূর্য্য-কান্ত কিছুই লিখিতে পারে নাই ! প্রথম দীর্ঘ বিরহ আসিবামাত্র স্বামী তার বুঝিতে পারিয়াছে কি ভয়ানক ভালই সে বাসিয়া ফেলিয়াছে তার বৌকে ! অমলা শিহরিয়া ওঠে, তার রোমাঞ্চ হয়।

গদগদকণ্ঠে সে বলিল, আমার জন্য ? আমার জন্য এক মাস তুমি লিখতে পার নি ?

সূর্য্যকান্ত তার হাত চাপিয়া ধরিল। এত জোরে ধরিল যে চুড়িগুলি প্রায় কাটিয়া বসিয়া গেল অমলার হাতে। গলা আবেগে কাঁপাইয়া সূর্য্যকান্ত বলিল, কার জন্য তবে ? তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছ অমল, আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। কতবার ইচ্ছে হয়েছে ছুটে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কেন যাইনি জান ? বিরহের বাতনা কত তীব্র হতে পারে তাই দেখবার জন্য। আমার রাজবন্দ্ বইএর অপর্ণাকে মনে আছে তোমার ? ভালবাসা বাড়াবার জন্য সে থেকে থেকে নিজেই বিরহ সৃষ্টি করে নিত। আমিও ভাবছিলাম—

একটি মুখর হিরো ও প্রায় নির্ব্বাক হিরোইন—শুধু এই দুটি চরিত্র লইয়া লেখা নাটকের যেন অভিনয় চলিতে থাকে

ঘরে,—রাত দুটা পর্য্যন্ত। প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার আগেই অমলার সবটুকু উত্তেজনা নিস্তেজ হইয়া আসে, জাগে ভয়, মুখ হয় বিবর্ণ। একি ব্যাপার? সত্য সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে নাকি সূর্য্যকান্ত? এসব কি সে বলিতেছে, কি করিতেছে? ক্রমে ক্রমে শ্রান্তি বোধ করে অমলা, তার ঘুম পায়। কিন্তু ঘুমানোর উপায় নাই। তার আট মাসের প্রতিহত উচ্ছ্বাস স্বামী আজ সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতেছে। গ্রহণ না করিয়া তার উপায় কি? কখনো প্রচণ্ড ও কঠিন, কখনও মৃদু ও কোমল ভালবাসার বন্যা আনিয়া দিতেছে স্বামী যা সে চাহিয়া আসিয়াছে চিরকাল, আজ এ বন্যায় ভাসিয়া না গেলে কি চলে? মাগো, এমন হইল কেন সূর্য্যকান্ত, কিসে এমন পরিবর্ত্তন আসিল তার?

রাত দুটোর সময় বোধ হয় তার মুখ দেখিয়া দয়া হইল সূর্য্যকান্তের। হঠাৎ, মোটরের ব্রেক কষার মত, সে থামিয়া গেল। অমলা মরার মত জিজ্ঞাসা করিল, আমি এসেছি এবার তো লিখতে পারবে?

সূর্য্যকান্ত আনমনে জবাব দিল, আমি ভাবছি অমল, কথা কোয়ো না। তোমার কথা ভাবছি। পাশে শুয়ে আছ তুমি, তবু তুমি যেন কতদূরে, কত সমুদ্র, কত মরুভূমি পার হয়ে কুয়াশার আড়ালে তুমি যেন লুকিয়ে আছ, মনকে বাহন করে আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বাধা দিও না, কথা কোয়ো না।

বিষের ওষুধ নাকি বিষ। তবু, স্ত্রীর প্রকৃতির অস্বাভাবিকতাটুকু স্বাভাবিক করিয়া আনার জন্য সূর্য্যকান্তের এই অভিনব চিকিৎসাকে সমর্থন করা যায় না। আসলে, দোষ তো তারও কম নয়। প্রথম বয়সে ভাবপ্রবণতা, কবিত্ব ও রোমাঞ্চের পিপাসা, হৃদয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য, অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের কম বেশী থাকে। এদিকে সূর্য্যকান্ত হইয়া গিয়াছে বুড়া। বয়সে না হোক, মনের হিসাবে। শুধু নিজের জীবনে নয়, পরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিয়া, সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে স্তূপাকার, লিখিতে বসিয়া শুধু পুরুষের নয়, মেয়েদেরও অসংখ্য বিভিন্ন অনুভূতি উপভোগ করিয়াছে বহুবার। ধরিতে গেলে ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সূর্য্যকান্তের, কখনো সে হইয়াছে বৌ, কখনো বর; সে একাই এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া নানা ভাবে নানা রকম সংসার সে স্থাপিত করিয়াছে। অমলা তার কোন পক্ষের বৌ বলা যায় না। তবু অমলার কল্পনাকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দেওয়ার মত ছেলেমানুষী, অবাস্তব কল্পনা, জীবনকে কাব্যময় ও নাটকীয় করিয়া তুলিবার পিপাসা—এক কথায়, অনুভূতির জগতে বৈশাখী ঝড় ও বাসন্তী বায়ুর বিপরীত বিপর্য্যয় ঘটাইবার কামনা আজও সূর্য্যকান্তের আছে—তবে সেই সঙ্গে আছে ওই পিপাসা বা কামনাকে গোপন করিয়া রাখার অভ্যাস ও কোন জীবন্ত রক্তমাংসের রমণীর সঙ্গে ও সমস্তের আদানপ্রদানের অক্ষমতা। জীবনটা মানুষের যতখানি গল্প উপন্যাস হওয়া দরকার, নিজের গল্প উপন্যাসে সূর্য্যকান্তের তা বহুগুণ বেশী হয়। লেখার সময় ছাড়া সে তাই হইয়া থাকে একটু ভোঁতা, চায় শান্তি ও সহজ স্বাভাবিক জীবন। প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা এরকম হয় কিনা জানি না, তবে যে সব লেখকের বই পড়িয়া শুধু অমলার মত মেয়েদের বুকটা ধড়ফড় করে তারা অবিকল এই রকম বা এই ধরণেরই অন্য রকম হয়।

বাস্তব জীবনের সাধারণ কাজগুলি সূর্য্যকান্ত সাধারণ ভাবেই করে, সাধারণ সমস্যার মীমাংসা করে সাধারণ বুদ্ধি খাটাইয়া, তাতে কাজও হয়, সমস্যাও মেটে। অমলার জ্বর হইলে সে ডাক্তার ডাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্বর সাধারণ অসুখ। কিন্তু অমলার হৃদয় মনের অস্বাভাবিক উত্তাপ তো জ্বর নয়। এই অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে সূর্য্যকান্তর সাধারণ বুদ্ধি গুলাইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে বিষে যদিও বিষ ক্ষয় হয়, হিষ্টিরিয়া হিষ্টিরিয়ায় সারে না—কারণ হিষ্টিরিয়া বিষ নয়।

কয়েক দিনের মধ্যে অমলা শুকাইয়া গেল। এতো আর বই পড়া নয়, কল্পনা করা নয়, স্বপ্ন দেখা নয়, নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কোন রকমে বাহির করিয়া দেওয়া নয়। অন্য একজনের হৃদয়কে বহিয়া বেড়ানো—প্রত্যেক দিন উত্তেজনার মদ খাইয়া নেশায় জ্ঞান হারানো। স্বামীর আক্রমণের আকস্মিকতায় প্রথম রাত্রে অমলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল, এখন আর ভয় হয় না, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়, মাথার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল আবর্ত্তনের সৃষ্টি হয়, চোখের সামনে সমস্ত ঝাপ্সা হইয়া আসে। এক এক সময়

চীৎকার করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। এক এক সময় ঘরের জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া ছারখার করিয়া দিবার অথবা সূর্য্যকান্তর বুকটা আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবার অদম্য প্রেরণা জাগে। সূর্য্যকান্তর আদরে তার দম আটকাইয়া আসে, কথা শুনিতে শুনিতে ছুই কাণের মধ্যে ঝম ঝম আওয়াজ হয়, হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া সে চুপ করিলে চারিদিকের স্তব্ধতা মনের মধ্যে আছড়াইতে থাকে।

ফিস ফিস করিয়া বলে, আলো নিভিয়ে দাও, আলো নিভিয়ে দাও!

সূর্য্যকান্ত বলে, আলো? কোথায় আলো অমলা? জ্যোৎস্নাকে আলো বোলো না।

একটু ঝিমায় অমলা।

লিখবে না আজ?

লেখা? একটু হাসে সূর্য্যকান্ত, কার জন্য লিখব? মনের পাতায় লিখছি, মুখে তোমাকে শোনাচ্ছি।

আর কি দরকার লিখে?

মাথাটা কেমন ঘুরছে, কি রকম একটা কষ্ট হচ্ছে।

এবার হঠাৎ যেন সূর্য্যকান্ত চোখের পলকে আগেকার সূর্য্যকান্ত হইয়া যায়। একগ্লাস জল গড়াইয়া সে অমলাকে দেয়, ভিজা হাত বুলাইয়া দেয় তার কপালে ও ঘাড়ে। শুধু বলে, শোও। তারপর আলো নিভাইয়া সেও আসিয়া শুইয়া পড়ে। বলে, কি কষ্ট হচ্ছে অমলা?

কি জানি, বুঝতে পারছি না।

কেবল কষ্ট নয়, অনেক কিছুই সে বুঝিতে পারে না। বারুদ-ফুরানো তুবড়ির মত হঠাৎ সূর্য্যকান্ত নিভিয়া গেল কেন? রামধনুর মোহিতের মত বিপুল দুর্ব্বোধ্য প্রেম একমুহূর্ত্তে কি করিয়া হইয়া গেল এমন মৃদু কোমল স্নেহ? গভীর বিষাদ ও অবসাদ বোধ করে অমলা, তার ঘুম আসে না। এক সময় মৃদুস্বরে সূর্য্যকান্ত তাকে ডাকে। ঘুমের ভাণ করিয়া সে জবাব দেয় না। তামাসা? সূর্য্যকান্ত কি তামাসা জুড়িয়াছে তার সঙ্গে? এতদিন ধরিয়া এরকম তামাসা করিবার মানুষ তো সে নয়! তাছাড়া, কারো তামাসা কি এমন উতলা করিয়া তুলিতে পারে একজনকে? প্রথম দু'একদিন কেমন খাপছাড়া মনে হইয়াছিল স্বামীর এই অভিনব পরিবর্ত্তন, এখনো মাঝে মাঝে সব যেন কেমন বেসুরো কৃত্রিম মনে হয়—কিন্তু বাকী সময়? তখন যে আশ্চর্য্য ব্যাকুলতা সে দেখায়, যে অভূতপূর্ব্ব ভাব ফুটিয়া থাকে তার মুখে চোখে, তা কি কখনো বানানো হইতে পারে? কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া সে যখন শুধু চাহিয়া থাকে, শুধু ভাবে, আর মোহগ্রস্ত বিহ্বল মানুষের মত দুটি হাত বাড়াইয়া তাকে স্পর্শ করামাত্র চমকাইয়া ওঠে এবং ভীরু শিশুর মত তাকে জড়াইয়া ধরে, তখনও সে অভিনয় করিতেছে এ কি ভাবা যায়! অথচ এদিকে তার প্রকাণ্ড একটা মিথ্যা অমলার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সূর্য্যকান্ত তাকে বলিয়াছিল সে বাপের বাড়ী যাওয়ার পর মাণিকের উপন্যাসটির ইনষ্টলমেণ্ট পর্য্যন্ত সে লিখিয়া দিতে পারে নাই। কদিন আগে, সে আপিস চলিয়া গেলে বারোটার ডাকে মাসিকপত্রটি আসিয়াছিল: তাতে ছিল উপন্যাসটির দশপাতা ইনষ্টলমেণ্ট! কৈফিয়ৎ অবশ্য সে একটা দিয়াছিল, সে নাকি এমাসের কথা বলে নাই, বলিয়াছিল আগামী মাসের কথা। এ সংখ্যার লেখাতো সে কবে লিখিয়া দিয়াছে, অমলার বাপের বাড়ী যাওয়ার অনেক আগে।

অন্ততঃ দু'মাস আগে লেখা দিতে হয় অমল, নইলে ওরা সময় পাবে কেন ছাপবার?

তবু অমলার মনের খটকা যায় নাই। দু'মাস আগে হোক চারমাস আগে হোক, পাঠাইয়া দেওয়ার আগে সূর্য্যকান্তর কোন্ লেখাটা সে পড়িয়া ফ্যালে নাই? এ লেখা সে লিখিল কখন?

আপিসে লিখেছিলাম। দশবারো দিন একদম কাজ ছিল না, সেই সময়। এডিটর তাগিদ দিচ্ছিল তাই আর তোমাকে পড়তে দিইনি।

তবু মিথ্যাটা এসব কৈফিয়তের খোলসে সম্পূর্ণ ঢাকা যায় নাই। অমলার প্রতিবাদ ইহা না মানিয়া একটা বিস্বাদ ব্যথায় পরিণত হইয়া আজও তার মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। আছে গোপনে। সূর্য্যকান্তর এখনকার নতুন ধরণের ভালবাসারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই!

লেখা সূর্য্যকান্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। বাড়ীতেও লেখে না, আপিসেও লেখে না। বাপের বাড়ী গিয়া নয়, এখানে আসিয়া অমলা তার লেখার ক্ষমতা হরণ করিয়াছে। অমলাকে অজস্র পরিমাণে দেওয়ার জন্য নিজের মধ্যে সে

যে উচ্ছ্বাসের কারখানা বসাইয়াছে এবং কারখানা চালানোর জন্য মজুর ভাড়া করিয়াছে—বই লেখার কৃত্রিম খাদ্যে পরিতুষ্ট মনের চাপা-পড়া পাগলামীগুলিকে, সেই কারখানাতে এখন সবসময় সে কর্তৃত্ব খাটাইতে পারে না। অমলাকে দেওয়ার জন্য ছাড়া অন্য কাজে খাটাইতে গেলে মজুররা ধর্ম্মঘট করে, কারখানা বন্ধ করার কথা ভাবিলে আরম্ভ করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে একটু একটু মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া যারা নেশার দাস হইয়া পড়ে, তাদের মত অবস্থা হইয়াছে সূর্য্যকান্তর। অমলার সঙ্গ ছাড়া আর কিছু তার ভাল লাগে না—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্ত্তব্যপালন। শয়নঘরের বাহিরে সে আগের চেয়েও গম্ভীর হইয়া থাকে, মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারকে সে আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া রাখে—মনে হয় সে যেন সবসময় প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া চলিতেছে আর বোধ করিতেছে দারুণ অস্বস্তি। সাহিত্যিক বন্ধুরা জানিতে চায় সে তার এক নম্বর এপিকটা লিখিতেছে কিনা, সম্পাদকরা প্রকারান্তরে জানাইয়া দেয় এরকম অন্যায় ব্যবহার সহ্য করা কঠিন, সাধারণ বন্ধুরা উপদেশ দেয় চেঞ্জে যাওয়ার, বাড়ীর লোকে চেষ্টা করে আদর যত্ন স্নেহ মমতা সহানুভূতি প্রভৃতির পরিমাণটা বাড়াইবার। বাইশ বছর বয়সে যা করা চলিত, ত্রিশ বছর বয়সে তাই করিতে চাহিয়া চারিদিকে সূর্য্যকান্ত বিশৃঙ্খলা আনিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে তার মনে হয় অমলার চিকিৎসার জন্য নয়—ওই ছুতা করিয়া নিজের দাবাইয়া রাখা মানসিক বিকারগুলিকে সে সতেজে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দিয়াছে। অমলার পাগলামী সারানো নয়, এ তার নিজেরই পাগল হওয়ার ইচ্ছা মেটানো। তা না হইলে, এসব অমলার সহ্য হইতেছে না দেখিয়াও সে কি থামিয়া যাইত না? সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া আনিত না তাদের সঙ্গ? এভাবে সে তো ওকে নির্য্যাতন করিতে চায় নাই! ওকে শুধু সে বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ও যে নাটকীয় প্রেম চাহিত সেটা কত তুচ্ছ, কত হাল্কা, কতদুর হাস্যকর! সে তো শুধু থিয়েটার করিতে চাহিয়াছিল কদিন, তার নিজের গৃহের সিমেণ্টের রঙ্গমঞ্চে সাধারণ বাস্তব জীবনের বিরুদ্ধ দৃশ্যপটের আবেষ্টনীতে অমলার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা লইয়া রচিত একটা শিক্ষাপ্রদ নাটকের অভিনয়: এখন তার কাছেই সে অভিনয় এতবড় সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে কোন মতেই যবনিকা সে আর ফেলিতে পারিতেছে না।

দিন কাটে। একমাসের ছুটি নেয় সূর্য্যকান্ত, আপিস বিরক্তিকর। অমলার চোখের নীচেকার কালিমার ছাপ গাঢ় হইতে থাকে, কোন কারণে কোন দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিলে মনে হয় চোখে যেন তার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সংসারের কাজ আছে, সকলের সঙ্গে মেলামেশা আছে, সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হাসিকান্নার ভাগ নেওয়া আছে। শ্রান্ত, বিষণ্ন ও অন্যমনস্কভাবে এসব সে করিয়া যায়। রান্নাঘরে রাঁধিবার সময়ও সে যেন থাকে তার নিজের ঘরে, কল চালাইয়া সেজ ননদের ছেলের জামা সেলাই করিবার সময় সে যেন কণ্ঠলগ্না হইয়া থাকে সূর্য্যকান্তর। শান্ত ও স্নিগ্ধ একটু রূপ ছিল অমলার. আর ছিল তেলমাখা পাথরের বাটির মত একটু ভোঁতা লাবণ্য, এখন তার রূপ হইয়াছে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা মুখভঙ্গির তীক্ষ্ণ তেজী মৌলিকতা, লাবণ্য হইয়াছে সদ্য শান্ দেওয়া সীসার ছুরির পালিশ। মেজাজ, বুদ্ধিবিবেচনা, আত্মসংযম, চিন্তা ও কল্পনা, সুনিদ্রা এসব বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে অমলার। হঠাৎ সামান্য কারণে সে এত রাগিয়া যায় যে অন্ততঃ আরও একটা বছরের পুরাণো বৌ যদি সে হইত, না খাইয়া শুইয়া থাকার বদলে বাড়ীঘর মাথায় না তুলিয়া কখনই ছাড়িত না। ভাবনাগুলি তার এমন এলোমেলো হইয়াছে যে সব সময় কি ভাবিতেছে তাও সে বুঝিতে পারে না: ষ্টিমারে চাপিয়া কবে সে একবার মামার সঙ্গে ঢাকা গিয়াছিল, আর কাল সেজ ননদ যে বড়জার ছেলের দুধটুকু নিজের ছেলেকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল, আর পরশু রাত্রে সূর্য্যকান্ত যে তার উনিশ বছর বয়সের একটা ভুলের কাহিনী শোনাইয়াছিল, আর—। তবু এ সমস্ত খিচুড়ি পাকানো চিন্তার মধ্যে আসল চিন্তার খেইটা না হয় নাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল, বারান্দায় বাড়ীর যে দাসীটা আঁচল পাতিয়া ঘুমাইয়া আছে ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া দিবার সাধটা কোন দেশী সাধ? আর আজ রাত্রে বিধবা বড় ননদের সঙ্গে শোয়ার সাধ? চুপি চুপি সদর দরজা খুলিয়া পলাইয়া যাওয়ার সাধ? কলের ছুঁচটার নীচে একটা আঙ্গুল দিয়া নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বাড়ীতে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল সৃষ্টি করার সাধ? আচ্ছা, কাল

যখন সিঁড়ি দিয়া নামার সময় পা পিছলাইয়া গিয়াছিল, রেলিং ধরিয়া সামলাইয়া না নিলে কি হইত? খুব কি লাগিত গড়াইয়া গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেলে, হাত ভাঙ্গিত, মাথা ফাটিত, একেবারে সে অজ্ঞান হইয়া যাইত? কি করিত সকলে? সূর্য্যকান্ত কি করিত? ছ্যাখো! সেজ ননদের ছেলের জামার কোনখানটা সে সেলাই করিয়া ফেলিয়াছে। মরেও না সেজ ননদটা।

একমাস ছুটি নিয়াছে সূর্য্যকান্ত। কিন্তু দুপুরে অমলা ঘরে যায় না। সূর্য্যকান্তও তাকে ডাকে না। আপিস না করার আলস্য সে অমলা কাছে না থাকার মুক্তির সঙ্গে মিশাইয়া উপভোগ করে। বেশী বেলায় বেশী খাওয়ার জন্য একটু অম্বলের জ্বালাও সে ভোগ করে। চোখ দিয়া ছ্যাখে কড়িকাঠ, কাণ দিয়া শোনে ওদিকের ঘরে অমলার কল চালানোর ক্ষীণ শব্দ, হৃদয় দিয়া অনুভব করে ভোঁতা একটা গ্লানি, আর মন দিয়া ভাবে আজই পোষ্টাপিস হইতে শ' তিনেক টাকা তুলিয়া বিকালের কোন একটা গাড়ীতে কোথাও বেড়াইতে গেলে কেমন হয়। বিকালের গাড়ীতে। অন্ততঃ রাত্রি নটার আগের কোন গাড়ীতে। অমলা ঘরে আসার আগেই যে গাড়ীটা ছাড়িয়া যায়। কোন্ অমলা? তার মনের, না ও ঘরে কল চালাইয়া যে সেজ ননদের ছেলের জামা সেলাই করিতেছে, যে ঘরে আসিলে এতটুকু ঘরে কোটি বসন্ত আর কোটি প্রেমিকপ্রেমিকার মিলন মুহূর্ত্তগুলি ঘনাইয়া আসিবে? ঠিক বুঝিতে পারে না সূর্য্যকান্ত। মনের অমলাকে সাথী করিয়া বিকালের গাড়ীতে পালানো যায়, কিন্তু তাতে কি ও ঘরের অমলার জন্য মন কেমন করা কমিবে?

ছুটি নেওয়ার চার পাঁচদিন পরে বিকাল বেলা সূর্য্যকান্ত একখানা চিঠি লিখিতেছিল, অর্দ্ধেক লিখিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কার উপরে রাগ করিয়াই সে যেন উঠিয়া পড়িল। সহজ ভাষায় পরিষ্কার করিয়া কেবল দরকারী কথাগুলি লিখিয়া একখানা চিঠি লেখার ক্ষমতাও যদি তার লোপ পাইয়া থাকে, এবার তবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। জামা গায়ে দিতে দিতে সূর্য্যকান্তর রাগ কমিয়া আসিল। কার উপরে রাগ করিবে? চিঠি লিখিতে বসিয়া সে যদি ভাবিতে আরম্ভ করে যে আজ রাত্রে অমলার সঙ্গে প্রথমেই কি ভাবে একটা নতুন ধরণের মধুর-কলহ আরম্ভ করা সম্ভব, গুরুতর বিষয়ের বৈষয়িক চিঠি সে লিখিবে কি করিয়া? জুতা পায়ে দিয়া, কাপড় বদলাইয়া সূর্য্যকান্ত ঘরের বাহিরে আসিল। বারান্দায় ষ্টোভ জ্বালিয়া বৈকালিক চা জলখাবারের আয়োজন হইতেছে। মেঘলা রঙের শাড়ী পরিয়া অমলা বেলিতেছে লুচি। শুধু বাড়ীর মেয়েদের ও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অমলার স্বাভাবিক তুচ্ছ অসংযমটুকু কি রহস্যময় (সূর্য্যকান্তর চোখে, লেখকের নয়)! একটু দাঁড়াইল সূর্য্যকান্ত। অমলার সেজ ননদ বলিল, বেরিয়ে যাচ্ছ নাকি দাদা? খেয়ে যাও, আগে চা করে দিচ্ছি তোমাকে। কেট্‌লিতে জল আনো দিকি মেজো বৌদি? যা লুচি ভাজা হয়েছে ওতেই দাদার হয়ে যাবে।

সূর্য্যকান্ত বলিল, এখন কিছু খাব না। খিদে নেই। সময় নেই।

তখন উঠিয়া আসিয়া অমলা ঘরে ঢুকিল। বক্তব্য আছে। এ বাড়ীতে আধ-পুরাণো বৌদের প্রথমে নিজে সকলের চোখের আড়ালে গিয়া—তারপর স্বামীকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া কথা বলা নিয়ম। এখন ইসারার দরকার ছিল না। সূর্য্যকান্তও ঘরে গেল।

অমলা বলিল, বাইরে থেকে চা খেয়ে এসো না কিন্তু। আমিও এখন চা খাব না, তুমি ফিরে এলে আমি নিজে চা করে দেব, তারপর এক পেয়ালা থেকে দুজনে এক সঙ্গে চা খাব কেমন? এমনি করে খাব—

এ মন্দ পরামর্শ নয়। গালে গাল ঠেকাইয়া একসঙ্গে দুজনে চায়ের কাপে চুমুক হয়ত তারা দিতে পারিবে। কিন্তু কেন? গালে গাল ঠেকানো আর চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ব্যাপার দুটো পৃথক করিয়া রাখিলে দোষ কি?

আজ আমি ফিরব না অমল।

ফিরবে না! রাত্রে বাড়ী ফিরবে না! কোথায় থাকবে সূর্য্যকান্ত সমস্ত রাত? বন্ধুর বাড়ী? কেন? বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রে থাকিবে কেন? নিমন্ত্রণ আছে, খাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে তাই? হোক রাত্রি, ট্যাক্সি করিয়া সে যেন ফিরিয়া আসে। একদিন না হয় ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ দেড়টাকা দু'টাকা খরচই হইবে! অমলার অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে বিঁধিতে থাকে সূর্য্যকান্তর, মাথাটা যেন ঘুরিয়া ওঠে।

তবে যাব না অমল।

সেই ভাল। কি হবে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ?

তাই তো বটে ! তার চেয়ে অমলার সঙ্গে এক কাপে চা খাওয়া ঢের বেশী উপভোগ্য। কিন্তু কি ভাবে ওর সঙ্গে আজ সে মধুর কলহটা আরম্ভ করিবে? কি ভাবে আজ সে নূতন একটা বৈচিত্র্য আনিবে তাদের প্রেমাভিনয়ে? বেশী জটিল হইলে, বেশী আর্টিষ্টিক হইলে- অমলা আবার বুঝিতে পারে না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে সে তার উপযুক্ত বৌ নয়, তার মরাই ভাল। ফেণা ভালবাসে অমলা, শুধু ফেণা। তার মত সাধারণ অল্পশিক্ষিতা ঘরের কোণায় বাড়িয়া ওঠা মেয়ে যা কিছু বুঝিতে, অনুভব করিতে ও উপভোগ করিতে পারে তারই ফেণা। ওর জন্য জলকে সোডা ওয়াটারের মত, সিদ্ধির সরবতকে মদের মত ফেনিল করিয়া তুলিতে হয় তাকে। নতুবা তাদের নাটক জমে না। নাটক না জমিলে অমলার মত তারও মনে হয় জীবনটা বৃথা হইয়া গেল, বাঁচিয়া থাকার কোন মানে রহিল না।

বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে নয়, পরদিন থিয়েটার দেখিতে গেল সূর্য্যকান্ত। অমলা ও বাড়ীর অন্য মেয়েরাও অবশ্য সঙ্গে গেল। থিয়েটারে তাই দুজনের মধ্যে দু'একবার দৃষ্টি-বিনিময় ছাড়া কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না। রাত তিনটায় বাড়ী ফিরিয়া নিদ্রাতুর দুজনে দু'একটি কথা বলিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সূর্য্যকান্ত বাড়ীতেই রহিল বটে কিন্তু আগের রাত্রে বাহিরের আসল নাটক দেখিয়া আসার জন্যই সম্ভবতঃ সেদিন রাত্রে ঘরোয়া নাটক তাদের তেমন জমিল না, দারুণ অস্বস্তি মনে লইয়া দু'জনে সে রাত্রে ঘুমাইল। পরদিন অমলার সেজ ননদকে স্বামীর কাছে রাখিয়া আসিতে সূর্য্যকান্ত চলিয়া গেল পাটনা। কাজটা অমলার দেবর করিতে পারিত—তাই ঠিক ছিল আগে, শুধু দিন তিনেক তার কলেজ কামাই হইত। তিনদিন তাকে ছাড়িয়া থাকার চেয়ে ভাইএর তিনদিন কলেজ কামাই হওয়াকে সূর্য্যকান্ত যে বড় মনে করিল এতে কি মর্ম্মান্তিক আঘাতই অমলার মনে লাগিল ! তাও, ভাগের সঙ্গে যখন সেজ ননদকে পাঠানো চলিত, সেজ ননদের স্বামীকেও যখন লেখা চলিত যে আসিয়া লইয়া যাও। ভাগ্নে অবশ্য খুব ছেলেমানুষ, সেজ ননদের স্বামী অবশ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ছুটি পায় নাই—তবু মনে আঘাত লাগা তো এসব যুক্তি মানে না ! তারপর তিনদিন পরে যখন অমলার বদলে অমলার দেবরের নামে একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি আসিল সূর্য্যকান্তর—যে এখানে ওখানে একটু সে বেড়াইবে এবং ফিরিতে তার দেরী হইবে, অমলার চোখে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল স্বামী তাকে ত্যাগ করিয়াছে। হঠাৎ তাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া একবার যেমন ত্যাগ করিয়াছিল এবার নিজে বোনের শ্বশুর বাড়ী গিয়া আবার তেমনি ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সেবার এখানে ফেরামাত্র স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবার স্বামী তার ফিরিয়া আসিলেও তাকে আর সে ফিরিয়া পাইবে না। অনুপযুক্তা বৌটাকে জীবন হইতে ছাটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য না থাকিলে এত লোক থাকিতে সে কেন যাচিয়া পাটনা যাইতে চাহিবে, তার সজল চোখের বারণ মানিবে না ? হায়, একখানা চিঠিও যে সে লিখিল না অমলাকে !

তিনচার দিন পরেই আগ্রা হইতে চিঠি আসিল বটে, বেশ বড় চিঠি, ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় একপাতা। কাগজ দেখিয়া আর 'কল্যাণীয়াসু' সম্বোধন দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিল এ চিঠি চিঠিই নয়, পরিত্যক্তা স্ত্রীর সঙ্গে এ শুধু সূর্য্যকান্তর ভদ্রতা। কি লিখিয়াছে সূর্য্যকান্ত ? কিছুই নয় ! অমলাকে সে একটা ভ্রমণ কাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছে। শুধু গোড়ায় একটা অর্থহীন কৈফিয়ৎ দিয়াছে হঠাৎ তার বেড়ানোর সখ জাগিল কেন এবং শেষে লিখিয়াছে অমলাকে সাবধানে থাকিতে, সময় মত খাওয়া-দাওয়া করিতে; শরীরের দিকে নজর রাখিতে, বাড়ী ফিরিয়া সে যদি অমলাকে বেশ মোটা-সোটা ছাখে তবে তার কত আনন্দ হইবে—এই কথা। তারপর ভালবাসা জানাইয়াই ইতি এবং সে যে শুধু অমলারই এই মিথ্যা ঘোষণা।

ঘরে খিল দিয়া চিঠি পড়িয়াছিল অমলা, পাঁচঘণ্টা পরে সে খিল খুলিল। পাংশু বিবর্ণ তার মুখ, চোখ দুটি লাল। অসুখের কথা সকলে বিশ্বাস করিল, কেবল অমলার ছোট ননদ, যার বিবাহের বয়স হইয়াছে এবং সূর্য্যকান্তর মত সাহিত্যিকদের উপন্যাস পড়িয়া যার আজকাল বুক ধড়ফড়

করে সে শুধু বলিল—বিরহ নাকি বৌদি? চিঠি তো এল আজ। দাও না চিঠিখানা লক্ষ্মী বৌদি ভাই, দেখি দাদা কি লিখেছে। সারাদিন ধরে পড়লে চিঠি, খেলে না দেলে না—

বিরহ? ওসব তুচ্ছ মৃদু বেদনা বোধ করিবার শক্তি অমলার আর ছিল না। আর কি তার সন্দেহ আছে যে সূর্য্যকান্তর হঠাৎ পাটনা যাওয়া ও এত দেরী করিয়া বাড়ী ফেরা তাকে ত্যাগ করারই ভূমিকা? রামধনুর অপর্ণাকে তার সাধারণ অনুপযুক্ত প্রফেসার স্বামী যে কারণে ত্যাগ করিয়াছিল, তার ঠিক উল্টা কারণে। নিজের বিবাহিত জীবনকে ও বিবাহিত জীবনের বাছা বাছা ছোট বড় ঘটনাকে অমলা তাব এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়ায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সূর্য্যকান্ত তাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাই গতবার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত তাকে সে ভালবাসে নাই, তার বুকে ভালবাসা জাগাবার চেষ্টাও করে নাই, বরং বাধাই দিয়াছে। অমলার ভালবাসা তখন সে চাহিত না, আরেক জনের স্মৃতি (উনিশ বছর বয়সে একটা ছেলেমানুষী ভুল করার কাহিনীতে সে যার নাম করিয়াছিল তারই স্মৃতি কি না কে জানে!) বুকে পুষিয়া রাখিয়াছিল, নিজেকে ধরা দেয় নাই। অথবা হয় তো সে অপেক্ষা করিয়াছিল যে তাকে জয় করিয়া অমলা নিজের উপযুক্ততার প্রমাণ দিবে: মাঝে মাঝে দেখা হইয়া নয়, দিবারাত্রি একসঙ্গে বাস করিয়াও অমলা যদি তার বুকে ভালবাসা না জাগাইতে পারে, কোন গুণে তবে সে তার মত দেশ-বিখ্যাত সাহিত্যিকের বৌ হইয়া থাকিবে? তারপর তাকে বাপের বাড়ী পাঠানোর নামে ত্যাগ করিয়া বুঝি একটু মায়া হইয়াছিল সূর্য্যকান্তর, ভাবিয়াছিল সবদিক দিয়া নিজেকে অমলার কাছে সঁপিয়া দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে অমলা তাকে বাঁধিতে পারে কি না। তাও যখন সে পারিল না, তখন আর পাটনা যাওয়ার ছলে তাকে ত্যাগ করা ছাড়া কি উপায় ছিল সূর্য্যকান্তর।

অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া ত্যাগ হয়ত সে করিবে না, এখানে থাকিতে দিবে। আগের মত থাকিতে দিবে, গাম্ভীর্য্য ও সহজ ব্যবহারের ব্যবধান রচিয়া। মৃদু একটু স্নেহ মমতা সে পাইবে, আর কিছুই নয়। এ জীবনে একটি রাত্রিও আর অমলার আসিবে না স্বামীর যখন সে নাগাল পাইবে, স্বামী যখন তাকে ভালবাসিবে।

আগে, বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার আগে, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে এইসব কথা হয়ত অমলার মনে আসিত কিন্তু আসিত কল্পনার রথে। হাজার সে বিচলিত হোক তার নারী-মস্তিষ্কের স্বভাবজ ও অপরিবর্ত্তনীয় হিসাব করার প্রবৃত্তি, যা বাস্তবতা ও বাস্তব লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়া আর কিছুই মানে না, তাকে কখনো ভুলিতে দিত না যে তার এইসব উদ্ভট বিশ্লেষণ সাংসারিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধ, এ তার পাগলামী, তার নারী-জীবনের প্রকৃত সার্থকতাগুলির একটাও এইসব কারণে আসিতে বাধা পাইবে না। বরং এই উপলক্ষে একটা নূতন ধরণের মান অভিমানের পালা গাহিয়া আরও সে নিবিড়ভাবে বাঁধিতে পারিবে তার স্বামীকে। কিন্তু অস্বাভাবিক ও মারাত্মক ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তার আত্মরক্ষার এই স্বাভাবিক ব্রহ্মাস্ত্রটি সূর্য্যকান্ত অব্যবহার্য্য করিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। যা ছিল অমলার শুধু কল্পনা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সংসারের ঢের বেশী গুরুতর ও ঢের বেশী প্রিয়তর ভাবনা-চিন্তার তলে যা কোথায় তলাইয়া যাইত, নিজের অপরিমেয় অস্থায়ী পাগলামী দিয়া সূর্য্যকান্ত তাকেই অমলার কাছে দিয়া গিয়াছে সত্য ও বাস্তবতার রূপ। জীবনে নভেলী আবহাওয়া থাকে না জানিত বলিয়াই নিজের জীবনকে একটু নভেলী করার জন্য অমলার অদম্য পিপাসা জাগিয়াছিল, বিশেষতঃ সে যখন মনে করিয়াছিল যে সূর্য্যকান্তর মত নামকরা সাহিত্যিকের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় জীবনটাকে ওরকম করাব একটা দুষ্প্রাপ্য ও বিশিষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। জীবনটা কাব্যময় করার সুযোগ, কাব্যকে জীবন করার নয়। অমলা তো সামান্য স্ত্রীলোক, কাব্য ও জীবনের এই পার্থক্য জানা থাকে বলিয়াই কবি পর্য্যন্ত এ জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সূর্য্যকান্ত সব ভণ্ডুল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কবিত্ব করিতে গিয়া স্বামীর কাছে প্রশ্রয় না পাইয়া আগে কাঁদিয়াও সে সুখ পাইত, কারণ তাও ছিল একধরণের কাব্য। বাহুল্য কল্পনা ব্যাহত হইয়া বাহুল্য ব্যথা আসিয়া জীবনকে অমলার করিয়া তুলিত রসালো। এখন বাহুল্যতা ঘুচিয়াছে, রস হইয়াছে বিষ। একটা বোঝাপড়া যদি

করিয়া যাইত সূর্য্যকান্ত, ভাবিবার একটা নতুন খোরাক যদি সে দিয়া যাইত অমলাকে! শুধু এইটুকু যদি অমলা কোনরকমে ভুলিতে পারিত যে ইদানীং সূর্য্যকান্ত যখন তাকে অজস্র পরিমাণে স্বর্গের সুধা আনিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাকে সে সহ্য করিতে পারিত না, কাছে যাইতে ভয় করিত। হায় ভগবান, সাধে কি স্বামী তার হাল ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে।

সময়ে স্নানাহার হয় না, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, জীবনের গোড়াটাই যেন আলগা হইয়া গিয়াছে অমলার। কথা বলিতে কষ্ট হয়। মানুষ কাছে থাকিলে বোধ হয় বিরক্তি। হোক। কেউ কিছু বলিতে সাহস পায় না, এ বিরহিনী উন্মাদিনীকে কে ঘাঁটাইবে? নিজের মনে থাকে অমলা, অনেকটা স্বাধীনভাবেই নিজের মনের বিকারকে ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সহর হইতে সূর্য্যকান্তর চিঠি আসে, কখনো অমলার নামে—কখনো বাড়ীর অন্য কারো নামে। প্রত্যেকটি চিঠি অমলাকে আঘাত করে। অমলার বিকৃত জগতে যা কিছু দামী সে সব কোন কথাই চিঠিতে থাকে না, শুধু বাজে অবান্তর কথা। সূর্য্যকান্তর কাছে অমলার তুচ্ছতাই শুধু প্রমাণ করে চিঠিগুলি, আত্মগ্লানির আলোড়ন তুলিয়া দেয় মনে। একদিন প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়া অমলা একখানা চিঠি লেখে সূর্য্যকান্তকে, আর একবার সে তাকে সুযোগ দিক, আর একটিবার, এবার যদি অমলা তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী হইতে না পারে তবে বিষ খাইয়া হোক, গলায় দড়ি দিয়া হোক ইত্যাদি। দশ দিন পরে মাদ্রাজ হইতে এ চিঠির জবাব আসিল। অমলার চিঠি পাইয়া সূর্য্যকান্ত নাকি খুব খুসী হইয়াছে, তবে ওসব আবোল-তাবোল কথা কি ভাবিতে আছে, ছি। অমলা যে তার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী নয় এ ধারণা তার কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া সেই মাদ্রাজের একটা হোটেলের ঘরে বসিয়া সূর্য্যকান্ত এমন অবাক হইয়া যাইতেছে যে—

এদিকে আরও একমাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছে সূর্য্যকান্ত। আরও কিছুদিন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবে। অমলা যেন খুব সাবধানে থাকে, কেমন?

হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া আসে অমলার, মুখ দিয়া ফেণা বাহির হয়, হাত-পা ছুঁড়িবার ভঙ্গি দেখিয়া ভয় হয়—অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি খসিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িবে। —পালিয়ে পালিয়ে কতকাল বেড়াবে ঠাকুরঝি? বলে, আর ধনুকের মত বাঁকা হইয়া অমলা হাসে। ব্লাউজের বোতামগুলি পট পট করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া রাগে অমলা ব্লাউজটাই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, গায়ে আঁচলটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে চায় না। বড়-জা চেঁচায়, ছোট-ননদ কাঁদে, দেবর মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালে, ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া পিসী যে কি বলে বোঝা যায় না, বাকী সকলে যা করে অথবা বলে—তার কোন মানে থাকে না। শেষে সকলে মিলিয়া চাপিয়া ধরে অমলাকে, অমলাও বড়জা'র হাতে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। অতি কষ্টে কামড় ছাড়াইয়া দিবার পর এতজোরে তার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় যে শরীরের আর কোথাও বোধ হয় তার একটুও শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া যায়।

এই প্রথমবার। দ্বিতীয়বার হয়—জরুরি টেলিগ্রাম পাইয়া সূর্য্যকান্ত ফিরিয়া আসিবামাত্র। তবে এবার হাসি দিয়া আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় কলহে। কার হুকুমে সূর্য্যকান্ত ফিরিয়া আসিল বলিয়া অমলা কলহ আরম্ভ করে, চীৎকার করিয়া গালাগালি দেয়, মুখে ফেণা তোলে, হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়, তারপর দাঁতে দাঁত লাগাইয়া হইয়া যায় শিথিল।

এবার সকলে ব্যস্ত হয় কম। এমন কি অমলার মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে তাকে এ বাড়ীতে গছানোর জন্য বড়-জা তার বাপ দাদার নিন্দাও করে।

সূর্য্যকান্ত বলে, তিন বছর বয়েস যখন ভাঁড়িয়েছিল, এ রোগের কথা গোপন করবে তা আর বেশী কি। এ্যাদ্দিন হয় নি কেন তাই আশ্চর্য্য।

কথাগুলি অমলা শুনিতে পায় না। রাত্রে সে তাই চুপি চুপি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ? সত্যি বলছ তোমার মন কেমন করত? কেন তবে ফেলে পালিয়ে গেলে আমাকে? পাটনা থেকে কেন ফিরে এলে না?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কি হইবে? হিষ্টিরিয়া ভাবপ্রবণতা নয়, ও একটা রোগ।

সুদান মরুপ্রদেশ

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

এইবার সুদানের কয়েকটি সহরের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা যাক্। ওয়াদি হালফা (Wadi Halfa) সহর নীল নদীর

সুদানের স্নানাগার

তটে এবং উত্তরদিকে। এই সহরটী যদিও আফ্রিকার মধ্যে, কিন্তু অপরাপর সহর অপেক্ষা ইহা বিশেষ ঠাণ্ডা। বহু ইউরোপীয় পর্যটক সুদানে পদার্পণ করলে এখানে বাস করতে চান। এখানে একটি ভাল
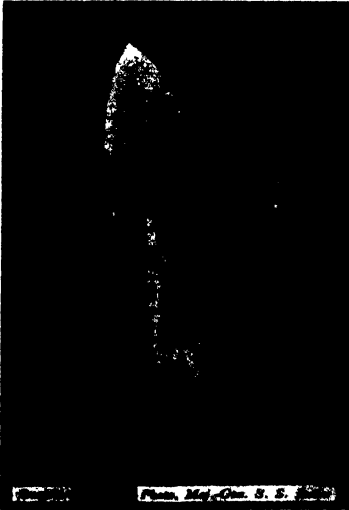
সুয়াকিন

হোটেলও আছে। সহরটী ছোট হলেও এখানে বহু দোকান পাট আছে। সেখানে নিত্য বেচাকেনা চলে। এখানে একটি যাদুঘর আছে। সেখানে প্রাচীনকালের বহু মূল্যবান সংগ্রহ স্থান পেয়েছে। এখান হতে নীল নদীর প্রায় ১৫০ ফিট নিম্নে Second Cataract মধ্যে Thousand Island একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ। Abu Sir পর্ব্বতচূড়া ওয়াদি হালফার দক্ষিণে।

পোর্ট সুদান (Port Sudan) একটি প্রসিদ্ধ সহর। এখানে শীতকালে বেশ মনোরম। আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের সব কিছু সুখসুবিধাই এখানে পাওয়া যায়। এখানকার দ্রষ্টব্য

ওমডারমানের একটি রাস্তা
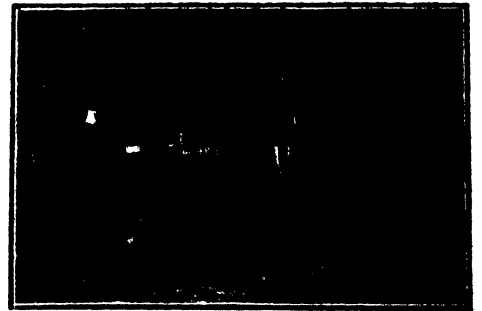
অসভ্যগণের কুটীর

বস্তুর মধ্যে জলের মধ্যে প্রবাল মালা দর্শনই প্রধান। বহু নৌকার মধ্যে কাচের বাক্স বসান থাকে, তা হতে জলের ভিতর প্রবালমালা এবং নানারূপ রঙ্ বেরঙের মাছের বাসা দেখা যায়। জলীয় জীবনের এমন সুন্দর প্রতিচ্ছবি আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।

সুয়াকিনের রাজপথ

সুয়াকিন (Suakin) সহর পোর্ট সুদান হতে ৪২ মাইল দূরে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এক সময়ে এখানে ক্রীতদাস ব্যবসার বিশেষ প্রচলন ছিল। এখানকার আরবগণের তুর্কী ধরণের বাড়ীগুলি ভারী সুন্দর। সহরটী একটি দ্বীপের উপর। জেনারেল গর্ডন একটি উঁচু রাস্তা (cause way) তৈরী করে দেশের স্থলভাগের সহিত ইহাকে যুক্ত করে দিয়েছেন।

গির্জ্জা খার্টুম

খার্টুম সহর সুদানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সহর। ইহা সমুদ্র বক্ষ হতে ১,২০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। দিবাভাগে উষ্ণ হলেও রাত্রিতে বিশেষ মনোরম। এখানে বড় বড় রাস্তা, বাগান, পশুশালা প্রভৃতি কত কি আছে। নীল

নদীর তটে এমন সুন্দর সহর আর দ্বিতীয়টা নাই! নদীর বাঁধের নিকটেই গভর্ণর জেনারলের প্রাসাদ। জেনারল গর্ডন যে বাড়ীটীতে থেকে মারা যান এটি তার স্থানেই তৈরী হয়েছে। গর্ডন যে স্থানটিতে মারা যান সেখানে একটি পিতল-ফলকে সে কথা নির্দেশ করা আছে। দক্ষিণদিকে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত। এরই নিকটে গির্জ্জা। এখানকার 'গর্ডন মেমোরিয়াল কলেজ' বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে রেশকোর্স আছে। একটি পশুশালাও আছে। সেখানে সুদানে যত বিচিত্র জন্তু জানোয়ার পাওয়া যায় তা রক্ষিত হয়েছে।

গ্রাণ্ড হোটেল

খার্টুমের পর 'ওমডারমান' সহরের নাম করা যায়। এই সহরে হাজার হাজার এ দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর আদিম অধিবাসী দেখা যায়। এখানকার বাজার-দোকানে এ দেশীয় আসবাবপত্র, বাসনকোসন ইত্যাদি বহু পাওয়া যায়। হাতীর দাঁতের এবং রূপার নানা কারুকার্য্যপূর্ণ জিনিষের জন্য সহরটার প্রসিদ্ধি আছে। এই সহরের নিকটেই Kerreri পর্ব্বতমালা। এখানে কিচেনারের নেতৃত্বে মাধীগণের পরাজয় ঘটে।

বাজার

খার্টুম হইতে একশত মাইল দক্ষিণে 'ওয়াদ মিদানী'

বৃহৎ ভেট্‌কী মাছ

Red Sea Hotel—সুদান

বামনগণের নৃত্য

খার্টুম সহর
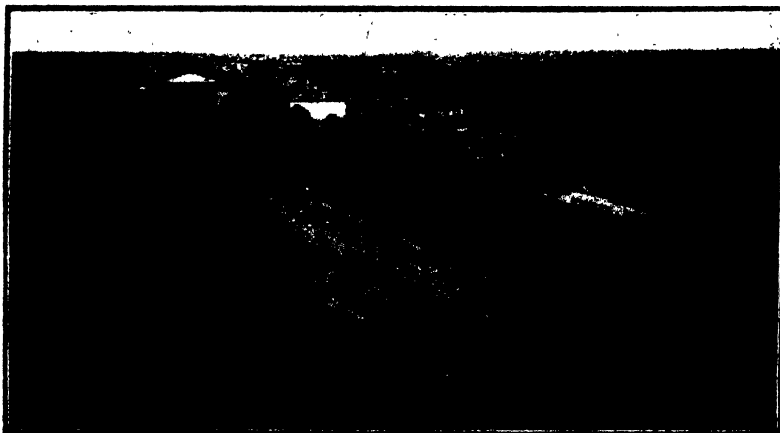
(Wad Medani) সহর। এটি একটি native town। ওয়াদ মিদানী সহরটী তূলার চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে তূলার নানাবিধ কলকারখানা আছে। সেগুলি এখানকার Plantation Syndicate কর্তৃক পরিচালিত।

সুদান বন্দরটী মাছের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। এখানে নানা প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। কতকগুলি মাছ ধরার মধ্যে সত্য সত্যই শিকারের আনন্দ পাওয়া যায়। Barra-conta মাছগুলি ১০ হইতে ৮৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হতে পারে এবং তাদের ধরে ডেঙ্গায় তোলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শারীরিক শক্তি এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়। লোহিত কড মৎস্য বহু পাওয়া যায়, সেগুলির ওজন প্রায় ১০০ শত পাউণ্ড। Groper মৎস্য-গুলির ওজন প্রায় দেড়শত পাউণ্ড ক'রে। নীল নদী এবং তার শাখা প্রশাখায় বহু মাছ পাওয়া যায়। Sennar Damএর নিকট বহু মাছ ধরা যায়। এখানে Nile Perch, (একপ্রকার মিঠা জলের মাছ), Tiger Fish, Berbel প্রভৃতি মাছগুলি প্রধান।

মৎস্যের মতো পাখী ও সুদানে বহু দেখা যায়। নীল-

নদীর আশপাশের স্থানগুলিতেই এদের আড্ডা। এখানকার পাখীগুলি মরুপ্রদেশের উষ্ণ স্থানেও গিয়ে আড্ডা গেড়ে থাকে। নীল নদীর তীরে সন্ধ্যা ও সকালে দেখা যায় রাশি রাশি বক এবং হাঁস দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। খার্টুমের দক্ষিণে নীল নদীর বালুচরে এদের শিকার করবার জন্য অনেক শিকারী বসে থাকে।

রাজপ্রাসাদ খার্টুম

সুদান প্রদেশে পাখীর মতো নানা জন্তু জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অধিকাংশ জন্তু যা শিকারীর পক্ষে লোভনীয়—তা এখানে প্রচুর পরিমাণে জঙ্গলের আশে পাশে, ঝোপঝাড়ের নিকটে এবং কখন কখন উষ্ণতম মরুপ্রদেশেও দেখা যায়। বাঘ (সকল জাতীয়), ঘোড়া, হাতী, হরিণ, জেব্রা, জিরাপ, বন্য ছাগল, শূকর কোন কিছুরই অভাব নেই! যত রকমের জন্তু জানোয়ার পাওয়া যায় তার সংখ্যা নির্ণয় করলে হবে পঞ্চাশ। দেশের উত্তর-পূর্ব্বদিকে Red Sea Hills প্রদেশে নানা প্রকার বন্য বরাহ শিকারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নিউবিয়ান মরুপ্রদেশে নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, বন্য শৃগাল প্রভৃতি পাওয়া যায়।

সুদানী পিতা

বনের মধ্যে হাতীর দল

দক্ষিণ প্রদেশে যেদিক দিয়া White Nile এবং তার শাখাপ্রশাখাগুলি প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকটাতে অনেক

Tiger Fish

Perch মাছ

প্রকার জন্তু জানোয়ার মেলে। এদিকটা ঝোপঝাড় এবং জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। এই প্রদেশে Tiang নামে এক প্রকার জন্তু আছে। ঠিক দেখতে মেহগনি রঙের। এগুলি দল বেঁধে থাকে। শিকার করা একটু শক্ত। কাজেই এ জন্তু শিকারীদের পক্ষে এক আকর্ষণ! এখানে শ্বেতকর্ণ বিশিষ্ট এক প্রকার হরিণ পাওয়া যায়। ইহার গায়ের বর্ণ-বৈচিত্র্য একটি প্রধান দ্রষ্টব্যের বিষয়। দূর হতে এগুলিকে দেখতে বিশেষ কৃষ্ণকায়—কিন্তু নিকটে আসলে মখমলের ন্যায়।…এরাও আফ্রিকার অপরাপর জন্তুদের ন্যায় দল বেঁধে বাস করে এবং

মাছধরা

সকাল সন্ধ্যায় নীল নদীর তীরে দলে দলে ছুটে জল খেতে আসে।

দক্ষিণ দিকে—সুদান হতে প্রায় দুইশত মাইল দক্ষিণে হাজার হাজার হাতী দেখা যায়। তারা জঙ্গলের মধ্যে আপনার রাজত্ব স্থাপন করে বাস করছে। তাদের সে প্রদেশে কারুর ঢোকবার অধিকার নেই—তবে একান্ত প্রয়োজন হলে অত্যন্ত সন্তর্পণে সেখানে যেতে হয়। তা না হলে মৃত্যু অনিবার্য।...অনেক সময় ষ্টীমার করে যেতে যেতে দেখা যায় বড় হাতী জঙ্গল থেকে বাহির হয়ে নদীতটে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করছে।
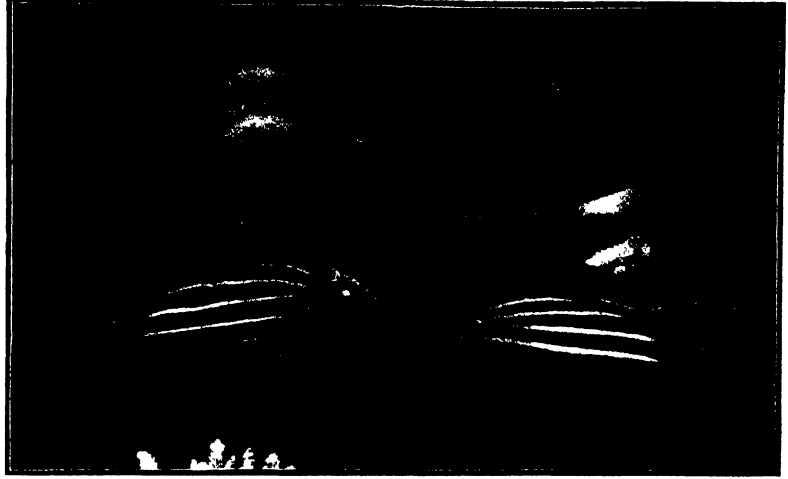
প্রবাল-মালা ও বিচিত্র মাছ

ইউগাণ্ডার নিকটস্থ স্থানে জেব্রার প্রাদুর্ভাব একটু অধিক। দক্ষিণ সুদান প্রদেশে বড় সিংহও আছে। এ দিকে শ্বেত এবং কৃষ্ণ গণ্ডার পাওয়া যায়। শ্বেত গণ্ডারের সংখ্যা অল্প।

এবার সুদানের রাজনৈতিক অবস্থা একটু আলোচনা করা যাক। সুদান প্রদেশে ইজিপ্‌সিয়ান এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট—দুই গভর্ণমেণ্টের অধিকার আছে। ১৮৯৯ খৃঃ Anglo-Egyptian Condominion ঘোষণা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী দেশের সর্ব্বত্র বৃটীশ এবং ইজিপ্‌সিয়ান পতাকা উড্ডীন হয়ে থাকে। দেশের শাসন-কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করেন এই দুই গভর্ণমেণ্ট। তাঁদের প্রতিনিধিরূপে বৃটীশ গভর্ণর জেনারল এ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে থাকেন। ১৮৯৯ খৃঃ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, যে কোন ইজিপ্‌সিয়ান আইন দেশের (সুদানের) উপর খাটবে না এবং যদি কোন consul নিয়োগ করতে হয় তো সে কাজ বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট করবেন। এই ব্যাপারের গূঢ়তম উদ্দেশ্য আর কিছু না হোক অন্ততঃ এই, যে সুদানের বড় অংশটা নিজের কোলের দিকে টেনে নেওয়া।...এ অভিসন্ধি অপরে বুঝতে

১৩ আঠা (Gum) বাছাই

পারলে। ১৯২৪ খৃঃ Wafdist Party নামে এক রাজনৈতিক দল দাবী করলেন যে Condominion ভেঙে দেওয়া হোক এবং ইজিপ্টের-ই সুদানের উপর দাবী অধিক একথা গ্রাহ্য করা হোক। কিন্তু এতেও বিশেষ সুবিধা হোল না। ব্রিটীশরা দেশের বড় বড় সরকারী পদগুলি (Civil administration) দখল করে রইলেন। কিন্তু ইজিপ্‌সিয়ান গভর্ণমেণ্ট এতেও কোন গোলমাল করলেন না। সুদানের সামরিক ব্যয় বহনের জন্য বৎসরে ৭৫০,০০০ ইজিপ্‌সিয়ান পাউণ্ড নিয়মিত দিয়ে আসতে লাগ্‌লেন। ১৯৩০ খৃঃ পুনরায় Wafdistরা গোলমাল আরম্ভ করলেন। তাঁরা চাইলেন যে ইজিপ্‌সিয়ানরা যাতে বিনা বাধায় যত ইচ্ছা সুদানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এতে রাজী হলেন না। এই দলের নেতা Zaghlul Pasa বললেন—"If I can go to conduct the negotiations I shall say that the Sudan is our property, that is an inseparable part of Egypt and that it should be restored to us." Wafdistরা যতই চেষ্টা করুক না কেন বর্ত্তমানে সুদানীয়গণ বড় বড় রাজপদ অধিকার করবার যথার্থ পাত্র—এ মত Timesএর এক সংবাদদাতা প্রকাশ করেছেন। কারণ সুদানীয়গণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির অভাব নেই। বর্ত্তমানে সুদানে উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য ইজিপ্‌সিয়ানগণও যে বিশেষ উৎসাহী তাও মনে হয় না। কারণ গত কয়েক বৎসরে অত্যন্ত অল্প কয়েকজন ইজিপ্‌সিয়ান চাষী সুদানে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহ দেখিয়েছে। সুদানীয়গণ বর্ত্তমানে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি করবার জন্য উৎসাহী হয়েছে। ইজিপ্ট অবশ্য সুদানের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অনেক করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদান আজও পৃথিবীতে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। Blue এবং White নীল নদীর উপরের বৃহৎ পুল দুটী, Nile Red Sea Railway, El Obeid Railways (যা Kardofan প্রদেশের গঁদ Red Sea পর্য্যন্ত পৌছে দেয় এবং সুদান এতে যথেষ্ট লাভবান হয়) এ সমস্ত ইজিপ্টের টাকায় হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত সুদান গভর্ণমেণ্ট তার ঋণ শোধ করতে পারেন নি। British cotton growing Association ও সুদান গভর্ণমেণ্টকে বহু মুদ্রা ঋণ দান করেছেন।

একটি পরীক্ষাগার খার্টুম

আবদুর রহিম্ খাঁন্খানান্ ও হিন্দী সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী এম, এ; পি, আর, এস

মধ্যযুগে যে কয়েকজন মুসলমান মনীষী ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ভাষার সাহায্যে স্বীয় সাধনাকে রূপদান করিয়াছিলেন, আবদুর্ রহিম্ খাঁন্খানান্ তাঁহাদিগের অন্যতম (১)। সম্রাট্ আকবরের অভিভাবক ও পিতৃবন্ধু বৈরামখাঁর নাম সকল ভারত-ইতিহাস পাঠকের নিকট সুপরিচিত। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বৈরাম-খাঁ 'মক্কা' গমন উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগকালে পাঠানশত্রু হস্তে নিহত হন; তখন সম্রাট্ আকবর শত্রুপুত্র আবদুর্ রহিম্কে প্রতিপালনের জন্য রাজধানীতে আনয়ন করেন। যে তুর্কী রাজবংশের চিরন্তন ধারণা এই যে রাজাদের আত্মীয় বলিয়া কেহ নাই—সেই তুর্কী রাজবংশের কোন সম্রাটের পক্ষে একজন রাজবংশধরের (২) পালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করা অতি অপরূপ জিনিষ। পিতৃহীন বালক রহিম আকবরের স্নেহ ও অনুগ্রহের আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আকবরের তত্ত্বাবধানে আবদুর্ রহিম্ আরবী, ফার্সী, তুর্কী, উর্দ্দু, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। যেমন সৈন্য সঞ্চালনে দক্ষতা, তেমনি রাষ্ট্রপরিচালনে বিচক্ষণতা লাভ করিলেন। গুণগ্রাহী আকবর রহিমের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাহ্জাদা সলিমের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

আহ্মদাবাদের যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্যদ্বারা বহু বিদ্রোহী দমন করার পুরস্কার-স্বরূপ সম্রাট আবদুর্ রহিম্কে 'খাঁন্খানান্' (৩) পদবী প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে আবদুর রহিম খাঁন্খানান্ মুঘল সাম্রাজ্যের একজন নায়করূপে সম্মানিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধে অজেয়, শৌর্য্যে অপরিমেয়, উদারতায় অতুলনীয় (৪) রাষ্ট্রসংঘটনে দূরদর্শী রহিম্ ছিলেন কৃষ্টির মূর্ত্তিমান্ প্রতীক্। মুঘল যুগের বীরত্ব, শৌর্য্য, সংঘটন, শিল্প, উদারতা, কৃষ্টি যেন রহিমকে কেন্দ্র করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-চতুর্থকে গড়িয়া উঠিয়াছিল। রহিমের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া আকবরের তথা মুঘল সাম্রাজ্যের বিষয় একখানি সুদীর্ঘ সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। কিন্তু রহিমের পার্থিব সম্মান-সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই তাঁহার ইহলোকের পরম-স্নেহ বন্ধনগুলি খসিয়া পড়িতে লাগিল। বিজাপুর যুদ্ধজয়ের আনন্দ তাঁহার ম্লান হইল প্রিয়তমা পত্নী মহ্বানুর মৃত্যুতে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রহিমের বীরপুত্র শান্বাজ্খাঁ দাক্ষিণাত্যে চতুর মালিক অম্বরকে পরাজিত করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন 'সাতহাজারী-মন্সব'। কিন্তু শানবাজ্খাঁর মৃত্যুতে সেই আনন্দ আরও অধিকতর দুঃখের কারণ হইল। শোকার্ত্ত পিতার শোককে ঘনীভূততর করিয়াছিল পুত্র রহমান্দাদের মৃত্যু। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন তখনও পূর্ণ হয় নাই। ভাগ্য তখনও রহিমের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াই চলিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে শাহ্জাদা শাহ্জাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করিল; সন্দেহবশতঃ রহিমকে ও তাঁহার পুত্র দরবারখাঁকে 'আসীরগড় দুর্গে' অবরুদ্ধ করিলেন। পরে প্রমাণাভাবে পিতা পুত্রের মুক্তি হইল। মহবৎ খাঁ পুনরায় রহিমকে বন্দী করিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া মন্সব ও জায়গীর প্রত্যর্পণ করিলেন (৫)। এইখানেই দুর্ভাগ্যের শেষ হয় নাই। মহবৎ খাঁ তাঁর পুত্র দরাবখাঁকে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড তরবুজ উপহারের ছদ্ম-আবরণে রহিমের নিকট প্রেরণ করিলেন। উপহারের আবরণ উন্মোচন করিয়া পুত্রের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া রহিম শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন—"তরবুজ শহীদ্ হায়। (৬)। কিছুদিন পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আমীরুল্লা যৌবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। জীবনের প্রথম জয়যাত্রার দিনে প্রিয়তমা পত্নী রহিমকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; পর পর চারটী পুত্র চোখের উপর ইহলোক ত্যাগ করিল; নিজে বৃদ্ধ বয়সে দুইবার অবরুদ্ধ হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রের ছিন্নমুণ্ড নিজ হস্তে উপহারস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইল; রহিমের জীবনে অদৃষ্টের অত্যাচার কম সহ্য করিতে হয় নাই।

বোধহয় জীবনের এই উত্থান-পতন, আনন্দ-বিয়োগ ক্রমশঃ রহিমকে সংসারে বিগত-স্পৃহ করিয়া তুলিল, এক অতীন্দ্রিয়-জগতের দিকে টানিতে লাগিল; দেহের সেখানে অভিযোগ নাই, আবেদন নাই—

---

(১) রহিমের পূর্ব্বে আমীর খসরু, মঞ্জন, কবীর, কমাল, মলিক, মহম্মদজায়সী, রজ্বজী প্রভৃতি মনীষীগণ হিন্দীভাষায় রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(২) হুমায়ুনের ভগ্নী সলিমার সঙ্গে বৈরাম-খাঁর বিবাহ হয়। সুতরাং হুমায়ুন পুত্র আকবর ও সলিমার পুত্র রহিম বাবরের পৌত্র ও দৌহিত্র।

(৩) 'খাঁন্খানান্' তুর্কী শব্দ—অর্থ—Lord of Lords.

(৪) গঙ্গাকবিকে মনোহর ছন্দ-বন্ধনের জন্য ৩৬ লাখ শিকা দান করিয়াছিলেন। সিন্ধু বিজয় উপলক্ষ করিয়া মোল্লা একখানি মস্নবী লিখিলেন—পুরস্কার হইল সহস্র সুবর্ণ আসরফি।

(৫) এই উপকার স্মরণে রহিম জাহাঙ্গীরকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

মরা-লুৎক্-এ জাহাঙ্গীর্-ই-জ তায়িদ্এ রব্বানী—
দোবারা জিন্দ্গী দাদ্ দোবারা খাঁন্খানানী।

অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের দয়ায় ও ভগবানের অনুগ্রহে দুইবার জীবন লাভ করিলাম—দুই বার 'খাঁন্-খানান্' পদবী লাভ করিলাম।

(৬) শহীদ্ শব্দের অর্থ কোনও মহদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ।

লাভক্ষতি নাই, জীবনের আকর্ষণ বিকর্ষণের কোন প্রভাবই অনুভূত হয় না। বিশ্ব-নিয়ন্তার চরণে চরম নিবেদনই যেন সকল আকাঙ্খার ধন; শোক দুঃখময় সংসারের আবর্ত্ত রহিমকে এমন একটা জায়গায় লইয়া আসিল—যেখানে চিরন্তনের চরণ বিনা আর মানবের ত্রাণের কোনও উপায় নাই, তাই রহিম্ বলিয়া উঠিলেন;

'গহি শরণাগত রামকী, ভব সাগর কি নাব্।
রহিমন্ জগৎ উধার করি, আর না কিছু উপায়॥

হে রহিম, জগৎ উদ্ধার করিতে আর কোনও উপায় নাই; তাই শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইলাম, ভবসাগর পার হইবার তরণী।

ভক্তপ্রাণ এবার শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ভক্তপ্রাণের অনাবিল অর্ঘ্য হিন্দি দোঁহার ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করিতে লাগিল; উদারচেতা রহিমের নিকট বিশ্ববিধাতা অখণ্ড, সে হিন্দুরও যেমন মুসলমানেরও তেমন। রহিমের ভগবানের জাতি নাই। রহিমের কৃষ্টি ও সাধনা কোনও বিশেষ সম্প্রদায় অথবা জাতির ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল না। পিতা বৈরাম খাঁ ছিলেন শীয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, প্রভু আকবর ছিলেন সুন্নী। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ী যে প্রবাহ চলিয়াছিল তাহা দ্বারা নিজে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি মুসলমানের যে সহজ উষ্মা থাকা সম্ভব তাহার কোনও প্রকাশই রহিম্ সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুসলমান নবী ও সুফীদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা প্রগাঢ় ছিল। ফার্সী ভাষায় তাঁহার মসনবী ও দেওয়ান্ অতি সুখপাঠ্য সুন্দর সামগ্রী। তুর্কী ভাষায় রচিত বাবর জীবনীর ফার্সী অনুবাদ তিনি আকবরকে উপহার দিয়াছিলেন। রহিম ছিলেন রসিক, রসগ্রহণে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল সমধিক, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার অনুরাগ প্রবাদ-স্বরূপ ছিল; "খেট কৌতুকম্" নামে উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দি ভাষায় তাঁহার রচনা বহুল প্রচারিত। তন্মধ্যে রহিম শতসই, বরবৈ নায়কাভেদ মদনাষ্টক, রসপঞ্চাধ্যায়ী, শৃঙ্গার সৌরট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দী দোঁহা ও পদাবলীর ভিতর দিয়া হিন্দু পুরাণের সহিত রহিমের প্রগাঢ় পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার পদাবলী ভক্তি-রসে এতই আপ্লুত যে তাঁহাকে ভক্ত ও প্রেমিক হিন্দু বলিয়া মনে হয়; পদাবলীর প্রতি চরণে বৈষ্ণব সাধারণের ঐকান্তিকী ভক্তির উচ্ছ্সিত ধারা স্বতঃস্ফুরিত হইতে থাকে। তাঁহার যোদ্ধ্ জীবনের অন্তরালে যে এত অন্তঃসলিলা প্রেমধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে, উহার সন্ধান কয়জন পাইয়াছে? যে হস্ত অযুত শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল, সেই হস্ত বহিয়াই কি এই প্রেমবারি সিঞ্চিত হইত? তাঁহার যেমন ছন্দ জ্ঞান, তেমন ভাষার অধিকার—অথচ তৎসঙ্গে তেমনি আশ্চর্য্য রস-গ্রাহিতা। তাঁহার হিন্দী কবিতার অনেক স্থানে সুন্দর ফার্সী মিশ্রিত; আবার কোথাও প্রতিচরণের অর্দ্ধেক হিন্দী, অর্দ্ধেক ফার্সী; কোথাও বা প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃত, শেষার্দ্ধ হিন্দী; অন্য জায়গায় উর্দ্দুর সঙ্গে সংস্কৃত অথবা হিন্দী মিশ্রিত; অথচ, রস বা ভাবের কোন বৈপরীত্য কিংবা বিকার নেই।

তৌ রহিম মনো আপ্নো, কিন্হো চারু চকোর,
নিশি বাসর লাগো রহে, কৃষ্ণচন্দ্র কি ঔর॥

রহিম, তোমার মনকে তুমি সুন্দর চকোর করিয়া রাখিয়াছ, সারা নিশি সে যে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখচন্দ্রিকার প্রতি চাহিয়া আছে।

হিন্দুর দেবতার প্রতি মুসলমানের তীব্র বিমুখতার কোন আভাষই এই মুসলমান কবির কাব্যে খুজিয়া পাওয়া যায় না। উপমা ও অলঙ্কার বিন্যাসে তিনি হিন্দি সাহিত্যের প্রিয় উপমা ও অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ অন্তরে যে অনাবিল প্রেমধারা নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে তাহাই অক্ষরে প্রতিবিম্বিত, কৃষ্ণপ্রেমে রহিম পরিপূর্ণভাবে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে, জীবনে তাঁহার অন্য কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নাই; পার্থিক সম্পদ বহু আহরণ করিয়াছিলেন; সকলই তাঁহাকে মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় কেবল বঞ্চনা করিয়াছেন। তাই রহিম তাঁর জাগতিক আকর্ষণকে দূরে সরাইয়া দিলেন।

প্রীতম্ ছবি নয়ননি বসী, পরছবি কঁহা সমায়।
ভরো সরাই রহিম! লখি আপ্ পথিক ফিরি যায়॥

রহিম! প্রিয়তমের ছবিতে নয়ন ভরিয়া গিয়াছে, অন্য ছবি আর কোথায় বসাইবে? পরিপূর্ণ পান্থশালা দেখিয়া পথিক আপনি ফিরিয়া যায়।

বৈষ্ণবের একনিষ্ঠ প্রেমের আকুলতা ভাষাকে ছাড়াইয়া এক বিদেহ রাজ্যে মনকে লইয়া যায়; একবার যে আপনি প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার কি আর অন্য সম্পদের আকর্ষণ আছে?

মুগল-সাম্রাজ্যের যিনি একদিন নিয়ন্তা ছিলেন, তিনি আবার অন্যদিন নিজেকে ধূলায় অবলুণ্ঠিত দেখিলেন; ইচ্ছা করিলে পুনরায় লুপ্তগৌরব ফিরিয়া পাইতেন, তিনি তাহা প্রত্যাশা করেন নাই; পার্থিব সম্পদের দিনে তিনি ভগবানকে অনুসন্ধান করেন নাই; যেদিন অবস্থান্তরে তিনি সেই পরম-সম্পদের স্পর্শলাভ করিলেন, তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

ধুর ধরত নিত সীস্ পর কহু রহিম! কেহি কাজ?
জিহি রজ মুনীপত্নী তরী স্ ঢ়ুঁড়তে গজরাজ॥

রহিম, বলত গজরাজ কোন ধূলি আপনার মস্তকে ছড়াইয়া দেয়? (রহিমই উত্তর করিলেন) গজরাজ সেই ধূলিই খুঁজিয়া বেড়ায়, যে ধূলিতে মুনীপত্নী উদ্ধার পাইল; (রামচন্দ্রের চরণ রজস্পর্শে গৌতম পত্নী অহল্যা উদ্ধার পাইল, গজরাজ সেই ধূলি অনুসন্ধান করে এবং মস্তকে ছড়াইয়া দেয়; নচেৎ গজরাজ হইয়া মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিবে কেন?)

আপনার জীবনের ঘটনা বিপর্য্যয়ের কেমন একটা সুন্দর সামঞ্জস্য করিয়া তুলিয়াছে, ম্লান গৌরবের ভিতরে ভগবানের আশীর্ব্বাদ খুঁজিয়া পাইয়াছে, অথচ হিন্দুর পুরাতত্ত্বের কি সুন্দর জ্ঞান! সত্য সত্যই এই কবিতাগুলি বিশেষ প্রেরণা ব্যতীত প্রকাশ হইতে পারে না। "রহিম শতসই" কবিতাগুলির বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য এই, যদি কেহ ঐ গুলি মুসলমান কবি রহিমের লেখা বলিয়া না জানে তবে সে বলিতে বাধ্য

যে উহা বিশেষ কোন ভক্তপ্রেমিক হিন্দুপ্রাণের অনাবিল অর্ঘ্য। সেই যুগে হিন্দুমুসলমানের কৃষ্টি ও সাধনা যে পরস্পরের কত সান্নিধ্যে আসিয়াছিল তাহা মধ্যযুগের সাহিত্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে গিয়াসুদ্দিন বল্‌বনের সময় আমীর খসরু * হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট আকবরের যুগে রহিম পর্য্যন্ত নিরন্তর চলিয়াছিল। রহিমের 'নায়িকাভেদ' নামে একখানি পুস্তক আছে, ইহা 'বরবৈ' ছন্দে লিখিত, সেইজন্য সাধারণতঃ তাহা 'বরবৈ' নায়িকাভেদ নামে অভিহিত, নায়িকাভেদ' সাধারণতঃ লোকে অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু কাব্যশক্তির স্ফুরণে, ভাষার ব্যঞ্জনায় এবং ছন্দ গৌরবে হিন্দী সাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। কেহ কেহ এই পুস্তকখানিকে ছন্দ-বিচারে তুলসীদাসের উপরে স্থান দেয়। কবিতাগুলি হিন্দিভাষায় প্রবাদস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

টুটখাট, ঘর টপকত, টটিয়ৌ টুটি,
পিয়কে বাহ্‌ শিরহন বাঁ সুখকে লুটি ;

শয্যা ছিন্ন, গৃহ জলবর্ষিত, প্রাচীরজীর্ণ, তবু প্রিয়তমের বাহু যদি মস্তকের নীচে থাকে তবে আমি সকল সুখ লুটিয়া লইব।

এই কবিতাগুলি মানবজীবনের আদি রসাভিজ্ঞতার চরম পরিণতি। এবং অনুপ্রাসে অনুরঞ্জিত। ছন্দ ও ভাষা যেন রসের সমান তালে চলিয়াছে।

"মদনাষ্টক" নামে রহিমের আর একখানি কবিতাগুচ্ছ আছে তাহাতে মাত্র আটটী কবিতা, ভাবসম্পদে ও শব্দগৌরবে তাহা অতুল, কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে, ভক্তহৃদয় ঈপ্সিতের চরণে লুটিয়া পড়িয়াছে, অথচ প্রতি চরণের প্রথমাংশ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত ও শেষার্দ্ধ হিন্দী ;—

শারদ নিশী নিশীথে, চান্দ্ কি রোশনাই,
সঘন বন নিকুঞ্জে, কানু বংশী বাজাই ॥
রতিপতি সুতনিদ্রা, সাইয়া ছোড়ী ভাগী।
মদন শিরসিভূয়ঃ, ক্যা বলা অনে লগী ॥

শারদীয়া রাত্রি, নিশীথিনী গভীরা, চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কানু বাঁশী বাজাইল, রাধা নিদ্রাদূর করিল, স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিল, হে মন্মথ ! কপালে একি দুর্দ্দৈব দিলে ?

সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে বিষয়বস্তু যেন অপরূপ রসসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে যেন ভাবময় জগৎ গড়িয়া ছন্দ শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে, অথচ অর্থগৌরবে সমস্ত জিনিসটি পূর্ণ।

রহিমের কয়েকটী স্ফুটপদ আছে, তাহার ভিতরে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের সঙ্গে উর্দ্দু ভাষা মিশ্রিত, অথচ বিভিন্ন ভাষার সমাবেশে সুন্দরতা মোটেই মলিন হয় নাই।

একস্মিন্ দিবাবসান সময়ে, মঁ্যায় গিয়াথা বাগ্‌মে।
কাচিওএ কুরঙ্গনয়না, গুল তোড়তী-থি খড়ী ॥

আমি একদিন সন্ধ্যাসময়ে উদ্যানে গিয়াছিলাম ; কুরঙ্গনয়না বালা পুষ্পচয়ন করিতেছিল।—

কবির বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় রচিত শ্লোকাবলি অতীব উপাদেয় জিনিষ, ভাবের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, প্রগাঢ় অনুভূতি জড়াইয়া জিনিষটা একটী অভিনব রূপ গ্রহণ করিয়াছে ;—

রত্নাকরোঽস্তি সদনং গৃহিণী চ পদ্মা,
কিম্ দেয়মস্তি ভবতে জগদীশ্বরায় ॥
রাধাগৃহীতমনসে, মনসে চ তুভ্যম্।
দত্তং ময়া নিজমনস্তদিদং গৃহাণ ॥

রত্নাকর তোমার গৃহ। লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী ; তোমাকে দিবার কি আছে, তুমি ত' জগতের ঈশ্বর, তবে তোমার মনটা শুধু তোমার নয়, কারণ তুমি তাহা রাধাকে দান করিয়াছ, সুতরাং আমি আমার মনটা তোমাকে উৎসর্গ করিলাম। তুমি তাহাই গ্রহণ কর।

রহিমের হিন্দুশাস্ত্রে অন্তর্দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত ভাবধারার একটা ক্রম এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মূল্য।

* আমীর খসরুই প্রথম ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে হিন্দু-ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ; তার জন্য তাঁহাকে কম ধিক্কৃত হইতে হয় নাই, তাই তিনি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন ;—

কাফের্ ইশ্‌ক্-ম্ মুসলমানুই মরা দরকার নিস্ত্।
হররগে মন্, তার গাস্‌তা হাজ্‌ত্ জুন্নার নিস্ত্ ॥
খলক্ মি গুয়েদ্ কে খসরু বুত্ পরস্তী মী কুনাদ্।
আরে আরে মি কুনাম্ বা খলকে খোদাকার নিস্ত্ ॥

বিরহ-মিলন-কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

দিবা অবসানে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্ত দেখতে দেখতে অকস্মাৎ মাধবীর একটি মাত্র কথার ইঙ্গিত বিজনের জীবনকে তার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে উন্মোচিত ক'রে দিল। নিজের জীবন সম্বন্ধে তার ভ্রান্ত ধারণা গেল বদলে, দৃষ্টিও গেল খুলে। সামনে মাঠের শেষে তখন পশ্চিম আকাশ অজস্র লাল সোণার ঐশ্বর্য্যে ফেটে পড়ছিল, বিজন দেখলে তার নিজের জীবনে ঐ রঙের এক কণাও নেই। জীবন তার নীরস, রঙের অভাবে বিবর্ণ। অথচ জীবনের এই রঙের অভাব সে একটি দিনের জন্যও অনুভব করেনি, তাই আজ যখন অকস্মাৎ নিজের জীবনের আসল রূপ তার চোখে ধরা পড়ল তখন সে বিস্মিত হ'ল হতাশ হ'ল। বেলা শেষ হ'য়ে দিনান্তকালের আলোর ঝিকিমিকি মাঠের কোল থেকে মিলিয়ে গেল, মাধবীর সঙ্গে বাড়ী ফেরবার পথে এই মুখর যুবকটির রক্তে এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস লাগল। নিজের জীবনের এই নিষ্ঠুর অভাব আর সে রাখবে না, যাকে চিরদিন সে অবহেলা ক'রে এসেচে—জীবনে কোনদিন যার প্রয়োজন সে স্বীকার করেনি—আজ সেই নারীরই উদ্দেশে তার কাঙাল মন বার বার বলতে লাগল : আমার জীবনে তুমি এস, রঙে রসে আমার জীবনকে তুমি অনির্ব্বচনীয় ক'রে তোল। কিন্তু সে কোন্ মেয়ে? বিজন মনে মনে বলতে লাগল : জীবনে কখন কোন মেয়েকে আমি চাইনি কিন্তু আজ আমি একটি মেয়েকে কামনা করচি—যাকে আমার দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা ভালবেসেচে। তাকে দাও আমাকে; ভগবান তাকে দাও।

লন-এর পরিপূর্ণ মজলিস থেকে একটা অছিলা ক'রে বিজন উঠে গেল। এই সম্মিলিত লোকের আলাপ-আলোচনা হাস্য-কৌতুক—এদের সঙ্গে তার প্রাণের সহজ যোগসূত্র ছিল না। সবিতার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলেই বিজন সটান উপরে মাধবীর ঘরে চলে গেল। আশ্চর্য্য জীবনের গতি, নইলে একটা দিনে যে তার জীবনের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবনা হবে একথা ভেবেছিল কে?

বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত সৌরভময় রাত্রি—সেই দিকে চেয়ে আচ্ছন্নের মত বিজন বসে রইল। একথা আর সে অস্বীকার ক'রতে পারবে না মাধবীকে সে গভীর ভাবে ভালবেসেচে, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রেচে তার নবজীবনে যেন এই মেয়েকেই সে পায়। তার নব জীবন রাণীর প্রতীক্ষাতেই উন্মুখ হ'য়ে থাকবে—অফোটা ফুল যেমন উন্মুখ হ'য়ে সূর্য্যোদয়ের প্রস্তাবনায় জ্যোতির্ম্ময় আকাশের দিকে উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে। রাণীকে না পেলে তার জীবন হবে ব্যর্থ। কি সুন্দর কমনীয় কান্তি এই মেয়েটি—আর রাণী নামটি কি মধুর! হাঁ মেয়েটি রাণীই বটে, দেহ মনে তার যে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য সম্ভার, সেই ঐশ্বর্য্যই তাকে ক'রেচে সমৃদ্ধ রূপবতী, তার শিক্ষা মননশক্তি সৌন্দর্য্য সব মিলিয়ে বিজনকে বিস্মিত মুগ্ধ অনুরক্ত ক'রেচে। তাইতো তার প্রতিটি রক্তবিন্দু উন্মুখ হ'য়ে র'য়েচে তারই মহান আগমনের প্রতীক্ষায়। বিজন একবার নড়ে চড়ে বসল। অনেকক্ষণ পরে স্থির ক'রে ফেললে মাধবীকে গ্রহণ করবার আয়োজন তাকে শিগ্‌গিরই ক'রতে হবে, আর বেশিদিন অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—নয়—নয়। তাদের মিলনের শুভ লগ্নটির জন্য কোথাকার নিশীথের অতন্দ্র আকাশ হয়তো তারায় তারায় খচিত হ'য়ে আছে।

মাধবীকে বিজন পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রবে—এতে তার নিজের দিক থেকে আর সন্দেহমাত্র নেই। এ সঙ্কল্প তার স্থির অটুট। কিন্তু বিজন ভাবতে লাগল ও পক্ষের এ সম্বন্ধে মনোভাব জানা যায় কি ক'রে? এই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা সেকেলে ভাষায় যাকে বলে—বিজন দেখলে এর মধ্যে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, পাত্রিক অনেক রকম সমস্যা র'য়েচে। এ সমাজে কেবল দুপক্ষ রাজি হ'লেই হয় না, প্রথমে এ সমস্যাগুলির সুমীমাংসা হওয়া দরকার। সামাজিকতার দিক দিয়ে, বিজন ভেবে দেখলে

রাণীকে তার হাতে সঁপে দিলে কারও কোন আপত্তি উঠবে না। অর্থের দিক দিয়ে যে কোন বাধা পড়বে না এটা বোধ করি না ভাবলেও চলে, তৃতীয় কথা ও পক্ষের পরিবার এবং পাত্র। এইটাও হ'চ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় কথা। পাত্র হিসাবে সে কেমন? এক সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে গ্রহণ করবার যোগ্যতা তার আছে কিনা, এই প্রশ্নটা নিজের মনে তলিয়ে দেখে তার ভারী হাসি পেল। কারণ তার মনের অজ্ঞাতে যে এই ভয়ানক গর্ব্বটা ছিল—বাঙলা দেশের যে কোন লোক তাকে মেয়ে দিয়ে গৌরবান্বিত হবেন, সুখী হবেন—এই গর্ব্বের কথাটা এত দিন নিজেই জানতে পারেনি। আজ এই প্রথম জানল নিজের এই গর্ব্বের কথা ও সুখী হ'ল। হাঁ—পাত্র হিসাবে সে ভালই, বিশেষ করে প্রতাপবাবুর কাছে যে অসাধারণ ভাল—একথা ভেবে সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পেলে আজ। এ বাড়ীতে তার যাতায়াত নেই তথাপি সে জানে সবদিক্ দিয়ে ও বাড়ীর সকলের তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসা, বিশেষ ক'রে প্রতাপবাবুর আজকের কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে তার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা স্নেহ ভালবাসাই না প্রকাশ পেয়েচে। সেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বিজনের মত ছেলে যদি তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তিনি গৌরবান্বিত না হ'য়ে পারেন? নাঃ কোথাও কোন বাধা নেই মাধবীকে গ্রহণ ক'রতে। বিজন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি ভেবে অবশেষে স্থির করলে মাধবীকে সে গ্রহণ ক'রবে।

তারপর একে একে আজকের দিনের ঘটনাগুলি তার মনে পড়তে লাগল। সবিতার আজকের কথাগুলির কয়েকটা বিদ্যুতের মত স্মৃতিপটে জেগে উঠতেই অকস্মাৎ বিজন সোজা হ'য়ে উঠে বসল। সারাদিন আনন্দ-কলরব ব্যস্ততার মধ্যে সবিতার কথাগুলি যে নিছক হাস্য-রসের উপাদান এনে দিয়েছিল, এখন নির্জ্জন ঘরের নিঃসঙ্গতায় সেই কথাগুলি এক বিচিত্র ইঙ্গিত নিয়ে তার কাছে দেখা দিল। ঠিক ঠিক, সবিতা আজ তাকে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করবার জন্যে অনুরোধ ক'রচে—বারবার বলচে তার হাতে খুব সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে আছে—বিজনের অনুমতি পেলেই এখনি সব আয়োজন ঠিক ক'রে ফেলে। এই রকম সবিতার আরো অনেক কথা একটি একটি ক'রে বিজনের মনে পড়তে লাগল। মনে প'ড়ল তার কাছে কত চিঠিতে রাণীর অসংখ্য গুণপনার বর্ণনা—বিজনের জন্য রাণীর সেই সশ্রদ্ধ ব্যাকুল প্রতীক্ষার কত খুঁটিনাটি কাহিনী। মনে পড়ল বেড়াতে যাবার ঠিক আগে বিজনের মুখ থেকে রাণীর নাম ধরে তাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন শোনবার সবিতার সে কি ঔৎসুক্য। মনে পড়ল বাড়ীতে এসেই সবিতার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তে একথা-সেকথার পর যখন বিজন একরকম রহস্য ক'রেই বললে যে বিয়ে করা তার আর হ'য়ে উঠবে না—তখন সবিতার মুখের গভীর নৈরাশ্যের সেই ছায়া, সেই কাতর অশ্রুত্যাগ। সমস্ত ভেবে বিজন প্রথমটা অবাক হ'য়ে গেল। সবিতার এই সব রসাত্মক গভীর ইঙ্গিত সে বোঝেনি? বোঝেনি এই ব্যাকুলতা? মাধবীকেই তো নির্ব্বাচিত পাত্রী হিসাবে সবিতা বার বার ইঙ্গিত ক'রেচে। হাঁ দিদির আনন্দই সবচেয়ে বেশি হবে। বিজনের হাতে মাধবীকে সঁপে দিতে পারলে তাকে এমনটি ক'রে মানুষ করা সবিতার যে পরিপূর্ণ সার্থক হয়। সবিতার স্থির ধারণা মাধবীকে গ্রহণ করবার যোগ্যতা একমাত্র বিজনেরই আছে। বিজন জানে ভ্রাতৃ গর্ব্বে সবিতা গর্ব্বিতা।

তারপর বিজন ভাবতে লাগল, কি ভাবে এ প্রস্তাব করা যেতে পারে। কি ভাবে ক'রলে খুব শোভন হয়। কাল যদি সবিতাকে একান্ত নির্জ্জনে সে তার এই ইচ্ছার কথা তাকে বলে তাহ'লে কেমন হয়? নাঃ, তার সুবিধে হবে না। বলবার সময় যত রাজ্যের নিদারুণ লজ্জা তার কণ্ঠকে রুদ্ধ ক'রে দেবে—কোন মতে সে একটি কথাও উচ্চারণ ক'রতে পারবে না। আরও একটা লজ্জাকর বাধা আছে এত শিগ্‌গীর এই প্রস্তাব করার মধ্যে। সবিতার যে স্থির ধারণা বিজনই একমাত্র যোগ্য মাধবীকে গ্রহণ করবার এবং বিজনের হাতে সঁপে দিতে পারলে সবিতা সত্য ধন্য হয় একথা ঠিক; কিন্তু একদিনের এই পরিচয়ে বিজনের এমনতর ব্যগ্রতা দেখে সবিতা তো মনে মনে হাসতেও পারে। তার এই গভীর ভালবাসাকে ক্ষণিক মোহ ব'লে সন্দেহ করাও আশ্চর্য্য নয়—যদিও সে সন্দেহ একটা প্রচণ্ড মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বিজনের এই ধারণা দুটি পূর্ণযৌবনা নর-নারীর ভালবাসার গভীরতা সব সময়ে কিছুতেই কালের স্বল্পতা দিয়ে মাপা যায় না। যারা মাপতে যায় তারা ভুল করে—প্রেমকে করে

অপমানিতা। এ সত্য কোন বই থেকে সে পায়নি, পেয়েচে নিজের জীবন থেকে তার নিবিড় উপলব্ধি দিয়ে। কিন্তু সবিতার মুখের সামনে এই প্রস্তাব ক'রতে যখন এত বাধ তখন অন্য কোন উপায়ের শরণাপন্ন হ'তে হবে। কি উপায়? কি ক'রে এ প্রস্তাব করা যায়। ভাবতে ভাবতে একটা উপায় তার সহজ ব'লে মনে হ'ল। হাঁ তাই করলে তো সব দিক দিয়ে জিনিষটা সহজ সরল শোভন হয়। তাই সে করবে স্থির ক'রলে। শিলঙ গিয়েই তার প্রার্থনা জানিয়ে প্রতাপবাবুকে একখানি চিঠি লিখবে, আর বেশি-দিন অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তারপর—

চিঠিখানি ফেলবার পর কি হবে সেটা ভাবতে বিজনের খুব আনন্দ হ'ল। বাইরের ঘরে প্রতাপবাবু হয়ত ব'সে কাগজ পড়চেন—একা, খট্ খট্ শব্দ ক'রে পিয়ন দিয়ে যাবে এক চিঠি। প্রতাপবাবু চিঠিখানি পড়বেন একবার দুবার তিনবার। আনন্দে মুখ তাঁর হবে উজ্জ্বল, উল্লাসে প্রায় চীৎকার ক'রে চাকরকে ডেকে সবিতার কাছে পাঠিয়ে দেবেন সেই চিঠি। সবিতা হয়তো তখন সংসারের কাজে ব্যস্ত, তাকে সাহায্য করচে মাধবী। কর্ম্মরতা সবিতার চিঠি খুলে পড়বার উপায় নেই তখন মাধবীকে চিঠিখানি পড়ে শোনাতে ব'লে সাগ্রহে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। মাধবী চিঠির খানিকটা পড়তেই তার সমস্ত মুখ টকটকে রাঙা হ'য়ে উঠবে, পরমুহূর্ত্তেই চিঠিখানি সবিতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মাধবী সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। তার হয়তো তখন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়বে—অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবেশে বুক উঠবে দুলে দুলে। মাধবী শিলঙ বড় ভাল-বাসে। তার সঙ্গে শিলঙে থাকবার সময় কতদিন হয়তো ঐ দিনের লজ্জাকর ঘটনা নিয়ে অভিযোগ ক'রবে। চিঠি-খানি পড়বার পর সবিতার সেই আনন্দদীপ্ত পরিতৃপ্ত মুখ-খানি বিজন দেখতে পাচ্চে—এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্চে। বাড়ীতে সেদিন কি উল্লাস!

মাধবী হবে তার, সম্পূর্ণ তার একার। এই কটি কথার মধ্যে যে গভীর রসের ইঙ্গিত র'য়েচে তা যেন বিজন সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি ক'রল। এক মেয়ে—যার শিক্ষা মননশক্তি স্বকীয়তা অসাধারণ—যার সৌন্দর্য্য ফেনোচ্ছল মদের মত উপচে উপচে পড়ে—তার প্রত্যেকটি কথায় হাসিতে চাউনিতে দেহের লীলায়িত ভঙ্গীতে তার মনে এক অনির্ব্বচনীয় রসলোকের আশ্চর্য্য স্পর্শ সঞ্চার করে। সেই মেয়ে তার সম্পূর্ণ একার, এ কথা ভাবতে কি সম্মোহন। সে ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো কোন অধিকার নেই তার দেহের উপর। কেবল আছে তার—তার একার; সে তাকে নিজের ইচ্ছামত চালনা ক'রবে, নানা ভাবে নানা রসে তাকে ক'রবে নিবিড় উপভোগ। তার সমস্ত দেহ—যা তার কাছে সমুদ্রের চেয়ে আশ্চর্য্য সুন্দর বিস্ময়কর রসে গভীর—সেই দেহের উপর তার একাধিপত্য বিস্তার ক'রবে। তার অসীম রহস্য ক'রবে উন্মোচিত। ভাবতে ভাবতে কি এক উত্তেজনায় তার নাভীস্থ মাংসপেশী ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হ'তে লাগল।

তীব্র উত্তেজনায় বিজন বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। বাইরে সুস্নিগ্ধ রাত্রি জ্যোৎস্নায় হাসচে। অদূরে সারি সারি নারকেল গাছের রোমাঞ্চিত দীর্ঘ পাতায় আলো উঠচে ঝলমলিয়ে। সেই আলোর স্পর্শে প্রতি পল্লব যেন মর্ম্মরিত হ'চ্ছে। সেইদিকে চেয়ে অকস্মাৎ মাধবীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর আর্দ্র হ'য়ে এল। আজ এই যে তার নব জীবনের প্রস্তাবনা হ'লো এই সবের উৎস তো ঐ মেয়েটি—যে তার বিবর্ণ নীরস জীবন নদীতে দেখিয়েচে। সে না দিলে হয়তো জীবন এমনি ক'রেই কাটতো, নিজের জীবনের এই ভয়াবহ অভাব এই নিষ্ঠুর দৈন্যের কথা সে জানতেও পারতা ন। ঐ মেয়েটি জীবনে না এলে রঙ্ ও রসে জীবনকে অনির্ব্বচনীয় ক'রে তোলবার সুযোগ সে পেত কোথা থেকে? আজ এই মুখর রাত্রে বিজনের ইচ্ছা হ'ল মাধবীর কাছে নিজের মনের সব কথা অকপটে ব্যক্ত করে, আর তার সেই শুভ্র কমনীয় করপুট একান্ত আগ্রহে নিজের কম্পিত করপল্লবের মধ্যে গ্রহণ ক'রে বারবার শুধু এই কথাই বলে: ভুলবো না, কখনো ভুলতে পারবো না—সত্যিকার বেঁচে থাকার মন্ত্র তুমিই আমাকে শিখিয়েচো রাণী।

তারপর সেই নির্জ্জন তেতালায় জ্যোৎস্না এসে পড়া ঘরে নিরালা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আরও অনেকক্ষণ কাটল। কি তীব্র মধুর অনুভূতি! বিজন ভাবলে, জীবনে এমন অনুভূতির স্বাদ তো কখনো পাইনি। এই যে বাইরে এমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না—কাছে দূরে গোপনচারিণীর অস্ফুট গুঞ্জনের মত এই মর্ম্মরধ্বনি—এই সবের সঙ্গে আমার প্রথম প্রিয়াকে

কল্পনা ক'রে প্রতি মুহূর্ত্ত কি তীব্র মধুর রসোপলব্ধিতে আমার সমস্ত অন্তর ভরে উঠচে। পৃথিবীতে যত কিছু রূপ রস আনন্দ—মানুষের অনুভূতির মধ্যেই তার একমাত্র সার্থকতা—এ কথা আজ আমি নতুন ক'রে যেন অনুভব করচি। কি তীব্র কি মধুর কি আনন্দোচ্ছ্বসিত প্রতি মুহূর্ত্তের এই গাঢ় অনুভূতি!

আজ এই সুরভিত রাত্রে অনেকদিন আগেকার পড়া একটা কবিতা হঠাৎ তার মনে পড়ল। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন রসলোকের এক আশ্চর্য্য অনাস্বাদিত স্পর্শ সঞ্চার করল তার মনের বৃন্তে। মর্ম্মদোলায় লাগল দোলা। ভ্রমরের মত সেই কবিতা যেন জীবন্ত প্রাণবান হ'য়ে তার অন্তরে গুঞ্জরণ ক'রতে লাগল। ফাল্গুনের গভীর আরক্তক পলাশ বনের মত মনের ভেতরটা রঙ আর রসে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। মনে মনে সে আবৃত্তি ক'রতে লাগল:

সেই রূপ ধ্যান করি অঙ্গে মোর লাগিল যে
স্ফুরৎ কদম্ব শিহরণ।
দেহ হ'তে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজ
প্রীতি প্রেম সেতুর বন্ধন।
পাপ মোহ লালসার লাল নীল রশ্মিমালা
বরতনু ঘেরিয়া তোমারি।
লাবণ্যের ইন্দ্রধনু শোভা ধরে নাহি জ্বালা
মুগ্ধ হনু আনন্দে নেহারি।
তারপর যতবার দেখিয়াছি সখি তোর
নগ্ন তনু শুভ্র অশোভন।
মানস কলঙ্কমসী লোক শিক্ষা সুকঠোর
অকাতরে ক'রেছি মোচন।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি ওষ্ঠে শুষি সব রস
কণ্ঠসিক্ত গীত রসায়নে।
ও রূপ দীপক রাগে দাহ করি অপযশ
দেহ-দীপ জ্বালানু যতনে।
প্রেম আর পরমায়ু এর লাগি যত ব্যথা
মানবের তৃষ্ণা চিরন্তন—

এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি ক'রেই হঠাৎ এই লাইনটায় এসেই সে থেমে গেল। তার মনে আস্তে আস্তে যে আবেশ ঘনিয়ে উঠছিল শেষের পংক্তিটা তাকে অকস্মাৎ বিস্ময়ে স্তব্ধ ক'রে দিলে। বিজন নির্ব্বাক হ'য়ে থেমে রইল. মনের ভিতরটায় কবিতার শেষ পংক্তিটা বার বার ঝঙ্কার দিতে লাগল। বাইরে আলোকিত রাত্রি, মৃদু মর্ম্মর কাণে আসচে—সেই দিকে চেয়ে বিজন চুপ ক'রে কত কি যেন ভাবতে লাগল, বুকের ভেতরটা কি কারণে জানিনা সহসা উঠল উদ্বেলিত হ'য়ে! এই কবিতা সে অনেকবার প'ড়চে কিন্তু কোনদিন তার কোন লাইন এমন ক'রে তাকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক করেনি, এমন অকস্মাৎ সমস্ত বুক উদ্বেল হ'য়ে ওঠেনি কবিতার একটি চরণে। এই বিস্ময় এবং রহস্য নিয়েই হয়তো সত্যকার কবিতা। অনেকক্ষণ পরে বিজন যখন নিজের মধ্যে ফিরে এল তখন তার মনে হ'ল এই কথা।

রবীন্দ্রনাথকে তার মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর বিধাতৃ-তুল্য সৃষ্টির কথা। পৃথিবীতে ছোট বড় অনেক কবি জন্মেচেন, তাঁদের কাব্যের সঙ্গে বিজনের পরিচয় আছে—কিন্তু কার কবিতা রবীন্দ্রনাথের মত আত্মার গভীরতম মূলে এমন ক'রে স্পর্শ ক'রে? জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কজন কবি পৃথিবীতে এসেচেন? কার রচনায় মানব জীবনের সমস্ত বিস্ময় রহস্য এমন আগুনের দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে? সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালের যৌবন কোন কবির কণ্ঠে জয়মাল্য দেবে? তিনি রবীন্দ্রনাথ। বিজন মনের আবেগে বললে। কত কবিতা মনে পড়ল, আর নিজের মনেও এল কথা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নিজের প্রকাশের ভাষা পেল:

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এককোণে
রচিব আপন মনে
ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা
ক'রেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া নদীটির ধারা
গোধূলীতে ঘরে আনা সন্ধ্যাটির তারা
চামেলীর গন্ধটুকু জানালার ধারে
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

দরজার কাছে শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ হ'লো একবার—পরক্ষণেই বিজনের স্বপ্নের সূক্ষ্ম জালকে টুকরো টুকরো ক'রে

জ্যোৎস্নাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়ে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল। নিমেষে তীব্র শাদা আলোর স্রোতে ঘর গেল প্লাবিত হ'য়ে। দুঃসহ বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে জিনিষ তার চোখে পড়ল তাতে সে ভয়ানক বিস্মিত হ'ল। মাধবী এসে ঢুকেচে ঘরে। তার সাজসজ্জা প্রসাধন আশ্চর্য্য সুন্দর। কিন্তু তার সযত্ন রচিত কবরী ত্রস্ত বিপর্য্যস্ত, স্বভাব সুন্দর কমনীয় মুখের সেই অম্লান রক্তিম দীপ্তি একেবারে নিষ্প্রভ, সে মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ পাংশু তাতে রক্তের লেশমাত্র নেই। বিজন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এ কি ভয়ানক শুষ্ক পাণ্ডুরতা ঐ আশ্চর্য্য সুন্দর মুখে! কিন্তু তার বিস্মিত কণ্ঠে কোন কথা উচ্চারিত হবার পূর্ব্বেই মাধবী সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার ক'রে জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

অপরিসীম বিস্ময়ে একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে বিজন বললে: 'আলো নিভিয়ে দিলেন যে?'

মাধবী সহজভাবে বললে: 'যাক না, বেশ তো জ্যোৎস্না আসচে। আসুন খাটে গিয়ে বসি।'

এই জনশূন্য ত্রিতলে অন্ধকার ঘরে তার সঙ্গে পাশাপাশি খাটে বসবার কল্পনা ক'রে বিজনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যে মেয়েকে সে তিল তিল ক'রে ভালবেসেচে আজ এতক্ষণ যার মধুর কল্পনা তাকে বিহ্বল স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, দুদিন পরে যাকে নিয়ে তার নব জীবনের প্রথম প্রভাতের উদ্বোধন হবে—দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা যাকে অহরহ কামনা করচে—সেই মেয়েকে এই নির্জ্জন জনহীন ত্রিতলের অন্ধকার ঘরে সম্পূর্ণ একান্ত ক'রে পাবার কল্পনা তাকে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত ক'রতে পারল না। বরঞ্চ মনে হ'ল অন্যের এই প্রস্তাব তাকে নিগূঢ় বিস্ময়ে বিহ্বল ক'রে তুলেচে। মাধবীর কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক শুষ্কতা তাই তার কাণে ঠেকল না।

মাধবী পুনরায় অস্বাভাবিক নীরস কণ্ঠে বললে: 'আসুন বসি। ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচি।'

বিজন কেবল বললে: 'চলুন।'

যন্ত্রচালিতের মত বিজন খাটে গিয়ে বসল। মাধবী বসল ঠিক তার সামনে—একেবারে মুখোমুখি। তার এই প্রচণ্ড সাহস ও রহস্যময় আচরণ প্রথমটা বিজনকে নির্ব্বাক ক'রে দিল। এই জনশূন্য নির্জ্জন ত্রিতলের ঘর অন্ধকার ক'রে তার সঙ্গে একই শয্যায় এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সতে মাধবীর এতটুকু লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা হ'ল না। বাড়ীতে লোকের অভাব নেই—যে কোন মুহূর্ত্তে যে কেউ এখানে এসে পড়তে পারে এবং এই অবস্থায় যদি তাদের দুজনকে দেখে তাহ'লে কি ভাববে। কি ভাববে! ঐ যে মেয়েটি তার সামনে এমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছে সে কি এখানে বাড়ীর কারো আকস্মিক উপস্থিতির কথা একটিবারও ভেবে দেখেনি? ভাবেনি কি এর ফলাফল কি হ'তে পারে? বিজনকে সে ভালবাসে—অন্তরে তার বিজনের আসন—তাই তার সঙ্গে এমন ঘরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসতে তার কোন লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নেই এ ঠিক, কিন্তু বিজন ছাড়া যে বাড়ীতে ঢের লোক আছে। সেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা কি মাধবী প্রয়োজন মনে করে না? জিনিষটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম ক'রে এক লজ্জাকর আশঙ্কায় ও অস্বোয়াস্তিতে বিজন ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু আলোটা জ্বেলে দেবার কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

আলো ছায়ার এই অস্পষ্টতার মধ্যে বিজনের এই দ্বিধা মাধবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না। অকস্মাৎ বিজনের মর্ম্মস্থলে সজোরে নাড়া দিয়ে ব'লে উঠল: 'ওকি ভাল হ'য়ে ব—সু—ন। এমন জড়ো সড়ো হ'য়ে ব'সে আছেন কেন? ঘর অন্ধকার ক'রে দিলুম ব'লে?'

সত্য কথাটা অকপটে স্বীকার ক'রতে পারলেই বিজন বাঁচে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে কোন কথাই তার মুখে এল না। মাধবী এক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'তাতে কি হ'য়েচে? আপনার এতে লজ্জার কোন কারণ নেই। আপনার সঙ্গে আমাকে এখানে এমনভাবে দেখলে বাড়ীর কেউ দোষের মনে ক'রবে না। খালি আপনারই সঙ্গে আমি এমনভাবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসতে পারি, আর কারো সঙ্গে নয়। কারণ আমার আত্মীয় পরিচিত সবারের চেয়ে আপনাকে আমি আপনার ভাবি। যদিও আমাকে আপনি মাত্র আলাপী ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না।'

এ কি রহস্য! বিজন অবাক হ'য়ে বললে: 'এত বড় মিথ্যে ধারণা কোথা থেকে হ'ল আপনার?'

'মিথ্যে ধারণা আমার?'

'তা ছাড়া আর কি।'

'সত্যি সত্যি ক'রে বলুন আমাকে পর ভাবেন না?'

'পর ভাবি ?' বিজন নিজের অন্তরের দুর্ণিবার আবেগকে প্রাণপণে রোধ ক'রে বললে : 'একথা আমি এখন ব'লতে পাচ্ছি না—কিন্তু আমার অন্তর্যামী তার সাক্ষী। আমার মনের কথা কি এখনও আপনার জানতে বাকি আছে ?'

ব'লে মাধবীর দিকে নির্ণিমেষে তাকিয়ে দেখলে সে আনমিত মুখে কোলের উপর ন্যস্ত শিথিল বাঁ হাতখানির তালুর উপর অন্য হাতের আঙুলগুলি আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। হঠাৎ সে মুখ তুলে বিজনের দিকে তাকালে। সে মুখ তেমনি বিবর্ণ রক্তলেশহীন, তাতে অন্তর্দাহের চিহ্ন প্রকট হ'য়ে উঠেচে। অভিযোগ ক'রে বললে : 'যদি—যদি তাইই ভাবেন তবে কেন এখনও এই সামান্য ব্যবধানটুকু কাটিয়ে উঠতে পাচ্চেন না ?'

'কোন ব্যবধান ?'

'এই আপনি তুমির। আমাকে নাম ধরে কেন তুমি ব'লে ডাকেন না !'

'কিন্তু এ অনুমতি তো পাইনি।'

'অনুমতি—কিসের অনুমতি ? যেখানে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার সেখানে কি কেউ তুচ্ছ অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাকি ? এখন থেকে আমাকে নাম ধরে তুমি ব'লে ডাকবেন। এই আমি চাই।'

বিজনের শিরায় শিরায় সহসা উদ্দাম গতিতে উষ্ণ রক্তস্রোত সঞ্চারিত হ'ল। কথাটা তার মুখে যে কোন অবস্থায় উচ্চারিত হ'তে পারে এটা বিজন কল্পনাতেও স্থান দেয়নি। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার সে নানা ছলে কৌশলে তার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার প্রয়াস ক'রেচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—এইজন্য ক'রেচে আঘাত—কিন্তু মাধবী সর্ব্বক্ষণ নিজেকে গোপন ক'রেচে—এই স্বীকারোক্তির হাত থেকে নিজেকে বার বার বাঁচিয়েচে—কিছুতেই ধরা ছোঁয়া দেয়নি। তাই এই নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে একান্ত নিরালায় তার প্রেমাস্পদের মুখে এই কথাটা আবেগকম্পিত ভাষায় উচ্চারিত হ'তে বিজনের সর্ব্বাঙ্গ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ও অপরিসীম বিস্ময়ে যেন শিথিল হ'য়ে এল। তাদের দুটির মধ্যে অনেক কথাই অনুচ্চারিত ছিল কিন্তু গোপন বা অস্পষ্ট ছিল না কিছুই। মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বিজন ভাবলে, নিজের এতবড় দুর্ব্বলতা মাধবী কি ক'রে নিজেকে বিজন সামলে নিলে। তারপর সহজভাবে হেসে বললে : 'তাই হবে গো, তাই হবে। কিন্তু কি নামে তোমাকে আমি ডাকব বলতো ?'

'যে নামে ভাল লাগে।'

'তবে রাণু ব'লেই ডাকব।'

'বেশ।'

'তবে ডাকি ?'

'আপনার ইচ্ছে।'

'রাণু—রাণু—রাণী'

বিজনের কণ্ঠে তার নাম নানাভাবে নানা রসে উচ্চারিত হ'তে থাকল। মাধবী রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে শক্ত হ'য়ে নত-মুখে ব'সে রইল। তার এই নীরবতাকে মধুর লজ্জা কল্পনা ক'রে বিজনের মন হ'ল রসে উচ্ছল, কিন্তু যদি ঐ মুখ আলোয় স্পষ্ট হয় তবে ঐ মুখ ঐ ওষ্ঠ দেখে বিজন চমকে উঠবে। একটু পরে মাধবী বললে : 'কিন্তু সবারের সামনে নাম ধরে তুমি ব'লে ডাকতে হবে। বলুন ডাকবেন।'

'ডাকব ডাকব ডাকব। সুখী হ'লে ?'

'হাঁ।'

'আমার মুখে তোমার নামের ডাক তোমার খুব মিষ্টি লাগে না রাণু ?'

'হাঁ খুব, কেবল আপনারই মুখে।'

'কিন্তু আমাকে তুমি ব'লে কি আজ থেকে ডাকতে পারবে না ?'

'আজ নয় একদিন ব'লব।'

'একদিন তো বলতেই হবে তবে আজ থেকে নয় কেন রাণু ?'

মাধবী তার মুখের দিকে তাকাল। মনে হ'ল সে কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু বোঝবারও প্রয়াস ক'রলে না। বললে : ওকথা থাক, আসুন একটা প্রোগ্রাম তৈরী করি।'

বিজন কোমল কণ্ঠে বললে : 'কিসের প্রোগ্রাম রাণু ?'

মাধবী বললে : 'আমাদের বেড়াবার। ঠিক ক'রেচি কাল থেকে এমন ক'রে বাড়ীতে না থেকে বাইরে বেড়াতে যাবো। মোটরটা কাল থেকে পাওয়া যাবে—কোন কিছুই অসুবিধে হবে না, আসুন না প্রোগ্রামটা তৈরী ক'রে

বিজন তেমনি কোমল কণ্ঠে বললে: 'যা করবার তুমি একাই করোনা রাণু, কেবল আদেশ ক'র তোমার সঙ্গী হব তখন।'

মাধবী ঘাড় নেড়ে বললে: 'না তা হবে না, আসুন দুজনে মিলে করি।'

দুজনে প্রোগ্রাম তৈরী ক'রতে ব'সল। কলকাতার কোন্ কোন্ দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে তারা যাবে এই নিয়ে কথা হ'ল। এ ছাড়া মোটর ক'রেই তারা ঘুরবে। ব্যারাক-পুরের নির্জ্জন প্রশস্ত রাস্তার উপর দিয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে মোটর চালাবে বিজন—আর তার পাশে ব'সে সেই পরিপূর্ণ গতির পুলক—সেই অনাস্বাদিত বুকের রক্তে দোলা দেওয়া উত্তেজনা—মাধবী সর্ব্বাঙ্গের রোমকূপ দিয়ে তীব্রভাবে অনুভব ক'রবে। কিম্বা ভয়ব্যাকুল দুটি বাহু দিয়ে বিজনকে জড়িয়ে ধরে বলবে: থামাও থামাও আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। এখন পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে স্থায়ী, সেই জ্যোৎস্নাভরা গঙ্গায় তারা ষ্টীমার ক'রে বেড়াবে। বাড়ীতে গানে গল্পে সাহিত্যআলোচনা ইত্যাদিতে তাদের দিনরাত্রি মধুতে ভরে উঠবে। প্রোগ্রাম করা হ'লে পর মাধবী মনে মনে বললে: এমনি ক'রে কাটবে আমাদের দিনরাত্রি। সকলে দেখবে আমাদের দুজনের মধ্যে কি গভীর অন্তরঙ্গতা। প্রিয় মিলনের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে আমার মুখ চোখ ঝলমল ক'রবে। এই সব দেখবে সেই শৈবাল, আর রোষে ক্ষোভে হিংসায় আক্রোশে নিজে জ্বলে পুড়ে অস্থির হ'য়ে মরবে। শৈবালের সেই অতীব মর্ম্মদাহের ছবিটা কল্পনা ক'রে মাধবী ক্ষণিকের জন্য একটা হিংস্র আনন্দের রসাস্বাদ করলে।

কিন্তু এ কতটুকু! কতটুকু এ হিংস্র আনন্দের স্থিতি! শৈবালের নিষ্ঠুরতম আঘাত কুৎসিত বিদ্রূপ মর্ম্মান্তিক অপমান সমস্ত মিলিয়ে তার বুকের ভেতরটায় যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তার অসহ্য জ্বালা মর্ম্মান্তিক দাহ প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে অস্থির চঞ্চল ক'রে তুলছিল। মনে মনে শৈবালকে বার বার কঠিন আঘাত ক'রে তাকে অতি নীচ ক্ষুদ্র হেয় জঘন্যচরিত্র প্রতিপন্ন ক'রেও যখন তার বুকের অনির্ব্বাণ জ্বালাকে এতটুকু স্নিগ্ধ ক'রতে পারল না তখন সে উন্মাদ ভঙ্গীতে মনে মনে ব'লে উঠল: ঈর্ষা ঈর্ষা! আমি বিজনের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা ক'রচি ব'লে ওর আর সহ্য হ'চ্চে না—হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরচে। কিন্তু কেন আমি মিশবো না, হাজারবার এমনি অন্তরঙ্গভাবে মিশব—মিশব—মিশব। সে নিষেধ করবার বাধা দেবার কে? তার ভ্রূকুটি তার ক্রোধকে কে গ্রাহ্য করে? কি অসহ্য স্পর্দ্ধা সেই নীচ ঘৃণ্য হেয় লোকটার! শৈবালের কথাগুলি মনে প'ড়ে বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল। পুনরায় নিজের মনেই সে বলতে লাগল: কেন আমি অস্বীকার ক'রব যে বিজন আমাকে সব দিক দিয়ে মুগ্ধ ক'রেচে, শ্রদ্ধান্বিত ক'রেচে! তাকে আমি ভালবাসি তো, খুব ভালবাসি। আমার অন্তরে তার আসন। আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু আমার সমস্ত মন অহরহ ওকে কামনা ক'রচে। ওর ভালবাসা পাবার জন্য আমি কাঙালের মত অপেক্ষা ক'রে আছি! এই মুহূর্ত্তে বিজন যদি আমাকে কাছে টেনে নেয়—বুকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখ অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেয়, তবে আমি সুখী হই তৃপ্ত হই। কেবল ওরই আছে আমার দেহের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার। আর কারো নয়—নয়—নয়। এই বিজনকে তুচ্ছ ক'রতে বিদ্রূপ ক'রতে চায় কিনা সেই নগণ্য শৈবাল, প্রতিদ্বন্দ্বী হবার প্রয়াস করে কিনা তার, যার পায়ের ধূলো হবার যোগ্যতা তার নেই। কি হাস্যকর, কি করুণাকর তার এই প্রয়াস! পৃথিবীতে তাহ'লে সবই সম্ভব। একটা অতি ক্ষুদ্র মূষিকও তো সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারে। কেন পারেনা, যদি শৈবাল পারে বিজনের মত যুবকের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার প্রয়াস ক'রতে।

তারপর তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এমনতর অনেক প্রকারের হিংস্র প্রতিশোধ নেবার কল্পনা উদয় হ'ল। হঠাৎ এক সময়ে তার মনে পড়ল শৈবালের সঙ্গে তার আশৈশব পরিচয়। এই চিন্তাটা নিবিড় ঘৃণায় তার সমস্ত দেহকে যেন আকুঞ্চিত ক'রে তুলল। ছি ছি, মাধবী সমস্ত মুখ ঘৃণায় বিকৃত ক'রে বললে: কি ক'রে পেরেছিলাম, তার সঙ্গে এতকাল মেলামেশা ক'রতে! দেহ মন যার এমন কৃমি-পঙ্কিল তার সঙ্গে আমার মেশা সম্ভব হ'য়েছিল কেমন ক'রে? কিন্তু আমি জানব কি ক'রে—তার বাহ্যিক ভদ্রতার নীচে এমন একটা অতি ঘৃণ্য জঘন্য নীচ মানুষ আত্মগোপন ক'রে আছে। আজ যখন জানলাম তখনই তো তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ করলাম।

আজই তার সঙ্গে আমার সব শেষ হ'ল। আমার জীবন থেকে সে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাক্—আমি বাঁচি আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হই। জানি একদিন এমনদিন আসবে যেদিন নিজের ভয়ানক ভুল নিজের কাছেই ধরা পড়বে কিন্তু সংশোধনের সময় আর পাবে না। যে জিনিষ শৈবাল নিজের পাপে জন্মের মত হারালে তার জন্য সারা জীবন তাকে কাঁদতে হবে। ব'লতে ব'লতে তীব্র প্রতিহিংসার হিংস্র আনন্দের পরিবর্ত্তে একটা দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ তার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠল।

তারপর দুজনের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। এই জনশূন্য অন্ধকার ঘর—এই রোমাঞ্চকর গাঢ় আবহাওয়া—মাধবীর শারীরিক উপস্থিতি—তার দ্রুত নিঃশ্বাস পতন—সমস্ত কিছু বিজন সূক্ষ্ম সত্ত্বা দিয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত অনুভব ক'রতে লাগল। বাইরে মর্ম্মরিত নীল রাত্রি, এইমাত্র একখণ্ড কাল মেঘ চাঁদকে আড়াল ক'রল, ঘরে পড়ল তারই দীর্ঘতর ছায়া। সেই ছায়ায় মাধবী হ'ল আরো অস্পষ্ট, তবু বিজন হৃদয়ঙ্গম ক'রলে ঐ অবলার গভীর চোখে কামনার আগুন জ্বলছে। পরনির্ভরশীল দুটি কোমল বাহু আত্মসমর্পণের জন্য উৎসুক, তাই শিথিল হ'য়ে এলিয়ে প'ড়েচে। বিজনের ইচ্ছা করল উঠে তার পাশে গিয়ে বসে ঐ দুটি শিথিল এলায়িত পরনির্ভরশীল বাহু তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ব'সে থাকে, নাড়াচাড়া করে। প্রথমে একটুখানি চাপ দেয়, একটু পরে আর একটু জোরে, তারপর আরো জোরে। তার বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে ঐ দুটি কোমল কমনীয় হাত একটু একটু ক'রে তিলে তিলে নিষ্পেষিত চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'ক। ঐ দেহের উপর একা তারই তো অধিকার। বিজনের নিঃশ্বাস পতন অতি দ্রুত হ'ল—পুনরায় তার নাভিস্থ মাংসপেশী ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত এবং প্রসারিত হ'তে লাগল। কি দুর্দ্দমনীয় শক্তিতে মাধবী তাকে তিলে তিলে আকর্ষণ ক'রচে। বিজনের সর্ব্বাঙ্গ সহসা অবশ শিথিল হ'য়ে এল। আর মহাকালের অসীম সমুদ্রে চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি একটি একটি ক'রে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে লাগল।

একটু পরে মাধবী বললে: 'চলুন এবার!'

'কোথায়?'

'খেতে হবেনা রাত দশটা যে বেজে গেল।'

'উঠতে আর ইচ্ছে ক'রচে না রাণু।'

'কি তবে ইচ্ছে ক'রচে?'

'তোমার পাশে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে। কি আরাম!'

'আমার পাশে বসে থাকলে তো আর পেট ভরবে না, উঠুন।'

'চাইনা পেট ভরাতে—যদি তোমাকে পাই।'

মাধবী মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবল, পরক্ষণেই বিজনের কাছে এগিয়ে এসে তাকে অপরিসীম বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে তার একখানি হাত ধরে চুপি চুপি বললে—'কথার অবাধ্য না হ'য়ে এখন ভাল ছেলের মত উঠে আসুন।' ব'লে তার হাত ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ থামল, মুহূর্ত্তকাল কি ভেবে বললে: 'আচ্ছা এটা হ'লে কেমন মজা হয়?'

বিজন অসাধারণ শক্তিতে নিজেকে সামলে বললে: 'কোনটা রাণু?'

'এই ধর তেতালায় ঘর অন্ধকার ক'রে খাটের ওপর পাশাপাশি ব'সে আমরা দুজন চুপি চুপি গল্প ক'রচি এমন সময় শৈবাল যদি এসে এটা দেখে তাহ'লে সে কি করে বল তো?'

'বোধ হয় লজ্জায় দৌড় দেন।'

'ইস্ লজ্জায় দৌড় দেয় বৈ কি। বুকের জ্বালায় বাড়ীতে গিয়ে আত্মহত্যা করে তাহ'লে।'

তার কণ্ঠের অস্বাভবিক উত্তেজনা ও মুখ চোখের হিংস্র ভঙ্গী অন্ধকারে বিজন ঠিক বুঝল না। তার কথাকে রহস্য মনে ক'রে সেও রসিকতা ক'রে বললে: 'তবে দোহাই তোমার, তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দাও। নইলে একজনের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হ'তে হবে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিজন বললে: 'কিন্তু যাই বল রাণু পুরুষমানুষের এ রকম লজ্জা মোটেই শোভা পায় না। আজ দিদির সঙ্গে একটু আগেই শৈবালবাবুর সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল। মাঠে দেখা হওয়ায় কথা ইত্যাদি ব'লে খুব খানিকটা হাসলাম। কিন্তু দিদি দেখলাম হঠাৎ গুম হ'য়ে গেল। হাজার হোক স্নেহের পাত্র তো—তাকে নিয়ে এমনভাবে হাসাহাসি করাটা পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক।'

মাধবীর সর্ব্বাঙ্গ সহসা যেন হিম হ'য়ে এল। শৈবালের সঙ্গে তার যে অতীব লজ্জাকর কলহের কথা সে কোনরকমে গোপন ক'রে রেখেছিল, অকস্মাৎ বিজন ঐ একটি কথায় তার সমস্ত সবিতার কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রে দিল। যার কাছে সব চেয়ে বড় লজ্জা সেই সবিতাই তো জানল। তবে—তবে আর ঘটতে বাকি থাকল কি! ক্রমশঃ

ভুবনরঞ্জনের 'আনন্দ-বিলাস'

শ্রী নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

ভুবনরঞ্জন উপাধিধারী শ্রীকান্ত নামা কবি স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন 'আনন্দ-বিলাস'।

কাশীখণ্ডের আরও দুইখানি বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একখানি কাশীপ্রবাসী রাজা জয়নারায়ণের ভণিতা সম্বলিত। এখানি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অপর অনুবাদখানির সঙ্কলন-কর্ত্তা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুর গ্রামের 'শূদ্র পণ্ডিত'। এই কবির প্রকৃত নাম ছিল কেবলরাম বসু। ১৩০৬ সালের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় ঐ গ্রামেরই রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই অনুবাদের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আনন্দ-বিলাসের একখানি পুঁথিই পাইয়াছি। পুঁথিখানি দেশী তুলোট কাগজে লেখা মোট পত্রসংখ্যা ৭৩। পত্রের আকার ১৪½ × ৫½ ইঞ্চি। প্রথম ও শেষ পত্র দুইখানি ব্যতীত, অপরগুলি দোভাঁজ করিয়া উভয় পৃষ্ঠে লিখিত এবং প্রতি পৃষ্ঠায় দশ, এগার বা উর্দ্ধ সংখ্যায় বার লাইন বর্ত্তমান।

কবি তাঁহার অনুবাদের প্রারম্ভে জানাইয়াছেন,—

> "বেদব্যাস বিরচিত শ্রীস্কন্দ পুরাণ।
> শ্লোক শত অশীতি সহস্র পরিমাণ॥
> তার খণ্ড কাশীখণ্ড কাশীর ব্যাখ্যান।
> তাহার পয়ার রচি যথা শক্তিজ্ঞান॥"

ইহা অনুসারে আনন্দ-বিলাস সমগ্র কাশীখণ্ডের অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। কাশীখণ্ডের শততম অধ্যায়ের মধ্যে কবি শ্রীকান্ত মাত্র প্রথম চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন। পুঁথি দেখিয়া মনে করিতে পারিতেছি না যে পরে আরও ছিল, কারণ গ্রন্থের প্রথমে কবির যে বংশ পরিচয় আছে, গ্রন্থশেষেও তাহার পুনরুল্লেখ আছে এবং তাহার পরেই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাইতেছি,—

> "কাশীখণ্ড মধ্যে শিবশর্ম্মা উপাখ্যান।
> পয়ার করিয়া রচি যথা মোর জ্ঞান।"

আনন্দ-বিলাসের পুঁথিখানিতে কোনও তারিখ নাই—না রচনার, না নকলের। কিন্তু কবি জানাইতেছেন, তাঁহার পিতামহ শিবরাম বাচস্পতি 'বিদ্যা-বৃহস্পতি' ছিলেন। কোন বিদ্যায় 'বৃহস্পতি' সে কথার স্পষ্টোল্লেখ নাই, তবে বিদ্যাটা তর্ক-বিদ্যা হওয়াই সম্ভব, কারণ কবি তাঁহার পিতারও তর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের গৌরব করিয়াছেন, নিজেরও 'তর্ক-পঞ্চানন' উপাধি ছিল একথা একাধিকবার জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে, নব্য-নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের 'নব্য-মুক্তিবাদ'-এর টিপ্পনীকার—শিবরাম বাচস্পতি ও শ্রীকান্ত কবির পিতামহ—শিবরাম বাচস্পতি অভিন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিজ্ এডোয়ার্ড হল্ সাহেব তাঁহার 'Contributions towards an Index to the Bibliography of the Indian philosophical Systems' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৯) এই টিপ্পনীর উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গদাধরের মূলের সহিত এখানি প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর মহাশয়ের মতে গদাধর সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন এবং এই মতই এখন সুধীসমাজে আদৃত। কাজেই গদাধরের টিপ্পনীকারের পৌত্রের অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর নয়।

আর এক কথা, সংস্কৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে 'পরাকৃত প্রবন্ধ' রচনায় যে কোনওরূপ অপরাধ হয় বা হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা কবি শ্রীকান্তের মনে উদয় হয় নাই, বরঞ্চ তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার অনুবাদ তাঁহার পক্ষে পুণ্যজনক—" শ্রীকান্ত যাহার নাম, খ্যাতি যার ভুবনরঞ্জন। অশেষ রসের ধাম আনন্দবিলাস নাম রচে গীত ধর্ম্মের কারণ॥" ভাষায় বা অ-সংস্কৃতে রচনা যে লোকের মনে তাচ্ছিল্যের উদ্রেক করিবে, এমন সন্দেহও কবির হয় নাই—তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন, "রচিবো পয়ার করি যত ইতিহাসে। সকল সংসার যেন শুনে অনায়াসে।"—যেন দেশে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ তেমন অনায়াসে বোধগম্য হওয়ার দিন গতপ্রায়। এই হিসাবেও কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অনুমান না করাই শ্রেয়ঃ।

পুঁথিতে তারিখ নাই সত্য, কিন্তু পুঁথির বয়স দেড়শত বৎসর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। পুঁথির কালি স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়াছে—ইহা কতকটা অযত্নে রক্ষিত হওয়ার ফল, একথা স্বীকার না করিলে পুঁথির বয়স আরও ঢের বেশী হইয়া পড়ে, কিন্তু পুঁথির অক্ষরাবলী দৃষ্টে তাহা মনে হয় না। পুঁথির ভাষাও অধিকতর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয় না। আদি, মধ্য ও অন্ত হইতে নমুনা স্বরূপ তিনটি স্থান উদ্ধৃত করি :—

> (১) "ইম্বোল অগস্ত্যের পাইয়া দরশনে।
> হৃষ্টপুষ্ট দেখি হৃষ্ট হয় নিজমনে॥
> ইম্বোল অঞ্জলি বান্ধি হঞা সবিনয়।
> চরণে প্রণতি করি অগস্ত্যেরে কয়॥
> অতিথি না পাঞা কালি আছি উপবাসী।
> গ্রহাশ্রম সার্থক করহ ঘরে আসি॥
> আজ যদি তুমি মোর ঘরে না আসিবে।
> নিশ্চয় জানিও আজি উপবাস হবে॥

এতো শুনি অগস্ত্য করেন অনুমান।
অতি ভক্তি ধ্রুব বটে চোরের লক্ষণ॥
ধ্যান যোগে মুনিবর সকল জানিলা।
ইথোলের পাছে পাছে অগস্ত্য চলিলা॥"

(২) "নিশা অবসানে যাত্রীগণ পথে চলে।
দস্যুগণ আসিয়া ঘিরিলো এককালে॥
কেহ বলে ঘির ঘির কেহ বলে মার।
কেহ বলে বস্ত্র কাড়্যা লওরে সভার॥
যত আছে ধন-কড়ী সব লও লুটী।
কাটিয়া পথিকগণে করো কুটী কুটী॥
যাত্রিগণ বলে লুট্যা লও ধন-কড়ী।
কেবল রাখিয়া প্রাণ সভে দেও ছাড়ী॥"
আমরা অনাথ যাত্রি নাথ কেহ নাই।
অনাথ দেখিয়া ছাড়ি দেও চলি যাই॥"

(৩) "জরাতুর শরীর দেখিলাম এখনী।
এখনি হইলা যুবা অদভুত মানি॥
ইহার কারণ প্রভু কহিবারে হয়।
অদভুত দেখি বড়ো হইছে সংশয়॥
বৃদ্ধ বলে সব কথা কহিবো তোমারে।
তোমারে জানিয়ে তুমি না জান আমারে॥
পূর্ব্বজন্মে আছিলা তুমি বিপ্র শিবশর্ম্মা।
বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত নিতান্ত সাধুকর্ম্মা॥"

এই তিনটিকে উনবিংশ শতাব্দীর যে কোনও সময়ের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিত, যদি না পুঁথির বয়সে ঠেকিত।

অতএব ভুবনরঞ্জন অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই আপাততঃ ধরিয়া লইতে পারি। জয়নারায়ণের অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল ১৭১৪ শকে বা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, শূদ্র কবির খানি হইয়াছিল ইহারাও ২৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৩৭ শকে বা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। অধুনা জ্ঞাত তিনখানি অনুবাদের মধ্যে ভুবনরঞ্জনের খানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে হইতেছে।

আনন্দ-বিলাসে সর্ব্বপ্রথম গুরু-দেব ঋষি-ব্রাহ্মণ বন্দনার পরে এবং প্রকৃত অনুবাদ আরম্ভের পূর্ব্বে কবির আত্ম পরিচয় আছে :—

"গৌড় মণ্ডলেতে রাজ্য নাম রাজসাই।
সমুদ্র সমান রাজ্য তুল্য যার নাই॥
তার এক পরগণা নামেতে গোহাস।
তাহার মধুরকোল গ্রামেতে নিবাস॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শিবরাম বাচস্পতি।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বিদ্যাবৃহস্পতি॥
তাহার তনয় রামপ্রসাদ আখ্যান।
তর্কসিদ্ধান্ত বক্তা যাহার ব্যাখ্যান॥
তার সুত শ্রীশ্রীকান্ত তর্ক-পঞ্চানন।
কবিকুল মধ্যে নাম ভুবনরঞ্জন॥
কাশীখণ্ড পুরাণ রচিলা বেদব্যাস।
তাহার পয়ার রচে আনন্দ-বিলাস॥"

এই মধুরকুল বা মধুরকোল গ্রামের অস্তিত্ব এখনও আছে, তবে এই গ্রা
এখনও রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নয়, মুর্শিদাবাদ জেলার এলাকায় খ
নদীর ধারে অবস্থিত। অনুবাদের শেষে কবির যে পরিচয়ের পুনরাবৃ
আছে, তাহাতে তাঁহার পিতামহকে একেবারে 'ব্রহ্ম ঋ (ষি)'র পর্য্যা
ফেলা হইয়াছে। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে ব্যবহৃত বিশেষণগুলিও উল্লেখ
যোগ্য—"গ্রহস্থ আশ্রমী ব্রহ্মচারীর সমান। জিতেন্দ্রিয় মহাজ্ঞা
পরম বিদ্বান।" কবির মাতার নাম ছিল অন্নপূর্ণা, কারণ এক
ভণিতায় পাইতেছি, 'ভাবিয়া ভবানী ভবচরণ অভয়। রচিলো পয়া
অন্নপূর্ণার তনয়।" তাঁহার 'ভুবনরঞ্জন' উপাধি কাহার বা কাহাদে
দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, সে কথা পুঁথিতে প্রকাশ নাই কিন্তু উপাধি
তিনি প্রিয় ও মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, অধিকাংশ ভণিতায়ই ইহা
প্রয়োগ তাহার প্রমাণ।

পুঁথিখানিতে অধ্যায়গুলির প্রারম্ভে ছন্দের নাম লেখা নাই। অব
এমন অনেক পুঁথিতেই থাকে না, কিন্তু বর্ত্তমান পুঁথিতে না থাকা
একটি বিশেষ হেতু আছে। কবি প্রারম্ভেই ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে
'রচিবো পয়ার করি যত ইতিহাসে।" এই উক্তি একটুও নিরর্থক নয়
কেবলমাত্র নবম অধ্যায়টিতে দীর্ঘ ত্রিপদীর ব্যবহার আছে নতুবা বাব
তেইশ অধ্যায়ই পয়ারে লেখা। ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব এই অনুবাদে
একটা গুরুতর ও স্মরণীয় বিশেষত্ব। রচনার গুণে এই বিশেষত্বে
দোষের দিকটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, নচেৎ শ্রীকান্তের গ্রন্থ বি
একঘেয়ে হইয়া উঠিত। ভাষায় আড়ষ্টতা নাই, উহা সুন্দর স্বচ্ছ
অবাধ গতিতে চলিয়া গিয়াছে। কবির অনুবাদ অধিকাংশ স্থ
মূলানুগত, কিন্তু মূলের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া উহাকে অবলম্ব
করিয়া লিখিলেই ভুবন-রঞ্জনের কাব্য প্রতিভার বেশী পরিচয় পাও
যাইত। মূলে নাই, অথচ অনুবাদে সন্নিবিষ্ট যে দুই তিনটি স্থান আ
তাহাতে কবির কবিত্ব অধিকতর ভাল ফুটিয়াছে।

পুঁথিতে ভাষার প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত বহু; ইদিগে উদিগে
'ইসব', যা হইতে' 'যা দিগের', থাক' (থাকুক), হকু' (হউক
'কথাকারে' (কোথায়), 'কেহু' (কেহ), 'সাদ' (সাধ), 'মা
(মাঠ), কৈরাছি', 'দেখ্যা', 'শুক্ষ্ম' ইত্যাদি। এ সকল ভা
লিপিকারের অথবা কবির তাহা স্থির করা দুরূহ। কয়েকটা স্থা
অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ দেখা যায়, 'আঁনন্দ', 'তাঁমা', কাঁন্দিযে
'যেঁন' ইত্যাদি। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' এইরূপ অনাবশ্
চন্দ্রবিন্দুর অজস্র প্রয়োগ আছে এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এর প্রাপ্ত পুঁ
চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত এই মতবাদ প্রচারিত হওয়ায়, যে
কেহ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে ঐ অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু প্রাচীন বাঙ্গা
ভাষার একটা নাকি গুরুতর বিশেষত্ব (idiosyncracy)
আনন্দবিলাসের পুঁথির কয়েকটি অক্ষরের আকার দেখা প্রয়োজ
ঋ'র প্রধান অংশ খ'এর মত না হইয়া ধ'এর মত; ক্ষ অনেকটা ক'
মত, কেবল উপরে মাথার দিকে সামান্য একটু ফাঁক; ব'র তলে ফোঁ
এবং র পেট-কাটা ব; ত'এর মাত্রা বাদ দিয়া ৎ এবং অক্ষরের মা
শূন্য বসাইয়া ং নিষ্পন্ন; ভু'এর আকার বর্ত্তমান ও'র ন্যায়; শ এব
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেকগুলি শ ও লএর সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ষ্টীমারে ভিয়েনা থেকে বুদা-পেশ্‌ৎ

ভিয়েনা থেকে বুদা-পেশ্‌ৎ যাওয়া যায় রেলে, মোটর-ব্যসে, ষ্টীমারে, আর হাওয়াই জাহাজে। শেষোক্ত যানটী এখনও সর্বসাধারণের উপযোগী হ'য়ে উঠে নি—পয়সার দিক্ থেকে। দানুব-নদীর সঙ্গে একটু পরিচিত হবার ইচ্ছে বহুদিন ধ'রেই ছিল ;—তাই ষ্টীমারে ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ যাবো আগে থেকেই স্থির ক'রেছিলুম। দানুব-নদী ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী—রুষদেশের ভল্‌গার পরেই এর স্থান ; আমাদের গঙ্গার চেয়েও লম্বা, গঙ্গা হ'চ্ছে ১৫১৪ ফুট, আর দানুব ১৭৪০ ফুট। দানুবের মত 'আন্তর্জাতিক নদী' জগতে দুটী নেই—জরমানি, অস্‌ট্রিয়া, হঙ্গেরী, চেখোস্‌লোবাকিয়া, যুগোস্‌লাবিয়া, বুল-গারিয়া, রুমানিয়া—এতগুলি স্বাধীন দেশের মধ্য দিয়ে, বা এদের সীমানা স্বরূপ হ'য়ে দানুব প্রবাহিত। এদের কৃষি আর পণ্যবাহন দানুবের উপরেই কতকটা নির্ভর করে ব'লে, দানুব-নদীর জল ব্যবহার আর তাতে ষ্টীমার চালানো প্রভৃতি কতকগুলো বিষয় নিয়ে এই কয়টী দেশ মিলে কতকগুলি আইন কানুন ক'রেছে।

বহুবার ষ্টীমারে ক'রে গঙ্গাবক্ষে—পদ্মায় আর মেঘনায়—ভ্রমণ হ'য়েছে, গঙ্গাকে আশ্রয় ক'রে আমাদের বাঙলার প্রাণের স্পন্দন অনুভব ক'রেছি। ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রোমান্সের আকর-স্বরূপ, জরমান সভ্যতার কেন্দ্র-স্থানীয় রাইন নদীর সঙ্গেও ছাত্রাবস্থায় একটু পরিচয় হ'য়ে-ছিল ; ১৯২২ সালে Mainz মাইন্‌ৎস্ থেকে Coblenz কোব্‌লেন্ৎস্ পর্য্যন্ত রাইন-ষ্টীমারে ভ্রমণ ক'রে, জরমানীর গঙ্গা এই রাইন-নদীর মাহাত্ম্য আর জরমানদের প্রাণে এর স্থান কোথায় তার কিছুটা উপলব্ধি ক'রেছিলুম। এবার মধ্য ইউরোপের অধিবাসী নানা জাতির যোগসূত্র বা নাড়ী দানুবের সঙ্গেও পূরো একটা দিন ধ'রে পরিচয় হ'ল।

১৩ই জুন, বৃহস্পতিবার, সকাল আটটায় ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত হ'লুম। আগেই টমাস কুকের আপিসে টিকিট কেনা ছিল। বারো ঘণ্টার পথ ; জাহাজ সাড়ে আটটায় ভিয়েনা ছেড়ে, রাত সাড়ে আটটায় বুদা-পেশ্‌ৎ পৌছুবে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিয়েছিল ১৩ শিলিং ৬০ গ্রশেন—আমাদের টাকা সাতেক। ষ্টীমার ঘাটে র'য়েছে, কিন্তু যাত্রীদের চ'ড়্‌তে দিতে দেরী আছে। একজন কুলী আমার মাল-পত্রের জিম্মেদারী গ্রহণ ক'রলে। ভিয়েনার কুলী, সব বিষয়ে তাহার বেশ একটু কৌতূহল আছে। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমার দেশ কোথায়। আমি ব'ল্লুম, Indien বা ভারতবর্ষ। "খুব বড় দেশ, খুব পয়সাওয়ালা দেশ, তা আপনি এসেছেন দেশ ভ্রমণ ক'রতে ?"—"হাঁ" ; "লোকে সে দেশে বেশ আরামে আছে ? আমাকেও নিয়ে

দানুব-নদীর দৃশ্য

চলুন না ?" "কেন বলো তো ?"—"মশায়, আমাদের কষ্টের কথা কি আর ব'লবো—এখানে কাজ-কর্ম্ম আর পাওয়া যায় না, বছরের মধ্যে কতমাস arbeitlos অর্থাৎ বেকার ব'সে থেকে, খেতে না পেয়ে আমরা ম'র্‌ছি। আপনাদের দেশে গেলে কাজ তো মিল্‌বে।"—আমার যথাজ্ঞান জরমানে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রলুম, বাপু হে, অবস্থা সর্বত্রই এক ; কাজের অভাবে সেখানেও লোকে বেকার থাক্‌ছে, আর শিক্ষিত ব্যবসায়ের লোকেরা তো দাঁড়িয়া ম'রছে। লোকটা সম্পূর্ণরূপে আমার কথা বুঝ্‌লে কি না জানি না, তবে মনে হ'ল আমার কথায় যেন তার বিশ্বাস হ'ল না।

ষ্টীমার-যাত্রী অন্য নানা লোক জমা হ'য়েছে, আরও

হ'চ্ছে। কতকগুলি তরুণ তরুণী একগাদা সুটকেস্ জড়ো ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে; দেখে বোঝা গেল, এরা সব ছাত্র-ছাত্রী, দলবদ্ধ হ'য়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। একটা লোক, ময়লা পোষাক পরা, গায়ে একটা ময়লা বর্ষাতী কোট চড়ানো, খুব তড়বড়ে' ইংরিজিতে এই দলের সঙ্গে কথা কইছে—জরমান-ভাষীর দেশ ভিয়েনায় ইংরিজি বলে, লোকটা কি, কি বৃত্তান্ত, তখন বুঝতে পারলুম না। দূর থেকে দেখে ইংরেজ ব'লে মনে হ'ল না—গায়ের রঙ্টা ময়লা-ময়লা ঠেক্‌ল। পরে এর পরিচয় পেলুম।

পাসপোর্ট দেখে, টিকিট দেখে আমাদের জাহাজে উঠতে দিলে। ছোট জাহাজ, পদ্মাতে যে সব যাত্রীবাহী জাহাজ চলে, সেই রকম, তবে তার চেয়ে হালকা আর ছোট। দোতালার সাম্‌নেটায় ছাত নেই, খোলা, দরকার হ'লে শামিয়ানা টানাবার ব্যবস্থা আছে। দুইটী শ্রেণী—প্রথম শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণী। যাত্রীদের বস্‌বার জায়গা দোতালায়; সামনের ভাগে দ্বিতীয় শ্রেণী, পিছনের ভাগে প্রথম শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর বসবার ডেকে, খোলা আকাশের তলায়, রেলিঙ্-এর ধারে কাঠের বেঞ্চিতে, অথবা কাম্বিসের আসন-যুক্ত ছোটো ছোটো মোড়া টুলে যাত্রীরা বসে। এ জায়গা বড় সঙ্কীর্ণ; দেখতে দেখতে যাত্রীতে ভ'রে গেল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা চিমনির পিছনের অংশে বসে, তাদের বসবার জায়গাটা ছাতে ঢাকা, ভিতরে বসবার গদী আঁটা বেঞ্চি, তার পরে সব পিছনে শামিয়ানা দেওয়া বারান্দা। খাবার জায়গা নীচের তলায়—প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আলাদা আলাদা। আমি যে জাহাজে চ'ড়লুম এটী হঙ্গেরীয় কোম্পানীর। জাহাজটীর নাম Szent Istvan 'সেন্ত্ ইশ্‌ৎভান্'—অর্থাৎ Saint Stephen; এই Saint Stephen ছিলেন হঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা, তাঁরই আমলে হঙ্গেরী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তিনি খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালে রাজত্ব করেন, হঙ্গেরীয়েরা তাঁর স্মৃতির প্রতি খুবই শ্রদ্ধা দেখায়, রোমান-কাথলিক মতে তিনি একজন saint বা সিদ্ধ-পুরুষ ব'লে গণ্য—তাঁরই নামে এই জাহাজ। অস্ট্রীয়, চেখোস্লোবাকীয়, হঙ্গেরীয়—এদের সব আলাদা আলাদা জাহাজ কোম্পানি আছে, দানুবের তীরে বিভিন্ন নগরে যাত্রী আর মাল নিয়ে যাবার জন্য।

এস্তেরগোম্ গির্জা ও দানুব ষ্টীমার

জাহাজ ছেড়ে দিলে। যাত্রীরা রুমাল নেড়ে বিদায় নিলে। জাহাজ লাল-সাদা-সবুজ তে-রঙা হঙ্গেরীয় ঝাণ্ডা উড়িয়ে চ'লেছে। ভিয়েনার জাহাজঘাটা ক'লকাতার মত বিরাট বা সরগরম নয়। নদীও তেমন চওড়া নয়। নদীর জল ঘোলাটে, আমাদের বর্ষার গঙ্গার মত; একটী জরমান গানে দানুব-নদীকে "নীল দানুব" ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে—নীলত্ব তো কিছুই দেখলুম না। শহর ছেড়ে পূব-মুখো হ'য়ে জাহাজ চ'ল্‌ল। আরোহীরা যে যার বসবার জায়গা ক'রে নিলে। সকাল বেলার মিঠে রোদ্দুরে ছোটো কাম্বিসের টুলের উপর ব'সে নদীর হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু আমরা সূর্য্যদেবের খাস তালুকের প্রজা, তাঁর দুপুরের প্রতাপ কখনও আমাদের সহ্য হয় না। একটু ছায়া-ঢাকা কাঁচের জায়গা ঠিক ক'রে নেওয়া গেল। এ দেশের লোকেরা সারাদিন রোদ্দুরে থাকতে পেলে আর কিছু চায় না—রোদ্দুরে পোড়াকে এরা "সূর্য-স্নান" করা বলে। চড়নদারদের মধ্যে বিদ্যার্থীর দল—ছাত্র-ছাত্রী—সংখ্যায় এরা জন তিরিশ হবে—উপরের সেকেণ্ড-ক্লাস

ডেকের অনেকটা এরাই দখল ক'রে ব'স্‌ল। এদের মধ্যে মেয়েই হবে আর্দ্ধেক। শুন্‌লুম, এরা ভিয়েনার একটা টেক্‌নিকাল-স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, ছুটী হ'য়েছে তাই দলবদ্ধ হ'য়ে বুদা-পেশ্‌ৎ আর হঙ্গেরী ভ্রমণ ক'রতে বেরিয়েছে। দিন দশ পনের ঘুরে, দেখে শুনে আবার বাড়ী ফিরবে। এদের বয়স ১৮ থেকে ২৫।২৬ পর্য্যন্ত ব'লেই মনে হ'ল। কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বেশ ভাব বা ভালোবাসা আছে দেখলুম—মার্কা-মারা প্রেমিক প্রেমিকার মত জোড় বেঁধে এরা চ'লেছে। দেখ্‌তে মন্দ লাগে না—বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার ছেলেগুলি, মেয়েগুলি সুশ্রী—সকলেই স্বাস্থ্যের আর স্ফূর্ত্তি-পূর্ণ জীবনী-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি,—হাসি খুশীর মধ্যেই সব চ'লেছে—এ একেবারে "যৌবনের জয়যাত্রা"। চার পাঁচটী নি—একটা কথা ব'লতেও হয় নি। ছেলেমেয়ের দল ব'সে, রোদ্দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরকার কোট খুলে জাহাজের এখানে ওখানে সুটকেসের উপর সাজিয়ে রেখে দিয়ে, কেউ একখানা বই নিয়ে, কেউ খবরের কাগজ নিয়ে, কেউ বা রেলিঙ্‌-য়ে হেলান দিয়ে, কোথাও বা কতকগুলি মিলে দলবদ্ধ হ'য়ে গল্প-গুজব ক'রতে ক'রতে চ'ল্‌ল। অন্য যাত্রী যারা ছিল তারা তেমন লক্ষণীয় নয়। তবে কতকগুলি চাষী শ্রেণীর মেয়ে আর পুরুষও ছিল, তাদের গেঁয়ো পোষাকে তারা যে কৃষাণ শ্রেণীর তা বোঝা যাচ্ছিল।

ভিয়েনা শহর ছাড়িয়ে জাহাজ চ'ল্‌ল, ডান দিকের কিনারায় নদীর ধারের বাঁধা পোস্তা আর রাস্তা শেষ হ'ল। বাঁ-দিকে, ভিয়েনার ও-পারে, খানিকটা যেতে না যেতেই

বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সাধারণ দৃশ্য

প্রেমিক-জোড় ছিল, এরা পাশাপাশি জায়গা ক'রে নিয়েছে। কোনও রকম অশোভন ব্যবহার নেই। সঙ্গে একজন আধাবয়সী মাষ্টার, এদের অভিভাবক-রূপে সঙ্গে আছেন। অতি গোবেচারী ভালোমানুষ চেহারা,—একেবারে খাঁটী জরমান ইস্কুল মাষ্টার; লোকটী একটু বেঁটে-খাটো পেট-মোটা চেহারার, মাথার বাদামী রঙের চুল কদম-ছাঁটা ক'রে কাটা, মুখে ছাঁটা-গোঁপ, চোখে একজোড়া খুব পুরু কাঁচের চশমা। বেচারী নেহাৎ 'হংস-মধ্যে বকো যথা' অবস্থায় এক পাশে ব'সে দাঁড়িয়ে কাটাচ্ছিল—এই সব উদ্দাম বয়সের ছেলে-মেয়ের মধ্যে তাকে কিছু ক'রতেই হয় নদীর লাগোয়া ঢালু খোলা মাঠ পাওয়া গেল—আগাছার মত মোটা মোটা খাগড়া জাতীয় ঘাস একেবারে জল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। শীত তো মোটেই নেই—আমাদের দেশ হ'লে এমন একটা নদীর তীরে ঘাটের পরে ঘাট মিল্‌ত, আর স্নান-নিরত লোকের দাপাদাপিতে নদীর কূল মুখরিত হ'ত। এখানে ওসব নেই—কচিৎ কখনও নীল বা কালো কাপড়ের 'সুইমিং' পোষাক পরা দুই একটী লোক জলে সাঁতার কাটছে।

জাহাজ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে, সকলে গুছিয়ে ব'সে নেবার পরেই, জাহাজের মধ্যেকার চিমনির পাশের এক কুঠরী

থেকে মেগাফোন মারফৎ যাত্রীদের সব বিষয় ওয়াকিব-হাল ক'রে দেবার জন্য জাহাজওয়ালাদের নিযুক্ত গাইডের গলার আওয়াজ সব প্যাসেঞ্জারদের কানে পৌছুলো—"ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, এখন সাড়ে আটটা, প্রাতরাশ প্রস্তুত—যাঁদের ইচ্ছা নীচে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে 'সেবা' ক'রে আসুন।" এই অনুরোধ একই লোক পর পর চারটে ভাষায় ক'রলে,—প্রথম 'মজর' Magyar বা হঙ্গেরীয় ভাষায়, তার পরে জরমানে, তারপরে ইংরিজীতে, তারপরে ফরাসীতে। সারাদিনের পাড়ী, কখন কোথায় কি জোটে ঠিক নেই, আর জানি যে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে না গেলে বা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে না রাখলে জাহাজে আর

বুদা-পেশ্‌ৎ—রাত্রের দৃশ্য

ট্রেনে খাওয়া জোটে না—তাই প্রথম শ্রেণীর ভোজনশালায় গিয়ে হাজির হ'লুম। দেখ্‌লুম, বেশী যাত্রী তো এল' না। কফি রুটি, মাখন, ডিম—এই পাওয়া গেল, তারজন্য ডাঙার তুলনায় নিলে অনেক। প্রাতরাশ চুকিয়ে উপরে এসে দেখি, যাত্রীদের অনেকেই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য এনেছে, তারই সদ্ব্যবহার ক'রতে লেগেছে। অনেকে থার্মস ফ্লাস্কে ক'রে কফি এনেছে, আর রুটি আর সসেজ আছে। শস্তায় এইভাবে সফর চলে।

ভিয়েনার জাহাজের ষ্টেশনে ইংরিজি বলিয়ে যে অপরিষ্কার লোকটাকে দেখেছিলুম, এইবার উপরে এসে তাকে চাক্ষুষ দর্শন ক'রলুম আর তার সঙ্গে আলাপন হ'ল। লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে; পরিচয় দিলে, সে ভারতীয়—পারসী; বোম্বাইয়ে বাড়ী; পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, তবে বিশেষ যোগ্যতা কিছু নেই, আর কাজকর্মও নেই; ইউরোপে কোনও রকমে এসে প'ড়েছিল, তারপরে ইউরোপের এ-শহর সে-শহর ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। মাসে গোটা পঞ্চাশেক ক'রে টাকা দেশের সম্পত্তি থেকে পায়, তার উপরে উঞ্ছবৃত্তি ক'রে আরও কিছু রোজগার করে, শস্তার গণ্ডা ব'লে মধ্য-ইউরোপে কোনও রকমে চালিয়ে নেয়। কি ভাবের উঞ্ছবৃত্তি করে তা পরে দেখলুম। বোম্বাইয়ের পাঁচজন আত্মীয় আর পরিচিতের নাম ক'রলে; ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানী ব'ল্‌তে পারে; বিদেশী ভাষা ইংরিজি ছাড়া আর কিছু জানে না; গুজরাটীতে নিজের নাম লিখে দিলে। ভিয়েনায় খরচপত্র বেশী প'ড়ে যাচ্ছে, তাই বুদা-পেশ্‌তে চ'লেছে—সেখানে নাকি আরও শস্তায় থাকা যায়, আর সেখানে জানাশুনো লোক আছে, তাদেরও আতিথ্য দু-পাঁচদিন গ্রহণ ক'রতে পারবে। কথায় বুঝলুম, লোকটি ভালো ঘরের ছেলে, তবে মাথায় ছিট আছে। আমার কাছে সাহায্য-টাহায্য চাইলে না। বড্ড বেশী বকে, খানিক কথা ক'য়ে আর আলাপ ক'রতে ইচ্ছে করে না। একটু গায়ে-পড়া হ'য়ে, লোকটি জরমান ছাত্র-ছাত্রীদের মহলে পসার জমাবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল। অনেকগুলো জরমান ছেলে ইংরিজি ব'লতে পারে, মুফতে একজন ইংরিজিওয়ালার সঙ্গ পেয়ে তার সঙ্গে ইংরিজি ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নেওয়ার লোভে অনেকেই তাকে একটু কৃপার সঙ্গে আমল দিলে। পরে বিকালের দিকে দেখি, এক অব্যর্থ উপায়ে এই পারসীটা এদের মধ্যে খুব

জমিয়ে নিয়েছে—এদের সবাইয়ের হাত দেখতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। একে খাস ভারতবাসী, ময়লা রঙ্, জরমান জানে না, কেবল ইংরিজিমাত্র ব'লছে; তারপরে হাত দেখে শুণে ভবিষ্যৎ ব'ল্‌ছে—আবার মস্ত এক ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বা'র ক'রে হাতের উপরে ধ'রে ভুরু কুঁচকে নিবিষ্টচিত্তে দেখ্‌ছে; "হিন্দু মাহাৎমা" লোকের এরূপ সান্নিধ্য মধ্য ইউরোপে দুর্লভ; কোন্ ইউরোপীয় এই সুযোগ ছাড়তে পারে? পারসীর চারিদিকে ছোকরাদের আর মেয়েদের ভীড় লেগে গেল—আর দেখাদেখি দু-পাঁচ জন অন্য যাত্রী, বুড়ো আধবুড়ো মেয়ে পুরুষও একটু ইতস্ততঃ ক'রে একখানি ক'রে হাত বাড়িয়ে দিতে লাগল। অনেক ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যদ্বাণীতে এরা খুশী হ'চ্ছিল। জরমান প্রকৃতি বিশেষভাবে ঘর-মুখো; এদের মেয়েদের মধ্যে ঘর-গৃহস্থালী স্বামী-পুত্র এই সবের দিকেই টান এখনও অনেক পরিমাণে আছে;—আমি এক পাশে রেলিঙে ঠেশান দিয়ে এই ব্যাপার দেখছি—সামনে দিয়ে একটী ছাত্রী তার একটী সখীর কাঁধে হাত দিয়ে বেশ খুশীর ভাবেই ব'লতে ব'লতে যাচ্ছে—"শুন্‌লি ভাই, ব'ল্‌লে যে আমার পাঁচটী সন্তান হ'বে, তিনটী ছেলে আর দুটী মেয়ে।" সন্ধ্যার দিকে, পারসীটীকে একটু ক্লান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌লুম; গায়ের সেই ময়লা বর্ষাতী তখনও গায়েই চড়ানো র'য়েছে; সারা বিকাল আর সন্ধ্যার যতক্ষণ পর্য্যন্ত নজর চলে বেচারী জাহাজ-শুদ্ধ লোকের হাত দেখেছে আর ক্রমাগত ব'কেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কেম ছে, ভাই? শু মল্যু? কি খবর ভাই? কি মিল্‌ল?" ম্লান মুখে ব'ল্‌লে—"বিশেষ কিছু না—এরা কিছু দিতে চায় না, আর ছাত্র বৈতো নয়, দেবেই বা কোথা থেকে; খালি একটী ভদ্রমহিলা আর একটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে মিলিয়ে দেড় পেঙ্গো আন্দাজ হ'য়েছে" (পেঙ্গো হ'চ্ছে হঙ্গেরীয় মুদ্রা—২৫ পেঙ্গোতে ইংরিজি এক পাউণ্ড)। লোকটীর সঙ্গে এই বুদা-পেশ্‌ৎগামী জাহাজেই যা সাক্ষাৎ, তারপরে আর দেখা হয় নি। তবে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ একটী হঙ্গেরীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, তার আশ্রয়ে ও তখন ছিল শুনেছিলুম।

জাহাজ ছোটো-খাটো দুটো ঘাটে থাম্‌ল, মেগাফোনের গলায় শুন্‌লুম, এইবারে আমরা অস্‌ট্রিয়ার হদ্দ পেরিয়ে এলুম। যেমন যেমন কোনও লক্ষণীয় জায়গার কাছে জাহাজ আস্‌ছে, অমনি মেগাফোনে ক'রে গাইড চার ভাষায় তার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি যাত্রীদের শুনিয়ে দিচ্ছে—এ বেশ লাগ্‌ছিল। ব্রাতিস্‌লাবা (Bratislava) শহর প'ড়্‌ল, নদীর বাঁ দিকে; খানিকটা পথ, পূর্ববাহিনী দানুব-নদী দক্ষিণবাহিনী হওয়া পর্য্যন্ত, উত্তরে চেখোস্‌লোবাকিয়া দেশ, দক্ষিণে হঙ্গেরী। ব্রাতিস্‌লাবা হ'চ্ছে এই শহরের চেখ্ নাম; হঙ্গেরীয়দের দেওয়া নাম হ'চ্ছে পোঝোনি (Pozsony) আর জরমানরা বলে একে প্রেস্‌বুর্গ (Pressburg)। মধ্য-ইউরোপে নানা ভাষার লোক একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বা একসঙ্গে থাকার ফলেই এই সব নাম-বিভ্রাট। কোনও গ্রাম বা শহরের একটা পুরোনো নাম ছিল; নোতুন একটা জা'ত এসে সেই নামটাকে বিকৃত ক'রে নিলে, নয় সম্পূর্ণ

বুদা-পেশ্‌ৎ—সহস্রবর্ষীয় স্মৃতিস্তম্ভ—স্তম্ভ-পাদপীঠে সওয়ারের মূর্ত্তি

নোতুন একটী নাম দিয়ে দিলে। স্থানীয় লোকেদের পক্ষে এই নাম-বিভ্রাট এতটা অসুবিধের হয় না, কারণ এতে তারা অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে। যেমন আমাদের দেশে :—প্রয়াগ—এলাহাবাদ ; কাশী—বনারস ; চেন্নপট্টনম্—মাদ্রাস ; কোইল—আলীগড়। কিন্তু এই নাম-রহস্য জানা না থাকলে বিদেশীদের একটু ধাঁধায় প'ড়তে হয়। ব্রাতিস্লাবার পাশ দিয়ে দানুবের উপরে এক সাঁকো চ'লে গিয়েছে। ব্রাতিস্লাবার জাহাজঘাটায় লোক নাম্‌ল, উঠ্‌ল। চেখো-স্লোবাকিয়া রাষ্ট্র,—তার নিশান, পুলিস, সব মোতায়েন আছে, চোখে প'ড়্‌ল।

বুদা-পেশ্‌ৎ—অশ্বারোহী রাজা আর্পাদ-এর মূর্ত্তি

বেলা বেড়ে যাচ্ছে, রোদ্দুর একটু বেশ প্রখর লাগ্‌ছে, কিন্তু খুব হাওয়া থাকায় কষ্ট নেই। সারাদিনটা রোদ্দুরে প'ড়ে থাকতে এদের আপত্তি নেই। নীচের তলায় ঘুরে ফিরে জাহাজের হালচাল দেখা গেল। দুজন যাত্রী নীচে ব'সে আছে—দুই ইহুদী যুবক, মাথায় লম্বা চুল, মাথার মাঝে সিঁথে ক'রে দেওয়া, ঘাড় অবধি এসেছে ; মুখে কোমল দাড়ি-গোঁফ, ঘন কাল চুল, বড় বড় কালো চোখ, কালো পোষাক—চেহারায় এদেশের লাল আর কটাচুলো, নীল আর পাঁশুটে-চোখো লোকেদের থেকে এরা একেবারে আলাদা। একটী যুবক পঙ্গু, একখানা রোগীদের চাকাওয়ালা চেয়ারে ব'সে আছে ; দুজনে ব'সে ব'সে খালী নিবিষ্টচিত্তে শতরঞ্জ খেল্‌ছে, নয় বই প'ড়ছে ; আড়চোখে দেখে নিলুম, হিব্রু অক্ষরে ছাপা বই। কি ভাষায় কথা কইছে তা কাছে গিয়ে কান খাড়া ক'রে শোনবার চেষ্টা ক'রেও ধ'রতে পারলুম না—এমনই ধীরে ধীরে কথা কইছিল। এদের চলন-চালনে এমন একটা আভিজাত্য, একটা আত্মকেন্দ্রীয় ভাব ছিল, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল—আমার তো এদের প্রতি মনে মনে একটা শ্রদ্ধার ভাবই হ'ল।

ব্রাতিস্লাবার পরে, খানিকক্ষণ ধ'রে দানুবের দুধার সমতল ক্ষেত্রময় ; তারপরে আবার পাহাড় এল'। সমতল ক্ষেত্রে সব বাড়ী,—চাষীর বাড়ী, ঘাসে ভরা ক্ষেত সেখানে গোরু, ভেড়া, রাজহাঁসের পাল চ'রছে ; গাছপালা আর ঘাস, নদীর ধার পর্য্যন্ত এসেছে,—নদীর ধার তো নয়, যেন পুখুরের পাড় ; নদীর অত কাছে বাড়ী ক'রতে ওদের ভয় করে না ? একজন সহযাত্রীর সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ হ'চ্ছিল, লোকটী হঙ্গেরীয় ; তিনি বেশ সহজ ভাবেই ব'ল্‌লেন, এখন আমরা দেশের নদীগুলিকে train ক'রে নিয়েছি, অর্থাৎ বশে এনেছি, এখন ইচ্ছামত খামখেয়ালী ভাবে নদী যা তা ক'রতে পারে না ; মাঝে মাঝে বন্যা হয় বটে, কিন্তু তেমন ক্ষতি ক'রতে পারে না। এরা কেমন প্রকৃতির সংহার-শক্তিকেও কতকটা সংযত ক'রে ফেলেছে ! দু'চার জায়গায় দেখলুম, গ্রামের লোকেরা নদীতে নাইতে এসেছে—একটী গাছের তলায় কোট-প্যাণ্টলুন খুলে রেখে দিয়েছে, আর সাঁতারুর পোষাক প'রে জলে ভাস্‌ছে, নয় ডাঙায় ব'সে ব'সে আমাদের দেখ্‌ছে। এত বড় একটা নদী, বাঙ্‌লা দেশে একে আশ্রয় ক'রে জীবন যতটা প্রবাহিত হ'ত, এখানে তার দশ ভাগের এক ভাগও নেই। ডিঙি নৌকো খুব কম, যেন নেই ব'ললেই হয় ; অন্য ষ্টীমার দু একখানি পাড়ি দিচ্ছে, আর চেখোস্লোবাকিয়ার ঝাণ্ডা উড়িয়ে ব্রাতিস্লাবার দিকে গাধা-বোট টেনে দু-একখানা ষ্টীমার চ'লেছে দেখলুম।

জাহাজের সহযাত্রী একটী যুবক আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'রলে। আলাপের ধরণেই মনে হ'ল, ভদ্রলোক ইহুদী-জাতীয় ; পরে জানলুম, অনুমান ঠিকই

বটে। ইহুদীরা একটু বেশী মিশুক, একটু বেশী কৌতুহলী; আর "বো'দ্দরে বো'দ্দরে আলাপ 'অইলেই ল'াব্"—এ ভাবটাও যেন তাদের মনে সদাই খেল্ছে। লোকটীর বাড়ী বুদা-পেশ্‌ৎ শহরে, এক বইয়ের দোকানে কাজ করেন; বড়লোকের ঘরে বিয়ে ক'রেছেন, সে কথা, আর তাঁর স্ত্রীর নানা সদ্‌গুণের কথা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে আমায় শোনালেন; তিনি ছুটী নিয়ে ভিয়েনা দেখ্‌তে এসেছিলেন, কখনও আগে ভিয়েনায় আসেন নি। স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়ে যাচ্ছেন, ভিয়েনার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্প চামড়ার ছোট্ট ব্যাগে মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, আমায় দেখালেন। ভিয়েনায় পৌছে দিন আষ্টেক দশেক পরে আবার কিছু দিনের জন্য ছুটী উপভোগ ক'রতে বেরুবেন—এবার সস্ত্রীক,—হঙ্গেরীর বিখ্যাত বালাতোন-হ্রদের তীরে। ভদ্রলোক নানান বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন—তিনি 'তাগোরে'-র অনুরাগী ভক্ত, আর ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে 'বুদা' অর্থাৎ বুদ্ধের নাম উচ্চারণ ক'রে, ঘাড় কা'ত ক'রে চোখ বুজে দুই হাত তুলে অভয়-মুদ্রার মতন ক'রে এই মহাপুরুষের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকট ক'রলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে ব'সে নানা কথা হ'ল,—ফরাসী ভাষায়; ইউরোপের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইউরোপের তথা এশিয়ার সংস্কৃতি, হঙ্গেরীর পলিটিক্স, আর ইহুদীদের সমস্যা। শেষোক্ত বিষয়টী নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা ক'রতে ভদ্রলোককে একটু নারাজ দেখলুম—পরে বুঝলুম, ঐখানেই ব্যথা—হঙ্গেরীতেও ইহুদী-বিদ্বেষ প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ইহুদী আর দেশবাসীদের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহুদীদের মন এখন বিশেষ স্পর্শ-কাতর। ইনি অযাচিতভাবে নাম ঠিকানা দিয়ে আমাকে বহু সাহায্য ক'রলেন—আমি বুদা-পেশৎ গিয়ে কোথায় উঠ্‌বো জানতে চাওয়ায় আমি Nemzeti Szalloda বা National Hotel 'জাতীয় পান্থশালা' নামে একটা মাঝারী দামের হোটেলের নাম ক'রলুম—ইনি আমাকে কতকগুলি শস্তা পান্সিঅঁ-র নাম লিখে দিলেন, সেখানে যে কম খরচে আর আরামে থাকা চ'ল্‌বে তা আমায় বার বার স'মঝে দিলেন (বলা বাহুল্য, এগুলি ইহুদীদের পান্সিঅঁ)। ভদ্রলোকের সৌজন্য জাহাজে মুখের কথায়ই পর্যবসিত হয় নি; তার পরের দিন ইনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এ হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করেন, দুই একটি দ্রষ্টব্য স্থানেও নিয়ে যান; Az Est "অজ্‌ এশ্‌ৎ" ব'লে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর বিখ্যাত সংবাদপত্র আছে (এই সংবাদপত্রটীর মালিক, সম্পাদক আর পরিচালক সবই হ'চ্ছে ইহুদী), তার আপিসে নিয়ে যান, সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন (সম্পাদক আমায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু ঘুরে ফিরে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়েই তাঁর যত প্রশ্ন—আমি এ বিষয়ে হাঁ না কিছুই ব'লবো না তাঁকে স্পষ্ট ব'লে দিলুম, কারণ আমার সঙ্গে interview ব'লে আমার পিছনে আর

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ হঙ্গেরী দেশের বিচ্ছিন্ন অংশের স্মারক প্রতিমূর্ত্তি (১)

আমার অবোধ্য ভাষায় আমারই উক্তি স্বরূপ কি বেরিয়ে যাবে তার স্থিরতা নেই—এতে কারো লাভ নেই, উপরন্তু খামখা অনেক ঝঞ্ঝাট হবার আশঙ্কাও থাকে), হঙ্গেরীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বই কিন্‌তে সাহায্য করেন, আর ভদ্র আর শস্তা রেস্তোর'াও বাৎলে দেন—সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে, ও দেশের রেস্তোর'ার কায়দা-করণ বুঝিয়ে দিয়ে একটু সুবিধাও ক'রে দেন।

ইহুদীরা এই রকমভাবে বিদেশীদের সঙ্গে আপনা থেকেই

মিশে, তাদের দখল ক'রে ফেলে। আমায় জরমানিতে একজন অধ্যাপক ব'লেছিলেন—আপনাদের দেশের ছেলেরা জরমানিতে এসে প্রায়ই ইহুদীদের set বা দলে প'ড়ে যায়; খাঁটী জরমানরা এত শীগ্‌গির বিদেশীদের গ্রহণ করে না, তাদের একটু বাধো-বাধো ঠেকে, তবে পরিচয় হ'লে, তারা বিদেশীদের একেবারে আত্মীয়ের মতনই দেখে। ইহুদী হোটেল বা বাসা-বাড়ীতে উঠে, ইহুদীদের internationalism-বুক্‌নি শুনে, এই সব ভারতীয় আর অন্য বিদেশী, দেশের জনসাধারণকে চিন্‌তে পারে না, দেশের মনোভাব বা সংস্কৃতি তারা বোঝে না। তিনি অনুযোগ ক'রে ব'ললেন,

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ হঙ্গেরী দেশের বিচ্ছিন্ন অংশের স্মারক প্রতিমূর্ত্তি (২)

জরমানিতে রবীন্দ্রনাথ যে কয়বার এসেছিলেন, জনকতক ইহুদী তাঁকে এম্‌নি ক'রে ঘিরে আর চালিয়ে নিয়ে বেড়াত, যে অন্য ভদ্র জরমানরা সেখানে পাত্তা পেত না। এঁর কথায় একটু ইহুদী বিদ্বেষ হয় তো জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ব্যাপারটা বোধ হয় কতকটা সত্য। ইহুদীরা হুঁশিয়ার, আর যাকে ক'লকাতার ভাষায় বলে "চড়্‌কো" অর্থাৎ aggressive; এই "চড়্‌কো" ভাবটা হয় তো আভিজাত্যের বা সুকুমার মনোবৃত্তির লক্ষণ নয়,—হয় তো এতে শেষটায় শত্রু বৃদ্ধি করে, কিন্তু কার্য্য-উদ্ধারের পক্ষে এই "চড়্‌কো" ভাবটা যে খুবই উপযোগী, তাতে সন্দেহ নেই।

ভিয়েনা থেকে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর পথে দানুবের ডানদিকে Esztergom এস্তের্‌গোম্‌ ব'লে একটী নগর পড়ে, এইটীকে এই পথের মধ্য সবচেয়ে প্রধান স্থান বলা যায়। জরমানেরা এই নগরকে বলে Gran গ্রান্‌। এখানে হঙ্গেরীর রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্ম্মযাজকের গির্জা; এখানে হঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা Istvan ইশ্‌ৎভান বা স্তেফান Stephan জন্মগ্রহণ করেন ও রোমান-কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এখানে হঙ্গেরী রাজ্যের যত প্রাচীন তৈজস-পত্র অলঙ্কার ইত্যাদি সব রাখা আছে। দূর থেকে এক পাহাড়ের উপরে এখানকার বড় গির্জাটী দৃষ্টিগোচর হ'ল—রোমান বাস্তু-রীতিতে তৈরী, হালের ইমারত, বড় গোল গুম্বজ আর তার চারিদিকে বড় বড় থাম। চৌভাষী গাইড এস্তের্‌গোম্‌-এর কাছে জাহাজ আস্‌তে তার মেগাফোনে এস্তের্‌গোম্‌-এর পরিচয় শুনিয়ে দিলে।

একটা ষ্টেশনে এক বুড়ী জাহাজে উঠ্‌ল, কাগজের ঠোঙায় ক'রে ষ্ট্রবেরী আর চেরী ফল নিয়ে। ৪০ আর ৩০ ফিলের (১০০ ফিলেরে এক পেঙ্গ্যো, ২৫ পেঙ্গ্যোতে ইংরিজি ১ পাউণ্ড) ক'রে ঠোঙা, এক এক ঠোঙা ক'রে কিনে নিয়ে সদ্ব্যবহার করা গেল।

দুপুরের আর রাত্রের খাওয়া জাহাজে সেরে নেওয়া গেল। আহারের তালিকা মজর ভাষায়—ভাগ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী আর জরমান অনুবাদ দেওয়া ছিল, তাই কি কি পদ দেবে তা বোঝা গেল—মজর ভাষার কতকগুলি শব্দ মুফতে শিখে নেওয়া গেল। এই মজর ভাষা হঙ্গেরীতে আর হঙ্গেরীর পূবে ত্রান্‌সিল্‌ভানিয়ায়, উত্তরে চেখো-স্লোবাকিয়ায় আর দক্ষিণে যুগোস্লাবিয়ায় প্রায় এক কোটি লোকে বলে; এর মধ্যে খাস হঙ্গেরীতে ৭৲ লাখের বেশী থাকে। ভাষাটী আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠির নয়; জরমান, চেখ, স্লোবাক, পোলিশ, রুষ, সর্ব্‌, রুমানীয়—এগুলি আর্য্য ভাষার বিভিন্ন শাখার; এগুলির পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব আছে। কিন্তু মজর ভাষা একেবারে পৃথক্‌। ফিনলাণ্ড, এস্তোনিয়া আর লাপলাণ্ডের ভাষা আর রুষ দেশের কতকগুলি আদিম

অধিবাসীদের ভাষা—এগুলি মজরের সঙ্গে সম পর্য্যায়ের। এক হাজার বছর হ'ল, মজররা পূর্ব থেকে হঙ্গেরী দেশে এসে, ঐ দেশ জয় ক'রে বাস ক'রতে আরম্ভ করে। আর্পাদ Arpad হ'চ্ছে এদের প্রথম সার্বভৌম রাজা। আর্পাদের পরে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন স্তেফান। খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ ক'রে, মজররা রোমান বর্ণমালায় নিজেদের ভাষা লিখ্‌তে থাকে। এরা পশ্চিম-ইউরোপের রোমান-কাথলিক জগতের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়—লাতীনকে এরা ধর্মের ভাষা আর শিষ্ট ভাষা ক'রে নেয়। দেশের স্লাব, রুমানীয়, জরমান প্রভৃতি আর্য্যজাতির সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ অল্পবিস্তর হ'লেও, প্রকৃতিতে মজর জাতি তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনেক সদ্‌গুণ রক্ষা ক'রে এসেছে। উদার-প্রকৃতিক, কল্পনাশীল, সঙ্গীতপ্রিয়, সাহসী, বীর এবং শিল্পী এই জাতি। মজর ভাষা কানে শুন্‌তে বেশ লাগে। এরা কথার আদিতে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে ব'লে, তাতে কতকটা বাঙলার মতন ভাব আসে। 'চ, শ' প্রভৃতি তালব্য ধ্বনি বেশী ক'রে থাকা এই ভাষার সুশ্রাব্যতার আর একটি কারণ। এরা যে বানানে ভাষার ধ্বনিগুলি প্রকাশ করে, সে বানান অনেক সময়ে ইংরেজি থেকে একেবারে পৃথক্। c-র উচ্চারণ সর্বত্র ts 'ৎস'; ch='খ'; g=সর্বত্র 'গ'; gy=কতকটা জ য়ের মত, গ্য; j=য়; বাঙ্গলা 'চ', 'জ'-এর ধ্বনি এরা cs, ds দিয়ে প্রকাশ করে; বাঙলা 'চাটুর্জে' এরা লিখবে Csáturdse's, সর্বত্র 'শ'; sz=দন্ত্য স বা পূর্ববঙ্গের 'ছ'। a-এর উচ্চারণ 'অ', á-র মাথায় accent চিহ্ন দিলে 'আ'। মজর ভাষা পড়া সোজা, কিন্তু ভাষার শব্দাবলী একেবারে অন্য ধরণের। আর ভাষার ব্যাকরণ-রীতি আমাদের তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মেলে। তুর্কী ভাষা এই মজরের দূর-সম্পর্কীয় জাতি। এই ভাষায় একটী বড়দরের সাহিত্যে গ'ড়ে উঠেছে। মজর সাহিত্যের প্রধান গৌরব হ'চ্ছে গীতি-কবিতা, আর মজর গীতি-কবিতার রাজা হ'চ্ছেন Sandor Peto''fi শান্দোর (বা আলেক্সান্দর) পেতোফি (১৮২৩ ১৮৪৯)। ইম্‌রে মদাখ Imre Madách (১৮২৩-১৯০৮) Tragedy of Man (Az Ember Tragoedia) বা 'মানবের দুঃখনাটক' নাম দিয়ে একখানি নাটক লেখেন, এখানিকে গ্যেটের ফাউস্‌ট্-এর সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। বাঙলা ভাষায় মধুসূদন যা ক'রেছিলেন, মিহালি (বা মিখাইল—অর্থাৎ মাইকেল) ভ্যোরোশ্‌মর্তি Mihaly Vörösmarty (১৮০০-১৮৫৫) মজর ভাষায় তাই ক'রেছিলেন—ইনি মহাকাব্য রচনা ক'রে ইউরোপের অন্য পাঁচটা ভাষার সঙ্গে মজর ভাষাকে এক পর্য্যায়ে উন্নীত করেন। মউরুশ্ য়োকই Maurus Jokai (১৮২৫-১৯০৪) হঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বিগত ৫০ বৎসরে মজর ভাষা খুবই উন্নতি ক'রেছে। সঙ্গীতে—বাজনায়, গানে—হঙ্গেরীয়দের কৃতিত্ব ইউরোপের সব জাতি স্বীকার করে।

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ হঙ্গেরী দেশের বিচ্ছিন্ন অংশের স্মারক প্রতিমূর্ত্তি (৩)

জাহাজের মধ্যেই আমাদের পাসপোর্ট দেখে ছাপ মেরে দিলে। সঙ্গে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছি তাও ব'লতে হ'ল। জাহাজের একটি কর্মচারী আমার সঙ্গে আলাপ ক'রলে—ইংরেজীতে; কথায় বুঝলুম, ইনিই হ'চ্ছেন গাইড, চারটী ভাষায় যিনি যাত্রীদের সব খবর দিতে দিতে যাচ্ছেন। ভারতবাসী শুনে অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে আমাকে বুদা-পেশ্‌ৎ আর হঙ্গেরী সম্বন্ধে কতকগুলি ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা দিলে। আধুনিক ভারতবর্ষের দুটী নাম সকলেই

জানে—এই দুটী নামের গুণে ভারতবাসীকে সর্বত্র শিক্ষিত লোকে সম্মানের চোখে দেখে—'তাগোরে' আর 'গান্দি'। আমার পাসপোর্টে আমার পরিচয় লেখা ছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেখে, এর সৌজন্যের মাত্রা আরও বেড়ে উঠ্‌ল। এখানে ইস্কুল-মাষ্টারের সম্মান খুব। এক-খানা খাতা এনে দিলে—জাহাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য যদি লিখে দিই, কর্মচারীরা বড়ই অনুগৃহীত হয়। খাতার পাতা উল্‌টে দেখলুম, নানা লোকের মন্তব্য, আর নানা ভাষায়। ফরাসী, জরমান, ইংরেজী, ইটালিয়ান, চেখ, রুষ, গ্রীক—সব আছে; আরও আছে প্রাচ্য ভাষা, আরবী, তুর্কী, চীনা, জাপানী। আমি জাহাজের ব্যবস্থার আর কর্মচারীদের ভদ্রতার তারিফ ক'রে হিন্দী, বাঙলা আর ইংরিজিতে কয়েক ছত্র, নামধাম পরিচয় সমেত লিখে দিলুম—এরা ভারতীয় অক্ষরের অভিনবত্ব আর প্রশংসার আন্তরিকতা দেখে খুব খুশী হ'ল।

ক্রমে রোদ প'ড়ে এল, সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগ্‌ল। মেঘ ক'রে ফোঁটা কতক বৃষ্টিও হ'ল। বেশ অনেক-ক্ষণ ধ'রে সূর্য্যাস্তের পরেও আলো-আঁধারি রইল। এস্তের্-গোমের পরে, নদীর ডান ধারে পাহাড় শুরু হ'ল; ঘন বনানী আবৃত পাহাড়, আর পাহাড়ের ছায়ায় ঢাকা নদীর স্বচ্ছ জল—আকাশে, জলে, স্থলে চমৎকার রঙের খেলা শুরু হ'ল—সূর্য্যাস্তের লাল রঙ, মাঝে মাঝে মেঘের পাঁশুটে, গ্রীষ্মের আকাশের নীল, আর পাহাড়ের নীল আর সবুজ, আর জলের কালো।

বাঁ-হাতি এবার Szob সোব্‌ নগর প'ড়্‌ল; এখান থেকে ষ্টীমারে উঠ্‌ল এক হাই-স্কুলের কতকগুলি ছেলে; সবাই বিশেষ এক রকমের টুপী প'রেছে, তা'তে একটা ক'রে ধাতু-নির্মিত মনোগ্রাম,—এ টুপী হ'চ্ছে এদের ইস্কুলের উর্দী। এই ছেলেগুলিকে বেশ বুদ্ধিমান্ চট্‌পটে দেখাচ্ছিল। এরা পরের ষ্টেশনে নেমে গেল।

দানুব দক্ষিণবাহিনী হ'ল, আমরা পাহাড়ে' তীরভূমির কোল দিয়ে দিয়ে চ'ললুম। ক্রমে একটু একটু ক'রে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগ্‌ল। তার পরে আমরা দূর থেকে দেখ্‌লুম—বুদা-পেশ্‌ৎ শহর সামনে প্রসারিত—অল্প অল্প ক'রে তার বিজলীর বাতী জ্ব'লে উঠ্‌ছে। খানিক পরে, দূরে অগণিত বৈদ্যুতিক আলোক মালা ভূষিতা, সুন্দরী বুদা-পেশ্‌ৎ নগরীতে আমাদের জাহাজ পৌঁছে গেল। বুদা-পেশ্‌ৎ দুটী শহর নিয়ে; নদীর ডান ধারে বুদা, বাঁ ধারে পেশ্‌ৎ। বুদা অংশ ছোট ছোট পাহাড়ের সমাবেশে রমণীয়, পেশ্‌ৎ সমতল ভূমির উপরে। পাহাড়ের দরুণ শহরের এই উচ্চাবচ ভাবকে আশ্রয় ক'রে, অসংখ্য বিদ্যুতের আলোকে এক কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে দিলে।

ঘাটে জাহাজ ভিড়তে, লোকেদের বেরুবার তাড়া প'ড়ে গেল। কুলীর মজুরী আন্দাজ কত দিতে হবে তা জেনে নিয়েছিলুম—কুলীরা সবাই মজর-ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জরমান ভাষাও জানে, বিশেষ ঝঞ্ঝাট হ'ল না; উপরন্তু জাহাজের পরিচিত ইহুদী ভদ্রলোকটী খানিকটা পথ আমার সঙ্গেই আমার ট্যাক্সিতে আসায়, আমার সুবিধেই হ'ল। পেশ্‌ৎ শহরে এক বড় রাস্তার উপরে Nemzeti Szalloda বা National Hotel. হোটেলের পোর্টার মালপত্র নামিয়ে নিয়ে, আমার হ'য়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিলে। উপরে একটী কামরা ঠিক ক'রে দিলে—দিন সাড়ে সাত পেঙ্গো ক'রে নেবে। বড় ক্লান্ত হ'য়েছিলুম, জাহাজেই রাত্রের আহার সেরে নেওয়া হ'য়েছিল—একেবারে নিদ্রা দেবার জন্য ঘরে গিয়ে উঠ্‌লুম।

সুভাষবাবু বিশেষ সৌজন্য ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ আমার আগমনের কথা তাঁর পরিচিত দুইএকজনের কাছে লিখে দেন। এঁদের একজন, রেলযোগে সুভাষবাবুর চিঠি পেয়েই, সেই রাত্রেই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এঁর নাম Ferenc Zajti ফেরেন্‌ৎস্ জয়্‌তি। ইনি একটী বিশেষ লক্ষণীয় ব্যক্তি, এঁর কথা পরে লিখ্‌ছি। জয়্‌তি ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন; এঁর সঙ্গে ক'লকাতায় আমার একবার দেখা হ'য়েছিল—সে কথা তিনি আর আমি উভয়েই ভুলে গিয়েছিলুম। দেখার পরে আলাপ হ'তে দুজনের মনে প'ড়ে গেল। জয়্‌তি শিষ্টাচার ক'রে চ'লে গেলেন।

ঘরে এসে পোষাক ছেড়ে আরাম ক'রে শুয়ে চোখ বুজেছি, এমন সময়ে অতি চমৎকার বাজনার আওয়াজে ঘুম আপনা থেকেই কোথায় চ'লে গেল। বাজনা হ'চ্ছে ঠিক মাথার কাছে। উঠে মাথার জানালা খুলে দেখি, আমার কামরা তেতালায়, নীচে একতালার হোটেলের রেষ্টরাণ্ট্, তার কাঁচে ঢাকা ছাত, খানিকটা খোলা—

সেই রাতে Gipsy Band অর্থাৎ হঙ্গেরীর বিখ্যাত Gipsy জাতির বাজিয়েদের সঙ্গত হ'চ্ছে। কি চমৎকার বেহালার টান! পিয়ানো, বেহালা, আর খাদের আওয়াজের চেল্লো—এই তিনে মিশে এমন অপূর্ব সুরের সমাবেশ সৃষ্টি ক'রলে, যে আনন্দে চোখ বুজে আস্‌তে লাগ্‌ল, গায়ে রোমাঞ্চ হ'তে লাগ্‌ল। Golden-tongued Music, yearning like a God in pain—কি ধীরোদাত্ত, করুণ-মনোহর বেহালার সুরের রেশ—যেন সুরের জল-প্রপাত আর ঝরনা, সুরের হাউই আর ফুলঝুরি ছুট্‌তে লাগ্‌ল। মজর বাজনা আর সঙ্গীতের প্রশংসা শুনেছিলুম—আজ তার সার্থকতা উপলব্ধি ক'রলুম।

ছয়টা রা'ত বুদা-পেশ্‌ৎ-এ কাটাই। মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌বো, এমন সুন্দর শহর আমি আর দেখি নি। এখানে প্রকৃতি আর মানুষ দুইয়ে মিলে শহরটাকে সুন্দর ক'রে তুলেছে। জল, পাহাড়, গাছপালার চমৎকার সবুজের খেলা, গুটী সাতেক অতি সুদর্শন সেতু, সুন্দর সুন্দর ইমারৎ, আর রাত্রে বিজলীর আলোর অতি শোভন ব্যবস্থা,—এর উপরে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার রেওয়াজ; সবে মিলে সৌন্দর্যের দিক্ থেকে এই শহরকে, জগতের তাবৎ নগরা-বলীর শীর্ষস্থানীয় ক'রে তুলেছে। ভিয়েনার একটু sombre অর্থাৎ গম্ভীর ভাব আছে—এখানে সবই বেশ যেন উল্লাস-ময়। কলাকুশল মজর জাতির শিল্পপ্রাণতার পরিচয়, এদের ইমারত দালান কোঠায়, এদের বাগ-বাগিচায়, এদের নদীর ধারের আর পাহাড়ের সৌন্দর্য অটুট রাখবার চেষ্টায়, এদের নগর-শোভন মূর্ত্তির মনোহারিত্বে আর প্রাচুর্যে, বেশ দেখা যায়।

ছয় দিনে এদের বড় বড় কয়েকটা মিউজিয়ম, আর অন্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখ্‌লুম। সমতল ভূমিতে পেশ্‌ৎ অপেক্ষা-কৃত হালের শহর, পাহাড়ে অঞ্চলে বুদা প্রাচীন শহর। বুদায় রাজপ্রাসাদ, প্রাচীন গির্জা, সরকারী দপ্তরখানা, রাজা স্তেফানের সওয়ার মূর্ত্তি—এই সব আছে; নদীর উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা টানা বারান্দা আর গুম্বজ-মতন আছে—সেটাকে Halaszbastyan অর্থাৎ Fisher Bastion বা 'জেলেদের বুরুজ' বলে। নদীর ধারের পাহাড়ের উপরে এই বুরুজ, আর অন্যান্য বাড়ী, পরিষ্কার রাত্রে প্রায়ই flood-light বা আলোক-প্রপাতের আলোর দ্বারা আলোকিত করা হয়, সে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখায়। পেশ্‌ৎ শহরে পার্লামেন্ট বাড়ী, অপেরা-হাউস বা সঙ্গীত-নাট্যশালা, থিয়েটার, যত সব মিউজিয়ম, মূর্ত্তি, বিদ্যমান। বিশেষ ক'রে হঙ্গেরীর ইতিহাস আর শিল্প নিচয়ে কতকগুলি মিউজিয়ম আছে। কতকগুলি প্রাচীন মধ্যযুগের ও আধুনিক শিল্প-সংগ্রহ দেখে খুব আনন্দ পাই। শহরে মূর্ত্তি যত আছে, তার মধ্যে গুটীকতক আমার খুবই চমৎকার লেগেছিল। রাজা আর্পাদের নেতৃত্বে মজর-জাতীয় লোকেদের হঙ্গেরী দেশ দখল আর দেশে উপনিবিষ্ট হওয়ার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ হঙ্গেরী দেশের বিচ্ছিন্ন অংশের স্মারক প্রতিমূর্ত্তি (৪)

জন্য একটা স্মারক-স্তম্ভ আর আর্পাদ আর তাঁর অমাত্য আর সেনানী জনকয়েকের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়। এই সু-উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভের শিরোভাগে দেবদূতের মূর্ত্তি; পাদ-পীঠে ব্রঞ্জে ঢালা অশ্বপৃষ্ঠে বিরাটকায় মজর বীরগণের মূর্ত্তি,—রাজা আর্পাদ সাম্‌নে ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে ঘোড়া চ'ড়ে জনকতক তাঁর অনুচর। এই মূর্ত্তি কয়টার কল্পনা আর গঠন খুব উঁচুদরের শিল্পীর কাজ। ভাস্কর Gyorgy Zala গ্যোর্গি (অর্থাৎ জর্জ)

জ.ল এই স্মারক-মূর্ত্তি আর স্তম্ভের শিল্পী। স্তম্ভের পিছনে, অর্ধচন্দ্রাকারে দুটী ইমারত, প্রত্যেকটীতে সাতটী ক'রে চোদ্দটী মূর্ত্তি—হঙ্গেরীর প্রাচীন রাজাদের প্রতিকৃতি; আর এদের পায়ের তলায় ব্রঞ্জে ঢালা এক একটী ক'রে bas-relief বা খোদিত চিত্র—অতি প্রাণবন্ত ভাবে এই গুলিতে এই সব রাজাদের জীবনের এক একটী ঘটনা চিত্রিত র'য়েছে। এগুলিও ভাস্কর জ.লর কীর্ত্তি। এগুলির দ্বারা চোদ্দখানি চিত্রে এক নিঃশ্বাসে হঙ্গেরীর ইতিহাসের রোমান্স উপভোগ করা যায়। এই সব জড়িয়ে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ মজর জাতির সহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাসের গৌরবময় চিত্রণ হ'য়েছে; মজররা নিজেদের ভাষায় এই স্মারক-স্তম্ভ, মূর্ত্তি, আর খোদিত চিত্রাবলীকে বলে Ezredves-emlekmu", অর্থাৎ Millenary Memorial বা "সহস্রবর্ষীয় স্মারক"। এই জিনিসটী আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে।

হঙ্গেরীর পার্লামেন্ট-গৃহ দানুবের ধারেই। এই বাড়ীটী ইউরোপের অন্যতম সুন্দর ইমারত। পার্লামেন্ট-গৃহের কাছে Szabadság Ter 'স-ব্‌ডাগ্‌ তের্‌' অর্থাৎ 'স্বাধীনতা চত্বর' নামে একটি বাগিচায় কতকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি আছে—সেগুলির মধ্যে, হঙ্গেরীর কাছ থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, আর পশ্চিমে তার যে যে অংশ গত মহাযুদ্ধের পরে কেড়ে নেওয়া হয়, সেই সেই অংশের স্মারক হিসাবে রূপক-ময় চারটী মূর্ত্তিপুঞ্জ বেশ লাগ্‌ল। এইখানেই মজর জাতির প্রতি প্রীতিযুক্ত ইংরেজ লর্ড রদারমিয়ার কর্ত্তৃক উপহৃত, এক ফরাসী ভাস্করের তৈরী শোকবিহ্বলা দিগম্বরী হঙ্গেরী-দেবীর মূর্ত্তি—ব্রঞ্জে ঢালা—প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে; এ মূর্ত্তিটীও চমৎকার লাগ্‌ল।

হঙ্গেরীতে জন-সাধারণের মধ্যে শিল্প-সৃষ্টির রীতি খুবই প্রবল। হঙ্গেরীর গাঁয়ের লোকেরা আর অন্য লোকে যে সব চমৎকার চমৎকার অলঙ্করণ-দ্বারা ঘর-গৃহস্থালীর খুঁটীনাটী থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় জিনিস খুব লক্ষণীয় ক'রে তোলে, তার অনুরূপ গ্রাম-শিল্প ইউরোপে আর কোথাও এখন নেই। রঙীন রেশম দিয়ে সাদা কাপড়ের উপরে ফুলপাতা তুলে বুটী বা অলঙ্করণের কাজ—এটী হঙ্গেরীর গ্রাম-শিল্পের বিশেষ একটী জিনিস। সুতোর লেস; চীনা মাটির খেলনা; পোর্‌সেলেনের পাত্রাদি; কাঠে খোদাই; চামড়ার কাজ; প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ বিস্তর দোকান দেখা যায়। বিদেশীরা এসব খুবই কেনে—দেশের লোকেরাও এ সবের আদর করে।

হঙ্গেরীয় জাতি কেমন সৌন্দর্য্যের উপাসক, তাদের মধ্যে শিল্পপ্রীতি কত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, তার একটা প্রমাণ পেলুম,—এদের এক আর্ট-গ্যালারীতে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর ইস্কুলের ছাত্রদের হাতের কাজের এক প্রদর্শনী হ'চ্ছিল, তাতে গিয়ে। বুদা-পেশ্‌ৎ-এর প্রায় সব বড় বড় ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, ইস্কুলের সাধারণের পাঠের অতিরিক্ত যা শিল্পচর্চা করে, তার নমুনা নিয়ে বেশ বড় একটী প্রদর্শনী। ছবি, নক্সা, নক্কাশীর কাজ, সীবনশিল্প, কাপড়ে ফুলতোলা (এই জিনিসটী এদের একটী জাতীয় শিল্প—এত চমৎকার চমৎকার ফুল-পাতা-লতার নক্সা এরা করে যে দেখে তারিফ না ক'রে পারা যায় না)—এসবে মিলে সহজেই এমন একটা রঙের আর রেখার সমাবেশ ক'রেছিল যে সে রকমটা অনেক বড় বড় শিল্প প্রদর্শনীতে পাওয়া কঠিন।

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ যাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল—তাঁদের কথা পরের বারে ব'ল্‌বো।

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

এক

এক বছর বেকার থাকিয়া তপেশ বহু চেষ্টায় এতদিনে চাকুরী জুটাইয়াছে। ইংরেজী দৈনিক 'ভ্যান্ গার্ডে' ৩০্ মাহিনার প্রুফ্ রীডার। দেশবিখ্যাত সংবাদপত্র 'ভ্যান্ গার্ডে'র আর সেদিন নাই। দলের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে কাগজ না হইলে চলে না, বড় বড় চাঁইদের আপন আপন গরজের কৃপা-কণা সিঞ্চনে 'ভ্যান্ গার্ড' আজ না-চলার মত চলিয়া কোন গতিকে টিম্‌টিম্ করিয়া টিকিয়া আছে মাত্র।

মাহিনা পাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। সম্পাদক হইতে আরম্ভ করিয়া সাইকেল্‌পিয়ন অবধি গোটা আপিসেরই দুমাস মাহিনা বাকী।

আর সবই ভাল, খাটুনিও বেশী নয়। মাসে এক সপ্তাহ নাইট্ ডিউটি। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় উপস্থিতি ও আপিস-ত্যাগের সময়নিষ্ঠতার তেমন কড়াকড়ি নাই। শুধু ঐ টাকাকড়ির বেলায় নিয়মিতভাবে অনিয়মিত হওয়াটাই 'ভ্যান্-গার্ডে'র বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্য।

তবু তো চাকুরী! তপেশের কাছে ইহাই পরম বিত্ত-লাভ। এক বছরের একটানা ব্যর্থতার পর এখন আর বাচবিচার করিলে চলিবে কেন!

ম্যানেজার তপেশকে পরদিন হইতে যোগদান করিতে বলিলেন। বর্ত্তমানে তিনমাস নাইট্ ডিউটি, কাজ-কর্ম্ম শিখিয়া পাকাপোক্ত হইলে ম্যানেজার তাহাকে দিনের কাজে বাহাল করিবেন। তথাস্তু!

কাল থেকে, তপেশ ভাবিল—কাল থেকে আর তাহাকে বেকার বলিবে কে! বেকার! কি বিশ্রী শব্দটা! কি বেয়াড়া বিদ্‌কুটে অর্থ-তীক্ষ্ণতা!

আর সে বেকার নয়। এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল তপেশ।

আপিসের বাহিরে আসিয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া তপেশ একবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিল। রাস্তাঘাট, গাড়ী-ঘোড়া, দোকানপাট, লোকজন, আকাশ-আলো—সবকিছুই আজ কেমন এক নূতন ঠেকিতেছে চোখে। এক নিমেষে গেছে সব কিছুরই পুরাতন রঙ্ বদলাইয়া, শিয়ালদহের মোড়ে রোজকার বুড়ী ভিখারীটাকে আজ আর তপেশের কদর্য্য মনে হইল না।

তাহার কাছে আজ সকলেরই মূল্য আছে। চমৎকার এই কলিকাতা সহর! সুন্দর এই সংসারটা। সারা দুনিয়া যেন আজ এক জমাট বাঁধা জীবন্ত আনন্দ!

উর্দ্ধশ্বাসে ফুটপাত দিয়া চলিয়াছে—উর্দ্ধশ্বাসে বাসার দিকে। স্ত্রী মঞ্জুলীকে এখনই এই সুসংবাদ দিয়া আচম্‌কা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। আর সে বেকার নয়! সমাজ জীবনে আর সে উদ্‌বৃত্ত নয়!

মহানগরীর ধূসর ধূমল সন্ধ্যা। আলো ঝিল্‌মিল্ পথি-পার্শ্ব। কাতারে কাতারে যান-বাহন। কিল্‌বিল্ করে মানুষ-কীট। তপেশের এসবে আর ভ্রূক্ষেপ নাই। দ্রুতপদে জনতার জোয়ার ঠেলিয়া চলিয়াছে। ঘরে আছে মঞ্জুলী। আজ আর সে কেউ-কেটা নয়—দস্তুর মত একটা পারসোন্যালিটি!

কি ভোগানই না সে ভুগিয়াছে এই একটা বছর! চলিতে চলিতে পথের মাঝে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া তপেশ মনে মনে উচ্চারণ করিল—বিদায়, বিদায় আমার অসহ দুঃখ-বেদনার অশ্রুভেজা তিক্ত দীর্ঘ দিবসগুলি!······

বৌবাজার ষ্ট্রীটটা হঠাৎ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া গেল নাকি?—না, রমানাথ কবিরাজের লেনটাই দক্ষিণে কতকটা সরিয়া গেছে? এত সময় লাগে কেন আজ?······

তপেশ ভাবিল, মঞ্জুলী এখন রান্নাঘরে, অথবা ভাত চাপাইয়া দিয়া শেলাই লইয়া বসিয়াছে, নয় তো বা ও ঘরের নরেনবাবুর বউ কি তাহার বোনের সঙ্গে গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে। মঞ্জুলী একবার কল্পনায়ও ভাবিতে পারে না, স্বামী তাহার কত বড় সুদুর্লভ প্রাপ্তি লইয়া নেবুতলার মোড়টা পার হইতেছে।······

সম্মুখে বাল্যবন্ধু পশুপতিদের মেস্। তপেশ ভাবিল, সুসংবাদটা তাহাকে এখনই দিয়া যাইবে, আর গোটা পাঁচেক টাকা ধার চাহিবে। আজ আর 'নেই' বলিতে পারিবে না, ধার নিয়া পরিশোধের উপায় জুটিয়াছে।···

বন্ধুবান্ধবরা এতদিন অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাকে নয় —তাহার অবস্থাকে। ধার দিতে চায় নাই, না পাইবার ভয়ে নয়—ধার পরিশোধে দেরী হইবার আশঙ্কায়। আজ তাহার হাত পাতিতে লজ্জা কি !······

না, পশুপতিকে শুভ সংবাদ কাল দিবে। মঞ্জুলীর শুনিতে দেরী হইয়া যাইবে যে ! তপেশ ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রচণ্ড উন্মাদ উল্লাস !···

সমগ্র পৃথিবী এখন মহাপ্রলয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে চুরমার হইয়া গেলেও তপেশ কোন আপত্তি জানাইবে না ; অবশ্য মিনিট দশেক বাদে। বাসায় পৌছিয়া মঞ্জুলীকে সংবাদ শুনাইতে দশ মিনিটের বেশী লাগিবার কথা নয়।

সম্মুখে ধাবমান জনস্রোত। বেগবান যানবাহন। চারিদিকে ব্যস্ত চঞ্চলতা। এতদিন এই চলমানতার সঙ্গে যেন তপেশের কেমন খাপ খাইতেছিল না। কোথায় যেন একটি মিলের অভাব ছিল। রক্তমাংশের হাত-পা লইয়া চলিয়াও তপেশ যেন অচল ছিল স্থাণুর মত। আজ সে ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীটার অফুরন্ত গতিস্রোতে কেমন করিয়া নিমেষে মিলিয়া মিশিয়া গেছে। আজ বিশ্ব-বিরাট চলার ঐক্যতানে তাহার এতদিনের নীরবতা যেন মুহূর্ত্তে গীতিময় হইয়া উঠিল। তাহার এতকালের শত সহস্র সগোত্র, ক্রমবর্দ্ধমান বিরাট জাতিগোষ্ঠী—তাহাদের সঙ্গে এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে 'ভ্যান্ গার্ডের' বেদীমূলে ম্যানেজারের সর্ব্ব বিপদঘ্ন মন্ত্রোচ্চারণে তপেশের গোত্রান্তর হইয়া গেছে ! তাহার পাতিত্যের শুদ্ধিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল ! শেষ হইল তাহার উদ্বৃত্ত, অপাঙ্‌ক্তেয় জীবনের ! আর সে সমাজ-যাত্রার বেখাপ্পা বেমানান নয়।

এখন হইতে তাহার আর একটী বিশেষণ বাড়িয়া গেল। আজ সে চাকুরে !

তপেশ ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে।······

আর দু'পা গেলেই রমানাথ কবিরাজ লেন।

তপেশ আর সে তপেশ নাই। সুবিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক 'ভ্যান্-গার্ডের' নবনিযুক্ত কর্ম্মচারী !

প্রুফ-রীডার। সংবাদপত্রসেবা। সম্মানজনক পেশা।

তপেশ কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে কোন সাড়া নাই। এবার তপেশ সমস্ত গায়ের জোর প্রয়োগ করিল সামান্য এক জোড়া কড়ার উপর।

খটাস্ করিয়া কপাটের শব্দ হইল।···মঞ্জুলী নিশ্চয়।···

দুয়ার খুলিল রতনবাবুদের বুড়ী ঠিকে-ঝি বাতাসী।···

ও হরি ! এ যে একটা দীর্ঘ লিরিকের প্রারম্ভেই হোঁচট্ খাওয়া ছন্দপতন !···

"কে ? দাদাবাবু !" বলিয়া বুড়ী সরিয়া দাঁড়াইল।

এই একতলা ভাড়াটে বাড়ীর মেয়ে মহল তখন কলতলায় গা ধুইতেছিল। তপেশকে দেখিয়াই সকলে মাথায় ঘোমটা টানিল। নরেনবাবুর ষোল বছরের বিধবা বোন সুমতিও মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়াছে।

তপেশ তাড়াতাড়ি ঘরে যাইয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিল।

ত্রিতল বাড়ীর একতলা।

স্যাঁৎসেঁতে ছোট ঘর। দশ হাত দৈর্ঘ্য—প্রস্থে আট হাত।

তপেশের সারা অস্থাবর সংসারটা আঁটসাট হইয়া আছে ঐ ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে। তক্তাপোষখানিই ঘরের অর্দ্ধেকের বেশী জুড়িয়া রাখিয়াছে।

দক্ষিণে জানালার উৎপাৎ নাই। পশ্চিম বন্ধ। পূব খোলা—একটী জানালা ও ঘরের একমাত্র দুয়ার সেদিকটায়।

রান্নাঘর পায়রার খুপ্‌রি বলিলেই হয়। ভাঁড়ার ঘরের হেঁসেল সংক্রান্ত বারো আনা জিনিষপত্তর শোবার ঘরেই রাখিতে হয়।

তপেশের সমস্ত প্ল্যানটাই মাঠে মারা গেল। মনে মনে সে রাগিল, রোজ গা ধোয় বিকেলে—আজ এত রাত করিয়া দল বাঁধিয়া স্নান না করিলেই নয় !

তপেশের ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া ডাকে—মঞ্জু ! শীগ্‌গির এসো ঘরে।···কিন্তু ওরা সব মনে করিবে কি !— এ তো আর আলাদা বাসা নয়।

ব্যগ্র অপেক্ষায় তপেশ ঘরে বসিয়া আছে। এবার ভ্যান্-গার্ডে চাকুরীর তদ্বিরের কথা সে মঞ্জুলীকে কিছুই জানায় নাই। বারে বারে আশা-পথ-চাওয়া মঞ্জুলীর হতাশ

মূর্ত্তি আর দেখিতে ভাল লাগে না। তাই এবার তপেশ তাহাকে বিন্দুবিসর্গও জানায় নাই। ইচ্ছা ছিল, মেঘ-ছেঁড়া সূর্য্যের মত সে অভাবিত বিস্ময়-চমক লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।

তপেশের সে প্ল্যান গেল ভেস্তে। এতক্ষণে উচ্ছ্বাসও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। তেমন করিয়া নাটকীয় আকস্মিকতা, আর জমিবে না এখন।

স্নান সারিয়া এলোচুলে মঞ্জুলী ঘরে ঢুকিল।

দেখিতে সে সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মতই।—রূপসী না হইলেও সুন্দরী সে। গায়ের রঙ্ কাল আর ধবলের মোলায়েম সংমিশ্রণ—বাঙ্গালী মেয়ের বর্ণ-বৈশিষ্ট্য। তাহার উজ্জ্বল-কাল মুখখানি যেন এ দেশেরই সবুজ প্রান্তর ও সুনীল আকাশের শারীর প্রতিনিধি। রূপের অপেক্ষা ওখানে লাবণ্য বেশী, ভাষার চেয়ে থাকে অর্থ অধিক।

তপেশ ডাকিল—মঞ্জু!

একটী মাত্র শব্দ! এতটুকু! স্বামীর এই আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মঞ্জুলী না বুঝিয়াও বুঝিল অনেক কিছু, আগাইয়া আসিল তক্তাপোষের কাছে, স্বামীর একান্ত সান্নিধ্যে।

'ব্যাপার কি?'

মঞ্জুলীর উৎফুল্ল উৎকণ্ঠায় তপেশ কৌতুক করিয়া একটু নাচাইয়া দেখিতে চায়। কহিল, "তুমিই বল না।"

"আমি কেমন করে বলব?"

"তোমায়ই বলতে হবে—আন্দাজ কর।"

"আঃ তোমার দুটী পায়ে পড়ি—বল না।"

"ও হুঁ"—নাছোড়বান্দা তপেশ।

অগত্যা নিরুপায় মঞ্জুলী কহিল, "সেই পনের টাকার টিউসনটা ঠিক হয়েছে?"

"পারলে না," তপেশ হাসিয়া উঠিল।

"দেশ-মুকুরে তোমার লেখাটা উঠেছে?"

"তা-ও না।"

"আঃ বল না,···তোমার পায়ে পড়ি।" মঞ্জুলী তপেশের হাত চাপিয়া ধরিল। বুঝিতে সে পারিয়াছে। 'ভ্যানগার্ডে' কাজের চেষ্টার কথা স্বামী না বলিলেও ঐরকমই একটা কিছু সে আন্দাজ করিয়া লইল। পাকাপাকি একটা সফলতার কথাও বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বলিতে সে ভরসা পায় না। কতবারের নিরাশার মত এবার-ও যদি না হওয়ার অদৃশ্য ফুৎকারে হাতের কাছে ধরিতে পারা এই হওয়াটা হঠাৎ ছিঁড়িয়া পড়িয়া যায় মুহূর্ত্তের বৃন্ত হইতে নিষ্ঠুর পরিহাসে!

হাসিয়া তপেশ কহিল, "আগে কি খাওয়াবে বল।"

"ঘরে আছে কি যে খাওয়াব?"

"যা আছে তা-ই" তপেশের মুখেচোখে কৌতুকের হাসি।

"বেগুন খাবে?—বেগুন? পুঁইডাটা?—পটোল? তাও যে বাড়ন্ত আজ।"

তপেশ হাসিল, "যা চাইব শুধু তা-ই।"

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মঞ্জুলী কহিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—আঃ বলো না তুমি," বলিয়া মঞ্জুলী দেহভার স্বামীর পিঠে ছড়াইয়া দিল।

এবার তপেশ কহিল, "আজ ভ্যানগার্ড পত্রিকায় আমার চাকুরী ঠিক হয়ে গেল।"

মঞ্জুলীর মুখে কথা নাই। সারা হৃদয়ের আনন্দ এক নিমেষে আঁখির পাতায় আসিয়া জমা হইয়াছে। মুখে তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ করা চলে, আর সময়ও নেয় তাহাতে কত!

তপেশ বলিয়া চলিল, "এখন ত্রিশ টাকা মাইনে, এ-তো আরম্ভ মাত্র, পরে বাড়িয়ে দেবে নিশ্চয়ই।"

মঞ্জুলী মিষ্টি করিয়া হাসিল—"এ আমি আগেই জানতাম।"

তপেশ কহিল, "ঘোড়ার ডিম।"

"হ্যাঁ গো, তোমায় এই ছুঁয়ে বলছি, তুমি যখন বলছিলে—"

তপেশ কথায় বাধা দিয়া কহিল, "এখন মাস তিনেক পার্মানেণ্ট নাইট্ সিফ্ট, মানে রাত্রে কাজ করতে হবে···"

"সে কি গো! রাত্রে আবার চাকুরী কি!" মঞ্জুলী বিস্ময় প্রকাশ করিল।

তপেশ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মঞ্জুলী বুঝিতে নারাজ। পরে সে এই বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল যে একমাস কাজ করিয়া পরে চেষ্টা তদ্বির করিলে দিনের কাজই পাইবে।

মঞ্জুলী তথাপি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "ঐ তো বললে, তবু

মাসে এক হপ্তা রাত জাগতে হবে, না গো একাজ তুমি করতে পারবে না, দশটা থেকে চারটে অবধি রাত জেগে মানুষ বাঁচে!"

"উপায় কি মঞ্জু। আর যে কোথাও জোটে না। তুমি ভেব না, দুদিনেই সয়ে যাবে। দুনিয়ার কত লোক রাত-জাগা কাজ করে তার হিসেব রাখ?—আর তারা সবাই দুদিনেই মরে যায়, না?"

মঞ্জুলী নীরব। তপেশ তাহাকে আশ্বাস দিল, কালই সে ম্যানেজারকে স্ত্রীর কঠিন ব্যাধির ওজুহাত দেখাইয়া নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে।

দুয়ারের ওপিঠ হইতে নরেনবাবুর বোন সুমতি ডাকিয়া কহিল, "দিদি, তোমার ভাতের ফেন সব গড়িয়ে যাচ্ছে যে।"

"এ্যাঁ! ভাত চাপিয়ে দিয়ে গা ধুতে কি এখন গেছি! আমি এক্ষুণি ফিরে আস্‌ব।" মঞ্জুলী একটা আনন্দের ঘূর্ণি রচিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ভাত নামাইয়া মঞ্জুলী নরেনবাবুর স্ত্রী মনোরমা ও রতন-বাবুর গিন্নী লবঙ্গলতাকে স্বামীর চাকুরীর সুসংবাদ শুনাইতে গেল। তিনঘর ভাড়াটে এই ত্রিতল বাড়ীটার একতলায় থাকে। পরস্পরের সুখদুঃখের ইতিহাস পরস্পরকে রাখিতে হয়।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই মঞ্জুলী কহিল, "এবার থেকে আমি ঘরে লক্ষ্মীর আসন পাতব। আর তোমার আপত্তি শুনব না—বলে রাখছি।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর, মিথ্যাপীর যা-খুসী যত খুসী—আমার আপত্তি নেই আর। কিন্তু দোহাই গিন্নী ঠাক্‌রুণ, মা ষষ্ঠীর পূজা যেন ভুলেও কখনো—"

মঞ্জুলী তাহার ডান হাতের মুঠিতে তপেশের ঠোঁটদুটী চাপিয়া ধরিয়া কথা বন্ধ করিল।

"আঃ আমার বুঝি আর লাগে না" বলিয়া তপেশ তাহাকে কাছে টানিতে চেষ্টা করিল।

"দোর খোলা রয়েছে দেখতে পাও না?"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "বারে! আমার পাওনা বুঝি—তুমিই ত বলেছ, যা খেতে চাইব তাই—"

"তা বলে এখনই বুঝি?"

তাহাদের বিবাহিত প্রথম বৎসরের সহজ সুন্দর ছেলেমানুষি আজ আবার নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে।

"এই তোমার কথা দিয়ে কথা রাখা, না?" বলিয়া তপেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুলী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আগাইয়া গেল দুয়ারের কাছে। তারপর পিছন ফিরিয়া ঠোঁটে-ঠোঁটে একপ্রকার ফুৎকার শব্দ করিয়া তপেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে চৌকাঠের আড়ালে মিলাইয়া গেল।

ভাড়াটে বাসা। পাশাপাশি তিনটী সংসার। কাচ্চা-বাচ্চা গোষ্ঠীগোত্র লইয়া আঁট-সাঁট হইয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকে। তপেশদের কষ্ট যা কিছু ঐ বাহিরে। ঘরে তাহারা স্বামী আর স্ত্রী। পূর্ণস্বরাজ।

কলিকাতার ভাড়াটে বাড়ী! এজমালি কল-চৌবাচ্চা-পায়খানা। আলাদা শুধু স্ব স্ব হেঁশেল ও শোবার ঘর। যার-যার ঘরের চৌকাট পার হইলেই স্বামী স্ত্রীর সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ-সম্বোধনাদি অতি-যত্নে পরিহার করিয়া চলিতে হয়। আপন আপন ঘরে একাধিপত্য, অবশ্য যদি দুয়ার ভেজান থাকে। এ-ঘরের একটু জোরে কথাই ও-ঘরে পৌছায়; ও-ঘরের আস্তে কথাও দোরের কাছে কান পাতিলেই এ-ঘরে আদ্ধেক-শোনা আদ্ধেক-বোঝা অস্পষ্টতায় ধরা দেয়। সুতরাং কাহারো ফিস্ ফিস্ সমালোচনা করিতে হইলেও জানালার হাঁ-করা খড়খড়িটাকে বিশ্বাস করা যায় না, কি জানি জানালার ফাঁকে ফাঁকে টুকরা-টাকরা ছেঁড়া-কথা যদি ছিটকাইয়া পড়ে ও-ঘরের সটান-খোলা জানালার মধ্য দিয়া।

দুদিনেই এ হয় ও'র মাসী বা পিসী, কেহ বা কাহারো দিদি বা বোনঝি, কেহ কেহ আবার ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া 'গঙ্গাজল', 'মকর' 'আতর' 'গোলাপ' কত কি!

এ-ঘরের ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া ও-ঘরের বউ দেয় পুরা ঘোমটা, কোনের ঘরের বাবুকে দেখিয়া মাঝের ঘরের গিন্নী দেয় অর্দ্ধ-ঘোমটা। সিকি ঘোমটা চলে রান্নাঘরে, চাতালে আর কলতলায়। দশটায় একেবারে মুক্তকেশ—অবাধ আধিপত্য। দুপুর বেলা কেউ বা গল্প জমায়, কেউ বা পড়ে ঘুমাইয়া, ছা-পোষারা করে কাঁথা শেলাই, অল্পবয়সীরা মেঝেতে শুইয়া পাড়ার লাইব্রেরীর মলাট-ছেঁড়া সস্তা নভেল বা মাসিক পত্রের গল্প লইয়া মাঝে মাঝে আঁচলে চোক মোছে।

যার-যার ঘরে তার-তার নির্ঝঞ্ঝাট পূর্ণস্বরাজ। শুধু গোল বাধে মাঝে মধ্যে ঐ এজমালি সম্পত্তিগুলি লইয়া। বাড়ীওয়ালার এজলাশে নালিশ রুজু হয় কদাচিৎ। প্রতি ঘরের প্রতিনিধি লইয়া শালিসি বৈঠকও বসে না তাদের। আজ সন্ধ্যায় চুলাচুলি করিয়া পরশু সকালেই গলাগলি আবার।

মাসের শেষের দিকে মাহিনার তারিখের দু'চারদিন থাকিতেই অধিকাংশ হেঁসেলেই মাছের পাট উঠিয়া যায়। কেউ বা কোথাও হাত পাতিয়া ধার আনে কিছু, কেউ বা চালায় ঐ দু'চারদিনের জন্য দুইবেলা ডাল, চচ্চড়ী আর ভাত।

তারপর মাহিনার তারিখের পরদিন আসে মাংস, না হয় রুইয়ের মাথা, ছানার ডেলা, দইয়ের ভাঁড়, রাবড়ী-ও বা কখনো কখনো।

অসুখে-বিসুখে ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইলে এদের শতকরা পঁচানব্বুইজনের গৃহলক্ষ্মীর ক্যাশবাক্স হইতে একসঙ্গে পাঁচটা টাকাও বাহির হইবে না।

ইহাই কলিকাতা মহানগরীর অধিকাংশ মসীজীবী সমাজের মাথা গুঁজিবার আস্তানাগুলির মোটামুটি ঘরোয়া ইতিহাস।

তপেশের স্যাঁতসেঁতে কোঠাখানি। রমানাথ কবিরাজ লেনের ত্রিতল 'ফেডারেশনের' একতলাস্থ একটি ছোট্ট সভ্য-রাষ্ট্র।

মঞ্জুলী রাঁধিতেছে। তপেশ রান্নাঘরের দুয়ারের বাহিরে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি কি রান্না হচ্ছে মঞ্জু?"

মঞ্জু চাপা গলায় কহিল, "ডাল হয়েছে, আর এই বেগুন ভাজ্‌ছি।"

"কেন, তরকারী কিছু নেই?"

"সোমবার বাজার এসেছে—আর আজ বেস্পতিবার। আলু-পটোল ঘরে এসে বাচ্চা বিয়োয় না-কি?"

তপেশ আস্তে আস্তে কথাটা পাড়িল; "মঞ্জু, আজ একটু রাবড়ী নিয়ে আসি, শুভদিনে মিষ্টি মুখ করতে হয়—কি বল?"

"সখ ছাখ না!"

"না, না, আপত্তি কর না। সামনের মাস থেকে আর চিন্তা কি। ড্যামগার্ড আর টিউসন নিয়ে ৪২৲ টাকা।—প্রিন্স!—আজকের আনন্দের দিনে—এই বেশী না, এক পো—তিন আনা মাত্র।"

স্বামীর এই সানুনয় নিবেদনে মঞ্জুলী মুখ না ফিরাইয়াই হাসি চাপিয়া কহিল, "আমার হাত আট্‌কা, দেখ্‌ছ না? আঁচলে চাবী রয়েছে।"

তপেশ চাবী লইয়া ঘরে গেল।

রাত্রে আলো নিবাইয়া স্বামী-স্ত্রী শুইয়া পড়িয়াছে। পূবদিকের জানালার ফাঁকে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ দেখা যায়।

চৌকীর উপর উঠিয়া বসিয়া মাথাটা একটু বাড়াইলেই দেখা যাইবে, জানালার ঠিক নীচে এ-বাড়ী ও ও-বাড়ীর মাঝখানের সঙ্কীর্ণ পথটায় জমা হইয়া আছে মেটে হাঁড়ি-ভাঙ্গা, বেলের খোলা, নারকেলের মালা, কাচের গ্লাসের টুক্‌রা, চীনা মাটির বাসনগুলির শত খণ্ড অবশেষ, দু'পাশের দ্বিতল-ত্রিতলের গৃহলক্ষ্মীদের নিক্ষিপ্ত জঞ্জাল, এমন আরো কত কি।

বৈশাখের নির্মেঘ আকাশে আজ জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়াছে। ভুবন-ছাওয়া রুপালী আলো তন্দ্রাতুরা পৃথ্বীকে যেন গিলিয়া গলিয়া পড়িয়াছে। ঐ অথই আলোক-সঙ্গীতের অশ্রান্ত সুর-সায়রের এক ঝলক তরঙ্গ-রেশ আজ ইট-সুরকির উত্তুঙ্গ নিষেধ ডিঙ্গাইয়া তপেশের ঘরের মধ্যেও ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে অ-রব অনুরণনে।

বালিশ দুটা জোছনায় পাতিয়া স্বামী-স্ত্রী শয়ন পরিবর্ত্তন করিল।

আজ ঘুম নাই কাহারো চোখে। তপেশ কহিল, "মঞ্জু, তোমার হাতে এখন কত আছে?—মাইনে তো আর কালই দিচ্ছে না। পেতে পেতে—ধর এই—এখনো ১ মাস ১ হপ্তা।"

"তা চলে যাবে। মাসের শেষে সের কয়েক চাল আর কিছু তেল হয়ত টান পড়তে পারে। তা আমি চালিয়ে নেব'খন।—বাজারের খরচা তো দিন দু'আনার বেশী লাগে না আমাদের—"

"না মঞ্জু, আমি আশুর কাছ থেকে কাল ৩৲ টাকা ধার নিয়ে আসব। রোজ একটু [illegible]—"

"অমন কাজও কর না। এদ্দিনই কষ্ট করলে—একটা মাস বৈ তো নয়। ধার নিলে তা শোধ দিতে হয় সেকথা তুমি ভুলে যাও পরে।"

তপেশ বিপদ বুঝিয়া প্রসঙ্গের মোড় ফিরাইল, "আচ্ছা মঞ্জু, আমাদের মাসে কত টাকা হ'লে বেশ ভালভাবে চলে?—অবশ্য আমার ছেলে-পড়ানর টাকাটা ধরেই বলবে।"

"এমাস বাদে তোমাকে টিউসন ছাড়তে হবে, বলে রাখছি। দুদিকের খাটুনি সইবে না তোমার।—শরীর যে কি হয়ে গেছে নিজে তা দেখ্‌তে পাও না!"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "৩০৲ টাকায় চলবে কি করে?"

"এদ্দিন ২৫৲ টাকায় চলেছে কেমন করে?"

"এখন তো আর তখন নয়, মঞ্জু।"

মঞ্জুলী গম্ভীর ভাব দেখাইয়া কহিল, "আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর এই মোট ত্রিশ টাকাই মাস। ঘরভাড়া ১০৲, আলোর খরচা ১৲, খাইখরচা আমাদের বেশী নয়—মুদীর দোকান ৬৲ টাকার বেশী লাগে না কোন মাসেই, কয়লা ঘুঁটে মাটি কেরোসিন এই সব তাতে—ধরো—বড় জোর ১॥০ টাকাই খরচ হোক্। ধোবা খরচা তো আমাদের নেই-ই—"

"না মঞ্জু, এবার থেকে ধোবা রাখতে হবে।"

"তা বৈ কি! তোমার রাত-জাগা টাকা আমি অমন করে ওড়াতে দেব কিনা।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "আর কাপড় জামা জুতা মুচী—হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হলে ওষুধপত্তর, এসব তোমার হিসাবের মধ্যে ধরবে না বুঝি?"

"ধরব না কেন গো! ২৫৲ টাকায়ই সব কুলন হবে। হাতে রইল ৫৲। কাপড়-জামা জুতো-ছাতা তো আর প্রতি মাসেই কিনতে হবে না।"

তপেশ মনে মনে হাসিল। ভাবিল, দুঃখকষ্টের সঙ্গে এরূপ সুসমঞ্জস আপোষ রফায় নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততা আছে বটে; কিন্তু এতে একবিন্দুও আনন্দ নাই—না আছে সম্ভ্রম, না বা পৌরুষ।

স্বামীর প্রশস্ত বক্ষে মাথাটী রাখিয়া মঞ্জুলী প্রশ্ন করিল, "কিছুদিন বাদে তোমার মাইনে বাড়বে তো?"

"ঠিক বলা যায় না এখনই—হয়ত বাড়বে।"

পাশের ঘরে ওরা সব অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দূরের ঐ মেস্ বাড়ীটার আলোগুলিও একে একে নিবিয়া গেছে।

বাহিরে নিঝুম মহানগরী। আর ভিতরে সংসার-সমুদ্রের সাঁতার-শ্রান্ত একটি নর ও একটি নারী—স্বামী ও স্ত্রী—ক্ষুদ্র ভেলার দুর্ব্বল নির্ভরতায় আজ একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে চায়।

মঞ্জুলী আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঘুমুচ্ছ?"

তন্দ্রালস তপেশ কহিল, "হুঁ।"

"হুঁ কি গো—ঐ ত কথা বল্‌ছ।"

"বল না—কি?"

মঞ্জুলি কহিল, "এবার তোমার কবিতা ও গল্পগুলি বের করবার চেষ্টা কর।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে," বলিয়া তপেশ তাহাকে বাহুবন্ধনে নিবিড় করিয়া টানিয়া নিল। স্বামীর বলিষ্ঠ বক্ষের নিশ্চিন্ত নীড়ে মাথাটী রাখিয়া মঞ্জুলী আজ আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে জ্যোৎস্নার ভরা-জোয়ার। ভিতরে নিদ্রিত স্বামী-স্ত্রী। উন্মুক্ত জানালা। চতুষ্কোণ আলোক-পরিধি বুকের কাছ হইতে সরিয়া গিয়া এখন পায়ের তলায় আসিয়া জমা হইয়াছে। অলক্ত-ডোরে কোমল-কঠোরে জড়াজড়ি করিয়া আছে দু'জোড়া বিজাতীয় তাজা পদ্ম: যেন চারিটি অঙ্কে সুসমাপ্ত এক অলিখিত দৃশ্যকাব্য। ক্রমশঃ

রমাপ্রসাদ রায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

দেশের গৌরব এবং দেশবাসীর গর্ব্বের সামগ্রী, যে মনস্বীর উদ্দেশে আজ শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি নিবেদিত হইতেছে, তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনীর সম্যক্ পরিচয় আজ বোধ হয় অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র, ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সদস্য, গবর্ণমেন্টের প্রথম বাঙ্গালী লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার, হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতিরূপে মনোনীত, কুশাগ্রবুদ্ধি রমাপ্রসাদ রায় যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রচিত করিয়া গিয়াছেন, কালসমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে তাহা সহজে বিলুপ্ত হইবার নহে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পাঠকগণ বিদিত আছেন যে আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে বালক রামমোহনের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি বর্দ্ধমান জিলার কুড়মন পলাশি গ্রামে শ্রীমতী দেবী নাম্নী এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভবানীপুর নিবাসী ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমা দেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যমা পত্নীর গর্ভে রামমোহনের দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই।

রামমোহন যখন "বিধর্ম্মী" বলিয়া তাঁহার মাতা তারিণী দেবী ওরফে ফুলঠাকুরাণী কর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে, ১২২৪ বঙ্গাব্দে ১২ই শ্রাবণ (ইং জুলাই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ) রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

রমাপ্রসাদের বয়ঃক্রম যখন ১৩।১৪ বৎসর তখন, অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। কৈশোরে পিতাকে হারাইলেও রমাপ্রসাদ তাঁহার পিতার স্নেহময় ব্যবহারের স্মৃতি চিরদিন তাঁহার হৃদয়পটে উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট পিতার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিও গৌরববিমিশ্রিত আনন্দ-সহকারে বিবৃত করিতেন।

রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রমাপ্রসাদের অভিভাবক হন। রাধাপ্রসাদ রমাপ্রসাদ অপেক্ষা বয়সে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় ছিলেন। আর একজন রমাপ্রসাদের প্রকৃত হিতৈষী ও অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। ইনি রাজা রামমোহনের গুণমুগ্ধ শিষ্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

বাল্যকালে রমাপ্রসাদ তাঁহার পিতা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। রামমোহনের বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড উইলিয়ম আড্যাম এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ছিলেন। কিছুদিন পরে রমাপ্রসাদ পেরেণ্ট্যাল এ্যাকাডেমীতে (পরে ডভটন কলেজ নামে খ্যাত) প্রবিষ্ট হন। বিখ্যাত য়ুরোপীয় শিক্ষক ও কবি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেট্স্ এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে রমাপ্রসাদ উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই কলেজ স্থাপনে রামমোহন ও ডেভিড হেয়ার কিরূপ যত্ন লইয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। রমাপ্রসাদ তাঁহার পাঠানুরাগ, অধ্যবসায়, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি গুণের জন্য যেরূপ শিক্ষক ও সতীর্থগণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিনয়, শিষ্টাচার, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণে তাঁহাদের সেইরূপ প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। রামমোহনের পুত্র বলিয়া ডেভিড হেয়ার তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

ইংলণ্ডে মৃত্যুকালে রাজা রামমোহন প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান। রমাপ্রসাদকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজ রাধাপ্রসাদকে জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যে সাহায্য করিতে হইল। তিনি এই সময়ে দেশে থাকিয়া পারস্য ও সংস্কৃত ভাষা এবং জমিদারী কার্য্য মনোযোগসহকারে শিক্ষা করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণকে ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ অন্যতম ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন এবং ক্রমান্বয়ে নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণায় কার্য্য

বন্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবন বর্ম্মা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
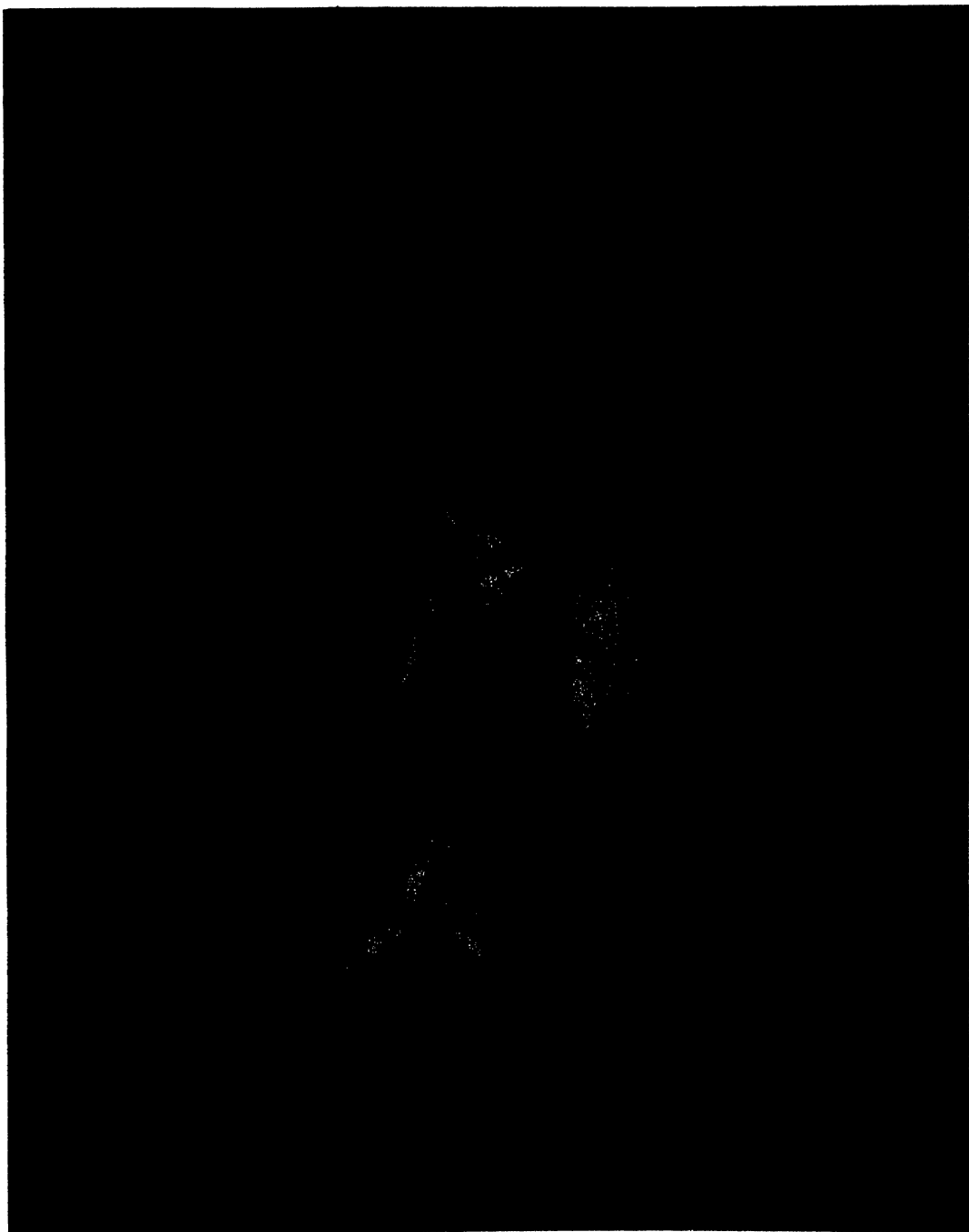
করেন। এই জিলাগুলি তৎকালে সকল বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিলা ছিল এবং রমাপ্রসাদ এই সকল জিলায় কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়া দেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন এবং অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন।

হুগলীতে রাজকার্য্য সম্পাদনকালে তিনি কিছুদিন কলেক্টরের অসুস্থতানিবন্ধন অনুপস্থিতিতে কলেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। হুগলী জিলার ইতিহাস লেখক জর্জ্জ টয়েন্‌বি লিখিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় আর কোন দেশবাসী এইরূপ সমগ্র জিলার শাসনভার প্রাপ্ত হন নাই।

বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এখনও রমাপ্রসাদের একটি সুন্দর তৈল চিত্র বর্দ্ধমান রাজবাটীতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে এবং উভয়ের গভীর বন্ধুপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। "ভারতবর্ষে" যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল উহা বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে রক্ষিত তৈলচিত্রের ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত।

সেকালে ডেপুটী কলেক্টরদিগের পদ যথেষ্ট সম্মানের ছিল এবং এই পদের গৌরবরক্ষার জন্য দেশীয় ডেপুটী কলেক্টরগণও য়ুরোপীয় কলেক্টরদিগের ন্যায় জাঁকজমকে থাকিতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানে বর্দ্ধিত হইয়া রমাপ্রসাদ অর্থের মূল্য বুঝিতেন না। আয় অপেক্ষা তাঁহার ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িল যে তিনি রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই সময়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাকুরী ত্যাগ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে উকীলশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তখনকার নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তাহাকে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দাখিল করিতে বলা হয়। রমাপ্রসাদ রামগোপাল ঘোষকে এ বিষয়ে জানাইলে তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষাপরিষদের সভাপতি মাননীয় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে বলেন। কথিত আছে যে, বেথুন লিখিয়াছিলেন, "যদি নেলসনের পুত্র নৌবিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিফলমনোরথ করিতে পারিতেন? যদি রামমোহন রায়ের পুত্রকে স্বকীয় চেষ্টাতেও অর্থোপার্জ্জন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এ দেশের গবর্ণমেণ্টের নামে কলঙ্ক হইবে।" ইহার পর আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই।

প্রসন্নকুমারের সাহায্যে রমাপ্রসাদ দ্রুতগতিতে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ লর্ড ড্যালহৌসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্থানে সরকারী উকীল নিযুক্ত হইলেন। আট বৎসরকাল কলেক্টরের কার্য্য করিয়া জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক নিয়মাদিতে তিনি এরূপ অসামান্য জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে বিচারকগণ তাঁহার যুক্তি ও তর্ক শুনিয়া বিস্মিত, চমৎকৃত ও উপকৃত হইতেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রভূত বিত্তশালী হইয়াও তিনি এরূপ বিনীত, অমায়িক ও শিষ্ট ব্যবহার করিতেন যে যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনিই মোহিত হইতেন।

দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞানসহ প্রতীচ্য-বিদ্যার বিস্তারে রমাপ্রসাদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়ায় রমাপ্রসাদ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ে মিলিয়া একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের শিক্ষা প্রদান হইত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রভাব হইতে হিন্দুবালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। রমাপ্রসাদ এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং উহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি শিক্ষা-পরিষদ দেশের শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদির সমাধান করিতেন। উহাতে বিচক্ষণ য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষাহিতৈষিগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য্য

করিতেন। রমাপ্রসাদ এই পরিষদের অন্যতম উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন এবং রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মার সহিত শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতেন।

ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, লর্ড ক্যানিং, সার জন পিটার গ্রাণ্ট প্রভৃতির তিনি গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন এবং ইঁহাদের স্মৃতি-সভায় বা সম্বর্দ্ধনা-সভায় তিনি উৎসাহ সহকারে যোগ দিতেন।

রমাপ্রসাদের ব্যবস্থাশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান এত প্রগাঢ় ছিল যে গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন! ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার বোফোর্টের স্থানে রমাপ্রসাদ লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সারের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন দেশীয় ব্যক্তি এই সম্মানজনক পদে নিযুক্ত হন নাই।

এই সময়ে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে রমাপ্রসাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি বিশ্রামের জন্য মধ্যে মধ্যে আলমবাজার বা রাণীগঞ্জের উদ্যান-বাটিকায় কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি ৺রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী দ্বারা এই সময়ে How we are governed নামক ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া প্রকাশ করেন। উহা কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি আইন গ্রন্থাদির টীকাও প্রণয়ন করিতেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারী অব ষ্টেটের আদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও মৌলবী (পরে নবাব বাহাদুর) আবদুল লতিফ উহার সদস্য মনোনীত হন। কৃষ্ণদাস পাল এক স্থানে লিখিয়াছেন ইঁহাদের মধ্যে রমাপ্রসাদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই বৎসরেই পার্লিয়ামেণ্টের নূতন বিধি দ্বারা এদেশে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের রাজপ্রতিনিধির পরামর্শ লইয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া রমাপ্রসাদকে ভারতবর্ষের এই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে যখন নিয়োগ-পত্র আসিল তখন রমাপ্রসাদ অনন্ত পথের যাত্রী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি বলিলেন "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি, এ নিয়োগ-পত্র লইয়া আমি কি করিব?"

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ ১২৬৯ বঙ্গাব্দ) রমাপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করেন। অমর কবি দীনবন্ধু তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে' লিখিয়াছেন—

> "আইন পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর
> সাধিতে স্বদেশ হিত ছিলেন তৎপর।
> প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
> অস্তমিত হ'ল কিন্তু না হতে উদয়,
> অভিষেক দিনে গেল শমন ভবনে,
> কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে।"

বাস্তবিকই যে সময়ে রমাপ্রসাদ গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরের সমীপবর্ত্তী, সেই সময়ে দেশবাসীর আশা ও আনন্দের স্বপ্ন-সৌধ ধূলিসাৎ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন যে যদিও রমাপ্রসাদের জন্য সৃষ্ট সম্মানজনক পদটিতে শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু নূতন বিচারালয়টি উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার-চ্যুত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল।

রমাপ্রসাদ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, দেশীয় আচারব্যবহারাদি সম্বন্ধে তাঁহার পিতা অপেক্ষা রক্ষণশীল ছিলেন। 'হুতোম প্যাচার নক্সা' পাঠকগণ জানেন যে তিনি তাঁহার বিমাতার শ্রাদ্ধ বিশুদ্ধ হিন্দুমতেই করিয়াছিলেন। 'বিধবা বিবাহ' প্রচলন সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত আগ্রহশীল না হইলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধু প্রচেষ্টায় তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপ্রণীত 'বহু বিবাহ'—নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"লোকান্তরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়।" তিনি নীরব-কর্ম্মী ছিলেন। দেশহিতকর সকল কার্য্যে তাঁহার অসীম

উৎসাহ ও উদ্যম ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক পুণ্যস্মৃতি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "প্রতিভায় ও মনস্বিতায়, ব্যবহারশাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞানে, কুশাগ্র বুদ্ধিতে, মতের উদারতায় এবং দেশবাসীর ন্যায্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিতে তিনি তাঁহার সমসাময়িকগণের কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না।" এই একটি বাক্যে রমাপ্রসাদের চরিত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিপিন দা"

শ্রীআদিনাথ মুখোপাধ্যায় (মূকবধির শিল্পী)

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাবার সহিত আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। জেঠামহাশয়ও তখন কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় ছিলেন। জেঠামহাশয় ও বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে লইয়া যান। ৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন ওখানকার প্রিন্সিপাল। জেঠামহাশয় আমার সম্বন্ধে সব কথা যামিনীবাবুকে বলেন। উত্তরে যামিনীবাবু বলিয়াছিলেন, বয়স অনেক কম তাই হোষ্টেলে রাখা অসম্ভব ; তখন আমার বয়স অনুমান ৬।৭ বৎসর হইবে। অগত্যা জেঠামহাশয় আমাকে ঢাকায় লইয়া যান। বাবা রেঙ্গুনে তাঁহার কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমি ঢাকা মূকবধির বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসি। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রদত্ত বৃত্তিলাভ করিয়া ১৯২৪ এর জুলাই মাসে কলিকাতা 'গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্ট' এ প্রবেশ করি। তখন
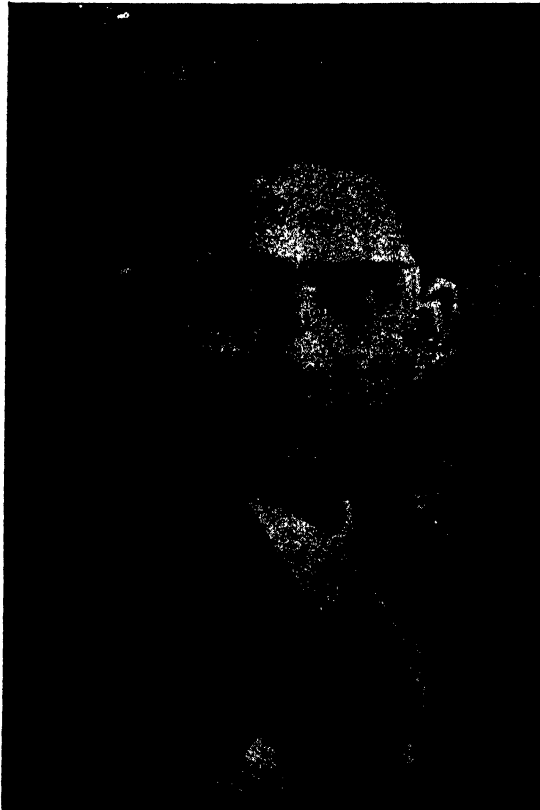
মূকবধির শিল্পী শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী এ-আর সি-এ (লণ্ডন)

মিঃ বি, দাস এম-এল এ (পেন্সিল স্কেচ)

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিত্র (ভবানীপুরস্থ বিখ্যাত ডাঃ আন্তনাথ বসুর আত্মীয়), শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভৌমিক (সিউড়ীস্থ বিখ্যাত মোরব্বা-ব্যবসায়ী ডি, সি, ভৌমিকের ভ্রাতা) ইত্যাদি ঐ স্কুলে পড়িতেন। ভাল ছবি আঁকেন এ জন্য আসিয়াই বিপিনবাবুর নাম বেশ

বোন (স্কেচ)

শুনিতে পাই। আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হওয়া অবধি আর্ট হোষ্টেলেই (যাহা বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত মুকুল দের আদেশে উঠিয়া গিয়াছে) ছিলাম। বিপিনদার সঙ্গে প্রথমে এখানেই আমার আলাপ

যীশু (এচিং)

হয়, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত স্কলারসিপ লাভ করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক সঙ্গে খেলা ধুলা, স্কুলে যাওয়া, বেড়ান ইত্যাদিতে বেশ আনন্দেই দিন কাটিত; বিপিনবাবু আমাকে খুব ভাল-বাসিতেন তাই তাঁহাকে 'বিপিন দা' বলিয়া ডাকিতাম তাঁহার পিতা অবসরপ্রাপ্ত জজ ৺গগনবিহারী চৌধুরী—কার্য্যকালে মুন্সেফ হইয়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি অনেক স্থানে ছিলেন, পরে জজ্ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিপিনদার কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার এক বৎসর পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। ইহারই ঠিক ১ মাস পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা—বিপিনদা ও তাঁহার ভাইবোন সহ ভীষণ বিপদে পড়িলেন। ফাইন আর্ট সোসাইটীতে (যাহার উদ্যোগে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল) Rev. C. F. Andrews (দীনবন্ধু) এর ছবি Black & White Paintingএ (কাঠের কয়লার চিত্র) তরুণ

পরট্রেট (কলিকাতা একাডেমী অব্ আইন আর্টস্ একজিবিসনের পুরস্কারপ্রাপ্ত—মূকবধির শিল্পী সুবোধঅধিকারী কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)

শিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় বিপিনদা সোসাইটী কর্ত্তৃক স্বর্ণপদক প্রদত্ত হন, এ ছাড়া আরও অনেক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফাইন্যাল পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, পরে বোম্বাইস্থ 'স্যার জে, জে, আর্ট স্কুল' এ কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া ১৯৩২ এর জুলাই মাসে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন; উচ্চ শিক্ষার্থ ইনিই মূক-বধির প্রথম ইংলণ্ড যাত্রা করেন। লণ্ডনে পৌছিয়া নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে 'রয়েল কলেজ অব্ আর্ট' এ প্রবেশ করেন। কলেজে ছুটীর সময়ে তিনি ইউরোপীয়ান মূকবধিরদিগের সঙ্গে মিশিয়া নানারূপে তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি অন্যান্য দেশে বেড়াইতে যাইতেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফাইন্যাল পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়া এ, আর, সি, এ ডিগ্রি-প্রাপ্ত হন। মূকবধির শিল্পীদের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ইনিই প্রথম "এ, আর, সি, এ" উপাধি লাভে সমর্থ হন। মাননীয় লয়েড জর্জ্জ, ল্যান্সব্যারী, আগা খাঁ ও স্যার বি, এন, মিত্র (ভারতের হাই কমিশনার) প্রভৃতি তাঁহার কাজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। স্যার বি, এন, মিত্র তাঁহাকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় মূকবধির-দিগের শিল্প শিক্ষার সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। কয়েকমাস হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। বর্ত্তমান "কলিকাতা মূক বধির ক্লাব" এর তিনিই প্রেসিডেণ্ট। অসহায় মূক বধিরদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কল্পে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে হতাশ মূক বধিরদের প্রাণে নিরতিশয় আশার সঞ্চার হইবে এবং তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই দুর্ব্বহ জীবনেরও সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে। এই সঙ্গে বিপিনবাবুর নিজের চিত্র এবং তাঁহার অঙ্কিত চারিখানি চিত্র প্রকাশিত হইল।

তপোবন-সন্ধ্যা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

দিবাশেষে রক্ত আঁখি তপোবন-ধেনুটির প্রায়
ফিরিছে ধূসর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আশ্রমছায়ায়।

গুহামাঝে দিবালোকে লুকাইয়া ছিল তমোরাশি
তস্করের মত ;—এবে আপনারে দিতেছে প্রকাশি'।

হের হোথা জরাহত পারাবত-পতত্র-পিঙ্গল
তারকা-খচিত ঐ শোভা পায় সান্ধ্য অভ্রতল।

পাখীরা কুলায়ে ফিরে ফেলি' পথে শালিধান্যকণা
উঠিছে আশ্রম ভরি' দুগ্ধধারা দোহন মূর্চ্ছনা।

মিলি' ঋষি-কন্যাকারা সযতনে ইঙ্গুদীর স্নেহে
জ্বালিছে মৃণ্ময়দীপ মৃদঙ্গনে তপোবন-গেহে।

হব্য যত আজ্য-গন্ধ সমীরণ করিছে বিধুর
তার সনে ঋষি-কণ্ঠে বেদ-গাথা মঙ্গল মধুর!

যজ্ঞ-বেদিকারে ঘিরি' তন্দ্রাহত কুরঙ্গমগণ
অর্দ্ধ-অবলীঢ় দর্ভ ধীরে ধীরে করে রোমন্থন।

অপশ্রী কমলবনে—কুসুমিত বৃক্ষ-বাটিকায়
আসন্ন বিরহ স্মরি' চঞ্চরীক মুহু মুরছায়।

তপঃশীর্ণ তাপসেরা করে পরাতত্ত্বের ধেয়ান—
নির্ম্মোক-সমান দেহ—ব্রহ্মলীন যাঁহাদের প্রাণ!

কিশলয়-ভোজী কলহংসদল ভরি' সরস্তীর
করে কলরব—যেন বাজে বন-দেবীর মঞ্জীর!

শান্তিমগ্ন চরাচর—শান্ত ঋষি-হৃদয়-সমান
কুররীর কম্প্রকণ্ঠে বাজে এবে নিশীথের গান।
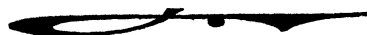
জীবনবীমা ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম

(তত্ত্বসন্ধানী)

মুসলমান জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের একস্থানে আছে—

'হে বিধাতা, তুমি আমাদিগকে ইহজগতে ঐশ্বর্য্য দান কর— যাহাতে আমরা পরজগতে কল্যাণ লাভ করিতে পারি।"

হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রেও অনুরূপ বাণীতে পৃথিবীতে টাকা পয়সা ধন দৌলতের প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনে সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন, যাহার সদ্ব্যবহারে পারমার্থিক জীবনেও কল্যাণ লাভ করা যায়, তাহাকে অনর্থ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বাস্তব-জীবনে, ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান সকলেরই—নানা কারণে টাকার প্রয়োজন আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। টাকার অভাবে মানুষের সদ্‌গুণেরও বিনাশ সাধিত হয়। কাজেই দেখা যায় যে নিজের পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বৃহত্তর পৃথিবীর নানা ক্ষেত্রেই টাকার প্রয়োজন অনিবার্য্য।

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন ও তদনুপাতে ব্যয় করিলেই টাকার সার্থকতা লাভ হইবে। বাস্তবিক পক্ষে টাকার সার্থকতা—মিতব্যয়ে ও সঞ্চয়ে। সঞ্চয়ের অভ্যাস না থাকিলে দান ধ্যান প্রভৃতি পুণ্য কাজও সম্ভবপর হয় না, অথচ মুসলমান শাস্ত্রানুসারে ইহার মত পুণ্য কাজ আর কিছুই নাই। কিন্তু টাকার সদ্ব্যবহার ও সঞ্চয়ের অভ্যাস নির্ভর করে শিক্ষার উপর। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত এবং তাহাদের মাথা পিছু আয় এত অল্প যে তাহারা স্বচ্ছন্দে নিজের জীবনযাপন করিতেই পারে না—সঞ্চয় ত দূরের কথা। অনাহার অর্দ্ধাহারে যাহাদের জীবনযাপন করিতে হয়, শরীর আচ্ছাদনের উপযুক্ত বসনের যাহাদের অভাব তাহাদের পক্ষে উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করা একটা গুরুতর সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা মূলতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক। সকল দেশেই যেমন অভাব অনাটন আছে, তাহা নিবারণের পন্থাও সকল দেশে আছে। এই সকল প্রচলিত পন্থার তেমন কোনও পার্থক্য নাই। তবে সর্ব্বত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইয়াছে বলিয়াই—উপযুক্ত পন্থাও সকলে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন।

সঞ্চয়-অভ্যাসের অভাব

সমগ্রভাবে সমাজের দারিদ্র্য দূর করিবার যে সকল উপায় সকল দেশে চলিয়া আসিয়াছে, তন্মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস প্রধানতম। পাশ্চাত্য দেশে সঞ্চয়ের অভ্যাস খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে বলিয়াই, সে দেশের দারিদ্র্য আমাদের দেশের মত এমন ভয়াবহ নহে। সেদেশে একজনের মৃত্যুতে পরিবারের সকলকে অন্যের গলগ্রহ হইতে হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের দেশে সঞ্চয়ের অভ্যাস একপ্রকার নাই বলিয়াই অনেকে জীবন-কালে প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াও স্ত্রীপুত্রের পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থান হিসাবে বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন না। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা সারা জীবন উপার্জ্জন করিয়াছেন প্রচুর, কিন্তু বার্দ্ধক্যের সম্বল কিছু রাখিতে পারেন নাই—ফলে শেষ জীবনটা তাঁহাদের অপরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে সংস্থান না থাকিলে হিন্দুদের যে দুর্দ্দশা—মুসলমানদেরও সেই একই দুর্দ্দশা। অভাব অনাটনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা এক।

কল্যাণ কোন পথে ?

কিন্তু সভ্যসমাজে প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মানুষের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিবার জন্য সঞ্চয়ের অভ্যাস দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টাতেই জীবন-বীমা পরিকল্পিত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি, বৃদ্ধবয়সের সম্বল, পরিবারের ভবিষ্যৎ সংস্থান—বাধ্যতামূলক এই সঞ্চয়ের অভ্যাস দ্বারাই কেবল সম্ভব।

সভ্যদেশের সমাজে ইহাই অভ্যাসের প্রবৃত্তি সঞ্চার করিয়াছে এবং সাধারণভাবে তাহার বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়াছে। একের সঞ্চিত অর্থ বহুর উপকার সাধনে নিয়োজিত করিয়া সমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করাই জীবন-বীমার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য মুসলমান ধর্ম্মের মত উদার-ধর্ম্মের বিরোধী ত নয়ই—বরং তাহার উচ্চাদর্শের সম্পূর্ণ অনুকূল। বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে বলিয়াই অর্থ সঞ্চয়ের সুবিধাও তাহাদের কম, কিন্তু সেই কারণে তাহাদিগের জীবনবীমা করিয়া সাধ্যমত অর্থ সঞ্চয়ের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন।

জীবনবীমা তহবিলে বহুজনের প্রদত্ত টাকা একত্রীভূত হইয়া যে বিরাট ধনভাণ্ডারের সৃষ্টি করে তাহা দেশের মধ্যে নানা ব্যাপারে লগ্নী করা হইয়া থাকে; শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি সম্পদবৃদ্ধির অনুকূল ব্যাপারে এই টাকা খাটান হয় বলিয়া তাহার সুফল ও স্বার্থ মুসলমানগণও সমভাবে ভোগ করিতে পারেন এবং জীবনবীমার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষিত মুসলমানগণের যথাযোগ্য স্থান পাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে।

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ

ধর্ম্মের নামে নিজের স্বার্থসাধনের জন্য যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণের পথ হইতে আজ মুসলমান সম্প্রদায়কে বহুদূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারা অকারণ অজুহাত না তুলিয়া আজ এই বিরাট সম্প্রদায়ের স্থায়ী উন্নতির কথা ভাবিয়া দেখুন। মুসলমান সম্প্রদায়ও আজ নিরপেক্ষভাবে এই প্রয়োজনীয় কথাটি ভাবিবার চেষ্টা করুন।

দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের অভিভাবকহীন পরিবারের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষাভাবের কথা কাহারও অবিদিত নাই; অথচ আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের উদাহরণও যথেষ্ট আছে। অপরিণামদর্শিতার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানই আজ সকলের অপেক্ষা অধিকতর ঋণভারে প্রপীড়িত,—পারিবারিক শান্তি হারাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি আজ বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনীর সংখ্যা অনুপাতে খুবই কম; তাঁহারা ত যথাসাধ্য সঞ্চয় করিয়া বা সঞ্চিত টাকার যথাবিহিত সদ্ব্যবহার করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন—তাহাতে দেশের মধ্যে প্রসারপ্রতিপত্তিও আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

একথাগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্বতই সকলের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ও মিতব্যয়িতার অভ্যাস জাগিয়া উঠিবে। তখন জীবনবীমা করিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার অবকাশ ঘটিবে। বীমাকারী লাভসহ সঞ্চিত টাকা মেয়াদ অন্তে নিজে ভোগ করিতে পারেন, সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থ ব্যয় করিতে পারেন —অথবা তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার পরিবারবর্গ উক্ত টাকা ভবিষ্যতের সম্বল স্বরূপ লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সংসারী লোকের পক্ষে ইহা কম সান্ত্বনার কথা নহে।

জীবন বীমার মূল নীতি

অথচ বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে জীবন-বীমা তেমন সমাদর লাভ করে নাই। আমাদের দেশের অনেক মুসলমানের ধারণা আছে যে, বীমা-ব্যবসায়-ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিরোধী—কিন্তু তুরস্ক, মিশর, পারস্য ও ইরাক প্রভৃতি মোসলেম দেশে বীমা-ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। যদি ইহা ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধীই হইত তাহা হইলে ইস্‌লাম সভ্যতার কেন্দ্র স্বরূপ এই সকল দেশে এ ব্যবসা এতটা বিস্তৃত ও জনপ্রিয় হইতে পারিত না। অনেকের ধারণা যে বীমা-ব্যবসায়ের সহিত সুদ গ্রহণের গৌণ সম্পর্ক আছে বলিয়া ইহা মুসলমান সমাজের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু বীমা-ব্যবসায়ের গোড়ার কথা সুদ নহে; একজনের আর্থিক দায়িত্ব দশজনের মধ্যে ভাগ করিয়া বৃহত্তর সমাজের সেবায় সহায়তা করাই ইহার মূল কথা। প্রত্যেকের অল্প অল্প সঞ্চয়—একটি তহবিলে একত্রীভূত হইলে সমাজের কাহারও মৃত্যুতে বা বার্দ্ধক্যে সেই তহবিল হইতে সাহায্য করাই হইল জীবন-বীমার মূলনীতি। যাঁহারা বীমার সুবিধা গ্রহণ করিয়া এই সঞ্চয় নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই সমষ্টিগতভাবে এই তহবিলের সাহায্য লইতে পারেন। এই জন্যই জীবন-বীমা জনসেবার, সামাজিক কল্যাণ বিধানের নামান্তর মাত্র। ইস্‌লাম ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্মের সহিত কখনই ইহার বিরোধ থাকিতে পারে না।

মুসলমান নেতৃবৃন্দের অভিমত

জীবন-বীমা যে উদার মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী নহে সে সম্বন্ধে পৃথিবীর আট কোটি মুসলমানের ধর্মনেতা—মহামান্য আগা খাঁর অভিমত খুবই স্পষ্ট। কোনও একটি বীমা-কোম্পানী পরিদর্শনের সময় তিনি বলেন—

"বীমা যে জনসাধারণের পক্ষে কত উপকারী, তাহা হয়ত মুসলমানগণ সম্যক অবগত নহেন। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে বীমা ব্যবসায়কে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা দরকার। বীমার মূলসূত্রের সহিত ইসলাম ধর্ম্মের কোনও বিরোধই নাই, সুতরাং যে কোনও রূপ বীমা করিবার সময়—মুসলমানগণের দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই।"

মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধেয় বহু নেতাও বীমা করিবার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর দিল্লীতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সভায় একটি প্রস্তাব পেশ হয়। তাহা এইরূপ—

'মুসলমানগণ যখন স্পেনে রাজত্ব করিতেন তখন সমুদ্রগামী মুসলমানদের পক্ষে বীমা একান্ত আদরের বস্তু ছিল। কিন্তু এখন মুসলমানদের মধ্যে বীমা তেটা প্রচলিত নহে এবং এই জন্যই প্রাচীন পরিবারগুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে এবং অন্যগুলি দরিদ্র অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইয়াছে। তজ্জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে মুসলমানগণ যেন তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের এই অভ্যাস সর্ব্বদা পালন করেন এবং যাহাতে সন্তান সন্ততির শিক্ষা বিবাহাদি কাজের জন্য, সংস্থান হয় তজ্জন্য যথোচিত বীমা গ্রহণ করেন।"

এই প্রস্তাব যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন :—হাফিজ হেদায়েৎ হুসেন, ডাঃ স্যার সাফাৎ আহম্মদ খাঁ, ডাঃ সইফ উদ্দিন কিচ্‌লু, খান্ বাহাদুর আব্দুল কাদের। ইঁহারা সকলেই মুসলমান সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। মুসলমান সমাজের সর্ব্বজনমান্য পীর খাজা হাসান নিজামী সাহেবও কোরাণ ও হদিশের কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বীমা সম্পূর্ণ মুসলমানশাস্ত্রসম্মত। মুসলমান সম্প্রদায়ের আলীমগণের কেন্দ্রীয় সমিতি দিল্লীর জমিয়েত উলেমা সুস্পষ্টভাবে বীমা ব্যবসায় সমর্থন করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ভারতীয় মুসলমান সমাজের অন্যতম ধর্ম্মনেতা—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিতেছেন—

'আমি যতদূর মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি—তাহাতে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে জীবনবীমা কখনই ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিগর্হিত হইতে পারে না। যখনই কোনও মুসলমান আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে তখনই আমি এই উত্তরই দিয়া আসিয়াছি।"

দেশনেতা সর্ব্বজনপ্রিয় ডাঃ এম, এ, আনসারি বলিয়াছেন—

The development in the business and in the resources of the indigenous insurance companies have been marked in the last decade and I am confident that if we go ahead continuously and directly and make vigorous attempts to consolidate the Indian business, the chances of our nation Is absorbing the whole of India's business will be assured at no distant date.

অর্থাৎ—গত দশ বৎসর আমাদের দেশের ব্যবসায়ের প্রসার ও দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির শক্তি বৃদ্ধি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং আমার বিশ্বাস যদি আমরা অবিরাম অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি, ভারতীয় বীমা ব্যবসায়কে সংঘবদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের সমগ্র বীমার কাজ একচেটিয়া করিতে পারিব।"

পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক মুসলমান নেতা খাঁন বাহাদুর মহম্মদ গাজী চৌধুরী সাহেব লিখিতভাবে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমি নিজে কোরাণ শরিক হদিস প্রভৃতির অল্পাধিক খোঁজ রাখি এবং আমার জ্ঞান ও বিবেকমতে জোর করিয়াই বলিতে পারি যে মুসলমান ধর্ম্মের কোনও নির্দেশই আমাদিগকে জীবনবীমা করিতে নিষেধ করে না"।

বাঙ্গালার অন্যান্য সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক জীবন-বীমা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অর্থের সংস্থান করিতেছেন, বাঙ্গালার বাহিরে খ্যাতনামা বহু মুসলমান—বীমা-ব্যবসায় অগ্রণী আছেন এবং তাঁহাদের উৎসাহে বহু মুসলমান বীমা করিয়া শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন।

তাই আজ দেশের এই দারুণ আর্থিক দুর্গতির দিনে ভবিষ্যতের অজ্ঞাত অন্ধকারময় জীবনের নৈরাশ্য দূর করিবার জন্য সঞ্চয়ের সর্ব্বোত্তম উপায় জীবন-বীমার দিকে সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা—

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা সাধারণতঃ ভাল নয়। উক্ত স্বাস্থ্যহানির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার কলিকাতার ৩০টি বিদ্যালয়ের (সরকারী ও সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়) সকল ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুইজন এম-বি ডাক্তার ১৯৩৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ৮ সহস্র ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া ছাত্রগণের মধ্যে যে সকল রোগ দেখিয়াছেন তাহার হিসাব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শতকরা ২৮ জন ছাত্র চক্ষুরোগগ্রস্ত; শতকরা ৯ জন ছাত্র দন্ত রোগে ভুগিতেছে; শতকরা ২৩ জন ছাত্রের টন্‌সিল বর্দ্ধিত। ডাক্তারগণের মতে ছাত্রগণের উপযুক্ত আহারের অভাবই এই সকল রোগের কারণ। কলিকাতা সহরে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরা বাস করিয়া থাকেন; তাঁহারাই যদি পুত্রদিগকে পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার প্রদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রামের ছাত্রদের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। ছাত্ররা সাধারণতঃ বেলা সাড়ে ৯টার সময় বাড়ীতে ভাত খাইয়া আসে এবং সাড়ে ৪টার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করে না। এই ৭ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোন খাদ্যই গ্রহণ করে না। যাহাতে সকল বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক টিফিন (জল খাবার) প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, ডাক্তারগণ সে জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ এই দরিদ্র দেশে কি করিয়া পালন করা সম্ভব হইবে বলিতে পারি না। তাঁহারা প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এক পোয়া দুগ্ধ, ১টা ডিম, ১ ছটাক আলুর তরকারী, আধপোয়া আটার রুটি, ১ ছটাক মাখন ও চিনির ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। অন্ততঃ-পক্ষে রুটি, আলু, ডাল, নারিকেল, গুড় ও ভিজা ছোলার অনুকল্প ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা-বিভাগের শরীর-চর্চ্চা শিক্ষার ডিরেক্টার মিঃ বুকাননের চেষ্টায় ছাত্রগণের এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাহা হউক, ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা যখন জানা গেল, তখন ইহার প্রতীকারের উপায় যাহাতে সত্বর অবলম্বিত হয় সে জন্য শিক্ষা বিভাগের অবহিত হওয়া উচিত। স্কাউটিং, ব্রতাচারী নৃত্য প্রভৃতি শিক্ষা দান ব্যবস্থার ফলে ছাত্রগণের ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে উক্ত ৭ ঘণ্টার মধ্যে উপযুক্ত টিফিন পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। স্বাস্থ্যহীন ছাত্র-গণ বিদ্যা শিক্ষা করিলেও পরে কর্ম্ম-জীবনে কোন কাজের হয় না—ইহা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আমরা মিঃ বুকাননের এই চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব।

নূতন বড়লাটের প্রচেষ্টা—

বড়লাট লর্ড লিংলিথ্‌গো সম্প্রতি নিজ ব্যয়ে দুইটি ষাঁড় কিনিয়া তাহা দিল্লীকে দান করিয়াছেন। যাহাতে ধনীরা ভাল ভাল প্রজনন-ক্ষম ষাঁড় কিনিয়া গ্রামে গ্রামে দান করেন সে জন্য তিনি বাঙ্গালার প্রাদেশিক গভর্ণরের মারফত ধনীদিগকে আবেদন জানাইয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন জমীদার ষাঁড় বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় সিমলা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয়সমূহের দরিদ্র ছাত্রদিগকে কয় মাসের জন্য প্রতিদিন বিনামূল্যে দুগ্ধ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও গত কয় বৎসর যাবৎ গোজাতির উন্নতি বিষয়ে কাজ করিতেছেন। মালদহ ও রাজসাহী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও বাঁকুড়া, ঢাকা ও ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা ও নোয়াখালি এই ১০টি জেলাকে ৫টি কেন্দ্রে পরিণত করিয়া কৃষিবিভাগের ৫জন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী পশু প্রজননের উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেছেন। নিকৃষ্ট বৃষ দ্বারা প্রজননের কুফলের কথা উক্ত কর্ম্মচারীরা কৃষকগণকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

বড়লাটের এই প্রচেষ্টা সত্যই যদি ফলবতী হয়, তবে দেশ তদ্দারা উপকৃত হইবে এবং এই কৃষকের-মঙ্গলকামী বড়লাটের কথা দেশবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

কৃষি বিভাগ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ১৯৩৪ ৩৫ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ ভারতবর্ষে প্রতি একর জমীতে গড়ে ১৬ মণের অধিক ধান উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এরূপ কম নহে। এ দেশে নাকি অনুর্ব্বর জমীতেই অধিক পরিমাণে ধানের চাষ করা হয়, সে জন্য এত অল্প পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্র-গুলিতে গড়ে প্রতি একরে ৩০ মণ ধান হইয়া থাকে। কুমিল্লায় গভর্ণমেণ্টের যে কৃষিক্ষেত্র আছে তাহাতে বৎসরে দুইবার ধানের চাষ করিয়া প্রতি একরে ৫২ মণ এবং ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ২ বার চাষ করিয়া প্রতি একরে ৫৪ মণ ধান পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকগণ দরিদ্র, অর্থাভাবে তাহারা জমীতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে পারে না—কাজেই তাহাদের জমী অনুর্ব্বরই থাকিয়া যায়। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব ২১টি কৃষিক্ষেত্র আছে। সেই সকল ক্ষেত্র-রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট বৎসরে কত অর্থব্যয় করেন জানি না। ঐ সকল কৃষিক্ষেত্র দ্বারা সাধারণ কৃষক যে আদৌ উপকৃত হয় না, তাহা অবশ্যই বলা যায়। কৃষিক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষা হয়, তাহার ফল কৃষকদিগকে জানাইবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্য্যন্ত নহে। যাহাতে দরিদ্র কৃষক যথাসময়ে স্বল্প মূল্যে সার পাইয়া তাহা ব্যবহার করে, সে বিষয়ে কৃষকদিগকে কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না। তাহা দেওয়া হইলে তাহারা ৩০ মণের স্থলে ১৬ মণ ধান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত না। সরকারী কার্য্যবিবরণে প্রকাশ, এক বৎসরে সরকার নিম্নলিখিতরূপ বীজ বিতরণ করিয়াছেন—বীজ ধান্য—৫৬৯৯ মণ ৭ সের ১৩ ছটাক; পাটের বীজ ১৩২ মণ ২১ ছটাক; আখের গাঁট (ইহাই বীজরূপে ব্যবহৃত হয়)—১ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত ৮১টি এবং তামাকের বীজ ৩৭৫৪ তোলা। এই যে বীজ বিনামূল্যে বিতরিত হয়, তাহা কাহারা পায়? যে সকল কৃষক সত্য সত্যই অর্থাভাবে বীজ ক্রয়ে অসমর্থ, তাহারাই ইহা পায়—না যাহারা সুবিধা করিয়া উহা গ্রহণ করিতে পারে, তাহারা পায়? প্রকৃত দরিদ্র কৃষকগণ যদি ঐ বীজ পাইত, তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। শিক্ষা বিভাগের চেষ্টায় মফঃস্বলে বহু প্রাথমিক, মধ্যইংরাজি এবং উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ে কৃষিক্ষেত্র করিয়া কৃষি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যে সকল ছাত্র ঐ সকল বিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, তাহাদের অধিকাংশই কখনও কৃষিকার্য্য করিতে যায় না। প্রকৃত কৃষকের ছেলেরা যাহাতে ঐ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে জন্য তাহাদের পক্ষে উহা কোন প্রকারে বাধ্যতামূলক না করিলে এই শিক্ষায় কোন উপকার হইবে না।

বর্ত্তমানে কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়া থাকে। "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ্চ" হইতে বাঙ্গালা দেশ ঐ উদ্দেশ্যে অনেক টাকা পায়; তাহা ছাড়া "ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী" ও বাঙ্গালায় তুলার চাষ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বহু অর্থ দিয়া থাকেন। এই সকল গবেষণার ফল কিন্তু সাধারণে জানিতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ যেমন দলে দলে প্রচারক প্রেরণ করিয়া মফঃস্বলের লোকদিগকে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলগুলি জানাইয়া দিতেছেন, কৃষি বিভাগ হইতে সেইরূপ প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা না করিলে দেশের লোক উপকৃত হবে না। তাহা ছাড়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার যুবকগণ যাহাতে কৃষিকার্য্য জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে। তাহার ফলে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হইবে, অপর দিকে তেমনই শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা উন্নততর কৃষি ব্যবস্থার ফলে দেশ অধিক লাভবান হইবে ও কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গালায় সেচের ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার হাজা-মজা নদীগুলির সংস্কার সাধন ও প্রয়োজনমত নূতন খাল খনন করিয়া কৃষির জমীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সেচ বিভাগ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই বিভাগের কার্য্য এত অল্প যে তাহা একরূপ উপেক্ষার যোগ্যই বলা যাইতে পারে। পশ্চিম বাঙ্গালার হাজা-মজা নদীগুলির সংস্কার সাধন করিলে যে গভর্ণমেণ্টের আয়ও বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইতে পারে, তাহা জানিয়াও

কেন যে সেচ বিভাগে এ বিষয়ে উদাসীন তাহা বলা কঠিন। ভাগীরথী বা গঙ্গানদীও এখন এমনভাবে মজিয়া গিয়াছে যে বর্ষার ৪।৫ মাস ছাড়া আর কাটোয়ার উত্তরে ষ্টীমার চলাচল করিতে পারে না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে আর কয় বৎসরের মধ্যে নদীর অবস্থা এরূপ হইবে যে হুগলীর উত্তরে আর নৌকা বা ষ্টীমার যাইতে পারিবে না। ইহার প্রতীকারের জন্যও এখন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। ২।৪টি ছোট ছোট খাল কাটিয়া বা ২।১টি ষ্টীমার পথ রক্ষা করিয়া সেচ বিভাগ বৎসরান্তে তাহারই ঢাক পিটিয়া নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছেন। অথচ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত কয়েকটি ড্রেজার বা মাটি কাটার যন্ত্র সারা বৎসরই যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা সরকারী রিপোর্টেই জানা যায়। ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায় যে মাত্র একখানি ড্রেজার সামান্যমাত্র কাজ করিয়াছে ও অবশিষ্ট ৪ খানি ড্রেজার পড়িয়াই ছিল। সেচের খাল কাটিলে যে দেশের লোক উপকৃত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। দামোদরের খাল কাটার ফলে পূর্ব্বে যে জমীতে বিঘা প্রতি ৫ মণের অধিক ধান হইত না, সেই জমীতে সেচের জলের সাহায্যে চাষ করিয়া বিঘা প্রতি ১৭ মণ পর্য্যন্ত ধান জন্মিতেছে। সরকার খাল কাটার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা জল বিক্রয় দ্বারা সংগ্রহ করিতেছেন। কবে যে দেশে সেচের কাজ বৃদ্ধি দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানে সরকার অবহিত হইবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

শিল্পোন্নতি ও সরকার—

বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত কয় বৎসর হইতে দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকগণের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্প বিভাগ অবহিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন—এ সংবাদ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর উদ্যোগে শিল্প বিভাগের ডেপুটী ডিরেকটার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালার বেকার যুবকদিগকে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কি করিয়াছেন, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ৪ দল শিক্ষক শুধু সাবান প্রস্তুত শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল কলিকাতাস্থ গবেষণাগারে থাকিয়া এক বৎসরে তিন দল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। কলিকাতা ও বাঙ্গালার মফঃস্বলের বহু শিক্ষার্থী কলিকাতার কেন্দ্রে আসিয়া সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট তিনটি দল নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে যাইয়া দল দল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিয়াছেন —সাজাহানপুর (পাবনা), সিউড়ী (বীরভূম), কৃষ্ণনগর (নদীয়া), বগুড়া সহর, বাকুড়া সহর, রাজগঞ্জ (হাওড়া), জঙ্গীপাড়া ও ফুরফুরা (হুগলী), ফুলসাজি (নোয়াখালি), টেকনিকাল স্কুল (ত্রিপুরা), চকদিঘী (বর্দ্ধমান), ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল (রাজসাহী), ফরিদপুর সহর, দিনাজপুর সহর, জে-এম-সেন-হল-চট্টগ্রাম।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের পর নানাস্থানে ছোট ছোট সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার সুফল যে একেবারে ফলে নাই, এমন নহে।

সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়, শিল্প-বিভাগ কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের মধ্যে ৩৫ জন ছাতার কারখানা খুলিয়াছেন, ৪ জন হুগলী, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বীরভূম ও কুমিল্লা জেলায় মাটীর বাসন প্রস্তুত করিতেছেন, ৯ জন পিতল-কাঁসার বাসনপত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন ও ৬ জন ছুরী কাঁচি প্রস্তুত করিতেছেন। দেশ হইতে এই সকল শিল্প প্রায় লোপ পাইতেছিল। উন্নত প্রণালীর শিক্ষা লাভের পর যুবকগণ দেশের স্থানে স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠা দ্বারা অর্থার্জ্জনে সমর্থ হইলে তাঁহাদের আদর্শে বেকারগণ অনুপ্রাণিত হইবেন এবং ক্রমেই আমরা ঐ সকল শিল্পের প্রসার দেখিতে পাইব।

এ দেশের যে সকল লোক বর্ত্তমানে শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার উপশম হইতে পারে—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সরকারী শিল্প বিভাগ ২৮ দল শিক্ষককে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে ঘুরাইতেছেন। ঐ ২৮টি দল বর্ত্তমানে ৭ প্রকার শিল্প শিক্ষা দান করিতেছেন। তাহার ফলে—(১) শিল্প কার্য্যের প্রতি দেশের লোকের

উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে (২) নিত্য ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য গ্রামের লোকগণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছে (৩) লুপ্ত শিল্পগুলি পুনরায় চালাইবার জন্য শিক্ষিত শিল্পী পাওয়া যাইতেছে ও (৪) বহু বেকার অন্ন-সংস্থানের উপায় প্রাপ্ত হইতেছে।

মাটি ও পিতল-কাঁসার কাজ বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁত ও চামড়ার ব্যবসায়ে গত কয় বৎসরে বহু বেকার লোক আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এ দেশের তাঁতীরা যে এককালে সমৃদ্ধই ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কলের সহিত প্রতিযোগিতা যতই প্রখর হউক না কেন, তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের ব্যবহার কখনই কমিবে না এবং তাঁতে বোনা কাপড়ের আদর থাকিবে। কাজেই যে সকল তাঁতি ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা যদি পুনরায় স্ববৃত্তিতে প্রত্যাগমনের সুযোগ সুবিধা পায়, তবে একদল বেকারের অন্নচিন্তা দূর হইতে পারে। এ দেশে চামড়ার কাজও যথেষ্ট পরিমাণেই লাভজনক হইয়া থাকে। সুখের বিষয় লোক এখন গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাগার-গুলিতে চামড়া-শিল্প শিক্ষা করিয়া চামড়ার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। চামড়ার ব্যবহার যখন বাড়িয়াছে, তখন এই শিল্পও অবশ্যই ভবিষ্যতে বহু বেকারকে অন্নদান করিতে পারিবে।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ—

বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট হিন্দুনেতা ভারতসচিব লর্ড জেট্‌-ল্যাণ্ডের নিকট একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তে সাধারণের নিকট প্রচার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"স্বাক্ষরকারিগণের দৃঢ় বিশ্বাস, এই দরখাস্তে শুধু যে আসন্ন শাসন-সংস্কারে বর্ণিত সাধারণ রাষ্ট্ররূপের বিরুদ্ধেই বাঙ্গালার সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে—মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনতন্ত্র অনুসারে বাঙ্গালার হিন্দুরা গত ১৬ বৎসর যাবৎ দেশের শাসন-সংরক্ষণে ও ব্যবস্থাপক সভায় যে ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতেছিল, আসন্ন শাসন-সংস্কারে যে তাহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও বাঙ্গালার হিন্দুদের নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভ ব্যক্ত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র অনুসারে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যে অধিকার আছে সেই অধিকার দাবী করিয়া বাঙ্গালায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের পক্ষ হইতে স্বাক্ষরকারিগণ নূতন ভারত শাসন আইনের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সংশোধনের জন্য শেষ পন্থা হিসাবে এই দরখাস্ত ভারতসচিবের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। এই দরখাস্তে যে সকল দাবী করা হইয়াছে, দরখাস্তকারিগণের দৃঢ় বিশ্বাস বাঙ্গলার সমস্ত বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুগণ তাহা সমর্থন করিয়া প্রমাণ করিবেন যে, অবিচারমূলক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে বাঙ্গালার সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের অভিমত ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু বাঙ্গালার সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরাই তাহা হইতে বঞ্চিত। অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহকে জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপরিষদে তাহাদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত আসন দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দু-দিগকে জনসংখ্যার অনুপাতে তাহাদের প্রাপ্য অপেক্ষাও কম আসন দেওয়া হইয়াছে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহাদিগকে চিরকালের জন্য আইনতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ করা হইয়াছে। এই বিষয়টী দরখাস্তে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। দরখাস্তে আরও বলা হইয়াছে—হিন্দুরা জন-সংখ্যার অনুপাতের অতিরিক্ত যে আসন দাবী করিতেছে, তাহাদের এই দাবীর পক্ষে আর এক যুক্তি "বৃটিশ আমলে বাঙ্গালার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ স্থান;" তাহাদের দাবীর পক্ষে বিশেষ যুক্তি এই যে, বাঙ্গালার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহারা অনেক বেশী ট্যাক্স দেয়। যতদূর সম্ভব, প্রত্যেক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত ট্যাক্সের অনুপাতে তাহার সদস্য-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা উচিত।

বাঙ্গালার হিন্দুরা মাথা গুণতি হিসাবে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বটে, কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাহারা এত গরিষ্ঠ যে বাঙ্গালার কোনও সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। বাঙ্গালার শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৬৪ জন হিন্দু। বাঙ্গালার যত ছাত্রছাত্রী স্কুলে শিক্ষালাভ করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরও অধিক হিন্দু। এ দিকে বাঙ্গালার আইন ব্যবসায়ীদের শতকরা ৮৭ জন হিন্দু, চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণের শতকরা ৮০ জন হিন্দু এবং

ব্যাঙ্কিং, বীমা ও এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়িগণের শতকরা ৮৩ জনই হিন্দু; স্বাধীন জীবিকা এবং ব্যবসায়ে ব্রতীদের এই অনুপাত হইতেই বুঝা যাইবে আর্থিক ক্ষেত্রেও বাঙ্গালার হিন্দুদের স্থান কত উচ্চে।

দরখাস্তকারিগণ ভারত শাসন আইনের ৩০৮ (৪) ধারা অনুসারে এই সকল সংশোধন করিতে সপারিষদ সম্রাটকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, হিন্দু সম্প্রদায় যুক্ত-নির্ব্বাচনে বিশ্বাসী, সুতরাং তাহাদের উপর পৃথকনির্ব্বাচনপ্রথা না চালাইয়া, যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথায় সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হউক। পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা আত্মকর্তৃত্বশীল শাসনতন্ত্রের বিরোধী। ব্যবস্থা-পরিষদে যে হারে সদস্য সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুদিগকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের গুরুত্ব অনুসারে সদস্যপদ দেওয়া হউক। উপসংহারে দরখাস্তকারিগণ ইহাও প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপরিষদে আরও অধিক সংখ্যক সদস্যপদের জন্য তাহাদের দাবী সম্পর্কে যত দিন পর্য্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন যেন বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার হিন্দুদের সদস্য সংখ্যার অনুপাতেই তাহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা—

ছাত্রগণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহের সঞ্চার ও ইউনিভার্সিটি ট্রেণিংকোরের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই বিষয়ে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। বিগত ২৭শে জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় সামরিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, সামরিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীন বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং এই শিক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে—সিনিয়র ও জুনিয়র। প্রত্যেক ভাগে দুই বৎসর করিয়া সময় লাগিবে এবং প্রত্যেক ভাগ আবার থিয়োরেটিক্যাল (পুঁথিগত) ও প্রাকটিক্যাল (ব্যবহারিক) দুইভাগে বিভক্ত থাকিবে। ব্যবহারিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনাবাহিনীর মধ্যে লাভ হইবে এবং পুঁথিগত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। সামরিক শিক্ষা বর্ত্তমানে ইচ্ছাধীন বিষয়মধ্যে গণ্য হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ইউনিভার্সিটি কোরের সদস্য—কেবলমাত্র তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষার পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে এবং এই পরীক্ষায় ফেল করিলেও তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরীক্ষার তাহাতে কোনই ক্ষতি হইবে না। সামরিক শিক্ষার উভয় ভাগের প্রতি ভাগে ২০০ নম্বর থাকিবে। তন্মধ্যে কেহ ৬০ নম্বরের বেশী পাইলে, বেশী নম্বরটা সেই ছাত্রের অন্যান্য পরীক্ষার মূল নম্বরের (এগ্রিগেট) সহিত সংযুক্ত হইবে।

কমিটির রিপোর্ট গ্রহণের সময় তিনজন শ্বেতাঙ্গ সদস্য উহাতে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন। ভাইসচ্যান্সেলর পরিকল্পনাটির সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—"বাঙ্গালার ইউনিভার্সিটি সেনা-বাহিনী যাহাতে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ছেলেদিগকে সদস্য হিসাবে পায় তজ্জন্য একটু সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিতে চাই। এই সহরে যেদিন একটী সামরিক কলেজ দেখিতে পাইব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ভাল ভাল ছাত্র যেদিন সেই কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছি।" সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাটী আমরা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছি। সকল স্বাধীন সভ্যদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের এই পরাধীন দেশের কথা স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী-ছাত্র সম্প্রদায়কে সরকার সাধারণতঃ সন্দেহের চক্ষেই দেখেন। তাঁহারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সামরিক শিক্ষা-দানের প্রচেষ্টা প্রকৃত ভালভাবেই গ্রহণ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। ভাইসচ্যান্সেলার যে উচ্চাশা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও যে কতদিনে পূরণ হইবে, তাহা কেবল ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

আবিসিনিয়া—

ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া-বিজয় কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং ইটালীর রাজা আবিসিনিয়ার সম্রাট ঘোষিত হইয়াছেন। পৃথিবীর আর একটি দেশে শ্বেতাতিরিক্ত

জাতির প্রাধান্যের অবসান ঘটিল। সাম্রাজ্যবাদ আবার জয়যুক্ত হইল। জার্ম্মাণযুদ্ধে যখন আমেরিকা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে, তখন উদার উদ্দেশ্য জাগরিত হইয়াছিল—সকল দুর্ব্বল জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করা হইবে। ইটালী যে সেই উদ্দেশ্য পদদলিত করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহাকে বিজ্ঞবর মিল civilisade বলিয়াছেন, এখনও তাহার অবসান হইল না। পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে জাতিসঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জাতি সঙ্ঘও ইটালীর কার্য্যে বাধা না দেওয়ায় লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে—সঙ্ঘ শ্বেত জাতি-সমূহের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই স্থাপিত হইয়াছে। আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধে ইটালী জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসানে স্বাক্ষরিত সন্ধির সর্ত্তও রক্ষা করে নাই—হাসপাতালের উপর বোমা বর্ষণে ও বিষবাষ্প ব্যবহারে বিরত হয় নাই। তথাপি য়ুরোপের অন্যান্য দেশ ইটালীর কার্য্যে বাধা দেয় নাই। কবি কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশি বিষে দংশেনি যারে?"

ইটালী কিন্তু অপরের দ্বারা পিষ্ট হইবার যাতনা সহ্য করিয়াও সাম্রাজ্যবাদ মত্ততায় আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। এক কালে ইটালী কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হেমচন্দ্র "ভারত-ভিক্ষায়" লিখিয়াছিলেন :—

"হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী।
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল মন্দির রঙ্গ-নাট্যশালা
গৃহ হর্ম্ম্যপথ সেতু পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।"

ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডীর চেষ্টায় ইটালীর ভাগ্যোদয়—সে-ও যে অধিক দিনের তাহা নহে। কিন্তু সুদিনে দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ত পরের কথা—ইটালী আবিসিনিয়ার দৌর্ব্বল্যের সুযোগ পাইয়া তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। ইটালী যে এই যুদ্ধে "সভ্য"জাতি সমূহের নির্দ্দিষ্ট সামরিক রীতি ভঙ্গ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সংপ্রতি ইটালীর সাফল্যের আর একটি কারণ—তুর্ক সেনাপতি ওয়াহিব পাশা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়াহিব আবি-সিনিয়ার সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া তথায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—যখন আবিসিনিয়ার সম্রাট বুঝিতে পারিলেন, দেশের অধিবাসিগণের এক-চতুর্থাংশ বিষবাষ্পে ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য হইয়াছে, তখন তিনি দেশ ত্যাগের সংকল্প করেন—তাহার পূর্ব্বে নহে। তিনি আরও বলেন, ইটালী যদি সোমালীদিগের মারফতে আবিসিনিয়ার সর্দ্দারদিগকে কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়া বশীভূত না করিত, তবে তাহার পক্ষে আবিসিনিয়া জয় করা কখনই সম্ভব হইত না। সোমালীরা ইটালীর টাকা লইয়া বার বার আবিসিনিয়ার সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল।

পরাভব স্বীকার করিয়া আবিসিনিয়ার সম্রাট দেশ ত্যাগ করিয়া প্যালেষ্টাইনে গমন করেন। তথা হইতে তিনি সপরিবারে ইউরোপে গিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, এখনও মনে মনে আশা করিতেছেন, জাতি সঙ্ঘ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাঁহার সম্বন্ধে ন্যায়-বিচার করিবেন। কিন্তু সে আশার আর অবকাশ আছে কি? রাজ্যচ্যুত সম্রাটের পত্নী নাকি স্থির করিয়াছেন, তিনি অতঃপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবেন।

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভূপর্য্যটক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আসামের তিনসুকিয়া হইতে একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া উত্তর ও মধ্যভারত প্রদক্ষিণ করেন। তিনি পার্ব্বত্য পথ দিয়া রেঙ্গুন পর্য্যন্ত গমনের পর তথা হইতে সাইকেলযোগে ব্রহ্মদেশ, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বর্ণিও, সেলিবিকা, বালি, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও ষ্ট্রেট্‌সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি ঘুরিয়া গত ৭ই মার্চ্চ মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন। মাদ্রাজ হইতে কটক ও পুরী হইয়া তিনি গত ২০শে এপ্রিল কলিকাতায় আসেন।

তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ২৪ বৎসর, তিনি ঢাকা বিক্রমপুর পরগণার আড়িয়ল গ্রামের অধিবাসী। ক্ষিতীশচন্দ্র এ পর্য্যন্ত পদব্রজে ১০ হাজার মাইল, সাইকেলে ১৩ হাজার মাইল ও জাহাজে ৭ হাজার মাইল গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রুসিয়ার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট অনুমতি না দেওয়ায় তাঁহার রুসিয়ায় যাওয়া হয় নাই। শীঘ্রই তিনি আফ্রিকা ভ্রমণে গমন করিবেন।

শ্রীমান শৈলেন্দ্রমোহন বসু—

ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সেক্রেটারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রমোহন বসু রেঙ্গুনে মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি-বি-এস পাশ করিয়া গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিলাত গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি ও ডি-টি-এম-এচ উপাধি লাভের পর গত অক্টোবর মাসে এডিনবরা হইতে এম-আর-সি-পি উপাধি লাভ করিয়াছেন। লণ্ডনেও তিনি পরে উক্ত উপাধি লাভ করিয়াছেন—অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই এই সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি কার্ডিফে যক্ষ্মা চিকিৎসা শিক্ষা

শ্রীমান শৈলেন্দ্রমোহন বসু

করিতেছেন। আমরা এই যুবকের দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।

জাহান্‌-আরা বেগম চৌধুরী—

শ্রীমতী জাহান্ আরা বেগম চৌধুরীর নাম শিল্পজগতে সুপরিচিত। এ বৎসর ফরিদপুর সহরে দুইটি প্রদর্শনী

জাহান্‌-আরা বেগম চৌধুরী

হইয়াছিল—একটি স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, লাল মিয়া প্রভৃতি দেশকর্ম্মীরা অপর
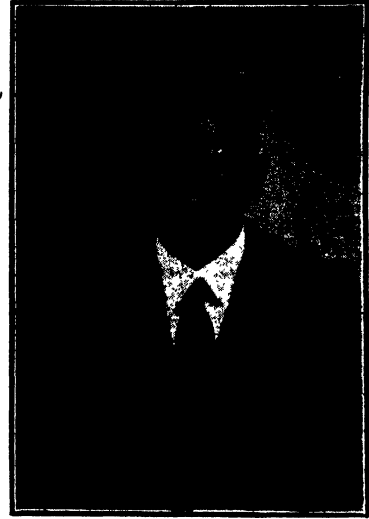
প্রদর্শনীটির আয়োজন করিয়াছিলেন। উভয় প্রদর্শনীর শিল্প প্রতিযোগিতাতেই শ্রীমতী জাহান-আরা বেগম চৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

হারিকেন লণ্ঠনের কারখানা—

হারিকেন লণ্ঠন এখন গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালা দেশে একটিও লণ্ঠন প্রস্তুতের কারখানা নাই; সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র একটি কারখানা আছে। প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের হারিকেন লণ্ঠন ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। শ্রীযুত সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য নামক একজন উৎসাহী যুবক তিন বৎসর কাল ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে থাকিয়া লণ্ঠন প্রস্তুত কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে এবং কলিকাতা কলুটোলার সি, কে, সেন কোম্পানীর শ্রীযুত বলাইচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত রাসবিহারী সেনের অর্থানুকূল্যে সম্প্রতি আগড়পাড়ায় একটি লণ্ঠনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৩শে জুন বাঙ্গালার সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন উক্ত কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ কারখানায় প্রত্যহ ৫ শতটি করিয়া লণ্ঠন প্রস্তুত হইবে। আমরা এই কারখানার সাফল্য কামনা করি।

আগড়পাড়ায় হারিকেন লণ্ঠনের কারখানা

কবিরাজের সম্মান প্রাপ্তি—

কলিকাতা ১৯৭ বৌবাজার ষ্ট্রীটের খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায় এম, এস-সি মহাশয় এবার "আয়ুর্ব্বেদে ত্রিদোষ" সম্বন্ধে ইংরাজিতে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "সার জে, সি, বসু পুরস্কার" প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় কলিকাতাস্থ শ্যামাদাস বৈদ্য শাস্ত্রপীঠের অধ্যাপক এবং ধন্বন্তরি নামক আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ক মাসিক পত্রের সম্পাদক। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে এম, এস-সি পাশ করেন ও কয় বৎসর কলিকাতা মেডিকাল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

কবিরাজ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ রায়

ডাক্তার সুশীলকুমার প্রামাণিক—

করাচী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডাক্তার সুশীলকুমার প্রামাণিক কিছুদিন পূর্ব্বে পুনায় বদলী হইয়াছেন। করাচীতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে ক্লাব আছে,

করাচী-প্রবাসী বাঙ্গালী সুশীল প্রামাণিক (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট)

ডাক্তার প্রামাণিক তাহার সভাপতি ছিলেন ; তিনি স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহার করাচী ত্যাগের প্রাক্কালে করাচীর বাঙ্গালী অধিবাসীরা তাঁহাকে এক প্রীতিসম্মিলনীতে বিদায় অভিনন্দন করিয়াছিলেন। সম্মিলনীতে সহকারী এরোড্রম অফিসার মন্মথনাথ ঘোষ ও রয়াল এয়ার ফোর্সের গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার কে, এস, মিত্রের গান সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ঐ বিদায় সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে তথায় যে ফটো তোলা হইয়াছিল, আমরা তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে করাচী সহরে বাঙ্গালীদের এই অনুষ্ঠান বাঙ্গালীর নিকট গৌরবের বস্তু, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মে বাঙ্গালীর সম্মান—

যে সকল বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে যাইয়া নিজ কৃতিত্বের দ্বারা অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তন্মধ্যে রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রমোহন রায় অন্যতম। তিনি গত ২৩শে জুন ব্রহ্মের সিনিয়র ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঢাকা জেলার শেখরনগর গ্রামের অধিবাসী। রায় মহাশয় ব্রহ্মে যাইয়া মাত্র ৬০ টাকা বেতনে সরকারী চাকরী আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ব্রহ্মে বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ব্রহ্মবাসীদিগের এবং প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের নানা প্রকার উপকার করিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী-

হেমেন্দ্রমোহন রায়

দিগের মধ্যে রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত এস, এন, সেনের পর তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ব্যক্তি।

ছাপ্পান্ন বৎসর অনাহারে যাপন—

বাঁকুড়া পাত্রসায়ার থানার বিউর গ্রামনিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বিধবা ভগিনী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী গত ৫৬ বৎসরকাল অনাহারে আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৬৮ বৎসর। তিনি প্রত্যহ মাত্র একটি তুলসীপত্র আহার করেন—জল পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। অনাহারে থাকার জন্য তাঁহার শরীরের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। তিনি বেশ সুস্থ ও সবল এবং স্বহস্তে সাংসারিক বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার এই অনাহারে অবস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, ব্যাপারটি প্রকৃত সত্য। ১২ বৎসর বয়স হইতে যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা তিনি পানাহার ত্যাগ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। ১২ বৎসর বয়সেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। এখন প্রত্যহ বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া থাকে।

ছাপ্পান্ন বৎসর যাবৎ অনাহারে বাঁকুড়ার হিন্দুমহিলার কৃচ্ছ্র সাধনা

কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি উৎসব—

'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনের সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল পরে তাঁহার জন্মভূমি কৃষ্ণনগরে এবার গত ৫ই জুলাই তাঁহার জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালীজাতির দুর্ভাগ্য যে কলিকাতার মত সহরেও জাতীয়-কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। এ বৎসর তাঁহার মৃত্যু-দিবসে মেদিনীপুর জেলার কাজলাগড় গ্রামের ও হাওড়া জেলার বালী গ্রামের অধিবাসীরা দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অধিবাসীরা সেদিন প্রাতে দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক বাটীতে এবং অপরাহ্ণে স্থানীয় পাবলিক হলে তাঁহার প্রতিভার আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। প্রাতে সহরবাসীরা মিছিল করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত সঙ্গীত গান করিতে করিতে তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই কবিতা আবৃত্তি করিয়া ও তাঁহারই সঙ্গীত গান করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হইয়াছিল; তাহাতে প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, অভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক মহাশয় অসুস্থতার জন্য এই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তিনি একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং 'ভারতবর্ষে'র সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় 'ভারতবর্ষে'র প্রতিনিধিরূপে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা কৃষ্ণনগরবাসীদিগকে তাঁহাদিগের এই প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি এবং আশা করি এখন হইতে প্রতি বৎসরই তাঁহারা এইভাবে কবিবরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। কলিকাতা কর্পোরেশন দ্বিজেন্দ্রলালের কলিকাতাস্থ বাসভবন 'সুরধামে'র সম্মুখস্থ একটি ছোট গলির মাত্র একাংশের নাম "ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট" করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমাদের মনে হয়, ইহা নিতান্তই ছেলেখেলা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন আদৌ শোভন হয় নাই। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে আপার সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত মানিকতলা স্পারের যে অংশ বর্তমান, তাহার এখনও নূতন নামকরণ হয় নাই; দ্বিজেন্দ্রলালের নামে ঐ অংশের নামকরণ হইলেই শোভন হইবে। আমরা ঐ অঞ্চলের ওয়ার্ড-কাউন্সিলার শ্রীযুত নলিনচন্দ্র পাল ও কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়কে এ বিষয়ে অবহিত হইতে সানুনয়ে অনুরোধ জানাইতেছি।

শোক-সংবাদ

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় গত ২৫শে বৈশাখ মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়সে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রায় পদব্রজেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেলেঘাটা শুঁড়ায় একটি
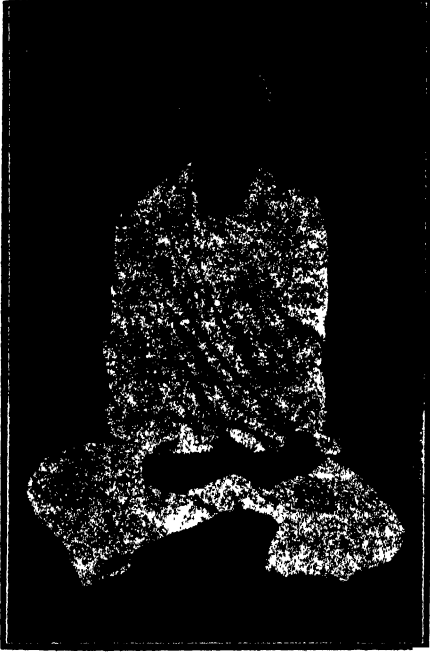
কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

টোল প্রতিষ্ঠা করেন। বাগ্মী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি বহু সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় সারস্বত লাইব্রেরী ও হরিহর লাইব্রেরী নাম দুইটি পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতমহামণ্ডলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পি, এম, বাগচী পঞ্জিকার প্রধান ব্যবস্থাপক ও দেববাণী নামক সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকরূপে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হইল।

কৈলাসচন্দ্র বসু—

খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় গত ১৮ই জুন রাত্রিশেষে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আইনে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। প্রভূত অর্থের মালিক
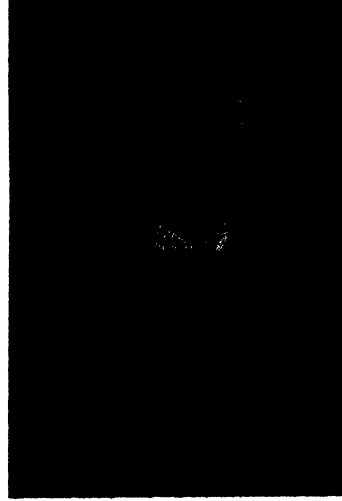
কৈলাসচন্দ্র বসু

হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং অনাড়ম্বর সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। কৈলাসচন্দ্র যশোহর জেলার রায়-গ্রামের অধিবাসী। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের পদলাভ করেন ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় মাত্র গত ২ মাসকাল তিনি অবসর ভোগ করিয়াছিলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি পিতার নামে স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার নামে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালেও তিনি ৫ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

ম্যাক্সিম গোর্কী—

গত ১৭ই জুন রুশদেশীয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে বাস করিতেন বটে, কিন্তু
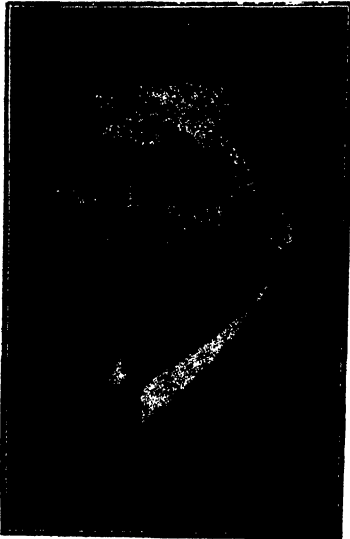
ম্যাক্সিম গোর্কী

তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বহু ভারতবাসীই সেগুলির রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার রচিত একখানি পুস্তক বাঙ্গালা ভাষাতেও অনূদিত হওয়ায় তাহা ইংরাজি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদিগকেও আনন্দ দান করিয়াছে। গোর্কী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যবশতঃ তিনি স্কুল কলেজে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে তাঁহাকে মুচীর কাজ, পাচকের কাজ ও ভৃত্যের কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইত। এই দরিদ্রের জীবনেই গোর্কী তাঁহার লেখার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমে কেহ তাঁহার লেখা পড়িত না বা তাঁহার আদর করিত না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কতকগুলি গল্প দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইলে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার একখানি নাটক বার্লিনে একটি থিয়েটারে ক্রমান্বয়ে ৫ শত রাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। বিপ্লববাদীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ লেখার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-গভর্ণমেণ্ট গোর্কীকে গ্রেপ্তার করে। তখন তিনি কিছুদিন আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইয়া রুশিয়ার জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে গোর্কী রুশদেশে ফিরিয়া যাইয়া যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধে আহত হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি বিপ্লব প্রচারের জন্য এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু লেনিনের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করায় তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি রুশিয়ার বাহিরে চলিয়া যান ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রুশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে রাজোচিত সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি কখনও রুশিয়ায় তাঁহার পল্লীভবনে, কখনও বা ইটালীতে বাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও গোর্কী প্রতিদিন সকাল ৯টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া গোর্কী সমগ্র রুশিয়ার হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তিনি ঘরের বাহির হইলে মস্কোয়ের পথে ছেলেদের ভিড় জমিয়া যাইত, তাঁহার দর্শনলাভের আশায় কৌতূহলী নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকিত। তাঁহার নামানুসারে সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ রণতরী ও বিমানপোতের নামকরণ হইয়াছে। সাহিত্যিকের জীবনে তাঁহার এই সৌভাগ্যের বোধ হয় তুলনা নাই।

জগদ্বন্ধু ভৌমিক—

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের প্রবীণ ব্যবহারাজীব জগদ্বন্ধু ভৌমিক মহাশয় ৬৯ বৎসর বয়সে সম্প্রতি সন্ন্যাস-রোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবু অত্যন্ত

দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ অধ্যবসায়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় কোন প্রকার পুস্তকের সাহায্য না পাইয়া শুধুমাত্র শ্রুতির সাহায্যে তিনি প্রথমবার আইন পরীক্ষা দেন। পর বৎসর ২৫ ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং প্রথম বৎসর হইতেই তাহাতে তিনি সফলতা লাভ করেন। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল তিনি প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা, সুমার্জ্জিত ব্যবহার ও সরস হাস্য রসিকতার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। ব্যয়বহুল বিলাসিতা-বর্জ্জিত অথচ সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ অত্যন্ত সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব যেন পরিস্ফুট ছিল। স্বগ্রামের প্রতি তাহার আকর্ষণ ছিল অসাধারণ। পশ্চিমে হাওয়া বদল বিলাসী অতি-আধুনিক শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রামবিমুখতার দিনে ইহা জানিয়া অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইবেন যে প্রতি বৎসরই পূজাপার্ব্বণে সপরিবারে তিনি নিজ গ্রামে উপস্থিত থাকিতেন। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই সহিত তাঁহার কোন না কোন একটা পাতানো সম্পর্ক ছিল। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী। জ্যেষ্ঠ রমণীরঞ্জন কুমিল্লার এসিস্ট্যাণ্ট পাবলিক্ প্রসিকিউটর, মধ্যম অবনীরঞ্জন চাঁদপুরের উকীল ও কনিষ্ঠ মনোরঞ্জন তরুণ ভাস্কর রূপে কলিকাতার শিল্পী-

জগদ্বন্ধু ভৌমিক

সমাজে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবুর বিধবা, পুত্রগণ ও কন্যা শান্তিলতাকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

মেঘদূতের কবির প্রতি

শ্রীমলয় মিত্র

গোপনে যারে রাখিয়াছিলে, নিভৃত মন-কন্দরে
অসীম স্নেহে ভরি',
স্বপনে যাহা রচিত মায়া বিরহী তব অন্তরে
মরম-দুখ হরি'।
নীরবে যদি সহিয়াছিলে অসীম অনুকম্পাতে
বেদন—মেঘভার,
আষাঢ়-ধারা দিল কি সাড়া প্রথম বারি-সম্পাতে
খুলিলে হৃদিদ্বার।

তথাপি বুঝি পড়িল মনে, সলাজ প্রিয়া-আঁখিতে
নীরব ব্যাকুলতা,
'এ কথা কভু বলোনা কারে'—কথাটি তারি রাখিতে,
রচিলে অমরতা।
ঘোষিলে বাণী যক্ষমুখে প্রণয়-রাগ-সৌরভে,
বিরহী মহাকবি!
আষাঢ়-উষা-প্রথম-আলো জগৎ-জোড়া গৌরবে
স্মরিল তব ছবি।

কবি-প্রিয়া

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল্

বসিয়া থাকিলে অনেক কথাই মনে পড়ে। গরীবের পক্ষে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করাও নাকি অপরাধ—অন্ততঃ গৃহিণীর কথায় তাহাই মনে হয়। পাশের বাড়ীর দরজায় মোটরের শব্দ উঠিল, দেখিলাম বিজয়বাবু সস্ত্রীক চলিয়াছেন—সিনেমায় নিশ্চয়। আজ গ্লোবে নূতন বই আসিয়াছে। বেশ আছেন বিজয়বাবু—বড়লোকের ছেলে, পয়সার ভাবনা নাই—রূপ, স্বাস্থ্য, আনন্দ—কোনো কিছুরই অভাব নাই। মানুষ ইহজগতে যাহা চায় বিধাতা তাহাই তাঁহাকে ভরপুর করিয়া দিয়াছেন।

আর আমি!—যাক্, আজ এই জ্যোৎস্নাভরা গভীর অনন্ত নীল আকাশের তলে বসিয়া আর বিধাতাকে দোষ দিব না। বাহিরের লোক জানে, আমার সাহিত্য রসের অফুরন্ত উৎস আমার গৃহিণী। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আজ আমার কত সুখ কত আনন্দ। সাহিত্য-রসে উদর পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু আর কিছু করিবার মত শক্তিও ত নাই।

কয়েক দিন হইতে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের একটি বাঙ্গালা অনুবাদ করিতেছি; শেষ করিতে পারিলে কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। পঞ্চম অঙ্ক শেষ করিয়া ষষ্ঠ অঙ্ক আরম্ভ করিয়াছি। ধীবরকে লইয়া নগররক্ষক রাজপ্রাসাদে আসিয়াছে…

বসিয়া বসিয়া মহাকবির কাব্যরচনার কথা ভাবিতে লাগিলাম। উজ্জয়িনীর প্রান্ত ঘিরিয়া শিপ্রা নদীর শাখা গন্ধবতী পড়িয়া রহিয়াছে। পাশেই মহাকালের প্রাচীন মন্দির! তাহারই সোপানে বসিয়া কবি নদীর পানে চাহিয়া আছেন। শিপ্রার মত গন্ধবতীর স্রোত নাই; স্থানে স্থানে জল জমিয়া আছে, আর তাহারই উপর অগণিত কুমুদ ফুটিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। নদী-তটে একটি বকুল বৃক্ষ নব প্রস্ফুটিত পুষ্পে সজ্জিত হইয়া বিলাসমধুরা নারীর মতই দাঁড়াইয়া আছে। দূরে নদীর বালুকারাশির উপর শুভ্রবর্ণ বলাকা আনন্দে বিচরণ করিতেছে—তাহারই পশ্চাতে চক্রবাল রঞ্জিত করিয়া দিবাকর অস্তগমনে চলিয়াছে।

মুগ্ধ কবি স্তিমিতনয়নে প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা দেখিতেছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে একে একে দেবদাসীরা মহাকালমন্দিরে আরতি-নৃত্য করিতে আসিল। চটুলা নর্ত্তকীগণ রসিকবর কবিকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল—নৃত্যতালের চলনে মেখলা লম্বিত নবনীপের মালা গতিভঙ্গিমায় অপূর্ব্ব ছন্দে নাচিতে লাগিল। তাহাদের কজ্জলরঞ্জিত নয়ন, লাক্ষারাগ শোভিত অধর, লোধ্ররেণুস্পৃষ্ট আনন—আজ কবির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিল না; কবি আজ বড় বিমর্ষ—কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন! অন্যদিন রসিকা নাগরিকাদের পরিহাসে কবি আনন্দে যোগ দিতেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম হইল। ধীরে ধীরে নর্ত্তকীগণের নূপুর ধ্বনি মিলাইয়া গেলে কবি উঠিলেন।

উজ্জয়িনীর প্রশস্ত রাজপথ জনকোলাহলে মুখরিত। প্রস্তর নির্ম্মিত রাজপথের উভয়পার্শ্বে উচ্চ সৌধ-শ্রেণী সান্ধ্য প্রদীপে সজ্জিত—দ্বারপ্রান্তে মঙ্গলঘট—তোরণশিরে পুষ্প-মালা—গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি। ধীর পদক্ষেপে, আনত নয়নে, গভীর চিন্তায় কালিদাস রাজপথে চলিয়াছেন। পথে কত লোক তাঁহাকে প্রণাম করিল—কত শ্রেষ্ঠী চন্দনের মালা পরাইয়া দিল—কত পুষ্পকার পুষ্পগুচ্ছ দিল—কবির আজ কিছুতেই মন বসিতেছে না।

কবি-প্রিয়া কমলাদেবী গৃহকক্ষে অগুরুধূপে নিজের প্রসারিত কেশরাশি সুগন্ধী করিতেছিলেন। মস্তকের সম্মুখদেশে অলকগুচ্ছ, সদ্যচয়িত কুরুবকের মালা—কর্ণের মুক্তাভরণের উপর দুইটি ক্ষুদ্র শিরীষ যেন শতগুণ রূপ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

কালিদাস ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কমলাদেবী স্বামীর আগমন শব্দে আনন্দে সম্ভাষণ করিতে আসিয়া কবির গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কহিলেন—'প্রিয়, আজ তোমার এ মূর্ত্তি কেন?—কোথায় গেল তোমার আদরসম্ভাষণ, কোথায় গেল হাস্যমুখর পরিহাস?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কালিদাস কহিলেন—'প্রিয়ে, আজ অপমানিত হলাম।'

—'তোমার অপমান!—বিশ্ববিখ্যাত কবির অপমান! কে করেছে?'

—'কর্ণাট রাজমহিষী।'

—'কর্ণাট রাজমহিষী?'—কমলাদেবী বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে উত্তরীয় প্রান্ত হইতে সুদৃশ্য বল্কল পত্রখানি বাহির করিয়া কবি কহিলেন—'এই দেখ তাঁর পত্র! আমার পুস্তিকাগুলির একটি অনুলিপি পাঠিয়েছিলাম তাঁর কাছে। কত বড় বিদুষী তিনি—ভাব্‌লাম তাঁকে একবার আমার লেখা দেখাই!—এই দেখ তাঁর পত্র।'

কমলাদেবী পত্রখানি পাঠ করিলেন। কর্ণাট রাজ-মহিষী লিখিয়াছেন যে জগতে কবি তিনজন—যিনি বেদ উপনিষদ রচনা করিয়াছেন তিনি, আর ব্যাসদেব ও বাল্মীকি। ইহা ব্যতীত যাহারা কাব্য লেখে তাহারা গদ্য-পদ্য রচনা করে বটে কিন্তু তাহারা কবি নহে। কর্ণাট রাজমহিষী তাহাদের মাথায় বামচরণ স্থাপন করেন—'তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাট রাজ-প্রিয়া'।

লিপিপাঠ শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কবিপ্রিয়া মৃদু হাসিলেন।

কালিদাস বিস্ময়ে কহিলেন—'প্রিয়ে, নারীর নিকট আমি অপমানিত হয়েছি আর তুমি হাস্‌ছ? অপামর দেশবাসী আমার কাব্যরস আস্বাদন করে আনন্দিত হয়েছে—আর আজ সেই আমি অত্যন্ত নীচ ভাষায় অপমানিত হলাম! তোমার মুখে আজ হাসি দেখে আমি অপমান অপেক্ষা শতগুণ ব্যথা পেলাম।

কবিপ্রিয়া সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'নারী অপমান করেছে, তাই দুঃখিত হয়েছ প্রিয়তম, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—নারীর কাছে কেন গিয়েছিলে? তোমার অপূর্ব্ব কাব্যের রস গ্রহণ করতে যেখানে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অক্ষম, সেখানে নারীর ক্ষমতা কোথায়!'

কবি কহিলেন,—'কমলাক্ষি, তুমি ত জানো তিনি সাধারণ নারী নন!—অত বড় বিদুষী, কাব্যামোদিনী নারী ভারতে আর কে আছে বল! তাঁর মুখে প্রশংসার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব।'

কমলাদেবী কৃত্রিম রোষে বলিলেন—'কিন্তু নারীর কাছে সুখ্যাতি তুমি পাবে না কবি! কাব্যে তোমার নারীর অপমান করেছ—আর তুমি চাও নারীর প্রশস্তি?'

কবি বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন—'আমি নারীর অপমান করেছি!'

—'হাঁ, যে নারী বস্ত্রে উত্তরীয়ে অলঙ্কারে, কেশে সর্ব্ব-প্রকার বাহুল্যে নিজের দেহশ্রী আবৃত রাখ্‌তে প্রয়াস পায়—তুমি সেই অন্তঃপুরচারিণী নারীর দেহ-সৌষ্ঠব নিয়ে অযথা বিনা কারণে তোমার কাব্যে আলোচনা করেছ।—কোথাও কিছুর তুলনা করতে গিয়ে তুমি নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যের কথাই বলেছ।—তাতে নারীর অপমান বোধ হয় না?'

বিমূঢ় কালিদাস কহিলেন—'কোথায় নারীর দেহশ্রীর কথা বলেছি!'

অশেষ বিদ্যাপারদর্শিনী কবিপ্রিয়া কহিলেন—'এখন তোমার স্মরণ হচ্ছে না, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি—'কুমার সম্ভব' লিখ্‌তে গিয়ে অষ্টম, নবম, দশম সর্গে কি কাণ্ডটাই করেছ! যে গৌরীকে আমরা জগন্মাতা বলে পূজা করি, তাঁর নগ্নচিত্রই তুমি এঁকেছ?—এমন কি তাঁকে মদ্যপান পর্য্যন্ত করিয়েছ! অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা মনে হয় নি?—'সম্ভোগ শৃঙ্গার রূপ উত্তম দেবতাবিষয়া ন বর্ণনীয়া'। কাব্যনীতির বহির্ভূত এই চিত্র না আঁকলে কি ক্ষতি হত? বিনাকারণে মেঘদূতে অলকারূপসীবৃন্দের যৌবনশ্রী নিয়ে কি রসিকতাই না করেছ! নলোদয়ে নল-দময়ন্তীর সুমধুর জীবনযাত্রার মধ্যেও অযথা অসংযমের পরিচয় দিয়েছ;—তাঁদের কক্ষগাত্রে নগ্নচিত্র অঙ্কিত করবার কি প্রয়োজন ছিল! সব কথা আজ মনে পড়ছে না। এমন কি যে শকুন্তলা কাহিনী লিখ্‌তে আরম্ভ করেছ তাতেও—বল্‌তে লজ্জা হয়—শকুন্তলার বক্ষবল্কলের দৃঢ়বদ্ধতার বিষয়ে প্রিয়ংবদার মুখে ও উক্তি কি লেখকের সংযমের অভাবের পরিচয় দেয় না? এরপর কোনো নারী আর তোমায় সুচক্ষে দেখবে?'

কালিদাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। গৃহের সম্মুখে উদ্যান, তাহার মধ্যস্থলে বৃহৎ অশোকতরু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কবি তাহার তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঊর্দ্ধে সীমাহীন আকাশ ছাইয়া পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে। ভাবিলেন, ইহাকে দেখিয়াই একদিন নলোদয়ে লিখিয়াছিলাম—'স্মরাগ্রগঃ রাজতঃ ঘটঃ'—মদনের রজতকুম্ভ! সত্যই ত, কি প্রয়োজন ছিল চন্দ্র মদনের নামে প্রযুক্ত করিতে। আর কি উপমা ছিল

দূরে ঐ শুষ্কপ্রায় গন্ধবতীর বালুকারাশির উপর নীল বেতসলতা পড়িয়া আছে—উহা দেখিয়াই একদিন মেঘদূতে লিখিয়াছিলাম—'হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধো নিতম্বম্'। স্ত্রী দেহের উপমা ব্যতীত সত্যই কি নদীর সহিত তুলনা করিবার আর কিছুই ছিল না। এই পুষ্পভারনত অশোকতরুর কথা স্মরণ করিয়াই একদিন রঘুবংশে লিখিয়াছিলাম,—'স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্।' নব রসের মধ্যে নিকৃষ্ট রস দিয়াই বুঝি এতদিন লোকরঞ্জন করিয়াছি। কিন্তু কোনদিন ত নিজে বুঝিতে পারি নাই—নিজের মনের কোণে কোনদিন এতটুকু চাঞ্চল্য—এতটুকু দুর্ব্বলতা—এতটুকু বিকৃতি অনুভব করি নাই।

হৃদয় মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। কমলাদেবী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন—'পাদ্য প্রস্তুত, সন্ধ্যা বন্দনাদি করবে চলো! এরকম চিন্তা ত তোমার সাজে না দেব!'

কালিদাস রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—'সত্যই আমি অপরাধী দেবি! নিজে কোনদিন বুঝ্‌তে পারি নি, কি করছি। আমার মনের কোণে নারীর রূপ বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ আদর্শ-রূপে জেগে আছে—আমার কাছে নারীর মন, দেহভঙ্গিমা বিধাতার শিল্পজ্ঞানের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাই কোনো কিছু শ্রেষ্ঠের কল্পনার তলে আমার এই মূর্ত্তিই জেগে ওঠে; —কিন্তু তা যে এত ক্ষতিকর তা ত ভাবি নি।'

কমলাদেবী পরম প্রীতিভরে স্বামীর হাত দু'টা ধরিয়া বলিলেন—'আমি এতক্ষণ পরিহাস করছিলাম প্রিয়—আমার মুখ দেখে তা বুঝতে পারো নি? তুমি যে কত ভালো—কত মহান্ তা কি আমি জানি না! যারা মূর্খ—তারা তোমার সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে থাকে—কিন্তু আমি ত জানি তোমার মত এমন উদার—এমন পবিত্র মহামানব জগতে অল্প আছে। তুমি দুঃখ করো না। কর্ণাট রাজমহিষীর ঔদ্ধত্যের উত্তর দাও—নইলে, সহ্য করলে লোকে তোমায় নির্ব্বোধ বল্‌বে।

কবি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—'কেমন করে উত্তর দেব?—আমার ত কিছুই মনে আসছে না!'

কবি-প্রিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'তবে আজ স্ত্রীবুদ্ধি একটু নাও—এ প্রলয়ঙ্করী নয়—শুভঙ্করীই হবে! লিখে দাও যে তুমি কর্ণাট রাজমহিষীর উক্তির এই রকম অর্থ করেছ;—তিনি লিখেছেন 'তেষাং মূর্দ্ধি—দধামি বাম-চরণং'—তুমি যেন তার মানে করছ—'মূর্দ্ধি দধামি—তেষাম্ বামচরণং' অর্থাৎ অন্বয়ে যেন তেষাম্ কথাটা বাম চরণকে বুঝায়—রাণী যেন ভক্তি জানিয়ে বল্‌ছেন—নিজের মাথায় তাঁদের অর্থাৎ কবিদের বামচরণ রাখেন।

অপূর্ব্ব আনন্দে কালিদাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। দুঃখে তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইটুকু বুদ্ধি মাথায় আসে নাই! হর্ষপ্লুত নয়নে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আননখানি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন, কহিলেন—'দেবি, তোমার জন্যই আজি আমি এ অপমানের হাত থেকে উদ্ধার পেলাম;—আমার সহ-ধর্ম্মিণী—আমার ইষ্টা—আমার মানস-কবিতা—আজ কি দিয়ে তোমাকে আমার শ্রদ্ধা জানাব!'

কমলাদেবী ভক্তিভরে স্বামীর চরণে প্রণাম করিলেন।

পরদিন কর্ণাট রাজপ্রাসাদে কালিদাসের পত্র গেল। কালিদাস লিখিলেন, রাজমহিষী যে তাঁহাকে কবি স্বীকার করিয়া তাঁহার বামচরণ নিজ মস্তকে ধারণ করিবেন বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য কবি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ;—যোগ্য ব্যক্তি নহিলে কি যোগ্যের সম্মান করিতে জানেন।

রাণী পত্র পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন; বুঝিলেন অশেষ বুদ্ধিশালী ও প্রত্যুৎপন্নমতি না হইলে তাঁহারই পত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া অন্য কাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি কৌতূহলবশে কালিদাসের গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেন। পড়িতে পড়িতে অপূর্ব্ব রসধারায় তাঁহার স্তিমিত মন পরিপ্লুত হইয়া উঠিল—কবির প্রতি শ্রদ্ধায় মন আপনি নত হইয়া পড়িল। হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন জানাইবার জন্য পরদিনই তিনি মহাকবিকে নিজ আলয়ে আহ্বান করিলেন।

রাণীর পত্র পাইয়া কালিদাস কর্ণাট যাত্রা করিলেন। স্ত্রীর বুদ্ধিতে সে যাত্রা তিনি অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

কর্ণাট রাজদুর্গে রাজশ্যালক মিত্রকেশরী নগর-রক্ষকের মর্য্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজদুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে নগররক্ষকের অনুমতি প্রয়োজন হইত। কালিদাস অত্যন্ত সাধারণ বেশে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেন। মিত্রকেশরী রাজশ্যালক হইলেও এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে

অধিষ্ঠান করিলেও অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। উৎকোচ না পাইলে তিনি কোনো বিদেশী ব্যক্তিকে রাজ-সন্দর্শনে যাইতে অনুমতি দিতেন না। কালিদাসকে প্রথমে সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়া তিনি তাঁহার সহিত কথা বলেন নাই। কালিদাস রাণীর পত্র দেখাইলে ইতস্ততঃ করিয়া অনুমতি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে রাণীর নিকট হইতে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত মুদ্রার অর্দ্ধেক তাঁহাকে দিয়া যাইতে হইবে। কর্ণাট রাজমহিষী মহাসমাদরে মহাকবির বন্দনা করিলেন। তিনি নিজ হস্তে কবির পদতলে সুগন্ধী কালেয় লেপন করিয়া হস্তে নবীন দুর্ব্বাঙ্কুর বাঁধিয়া দিলেন; তারপর গলায় মধুক্রন কুসুমের মালা পরাইয়া পরম ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন; কহিলেন—'আজ মহাকবির দর্শনে আমার জীবন ধন্য।'

কালিদাস প্রীতিচিহ্নস্বরূপ রাণীর হস্তে কস্তরী দিয়া কহিলেন—'আমিও ধন্য—আপনার ন্যায় মহীয়সী বিদুষীর ভক্তিলাভ করলাম।'

বিদায়কালে নানাবিধ উপঢৌকন সহ বহুমূল্য কৌসেয় বস্ত্র প্রদান করিয়া—রাণী মহাকবির পদপ্রান্তে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

ফিরিবার পথে মিত্রকেশরী অর্দ্ধাংশ দাবী করিলেন, কালিদাস আনন্দে তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত প্রদান করিলেন। মিত্রকেশরী হর্ষপ্লুত হইয়া হাসিয়া কহিলেন—'আমার গৃহে চলুন, কিঞ্চিৎ পানাহার করতে ইচ্ছা করুন।'

কালিদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'আমার বিলম্ব করবার উপায় নেই। এখনই যেতে হবে।'

মিত্রকেশরী লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে এই ব্যক্তি মহাপণ্ডিত, স্বয়ং রাজমহিষী তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থরাজি নাকি সাহিত্যজগতের শীর্ষস্থানে। সে জন্য তিনি আজ কবির নিকট একটা প্রার্থনা জানাইলেন; কহিলেন—'শুনছি আপনি নাকি বিখ্যাত গ্রন্থকার—যদি কোনো গ্রন্থে আমার সম্বন্ধে কিছু লেখেন ত বড় আনন্দিত হই। রাজাদের সম্বন্ধে ত অনেকে অনেক প্রকারে লেখেন—কিন্তু নগররক্ষকের মত দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য কেহ কিছুই লেখেন না। আপনি যদি আপনার কোনো গ্রন্থে আমার সম্বন্ধে কিছু লিখে যান, ত ভবিষ্যতে লোকে আমার কথা স্মরণ করে।'

কালিদাস হাসিয়া বলিলেন—'বেশ তাই হবে। আপনার সম্বন্ধে এমন কথা লিখ্‌ব যে, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও তা মিথ্যা হবে না;—একেবারে শাশ্বত চিত্র আঁকা।'

নগররক্ষক মিত্রকেশরী নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া কালিদাস প্রিয়া সম্ভাষণ করিয়া যাবতীয় ঘটনা বলিলেন। কমলাদেবীর জন্যই যে আজ তিনি কর্ণাট রাজ্য হইতে বহুমানী হইয়া ফিরিলেন—বার বার তাহাই জানাইতে লাগিলেন। তারপর নগর-রক্ষকের কথা বলিয়া কহিলেন—'আমার অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পুঁথিখানি আন ত প্রিয়ে—কতদূর লেখা হয়েছে দেখি।'

কমলাদেবী পুঁথি আনিয়া কহিলেন—'ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশক শেষ হয়েছে দেখ্‌ছি—ধীবরকে ক্রুদ্ধ নয়নে প্রহরীরা দেখ্‌ছে।' কবি হাসিয়া বলিলেন,—'না ওখানে শেষ করলে চল্‌বে না, আরও একটু লিখতে হবে। এই বলিয়া লিখিলেন—'ভট্টালকে ইদো অর্দ্ধং তুম্হানং সুমণোমুল্লং হোউ।' তার-পরেই রাজশ্যালকের উক্তি—'কাদম্বরী সক্খিয়ং অম্হাণং পড়ম্ মোহিদং ইচ্ছীয়ই, তা সোণ্ডি আপণং এব গচ্ছামো'।—এস আমরা শুঁড়ির দোকানে মদ সাক্ষী করে বন্ধুত্ব করি।

এই নিবিড় তন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া নীচে হইতে গৃহিণী হাঁকিলেন,—'বলি, ভাত নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব—ডেকে ডেকে যে সাড়া পাওয়া যায় না।'

আবার কঠিন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম—সেই অর্থচিন্তা—সেই অভাব অনটন—সেই প্রিয়ার সম্ভাষণ। বেশ ছিলাম এতক্ষণ। দেড় হাজার বছরের ঘটনা যেন এখনো চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। নগররক্ষক সম্বন্ধে এই উক্তি সত্যদ্রষ্টা মনীষীর কলম দিয়া কি করিয়া বাহির হইল ভাবিতেছি, এমন সময় গৃহিণী উপরে আসিলেন।

কালিদাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনটা বেশ হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। গৃহিণীকে দেখিয়া আমার অন্তরের সুপ্ত কবি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। শকুন্তলা হইতে একটা শ্লোক তুলিয়া বলিলাম—

অধর কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥'

প্রিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন—'কি বল্‌লে?—ওর মানে কি?'

বলিতে লাগিলাম—'কিসলয়ের মত গোলাপী ঠোঁট দুটী—কচি গাছের ডালের মত—'

অকস্মাৎ বাধা দিয়া বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—'আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না;—বুড়ো বয়সে একপয়সা রোজগার করবার মুরদ নেই—'

তারপর ইহজগতের কবি-প্রিয়া যে সকল উক্তি করিলেন, তাহা আর প্রকাশ করিতে পারিব না; বন্ধুসমাজ ত ঘরের কথা জানে না—সেখানে এখনও আমার মানসম্ভ্রম আছে।
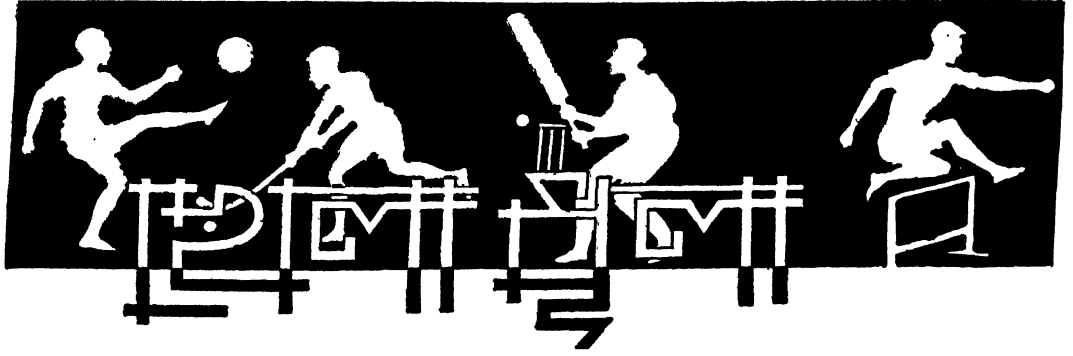
চৈনিক ফুটবলদল ঃ

আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী চৈনিক ফুটবলদল বার্লিনের পথে রেঙ্গুন, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে এসে কয়েকটি ম্যাচ খেলে গেছে।

এই চৈনিক দলটি হং কং ও সাংঘাইয়ের সেরা তিনটি দল থেকে ২২জন নির্ব্বাচিত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। গত বৎসর থেকে ইঁহারা স্বদেশে প্রাক্‌টিস্ করেছেন। এই বৎসর হংকংএর গভর্ণর কাপ্ ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছেন। চীনদেশের নিয়মানুসারে খেলোয়াড়দের জামায় তাদের নম্বর থাকে, যেমন এখানে রাগবী খেলোয়াড়দের থাকে। ইহাতে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব ও তাদের পরিচয় সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করা পর্য্যন্ত ইহারা ২২টি ম্যাচ খেলেছে। মাত্র ৪টি খেলায় ড্র করেছে, বাকীগুলি জিতেছে—অর্থাৎ, এ পর্য্যন্ত একটি খেলাতেও হারে নি।

সায়ানে দু'টি ম্যাচ খেলে ও জয়ী হয়। সিঙ্গাপুরে দু'টি খেলে এবং জয়ী হয়। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিসে দশটি খেলার মধ্যে একটিতে ড্র ও বাকী নয়টিতে বিজয়ী হয়। পিনাংয়ে দু'টির মধ্যে একটিতে ড্র ও একটিতে জয়ী হয়েছে। রেঙ্গুনে তিনটি খেলায় সবগুলিতেই জয়লাভ করেছে। রেঙ্গুনে কে আর আরকে ৮-৩ গোলে হারিয়েছে। লি ওয়াইটং ৫, ট্যাম কং পাক্ ২ ও সুয়েন কাম সান্ ১ গোল দেয়। বি এ এ বাছাই দলকে রেঙ্গুনে ৪-০ গোলে হারায়।

চীনা ও সিভিল-মিলিটারী খেলার প্রারম্ভে চীনা ক্যাপটেন লি ওয়াই ট° ও টেলারের (ক্যাপটেন, সিভিল-মিলিটারী) করমর্দ্দন, রেফারি বলাই চট্টোপাধ্যায় দূরে দণ্ডায়মান

ছবি—জে কে সান্যাল

কলিকাতার পরে চৈনিকদল বোম্বাইতে বোম্বাই সম্মিলিত দলের সঙ্গে তাদের ভারতের শেষ খেলায় ৩-৩ গোলে ড্র করে বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করেছে। চীনাদের শেষ গোলটি পেনালটি থেকে হলে খেলাটি ড্র হয়ে যায়। বোম্বাইয়ের গোল-রক্ষক ইডেনের অত্যাশ্চর্য্য গোলরক্ষার জন্যই বোম্বাই পরাজয় থেকে বেঁচেছে।

চীন বনাম ভারত ঃ

সত্যকার আন্তর্জ্জাতিক খেলা, চীন বনাম ভারত, ৪ঠা জুলাই ১৯৩৬, কলিকাতা মাঠে হয়েছে। এই খেলাতে বিপুল অভূত-পূর্ব্ব জনসমাগম হয়েছিল। কারণ, পূর্ব্বেই প্রচার হয়ে পড়েছিল যে এই চৈনিকদল

চীন ও ভারতের খেলোয়াড়গণ

ছবি— জে কে সান্যাল

চৈনিক ও সিভিল-মিলিটারী-দলের খেলোয়াড়গণ

ছবি— জে কে সান্যাল

বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ। এদের খেলা দেখবার জন্ম কলিকাতা ভেঙে পড়েছিল। এই খেলায় ভারতবর্ষ চৈনিকদল অপেক্ষা ভালো খেলে প্রতিপন্ন করেছে যে উপযুক্ত সুযোগ ও নিয়মিত শিক্ষা পেলে ভারতবর্ষও অলিম্পিকে ফুটবলদল পাঠাতে পারে, যে-দলকে হারাতে বিদেশী নামজাদা বড় বড় দলকেও বিশেষ বেগ পেতে হবে। ভারতীয় দল যতগুলি সুযোগ পেয়েছিলো তার কিছুও যদি সদ্ব্যবহার করতে পারতো তবে তাদের জয় হতো নিশ্চয়। উপযুক্ত সেণ্টার ফরওয়ার্ডের অভাবে বিজয়লক্ষ্মী করায়ত্ত হলো না।

করুণা ভট্টাচার্য্য

রসিদের অভাবে যদি নন্দ রায়চৌধুরী বা লক্ষ্মীনারায়ণ মনোনীত হতো তাহ'লেও কার্য্যোদ্ধার হতো। এদিনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় করুণা ভট্টাচার্য্য। তাঁর খেলা অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ড্রিব্‌লিং ও পাশিংএ চমৎকার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। আবার আবশ্যক মত রক্ষণভাগে এসে বিপক্ষদের বাধাও দিয়েছেন। তাঁর পরই রক্ষণভাগে ভারতীয় দলের ক্যাপটেন মন্মথ দত্ত নিখুঁত খেলেছেন। হাফে নূরমহম্মদ খেলার প্রথমার্দ্ধে ভাল খেলতে পারেন নি, পরে কৃতিত্বপূর্ণ খেলেছেন। তিনি বহুবার গোল লক্ষ্য করে 'সট' করেছিলেন। চীনা গোলরক্ষককে দূর থেকে ঐরূপ সটে গোল দেওয়া দুরূহ। গোলে ব্যানার্জ্জি কতকগুলি অতি কঠিন ও অব্যর্থ সট রক্ষা করেছেন। কিন্তু ঐ গোলটিও তাঁর রক্ষা করা উচিত ছিল। রহিম ও আব্বাস ভালো খেলতে পারেন নি। সেলিম মন্দের ভালো। চৈনিকদের ক্যাপটেন ও সেণ্টার ফরওয়ার্ড লি ওয়াই টং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। বুলেটের মত সট্ ও নিখুঁত পাশিং তাঁর বিশেষত্ব। ইন্‌সাইড-রাইট সেন কাম্ সানএর ফরওয়ার্ডের মধ্যে আদান-প্রদান অতি সুন্দর, একমাত্র গোলটি দেবার সৌভাগ্যও তিনিই অর্জ্জন করেছিলেন। লেফ্‌ট্ আউট টে কি লিয়াং খুব তৎপর এবং লেফট্ ব্যাক্ লি টিং সাং রক্ষণভাগে বিশেষ কার্য্যকরী খেলা খেলেছিলেন; তার অংশীদার ম্যাকসিন হাউএর স্থান-জ্ঞান অতীব চমৎকার।

মন্মথ দত্ত
(ক্যাপ্‌টেন—ভারতবর্ষ)

বিশ্রামের এক মিনিট পূর্ব্বে চীনাদল গোল দেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সেলিমের সেণ্টার থেকে করুণা ভট্টাচার্য্য হেড করতে গেলে লি টিং সাং ফাউল করলে রেফারী পেনালটি দেয়। ঐ পেনালটি থেকে নূরমহম্মদ গোল দেয়। এর পর থেকে ভারতীয়রা চীনাদের চেপে ধরে কিন্তু সামান্যর জন্য তাদের গোল করার চেষ্টা সফল হয় না। অন্যদিকে ব্যানার্জ্জিকে একবার লি ওয়াই টংয়ের দারুণ সট পা দিয়ে আটকে অব্যর্থ গোল রক্ষা করতে হয়। তুলনায় ভারতীয়দলই উৎকৃষ্ট খেলেছিল।

নূরমহম্মদ

চৈনিকদলের ম্যানেজার তাঁর বিবৃতিতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রশংসা করে বলেছেন, ঐ দিনের খেলায় শুধু দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁরা জয়ী হতে পারেন নি।

ভারতবর্ষ :—এস্ ব্যানার্জ্জি; এস্ দত্ত (ক্যাপ্‌টেন), এস্ মজুমদার; বিমল মুখোপাধ্যায়, নূরমহম্মদ, মাসুম; সেলিম, রহিম, আর কার, করুণা ভট্টাচার্য্য ও আব্বাস।

চীন :—পাউ ক্বা পিং; ম্যাকসিন হাউ, লি টিন সাং; লিয়াং উইং টিন, সিন্ আহুই, চ্যান চেন হো; ইউং সেন ইক্, সেন কাম্ সান্, লি ওয়াং টাং (ক্যাপ্‌টেন), ট্যাম কং পাক, টেকি লিয়াং।

রেফারি—সি এস এম লো।

লাইন্সম্যান—জে চক্রবর্ত্তী ও সি ডান্‌কান।

চৈনিক বনাম সিভিল-মিলিটারী ঃ

৬ই জুলাই, সোমবার, চীনাদল ২-১ গোলে সিভিল মিলিটারীদলকে পরাজিত করেছে। সারা রাত্রি ও দিবস বারিবর্ষণের ফলে ক্যালকাটা মাঠ জলকাদায় পরিপূর্ণ ছিল। খেলার সময় দেখা গেলো জলকাদা চীনাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে। তারা শনিবারের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খেলা দেখাতে সক্ষম হয়। এরূপ ভিজা মাঠেও তাদের পাশিং সুন্দর এবং নিখুঁত হয়েছে। এদিন চারজন খেলোয়াড় বদল ছিল। তাদের নিয়মিত সেণ্টার ফরওয়ার্ড কুন্ ফিং চেং রাইট-ইনে খেলেছে। তার খেলা তেমন দর্শনীয় হয় নি। ক্যাপটেন লি ওয়াই টং অতি সুন্দর খেলে দু'টি গোলই দিয়েছে। পকা পিং সত্যই আশ্চর্য্য গোলরক্ষক। সে অনেকগুলি কঠিন বল ধরেছে। লিয়াং

ভারতীয় লীগ ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

উইং চিন্ সেণ্টার হাফে উৎকৃষ্ট খেলেছে। সকল হাফেরাই বল পাশ করতে খুব তৎপর, মোটেই বিলম্ব করে না। ব্যাকদ্বয় তেমন খেলতে পারে নি, অনেকগুলি কর্ণার করেছে।

স্থানীয় দলের পক্ষে গোলরক্ষক আর্ম্‌ষ্ট্রং সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছেন। তিনি লি ওয়াই টংএর কতকগুলি দারুণ সট্ রক্ষা করে সকলকে বিস্মিত করেছেন। জে কার্ভ্জে, টার্ণবুল ও ম্যাককিউ বেশ ভালো খেলে-

য়ুরোপীয় লীগ ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

ছেন। জুম্মা খাঁ ও রহিম ভালো খেলতে পারেন নি। উইল্‌কিসন ও ক্যাস্ মন্দ খেলেননি। হাফব্যাক লাইন দুর্ব্বল ছিল। পেনাল্‌টি গণ্ডির মধ্যে লি ওয়াই টংয়ের কাছ থেকে বলটি কেড়ে নেবার সময় কার্ভে ফাউল করেছিলেন বলে অনেকের মত—আমাদের কিন্তু তা মনে হয় নি।

সিভিল ও মিলিটারী :—আর্মষ্ট্রং; জে কার্ভে, জুম্মা খাঁ; টেলার (ক্যাপ্‌টেন), গেষ্ট, টার্ণবুল; সি ব্রাউটন, রহিম, ক্যাস, ম্যাককিউ ও উইল্‌কিসন।

চৈনিকদল :—পকা পিং; লিং টিংসাং, টাম্ কংপাক; টি হিয়াংগুয়ান, লিয়াং উইং চিন্, চানচেনহো; সো ওয়াই সিং, কুং কিংচেং, লি ওয়াই টং (ক্যাপ্‌টেন), সেন কাম সান ও হপ্ পাক্ ওয়া।

রেফারি :—বলাই চট্টোপাধ্যায়।

লাইন্সম্যান :—এম মুখার্জ্জি ও এম এস মেণ্ডি।

টিকিট বিক্রয়ে অনিয়ম ঃ

চীন ও ভারতীয়দের খেলায় মাঠে অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হয়েছিল। বেলা ন'টার সময় থেকে লোক মাঠে গিয়েছিল। দর্শকের গ্যালারীর মাত্র একদিনের আসন ১৵০ ও ৷৵০ মূল্যের টিকিটের জন্য ছিল। আর সমস্ত আসনগুলি ২।০ মূল্যে পূর্ব্বেই বিক্রিত হয়ে যায়। শোনা যায় একখানি ২।০ আনার টিকিট ২৫৲ বা ৩০৲ টাকারও বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়েছে। টিকিট বিক্রয় সম্বন্ধে নানা অভিযোগ হয়েছে। ২।০ মূল্যের টিকিট রিজার্ভ আসনের, তাতে নম্বর দেওয়া ছিল, সিটেও নম্বর ছিল। কিন্তু ৫।২০ মিনিটে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ঢুকতে পান নি।

মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ ছবি—জে কে সান্যাল

সাদা গ্যালারীর আসনের টিকিটের গেট পূর্ব্বে বন্ধ হয় নি। অন্যদিন না হয়—সাদা আসনের ও সবুজ আসনের মূল্যের পার্থক্য হেতু নিয়মেরও পার্থক্য থাকে। এ দু'দিন সম-মূল্যে নিকৃষ্ট জায়গার টিকিট খরিদ করেও লোকে প্রবেশাধিকারটাও পায় নি। এরূপ অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে ভবিষ্যতে সাধারণ দর্শকে আর চ্যারিটি ম্যাচে যাবে না।

সাদা গ্যালারীর সিটগুলিও ঐ একই মূল্যে বিক্রীত

হয়েছে। বরঞ্চ কলিকাতা ক্লাব মেম্বররা কন্‌সেস্‌ন মূল্যে কিন্‌তে পেয়েছে বলে জানা গেল। মেম্বাররা ঐ টিকিট

ভারতীয় ও য়ুরোপী। লীগ ক্লাবের খেলায় মজিদ শেষ মুহূর্ত্তে গোল করে খেলাটি ড্র করে

ছবি—জে কে সান্যাল

অন্যদের বিক্রয় করেছে জেনে ঐ ক্লাবের সেক্রেটারী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হন যে মেম্বর বা তাঁদের নিমন্ত্রিতরা ব্যতীত ঐ টিকিট অন্যে নিয়ে এলে প্রবেশাধিকার পাবেন না। সাধু,—বিক্রয় করবার সময় কি ঐ অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কোন ক্লাব সুবিধা মূল্যে পাবে কেন? ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে ঐ খেলা হয়েছিল বলে তাঁরা পেয়েছিলেন বোধ হয়। ইহাতে কি সাধারণের এই ধারণা হবে যে পূর্ব্বেও যত চ্যারিটি ম্যাচ ও ফাইনাল খেলা হয়েছিল তাতেও ক্যালকাটারা কম মূল্যে টিকিট পেয়েছে। ইহা সত্য হলে আই এফ এর সত্বর ষ্টাডিয়ম করা উচিত। অন্ততপক্ষে ক্যালকাটার মতন একটা গ্রাউণ্ড করে সেখানে আই এফ এর খেলাগুলি খেলালে তাঁদের আর গ্রাউণ্ডের জন্যে কম মূল্যে কোন ক্লাবকে টিকিট বিক্রয় করতে হবে না। ক্যালকাটা ক্লাব অধিকাংশ টিকিট আর চৈনিক কন্‌সাল বাকী সাদা গ্যালারীর টিকিট কিনে নিয়েছে গুজব রটেছিল। সাধারণে আই এফ এ থেকে সাদা গ্যালারীর টিকিট অতি অল্পই পেয়েছে।

চৈনিকরা তো প্রতিবার আসবে না। ক্যালকাটা ক্লাবও তো কয়েক বৎসর থেকে দাতব্য-ভাণ্ডারে যে পরিমাণ টাকার টিকিট ক্রয় করছে তার নমুনাও পাওয়া গেছে। সাদা গ্যালারী প্রায় তো খালি থাকে চ্যারিটি ম্যাচে। অথচ ভালো ভালো খেলা, শীল্ডের ও লীগের, ঐ ক্যালকাটা মাঠেই হয় আর তার মেম্বারদের বিনামূল্যে সেই সকল খেলা দেখবার সৌভাগ্য হয়। জনসাধারণ অর্থ বিনিময়েও যেগুলি দেখতে পায় না। এই সকল সুবিধা পেয়েও তাঁরা কন্‌সেসন্ মূল্যে টিকিটের দাবী করবেন! তাঁদের নিজেদের খেলা যদি চ্যারিটি করা হতো—যেমন মোহনবাগান মহমেডান ও ইষ্ট বেঙ্গলের লীগ খেলা হয়েছিল

ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় ক্যালকাটা গোল অত্যাশ্চর্য্য গোলরক্ষা

ছবি—জে কে সান্যাল

—তাতে তাঁদের সুবিধা মূল্যে টিকিটের দাবী সর্ব্ববাদী-সম্মত। কিন্তু সেদিন দেখা গিয়েছিল যে চীনারা মাত্র ‘ই’

ব্লকের কিছু টিকিট পেয়েছে, তাদের সংখ্যা বড় জোর তিনশো চারশো হবে। সামান্য কিছু ভাগ্যবান ভারতীয়দের সাদা ব্লকে দেখা গিয়েছিল, বোধ হয় তাঁদের সঙ্গে আই এফ এ বা তার কর্ম্মচারী কিম্বা ক্যালকাটার মেম্বরদের পরিচয় ছিল। ইহা ব্যতীত সকল ভারতীয়, তা' তিনি যতই পদস্থ ও অর্থশালী হোন না কেন, তাঁকে ঐ সবুজ গ্যালারী বা বেঞ্চের টিকিট সম-মূল্যে ক্রয় করে পূর্ব্বাহ্ণে আসন সংগ্রহ করতে হয়েছিল। যাঁরা কার্য্য-গতিকে বা এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বিলম্ব করেছেন যে রিজার্ভ টিকিট যখন যাবো সিট পাবো, তাঁদেরই হতাশ হতে হয়েছে। সবুজ গ্যালারীর টিকিটও বেশী সাধারণে কিনতে পায় নি। বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে ঐ টিকিট বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের প্রত্যেক মেম্বরকে মাত্র একখানি করে দিয়েছেন। মেম্বরদের আত্মীয় বন্ধু পুত্র পরিজনদের জন্য তাঁরাও পান নি। অথচ ক্যালকাটার সভ্যরা এমন কি তাঁদের অভ্যাগতরাও কম মূল্যে ভালো স্থানের টিকিট ক্রয় করতে পেলেন। আই এফ এর আয়ের টাকার বেশী পরিমাণই বোধ হয় ভারতীয় দলরা দেয়। এ রকম বর্ণ-বৈষম্য ও অবিচার চললে ক্রমশই আই এফ এর আয় ও প্রতিপত্তির হ্রাস হবে। জনসাধারণ সুবিচারের আশা করে। প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের মেম্বারদের এই

কালীঘাট-ব্লাকওয়াচ ম্যাচে কালীঘাট গোলরক্ষক ব্লাকওয়াচের পা থেকে বল তুলে নিয়ে গোল বাঁচাচ্ছে —জে কে সান্যাল

কালীঘাট-ডালহৌসী খেলায় ডালহৌসী গোলকিপার কালীঘাট ফরওয়ার্ডের কাছ থেকে বল নিয়ে গোল রক্ষা করছে —জে কে সান্যাল

অনিয়মের প্রতি দৃষ্টি পড়া উচিত। নিয়ম হওয়া উচিত যে রিজার্ভ টিকিটের অর্দ্ধেক বিভিন্ন ক্লাবদের মধ্যে সমান সংখ্যায় বিক্রয় করা হবে। সাধারণের জন্য কোন পাবলিক্ স্থানে রিজার্ভ টিকিটের বাকী অর্দ্ধাংশ বিক্রিত হবে। স্পোর্টসে ব্যবসাদারী চলবে না।

ইষ্টবেঙ্গল গোলরক্ষকের এটাচ্‌ড্ সেক্সনের ফরওয়ার্ড ক্যাসের সট্ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা

—জে কে সান্যাল

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ঃ

বার্ষিক ইণ্টার ন্যাশন্যাল খেলা ভারতীয় লীগ ক্লাব ও য়ুরোপীয় লীগ ক্লাবের মধ্যে হয়েছে। উভয় দলই তিনটি করে গোল দেওয়ায় খেলা ড্র হয়। পূর্ব্বে খেলা ড্র হলে টস্ করে জয়ী স্থির করা হতো। কিন্তু এবার অতিরিক্ত সময় খেলান হয়, কিন্তু তাতেও কোন ফল না হওয়ায় টস্ করতে হয়। ভারতীয়দল টসে জিতে মোহনবাগান ক্লাব প্রদত্ত সুবাদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু মেমোরিয়াল শীল্ড ও মেডেল প্রাপ্ত হন। য়ুরোপীয়দল এরিয়ান ক্লাব প্রদত্ত ও মজুমদার স্মৃতি কাপ ও মেডেল পেয়েছেন।

খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ পিছিল হয়। দুলাল ছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড়রা সবুট খেলেছেন। ইতিপূর্ব্বে এই খেলায় অতিরিক্ত জনসমাগম ও বহু অর্থ সংগ্রহ হতো। কিন্তু এবার খুব কম লোক হয়েছিল। হঠাৎ এই খেলার আকর্ষণ কেন নষ্ট হলো? এবার ভারতীয় নির্ব্বাচন ভাল হয় নি। ইহাই যদি কারণ হয়, তবে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু খোলা উচিত। স্বপক্ষীয় যাকে তাকে নির্ব্বাচন করলে যে অর্থাগম হবে না, ইহা বুঝতে পারলেও যদি পক্ষপাতিত্ব কমে। সন্মথ দত্ত ও কে ভট্টাচার্য্যকে বাদ দিয়ে টীম নির্ব্বাচন করলে অর্ব্বাচীনের মতন কাজ করা হয়।

১৯২০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে। ১৯৩০ সালে অসহযোগিতার জন্য কোন খেলা হয় নাই। এ বৎসর নিয়ে ভারতীয়রা ১৯বার জয়ী হয়েছেন, আর য়ুরোপীয়রা ৮বার। ১৯৩৫ সালে রাজা জর্জ্জের রজত জুবিলী ফণ্ডের জন্য আর একটি খেলা হয়, তাতে ভারতীয়রাই জয়ী হয়েছিলেন।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

লীগ খেলা শেষ হয়েছে। এবারও মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে ব্লাকওয়াচ, মোহনবাগান তৃতীয় স্থান পেয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং রসিদকে হারিয়ে পুলিস ও ক্যালকাটার সঙ্গে 'ড্র' করায় শেষটা চ্যাম্পিয়নসিপ্ নিয়ে একটু প্রতিযোগিতা হয়েছিল। মোহনবাগানের সঙ্গে মহমেডানের শেষ খেলাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল; কারণ এই ম্যাচে যদি তারা হারতো আর কালীঘাটের সঙ্গে ব্লাকওয়াচ জিততো তবে তাদের ও ব্লাকওয়াচের সমান পয়েণ্ট হতো। তাহ'লে মহমেডান ও ব্লাকওয়াচের মধ্যে আর একটি খেলা হয়ে তবে চ্যাম্পিয়নসিপ্ স্থির হ'তো। মোহনবাগান বেশ ভালো খেলেছিল, তাদের জেতা উচিত ছিল। ভাগ্যবলে মহমেডানরা

ড্র করেছে। মহমেডানরা উপর্যুপরি তিনবার লীগ বিজয়ী হয়ে ডারহামের সঙ্গে সমান রেকর্ড করেছে।

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

	খেলা	জিত	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পঃ
মহমেডান স্পোর্টিং	২২	১৫	৬	১	৪৫	৮	৩৬
ব্ল্যাকওয়াচ	২২	১৫	৪	৩	৪৫	২৪	৩৪
মোহনবাগান	২২	৯	৮	৫	১৭	১৪	২৬
ক্যালকাটা	২২	৮	৮	৬	২৭	১৬	২৪
ই, বি, আর	২২	১০	৪	৮	২৮	২২	২৪
কালীঘাট	২২	৮	৭	৭	২৭	৩০	২৩
এরিয়ান	২২	৯	৫	৮	২৩	২৯	২৩
ইষ্টবেঙ্গল	২২	৭	৬	৯	২৬	২০	২০
কাষ্টমস	২২	৩	১১	৮	২০	২৮	১৬
ডালহৌসী	২২	৭	৩	১২	২২	২৯	১৭
পুলিস	২২	৫	৫	১২	১৭	৩০	১৫
এটাচড সেক্সসন	২২	২	১	১৯	১৭	৫৪	৫

খেলায় দুর্ঘটনা ঃ

১৬ই জুন মঙ্গলবারের বারবেলায় মোহনবাগান মাঠে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে ই বি আরের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক

সামাদ

রসিদ
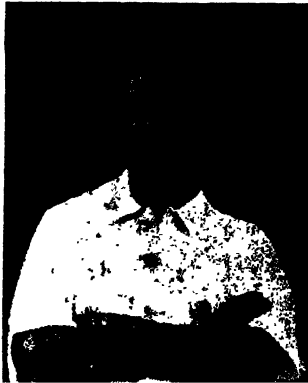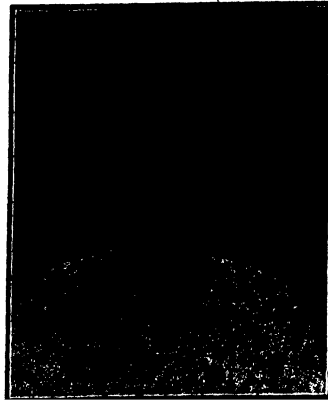
পি ব্যানার্জ্জির সঙ্গে সংঘর্ষে সামাদের পায়ের 'সিন্‌বোন' ভেঙে গেছে।

পরদিন ১৭ই জুন তারিখে ঐ মোহনবাগান মাঠে এটাচ্‌ড্‌ সেক্সনের সঙ্গে খেলাতে তাদের লেফট্‌ ব্যাক মার্টিনের পদাঘাতে মহমেডানদের বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড রসিদে পায়ের 'সিন্‌বোন' ভেঙে গেলো। রসিদ আহত হওয়া পরই মাঠে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায়। মহমেডানদের অধি আহমদ, নুরমহম্মদ, ওসমান খাঁ প্রভৃতি অনেকে রীতিম ক্রন্দন করতে থাকেন। শোনা যায়, তারা আর খেলতে চায় নি। অনেক বুঝিয়ে তবে তাদের খেলতে রাজী করতে পারেন তাদের ক্লাবের সভ্যরা।

এই দু'টি দুর্ঘটনাই সম্পূর্ণ আকস্মিক। ইহার জন্য কেহ দায়ী নহে। মহমেডানদের খেলার দিন বলাই চট্টোপাধ্যা রেফারি ছিলেন। তাঁর খেলা পরিচালনা ভালই হয়েছিল কিন্তু ঐ দুর্ঘটনার পরে ৭ মিনিট বাদে খেলা আরম্ভ হলে 'ড্রপ্‌ না দিয়ে তিনি কেন যে এটাচ্‌ড্‌ সেক্সনের বিরুদ্ধে কিব দিলেন তা বোঝা গেল না। মার্টিন তো ফাউল করে নি সে তেড়ে এসে কিক্‌ করে বল ক্লিয়ার করে। রসিদে অসাবধানতা বা দুর্ভাগ্যের জন্যে তার পায়ে আঘাত লাগে সৈনিক খেলোয়াড়দের রোরুদ্যমান মহমেডানদের পিট চাপ্‌ড়ে সান্ত্বনা দিতে দেখা গিয়েছিল।

আশা করি, এই দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় সম্পূ আরোগ্য লাভ করে পুনরায় তাঁদের ক্রীড়াকৌশল দেখাতে সক্ষম হবেন।

রেফারি অপমানিত ঃ

ডা ল হৌ সী ও মোহনবাগানে খেলায় রেফারি এন আমেদকে ডাল হৌসীর একজন ব্যাক হাত ধরে টানে ও বল কিক্‌ করে গায়ে দেয় রেফারির সেই খেলোয়াড়কে তখনি মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয় উচিত ছিল। তিনি কি ঐ দুর্ব্যব হারের বিষয়ে আই এফ এতে রিপোর্ট করেন নি? কাউন্সিল মিটিংএর রিপোর্টে সেই খেলোয়াড়ের বিপক্ষে কোন step নেওয়া হয় নি এখনও

খেলোয়াড় দণ্ডিত ঃ

মহমেডানদের সফিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে স্পিককে ইচ্ছাকৃত আঘাত করবার জন্যে। মাসুদকে ৪ঠা জুন তারিখে পাওয়ার লীগের খেলায় মাঠ হতে বহিষ্কৃত

করা হয়। ঐ তারিখ থেকে একমাসের জন্ত সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে—অর্থাৎ রায় বেরুবার আগেই তার দণ্ড-কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলো।

সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা ঃ

লীগ খেলায় ক্যাস (এটাচড্ সেক্সন) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গোল করেছেন। রসিদ ও রহিম (মহমেডান) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন।

ক্যাস ১৩টি গোল দিয়েছেন। ৩টি কালীঘাটের, ১টি পুলিসের, ১টি মহমেডানের, ২টি ব্লাকওয়াচের, ১টি ডালহৌসীর, ১টি মোহনবাগানের, ২টি ই বি আরের, ১টি এরিয়ানের ও ১টি ব্লাক ওয়াচের বিপক্ষে।

রসিদ মোট ১২টি গোল করেছেন। ২টি কালীঘাটের, ৩টি এরিয়ানের, ১টি ইষ্টবেঙ্গলের, ১টি এটাচ্‌ড সেক্সনের, ৩টি ব্লাকওয়াচের, ১টি ক্যালকাটার ও ১টি কালীঘাটের বিপক্ষে।

রহিম মোট ১১টি গোল দিয়েছেন। ৩টি ব্লাকওয়াচের, ১টি ক্যালকাটার, ১টি মোহনবাগানের, ১টি ইষ্টবেঙ্গলের, ৩টি এরিয়ানের, ১টি কাষ্টমসের ও ১টি ই বি আরের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

ভবানীপুর ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তাঁদের এই সফলতার জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। গত বৎসর থেকে তাঁরা প্রথম বিভাগে খেলবেন। তাঁদের দল যাতে বেশ পুষ্ট হয়, আগামী বৎসর যাতে তাঁরা প্রথম ডিভিসনে ভাল স্থান অধিকার করতে পারেন সেজন্যে এখন থেকেই তাঁদের বন্দোবস্ত করা উচিত। তাঁহারা বহু প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বে বিজয়ী হয়েছেন, যথা—কলিকাতা সসার লীগ, বেঙ্গল সসার লীগ, কুচবিহার কাপ ১৯২৩, ১৯২৭, ১৯২৯ সালে, বঙ্কিমবিহারী শীল্ড (৫ বৎসর), মরেনো শীল্ড (৩ বৎসর), জবাকুসুম কাপ…।

১৯১৮ সালে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৩ সাল থেকে লীগ খেলতে আরম্ভ করেন। ১৯২৫, ১৯২৮ ও ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগে রানার্স আপ্ হন।

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর ক্লাব
(দাঁড়াইয়া) এ পাল, জে সামন্ত, এইচ গুহ, এস দত্ত, এ রায়, এন মজুমদার
(চেয়ারে) এন গুহ, এম দাস, অনিল বোস (ভাইস্-ক্যাপটেন), এস রায়
(ফুটবল সেক্রেটারী), এস্ মুখার্জ্জি (ক্যাপ্টেন), এ খালেক, রাজবআলি
(সম্মুখে) পি দে, এস দেব, পি পাল

শীল্ড খেলা ঃ

শীল্ড খেলা ৮ই জুলাই থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম রাউণ্ড শেষ হয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ক্যালকাটা ও নরফোকের খেলা হয়েছে। এ পর্য্যন্ত একটিও উচ্চাঙ্গের খেলা হয় নাই। কেন যে বাইরের নিকৃষ্ট দলগুলি শীল্ড প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে অর্থ নষ্ট করে তা' বোধগম্য হয় না। এই সব বাজে দলের আবেদন আই এফ এর বাতিল করা উচিত।

ইষ্টবেঙ্গল ভিজা মাঠে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংকে ৯ গোলে

হারিয়ে রেকর্ড করেছে। ডালহৌসীও এম এস ক্লাবকে ৭ গোলে হারিয়েছে। ভবানীপুর অতি কষ্টে কুমারটুলিকে এক গোলে হারিয়েছে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তাদের মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলতে হবে। খেলা দেখে কোন আশাই তাদের আনুকূল্যে করা যায় না। এরিয়ান দ্বিতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলবে। ক্যালকাটা নর্কফোক রেজিমেণ্টকে ভিজা মাঠে এক গোলে হারিয়েছেন।
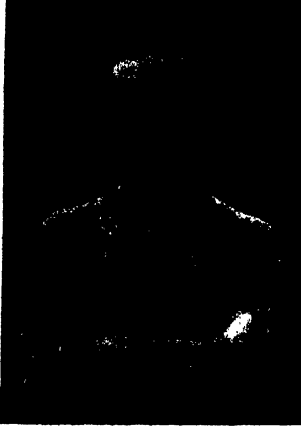
আর্মষ্ট্রং (সিভিল-মিলিটারী গোলরক্ষক)

বিলাতে ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ—১৭৪ ও ২০৩ (৩ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ডারহাম—১৭৬ ও ২০৩ (৫ উইকেট)

ডারহাম ৫ উইকেটে জিতেছে। প্রথম ইনিংসে জয়ের ৪৬ই সর্ব্বোচ্চ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াজির (নট্ আউট্) ১৩৯, জয় ৩৫ ও রামাস্বামী (নট্ আউট্) ২১। বোলিংএ ব্যানার্জ্জি প্রথম ইনিংসে ৫৪ রানে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৫ রানে ৫ উইকেট নিয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ, গোপালন্ ও পালিয়া বল দিয়েছেন কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। ডারহাম তাঁদের পিটিয়ে ১৩৫ মিনিটে ২০৫ রান তুলে দিয়ে মাত্র ৪ মিনিট সময় থাকতে জয়ী হয়ে গেলো। ডারহামের মতন সেকেণ্ড ক্লাস কাউন্টিকে প্রথম ইনিংসে ২ রানে অগ্রগামী হ'তে দেওয়া এবং দ্বিতীয় ইনিংসে চা পানের পরে ২০৩ রান তুলতে দেওয়া ক্ষমার্হ নহে।

এস ব্যানার্জ্জি বল দিচ্ছেন

ভারতবর্ষ—১২৪

নটিংহাম—১৫৪ (২ উইকেট)

খেলা ড্র হয়েছে। বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনে খেলা হতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনেও মাত্র দু' ওভারের পর খেলা বন্ধ হয়; তৃতীয় দিনে খেলা হয়। লারউড ১১ রানে ৩ উইকেট ও ভয়েস ২৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ভারতের প্রথম জয় ঃ

ভারতবর্ষ—৪০২

মাইনর কাউন্টি—২৮৬ ও ৪২

মাইনর কাউন্টির সঙ্গে ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৭৪ রানে জয়ী হয়েছে। বিলাতে তাঁদের ইহাই প্রথম জয়। প্রথম ইনিংসে, মান্তাক আলি ১৩৫, মার্চ্চেণ্ট ৯৫, অমরসিং ৪৪, সি কে নাইডু ৩৬। নাইডু চমৎকার খেলেছেন। দু'বার বুথকে ছ'য়ের বাড়ি দিয়েছেন। মাইনর কাউন্টি প্রথম ইনিংসে, ডি সারেম ৮৬, গিব্ ৪৪, ডেনিস (নট্ আউট্) ৪৪, বাট্‌লার ৩৮। অমরসিং ৫২ রানে ৪, সি কে নাইডু ৩২ রানে ১ ও অমরনাথ ৪০ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে মাইনর কাউন্টি নিসার ও অমরসিংয়ের বোলিংএর কাছে দাঁড়াতেই পারেন নি। তাঁরা সবাই ৮৩ মিনিটের মধ্যে মাত্র ৪২ রানে আউট হয়ে যান। নিসার ৫টা ও অমরসিং ৫টা উইকেট নিয়েছেন। নিসার অত্যন্ত দ্রুত বল করেছেন। অমরসিং একটাও খারাপ বল দেন নি।

ভারতবর্ষ—২২৬ ও ৪২১ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

সারে—৪৫২ ও ৫২ (৩ উইকেট)

সময়াভাবে খেলাটি ড্র হয়েছে। এই খেলাতে সর্ব্বসমেত ১১৫১ রান হয়েছে, ২৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাস্তাক আলি ও হিন্দেলকার দ্বিতীয় উইকেট সহযোগিতায় ২২১ রান করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মাস্তাক আলি ১৪১, হিন্দেলকার ৮০। প্রথম ইনিংসে স্যাণ্ডহাম ১০৫, ফিস্লক্ ৯৮; শেষ উইকেটে ১১১ রান উঠেছিল।

ভারতের দ্বিতীয় জয় ঃ

ভারতবর্ষ—১৫০ ও ১৩১ (০ উইকেট)

আয়ার্ল্যাণ্ড—১৬১ ও ১১৯

ভারতবর্ষ দশ উইকেটে জয়ী হয়েছে। বৃষ্টির জন্য চায়ের পূর্ব্বে খেলা আরম্ভ হতে পাবে না। প্রথম দিন ৬ উইকেট খুইয়ে আয়র্ল্যাণ্ড ৮১ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে আয়র্ল্যাণ্ড মাত্র ১১৯ রান করতে পারে। সি কে নাইডু ৭ উইকেট মাত্র ৪৪ রানে নেন, ৩ উইকেট শেষ ওভারে নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে আবশ্যকীয় ১৩১ রান কোন উইকেট না খুইয়ে তুলে দিয়ে দশ উইকেটে জয়ী হয়েছেন। মার্চ্চেণ্ট ৭১ রান করেছেন।

ভারতবর্ষ—৪০৫

ল্যাঙ্কাসায়ার—৪৩৫ (৮ উইকেট্, ডিক্লেয়ার্ড) ও
২৫ (১ উইকেট)

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে। বৃষ্টির জন্য খেলা মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয়। রামাস্বামী (নট আউট) ১২৭, বাকাজিলানী ৬৯, মার্চ্চেণ্ট ৭০, সি কে নাইডু ৩৯, জয় ৩৪; অতিরিক্ত রান পেয়েছেন ৪১। ল্যাঙ্কাসায়ার পক্ষে, ওয়াসব্রুক ১১৩, ওল্ডফিল্ড ১০৭, হপ্উড ৫৫, লিষ্টার ৫০।

বিলাতে ভারতের প্রথম টেষ্ট ঃ

১৯৩৬ সালের ২৭শে জুন, বিলাতের লর্ডসের মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হলো।

ভারতবর্ষ—১৪৭ ও ৯৩

ইংলণ্ড—১৩৪ ও ১০৮ (১ উইকেটে)

ভারতবর্ষ ৯ উইকেটে পরাজিত হয়েছে।

সূর্য্যালোক ছিল, কিন্তু মাঠ নরম ও উইকেট শুকোচ্ছিল। দর্শক সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন এলেন টস্ জিতে নরম ভিজা মাঠের সুবিধা পাবার জন্য ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন। বেলা সাড়ে এগারোটায় মার্চ্চেণ্ট ও হিন্দেলকার আরম্ভ করলে, এলেন ও ওয়্যাটের বলে। মার্চ্চেণ্ট প্রায় রান আউট হয়েছিল চার করে। ৬২ মিনিটে ৫১ রান উঠ্লো। ৬২ রান উঠলে ভারতীয়দের পতন আরম্ভ হলো। এলেনের বলে মার্চ্চেণ্ট বোল্ড হলে মাস্তাক আলি এসে একরান না তুলেই ল্যাংরিজের হাতে আটকে গেলো। তৃতীয় উইকেট (হিন্দেলকার) গেলো ৬৪ রানে, চতুর্থ (সি কে নাইডু) ৬৬ রানে। এলেন ৩ উইকেট ১১ ডেলিভারীতে মাত্র ১ রান দিয়ে নিলেন। অমর সিং সাহসের সঙ্গে খেলে ২ বার ৪ করে ১২ রানে গেলেন। পালিয়া এসে ২ বার বাউণ্ডারী করলে। লাঞ্চের সময় ভারতীয়দের স্কোর ৯৭, তখন ৫ উইকেট গেছে।

দর্শক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পনেরো হাজার। খেলা আরম্ভ হলে দ্বিতীয় বলেই ওয়াজিরের মাঝের ষ্ট্যাম্প গেলো। জাহাঙ্গীর এলো ও ভেরেটির বল সোজা পিঠিয়ে শত রান তুললে ১৩৩ মিনিটে। পালিয়াকে মিচেল 'ফাইন-লেগে' সুন্দর লুফলে। ক্যাপ্টেন ভিজিয়ানাগ্রাম নামতে সম্বর্দ্ধনা হলো।

রামাস্বামী সি এস নাইডু

তিনি এলেনের বল বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। জাহাঙ্গীর এলেনের বলে বোল্ড হলে সি এস নাইডু এসে ৬ রান করে সোজা ড্রাইভ্ মারতে গিয়ে ওয়্যাটের হাতে আটকালেন। নিসার এসে এক ওভারে ২ বার চারের বাড়ী মেরে ষ্টাম্পড্ হলে ভারতীয়দের ইনিংস শেষ হলো ১৪৭ রানে, মাত্র তিন ঘণ্টায়।

বেলা সাড়ে তিনটায় ইংলণ্ডের ইনিংস আরম্ভ হলো

মিচেল ও গিম্‌ব্লেটকে দিয়ে। নিসার ও অমরনাথ বল দিতে লাগলেন। ইংলণ্ডের প্রথম উইকেট (গিম্‌ব্লেট) ১৬ রানে, দ্বিতীয় উইকেট (টার্ণবুল) ১৬ রানে, তৃতীয় উইকেট (মিচেল) ৩০ রানে, চতুর্থ উইকেট (ওয়াট) ৩৪ রানে, এবং পঞ্চম উইকেট (হার্ডষ্টাফ্) ৪১ রানে গেলো।

চা পানের সময় পর্য্যন্ত অমর সিং ৯ ওভারের ৫টা মেডেন নিয়ে ১৩ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। ইনি বিপজ্জনক বল দিয়েছেন। ইংলণ্ডের পক্ষে লেল্যাণ্ড এসে অবস্থার পরিবর্ত্তন করলেন। বেলা শেষে ৭ উইকেট খুইয়ে ইংলণ্ড ১৩২ রান করতে পারলে।

লেল্যাণ্ড (ইংলণ্ড)

বারিপাতের জন্য দ্বিতীয় দিনে খেলা সময়মত আরম্ভ হতে পারলে না। বৃষ্টি থামলে ক্যাপটেন ও আম্পায়ারদ্বয় বার বার তিনবার মাঠ পরীক্ষা করলেন। দ্বিতীয়বারে ক্যাপটেন ও আম্পায়ারে মতদ্বৈধ হলো মাঠ কৃত্রিম উপায়ে শুকোবার বিষয় নিয়ে। আম্পায়ার কি রকম রোলার ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে ব্যাটিং দলের মত না নিয়ে নিজের ইচ্ছানুরূপ রোলার ব্যবহার করতে আজ্ঞা দিলেন।

খেলা আরম্ভ হলো বেলা স'দু'টোয় মাত্র দু' হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে। ইংলণ্ড মাত্র ২ রান গত রাত্রের রান সংখ্যায় যোগ করতে সক্ষম হলো। ১৫ মিনিট মধ্যে তাঁদের তিন উইকেট গেলো। ভেরিটি মাত্র একবার ষ্ট্রোক্ করে ঐ দু' রান করেন। ইংলণ্ডের ইনিংসও ভারতবর্ষের মতন তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপী হয়েছে। মোট স্কোর ১৩৪, ভারতবর্ষ ১৩ রানে এগিয়ে রইলেন।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলে, মার্চ্চেণ্ট এলেনের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলটি মারলে ডাক্‌ওয়ার্থ 'ফাইন লেগে'র দিকে পূরো ঝুঁকে পড়ে তাঁকে অদ্ভুত 'ক্যাচ্' করলেন। প্রথম উইকেট শূন্য রানে, দ্বিতীয় ১৮, তৃতীয় ২২, চতুর্থ ২৮, পঞ্চম ৩৯ রানে গেলো। এলেন ১৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দিনের শেষে ভারতবর্ষ ৭ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৭৮ রান তুলতে পারলে।

পরদিন সকালেও খেলা নিয়মিত আরম্ভ হতে পারলো না বৃষ্টির জন্য। সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত বারিপাত চললো। বেলা ৩টায় খেলা আরম্ভ হলে মহারাজকুমার ও পালিয়া ব্যাট করতে নামলেন। ক্যাপটেন এক রানও না করে ভেরিটির বলে মিচেলের হাতে আটকালেন। সি এস যোগ দিলেন। পালিয়া লেল্যাণ্ডের হাতে গেলেন, পরে সি এস এলেনের বলে হার্ডষ্টোনের হাতে আটকালে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মোট ৯৩ রানে ১৬৫ মিনিটে।

মিচেল ও গিম্‌ব্লেট এসে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। নিসারের তৃতীয় বলে মিচেল এক রান না হতেই মার্চ্চেণ্টের হাতে আটকালে টার্ণবুল যোগ দিলেন। আধ ঘণ্টায় ২১ রান উঠ্‌লো। অমরসিং ৯ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়েছেন। জাহাঙ্গীর বল দিতে এলেন। ভারতীয়দলের ফিল্ডিং খারাপ হতে লাগলো। গিম্‌ব্লেট ৪৯ রানের মাথায় 'স্কাই' করলে পালিয়া ধরতে পারলে না। টার্ণবুলও স্কাই তুললে জাহাঙ্গীর লুফ্‌তে পারলে না। গিম্‌ব্লেট অমরসিংয়ের বলে বাউণ্ডারী করে ১০৮ রান করলে, ইংলণ্ড ৯ উইকেটে প্রথম টেষ্ট জয়ী হলো।

টার্ণবুল

অমরনাথ—বিদায়ঃ

২১শে জুন তারিখের প্রভাতে পৃথিবী জান্‌তে পারলে যে অমরনাথকে ভারতে ফেরত যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা। অমরনাথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি সাশ্রুনেত্রে এবারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও ক্যাপ্‌টেন যদিবা ক্ষমা করতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু ইংরাজ ম্যানেজার রাজী না হওয়ায় তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাঁর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে মাইনর কাউণ্টির ম্যাচে

প্যাড প'রে প্রস্তুত হতে বলবার পর চার ঘণ্টা তাঁকে অপেক্ষা করতে হওয়ায় তিনি বিরক্ত হয়ে ড্রেসিংরুমের কোনে ব্যাট ছুড়েছিলেন। তাঁকে নাকি সর্ব্বদাই বলতে শোনা গিয়েছিল যে তিনি দলের পক্ষে অপরিহার্য্য তাঁকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া চলবে না।

তাঁর এই দম্ভের আমরা অনুমোদন করি না। তিনি ভাল খেলেন, তাঁকে সেইজন্যই দলে নেওয়া হয়েছিল, সেই কারণে খেলোয়াড় বা অধিনায়কের প্রতি তিনি কি অসম্মান প্রকাশ করবেন। তিনি দলের পক্ষে অপরিহার্য্য বিধায় বলে যে তিনি কেবল চোখ রাঙাবেন ইহাও সহ্য করা যায় না। আবার ইহাও দেখতে হবে যে তাঁর উপর অন্যায় করা হয়েছে কিনা। অধিনায়কের ব্যাটিং পর্য্যায় নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা ওদেশের বহু কাগজে বেরিয়েছে। অমরনাথকে প্রস্তুত থাকতে বলে চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখাও ক্যাপ্টেনের উচিত হয় নি। তাতে যদি তাঁর মেজাজ কিছু রুক্ষ হয়ে থাকে এবং সেই কারণে তিনি কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু তার জন্যে পরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখনও কি disciplinary measureটা একটু খাটো করা যাবে না। দলের অমরনাথকে যে বিশেষ আবশ্যক ইহা তিনি বলুন আর না বলুন, বিদেশী ও স্বদেশবাসী সবাই মনে প্রাণে তা' জানে। টেষ্ট ম্যাচের ঠিক পূর্ব্বে তাঁকে বিদায় দিয়ে ম্যানেজার ও ক্যাপ্টেন ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করেন নি, তাঁদের জিদ্ রক্ষা করেছেন।

বৃটেন জোন্স
ও ভিজিয়ানাগ্রাম ম্যানেজার

ম্যানেজার বৃটেন জোন্স বিদেশী। ইনি ম্যানেজার নিয়োজিত হলে এদেশে প্রতিবাদ হয়েছিল। একটি নানা বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভারতীয় দলের ম্যানেজার একজন ইংরাজ কেন হলেন তা অনেকের পক্ষেই অবোধ্য ছিল। এইরকম একটি দল বিদেশে নিয়ে যাবার তাঁর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাও কিছু ছিল না। তিনি ইংরাজ বলেই এইরকম drastic step একজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে নিয়ে ভারতবর্ষকে জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন। ঘরের কথা প্রকাশ না করেও অন্য উপায়ে অমরনাথকে শাস্তি বা আক্কেল দেওয়া যেতে পারতো।

স্পোর্টিং স্পিরিট দেখিয়ে হিউম্যানকে লোফা বল দিয়ে সেঞ্চুরি করতে দেওয়াই বুঝি স্পোর্টিং, আর দেশীয় খেলোয়াড় অপরাধ স্বীকার করলেও তাকে ক্ষমা করা মহাপাপ। বড় বড় স্পোর্টস্‌ম্যান ক্যাপ্টেনকেও দেখা যায় নি যে তাঁরা বিপক্ষ পক্ষের কাহাকেও সেঞ্চুরি হবার সুযোগ দেবার জন্য বোলারের কাছ থেকে বল নিয়ে নিজে সোজা বল দিয়েছেন। জগতের ইতিহাসে ইহা নেই—কেবল ভারতবর্ষের ক্যাপটেনের পক্ষেই ইহা হয়েছে। তাঁর অধিনায়কতায় যে অনেক গলদ দেখা গেছে তা' সে-দেশীয় বিশেষজ্ঞদের সমালোচনা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। যাঁদের খুসি করতে তাঁর চেষ্টার ক্রটি নেই। ক্যাপটেন একটি ভোজে বলেছেন 'আমরা ছাত্র হিসাবে শিখতে এসেছি, কালে হয়তো ছাত্ররাই শিক্ষকদের একদিন শেখাতে পারদর্শী হবে।

বেশ কথা—শিখতেই যদি গিয়ে থাকো তবে তাঁদের এতগুলি খেলা দেখেও কি চৈতন্য হ'লো না,—কি করে দলের অধিনায়কতা করতে হয়, খেলোয়াড়দের প্রীতি ও সম্মান আকর্ষণ করতে হয়। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ মাননীয় খেলোয়াড়দের প্রতি যোগ্য সম্মানিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক খেলার পূর্ব্বে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে টীম মনোনয়ন ও ব্যাটিং পর্য্যায় এবং ফিল্ডিং সাজানো উচিত। তা' কি করে থাকো?

বিজয়-যাত্রা পথে হকিদল ঃ

২৭শে জুন তারিখে ভারতীয় অলিম্পিক হকিদল রানপুরা জাহাজে ভারত ছেড়েছেন বার্লিন অভিমুখে। ভারতবর্ষ হকি খেলায় পৃথিবীর চ্যাম্পিয়নসিপ্ বিজয়ী হয়ে আছেন ১৯২৮ সাল থেকে। আমষ্টার্ডমে প্রথম বিজয়ী হন, ১৯৩২ সালে। দ্বিতীয়বার উহা রক্ষা করেন লস্

এঞ্জেলে। এবার বার্লিনে পুনরায় বিজয়ী হয়ে ফিরে আসুন এই শুভ-ইচ্ছা করি।

আমষ্টার্ডমে, ভারতবর্ষ—অষ্ট্রিয়াকে ৬-০, বেলজিয়মকে ৯-০, ডেনমার্ককে ৫-০, সুইজারল্যাণ্ডকে ৬-০, হলাণ্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

লস্ এঞ্জেলে, ভারতবর্ষ—জাপানকে ১১-১, আমেরিকাকে ২৪-১ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়।

এবার জগৎবিখ্যাত যাদুকর খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হয়েছেন।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

এফ্ জে পেরী ৬-১, ৬ ১, ৬ ০ গেমে ভনক্রামকে (জার্ম্মাণ) ৪০ মিনিটের মধ্যে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

এফ জে পেরী

গত দু' বৎসরও পেরী বিজয়ী ছিলেন। এইচ্ এল্ ডহার্টি ১৯০২-১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত পরপর বিজয়ী হন। খেলার পূর্ব্বে ভন্‌ক্রামের ডান পায়ের পেশীর আকুঞ্চনের জন্য তিনি মোটেই খেলতে পারেন নি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরূপে খেলা চালিয়েছিলেন। এই জন্যে খেলাটি মোটেই প্রতিযোগিতামূলক হয় নি।

মেয়েদের চ্যাম্পিয়নসিপ্ ফাইনালে মিস্ জ্যাকব্ ৬-২, ৪-৬, ৭-৫ গেমে মিসেস্ স্পারলিংকে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছেন। গত বৎসর বিজয়িনী ছিলেন মিসেস্ এফ্ এস্ উড।

মেয়েদের ডবল ফাইনালে মিস্ জেমস্ ও মিস্ ষ্টামারস্ ৬-২, ৬ ১ গেমে মিসেস্ ফেবিয়ন ও মিস জ্যাকবকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের ডবল ফাইনালে হিউগস্ ও টাকে ৬-৪, ৩ ৬, ৭-৯, ৬-১, ৬ ৪, গেমে হেয়ার ও ওয়াইল্ডকে হারিয়েছেন।

মিস্ জ্যাক্‌ব

ফরাসী টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

ফরাসী টেনিস্ চ্যাম্পিয়নসিপ ফাইনালে জি ভনক্রাম্ ৬ ০, ২-৬, ৬ ২, ২ ৬, ৬-০ গেমে এফ্ জে পেরীকে (ইংলণ্ড) হারিয়েছেন। পেরী গত বৎসর ভনক্রামকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। পেরী অত্যধিক সতর্কতার হেতু সহজ বলও 'নেট' করেছেন। এ দিনের খেলায় ক্রাম অলরাউণ্ড ভাল খেলেছেন।

মেয়েদের ফাইনালে স্পারলিং (ডেনমার্ক) ৬-৩, ৬ ৪ গেমে ম্যাথিউকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। গত বৎসরও ইনিই বিজয়িনী ছিলেন।

উইটম্যান কাপ্ ঃ

ওয়েটম্যান কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকা বৃটেনকে ৪-৩ ম্যাচে হারিয়েছেন।

মিসেস্ ফ্যাবিয়ানের ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য আমেরিকা জয়ী হতে পেরেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত ছোটদের জন্য লিখিত "হাম্মীর"—।০, "চণ্ড"—।০, "সমরসিংহ"—।০, "বাপ্পাদিত্য"—।০

ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থ "ক্লিনিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকা"—২্

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু প্রণীত গল্প পুস্তক "পুরাতন ছবি"—১।০

কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত দেবনাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ "রসজলনিধি" চতুর্থ খণ্ড—৬্ বঙ্গাক্ষরে মূল সংস্কৃত ও তাহার বাঙ্গালা "রসজলনিধি চতুর্থ খণ্ড, প্রথম অংশ—২্

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত উপন্যাস "আগুনের ঝলকে"—১।০

পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "বৌভাত"—১।০

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ প্রণীত জীবনী "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন"—১।০

মৌলবী মোহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ প্রণীত উপন্যাস "তাজিয়া"—১্

দম্পতি—কুমার ও মায়া দেবী রচিত গল্প পুস্তক "শেষ চিঠি"—১্

শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত ছোটদের গল্প পুস্তক "মায়াপুরীর ভূত"—।৵০

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক "বঙ্গনারী"—১।০

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "ঝড়"—২্

ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ প্রণীত "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন"—১।০

শ্রীমিহিরকুমার সিংহ সম্পাদিত "কালী-সাধক" রহস্যগ্রন্থ—৫০

জন্ম সন ১২৭২ সাল ১২ই শ্রাবণ | রজনীকান্ত সেন | মৃত্যু—সন ১৩১৭ সাল ২৮শে ভাদ্র
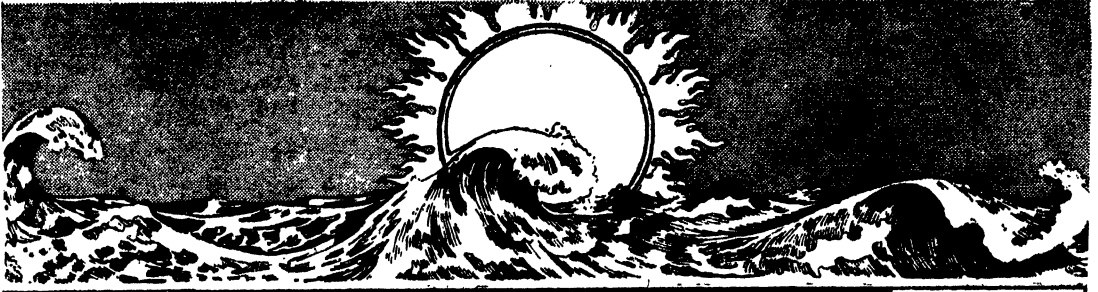
ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৪৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ভারতের ধর্ম্ম-সমস্যা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এস্-সি, বিদ্যাবিনোদ

ভারতবর্ষের নানা অংশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্ম্মমতের গণ্ডি নিরূপণ যথার্থই সমস্যা বিশেষ। বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার-নিষ্ঠা বহু ক্ষেত্রে কিরূপ জটিলভাবে একে অপরের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহা ইতঃপূর্ব্বে মৎপ্রণীত এক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে (১)। তথাপি প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা এবং লোক-কথিত ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মমতগুলির পরস্পরের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভারতীয় ধর্ম্মমতগুলিকে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আসিয়া পড়ে হিন্দু ধর্ম্মের কথা। ভারতীয় জন-সংখ্যার পাঁচ ভাগের তিন ভাগেরও বেশি হইল হিন্দু, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৭.৭ জন হিন্দু। সেন্সস্ কমিশনারের (২) মতানুসারে যদি আদি-হিন্দু, আদি-দ্রাবিড়, আদি-কর্ণাটক প্রভৃতি মতানুবাদিগণকে (ইহারা মোট ৩৯৯, ৩০৭) হিন্দুগণের সহিত একত্র বিবেচনা করা যায়, তবে হিন্দু জন-সংখ্যা শতকরা ৬৭.৯ জনে (০·২ কেবল পার্থক্য) পরিণত হয়। কেবল যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ তাহাই নহে, ধর্ম্মমতের জটিলতা যত দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দুধর্ম্মের সীমা নিরূপণের বেলা, এত আর ভারতীয় অন্য কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে দেখা যায় না; হিন্দু ধর্ম্মের ধারা বহু এবং শাখা-প্রশাখা যেন দিগন্ত-প্রসারী; 'হিন্দুর' সংজ্ঞা নির্দ্ধারণও তাই সমস্যাময়। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অবশ্য প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচিত হইবে।

প্রধানতঃই দেখিতে পাওয়া যায় 'হিন্দু' বলিতে ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা জন্মে প্রায় ততখানি দৃষ্টিই যাইয়া পড়ে সমাজ এবং সামাজিকতার প্রতি। এতদ্‌সম্পর্কে ডাঃ হাটন বলেন,—"...really denotes membership of a system of organised society with great latitude of religious beliefs and practices...

(১) লেখক—"ভারতীয় ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য"—ভারতবর্ষ, ২৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, চৈত্র, ১৩৪২।

(২) *Census of India*, 1931, Vol. I, part I, page 387.

...।"(৩) বস্তুতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই আমরা দেখিতে পাই 'হিন্দু' হিন্দু—যেমন পূজা-আহ্নিক প্রভৃতির দিক দিয়া, তেমনি আচার-নীতি-নিষ্ঠার দিক দিয়াও হিন্দুত্বের কড়া দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভাব পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম্মের লোকের মধ্যে এত নাই—যত রহিয়াছে হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগীদিগের মধ্যে। হিন্দুর যে দুইটি তথা-কথিত ভাগ—বর্ণ হিন্দু ও অস্পৃশ্য হিন্দু—তাহার মধ্যে পর্য্যন্ত স্তরভেদে ধর্ম্মাচরণের অধিকার সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যাগ-যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইবে প্রধান হোতা, আর অন্যান্য বর্ণ হিন্দুরও প্রতিনিধি বা ব্রাহ্মণের সাহায্যে আহুতি দিতে হইবে, পূজা-অর্চ্চনায় অর্ঘ্যদান পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিত্বে। ভারতীয় ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য(৪) আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে কতকগুলি শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অন্যরূপ, কিন্তু বিবাহাদি শুভকার্য্যে আচার-নীতি প্রচলিত রহিয়াছে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী। নানা দিক দেখিয়া-শুনিয়া ডাঃ হাটন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহার মতে সামাজিক রীতি-নীতির দিক দিয়া এমন লোকও হিন্দু বলিয়া দাবী করিতে পারে যাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস হয় তো পৃথক এক দল, যাহাদের উপর হিন্দুর কোন কিছুরই ছাপ পড়ে নাই, তাহাদেরই মতানুগামী (৫)। একজন করোয়া বলিয়াছে "if we had plough cattle we should be Hindus"(৬) যেন হিন্দুত্বের যা'-কিছু তাহার পক্ষে ঐ 'plough cattle'; কেবল হালের গরু না থাকাতেই যেন সে হিন্দুর গণ্ডির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন হইল 'হিন্দুর' সংজ্ঞা কি?

মহীশূরের সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ নিম্নোক্তরূপ হিন্দুর সংজ্ঞা নিরূপিত করিয়াছেন :—

"What makes a man Hindu is the fact that he is an Indian by birth, that he shares religious belief of a kind familiar to the majority of the people, that he is a member of the social order accepted by that majority and that he worships one or other of the dieties in the pantheon commonly accepted by that same majority." (৭)

আবার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-প্রদেশে স্থাপিত 'হিন্দু মিশন' যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা যদিও মহীশূরের উক্ত ব্রাহ্মণ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের উক্তি হইতে মূলতঃ সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তথাপি হিন্দু সম্বন্ধে বঙ্গের মিশনের ধারণা কিঞ্চিৎ বেশি উদার। মিশনের মতে ভারতভূমিতে উদ্ভূত ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম্ম-শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তিই হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত; এমন কি কেহ যদি সরল বিশ্বাসে বলে সে হিন্দু, আর প্রাথমিক রীতি-নীতিগুলি যদি মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে তবেই সে হিন্দু নামের অধিকারী (৮)। বঙ্গের মিশন ও মহীশূরের সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কৃত ব্যাখ্যার মধ্যে প্রধান অনৈক্য হইল—মিশন জন্মস্থান সম্পর্কে কোন প্রকার কড়াকড়ি করিতেছে না, কিন্তু মহীশূরের ব্রাহ্মণের উক্তিতে দেখা যায় প্রথমেই তিনি জন্মস্থানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু উৎপত্তিগত দিক দেখিতে গেলে হিন্দু শব্দের অর্থ আবার কিঞ্চিৎ অন্যরূপ দাঁড়ায়। কথিত আছে সিন্ধুপ্রদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে "স" স্থানে "হ" উচ্চারিত হইত (৯)। বেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে এবং ইহাই পারস্য-পণ্ডিতগণের নিকট যাইয়া ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারেই বোধ করি 'হপ্ত-হিন্দু'তে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। "ক্রমে মুসলমান-জগতে ভারতবাসী

(৩) *ibid*, page 381.

(৪) লেখক—*loc. cit.*

(৫) "..... it is possible for a man to be a Hindu socially and to have a religious belief shared with others who do not regard themselves as members of the same society, ..."—*Census of India*, 1931, Vol. I, part I, page 381.

(৬) " a tribal Korwa of the Central Provinces who said to his Census Superintendent "if we had plough cattle we should be Hindus"—*loc. cit.*

(৭) *Census of India*, 1931, Mysore, Vol. XXV, part I, page 298.

(৮) "all persons who follow a religion or doctrine which had its origin in India or in good faith call themselves Hindus and generally follow or try to follow the fundamental principles, usages and customs of the Hindus as enjoined in the Hindu scriptures."—*Census of India*, 1931, Bengal, Vol. V, part I, page 394.

(৯) বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, বাবিংশ ভাগ, ৩০৫ পৃঃ।

মাত্রই হিন্দু শব্দে অভিহিত" (১০)। নানা দিক বিবেচনা করিয়া বিশ্বকোষে হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :—

"মুসলমান, অপর বিদেশী ও অনার্য্যজাতি ভিন্ন ভারত-বাসী মাত্রই 'হিন্দু' নামে পরিচিত।"(১১)

এইরূপ গোলযোগের লক্ষণ হিন্দু ব্যতীত আরও অন্য দুই-এক ক্ষেত্রে কখন কখন এক-আধটুকু দেখিতে পাওয়া যায়। গত আদমসুমারীতে(১২) এক জনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি সামাজিক বন্ধনের দিক দিয়া ইস্‌লামের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম 'এ্যাগনষ্টিসিজ্‌ম্' (Agnosticism)(১৩) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য এই রকম আর কাহারও কথা আদমসুমারীতে অন্ততঃ লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইঁহার উক্তি সমালোচনা করিতে যাইয়া সেন্সস্ কমিশনার, ডাঃ হাটন মরিস্ ব্যারেস্ নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"...a position which recalls that of Maurice Barrés who said of himself "I am an atheist, but of course I am a catholic"..."...(১৪)। কিন্তু হিন্দুদের বেলায় এই প্রকার গোলযোগ এত বেশী এবং এত জটিল যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার সীমা নিরূপণ অনেক সময় মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সাহেজধারী শিখগণ সম্বন্ধে এই প্রকার জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায় (১৫)। ইহারা যেন হিন্দু ও শিখের মাঝামাঝি। গত আদমসুমারীতে নাকি ইহাদের কতক হিন্দু বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, আবার কতক বিবেচিত হইয়াছে শিখরূপে। অর্থাৎ যে যেমনভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে তাহাকে সেইরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। যথার্থপক্ষে যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই, তখন এই রকম করা ছাড়া উপায়ই বা কি? ফলে সংখ্যা তালিকাগুলি এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই অনিশ্চয়তা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকারের দ্বন্দ্বে পড়িয়া ডাঃ হাটন বলিতেছেন,"...the cross division of religion and society is clearly going to create a difficult position for census operations in the future unless a return of "community" be substituted for that of religion and caste." (১৬) মদ্র প্রদেশের হিন্দু ও আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গোলযোগের কোন যুক্তি-সঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়াই সম্ভবতঃ তথাকার সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ রহস্য করিয়া বলিয়াছেন,—"It would be a wise man indeed who could draw a satisfactory line between catholic Hinduism and the vague religious beliefs of the primitive tribes." (১৭) আদিম অধিবাসীদিগের বেলা বঙ্গ-প্রদেশেও অনুরূপ গোলযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে (১৮)। বঙ্গ-প্রদেশের সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় ঐ রকমের সমস্যায় পড়িয়া হিন্দু-মিশন ও হিন্দু-সভার সংজ্ঞা (১৯) অনুসারে উহাদিগকে অমীমাংসিত ক্ষেত্রে হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন (২০)। কিন্তু কথা হইল—আসল গোলযোগ মিটিল কই? আদমসুমারীর কার্য্য না হয় কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইল, যদিও নানা মতানৈক্যের নিমিত্ত বিভিন্ন অংশে সমতা সংসাধন সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত পার্থক্য ও সীমা নির্দ্ধারণ ইহাতে হইল না, ফলে হইল কেহ বলিবে হিন্দু, তাহার প্রতিবাদও উপস্থিত হইবে; আবার কোন শ্রেণীকে হিন্দু বলিয়া দাবী করিবে হিন্দুরা,

(১০) *loc. cit.*

(১১) *loc. cit.*

(১২) *Census of India*, 1931, Vol. I, part I, page 382.

(১৩) "Agnostics, a term invented by Huxley in 1869 and applied to those who disclaim any knowledge of God, the origin of the universe, immortality, etc. The Agnostics hold that everything is unknowable which is incapable of scientific proof. Agnosticism is therefore the attitude of 'solemnly suspended judgment' and cannot be identified with atheism. The Agnostics do not deny the existence of a Divine Being, but merely maintain that we have no scientific ground for either belief or denial."—The compact Encyclopedia (The Gresham. Pub. Cony. Ltd.—1928), Vol. I, page 32.

(১৪) *Census of India*, 1931, Vol. I, part I, Page 382.

(১৫) লেখক—*ibid.*

(১৬) *Census of India*, 1931, Vol. I, part I, Page 382.

(১৭) *Census of India*, 1931, Madras, Vol. XIV, part I, page 317.

(১৮) *Census of India*, 1931, Bengal Vol. V, part I, page 382.

(১৯) পত্রতলস্থ ৮ম টীকা দ্রষ্টব্য।

(২০) *loc. cit.*, page 382—383.

যেমন শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি—অথচ তাহাদের কেহ সেই দাবী অস্বীকার করিবে, কেহ বা মানিয়া লইবে। হিন্দুর সংজ্ঞা নিরূপণ যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা মহীশূরের সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয়ের বিবৃতি হইতেই বুঝা যায় (২১)। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও কোনরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বোম্বাই প্রদেশের আদমসুমারীর বিবরণীতে আবার হিন্দুর ব্যাখ্যা অতি সহজভাবে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উক্ত বিবরণী অনুসারে ভারতভূমি হিন্দুস্থান নামে পরিচিত, অতএব যদি অন্যরূপ উক্ত না হয় তবে এতদ্দেশবাসী মাত্রই হিন্দু নামে অভিহিত হওয়া উচিত (২২)। পূর্ব্বোক্ত মহীশূরের সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয়ের উক্তির সহিত এইরূপ ধারণার অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের সেন্সস্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ এই সম্পর্কে স্যার এ্যাল্‌ফ্রেড লায়েলের (Sir Alfred Lyall) মতামত উদ্ধৃত করিয়াও হিন্দুর সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন (২৩)। স্যার এ্যাল্‌ফ্রেড্ লায়েল্ দেশ, ধর্ম্মাচরণ, বংশধারা ও জাতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই সকল নানা মতের মধ্য হইতে চট্ করিয়া কোন প্রকার উপসংহারে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আরও দুই একটি মতামত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। হিন্দু ধর্ম্মের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করিয়া স্যার হারবার্ট রিজলে (Sir Herlbert Risley) স্যার ডেন্‌জিল্ ইবেট্‌সনের (Sir Denzil Ibbetson) যে বিবৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বর্ত্তমান আলোচনার অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।

"A hereditary sacerdotalism with Brahmans for its Levites, the vitality of which is preserved by the social institution of caste and which may include all shades and diversities of religion native to India, as distinct from the foreign importations of Christianity and Islam and from the later outgrowths of Buddhism, more doubtfully of Sikhism and still more doubtfully of Jainism." (২৪)। অনুরূপ ব্যাখ্যা স্যার এ্যাথেল্‌ষ্টেন্ বেন্‌স্ (Sir Athelstane Baines) মহোদয়ের বিবৃতিতেও আমরা দেখিতে পাই (২৫)। স্যার হারবার্ট রিজলে তাঁহার 'The people of India' পুস্তকে স্যার এ্যাল্‌ফ্রেড্ লায়েলেরও দুই একটি মতামতের উল্লেখ করিয়াছেন (২৬)। তাহাতেও বিশ্বাস, পূজা আর্চ্চা প্রভৃতির কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যথার্থপক্ষে দেখিতে গেলে হিন্দু বলিতে যে ব্রাহ্মণের আধিপত্যের কথা আসিয়া পড়ে তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইলে আর্য্যসমাজী ও ব্রাহ্মগণের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলা হয়। ইহাদিগকে তো আর হিন্দু বলিতে অস্বীকার করিলে চলিবে না!

বহু লোকের মতামত ও নানা অবস্থা বিবেচনা করিয়া পরে স্যার রিজলে তাঁহার এক স্বকৃত সংজ্ঞা উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"...Hinduism may fairly be described as *Animism more or less transformed by philosophy*, or, to condense the epigram still further, as *magic tempered by metaphysics*" (২৭)

স্যার হারবার্ট রিজলের মত কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। হিন্দুগণ দেব দেবী অবতার প্রভৃতি বিশ্বাস

(২১) "Hinduism ... is a collection of many such schools and naturally covers too wide range of ideas to be brought into a simple definition—*Census of India*, 1931, Mysore, Vol. XXV, part I, page 299.

(২২) "This land is called Hindusthan and is the country of the Hindus and all who live in it must be Hindus unless they definitely claim another recognised religion."—*Census of India*, 1931, Bombay Presidency, Vol. VIII, part I, page 356.

(২৩) *loc. cit.*

(২৪) Sir Herbert Risley,—The People of India, second edition (1915), page 232.

(২৫) "The large residum that is not Sikh, or Jain, or Buddhist, or professedly Animistic, or included in one of the foreign religions such as Islam, Mazdaism, Christianity, or Hebruism."—*Census Report*, India, 1891, page 158.

(২৬) Sir Herbert Risley—*op. cit.*, page 233.

(২৭) *loc. cit.*

করিলেও তাঁহারা প্রেত-তান্ত্রিক এমন কথা বলা যায় না। পৌত্তলিকতা আর প্রেততান্ত্রিকতার মধ্যে মূলতঃ যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা স্যার রিজ্‌লে সঠিক বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই এ গোলযোগ করিয়াছেন। পূজার পরে প্রতিমা বিসর্জ্জনকালে দেখা যায় তথাকথিত অস্পৃশ্যগণ প্রতিমা বহন ও বিসর্জ্জন করিতে অনুমতি পাইয়া থাকে এবং প্রয়োজন হইলে প্রতিমার ঘাড়ে মাথায় পা দিয়াও কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই আচরণের সহিত প্রেত-তান্ত্রিকতার সামঞ্জস্য কোথায়? বরং মহীশূরের সেন্সস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইবেট্সন, স্যার এ্যাল্‌ফ্রেড্ লায়েল্ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য হিন্দু-সংজ্ঞার প্রথমেই বেদজ্ঞান ও বেদে বিশ্বাসের কথা উত্থাপিত হওয়া উচিত এবং তৎসঙ্গে হিন্দুর উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ আইনও (Hindu Succession Law) বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। তবে যাহারা উক্ত উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ আইন মানিয়া চলে, অথচ স্পষ্টতঃ অন্য ধর্ম্মবিশ্বাসী (২৮), তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। গৌরের সম্প্রতি-প্রবর্ত্তিত বিবাহ আইনানুসারে সম্পাদিত বিবাহের সন্ততিগণের বেলা হিন্দু উত্তরাধিকার আইন না খাটিলেও উক্ত আইনের উক্তি অনুসারেই তাহাদের পক্ষে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কোন বাধা নাই।

হিন্দু মহাসভা বৌদ্ধগণকেও হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করে। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে যে সকল মনীষীর বিবৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধগণকে হিন্দু হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচনা করেন। বৌদ্ধগণেরও বেশির ভাগ হিন্দু মহাসভার দাবী অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধগণকে বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। ডাঃ হাটনের মতে ভারতীয় বৌদ্ধগণকে হিন্দু বলায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত স্পষ্টতঃ অন্য কোন প্রকার যুক্তি-যুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না (২৯)। কিন্তু উভয় পক্ষই যদি একমত হইয়া হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করে, তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক এতদ্‌সম্পর্কে আর কোন যুক্তি-তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু মহাসভা জাপানী বৌদ্ধগণকেও হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে কি? আর জাপানের বৌদ্ধগণ তাহা স্বীকার করিবে কি? ডাঃ হাটন এই সম্পর্কে আলোচনাকালে বলিয়াছেন,—

"The common element in the two religions and this is of course apparent, even to the parallel between the Indian *holi* and the chaster Burmese Water Carnival, is often derived from a more primitive religion, but to claim Buddhists as Hindus by religion appears to the disinterested just about as reasonable as it would be to claim Christians as Jews." (৩০)

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধগণকে হিন্দু বলিয়া দাবী করা চিন্তনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়ার (reaction against) ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি বলিয়া ডাঃ হাটন মত প্রকাশ করিয়াছেন (৩১)। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হিন্দুর সহিত প্রতিক্রিয়ার ফলেই এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা না গেলেও এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে যে একটা রেশারেশি বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে (৩২) এবং ধর্ম্মমতের মূলেই যে যথেষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। নানা সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন সময়ে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক আচার-নীতির পার্থক্য থাকিলেও ধর্ম্মমতের গোড়াগুড়িতে কোন প্রকার অনৈক্য এই সকল সম্প্রদায়ের নাই।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে বাসবকৃত এইরূপ সংস্কার

---

(২৮) 'Khojas' and 'Cutchee Memons—in the Bombay Presidency—cases reported in (1874) 12 Bom. H. C. 281; (1885) 10 Bom. 1 & other cases, which held that the 'khojas' & Cutchee Memons', though Mahammedans, are governed by the Hindu Law of Succession.

(২৯) "...considerations of politics have probably been allowed to bias the critical faculty in putting forward this claim '..."—*Census of India*, 1931, Vol. I part I, page 382.

(৩০) *Census of India*, 1931, Vol. I, part I, page 382.

(৩১) *loc. cit.*

(৩২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—'বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও হিন্দু বিদ্বেষ', ভারতের সাধনা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।

প্রচেষ্টার ফলে বোম্বাই প্রদেশে লিঙ্গায়েতগণের উৎপত্তি। কবীরপন্থী প্রভৃতি আরও কয়েকটি দলের উৎপত্তিও এইরূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অধিকতর নৈকট্য ও সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত হিন্দুর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলেই যে বঙ্গ-প্রদেশের বৈষ্ণবগণের উদ্ভব সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। শিখগণ অবশ্য যে ভাবেই হউক, হিন্দু হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে হয় তো প্রশ্ন করিবেন বৌদ্ধধর্ম্মেরও তো উদ্ভব হিন্দুর মধ্য হইতে। যাহারা বৌদ্ধগণকে হিন্দু বলিয়া দাবী করে তাহাদেরও অন্যতম যুক্তি এই। উৎপত্তি যে ভাবেই হউক ইহারা স্পষ্টতঃ যে একটি পৃথক দল সৃষ্টি করিয়া আছে সে বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আর্য্যসমাজী ও ব্রাহ্ম—এই উভয় দলই সংস্কার চেষ্টায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে সমতা সাধনের নিমিত্ত গঠিত হইয়াছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহারা হিন্দুর গণ্ডির মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

গত আদমসুমারী অনুসারে দেখা যায় আর্য্যসমাজীদের মধ্যে আবার একদল নাকি হিন্দুর আওতায় থাকিতে প্রস্তুত নহে। অবশ্য এই দলাদলি আর্য্য আন্দোলনের গোড়াতে যত ছিল এখন আর নাকি ততটা নাই (৩৩)। ডাঃ হাটন বলেন যে গোড়ামি কিঞ্চিৎ কমিয়া যাওয়ার ফলেই দলাদলিও কমিয়াছে (৩৪)। হিন্দুদের মধ্যেও যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে খানিকটা উদাসীনতা আসিয়া পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কোচিনের সেন্সস্ সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট্ও এইরূপ উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কিন্তু বর্ণ হিন্দুর উপরেই দোষারোপ করেন বেশি (৩৫)। এই প্রকার উদাসীনতার কারণ কি? কোচিনের উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয় যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

" in these days of communal demand for equal representation of all creeds and classes in the Public service…, they find that the unlucky accident of their birth within the Hindu fold is an almost impassable barrier against their entry into government or quasi-government service—the only career for which they are fit by training and temperament alike." (৩৬)

তাঁহার এই যুক্তি সম্বন্ধে যথার্থই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন,"...there being no provision for religious instruction in the curriculum of our modern schools, the children of the educationally advanced Hindu classes grow up as complete strangers to even the most elementary principles of their creed, so much so that our educated Hindu youth is as a rule grossly ignorant of the essence of Hindu religion and philosophy and of the inner meaning of its rituals." (৩৭)

তা'রপর জৈনদের কথা। হিন্দুগণ জৈনগণকে হিন্দু বলিয়া দাবী করে। ইহাতে হিন্দুগণের পক্ষ সমর্থনোপযোগী যৌক্তিকতা বেশি আছে বলিয়া মনে হয়, কেন না জৈনগণেরও অনেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে (৩৮)। অবশ্য অন্যান্য আরও দুই একটি কারণও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জৈনদের মধ্যে উত্তরাধিকার প্রথা এবং পোষ্যপুত্রাদি গ্রহণ ব্যাপারে হিন্দু আইন অনুসৃত হয় না। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে খুব সম্ভবতঃ প্রাগ্-বৈদিক যুগ হইতেই একদল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। সেই দলই উত্তরকালে 'জৈন' নামে পরিচিত হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস

(৩৩) *Census of India*, 1931, Vol. I, part I, page 382.

(৩৪) *loc. cit.*

(৩৫) "To the generality of English educated persons—be it remembered in this connection that the Caste-Hindus have progressed much more than all others in English education—religion is now a matter of utter indifference or unconcern and its rites and practices are a mass of superstition to be derided and condemned by all right-thinking people …the attitude of a great majority of the English-educated young men of Caste-Hindu communities towards their religion is now one of veiled hostility..." —*Census of India*, 1931, Cochin State, Tol. XXI, part I & II, page 235.

(৩৬) *loc. cit.*

(৩৭) *loc. cit.*

(৩৮) লেখক—*ibid.*

করিবার যথেষ্ট স্থায়সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। প্রথমে হয় তো এরূপ ধারণা পোষণ করা হাস্যকর বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু কতকগুলি কার্য্যকারণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মহাবীরকে স্পষ্টতঃ জৈন ধর্ম্মের স্থাপয়িতা বলিয়াই মনে হয় এবং ইতিহাস আলোচনা করিলে ইঁহাকেই জৈনগণের মধ্যে প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ জৈনদের নিকট ইনি ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নামে খ্যাত। তবে বাকী বাইশ জন তীর্থঙ্কর কাহারা? জৈনদের মতে বারাণসীর অন্যতম রাজা অশ্বসেনের পুত্র তীর্থঙ্কর পার্শ্ব মহাবীরের পূর্ব্বতন; অথচ ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যে নাগরাজগণের একজন ব্যতীত এই নামের আর কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না।

মহাবীরের উপদেশাবলী সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ; অথচ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য তপশ্চরণের নিয়ম ও সূত্রগুলি কিন্তু প্রায় একই প্রকার। ইহারই বা কারণ কি? ইহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে বহু আদি যুগ হইতে হিন্দু-ধর্ম্মের গোড়াপত্তনের কিয়ৎকাল পরেই জৈনগণের অভিযান আরম্ভ হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এই জটিলতা সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে ব্রাহ্মণ-প্রধান হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্ব এদেশে ইণ্ডো-ইয়ুরোপীয় নবাগতগণের আনীত কোন নূতন ধর্ম্ম—এইরূপ ধারণা খুব আস্থা-স্থাপনোপযোগী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। এই সকল নবাগতগণের ধর্ম্মমত প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমীয় উচ্চ-শ্রেণীর সমধর্ম্মা; আর এতদ্দেশে পূর্ব্ব হইতেই যে এক দল অধিকতর সভ্য লোক বাস করিত তাহাদের ধর্ম্মমত প্রধানতঃ মেসোপটেমিয়া, এশিয়া মাইনর বা পূর্ব্ব মেডিটেরেনিয়ন প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে গৃহীত। এই দুই দলের পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের ফলে ব্রাহ্মণ-প্রধান হিন্দুত্বের উৎপত্তি। অবশ্য এতদ্‌সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে আরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্মণ-প্রধান হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত সত্য মানিয়া লইলে পূর্ব্বোক্ত জটিলতা অনেকাংশে মীমাংসিত হইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুত্বের অভ্যুত্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অপর এক প্রতিযোগী দলের অভিযান আরম্ভ হয় এবং সেই দল পরে মহাবীরের আমলে সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই মতদ্বৈধ যেমন আছে, সৌসাদৃশ্যও তেমনি কোন কোন স্থানে রহিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক তুক্কির (Prof. Tucci) মতে জৈনগণের মতবাদের মধ্যে অতি প্রাচীনতম—এমন কি সম্ভবতঃ আর্য্যগণেরও পূর্ব্বে প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক তুক্কীর এই মত হইতেও পূর্ব্বোক্ত ধারণার যথার্থতাই অনুমিত হইতে পারে। দিগম্বর নগ্ন জৈনগণের ধর্ম্মাচরণ যে প্রাচীনতম যুগে প্রচলিত আচরণ বিশেষ হইতে গৃহীত তাহা অস্বীকার করা যায় না। মেগাস্‌থেনিস্ বর্ণিত খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের যে ঐতিহাসিক বিবরণ আমরা পাই, সম্ভবতঃ তাহারও পূর্ব্বে এরূপ নগ্নতা এ'দেশে অনবজ্ঞাত ছিল। এ প্রকারের নগ্ন মুনিগণের অভ্যুদয়ে বর্ত্তমান যুগে কিন্তু স্থান বিশেষে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে (৩৯)।

হিন্দুর সংস্কার প্রচেষ্টায় যে জৈনগণের উদ্ভব, তাহাদেরই মধ্যে কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কোন প্রকার সংস্কার আন্দোলনে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি হয় (৪০)। অথচ হিন্দুগণ সংস্কার আন্দোলনকে পূর্ব্বেও যেমন চক্ষে দেখিয়াছে, এখনও তেমনি সমাদরে গ্রহণ করে এবং আজও অবধি হিন্দুগণের মধ্যে বহু দল নানা ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া সংস্কার-কার্য্য চালাইতেছে।*

(৩৯) '......some Jain *munis* were in April 1931 charged with indecency in the court of the City Magistrate at Surat. The case was withdrawn on an understanding given by the Jains that such sky-clad" ascetics should only move about in public surrounded by a discreet bodyguard. In May however in Dholpur State the appearance of sky-clad Jains in the village of Rajakhera, where the populace was less tolerant, gave rise to a serious riot."—*Census of India*, 1931, Vol. I, part I. page 383.

(৪০) "The Jain ... is not unmoved by the spirit of reform and opinion has run very high on the question of the initiation of minors as religious ascetics (*mussi*), leading in Ahmadabad to blows between the two factions in July 1930 and to action by the Magistrate who had to take security against breaches of the peace in January 1931."—*loc. cit.*

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে জৈনগণ সম্বন্ধে যাহা কিছু ডাঃ হাটনের বিবৃতি (Census of India, 1931, Vol. I, part I) অনুসারে লিখিত হইয়াছে।—লেখক।

লক্ষ্মীর বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ—লক্ষ্মীর উদ্ধার

সুকৃতি যতই সুস্থ হইতে লাগিল, শঙ্করের উপর তাহার আধিপত্য ততই সে প্রকাশ করিতে লাগিল ; শঙ্কর ক্রমে বিব্রত হইল, সুকৃতি ভাল হইয়া উঠিলে সে যে কলিকাতা হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহার কোনও লক্ষণ সে দেখিতে পাইল না। অবশ্য সুকৃতিকে ফেলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার মনও মাঝে মাঝে অশ্রান্ত হইত, কিন্তু সুকৃতিকে লইয়া গিয়াও যে তাহার বিপদ—তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না। সুকৃতি তাহাকে কোথাও যাইতে দিত না। যাইবার নাম করিলেই হয় তিরস্কার করিত, না হয় ক্রন্দন করিয়া বলিত সে মরিবেই। শঙ্কর তাহাতে আরও বিব্রত হইত ও শেষে দায়ে পড়িয়া অঙ্গীকার করিত সে কোথায়ও যাইবে না। কিন্তু ভট্চাজের বাড়ীতে একবার যাইতে তাহার মন নিতান্তই চাহিত ও একবার লক্ষ্মীকে দেখিবার জন্যও তাহার মনে মনে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে সমস্তই চাপিতে হইত, সংসারের সব ভার তখন প্রকৃতিই একরূপ লইয়াছে। ক্ষান্তমণি শয্যাত্যাগ করেন নাই, করিবার লক্ষণও দেখাইলেন না। শঙ্করকে সুকৃতি মধ্যে মধ্যে শুধু ছাড়িয়া দিত, প্রকৃতির সাহায্য করিবার জন্য।

এই অবস্থায় একদিন শঙ্কর বাজারে যাইতেছে এমন সময় বাজারে একটি দোকানে তাহার ভট্চাজের সহিত অতর্কিতভাবে দেখা হইয়া গেল। ভট্চাজ তাহাকে দেখিয়া বিলক্ষণ শঙ্কিত হইল—সে অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে গিয়া শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ ভট্চাজকে ধরিয়া বলিল, "ভট্চাজ মশায় ?"

ভট্চাজ চারিদিকে চাহিয়া মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিতে সঙ্কেত করিল, তারপর শঙ্করের হাত ধরিয়া বাজারের পিছন দিকের একটা গলিতে বাহির হইয়া পড়িল। শঙ্কর বিস্মিত হইয়াই চলিল।

ভট্চাজ দুই তিনটি গলি পার হইয়া একটি ক্ষুদ্র গলিতে প্রবেশ করিয়া এক দ্বিতল বাড়ীর দরজার সামনে পড়িল ও দরজা খুলিয়া ভিতরে শঙ্করকে সঙ্গে যাইতে বলিল। নিজেও অগ্রগামী হইল। শঙ্কর তাহার সহিত নীচের একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরে বিশেষ কিছু নাই। একখানা সতরঞ্চি, একটা পুরাণো বালিশ ওয়াড়হীন ও কতকগুলি কাপড় মাত্র আছে।

ভট্চাজ শঙ্করকে সতরঞ্চির উপর বসিতে বলিল। শঙ্কর বসিল।

ভট্চাজ বলিল, "এই আমার বাড়ী। পালিয়ে এসেছি।" তারপর চুপি চুপি বলিল, "সাহেবরাও জানে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "ও বাড়ী ? সেই মেয়েলোকটি ? তাদের কি হ'ল ?" সে ঠিক করিল, নটবর মিত্র ইহাদেরও তাড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্চাজ কহিল, "তাকে আটকে রেখেছে। বেশ মেয়েটি লক্ষ্মীর মতই। তুমি জান লক্ষ্মীকে ? মিত্তিরজা তা'কে বিয়ে করেছে।"

শঙ্কর অভিভূত হইয়া কিছুকাল রহিল। পরে বলিল, "লক্ষ্মী ? লক্ষ্মী এখানে ? তা'র সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে ?"

ভট্চাজ উত্তর দিল, "হাঁ। আমি বল্লুম পালাতে, পারলে না। শেষে মিত্তিরজা বিষ দেবে। রাধারাণীর মত। তখন কি হবে ? রাধারাণীর মা'কেও দিয়েছিল। মিত্তিরজার অনেক টাকা—অনেক বিষ !"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হলে ? চলুন, শীগ্‌গির যাই, লক্ষ্মীকে আনি গে। যাবেন ?"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভট্‌চাজ বলিল, "যেও না। ওখানে মিত্তিরজা আছে।" তা'রপর ভট্‌চাজ কি যেন ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "নাঃ! লক্ষ্মীকে ছাড়বে না। লক্ষ্মী যে পালালে না।"

শঙ্কর উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কি করবেন? এখনই চলুন না। শেষে যদি সত্যি বিষ দেয়।"

ভট্‌চাজ অধোমুখে বসিয়া ভাবিতেই লাগিল। তা'রপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, "না। সেখানে মিত্তিরজা আছে।"

শঙ্কর অস্থির ও বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। ভট্‌চাজ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "শোন।"

শঙ্কর দাঁড়াইল। ভট্‌চাজ বলিল, "আমি করি নি—মিত্তিরজা করিয়েছে। কুসুমের অনেক টাকা ছিল না? আমাকে বল্‌লে, নকল কর, করে দিলুম। আমি কি জানি নকল ক'র্‌লে জাল করা হয়?" তা'রপর সুর নীচু করিয়া বলিল, "সাহেবরা জানে না।"

শঙ্করের মাথার ভিতর সমস্ত ঘুলাইতেছিল। সে আর দাঁড়াইল না। বেগে বাহির হইয়া গেল। ভট্‌চাজ অধোমুখে বসিয়া রহিল। শঙ্কর সুকৃতিকে ভুলিয়া ছুটিল, শঙ্কর বাজারের কথা ভুলিল। সে সোজা গেল কুমারটুলির সেই বাড়ীতে। নিজের কোনও কিছু বিপদের আশঙ্কা তাহার কখনও হইত না। কেন না বিপদ সে কল্পনাও করিতে পারিত না। সেখানে গিয়া সে সোজা দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। পরিচিত সেই উঠানে পৌছিয়া সে ইতস্তত চাহিয়া দেখিল, কেহ-ই নাই। সে দালানে উঠিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল সেই স্ত্রীলোকটি শয্যাশায়িতা। সে ডাকিল, "শুনছো?"

স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মী কোথায়? সে এখানে? ভট্‌চাজ বল্‌লেন?"

স্ত্রীলোকটি নিরুত্তরে রহিল। শঙ্কর মিনতির সুরে বলিল, "লক্ষ্মী কোথায় বল। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

স্ত্রীলোকটি কি বলিতে গিয়া বলিল না, পাশের গলিপথে অদৃশ্য হইল। শঙ্করও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। আজ তাহার মাথার ভিতর একই চিন্তা স্থির হইয়া বসিয়াছিল, লক্ষ্মীকে চাই।

স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিয়া সে আর একটি উঠানে পড়িল, ঠিক আগেকার প্রথম উঠানের অনুরূপ। স্ত্রীলোকটি দালানে উঠিয়া ঘরের বন্ধ দরজাতে ঘা দিল।

ভিতর হইতে কে প্রশ্ন করিল, "কে?"

শঙ্করের মনে হইল, ইহাই লক্ষ্মীর গলা। সে বলিল, "আমি শঙ্কর, লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী পরম বিস্মিত হইল। সে ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া রাধারাণী ও শঙ্করকে দেখিয়া কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

শঙ্কর বলিল, "এখনই চল, লক্ষ্মী। পালিয়ে চল। সময় নেই।"

রাধারাণী উভয়ের মুখের দিকে দেখিতে লাগিল।

লক্ষ্মী শীঘ্রই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "চল।" সে রাধারাণীরও হাত ধরিল, তিনজনে অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করিয়া আবার এক অনুরূপ অংশে পৌছিল, শঙ্কর বিস্মিত হইল। কহিল, "এ কোন দিক? এ দিকে না।"

আবার এক ছোটপথে চলিয়া তিনজনে ঘুরিয়া লক্ষ্মীর অংশেই আসিল, লক্ষ্মী ও শঙ্কর অত্যন্ত ভীত হইল। এই গোলোকধাঁধার বাহিরে যাইবার পথ নাই। লক্ষ্মী কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে? এ যে ভূতের বাড়ী!"

"কি আর হবে?" বলিয়া নটবর আবির্ভূত হইলেন ও হাসিয়া উঠিলেন।

শঙ্কর সোজা হইয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। নটবরের হাসির মধ্যে একটা বীভৎসতা ছিল। রাধারাণী নির্ব্বাক হইয়া দেখিতেই লাগিল।

হাসি থামিলে নটবর শঙ্করকে বলিলেন, "আজ তোকে এইখানে খুন করে পুঁতে রাখ্‌বো। হতভাগা, পাজি, নচ্ছার! কি করতে এসেছিস্? কে তোকে আস্‌তে দিয়েছে?"

শঙ্কর সোজা হইয়া বলিল, "খবরদার!" সে আজ একেবারে মরিয়া হইয়াছিল।

নটবর জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিলেন, "খবরদার? বটে? এই কে আছিস্?"

এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইল।

নটবর বলিলেন, "এ লোকটা কি করে এল?

তো'রা সব ঘুমুস নাকি ? বাড়ীতে বাইরের লোক কেন ? আমার খাবে—আর কাজ করবে না !"

সে লোকটি জবাব দিল না। নটবর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ধর্ ওকে—তারপর ও'র ব্যবস্থা হবে। আজ ও'র শেষ হয় কিনা দেখ্‌ছি।"

শঙ্কর একলাফে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া চক্ষুর পলকে অন্ধকারে গলিপথে পড়িল।

নটবর আদেশ করিলেন, "ধর্! হতভাগা, পাজী,—চোখের সুমুখে ও পালাবে? যদি পালায় তবে তোর কাঁধে মাথা থাক্‌বে না।"

কিন্তু শঙ্কর তখন এক পথ হইতে অন্য পথ করিতেছে। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে তাহার পরিচিত অংশে পৌছিয়া দেখিল—লোকটি তাহার আগেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। লোকটি তাহাকে দেখিয়াই তাহার দিকে ছুটিল।

শঙ্কর ইতস্তত দেখিয়া উঠান হইতে একখানা ভাঙ্গা টালি তুলিয়া লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। টালি লোকটির ডান চোখের উপর পড়িল। সে "বাপ" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

শঙ্কর কোনও কথা না বলিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে পড়িল। সদর রাস্তাতে আসিয়া সে শুধু বলিল, "চল, লক্ষ্মী, শীগ্‌গির!" কাঁপিতে কাঁপিতে লক্ষ্মী পা বাড়াইয়া চলিল।

কিছু পথ গিয়া শঙ্কর প্রকৃতিস্থ হইল। এতক্ষণ তাহার দেহের রক্ত সমস্ত মাথাতেই উঠিয়াছিল। সে বলিল, "লক্ষ্মী, কোথায় যাবো?"

লক্ষ্মী কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

শঙ্কর দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তা'র পর তাহাকে লইয়া ভট্টচাজের নূতন বাসাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল ভট্টচাজ তখনও মাথাতে হাত দিয়া অধোবদনে ভাবিতেছে।

শঙ্কর ও লক্ষ্মীকে দেখিয়া ভট্টচাজ অত্যন্ত চমৎকৃত হইল, শঙ্কর বলিল, "ভট্টচাজ, লক্ষ্মীকে এনেছি। একে রাখ একটু। আমি একটা বন্দোবস্ত করে আসি।"

লক্ষ্মী কহিল, "কোথায় যাবে তুমি? না, আর যেতে হবে না।"

শঙ্কর ইহার উত্তর না দিয়াই বাহির হইয়া গেল। সে ছুটিল রাধারাণীকে আনিতে। রাধারাণীর বিপদ সে চোখের উপর দেখিতে পাইতেছিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ—শঙ্করের জিদ্

নটবর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কি ঘটিল জানিতে যাইবার জন্য অন্ধকার গলিতে পা দিতেই রাধারাণী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল।

নটবর মহাবিরক্ত হইয়া তাহাকে ঝট্‌কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাধারাণী তাহার উত্তরে নটবরের পৃষ্ঠে দংশন করিল। নটবর দংশন যন্ত্রণাতে অধীর হইয়া রাধারাণীকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাধারাণী দাঁত বসাইয়া—জোর করিয়া কামড়াইয়া ধরিল। নটবর তাহাকে দুই হাতে টানিয়া সম্মুখের দিকে তাহার দেহাংশ আনিয়া সমস্ত বল প্রয়োগ করিতেই রাধারাণীর পক্ষে দাঁত বসাইয়া রাখা অসম্ভব হইল। কিন্তু সে এক টুক্‌রা মাংস শুদ্ধ মুখ তুলিল।

নটবর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে প্রাচীরের গাত্রে চাপিয়া ধরিয়া রাধারাণীর মাথা প্রাচীরে ঠুকিতে লাগিলেন। রাধারাণীর রক্তাক্ত মুখ অন্ধকারে ভীষণ দেখাইতে লাগিল। সে কিন্তু এতটুকু বাধা দিল না। শব্দও করিল না।

ঠুকিতে ঠুকিতে রাধারাণীর মাথা দিয়া নটবর রক্তপাত করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার ক্রোধ শান্ত হইল না। সে আরও ঠুকিল। শেষে যখন সে রাধারাণীকে ছাড়িল, তখন রাধারাণী মৃতবৎ সেইখানে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে সেই লোকটিও রক্তাপ্লুত চোখ মুখ লইয়া উপস্থিত হইল। সেও নটবরের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

রাধারাণী পড়িয়া গেলে নটবর তাচ্ছিল্যভাবে পদাঘাতে তাহাকে সরাইয়া অগ্রসর হইতেছে—লোকটি বলিল, "ও মরে গেছে!"

নটবর প্রথমটা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে? কে মরেছে? লক্ষ্মী?"

লোকটি উত্তর দিল, "না, যাকে মারলে বাবু, সেই! লক্ষ্মী পালিয়েছে।"

নটবর উন্মত্তবৎ বলিল, "লক্ষ্মী পালিয়েছে! হতভাগা, পাজি, পয়সা খাচ্ছ—একটা মেয়ে আর একটা ছোট ছেলেকে আট্‌কাতে পার্লে না! দেখাচ্ছি মজা—"

লোকটি বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "না।"

নটবর জিজ্ঞাসা করিল, "আর সব কোথায়? তারাও মরেছে?"

লোকটি বলিল, "তারা ভট্‌চাজকে খুঁজ্‌তে গেছে। নিজেই পাঠিয়েছ—মনে নেই?"

নটবর এই লোকটিকেও খুন করিতে পারিলে করিতেন। কিন্তু তাহার উপায় নাই, দেখিয়া বলিলেন, "চুলোয় গেছে।" তিনি অগ্রসর হইলেন।

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "এই মরা মেয়েছেলেটিকে নিয়ে কি হবে, বাবু?"

নটবর দাঁড়াইলেন। তা'রপর প্রশ্ন করিলেন "মরেছে? কে বল্‌লে?"

লোকটি বলিল, "দেখ্‌তেই পাচ্ছ! এ 'ত খুন! ওকে নিয়ে কি হবে?"

নটবর কহিলেন, "না, না, ও মরবে না। তুই ত আছিস্ এখানে—যদি দেখিস্ যে সত্যিই মরে গিয়ে থাকে, আমাকে খবর দিবি, ব্যবস্থা কর্‌বো। আমার এখন সময় নেই। সেই ছোকরা কোথায় গেল, দেখ্‌তে হবে।"

লোকটি বলিল, "উঁহুঁ। ও মরেই গেছে একেবারে। দেখ্‌ছো না? বেঁচে নেই।"

নটবর ঈষৎ হাসিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

লোকটি দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতে লাগিল। পুলিসে গিয়া খবর সে দিতে পারে—কিন্তু তাহাতে সে নিজেই জড়াইয়া পড়িবে। সে সঙ্গীদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষাতে রহিল। সঙ্গীরা প্রায় একঘণ্টা পরে ফিরিয়া তাহার কাছে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "সেই খুনেটাকে যেতে দিলি কেন? পাগল মেয়েছেলে—তাকে খুন কর্‌লে পারশু!" প্রথম লোকটি বলিল, "যাবে কোথায়? কলকাতা ছেড়ে ত যাবে না।"

তাহারা লক্ষীর পলায়নের সংবাদে আনন্দিতই হইল। তারপর রাধারাণীকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া—নিকটের দালানের উপর শোয়াইয়া তিনজনেই সেই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় আরও ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর আবার সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সে এতক্ষণ বাহিরেই অদূরে আত্মগোপন করিয়াছিল। লক্ষীকে রাখিয়াই রাধারাণীর জন্য সে পুনরায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল রাধারাণীকেও উদ্ধার করা চাই। না হইলে নটবর মিত্র তাহাকে সুকৃতির মত খুন করিবে। কিন্তু ভয়ে সে এ বাড়ীতে পুনরায় প্রবেশ করে নাই। তখন সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। যদি উহাদের কেহ আবার ফিরিয়া আসে। একঘণ্টার ভিতর কেহ ফিরিল না দেখিয়া সে সন্তর্পণে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

এ পথ ও পথ ঘুরিয়া সে ঠিক অংশে গিয়া অচৈতন্য মৃতপ্রায় রাধারাণীকে দেখিতে পাইল। প্রথমটা তাহারও ভয় হইল, বুঝিবা মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সুকৃতিকে এইরূপে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি কলতলা হইতে জল আনিয়া সে যেমন সুকৃতির চিকিৎসা করিয়াছিল, সেইরূপই করিল। অনেক করিয়া শেষে রাধারাণীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের ধারা পুনরায় সচল হইল। শঙ্কর আনন্দিত হইল। এই মেয়েটির সহিত তাহার প্রথম আলাপ হইতেই একটা অবোধ্য সদ্ভাব ঘটিয়াছিল। ইহাকে বুঝিতে না পারিলেও, শঙ্করের ইহার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল।

রাধারাণী চোখ খুলিয়া শব্দ করিল, "উঃ! মাগো!"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি উঠ্‌তে পারবে?"

রাধারাণী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাথা নাড়িল।

শঙ্কর তাহার কাপড়ের অংশ আবার জলে ভিজাইয়া রাধারাণীর মাথাতে বেশ করিয়া পটি বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "আমি এখনই আস্‌ছি!"

সে ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল। গলির পথে দুই একবার ঘুরিতে হইল বলিয়া বিরক্ত হইল।

বাহির হইয়া সে একখানি গাড়ী ভাড়া করিল। তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া রাধারাণীকে ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "ওঠ! চল গো!"

রাধারাণীকে কোনও মতে সে টানিয়া, ধরিয়া আনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া পুনরায় ভট্‌চাজের বাসাতে উপস্থিত হইল। ভট্‌চাজও বিস্মিত হইল; লক্ষী দেখিয়া আনন্দিত হইল। শঙ্কর যে এত কাজের হইয়াছে—এমন সাহসী, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই কখনও। যখন সমস্তই তাহার করা হইল, তখন শঙ্করের মনে পড়িল সে বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল—প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে।

সুকৃতি অপেক্ষা করিতেছে ইহা ভাবিয়া তাহার মনের সমস্ত প্রসন্নতা দূর হইল। সে লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী, তোমরা থাক এইখানে। আমি এখানে আবার আস্‌বো।"

ভট্‌চাজ বাধা দিয়া বলিল, "উঁহু! মিত্তিরজা জান্‌তে পার্‌লে আস্ত রাখ্‌বে না। ও কাজ কর না। মিত্তির বড় সোজা নয়।"

কিন্তু ভট্‌চাজের সুপ্রশস্ত কপাল ও মুখে একটা আনন্দের আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্মীও নিষেধ করিল, "না, শেষে আবার কি ঘট্‌বে!"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া বিরক্তভাবে কহিল, "কিন্তু সুকৃতি যে বসে আছে।" লক্ষ্মী ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই শঙ্কর চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—নটবরের অস্বস্তি

নটবরের মনস্তাপের অন্ত রহিল না। শেষে তাঁহার মত প্রখরবুদ্ধির লোক বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন, গ্রাম্য শঙ্করের কাছে হার মানিবে? এ ত সম্ভব নহে। এ তাঁর নিজেরই বুদ্ধির দোষ। শঙ্করকে ভট্‌চাজের বাড়ীতে না লইয়া গেলে এত বিপদ ঘটিত না। এত হাঙ্গামও ঘটিত না। যাহাই হউক সে লক্ষ্মীকে লইয়া যাইবে কোথায়? এক ত্রিশবিঘা—তা নটবরের হাত ত্রিশবিঘা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। লক্ষ্মীকে চাই।

নটবর আবার তাঁর ঘরে বসিয়াই ফোন ধরিলেন, ফোনে কাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া শঙ্করের উপর লক্ষ্য রাখিবার ও সন্ধান করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন, এমন সময়ে কুমারটুলির বাড়ীর সেই তিনজন লোক আসিয়া দর্শনপ্রার্থী হইল।

এই ঘটনা এতই অস্বাভাবিক যে নটবর প্রথমটা বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভাবিলেন হয় ত ইহারা ভট্‌চাজ—কি লক্ষ্মীর খবর আনিয়াছে। তাই নীচে দেখা করিতে গেলেন।

লোক তিনটির একজন বলিল, "বাবু, খুনের কি হবে?" নটবর জবাব দিলেন, "আমি কি জানি? এখানে এসেছ কি কর্‌তে?"

সেই ব্যক্তি কহিল, "এসেছি জান্‌তে কি কর্‌া হবে?"

নটবর বলিলেন, "বটে? তা আমার কাছে কেন? খুন হোয়ে থাকে—তা'র ব্যবস্থাও হবে। তোমাদের মাথাব্যথা কিসের?"

লোকটি বলিল, "কিছু না। তবে পুলিসের মাথাব্যথা হতে পারে। তখন আমরাও মারা যাবো। এই হুজুর।"

নটবর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্যি মরেছে? ঠিক্?"

লোকটি উত্তর দিল, "বেবাক্!" নটবর কহিলেন, "বেশ, টাকা পৌঁছে যাবে। সবাই ২০০৲ টাকা পাবে। কিন্তু এখানে কাকেও আস্‌তে হবে না। ওবাড়ীতেও যেতে হবে না। বাড়ী ভাঙ্গার ব্যবস্থা কর্‌ছি আমি।"

লোক তিনটি সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। নটবর আবার ফোন ধরিলেন—কি সব কথাবার্ত্তা কহিলেন। সম্ভব সমস্তই মনোমত ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু সমস্তই যেন আবার নূতন করিয়া সুরু করিতে হইতেছে—ভাবিয়া নটবরের শান্তি রহিল না। হস্তগতা লক্ষ্মীকে হারাইয়া তাঁহার জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন অপেক্ষা করাও যেন সাধ্যাতীত হইল।

মনে মনে চিন্তা করিয়া সন্দেহ করিলেন, শঙ্কর লক্ষ্মীকে লইয়া তাঁহারই পুরাতন কাঁটাপুকুরের বাড়ীতেও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে।

সন্দেহ হইবামাত্র তিনি প্রস্তুত হইয়া তখনই তাহা ভঙ্গ করিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গৃহে থাকা অসহ্য হইতেছিল বলিয়া নিজেই গেলেন—স্বাভাবিক অবস্থা হইলে অন্য কাহাকেও ভার দিতেন। বুদ্ধিমান মিত্রজা চিরকালই জানিতেন, নিজের হাতে কোনও কুকাজ করার চাইতে—পয়সা দিয়া অন্যকে দিয়া তাহা করানই লাভের। নিজেকে সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত রাখার চেয়ে নিরাপদ কাজ আর কিছুই নাই। কিন্তু মানুষের মনের আবেগ বাড়িলে, বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তি পরিম্লান হয়।

পথে তিনি গাড়ী ব্যতীত বড় চলিতেন না। সাবধানের মার নাই। অবশ্য তাঁহার জানত কোনও শত্রুই তাঁহার নাই। তবু বলা যায় কি? জীবনের পিছন দিকে চাহিলে তাঁহার মনটা সঙ্কুচিত হইত যে তাহা নহে, তবুও তাহার ভিতর ভয়ের বস্তু অনেক ছিল। সোজা সরল পথে তিনি কখনও চলেন নাই। নির্বুদ্ধিদের জন্যই সরল পথ; বুদ্ধিমান সর্ব্বত্রই আপনার হিসাবমত, উদ্দেশ্যমত পথ কাটিয়া লন।

নটবর মিত্রও তাহাই করিয়াছিলেন। সে পথের শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—তাঁহার অভীপ্সা পূর্ণ হইলেও, তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত এখনও হইতে পারেন নাই। রাধারাণী যদি মরিয়া থাকে—যদি কেন, সে ত নিঃসন্দেহে মরিয়াছে—দুদিন ঐ বাড়ীতে "ভাড়া দেওয়া যাইবে"—লিখিয়া নোটিশ দিবার পরই, বাড়ী ভাঙ্গিতে সুরু করিবেন—তখন কাহার মৃতদেহ কে জানিবে?—তাহা হইলে নিশ্চিন্ততার কথা। পাগল হইলেও তাহাকে রাখা একটা বোঝা হইয়াছিল। বাড়ীখানি ভাঙ্গিলে—উহার ভিতরের এত বুদ্ধিপূর্ব্বক নিৰ্ম্মিত গোলক-ধাঁধাও যাইবে। এক বাকী—ভট্‌চাজ। নটবর ভাবিলেন, পথে আজ প্রথম পদব্রজে চলিতে চলিতে ভাবিলেন—ভট্‌চাজ হঠাৎ এমন অন্তর্হিত হইল কোথায়? সেই আধ্‌পাগলাকে ভয় অবশ্য নাই, ধনী প্রতিপত্তিশালী নটবরের বিপক্ষে আধপাগ্‌লা ভট্‌চাজের কোনও কথাই কেহ বিশ্বাস করিবে না—একথা নিশ্চিত—তবু সে গেল কোথায়? এতদিন নটবর তাহাকে এমন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে ভট্‌চাজ নটবরকে যমের মত ভয় করিত—সেই ভট্‌চাজ হঠাৎ সমস্ত ভয় বিসর্জ্জন দিয়া পলাইল কোথায়? শেষে গঙ্গাতে গিয়া ডুবিয়া মরে নাই ত? নটবর ভাবিলেন, ইহাও সম্ভব। পাগলের কথা কে বলিতে পারে? তা যদি হয় তবে তিনি নিশ্চিন্ত—একেবারে। তাঁর পূর্ব্ব-সংসারও আর নাই—সমস্ত বোঝা ও বন্ধন গিয়েছে। একবার তাঁর নিজের পুত্রদের কথা স্মরণ হইল। তখনই তাঁর মুখে হাসি দেখা দিল। পুত্র? কন্যা? "কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ!" ওঃ! না জেনে এই শাস্ত্রওয়ালারা কি জ্ঞানের কথাই লিখে গেছে। নটবর মিত্তির যদি ইচ্ছা কর্‌তো, তবে জ্ঞানে বুদ্ধিতে এই সব শাস্ত্রওয়ালাদের সমকক্ষ হত। পুত্র? পুত্র না বোম্বেটে? একদিন নটবরকে নিজে এই পুত্রদের পুলিসে দিতে হত, না হয় কোথাও গুমখুন করাতে হত। তাঁর টাকা নেবার জন্য সব একেবারে হন্যে হয়ে আছে—এরা আবার ছেলে? আর ছেলেই বাপের পরম শত্রু। ও বাড়্‌তে দেওয়া কিছু নয়। নটবর যে কখনও পুত্রদের কোনরূপ প্রশ্রয় দেন নাই—তাহাতে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।

এক চিন্তা এখন লক্ষ্মী ও শঙ্করকে লইয়া। লক্ষ্মীকে চাই। এই বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গ অবস্থাতে লক্ষ্মীর মত স্ত্রী লাভ করা একটা মস্ত সুবিধা। ভোগ ত জীবনে নটবর কখনও করেন নাই; বিনা ভোগে জীবন কেটেছে। এখন আর ভোগ উপেক্ষা করা চলে না। আর লক্ষ্মীকে যেদিন পাওয়া যাবে পুনরায় হাতে, সেই দিনই শঙ্করেরও একটা ব্যবস্থা হবে। শঙ্করের কথা মনে হইতেই নটবরের মুখে ভ্রুকুটি আসিল, হস্তদ্বয় আপনা হইতেই মুষ্টিবদ্ধ করিল। যদি সেই দিগ্বিজয় ছোকরা মানুষ হত, তবে ত এতদিনে শঙ্করের ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু সেটা একেবারে অপদার্থ! আবার লক্ষ্মীকে চায় বিবাহ করিতে? যে শত্রুকে ধ্বংস কর্‌তে পারে না, তাহার কপালে কখনও স্ত্রীধন লাভ ঘট্‌তে পারে? তাহার কখনও সৌভাগ্য ঘট্‌বে, না কিছু হবে? এই সব যুবকগুলার মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই। সেই ছোকরার চেয়ে এক হিসাবে শঙ্কর ভাল। এই সমস্ত কথা চিন্তা করিতে করিতে নটবর আপনার পূর্ব্ব-গৃহের গলির মোড়ে আসিয়াছেন এমন সময় ঠিক তাহার সম্মুখে দেখিলেন যে শঙ্কর ও পাড়ার সেই ডাক্তার। শঙ্কর নটবরকে দেখিয়াই ডাক্তারকে বলিল, "ঐ ইনিই নটবর মিত্র!"

নটবর সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া দেখিলেন। ডাক্তারও তাহাকে দেখিতে পাইয়া বেশ করিয়া তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তা'রপর প্রশ্ন করিলেন, "আপনিই—তুমিই নটবর মিত্র?"

নটবর উত্তর না দিয়া অগ্রসর হইলেন।

ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন, "আগে যাচ্ছেন, কোথায়? শুনুন, একটা কথা আছে।"

নটবর বিরক্তভাবে কহিলেন, "পাগলের সঙ্গে কথা কইবার সময় নাই আমার! আপনি ডাক্তার—ব্যবসাতে লেগে থাকুন। অনধিকার চর্চ্চা কর্‌বেন না।"

ডাক্তার যুবক না হইলেও, বৃদ্ধ নহেন। সুন্দর, সরল, ব্যক্তি। কিন্তু বড় জেদী লোক। বলিলেন, "বটে, আচ্ছা, যান্ তবে। কিন্তু ফির্‌তেই হবে। এ পথ বেশীদূর যায় নি।"

নটবর আরও অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, শঙ্কর ও ডাক্তার—একত্র ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিল।

নটবর দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন। এই অর্ব্বাচীন শঙ্কর হইতেই শেষে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে নাকি? উহাকে অবিলম্বে সরান চাই, নচেৎ ত কিছুতেই তিনি নিরাপদ

নহেন। তিনি আর আপনার পুরাতন গৃহেও গেলেন না, অন্যদিক দিয়া আপনার নূতন বাসাতে ফিরিলেন, তখনই আবার কিছুকাল ফোন ধরিলেন; নানা উপদেশ আদেশ দিলেন। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তামাকু সেবনে মন দিলেন।

দুনিয়াতে বুদ্ধিমান লোকের ভয় বুদ্ধিমানকে নহে—বুদ্ধিহীনকে। নটবর তাহা জানিতেন। অর্ব্বাচীন শঙ্কর অবাধে সকলের কাছে নটবরের কার্য্যকলাপের পরিচয় দিবে—তখন কি ঘটিতে পারে বলা যায় কি? নটবরের মনের স্বস্তি একেবারে গেল। রাধারাণীর মৃতদেহ কুমারটুলির বাড়ী হইতে সরান চাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মের কল নড়িল

শঙ্কর সুকৃতিকে দেখিতে যাইবে বলিয়া লক্ষ্মীর কাছ হইতে আসিতেছিল, পথে ডাক্তারকে দেখিয়া তাহার মনে হইল যে রাধারাণীকেও একবার ডাক্তার দিয়া দেখান উচিত, যদি শেষে আবার বিপদ হয়।

সে ডাক্তারকে গিয়া সব কথা শুনাইল। কোনও কথাই গোপন করার তাহার প্রয়োজনও ছিল না, স্বভাবও তাহার ছিল না।

ডাক্তার শুনিয়া বিষম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নটবর মিত্রের কার্য্যকলাপ একবার তিনি দেখিয়াছেন—সুকৃতি মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছে—আবার এ কি? তাঁহার সন্দেহ হইল, নটবর—নটবরই। উহার অভিনয়ের আর শেষ নাই।

তিনি তখনই রাধারাণীকে দেখিতে গেলেন। ইন্‌জেকসন্ দিয়া ঔষধপত্র দিয়া আরও তথ্য লইতে শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহের সম্মুখে নটবরের সহিত সাক্ষাতও ঘটিয়া গেল। নটবর তাঁহাকে অপমান করিয়া যাইবার পর—ডাক্তার আপনগৃহে প্রবেশ করিয়া একজন কম্পাউণ্ডারকে বলিলেন, "ললিত, ঐ লোকটার পিছু নিয়ে গিয়ে দেখে এস—ও কি করে ও কোথায় যায়! খুব সাবধানে। ও বড় ঘাগী লোক কিন্তু। চেহারা দেখ্‌ছো না।" ললিত চলিয়া গেল, তারপর ডাক্তার শঙ্করকে আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—রাধারাণী কে? ভট্‌চাজ কে? শঙ্কর উত্তর দিয়া যাহা জানাইল তাহার সমস্তটা ডাক্তার বুঝিতে না পারিলেও—বলিলেন, "তুমি ছোক্‌রা সাবধানে থেক। তোমাকে মিত্তির ছাড়্‌বে না। বিশেষ রাস্তা-ঘাটে বেরিয়ো না। এসব লোক সব করতে পারে।"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "এখন যাবে কোথায়?" শঙ্কর বলিল, "ঐ বাড়ীতেই যাব—সুকৃতিকে দেখ্‌তে। সকালে বেরিয়েছি সেই।" ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সেজন্যে ভাবতে হবে না। আমি এখনই লোক পাঠিয়ে খোঁজ নেব। তুমি সোজা যাও—ভট্‌চাজের বাসাতে, আর দু'চার দিন চুপ করে ঘরে বসে থেক!"

শঙ্কর অস্বীকৃত হইল। সুকৃতি তাহাকে না দেখিয়া এতক্ষণে কি করিতেছে, কে জানে?

ইতিমধ্যে ললিত আসিয়া নটবরের গতিবিধির খবর দিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, তোমার হেঁটে যেয়ে কাজ নেই হে। গাড়ীতেই যাবে।" তিনি ফোন করিয়া ট্যাক্সি আনাইলেন ও শঙ্করকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে ভট্‌চাজের বাড়ীতেই নামাইয়া দিলেন। শঙ্করকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যেন সে বাহিরে না যায়।

শঙ্কর বিপদে পড়িল। সুকৃতির স্বভাব ও মেজাজের কথা ভাবিয়া তাহার ভয়ের ও উদ্বেগের অন্ত রহিল না। অথচ উপকারী ডাক্তার বাবুর আদেশও অমান্য করা যায় না। এই বন্ধুবান্ধবহীন কলিকাতাতে ডাক্তারবাবুই একমাত্র সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সারা রাত্রি সে ছট্‌ফট করিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উঠানে শুইয়া ভট্‌চাজের সঙ্গে কথা কহিয়া কাটাইল। ভট্‌চাজের নিদ্রার জোর ছিল। তাই সমস্ত কথার ফাঁকে ঘুমাইয়া লইল। শঙ্করের আদৌ ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে সে দেখিল, রাধারাণী অনেকটা সুস্থ। লক্ষ্মীর সেবার গুণ আছে। একটু পরে ডাক্তারবাবু আসিয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রাধারাণীকে ও লক্ষ্মীকে নটবর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মী সব বলিল। রাধারাণীর নিকট হইতে সব সংবাদ পাওয়া গেল না। তবু যা পাওয়া গেল, তাহাতে তিনি মুখ গম্ভীর করিলেন। তা'রপর ভট্‌চাজকে জেরা করিলেন।

ভট্‌চাজ ভীত হইয়া বলিল, "আমাকে বল্লে মিত্তিরজা, কুসুমের টাকা ছিল, বল্‌লে নাম নকল কর্‌তে, করে দিলুম; রাধারাণীর টাকা ছিল, বল্লে, নাম নকল কর—করলুম। আমি কি জান্‌তুম, নকল করা মানে জাল?" তা'র পর একটু সুর নীচু করিয়া বলিল, "সাহেবরাও জানে না। মিত্তিরজার অনেক টাকা—অনেক বিষ। কুসুমকে দিয়েছে—রাধারাণীকে দিয়েছে।"

সব শুনিয়া ডাক্তারবাবু লক্ষীকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী ভাবিয়া বলিলেন, "সব বুঝেছি। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। নটবর মিত্তির বড় চালাক—কিন্তু পাপ চাপা থাকে না। ঐ ভট্‌চাজই ধর্ম্মের কল।"

শঙ্কর ভট্‌চাজের দিকে চাহিয়া দেখিল, ভট্‌চাজ কবে কি উপায়ে ধর্ম্মের কলে পরিণত হইয়া গেল। ডাক্তার লক্ষীকে বলিলেন, "ভয় নেই—রাধারাণী সম্ভব ভাল হয়েও উঠ্‌তে পারে। ওকে যে বিষ দিয়ে পাগল করেছে—তা'র প্রতিষেধকও আছে। তবে একেবারে ঠিক বল্‌তে পারি না। আপাতত থানাতে খবর দিতে হবে। তাই ভাব্‌ছি।"

তখনকার মত ডাক্তার প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। শঙ্কর কাতরভাবে বলিল, "ডাক্তারবাবু, আমি একবার ওবাড়ী যাই, সুকৃতির কাছে।"

ডাক্তার কি ভাবিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে গাড়ীতে এস। তোমাকে ওবাড়ীর দরজাতে নামিয়ে দেব। তার পর দরজার কাছে কাকেও দাঁড় করিয়ে দেব—যাতে কেউ না ভিতরে যায়।"

শঙ্কর তাহাতেই সম্মত হইয়া চলিল। লক্ষী বাধা দিতে বা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিলেও, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কাতে বিচলিত হইল।

উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ—অপরাধ কার?

সুকৃতি যখন দেখিল যে এক ঘণ্টার ভিতরেও শঙ্কর ফিরিল না, তখন তাহার ভয় হইল, শঙ্কর পলাইয়াছে।

এই শীর্ণ, জীর্ণ বালিকাটির—তাহাকে দেখিলে বালিকাই মনে হইত—মনের ভিতর শঙ্কর যে কিরূপে ও কতটা গভীররূপে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, তাহা সে কাহাকেও বুঝাইতে পারিত না।

শঙ্কর পলাইয়াছে—এই চিন্তাতে সে অধীর হইল তাহার ক্রোধের, অভিমানের পরিসীমা রহিল না। শেষে পলাইল?—তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল? কোথায় গেল—নিশ্চয়ই সেই লক্ষীর কাছে। সুকৃতির মনে হইল যে পারিলে এখনই যাইয়া লক্ষীর মাথা খাইত। কিন্তু সে নিজে তখন অশক্তা! তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরুপায় হইয়া আপন মনে গর্জ্জাইতে লাগিল। প্রকৃতি আসিয়া জানাইল, রন্ধনের ব্যবস্থা হইল না। সুকৃতি কোনমতে তাহাকে বিদায় করিল। কান্তমণি উঠিলেন না, কোনও সংবাদও লইলেন না; সংসারের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য গভীর হইয়াছিল। নটবর সুকৃতিকে ঐরূপ সাংঘাতিক আঘাত করিয়া চলিয়া যাইবার পর তাঁহার আর মৃত্যু ব্যতীত কিছুই শ্রেয়ঃ মনে হইত না। সারা বাড়ী অভিশপ্ত গৃহের মত রহিল। প্রকৃতি লুকাইয়া কাঁদিল।

দিন গিয়া সন্ধ্যা হইল; সুকৃতির আর সন্দেহ রহিল না যে শঙ্কর তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। এই ভয়ই তাহার ছিল যে সে ভাল হইলেই শঙ্কর আর তাহাকে চাহিবে না। তাই সে ভাল হইতেই চাহে নাই। এখন কেন সে ভাল হইল, সারিয়া উঠিল, ইহাই হইল তার অনুতাপ।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ডাক্তার বাবুর বাড়ীর এক ভৃত্য আসিল সংবাদ লইতে। ডাকিয়া সে প্রথমে কাহারও সাড়া পাইল না। শেষে সুকৃতি শঙ্করের কুঠ্‌রির দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" ভৃত্য জানাইল, যে ডাক্তারবাবু পাঠাইয়াছেন, যদি কোনও প্রয়োজন থাকে। সুকৃতি ভাবিয়া পাইল না কেন হঠাৎ ডাক্তারবাবু লোক পাঠাইলেন। সে প্রশ্ন করিল, "এ বাড়ীর বাবু কি ডাক্তার বাবুর কাছে গিছ্‌লেন?" ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে, হাঁ, গিছ্‌লেন!"

সুকৃতি জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাবু কোথায়?" ভৃত্য তাহা বলিতে পারিল না। সুকৃতি কিছুকাল দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ আর কিছু চাই না। কাল সকালে একবার এস। আর পার ত' ডাক্তার বাবুকেও ডেকে দিয়ে একবার—বল বিশেষ দরকার!" ভৃত্য চলিয়া গেল।

সুকৃতির কাছে ইহা ভীষণ প্রহেলিকা মনে হইল শঙ্কর পাড়াতে আসিয়াছে—ডাক্তারের কাছে গিয়াছে—

অথচ তাহার কাছে ফিরে নাই, ইহার কারণ কি? কিন্তু ভাবিয়া সে ইহার কোনও রকম সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না দেখিয়া সে ক্লান্ত হইয়া গিয়া শুইল। প্রকৃতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, কি খাবে?" সুকৃতি জবাব দিল, "ছাই!" প্রকৃতি ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

সুকৃতি একটু চুপ করিয়া বলিল, "তুই যা হয় করে খেয়ে নিগে যা, আমার কিছু খাবার ইচ্ছে নেই।" প্রকৃতি প্রস্থান করিল।

সারা রাত্রি সুকৃতি ঘুমাইতে পারিল না। সে কেবল মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—জগতের সমস্ত দেবতার কাছে, "হে ঠাকুর, ফিরিয়ে এনে দাও, ফিরিয়ে এনে দাও। আমাকে প্রতারণা করো না—আমি তা হলে বাঁচবো না।" তাহার মানসিক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যে সে নিজের ক্ষতপূর্ণ মস্তকের কথা ভুলিয়া গিয়া বার বার মেঝেয় মাথা ঠুকিতে লাগিল। প্রকৃতির ঘুম ভাঙ্গিয়া সে উঠিয়া দেখিয়া ভীত হইল। একবার বলিল, "এ কি করছো, দিদি? ফের যে মাথা ফেটে যাবে। তোমার ঘা যে এখনও শুকোয় নি।" সুকৃতি তাহাকে ধমক দিল, "তুই শুয়ে থাক্!" তা'র পর আবার মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে গোঙাইতে লাগিল, "বেঁচে কি হবে? আমি বাঁচতে চাই না, বাঁচতে চাই না!" নির্জ্জন বাড়ীর ভিতর, অন্ধকারে, তাহার সেই গোঙানিতে সমস্ত স্থানটি পূর্ণ হইল। এমন কি ক্ষান্তমণিরও গভীর অনুভবলেশহীন মনটাতে যেন একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। তিনি কাণ পাতিয়া শুনিয়া শুধু বলিলেন, "হতভাগী, কেন আমার পেটে এসেছিলি?" অতিষ্ঠ হইয়া বসিয়া—দেখিয়া দেখিয়া—কাঁদিয়া প্রকৃতি শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইলে প্রকৃতি উঠিয়া দেখিল, সুকৃতির ক্ষতগুলি পুনরায় ফুলিয়া গিয়াছে, রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁস হইয়া সে শুইয়া রহিয়াছে। সে আতঙ্কে ডাকিল, "দিদি!" কিন্তু কোনও জবাব পাইল না। সে ক্ষান্তমণিকে গিয়া সংবাদ দিল, ক্ষান্তমণি ভাবহীন অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিলেন। কিছু বলিলেন না। প্রকৃতি ছুটিয়া আপনিই বাহির হইয়া ডাক্তার বাবুর বাড়ী গিয়া ডাক্তারকে ডাকিল। ডাক্তার সব কথা শুনিয়া নিরতিশয় বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ আসিলেন। ঔষধপত্র দিয়া কিন্তু তিনি এইবার একেবারে নিরাশ হইলেন। নিজে গিয়া অবিলম্বে শঙ্করকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আনিলেন।

শঙ্কর অস্থির হইয়া ছিল। গতকল্য সারাদিনই তাহার মনে হইতেছিল যে সুকৃতি তাহার আসার পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু সে যখন পৌছিল, সুকৃতির তখন একেবারে হুঁস্ নাই। শঙ্করের বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। প্রকৃতির কাছে সব শুনিয়া সে স্থির করিল, সুকৃতির মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। সুকৃতিকে তাহার এমন করিয়া মরিতে দেওয়া উচিত হয় নাই। সে অনুতপ্ত হইয়া তাহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

ক্রমে সুকৃতির অবস্থা আরও খারাপ হইল। ডাক্তার বাবু পুনরায় আসিয়া অবস্থা দেখিয়া থানাতে রিপোর্ট করিলেন। থানা হইতে ইনস্পেক্টর আসিয়া তদন্ত করিয়া গেলেন, ডাক্তার ও শঙ্করের সাক্ষ্য লইলেন। তিনি চলিয়া গেলে, শঙ্কর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু, সুকৃতি তবে বাঁচবে না?" ডাক্তার হতাশভাবে মাথা নাড়িলেন।

শঙ্কর সুকৃতির কাছে গিয়া বলিল, "সুকৃতি, বাঁচো, তুমি ভাল হোয়ে ওঠ—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব না আর, তুমি ভাল হও!"

সুকৃতি হয়'ত শুনিল। তাহার মুখের উপর ওষ্ঠাধরে একটুখানি হাসি ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা তাহার অচৈতন্য অবস্থাতেই।

শঙ্কর পুনরায় বলিল, "বাঁচো, সুকৃতি, এমন করে যেওনা। আমার দোষ হয়েছে।" কিন্তু সুকৃতি শুনিল না।

শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে সরকারী ডাক্তারের সহিত ডাক্তার বাবু আসিলেন। সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিলেন—নটবরের বিরুদ্ধেই দিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর সুকৃতি চক্ষু উন্মীলন করিল, ইতস্তত চাহিয়া শঙ্করের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। শঙ্কর কহিল, "সুকৃতি—আমি এসেছি—আমাকে ক্ষমা করো।" সুকৃতি একবার কি বলিতে গেল, তাহার ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইল। শঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি আর যাবো না, এবারকার মত ক্ষমা কর!" সুকৃতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল মাত্র। তারপর সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ক্রমে সব শেষ হইয়া গেল। সুকৃতি আপনার কথা রক্ষা করিল। শঙ্কর

কাঁদিয়া কাটিয়া বলিল, "এর জন্য দোষ আমারই ডাক্তার-বাবু! কেন আমি সময়ে ফিরি নি। ও যে বলেই ছিল যে মাথা খুঁড়ে মরবে!" ডাক্তারবাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "এ তোমার দোষ নয়। বাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মেয়ে কর্‌লে। তা ছাড়া আমিই তোমাকে ধরে রেখেছিলুম, আস্‌তে দিই নি। দোষ আমারও, শঙ্কর।" কিন্তু বিধাতা—যিনি সব দেখিতেছেন ও করিতেছেন—কেবল তিনিই বলিতে পারেন, কার দোষ।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নটবর প্রতি মুহূর্ত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন যে তাঁর লোকরা আসিয়া লক্ষ্মী ও শঙ্করের খবর দিবে। সারা রাত্রে তিনি তিনবার ফোন করিয়াও কোনও খবর পাইলেন না। কলিকাতার দুই চারিটি বিখ্যাত গুণ্ডার দল তাঁহার কাছে অর্থ লইয়া কাজ করিত। রাত্রের মধ্যে সংবাদ না পাইয়া অস্থির হইলেন।

প্রভাতে ফোনে কে তাঁহাকে ডাকিল। তিনি তন্দ্রামগ্ন ছিলেন, তখনই উঠিয়া ফোন ধরিতেই শুনিলেন, যে রাধারাণীর মৃতদেহ কুমারটুলির বাড়ীতে নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একটু ভীতও হইলেন। ঐ বাড়ী হইতে বাহিরের কোন ব্যক্তিই রাধারাণীর মৃতদেহ লইয়া যাইতে পারে না। সম্ভব সেই ভৃত্য তিনটিই পরামর্শ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি ফোন করিয়া সন্ধান করিয়া কিন্তু জানিলেন, যে তাহারা মৃতদেহ লওয়া ত দুরের কথা, সে বাড়ীর দিকেও আর যায় নাই। নটবর এইবার সত্যই ভীত হইলেন। সে বাড়ীর সংবাদ জানে এক ভট্‌চাজ—অন্য এক শঙ্কর। তিনি আদেশ করিলেন, যে উপায়েই হোক্, যত-টাকা লাগে, এই দুই ব্যক্তিকে হাত করা চাই—দরকার হইলেই হত্যাও।

আদেশ দিয়া নটবর আপনার দৈনিক কার্য্যকলাপে মন দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন কিছুতেই দিতে পারলেন না। প্রত্যেক ঘণ্টাতে ফোন করিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন, কি হইল। অবশেষে বেলা ১০টা নাগাদ খবর পাইলেন যে শঙ্কর ও ডাক্তার তাঁর পূর্ব্বকার বাড়ীতে গিয়াছে, কিন্তু সুযোগ না পাওয়াতে তাঁর লোক কিছুই করিতে পারে নাই। নটবর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আদেশ দিলেন, "সুযোগ করা চাই-ই!"

তারপর সারাদিন তিনি নূতন সংবাদের প্রতীক্ষাতে অস্থির হইয়া কাটাইলেন। দিন গিয়া সন্ধ্যা হইতে চলিল, তবুও সংবাদ পাইলেন না। তাঁর ধৈর্য্যরক্ষা করা আর দায় হইল। সমস্ত লোকই কি অকর্ম্মণ্য? একটা সামান্য গ্রাম্য ছোকরাকে কি কেহই সরাইতে পারে না! আশ্চর্য্য! নটবর স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিবেন। তিনি প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে একজন কে নীচে তাঁহাকে ডাকিল। কাহাকেও তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন না, সুতরাং বিস্মিত হইয়া নীচে নামিলেন। নামিতেই তিনি দেখিলেন, চার-পাঁচজন সিপাহী ও একজন ভদ্রলোক, সম্ভব থানার ইনস্‌পেক্টর। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

ইনস্‌পেক্টরের ইঙ্গিতে সিপাহীরা প্রথমেই তাঁহার হাতে হাতকড়ি লাগাইল।

নটবর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এ সবের মানে কি? কি চার্জ্জ?" ইন্সপেক্টার হাসিয়া বলিলেন—"সবই শুন্‌তে পাবেন মশায়। বিনা বিচারে ত আর আপনাকে ফাঁসীতে লট্‌কান হবে না। তখন দুর্ভাবনা কিসের?"

তারপর তিনি থানাতল্লাসির আদেশ দিলেন। বাড়ীর সমস্ত পুলিসের লোক উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সন্ধান করিতে লাগিল। এমন সময়ে নটবরের ঘরের ফোনে ডাক পড়িল। ইনস্‌পেক্টর স্বয়ং ফোন ধরিলেন, শুনিলেন কে বলিতেছে, "সুবিধে হল না, সারাদিন শা-পুলিসের ভিড়, মশায়! ব্যাপার কি বুঝতে পারা গেল না। পালান, গতিক ভাল নয়!" ইনস্‌পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শা-পুলিস জাহান্নমে যাক্! তুমি কে ও কোথায়?" লোকটি জানাইল সে সারাদিনই শঙ্করের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এই মাত্র আড্ডায় ফিরিয়াছে, আজ কিছু হইল না, কাল সব কাজ ফর্সা হবে। ইনস্‌পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা।" তা'রপর নটবরকে বলিলেন, "চলুন, মশায়! কাল কাজ ফর্সা হবে! এখন নির্ভাবনাতে চলুন। আপনার এতদিনে সব ফর্সা হয়েছে। লক্ষ্মীর ঘর ছেড়ে শ্রীঘরে চলুন, একই কথা! এতে আপনার মতদ্বৈধ করার কোনও হেতু নেই।"

নটবরের অসামান্য চাতুরী তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না। এত বুদ্ধি করিয়া যে ভাগ্য-সৌধ গড়িয়াছিলেন, ঘটনাচক্র বিনা-বুদ্ধির যন্ত্র দিয়া তাহা ধূলিসাৎ করিল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নটবর ধরা পড়িয়াছে—তাহা জানিতে তাঁহার অনুচর-বর্গের বেশী দেরী হইল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনাদের জন্য চিন্তিত হইয়া সরিয়া পড়িল। ডাক্তার তখন ইনস্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া নটবরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। চার দফা অভিযোগ নটবরের বিরুদ্ধে হইল—প্রথম রাধারাণীকে বিষপ্রয়োগ; দ্বিতীয় সুকৃতিকে গুরুতর আঘাত করা; তৃতীয় রাধারাণীকে গুরুতর আঘাত করা; চতুর্থ লক্ষ্মীকে অন্যায়ভাবে বদ্‌মতলবে আটক করা। সবগুলিই প্রায় প্রমাণিত হইল—রাধারাণী ও ভট্‌চাজ যাহা সাক্ষ্য দিল, মুখুয্যেমশায়ের নিকটস্থ দলিলে তাহার সমর্থন হইল। অন্যান্য অভিযোগে যথেষ্ট সাক্ষী ছিল। আদালতে জেরায় যে খবর প্রকাশ পাইল তাহা এই যে নটবর প্রায় দশবছর পূর্ব্বে একটা কি উপলক্ষে রংপুর যায়; তথায় কুসুম ও রাধারাণীকে ভুলাইয়া তাহাদের উভয়কে কলিকাতায় আনে। রাধারাণীকে বিবাহ করারও একটা অভিনয় করিয়াছিল। তারপর ভট্‌চাজকে পাগল ও বোকা পাইয়া তাহাকে দিয়া কুসুম ও রাধারাণীর নাম জাল করাইয়া টাকা আত্মসাৎ করে। ক্রমে কুসুমও রাধারাণীকে সন্দেহ হওয়াতে দুইজনকেই বিষ প্রয়োগ করে। রাধারাণী তাহাতে পাগল হইয়া যায়, কুসুম মরিয়া যায়। ভট্‌চাজকে ফাঁসীর ভয় দেখাইয়া একেবারে হাত করে ও দুইজনকে কুমারটুলির বাড়ীতে আটক রাখে।

বিচারে নটবরের বারবছর জেল হইয়া গেল। জেলে যাইবার সময় সে শাসাইয়া গেল যে ফিরিয়া আসিয়া সে শঙ্করের মুণ্ডপাত করিবে। তাহার টাকাকড়ি যাহা ছিল, তাহার অর্দ্ধেক রাধারাণীর নামে, আর অর্দ্ধেক প্রকৃতির নামে করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পুত্রদের কোনও সংবাদ ছিল না। আর আদালত তাহাদের চরিত্রের কথা শুনিয়া পুত্রদের অধিকার দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না।

রাধারাণী আসিয়া নটবরের কাঁটাপুকুরের বাড়ীতেই উঠিলেন। প্রকৃতি তাহাকে ছোট-মা বলিতে সুরু করিল। ভট্‌চাজও আসিল। সে প্রথমত বিলক্ষণ ভীত হইয়াছিল, কিন্তু ডাক্তারের ভরসাতে আসিল। ক্ষান্তমণি শয্যাগতাই রহিলেন,—যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন কেবল বলিতেন, "আমার কপাল? কেন তোরা হতভাগীর পেটে এসেছিলি ?"

শঙ্কর ও লক্ষ্মী ত্রিশ বিঘাতেই ফিরিয়া গেল। মুখুয্যে-মশায় সাক্ষ্য দিতে কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়া লইয়া গেলেন। যে মিথ্যা বিবাহের জনরব তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই শেষে হইল। লক্ষ্মীর এখনও আশা আছে—তাহার পুত্ররা রায় ও বসু গোষ্ঠীর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে। শঙ্করের কোষ্ঠীতে গ্রহ নক্ষত্ররা যে চক্রান্ত করিয়াছিল লক্ষ্মী তাহা ব্যর্থ করিয়াছে। সে এখন দিনরাত পরিশ্রম করে—রাধারাণী তাহাকে কিছু অর্থ ধার দিয়াছিল তাহা লইয়া সে চাষ করে। শীঘ্রই যে দেনা শুধিবে এমন আশা আছে। শঙ্কর কিছুই করে না—লক্ষ্মী তাহাতেই সুখী। আর সেও শুনিয়াছে যে চাতরার মাসীপুত্র দিগ্বিজয় এখন নাকি মায়ের আদেশে বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘর ও আফিস করিতেছে—এমন কি তাদের আড্ডাতেও যায় না।

সমাপ্ত

স্বর্ণমান ও বিশ্বব্যাপী অর্থ-সঙ্কট

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতেই, বিশেষ কয়েক বৎসর হইতে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা অতিশয় মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই আর্থিক দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। ভারতের অবস্থাও তাই। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য শোচনীয়। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহার কারণ কি? কারণ অনেক আছে। কিন্তু মুদ্রাসঙ্কটজনিত ক্রয়-শক্তির অভাব অনেক দেশের এই অবস্থার যে একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুদ্রাসঙ্কটের ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে পৃথিবীর স্বর্ণমানের ওলট পালটের কথা এবং ভারতের উপর উহার ফলাফল বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান আবশ্যক। ইংলণ্ড এবং ভারতের স্বর্ণমানের বিষয়ে মোটামুটী কিছু আলোচনা করিলে এই জটিল বিষয়টা একটু পরিষ্কার হইতে পারে।

স্বর্ণমান (Gold Standard)

প্রথমত স্বর্ণমান (gold standard) জিনিষটী কি বুঝিয়া দেখিতে হইবে। মূল্যের সমতা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেক দেশই তাহাদের প্রচলিত মুদ্রার মূল্য একটী নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের সহিত স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার জন্য যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত রাখিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্ত্তে আবশ্যকীয় পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশী বাণিজ্যের জন্য আমদানী রপ্তানীর সুবিধার নিমিত্ত পাওয়া গেলেই স্বর্ণমান বজায় থাকিতে পারে। এজন্য সাধারণতঃ তিন প্রকারের স্বর্ণমান চলিয়া থাকে :—

(ক) স্বর্ণমুদ্রামান (Gold Currency Standard) —এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রার দেশে অবাধভাবে প্রচলন (circulation) থাকে এবং স্বর্ণকে মুদ্রারূপে ব্যবহারে কোন বাধা থাকে না। প্রচলিত কাগজের নোট স্বর্ণ-মুদ্রার এবং স্বর্ণমুদ্রা কাগজের নোটের বিনিময়ে যথেচ্ছ-ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং যাঁহাদের স্বর্ণখণ্ড (Gold Bullion) আছে তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণমুদ্রা পাইতে অধিকারী হন।

(খ) স্বর্ণখণ্ডমান (Gold Bullion Standard) —এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের মালিকগণ উহার পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা পাইতে অধিকারী হইতে পারেন না এবং প্রচলিত কাগজের নোটও স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, কিন্তু দেশের গভর্ণমেণ্ট কিম্বা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে নির্দ্দিষ্ট একটি হারে প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকেন। এই প্রথায় দেশে যথার্থ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চালনের কোন আবশ্যকতা থাকে না।

(গ) স্বর্ণবিনিময়-মান (Gold Exchange Standard)—যে সব দেশে স্বর্ণ, পণ্যমূল্যের যথার্থ পরিমাপক হইলেও সঞ্চালনের কিম্বা মুদ্রার জন্য ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই তথায় এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে। ইহাতে দেশে প্রচলিত মুদ্রার পশ্চাতে গভর্ণমেণ্টের তহবিলে স্বর্ণ এবং কোন স্বর্ণমুদ্রামান কিম্বা স্বর্ণখণ্ডমান যুক্ত দেশের বিল, নোট প্রভৃতিতে একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডার (Reserve) থাকে ও নির্দ্দিষ্ট হারে প্রথমোক্ত দেশের মুদ্রার সহিত একটী বিনিময়ের হার শেষোক্ত দেশের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে ইহার যে কোন প্রকারের স্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলেই স্বর্ণ কিম্বা যে সকল সিকিউরিটি সহজেই স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা হইতে পারে তাহার উপযুক্ত পরিমাণ সংরক্ষিত-ভাণ্ডার দেশে রাখিতে হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতে ইহার দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ স্বর্ণখণ্ডমান প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তাহা নাই। সে কথা পরে বলিতেছি।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই যে কোন প্রকারের স্বর্ণমান প্রচলিত থাকার সময় পৃথিবীর মুদ্রা বিনিময় ব্যাপার অনেকটা বাধামুক্ত ছিল, ব্যবসা বাণিজ্যের গতিও তখন

বর্ত্তমানের ন্যায় জটিলতা প্রাপ্ত হয় নাই। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা, আমদানী-রপ্তানী কাটাকাটি হওয়ার পর বাকি অংশ (balance of trade) সাধারণতঃ স্বর্ণ কিম্বা স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তনীয় বিল প্রভৃতি দ্বারা পরিশোধিত হইত। এরূপ অবস্থায় মুদ্রা-বিনিময় অনেক পরিমাণে স্বর্ণ-মানের উপর নির্ভর করায় কোন দেশের পক্ষেই বিশেষ অসুবিধা হইত না। সকল দেশই তাঁহাদের নোটের পশ্চাতে আবশ্যকীয় গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ডার রাখিতেন। দেশে সাধারণ অবস্থায় নোট চলিত ও বিদেশের সহিত কারবারের জন্য আবশ্যকীয় স্বর্ণ দেশে পাওয়া যাইত। কিন্তু বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এই নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা-বিনিময় ব্যাপারে বাধা ঘটাইয়াছে।

মহাযুদ্ধের ফল

মহাযুদ্ধের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পরে অনেক দেশই প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণের সহিত অবিনিমেয় (unconvertible) নোট বাহির করিতে বাধ্য হন এবং স্বর্ণমান পরিত্যাগ করেন। ফলত ঐ সকল দেশ ঐ নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিতে না পারায় বিদেশের সহিত মুদ্রা বিনিময়ে বিষম বিভ্রাট ঘটে। তখন অনেক দেশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদের প্রচলিত মুদ্রাকে স্থায়ী-মান (stabilisation) দিতে চেষ্টা করেন এবং কোন কোন দেশ এই বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হন। এজন্য এই সকল দেশের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষিত-স্বর্ণ-ভাণ্ডারের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীর স্বর্ণ-ভাণ্ডার উপরোল্লিখিত বিনিময় প্রথায় অনেকটা সমপরিমাণে বণ্টিত হইয়া বিভিন্ন দেশ-গুলিকে স্বর্ণমান বজায় রাখিতে সক্ষম করিত, কিন্তু কতকগুলি অসাধারণ কারণে ও কোন কোন দেশের অনুসৃত সাধারণ অননুমোদিত মুদ্রানীতির জন্য উপযুক্ত ভাবে এই স্বর্ণ বিভাগে বাধা ঘটে এবং তাহাতে পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়া ইহাতে সমতা প্রতিষ্ঠার বাধা দেওয়ায় কোন কোন দেশের পক্ষে আবশ্যকীয় সংরক্ষিত স্বর্ণভাণ্ডারের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এরূপ হইবার কারণ ছিল অনেক, কিন্তু মহাযুদ্ধ ক্ষতিপূরণ ও ঋণ-শোধের (reparation and debt-payment) আকারে যে প্রমাদকর উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করিয়া যায়, তাহাতেই যথার্থ অনর্থের কারণ ঘটে। অনেক দেশই এই সময় তাহাদের মুদ্রা-মূল্যের স্থিতি সংরক্ষণ করিয়া পণ্য-মূল্যের সাধারণ স্থায়িত্ব বিধানের জন্য স্বর্ণমানের ইচ্ছা নিরপেক্ষ গতিতে বাধা দিতে থাকেন এবং উপরোক্ত কারণে স্বর্ণমূল্যের ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ও কিয়ৎপরিমাণে যথেষ্ট স্বর্ণের অভাবে "পরিচালিত" (managed) মুদ্রানীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফল-স্বরূপ কোন কোন দেশের স্বর্ণভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেলেও অনেক দেশে আবশ্যকতার অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্ণ জমিয়া যায় এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য একবারে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পতিত হওয়ায় পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা চরমে উপস্থিত হয়। পৃথিবীর এই স্বর্ণা-ভাবের বিষয়ে বিখ্যাত অর্থনৈতিক পণ্ডিত অধ্যাপক গাষ্টাভ ক্যাসেল (Gustav Cassel) তাঁহার রোড্‌স্ মেমোরিয়াল বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"Quite clearly, under modern conditions, the world's gold market can no longer be considered a free market, governed by objective economic forces, in which a definite value of gold emerges automatically. Those who cherish the hope that the world market for gold will gradually return to some such conditions grossly delude themselves. The gold standard of the future will always be a "controlled" or "managed" standard, a standard subject to deliberate influence."

* * * *

"Roughly calculated, an annual production of gold equal to 3 *per cent* of the accumulated stock of gold will be required for the future to ensure that without disturbance of the price level of commodities, the world may advance at a rate of progress corresponding to that of pre-war days—namely, at about 3 *per cent* per annum. The world's gold production today is actually about two-thirds of what we have found to be normally requisite to keep the level of prices constant. The deficiency is so enormous that ordinary

discoveries of new gold mean little towards its repair.

"Experts are unanimous in their opinion that gold production from present sources will sink considerably in the next decade.

*   *   *   *

"A systematic gold economizing policy will therefore be necessary. The present violent crisis is fundamentally the result of the fact that the monetary policy of leading countries has departed from this programme without the slightest regard to the inevitable consequences.

ইহার ভাবার্থ এই যে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় স্বর্ণের বাজারকে পৃথিবীতে আর অবাধ-বাজার বলা চলে না। যাঁহারা মনে করেন ইহা আবার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তাঁহারা বড় একটা ভুল করিতেছেন। মোটামুটী হিসাবে পৃথিবীর বর্ত্তমান মজুত স্বর্ণের উপর বাৎসরিক শতকরা তিন ভাগ অতিরিক্ত স্বর্ণ উৎপন্ন হইলে তবে পৃথিবীর দ্রব্য-মূল্যের বাজারে বিশেষ আবর্ত্তন উপস্থিত না করিয়া পৃথিবী মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের মত গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান উৎপন্ন স্বর্ণের পরিমাণ এজন্য আবশ্যকতার ৩ ভাগের ২ ভাগ মাত্র ; সুতরাং সমস্ত দেশের পক্ষেই স্বর্ণ বিষয়ে অতিশয় মিতব্যয়িতা অবলম্বন আবশ্যক ; কিন্তু পৃথিবীর অনেক প্রধান দেশ তাহাদের মুদ্রানীতিতে এই ব্যবস্থা মানিয়া না চলায় বর্ত্তমান গুরুতর বিপদ সঙ্কুল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বিভ্রাটের কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং ধারশোধের জন্য উহার অব্যবহিত পরেই অপরিমিত অর্থ প্রধানতঃ পরাজিত জাতি সকলকে ঋণ পরিশোধ জন্য বিজয়ী জাতি-সকলকে দিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স দেশই এই অর্থের অধিকাংশের অধিকারী হন এবং ফল-স্বরূপ প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ এই দুই দেশে আমদানী হয়। এরূপ অবস্থায় সাধারণত উত্তমর্ণ দেশ এই অর্থ বিদেশে নানা প্রকারের দাদন করেন কিম্বা বিদেশী পণ্য খরিদ করিয়া তাহাদের পাওনা ওয়াশীল করিয়া থাকেন এবং এই প্রকারে আন্তর্জ্জাতিক দেনা পাওনা স্বয়ংসিদ্ধভাবে মিটিয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স এই সাধারণ নীতি অবলম্বন না করিয়া তাহাদের অধিকাংশ প্রাপ্ত অর্থ স্বর্ণে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেশের অর্দ্ধ-সরকারী ব্যাঙ্কের "লৌহ কক্ষে" বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং এই প্রকারে উহার সঞ্চালন বন্ধ করিয়া দেশের পণ্য মূল্যের উর্দ্ধগতিতে বাধা দিতে লাগিলেন। যুক্তরাজ্য ইহার উপর আবার মুদ্রা-সঙ্কোচ নীতি অবলম্বন করিয়া পণ্য-মূল্য আরও কমাইয়া দিলেন। ফলস্বরূপ স্বর্ণের মূল্য পূর্ব্বের মূল্য হইতে শতকরা ৪০ হইতে ৬৭ ভাগ পরিমাণ বাড়িয়া গেল। এদিকে অন্যান্য দেশ স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের রপ্তানি-বাণিজ্য বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের দেশের পণ্য-মূল্য যুক্তরাজ্যের অনুপাতে ধার্য্য রাখিতে বাধ্য হইলেন। ইহা ব্যতিত যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স তাহাদের অধমর্ণ দেশের বিরুদ্ধে "রক্ষা-শুল্কের দেওয়াল" উঠাইয়া তাহাদের পণ্য খরিদ এক প্রকার বন্ধ করিলেন এবং পাওনা অর্থ স্বর্ণে আদায়ের জন্য জেদ করিতে থাকিলেন, ইহার ফলে অধমর্ণ দেশের সমস্ত স্বর্ণ নিঃশেষিত-প্রায় হওয়ায় ঐ সকল দেশে পণ্য-মূল্য একেবারে কমিয়া গেল এবং স্বর্ণাভাবে তাহারা উহা বাড়াইতে পারিলেন না। অপর দিকে উত্তমর্ণ দেশগুলি—বিশেষ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স—অধিকাংশ স্বর্ণ ব্যাঙ্কে বন্ধ করিয়া উহার ব্যবহার ব্যাহত করত পণ্য-মূল্য বৃদ্ধিতে বাধা দিতে লাগিলেন। এদিকে কাঁচা মালের মূল্য এবং মজুরী ও বেতনের হার হঠাৎ কমিল না এবং পূর্ব্বকার বর্দ্ধিত হারে খরচে উৎপাদিত পণ্যও প্রভূত পরিমাণে মজুত থাকিল। যুদ্ধের সময় অসংখ্য কলকারখানা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোলাগুলি ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধ শেষে এই সমস্ত কারখানা পুরাদমে সর্ব্বপ্রকারের পণ্য উৎপাদন করিতে লাগিল এবং অনেক নূতন কারখানা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। অপর দিকে পৃথিবীতে সঞ্চালিত স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকের ক্রয়শক্তির অভাব ঘটিল। ফল-স্বরূপ পণ্যউৎপাদনকারীগণ অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া ভয়ানক লোকসান দিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীর অনেক কারখানা তখন বন্ধ হইয়া গেল ও

ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হইয়া যাওয়ায় অনেক দেশের আর্থিক দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌঁছিল এবং সাধারণ নিয়মে এই দুর্দ্দশা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল।

এক শ্রমশিল্পের দুর্গতি ঘটিলে কিরূপে তাহা অন্য শিল্পে সংক্রামিত হয় এবং এক দেশের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা কি করিয়া অপর দেশে ব্যাপ্ত হয় তাহা একটী উদাহরণ দিলেই বোধগম্য হইবে। মনে করুন, যদি এদেশে পাটকলগুলির উহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদদারের অভাবে দুর্দ্দশা হয় তবে উহারা নূতন যন্ত্রাদি ও কলকব্জা কিনিবে না এবং তাহার ফলে যে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিত তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িবে; তখন তাহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণ কয়লা খরিদ করিত তদপেক্ষা কম কয়লা কিনিবে ও কয়লার ব্যবসা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। কয়লার খনির মালিকগণ তখন কয়লা উত্তোলন যন্ত্র খরিদ প্রায় বন্ধ করিবে এবং ঐ যন্ত্র নির্ম্মাতাগণের কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপে এক দেশের ব্যবসায়ে মন্দা (trade depression) উপস্থিত হইলে উহা অপর দেশ হইতে আশানুরূপ মাল আমদানী করিতে পারিবে না এবং ইহার ফলে রপ্তানীকারক দেশের মালের কাটতি কম হওয়ায় তথায়ও মন্দা ঘটিবে ও এইরূপে এক দেশের একটী পণ্যের মন্দা পৃথিবীতে সকল ব্যবসায়ে মন্দা ঘটাইবে।

স্বর্ণমান পরিত্যাগ

সুতরাং যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের এই আত্মঘাতী নীতি যে কেবল অধমর্ণ দেশসমূহেরই ভয়ানক ক্ষতি করিল তাহা নহে, ঐ-সব দেশের ক্রয়-শক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ইহাদের নিজের রপ্তানি-বাণিজ্যেরও গুরুতর ক্ষতি হইল এবং অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা তাহাদিগকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। নিজে ক্রেতা হইয়া কিম্বা প্রাপ্ত অর্থ দীর্ঘ দিনের মেয়াদে অন্য দেশে দাদন করিয়া পৃথিবীর বাজারের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে যে নিজের রপ্তানি-বাণিজ্য চলিতে পারে না, এই অর্থ-নৈতিক সত্যটী তাঁহারা তথাপিও বুঝিতে স্বীকার করিলেন না এবং আমদানী বন্ধ করিতে যে "শুল্ক প্রাচীর" তাঁহারা গাঁথিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অপসারিত করিতে ইতস্তত করত পাওনা অর্থ স্বর্ণে আদায়ের দাবী বলবৎ রাখিলেন। কিন্তু দেশে আবশ্যকীয় স্বর্ণ না থাকায় অনেক অধমর্ণ দেশবিদেশে চালান দেওয়ার জন্য স্বর্ণ যোগাড় করিতে অক্ষম হইলেন ও পরিশেষে আইন দ্বারা স্বর্ণমান ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্বদেশে ব্যবহার ও বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য সাধারণকে আর স্বর্ণ দিতে বাধ্য রহিলেন না। ইহার ফলে স্বর্ণের পৃষ্ঠপোষকতা (backing) না থাকায় ঐ-সব দেশের প্রচলিত নোট এবং অপরাপর মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের সহিত তুলনায় কমিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণমানযুক্ত অপর দেশের পণ্য-ক্রয়ের ক্ষমতাও তাহাদের হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, কারণ মুদ্রা মূল্য কমিয়া যাওয়ায় আমদানী মালের মূল্য শোধ করিতে তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুদ্রার আবশ্যক হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডও স্বর্ণমান বজায় রাখিতে পারিলেন না।

ইংলণ্ডের অবস্থা

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে কোন ব্যক্তি স্বর্ণখণ্ড দিলেই তৎপরিবর্ত্তে প্রতি আউন্সে ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স মুদ্রা টাকশাল হইতে পাইতেন। একবারে বিনা ঝঞ্ঝাটে প্রতি আউন্সে ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৯ পেন্স হিসাবে ব্যাঙ্ক-অব্-ইংলণ্ডে এইরূপ স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা পাওয়া যাইত। তখন ইংলণ্ডে অবাধ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণের গতিবিধিতে বাধা দিতে বাধ্য হইলেন এবং ১৯১৫ খৃঃ অব্দে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলেন। এই অবস্থা ১৯২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত চলিল। তারপর ঐ বৎসর আইন (Gold Standard Act) করিয়া ইংলণ্ড আবার দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের আনীত স্বর্ণ, মুদ্রায় পরিণত করার দায়িত্ব হইতে টাকশালকে রেহাই দিয়া ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ডকে যথাক্রমে ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৯ পেন্স এবং ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স আউন্স হিসাবে সাধারণকে স্বর্ণ ক্রয় এবং বিক্রয় করিতে বাধ্য রাখিলেন এবং ব্যাঙ্ককে ইহার নিজ নোট এজন্য ব্যবহারের ক্ষমতা দিলেন।

এই ব্যবস্থা ১৯৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত চলিল, কিন্তু পূর্ব্বের উল্লিখিত কারণে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক বিষয়ে পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে পরস্পরের বিশ্বাসের অভাবহেতু অন্যান্য দেশের যে প্রভূত অর্থ ইংলণ্ডে স্বল্প সময়ের জন্য

দাদনে থাকিত তাহা ঐ সমস্ত দেশ ইংলণ্ড হইতে উঠাইয়া লইতে থাকিলেন ; কিন্তু ইংলণ্ডের অধিকাংশ দাদন অন্যান্য দেশে দীর্ঘ মেয়াদে থাকায় ঐ অর্থ ইংলণ্ড ফেরত আনিতে পারিলেন না। ফলতঃ ইংলণ্ডে গুরুতররূপ স্বর্ণ রপ্তানীর আকারে বিদেশী নির্গম (Foreign drain) চলিতে থাকিল। উৎপাদন খরচ অধিক হওয়ায় এবং অপরাপর দেশের শুল্ক-নীতির জন্য রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থাও ঐ সময়ে ইংলণ্ডে শোচনীয় দশায় উপনীত হইল। যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স এই অবস্থা সামলাইয়া লইতে ইংলণ্ডের জন্য কিছু কিছু জমার সংস্থানের (credit) বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু উহা শেষ হইয়া যাওয়ার পর তাঁহাদের পক্ষে আর জমার সংস্থান করা অসম্ভব হইল এবং ইংলণ্ডের পক্ষেও আর স্বর্ণমান বজায় রাখা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। তখন ইংলণ্ড ঐ বৎসরের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বর্ণমান ত্যাগ করিলেন এবং ব্যাঙ্ক-অব্-ইংলণ্ডকে স্বর্ণ বিক্রয়ের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। স্বর্ণমান ত্যাগের ফলে ব্রিটিশ ষ্টার্‌লিং আর স্বর্ণমানযুক্ত দেশের মুদ্রার সহিত পূর্ব্ব বিনিময়-মূল্য বজায় রাখিতে পারিল না। আশা করা গিয়াছিল যে এই মুদ্রা-মূল্য কমিয়া যাওয়ার ফলে ইংলণ্ডের রপ্তানি বাণিজ্য বাড়িবে এবং সেজন্য স্বদেশে পণ্য মূল্যও বৃদ্ধি হইবে। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের বিষয়ে আশানুরূপ ফল হইয়াছে কিনা তাহা সন্দেহের কথা। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিতেছি।

ভারতের কথা

উপরে যে তিন প্রকার স্বর্ণমানের কথা বলিয়াছি, ১৮৯৩ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত ভারতে উহার তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ স্বর্ণ-বিনিময়মান প্রচলিত ছিল এবং একটী নির্দ্দিষ্ট হারে ব্রিটিশ ষ্টার্‌লিংএর সহিত গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃত্বাধীনে উহা গ্রথিত ছিল। ১৮৯৯ খৃঃ বিনিময়ের হার ১৫ টাকা করিয়া পাউণ্ড বাঁধা ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে পৃথিবীতে রূপার বাজার অতিশয় চড়িয়া যাওয়ায় গভর্ণমেণ্টকে ঐ বিনিময়ের হার ১০ টাকা ধার্য্য করিতে হয়। ইহার পর রূপার বাজার আরও বাড়িতে থাকায় এই বিনিময়ের হারও বহাল রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং বিনিময়ের বাজারে টাকা একটী নিতান্ত অনিশ্চিত জিনিষে পরিণত হয়। ফলতঃ গভর্ণমেণ্ট আর এই বিনিময়ের হার বাঁধিয়া রাখিতে অসমর্থ হওয়ায় টাকা পাউণ্ডের নোঙ্গর (anchor) ছিন্ন করিয়া বাজারের অজ্ঞাত সমুদ্রে লক্ষ্যবিহীন অবস্থায় বিচরণ করিতে থাকে। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হয়।

টাকার এই অনির্দ্দিষ্ট মূল্যের জন্য কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসায়ীগণের এই ভয়ানক অসুবিধা চলিতে থাকে এবং এই অনির্দ্দিষ্ট বিনিময়-প্রথা রহিত করিয়া স্বর্ণমান বহাল করিবার জন্য এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টও এই অসুবিধা বুঝিতে পারেন এবং ব্যবসায়ী মহালকে সমর্থন করিয়া এ দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকটে সুপারিশ করেন। ফল-স্বরূপ ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দে কমাণ্ডর (এখন স্যর) হিল্‌টন ইয়ংএর সভাপতিত্বে এ বিষয়ে সন্ধান করিয়া আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এক কমিশন নিয়োগ করেন।

এই রয়াল কারেন্সি কমিশন এ দেশে আসিয়া যখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন তখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রভূত স্বর্ণ জমিয়া গিয়াছে ; পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক স্বর্ণ তখন যুক্তরাজ্যে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় তথায় ভয়ানক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিবেচিত হইল এবং পৃথিবীর অনেক অর্থনৈতিকই মনে করিলেন যে এই মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য যুক্তরাজ্যকে এই প্রভূত স্বর্ণের অধিকাংশ পৃথিবীতে বিভক্ত হইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের পরবর্ত্তী নীতি ইহার বিপরীত হওয়ায় দেখা গেল অর্থনৈতিকগণের এই অনুমান ভ্রান্ত হইয়াছিল। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভারতের তখন অনেক স্বর্ণ জমা ছিল। এ অবস্থায় এদেশে স্বর্ণমুদ্রামান প্রচলন রাখা অসম্ভব বিবেচিত হইল না। বর্ত্তমান লেখক ঐ কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময়ও ঐ প্রকারের স্বর্ণমান প্রচলিত করিবারই পরামর্শ দিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর কমিশন অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ স্বর্ণে কাজ চালাইবার পন্থা-স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রামান প্রচলিত করিবার পরামর্শ না দিয়া স্বর্ণখণ্ডমান (Gold Bullion standard) প্রচলনের সুপারিশ করিলেন। ইংলণ্ডও এই সময় পুনরায় স্বর্ণমান গ্রহণ করিলেন এবং তথাকার ষ্টার্‌লিং পাউণ্ড স্বর্ণ পাউণ্ডেরই সমান মূল্যবান হইয়া পড়িল।

গভর্ণমেণ্ট তখন কমিশনের পরামর্শমত কার্য্য করিয়া প্রতি তোলা স্বর্ণ ২১ টাকা ১৩ আনা ১০ পাই মূল্যে খরিদ করিতে এবং ঐ মূল্যে ইচ্ছানুসারে স্বর্ণ কিম্বা ষ্টার্‌লিং বিক্রয় করিতে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া আইন পাশ করিলেন।

এই ব্যবস্থা ১৯৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত একরূপ মন্দ চলিল না, কিন্তু ঐ বৎসর ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিলেন তখন ষ্টার্‌লিংএর মূল্য স্বর্ণ পাউণ্ড হইতে কমিয়া যাওয়ায় টাকার মূল্য-ও স্বর্ণের হিসাবে কমিয়া গেল এবং ইংলণ্ডের সহিত বিনিময়ে আর স্বর্ণ-পাউণ্ডের সহিত উহার পূর্ব্ব বিনিময় হার বজায় থাকিল না। কিন্তু ১৯২৭ খৃঃ অব্দের ভারতীয় কারেন্সি আইন (Indian Currency Act) গভর্ণমেণ্টের স্বর্ণ খরিদ বিক্রয়ের হার পূর্ব্বোক্ত রূপ বাঁধিয়া দেওয়ায় ইহার সম্মুখে গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইল। এই সমস্যা সমাধানের তিনটি উপায় ছিল এবং ইহার যে কোন একটি গভর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। প্রথম উপায়—প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিয়া টাকার স্বর্ণমূল্য সংরক্ষণ। কিন্তু ইংলণ্ডের সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল না, আবার ইংলণ্ডেরও এ বিষয়ে তখন সাহায্য করিবার উপায় ছিল না। দ্বিতীয় উপায়—টাকাকে স্বর্ণ বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডের-ষ্টার্‌লিং পাউণ্ডের সহিত গ্রথিত করা; ইহার ফল অন্যান্য স্বর্ণমানযুক্তদেশের প্রচলিত মুদ্রার সহিত বিনিময়ে টাকার মূল্য কমিয়া গেলেও ইংলণ্ডের পাউণ্ডের সহিত উহার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিনিময়। তৃতীয় উপায়—টাকাকে স্বর্ণ কিম্বা ষ্টারলিং কাহারও সহিত যুক্ত না করিয়া পৃথিবীর বাজারে উহাকে স্বাভাবিক বিনিময়ের হারে প্রচলন জন্য ছাড়িয়া দেওয়া—ইহার ফল পরিবর্ত্তনশীল বিনিময়ের হার জন্য ১৯২৫ খৃঃ অব্দের পৃথিবীর অনিশ্চিত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন এবং তজ্জনিত পুনর্ব্বার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ বহির্বাণিজ্যের সঙ্কটজনক অবস্থা। অনেক বিবেচনার পর ইংলণ্ডের ন্যায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করাই গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন অর্থাৎ টাকাকে স্বর্ণমানচ্যুত করিয়া ব্রিটিশ ষ্টার্‌লিংএর সহিত পূর্ব্ববৎ ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্দ্দিষ্ট মূল্যে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হয়।

ইহার ফল

পরোক্ষভাবে ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে যে আমাদের টাকার বিনিময়ের হার অপরাপর স্বর্ণমানযুক্ত দেশের মুদ্রার সহিত বিনিময়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে—কিন্তু ইংলণ্ডীয় ষ্টার্‌লিং পাউণ্ডের সহিত আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট হার বহাল থাকায় ঐ দেশের সহিত আদান প্রদানে কোন গোলমাল ঘটে নাই। ভারতের রাজস্বের প্রায় একের পঞ্চমাংশ আমাদিগকে হোম্‌চার্জ্জের নিমিত্ত ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়। ইংলণ্ডীয় মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময়ের হার কমিয়া গেলে কিম্বা কমাইয়া দিলে এই "হোম্‌চার্জ্জ" অনেক বাড়িয়া যাইত এবং গভর্ণমেণ্ট উহার বাজেট এষ্টিমেট উলটপালট হইয়া যাওয়ায় বিষম অর্থসঙ্কটে পড়িতেন। ফলস্বরূপ নূতন ট্যাক্স দেশে বসাইতে হইত এবং যে প্রাদেশিক চাঁদা (Provincial contribution) ভারত গভর্ণমেণ্ট আদায় বন্ধ রাখিয়াছিলেন তাহা হয়ত আদায় করিতে হইত। পরোক্ষভাবে ইহাতে টাকার বিনিময়-মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অন্যান্য স্বর্ণমানযুক্ত দেশের সহিত আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং তথা হইতে আমাদের আমদানী-বাণিজ্যে বাধা দিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে—অথচ ইংলণ্ডের দেনা শোধের বেলায় টাকার মূল্য কমিয়া যায় নাই। এজন্য যাঁহারা টাকার বিনিময়-মূল্য কমাইয়া ১ শিলিং ৪ পেন্স করিতে ইচ্ছুক কার্য্যত তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ স্বর্ণের সহিত বিনিময়ে টাকার মূল্য এখন প্রায় একের তৃতীয়াংশ পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১ শিলিং ৪ পেন্সেরও কমে দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ডের সহিত এই ১ শিলিং ৬ পেন্স বিনিময়ের হার এখন গভর্ণমেণ্ট মুদ্রার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ (contraction and expansion) নীতির দ্বারা এবং অবস্থা অনুসারে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কাউন্সিল বিল (council bill) বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়া বহাল রাখিয়াছেন। এদিকে কারেন্সী এক্ট্ অনুসারে গভর্ণমেণ্ট উহার স্বর্ণ খরিদের হার পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি তোলায় ২১ টাকা ১৩ আনা ১০ পাই বহাল রাখিয়া স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বর্ণের দাম গভর্ণমেণ্টের এ হার হইতে অনেক বেশী, সুতরাং ভারত হইতে টাকার হিসাবে অনেক অধিক মূল্যে প্রভূত পরিমাণ

স্বর্ণ কয়েক বৎসর ধরিয়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে। এই স্বর্ণ রপ্তানির বিষয় অনেক কথা আছে, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। *

উপায় চিন্তা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের মুদ্রা ও বাণিজ্যনীতি পৃথিবীর অর্থসঙ্কটের একটি প্রধান কারণ। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্যে প্রয়োগ না করিয়া প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ ইহাদের ব্যাঙ্কের "লৌহ-কক্ষে" বন্ধ রাখায় পৃথিবীর পণ্যমূল্য উপযুক্তভাবে বাড়িতে পারিল না। ইহারা নিজেও সেজন্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু ইহারা এই নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। ফলস্বরূপ এখন পৃথিবীর অনেক দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া তাহাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করত স্বদেশে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির এবং বিদেশে রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় যুক্তরাজ্যকেও কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং বর্ত্তমান লেখকের বিশ্বাস ফ্রান্সকেও সত্বর এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এখন সকল দেশের মধ্যে রপ্তানি-বাণিজ্যের এক গুরুতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে; সকলেই শুল্কনীতি ও মুদ্রামূল্য হ্রাস দ্বারা আমদানী-বাণিজ্যে বাধা এবং রপ্তানি-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেছেন। ফলত সর্ব্বত্রই এখন অন্যান্য প্রকারের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ" (Economic nationalism) প্রচলিত হইয়াছে। সকলেই এখন বিদেশী মালের ক্রেতা হইতে অনিচ্ছুক কিন্তু দেশের মাল বিদেশে বিক্রয় করিতে অতিশয় অভিলাষী। বিদেশী বাণিজ্যে ক্রেতা না হইলে যে বিক্রেতা হওয়া অধিক দিন সম্ভব নয় এই অর্থনৈতিক সত্যটীকে কেহই বুঝিতে চাহিতেছেন না এবং পৃথিবীর অর্থসঙ্কট নিবারণেরও কোন উপায় হইতেছে না। স্বর্ণ সঞ্চালনের অভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, বিশেষত কৃষিজাত পণ্যের অবস্থা একবারে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়াছে। ভারতবর্ষ ইহার একটি উদাহরণ। এখানে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য-হ্রাস হেতু দেশে সর্ব্বশ্রেণীর ভিতর কিরূপ অর্থকষ্ট দেখা দিয়াছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। জমিদার ও মহাজন জমির খাজনা এবং সুদ কিম্বা আসল না পাইয়া বিপদে পড়িয়াছেন। আইনব্যবসায়ী ও চিকিৎসাব্যবসায়ীর আয় কমিয়া গিয়াছে। কৃষকেরও দুর্দ্দশার সীমা নাই। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক না হইলে ইহার প্রতিকারের উপায় কি? কারণ এখন সমস্ত পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক অবস্থা এক সূত্রে গ্রথিত। ভারতে এ বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা তাহা আলোচনা করা দরকার। যুক্তরাজ্যও তাহাদের প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্টের পরিকল্পিত New Deal বহু বাধা সত্ত্বেও চালাইবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় আছেন। এই New Deal এর বিষয় এখানে আলোচ্য নহে।

একথা বলা এখানে বোধকরি অনাবশ্যক যে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির অর্থ মুদ্রার মূল্য হ্রাস। এদেশে এখন প্রধানতঃ দুই প্রকারে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। প্রথমত কার্য্যকরী মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়ত স্বদেশী মুদ্রার সহিত বিনিময়ে এদেশের মুদ্রার মূল্য আইনের সাহায্যে কমাইয়া দেওয়া। দুইটি উপায়েরই ফলাফলের বিষয়ে অনেক কথা বিবেচনা করিবার আছে, আর এদেশে সাধারণের ইচ্ছার উপরও ইহার কোন নীতি প্রবর্ত্তন নির্ভর করে না। দুইটি উপায়ই গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা-সাপেক্ষ। গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও ইহাতে অনেক বাধা আছে। দ্বিতীয় উপায় বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্কটের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। প্রথম উপায়টীও দ্বিতীয়ের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। আবার নূতন মুদ্রা ইচ্ছা করিলেই সৃষ্টি করা যায় না। এ বিষয়ে অনেক বাধা আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ মুদ্রা কতকগুলি ব্যবসায়ী এবং ধনীর হাতে জমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার জন্য পণ্য বিভাগের (Distribution) অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় ঐ মুদ্রার যথোপযুক্ত

---

* স্বর্ণমান এবং মুদ্রাবিনিময় বিষয়ে যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চান তাঁহারা বর্ত্তমান লেখক প্রণীত "Theory and Practice of Commerce and Business" নামক পুস্তকের Function of Money এবং Foreign Exchange শীর্ষক অধ্যায় দুটী পাঠ করিতে পারেন।

ব্যবহার হইতে পারিতেছে না এবং উহা ব্যাঙ্ক ও অন্যত্র সঞ্চিত আছে, কারণ পৃথিবীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য কোন লাভজনক কাজে উহা খাটাইতে পারা যাইতেছে না। এই মুদ্রা উপযুক্তভাবে দেশের মধ্য সঞ্চালিত হইতে পারিলে কার্য্যকরী মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধির সহিত পণ্য মূল্যের কিছু বৃদ্ধি হইত, কিন্তু উপস্থিত সে আশা দেখি না। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন মুদ্রা স্থষ্টির সমস্যাও জটিল। কাগজের মুদ্রা বাড়াইতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আইন অনুযায়ী যে কতকগুলি প্রাথমিক আবশ্যকতা আছে তাহার সমাধান কঠিন ব্যাপার এবং মুদ্রা বাড়াইয়া পণ্য-মূল্য বাড়াইলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের কি অবস্থা হইবে তাহাও এক গুরুতর সমস্যা। এ সব প্রশ্নের এখানে আলোচনা উপস্থিত না করিয়া এই কথা বলিলেই চলিবে যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রথম পথটী অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ। মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রা বাড়াইয়া যে পণ্য উৎপাদন খরচ নানা প্রকারে গভর্ণমেণ্ট বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন সেই বৃদ্ধি সংযত করিতে এখনও ইহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ আঘাত না করিয়া ও অকারণ সঞ্চয় (hoarding) নিবারণ করিয়া কি করিয়া কার্য্যকরী মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সে বিষয়ে পৃথিবীতে কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছে। বিষয়টী এখানে একটু অবান্তর হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষেপে উহার কিছু বলিতেছি। যুক্তরাজ্যের কয়েকটী জনপদ এবং অষ্ট্রিয়ার একটী সহর এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। অকারণ সঞ্চয় নিবারণ করিয়া পণ্য মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় আনাই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহারা এক প্রকার প্রাইভেট নোট ঐ সকল জনপদের ব্যবহারের জন্য বাহির করিয়াছিল। ঐ সকল নোটের সমপরিমাণ গভর্ণমেণ্টের মুদ্রা ব্যাঙ্কে রিজার্ভ রাখা হইয়াছিল এবং ব্যবস্থা হইয়াছিল যে এই নোটগুলির মূল্য প্রতিমাসে শতকরা একভাগ কমিয়া যাইবে। সুতরাং ইহা কাহাকেও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইলে প্রতিমাসে ঐ হিসাবে লোকসান দিতে হইবে। এই জন্য এই নোটের নাম হইয়াছিল "ক্ষয়শীল মুদ্রা" (melting money)। জনপদের সমস্ত কাজ-কর্ম্মই এই নোটের দ্বারা চলিত। সঞ্চালিত মুদ্রার পরিমাণ ইহাতে বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের শ্রম এবং পণ্য-মূল্য ইহাতে অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছিল অথচ ইহাতে "মুদ্রা-বৃদ্ধি" (inflation) সৃষ্টি করিয়া বহির্বাণিজ্যে বিভ্রাট উপস্থিত করে নাই। দেশের মুদ্রা-বিষয়ক আইনের বিরোধী হওয়ায় পরে এই ব্যবস্থা ঐ সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিয়াছিলেন। ভারতে ঐরূপ কোন ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে, কারণ ভারতীয় পেপার কারেন্সী আইনের (Indian Paper Currency Act) ২৫ ধারা মতে এ দেশে কাহারও এরূপ চাহিবামাত্র বাহককে দেয় (payable to bearer on demand) নোট বাহির করিবার অধিকার নাই।

পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির দ্বিতীয় পরিকল্পিত উপায়—বিদেশী মুদ্রার সহিত এ দেশের টাকার বিনিময়ের হার হ্রাস করা অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় মুদ্রায় টাকার যে ১ শিলিং ৬ পেন্স মূল্য আইন দ্বারা বাঁধা আছে উহা আবশ্যক মত কমাইয়া দেওয়া। যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে টাকার বিনিময় মূল্য কমাইলে বিদেশী ক্রেতা তাঁহাদের দেশের অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ মুদ্রায় আমাদের টাকার দেনা শোধ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের মুদ্রায় আমাদের পণ্য সস্তা হওয়ায় এ দেশী মালের কাটতি বিদেশে বাড়াইয়া আমাদের বর্ত্তমান রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দিবে। ফলতঃ আমাদের পণ্যের চাহিদা বাড়িবে ও তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া আমাদের অর্থ-কষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইবে। অপর পক্ষের কথা হইতেছে যে বিশেষ কারণে সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা না হইলে কোন দেশেরই তাহার নিজের মুদ্রার বিনিময়মূল্য হ্রাস করা সমীচীন নহে। তদ্ভিন্ন ভারতের বিশেষ অবস্থায় মুদ্রা-মূল্য কমাইয়া কোনই লাভ হইবে না। বরং কল-কব্জা প্রভৃতির ন্যায় আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি বিদেশী আমদানী দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দিয়া উহা আমাদের শিশু-শিল্পের ভয়ানক অনিষ্ট করিবে এবং টাকার হিসাবে ভারতের "হোম্-চার্জ্জের" পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টের বাজেটে গুরুতর ঘাটতি আনয়ন করিবে। ফলস্বরূপ করদাতাদের উপর আরও অতিরিক্ত ট্যাক্সের চাপ পড়ায় অর্থকষ্ট আরও বাড়িয়া যাইবে। এই দুই পক্ষের মতের ভিতরই কিছু কিছু সত্য আছে। বিষয়টা অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিতে চাই।

সাধারণ নীতি

প্রথম কথা কোন দেশের মুদ্রামূল্যের বিদেশী বিনিময়ের হার কমাইয়া দিলেই, ঐ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ে কিনা? অর্থনৈতিক নিয়ম প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে গেলে বাড়িবারই কথা বটে, কিন্তু অনেক সময় ঐরূপ বৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। তাহার কারণ রপ্তানী বৃদ্ধির সহিত পণ্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উহার যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে, দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য হ্রাসজনিত সুবিধা তাহাতে অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং এই মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী হয় না, ঘড়ির পেণ্ডুলামের গতির ন্যায় অতিবৃদ্ধি এবং অতিহ্রাসের অনুবর্ত্তী হয় মাত্র। আবার কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমাইয়া অনেক দেশই বিশেষ কৃষিপ্রধান দেশগুলি, রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ বাড়াইতে পারে নাই এবং ঐ সকল দেশের আভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্যও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। মুদ্রা-মূল্য কমাইয়া জাপান রপ্তানী-বাণিজ্য কিছু বাড়াইয়াছে বটে কিন্তু অন্যান্য দেশে—বিশেষ ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়, এই নীতি আশানুরূপ সফল হয় নাই। দেশের মধ্যে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধিও তথায় বিশেষ কিছু হয় নাই, বরং উহা কমিয়া গিয়াছিল। মুদ্রার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩১ এর শেষাশেষী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে জিনিষের মূল্য ১০০ ছিল, ১৯৩৩এর শেষের দিকে উহা কমিয়া যথাক্রমে ৮২.২ ও ৭৮.৭ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে মূল্য আরও কমিয়াছিল, কিন্তু অটোয়া-চুক্তির ফলে কিছু কিছু বাড়িতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও একরূপ গায়ের জোরে এই চেষ্টা চলিতেছে।

এই সব শিল্প-প্রধান দেশের কথা ছাড়িয়া যদি আমরা যে সকল কৃষি-প্রধান দেশ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করি, তবে মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস নীতির ফলাফল অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি। দেখিতে পাই উরুগুয়ে, আর্জ্জেন্টিনা, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা এবং ডেনমার্ক প্রভৃতি কয়েকটী কৃষি-প্রধান দেশ তাহাদিগের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কাহারও রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষ কিছু বাড়ে নাই এবং অনেকেরই কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং মুদ্রামূল্য হ্রাস করিলেই সব সময় রপ্তানি বাণিজ্য এবং দেশের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে না। জাপানের এ বিষয়ে কিছু সুবিধা হইয়া থাকিলেও তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীর কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ১৯৩২এর মাঝামাঝি ইউরোপের আটটী কৃষিপ্রধান দেশের প্রতিনিধি-গণের ওয়ার-স সহরে এক মন্ত্রণা সমিতি বসিয়াছিল। উহারা কৃষি-পণ্যের দুর্দ্দশানিবারণ কল্পে যে সকল উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মুদ্রার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের কোন উল্লেখ করেন নাই। ভারতবর্ষও কৃষি-প্রধান দেশ, একথা মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং টাকার বিনিময় মূল্য কমাইলেই দেশে রপ্তানি বাণিজ্য ও পণ্যমূল্য বিশেষ কৃষিপণ্যমূল্য বাড়িবে এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাতে বিদেশ হইতে আমদানী কল-কারখানার আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির মূল্য বাড়াইয়া আমাদের—বিশেষ বাঙ্গালাদেশের, উদীয়মান শিল্পে বিলক্ষণ আঘাত দিবে এবং যে চিনি ও কাপড়ের নূতন কলগুলির উন্নতিকল্পে আমরা এতদূর চেষ্টা করিতেছি সেইগুলির অনিষ্ট সাধন করিবে। সুবিখ্যাত অর্থ-নৈতিক পণ্ডিত মেনার্ড কীন্‌স্ বলিয়াছেন—দেশের পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে কোন দেশের লাভ হয় না, উহাতে ক্ষতিই হইয়া থাকে। ভারত বিদেশী ঋণগ্রস্ত, সুতরাং ভারতের অবস্থা এ বিষয়ে আরও প্রতিকূল।

যে কয়েকটি বিশেষ দেশের পণ্যমূল্য বিষয় আলোচনা করিলাম উহা ছাড়িয়া যদি সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের একটী গড়পড়তা হিসাব লওয়া যায় তাহা হইলেও দেখিতে পাই, অনেক দেশের স্বর্ণমানচ্যুত হওয়ার পর বাণিজ্য আশানুরূপ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। জেনেভার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের হিসাবে দেখা যায় যে সমস্ত পৃথিবীতে (ইহার মধ্যে স্বর্ণমানচ্যুত এবং স্বর্ণমানযুক্ত সকল দেশই আছেন) ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৩৪এর তুলনায় ১৯৩৫এ মাত্র ৬.৬ ভাগ বাড়িয়াছে কিন্তু ঐ সময়ে স্বর্ণের দাম শতকরা ৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং বাণিজ্যের এই সামান্য-দৃশ্যতঃ বৃদ্ধি স্বর্ণের দর বৃদ্ধির ফলমাত্র, বাস্তবিক বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে পৃথিবীতে যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল, এখন গত কয়েক বৎসরের সামান্য বৃদ্ধির পরেও বর্ত্তমানে উহার পরিমাণ তাহার শতকরা ৮৪.১ মাত্র। আবার পৃথিবীতে পণ্য উৎপাদনের

দিক হইতে হিসাব করিতে গেলে দেখা যায় যে কোন কোন দেশে—যথা রাশিয়া, জাপান, চিলি, গ্রীস, রুমানীয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ও যুক্তরাজ্যে—১৯২০ খৃঃ এর তুলনায় গত বৎসর পণ্য উৎপাদন কিছু বাড়িলেও, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্, পোলাণ্ড ও জেকো-স্লোভাকিয়াতে শতকরা ৩০ ভাগ; আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রিয়া ও বেলজিয়ামে শতকরা ২০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ এবং স্পেন, ইটালী ও জার্ম্মাণীতে শতকরা ১০ ভাগ এখনও কম রহিয়াছে। কাজেই পৃথিবীতে সে সামান্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কারণ হয়ত এই পণ্য উৎপাদনের অল্পতা। সুতরাং অনেক দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া এবং কোন কোন দেশ পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ তাহাদের ব্যাঙ্কের "লৌহ-কক্ষে" বন্ধ করিয়া যে পৃথিবীর, বিশেষ ভাবে তাহাদের নিজ নিজ দেশের, অর্থ-সঙ্কট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন একথা বলা যায় না। "অর্থ-নৈতিক জাতীয়তা" (Economic nationalism) নীতি অবলম্বন করতঃ দেশে "শুল্ক প্রাচীর" গাথিয়া তুলিয়াও যে এই সব দেশ শ্রমশিল্প এবং কৃষিতে বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন তাহাও মনে হয় না। ফলত এই কার্য্যের জন্য পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনে ইহারা বাধা দিতেছেন মাত্র। সুতরাং উপযুক্তভাবে স্বর্ণ বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ যদি স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রক্ষাশুল্ক-নীতি যথাসম্ভব প্রত্যাহার করিয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন তবেই নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার অবসানের আশা করা যাইতে পারে; বর্ত্তমানে স্বর্ণমানযুক্ত এবং স্বর্ণমানচ্যুত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য-নীতির পার্থক্যজনিত প্রতিযোগিতা জগতের ব্যবসারাজ্যে বিভ্রাট ঘটাইতে থাকিবে এবং সেজন্য পৃথিবীর বাজারের এই মন্দা দূরীভূত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে।

সিদ্ধান্ত

বর্ত্তমান আলোচনা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত (conclusions) সমূহে উপনীত হইতে পারি :—

(১) ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের নিমিত্ত অনেক দেশকে বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান ত্যাগ করিতে হয়।

(২) ইহার জন্য যে সকল স্বর্ণের পৃষ্ঠপোষকতাবিহীন নোট বাহির করা হয় তাহা লইয়া অনেক গভর্ণমেণ্টকে মহা বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল।

(৩) ফলস্বরূপ পৃথিবীতে স্বর্ণ-সংগ্রহের জন্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়।

(৪) ভারসেলি সন্ধিতে বিজেতা রাজ্যগুলি বিজিত রাজ্যসমূহের নিকট দেনা শোধ এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রভূত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করে।

(৫) ঐ অর্থ তাহারা বিজিত দেশে দাদন না করিয়া কিম্বা তথা হইতে রপ্তানি মালে না লইয়া স্বর্ণে লইতে দাবী করে।

(৬) ইহার ফলস্বরূপ বিজিত দেশের প্রায় সমস্ত স্বর্ণ বিজয়ী দেশে, বিশেষ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে যাইয়া জমা হয়।

(৭) স্বর্ণের অসমান বিভাগের জন্য স্বর্ণাভাবে অনেক দেশ চেষ্টা করিয়া স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও অনেকেই পুনর্ব্বার স্বর্ণমানচ্যুত হইতে বাধ্য হয়।

(৮) ইংলণ্ডের পক্ষে, অবস্থা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত হইবার পূর্ব্বেই স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করায়; পুনর্ব্বার স্বর্ণমানচ্যুত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

(৯) মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলিত হওয়া আবশ্যক সে পরিমাণ স্বর্ণ না উঠায় এবং স্বর্ণের অকারণ সঞ্চয় ও অসমান বিভাগের জন্য পৃথিবীর পণ্যমূল্য কমিয়া যায়।

(১০) এজন্য অনেক দেশে ব্যবসার বাজারে ভয়ানক মন্দা দেখা যায় এবং অর্থ নৈতিক নিয়মে উহা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে।

(১১) "অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদ" (Economic Nationalism) পৃথিবীর অনেক দেশকেই পাইয়া বসায়—প্রায় সকল দেশই "শুল্ক প্রাচীর" তুলিয়া পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দেওয়ায় পৃথিবীর অর্থসঙ্কট দূরীভূত হওয়া কষ্টকর হইয়াছে।

(১২) ১৯৩১ খৃঃব্দে ইংলণ্ডের সহিত ভারতেরও স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের ষ্টার্লিংএর সহিত টাকার বিনিময়ের হার বহাল রাখা ভিন্ন উৎকৃষ্টতর পন্থা ছিল না।

(১৩) ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ১ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে টাকার বিনিময় হার অসুবিধাজনক নহে।

(১৪) বিদেশী বিনিময়ে মুদ্রামূল্য কমাইলেই সকল সময় পণ্যমূল্য, বিশেষ কৃষিজাত পণ্যমূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না কিম্বা রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ে না।

(১৫) পৃথিবীতে যে স্বর্ণ আছে তাহা ব্যবহারে মিতব্যয়িতার বন্দোবস্ত এবং মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের ন্যায় মুদ্রা-নীতি অবলম্বন করিয়া দেশসমূহের মধ্যে উহার উপযুক্ত বণ্টনের ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমানের পক্ষে প্রশস্তনীতি।

(১৬) রক্ষা-শুল্কের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পারিলে পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক সুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন-অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য।

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যাতে আশা হ'ল—বিপুল হংসবলাকার অন্তত একটি হংস মানস-সরোবরের কাছাকাছি পৌঁছুল।

খবরের কাগজের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা এবং সুবিধামতো জায়গায় চিঠি ছেড়ে দেওয়া—আর দশ জনের মতো সুকুমারেরও একটা রোগ। কাছে পয়সা থাকলে অনেক সময় সে দৈনিক খবরের কাগজ কিনেই আনে। অন্য সময় ছেলে পড়িয়ে ফেরবার পথে কখনও এলবার্ট হলে, কখনও বা ওয়াই-এম-সি-এতে দেখে নেয়। এই রকমই করে বেশী। এই ভাবে সে যে কোথায় কোথায় কত দরখাস্ত পাঠিয়েছে তা আর তার নিজেরই মনে পড়ে না। অকস্মাৎ একদিন একটা জায়গা থেকে তার একখানা দরখাস্তের জবাব এল, দেখা করার জন্যে।

একটা স্কুল থেকে।

প্রায় মাস তিনেক আগে এই স্কুলে একটা শিক্ষকের পদ খালি হওয়ার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সুকুমার সেই পদের জন্যে আবেদন ক'রেছিল, এত দিন পরে তার উত্তর এল। এতদিন কি ছেলেদের পড়াশুনা বিনা-শিক্ষকেই চলছিল?

কিন্তু সে সব গবেষণা পরে হবে। স্কুলের বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল। তার পিওন-বইতে সই ক'রে দিয়ে সুকুমার ছুটি খেয়ে নিয়ে ভব্যযুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

পথ অনেকখানি। তবু সুকুমারের হেঁটে যাওয়াই উচিত ছিল। তার পুঁজি ক'মে এসেছে। কিন্তু ভাবলে, এতখানি পথ এই রৌদ্রে হেঁটে রক্তমুখে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গিয়ে উপস্থিত হ'লে হেড্‌মাষ্টার হয়তো কিছু ভাবতে পারে। শিক্ষকের একটা সম্মান আছে তো? এ সব ক্ষেত্রে পাঁচটি পয়সার মমতা করা ঠিক হবে না। অবশ্য চাকরী যে হবেই এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। কিন্তু না হয়, গেলই সামান্য ক'টি পয়সা। সংসারে থাকতে গেলে···

এই অকৃপণতা এবং ঔদার্য্যের জন্যে সুকুমার মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলে।

বাস থেকে নেমে সুকুমার যখন স্কুলে পৌঁছুল তখনও স্কুল বসেনি। ক্লাসে ক্লাসে বাজার ব'সে গেছে এমনি চীৎকার উঠেছে। একটা ঘরে কয়েকজন শিক্ষক বেশ রসালাপ জমিয়ে তুলেছেন। সেটা বোধ হয় টিচার্স্ কমন্ রুম। তার পাশের ঘরটা অফিস। দারোয়ানকে বলতে দারোয়ান তাকে সেই ঘরে হেডমাষ্টারের কাছে নিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। পঞ্চান্নর নীচে নয়। গায়ে একটা লংক্লথের কোট, তার ওপর চাদর। মাথায় টাক। মুখে পরিপুষ্ট পাকা গোঁফ। সুকুমারের আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে তিনি তাকে বসতে বললেন।

সুমুখের খাতাগুলোর দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে বললেন, আপনি এম-এ পাশ করেছেন?

সুকুমার হুঁ দিলে।

—কিসে?

—ইংরিজিতে।

—কোন্ ক্লাস?

—সেকেণ্ড ক্লাস।

হেডমাষ্টার ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কি যেন ভাবলেন। অন্যমনস্কভাবে টাকটা একবার খশ্ খশ্ ক'রে চুলকুলেন। বললেন, কোন বৎসর পাস করেছেন?

সুকুমার তাও বললে।

—এতদিন কি করছিলেন?

একটু ইতস্তত ক'রে সুকুমার জবাব দিলে, বিশেষ কিছুই নয়। দুই একটা···

—মাষ্টারী ক'রেছেন কখনও?

সুকুমারের মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, না।

হেডমাষ্টার আবার খশ খশ্ ক'রে টাকটা চুলকুলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ লাইন ভালো লাগবে তো? ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখার কিছু নেই। সুকুমার পাস করার পর থেকে কোথাও একটা প্রোফেসারীর জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। কিন্তু প্রথমত খালিই কোথাও বড় একটা পড়ে না। বুড়ো বুড়ো প্রোফেসার, মাসে পঁচিশ দিন যাঁদের শরীর অসুস্থ থাকে, ক্লাস নিতে পারেন না, কণ্ঠস্বর যাঁদের এমন ক্ষীণ হয়ে গেছে যে সামনের বেঞ্চেও পৌছয় না—লিখতে গেলে হাত কাঁপে, সেজন্যে বোর্ডের দিকে সহজে এগুতে চান না—তাঁরা অবসর নেওয়ার চিন্তাও করেন না। খালি হবে কোথা থেকে? যদি দু একটা কোথাও খালি হয়, তারাও ফার্ষ্টক্লাস লোক চায়, আর সেই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হলেই ভালো হয়। সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ-র স্কুল-মাষ্টারী ছাড়া উপায় কি?

আর সত্যি সত্যি কেরাণীগিরির উপর সুকুমারের কেমন একটা জন্মগত বিতৃষ্ণাও আছে। তারা কোনো পুরুষে চাকরী করেনি। মার্চেন্ট অফিসে যে ভাবে কেরাণীরা কাজ করে ব'লে শুনেছে, তার ভয় হয় তেমন ভাবে সে একটা দিনও কাজ করতে পারবে না। তবু চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু সে অভাবের তাড়নায়। এখন একটা স্কুল-মাষ্টারীর সম্ভাবনায় সে পুলকিত হয়ে উঠল। সুকুমার খুব বেশী টাকার প্রার্থী নয়। তার সংসারের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করার পর নিজের মনে একটু লেখাপড়া করার অবসর পেলেই সে সন্তুষ্ট। সে সুযোগ এবং সে সুবিধা মাষ্টারী ছাড়া আর কিছুতে মিলবে না। বছরে চার মাস ছুটি আর কোন চাকরীতে আছে?

সুকুমার আনন্দের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানালে, মাষ্টারী তার খুব ভালো লাগে।

হেডমাষ্টার মশা'য় প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি। ছেলেমানুষের ভাববিলাসিতায় ভোলেন না। একটু হেসে বললেন—অত তাড়াতাড়ি বলবেন না, একটু ভেবে বলুন।

তাঁর হাসির ভঙ্গিতে আর কথার ইঙ্গিতে সুকুমার থতমত খেয়ে গেল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে রইল।

হেডমাষ্টার সুমুখের খাতার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন:

—আমাদের সময়ে তাই ছিল বটে। ভদ্রলোকের অভাবও কম ছিল, টাকার লোভও কম ছিল। সেজন্যে বেশী লেখাপড়া শিখে কেউ বড় কেরাণীগিরির দিকে যেত না। শিক্ষকতার মতো এত বড় সম্মান তো আর কোথাও নেই, এমন মহৎ কাজও আর কিছু নয়। সুতরাং দু পাঁচটা টাকা কম পেলেও বহু লোকের সম্মানে ও শ্রদ্ধায় তা পুষিয়ে যেত। এখন দিন গেছে বদলে। মানুষের অভাব বেড়েছে, টাকার লোভও বেড়েছে। ভালো ভালো ছেলেরা এখন ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটের জোরে বেশী মাইনের যে কোনো চাকরীতে ঢুকে পড়ে, অন্তত চেষ্টা তো করে। নিতান্ত থার্ডক্লাস লোক সেদিকের প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে না পেরে আসে এই দিকে। ব'সে না থাকি, ব্যাগার খাটি।

হেডমাষ্টার হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

বড় বড় গোঁফে আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে এতক্ষণ সুকুমারের মনে হচ্ছিল, লোকটি বড় কঠিন লোক। এখন তাঁর হাসি দেখে সে যেন ভরসা পেলে। মনে হ'ল, বাইরে থেকে দেখে যত কঠিন মনে হয়—তত কঠিন লোক উনি নন। মনটি সেকালের শিক্ষকের মতো সরল।

হেডমাষ্টার বললেন, ব্যাগার খাটাই হয়েছে। ছেলেদেরও শিক্ষে হচ্ছে তেমনি।

তার পরে একখানা মোটা খাতা দুম করে সামনের দিকে ফেলে দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, চুলোয় যাক। কি করবেন ভেবে বলুন। এখানে মাইনে সামান্য, তিরিশটি টাকা। লিখতে হবে ষাট। তবে হাঁ, স্কুলে মাষ্টারী করলে দুই একটা ভালো ট্যুইশান মেলেই। তাতেই পুষিয়ে যায়। কি করবেন?

ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে চাইলেন। স্কুল বসতে আর মিনিট পাঁচেক আছে। অন্যান্য শিক্ষক একে একে আসেন, আর রেজিষ্টারে নাম সই ক'রে চ'লে যান। যাবার সময় একবার সুকুমারের দিকে আড়-চোখে চেয়ে যান।

সুকুমার স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। মাইনে মোটে তিরিশটি টাকা, কিন্তু লিখতে হবে ষাট। এ প্রথা যে অনেক স্কুলে কতকটা জ্ঞাতসারেই চলে সে সংবাদ সুকুমারের অবিদিত

নয়। এ নিয়ে সে নিজেও কত আলোচনা, কত তর্ক, কত হাস্যপরিহাস ক'রেছে। আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন কোনো ব্যক্তি কি ক'রে এই হীনতা স্বীকার ক'রে শিক্ষকতা গ্রহণে সম্মত হয় তা নিয়ে সে যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ ক'রেছে। আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে কেরাণীগিরি করা চলে, অন্য আরও অনেক কাজই করা চলে, কিন্তু শিক্ষকতা নয়। শিক্ষক মনুষ্যত্বের প্রতীক। তাঁর উপর ছেলেদের মানুষ করার ভার। ছেলেরা তাঁকে দেখে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করে। তিনি যদি এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হবার পূর্ব্বে আত্মসম্মান বোধে জলাঞ্জলি দেন তবে আর তাঁর রইল কি?

সুকুমার যত তর্ক ক'রেছে তত শিক্ষকদের উপরই চটেছে। তাঁরা এই হীনতা স্বীকার ক'রে যান কেন? এই প্রথম বুঝল, কেন তাঁরা যান। দারিদ্র্যের দুঃখ কত বড়। চারিদিকে চেয়ে কোথাও যখন কোনো আশা দেখা যায় না তখন মানুষ কি করতে পারে!

কতক লজ্জায়, কতক ক্রোধে সুকুমারের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখ পেয়ে পেয়ে এই বয়সেই তার যথেষ্ট সংযম এসেছে। চক্ষের পলকে সে ভেবে নিলে, তার সংসারের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা এবং এখন থেকে কিছু সাহায্যও করতে না পেলে পরে আরও কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে সেই কথা। সে সঙ্গে সঙ্গে ওতেই রাজী হয়ে গেল।

হেডমাষ্টার মশাই আর কিছু বললেন না। তাকে নিয়োগপত্র দিয়ে ব'লে দিলেন, পরের দিন থেকে আসবার জন্যে—তার পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকের রুটিন অনুযায়ী কাজ করতে অসুবিধা হবে কি না তাও জিজ্ঞাসা করলেন। সুকুমার রুটিনে চোখ বুলিয়ে দেখলে। কিছু অসুবিধা হবে না। উপরের শ্রেণীতে তাকে ইংরিজি আর ইতিহাস পড়াতে হবে। এ দুটোই তার ভালো জানা।

বললে—না, কিছু অসুবিধা হবে না।

—আচ্ছা, তাহ'লে কাল থেকে আসবেন।

মেসে এসে সুকুমার এই সুসংবাদের কথা জানাতেই সবাই এসে ছেঁকে ধরলে। বললে, খাওয়াতে হবে। দশ টাকার কম ছাড়ছি না।

বেশ! ষাট টাকা লিখে ত্রিশ টাকা পাবে। তার মধ্যে মেসে খাওয়াতে হবে দশ টাকা। কিন্তু সমস্ত কথাও সুকুমার স্পষ্ট ক'রে বলতে পারলে না। এম-এ পাশ ক'রে ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারিতে ঢোকার লজ্জা কম নয়। আবার ষাট টাকার কথা বলাও মিথ্যাচার। সে আমতা আমতা ক'রে শুধু বললে, না, না, সে রকম ভালো মাইনে নয়। তেমন হ'লে খাওয়াতাম বই কি—নিশ্চয় খাওয়াতাম। আপনাদের ব'লতে হ'ত না।

—ভালো মাইনে নয় মানে? পঞ্চাশ টাকা তো বটেই।

সুকুমার হাসলে। বললে, সে আর শুনে কাজ নেই। ওই তো বললাম, তেমন সুবিধাজনক নয়।

—আরে মশাই, পাঁচ টাকার কমে হবে না। তা যত কমই মাইনে হোক না কেন।

সুকুমারও আর এ নিয়ে দর কষাকষি করতে চাইল না। পাঁচটা টাকাই খাওয়াতে রাজি হ'ল। স্থির হ'ল, রবিবারে সাধারণত যে ফিষ্ট হয় তারই সঙ্গে ওই পাঁচ টাকা দিয়ে আরও একটু ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

সুকুমার সন্ধ্যের সময় ট্যুইশানে বেরিয়ে যাবার পরে এ নিয়ে মেসে সভা বসল। সুকুমারের মাইনে কত হ'তে পারে এ কথা জানার আগ্রহ সকলেরই অত্যন্ত বেশী।

—কি গো রায় মশাই, বলুন না সুকুমারবাবুর কত মাইনে। আমরা তো আর কেড়ে নিচ্ছি না।

রায়মশাই বিব্রত হয়ে বললে, আমি কি ক'রে জানব বলুন। আপনারাও যেখানে—আমিও সেখানে।

—সে কি আর একটা কথা হ'ল! আপনি হ'লেন তার most intimate friend—এক ঘরে থাকেন।

রায়মশাই খানিকটা ফাঁকা হেসে বন্ধুত্বের কথা উড়িয়ে দিলে। সত্যি সত্যি মাইনের কথা সে জানেও না। নানা রকম অনুমান চলল। কেউ বলে দশ, কেউ পনেরো, কেউ চল্লিশ। স্থির কিছুই হ'ল না। তবে সবাই এই ভেবে আনন্দ পেলে যে মাইনে চল্লিশের বেশী কিছুতে নয়, বরং কমই হবে। প্রাইভেট স্কুল তো, বিশেষ ক'লকাতার।

জগদীশ মেসে মাতব্বর ব্যক্তি। বেঁটে, থস্‌থসে মোটা। গলার জোর আছে। আস্তে কোনো কথা বলতে পারে না। তার গলার জোরে সবাই হার মেনে তাকে সামনের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। বি-এ পাশ ক'রে

অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে অদৃষ্টের জোরে একটা বীমা কোম্পানীতে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছে। চাকরীর বাজারে তার অভিজ্ঞতা জন্মেছে প্রচুর।

বললে, ক'লকাতার প্রাইভেট স্কুলের কথা আর বলবেন না। ও একটা রীতিমত ব্যবসা। অন্তত দুটো স্কুলের কথা আমি জানি—যেখানে ওই আয়ে সেক্রেটারীর সংসার চলে। মাষ্টারের মাইনে তো দু'পাঁচ টাকা কখনও দেয়, কখনও দেয় না। আবার মজা কি জানেন—গলা অপেক্ষাকৃত নামিয়ে বললে—লম্বা ছুটির আগে দেয় চাকরী ছাড়িয়ে।

জগদীশ হো হো ক'রে হেসে ঘর ফাটিয়ে দেবার মতো করলে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? কেন?

জগদীশ মাতব্বরের মতো স্থূল উরুতে একটা চাপড় মেরে বললে—বুঝুন না কেন?

বুঝতে না পেরে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

জগদীশ বুঝিয়ে দিলে, ছুটির মাইনে ফাঁকি দেবার জন্যে। এ আর বুঝলেন না?

সকলের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জগদীশ আবার একবার তার পেটেণ্ট হাসি হাসলে।

সকলেই অভাবগ্রস্ত। কেউ চাকরী ক'রে খায়, কেউ সেই চেষ্টায় রয়েছে। সমস্ত বছর খাটার পর লোককে লোকে ঠকাচ্ছে—এ কথা শুনলে আঘাতটা যেন তাদের নিজের গায়েই পড়ে।

ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, এর প্রতিকার নেই?

জগদীশ গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, না।

বললে, কি প্রতিকার করবেন? খাতায় আর আইন-কানুনে সব ঠিক আছে যে! আর লোকের পেটে খাবার ভাত নেই, কে বড়লোকের সঙ্গে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে মামলা করতে যাবে বলুন? সে ঝঞ্ঝাটই বা পোয়ায় কে? সবাই বিদেশী নিরীহ ভদ্রসন্তান। বলুন বটে কি না!

সবাই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

জগদীশ বলতে লাগল, তারা বড় লোক। টাকার জোরে হয়কে নয় ক'রে দেবে।

রায়মশাই শান্তভাবে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল। বিস্মিত ভাবে বললে, এরা সব বড় লোক? অথচ···

ভারিক্কি চালে হেসে জগদীশ বললে, মস্ত বড় লোক। বাপ বিস্তর টাকা রেখে গেছেন। হয়তো এটর্ণি, কিম্বা উকিল, কি ধরুন ডাক্তার। বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, আরও আনুষঙ্গিক এটা-ওটা আছে। দানের ফর্দ্দে মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বেরয়। আর কি চান?

না, আর কিছুই চাই না। একে বড়লোক, খবরের কাগজে নাম বেরয়। তাতে তার সঙ্গে 'এটা-ওটার' ইঙ্গিত জড়িয়ে আছে। রস জমাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। আর এ এমন প্রসঙ্গ যে, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ ক'রে প্রাণ আকুল ক'রে দেয়। আরও আশ্চর্য্য, একজন ভদ্রলোকের চরিত্রের উপর এত বড় কলঙ্ক সম্বন্ধে কেউ একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলে না। সকলেই এটাকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে শিরোধার্য্য ক'রে সহাস্যে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে লাগল।

কেবল রায়মশাই একবার জিজ্ঞাসা করলে—অবিশ্বাস ক'রে নয়, ভিতরের কথা আরও কিছু টেনে বার করবার জন্যেই বোধ হয়—বললে, আপনার যত বাজে কথা। কিছু প্রমাণ আছে?

জগদীশ রায়মশায়ের মূর্খতায় হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, বিলক্ষণ! প্রমাণ নেই তো কি! রাজ্যশুদ্ধ লোক একথা জানে। তারা কি প্রমাণ না পেয়েই বলে? বলুন, বটে কি না!

এমন যুক্তির উপর আর কথা চলে না।

অরবিন্দ বললে, বটেই তো। যা রটে তার কতক বটে, বুঝলেন? আমাদের দেশের বড়লোকদের কথা আর বলবেন না।

ব'লে নাক সিঁটকালে।

রায়মশাই ব'লেই বেকুব। কিন্তু বেকুব সে হ'ল না, সকলের সঙ্গে সমানে হাসতে লাগল।

অরবিন্দ "দেশের কীর্ত্তি"র নিয়মিত পাঠক। শুধু "দেশের কীর্ত্তি" নয়, এক পয়সা দামের যতগুলি সাপ্তাহিক সরস পত্রিকা আছে সবগুলি নিয়মিত কিনে পড়ে।

বড়লোকের কেচ্ছার আলোচনায় সে সগর্ব্বে সুমুখের

নজ্‌রুল

শিল্পী — শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

দিকে এগিয়ে এসে বললে, চিনি সবাইকে মশাই। পাঁচ বছর হ'ল ক'লকাতায় এসেছি—চিনতে আর কাকেও বাকি নেই। দেশের ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে।

—যা ব'লেছেন!

উৎসাহ পেয়ে অরবিন্দ চোখ পাকিয়ে বললে, আর শুনেছেন আমাদের দেশপূজ্য কনকবাবুর কথা?

কথাটা আজকের বিকেলের কাগজে বেরুলেও এরই মধ্যে সবাই শুনেছে। তবু—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥

সবাই আর একবার অরবিন্দের মুখে শোনবার জন্যে গ্রীবা বাড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—না, শুনিনি তো। কি রকম—শুনি, শুনি।

এতগুলি লোকের কূপমণ্ডূকতায় দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে অরবিন্দ বললে—আর শুনি, শুনি! ক'লকাতা শহর তোলপাড় হয়ে গেল, আর আপনারা অম্লানবদনে বলছেন, না শুনিনি তো। কি যে মেসের কোটর চিনেছেন! আপিসের ছুটি হবে, আর ছুটতে ছুটতে এসে গুহায় ঢুকবেন। কৌতূহল ব'লে কোনো পদার্থ যদি আপনাদের মধ্যে থাকে!

সকলে নিঃশব্দে এই তিরস্কার সহ্য করলে।

স্কুল-মাষ্টারের মতো ধমক দিয়ে অরবিন্দ বললে, আমার ঘর থেকে "দেশের কীর্ত্তি"খানা নিয়ে এসে প'ড়ে দেখুন।

জগদীশ উৎসাহভরে তার মোটা গলায় চীৎকার ক'রে বললে, কিনেছেন না কি? বেশ, বেশ! অরবিন্দ-বাবু আছেন ব'লে মাঝে মাঝে বুঝতে পারি, ক'লকাতা শহরে আছি।

অরবিন্দ মনে মনে পুলকিত হ'লেও প্রকাশ্যে গোঁ গোঁ ক'রে বললেন, ওই আনন্দেই তো আছেন। মাঝে মাঝে দু' একটা পয়সা বাজে খরচ করবেন। ক'লকাতা শহরে থাকতে গেলে অমন পয়সায় গিঁট বেঁধে থাকলে চলে না, বুঝলেন?

মনোহর তখন ছুটেছে অরবিন্দের ঘর থেকে কাগজখানা আনতে।

রায়মশাই অরবিন্দের অভিযোগ নিঃশব্দে হজম ক'রে বললে, রাস্তায় হকারের চীৎকার শুনছিলাম বটে। খুব বিক্রি হ'চ্ছে, না।

—বিক্রি?—অরবিন্দ যেন অকস্মাৎ বোলতার কামড় খেয়ে চমকে লাফিয়ে উঠল।

বললে, বলেন কি মশাই! এক পয়সার কাগজ, বেরুবার এক ঘণ্টার মধ্যে আমি কিনেছি দু'পয়সা দিয়ে। এতক্ষণ বোধ হয় চার পয়সায় উঠেছে।

একবার রাস্তার দিকে চেয়ে বললে, উঃ! কি বিক্রি! selling like hot cakes! ভিড় ঠেলে যায় কার সাধ্য!

মনোহর বারান্দা থেকেই চীৎকার ক'রে পড়তে পড়তে ঘরে ঢুকল:

কোমরেতে চন্দ্রহার, হাতে ফুলের বালা,
চিনতে পার কে নটবব এমন ভুবন-আলা?
ফুল্-ধনুকে টান্ জুড়েছে পৃথ্বী টলমল্,
কোন্ তরুণীর বুকের মাঝে ফুট্‌ল শতদল!
ঈশান কোণে মেঘ লেগেছে নদেয় এল বাণ,
চিরকুমার ব্রহ্মচারীর প্রাণ করে আনচান।
সাপের লেখা, বাঘের দেখা, রাষ্ট্রপতির দান,
রূপকুমারীর গেল ভেসে কুল-শীল-মান।
কনক শতদলের হ'ল দার্জ্জিলিঙে ছেলে।
নগরবাসী, দেখবি আসি সমস্ত কাজ ফেলে।

এই ছড়াই বটে। অফিস থেকে আসবার পথে সকলেরই কিছু কিছু কানে গেছে। অবশ্য এর সঙ্গে হকার তার নিজের সাহিত্য-প্রতিভা দিয়ে আরও দুটো লাইন যোগ ক'রেছে:

দুটি পয়সা খরচ ক'রে
দেখুন মশাই প'ড়ে প'ড়ে।

ছড়ার উপর একখানা বাজে ছবিও আছে: একটি লোক, চোখে চশমা, গোঁফ-দাড়ি কামান, হাতে ফুলের গহনা, কোমরে চন্দ্রহার, ফুলধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সামনে একটি মেয়ে তার পায়ের তলায় একটি শিশুকে রেখে হাঁটু গেড়ে করযোড়ে ব'সে আছে।

মেসের সবাই উল্লাসে হরিধ্বনি ক'রে উঠল।

পরের দিন দশটার সময় সুকুমার ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা প'রে স্কুলে গেল। চাদর ছিল না, একজনের কাছ

থেকে ধার ক'রে নিলে। একটু অসুবিধা হ'ল জুতো জোড়া নিয়ে। বেচারার একেবারে অন্তিম সময় উপস্থিত। তালিতে তালিতে তার আর তালি মারবার স্থানও অবশিষ্ট নেই। সব কটি আঙুলেরই স্থান হয়, কেবল কনিষ্ঠাঙ্গুলির কিয়দংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে। তার আর কি করা যায়! জুতো ধার মেলে না।

হেড মাষ্টার অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা মহোল্লাসে বরণ ক'রেও নিলেন না, আবার মুখ ফিরিয়েও রইলেন না। শিক্ষক এক ছাড়ছেন, আর আসছেন। ক্রমাগত যাওয়া-আসা দেখে দেখে তাঁদের মনে সম্ভবত মায়াবোধ জন্মেছে। এ সংসার—বিশেষ ক'রে এই স্কুল যে পান্থনিবাস—সে সম্বন্ধে কারও আর তিলমাত্র সংশয় নেই। ফলে আহ্বানও নেই, বিসর্জ্জনও নেই—স্কুলের এই হয়েছে দস্তুর।

ঘণ্টা বেজে গেছে। তখন আর কারও গল্প করার অবসরও নেই। সবাই নিজের নিজের ক্লাসে চ'লে গেলেন।

ক্লাসে গিয়ে সুকুমার একটু বিব্রত অবশ্য বোধ করলে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তা কাটিয়ে উঠল। সে সুপুরুষ এবং একমাত্র জুতো জোড়া ছাড়া পোষাকও তদুপযুক্তই ক'রে এসেছিল। ভগবদ্দত্ত রূপের একটা ঐশ্বর্য্য আছে। তার পক্ষে মানুষের চিত্তজয় করা সহজ হয়। সুকুমার ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ ক'রে দেখলে, মারাঠাদের সম্বন্ধে একটি ছেলেরও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কি যেন ফিসফাস করছে, মুখ টিপে টিপে হাসছেও। পিছনের বেঞ্চ তো প্রায় বাজার বসাবারই চেষ্টায় আছে। সুকুমার বই বন্ধ ক'রে প্রথমে সামনের বেঞ্চের দুটি ছেলের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে। নিতান্ত ঘরোয়া গল্প। দেখতে দেখতে বাকি ছেলেগুলিও ক্রমে ক্রমে তাতে আকৃষ্ট হ'ল। তারপরে কখন যে সে লর্ড ডালহৌসির "নিরপেক্ষ নীতি" আর মারাঠাদের ঘরাও মনোবিবাদের কথা পড়িয়ে দিলে—ঘণ্টা বাজবার আগে পর্য্যন্ত কেউ টেরও পেলে না। হেড মাষ্টার সামনের বারান্দা দিয়ে যখন চলে গেলেন, দেখে গেলেন ক্লাসে নিবিড় শান্তি বিরাজ করছে। আপন কৃতকার্য্যতায় সুকুমারের সাহস বেড়ে গেল। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়াতে লাগল।

টিফিনের সময় যখন সে কমন-রুমে এল, তখন সেখানে শিক্ষকদের মেলা ব'সে গেছে। হরেক বয়সের শিক্ষক। বুড়ো আছেন, আধ-বুড়ো আছেন, ছোকরাও আছে। আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায়, আর হুঁকোর শব্দে ঘর সরগরম। তৃতীয় শ্রেণীর ইংরিজি পড়িয়ে ফিরতে সুকুমারের একটু দেরীই হয়েছিল অর্থাৎ সকলে যেমন ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কমন-রুমে এসে জুটেছিলেন, সুকুমার তা করেনি। সে তার পড়ান শেষ ক'রে তবে এসে জুটেছে।

অঙ্কের মাষ্টার যদুপতিবাবু লিক্‌লিকে লম্বা। খিট্‌খিটে মেজাজ। বললেন—কি মশাই, এত দেরী যে! ঘণ্টা শুনতে পাননি নাকি?

সুকুমার একটু অপ্রস্তুত হয়ে সকলের মুখের দিকে চাইতে চাইতে বললে, না, এই তো ঘণ্টা পড়ল।

ভূগোলের মাষ্টার অশ্বিনীবাবুর আফিম খাওয়ার অভ্যাস আছে। রোগা। গাল ভাঙা। গলাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। চোখ সকল সময়েই অর্দ্ধনিমীলিত। একটু রসিক লোক।

বললেন—এইতো নয় মশাই, পাঁচ মিনিট হ'ল পড়েছে। পণ্ডিত মশাই এক কলকে শেষ করেছেন। ক'রে আমারটার দিকে মার্জ্জারের ন্যায় দৃষ্টি দিচ্ছেন।

সুকুমার হাসতে হাসতে ছোকরাদের দলে গিয়ে বসল।

সায়ান্সের রমেশও সদ্য পাশ করা এম-এস্‌-সি। বললে, ক্লাস ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না। না মশাই?

সুকুমার মাথা চুলকুতে লাগল।

বাংলার আশুবাবু সিগারেটটা শেষ ক'রে বললেন, এখন নতুন নতুন খুব ভালো লাগবে মশাই। তারপরে···আপনার বুঝি এই প্রথম, না, আরও দু'পাঁচ জায়গায় হয়েছে?

—এই প্রথম।

—তাইতেই। পড়ান, পড়ান। কি ওটা?

ইতিহাসের শিববাবু একখানা "দেশের কীর্ত্তি" নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কাগজখানা খুলতে খুলতে বললেন; "দেশের-কীর্ত্তি"—শুনুন:

কোমরেতে চন্দ্রহার, হাতে ফুলের বালা,
চিনতে পার কে নটবর এমন ভুবন-আলা?
ফুল্‌-ধনুকে টান জুড়েছে পৃথ্বী টলমল,
কোন তরুণীর বুকের মাঝে ফুটল শতদল!

সমবেত শিক্ষকরা লাফিয়ে উঠলেন।

—দেখি, দেখি, দেখি!

—কোথায় পেলেন?

—আমি শুনে পর্য্যন্ত খুঁজছি। বাজারে এক কপি নেই।

—দেখি, দেখি।

শিবুবাবু সকলের হাত থেকে কাগজখানা সুকৌশলে বাঁচিয়ে একটা বসবার স্থান খুঁজতে খুঁজতে বললেন, সেকেণ্ড ক্লাসের একটা ছেলে ক্লাসে ব'সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল। দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে কেড়ে এনেছি।

ব'লে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসলেন।

অশ্বিনীবাবু পরম সমাদরে তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, বেশ করেছেন। পড়ুন।

শিববাবু পড়তে লাগলেন:

একটি চড়ুই পাখী আমাদের কানে কানে এক গোপন সংবাদ দিয়া গিয়াছে। অল্প কয়েক দিন হইল, দার্জ্জিলিঙে বাংলার ভাবী যুবরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এত বড় আনন্দ সংবাদ বাংলার মুকুটহীন রাজা কেন যে গোপন রাখিয়া তাঁহার অগণিত দেশভ্রাতার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিলেন তিনিই জানেন। শুনিলাম, নবকুমারের পিতামহ সুতিকাগৃহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রসূতির জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়াও তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশা করিতেছি, আগামী সংখ্যায় ফটোগ্রাফসহ এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিব।

যদুপতিবাবু লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, দেখেছেন মশাই কাণ্ড! কি সর্ব্বনাশ!

পণ্ডিত মশাই কেশবিরল ছোট মাথাটি নেড়ে টিপে টিপে বললেন, ডুবে জল খাওয়ার মতলব। ভেবেছিল, শিবের বাবাও টের পাবে না।

আশুবাবু চীৎকার ক'রে বললেন—বাবা, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। হ্যাঁ, কাগজ বটে "দেশের কীর্ত্তি"। একেবারে হাঁড়ির খবরটি টেনে বার করে। আর কি ভাষা! কলম ধরতে শিখেছিল বটে। একটা কার্টুনও দিয়েছে না? দেখি, দেখি।

শিবুবাবু তাঁর হাতে কাগজখানা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আসছে সংখ্যাটা বের হওয়ামাত্র কিনতে হবে, নইলে আর পাওয়া যাবে না। শতদলবাসিনীর ছবিটা তো একবার দেখা দরকার। কি বলেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

যদুপতিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন—শতদল বুঝি সেই মাগীর নাম।

অশ্বিনীবাবু চোখে একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে বললেন, হুঁ। তবে আর শুনলেন কি? কনক-শতদলের ···কি হে?

আশুবাবু ছড়াটা বোধ হয় ছাত্রদের ছন্দশিক্ষাদানের অভিলাষে মুখস্থ করছিলেন। বললেন,

> কনক-শতদলের হ'ল দার্জ্জিলিঙে ছেলে।
> নগরবাসী, দেখবি আয় সমস্ত কাজ ফেলে।

অনবদ্য!

ক'টি ছেলে কমন-রুমের বাইরে উঁকি দিচ্ছিল। অন্য শিক্ষকরা ছড়ায় মশগুল থাকায় তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি। সুকুমারের চোখে চোখ পড়তেই তারা স'রে গেল।

তাদের জন্যেই হোক, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, একজন দেশমান্য নেতার সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি, ভদ্র-মহিলাকে মাগী সম্বোধন সুকুমারের কোথায় যেন বিঁধছিল। কিন্তু এতগুলি লোকের আনন্দ উল্লাসে বাধা দিতে সে সঙ্কোচ বোধ করছিল।

একটু ইতস্তত ক'রে বললে—কিন্তু এ সব মিথ্যাও তো হ'তে পারে।

আশুবাবু জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শিবুবাবু তাঁকে ঠেলে দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললেন—পারে। তাহ'লে কনক চৌধুরী মানহানির মামলা আনুক।

তাঁর জ্বলন্ত চোখের ভঙ্গি দেখে সুকুমার থতমত খেয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে একবার শুধু আবৃত্তি করলে, মামলা··· তা মামলা···

টেবিলে একটা চাঁটি দিয়ে শিবুবাবু বললেন—হাঁ, মামলা করুক। তাহ'লে বুঝব।

রমেশ সুকুমারের সাহায্য করতে এল। বললে—দেখুন, কংগ্রেসের নেতা কোর্টে যান কি ক'রে!

শিবুবাবু জিভে টাকান দিয়ে বললেন—হুঁ, হুঁ, কোর্টে যান কি ক'রে! মশাই, এ "দেশের কীর্ত্তি"। বড়লোকের কেলেঙ্কারী বার করা ব্যবসা। বিশেষ প্রমাণ না পেলে কখনই অত বড় কথা ছাপতে সাহস করত না। তা জানেন? ও আমাদের মতো নিরীহ স্কুল-মাষ্টার নয়।

ব'লে সকলের দিকে সগর্ব্বে চাইতেই সকলে মাথা নেড়ে একবাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলেন এবং এই নিয়ে যখন কলগুঞ্জন উঠছে তখন যদুপতিবাবু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দু'টো নীচের ক্লাসের ছোট ছেলের কান ধ'রে হিড়হিড় ক'রে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলেন। তাঁর ক্লাসে ভয়ে কারো টঁ্যা ফোঁ করার উপায় নেই। ছেলেরা নিশ্বাস ফেললে শুনতে পান, কান এমন সজাগ।

—ওখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে কি করছিলি রে?

ছেলেদের সাড়া নেই।

—কি করছিলি?

টানের চোটে ছেলেদের কান লাল হ'য়ে উঠল। ছেঁড়বার উপক্রম।

ছেলেদের হয়ে জবাব দিলে রমেশ-মাষ্টার। বললে, আপনাদের রসালাপ শুনছিল আর কি?

যদুপতিবাবু ছেলেদের দুই গালে দুই চড় দিতেই তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে বাঁচল। মাষ্টাররা তা দেখে একটু ঠোঁট কুঁচকে হাসলেন। যদুপতিবাবু প্রহারের জন্যে বিখ্যাত।

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ল। রমেশ যাওয়ার সময় শিবুবাবুকে ব'লে গেল—কাগজখানা যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবেন যেন শিবুবাবু। আপনার ছেলেমেয়েরা প'ড়ে খুশী হবে।

শিবুবাবু হঠাৎ যেন চমকে গেলেন। তারপর অপ্রস্তুত-ভাবে হাসতে হাসতে ক্লাসে চ'লে গেলেন। যাওয়ার সময় ভুল ক'রেই হোক, অথবা ইচ্ছা ক'রেই হোক, আশুবাবুর কাছ থেকে আর কাগজখানা চেয়ে নিয়ে গেলেন না।

ক্রমশঃ

গ্রহনক্ষত্রের পরিচয় ও জন্মকথা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এস-সি

প্রথমাংশ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌমরুতস্তথা
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারতঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১শ অধ্যায়।

সৃষ্টির আদিযুগে মানুষকে তার সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করতে হ'ত দেহরক্ষার জন্য—আহারের সন্ধানে ও বন্যপশুর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। তার পর কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কৃষির প্রবর্ত্তন হয়, আদি মানব যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে একস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে আরম্ভ করল। তখনই হল সমাজের সৃষ্টি। দলবদ্ধ হয়ে মানুষ বন্যপশুর আক্রমণ হ'তে সহজে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। আবার শস্যাদি উৎপন্ন করায় অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার নিরাকরণ হ'ল। তার পর অবসরকালে জ্ঞানান্বেষণের চেষ্টা হ'ল। তখনই হ'ল সভ্যতার উন্মেষ। মনের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে কল্পনাশক্তি দিল কলাসৃষ্টির প্রেরণা—পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ করল বিজ্ঞান ও দর্শন। তার পর ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানের প্রয়োগের ফলে ফলিত বিজ্ঞানের উৎপত্তি। অল্প শ্রমে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রস্তুত সম্ভব হওয়ায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও অবসর কলা ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সুযোগ উপস্থিত হয়। মধ্যে মধ্যে 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত' কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ কলা ও বিজ্ঞানের বিকাশ বন্ধ করতে পারে নাই। পরন্তু ভরসা আছে যে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হ'লে যখন ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাবে, নব নব দেশ আবিষ্কৃত হবে ও হয়ত রসায়নের সাহায্যে উন্নততর মানব সৃষ্টি হবে তখন আর যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে না।

কোন্ সময়ে মানুষ গ্রহনক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় সঠিক বলা যায় না। হয়ত মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র যেমন তার চারিদিকে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয় সেইরূপ আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে বিস্মিত হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কৌতূহল বৃদ্ধি হ'লে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানবার জন্য সে প্রশ্ন করে তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে। প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেলে আশ্রয় লয় কল্পনার। তাই দেখি কতনা কবি সুন্দর আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র সম্বন্ধে কত কবিতা রচনা করেছন।

গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে তথ্য-নির্ণয় চেষ্টাও চল্‌ছে বহুকাল হ'তে। কৃষি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলের জন্য মানুষকে আকাশের পানে চেয়ে থাকতে হয়। নিয়মিত বারিবর্ষণের জন্য মানুষ প্রার্থনা করত প্রথমে প্রাকৃতিক নানা প্রকার শক্তির নিকট, পরে ঐ শক্তি-মানের প্রতীকস্বরূপ আকাশ স্থিত দেবতাগণের নিকট। পরে গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি বিভিন্ন দেবতা বা দেবলোক ব'লে কল্পিত হয়। পরে গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশের সঙ্গে মানবজীবনের যোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়। ইহার উত্তরে পাই ফলিত জ্যোতিষ। এদেশে জ্যোতিসের চর্চ্চা বহুকাল পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। আর গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি নির্ণয় চেষ্টাই হ'ল গণিত জ্যোতিষের মূল। এদেশীয় পণ্ডিত-গণ বহুকাল পূর্ব্বেই সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর সংক্রমণ ও গ্রহ নক্ষত্রের পরিস্থিতির বিষয়ে অনেক তথ্যই জান্‌তেন। রাশি, লগ্ন, তিথির সৃষ্টিই তার প্রমাণ। বস্তুতঃ পঞ্জিকার পঞ্চাঙ্গ হ'ল বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ। বীজগণিত, জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্রের জন্মভূমি ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা কিরূপ সঠিকভাবে গ্রহণ প্রভৃতির সময় নির্ণয় কর্‌তেন তাহা বাস্তবিক বিস্ময়ের বিষয়।

৩৬" দূরবীক্ষণ—এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরস্থ নক্ষত্ররাজি কেবল দৃষ্টই হয় না ; উহাদের আলোকচিত্র গ্রহণ, বর্ণ-নিরূপণ, উত্তাপ ও এমন কি উহার আভ্যন্তরিক বস্তু-সমূহ নির্ণয় করা যায়। (লিক অবজারভেটারীর সৌজন্যে)

পুরাকালে মানুষ মাত্র স্বীয় চক্ষুর সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র নিরীক্ষণ করত। পরে চক্ষুর সাহায্যার্থ লেন্‌সের (lens) সৃষ্টি হয়। প্রথম লেন্সের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিজের (Archimedes) আখ্যানে। লেন্স-

সমূহের বিভিন্ন প্রকার সংযোগে দূর্বীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এদেশে কবে দূর্বীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার হয় জানা নাই, আকবরের সময়ে স্থাপিত কাশীর মানমন্দিরে ঐরূপ যন্ত্র হয়ত ব্যবহৃত হ'ত।

ইয়োরোপে সর্ব্বপ্রথম দূর্বীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাতা হ'লেন ফ্রান্সদেশীয় লিপারশে নামক জনৈক কাঁচ-ব্যবসায়ী। ইহার অব্যবহিত পরেই ভেনিসের অধিবাসী জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও গালিলি লিপার্শের যন্ত্রাপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ একটা দূর্বীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রে উহার সাহায্যে ৭ই জানুয়ারী ১৬১০ খৃঃ অব্দে গ্রহ নক্ষত্রের স্বরূপ দেখার প্রয়াস পান। ঐদিন জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হ'ল। গ্যালিলিওর যন্ত্রে মানব চক্ষুর ভিতরে প্রবিষ্ট আলোকাপেক্ষা ১০০ গুণ আলোক প্রবেশ করে ও ৫০ মাইল দূরস্থ বস্তু ৫ মাইল দূরে অবস্থিত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অধুনা বৃহত্তম দূর্বীক্ষণের আলোক প্রবেশের ছিদ্রের ব্যাস ১০০ ইঞ্চি, ইহাতে গ্যালিলিও যন্ত্রাপেক্ষা ২৫০০ গুণ আলোক প্রবিষ্ট হয়। মাউণ্ট উলসন্ অবজার্ভেটারীতে শীঘ্রই ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত একটা দূর্বীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। ইহার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের আরও বহু নূতন তথ্যাবিষ্কার সম্ভব হ'বে।

ওরিয়েন নীহারিকা—এইরূপ নীহারিকা হইতে কালে সহস্র সহস্র সূর্য্য বা নক্ষত্রের সৃষ্টি সম্ভব। অনেকের মতে সব নীহারিকা প্রথমে গোলাকৃতি ছিল। পরে ঘূর্ণনের জন্য অন্যরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। (লিক অবজারভেটারীর সৌজন্যে)

মধ্যযুগে যখন কোপার্নিকাস্ প্রচার করেন যে পৃথিবীও অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে তখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এই মতবাদের বিরুদ্ধতা করেন ও ইহার সমর্থকদিগকে উৎপীড়িত করেন। কোপার্নিকাসের পরে টাইকো ব্রাহি ও জোহান কেপ্‌লার্ উক্ত মতবাদের সমর্থন করে বহু গবেষণা করেন বটে কিন্তু গ্যালিলিওই সর্ব্বপ্রথম ইহার স্বপক্ষে চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। তাঁর যন্ত্র সাহায্যে শুক্র ও মঙ্গলের সূর্য্যে ও বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি উক্ত গ্রহের চতুর্দ্দিকে সংক্রমণ লক্ষিত হয়। এই আবিষ্কারের পুরস্কার গ্যালিলিওর আজীবন কারাবাস। কিন্তু সত্যকে গলা টিপে মারা যায় না। আজ স্কুলের বালকও জানে যে কোপার্নিকাসের মতবাদই ঠিক। অবশ্য বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ

স্থির করেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও পদার্থই স্থির নয়। সূর্য্য ও এমন কি নীহারিকাগুলিও ঘুরিতেছে। আইনষ্টাইনের মতে গতিশব্দ আপেক্ষিক।

গ্যালিলিওর পরে অতীত তিনশত বর্ষে কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু ও উল্কা যে আবিষ্কৃত হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। পূর্ব্বোল্লিখিত নূতন শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে আরও কত যে জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হবে তা কে জানে। অদ্যাবধি প্রায় ২০ লক্ষ নীহারিকা দেখা গিয়েছে। প্রত্যেকটী নীহারিকা ২০ লক্ষ সূর্য্যের সমান ভারী ও মোট ১০ লক্ষ নক্ষত্রের জন্মদাতা। সুতরাং প্রত্যেকটী নীহারিকা এক একটী নক্ষত্রগোষ্ঠী বলা যেতে পারে।

অমাবস্যা রাত্রে পরিষ্কার আকাশে যে প্রকার গোলাকৃতি সাদা আবছায়ার পথ দেখা যায় তাকেই ছায়াপথ (Milky way) বলে। এই ছায়াপথ একটী গাড়ীর চাকার ন্যায়, ইহার ব্যাস হল ১৫ হাজার কোটী কোটী (১৫০০০, ০০০০০০০০, ০০০০০০০০) মাইল। হার্শেলদ্বয় (পিতা ও পুত্র) তাঁদের প্রস্তুত দূরবীক্ষণের সাহায্যে ছায়াপথে অগণিত নক্ষত্ররাজি দেখতে পান। ছায়াপথের অন্তর্বর্ত্তী ১১০০০ কোটী নক্ষত্র আছে; ইহাদিগকে ছায়াগোষ্ঠীর (Galactic System) পরিবারভুক্ত বলা হয়—সূর্য্য ইহাদের অন্যতম। এই ছায়াগোষ্ঠীর পরে বিরাট ব্যবধান, তৎপরে আর বহু ছায়েতরগোষ্ঠী (Extra-galactic System) বিদ্যমান। ছায়াগোষ্ঠীর নিকটতম নীহারিকা (w Centauri) থেকে যে আলোক দেখা যায় তাহা ৫২০০০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে রওয়ানা হয়েছিল। (আলোক প্রতি সেকেণ্ড ১৮৬০০ মাইল যায়, সুতরাং এক বৎসরে যায় ১৫০০০০ কোটী মাইল—এই ব্যবধানই আলোক-বর্ষ Light year)। দূরতম নীহারিকা ১৪ কোটী আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান দূরবীক্ষণ অপেক্ষা অধিকশক্তিশালী যন্ত্রে হয় ত আরও দূরস্থ নীহারিকা দৃষ্ট হবে। এইরূপে দূরবীক্ষণের শক্তি বাড়াতে থাকলে কি হবে? সাধারণতঃ মনে হয় যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড অসীম—বিরাট ব্যোমের ভিতর আরও অধিক দূরস্থ নীহারিকাগুলি দেখা সম্ভব হ'বে। কিন্তু আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের (relativity theory) সাহায্যে স্থির হয় যে ব্যোম (space) বক্র ও ব্রহ্মাণ্ড সসীম, অথচ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এ যেন সেই 'অখণ্ডমণ্ডলাকারম্' আইনষ্টাইনের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস ৩২০০ কোটী আলোকবর্ষ। পরে ফ্রিডেমান ও ল্য মেত্র (Le Maitre)

সূর্য্য
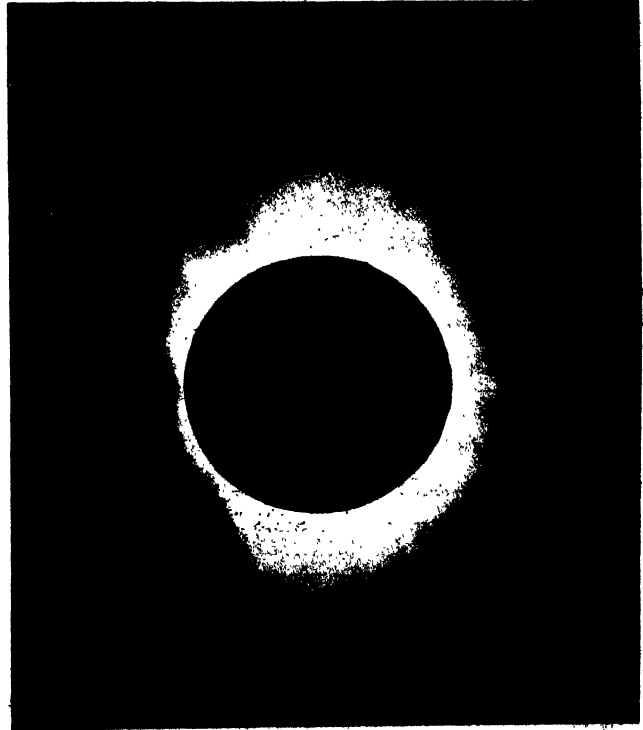
(লিক্ অব্জারভেটারীর সৌজন্যে)

নামক দুইজন পণ্ডিত বলেন যে ব্রহ্মাণ্ড সসীম বটে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধনশীল। এইসব মতবাদ এরূপ জটিল গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত যে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নয়।

এখন আবার আমাদের রাজ্যে ফিরে আসা যা'ক। পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান নক্ষত্র সূর্য্য ছায়াগোষ্ঠীভূত। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে যে গ্রহগুলি উহার

চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে তারা সকলেই সৌরজগতের অন্তর্গত। সৌরজগতের গ্রহগুলির সূর্য্য হ'তে দূরত্ব, আকার ও গুরুত্ব অনুসারে এইরূপ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইন্দ্র (Uranus), বরুণ (Neptune) ও নবাবিষ্কৃত প্লুটো (Pluto)! গ্রহগুলির চতুর্দ্দিকে আবার উপগ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করে। বুধ, শুক্র ও প্লুটোর

ক মঙ্গল গ্রহ খ

ক ও খ—বিভিন্ন আলোকের সাহায্যে আলোক-চিত্র গৃহীত হইয়াছে। (লিক অবজারভেটারীর সৌজন্যে)

কোনও উপগ্রহ নেই। পৃথিবী ও বরুণের প্রত্যেকের ১টী, মঙ্গলের ২টী, বৃহস্পতি ও শনির প্রত্যেকের ৯টী ও ইন্দ্রের ৪টী উপগ্রহ আছে। ইহা ব্যতীত শনির চারিদিকে তিনটী অঙ্গুরীয়ক (Ring) ঘুরছে।

গ্রহ ও উপগ্রহের নিজস্ব আলোক বা উত্তাপ নেই। সূর্য্য ইহাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দেয়। সেইজন্য সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ গ্রহদ্বয় (বুধ ও শুক্র) জ্বলন্ত

বছর আগে বৈজ্ঞানিকগণ মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর অধিবাসীর ন্যায় বুদ্ধিজীবী প্রাণীর বাস অনুমান করেন। মাঝে মাঝে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বেতার যন্ত্রে এক প্রকার অজ্ঞাত শব্দ শোনা যেত। উহা মঙ্গলাধিবাসী প্রেরিত ব'লে মনে হ'ত। পরে গবেষণা দ্বারা পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সৌরজগতে পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোথায় জীবজন্তুর বাসের সম্ভাবনা বিরল। হয় ত অন্য কোথাও জীবের বাসোপযোগী গ্রহ নক্ষত্র থাকতে পারে কিন্তু দূরত্বের জন্য উহা লক্ষ্য করা যায় না। তবে অদ্যাবধি যেরূপ জানা গেছে তাতে মনে হয় যে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অপেক্ষাকৃত নগণ্য এই পৃথিবীতেই মাত্র কয়েক লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে জীবের উৎপত্তি হয়।

গ্রহ উপগ্রহ ব্যতীত সৌরজগতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া যায়। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী পথে কতকগুলি ক্ষুদ্র উপগ্রহ বা গ্রহক (Asteroids) আছে। আকাশে মাঝে মাঝে ধূমকেতু ও উল্কা দেখা দেয়। উল্কা হ'তে উল্কজ প্রস্তর পৃথিবীতে পড়ে। ইহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয়। সূর্য্য ব্যতীত আরও বহু নক্ষত্র ছায়াগোষ্ঠীতে বিদ্যমান। সূর্য্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সি-সেণ্টরী, (Proxy-Centauri) হ'তে বেতার সঙ্গীত ৪ বছর ৩ মাস পরে সূর্য্যে পঁহুছাবে। পৃথিবীবাসী মানব শিশু তার জন্মের
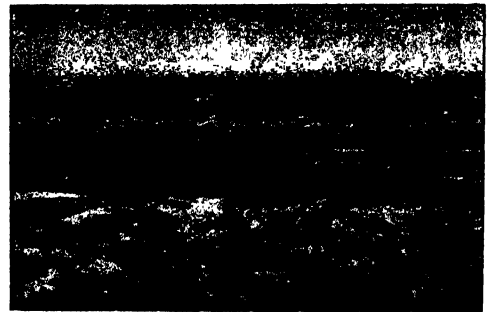
গ সানজোসে ঘ

মাউণ্ট হ্যামিল্টনে গৃহীত আলোকচিত্র—বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণে গ্রহের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কতকগুলি বিবরণ একপ্রকার রশ্মিতে, অন্য কতকগুলি বিবরণ আর একপ্রকার রশ্মির সাহায্যে দৃষ্ট হয়।

উনানের ন্যায় উত্তপ্ত। পরোক্ষে দূরস্থ গ্রহগুলির (বৃহস্পতি, শনি, ইন্দ্র, বরুণ ও প্লুটো) শৈত্য কল্পনাতীত। মাত্র পৃথিবী ও মঙ্গলের উত্তাপ জীবের পক্ষে অনুকূল। কয়েক

৪ বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত নক্ষত্রবাসীর (?) উক্ত কথা অনায়াসে শুনিতে পাবে। সূর্য্য হ'তে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রাবলী আছে। বস্তুত নক্ষত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) লোহিত বা হরিদ্রাবর্ণের দৈত্য (Red or Yellow Giant), (২) সাধারণ নক্ষত্র (Main Sequence) ও (৩) শ্বেত বামন (white dwarf)। প্রথমোক্ত নক্ষত্রগুলি এরূপ অতিকায় যে ইহাদের প্রত্যেকটী ১০ লক্ষ সূর্য্য ধারণ করতে পারে ; ইহাদের বহির্তল (Surface) বৃহৎ হওয়ায় এগুলি অধিক গরম হ'তে পারে না কাজেই ইহাদিগকে লোহিত বা পীত দেখায়। সাধারণ নক্ষত্র-গুলি বিভিন্ন বর্ণের ও ওজনের, কতকগুলি অতিকায় দৈত্য ও কতকগুলি বামন। সূর্য্য ইহাদের অন্যতম। শতকরা ৮০টী নক্ষত্র এই শ্রেণীভুক্ত। শ্বেতবামনগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, গুরু ও উত্তপ্ত। ইহাদের অন্তস্থিত জড় পদার্থের গুরুত্ব আমাদের কল্পনার বহির্ভূত। সাধারণ কয়লা এরূপ ভারী হ'লে গৃহস্থের সারা বছরের প্রয়োজনীয় কয়লা অনায়াসে পকেটে ক'রে নিয়ে যেতে পারা যায়। বায়ু এরূপ ঘন হ'লে সাধারণ পারদের চেয়ে ভারী হ'ত। ইহাদের আভ্যন্তরিক উত্তাপ ১০ কোটী ডিগ্রীরও উপর।
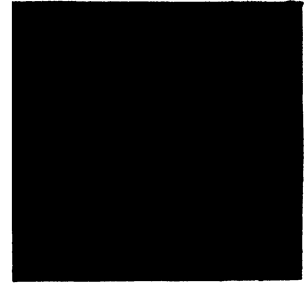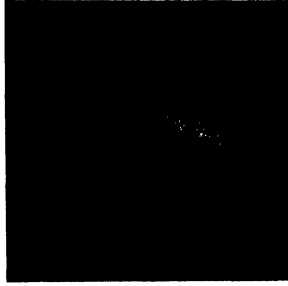
বৃহস্পতি

(ক) বেগুনি রশ্মির সাহায্যে আলোকচিত্র

(খ) উপলোহিত (Infra-red) রশ্মির সাহায্যে আলোক চিত্র

(লিক্ অবজারভেটারীর সৌজন্যে)

চন্দ্র—চন্দ্রস্থ মরুভূমির সদৃশ পাহাড়রাজি ও তন্মধ্যস্থ গহ্বর (যাহা পূর্ব্বে খাল বলে মনে হয়) দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রের উপাদান ভস্মের ন্যায় একবার বস্তু। ইহা যেমন সহজে সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা ভীষণ উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ রশ্মি অপসৃত হইলে দারুণভাবে ঠাণ্ডা হয়। এই নিমিত্ত চন্দ্রে জীবজন্তু বা গাছপালা বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।
(লিক্ অবজারভেটারীর সৌজন্যে)

এ সব নক্ষত্র ছাড়া আরও কতগুলি তারকা আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী দ্বৈত (binary stars), একটী আর একটীকে প্রদক্ষিণ করে। কতকগুলি তারকা কখনও উজ্জ্বল আবার কখনও বা স্তিমিত—এগুলি মিটমিট-

কারী নক্ষত্র (Cepheid variables)। অপর কতকগুলি তারকা গোলকাকৃতিতে একত্রে থাকে (Globular clusters)।

আগেই বলা হ'য়েছে যে আমাদের এই ছায়াগোষ্ঠীতে ১১০০০ কোটী তারকা আছে। কোনও লোকের এই সমস্ত নক্ষত্র গণনা করা সম্ভব নয়। প্রতি সেকেণ্ডে ৫টী নক্ষত্র গণনা করলে সমস্ত গণনা করতে দুই হাজার বছরের অধিক লাগ্‌বে। এই তারকাগুলি পৃথিবীর লোককে বণ্টন করলে প্রত্যেকের ভাগে ৬০টী ক'রে পড়ে।

এখন আর একবার বিশ্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা যাক্‌। ১ বৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ৬০ কোটী মাইল পর্য্যটন করে। এই কক্ষকে ১ ইঞ্চের ১ আনা ভাগ ব্যাসের আলপিনের মাথা মনে করা যাক্‌। এই মাপ অনুসারে সূর্য্য এত ক্ষুদ্র ধূলিকণায় পর্য্যবসিত হয় যে ১ ইঞ্চে ৩৫০০ সূর্য্যের ব্যাস ধরতে পারে। পৃথিবী এত ক্ষুদ্র হ'বে যে কোনও প্রকার অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উহা দেখা অসম্ভব। নিকটতম নক্ষত্র (Proxi. centauri) ১ মাইল দূরে অবস্থিত থাকবে ও সূর্য্যের নিকটস্থ নক্ষত্রসমূহ গড়ে সিকি মাইল অন্তর ধূলিকণার ন্যায় বোধ হ'বে, ও সবগুলি ১ ঘন মাইলের মধ্যে অবস্থিত থাকবে। এরূপে বহুশত মাইল প্রতিদিকে গেলে ধূলিকণাগুলি আরও কমে যাবে। সমস্ত ছায়াগোষ্ঠী এই অনুপাতে এসিয়া মহাদেশাপেক্ষা সামান্য বড় হ'বে। ছায়াগোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে পঁহুছাতে হ'লে ১২০০ মাইল ভ্রমণ করতে হ'বে। তবে আমরা আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মহাদেশ পাব। এইরূপে মোটামুটি ৩০,০০০ মাইল সহস্র কোটী নক্ষত্র সম্বলিত এক একটি নক্ষত্রগোষ্ঠী থাকবে। সর্ব্বসমেত ২০ লক্ষ নক্ষত্রগোষ্ঠী আমাদের এই মডেল অনুযায়ী ৩০ লক্ষ মাইল লম্বা, চওড়া ও উঁচু একটি স্থানে স্থিত কল্পনা করতে হ'বে। এই বিরাট ব্যোমের মধ্যে নক্ষত্রগুলি অপেক্ষাকৃত এত অল্পসংখ্যক যে আমাদের চিত্র অনুযায়ী মোট ৮০ মাইল এক একটি নক্ষত্র আছে অর্থাৎ কলিকাতা থেকে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত একাধিক ধূলিকণা নেই। সুতরাং মহাব্যোম যে কিরূপ নির্জ্জন তাহা কল্পনা করা যেতে পারে। অধুনা পণ্ডিতগণ স্থির করেছেন যে মহাব্যোমের তথাকথিত শূন্য প্রদেশে বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন পদার্থের অণু (ions) থাকতে পারে।

স্মারকস্বরূপ গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া হ'চ্ছে—

	ওজন	ব্যাস	ঘনত্ব	আবর্ত্তনকাল	সূর্য্য হ'তে দূরত্ব	উত্তাপ	আলোকশক্তি প্রতি বর্গ ইঞ্চে
পৃথিবী	১.৬৮×১০^{২৩}	৭৯১৪	৫.৩৭	১ বৎসর	৯.২৮×১০^{৭}	০°—৩৫°	
	মণ	মাইল			মাইল		
ক্ষুদ্রতমগ্রহ		পৃথিবীর তুলনায়					
বুধ	.০৪	.৩৯	—	.২৪	.৩৯	৬৬২°	
বৃহত্তম গ্রহ							
বৃহস্পতি	৩১৭০	১০.৯৫		১১.৮৬	৫.২০	—২৭০°	
দূরতম গ্রহ							
প্লুটো				২৪৮	৩৯.৮	—৪০০°	
চন্দ্র	.০১২৬	.২৪	.৫০	..০৩		দ্রুত পরিবর্ত্তন	
সূর্য্য	৩৩২০০	১০৮.৮	.২৮	—	—	১০০০০০	৫০ বাতি শক্তি (candle-power)
সূর্য্যের	সূর্য্যের তুলনায়			আলোকবর্ষ			সূর্য্যের তুলনায়
নিকটতম নক্ষত্র (Prox-cent.)				৪.২৭		২৭৫০	১।২০,০০
লোহিত দৈত্য (Betelgeux)	৪০	১½ কোটি	২.২×১০^{৮}	২০০		২৫৫০	১৬০০

শ্বেতগমন　৮৫　··২৭　১ × $১০^{৬}$　৮·৬৫　　১০,০০০　১।৪·০
(Sirins. B)

	ওজন	ব্যাস	ঘনত্ব	দূরত্ব	উত্তাপ	আলোক শক্তি
ছায়া নীহারিকা (ছায়া গোষ্ঠী)	১১০০ কোটী	৩৫ লক্ষ কোটী	$১০^{২১}$			
নিকটতম নীহারিকা (M 33)				৫২০০০০ আলোকবর্ষ		
দূরতম নীহারিকা				১০ কোটি আলোকবর্ষ		
মহাব্যোম	২০ লক্ষ নীহারিকা	৩১০০ কোটী আলোকবর্ষ	$১০^{২৭}$			

মোট নীহারিকা সংখ্যা—২০ লক্ষ

প্রতি নীহারিকায় গড়ে নক্ষত্র সংখ্যা—২০ লক্ষ

ছায়াগোষ্ঠীর নক্ষত্র সংখ্যা—১১,০০০ কোটী

আলোকের গতি—১,৮৬০০০ মাইল প্রতি সেঃ

আলোকবর্ষ—৬,০০০০০ কোটী মাইল

বিশ্বের মোট পরমাণু সংখ্যা $১০^{৭৯}$ ইলেকট্রন, প্রোটন, পসিট্রন ও নিউট্রন

প্রতি নক্ষত্রে গড়ে পরমাণু সংখ্যা—$১০^{২৬}$

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

দুই

পরদিন হইতে সুরু হইল তপেশের চাকুরী-জীবন। নাইট্ ডিউটি। রাত দশটা হইতে শেষরাত্র অবধি। প্রত্যহ।

বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতি যখন গভীর ঘুমে ঢলিয়া পড়ে, সংবাদপত্র আপিসের নিশাচররা জাগিয়া থাকে স্ব স্ব স্থানে।

লাইনো মেসিনের খট্ খট্ খটাস্ শব্দ। উপরে-নীচে প্রিণ্টারের বারে বারে ওঠা-নামা। কপি লইয়া বেয়ারাদের আনাগোনা। উপরে প্রুফ-রীডাররা প্রুফ লইয়া ব্যস্ত। সাব্-এডিটর কাঁচি দিয়া অপর কাগজ হইতে সংবাদ আহরণ করিয়া 'নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র' বলিয়া চালাইয়া দিতেছেন। নাইট্-এডিটর ফোনে সংবাদ কুড়াইয়া লইতেছেন। নীচে প্রেস-ঘরে 'গেলি'র সামনে নিঃশব্দে উপুড় হইয়া দাঁড়াইয়া কম্পোজিটররা চোখের মাথা খাইয়া সারা রাত অক্ষরের পর অক্ষর তুলিয়া যাইতেছে। কারেক্টার, ইম্পোজিটর, মেক্-আপ্-ম্যান, লাইনো-ম্যান, নিদ্রাবিজয়ী বীরের দল বিড়ি চুষিয়া চা খাইয়া আপন আপন কাজে ব্যস্ত।

বাহিরে নিঝুম নিশীথ নগরী। ঘুমের একচ্ছত্র রাজত্ব। রাস্তায় জনপ্রাণী নাই। ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। দেহবিক্রয়-বিপণির চৌকাঠেও বুঝি এখন আর রঙ্চঙ্ মাখিয়া বসিয়া নাই—তন্দ্রাতুর একটী কঙ্কাল-করুণা-ও।

নিঝুম নিস্তরঙ্গ কলিকাতা।

তপেশ সহকর্মীদের সঙ্গে আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে ডুবিয়া থাকে। চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর উপুড় হইয়া শ্যেন-দৃষ্টি দিয়া প্রুফ্-রীডারগণ পাতি পাতি করিয়া ভুল খুঁজিয়া দৌড়াইতেছে—শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন, প্যারার পর প্যারা, গ্যালির পর গ্যালি। একটু এদিক-ওদিক হইলে বিপদের সম্ভাবনা—ভুল যে ভুলই থাকিয়া যাইবে। দৃষ্টি একটু পিছ্‌লাইলেই একটা সামান্য মহা-ত্রুটি কাল সকালে সমগ্র দেশের শত সহস্র পাঠকের অনভ্যস্ত চক্ষু এড়াইয়া গেলেও ম্যানেজার ও সম্পাদকের খানাতল্লাসী চোখে যাইয়া ধাক্কা খাইয়া পড়িবেই পড়িবে।

রাত ৩টা, কি ৩৷৹টা, কোন কোন দিন বা ৪টা পর্য্যন্তও কাজ চলে। তার পর উপরে-নীচে হাঁক-ডাক। চারিদিকে ব্যস্তসমস্ত ভাব। নাইট্-এডিটর পেজ-প্রুফে চোখ বুলাইয়া শুইতে যান। ঘড় ঘড় শব্দে রোটারী মেসিন্ শেষ রাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে। তারপর লৌহ-দানবটার জঠর হইতে বাহির হইয়া আসে মুদ্রিত কাগজের ধাবমান স্রোত, ভাঁজ হইয়া পাতা কাটিয়া মাটিতে আসিয়া পড়ে স্তূপের পর স্তূপ।

সকালে দুয়ারে দুয়ারে রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে হকাররা জোর গলায় হাঁকে। মেসে, হোটেলে, গৃহে, দোকানে, রেল-ষ্টিমারে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে দেখিতে দেখিতে। মেদিনীপুর হইতে মস্কো, হঙ্কং হইতে হনলুলু, এক নিঃশ্বাসে ঘুরিয়া আসে পাঠকরা। আটলান্টিকের ওপারের হেরফের আর এপারের হালচাল ভাল করিয়া বুঝিতে চায় অর্থনীতির মেধাবী ছাত্র। দালাইলামা, লিট্‌ভিনফ্ আর গ্রেটাগার্ব্বো ; টেষ্ট ম্যাচ, ডক ধর্ম্মঘট আর পি-ই-এন ক্লাব ; জাপানী শুল্কনীতি, মার্কিনী নিউ ডিল আর বাঙ্গলার পাট নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা—কর্ম্মব্যস্ত জনগণ চোখ বুলাইয়া যায় বাছিয়া বাছিয়া আপন আপন প্রয়োজন মত।

সংবাদপত্র! ব্যানার, টপ্-হেডিং, ডবোল কলম, ইন্‌সেট্, ইন্‌ভেণ্ট—ডরিক, ইটালিক, পাইকা, স্মল পাইকার অজস্র ছড়াছড়ি! সমগ্র বর্ত্তমান দুনিয়া প্রতিফলিত গুটিকয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে!

সকালে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পক্ককেশ ভুয়োদর্শী পাঠক মহাশয়ও জানেন না ইহার এক একটী অক্ষর কাগজের পাতায় ফুটিয়া উঠিতে আবশ্যক হইয়াছে কত যত্ন, কত কষ্ট, কত শ্রান্তি ; প্রয়োজন হইয়াছে কত নিদ্রাপহরণ, কত চোখের শক্তির অপচয়, কত দেহের প্রাত্যহিক আয়ুরাহুতি,—তিলে তিলে, অজানিতে, যান্ত্রিক অভ্যস্ততায়!

রাত্রে কাজ শেষ হইলে নিকটে যাহাদের বাসা তাহারা বাসায় যায়। আর সকলে, কেউ বা মেঝেতে কাগজ পাতিয়া শুইয়া পড়ে, কেউ বা টেবিলের উপর সটান হইয়া পড়ে, কেহ কেহ চেয়ারের পিঠে শ্রান্ত দেহ এলাইয়া দেয়। সকাল ৭টা কি ৭৷৹টায় ঘুম ভাঙ্গে। যার যার বাসায় ফিরে।

তপেশের বাসায় পৌছিতে বেলা আট্‌টা বাজে। তাহার যাইবার পূর্ব্বেই আপিসের সাইকেল-পিয়ন 'ভ্যান-গার্ড' দিয়া যায়।

তপেশের আজকাল খবরের কাগজ পড়িতে ভাল লাগে না। অথচ একদিন ছিল যখন তপেশ কলেজ ষ্ট্রীটের ওয়াই-এম-সি-এর নীচে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া সংবাদ পড়িয়াছে। হায়! আজ আর সেই ব্যগ্রতা নাই। কতকটা রাত্রি জাগরণজনিত ক্লান্তি, কতকটা সংবাদ-সরবরাহের ভিতরকার রহস্য উৎকটরূপে উৎঘাটিত হইয়া গেছে বলিয়াই। আগেভাগে গ্রীণরুমের গোপনতা দেখিয়া আসিয়া পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যেমন ভাল লাগে না আর।

তপেশ সংবাদের স্তম্ভগুলিতে চোখ ডুবাইয়া দেখে তাহার কাটা ভুলগুলি যথাযথ শুদ্ধ হইয়া আছে কিনা। তারপর থলে লইয়া বাজার যায়।

বাজার করে স্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী। যেদিন মাছ আসে সেদিন তরকারী আনে না। মাছের ঝোল আর ভাতেই বেশ চলে দুজনের। যেদিন তরকারী আসে, মাছ হয় না।—ডাল আর তরকারীই যথেষ্ট!

দুপুরে ঘণ্টা তিনেক ঘুমায়। বিকেলে ছেলে পড়াইতে যায়। সন্ধ্যার পর খাইয়া দাইয়া আবার ঘুমায়। কোনদিন বা কলম লইয়া বসে, অসমাপ্ত গল্পটা শেষ করে, অথবা সমাপ্ত কবিতাটি ফ্রেস্ করিয়া রাখে।

তপেশ স্ত্রীকে দশটা বাজিবার মিনিট কয়েক আগে ডাকিয়া দিতে বলিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়ে।

মঞ্জুলীর চোখের পাতা ছাইয়া ঘুম আসে। চোখে জল দিয়া জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের লোক চলাচল দেখে। অন্ধকারে রাস্তার গ্যাসের আলোয় ঘড়িতে কটা বাজে ঘন ঘন দেখিতে থাকে। কোনদিন বা শেলাই লইয়া বসিয়া ঝিমায়।

ঘড়িতে দশটা বাজে-বাজে হইলে মঞ্জুলী ডাকে, "ওঠ, সময় হয়েছে।"

তপেশ ডাক শুনিয়া রোজই ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসে। অধিকাংশ দিনই সে ঘুমের চোখে আবার শুইয়া পড়ে। আবার মঞ্জুলী ডাকে। তপেশ রাগিয়া বলে, "আঃ বিরক্ত করো না।"

"দশটা বেজে গ্যাছে যে।"

"বেশ হয়েছে।"

"আজ আপিস যাবে না তা হ'লে?"

"আর একটু পরে।"

এক একদিন মঞ্জুলী-ও হয়ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে দৈবাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত ১০৷৷০টা কি এগারটায় ওপারের জমিদার বাড়ীর গেট বন্ধ হওয়ার শব্দে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। মঞ্জুলী স্বামীকে জোরে দেয় ধাক্কা, "ওঠ, শাগ্‌গীর ওঠ, এগারটা বাজে।"

তপেশ উঠিয়া বসিয়া চোখ কচলাইতে কচলাইতে রাগিয়া উঠে, "রাত দশটায় ডেকে দেবার উপকারটুকুও তোমায় দিয়ে হবে না।"

মঞ্জুলীও গরম হইয়া উঠে, "তোমার না হয় রাত-জাগা কাজ, সবার তো আর রাত-জাগা ব্যবসা নয়।"

"কথার পিঠে কথা বল্‌তেই শুধু শিখেছিলে," বলিয়া তপেশ জামাটা গায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হয়।

মঞ্জুলী পিছে পিছে সদর দুয়ার পর্য্যন্ত যায়। রাস্তায় নামিয়া তপেশ মাতালের মত টলিতে টলিতে চলে। চোখে তখনও ঘুমের ঘোর। মঞ্জুলী বার-দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। কিসের আশঙ্কায় তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া ওঠে। সমস্ত দুনিয়ার লোক ঘুমায়, আর এ কেমন ধারা রাত-জাগা রক্ত-শোষা কাজ! মঞ্জুলীর চোখে আর ঘুম আসিতে চায় না।

এমনি করিয়া তপেশের দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত। নিশ্ছন্দ জীবনযাত্রা! একঘেয়েমির পৌনঃপুনিক আবৃত্তি—যেন একটানা এক রেললাইন আছে পাতা—শিয়ালদহ হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত; রোজ গাড়ী আসে, গাড়ী যায়, একই পথে!

তারপর একমাস পরে মাহিনা পাইবার দিন আসিল। তপেশ আজ দুপুরে ঘুমায় নাই। তিনটা বাজিতেই আপিসের দিকে রওয়ানা হইল। প্রথম চাকুরী জীবনের প্রথম মাসের মাহিনা!

কেসিয়ারের কাউন্টারের কাছে তপেশ মাথায় হাত দিয়া সামনের বেঞ্চিটায় বসিয়া পড়িল। সে এ-মাসে মাহিনা পাইবে না। শুধু এমাস কেন, সামনের মাসেও না। তৃতীয় মাস হইতে তাহার মাহিনা দেওয়া সুরু হইবে। অবশ্য পাওনা তাহার এই মাস হইতেই। কিন্তু গোটা আপিসের কর্ম্মচারীদের দু' মাসের বেতন বাকী। এখন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ, অথচ আর সকলে বেতন পাইতেছে এপ্রিল মাসের। সুতরাং তপেশকে এখন মাহিনা দিলে দু' মাস আগেই দিতে হয়, সেটা আপিসের বর্ত্তমান নীতির বিরুদ্ধ। অকাট্য যুক্তি!

নিরুপায় তপেশ ম্যানেজারের ঘরে গেল। তিনিও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "এমন যে হবে সে তো তোমার প্রথমেই জানা ছিল। না পোষায়, চলে যাও।"

তপেশ আধঘণ্টা অনুনয় বিনয় করিয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে এ মাস হইতে বেতন পাইবার অনুমতি আদায় করিল। যাইবার সময় ম্যানেজার কহিলেন, "১০৲ টাকার বেশী আজ পাচ্ছ না। তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে আজ ১০০৲ টাকার বেশী দিতে পারি নি। এ রকম ৫৲।১০৲ টাকা করেই নিতে হবে। তবু তো পাচ্ছ কিছু কিছু, কোন রকমে পেট তো চল্‌ছে। আজ কাগজ বন্ধ করে দিলে কাল সকলে রাস্তায় দাঁড়াবে—সে-কথা একবার ভাব কেউ? রোজ রোজ যদি সবাই মিলে চারদিক থেকে টাকা টাকা করে বিরক্ত করতে থাক একদিন তালাবন্ধ করতে আমরা বাধ্য হব।"

তপেশ ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। এই তাহার চাকুরীর স্বরূপ! একমাস রাত জাগিয়া মাসান্তে এই তাহার ফল-লাভ!

ভাগের ভাগ ১০৲ টাকা পকেটে গুঁজিয়া তপেশ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার খেয়াল নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে হেদুয়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল তপেশ। সে আজ বাসায় ফিরিবে কোন মুখে! রাত জাগিয়া মাসান্তে একসঙ্গে যদি বেতনের টাকা না পাওয়া গেল তো এ কেমন চাকরী! মঞ্জুলীকে বলিবে কি! বাড়ীওয়ালা জানে আজ মাহিনার তারিখ, জানে নরেনবাবুরা, রতনবাবুরাও শুনিয়াছে। মাহিনা পাইয়া প্রথম দিন সে সকলকে খাওয়াইবে বলিয়া রাখিয়াছে।··· ···

বাড়ীওয়ালা লোক ভাল। পরের কিস্তির টাকা পাইয়া ভাড়া দিলেই চলিবে। ধীরেনবাবুরা কিছু আর জানিতে আসিবে না। মুদীকে গোটা ৫৲ টাকা দিলেই প্রায় শোধ হইয়া আসিবে। আবার সামনের সোমবারই তো আর একটা ইন্‌ষ্টলমেণ্ট্।······

আর সকলের কাছে চাল বজায় রাখা তেমন কঠিন হইবে না। কিন্তু মঞ্জুলী? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের চোখে তাহার এতদিনের অপদার্থ স্বামী যদি হঠাৎ একটা পদার্থ ই হইয়া উঠিল, সে কি ঐ একমাস পরে বাসায় যাইয়া স্ত্রীর হাতে ১০৲ তুলিয়া দিবার জন্য! মঞ্জুলী —তপেশ ভাবিতে ভয় পাইল—শেষে মঞ্জুলীও যদি সকলেরই মত তাহাকে অপদার্থ ভাবিতে আরম্ভ করে! অসম্ভব!···

মঞ্জুলীর কাছে তো কিছুই গোপন রাখা চলিবে না। হঠাৎ তপেশের মনে আশার আলো দেখা দিল। টিউসনির টাকাটা আজ ৭৮ দিন দিই-দিচ্ছি করিয়া ঘুরাইয়াছে। ছেলের বাবা আজ নিশ্চয় দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। দু'মাসের ২৪ টাকা পাওনা হইয়াছে। টিউসনির অন্ততঃ গোটা পনের টাকা পাইলে সে-কথা মঞ্জুলীর নিকটে আজ গোপন রাখিতে হইবে। এই পনের, আর ভ্যানগার্ডের দশ, মোট পচিশ টাকা। তবু তো ৫৲ টাকার টান। যাক্, ৫৲ আপিস থেকে ৪।৫ দিন বাদেই পাওয়া যাইবে, বিশেষ কারণে আজ পাওয়া গেল না, এইরূপই একটা কিছু বলিয়া সে মঞ্জুলীকে বুঝাইবে। প্রয়োজন হইলে, চট্‌পট একটা ওজুহাত বানাইতে সে অপারগ হইবে না। কোন মতে মঞ্জুলীর কাছে মুখ রক্ষা হইবে তো।

তপেশের মনে জাগিল, মঞ্জুলীর সেদিনকার ফণিনী মূর্ত্তি! কি দুর্জ্জয় নারী-অভিমান তাহার! কি তীব্র স্বামী-সোহাগীর আত্মমর্য্যাদা!

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। রতনবাবুর স্ত্রী লবঙ্গলতিকার সঙ্গে মঞ্জুলীর বনিবনাও নাই। মঞ্জুলী গল্প করিত, স্বামী তাহার নভেল লেখে, কবিতা রচনা করে, ভাল গাহিতে বাজাতে জানে। এই বাড়ীতে সাধারণভাবে থাকিলেও তাহার স্বামী যে সাধারণের চেয়ে একটা বিশেষ কিছু—ইহাই সে প্রমাণ করিতে চায়। সে নিজেও যে একটু-আধটু ইংরেজী জানে তাহাও জানাইতে ছাড়ে নাই। শুনিয়া লবঙ্গ মুখ টিপিয়া হাসিত। পাল্টা জবাবে লবঙ্গও রকে বসিয়া গল্প করিত, এ বাড়ীতে তাহার স্বামীই বেশী রোজগার করে, তাহার মৃত শ্বশুরের দেনাটা শোধ করিবার জন্যই তাহারা ভাড়াটে বাসায় আসিয়াছে, নহিলে মাস ১০০ টাকায় আলাদা বাসায় তাহারা অনায়াসেই থাকিতে পারে। তারপর রতনবাবুর মাহিনার অঙ্কটা একদিন দপ্ করিয়া অর্দ্ধেকে নামিয়া আসিল। গুপ্ত কথাটা অবশ্য ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন নরেনবাবুর শ্যালক জিতেন দত্ত, ঐ রতনবাবুদের আপিসেরই একজন টাইপিষ্ট্।—মঞ্জুলীও সেদিন কলতলায় মুখ টিপিয়া হাসিয়া সেদিনের প্রতিশোধ লইতে ছাড়িল না। লবঙ্গ চুপ করিয়া ঘরে গিয়া রাগে গজগজ করিয়াছে— "রবিঠাকুর আর শরৎ চাটুজ্জ্যের গিন্নী আর কি! তবু যদি ঐ ছাইভস্ম ছাপ্‌ত কোন কাগজ।"

এমনি করিয়া মঞ্জুলী ও লবঙ্গের সম্বন্ধটা আদা-কাঁচকলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরশু গা ধুইবার সময় কলতলায় লবঙ্গ মনোরমাকে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিতেছিল, "কি জানি গো— এ আবার কেমন কাজ। কুকুর বেড়ালও রাত্তিরে ঘুমোয়। তা-ও শুনলুম মাইনে দিতে পারে না। ওঁর এক বন্ধুর ছোট ভাই ঐ আপিসে ছাপার কাজ করে। বলে, তিন মাসের মাইনে বাকী পড়ে গেছে। যে-ই না কাজ, তার আবার গুমর ছ্যাখ না—"

মনোরমা বাধা দিয়া কহিল, "তা বোন এ দুর্দ্দিনে যার যেমন জোটে। আর লোক অমন বাজে কথাও রটায় ভাই।"

লবঙ্গ ভাবিয়াছিল, মঞ্জুলী তার ঘরে। সে যে রান্নাঘরে বসিয়া সব কথা শুনিতেছে লবঙ্গ স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই।

তারপর রান্নাঘর হইতে উত্তর, কলতলা থেকে প্রত্যুত্তর। এদিকে আঘাত, ওদিক হইতে প্রতিঘাত। তেতো কড়া কথা-কাটাকাটি। বাক্য-বর্ষণের প্রবল প্রতিযোগিতা।

কণ্ঠ অবশ্য কাহারো সপ্তমে চড়ে নাই। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। তাহারাও খোলার ঘরে বাস করে না। তবু চাপা-চাপা যে গর্জ্জন-বর্ষণ হইয়া গেল তাহাকে বস্তির চুলাচুলি বিবাদ না বলিলেও চায়ের টেবিলের বিতর্কও বলা চলে না। দ্বিতল ও ত্রিতলের সুর-কামিনীরা রেলিঙে দাঁড়াইয়া মর্ত্ত্যের এই উপভোগ্য ঘটনাটী হঠাৎ থামিয়া গেল দেখিয়া মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করিল। মনোরমার মধ্যস্থতায় মঞ্জুলী ও লবঙ্গ যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

রাত্রে তপেশ দেখিল, মঞ্জুলীর সে কি বাঘিনী মূর্ত্তি! লবঙ্গকে তখন হাতের কাছে পাইলে সে বুঝি তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তপেশ তাহাকে বুঝাইয়া কহিল—আপিসের অবস্থা ভাল নয় একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু লবঙ্গ যাহা বলিয়াছে তাহা নিতান্তই বাড়ান, বানান, অতিরঞ্জিত কথা।

আজ তপেশ মঞ্জুলীর কাছে কোন মুখে যাইবে। লবঙ্গ-লতিকা! তপেশ মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই কথা ভাবিতেছে।

সন্ধ্যা লাগে-লাগে। হেদোর জলে ছেলেরা সাঁতার কাটিতেছে। পশ্চিম পারে ওয়াটার-পলোর মাতামাতি। পূব-উত্তর কোণে ছোট ছোট ছেলেরা দাপাদাপি করিতেছে, অল্পবয়সী মেয়েরা শিখিতেছে ড্রিল। ওপারে স্কটিস্। এপারে বেথুন। চারিদিকে সব বাড়ীতেই আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হেদুয়ার ডিম্বাকার কঙ্করপথে শত শত সান্ধ্য-ভ্রমণকারী। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গাড়ীঘোড়া, ট্রাম, বাস ও পাদচারী জনতার শোভাযাত্রা। হাসি হল্লা শব্দ কম্প আলো আবছায়ার এই ঘনীভূত পরিবেশটি তপেশের কাছে দৃষ্টি-সহ, স্পর্শ-সহ—কিন্তু নিতান্ত অর্থহীন আজ—একান্ত ঔদাসীন্য।

তপেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া দক্ষিণে চলিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, আজ টাকা না দিলে অভি-ভাবকের মুখের উপরেই বলিবে, কাল হইতে সে পড়াইতে আসিবে না।

পথে বারবার তপেশ সেদিনের মঞ্জুলী-লবঙ্গ প্রসঙ্গটাই মনে মনে তোলপাড় করিতে লাগিল।—কেবলি ঘুরপাক খাইতেছে মানিনী মঞ্জুলীর সিংহিনী মূর্ত্তি!

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ১৫৲ পকেটস্থ করিয়া তপেশ উঠিয়া পড়িল।···ছাত্র পড়াইতে হয় তো এমন বাড়ী-ই! আর পাঁচটা টাকা যদি কোথাও পাইত আজ। তবে মঞ্জুলীর হাতে পূরাপূরি ত্রিশ টাকাই দিতে পারিত। প্রথম চাকুরীর প্রথম মাসের মাহিনা!—প্রথম মাসটা শুধু, পরের কথা পরে।

মঞ্জুলী হাত বাড়াইয়া নোট তিনখানি নিল। মুখে স্নিগ্ধ স্মিতহাস্য—এক পরিতৃপ্ত প্রসন্নতা।

"পাঁচটা টাকা কম আছে মঞ্জু?"

"কম কেন?"

"এই—ইয়ে—আমাদের সঙ্গে কাজ করেন সুরেশবাবু না? তার বাড়ী থেকে বউএর কলেরা হয়েছে বলে তার এসেছে, টাকার দরকার। আমরা সকলে দু'চার টাকা করে ধার দিয়েছি। সে ফিরে এলেই পাওয়া যাবে।"

"তা আপিস থেকে দিলে না কেন?"

"দেবে না কেন! তার পেল সন্ধ্যের পর,—কাউণ্টার যে বন্ধ হয়ে গেছে ছ'টার আগেই।"

মঞ্জুলী নোট-শুদ্ধ হাতখানি কপালে ছোঁয়াইয়া প্রথম মাসের মাহিনা ক্যাশবাক্সে রাখিতে গেল। প্রথম মাসের মাহিনা!

তপেশের মনটা কেমন করিয়া ওঠে। ফাঁকি! খানিকটা নিজেকে ফাঁকি, খানিকটা মঞ্জুলীকে ফাঁকি। এ-ফাঁকি আজ না হয় কাল, কাল নয়ত পরশু—ধরা পড়িবেই। পড়ুক্। আজিকার বিপদ তো কাটিল। যে-দিনের মুখ রক্ষা হয় সেদিনটাই বাঁচিয়া যায়!

লবঙ্গলতিকার মিথ্যা চালকে আজ আর তপেশ আপত্তির চোখে দেখিতে পারিল না। কুৎসিত উপদংশকে লোক আবরণের অন্তরালেই ঢাকিয়া রাখিয়া চলে। ব্যাধি বৈ কি! দৈহিক নয়, ব্যক্তিগত নয়,—সামাজিক ব্যাধি!—আবহমান দুরারোগ্য কুশ্রী ব্যাধি! ··

মঞ্জুলী টাকা তুলিয়া রাখিয়া চৌকির কাছে আসিয়া কহিল, "কাল থেকে আমি ঘরে লক্ষ্মীর আসন পাতব।—

হেসো না। তোমার তো কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই।—দুঃখকষ্টও তার জন্যই পাচ্ছ।"

তপেশ একটু হাসিল। মঞ্জুলী বুঝিল না, ও-হাসিতে আজ যাহাই থাক্, ঠাট্টা বিদ্রূপের লেশমাত্র নাই।

মঞ্জুলী অনেক কথাই বলিতেছে। আজ তার আনন্দের সীমা নাই। চাকুরে স্বামীর মাহিনার টাকা ক্যাসবাক্সে তুলিয়াছে! তপেশের সে-দিকে আদৌ কান নাই। স্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আনমনা ভাবিতেছে—এমন করিয়া কতদিন চলিবে! মঞ্জুলীকে সকল কথা খোলসা করিয়া না বলিলে কোন মতেই চলিবে না।...তা' মঞ্জুলী জানুক্। বাড়ীওয়ালাও তাগাদায় আসিয়া শুনুক কিছু। নরেনবাবু-ও যদি আভাস পায়, পাক্। শুনুক্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব লোক। ক্ষতি নাই। দারিদ্র্যকে স্বীকার করিতে পারিলেই'ত তার বারো আনা জালা আপনি কমিয়া যায়। সত্য-প্রকাশে আর লজ্জা কি! কিন্তু ও-ঘরের লবঙ্গ যেন কিচ্ছুই না জানে। শুধু ঐ মানিনী মঞ্জুলীর প্রতিযোগী লবঙ্গলতিকা।

(ক্রমশঃ)

রামগড়

শ্রীজনরঞ্জন রায়

হাজারীবাগের প্রাচীন ইতিহাস রামগড় হইতে অভিন্ন। ইহা ঝারিখণ্ডের একটী অংশ, জঙ্গল পরিপূর্ণ মধ্যভারতের পাহাড়ময় একটী উচ্চস্থান এবং অসভ্য জাতিগণের আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ও পরম স্বাস্থ্যপ্রদ হাজারীবাগ সহরটীর সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র এক শত বৎসর পূর্ব্বে। কিরূপে রামগড় হইতে হাজারীবাগের উদ্ভব হইল তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রথমে আমরা রামগড়ের বৈচিত্র্যময় বিবরণ আলোচনা করিব।

১৭৬৫ খৃঃঅব্দে লুপ্তবৈভব দিল্লীর বাদশা শাহ আলামের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সমস্ত প্রদেশ আয়ত্ত করিতে ইংরাজদের অনেক দিন লাগে। তন্মধ্যে ছোটনাগপুর দখলের ইতিহাসই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মনে রাখিতে হইবে হাজারিবাগ, ছোটনাগপুরেরই একটী অংশ।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ক্যাপ্টেন ক্যাম্যাক্ গয়া (১) দখল করিয়া রামগড় জিলার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। গয়ার রাজা (২) তখন সুন্দর সিং এবং রামগড়ের রাজা বিষ্ণু সিং (সীতাব রায়ের রিপোর্ট মতে) ছিলেন। এই দুই রাজার মধ্যে তখন বিবাদ ছিল।

রামগড় রাজ্য উদ্ভবের বিবরণ

রামগড় রাজ্যটী সিংদেও ও বাগদেও নামক বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের খেরাগড় নামক স্থান হইতে আগত দুই জন ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি দ্বারা স্থাপিত। তাঁহারা দুই ভ্রাতা প্রথমে ছোটনাগপুরের মহারাজার অধীনে চাকুরী লয়েন। রামগড় প্রদেশে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ধূমায়িতপ্রায় হইলে সুযোগ বুঝিয়া আশ্রয়দাতার এই রাজ্যটী তাঁহারা হস্তগত করেন। প্রথমেই করণপুরার জমিদার কর্পূর দেওকে পরাস্ত করিয়া নিম্নলিখিত বাইশটী পরগণার মালিক হয়েন। যথা—(১) করণপুরা (২) গোরিয়া (৩) যোগেশ্বর (৪) চুনবুরিয়া (৫) পালানি (৬) গোলা (৭) কল্যাণপুর (৮) বসন্তপুর (৯) চম্পা (১০) বামনবে (১১) বসও, (১২) গোমো, (১৩) মুরকচো, (১৪) কুটকুমপাতি, (১৫) আহোরি, (১৬) দপ্তার, (১৭) সুন্দম, (১৮) সারম, (১৯) সিংপুর, (২০) তিসর, (২১) হোলং এবং (২২) রামপুর।

ছোট ভ্রাতা বাগদেও ১৩৬৮ খৃঃঅব্দে রাজা উপাধি লইলেন এবং বড় ভ্রাতা সিংদেওকে সেনাপতি করিয়া ঠাকুর উপাধি দিলেন। বাগদেও এবং সিংদেওএর বংশধরগণ সিংহ উপাধি ধারণ করেন।

কথিত হয় যে উগ্রসিংহের পুত্র চতুর সিং এবং তাঁহার পুত্র থালটাঁড়দেও বা কালাচাঁদ বাগদেও ও সিংদেওয়ের পিতা ছিলেন।

বাগদেওয়ের বংশাবলী

বাগদেওএর পুত্র খেরাৎসিং, তৎপুত্র রামসিং, তৎপুত্র মাধোসিং, তৎপুত্র জগৎসিং—ইহাদের উর্দ্দা নামক স্থানে রাজধানী ছিল। জগতের পুত্র হেমৎ, তৎপুত্র রাম। উভয়েরই বাদাম নামক স্থানে রাজধানী ছিল। রামের পুত্র দালেল, ইনিই সর্ব্বপ্রথমে পিতৃনামে রামগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। দালেলের পুত্র মহরুদার। মহরুর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিষ্ণুসিং রামগড়ের গদি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ১৭৬৩ খৃঃঅব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। বিষ্ণুর দ্বিতীয় ভ্রাতা মুকুন্দসিং রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ১৭৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা থাকেন।

(১) গয়া জিলার পূর্ব্বনাম বিহার ছিল।

(২) টিকারীর রাজা।

মুকুন্দসিংহের রাজ্য বিস্তার

রাজা মুকুন্দসিং চৈ পরগণা দখল করিয়া (১) রামপুর, (২) জগোদি, (৩) পুরোরিয়া (পুরুলিয়া ?), (৪) ইতখোরিও, (৫) পিতিজ নামক রাজ্যগুলি আপন অধিকারে আনয়ন করেন। পুরুলিয়া জেলার খাসপুর পরগণাও রামগড়ের জনৈক রাজা দখল করেন। কিন্তু তাহা পচেতি রাজাকে ইংরাজ আমলে প্রদত্ত হয়।

যাহা হউক ১৩৭৮ হইতে ১৭৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত ছোট ভ্রাতা বাগদেওএর বংশধরগণ রাজা ছিলেন—কিন্তু ঐ বৎসরে বাগদেওএর বংশধর মুকুন্দ সিংহের সহিত সিংদেওএর বংশধর তেজ সিংহের বিবাদ হয়। মুকুন্দসিং সত্যকার একজন বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি সিংদেও দেশদ্রোহী ও ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া পরাধীনতা বরণ করেন। (১৮৭৬ খৃঃ ছোটনাগপুরের কমিশনার মিঃ রবিনসনের লিখিত বিবরণ)।

সীতাব রায়ের বিবরণ

এই প্রদেশের জমিদারগণের যে সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তন্মধ্যে ১৫৩৯ খৃঃ হইতে ১৭৬৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা সীতাব রায়ের বিবরণটী সর্ব্বপ্রাচীন। তিনি লিখিতেছেন :— আকবর সাহের রাজত্বকালে, হিজরা ৯৫২ সালে (১৫৩৯ খৃঃ) রাজা মোহন সিংহ বিহার প্রদেশে জমিদারগণের কেল্লা সকল দখল করিবার জন্য একদল শক্তিশালী সৈন্য লইয়া যাত্রা করেন। সের শাহের মৃত্যুর পর জমীদাররা রোটাস্ দুর্গ দখল করিয়াছিল। মোহনসিং তাহা পুনর্ব্বার খাস দখলে আনিয়া নিম্ন প্রদেশের আকবরপুর পরগণার সামিল করিলেন। তৎপরে তিনি পালনের রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাহারা ঘাট ও প্রবেশ পথগুলি অবরোধ করিবার নিস্ফল চেষ্টা করে। বহু হতাহত হয় এবং ক্রমে অনেকেই বশ্যতা স্বীকার করে। পরে তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু আকবর সাহের মৃত্যুর পরে বিদ্রোহী জমীদারগণ সরকারী সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া আবার ঐ প্রদেশ দখল করে। আকবর সাহের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নবাব সাজাহান হিঃ ১০৪২ সালে বুজরুক ও আহম্মদ খাঁকে পাটনার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং জায়গীরস্বরূপ ১৩৬০০০৲ সিঃ টাকা খাজনা স্থির করিয়া দেন। কিন্তু হিঃ ১০৯৬ সালে বুজরুক বিতাড়িত হয়েন এবং ইব্রাহিম খাঁ সুবাদারী ও জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। ইব্রাহিমের ফৌজদার বিহারী দাস ৪১৪০৲ টাকা সেলামি দিয়া পূর্ব্ব খাজনার পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত লয়। হিঃ ১১৩১ সালে জেহন সাহের পুত্র মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে সেখবুলন্দ খাঁ বিহার প্রদেশে সাত বৎসর কাল সুবেদারী করেন। তিনি ভোজপুর প্রদেশটী সুশাসনে আনেন এবং খুন্দাদার নামক যে জমিদার বিদ্রোহী হইয়া পালংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করে তাহাকে তিনি হত্যা করেন। শেখ বুলন্দ খাঁ প্রথমে নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত সের ও সেরঘাটি পরগণাদ্বয় লক্ষণ কানুনগোর পুত্র জিজা অঘোরীকে পত্তন দিয়া নাগপুরের পাহাড়ের দিকে চলিয়া যান। এইরূপে সের ও সেরঘাটী পরগণাকে পৃথক করা হয়। তৎপরে উক্ত সুবাদার পালং, বাদামও রামগড়ের ঘাঁটোয়ালগণের রাজা নাগপুরাধিপ নাগবংশী সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। জিজা অঘোরীর মধ্যস্থতায় রাজমন্ত্রী বুদ্ধিমান দাসঠাকুর সুবেদারের নিকট দৌত্যে প্রেরিত হয়েন। রাজা তাঁহার দ্বারা এক লক্ষ টাকা নজর-আনা দিবার প্রস্তাব করেন। তন্মধ্যে ৪১০ ০৲ টাকার দ্রব্যাদি ও বাকী টাকার হীরকখণ্ডসকল প্রদান করিলে সরকারী সৈন্যদের সরাইয়া লওয়া হয়। সের, সেরঘাটী, আখোরী, দিতারা, আঁটীকোরী এবং নিম্নস্থিত ক্ষুদ্র প্রদেশ মির আজিজ্ খাঁ, রোহিনা ও অঘোরী অমরসিংহের সহিত ৩৫০০০৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত হয়। ইহা পাটনায় দিতে হইবে স্থির হয়।

শের বুলন্দ খাঁ, নয়োরব খাঁ, জুম্মা খাঁ, আবদুল রহিম খাঁ, আকিদৎ খাঁ এবং মরহম্মৎ খাঁর পাঁচ বৎসরের দুর্ব্বল শাসনকালে এই সমস্ত খাজনা বা নজর-আনা জমিদারগণের নিকট হইতে আদায় হয় নাই। এইজন্য খৃঃ ১১৩৭ সালে ফগিরুলদৌলা নিজ রাজত্বকালে খোনদার রাস্তা দিয়া এই পর্ব্বতপ্রদেশে অভিযান করেন এবং আজীজ খাঁর পুত্র রোচিলা মুয়াজ্জন খাঁর সহিত সের পরগণার বন্দোবস্ত করেন। মুয়াজ্জন খাঁ ডেরা প্রদেশে আসিয়া দেখিতে পান যে পালংএর বিদ্রোহীগণ বড় বড় গাছ ফেলিয়া রাস্তা অবরোধ করিয়াছে এবং পাহাড় হইতে তীর ছুড়িতেছে। মুয়াজ্জন আহত হইয়া এইস্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন; ইহাতে ফগিরুলদৌলা ভীত হয়েন এবং অঘোরী কুঞ্জ সিং কাননগোর মধ্যস্থতায় নগদ ১২০০০৲ টাকা পালংএর ঘাটোয়ালের নিকট হইতে লইয়া মীমাংসা করেন। বর্ষার সময় তিনি পাটনায় চলিয়া আসেন। কিন্তু তৃতীয় বর্ষে এই খাজনা বন্ধ হয়, তাহাতে ফগিরুলদৌলা সুবাদারী হইতে বঞ্চিত হয়েন।

খৃঃ ১১৪১ সালে সুজা-উল-দেওয়ান মহম্মদ খাঁ বঙ্গদেশের এবং আলীবর্দ্দী খাঁ বিহারের সুবাদারী প্রাপ্ত হয়েন। আলীবর্দ্দী, সনউৎ পরগণার ফৌজদার ফৈজুল্লা খাঁকে নিজ অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই প্রদেশের জমিদারগণ দুর্ব্বল রাজশক্তির সুবিধা লইয়া ঐ সময়ে নিজেদের স্বাধীন মনে করিতেন। টিকারীর জমিদার, ফৈজুল্লা খাঁকে হত্যা করিয়া সুবেদারের সৈন্যগণকে বিতাড়িত করেন। সুবাদার এই সংবাদ পাইবা মাত্র ফৈজুল্লার পুত্রকে নিজ বাটীতে ফৌজদার পদ প্রদান করেন, কিন্তু ফৈজুল্লার পুত্রও নিহত হয়। তজ্জন্য জমিদারদের শাসন করিতে সুবাদার কৃতসংকল্প হয়েন এবং সুন্দরসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সুন্দরসিং সসৈন্যে পাহাড়ের তলদেশে নামিয়া পড়েন। আলীবর্দ্দীখাঁ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। সুন্দরসিংহের কর্ম্মচারী মুস্তকখাঁ অসিহস্তে তাঁহাকে প্রতি সুবিধাজনক স্থানে পিছন হইতে আক্রমণের চেষ্টা করেন। এইরূপ একটী যুদ্ধে মুয়াজ্জন খাঁ ও রোহিলার পুত্র আজীম্ খাঁ নিহত হয়েন। কিন্তু সুন্দরসিং ও ক্ষেত্রসিং ধরা পড়েন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ ধরা পড়িবার ভয়ে চাত্‌রার দুর্গে আশ্রয় লয়েন। তাঁহাদের ধরিবার জন্য আলীবর্দ্দী খাঁ, হাইদৎ আলীর অধীনে একদল সৈন্য পাঠান। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া চাতরা হইতে তাঁহারা পলায়ন

করেন। পলাইবার সময়ে চাতরার দুর্গটী তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দিয়া যান। (এইস্থানে) রামগড়ের ঘাটোয়াল সুবেদারের নজরানার টাকা মিটাইবার অঙ্গীকার করায় এবং ত্রিহুতের জমিদার রাজা রঘুসিংহ এবং বেথিয়ার জমিদার ধ্রুবসিংহকে শাসন করিবার ভার লওয়ায় সুন্দরসিংহের সৈন্যদলকে আলিবর্দ্দী আর পীড়ন করিলেন না এবং সুন্দরসিংহকে ক্ষমা করিয়া সনৎ পরগণার জমিদারী ফেরৎ দিলেন এবং সের, সেরঘাটী ও পালং প্রভৃতি পরগণা খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাজা সুন্দরসিং তৎপরে পাহাড়ের তলদেশের লোকদের সহিত যথেষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ও হঠাৎ রামগড় আক্রমণ করিয়া তথাকার ঘাটোয়াল রাজা বিষ্ণুসিংহকে বাকী কর বাবদ ৮৫০০০৲ টাকা দিতে বাধ্য করেন এইরূপ কথিত হয়। নিজ মতের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে ঐ রাজা ইহা হইতে ১২০০০৲ টাকা তথায় জমা দেন এবং পালংএর ঘাটোয়াল ৫০০০৲ টাকা জমা দেয়। এই সময় তাহাদের দেয় খাজনা পূর্ব্ববৎ ছিল। উপরোক্ত খাজনা এক বৎসর পরে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কোনও জমিদারই তাহাদের আদায় উশুলের হিসাব দেয় নাই।"

সীতাব রায় প্রদত্ত চৈ-চম্পার বিবরণ ফঃ ১১২৬-১১৭৬ (১৭১৯-১৭৬৯)

"চৈ পরগণার যগোদি তালুকের জন্য রাজা মেগারখাঁ সরকারী খাজনা দিত। নুরগুত সাময়ের রাজা কামদার খাঁ ঐ দেশটী বন্দোবস্ত করিয়া লইলে সে মেগারকে খাজনা দিত।

এই সময়ে রামগড়ের রাজা দেলিল সিংহ নুরগুতের বিতানামক কেল্লা ও তৎসংলগ্ন আটটী তালুক ছলে বলে দখল করিয়া লয় ও মেগারকে হত্যা করে। ফঃ ১২২৬—১২৩৩ এই সাত বৎসর রামগড়ের দেলিলসিংহ এই স্থানগুলি দখল করিয়া রাখে। সেই সময়ে নুরগুতের আর্ত্তমিল (আমিন) আলি নমেলখাঁর নিকট এ বিষয়ে মৃত রাজার পুত্র রণমস্ত-খাঁকে লইয়া পরমদেব ও রুপিয়ালসিং চৌধুরী নালিস করেন। সেজন্য ঐ আর্ত্তমিল ২০০০ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা জমিদারদের সাহায্য করেন এবং রণমস্তখাঁকে তাঁহার কেল্লা ও সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেন। ছয় বৎসর তাহা ভোগ দখল করিয়া রণমস্তখাঁর বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মহিপৎখাঁ পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা রামগড়ের রাজা বিষ্ণুসিং বুগিয়ার সমস্ত লোককে হত্যা করিয়া এইস্থান দখল করে। তথাকার রাজা তখন আপন খুল্লতাত এটকৌড়ির রাজা সত্যনারায়ণ সিংহের নিকট পলায়ন করেন। উক্ত উভয় রাজা একযোগে টীকারীর রাজা সুন্দরসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া রামগড় আক্রমণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা রামগড়ের রাজা বিষ্ণুসিংহকে অবরুদ্ধ করেন। সুন্দরসিংহ বিষমসিংহের নিকট হইতে তাঁহার মুক্তির জন্য ৮০০০৲ টাকা এবং উক্ত কেল্লাসহ আটটী পরগণা আদায় করিয়া লয়েন। পাঁচ বৎসরকাল ঐ সকল সুন্দরসিংহের অধিকারে থাকে। তৎপর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ সুন্দরসিংহকে আক্রমণ করিলে সে পাহাড়ের মধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হয়। তখন বিষ্ণুসিংহ নবাব সৈন্যের সহায়তায় আবার ঐ সব স্থান অধিকার করে। ফঃ ১১৪৫-১১৫৪ এই নয় বৎসরকাল এই সকল সম্পত্তি বিষ্ণুসিংহের অধিকারে থাকে। এই সময়ে কামাল খাঁর নিকটে গিয়া লাল খাঁ, রাজা মহাপৎ খাঁ এবং যগোদী ও রামপুরের রাজা রতনসিংহ নিজেদের অবস্থা জ্ঞাত করেন। কামদার খাঁ সরকারী আদেশমত সসৈন্যে ঐ সকল স্থানে গিয়া ঐ জমিদারদের সম্পত্তিতে দখল প্রদান করেন। সামান্য কয়েক মাস এইভাবে থাকে। সেই সময়ে রুশেহার পণ্ডিত, নিলু পণ্ডিত এবং অন্যান্য মারাঠা সদ্দারগণ পূর্ব্বদিক দিয়া ঐদিকে প্রবেশ করিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া বিষ্ণুসিং তাহাদিগকে ঐ সমস্ত তালুকসহ এটকোরী এবং যগোদি কেল্লা দখল করিয়া দিবার জন্য বহু টাকা উপঢৌকন দেয়। মারাঠাগণ চেষ্টা করিয়া তাহাতে সমর্থ না হইয়া তাহারা যে টাকা উপহার পাইয়াছিল তাহা হইতে ২২০০০৲ টাকা কামদারখাঁকে এই সর্ত্তে প্রদান করেন যে দুই মাসের জন্য তিনি বিষ্ণুসিংহকে ঐ সকল স্থানের অধিকার দিবেন ও ইচ্ছা করিলে দুই মাস পরে পুনর্ব্বার ফেরৎ লইবেন। পরামর্শ স্থির হইল মারাঠাদের যগোদি প্রদান করা হইবে এবং কামদার এটকোরী অধিকারে রাখিবেন। ঐ সকল জমিদারদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে কয়েক মাস পরেই তাঁহারা নিজ নিজ সম্পত্তি ফেরৎ পাইবেন। এক বৎসর বে-দখল থাকিবার পর জমিদারেরা তাঁহাদের সম্পত্তি বিষ্ণুসিংহের নিকট হইতে ফেরৎ না পাওয়ায় কামদারের নিকট দরখাস্ত করেন। ফঃ ১১৭৭ এবং ১১৭৮ সালে কামদার বিষ্ণুসিংহকে আক্রমণ করিয়া ঐ সকল স্থান বিধ্বস্ত করিয়া দেন। অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া সেই বৎসরে বিষ্ণুসিংহ মীমাংসার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দসিংহকে কামদারের নিকট প্রেরণ করেন। তৎপর সাব্যস্ত হয় যে বরাকর নদীর উত্তর দিকের জমিদারী কামদারের দখলে থাকিবে এবং রামগড়ের রাজা, লাল খাঁ এবং অন্য দুইজন রাজা ঐ নদীর দক্ষিণ দিকের সম্পত্তি দখল করিবেন। এইরূপে তাঁহারা ফঃ ১১৬৭ সাল পর্য্যন্ত ৯ বৎসরকাল নির্দ্দিষ্ট মত সরকারী খাজনা দিয়া নিজেদের সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে থাকেন। ফঃ ১১৬৮ সালে এই দেশে যে যুদ্ধ বাধে তাহাতে কামদার খাঁ সুবাদার রামনারায়ণের বিরুদ্ধে—পক্ষ সমর্থন করেন এবং পরাস্ত হইয়া নিজ আত্মীয় পরিবারবর্গের আশ্রয়ের জন্য রামগড় রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে রামগড়ের রাজা জানান যে, কামদার যদি তাঁহাকে প্রত্যাহৃত স্থানগুলিতে দখল প্রদান করেন তবে রামগড়রাজ কামদারের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিবেন ও তাহা ছাড়া কামদারকে নগত ৩৭০০০৲ টাকাও দিবেন। কামদার ইহাতে অস্বীকৃত হইলে বিষ্ণুসিং এই প্রস্তাবসহ ঐ টাকা কামদারের স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেন। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে কামদার উক্তরূপ আবেদনে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু এই আবেদন সরকারীভাবে অনুমোদিত হয় নাই। বস্তুতঃ সে সময়ে কামদার একজন বিদ্রোহী ও বিতাড়িত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ছিলেন। যখন এই সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—তখন রাজা লাল খাঁ ও রতনসিংহের

ভ্রাতা শ্রীনাথসিং কামদারের নিকট এইরূপভাবে তাঁহাদের সম্পত্তি বিক্রয় করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। কামদার তদুত্তরে বলেন যে তাঁহার পরিবারবর্গের সম্মানরক্ষার্থে তিনি রামগড়ের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু কয়েক মাস পরেই এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। ফঃ ১১৬৯ সালে কাসিম আলিখাঁর খুল্লতাত-পুত্র বোয়ালী খাঁ নূরহুত সাময় প্রদেশ দখল করেন। তৎপর কামদার খাঁর জমিদার রাজা লাল খাঁ, রাজা শ্রীনাথসিংহ এবং চৈ ও চম্পার অন্যান্য জমিদারগণ বোয়ালী খাঁর সহযোগে কামদার খাঁকে পর্ব্বত্য প্রদেশে পশ্চাদ্ধাবন করে। কামদার নাগপুর হইতে পালামৌ অভিমুখে সরিবারে পলায়ন করেন। গিরিসঙ্কটের নিকট রামগড়ের রাজা বিষ্ণুসিংহ বোয়ালী খাঁকে বাধা প্রদান করেন, কিন্তু বিষ্ণুসিংহ পরাস্ত হয়েন; বোয়ালী খাঁ বিগা নামক স্থান অবরোধ করেন ও সেখানকার বারুদখানা তাঁহার কামানের গোলার দ্বারা আগুন লাগিয়া ধ্বংস হয়। বিগার লোকেরা আত্মসমর্পণ করিলে বোয়ালী খাঁ ৫৫০০০৲ টাকা উপঢৌকন লইয়া বরাকরের উত্তর দিকের জমিদার—লাল খাঁ প্রভৃতিকে তাহাদের জমিদারীতে দখল প্রদান করেন। কিন্তু ছয় মাস গত না হইতে বোয়ালী খাঁ কর্ম্মচ্যুত হয়। তখন মুৎসুদ্দিগণের মধ্যে ২০০০০৲ টাকা বিতরণ করিয়া দিয়া জগোতি প্রভৃতি স্থান রামগড়ের রাজা দখল করিয়া লয়েন। ফঃ ১১৭০ সালে নবাব কাশিমালী খাঁর নিকট এইরূপ সংবাদ আসে যে, সরকারের বিরোধী পঞ্জাপুরের রাজা মজফ্‌ফর আলী পাৎচিতের রাজা রঘুনাথ নারায়ণ, বীরভূমের রাজা বুদ্ধিবল রাম খাঁ এবং নূরহুত সাময়ের রাজা কামগর খাঁ বাধা না পাইয়া পাহাড়ের নিম্নস্থ দেশসমূহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক দখল করিতেছে। ইহা জানিতে পারিয়া নবাব কাসিমালী বহু সিপাইসহ আশাদুল্লা খাঁ এবং মরকটকে রামগড় প্রদেশ এবং তথাকার কেল্লাসমূহ দখল করিয়া রামগড় রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে প্রেরণ করেন। এইরূপে তাঁহারা খড়গদেশ অভিমুখে অভিযান করিলে রাজা শ্রীনাথসিংহ, নির্ম্মল চৌধুরী এবং দুর্গের মাহাতোর (যাহারা উভয়েই ক্যাপটেন ক্যামাকের সহিত একণে রহিয়াছে) সহিত অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধের পর রামগড়ে উপস্থিত হয়। মরকট্‌ রামগড়ের প্রস্তর প্রাচীরের একস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলে। রাত্রি-যোগে রামগড়ের রাজা কেল্লা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। অল্পদিন মধ্যে সমস্ত দেশ আয়ত্তে আসে। তখন রাজা বিষ্ণুসিং ও তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দসিংহ গত্যন্তর না দেখিয়া এই প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, আশাদুল্লা খাঁ গিরিসঙ্কট হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করা হইবে। কিন্তু সুরৎসিংহ হরকরা ও অন্যান্য জমিদারগণ আশাদুল্লাকে অবগত করান যে, ইহা বিষ্ণুসিংহের একটী ছলনা মাত্র। কারণ পাহাড় তলে অবতরণ করিলেই বিষ্ণুসিংহ তাহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ইহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য আশাদুল্লা নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং বিষ্ণুসিংহের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন; কিন্তু আশাদুল্লাই যুদ্ধে জয়ী হইলেন। তৎপরে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আশাদুল্লা উক্ত রাজার উকিল ও তাহার সঙ্গী ১৯ জন লোককে নিহত করেন এবং লাল খাঁ প্রভৃতির নিকট কবুলতি লইয়া তাহাদের সম্পত্তি প্রদান করেন ও বাকী সম্পত্তি সরকারের খাস দখলে আনয়ন করেন। কিন্তু এই বৎসরের শেষেই নবাবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধে এবং আশাদুল্লাকে প্রস্থান করিতে হয়। যাইবার কালে আশাদুল্লা বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ ও খাদ্যদ্রব্য এই সমস্ত কেল্লার ভিতর ফেলিয়া চলিয়া যান। কামদার খাঁও নবাব কর্ত্তৃক আহত হয়েন। নবাব তাহাকে পরিচ্ছদাদি উপহার দিয়া ও পূর্ব্ব সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া ইংরাজগণের বিরুদ্ধে পাৎচিতের সীমান্তে প্রেরণ করেন। কিন্তু কামদার তথা হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন। এই সময়ে বিষ্ণুসিংহের মৃত্যু হয় এবং মুকুন্দসিংহ রাজা হয়েন। কামদারের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া মুকুন্দসিংহ নিজ কেল্লাগুলি ফেরৎ পাইবার দাবী করেন। সেই দাবী পূরণ না হওয়ায় তিনি ঐ সমস্ত স্থান অবরোধ করেন ও তাহার ফলে এই সর্ত্তে ঐ সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হয়েন যে, আশাদুল্লাখাঁর পরিত্যক্ত রসদাদি ইংরাজের ফেরৎ দিতে হইবে। কিন্তু অধিকার পাইবামাত্র মুকুন্দসিংহ সমস্ত রসদাদি লইয়া চলিয়া যান এবং কেল্লাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও চৈচম্পা প্রদেশ নিজ অধীনে আনয়ন করেন। কাশীম আলী খাঁ পলায়ন করিলে রাজা মুরলীধর এবং নন্দকুমারের মধ্যস্থতায় ইংরাজ সেনাপতি ও নবাব সরকারের নিকট কামদার খাঁ পরিচিত হয়েন। ইহাদিগের দ্বারা তিনি নিজ অধিকারে পুনস্থাপিত হন এবং রাজা শ্রীনাথ সিংহ প্রভৃতিকে তাঁহাদের সম্পত্তি পুনরায় প্রদান করেন। কামদার খাঁ তখন মুকুন্দসিংহের নিকট হইতে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত রসদাদি ফেরৎ পাইবার দাবী করেন। ইহাতে ভীত হইয়া মুকুন্দসিংহ সেগুলি তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠান, কিন্তু ঐগুলি ইচাক নামক স্থানে পৌঁছিলে, কামদারের মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র মুকুন্দসিংহ সেগুলি ফেরৎ লইয়া যান। হিঃ ১৭১ সালে কামদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নেমদার খাঁর পুত্র ওয়ারীশ আলী খাঁ সুবেদার হইলেন। তিনি তেমন কাজের লোক ছিলেন না; এজন্য অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিন বৎসরের খাজনা বাকী পড়ে। এজন্য হিঃ ১১৭৩ সালে জিহন খাঁ এবং পুতি খাঁ নামক ওয়ারীশ খাঁর দুইজন পূর্ব্ব কর্ম্মচারী সমস্ত পরগণার মহিষ, গরু প্রভৃতি পশু সকল আটক করে ও তজ্জন্য সমস্ত জমি পতিত পড়িয়া যায়। একারণে নূরহুত সাময়ের আওমিলের (আমীন?) নিকট এই সমস্ত স্থানের খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া খড়্গডিহা প্রদেশটী বন্দোবস্ত লইবার জন্য মুকুন্দসিংহ আত্রাব খাঁকে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মুকুন্দসিংহের উকিল রাজা ওয়ারীশ আলীখাঁর নিকট দরখাস্ত করেন এবং গত তিন বৎসরের খাজনা বাবদ কত দিতে হইবে ও ভবিষ্যতে কত খাজনা ধার্য্য থাকিবে তাহা জানিতে চাহেন। তখনকার অবস্থায় ঠিক মত কিছু আদায় হওয়া সম্ভব নহে এবং যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লাভ ভাবিয়া গত তিন বৎসরের বাকী খাজনা বাবদ ২৭০০০৲ টাকার কবুলতী লেখাপড়া হয় এইরূপ শুনা যায়। কারণ এ সম্বন্ধে কানুনগো বা চৌধুরীদের সহি করা কোন দলিল নাই বা সরকারী খাতাপত্রেও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক এই টাকার মধ্যে মুকুন্দসিংহ সামান্য কিছু দিয়াছিলেন মাত্র এবং বাকী টাকার জন্য দায়ী আছেন। আশ্রফ আলীখাঁর পর জুল্‌ফিকার আলী খাঁ আওমিল হইলে রামগড়ের রাজা পুনর্ব্বার খড়্গদিহা পাইবার জন্য দরখাস্ত করেন। জুল্‌ফিকার তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও নবাব সরকার হইতে তাহা নামঞ্জুর হয়। এইরূপে উপায়ান্তর না দেখিয়া ও ওয়ারীশ আলীর দুর্ব্বলতার সুবিধা লইয়া মুকুন্দসিংহ প্রকাশ্যভাবে ঐ দেশ আক্রমণ করেন। মুকুন্দসিংহকে প্রতিরোধ করিতে ওয়ারীশের বহু ব্যয় হয়। হিঃ ১০৬৯ সালে কাদের কাশিম খাঁ খড়্গদিহা আক্রমণ করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিলে ক্যাপ্টেন ক্যামাক সসৈন্যে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েন। তিনি ঐ পরগণা জয় করিয়া বাকী খাজনার দাবী করেন। ঐ সময়ে মুকুন্দসিংহের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন গোপদার্ড প্রেরিত হয়েন এবং তিনি রাজার নিকট হইতে শেরঘাটি পরগণার বাকী খাজনার দাবী করেন। দুই সৈন্যদল উক্ত প্রদেশের মধ্যস্থলে মিলিত হইলে দুই একটী ব্যর্থ আক্রমণের পর উক্ত রাজা নিজ উকিলগণকে পাঠাইয়া দেন। তাহার পরের ঘটনা উক্ত ব্যক্তিগণের পত্রাদি এবং বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায়।" ইহাই হেষ্টিংসের আমলে ইংরাজ ও নবাবের দ্বারা দ্বৈত-শাসনের ইতিহাস।

ক্যাপ্টেন ক্যামাক্ কর্ত্তৃক রামগড় বিজয়

অতঃপর মুকুন্দসিংহের পরাজয় এবং মৃত্যুর বিবরণ দিতেছি। ক্যাপ্টেন ক্যামাক নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি রামগড় রাজ্য দখল করেন। তাঁহার লিখিত একখানি পত্র হইতে অবস্থাটার পূর্ব্বাভাস জ্ঞাত হওয়া যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের প্রধান সদস্য মিঃ জেকিলের নিকট ক্যাপ্টেন ক্যামাকের খৃঃ ১৭৭১ অব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে লিখিত পত্র—

"মহামান্য যোসেফ জেকিল—রেভেনিউ কাউন্সিলের প্রধান সদস্য মহাশয় সমীপেষু

মহাত্মন, উকিলকে আপনার পরোয়ানা সহ রামগড়ে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু বাকী খাজনা আদায় সম্বন্ধে সেখান হইতে সে কোনও জবাব আনে নাই। যে জবাব আনিয়াছে এই সঙ্গে তাহার তরজমা খানি পাঠাইলাম। জবাবের মর্ম্ম এই যে, রামগড়ের রাজা নাগপুরের জমিদারের নিকট খাজনা না পাওয়ায় তাহার খাজনা আদায় দিতে পারিতেছে না। কিন্তু বেশীর ভাগ অনাদায় খাজনা নুরুদৎ সাময়ের দরুণ। সে খাজনা পরিশোধের একটী কথাও রাজা লেখে নাই। নাগপুরের লোক জবাবদিহি করিবার জন্য এখানে হাজির আছে। বুঝিতে পারা যাইতেছে মুকুন্দসিংহের খাজনা দিতে আপত্তি আছে। এক্ষণে আমি আরও তলব তাগাদা করিব কি না এবং করিতে হইলে তাহা কি ভাবে করিব তাহার আদেশ দিবেন।

রাজা মুকুন্দসিং এই কোম্পানীর প্রতি ক্রমাগত খারাপ ব্যবহার করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বিশেষতঃ আমাদের পালামৌ অভিযান কালে সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে—তাহা অতীব স্পর্দ্ধার কার্য্য। সেখানে সে আমাদের শত্রুপক্ষকে লোক ও অর্থদ্বারা সাহায্য করে। শুধু তাহাই নহে, আমাদের প্রতি এতই উপেক্ষাপরায়ণ যে, কোম্পানীর যে হর্করা পরোয়ানা লইয়া যাইতেছিল তাহাকে হত্যা করে। হর্করার অপরাধ সে রাজার বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিল। সম্প্রতি ১০।১২ জন সঙ্গীসহ একজন ফরাসীকে সে পাথেয় দিয়া আনিয়াছে। দাক্ষিণাত্য হইতে সদলবলে ফরাসী যখন এই দিকে আসে তখন উহাদের আশ্রয় না দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। আমি শুনিতেছি ইংরাজদের শত্রু বলিয়া পরিচয় দেওয়াতেই ঐ ফরাসীদের সঙ্গে রাজার এত বন্ধুত্ব। পাহাড়ীয়া রাজাগণের তলব হওয়ার পর সর্ব্বশেষে রামগড়ের উকিল আসিয়াছিল। সে একটী দুরভিসন্ধি লইয়া আসে। পালামৌর রাজা গোপাল রায়কে আমাদের নিকট হইতে নিজের দলে টানিয়া লওয়াই তাহার গোপন উদ্দেশ্য ছিল। তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গোপাল রায় আমার নিকট সে সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে জানায়। সে বলে যে রামগড়ের রাজা তাহাকে বলিতেছে টিকারীর রাজাকে দলগত করিয়া সমস্ত পাহাড়ীয়া রাজারা একযোগে আমাদিগকে পুনর্ব্বার বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করুক, তাহা করিলে রামগড়ের রাজা গোপাল রায়কে অর্থ এবং লোকজন দিয়া সাহায্য করিতে পারে। এই প্রস্তাবে গোপাল রায় অস্বীকৃত হইলে রামগড়ের রাজা পালামৌর প্রজাদের গরু বাছুর আটক করিয়া বিপর্য্যস্ত করে। এই সমস্ত অত্যাচারের বিষয় আপনাকে আমি বহুবার জানাইয়াছি। আপনার আদেশের অপেক্ষা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে নিজে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করি নাই। এক্ষণে আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম যে টিকারীর রাজাকে কয়েকটী সহরের অধিকার দিয়া রামগড়ের রাজা নিজের দলে তাহাকে টানিয়া লইয়াছে। পালা-মৌতে আমাদের যে সৈন্যদল আছে তাহারা তাহাদের সর্ব্বপ্রকারে উত্যক্ত করিয়া বিতাড়িত করিবে। অসুবিধাকর অবস্থার সময়ে সুযোগ পাইয়া মুকুন্দ সিংহ এই প্রদেশে যে সকল স্থান দখল করিয়াছিল, তাহাতে আমাদের দাবী ও অধিকার সে মানিয়া লইতে চাহিতেছে না। সে অত্যন্ত অবিশ্বাসী লোক, তাহাকে বুঝাইয়া কোন ফল নাই। বিশেষ অবস্থান হিসাবে এই সমস্ত প্রদেশ যে এই অঞ্চলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান, তাহা গত ৬ই নবেম্বর তারিখে আমি মিষ্টার আলেকজাণ্ডারকে পত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছি। কিন্তু কি করা কর্ত্তব্য তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। তদন্ত করিয়া এক্ষণে আমি জানিতে পারিয়াছি যে এই পাহাড়ীয়া জমিদারগণ পাঁচ বৎসরের কবুলতীতে বার্ষিক ৮৫০০০৲ টাকার খাজনায় বিশ্বাসযোগ্য জামীন দিয়া এই প্রদেশের বন্দোবস্ত লইতে চাহে। এই খাজনা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। বর্ত্তমানে মাত্র ৬৬০০০৲ টাকা খাজনা আছে। তাহা এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা অধিক লাভজনক হইবে। কিন্তু বেশী লাভের হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে এই সব স্থান পুনরায় দখল করা। পালামৌ দখলে আসায় সাশারাম, সেম্রাইশ, কোটম্বা, চায়কোয়া, সমোৎ ও শেরঘাটী

নামক লাভবান পরগণাগুলির মধ্যে তাহা একটী সীমারেখাবৎ হইবে। সেগুলিকে রক্ষা করিতে এই সৈন্যদলকে তথায় রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহার দ্বারা চৈ-চম্পা প্রভৃতি প্রদেশকে শাসনে রাখা হইবে এবং তদ্দ্বারা দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের পাহাড়ের নিম্নদেশসকল শাসনে থাকিবে। এই পাহাড়তলের প্রদেশসকল যত ডাকাতের দল ও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট জমীদারগণের আড্ডা হইয়াছে। কামদার খাঁ কখনই সব প্রদেশ এইরূপ ভাবে থাকিতে দিত না এবং কাসিম আলীর সৈন্যদলকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নবাব সরকার যদি লইয়া না যাইতেন তাহা হইলে কাসিম নিশ্চয় এতদিন এই সব স্থানে অধিকার স্থাপন করিত। পাহাড়ের এই নিম্ন দিকে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। এই শান্তির সময়ে যদি এই প্রদেশকে শাসনে আনা না যায়, তবে যুদ্ধের সময় অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। এই বিদ্রোহীরা তখন বিহার পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ধ্বংস করিয়া দিবে। অনেক সৈন্য থাকিলেও কামদার বহু কষ্টে এই দেশকে শাসনে রাখিতে সমর্থ হয়। এই সব পাহাড় দখলে সৈন্য রাখা প্রয়োজন। এই সমস্ত স্থানে আমাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিলে বাংলা ও বিহারকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হইবে। পালামৌ দখল করায় মারাঠাদের আসিবার একটা পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে নাগপুরের রাজার বন্ধুত্ব দ্বারা নাগপুর ও পাৎচিৎ বা বীরভূমের পথ রুদ্ধ হইবে। তাহা হইলে উড়িষ্যা বা পশ্চিম দিক ভিন্ন আর এদিকের প্রবেশ পথ থাকিবে না। এইরূপে বলবান সিংহের জমীদারী হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ নিরাপদ হইবে। মুকুন্দসিংহ একজন সাধারণ প্রজা বা ফৌজদার মাত্র, তাহাকে যখন ইচ্ছা বেদখল করিতে পারা যায়। সে ক্রমাগত খাজনা ফেলিয়া রাখে, এইজন্য ন্যায়ের খাতিরে তাহাকে উচ্ছেদ করা উচিৎ। এই পাহাড়ীয়া দেশের এখন যে অবস্থা তাহাতে মনে হয় ইহা পুনর্ব্বার দখল করিবার এখনই উপযুক্ত সুযোগ হইয়াছে। এখন দখল করিতে অসুবিধা যেরূপ কম, ব্যয়ও সেইরূপ অল্প হইবে।

নাগপুরের রাজা শক্তিশালী, তাহার উপর বিশ্বাস করা যায়। তাহার জমীদারীর সীমায় সে মুকুন্দ সিংহের বিরুদ্ধতা করিবে। পালামৌর রাজার শক্তিও নগণ্য নহে, সে আমার অনুগত। সুতরাং পাৎচিতের এই দিকটা ব্যতীত মুকুন্দ সিংহ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত। কিন্তু আমি বেশী নির্ভর করিতেছি ঠাকুরের (মুকুন্দ সিংহের ভ্রাতা ও সেনাপতি) সহিত চৈ-চম্পার জমীদারগণের সাহায্যের উপরে। এই ঠাকুর এক্ষণে মুকুন্দ সিংহের দলে নাই ; এমন কি সে নিজের জীবনের আশঙ্কা করে এবং পরিবারবর্গকে নিরাপদে বাহির করিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইতে লিখিয়াছে। পরিবারবর্গকে সরাইয়া লইয়া ঠাকুর নিজেই রাজাকে আয়ত্ব করিতে পারিবে ভরসা করে এবং তাহার সহিত চৈ প্রভৃতি স্থানের জমীদারগণ আছে। এই জমীদারগণের সম্পত্তি মুকুন্দ সিংহ বেদখল করিয়া এখন তাহাদের সামান্য মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকে। ঐ জমীদারগণ সম্পূর্ণ আমার আয়ত্বাধীন এবং সম্পত্তি দখলে পাইলে সমস্ত বাকী খাজনা মিটাইয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস চার পাঁচ দল ইংরাজ সৈন্য এবং কিছু নিজামত সিপাহী পাইলে আমি মুকুন্দ সিংহকে পরাজিত করিতে পারি। পাৎচিতের দিকেও দুই এক দল ইংরাজ সৈন্য পাঠাইলে ভাল হয়। সরাই-কোটম্বাতে যে সৈন্য ছিল তাহা পালামৌর জন্য প্রয়োজন। তাহাদের দ্বারা ঐ সকল স্থান দখলে রাখা চলিবে এবং সীমান্তে যে সকল সৈন্য ছিল তাহাদের সাহায্যে জমীদারগণকে নিরাপদ রাখা চলিবে। নিবেদন ইতি— পাটনা, তাং ১ই আগষ্ট, ১৭৭১।

একান্ত অনুগত ভৃত্য

(সহি) জে ক্যামাক।"

"এই পাহাড়ীয়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হইতে গত তিন বৎসরের বাকী খাজনার তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি—

নাগপুর ও টোর	১০,০০০৲	৫,০০০৲	১৫,০০০৲
রামগড়	১৬,০০০৲	৮,০০০৲	২৪,০
কেণ্ডি ও পিতিজ	১,৮০০৲	৭০০৲	২,৫
চৈ-চম্পা দিগর	২০,০০০৲	১২,০০০৲	৩২,০
চৌরি ও ধুতুরা	৮,০০০৲	৪,০০০৲	১২,০
একুন	৫৫,৮০০৲	২৯৭০০৲	ৰ৫৫ৰ

(সহি)—জে, ক্যাম্যাক।"

ক্যাপ্টেন ক্যামাকের নিকট রাজা মুকুন্দ সিংহের পত্র

তারিখ ১৯শে চন্দ্রমান রুবিয়াসসামি

"আপনার অনুগৃহীত পত্র পাইলাম। বাকী খাজনার তলব করিয়াছেন। যাহা কিছু বাকী তাহা নাগপুরের নিকট পাওনা আছে। যে খাজনার জন্য আমি দায়ী তাহা পরিশোধ করিয়াছি, ইহা ছাড়া আমি জমীদারীর মধ্যে জায়দাদ প্রদান করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বেও আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে জানাইয়াছি যে খাজনা আদায় দিতে আমি কখনও বিলম্ব করি না। জয়নারায়ণ চৌধুরীর নিকট আপনি অবগত হইবেন যে, আমি আপনার কৃপার কত আশা ভরসা করি। কিন্তু অবস্থা বিশেষের জন্য আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। আপনি যদি দয়া করিয়া সায়াদুল্লা খাঁকে এখানে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমার যথা কিছু নিবেদন তাহার নিকট জানাইতে পারি এবং তিনি আপনার পক্ষ হইতে আমায় অভয় দিতে পারেন। মহারাজা ও সর্দ্দারের পত্রে বাকী জায়ের বিবরণ আসিয়াছে। ঐ সমস্ত হিসাব এককৌড়ি ও নুরুলহোসেন খাঁর নিকট এবং আপনাদের সরকারী সেরেস্তায় আছে বলিয়া আর পৃথক আর্জ্জি পাঠাইলাম না।"

ক্যাপ্টেন ক্যামাকের উক্ত পত্র পাইয়া খৃঃ ১৭৭১।১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়মের কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট অনারেবল জন কার্টিয়ার সাহেবের নিকট সমস্ত ফাইল পাঠাইয়া অচিরাৎ সুব্যবস্থা করিবার জন্য যোসেফ্ যেকিল্ সাহেব পত্র দিলেন। তাহাতে বলা হইল যে নাগপুর-রামগড়ের রাজা মোটেই অধীনতা দেখাইতেছে না—ইত্যাদি।

অতঃপর খৃঃ ১৭৭২, ৫ই নবেম্বর তারিখে পাটনার চীফকে ক্যাপ্টেন ক্যামাক নিম্নলিখিত পত্র লিখেন—

"জর্জ্জ ভ্যান্‌সিটার্ট স্কোয়ার

পাটনার চীফ্ মহোদয় সমীপেষু।

মহাশয়, আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে গত মাসের ২৮শে তারিখে আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাজার কোনও খোঁজ পাই নাই। শুনিতেছি এখান হইতে ৮।১০ ক্রোশ দূরে পাহাড়ের মধ্যে সে আছে এবং দিনের মধ্যে দুই একবার করিয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে যাতায়াত করে। নাগপুরের রাজার দেওয়ান ও 'ঠাকুর' (তেজসিংহ) প্রায় ৫০০ শত লোক লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদিগকে ঐদিকের গিরিবর্ত্ত রক্ষার ভার দিয়াছি। ঐ পথ দিয়াই আমাদের রসদ আসে, এজন্য ঐ গিরিপথে পাহারা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। রাজার সঙ্গে অন্যান্য ঠাকুর ও সর্দ্দারগণ যোগ দিয়াছে, কেবল চৈ-চম্পার জমীদারগণ যোগ দেয় নাই। তাহারা তেজসিংহের দলে আছে। আমার মনে হয় রাজাকে খুঁজিয়া পাইলে বা বিতাড়িত করিতে পারিলে সকল সর্দ্দারই রাজার দল ত্যাগ করিবে। এখানে (রামগড়ে) আমাদের একটী ঘাঁটী থাকা প্রয়োজন। কারণ আমাদের হাঁসপাতাল, রসদ, গুলিবারুদ এবং ভারী লট বহরগুলি আমরা এখান হইতে চলিয়া গেলে পাহারা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য আমি এখানকার পুরাতন কেল্লাটীকে সুসজ্জিত করিতেছি। এই কেল্লাটী বেশ উচ্চ জায়গায় এবং উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত ও পরিখা বেষ্টিত। ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত ও ছোট হইলেও বেশ ঠাসা ধরণের, কিন্তু ইহার অংশবিশেষ এবং চারিটী চূড়াই আশাতুল্লা ও মর্কট নষ্ট করিয়া গিয়াছে। এই স্থানটী একটী ভাল ঘাঁটী হইবে। কারণ এখান হইতে নাগপুর ও রামগড় উভয় স্থানের উপর দৃষ্টিরাখা চলিবে। যদিও নাগপুরের লোকরা তাহাদের এত নিকটে এইরূপ একটী থানা প্রস্তুত হওয়াটা ভালবাসিতেছে না। তথাপি তাহারাই আমায় রাজমিস্ত্রী যোগাড় করিয়া দিয়াছে। আমি আশা করি যে ১৫।২০ দিনের মধ্যেই এখানে একটী ঘাঁটী প্রস্তুত হইবে। ইতি রামগড় ক্যাম্প খৃঃ ১৭৭২।৫ই নবেম্বর।

একান্ত অনুগত জে ক্যামাক।

দক্ষিণ ফ্রন্টিয়ারের একটী দলের সেনাপতি।"

উহার দশ দিন পরে জর্জ্জ ভ্যান্‌সিটার্ট সাহেবকে ক্যাপ্টেন ক্যামাক দ্বিতীয় এক পত্র লিখেন। সহজে মুকুন্দসিংহকে পরাজিত করা যাইবে ভাবিয়াছিলাম তাহা হয় নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

"মহাশয়, অল্প একদল সৈন্য লইয়া রাঁচির দিকে রাজা অগ্রসর হইতেছে জানিতে পারিয়া গত ৮ই তারিখে ক্যাপ্টেন ইউয়েন্স ও ঠাকুর তেজসিংহকে পাঁচ দল সৈন্যসহ পাঠান হইয়াছে। এখান হইতে আট ক্রোশ পূর্ব্বে গোলা চিতোরপুর নামক একটী গ্রাম আছে, উহা পূর্ব্বে নাগপুরের সামিল ছিল, এখন রামগড়ের এলাকাধীন। এখানে রাজার দলের সহিত একটী সংঘর্ষ হয়, তাহাতে রাজার সৈন্যেরা গুলি চালায়। আমাদের কিছু করিতে পারে না, কিন্তু আমরা রাজার দলের একজন লোককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি এবং তাহাদের বিতাড়িত করিয়াছি। রাজা এখন প্রতাবগড় (?) ও প্রাচীর মধ্যে জঙ্গলে আছে। ক্যাপ্টেন উইয়েন্স লিখিতেছেন, তিনি এখন রাজার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। যদি রাজার সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে ইউয়েন্স উক্ত রাজার দেওয়ান মির্জ্জা সামসেরবেগের অনুসরণ করিবেন। সামসের সৈন্য সংগ্রহের জন্য সিলি নামক স্থানে গিয়াছে, অকুস্থল হইতে সিলি অল্প দূরে অবস্থিত, তাহা একসময়ে নাগপুরের অধীনে ছিল, এখন রামগড়ের এলাকাভুক্ত।

অল্যাগর্ব্বার গিরিপথের ঘাটোয়াল—যে ইউয়েন্সের সৈন্যদলকে ঐ পথ দিয়া নিরাপদে যাইতে দিয়াছিল ও আমরা এই প্রদেশে আসার পর নাওদাতে ঐ পথ দিয়া যে পত্রাদি পাঠাইতেছিলাম তাহাও যাইতে দিয়াছিল, সে এক্ষণে শত্রু দলে যোগ দিয়াছে এবং চারিটী ডাক্ মারিয়াছে ও 'ঠাকুরের' যে সব লোক ঐ সমস্ত ডাক্ আনিয়াছিল তাহাদেরও হত্যা করিয়াছে। গত ১১ই তারিখে আমি খবর পাই যে উক্ত ঘাটোয়াল জুরাকাট নামক একটী দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য ঘাঁটীতে আছে। ইহা জানিবামাত্র, ঐদিনই প্রাতে ৪টার সময়ে মিষ্টার স্কট্ যে ১২০ জন সিপাহি লইয়া আসেন তাহাদের লইয়া স্কটকে উক্ত ঘাটোয়ালের অনুসন্ধানে রওনা করিয়া দিই। তাঁহারা ঘাটোয়ালকে ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার অনেক লোকজন ও সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র করায়ত্ত করিয়াছেন। ঘাটোয়াল একটা নালার নিম্ন দিয়া গুড়ি মারিয়া পলায়ন করিয়াছে। নাগপুর ও পালামৌ ঘুরিয়া আমার এই পত্র পাঠাইতে হইল। যতদিন কোন নিকটস্থ গিরিপথে একটী থানা স্থাপন করিতে না পারি, ততদিন এইভাবে ঘোরা পথ ব্যবহার করিতে হইবে।

লোয়াঙ্গা এবং ডুঙ্গনা গিরিবর্ত্তে এখনও শত্রুদল রহিয়াছে। আমি ঐ পথ দিয়াই এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এখানকার বহু প্রজা এবং এখান হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত সমস্ত গিরিবর্ত্তের ঘাটোয়াল এবং চৈ-চম্পার প্রায় প্রত্যেক প্রজা রাজার হুকুম মত নিজের নিজের ফসল কাটিয়া লইয়া পর্ব্বতের ভিতর গিয়া লুকাইতেছে ও যে গ্রামের লোক তাহা করিতেছে না সে সমস্ত গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেছে এবং কোথাও কোথাও তাহাদের কথা যাহারা শুনিতেছে না তাহাদের কাটিয়া ফেলিতেছে। যে সব লোক ঠাকুর সাহেবের বাধ্য তাহাদের প্রতি শত্রুপক্ষের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী। চৈ নামক স্থানে আমাদের সৈন্যদল, ঠাকুর সাহেবের ভ্রাতা শিবনাথ সিংহের লোকজনের সহায়তায় উন্নৎসিং নামক যে লোকটা ঠাকুরের আত্মীয় হইয়াও রাজার দলকে খুব সাহায্য করিতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আমি চারিদিকে সহরৎ করিয়া জানাইয়া দিতেছি যে জরুরী প্রয়োজনে এই প্রদেশ আক্রমণ করা আমাদের দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও কোন ভয় নাই কেহ যেন পলায়ন না করে—যেন নিজের ঘরবাড়ীতেই থাকে ও নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজার সংস্রব ত্যাগ করে। তাহা করিলে আমরা প্রত্যেকেরই স্বত্ব স্বীকার করিয়া লইব, কাহাকেও

অসুবিধায় ফেলিব না বা পীড়ন করিব না। কিন্তু তাহা না করিলে আমরা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিব।

পশ্চিমের দিকে রাজা গিয়াছে এইরূপ সংবাদ ক্যাপ্টেন ইউইন্স লিখিলেও আমি বহু লোকের নিকট সন্ধান পাইতেছি যে রাজা এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু পরের মার্ফৎ সংবাদ পাওয়ায় কিছুই স্থির করা সম্ভব হইতেছে না। চকিত আক্রমণ দ্বারা গ্রামের লোকদের নিকট সংবাদ জানিয়া রাজাকে ধরিবার চেষ্টায় আছি। গ্রামের লোকরা রাস্তায় রাস্তায় কাটা গাছ ফেলিয়া যাতায়াত অবরোধ করিয়াছে।

সেরঘাটী ত্যাগের পর হইতে আমি পাটনার পত্র পাই নাই। নাগপুর ঘুরিয়া ঐ সব পত্র আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

১৫ই নবেম্বর, ১৭০২।

দক্ষিণের সৈন্যদলের অধিনায়ক

অনুগত (সহি) জে, ক্যামাক্।"

ক্যাপ্টেন ক্যামাকের অভিযান ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয় এবং ৩।৪ বৎসরের মধ্যে তিনি পালামৌ, রামগড় ও ছোটনাগপুরের রাজ্যগুলি ইংরাজের অধীনে আনিতে সমর্থ হয়েন।

পাটনার বড় সাহেবের লাল বাহাদুর সিং নামক একজন চাপরাসী এই অভিযানে ক্যামাককে সর্ব্ব প্রথমে উৎসাহিত করে। লাল বাহাদুরের নিবাস ছিল বন্ধুরা নামক স্থানে। এক্ষণে বন্ধুরা স্থানটী ই, আই, রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনের একটী ষ্টেশন ও হাওড়া হইতে ২৮৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বন্ধুরা, গয়া হইতে ৭ মাইল ডাউনের ষ্টেশন। সম্ভবতঃ গয়া দখল হওয়ার পর লাল বাহাদুর ক্যামাককে জানায় যে, সে রামগড়ের পথঘাটের সঙ্গে পরিচিত। পরে সে ক্যামাকের বিশ্বস্ত গুপ্তচর ও পথপ্রদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বোধ হয় এই লাল বাহাদুরের সহিত যুক্তি করিয়া রামগড়ের সৈন্যাধ্যক্ষ তেজসিং অন্যান্য ছয়জন সামন্ত রাজার সহযোগে রাজা মুকুন্দসিংহের বিদ্রোহিতা করেন। তেজসিংহের সহিত জগোদি, রামপুর, ইটখোড়ি, উত্তর পরোরিয়া ও দক্ষিণ পরোরিয়ার সামন্তরাজগণ একযোগে ক্যামাককে সাহায্য করেন। প্রথমে রামগড়ের মধ্যে চিতরপুরে একটী বড় রকমের যুদ্ধ হয়, তাহাতে কোনও মীমাংসা হয় না। তৎপরে (হাজারিবাগ হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে) ইন্দ্রাজর্ব্বায় যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজা মুকুন্দসিং পরাস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েন। তাঁহাকে পাটনার প্রধান কুঠিতে চালান দেওয়া হয়। তখনকার দিনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান প্রধান কুঠি, ঢাকা, কাশিমবাজার, কলিকাতা ও পাটনায় অবস্থিত ছিল। রাজা গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পাইয়া রাণীরা জহরব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক রামগড়ের একটী কূপ মধ্যে উলম্ফনে প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপ কিম্বদন্তি প্রাচীনদের মুখে শুনিতেছি। পাটনা হইতে বন্দী অবস্থায় কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারদের নিকট কলিকাতায় আপিল করিবার জন্য যাইবার কালে গঙ্গাবক্ষ দিয়া যখন নৌকা চলিতেছিল তখন ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া রাজা মুকুন্দ সিংহ সংসার লীলার অবসান করেন। তখনকার দিনে নৌকাপথেই গমনাগমন ছিল। যাহা হউক উপরোক্ত ঘটনা হণ্টার, সিফ্‌টন্ বা লিষ্টার সাহেবের গেজেটিয়ারের বিবরণীতে পাওয়া যায় না। রবিন্সন সাহেবের বিবরণীর ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—"ফৌজদার তেজসিং, মুকুন্দ সিংহের সহিত বিবাদ করিয়া, কিরাত সিংহের বংশধর—বোগড়ার বাচু সিং ও মার্কা চোর ফতে সিংহের সহায়তা পাইয়া গয়ার জনৈক অধিবাসী (পাটনার বড় সাহেবের চাপরাসী) লাল বাহাদুর সিংহের মার্ফৎ ইংরাজদের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করেন এবং ইংরাজদের ঐ প্রদেশ দখল করাইয়া দিতে সাহায্য করিবেন এইরূপ জানান। তাঁহার সাহায্য গৃহীত হয় ও রামগড়ে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। মুকুন্দ সিংহ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। কথিত হয় মুকুন্দ সিংহ তাহার রাজ্যচ্যুতির অল্পকাল পরে মারা যায় ও তাহার যে নাবালক পুত্র ছিল সেও ত্বরায় পিতার অনুসরণ করে ।"

কর্ণেল রবিন্সনই (১৮৭১ খৃঃ) এই প্রদেশের প্রথম ইংরাজ ঐতিহাসিক। তৎপরে হণ্টার (১৮৭৭ খৃঃ), সিফ্‌টন্ (১৯০৮-১৫ খৃঃ) ও লিষ্টার (১৯১৭ খৃঃ) সাহেব যথাক্রমে যে সমস্ত গেজেটিয়ার লেখেন তাহাতে রবিন্সনেরই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে।

অতঃপর তেজসিংকেই ইংরাজরা রামগড়ের জমিদারী দিলেন, তাঁহাকে রাজা উপাধি না দিয়া 'মুস্তাজীর' উপাধি দেওয়া হইল। কিন্তু রাজ্যভোগ করিতে তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন না।

ইংরাজ কর্ত্তৃক বন্ধুত্বের পুরস্কার

তেজ সিং রামগড় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন বটে কিন্তু তাহা জায়গীর বা নিষ্কররূপে নহে, যদিও অন্যান্য প্রধান সাহায্যকারীগণ কিছু না-কিছু বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে লাল বাহাদুরের বংশের জায়গীর উল্লেখযোগ্য। তেজ সিংহের মত লাল বাহাদুরও এই যুদ্ধ বিজয়ের অল্প দিন পরেই পরলোকপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু লাল বাহাদুরের পুত্র ওয়াজীর আলিকে ইংরাজ কোম্পানী ৫০২২৲ টাকা মূল্যের ২২ খানি গ্রাম ৩০শে আগষ্ট ১৭০০ খৃঃ তারিখে জায়গীর প্রদান করেন এবং তাহা ১ নং খেওটভুক্ত পৃথক তৌজী বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই এই সম্পত্তি লাল বাহাদুরের বংশধরেরা খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। যগোদি, রামপুর, পরোরিয়া ও ইটখোড়ীর জমিদারদের প্রত্যেককে রামগড় হইতে পৃথক ও স্বাধীন বলিয়া গণ্য করা হইল। কুণ্ডার রাজাধিরাজ নারায়ণ সিংহ ঐ প্রদেশে প্রবেশ কালে ক্যামাককে বিশেষ সাহায্য করেন, এজন্য তিনি তাঁহার অধীনস্থ ৩২৮ খানি গ্রাম বিনা করে ভোগ দখলের কায়েমি সত্ত্ব পাইলেন।

মুকুন্দ সিংহের অধিকৃত বিশাল রাজ্য এই প্রকারে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। (রবিন্সনের বিবরণ ৭৭।৭৮ অধ্যায়)

সিং দেও'য়ের বংশধরদের বিবরণ

সিংদেওয়ের পুত্র মান সিং, তৎপুত্র নেওয়াল, তৎপুত্র রাম, তৎপুত্র দুর্য্যোধন, তৎপুত্র রাজবল। রাজবলের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খেয়াৎ, তিনি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজিৎ সিংহকে ফৌজদার করেন।

অজিতের পুত্র গোলাল। গোলালের ৬ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনির। মনিরের জ্যেষ্ঠপুত্র তেজসিং ও কনিষ্ঠ শিবনাথ সিং।

তেজসিংহের বংশ-লতিকা

তেজ সিং ইচাক নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার বংশ-লতিকা নিম্নে লিখিত হইল।

তাঁহার দুইটী পুত্র বর্ত্তমান আছেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানারায়ণ সিং ও কনিষ্ঠ শ্রীমান বসন্তনারায়ণ সিং। ইঁহারা দুই ভ্রাতাই রায়পুরের প্রিন্সেস কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া সম্প্রতি আজমীরের মেয়ো কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। ১৯৩৭ খৃঃ ৯ই আগষ্ট তারিখে সাবালক হইয়া রাজা শ্রীযুক্ত কামাখ্যানারায়ণ কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের নিকট হইতে নিজ সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী নেপালের সেনাপতি জেনারেল সিংহ সামসের জঙ্গ বাহাদুরের কন্যার সহিত কামাখ্যানারায়ণ
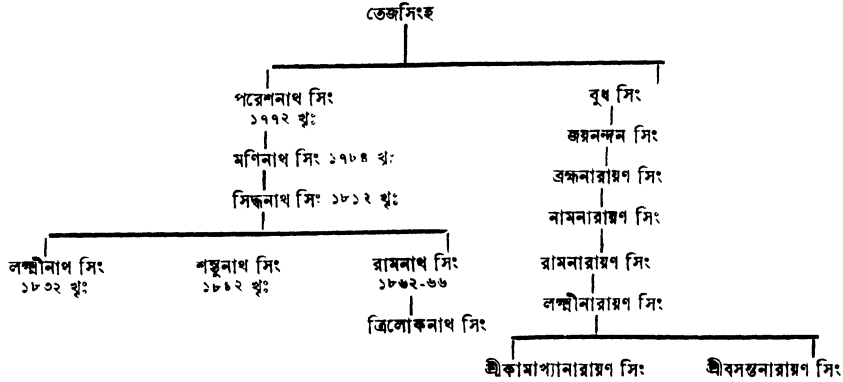
তেজসিংহের পুত্র পরেশনাথ সিং, তৎপুত্র মণিনাথ সিং। এই মণিনাথের সঙ্গে ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে খাজনা ধার্য্য হইয়া রামগড় রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত হয়। সে বিবরণ পরে দিতেছি।

মণিনাথের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই রাজ্যাভিষেক কালে ছোটনাগপুরের রাজার নিকট হইতে রাজটীকা গ্রহণ করিতেন। ছোটনাগপুরের রাজা তাঁহার দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা টীকা প্রদান করিতেন। মণিনাথ এই অপমানকর প্রথা-মত টীকা লইলেন না। মণিনাথের পুত্র সিদ্ধনাথ, তৎপুত্র লছমীনাথ। লছমীনাথ অপুত্রক মারা যাওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুনাথ রাজা হয়েন। তিনিও অপুত্রক মারা যাওয়ায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রামনাথ রাজা হয়েন। রামনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার একটী পুত্র হয়, কিন্তু পুত্রটী জীবিত না থাকায় ঐ গদি লইয়া প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলে। তাহাতে তেজসিং হইতে ৪র্থ পুরুষ বাবু * ব্রহ্মনারায়ণ সিংহের দাবী স্বীকৃত হয়। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই ব্রহ্মনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নামনারায়ণ সিং গদির মালিক হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামনারায়ণ সিং গদি প্রাপ্ত হয়েন। রামনারায়ণের ১৯১৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র লছমীনারায়ণ সিংহের রাজ্য কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে যায়। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত চক্রধরপুরের রাজা নরপৎসিংহের বিদুষী কন্যা শ্রীযুক্তা শশাঙ্কমঞ্জরী দেবীর বিবাহ। রাজ্যাভিষেক কালে রাজা নরপৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

সিংহের বিবাহ হইয়াছে। কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের হস্তে রামগড় রাজ্য অবস্থিত থাকা কালে প্রভূত উন্নতি উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থানান্তরে সে বিষয় বর্ণনা করিব।

রাজা মণিনাথ সিংহের সহিত বন্দোবস্তের দলিলের নকল।—

রামগড়ের কালেক্টারের নিকট লিখিত পত্র

"মহাশয়,

সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট আপনার ২৮শে আগষ্ট, ১লা সেপ্টেম্বর, ৭ই অক্টোবর এবং ২০শে নবেম্বর তারিখের পত্র ও বিরোধী নকল পেশ করিয়া তাঁহার আদেশমত জানাইতেছি যে, আপনি, রামগড়, পালামৌ ও কেন্দি রাজাগণের সহিত পূর্ব্বপ্রেরিত আদেশমত বন্দোবস্ত করিবেন, যাহা দ্বারা আয়ের খাজনা বাবত (ঘাটোয়ারী, পঞ্চাইত এবং হাওত বাবত) নিম্নলিখিত মত বাদ যাইবে, যথা—

রামগড় সিক্কা তঙ্কা ৯৫০০৲
পালামৌ " " ২৩০০৲
কেন্দি " " ৭৯০।৵০

আমরা রামগড়ের রাজাকে ঘাটোয়াল এবং কোতোয়ালগণ দ্বারা দেশে খবরদারী করিবার এবং উহাদের রক্ষার জন্য কাশীর তঙ্কা ২০৬২৴৫ এবং অন্যান্য খয়রাৎ ব্যয় বাবত কাশীর তঙ্কা ২০৫।৫ দিবার দায়ী করিতেছি।

* * * * *

মিঃ ডবলিউ, এম, লেসলি—রামগড়ের কলেক্টার সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার ৬ই জুলাই এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের

---

* রামগড় রাজ এলাকায় যাঁহারা খোরপোষভোগী তাঁহাদের 'বাবু' বলা হয় এবং তাঁহাদের সম্পত্তি 'বাবুয়ান সম্পত্তি' নামে গণ্য হয়।

পত্র পাইয়াছি। আপনার এলাকাস্থিত বিহার জেলায় যে দশশালা বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা আমরা অনুমোদন করিলাম। আপনার প্রস্তাবমত জমিদারদিগকে ১১৯৭ ফসলী সাল হইতে ১০ দশ বৎসরের জন্য নূতন কবুলতি দিতে হইবে।

*　　*　　*　　*　　*

মহামান্য শ্রীযুক্ত উইলিয়ম কাউপার সভাপতি মহোদয় এবং রেভেনিউ বোর্ডের সদস্যগণ সমীপেষু—

মাননীয় মহোদয়গণ,

আপনাদের অবগতির জন্য আমরা, দশশালা বন্দোবস্তকে স্থায়ী বন্দোবস্ত স্বীকার করিয়া লইয়া সেই মর্ম্মে কতকগুলি ছাপা বিজ্ঞাপন এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিভিন্ন জেলার প্রত্যেক কালেক্টরকে ইহার তিনখণ্ড করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।

আমরা অতঃপর ইহার পার্শি ও বাংলা তর্জ্জমা ছাপাইয়া আপনাদের নিকট পাঠাইব। তাহা প্রধান প্রধান জমিদারদের বিতরণ করিবেন।

ইতি—

কোর্ট উইলিয়ম,　　একান্ত অনুগত ভৃত্য
৬ই মে, ১৭৯৩　　কর্ণওয়ালিস,
পিটারস্পিকি,
উইলিয়ম কাউপার

রামগড় রাজ্যের ক্রমোন্নতি ও রাজকর প্রভৃতি

রামগড়ের বার্ষিক রাজস্ব	২২৯৮৮।৶৫ পাই
দিগওয়ারী বাবত	২১৩৯৬৷৷৶০
পুলিশ বাবত	২৫৯৫৷৵০
সেসেস	৭৬২৫৫৷৷৫
কয়লা	১২৭৴০
জঙ্গল	১১২৫৲
অভ্র ...	১৩৮৷৵৴০
পাথর ...	৪১।৴০
	১১৪৬৬৮।৶০

১৯১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যের জমা-জমী

	১৭৭৮খৃঃ	১৮৭৩খৃঃ	১৯১৩খৃঃ
রাজ্যের মৌজার সংখ্যা	৩১৮৪	৩২০৯	৩১৯৩
জায়গীর	১৪৯০	১১১৪	৭৯০
খয়রাত ও বরাত	৪০০	৪৭০	৬০৭
মোকররী	৬৪৪	৬৩৪	৪৯৮
অন্যান্য জমা	৩৫৫	২৩২	৯২২
খাস ও ঠিকা	৫৩৯	৭৫৯	৭৭৬

কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডের অধীনে ক্রমোন্নতি

রামগড় রাজ্য ২৬শে জানুয়ারী ১৯১৩ খৃঃ অব্দে কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডের হস্তে আসে এবং এ পর্য্যন্ত সেইরূপ আছে।

সম্প্রতি ৪৪২৫ বর্গমাইল ব্যাপী এই এলাকা মধ্যে ৩৬৭২ খানি মৌজা আছে এবং হাজারিবাগ জেলার প্রায় ⅔ অংশ এই রাজ্যের সামিল। প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ১৯৬ জন লোকের বসতি আছে। রাজ্যমধ্যে প্রায় ৪১৩৭০ প্রজাই সত্ত্ব আছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে খালসা (নিজ দখলে) মৌজার সংখ্যা ২২৬টী ছিল, এক্ষণে তাহা ১৩২১টী হইয়াছে এবং জায়গীর ও সর্ব্বপ্রকার মোকররী জমা ২২৯১টী আছে।

১৯১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের দেনা ছিল ৪৪৬৪৫৲ টাকা, এক্ষণে সে সমস্ত পরিশোধ হইয়া (১৯২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত) ৩২৩৪৪০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছে।

১৯১৩।১৪ খৃঃ অব্দে এই রাজ্যের মূল্য ৩৯৪৭০০৲ ছিল, এক্ষণে (১৯২৭খৃঃ) তাহা ৯৩৬৮৪৬৩৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

রামগড় রাজ্যের আয়

	১৯১৩।১৪	১৯২৬।২৭ খৃঃ	১৯৩৫।৩৬
খাজনা	২০৭৬৬২৲	৫২৯৯৩৮৲	প্রায় ৬০০০০০৲
খনির আয়	২১৯০৬৲	৫৫৬৩০৭৲	প্রায় ১২০১০০০৲
সুদের আয়		১৩১৪২৮৲	
অন্যান্য বাবত	১৫০৫৭৲	১৪৭১৮৩৲	প্রায় ৪০০০০০৲
	২৪৪৬২৫৲	১২৬৪৮৫২৲	২২০০০০০৲

১৯১৩,১৪ খৃঃ অব্দে সংরক্ষিত বৃক্ষাদি কিছুই ছিল না, এক্ষণে ৪০০০০ একর জমিতে (রিজার্ভ ফরেষ্ট) বৃক্ষ সকল সংরক্ষিত হইতেছে এবং ১২০০০০ একর জমি ঐরূপ সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কোর্ট অফ ওয়ার্ডের আমলে রাজ্যের উন্নতিকল্পে বার্ষিক কম বেশী প্রায় ৫০০০০৲ ব্যয় হইয়াছে এবং বহুবিধ দাতব্য অনুষ্ঠানে প্রচুর সাহায্য করা হইয়াছে। সদরে ও মফঃস্বলে কর্ম্মচারীদের কোনও থাকিবার স্থান ছিল না। এক্ষণে ২৩টী তহশীল সার্কেলে কাছারীবাটী এবং কর্ম্মচারীদের থাকিবার গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে ও হাজারীবাগে রাজবাংলো" নামক খোলার নির্ম্মিত যে সদর কাছারী ছিল সেখানে প্রাসাদসম কাছারী বাটী ও সেরেস্তাখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় ম্যানেজার, দুইজন সহকারী ম্যানেজার, একজন ফরেষ্ট অফিসার, একজন ল' সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, একজন সুপারভাইজার, একজন অফিস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, একজন হেড এসিস্টেণ্ট, একজন হেড ক্লার্ক এবং আরো প্রায় ৬৫ জন ছোট বড় কর্ম্মচারী আছেন। মফঃস্বলে ৪ জন সার্কেল অফিসার, কয়েকজন ফরেষ্ট রেঞ্জার প্রভৃতি আছেন। মোট কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত হইবে। ১৯২৭ খৃঃ অব্দের পরেও সর্ব্ববিষয়ে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ডবলিউ, ও, ম্যাক্‌গ্রেগার সাহেব কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি ১৯১৪ খৃঃ অব্দে মারা গেলে তাহার পর মিঃ এ, এম ওয়ালটার সাহেব ম্যানেজার হন, তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছেন। নদীয়া জেলার উলা-রঘুনাথপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ

রায় বি এল মহাশয় ল' সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আছেন। ইঁহাদের বুদ্ধি ও চেষ্টার ফলে আজ রামগড় রাজ্যের এতটা উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। রামগড় রাজ্যের আদি অন্ত সমস্ত বিবরণ সুরেন্দ্র বাবুর যেন নখদর্পণে আছে। রবার্টসন সাহেবের এবং গেজেটিয়ার-ত্রয়ের বিবরণীর অতিরিক্ত বহু বিষয় যাহা আমি এই নিবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি তাহার অনেক কিছু সুরেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত। বিশেষতঃ সীতান রায় ও ক্যাপ্টেন ক্যামাকের পত্রগুলি, সহি মোহরের নকলগুলি দেখিতে দিয়া সুরেন্দ্রবাবু আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

রামগড় এক্ষণে উত্তর বিহারের মধ্যে ৫ম রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ১ম দ্বারবঙ্গ—আয় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা, ২য়, বেটীয়া—আয় প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা, ৩য় বনেরি—আয় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা, ৪র্থ টিকারী ॥৶০ + আমায়ন্ ।৶০—যুক্ত আয় প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা, ৫ম, রামগড়—আয় প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ও ৬ষ্ঠ ডুমুরায়োন্।

রামগড় রাজ্যে বহু প্রকারের জায়গীর প্রচলিত আছে। যথা—

(১) মশ্রুতি=একাদিক্রমে কার্য্য জন্য। (২) খয়েরখাই খিজমতি=পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য। (৩) বিশ্বান=বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া। (৪) বক্স পিকদান=দাতা ইহার সন্মে পিক ফেলিয়া মজুরী প্রদান করিতেন। (৫) মৌরসি মুরকাটি=যে কর্ম্মচারী কোনও রাজশত্রুর মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাকে দেওয়া হইত। (৬) শিরকাটি=যে কর্ম্মচারীর বংশের কেহ রাজার কাজে মাথা দিয়াছিল তাহাকে দেওয়া হইত। (৭) খয়রাত বা বৃত্তি=সাধু ফকির বা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত। (৮) খোরপোষ বা বাবুয়ান=রাজবংশের কনিষ্ঠের পরিবারবর্গকে প্রদত্ত বা রাজমহিলাদের প্রদত্ত জায়গীর এবং (৯) দিগওয়ারী জায়গীর।

কিন্তু এক্ষণে খয়রাত, খোরপোষ, বিশ্বান (বইসোয়ান), খিদমৎ ও দিগওয়ারী জাইগীর ব্যতীত অন্য জাইগীরগুলি প্রচলিত নাই। উপরোক্ত জায়গীর জমাগুলিকে কামিল-জমা বলা হয়। জমা প্রতি, যেখানে ১৲ খাজনা হওয়া উচিৎ সেখানে মাত্র ৵০ হইতে ।৵০ খাজনা দিতে হয়। কিন্তু খয়রাৎ জাইগীরের খাজনা নাই। তাহা রোল্-বিলকায়েল্-মকুফ শ্রেণীভুক্ত। রামগড়ের জায়গীরগুলিতে বিশেষত্ব এই প্রত্যেক জায়গীরই বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। কিন্তু আদালতের রায়ের দ্বারা সেই বংশের পুরুষ ওয়ারীশের শাখা বিস্তৃত হওয়াতে ঐ প্রকারের জায়গীর লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সেই প্রকারে কার্য্যকাল পর্য্যন্তই ভৃত্যদের বা কর্ম্মচারীদের জায়গীর থাকিবে তৎপরে উহা বাজেয়াপ্ত হইবে সাব্যস্ত হইয়াছে। (আই, এল, আর ৪৬। কলিকাতা ৬৮৩)।

রাজা রামনাথ সিং ১৮৩৪-৬৬ খৃঃ মধ্যে রামগড়ে ৬৪৪টা এই প্রকারের জায়গীর প্রদান করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা বিভিন্ন বংশের দুই জনের নামে একযোগে সনন্দ আছে, কদাচিৎ এক জনের নামে সনন্দ আছে। এইরূপ উভয় মোকররীদারের মৃত্যুর পরেই ঐ সব মোকররী জায়গীর লুপ্ত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইয়াছে (আই, এল, আর ৩। কলিকাতা ৮৮৩; ঐ ৪৩। কলিকাতা ৩৩২; প্রিভিকাউন্সিল, আই, এস, আর ১০, সি, ডবলিউ, এন, ঐ ৭ পাটনা ৬৮৭)। এইরূপে এখন ১০টী মাত্র মোকররী জমা আছে। যদি কোন মোকররীর জমায় নাস্‌লান বাদ-নাসলান্, বাৎ-নান্ বাদবাতান্, অথবা বা কার্জান্দ শব্দের উল্লেখ না-থাকে তবে তাহা বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য—আদালত হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে।

দিগওয়ারী জমাগুলিও এক প্রকারের জায়গীর।

রাজা মণিনাথ সিংহের সহিত যখন ইংরাজ সরকারের স্থায়ী বন্দোবস্ত পাটা কবুলতি হয় তখন রাজাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছিল যে,—

"আমি, গিরিবর্ত্ত ও ঘাটগুলিতে পাহারা রাখিব যাহাতে নিরাপদে যাত্রী ও পর্য্যটকগণ সে পথ দিয়া যাইতে পারে। কোনও চোর ডাকাতকে (ঐ পথ দিয়া) আসিতে দিব না। ভগবান না করুন, কোনও চুরী হইলে, আমি চোরকে চোরাই মালসহ আদালতে হাজির করিব।"

এই কবুলতি অনুসারে রাজাকে দিগওয়ারীর কাজ ও পুলিশের কাজ করিবার ভার লইতে হইয়াছিল। এই জন্য ৬৯টী দিগওয়ারী জমার উদ্ভব হয়। দিগওয়ারগণ এই সব চাষের জমী বিনা করে ভোগ করিত ও তৎপরিবর্ত্তে পাহাড়ের ঘাটীগুলিতে প্রহরীর কাজ করিত। কিন্তু ১৭৭৮ সালের ৮ আইন জারী হওয়ার পর জমিদারের হাত হইতে পুলিশের ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইল ও সরকার হইতে পুলিশ নিযুক্ত হইল। এইরূপে দিগওয়ারগণ ও জমিদারগণ দায়িত্ব মুক্ত হইল। রামগড় রাজ্যে দিগওয়ারী কার্য্যের জন্য রাজার তহবীল হইতে ২৯৫৩২ টাকা ব্যয় হইতেছিল। অতঃপর হাজারীবাগের ডেপুটী কমিশনার সাহেব দিগওয়ারদের আয়ের উপর শতকরা ৬০৲ সেস হিসাবে আদায় দিবার আদেশ প্রদান করেন। এই প্রকারে দিগওয়ারদের নিকট ১৩১৪৩৷০ এবং রামগড় রাজাকে বাকী ৯৩-৮॥০ দিবার আদেশ হয়। দিগওয়ারগণ এই আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার সাহেবের নিকট আপিল করে। তাহার ফলে শতকরা ১০৲ হইতে ৩০৲ টাকা আদায় করিবার রায় হয় (ছোট নাগপুরের কমিশনার সাহেবের ১ই নভেম্বর, ১৭০ তারিখের রায়) এবং বাকী সমস্ত টাকাই রামগড়কে দিতে হইবে এইরূপ আদেশ হইয়াছে। ১৮৮৩ খৃঃ রাজা নামনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক দিগওয়ারদের বিরুদ্ধে তাহাদের কোনও কাজ করিতে হয় না—এই অজুহাতে দিগ-ওয়ারী জায়গীর খাস দখল করিবার বহু মোকদ্দমা হয়; কিন্তু হাইকোর্ট কর্ত্তৃক সে সমস্ত ডিসমিস্ হইয়া যায়, প্রিভিকাউন্সিলেও হাইকোর্টের রায় বজায় থাকে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে দিগওয়ারদের কাজ নাই বটে কিন্তু তাহারা খাজনা দিতেছে—এজন্য জমা বাজেয়াপ্ত হইবে না।

রামগড়রাজ প্রদত্ত একখানি সনন্দের নমুনা

সম্বৎ ১৭০৪ বদি ৪ঠা মাঘ

পাট্টাদাতা উদিৎ প্রতাপসম্পন্ন মহারাজা শ্রীশ্রীহেম্মৎ সিং

গৃহীতা ঠাকুর ত্রিভুবন সিং

দুইটী ঘোড়সোয়ার ও ৩০ জন পদাতিক সৈন্য রক্ষার জন্য বার্ষিক ৬২৭॥০ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পরগণে সাদাম মধ্যে হোসের সাদাম প্রভৃতি ২৮ খানি মৌজা মায় গাছ মাছ, দেওয়াল প্রভৃতি তোমাকে দান করিলাম।

সাক্ষী শীতল সিং

সহি—ঠাকুর দামোদর দাস

সাং হুরিয়া

কান্ত

ভৈরব—একতালা

(লঘুগুরু ছন্দ—হিন্দি)*

আরো অপরূপ কান্ত,
ঐসী ছবি বনিয়া :
নীল ছন্দ, নন্দলাল,
কণ্ঠে বনকুসুম মাল,
মধুর-তাল,
চতুর-চাল—
বাজত পয়জনিয়া !

আরো অপরূপ কান্ত,
ঐসী ছবি বনিয়া :
সুখমন্দির-সুরবল্লভ,
ফুললাঞ্ছন-করপল্লব,
রাধারব-
নটনোৎসব—
মুরলী-মোহনিয়া !

আরো অপরূপ কান্ত
ঐসী ছবি বনিয়া :
চিরবাঞ্ছিত জগবন্দন ;
মন্ত্রশরণ চিতনন্দন,
কর মোচন
সব বন্ধন—
মাঙত হুঁ শরণিয়া !

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শান্ত

ভৈরব—একতালা

(লঘুগুরু ছন্দ)

মোহন ! ঘন-শ্যামলতনু !
এলে নব সাজে।
স্তব্ধ শঙ্খ, মৌন বাঁশি,
চরণে নত কুসুমরাশি :
তিমির নাশি'
মিহির-হাসি
কৌস্তুভসম রাজে।

মোহন ! ঘন-শ্যামলতনু !
এলে নব সাজে।
রাসরঙ্গ করি' নীরব
অতল-মন্ত্র-মন্দ্রে তব :
প্রখর-বিভব
ফেণোৎসব
মুখর মোহ লাজে।

মোহন ! ঘন-শ্যামলতনু !
এলে নব সাজে।
সুধানিলয়-নীল নয়ন,
কণ্ঠে নিধিছন্দ গহন
করি' বন্দন
গীতি-গগন
নিধ্বনি-নতি যাচে।

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

* জ্যোতির্মালা দেবী আমার এই হিন্দি গানটির ছন্দে একটি বাংলা গান রচনা করেন। লঘুগুরু ছন্দ মাত্রাবৃত্তেরই সগোত্র, কেবল লঘুগুরুতে আ ঈ ঊ এ ও এই কয়টি স্বরবর্ণ দুইমাত্রা। এ দুটি থেকে দেখা যাবে লঘুগুরু ছন্দ নিপুণ হাতে পড়লে কত সুন্দর হ'তে পারে। জ্যোতির্মালা দেবী, কবি নিশিকান্ত, অনিলবরণ, সাহানা দেবী, নীরদবরণ প্রভৃতি লঘুগুরু ছন্দে এরকম গান আরও রচনা করেছেন সেগুলি আমার "গীতশ্রী" স্বরলিপি পুস্তকে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার

০ ১ + ৩ ॥ ০ ১
II গা মা ঋা | সা ন্দা ন্া | সা ঋা সা | সা -া সা | র্সা ঋা গা | মা মা মপা |
আ - রো - অ প রূ - প কা ন্ ত অ য়্ সী - ছ বি
মো - হ ন ঘ ন শ্যা - ম ল ত নু এ - লে - ন ব

+ ৩ ০ ১ + ৩
মগা পা মা | পমা পমা পগা | মগা গঋা ঋসা | -া ন্দা ন্া | সা মা মগা | মঋা গঋা সা |
ব নি য়া - - - আ - রো - অ প রূ - প কা ন্ ত
সা - জে - - - মো - হ ন ম ধু শ্যা - ম ল ত নু

০ ১ + ৩ ০ ১
মা -া পা | পদা মা পা | পদা না না | র্সা -া র্সা | র্সা গঋা র্সা | -া র্সনা র্সা |
নী - ল ছ ন্ দ ন ন্ দ লা - ল ক ণ্ ঠে - ব ন
চি র রা ন্ ছি ত জ গ ব ন্ দ ন ম ন্ ত্র শ র ণ
স্ত ব্ ধ শ ঙ্ খ মৌ - ন বাঁ - শি চ র ণে - ন ত
সু ধা - নি ল য় নী - ল ন য় ন ক ণ্ ঠে - নি ধি

+ ৩ ০ ১ + ৩
নর্সনা দা না | দা পা পা | মা র্মা গর্মা | গর্মা ঋা র্সা | না র্সা না | দা পা মগমা |
কু সু ম মা - ল ম ধু র তা - ল চ তু র চা - ল্
চি ত ন ন্ দ ন ক র মো - চ ন স ব ব ন্ ধ ন
কু সু ম রা - শি তি মি র না - শি মি হি র হা - সি
ছ ন দ গ হ ন ক রি' ব ন্ দ ন গী - তি গ গ ন

০ ১ + ০
পদা পদা পা | দপা মা পমগা | গা পা মপা | গমা ঋা সা | II
বা - জ ত প - য় জ নি য়া - - - -
মা - ও ত হুঁ শ - র ণি য়া - - - -
কৌ - স্তু ভ স ম - রা - জে - - - -
নি - ধ্ব নি ন তি - যা - চে - - - -

০ ১ + ৩ ০ ১
ন্া সা ঋসা | ন্া দ্া প্া | প্া মা মা | -া মা মা | মা মা পদা | পদা পা দমা |
সু থ ম ন্ দি র সু র ব ল্ ল ভ ফু ল লা ন্ ছ ন
রা - স র ঙ্ গ ক রি' নী - র ব অ ত ল ম ন্ ত্র

+ ৩ ০ ১ + ৩
মা পা মগা | মা মা মা | পা দা না | র্সা র্সা র্সা | না র্সা নদা | -া পা মা |
ক র প ল্ ল ব রা - ধা - র ব ন ট নো ত্ স ব
ম ন্ ত্রে - ত ব প্র খ র বি ভ ব ফে - নো ত্ স ব

০ ১ + ৩
মমা ণা দা | পা মা পা | গা পা মপা | গমা সঋা গমা |
মু র লী - মো - হ নি য়া - - -
মু খ র মো - হ লা - জে - - -

মণিব্যাগ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

বাংলার এক বিখ্যাত রঙ্গালয়ে বাংলার মেয়েদের সম্পর্কে বেশ উপদেশাত্মক নাটকাভিনয় চলছে; অনিমেষ তার বৌদি ও এক বান্ধবীকে নিয়ে গেল সেই অভিনয় দেখতে। অনিমেষ থিয়েটার বড় একটা দেখে না, সে সিনেমা-দেখা ছেলে; জ্ঞান দুর্ব্বীণ কষে সে চলচ্চিত্রাকাশের প্রত্যেকটি 'তারকার' হাব-ভাব ও গতি-বিধি নিখুঁত-ভাবে পাঠ করে নিয়েছে। আধুনিক 'ড্রইংরুম টকে' তাই তার বিশেষ একটা স্থান আছে; বিশেষ করে আর্টের আলোচনায় ত তার অখণ্ড অধিকার।

অনিমেষ নিজে বসে মাঝখানে, এক পাশে তার বৌদি—অপর পাশে ব্যারিষ্টার কন্যা ডালিয়া। অভিনেতাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি কোথাও আর্টের চমক খেলে যায় সেটা জানা এবং জানানর ভার অনিমেষের উপর। অভিনয় সুরু হবে—ঠিক এমনি সময় সামনের 'রো'তে যে তিন খানা সিট কোল পেতে অপেক্ষা করে—এসে জুড়ে বসেন তিনটি মহিলা। মাথায় ও কপালে তাদের নিষেধের নিশানা নেই—অনিমেষের উৎসাহ বেড়ে যায়। সঙ্গে যদিও বান্ধবী একটি রয়েছে, হলে কি হবে - বান্ধবীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলায় আগ্রহ তার অসীম। এ বিষয়ে সে একেশ্বরবাদী—কিন্তু একেশ্বরবাদে শ্রদ্ধা তার নেই। অনিমেষের দুঃখ হয় এই ভেবে; মহিলা তিনটি সামনে না বসে যে কোন পাশে এসে বসলে সুবিধা হ'ত ঢের বেশী। তার দু' পাশে দুটি সূত্র রয়েছে, যে কোন একটির উপর দিয়ে সার্কাসীয়ানের পটুতা ও সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে অনায়াসে সে আলাপ জমিয়ে বসতে পারতো। শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে অনিমেষ অভিনয়ের দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে।

অভিনয় সুরু থেকে সুরু হয় সব মোটা রকমের দুঃখের কথা; দুঃখটাকে গাঢ়তর করবার জন্ত লেখক মাঝে মাঝে এক একজনকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছেন। মেয়েদের দৃষ্টি চোখের জলে কেবলই ঝাপসা হ'য়ে আসে। অনিমেষের বৌদি ভুল করে তার রুমাল ফেলে এসেছেন—চেয়ে নেন অনিমেষের কাছ থেকে। অনিমেষের কাছে কিন্তু অভিনয়ের দুঃখের বহরটা মোটেই ভাল লাগে না; তা বলে দুঃখিতাদের সে কিছু বলতেও পারে না। বিশেষতঃ তর্ক করে বিরুদ্ধ মত বহাল রাখবার সময় করে নেওয়াও সেখানে সম্ভব নয়।

স্বল্প-পরিসর রাস্তা, তাতে আবার নিজের 'রো'তে জোড়ায় জোড়ায় সব নীরস হাঁটু—এদের বাঁচিয়ে ঘন ঘন বাইরে যাবার তাগিদ অনিমেষের নেই। তৃতীয় অঙ্কের শেষে ড্রপ পড়বার পরে সিটে বসেই সে পানওয়ালার কাছ থেকে একটা কিনে মুখে পুরে দেয়। হাত মুছবার জন্ত বৌদির কাছ থেকে রুমালটা হাতে নিয়েই কি যেন বলতে যায়, এমন সময় ডালিয়া বলে ওঠে—উঃ, কি চমৎকার হল; সত্যি মনটা ভারি খারাপ লাগছে—ঝুণ্টুটাকে রেখে এসেছি বলে। আচ্ছা, আপনার ভাল লাগছে না অনিমেষবাবু?

অনিমেষ মুখে কিছু না বলে মুঠো করা রুমালটা বাড়িয়ে ধরে ডালিয়ার কোলের কাছে। ডালিয়া সেটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তার ছোট্ট রুমালখানা অনিমেষের হাতে দিয়ে বলে—আর দেখুন এটার অবস্থা। অনিমেষ বলে—আমারটা নেহাৎই বড় বলে—না হয় দুঃখটা আমারও কিছু কম হয় নি। অনিমেষ কথা বলে বটে কিন্তু মন ও চোখ থাকে তার সামনের দিকে। ঠিক তার সামনের সিটে যে মেয়েটি বসেছে মাঝে মাঝে সে পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। অনিমেষের সঙ্গে দু একবার চোখো-চোখিও হয়। অনিমেষের মনে হয় মেয়েটি যেন তার পরিচিত। অবশ্য এ মনে হওয়ার কোনই অর্থ নেই, এমনি ধারা মনে তার সব সময়েই হয়। বিশের কোঠায় যে কোন মেয়ের মুখই তার বিশেষ পরিচিত বলে মনে হয়। সবাই যেন বড় আপনার, শুধু বহু দিনের অসাক্ষাৎ ও বহু প্রকার জুলুম মাঝখানে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মাত্র।

ডালিয়া অসৎ কোন মেয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখলে বড়

অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই লক্ষ্য করে নি এমনি ভাব নিয়ে সে প্রোগ্রামের পাত উল্টাতে লেগে যায়। বৌদি নারীসুলভ পরিহাসছলে অনিমেষের গায়ে একটা চিমটি কাটতে অনিমেষ এমন একটা মুখের ভাব করে—যেন এ প্রকার অত্যাচার তাকে কত সইতে হয়। অবশ্য এ গৌরব করা তার মানায়। অত্যাচার তাকে কতটা সইতে হয় সেই জানে; কিন্তু কিছুটা অত্যাচার আশা (আকাঙ্ক্ষা নয়) করবার মত যে তার চেহারা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ড্রপ উঠতেই বাইরের বাতি নিভে যায়। আবছায়া অন্ধকারে দৃষ্টি হয়ে পড়ে অকর্ম্মণ্য, অনিমেষ হতাশ হয়ে পড়ে। অভিনয় দেখার চাইতে নভেলী ঢংএ একটা অভিনয় করার জন্য মন তার পিস্‌-পিস্‌ করতে থাকে। সে যখন ভেবে পায় না—কি করে আর একটু অগুনো যায়, এমনি সময় টের পায় টপ করে কি যেন একটা পড়লো তার পায়ের কাছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই বুঝতে পারে বস্তুটা তুচ্ছ করবার মত নয়। চট্‌ করে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে একটু পরেই সে বাইরে বেরিয়ে যায়। আলোর কাছে নিয়ে দেখে—বস্তুটা থলের মত মরক্কো লেদারের তৈরী ছোট্ট একটা মনিব্যাগ, মুখ তার ফাস্‌নার দিয়ে আঁটা। মাঝখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—জোনাকী সেন, ৪৩২ বি কড়েয়া রোড। অনিমেষের মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—এ যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, সাগ্রহ আমন্ত্রণ!

ফাস্‌নারের দাঁত-কপাটি ছাড়িয়ে স-সন্তর্পণে মুখ খুলে দেখে, ভেতরে রয়েছে পাঁচটি টাকা—আর জ্ঞান জগতের চির শিশুদের ছোট্ট একটি শিশু রুমাল; রংটা তার গোলাপী, একটা কোনে লেখা 'শনিবার'। বারের নাম পড়ে অনিমেষের মনটা খট্‌ করে ওঠে। তখনি আবার ভাবে; আজ শনিবার, সেট থেকে শনিবারের সাজ সঙ্গে আসবে তা'তে আর ভাবনার কি আছে। অতিরিক্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মনকে কতটা কুসংস্কারাপন্ন করে তোলে ভেবে তার হাসি পায়।

মেয়েটির বর্ণ যদিও খুব উজ্জ্বল নয়—মুখখানা ভারি সুন্দর। অনিমেষের চোখে সব চাইতে ভাল লাগে ওর চোখ দুটি। চেহারার সৌন্দর্য্যের চেয়ে পরিচয়ের অভিনবত্বের উপরেই অনিমেষের মোহটা বেশী; তা ছাড়া প্রতিদান বলে একটা কথা ত রয়েছেই। এমন সহজ ও সুন্দর ভাবে বাড়ীর রাস্তা ও পরিচয়ের রাস্তা দুটোই নির্দ্দেশ করে দেওয়াতে অনিমেষ মনে মনে মেয়েটির বুদ্ধির তারিফ করে। মুহূর্ত্তে তার চিন্তা ধারা ঘটনার অলি গলি বেয়ে বহুদূর এগিয়ে যায়।—অপরিচিতার সঙ্গে যেন নিবিড়ভাবে তার পরিচয় হ'য়ে গেছে। প্রথম পরিচয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে আলাপ হয়। পেছন দিকে তাকিয়ে অনিমেষকে দেখা মাত্রই যে খুব ভাল লেগেছিল—এ পর্য্যন্ত মেয়েটি সলজ্জভাবে স্বীকার করে; কিন্তু থলেটা যে ইচ্ছে করেই ফেলেছিল এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। অনিমেষ রাগ করে। এ সত্য কথাটা স্বীকার করলে সে যদি একটু আনন্দ পায় ত তাতে এত কৃপণতা কেন! মেয়েদের এই নিরর্থক লজ্জার কোন মানে খুঁজে না পেয়ে মনে মনে সে ভারি চটে যায়। হঠাৎ তার মনে হয় এও ত হতে পারে—এটা 'অসাবধানতাবশতঃই পড়ে' গেছে, হয়ত একটু পরেই খোঁজ পড়বে। আবার ভাবে, মঞ্চে যে আন্দাজ মড়ক লেগেছে, অনিচ্ছাকৃত হলে রুমালের তাগিদে একবার অন্তত খোঁজ পড়বার সম্ভাবনা আছে। পড়লেও আজ যে ফেরৎ দেবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে তার নিজের সিটে ফিরে যায় ব্যাপারটা বুঝে দেখবার জন্য।

মহিলা তিনটির পাশে যে কয়টি যুবক বসেছে চাপা হাসির সঙ্গে তাদের ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথাবার্ত্তা বলতে শুনে অনিমেষ ভাবে নিশ্চয়ই তারাও মহিলাটির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেই এসব কচ্ছে। সে একটু যে অস্বস্তি বোধ না করে তা নয়, কিন্তু গৌরব বোধ করে তার চেয়ে ঢের বেশী। শেষাঙ্ক শেষের দিকে গড়িয়ে চলে। অনিমেষের বাঞ্ছিত দৃষ্টি আর একবার বোধ হয় পেছন ফিরে তা'কে দেখে নেয়; কিন্তু তার হেফাজতে যে অমূল্য বস্তুটি রয়েছে তার তালাশ পড়বার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

বাড়ীর গাড়ী অপেক্ষা করছে; অভিনয় শেষে মহিলাত্রয় যেয়ে তাতে উঠে বসেন। অনিমেষ কোন প্রকারে এরই মধ্যে বিদায়-দৃষ্টি-বিনিময়টা সেরে নিয়ে সঙ্গীদ্বয় সহ নিজের 'বেবী'তে চেপে রওনা হয়ে পড়ে।

জাতিগত অস্তিত্বের মূল্য হিসেবে ভালিয়া পুরুষদের এসব দুর্ব্বলতাকে সস্নেহে ভ্যানিটি কেসে রেখে দেবার মত বস্তুই মনে করে। কিন্তু বরাবর নিজের অস্তিত্বে ঘা পড়ায় সে

বেশ একটু কষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা প্রকাশ করে অনিমেষকে অধিক তুষ্ট হবার সুযোগ দিতে সে রাজি নয়, তাই যথাসম্ভব সহজ ভাব বজায় রেখে গাড়ীতে বসে কথাবার্তা বলতে থাকে। তার বাড়ীর দোর গড়ায় এসে যখন গাড়ী থামে নেমে ছোট্ট একটি নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে সে ভেতরে চলে যায়।

ডালিয়াকে ছেড়ে দিয়ে অনিমেষ বাড়ী ফিরে এসে সটান গিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পড়ে। একটা আরাম কেদারায় বসে প্রাপ্ত বস্তুটিকে সস্নেহে নাড়া চাড়া করতে করতে সে নাম ও ঠিকানাটা আরও বার কয়েক পড়ে নেয়। তার কল্পনায় ঘটনাবলী মধুর হতে মধুরতর হয়ে ফুটে উঠতে থাকে।

বাতিটা নিভিয়ে দিতেই চাঁদ যেন বজ্জাতি করে জানালা দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না অনিমেষের নাকে মুখে ছিটিয়ে দেয়। ঘুম তার এমনিও আসবে না—অনিমেষ ছাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। অনিমেষের যে বয়স, সে বয়সটাই এমন, সবারই প্রাণে—কবিত্বের মত একটা কিছু এনে দেয়। কই মাছ যেমন মেঘের ডাকে এঁদো ডোবা ছেড়ে প্রাণের আবেগে নাচতে নাচতে ডাঙ্গায় উঠে আসে—অনিমেষও তেমনি সত্বরে চাঁদের হাতছানি পেয়ে ঘর ছেড়ে ছাদে গিয়ে আবেগের বেগে পাইচারী করতে সুরু করে দেয়। হঠাৎ তার মাথায় একটা নূতন বুদ্ধি আসে। ঠিক করে ফেলে কোন একটা উপহার সে সঙ্গে রাখবে এবং সম্ভব হলে সুযোগ বুঝে মণিব্যাগটার মধ্যে পুরেই সেটা ব্যক্তিবিশেষের কাছে পৌছে দেবে।

কিন্তু কি দেওয়া যায় তাই নিয়ে পড়ে সে মহা ভাবনায়। বস্তুটা বেশ অর্থপূর্ণ হবে এমন কিছু দেওয়া চাই। অনেক গবেষণার পর একটা পার্কার কলম দেওয়াই স্থির করে ফেলে। অর্থটি হবে চমৎকার—অথচ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে দেবে 'parker from a parker'। কবিরা আবহমান কাল থেকে জীবন-তরী ঘাটে ভিড়িয়ে আসছেন; অনিমেষ সেটাকে জীবন-গাড়ী রূপে ঘাঁটিতে দাঁড় করিয়ে দেবে।—নিজের কল্পনা শক্তির উপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

উপহার দেওয়া সে স্থির করে বটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা দ্বিধা তার মনে উঁকি দিতে থাকে। সুরুতেই অপর পক্ষ ব্যাপারটা এত স্পষ্টভাবে মেনে নিতে চাইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আসে। শেষ পর্য্যন্ত মনকে প্রবোধ দেয় এই বলে প্রথম পরিচয়ে নেহাৎ অসম্ভব হ'লে দু'দিন না হয় অপেক্ষা করবে।

অনিমেষকে ছাদে টেনে নিয়ে চাঁদ আস্তে আস্তে পালিয়ে যায়। বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য অনিমেষ তার ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

চাঁদের ধারকরা আবছা আলো মনের ভেতর যে স[illegible] মায়া লোক গড়ে তোলে, দিনের প্রখর আলো সগর্ব্বে তা[illegible] সকল ফাঁকি ধরিয়ে দেয়। অনিমেষের মনে প্রতিকূ[illegible] অবস্থার চিত্রগুলি ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে থাকে। হয়ত মহিলাটির সঙ্গে দেখাই হবে না; হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বে[illegible] ছেলেদের কারুর হাতেই ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে হবে। [illegible] সকল ভাবনার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে তার উপহা[illegible] দেবার বাসনাটুকু কখন যেন উবে যায়।

দিনের আলোটা বড় খট্-মটে ও কর্কশ, অনিমেষ তা[illegible] সন্ধ্যার পরে যাওয়াই ঠিক করে ফেলে। সমস্তটা দিন ছট্‌ফট্ করে সন্ধ্যায় সুসজ্জিত হয়ে তার ছোট্ট গাড়ীখানা নি[illegible] বেরিয়ে পড়ে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্য সে এসে কড়েয়া রোডের ৪৩ বি'র সামনে এ[illegible] দাঁড়িয়ে পড়ে। ছোট রকমের একখানা একতালা বাড়ী গত রাত্রের নারীদের সঙ্গে বাড়ীটা যেন খাপ খেতে চায় না অনিমেষের মনটা কেমন একটু দমে যায়। গত রা[illegible] সঙ্গে তাদের বাড়ীর গাড়ী ছিল। কিন্তু এ বাড়ীতে [illegible] গাড়ীর আস্তানা খুঁজে পায় না। এ সকল অসামঞ্জস্যে[illegible] জবাব পেতেও আবার দেরি হয় না; ভাবে, কোন আত্মী[illegible] বা বন্ধুর গাড়ী হওয়া অসম্ভব নয়, আর শাড়ী দেখে বাড়ী[illegible] অবস্থা আঁচ করাও আজকালকার দিনে সুকঠিন।

সামনের ঘরে তিন চারটি যুবক বসে গল্প করছে; দরজা[illegible] গাড়ী দাঁড়াতে দেখে সকলে উন্মুখ হয়ে সেদিকে তাকায় অনিমেষ ভিতরে প্রবেশ করে অনুরুদ্ধ হয়ে একটা চেয়া[illegible] টেনে বসে পড়ে। একটি যুবক প্রশ্ন করে—কাকে চা[illegible] আপনি?

সবারই মুখের ভাব যেন কেমন—অনিমেষ অস্বস্তি বো[illegible] করে। এঁদের মাঝে বসে তেমন কোন সুবিধা হবে ব[illegible] সে ভরসা করতে পারে না। ভাববার সময় নেই, তা[illegible]

যদি মনে না করেন—এখানে জোনাকী সেন বলে কেউ থাকেন!

সেই যুবকটিই উত্তর করে—হ্যাঁ, গত রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়ে তার একটা মণিব্যাগ হারিয়ে গেছে। আপনি পেয়েছেন বুঝি? লাল মরক্কো লেদারের, ভেতরে পাঁচটা টাকা আর একখানা গোলাপী রংয়ের রুমাল—এক কোনে লেখা 'শনিবার'—তাই না? দেখি? বলেই হাত বাড়িয়ে দেয়।

অনিমেষ শুধু একটা "হ্যাঁ" বলে যন্ত্রচালিতের মত ব্যাগটা পকেট থেকে বের করে যুবকটির হাতে দিয়ে দেয়। সে বেশ দেখতে পায়—সবাই ওরা মুখ টিপে হাসছে। যুবকটি বলতে থাকে—অনেক ধন্যবাদ। সন্তুষ্ট হলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় হল। আপনার নাম?

—অনিমেষ গুপ্ত।

—আমার নাম সমর বোস। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম সেজন্য মাপ চাইছি। দেখুন, মণিব্যাগ বস্তুটার ভেতরে থাকে টাকা পয়সা, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে—ওর উপর নিজের নাম লিখে রাখার কোন মানেই হয় না। স্বজাতিদের কাছ থেকে ফিরে পাবার আশাও থাকে খুবই কম। কে এত হাঙ্গাম পোয়াতে চাইবে বলুন? অবশ্যই আপনাদের মত লোকের হাতে পড়লে ভাবনার কারণ থাকে না; এ না হয় বাড়ী বয়ে দিয়ে গেলেন, তা না হয় হয়ত খবর দিতেন গিয়ে নিয়ে আসতে। ভয় হয়েছে দুষ্ট লোকদের দিয়ে, এক্ষেত্রে কিন্তু ওদের দিয়েই ভরসা—হয়ত দু' পাঁচ টাকা বেশীও ভয়ে দিতে পারে।

অনিমেষ বিমূঢ়ের মত বসে কথাগুলো শুনতে থাকে, কলমের কথাটা তার মনে পড়ে যায়। ক্ষোভে ও লজ্জায় ক্ষিপ্তের মত হয়ে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়ে। যুবকটি পেছনে আসতে আসতে বলে—দয়া করে চলে যাবেন না। আমার এ ফিকির খাটবে না বলে থিয়েটার হলে বসে বন্ধুরা দশ টাকা বাজি রেখেছে। তাই ত ইচ্ছে করেই পাঁচ পাঁচটা টাকা রিস্‌ক করেছিলাম। বাজির টাকাটা খেয়ে যাবেন না?

ততক্ষণ গাড়ীতে বসে' অনিমেষ ষ্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। হর্ণের ফোলা গালে চাপ পড়তেই সেটা চিৎকার করে ওঠে, 'বেবী'র ক্রন্দনে দুকান পূর্ণ করে সে ছুটে বেরিয়ে যায়, কোন কথাই তার কানে পৌছায় না।

আধুনিক ভাস্কর্য্য ও তরুণ-ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ভারতের আধুনিক চিত্রকলা দেশে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক চিত্রকলা যে একটি নতুন ভঙ্গি আনিয়াছে, তা সারা ভারত গ্রহণ করিয়াছে। শিল্পের এই নতুন ব্যঞ্জনা নতুন চিন্তাধারা আনিয়াছে; এই আদর্শে নতুন ভারতীয় পদ্ধতি বা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই নতুন আদর্শে চিত্রকরদের পদ্ধতি স্থাপিত হইলেও, ভাস্কর বা মূর্ত্তি-নির্ম্মাতারা কোনও আদর্শে তেমন অনুপ্রাণিত হইয়া নতুন পদ্ধতি স্থাপিত করেন নাই।

কোনও শিল্পী হয়ত ভাস্কর্য্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রকরদের ন্যায় ভাস্করদের ভিতর তেমন সম্মিলিত চেষ্টা প্রকাশ পায় নাই; কারণ তাঁহারা বোধ হয়, বিশেষ কোনও আদর্শ বা ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টি করেন নাই। এই দিকে যে চেষ্টা হইতেছে এবং একটি "স্কুল অফ্ স্কাল্‌প্‌টারস্" যে ক্রমশঃ ভবিষ্যতে বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে, নানা শিল্পীর কাজের ভিতর তারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

প্রকৃতিকে অনুকরণ করিলেই ভাল চিত্র হয় না, যেমন মানুষের প্রতিকৃতিকে হুবহু অনুকরণ করিতে পারিলেই তা ভাল মূর্ত্তি হয় না। যে সকল শিল্পী ভারতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের কাজ প্রায় সবই পোর্‌ট্রেট্ বা প্রতিকৃতি রচনা। প্রতিকৃতি রচনার ভিতরেও গুণী শিল্পী ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন; কিন্তু সাধারণত যে সকল মূর্ত্তি রচনা দেখিতে নাই তা ফটোগ্রাফ বই কিছু না। ফরাসী ভাস্কর রোদাঁ ভিক্‌টর হ্যুগোর যে মূর্ত্তি রচনা

করিয়াছেন, তা কেবল হুগোর প্রতিকৃতি নয়, তা যেন তাঁহার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্তি। ফ্রান্সে ও পোলাণ্ডে ইটালীর অনেক আধুনিক ভাস্করদের কাজে নানা বিষয়ে পরিকল্পনা এবং সংগঠনরীতি দেখা যায়। প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ ছাড়াও ভাস্করদের প্রচেষ্টা নানাক্ষেত্রে পরিস্ফুট। শিল্পামোদীদের আনন্দের খোরাক তাহা নানাদিক হইতে দিতে পারে।

বোম্বের একজন খ্যাতনামা ভাস্করকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনাদের কাজ প্রতিকৃতির ভিতরেই আবদ্ধ কেন? আপনারা কোনও বিষয় লইয়া রচনা করেন না কেন? উত্তর দিলেন আমরা সে রকম কোনও কমিশন
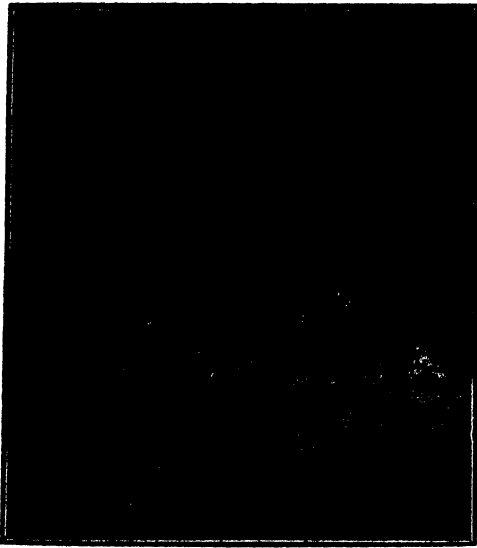
প্রদোষ দাশগুপ্ত

পাই না। এই শিল্প প্রচেষ্টায় হয়ত অর্থ-নৈতিক দিকটা প্রবল। তার Aesthetic বা সৌন্দর্য্যনীতির পক্ষ হইতে হয়ত তেমন তাগিদ হয় নাই। প্রতিভাবান শিল্পী প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও পথ দেখাইয়া যায়, ক্রমশঃ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও বাংলার নূতন চিত্রকলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সারা ভারতে ক্রমশঃ তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভাস্কর্য্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ যতটা বেশী, চিত্রের সঙ্গে ততটা নয়; অর্থাৎ ভাস্কর্য্য চিত্র অপেক্ষা পৃষ্ঠপোষকতা বেশী আশা করে। কারণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা চিত্র অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম এবং ব্যয় সাপেক্ষ। শুধু মনের আনন্দের জন্য শিল্পী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তার তোড়-জোড় এবং স্থান অনেক বেশী লাগে। চিত্রকর হয়ত যেখানে সেখানে তার ছবি আঁকিতে পারেন, মাঠে যাইয়াও ছবি আঁকা চলে, কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাতার একটি ষ্টুডিও বা গৃহ চাই। একটি দেওয়ালে
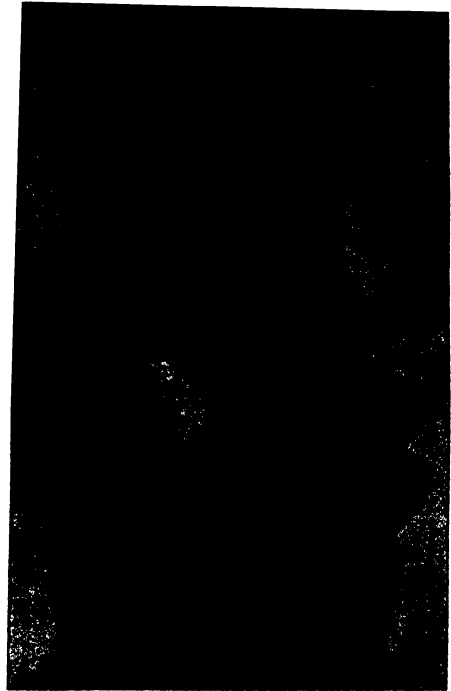
মালাবার বালিকা

অনেক ছবি টানান যায় বা একটি তোরঙ্গের ভিতর অনেক ছবি ভরিয়া রাখা যায়, কিন্তু মূর্ত্তি রাখিবার জন্য পরিসর স্থানের প্রয়োজন। অতএব একজন ভাস্কর চিত্রকর অপেক্ষা অধিক পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে যোগ দিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক ধনকুবেরের বাড়ীতে দেখিলাম লক্ষ কয়েক টাকার শ্বেত পাথরের নগ্ন এবং অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি ইটালী হইতে আনাইয়া বাড়ী সাজাইয়াছেন; এই অর্থ কি ভারতীয় শিল্পীদের দাবী করার কারণ ছিল না?

অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া এতটা অর্থ আমাদের দেশ হইতে বিদেশে যাওয়া অবিচার, আর যে সকল মূর্ত্তি বিদেশ হইতে আনান হইয়াছে তা কি যথার্থই শিল্পামোদীদের আনন্দের বস্তু? তা যদি হইত, তবুও কতকটা সান্ত্বনার কারণ হইতে পারিত।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় আমাকে একদিন বলিতেছিলেন যে,

কৃষক দম্পতি

ইউরোপে যাঁরা খ্যাতনামা শিল্পী তাঁরা পাকা বিজ্‌নেস্‌ম্যান। বাঙ্গালীদের মূলধন হয়ত আছে, বিদ্যাবুদ্ধি সবই আছে, কিন্তু তাহা কাজে খাটাইবার ক্ষমতা নাই।

চিত্রকলা পূর্ব্বে শুধু চিত্রের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজকাল চিত্রকরদের ক্ষেত্র নানাদিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা যাকে কমার্শাল আর্ট বলি, তাহা চিত্রকলার আধুনিক এক অভিব্যক্তি। চিত্রকর তাঁর পরিকল্পনাকে নানাদিকে খাটাইতেছেন; টেক্সটাইল বা কাপড়ের পাড়ের ডিজাইনের আজকাল খুব চাহিদা। ভিত্তি চিত্র অর্থাৎ ফ্রেস্কো বা মুরাল পেণ্টিংএর আজকাল অল্প অল্প চাহিদা হইতেছে। এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। চিত্রকররা নানাদিকে তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি এবং কল্পনা খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে।

ভাস্করেরও এরূপ নানাদিকে প্রচেষ্টা হইবে না কেন? প্রতিকৃতি রচনাতেই তাঁর কর্ম্মের অবসান হইবে কেন? কমার্শাল আর্টের ন্যায়, কমার্শাল মডেলিংএর সৃষ্টি হইতে পারে। এরূপ হইলে, মূর্ত্তি নির্ম্মাতাদের অর্থনীতির একটা দিক খুলিয়া যাইতে পারে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে আচার্য্য নন্দলাল বসুর শিক্ষাধীনে এরূপ কতগুলি কারুশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। বালী, চূণ বা সিমেণ্টের সাহায্যে মূর্ত্তি, পশু, পক্ষী, ফুল ও লতাপাতার পরিকল্পনায় পাকাবাড়ীর দেওয়াল সুশোভিত করা হয়; ইংরাজীতে এ কাজকে বলে স্টুকো ওয়ার্ক (stucco work); টেরাকোটার পরিকল্পনা দ্বারাও অট্টালিকা সুশোভিত করা যাইতে পারে। মনে হয়, ইটের বাড়ীর সঙ্গে টেরাকোটার যেন সম্বন্ধ আছে। গৃহকে সুশোভিত করার আর এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানকার বাড়ী সকল মাটীর, এমন কি ছাদও মাটীর। সেই আদর্শে শান্তিনিকেতনে মাটীর ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। মাটীর সঙ্গে আলকাতরা মাখান হয়, তাহাতে মাটীর বৃষ্টি-সহন ক্ষমতা হয়। দেওয়াল মাটীর রিলিফ মডেলিংএ সুশোভিত করা হইয়াছে; এ ক্ষেত্রেও মাটীর সঙ্গে আলকাতরা মিশান হইয়াছে। খোলা মাঠে মাটীর পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দুই এক বর্ষা মাটীর উপর দিয়া গেলেও মূর্ত্তি ঠিক অবিকৃত আছে; অবশ্য এ কাজ এখনও পরীক্ষাধীন।

'ওরিয়েণ্টাল' নামধেয় চিত্রের ন্যায় 'ওরিয়েণ্টাল' নামযুক্ত এক প্রকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য আজকাল কিছু কিছু দেখা যায়। বাড়ী খেলো সস্তা সিমেণ্টের মূর্ত্তিতে সজ্জিত করা কলিকাতায় কোথাও কোথাও আজকাল রেওয়াজ

হইয়াছে। আমার মনে হয় এ জাতীয় ওরিয়েণ্টাল আর্ট জবড়জঙ্গ বই কিছু না। আর্টের বা সৌন্দর্য্য-নীতির একটি প্রধান গুণ হইল—বিশেষ করিয়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সুসঙ্গতি। দেখিতে হইবে বাড়ীর সকল অংশ—দরজা, জানালা, বারান্দা, ঝরোখা, বাড়ীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সম্বন্ধ সব মিলাইয়া নয়নাভিরাম হইল কিনা। চক্ষুতে যদি একটি সামঞ্জস্যের ছাপ, Uniformity বা Completeness এর ছবি দিতে না পারিল, তবে তার সাজ-সজ্জা বৃথা।
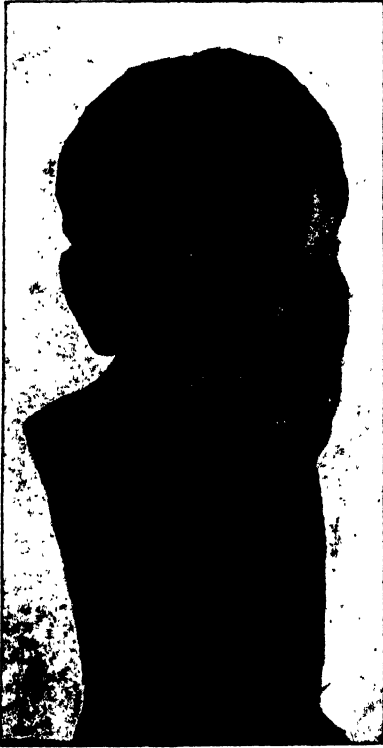
আফিংখোর

প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরাদিতে দেখিতে পাই, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য এক সঙ্গে চলিয়াছে, কোনটা হইতে কোনটা আলাদা করিয়া দেখা যায় না, সবই যেন এক সুরে বাঁধা।

ভারতবর্ষে আধুনিক ভাস্কর্য্য সবে সুরু হইয়াছে বলিতে হইবে। এর অনুপ্রেরণা প্রধানত আসিতেছে ইউরোপ হইতে। আধুনিক মূর্ত্তি-শিল্প নিশ্চয়ই উন্নত হইবে, যদি শিল্পীরা প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু ভাস্কর্য্যে অনুপ্রেরণার কিছু বিষয় পায়। বলিতেছি না, যে তাহাদের প্রাচীনকে অনুকরণ করিতে হইবে, কিন্তু নিতে হইবে তার spiritকে বা মূলনীতিকে।

এই প্রসঙ্গে একজন তরুণ ভাস্করের প্রচেষ্টাকে সর্ব্বসমক্ষে
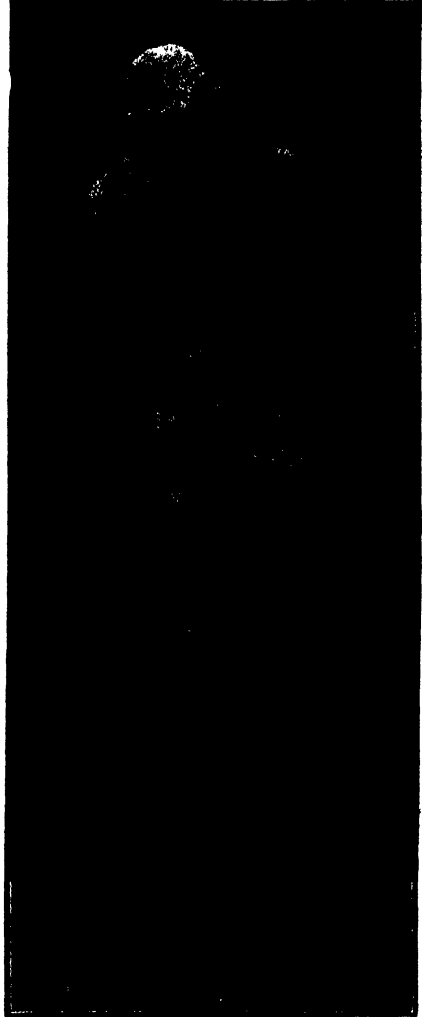
পরাজয়

পরিচিত করিতে ইচ্ছা করি। তিনি এখনও খ্যাতিলাভ করেন নাই, যদিও অনেক প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ দর্শক এবং শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তরুণ ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তের বয়স এখন মাত্র ২৪ বৎসর—তাঁর

নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। সবে মাত্র তিনি মান্দ্রাজ আর্ট স্কুল হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়াছেন। সুযোগ পাইলে তিনি যে তাঁর কাজে কৃতকার্য্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রদোষ দাশগুপ্তের বাড়ী বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে। পিতা শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। তিনি সুসাহিত্যিক। তিনি ভারতবর্ষ, বিচিত্রা,
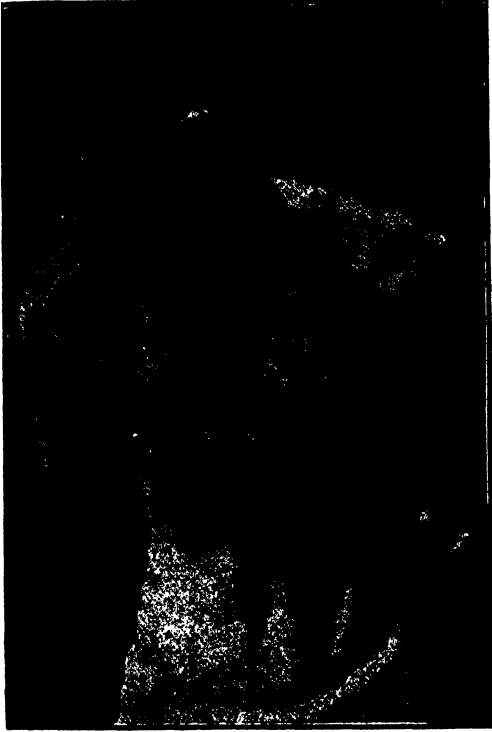
পরাজয় (Close up)

বঙ্গবাণী, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন।

প্রদোষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনীতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। প্রদোষ এবং তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে কলেজের এই বার্ষিক প্রদর্শনী স্থাপিত হয়। স্কটিশ চার্চ্চের প্রথম প্রদর্শনীতে খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এবং আমি বিচারক-রূপে আহূত হইয়াছিলাম। প্রদর্শনী-কক্ষে ঢুকিয়াই ছোট একখানা জল রংয়ের দৃশ্য-চিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই চিত্রখানাকেই শ্রেষ্ঠ বিচার করিয়া প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়াছিলাম। সে চিত্রখানা প্রদোষের আঁকা ছিল। শাদা কাল বা অন্য কিছুর জন্য আরও দুয়েকখানা পুরস্কার প্রদোষ পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। তখন কারও কাছে শিক্ষা না পাইয়াই নিজে নিজে চিত্র অভ্যাস করিতেন। তাঁর যে শিল্পানুরাগ এবং শিল্পী-সুলভ দৃষ্টি ও রুচি ছিল, এই প্রদর্শনীর চিত্রে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

প্রদোষ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া শিল্পকেই তাঁর বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতে এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন। সেই উদ্দেশে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। ভর্ত্তি হইতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। কারণ ইউ, পি সরকার অন্য প্রদেশের ছাত্র নেওয়ায় উৎসাহ দেয় না। যদিও সেই প্রদেশের ছাত্ররা বিনা বেতনে পড়িতে পারে, কিন্তু অন্য প্রদেশ হইতে আগত বলিয়া ৩০৲ টাকা মাসিক বেতন দিয়া প্রদোষকে শিক্ষা করিতে হয়। এ বিষয়ে বাংলা উদার; তার যে কোনও স্কুল, কলেজ এবং যে কোনও বিদ্যায়তন সকল লোকের জন্য উন্মুক্ত।

ভাস্কর শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরীর নিকট কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসর কাল প্রদোষ শিক্ষা করেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার হালদার মহোদয় তাঁর কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন, বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। রায় চৌধুরী মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া প্রদোষ মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নিকট ২ বৎসর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিক্ষা পান।

বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রদোষ মান্দ্রাজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন; ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর নির্ম্মিত মূর্ত্তিসকল মান্দ্রাজ এবং কলিকাতার ফাইন আর্টস্ একাডেমির প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞগণ তাঁর কাজের প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে আশা করি পাঠকগণ শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় পাইবেন।

চিত্র পরিচয়

মালাবার বালিকা—মালাবার প্রদেশের একটি বালিকার মুখ। মুখের মাংসপেশীর ভিতর গঠনের (মডেলিং)

পরিচয় পাওয়া যায়, চোখে সজীবতার দীপ্তি। ওষ্ঠে গঠন পরিপাট্য আছে এবং তা ভাবপ্রকাশক।

কৃষক দম্পতি—কর্ম্ম অবসানে কৃষক ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে। পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত। এরা যে মাটীর মানুষ, Children of the soil—চারিদিকে পাওয়া যায়, এমনই কৃষক জীবনের একটি আবহাওয়া যা মাটীর গন্ধকে টানিয়া আনে। কবি এই মাটীকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছেন "ফিরে চল মাটীর টানে"। আচার্য্য নন্দলালের একটি পেন্সিল ড্রয়িং "প্রত্যাবর্ত্তন"—এই মাটীর মানুষের জীবনকে ব্যক্ত করিয়াছে। তবে ভিতরে বাজিতেছে এক বেদনা, মাটীর মানুষের করুণ গান। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের চিত্র "পথের সাথী" বাঁশের বাঁশীতে মেঠো সুরকে ব্যক্ত করিতেছে। ফরাসী চিত্রকর জঁ্যা ফ্রাঁসোয়া মিলের অঙ্কিত কৃষকদের চিত্রসকল জগৎ বিখ্যাত।

আফিংখোর—আফিংখোরের জড়তা এবং অবসাদ-প্রাপ্ত মুখের ছবি। মস্তক ঈষৎ হেলান, মুখ ঈষৎ হাঁ করিয়া আছে—সব মিশাইয়া ঝিমাইয়া পড়া একটা ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা সত্য সত্যই আফিংখোরের ছবি।

পরাজয়—সুদীর্ঘবপু, মাংসপেশীবহুল নিগ্রোর মূর্ত্তি; পরাজয়ের বেদনায় মস্তক ঈষৎ আনত। পরাজয়ের চিত্রটি দেখাইতে শিল্পী নিগ্রোর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে শিল্পী ইউরোপের আধুনিক ফ্যাশান দ্বারা সংক্রামিত হইয়াছেন। ইউরোপের শিল্পীদের আজকাল একটা নিগ্রো-প্রীতি দেখা যায়। এপিস্টাইন, ব্রোনগুইন, লরা নাইট প্রভৃতি শিল্পীগণ তাহাদের অনেক চিত্র নিগ্রো আদর্শ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের সুবিশাল সুগঠিত দেহ শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; আর একটা কারণেও হয়ত তারা শিল্পীদের নিকট সহানুভূতি পাইয়াছে। কত কালের দাসত্বের কলঙ্ক তাহাদের কপালে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাই তাহাদের বেদনাবিধুর জীবন শিল্পীদের আঁকিবার বিষয় হইয়াছে, তাহাদের জীবনে রহিয়াছে একটা বিরাট Pathos, যা কল্পনার রসদ জোগাইয়াছে।

আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে শিল্পী ইউরোপের রীতি অনুযায়ী নিগ্রোর চিত্র গ্রহণ না করিয়া ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেন। ভারতের অধিবাসী ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিমজাতি হইতে আদর্শ গ্রহণ করিলে একই ফল পাইতে পারিতেন। এসকল আদিম জাতিদের দেহ, প্রকৃতি নিগ্রোদের ন্যায়ই গঠন করিয়াছে। তাহাদের সুগঠিত দেহ তাহারা ব্যায়াম করিয়া লাভ করে নাই; প্রকৃতিই তাহাদের সুন্দর করিয়া গড়িয়াছে।

পর্ব্বত এবং অরণ্যচারী জীব ইহারা, তাই প্রকৃতি যেন তাহার স্পর্শ তাহাদের দেহে বুলাইয়া দিয়াছে।

ভারতীয় আদর্শ হইতে এ চিত্রটি গ্রহণ করিলে, আরও উচ্চতর পরিকল্পনা হইত বলিয়া আমি মনে করি।

বয়সের বোঝা—শিল্পীর ইহা একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।
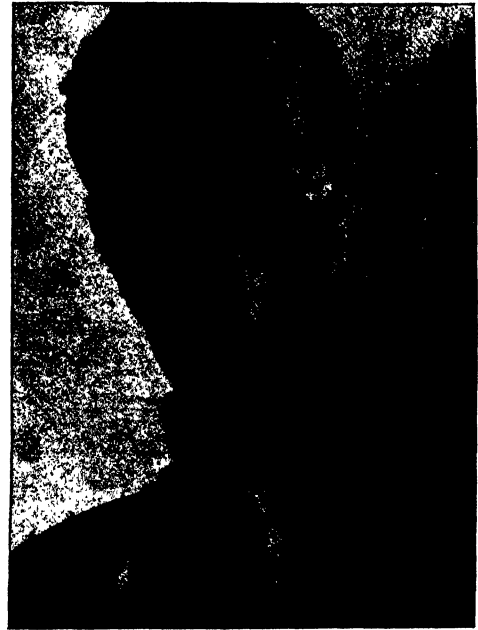
বয়সের বোঝা

কলিকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্‌এ এই মূর্ত্তিটি পুরস্কৃত হইয়াছে। কলিকাতার একজিবিসনে যখন এই মূর্ত্তিটি প্রদর্শিত হইতেছিল, অনেক শিল্পীকে আমি প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। শিল্পী নিশ্চয়ই এই প্রশংসার অধিকারী। বৃদ্ধের এই মূর্ত্তিতে শিল্পী বিশেষভাবে সফলতা লাভ করিয়াছেন।

শিল্পীর কাজ কেবলমাত্র এখন আরম্ভ হইল। তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্মুখে পড়িয়া আছে। আশা করি, তিনি যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

জ্যেঠামশায়

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

১

—জ্যেঠামশায়, জ্যেঠামশায়, শুনছেন ?

—শুনছি পড়ো—বলিয়া জ্যেঠামশায় পুনরায় নাসিকা-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উষা পড়িয়া যাইতে লাগিল—

মারিতে কাটিতে চাহে নাহি ব্যথা মনে।
কাঁদিছেন সীতা আর কত সহে প্রাণে ॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা নাহি বান্ধে কেশ।
শোকেতে আকুল হয়ে কান্দেন অশেষ ॥

কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্য আর কতক্ষণ থাকে ? জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর—মৃদুবাতাসে সম্মুখের বাগানে টুপটাপ করিয়া দুই একটী পাকা আম পড়িতেছে। উষা একবার বাগানের দিকে আর একবার জ্যেঠামশায়ের দিকে তাকাইয়া, আস্তে আস্তে বইখানা বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

জ্যেঠামশায়ের নাম গুরুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বয়স ষাটের উপর—গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে নেড়া বটগাছ যেমন করিয়া খাড়া হইয়া থাকে, ইনিও নিজের সংসারে তেমনি করিয়াই খাড়া হইয়া আছেন—সংসারে আপনার বলিতে বিশেষ কেহ আর নাই—স্ত্রী ও দুই একটী ছেলে মেয়ে বহুদিন পূর্ব্বেই একে একে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এককালে যে মস্তবড় সংসার ছিল—বাড়ীতে ঘরদোরের প্রাচুর্য্য ছিল, তাহার নিশানা আজিও আছে। কিন্তু সংসারে মাত্র তিনটী প্রাণী বর্ত্তমান—গুরুপ্রসন্ন নিজে—চাকর মধু, আর টিকলী গাই। মধু বহুদিনের পুরাণো চাকর—পাকের যোগাড় হইতে কাপড় কাচা এবং গরুর জাব দেওয়া হইতে বাজারের হিসাব রাখা সে একাই করে। টিকলী গাইটী বনিয়াদী বংশের—কতকাল হইতে তাহার বংশ এ বাড়ীতে আসন গাড়িয়াছে গুরুপ্রসন্নের ও তাহা বলা মুস্কিল। উষা এ বাড়ীর মেয়ে নয়। কিন্তু মেয়েটী দিব্যি ! ফুটফুটে চেহারা—চোখ দুটী বুদ্ধিতে উজ্জ্বল—মুখখানি দেখিলে মায়া হয়—বছর চৌদ্দ বয়স। বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী—গুরুপ্রসন্নের বড় আদরের বস্তু ! বাড়ীর পাশে বাড়ী। একমুহূর্ত্ত উষাকে না হইলে গুরুপ্রসন্নের চলে না—উষাও যেদিন দুই চার বার আসিয়া জ্যেঠামশায়ের সহিত গল্প না করিয়া যায়—সে দিনটী তাহার নিকট বৃথাই মনে হয়।

আজকাল তো একে বয়স হইতেছে—তায় মেয়েমানুষ ; কাজেই এই নিরীহ জ্যেঠামশায়ের উপরে গিন্নিগিরি ফলান হয় !—"ওকি জ্যেঠামশায়, ডালের ফোড়নগুলো যে পোড়ে নি, একটু সবুর করুন !" "কি ? তরকারীতে অত নুন ? আর একটু রাখুন—আরও কম—আরও —আহা, হা, কি যে করেন ?"

বলিতে বলিতে রান্নাঘরের ভিতরে পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়া জ্যেঠামশায়কে ছুঁইয়া ফেলে আর কি ! বাহির হইতে মধু চেঁচাইয়া বলে—"এই উষা—ছুঁস্‌নে—ছুঁস্‌নে খবর্দ্দার ! নাম রান্নাঘর হতে—নেমে দাঁড়া !"

উষা বলে—"নামছি—নামছি—এই নাও হলো তো ! তুমি যে কেমন করো মধুকাকা ! কি যেন এমন দোষ হলো।"

গুরুপ্রসন্ন বলেন—"না, না, মধুর বাড়াবাড়ি। তুই বোস্ মা বোস্। না হয় ঐ নীচেটায়ই বোস—বেশ ছায়া আছে কিনা—এই ঘরটার ভিতরে কি গরম দেখছিস্ তো ?"

—"কে উঠ্‌তে চাচ্ছে আপনার ঘরে জ্যেঠামশায় ? আর আমি কক্‌খনো ছোঁবনা আপনার ঘর !

—"এই দেখ, সেরেছে—পাগলী কোথাকার ! তুই আয় উঠে আয়—জানিস্ তো আমি ওসব মানি নে—কেবল মধু চেঁচামেচী করে, তারই ভয়ে ওটুকু করি—নইলে

আমার কি? আয় উঠে আয় মা—মধু গাইটা নিয়ে মাঠে গেছে—আয় ভয় নাই।"

—"না জ্যেঠামশায় উঠ্‌বোনা আমি ঘরে—কি জানি যদি দোষ্‌ হয়? ঐ বুঝি মা ডাক্‌ছে—যাই, বাড়ী যাই।" ম্লানমুখে উষা উঠিয়া চলিয়া যায়, গুরুপ্রসন্নও একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

২

মতিলাল জাতিতে মাঝি—মাছধরা তার জাতব্যবসা; কিন্তু চিরকাল তাব কাটিল পানের ফেরী করিয়া। এ গ্রামে মাত্র ২।৷ ঘর জেলের বাস—কেউ করে পানের ব্যবসা, কেউ করে মনোহারীর দোকান—জাতব্যবসা তাহারা একপ্রকার ভুলিযাই গিয়াছে। মতিলালের সংসারে মাত্র তিনটী প্রাণী- সে, স্ত্রী, আর একটী মাত্র কন্যা উষা। গুরুপ্রসন্নের নিত্যকারের সঙ্গী উষা- ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ নয়—জেলের মেয়ে! কিন্তু না জানিলে কি কেউ চট্‌ করিয়া কথাটা বিশ্বাস করে? গুরুপ্রসন্ন যদি কোন অপরিচিতকে বলিয়া বসেন "এটী আমার মেয়ে"—কি উপায় আছে প্রতিবাদ করিবার? কিন্তু তবু উষা জেলেরই মেয়ে। বাড়ীর পাশে বাড়ী। গুরুপ্রসন্নেরও ঠিক এমনি একটী মেয়ে ছিল—সেটী যখন ছাড়িয়া যায়—ঠিক্‌ তাহার পর হইতেই উষার উপরে তাহার নজর পড়িল—সেই হইতে উষা তাহার সাথের সাথী। যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে—ভাল ভাল জামা কাপড় নিজে কিনিয়া দিয়া, তাহাকে পরাইয়া দু'চোখ ভরিয়া দেখিয়াছে! মতিলাল গরীব মানুষ; কোন রকমে তাহার সংসার চলে—সে মেয়েকে আদর যত্ন করিবেই বা কখন—আর বিলাস সামগ্রী দিবেই বা কি দিয়া? তবু দাদাঠাকুর যে তাহার মেয়েকে আদর যত্ন করে এইটুকু ভাবিয়াই তাহার তৃপ্তি!

কিন্তু গোল বাধিল উষার বিবাহ লইয়া। বিবাহের আইন পাশ হইয়া গিয়াছে—আর দুইমাস পরে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে—সুতরাং দেশে বালবিবাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে—তিন হইতে তের বৎসরের শতশত মেয়েকে পাত্রস্থ করিয়া মা বাপ সব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছে।

মতিলাল দাদাঠাকুরকে আসিয়া ধরিল—উষার বিবাহ দিতে হইবে। কথা শুনিয়া গুরুপ্রসন্ন তো চটিয়া লাল! "কি, এতটুকু মেয়ের বিয়ে? ওসব হবেনা মতিলাল। মেয়েকে জলে ফেলে দিতে চাও তো এখন বিয়ে দাও। দেখা নাই, শুনা নাই—তাড়াতাড়ি অমনি একজনের হাতে ধরে দিলেই হলো কিনা? বিয়ে ছেলেখেলা নয়।"

মতিলাল আর কি করে—মুখ খানা অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া যায়।

কিন্তু সে আজ চার বছরের কথা। উষার বয়স এখন চৌদ্দ আর তো ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু দাদাঠাকুরের আর মত হয় না—তাঁহার মনের মত ছেলে বুঝি মতিলালের সমাজে মিলিবে না। মতিলাল আর তাহার পরিবার ভাবিয়া অস্থির—নাঃ, এইবার দাদাঠাকুর তাহাদিগকে না মজাইয়া ছাড়িবেনা। মেয়ে ঘরে রাখিয়া যে প্রতিদিন পাপের ভাগী হইতেছে!

মতিলাল শক্ত হইয়া আসিয়া বলে—"আমি রাজগাঁয়েই উষার বিয়ে দেব দাদাঠাকুর, আপনি অমত করবেন না।"

গুরুপ্রসন্ন মাথা নাড়িয়া বলেন—"তা হয় না মতিলাল, —অবুঝ হয়োনা। সে ছেলে যে লেখাপড়া জানে না—মাছ ধরে খায়- সেখানে আমার উষাকে আমি দিতে পারবো না। ওকে আমি যা শিখিয়েছি—ও যদি বামুন কায়েতের মেয়ে হতো—তবু ওকে সবাই আদর করে নিতে চাইত। যাক্‌, তুমি আর একবার রতনপুর যাও—সে ছেলেটী কিন্তু মন্দ নয়—একটু লেখাপড়া জানে, কিছু জমিজমা আছে—হলে মন্দ হয়না। কিছু যদি খরচপত্র লাগে—সেজন্য ভেবনা, সে সব আমিই দেব। তুমি কালই যাও।"

মতিলাল আর প্রতিবাদ করিতে পারেনা—ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

৩

কয়েক মাস হইল একটী কঠিন অসুখে মতিলালকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়া গিয়াছে। পেটজোড়া প্লীহা, লিভার—রোজই বিকালে কাঁপাইয়া জ্বর আসে—গায়ে একটুও বল নাই। কাজেই সংসারের অবস্থাও সঙ্গীণ—কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো ভাতের যোগাড় হইতেছে মাত্র। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের

মেজাজও আজকাল বিগড়াইয়া গিয়াছে—কারণে অকারণে যখন তখন রাগিয়া উঠে।

একে পেটের চিন্তা, তাহার উপরে এত বড় মেয়ে গলায়—কাজেই বেচারার মেজাজ না বিগড়াইয়াই বা করে কি? যতই সে এ সব ভাবিতে থাকে দাদাঠাকুরের উপর ততই হয় তাহার রাগ—দাদাঠাকুরই তাহার সর্ব্বনাশের মূল—তাঁহার কথা না শুনিলে কি আর এত বড় মেয়ে এতদিন ঘরে থাকিত? মেয়ের বিবাহের অবশ্য এখনও তাহার ভাবনা নাই—কতজন হা করিয়া আছে—মুখের কথা ফেলিলেই হয়। কিন্তু এদিকে তাহার পরিবারটীও হইয়াছে তেমনি। তিনিও দাদাঠাকুরের কথারই পোঁ ধরিয়া চলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মতিলাল আজকাল হাল ছাড়িয়া দিয়াছে—যাহা হয় হউক। না হইলে রাজগাঁয়ের ওরা নগদ দুশো টাকা পণ দিবে বলিয়া কত খোসামদ করিতেছে—পারিলে এ সুযোগ কি সে ছাড়িত!

সে দিন মতিলাল পাশের গ্রামে পান বেচিতে গিয়াছিল কিন্তু কিছুই বিক্রী করিতে পারে নাই—যাইতে না যাইতেই কাঁপাইয়া জ্বর আসিয়া পড়িয়াছে। এক হাঁটু কাদা লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ঢুকিয়াই দাওয়ার উপরে একেবারে হাঁপাইয়া পড়িল। উষার মা ঘাটে গিয়াছিল—উষারও দেখা নাই। অনেক ডাকাডাকির পর উষার যখন দেখা পাওয়া গেল তখন মতিলালের রাগ একেবারে পঞ্চমে চড়িয়া গিয়াছে। উষা কাছে আসিতেই তাহাকে কীল, চড় যাহা হাতে আসিল মারিয়া বসিল। চেঁচামেচী শুনিয়া ওবাড়ী হইতে গুরুপ্রসন্ন ব্যাপার কি দেখিতে আসিলেন। সব শুনিয়া মতিলালকে দুই-একটা কড়া কথা বলিতেই—মতিলাল তাঁহাকে যাহা মুখে আসিল শুনাইয়া দিল—একটুও মান রাখিল না। গুরুপ্রসন্ন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। উষার এ বাড়ী আসা বন্ধ হইয়া গেল।

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে উষা একদিনও এবাড়ী আসে নাই। গুরুপ্রসন্ন কতদিন তাহাকে আম বাগানের ওপাশ দিয়া যাইতে দেখিয়াছেন তবু ডাকিতে সাহস করেন নাই; কিন্তু এ কয়দিন তাঁহার যে কেমন করিয়া কাটিতেছে তাহা তিনিই জানেন।

সামনে পূজার ছুটী—ইদানীং তাঁহার শরীরটাও বিশেষ ভাল যাইতেছে না—তাই মধু ধরিয়া পাকড়িয়া তাঁহাকে আর এক মাসের ছুটী লওয়াইয়া রাঁচি রওনা হইয়া গেল; রাঁচিতে গুরুপ্রসন্নের এক ভাইয়ের জামাই চাকুরী করে।

৪

গুরুপ্রসন্নের অনুপস্থিতের সুযোগ মতিলাল ছাড়িল না—ভাদ্রের শেষেই উষাকে রাজগাঁয়ে বিবাহ দিয়া দিল। মেয়ের দাম হইল আড়াই শো টাকা। বিবাহের পরই তাহারা উষাকে লইয়া গিয়াছে—মতিলালও বড় একটা আপত্তি করে নাই—মনে করিয়াছে তিন চার মাস পরে একবার আনিলেই চলিবে।

শ্বশুর বাড়ী পা দিয়াই উষার মন একেবারে বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। চারিদিকে বাঁশের ঝাড়—মাঝখানে ছোট একটী উঠান, তারই চারি পাশে খানকয়েক জীর্ণ খড়ের ঘর। উঠানের এক পাশেই শাক সব্জীর জন্য একটু জায়গা করা হইয়াছিল—সম্প্রতি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘরের পাশে মাটির হাঁড়িতে গাব পচান রহিয়াছে—তারই দুর্গন্ধে সারা বাড়ী ভরিয়া আছে। ঘরগুলার বারান্দার আশে পাশে নূতন পুরাতন জাল টাঙ্গান, তাহা হইতেও একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ বাহির হইতেছে। জেলের মেয়ে হইলে কি হয়—উষা এই সবে কোন দিনই অভ্যস্ত নয়—এমন কি কোন দিন এ সব দেখেও নাই।

তাহার স্বামীর নাম শ্রীদাম, বয়স বছর ত্রিশেক। লোকটার বুদ্ধি একটু কম—গোঁয়ার প্রকৃতির—যখন তখন অযথা রাগিয়া উঠে; ইহা তাহার স্বভাব। বাড়ীতে মাত্র দুটী স্ত্রীলোক—এক বুড়ী শাশুড়ী, অন্যটী বিধবা ননদ। ইহাদের নিকটে উষার গঞ্জনার সীমা নাই—তাহার মস্ত বড় অপরাধ, সে জাল বুনিতে জানে না। জেলের মেয়েদের জাল বোনা একটী বড় গুণ! অনেক গরীব সংসারের মেয়েরা এই করিয়া সংসারের অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু উষা ছোটবেলা হইতেই সঙ্গী পাইয়াছিল গুরুপ্রসন্নকে, তাহার পিতা করিত পানের ব্যবসা—এমন কি তাহাদের গ্রামেও অন্য কেহ জাল বোনা বা মাছ ধরার ব্যবসা করিত না—সুতরাং সে এ সব শিখিবে কোথা হইতে?

জ্যেঠা মশায়ের নিকটে এতদিন ধরিয়া যে লেখাপড়া শিখিয়াছিল—তাহা এখন তাহার পক্ষে অভিশাপের মত হইয়া দাঁড়াইল—ইহারা এসব ভাল বাসিত না—শ্রীদাম

নিজে জানে না নামটা সই করিতে—তাহার বউ, সে আবার করিবে পড়াশোনা!

এই সমস্ত আবেষ্টনী উষার মনকে একেবারে পাথরের মত চাপিয়া ধরিল। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভাঙ্গিয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া বিকালে জ্বর হইতেছিল, কিন্তু তাহা সে নিজে বা অন্য কেহই গ্রাহ্য করিল না। এমনি একটু আধটু জ্বরের চিকিৎসা এখানে কেহ করে না। দুই চারি দিন এমনি চলার পর জ্বর যখন একটু বেশী হইল, তখন উপরি উপরি ৮।১০ দিন অনিয়মিত কিছু কুইনাইনের পিল গিলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কাজেই স্নান, আহার ও কাজকর্ম্ম সমান তালেই চলিতে লাগিল। মাস দুই যাইবার পর উষার অবস্থা এমন হইল যে তাহাকে আর চিনিতে পারা যায় না—প্লীহা লিভারে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে—শরীরে রক্ত নাই—মুখ চোখ্ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এত করিয়াও ফল না পাইয়া শ্রীদাম একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল—বাজার হইতে পাঁচ সিকা দিয়া একটা নামজাদা পাচনের বোতল কিনিয়া আনিয়া দিল। কিন্তু ঔষধের সমস্ত শক্তি বিফলে যাইতে লাগিল।

৫

অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্তও গুরুপ্রসন্ন রাঁচি হইতে ফিরেন নাই—দেশের খবরও এতদিন কিছুই রাখেন না। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন একখানা পত্র পাইলেন। উষার হাতের লেখা—কে যেন তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা কাটিয়া তাঁহার রাঁচীর ঠিকানায় চিঠিখানা পাঠাইয়া দিয়াছে। চিঠিখানা পড়িয়া গুরুপ্রসন্ন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। —উষা লিখিয়াছে—"জ্যেঠামশায়, পর পর আপনাকে দুই খানা পত্র দিলাম একখানারও উত্তর দিলেন না! বাবার নিকটেও পত্র লিখিয়া জবাব পাই না। আপনারা কি আমাকে এমন করিয়াই ভুলিয়া গেলেন! আমি মরিতে বসিয়াছি—আর বাঁচিব না—একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।" রাজগ্রাম হইতে উষা চিঠি লিখিতেছে—তবে কি মতিলাল রাজগ্রামেই উষার বিবাহ দিয়াছে? কিন্তু তাহার কি হইয়াছে? কেন সে বাঁচিবে না? ভাবিতেই গুরুপ্রসন্নের সারা অন্তর কাঁদিয়া আকুল হইল—রাঁচিতে থাকা আর পোষাইল না। পরের দিনই ভোরে রাঁচি ত্যাগ করিলেন। বাড়ী আসিতেই রোগশীর্ণ মতিলাল তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দাদাঠাকুর, উষা বুঝি আর বাঁচে না—আমার খুব শাস্তি হয়েছে। আপনার কথা না শুনে রাজগাঁয়ে বিয়ে দিয়েই এই সর্ব্বনাশ হলো।"

পাশের বাড়ীর এক ব্যক্তি আসিয়া দুইখানা পত্র গুরুপ্রসন্নকে দিয়া গেল—সে দুইখানা পত্রও উষারই লেখা—কত দিন হইল এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে।

একখানায় লেখা আছে—

"জ্যেঠামশায়, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না—এরা আমাকে দেখিতে পারে না—সব সময় গালাগালি দেয়—আপনি বাবাকে বলিয়া আমাকে এই মাসেই লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন।"

অন্য পত্রে সে তাঁহাকে অসুখের কথা লিখিয়া, পুনরায় লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছে। সমস্ত ব্যাপার তলাইয়া বুঝিয়া গুরুপ্রসন্নের অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। পরের দিনই রাজগ্রামে রওনা হইলেন—মধু সঙ্গে গেল। কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য এই ১১।১২ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিলেন—তাহার সহিত আর দেখা হইল না। আগের দিনই উষার এ পৃথিবীর সহিত সকল কারবার চুকিয়া গিয়াছিল। এদিকে রাজগ্রাম যাইবার সময় যে বুড়া তিন ঘণ্টার পথ দুই ঘণ্টায় চলিয়া গিয়াছিল—আসিবার সময় আর তাঁহার সামর্থ্যে কুলাইল না—শেষে পাল্কী করিয়া বাড়ী বহিয়া আনিতে হইল।

পরের দিন মধুর তাড়া-হুড়ায় দুটী সিদ্ধ করিয়া মুখে দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মধু বারান্দায় মাদুর পাতিয়া, রামায়ণখানা আনিয়া হাতে দিয়া বলিল—"তুমি পড়ো দাদাঠাকুর, আমি শুনি।"

বইখানি খুলিতেই উষার চিহ্নিত স্থানটী বাহির হইয়া পড়িল—এই পর্য্যন্ত তাহার শেষের দিন পড়া হইয়াছিল।

"মারিতে কাটিতে চাহে নাহি ব্যথা মনে।
কাঁদিছেন সীতা, আর কত সহে প্রাণে॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা নাহি বান্ধে কেশ।
শোকেতে আকুল হয়ে কান্দেন অশেষ॥"

আর পড়া হইল না—উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ তাঁহার সমস্ত সংযমের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিল।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

বাংলা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে যাঁর সঙ্গে শেষ কায করেছি আজ তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ করব। তিনি স্বনামধন্য "ইণ্ডিয়ান মিরার"-সম্পাদক পরলোকগত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই নরেন্দ্রবাবুকে কত সভা-সমিতিতে দেখেছি। তাঁর সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান মিরার" কাগজ অনেক সময় পড়েছি, ইংরাজী ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছি, অমন নির্ভীক সম্পাদক সেকালে অতি কমই ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল তার চার মাস পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করেন। এই চার মাসের স্মৃতির আলোচনা আজ করব।

রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের পরিচয় সে-কালের বাঙ্গালীর কাছে দেবার আবশ্যক নাই, এ-কালেরও অনেকে এখনও তাঁকে ভোলেন নি।

নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা বলবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি— আমি 'হিতবাদীর' সংস্রব ত্যাগ করলাম। এ থেকে অনেকে হয় তো মনে করতে পারেন যে, যেমন অকস্মাৎ এই সঙ্কল্প করি তৎক্ষণাৎ তা কার্য্যে পরিণত করি। আসল কথা কিন্তু তা নয়।

প্রায় মাসখানেক থেকেই আমি 'হিতবাদী'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করব কি না সে কথা চিন্তা করছিলাম। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু সহসা কার্য্য ত্যাগ করে আবার কোথায় দাঁড়াব এই ভাবনা হয়েছিল।

আমি কিন্তু আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে দেখতে পেয়েছি যে, অলক্ষ্যে থেকে কে একজন আমার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন, আমাকে কখনো চাকরির জন্য কারও কাছে উমেদারী করতে হয়নি। স্বয়ং বিশ্ববিধাতা সে ভার নিয়েছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাই হ'ল।

সে সময় ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের খ্যাতনামা কবি জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী (এখন স্যার মহারাজা) কলিকাতায় বাস করতেন। তাঁরা তখন তাঁদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। বড় ভাই প্রমথবাবু কবি ও সাহিত্যিক, ছোট ভাই মন্মথবাবু তখন সাহিত্যিক এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুপরিচিত দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য।

তাঁদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এক বৈঠকখানায় সাহিত্যিকদের বৈঠক বসত—সেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার প্রমুখ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক প্রতিদিন আড্ডা দিতেন—নানা বিষয়ের আলোচনা হত। আর সেই প্রশস্ত অট্টালিকার আর এক প্রান্তে মন্মথবাবুর মজলিস্ বসত। সেখানে প্রায় প্রতিদিন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় মহোদয়গণের আগমন হ'ত, রাজনীতি সম্বন্ধে বিপুল আলোচনা হ'ত। আজ যে মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী খ্যাতনামা রাজনীতিক ও সুবক্তা, এর সূচনা সেই বৈঠকেই হয়েছিল। মহারাজা স্যার মন্মথনাথ তখন থেকেই ইংরাজী ভাষায় একজন সুবক্তা বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

আমার এই দুই মজ্‌লিশে মিশবারই ছাড়-পত্র ছিল। সাহিত্যসেবা করতাম বলে প্রমথনাথের আসরে স্থান পেতাম, আবার সংবাদপত্রের সম্পাদক বলে মন্মথনাথের মজ্‌লিসেও আমার প্রবেশাধিকার ছিল; আমি দুই মজলিসেই সমভাবে যোগ দিতাম; দুই ভাই-ই আমাকে যথেষ্ট স্নেহই বলুন আর অনুগ্রহই বলুন—করতেন। তাতে আমার এই সুবিধা হয়েছিল যে কোন মজ্‌লিসেই চা জলযোগ বা সাময়িক ভোজনে আমাকে বঞ্চিত হতে হোতো না। এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে আমি যে আর 'হিতবাদী'র সঙ্গে পেরে উঠছিনে এ সম্বন্ধে প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে অনেক দিন আমার আলোচনা হয়েছিল। সেই আলো-চনার ফল এই হ'ল যে একদিন প্রমথবাবু আমাকে বললেন— দেখুন জলধরবাবু, আমি সুদীর্ঘকালের জন্য কলিকাতা ছেড়ে

দেশে যাব। আমি বলি কি—আপনি অবিলম্বে 'হিতবাদী'র কায ছেড়ে দিন—আমার সঙ্গে সন্তোষে চলুন। সেখানে আমার ছেলে ও মেয়ের (ছোট ছেলে তখনো জন্মগ্রহণ করেন নি) অভিভাবক ও শিক্ষক হবেন। আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করব। সন্তোষে আপনার কোন খরচপত্র লাগবে না, সবই আমি বহন করব। আপনি মাসিক দেড়শো টাকা পাবেন। একে ভগবানের অনুগ্রহ ছাড়া আর কি বলব। মন্মথবাবুও এই কথা শুনে খুব আনন্দিত হলেন। তার দুই-এক দিন পরেই 'হিতবাদীর' কার্য্য ত্যাগ করলাম এবং তখনই চলে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু 'হিতবাদীর' অন্যতম স্বত্বাধিকারী উপেন দাদা প্রমথবাবুকে চিঠি লিখে আমাকে আরও একমাস আট্‌কে রাখলেন। তার পরেই আমি সন্তোষে চলে গেলাম।

দুই বৎসর আমি সন্তোষে ছিলাম। প্রথম কিছুদিন প্রমথবাবুর ছেলে ও মেয়েটীকে নিয়েই থাকতাম, আর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রমথবাবুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীর অনুপম সেতার-বাজনা শুনতাম। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত কি যে আনন্দে কেটে যেত তা আর বলতে পারিনে। তার পরই এক বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে পড়া গেল।

এই সময় মন্মথবাবু রাজা উপাধি লাভ করে কলিকাতা থেকে দেশে গেলেন। আমরা মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করলাম। তার পরই বিষয়-কর্ম্ম, দেনা-পাওনা ও জমিদারী নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হ'ল। এই মতান্তর যখন মনান্তরের সীমানা স্পর্শ করল তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। জমিদারী ও বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমি দুই ভাইয়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। নানা ব্যাপারে দুই ভাইই আমার সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। সে সব কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কোন রকমে গোলযোগ মেটাতে পেরেছিলাম। দাঙ্গা হাঙ্গামা, আইন আদালত, বাহিরের মধ্যস্থতা কোন কিছুই করতে হয়নি। এর ফলে এই হ'ল যে আমি বড় তরফের অর্থাৎ প্রমথবাবুর দেওয়ান নিযুক্ত হলাম। গিয়েছিলাম ছেলেদের অভিভাবক হয়ে—শেষে হলাম জমিদারীর অভিভাবক।

কিন্তু এসব হাঙ্গামা আমার শরীর বেশীদিন সহ্য করতে পারল না। টাঙ্গাইল অঞ্চল তখন ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—এখনও আছে। আমার সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় শরীর ভেঙ্গে পড়ল। আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। দুদিন ভাল থাকি তো পাঁচ দিন জ্বরে ভুগি। কি করব উপায় নাই; এত বড় চাকরিটা ছেড়েই বা দিই কি করে। কিন্তু যে বিধাতা এত কাল আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন—তিনিই তার বিধান করলেন।

একদিন আমার পরম বন্ধু সম্প্রতি পরলোকগত অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভায়ার একখানি পত্র পেলাম। তিনি যা লিখেছেন তার সার মর্ম্ম এই যে তিনি শুনতে পেয়েছেন যে আমি সন্তোষে ম্যালেরিয়ায় ভুগছি। কোন সুবিধা পেলেই কলিকাতায় চলে যাবো। তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যে, আমি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত "সুলভ-সমাচার" পত্রিকায় সহকারী হয়ে কলিকাতায় যাই। সম্পাদক হয়েছেন—রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও বাংলা ভাল জানতেন না, লিখতেও পারতেন না। আমায় সেখানে সহকারী হয়ে কায চালাতে হবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পত্র প্রমথবাবু ও রাজা মন্মথ উভয়কেই দেখালাম। আমার সে সময়ের শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা আমার কলিকাতা যাওয়াই কর্ত্তব্য বলে মনে করলেন। আমি সন্তোষের দেওয়ানী, ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকত্ব ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে "সুলভ সমাচারের" সহকারী হলাম। চাকরি ত্যাগ করে এলাম বটে, কিন্তু জমিদারভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহপাশ ছিন্ন করতে পারলাম না। তখনও পারিনি, এখনও পারিনি। এখনও তাঁরা পূর্ব্বের মতই আমাকে স্নেহ ও অনুগ্রহ করে থাকেন।

তখন 'সুলভ-সমাচারের' আফিস ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট ক্রীকরোতে ছিল। আমি এসে দেখলাম রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভায়া ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয় 'সুলভ সমাচারের' কাযকর্ম্ম দেখছেন। তিনকড়ি-দাদাকে পেয়ে আমার খুব ভরসা হোল। পূর্ণ দুই বৎসর সংবাদপত্রের সেবা থেকে দূরে ছিলাম, আবার নূতন করে আরম্ভ করতে হোল। নরেন্দ্রবাবু আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। প্রত্যহ আফিসে আসবার সময় ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হোত। তিনি

গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত চিঠি-পত্র, নোটিস, সারকুলার, সমস্ত আমাকে দিতেন। আর কোন্‌টা সম্বন্ধে কি ভাবে বলতে হবে তাও বলে দিতেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আজীবন নিযুক্ত থাকার অনেক নিদর্শন, তাঁর কথায় ও তাঁর উপদেশে পেতাম। প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন এবং নূতন প্রবন্ধ লেখা সম্বন্ধে তিনি আমাকে অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। আমি তাঁর স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম। আমি রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের জীবন-কথা লিখতে বসিনি। তাঁর অবদান সর্ব্বজনবিদিত, বড়লাটের গৃহে তাঁর তেজস্বিতার বিবরণ এখনও প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে। সে সব কথা তাঁর জীবনচরিতকারের জন্য রেখে দিলাম।

মনে করেছিলাম নরেন্দ্রবাবুর ন্যায় বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে কায করে যাব, কোন দায়িত্ব আমার থাকবে না। কিন্তু আমি মনে করলে কি হয়? বিধাতার বিধান অন্যরূপ। চার মাস যেতে না যেতেই নরেন্দ্রবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিন পরেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন।

নরেন্দ্রবাবু যেদিন পরলোকগত হলেন সেই দিনই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বাংলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীকে তাঁর পিতৃদেবের পরলোকগমন সংবাদ পাঠালেন এবং "সুলভ সমাচার' পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

চিঠি পাবার পরদিনও যখন চীফ সেক্রেটারী মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না, তখন সত্যেন্দ্রবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি তাঁকে সে কার্য্য হতে বিরত হতে বললাম, কারণ সত্যেন্দ্র বাবুর যা কর্ত্তব্য তা তিনি করেছেন। তাঁর অত তাড়াতাড়ি করবার কোন প্রয়োজন নেই। গবর্ণমেণ্টের কাগজ, তাঁরা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। সত্যেন্দ্রবাবু আর দেখা করতে গেলেন না। তিনদিন পরে চীফ সেক্রেটারী মহাশয় একটা সময় নির্দ্দেশ করে সত্যেন্দ্রবাবুকে ও আমাকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করতে আদেশ দিলেন।

আমরা দুইজন যথাসময়ে চীফ সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রথমেই নরেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করলেন, তারপর সত্যেন্দ্রবাবুকে বললেন—আপনার পত্রের উত্তর দিতে তিন চার দিন বিলম্ব হয়েছে, কারণ যেদিন আপনার পত্র পাই সেই দিনই 'সুলভ সমাচারের' সম্পাদক-পদপ্রার্থী হয়ে পাঁচসাত জন আবেদন করেছেন। সেক্রেটারী মহাশয় তাঁদের কয়েকজনের নামও করলেন এবং তাঁদের মধ্যে দুই তিন জন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে কথাও বললেন। এইখানে বলে রাখি যে আমি কিন্তু কোন আবেদনও করিনি বা তদ্বিরও করিনি; বরং সত্যেন্দ্রবাবুকে এ সম্বন্ধে কিছু করতে বিরত করেছিলাম।

তারপর সেক্রেটারী আমাকে বললেন—আপনার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে যে রিপোর্ট আছে তা আমি পড়েছি। আপনার যোগ্যতার পরিচয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করাছনে—সে আমি জানি। সুতরাং আমাকে একটী কথাও বলতে হ'লনা। তারপর সত্যেনবাবুকে বললেন—আমরা স্থির করেছি—মিঃ সেনকেই 'সুলভ সমাচারের' সম্পাদক করব। আপনি কি বলেন সত্যেন্দ্রবাবু!

সত্যেনবাবু উত্তর দিলেন—আমারও তাই ইচ্ছা। তবে সে কথা আপনাকে না লিখে আপনার উপরেই ভার দিয়েছিলাম। তখনি আদেশ হ'ল, নরেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনের দিন থেকেই আমি সম্পাদক হলাম এবং আমার বেতনও যথেষ্ট বৃদ্ধির অনুরোধ সেক্রেটারী মহাশয় সত্যেনবাবুকে জানালেন।

আমি নিজে কোন চেষ্টা করিনি। কোনও তাদ্বিরও করিনি এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রবাবুও কিছু করেন নি। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকেই আমাকে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হ'ল।

তার পরই আর যাই কোথায়! চারিদিক থেকে আমার উপর তিরস্কার ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতি বর্ষিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। রহস্যের কথা এই যে, যাঁরা এই পদের জন্য আবেদন করে বিফল-মনোরথ হয়েছিলেন, তাঁরাই আমাকে স্বদেশ-দ্রোহী প্রভৃতি সুমিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সে অপ্রীতিকর বিষয় সম্বন্ধে তখনও কিছু বলিনি—এত কাল পরে আজও কিছু বলব না।

বৎসরের অবশিষ্ট কয়মাস যেমন করেই হোক 'সুলভ-সমাচার' চালালাম। সেই সময় লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিভাগ

রদ্ হয়ে গেল। মহামতি ভারত-সম্রাটের আদেশে কার্জ্জন বাহাদুরের সেটেল্‌ড্ ফ্যাক্ট একেবারে আন্‌-সেটেল্‌ড্ হয়ে গেল। দুই বাংলা জুড়ে গেল। বাংলাদেশ আর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন থাকল না—একজন গভর্ণর নিযুক্ত হলেন। বিহার ও উড়িষ্যা বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ হ'ল। রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লী চলে গেল। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তখন বলা হ'ল—বাংলা দেশে শান্তি এসে গেছে—আর কোন গোলমাল হবে না। সুতরাং বৎসরে একরাশি টাকা ব্যয় করে 'সুলভ-সমাচার' প্রচারের আর প্রয়োজন নেই।

তখন ভারত-সম্রাট দিল্লীতে দরবার করলেন। কলিকাতা টাউনহলের সিঁড়িতেও একটা ছোটখাটো দরবার হ'ল। সেই দরবারে আর দশজনের সঙ্গে আমিও একখানি সার্টিফিকেট-অব্-অনার পেলাম।

এইভাবে বাংলা সংবাদপত্রের সেবার অধ্যায় আমার শেষ হোল। এর পরে আর কোনদিন কোন সংবাদ-পত্রের সংশ্রবে আমি যাই নি। তাই আজ বাংলা সংবাদ-পত্রে আমার শেষ আশ্রয়দাতা পরলোকগত রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের স্মৃতি-তর্পণ করছি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্ব্বে আরও দুই-একটী কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

'সুলভ সমাচারে'র চাকরি তো গেল! তারপর কি করা যায়! সার্টিফিকেট-অব্-অনার ধুয়ে জল খেলে তো পেট ভরবে না! 'সুলভ-সমাচার' উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পূর্ব্ব মনিব সন্তোষের কবি জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং যতদিন আর কোন সুবিধা না হয় ততদিন তাঁর প্যারাগন প্রেসের ভার নিতে বললেন। এখন যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ আফিস হয়েছে পূর্ব্বে সেখানে ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল ছিল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলেন। আমি সেই প্রেসের ম্যানেজার হলাম।

তখন, ভারতবর্ষ' প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধি-কারী শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে তিনি প্যারাগন-প্রেসেই 'ভারতবর্ষ' ছাপতে চান। আমার আর তাতে আপত্তি কি! অতবড় একখানি কাগজ ছাপবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আমি তাই করতে লাগলাম। হরিদাসবাবু কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। তখন 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে আমার ঐ টুকুই সম্বন্ধ ছিল।

আমি চার পাঁচ ফর্ম্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম। প্রথম ফর্ম্মার পেজ্ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্ম্মার প্রুফ্ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।

তখন চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। 'ভারতবর্ষে'র কর্ম্মকর্ত্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হ'ল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যপদে জোর করে বসিয়ে দিলেন। আমি এ সৌভাগ্যের আশাও করিনি এবং এজন্য কোন চেষ্টাও করিনি।

প্রথম বৎসর পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আমার সহযোগী ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের আরম্ভে তিনি চলে গেলেন, 'বঙ্গনিবাসী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহযোগী হলেন। তৃতীয় বৎসরে তিনিও চলে গেলেন। সেই থেকে এই সুদীর্ঘকাল আমি একাকী 'ভারতবর্ষ' নিয়ে বসে আছি।

সুরসংযোগ

শ্রীনিখিল সেন

পুরো একটা টাকা হইতে একটি পয়সা খসাইয়া নিলে যেমন আর একটা আস্ত টাকা থাকে না—ইহা যেমন সত্য, পরপর একটি একটি করিয়া পয়সা জমাইলে চোষট্টি দিনে যে চকচকে একটা টাকা হইতে পারে—ইহাও তেমন নিছক সত্য! হোক না, সামান্য চাকরী; তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ—একটুতেই অধৈর্য্য হইয়া পড়। যে কাজটায় লাগিয়া আছ, লাগিয়া থাক সে কাজটায়; দেখিবে, তুমিই এককালে হেডমাষ্টার হইয়া গিয়াছ! কল্যাণকামী গুরুজনদের সৎ উপদেশে কান দুটি ভারী হইয়া উঠে।

ক্রমাগত কয়েক বৎসর বাড়ীতে বেকার বসিয়া কাটাইবার পর মাষ্টারীটা শেষে জুটাইয়াছিলাম। বেতগাছিয়া হাই স্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট টিচারী; মুটি-বাঁধা মাহিনা হইলেও খাটিতে হয় প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু সংসার খরচ উহাতে কুলাইয়া উঠে না: বাকি পড়ে মুদির দোকানে; হারু গোয়ালা প্রতিদিন আসিয়া খিট-মিট করিয়া যায় দুধের বাকি দামের জন্য; বাড়ীওয়ালা আসিয়া তাগাদা দেন বাড়ীর ভাড়ার জন্য। বুকে মাথা গুঁজিয়া নীরব থাকিতে হয়। না, টিউসানীটা না করিলে আর চলে না কিছুতে। চৌধুরীদের ছেলেটিকে পড়াইয়া আসি সকাল বিকাল দুইবেলা।

কিন্তু মেঘমায়া বারণ করে। বলে: কাজ নেই বাপু, অতো খাটুনিতে। ছেলে পড়ানোটা ছেড়ে দাও তুমি, আমি কোন রকমে চালিয়ে দেবো এ'তেই। শরীরটা যে কি হ'চ্চে দিনদিন, তার খেয়াল নেই এতটুকু। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারো না মুখটা একবার?

হ্যাঁ, পারি! কিন্তু তুমিও তো কম খাটো না মায়া, একটা ঠাকুর রাখলে তো—

না, বেশ হয় না। ও এসে যা তা রেঁধে দেবে, আর তোমরা খেয়ে অসুখে মরো আর কি? তারপর দেখবে কে শুনি?

কেন, তুমিই।

ঈস্, আমার বয়ে গ্যাছে! রাগের ভাণ করিয়া উত্তর দেয় মায়া। চোখ দুটি আমি বুলাইয়া নি তাহার মুখের উপর। গালের দুপাশে বড়ো হাড় দুটি শাদা পাতলা চামড়া ফুটো করিয়া ক্রমশঃ বাহির হইয়া পড়িতেছে। আর দিনদিন সে হইয়া যাইতেছে রোগা, ছিপছিপে, শাদা।

পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি নিয়া মেঘমায়া কহিল:

ওকি। হাঁ করে গিলছো নাকি?

উঁহু, দেখছি শুধু, চোখ দুটি নামাইয়া নিয়া বলিলাম।

স্কুলে যাবে না? দেরী হচ্চে না তোমার?

পানের খিলীটা আমার মুখে পুরিয়া দেয় মেঘমায়া। একটু হাসিয়া আমি চলিয়া যাই লম্বা পা ফেলিয়া।

সামান্য একটা স্কুল-মাষ্টারের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ-ভাঙ্গা পাতা। কিন্তু ইহার একঘেয়েমীর সঙ্গে সুর মিশাইতে পারিত আরও একটী হতভাগা স্কুলমাষ্টার; তার জীবনের ঝরা কয়েকটা পাতা!

অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন মহিমের সঙ্গে দেখা ঘটিয়াছিল জীবনে। স্কুল হইতে ফিরিয়া একদিন বিকালে বাহিরের দাওয়ায় একটা তক্তাপোষের উপর বসিয়া ছেলেদের খাতাগুলি দেখিতেছিলাম। হঠাৎ সদর দরজার ভেজান কপাটটী ঠেলিয়া মহিম ভেতরে ঢুকিল; এমনভাবে ঢুকিল যেন তাহার সহিত আমার বহুদিনের আলাপ, আত্মীয়তা! একমাথা রুক্ষ লম্বা চুল সারা মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত নোংরা ও ছেঁড়া একটা কাপড় কোমরে জড়াইয়া সে পরিয়াছে। বহুদিনের অনিয়মিত স্নান ও রাস্তার যেখানে-সেখানে শোয়ায় মহিমের গায়ে পুরু ময়লা জমাট বাধিয়া গিয়াছে।

কাল একগাল দাড়ি ও গোঁফের ফাঁকে ময়লা দাঁত দুপাটী বাহির করিয়া সে একগাল হাসিয়া ফেলিল: কি মাষ্টারবাবু, চা খাচ্চেন নাকি?

খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমি তাহাকে আসিতে

..লাম। মেঘমায়া একটু আগে চা রাখিয়া গিয়াছিল; খুব গরম বলিয়া এতক্ষণ খাই নাই—খেয়াল হইল।

একটুখানি সঙ্কোচ করিয়া মহিম আসিয়া বসিল তক্তাপোষের একপাশে। তারপর পাশে নামাইয়া রাখিল বগলের নীচ হইতে পুরাণ কাগজ দিয়া জড়ান কাগজের একটি মোড়ক। বাঁ'হাতটা তার উপর রাখিয়া মহিম কহিল: যা ক্ষিদে পেয়েছে মাষ্টারবাবু, এক কাপ চা যদি—

আমি হাসিয়া কহিলাম: হ্যাঁ, বেশ তো; কিন্তু, শুধু চা খাবেন নাকি খালি পেটে? আমি মেঘমায়াকে খাবার আনিতে বলিয়া পাঠাইলাম।

মহিমের শুকনো মুখটা খুশীতে ভরিয়া গেল। বলিল:

ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা গেলো না মাষ্টারবাবু। বেশ করে পিটিয়ে দিতে পারেন না হারামজাদাদের? আমাকে পেয়েছে কি ওরা, বলুন তো মশাই। কালকে বুঝলেন, গুপ্তদের ছোট গিন্নী খেতে দিলো একথালা ভাত। কিন্তু খেতে কি আর পারলুম? হারামজাদারা এসে শুধু শুধু আমায় ক্ষেপাতে সুরু করে দিলে। একটা কাঁচা লঙ্কা চাইলুম, দিলে না। এনে দিলে একখিলী পান! খাচ্চি তখন—পান কি করে খাই বলুন দিকি?

একটানা এতগুলি কথা বকিয়া গিয়া পরপর কয়েকটা ঢোক গিলিল মহিম। তারপর এক সময় আমার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া আবার সুরু করিল:

কি বলে ক্ষেপায় জানেন মাষ্টারবাবু।

সে আমার দিকে আরও একটুখানি আগাইয়া আসিল। মাথাটা পেছনে একবার হেলাইয়া হাসিয়া বলিল: আমি নাকি বউ-এর জন্য পাগল! বলুক তো দেখি কোন শালা, মণির কথা আমি পেড়েছি কিনা তাদের কাছে। ঐতো সেবার মণির মেয়েটি হলো, আমি বুঝি খপর পাইনি? তবু, গেছি কোনদিন দেখতে? আর প্রভাসটা—প্রায় তো দেখা হয় তার সাথে; আমায় দেখলে সে পাশ কেটে চলে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করেছি কোনবার মণির কথা? বলুক না দেখি শালারা—

মহিম উত্তেজিত হইয়া উঠে। শূন্যে হাত ছুড়িয়া বলে:

আমি ছেলেদের কিন্তু মেরে একদিন হাত গুঁড়ো করে দেবো মাষ্টারবাবু, তখন টের পাবে, হ্যাঁ!

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

না—না, মহীবাবু, তা কি হয়। আর কে বলচে আপনাকে পাগল? ছেলেমানুষ ওরা—দেখুন কালকে আমি ঠ্যাঙিয়ে সবাইকে ঠিক করে দিয়েছি।

মহিম আশ্বস্ত হইল। মেঘমায়া খাবার ও চা আনিয়া দিল। সে নোংরা হাত না ধুইয়াই খাবার মুখে পুরিয়া দিল। চিবাইতে চিবাইতে নীচু গলায় আবার বলিল:

শুধু মিছিমিছি খেপায় মাষ্টারবাবু। ঢিল ছুঁড়লে আমার রাগ হয় না। তবে বাপু, বৌয়ের কথা তুলিস কেন?

মহিম একচুমুকে কাপের সবটুকু চা শেষ করিয়া ফেলে।

একদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। কুমীর-খালির কাঠের পুলটি পার হইয়া সামনে চাহিয়া দেখি—মহিম রাস্তার উপর ছেলেদের মত ধেই-ধেই করিয়া লাফাইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতেছে। আর তাহার পিছনে একদল ছেলে দূর হইতে তাহাকে ঢিল ছুড়িতেছে ও হাততালি দিয়া ছড়া কাটিয়া তাহার মত নাচিতেছে:

ওরে মহী পাগলা,
দু ঠ্যাং-য়ালা ছাগলা;
বউ-এর নামে পাগলা—

আমাকে দেখিয়া ছেলেগুলি পিঠ দেখাইল। আমি মহিমের কাছে আগাইয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম:

কি হ'লো, মহীবাবু?

সে একটুকুও অপ্রস্তুত হইল না। দাঁত দেখাইয়া শুধু হাসিতে লাগিল। এক সময় আমার কাছে আসিয়া খুব ছোট গলায় বলিল:

জানে না মাষ্টারবাবু, জানে না—

কি জানে না?—আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম।

কেউ জানে না। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলুম, কি ছাই, বলুন না।

মহিম আরেক চোট হাসিয়া নিল। এক সময় আমার কানে কানে কহিল:

Entice মানে; কেউ জানে না, মাষ্টারবাবু!

আমার দম ফাটিয়া হাসি আসিল। কহিলা

হবে আপনার ও নিয়ে? চলুন, চা খাবেন না? মহিমের একটা হাত ধরিয়া আমি তাহাকে সঙ্গে নিয়া চলিলাম। সে নীরবে চলিতে লাগিল। চোখের কোন দিয়া আমি একবার তাহার মুখটা দেখিয়া নিলাম—অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে তাহার মুখ। একসময় সে বলিল: হঠাৎ মণির কথা মনে পড়লো কিনা, তাই জিজ্ঞেস করলাম মাষ্টারবাবু। কিন্তু কেউ বলতে পারলে না? আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া সে একবার আমার দিকে চাহিল। তারপর আর একটা কথাও বলিল না; মুখ গুঁজিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

এমনই তাহার চাল-চলন! কখন কি যে করিয়া বসে, তাহার কোন ঠিক নেই। অকারণে হাসে, ছেলেদের মত গলা ছাড়িয়া অকারণে কাঁদিতে বসে। বিড়-বিড় করিয়া আপনা-আপনি বকিয়া যায়। রথযাত্রার সেদিন হাফ-হলিডে হইয়াছিল। দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া দেখি—সে খাইতে বসিয়াছে এবং মেঘমায়াকে উদ্দেশ করিয়া অনর্গল কি সব বকিয়া যাইতেছে। আমাকে ভেতরে ঢুকিতে দেখিয়া সে একটু চমকাইয়া উঠিল। অপরাধীর মত আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল: এত সকাল সকাল এলেন যে?

ঢক-ঢক করিয়া খানিকটা জল খাইয়া নিয়া আবার বলিল: আমি বলছিলুম আপনার স্ত্রীকে—মহিম একটু থামিল।

আগে খেয়ে নিন না, তারপর বলবেন।—আমি হাসিয়া বলিলাম।

মহিম মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। ভাত সে খাইতে পারিল না; শুধু বৃথা নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া গিয়া বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না।

আমি মেঘমালার দিকে চোখ দুটি তুলিয়া ধরিলাম। রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল:

তুমি ভারী ইয়ে তো, উপোসী লোকটিকে খেতে দিলে না সামনের ভাতগুলো?

আমার অপরাধ?

রথযাত্রার হাফ-হলিডে হলো যে—

পারলে না, বাইরে একটু অপেক্ষা করতে? মহিমবাবু বলছিলেন: তিনি তাঁর স্ত্রীকে কত ভালবাসতেন। একখানা করে রোজ চিঠি লিখতেন। গল্পটা বেশ জমে আসছিল, আর তুমি এসে সব পণ্ড করে দিলে।

তাই নাকি? ভারী দুঃখিত তা' হলে!

মেঘমায়া হাসিয়া ফেলিল—লাল পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়া একটুখানি।

প্রতিবৎসর এমনি দিনে বেতগাছিয়া গ্রামে রথযাত্রার মেলা বসে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অনেক ছেলে-মেয়ে রথ দেখিতে আসে। শহর হইতেও মাঝে মাঝে দোকানপাতি বেতগাছিয়া গ্রামে আমদানি হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া আবার খড়ের বড় চালাঘরটি ভাড়া লইয়া যে বায়স্কোপটি আসিতে সুরু করিয়াছে, তাহার আলোচনা বালকমহলে অনেকদিন চলে। রায়দের বীরুটাই একবার শুধু তার বাবার সঙ্গে কলিকাতা শহরে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে—ছবিগুলিও পারে মানুষের মত কথা কহিতে, নাচিতে ও গান করিতে। অনেকে তখন অবিশ্বাস করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল—বীরু তাহাদের গেঁয়ো পাইয়া বোকা বানাইতেছে। কিন্তু তাহারাও স্বচক্ষে দেখিয়াছে—অন্ধকারে কাপড়ের পরদার উপর ছবি হাসিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে। সেই বায়স্কোপটি এবারও নাকি আসিয়াছে এবং ঢোল পিটাইয়া, লাল ও নীল রঙের কাগজ ছড়াইয়া গাঁয়ের চারিদিকে প্রচার করিয়া দিয়াছে যে এবারকার ছবি কথাও কহিবে।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রথের দিনে এমন নাকি প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। গেঁয়ো পথ কাদায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছে।

খোকাকে নিয়া বিকালে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। মেলার অসংখ্য লোকের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল—কিছু দূরে গাছের একটি গুঁড়ির উপর মহিম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার দিকে আগাইয়া যাইতেই সে উঠিয়া আসিল। কোন ভূমিকা না করিয়া কহিল: মণির মেয়েটাকে দেখলুম মাষ্টারবাবু—প্রভাস হাত ধরে এনেছিল। একটু থামিয়া আবার

জন্মাষ্টমী
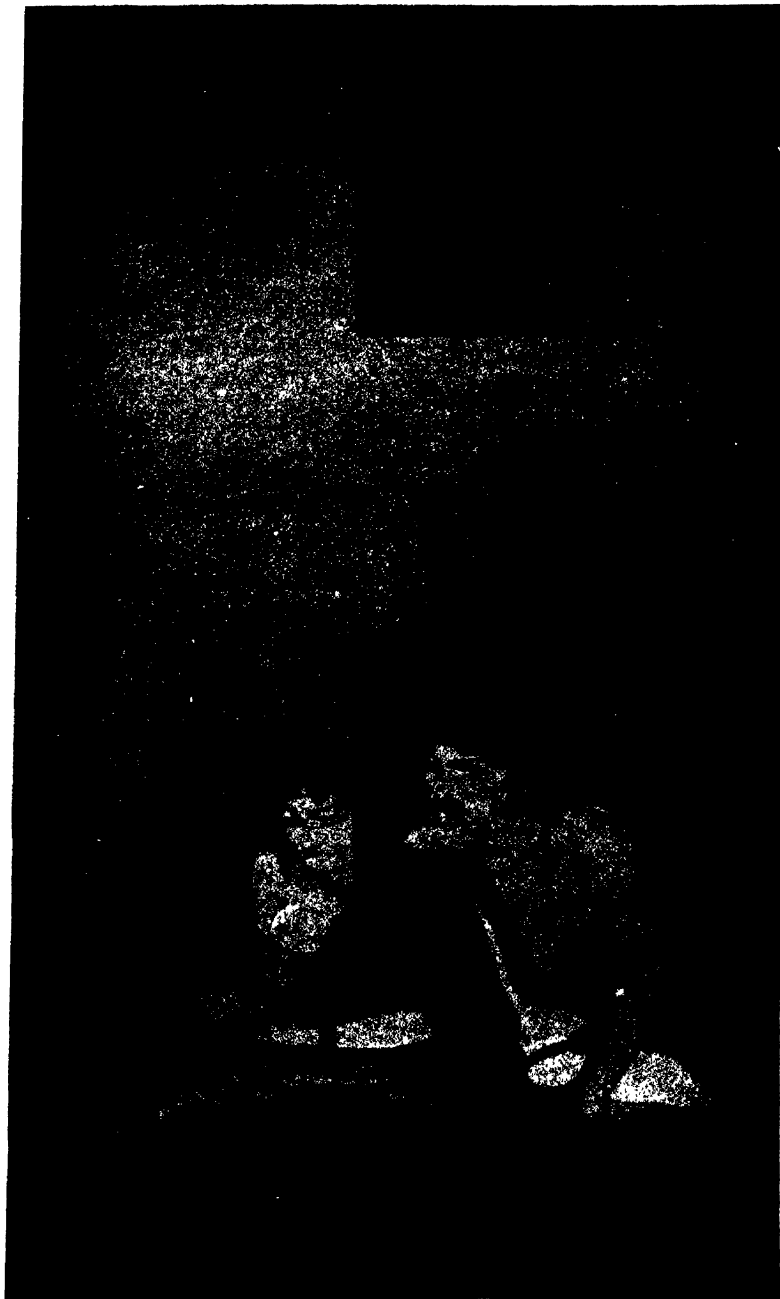
শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী   Bharatvarsha H. & P. Works

ঠিক মণির মতই হয়েছে! পয়সা থাকলে একটা পুতুল কিনে দিতে পারতুম।

আমি তাহাকে পয়সা দিতে চাহিলাম। সে নিল না; বলিল:

তারা তো চলে গেছে—এই একটু আগে!

মহিম আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

একটা পুতুল কিনিতে খোকা শেষে বায়না ধরিল। জাপানী একটা 'ডল' তাকে কিনিয়া দিতে হইল। খুশী হইয়া সে চলিতে লাগিল লাফাইয়া লাফাইয়া। আমি তার উপর চোখ দুটি একবার বুলাইয়া নিলাম। মনে একটা করুণা জাগিল মহিমের জন্য!

একদিন খুব সকালে—একটু একটু করিয়া চারিদিকে মাত্র ফরসা হইতেছে, মহিম আসিয়া আমাকে ডাকিতে সুরু করিল। আমি বিছানা ছাড়িয়া তাহার নিকটে গেলাম। এই কয়দিনে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে ব্যস্ত হইয়া তাহার কাগজের সেই মোড়কটি আমার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল:

রেখে দিন তো এটা। আর কাউকে দেবেন না কিন্তু!

বিস্মিত দু'টি চোখে আমি চাহিলাম মহিমের দিকে। বুঝিতে পারিলাম না—যে প্রিয় মোড়কটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সঙ্গ-ছাড়া করিতে রাজি নয়, কেনই বা সে নিজে যাচিয়া আমাকে সেটা দিয়া গেল।

আজকে রেখে দিন, আর একবার এসে নিয়ে যাব মাষ্টারবাবু।

হন-হন করিয়া চলিয়া গেল মহিম। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল না—সে এখন কোথায় ও কি জন্য যাইতেছে।

ইহার পর মহিমকে আর বেতগাছিয়ায় দেখি নাই অনেকদিন। সন্ধানী ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই—সে এখন কোথায় ও কি ভাবে আছে।

উৎকট ইচ্ছা দমন করিতে না পারিয়া একদিন মহিমের কাগজের মোড়কটি খুলিয়া ফেলিলাম। কাঁচা মেয়েলী হাতের অনেকগুলি চিঠি। অনেক জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়া সম্পূর্ণ অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। বেতগাছিয়া গাঁয়ের কোন এক মণিমালা তাহার প্রবাসী স্বামীকে লিখিয়াছে; তরুণী-হিয়ার আবেগ-ভরা রচনা। আমি পত্রগুলির উপর নীরবে চোখ বুলাইয়া নিলাম। বুঝিতে পারিলাম—কেন মহিম এই পত্রগুলি এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আর কেনই বা শেষে যাইবার কালে আমাকে দিয়া গিয়াছে। তাহার হয়ত দৃঢ় বিশ্বাস—আমি তাহার গোপন চিঠিগুলি প্রকাশ করিব না, কিম্বা নষ্ট করিব না। হয়ত ছিল আরও কিছু।...

আমি পত্রগুলি আবার কাগজ দিয়া মুড়িয়া রাখিলাম। অনুতাপ হইল, কেন চিঠিগুলি পড়িয়া একজনের নিকট অলক্ষ্যে অপরাধ করিলাম। না পড়িলেই ত' পারিতাম। কিন্তু মানুষের কৌতূহলী চোখ তাহা মানিয়া নেয় না সব সময়!

দয়াময়ীই আঘা তি মর্ম্মান্তিক ভাবে পাইয়াছিলেন। একটা সুখের সংসার কামনা করিয়া তিনি একমাত্র পুত্র মহিমকে বিবাহ দিয়াছিলেন খুব ঘটা করিয়া; বহু খোঁজা-খুঁজির পর সাক্ষাৎ লক্ষ্মীবৎ মণিমালাকে তিনি দেখিয়া শুনিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু এই মণিমালা অপ্রত্যাশিতভাবে বংশে কালি মাখাইয়া এমন সর্ব্বনাশ যে করিতে পারে, তিনি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেন নাই। সেই নৃশংস আঘাতে তিনি একেবারে নুইয়া পড়িলেন। মণিমালা কুলত্যাগ করিবার পরেই তিনি মারা গেলেন।

মহিম তখন কলিকাতার এক স্কুলে পড়াইত। খবরটা তাহার কাণে গিয়াও যথাসময়ে পৌঁছাইল: ও পাড়ার প্রভাস চৌধুরী মণিমালাকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া বেতগাছিয়া হইতে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহারা যে তখন কোথায় গিয়াছে, গাঁয়ের কেহই বলিতে পারে না। মহিমের দুই কানে কে যেন এক কড়া তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিল।

মায়ের শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি শেষ করিতে মহিমকে শেষে গ্রামে ফিরিতে হইল। কোনক্রমে তাহা চুকিয়াও গেল।

হারাণ খুড়াই তারপর কথাটা প্রথম পাড়িলেন। বলিলেন:

যা হয়েচে, তার জন্ত আর ভেব না বাবাজী। জান তো, শাস্ত্রে বলে—'গতস্য শোচনা নাস্তি'। আবার

ঘর-সংসার পাতো, দেখবে দুদিনেই সব ঠিক হ'য়ে গ্যাছে। কি বল কালীদা ?

হারাণ খুড়া কথাটা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পাশের কালীপদ চক্রবর্ত্তীকে। আর মাথা নাড়িয়া সায় দিল কালীপদ।

খুসী হইয়া হারাণ খুড়া আবার বলিলেন :

তাই তো বলছি বাবাজী, আমাদের কৈলাসদার ছোট মেয়েটীকে তুমি তো দেখেছ অনেকবার। বলো তো, দেখি চেষ্টা-টেষ্টা করে—

গ্রামের এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোভী বৃদ্ধদের কৌতূহলী চাহনির নীচে মহিম একবারও মাথা তুলিয়া চাহিল না কিম্বা চাহিতে চেষ্টাও করিল না। যেমনি দাঁড়াইয়াছিল মাথা নীচু করিয়া, স্থানুর মত তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর হইতে মহিমের পাগলামী আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পরে প্রভাস চৌধুরী মণিমালাকে নিয়া বেতগাছিয়ায় আবার ফিরিয়া আসিল। আগের মণিমালাকে তখন আর চেনা যায় না; খুব রোগা হইয়া গিয়াছে, গায়ের রঙ্‌ও ফ্যাকাসে।

মহিম কিন্তু কোথা হইতে একদিন হঠাৎ আসিয়া অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনার সৃষ্টি করিল। ঘরের চালা হইতে বড় রামদাওখানা নামাইয়া নিয়া ক্রুদ্ধ উন্মত্তের মত উহা মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে চেঁচাইতে লাগিল যে, আগে মণিমালাকে খুন করিয়া তবে সে ফাঁসিতে ঝুলিবে। প্রতিবেশীগণ অনেক কষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করিল।

তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এত ক্ষুদ্র না হইয়াও হইতে পারিত একঘেয়ে—সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের ঘর-কন্নার ছন্দভাঙ্গা অভিনয়। কঠিন বাস্তবতার রূঢ় দৈন্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম; আলো ও বাতাসের জন্য আকুল প্রচেষ্টা! কিন্তু মণিমালাই সমস্ত ভাঙ্গিয়া ওলট-পালট করিয়া দিল। এক দোয়াত কালি আচমকা ঢালিয়া দিল মহিমের জীবনের শাদা পাতায়! তারপর হয়ত আসিয়া একবার চেষ্টাও করে নাই মুছিয়া ফেলিতে কালির দাগ তাহাদের জীবন হইতে; ঝড়ো-হাওয়ায় বিধ্বস্ত তাহাদের নীড়ের সংস্কার করিতে!

হয়ত পারিত; কিন্তু করে নাই

কোথা হইতে আসিয়া একদিন মহিম তাহার চিঠিগুলি ফিরাইয়া নিয়া গেল। গম্ভীর হইয়া বলিল যে, সে এইগুলি পুড়াইয়া ফেলিবে।

বেশ ধীরে ধীরে সে কথাগুলি বলিল। আমি লক্ষ্য করিলাম—আগের মত তাহার আর অত চঞ্চলতা নাই।

মেঘমায়ার গায়ের উপর একখানা হাত রাখিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম :

মায়া—

কিছু বলবে ?

আমি বলিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু পারিলাম না। একটা নিশ্বাস নিয়া কয়েক মিনিট চুপ করিয়া রহিলাম। মেঘমায়া তাহার আঙুলগুলা আমার চুলের ভিতর চালাইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল :

অসুখ করেছে নাকি—মাথা ধরেছে ?

উঁহু—

তবে, অন্ধকারে চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছ কেন ?

মহিমের কথা মনে পড়ে, মায়া ?

মহি পাগলার ?

হাঁ, সে আত্মহত্যা করেছে পুকুরে ডুবে। একটুকরো কাগজে কি লিখে গ্যাছে জান ?—'আমার দুর্ব্বিসহ জীবনের চির সমাপ্তি!'

আমি খুব আস্তে আস্তে বলিলাম। মেঘমায়া একটা টানা নিশ্বাস ছাড়িল। কহিল : ও খুব আঘাত পেয়েছিল।

তারপর সে আর একটি কথাও বলিল না; ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। আমি কান পাতিয়া তাহার বুকের দ্রুত নিশ্বাস পতনের ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। তারপর এক সময় চোখ বুঁজিয়া মনে হইল—মণিমালার মত যদি মায়াও চলিয়া যায়! আমি আর ভাবিতে পারিলাম না। আমার বুকের ভিতর কে যেন সশব্দে হাতুড়ি পিটাইতেছে। মুঠোর মধ্যে মায়ার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রজনীকান্ত সেন

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

বঙ্গের বাণীকুঞ্জ হইতে নিষ্ঠুর শমন অকালে যে সকল "কলকণ্ঠ-কোকিল"কে লোকান্তরে লইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন অন্যতম। যদিও বঙ্গবাসী তাঁহার প্রিয় কবির কণ্ঠনিঃসৃত প্রাণময়ী সুধানিঃস্যন্দিনী সঙ্গীতাবলী শ্রবণ করিয়া আর আনন্দোপভোগ করিতে পারিবে না, তথাপি তাঁহার গীত সঙ্গীতের ঝঙ্কার, যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন "মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে" ভাসিয়া আসিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিবে সন্দেহ নাই। যে সকল বাণীসেবক সাধনাবলে বাণীর প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ অমরত্ব কালের সাধ্য নাই যে বিলুপ্ত করে। আজ আমরা এই সাধক কবির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে সন ১২৭২ সালে ১২ই শ্রাবণ (ইং ২৬শে জুলাই ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ) রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সহদেবপুর গ্রামে বসতি করিতেন, রজনীকান্তের প্রপিতামহ যোগিরাম বিবাহ করিয়া ভাঙ্গাবাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ মুন্সেফ ছিলেন এবং পরে সবজজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত 'পদচিন্তামণিমালা'য় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে লিখিত অনেক সুমধুর বৈষ্ণব কবিতা লিপিবদ্ধ আছে। রজনীকান্তের এক ভগিনী অম্বুজাসুন্দরীও নিজ গ্রামে সুকবি বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রজনীকান্তের জননী মনোমোহিনী দেবী অতি নিষ্ঠাবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন।

পিতা সুগায়ক ছিলেন, সেইজন্য রজনীকান্ত বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত অভ্যাসের সুযোগ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সাধক রামপ্রসাদের অমর সঙ্গীতগুলি সুন্দরভাবে গাহিতে শিখিয়াছিলেন। বার বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পাঠ্য ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালায় সুন্দর অনুবাদ করিতেন।

রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দপ্রসাদ রাজসাহীর অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। ইনি পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রজনীকান্ত ইঁহার নিকট থাকিয়া রাজসাহী বোয়ালিয়া জিলা স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন।

রজনীকান্ত বাল্যকালে অটুট স্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি ব্যায়াম প্রদর্শনীতে প্রথম বা দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিতেন। তিনি 'গ্রন্থ-কীট' ছিলেন না, কিন্তু স্বভাবদত্ত প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির বলে পরীক্ষার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেন। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি একটি কালীস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত শ্লোকে স্বীয় ছাত্র-জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও কোনও গানে সংস্কৃত ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকটিত হইয়াছে।—

"শুনিবে কি আর ?
আর্য্যের সে দেবভাষা নিত্য সুধাসার।
চতুর্ব্বেদ শ্রুতি স্মৃতি, গায় যার যশোগীতি,
কবীন্দ্র বাল্মীকি ব্যাস, সুপুত্র যাহার;
যে ভাষায় রচি মন্ত্র, দর্শন পুরাণ তন্ত্র,
ক'রে গেছে কত নব সত্য আবিষ্কার।
ভারতে জনম ল'য়ে, অশেষ লাঞ্ছনা স'য়ে,
অনাদর অযতনে, কি দশা তাহার!
দেববালা অঙ্গহীন, কি বিষণ্ণ কি মলিন!
হেরিলে পাষাণ প্রাণ কাঁদেনা তোমার ?
অমৃত আস্বাদ ভুলি, ধরেছ বিদেশী বুলি,
বিদেশে চাহিয়া দেখ সম্মান তাহার;
তোমার নিজস্ব ল'য়ে, পরে যায় ধন্য হ'য়ে,
ফিরিয়া না দেখ তুমি, হায় কি বিকার!"

রাজসাহী স্কুল হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজসাহী জিলার মধ্যে ইংরাজী রচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া তিনি প্রমথনাথ বৃত্তি নামক মাসিক পাঁচ টাকার একটি বৃত্তি পাইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি রাজসাহী কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ও জ্যেষ্ঠতাত-বিয়োগ ঘটে। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি পাঠে কখনও মনোযোগী ছিলেন না। তিনি ১৩১৭ সালে ৩১শে আষাঢ়ের রোজনামচায় লিখিয়াছেন "দাবা, হারমোনিয়াম, তাস, ফুটবল এই নিয়ে কাটিয়েছি। যেবার বি-এ পাশ হলাম, সেবার বাটীতে ব'সে কেবল হিন্দু হোষ্টেলেরই ৮০।৮২খানা পোষ্টকার্ড পাই যে এমন আশ্চর্য্য পাশ। * * * আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাশ হয়েছি। আমি কখনই বইএ-মুখে থাকিতাম না, কারণ আমার মেধা ও প্রতিভা ভালই ছিল।"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত সিটি কলেজ হইতেই বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রাজসাহীতে উকীল শ্রেণীভুক্ত হন। কিন্তু ওকালতীতে তাঁহার মন ছিল না। তিনি দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন:—"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লজ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

বাস্তবিক রজনীকান্ত রাজসাহীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন না, তাহা হইলে হয়ত কবিতার পূজা করিয়া, কল্পনার আরাধনা করিয়া, অমরত্বলাভের সুযোগও ঘটিত না। তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবার পরম উৎসাহদাত্রী ছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী দেবী। কলেজে প্রবেশের অল্পকাল পরেই রজনীকান্তের সহিত স্কুলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর তারকনাথ সেন মহাশয়ের উচ্চপ্রাথমিক বৃত্তিধারিণী এই কন্যার বিবাহ হয়।

রাজসাহীতে রজনীকান্ত একটি পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং একই সঙ্গে ওকালতী ও সাহিত্যসেবা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতির প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করেন।

১৩০৪ সালে রাজসাহী হইতে "উৎসাহ" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিন চারি বৎসর উহা চলিয়াছিল। রজনীকান্ত উহাতে কবিতা ও গান প্রকাশিত করিয়া এবং নানা সম্মেলনীতে গান রচনা করিয়া ও গান গাহিয়া রাজসাহীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে গান রচনা করিতে পারিতেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"রাজসাহীর লাইব্রেরীতে একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, "রজনী ভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।" রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, "একঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?" অক্ষয় বলিল, "রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।" রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি ত অবাক্। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্ব্বজন পরিচিত—

"তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা
ঊর্দ্ধে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।"

রজনীকান্তের গানের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার অধিকাংশ গানই অকৃত্রিম আন্তরিকতায় পূর্ণ। ভগবানের প্রতি অসীম নির্ভরতা তাঁহার অধিকাংশ গানেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্রের বিয়োগের পর তাঁহার শোককাতর হৃদয় হইতে যে সঙ্গীতটি স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছিল বলিয়া

মনে হয়, তাহা পাঠ করিলে আমাদের এই মন্তব্য সহজেই বোধগম্য হইবে !—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারই দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারই দুনয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারই ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত, আকুল পথ চাওয়া।
* * * *
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।"

রজনীকান্তের সরল, সুন্দর ও মধুর গান যখন দেশব্যাপী সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, 'গানের রাজা, রবীন্দ্রনাথ' ও যখন রজনীকান্তের গান শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তখনও রজনীকান্তের স্বাভাবিক সঙ্কোচ দূর হয় নাই। তাঁহার একখানি কবিতাপুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করিলে রজনীকান্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "সমাজপতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।" ইহার কারণ এই যে যাহা মেকী ও অসার তাহার উপর বিদ্রূপ ও শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিতে, তাহার উপর কশাঘাত করিতে সুরেশ সমাজপতি কখনও বিরত হইতেন না ; কিন্তু যাহা সারবান, যাহা অকৃত্রিম, যাহা যথার্থ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেও যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন তাহা রজনীকান্ত বোধ হয় জানিতেন না। অক্ষয়কুমার সমাজপতিকে বিশেষভাবে জানিতেন। তিনি একদিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রায় জলধর সেন বাহাদুরের বাসায় সমাজপতিকে আনাইয়া তাঁহার সম্মুখে রজনীকান্তকে স্বরচিত গান গাহিতে বলিলেন। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, রজনীকান্তের মধুর সঙ্গীতে মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ আহারের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তৎপরে সমাজপতি স্বয়ং গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। তাহার পর এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পর যখন রজনীকান্তের গান শ্রোতৃগণ উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিল, তখন রজনীকান্তের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "বাণী" প্রকাশিত হইল। কবির অনুরোধানুসারে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উহা ভূমিকাসহ সম্পাদিত করিয়া দেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ **"কল্যাণী"** প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালার সুধীগণ সমস্বরে রজনীকান্তের গ্রন্থদ্বয়ের উচ্চ সুখ্যাতি করিলেন এবং সাধারণ পাঠকগণ উহার এরূপ সমাদর করিলেন যে গ্রন্থদ্বয়ের সংস্করণের পর সংস্করণ মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইল।

এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার জন্য দেশনায়কগণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, নাট্যকারগণ দেশ-প্রেমোদ্দীপক নাটকাবলী রচনা করিতে লাগিলেন, কবিগণ দেশাত্মবোধমূলক গান রচনা করিতে লাগিলেন। সহজ, সরল, আন্তরিক ও প্রাণময়ী গীত রচনায় রজনীকান্তের প্রতিভা এইবার সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহার সরল ভাষায় রচিত নিম্নলিখিত গানটি পল্লীগ্রামের হাটে মাঠে ঘাটে গীত হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের ঝঙ্কার তুলিল !—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু তাই বেচে, কাচ, সাবান, মোজা
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই,—
পরের জিনিষ কিন্‌বো না,
যদি, মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

এইরূপ সহজ ও সরল সুর তাঁহার আরও অনেক ‘স্বদেশ সঙ্গীতে’ দেখা যায় :—

“তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব, মা’র বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষায় যেয়ে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হ’ক সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান !
মিহি কাপড় পর্‌ব না আর যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পর্‌লে কেমন সাজে—
দ্যাখ্‌ তো পর্‌লে কেমন সাজে !
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি, আজ্‌কে সুপ্রভাত !
ক’সে লাঙ্গল ধর, ভাই রে, ক’সে চালাও তাঁত—
ক’সে চালাও ঘরের তাঁত।”

শৈশব হইতে রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব সাধকগণের গানের সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার গানে যে ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অসীম নির্ভরতা প্রকাশ পাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠতম গীত বোধ হয় তাঁহার এই ভক্তি-গীতিগুলি। উহার যে কোনও স্থল পাঠ করিলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত উন্নত ভাবের উদয় হয় !—

আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ। ইত্যাদি—

অথবা,—

(আমি) অকৃতি অধম ব’লেও তো কিছু
কম করে মোরে দাওনি !
যা’ দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তো কিছু নাওনি ! ইত্যাদি

রজনীকান্ত কেবল জাতীয় সঙ্গীত ও ভক্তি-গীতি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ‘হাসির গান’ রচনাতেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ হাসির গান নিরর্থক হাস্য অবতারণার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। ভণ্ডামী ও কপটাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিয়া সমাজের ক্ষতস্থানে নিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। হাস্যরসের আবরণে তিনি অনেক স্থলেই প্রচুর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন—কমলাকান্তের ন্যায় “হাসির ছলনা করি” কাঁদিয়াছেন।

যখন রজনীকান্ত যশঃ ও গৌরবের শিখরে আরোহণ করিতেছেন ঠিক সেই সময়ে নিয়তি আসিয়া তাঁহার শত্রুতাসাধন করিল। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি দুরারোগ্য গলক্ষত (cancer) রোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার শেষ-জীবনের অসহ্য দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও কোনও চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। অবশেষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইল। অস্ত্র সাহায্যে গলায় নল বসাইয়া তদ্দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তাঁহার যে কণ্ঠ সহস্র সহস্র লোকের মনোরঞ্জন করিত তাহা চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তিনি চিকিৎসালয়ে থাকিয়াও বাণী-সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেলেও তাঁহার লেখনী অচলা হয় নাই। হাসপাতালে থাকিয়া তিনি ‘অমৃত’ ‘আনন্দময়ী’ ও ‘অভয়া’ নামক তিনখানি কাব্য রচনা করিলেন। তাঁহার আরও কতকগুলি কবিতা ‘সদ্ভাবকুসুম’ ও ‘শেষদান’-এ পরে প্রকাশিত হয়। অসহ্য যন্ত্রণার সময়ে তিনি কবিতা রচনার দ্বারা শান্তিলাভ করিতেন। যখন তিনি রোগের অরুন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখনও তিনি অম্লানবদনে, অকম্পিত হস্তে, অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত লিখিয়াছিলেন—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে চুর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছ দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করেছ চুর।
যায়নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
(এই) দেহটা যে আমি, সেই ধারণায় হ’য়ে আছি ভরপুর ;
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করেছ চুর।
ভাবিতাম, আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে
বেদনা দিলে প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব্ব করিতে চুর।”

তাঁহার জীবনের শেষদিনগুলিতে তাঁহার গর্ব্বের ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল এই যে—সমগ্র দেশ তাঁহার জন্য অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাঁহার আরোগ্যের জন্য আকুল প্রার্থনা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং দেশের নেতৃস্থানীয়গণ প্রায় সকলেই তাঁহাকে হাসপাতালে দেখিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালে অনন্তপথযাত্রী রজনীকান্তকে ভীষণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও শান্তভাবে কাব্য সাধনায় রত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং বোলপুরে ফিরিয়া গিয়া লিখিয়াছিলেন—

"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। * * কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে। মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায় তাহা অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশীর ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগ-ক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য! * * ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে কান্তকবি রজনীকান্ত অনন্তলোকে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুদ্গতিতে নগরময় প্রচারিত হইল। শত শত ভক্ত, অনুরাগী ও বান্ধব তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে গেলেন এবং তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গানটি করুণ স্বরে গাহিতে গাহিতে তাঁহার দেহ ভাগীরথী তীরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য লইয়া গেলেন!—

"কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে, তাপিত এ চিত করিব শীতল,
তোমারি করুণা চন্দনে!
কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক স্পন্দনে!
কবে, ভবের সুখ-দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না—
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

জীবন-বীমা কোম্পানীর সুদের আয় বনাম "বোনাস্" বা লভ্যাংশ বণ্টন

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গত তিন বৎসরের পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার জন্য লগ্নী কারবারে সুদের হার দ্রুত কমিয়া আসিয়াছে—ফলে দেশ-বিদেশের বীমা-কোম্পানীর লগ্নী কারবারে অর্জ্জিত নিট সুদের হার যেভাবে কমিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ আশঙ্কাজনক। কারণ অর্জ্জিত সুদের লাভ হইতেই বীমা কোম্পানী 'বোনাস্' দিয়া থাকে—সুদের হার কম হওয়াতে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে হারাহারি ভাবে প্রিমিয়াম বা চাঁদার হার না বৃদ্ধি করিলে ভবিষ্যতে আর 'বোনাস'-এর হার ঠিক রাখা যাইবে না।

সুদের হার

কি পরিমাণে এই অর্জ্জিত সুদের হার কমিয়াছে তাহাই বলিতেছি। আয়-কর বাদ দিয়া গ্রেট ব্রিটেনের বীমা কোম্পানীগুলি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৪১/৪% হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছে; এই হার ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ছিল ৪৩/৪%। এই সময়ের মধ্যেই আমেরিকার বীমা-কোম্পানীর সুদের হার কমিতে দেখা যায়—প্রায় ৩/৪%; আবার কানাডাতে কম হইয়াছে পুরাপুরি ১% যদিও সেখানে বীমা কোম্পানীর লগ্নীপ্রথার মধ্যে স্থাবর-সম্পত্তি ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানের উপর ডিবেঞ্চার-ষ্টকে টাকা দাদন করা অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রকৃত হিসাব এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই) মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সুদের আয় কমিয়াছে কিছু কম ১/২%, অর্থাৎ এখনও অর্জ্জিত নিট সুদের হার রহিয়াছে ৫%,—যদিও গত দশ বৎসরের প্রথম দিকের তুলনায় শেষের দিকে মোটের মাথায় ওই হার ১% কম হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে ১৯৩৩ বা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি গড়পড়তা যে হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা কোনও ক্রমেই তাহাদের লগ্নীকৃত টাকার প্রকৃত উপার্জ্জিত সুদের নিট হার নহে, বস্তুতঃ এই সুদের হার তদপেক্ষা অনেক কম। ১৯২৯ এর পূর্ব্বে উচ্চ হারে অর্জ্জিত সুদের সহিত গড়পড়তায় বর্ত্তমান উচ্চ হার রক্ষা করিয়া চলা হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যদি বর্ত্তমানের নিম্ন হারই থাকিয়া যায়, এমন কি আর যদি কিছু নাও কমে, তত্রাচ নূতন দাদনযোগ্য টাকার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিবে সঙ্গে সঙ্গে বীমা কোম্পানীগুলির সুদের নিট আয়ও ক্রমশঃ আরও কমিয়া যাইবে। একথা শুধু ভারতীয় বীমা কোম্পানী নহে, অন্য দেশীয় কোম্পানীগুলির পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য।

কোম্পানী পরিচালনে সুদের হারের সার্থকতা

এ ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী পরিচালন ব্যাপারে অর্জ্জিত সুদের হার কতটা দরকারী তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। যদি কোনও কোম্পানীর অর্জ্জিত সুদের হার ১/২%তেই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার প্রিমিয়াম বা চাঁদার হার গড়পড়তা ৫১/২% বৃদ্ধি করিলেই ঐ ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইত। অর্থাৎ যদি কোনও অ্যাকচুয়ারী-নির্দ্দিষ্ট বা অন্য কোনও প্রকার 'রিজার্ভ ফাণ্ড'-এর পরিমাণ না কমাইয়া বা 'ভ্যালুয়েশন'-এর পরিমাপ বা নিয়ম কানুনের কঠোরতা হ্রাস না করিয়া 'ভ্যালুয়েশন'-এ পূর্ব্ব ঘোষিত 'বোনাস্'-এর হার বলবৎ রাখার ইচ্ছা থাকে এবং গড়পড়তা ও পরিচালন-ব্যয়ের হার যদি পূর্ব্ববৎ থাকে, অথচ নিট সুদের আয় ১/২% কমিয়া থাকে—সে ক্ষেত্রে এই ক্ষতি মোটামুটি ভাবে পূরণ করিয়া রাখিবার জন্য গড়পড়তা ৫১/২% প্রিমিয়াম বা চাঁদার হার অর্থাৎ বীমা ক্রয়ের মূল্য ৫১/২% বাড়াইলেই চলিত।

পক্ষান্তরে এমন বিপদও আসিতে পারে যে বীমা কোম্পানীর সুদ অর্জ্জনের পরিমাণ অসম্ভব রকম কমিয়া গেল—সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমান প্রিমিয়ামে বীমার দায় মিটান কোম্পানীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য এ কথা সত্য যে বাজারের আর্থিক অবস্থার তারতম্যের সহিত ব্যবসায়ের অবস্থা সমীকরণের জন্য প্রিমিয়াম বা চাঁদার হার বৃদ্ধির মধ্যে দোষের কিছু নাই। কিন্তু

পৃথিবীব্যাপী সকল কোম্পানীই দেখিতেছে যে বর্ত্তমানে 'মৃত্যুহার' ব্যবসায়ের পক্ষে খুবই অনুকূল; ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। এ ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতেও চাঁদা বা প্রিমিয়াম বৃদ্ধির কোনও অজুহাতই আসিতে পারে না। প্রতি বৎসর মৃত্যুহার কমিতে থাকিলেও পরিচালন ব্যয় বেশ আয়ত্তের মধ্যে আসিলেও এই সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় কেবল 'বোনাস' দেওয়ার পক্ষে অন্তরায় ঘটিতে পারে—এই ব্যাপারে বীমা ব্যবসায়ের ইহার অধিক কোনও ক্ষতি হওয়া উচিত নয়।

তবে এ কথা সত্য, কোনও বীমা কোম্পানীর পক্ষে 'বোনাস' না দিতে পারার ফল গুরুতর হয়; কোম্পানীর উপর জনসাধারণের আস্থা কমিবার অবসর বটে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে লাভ সহিত মেয়াদী বীমারই (Endowment Policies with Profit) কদর বেশী এবং সংখ্যাতেও এই প্রণালীর জীবন বীমাই সাধারণে বেশী গ্রহণ করিয়া থাকেন। লাভের আশা আছে বলিয়া "লাভ-সহিত" মেয়াদী বীমার উপর বীমাকরণেচ্ছু জনসাধারণের আকর্ষণ সর্ব্বাধিক। এই প্রকার বীমার প্রাপ্য লাভই হইতেছে 'বোনাস'। 'বোনাস' বা লভ্যাংশ হিসাবে এই বীমার নিয়মিত একটা আয় হয় বলিয়া পাশ্চাত্য দেশে এই প্রকার বীমার অপর নাম দেওয়া হইয়াছে "Income Policies" অর্থাৎ আয়কারী বীমাপত্র। সমগ্র জীবন-বীমার মধ্যে এই প্রকার মেয়াদী বীমার পরিমাণ ৮৫%; অতএব এই ধরণের বীমার কাজ যে 'বোনাস' না দিতে পারিলে রক্ষা করা দায় হইবে একথা বলাই বাহুল্য। অতএব এই প্রণালীর জীবন-বীমার কাজ অব্যাহত রাখিতে হইলে উচ্চ হারে 'বোনাস' ঘোষণা করিবার মত লাভ হওয়া দরকার এবং সে লাভ প্রধানতঃ উচ্চ হারে সুদ অর্জ্জনেই সম্ভব হইতে পারে। কাজেই বর্ত্তমান সুদের হার মন্দার বাজারে ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

"বোনাস্" কি ?

'বোনাস' দিবার মত আর্থিক সচ্ছলতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:—

(১) সুদের আয় সন্তোষজনক হইলে।

(২) মৃত্যুহার নির্দ্ধারিত সংখ্যার কম হইলে।

(৩) বিবিধ উপায়ে লাভ করিতে পারিলে।

এই তিনটির মধ্যে মৃত্যুহার ক্রমশঃই সন্তোষজনকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে এবং জীবনবীমা খুব সতর্কভাবে গ্রহণ করিলে কোম্পানীর বোনাস্ দিবার শক্তি বাড়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এদিক দিয়া হঠাৎ কোম্পানীর আর্থিক সচ্ছলতা বাড়িবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বিবিধ উপায়ে লাভের উপর নির্ভর করা চলে না, কারণ যদিও অনিশ্চিত আর্থিক মন্দার বাজারে এদিক দিয়া লাভের পরিমাণ কিয়দংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু এই উপায়ে গড়পড়তা লাভের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে ক্রমশঃই লোকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতেছে, কাজেই বর্ত্তমানে কোম্পানীর "ভ্যালুয়েশন"এ বা সম্পত্তিসমূহের মূল্য নির্দ্ধারণে যদিও ইহার স্থান রহিয়াছে কালক্রমে ইহার আর বিশেষ কোনও মূল্য থাকিবে না। কাজেই যে 'ভ্যালুয়েশন'এর উদ্বৃত্ত হইতে 'বোনাস' দেওয়া হয়, তৎ-সম্পর্কে ইহা বিশেষ কোনও সাহায্যে আসিবে না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বীমাকারীকে বোনাস্ দিবার ক্ষমতা প্রধানতঃ সুদ অর্জ্জন দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতে থাকিবে। তাহা হইলেই এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীসমূহের বর্ত্তমান দাদন বা লগ্নী প্রথার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যাহাতে বর্ত্তমান অপেক্ষা উচ্চতর হারে সুদ অর্জ্জন করা যায় এমন কোনও উপায় অবলম্বন করা যায় কিনা এবং তাহা সমীচীন কিনা।

বীমা-তহবিলের দাদন

আমরা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের হিসাব হইতে দেখিতে পাই যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী দাদনী টাকার প্রায় ৬৬% কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল, পোর্টট্রাষ্ট ও রেলওয়ে ডিবেঞ্চার, ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট জামানত প্রভৃতিতে আবদ্ধ আছে—এগুলিকেই আমরা সাধারণতঃ Gilt-edge security বা সংক্ষেপে কোম্পানীর কাগজ বলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া বীমাকারিগণের ঋণদানে কোম্পানীর টাকা খাটান হইয়া থাকে। এই প্রকার বীমাপত্রে ঋণদানে যেমন উচ্চহারে সুদ পাওয়া যায়,

তেমনি বীমাকারীর ঋণের পরিমাণ প্রত্যর্পণ মূল্য (Surrender Value) অতিক্রম করে না বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এই প্রকার দাদনে বেশী টাকা খাটাইবার দিকে অনেক কোম্পানীই মন দিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু লাভের দিক দিয়া ইহা প্রশস্ত হইলেও জীবনবীমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহার সার্থকতা নাই। কারণ জীবনবীমার প্রধান উদ্দেশ্য নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনের সংস্থান করা। সেইজন্য জীবন-বীমা ব্যবসায়কে কেহ লগ্নী-কারবার বলে না—ইহা সামাজিক হিতসাধনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান বিশেষ। বীমাপত্রের জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা ঋণ লইয়া নিঃশেষ করিয়া দিলে জীবন-বীমার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। সেই কারণেই বীমাকারীর সাময়িক ও আংশিক সাহায্যের জন্য বীমাপত্রে ঋণ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও ইহার ব্যাপক প্রয়োগ কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

বন্ধকী দাদন

স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে টাকা খাটান অর্থাৎ বন্ধকী দাদনে টাকা আবদ্ধ রাখার প্রথা ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে তেমন সুপ্রচলিত না হইলেও, উচ্চহারে সুদ অর্জ্জনের পক্ষে এই প্রণালীর দাদন যে বিশেষ প্রশস্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় ভারতীয় জীবন-বীমার ক্ষেত্রে বন্ধকী-দাদনের সুযোগ সুবিধা আমরা এখন পর্য্যন্ত সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারি নাই; এ পথ এখনও আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশে যে প্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে জীবন-বীমার কাজ চলিয়া থাকে তাহাতে বীমা-তহবিলের প্রভূত পরিমাণ টাকা এই দিক দিয়া লগ্নী করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। জীবন-বীমা তহবিলের দাদনী টাকা অনায়াসে দীর্ঘ মেয়াদে খাটান যায়; যতদিন পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুদ অর্জ্জিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দাদনী টাকা আদায় করিয়া লইবার কোনও প্রয়োজনই বীমা কোম্পানীর হয় না। জীবন-বীমা কোম্পানীর দাদনের এইটুকু বিশেষ সুবিধা আছে। পৃথিবীব্যাপী সকল বীমা কোম্পানীর অভিজ্ঞতা হইতেই দেখা যায় যে বৎসরের পর বৎসর তাহাদের যে আয় হইতেছে, তাহা তৎকালীন বীমার দায় মিটাইবার ও অন্যান্য খরচপত্র সঙ্কুলান করিবার পক্ষেই যে যথেষ্ট তাহা নহে, সকল প্রকার দায় মিটাইবার পরও বহু টাকা লগ্নী করিবার মত উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ এই ভাবেই বীমা-কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা হইয়া থাকে। দাদনের মেয়াদ ফুরাইলে সে টাকা লইয়া আবার কি ভাবে যে খাটান যায় তাহা লইয়া সর্ব্বদাই পরিচালকগণকে চিন্তান্বিত থাকিতে হয়। সুনির্ব্বাচিত এবং পূর্ণমাত্রায় নিরাপদ উৎকৃষ্ট বন্ধকী দাদনে এই প্রকার নিত্য নূতন লগ্নী সমস্যা উপস্থিত হয় না বলিয়াই জীবন বীমা কোম্পানীর পক্ষে এইরূপ দীর্ঘ-মেয়াদী দাদন অবলম্বনীয়—শুধু সুদের হার বেশী বলিয়া নয়, সুনির্ব্বাচিত বন্ধকী দাদনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জামানত থাকে বলিয়াও নয়, কিন্তু সাধারণতঃ বন্ধকী দাদন দীর্ঘ মেয়াদী হয় বলিয়া এবং নিরাপদ ও লাভজনক দাদনের টাকা সত্বর পরিশোধিত হওয়া জীবন-বীমা কোম্পানীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া এই প্রকার দাদন জীবন-বীমা কোম্পানীর পক্ষে প্রশস্ত।

এই প্রকার দাদনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া বলা হয় যে, বন্ধকী সম্পত্তির বাজার দর নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন এবং ব্যক্তিবিশেষকে অনুগৃহীত করিবার জন্য ইহার সুযোগ লইয়া বিবেকহীন পরিচালক বীমাকারীর স্বার্থহানি করিতে পারেন।

পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে পরিচালক-সঙ্ঘ বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বারা এই প্রকার আশঙ্কাজনক ব্যাপার যাহাতে না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং যদি কখনও কোনও কারণে বন্ধকী দাদনে এই প্রকার ত্রুটির আশঙ্কা থাকিয়াই যায় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ বীমাকারীর বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যদি দাদন নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীর প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

চন্দ্রলোকে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দিনান্তের গোধূলি লগ্নে প্রদোষের প্রায়ান্ধকার ক্রোড়ে সারা-দিবসের কর্মক্লান্ত মানুষটি যখন এসে পৌঁছয়, স্নেহার্দ্র প্রকৃতি তার অবসাদ দূর করবার জন্য যেন বিছিয়ে দেন নিখিল ভুবনের শ্যাম অঙ্গনে তাঁর শান্ত সন্ধ্যার ছায়াঞ্চলখানি।

অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসে, অদূরে শোনা যায় আসন্ন-রজনীর নূপুরধ্বনি; দিগন্ত ছেয়ে নেমে আসে এক প্রশান্ত গম্ভীর বিপুল স্তব্ধতা! মানুষের মনে অকারণ জেগে ওঠে কেমন যেন অহেতুক করুণ কোমলতা; তাকে যেন চারিদিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এক স্বপ্নালস কল্পনার কুহকী মায়া!

সে যেন সেই সুদূর-প্রসারিত-দৃষ্টি নীল-নয়না নীলিমার আয়ত আঁখি-তারার প্রভাব! নিদ্রালু পৃথিবীর সুপ্তি-সুন্দর শিথিল অঙ্গে সে যেন তরুণী জ্যোৎস্নার প্রেম-সুকোমল প্রথম স্পর্শ!

পশ্চিম দিগ্‌লয়ের সীমান্ত-প্রান্তে বিদায়োন্মুখ সূর্যের অস্তরাগ নিঃশেষে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নিভে যায় দীপ্ত দিনের জ্যোতির্ময় দ্যুতি। ঘূর্ণ্যমান ধরণীর গোলকপিণ্ড গড়িয়ে চলে সৌরমণ্ডলের আবর্তপথে তার নিত্য নিয়মিত গতি-বেগে। ভূলোকের অধিবাসীরাও ভেসে চলে সেই সঙ্গে মহাশূন্যের পূর্বাঞ্চলে এগিয়ে। তিমির রাত্রির নিবিড় ঘন অন্ধকার নিবিড়তর হ'য়ে ওঠে ক্রমে! এহেন সময় অকস্মাৎ দেখা দেয় ভুবনের ঘাটে ঘাটে পূব আকাশের তীরে—এক স্নিগ্ধ পেলব মৃদুল আলোক বিভা!

চাঁদ হেসে ওঠে!—প্রাচীন পুরাণে যিনি হিমাংশু-কিরীটী সোমদেব! সপ্তবিংশতি নক্ষত্রবালার বঁধুয়া যে বিধু, পুরাণে কাব্যে জ্যোতিষে জগতে যার জয়গান জন্মাবধি শুনি, অতি শৈশবেই জননী যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন—"আয় চাঁদ আয়! চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা!—"

দিবাধিপতি দিবাকরের পরিত্যক্ত সিংহাসনে এসে দরবার দিয়ে বসেন রজনীনাথ চন্দ্র! সারারাত চলে আকাশ-জুড়ে তাঁর রাজসভা। একে একে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক এসে অলঙ্কৃত করে তাঁর নৈশ-আসর। কিন্তু, সবার জ্যোতিই ম্লান হ'য়ে যায় কৌমুদী-বল্লভ চন্দ্রের রজত-প্রভার কাছে। তাই নক্ষত্র-সন্ধানী জ্যোতির্বিদেরা তাঁকে অনেক সময় পরম শত্রু বলেই মনে করেন। গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতি অগণিত গগনচারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের প্রধান বাধা হ'য়ে ওঠেন জোছনামত্ত যামিনীর পরাণ প্রিয়

পৃথিবী ও চন্দ্র (পৃথিবীর বাইরে দাঁড়িয়ে যদি চাঁদকে দেখবার কখন সুযোগ ঘটে তাহ'লে এই সাদা চোখেই দেখতে পাওয়া যাবে যে চাঁদ গোলাকার নয়—ডিম্বাকার গ্রহ!)

এই আলোক-পুলকিত চন্দ্র! চন্দ্রপ্রভায় তাঁদের আকাশ পর্যবেক্ষণের তেমন অবাধ সুযোগ মেলে না!

প্রকৃতির পরম রহস্যরূপে সৃষ্টির আদিম সন্ধ্যায় আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি, কত কবির ছন্দোবন্দিত, কত প্রণয়ী যুগলের স্বপ্ন-বাঞ্ছিত, কত ভক্ত ভাবুকের হৃদয়স্তুত যিনি, আকাশ সন্ধানী জ্যোতিষ্ক বিজয়ীদের প্রথম দৃষ্টিপাত যাঁর চরণে গিয়ে প্রথম প্রণিপাত ক'রতে বাধ্য হয়, পুরাণে প্রাচীনেরা যাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে

কোপার্ণিকাস্ গিরিচক্র (এর ব্যাসের বিস্তার ৪৬ মাইল। চারপাশের পাহাড়গুলি ১২০০০ ফুট উঁচু। ভিতরের চক্রতল থেকে যে চূড়াগুলি উঠেছে উপরে তার এক একটি ২৪০০০ ফুট উঁচু)

দিয়েছিলেন, সেই বিশ্বের প্রীতিভাজন চন্দ্র—জগতে যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, আর থাকবে তাদের চোখের দৃষ্টি ও মনের মাধুরী, তারা তাঁকে না ভালোবেসে পারবে না।

চন্দ্রলোকের স্বপ্ন ও মায়া আমাদের মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। ঐ যে আশ্চর্য সুন্দর স্নিগ্ধ আলোর অধীশ্বর—যাঁর রজতোজ্জ্বল রূপ শিশুকাল থেকেই আমাদের দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে, নীলাকাশের বুকে এক একদিন দেখি তাঁর সেই পূর্ণ প্রসন্ন মূর্ত্তি! দিনে দিনে তাঁর সেই ক্রমিক পূর্ণতা লাভ

চাঁদের খাল (চন্দ্র পৃষ্ঠের ঐ কোনাচে দীর্ঘ রেখাগুলি কোনো কোনো জ্যোতির্বিদের মতে চন্দ্রলোকের খাল ব'লে খ্যাত)

আমাদের কাছে রহস্যময়! নিত্য তাঁর আকারের সেই সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন, কোনো দিন সন্ধ্যা না হ'তেই তাঁর হাসিমুখ দেখতে পাওয়া—কোনোদিন রাত্রের অন্ধকারে

তাঁর নিঃশব্দ আগমন। কখনো এমন হয়—সারা রাতের অপেক্ষার পর তবে তাঁর উদয় দেখি ; কোনো কোনো রাত্রি

চাঁদের পৃষ্ঠদেশ (ফ্ল্যামেরীয়ন গিরিচক্র দেখা যাচ্ছে। এর ব্যাস ৩৩ মাইল প্রশস্ত !)
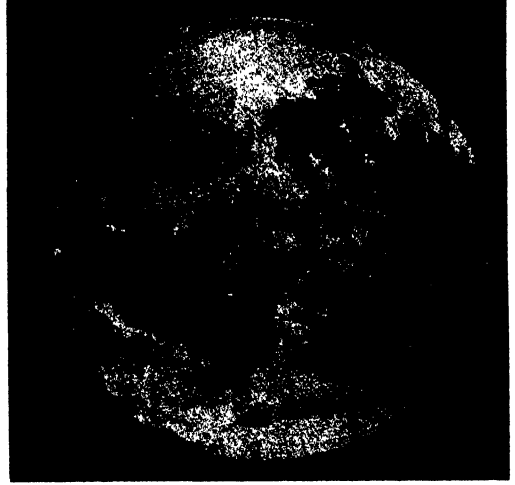
আবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনে হয় এই প্রিয়দর্শনের একান্ত অভাবে ! এমনি ক'রে যিনি আমাদের প্রতিদিনের অবসরক্ষণের সঙ্গী হয়ে আসেন, রাতের পর রাত যাঁকে শিয়রে দীপ নিয়ে জেগে আছেন দেখতে পাই, পূর্ণিমার-মিলন-রাত্রে যিনি আমাদের প্রধান সঙ্গী, আমাদের মধু-মাধবীর উৎসবকে যিনি মধুরতর ক'রে তোলেন, আমাদের নর্মলীলার প্রমোদ বাসরে যাঁর স্মিত মুখখানিই একমাত্র প্রদীপ স্বরূপ দীপ্তি দান করে—তাঁকে আমরা বন্ধুর মত ভালো না বেসে পারি নে।

সূর্য্যকে আমরা গুরুজনের মতো দেখি ; তাঁকে ভয় করি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, পূজা করি—"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম্" বলে করজোড়ে অর্ঘ নিয়ে প্রণামও করি, কিন্তু, গলা জড়িয়ে ধরে 'বন্ধু !' বলে কোনো দিন আদর করবার স্পর্ধা পাই নে ! অথচ চন্দ্রের সঙ্গে আমাদের এমন একটা প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে যে তাঁর কাছে আর আমাদের কোনো লজ্জা - কোনো সঙ্কোচই থাকে না ! আমাদের সদর অন্দরে তাঁর অবাধ গতি ! 'অসূর্য্যম্পশ্যাদেরও' চন্দ্র-সাহচর্যে কোনো বাধা নেই !

পূর্ণচন্দ্র (ষোলো কলায় পূর্ণচন্দ্রের এই সুন্দর চিত্র লিক্ মানমন্দির হইতে দুরবীক্ষণ ছায়াধর যন্ত্রে গৃহীত)

সৌম্য সাগর (গিরিচক্রাভ্যন্তরস্থ এই বিশালপ্রদেশ ধূসর বর্ণের ভাপ্‌রায় ভরা বলে মনে হয়)

এহেন চন্দ্র যে গ্রহ-সন্ধানী ও জ্যোতিষ্ক-বিজয়ী বৈজ্ঞানিকদলেরও প্রধান লক্ষ্য হ'য়ে উঠবে এ আর বিচিত্র কি? দীর্ঘকালের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে তাঁরা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন যে পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রও সৌর জগতের আর একটি গ্রহ এবং পৃথিবী যেমন নিজে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে চলেছে, চন্দ্র নাকি সেইরূপ পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরছে! আর, এই কিন্তু, চাঁদের রূপের কিছুমাত্র পরিবর্তনই ঘটে না! তা' ছাড়া চন্দ্র সম্বন্ধে তাঁদের সবচেয়ে মানহানিকর ও অমর্যাদাসূচক ঘোষণা হ'চ্ছে এই যে, চাঁদের নিজের কিছুমাত্র জ্যোতি বা দীপ্তি নেই!

জ্যোতির্বিদেরা বলেন—চাঁদের যে আলো দেখে আমরা

শিশু শশী (চাণক্যের মতে এ চাঁদের এখনো লালনের বয়স!)

দোটানায় চাঁদ (পৃথ্বী পুত্র চন্দ্র জন্মগ্রহণের পর থেকেই দোটানায় পড়ে ঘুরছেন। একদিকে সৌরপ্রবাহের আকর্ষণ, অপরদিকে জননীর দুর্নিবার আকর্ষণ, ফলে চাঁদের কমনীয় মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ডিমের মত বাদামী! ঘোরার বেগও তাতে কতকটা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চাঁদের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল)
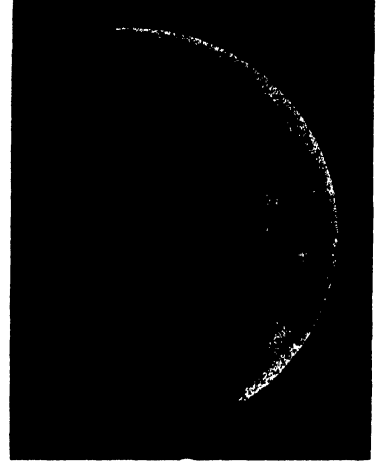
শুক্লা একাদশী (পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রকাশ হ'তে আর বেশী দেরী নেই!)

পাক দিয়ে ঘোরার ফলেই নাকি আমরা চাঁদের আকৃতির নিত্য নিয়মিত নানা পরিবর্তন দেখতে পাই! আসলে মুগ্ধ হই, সে নাকি সবটাই তাঁর সূর্যি মামার কাছে ধার ক'রে পাওয়া! চাঁদের কিরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রে

সূর্যরশ্মির অনুগ্রহ ভিক্ষার উপর! কথাটা চট্ করে বিশ্বাস করতে আমাদের মনে একটু কেমন যেন বাধে!

কৃষ্ণাষ্টমী (চাঁদ ক্রমে ক্ষয় হ'য়ে আসছেন)

এমন সুন্দর যে চাঁদ তার, নিজের কি কোনো সম্পদই নেই! সে একেবারেই নিঃস্ব এক ছদ্মবেশী! পরের ধনে সে পোদ্দারী করে! মিথ্যা চাতুরীর ছলনায় সে এতকাল আমাদের ভুলিয়ে এসেছে! সে কিনা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক!

কিন্তু, গ্রহ-সন্ধানীরা আমাদের এ সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ রাখেন নি। তাঁরা একেবারে বামাল সমেত চোর ধরার মতো চাঁদের ধাপ্পাবাজী ধ'রে ফেলেছেন এবং আমাদের চখের সামনে তাঁর ছদ্মবেশ অনাবৃত ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন! এখন নিঃসংশয়ে এই সত্যই প্রমাণিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, চাঁদের যে আলো সে সূর্যেরই সম্পত্তি। চাঁদ যখন ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর উপর দিকে উঠে আসে এবং সূর্যের ঠিক মুখোমুখি অর্থাৎ সাম্না-সামনি হয়ে পড়ে, সেই সময় চন্দ্র গোলকের যে অর্ধাংশ পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায় সেটুকু সূর্যরশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে!
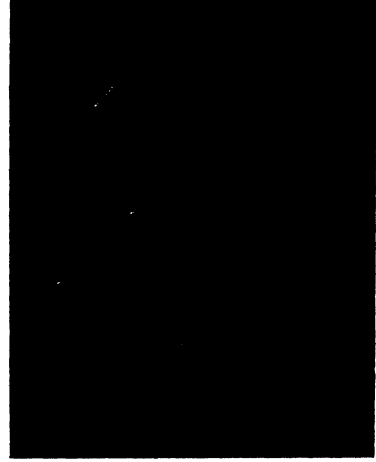
অমাবস্যার দ্বারে (চন্দ্রদেব প্রায় অমাবস্যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন)

গিরিচক্র 'প্লেটো' (দক্ষিণের বৃহৎ গিরিচক্রটির নাম 'প্লেটো'। চাঁদের এই অঞ্চলে আরও অসংখ্য গিরি- চক্র জেগে উঠেছে আবার মিলিয়ে গেছে অথবা স্থান পরিবর্তন করেছে। এ থেকে বোঝা যায় চন্দ্রগর্ভ এখনো সম্পূর্ণ শীতল হয়নি)

সেদিন আমাদের পঞ্জিকাকারেরা 'আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়' অর্থাৎ 'পূর্ণিমা' ব'লে নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। তার পর, যেমন ঘুরতে ঘুরতে দিনের দিন চাঁদের মুখ ক্রমেই পূব দিকে সরতে থাকে, সূর্যের আলোও ক্রমশঃ তার সে দিক থেকে আড়ালে পড়তে থাকে। কাজেই, পৃথিবী থেকে তার সে আঁধার অংশটুকু আর দেখা যায় না; দেখা

জর্জরিত চন্দ্রাবরণ (চাঁদের উদরাভ্যন্তরে একদিন পুঞ্জীভূত উষ্ণ বাষ্প ও তপ্ত ভাপ্‌রা যে প্রলয় কাণ্ড করেছিল চাঁদের সর্ব্বাঙ্গে আজও তার অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান)

যায় কেবলমাত্র সেই অংশটুকু যে টুকুর উপর সূর্যরশ্মির সমুজ্জ্বল স্পর্শ তখনও বজায় থাকে। মাঝে মাঝে আকাশ উজ্জ্বল থাকলে এই অন্ধকার অংশটুকুরও একটা সুস্পষ্ট আবছায়া দেখতে পাওয়া যায়। একেই আমরা চাঁদের ক্রমিক ক্ষয় ও ক্রমিক পূর্ণতা বা 'কলা' বলে উল্লেখ করি। সূর্যরশ্মি চাঁদের উপর থেকে সম্পূর্ণ সরে যেতে পনেরো দিন সময় লাগে এবং ঘুরে এসে আবার সম্পূর্ণ আলোকিত করতেও পনেরো দিন সময় লাগে! যে পনেরো দিনে ক্রমে ক্রমে চাঁদের পশ্চিম অংশ সূর্যের দিকে ফেরে সেই পনেরো দিনকে আমরা শুক্লপক্ষ বলি, আর যে পনেরো দিনে ধীরে ধীরে চাঁদের পূর্বাংশ সূর্যের দিকে ফেরে তাকে বলি কৃষ্ণ পক্ষ। সূর্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যেদিন চাঁদ এসে পড়ে আমরা আর চাঁদের চিহ্নমাত্র সেদিন দেখতে পাই না।
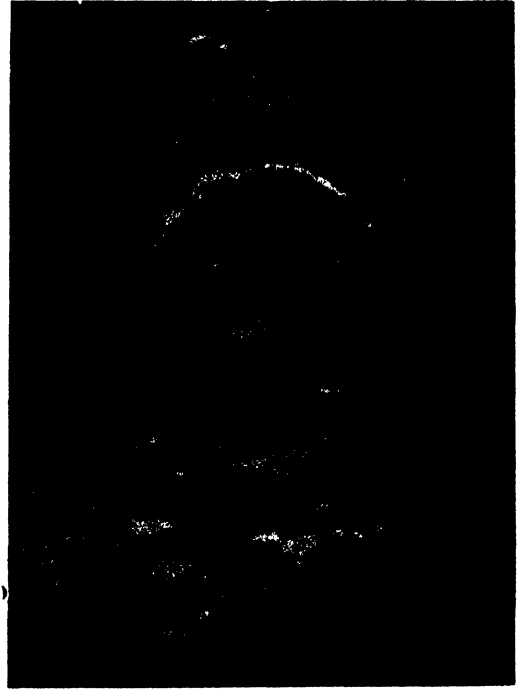
গিরিচক্র 'টাইকো' (চন্দ্রলোকের সুপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত-বেষ্টনী)

পাঁজিতে সে রাত্রির নাম অমাবস্যা। দেখতে না পাওয়ার কারণ এ নয় যে চাঁদ লুপ্ত হয়ে যায়, চাঁদ সশরীরেই বর্তমান থাকেন, কিন্তু এ সময় তাঁর যে পিঠে সূর্যরশ্মি এসে পড়ে সে পিঠ থাকে সূর্যের দিকে, পৃথিবীর দিকে থাকে সূর্য-

রশ্মিহীন বিপরীত দিক। চাঁদের নিজের কণামাত্র দীপ্তি বা জ্যোতি না থাকায় সেই ঘোর অন্ধকার দিকটি সে রাত্রে একেবারেই আমাদের চোখে পড়ে না। অমাবস্যার দু'দিন পরেই পশ্চিম আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ একখানি শাণিত কাস্তের ফলার মতো চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে! মুসলমান সমাজে এই দ্বিতীযার চাঁদ রমজানের মাসে "ঈদের চাঁদ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দ্বিতীয়ার চাঁদের ফলাকে প্রাচীন কবিরা সুন্দরী তরুণীর ললাট ফলকের সঙ্গে তুলনা ক'রে গেছেন!

আমাদের এই পৃথিবীর মতই চন্দ্রও যে আর একটি জগৎ একথা আজ আর নূতন ক'রে কাউকে শোনাবার প্রয়োজন নেই। চন্দ্রই পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। যে সূর্যকিরণে ধরণীর বুকে প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে, সৃষ্টির সমারোহ চলে, সেই রবিরশ্মিই চন্দ্রলোকেও দিনের আলোক সঞ্চারিত করে!

প্রকৃতির কোনো বৈচিত্র্যই নিরর্থক নয়। প্রাকৃত-বিজ্ঞান বিশারদেরা বলেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু থেকে গ্রহ উপগ্রহ পর্যন্ত সব কিছু সৃষ্টিরই একটা উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য আছে। ভগবানের রাজ্যে কোনো কিছুই ব্যর্থ যায় না। সুতরাং চাঁদ দেখে এ প্রশ্ন সহজেই আমাদের মনে আসতে পারে যে এই বিপুল গ্রহের অস্তিত্ব নিখিল সৃষ্টির কি প্রয়োজনে লাগে? পৃথিবীর সঙ্গে যার সুখ দুঃখ এমন ঘনিষ্টভাবে জড়িত সেই চন্দ্রলোকে কি ব্যবস্থা প্রচলিত? সেখানকার বিধি-বিধানই বা কি?

এ সব তথ্য জানতে হ'লে চন্দ্রলোকে অভিযান করা ছাড়া উপায় নেই! কারণ এ পর্যন্ত কোনো কৌতুহলী যাত্রী পৃথিবীর সীমান্ত পার হ'য়ে গিয়ে চন্দ্রলোক পর্যটন ক'রে ফেরেনি। কাজেই চন্দ্রলোকে শুধু ধূ ধূ বিশাল দগ্ধ মরুভূমি অথবা হিমালয়ের চেয়েও বিরাট উচ্চ পর্বতমালা বিরাজমান, কিংবা মেরু প্রদেশের ন্যায় চিরতুষারাচ্ছন্ন বিস্তৃত ভূভাগ পড়ে রয়েছে সেখানে, এর কোনোটাই আমাদের সঠিক জানা নেই। ফলে এসব জানবার আগ্রহ উত্তরোত্তর প্রবল ভাবেই বেড়ে চলেছে।

আমাদের নিজের জগৎ সম্বন্ধে বিশদ অনুসন্ধান ক'রে আমরা জানতে পেরেছি এখানকার মাটি, জলহাওয়া, তরুলতা, পশুপক্ষী, তৃণগুল্ম ইত্যাদি দেশভেদে এত অসংখ্য বিভিন্নরূপ ধারণ ক'রেছে যে তা নির্ণয় ক'রে শেষ করা যায় না। সুতরাং, নিজেদের পৃথিবীলব্ধ এই অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারি যে, চন্দ্রলোকেও সম্ভবতঃ পৃথিবী অপেক্ষা আরও অধিকতর বিভিন্ন রূপের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে। জীবন যাপন ও জীবন ধারণের দিক দিয়ে পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রলোকে কি অধিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে এইটেই গ্রহ-সন্ধানীদের বিশেষ আলোচ্য হওয়া উচিত।

যদিও পৃথিবীর অতি নিকটেই চন্দ্রলোক, তবু পৃথিবীর সঙ্গে এর কিছুই মেলে না! পৃথিবীবাসী কোনো মানুষকে যদি চন্দ্রলোকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তা'হলে সে বেচারী বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে! তার অবস্থা হবে, ঠিক যেন জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েছে! কিন্তু এ বিষয় জোর ক'রে নিশ্চিত কিছু বলা চলে না, কারণ এই সব অনুমান বৈজ্ঞানিকদের অনুমানই রয়ে গেছে, ভৌগলিক সত্য বলে প্রমাণিত হবার সুযোগ ঘটে নি! পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র ২,৩৮,৬১০ মাইল! এ দূরত্ব গ্রহবিহারীদের কাছে কিছুই নয়, মর্ত্য বিহারীদের কাছে অনেকটা হ'লেও তাদের মধ্যে অনেকেই রেলপথে এর বেশী বেড়িয়েছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে এ পর্যন্ত চন্দ্রলোকে কোনো যাত্রীই পৌছতে পারে নি। মর্তবাসীদের পক্ষে যে তা' সম্ভবও হবে না কোনোদিন তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার পথটুকু একেবারেই বায়ুশূন্য! কাজেই 'অক্সিজেন ব্যাগ' বুকে পিঠে বেঁধেও প্রকৃতিজয়ী মানুষের সে পথ পার হবার উপায় নেই! কারণ, বায়ুশূন্য শূন্যমার্গে তার বিমান বা ব্যোমযান সব কিছুরই গতি বন্ধ! সুতরাং চন্দ্রলোকে মানুষের প্রবেশ নিষেধ!

কিন্তু, মানুষের মন চিরদিনই চেয়েছে নিষেধের প্রাচীর লঙ্ঘন করে এগিয়ে যেতে। বাধা চূর্ণ করে চলাই তার স্বভাব। দক্ষিণের দ্বার যেখানেই সে বন্ধ দেখেছে, সেখানেই প্রাণের ভয় না রেখেই সে তা' খুলে দেখতে চেয়েছে! তাই চন্দ্রলোকে পৌছবার আর কোনো পথ নেই দেখে সে দিগ্বিজয়ী দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রলোকে উঁকি মেরে আসবার উপায় আবিষ্কার করেছে! ক্ষিপ্রগতি বৈদ্যুতিক ট্রেনে চন্দ্রলোকে পৌছাতে খুব কম ক'রেও আমাদের বারো

বৎসর লেগে যাবে! কিন্তু, দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে আলোকতরঙ্গের সাহায্যে মাত্র সওয়া একসেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌঁছায়। কারণ, আলোক প্রবাহের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,৭৭২ মাইল!

দূরবীক্ষণ চন্দ্রলোকের যে পরিচয় আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে—চন্দ্রলোকে ঘুরে এসেও কোনো পর্যটনকারী তা জানাতে পারতো কিনা সন্দেহ! তবে একথা সত্য যে চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ঠিক সম্পূর্ণ বলা চলে না! কারণ চাঁদের অর্ধেকমাত্র আমরা দেখতে পাই, অপরার্ধ বরাবরই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে! অর্থাৎ চন্দ্র গোলকের যে অর্ধাংশ পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে আছে, কেবল সেই অংশটুকুই আমরা দূরবীক্ষণে দেখতে পাই! চাঁদ কোনোদিনই ঘুরে গিয়ে তার উল্টোদিকটি অর্থাৎ পশ্চাৎ গোলকার্ধ পৃথিবীর দিকে ফেরায় না! বরাবর ঐ একটি দিকই আমাদের সামনে ধ'রে চারিপাশে ঘোরে। অতএব, চন্দ্র-গোলকের এই অর্ধাংশের মধ্যেই চন্দ্রলোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ!

চাঁদের জন্ম সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদেরা বলেন যে, বহু কোটী বৎসর পূর্বে নাকি চাঁদ ও পৃথিবী একত্রে জড়িত এক বিরাট গ্রহপিণ্ডরূপে শূন্যে ঘূর্ণ্যমান ছিল। পরে তাদের এই প্রবল ঘোরার বেগ প্রসূত কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির সঙ্গে সৌরমণ্ডলের বিপুল চলোর্মি বেগ সম্মিলিত হওয়ার ফলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু দূরে ছিট্‌কে চলে যায় এবং মহাশূন্যের বুকে দুটি বিভিন্ন গ্রহরূপে আবর্তিত হ'তে থাকে! আজও তাদের সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি!

সার জর্জ ডারউইনের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরাও মেনে নিয়েছেন। সৌর-জগতের এই প্রচণ্ড বিপর্যয়ের ঘটনাকাল তাঁরা নির্ণয় করেছেন, মাত্র পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা! অর্থাৎ খৃঃ পূর্ব্ব ৫৬০,০০০০০ অব্দে চন্দ্র প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এইচ পিকেরিং বলেন—পৃথিবীর নাড়ী ছিঁড়ে যেখান থেকে চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেইখানেই সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছিল! একথা মেনে নিতে হ'লে এটাও মানতে আমরা বাধ্য যে তাহ'লে পৃথিবীর খোলটা তখন থেকেই কাঠিন্যলাভ করতে সুরু করেছিল! কিন্তু, অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন এ সম্বন্ধে নাকি যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে! তবে পৃথিবীই যে চন্দ্রের জননী এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত!

জন্মগ্রহণের পর থেকেই চন্দ্র তার মায়ের চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এসময়, কি পৃথিবীতে—কি চন্দ্রলোকে—দিনের আয়ু ছিল মাত্র সাড়ে পাচ ঘণ্টা! চাঁদ ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে তার মায়ের কাছ থেকে আরও দূরে গিয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু মাতৃস্নেহের প্রচণ্ড আকর্ষণ সে এড়াতে পারেনি। পৃথিবীর প্রবল টানে চাঁদের উপর যে বিপুল জোয়ারভাটা খেলেছিল তারি উন্মত্ত তাড়নায় চাঁদের ক্ষেত্র-পৃষ্ঠ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল। প্রকাণ্ড এক বুদ্‌বুদ্ বা কুঁজ তার অঙ্গে উৎপন্ন হ'য়ে চাঁদের ঘোরার বেগে ক্রমেই সেটা পূর্ব্বদিকে ঠেলতে সুরু করেছিল, কিন্তু জননী কিছুতেই সন্তানকে তাঁর চোখের আড়াল হ'তে দেননি! মায়ের সর্ব্বজয়ী আকর্ষণ চাঁদের সে প্রকাণ্ড কুঁজ বা বুদ্‌বুদ্‌টিকেও তাঁর নিজের কোলের দিকেই টেনে রেখেছিল। এই কুঁজ বা বুদ্‌বুদের ভারে চাঁদের ঘোরার প্রতিবেগ মন্থর হ'য়ে পড়েছিল, ফলে দিনের আয়ু বেড়ে গিয়ে ক্রমে বর্ত্তমান চান্দ্রমাসের দিবসকালে পরিণত হ'য়েছিল। চাঁদের বুকে জোয়ার ভাঁটাও থেমে গেছে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনই এর হেতু, তবে এই জোয়ার ভাঁটার ফলে চাঁদের উপর যে চাপ পড়েছিল তাতে চাঁদের যে অংশ পৃথিবীর দিকে দেখা যায় তা ডিম্বের অর্দ্ধাংশের ন্যায় সামনে দিকে ঠেলে এসেছে! কাজেই চন্দ্রগ্রহের আকৃতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমে একটি বিরাট হংস ডিম্বের মতো!

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে 'চন্দ্রলোক' একটা কিছু দেব-নির্বাসিত স্বর্গ প্রদেশের উপনিবেশ নয়। এই পৃথিবীরই আত্মজ এবং নিতান্তই এক পার্থিব ভূমি সেটা। কিন্তু চন্দ্রলোকের ভূমিতল মর্তলোকের মৃত্তিকার মত কঠিন নয়! পৃথিবীতে মাটী আছে, পাথর আছে, তাম্র লৌহ প্রভৃতি ভারি ভারি খনিজ ধাতু আছে, কিন্তু চাঁদের মধ্যে আছে বেশীর ভাগ সাদা চা খড়ির মত কাদা মাটি—যাকে চীনেমাটি বলা যেতে পারে, আর আছে সেই খড়ি মাটিরই জমাট পাহাড়—যা সূর্যের আলোর তাপে ফেটে ফেটে চৌচির হ'য়ে রয়েছে! এরই উপর যখন সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় তখন এর আকৃতি এমন উজ্জ্বল দেখায় যে মনে হয় যেন চাঁদ আগাগোড়া শ্বেত মর্মরে তৈরি!

চন্দ্রলোকে উপস্থিত জলবায়ুর একান্ত অভাব ব'ললেও চলে ! অবশ্য জন্মের পর কিছু দিন পর্যন্ত এর মধ্যে জলও ছিল, বাতাসও ছিল। কিন্তু চাঁদ তাদের ধারণ ক'রে রাখতে পারেনি। পৃথিবীর চেয়ে আকারে অনেক ছোট বলে চাঁদ পৃথিবীর অনেক আগেই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বেঁধে উঠেছিল। খোলাটা আগে শক্ত হয়ে ওঠায়, ভিতরের ভাপরা ও বাষ্প প্রভৃতি নির্গমনের পথ না পেয়ে চন্দ্রগর্ভে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছিল। তাদের প্রসারণ শক্তির প্রবল চাপে চাঁদের খোল একেবারে জর্জারত হ'য়ে উঠেছিল। সেই অবরুদ্ধ ধূম-জ্যোতি সলিল মরুতোদগত বাষ্পরাশির আক্রমণ চন্দ্র পৃষ্ঠে বহু আঘাত-চিহ্ন রেখে গেছে। অসংখ্য পর্বতমালায় চন্দ্রপৃষ্ঠ কণ্টকিত। কালের সর্ববিধ্বংসী করস্পর্শে পর্বত চূড়াগুলি প্রায় ক্ষয় হয়ে এসেছে, বহু গভীর খাদ চারি দিকে বিদ্যমান, নানা স্থানে জমি ধ্বসে পড়ার চিহ্ন বর্তমান, কোথাও কোথাও বা বিস্তৃত ভূখণ্ড ঢিবির মত উঁচু হ'য়ে উঠেছে।

পৃথিবীর ভূসংস্থানের তুলনায় চন্দ্রলোকের ভূসংস্থানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এখানে যেমন পর্বতমালা দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছে, চন্দ্রলোকের গিরিরাজি কিন্তু চক্রাকারে অবস্থিত! এই গিরিচক্র কোথাও সাগর-তুল্য বিশাল ভূমি বেষ্টন ক'রে আছে, কোথাও বা এত ক্ষুদ্র ভূমি ঘিরে আছে এই গিরি-চক্র যে তার অভ্যন্তর ভাগ এক ভীষণ আগ্নেয় গিরি গহ্বরের ন্যায় দেখায়। এর কারণ নির্দেশ ক'রতে গিয়ে জানা গেছে যে পূর্বোক্ত সেই বাষ্প ও ভাপ্‌রা যেখানে যতটা পুঞ্জিভূত হ'য়ে নির্গমনের চেষ্টায় উপর দিকে ঠেলে উঠেছে সেখানেই ছোট বড় নানা আকারের অতিকায় সব বুদ্‌বুদ সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে সেখানটা বিদীর্ণ ক'রে তারা বিস্ফুরিত হয়ে গেছে। পশ্চাতে রেখে গেছে সেই অসংখ্য গিরিচক্র—চন্দ্রলোকের বৈশিষ্ট্য ব'লে যা খ্যাত হয়ে পড়েছে।

চন্দ্রলোকের এই অসংখ্য গিরি-চক্রের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে 'টাইকো পাহাড়'। পূর্ণিমার দিনে চাঁদের মধ্যে এটাকে খুব উজ্জ্বল দেখায়! আমরা একে বলি চাঁদের কলঙ্ক! এখান থেকে দেখা যায়—অসংখ্য সাদা সাদা সুদীর্ঘ বর্ম্ম্য চলেছে চাঁদের চারিদিকে এঁকে বেঁকে! এরা হচ্ছে সে যুগের চাঁদের পিঠের বড় বড় ফাটল, যেখান দিয়ে পরে সেই বিস্ফুরিত বুদ্‌বুদের গলিত জ্যোতির্ময় চন্দ্রস্রাব প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং চাঁদের সমস্ত ফাটল রন্ধ্র ও ছিদ্র বুজিয়ে চাঁদের খোলটিকে নীরেট ও কঠিন করে তুলেছিল। 'টাইকো' পাহাড়ের যে চক্র তার ব্যাসের পরিমাপ প্রায় ৫২ মাইল ও ১৪৩৫৮ গজ! এই গিরি-চক্রের উচ্চতা প্রায় ৩ মাইল ও ৫৫২·৭ গজ। 'ক্লেভিয়াস্' গিরিচক্রের বেষ্টনী ১৩০২ মাইল প্রশস্ত এবং উচ্চতা ৪ মাইল ও ৬১৫৪ গজ। চাঁদের গায়ে এমন আরও বিংশাধিক গিরিচক্র গুণে পাওয়া যায় যার ব্যাসের পরিমাপ ষাট মাইলেরও বেশী! উচ্চতায় এরা পৃথিবীর 'মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক' পাহাড়কেও ছাড়িয়ে যায়! 'লায়েব্‌নিট্‌জ্' গিরিচক্র পাঁচ মাইল ও ২২১ গজ উঁচু। 'রকি' গিরিচক্র প্রায় পাঁচ মাইল উঁচু। 'নিউটন' গিরিচক্র ৪ মাইল ও ৮৮৮.৮১ গজ উঁচু। 'ক্ল্যামেরীয়ন' গিরিচক্রের ব্যাস ৩৩ মাইল বিস্তৃত; এই সব গিরিচক্রের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে চক্রের বহির্দিকের ভূমির তুলনায় ভিতর দিকের ভূমি অপেক্ষাকৃত অনেক নীচু! এর কারণ সহজেই অনুমেয়। যেহেতু ভিতরের মৃত্তিকাই বিদীর্ণ করে চাঁদের অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত বাষ্প ও ভাপ্‌রার পুঞ্জ বিস্ফুরিত হয়েছিল এবং চারিপাশে এই গিরিচক্র সৃষ্টি ক'রেছিল, সেইজন্য ভিতরের দিকের মাটি খাল হ'য়ে যাওয়াতে বাহিরের সমতল ক্ষেত্র হ'তে অনেক নীচু হয়ে পড়েছিল।

প্যারিসের মানমন্দির থেকে চন্দ্রলোকের যে চমৎকার পর্যবেক্ষণ চিত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ঐসব অতিকায় বাষ্প বুদ্‌বুদ্ বিস্ফুরণের ফলে সেখানে একদা যে মহাপ্রলয় ঘটেছিল, তাতে বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপী গাঢ় ঘন কর্দম স্রোত প্রবাহিত হ'য়ে চন্দ্রলোকের নিম্নভূমিতে বিপুল ঢল নামিয়েছিল এবং অসংখ্য গিরিচক্রের গহ্বর পরিপূর্ণ করে তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছিল!

পাঁচকোটী ষাটলক্ষ বৎসর চলে গেছে, চাঁদ কোন্ সে বিস্মৃত অতীত যুগে শীতলতা লাভ করেছে, কিন্তু তবু এখনো মাঝে মাঝে চন্দ্রলোকের কোনো কোনো ক্ষুদ্র গিরিচক্রের ভিতর থেকে বাষ্পোদ্গম হ'চ্ছে দেখা যায়। চন্দ্রলোকের যে অংশ আমরা দেখতে পাই তার দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে একটি চক্রাকার বিশাল খাদ চোখে পড়ে, এর বর্ণ ধূসর দেখায়। জ্যোতির্বিদেরা এর নামকরণ

করেছেন 'সৌম্য-সাগর' (The sea of serenity) এই প্রদেশেই দূরে দূরে আরও ছুটি গিরিচক্র আছে—'পোশিদোনিয়স্' ও 'ক্যাকেট', এদেরও ভিতরটা মাঝে মাঝে বাষ্পপূর্ণ হয়ে ওঠে! মনে হয় যেন সাদা ভাপ্‌রায় ভরে গেছে এই গিরিচক্রের অভ্যন্তর!

সম্ভবতঃ চন্দ্রলোকের সুদীর্ঘ শীতল রাত্রে অর্থাৎ যে চৌদ্দ পনেরো দিন চাঁদের একটা অংশ সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত থাকে সেই সময় চন্দ্রলোকের সেই প্রদেশের আবহাওয়ার তাপমান অত্যন্ত নেমে পড়ে এবং কুয়াসা ও তুষার বাষ্প সেখানে জমে উঠ্‌তে সুরু করে, কাজেই গিরিচক্রের অভ্যন্তরপ্রদেশ ধূসর বর্ণ দেখায় এবং সাদা ভাপ্‌রায় ভরে উঠেছে মনে হয়! আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সব বাষ্প উবে যায়, বরফ গলে যায় এবং গিরিচক্রের মধ্যভাগ পুনরায় চোখে পড়ে!

যদিও চন্দ্রলোকে বৎসরে মাত্র ৩৫৪ ঘণ্টা দিনের আলো বা সূর্য কিরণ পাওয়া যায়, তবু চাঁদ তেতে ওঠে পৃথিবীর দ্বিগুণ! ১০০ থেকে ২০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ চান্দ্রদিনের প্রাত্যহিক ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহাশূন্যে ঘূর্ণ্যমান এই রজতশুভ্র গ্রহপিণ্ডটি দিনে অসহ্য গরম ও রাত্রে দারুণ শীত নিয়ে মনুষ্যবাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে! তবে এ অনুমান সম্ভবতঃ সত্য যে পৃথিবী যখন তরল অগ্নিপিণ্ড মাত্র এবং মনুষ্যবাসের একেবারেই অযোগ্য ছিল, চন্দ্রলোকের আবহাওয়া তখন জীব নিবাসের অনুকূল হ'য়ে উঠেছিল! কত কোটী কোটী প্রাণী হয়ত সে যুগে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর চাঁদে বাস ক'রেছে, তারপর চাঁদের আবহাওয়া বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিলুপ্ত হয়েছে! এখনো একথা ঠিক জোর করে বলা যায় না যে চন্দ্রলোক একেবারে প্রাণীশূন্য! কে জানে, হয়ত এর মধ্যে স্থানে স্থানে এখনো এমন লোকের বসতি আছে যারা চন্দ্রলোকের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকবার উপযোগী!

বিশ্ব-সমালোচক

কপিঞ্জল

ইচ্ছা করে আগুন জ্বেলে জ্বালিয়ে দিই সাহিত্যকে।
লজ্জা করে যুগের যুগের কীর্তিমানের কীর্তি দেখে।
রামায়ণে কেবল ত পাই—
বানর এবং রাক্ষসই ভাই
ভ্রাতৃদ্রোহের মহাভারত বিফল জিনিষ কাজ কি রেখে।

২

ফাটকেতে আটক রাখ মস্ত নাটক শকুন্তলা,
তপোবনের অপমান আর প্রকাশ করে কাজ্ কি বলা।
মেঘদূত ও যে কালোর কালো—
যমদূত ও যে অনেক ভালো
মেদুর তোমার গীতগোবিন্দে দাওগে মাটী মাদুর ঢেকে।

৩

সেক্ষপীরের নাটক কেবল দুর্নীতি আর পাগলামি ত
ডাঁড়ামি আর খুন-খারাবির পক্ষপাতী নই আমি ত।
মিলবিহীন হায় ও মিল্‌টনে,
সয়তানেরে জাগায় মনে
বন্ধ কর তাহার পুঁথি, অন্ধ আবার কাব্য লেখে!

৪

সিরাজী আর সাকী নিয়েই হাফেজ শুধু খেলেন খাবি
এ সব লিখে কেমন করে নাম করে যে তাহাই ভাবি।
হুউগো লেখে দাগীর কথা,
নায়ক তেমন আপ্‌নি যথা,
শেলী লেখে নোংরা বড়, সিনান করো তৈল মেখে।

৫

নারীহরণ নিয়ে কেবল হোমর লেখেন গাঁজাখুরি
গেটে দর গিঁটের চেয়ে গেছে তাহার জারিজুরি।
থাকবো এবং আমিই আছি
সাহিত্যের এই কাণামাছি,
গরল আমি তুলতে পারি অমৃতেরও কুণ্ড থেকে।

বাংলা বানানের নিয়ম

শ্রীগোবর্দ্ধনদাস শাস্ত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রচারিত "বাংলা বানানের নিয়ম" নামক পুস্তিকায় "রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব" নামক অনুচ্ছেদে লেখা হইয়াছে—

"যদি শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে, যথা—'কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক'; অন্যত্র দ্বিত্ব হইবে না,—যথা 'অর্চনা, মূর্চ্ছা অর্জুন, কর্তা, কর্দম, অর্ধ, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্য, সর্ব'।"

"শেষোক্তস্থলে রেফের পর দ্বিত্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বিকল্পে সিদ্ধ, না লিখিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়। হিন্দি মারাঠি আদি ভাষায় এই দ্বিত্ব হয় না।"

এখানে আমার বক্তব্য এই যে—"অর্চনা, মূর্চ্ছা, অর্জুন, কর্তা "আদি শব্দে রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব যেমন বিকল্পে সিদ্ধ, তেমনি "কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক" আদি শব্দেও তা বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন। প্রভেদের মধ্যে এই যে "অর্চনা, মূর্চ্ছা, অর্জুন, কর্তা" আদি শব্দে পাণিনির "অচোরহাভ্যাংদ্বে" (৮।৪।৪৬) এই সূত্র অনুসারে রেফের পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে বিধান করা হয়েছে; "কার্ত্তিক, বার্ত্তিক, বার্ত্তা" আদি শব্দে "ঝরো ঝরি সবর্ণে" (৮।৪।৬৫) এই সূত্র অনুসারে রেফের পরবর্তী বর্ণ-দ্বয়ের মধ্যে প্রথমটার বিকল্পে লোপ করা হয়েছে। প্রথমটায় দ্বিত্ব ছিলো না, সেখানে তা বিকল্পে বিধান করা হয়েছে; দ্বিতীয়টায় মূলভূত 'কৃত্তিকা' আদি শব্দে যা দ্বিত্ব ছিলো তার একটার বিকল্পে লোপ করা হয়েছে। ফল দুটিরও সমান। ইচ্ছা করলে উভয়ত্র রেফের পর দ্বিত্ব না দিয়ে লেখা চলে। পাণিনির ব্যাকরণ এ কথাই বলে। তবু 'বাংলা বানান সংস্কার-সমিতির সদস্যগণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির দোহাই দিয়ে এই দুটির মধ্যে জাতি বৈষম্য সৃষ্টি করে ভাষাকে অধিকতর দুরূহ করবার চেষ্টা করেছেন কেন তাই ভেবে পাচ্ছি না। সমিতির সদস্যগণের মধ্যে অনেকেরই শব্দশাস্ত্র বিষয়ে দেশ-জোড়া নাম আছে। ব্যাকরণের এই স্থূল কথাগুলি তাঁদের অজ্ঞাত থাকা কখনো সম্ভবপর নয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

সমিতির সদস্যগণ হিন্দি, মারাঠি আদি ভাষার বানানের দিকে আরও একটু মনোযোগ দিলে দেখতেন:—সে সকল ভাষায় "অর্চনা, মূর্চ্ছা, অর্জুন, কর্তা"আদিশব্দের মতোই 'কার্তিক, বার্তা, বার্তিক"আদি শব্দেও সাধারণতঃ দ্বিত্ব লেখা হয় না। আরও দেখতেন —যদি কেউ ইচ্ছা করে এ সব স্থলে দ্বিত্ব লেখে তাহলেও তা ভুল বা অশুদ্ধ বলে গণ্য হয় না। কারণ, সে সকল ভাষায় ইচ্ছানুসারে দ্বিত্ব লেখবার বা না লেখবার স্বাতন্ত্র্য সবারই রয়েছে। শুধু এই নয়, "সন্ন্যাস পুত্র, গায়ত্রী, মহত্ব, উজ্জ্বল, বিদ্বত্ব" আদি শব্দে য-ফলা, র-ফলা ও ব-ফলার পূর্বেও সে সমস্ত ভাষায় সাধারণতঃ দ্বিত্ব লেখা হয় না—যদিও এ সকল স্থানে দ্বিত্ব লেখাই শাস্ত্রীয়-বিধি। এই জন্য কেউ তাঁদের দোষ দেয় না; কোনো কাজও এতে তাঁদের আটকায় না। কারণ, অল্পের জন্য ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে আটক রেখে দুরূহ করতে তাঁরা রাজি নন। জানি, হিন্দি মারাঠি আদি ভাষাভাষীদের মতো এ বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণকে একেবারে অবহেলা করে চলতে বাঙ্গালীরা পারবেন না—অন্ততঃ এখন তাঁরা এর জন্য প্রস্তুত নন। কাজেই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে হিন্দি, মারাঠি আদি ভাষার নজির এখন সম্পূর্ণভাবে খাটবে না। তবু এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে—"বাঙ্গালা ভাষায় কোনো খানেই রেফের পর দ্বিত্ব লেখা হবে না" এরূপ একটা সরল নিয়ম অনায়াসেই প্রবর্তন করা যায়। এতে নবশিক্ষার্থী বালকগণের পক্ষে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি অন্যদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মও সুরক্ষিত থাকবে। বাঙ্গালা বানান সংস্কার সমিতির সদস্যগণ এদিকে একটু চেষ্টা করে দেখবেন কি?

* * * *

বিসর্গ, হস্-চিহ্ন, ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা আদির ব্যবহারসম্বন্ধেও সমিতির সদস্যগণ কোনো সুনির্ধারিত সহজ পন্থা অবলম্বন করেন নি। এ বিষয়ে তাঁরা যা করেছেন তা কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না। এমনিতেই শেষ অ কারের উচ্চারণ নিয়ে বাঙ্গালা ভাষায় অল্প সন্দেহের সৃষ্টি হয় নি। এ বিষয়ে একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম কোথাও পালন করা হয় না। সর্বত্র ব্যতিক্রম নিয়েই কাজ চালাতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ "রাম, শ্যাম, যাচক পাচক, মোহন, শোভন, সুন্দর, কুৎসিত, করেন, করিস, করুক, করুন, করিবার" ইত্যাদি শব্দের শেষ অ-কার উচ্চারিত হয় না—তা প্রসুপ্ত থাকে। কিন্তু "ছোট, বড় কোন, কখন, যত, তত, এত, কত, এমনতর, কেমনতর সেজ, মেজ, কর, করিব করিল, করিত, করিয়াছ, করিতেছ, করিয়াছিল, করিতেছিল" ইত্যাদি বহু বহু শব্দে তা উচ্চারণ না করলে কোনো মতেই চলবে না। অনেক স্থানে আবার অর্থভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ কর‌তে হয়, যেমন—"বল, ভাল, কাল, মত, করান" ইত্যাদি। এরূপ ব্যতিক্রম শব্দের সংখ্যাও বাঙ্গালা ভাষায় অল্প নয়। সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে এটা যে কতো বড়ো অসুবিধাজনক তা সমিতির সদস্যগণ একটুও ভেবে দেখেন নি। বরং তাঁরা এই অসুবিধাকে আরও বহুগুণ বাড়াবার ব্যবস্থাই করেছেন। এ কথা দু-একটি উদাহরণেই প্রকাশ পাবে।

পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় "অন্ততঃ বিশেষতঃ, ইতস্ততঃ, সাধারণতঃ, প্রায়শঃ, ক্রমশঃ, পুনঃপুনঃ" ইত্যাদি শব্দে বিসর্গ লেখা হতো বলে উচ্চারণে সন্দেহের কোনো কারণ ছিলো না। এখন কিন্তু সমিতির সদস্যগণ এ সকল শব্দ থেকে বিসর্গ উঠিয়ে দিতে মত দিয়েছেন। এঁদের মতে চললে ছেলেরা ধরতেই পারবে না যে—এ সকল শব্দ হসন্ত উচ্চারণ

করতে হবে, না স্বরান্ত। সমিতি এ বিষয়ে "আয়ু, চক্ষু, মন, দুর্বাসা' আদি শব্দের যে নজির দেখিয়েছেন তা একেবারে অচল, এ কথা একটু পরেই প্রমাণিত হবে।

এমনি বাঙ্গালা ভাষায় হ এবং যুক্ত বর্ণ সাধারণতঃ স্বরান্তই উচ্চারিত হয়ে থাকে, যথা—'দহ, দাহ, দেহ মেহ, অহরহ, প্রত্যহ, রক্ত, শক্ত, ব্যস্ত, গ্রন্থ, কাণ্ড, ভাণ্ড, খণ্ড, গণ্ড" ইত্যাদি। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ এবং যুক্ত বর্ণের পর হস্‌চিহ্ন দেওয়া হয়; যথা—"শাহ্‌, তখ্‌ত্‌, জেম্‌স্‌, বণ্ড্‌" ইত্যাদি। সর্বত্র এই নিয়ম থাকলে সন্দেহের কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু সমিতির সদস্যগণ তা রাখেন নি। তাঁরা সুপ্রচলিতত্বের দোহাই দিয়ে "আর্ট কর্ক, গভর্ণমেন্ট, স্পঞ্জ" ইত্যাদি শব্দে হস্‌চিহ্ন দিতে নিষেধ করেছেন। এতে এ বিষয়েও নূতন করটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে উচ্চারণকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্দেহ-সঙ্কুল করে তোলা হয়েছে। এদিকে তাঁরা অনেক কথাই বলেছেন; যেমন—'বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণ-সূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

" বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া যথাসম্ভব সরলতা সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।" 'ভবিষ্যতে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের যদি সুবিধা হয় তবেই নিয়ম গঠন সার্থক হইবে"। সর্বত্র একই নিয়ম গ্রহণীয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলি কাজের বেলায় অনায়াসেই সুরক্ষিত হতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি।

* * * *

বানানের দিক্ দিয়ে ভাষা দুরূহ হয়ে ওঠে সাধারণতঃ দুটি কারণে—

১। একই উচ্চারণের অর্থভেদে নানা প্রকারের বানান; যথা—'বিনা—বীণা, সুর—শূর কৃত—ক্রীত, বৈ—বই, শণ—সন, বিশ—বিষ, শাল—সাল" ইত্যাদি।

২। (ক) একই বানানের অর্থভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ; যথা— বল, ভাল, কাল, মত, করান" ইত্যাদি—

(খ) একই বর্ণের শব্দভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ; যথা—"মোট—ছোট, গরিব—করিব" ইত্যাদি।

এই দুটিই বাঙ্গালা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাতেই নেই। ইংরেজিতে আছে বটে। কিন্তু একই বানানের অর্থভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ তাতেও দেখি নি। এই দুটির জন্য বড়ো বড়ো পণ্ডিতগণেরও অনেক সময়ে বিপদে পড়তে হয়। নবশিক্ষার্থী সুকুমার-মতি বালকগণের তো কোনো কথাই নেই। এর প্রথমটার সৃষ্টি হয়েছে বাঙ্গালা বর্ণমালার বহু বহু বর্ণের উচ্চারণগত তারতম্যের অভাবে। এটা থেকে অব্যাহতি পাবার কোনো সর্ববাদিসম্মত সুচিন্তিত উপায় এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। অদূর ভবিষ্যতে হবে কি না তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। নবীনেরা বলেন:—যে সকল বর্ণের উচ্চারণে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই সেগুলির মধ্যে একটি মাত্র রেখে অবশিষ্ট-গুলি বাদ দিতে পারলে এই বিপদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে ইত্যাদি।" অন্য দিকে প্রবীণেরা মত প্রকাশ করেন:—প্রত্যেকটি বর্ণের পরস্পর তারতম্যযুক্ত একটা পাণিনি সম্মত উচ্চারণ পদ্ধতি দেশের সর্বত্র প্রচার করতে পারলে সমস্ত বিপদই ঘুচবে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, উপায় দুটির একটাও কার্যকরী হবে বলে আজ পর্যন্ত বিবেচিত হয় নি। কাজেই যতো দিন পর্যন্ত কোনো একটা কার্যকরী পন্থা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় না ততো দিন পর্যন্ত এই প্রথম অসুবিধাটা নীরবে সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

আর রইলো দ্বিতীয়টির কথা। ইচ্ছা করলে এই দ্বিতীয় অসুবিধাটা সহজেই দূর করা যায়। আমি বলি:—"হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য কোনো খানেই শেষের অ-কার উচ্চারিত হবে না" এরূপ একটা সরল সহজ নিয়ম প্রবর্তন করতে পারলে অনায়াসেই এই বিপদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এরূপ করলে "দহ, দাহ, দেহ, মেহ, প্রত্যহ, অহরহ, রক্ত শক্ত, ব্যস্ত, গ্রন্থ, কাণ্ড ভাণ্ড, খণ্ড, গণ্ড" আদি শব্দে নিঃসন্দিগ্ধভাবে শেষ অ-কার উচ্চারিত হবে এবং "রাম, শ্যাম যাচক, পাচক, মোহন, শোভন, সুন্দর, কুৎসিত, বল (শক্তি), ভাল (ললাট), কোন, কথন (প্রশ্নে), কাল (সময়, কল্য), মত (অভিপ্রায়), করেন, করিস, করুক, করুন, করিবার, করান (বর্তমান সামান্য, বর্তমান অনুজ্ঞা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ," ইত্যাদি শব্দে তা উচ্চারিত হবে না।

যে সকল শব্দে হ এবং যুক্তবর্ণে শেষ অকারের উচ্চারণ বাঞ্ছনীয় নয় সে সকল শব্দে—তা প্রচলিতই হোক কিংবা অপ্রচলিতই হোক, সর্বত্র হস্‌চিহ্ন দিয়ে লেখবার ব্যবস্থা থাকবে; যেমন— শাহ্, আর্ট্, কর্ক, স্পঞ্জ্, তখ্‌ত্‌, বণ্ড্, গভর্ণমেন্ট্" ইত্যাদি। এমনি হ ও যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য যে সমস্ত স্থানে শেষের অ-কার উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, সে সমস্ত স্থানে ও-কার দিয়ে লেখা হবে; যথা—ছোটো, বড়ো কোনো, কখনো, যতো, ততো, কতো, এতো, মতো (সদৃশ), কালো (কৃষ্ণবর্ণ), ভালো (উত্তম), সেজো, মেজো, কেমনতরো, এমনতরো, বলো (বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা), করো, করিবো, করিলো, করিতো, করিয়াছো, করিতেছো, করিয়াছিলো, করিতেছিলো, করানো (Past Participle & Verbal noun)" ইত্যাদি।

এখনো অনেকে এরূপ ও-কার দিয়ে লিখে থাকেন। কাজেই এটা প্রচার করা বেশি আয়াসসাধ্য হবে না। তবে এরূপ ও-কার লিখলে কোনো কোনোখানে উচ্চারণে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকতেও পারে। কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কোনো জীবিত ভাষাতেই ততো সূক্ষ্ম-ভাবে বিবেচনা করলে চলবে না। তাই যদি করতে হয় তবে ও-কারের পরিবর্তে ঊর্ধ্ব কমা দিয়েও শেষ অ-কারের উচ্চারণ ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু এই ঊর্ধ্ব-কমাটা এদেশের ভাষার সঙ্গে বেশি খাপ খাবে না। এটা "বাই-ল" ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের জন্য রাখাই ভালো। এরূপ ইংরেজি শব্দে ও-কার লেখা যায় না। তার কারণ, "বাইব, বাইও" ইত্যাদির শেষে অ-কার এবং "বাই-ল" ইত্যাদির শেষ অ-কারের উচ্চারণে অনেক প্রভেদ। "বাই-ল" ইত্যাদিরূপে ঊর্ধ্ব-কমা দিয়ে লিখলে এই প্রভেদটুকু রক্ষা পাবে। ইংরেজি শব্দে এটা ততো বেমানান দেখাবে বলেও মনে হয় না।

"সন্ত, বক্ষ" আদি শব্দের শেষে যুক্তাক্ষর থাকায় বিসর্গ না দিলেও

উচ্চারণে কিছু আটকাবে না। "মন, বশ" ইত্যাদির শেষ অ-কার উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; কাজেই বিসর্গের কোনো আবশ্যকতা নেই। কিন্তু "অন্ততঃ বিশেষতঃ, সাধারণতঃ, ইতস্ততঃ, ক্রমশঃ, প্রায়শঃ, পুনঃপুনঃ" ইত্যাদি শব্দে বিসর্গ লেখাই উচিত। অন্যথায় হসন্ত উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে। "আয়ু, চক্ষু, বিশ্রবা" আদি শব্দ অ-কারান্ত নয় বলে হসন্ত উচ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কাজেই এরূপ শব্দে বিসর্গ দেবার কোনো সার্থকতা থাকে না। একারণেই, বিসর্গ উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে সমিতি নজির দেখিয়েছেন তা একেবারে অচল বলেছিলাম।

আর রইলো "প্রিয় গাঢ়, ঘন, গলিত, ভ্রষ্টতর অধিকতর, হৈম, শৈল" আদি শব্দের কথা। এরূপ শব্দে শেষের অ-কার উচ্চারিত হয়। কিন্তু ও-কার লেখবার উপায় নেই। তবে এরূপ শব্দের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কাজেই এগুলিকে পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকার করলেই হয়। ব্যতিক্রমকে একেবারে বাদ দেবার উপায় নেই। কোনো জীবিত ভাষাই সম্পূর্ণভাবে নিয়মের বশবর্তী হয়ে থাকতে পারে না। ব্যতিক্রম থাকবেই। কিন্তু এরূপ নিয়ম প্রবর্তন করলে ব্যতিক্রমের সংখ্যা পুর্বের এক শতাংশের চেয়েও কম হবে। নূতন শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটা অল্প সুবিধার কথা নয়।

এরূপ ও-কার বা উর্ধ্ব-কমা ব্যবহার করলে প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন হবে বলে মনে করবারও কোনো কারণ দেখি না। বহু বহু গণ্যমান্য লেখক, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এরূপ বানান যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন এবং এখনো করছেন। সেটাকে একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে চালালেই হবে। এতে হাজার হাজার শব্দের বানান এবং উচ্চারণ সম্বন্ধে এক দিক্ দিয়ে সকলেই সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। লেখক, মুদ্রাকর প্রভৃতির হাতের কাজও এতে খুব বেশি বাড়বে না। পূর্বে "তুই চল্, তুমি চল" লেখা হতো; এখন তা "তুই চল, তুমি চলো" হয়েছে। একদিকে যেমন একটা ও-কার বেড়েছে তেমনি অন্য দিকে একটা হস্‌চিহ্ন কমেছে। কাজেই এবিষয়েও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

সমিতি বলেছেন—"ওকার অনাবশ্যক, অর্থ হইতেই উচ্চারণ বোধ হয়"। কথাটা বড়ো বড়ো অধ্যাপকগণের পক্ষে হয় তো উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু নবশিক্ষার্থী কোমল-মতি বালকগণের পক্ষে 'অর্থ হইতে উচ্চারণ বোধ" একেবারে অসম্ভব। উচ্চারণ ব্যক্ত করবার জন্যই বানান পরিকল্পনা করা হয়। উচ্চারণেই যদি সন্দেহ থেকে যায়—বানান দেখে তা যদি বোঝা না যায়—কেবল 'অর্থ হইতেই" তা যদি অনুমান করে নিতে হয় তবে এতো চেষ্টা করে বানান সংস্কার করবার দরকারই বা কি ছিলো? যদি বানানগত উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করাই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য, তবে তার জন্য বানান 'সংস্কার' করবার কোনো আবশ্যকতাই থাকে না। তার জন্য প্রচলিত যে কোনো একটা বানান-নিয়ম ধরে নিয়ে একমাত্র তারই অনুসারে লেখবার জন্য সর্বসাধারণের কাছে অনুরোধ জানালেই হয়। আমার মনে হয় সমিতি কেবল তাই করেছেন। বানানকে সরল ও উচ্চারণমূলক করবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন নি। তবে "বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি" এই নামটাকে অনর্থক করবার পক্ষে যতোটুকু দরকার তা তাঁরা করেছেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

দালানের সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে বিজনের আহার্য্য পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে সবিতা তারই জন্য অপেক্ষা করে ছিলো। সবিতার সামনে কেমন ক'রে মুখ দেখাবে—এই অতীব লজ্জাকর ভাবনা নিয়ে মাধবী বিজনের পেছন পেছন নেমে এলো। দেখলে সবিতা ব'সে আছে তাদেরই প্রতীক্ষায়। পদশব্দে মুখ তুলে সবিতা তাদের দিকে একবার মাত্র তাকাল কিন্তু অন্য সময়ের মত সে কণ্ঠে সেই অনির্ব্বচনীয় মধুর আহ্বান ধ্বনিত হ'লো না, নিছক স্নেহের খাতিরে বিজনকে সম্বোধন ক'রে একটি কথাও সবিতা বললে না। বিজন আসনে ব'সলো। সবিতার সেই মুখ দালানের উজ্জ্বল আলোকে আশ্চর্য্য ম্লান বিষাদময় ঠেকল, আর তার সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য মিশে সেই একান্ত স্নেহময় দীপ্তিময় মুখের চেহারাকে যেন আর এক রকম ক'রে তুলেছে। মাধবীর সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মত ভারি বোধ হ'তে লাগল। আর যে তিলার্দ্ধ সে সবিতার সামনে এগিয়ে যেতে পারবে এ তার মনে হ'লো না। বয়স তার নিতান্ত অল্প নয়, সে কি হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারছে না কিসে সবিতার মুখের চেহারার এমনতরো পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। কেন তার ঐ কণ্ঠে সেই অনির্ব্বচনীয় স্নেহের সুর ধ্বনিত হ'লো না। সবিতা ইচ্ছা ক'রে নীরব হ'য়ে নেই, শৈবাল এবং মাধবীর

এই সংঘাতের আভাষ তার মনকে কত প্রকারের দুর্ভাবনায় যে বিচলিত ক'রে তুলেছে তা সবিতার মুখের দিকে চেয়ে মাধবী হৃদয়ঙ্গম ক'রল। মন তার অত্যন্ত স্পর্শাতুর। সবিতার মুখের সেই ক্লিষ্ট চেহারা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। একটা দুর্নিবার অভিমান এবং কান্নার ঢেউ তার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। ইচ্ছা হ'লো সবিতার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বলে : এ দোষ কি আমারই কাকীমা। নিরপরাধ হ'য়ে আজ যে আমি কি শাস্তি পেয়েছি তা তুমি জানো না। কিন্তু মিথ্যে মিথ্যে যে জন আমাকে এতো খানি আঘাত, এতো বড় কুৎসিত অপমান ক'রতে পেরেছে আমার মতন তাকে তুমিও কিছুতে ক্ষমা ক'রো না কাকীমা। কিন্তু নিজের দুর্নিবার আবেগকে প্রাণপণে সংযত ক'রে মাধবী সবিতার একটুখানি তফাতে গিয়ে বসল। সবিতা এবং বিজনের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হ'তে থাকল তার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের বিশ্রী নীরবতাকে ভঙ্গ করা, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। মাধবী লক্ষ্য ক'রলো সবিতা মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের দিকে। যেন বলছে : কাজটা তোর ভালো হয়নি রাণু। ভালো হয়নি কে না এটা মানে। কিন্তু সে যদি বিনা দোষে আমাকে এতো বড় অপমান করে, তা আমি মুখ বুঁজে সইতে যাবো কি জন্য? অপমান করবার আঘাত করবার কোন্ অধিকার তার আছে? তার কি ধার ধারি আমি?

অনেকক্ষণ পরে সবিতা মাধবীর সঙ্গে কথা কইল। তার মুখের দিকে চেয়ে বললে : 'তুমি আর মিথ্যে ব'সে আছো কেন রাণী, খাওগে না এবার। সেই সকালে কখন দুটি মুখে দিয়েছো তারপর তো আর পেটে কিছুই পড়েনি। পিত্তি প'ড়ে শেষে একটা রোগ ধরবে। শরীর তো এদিকে কেমন।'

মাধবী নতমুখে আস্তে আস্তে বললে : 'একটু পরে যাচ্ছি।'

সবিতা বাতাস ক'রতে ক'রতে মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবল। তারপর মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে : 'একটু আগে ওদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিলো।'

মাধবী ভয়ে ভয়ে সবিতার মুখের দিকে তাকালো।

'আজ তোমার ও-বাড়ীতে সন্দেবেলা খাবার কথা ছিলো?'

'কই না।'

'ঝি যে বললে।'

'কি বললে?'

'বললে দিদিমণি মাকে খাবার ঠিক ক'রে রাখতে ব'লে দাদাবাবুর কাছে গেলো। মা খাবার নিয়ে ব'সে রইলো, অথচ দিদিমণি দেখা না ক'রে না খেয়ে চ'লে এসেছে। তাই শৈবালের মা ওকে পাঠিয়েছিলো' সবিতা বললে : 'অমন ক'রে না খেয়ে চ'লে এলে কেন?'

মাধবী মুখ নীচু করল। তাদের দুজনের এই সংঘাত সম্বন্ধে সবিতার ধারণা পাছে আরো দৃঢ় হয়, আরো নিঃসন্দেহ হয়—এই ভয়াবহ আশঙ্কায় মাধবী চক্ষের পলকে নিজেকে সংযত ক'রে ফেলল। সবিতার মুখের দিকে জোর ক'রে আনত দৃষ্টিকে তুলে পাণ্ডুর ওষ্ঠে প্রাণহীন দীপ্তিহীন হাসি ফুটিয়ে বললে : 'ঐ যাঃ, একথা তো আমার একদম মনে ছিলো না কাকীমা!'

সবিতা বললে : 'একেবারে মনেই ছিলো না?'

তার কণ্ঠস্বরে নিহিত ব্যঙ্গ মাধবী অন্তরে অনুভব ক'রেও তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিলে : 'একদম নয়। শৈবালদার সঙ্গে এমনি গল্পে মেতেছিলাম যে খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি।'

সবিতা তার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মাধবীর এই কৃত্রিম দীপ্তিহীন হাসি ঐ রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখ, তার কাছে তাদের এই কলহকে মিথ্যা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করবার কৌশল সবিতার নারী-সুলভ অন্তর্দৃষ্টির কাছে চক্ষের পলকে ধরা পড়ে গেলো। কিন্তু এই নিয়ে আর কথা বাড়াতে তার ইচ্ছা করল না। মন তার এই দুর্ভাবনায় ক্লিষ্ট অবসন্ন। একটুখানি নীরব হ'য়ে থেকে সবিতা বললে : 'কাল ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন তো?'

'হাঁ।'

'তোমরা যাবে?'

'বাঃ কেন যাবো না, আমি তো যাবোই। জ্যাঠাইমা কালকে ওঁকে নিয়ে যাবার জন্যে পই-পই ক'রে ব'লে দিয়েচেন। তুমি ওঁকে যাবার জন্য বলো না কাকীমা।'

বিজন এতোক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন হ'য়েছিলো, মাধবীর শেষের কথা তার কানে যেতেই মুখ তুলে বললে : 'কোথায় যেতে হবে?'

'কাল দুপুরে তোর ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন।'

'কাদের বাড়ী?'

'শৈবালদের। ওর মা তখন নেমন্তন্ন ক'রে গেলো মনে নেই?'

বিজন মুহূর্ত্তকাল নতমুখে কি যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে বললে: 'আমাকে মাপ করো দিদি, নেমন্তন্ন খাওয়া আমার সুবিধে হবে না।'

সবিতা তার মুখের দিকে চেয়ে খুব সহজ কণ্ঠে বললে: 'বেশ তো, সুবিধে না হয় যাসনি।'

'সত্যি ব'লচো, না রাগ ক'রে?'

'সত্যিই বলচি।'

বিজন হো হো ক'রে হেসে উঠল। মাধবীর দিকে চেয়ে বললে: 'দেখলে তো রাণু, দিদিটি আমার আজকাল কি রকম রিস্‌নেব্‌ল হ'য়ে উঠেচে। দিদি খুব ভালো ক'রেই জানে নেমন্তন্ন খাওয়াটা আমার সংস্কার বিরুদ্ধ—তাই নেমন্তন্ন খাবার জন্য আর নারীসুলভ জেদাজেদি ক'রলে না। যে ভয়টা সবচেয়ে বেশি ক'রেছিলাম।'

কিন্তু সবিতার সেই মৃদু কণ্ঠের ঐ কটি কথার গভীরতর অর্থ কল্পনা ক'রে মাধবীর গায়ের রক্ত জল হ'য়ে আসবার উপক্রম হ'লো। সবিতার ঐ কটি কথার অর্থ কি এই নয়: শৈবাল তোমাকে তার আচরণে স্পষ্ট অবজ্ঞা ক'রেছে, এই কারণে তোমার যদি সেখানে যেতে অভিরুচি না হয় নাই গেলে। এ অবস্থায় সেখানে যাবার জন্য তোমাকে আমি জোর ক'রতে পারিনে। বিজনের নেমন্তন্ন খাবার আপত্তির মূলে এই কারণ র'য়েছে এ ঠিক এবং সবিতা যে ঠিক এই জন্য তাকে সেখানে যাবার জন্য আর একটি বারও অনুরোধও ক'রলে না এই কথাটা কল্পনা ক'রে মাধবীর নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো। তাদের কলহের কথা সবিতা জানতে পেরেছে এটা অতীব লজ্জাকর, কিন্তু সবিতা যদি এও জেনে থাকে বিজনের প্রতি প্রচণ্ড ঈর্ষা শৈবালের অন্তরে ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়েছে যাতে ক'রে তাদের দুজনের এই সঙ্ঘাত ঘটল, তবে লজ্জায় মাধবী পালাবে কোথা? সবিতা এটা নিশ্চয় জানতে পেরেছে, নইলে জোর ক'রে জেদাজেদি ক'রে বিজনকে পাঠাবার প্রয়াস না ক'রে এমন শান্তকণ্ঠে এটা তারই ইচ্ছার উপর ফেলে দিল কেন? মাধবী আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, পাছে তার এই নীরবতা সবিতার সন্দেহকে আরো দৃঢ় হবার সুযোগ দেয় এই ভয়ে বিজনের কথা শেষ না হ'তেই সে ব্যাকুলকণ্ঠে ব'লে উঠল: 'আপনি কেন যাবেন না? কি হ'য়েচে আপনার?'

তার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে দুজনেই ভয়ানক বিস্মিত হ'লো। বিজন একটু পরেই হেসে জবাব দিলে: 'কই কিছুই তো হয়নি।'

মাধবী বললে: 'তবে কেন নেমন্তন্ন খেতে চাইছেন না?'

বিজন হেসে বললে: 'যেতে চাইছি না—নেমন্তন্ন খাওয়া আমার পোষায় না ব'লে।'

মাধবী জোর ক'রে ঘাড় নেড়ে বললে: 'ওসব আমি শুনতে চাই না, কাল আপনাকে নেমন্তন্ন যেতেই হবে। জ্যাঠাইমা আপনাকে কাল নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পই-পই ক'রে ব'লে দিয়েছেন। আপনি না গেলে তিনি কি ভাব্‌বেন?'

বিজন সহসা গম্ভীর হ'য়ে বললে: 'তুমি কি আমাকে কাল সত্যই সেখানে নেমন্তন্ন যেতে বলো রাণু?'

এই প্রশ্নের নিহিত অর্থ সবিতার সামনে মাধবীকে রোমাঞ্চিত করল। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সাম্‌লে তেমনি সজোরে মাথা নেড়ে মাধবী বললে: 'হাঁ পাঁচশো বার বলি। কেন সেখানে নেমন্তন্ন গেলে কি আপনার পাপ হবে যে ওকথা ব'লছেন?'

বিজন নতমুখে আস্তে আস্তে বললে: 'বেশ যাবো কাল।'

'সব দায় আমারই' ব'লে মাধবী সবিতার দিকে চেয়ে বললে: 'তুমি তো বেশ কাকীমা চুপ ক'রে ব'সে আছো। বিজনবাবুকে নেমন্তন্ন যাবার জন্য একবার জোর ক'রে বললেও না। এমনভাবে ব'সে আছো যেন তাঁর যাওয়া না যাওয়ায় তোমার কিছুই এসে যায় না।'

বিজন মুখ তুলে বললে: 'কথা তো দিলাম যাবো।'

'আমি কাকীমাকে বলছি' মাধবী মুহূর্ত্তকাল সবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে: 'আজ তোমার কি হ'য়েছে কাকীমা?'

'কই কিছুই তো নয়।'

'কিছুই নয়?'

'আমি নিজে তো জানিনে।'

'তবে এমন ক'রে ব'সে আছো কেন—মুখে কথা নেই, হাসি নেই।'

'এ-ম-নি। মনটা তেমন ভালো নেই।'

'কেন কাকীমা?'

'কেন কাকীমা! নাও ওকে তার জবাব দিতে ব'সো এখন' মাধবী ছলে কৌশলে যে তার মনের আসল কথাটা টেনে বার করবার প্রয়াস ক'রছে এটা বুঝতে পেরে এতো দুঃখেও সবিতার হাসি পেলো। ম্লান হেসে বললে: 'তুই দিনকে দিন ভারী ছেলেমানুষ হ'চ্চিস, রাণী।'

সবিতার এই হাসি মাধবীর দগ্ধ মনে সুধাবর্ষণ করল। সে হেসে বললে: 'তুমি ছাড়া আর আমার ছেলেমানুষি করবার কে আছে কাকীমা। তোমার কাছেও ছেলেমানুষি ক'রতে বারণ ক'রছো।'

তার মুখের হাসি সত্বেও কণ্ঠস্বরে যে সূক্ষ্ম অসহায় সকরুণতা ধ্বনিত হ'লো তা গভীরভাবে অন্তর স্পর্শ করলো সবিতার এবং মুহূর্তেই মাধবীর জন্য বেদনায় তার বুকের ভেতরটা উদ্বেলিত সমুদ্রের মত একবার দুলে উঠে পরক্ষণেই স্থির হ'লো। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে দুটি আয়ত চক্ষের স্নেহধারা মাধবীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখে বর্ষণ ক'রতে ক'রতে বললে: 'পাশ ক'রে আর কিছু না হোক, কথা খুব শিখিছিস রাণী।'

মাধবী সবিতার মুখের দিকে হেসে তাকাল। চেয়ে চেয়ে আবার তার চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হ'লো। সে জানে একদিন তাদের এই কলহের কথা সমস্তই সবিতার কাছে খুলে তাকে ব'লতে হবে। সেদিন কি সবিতা কঠোর শাস্তি দিতে পারবে না তাকে, যে তাদের মধ্যে সত্যকার অপরাধী? সবিতা কি তাকে ক্ষমা ক'রতে পারবে এতো বড় অপরাধ যে জন ক'রেছে। যদি সব জেনেশুনেও সবিতা তাকে ক্ষমা করে করুক কিন্তু সে করবে না। তার সঙ্গে আজ জন্মের মত সব সম্বন্ধ ছিন্ন করল তাতে যে যাই বলুক না কেন। যত বড় ব্যথাই সবিতা পাক না কেন।

মিনিট দুই নিঃশব্দে কাটবার পর মাধবী বললে: 'কাকীমা!'

'কি রে রাণী?'

'তুমি আমাদের প্রোগ্রামের কথা শুনেছো?'

'কিসের?'

'বেড়াবার! কাল থেকে আমরা এই দুজনে কলকাতায় বেড়াতে যাবো কাকীমা।'

'কলকাতায়?'

'হাঁ, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, জু, চিঁড়িয়াখানা—কত জায়গায় যাবো। তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো না কাকীমা। বেশ হয় তাহ'লে।'

সবিতা মাধবীর দিকে চেয়ে বললে: 'আমি কোথা যাবো?'

মাধবী সলজ্জে বললে: 'তুমি তো জু দেখোনি কাকীমা। চলো না আমাদের সঙ্গে জু দেখে আসবে। পরশুদিন তো জুতে যাচ্চি।

সবিতা ভয়ানক বিস্মিত হ'য়ে বললে: 'পরশুদিন কার সঙ্গে যাবি?'

মাধবী হেসে বললে: 'কেন বিজনবাবুর সঙ্গে, এ কদিন ওঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রাণ ক'রে তবে ছাড়বো। তোমার ভাই ব'লে রেহাই দেব না কাকীমা।'

সবিতা অধিকতর বিস্মিত হ'য়ে বললে: 'পরশুদিন বিজনকে তুই পাবি কোথা? কাল তো আটটার ট্রেণে ও চ'লে যাচ্চে।'

'কাল? চলে যাচ্ছে? বিজনবাবু?'

'হাঁ, সে খোঁজও রাখিস নে।'

মাধবী বিজনের মুখের দিকে তাকাতেই বিজন চমকে উঠে মুখ তুলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎস্ফুরণের মত সব কথা তার মনে পড়ল। আজ মাধবীর সঙ্গে পরিপূর্ণ আনন্দোৎসবের মধ্যে মগ্ন থেকে একথা তার একেবারেই মনে নেই যে সে ব'লেছে কাল রাত্রে তার যাওয়া চাই, নইলে তার চাকরী থাকবে না। মুহূর্তে স্রোত একেবারে ঘুরে গেলো। বিজন আর মাধবীর মুখে কথা বের হ'লো না।

দুজনেই নতমুখে স্তব্ধ এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যেই সবিতা আস্তে আস্তে বলতে লাগলো: 'আমার কি সাধ হয় না ও এখানে থাকে। আজ ওকে কত ক'রে সকালে বলেছি কখনো তো এ পথ মাড়াবিনে, যদি এসেইছিস্ দিন দশেক থেকে যা, তা ও বললে: কাল আমাকে যেতেই হবে দিদি, নইলে আমার চাকরী থাকবে না। এ কথার

পর তো আর থাকতে বলতে পারিনে। হাঁরে কাল তোর যাওয়া ঠিক তো?'

বিজনের গলা চিরে যেন বের হ'লো : 'হাঁ।'

মাধবী এক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষে বিজনের দিকে চেয়ে থেকে বললে : 'আগে-আগে কেন বলেন নি এ কথা?'

বিজন মাথা নিচু ক'রে বললে : 'মনে ছিলো না রাণু।'

মাধবী আর একটি কথাও বললে না। বিজনের খাওয়া শেষ হ'লে পর কোন রকমে সবিতার সামনে বসে দুটি খেয়ে উপরে নিজের ঘরে এলো। জানলার পরদা সরিয়ে গরাদেতে মাথা রেখে নিঃশব্দে বাইরের দিকে রইল চেয়ে। শরতের আকাশ সমুদ্রের মতো প্রশস্ত নীল, তার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ স্থির দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে! দূরের সার-দেওয়া নারকেলবন দীর্ঘ পল্লবের অণু-পরমাণুতে জোছনা মেখে মর্ম্মর গুঞ্জন করছে, বাতাসে তাদের আনন্দ বার্ত্তা দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আজ রাত্রির নিবিড় মায়াময় রূপ তার দুই চোখের অপলক দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না, তার গভীর দৃষ্টি আজ এই জ্যোৎস্না-মর্ম্মরিত রাত্রিকে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে চ'লে গিয়েছে। নিজের জীবনকে এতোদিন সে যে দৃষ্টিতে দেখে এসেছে, মধুর ক'রে কল্পনায় সাজিয়েছে কত রঙে কত রসে কত বৈচিত্র্যে—আজ তার সেই মধুরতম জীবন এক ভয়ানক সমস্যা নিয়ে তার দুই অপলক চোখের সামনে গতিহীন হ'য়ে থেমে রইল। এই তেইশ বছর জীবনে সে কি পেয়েছে তার হিসাব-নিকাশ আজ বাইরেই পড়ে থাক—মাধবীর জীবনের সামনে এক ভয়ানক সমস্যা আজ এসেছে, জীবন দিয়েও যেন তার সমাধান হয় না। মাধবীর মনে হ'লো যে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন তার অন্তরকে সুধার রসে ভরিয়ে রেখেছিলো, আজ সেই হৃদয় পেয়ালার সমস্ত সুধা উপছে প'ড়ে সেই শূন্যপাত্র তীব্র হলাহলে পূর্ণ হ'লো। তার এই তেইশ বছরের জীবনে সে যাদের সংস্পর্শে এলো, আদর্শ ব'লে উন্নত ব'লে মহত্তর ব'লে যাদের জেনে এলো, যাদের স্নেহ ভালোবাসার মন্দাকিনীধারা তার জীবন পথের উপর দিয়ে মধুর কলস্বরে ব'য়ে গিয়েছে এবং চিরদিন যাবে ব'লে সে কল্পনা ক'রেছে, যাদের সাহচর্য্যে তার জীবনে এতো মধু এতো রস এতো আনন্দ—আজ এই গভীর রাত্রির নিঃশব্দতায় তাদের আসল রূপ প্রেতের মতো তার চোখের সামনে যেন নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল। অতীতের স্থির সমুদ্র আলোড়িত হ'য়ে উঠল মনে। কত কথা কত ঘটনা কত ইঙ্গিত। মাধবীর কপালে বিন্দু-বিন্দু স্বেদ জমে উঠল, জানালার গরাদেটা আরো জোরে দু'হাতে চেপে সে নিজের জীবনের মঞ্চে তাদের অভিনয় চোখ মেলে দেখতে লাগল। বুকের ভেতর থেকে এক নির্ম্মম হাহাকার প্রাণান্তকারী কান্নায় রূপান্তরিত হ'য়ে উপরের দিকে ঠেলে-ঠেলে উঠতে থাকল, নিজের পরম কাম্য মধুরতম জীবনের যে রূপ তার ধ্যান-গভীর চোখে লেগেছিলো স্নিগ্ধ অঞ্জনের মতো, সেই জীবনের রূপ এই। হৃদয় মনের যে রঙ রস মাধুর্য্য কল্পনা দিয়ে একটু একটু ক'রে যে গৃহ সে সৃজন ক'রেছিলো আজ জানল—সে গৃহ নয়, অবরুদ্ধ অন্ধকূপ। সেই অন্ধকূপে কোথা থেকে একটি চঞ্চল সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ ক'রে তার অতলস্পর্শ অন্ধকারকে ব্যঙ্গ ক'রে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেলো, সুন্দর ধরা দিলে না। তার ক্ষণিক আবির্ভাব শুধু জীবনের সমগ্র মিথ্যাকে কুশ্রীতাকে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ ক'রে দিয়ে গেলো, সুন্দরের উপাসনার নামে জীবনের কুশ্রীতাকেই সে উপাসনা ক'রে এসেছে—সুন্দর এসে তার জীবনের সমস্ত ভুলকে কুশ্রীতাকে ব্যঙ্গ ক'রেই চ'লে গেলো, ধরা দিলে না। রিক্ত বনভূমির অঙ্গ বসন্ত তার সবুজের আবরণ দিয়ে সাজাল, শাখায় শাখায় কচি পাতার সমারোহ দেখা দিল, বৃন্তে বৃন্তে ফোটা ফুলের উৎসব সুরু হ'লো, কিন্তু ক্ষণিকের অতিথি যখন চলে গেলো তখন মরা ফুল আর ঝরা পাতার মেলাই সুন্দরের অভাবকে বেশি ক'রে জানিয়ে দিতে লাগল। তারই অভাবে ধরণীর নাড়ীতে নাড়ীতে কান্নার সুর, তারই জন্য বাতাসের হাহাকার, তারই অভাবে নদীর স্রোতে এই মন্থরতা। সুন্দর চ'লে গেলো। চিরদিন সে সোনার হরিণ মনে ক'রে মায়ামৃগেরই অনুসরণ ক'রে এসেছে, সংসারের সহস্র হীন বন্ধন তার দেহকে তিল-তিল ক'রে বেঁধে ফেলেছে, অসুন্দরকেই চিরকাল সুন্দর ব'লে মালা দিয়ে এসেছে এতোদিন—এই মিথ্যা বিড়ম্বনা সে জানতে পারেনি। জানালার গরাদেতে মাথা দিয়ে মাধবী নির্নিমেষে চেয়ে রইল। বসন্ত চলে গেলো, জীবন থেকে সুন্দর জন্মের মতো অন্তর্হিত হ'লো—তার বিড়ম্বিত জীবনের আসল রূপকে তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে। মাধবী জীবন দিয়ে চির-উপাস্য সুন্দরকে ধরে রাখতে পারলে না, জীবন দেবতা বাদ সাধল।

তার জীবন আজ সহস্র হীন বন্ধনে পঙ্গু। মাধবী চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, তার জীবনে যারা এলো গেলো আর যারা রইল।

রাত্রি একটু একটু ক'রে গভীরে ডুবতে লাগল। মায়াময়ী রাত্রি। মাধবী তেমনি অপলক চোখে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। আকাশ থেকে আবার একদিন এই অনির্ব্বচনীয় নীল ঠিকরে পড়বে, তার উপরে এমনি করে চাঁদ উঠে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোর ঐশ্বর্য্যে ধরিণীকে সাজাবে, ঋতুচক্রের চিরন্তন আবর্ত্তনে যুগে যুগে বসন্ত এসে পৃথিবীকে সুন্দর করবে আজকের মতো, আর আজকের মতোই সৌরভ-বিহ্বল রাত্রি কোন চির-সুন্দরের তপস্যায় এমনিভাবে ধ্যানমগ্ন থাকবে, কিন্তু তার জীবনে আর সে সুন্দরকে পাবে না। নিজের জীবনের এই ভয়াবহ দৈন্যের কথা মনে পড়তেই তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, এক প্রাণান্তকারী বেদনা অশ্রুতে রূপান্তরিত হ'য়ে টপ-টপ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল। জীবনে বেদনা পেয়ে সে হয়তো অনেকবার কেঁদেছে কিন্তু আজ নিশীথ রাত্রির নীরব মন্দিরে একা ব'সে এই কান্নার সঙ্গে জীবনের ছোট ছোট দুঃখ ব্যর্থতার কান্নার কোন দিক দিয়েই তুলনা হয় না। এ কান্না তার বিড়ম্বিত জীবনের শোকপ্রকাশ নয়, এ কান্না মহত্তর নিষ্কলঙ্ক-জীবনের উদ্দেশে বুভুক্ষিত আত্মার বন্দনা। সুন্দরের জন্য চিরন্তন মানব হৃদয়ের অপরিসীম ব্যাকুলতা। মাধবী নিজের মনেই উচ্ছ্বসিত আবেগে বলতে লাগল: কেমন ক'রে এই স্বপ্নভঙ্গের নিরাশা নিয়ে আমি বাঁচব। কি নিয়ে দিন কাটবে আমার। যাকে আমার জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজন, যাকে অবলম্বন ক'রে আমার দিন রাত্রি সুরে সুরে মুখর হবে, সৌগন্ধ্যে বিহ্বল হ'য়ে উঠবে, জীবনের সমস্ত কুশ্রীতাকে এড়িয়ে শুচি হ'য়ে চলতে পারবে, সেই সুন্দর শুধু দেখা দিয়েই চ'লে গেলো, ধরা দিলে না। তার অভাবে আমার জীবন ব্যর্থ হ'লো, তার অন্তর্দ্ধ্যানেই জীবনের সমস্ত মধু আজ নিঃশেষিত, তার জন্যই আমার সমস্ত জীবন মরুভূমির তৃষ্ণা নিয়ে হা হা ক'রবে। জীবনে সুন্দরকে পেলাম না। মাধবীর দুই চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল প'ড়তে লাগল এবং আজ এই শোকার্ত্ত রাত্রে বহুকালের সমুদ্রকল্লোলকে অতিক্রম ক'রে এক বৈষ্ণব কবির এই অভাবের অসহ্য বেদনা কবিতার চরণে মূর্ত্ত হ'য়ে তার দুই কান আচ্ছন্ন ক'রে মর্ম্মান্তিক কান্নার সুরে বেজে উঠল: 'কৈসে গোঙায়বি হরিবিনে দিন রাতিয়া।'

আগামী কাল রাত্রি আটটার শিলঙ্ মেলে বিজনকে যেতেই হবে, নইলে তার চাকরী থাকবে না—সবিতাকে বিজন এ কথাটা মিথ্যা ক'রে ব'লেছিলো। ব'লেছিলো তার কারণ দিদির স্বভাবটি সে জানতো। যদি সবিতা জানতে পারে বিজনের অবকাশ আছে তাহ'লে সে কোনমতে সপ্তাহখানেকের আগে তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। এই নির্বান্ধব শ্বাসরোধকারী স্নেহময় আবহাওয়াযুক্ত ঘরে কয়েদ ক'রে রাখবে। তাই বুদ্ধি খরচ ক'রে বিজন প্রথমেই এই চরমতম অব্যর্থ অস্ত্রটি ছুঁড়ে রেখেছিলো আত্মরক্ষার জন্য। বিজনের আত্মরক্ষা হ'লো। খাওয়া শেষ ক'রে যখন সে উপরে এলো তখন অনুশোচনার আক্ষেপে তার সমস্ত বুকটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। কেন সে ওকথা ব'লতে গিয়েছিলো? কি দরকার ছিলো তার ঠিক ঐ কথাটি বলবার—যার জন্য এই আনন্দধাম থেকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কালই বিদায় নিতে হবে। উচ্চারিত কথা আর বিক্ষিপ্ত তীর এদের ফিরিয়ে আনা যায় না, তাই তার উচ্চারিত কথার ফল ভোগ তাকে করতে হবেই। বিজন অনুশোচনার আক্ষেপে জ্বলতে লাগলো। কিন্তু এতে তার নিজের দোষ কতটুকু? কে জানতো, কার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হ'য়েছিলো—সামান্য একটি দিনে তার জীবনের এমনতরো অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন বিস্ময়কররূপে ঘটবে, জীবনের একটানা স্রোত হবে ভিন্নমুখী। একথা কে জানতো। না এতে তার নিজের কোন দোষ নেই। জীবনের বিচিত্র বিস্ময় রস সবই তো এইখানে। এর জন্য আক্ষেপ করা ভুল। বিজন নিজের মনকে প্রবোধ দিল। তার চেয়ে—বিজন ভাবলে—এমন কোন একটা কৌশল করা যায় কিনা যাতে সব লজ্জা বাঁচিয়ে আরো কিছুদিন সে এখানে থাকতে পারে। কে চায় এমন আনন্দধাম থেকে মাধবীর কাছ থেকে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে। কিন্তু হায়রে সব লজ্জা বাঁচিয়ে আর একটি দিনও এখানে থাকবার কোন উপায় সে দেখতে পেলে না। অবশেষে নৈরাশ্যক্লুব্ধকণ্ঠে বললে: কাল আমাকে যেতেই হবে।

মাধবীকে বিজন গভীরভাবে ভালোবেসেছে, তার প্রতিটি রক্তকণিকা তাকে কামনা ক'রছে, শিলঙে গিয়েই বিজন তার প্রার্থনা জানিয়ে চিঠি লিখবে এবং তার প্রার্থনা যে সফল হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি কথা ভেবে বিজন সহসা অস্থির হ'য়ে উঠলো। তাদের দুটির মিলনের এখনো কিছু বিলম্ব আছে, মাঝের এই কটা দিন সে কাটাবে কি ক'রে—এই চিন্তায় সে উঠলো অস্থির হ'য়ে। মনে প'ড়লো শিলঙের সেই দিনগুলির কথা। এতো দিন যে দিনগুলির মধ্যে অনাবিল আনন্দের আস্বাদ পেয়ে এসেছে আজ সেই দিনগুলি অন্য একরকম চেহারা নিয়ে দেখা দিল। শিলঙের সেই প্রাত্যহিক দিনগুলি কি বিরস বিস্বাদ বৈচিত্র্যহীন! সেই তিক্ত একটানা কাজ, সেই পরিচিত সীমাবদ্ধ বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্য, সেই রাত্রি জেগে বইপড়া—সমস্ত জিনিষ তার চোখে অসহ্য বিস্বাদ ক্লান্তিকর ঠেকল। একথা ভাবতেও আজ তার নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো, এখনো অনেকগুলি নিঃসঙ্গ দিন এই ভাবে কাটাতে হবে। এমনই হয়তো হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন নীরস বৈচিত্র্যহীন। প্রাত্যহিক দিনের বিবর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত। তাই প্রত্যেক দিনটি যাপন করবার সময় আমরা ভুলে যাই নিজেদের জীবনের এই তিক্ত বিবর্ণতার কথা। কিন্তু যখন আসে জীবনে বৈচিত্র্য, রঙের ক্ষীণতম স্পর্শ আমরা পাই, তখন আমরা বুঝতে পারি কি তিক্ত বর্ণহীন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—আমরা বিস্মিত হই ব্যথিত হই। তারপর চ'লে যায় সেই বৈচিত্র্য, ক্ষণিক বর্ণচ্ছটা যায় মিলিয়ে—তখন কি তীব্রভাবেই না অনুভব করি সেই গত বৈচিত্র্যের সেই রঙের নিষ্ঠুর অভাব। কিছুদিন তার অভাব আমাদের জীবনকে কি দুর্ব্বিসহ ক'রে তোলে। আরো একটা দৃষ্টান্ত। অন্ধকার রাত্রি পথিক কোন রকমে পথ চিনে চিনে এগিয়ে চ'লেছে। অকস্মাৎ অন্ধকারের স্পষ্ট রূপ উদ্ঘাটিত ক'রে আলো গেলো মিলিয়ে। তখন সেই অন্ধকার তার চোখে অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হ'লো। সেই চকিত আলোক রেখাটির অভাব প্রতি পদে পদে নিষ্ঠুর ভাবে উপলব্ধি ক'রে সে পীড়িত ভীত হ'য়ে উঠলো। জীবনেও ঠিক তাই।

বাইরে আচ্ছন্ন রাত্রি মন্থরগতিতে নব প্রভাতের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেইদিকে চেয়ে অকস্মাৎ তার মন সান্ত্বনা-স্নিগ্ধ হ'য়ে এলো। কি ভয়, কিসের নৈরাশ্য? দিন যাবে, এদিন তার যাবে। এখান থেকে নিজের অন্তর ভরে যে সুধা সে নিয়ে যাচ্চে তাই দিয়ে সে শিলঙের অসহ্য নীরস বিবর্ণ দিনগুলি কাটিয়ে দেবে। আর ঊর্দ্ধমুখী সূর্য্যমুখীর মত তার তৃষিত জীবন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে থাকবে সেই মিলন লগ্নটির চরম মুহূর্ত্তগুলির জন্য, যে শুভ মুহূর্ত্তে নতমুখী বধূর মত রাণী আসবে তার জীবনে।

রঙে রসে গন্ধে অনির্ব্বচনীয় ক'রে তুলবে তার বিবর্ণ জীবন। তার রাণু।

১০

তার পরদিন বিদায়। এই বিদায় দিনটির কথা সংক্ষেপে বিবৃত ক'রেই আমি এই নাট্য-গল্পটির নায়ক নায়িকার জীবনের বিরহ-মিলন কথা শেষ করব।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বিজন নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তন্ময় হ'য়ে কি ভাবছিলো। দুপুর তখন পুরোপুরি, নীল আকাশ থেকে সোনালী রোদ অপরূপ দীপ্তিতে ঠিকরে পড়ছে, অতীতের সুখস্মৃতির মতো অনেক দূর থেকে অব্যক্ত মর্ম্মর ভেসে আসছে, রৌদ্রোজ্জ্বল অলস বেলাটি মন্থর গতিতে এগিয়ে-এগিয়ে চলেছে অপরাহ্ণের দিকে। এমন সময় সবিতা এসে ঢুকল ঘরে। বিজন চকিত হ'য়ে উঠল সবিতার আহ্বানে। তারপর দুই ভাই বোন মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াল।

সবিতা বললে: 'কি বলবার জন্য আমাকে ডেকেছিস বল্।'

'এতো তাড়া দিলে হবে না, একটু বস।'

'কি বল।'

'দিদি ভেবে দেখলুম' বিজন ঈষৎ দ্বিধায় বললে: 'তোমার কথায় রাজি না হ'য়ে আমার আর উপায় নেই। এই কথাটা জানাবার জন্যই শিলঙ থেকে আসা।'

সবিতা ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বললে: 'তার মানে?'

বিজন ম্লান হেসে বললে: 'তার মানে বিয়ে ক'রতে আমার আর আপত্তি নেই, এখন তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।'

সবিতা মুহূর্ত্তকাল বিজনের মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'ঠাট্টা করছিস বোধ হয়?'

বিজন ক্লান্তকণ্ঠে বললে : 'ঠাট্টা নয় দিদি, ঠাট্টা নয়। সত্যি কথাই বলছি, এমন ভাবে দিন কাটাতে আর আমি পারবো না।'

সবিতা বিজনের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলো। ঠাট্টা নয়, এ সত্যিই তার প্রাণের কথা। এই নির্ব্বিকার উদাসীন ভাইটির জন্য যে বেদনা যে প্রচণ্ড উদ্বেগ-আশঙ্কা এই দীর্ঘ কয় বছর তার বুকে পাষাণের ভার নিয়ে ছিলো আজ যেন বুক খালি ক'রে তা নেবে গেলো। একটা তীব্র আনন্দে সবিতার চোখে যেন জল এলো। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম ক'রে বললে : তুমিই কেবল জানো ঠাকুর ভাইটির জন্য আমার কত ব্যথা। যদি আমার দুঃখ দূর ক'রতে তাকে এমন সুমতি দিয়েইছো তবে এই ক'রো যেন শেষ পর্য্যন্ত এই সুমতি থাকে।

'এই মতিগতি শেষ পর্য্যন্ত থাকবে তো ভাই?'

'হাঁ থাকবে।'

'আমি তাহ'লে সব ঠিকঠাক করি?'

'করো—এখ্খুনি করো, কে বারণ ক'রছে' ব'লে বিজন থাম্‌লো, পরমুহূর্ত্তে ব'লে ফেললে : 'হাঁ দিদি, তখন যে তুমি বলছিলে মেয়েটি তোমার জানাশুনো।'

'সত্যি কথাই বলছিলুম' সবিতা হেসে বললে : 'এমন বউ তোকে ক'রে দেব যে তুই চমকে উঠবি। তোর সঙ্গে সে মেয়ের চমৎকার মিলছে তখন বলবি, হাঁ।'

মেয়েটি যে মাধবী এবং নির্ব্বাচিত পাত্রী হিসাবে সবিতা যে তাকেই ইঙ্গিত ক'রলে এতে কোন ভুল নেই। তথাপি সে নিজেকে আর কোন রকমে সংযত রাখতে পারলে না। সবিতার মুখ থেকে তার একান্ত বাঞ্ছিতার নাম শোনবার জন্য সহসা সে অধীর হ'য়ে উঠলো। তার সমস্ত বুককে তোলপাড় ক'রে তীব্রভাবে বইলো রক্তস্রোত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে উন্মত্ত আবেগে যেন এই কথা বেরিয়ে পড়লো : 'কে, কে দিদি সেই মেয়ে?'

'কি দরকার এখন জেনে' সবিতা হেসে বললে : 'যখন হবে তখন দেখবি।'

সবিতা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। এই শুভ সংবাদ এখনি সকলকে না জানাতে পারলে যেন সে কোন কাজ ক'রতে পারবে না। আনন্দ তার অনুভূতির সীমাকে ছাপিয়ে উঠেছে। কি আনন্দের দিন আজ।

সবিতা চলে যাবার পর বিজন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে। মাধবীকে তবে সে সত্য সত্যই পেলে।

বৈকালিক জলযোগ শেষ ক'রে বিজন উপরে উঠছিলো এমন সময় সিঁড়িতে মাধবীর সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা। বিজনের সমস্ত অন্তর মুহূর্ত্তের জন্য একটা নিগূঢ় অভিমানে দুলে উঠল। সে আজ চ'লে যাবে তার জন্য সবাই দুঃখিত, তাকে আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্য কত অনুরোধই না ক'রেছে, শুধু করেনি মাধবী। অথচ বিজন তার কাছ থেকেই সবচেয়ে এটা বেশি প্রত্যাশা ক'রেছিলো। তার এই অপ্রত্যাশিত বিদায়ের জন্য কত কান্নাকাটি মান অভিমান ক'রবে—এসব সত্ত্বেও সে থাকতে পারবে না, জিনিষটা কাল তারা-ভরা অতন্দ্র রাত্রির নিঃশব্দতায় কল্পনা ক'রে একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর বেদনার রসাস্বাদ ক'রেছিলো; কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি। মাধবীর কি উচিত ছিলো না একটিবারও তাকে এ অনুরোধ করা! আরো একটা কথা বিজনের স্মরণ হ'লো, আজ সকাল থেকে যে কোন কারণেই হোক মাধবী তার কাছে পর্য্যন্ত আসে নি। বার বার তার ডাকা সত্ত্বেও তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্চে—কেবল সবিতার ডাকে একটি বারের জন্য তার খাবার সময় কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো। কি একটা ব'লতে তার দিকে মুখ তুলে চেয়ে তার দৃষ্টি বিস্ময়ে স্থির নিশ্চল হ'য়ে গিয়েছিলো। আসন্ন বিদায় ব্যথার কোন চিহ্নই তো সে মুখে নেই। গর্ব্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, প্রথম যৌবনের লাবণ্যে স্নিগ্ধ, রসে লীলায় চঞ্চল সেই মুখ যেন পাষাণের মত কঠিন নির্ব্বিকার। ঘন চোখের পাতার নীচে সেই অবগাঢ় গভীর চোখ দুটিতে কি ঔদাস্যই না ফুটে উঠেছিলো যাকে ঐ মেয়ে তিল-তিল ক'রে ভালোবেসেছে, তার এই আসন্ন বিদায় যেন মাধবীকে তিলার্দ্ধ অস্থির চঞ্চল বেদনাতুর করেনি বাইরে থেকে এমনি বোধ হ'লো। কিন্তু তা তো সত্যি নয় কতখানি বেদনায় মানুষের মুখের চেহারা এমনতরো হয় তা মাধবীর দিকে চেয়ে বিজন হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারলো। এখনও সেই মুখ তেমনি স্থির অচঞ্চল নির্ব্বিকার। বিজনের বুক দুলে উঠলো। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে : 'তোমার জন্য কাঙালের মত ব'সে আছি একটিবারও কি কাছে আসতে নেই রাণু! দুঃখ কি কেবল তুমি একাই পাচ্ছো?'

এতো বড় অভিমান-সজল কণ্ঠের অভিযোগে যে মাধবীর

মর্ম্মমূলে কতখানি আঘাত ক'রলো তার বিন্দুমাত্র আভাষ পাওয়া গেলো না। বিজনের উচ্ছ্বাসে সে নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিজন আরো কাছে সরে এসে কোমলকণ্ঠে বললে : 'তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নাও, এখুনি হাওড়া ষ্টেশনে যেতে হবে। তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে রাণু, সে সব গাড়ীতে ব'লবো।'

মাধবী শান্তকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলে : 'আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না, শরীর আমার বড় খারাপ।'

'তার চেয়েও খারাপ তোমার মন, আমি জানি' বিজন তার শিথিল হাতখানি টেনে নিয়ে আবেগে চাপ দিয়ে বললে : 'মনকে এ সময় একটুখানি শক্ত করো রাণু, আর কদিন তার পরেই তো আমরা পরস্পরকে পাবো। দিদি সব—'

মাধবীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো এবং চক্ষের পলকে সজোরে নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপদে বিজনের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। হয় তো আর নিজেকে সে সংবরণ ক'রতে পারতো না। এমনিই হয় তো হয়, যাকে ভালোবাসি একটি উৎসবের রাত্রিও যাকে নিয়ে অতিবাহিত ক'রেছি তাকে ছাড়তে গেলে বুকে বড় বাজে। বিজনের মন আর্দ্র হ'য়ে এলো। একদিকে রাণীর নিবিড় প্রেম, অন্যদিকে মাতৃসম সবিতার স্নেহচ্ছায়া—তবু এসব উপেক্ষা ক'রে তাকে চ'লে যেতে হবে, বিদায়ের সজল মুহূর্ত্তটি ক্রমশঃ ঘনিয়ে এলো এবং এই আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে বিজন মনে মনে তার প্রিয়তমার উদ্দেশে বললে, 'এই বিবর্ণ জীবনে যে এই বিপুল সম্ভাবনা ছিলো তা জানতাম না, কিন্তু আমার জীবনে তোমাকে পাঠিয়ে এই বিপুল সম্ভাবনাকে সার্থক করবার এই সুযোগ যে আমাকে দিয়েছে, আজ যাবার সময় সেই জীবন-দেবতার উদ্দেশে আমার প্রণতি জানিয়ে যাই।'

সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে বিজন নীচে নামল। সবিতা এবং বাড়ীর ঝি চাকর বামুন মাননীয় অতিথিকে বিদায় দেবার জন্য দালানে দাঁড়িয়েছিলো, সকলে তাকে প্রণাম ক'রল। বিজন একখানি দশটাকার নোট তাদের ভাগ ক'রে দেবার জন্য সবিতার হাতে দিয়ে নীচু হ'য়ে তার পায়ের ধুলা নিল। সবিতা তার মাথায় ছোঁয়ানো আঙুলের প্রান্তভাগ চুম্বন করে সজলকণ্ঠে বললে : 'তোমাকে আর আমার কিছু বলবার নেই ভাই, কিন্তু বিয়ের মত শেষ পর্য্যন্ত যেন তোর স্থির থাকে এর বেশি আর আমি কিছু চাইনে। আর পরের মাসে ছুটি নিয়ে দুদিনের জন্যও একবার এসো, নইলে ভাসুর বড় দুঃখ ক'রবেন।'

'পরের মাসে' বিজন ভয়ানক বিস্মিত হ'য়ে বললে : 'কেন দিদি?'

'এই আশ্বিনের শেষে' সবিতা আস্তে আস্তে বললে : 'শৈবালের সঙ্গে রাণীর বিয়ে—সব ঠিকঠাক হ'য়ে আছে। চিঠি পেয়েই এখানে চলে এসো।'

সমাপ্ত

ঘাটশিলা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

(প্রভাতে)

কৌতুক-ভরা কিশোরীর মত,
রূপসীর মত মাতাল-করা—
এলো চঞ্চল বায়ু সুশীতল,
ঘুম-ঘোরে যবে নয়ন ভরা!
কেশ ছুঁয়ে যায়, মুখে ছুয়ে যায়,
কচি কিসলয়ে হাসিটি বাজে!
নব-পল্লবে হাতছানি দিয়ে
রাঙা হয়ে ওঠে মধুর লাজে!

রাঙা হয়ে ওঠে উষার আকাশ,
রূপসীর রাঙা কপোল সম—
স্বপন আবেশে ঢুলিছে তখনো
সবে-ঘুম-ভাঙা নয়ন মম!

*　　*　　*　　*

রাঙা কাঁকরের পথ চ'লে গেছে
দুরগিরি নদী বনের দেশে,
ধূমল শৈল নীলাকাশ সনে
গলা-গলি ক'রে উঠিছে হেসে।

ধীরে ধীরে হেসে উঠিছে পল্লী
সোনালী অরুণ-কিরণ-রাগে
সবে-ঘুম-ভাঙ্গা হাসি-রাঙ্গা-মুখে
শাল-বনে শিশু তরুরা জাগে!
কচি কিসলয়ে গ'লে পড়ে সোনা—
বন-টিয়া বনে উঠিছে গাহি'
মোরা চলিয়াছি রাঙ্গা কাঁকরের
উঁচু-নীচু বাঁকা পথটি বাহি'!
পথের দু'পাশে ছোট ছোট শিলা
উদগ্রীব যেন কৌতূহলে
নীচে ক্ষীণ-তোয়া উপল-বহুলা
কত গিরি-নদী বহিয়া চলে!
পথ চ'লে গেছে—দু'পাশে পাহাড়—
দূরে সুবর্ণ-রেখার বালু
উপত্যকার মায়া মনোলোভা
অধিত্যকায় হয়েছে ঢালু!
স্বাস্থ্যের গীতি গাহিছে পবন,
মঙ্গলতায় আকাশ আলো,
স্বাস্থ্য-সুষমা-আশীষ-ধন্য
নর-নারী চোখে লাগিছে ভালো!
ভালো লাগিতেছে পাতার কুটীর,
অনাড়ম্বর জীবন-গতি,
ভালো লাগিতেছে কুলি ও দুর্গা,
পাহাড়ী দেশের চন্দ্রাবতী!

(সন্ধ্যায়)

স্বপনের মত নামিছে সন্ধ্যা
ক্লান্ত চাঁদের জ্যোছনা বেয়ে—
আকাশের আঁখি ঘুমে ঢুলু ঢুলু
নীরবতা আসে ভুবন ছেয়ে!

কানন-ভূমির আননখানিতে
খেলে আলো-ছায়া জ্যোস্না রাতে!
নিম্নে তটিনী আল্পনা আঁকে
কত কথা কহে কল্পনাতে!
বলে নদী মোরে "রহ মোর ক্রোড়ে
ঘর বাঁধো বন-বিজন-ভূমে
দেখিবে তোমার শ্রান্ত নয়ন
আমি ভরি' দিব মধুর ঘুমে!
শীতল পরশে জুড়াবো তোমার
তপ্ত ললাট, ক্লান্ত দেহ—
মোর বন ছায়া রচি শ্যাম-মায়া
বিতরিবে নিতি শীতল স্নেহ!
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ষড়ঋতু ভরি' ফুলের ভারে
মোর বনবালা করে ফুলমালা
দাঁড়াবে তোমার কুটীর দ্বারে!
মোর চন্দনা, হরিয়েল, বোনা,
মোর কুরঙ্গ কানন-চারী —
বনপথে পথে পথ ভুলাইয়া
বনের বিতানে দিবে সে ছাড়ি।"

* * * *

পায়ে কুলু কুলু কলভাষী নদী—
আমি দেখি চাঁদ এসেছে কাছে,
শাল তরুগুলি কচি মুখ তুলি'
সেই চাঁদ মুখে চাহিয়া আছে!
এ ঘাটশিলার সবই জীবন্ত
তারকারা এসে মিতালী করে,
বন কথা কয়, নদী হেসে বয়,
হাওয়া এসে বুকে জড়ায়ে ধরে!

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বুদা-পেশ্‌ৎ

মজর জাতির উৎপত্তি বিষয়ে আগে ইউরোপের লোকেদের ধারণা ছিল যে তারা হূণ-বংশোদ্ভব, যে হূণ জাতি একসময়ে একদিকে ভারতবর্ষ আর অন্য দিকে ফ্রান্স-পর্য্যন্ত রোম-সাম্রাজ্য, এই সবটা জুড়ে বিস্তীর্ণ ভূভাগ আক্রমণ ক'রে বিধ্বস্ত ক'রে দিচ্ছিল। এখন, হূণেরা হ'চ্ছে তুর্কীদের পূর্ব্বপুরুষদের জাতি; সুতরাং, এই মত অনুসারে, তুর্কী আর মজর, এরা হ'চ্ছে পরস্পরের জা'ত-ভাই, জ্ঞাতি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে, হূণদের দাপটে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের গুপ্ত সাম্রাজ্য আর পশ্চিমে ইউরোপের রোমক-সাম্রাজ্য ভয়ে কম্পমান ছিল। ইউরোপে Attila আত্তিলা নামে হূণ-রাজ রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টায় ছিল; একটা ভীষণ যুদ্ধে রোমান আর জরমানদের সমবেত শক্তির কাছে কিন্তু তার পরাজয় হয়; তার পরে খ্রীষ্টীয় ৪৫৩ সালে তার মৃত্যু হয়, সেই সময় থেকে হূণদের প্রতাপ ইউরোপে একেবারে শেষ হ'য়ে যায়। আত্তিলার হূণেরা আধুনিক হঙ্গেরী দখল ক'রে ছিল, সেই জন্যেই এই দেশের নাম হয় "হুন্ (বা হূণ) গারিয়া," ইংরিজি উচ্চারণে "হঙ্গেরি"। আত্তিলার মৃত্যুর পরে, হূণ জাতির ক্ষমতা নষ্ট হ'ল,—এরা হয় বিনষ্ট হ'ল, নয় ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হ'ল; হঙ্গেরি দেশ তখন এদেরই জ্ঞাতি Avar "আভার" নামে একটী তুর্কী জাতির দখলে এল। খ্রীষ্টাব্দ ৪৫০-এর পর থেকে ৩০০ বৎসর ধ'রে আভারেরা হঙ্গেরিতে বাস ক'রতে থাকে। এরা বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ জা'ত ছিল, প্রায় সমস্ত মধ্য-ইউরোপে এদের কব্‌জায় এসেছিল, আর একাধিকবার এরা কনস্তান্তিনোপল প্রায় দখল ক'রেই ফেলেছিল। এরা খ্রীষ্টান ছিল না। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সের রাজা শার্ল্‌মেন্ ফ্রেঞ্চ আর জরমান জা'তকে নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য পশ্চিম ইউরোপে গ'ড়ে তুল্‌লেন, তখন তাঁর নজর প'ড়্‌ল এই অ-খ্রীষ্টান, অন্-আর্য্যভাষী, আর ইউরোপের চোখে বর্ব্বর, আভার জাতির উপর। তিনি এদের সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্য কোমর বেঁধে লাগ্‌লেন। আট বছর ধ'রে টানা লড়াইয়ের পরে, আভার জাতি পরাজিত আর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল; পশ্চিম ইউরোপীয়েরা এদের কোনও দয়া দেখায় নি—প্রায় সমগ্র জাতিকে হত্যা করে। অল্প স্বল্প আভার কোনও মতে প্রাণ নিয়ে হঙ্গেরির পশ্চিম সীমান্তে ত্রান্‌সিল্‌ভানিয়ার পাহাড়ে আর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পায়।

সমগ্র হঙ্গেরি দেশ এই ভাবে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে খালি হ'য়ে যায়। তখন মজরেরা এল। আসলে, মজরেরা
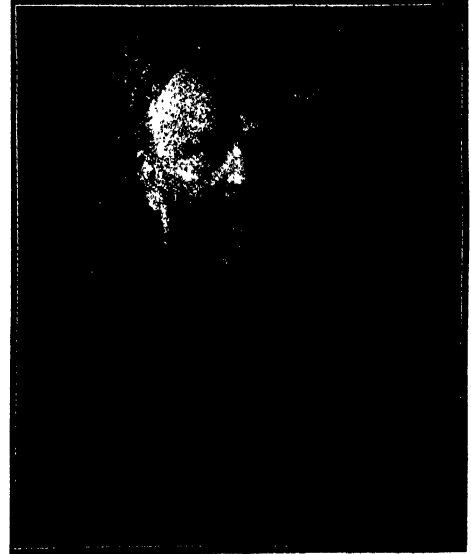
Ferenc Zajti ফেরেন্‌ৎস্ জ-য়্‌তি।

হূণদের কেউ নয়—হূণ, আভার, তুর্কী, এদের সঙ্গে মজরদের রক্ত-সম্পর্ক আর ভাষাগত সম্পর্ক অনেক দূরের। মজরেরা ভাষায় হ'চ্ছে Finno-Ugrian ফিন-উগ্রীয় শাখার; ফিনলাণ্ডের Finn ফিন্ ভাষা, এস্তোনিয়ার Est এস্‌ৎ, লাপলাণ্ডের Lapp লাপ্, আর রুষদেশের উত্তর অঞ্চলের কতকগুলি ভাষা, যথা—Mordvin, Cheremis, Votyak, Zyrien, Vogul, Ostyak ও Samoyed—মজর

ভাষার নিকট আত্মীয়; এই Finno-Ugrian শ্রেণীর ভাষার সঙ্গে, তুর্কী মোঙ্গোল মাঞ্চু প্রভৃতি Altaic আল্‌তাই-শ্রেণীর ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে—এই যা। যা হোক্, ইউরোপের আর্য্যভাষী জাতিদের সামনে, এশিয়া আর রুষ থেকে আগত, দূর-সম্পর্কে জ্ঞাতি, হূণ তুর্কী আর মজরদের এক শ্রেণীতে ফেলে, তাদের এক গোষ্ঠীর বলা যেতে পারে। মজরেরা আভারদের খালি দেশ হঙ্গেরিতে এল; আভার যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে ছিল, তারা এদের সঙ্গে যোগ দিলে—ক্রমে তারা নবাগত মজরদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেল। এরা খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যে হঙ্গেরি দেশটা দখল ক'রে তাতে উপনিবিষ্ট হ'য়ে ব'স্‌ল। উর্ব্বর দেশ, বীরের জাতি; এরা শীঘ্রই দেশটাকে আপনার ক'রে ফেল্‌লে। মজরেরা প্রথমটায় খ্রীষ্টান ছিল না; এরা Isten "ইশ্‌তেন্" নাম দিয়ে, এক পরমেশ্বরের পূজো ক'রত, তাঁর উদ্দেশে গোমেধ অশ্বমেধ ক'র্‌ত। এদের লড়াইয়ের রীতি আর বীরত্ব এমন ছিল যে পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা এদের কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে না। রাজা আর্পাদ-এর আমলে এরা বেশ সুসংগঠিত হয় (দশম শতক)। তার পরে খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে এরা এদের রাজা Istvan ইশ্‌ৎভান বা Stephan স্তেফান-এর দেখাদেখি খ্রীষ্টান হয়; যারা এই নোতুন ধর্মের বিরোধী ছিল, তারা বিদ্রোহ করে, কিন্তু শেষটায় তাদের হার হয়। তার পর থেকে, ভাষায় সম্পূর্ণরূপে অন্য হ'লেও মজরেরা ইউরোপের সভ্য জাতিদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গিয়েছে—মজরেরা প্রাণপণে ল'ড়ে মুসলমান তুর্কীদের হাত থেকে পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টানী সভ্যতাকে রক্ষা ক'রেছে।

মজরেরা দুর্দ্ধর্ষ হূণ জাতির উত্তরাধিকারী ব'লে নিজেদের মনে করে—তা থেকে তাদের অনেকের মনে এ ভাব ক্রমে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়, যে রক্তেও তারা হূণ। এই বিষয়ে তারা বড় গর্ব্ব অনুভব করে। অবশ্য, যে সব মজর শিক্ষিত লোকে তাঁদের ভাষার আর জাতির সত্য ইতিহাস জানেন, তাঁরা আর হূণ বা তুর্কী সম্পর্কের কথা টেনে এনে আভিজাত্য বাড়াবার চেষ্টা করেন না,—তাঁরা Finno-Ugrian-ভাষী সভ্য আর অর্দ্ধ-সভ্য অন্য জাতিগুলির ভাষা আর সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদের প্রাচীন কথার চর্চ্চা করেন; মজরদের জ্ঞাতি ফিন্‌লাণ্ডের অধিবাসী ফিনেরা এ বিষয়ে মজর পণ্ডিতদের সাহচর্য্য ক'রে আসছেন। কিন্তু হূণ জাতি আর এশিয়া—এদের মোহ অনেক মজর এখনও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। বিশেষতঃ হূণেরা মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল, আর টড্ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক ঐতিহাসিক ব'লে গিয়েছেন যে ভারতের অসাধারণ শৌর্য্য আর দেশাত্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত রাজপুত জাতি অল্প বা বহুল পরিমাণে হূণদেরই বংশধর; ভারতের হূণবংশধর রাজপুত, আর হঙ্গেরির হূণ-বংশধর মজর—এই দুই জাতির বংশগত ঐক্যের কথা বা কল্পনা ভারত-প্রেমী বহু মজরের চিত্তে আনন্দ দেয়।

একশ' বছরের বেশী হ'ল, Sa'ndor Csoma Ko"ro"si শান্দোর্ চোমা ক্যোর্যোশি নামে এক মজর পণ্ডিত ভারতে আসেন, ভারতে মজরদের (অর্থাৎ তখনকার প্রচলিত বিশ্বাস-মত মজরদের পূর্ব্বপুরুষ হূণেদের) প্রাক্‌কথা কিছু জান্‌তে পারেন কিনা, সেই সন্ধানে। ক্যোর্যোশি ভারতবর্ষে কিছুকাল বাস করেন; তার পরে তিনি হিসেব ক'রে দেখ্‌লেন, মধ্য এশিয়া আর তিব্বতে গিয়ে সন্ধান করা উচিত। দার্জিলিঙের পথে তিনি তিব্বতে গেলেন, আর সেখানে গিয়ে তিনি তিব্বতী ভাষা শিখ্‌লেন। আধুনিক ইউরোপীয়দের মধ্যে এইরূপে তিনি প্রথম তিব্বতীর আর তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মের পণ্ডিত হ'লেন; মজর জাতির ইতিহাস কিছু পেলেন না, কিন্তু তিনি আধুনিক প্রাচ্যবিদ্যার শাখা স্বরূপে প্রাচীন ভোট বিদ্যার স্থাপনা ক'রলেন। ক'লকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারায় ক্যোর্যোশির প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়; এঁর ব্যক্তিত্ব আর কাজকে অবলম্বন ক'রে, ক'লকাতার এশিয়াটিক্ সোসাইটী আর হঙ্গেরির বিজ্ঞান ও সাহিত্য-পরিষদ্, এই দুই পণ্ডিত সভার মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়—হঙ্গেরির পরিষৎ থেকে ক্যোর্যোশির এক মর্ম্মরমূর্ত্তি, আর একটী বৃহৎ ও সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত এক পিতলের দোয়াত-দান সোসাইটীতে উপহার স্বরূপ প্রেরিত হয়—এগুলি এখনও ক'লকাতার সোসাইটীতে আছে।

চোমা ক্যোর্যোশি ১৮৪২ সালে মারা যান, দার্জিলিঙে। তার পরে এই একশ বছরে মজরদের উৎপত্তি আর আদি ইতিহাস সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ব আর পুরাতত্ত্ব সত্য সংবাদটা খুঁজে বা'র ক'রেছে;—কিন্তু তবুও অনেক হঙ্গেরিয়ান এখনও

হুণ আর ভারতের নামের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছে না। এইরূপ দু'জন হঙ্গেরীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেশেই দেখা হ'য়েছিল—এবার বুদা-পেশ্‌ৎ-এ গিয়ে আবার এঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

এঁদের মধ্যে একজন হ'চ্ছেন Ferenc Zajti ফেরেন্‌ৎস্‌ জ-য়্‌তি। চেহারা দেখলে ষাট বছর বয়স ব'লে মনে হয়,—সুন্দর গম্ভীর মুখশ্রী, লম্বা গোঁফ-দাড়ী, লম্বা দাড়ীর তলার দিকটা চৌকো ক'রে ছাঁটা, চোখে মুখভাবে একটা শিশুসুলভ সারল্য, সুগঠিত নাতিদীর্ঘ চেহারা; ভদ্রলোক শিষ্টতা আর সৌজন্যের অবতার। ইনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সাধারণ গ্রন্থাগারে কাজ করেন। এ ছাড়া ছবি আঁকেন, শিল্পকলায় ও কারুশিল্পে অনুরাগ আছে, প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'রে থাকেন। রাজপুতদের সঙ্গে মজরদের রক্তসম্পর্কে ইনি বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে গিয়ে রাজপুতানায় বহু জানপদ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভারতের এবং বিশেষ ক'রে রাজপুতানার শিল্পদ্রব্যের একটী নাতিবৃহৎ সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন; বেশীর ভাগ হ'চ্ছে পোষাক-পরিচ্ছদের—ভারতের সূচী-শিল্পের অপূর্ব্ব সুন্দর সব নমুনা; এই সংগ্রহটী তাঁর বসত-বাড়ীতে রেখে দিয়েছেন। রাজপুতানা অঞ্চলের ছবি এঁকেছেন অনেক—রাজপুতানার মেয়েদের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, লোকজনের জীবনযাত্রার ছবি; আর তা ছাড়া এঁকেছেন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর দু'চারখানা ছবি—রাধাকৃষ্ণ, শকুন্তলা, বুদ্ধদেবের উপাখ্যান নিয়ে। কতকগুলি ছবি চমৎকার—তাঁর কল্পনা আর শক্তি দুইয়েরই পরিচায়ক। এই সব ছবির ফোটো তিনি আমায় কতকগুলি উপহার দেন; এই সঙ্গে তার খানকতক প্রকাশিত হ'ল।

ভারতবর্ষের প্রতি জ-য়্‌তির ভালোবাসা যতখানি, তার সম্বন্ধে জ্ঞান ততখানি নেই। ভারতের সংস্কৃতি বা ইতিহাস আলোচনার কোনও সাধন তাঁর আয়ত্ত হয় নি—কোনও ভারতীয় ভাষা জানেন না, একবর্ণও না। ইংরিজি যা বলেন তা অতি কষ্টে-সৃষ্টে—আমাদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন। ভারতবর্ষ ঘুরে, স্বদেশে ফিরে গিয়ে, তিনি দেশের লোকেদের মধ্যে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন এই কথা ব'লে, যে তিনি রাজপুতদের মুখে শুদ্ধ মজর ভাষা শুনে গিয়েছেন—রাজপুতী ভাষা আর মজর ভাষায় কোনও তফাৎ নেই। শুনলুম, ব্যাপারটা হ'য়েছিল এই; তিনি রাজপুতানার একটী পাহাড়ে' অঞ্চলের গাঁয়ে যান। কতকগুলি পাহাড়ী লোক—ভীলদের জ্ঞাতি, মেড় বা মীনা জা'ত হবে—সাহেব দেখে তাঁর কাছে আসে। তিনি রাজপুত ছত্রী আর পাহাড়ী অনার্য্য—এদের মধ্যে পার্থক্য ক'রতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। ইনি নাকি এই পাহাড়ী লোকেদের কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমরা কে?" তারা রাজস্থানী বুলীতে উত্তর দেয়—"আমরা পাহাড়ের লোক।" এখন রাজপুতী বুলীতে

রাজস্থান-কন্যা—হঙ্গেরীয় চিত্রকর জ-য়্‌তি অঙ্কিত।

পাহাড়কে "মাগ্‌রো" বলে। উনি কানে "মাগ্‌রো" শব্দ শোনেন, আর স্থির ক'রে নেন যে ওরা ব'লছে যে ওরা হ'চ্ছে "মাগ্‌রো" বা "মাগ্যার" অর্থাৎ "মজর" জাতীয় লোক। বুদা পেশৎ-এ আর দু'চারজন লোক যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়, কথাবার্ত্তায় মনে হ'ল, তারা জ-য়্‌তির মতে বিশ্বাসী। তবে এটাও সত্য, এঁর কথার বা মতের প্রতিবাদ করেন এমন পণ্ডিত ও মজরদের মধ্যে আছে।

যেদিন বুদা-পেশ্‌ৎ পঁউছুই সেদিনই রাত্রে জ-য়্‌তি আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর বাড়ীতেও নিয়ে যান। ছবিতে বইয়ে ভরা, ভারতীয় সূচীশিল্পময় বস্ত্রে জরীর কাপড়ে মূর্ত্তি প্রভৃতির সমাবেশে সুন্দর উপরের তলায় তাঁর পড়বার আর কাজ করবার ঘর। তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন, তাঁর সংগৃহীত শিল্পদ্রব্য দেখালেন। কথা কইতে কইতে টেলিফোন বেজে উঠল। মজর ভাষায় জ-য়্‌তি আলাপ ক'রতে লাগলেন। দুই একটী জরমান আর ইংরেজী কথায় আলাপের আশায় বুঝতে পারলুম—ভারতীয় ভাষাবটিত কি একটা প্রশ্ন ক'রে তাঁর মত চাইছে। "বুদ্ধ", আর বৃদ্ধ-বাচক "বুড্‌ঢা" শব্দ নিয়ে মামলা—যতদুর মনে হ'চ্ছে। জ-য়্‌তি খুব তড়বড় ক'রে নানা কথা ব'ললেন, দু-একবার ছুটে গিয়ে দুখানা ডিক্‌শনারিও ঘাঁট্‌লেন। শেষে আমার শরণাপন্ন হ'লেন—আমি দুইটী শব্দের পার্থক্য লিখে দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম। তিনি ফোনে জানিয়ে দিলেন, খাস ভারতবর্ষ থেকে এক প্রফেসর এসেছেন, তাঁর মত এই।

জ-য়্‌তি তাঁর মনের কথা আমায় ব'ল্‌লেন। হঙ্গেরিতে যে রকম অবস্থা, তাতে আর ভদ্রলোকের সেখানে বাস করা সম্ভবপর হবে না। ইহুদীরা সব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব শুরু ক'রে দিয়েছে—(ইহুদীদের উপরে বিরাগের অন্য প্রমাণও বুদ্‌-পেশ্‌ৎ-এ পেয়েছি)—তাঁর ইচ্ছা, তিনি জীবনের বাকী অংশ ভারতবর্ষে গিয়ে কাটান। তাঁর এইসব ছবি, এই শিল্পসংগ্রহ,—এ সমস্ত দিয়ে, কোনও দেশী রাজ্যে—বিশেষ ক'রে কোনও রাজপুত রাজ্যে—তিনি একটী সংগ্রহশালার পত্তন ক'রতে পার্‌লে খুশী হন। নিজের সব ছবি আর জিনিস দিয়ে যে সংগ্রহশালা হবে, তাতে তিনি অল্প মাইনেতে কিউরেটর বা অধ্যক্ষ হ'তে চান; এই অধ্যক্ষতা ক'রে বাকী জীবন ভারতবর্ষেই কাটিয়ে দেবেন। আবু পাহাড়ের বিখ্যাত হ্রদের ধারে, জনৈক দেশী রাজার একটী সুন্দর বাড়ী আছে। সেই বাড়ীটী তাঁর বড় পছন্দ হ'য়েছে, সেই রকম একখানি বাড়ীতে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। আমাকে অনুরোধ ক'রলেন, ভারতবর্ষে এইভাবে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রতে আমি দেশে ফিরে এসে তাঁকে যেন সাহায্য করি। তাঁকে আমি বোঝাতে পারলুম না, যে এরকম ব্যাপারে সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত।

জ-য়্‌তির ধারণাগুলি যাই হোক্‌, মানুষটী চমৎকার; এরূপ একটী ভদ্র ও সরল মনের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা সচরাচর ঘ'টে ওঠে না। বুদা-পেশ্‌ৎ-এর নাম ক'রলেই আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে জ-য়্‌তির শ্মশ্রুমান সৌম্য মূর্ত্তি প্রথমেই মনে জাগে।

অধ্যাপক Istvan Medgyaszay ইশ্‌ৎভান মেদ্‌গ্যাসাই (বা মেজ্জসাই) হ'চ্ছেন বুদ্‌-পেশ্‌ৎ-এর একজন নামী পূর্ত্তকার আর গৃহনির্ম্মাতা, আর স্থানীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি ভারতবর্ষে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন এঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল ব'ল্‌লেন, কিন্তু কোথায় তা আমার মনে ছিল না,—খুব সম্ভব শান্তিনিকেতনে। ইনিও ভারতের প্রতি অসীম অনুরাগসম্পন্ন। অধ্যাপক মেজ্জসাইকেও সুভাষবাবু পত্র লিখেছিলেন, তাই ইনি আমার হোটেলে ফোন করেন, আর হোটেলে এসে দেখাও করেন। এঁর চেষ্টায়, হঙ্গেরীয় এন্‌জিনিয়র আর আর্কিটেক্ট অর্থাৎ পূর্ত্ত ও বাস্তুকারদের পরিষদে (হঙ্গেরীয় ভাষায় এই পরিষদের নাম হ'চ্ছে Magyar Me'rno"k e's E'pite'sz-egylet) আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৮ই জুন বিকালে এই পরিষদের নিজস্ব বিরাট বাড়ীতে গিয়ে, স্লাইড দেখিয়ে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা দিই। বক্তৃতায় জন ৪০।৫০ লোক ছিল। বুদা-পেশ্‌ৎ-এর মত এত দূর শহরে ইংরিজি বুঝতে পারে এমন ৪০ জন লোক পাওয়া গেল। তা থেকে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ আর ইংরিজি ভাষার প্রসার সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া গেল। অধ্যাপক মেজ্জসাই ভাল ইংরেজি ব'লতে পারেন না, কাজ-চালানো গোছ ইংরিজি জানেন, তিনি আমাকে খাতির ক'রে ইংরিজিতে অংশতঃ বক্তৃতা ক'রলেন। দিল্লী থেকে আগত একটী ভারতীয় ছোকরা তখন বুদা-পেশ্‌ৎ-এ ছিল, হকি খেলোয়াড়, সে জনকতক হঙ্গেরীয় বন্ধুর সঙ্গে আমার বক্তৃতার খবর পেয়ে এসেছিল—খবরের কাগজে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'য়েছিল, তার হঙ্গেরীয় বন্ধুরা প'ড়ে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল।

অধ্যাপক মেজ্জসাই আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর তৈরী একটী মেয়ে-স্কুলের বাড়ী দেখাতে। মেয়েদের বোর্ডিং-ইস্কুল। বাড়ীখানি পাথরে তৈরী, খুব বড় হাতার মধ্যে—বাগান, ফোয়ারা, খেলবার জায়গা। বাস্তুরীতি, নোতুন ধরণের

—তবে মধ্যযুগের খ্রীষ্টানী ছাপ থাকায় একটু সেকেলে ভাবও ছিল। তাঁর নিজের বাড়ীতেও নিয়ে যান। এরা বসত-বাড়ী বা অন্য ইমারত যখন তৈরী করে, তখন গাছ-পালা, থরে থরে সাজানো বাগান প্রভৃতি দিয়ে বাড়ীটাকে বস্তু-সৌন্দর্য্য আর প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক এই দুই মিলিয়ে অপূর্ব্ব রমণীয় ক'রে তোলে। জমীতে দুই একটা বড়ো গাছ থাকলে, সেই গাছ এরা কাটে না, তাকে বাড়ীর শোভার অংশ ক'রে তোলে।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে নিজাম বাহাদুরের দেওয়া টাকায় ইস্লামিক বিদ্যার অধ্যাপকের যে পদ স্থিরীকৃত হ'য়েছে, Julius বা Gyula Germanus য়ুলিউস্ (বা গুলা) গের্মানুস্ নামে একটা হঙ্গেরীয় অধ্যাপক সেই পদে নিযুক্ত হ'য়ে আসেন, এক বৎসর সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে কাটান। ভদ্রলোক তুর্কী আর আরবী ভাষায় পণ্ডিত, পারসী উর্দ্দু জানতেন না। ইনি ইহুদী জাতীয়। শান্তিনিকেতনে এঁর অবস্থান-কালে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, আরবী তুর্কী প্রভৃতি ইস্লামীয় ভাষা আর সাহিত্য বিষয়ে আমার একটু অনুরাগ আছে ব'লে এঁর সঙ্গে অনেকটা হৃদ্যতাও হয়। তুর্কী ভাষায় কামাল-পাশার হুকুমে যখন রোমান অক্ষরের ব্যবহার এল, তখন এ বিষয়ে এঁর সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হ'ত; আরবী উচ্চারণ তত্ত্ব নিয়ে, তুর্কী আরবী সাহিত্য নিয়ে, ভারতীয় মুসলমান ও অ-মুসলমান জাতিদের মধ্যে ফারসী আর আরবীর প্রভাব নিয়ে, এঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা চ'লত। গের্মানুস্ এই সব বিষয়ে বেশ সদালাপী লোক ছিলেন। শান্তিনিকেতনে কিন্তু তিনি তেমন লোকপ্রিয় হ'তে পারেন নি। ইনি ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টামূলক রাজনৈতিক আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখতেন না;—অনেক সময়ে আমাদের সামাজিক অসঙ্গতি আর অনিয়মগুলিকে ইনি মিস্ মেয়োর দৃষ্টিতেই দেখতেন। ইনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চ'লে যাবার পূর্ব্বে এঁর সম্বন্ধে একটা গুজব শুনি যে ইনি মুসলমান হ'য়েছেন,—আর হজে গিয়ে মক্কা মদীনা দেখে আসবার মতলবে আছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে এঁর হজে যাওয়া ঘটে নি। ইনি সপরিবারে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ ফিরে যান।

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ পৌছে আমি অধ্যাপক গের্মানুস্-এর খোঁজ করি। গের্মানুস্ সম্বন্ধে শুনলুম যে তিনি মুসলমান হ'য়ে—বা মুসলমান ব'লে পরিচয় দিয়ে—মক্কা মদীনা হ'য়ে এসেছেন—এখন তিনি "অল্-হাজ" বা হাজী গের্মানুস। হজ ক'রে আসবার পরে তিনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এ তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন—হঙ্গেরিতে তিনি ইসলাম জগৎ সম্বন্ধে একজন "অথরিটি"—একপত্রী। যাঁদের কাছে শুনলুম তাঁর কথা, তাঁরা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হ'লেও, কেমন যেন তাঁর কথা এড়িয়ে চ'লতে চান। গের্মানুস

রাধা-কৃষ্ণ—হঙ্গেরীয় চিত্রকর জয়তি অঙ্কিত।

যে জা'তে ইহুদী, সে কথাও বারবার শুনিয়ে দিলেন। ইংরিজি কথায়—গের্মানুস্ সম্বন্ধে এঁদের একটু "সুশীতল ভাব"। কিন্তু পূর্ব্ব পরিচয় আর হৃদ্যতার জন্য আমাকে তো এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতেই হবে—আর গের্মানুস্ বেশ ভাল ইংরিজি ব'লতে পারেন, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে পাঁচটা বিষয়ে আলাপ ক'রে একটু সুখ পাওয়া যাবে। অধ্যাপক মেজ্জসাই আমায় ব'ল্‌লেন, বুদাতে Szent Luka'cs Gyo'gyfu"rdo" "সেন্ত্ লুকাচ্ জোজ্‌ফ্যর্দ্যো" নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার লাগাও হোটেলে একটী সমিতির এক অধিবেশন হবে, সেই অধিবেশনে অধ্যাপক গের্মানুস্ বক্তৃতা দেবেন; তিনি আমাকে সেই বক্তৃতায় নিয়ে যাবেন, সেখানে গের্মানুস্-এর সঙ্গে দেখা হবে। বক্তৃতা অন্তে সমিতির সভ্যদের এক ডিনার হবে, অধ্যাপক মেজ্জসাই সমিতির সভ্য হিসেবে, আমাকে তাঁর অতিথি স্বরূপে নিয়ে যাবেন।

এখন বুদা-পেশ্‌ৎ-এ কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেগুলির জলে প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকে, সেই সব জলে স্নান, বা জলপান, স্বাস্থ্যের পক্ষে, চিকিৎসার পক্ষে খুবই উপকারী। আমাদের দেশে যেমন এই সব উষ্ণ প্রস্রবণ দেবতার নামের সঙ্গে জড়িত ক'রে দিয়ে, পবিত্র তীর্থ-রূপে স্থাপিত করা হয়—যেমন চন্দ্রনাথে বক্রেশ্বরে রাজগিরে সীতাকুণ্ডে করা হ'য়েছে—তেমনি হঙ্গেরিতে আর ইউরোপের অন্য স্থানে খ্রীষ্টান সাধু বা সিদ্ধা বা দেবতাদের নামের সঙ্গে জড়িত করা হয়। আজকাল এসব তীর্থের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অঙ্গ আর নেই—খ্রীষ্টান সাধু বা দেবতার নামগুলো যা আছে; লোকে স্বাস্থ্যের জন্য এসব জায়গায় আসে—স্নান করে, জলপান করে, ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকে। প্রস্রবণগুলির জল চৌবাচ্চায় ফেলা হয়, তারপরে নলে ক'রে নানা হোটেলে বা স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া হয়, স্বাস্থ্যকামীরা এই সব হোটেলে থাকে, জল-চিকিৎসা চালায়। বহু ক্ষেত্রে এই সব প্রস্রবণের হোটেলকে কেন্দ্র ক'রে সামাজিক আর অন্য প্রকারের মেলামেশা আর আমোদ-প্রমোদ করবার জায়গা গ'ড়ে ওঠে। Szent Luka'cs Gyo'gyfu"rdo" এইরকম একটী স্থান।

যথাসময়ে আমরা লুকাচ্-স্নানাগারের হোটেলে উপস্থিত হ'লুম্। দানুব নদীর ধারে এক বাগানের মধ্যে মাঝারী আকারের এক প্রাসাদ—সেকেলে ধরণের, দেখতে খুবই সুন্দর আর আভিজাত্যপূর্ণ। বাইরে বাগানে খোলা জায়গার মধ্যে সব টেবিল চেয়ার পাতা—অভ্যাগতদের পান-ভোজনের জন্য। রাত্রের "বড় খানা"-র (ডিনারের) জন্য খানিকটা জায়গায় প্রায় শতখানেক কি সওয়া শ' লোকের আয়োজন হ'চ্ছে—টেবিল-চেয়ার ছুরী-কাঁটা ফুল সাজানো হ'চ্ছে, কালো সান্ধ্য পোষাক প'রে খিদমদগাররা ঘোরাঘুরি ক'রছে। প্রাসাদের দোতালায় একটা বিরাট দালান-ঘর; বড় বড় ঝাড়, ছবি,—সেকেলে প্রাসাদের বন্দোবস্ত। হোটেলে এসে যারা চিকিৎসার জন্য বা বাসের জন্য থাকে, তাদের জন্য এই প্রাসাদের লাগাও অন্য বাড়ী আছে; প্রাসাদটী এইরূপ সভা-সমিতির জন্য বা উৎসবাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

সভার কার্য্য আরম্ভ হবার একটু আগে আমরা পৌঁছুলুম, কারু সঙ্গে বিশেষ আলাপ তখন হ'ল না। সভার সভাপতি ছিলেন ভূতপূর্ব্ব অস্ট্রিয়া-হঙ্গেরি সাম্রাজ্যের রাজবংশের একজন কুমার। হঙ্গেরিতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হ'লেও, হঙ্গেরীয় জাতি মনে প্রাণে রাজতন্ত্রই চায়। ভূতপূর্ব্ব রাজপরিবারের লোকেদের প্রতি এদের অসীম অনুরাগ। সভাপতি রাজকুমারটী ফৌজী পোষাক প'রে এসেছিলেন। কাঠের উঁচু বেদিতে একটী লম্বা টেবিলের সামনে সভাপতি, বক্তা আর অন্য কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'স্‌লেন। বক্তা ব'সে ব'সেই বক্তৃতা দিলেন। মজর ভাষায় বক্তৃতা—তার কিছুই বুঝতুম না, যদি না তাতে প্রচুর জরমান আর ফরাসী শব্দ থাকত। এই সব আন্তর্জ্জাতিক শব্দ থাকায় বুঝলুম, "পান্-ইস্‌লামিজম্", ইংরেজ আর ফরাসীদের সঙ্গে ঐ পান্-ইস্‌লামিজম্‌বাদের যোগ, মুসলমান জগতের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, এই সব বিষয়ে বক্তৃতা হ'চ্ছে।

বক্তৃতা আরম্ভ হবার পরে দেখি, কেজ মাথায় তিন মূর্ত্তি সভাগৃহে ঢুকে আমারই চেয়ারের পিছনে খালি চেয়ার ছিল তাতে ব'স্‌লেন। এঁদের মধ্যে দুজন ভারতীয় মুসলমান ছিলেন—মৌলবী-মোল্লা টাইপের চেহারায়ই মালুম হ'ল; আধ ময়লা রঙ, পাতলা রোগা চেহারা, বড় বড় চোখ, উপরের গোঁফ ছাটা, অল্প-সল্প দাড়ি, গায়ে কাল রঙের আচকান, মাথায় লম্বা কালচে-লাল তুর্কী টুপি; এরূপ

মূর্ত্তি ও বেশভূষা ভারতের বাইরেকার মুসলমান জগতে দুর্লভ। তৃতীয় ব্যক্তিটী যে ইউরোপীয় মুসলমান, তা তার লাল টকটকে মুখের রঙে আর টুপীর রঙে বুঝতে দেরী হয় নি। দু দুজন স্বদেশীয়কে এখানে দেখে একটু প্রীত ও বিস্মিত হ'লুম,—কৌতূহলও হ'ল। পকেট থেকে কলম কাগজ বার ক'রে, উর্দুতে লিখে ভদ্রলোকদের দিকে এক-টুকরো কাগজ চালিয়ে দিলুম—"মৈঁ কলকত্তে সে আয়া হূঁ, সৈর করনেকো নিকলা, তীন রোজ হূএ য়হাঁ পহুঁছা। আপলোগ কহাঁসে তশরীফ লে আতে হৈঁ? কব্ আয়ে?" ওঁরা প'ড়ে জবাব লিখে দিলেন—"হমলোগ হৈদরাবাদ-দকন সে আতে হৈঁ, we are world-tourists." গেমান্দুস্-এর বক্তৃতা চুকে গেলে, যখন হল খালি হ'চ্ছে তখন আমি এই ভদ্রলোক তিনজনের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলুম। ফেজ-পরা ইউরোপীয় ভদ্রলোকটী তাঁর কার্ড দিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন—তিনি হ'চ্ছেন Husain Hilmi Durich, Grand Mufti of Buda—বুদা-পেশ্‌ৎ তথা হঙ্গেরির মুসলমানদের বড় মুফ্‌তী, অর্থাৎ কর্ত্তা বা মুরুব্বি। হাজারের ঢের কম সর্বিয়ান আর মজর মুসলমান মজর-রাষ্ট্রে বাস করে; মজর সরকার এদের উপরে একজন কর্ত্তা নিযুক্ত ক'রেছেন, তিনি এদের সব ঘরোয়া ব্যাপারে, ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে 'মুখিয়া' বা প্রধানের কাজ করেন। লোকটী খুব লম্বা-চওড়া চেহারার; বেশ দিল-খোলা হাসি; একটু একটু ইংরেজি জানেন। ভারতীয় মুসলমান ভদ্রলোক দুটীকে এঁর পাশে নিতান্ত বেঁটে-খাটো দুবলা-পাতলা দেখাচ্ছিল। এঁরা ব'ললেন, ভারতবর্ষ থেকে ইংলাণ্ড ফ্রান্স জরমানি অস্‌ট্রিয়া ঘুরে এঁরা বুদা-পেশ্‌ৎ-এ এসেছেন, বুদা-পেশ্‌ৎ থেকে যাবেন রেল-যোগে যুগোস্লাবিয়ার রাজধানী বেওগ্রাদ, তারপরে বলকান্-রাষ্ট্রগুলির কোন কোন অংশ ঘুরে, তুর্কীদেশ কন্‌স্তান্তিনোপল, আঙ্কারা (আঙ্গোরা) হ'য়ে, শাম বা সিরিয়া আর ফলস্তীন অর্থাৎ পালেষ্টীন আর মিসর দেখে, তবে দেশে ফিরবেন। এঁরা খুলে না ব'ললেও অনুমান ক'রলুম, ইউরোপের বলকান্ অঞ্চলে মুসলমান তুর্কীর দ্বারা বিজিত ও অধ্যুষিত দেশ দেখবার জন্য, কতকটা তীর্থযাত্রীর ভাবে, এঁরা বেরিয়েছেন—এই সব অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থাও কতকটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রবেন, আর সিরিয়া পালেষ্টীন মিসর প্রভৃতি আরব দেশ ঘুরে যাবেন। মুফ্‌তী-সাহেবকে আমার কার্ড দিলুম—দেবনাগরীতে আর ইংরিজিতে আমার নাম আর পরিচয় ছাপিয়েছি, আর কার্ড, বিলিতি ভিজিটিং-কার্ড নয়—বিক্রমপুর আড়িয়লের সাদা আর হ'লদে মোটা তুলট কাগজ কেটে এই কার্ড তৈরী করে নিই। এই দেশী কাগজ আর দেবনাগরী লিপি আমার পরিচয়-পত্রে ইউরোপের ভদ্রব্যক্তিদের চোখে একটু বৈশিষ্ট্য আন্‌ত—অনেকে এই কার্ডের অক্ষর, আর তার

পনিহারিন্—হঙ্গেরীয় চিত্রকর জ-য়্‌তি অঙ্কিত।

কাগজ সম্বন্ধে প্রশ্নও ক'রত। আমি ছাত্রাবস্থায় জরমানিতে আমার কার্ড দেবনাগরীতে আর ইউরোপীয় অক্ষরে প্রথম ছাপাই। লণ্ডনে আর পারিসে, এই দু জায়গায় যত মিসরী, চীনা, জাপানীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, দেখি, তাদের কার্ডে রোমান অক্ষরে তো পরিচয় থাকেই—উপরন্তু তাদের জাতীয়তার পরিচায়ক স্বরূপ, আর কার্ডের অলঙ্করণ স্বরূপ,

নিজ নিজ মাতৃভাষার অক্ষরেও নামধামাদি দেওয়া থাকে। তাই, নিজের ভারতীয় জাতীয়তার বর্ণ বা লিপিময় প্রকাশকেও দেখাবার জন্যে—কার্ডের মধ্যে কতটা জাতীয় আত্মসম্মানবোধকে মূর্ত্তি দেবার জন্য—আমি দেবনাগরীও ব্যবহার ক'রে থাকি। (ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য রোমান বর্ণমালার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি যে অনুকূল মত পোষণ করি, আপাত-দৃষ্টিতে তার সঙ্গে আমার কার্ডে ভারতীয় দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহারের একটা অসামঞ্জস্য লাগবে;—কিন্তু এইপ্রকার অলঙ্করণ-রূপে, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উদ্দেশ্যে ভারতীয় লিপির ব্যবহারের সঙ্গে, সাধারণভাবে দৈনন্দিন কার্য্যে রোমান বা ভারতীয়-রোমান লিপি ব্যবহারে কোনও অসমঞ্জস্য আমি দেখি না)। মুফ্‌তী-সাহেব আমার কার্ড দেখলেন, আমার স্বদেশীয় মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয়ও দেখলেন, তারপরে মুফ্‌তী আমাকে দেবনাগরী লিপি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন—আমি ব'ললুম, ও হ'চ্ছে হিন্দুস্থানে ব্যবহৃত দেশীয় অক্ষর। ইতিমধ্যে কতকগুলি মহিলা আর ছোট ছেলে এসে হাজির—অটোগ্রাফের খাতা খুলে, তিন কালা আদমী আমাদের সামনে দাঁড়াল—সই দিতে হবে; আমি কোথাও বা ইংরিজি আর দেবনাগরী, আর কোথাও বা ইংরিজি আর বাঙলায় সই দিলুম—ভারতীয় বন্ধুদ্বয় ইংরিজি আর উর্দ্দুতে লিখে দিলেন।

শকুন্তলা—হঙ্গেরীয় চিত্রকর জয়্‌তি অঙ্কিত।

সভাপতি মহাশয় বিদায় নেবেন, তিনি যাবার আগে সমাগত ভদ্রলোক আর মহিলাদের সঙ্গে একটু শিষ্টালাপ ক'রছেন;—দূর থেকে গেমান্নুস্‌ আমায় দেখেছিলেন, ছাড় পেয়েই তিনি এসে আমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ ক'রে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলেন—কবি, শাস্ত্রীমহাশয় (অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী) রথীবাবু প্রমুখ শান্তি-নিকেতনের প্রধানদের খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—সভাপতি রাজকুমার, ইংরেজী আর ফরাসীতে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন। ইতিমধ্যে হস্তাক্ষর প্রার্থী মহিলা আর ছেলে মেয়ের দল এসে তাঁকে ঘেরাও ক'রলে। গেমান্নুস আর আমি বিদায় নিয়ে এদিকে এলুম। গেমান্নুস মুফ্‌তীর সঙ্গে মজর ভাষায় আর ভারতীয় মুসলমান দুইটীর সঙ্গে কখনও আরবী কখনও ইংরেজীতে কথা কইতে লাগ্‌লেন।

অধ্যাপক মেজ্জসাইয়ের অতিথি-স্বরূপে রাত্রের ডিনারে যোগদান ক'রলুম, ভারতীয় ভদ্রলোক দুটী আর মুফ্‌তীসাহেবও র'য়ে গেলেন—এঁরা অধ্যাপক গেমান্নুস-এর অতিথি হ'লেন। ডিনারের ব্যবস্থা একটু নোতুন লাগ্‌ল, ইউরোপীয় খাদ্যের ধরা-বাঁধা কয় পদ ছিল,—সূপ, মাছ, রোষ্ট, সবজী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি; ডিনারের দামে এই সব জিনিস দেয়। উপরন্তু রুটী আর পানীয়ের আলাদা দাম দিতে হয়। একজন স্ত্রীলোক একটা লম্বা বেতের ঝুড়িতে রুটী নিয়ে বেড়াচ্ছে, নগদ কিনে নিতে হয়। পানীয় খানসামা দিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে দাম নেয়।

অধ্যাপক গের্মানুস্ তাঁর বাড়ীতে চা খেতে নিমন্ত্রণ ক'রলেন, একদিন বিকালে হোটেল থেকে আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ইউরোপে যা সাধারণ নিয়ম, একটী ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে গের্মানুস্‌রা স্বামী-স্ত্রীতে থাকেন। গের্মানুসের পত্নী ছবি,টুকিটাকি জিনিস ভালবাসেন, ভারতীয় জিনিস দুই চারিটী এঁদের আসবাবপত্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ডাক্তার জোলতান্ তকাচ্ Dr. Zolta'n Taka'cs ব'লে একটী ভদ্রলোক চায়ে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন, তিনি বুদা-পেশ্‌ৎ এর Ferenc Hopp "ফেরেন্‌ৎস্ হোপ প্রাচ্য দেশীয় শিল্প-সংগ্রহের" সংরক্ষক। এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় বিশেষ খুশী হ'লুম। Ferenc Hopp বুদা-পেশ্‌ৎ-এর এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, চীন দেশে ব্যবসা ক'রতেন। আস্তে আস্তে চীন জাপান আর ভারতের নানা শিল্প-বস্তু সংগ্রহ ক'রে, বুদা-পেশ্‌ৎ-এ তাঁর বাড়ীতে জমা করেন, তারপরে বাড়ী-সমেত সেগুলি নিজ জাতিকে দান ক'রে যান। মজর সরকার এই দান গ্রহণ ক'রে, এর সংরক্ষণ আর সংবর্দ্ধনের ব্যবস্থা ক'রেছেন। ডাক্তার তকাচ্ পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেশ জমিয়ে নিলেন। যথার্থ পণ্ডিত, আর ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সম্বন্ধে আন্তরিক দরদ আছে—মনে-প্রাণে এই সব দেশের সভ্যতার প্রতি একটা টান অনুভব করেন। ডাক্তার তকাচ্ হ'চ্ছেন আধা-মজর আধা আর্মেনীয়; হাজার কতক আমানী, তুর্কীদের প্রাধান্যের কালে, তুর্কী সাম্রাজ্যের অপর প্রান্ত থেকে এসে বলকান্ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হন, তারপরে তারা হঙ্গেরিতে আসে। এরা ভাষায় প্রায় হঙ্গেরীয় হ'য়েই গিয়েছে, তবে আর্মানী মতের খ্রীষ্টান ধর্ম্মই পালন করে, পূজা পাঠে আর্ম্মানী ভাষাই ব্যবহার করে। অনেক সময় হঙ্গেরীয়দের সঙ্গে বিবাহ হয়,—ক্রমে এরা আর্ম্মানী থেকে হঙ্গেরীয় হ'য়ে যাচ্ছে। তকাচের মা এই আর্ম্মানী জাতীয়া তকাচ্ মহিলা। আমার পাশ থেকে নিজের মাথা আর মুখের আদল দেখিয়ে ব'ল্‌লেন—এই দেখুন না, আমার মাথা কি রকম পূরো আর্ম্মেনয়েড টাইপের। তাঁর মিউজিয়ম দেখে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। বীরেন বাঁড়ুজ্যে ব'লে একটী ভদ্রলোক কিছুকাল হ'ল বুদা-পেশ্‌ৎ-এ বাস ক'রছেন, তিনি বুদা-পেশ্‌ৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে হিন্দুস্থানী বাঙলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক—তাঁর নাম আগে থেকে জানতুম,—গের্মানুস্ তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি; পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। বাঁড়ুজ্যে মহাশয় পারিসের ডক্টরেট পেয়েছেন নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখে—তিনি প্রায় বিশ বাইশ বছর দেশ-ছাড়া,ইউরোপেই বিবাহ ক'রেছেন, আমেরিকাতেও কিছুকাল ছিলেন, এখন বুদা-পেশ্‌ৎ-এই 'থিতু' হ'য়ে যেতে পারেন; ডাক্তার তকাচ্, ডাক্তার গের্মানুস্ প্রভৃতির খুব ইচ্ছা দেখলুম, যাতে ওঁকে বুদা-পেশ্‌ৎ-এই কায়েমীভাবে অধ্যাপকের পদে বসাতে পারেন। ভদ্রলোক বেশ সজ্জন; তাঁর পরিবারবর্গ সব হঙ্গেরিতে আছেন; বড় ছেলেটীর বয়স হবে উনিশ কুড়ি বছর, সে বুদা-পেশ্‌ৎ-এই ডাক্তারী প'ড়ছে। এই বঙ্গ-ইউরোপীয় পরিবারটী বোধহয় হঙ্গেরীয় হ'য়ে গেল; খালি Bonnerjea পদবীতে ভবিষ্যতে এঁর বংশের ভারতীয় আর বাঙালী উৎপত্তি সূচিত হবে।

আমাদের সঙ্গে খানিক আলাপের পরে, চা-টা খাইয়ে, গের্মানুসের গৃহিণী কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গেলেন; ডাক্তার তকাচ্, গের্মানুস আর আমি খুব গল্প জুড়ে দিলুম। গের্মানুস্ তাঁর হজ যাত্রার অনেক কৌতুককর কথা ব'ললেন। তিনি আমাদের ব'ল্‌লেন—"আমি হজে যাই, ব্যর্টন্ আর অন্য দুচারজন ইউরোপীয়ের মত নাম বা ধর্ম্ম না ভাঁড়িয়ে; আমি সোজাসুজি ভাবে একজন 'মজরী' বা মজর-জাতীয় মুসলমান হিসেবেই যাই" (তাঁর কথায়, এখন তিনি কতটা মুসলমান আছেন সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়)। হজ করবার সময়ে তিনি যে "এহ্‌রাম" অর্থাৎ ধুতি-উত্তরীয় প'রে হাজী সেজেছিলেন, তাই পরা একখানি ফোটো আমায় দিলেন; তাতে দেখি, হজের জন্য তিনি বিরাট দাড়ী গজিয়েছিলেন; আগে ভারতে তাঁকে সাফ্ ক'রে কামানো রূপে দেখেছি,—বুদা-পেশ্‌ৎ-এও পূর্ব্বেরই মত দেখলুম—মাঝেকার এই শ্মশ্রুমণ্ডিত মূর্ত্তি চোখে দেখি নি। আরবী ভাষায় তাঁর কার্ড ছাপিয়েছিলেন—আমায় দিলেন, তাতে লেখা—"দক্তুর 'অব্‌দ্ অল্-করীম জরমানুস্ অল্-মজ্‌রী"। হজের ব্যাপার আর রোমাঞ্চকর নয়। বাহ্যতঃ হোক্ আর আন্তরিক ভাবে হোক্, মুসলমান ধর্ম্মের বর্ম্মে আবৃত হ'য়ে ইদানীং বহু ইউরোপীয় হজ ক'রে আসছে, তার সম্বন্ধে বই লিখ্‌ছে। নানা খোশ-গল্প আর অন্য খবরের মধ্যে একটা বিষয় শুনলুম—তুর্কীরা তুর্কী প্রজার (তা সে যত

গোঁড়া বা বিশ্বাসী মুসলমানই হোক্ না কেন) হজ্জে গমন বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। গের্মান্থস্‌দের সঙ্গে একটী তুর্কী ভদ্রলোক হজ ক'রতে যায়, কিন্তু সারা পথ সে ভয়ে ভয়ে গিয়েছিল, পাছে তুর্কী সরকার টের পেয়ে তার বহু অর্থ দণ্ড করে। তুর্কীটী মিসরে আসে ব্যবসা ক'রতে, সেখান থেকে তুর্কী সরকারের অজ্ঞাতে আরবে এসে মক্ক-মদীনা দেখে হাজী হ'য়ে পুণ্য অর্জ্জন ক'রে চুপি চুপি দেশে ফিরবে, এই আশায় ছিল, কিন্তু ভয়টা ছিল আরও বেশী। গের্মান্থস্ ব'ল্লেন যে তুর্কীটী তাঁকে ব'লেছে যে যদি কোনও ধর্ম্ম-বিশ্বাসী তুর্কী হজ ক'রতে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, অমনি সরকার থেকে তার কাছে পরওয়ানা আসে—হজ্জে গিয়ে যে টাকাটা সে খরচ ক'রবে সে টাকা দিয়ে সে যেন তার গাঁয়ে বা শহরে ইস্কুল বা অন্য জনহিতকর কাজ ক'রে দেয়। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে"—যে তুর্কীর নাম নিয়ে সমগ্র জগতের মুসলমান ধর্ম্মগৌরবে মাতোয়ারা হ'ত, সেই তুর্কীর দেশে এখন গোঁড়া মুসলমানীর কি অবস্থা! ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসের "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস "বাইসিকেলে আমার ভূ-পর্য্যটন" শীর্ষক প্রবন্ধে তুর্কী দেশে তাঁর যে অভিজ্ঞতার কথার বর্ণন ক'রেছেন, তা প'ড়ে আশ্চর্য্য লাগে—বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে করে না, কি ক'রে তুর্কী এতটা সংস্কার-মুক্ত হ'য়ে দাঁড়াল! ভারতীয় মুসলমানেরা সকলেই অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান হয়, এই বোধে তুর্কী দেশে এখন ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে দ্বার রুদ্ধ—কিন্তু অমুসলমান ভারতীয়ের পক্ষে তুর্কীদেশে যেতে কোনও বাধা নেই; আরবী ভাষা মসজিদের আজান থেকেও বহিষ্কৃত হ'য়েছে; "আল্লাহু আক্‌বর" ("ঈশ্বরই মহত্তম") এই বচন, তুর্কী মুয়জ্জেন মসজিদে তুর্কী ভাষাতেই চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে—"তান্‌দ্রে (? তান্‌গ্রি) উল্ দুর্।" যাক্, এই সব কথা, বিভিন্ন দেশে মুসলমান জগতের পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে, গের্মান্থস বেশ আলাপ ক'রে গেলেন। তিনি যে কস্মিন্‌কালে মুসলমান হ'য়েছিলেন, তা তাঁর গল্পের ধরণে ধরা গেল না,—তাঁর কথার ভাবে ভঙ্গীতে তাঁর ইস্‌লামীয়ত্বের এতটুকুও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না।

গের্মান্থসের সঙ্গে একদিন রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে, হঙ্গেরির রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে দু একটী বিষয়ে মন্তব্য শুন্‌লুম। তিনি জরমান জাতের অনুরাগী; জরমানরা যেমন কার্য্যকারিতার সঙ্গে অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরির সাম্রাজ্য চালাচ্ছিল, যেমন ক'রে একটা বিরাট সভ্যতা-সূত্রে মধ্য-ইউরোপের পাঁচ ছটা জাতিকে বেঁধে তুলেছিল, সেই সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলে, চেখ্‌ও শ্লোবাক, মজর, যুগোশ্লাব বা সর্ব, শ্লোবেন, রুমানীয় প্রভৃতি জাতির লোকেরা তার জায়গায় কিছু গ'ড়তে পারছে না। আর পারবেও না; কারণ এই সব জাতের মধ্যে জরমান জাতের সে energy, প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি—কোথায়? বোঝা গেল, জরমানরা ইহুদীদের নির্যাতন আরম্ভ ক'রলেও, গের্মান্থস তাঁর স্বদেশবাসী মজর, বা শ্লাব জাতীয় চেখ, যুগোশ্লাব প্রভৃতিদের চেয়ে, জরমানদেরই বেশী পছন্দ করেন। তাঁর পদবীর মানে হ'চ্ছে "জরমান"—জরমানি থেকে তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষ কেউ এসে মজর-দেশে উপনিবিষ্ট হ'য়ে থাক্‌বেন,—এটা তাঁর জরমান প্রীতির একটা কারণ হ'তে পারে। তিনি তুলনা দিলেন: ভারতবর্ষ যেমন ইংরেজের শাসনে সুখে সমৃদ্ধিতে আছে, ব্রিটিশ শাসনে যেমন ভারতবর্ষ efficient administration পেয়েছে, জরমান-শাসিত অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরি সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। আমি এ সম্বন্ধে গের্মান্থস্-এর মত জান্‌তুম, নোতুন কথা তিনি আর কি ব'লবেন, প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করলুম।

রাত্রে ডিনারের পরে গের্মান্থস্ বুদা-পেশ্‌ৎ-এর একটী সাহিত্যিক মহিলার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন—ইনি মজর ভাষায় একজন নামী ঔপন্যাসিক, এঁর নাম Mme. Berend মাদাম্ বেরেন্দ্; এঁর বই জরমান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে। এঁর স্বামী বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, বিগত মহাযুদ্ধের পরে যখন মধ্য-ইউরোপের দেশগুলিতে ক্রমাগত বিপ্লব আর প্রতি-বিপ্লব চ'ল্‌তে থাকে, তখন খামখা একটী দলের সৈন্যের হাতে এঁর স্বামী নিহত হন। কয়টী ছেলেমেয়ের সঙ্গে ইনি দানুব নদীর ধারে, এলিজা-বেথ-সেতু নামে পোলের পাশে, চমৎকার একখানি বাড়ীতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। এঁর এই বাড়ী বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সাহিত্যিক আর পণ্ডিতদের একটী কেন্দ্র—প্যারিসের উচ্চ শিক্ষিতা সাহিত্যিক মেয়েদের সেকেলে সালন্-এর মত। খাবার পরে, রাত্রি স্যাড়ে নটার সময়ে এঁদের বাড়ীতে গেলুম। বসবার ঘরে আরও কতকগুলি অভ্যাগত র'য়েছেন—একটী জরমান ছাত্রী, জরমানির কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী

ভাষা আর সাহিত্য প'ড়ছে; একটী জরমান ছোকরা—এও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; দুটী বুদা পেশ্‌ৎ-এর রাজকর্ম্মচারী, আর গের্মানুস্, আর আমি। বসবার ঘরটী নানা টুকিটাকি জিনিস দিয়ে সাজানো; ভারতীয় মূর্ত্তি মনে ক'রে মহিলাটী একটী পুরাতন ধরণের চীনা কান্‌য়িন্ বা অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি রেখেছেন। মহিলাটীর বয়স পঞ্চাশের উপর হবে,—দুটী মেয়ে, একটী ছেলে, সব কলেজে পড়বার বয়স। আমার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা কইলেন; সকলেই ইংরিজি জানে—আমি ছিলুম ব'লে ইংরিজিতেই আলাপ চ'ল্‌ল। মাদাম বেরেন্দ্‌ দেখ্‌লুম ভারতবর্ষের অনেক খবর রাখেন—দেবতা থেকে নারী-প্রগতি পর্য্যন্ত। হাতী-শুঁড়ো গণেশ ঠাকুরটীকে তাঁর বড় ভাল লাগে; "রামাইয়ানা" আর "মাআবারাতা"র খুব প্রশংসা ক'রলেন; "সিভা, উমা, ভিষ্ণু, লাক্‌ষ্‌মী"—এঁদের নামও ক'রলেন; আর "তাগোরে" আর "গান্দি" তো আছেনই। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে পান ভোজনের ব্যবস্থা ছিল—এঁর মেয়ে দুইটী সে সব এনে এনে পরিবেশন ক'রতে লাগ্‌ল। সরবৎ; ষ্ট্রবেরী আর অন্য ফল; রুটি, নানা রকমের সসেজ, মাছ; চা, কেক;—ভিয়েনায় রাত্রে ফেটার পরিবারে যেমনটী। বেশ জ'ম্‌ল, কথাবার্ত্তায়, আলাপ পরিচয়ে। মহিলাটী সদালাপী, তবে প্রায় সারাক্ষণ অন্য কারো অপেক্ষা না ক'রে একাই তিনিই আলাপ জমিয়ে রাখ্‌ছিলেন। মাঝে একবার তাঁর বাড়ীর বারান্দা থেকে রাত্রে দানুবের দৃশ্য দেখে প্রীত হলুম। আলোকমালা-মণ্ডিত বুদা-পেশ্‌ৎ শহর; অনেকগুলি ইমারৎ আলোক-প্রপাতে উদ্ভাসিত—খুব উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ব'লে ভ্রম হয়; আর দানুবের উপরে সারি সারি সেতু—তার আলোকমালা নদীর জলে কাঁপছে। যেন অপূর্ব্ব সুন্দর এক কল্প-লোক চোখের সামনে প্রসারিত দেখ্‌লুম।

একটী মজর তরুণের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি চমৎকার ইংরিজি জানেন, আর ইংরিজি ভাষা যে আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতার ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে খুব সুদৃঢ় মত পোষণ করেন। এঁর মতে, সমগ্র সভ্য জগতের প্রধান ভাষা ইংরিজিই হবে। এ বিষয়ে আমিও পূর্ণভাবে তাঁর সঙ্গে এক-মত। ইনি ব'ল্‌লেন—হঙ্গেরিতে অতি দ্রুত ভাবে ইংরিজির প্রসার হ'চ্ছে। ফরাসী আর জরমান টকীর চেয়ে ইংরিজি-ওয়ালা টকী, তা ইংলাণ্ডেরই হোক আর আমেরিকারই হোক্—বুদা-পেশ্‌ৎ-এর লোকেরা বেশী পছন্দ করে। আরও ব'ল্‌লেন—ত্রান্‌সিল্‌ভানিয়া প্রদেশ হঙ্গেরির পূর্ব্বাঞ্চলে, আগে হঙ্গেরির অংশ ছিল, লড়াইয়ের পরে রুমানিয়াকে দিয়ে দেওয়া হ'য়েছে; এখানকার লোকেরা তিনটী ভাষা বলে—মজর, আদ্ধেকের কিছু কম; আর বাকী জরমান আর রুমানীয়। এরা কেউই রুমানিয়ার শাসন পছন্দ করে না; এদের মধ্যে সুইট্‌জরলাণ্ডের আদর্শে একটী স্বাধীন গণতন্ত্র গ'ড়ে তোলবার ধুয়া উঠ্‌ছে; সেই গণতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে—ইংরিজি। এঁর মতে—United States of India-র রাষ্ট্রভাষা ইংরিজি হ'লে, তাতে ভারতের আর জগতের উভয়েরই লাভ। আমরা অবশ্য হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি; কিন্তু ইংরিজিকে কেউ ছাড়তে চাই না; আর যদি ইংরিজি আর হিন্দী এই দুইয়ের একটা নিতে হয়, তা হ'লে ইংরিজিকেই মানবেন,—জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাকামী এমন ভারতীয় বহু আছেন।

স্বাগত দেবতা

শ্রী সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

ভাদরের বারিধারা আজো আসে আশীর্ব্বাদ সম,
আজো ভক্ত ডাকে ঘন "এস এস, স্বাগত, দেবতা
কৃষ্ণপক্ষে আসে কৃষ্ণ নব-ঘন-শ্যাম-অনুপম,
বিজলি কৌস্তুভমণি নাশে ত্রাস পাপ মলিনতা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইন্দ্রজাল বিদ্যা

প্রফেসার পি, সি, সরকার এম্-এম্-সি (লণ্ডন)

প্রাচ্য যেদিন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানময় আলোকের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া নিজের বিশেষত্বকে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল তখনই তাহার পতন যুগের আরম্ভ। একদা ভারতের স্বর্ণযুগে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এমন বিদ্যা ছিল না, যা' নিষ্ঠা সহকারে অধীত বা আলোচিত হইত না। সে ছিল ভারতের জাগরণ যুগ! তারপর পতন যুগের এক অশুভ মুহূর্ত্তে ভারতের সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রবাহে ভাঁটা ধরিল। জ্ঞান চর্চ্চা লোপ পাইল। সব কিছুকে গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি জাগিল; বিস্তৃত ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া নিবদ্ধ হইল বংশ বা গুরু পরম্পরার মধ্যে। বস্তুর বিজ্ঞান অতলে তলাইল এবং সংগোপনের প্রয়াস পাইল সেখানে প্রাধান্য। সমাহিত হইয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে, অতীতের সেই প্রতিভা-দীপ্ত ভারতের জন্য ব্যথা ও বেদনায় বুক হাহাকার করিয়া উঠে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গবেষণা মন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকিয়া আত্মসম্বিৎ হারা এই জাতিই যদি কখন সচেতন হয়, তখন আবার সে বুঝিবে, অনুতাপ করিবে যে, তাহার কি ছিল আর এখন নাই।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল 'ম্যাজিক' বা 'ব্লাকার্ট' (Bl ck Art) নামে যে বিদ্যা পরিচিত উহা হস্তকৌশল বা যান্ত্রিক কৌশল সাহায্যেই সাধারণতঃ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভারতীয় ইন্দ্রজাল বিদ্যা বা 'যথার্থ ম্যাজিক' দেবসেনানী কার্ত্তিকেয় আবিষ্কৃত চৌর্য্যবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু বিদ্যাটী চুরি হইলেও যোগশাস্ত্রের অন্যান্য শাখার ন্যায় সাধনা-সাপেক্ষ। এই ইন্দ্রজাল ভারতবর্ষের একচেটীয়া বিদ্যা—বহুকাল হইল ইহা এদেশে প্রচলিত। কথিত আছে পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে এই বিদ্যা প্রদর্শিত হইত এবং ইহা তৎকালীন সমাজজীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। 'ইন্দ্রজাল' এই নামটী সেই সময় হইতেই প্রচলিত হয়। তারপর ভোজরাজা এই খেলা এদেশে ভালরূপে ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। সেই ভোজরাজার নাম হইতেই ইহা 'ভোজরাজার খেলা' 'ভোজবিদ্যা' বা 'ভোজবাজী' নামে পরিচিত। পূর্ব্বকালে ভানুমতী নামে এক মহিলা এই বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করেন। শুনা যায় তিনি ভোজরাজা অপেক্ষাও অধিক পটীয়সী ছিলেন। তিনিই এই বিদ্যাকে পথে ঘাটে দেখাইবার উপযুক্ত করেন। তাহার নাম হইতেই ইহা 'ভানুমতীর খেল' নামে অভিহিত।

অনেকে পথের বেদিয়াদের এই ভানুমতীর খেলাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু সম্মানের সিংহাসন চ্যুত হইয়া ভারতবর্ষ যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ হারা হইয়াছে—তাহার দু' একটার নিরাবরণ অস্তিত্ব আজও এই পথের বেদিয়াদের হাতেই পাওয়া যায়। নিছক অর্থোপার্জ্জনের জন্যই তাহারা এমন অনেক জিনিষকে অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছে। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে, বিশেষ করিয়া বয়স্কেরা বেদিয়াদের বহু আশ্চর্য্যজনক যাদুর কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। পথে ঘাটে মাঠে গৃহাঙ্গনে তাহারা অদ্ভুত বাজী দেখাইত এবং এখনও দেখাইয়া থাকে। বাঁধা ষ্টেজের বালাই নাই। নিজে যাদুকর হইয়াও যখন ভাবি, এই সকল উপেক্ষিত পথের বাজীকরদের কথা—বিস্ময়ে মাথা নত হইয়া পড়ে তাহাদের কৃতিত্বের কাছে।

'ভারতীয় দড়ির খেলা' 'জীবন্ত লোকের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করা' 'জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া চলা' প্রভৃতি যে সমস্ত খেলা লইয়া আজ-কাল সর্ব্বত্র আন্দোলন চলিয়াছে উহাও এই পথের বেদিয়াদেরই খেলা। বেদিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে এক উন্মুক্ত ময়দানে একগাছি রজ্জু ২০।২৫ ফুট উচ্চে বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত করে এবং ঐ রজ্জু লম্বভাবে বায়ুমণ্ডলেই অবস্থান করে। পরে একটী বালক সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে এই 'ভারতীয় দড়ির খেলা' লইয়া বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। ও দেশে ম্যাজিক, সম্মোহন বিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা চলিয়াছে খুব বেশী দিন নয়। কোন ইউরোপীয় বা আমেরিকান যাদুকর এ পর্য্যন্ত এই ধরণের খেলা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া—এই খেলা লইয়া প্রচুর মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়—কেহ বা বিশ্বাস করেন, কেহ বা করেন না।

এক শ্রেণীর ক্রিয়া-প্রদর্শক আছেন যাহারা কোন ব্যাপার স্বচক্ষে না দেখিলে বিশেষ করিয়া নিজে ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইলে উহাকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু অভিজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে উহার অস্তিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ভারতীয় দড়ির খেলা'র ব্যাপারেও তাই—উহা যে ভারতে ছিল এবং অনেকে দেখিয়াছেন এরূপ বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভারতেই এই খেলার উৎপত্তি এবং লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিলেও, এখন পর্য্যন্ত ভারতেই উহা সীমাবদ্ধ। এই খেলা সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে জ্ঞাত ছিল। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত 'যোগসূত্রম্' এর ১৭শ সূত্রেও এই খেলার বিস্তৃত বিবরণ পাও। যায়।

এই দড়ির খেলার গোড়ার সত্যটী আবিষ্কারের জন্য আমি বহু বেদিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এতদিনে বুঝিয়াছি যে সাধারণ হাতের কৌশল বা ঘুম-ঘুম বলিয়া মাথা চাপড়াইয়া সম্মোহন সৃষ্টি প্রভৃতির চেয়ে এটী অনেক উচুদরের খেলা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়া ব্যতীত এ খেলা করা কষ্টকর। আমি নিজেও এই খেলাটী করিতে সমর্থ। বিলাতের প্রদত্ত challenge আমি বহু পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহা ইতিপূর্ব্বে বহু পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। আমার ধারণা এই খেলা ভারতীয় আবহাওয়া অর্থাৎ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেই এই খেলা করা সুবিধাজনক। পাশ্চাত্যের সুবিখ্যাত আত্মিক তত্ত্ববিদ পণ্ডিত Alexander Cannon মহোদয়েরও সেই মত—কারণ 'জনতা

সম্মোহনের' ক্রিয়া শীতপ্রধান অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অপেক্ষাকৃত ভাল হয়।—

" It is an extremely difficult effect to produce in the west, as in the hot climates the cortex of the brain is much more passive and the unconscious mind consequently easier to deal with" বিলাতের কর্তৃপক্ষকে আমি ভারতবর্ষে এই খেলা দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ জানাইব। এই খেলাটী লইয়া আমার শীঘ্রই পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমার 'সম্মোহিতাবস্থায় অঙ্গচ্ছেদ' খেলাটী আমি বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের নানাস্থানে, ব্রহ্মদেশ, সানরাজ্য ও চৈনিক সীমান্তে বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সম্মুখে দেখাইয়াছি। সিভিলসার্জ্জনগণ স্বহস্তে পরীক্ষা করিয়া নিজেদের লোকের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করিলে আমি উহা জোড়া লাগাইয়া দিয়াছি। সেদিনও রংপুরে তাজহাট রাজবাড়ীতে বহু পদস্থ সিভিল ও মিলিটারী অফিসার দর্শকগণের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে আমি এই খেলা দেখাই। ডাক্তারগণ দেখিলেন যে পাত্রের দেহ সংজ্ঞাস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছে—নাড়ী দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে হইতে বন্ধ হইয়াছে।

বিগত 5th may 1935 অপরাহ্নে তাজহাট রাজবাড়ীর লালকুঠিতে Mr. N. M Ayyar I. C. S, Mr. F. Bell I. C. S, Mr. D. F. Leslie M. A. I. P, Captain C. E. C. Gregory, Military Intelligence Officer, Rajah of Tajhat প্রভৃতির সম্মুখে দেখাইয়াছি। ঐ দিনের খেলা দেখিয়া Mr. F. Bell I. C. S মহোদয় ঘটনাস্থলে অচৈতন্য হইয়া পড়েন।

Mr. N. M Ayyar মহোদয় লিখিয়াছেন—"His hypnotic operation, whereby he was successful in cutting and re-joining the tongue of a patient while under a hypnotic trance was particularly thrilling." (14th may 1935)

Mr. D. F. Leslie স্বীকার করিয়াছেন—"The best I have seen in India to date" (28th may 1935)

Mr C. E. C. Gregory মহোদয় লিখিয়াছেন—"He has a very varied programme and each performance that I saw was equal to some of the best magical shows in England. The trick of cutting off part of a man's tongue which he did in the Lalkoti of the Rajah of Tajhat is the best trick I have seen in either India or England. (31st May 1935)

এতদ্ব্যতীত 12th Feb 1934 তারিখে ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউন হলে দিনের বেলায় খান বাহাদুরের পার্টিতে J. A. Talukder M. B প্রমুখ বহু ডাক্তার, 9th December 1935 তারিখে ইয়ানন্জং টাউনে B. O. Cর ডাক্তার, সান রাজ্যে পাংহাই টাউনে ডাক্তারদের সম্মুখে 10th February 1936, ও আপার বর্ম্মাতে Myingyan টাউনে সিভিলসার্জ্জন প্রভৃতির সম্মুখে 26th February 1936 তারিখে দেখাইয়াছি। পাবনাতেও গত বৎসর সিভিলসার্জ্জন নিজেদের একটী লোকের জিহ্বা ঐরূপে কাটিবার পর আমি জোড়া লাগাইয়াছিলাম। তখন দর্শকগণ এই খেলায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন বলিয়া বিগত 15th August 1935 তারিখে প্রোগ্রাম হইতে এই 'thrilling and horrible' খেলাটী বাদ দিয়া His Excelency Sir John Anderson মহোদয়ের সম্মুখে অন্য খেলাগুলি দেখাইবার আদেশ হইয়াছিল।

সেদিনও ভারতীয় যাদুকর খোদাবক্স বিলাতে Professor Pannet নামক Surgical unit of St. Thomas's Hospitalএর ডিরেক্টার প্রমুখ বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সম্মুখে ১২ ফুট লম্বা ৮০০ ডিগ্রি (Fahrenheit) উত্তাপের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর খালি পায়ে হাঁটিয়া তদ্দেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির জনৈক মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া দিবসের পর দিবসব্যাপী জীবন্ত অবস্থায় মাটীর নীচে প্রোথিত ছিলেন। সংবাদপত্রসেবী মাত্রেই তাহার বিবরণ জ্ঞাত আছেন। সেদিনও ভারতীয় ঐন্দ্রজালিক খগানন্দ ও নরসিংহ সর্ব্বভক্ষক পাশ্চাত্যের রসায়নবিদ্‌দের সম্মুখে কাঁচ, পেরেক, নাইট্রিক, সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড ও তীব্র বিষ পান করিয়াছিলেন। x' ray চিত্র গ্রহণ করিয়াও উহার সত্যতা প্রমাণ হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

এগুলি সমস্তই প্রাচ্যের খেলা পাশ্চাত্যের স্থূল বিজ্ঞান দ্বারা এগুলির বিচার চলে না। ভারতীয় যৌগিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইচ্ছাশক্তির প্রখরতা দ্বারা এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 'ঘড়ির সময় পরিবর্ত্তন' প্রমুখ আমাদের বড় বড় অনেক খেলাই এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে সম্পন্ন হয়। বৃদ্ধ যাদুসম্রাট গণপতি চক্রবর্ত্তী এখনও তাঁহার পুরাতন খেলার স্মৃতিসমূহ লইয়া কলিকাতায় বর্ত্তমান আছেন।

উচ্চশ্রেণীর ক্রিয়াপ্রদর্শক মাত্রেই শুধু হস্তকৌশল বিদ্যা নহে, সম্মোহন, চিন্তা-পঠন, বিশেষ করিয়া ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ বিদ্যায় পারদর্শী। এই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত না থাকিলে কখনও উচ্চশ্রেণীর যাদুকর হওয়া সম্ভবপর নহে।

'জনতা-সম্মোহন' (mass hypnotism) প্রভৃতিও এই তীব্র ইচ্ছাশক্তি সাহায্যেই হইয়া থাকে। বড় বড় সম্মোহক এই বিদ্যা সাহায্যেই বহু লোককে সম্মোহিত করিয়া তাঁহাদের ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। প্রকৃত শক্তিসম্পন্ন সম্মোহক নিজের ব্যক্তিত্ব সাহায্যেই বহু লোককে সম্মোহিত করিতে পারেন। অনেকে এই জনতা-সম্মোহনের কথা অবিশ্বাস করেন। কিন্তু বহু অভিজ্ঞ সম্মোহক ও ডাক্তার ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ আত্মিকতত্ত্ববিদ্‌গণের অন্যতম Alexander Cannon—সম্মোহন বিদ্যার ছয়টী স্তরের বর্ণনা

প্রসঙ্গে—" The Invisible Influence" পুস্তকে এই 'জনতা-সম্মোহন' ও দৃষ্টিভ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্যারিসের জগদ্বিখ্যাত সম্মোহন শিক্ষাগারের প্রবর্ত্তক Dr. X. La Motte Sage M. A. Ph. D L. L. D. মহোদয়ও মুহূর্ত্তে বহু লোককে সম্মোহিত করা স্বীকার করেন। তিনি Philadelphiaতে Park Theatreএ একবারে বহু লোককে সম্মোহিত করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের নিকট সেই ফটোটী এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত কলেজেরই একটী পুস্তকে প্রকাশ—

Dr. Sage has hypnotised hundreds of people in the twinkling of an eye. Many persons do not believe it is possible to hypnotize instantaneously, but Dr. Sage has demonstrated to thousands of people that this can actually be done.....A word, a movement of the hand, and the whole work is done"

"ডাক্তার সেজ চক্ষের নিমেষে শত লোককে সম্মোহিত করিয়াছেন · অনেকে বিশ্বাস করেন না যে মুহূর্ত্তে সম্মোহিত করা সম্ভব। কিন্তু ডাঃ সেজ সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহা সম্ভব।.. একটী কথা, একটী বার মাত্র হাত নাড়া, অমনি সমস্ত কার্য্য শেষ।"

বিগত ১০ই এপ্রিল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের Times of Indiaতে প্রকাশ যে—

" It is only the ignorant who scoff at the possibility of these phenomena. Those well-versed in mesmerism and hypnotism and among them there are several doctors of repute—believe in mas -hypnotism and mass-suggestion."

"অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইহা অবিশ্বাস করেন। মেসমেরিজম ও হিপ্নোটিজমে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ—(তাঁহাদের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারও আছেন)—তাঁহারা 'জনতা সম্মোহনে' বিশ্বাস করেন।"

জগৎ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুরাতন পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া দিন দিনই উৎকৃষ্টতর উপায় বাহির হইতেছে। সেদিন Illustrated weekly of Indiaতে প্রকাশ যে যন্ত্রসাহায্যেও সম্মোহন করার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রত্যেক ভাল খেলারই নকল হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আর অবিশ্বাসীর দলও চিরকাল থাকিবে। কিন্তু ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কোনও মত প্রকাশ করা উচিত নহে। সেদিনও লোহা লক্কড় ও হাড়ের টুকরার উপর পাট জড়াইয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া আবু নসের 'ভারতীয় দড়ির খেলা' দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিল। "Berliner Illustrierte Zeitung"এ ইহার বিবরণ প্রকাশ হয়। তীক্ষ্ণ পর্য্যালোচনায় তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ তারিখের The Listener পত্রিকার পাঠক তাহা অবগত আছেন। এক ব্যক্তি রবারের কৃত্রিম জিহ্বা লাগাইয়া আমার খেলা দেখাইতে গিয়াছিল—তাহারও সেই দশা হইয়াছিল। Psychical Research সমিতির Mr. Dunninger খোদাবক্সের 'আগুনের উপর চলা' খেলাকে নকল করিতে যাইয়া কিরূপ জব্দ হইয়াছেন বিলাতের Magical Quarterly তে ১৯৩৩ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় তাহার বিবরণ বাহির হইয়াছে। সেইরূপ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে হাওয়ার উপরে "Aerial Suspension" প্রভৃতি খেলাও নকল হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু Secrets of Ancient & Modern Magic পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠা হইতে জানা যায়—বর্ত্তমানে হাওয়ার ঐরূপ অবস্থার বিষয় (the anaesthetic quality of ether) আবিষ্কার হইয়াছে।

যাহা হউক, ইহা সমস্তই ভারতের নিজস্ব বিদ্যা। উপযুক্ত লোকের সহানুভূতির অভাবে ইহা দিন দিন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই কলিকাতাতেই Dr. Esdaile একটী mesmeric Hospital খুলিয়া কয়েক মাসের মধ্যে ইহার সাহায্যে ২৬১টী অস্ত্রচিকিৎসা করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু অভিজ্ঞ ডাক্তার এই বিদ্যা সাহায্যে এখনও চিকিৎসা করিতেছেন। পুরাতন প্রণালী ও অন্ধ কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতন উন্নত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। জগতের সমস্ত বিদ্যাই সাধনা সাপেক্ষ। এই সাধনা বা অভ্যাস দ্বারা সমস্তই শিক্ষা করা যায়। যাদুকর, সম্মোহক, ডাক্তার সকলে ভারতের সেই প্রতিভাদীপ্ত অতীতের কথা স্মরণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে এই বিদ্যা আবার গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠিবে। সংকল্প যাহার সৎ, ঈশ্বর তাহার সহায় হইবেন সন্দেহ নাই।

খাস্-মুন্সীর নক্সা

৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

এই দেশীয় রাজ্যে যখন আমি প্রথম আসিয়া উপস্থিত হই, তখন এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি অদ্ভুত ছিল। মহারাজার বয়স তখন প্রায় ৬০ বৎসর। ১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর তখন তিনি রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি পূর্ব্বে এই রাজ্যভুক্ত কোনও পল্লীগ্রামে বাস করিতেন এবং অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। সুতরাং এইরূপ উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে কিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে, সে দায়িত্বের ভার গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁহার আদবেই হয় নাই। ৫০ বৎসর বয়সে বৃদ্ধাবস্থায় বিধাতা তাঁহাকে এই রাজ্যটীর অধীশ্বর করিলেন। প্রায় দেড় লক্ষ প্রজার মরণ-বাঁচন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল।

এ রাজ্যে রাজাদিগের নিজ খরচ বিভাগকে "গুম্মট" বলে। রাজাদের নিজের খাইবার-পরিবার, নিজ ইচ্ছাপূর্ব্বক দান, পারিতোষিক প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের সরবরাহ এই গুম্মট হইতে হইয়া থাকে। রাজ্য পরিরক্ষণার্থ বাকি সমস্ত ব্যয় সরকারী রাজকোষ হইতে হইয়া থাকে। মহারাজা বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত সরলমতি, সুতরাং কুচক্রী এবং দুষ্ট লোকের অভাব হইল না। তাহারা প্রথমে মহারাজাকে এই বুঝাইল যে তাঁহার 'খাস-বিভাগ' তাঁহার নিজস্ব আয়, আর রাজ-খাজনা যেন অপর কাহারও। মহারাজাও তাহাই বুঝিলেন। যখন এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দৃঢ়রূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল তখন উক্ত বিভাগে অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হইল। রাজ্যের যে আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রস্তুত হয় তাহাতে রাজার নিজ খরচের সঙ্কুলনার্থ ২০।২৫ সহস্র মুদ্রা দেওয়া হইত, তাহা ঐ "খাস" বিভাগ হইতে রাজার নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা ব্যয় হইত। কিন্তু রাজার যখন দৃঢ় বিশ্বাস গুম্মট আমার আয়, রাজ-খাজনা অপর কাহারও—তখন ২০।২৫ সহস্র বাৎসরিক আয়ে আর তাঁহার কিরূপে চলিতে পারে। অর্থাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল এবং কুচক্রীরা নিজ নিজ কুপরামর্শে সেই আকাঙ্ক্ষারূপ অগ্নিতে লোভরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। রাজ্যের কোনও একটী পদ খালি হইয়াছে, অমনি আবেদন-কারীরা এই সমস্ত কুচক্রীদের মধ্যস্থ করিয়া পদের মূল্য নিরূপণ করিতে উপস্থিত। মূল্যের কথা-মাজা আরম্ভ হইল। ফল কথা, পদ এক প্রকার নিলাম হইতে লাগিল। মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া টাকা 'খাস-বিভাগে' জমা হইলেই সেই ব্যক্তি উক্ত পদে বরিত হইল। ছয় মাস বা এক বৎসর উক্ত ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছে কিনা সন্দেহ, অমনি একটা তুচ্ছ অপরাধে তাহাকে অপসৃত করিয়া অপর ব্যক্তির নিকট লইতে পুনরায় ঐরূপ মূল্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় নূতন লোক নিয়োগ করা হইল। পূর্ব্বে সে "খাঁ সাহেব" ও "দেওয়ান" সাহেবের উল্লেখ করিয়াছি উক্ত মহারাজার সময়ে তাঁহারা এই রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী। খাঁ সাহেবের চরিত্র অতি নির্ম্মল। আমি আজ ২৮ বৎসর ধরিয়া এখানে রহিয়াছি, কখনও তাঁহার নামে কোন অপবাদ শুনি নাই। এই দুইজন যখন রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী তখন রাজ্যে সুবন্দোবস্তের জন্য তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী। এজেণ্ট সাহেব প্রভৃতি দেশের অত্যাচারের কথা শুনিলে তাঁহাদের নিকট হইতেই জবাব তলব করিতেন এবং এই দুই ব্যক্তিই জবাব দিতে বাধ্য। সুতরাং মহারাজা সকল সে কার্য্য করিতে লাগিলেন এই দুইজন সময় সময় তাহাতে বাধা দিতেন তজ্জন্য উক্ত কুচক্রীদের বিষ নয়নে ইহাঁরা পড়েন। তাহারা নানা রূপে ছল করিয়া মহারাজার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া ইহাদের দুইজনকে বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ ২৮ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহাতে এই বোধ হইতেছে, যাহারা অত্যাচারী তাহারা কখনই সাহসী হয় না। মহারাজা সেই জন্যই "খাঁ সাহেব" ও "দেওয়ান"কে মনে মনে ভয় করিতেন।

এই রাজ্যের সৈন্য-বিভাগের এক পল্টনের নাম "আরদালী।" ইংরাজী 'Orderly' শব্দের অপভ্রংশ। এই আরদালীভুক্ত সিপাহীরা রাজবাটীতে রাজার সন্নিকটে থাকিয়া সদাসর্ব্বদা পাহারা দিয়া থাকে। সুতরাং রাজার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইয়া উঠে। এই প্রকারে কুচক্রীদের মধ্যে এই আরদালী-ভুক্ত গুটি কত লোক মহারাজার প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠে। চলিত কথায় এ দেশে "আরদালীর" সিপাহীদের আরদালীকা-মোড়া কহে। এদেশে গ্রাম্য ভাষার ছেলেকেও মোড়া কহে। ক্রমশঃ এই আরদালীকা-মোড়ার নামে দেশের লোকের হৃৎকম্পন হইতে লাগিল। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই মূর্খ, সুতরাং অশিক্ষিত সমাজে যে সকল পুরাতন অপকৃষ্ট ধর্ম্ম-বিশ্বাস থাকে এতদ্দেশে তাহার অভাব নাই। ভূত প্রেত, ডাকিনী, মারণ, উচাটন ইত্যাদি সকল বিদ্যায় লোকের অটল বিশ্বাস। বৃদ্ধ মহারাজারও এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট বিশ্বাস। "আরদালীর" মোড়ারা নিজেরাও বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। আবার কাহারও সহিত শত্রুতা হইলে বা কোনও সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট হইতে কিছু অর্থ দোহন করিবার ইচ্ছা হইলে এক নবীন উপায় এই কুচক্রীরা উদ্ভাবন করিল। নগরের বহির্ভাগে বন জঙ্গল নালা প্রভৃতির অভাব নাই। কোনও একটি নিভৃত স্থানে একজন কৌপীনধারী সন্ন্যাসীকে রাত্রি-কালে বসাইয়া তাহার সম্মুখে মাস কলাই বাটিয়া তদ্দারা একটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে একটু সিন্দূর লেপন পূর্ব্বক উক্ত পুত্তলিকার বক্ষস্থলে একটি লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া ২।৪টি পুষ্প ও একটি ঘৃতের প্রদীপ রাখিয়া দিল। কৌপীনধারীকে ২।৪ টাকা দিয়া পূর্ব্বাহ্ণে বশীভূত করিয়া মোড়াদিগের মধ্যে একজন গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল—"মহারাজ" শুনিলাম, অমুক স্থলে একজন বাবাজী আপনাকে মারিবার জন্য কোনরূপ যাদু করিতেছে। মহারাজা ভয়ে ও ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় মোড়াদের উক্ত বাবাজীকে ধৃত করিয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থ পুলিশ কোতওয়ালীতে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। মোড়ারা একে চায়, আরোও পায়। তাহারা চতুর্দিকে ছুটিল। কৌপীন-ধারীকে বাঁধিয়া আনিয়া কোতওয়ালীতে উপস্থিত করিল। তথায় পূর্ব্ব পরামর্শমত ২।৪ বার প্রহারের পরই বাবাজী নগরস্থ কোনও ভদ্রলোকের নাম বলিয়া দিল। মহারাজার নিকট সে সংবাদ মোড়ারা পৌছাইল। ভদ্রলোকটীর সর্ব্বনাশ। তাহাকে ধরিয়া আনিবার সময়ে এই কুচক্রীরা পথে তাহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া বিলক্ষণ অর্থ দোহনের সুবিধা করিয়া লইল। তাহাকে রাজবাটীতে হাজির করিয়া পরে তাহারা নিজেরাই ২।৪ জন মিলিয়া রাজার নিকট সুপারিস করিয়া রাজার "গুম্মটে" কিছু টাকা দেওয়াইয়া এবং কিছু নিজেরা উদরস্থ করিয়া ছাড়িয়া দিল। আর যদি সে গরীব বেচারী টাকা না দিতে পারিল বা সম্মত না হইল তাহার দোষের কোনও বিচার বা অনুসন্ধান না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য কোতওয়ালীতে পাঠান হইল। তথায় তাহাকে চর্ম্মদ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রহার করিয়া এবং নানারূপে অপমান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

রাজদরবার হইলে পাত্র-মিত্র, সর্দার, পণ্ডিত, সভা-পণ্ডিত প্রভৃতি রাজদরবারে বিবিধাঙ্গে থাকা চাই। সুতরাং বৃদ্ধ মহারাজার রাজ-দরবারেও কতকগুলি পণ্ডিত এবং তাহাদের সর্ব্বোপরি এক বিশ্ব-পণ্ডিত সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম 'ভৈরব'। তিনি এখন কাল-ভৈরব রূপ ধারণ করিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণের জীবরা অতি সহজেই এই রাজ্যে পণ্ডিত নামধারী হইয়া থাকেন। এখানে যে ব্যক্তি সারস্বত ব্যাকরণের পূর্ব্বাঙ্গবাদ ও চন্দ্রিকা ব্যাকরণের উত্তরার্দ্ধ পাঠ করিয়াছে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধমাত্র পাঠ করিয়াছে সেই পণ্ডিত। ন্যায়, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ এ সমস্ত বিবিধ শাস্ত্রের চর্চ্চার কোনই আবশ্যক নাই এবং কেহ এ সকল শাস্ত্র চর্চ্চার তোয়াক্কা রাখে না। যখন পাণ্ডিত্যপদ এত সহজলভ্য তখন ঐ সকল কটমট শাস্ত্র চর্চ্চায় এ ক্ষুদ্র জীবনটুকু নষ্ট করিবার আবশ্যক কি? যাহা হউক ভৈরব যখন দেখিলেন যে মহারাজার পার্শ্বচরগণ তথা আর্দ্দালির মোড়াটা যাদু ব্যপদেশে দিব্য দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে তখন তিনি এই সুবিধা ছাড়েন কেন? তিনি নিজ পণ্ডিতী মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এ প্রদেশের প্রত্যেক রাজ্যে রাজাদের কোনও না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেব বা দেবী আছেন। রাজারা তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা বা কর্ত্রী মনে করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রতি নরপতিদের

যক্ষাঙ্গনা—মেঘদূত
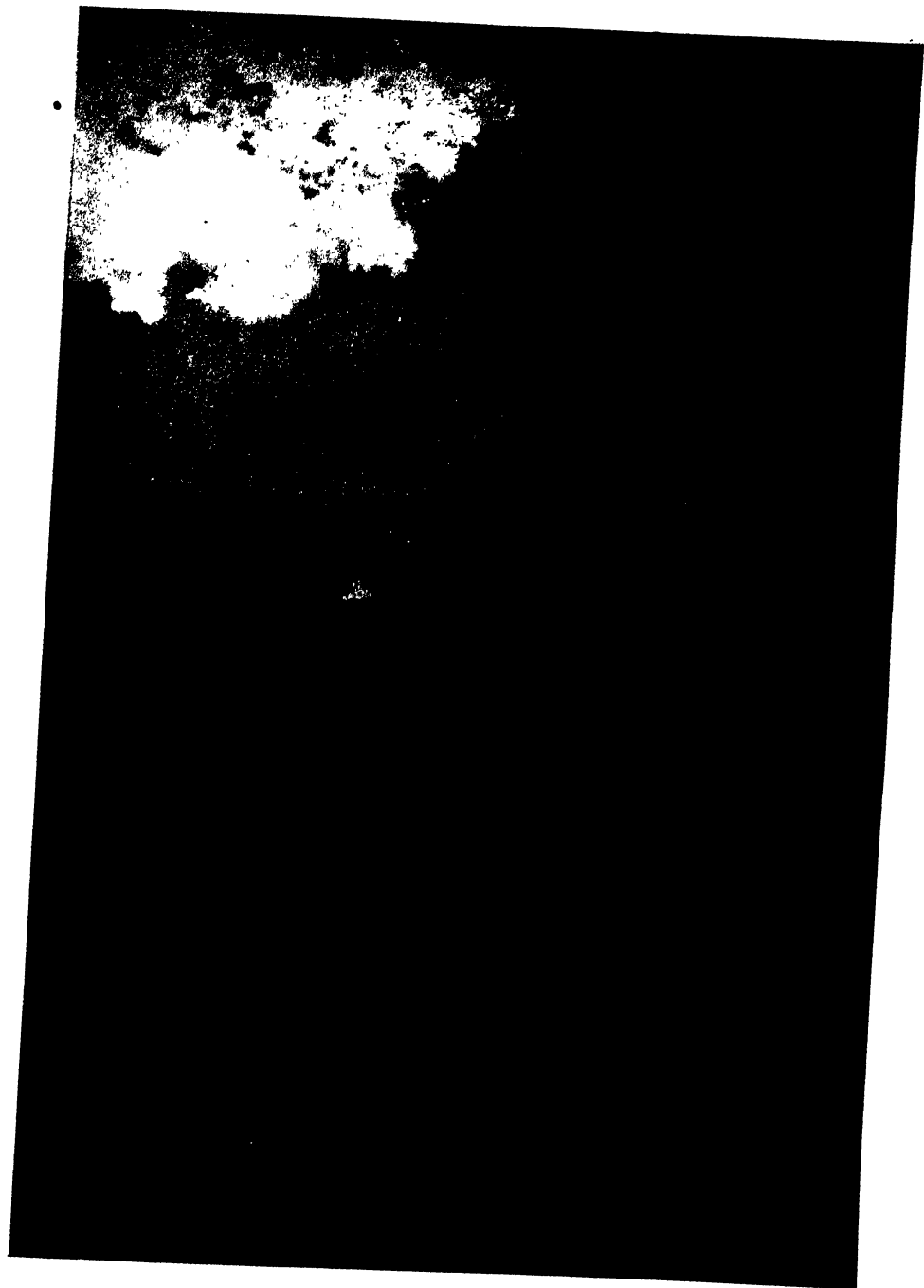
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিশাথকুমার রায়চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। যেমন উদয়পুর রাজ্যে একলিঙ্গেশ্বর। জয়পুরে অম্বরের কালীমাতা। এইরূপ আমাদের এই রাজ্যে একটী প্রসিদ্ধ দেবী আছেন। সমস্ত হিন্দু সমাজে তাঁহার নাম ও গৌরব ঘোষিত হইয়া থাকে। দেবী বিগ্রহটী খাস রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন। আবার নগর হইতে ১৪ মাইল দূরেও পর্ব্বত ও জঙ্গলের মধ্যে এক দেবী আছেন তিনি এদেশে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধা। চৈত্র মাসে তাঁহার বাৎসরিক মেলা হয়, সেই সময় বহু দূর হইতে ভক্তগণ তাগ দর্শন করিতে আসেন। সকলের বিশ্বাস যে দেবীটি অতি জাগ্রত। ভক্তিভাবে যে তাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রার্থনা করে তাহাই সিদ্ধ হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া এই "সিদ্ধ" বা জাগ্রত ভাবটি ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া পরিশেষে এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে এখন লোকের এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে দেবী ভাবাবেশ দ্বারা বিশেষ লোক মারফত নিজ আদেশ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মোট কথা ইতিহাসভক্ত পাঠক গ্রীস দেশে যে ডেলফীক অরেকেল ব্যাপার পাঠ করিয়াছেন ঠিক এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই আদেশ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইতেছে আমার ইহাতে আদৌ বিশ্বাস নাই।

যাহা হউক এই আদেশ কিরূপে হইয়া থাকে তাহার আনুসঙ্গিক বিবরণ আমি স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই বর্ণনা করিতেছি। একটু গভীর রাত্রে দেবীর সম্মুখে "নাট-মন্দিরে" দুই দল "চামার" সার দিয়া বসে। এতদ্দেশে চামার বলিয়া এক নিকৃষ্ট জাতি আছে। মেথরের ন্যায় নিকৃষ্ট নহে। তবে অস্পৃশ জাতি বটে। বৃহৎ নাগড়া বাদন করিতে করিতে নিজেদের "চামারী" ভাষায় দেবীর স্তব গান করিতে থাকে। এতদঞ্চলে 'গুজর' বলিয়া এক জাতি আছে, ইহারা প্রায়ই চাষা শ্রেণীর। ভূমিকর্ষণ ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এই গুজর জাতীয় একটি লোকের দ্বারা দেবীর আদেশ হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে উক্ত গুজরকে ভোপা বলিয়া থাকে। ভোপা দেবীর বেদীর নিকট স্থিরভাবে বসিয়া চামারদের গীত শ্রবণ করিতে থাকে। প্রায় ১৫।২০ মিনিট এইরূপ গীত শ্রবণ করিতে করিতে তাহার শরীরে কম্পন আরম্ভ হয়। ক্রমশঃই এই কম্পন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যত কম্পন বৃদ্ধি হয় ততই চামাররা নাগড়া পেটার মাত্রা বাড়াইতে আরম্ভ করে। শেষকালে এত বৃদ্ধি হয় যে ভোপার মস্তকের উষ্ণীষ পড়িয়া যায়। উষ্ণীষ পড়িয়া গেলেই ভোপা দেবীর চরণে লুটাইয়া পড়ে। অমনি দেবীর মোহান্ত চরণামৃত তাহার মস্তকে ছিটাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ 'ভোপা' কম্পান্বিতকলেবরে লাফাইয়া সেই চামারদের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং এই সময় মনুষ্য নিদ্রাবস্থায় যেরূপ নাসিকা গর্জ্জন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অথবা শূকরের নাসিকার শব্দের ন্যায় মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। চামার মণ্ডলীর মধ্যগত হইলেই 'ভোপা' মহাশয়ের হস্তে মোহান্তদেব একখানি উলঙ্গ তরবারী প্রদান করেন। তরবারীখানির মধ্যদেশ ভোপা বজ্রমুষ্টি দ্বারা ধারণ করে। উলঙ্গ তরবারীর মধ্যদেশ এরূপ বজ্রমুষ্টি দ্বারা ধারণে আমি প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পরে মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়া জানিতে পারিলাম তরবারী খানি ভোঁতা। যেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম সে দিবস নিকৃষ্ট-জাতীয় মিনা, গুজর, মালী ইত্যাদি স্ত্রী-পুরুষ অনেকে দেবীর আদেশপ্রাপ্তির জন্য জাগরণ করিয়াছিল। প্রদীপ জ্বালিয়া এই নাগড়া পিটিয়া গীত প্রভৃতি কার্য্যকে "জাগরণ" বলে। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা জাগরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকেই রোগী। কেহ জ্বর, কেহ চক্ষুরোগ, কেহ বা রাতকাণা ইত্যাদি রোগমুক্ত হইবার ইচ্ছায় তথায় আসিয়াছিলেন। জাগরণ করাইতে গেলে প্রত্যেকের নিকট হইতে ১॥০ টাকা শুল্ক গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক ভোপা মহাশয় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইতে কাঁপাইতে জন্তু বিশেষের ন্যায় নাসিকার শব্দ করিতে করিতে তরবারীহস্তে রোগী-দিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও চরণামৃত দিলেন, কাহাকেও দেবীর বেদীস্থিত কিঞ্চিৎ "বিভূতি" দিলেন। চক্ষুরোগে প্রপীড়িত কাহাকেও বা তাহার চক্ষুদ্বয়ে চরণামৃত ছিটাইয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে এইরূপ ঔষধদানের পর কাহাকেও বা ১০, কাহাকেও বা ৫, কাহাকেও বা ১৫ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে বলিলেন। ফল কথা ব্রাহ্মণের উদর পূর্ণ না করিতে পারিলে কোনও কার্য্যেরই গতি হয় না। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া এক দীর্ঘ নাসিকার শব্দ করিয়া "ভোপা" মহাশয় আমার দিকে মনোযোগ দিলেন। আমি কোনও প্রশ্ন করি নাই। তবে মনে মনে পরীক্ষার জন্য একটি প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম

এবং ভাবিতেছিলাম যে জগজ্জননী ত সর্ব্বান্তর্যামিনী—যদি বাস্তবিকই তাঁহার আদেশ হয় তবে বিনা শুল্কদানে ও বিনা প্রশ্ন উত্থাপনে আমার মনের কথা সম্মুখস্থ "ভোপা" বলিয়া দিবে। কিন্তু তাহা হইল না। "ভোপা" আমার দিকে ফিরিয়া একমুষ্টিপূর্ণ ভস্ম এবং বাতাসা চূর্ণ আমার হস্তে দিয়া বলিল "লে মেরা পাশ আওর ক্যা হায়"। আমি দেশ, কাল ও পাত্রের মহিমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভস্ম মুঠা পকেটস্থ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করি।

মহারাজাদের এই আদেশের প্রতি অচলা ভক্তি। তাঁহাদের কৃত জাগরণের সময় জনতা থাকে না। কেবল ২।৪টী বিশ্বাসী লোক ব্যতীত অপর সকলকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ভৈরব এইরূপ 'কাল-ভৈরব' দশা ধারণ করিলেন। তিনি কিছু অর্থব্যয় করিয়া ভোপা মহাশয়কে সদলভুক্ত করিলেন এবং কাহারও নিকট অর্থ-শোষণ করিতে হইলে বা কোনও শত্রুকে লাঞ্ছিত করিতে ইচ্ছা করিলে মহারাজার জাগরণের সময় ভোপার দ্বারা প্রত্যাদেশ করাইলেন "দেখ ছত্রী অমুকের নিকট সাবধান"। মহারাজা অমনি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর খড়্গ-হস্ত। বিধিমতে তাহার উপর অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল। একটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত এক সময়ে কালভৈরবের একটু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই "ভোপার" চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ অপমানিত হইতে হয়। মহারাজার দৃষ্টিতে পড়িয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থ একটী কামানের মুখে তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া দুই প্রহর রাত্রে প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। তিনি মৃতপ্রায় হইলে কেহ গিয়া মহারাজাকে ব্রহ্মহত্যার ভয় দেখায়, তখন সেই গরীব ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রাজ্যের যখন এইরূপ অবস্থা তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যাদি তথা ভূমিকর ইত্যাদি আদায় বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। খাজনার টাকা আয়ে দেখা যায় না। রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মচারী তথা ফৌজ-পল্টনদিগের বেতন বাকি পড়িতে লাগিল। তহশীলদারগণ নিজ নিজ উদর পূরণে ব্যস্ত, সময়মত কেহ তহশীল করিয়া রাজস্ব পাঠায় না। রাজকোষ শূন্য হইয়া ক্রমশঃ ঋণ হইল; মহারাজাকে কুচক্রীরা এইরূপ পরামর্শ দিল যে একটি ব্যাঙ্ক খুলিয়া দেওয়া হউক; রাজধানীর কাহারও ঋণ আবশ্যক হইলে গুম্মট হইতে অনায়াসে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা লইতে পারিবে। খুব উচ্চহারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল।

এস্থলে রাজপরিবারের একটু পরিচয় না দিলে সমস্ত কথা পরিস্ফুট হইবে না। আমাদের বৃদ্ধ মহারাজার তিন ভ্রাতা। মহারাজা নিজে মধ্যম। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু বহুদিন পূর্ব্বে হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি এক শিশুপুত্র রাখিয়া যান। কনিষ্ঠের মৃত্যু আমার এস্থলে আসিবার ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র। মহারাজা অপুত্রক। এই নিমিত্ত তিনি জ্যেষ্ঠের পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে বরণ করিয়াছেন। এখানকার এই নিয়ম রাজ-গদি পাইলেই তৎসঙ্গে তাঁহার উত্তরাধিকারীও মনোনীত হয়। যুবরাজের নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে ভূ-সম্পত্তি আছে তাহার বাৎসরিক আয় প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা হইবে। আমি যখন আসি তখন যুবরাজের বয়স প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হইবে। ওদিকে কতকগুলি কুচক্রী মিলিয়া রাজাকে অসৎ পরামর্শ দিতে লাগিল; এদিকে যুবরাজেরও ২।৪টি পার্শ্বচর মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইল। যুবরাজের পার্শ্বচর তাঁহার এক পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন গোলাম-জাতীয় অর্দ্ধক্ষত্রিয়। পাচককে যুবরাজ দাদা বলিয়া ডাকিতেন। এই তিনজনের পরামর্শে যুবরাজের গৃহকার্য্য ও বিষয়কার্য্য সমস্তই সমাধান হইত। ক্রমে ক্রমে এই তিনজন যুবরাজকে অপদেবতার ন্যায় পাইয়া বসিল এবং নানা সূত্রে তাহারা নিজের উদর পূর্ত্তি করিতে ত্রুটি করিত না। যুবরাজ তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইলেন; যুবরাজের যাহা বাৎসরিক আয় তাহাতে কুলায় না। ইতিমধ্যে দুইটি দারপরিগ্রহ করা হইয়াছে। দুই স্ত্রীর দাস দাসী আহার-পরিচ্ছদ সমস্তই স্বতন্ত্র। বড়ঘরের এখানে এইরূপ রীতি; তাহার উপর যুবরাজের নিজের খরচ ও এই পাপগ্রহদের উদর পূর্ত্তি। সুতরাং ব্যয় সঙ্কুলান না হইবার কথা। প্রথমে তাঁহার নিজ জায়গীরে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে জুলুম আরম্ভ হইল। প্রজারা ভিটা ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ অন্য রাজ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে লাগিল। তৎপরে রোহরাজাতীয় উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ। না দিলে বাটীর সম্মুখস্থ নিম্ব বৃক্ষের শাখায় লম্বমান করিয়া তাহাদের বেত্রাঘাত এবং 'তুদম' নামক যন্ত্রে

তাহাদের পদদ্বয় আটকাইয়া অশেষবিধ অত্যাচার ও অপমান এই তিন নরাধম করিতে আরম্ভ করিল। এখানে কতকগুলি দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ আছেন। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে হইতে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণীর সহিত যুবরাজের অবৈধ প্রণয় জন্মাইয়া দিল। যুবরাজের চরিত্র যৌবনের প্রারম্ভ হইতে দুষ্ট হইয়াছিল। তাহা এই পাপগ্রহদের অবিদিত ছিল না। প্রথমে নগর বহির্ভাগে কোনও জঙ্গলে উভয়ের মধ্যে মধ্যে মিলন হইত; তৎপর যখন প্রণয় ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিল, তখন সেই স্ত্রীলোকটি বাটীর ভিতর গুপ্তভাবে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। পাপকার্য্য অধিককাল লুক্কায়িত থাকে না। জ্যেষ্ঠা পত্নী ক্রমশঃ সমস্ত অবগত হইলেন। সেই তেজস্বিনী রাজপুত কন্যার এই সকল ব্যাপার অসহ্য হওয়ায় একদিবস নিজ বাঁদীদিগের দ্বারা উক্ত কুলটাকে ধর-পাকড় করা হয়। যুবরাজ তজ্জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া বাঁদীদের সর্ব্ব সমক্ষে কশাঘাত করেন। এই ব্যাপারের পর কুলটা প্রকাশ্যেই বাটীতে আসা যাওয়া আরম্ভ করিল। তিন উপগ্রহ এই পাপিষ্ঠ রমণীর দ্বারা যুবরাজকে স্থায়ীভাবে করতলগত করিবার আশায় এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কুলটা এখন যুবরাজকে ক্রমশঃ 'করণ' করিয়া 'খাওয়াস' হইবার প্রস্তাব করিল। বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার কর্ণে 'খাওয়াস্' কথাটা অদ্ভুত ঠেকিবে। বাস্তবিক তাহাই। আমাদের দেশে এ প্রথা আদবে প্রচলিত নাই। এই প্রথার একটু ইতিবৃত্ত শুনিলেই পাঠক পাঠিকারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এরূপ কলুষিত প্রণয়ে পড়িয়া উপপত্নীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া পর্দ্দার মধ্যে স্ত্রীর মত রাখাকে "খাওয়াস" করা বলে। পূর্ব্বে সে রমণী অতি নীচ বারবনিতার ব্যবসা করিয়া থাকুক তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। অন্তঃপুরে সে "খাওয়াস"-রূপে প্রবেশ করিলে প্রায়ই বিবাহিতা পত্নীর সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। যুবরাজ এখন প্রেমান্ধ, হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই—তাহার উপর সেই তিনটি উপগ্রহ উৎসাহদাতা সুতরাং নির্ব্বিবাদে কুলটাকে খাওয়াস করা হইল। সে স্ত্রীলোকটা সময় বুঝিয়া যুবরাজকে স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়া লইল যে তিনি জীবনান্ত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবেন না। দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণমহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কুলটার এ রাজ্যে পিত্রালয়। তাঁহার ভ্রাতা চতুর্দ্দিকে চিৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই তাহার অরণ্যে রোদন। কিছুকাল পরে উক্ত রমণীর স্বামী স্ত্রীপ্রাপ্তির আশায় কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট অনুযোগ করে। পরে কিছু অর্থ দিয়া তাহার সহিত নিষ্পত্তি করা হয়।

"খাওয়াসজী" যুবরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া তাঁহার গৃহে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। যুবরাজের জ্যেষ্ঠা পত্নী সুবুদ্ধিসম্পন্না তেজস্বিনী রমণী; দ্বিতীয়া পত্নী বালিকা ইহার বয়স তখন একাদশ অথবা দ্বাদশ। উভয়ের উপর খাওয়াসজীর সমূহ সপত্নী-বিদ্বেষ পড়িল। মধ্যে মধ্যে তিনি নিরাশ্রয়া রাজপুত-বালিকার উপর অশেষবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই বালিকা বুঁদিগাড়া রাজপুত শ্রেণীর কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। পরে ইনি পাটরাণী হইয়া এই রাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কারী ও তেজস্বিনী রাজকন্যা আধুনিক সময়ে অতি অল্প দেখা যায়। তিনি প্রকৃতই ক্ষত্রিয়-কন্যা ছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি বালিকা, সুতরাং তাঁহাকে যথেষ্ট মানসিক ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে দুই তিন দিন অনাহারে কাটাইতে হইত।

ক্রমশঃ এ রাজ্যের অত্যাচার কাহিনী গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একজন খাস পোলিটিকাল এজেণ্টকে সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। খাঁ সাহেব এবং দেওয়ানজী অতি কষ্টে কোনও ক্রমে মান বাঁচাইয়া এতদিন জীবন যাপন করিতেছিলেন। দেওয়ানজী এখন মহা-রাজাকে বলিলেন এই বার আপনার সিংহাসন রক্ষার ভার। যে সকল অত্যাচার কুচক্রীদের পরামর্শে করিয়া-ছেন, তাহার সমস্ত গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং প্রজাবর্গ যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আছে তাহারা সমস্তই প্রমাণ করিয়া দিবে। এখন তাঁহার চক্ষু ফুটিল। দেওয়ানকে এখন তোষামোদ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন পরিত্রাণ পাবার উপায় বল। দেওয়ান বুঝিলেন ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি বলিলেন এক উপায় আছে। আপনি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাব• করুন যে আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক

তাদৃশ তেজ নাই। এইজন্য সমস্ত রাজকার্য্য পরিদর্শনে অসমর্থ। গভর্ণমেণ্ট এরাজ্যের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলে ভাল হয়। এ প্রস্তাব করিলে আপনি সিংহাসনচ্যুত হইবেন না। আপনার পরামর্শে সমস্ত কার্য্য হইবে। তবে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না হইতে পারে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্ট দৃষ্টি রাখিবেন। মহারাজা নিজের সরল প্রকৃতির অনুযায়ী এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাই বলিলেন। পলিটিকাল এজেণ্ট বাহাদুর সন্তোষপ্রকাশ করিয়া মহারাজাকে সেই প্রস্তাব পত্র দ্বারা গোচর করাইতে পরামর্শ দিলেন। নৃপতি তাহাই করিলেন।

এইরূপে বৃদ্ধ রাজার হস্তলিপি হস্তগত করিয়া এজেণ্ট বাহাদুর রাজ্যের সুবন্দোবস্তে মনোযোগী হইলেন। নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যাহাদের প্রতি কোনরূপ অযথা অত্যাচার হইয়াছে তাহারা তাঁহার নিকট আবেদন করিলে এবং সমুচিত প্রমাণ দিলে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত বিচার হইবে। প্রজাবর্গ প্রথমে ভয় পাইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রজাপেক্ষা দেশী রাজ্যের প্রজারা কিছু বেশী ভীরু। তখন এজেণ্ট সাহেব রাত্রিকালে দুই একটী বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যবহারে ছদ্মবেশে নগরের গলি গলি ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ পরস্পর কিরূপ কথোপকথন করে এবং অন্যান্য গুপ্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সাহস পাইয়া লোকে তখন আত্ম-দুঃখকাহিনী তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের অনুযোগ ধীরচিত্তে শ্রবণ করিয়া তাহাদের যেরূপ কষ্ট তাহা মোচন করিতে লাগিলেন। যে সকল লোকের নিকট অন্যায় উৎকোচ গ্রহণ করা হইয়াছিল অথবা ঋণ ব্যপদেশে অযথা পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল সে সমস্ত মহারাজার শুম্মট হইতে ফেরৎ দেওয়াইয়া দিলেন এবং আরদালীর 'মোড়া' দিগের মধ্যে যে ৫।৬জন অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের এ রাজ্য হইতে যাবজ্জীবন বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

এখন রাজ্যের অন্যান্য বিশৃঙ্খলার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। এ রাজ্যের আয় পাঁচ লক্ষের বেশী হইবে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। সুতরাং সাহেব আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করণার্থ নূতন করিয়া বাৎসরিক আয় ব্যয়ের তালিকা বানাইলেন। দেশীয় রাজ্যে সাধারণতঃ যেরূপ সৈন্য হইয়া থাকে এখানেও সেইরূপ ছিল। কতকগুলি অলস লোককে প্রতিপালন করিয়া রাজ্য ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সৈন্য সংখ্যা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে ২৫০০ ছিল। তিনি কাটিয়া ২১০০ করিলেন এবং চারিশত লোককে ছয়মাস বেতন অগ্রিম দিয়া বিদায় দিলেন। ঈদৃশ প্রকারে নানা উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া বাৎসরিক ৭০০০০৲ টাকা ঋণ পরিশোধার্থ রাখিলেন। আয় ব্যয়ের এরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া দেওয়ানী, ফৌজদারী, রাজস্ববিভাগ একে একে সমস্ত বিষয়গুলির সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের যুবরাজের সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাঁহার জায়গীরস্থ প্রকৃতিপুঞ্জ এবং নগরের লোক ক্রমশঃ তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী সাহেবের গোচর করিল এবং খাওয়াসকৃত কলঙ্ক কাহিনী ও যুবরাজের পত্নীদ্বয়ের প্রতি অত্যাচার—তৎসহ তিন উপগ্রহের কীর্ত্তি সমস্তই তাঁহার কর্ণগত হইল। তিনি প্রথমে যুবরাজকে ডাকিয়া বন্ধুভাবে অনেক বুঝাইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার জায়গীরের আয় ৯।১০ সহস্র টাকা এবং তাঁহার ঋণ প্রায় ২৪০০০৲ টাকা হইয়াছে, ইহার পরিশোধার্থ যত্নবান হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া তিনি যখন এই রাজ্যের যুবরাজ ও ভাবী উত্তরাধিকারী তখন তাঁহার নির্ম্মলচরিত্র হওয়া উচিত এবং ভাবী দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে সতত নিজ পদোচিত কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত। তজ্জন্য তিনি উক্ত তিন উপগ্রহকে এবং "খাওয়াস নাম্নী" বেশ্যাকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং অতি ধীরভাবে বুঝাইলেন যে যতদিন এই সকল কদর্য্য লোক তাঁহার নিকট থাকিবে তিনি কোনও ক্রমে ঋণমুক্ত হইতে পারিবেন না এবং তাঁহার পদগৌরব ও মর্য্যাদা কোনও ক্রমে রক্ষা হইবে না। উপগ্রহরা তাঁহাকে শিখাইয়াছিল যে সাহেবের নিকট কোনও বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইও না—কেবল বলিয়া আসিও যে আপনি অবশ্য আমার শুভকামনা করিয়া সৎপরামর্শ দিতেছেন আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া ৫।৭ দিবস পরে আপনাকে উত্তর দিব। এই বলিয়া সে দিবস চলিয়া

আসিলেন। এদিকে তিন উপগ্রহ ও খাওয়াসজী প্রমাদ গণিয়া যুবরাজকে বাটীতে ভজাইতে লাগিলেন। রাজপুত-জাতির প্রকৃতি এই যে তাঁহারা যে কথায় জেদ ধরেন তাহা সহসা ত্যাগ করেন না। আবার এ রাজ্যে উচ্চপদস্থ রাজপুত্রদের প্রায়ই দেখিয়াছি তাঁহারা সৎকার্য্যে এরূপ জেদ করেন না, কিন্তু মন্দকার্য্যে তাঁহাদের অত্যন্ত জেদ। প্রাণান্ত হউক নিজের হঠকারিতা ছাড়েন না। যুবরাজও এই দুষ্ট কর্ণজপাদের মধুমিশ্রিত বাক্যে ভুলিয়া হট করিয়া বলিলেন যে ধন জন জায়গীর সমস্ত যাউক—এ চারিজনকে কোনও ক্রমে ত্যাগ করিবেন না। এই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। দেখিতে দেখিতে ৭।৮ দিবস চলিয়া গেল, সাহেবের নিকট কোনই উত্তর গেল না। সাহেব তখন নিজে যুবরাজকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তথায় গিয়া যুবরাজ নিজ অভিপ্রায় ও প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন; সাহেব তখন রোষপরবশ হইয়া নানারূপ তিরস্কার করিলেন এবং পুনরায় এক সপ্তাহের সময় দিয়া বিদায় দিলেন।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহও অতিবাহিত হইয়া গেল। যুবরাজের দেখা নাই। সাহেব বুঝিলেন, সোজা কথায় মানিবার নহে। সে সময় রাজ হইতে চারিজন অশ্বারোহী সৈন্য যুবরাজের শরীর রক্ষক দলে থাকিত। বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্বতন যুবরাজরা এ মর্য্যাদা পান নাই। সাহেব উক্ত অশ্বারোহী চতুষ্টয়কে কাড়িয়া লইলেন এবং এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যদি এক মাসের মধ্যে আজ্ঞানুসারে কার্য্য না হয় তাহা হইলে জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইবে। ইহাতেও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে আসিয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। তিনি বলিলেন আমি কিছু চাই না কেবল 'খাওয়াস' চাই, আর এক বন্দুক হইলে আমার চলিবে। জঙ্গলে শিকার করিব তদ্দারা আমার উদর পূর্ণ হইবে। তাঁহার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্ব হইতেই ঋণগ্রস্ত। তদুপরি এখন জায়গীর পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু তত্রাপি উপগ্রহ ও স্ত্রীলোকটা পরিত্যাগ করিলেন না। পুত্রবৎসল মহারাজা সাহেবের তোষামোদ আরম্ভ করিলেন এবং সাহেবের মিথ্যা প্রশংসা করিয়া সাহেবের ক্রোধ উপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি সাহেবের নিকট বলিয়া আসিলেন যে যুবরাজের মত ফিরিয়াছে এবং সে ২।৪ দিবসের মধ্যেই কুলটাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছে। অথচ কথাটা মিথ্যা। দুই চার দিবস পরে সাহেব নিজে যুবরাজের বাটীতে গিয়া তদন্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মহারাজার নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইলে তিনি অতি সত্বর যুবরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে দালানে কাপড় টাঙ্গাইয়া তন্মধ্যে খাওয়াসকে লুকাইয়া রাখ। তদ্রূপই করা হইল। বহির্বাটীতে এক দালানে "কানাত" খাটাইয়া তাঁহাকে রাখিয়া দিল। সাহেব তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। যুবরাজ তাঁহার সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সাহেব বহির্বাটীর চতুর্দ্দিক দেখিয়া হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কানাত টাঙ্গান কেন। তিনি অমনি বলিলেন "হুজুর ঘোড়ী বিয়াই হয়, হাওয়া না লাগনে পাওএ এহিসে পর্দ্দা টাঙ্গা দিয়া।" "ক্যাসা ঘোড়ী বিয়াহি হয় হম দেখনা চাহতে হ্যায়"। এই বলিয়া সাহেব দ্রুতপদে সেইদিকে গমন করিলেন। যুবরাজের বদনমণ্ডল শুষ্ক। পর্দ্দা উঠাইয়া দেখিলেন অশ্বের পরিবর্ত্তে তথায় হস্তপদ বিশিষ্ট "মানুষী"। সাহেব হাসিয়া বলিলেন "ও যুবরাজ, ইহ তোমারী ঘোড়ী বিয়াহী হয়।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে এই ব্যাপার দেখিয়া সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালা দেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে তাহা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবের কথা নহে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই গৌরবের বিষয় হইবে। তিন খণ্ডে ইতিহাসখানি সম্পূর্ণ হইবে; অধ্যাপক শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রথম খণ্ডের এবং সার যদুনাথ সরকার অপর দুই খণ্ডের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মোট ৫৮টি অধ্যায়ে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে; শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বহু মনীষী ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় সম্পাদন করিবেন। এই কার্য্যের প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক সহস্র টাকা ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মিঃ এ-এফ রহমন এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

সম্মানার্হকে সম্মান দান—

ইউরোপের নানাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্মান-সূচক উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐরূপ উপাধি দান করিয়াছিলেন। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবের সময়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কয়েকজন সুধী ব্যক্তিকে উপাধি দান করিয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন ও ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি সার আবদার রহিম 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি পাইয়াছেন। সার জগদীশচন্দ্র বসু ও সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'ডক্টর অব্ সায়েন্স' উপাধি লাভ করিলেন। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সার মহম্মদ ইক্‌বাল ও সার যদুনাথ সরকার 'ডক্টর অব্ লিটারেচার' উপাধি পাইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার-রূপে সার জন এণ্ডারসন উৎসব সভায় উপস্থিত ছিলেন —তাহা ছাড়া উপাধি পত্র গ্রহণের জন্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ঢাকায় গিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে সম্মানিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতাস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় এখনও এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন নাই। ইহা বাস্তবিকই একান্ত পরিতাপের বিষয়।

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ—

"রচনা করার পক্ষে নির্জ্জনতার অবকাশ যেমন সুবিধাজনক, তেমনি তাতে যে অসুবিধা নেই, তাও নয়। একথা সত্য যে নির্জ্জনতার মধ্যে সুধু পাওয়া যায় নিতান্ত নিজেকে, সাধনার চির-নিষ্ঠার মূল্য সেখানে আছে মেনে নিতে পারি, সেখানে কোন আবিলতা থাকে না, সেখানে কোন চিত্ত-বিক্ষেপ হওয়ার কারণ ঘটে না, সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতা ও কোলাহলের কারণ ঘটে না। আমার অভ্যাসের মধ্যে ঐটি বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তবে এ কথা সত্য যে, সমাজের কাছ থেকে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করলে কোন রকমেই মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাবার সুযোগ ঘটে না। নানা লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যে যে একটা শিক্ষা আছে, তার ভিতর হ'তে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দূরে থাকলে সম্ভব হয় না। সমাজকে জানতে হ'লে, তার উন্নতির পথ কোন দিকে, কোন পথে তার সন্ধান নিতে হ'লে—চাই পরিচয়, অন্তরের পরিচয়, সমাজের সত্যিকার নাড়ীজ্ঞান। এই নাড়ীজ্ঞান লাভ হয় সুধু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় দ্বারা এবং সেই অন্তরের পরিচয় হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সাহায্যে। এই মানব মনের পরিচয়ের ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সে হ'ল

সত্যিকার অন্তরের পরিচয়। এই পরিচয়ের দ্বারা, এই সহযোগিতার দ্বারা জনসমাজের কি সঙ্কল্প তা জান্‌তে পেরে ভবিষ্যতকে যারা তৈরী করবে, জাগিয়ে তুল্‌বে, উন্নতির পথ দেখিয়ে দেবে, কালের উপযোগী বাণী প্রচার করবে, তারা পায় পথের সন্ধান। কাজেই জন-সমাজের কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে ত চলবে না। তাদের মানুষকে চিনতে হবে, মানুষের ভিতর দিয়ে মেলা-মেশা ক'রে। আমার মত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাক্‌লে তা চল্‌বে না। আমি সুদীর্ঘ পথ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থেকে অভ্যাসের মধ্যে যে প্রধান ত্রুটি করেছি, সে অভিজ্ঞার দ্বারা যে সত্যকে উপলব্ধি করেছি, আজ তোমাদের কাছে সে কথাই বল্‌লুম। আমার সহজ বুদ্ধি বলে দিচ্ছে, মানুষকে সমাজকে ভালবাসতে হবে।" গত ৩রা শ্রাবণ রবিবার কলিকাতা বালীগঞ্জে শ্রীযুত শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রায়বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে "রবিবাসরের" এক সভায় কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইয়া সমবেত সাহিত্যিক-গণকে উপদেশ প্রদান কালে উপরোক্ত কথা কয়টি বলিয়া-ছিলেন। সেদিন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সকলের বিশেষ হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল এবং শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় স্বয়ং তাহা লিখিয়া লইয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। 'রবিবাসর' সাহিত্যিকগণের একটি সামাজিক মিলন-কেন্দ্র, সে জন্য রবীন্দ্রনাথ তথায় মিলনের কথাই বলিয়াছিলেন।

টাউন হলে প্রতিবাদ সভা—

বাঙ্গালার হিন্দুগণের পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদা-দের বিরুদ্ধে ভারত সচিবের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা গত মাসেই আলোচনা করিয়া-ছিলাম। গত ৩১শে আষাঢ় বুধবার কলিকাতা টাউন হলে কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক জন-সভায় হিন্দুগণের ঐ আবেদন সমর্থন করা হইয়াছে। টাউন হলের সভায় এরূপ জনসমাগম বহুদিন দেখা যায় নাই। এই সভা সেদিন সকলকে অসহযোগ আন্দোলনের যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সভায় সমবেত জনগণের অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক সভাস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটি কথা প্রদত্ত হইল—"বহুকাল পরে এই রাজ-নীতিক প্রসঙ্গে যোগদান করিবার পূর্ব্বে আমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম, কিন্তু সমগ্র জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে ছুরিকা শাণিত হইতেছে, তাহার কথা বিবেচনা করিয়া আমি নীরব থাকিতে সমর্থ হই নাই। সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণ দ্বারা রাজনীতিক্ষেত্রে দেশবাসীকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে ১৮টি স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠন করা হইতেছে, তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় ভারতীয় রাজনীতিক দেহের উপর অস্ত্রোপচার করা হইবে এবং ভারতীয় জাতির মৃত্যু হইবে। বাঙ্গালা দেশে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বলিতে হিন্দু সম্প্রদায়, কিন্তু তাহাদিগকে কোনরূপ সংখ্যাধিক্য প্রদান দূরের কথা, পরন্তু জন সংখ্যার অনুপাতে তাহাদিগকে আইন সভায় আসন না দিয়া তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূলে অন্যান্য সম্প্রদায়কে অধিক সংখ্যক আসন দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপিত হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে। ধর্ম্মোন্মাদনাকে প্রশ্রয় দিয়া রাজনীতিক অধিকার লাভের এই পরিকল্পনায় উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতি-গ্রস্ত হইবে। এই নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইবার পর হইতে বঙ্গদেশের আবহাওয়া অতিরিক্ত মাত্রায় সাম্প্রদায়িকতা বিষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই নির্দ্ধারণে মুসলমানগণও আমাদের মতই ক্ষতিগ্রস্ত। কাজেই, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার কিছুই নাই। নিরুপায় জাতিকে অবিচার মানিয়া লইতে বাধ্য করা যায়—কিন্তু তাহাদিগকে চিরকাল উহা সহ্য করিতে বাধ্য করা যায় না। এক সময় এ অবিচার সমগ্র দেশে বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। যে সকল দেশবাসী অনুগ্রহ লাভের আশায় বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পথে কোন ভুল করিলে উহা দ্বারা আমাদের চিরস্থায়ী ক্ষতি হইবে।" এইরূপ স্পষ্ট ও সরলভাবে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে আর কেহ কিছু বলেন নাই। আমরা দেশের সকলকে রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি কথা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পথ স্থির করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালার সমস্যা—

খ্যাতনামা অর্থনীতি-বিদ্ পণ্ডিত, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া এবার কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালার কয়েকটি অতি গুরুতর সমস্যার প্রতি বাঙ্গালী জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। সমস্যাগুলি নূতন না হইলেও, তাহার সমাধানে যত্নবান না হইলে যে বাঙ্গালী জাতি অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া ভাগীরথী নদী এবং যশোহর ও নদীয়ার ক্ষুদ্র নদীসকল ক্ষীণতর হইতেছে; আশা ছিল মধ্যবঙ্গে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংঘাতে এই সকল নদী পুনরায় সজীব হইবে; কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নদী-সংস্কার সম্বন্ধে যে কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধান্তে প্রকাশ, মধ্যবঙ্গ ক্রমশ জলা ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া ধ্বংস হইবে। ইহা যে মিথ্যা নহে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিসাবটি দেখিলেই বুঝা যায়। গত ৩০ বৎসরে বর্দ্ধমান জেলার চাষের জমির পরিমাণ কমিয়া ১১ লক্ষ একরের স্থলে ৭ লক্ষ একর হইয়াছে। ঐ সময়ে যশোহর জেলার চাষের জমি ১২ লক্ষ একর হইতে ৮ লক্ষ একর হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গেও রাস্তা এবং রেলপথ নির্ম্মাণের ফলে স্বাভাবিক জল সরবরাহ ও খাল সমূহের প্রাকৃতিক শোধন বাধা পাইবে। এই সকল পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করা না হইলে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে কলিকাতার স্থান গ্রহণ করিবে। সাবজ-পুর বা সন্দীপের নদী কলিকাতার হুগলী নদীর স্থান অধিকার করিবে; চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও ঝাল-কাঠির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কলিকাতার দিন ফুরাইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে খাল খনন করিয়া গঙ্গা ও যমুনা হইতে সেচের জল লওয়ায় বাঙ্গালায় গঙ্গার জল তিন ফিট কমিয়াছে; ইহাও মধ্যবঙ্গের দুর্দ্দশার কারণ। পশ্চিম বঙ্গকে এই আসন্ন বিপদ হইতে বাঁচাইতে হইলে ২০।২৫ বৎসরব্যাপী নদী-সংস্কারের একটি পরিকল্পনা স্থির করা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট যে এলোমেলোভাবে সেচের কাজ করিতেছেন, তাহার দ্বারা কোন ফল হইবে না। অপর একটি বক্তৃতায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গালায় যে শুধু শিল্পের প্রসার হয় নাই তাহা নহে, বরং হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ বাঙ্গালার শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে যত লোক কাজ করিত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাহা অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম লোক কাজ করিয়াছে। শিল্প হ্রাস পাইলে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; অথচ বর্ত্তমানে যত লোক কৃষির উপর নির্ভর করে, কৃষি দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বাঙ্গালার কারখানাগুলির অধিকাংশই ব্যাণ্ডেল হইতে বজবজের মধ্যে এবং এই সকল কারখানায় অন্য প্রদেশেরই অধিক লোক কাজ করে। যে অঞ্চলে যে কাঁচা মাল অধিক পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে সেই শিল্পের কারখানা স্থাপিত হইলে পড়তা কম হইয়া শিল্পের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হয়, পল্লীবাসীরাও তেমনই কারখানায় জীবিকার্জ্জনের সুযোগ পায়। পল্লী অঞ্চলে বড় বড় কল-কারখানা স্থাপিত হইলে কি উপকার হইতে পারে, কুষ্টিয়া ও ঢাকার কাপড়ের কলগুলি এবং রাজসাহী ও বেলডাঙ্গার চিনির কলগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এই সকল কল-কারখানা কৃষি-জীবীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে এবং পল্লীবাসীদের জীবিকার মান এত উন্নত করিয়াছে যে পাটের আবাদ দ্বারা বহু বৎসরেও তাহা সম্ভব হইত না।

আমরা উপরে মাত্র দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এদেশবাসী বহু সুধী যদি সমবেতভাবে এ সকল সমস্যার সমাধানে অবহিত হন, তবেই বাঙ্গালার লুপ্তশ্রী ফিরিয়া আসিবে এবং ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতি পুনরায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

স্পেনে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লব—

ইউরোপের স্পেন দেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ক্রমাগত তথায় অশান্তি চলিতেছে। সম্প্রতি উগ্রপন্থী শ্রমিকগণ নির্ব্বাচনে জয়লাভ করায় মনে হইয়াছিল যে এবার বুঝি স্পেনে শান্তির রাজ্য ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু রাজতন্ত্রী ফ্যাসিষ্ট দল শক্তিলাভের জন্য সারা দেশময় বিপ্লব-বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে। রাজতন্ত্রের আমলের সেনাপতিবৃন্দ এই বিপ্লবে ইন্ধন সরবরাহ করিতেছেন। বিপ্লবীদের নেতা হইয়াছেন পরলোকগত

স্বেচ্ছাচারী নেতা প্রাইমো-ডি-রিভেরার পুত্র সেনাপতি-ডি-রিভেরা। প্রাইমো-ডি-রিভেরা এককালে রাজা আল-ফেন্সোকে হাতের মুঠায় আনিয়া স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যফলে তাঁহার মৃত্যুর পর লোক রাজতন্ত্রের উপর বিরক্ত হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সে বিপ্লবে রক্তপাত হয় নাই—রাজা আলফেন্সো স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত কঠোরভাবে বিপ্লব দমনের চেষ্টা করিতেছেন ও জনসাধারণের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। দেশময় ধর্ম্মঘটের ধুম পড়িয়া গিয়াছে এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রুসিয়ায় বলশেভিক বিদ্রোহের সময় যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে স্পেনে সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। জনগণ ফ্যাসিষ্টদিগকে পরাভূত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইতেছে এবং সহস্রসহস্র নরনারী দেশ-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। এই অশান্তি নিবারণের উপায় কি, কে জানে।

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র গুপ্ত—

যুক্তপ্রদেশের পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ডাক বিভাগে ৩৩ বৎসর চাকরী

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র গুপ্ত

করিয়া গত ১লা আগষ্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ডাক ও তার বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার জেনারেল পদ লাভ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জাতিক পোষ্টাল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য মিশর দেশে গিয়াছিলেন। সেবার তিনি ইংলণ্ড, জারমাণি, অষ্ট্রিয়া, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, প্যালেষ্টাইন, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

সম্রাটের জীবন-নাশের চেষ্টা—

সম্প্রতি বিলাতে বৃটীশ সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের প্রাণ-নাশের চেষ্টার সংবাদে সমগ্র জগত চমকিত হইয়াছে।

ভারত-সম্রাট—অষ্টম এডোয়ার্ড

বর্ত্তমান সম্রাট সর্ব্ব-জনপ্রিয়। তাঁহার জীবন-নাশের চেষ্টাকে বাতুলতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ভগবানের

অসীম কৃপায় সম্রাটের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, ধৃত ব্যক্তির পিছনে কোন ষড়যন্ত্র নাই। সম্রাটের জীবন রক্ষায় পৃথিবীর সকল লোকই আনন্দিত হইয়াছে।

ডাক্তার এ, এন, মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার এ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতের গ্লাসগো সহরে আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদানের জন্য গত ১৮ই জুলাই ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে কলিকাতা ও বোম্বাই
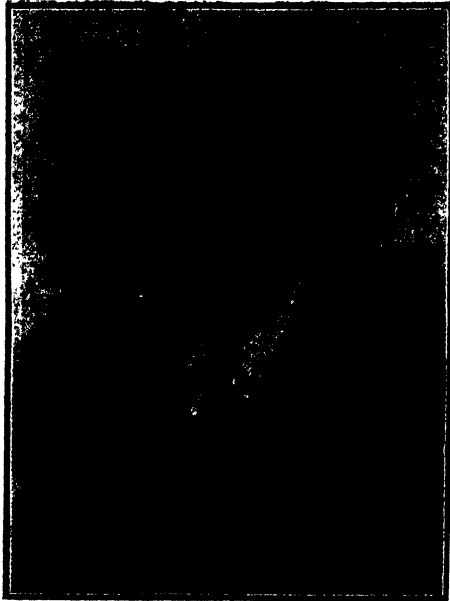
ডাক্তার এ, এন, মুখোপাধ্যায়

সহরে হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও চিকিৎসকগণের পক্ষ হইতে ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

উচ্চ-শিক্ষার ভবিষ্যৎ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার এই সময়। বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ এখন নূতন পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছেন। যাঁহারা সাধারণভাবে বি-এ পাশ করিয়াছেন, অথচ উচ্চ শিক্ষার আশা এখনও ত্যাগ করেন নাই তাঁহাদের বিপদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা এম্-এ পড়িবেন কিন্তু কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করিবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বি-এ ক্লাসে তিন চারিটি বিষয় পড়িয়াছেন। পাশ করিবার যোগ্যতা অধীত সকল বিষয়েই অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও বিষয়ে জ্ঞান হয়ত লাভ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সমস্যা গুরুতর। তাঁহারা ভাবেন—ইংরাজিও যা', অর্থ-নীতিও তাই। দর্শনও পড়া যায়, ইতিহাসও পড়া যায়। অনেকে বাঙ্গালাতেও এম-এ পাশ করিতেছে—সেটা লইয়া দেখিলেই বা ক্ষতি কি? তাহার পর গুরুজনের উপদেশ, বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ এবং আরও নানাবিধ কারণে সমস্যার একটা সমাধান হয়—গ্রাজুয়েটরা পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের যে কোন একটা ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া নিশ্চিন্ত হন। অধিকতর বিবেচক ছাত্রগণ একটু স্থিরভাবে চিন্তা করেন। তাঁহারা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ভাল করিয়া খতাইয়া দেখেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোন্ বিষয়ে অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী অল্পমাত্র বুদ্ধি লইয়া উত্তীর্ণ হয়—সে সম্বন্ধেও খোঁজখবর লইয়া থাকেন। সন্ধান লইয়া দেখেন—কোন্ বিষয়ে শতকরা ৮০।৯০ বা তাহারও অধিক পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় এবং শতকরা ২৫।৩০জন প্রথম বিভাগেই পাশ করিয়া থাকে।

আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছেন, যাঁহারা শুধু উপাধি লাভের উদ্দেশ্যেই পরীক্ষা দিতে চান না, সেই উপাধির দ্বারা যাহাতে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন—ইহাও তাঁহাদের অন্যতম আশা। এরূপ আশা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। জানি সকলেই কিছু চাকুরি পাইতে পারে না। এম্-এ, বি-এ'র সংখ্যার অনুপাতে চাকুরির সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু যে কয়েকটি পদ আছে তাহার জন্যও ত লোক আবশ্যক। যে শ্রেণীর ছাত্রদের কথা বলিতেছি তাঁহারা দেখেন কোন্ বিষয়ে এম্.এ পাশ করিলে শিক্ষক বা অধ্যাপকের পদ পাওয়া সহজ হয়। তাঁহারা দেখেন স্কুলে বা কলেজে কোন্ কোন্ বিষয়ে নূতন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্যটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করি। বর্ত্তমান বৎসর হইতে বি-এ পাশের হিন্দী ভাষাকে বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) বলিয়া গণ্য করা হইল। যে সব কলেজে হিন্দী ভার্ণাকুলার-রূপে পড়া হইত সে সকল কলেজে আজ হউক অথবা কাল হউক এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। সুতরাং এই বিষয়

পড়াইবার জন্য হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপকের আবশ্যক হইবে—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তখন হিন্দীর এম্-এ'র চাহিদা বাড়িবে। যাহারা কোন দিন হিন্দীতে এম্-এ পড়িবার কল্পনাও করে নাই—তাহারাও হিন্দীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। এই সকল এম্-এ পরীক্ষার্থী, যাঁহারা কেবল উপাধির লোভেই উপাধি লাভ করিতে চান না, যাঁহারা অধীত বিষয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে চান—মূলত তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাঁহারা এম্-এ পাশ করিয়া ঐ উপাধির সাহায্যেই জীবিকা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের প্রথমেই কয়েকটি বিষয় ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া যে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্ভব হয়, তাহার পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আপনি যদি ডাক্তার হন বা ইঞ্জিনিয়ার হন, সে কথা স্বতন্ত্র। আপনি যদি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া কৃষিকার্য্যে মন দেন, সে খুব ভাল কথা। যদি গো-পালনকেই আপনার জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে বাঙ্গালী এবং গোজাতি উভয়েরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু এ সকল কাজের জন্য এম্-এ পাশের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া কেহই মনে করিবেন না। চাকুরির জন্যও এম্-এ পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সর্ব্বত্র নাই। হেড্ কনষ্টেবলের পক্ষে এম্-এ পাশ করা অনাবশ্যক। মার্চেণ্ট আফিসের কেরাণীর পক্ষে ফিলজফি অপেক্ষা টাইপ-রাইটিংএ অধিকতর পারদর্শিতার প্রয়োজন। মুদী-দোকানে যাহারা খাতা লিখে, মিক্সড্ ম্যাথেমেটিক্সের এম্-এ তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অক্ষম। অথচ তাঁহাদের যে দুর্গতি তাহাতে এ সকল কাজও তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিলে বাঁচিয়া যান।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মাত্র দুইটি গতি; এক—গৃহ শিক্ষকতা, আর—স্কুল বা কলেজে অধ্যাপনা। স্কুলের কাজের জন্য অনেকগুলি বিষয়ের কোন সার্থকতাই নাই—ফিলজফি, ইকনমিক্স প্রভৃতি বিষয়ই তাহার নিদর্শন। অথচ এ সকল বিষয়ের এম্-এ'কেও স্কুলের চাকরি লইয়া বাধ্য হইয়া পঞ্চম শ্রেণীতে বেত্র সহযোগে ভূগোল অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিতে হয়। কলেজের কাজের জন্যও যে কোন বিষয়ে এম্-এ পড়িয়া লাভ নাই। তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্বের এম্-এ কে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কি পদ দিবেন! যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয় অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের কথা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে। যাঁহারা স্কুলের শিক্ষক হইতে চান প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এম্-এ পাশ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। বি-এ পাশ করিলেই স্কুলের শিক্ষকতা করিবার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতা জন্মায়। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এম্-এ পাশ করা দরকার—এই যা। তাহা ছাড়া স্কুলের শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিংএর ব্যবস্থাও আছে।

ইংরাজি, বাঙ্গালা, অঙ্ক, সংস্কৃত প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আছে, সেগুলি স্কুল এবং কলেজ উভয়ত্রই কাজে লাগিতে পারে। এইজন্য অনেকে ইহাদের মধ্য হইতে কোন একটি বিষয় এম্-এর জন্য মনোনীত করেন। অবশ্য বিষয় নির্ব্বাচনের সময় নিজের যোগ্যতাও বিচার্য্য। উপরি-উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন। নূতন বিষয়ের প্রতি লোকের আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাই অনেকে বাঙ্গালা ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং যাঁহারা ভর্ত্তি হন তাঁহারা প্রায় সকলেই উত্তীর্ণ হইয়া উমেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকেন। বাঙ্গালায় এম্-এ পাশ করিয়া আসিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, প্রথমে যাহা ভাবা যায় তাহা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাংশে সত্য নয়। বুঝিতে পারেন, প্রকাণ্ড ব্যতিক্রমের দ্বারাই ক্ষুদ্র আইন তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। যাঁহারা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন বাঙ্গালায় এম্-এ পাশ করিলে বাঙ্গালা অধ্যাপনার জন্য তাঁহারা অন্য বিষয়ের এম্-এ অপেক্ষা যোগ্যতর বিবেচিত হইবেন তাঁহারা পরে ভাবেন—কেন এ রকম ভাবিয়াছিলাম? ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ'র বাঙ্গালার পরীক্ষকদের তালিকা খুলিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করেন—তাই ত একি? তাঁহারা দেখেন 'ভারতীয় দেশজ ভাষার' (Indian Vernaculars) কোন একটিতে উত্তীর্ণ না হইয়াও কোন বিভাগে অধ্যাপনার কাজ পাওয়া যায়। অথচ যাঁহারা সাধারণের দৃষ্টিতে যোগ্যতর বিবেচিত হইবেন তাঁহারা নীরবে বসিয়া থাকেন। হয়ত ইংরাজি অথবা ইতিহাসে এম্-এ বা সাধারণ গ্রাজুয়েট—শতাধিক বাজালার এম্-এ বর্ত্তমানেও বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া যান।

যাঁহারা কেবল বঙ্গ-ভারতীর অর্চ্চনার জন্যই বাঙ্গালা ক্লাসে ভর্ত্তি হন, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছুই নাই। তবে তাঁহাদিগকে নিজেদের অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত একবার ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা যদি বলেন, কেবল বাঙ্গালা পড়িতে চাই বলিয়াই পড়িতেছি—তাহা হইলে বুঝিব তাঁহারা ছাত্র সমাজের আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শ ছাত্রদের মধ্যেও যশোলিপ্সা থাকা অস্বাভাবিক নহে। পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করিবার ইচ্ছা ছাত্রগণের মধ্যে না থাকিবে কেন? বাঙ্গালায় এম্-এ পড়িয়া যাঁহারা সুফল পাইতে চান, তাঁহাদের কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। বাঙ্গালায় নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যার অনুপাতে যাহারা প্রাইভেট পরীক্ষা দেয় তাহাদের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়। এই পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়া অবধি বহুসংখ্যক কলেজের অধ্যাপক ইহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই অধ্যাপকদের মধ্যে সংস্কৃতের অধ্যাপকদের সংখ্যাই বেশি। যোগ্যতা বর্দ্ধনের এই সহজ উপায় তাঁহারা উপেক্ষা করেন নাই। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষেরও তাহাতে সুবিধা হয়। অবশ্য তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ইংরাজির এম্-একেও যে বাঙ্গালার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত না করিতে পারেন, এমন নহে। কিন্তু যিনি বাঙ্গালার ক্লাস লন তাঁহার যদি ঐ বিষয়ে একটা উপাধি থাকে তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকে না। একই অধ্যাপকের একাধিক বিষয়ের অধ্যাপনাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন আপত্তি উঠাইতে ত দেখা যায় না। মফঃস্বলের অনেক কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকরাই এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পড়াইয়া আসিতেছেন। যাহাই হউক এতৎসত্ত্বেও বিদ্যা ও বেতন বৃদ্ধির জন্য যে সকল পণ্ডিত মহাশয় পরীক্ষা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অপেক্ষা তাঁহাদের সুবিধা অনেক বেশি। সংস্কৃত জানার জন্য প্রাকৃতের প্রশ্ন উত্তর করা তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। ইন্দো-আর্য্য ভাষাতত্ত্ব সংস্কৃত পড়িবার সময় তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে পড়িলে হয়। বাঙ্গালার অষ্টম পত্রে তাহা কাজে লাগে। এই দুইটি বিষয়ই বাঙ্গালী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছাত্রের পক্ষে দুরূহ। অন্যান্য বিষয়ে সমান সমান হইলেও এস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। গত কয়েক বৎসরের বাঙ্গালার এম্-এর ফল হিসাব করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন—প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছাত্র কয়বার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে প্রাইভেট ছাত্রের সহিত নিয়মিত ছাত্রের এরূপ সংঘর্ষ এবং তাহাতে নিয়মিত ছাত্রের পরাজয় দেখা যায় কি না, তাহার সন্ধান লওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

শোক-সংবাদ

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—

গত ১৫ই জুলাই আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে খ্যাতনামা বাঙ্গালী অধ্যাপক ও লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালীমাত্রই বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমেরিকায় যাইয়া যে সকল বাঙ্গালী খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, ধনগোপালবাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিস মেয়ো নামক মার্কিণ মহিলা যখন 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তক লিখিয়া বিদেশে ভারতবাসীর গৌরব ম্লান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে সময়ে ধনগোপালবাবু তাহার উত্তর-স্বরূপ এক পুস্তক প্রকাশ করায় এবং তাহা সুপ্রচারিত হওয়ার ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে আমেরিকার লোকের ভ্রান্ত ধারণা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল। ধনগোপালবাবু মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াই পিতামাতার অজ্ঞাতসারে প্রথমে জাপানে ও পরে আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন এবং শস্যক্ষেত্রে, হোটেলে, গৃহস্থের বাটীতে ও ফলের বাগানে নানাপ্রকার চাকরী করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ষ্ট্যাসফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হইয়া তিনি সাহিত্য সেবায় মন দেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জন্য সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত হন। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাহিত্যিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং যশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রভূত

অর্থেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রাজ্ঞ রোমা রোলা তাঁহার লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়াই সর্ব্বপ্রথম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ধনগোপালবাবু কেবল লেখক ছিলেন না, তাঁহার বক্তৃতা শক্তিও অসামান্য ছিল। তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে নানাস্থানে বহু বক্তৃতা করিয়া সে বিষয়ে বিদেশীয়দিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এক মার্কিণ মহিলাকে তথায় বিবাহ করেন—তাঁহার একটি ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র আছে, তাহার নাম নরেন্দ্রগোপাল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

তমলুকে ওকালতী করিতেন। তাঁহারা পাচ ভ্রাতা ছিলেন; তন্মধ্যে ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে রাজবন্দী হইয়া আছেন। ধনগোপালবাবু ১৯২১ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দুইবার জন্মভূমি দর্শন করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণমিশনের স্বর্গীয় সভাপতি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

ধনগোপালবাবু বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Caste and Out-Caste নামক গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবনের বহু কথা বিবৃত করিয়াছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে My Brother's Face নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ভারত-ভ্রমণের বিবরণ লিখিত আছে। তাঁহার লিখিত কয়খানি পুস্তকের নাম এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল—Gay Neck, The Face of Silence, The Secret Listeners of the Past, A Son of Mother India answers, Devotional passages from the Hindu Bible, Visit India with Me, Dis-illusioned India, Rama the hero of India, Kari the Elephant, Jungle beasts and men, Hari the Jungle God, Ghond the Hunter, The chief of the herd.

তাঁহার দেশবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় এই যে মানসিক অশান্তি লাঘবের জন্য তাঁহাকে আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে।

পঞ্চানন মিত্র—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার পঞ্চানন মিত্র গত ২৫শে জুলাই শনিবার মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। শুধু অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য নহে, তাঁহার সরল, অমায়িক ব্যবহারের জন্যও তিনি তাঁহার ছাত্র-মহলে এবং বন্ধু-সমাজে সকলের অতি প্রিয় ছিলেন।
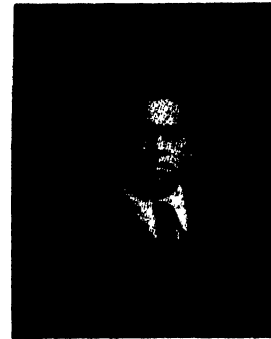
ডাক্তার পঞ্চানন মিত্র

পঞ্চাননবাবু পরলোকগত সুধী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পৌত্র। তিনি ছাত্রাবস্থা হইতেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পি-আর-এস হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পরে ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি বিভাগে নৃতত্ত্বের

প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘোষ-ভ্রমণ-বৃত্তি লাভ করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন ও তথায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন এবং স্বরাজ্য দলের সহিত একযোগে পৌরজন-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি একবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃ-তত্ত্ব বিভাগে সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, দুই কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান।

জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি, ডি-পি-এচ মহাশয় গত ৩রা জুলাই মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। হিন্দু স্কুল ও সেণ্ট জেভিয়ার্স

ডাক্তার জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজে শিক্ষা লাভের পর তিনি স্বর্ণপদক লাভ করিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এম-বি পাশ করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, মেয়ো হাসপাতাল, হাতোয়া রাজ-এষ্টেট ও কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজে চাকরী করার পর তিনি ১৯২০ হইতে ১৯৩৩ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগে স্কুল সমূহের মেডিকেল ইন্সপেক্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি বহু পারিতোষিক ও পদক লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির কার্য্য করিয়াও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু মাসিক পত্রে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং স্বাস্থ্য-বিষয়ক কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও কয়েকটি শিশু সন্তান বর্ত্তমান। চট্টগ্রামের এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমান হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—

কলিকাতাস্থ সেণ্ট্রাল ফর্ম্মস্ প্রেসের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ম্যানেজার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি ৫৮ বৎসর

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

বয়সে সন্ন্যাস রোগে মাত্র আড়াই ঘণ্টা কাল ভুগিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ২৪ পরগণা বসিরহাট মহকুমার শিবহাটী নিবাসী ডেপুটী কলেক্টার ৺ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তথায় সাফল্যের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। নিজ বাস-গ্রামের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন এবং সাহিত্যানুশীলনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

ভাগবতকুমার শাস্ত্রী—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাক্তার ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। শাস্ত্রী মহাশয় গত ১৭ই শ্রাবণ রাত্রিশেষে হাওড়া বাজে-শিবপুরে নিজ বাটীতে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম' আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন এবং সিনেটের সদস্য ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার বাগনাপাড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সংস্কৃতে এম-এ পাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি সংস্কৃতে প্রথম হওয়ায় 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ১৯০০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী কলেজে এবং পরে ১৯২৯ পর্য্যন্ত হুগলী কলেজে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগ খোলার প্রথম হইতেই তিনি তথায় অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পি-এচ্ ডি উপাধি প্রাপ্ত হন ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিলেই শ্রোতাকে মুগ্ধ হইতে হইত। ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি কম ছিল না। তাঁহার বিধবা পত্নী, ৫ পুত্র ও ৫ কন্যা বর্ত্তমান।

গোলাপমণি—

৺জয়গোবিন্দ লাহা সি-আই-ই মহোদয়ের সাধ্বী মহাপ্রাণা পত্নী গোলাপমণি বিগত ৩২শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। চুঁচুড়ার সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত জমিদার বঙ্কুবিহারী দত্ত মহাশয়ের তিনি দ্বিতীয়া কন্যা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। ধনে মানে চুঁচুড়ার দত্ত বাবুরা সুপ্রসিদ্ধ। এ হেন বংশের আদরিণী কন্যা গোলাপমণিকে বিবাহ করেন মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর জয়গোবিন্দ। মহারাজা দুর্গাচরণ বঙ্গদেশের তৎকালীন বাণিজ্য-ধুরন্ধর। গোলাপমণি দ্বারা এই দুই পরিবারের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

গোলাপমণি লক্ষ্মীদেবীর মত লাহা বংশের সুখশান্তি খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত দানশীলা, সরলহৃদয়া, উদারমনা, শ্রমশীলা, শান্তস্বভাবা, ধৈর্য্যশীলা, নিরভিমানা গৃহিণী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের এক আদর্শ ঘরণী ছিলেন। গোপন দান তাঁহার ধর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্ম ছিল। দরিদ্রের
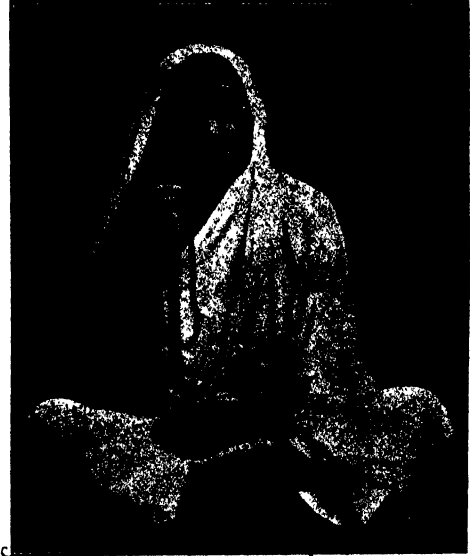
গোলাপমণি

দুঃখনিবারণে, পীড়িতের রোগ প্রশমনে, গৃহহীনের গৃহ নির্ম্মাণে, কন্যাদায়গ্রস্তের সাহায্যে, দেশের নানা স্থানের দেবমন্দির সংস্কারে, পুষ্করিণী ও কূপ খননে, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণে, বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণে তিনি দেড় লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় আশী বৎসর যাবৎ সংসারের প্রধানা গৃহিণী হইয়াও কখনও কাহারও মনে কষ্ট দেন নাই—পরন্তু ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, করুণায়, সমবেদনায়, মমতায় তিনি আত্মীয়স্বজন ও অনুগতজনের হৃদয় অধিকার করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অম্বিকাচরণ কোটিপতি জমিদার হইয়াও মাতার শিক্ষায় ও আদর্শে এমন অমায়িক ও আদর্শপুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের "মা ও ছেলের" সম্বন্ধ অতি মধুর ছিল।

৺অভয়চরণ লাহা মহাশয়ের নিকট তিনি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন এবং বিদুষী স্ত্রীলোক রাখিয়া তিনি প্রত্যহ সংস্কৃত ও ইংরাজি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থ তিনি প্রিয় পৌত্র সত্যচরণ ও জামাতা মন্মথনাথ দে মহাশয়ের সহিত দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দেবদ্বিজ ও দরিদ্রনারায়ণকে নিত্য সেবায় তুষ্ট করিতেন। পিতামহীর পুণ্যে ও আশীর্ব্বাদে ডাঃ সত্যচরণ লাহা ও ডাঃ বিমলাচরণ লাহা আজ দেশে লক্ষ্মীসরস্বতীর সুসন্তান।

৺ভোলানাথ মিত্র—

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে বিগত ১১ই আষাঢ় কলিকাতা সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ মিত্র বংশোদ্ভব ভোলানাথ মিত্র মহাশয় অকস্মাৎ হৃদ্রোগে তদীয় 'বাগমারী-ভিলা' নামক উদ্যানবাটীকায় প্রাণত্যাগ করিয়া-

ভোলানাথ মিত্র
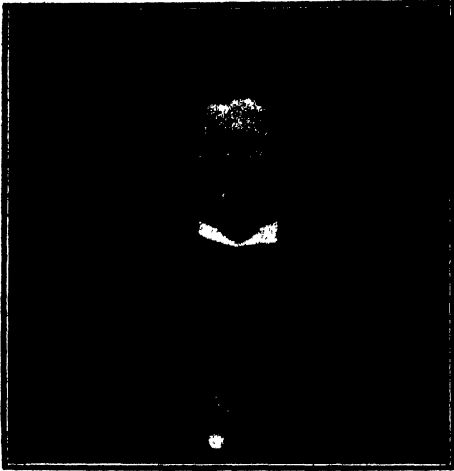
ছেন। ইঁহাদের আদি বাস হালিসহরে। ভোলানাথ বাবুর প্রপিতামহ সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় আগমন করিয়া সিমুলিয়া পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন এবং 'রাধানাথ জীউ' গৃহ-দেবতার প্রতিষ্ঠা করত দেবসেবার জন্য বহুমূল্য দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন। ভোলানাথ বাবুর পিতা সাতকড়ি মিত্র মহাশয় বিখ্যাত সওদাগর জে, টমাস কোম্পানীর অফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করেন। সাতকড়ি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কালিদাস মিত্র মহাশয় তদানীন্তনকালে কবিরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'মানসকুসুম' কাব্য জনাদর লাভ করিয়াছিল। তিনি "সুবোধিনী" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত করিয়াছিলেন। কালিদাস-বাবুর অকাল-মৃত্যুর পর তদীয় মধ্যম ভ্রাতা ভোলানাথবাবু উক্ত পত্রিকাখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া কিছুকাল উহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সাতকড়িবাবু ভোলানাথ বাবুকে জে, টমাস কোম্পানীর অফিসে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই স্থানে ৪৬ বৎসর কাল তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ভোলানাথবাবু সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 'সুবোধিনী' পত্রিকা সম্পাদন ব্যতীত তিনি ইংরাজীতে A visit to Darjeeling নামে একখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগ ঘটিবার পর তিনি মাণিকতলায় 'বাগমারী-ভিলা'তে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটীর রেট-পেয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন এবং উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী ও পল্লীর অনেক উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে।

ভোলানাথবাবু শোভাবাজারের মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অন্যতমা পৌত্রীকে (মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যাকে) বিবাহ করেন। তাঁহার চারি কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা তাঁহার জীবিতকালেই গতাসু হন। তাঁহার শোকাকুলা পত্নী ও পুত্র শ্রীমান পরেশনাথ এবং দুহিতৃগণের শোকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শীল্ড বিজয়ী মহমেডান ঃ

১৯৩৬ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখ ভারতের ইতিহাসের আর একটি সুবর্ণ দিবস। এ-দিন লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং শীল্ড বিজয় করলে। ইঁহারা ক্যালকাটা এফ সি দলের সঙ্গে দু'দিন গোলশূন্য ড্র করে তৃতীয় দিনে অতিরিক্ত সময় খেলে ২-১ গোলে জয়ী হওয়ায় শীল্ডবিজয়ী দ্বিতীয় ভারতীয় দল হয়েছে। জনপ্রিয় মোহন- বাগান এফ. সি ২-১ গোলে প্রবল পরাক্রান্ত ইষ্ট ইয়র্ক সৈনিক দলকে সুদূর পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের একটি দিনে

আই এফ এ শীল্ড

পরাজিত করে ভারতীয়দের নাম শীল্ড ফুটবল খেলার ইতিহাসে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করে। তার পর থেকে প্রতি বৎসরেই ভারতীয়দের শীল্ড বিজয়ের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়ে আসছে। এবারও ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভের পরে অতর্কিত বারি পতনের ফলে ক্যালকাটা দল দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠে, কিন্তু বিধাতা এবার ভারতীয়দের পক্ষে থাকায় এবং ক্যালকাটা সুবর্ণ সুযোগগুলি নষ্ট করায় খেলাটি সেদিনও ড্র হয়। বুধবার পুনরায় খেলা হয়। প্রভাত থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। প্রতিক্ষণে ভয় হচ্ছিল যে, ভগবান বুঝি এবারও ১৯২৩ সালের ন্যায় ক্যালকাটার পক্ষে সদয় হয়ে বরুণ দেবতাকে দিয়ে মাঠ ভিজিয়ে দেন। ঐ সালে মোহনবাগান-ক্যালকাটার ফাইনাল খেলার দিন এমন প্রবল বারিপাত হয় যে, খেলার মাঠ ও কলিকাতার রাজপথগুলি জলপূর্ণ হওয়ায় অনেক স্থলে যানবাহনাদি চলাচল

থম্‌সন (ক্যাপ্‌টেন) ক্যাল্‌কাটা

আব্বাস (ক্যাপ্‌টেন)

দুরূহ হ'লেও খেলা বন্ধ হয় নি, ক্যালকাটার সুবিধার জন্য। নগ্নপদ ভারতীয় দল sportingly পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এবার ভগবান সত্যই ভারতীয়দের পক্ষে ছিলেন। সমস্ত দিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকায় দর্শকদের কষ্টের লাঘবই হয়েছিল। মাঠ নগ্নপদ খেলোয়াড়দের পক্ষেই সুবিধাজনক ছিল। খেলার শেষ ভাগে ছিল না, ধীরে সুস্থে বল ধরে আরো এগিয়ে গিয়ে অনায়াসে ওসমানকে সে পরাস্ত করতে পারতো। নিশ্চিত গোল সে অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে আউট করে ফেললে, বোঝা গেলো যে বিজয়লক্ষ্মী এবার ক্যালকাটার পক্ষে নয়।

ফাইনালের প্রথম দিনের খেলা চ্যারিটি হয়। এদিনের খেলা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের হয়েছিল। মহমেডান ও ক্যালকাটা উভয় পক্ষই nervous হয়ে খেলেছে।
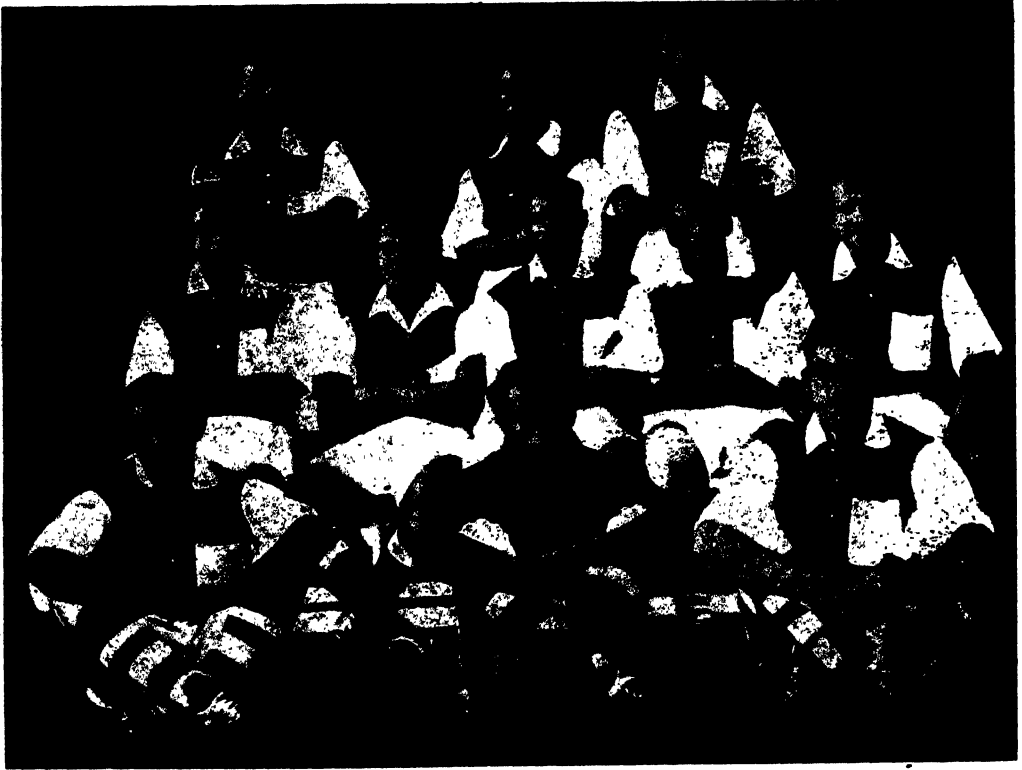
১৯৩৬ সালের শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ছবি—তারক দাস

এত গভীর মেঘ হয়েছিল যে বল দেখা কঠিন হয়েছিল, বৃষ্টি পড়ে পড়ে, এমন কি দু' এক ফোঁটা পড়েও ছিল। বিশাল জনতার সুমুখে অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধের শেষে রহিম দ্বিতীয় গোল দেওয়ায় মহমেডান দল বিজয়ী হয়ে গেলো। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমেই ক্যালকাটার লেফ্‌ট আউট বয়োজ গোলের সুমুখে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। ওসমান ব্যতীত কেহ তাকে বাধা দিতে নিকটে পুরা সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়। ফাইনালের প্রথম দিন অতিরিক্ত সময় খেলাবার নিয়ম নাই। দ্বিতীয় দিনের অতিরিক্ত সময়ে ক্যালকাটা খুব চেপে ধরে এবং কয়েকটি সুযোগ পেয়েও তাদের ফরওয়ার্ডদের—বিশেষত সেণ্টার ফরওয়ার্ড ষ্টাইলের দোষে গোল দিতে পারে না। এদিন তারা প্রকৃতপক্ষে দশজনে খেলতে বাধ্য হয়, কারণ

ফাইনালে ক্যাপ্টেনদ্বয়ের করমর্দ্দন

ছবি—জে কে সান্যাল

তাদের প্রসিদ্ধ হাফ্ টার্ণবুল খেলারম্ভের প্রায় প্রথম থেকেই আঘাত পেয়ে খোঁড়াচ্ছিল এবং দর্শকে পরিণত হতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় দিনে, মহমেডানদের পক্ষে উৎকৃষ্ট খেলেছে—রহিম, নুরমহম্মদ ও সাফি। অন্য সকলে দলের সুনাম রক্ষা করেছে। শুকনো মাঠে নগ্নপদ ভারতীয়দের ক্ষিপ্র-গতির বিপক্ষে ক্যালকাটা দলের খেলোয়াড়দের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। তথাপি ক্যালকাটার রক্ষণবিভাগ চমৎকার খেলে তাদের দাবিয়ে রাথে। পুরা সময়ের দু'মিনিট পূর্ব্বে ক্যালকাটা গোল শোধ দিয়ে তারা যে 'ভীষণ শীল্ড-কাপ্ ফাইটার' বলে কথিত তা' প্রমাণিত করে। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমে বারোজ যদি ঐ অবধারিত গোলটি নষ্ট না করতো তবে খুব সম্ভব এবারও তারা ভারতীয়দের আশা ভঙ্গ করতে পারতো।

ক্যালকাটার পক্ষে—তিন দিনই উৎকৃষ্ট খেলেছেন,—আর্মষ্ট্রং, থম্সন, গ্রস্ম্যান ও টার্ণবুল। ফরওয়ার্ড লাইন একটু ভালো খেললে তাদের জেতা শক্ত হতো না। রক্ষণ-ভাগের, বিশেষত ব্যাক দু'জন ও গোল-রক্ষকের, জন্যই মহমেডানরা দু'দিন কৃতকার্য্য হতে পারে নি। আর্মষ্ট্রং কয়েকবার বিপক্ষ খেলোয়াড়দের পা' থেকে বল তুলে নিয়ে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছেন।

বাঙ্গলার গভর্ণর আই এফ এর প্রেসিডেন্ট মহারাজা সন্তোষের সঙ্গে উভয়দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন ছবি—জে কে সান্যাল

শীল্ড খেলা ঃ

এবার শীল্ড প্রতিযোগিতায় ৪৬টি দল নাম দিয়েছিল। কিন্তু বিদেশ থেকে আগত অধিকাংশ দলই বাজে, এমন কি মিলিটারীর মধ্যেও তেমন নামজাদা দল ছিল না। মফঃস্বলের অনেকগুলি ভারতীয় দলও নাম দেয়। খুলনা থেকে দু'টি, ঢাকা থেকে তিনটি ক্লাব

খেলতে এসেছিল। এই সকল স্থানীয় দল থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে যদি একটি সম্মিলিত দল শীল্ড প্রতিযোগিতায় খেলতে আসে তবে তাদের কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে সামান্য কিছু আশাও থাকে। আই এফ এরও কর্ত্তব্য যা-তা দলের নাম বাতিল করা। বহুসংখ্যক দল যোগ দিলেই প্রতিযোগিতা উচ্চাঙ্গের হয় না। বিশিষ্ট নামজাদা খেলোয়াড় দলের সংখ্যা বেশী হলে প্রথম রাউণ্ড থেকেই শীল্ড খেলা বেশী আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক হয়। নর্থ ষ্টাফোর্ড ও সাউথ ষ্টাফোর্ডের মতন প্রতিযোগিতামূলক খেলা বহুদিন দৃষ্ট হয় নি।

মহমেডান সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কাছ থেকে ক্যালকাটার গোলরক্ষকের বল ধরা

ছবি—জে কে সান্যাল

আর্মষ্ট্রংয়ের আর একটি গোলরক্ষা

ছবি—জে কে সান্যাল

মহমেডানদের ভবানীপুরের সঙ্গে প্রথম খেলায় তারা বরাতজোরে জয়ী হয় এক গোলে। দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়নকে বেশ বেগ দিয়েছিল। ভবানীপুরের জয়ী হওয়া উচিত ছিল, তাদের খেলাই সেদিন ভালো হয়েছিল। পরের খেলায় ৫২ লাইট ইন্‌ফেন্ট্রির সঙ্গে এক গোলে ড্র করে দ্বিতীয় দিনে মহমেডান ৩-২ গোলে জয়ী হয়। তৃতীয় খেলায় মহমেডানরা ডারহাম্‌কে ২-১ গোলে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে হাওড়া ইউনিয়নকে ৫ গোলে হারিয়ে দেয়।

মোহনবাগানের গোলরক্ষক কে দত্তের রয়েল ইষ্ট কেণ্টের সেণ্টার ফরওয়ার্ড বেরীর সট্ থেকে গোল রক্ষা। ছবি—জে কে সান্যাল

হাওড়া ইউনিয়ন এবার শীল্ডে সকলকে বিস্মিত করেছে। তারা সাইনিং ক্লাবকে ৪ গোলে হারিয়ে, ডি সি এল আই সৈনিক দলের সঙ্গে দু'দিন ভিজা ও কর্দ্দমাক্ত মাঠে ১ গোলে ড্র করে, তৃতীয় দিনে ১-০ গোলে জয়ী হয়। গত বৎসরের শীল্ড-বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক দলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠে। অবশ্য ইষ্ট ইয়র্ক দল হেরে গেলেও তারাই প্রায় সমস্ত সময়টা বিপক্ষকে আক্রমণ করে উদব্যস্ত করেছিল, কিন্তু গোল-রক্ষক প্লাক্নেটকে কিছুতে পরাস্ত করতে পারে নি। অন্যদিকে তাদের সুবিখ্যাত গোলরক্ষক পটারের দোষেই বিপক্ষ পক্ষ তিনটি গোল করতে পারে। হাওড়া ইউনিয়ন ডি সি এল আই ও ইষ্ট ইয়র্কের সঙ্গে খেলায় প্রতিযোগিতামূলক খেলে জয়ী হয়, কিন্তু মহমেডানদের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে একেবারে দাঁড়াতে পারে নি। হাফ-টাইম পর্য্যন্ত কোন রকমে যুঝেছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম চার পাঁচ মিনিট এমন সুন্দর খেলা আরম্ভ করলে যে, মনে হলো বুঝি এ খেলাটিও তারা জয়ী হয়ে সকলকে বিস্মিত করে দেবে। কিন্তু যেমন একখানি গোল খেলে আর তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলো—উপর্য্যুপরী গোল খেতে লাগলো।

রয়েল ইষ্ট কেণ্ট ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ভলাণ্টিয়ার্স ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা নরফোক রেজিমেণ্টকে অনায়াসে হারিয়ে পি ডব্লিউ ভলাণ্টিয়ার্সের সঙ্গে প্রথম দিন এক গোলে ড্র করে দ্বিতীয় দিনে ১-০ গোলে জয়ী হয়। পরের খেলায় ৬ষ্ঠ

ব্রিগেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠলো। এবারকার সৈনিক দলের মধ্যে ৬ষ্ঠ ব্রিগেড ও রয়েল ইষ্ট কেণ্ট দলই ভালো দল ছিল। ৬ষ্ঠ ব্রিগেড বেশ ভালো খেলেছিল,

নরফোকস্ রেজিমেণ্ট ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ডি সি এল আই ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

কিন্তু তাদের ফরওয়ার্ডরা সুযোগ নষ্ট করায় পরাজিত হতে বাধ্য হয়। এই দলটির খেলোয়াড়রা বেশ সৌখীন। খেলার বিশ্রাম সময়ে, তারা সকলে হাতমুখ ধুয়ে একবার পরিষ্কার হয়ে নেয়। সেমি-ফাইনালে ভাগ্যবলে ক্যালকাটা মোহনবাগানকে ভিজা মাঠে ১-০ গোলে হারায়।

শীল্ডের প্রথম খেলায় মোহনবাগান এরিয়ানদের ২-০ গোলে হারায়। এদিন তাদের ফরওয়ার্ডের খেলা খুব ভালো হয়েছিল। পরে কাষ্টমস্‌কে এক গোলে কোন রকমে হারিয়ে রয়েল ইষ্ট কেণ্টের কাছেও এক গোলে জয়ী হয়। সেমি-ফাইনালে ক্যালকাটার সঙ্গে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সেম সাইডে গোল খায়। মন্মথ বল কিক্ করলে বিরাজ ঘোষের গায়ে লেগে বল গোলে চলে যায়। পরে বহু চেষ্টায় এ গাঙ্গুলি একটি অতি সুন্দর গোল করে। কিন্তু সেদিনের তাদের খেলার ভাগ্য-বিধাতা সি ডান্‌কানের মতে সেটি অফ্‌সাইড বলে বাতিল হয়। আমাদের মতে সেটি তো অফ্‌সাইড নয়ই বরঞ্চ এ রকম গোল তার পূর্ব্বে শীল্ডে আর একটিও হয় নি। গাঙ্গুলি এ দেবকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলটি এগিয়ে দিতে বলে, এ দেব বলটি গোলকিপার ও ব্যাকদের মধ্যস্থলে ঠেলে দেয়, তখন এ গাঙ্গুলি ক্যালকাটার লেফ্‌ট ব্যাককে কাটিয়ে দৌড়ে এসে গোল করে। আর্ম্মষ্ট্রং বাধা দিতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি। গাঙ্গুলি বল ধরলে রেফারি বাঁশী বাজায় নি, গোল হবার পরে অফ্‌সাইড নির্দ্দেশ করে। মোহনবাগানের ভাগ্য যে

সেদিন অত্যন্ত বিরূপ ছিল তা' প্রমাণ হ'লো যখন তারা পেনালটি পেয়েও গোল করতে পারলে না। সম্মথ দত্ত বল মারে, কিন্তু তেমন ভাল হয় নি। সোজা মার হওয়ায়, আর্ম্মষ্ট্রং কর্ণার করে গোল বাঁচায়।

মোহনবাগানের ক্যালকাটার ও রয়েল ইষ্ট কেন্টের সঙ্গের খেলা ছ'টি চ্যারিটি করা হয়েছিল। ক্যালকাটার সঙ্গে খেলাটিতে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। একই ক্লাবের ছ' ছটো শীল্ডের খেলা চ্যারিটি করলে সে ক্লাবের মেম্বারদের উপর অবিচার করা হয়। মহামেডানদের একটা খেলা চ্যারিটি করলে সুবিবেচনার কাজ হতো।

রেফারিং ঃ

প্রতি বৎসরের মতো এবারও রেফারিংএ নানা গোলযোগ ঘটেছে। এখানে ছ'একটির উল্লেখ করছি। মোহনবাগান-ক্যালকাটার খেলার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। হোয়াইট ছিলেন ইষ্টইয়র্ক ও ই, বি আরের খেলায় রেফারি। পটারকে ছ'তিন জনে লাথি মারতে থাকলেও রেফারি ফাউল দেন নি। কাষ্টমস্ ও ডেভনের খেলায় রেফারিংও অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। ই ডবলিউ ইভান্স রেফারি ছিলেন। রেফারিং strict হলে, ডেভনস্ জিততে পারতো।

মহমেডান ও ৫২ লাইট ইনফেন্টির খেলার প্রথম দিনে বলাই চট্টোপাধ্যায় রেফারি ছিলেন। তাঁর রেফারিংএ কোন দোষ দৃষ্ট হয় নি। রীপ্লেতে তাঁকে না দিয়ে অন্য রেফারি নিযুক্ত হলো কেন? প্রথম দিনের রেফারি রীপ্লেতেও খেলা পরিচালনা করেন, এই নিয়ম। ১৯৩৪ সালের ফাইনালে উভয় পক্ষই রেফারি বদলাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাহা অনুমোদিত হয় নি। এই কারণে উভয় মিলিটারী দলই খেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করেন। এবার এই অনিয়মের কারণ কি? দেখা গেছে কোন বিশেষ দলের খেলায় এক নির্দ্দিষ্ট রেফারি প্রতিবারই খেলা পরিচালনা করেছেন। সে পক্ষ যে এই রেফারিকে পছন্দ করেন তা' তাঁর মাঠে আগমনে সে দলের মেম্বর ও সমর্থকদের করতালি ধ্বনি দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। রেফারি এসোসিয়েশন কোন দলের অনুমোদিত রেফারি বারংবার নিযুক্ত করেন কেন? ইহাতে অন্যপক্ষের প্রতি অবিচার করা হয় না কি?

এবারকার রেফারিদের মধ্যে সার্জ্জেন লোই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলা পরিচালনা করেছেন, কোন মারাত্মক ভুল করেন নি।

চ্যারিটি খেলা ঃ

পূর্ব্বে চ্যারিটী ম্যাচের টিকিটে আমোদ-কর লাগতো না; এ বৎসর উহা ধরে নেওয়া হয়েছে। আমোদ-কর আইন তো পূর্ব্ব বৎসরেও ছিল, তখন যদি চ্যারিটি খেলার টিকিটে কর না লেগে থাকে তবে এবার কর ধরা হয় কেন? খেলার টিকিটের উপর কোন ট্যাক্স হওয়া বাঞ্ছনীয়ই নয়। দৈনিক টিকিট্ বিক্রয়ের উপর থেকেও কর উঠিয়ে দেওয়া উচিত। আমোদ-কর বায়স্কোপে থিয়েটারেই বসানো চলে। এই কর প্রত্যাহার করাবার জন্য আই এফ এর বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।
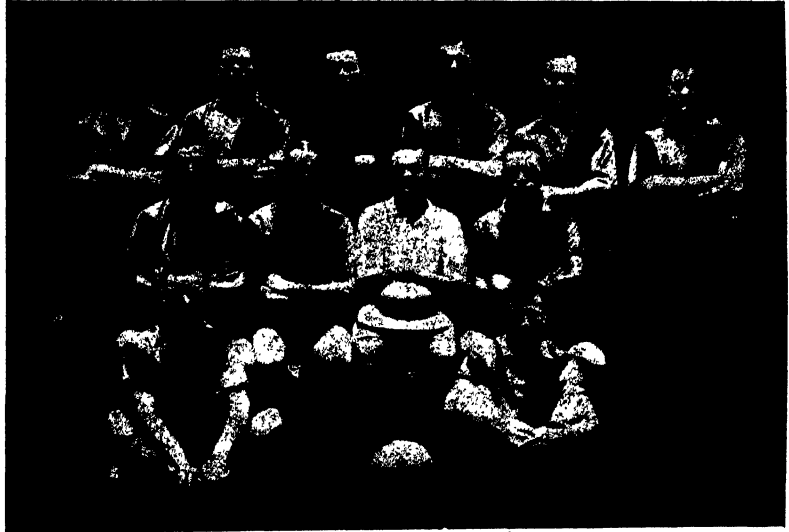
শ্যামসায়র ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

চ্যারিটি খেলার লব্ধ অর্থ যত সত্বর ছুঃস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিতরিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিক অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ভারতীয়দের কাছ থেকেই বেশী পরিমাণ অর্থ আদায় হয়। আমরা আই এফ এর যোগ্য প্রেসিডেণ্ট মহারাজ সন্তোষকে এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করছি।

১৯৩৬ সালের আই, এফ, এ শীল্ডখেলার ফলাফল ঃ

প্রথম রাউণ্ড

- হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন ৬ — ইউনিয়ন স্পোর্টিং (খুলনা) ২
- ওয়াইএম ক্লাব (দিনাজপুর) ১ — জামসেদপুর স্পোর্টিং ৩
- ওয়াইএম স্পোর্টিং এসোসিয়েশন (কুমিল্লা) ০ — ফরিদপুর ক্লাব ১
- এরিয়ান ক্লাব ২ — মুঙ্গের জিমখানা ১
- মারওয়ারী ক্লাব ০ — কাষ্টমস এ সি ১
- কুমারটুলি ০ — ভবানীপুর ক্লাব ১
- জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ২ — ঢাকা ফার্ম স্পোর্টিং ক্লাব ৩
- সিটি এ সি ০ — টাউন ক্লাব (খুলনা) ২
- ডালহৌসী এ সি ৭ — এম এস ক্লাব (বনগাঁও) ০
- নেপিয়ার স্পোর্টিং ০ — হাওড়া ইউনিয়ন ৫
- ই বি আর ৫ — পুলিস এ সি ২
- ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ০ — ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ৯
- কালীঘাট ক্লাব (০-১)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

- ইউনিয়ন স্পোর্টিং ০ — ৬ষ্ঠ ব্রিগেড ৪
- ওয়ারী এ সি ০ — ব্লাকওয়াচ ২
- বিসেট ইন্‌ষ্টিটিউট (আজমীর) ০ — ২য় প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ভলাণ্টিয়ার্স ৪
- ক্যালকাটা এফ সি ১ — প্রথম নরফোক রেজিমেণ্ট ০
- জামসেদপুর ০ — প্রথম রয়েল ইষ্ট কেণ্ট ১
- ফরিদপুর ক্লাব ১ — প্রথম হ্যাম্পসায়ার রেজিমেণ্ট ২
- এরিয়ান ক্লাব ০ — মোহনবাগান এ সি ২
- কাষ্টমস এ সি ২ — প্রথম ডেভনসায়ার ১
- ভবানীপুর ক্লাব ০ — মহমেডান স্পোর্টিং ১
- ৫২ লাইট্ ইন্‌ফেণ্ট্রি ৬ — টাউন ক্লাব ০
- ঢাকা ফার্ম স্পোর্টিং ১ — দ্বিতীয় ডারহামস্ এল আই ২
- টাউন ক্লাব (খুলনা) ২ — প্রথম বেড্‌ফোর্ড ও হার্টফোর্ড ০
- ডালহৌসী এ সি ০ — প্রথম ডি সি এল্ আই ২
- হাওড়া ইউনিয়ন ৪ — সাইনিং ক্লাব (কোহাট) ০
- ই বি আর ২ — ১ম ইষ্টইয়র্ক রেজিমেণ্ট (বিজয়ী) ৩
- ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (০-৩)
- কালীঘাট ক্লাব (০-২)

তৃতীয় রাউণ্ড

- ৬ষ্ঠ ব্রিগেড ৩ — ব্ল্যাকওয়াচ ১
- প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ ভলাণ্টিয়ার্স (১-০) — ক্যাল্‌কাটা এফ সি (১-১)
- রয়েল ইষ্ট কেণ্ট ২ — হ্যাম্পসায়ার ০
- মোহনবাগান ১ — কাষ্টমস্ ০
- মহমেডান স্পোর্টিং (১-৩) — ৫২ লাইট ইন্‌ফেণ্ট্রি (১-২)
- ডারহামস্ ৭ — টাউন ক্লাব (খুলনা) ০
- ডি সি এল আই (১-১-০) — হাওড়া ইউনিয়ন (১-১-১)
- ইষ্ট ইয়র্ক ১ — ইষ্ট বেঙ্গল ০

চতুর্থ রাউণ্ড

- ৬ষ্ঠ ব্রিগেড ০ — ক্যাল্‌কাটা ২
- রয়েল ইষ্ট কেণ্ট ০ — মোহনবাগান ১
- মহমেডান স্পোর্টিং ২ — ডারহামস্ ১
- হাওড়া ইউনিয়ন ৩ — ইষ্ট ইয়র্ক ১

সেমিফাইনাল

- ক্যালকাটা (সেম সাইড) ১ — মোহনবাগান ০
- মহমেডান স্পোর্টিং ৫ — হাওড়া ইউনিয়ন ০

ফাইনাল

- ক্যালকাটা (০-০-১) — মহমেডান (০-০-২)

ট্রেডস্ কাপ ঃ

রেঞ্জার্স ২—০ গোলে মেজারার্সকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

রেঞ্জার্স মোহনবাগানকে এবং মেজারার্স কাষ্টমস্কে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ড ঃ

মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীল্ড জয় করেছে। গত বৎসরেও মোহনবাগান বিজয়ী ছিল। এ দেব ও এস চৌধুরী গোল করেছেন।

রাজা শীল্ড ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং রেঞ্জার্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে রাজা শীল্ড পেয়েছে।

বিলাতে ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ—২৭১ ও ১৬১

ল্যাঙ্কাসায়ার—২৩৪ ও ১১৪

ভারতবর্ষ ৮৪ রানে জয়ী হয়েছে। এই খেলার প্রথন ইনিংসে মার্চ্চেণ্ট ১৩৫ রান করে নট-আউট থাকেন। তিনি পুরা ছ' ঘণ্টা ধরে খেলেছেন, একটিও সুযোগ দেন নি। রামাস্বামী ৭৮ ও গোপালন ২৫। সি কে নাইডুর অধিনায়কতায় ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৩৭ রানে অগ্রগামী হয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসেও মার্চ্চেণ্ট ৭৭ (নট-আউট) ছিলেন।

ল্যাঙ্কাসায়ার পক্ষে, নাটার (নট-আউট) ৬৪, ওয়াসব্রুক ৫২, পেণ্টার ৩৪ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে, ওয়াসব্রুক ৪১ ও লিষ্টার ২৭।

নাইডুর অধিনায়কতার সম্বন্ধে বিলাতের সমালোচকের মত— * * * that it was skilful and clever. His management of fielding was excellent and his utilization of available bowlers praise-worthy.

নাইডু ৬ উইকেট ৪৬ রানে ও জাহাঙ্গীর খাঁ ৩ উইকেট ২৫ রানে নিয়েছেন। একসময়ে নাইডু ৩ উইকেট মাত্র ৬ রানে পেয়েছেন। মার্চ্চেণ্টের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাটিং ও সি কের মারাত্মক বোলিং এই জয়ের কারণ। সি কে দুই ইনিংসেই শূন্য করেছেন, আর মার্চ্চেণ্ট দুই ইনিংসেই নট-আউট ছিলেন।

ভারতবর্ষ—২২৮ ও ২৩২ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ডার্ব্বিসায়ার—১৬০ ও ১৬৯ (২ উইকেট)

সময়াভাবে খেলাটি ড্র হয়েছে। এই বিলাত অভিযানে মার্চ্চেণ্ট দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হাজার রান তুললেন।

সি কে নাইডু এই খেলাতেও অধিনায়কতা করেন ডার্ব্বিসায়ার কাউণ্টি খেলায় এবার প্রথম যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে ড্র করে ভারত যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে জন্য সুখ্যাতি পাবার যোগ্য। তাঁরা প্রথম ইনিংসে এগিয়ে ছিলেন। একদিকের উইকেটে 'বেল' ব্যতিরেকে খেলা হয়েছিল। কারণ বায়ুর জোরে 'বেল' কয়েক মিনিট অন্তর উড়ে যাচ্ছিল। সি কে নাইডু ৬০, জয় ৪৩, বাকাজিলানী ৩৩, এস ব্যানার্জ্জি ২৮, মার্চ্চেণ্ট ২৩। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৬৮ রানে এগিয়ে রইলেন।

ডার্ব্বির পক্ষে সি ইলিয়ট ৭৭, এইচ ইলিয়ট ৪২ করেছেন। অন্য কেহ দু' অঙ্করে স্কোর তুলতে পারেন নি।

বোলিং এ ব্যানার্জ্জি ৫১ রানে ৪ উইকেটে, জাহাঙ্গীর ২৮ রানে ৩, সি এস নাইডু ৪৫ রানে ২ ও সি কে নাইডু ১৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে—মার্চ্চেণ্ট ৭৫, রামাস্বামী (নট আউট) ৪০, সি কে নাইডু ৩০, মাস্তাক আলি ২৭।

ডার্ব্বিসায়ারের পক্ষে,—অল্ডারম্যান (নট আউট) ৬১, টাউনসেণ্ড ৭৭, ওয়ার্দ্দিংটন ১৪।

ভারতবর্ষ—১১২ ও ১১৪

গ্লামারগান—২৩৮

ভারত ১ ইনিংস ও ১২ রানে পরাজিত হয়েছে। বৃষ্টির জন্য মাঠের অবস্থা খারাপ ছিল। তার উপর মার্সার মারাত্মক বল করে ৪৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে, ক্লে মারাত্মক হয়েছেন এবং ৪৩ রানে ৮ উইকেট নিয়েছেন, এক ওভারে এক রানও না দিয়ে শেষ ৩ উইকেট নিয়েছেন।

গ্লামারগান পক্ষে,—টার্ণবুল ৫০, স্মার্ট ৫৮, ডাকফিল্ড ৪৪। সি কে নাইডু ৫৩ রানে ৪ ও জাহাঙ্গীর খাঁ ৬৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

মার্চ্চেণ্ট অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ১০০ মিনিট খেলে মাত্র ২৪ করেন, ৭৫ মিনিটে তাঁর ১৩ রান উঠে। শেষ উইকেটের জুড়ি নিসার ও জাহাঙ্গীর খাঁ ১৫ মিনিটে ৬৫ রান করেন। তাঁরা দুর্দ্দান্ত বোলিংকে নির্দ্দয় ভাবে পিটিয়ে রান তুলেছেন। নিসার ৪২, জাহাঙ্গীর খাঁ (নট-আউট) ৩২, মার্চ্চেণ্ট ১৬।

১৯৩২ সালে ভারতবর্ষ এদের সঙ্গে ৫৪ রানে জয়ী

হয়েছিল। সেবার ভারতবর্ষ—২২৯ ও ৮৭ করেছিল। ক্লে, মার্সার ও ডেভিসের বোলিংএর জন্যই সেবারেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতবর্ষের ৮৭ রানে পতন হয়েছিল।

গ্লামারগান এবার কাউন্টি খেলায় শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে। তাদের কাছে এরূপ পরাজয় লজ্জার কথা।

ভারতবর্ষ—২৪৯ ও ৫৪ (৩ উইকেট)

ওয়ার উইক্‌সায়ার—১৮১ ও ২১৯ (৩ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে। কিল্‌নার ৪৩, ক্রম্‌ ৩২, হায়াইট ২৫। আমীর ইলাহী ৪৮ রানে ৫ উইকেট, জাহাঙ্গীর খাঁ ৪১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে ক্রম ৫৬, ওয়্যাট (নট-আউট) ৫৭, ডলারী (নট-আউট) ৪১।

দিলওয়ার হোসেন (নট-আউট) ১০১, সি কে নাইডু ৩৫, জাহাঙ্গীর খাঁ ২৯, ওয়াজির আলি ২৩। মেয়ার ১৮ রানে ৪ উইকেট, পারট্রিজ ৪৭ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ভারতবর্ষ—১৫৪ ও ২৬০

গ্লস্টার—৩১৩ ও ১০৪ (২ উইকেট)

ভারতবর্ষ ৮ উইকেটে পরাজিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে নবম উইকেট সহযোগিতায় আমীর ইলাহী ও বাকাজিলানী ১০০ রান ৯০ মিনিটে তোলে। আমীর ৪৫ ও বাকা ৫৯। সিন্‌ফিল্ড ৭৯ রানে ৫ উইকেট, ক্রান্‌ফিল্ড ৪৩ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। প্রথম ইনিংসে,—সিন্‌ফিল্ড ৩৮ রানে ৪ উইকেট নেন। হ্যামণ্ড ৮১, সিন্‌ফিল্ড ৪৫, মুর ৩৫। নিসার ৪৫ রানে ৩, জিলানী ৪৬ রানে ৩ ও নাইডু ৮৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

বিলাতে ভারতের দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

২৫শে জুলাই, ১৯৩৬, ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা ম্যানচেষ্টার মাঠে আরম্ভ হয়।

হ্যামাণ্ড ওয়্যাটের পাশ দিয়ে শ্লিপে বল পাঠিয়ে রান নিচ্ছেন
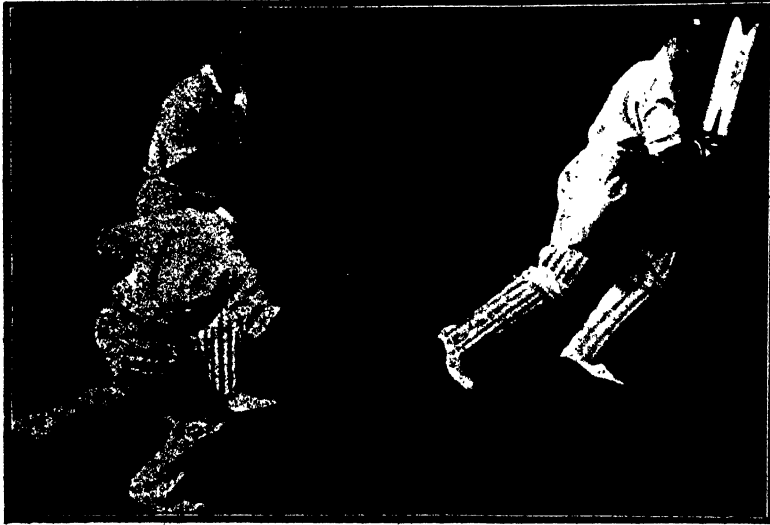
ভারতবর্ষ—২০৩ ও ৩৯০ (৫ উইকেট)

ইংলণ্ড—৫৭১ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

আলো কম হওয়ায় খেলাটি শেষ সময়ের আগেই বন্ধ হয়। খেলাটি ড্র হয়েছে।

বৃষ্টি ছিল না, প্রবল বায়ু বইছিল। উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে খেলা আরম্ভ হলো বেলা ঠিক সাড়ে এগারটায়,ম্যান্‌চেষ্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে। ভারত টসে জিতলে, ব্যাট করতে নামলো মান্তাকআলি ও মার্চ্চেণ্ট। বল দিতে এলেন, এলেন ও গোভার। গোভারের বলে মার্চ্চেণ্ট ক্যাচ তুললে গিম্বলেট ধরতে পারলেন না। ৩, ৬ ও ১১ রানের মাথায় তিনটি ক্যাচ ওঠে কিন্তু ইংলণ্ড ধরতে পারে না। ১৩ রান করে মান্তাকআলি ইতস্তত করে রান নিতে গিয়ে রান-আউট হলো। অমর সিং এসেই পেটাতে সুরু করলেন। হ্যামণ্ডের বলে অমর সিং ছু'টি চার করলেন। মার্চ্চেণ্টও পেটাতে আরম্ভ করে বাউণ্ডারী করলেন। ৫৫ মিনিটে ৫০ রান উঠ্‌লো। ভেরিটির বলে পেটাতে গিয়ে ৩৩ রানের মাথায় মার্চ্চেণ্ট ক্যাচ তুললে হ্যামণ্ড শ্লিপ্‌ থেকে ছুটে গিয়ে ধরলেন। অমর সিংও ২৭ করে ওয়ার্দ্দিংটনের 'অফে'র বল

মারতে গিয়ে ডাকওয়ার্থের হাতে আটকালেন। মেজর নাইডু এলেন এবং মাত্র ১৩ রান করে এলেনের বলে এল্-বি (নূতন নিয়মে) হলেন।

জলযোগের পর দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হলো সাড়ে আট হাজার। ওয়াজির আলি ও রামাস্বামীতে মিলে খেলা বেশ জমিয়ে তুলেছে। রান সংখ্যা যখন ১৬১, ভেরিটির বলে রামাস্বামী ৪০ করে বোল্ড হলেন। তিনি আধ ঘণ্টায় ২৯ রান করেন। এর পর উইকেট দ্রুত পড়তে লাগলো; ভিজিয়ানাগ্রাম রবিনসনের বলে বোল্ড হলেন। ওয়াজির ৪২, সি এস নাইডু ১০, নিসার ১৩ করে আউট হলে ভারতীয়দের ইনিংস ২২৫ মিনিটে ২০৩ করে শেষ হলো।

চা পানের পরে ইংলণ্ডের ইনিংস আরম্ভ হলো। ১২ রানের মাথায় গিম্বলেট নিসারের বলে বোল্ড হলো। ফ্যাগ ৩৯ রানে মাস্তাক আলির বলে গেলো। হ্যামণ্ড পেটাতে সুরু করে নিসারকে দু'বার বাউণ্ডারীতে পাঠালে। স্কোর ৫০ উঠলো ৪৫ মিনিটে। ৫০ মিনিটে হ্যামণ্ডের নিজস্ব ৫২, এবং ১০০ হলো ৭৫ মিনিটে। বেলা শেষে হ্যামণ্ড (নট্-আউট) ১১৮, ইংলণ্ড ২ উইকেটে মোট ১৭৩ করেছে।

দ্বিতীয় দিনের খেলা সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে আরম্ভ হলো। মাঠ বেশ শুকিয়ে গেছে, ব্যাটস্‌ম্যানদের দিন। হ্যামণ্ড নিজের ১৫০ রান ১৭০ মিনিট খেলে তুললেন। মোট স্কোর ২০০ উঠ্‌লো আড়াই ঘণ্টা খেলার পর। সি কে নাইডু ২৫১ রানের মাথায় বল দিতে এসে প্রথম ওভারে হ্যামণ্ডকে ১১ রান করতে দিলে। দু' ওভার পরে হ্যামণ্ড তার বল জোরে পেটাতে গিয়ে বোল্ড হলো ১৬৭ রানে, ১৯০ মিনিট খেলার পরে। তিনি ২১টা চার করেছেন, পূর্ব্বের গৌরবের দিনের ন্যায় অতি সুন্দর খেলেছেন। ৩০০ উঠ্‌লো ২২৫ মিনিটে। ওয়ার্দিংটন ৮৭ রান ১৫৫ মিনিটে করে সি এস এর বলে সি কের এক হাতে আটকালেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দল—বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে গৃহীত ছবি

হার্ডষ্টাফ-ওয়ার্দিংটনের জুটি ৮৬ রান ৫৫ মিনিটে যোগ করলে। এলেন মাত্র এক করে গেলেন। হার্ডষ্টাফ অমর সিংয়ের বল খুব জোরে পিট্‌লে অমরসিংই তাকে সুন্দর

লুফলে। তার ৯৪ হয়েছে ৭৫ মিনিটে। রবিন ৭৬ রান ৭৫ মিনিটে করে নিসারের বলে মার্চ্চেন্টের হাতে আটকালো। অমরসিং ও সি এস নাইডুর ফিল্ডিং অতি সুন্দর হয়েছে। ইংলণ্ডের ৪৫০ উঠ্‌লো ৩১৫ মিনিটে। ১৯৩৩ সালের বোম্বাইএ ইংলণ্ডের ভারতবর্ষের বিপক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান সংখ্যা ৪৩৮ ছাড়িয়ে গেলো। ভেরিটি ৯০ মিনিটে ৬৬ রান করবার পরে ইংলণ্ড ৩৭৫ মিনিট খেলে মোট রান ৫৭১ হ'লে ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড করলে বেলা সাড়ে ৪টায়।

চা পানের পরে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো। মাস্তাক ও মার্চ্চেন্ট বেলা শেষে নট্‌-আউট্‌ থাকলেন ৭১ ও

প্রথম টেষ্ট খেলায় ভেরিটির একটা বল তেড়ে হাঁক্‌রাতে গিয়ে ভি এম্‌ মার্চ্চেন্ট পড়ে গেছেন

১০৫ রান করে। ভারতের মোট রান ১৯০ কোন উইকেট না খুইয়ে।

শেষ দিনের খেলা আরম্ভ হবার পরে মাস্তাক আজ মাত্র ৭ রান করে রবিনেরই বলে তারই হাতে গেলেন। তিনি ১৫৫ মিনিটে ১১২ রান করেছেন, তাঁর ইনিংস দোষশূন্য ও সুযোগ-বিহীন ছিল। এলেনের বলে এক ওভারে ১৫ রান করেছেন এবং নিজস্ব শত রান ১৩৯ মিনিটে করেন, তার মধ্যে ১৫ বার চার ছিল। টেষ্ট খেলায় প্রথম উইকেট সহযোগিতায় ২০৩ রান করা রেকর্ড। মাস্তাক আলি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় সেঞ্চুরী করলেন এবং প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাতের মাঠে টেষ্টে প্রথম সেঞ্চুরী করলেন।

মার্চ্চেন্ট তাঁর সেঞ্চুরী করলেন ২০০ মিনিটে। তিনি সতর্কতার সঙ্গে খেলেছেন। ১১০ করে ১৫ মিনিট কিছু করেন নি। ১১৪ রানে হ্যামণ্ডের বলে এল্‌ বি হলেন ২৫৫ মিনিট খেলার পরে।

তিনি উইকেটের চতুর্দ্দিকেই বল চালিয়েছেন এবং ১৩বার চার করেছেন। দ্বিতীয় উইকেট সহযোগিতা ৯৫ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। সি কে নাইডু এসে রামাস্বামীর সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন রামাস্বামী ৪২ করেছেন। রামাস্বামী ১৩৫ মিনিট খেলে ৬০ রান করে রবিনের বলে বোল্‌ড হলেন। ওয়াজির এলেন ও ৪ করে গেলেন। অমরসিং এসে নাইডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে ১০ মিনিটে ২৫ রান করলেন। ভেরিটির বলকে একটা ছয়ের বাড়ি দিলেন, তারপরে হু'বার ওভারে পাঠিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের স্কোরের সমান করে দিলেন। নাইডু যখন ১৫ করেছেন, অমরসিং আসেন এবং ৪৩ রান ৪৮ মিনিটে যখন তাঁর হয় তখন নাইডু মাত্র ৬ করেছেন। নাইডু ৩৪ করে ষ্টাম্পড হলেন ভেরিটির বলে ১০৫ মিনিট খেলে। ভিজিয়ানা এসে যোগ দিলেন এবং সে ওভারটা কাটিয়ে দিয়ে ক্ষীণ আলোর জন্য আবেদন জানাতে তা মঞ্জুর হওয়ায় খেলা বন্ধ হলো। অতএব খেলাটি ড্র হয়ে গেলো। ভারতবর্ষ ৫ উইকেটে ৩৯০ করেছে।

বিলাতের সংবাদপত্র মাস্তাক আলি ও মার্চ্চেন্টের ব্যাটিংএর খুব প্রশংসা করেছেন।

ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছেন—"এ বৎসর মাস্তাক আলির চেয়ে চমৎকার মার আর কাহারও দেখি নি।"

ডেলি মেল বলেছেন,—"সমস্তটা বিবেচনা করলে এই দিনের খেলার গৌরব প্রাপ্য মাস্তাক আলি ও মার্চ্চেন্টের।" দর্শকগণও একবাক্যে ইহাদের প্রশংসা করেছেন।

সমালোচকেরা বলেছেন, এই খেলা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইংলণ্ডের বোলিং অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে কিছুই হবে না।

ভেরিটি (ইয়র্কসায়ার বোলার)

ভারতবর্ষ :—ভিজিয়ানা গ্রাম (ক্যাপটেন) ইউ পি, সি কে নাইডু (সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া), ওয়াজির আলি (সেণ্ট্রাল), জাহাঙ্গীর খাঁ (পাঞ্জাব), অমরসিং (সেণ্ট্রাল), নিসার (পাঞ্জাব), রামাস্বামী (মাদ্রাজ), ভি মার্চ্চেণ্ট (বোম্বাই), মেহেরমজি (উইকেট-রক্ষক) (সেণ্ট্রাল), মাস্তাক আলি (সেণ্ট্রাল), সি এস নাইডু (সেণ্ট্রাল) ; এস ব্যানার্জ্জি (বাঙ্গলা) রিজার্ভ।

হ্যামণ্ড

ইংলণ্ড :—এলেন (ক্যাপটেন) মিডেলসেক্স, রবিন্সন (মিডেলসেক্স), গোভার (সারে), ফিস্লক্ (সারে), হামণ্ড (গ্লস্টার), ওয়ার্দিংটন (ডার্বি), এইচ্ ভেরিটি (ইয়র্ক), ফ্যাগ্ (কেণ্ট), ডাক্ওয়ার্থ (উইকেট-রক্ষক) (ল্যাঙ্কাসায়ার), গিম্বলেট (সোমারসেট), জে হার্ডষ্টাফ (নটস্)।

মার্চ্চেণ্টের দ্বিতীয় স্থান অধিকার ঃ

এ বৎসর ইংলণ্ডে যে সকল খেলা হয়েছে, তাতে ব্যাটস্‌ম্যানদের গড়পড়তা হিসাবে ফিস্লক ৬৪.৫৩—প্রথম, মার্চ্চেণ্ট ৬০.০৯—দ্বিতীয় ও লেল্যাণ্ড ৫৮.৭২—তৃতীয় হন।

একাদশ অলিম্পিয়ার উদ্বোধন ঃ

১লা আগষ্ট, ১৯৩৬ সালে হার হিট্‌লার বার্লিনে একাদশ অলিম্পিয়া ক্রীড়ার উদ্বোধন সম্পন্ন করেছেন। বৃষ্টির জন্য সৌন্দর্য্যের কিছু হানি ও উৎসাহের কিছু হ্রাস হয়েছিল। বিশ্বের ৫৩টি দেশ থেকে পাঁচ হাজারেরও অধিক এথ্‌লেটস্ প্রেরিত হয়েছে। লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উদ্বোধন ক্রীড়া সম্পন্ন হয়। হার হিট্‌লার

"অলিম্পিকের মশাল"—এথেন্স থেকে সূর্য্যকিরণে প্রজ্বলিত করে রাণার্স'রা বহে নিয়ে এসেছে বার্লিনের ক্রীড়াক্ষেত্রে

প্রথমে জার্ম্মানীর জাতীয় সৈন্যদল পরিদর্শন করেন। জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'লে যোগদানকারী বিভিন্ন জাতির জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রতিষ্ঠাতা ব্যারণ পিয়ের দ্যা কুবের তাঁর চিরস্মরণীয় কথাগুলি লাউড স্পিকার সাহায্যে প্রতিধ্বনিত করা হয়—"অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদানই হ'লো মূল কথা—জয় নয়। জয়টাই জীবনের মুখ্য কথা নহে, উত্তমরূপে যুদ্ধ করাই আসল কথা।" বিভিন্ন জাতির এথলেটরা 'মার্চ্চ পাষ্ট' করে হার হিট্‌লারের সম্মুখ দিয়ে যান। কতক তাঁকে নাজি অভিবাদন ও কতক অলিম্পিক অভিবাদন দেন। ভারতীয় হকিদলের ক্যাপ্‌টেন ধ্যানচাঁদ ভারতের পতাকা বহন করেন। পরে দলের কর্ম্মচারী, হকি খেলোয়াড়গণ, এথ্‌লেট্‌স্ ও ভারত্তোলনকারী কুস্তিগীরগণ ছিলেন। ত্রিশ হাজার পারাবত ছেড়ে দেওয়া হয় সমগ্র পৃথিবীকে উদ্বোধন সংবাদ জানাবার জন্য।

২০শে, জুলাই তারিখে অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীসের এথেন্স থেকে সূর্য্যকিরণে প্রজ্বলিত 'অলিম্পিকবাতি' নিয়ে রানার এসে পৌছুলে হার হিট্‌লার ঐ বাতির সাহায্যে "অলিম্পিক অগ্নি" জ্বেলে দেন। ঐ অগ্নি ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রজ্বলিত থাকবে যতদিন খেলা চল্‌বে।

তিন হাজারের অধিক রানার এথেন্স থেকে বার্লিন পর্য্যন্ত এই দু'হাজার মাইল রীলে রেস সম্পন্ন করতে আবশ্যক হয়েছে। প্রত্যেক রানারকে এক কিলোমিটার আন্দাজ ছুটতে হয়েছে। ছয়টি বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের ভিতর দিয়ে টর্চ্চবাহীরা গিয়ে বার্লিনে পৌছিয়েছেন। অলিম্পিয়াবাসী কন্‌ডিনিস্ প্রথম টর্চ্চবাহী ছিলেন।

অলিম্পিকে হকি খেলা ঃ

আফগানিস্থান ও ডেনমার্কের খেলা ৬-৬ গোলে প্রথম দিন ড্র হয়েছিল। আফগান দল ভালই খেলেছেন। তারা খালি পায়ে খেলায় দর্শকরা বিস্মিত হন। পরের খেলায় আফগানরা জয়ী হয়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ তাদের প্রথম খেলা হাঙ্গারীর সঙ্গে খেলে ৪ ০ গোলে জয়ী হয়েছেন। রূপসিং তিনটি ও জাফর একটি গোল দিয়েছেন। হাঙ্গারীর গোল-রক্ষকের অত্যাশ্চর্য্য খেলা গোল সংখ্যা কম হবার জন্য দায়ী। সমালোচকদের মতে, ভারতবর্ষ ১৯৩২ সালের মতন ততো শক্তিশালী না হলেও আমেরিকা ও জাপানের বিরুদ্ধে সহজেই জয়ী হবে। কেবল জার্ম্মানীই তাদের বেগ দেবে।

ভারতের দলে ছিলেন—এলেন: ট্যাপসেল, হুসেন:

দারাকে যদিও ভারত থেকে বায়ুপথে আনান হয়েছিল, কিন্তু তাকে এই খেলায় নামান হয় নি। কারণ রাইট-ইনে জাফর ধ্যানচাঁদের সঙ্গে মিল খেয়েছে। গ্যালিবর্ডি হাফ্ ব্যাকে অদ্ভুত খেলেছে, দর্শকরা তাকে উচ্চ প্রশংসিত করেছে।

ভারতবর্ষ ৭-০ গোলে আমেরিকাকে হারিয়েছে। গোল করেছেন জাফর (২), ধ্যানচাঁদ (২), রূপসিং (২) ও কুলেন (১)।

পরের খেলায় ভারত ৯-০ গোলে জাপানকে হারিয়ে তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। খেলাটি জাপানের গোলের দিকেই হয়েছিল। দর্শকরা খেলায় চমৎকৃত হয়ে ভারতীয়দের মুহুর্মুহু প্রশংসিত করেছে।

সুইজারল্যাণ্ড ২-১ গোলে বেলজিয়ামকে পরাজিত করেছে।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

ফুটবল প্রতিযোগিতায় গ্রেট বৃটেন ২-০ গোলে চীনকে হারিয়ে দিয়েছে। বৃটেন ভালো খেলেছে এবং তাদের জয় যোগ্য হয়েছে। চীনাদের খেলা দ্রুত ও উপভোগ্য, কিন্তু বৃটেনের খেলা বেশী কার্য্যকরী হওয়ায় তারাই জয়ী হয়েছে। চীনারা নূতন দেশের আবহাওয়া ও খেলার মাঠের সঙ্গে অপরিচিত থাকায় কিছু অসুবিধা বোধ করেছে।

ভারতবর্ষে চীনাদের খেলা দেখে আমরা বলেছিলুম যে অলিম্পিকে তারা বিশেষ কিছুই করতে পারবে না। তাদের খেলার ফলাফল থেকে পাশ্চাত্য দেশের ফুটবল খেলার ষ্টাণ্ডার্ড সম্বন্ধে ধারণা হলো। তারা যে আমাদের চেয়ে এখনও অনেক শ্রেষ্ঠ তা বোঝা যাচ্ছে। পোলাণ্ড ৫-৪ গোলে চীন-বিজয়ী বৃটেনকে হারিয়েছে।

অলিম্পিক খেলার কয়েকটি ফলাফল ঃ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্পিণ্টার হিসাবে জেস্ ওয়েন্‌স্ (আমেরিকার নিগ্রো) তাঁর কৃতিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। তার কয়েকটি রেকর্ড—

১০০ মিটার দৌড়—১০$\frac{3}{10}$ সেকেণ্ডে (জগতের রেকর্ডের সমান)

২০০ মিটার দৌড়—২১$\frac{1}{10}$ "

লং জাম্প—২৫ ফিট ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ও ২৫ ফিট ১০$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পূর্ব্বে ২৬ ফিট ৮$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি লাফিয়ে বিশ্বের রেকর্ড করেছেন।

মেয়েদের ডিসকাস নিক্ষেপ—(১) মেনার মেয়ার (জার্ম্মাণী)—৪৭·৬৩ মিটার। (২) ওয়াজ সোনা (পোলাণ্ড)

(আমেরিকা)—১১৫ সেকেণ্ড (বিশ্ব রেকর্ড)। (২) ষ্টেলা ওয়ার্স (পোল্যাণ্ড), (৩) ক্রাস (জার্ম্মাণী)।

৮০০ মিটার দৌড়—(১) জে উড্ রফ্ (আমেরিকা)—১ মিনিট ৫২$\frac{9}{10}$ সেকেণ্ড। (২) লাঞ্জি (ইটালি)—১ মিনিট ৫৩$\frac{2}{10}$ সেকেণ্ড। (৩) এড্ওয়ার্ডস (কানাডা) —১ মিনিট ৫৩$\frac{6}{10}$ সেকেণ্ড।

১০,০০০ মিটার—(১) সালমিনেন, (২) অস্কোলা, (৩) ইসোহোল্লো। সময়—৩০ মিনিট ১৫$\frac{4}{10}$ সেকেণ্ড। প্রথম এক গজ ব্যবধানে জয়ী হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৫ গজ। সকলেই ফিনল্যাণ্ডবাসী।

হ্যামার নিক্ষেপ—(১) হেন্ (জার্ম্মাণী)—দূরত্ব ৫৬·৪৯ মিটার, (২) ব্লাস্ক (জার্ম্মাণী)—৫৫·০৪ মিটার, দু'জনেই রেকর্ড স্থাপন করেছে।

পুটিং সট্—উয়েলকি (জার্ম্মাণী)—৬·২০ মিটার।

হাই জাম্প—জন্সন্ (আমেরিকা) ২·০৩ মিটার।

১৫০০ মিটার দৌড়—(১) লাভলক (নিউজিল্যাণ্ড) —সময়, ৩ মিনিট ৪৭৮ সেকেণ্ড, ১০ গজ ব্যবধানে জিতেছেন। (২) ক্যানিংহাম (আমেরিকা)—সময়, ৩ মিনিট ৪৮$\frac{4}{10}$ সেকেণ্ড। (৩) বেকালী (ইটালী)—সময়, ৩ মিনিট ৪৯$\frac{2}{10}$ সেকেণ্ড।

হপ, ষ্টেপ ও জাম্পে—তাজিমা (জাপান) ১৬ মিটার দূরত্ব করে রেকর্ড করেছেন, ইনি লং জাম্পে তৃতীয় হয়েছেন।

১৬০০ মিটার রীলে দৌড়—(১) গ্রেট্ বৃটেন—সময়, ৩ মিনিট, ৯$\frac{2}{10}$ সেঃ। (২) আমেরিকা—সময়, ৩ মিঃ ১১ সেঃ। (৩) জার্ম্মাণী—সময়, ৩ মিঃ ১১$\frac{8}{10}$ সেঃ।

৪০০ মিটার রীলে দৌড়—(১) আমেরিকা—সময়, ৩৯$\frac{8}{10}$ সেকেণ্ড, (রেকর্ড)। (২) ইটালী—সময়, ৪১$\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড। (৩) জার্ম্মাণী—সময়, ৪১$\frac{2}{10}$ সেকেণ্ড।

মেয়েদের ৪০০ মিটার রীলে দৌড়—(১) আমেরিকা —সময়, ৪৬$\frac{9}{10}$ সেকেণ্ড, (রেকর্ড)। (২) গ্রেট্ বৃটেন—সময়, ৪৭$\frac{6}{10}$ সেকেণ্ড।

মারাথন দৌড়—(১) কিয়েটেইসন্ (জাপান)—সময়, ২ ঘণ্টা, ২৯ মিঃ, ১৯$\frac{1}{5}$ সেঃ। (২) আর্ণেষ্ট হার্পার (বৃটেন)—সময়, ২ ঘণ্টা, ৩১ মিঃ, ৪২ সেঃ। (৩) নান্ (জাপান)—সময়, ২ ঘণ্টা, ৩১ মিঃ, ৪২ সেঃ।

মেয়েদের ২০০ মিটার 'ব্রেষ্ট্ ষ্ট্রোক' সন্তরণ—মেইহাটা (জাপান)—সময়, ৩ মিঃ ১$\frac{6}{10}$ সেঃ (রেকর্ড)।

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণ—(১) জিক্ (হাঙ্গেরী) —সময়, ৫৭$\frac{6}{10}$ সেকেণ্ড। (২) য়ুসা (জাপান)—সময়, ৫৭$\frac{9}{10}$। (৩) আরাই (জাপান)—সময়, ৫৮ সেকেণ্ড।

ডেভিস্ কাপ-বিজয়ী বৃটেন ঃ

উইম্বলডনে ডেভিস্ কাপ্ প্রতিযোগিতায় বৃটেন ৩-২ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চতুর্থ বৎসরের জন্য বিজয়ী হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া জার্ম্মাণীকে ৪-১ ম্যাচে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। কুইষ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) অষ্টিনকে (বৃটেন) ৬-৪, ৩-৬, ৭-৫, ৬-৩ গেমে পরাজিত করেছিল। পেরী ৬-২, ৬-৩, ৬-৩ গেমে ক্রফোর্ডকে হারিয়েছে। শেষ সেটে অনেকগুলি সুন্দর ও দীর্ঘ 'র‍্যালি' চলেছিল। গত বৎসর বৃটেন ৫-০ ম্যাচে আমেরিকাকে হারিয়েছিল।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ফ্রেড পেরী ও মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হেলেন জ্যাকব আলাপ করছেন

পোলো ঃ

হার্লিংহামে ওয়েষ্টচেষ্টার পোলো কাপ খেলায় আমেরিকা ১০-৯ গোলে ইংলণ্ডকে হারিয়েছে। হাজার দশেক দর্শক হয়েছিল, ডিউক ও ডাচেস্ অফ গ্লষ্টার্স উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ড দুর্ভাগ্যবশতঃ ড্র করতে পারলে না, শেষ 'চকারে' বল্ডিংএর ফ্রি হিট্ পেড্লে আট্‌কে দিলে। দু'পক্ষই জোর মেরে (হার্ড হিটিং) খেলেছে। ইংলণ্ড অপ্রত্যাশিত ভালো খেলেছে। আমেরিকা কিঞ্চিৎ বেশী চতুরতা দেখিয়েছে, খুব কমই ভুল করেছে এবং অশ্বচালনায় বেশী দক্ষতা দেখিয়েছে।

স্কোর :—আমেরিকা—পেড্‌লে ৭, গেষ্ট ১, ইগ্লেহার্ট ১ (একটা পেনালিটি পেয়েছে ফাউলের জন্ত)।

ইংলণ্ড—হিউগেস্‌ ৫, বল্‌ডিং ৩, গুইনেস ১।

চাকার স্কোর :—(আমেরিকা প্রথম) ২-১, ৪-৩, ৭-৩, ৭-৬, ৭-৬, ১০-৭, ১০-৯।

বক্সিং ঃ

দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় গ্যানবোট জ্যাক সার্জেণ্ট ক্রি ম্যানকে পয়েণ্টে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন।

হস্তবদ্ধাবস্থায় সন্তরণে রেকর্ড ঃ

রবীন চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ড ভঙ্গ করতে প্রফুল্লকুমার হস্তবদ্ধাবস্থায় সন্তরণ আরম্ভ করেন এবং ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট অবিরাম সাঁতার কেটে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

হস্তবদ্ধাবস্থায় সন্তরণে প্রফুল্লকুমার

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল প্রণীত গল্পপুস্তক "দিবাস্বপ্ন"—১৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মাটির দেবতা"—২৲

" " গল্পপুস্তক "হারাণো-স্মৃতি"—২৲

" " ছোট উপন্যাস "ছন্নছাড়া"—।৶৹

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ প্রণীত উপন্যাস "ঘরের বউ"—২৲

" " "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও হিন্দুজীবন"—১৷৹

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "সূর্য্যমুখী"—২৷৹

শ্রীসুধীরকুমার দাস এম-এ প্রণীত অলঙ্কার শাস্ত্র "কাব্যপ্রদীপ"—৸৹

শুভঠাকুর প্রণীত ইংরাজি কবিতা পুস্তক "ময়ূর পঙ্খী"—১৷৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্যলহরী উপন্যাসমালার "ফ্যাসাদে বাড়ী"—৸৹ ও "শত্রু সমরে নারী"—৸৹

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত নাটক "সম্রাট অশোক"—৷৹

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত শিশুপাঠ্য জীবনী "কর্ম্মবীর রাজেন্দ্রনাথ"—৶৹

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত চিকিৎসা পুস্তক "বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা"—১।৹

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বি-এল প্রণীত উপন্যাস "খেয়ালী তরুণী"—১।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক নাটক "ব্রহ্মতেজ"—১।৹

শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থ "বাঙ্গালীর সার্কাস"—১।৹

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ব্যবধান"—২৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য-জীবনী "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও মহাস্থবির শীলভদ্র"—৶৹

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত অর্থনীতিক গ্রন্থ "বঙ্গ পরিচয়" প্রথম ভাগ —২৷৹

শ্রীআশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "অন্তঃপুরে"—১।৹

শ্রীসীতাদেবী প্রণীত উপন্যাস "জন্মস্বত্ব"—২৷৹

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এ, বিদ্যাভূষণ প্রণীত কবিতা-পুস্তক "স্বর্ণাধারা"—১৲, গল্পপুস্তক "পঞ্চপ্রদীপ"—৷৹

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"—৷৹

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি-টি এম সঙ্কলিত চিকিৎসা গ্রন্থ "ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা" প্রথম খণ্ড—৩৲

শ্রীসুনীতিরমণ ঠাকুর প্রণীত শিশুপাঠ্য অনুবাদ-সাহিত্য "লীয়ারের কথা"৷৹

Editor ;—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Gurudas Chatterjee & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.
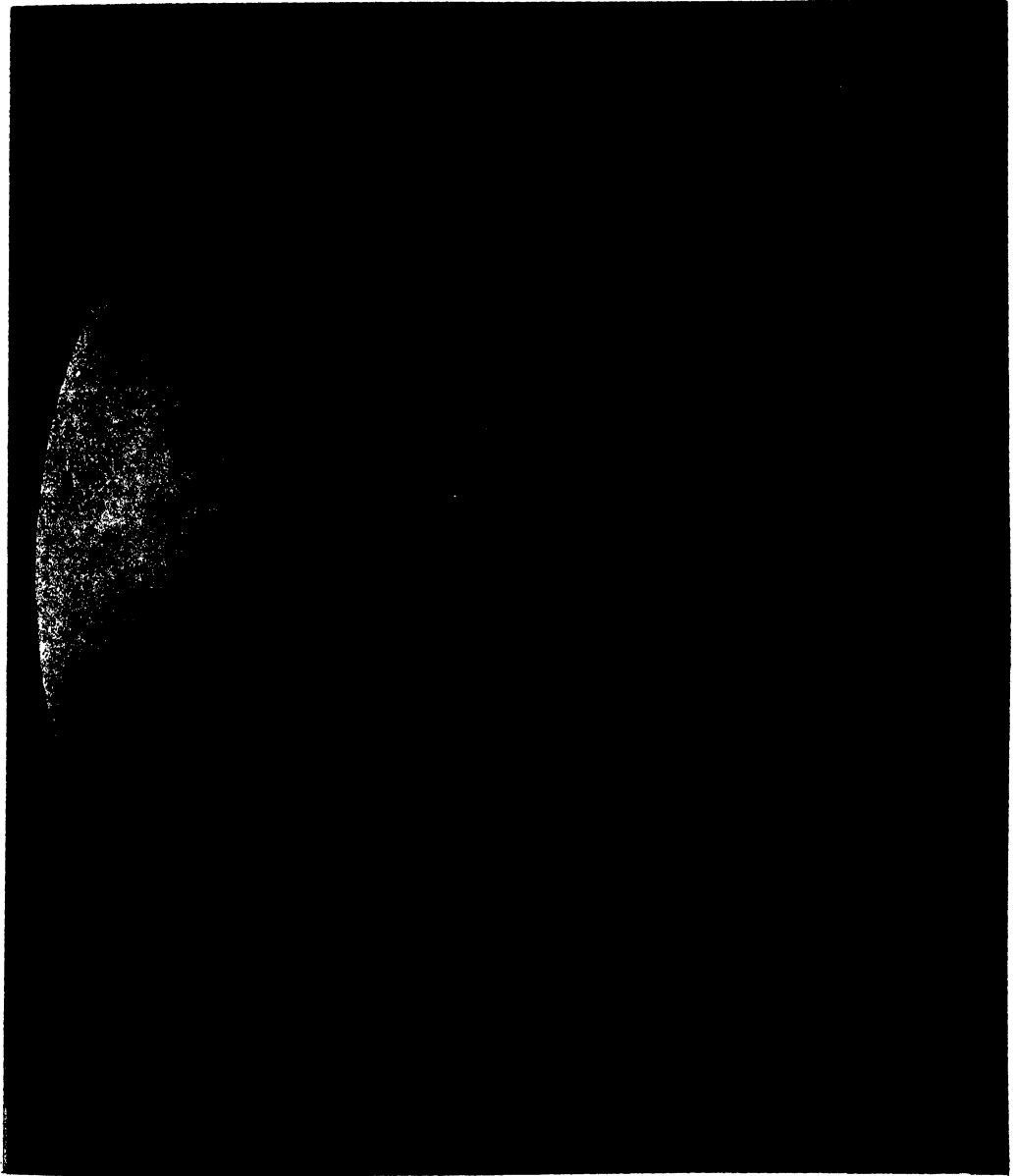
জন্ম – [illegible] পৌষ ১২৬০ সাল   দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী   মৃত্যু—১৮ আশ্বিন ১৩২৭ সাল
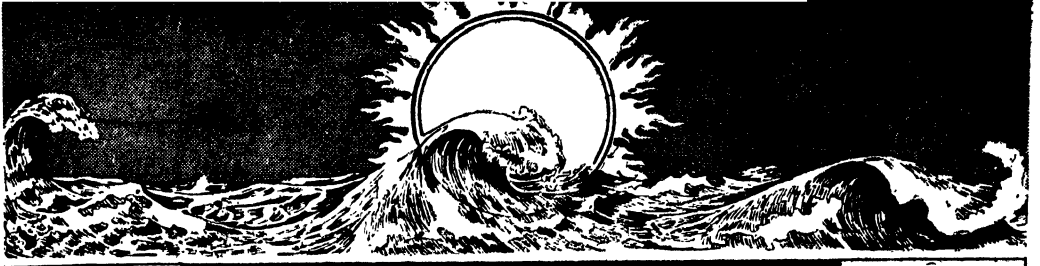
আশ্বিন—১৩৪৩
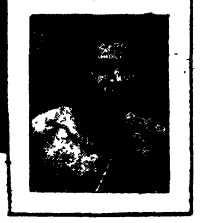
প্রথম খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রজ্ঞানের প্রগতি

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু ডি-এস্‌সি

(২)

পারস্য পরাজয়ের (৪৭৯ খৃঃ পূঃ) পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর-ব্যাপীকাল গ্রীসীয় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির যুগ। যদিও গ্রীসীয় রাজ্যের অন্তর্গত এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ নিজ নিজ প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহে কিছুকাল লিপ্ত ছিল এবং পরিশেষে (৩৩৮ খৃঃ পূঃ) ম্যাসীডনবাসী দ্বারা গ্রীস সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছিল, তত্রাচ এই সার্দ্ধাধিক শতাব্দী কালের গ্রীসীয় চিন্তাধারা, শিল্পকলা ও গঠনমূলক-শক্তির নব নব প্রেরণা তাহাদের এতদূর উন্নতির সোপানে লইয়া গিয়াছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রীসীয় সংস্কৃতি ও বিদ্যার দানসম্পদ্ পরবর্ত্তী যুগের আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ মানুষকে প্রজ্ঞানের পথেই লইয়া গিয়াছে।

এথেন্স হইয়াছিল জ্ঞানের কেন্দ্র।

পারসীকগণ যে ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া গিয়াছিল রাজা পেরিক্লিস্ প্রায় ত্রিংশৎ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া (৪৬৬-৪২৮ খৃঃ পূঃ) এথেন্সের চিতাভস্ম হইতে তাহাকে এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; শুধু বিরাট সৌধমালা সুশোভিত ব্যবসা-বাণিজ্য গৌরবে ঋদ্ধিশালিনী এথেন্স নগরী নয়, বিদ্যা, চারুকলা ও মনীষার আবাসভূমি রূপেও। সৌধ-শিল্পী, ভাস্কর, কবি, ঐতিহাসিক, নাট্যবিশারদ, দার্শনিক ও অধ্যাপক তাঁহার আহ্বানে এথেন্সে সমবেত হইয়াছিলেন। রাজা পেরিক্লিস্ শক্তিমান্, উদার ও গুণগ্রাহী। ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্, নাট্যাচার্য্য য়্যাস্কিলাস্, সোফোক্লস্ ও য়ুরিপিডীস্ বিয়োগান্ত নাট্যে উন্নত বিশুদ্ধ classic ভাব আনয়ন করিয়া গ্রীসীয় সাহিত্যকে অভিনব সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

জ্ঞানানুসরণের প্রতি প্রবল স্পৃহা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এই জ্ঞানানুরাগ প্রদীপ্ত করিয়া দিল একটী পেশাদার আচার্য্য সম্প্রদায়, যাঁহাদের sophist বা "জ্ঞানী" এই অভিধান দেওয়া হয়। উক্ত উপাধ্যায়গণ একদিকে শিল্পী ও কারিকর এবং অপরদিকে দার্শনিক—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী

সামাজিক স্তরে থাকিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। তাঁহারা ছাত্রদের কোন বিশেষ বৃত্তি, profession বা বিদ্যায় শিক্ষাদান করিয়া গড়িয়া তুলিতেন তাহা নয়, তবে নাগরিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতেন। অধুনা ভারতবর্ষে যেরূপ অশিল্প-শিক্ষা (liberal education) বিস্তার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান্ ও ডিগ্রীধারী বহু শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, সোফীষ্টগণ এথেন্সে সেইরূপ অশিল্প বা সাধারণ শিক্ষার গুরুহিসাবে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহাদের প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী শিক্ষার অবদান মোটেই অগ্রাহ্যের বস্তু নয়।

তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতি চতুর্বিধ বিষয়ে আবদ্ধ ছিল—অনুশীলন (culture), অলঙ্কার (rhetoric), তর্কবিদ্যা (eristic) ও রাষ্ট্রতন্ত্র (politics); তাঁহাদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল "sophistry"—কূটতার্কিকতা। এই কূটতার্কিকতার চারিটী কাল নির্দেশ করা যাইতে পারে। আনুমানিক ৪৪৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অনুশীলন প্রথমেই আরম্ভ হয়, যাহা পরে তর্কবিদ্যায় পর্য্যবসিত হয় এবং আনুমানিক ৪২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অলঙ্কার মধ্যগ্রীসে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া পরে রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভব সৃষ্টি করে।

সোফীষ্টদের পূর্ব্বে গ্রীসদেশে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল—লিখন, পঠন, ব্যায়াম ও সঙ্গীতবিদ্যা বিষয়ে। সর্ব্ব প্রথম সোফীষ্টগণ চারিটী নূতন বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন—ব্যাকরণ, রচনারীতি (style), সাহিত্য ও বাগ্মিতা এইগুলি প্রবর্ত্তিত করিয়া। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে অতিমাত্রায় অলঙ্কার ও তর্কবিদ্যার প্রচলন হয়। সর্ব্ব শেষ যুগে সোফীষ্টীয় শিক্ষায় এত অধিক আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা ও কূটতর্কজাল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে যে মানুষের নৈতিক চরিত্র কূপথেই পরিচালিত হয়। পণ্ডিতী ব্যাখ্যা ও তর্কে জয়লাভ করা হইল পরম পুরুষার্থ; ব্যাখ্যা ও তর্কের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সত্যবস্তু কি লোকে বুঝিবার চেষ্টাও করিল না—সত্যানুসন্ধিৎসার আলোককে খর্ব্ব করিয়া দিল আড়ম্বর-পরিপূর্ণ, শূন্যগর্ভ, তামসী তর্কজালপ্রসূত বিজয়-দুন্দুভি!

সোফীষ্টীয় মতবাদ ও "সোফীষ্ট্রী"র কারণ

সোফীষ্টগণের পূর্ব্ববর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত গ্রীসীয় দর্শন ছিল cosmological; এজন্য উহা অনাত্ম বা বস্তুসম্বন্ধীয় দর্শন, যাহাকে বলা হয় objective philosophy—এই অনাত্ম-দর্শন নেচার্-সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিল, মানুষকে ও মানবিকতাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিয়া। সোফীষ্টদের চিন্তা হইল "the thinking and willing subject"কে লইয়া—মানুষ, মানুষের মন, মনের স্বভাব ও উৎপত্তি এই সব রহস্য সমাধানে তাঁহারা নিযুক্ত হইলেন। কার্লাইল বাস্তবিকই বলিয়াছেন, "Man is a visible mystery walking between two eternities and two infinitudes," দুই অনন্তকাল ও দুই অনন্ত দেশের মধ্যবর্ত্তী একটি ভ্রমণশীল দৃশ্যমান্ রহস্য হইল মানুষ। তাঁহাদের চিন্তা হইল ব্যক্তিমূলক, individualistic; মানব চরিত্রকে সারবস্তু * বলিয়া তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" তাঁহারা সাধারণের শিক্ষাপ্রসার ব্যতীত প্রচলিত বিশ্বাসগুলির সমালোচনা করিয়া মানব জীবনের বহুবিধ জটিল সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাধান করিবার জন্য তদানীন্তন প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই আহ্বান করিতেন। এই যুগকে আমরা "নৃতত্ত্বযুগ" বলিব পূর্ব্বে আভাষ দিয়াছি। সোফীষ্টীয় চিন্তায় কোন অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানের (cognition) থিওরি বা নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানানুগ ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। সোফীষ্টদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্রোটাগোরাস্, জর্জিয়াস্, হিপিয়াস্ ও প্রোডিকাস্। প্রোটাগোরাস্ ব্যক্তিবাদী, individualistic; জর্জিয়াস্ শূন্যবাদী, nihilist; হিপিয়াস্ পাণ্ডিত্যবাদী, polymathist এবং প্রোডিকাস্ নীতিবাদী, moralist; এইগুলি মনে রাখিলে উহাঁদের অভিমতগুলি বুঝিবার সুবিধা হয়।

এই সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী জড়বিজ্ঞানাভিমুখী চিন্তাধারা মানুষকে অজ্ঞেয়তাবাদের (agnosticism) দিকে ছুটাইয়া দিয়া তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে সংশয়বাদী করিয়া তুলে।

* The essential point in which the Sophists were innovators was this that they introduced a new kind of instruction, not in any special department, as music or gymnastics, but with a view to the development of a certain universality of culture, a culture which should embrace all the interests of life; that this instruction was founded on speculations concerning the nature of human volition and thought.—Plutarch, Life of Themistocles.

এজন্য কূটতার্কিকতা জিনিসটাকে আমরা প্রজ্ঞানের ইতিহাস-নাট্যের একটা মধ্যবর্ত্তী অবকাশ—interlude হিসাবেই ধরিয়া লইতে পারি।

একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিলেন—

ধরিয়া লওয়া যাউক যে সদ্বস্তু—Being—বিদ্যমান আছেন এবং অসদ্বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; তাহা হইলে সদ্বস্তু নিশ্চয়ই অজ (unproduced), নিত্য (unchangable) ও অবিচ্ছিন্ন (undivided) হইবেন।

—অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো— গীতা॥

অপর দল বলিলেন—

যদি জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধরূপে সদ্বস্তু এইরূপই হন তবে ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান (sense) ও প্রজ্ঞা (reason) উভয়ের পার্থক্য বিষয়ে এক জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়—বহির্জগৎ বিষয়ে ঐন্দ্রিক জ্ঞানকে অপ্রামাণিকরূপে গণ্য করিতে হয়। কেন না, প্রজ্ঞা সদ্বস্তুকে (reality) অদ্বৈত অনিত্য কল্পনা করিল, কিন্তু ঐন্দ্রিক জ্ঞান জাগতিক বিষয়নিবহের বহুত্ব ও অনিত্যতারই পরিচয় করাইয়া দিল।

এ বিষয়টা আমরা কান্তীয় দর্শন বুঝিবার সময় আবার উপস্থাপিত করিব। কান্তের মতে বুদ্ধিবৃত্তির (understanding) রাজ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু প্রজ্ঞা বা তত্ত্ববোধিনীবৃত্তি (reason) ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। কান্তের understanding হইল বাসনাত্মিকা বুদ্ধি—practical reason বা insight এবং কান্তের reason ["pure reason"] হইল গীতার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। অনেকটা এই রকমের।

সে যাহা হউক, গতিশীল জগৎ, প্রপঞ্চ—Becoming—হইল মরীচিকা (illusion) এবং বিরোধাভাস (paradox) ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঠিক এইখানেই প্রজ্ঞানের মূল্য ["worth of knowledge"] সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সোফীষ্টগণ এই বিষয়েই সন্দেহবাদ (scepticism) প্রচার করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন—

যাবতীয় মানবীয় জ্ঞানই আপেক্ষিক; যাহা কয়েকটী ধীমান্ ব্যক্তির নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রেরই নিকট অবশ্য সত্যরূপে প্রতীয়মান হইবে, ইহা প্রমাণিত হয় না; অর্থাৎ আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই subjective—বিষয়ীগত প্রতীতিসমূহের অবস্থা মাত্র; objective সত্য—বিষয়াত্মক জ্ঞান—বলিয়া কিছুই নাই।

সোফীষ্টীয় দর্শন হইল subjectivism, একটা বিজ্ঞানবাদ্। সত্যের মর্য্যাদা একটা সম্বন্ধবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে "সোফীষ্টী"র যুগ একটা সন্ধিকাল। আয়োনীয় দার্শনিক সম্প্রদায় বস্তুর নানাত্ব হইতে একত্ব অভিমুখী চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, প্রজ্ঞান ("knowledge") সম্ভব কি অসম্ভব সে বিষয়ে কোন চিন্তা তাঁহাদের উদ্বেলিত করে নাই। তৎপরে হিরাক্লিটাস্ অগ্নি বা তেজকে বিশ্বের মূলাধাররূপে মানিয়া লইয়া বলিলেন, "বস্তুনিচয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, কেন না বস্তু অহরহঃ আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রপঞ্চিত হইতেছে—things are in perpetual flux." এই জন্যই বৌদ্ধ মুদ্রাদ্বয় হইতেছে,—'সর্ব্বম্ অনাত্মম্', কেননা 'সর্ব্বম্ অনিত্যম্'। তৎপরে ধর্ম্ম-বৈজ্ঞানিক (theologian) জেনোফেনীস্ হইতে ইলীয় দার্শনিক পার্মিনাইড্স্ অবগত হইলেন, প্রজ্ঞান ('knowledge' : gr. *episteme*) ও অভিমত ('opinion' : gr. *dosa*) এই দুইটার প্রভেদ কি*, এবং চিন্তা করিলেন :—

Whilst the *One exists* and is the object of *knowledge*, the *Multiplicity* of things *becomes* and is the object of *opinion.*

অর্থাৎ, একমাত্র সদ্বস্তু প্রজ্ঞানের বিষয়, কিন্তু বস্তুনিচয়ের বিবর্ত্ত হইল বহুত্বের কারণ, এজন্য বহুত্বটী মতবাদের বিষয়ীভূত এবং গ্রাহ্য। †

পরবর্ত্তী দার্শনিক (নৈয়ায়িক ?) জেনো নানা বিরোধা-

---

* আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানবিদ্যাকে epistemology বলা হয়, ইহা গ্রীক্ শব্দ *episteme* হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং কোন শাস্ত্র বিষয়ে অভিমতকে doxy বলা হয়, যাহার উৎপত্তি গ্রীক্ শব্দ *dosa*.

† "Only being is, non-being is not ; there is no becoming The existent alone is thinkable and only the thinkable is real. Of the one true existence, convincing knowledge is attainable by thought ; but the deceptions of the senses seduce men into mere opinion and into the deceitful rhetorical display of discourse respecting the things, which are supposed to be manifold and changing."—*Uberweg,* History of Philosophy. Vol I

ভাস ও অসঙ্গতি প্রদর্শন (*reductio adde absurdum*) দ্বারা বিচার করিলেন যে সদ্বস্তু অদ্বিতীয়—"One is One"; জেনোর সিদ্ধান্তকে পরোক্ষ প্রমাণ [indirect proof] স্বরূপ ধৃত করা হয় এবং তৎপরবর্ত্তী মেলিসাসের "প্রকৃতি" ["On the Existent."] নামক গ্রন্থে ঐ চরম একত্বের কথাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ [direct proof] দ্বারা স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ হয়।—

—The One is.—

মেলিসাস "একত্বে"র পরিচয় দিয়াছেন বস্তুর নিরবচ্ছিন্নতা, continuity of substance প্রমাণ করিয়া; সদ্‌বস্তুর (Being) কোন ধারণাত্মক তাদাত্ম্য (notional identity) বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন নাই।

ইলীয়দর্শন কতকটা dogmatic বা যুক্তিনিরপেক্ষ হইলেও সংশয়বাদই তাহার বক্তব্য। সংশয়বাদী হইলেন তাঁহারা যাঁহারা পরমতত্ত্ব—absolute truth—বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যস্থতা অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন বা সন্দেহ করেন।

তৎপরে "জড়বাদী" দার্শনিকের তৃতীয় স্তরে আসিলেন এম্পিডোক্লস্, আনাক্সাগোরাস্, লিউসিপ্পাস্ ও দিমোক্রীটাস্। এক ও বহুর রহস্য লইয়া চিন্তিত হইবার ইহাঁদের অবসর মিলিল না; তাঁহারা একটা সহজ বিজ্ঞানানুগ ধারণা লইয়া ঘটনার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে ঐন্দ্রিকজ্ঞান যথেষ্ট নয়। এজন্য, এই scientific instinct থাকা সত্ত্বেও, ইহাঁরা প্রকৃতপক্ষে সংশয়বাদের গতানুগতিকতায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সন্দেহবাদী-ই রহিয়া গেলেন।

এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নীতিগুলি (systems) সন্দেহাত্মক হইলেও উক্ত দার্শনিকগণ সংশয়বাদপ্রসূত কোন অনুমান সিদ্ধান্তে ("sceptical inference") উপনীত হইতে পারেন নাই, যাহা প্রোটাগোরাস্, প্রোডিকাস্, জর্জিয়াস্ প্রমুখাৎ সোফীষ্টগণ স্পষ্ট উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন।

সেই কথাই বলিব। ইহাই হইল গ্রীসীয় দর্শনের দ্বিতীয় যুগ।

প্রোটাগোরাস্

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চমশতাব্দীর মধ্যভাগে সোফীষ্টগণই প্রথমে প্রচলিত ও আসল মূল্য—mere convention and intrinsic value—এই উভয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন। প্রোটাগোরাস্ (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৪৯১-৪২১) ইহাঁদের অন্যতম দার্শনিক। "সত্য" বিষয়ক একটী গ্রন্থে তিনি বলিলেন 'মনুষ্যই সকল বিষয়ের পরিমাপক'। এইটাই তাঁহার হইল যেন fundamental theorem—মূল প্রতিজ্ঞা)

—If all things are in flux, so that sensation is subjective, it follows that Man is the measure of all things, of things that are, that they are, of things that are not, that they are not. Just as each thing appears to each man, so is it for him. All truth is relative. The existence of the gods is uncertain.—

প্রোটাগোরাসের উক্তিটাই মনে হয় কৃতসাধ্যকতাবাদ (pragmatism) ও মানবীয়বাদের পূর্ব্বসূচনা *, যেগুলির উৎপত্তি হইয়াছে আধুনিককালেই। কারণ, ব্যবহারিক জগতে মানুষের সততা ও উৎকৃষ্টতা যে একটা সম্বন্ধবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহা ইহা দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। কাযেই, প্রোটাগোরাস্ বলিলেন যে মানববুদ্ধিকে সত্য বা জ্ঞানের পথে পরিচালিত না করিয়া প্রকর্ষের ("virtue", "excellence") পথে পরিচালিত করাই শুভদ; কারণ, সত্য বস্তু লাভ করা যায় না এবং বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি-পরিকল্পনা করা অপেক্ষা নাগরিক জীবনের কার্য্যোপযোগিতাই বাঞ্ছনীয়। প্লেটোর "প্রোটাগোরাস্" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে তাঁহার উক্তিটী এই :—

The lesson which I have to teach is prudence or good counsel, both in respect of domes-

* "The old saying of Protagoras, "Man is the measure of all things" is, when interpreted aright, the greatest discovery of philosophy: it does not lead to scepticism, but impels science to enquire how man can measure, and what expedients will enable him to bring his measures into agreement with those of his fellows. Humanism regards human consciousness as the centre of the universe and makes use of its guidance alone in the world of experience, rejecting every *A priori* principle in whose name the possibility is claimed of reducing that which is the concrete type of every reality to an illusory appearance of some fantastic Absolute,"—*A liotta*, "The Idealistic Reaction against Science." (1914)

tic affairs that the man may manage his house-hold aright and in respect of public affairs, that he may be thoroughly qualified to take part, both by deed and by word, in business of the State. In other words I profess to make men good citizens.—

উপযোগিতাবাদেরও (utilitarianism) কতকটা ঐরূপই নীতি।—

"Our business in this world is not to know everything, but to know that which concerns the conduct of our life."—*Locke.*

—"Let your science be human and such as may have a direct reference to action and society…Be a philosopher, but amidst all your philosophy, be still a man."—*David Hume.*

নাগরিক জীবনে সার্থকতা আনিবার জন্য প্রোটাগোরাস্ চারিটী নূতন বিষয় পঠিতব্য করিলেন। ব্যাকরণ, রচনারীতি, কাব্য ও বাগ্মিতা এই বিষয়গুলি উচ্চ শিক্ষার অঙ্গরূপে (curriculum) পরিগণিত হইল। প্রোটাগোরাস্ হইলেন অধ্যাপক। ভাষাবিজ্ঞান (philology) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শব্দের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ বিষয়ে ও ক্রিয়াপদের রূপ (mood) অনুযায়ী বাক্যের বিভিন্ন বিন্যাস বিষয়ে তিনি গ্রীক ভাষায় নবপদ্ধতি সৃষ্টি করেন। বিশেষ্যের লিঙ্গভেদ তিনি বুঝাইয়া দেন। অলঙ্কার জিনিসটাকে একটা art রূপে তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি নাস্তিক্যবাদী ছিলেন।

প্রোডিকাস্ ও হিপিয়াস্

প্রোটাগোরাসের অব্যবহিত পরে অপর দুইজন সোফীষ্ট গ্রীসীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের নাম প্রোডিকাস্ ও হিপিয়াস্।

প্রোডিকাস্ পূর্ব্বগ অধ্যাপক প্রোটাগোরাসের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত চারিটী বিষয়ে ছাত্রদের ব্যুৎপন্ন করিবার নিমিত্ত এথেন্সে আগমন করেন। তাঁহার মতেও প্রকর্ষের পথই নাগরিক জীবনের মৃগ্য। প্রোটাগোরাস্ যেরূপ অনুশীলনের প্রচারে প্রথম পথপ্রদর্শন করেন, প্রোডিকাস্ সেইরূপ অনুশীলনের পক্ষপাতী হইয়া নৈতিক জীবনের উপকারিতা বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইলেন। তিনি নৈতিক বিষয় লইয়া কথোপকথন করা অত্যন্ত মনোজ্ঞ বিবেচনা করিতেন। "Hercules at the Cross-roads" শীর্ষক তাঁহার একখানি নীতিমূলক পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে তিনি হারকিউলিস্ নামধেয় এক কাল্পনিক ব্যক্তিকে প্রকর্ষ ও সম্ভোগ (pleasure) এই দুইটীর মধ্যে কোন পথটী নির্ব্বাচন-যোগ্য এতদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। প্রোডিকাস্ বলিতেন "জীবনের নানাবিধ পাপাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পক্ষে বরং মৃত্যুলাভ শ্রেয়ঃ"। কিন্তু তাঁহার নৈতিক জ্ঞানে দার্শনিক তত্ত্বের গভীরতা স্থান পায় নাই। ব্যাকরণে পর্য্যায়শব্দ (synonym) বিভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য, এ বিষয় তিনি প্রচলিত করিয়া যান। প্রভেদগুলি তিনি পাণ্ডিত্যগর্ব্বী ব্যক্তির (pedant) মতই দেখাইয়া দিতেন, যেমন অনেক বিদ্যালয়ে পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে নানা প্রতিশব্দের প্রভেদার্থ বুঝাইবার কালে 'অমর-কোষ' বা 'পাণিনি'র শ্লোক উদ্গার করিয়া ছাত্রদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকেন।

হিপিয়াস্ ছিলেন প্রোডিকাসের সমসাময়িক। কোন দার্শনিক মতবাদ "জারী" করা অপেক্ষা হিপিয়াস্ অলঙ্কার, গণিত, জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলনে সার্থকতা আছে মনে করিতেন। দর্শনের নৈতিক দিক্‌টা অগ্রাহ্যের বস্তু নয়, এজন্য তিনি তরুণদের যাবতীয় চারিত্রিক উৎকর্ষ বিষয়ে শিক্ষার ভার লইলেন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত তিনি ব্যাকরণ, পুরাণতত্ত্ব (mythology), ইতিবৃত্ত (family history), মহাকাব্য (Homerology), জ্যামিতি, সঙ্গীত কোনটাই বাদ দিলেন না। কেবল ব্যবস্থা-শাস্ত্র (law) সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আইন্-কানুন্ মানুষের যথেচ্ছাচারী শাসক, ইহা মানুষকে স্বভাবের প্রতিকূলে অনেক কার্য্য করিতে প্ররোচিত করে।" হিপিয়াস্ হইলেন polymathist ; এই মহাপণ্ডিতের শিক্ষা হইল পূর্ব্ববর্ত্তী প্রোটাগোরাস্ ও প্রোডিকাসের অনুশীলন পদ্ধতি ও পরবর্ত্তী তর্ক-পদ্ধতি-মূলক শিক্ষার যোগসূত্র।

জর্জিয়াস্ সম্প্রদায়

কালক্রমে এথেন্সে বহু সোফীষ্ট সমবেত হইলেন, কেহ নাগরিক, কেহ বিদেশী, কেহ বা প্রোটাগোরাস্-প্রোডিকাসের শিষ্য, কেহ বা শিক্ষকের অভাবে স্বয়ং শিক্ষিত।

সিসিলি দ্বীপস্থ Leontini শহর হইতে খৃঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে জর্জ্জিয়াস্ (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৪৮৩-৩৭৫) এথেন্সে উপস্থিত হইলেন। তিনি সক্রেটীসের সমসাময়িক, যদিও বয়সে কিছু প্রবীণ। প্রোটাগোরাস প্রমুখাৎ সোফীষ্টগণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল অনুশীলনের উপর ভিত্তি করিয়া; অলঙ্কার ও বাগ্মিতার অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু-কিছু উৎসাহ প্রদান করিতেন। জর্জ্জিয়াস্ সোফীষ্টীর ইতিহাসে নবপন্থা অবলম্বন করিলেন অলঙ্কার শাস্ত্রটীকে বাধ্যতামূলক (compulsory) করিয়া। নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি "ধার ধারিতেন" না। দার্শনিক সত্য বিষয়ে মৌলিক গবেষণার পরিবর্ত্তে তিনি সংশয়বাদ ও শূন্যবাদ দুই-ই সাব্যস্ত করিলেন। তিনি "প্রকৃতি" ["On the Nonent"] নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রমেয়গুলি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন :—

(ক) সত্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই;

(খ) সত্যবস্তুর অস্তিত্ব থাকিলেও, উহা অবগত হওয়া যায় না;

(গ) সত্যবস্তুর অস্তিত্ব থাকিলেও এবং অবগত হওয়া যাইলেও, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

উপর্য্যুক্ত প্রতিজ্ঞাগুলি তিনি সমর্থন করেন জেনোর যুক্তিবিচার অনুসরণ করিয়া *। বহুর অস্তিত্বে যাহা লৌকিক বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল জেনো তাঁহার বিরোধাভাস পদ্ধতিতে যেরূপ একত্বে উপনীত হইয়াছিলেন জর্জ্জিয়াস্ সেইরূপই করিলেন; অর্থাৎ পারমিনাইড্‌সের গঠনাত্মক তত্ত্বদর্শনকে জেনোর খণ্ডনাত্মক ন্যায়বিচার দ্বারা ইলীয় দর্শনকে ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। জর্জ্জিয়াস্ আলঙ্কারিক ও কূটনীতিজ্ঞ; দার্শনিক নহেন। প্রোটাগোরাসের মতে যেমন প্রত্যেক অভিমত ("opinion") এক হিসাবে সত্য, জর্জ্জিয়াসের মতে তাহা একেবারে মিথ্যা। তাঁহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল "forensic rhetoric," ব্যবহারাজীবের অলঙ্কার; জর্জ্জিয়াস্-নীতি অনুসরণ করেন পরবর্ত্তী থ্রেসীমেকাস্, পোলাস্ প্রভৃতি সোফীষ্ট্।

আইসোক্রেটীস্ সম্প্রদায়

জর্জ্জিয়াস্ সম্প্রদায়ের rhetorical সোফীষ্টী পরবর্ত্তী যুগে political সোফীষ্টীতে পরিণত হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রতান্ত্রিক সোফীষ্টদিগের মধ্যে আইসোক্রেটীস্, লাইকোফ্রন্, আল্‌সিডামাস্ এই তিন জন উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের মধ্যে Isocrates সাহিত্যিক ও অধ্যাপক হিসাবেও বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন। রাষ্ট্রতান্ত্রিক বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার ওজস্বিনী রচনা গ্রীসীয় আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে চিন্তার স্রোত বহাইয়া দিত। ম্যাসীডন্-রাজ ফিলিপ গ্রীকরাজ্যগুলি একে একে অধিকার করিতেছিলেন; আইসোক্রেটীস্ তাঁহার রাষ্ট্রতান্ত্রিকতার পোষক ছিলেন। কিন্তু গ্রীসের অদ্বিতীয় বাগ্মী Demosthenis সে তন্ত্রের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা গ্রীক্-স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য লোকমত গঠন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পান। প্লেটো যখন তাঁহার 'একাডেমী' নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটী স্থাপন করেন (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৩৮৭-৩৮৬) তখন আইসোক্রেটীসের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বোচ্চশিখরে। দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। প্লেটোর 'Gorgias', 'Phædrus' ও 'Republic' গ্রন্থ-ত্রয় হইতে জানা যায় যে তিনি আইসোক্রেটীস্‌কে নানা দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলঙ্কারিক ও দার্শনিকের "দ্বৈরথ" যুদ্ধ উপস্থিত হয় শিক্ষার পদ্ধতিকে উপলক্ষ করিয়া। অবশেষে প্লেটো জয়যুক্ত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে জগদ্বিখ্যাত হন।

* *Nothing* is : for if anything were, its being must be either derived or eternal ; but it connot have been derived, whether from the existent or from the non-existent (according to the Eleatics) ; nor can it be eternal, for then it must be infinite ; but the infinite is nowhere, since it can nether be in itself nor in anything else and what is nowhere, is not,

If any thing were, it could not be known : for if knowledge of the existent were possible, then all that is thought must be and the non-existing could not even be thought of ; but then error would be impossible, even though one should affi m that a contest with chariots took place on the sea, which is absurd,

If knowledge were possible, yet it could not be communicated : for every sign differs from the thing it signifies ; how can any one communicate by words the notion of colour, seing that the ear hears not colours but sound ? And how can the same idea be in two persons, who are yet different from one another ? —*De Melisso, Xenophane et Gorgia* (Tr.)

সক্রেটীসের অভ্যুদয়

পূর্ব্বে চারি প্রকার "সোফীষ্ট"র বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তা হইতে রাষ্ট্রতান্ত্রিকতার উদ্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ অনুশীলনপ্রিয়তা হইতে তার্কিকতার সৃষ্টি হয়। প্রোডিকাসের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ তর্ক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন; হিপিয়াস্-পন্থীরা তর্ক-বিদ্যাত্মক বহুবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। উক্ত চর্চ্চার ফলে কোন বিষয়ের আন্বিক্ষীকী দিকটা বর্জ্জন করিয়া বিষয়টাকেই পূর্ব্বপক্ষ—Thesis—রূপে মান্য করিয়া তার্কিকতার শক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল। পরিণাম এই হইল যে সত্যের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা জয়ের আনন্দই প্রেয় হইল। প্রকর্ষের নিকশ এইরূপে উন্মার্গগামী হওয়ায় লোকে সারগর্ভ বিজ্ঞান ও ন্যায়ানুগ বিচার (reasoning) পরিত্যাগ করিয়া চাতুর্য্যময় অপসিদ্ধান্তপ্রবণ হইয়া পড়িল; দর্শকের "বাহবা" লাভ করাই সার্থকতা—ইহাই হইল mentality, মানস প্রকৃতি।

মানুষের মানস প্রকৃতিও লীলাময়ী। বিরোধাভাস পর্য্যসিত হইয়া পড়িল, অপসিদ্ধান্তে (fallacy) অবসাদ জন্মিল। যৌবনের নবোদ্যমে মানুষ তার্কিকতার অনুশীলন করিলেও পরিণত বয়সে বুঝিল যে উহা অর্ব্বাচীনের নিছক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন—pedantry—ভিন্ন আর কিছুই নয়; অথবা উহাকে প্রাথমিক শিক্ষা (propaedeutic exercise) স্বরূপে কতকটা গণ্য করা যাইতে পারে। মেধাবী ছাত্র মাত্রেই তার্কিকতার উপযোগিতা স্বীকার করিল এক-মাত্র সত্যের সন্ধানে; এজন্য সোফীষ্টীর পরিবর্ত্তে দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়েই যেন লোক-রুচির প্রতীক্ স্বরূপ হইয়া সক্রেটীস্ অবতীর্ণ হইলেন। সক্রেটীস্ নৈতিক-জীবনের প্রাণসঞ্চারে প্রধান হোতা, জ্ঞানবেদের মন্ত্রদ্রষ্টা।

সক্রেটীসের মতবাদ

সক্রেটীস্ (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৪৭১-৩৯৯) রাজা পেরিক্লিসের সমসাময়িক; সে যুগের গ্রীসীয় সংস্কৃতির কথা পূর্ব্বেই কিছু আলোচিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে পেরি-ক্লিসের রাজ্যকাল হইল "অ-বৈজ্ঞানিক" যুগ। কোনও বিজ্ঞান-তত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তা কাহারও মস্তিষ্ক আলোড়িত না করায় সক্রেটীসের কালে বিজ্ঞানের নিঃস্বতা ("bankruptcies of science) সুস্পষ্ট। সক্রেটীস্ অবৈজ্ঞানিক এবং অশিল্পী। যদি তাঁহাকে ও তাঁহার সম্প্রদায়কে (Socratics) শিক্ষক হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায় তবে তাঁহারাও "সোফীষ্ট" ছিলেন। সক্রেটীস্ জনসাধারণের—প্রধানতঃ যুবকবৃন্দের—শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, লৌকিক চরিত্র বিষয়ে তিনি সংস্পৃষ্ট থাকিয়া প্রচলিত বিশ্বাস-সমূহের সমালোচনা করিবার জন্য বহুবিধ "আহার্য্য" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সক্রেটীস্-সম্প্রদায়কে "সোফীষ্ট" আখ্যা দেন না, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা সাধারণ-শিক্ষা—যাহাকে 'লোক-শিক্ষা' বলা হয়—তাহা ঠিক দিতেন না। যে শিক্ষা লাভে জীবনে উন্নতি করা যায় ("অর্থকরী বিদ্যা!"), যে শিক্ষায় ব্যবহারাজীবরূপে সাফল্যলাভ হয়, যে শিক্ষায় রাষ্ট্রপরিষদে (Assembly) খ্যাতি অর্জ্জন করা যায় বা তর্ক সমিতিতে (debating society) "বাহবা", "capital" ইত্যাদি প্রশস্তিসূচক বাক্যে অন্তরে গর্ব্ব অনুভূত হয়—সে বিষয়ে তাঁহাদের জীবন গড়িবার প্রচেষ্টা ছিল না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল প্রজ্ঞান ও প্রকর্ষ; তাঁহাদের ছিল একটা intellectual effort, একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনের প্রযত্ন। প্রকর্ষ ও প্রজ্ঞান নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। উক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ("knowledge") লাভ বিষয়ে সোফীষ্টরা ছিলেন সন্দেহবাদী, সক্রেটীস্ সম্প্রদায় এ বিষয়ে ঘোর আস্থাবান। এই জ্ঞান কোন ব্যক্তিগত, দেশগত জ্ঞান নয়; ইহা কালের দ্বারা পরিমিত নয়। উপযুক্ত প্রণালীতে জ্ঞানের আরাধনা করিলে এই প্রজ্ঞানকে আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়। এই জ্ঞান হইল তপঃ; সক্রেটীস্ প্রজ্ঞানের উপাসক ছিলেন। তিনি গ্রীসীয় সুবর্ণ-যুগের ("Golden Age") প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রধান ঋত্বিক্।

বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান সক্রেটীস্ অনুমোদন করেন নাই; কারণ, "he had no head for physics", তাঁহার সহজ-প্রজ্ঞা, তাঁহার "mother-wit" অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি এথেন্সেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জ্যামিতি ও জ্যোতিষ তিনি জানিতেন। প্লেটো তাঁহার "Phaedo" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে তিনি আনাক্সা-

গোরাসের দর্শন পাঠ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য natural philosopher দিগের মতবাদ তিনি অবগত ছিলেন; ইলীয় দার্শনিক পারমিনাইড্‌সের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং তিনি সোফীষ্টীয় শিক্ষা প্রণালীতে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তার্কিকতার ("disputation") তিনি ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সে তার্কিকতার লক্ষ্য ছিল অবিদ্যা দূর করা—elimination of error, বিজয়ের সাফল্য নয়। এজন্য অনুশীলনাত্মক ও তার্কিকাত্মক ("eristic") সোফীষ্টীর সহিত তাঁহার কিছু ঐক্য ছিল। পন্থায় ঐক্য; লক্ষ্যে অনৈক্য। তাঁহার প্রণালী হইল "আরোহ" বা "অনুমান-সাধক"—inductive method; বিশেষ হইতে সামান্যে উপনীত হইবার প্রণালীকে ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ইহাতে পরীক্ষামূলক প্রস্তাবটী প্রথমে উপস্থিত করা হয়। তৎপরে প্রসঙ্গের অনুকূল কতকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রস্তাবটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা হয়। এতদ্বারা প্রাসঙ্গিক ব্যাপারের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া একটা প্রত্যয় বা idea তৈয়ারী হইয়া যায়। সত্যের সন্ধানে সক্রেটীস্ 'তাত্ত্বিক বিরোধ ও সমন্বয়' সংক্রান্ত ধারা অনুসরণ করিয়া যে Thesis গড়িলেন তাহা অভিনব। উহাই হইল dialectic শাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে eristic হইতেই dialectic জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্য বিভিন্ন।

মনোবিজ্ঞানে বিষয়াত্মকপদ্ধতির (objective method) পরিবর্ত্তে বিষয়ীগত পদ্ধতির (subjective method) সংস্থাপন করিয়া সক্রেটীস্ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যদিও তিনি নীতিশিক্ষক ও নৈয়ায়িক রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিশালী তত্রাচ মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁহার অবদান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মানুষ মাত্রেই অনুমানসাধক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ "প্রত্যয় জ্ঞান" (conceptual knowledge) লাভ করিতে পারে। সে জ্ঞান সার্ব্বজনীন ও পরা।

রাষ্ট্রনীতি সক্রেটীসীয় চিন্তায় স্থান পায় নাই। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মতে যিনি জ্ঞানী ও ধীমান্ তাঁহারই প্রভুত্ব করা শোভা পায়, অজ্ঞানীর পলিটিক্‌স্ অজ্ঞতারই অভিব্যক্তি। জেনোফোন্ তাঁহার Memorabalia গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"The fundamental thought in the political doctrine of Socrates is that authority properly belongs to the intelligent, to him who possesses knowledge."

সক্রেটীস্ ধর্ম্মপ্রবণ ও ধ্যানরসিক (mystic) ছিলেন। 'মাইথোলজী' একেবারে অবিশ্বাস্য ও কবিকল্পনা-প্রসূত, ইহাই তাঁহার ধারণা; কারণ, ইহাতে দেবদেবী সম্বন্ধে বহুবিধ নীতিদুষ্ট কাহিনী আছে, যাহা ধ্রুবসত্যরূপে মান্য করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কিন্তু তিনি ভগবদ্ বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও জগতপাতা।

—The world is governed by a supreme, divine intelligence.—

তিনি আত্মায় বিশ্বাসী; মানবাত্মা ভগবানেরই অংশ; আত্মা অমর। প্লেটোর 'Apology' পুস্তক হইতে জানা যায় যে সক্রেটীস বলিতেন: ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক ঘটনা পরম্পরার অচল-প্রতিষ্ঠ ক্রম-বিন্যাস, order, উপলব্ধি করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সার্ব্বভৌমিকতা লক্ষ্য করিয়া এবং তৃতীয়তঃ, স্বপ্নে যে সমুদয় সতর্কবাক্য, revelations প্রদত্ত হয় তাহা দ্বারা, অথবা কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনা (signs) ও ভবিষ্যদ্বাণী (oracles) দ্বারা।

আত্মজ্ঞান বিষয়ে জেনোফোনের পুস্তকে উল্লিখিত আছে:—

—"Know thyself," is the condition of practical excellence. External goods do not advance their possessor. To want nothing is divine; to want the least possible, brings one nearest to divine perfection.—

প্লেটোর Apologyতে আছে:—

—The specific message from God which Socrates brought to his fellowmen was that it is the great business of life to practice the "care" or "tendence" of one's soul, "to make one's soul as good as possible" and not to ruin one's life, as most men do, by putting care for the body or for "possessions" before care for the "soul."—

অর্থাৎ, আত্মার উন্নতি-কল্পে জীবনের ক্রিয়াকলাপ বাছাই করিতে হইবে, "কার্য্যং কর্ম্ম" করিতে হইবে, দৈহিক

সুখ বা বিষয় বৈভবের আকর্ষণে যেন আত্মার অবনতি না ঘটে। ইহাই শ্রীভগবানের বাণী।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চমশতাব্দী পর্য্যন্ত বা সক্রেটীস্-পূর্ব্ব যুগ পর্য্যন্ত "আত্মা" সম্বন্ধে গ্রীসীয় ধারণা এইরূপ ছিল :

(১) আত্মা হইল প্রাণবায়ু যাহা মৃত্যুকালে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হইয়া যায়। দেহের ধ্বংস হইলে ইহাই প্রেত ("ghost") বা ছায়া ("shade") অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই লৌকিক কুসংস্কারটী আবহমানকাল আছে।

(২) আয়োনীয় দর্শনে ইহাকে "বায়ু" (air) বলিয়াছে।

(৩) অরফীউস্ ধর্ম্ম (Orphic religion) যে সমুদয় সভ্যজাতির চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহাদের বিশ্বাস যে আত্মা এমন একটী বস্তু যাহার নিয়তি পরপারেও বিদ্যমান আছে ("the soul has a destiny beyond the grave") ; কিন্তু ইহা "অহং" (self) হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ—আত্মা যেন কতকটা strangerএর মতই দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে, ব্যক্তিগত চরিত্র-গঠন বিষয়ে ইহার কর্ম্ম কিছুই নাই, দেহ যখন কর্ম্মে নিযুক্ত তখন ইহা সুপ্ত এবং দেহ যখন নিদ্রায় অচেতন তখন ইহা জাগ্রত। ইহা সাধারণতঃ নিদ্রা বা সমাধি ("trance") অবস্থায় আত্ম-প্রকাশ করে। ইহার প্রকাশকে "revelation" বলা হয়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে "আত্মা" বলিতে মানুষের স্বাভাবিক চৈতন্যময় ব্যক্তিত্বকে ("normal waking personality") বুঝাইল—যাহা মেধা ও চরিত্রের অধিষ্ঠান-বীজ, যদ্দ্বারা নিরূপিত হয় অমুক ব্যক্তি জ্ঞানী কি অজ্ঞ, সৎ কি অসৎ।

—That in virtue of which we are called wise or foolish, good or bad.—

আত্মাই হইল মানুষ—মানুষের স্বরূপটী, অথবা মানুষ হইল দেহাশ্রয়ী আত্মা।

ব্যক্তিগত সুখাসুখ, হিতাহিত, পাপপুণ্য, আত্মার উৎকৃষ্টতা-অপকৃষ্টতার উপর নির্ভর করে। মানুষ প্রকৃত উৎকর্ষ ("goodness") অথবা প্রকৃত সুখই ("happiness") কামনা করে, কিন্তু সেই সুখ লাভ হয় না, কারণ প্রকৃত সুখের "জ্ঞান" লাভ হয় না বলিয়াই।—আত্মাকে উৎকৃষ্টতার মহিমায় মহিমান্বিত করিতে হইলে উৎকৃষ্টতার জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, সেই জ্ঞানবলে আমরা আমাদের শক্তি-সামর্থ্য, ধন-স্বাস্থ্য, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির কুব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। যাবতীয় সদ্‌গুণরাজি একই বস্তুর আধার, সেইটী উৎকৃষ্টতার জ্ঞান এবং যাবতীয় অসৎকর্ম্ম একই বস্তুর আধার, সেইটী উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

—All the "virtues" are one thing, knowledge of good ; and all "vice" is one thing, ignorance of true good.—

এই উৎকৃষ্টতার ideaটীকে ভিত্তি করিয়া সক্রেটীস্ একটী অদ্বৈত নৈতিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, যে ধর্ম্ম এথেন্সবাসী, স্পার্টাবাসী বা গ্রীক্ জাতিতে আবদ্ধ নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মনীতি ; তাহা কোন যুগের বিশিষ্ট সভ্যসমাজের লভ্য বস্তু নয়, সর্ব্বযুগের সর্ব্বসাধারণের ঈপ্সিত সামগ্রী। মানবের প্রচেষ্টা হইবে আত্মাকে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট করা, পবিত্র করা, দেবত্বের অধিকারী করা। মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে। ঋগ্বেদীয় সংহিতায় ঋভু দেবতার অর্চ্চনা তাহার প্রমাণ। সায়নাচার্য্য কহিতেছেন—

—"ঋভবহি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ"—

তপস্যার প্রভাবে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ঋভুপদলাভ করা যায়। অভিব্যক্তিবাদও ইহার সমর্থন করিবে। "অন্তরে সৎ হও, অনুধ্যানে সৎ হও, আচার-ব্যবহার সৎ হউক, তুমিও ঋভু দেবতার ন্যায় পূজার্হ হইতে পারিবে"—ইহাই ত "জ্ঞানবেদ"। জ্ঞানী সক্রেটীস্ বলিলেন :

—Make the soul as good as possible ; make it like God.—

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

৩

এক সঙ্গে পর পর তিন দিন ছুটি পড়ল। সোম, মঙ্গল, বুধ। তার সঙ্গে রবিবার। শনিবার স্কুল সেরে সুকুমার আড়াইটার ট্রেণে বাড়ী রওনা হ'ল। এবারে আর আগে সংবাদ দিলে না। তার কেমন ধারণা হয়েছে যথারীতি চিঠি দিয়ে বাড়ী যাওয়া তার অদৃষ্টে নেই। যখনই চিঠি দিয়েছে, কোনো না কোনো কারণে শেষ পর্য্যন্ত তার বাড়ী যাওয়া আটকে গেছে। এবারে যে বাড়ী যাওয়া হ'ল সে সম্ভবত এই জন্যে যে, বাড়ীতে চিঠি দেয়নি।

মাষ্টারী সুকুমারের ভালো লেগেছে। হোক গে মাইনে কম, কিন্তু সম্মান আছে। কে জানে, তার হাত থেকে যত ছেলে বেরিয়ে যাবে তার মধ্যে কত জন হাইকোর্টের জজ হবে, কত জন হবে মন্ত্রী, কত মেয়র, কত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার। হয়তো তারই ছাত্রদের মধ্যে ভাবী-কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক আছে। আজ যাদের সে ইতিহাস পড়াচ্ছে তারাই হয়তো একদিন ইতিহাস গড়বে নতুন ক'রে। পৃথিবীর মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আনবে উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদ। সুকুমার খুব মন দিয়ে ছেলেদের পড়াতে লাগল, শুধু ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনার কঙ্কাল নয়, যে সমস্ত শক্তিমান ব্যক্তি একটা জাতিকে নতুন ক'রে গড়েছেন, কোথায় তাঁর শক্তির সত্যকার উৎস—তারই সঙ্গে সে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যুগে যুগে সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষে কোথাও বা উঠেছে অমৃত, কোথাও হলাহল। বারে বারে বিচিত্র ঘটনার আবর্ত্তে কখনও সহজ হয়েছে কঠিন, কখনও অসম্ভব হয়েছে সম্ভব। সভ্যতার শিখর উঠল আকাশ ছুঁয়ে। দেখতে দেখতে গেল তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে। আবার নতুন কোনো দেশে [illegible] সভ্যতা। সুকুমার বুঝিয়ে দেয়, এ সবের কিছুই মিথ্যা নয়—পুরাতন সভ্যতার মৃত্যুর প্রয়োজন ছি[ল] নতুন আবেষ্টনে নবতর সভ্যতার জন্মের জন্য। ইতিহাসে যা কিছু ঘটে তা আকস্মিকও নয়, অনর্থকও নয়। সবেরই প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনে আসে শক, আসে হুন, আসে ঝড়ের মতো দুর্ব্বার চেঙ্গিস খাঁ। রক্তস্রোতে মাটি যায় ভেসে, হাহাকারে আকাশ যায় ফেটে। সুকুমার বুঝিয়ে দেয় তারও প্রয়োজন ছিল। রক্তস্রোতে আর হাহাকারে, দুর্ভিক্ষে আর রাষ্ট্রবিপ্লবে নতুন মানুষের জন্ম হয়।

এর জন্যে সুকুমারকে পড়াশুনা করতে হয়, খাটতে হয় বেশী করে। কিন্তু সে পরিশ্রম তার ভালোই লাগে।

ট্রেণে হঠাৎ মনে পড়ল ছেলের কথা। ওটির কথা তার বড় একটা মনেই পড়ে না। ওর কথা ভাবতে সে এখনও অভ্যস্ত নয়। জোর ক'রে মনে আনতে হয়। শুনেছে দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। কার মতো হয়েছে কে জানে বাপের চিঠিতে অত কথা লেখা নেই। মণিমালা সেই থেকে আর চিঠিই দেয় নি। হয় তো রাগ ক'রেছে মণিমালার কথায় কথায় রাগ। সুকুমারের দুঃখ কত এব[ং] কোথায়, তা সে কিছুতে বুঝবে না। কার না ইচ্ছা হয় প্রিয়-পরিজন নিয়ে এক সঙ্গে দিন কাটাই। ইচ্ছা ক'রে কে যায় আত্মীয়-স্বজন-বিহীন দূর প্রবাসে জীবন কাটাতে এই যে কিছুকাল আগে তার অমন কঠিন টাইফয়েড হয়েছিল, বাড়ীতে তার সংবাদ পর্য্যন্ত দেয়নি, পাছে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর বাড়ীও আসেনি এই লজ্জায় যে, কখনও তাদের এক পয়সা দিতে পারেনি, কেন আবার খরচ বাড়ায় সুকুমারের মনের সামনে স্পষ্ট জল জল করতে লাগল, দিনের অধিকাংশ সময় একা ঘরে পড়ে সে ছটফট করেছে। মাথা অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে ক্রমাগত ভুল দেখেছে। দেওয়ালের দিকে চাইলেই কখনও দেখেছে মরা [illegible]

অদৃশ্য হাতে কে যেন খস্ খস্ ক'রে কি লিখে দিলে। কখন আসে দিন, কখন আসে রাত—কিছুই ঠিক করতে পারত না। কি ক'রে যে দিন রাত কেটেছে তাও আর মনে করতে পারে না। মেসের সহবাসীদের দোষ দেওয়া যায় না। সকলেরই আফিস আছে। সে সময়টা তাকে মেসের ঠাকুর চাকরের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে কাটাতেই হ'ত। তারা অবসর এবং খুশী মতো কখনও মাথায় আইস্-ব্যাগ—মুখে এক ফোঁটা জল দিত, কখনও দিত না। কিম্বা দিত কি দিত না তাও ভালো মনে পড়ে না। রাত্রে মেসের বাবুরা শুশ্রূষার অবশ্য ত্রুটি করত না। কিন্তু বাড়ীর শুশ্রূষার কাছে সে কি শুশ্রূষা! তারা অবশ্য তাদের যথা-সাধ্য করেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া, বাকি কিছুই রাখেনি। ভাগ্যক্রমে একটি বিনা পয়সার ডাক্তারও পাওয়া গিয়েছিল। মেসের একটি ভদ্রলোকের আত্মীয়। নইলে পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার দেখাবার শক্তি তার ছিল না। হয় বিনা চিকিৎসায় তাকে মেসে প'ড়ে থাকতে হ'ত, নয় চেষ্টা-চরিত্র ক'রে হাসপাতালে যেতে হ'ত। বিনা পয়সার ডাক্তারকে বারে বারে ডাকা যায় না। তবু আত্মীয়ের খাতিরে এবং রোগীর অবস্থা দেখে তিনি প্রত্যহ একবার ক'রে আসতেন। আবার কখনও বা মেসের বাবুরাই তাঁর কাছে রোগীর অবস্থা জানিয়ে প্রেস্‌ক্রুপ্‌শান নিয়ে আসত। সুকুমারের টাকা ফুরিয়ে গেলে বাবুরা নিজের পয়সা দিয়ে তার জন্য ঔষধ পথ্য কিনে এনেছে। সে দেনা অবশ্য সে শোধ ক'রেছে। তবু বলতে হবে তারা সুকুমারের অসুখে খুব সেবা ক'রেছে। সত্য। কিন্তু কোথায় পাবে তারা মায়ের হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ, কোথায় বা পাবে প্রিয়ার নিঃশব্দ ক্লান্তিবিহীনতা! কিন্তু সেই মায়ের হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ, প্রিয়ার হাতের সুমধুর সেবার লোভ উপেক্ষা ক'রে কেন সে প'ড়েছিল মেসের সহস্র অসুবিধার মধ্যে? কেন? কেন? কেন? কেন এ অকারণ কৃচ্ছ্র-সাধন? চলন্ত গাড়ীর কামরায় ব'সে সুকুমার মনে মনে বার বার মণিমালাকে প্রশ্ন করতে লাগল, কেন ছিলাম প'ড়ে? কেন তুমি বোঝ না পুরুষের দারিদ্র্য মেয়েদের বৈধব্যের মতো—কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না? কাঁটার মতো বেঁধে—স্থির হ'য়ে নীড়ের নিবিড় শান্তি উপভোগ করতে দেয় না। বিদ্যা আর একালে ঐশ্বর্য্য নয়। ঐশ্বর্য্য নয় মনুষ্যত্ব। বড়বাজারের দোকানে দোকানে নুন-হলুদ-তেজপাতার মতো সমস্ত পুরিয়া বেঁধে বেঁধে বিক্রি হচ্ছে। সব ভাড়া খাটছে। মগনলাল নিমকচাঁদ ইচ্ছা করলেই আটায় জন এম-এ'কে দিয়ে মসলা ওজন করাতে কিম্বা চটের গাঁটে নম্বর দেওয়াতে পারে। যে কালে ছিল সেকালে ছিল, একালে আর বিদ্যায় মনুষ্যত্বে ঐশ্বর্য্য নেই। সমস্ত ঐশ্বর্য্য এসে আশ্রয় নিয়েছে ব্যাঙ্কের চেকে। আভিজাত্য পেতে গেলে চাই মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স পেতে গেলে চাই আভিজাত্য বিসর্জ্জন। এমনি জঘন্য চক্রের মধ্যে মানুষ গেছে প'ড়ে।

গাড়ীর মধ্যেই সুকুমার উত্তেজিত হয়ে উঠল। হতাশ-ভাবে ঘাড় নেড়ে নিজের মনেই বলতে লাগল, মণিমালা কিছুতে এ সব বুঝবে না। আমার কোনো কথা সে বুঝতে চাইবে না।

সুকুমার এবার বাড়ী এল অনেক দিন পরে। মাস ছয়েকের কম নয়। সব তার নতুন নতুন লাগছিল। দীঘির জল ঘাটের উপর পর্য্যন্ত থৈ থৈ করছিল। তাতে চাঁদ ভাসছে। এবারের বড় ঝড়ে বটগাছটার একটা ডাল ভেঙে পড়েছে। তাদের নিজের বাড়ীর পূর্ব্বদিকের পাঁচীলের খানিকটাও বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে। তালপাতার বেড়া দিয়ে সাময়িকভাবে অন্দরের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা হয়েছে। ওদিকের যশোদা বৈষ্ণবীর বাড়ীর শূন্য দেওয়ালগুলো চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলে ভয় করে। যশোদা গেল বারে মারা গেছে। বেচারীর ছেলেপুলে নেই। হয় তার উত্তরাধিকারী এসে চাল-ছাপ্পর ন'কড়া-ছ'কড়ায় বিক্রি ক'রে গেছে, নয় উৎসাহী লোকে সেগুলো ভেঙে নিয়ে গিয়ে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করেছে!

নিশুতি রাত্রি।

সুকুমার নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কাউকে ডাকতে তার লজ্জা করছিল। অনেকক্ষণ পরে ডাক দিতে লোচন বাইরে শুয়ে থাকে, সে এসে দরজা খুলে দিলে। তার মায়ের ঘরের দরজা খোলারও শব্দ পাওয়া গেল। ঘুমের ঘোরেও তিনি [illegible] গলার [illegible] চিনতে পেরেছিলেন।

তবু দ্বিধাভরে বললেন, সুকু এলি নাকি?

সুকুমার গিয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মেঝেতেই ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়ল। বললে, ভালো তো সব?

—হ্যাঁ ভালো। ও বৌমা, সুকু এসেছে।

মা ঘরের ভিতর থেকে আলোটা জেলে নিয়ে এলেন। মণিমালাও উপরের ঘর খুলে বেরিয়ে এল। কিন্তু নীচে পর্য্যন্ত এল না। সিঁড়ির আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

মা সুকুমারের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ও মা, এবারে তোর কি চেহারা হয়েছে সুকু! শরীরে যে আর দেহ নেই!

মা সুকুমারের টাইফয়েড হওয়ার কথা জানেন না।

—ও বৌমা, সুকুর হাত মুখ ধোবার জল দাও। সেই কোন্ কালে বেরিয়েছে ভর্ত্তি দুপুর বেলায়।

মণিমালা বারান্দার একধারে গাড়ু গামছা রাখলে। সুকুমার আড়চোখে একবার তার দিকে চাইলে। মুখ দেখতে পেলে না, ঘোমটায় ঢাকা ছিল।

মা বলতে লাগলেন, কি দুষ্টু ছেলেই হয়েছে সুকু! কেবল ডিগবাজি দিচ্ছে আর গড়াগড়ি পাড়ছে!

সুকুমার জবাব দিলে না। নিঃশব্দে পা ধুতে লাগল।

মণিমালা এসে শাশুড়ীর কানে কানে কি বললে। তার-পরে দুজনেই উদ্বিগ্নভাবে রান্নাঘরের দিকে গেল।

ভাত যা আছে তাতে সুকুমারের খুব হবে। আলু-পটলের ডালনা আছে। আর কিছু নেই। শাশুড়ী বৌতে অনেকক্ষণ চুপি চুপি পরামর্শের পর স্থির হ'ল খান-কয়েক পটল ভেজে দেওয়া হোক, আর দুটো ডিম। সুকু-মারের বাড়ীতে হাঁস আছে অনেকগুলো। ডিমের অভাব নেই। তাড়াতাড়িতে এর বেশী আর কিছু করা সম্ভব নয়। সুকুমারের ক্ষুধা পেয়েছে খুব। রাতও হয়েছে।

মণিমালা রান্না করতে লাগল। মা আবার সুকুমারের কাছে গিয়ে বসলেন।

—তোর ইস্কুলে ক'দিন ছুটি?

—চার দিন।

—মোটে! ছ'মাস পরে এলি চার দিনের জন্যে?

মা গালে হাত দিলেন।

সুকুমার হাসল। বললে, এবারে চারদিনই বটে। তবে আর ক'দিন পরেই তো পূজোর ছুটি—প্রায় দেড় মাস। সে সময় অনেক দিন থাকব। স্কুলের মাষ্টারী, আর যাই হোক ছুটির ভাবনা নেই।

রান্নাঘর থেকে মণিমালা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

মা বললেন, সে শুনছি না বাছা। আসছে শুক্রবারে তোর জন্মদিন। সেদিন পর্য্যন্ত থেকে যেতেই হবে।

সুকুমার বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, দোহাই মা, এবারে আর দেরী করিও না। জন্মদিন আবার আসছে বছর আসবে। সেদিন আশ মিটিয়ে তোমার হাতের পায়েস-পিঠে খেয়ে যাব। এবারে একটা দিন কামাই করলে আর চাকরী রাখতে পারব না।

সুকুমার হেসে বললে, আর বাবাকে পাঁজি দেখতে নিষেধ কোরো মা। বাবা পাঁজি দেখতে বসলে আর যাত্রার দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা খুঁৎখুঁতে তাঁর মন!

মা ছেলের হাসিতে যোগ দিলেন না। মুখ অন্ধকার ক'রে নিঃশব্দে ব'সে রইলেন।

আহারাদির পর সুকুমার উপরে শুতে গেল। সেই পুরোণো শয়ন কক্ষ। কিন্তু রূপ যেন তার বদলে গেছে। বাইরের রূপ নয়, অন্তরের। তাই কোথায় বদলে গেছে ধরা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। তার খাটখানা সেই তেমনি জায়গাতেই পাতা আছে। তার সঙ্গে আর একটি ছোট খাট যোগ করা হয়েছে। কর্ত্তাবাবু নিজে সখ ক'রে তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। কাঁঠাল কাঠের ছোট খাট, চারিদিকে পাখী দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ঘর আলো ক'রে শুয়ে আছে নিমীলিত কমলের মতো সুন্দর একটি শিশু। সুকুমারের শিশু।

সুকুমার তার পায়ের গোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কাঁচা সোনার মতো টুকটুকে রং। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। নাদুস নুদুস ছেলে। কচি পাতার মতো দুটি কান। রাঙা রাঙা হাত, মুঠি বন্ধ। ঘাড়ের গড়ন, পিঠের গড়ন, উরুর গড়ন চমৎকার, নিখুঁৎ। সুকুমারের ইচ্ছা করছিল ওকে জাগিয়ে দেয়, কাঁদিয়ে দেয়। চো[খ তুলে] দেখলে, মণিমালা দরজার গোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়ি[য়ে] ওর কাণ্ড দেখছে। তার ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি দেখা যাচ্ছে। সুকুমার হেসে ফেললে।

বললে, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে !

মণিমালা জবাব দিলে না। সুকুমার খোকনের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। একবার ওর হাতের মুঠি খুলে দেয়, সে মুঠি লজ্জাবতী লতার পাতার মতো আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মণিমালা দরজা বন্ধ ক'রে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

সুকুমারের কেমন একটা বিস্ময়ের ঘোর লেগেছে। একবার ওর রেশমের মতো নরম চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, একবার রাঙা রাঙা কচি পা দু'খানি আলোর দিকে তুলে ধ'রে কি যে দেখে সেই জানে।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করলে, অমন ক'রে কি দেখছ ?

—কি সুন্দর দেখ !

মণিমালা মুখ টিপে হাসলে। বললে, দেখেছি।

সুকুমার আর কিছু বললে না। ওর মনে জেগেছে বিস্ময়। কোথায় ছিল এই শিশু ? সে কি ছিল তার নিজের দেহের মধ্যে ছড়িয়ে ? কিম্বা মণিমালার ? কোথা থেকে এল ? বাপ-মায়ের মনের কামনা সত্যই কি রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আসতে পারে ? আর এই আশ্চর্য্য রূপবান শিশু, এই কি তার কামনার রূপ !

মণিমালা বললে, তোমার মতো মুখখানি হয়েছে।

সুকুমার নিজে কিছু বুঝতে পারছে না। অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে, আমার মতো ? যাঃ !

মণিমালা হেসে ফেললে। বললে, হাঁ তোমার মতো। জিগ্যেস করো সবাইকে।

—নাক, মুখ, চোখ—সব আমার মতো ?

—তাই কি হয় ? মুখের আদলটা তোমার মতো। নাকটা হয়েছে আমার বাবার মতো। নয় ?

—অনেকটা।

—অনেকটা নয়, বড় হ'লে ঠিক ওই রকম হবে দেখো।

—আর চোখ ? আমার মতো ?

—বরং শ্বশুর মশায়ের মতো। তোমাদের দুজনের চোখই তো অনেকটা এক রকম। আচ্ছা, ভুরুটা নান্তর মতো হয়নি ?

নান্ত মণিমালার ছোট ভাই।

সুকুমার খোকার ভুরুতে আঙুল বুলিয়ে দেখলে। কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, কি জানি।

—কি জানি কি গো ! তুমি কি নান্তকে দেখনি নাকি ?

সুকুমার হেসে বললে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুকুমার খোকার অদূরে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল। খানিকক্ষণ খোকার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শিউরে উঠল।

—কি হ'ল ?

সুকুমার বললে, আচ্ছা, এমন তো হ'তে পারে তোমার বংশের, কিম্বা আমার বংশের যাঁদের আমরা কেউ দেখিনি তাঁদেরও অনেক জিনিস খোকা পেয়েছে। তাঁদের দেখিনি ব'লে ধরতে পারছি না। হ'তে তো পারে।

মণিমালা হেসে বললে, পারেই তো। তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ?

—নেই ? ভাব তো, খোকা একা নয়। ওর মধ্যে দুটো বংশের বহু লোক রয়েছে বেঁচে। সবারই কিছু কিছু চিহ্ন আপন অঙ্গে ও বইছে। এ তো আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। এর পরে হয় তো দেখব, ওর বসবার ভঙ্গি আমার প্রপিতামহের মতো, কথা বলবার ভঙ্গি তোমার প্রপিতামহের মতো। আরও কত কি !

উত্তরে মণিমালা হাসলে।

খোকা প্রবীণ লোকের মতো গম্ভীরভাবে হাই তুললে। ছোট ছোট হাতে বহু কসরৎ ক'রে আড়ামোড়া ভাঙলে।

মণিমালা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, কর্ত্তাপ্রভুর এইবার ঘুম ভাঙল। সেই কোন সন্ধ্যেবেলায় ঘুমিয়েছে একবারও ওঠেনি। ভারী ঠাণ্ডা হয়েছে বাপু—তোমার মতো। কোনো ঝোঁক নেই।

মণিমালা সুকুমারের দিকে পিছন ফিরে ব'সে খোকাকে কোলে নিয়ে স্তন দিতে লাগল।

আর সুকুমার ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল মানুষের জন্ম-রহস্যের কথা। কি ক'রে জড় থেকে এল চেতন, দেহে এল প্রাণ, মস্তিষ্কে এল বুদ্ধি—এল মন, এল আত্মা। আজ যে শিশুর ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছাড়া আর কোনো বোধই নেই, একদিন সে হবে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য। এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথাই নয়। সুকুমার ভাবলে, এই শিশু, কারও কাছ থেকে এনেছে চোখ, কারও কাছ থেকে মুখ, কারও কাছ থেকে প্রবৃত্তি, কারও বা কাছ থেকে

বুদ্ধি। যেন তাজমহল। সহস্র স্থান থেকে সহস্র বস্তু দিয়ে তৈরী তাজমহল হ'ল সহস্রের থেকে স্বতন্ত্র। সুকুমারের আত্মজ সুকুমার নয়, তার নিজস্ব একটা সত্তা আছে।

উঠতে সুকুমারের একটু বেলাই হয়।

মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে যখন সে বৈঠকখানায় এল তখন পূর্ব্বদিকের দাওয়ায় ব'সে কর্ত্তাবাবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানা লম্বা হলদে কাগজ দেখছিলেন। সুকুমার গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে।

কর্ত্তাবাবু সস্মিত দৃষ্টিতে একবার তার দিকে চেয়ে বললেন, ব'স।

সুকুমার একপাশে বসল। কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কার কোষ্ঠি ওটা?

কর্ত্তাবাবু সগৌরবে হেসে বললেন, খোকা ভায়ের। এখনি দিয়ে গেলেন মুখুয্যে মশাই!

মুখুয্যে মশাই রাস্তার ধারের দক্ষিণের বারান্দায় ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কর্ত্তাবাবুর ডাক শুনে এদিকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছিলেন?

কর্ত্তাবাবু কোষ্ঠিপত্র তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ফলাফলটা একবার সুকুকে শোনান দিকি।

তিনি নিজে একবারের উপর দু'বার শুনেছেন। পুত্রের দোহাই দিয়ে আর একবার শুনতে চান। মুখুয্যে মশায়েরও আপত্তি নেই। তিনি ভালো ক'রে ব'সে আবার আদ্যোপান্ত মূল সংস্কৃত শ্লোক, আর তার ব্যাখ্যা ক'রে শোনাতে লাগলেন।

কোষ্ঠির ফল খুব ভালো। অর্থে, স্বাস্থ্যে, বিদ্যায় শিশু পিতৃপুরুষের মুখ উজ্জ্বল করবে। পরমায়ুও দীর্ঘ। শুনতে কর্ত্তাবাবুর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সগর্ব্বে পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। সুকুমার নতমুখে শুনে যেতে লাগল। নিঃশব্দে।

মুখুয্যে মশায়ের বলা শেষ হলে সুকুমার আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, মুখুয্যে মশায়, আপনি নিজে এ সব বিশ্বাস করেন?

বিস্ময়ে মুখুয্যে মশায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

বিরক্ত হয়ে কর্ত্তাবাবু বললেন, বিশ্বাস করবেন না কেন? এ কি মিথ্যে নাকি?

সুকুমার ধীরভাবে বললে, আমার কোষ্ঠিটা আছে এখানে? সেও তো উনিই করেছিলেন। একবার মিলিয়ে দেখতাম।

সুকুমারের কোষ্ঠি কর্ত্তাবাবু সেদিনও মিলিয়ে দেখেছেন, এই মুখুয্যে মশায়কে দিয়েই। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, এই ভাদ্র মাস থেকে তোমার অর্থভাগ্য ভালো হবে তা পর্য্যন্ত স্পষ্ট ক'রে লেখা আছে। আছে কি না?

ব'লে মুখুয্যে মশায়ের দিকে চাইলেন।

মুখুয্যে মশায় ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, আছেই তো। শাস্ত্রের বাক্য কি মিথ্যে হবার যো আছে? তবে আর শাস্ত্রবাক্য বলেছে কেন?

সুকুমার একটুখানি বিদ্রূপের হাসি গোপন ক'রে উঠে গেল। কথা বাড়াতে তার ইচ্ছা করল না। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় কি না সে তর্ক নিষ্ফল। নানা কারণে তার নিজের আস্থা কমে গেছে। ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে কিছুরই উপর তার আর আস্থা নেই। এটা ঠিক যুগধর্ম্মে হয়েছে বলা যায় না। কারণ মানুষের অন্য সব কিছুর উপর থেকে আস্থা চ'লে গেলেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর থেকে যায় নি। এর প্রমাণ এই যে, দেশে জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। অন্য স্থান দূরের কথা, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার আর হেদুয়াতেই তো অন্তত পাঁচগুণ বেড়েছে। আগে তিনটে স্কোয়ারের ফুটপাথে তিন জন উড়িয়া করতল-আঁকা ছক পেতে ব'সে থাকত। সে জায়গায় এখন পাঁচ-ছয় জন ক'রে গণৎকার সার সার বসে থাকে। তাদের কাছে ছক তো থাকেই, বনমানুষের হাড়, কালো বেরালের লেজের লোম, আরও কত কি থাকে। একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা যায় বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, মায় ফিরিঙ্গি খৃষ্টান পর্য্যন্ত হাত দেখাচ্ছে। মানুষের বর্ত্তমান যত অন্ধকার হচ্ছে ততই ভবিষ্যতের আলোর জন্যে ব্যাকুলতা বাড়ছে। সে ব্যাকুলতা হাত দেখান ছাড়া আর কিছুতে মিটতে পারে না। কিন্তু সুকুমারের সব উলটো। ভবিষ্যতের জন্যে আকাশ-কুসুম রচনার পালা সে এর মধ্যে সাঙ্গ করেছে। সে বলে, জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতে

গেলে জ্যোতিষের যে জ্ঞান প্রয়োজন তা খুব কম লোকেরই আছে। বেশীর ভাগ জ্যোতিষী লোক ঠকায়।

মোট কথা গণৎকারের চাটুবাক্যে সে বিচলিত হয় না। সে গ্রামের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বার হ'ল।

স্যাকরার দোকানে প্রাণ-গোপাল আর গৌরাঙ্গ দাবা পেতেছে। প্রাণগোপালের হাতে থেলো হুঁকো। গৌরাঙ্গ একটা কঠিন কিস্তি সামলাতে বিব্রত হয়ে উঠেছে। দুজনেরই এমন অবস্থা যে সামনে দিয়ে হাতী গেলেও টের পাবে না। ব্রজবল্লভ স্বর্ণকার একটু দূরে ব'সে। তার এক হাতে হাতুড়ি, আর এক হাতে একটা রূপার পাত নাইএর উপর। গৌরাঙ্গের দুরবস্থায় উভয় হাতই ক্রিয়া শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এরা তিন জনেই সুকুমারের ছেলেবেলার বন্ধু এবং সহপাঠী। ব্রজবল্লভ পাঠশালার পর আর অগ্রসর হয়নি। প্রাণ-গোপাল আর গৌরাঙ্গ গোস্বামী বংশধর। যথেষ্ট শিষ্যসেবক থাকায় তাদেরও বেশী লেখাপড়া শেখার শ্রম স্বীকারের প্রয়োজন হয় নি। থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত উঠে যেই বিবাহ হয়ে গেল, তারাও তখন পড়া ছেড়ে শিষ্য-সেবকের আর্থিক ও পারমার্থিক কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করলে। এরা সকলেই সুকুমারের সমবয়সী। কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক এমন একটা শ্রীহীনতা এসেছে যাতে সুকুমারের চেয়ে তাদের অনেক বড় মনে হয়।

সুকুমার তাদের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে একটু খেলা দেখতে লাগল। খেলোয়াড়রা একবার আড়চোখে তার দিকে চেয়ে নিয়ে আবার নীরবে বোড়ে চালতে লাগল।

একবার একজন বললে, এস।

আর একজন বললে, কখন এলে ?

সুকুমার উত্তর দিলে, কাল রাত্রে।

আবার নিঃশব্দে খেলা চলতে লাগল। ঘোড়ার কিস্তিতে রাজার প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী বহু পূর্ব্বেই মৃত। একখানা নৌকো ছিল, লাভের আশায় সেও এত দূরে পাড়ি দিয়েছে যে, তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র উপকারের প্রত্যাশা নেই। এ অবস্থায় বন্ধুর কুশল সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করার সময়াভাব। সুকুমার আর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেনেদের বৈঠকখানার দিকে চলল।

সেনেদের বৈঠকখানা তখন মশগুল। ভবতোষ সেন সুকুমারের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। তার পরে আর পড়েনি, পড়বার প্রয়োজনও হয়নি। তাদের অবস্থা খুব ভালো। অল্প কিছুদিন হ'ল পিতৃবিয়োগের পর সাবালক হওয়ায় তার বৈঠকখানায় ছুটির দিন সকালে সন্ধ্যায় আর অন্যদিন সন্ধ্যাবেলায় জোর আড্ডা বসে। এ আড্ডায় বেশীর ভাগ স্কুল-মাষ্টার। বি-এ পাশ ক'রে কিম্বা পাশ না ক'রে সুকুমারের যে সমস্ত সহপাঠী অথবা সমবয়সী বন্ধু বাড়ীতে এসে বসেছে, তারা এখন হয় গ্রামের, নয় আশ-পাশের স্কুলে মাষ্টারী করছে। কেউ কেউ বা শুধুই ব'সে ব'সে জোত-জমা দেখছে, আর আমের সময়ে সেনেদের বৈঠকখানায় তাস-পাশা খেলছে, নয় খোশ-গল্প করছে। এদের সংখ্যা বেশী নয়। বেশীর ভাগ ছেলেই কলকাতায় হয় চাকরী-বাকরী করছে, নয় তার চেষ্টা করছে।

সুকুমারকে দেখে এরা হৈ হৈ ক'রে উঠল।

ভবতোষ তার স্থূল দেহ দুলিয়ে বললে, আরে, সুকু এসেছে। Come along. Have a cup of hot tea, ওরে কেষ্টা !

কেষ্টাকে আর এক পেয়ালা চা আনবার হুকুম হ'ল। সেনেদের এই আসরটা হ'ল সব চেয়ে অভিজাত আসর। এর কর্ত্তা ভবতোষ গ্রামে থাকলেও শহুরে। কথায়-বার্ত্তায় চাল-চলনে সে খাশ শহুরেদেরও ছাড়িয়ে যায়। আর কথায় কথায় ইংরিজি বলে।

বললে, একটা মাষ্টারী পেয়েছ শুনলাম। My hearty congratulations. কবে খাওয়াচ্ছ বল। কোনো একটা গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস পেলে না ? কিম্বা কর্পোরেশনে ? আমার এক মামা একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের আফিসে বড় চাকরী করেন।

সুকুমার হেসে বললে, সে তো অনেক দিন থেকেই শুনছি। একটা চাকরী-বাকরী ক'রে দাও, তবে তো বুঝি।

—এই এদের জিগ্যেস করতে পার, তোমার কথা লিখেছিলাম কিনা। কিন্তু কোনো উপায় নেই। মামা লিখলেন, মুসলমান ছাড়া আর কারও কোনো···

—মুসলমানই হব না কি ?

সুকুমার হেসে সকলের মুখের দিকে চাইলে।

সকলেই হেসে বললে, তাই হয়ে যাও সুকু, কীর্ত্তি থেকে যাবে।

ভবতোষ বললে, The idea !

চা এল। সুকুমার চায়ে মন দিলে।

ভাবতোষ বললে, ভালো কথা। ইউরোপের খবর কি হে ? লড়াই-টড়াই বাধবে ব'লে মনে হয় ?

সুকুমার হেসে বললে, আমি কলকাতা থেকে আসছি। ইউরোপ সেখান থেকে অনেক দূর।

ভবতোষ হো হো ক'রে হেসে বললে, রাইট। স্কুলে ছেলে চরাও, আর মেসে এসে ঘুমোও। এই তো স্কুল-মাষ্টারের দস্তুর।

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললে, আমার মেশোমশাই বলছিলেন···তাঁকে চেন তো ? সম্প্রতি বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ ক'রে ফিরেছেন। একদম ছোকরা। আমাদেরই বয়সী। এরই মধ্যে ক'লকাতায় বেশ পসার করেছেন। তিনি বলছিলেন, লড়াই না বেধে আর যায় না। সমস্ত তৈরী, কেবল ব্যাণ্ড বাজতে দেরী। অমনি রাইট লেফ্ ট্, রাইট লেফ্ ট্···

ভবতোষ ব'সে ব'সেই পা দিয়ে তাল দিতে লাগল।

বললে, কি বল মন্মথ, যাবে তো ?

মন্মথ পাশের গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করে। প্রত্যহ চার মাইল হেঁটে হেঁটে তার শরীরে হাড় ক'খানি ছাড়া আর কিছু নেই। মাথা নেড়ে বললে, আমি না ভাই, আমি এমনিতেই সোজা হয়ে হাঁটতে পারি না।

মন্মথর কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই, বিশেষ ক'রে ভবতোষ হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সুকুমার হেসে বললে, তা সে যাই বল, ইউরোপে একটা লড়াই না বাধলে আমাদের আর কল্যাণ নেই।

—কেন ? কেন ?

সুকুমার বললে, তাহ'লে আবার ধানের দর, পাটের দর চড়তে পারে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হ'তে পারে। তখন তোমার আমার মতো লোকের এক-আধটা ভালো চাকরীও মিলতে পারে। আর ভবতোষের মতো লোক কোনো একটা ব্যবসায় বিশ-পঁচিশ হাজার ফেলে লক্ষপতি হ'তে পারে।

ভবতোষ গম্ভীরভাবে বললে, ঠিক। আমার একটা ইচ্ছেও আছে···

কি ইচ্ছা আছে তা আর ভাঙল না।

সুকুমার বললে, দেখ, এইখানে আমাদের মনে যে চিন্তা উঠেছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলের মনে সেই একই চিন্তা। বর্ত্তমান অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ আর কেউ সইতে পারছে না। সর্ব্বত্র বেকার-সমস্যা। সর্ব্বত্র হাহাকার উঠেছে। আর তারই ওপর যুদ্ধের বাজেটে ক্রমেই একটা ক'রে শূন্য বেড়ে চলেছে। এমন আর কতদিন চলবে ? তার চেয়ে যা হয় একটা হয়ে যাক। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, নয় শান্তি ফিরে আসুক। এই মাঝামাঝি অনিশ্চিত অবস্থায় সব হাঁফিয়ে উঠেছে। লড়াই যদি বাধে ভবতোষ, আমার মনে হয়, শুধু এই জন্যেই বাধবে।

আড্ডাতে লড়ায়ের গল্প ভালো জমে, কেন লড়াই বাধবে তা নিয়ে গবেষণা নয়। সুকুমারের ভণিতা শুনে সকলে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। এ বক্তৃতা যদি আর এক মিনিট চলে আড্ডার রস মাটি।

প্রভাময় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, জার্ম্মানীতে নাকি এমন তোপ তৈরী হয়েছে যে বার্লিন থেকে ছুড়লে প্যারিস উড়ে যাবে, এ কি সত্যি ?

—কি জানি !—সুকুমার বললে।

ভবতোষ বিজ্ঞের মত বললে, জার্ম্মানের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। সত্যি হওয়াই সম্ভব।

—আর সেই চুম্বক, যা একশো মাইল দূর থেকে উড়ো-জাহাজ নীচে নামিয়ে আনে ?

ভবতোষ বললে, তোমাকে তো এক কথা ব'লে দিয়েছি প্রভাময়। ও জাতের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। আমার মেশোমশায় বলেন···

এদের কথায় সুকুমারের তাক লেগে গেল। এরা যে সব খবর রাখে ক'লকাতা শহরে বাস ক'রে সুকুমার তা কোনোদিন কানেও শোনে নি।

ভবতোষ ভালো ক'রে উঠে ব'সে বললে, আমার মেশো-মশায় বলেন, জার্ম্মানীতে এমন ওষুধ তৈরী হয়েছে যার এক ফোঁটা খেলে সাত দিনের মধ্যে আর মানুষের ক্ষিধেও থাকবে না, তেষ্টাও থাকবে না। আর শুনবে কথা ?

এর পরে আর কথা না শোনাই ভালো ছিল। সুকুমার চুপ ক'রে ব'সে রইল, আর বন্ধুবর্গ বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করলে।

মন্মথর দেশপ্রীতি অপরিসীম। বিদেশীর এই প্রকার কৃতিত্ব তার বুকে বাজল। সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আশ্চর্য্য!

কিন্তু প্রভাময়ের দেশপ্রীতি তারও চেয়ে বেশী। সে তাকে একটা ধমক দিয়ে বললে, এর আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের শাস্ত্রে আছে পুরাকালে দেবতারা অমৃত পান করতেন, এও তাই আর কি!

আর একবার সকলের দিকে চেয়ে প্রভাময় সগর্জ্জনে বললে—ওরে বাপু, জার্ম্মান ফার্ম্মান কত দেখলাম, কিন্তু আমাদের দেশে যা ছিল তার চেয়ে বেশী কেউ কিছু করতে পেরেছে কি? আমাদের পুষ্পক রথ ছিল, ওরা এরোপ্লেন ক'রেছে। অমৃত ছিল তাই আবার নতুন ক'রে আবিস্কার ক'রেছে। বেশীটা কি?

ভবতোষ উৎসাহ দিয়ে বললে, ব্রাভো!

—নারদের ঢেঁকি ছিল বাহন। তাই দিয়ে তিনি দিবারাত্র স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ঘুরে বেড়াতেন। আরে বাপু, ঢেঁকী কি আর বাহন হয়? সেও ওই মগ্‌ এরোপ্লেন আর কি। একটু বুঝে দেখলেই তো হয়।

মন্মথও পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে মনে মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। কিন্তু তবু একটা সমস্যা যায়নি। একটা ঢোক গিলে বললে, কিন্তু এই তোপটা?

অর্থাৎ এই তোপটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই যেন মন্মথ নিশ্চিন্ত হয়।

সে ব্যবস্থা ক'রে দিলে প্রভাময়। সে মুখ দিয়ে এক প্রকার অস্ফুট বিকৃত শব্দ ক'রে যেন কলের তোপটাকে তিন হাজার মাইল দূরে ছিট্‌কে ফেলে দিলে।

বললে, ওঃ তোপ! আরে বাবা, মহাভারতে পড়নি? অর্জ্জুন বাণে বাণে জয়দ্রথের মাথাটা নিয়ে গিয়ে ফেললে তার বাপ তপস্যা করছিলেন তাঁর কোলের ওপর। তার মানে কি?

সত্যিই তো, তার মানেটা কি? তার মানে পাওয়া গেলে এই কলের তোপের মানে পেতে এক মিনিটও লাগবে না। সকলেই আনন্দে হর্ষধ্বনি করতে লাগল।

সুকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তাতে আমাদের সুবিধাটা কি হ'ল?

—সুবিধা?—সকলে অবাক হ'য়ে বললে, আমাদের সুবিধা আবার কি? যা ছিল তাই বলছি।

সুকুমারের কথাটা পাগলের প্রলাপের মতো হেসে উড়িয়ে দেবার জন্যে সকলে এক সঙ্গে অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

বললে, সুবিধা আবার কি! তুমি যে এম-এ পাশ করলে তাতে সুবিধাটা কি হ'ল? সবই কি সুবিধার জন্য হয়?

হয় না। অন্তত সুকুমারের এম-এ পাশের বিদ্যা দিয়ে তর্ক জেতার সুবিধাও হয় না। আজ সকালে উঠেই তো কর্ত্তাবাবুর কাছে একবার ঠ'কে এসেছে। আবার এখানেও সেই ঠকা।

সুকুমার একটুখানি ফিকে হেসে বললে, তা ঠিক। অন্তত আমার এম-এ পাশে যে কোনোই সুবিধা হয়নি, এ একেবারে ধ্রুব সত্য।

তারা সুকুমারকে আঘাত দেবার জন্যে ও কথা বলেনি। তর্কের মুখে ব'লে ফেলেছে। সুকুমারের কথায় একটু লজ্জা অনুভব ক'রে বললে, না, না, আমরা সে ভাবে কথাটা বলিনি।

ভবতোষও সান্ত্বনা দিয়ে বললে, সুকু, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, কথাটা সেভাবে নিও না। ওরা সে মনে ক'রে বলেনি।

সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না, না, মনে আমি কিছুই করিনি। কেবল···

ভবতোষ তার হাত ধ'রে বসিয়ে বললে, যেতে দাও। আর এক কাপ চা হোক। ওরে কেষ্টা! (ক্রমশঃ)
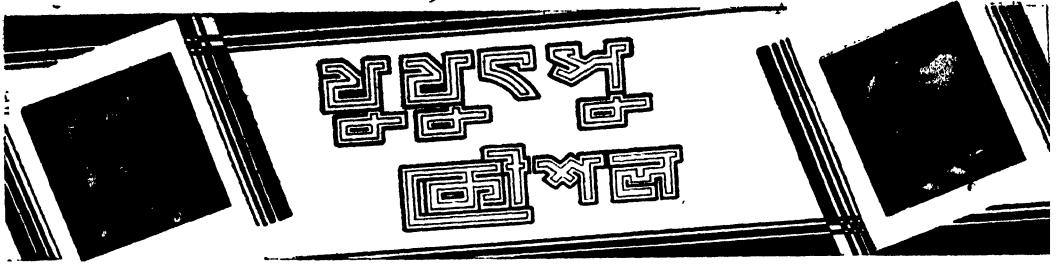
বীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৯১নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে দুই হাত বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া বুকটি জড়াইয়া ধরে এবং যদি তাহার ডান পা-টি আগান থাকে তবে বাঁ হাতটি তাহার চিবুকে লাগাইয়া ডান হাতটি তাহার কোমরের পিছনে ও বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া আট্‌কাইয়া

৯১নং প্যাচের ১ম চিত্র

(৯১নং প্যাচের ১ম চিত্র) কিম্বা ডান পা-টি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, তাহার ডান পা-টি টানিয়া লইয়া সামনে শরীরের ঝোঁক দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোমরটি টানিয়া ও চিবুকটি ঠেলিয়া দিয়া (৯১নং প্যাচের-২য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯১নং প্যাচের ২য় চিত্র

৯২নং প্যাঁচ

যদি অপরের বাঁ পায়তারা থাকে তবে ডান হাত দিয়া

৯২নং প্যাচের চিত্র

তাহার বাঁ হাঁটুটি ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকে অপর হাতটি লাগাইয়া (গলাতে বা মুখেও হাতটি লাগাইতে পারা যায়) জোরে ধাক্কা দিয়া ও পা-টি টানিয়া (৯২নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯৩নং প্যাঁচ

অপরের পিছনে যাইয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার গলাটি জড়াইয়া ও ডান হাত দিয়া তাহার ডান কনুইটি ধরিয়া, বাঁ

৯৩নং প্যাঁচের চিত্র

হাঁটুটি তাহার পাছার নীচে রাখিয়া তাহার শরীরটি কোমর হইতে পিছন দিকে টানিলে (৯৩নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯৪নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান ধার হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটি টিপিয়া ধরে তবে বাঁ হাতটি তাহার হাতের সহিত সমরেখায় রাখিয়া তাহার ডান কব্জীটি ধরিয়া ও ডান হাতটি নীচু হইতে তাহার দুই হাতের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া তাহার চিবুকে ধাক্কা মারিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের উপর রাখিয়া জোরে চাপিয়া ও বাঁ হাতে ধরা তাহার কব্জীটি জোরে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিলে (৯৪নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯৪নং প্যাঁচের চিত্র

৯৫নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ নিজের বাঁ হাতটি তুলিয়া তাহার ডান কব্জীর বাঁ ধারে

৯৫নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

৯৫নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

৯৫নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

নিজের বাঁ কব্জী দিয়া আট্‌কাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার মুঠোটি ধরিয়া লইয়া ডান পা-টি সামনে আগাইয়া দিয়া ডান হাতটি তাহার ধরা হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া তাহার কনুইটি চিৎ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া (৯৫নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) নিজে বাঁ দিকে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা-টি তাহার বাঁ দিকে লইয়া গিয়া তাহার ধরা হাতটি নিজের পেটের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার কনুইয়ে ও কব্জীতে চাড় দিতে দিতে (৯৫নং প্যাঁচের-২য় চিত্র) বাঁ ধারে কাৎ হইয়া জোরে ঘুরিয়া (৯৫নং প্যাঁচের-৩য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯৬নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জীর বাঁ ধারে নিজের বাঁ কব্জী দিয়া

৯৬নং প্যাচের চিত্র

আট্‌কাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি এবং ডান হাতটি নীচু দিয়া লইয়া গিয়া এইরূপে দুই হাত দিয়া তাহার মুঠোটি ধরিয়া বাঁ ধারে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-টি তুলিয়া তাহার ডান হাঁটুর ডান ধারে লাগাইয়া

ও ধরা হাতটি নিজের বাঁ দিকে টানিতে টানিতে তাহার মুঠোটি নিজের বাঁ ধারে ঘুরাইয়া মোচড় দিয়া (৯৬নং প্যাচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়। মুঠোটি মোচড় দিবার সময় তাহার হাতটি যাহাতে সোজা থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৯৭নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জীর ডান ধারে নিজের ডান কব্জী দিয়া আট্‌কাইয়া ডান হাত দিয়া তাহার কব্জীটি ধরিয়া

৯৭নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

লইয়া ও বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিকে আগাইয়া ডান দিকে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে (৯৭নং প্যাচের ১ম চিত্র) তাহার ডান কনুইটি নিজের ঘাড়ের উপর চিৎ করিয়া রাখিয়া ও নিজের বাঁ হাতটি পিছন দিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের একটু নীচে ধরিয়া নিজে সোজা হইয়া তাহার ডান কনুইয়ে চাড় দিতে দিতে (৯৭নং প্যাচের-২য় চিত্র) তাহার ডান গোড়ালীতে নিজের বাঁ পায়ের ডান ধার দিয়া জোরে মারিলে (৯৭নং প্যাচের-৩য় চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।
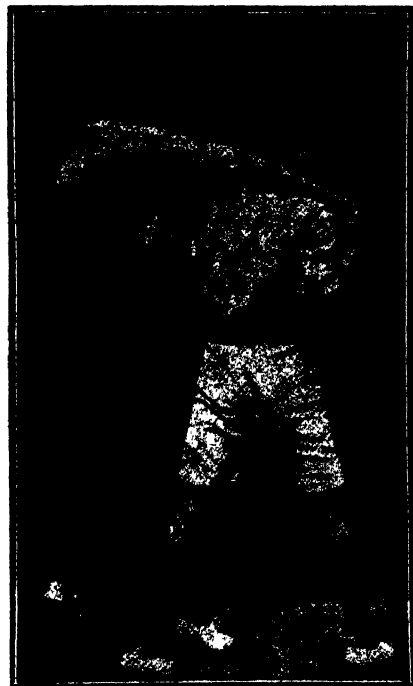
৯৭নং প্যাচের ২য় চিত্র
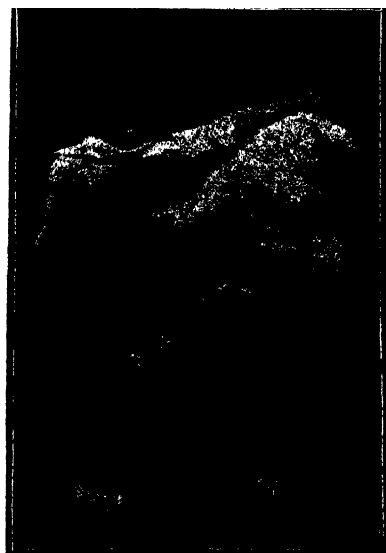
৯৭নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

৯৮নং প্যাঁচ

যদি অপরের বাঁ পায়তারা থাকে, তবে ডান হাতটি তাহার বাঁ গুলির বাহির দিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাঁ

৯৮নং প্যাঁচের (ক) চিত্র

বাহুটি জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে বাঁ দিকে ঘুরিয়া আসিয়া ডান পা-টি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া

৯৮নং প্যাঁচের (খ) চিত্র

উরুতের উপরে নিজের উরুতের পিছনটি লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সামনে শরীরের ঝোঁক দিতে দিতে একটু ডান দিকে ঘুরিয়া নীচু হইয়া (৯৮নং প্যাঁচের 'ক' চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

ডান পা-টি তাহার পায়ের মধ্য দিয়া না লইয়া গিয়া তাহার ডান পায়ের বাহির দিকে লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে শরীরের ও হাতের কাজ করিয়া জোর দিয়া (৯৮নং প্যাঁচের-খ চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

৯৯নং প্যাঁচ

যখন পরস্পরে ডান হাত ঘাড়ে রাখিয়া দাঁড়ায় তখন যদি অপরের ডান পায়তারা থাকে, নিজে বাঁ দিকে ঘুরিয়া

৯৯নং প্যাঁচের চিত্র

আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান কব্জীটি বা কনুইটি বা জামা ধরিয়া ও ডান পা-টি তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাঁ উরুতের উপরে নিজের উরুতের পিছনটি লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সামনে শরীরের ঝোঁক দিতে দিতে একটু বাঁ দিকে ঘুরিয়া তাহার ঘাড়টি টানিয়া নীচু করিয়া (৯৯নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১০০নং প্যাঁচ

অপরের পিছনে যাইয়া কোমরটি দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, হাতের জোরে তাহার শরীরটি একটু কাৎ করিয়া
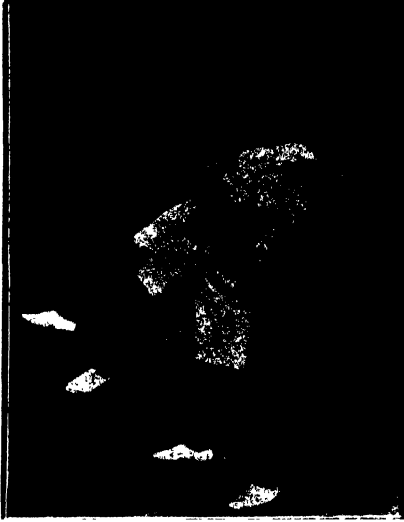
১০০নং প্যাঁচের চিত্র

উর্দ্ধে তুলিয়া (১০০নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নীচে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১০১নং প্যাঁচ

যদি কেহ সাম্‌না হইতে যে কোন প্রকারে অপরের গলাটি নিজের বাঁ বগলের নীচে পায়, নিজের বাঁ বাহুদ্বারা তাহার গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া ও অপর হাতটি সাম্‌না হইতে তাহার বাঁ বগলের নীচে চালাইয়া দিয়া পিঠের উপরে তুলিয়া বাঁ মোড়াতে চাড় দিতে দিতে (১০১নং প্যাঁচের

১০১নং প্যাঁচের চিত্র

চিত্র) ডান পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিকে লইয়া গিয়া জোরে বাঁ দিকে ঘুরাইয়া তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

তিন

তারপর দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেছে। প্রতি মাসেই চার-পাঁচ কিস্তিতে মাহিনা মিলে। থাকিয়া থাকিয়া পাইলে খরচও হয় বেশী, তপেশ ত্রিশ টাকায় যেন বিশ টাকারও কম উপকার পায়।

মুদীর দোকানে ৭৲ বাকী পড়িয়াছে। বাড়ীভাড়া এক মাস বাকী। বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও গোটা বিশেক টাকা দেনা। তবু সে চাকুরী করে!

একটা সুবিধা কিন্তু হইয়াছে এখন। বেকার অবস্থায় কোথাও হাত পাতিলে সহজে মিলিত না কিছু। এখন চাকুরীকে নিদর্শনস্বরূপ সামনে খাড়া করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিন গুজরাণ করিতে তেমন প্রাণান্ত কষ্ট পাইতে হয় না।

আজ মুদীর দোকানে কিছু কম দিয়া বাকী বাড়ীভাড়ার কতকটা শোধ করে। আর একদিন হয়ত বাড়ীভাড়া না দিয়া মুদীকে দেয়। পশুপতির কাছ হইতে টাকা আনিয়া

অম্বিকা চৌধুরীর দেনা শোধ দেয়, আবার ভবানী-খুড়োর কাছে হাওলাত লইয়া চৌধুরীর পাওনা মিটাইয়া দেয়। এমনি করিয়া ওর টাকায় তাহাকে, তার টাকায় একে—এখানে ফাঁক ঢাকিলে ওখানে ফুটো হয়, ওখানের ফুটো বুজাইয়া সেখানে জোড়াতালি দিতে হয়। সুকৌশল যোগ-বিয়োগের খেলা!

যাক্, এতদিনে তপেশের জীবনে এক মহা শুভদিন আসিল। ছাপার হরপে সর্ব্বপ্রথম আত্ম-দর্শন! পরিচিতির প্রথম উষা! দেশবিখ্যাত 'দেশ-মুকুর' মাসিক পত্রিকায় তাহার 'সংসার সমুদ্রে' গল্পটী বাহির হইয়াছে।

তপেশ 'দেশমুকুরে'র সুবিখ্যাত সম্পাদক সুমিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আপিসের বাহিরে আসিল। পকেটে দশটী টাকা। লেখার মূল্য। তপেশ অতখানি আশা করে নাই। গিয়াছিল শুধু আর একটী লেখা দিতে।

দ—শ টাকা! তপেশ আজ কর্পোরেশনে ১০০৲ মাহিনার এক চাকুরী পাইলেও এত সুখী হইত না।

রাস্তায় আসিয়া তপেশ সম্পাদকের কথাগুলি নিজের মুখ দিয়া বার বার উচ্চারণ করিয়া শুনিয়া লইল—বেশ হয়েছে লেখাটী আপনার। চমৎকার আইডিয়া!...না—না তপেশবাবু, আমার কাছে নূতন-পুরাতন নেই। ভাল লেখা পেলেই ছাপি। আর নতুনের মাঝ থেকে খুঁজে-পেতে বে'র করাই তো সম্পাদকের ধর্ম্ম।

স্বীকৃতির আরসিতে সে আজ সর্ব্বপ্রথম মুখ দেখিল! কি সুন্দর! তপেশ যে এত সুন্দর কে জানিত আগে। আজ তপেশের চোখে সারা দুনিয়া আবার রঙ বদলাইয়া নূতন হইয়া দেখা দিল; ঠিক তিন মাস পূর্ব্বে ভ্যানগার্ডে যেদিন প্রথম চাকুরী জুটিল সেদিনের বৈশাখের ম্লানায়মান আতপ্ত সন্ধ্যাটীর মত। তেমনি প্রচণ্ড অপ্রমেয় উল্লাস। কিন্তু সেদিনের আনন্দে ছিল অশ্রান্ত কল-কল্লোল, আজ আছে তাহাতে বিস্তার, আছে গভীরতা। সেদিনের আনন্দ জাতিবর্জ্জনের, গোত্রান্তরের—আজ আনন্দ রূপান্তরের, কৌলিন্যের, আভিজাত্যের।

অসহ উল্লাস! তপেশ যেন আজ সারা বিশ্বে নিজেকে বিলাইয়া বিলীন হইয়া মিশাইয়া মিশিয়া যাইতে পারে। কানে তাহার পশিয়াছে সুদূর দূরের বাঁশী! অন্তহীনের ইসারা! শুনিয়াছে সে হওয়ার ডাক। শুধুই হওয়া নয়—অফুরন্ত হইয়া-ওঠার উদার আহ্বান। তৃণগুল্ম পুষ্পলতা ফলমূল সকলের সঙ্গে তপেশ আজ যেন তাহার সাজাত্য খুঁজিয়া পাইল। আজ তাহার অন্তরে-বাহিরে এক জগৎ-জোড়া মিল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী পুরাতনের পাতা উল্টাইয়া তাহার চোখে এক অনাবিষ্কৃত নূতন অধ্যায় খুলিয়া ধরিয়াছে।

সেদিন তপেশ ছিল চলমান বিশ্বের গতির ঐক্যতানের একটী অখ্যাত অশ্রুত ক্ষীণতম সুর মাত্র। আজ সে পৃথক্ ও সুনির্দ্দিষ্ট একটী সঙ্গীত। এখন সে স্বয়ং স্বতন্ত্র। তাহার তৃতীয় নয়ন এতদিন নিজেকে চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারে নাই। আজ সে-চোখের সংশয়-কুয়াশার ঠুলি পড়িল খসিয়া। কি উল্লাস! কি আবিষ্কার!

রাস্তার মোড়ে চার পাঁচটী হকার জোর-গলায় হাঁকিতেছে "দেশ-মুকুর" বাবু, "দেশ-মুকুর"।

তপেশ দাঁড়াইয়া দেখিল। তিনটী কলেজী যুবক "দেশ-মুকুর" কিনিয়া তাহার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। তপেশ ভাবিল, তাহারা ভাবিতেও পারিতেছে না, যাহার গল্পটা লইয়া আজ হষ্টেলে বা মেসে রাত্রিবেলা হয়ত তুমুল আলোচনা চলিবে এখন তাহাকেই একবার চোখ দিয়া চাহিয়াও দেখিল না।

যাইবার সময় কলেজষ্ট্রীট-হ্যারিসন-রোডের মোড়ে তপেশ দড়িতে ঝুলান ১৫।২০খানি "দেশ-মুকুর" দেখিয়া গিয়াছে। এখন সেখানে তিনখানি অবশিষ্ট মাত্র।

'দেশ-মুকুরের'র বিক্রি-সংখ্যা তপেশ হাজার সাতেক বলিয়া শুনিয়াছে। আচ্ছা, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে যত প্রবাসী বাঙ্গালী আছে সর্ব্বত্র ৩।৪ দিনের মধ্যেই মোট ৭ হাজার পরিবারে একখানি করিয়া "দেশ-মুকুর" পৌঁছিবে। এক এক পরিবারে গড়ে ৪জন পড়ুয়া ধরিলে বেশী ধরা হয় না। আবার এই হিসাবের মধ্যেই তো কলিকাতার মেস, বোর্ডিং, হষ্টেল, রেঁস্তোরাগুলি আছে—একটা মেসে একজনের-কেনা-কাগজে দশজন চালায়, ইহা তপেশের জানা আছে। তারপর লাইব্রেরী ও ক্লাবগুলি বাদ পড়িলে চলিবে কেন। যাহা হউক গড়ে ৫জন করিয়া পাঠক পাঠিকা ধরিলেও পাঁচ-সাতে ৩৫ হাজার লোক এই "দেশ-মুকুর" পড়িবে। এই ৩৫ হাজারের মধ্যে

পাট-নিয়ন্ত্রণ, বীমা-প্রসঙ্গ পড়ুয়ার প্রবীণ পক্ককেশ দলটা বড় জোর ৫ হাজারই হউক। তাহা হইলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তপেশ লাহিড়ী ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত হইবে। আঃ, সবাই যদি তাহার গল্প না পড়ে। আচ্ছা, তপেশ সেজন্য আরো পাঁচ হাজার ছাড়িয়া দিতে রাজী আছে। তাহা হইলে এখন ২৫ হাজার লোক তাহার 'সংসার-সমুদ্রে' পড়িবেই পড়িবে। ইহার কম আর নামা যায় না।

তপেশের কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল এক ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া। মাফ চাহিয়া নমস্কার করিতেই তপেশ তাহার হাতেও একখানি "দেশ-মুকুর" দেখিতে পাইল। তপেশ তাহার পিছু পিছু গেল। কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটী বেঞ্চে বসিয়া পিছনে হেলান দিয়া ভদ্রলোক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তপেশও পাশে বসিয়া উৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল, ভদ্রলোক তাহার লেখাটা পড়েন কিনা—শেষ হইলে কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে; আবশ্যক বোধ করিলে পরিচয় প্রদান করিয়া ভদ্রলোককে অবাক করিয়া দিবে। ও হরি! তিনি যে 'সংসার-সমুদ্রে'র পাতাটা উল্টাইয়া গেলেন, একটু থামিয়া একবার লেখকের নামটাও দেখিলেন না। তপেশ নিরাশ হইল। ভদ্রলোকের পাতা ওল্টান থামিল 'বাঙ্গালা সরকারের পাট নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা' শীর্ষক প্রবন্ধে আসিয়া। বেরসিক! তপেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

বাসায় ফিরিবার আগে তপেশ একবার আপিসে গেল। ইভনিং সিফ্‌টের সহকর্ম্মীদের এই সুসংবাদ জানাইয়া যাইবে।

তাহাকে দেখিয়া মনোরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "তোমার এক গল্প পড়লাম হে। একস্‌চেঞ্জ্‌ কপিটা এতক্ষণ আমাদের টেবিলেই ছিল।"

তপেশের বড় আনন্দ, অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই তাহার সহকর্ম্মীরা 'সংসার-সমুদ্রে' পড়িয়া ফেলিয়াছে। তপেশ প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগল ভাই?"

মনোরঞ্জন সোজা সে কথার জবাব না দিয়া কহিল, "প্রকাশের জন্য অত ইম্‌পেসেন্ট হয়ো না এখন।—এটা training period. লেখা কিছুকাল ফেলে রাখবে, তারপর কয়েক মাস বাদে তুলে নিয়ে ঘষামাজা করবে—তখনই সেটা হবে পড়বার মতো জিনিষ—an elixir".

তপেশ এবার সৌমেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কেমন লাগল সৌমেনবাবু?"

"টেক্‌নিকে আরো হাত পাকাতে হবে। গল্পের আইডিয়াটা মন্দ নয়। তা বেশ হয়েছে লেখা।"

"অর্থাৎ ভাল হ'তো আরো ভাল হলে" তপেশ হাসিয়া উঠিল।

"না-না ভালই হয়েছে—তবে এই—ইয়ে—"

তপেশ তেমনি হাসিয়া কহিল, "মানে, অত ভাল-ও ভাল নয়—এই না?" যামিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক লোম-হর্ষক বি-এ এবং চমকপ্রদ একজন বি-এলও। অদৃষ্টের পরিহাসে 'অস্থানে পততাম অতীব মহতাম্' অবস্থা। গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে, যেন এ-সব কথায় তাহার কান নাই। তাহার ভাবটা এই, ইচ্ছা করিলে সেও অমন একটা—চাই কি উহার চেয়ে ভালই একটা গল্প লিখিয়া ফেলিতে পারিত। শুধু লিখে নাই বলিয়াই হইয়া ওঠে নাই এবং তপেশ যে পূর্ব্বে কোনরূপ নোটিশ না দিয়া আগেভাগে এই বাহাদুরীটা লইয়া বসিল সেটা রীতিমত ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি!

কেবল ধীরেশ কহিল, "আপনার গল্পটা আমার কিন্তু বড় ভাল লেগেছে তপেশবাবু। যাই বলুক ওরা—বেশ হাত আছে আপনার।"

গ্র্যাজুয়েট মনোরঞ্জন গরম হইয়া উঠিল। সেক্সপীয়ার হইতে বার্ণার্ড শ সে নাকি এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। আর, দু'বারের চেষ্টায় থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক-পাশ ধীরেশ আসিয়াছে তাহার সঙ্গে গল্প-সাহিত্যের উপকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে! অনধিকারচর্চ্চারও সীমা আছে!

আর যায় কোথায়! ম্যাথুআর্ণল্ড সাহিত্য সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, কার্লাইল ও ইমার্সনের অভিমত কি ছিল প্রভৃতি প্রমাণের পর প্রমাণের বাক্যবাণ আসিয়া পড়িল ধীরেশের উপর। বাগযুদ্ধ বেশ জমিয়া উঠিল। ওদিকে প্রুফের পর প্রুফও জমিতে লাগিল টেবিলের উপর।

তপেশ এই তর্কের মাঝখানে হঠাৎ সকলের অলক্ষিতে সরিয়া পড়িল। রাস্তায় আসিয়া সে একচোট হাসিল।

তাহার মনে পড়িল, সে যখন ফার্ষ্ট্ ক্লাসে পড়ে, স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় সে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল। পরদিন লাইব্রেরীতে বসিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় লেখাটার প্রশংসা করিতেই পুরু চশমার কাচের মধ্যে হেড পণ্ডিত মশায়ের চোখ ছুটী গোলাকার ধারণ করিল। "কে, তপা? হাঁ, ও আবার লিখবে! কাকে না কাকে ধরে লিখিয়ে এনেছে। কত কষ্টে ণত্ব-ষত্ব এখন কতকটা আয়ত্ত করেছে। সন্ধি-সমাসে এখনো ভুল করে। তদ্ধিত-প্রকরণে ওকে প্রাণান্তেও ঢোকাতে পারলুম না আজ পর্য্যন্ত—আর ও লিখবে প্রবন্ধ, তা হ'লেই হয়েছে!" বলিয়া পণ্ডিত মশাই চেয়ারের হাতলের ফাঁকে তাঁহার আটকে-পড়া কাছাটা ছাড়াইয়া নিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

পথেই আশুতোষদের মেস। তপেশ সেখানে গেল। মেসের অধিকাংশই পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। ছুনিয়ার নানা মতবাদ ও মতভেদের এক একটী করিয়া দম-দেওয়া প্রতিনিধি, প্রশ্নের পিন্ বসাইয়া দিলেই রেকর্ডের পর রেকর্ডগুলি গাহিয়া উঠিবে আপন সুরে। তাহাদের অধিকাংশই এক একটা সব-জান্তা ব্যক্তিত্ব। তাহারা যে সব-কিছুই জানে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সাহিত্য, ললিতকলা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজ-তত্ব, মনস্তত্ব, যৌনতত্ব, নৃতত্ব, সুপ্রজননবিদ্যা—কত আর বলা যায়! মলাটের সংক্ষিপ্তসার, ক্যাটালগের সমালোচনা, ইয়ার-বুক, রেজিষ্টার, গেজেটার, ষ্ট্যাটিস্টিকস্, নানা বিষয়ের কম্পেণ্ডিয়াম্, কত রকমের "royal roads to knowledge!" চৌবাচ্চার পারে, খাওয়ার ঘরে, কমন রুমে এরা তর্কে মাতিয়া পড়াটা মাথায় তোলে, ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইলেও মন ভাঙ্গাভাঙ্গি হয় না কাহারও। কাহারো মুখে তুবড়ী ছোটে, কোথাও ভাঙ্গে যেন সোডার বোতল, কেহ কেহ আবার চুপচাপ বসিয়া থাকিতেই ভালবাসে বই কোলে লইয়া। চব্বিশ ঘণ্টা তাহাদের আলাপ-আলোচনা বিচার-বিতর্কে কতগুলি বাঁধা ইংরেজী বুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষুরধার বুদ্ধি তাহাদের কথায় ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে সারা শরীর দিয়া চিক্‌চিক্ করিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। কোথাও বা পালিশ, আঙ্গুল দিলেই টের পাওয়া যায়, কোথাও মিশাইয়া গেছে বলিয়া ভালই লাগে, কোথাও বা বিস্মিত হইতে হয়—ওটা গায়েরই খাঁটি রঙ, বাহিরের নহে।

তপেশ যখন আশুদের ঘরে ঢুকিল সেখানে তখন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালার মনন-রাজ্যের গুটিকয়েক মুখপাত্র বই লইয়া বসিয়া আছে।

আশুতোষের টেবিলের উপর "দেশ-মুকুর" খানি রাখিয়া তপেশ কহিল, "পড়ে দেখিস্ আশু, আমার একটা গল্প বেরিয়েছে এতে।"

"আচ্ছা, রেখে যাও, পড়ে দেখব'খন।"

"কালই এটা ফিরিয়ে দিতে হবে। আমার আর কপি নেই।"

"তা কেমন করে বলি। সময় করে উঠে পড়তে হবে ত।"

আশুতোষ এবার ইকনমিক্সে এম-এ দিবে। টঙ্কা-ষ্টার্লিঙের চুলচেরা সূক্ষ্মতা লইয়া মাথা ঘামায়, রাষ্ট্র-ভাঙ্গা-গড়ার বিভিন্ন দর্শন কপচাইয়া দিন কাটায়, এ-সব নিছক ভাবানুবেগের হালকা জিনিষ লইয়া সময় নষ্ট করিবার পাগলামি তাহার নাই। তবে বন্ধু তপেশের লেখা বলিয়াই সময় মত পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

ওপাশের তক্তপোষে চশমা চোখে একটী ছেলে সমাজ-তত্বের একখানি শক্ত বই পড়িতেছিল, কহিল, "গল্পটা in a nutshell বলে ফেলুন না। লেবার ও টাইম্ ছুই-ই বাঁচবে।"

জানালার কাছে চেয়ারে উপবিষ্ট যুবকটী কহিল "গল্পের প্রথম কয়েকটা লাইন ও শেষের দিকের একটা প্যারা পড়লেই লেখকের বক্তব্য বেশ বুঝা যায়। তাই করুন না।"

তপেশ খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। যে যাহার আপন আপন বইএর পাতায় মনোযোগ দিল। তপেশ এদিক সেদিক চাহিয়া আলগোচে টেবিল হইতে 'দেশ-মুকুর'খানি লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মঞ্জুলী ঘরে ছিল না। ওদের রান্নাঘরের ছুয়ারে নরেন-বাবুর এক বছরের ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল।

ঘরে ঢুকিয়া তপেশের হাতে একটা কাগজের পুঁটুলি দেখিয়া মঞ্জুলী প্রশ্ন করিল, "তোমার হাতে ওটা কি?"

"সে দেখবে'খন পরে। আগে সুসংবাদ শোনাই। কাল 'দেশ-মুকুরে' আমার 'সংসার-সমুদ্রে' লেখাটা বেরিয়েছে। গল্পটার জন্য দশটা টাকাও পেয়েছি মঞ্জু। এই 'দেশ-মুকুর' আপিস হয়ে আস্‌ছি।"

"দেখি, দেখি," বলিয়া মঞ্জুলী তপেশের হাত হইতে পত্রিকাখানি কাড়িয়া নিল। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া পত্রিকার মাঝামাঝি আসিয়া তাহার ডাগর চোখদুটী আনন্দে বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। বড় বড় হরপে—সংসার সমুদ্রে—আর তারই নীচে কথঞ্চিৎ ছোট ছোট অক্ষরে লেখা—শ্রীতপেশ লাহিড়ী। অপলক দৃষ্টি মেলিয়া মঞ্জুলী খানিকক্ষণ অক্ষরগুলির উপর স্থির হইয়া রহিল। তাহার নূতন-ফোটা চাঁপার মত মুখে এক নিমেষে ফুটিয়া উঠিল তপেশের অরুণোদয়ের মঙ্গলাচরণ!—তাহার সারা অঙ্গে উছলিয়া উঠিয়াছে বিপুল সম্বর্দ্ধনা!

মঞ্জুলী কহিল, "দ-শ টাকা একটা গল্পে?"

"হঁ্যা—মাঝে মাঝে আরো লেখার অনুরোধ জানিয়েছেন সম্পাদক।"

"এবার পোড়ারমুখী লবঙ্গ এসে চোখের মাথা খেয়ে দেখুক" তপেশ হাসিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া কহিল, "এটার কথা ভুলে গেছ বুঝি।"

"ওটায় কি এনেছ?"

তপেশ স্ত্রীর হাতে চার টাকা আর কয়েক আনার পয়সা দিয়া পুঁটুলিটা তাহার হাতে দিল।

কাগজের মোড়ক খুলিয়া মঞ্জুলী দেখিল একখানি ছাই রঙের সিল্কের শাড়ী।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে কপাট দিয়া মেঝেতে অর্দ্ধশায়িত মঞ্জুলী স্বামীর 'সংসার সমুদ্রে' পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। চৌকির উপর শুইয়া থাকিয়া তপেশ আধ-শোওয়া অবস্থার মঞ্জুলীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। মঞ্জুলীর বিস্রস্ত এলোচুলের কতকটা কাঁধে, কতকটা পিঠে, খানিক আসিয়া পত্রিকাখানির প্রান্ত ছুঁইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দুহাতে দুগাছি শাঁখার চুড়ি—এক হাতে মাথাটী ন্যস্ত, অপর হাতের তর্জ্জনী ও অনামিকা ডানদিকের পৃষ্ঠার মাথায় পেজ্‌-মার্কটা ঢাকিয়া আছে। শঙ্খের মতো নিটোল গলাটী একেবারে খালি। কানে দুজোড়া সস্তা দুল, সিঁথিমূলে এয়োতির গর্ব্বচিহ্ন, কপালের জল্‌জলে ছোট্ট ফোঁটাটী তৃতীয় নয়নের মত অক্ষর পঙ্‌ক্তির মধ্যে নিবদ্ধ। পথ-ভ্রষ্ট দু'চারিটী সিন্দুর-মাখা চূর্ণ অলক বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজিয়া নামিতে নামিতে থামিয়া আছে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় বনানী ও প্রোজ্জ্বল সমতল ক্ষেত্রের সীমান্ত-প্রদেশের একটু নীচে। তপেশ চাহিয়া আছে—মঞ্জুলী তাহার 'সংসার সমুদ্রে' নিঃশব্দে ডুবিয়া গেছে।

তপেশ অনিমেষ দৃষ্টি দিয়া আ-প্রাণ পান করিতেছে এ নিরাভরণ স্বতঃপূর্ণ সৌন্দর্য্যখানি। তাহার রমানাথ কবিরাজ লেনের আট হাত প্রস্থের ও দশ হাত দৈর্ঘ্যের একতলা স্যাঁৎসেঁতে মহা-সাম্রাজ্যের মহিমান্বিতা রাজেন্দ্রাণী!

মঞ্জুলী পড়িতেছে। এবার আর একটা পৃষ্ঠা উল্টাইল। তপেশ ভাবিল, এবার মঞ্জুলী তাহার নায়ক নায়িকার প্রণয়-প্রলাপের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ তো মঞ্জুর ঠোঁটের কোনে লুকানো হাসি, চোখের আগে বিলোল আভা।…মঞ্জুলী নিশ্চয়ই রাগিতেছে। এ যে তাহারই অতি চেনা পুরানো ছবি নূতন করিয়া কথায় বোনা, তাহাদেরই কতদিনের বিস্মৃত প্রায় হারানো সুরগুলি দিয়া গাঁথা গল্পের নায়ক-নায়িকার কথার মালা। মাগো! কি ঘেন্নার কথা—মঞ্জুলী হয়ত ভাবিতেছে নিজের জিনিষ পরের বলিয়া এমন করিয়াও কেহ চালায়! লজ্জায় বুঝি সে মরিয়া যাইতেছে। তাহাদের একান্ত স্বকীয়া আজ পরকীয়া সাজিয়া মসীর বাসরে শত শত ব্যগ্র দৃষ্টির রূঢ় আলোকে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। ছি! ছি! স্বামী এ কি করিয়াছে!

মঞ্জুলী পাতা উল্টাইল। তপেশ ভাবিল, এবার সে গল্পের শেষের দিকে আসিয়াছে। নায়িকার মৃত্যু-শিয়রে নায়ক। মঞ্জুলী হয়ত রাগিতেছে, এমন করিয়া তাহাদের সুখের নীড় অকস্মাৎ চুরমার করিবার তাহার কি অধিকার ছিল! গল্প শেষ হউক্। সে মঞ্জুলীকে বুঝাইবে, এমন করিয়াই হয়, এমনি ঘটে। গল্প উপন্যাসের জীবন তো সংসার ছাড়াইয়া নয়, সে-ও ধূলি-কাদার মাটির উপর ভর করিয়া অদৃশ্য মহাশক্তির সঙ্গে মানুষের শক্তি পরীক্ষার মসীচিত্র। কেহ হারে, কেহ জিতে, কোথাও কেবলি পরাজয়, কোথাও জয়ে পরাজয়ে হাত ধরাধরি। শেষে জয়ের পর জয়েরও হয় ক্ষয়—শেষ পরিণতি এক শূন্যতায়

বিরতি-পাথারে, অথবা অথই অজ্ঞেয় সমাবর্ত্তনের মৃত্যুহীন পথে, কিংবা এমন একটা কিছু, জ্ঞানের সসীম রাজ্যে হয় তো আজও যাহার আভাসের ছায়াটুকুও ধরা পড়ে নাই।

"শেষ হ'ল?" তপেশের প্রশ্নে মঞ্জুলী মুখ তুলিয়া চাহিল। ওকি! তাহার ডাগর চোখের কোনে উদ্গত দু-ফোঁটা টল্‌টলে জল আলোর ছোঁয়ায় ঝল্‌মল করিয়া উঠিয়াছে!

তপেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, হ্যা, এই তো সে চায়! না পড়ুক আশু, ভাল না লাগুক যামিনী-সৌমেন-মনোরঞ্জন দলের, ধীরেশের 'বেশ হয়েছে' কে-ই বা শুনিতে চায়, সম্পাদকের প্রশংসার মূল্য চাই কতটুকু—এই তো তপেশের আত্মজের স্বীকৃতি। মঞ্জুলীই তো বুঝিবে। এতো তপেশের একার নয়। মঞ্জুলীর বিচিত্র মাধুরীর বিভিন্ন রঙে, তপেশের বুকের পটক্ষেপে কল্পনার অনাহত তুলি-পাতে, দিনের পর দিন জন্ম নিয়াছে যে অগণিত কোরক-পরাগ মসীর আঁতুড়ে একে একে ভূমিষ্ঠ হইয়া আজ তাহারা মঞ্জুলীর বুকে ফিরিয়া গেছে। এ যে তপেশ ও মঞ্জুলীর মিলিত সৃষ্টি! উভয়ের যুগ্ম উপঢৌকন!

মঞ্জুলী আঁচলে চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর কাঁধে মাথাটী এলাইয়া দিয়া কহিল, "তুমি বড় নিষ্ঠুর গো।"

তপেশ হাসিয়া কহিল, "এই তো ঠিক করেছি। স্বামীর আগেই যে মেয়েরা যেতে চায়।"

"আমি চাই না।" বলিয়া মঞ্জুলী নিবিড় বেষ্টনে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইল।

"সে কি গো! এ যে রীতিমতো পাপোচ্চারণ"—তপেশ সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশ করিল।

মঞ্জুলী স্বামীর কাঁধে একবার মাথাটী তুলিয়া আবার আলগোছে নামাইয়া দিয়া কহিল, "না, আমি তোমার পরেই মরব—ঠিক পরদিন। আমি ছাড়া তোমার শেষ সময় দেখবার যে কেউ থাকবে না।"

"কেন, হাসপাতাল আছে," বলিয়া তপেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জুলী সে কথায় কান না দিয়া তপেশের বুকের কয়েকটী পাজরের উপর তাহার কোমল আঙুলগুলি চালাইয়া কহিল, "কি রোগাই হয়ে গেছ! ওগো, এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও। রাত জেগে জেগে তুমি যে কি হয়ে গেছ তা তো নিজে তুমি দেখ্‌তে পাও না!"

"অন্য কোথাও জুট্‌লে তো ছেড়ে দিতে রাজীই আছি—আর শরীর খারাপ তুমি দেখছ কোত্থেকে?—এই ত্যাখ তো হাতখান', এখনো ডজন দুই ম্যালেরিয়া রোগীর সঙ্গে বেশ যুঝ্‌তে পারি। বরং রোগা হয়ে গেছ তুমিই মঞ্জু!" তপেশ মঞ্জুলীর বিলীয়মানাভ কপোল দুটার আসন্ন ভাঙ্গনের সুস্পষ্ট আভাসের উপর তাহার ডান হাতখানি একবার ধীরে ধীরে বুলাইয়া নিল।

আজ এক আনন্দ দিনের মধু মিলনে দুইটী প্রস্ফুটিত কুসুম-কোরক পরস্পর ভীতি-বিহ্বল চিত্তে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিল, তাহাদের কোমল পেলব দলগুলির উপর এতদিনে রুদ্র তাহার বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলিতে সুরু করিয়াছে।

ক্রমশঃ
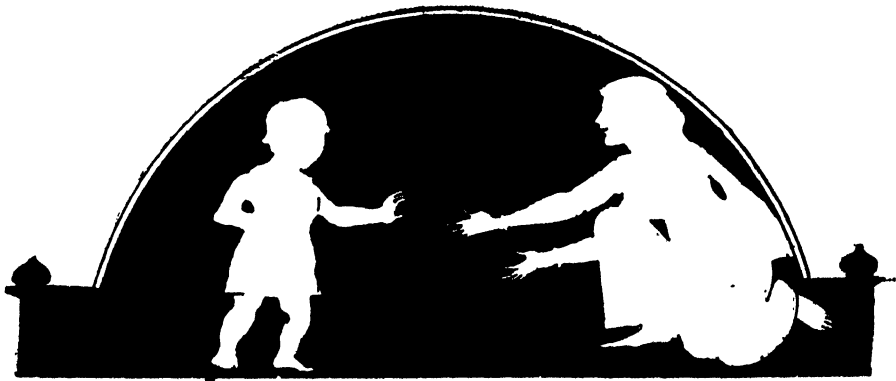
কবির গান

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

"রস-কীর্ত্তনের" স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। 'মনোহরসাহী' ও 'গরাণহাটী' সুর জনসাধারণের পক্ষে আয়ত্ত করা শক্ত বলিয়া 'রাণীহাটী' 'ঝাড়খণ্ডী' এবং 'মন্দারিণী' সুরের সৃষ্টি হইয়াছিল, জনগণের কানে তাহাও যেন পুরানো হইয়া গেল। নামকীর্ত্তনের উদাত্ত ধ্বনিতে পল্লীর আকাশ-বাতাস আজি আর তেমন মুখরিত থাকে না। এদিকে চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ণ, মনসামঙ্গল, রামায়ণের সুরও বোধ হয় মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণের চিত্ত নূতনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। এমন কি তাহাদের নিজস্ব সঙ্গীত ঝুমুর গানেও এখন যেন তাহারা তেমন তৃপ্তি পায় না। তাই একটা 'নূতন কিছুর' জন্য তাহাদের প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। হয়তো তাহারই ফলে 'কবির গানের' উদ্ভব। এ গানের অধিকাংশ কবিই সমাজের নিম্নস্তরে—অতি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই কবিওয়ালাগণ সাধারণের অতি আপনার জন।

এই গান কেন 'কবি গান' বা 'কবির গান' নামে পরিচিত হইল, বলিতে পারি না। অনুমিত হয় আসরে দাঁড়াইয়াই মুখে মুখে কিছু কিছু কবিতা রচনা পূর্ব্বক দুই একটা প্রশ্ন এবং উত্তর করিতে হইত, তাই গায়কের নাম 'কবিওয়ালা' এবং এই গানের নাম 'কবি গান' বা 'কবির গান' হইয়াছে। অনেকের মতে "আসরে গান রচনা করিয়া উত্তর দানের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন কবিওয়ালা রাম বসু। তৎপূর্ব্বে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লিখিয়া রাখা হইত।" তাহা হইলেও প্রথম হইতেই কবির গানে দুই একটা প্রশ্ন, উত্তর এবং আনুসঙ্গিক অনেক বিষয় যে আসরে দাঁড়াইয়া উপস্থিত রচিত কবিতাতেই বিবৃত করিতে হইত, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বোধ হয় ইহাই 'কবির গান' নামকরণের কারণ।

পশ্চিম বঙ্গের ঝুমুর গান কতদিনের পুরাতন কেহ বলিতে পারে না। আমাদের মনে হয় ঝুমুরের বয়স এখন হইতে কম বেশী প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি হইবে। ঝুমুর গানের প্রধান লক্ষণ হইতেছে, দুই দলে সম্পর্ক পাতাইয়া পরস্পরে পর্য্যায়ক্রমে গানে উত্তর প্রতি-উত্তর করে। তাহার নাম পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অর্থাৎ 'উতোর' ও 'চাপান'। গায়ক হিন্দু, শ্রোতাও হিন্দু, অথচ দুইদল কবিওয়ালাই হিন্দুর দেবদেবীকে যথেচ্ছ গালাগালি দেয়। কতকটা ব্যাজস্তুতির মত মনে হইলেও তাহার মধ্যে নিছক গালাগালিও বড় কম থাকে না। শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব বিভিন্ন সম্প্রদায় নহে, কোনরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্কও নাই, একই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, কুন্তী ও মাদ্রী প্রভৃতি সম্পর্ক পাতাইয়া দুইদলে বাছিয়া বাছিয়া পরস্পরের তথা—দেবতার নিন্দার ও গ্লানির কথাই প্রচার করে। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইহাই অনুমিত হয়, যে প্রাচীনকালে রাঢ়দেশে লুইপাদ, নাড়পণ্ডিত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের চেলার দল কেবলই অধ্যাত্ম-সঙ্গীত গাহিয়া ফিরিতেন না। সঙ্ঘে লোক-সংগ্রহ ও সম্প্রদায়-পুষ্টির জন্য তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ নিন্দাও করিয়া বেড়াইতেন। তাহারই পাল্টা জবাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্যের জন্য হিন্দুগণ ঝুমুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম হয়তো দুইদলে মুখোমুখী উত্তর প্রতি-উত্তর চলিত। অনেক সময় তাহাতে হাতাহাতির আশঙ্কা থাকায় ক্রমে একটা কল্পিত প্রতি-পক্ষের আবশ্যক হয়। একপক্ষ বৌদ্ধ, অপরপক্ষ হিন্দু। উভয় পক্ষই নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও শিক্ষামত স্ব স্ব বক্তব্য বলিয়া যাইত, জনসাধারণ জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করিত। ইহার আরো একটী কারণ অনুমান করা চলে। পুরাণে দেবদেবীর নিন্দা প্রশংসা দুই-ই আছে। সুতরাং তাহারই অনুসরণে মানুষ যে স্বভাবতই দুই দলে বিভক্ত হইয়া আপন আপন রুচি অনুসারে দেবতার অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা করিবে, ইহাও অসম্ভব নহে। যে জন্যই হউক ঝুমুর গানে পক্ষ প্রতিপক্ষের প্রথা প্রাচীনকাল

হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কবির গানে ঝুমুরের এই ধারাই অনুসৃত হইয়াছিল। কবির গান ঝুমুরেরই গোষ্ঠীভুক্ত। "বৌদ্ধগান ও দোঁহার" কয়েকটী গানে সেই সময়কার সঙ্গীতের ধারার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ঝুমুর গান আদিরস প্রধান। ঝুমুরের পরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দ্বিতীয়-স্তরে আমরা 'মঙ্গল-কাব্যের' সাক্ষাৎ পাই। ধর্ম্মের গান, চণ্ডীর গান, মনসার গান, শিবের গান প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট স্বীয় ধর্ম্মের মহিমা প্রচার, আপন সম্প্রদায়কে স্বধর্ম্মে দৃঢ়-নিষ্ঠ থাকিতে উপদেশ প্রদান, সর্ব্বোপরি দেবতাগণের লোক-কল্যাণ লীলার মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠাই মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই লোকরঞ্জনার্থ প্রণীত হইলেও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে আদিরসের বাহুল্য নাই। ইহার আরো একটী কারণ ছিল। মুসলমান আসিয়া দেশ অধিকার করিল। হিন্দুর রাজা গেল, রাজ্য গেল, সুতরাং দেশের যাহারা যোদ্ধ্-সম্প্রদায়—বাগ্দী, ডোম, হাড়ি, লোহার, থয়রা, তিওর প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। রাজানুগ্রহের প্রলোভন, রাজধর্ম্ম গ্রহণের প্রলোভন সমাজের ভিত্তিমূলে আসিয়া আঘাত করিল। তখন ধর্ম্মের যোগ-সূত্র ভিন্ন তাহাদিগকে একতাসূত্রে বাঁধিবার আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল—তাহারা দেবানুগৃহীত জাতি, তাহাদের জাতীয়-বৃত্তির মধ্যে কোন হীনতা নাই। সুতরাং সৈনিকের কাজ না থাকিলেও নিজ নিজ কুলোচিত বৃত্তি অবলম্বনেই তাহারা স্বচ্ছন্দে এবং মর্য্যাদার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বুঝাইতে হইল ধোপার মেয়ে নেতা মনসাদেবীর পরামর্শ-দাত্রী। কালুবীর ডোম হইয়াও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। 'হিংসক রাড়' ব্যাধ কালকেতু চণ্ডীর অনুগৃহীত মানসপুত্র। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল—স্বয়ং মহাদেব সাধারণ কৃষকের মত কৃষিকাজ করিয়াছিলেন। জগতের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা আপনি বাগ্দিনীর বেশে মাছ ধরিয়াছিলেন। জন্মান্তর, কর্ম্মফল এবং দেবতা-বিশ্বাসী একটা জাতির পক্ষে এসব কম ভরসার কথা নহে। ইহাই মঙ্গলকাব্যের মাহাত্ম্য। মঙ্গলকাব্যের পর বৈষ্ণব পদাবলী এবং বিবিধ অনুবাদ গ্রন্থের পর্য্যায় পার হইয়া আমরা কবি এবং যাত্রার আসরে আসিয়া উপস্থিত হই। কবি এবং যাত্রার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উভয়েই প্রায় সম-বয়সী।

যে সময় কবির গানের উদ্ভব হয়, পশ্চিমবঙ্গের সে এক দুর্য্যোগের দিন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে—১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চেতুয়া বরদার জমিদার শোভা সিংহ উড়িষ্যার আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহযোগিতায় বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া বসিল। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ এবং রহিম খাঁ প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে একাধিপত্য লাভ করে। দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদের বার্ষিক আয় যাট লক্ষ টাকায় এবং সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের অত্যাচারে উৎপীড়নে দেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই শ্মশানে নবাবী করিতে আসিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁহার অভাবনীয় উপদ্রবের কথা ইতিহাস বিখ্যাত। একে নবাবী উৎপাত, তাহার উপর নবাব-সৈন্যের সঙ্গে লাল উদয়নারায়ণের যুদ্ধ; পশ্চিম বঙ্গের নরনারী এক দিনের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। অবশেষে দুর্ভাগ্যের ষোলকলা সম্পূর্ণ করিয়া চূড়ার উপর ময়ূরপাখা—বর্ব্বর বর্গীর দল আসিয়া দেখা দিল। উড়িষ্যার গিরি নদী পার হইয়া পঙ্গপালের মত দলে দলে আসিয়া তাহারা পশ্চিমবঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। পাষণ্ড মীর-হবিবের নেতৃত্বে এদেশের কতকগুলি নরপিশাচ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। গৃহের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, গ্রাম ভস্মীভূত, রমণী ধর্ষিত, বালক বৃদ্ধ যুবক তরবারী-মুখে আহত নিহত—দেশ ব্যাপিয়া নরকের বিভীষিকা! বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কোন প্রতীকার হইল না। অবশেষে প্রচুর অর্থদণ্ড দিয়া—দিল্লীশ্বর-দত্ত সরদেশমুখীর অনুকরণে বাৎসরিক বার লক্ষ মুদ্রা চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া ক্লান্তদেহ, ভগ্ন-হৃদয় নবাব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। বর্গীরা দেশে ফিরিল। ১৬৯৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৫১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল-ব্যাপী এই অশান্তির মধ্যে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে কবির গানের উদ্ভব হইয়াছিল।

কালাপাহাড় এবং দায়ুদের আমল হইতেই পশ্চিমবঙ্গে মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। সবলের হাতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। অথচ দিনেকের তরেও কালাপাহাড়ের উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটে নাই। যাহার

খুসী সেই আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে অত্যাচার করিয়াছে, লুণ্ঠতরাজ চালাইযাছে। অত্যাচারকারী ক্লান্ত হইয়া না পড়িলে অত্যাচারিতেরা অব্যাহতি পায় নাই। এইবার যেন পশ্চিমবঙ্গ দুই-চারি দিনের জন্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অন্ধকার ভূগর্ভ হইতে, কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল হইতে, গণগতিহীন গহনের শৈবাল-সমাচ্ছন্ন জলাশয় হইতে মুখ বাড়াইয়া মানুষ আপনার দিকে চাহিল, আপনার পৈত্রিক ভদ্রাসনের দুরবস্থা দেখিল। অন্ন নাই, অর্থ নাই, সহায় নাই, সামর্থ্য নাই, ভরসা দিবারও কেহ নাই। সকলেরই সমান অবস্থা। লোকে একে একে আসিয়া শ্মশানে বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিল এবং জীবিকার সনাতন অবলম্বন কৃষিকার্য্যের উপায় খুঁজিতে লাগিল। গৃহদাহে গৃহপালিত পশু ও শস্যের বীজাদিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতএব একেবারেই নিরুপায় অবস্থা দাঁড়াইল। পল্লীর নষ্ট শ্রী পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপকভাবে কোন চেষ্টা হইল না। রাজকোষ কপর্দ্দক শূন্য, রাজদরবার কোনরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। সুতরাং জলাশয়-খনন, পথ-প্রস্তুত, উদ্যান-রচনা অথবা প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইল না। নূতন শিল্পের সৃষ্টি, পুরাতন শিল্পের পুনরুন্নয়ন অথবা কোনরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপায় নির্দ্ধারণেও কেহ পথ দেখাইল না। এক কথায় গঠনমূলক কার্য্যের কোন আয়োজনই কেহ করিল না। অত্যাচার-পীড়িত, বিভীষিকা-সম্মূঢ় জাতিকে অধঃপতনের অতল পঙ্ক হইতে উদ্ধারের জন্য সেদিন কোন যুগাবতারের আবির্ভাব ঘটিল না। যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা মীরহবিব ও রহিম খাঁরই পারলৌকিক সংস্করণ। ফলে যাহা ঘটিবার ঘটিল। শিক্ষাহীন, দুর্ব্বল, অদৃষ্টনির্ভর পরাধীন জাতি অসার আমোদে, অলস-বিলাসে গা ঢালিয়া দিল। অসাড় প্রাণ, রুগ্ন মন, বিকৃত শিক্ষা ও কদর্য্য রুচি লইয়া জনসাধারণ সেদিন যে রস-রূপের আবাহন করিয়াছিল, কবির গান তাহারই বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি। যাত্রাগান উদ্ভবেরও ঐ একই ইতিহাস।

কিন্তু হাস্য এবং সঙ্গীত শুধু বসন্ত-বাসরেই বন্দী হইয়া থাকে না। বর্ষাও তাহাতে বঞ্চিতা নহে। প্রচণ্ড ধারা-বর্ষণে নদী প্রান্তর যেদিন একাকার হইয়া যায়, সাগরের জল আসিয়া কন্দরে প্রবেশ করে, আকাশস্পর্শী বনস্পতিও যে দুর্দ্দিনে ভাঙ্গিয়া পড়ে, মালতী যূথী সেদিনও হাসিমুখে দেখা দিয়া যায়! বিপুল প্লাবন যেদিন আশ্রয়নীড়ও ভাসাইয়া দেয়, ভেক আসিয়া ভুজঙ্গের অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ে, মৃগ আসিয়া ব্যাঘ্রের গণ্ড লেহন করে, পর্ব্বতে প্রতিহত বজ্র যেদিন দিকে দিকে বহ্নিজ্বালা ছড়ায়, শৈলে শৈলে তাণ্ডবিনী উন্মত্তা নির্ঝরিণী ছিন্নমস্তার বিভীষিকা জাগায়, সেদিনও চাতক করুণ কণ্ঠে কাহার বন্দনা গায়, প্রমত্ত কলাপী কেকাঃধ্বনিতে কাহাকে স্বাগত জানায়! যদিও বর্ষার এই লোভনীয় দুর্য্যোগের সঙ্গে বাঙ্গালীর সে দুর্দ্দিনের তুলনা করা চলে না, তথাপি সেদিনের যাহারা কবি, তাহারা দুঃখের দিনের—দুর্দ্দিনেরই কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, যে সে দুঃখের ছায়াও কাহারো কবিতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই দুঃখের গরল আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার সাধ অথবা সাধনাও কেহ করে নাই। দুঃখ ছিল, কিন্তু দুঃখ-হরণের মন্ত্র কাহারো কণ্ঠে স্ফুরিত হয় নাই। যে দুঃখ মানুষকে আত্মচিন্তা ভুলাইয়া দেয়, দুঃখের পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য মানুষ আত্মবলি দেয়, যে অপমান মানুষকে উন্মাদ করিয়া তুলে, যাহার প্রতীকারে মানুষ স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব পণ করে, সে দুঃখ, সে অপমান বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারিল না। অবসাদ-পঙ্কে আকণ্ঠমগ্ন জাতি—হৃদয় অনুভূতিহীন, দেহ স্পর্শবোধশূন্য, অন্ধ তন্দ্রাহতের মত পড়িয়া রহিল। কেহ হাহাকার করিল না, কেহ একবিন্দু চোখের জল ফেলিল না, সকল দুঃখ সকল অপমান এমন ভাবে মাথা পাতিয়া সহ্য করিল, যেন ইহাই তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল। সুতরাং কবিওয়ালাগণকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না।

দূর জনপদে জমিন্দারের বরকন্দাজের হস্তে প্রহৃত রক্তাক্তদেহ গৃহস্বামী গৃহে ফিরিলে বেদনার গুরুভারে যখন সমস্ত গৃহখানি মূক এবং মৌন হইয়া যায়, তখন গৃহস্থিত শিশু যেমন সকলকে নির্ব্বাক দেখিয়া পরিচিত অভ্যস্ত-ভঙ্গীতে প্রত্যেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রত্যেকেরই কথা শুনিতে, হাসিমুখ দেখিতে চেষ্টা করে, কবিওয়ালাগণও ঠিক্ তেমনই ভাবেই শিশুসুলভ সারল্যে ও চাপল্যে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সকলকে কথা কহাইতে এবং হাসাইতে চাহিয়াছিল।

ঝুমুরের মত কবির গানেও আদিরসের বাহুল্য অন্যতম

প্রধান লক্ষণীয়। 'সখী-সংবাদ' এবং 'ভবানী-বিষয়' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ লীলা এবং হরগৌরী লীলা এই আদিরসের আশ্রয় ও অবলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ লীলার সে অনুপম ভাবমাধুর্য্য ইহাদের কবিতায় পাওয়া যায় না। হরগৌরী লীলার সে মহনীয় চিত্র ইহাঁরা ধারণা করিতে পারেন নাই। প্রেমের যে আদর্শ মরজগতকে অমরার গৌরব দান করে, সে অমৃতানুভূতির সামর্থ্য ইহাদের ছিল না।

ইহাদের রাধা-চিত্রে অহৈতুকী প্রেমে অতীন্দ্রিয় ভাব-সাধনার সে অপূর্ব্বতা নাই। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার অনাড়ম্বর বিলোপে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের সে উন্মাদনা নাই। প্রিয়-দয়িতের ব্রজ-বর্জ্জনে গোপাঙ্গনার সে যুগান্তব্যাপী তপস্যা—তাহা কবিওয়ালাগণকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ইহাদের রাধাকৃষ্ণ সাধারণ মানব-মানবী এবং ইহাদের প্রেম ইন্দ্রিয়-তাড়না-সঞ্জাত, লালসাপূর্ণ। অবশ্য তথাপি তাহা কবিত্ব বর্জ্জিত নহে।

মনে রাখিতে হইবে ইহাদের অধিকাংশ গানই প্রতি-পক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। কবি রাধা-বিরহ গান করিয়াছেন, তাহাও হয় প্রশ্ন, নয় উত্তরের জন্য রচিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার একটা ভাব অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং গানের মধ্যেও অপরপক্ষের একটু দোষ দেখাইয়া, "চাপান" দিয়াই গান রচনা করিতে হইয়াছে। সেইজন্য দেখিতে পাই যিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, বরং তাহার গান কতকটা স্বচ্ছন্দ, তাই কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। সাধারণ নায়ক-নায়িকার এবং বিরহের গান সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। তবে ইহা একান্ত সত্য, যে নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক হইলেও সখী-সংবাদের বিরহ অপেক্ষা সেগুলি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

কিন্তু ভবানী বিষয়ক গান সম্বন্ধে সেকথা বলিতে পারি না। হরগৌরীর কোন্দল, গৌরীর শাঁখা পরা প্রভৃতি গানে ইহাদের যে মনোবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সুস্থ অবস্থার পরিচায়ক নহে। অবশ্য ইহার জন্য প্রধানতঃ মঙ্গলকাব্য রচয়িতাগণকেই দায়ী করিতে হয়। তবে সমসাময়িক অবস্থা এবং উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলে তাঁহাদের সে দায়িত্ব অনেকটা লঘু হইয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেবলীলার গাম্ভীর্য্য না থাকিলেও মানবতার একটা নিরাভরণ সৌন্দর্য্য ছিল। কবির গানে তাহার রূঢ় অসম্পূর্ণতা মনকে পীড়িত করে। কবির গানের মহাদেব যেমন বৃদ্ধ, পেটুক, অলস, নেশাখোর, হাড়-জ্বালানে হত-দরিদ্র স্বামী, দুর্গাও তেমনই যৌবন-গর্ব্বিতা, কলহ-পরায়ণা, ছল খুঁজিতে মজ্‌বুদ বদমেজাজের লক্ষীছাড়া স্ত্রী। সুতরাং বলিতে হয় কবির গানে হরপার্ব্বতীর যথেষ্ট দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার আর একটী দিক্ আছে। সেদিক্ দিয়া দেখিলে কবিওয়ালাগণকে অভিনন্দিত করিতে হয়, যে ইহারা এই ভবানী বিষয়ক গানেই একটী নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। আমরা আগমনী গানের কথা বলিতেছি। আগমনী গান কবিওয়ালাগণই প্রথম রচনা করেন।

কবে, কোথায়, কে প্রথম কবির গানের সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন, কেহ জানে না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রাচীন কবিওয়ালাগণের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, রামজী দাস ও রঘুনাথ দাসের নাম করিয়া গিয়াছেন। গোঁজলার ও কেষ্টার গুরু বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন কবিওয়ালার নাম তিনি বহু অনুসন্ধানেও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয় গোঁজলার ও কেষ্টার সময়েই কবির গানের প্রচার ও পুষ্টির শৈশব অতিক্রান্ত হইতেছিল। কবির গান সাধারণতঃ "দাঁড়া-কবি" নামে পরিচিত ছিল। দাঁড়া-কবির সুর ভাঙ্গিয়া প্রায় সমসময়েই আখড়াই, হাফ-আখড়াই ও পাঁচালীর সৃষ্টি হয়। আখড়াই ও পাঁচালীতে কোন প্রতিপক্ষ থাকিত না। কিন্তু হাফ আখড়াইএ দুই পক্ষ না হইলে গানই চলিত না। কখনো কখনো তিনটী দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।

পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থান তখনো অশান্তিপূর্ণ এবং দেশে টাকা দিবার লোকেরও অভাব। সুতরাং অধিকাংশ কবি, যাত্রা, পাঁচালীওয়ালা আসিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে ভিড় জমাইলেন। এদিকে কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েকজন খ্যাতনামা গায়ক এবং সঙ্গীত-রচয়িতা সময়ের প্রভাবে কবিরদলে যোগ দিয়া কবির গানকে প্রকৃত রসসাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করিয়া তুলিলেন। শান্তিপুরে আখড়াই গানের সৃষ্টি হইলেও হাফ-আখড়াই গান কলিকাতারই নিজস্ব সৃষ্টি। যে সমস্ত

সুকৌশলীর দল রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ সাধনপূর্ব্বক নানা ছলে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং অর্থ ও জীবন নিরাপদে রাখিবার মানসে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত সৌখীনের দল অনুগৃহীত-বারাঙ্গনার বানর বা বিড়ালের বিবাহে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ধনবত্তার আড়ম্বর প্রকাশে উল্লসিত হইতেন, কবির গান প্রভৃতি যদিও প্রধানতঃ তাঁহাদেরই বিলাস-ব্যসনের অন্যতম উপকরণ বা দিনগত পাপক্ষয়ের উপাদান ছিল, তথাপি কলিকাতায় কবি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ-আখড়াইএর আশ্রয়দানে উৎসুক প্রকৃত রসগ্রাহী ধনী-সন্তানের অভাব ছিল না। কবিরগান প্রভৃতিকে অশ্লীলতার পঙ্ক হইতে উদ্ধারে ইহারা কম সাহায্য করেন নাই। কবিগণের সঙ্গে ইঁহাদের নামও বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

বাঙ্গালার মাটীর এবং জল বাতাসের আর যাই দোষ থাকুক, তাহার একটা মহৎ গুণ আছে—রস গ্রাহীতা এবং ভাবুকতা। তাই দেখিতে পাই—কোনরূপ উচ্চ-শিক্ষা না পাইয়াও, হীন প্রতিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও—বরাতি গান গাহিতে গিয়াও তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর বাঙ্গালী কবি আপনার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বে ও কল্পনায় প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশে উচ্চ চিন্তা নাই, উচ্চ আদর্শ নাই, তবু রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, দাশু রায়, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, নীলকণ্ঠ, মতিরায়ের অভাব ঘটিল না।

বহুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এমনই রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে একজন বিপ্লবী বাঙ্গালীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। হিন্দুর মন্ত্রণা-চালিত রাষ্ট্রবীর হুশেন শাহ রাষ্ট্র-বিপ্লবের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু রাজনীতির পঙ্কিল-আবর্ত্তের সমান্তরালে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র রক্ষা পূর্ব্বক যে মহান্ পুরুষ বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে এক অভিনব-আন্দোলনে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার মহনীয় চরিত্রের অমৃত-মাধুর্য্য জাতির জীবনেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনই সমান প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই যেমন দেখিতে পাই লক্ষপতির একমাত্র আদরের দুলাল গৃহ ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছেন, দেশের শ্রেষ্ঠ রাজবল্লভ পদমর্য্যাদার মোহ কাটাইয়া কন্থা করঙ্গ সম্বল করিয়াছেন, কূট তার্কিক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক বিশ্বাসী ভক্তে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তেমনই দেখিতে পাই কবিশেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাসের পদাবলী এবং কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির গ্রন্থ এক দিব্য মানবতার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রাসাদে-পর্ণকুটীরে, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে, পণ্ডিতে-মূর্খে যুগান্তরের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়াছে। সেদিনের কথা আজ কাহিনী মাত্র, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু বন্যা বিলুপ্ত হইলেও তাহার ফল্গুধারা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। স্থানে স্থানে তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎস—কবি, যাত্রা, পাঁচালীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তাই সেই দুর্দ্দিনেও আমরা সাহিত্যের স্বাদে বঞ্চিত হই নাই।

মঙ্গলকাব্য মানুষ ও দেবতার কথা কহিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস দেবরূপী মানবের কথা গাহিলেন। চণ্ডীদাসে যাহা ভাব ও রস, শ্রীমহাপ্রভুতে তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সেই প্রেম ও করুণার বিগ্রহকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কিম্বা দেখা লোকের মুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতা, মানুষ ও দেবরূপী মানুষ; কাহাকেও বাদ দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অমিয় গানে কাব্যেও যেমন, বাস্তবেও তেমনই দেবতা-মানুষে একাকার হইয়া গেল। তারপর আবার দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। আদর্শ নাই, আদর্শের বিগ্রহ নাই। সাধারণে আবার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটী লইয়া মাতিল। সেই কথা বলিবার জন্য, ব্যক্তি-জীবনের অতি স্থূল কথা, নিতান্তই এক ভগ্নাংশের কথা বলিবার জন্যই তখন কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীকার প্রভৃতির অভ্যুদয় ঘটিল। ইঁহারা একেবারেই ঘরের কথা, একান্তই মানুষের কথা বলিয়াছেন। বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক দেহের ক্ষুধার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারই মাঝখানে ইঁহাদের অবচেতনের অন্তস্তলে অবস্থিত দূর-অতীতের স্মৃতি, নিজেদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই ইঁহাদিগকে মাঝে মাঝে এক কল্পলোকের স্বপ্নে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে। সে স্বপ্ন ক্ষণিকের হইলেও সাহিত্যে তাহার স্থায়ী আলোকচিত্র রহিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তিই ছিল ইহাদের উপজীব্য। ক্বচিৎ কখনো সমাজের কথাও ইহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইত। কিন্তু তাহারই ফলে পল্লীগ্রামে এক সম্প্রদায় গায়কের

আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যাহারা বৎসরান্তে সারা গ্রামের "সালতামামি" গাহিত। এই জাতীয় গানের নাম ছিল ঘেঁটু। বীরভূম, বর্দ্ধমানের দূর পল্লীতে আজিও এ গানের লুপ্তাবশেষ খুঁজিলে মিলিতে পারে। কৃপণ গৃহস্বামী, প্রচুর অর্থ আছে, কিন্তু তথাপি কোন সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিবেন না। এমন কি নিজের প্রয়োজনে গৃহপ্রাঙ্গণে একটা কূপ খননেও তাঁহার আপত্তির অন্ত নাই, অবশেষে একদিন অকস্মাৎ দেশে দুর্ভিক্ষের সুযোগে গৃহিণীর জেদে নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি একটা কূপ খনন করাইলেন। ঘেঁটু সম্প্রদায় গাহিল—

ঘেঁটু তাই ভাবি মনে।
* * * * জলের কষ্ট যায় না গো কেনে।
গিন্নী বলেন আর তো আমি জল খাব না পুকুরে।
কুলীতে (গ্রামের পথে) তপ্ত বালী চল্‌তে নারি দুপুরে॥
কর্ত্তা বলেন, লখুরে,
যেখানে সস্তা পাবি আন্‌গা ডেকে মজুরে॥
পচা চাল' ঘরে ছিল, সেগুলার গতি হ'লো,
মিষ্টি জল উঠলো তবু এঁটেল মাটীর গহনে॥
ঘেঁটু গো তাই ভাবি মনে॥

এ গানের বাকী অংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অনেক সময় গানের মধ্যে সত্যকার মানুষের নাম ধাম সমস্তই অবিকল রাখা হইত। এমনই কত বিষয়ের কত গান, কত ছড়া, সমস্তই লুপ্ত হইয়া গেল। আখড়াই, হাফ-আখড়াই এবং পাচালী মৃত। কবি, ঝুমুর, এবং যাত্রা মৃতপ্রায়। মঙ্গল গান, রামায়ণ এবং কীর্ত্তন কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আর কতদিন ?

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের লক্ষ্য

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী

অসীম ক্ষুধা এই মানুষ জাতির। মানুষের ভোগের ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা, মানুষের প্রাণের ক্ষুধা—এ ক্ষুধার আর অন্ত নাই। দুর্ব্বার ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ আজ কান্তারে-প্রান্তরে জলে-স্থলে—আকাশে-বাতাসে তাহার লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া ছুটিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে মানুষের এই ভোগের পথ—শুধু পথ উন্মুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—প্রচুর ভোগ-লালসার বস্তুও ভারে ভারে সাজাইয়া ধরিয়াছে তাহার লালসা-লুব্ধ-জিহ্বার সম্মুখে। তাই আজ বিজ্ঞানের এই জয়ধ্বনি। বিজ্ঞানের বিজয়-দুন্দুভি তাই অস্থি মজ্জায় শিরায় উপশিরায় স্পন্দন জাগাইয়া বলিতেছে—'আমার শরণাপন্ন হও, তোমাকে অসীম-শক্তির অধিকারী করিব।'

বিজ্ঞানের এই বিজয় ঘোষণা মিথ্যা নহে। প্রকৃতির উপর অসীম প্রভুত্ব করিতে বিজ্ঞানই আমাদের শিখাইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বাণীই এই প্রভুত্বের বাণী। বিজ্ঞান শিখাইতেছে—পৃথিবীর মানুষ আমরা, পৃথিবীকে লুটিয়া নিঃশেষ করিয়া ইহার শেষ রসটুকু পর্য্যন্ত পান করিব।' কিন্তু তৃষ্ণা তবুও মিটেনা—কেবল যে বাড়িয়াই চলে—"ন জাতু কাম কামানুপভোগেন শাম্যতি।" ভোগের পথে বাসনার শান্তি কোথায় ? তাই প্রাচ্য ঋষি ও শাস্ত্রকার ত্যাগের পথে—নিবৃত্তির পথে শান্তির সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। "ত্যাগেনৈকেন একেন"- একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মানব জীবনের পূর্ণ পরিণতি, অন্ত কিছুতেই নহে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

তাই তো বিজ্ঞান প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার দাবী করিতে পারে না। এদিকে ভোগের পাহাড় জমিয়া উঠে, কিন্তু প্রাণ অনাহারে শুকাইয়া মরে—তাই এক মহাপুরুষ বজ্র-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"Man does not live by bread alone," অতি সত্য কথা ; তবে প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার দাবী করিতে পারে কে ? একমাত্র ধর্ম্ম অথবা আত্মবোধ, আমি যে সেই দিব্য ধাম হইতে এখানে অবতরণ করিয়াছি, তাঁহারই লীলা প্রকট করিবার জন্য—নিজের ভোগ-ব্যসনে পৃথিবীকে পঙ্কিল করিবার জন্য নয়—এই আত্মবোধ জাগরণই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানেই একটা ভয়াবহ কিছু নহে। জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলাই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধনা। তাই সুন্দর যেখানে নাই, সেইখানেই দানবের আধিপত্য—সেইখানেই কুৎসিৎ কবন্ধের রাজত্ব, সেইখানেই পঙ্কিল মৃত্যু। কিন্তু বিজ্ঞানে আর ধর্ম্মতত্ত্বে নাকি এক অনির্ব্বচনীয় শত্রুতা শুনিতে পাই—এ শত্রুতার নাকি আর সমাধান নাই। বিরোধ থাকুক ভালো, কিন্তু যে বিরোধের মূলে শুধু মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নাই, সে বিরোধ জীবন সংহারক—অতি কুৎসিৎ ও ভয়াবহ। তাই যখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে লাগে বিরোধ, জাগে সংঘাত, তখনই মনে হয় যে জাতির বক্ষে মোহনিদ্রা ঘনাইয়া আসিয়াছে। জাতির আর চেতনা নাই। রাজায় রাজায় সংগ্রাম তবুও ভালো, কেননা রক্তপাতেই ইহার পর্য্যবসান। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংগ্রাম এতো অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। 'মহতী বিনষ্টি' ইহার

পরিণাম। তাই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব দেখিলেই সেই ভয় উপস্থিত হয়। সামঞ্জস্য কি নাই? সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু আশা-নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ মানুষ এখনও তাহার যোগসূত্র খুঁজিয়া পায় নাই, পায় নাই বলিয়াই অকারণ দ্বন্দ্ব ও অকারণ সংঘাত।

লক্ষ্য আমাদের কি?—পূর্ণতাই আমাদের চরম লক্ষ্য। অপূর্ণতাই দুঃখের কারণ—যে পূর্ণ, তাহার আবার দুঃখ কি? আমরা সেই পূর্ণকেই চাই—প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক, তাহাকে না চাহিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। কেননা দুঃখকে আমরা কেহই চাই না। দুঃখের হাত হইতেই মুক্তি লাভের প্রচেষ্টাই হইতেছে সেই পূর্ণের দিকে যাওয়া। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা সেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণের দিকেই ছুটিতেছি—জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক। গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন—'হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই আমার অনুবর্ত্তন করিতেছে।' ছোটর ধর্ম্ম বড় হওয়া অর্থাৎ বড়র সঙ্গে যুক্ত হওয়া। একদিন যে ক্ষুদ্র সরিৎ পর্ব্বতের গোপন গুহায় জন্ম লাভ করিয়াছে, কেহ হয় তো জানে না, এমন কি সে স্রোতস্বতীও হয় তো জানে না যে অসীম কাল-প্রবাহে সে ক্রমাগত মহাসাগরের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। তাই ভূমাকেই আমরা চাই। এ আমাদের অহঙ্কার নহে, এই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের দাবী। ভারতের ঋষি একদিন তাহাই উপলব্ধি করিয়া আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন—

> 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ।'

আমাদের ধর্ম্মই এই অমৃত লাভের ধর্ম্ম। প্রচণ্ড কালপ্রবাহে যখন সে ধর্ম্ম হইতে আমাদের চ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনই পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি মাথা খাড়া করিয়া তাহারই সার বাণী বহন করিয়া আমাদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের আকাশে বাতাসে বাজিয়াছে সত্যের বিজয়-শঙ্খ, তোরণে তোরণে উড়িয়াছে ভক্তির বিজয়-পতাকা, হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিয়াছে বিশ্বাসের বিজয় দুন্দুভি। কিন্তু কালনেমির উত্থান-পতনে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কালক্রমে যুগের ধারা পরিবর্ত্তিত হইল। ইটালিয়ান রেনাসেন্সের কুক্ষি হইতে জন্মলাভ করিয়া নব্য বিজ্ঞান জীবনের ঘাটে ঘাটে তুলিয়া দিল এক বিস্ময় তরঙ্গ। আমরা ভক্তি বিশ্বাসের মূলে কুঠার হানিয়া যুক্তির সাহায্যে বিচার শিখিলাম। কিন্তু এ যুক্তিরাজ্যের সীমা যে কতখানি তাহা তখন বুঝিবার অবসর পাই নাই। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিই এই বিজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশক। তাই ইন্দ্রিয় অনুভূতির যেখানে পরাজয়, বিজ্ঞানের পরাজয় সেখানে অবশ্যম্ভাবী। তাই সেক্সপীয়রের Hamletএর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

> "There are more things on heaven and earth
> Horatio,
> Than can be dreamt of in your philosophy."

Philosophy অর্থে এখানে বিজ্ঞানকে (science)কেই বুঝা যাইতেছে। বিজ্ঞানের রাজ্য—ইন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্য—ইন্দ্রিয় রাজ্যের বিশ্লেষণ করিয়া সংস্কার বর্জ্জিত জ্ঞানলাভই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তাই বিজ্ঞানের বিলোম-গতি, আর প্রাচ্য-দর্শনের গতি হইতেছে অনুলোম অর্থাৎ একেবারে অখণ্ড সত্যে পৌঁছিয়া জগৎ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের নিরাকরণ। জগৎ-কার্য্য-কারণস্বরূপ সর্ব্ব-মূলাধারকে জানিলে জানিবার আর বাকী থাকে কি? তাই প্রাচ্য-দর্শনের গতি হইতেছে সেই মহান একে—। এককে জানিলেই শুধু সকল বস্তুর জ্ঞান নহে, দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়—ভারতীয় মুনি-ঋষিরা ইহা উপলব্ধি করিয়াই—এই নিবৃত্তিমার্গের সাধন-পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞানের গতিও যে সেই চরম-লক্ষ্যে, তাহা বড় বড় বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ও স্বীকার করিতেছেন। প্রকৃতি রাজ্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে ইহার ভিতরও অতীন্দ্রিয় রহস্য ঘেরা এক রাজ্য বিরাজ করিতেছে, যাহার পরিমাণ করা নব্য-বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত নহে। একজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কথায় বলিতেছি—

A science without mystery is unknown. A Religion without mystery is absurd. This is not attempt to reduce Religion to a question of Mathematics or to demonstrate God in Biological formulæ. The elimination of mystery from the universe is the elimination of Religion. However far the scientific method may penetrate the spiritual world, there will always remain a region to be explored by a religious faith. I shall never rise to the point of view which wishes to raise faith to knowledge. To me the way of truth is to come through the knowledge of my ignorance to the submissiveness of faith and then making that my starting place my knowledge into faith."

সুতরাং বিজ্ঞান এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছে যেখানে যুক্তি তর্ককে স্তব্ধ করিয়া বিশ্বাস-বস্তুর কাছে তাহার মাথা নোয়াইতে হয়। বিজ্ঞানের পথ চলার একটী সুসংবদ্ধ প্রণালী আছে। বিভিন্নতার মধ্যে একটী যুক্তির সূত্র টানিয়া বাহির করাই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম।

"The pursuit of Law is the passion of science. Each single law is an instrument of scientific research simple in its adjustment, but universal in its application, infallible in its results and despite the limitation of its sphere on every sphere Law is still the largest, richest and surest source of human knowledge."

এই বিধানের শাসনেই মানুষ প্রকৃতির সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারিয়াছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রকৃত-বিজ্ঞানের নীতি-ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করাই হইতেছে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রকাশের ক্রমাগত ধারা। ইহাই হইতেছে পাশ্চাত্য জাতির দৃষ্টি ভঙ্গী। অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—Religion is the opium of

the people.'। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহার মধ্যে অসীম-শক্তি নিহিত, তাহা কখনই মানুষকে দুর্ব্বল করে না। তাই উপনিষদে আছে—'বীর্য্যলাভ কর'—ক্লীবত্ব দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন হয় না। সেই জন্য ধর্ম্মের নামে ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দিলে গ্লানি বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং ভারতকে আবার বলশালী করিতে হইলে বিজ্ঞান-সম্মত যে ধর্ম্ম তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ মানুষ আর অন্ধ বিশ্বাস লইয়া মজিয়া থাকিতে রাজী নয়।—'ওঁ জবাকুসুমসংকাশং' বলিয়া সূর্য্যকে দেবতা মনে করিতে বা হাঁচি টিক্‌টিকিকে বিশ্বাস করিতে মানুষ এ যুগে আর পারিবে না। সুতরাং বিশ্বাসকে যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত লোক চাই। আমাদের মুনি ঋষিরা আহম্মক ছিলেন না। তাঁহারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহা সত্য, ধ্রুব ও সনাতন। অবিশ্বাসী জড়বাদী পাশ্চাত্য দেশের বুকেও তো আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া আসিলেন—কেমন করিয়া তিনি এই অসাধ্য সাধন করিলেন—?—শুধু ভক্তি বিশ্বাসের দোহাই দিয়া নহে। প্রকৃত জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যেই তাহাদের চোখে আঙুল দিয়া আমাদের অধ্যাত্ম মণি-কোষের রত্ন-প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন, তবেই না তাহারা বশীভূত হইল। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ এই খানেই। এই বিরোধ মিটিলেই তো সামঞ্জস্য বিধান হইল – তখন আর অনর্থক লাঠালাঠি থাকিবে কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের যেখানে পরিণতি, সেখানেই ধর্ম্মের সূত্রপাত। ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে অবহেলা করে না, তবে দুইয়ের গতিপথ স্বতন্ত্র; এই স্বাতন্ত্র্য লইয়া যাহারা কোলাহল করে, তাহারা গভীরভাবে কিছুই বুঝিবার চেষ্টা করে না। তাই যে হিসাবে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে science বলি—সেই হিসাবেই প্রাচ্য-ধর্ম্মকে আমরা omni-science বলিব। ইহাতে কাহারও বোধ হয় রুষ্ট হইবার কারণ থাকিতে পারে না।

বিলম্বিতা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দ্দশীর চাঁদ ডুবে যায় কঙ্কাবতীর পারে
দূরে ঝাউবীথি রহিয়া রহিয়া ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
রাত্রি শেষের হিমেল হাওয়ায় অন্তরে জাগে ত্রাস
এখনই রাত্রি প্রভাত হইবে, ফিরাতে নারিব তারে।

সারাটি রাত্রি জাগিয়াছ তুমি, শিয়রে জাগিয়া আমি,
ভবন-শিখরে জাগিয়া জাগিয়া স্বপন দেখেছে চাঁদ
প্রেম-আলাপনে মাধবীর বনে উঠিলে আর্ত্তনাদ,
মলিন আননে ধীরে আনমনে কখন গিয়াছে নামি।

বাসর-শয়নে অতনু মহিমা জাগিল সকৌতুকে
মিলন না হ'তে বিয়োগ-বিলাপ গুমরিয়া মরে হায়
ফুলধন্বার শর-সন্ধান ব্যর্থ হইয়া যায়
স্মিতহাস্যের জ্যোৎস্না জাগাও তব পাণ্ডুর মুখে।

শ্লথ অঞ্চল লুটাক ভূতলে করোনা সম্বরণ
আবেশে খসিয়া পড়েছে পড়ুক অলক-কুসুম দুটি'
নীবিতটে যদি দেহ-তরঙ্গ মদালসে পড়ে লুটি
সরম-চকিত বাহু দিয়ে সখী টেনো নাক' গুণ্ঠন।

নীল নয়নের কাজলের রেখা মুছিয়া গিয়াছে যাক্‌
চন্দন-লেখা মলিন হ'ল যে নিশীথ অন্ধকারে
জাগর রাতের অবসাদ প্রিয়ে নামিয়াছে চারি ধারে,
দূরে নদীতীরে উষার আভাসে ডাকিছে চক্রবাক।

ভূমিতল ছাড়ি' উঠে এস সখী, কুসুম-শয়ন 'পরে
স্তিমিত প্রদীপ যাক্ নিবে যাক্, আছে জ্যোৎস্নার আলো,
তব নয়নের প্রসাদে ঘুচাও নিষ্ফলতার কালো
যৌবন-সুধা তুলে ধর তব হৃদয়-পাত্র ভরে'।

আগন্তুক

শ্রীমতী রাণী সেনগুপ্তা

রায়মোহনবাবু অফিস রুমে হাটিতে হাটিতে হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। আর কোন উপায়ই ছিল না; অনেক চিন্তা, অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে নিজের ও পরিবারের আত্ম-সম্মান রাখিতে গেলে—এই একমাত্র পথ।

এ ভীষণ সঙ্কটের শেষ মীমাংসা করিবার জন্য তিনি আজ অফিসের সমস্ত কর্ম্মচারীদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়া, নিজে তাহার রুম্ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপরে ব্যাঙ্কের বই, অফিসের একাউণ্টের খাতা, দলিল-পত্র ইত্যাদি ছড়ান ছিল। ৩০,০০০৲ টাকা এবং দুইদিন পরেই Auditor আসিয়া পড়িবেন! পকেটের মধ্যে হাত দিয়া ক্ষুদ্র শিশিটী আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিলেন। হঠাৎ ভাবিলেন আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই।

অফিসের ক্যাস্‌টাকাগুলি এক বাণ্ডিলে বাঁধিয়া টেবিলের কোনে সরাইয়া রাখিলেন। নিজের উইলখানা পুনর্ব্বার পড়িয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তারপর চেয়ার হইতে উঠিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। পকেট হইতে নীল শিশিটী বাহির করিয়া খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে কর্ক খুলিতেছিলেন; হঠাৎ বাহিরে কাসির শব্দ হইল। দেখিলেন দরজার knobটা কে যেন ঘুরাইতেছে। চম্‌কাইয়া শিশিটা পকেটে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে?"

"আজ্ঞে!···এ···এ···আমি।"

"আপনি কে?"

"আমি ধীরেন রায়।"

দরজা খুলিয়া দেখিলেন—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক; পরণে খদ্দরের ধুতি ও সার্ট।

"আপনি কা'কে চান?"

ধীরেনবাবু বিনীতস্বরে বলিলেন, "আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।"

"আমার সঙ্গে! আপনি কে?"

ধীরেনবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমি··· আমাকে আপনি চেনেন না? আমি আপনার অফিসের store departmentএর ছোট কেরাণী।"

অফিসে ৪০জন কেরাণী ছিল। রায়মোহনবাবু ম্যানেজার, কাজেই অফিসের সমস্ত কেরাণীদের না চিনাই সম্ভব।

একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! আসুন।"

ধীরেনবাবু ভিতরে আসিলে, রায়মোহনবাবু একটু বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি অফিসের সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি?"

"আমি এক সপ্তাহ ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু বড়বাবুর উপদ্রবে আপনার কাছে এগুতে পারি নি। আজ আমি বাড়ী ফিরবার পথে আপনার রুমে লাইট্ দেখে মনে করলুম যে এখনই নির্ব্বিবাদে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে।"

"আচ্ছা? আপনার কি দরকার তাড়াতাড়ি বলুন।"

ধীরেনবাবু একটু গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনার অফিসে প্রায় বছরখানেক হ'ল ঢুকেছি; আপনার বড়বাবু আমাকে Temporary ভাবে কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমার কাজ দেখে পরে স্থায়ী Ledger clerk করে দেবেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তার কোন ব্যবস্থা হয়নি তাই আপনার কাছে এসেছি।"

"আপনার বেতন?"

"ত্রিশ টাকা।"

"তবে নেহাৎ মন্দই বা কি?"

ধীরেনবাবু টাক্ মাথায় একটু হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে। নেহাৎ মন্দ না, কিন্তু ছেলে-পিলেদের স্কুল কলেজের বেতন দিয়ে খাওয়া একপ্রকার জোটেই না।"

ধীরেনবাবুর এই সব দুঃখের কথা শুনিতে কি জানি কেন রায়মোহনবাবুর ভালই লাগিতেছিল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া একটু ভাল করিয়া বসিলেন।

"হুঃ! I see! আপনার কটী ছেলে-পিলে?"

"আমার দু'টী মেয়ে ও একটী ছেলে। বড় মেয়েটী আজ ৩ বছর হ'ল বিধবা। ছোটটী গত বছর আই, এ পাশ করে বসে আছে; তাকে যে বিয়ে দেব, সে অবস্থাও আমার নেই। ছেলেটী ছোট—এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আমার স্ত্রী আজ ৭ বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। বুঝ্তেই পারেন কি করে সংসার চালাই।" বলিতে বলিতে ধীরেনবাবুর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর দিকে তাকাইয়া রায়মোহনবাবু মনে মনে কেমন একটু ব্যথা অনুভব করিলেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আপনি এতদিন ৩০৲ টাকায় কি করে চালিয়েছেন?"

"অফিসের ছুটীর পর বাড়ী না ফিরে 'হেদো'র ধারে পান ও সরবৎ ফেরি করি; তাতে অল্প কিছু আয় হয়।"

আত্মহত্যা যে করিবেন, সেই ভাবটা এখন তাহার মন হইতে সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। এই সামান্য ব্যক্তি সারা-জীবন এইপ্রকার সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্তও হার মানে নাই; আর তিনি নিজে জীবনে এই একটা ব্যাপারেই এই রকম ঘৃণিত উপায়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলেন!! নাঃ—নিশ্চয় কোন পথ আছেই, নিশ্চয়ই কোন আশা আছে। তিনি যেন আবার নূতন জীবন লাভ করিলেন এবং মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন, "ধীরেনবাবু! Don't worry! আপনার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমি করব" এবং একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর আপনার পান সরবৎ ফেরি কর্‌তে হবে না।"

ধীরেনবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "Thank you very much, Sir, কিন্তু আমি···আমি···এ···তার মানে···।"

রায়মোহনবাবু দেখিলেন, ধীরেনবাবু টেবিলের উপরের টাকাগুলির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। তিনি পকেটের কাছে হাত লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও! আপনার উপস্থিত কিছু টাকার দরকার আছে কি?"

ধীরেনবাবু যেন চোখটা একটু মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "আমার একমাত্র ভাই বর্দ্ধমানে মৃত্যুশয্যায়, আজ টেলিগ্রাম পেলুম, তাই আপনি যদি অনু···।" রায়-মোহনবাবু পকেট হইতে ৩০টা টাকা বাহির করিলেন; আবার কি মনে করিয়া আরও ২০টা টাকা লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! আপনি এখনই বর্দ্ধমানে চলে যান, আমি আপনার ছুটীর বন্দোবস্ত করব।"

ধীরেনবাবু খুব নতভাবে নমস্কার করিয়া পুনরায় ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন।

রায়মোহনবাবু অফিসের সমস্ত কাগজপত্র ঠিকঠাক করিয়া, টুপি ও নালাক্কা কেনখানা লইয়া আফিস বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। মটরে বসিয়া স্থির করিলেন যে তাহার বন্ধু ব্যারিষ্টার সার রমেশ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করিবেন। সার রমেশ ও তিনি একসঙ্গে Oxfordএ পড়িতেন। নিশ্চয়ই তাঁহার এই দুঃসময়ে তিনি একটা কিছু উপায় কিম্বা সাহায্য করিবেনই।

* * * *

রায়মোহনবাবুর সেদিন বাড়ী ফিরিতে প্রায় রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ গা! তোমার আজ এত দেরী হ'ল কেন? যদি সময়মত বাড়ী ফির্‌তে, তবে বেশ Globeএ Greta Garbo দেখা যেত।"

"ওঃ! তাই নাকি? Awfully sorry! একটা Board of Directorsএর মিটিং ছিল, তাই এত দেরী।" এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেলেন।

পরদিন বিছানা হইতে রায়মোহনবাবু বেশ দেরী করিয়াই উঠিলেন।

স্ত্রী তাঁহার চেহারা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা! তোমার শরীর কি খারাপ হয়েছে?"

"কেন?" রায়মোহনবাবু একটু বিরক্ত হইয়াই জিজ্ঞাসা

করিলেন। "না, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন রাতে ভাল ঘুম হয়নি।"

"হ্যাঁ। শরীরটা যেন বিশেষ ভাল লাগছে না, ভাব্‌ছি অফিসে আজ যাব না।"

চা খাইয়া রায়মোহনবাবু অফিসে বড়বাবুকে টেলিফোন করিয়া দিলেন।

Breakfastএর পর রায়মোহনবাবু মটরে বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিতে তাঁহার প্রায় রাত ৮টা হইয়া গেল। ড্রইংরুমে ঢুকিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন, "টালিগঞ্জে এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বড়ই দেরী হয়ে গেল।"

* * * *

পরদিন তিনি একটু তাড়াতাড়িই অফিসে চলিয়া গেলেন। বড়বাবু মেল লইয়া ১১টার সময় রায়মোহনবাবুর রুমে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Good morning, Sir! আপনার শরীর কি সুস্থ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। সম্পূর্ণ। আজ ত Auditorএর আসবার কথা না? আচ্ছা, সেফের চাবিটা নিয়ে দেখুন ত সব ঠিক আছে কিনা?"

বড়বাবু সেফ্ খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে! হ্যাঁ! সব ঠিক।"

বড়বাবু চাবি টেবিলের উপরে রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রায়মোহনবাবু বলিলেন "Look here! বড়বাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমাদের Store Departmentএ এক কেরাণীকে অনেকদিন ধরে Temporary ভাবে রাখা হয়েছে; জান্‌তে পারলুম তার বাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ, তাকে কেন Permanent করা হয়নি? ওকে পরের মাস থেকে ১০৲ মাইনে বাড়িয়ে দেবেন।"

"Store Departmentএ? কে বলুন ত?"

"নামটা ঠিক মনে হচ্ছে না—কি এক রায় জানি। পরশু দিন আপনারা চলে যাবার পর আমার অফিসে এসেছিল। তার ভাইএর অসুখ শুনে বর্দ্ধমান চলে গিয়েছে। আমি তাকে দিন কয়েকের ছুটী ও ৫০টা টাকা সাহায্যের জন্য দিয়েছি।"

বড়বাবু খুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "রায়! কি রকম দেখ্‌তে বলুন ত?"

"দেখ্‌তে এই—৫০ বছরের কাছাকাছি, মাথায় টাক, চোখে চশমা এবং···।"

"এরকম কেউ ত আমাদের অফিসে নেই!" বড়বাবু বেশ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন।

"কেউ নেই?" রায়মোহনবাবু চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বলিলেন।

"আজ্ঞে, না।" বড়বাবু গম্ভীরভাবেই বলিলেন।

"Good Heavens!" বলিয়া রায়মোহনবাবু কিছুক্ষণ Ceilingএর দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন; তারপর একটু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "হুঁ! যদি লোকটার সঙ্গে আবার দেখা হয়, তবে আমি······।"

"তৎক্ষণাৎ জোচ্চোরকে জেলে দেবেন।"

"জোচ্চোর? হ্যাঁ, তা হতে পারে, কিন্তু··।"

"আবার কিন্তু কেন, Sir?" বড়বাবু একটু ব্যগ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন।

"পুরস্কার দিতাম।"

"পুরস্কার!!"

"হ্যাঁ।"

বড়বাবু ব্যাপারটা কিছুই না বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

গান

বাহার মিশ্র—ত্রিতাল

গগনে জাগিল মহাকাল।
ঘন ডম্বরু বাজে ভীম রুদ্র সাজে
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু-করাল ॥

মরণ-আঁধার কোলে
জীবন-আলোক জ্বলে,—
তাই, সংহার বেশে দেখা দিল যে ভয়াল ॥

প্রলয়-ঝঞ্ঝা শেষে নূতন সৃজন
যুগে যুগে আনিল যে অমর মরণ।

আজি অমানিশা-শেষে,—
আসিবে নূতন বেশে—
শঙ্কর শিব-সাজে সাজিয়া দয়াল

কথা—শ্রীজগৎ ঘটক

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

০ ১ + ৩
II না র্সা নর্সর্রা র্সা | সর্ণা পা মজ্ঞা মা | মণা -া ধা -া | -না -া র্সা -া I
গ গ নে০০ জা গি ল ম হা কা ০ ০ ০ ০ ০ ল্ ০

I র্সা র্সা ণা -া | পা পা পা পা | জ্ঞমা -পণা পা পরা | -া রা সনা সা I
ঘ ন ড ম্ ব রু বা জে০ ভী০ ০০ ম রু ০ দ্র সা জে

I সা গা গা -া | গরা মা মা মা | মা -ধা ধা ধা | পধা -ণা -ধণা -র্সা II
জা গে ভৈ ০ র ব আ জি মৃ ০ ত্যু ক রা০ ০ ০০ ল্

মাছ ধরা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing. Works

১ + ৩
II { পমা ণা -ধা ধা | না -র্সা না র্সা | র্সনা -র্মা র্রা র্সা | না -র্সা র্সণা ধা } I
ম র ণ আঁ ধা র কো লে জী॰ ব ন আ লো ক জ লে

I ধণা -া পা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা পা | পরা রা রা রজ্ঞা | সা -া -া -া I
সং ॰ হা র বে শে দে খা দি ল যে ভ য়া ॰ ॰ ল্

I সা গা গা -া | গরা মা মা মা | মা -ধা ধা ধা | পধা -ণা -ধণা -র্সা II
জা গে ভৈ ॰ র ব আ জি মৃ ॰ ত্যু ক রা॰ ॰ ॰॰ ল্

০ ১ + ৩
II সা মা মা মা | -া মা মা মা | মা পা মপধা পা | মজ্ঞা -া -া -া I
প্র ল য় ঝ ঞ্ ঝা শে ষে নূ ত ন॰॰ সৃ জ ॰ ন্ ॰

I মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা মা মা | রা রা রা রজ্ঞা | সা -া -া -া I
যু গে যু গে আ নি ল যে অ ম র ম র ॰ ণ্ ॰

I { সা র্রা র্রা র্রা | র্রা র্সর্জ্ঞা র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্সা র্সণা ধা | না না র্সা র্সা } I
আ জি অ মা নি শা॰॰ শে ষে আ সি বে নূ ত ন বে শে

I র্সা -া ণা পা | মা মজ্ঞা মা পা | পরা রা রা রজ্ঞা | সা -া -া -া I
শ ঙ্ ক র শি ব সা জে সা জি য়া দ য়া ॰ ল্ ॰

I সা গা গা -া | গরা মা মা মা | মা -ধা ধা ধা | পধা -ণা -ধণা -র্সা II II
জা জে ভৈ ॰ র ব আ জি মৃ ॰ ত্যু ক রা॰ ॰ ॰॰ ল্

গ্রহনক্ষত্রের পরিচয় ও জন্মকথা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এস-সি

শেষাংশ

পূর্ব্বে যে বিশ্বরূপের চিত্র দেওয়া হ'য়েছে তার সৃষ্টিরহস্য আরও বিচিত্র। সৃষ্টির স্বরূপ কি, আর সৃষ্টিকর্ত্তাই বা কে? ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবানকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে নির্দ্দেশ করা হয়। বাইবেলের জেনেসিসে দেখিতে পাই যে ঈশ্বর জল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, উদ্ভিদ, প্রাণী ও সর্ব্বশেষে মানুষ সৃজন করেন। উপস্থিত হ'য়েছে। আমরা দেখেছি যে পৃথিবী একটা নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রহ ও মানব এই ব্রহ্মাণ্ডে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ও অধুনা সৃষ্ট। চিরন্তন কালের তুলনায় মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী।

সাংখ্যের সৃষ্টিবাদ অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত। বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ, নিরাকার, নির্গুণ পরমব্রহ্ম ছিলেন। পরে ইঁহা হইতে পুরুষ-প্রকৃতি (দ্বৈতবাদ) সৃষ্ট। সৃষ্টির মূলে রয়েছে পরমেশ্বরের বহু হবার ইচ্ছা। পুরুষ প্রকৃতির মিলনে (বা বহু হবার চিন্তায়) আকাশের উৎপত্তি। পরে যথা-ক্রমে আকাশের কম্পনে বায়ু, বায়ুর গতিতে অগ্নি, অগ্নি হ'তে বাষ্প ও বাষ্প হ'তে ক্ষিতির সৃষ্টি হয়। ক্ষিত্যপ্তেজম-রুদ্ব্যোমের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে জড় পদার্থ। প্রলয় কালে জড় পঞ্চভূতে ও পঞ্চ-ভূত ব্রহ্মসমুদ্রে লুপ্ত হ'বে। আকাশকে মহাব্যোম (space) মনে করলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে সাংখ্যের সৃষ্টিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। কম্পনই সৃষ্টির আদি কথা। তার পরিচয় পাই আলোক, বিদ্যুৎ ও জড়ের তরঙ্গাকৃতির পরিকল্পনায়।

হাইড্রোজেনের আলোকে গৃহীত সূর্য্যের আলোক-চিত্র—কোদাইকানাল অবজারভেটারীর সৌজন্যে

উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন ক্রমবিবর্ত্তন মতবাদে বাইবেলের উক্তির অসামঞ্জস্য হওয়ায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের সঙ্গে বিরোধ হয় ও আজও সে বিরোধের অবসান হয় নি। মানবের শ্রেষ্ঠতা ও পৃথিবীর প্রাধান্য সম্বন্ধে আজ সন্দেহ

তেজ বা বিকীরণ (শক্তি) হ'তে জড়ের সৃষ্টি আর কল্পনামাত্র নয়। আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতত্ব সাহায্যে দেখান যে জড় শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ মাত্র। জড়ের ওজন 'ও', এবং আলোকের গতি 'গ' হ'লে জড়ধ্বংসে প্রাপ্ত শক্তি $শ = ও\ গ^{২}$ ($E = Mc^2$)। এই শক্তি বিকীরণে প্রাপ্ত আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $ত = \frac{প\ গ}{শ}$ ($\lambda = \frac{hc}{E}$ ত, λ = wave length, প, h = Planck's constant)। আবার বিকীরণ হ'তে জড় ও পাওয়া যায়। জড়ের ধ্বংসে বিকীরণ ও বিকীরণের পরিবর্ত্তনে জড় সৃষ্টি অধুনা প্রেক্ষাগারে সম্ভব হ'য়েছে। যাঁরা এই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সেই মাদাম কুরীর কন্যা-জামাতা ঈরীন কুরী ও এফ জোলিও (Curie—Joleot) দেখান যে রেডিয়াম হ'তে প্রাপ্ত অতি-শক্তিশালী গামা-রশ্মি (γ rays) বিপরীত বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন একজোড়া বিদ্যুতাণুতে (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক—Positron ও Electron) পর্য্যবসিত হয়। আবার লর্ড রাদারফোর্ডের কৃতি ছাত্রদ্বয় গ্রে ও ট্যারাণ্ট দেখিয়েছেন যে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুতাণুদ্বয় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া গামা রশ্মি হয় (নোবেল লরিয়েট বিখ্যাত ইংরাজ পদার্থবিদ্ ডিরাক্ গণিত দ্বারা ইহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বুক্তি করেন)। অধুনা আবিষ্কৃত কসমিক্ রশ্মির (Cosmic ray) উপাদানও বোধ হয় ইলেক্ট্রন, পসিট্রন ও প্রোটন। এই তিনটী বস্তুই হয়ত সৃষ্টির মূল উপাদান। ব্যোমে এগুলি এরূপ বিরলভাবে সন্নিবিষ্ট যে ইহাদের ঘনত্ব মাত্র ১০** অর্থাৎ ২৬ লক্ষ কোটি ঘন মাইলে মাত্র ১টী ক'রে ইলেক্ট্রন, পসিট্রন, প্রোটন (ও হয়ত নিউট্রন) আছে। ইহাই হ'ল বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্-কালীন বিশৃঙ্খল অবস্থা (chaos)। Let there be light এই ভগবদ্বাক্যে বিকীরণ ও পরে উহা হইতে ইলেক্ট্রন, পসিট্রন, প্রোটন উদ্ভূত অথবা ব্যোম ও জড় একত্রে সৃষ্ট হ'য়েছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে আজও মতৈক্য হয় নি। অধুনা একজন বৈজ্ঞানিক ব্যোমের অস্তিত্ব অস্বীকার করে মাত্র শক্তির দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে শক্তির ঘনীভূত অবস্থা হল জড়, আর বিরলীভূত অবস্থা হল বিকীরণ। শক্তিকণার বিচ্ছেদে ব্যোমের অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়।
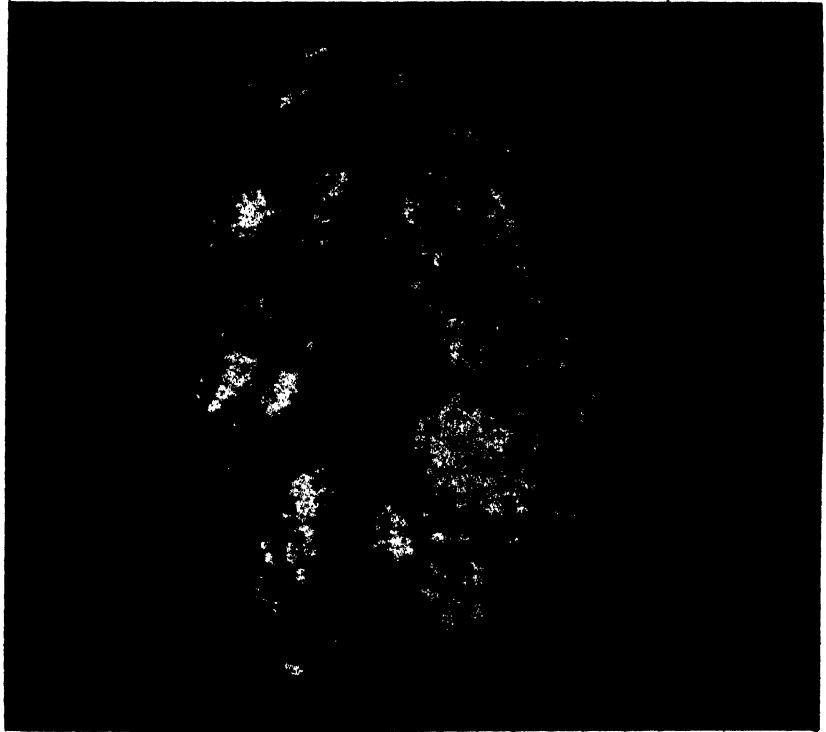
ক্যালসিয়ামের আলোকে গৃহীত সূর্য্যের আলোক-চিত্র—কোদাইকানাল অবজারভেটারীর সৌজন্যে।

শক্তি যে সৃষ্টি-মূল তাহা নিঃসন্দেহ। চাই কি শক্তি হ'তে কেবল জড় নয় পরন্তু প্রাণীও হয়ত সৃষ্ট হ'য়েছে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শক্তিশালী রশ্মির সাহায্যে জীবের পরিবর্ত্তন হয়। অবশ্য প্রাণের আদি সৃষ্টি-রহস্য আজও ভাল করে উদ্ঘাটিত হয় নি। তবে ইহা ঠিক যে প্রাণধারণের জন্য যে উত্তাপ ও শক্তি প্রয়োজন তাহা আমরা নক্ষত্র হ'তে পাই, কারণ গ্রহগণের নিজস্ব উত্তাপ নাই। জীন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই শক্তি উৎস হ'ল নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক জড় পদার্থ। সূর্য্যের বহির্তলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি হ'তে ৫০ অশ্ব-শক্তি (Horse power) বহির্গত হয়। উল্লিখিত হিসাব অনুসারে এই শক্তিদানে সূর্য্যের ১১ কোটী মন জড় পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কালকের চেয়ে আজ সূর্য্যের ওজন দশ লক্ষ কোটী মণ কম। এই অনুপাতে ১৫ লক্ষ কোটী বছরে সূর্য্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেবে। তবে আশার কথা এই যে এডিংটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের মতে নক্ষত্রের আলোক ও জড়ের মধ্যে একটী সম্বন্ধ আছে (Mass luminosity law)। কাজেই সূর্য্য আজ যে পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে কাল তদপেক্ষা কম পরিমাণে পাবে। এইরূপ হিসাব করলে সূর্য্যের পরমায়ু আরও অধিক হবে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে হয়ত সূর্য্যের উত্তাপদানের ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তে হ'তে যদি উহা শ্বেতবামনে পরিণত হয় তা হ'লে উহার আলোক ও উত্তাপের সাহায্যে আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হ'বে না। তবে এরূপ হ'তে পারে যে ততদিনে অন্য কোনও নক্ষত্র নিকটবর্ত্তী হ'য়ে সূর্য্যের স্থান অধিকার করবে। আবার এমনও হ'তে পারে যে সূর্য্য শ্বেতবামনে পরিণত হবার পূর্ব্বে অকস্মাৎ অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রে (Nova) পরিণত হ'য়ে এত অধিক আলোক ও উত্তাপ দেবে যে পৃথিবী দগ্ধ হ'য়ে যাবে। নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ধ্বংসের কথা আলোচনা না করে আবার সৃষ্টির কথা বলা যাক্‌। আদি মহা-বিশৃঙ্খলের (chaos) পরে ব্যোমস্থিত ইলেক্ট্রন প্রভৃতি উত্তপ্ত হয়ে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করায় ইহাদের মাধ্যাকর্ষণের অসামঞ্জস্য হওয়ায় ইহারা বিভিন্ন স্থানে একত্র সন্নিবিষ্ট হয় (condensation); তখন ইহাদের সমষ্টিকে মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এইগুলিই হল নীহারিকা। ইহাদের জড় পদার্থের ঘনত্ব $১০^{-২১}$ অর্থাৎ ২৬ কোটী ঘন মাইলে ১টী ক'রে ইলেক্ট্রন প্রভৃতি আছে। এক একটী নীহারিকা সংহতির (condensation) কেন্দ্র। এইরূপে প্রায় ১০ লক্ষ কোটী বর্ষ আগে মহাব্যোমে নীহারিকার সৃষ্টি হয়।
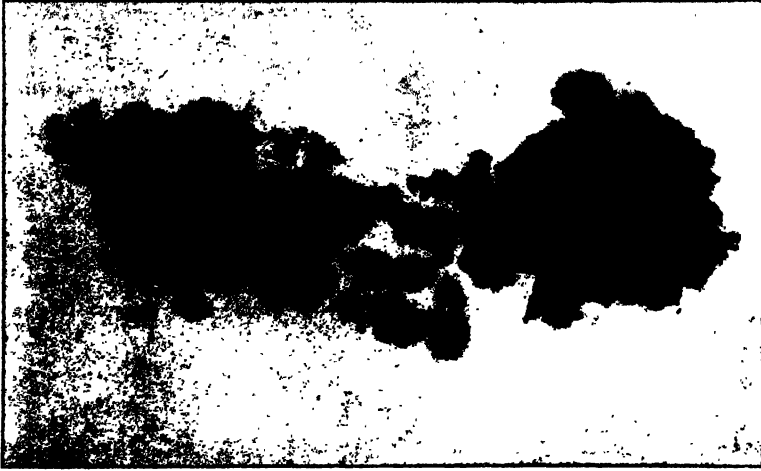
সূর্য্যের আভ্যন্তরিক দাগ (Sun spots)—কোদাইকানাল অবজারভেটারীর সৌজন্যে

নীহারিকাই হল নক্ষত্রপুঞ্জের জন্মদাতা। ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপ্‌লাসের মতে নীহারিকার ঘূর্ণনে গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি। পরে এই মত খণ্ডিত হয় বটে, কিন্তু উক্ত বৈজ্ঞানিক নীহারিকা ঘূর্ণনে সে সকল বিকৃতি গণিত দ্বারা গবেষণা করেন সেইরূপ বিকৃতি-প্রাপ্ত নীহারিকা হব্‌ল্‌ লক্ষ্য করেন। বস্তুতঃ নীহারিকার ঘূর্ণনে উহা শক্তি বিকীরণ হেতু ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, ফলে উহার ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধি হয়; প্রথমাবস্থায় গোলাকৃতি নীহারিকা বিকৃত হয়ে কমলালেবুর আকৃতি পায়, পরে আরও চেপ্টা হয়ে

উহাকে লেন্সের মত দেখায়। ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা আরও চেপ্টা হয়; এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় যে পার্শ্বস্থ জড়পদার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। হুব্‌লের গবেষণা নক্ষত্রের এইরূপ জন্মবাদ সমর্থন করে। আমাদের ছায়া

বিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি আবার ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকে এইরূপে শক্তিবিকীরণের ফলে এগুলি সঙ্কুচিত হয় ও আরও বেগে ঘোরে। তরুণ লোহিত দৈত্যগুলি এইরূপে সাধারণ নক্ষত্রে (main sequence)
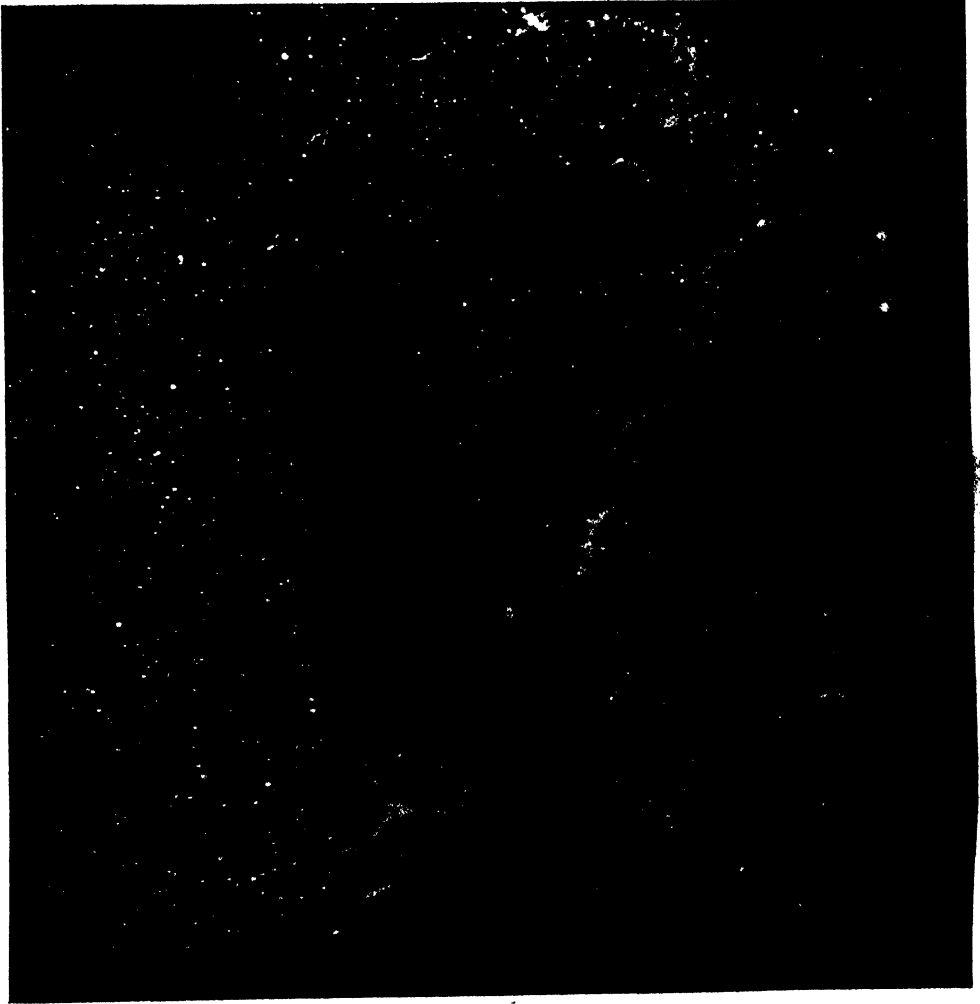
সিগমাস্থিত নীহারিকাপুঞ্জ—লিক অবজারভেটারীর সৌজন্যে। সম্ভবত এই ক্ষুদ্র নীহারিকাগুলি কোনও বৃহৎ নীহারিকা হইতে উদ্ভূত অথবা মহাব্যোম হইতে সরাসরি সৃষ্ট প্রথমাবস্থা

গোষ্ঠী এইরূপে একটী নীহারিকা হতে জন্মেছে। নীহারিকার জড়পদার্থের সংহতি (condensation) দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জের (globular cluster) সৃষ্টিও সম্ভব।

ও অবশেষে শ্বেত কমলে পরিণত হয়। কখনও বা কোনও কোনও নক্ষত্র অকস্মাৎ অত্যধিক আলোক দান করে; নূতন নক্ষত্র (nova) ও পরে শীঘ্রই অত্যধিক সঙ্কুচিত

হয়ে শ্বেত কমল হয়। কতকগুলি নক্ষত্র শক্তি বিকীরণের ফলে এরূপ ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত হয় যে ইহাদের অন্তস্থিত জড় শৈত্য ও চাপে তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই তরল বিন্দু ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজ হ'য়ে একজোড়া দ্বৈত নক্ষত্র (Benory stars) হ'য়ে যায়।

এবার আমাদের সৌরজগতের জন্মকথা আলোচনা করা যাক্। কাণ্ট ও লাপলাসের মতে নীহারিকার ঘূর্ণনে গ্রহগণের সৃষ্টি। এই মতের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি অবতারণা করা যায়। বাহুল্য ভয়ে একটীমাত্র উল্লেখ করা যাচ্ছে। জোয়ারে উত্থিত জলরাশি আবার সমুদ্রে পতিত হয়। সেইরূপ কোনও ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র সূর্য্যের নিকটস্থ হ'লে পরস্পরের আকর্ষণে উভয়ের মধ্যস্থ সন্নিকটে আসবার চেষ্টায়, উভয়ের বহিস্তলে উত্থিত জড়পদার্থ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চতা প্রাপ্ত হবে। বৃহত্তর নক্ষত্রের আকর্ষণে ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রের বহিস্তলস্থ জড়পদার্থের পর্ব্বত বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথমটীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার চেষ্টা করবে। এমন সময়ে প্রথম নক্ষত্রটী সরে গেলে বিচ্ছিন্ন পদার্থ খণ্ড খণ্ড হয়ে ঘনীভূত হবে। সূর্য্য হতে এরূপে বিচ্ছিন্ন জড়পদার্থ হতে সৌর জগতের উৎপত্তি।

লিক অবজারভেটারী—পূর্ব্বদিক হইতে দৃশ্য—লিক অবজারভেটারীর সৌজন্যে। ইহা আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানমন্দিরগুলির অন্যতম। বহু প্রকার জ্যোতিষবিষয়ক গবেষণা এখানে হয়

বিজ্ঞানের একটী সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহের বর্ত্তমান মিলিত ঘূর্ণন সূর্য্যের আদি ঘূর্ণনের সমান হ'বে। কিন্তু ঐ ঘূর্ণন উহাকে বিভক্ত করতে অসমর্থ। লাপ্‌লাসের আগে বুফন নামে এক ব্যক্তি বলেন যে সূর্য্যের সহিত ধূমকেতু জাতীয় পদার্থ বিশেষের সংঘর্ষই সৌর জগৎ সৃষ্টির মূল। পরে সেজউইক ও জীন্‌স্ উক্ত মতের পরিবর্ত্তন করেন। সকলেই জানেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার হয়। আকর্ষণ শক্তি অপসৃত হ'লে সূর্য্য থেকে গ্রহগণের দূরত্ব ও ওজন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে নিকটতম গ্রহদ্বয় (বুধ ও শুক্র) ও দূরতম গ্রহ (প্লুটো) মধ্যস্থিত গ্রহগুলি অপেক্ষা লঘু। ইহা গ্রহ সৃষ্টির উপরোক্ত মতবাদের সমর্থক।

উপগ্রহগণের সৃষ্টি গ্রহগণের সৃষ্টির অনুরূপ। সৃষ্টির অব্যবহিত পরে গ্রহগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করছিল। পরে উহাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমে গ্রহগুলি বাষ্পীয় গোলক ছিল। ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ প্রথমে ক্ষুদ্র ও পরে

বৃহৎ গ্রহগুলি তরল ও কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। বড় গ্রহগুলি কঠিন হওয়ার পূর্ব্বে বিচরণ করতে করতে সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কবলে পড়ায় উহাদের বহিস্তলস্থ পদার্থ জোয়ারে উত্থিত হয় ও পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপগ্রহ হয়। ক্ষুদ্র গ্রহগুলি শীঘ্র কঠিন হওয়ায় সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হতে পারে নাই ; এইজন্য বুধ, শুক্র ও প্লুটোর উপগ্রহ নাই। বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র উপগ্রহক (asteroids) হয়ত কোনও গ্রহের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ সৃষ্ট হয়।

সূর্য্যাস্থ অগ্নিশিখা (Prominent) ; ক্যালসিয়াম রশ্মিতে গৃহীত।—কোদাইকানাল অবজার-ভেটারীর সৌজন্যে।
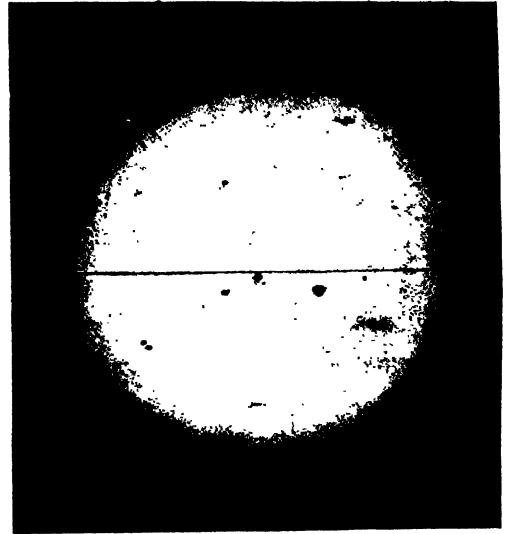
উপগ্রহগুলি আবার গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের কবলে পড়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে। শনির অঙ্গুরীয়কগুলির এইরূপে জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকগণের মতে যখন সৌর ও চান্দ্র জোয়ারে পৃথিবীর গতি মন্দ হ'বে, চন্দ্র ও পৃথিবী নিকটতর হবে। ফলে আমাদের দিনগুলি দীর্ঘতর হয়ে অবশেষে দিন ও মাস এক হ'য়ে বর্ত্তমান ৪৭ দিনের সমান হবে। এরূপ অবস্থায় উপনীত হতে ৫০০০ কোটী বছর লাগবে। ততদিন পৃথিবী থাকলে হয়। এইরূপে চন্দ্র পৃথিবীর নিকটস্থ হলে আর এক বিপদ হতে পারে। চন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শনির অঙ্গুরীয়কের ন্যায় কতকগুলি অঙ্গুরীয়কে পর্য্যবসিত হবে। কবিবহুল বাঙ্গালা দেশে কবিকুলের দুশ্চিন্তার কারণ বটে। কাব্যের অনুপ্রেরণা কোথা হ'তে আসবে ? তবে কিন্তু মাভৈঃ। একচন্দ্রের স্থানে অনেকগুলি অঙ্গুরীয়ক হবে কাজেই জ্যোৎস্না (?) আরও অধিক পাওয়া যাবে।

ধূমকেতু ও উল্কা উপগ্রহকের ন্যায় কোনও ক্ষুদ্র উপগ্রহের ভগ্নাবশেষ। ইহারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল (atmosphere) ভেদ করে পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ

শুভ্র রশ্মির সাহায্যে গৃহীতসূর্য্যের আলোকচিত্র—কোদাইকানাল অবজারভেটারীর

পৃথিবীতে পড়িবার আগেই ইহারা বাষ্পে পরিণত হয় ও উজ্জ্বল পতিত তারকার (shooting star) মত দেখায়। বৃহত্তর উল্কা বিক্ষিপ্ত না হয়ে ধরাপৃষ্ঠে উল্কা প্রস্তর (meteor) রূপে পড়ে। প্যানেল বলেন যে উল্কা ও ধূমকেতুর সূর্য্য হ'তে উৎপত্তি ও পৃথিবীসৃষ্টি সমসাময়িক।

স্মারক স্বরূপ গ্রহনক্ষত্রের বংশ পরিচয় পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল—
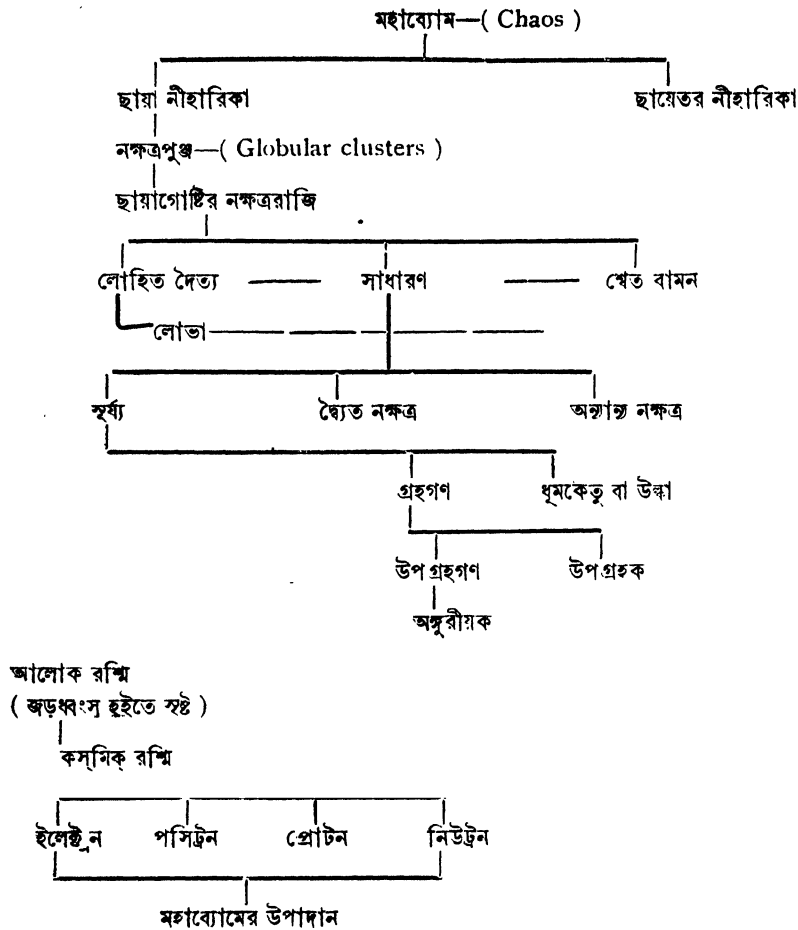
লোহিতদৈত্য, সূর্য্য, দ্বৈতনক্ষত্র ও অন্যান্য নক্ষত্র হইতে আলোকরশ্মি উদ্ভূত হইয়া থাকে।

গ্রহ নক্ষত্রের জন্ম রহস্য সম্বন্ধে উল্লিখিত মতবাদ হয়ত অভ্রান্ত নয়। রাসেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করেছেন। সম্প্রতি লিণ্ডব্লাদ (Lindblad) সৃষ্ট রহস্যের নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন এই গ্রহ নক্ষত্রের জন্মকথার আলোচনার সার্থকতা কি? বর্ত্তমান বস্তু-তান্ত্রিক জগতে দৈনন্দিন জীবনে যাহার প্রয়োজন দেখা যায় না অনেকে তাহা অবান্তর মনে করতে পারেন। তাই সাধারণ লোকেরা তত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের সমাজে প্রয়োজন স্বীকার করেন না। কিন্তু কাব্য, দর্শন ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চ্চাই কি মানবের সংস্কৃতির (culture) পরিচয় নয়? তাই শ্রেষ্ঠ মানব যাঁরা তাঁদের কার্য্যাবলী সাধারণের বোধগম্য নয়। বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক শোপেনহায়র বলেন যে মানব তার জীবনের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করার জন্যই সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে। বিরাট বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী অতীব ক্ষুদ্র ও পৃথিবীর অধিবাসী গর্ব্বিত মানব ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র। ব্রহ্মাণ্ডের এই বিরাট রূপের উপলব্ধির এই যে চেষ্টা আইনষ্টাইন ইহাকেই বিশ্ব-ধর্ম্ম (cosmic religion) বলেন। এই ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ, ইহার উপাসক গালিলিও, নিউটন, সেক্সপীয়র, কান্ট, আইনষ্টাইন্, রবীন্দ্রনাথ।

দ্বৈরথ

"বনফুল"

১

কাছারী বাড়ীর সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। আজ সেখানে বহুলোকের জনতা! 'তৌজি'র দিন। জমিদারের কাছারীতে সকলে খাজনা জমা দিতে আসিয়াছে।

প্রবীণ গোমস্তা হরিহর দাস খাতা খুলিয়া কাছারী-বাড়ীর বারান্দার এক-কোণে বসিয়া এ অঞ্চলের ধনী মহাজন গোলকচন্দ্র সাহার সহিত চুপি-চুপি কি কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন।

সম্মুখস্থ নিমগাছটার নীচে বসিয়া কয়েকজন প্রজা একটু উত্তেজিতভাবেই কি যেন আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে রুক্ষ প্রকৃতির একটি যুবক বলিতেছিল— "ন্যায্য খাজনা দিয়ে থাক্‌ব—তার আবার এত ভয়টা কিসের? ভারি ত আমার—!" প্রবীণ গোছের বিলাই মণ্ডল তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল—"অত রক্ত গরম করলে—জমিদার বাড়ীতে কাজ হাঁসিল হয় না! একটু ঠাণ্ডা মেজাজে কথাবার্ত্তা কইতে হয়।"

যুবকের মেজাজ কিন্তু ঠাণ্ডা নয়। ফলে কলরব বাড়িতেছিল।

আর একটু দূরে একটি যুবতীকে কেন্দ্র করিয়া আর কয়েকজন প্রজাও দাঁড়াইয়া নানারূপ পরামর্শ করিতে-ছিলেন। ব্যাপারটা গোপনীয়। তাঁহাদের মুখে চোখে সে ভাবটা পরিস্ফুট।

নিকটেই একটা আট-চালায় কতকগুলি লোক আহারে ব্যস্ত। দধি, চিঁড়া এবং গুড়ের ফলার চলিতেছে। যে আসিবে সেই খাইতে পাইবে!

মুন্সিজী খাওয়া দাওয়ার তদারক করিতেছেন।

আট-চালার দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি প্রজাকে লইয়া রমজান তহশিলদার বেশ জমাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। তাহার বক্তৃতার বিষয়টা এই যে জমিদার তাহার হাতের মুঠার মধ্যে। তহশিলদার মহাশয়ের নির্দ্দেশমত তিনি উত্থান ও উপবেশন করেন—অর্থাৎ ওঠেন-বসেন। সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিতে পারিলে প্রজাদের সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই নাই। প্রজারা হাঁ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিল।

মাঠের মধ্যে দুই একটি গরুর গাড়ীও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গাড়ীর ছইএর ভিতর হইতে নানা জাতীয় উৎসুক ও চিন্তাগ্রস্ত লোক মুখ বাহির করিয়া আছে।

একজায়গায় সারি সারি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া নগ্নগাত্র কতকগুলি লোক বসিয়াছিল। তাহারা নিতান্তই গরীব প্রজা। তাহাদের আশ্বাস দিবার কিম্বা তাহাদের হইয়া কিছু বলিবার কেহ নাই। ইহাদের সংখ্যাই বেশী। তাহারা নিজেদের মধ্যেই চুপি চুপি কথা-বার্ত্তা বলিতেছে। চতুর্দ্দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন!

সহসা চতুর্দ্দিক সচকিত করিয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং নিমেষের মধ্যেই বিশাল অশ্ব-পৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠকায় দীর্ঘদেহ ব্যক্তি সেই প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমবেত জন-মণ্ডলী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল। আগন্তুক গম্ভীরভাবে শির ঈষৎ আনত করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করিলেন এবং সহিসের হাতে লাগাম ও চাবুক দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের অভ্যাগমে সমস্ত কাছারি বাড়ীটা গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রভুর অনুগমন করিলেন।

২

খানিকক্ষণ পরে।

জমিদার উগ্রমোহন সিংহ একটা উঁচু মসনদের মত আসনে বসিয়াছিলেন। রাখালবাবু—অর্থাৎ দেওয়ানজী —নিকটেই তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর কর্ণগোচরযোগ্য বিষয়গুলি একে একে বলিয়া যাইতেছিলেন। নিবিষ্ট চিত্তে

সিংহ মহাশয় সব শুনিতেছিলেন। আদ্যোপান্ত সব শুনিয়া তিনি আদেশ দিলেন "ডাক তাকে!"

সেই রুক্ষ প্রকৃতির যুবকটি আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া উগ্রমোহনবাবু পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি বল্‌বার আছে তোর! বিধবার গায়ে হাত দিয়েছিস্ কেন?"

ছোকরা আমতা-আমতা করিয়া কি খানিকটা বকিয়া গেল!

উগ্রমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব জানিস্? এই মহাব্বৎ খাঁ—"

সঙ্গে সঙ্গে সেলাম করিয়া লম্বা-চওড়া চেহারা চাপ-দাড়ী-সমন্বিত মহাব্বৎ খাঁ হাজির হইল।

উগ্রমোহন হুকুম দিলেন—"পঁচিশ্ জুতি লাগাও!—"

কম্পিত-কলেবর যুবককে লইয়া মহাব্বৎ খাঁ চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন আবার আদেশ করিলেন—"ওর বাপ্‌কে ডাকো—"

বৃদ্ধ বিশাই মণ্ডল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"তোমরা আমার জমিদারী ছেড়ে একমাসের মধ্যে উঠে চলে যাও। আমার জমিদারীতে তোমাদের স্থান নেই।"

—"হুজুর—"

"কিছু শুন্‌তে চাই না আমি। একমাসের মধ্যে যদি তোমরা উঠে না যাও—ঘরে তোমাদের আগুন লাগিয়ে দেব!—যাও!"

বিশাই চলিয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন—"ডাক সেই বিধবাকে—"

বিধবা আসিল ও তাহার সহিত তাহার দূর সম্পর্কের এক খুল্লতাতও আসিলেন। খুল্লতাত যেমনি সুরু করিলেন —"দোহাই হুজুর—আপনি হলেন আমাদের—" অমনি উগ্রমোহন সপদদাপে বলিয়া উঠিলেন—"চোপ্‌রাও! কে তোমাকে আস্‌তে বলেছে! এই কোন হায়!"

খুল্লতাত ত্বরিত গতিতে বহির্গমন করিলেন!

উগ্রমোহন তখন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গ্রামে এত মেয়ে থাক্‌তে তোমার গায়েই বা লোকে হাত দেয় কেন? জবাব দাও!"

বিধবা মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বিধবা মানুষ তোমার মাথায় অত খোঁপা কেন? দেওয়ানজী—"

"হুজুর—"

"এখনি নাপিত ডেকে এর মাথার চুল কামিয়ে দাও। আর ওকে বুঝিয়ে দাও যে আবার যদি ওর ওপর কেউ নজর দেয়—ওকেই আমি গ্রামছাড়া করব। সব প্রজাদের ত আমি দূর করে দিতে পারি না। যাও—"

"যে আজ্ঞা—"

বিধবাকে লইয়া দেওয়ানজী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দেওয়ানজী ফিরিয়া আসিলে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর আজ কি কাজ আছে?"

"আজ্ঞে কতকগুলি গরীব সাঁওতাল প্রজা এসেছে—তারা নিবেদন করছে যে—"

রূঢ়কণ্ঠে উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন—"তাদের নিবেদন তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। বুড়ো বয়সে ঘুস্ খাচ্ছ নাকি? ডাক তাদের—"

সেই নগ্নকায় প্রজার দল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের বক্তব্যটা উগ্রমোহন আগেই কি করিয়া যেন টের পাইয়াছিলেন। তাহাদের দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন —"খাজনা-পত্তর কিছু আনিস্ নি ত!"

তাহারা কহিল যে অগ্‌ঘানি ফসলটা ভাল না হওয়ার দরুণ তাহারা সম্পূর্ণ খাজনাটা আনিতে পারে নাই—হুজুর যদি অনুগ্রহ করেন এবং ভগবানের যদি কৃপা থাকে আগামী বৈশাখীতে তাহারা বাকীটা শোধ করিয়া দিবে।"

"আচ্ছা। এবার কিন্তু যদি শোধ দিতে না পার তখন আর কিছু শোনা হবে না।"

ইহা শুনিয়া একজন বৃদ্ধগোছের প্রজা প্রস্তাব করিল যে যদি তাহারা শোধ না দেয় তাহা হইলে হুজুর যেন তাহাদের নিকট হইতে সুদ আদায় করিয়া লন।

উগ্রমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"সুদ? বৈশাখীতে যদি না দাও জুতো মেরে আদায় করে নেব। সুদের হিসেব করবার আমার সময় নেই!"

প্রজার দল চলিয়া গেল।

দেওয়ানজীকে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর বাকী কি আছে?"

"আজ্ঞে, গোলক সাকে ডাকতে বলেছিলেন—সে এসেছে—"

"ডাক তাকে!"

গোলক্ সার নাম শুনিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখখানা ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল।

গোলক সাহা আসিলেন। গোলক সাহা এই অঞ্চলে তেজারতি কারবার করিয়া থাকেন। তাঁহার নামে লোকের ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায় এইরূপ জনশ্রুতি। তাঁহাকে দেখিয়া বোঝা দুঃসাধ্য যে তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে দশ পনর হাজার টাকা বাহির করিয়া দিতে পারেন। গোলক সার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখটি গোলক সদৃশ। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলক সাহা অত্যন্ত ভক্তিভরে ভূমিতে ললাটদেশ স্পর্শ করাইয়া উগ্রমোহনকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন আসিয়া গোলক সাহার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—"খুব বেশী টাকা হয়েছে—না?"

গোলক সা টাল্‌টা সামলাইয়া গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া উগ্রমোহন বলিতে লাগিলেন—"আজ এই দ্বিতীয়বার তোমাকে বলে দিচ্ছি, চন্দ্রকান্ত রায়কে তুমি টাকা ধার দিতে পারবে না! যদি দাও মুস্কিলে পড়ে যাবে।"

গোলক সা নয়নে অশ্রু আনিয়া বলিল—"চন্দ্রকান্তবাবু ত আপনারই সম্বন্ধী হুজুর। কি করে তাঁর আদেশই বা অমান্য করি!"

উগ্রমোহন বলিলেন—"তুমি আমার জমিদারীতে বাস করে আমার বিপক্ষ জমিদারকে টাকা দিতে পারবে না। তা সে আমার সম্বন্ধীই হোক্—আর যেই হোক্। বুঝলে? —যাও। আবার যদি খবর পাই যে তুমি চন্দ্রকান্তকে টাকা দিয়েছ—"

"আর কি দিতে পারি হুজুর!"

"যাও—"

গোলক সাহা চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "চন্দ্রকান্তের নামে সেই ফৌজদারীটা দায়ের করে দিয়েছ ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আসামী কাকে কাকে করা হয়েছে—"

"চন্দ্রকান্তবাবু, রাম পীরিৎ—অহঙ্কার পাঁড়ে"

"আচ্ছা। আর কিছু কাজ বাকী রইল না কি—"

"আজ্ঞে না। গোপাল পাশ করে এসেছে। আপনাকে প্রণাম করবে বলে বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"ডাক"

রাখালবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল আসিয়া প্রণাম করিল।

উগ্রমোহনবাবু বলিলেন—"বাঃ বেশ! দেওয়ানজী গোপালকে আমাদের হাবেলির চিকিৎসক করে বাহাল করে নাও। গোপাল ডাক্তারি পাশ করিয়া আসিয়াছে।"

কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া জমিদার উগ্রমোহন সিংহ অশ্বারোহণে কাছারী ত্যাগ করিলেন। ধাবমান অশ্বটার দিকে সকলে সভয়ে চাহিয়া রহিল।

প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের দুর্জ্জয় প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত না—তাহার কারণ এই যে যদিও তাঁহার জমিদারীতে গরু যথেষ্ট ছিল—কিন্তু একটিও বাঘ ছিল না!

৩

সন্ধ্যা আসন্ন।

পশ্চিম দিগন্তে মহাসমারোহে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ছোট, বড়, কালো, সাদা, স্তর, স্তূপ—সকল প্রকার মেঘেই অস্তগামী সূর্য্যের দীপ্ত প্রভাব। কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অস্তগামী রবির আলোক-সমুদ্রে যেন তাহারা ছোট ছোট দ্বীপ! বিভিন্ন ভঙ্গীতে সকলেই যেন এই বিরাট দৃশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অস্তালোকচ্ছটার বিচিত্র অভিব্যক্তির ঐক্যতানে চরাচর সম্মোহিত। প্রান্তর-লক্ষ্মী ক্ষুদ্র নদীটিও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তাহার ঊর্ম্মি-শিহরিত বক্ষেও এই শাশ্বত স্বপ্নের ক্ষণিক উৎসব! তরঙ্গে তরঙ্গে অবর্ণনীয় বর্ণ-বিন্যাস। সে যেন চঞ্চল গতি-বেগকে ক্ষণিকের জন্য সংহত করিয়া অস্তগামী সূর্য্যকে বর্ণ-অভিনন্দন জানাইতে ব্যগ্র!

দিগন্ত-প্রসারী সরিষার ক্ষেত্র—যেন দিগন্ত-প্রসারী একখানি সোণার স্বপ্ন—লক্ষ কোটি ফুলে আত্মহারা!

মাঠের আলের উপর দিয়া অশ্বারোহণে মন্থরগতিতে উগ্রমোহন এই দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সহসা তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন—ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া পরিচ্ছদাদি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুগৌর নগ্ন গাত্রে শুভ্র উপবীত মাত্র শোভা পাইতে লাগিল। চক্রবাল-রেখা-লীন সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে উগ্রমোহন উদাত্ত কণ্ঠে সূর্য্য বন্দনা করিলেন। হস্তে জলের অর্ঘ্য!

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্

ধ্বান্তারিং সর্ব্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

উগ্রমোহনের উদ্ধত শির সূর্য্য-প্রণামে অবনমিত হইল। সূর্য্য-প্রণাম শেষ করিয়া উগ্রমোহন মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সূর্য্য অস্ত গেল।

... ...

উগ্রমোহন যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। শিব-মন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি তখনও থামিয়া যায় নাই। তিনি অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া দেখেন তাঁহার পত্নী রাণী বহ্নিকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছেন।

মৃদু হাস্য-সহকারে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"উপস্থিত কার প্রেমে পড়েছ? জগৎ সিংহ, না—গোবিন্দলাল?"

বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন—"গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের!"

"সে আবার কে?"

"জগৎসিংহকে চেন—অথচ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে চেন না?"

"কি করে চিনব!—কখনও পড়িনি—ও নাম দুটো শোনা ছিল।"

এইবার বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া ছদ্ম-বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "এতকাল কি করেছ তাহলে!—আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ত এই সেদিন মাত্র! বঙ্কিমচন্দ্রও পড় নি?"

"তোমার দাদার মত উপন্যাস, কবিতা, গান, বাজনা নিয়ে থাক্‌ব এত বড় দুর্ম্মতি কোনকালে আমার যেন না হয়। আমার যৌবন কেটেছে কুস্তিগীরের সঙ্গে! ঘোড়ার পিঠে! উপন্যাস-হাতে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে নয়। তোমাদের অবশ্য ওসব সাজে—?"

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া উগ্রমোহনের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধি দীপ্ত আয়ত চক্ষু-দুটিতে তীব্র ব্যঙ্গ যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। কানের হীরার দুল দুইটি যেন দুলিয়া দুলিয়া উগ্রমোহনের এই শোচনীয় মূর্খতাকে নীরবে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। উগ্রমোহন এই নীরব ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় অভিভূত হইয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন—"দুদিনেই বোঝা যাবে—কে বেশী বুদ্ধিমান্—তোমার দাদা, না—আমি!"

বলিয়া তিনি মাথার পাগ্‌ড়িটা নামাইয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আলস্যভরে গা ভাঙিয়া দুই হাত কোমরে দিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারী এবার কথা বলিলেন—"তোমার বুদ্ধিও ত কম নয়। তা না হলে আমার দাদার দেওয়া বাণী নামটাকে বদলে 'বহ্নি' করে দিলে!"

"নামটা তোমার পছন্দ হয় নি?"

বহ্নিকুমারী এবারও কোন উত্তর দিলেন না। কেবল হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হাসিতে উগ্রমোহনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিলেন। উগ্রমোহন আবার বলিলেন—"তুমি ত আগুন। তোমার নাম কি বাণী মানায়? বহ্নিকুমারী তোমার উপযুক্ত নাম। পছন্দ হয় নি তোমার? আশ্চর্য্য!"

বলিয়া উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি সোফায় উপবেশন করিলেন। বহ্নিকুমারী নির্নিমেষ নেত্রে এতক্ষণ স্বামীর বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামী উপবেশন করিতেই—বহ্নিকুমারী বিনা ভূমিকায় গিয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া কহিলেন—"তর্ক থাক্—ছাদে চল! কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ!"

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, ঠিক করে বলত তোমার কাকে বেশী ভাল লাগে? আমাকে—না তোমার দাদাকে? কে ভাল—আমি না চন্দ্রকান্ত?"

বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সিংহে আর ময়ুরে তুলনা হয় কি ? চল ছাদে যাই !"

উভয়ে ছাদে গেলেন।

এই উপমাটায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সুপুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিতে দিতে তাই তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"বাঃ সুন্দর শানাইটা বাজছে ত। চমৎকার পূরবী ধরেছে।"

বহ্নিদেবীর চক্ষু দুইটি নীরব হাস্যে আবার প্রখর হইয়া উঠিল।

উগ্রমোহন পত্নীর চক্ষুর এই ভাষাময় বিদ্রূপ বুঝিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, পূরবী নয় ?"

"না, ইমন-কল্যাণ !"

শুনিয়া উগ্রমোহন মনে মনে আবার দমিয়া গেলেন। এ বিষয়ে বহ্নিদেবী যে সত্যই বেশী সমজদার এবং বহ্নিদেবীর মানসিক এই উৎকর্ষের মূলে যে চন্দ্রকান্তের প্রভাব বিদ্যমান তাহা অনুভব করিয়া উগ্রমোহন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। দূরে নহবৎখানায় ইমন-কল্যাণে শানাই বাজিতেছে। জ্যোৎস্না আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা বহ্নিদেবী বলিয়া উঠিলেন—"আমারই ভুল হয়েছিল। এ ইমন-কল্যাণ নয়, পূরবীই—"

উগ্রমোহন বলিলেন—"তাই না কি ?"

এমন সময় নীচে শব্দ শোনা গেল—"হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো—হুম্ ব্রো—"

উগ্রমোহন উঠিলেন। বলিলেন—"চন্দ্রকান্তের পালকি এল। যাই একটু দাবায় বসি "

উভয়ে নীচে নামিয়া গেলেন।

নীচে বৈঠকখানায় একটি গালিচার উপর বসিয়া দাবার ছকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন বসিয়া আছে। কে বলিবে এই চন্দ্রকান্তকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী করিয়া উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হুকুম দিয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রকান্তও যে আসিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উগ্রমোহনের একটা জলকর লুঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন—তাহাও তাঁহার মুখ দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব।

বহুকালাবধি এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। বৈষয়িক ব্যাপারে একজন আর একজনকে জব্দ করিবার জন্য অহরহ সচেষ্ট। অথচ প্রত্যহ সন্ধ্যায় দুই শালা-ভগ্নীপতির একত্র বসিয়া দাবা খেলা চাইই।

সন্ধ্যায় দাবার ছক লইয়া দুইজনে যখন বসেন—তখন তাঁহারা যেন পরম মিত্র। আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও সাম্‌নাসামনি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা আদালতে হওয়াই সঙ্গত—বৈঠকখানায় নহে ; যেমন দাবা খেলার আলোচনা বৈঠকখানাতেই শোভন, আদালতে নহে! ইহাই ছিল বোধ হয় উভয়ের মনোভাব !

চন্দ্রকান্তের ছিপ্‌ছিপে শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। গোলাকার মুখে শুকচঞ্চুর মত নাসা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। চোখে মুখে বুদ্ধির জ্যোতি ঝলমল করিতেছে !

একজন চাকর দুইটি রূপার গেলাসে করিয়া সিদ্ধি লইয়া আসিল।

উভয়ে নীরবে তাহা নিঃশেষ করিয়া আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

ভৃত্য গেলাস লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল !

৪

সেদিন সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সূর্য্যের দেখা নাই। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। পথে লোকজন নাই বলিলেই হয়। চন্দ্রকান্ত রায়—নিজের খাসকামরায় বসিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত রায় সৌখীন লোক। তাঁহার বসিবার ঘরটি তাঁহার নিজের রুচি অনুযায়ী সাজান। টেবিল চেয়ার নাই। প্রকাণ্ড ঘরখানা জুড়িয়া একখানি দূর্ব্বাদলশ্যাম মখমলের গালিচা পাতা। তাহার উপর কয়েকটি শুভ্র-ওয়াড়-পরান তাকিয়া। গালিচার মধ্যস্থলে একাণ্ড একখানি রূপার পরাত। পরাতের উপর সুদৃশ্য একটি গড়-গড়া—মীনার কাজকরা। ঘরের কোনে একটি মেহগিনি কাষ্ঠের তেপায়া এবং তেপায়ার উপর সোণা-রূপার কাজকরা একটি বড় ফুলদানি। ফুলদানিতে তিন চারিটি কেয়াফুল দাঁড় করান রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল—পরিষ্কার চুণকাম করা। একখানিও ছবি

নাই। সেতার এস্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র একটি কোনে ঠেসান রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত তন্ময় হইয়া বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। প্রিয় ওস্তাদ মিশিরজী তানপুরা হস্তে মিয়ামল্লারে গান ধরিয়াছেন—

বুঁদন ভিজে মোরি শারী,
অব ঘর জানে দে বনবারি।
এক ঘন গরজে, দুজে পবন বহত,
তিজে ননদী মোসে দেত গারী॥

কৃষ্ণের কাছে রাধিকার এই মিনতি গানের সুরে সুরে যেন কাঁদিয়া ফিরিতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। গড়গড়ার নল হাতে ধরাই আছে—তাহাতে টান দেওয়া আর হইতেছে না। এই প্রায়ান্ধকার নিবিড় বর্ষা-প্রভাতে তাহার সমস্ত অন্তর গানের তানে ভর করিয়া যমুনার কুলে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে তিনি যেন দেখিলেন একটি গৌরী কিশোরী এক শ্যামকান্তি কিশোরের দুটি হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে "ওগো আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই বর্ষায় আমার শাড়ী ভিজিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, জোরে বাতাস বহিতেছে। ননদী আমাকে গালি দিবে। এবার আমাকে ছাড়িয়া দাও—"

গান বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক। সুরের রেশ তখনও ঘরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন "কি চমৎকার!"

মিশিরজী দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন—"হুজুরের মেহেরবাণী।"

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে একজন বলিষ্ঠকায় জমাদার আসিয়া সেলাম করিল।

চন্দ্রকান্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি খবর, ছোটন সিং?"

ছোটন সিং বলিল—গতকল্য তাহারা হুজুরের হুকুম অনুযায়ী যে জলকরটি লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুই মণ মৎস্য তাহারা লইয়া আসিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে তাহা জানিবার নিমিত্ত দেওয়ানজী তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত রায় বলিলেন যে দেওয়ানজী যেন সমস্ত মৎস্যগুলি উগ্রমোহনবাবুর নিকট উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দেন। তাহার পর তিনি ছোটন সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন খুন জখম হয়েছে?"

"তেমন বিশেষ কিছু নয়। রামঅওতার সিপাহীর মাথায় একটু চোট্ লাগিয়াছে—তবে তাহা সাংঘাতিক কিছু নয়।"

"আচ্ছা যাও—"

ছোটন সিং সেলাম করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেল—গোলক সাহা আসিয়া কাছারি বাড়ীতে বসিয়া আছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"এইখানে পাঠিয়ে দাও।"

মিশিরজী বলিলেন—"হুজুর যদি হুকুম দেন—তাহলে এবার উঠি। আমার স্নানাদি কিছুই এখনও সারা হয় নি।" বলিলেন অবশ্য হিন্দীতে।

"আচ্ছা—"

মিশিরজী উঠিয়া গেলেন। গোলক সা প্রবেশ করিলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"সা-জি সাব—তারপর, খবর কি?"

গোলক সা সসঙ্কোচে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"খবর ভাল নয়!"

"ওরে ভজনা—তামাক দিয়ে যা—" চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা খানসামা আসিয়া কলিকা লইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত সা'র দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"খবর ভাল নয় মানে?"

গোলক সা নিম্নস্বরে উত্তর দিলেন—"ও তরফে আমার ডাক পড়েছিল। উগ্রমোহন বাবু আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে আমি যেন কিছুতেই আপনাকে টাকা ধার না দিই।"

চন্দ্রকান্তের চক্ষু দুইটি ক্ষণিকের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার শান্তভাব ধারণ করিল। তাঁহার টাকার আর দরকার ছিল না। তথাপি তিনি বলিলেন—"টাকা যখন চেয়েছি—তখন দিতে হবে বৈ কি।"

ভজনা খানসামা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে দ্বারদেশে দেখা দিল।

চন্দ্রকান্ত অতি ধীরভাবে বলিলেন—"আগামী বুধবার—অর্থাৎ পরশুদিন আমার গোমস্তা রাধিকামোহন তোমার কাছে যাবে।"

ভজনা খানসামা এইবার কলিকাটা বেশ করিয়া ধরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

গোলক সা কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"আমার অবস্থাটা হুজুর একবার ভেবে দেখুন। আমার যে ডাঙ্গার বাঘ জলে কুমীর গোছ অবস্থা হল—"

"বেশ—তুমি আমার জমিদারীতে এসে বাস কর। কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। পীরপুর বাজারে আমার নিজের একখানা খাস বাড়ী আছে। ইচ্ছে করলে কালই তুমি তাতে উঠে আস্‌তে পার—!"

ভজনা খানসামা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া নলটি প্রভুর হাতে দিয়া পিছু হটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গড়গড়ায় একটা মৃদু গোছের টান দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তাহলে ওই ঠিক রইল। পরশু দিন রাধিকামোহন যাবে।"

গোলক সা খানিকক্ষণ বসিয়া মাথা চুলকাইলেন। পীরপুরের বাসায় আসিবেন কিনা তাহাই ভাবিতেছিলেন বোধ হয়। কিন্তু তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন বোঝা গেল তাঁহার চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আমতা আমতা করিয়া তিনি কহিলেন—"লেখা পড়াটা তাহলে—"

"—রাধিকামোহনকে আমার পাওয়ার অব্ এটর্ণি দেওয়া আছে। সে সব ঠিক হবে। টাকাটা তুমি মজুত রেখো।" বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে তিনি তাম্রকুট সেবন করিতে লাগিলেন।

গোলক সা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া অবশেষে বলিল—"পীরপুরের বাসাটা—"

"হ্যাঁ—কালই আস্‌তে পার—"

গোলক সা বিদায় লইল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। অম্বুরি তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই চন্দ্রকান্ত জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন যে কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার বন্ধুগণ শিকার করিয়া ফিরিতেছেন। হাতী গেটে ঢুকিল দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বালাপোষখানা গায়ে দিয়া বারান্দায় আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইলেন।

হস্তীপৃষ্ঠ হইতেই একজন ভদ্রলোক চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওহে ভারি গুড্ লাক্। একটা ক্লরিকান্ পেয়েছি—"

হস্তী উপবেশন করিতেই তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"কায়েমও অনেকগুলো পেয়েছ দেখ্‌ছি—"

শিকারীদের মধ্যে আর একজন বলিলেন—"চখাও পেয়েছি গোটা তিনেক—"

কলরব করিতে করিতে সকলে অতিথি-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিকারীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিলেন। তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সে বৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করিয়া চন্দ্রকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভজনা খানসামা ঊর্দ্ধ-শ্বাসে একটা ছাতা আনিয়া প্রভুর মাথায় ধরিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"থাক্ দরকার নেই!"

অতিথি ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র দেখা গেল—সেখানে অতিথিদের জন্য ধুমায়িত গরম চা প্রস্তুত। তাহার সঙ্গে গরম ফুল্‌কো লুচি এবং গরম গরম মাছ-ভাজা।

তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সকলে প্রাতরাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন শিকারের গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন একজন সিপাহী আসিয়া খবর দিল যে ম্যানেজারবাবু কোন জরুরি দরকারে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

... ...

বাহিরে যাইতেই ম্যানেজারবাবু বলিলেন—"রমেশবাবু আজ বেলা তিনটা নাগাদ এন্‌কোয়ারি করতে আসবেন।"

"আচ্ছা—" বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রমেশবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উগ্রমোহন সিংহ চন্দ্রকান্তবাবুকে আসামী করিয়া যে মকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন তাহারই সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আসিতেছেন। পূর্ব্বেই এ খবর চন্দ্রকান্ত রায় জানিতেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কেহই বলিতে পারিবে না যে তিনি আত্মরক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন। উপরন্তু তিনি কলিকাতার নিমাইবাবুকে তার করিয়াছেন যেন তিনি অবিলম্বে সবান্ধবে আসিয়া উপস্থিত হন—এই সময়টা শিকার ভাল

জুটিবে। নিমাইবাবু ডুইজন বন্ধু লইয়া গতকল্য আসিয়া পৌছিয়াছেন। নিমাইবাবু চন্দ্রকান্তের সহপাঠী। ডুইজনে কলিকাতায় এম-এ পড়িতেন।

"আচ্ছা" বলিয়া চন্দ্রকান্ত ত ভিতরে চলিয়া গেলেন—কিন্তু বিমূঢ় ম্যানেজার কমলাক্ষবাবু প্রভুর এতাদৃশ ঔদাসীন্যের কারণ কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া করতল দুইটি উল্টাইয়া চোখমুখের ভঙ্গীতে নৈরাশ্য-মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কাছারী বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

... ...

বেলা তিনটার সময় রমেশবাবু ডেপুটি আসিলেন।

আসিয়াই তাঁহার নিমাইবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। নিমাইবাবু রমেশের ভগ্নীপতি।

"আরে নিমাই যে, তুমি কোথা থেকে ?"

গল্প জমিয়া উঠিল। চা-খাবার গান বাজনা সহযোগে জিনিসটা আরও উপভোগ্য হইল। চন্দ্রকান্তবাবু হাস্যমুখে অতিথি সম্বৰ্দ্ধনা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য রমেশবাবু রিপোর্ট দিলেন চন্দ্রকান্ত রায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। উগ্রমোহনের মামলা ফাঁসিয়া গেল!

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন বঙ্গে মুদ্রা

শ্রীললিতমোহন হাজরা

পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষের অভাব আজিকার মত আত্ম-প্রকাশ করে নাই এবং তাহার প্রয়োজনের তাগিদা এত বেশী দুর্ব্বার হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেদিন মানুষ সামান্য দ্রব্যেই আপন আশা মিটাইয়া চলিত। তখন তাহার মুদ্রার প্রয়োজন ছিল না। আর থাকিবেই বা কি জন্য? ক্রমে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার সমস্ত অভাব অনুভব করিতে লাগিল। সেই অভাবের তাগিদা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে তখন বাধ্য হইয়া নূতন প্রথার সৃষ্টি করিল। যাহাকে অর্থশাস্ত্রে বলে Barter system অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময়ে আপন আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করা—তাহাই আদিম মানব সমাজের মধ্যে দেখা দিল। এইরূপে কয়েক যুগ গত হইবার পর পুনরায় অভাব বাড়িয়া গেল। Barter system মহা মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এইবার তাহারা বার্টার প্রথা সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতন এক মুদ্রানীতি প্রচলন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা প্রস্তাব করিল যে যাহাকে মুদ্রা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে তাহার নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া যাক। এইখানে বলিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে এই মুদ্রা ধাতু নির্ম্মিত নহে। কোন জীবন্ত প্রাণীকে মুদ্রারূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। বার্টার প্রথা হইতে তফাৎ রহিল এই যে একটী মাত্র দ্রব্য বিনিময় করা চলিবে ও তাহার এ মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। এইখানে এক প্রশ্ন উঠিতে পারে মুদ্রা কাহাকে বলে? "মুদ্রা"র সংজ্ঞা অনেকে অনেক কিছুই লিখিয়াছেন। আমার মনে হয় মিঃ ইলির সংজ্ঞাটী সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য। সেই সংজ্ঞাটী হইতেছে "Money is anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and which is finally discharged as the payment of debts." অর্থাৎ মুদ্রা মানুষের দেনা পাওনা মিটান সম্পর্কে মধ্যস্থ হইয়া কাজ করিয়া থাকে এবং এই ভাবে নানা মানুষ ও দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের সুবিধা করিয়া দেয়। "ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে জামিন-স্বরূপ দাঁড়াইয়া বিক্রেতাকে বলিতে থাকে, 'তুমি তোমার পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য দাবী করিও না, তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমার সকল প্রয়োজন মিটাইব।" (১) এই মুদ্রানীতি কি ভাবে ও কখন আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত হইল সেই কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

খৃঃ পূঃ ৮০০—৬০০ সাল ব্রাহ্মণ-যুগ। এই যুগে মুদ্রার রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল। জীবন্ত প্রাণীর পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যের আমদানি হইল। "কড়ি" তৎকালীন দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড মুদ্রা (standard coin) রূপে পরিণত হইল। "কড়ি" দেশের চলিত মুদ্রারূপে প্রচলিত হইল এবং দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে মধ্যস্থ হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিত। এই মুদ্রা দেশে বহু যুগ ধরিয়া প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলের ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা এই দেশে প্রচলিত ছিল। আবার অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন মুসলমান আমলেও এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কড়ি" দেশে মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল। "কড়ি" পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক গ্রামে এখনও বেশ চলিত আছে। তবে সামান্য ও স্বল্প মূল্যের ক্রয়কালীন এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গেও এই মুদ্রা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রচলিত ছিল

(১) শ্রীঅনাথ গোপাল সেন—"টাকার কথা"।

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবলমাত্র "কড়ি" বঙ্গদেশেই যে মুদ্রার কার্য্য করিত তাহা নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই মুদ্রানীতি যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত ছিল। "কড়ি" মুদ্রাজগতে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। "টাকাকড়ি" ও "পয়সাকড়ি" তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। জাতকে কড়ির (সিপ্পিকানি) কথা নাই বলিলেও চলে। জাতকে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় এই সময়ে "কড়ি"র প্রচলন প্রায় একরকম উঠিয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় "কড়ি" মুদ্রাজগতে এত বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে নব-প্রবর্ত্তিত মুদ্রা 'অবকস্'এর মূল্যের হার কড়ি দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অবকসের অন্য নাম "বট্‌স্কক"। "বট্" কথার অর্থ কড়ি কিন্তু এইখানে মুদ্রা অর্থেই ব্যবহৃত হইত। জাতক হইতে (শ্রীঅনাথ গোপাল সেন—"টাকার কথা") বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলিত হয় উত্তর ভারতে। আর ইহাও বেশ বোঝা যায় যে ধাতুমুদ্রার সৃষ্টির পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কড়িই একমাত্র মুদ্রারূপে বলবৎ ছিল। ধাতুমুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে "কড়ি" মুদ্রা লোপ পাইয়া বসে। "কড়ি" মুদ্রাকে হীন বা অন্তজ মুদ্রা Base or token Money) বলা হইত।

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মুদ্রাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র চিহ্নিত। ছিদ্রগুলি কেবলমাত্র মুদ্রাগুলিকে চিহ্নিত করিবার জন্য করা হইত। রৌপ্য মুদ্রাগুলিকে বলা হইত "পুরাণস্" বা "ধরণাস্।" রৌপ্যমুদ্রাগুলির ওজন ছিল ৩২ রতি বা ৫৬ গ্রেণ। তাম্রমুদ্রাকে বলা হইত "কার্ষপানস্" এবং ইহাতে ৮০ রতি বা ১৪৬ গ্রেণ তাম্র থাকিত। এই সমস্ত মুদ্রা বহুযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারতে প্রথম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিক পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে বেশ প্রচলিত ছিল। তাম্রমুদ্রাগুলিই সর্ব্বপ্রথমেই প্রস্তুত (manufactured) হইয়াছিল। ইহার পরে রৌপ্য মুদ্রার সৃষ্টি এবং প্রচলন হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে বহুযুগ ধরিয়া যথাক্রমে নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি প্রচলিত ছিল :—

১। কার্ষপানস্ (ইহাকে "পান্" বলা হইত) ২। অর্দ্ধকার্ষপানস্ বা অর্দ্ধপান ৩। সিকি কার্ষপানস্ বা সিকিপান ৪। মাসক ৫। অর্দ্ধমাসক এবং ৬। কাকনিকা। এই সমস্ত মুদ্রা তাম্র-নির্ম্মিত। মূল্যও যথেষ্ট স্বল্প।

পূর্ব্বে যে ছিদ্র চিহ্নিত মুদ্রার কথা বলিয়াছি তাহা বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা জেলার ভৈরব বাজার হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত এক গ্রামের জনৈক কৃষকের গৃহ হইতে অনেকগুলি ছিদ্র চিহ্নিত মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। ঢাকার মিউজিয়মে ৯৩টী এই মুদ্রা রক্ষিত আছে। আরও অনেকগুলি মুদ্রা ঐ কৃষক গলাইয়াছিল। পরে অনেকগুলি অর্দ্ধগলিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঐ মুদ্রাগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় ঐগুলি পাটনা এবং ব্যারোখাট সহরে যে সমস্ত ছিদ্র চিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল তাহাদেরই অনুরূপ। 'চক্র' চিহ্নিত ও 'তিন ছাতা' মুদ্রাগুলিই খুব সাধারণ ধরণের। ঐগুলি এখনও অনেক গৃহে পাওয়া যায়। অনেক মুদ্রার মধ্যে "সারি সারি বৃক্ষ" "স্বস্তিকা" "নন্দপদ" "কুকুর" "ষাঁড়" "হাতী" এবং নানা প্রকারের মেরু বা পাহাড়ের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি অতি সাধারণ মুদ্রা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এমন অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যাহার চিহ্নের কোনরূপ অর্থ ঠিক্ না হওয়ায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'তিন-ছাতা" মার্কা মুদ্রার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা প্রয়োজন। মুদ্রার ঠিক মধ্যস্থলে ছাতা তিনটী এক সঙ্গে বাঁধা থাকিত এবং সেগুলিকে এমনভাবে সাজান হইত যেন তিনটী ছাতা ঠিক বৃত্তাকারে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ছাতাই ছিল তৎকালীন রাজকীয় ক্ষমতার চিহ্ন।

মগধ সাম্রাজ্যের চিহ্ন 'চক্র'। "চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার বংশধরগণের আমলের মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায় চক্র। বগুড়ার নিকটে মহাস্থান-অনুশাসন লিপিতে 'গণ্ডা" নামক এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। ডাঃ বড়ুয়া বলেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে কাকনিকা মুদ্রার উল্লেখ আছে এই গণ্ডা মুদ্রাই ঐ সর্ব্বনিম্ন মুদ্রার এক অংশ। গণ্ডা মুদ্রার মূল্য চারি কড়ি। কেবলমাত্র তাম্রমুদ্রাই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। তাম্রমুদ্রাগুলি বঙ্গে নির্ম্মিত হইত না। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানি করা হইত। তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রার "রেশিও" সমস্যার কিরূপে সমাধান হইত তাহা দেখা যাক্। এক তোলা রৌপ্য ছয় তোলা তাম্রের সমতুল্য (১:৫:৭)। তাহার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ যখন বঙ্গদেশের সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসা আরম্ভ হয় তখন ঐ পুরাণস্ বা ধরণাস্ বঙ্গদেশে আসিতে লাগিল এবং পাওনাদারের দাবী মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। ইহা ব্যতীত অনুশাসন লিপিতে আরও তিন প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। তবে এ মুদ্রা সকল সময়ে মধ্যস্থ হইয়া কোন কার্য্যাদি করিত না। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে এই মুদ্রার প্রচলন করাইয়া রাজভাণ্ডার পূরণ করা হইত। যুদ্ধ বা বিদ্রোহের সময় এই মুদ্রাকে বাজারে চালান হইত।

অনিবার্য্য

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

এতক্ষণে সুলতার মনে হইল—সে বাড়ী পৌছিতে পারিবে।

ওই তাহার দেশের মাটি, তাহাকে চোখ বাঁধিয়া ঘাটে নামাইয়া দিলেও সে বলিতে পারিত। ঐ ষ্টীমার আর নৌকার সংযোগস্থল যে তাহার আশা-নিরাশার হাসি-কান্না মিশিয়া অপরূপ হইয়া আছে। ষ্টীমার হইতে নামিয়া মাটিতে পা রাখা মাত্র তাহার রোমাঞ্চ সুরু করে। তার পর নৌকাযোগে দীর্ঘ সাত আট মাইল রাস্তা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর পৌছান গেল না। তাহাদের গ্রামের নীচে যে খাল বহিয়া যাইতেছে, সেই খালই তো এই ষ্টীমার ঘাটের ফ্ল্যাটের তলায় ঘা খাইয়া খাইয়া মরিতেছে। খাল বেশ উছল হইয়া উঠিয়াছে আজ!

চলন্ত জলদুর্গ দুর্গম জলধি পার হইয়া দীর্ঘ পথশ্রমে মাতালের মত টলিতে টলিতে এইবার নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এতক্ষণে তাহার দেহে প্রাণ ফিরিয়াছে। যাত্রীরা তো অকুল সমুদ্রে তাহারই স্কন্ধাশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যায়; আর যত বিপদ আর ঝক্কি পোহাইতে হয় তাহাকে। অবিরত পক্ষসঞ্চালন আর মুহুর্মুহু ধূম উদ্গীরণ করিয়া সে এতগুলি প্রাণীর দায়িত্ব-ভারে হাঁপাইয়া ওঠে—আর ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

ষ্টীমারের একদিকে যাত্রীরা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ষ্টেশনের পানে চাহিয়া আছে। যাহারা নামিবে, তাহাদের কাহারও বিছানা বাঁধা তখনও হয় নাই। যে একা, সে বাম কুক্ষিতলে ছোট্ট সতরঞ্চ-মোড়া বিছানা আর ডান হাতে ষ্টীলের তোরঙ্গ লইয়া প্রস্তুত হইয়াই আছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা যাত্রীর বিশ্রামাগারের দরজায় গিয়া ডাকিতেছেন—কই বৌমা, দাদুকে দাও আমার কাছে, তুমি বরঞ্চ—

ওদিকে ততক্ষণে ষ্টীমার ভিড়িবার উদ্যোগ-কোলাহল শুরু হইয়া গেছে। পূর্ব্ববঙ্গের খালাসীদের অপূর্ব্ব ভাবার মধ্যস্থতায় ভাসমান তরী তীরে লাগি-লাগি করিতেছে। সুলতার তো সেই কখন বিছানা বাঁধা হইয়া গিয়াছে—দু'টি প্রাণীর বিছানাই তো! তাহার ইচ্ছা হইল, একবার ছুটিয়া গিয়া আর সকলের মতই রেলিঙ্ ধরিয়া দাঁড়ায়! কিন্তু আর সব যাত্রীরা যদি কিছু মনে করে—তাহারা যে জানিয়া ফেলিয়াছে যে, পরমেশ তাহার স্বামী।

বাঃ, তাই বলিয়া বুঝি সে একবার দেখিবেও না, ছোট বোনকে লইয়া যাইতে দাদা ষ্টীমার ঘাটে আসিল কিনা!

পরমেশ মালপত্র গুণিতেছিল, সুলতা চুপি চুপি কহিল—ওগো, ছাখো না দাদা এয়েছেন কিনা, বাবাও হয়তো আস্‌তে পারেন—

—বা রে, ষ্টীমার ভিড়্‌লে বুঝি দেখা যা'বে না!

দূর হইতে ভিড়ন্ত ষ্টীমারের বুকে বসিয়া অভ্যর্থনা-কারীকে দেখিতে পাইবার যে কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, তাহার বিন্দুমাত্র কৌতূহলও কিশোরী সুলতা বিজ্ঞ স্বামীতে পৌছাইতে পারিল না। সে ক্ষুণ্ণস্বরে শুধু কহিল—তা' যা'বে—

পরমেশ ততক্ষণে ছোট দুইটি জিনিষ হাতে উঠাইয়াছে।

ষ্টীমার ভাল করিয়া না ভিড়িতেই একপাল কুলী আসিয়া উঠিল। কাহারও নীল কোর্ত্তা ও উর্দ্দির সম্মান আছে—কাহারও বা নাই। পরমেশ না কহিতেই তিন চারজন আসিয়া মালপত্র নিয়া কাড়াকাড়ি সুরু করিয়াছে। সকলেই বলে—সেই প্রথম ধরিয়াছে। এদিকে যতক্ষণ পরমেশ দরাদরিতে ব্যস্ত, ততক্ষণে অবগুণ্ঠন-অন্তরালে দুটি কাল চোখ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। কি দরকার—সামান্য দু'চার পয়সার জন্য মহামূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া! অতি মিতব্যয়ী সুলতাও আজ হঠাৎ মালবাহকের দারিদ্র্যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরমেশের আর শেষই হয় না, সে-ও যেন জেদ ধরিয়াছে। ক্রুদ্ধ বিরক্ত স্বরে পরমেশ বলিতেছে—যা', লাগবে না তোদের কারুকে, আমি একাই পারবো—

কাঠের সিঁড়ির সেতু পার হইয়া মাটিতে পদার্পণ করিতেই সুলতার মন সুমুখের কূলে কূলে ভরা নদীর মতই উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতেছে—ঐ ভাঙা ভাঙা বালুর পাড় বহিয়া সে এক ছুট দিবে। দিক না-ই বা জানা থাকিল, তবু বাপের বাড়ী সে পৌছিতে পারিবে।

কুলীর সঙ্গে দরাদরি যদিই বা শেষ হইল, মাঝিদের আবার নতুন উৎপাত!

—পারুম না কত্তা, আষ্ট গণ্ডা পয়সা ধইরা দিয়েন, লয়েন লয়েন ওঠেন দেহি···। কেহ বলিতেছে—আইজ্ঞা হ, আপনেগো বারী আর চিনিনা, পাশের গেরামেই তো আমাগো মামারা থাকেন—ইত্যাদি নানারূপ আহ্বানে প্রত্যাখ্যানে ষ্টীমার ঘাট মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ষ্টীমারও ছাড়িয়া দিল; আবার আসন্ন পথচলার দায়িত্বে জলপোত যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, তাহার কয়লার গুঁড়ায় সুলতার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। পুচ্ছসঞ্চালনের ঢেউয়ে ঐ তো নৌকাগুলি দুলিতেছে।

ঐ পরিবারটিই বেশ কিন্তু, কেমন নৌকায় গিয়া উঠিল। পরমেশ একেবারে কি যেন!

গায়ে হলুদের দিন সন্ধ্যাবেলা পান্‌সিতে, নৌকায় ছ' সাতখানা আসিয়া ঘাটে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ধরণের বিবাহ—বরযাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের মত বিবাহের দিন সন্ধ্যায় আসিয়া বিবাহ দেখুক না দেখুক, লুচি তরকারী গিলিয়া বিদায় হয় না; বিবাহের দিন দুই পূর্ব্বে আসিয়া দুই দিন পর পর্য্যন্ত অন্ততঃ থাকে। আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় তাহাদের বরযাত্রীসুলভ অযথা অত্যাচার। পান হইতে চুণ খসিলেই কথায় কথায় ভয় দেখায়—লইয়া যামু ম'শয় পোলা ফিরাইয়া—দিমু না এই ছোট-লোকের বাড়ীতে—

যাহারা বয়স্থ বা বরের নিকটাত্মীয়, তাহারা বেশীর ভাগই রা-টি পর্য্যন্ত করেন না। এ সব উক্তি বরের বন্ধুদের। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে টীন-টীন দামী সিগারেট ধোঁয়াইয়া, ঝুড়ি ঝুড়ি পান চিবাইয়া, পানের পীচে ঘরবাড়ী নোংরা করিয়া, এই কয়দিন তাহারা সাময়িকভাবে ভোগের স্বর্গপুরে চলিয়া আসেন। পলে পলে টেরি কাটিবার বাহারে ও সস্তা সুগন্ধিতে এই কয়টা দিন তাঁহারা মুকুটহীন রাজপুত্র। মেয়ের বাপ তখন গলবস্ত্রে কন্যাদায় উদ্ধারের যূপকাষ্ঠে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন।

এমনি শত সহস্র আব্‌দার সুলতার বাবাকেও পালন করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সত্যই লগ্ন আসিল। সামান্য বাজনার সমারোহে ছোট্ট গ্রামখানির কিয়দংশ মুখর হইয়া উঠিল। ভাড়া-করা গ্যাসের আলো, আর পোড়া কারবাইডের গন্ধে একটি রাত্রিতে বাড়ীটার চেহারাটা বদলাইয়া গেল।

বিবাহের কথাটা সুলতার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। কি একটা মোহের মধ্যে যেন সন্ধ্যা হইতে বিবাহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। সুধু মনে পড়ে—সতী, মণি, হেনা, শেফালী—ওরা চন্দন দিয়া কপাল লেপিয়া দিয়াছিল, তারপর আলোকিত বিবাহ-বাসর, লোকজন, বাজনা ইত্যাদির মধ্য দিয়া সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়াছিল বাসর ঘরে গিয়া। শুভদৃষ্টির সময় পরমেশের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই, জোর করিয়া চিবুক তুলিয়া ধরিতে সে যেন দেখিয়াছিল—একটা রাক্ষসের মুখোমুখি সুলতা দাঁড়াইয়া।

তারপর প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে মিটি মিটি জ্বলিতেছে বরণডালার তৈলপ্রদীপ, বিশাল খাটের বার্ণিশের গন্ধ, একটু একটু মনে আছে বটে! সারাদিন না খাওয়া, আর এই আনুষ্ঠানিক অতি-আচার—। শরীর অবসন্ন, মন ভারাক্রান্ত, অপ্রসন্ন! অপরিচিত পুরুষ-দেহের সান্নিধ্যে সুলতার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

এক দাঁড়ের নৌকা, মন্দগতিতে সাঁতার কাটিতেছে, পুচ্ছ সঞ্চালনের আওয়াজ হইতেছে—ছপ্···ছপ্···

সুলতার চমক ভাঙিল, পরমেশের ডাকে—

—ঘড়ির চেনের বাক্‌সোটা বাইরে বার করে রেখেছিলাম, ক্যাশ বাক্সে তুলেছিলে তো—?

—বাঃ, তখুনি তো রাখলুম তোমার চোখের সুমুখে। এই অতি মনোরম পূর্ব্বাচলের স্মৃতিস্বপ্নের সুখ ভাঙিবার জন্য সুলতার রাগ হইল, না হইলে সে বলিত—এই ভুলো মন নিয়ে অফিসে কাজ করো কি ক'রে?

খালের দু'ধারে গ্রাম্য শ্যামলতা সুলতাকে আজ যেন

নূতন বেশে মুগ্ধ করিল। হইবে না? সেই কবেকার কথা—আজ চার বছরেরও উপর। সেই এই পথে গিয়াছিল, তখন চোখ তাহার অশ্রুতে ছিল ঝাপ্‌সা। নববধূ সে এক কোণে কাপড়ের পুঁটলীর মত বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কি আর শোভা অবলোকন করা যায়! তাতে আবার আকণ্ঠ অবগুণ্ঠন!

ছোট খাল—বর্ষার আগন্তুক জল তখনও কূল ছাপিয়া পাড়ের খানিক দখল করিয়া ডাঙ্গার রহস্য দেখিতেছে, আর আগাছায় শাখা আনত হইয়া সেই জল চুম্বন করিতেছে। আর তার উচ্চস্তরের গাছপালা একমেটে হইয়া আছে। ছোট ছোট কি সব পাখী কিচির-মিচির করিয়া একটি সুমধুর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে!

—কই যাও, কৈখনে আইলা—?

সুলতাদের মাঝি লগি খোঁচাইতে খোঁচাইতে উত্তর করিল—

—মেইলের লোক, যাইব ঐ···কি না কয়, এই তো আইয়া পড়ছি, তুমি?

নৌকাখানা ঐ নৌকা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল—ঐ মাঝি কি উত্তর করিল, সুলতার কর্ণে পৌছিল না!

ইতিমধ্যে পরমেশ দু'চার বার একথা সেকথা বলিয়া সুলতার ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে। সুলতা প্রয়োজনীয় উত্তরটুকু দিয়াছে সুধু। এইবার সুলতা খুশী হইয়া পরমেশের পায়ে ছোট্ট একটি চিম্‌টি কাটিয়া শুধাইল—ওগো, কত দেরী আর, মাঝি যে বল্‌লে—এসে পড়েছি!

পরমেশ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে চুপ করিয়া রহিল, কারণ এবার তার পালা।

সুলতা আবার বলিল—কত দেরী বল না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, সন্ধ্যার আগে পৌছুতে পার্‌বো তো?

পরমেশের কপট অভিমানের অভিনয় শেষ অঙ্কে পৌছিলেও যবনিকা পড়ে নাই, বলিল—কি জানি, জানিনে যাও—

সুলতাও এবার চুপ করিল। না বলিল পরমেশ কথা! সে আজ যে জায়গায় চলিয়াছে, সেখানে পরমেশ হইতে পরমাত্মীয় লোক আছে। যেখানে সে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর মানুষ, যেখানে তাহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে তাহার চেয়ে আর চার বৎসরের পরিচিত পরমেশ বেশী আপনার নয়।

তাহার যখন তিন চারি বৎসর বয়স তখন তাহার মা মারা যান। তারপর হইতে বাবাই দুইটি আসন পূর্ণ করিয়া বসিয়াছিলেন। মা'র কথা তাহার ভাল মনে নাই, মা থাকিলে এই যে দীর্ঘ চার বৎসর সে স্বামীর ঘর করিল, ইতিমধ্যে অন্ততঃ চারবারও সুলতাকে আনাইতেন। বাবাকেও সুলতা বহু পত্র লিখিয়াছে, উত্তর নাই একখানারও। কিন্তু সুলতা তো এটুকু জানে না যে, পরমেশ পিতার সব পত্রই গোপন করিয়াছে। না করিয়াই বা পরমেশের উপায় কি? পত্রের প্রত্যেক ছত্রে লেখা—সুলতাকে ছেড়ে থাক্‌তে পাচ্ছি না, সুলতাকে পাঠাও, সুলতাকে স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে, সুলতাকে পত্রপাঠ নিয়ে এস! কিন্তু গরীব রেলোয়ে কেরাণীর পক্ষে পাচিকাকে দীর্ঘ ছুটি দেওয়া যেমন অসম্ভব, আর অতদূরের পথে উপযুক্ত সহযাত্রী জোগাড় করা বা স্বয়ং গিয়া রাখিয়া আসা তারও চেয়ে অসম্ভব।

যে মাকে সুলতা দেখে নাই, তাঁরই পবিত্র স্মৃতিতে কখন তাহার চোখ ভিজিয়া উঠিয়াছে। আঁচলে চোখ মুছিতেই পরমেশ বলিল—একেবারে ছেলেমানুষ, ঠাট্টাও বোঝে না; এই তো আমরা সত্যি এসে পড়েছি!—তাহার কণ্ঠস্বরে আদর মাখান।

কিন্তু পিতার উপর অভিমানে কান্না যেন আর থামিতে চাহিল না, সে বাঁধা বিছানাটায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই কবেকার কথা, বিবাহের পর এই সে প্রথম বাপের বাড়ী চলিল, অন্য মেয়েরা কতবার যায় আসে। বাবা যেন কোনমতে কাঁধ হইতে বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

পরমেশ ততক্ষণে আরো একটু ঘেঁসিয়া বসিয়াছে—দেখ, নৌকার মধ্যে কি ছেলেমানুষী সুরু করলে।

অনেক কথাবার্ত্তায়ও সুলতার কান্না থামিল না—পরমেশ প্রমাদ গণিল।

পশ্চিমের ছোট্ট শহর। চারিদিকে লাল মাটি কাঁকর আর পাথর। না আছে সবুজ গাছপালা, নদী বা খাল—না আছে রকমারি-স্বরের পাখী। এক কথায় বাংলাদেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন সামঞ্জস্যই নাই।

ধূলা উড়াইয়া একদিন অপরাহ্ণে একখানা ট্যাক্সি নবনির্ম্মিত কোয়াটারে আসিয়া থামিল। তিন চারিটা তোরঙ্গ, গোটা দুই বিছানা আর এটা-ওটা-সেটা—পথশ্রমে রুক্ষকেশ, ক্ষুৎক্লিষ্ট দুইজন যাত্রী। পুরুষটি ভাড়া মিটাইয়া একটা বাড়ীর কড়া নাড়িয়া ডাকিল—সুরোদিদি, বাড়ী আছ?

মেয়েটি অকূল পাথারে পড়িল। না আছে বাসা ঠিক, না আছে খাবার-দাবার!

দরজা খুলিয়া একটী কচি মুখ উঁকি দিল, পরমুহূর্ত্তেই বাড়ীর ভিতর কচি কণ্ঠের চেঁচামেচি শোনা গেল—ও মা, দেখ্‌বে এসো, মামাবাবু এসেছেন—

সুরমা তখন হয়ত নবজাত শিশুকে লইয়া একটু চোখ বুঁজিবার চেষ্টায় ছিলেন। কোনরূপে উঠিয়া কাপড় চোপড় সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

পুরুষটি শুধাইল—আমার চিঠি পাওনি সুরোদি?

নবীনা বধূর দিকে তাকাইয়া সামান্য অপ্রস্তুতের হাসি হাসিলেন সুরমা—না তো! আজ বিকেলে পৌঁছুবে হয়তো, তোমার তো চিরটা কালই এম্‌নি হ'য়ে এল!—হঠাৎ সপ্রতিভ হইয়া নববধূর হাত ধরিয়া টান মারিয়া কহিলেন—এস ভাই, বাড়ীর ভেতর চল!

প্রবাসে বাঙালী—সবাই ভাই ভাই আর না হইয়াই বা উপায় কি? যদিও সুরমা পরমেশের গ্রামসম্পর্কে দিদি, না হইলেও এইরূপ আতিথেয়তা অপরিচিতেরাও পায়।

সেই একবেলা সুলতার হাঁড়ি ঠেলিতে হয় নাই। তারপর হইতে সূর্য্যোদয়ের মত অবশ্যম্ভাব্যতায় তাহাকে ছোট্ট সংসারের যাবতীয় কাজ করিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে যে কখনও সুলতার শরীর খারাপ হয় নাই এমন তো নহে, তাহা গোপন করিয়াই পতিদেবতার সেবা করিয়াছে সে। এই তো গত মাস চার পাঁচ যাবত তাহার শরীর নিতান্ত খারাপ যাইতেছে, এ না হইলে তো এখনও পশ্চিমের শহরেই পচিয়া মরিতে হইত—এদিকে পা বাড়াইতে পাইত না!

সুলতা স্থির করিল—পিতার সঙ্গে গিয়া সে কথাটি পর্য্যন্ত কহিবে না। যে পিতা এমন নিষ্ঠুর যে একটিমাত্র মেয়েকে রাখিয়া অনায়াসে আছেন, কি হইবে তাঁহার ওখানে গিয়া। মনে হইল, পরমেশকে ডাকিয়া বলে—চল, আমরা ফিরে যাই—

সুলতার চোখের জলে যখন এই সমস্ত করুণচিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে ততক্ষণে পরমেশের, সুলতার অভিমান ভাঙাইবার অভিনব উপায় মনে পড়িল। এ ইঙ্গিতটি তাহাদের অন্ধকার ঘরের দ্বৈত-শয্যার হাসির উৎস; আমরা এটির উৎপত্তির কথা বা ঐটুকু সাধারণ কথার রহস্যের অসাধারণত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না। পরমেশ কি একটা বলিতেই সুলতা কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠিল। পরমেশ বলিল—বারে—হাসে কাঁদে, পাগল আর কি?

কিন্তু সুড়সুড়ি লাগার মত সাময়িক জোর-করা হাসি সেটা। পরমুহূর্ত্তেই সুলতা আবার বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে। আর কিছুদূর আছে তাহাদের জলপথ, তারপর ডুলীযোগে মাইল দেড়েক রাস্তা।

সুলতা ভাবিতে লাগিল:—

ঘাটে নৌকা ভিড়িয়া আছে—সুলতার পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল নৌকাঘাটে। পাল্কীর প্রায় সাথে সাথেই আসিয়াছেন—সুলতার বাবা, দাদা। আর কে-ই বা আসিবেন?—আর তো কেউ নাই! দুই চারিজন প্রজা সুলতার মোট ঘাট লইতে আসিয়াছে।

সুলতা কাঁদিতেছে, সুলতার বাবা কাঁদিতেছেন।

সেই স্নেহপরায়ণ প্রৌঢ় আজ এই চারি বৎসরে এমন করুণালেশহীন পাথর হইয়া গেলেন কি করিয়া—সুলতা তাহাই ভাবিতেছিল। তিন চার বৎসর বয়স হইতে যে পিতা অক্লান্ত সেবায় মাতৃহীনা বালিকাকে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার কথা স্মরণ হইতেই একটা চাপা কান্নায় সুলতার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

তখন হইতে কিন্তু সুলতা পিতাকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই—বাড়ী মানেই পিতা, পিতা মানেই বাড়ী যে তাহার কাছে। কেবলই মনে হইতেছে নৌকাঘাটে একটি প্রৌঢ় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। চোখে চশমা, শরীরে অপরিমিত স্বাস্থ্য, মনে আনন্দ, মুখে সদাহাস্য। সন্তানের মুখ চাহিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই—ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাস্থ্যটি বেশ চমৎকার আছে কিন্তু। সুলতা

চারিদিকের বিগত-দার বৃদ্ধের পুনঃ পাণিপীড়নের কথা শুনিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে পিতাকে সভক্তি প্রণাম না করিয়া পারে না। সুলতার মা যখন মারা যান, পিতার তখন কতই বা বয়স!

একটি কথা মনে পড়িতেই কিন্তু তাহার মন খুশী হইয়া উঠিল। নিজে সে পিতাকে বলিতে পারিবে না—পরমেশও নিশ্চয়ই নিজে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না! তবে? কিন্তু এই বালিকার তো জানা নাই যে, চার পাঁচ মাস ক্রমাগত শরীর খারাপ হওয়ার অর্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বলিয়া দিতে হয় না। সুলতা শীঘ্রই মা হইবে।

হঠাৎ একটা ধাক্কায় সচেতন হইয়া সুলতা চাহিয়া দেখে—নৌকা ঘাটে ভিড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে পরমেশ আর একটি কথাও কহে নাই।

কিন্তু নৌকাঘাটেও তো কোন লোক নাই। সুলতা শুধাইল—

—তবে কি তুমি চিঠি দাওনি নাকি, কেউ নেই যে ঘাটে?

—কে আস্‌বেন বল তো, তোমার দাদা থাক্‌লে হয়তো আসতেন!

—কেন, দাদা কোথায়, বাড়ীতেই তো আছেন!

—না, ওঃ হো, তোমায় বল্‌তে ভুলেই গেছি; একটা মোকদ্দমায় তাঁর একটু শহরে যাবার কথা ছিল!

সংবাদ না পাওয়ায় কোন ডুলীর বন্দোবস্ত করা গেল না! মাঝিরা মালপত্র লইল—হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

তখন বেলা অপরাহ্ণ—ক্ষুধায় পিপাসায় প্রাণ দু'জনেরই কণ্ঠাগত। সুলতার তো পিতৃভবনে যাইবার আনন্দে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ না-হয় নাই, পরমেশের পা কিন্তু অচল!

সুলতার বারে বারেই মনে হইতে লাগিল—চিঠি তাঁহারা পান নাই। তাহা হইলে ঘাটে পর্য্যন্ত কেহ নাই কেন?

যাক—বহুবর্ষ পরে পিতাকে দেখার অদম্য আনন্দে দুহিতার দেহে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতেছে। সদাহাস্যমুখ সেই প্রৌঢ়ই তাহার পিতা ও মাতা।

আর কতক্ষণ—ঐ তো বোধ হয় সেই বটগাছ, যাহার উদ্দেশে তাহারা ছেলেবেলায় পড়া পদ্যটি প্রয়োগ করিত—"দিবানিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট, ওগো প্রাচীন বট—"। ওরই অনতিদূরে রমার পিতৃগৃহ। যদিই বা মাঝে মাঝে এটা-ওটা-সেটা বা প্রাচীন পরিচিত কোন বান্ধবীকে মনে পড়ে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। সব মিলাইয়া মিশাইয়া সেই প্রৌঢ়েরই মুখে, তাঁহারই চিন্তায় মিশিয়া যায়। তাঁহার বেশ-ভূষা, আলাপ-আলোচনা, আচার-বিচার যে সুলতার কিশোর মনে ও শরীরে—যখন দুটাই গড়িতে থাকে—সেই সময়ের মনে দেহে ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া আছে।

সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া কাহাকেও দেখা গেল না। সুলতার শঙ্কা হইল—বাড়ী ভুল হয় নাই তো! না—ঐ তো তুলসীতলা, অযত্নে জঙ্গল হইয়া আছে। বোধ হয় সন্ধ্যাবেলার আকাঙ্ক্ষিত প্রদীপ দেখাও ভাগ্যে ঘটে না।

ইতিমধ্যে নজরে পড়িল—ঐ তো তাহার পিতা। হাত বাড়াইয়া তাহাকে ঐ তো আহ্বান করিতেছেন।

সুলতা ছুটিয়া যাইতেই প্রসারিতবাহু প্রৌঢ় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কে যায় ওখানে, কে, কে, কে যায়, আঁা, পদি নাকি রে? সুলতা কাছে যাইতেই দেখিল—প্রসারিত বাহু অভ্যর্থনা করিতেছে না, আশ্রয় খুঁজিতেছে—বৃদ্ধ চোখে নিতান্ত কম দেখেন।

এই সেই পিতা! তাহার চলিয়া যাইবার পর যে দীর্ঘ চারিটি বৎসর অতীত হইয়াছে, বয়স যে আরো চার বৎসর যোগ দিতে হইবে, আর তা যোগ করিলে প্রৌঢ়ের বৃদ্ধ হইবার এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়াই স্বাভাবিক—এটা সুলতার স্নেহসিক্ত মন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল—এখনও তেমনি অমিত শক্তি এবং তেজস্বী চক্ষুর অধিকারী তাহার পিতা।—কিন্তু তা যে হয় না তাই বাস্তবের এই রূঢ় আঘাতে সুলতা ভাঙিয়া পড়িল।

এই বার্দ্ধক্যে পা রাখিয়া যে অনিবার্য্য চিরবিচ্ছেদ একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টিশক্তিকে যে মহাকাল করিয়াছে নিশ্চিত চিরবিরহের ভূমিকা, তাহার কথা স্মরণ হইতেই সুলতা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শিক্ষা ও পরিভ্রমণ

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ছোট ছেলেকে কোনও বিষয় শেখাতে হ'লে সুরু করতে হয়, তার বিশেষ চেনা জিনিষ হ'তে। তার পর তাকে নিয়ে যেতে হয় চেনা হ'তে কম চেনা বস্তুতে; সব শেষ যোগাযোগ করতে হয় অচেনা জিনিষের সঙ্গে। শিশু মনস্তত্ত্বের এই সোজা কথা আজ বেশীর ভাগ শিক্ষকই জানেন। কিন্তু কাজের বেলা অনেক সময়েই এ বিষয়ে ভুল হয়ে যায়। আমাদের শিশুপাঠ্য ভূগোল ও ইতিহাসের সিলেবাস এবং পড়াবার বই—এই দুটীতেই এই ভুল সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে।

উচ্চ ইংরাজী স্কুলে নিম্নতম শ্রেণীতে ইতিহাস পড়ান আরম্ভ হয় অগস্ত্য, নোয়া ও প্লাবন এবং সোরাব-রুস্তম প্রভৃতি সম্বন্ধে আখ্যান দিয়ে। এগুলি ইতিহাস নয়; শিশু বা শিক্ষক কা'রও পরিচিত ব্যক্তি বা ঘটনাও এগুলিতে পাওয়া যায় না।

ভূগোল-সিলেবাস এই জাতীয় দোষ হ'তে অনেকটা মুক্ত। কিন্তু ভূগোলের যে সব বই লেখা হয়েছে ও পাঠ্য ব'লে গৃহীত হয়েছে তাতে এ বিষয়ে জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

সিলেবাসে লেখা আছে, প্রথমে পড়াতে হ'বে যেখানে ছেলেদের নিবাস সেখানের লোকজন, ঘরবাড়ী, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে। তারপর থাকবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি কতক কথা। এবার শেখাতে হবে বাংলাদেশ হ'তে জলবায়ু তফাৎ এই রকম দেশের লোকের কথা ও আবহাওয়া এবং আশপাশের অবস্থার উপর তাদের জীবনযাত্রা কি রকম নির্ভর করে তাই দেখাতে হবে। এই হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম পাঠ্য বিষয়।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর এই শ্রেণীর বইএ দেওয়া থাকে। কিন্তু তার পরেই পড়ান হয় নিম্নলিখিত দেশগুলির বা তারই মত অপরিচিত অন্য দেশের ও লোকের কথা—

১। মেরুপ্রদেশের বরফের দেশ ও এস্কিমো।

২। সাহারার মরুভূমি ও সেখানের অধিবাসী।

আমাদের দেশে যে বইগুলিতে প্রথমে এই ধরণের আখ্যান লেখা হয়, সেগুলি উচ্চ প্রশংসিত হয়ে প্রচার লাভ করে। তারপর অন্য ভূগোল লেখকেরা এই জিনিষের নকল করে।

বাংলা দেশের পরেই, এই বিশেষ জায়গাগুলি নির্দ্দেশ করার কারণ, যতদূর বোঝা যায় এই, যে ইংলণ্ডে কোন একটী বড় সহরের শিক্ষাবিভাগ ভূগোল-সিলেবাসে তাদের নিজেদের দেশ হ'তে ভিন্ন আবহাওয়া ও অবস্থা বোঝাবার

মায়াপুর চৈতন্যমঠে মঠবাসীদের সঙ্গে মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ

জন্য এই দেশগুলির কথা উল্লেখ করে। বিলাতের পক্ষে এ নির্দ্দেশ খুবই ভাল। কারণ ওদেশের ছেলেরা এস্কিমো ও লাপ্পদের নাম ছেলেবেলায় শুনে থাকে। নাবিকরা মাছ ধরতে বা মেরুর সন্ধানে ঐসব বরফের দেশ ঘুরে এসেছে। মরুভূমি বলতে সাহারার চেয়ে কাছে ইংলণ্ডের ছেলেদের অন্য উদাহরণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এস্কিমো বা লাপ্পদের দেশ কজন দেখেছে বা দেখবে? বাংলার সমতল হ'তে ছোটনাগপুর, নেপাল ও আসামের পাহাড়ে জীবনযাত্রার কি পার্থক্য ঘটে; নেপাল হ'তে

আরও উঁচু তিব্বতে আরও কি তফাৎ হয়; পুরীর সমুদ্র-তটে ও রাজপুতানার মরুভূমিতেই বা কি প্রভেদ করে, এই সব কথা সহজেই বলা চলে। এগুলির অনেক কথা শিক্ষকরা নিজেরা জানেন বা জানতে পারেন ও এ বিষয়ে শিশুদের
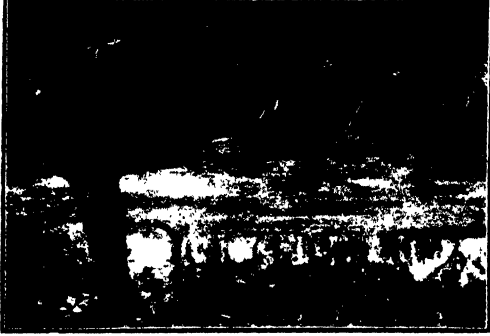
বল্লালঢিপিতে ছাত্র ও শিক্ষকগণ

পরিচয় দেওয়া সহজ। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে গেলে আমাদের পড়বার বইগুলি বাতিল করে নূতন বই লেখা দরকার; তার চেয়ে দরকার, শিক্ষকদের এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করা।

কারণ ভূগোল ও ইতিহাস শেখাবার জন্য পরিচিত হ'তে অপরিচিত জিনিসে যেতে হ'লে, প্রথমেই আবশ্যক হয় ছেলেদের পরিচিত জিনিষের পরিমাণ বাড়ান। বইএ লেখা থাকে—ছেলেদের স্কুলবাড়ী ও পাড়া মাপজোপ করে নক্সা করাও। তার পর গ্রামের নক্সা তৈয়ার করাও। এগুলি হাতে-কলমে করতে হয় তবেই কাজ হয়। তার পর লোকজনের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয়। এ বিষয়েও শিক্ষককে পরিশ্রম করতে হবে—ছেলেদের চোখ খুলে দেবার জন্য। নিজেরা, পাড়া-পড়শীরা কি করে খাওয়া-পরা চালায়, অন্ন আসে কোথা হ'তে, একথা সহজেই বোঝান যায় আশ-পাশে ছেলেদের একটু দৃষ্টি নির্দ্দেশ করিয়ে দিলেই। তেমনই ইতিহাস শেখান চলে নিজের গ্রাম হ'তে আরম্ভ ক'রে। প্রথমেই সুরু করা চলে পাঠশালাটীর উৎপত্তির ইতিহাস হ'তে; তার পর আসতে পারে গ্রামের বা সহরের অন্য শিক্ষালয়, দেবমন্দির ও মসজিদের কথা। গ্রামের বড় দীঘি বা কাছের কোনও খাল থাকলে, সেগুলির ইতিহাসও হবে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কাছে হাট বা বাজার থাকলে সেগুলির উৎপত্তি ও হিসাব জ্ঞাতব্যের মধ্যে আসবে। ছেলেদের নিয়ে ঘুরে ফিরে এই সব দেখালে এগুলির দূরত্ব ও পরিস্থিতি ঠিক করলে ও কবে, কেন, কি ক'রে এগুলি হ'ল তার কথা বিচার করলে—ছেলেদের প্রকৃত ভূগোল ও ইতিহাস শেখার গোড়া পত্তন হবে। তার পর তাদের শেখাতে হবে গ্রামান্তরের বা অন্য জায়গার কথা।

এই সব কারণে শিক্ষার বিশেষজ্ঞরা ছেলেদের নিয়ে বেড়িয়ে আসা শিক্ষার একটী বিশেষ উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এখানেও না ভেবে চিন্তে খানিকটা ঘুরে এলে বিশেষ কিছু শিক্ষা হয় না। কোথাও যাবার আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার কত রকমের দেখবার জিনিষের দিকে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তার জন্য একটা ধারাবাহিক কার্য্যতালিকা ও বিবরণী তৈয়ার করা উচিত।

কর্পোরেশনের কয়েকটি বড় বড় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার ফলে আজকাল আমাদের বিদ্যালয়গুলির ছেলেমেয়েদের পরিভ্রমণ (Excursion) কিছু পরিমাণে এই ধরণের ব্যবস্থায় হচ্ছে। এ বিষয়ে নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটের ধর্ম্মদাস মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় অগ্রণী।

নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে আতিথেয়তা

লম্বা পরিভ্রমণের মধ্যে এই স্কুলের ছেলেরা গত বৎসর ষ্টীমারে কোলাঘাট পর্য্যন্ত যায় ও রেলে করে ফিরে আসে। এ বৎসর এরা কলকাতা হ'তে ষ্টীমারে শান্তিপুর যায়; সেখান হ'তে ছেলেরা নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি

স্থান দেখে রেলে ক'রে ফিরে আসে। শিক্ষক মহাশয়দের অনুরোধে আমি তাঁদের এই পরিভ্রমণে কয়েক ঘণ্টার জন্য যোগ দিই। আপিসের কাজের তাগিদে আর বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। গ্রীষ্মের ছুটীর বন্ধের দিন, ছেলেরা স্কুল হ'তে রওনা হয় সকালে ৯টার সময়। রওনা হবার আগে য়ুনিফর্ম্ম পরা, সার-করা ৮০-৯০ জন ছেলে ও সাত জন শিক্ষক সমেত ছবিটি তোলা হয় বিদ্যালয়ের সামনে। ষ্টীমারের ব্যবস্থা হ'য়েছিল হাটখোলার ঘাটে। দুটী ফ্লাট নিয়ে আন্দাজ ১০॥০টার সময় ছোট লঞ্চটী রওনা হ'ল। আমার আপিস খোলা থাকায়, আমায় ফিরে আসতে হ'ল; ছেলেদের কাছে অবশ্য পৌঁছেছিলাম রাত দশটায়—সন্ধ্যার সময় ট্রেণে করে সোমড়া যেয়ে সেখানে ষ্টীমার ধ'রে। ছেলেদের সকালে শান্তিপুরে নামিয়ে দিয়ে, তাদের কীর্ত্তন শুনে ও ব্রতচারী নাচ দেখেই আমাকে কলকাতা ফিরতে হয় সকালের গাড়ীতে—আপিসে যথাসময়ে পৌছবার জন্য। এজন্য ছেলেদের ভ্রমণের ইতিবৃত্তটী প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিবরণী হ'তে গৃহীত হল।

পথে যাবার সময় ও পৌঁছে জায়গাগুলির অবস্থিতি ও সম্পর্ক বোঝাবার জন্য শিক্ষকগণ নক্সা আঁকেন। প্রথমটীতে স্কুল হ'তে ষ্টীমার পর্য্যন্ত পথের ছবি; দ্বিতীয়টীতে ষ্টীমারের জলপথ ও দুপাশের গ্রাম ও সহর; তৃতীয়টীতে নবদ্বীপের সব জায়গাগুলি দেখান ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের একটি মানচিত্রের নক্সাও সঙ্গে ছিল।

প্রত্যেক নক্সার সঙ্গে সঙ্গে একটি পথের বিবরণী সংলগ্ন ছিল। উদাহরণ স্বরূপ নীচে কিছু নমুনা দেওয়া গেল। কেবল বন্ধনীর ভিতরের অংশগুলি বিশদ বিবরণের সংক্ষেপ।

প্রথম নক্সা—কলিকাতার পথ; আশুতোষ কলেজ ও সাধারণ পুস্তকাগার (আশুতোষ বাংলাকে কি দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ)। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন (প্রতিষ্ঠানটীর ইতিহাস ও চিত্তরঞ্জনের কথা)। ষ্ট্রাণ্ড রোড—মালের গুদাম—হাওড়া পুল। দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট—টাঁকশাল।

দ্বিতীয় নক্সা—

ছেলেরা কোলাঘাট যাওয়ার সময় ভাগীরথীর নীচের দিক দেখিয়াছে; সে কথার সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি। এবারে উপরের অংশ দেখিবে। আশপাশের প্রসিদ্ধ স্থান, গ্রাম, সহর প্রভৃতি পূর্ব্ববারের মত দেখান হইবে।

বেলুড় মঠ—(বিবেকানন্দ স্বামীর কথা)।

বালীর পুল—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী—(শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা)।

শ্রীরামপুর—(ইতিবৃত্ত—দিনেমার উপনিবেশ—কেরী ও মার্শমান)।

টীটাগড়—কাগজ ও চটকল।

বারাকপুর—

মণিরামপুর—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী।

চন্দননগর—ফরাসী অধিকার।

ভাটপাড়া—সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র।

... ...

সপ্তগ্রাম—প্রাচীন বন্দর (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)।

... ...

শান্তিপুর—প্রাচীন সহর; বয়ন শিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

তৃতীয় নক্সা—

কৃষ্ণনগর—মাটীর খেলনা ও কারুশিল্পের জন্য খ্যাত। ইহারই অল্পদূরে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জন্মস্থান নাথপুর। (সংক্ষিপ্ত জীবনী)।

নবদ্বীপ—প্রাচীন বাংলার কৃষ্টির একটি বিশেষ কেন্দ্র। (এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিবরণী, মন্দির দর্শন)।

মায়াপুর—("বল্লালদীঘি," "বল্লালঢিপি," "চাঁদ কাজীর সমাধি"; এই স্থানকেই চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান বলিবার কারণ। শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী)।

মায়াপুরের চৈতন্য-মঠের এবং নবদ্বীপের সমাজ-বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সদাশয়তার পরিচয় দেন। এইভাবে দিন কাটিয়ে ছেলেরা ১৭ই মে তারিখে রাত্রে রেলে করে কলিকাতায় ফিরে আসে। বলা বাহুল্য শিক্ষক মহাশয়দের এই পরিভ্রমণের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হ'য়েছিল।

এই সকল পরিভ্রমণে ছেলেরা নিজে কত রকম প্রশ্ন উত্থাপন করে ও তাই হ'তে নূতন কথা শেখে, তার একটি সুন্দর উদাহরণ আমি এই যাত্রায় স্কুলের ছেলেদের কাছে পাই।

ভোরে উঠে আমি মুখ হাত ধুয়ে ষ্টীমার হ'তে নেমে নদীর ধারে একটা উঁচু মাটীর ঢিপিতে বসে দেখছিলুম—ছেলেরা মুখ হাত ধুচ্ছে। ছেলেরা পূর্ব্বেও আমাকে স্কুলে দেখেছে; তা ছাড়া রাত্রি বেলাই তাদের খাওয়া-শোয়ার খোঁজ খবর নেওয়া উপলক্ষে তাদের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হ'য়ে গেছল। কাজেই তাদের শিক্ষকদের মত আমাকেও এসে প্রশ্ন করতে তাদের কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নি।

মুখ হাত ধোয়া শেষ ক'রে দু তিনটী সাত আট বৎসরের ছেলে উঠে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা স্যার, কলকাতায় গঙ্গার জল কি ঘোলা; আর এখানে কেমন চক্‌চকে। কেন? ওখানেও কলকাতার নদীর স্রোতের তফাৎ ছেলেরা চোখেই দেখতে পাচ্ছিল। তা ছাড়া দুই জায়গায় জোয়ার ভাঁটার বেগের পার্থক্য বোঝানও সহজ ছিল। জল কেন ঘোলা হয় ও ঘোলা জল থিতিয়ে পরিষ্কার হয়, এসব কথা ছেলেরা জানত। সহজ প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই বলল ও ধাপে ধাপে বুঝে নিল, কলকাতার গঙ্গার ও শান্তিপুরের গঙ্গার জলের তফাৎ কেন হয়েছে। আলো-চনার মাঝে দেখা গেল একদল ছেলে আমাদের ঘিরে একমনে কথা শুনে যাচ্চে ও মধ্যে মধ্যে আলোচনায় যোগ দিচ্ছে।

ছেলেদের সহর দেখতে রওনা হ'বার এবং আমার ট্রেণ ধরবার সময় হ'য়ে এল। কাজেই আলোচনা ঐ পর্য্যন্ত পৌঁছেই শেষ হ'ল।

খাস্-মুন্সীর নক্সা

৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

তাহার পর একটী অত্যন্ত ভয়াবহ কার্য্যের সূত্রপাত হয়। আমি এ বিষয়ে অনেক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই যে এই ভয়াবহ কার্য্যের মূল কে? যেরূপই হউক কতকগুলি লোক যুবরাজকে পৈত্রিক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্টের নামে একখানি আবেদন পত্র লিখিত হইয়া রাজবংশের সমস্ত প্রধান প্রধান জায়গীরদার এবং আত্মীয়বর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহ হইতে লাগিল। যুবরাজের চরিত্র অতি মন্দ, তিনি একটী অসৎ চরিত্র স্ত্রীলোককে গৃহে নিজ পরিণীতা পত্নীদ্বয়ের সহিত সমভাবে রাখিয়া আত্মমর্য্যাদা লোপ করিয়াছেন এবং এরূপ কদর্য্য ও হিতাহিত-জ্ঞানবিরহিত লোক যে ভবিষ্যতে রাজ্যরক্ষার গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; অতএব তাঁহাকে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করা হউক। উক্ত আবেদনের এই মর্ম্ম। রাজ্যস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় একশত দেড়শত লোকের স্বাক্ষর হইলে পর আবেদনখানি মহারাজার স্বাক্ষরের জন্য তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। উক্ত আবেদন পত্রে তাঁহার স্বাক্ষর হইলেই সমস্ত চুকিয়া যায়। যুবরাজ চিরজীবনের জন্য অতলস্পর্শ জলে নিমগ্ন হন। কিন্তু বিধাতা যাহার সহায়, দুর্ব্বল মানব-শত্রু তাহার কি করিতে পারে। বৃদ্ধ মহারাজার অশেষ দোষ থাকিলেও তাঁহার চরিত্রে একটী মহৎ গুণ ছিল। তিনি এক-পত্নীক ছিলেন। রাজাদের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়দোষ ছিল না এবং মহারাণীর প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। দাম্পত্য প্রেমের অনুপম মাধুর্য্যও তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে এরূপ গুরুতর বিষয়ে মহারাণীর একবার পরামর্শ লওয়া যাক। অন্তপুরে গমন করিয়া মহারাণীর নিকট উক্ত আবেদন পত্র ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে মহারাণী তেজস্বিনী সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন—"কি যুবরাজের স্বত্বলোপ। বিধাতা আমাদের সন্তান দেন নাই। ভাসুর-পুত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে তাহার সত্বলোপ। আবার এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ। মহারাজ, বৃদ্ধ হইয়া তোমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে। এরাজ্যনাশ ত তুমি করিলে, আমার সন্তান ও সন্ততির সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। আমার এদেহে প্রাণ থাকিতে

ইহা কখনও হইতে পারিবে না।" এই বলিয়া আবেদন পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্তঃপুরে মহারাজা তাড়া খাইয়া আর সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার চক্ষু ফুটিল।

মহারাণী মহারাজাকে বলিলেন, তোমরা পুরুষ তোমাদের যতদূর বাহাদুরী তাহা আমি দেখিলাম। দেখ অদ্যই আমি "খাওয়াসকে" বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিতেছি। সেইদিন সাহেবের নিকট মহারাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে কল্যই খাওয়াসকে বহিষ্কৃত করিব, আপনি যেখানে তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহা করুন। যখন রাজপুত্রের গৃহে সে খাওয়াস হইয়াছে তখন তাহাকে সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় পথে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে আমাদের কুল-মর্য্যাদায় কলঙ্ক স্পর্শিবে। সাহেব নিকটস্থ ইংরাজ রাজ্যের কোনও নগরে তাহার থাকিবার এবং মাসিক এক শত টাকার বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এ সমস্ত বিষয় সাহেবের সহিত মহারাণীর অতি-গোপনে লোক দ্বারা স্থির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজঅন্তঃপুর হইতে একটি বাঁদী আসিয়া 'খাওয়াস'কে সংবাদ দিল যে মহারাণী তাঁহাকে রাজবাটীতে ডাকিয়াছেন। খাওয়াস যাইতে সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একখানি পাল্কী বেহারা ও কতকগুলি বাঁদী তাহাকে লইতে আসিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। বাহকগণ রাজবাটীতে না লইয়া তাঁহাকে একেবারে সাহেবের বাটীতে উপস্থিত করিল। সেখান হইতে তাঁহাকে নগর বহির্ভাগ দিয়া একেবারে অন্য একটী রাস্তা দিয়া রেলের ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। যখন এ রাজ্যের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন যুবরাজ শুনিলেন যে এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার খাওয়াসকে বহিষ্কৃত করা হইল। এখন আর তিনি কি করিবেন। তিনি সুপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আস্ফালনই সার। এই ব্যাপারের অতি অল্পকাল পরেই তিন উপগ্রহকেও তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত করা হইল। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যুবরাজ একা দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে এজেন্ট সাহেব এখান হইতে বদলী হইলেন, অন্য এজেন্ট এখানে আসিলেন।

এ রাজ্যের এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট Political agent ছিল না। কিন্তু Government এ রাজ্যে যে সমস্ত অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দেখিলেন, তাহাতে এখন হইতে এখানে একটী স্থায়ী এজেন্ট রাখা আবশ্যক মনে করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ রাজ্যটী অতি ক্ষুদ্র; সেইজন্য নিকটস্থ অপর আরও দুই রাজ্য মিলিয়া একটি এজেন্সি স্থাপিত হইল এবং নূতন এজেন্টের প্রতি এই তিন রাজ্য পরিরক্ষণের ভার ন্যস্ত হইল। এই তিন রাজ্যের মধ্যে বড়টীর ২৬ লক্ষ টাকা আয়। ২৬এর রাজা একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন, প্রতিভা-শালী বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি নিজ ক্ষমতায় আপন রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। স্বীয় রাজ্যমধ্যে নিজ প্রাধান্য এবং একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার তিনি সর্ব্বদা প্রয়াসী।

সমস্ত মিত্র এবং করদ রাজ্যে এই নিয়ম যে রাজপক্ষ হইতে একজন করিয়া উকিল এজেন্টদের নিকট থাকে। উকীল অর্থে ইংরাজী রাজ্যের সমনধারী ব্যবহারাজীব নহে। ইহাদের প্রধান কার্য্য রাজা এবং এজেন্টদের মধ্যস্থ হইয়া রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সওয়াল জবাব চালান। এজেন্ট সাহেব রাজ্যসংক্রান্ত কোনও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে উকিল মারফতে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উকিল মহাশয়কে সর্ব্বদা এজেন্ট সাহেবের নিকট তাঁহার ছায়ানুগামী হইয়া থাকিতে হয়। ২৬এর রাজার এক উকিল আমাদের এজেন্ট সাহেবের নিকট ছিলেন। ইনি একজন কাশ্মিরী পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোক। তাঁহার প্রতি ২৬এর রাজার এই আজ্ঞা ছিল যে যেন এজেন্ট সাহেব কোন প্রকারে কোনও বিষয়ে অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন। আমাদের বৃদ্ধ রাজা স্ব ইচ্ছায় গভর্ণমেন্টের হস্তে রাজ্য-পরিচালন-ক্ষমতা দিয়া বসিয়া আছেন। সুতরাং এজেন্ট সাহেবকে এই রাজ্যেই অধিক সময় থাকিতে হইত। অপর দুইটি রাজ্যে সময়ে সময়ে ২।৪ দিবসের জন্য পরিদর্শনার্থ যাইতেন মাত্র। এই উপলক্ষে এজেন্টের ছায়ানুগামী ২৬এর রাজ্যের উকীলের এ রাজ্যে শুভাগমন হইতে লাগিল। কাশ্মিরী পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইয়া থাকেন। ইনি উকিল, ইঁহার কুটবুদ্ধি কিছু প্রবল ছিল। এখানে আসিবার কিছুকালের মধ্যেই তিনি এখানকার সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। আবার সাহেব তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট বলিয়া নিজ ক্ষমতা পরি-চালনে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। এ রাজ্যের

লোকের কার্য্য আটকাইলেই তাঁহার শরণ লইত এবং তিনিও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই প্রকারে এই রাজ্যে তাঁহার ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পাইল। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হয়। উকিল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্য এক পণ্ডিতজী গৃহে নিষ্কর্ম্মা বসিয়াছিলেন। উকীল মহাশয় সাহেবকে বলিয়া তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম দেওয়াইলেন। তাঁহার একটী চর স্থায়ীরূপে এ রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

ওদিকে যুবরাজের সমূহ বিপদ। খাওয়াস ত ইতিপূর্ব্বে দেশ-বহিস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার তিন উপগ্রহ যদিও দেশ বহিস্কৃত হন নাই, কিন্তু তাঁহার নিকট তাহাদের যাতায়াত বন্ধ। জায়গীর নিজ কর্ম্মদোষে লুপ্ত, দেশীয় কোনও উত্তমর্ণ তাহাকে ঋণ দেয় না। প্রতিদিন গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত চলা ভার। এই সময়ে তাঁহার বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পরলোকগমন করেন। তিনি নিজের বুদ্ধিবলে নানা উপায়ে সংসার চালাইতেছিলেন। যুবরাজ এরূপ স্ত্রী-রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত নাই। কি প্রকারে খাওয়াসকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, কি করিয়া কৌন্‌সিলের মেম্বর "খাঁ সাহেব" ও "দেওয়ানজীর" উপযুক্ত শাস্তি দিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবেন এই ইচ্ছাই প্রবল। তিনটী উপগ্রহের যদিও তাঁহার নিকট আসাযাওয়া বন্ধ তত্রাপি তাহারা অতি প্রচ্ছন্নভাবে রাত্রিকালে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতেন এবং নিজেদের যতদূর বুদ্ধি বিবেচনার পরিসর তদনুসারে পরামর্শ দিয়া আসিতেন। বিশেষ 'দাদা' নামক পাচক ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে বিশেষ পটু, তিনি এক দিবস যুবরাজকে ২৬এর উকিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে এবং শরণাগত হইতে পরামর্শ দেন। খাওয়াস পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি সম্মত হইলেন এবং লোক মারফত উকীল সাহেবকে ডাকাইলেন। উকীল বড় চতুর লোক, তিনি নিজে না গিয়া নিজ সহোদরকে পাঠাইলেন। কারণ সহোদর এ রাজ্যের ভৃত্য, তাঁহার যাতায়াতে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। বড় পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিজ কষ্টের কথা সমস্ত তাঁহার গোচর করেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ অনুজের নিকট আসিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। দুই ভ্রাতা পূর্ব্বাপর অবস্থা সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যদি উপকার করিয়া যুবরাজকে হস্তগত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের একটা পথ পরিষ্কার হইয়া থাকে। বৃদ্ধ রাজা আর কত দিন। পরে ইনি রাজা হইলে নিজেদের বিলক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া কনিষ্ঠ উকিল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে নবাগত সাহেবের নিকট কথা প্রসঙ্গে যুবরাজের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। ওদিকে তাঁহাকেও বলিয়া পাঠাইলেন যে তুমিও সাহেবের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে থাক।

উকিল মহাশয় যুবরাজকে পরামর্শ দেন যে এখন 'খাওয়াসের' জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। যদি তুমি কখনও রাজা হও এবং ক্ষমতা পাও তখন তাহাকে আনিয়া যাহা হয় করিও। আপাততঃ গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তোমার যে কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছে তাহা ধৌত করিয়া জায়গীর পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা কর নতুবা তোমায় রাজ্যভ্রষ্ট অবস্থায় থাকিতে হইবে। এখন তোমায় সাহেবের নিকট এমন ভাবটী দেখাইতে হইবে যে খাঁওয়াসের প্রতি আদৌ আর মন নাই। বরঞ্চ তোমার পূর্ব্ব দুষ্কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত। স্বীয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে যুবরাজ এই "দোকানদারী" করিতে সম্মত হইলেন এবং সাহেবের নিকট তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। কাশ্মিরী পণ্ডিতদের এইরূপে যুবরাজকে সাহায্য করিবার কাহিনী কৌন্‌সীলের মেম্বরদের জানিতে বাকি রহিল না। তাঁহারা এ বিষয়ে বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে যুবরাজের মঙ্গলার্থ পূর্ব্বেকার সাহেব তাঁহার সহিত যে সকল কদর্য্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই সকল কার্য্যের মূল কারণ যুবরাজ এই মেম্বরদের ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের পরম শত্রু জ্ঞান করেন। মেম্বাররা বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহারা চিরকাল দেশীয় রাজ্যে কাটাইয়াছেন এবং যুবরাজের চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা যে ইঁহার সহিত যাহার একবার বৈরীভাব হইয়াছে শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও সে বৈরীভাব যাইবার নহে। সুতরাং তাঁহারাও যুবরাজকে শত্রুভাবে দেখিতেন। কাশ্মিরী পণ্ডিতদের যুবরাজকে সাহায্য করিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন এবং তলে তলে সাহেবের নিকট

সুবিধা পাইলেই যুবরাজের কুৎসা করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু গরজ এমনি বালাই যে খাওয়াস-রূপ অমূল্যরত্ন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যুবরাজ এখন সম্পূর্ণ শিষ্ট শান্ত বালকের মত হইলেন। পণ্ডিতদের পরামর্শ ব্যতীত একপদ আর চলেন না। সুতরাং মেম্বরদের নিন্দাবাদ সাহেবদের মনে স্থান পাইল না। এই প্রকারে নূতন সাহেবের যত্নে যুবরাজ পুনরায় জায়গীর ফেরৎ পাইলেন। কাশ্মিরী পণ্ডিতদ্বয় সতরঞ্চ খেলায় একবাজী মাত্ করিলেন। যুবরাজও বুঝিলেন অস্ত্র দিব্য পাইয়াছেন, ইহাদের দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিবেন এবং মেম্বরদের নিরস্ত্র করিয়া কোনও সময়ে খাওয়াসকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের জ্বালা মিটাইতে পারিবেন এ আশা তাঁহার মনে আবার অঙ্কুরিত হইল।

এই সময়ে আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয় কোনও একটী বৃহৎ রাজ্য হইতে বদলী হইয়া এখানে আসেন।

তিনি ডাক্তার—গভর্ণমেণ্টের চাকর—তবে দেশীয় রাজ্যে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন তজ্জন্য কতক পরিমাণে তিনি স্বাধীন। উক্ত রাজ্যের একটী কাশ্মিরী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। তিনি এখানকার দুই পণ্ডিত ভ্রাতার অতি নিকট আত্মীয়। এই সূত্রে ডাক্তার মহাশয়েরও ঐ উভয় ভ্রাতার সহিত বন্ধুত্ব হয়। সুতরাং তিনজনে এখন একজোট হইলেন। যুবরাজের জায়গীরপ্রাপ্তির পর উকিল মহাশয়ও সাহেবের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে যুবরাজ ভবিষ্যতে এ রাজ্যের অধিপতি হইবেন। সুতরাং এ সময় হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু রাজকার্য্যে অভ্যস্ত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। আপাততঃ অন্য কোনও কার্য্যে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিতে সুবিধা না হইলে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি করিয়া দিলে ক্ষতি কি? ইহা দ্বারা অন্ততঃ তিনি কিছু না কিছু কার্য্য শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন। প্রস্তাবটি বাহ্যিক অত্যন্ত সরল এবং স্বার্থশূন্য। কিন্তু অন্তরে একটু নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল। সাহেব তাহা বুঝিলেন না। বাহ্যিক আড়ম্বরে মোহিত হইয়া সেই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন।

দেশীয় রাজ্যে কার্য্য করিতে গেলে কেবল সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখিলে চলিবে না। সেই সঙ্গে তাহাদের আমলাদেরও সহিত বন্ধুত্বভাব রাখা চাই। সাহেবের দপ্তরে এখন দুইজন আমলা। এক ইংরাজী-নবীশ হেড্ বাবু, অপর ফার্সী-নবীশ মীর মুন্সী। হেড্ বাবু লোকটা কিছু সরল প্রকৃতির। ফারসী মীর-মুন্সী একজন এ দেশস্থ কায়স্থ, ভয়ানক চতুর। সে সময় বেশী কার্য্যই ফার্সীতে হইত। সরল বলিয়া হেড্ বাবুকে ভ্রাতাদ্বয় শীঘ্রই নিজ দলস্থ করিতে পারিয়াছিলেন। মুন্সীকে সেরূপ পারেন নাই। তিনি বিলক্ষণ ধূর্ত্ত বলিয়া কোনও দলে মিশিতেন না। যখন যেদিকে সুবিধা দেখিতেন তখনই সেইদিকে গড়াইতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের এই বাসনা যে তিনি তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করেন। তাহাতে তিনি সম্মত ছিলেন না এইজন্য তাঁহার সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের একটু মনোমালিন্য ছিল।

সাহেবের মেজাজটা একটু বাবু গোছের। তাঁহার পক্ষে এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় কালযাপন করা বড়ই কষ্টকর, এইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বৃটীশ রাজ্যে পালাইতেন এবং অধিককাল সেই স্থানেই কাটাইতেন। সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য যুবরাজকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার আবশ্যক হইত। প্রথম প্রথম ফার্সীতে চলিতে লাগিল। পত্রগুলি কাজেই মীর মুন্সীর হাতে পড়িত। তিনি পত্রে লিখিত বিষয় মেম্বারদের নিকট ব্যক্ত করিতেন। তাহা ভ্রাতৃদ্বয়ের অসহ্য। কিন্তু কি করেন উপায় নাই। এই সূত্রে একজন ইংরাজী-জানা লোকের আবশ্যক হয়। কিন্তু কি করিয়া যোগাড় হয়—তাহার পথ তখন সরল হয় নাই। ইতিমধ্যে ডাক্তার মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারী একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট স্কুলের দুরবস্থার বিষয় উল্লেখ করেন এবং তদানীন্তন হেডমাষ্টারের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব করেন যে এই স্কুলটীর উন্নতির জন্য একজন ইংরাজী-জানা ভাল লোক আনাইয়া নিজ দলস্থ করিলে হয় না। এই প্রস্তাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহেবের সহিত পুনরাগমন করিলে তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইল; তিনি ইহা অনুমোদন করিলেন এবং সুবিধামত অতি শীঘ্রই সাহেব বাহাদুরকে একবার বিদ্যালয়ের অবস্থা পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই সে সুবিধা হইল এবং সাহেব একদিন হঠাৎ বিদ্যালয়টী দেখিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোনও সংবাদ না দিয়াই তথায় উপস্থিত হইলেন। উকীল

সাহেব এবং তাঁহার দলস্থ লোকের এখন শুভগ্রহ। তাঁহারা যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেই সফলকাম হইতেছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একজন চৌবে ব্রাহ্মণ। বিদ্যা-বুদ্ধি তথৈবচ। তবে জাতির প্রথানুযায়ী তিনি সিদ্ধি খাইতে বিলক্ষণ পটু। গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকালে স্কুল বসে। গোটাকতক ছাত্র লইয়া তিনি প্যারীবাবুর ফার্ষ্ট বুকের পাঠ দিতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার জন্য সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। এমন সময়ে সাহেব তথায় উপস্থিত। সুতরাং সাহেবের স্কুলের অবস্থা জানিতে আর কিছু বাকি রহিল না। উকীল সাহেবের ঔষধ বিলক্ষণ ধরিল। সাহেব সেইদিনই Pioneer পত্রিকায় প্রধান শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দেন।

অষ্টম অধ্যায়

হঠাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি আমার চিত্ত এখানে কোনও মতেই স্থির হইতেছে না। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এ স্থল ত্যাগের জন্য আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ দলাদলি, শত্রুতা, পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, কুৎসা, বিষকুম্ভপয়োমুখম্ ব্যবহারে আমি অত্যন্তই উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার উপর সারাদিন 'জনাব জনাবের' জ্বালায় আরো বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। এমন একটা লোক নাই যাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া দুইদণ্ড মনের কথা কই। স্কুলের কার্য্য করিয়া সমস্ত দিন একা বাটীতে পড়িয়া থাকি। সময় আর কাটে না। নানারূপ পুস্তকাদি পাঠে সময় কাটাইবার চেষ্টা করি। মধ্যে মধ্যে ডাক্তার মহাশয় সৌজন্যপ্রকাশ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেই সূত্রে খানিক মন খোলসা করিয়া লই। আবার তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে সঙ্গে করিয়া জ্যেষ্ঠ পণ্ডিতজীর কাছে লইয়া যান।

ইতিমধ্যে একবার পুনরায় সাহেব আসিলেন। তাঁহার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা উকিল মহোদয়ও আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎলাভ হইল। তিনিও আমার সহিত বেশ যত্নের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। দেখিলাম লোকটী বেশ বুদ্ধিমান, ধীর ও গম্ভীরপ্রকৃতি। কথা যাহা বলেন তাহা যেন বেশ ওজন করিয়া বলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমার বেশ শ্রদ্ধা হইল এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন আমার সহিত তাঁহার সহৃদয়তা ছিল। তবে শেষাবস্থায় তাঁহার যেন একটু আত্মগরিমা হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমাদের রাজ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

ডাক্তার মহাশয় আমাকে একে একে প্রায় সকল উচ্চপদস্থ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। আমলা অথবা "মরদারী" শ্রেণীস্থ কোনও লোকের সহিত আলাপ করিবার অথবা পরিচিত হইবার আর আমার বাকি নাই। তবে একটা মস্ত বকেয়া পড়িয়াছে। এখন জুলাইয়ের শেষ, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও আমার বৃদ্ধ রাজার একবারও দর্শনলাভ হয় নাই। পণ্ডিতজী ডাক্তার বাবুকে তজ্জন্য লিখিয়াছিলেন যে বাবুকে একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া আন। তাহাতে ডাক্তার মহাশয় অতি শীঘ্র যাইব এরূপ বলেন। তবে আমাকে আবার সেই পাগধারী হইয়া ধড়াচূড়া বেশ ধারণপূর্ব্বক যাইতে হইবে ভাবিয়া আমি আর ততটা তাঁহাকে উত্যক্ত করি নাই। "যাচ্চি যাব" রূপ দীর্ঘসূত্রতায় জুলাই মাসটা কাটিয়া গেল। আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে শুনি মহারাজের অসুখ হইয়াছে। মহারাজের অসুখ—এখানে আবার এ কথা বলিবার যো নাই। বলিতে হইবে, "মহারাজের শত্রু পীড়িত। হুজুরকা দুষমন বিমার হ্যায়।" যাহা হউক তাঁহার শত্রু পীড়িত হউক বা তিনিই হউন, পীড়িত বটে। কি পীড়া তদন্ত করিয়া জানিলাম তাঁহার ব্রণ রোগ হইয়াছে। মনে মনে বুঝিলাম ব্যাপারটা কিছু কঠিন। আমার নৃপতির সহিত দেখা সাক্ষাতের কল্পনা জল্পনা আপাততঃ স্থগিত রহিল।

আমার বন্ধু ডাক্তার মিউনিসিপালিটী লইয়া তদ্গতচিত্ত। চিকিৎসালয় বা চিকিৎসার সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই। তিনি সহর পরিষ্কারের ভারে অবনত। এখানকার সদর চিকিৎসালয়ের জন্য একজন অন্য ডাক্তার আছেন হস্পিট্যাল আসিষ্টাণ্ট্ শ্রেণীর। বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহার অথৈবচ। ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে তিনি কোন মেডিক্যাল স্কুলের পাশ-করা নহেন। আমি যখন এখানে আসি তখন তাঁহার বয়স ৪০এর উর্দ্ধে। পুরাকালে তিনি কোনও সিভিল সার্জ্জেনের অধীনে ছিলেন। তৎপরে সাহেব

বাহাদুর কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে হস্পিট্যাল এসিষ্ট্যান্ট করিয়া মানবসমাজভুক্ত করিয়া দেন। তদবধি তিনি ডাক্তার হইয়া এই ব্যবসায় চালাইতেছেন এবং কত রোগীকে রোগের যন্ত্রণা তথা সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত করিয়া পুণ্যধামে পাঠাইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা বোধ হয় আমার সাধ্য নহে। এই ভিষক-চূড়ামণি মহারাজের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব বাহাদুর ইতিমধ্যে বদলী হইয়া যান। এখন বুন্দেলখণ্ড হইতে এক সাহেব আসিয়াছেন। আসিয়াছেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার দর্শনলাভ হয় নাই। মহারাজের পীড়ার কোন উপশম নাই বরঞ্চ বৃদ্ধি শুনিতে পাই। মনে মনে বুঝিলাম লক্ষণ ভাল নহে। পাদস্ফুট পৃষ্ঠব্রণ জাতীয় এক ফোঁড়া, সুতরাং রক্ষা পাওয়া কঠিন। ভিষক-চূড়ামণি একবার অস্ত্র করিলেন। মহা কোলাহল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ডাক্তার বুঝি অস্ত্র করিয়া নৃপতিকে সারিয়া দেয়। মধ্যে কিছু উপশম লক্ষণ হইল কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ক্রমে ভিতরে ঘা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুনরায় অস্ত্র না করিলে চলে না। ভিষক-চূড়ামণি আর অস্ত্রের জন্য আগুয়ান হইতেছেন না, বলিয়া বসিলেন আমি আর পারিব না আমার হস্ত কাঁপে। যুবরাজ দিবারাত্র পিতৃসেবায় রত, ভক্তি ও শ্রদ্ধার একশেষ করিতে লাগিলেন। ভিষকচূড়ামণি যখন পুনর্বার অস্ত্র করিতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না, তখন যুবরাজ আমার বন্ধু ডাক্তারকে অস্ত্র করিতে অনুরোধ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি কলিকাতার একজন পাশ করা লোক এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বিবেচক। অগত্যা ইহাঁকেই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। পুনরায় অস্ত্র করা হইল। কিন্তু পুঁজ এবং শোণিত তদবধি এত নির্গত হইতে লাগিল যে বৃদ্ধ মহারাজা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। ইতিমধ্যে নৃপতির জন্মদিন আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম অন্যসূত্রে না হউক জন্মদিনে মহারাজের দর্শনলাভ করিব। কারণ রাজাদের জন্মদিন এক তুমুল ব্যাপার, সেদিন অতি সমারোহের সহিত আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত ভৃত্যবর্গকে রাজসন্নিধানে গিয়া যাহার যেরূপ সামর্থ্য 'নজর' করিতে হয়। আমি ভাবিয়াছিলাম এই সূত্রে 'নজর' করিব এবং রাজদর্শনও ঘটিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। জন্মতিথির দরবার হইল না। মহারাজা সমূহ পীড়িত, এমন কি সেদিন তাঁহার কতকটা চৈতন্যলোপ পাইল। চতুর্দ্দিকে দান ধ্যান হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সময় বুঝিয়া দশ টাকা উদরস্থ করিলেন। গোদান হইতে লাগিল। নগরের রাজপথের স্থানে স্থানে গাভীদের ঘাস খাওয়াইবার ধুম পড়িয়া গেল।

মনুষ্য সব করিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না। শ্রাবণ মাসে বৃদ্ধ নৃপতি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নগরের চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। সে সমস্তই লোক-দেখান হাহাকার। বাস্তবিক আন্তরিক হাহাকার মহারাণীর এবং মহারাজার শারীরিক সেবায় নিয়োজিত নিজ ভৃত্যবর্গের। পতিপ্রাণা মহারাণী পতিহীনা হইলেন। বিষম বৈধব্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল। সুতরাং তাঁহার হাহাকার করিবার কথা। আর রাজার মৃত্যুতে এই দুঃখী ভৃত্যদের অন্ন মারা গেল। তজ্জন্য সে বেচারীরা আকাশ ফাটাইয়া রোদন করিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহাদের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রাজার মৃত্যুতে এ রাজ্যস্থ স্কুল, কাছারী, রাজকার্য্য সমস্ত তিনদিনের জন্য বন্ধ হইল। এমন কি নগরের ঘড়ি পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও নিয়মানুসারে তিন দিবসের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ রাখিলাম। সকলেরই মুখে শোকের চিহ্ন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু ডাক্তারটির উপর গালি বর্ষণ আরম্ভ হইল। কেহ বলে যুবরাজের লোক—সেই মারিয়া ফেলিল। কেহ বলে অস্ত্রে কোনও বিষাক্ত পদার্থ লাগাইয়া দিয়াছিল। তদ্দ্বারা রাজার মৃত্যু ঘটিল। কেহ বলে বিদেশীর হস্তে এরূপ চিকিৎসার ভার দেওয়া ভাল হয় নাই। ইত্যাদি যাহার মুখে যাহা আসিতে লাগিল, তদনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ হইতে লাগিল; আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

এ প্রদেশে প্রচলিত কথা আছে যে নৃপতিদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। দশজনে মিলিয়া স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিল। ডাক্তার বেচারী ক্ষোভে রোষে এবং লজ্জায় অবনতমস্তক। এ দেশবাসীদের চরিত্রে দ্বেষ, হিংসা ও পরনিন্দা কিছু বেশী দেখিতেছি। আমি মাস দুই এখানে বাস করিয়া জনসাধারণের মধ্যে এই দোষগুলি বিশেষ ভাবে দেখিলাম।

রাজার মৃত্যু উপলক্ষে এখানে একটি আশ্চর্য্য প্রথা

দেখিলাম। শবদাহ তিন দিবস ধরিয়া হইয়া থাকে। শ্মশানভূমিতে শব লইয়া গিয়া চিতা সাজাইয়া মুখাগ্নিক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ সমবেত ব্যক্তিমণ্ডলী চিতায় অগ্নিদান করেন; তৎপরে চিতা বিলক্ষণ জ্বলিয়া উঠিলে সকলে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত চিতা দাহ হইতে থাকে। তৃতীয় দিবসে মৃতের আত্মীয়বর্গ শ্মশান-ভূমিতে গমন করিয়া চিতা নির্ব্বাপিত করেন এবং অস্থি সংগ্রহ করিয়া পুণ্য-জাহ্নবী সলিলে অর্পণার্থ গৃহে লইয়া আসেন। তৎপরে সুবিধামত গঙ্গায় সমর্পণ করা হয়। নরপতির মৃত্যুতে কেবল এইমাত্র তফাৎ যে রাজ-পুরোহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৃতীয় দিবসেই অস্থি সমর্পণার্থ গঙ্গা যাত্রা করেন। এই ক্রিয়াটিকে এতদঞ্চলে "তিজা" বলে। আমার বোধ হয় গঙ্গাহীন দেশ হওয়া বশতঃ এবং এ প্রদেশে কোন বৃহৎ নদী না থাকায়, তিন দিবস ধরিয়া মৃতদেহ দাহ করা হয় যাহাতে শবের কোন অংশ অদগ্ধ না থাকিয়া যায়। বড় নদী থাকিলে সম্পূর্ণরূপে দেহ ভস্মীভূত না হওয়া বিশেষ ভয়ের কথা। যাহা হউক বৃদ্ধ নরপতির "তিজা"ও হইয়া গেল।

আমাদের 'যুবরাজ' এখন মহারাজা। যদিও রাজ-গদিতে এখনও সমাসীন হয়েন নাই তত্রাপি বৃদ্ধ রাজার প্রাণবায়ু যে মুহূর্ত্তে বাহির হইয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি রাজা। চতুর্থ দিবসে ভাবিলাম তাহাকে রাজবাটীতে একবার দেখিয়া আসি। বেলা চারিটার সময় মাথায় 'পগ' বান্ধিয়া চিরাশ্রিত ডাক্তার সাহেবের সহিত রাজ-বাটীতে গেলাম। এই আমার প্রথম রাজবাটী সন্দর্শন। তথায় গিয়া দেখিলাম নবীন মহারাজা ভূমিতে একটা হাল্কা গদি বিছাইয়া বসিয়া আছেন। গরুড় পুরাণ পাঠ হইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য। কিন্তু নবীন মহারাজের বদন-মণ্ডলে বিশেষ শোকের কোনও চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তবে লোক দেখান একটু গম্ভীর আকৃতি; তাহা সমাজের খাতিরে না করিলে চলে কই। শুনিয়াছি উদয়পুরে রাজা মরিলে তৎক্ষণাৎ উত্তরাধিকারী সিংহাসনারোহণ করেন। সেখানে অশৌচ মানিবারও ব্যবস্থা নাই। ওদিকে নবীন রাজা সিংহাসনে বসিলেন—এদিকে চোপদার রাজবাটীর বৃহৎ তোরণ দ্বারে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল "রাজ-বাটীতে একটা বৃহৎ হস্তী পতিত হইয়াছে; তাহাকে সরাইবার ব্যবস্থা কর।" পাঠকগণ দেখিলেন কেমন সুন্দর ব্যবস্থা; এক্ষেত্রে আমাদের নবীন মহারাজা যে একটু 'লোক-দেখান' শোকের জন্য গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছেন তাহা মন্দ কিছু নহে। বড় হইলে অনেক বিষয়ে কৃত্রিমতা চালাইতে হয়, সংসারের এই নিয়ম।

দেখিতে দেখিতে দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি হইল। পাঠকগণ ভাবিতেছেন মহারাজা করিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। সে সমস্ত কুল-পুরোহিতের কার্য্য। ইতিমধ্যে আমার একটু যে অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহার এইখানে আভাষ দিই। যখন মহারাজার মৃত্যু হয় তখন এজেণ্ট সাহেব এখানে ছিলেন না। মেম্বর মহাশয়রা তাঁহাকে তারযোগে এ সংবাদ দিলেন, তাহার লেখাপড়া আমার ঘাড়ে পড়িল। নবীন মহারাজের আলাপী ও পরিচিত যে সকল লোক ইংরাজ ছিলেন তাহাদের এবং বড়সাহেবকে—কাহাকেও বা তারে কাহাকেও পত্রদ্বারা এই শোকসংবাদ জানান হইল। সুতরাং দেখিলাম এখন হইতে হেডমাষ্টারী কার্য্য ব্যতীত আমার উপর মহারাজের প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কার্য্য অতি মন্দ গতিতে আসিয়া পড়িতেছে।

বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যুর ৩।৪ দিবস পরে এজেণ্ট সাহেব আসিলেন। আসিবার দুই একদিন পরে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। লোকটাকে একটু অদ্ভুত বোধ হইল। আমাকে দেখিয়াই 'what are you Babu' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি আত্ম-পরিচয় দিলাম এবং দুই তিনমাস হইল এখানে আসিয়াছি বলিলাম। সাহেব স্কুলের নানা কথার পর আমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন "তোমার মতে এখন এ রাজ্যের রাজগদি কাহার পাওয়া উচিত" আমি প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। আমি ২।৩ মাস মাত্র আসিয়াছি, তাহা জানিয়াও এই প্রশ্ন। আমি উত্তর দিলাম এখানকার লোক প্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে অমুক "যুবরাজেরই" প্রাপ্য। আর কোন উত্তর দিলেন না। তৎপরে আমি চলিয়া আসি। এই সাহেব একবার ইন্‌জিনীয়ারের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। তখন আমার বিদ্যালয়ের স্থান অতি সংকীর্ণ বলিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম

দালানের পরেই যে ঘরগুলি আছে, সেই ঘরগুলির সম্মুখের দেওয়ালগুলি ভাঙ্গিয়া উক্ত স্থলে খিলান করিয়া দিলে এ দালানগুলি বেশ পরিষ্কার হইতে পারে। এ অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে সাহেব পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। বলিলেন বা! তাহা কি করিয়া হইবে? দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেই স্থলে খিলান করিতে গেলে উপরের ছাদ যে মাথায় পড়িয়া যাইবে। ইহা অসম্ভব কথা। ইহা যে সহজসাধ্য তাহাকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, তিনি কোনমতেই বুঝিবেন না। শেষে ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় আমায় সাহায্য করিয়া যখন বুঝাইলেন, তখন তাঁহার বোধগম্য হইল।

গভর্ণমেণ্ট হইতে এখনও সিংহাসনারোহণের সনন্দ আসে নাই। সুতরাং প্রকাশ্যে মহারাজা গদিতে বসিতে অক্ষম। অতএব একাদশ দিবসে দিন মুহূর্ত্ত শুভ ছিল বলিয়া আমরা কয়েকজন স্থির করিয়া শুভক্ষণে গোপনভাবে একটী ক্ষুদ্র রাজগদি পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরে সনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করা গেল।

আজ দ্বাদশ দিবস লোকজন খাওয়ান হইবে। এদেশে এরূপ বৃহৎ কার্য্যে লোক খাওয়ান এক অদ্ভুত প্রকারে হইয়া থাকে। দ্রব্যাদি যাহা খাওয়ান হইবে তাহা একই প্রকারের হইয়া থাকে; আজ পাঁচদিন হইতে ক্রমাগত মতিচুরের বৃহৎ বৃহৎ লাড্ডু প্রস্তুত করিয়া পর্ব্বতাকার করা হইয়াছে। এখানকার সের বড়। ১০০ তোলায় এক সের। এক সেরে চারিটি লাড্ডু এই আন্দাজ। একাদশ দিবসের রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় রাজসংসারের একজন বিশেষ ব্রাহ্মণজাতীয় লোক রাজপথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঘোর চিৎকাররবে নগরবাসী সমস্ত লোকেদের পরদিবসের বৃহৎ ব্যাপারে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ নগরের সমস্ত পল্লীতে রাজপথে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল। তাঁহার চিৎকারে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে আমি তামাসা দেখিবার জন্য রাজবাটীতে গমন করিলাম। রাজবাটীর ছাদ হইতে যে কাণ্ড দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময়ও উদয় হইল। নগরে প্রবেশ করিবার যতগুলি তোরণ দ্বার আছে সেই সকল রাজপথ দিয়া পিপীলিকার সারের ন্যায় ক্রমাগত লোক আসিতেছে। এ জনস্রোতের আর বিরাম নাই। শুনিলাম দশ ক্রোশ পনেরো ক্রোশ অন্তর হইতেও লোক আসিতেছে। সে যে কি লোকের জনতা, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই তাহার সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন। চতুর্দ্দিকে কেবল পাগড়ীধারী মনুষ্যের মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বহু দূর ব্যাপী, যতদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর কেবল জনসমুদ্র।

এত লোক খাওয়ান কি করিয়া হইবে? বসিবার স্থান কোথায়? কেবল রাজপথের উভয় পার্শ্বে লোক আসিতেছে ও সার দিয়া বসিতেছে। চারি পাঁচ স্থলে লোক খাওয়াইবার ভাণ্ডার করা হইয়াছে। একেবারে দুই সহস্র তিন সহস্র করিয়া লোক এক এক স্থলে বসিতেছে। তাহাদের পাতে চারিটি করিয়া লাড্ডু দেওয়া হইতেছে এবং প্রত্যেককে এক একটী সিকি দিয়া বিদায় করা হইতেছে। যেই সমস্ত পরিবেশন সমাপ্ত হইল, অমনি বিদায়। সকলে নিজ নিজ অংশ বস্ত্রে বাঁধিয়া প্রস্থান। এইরূপে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক খাওয়ান অথবা প্রকৃত পক্ষে লাড্ডু বিতরণ হইয়া গেল।

এই সমারোহ ব্যাপারের দুই তিন দিবস পরে গদিপ্রাপ্তির সনন্দ আসিল। রাজবাটিতে আজ গদি পাইবার বৃহৎ সভা। রাজবাটী লোকে লোকারণ্য। রাজবাটী প্রবেশ করিয়াই বৃহৎ অঙ্গনে দুই সারি অশ্বারোহী সৈন্য দণ্ডায়মান। প্রথম অঙ্গন ছাড়াইয়া দ্বিতীয় অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখি যে সেখানে পদাতিকসকল দণ্ডায়মান। তৎপরেই সভা-মন্দির, সেখানে দুই সারি নিজ পদমর্য্যাদানুসারে রাজকর্ম্মচারী ও সর্দ্দারসকল নিজ নিজ পদানুসারে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। এই সারির মধ্যে বৃহৎ একটী "মখমলের" কার্য্য করা গদী স্থাপিত হইয়াছে। তাহারই এক পার্শ্বে এজেণ্ট সাহেবের বসিবার আসন। পশ্চাৎভাগে 'চামর' ইত্যাদি করিবার স্থান। বেলা দশটা কি এগারটা সময় এজেণ্ট সাহেব সনন্দ লইয়া আগমন করিলেন। তিনি অবশ্য আজ নিজ "Uniform" পরিয়া আসিয়াছেন। নবীন মহারাজার আজ একটু নূতন ধরণের পরিচ্ছদ। পায়জামা পরিধান করিয়া উপরি অঙ্গে এক লম্বা চাপকান। চাপকানের উপরিভাগ যেমন সচরাচর হইয়া থাকে তদ্রূপ, কিন্তু কটিদেশের কিঞ্চিৎ উপরিভাগ হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত

দুই পার্শ্বে এরূপ ভাবে চুনাট করা হইয়াছে যে ঠিক "ঘাগরার" মত দেখাইতেছে। রাজপুতদের বাদসাহী সময়ের এই পুরাতন বেশ। মস্তকে ও ললাটদেশে বাঁধা একটি বহুমূল্য হীরক জড়িত 'শিরপেঁচ'। এজেন্ট সাহেব আসিতেই মহারাজা তাহাকে পার্শ্বে লইয়া অগ্রসর হইলেন। এজেন্ট সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বরাবর গদি পর্য্যন্ত আসিলেন। তৎপরে গদির সন্নিকট হইয়া সকলে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাহেব প্রথম ইংরাজীতে স্বয়ং সনন্দ পাঠ করিলেন, তৎপরে তাঁহার ইঙ্গিতে মীরমুন্সী উহার ফারসী অনুবাদ পাঠ করিলেন। পাঠ শেষে মহারাজার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে গদিতে বসান হইল। চোপদার অমনি নবীন মহারাজার নাম লইয়া ফুকরাইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ঘোর রবে কামানে সেলামী হইতে লাগিল। মহারাজা এজেন্ট সাহেবকে ও গভর্ণমেণ্টকে পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং এ রাজ্যের রাজপরিবার চিরকাল গভর্ণমেণ্ট-ভক্ত ও গভর্ণমেণ্টসেবার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতে প্রস্তুত তাহাও দেখাইয়া দিলেন। এইরূপ কিছুকাল শিষ্টাচারের পর সভা ভঙ্গ হইল। সে সভাভঙ্গটি সাহেবের। তৎক্ষণাৎ পুনরায় দ্বিতীয় সভা হইয়া রাজকর্ম্মচারী ও সর্দারদের শুভদিনে নবীন মহারাজার নজর আরম্ভ হইল। মহারাজা অদ্য "খাঁ সাহেব" "দেওয়ান সাহেব" ও অপর একটী মেম্বারকে—প্রকাশ্যে রাজসভায় এই তিন মহোদয়কে "খেলাত" দিয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। এটী আর কিছুই নহে একটী রাজনীতিক ক্ষুদ্র বড়ের চাল। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল। (ক্রমশঃ)

সরোবর

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

হে স্ফটিক সরোবর, কোথা তুমি, কোন্ সঙ্গোপন-ঘনতলে ?
আমি আজ উৎকণ্ঠিত তোমার সন্ধানে।
কোন্ দূরে, কোন্ দেশে, তোমার প্রোজ্জ্বল-সুধা কোথায় উচ্ছলে ?
আমি আজ উৎকণ্ঠিত তোমার সন্ধানে।
পৃথিবী-পথের পান্থ চলিয়াছি কতকাল ধরি'
অধর তৃষায় কাঁপে, শ্রান্ত দেহে স্বেদ পড়ে ঝরি
ধূলায় নিষ্প্রভ আঁখি, বেদনা কণ্টক হানে প্রাণে।
আমি আজ উৎকণ্ঠিত তোমার সন্ধানে।

কত নদী, কত গিরি, কান্তার, প্রান্তর আমারে সাধিয়াছিল,
আমি শুধু চলিয়াছি তোমার সন্ধানে।
কত নির্ঝরিণী-ধারা মর্ম্মর-গীতির হৃদয় পাতিয়াছিল,
আমি শুধু চলিয়াছি তোমার সন্ধানে।
মর্ত্ত্যের আকাশে আমি নিদ্রাহারা তৃষ্ণার চাতক,
নির্ম্মল জলেরে সাধি,-অমৃত-পিয়াসী মানবক,
কত স্নেহ-সরোবর আঁখি মেলি চাহে মোর পানে।
আমি শুধু চলিয়াছি তোমার সন্ধানে।

হে সুন্দর, স্বচ্ছকান্তি, কৌমুদী প্রপাত—সঞ্চিত সুস্নিগ্ধ বারি,
আদিম আস্পৃহা চলে তোমার সন্ধানে।
গৃহের বন্ধন টুটি' উদ্ভিন্ন-যৌবনা সঙ্গিনীর সঙ্গ ছাড়ি'
আদিম আস্পৃহা চলে তোমার সন্ধানে।
ধুলায় লুটায়ে পড়ে বহুমূল্য রত্নের সম্ভার,
মণিমাণিক্যের মালা, বিচ্ছুরিত লক্ষ অলঙ্কার
ত্যজিয়া সম্রাট সুতা কি ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলি' মানে।
আদিম আস্পৃহা চলে তোমার সন্ধানে।

হে ধ্রুব-নক্ষত্র-দিশা, জ্যোতিষ্ক আবর্ত্তবাহী উচ্ছল-উজ্জ্বল,
চলিয়াছে কাল-চক্র তোমার সন্ধানে।
তোমার ইঙ্গিত-রসে প্রস্ফুটিয়া ওঠে যুগ-সূর্য্যের উৎপল,
চলিয়াছে কাল-চক্র তোমার সন্ধানে।
সপ্তর্ষির দীপ-মালা তোমার তরঙ্গে উদ্ভাসিয়া
তমিস্রা নিশার দ্বার বার বার দেয় উদ্ঘাটিয়া,
সুপ্তির শৃঙ্খল-ডোর ছিন্ন হয় তোমার আহ্বানে।
চলিয়াছে কালচক্র তোমার সন্ধানে।

নন্দন-মন্থন মধু, হে অমৃত উৎসারিত উৎসের আধার,
দেবতা, দানব দৃপ্ত তোমার সন্ধানে।
তোমার ঊর্ম্মির-ধ্বনি অখিলের মর্ম্ম কোষে তুলিছে ঝঙ্কার,
দেবতা, দানব দৃপ্ত তোমার সন্ধানে।
হে অতল, হে নিস্তব্ধ, হে প্রশান্ত প্রাণের স্পন্দন,
হে অবিনশ্বরধারা, তবমুক্ত শক্তির স্যন্দন
প্রসূন ও পাষাণেরে একস্রোতে ভাসাইয়া আনে।
দেবতা, দানব দৃপ্ত তোমার সন্ধানে।

হে সুচির-মাধুরীর সুবর্ণ-কমল-লগ্ন রূপ সরোবর,
আমি আজ আসিয়াছি তোমার সন্ধানে।
ধরিত্রীর—যেথা অবতীর্ণ তুমি শুভ্রতায় আকীর্ণ অন্তর,
আমি আজ আসিয়াছি তোমার সন্ধানে।
তৃষ্ণারে মিটাও আজি, দাও তব সুস্নিগ্ধ লহর,
স্বচ্ছতার শিহরণে রক্তে মোর আনো রূপান্তর,
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা মোর মুক্ত হোক সে-অমৃত-পানে।
আমি আজ আসিয়াছি তোমার সন্ধানে।

শব্দরত্নাবলী ও মূসা খাঁ

[উপরোক্ত বিষয়ে আমরা দুইটি আলোচনা পাইয়াছি। প্রথমটি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত ও দ্বিতীয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত। দুইটিই আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—ভাঃ সঃ]

১

বিগত চৈত্রের 'ভারতবর্ষে' (পৃঃ ৬০৬-৬১০) উল্লিখিত বিষয়ে একটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় মূলেই ভুল থাকায় লেখকের সমস্ত গবেষণা ব্যর্থ হইয়া প্রবন্ধটীকে ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ করিয়াছে। সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইল। (১) শব্দরত্নাবলী-কার ও সারসুন্দরী-কার অভিন্ন নহে। ১৮০৭ খৃঃ কোলব্রুক্ সাহেবের ত্রুটি মার্জ্জনীয় ছিল। ১২৫ বৎসর ধরিয়া গতানুগতিক্রমে এই ভুল চলিয়া আসিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। সারসুন্দরী সুপদ্মব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত —ইহার অংশবিশেষ আনন্দরাম বড়ুয়ার অমরকোষের সংস্করণে (১৮৮৭-৮৮ খৃঃ) মুদ্রিত হইয়াছিল। বিষ্ণুমিশ্রের সুপদ্মমকরন্দ সারসুন্দরীতে (১২ পৃঃ) উদ্ধৃত দেখা যায়। সুতরাং নপাড়ীয় বন্দ্য কুলীন মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার পূর্ব্ববঙ্গের লোক হইতে পারে না, কারণ পূর্ব্ববঙ্গে কোন কালেই সুপদ্ম ব্যাকরণের প্রচার ছিল না। উভয়গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতেও উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ উভয়ের মধ্যে প্রায় ৫০ বৎসরের ব্যবধান ছিল—সারসুন্দরী ১৫৮৮ শকে (১৬৬৬ খৃঃ) রচিত হয়, আর মূসা খাঁর সময় ১৫২৯—১৬২৩ খৃঃ। কোলব্রুক সাহেব পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন "His work (works নহে) contains the date 1588 saka or A. D. 1666" এই তারিখ উভয় গ্রন্থের নহে এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত শব্দরত্নাবলীরও নহে—কেবলমাত্র মূল টীকা গ্রন্থ সারসুন্দরীরই। পর-কালীন পুথিপত্র দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয়। শব্দরত্নাবলীর কোন পুথিতে এই তারিখ নাই এবং থাকিতেও পারে না। Wilson সাহেব প্রভৃতিরা কোন মূলগ্রন্থ না দেখিয়াই কোলব্রুকের ভ্রমটীকে অনবধানতা দ্বারা আরও দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। (২) বিদ্যালঙ্কার মথুরেশ ও তর্কপঞ্চানন মথুরেশের ব্যক্তিভেদ স্বতঃসিদ্ধ—কোন গবেষণাসাপেক্ষ নহে। বরং গুপ্তিপাড়ার মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের প্রসঙ্গ এই স্থলে করা যায়। তিনি সারসুন্দরীকারের সমসাময়িক—১৫৯৪ শকে "শ্রীশ্যামাকল্পলতিকা" রচনা করেন—অথচ ভিন্ন বংশীয় ছিলেন (চট্টশোভাকরবংশীয়—ভারতবর্ষ—২য় বর্ষ, ২ খণ্ড, ৯৪৪ পৃঃ)

(৩) শব্দরত্নাবলীর নানার্থ কাণ্ডে পৃথক্ "গৌরচন্দ্রিকা" আবশ্যক ছিল। কারণ দেখা যায় গ্রন্থরচনা বিষয়ে মূসা খাঁর দুইজন অমাত্যের অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগে প্রযোজকতা ছিল। একখানি পুথিতে (I. O. No. 1585) একথা পাওয়া যায়:

> ভূপশ্রীমশনন্দ-এল্লি-সমনুজ্ঞাতো চিরং জীবতাং,
> শ্রীমদ্বল্লভরায় উজ্জ্বলমতিঃ শ্রীরূপদাসোঽপি চ।
> যাভ্যামর্ধবিভাগতঃ ক্ষিতিপতেঃ শ্রীশব্দরত্নাবলী
> নিত্যং সৎকৃতিশোভনী শুভকরী যত্নেন নির্বাহিতা॥

(আনন্দরাম বড়ুয়া 'দুর্ল্লভ রায়' পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন)। শেষার্দ্ধ নানার্থবর্গের প্রারম্ভে—তজ্জন্যই মঙ্গলাচরণ পৃথক্ রহিয়াছে।

(৪) মথুরেশ মূসা খাঁর পিতৃপরিচয়ে অবশ্যই কোন ভুল করেন নাই। প্রবন্ধলেখকেরই সম্পূর্ণ ভুল। তিনি দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৃতীয় শ্লোকে শিলমান খাঁর পৌত্রের নাম ও 'মুছাখান' দেওয়া রহিয়াছে লক্ষ্য করেন নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুথির শ্লোক-গুলি ভুল ভ্রান্তিতে ভরা। বিলাতের পুথি দেখিয়া সংশোধন সহজ-সাধ্য। প্রথম শ্লোকে "শিলমান-খান", ২য় শ্লোকে "শ্রীশা খাঁন (শ্রী+ঈশা) এবং ৩য় শ্লোকে "মূশা খান্ মশনন্দ এল্লি"—ছন্দ ঠিক রাখিয়া বিশুদ্ধভাবেই লিপিবদ্ধ আছে।

(৫) বিলাতের একখানি পুথির পুষ্পিকায় অতিরিক্ত ছয়টী শ্লোক আছে (I. O. No 1585)—এই শ্লোকগুলি অতি মূল্যবান্। প্রথম শ্লোকে "শ্রীমশনন্দ এল্লি নৃপতি"র (অর্থাৎ মূসা খাঁর) স্তুতি; ২য় শ্লোকে "শ্রীমৎ খাঁন মহোম্মদস্তদনুজো" কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৩য় শ্লোকে তাঁহার অনুজ "খাঁনাবতুল্লাহ্বয়ঃ" (অর্থাৎ আবদুল্লা খাঁ) স্তুত হইয়াছেন। ৪র্থ শ্লোকে একসঙ্গে অন্যান্য (বহুসংখ্যক) ভ্রাতারা—"যুদ্ধানন্দ খাঁন প্রমুখাঃ" (?)—উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং ঈশা খাঁর মাত্র দুই পুত্র নহে—বহুপুত্রই গ্রন্থরচনা কালে বিদ্যমান ছিল।

(৬) আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রবন্ধলেখক বলেন, মূসা খাঁ সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব! ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হয় ত একথা খাটিত। কিন্তু বহারিস্তানের আবিষ্কার মূলে স্যার যদুনাথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের প্রবন্ধে মূসা খাঁ প্রভৃতির সহিত নবাব ইস্লাম খাঁর সংঘর্ষ কাহিনী এখন বঙ্গেতিহাসের এক সম্পন্ন অধ্যায়। এই ফারসী গ্রন্থ হইতে জানা যায় মূসা খাঁ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ সময়ে কিম্বা অল্পপূর্ব্বে স্বর্গী হন এবং তৎপুত্র ১৮-১৯ বৎসর বয়স্ক উদ্ধত মাহ্‌মূ খাঁ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন (I. H Q. Dec. 1934, p 678)। শব্দরত্নাবলীতে মূসাখাঁর এবং তাহার ভ্রাতাদের যেরূপ অক্ষুণ্ণ প্রতাপের উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতে অনুমান হয় ইস্লাম খাঁর বিজয় যাত্রার পূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল (১৬০০-১৬১০ খৃঃ মধ্যে)।

(৭) কবি মোহম্মদ খাঁর 'মুক্তলহোসেন" গ্রন্থের উপর লেখকের অপূর্ব্ব গবেষণাটী ভ্রান্তির পরাকাষ্ঠা। মোহম্মদ খাঁ গ্রন্থারম্ভে নিজের মাতৃ-

কুলের এবং পিতৃকুলের বিস্তৃত এবং তথ্যবহুল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কবি ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রমাতামহ আবদুল ওয়াহাব "সদরজাহা" চট্টগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ পীর ছিলেন এবং গৌড়াধিপ প্রভৃতির নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই একজন পৃষ্ঠপোষকরূপে "বার বাঙ্গালার পতি ইছার্খা"র উল্লেখ রহিয়াছে। নতুবা চট্টগ্রামের কবির পিতৃ-মাতৃকুলের সহিত ইছার্খার কোন প্রকার কুলসম্বন্ধ ছিল না। লেখক যাহাকে দ্বিতীয় মুছার্খা বানাইয়াছেন তাহার প্রকৃত নাম হামজা খান্ (মুছালন্দ উপাধি) এবং তিনি কবি মোহম্মদ খাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ; সুতরাং ইছার্খার পূর্ব্ববর্ত্তী !! শব্দরত্নাবলী-কারকে হামজা খাঁরও পূর্ব্বে নিয়া চট্টগ্রামে ফেলিতে লেখকের কল্পনা একটুও বাধাপ্রাপ্ত হইল না ইহাই আশ্চর্য্য।

২

বিগত ১৩৪২ সালের চৈত্র সংখ্যা "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 'শব্দরত্নাবলী ও মুসা খাঁ" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, গত জ্যৈষ্ঠ মাসের—'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় লিখিত তাহার এক প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয়ের অন্যান্য প্রবন্ধের ন্যায় এই প্রবন্ধটিও অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়াছিলাম এবং প্রতিবাদটি দেখিয়া উহা আরও একবার পড়িতে হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, "কোলব্রুক্ ও উইলসনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত মহাশয় শব্দ রত্নাবলীর রচনাকাল ১৫৮৮ শক বা ১৬৩৬ (? ১৬৬৬) খৃঃ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শব্দাবলীর '(? শব্দরত্নাবলীর) কোনও রচনাকাল মথুরেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।" কিন্তু শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া অপরের পক্ষে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ কিরূপে ঘটিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই : "ইতিহাস অনুসারে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসার্খার পৃষ্ঠপোষকতায় "শব্দরত্নাবলী" রচিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু কোলব্রুকের পুঁথিতেও '১৫৮০' শকাব্দ এর সহিত 'মুর্চ্ছাখান'এর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, উইলসনের পুঁথিতেও তাই এবং "সারসুন্দরী"তে 'মুর্চ্ছাখান' না থাকিলেও ১৫৮৮ শকাব্দটা ঠিকই আছে। এই তারিখ ও মূর্চ্ছাখানের সহিত ইতিহাসের মুসার্খার কি করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে কি এই সকল বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পুঁথির তারিখটা প্রক্ষিপ্ত? ভরসা করি, কোনও পণ্ডিত এ রহস্য ভেদ করিয়া দিবেন। ইতিহাসে পাই, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, মুসার্খার পৌত্র ও মশুম খাঁর পুত্র জমিদার মুনব্বর খাঁ চট্টগ্রাম অবরোধকারী সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ১,০০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মশুম খাঁ জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ তারিখে সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত একখানা সনদ ঐ বংশের উত্তরাধিকারিদের নিকট রক্ষিত আছে।" এই ভাষা এত সরল ও স্পষ্ট যে সকলেই বুঝিতে পারে, দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে কেবলমাত্র কোলব্রুক্ ও উইলসন্ প্রদত্ত শব্দরত্নাবলীর তারিখ (১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ) নহে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ণিত সারসুন্দরীরও ঐ তারিখ বিশ্বাসযোগ্য নহে। তৎপরে তিনি মহম্মদ খাঁ বিরচিত 'মুক্তাল হোছল'এর একখানি পুঁথি হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "যাহা পাইতেছি তাহাতে মনে হইতেছে, কবি মহম্মদ খাঁর মতে মুছানন্দ খান বা মুসা খাঁ 'মিনখান'এর পুত্র। এই 'মিনখান'কে মশুম খাঁ ধরিয়া লইলে 'শব্দরত্নাবলী'র বিবরণের এই ভাবে মীমাংসা করা যায় যে, ঐ বংশে দুইজন 'মূর্চ্ছাখান' ছিলেন। কিন্তু ঐ বংশের উল্লিখিত সনদ ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে মশুমর্খাকে প্রদত্ত হইয়াছিল; কাজেই তৎপূর্ব্বে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশের পক্ষে মুচ্ছাখানকে 'মহীপতিঃ' 'দীপ্তোদ্দাদশ-ভূমি-পৈশ্চিরতরং তীক্ষাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ'—ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না।" শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় কি সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রতিবাদ করিতে বসিয়াছিলেন?

"সম্ভবতঃ কোলব্রুক্ ও উইলসন্ সারসুন্দরীর তারিখটিকে মথুরেশ কৃত শব্দরত্নাবলীর রচনাকাল অনুমান করিয়া এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছিলেন"—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি কোনও পণ্ডিতে গ্রহণ করিবেন না ইহা নিশ্চিত এবং এই জাতীয় কথা কহিয়া কেবল হাস্যাস্পদই হইতে হয়। যে যে কারণে তিনি দুই মথুরেশের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, সেগুলিও নিতান্তই অসার। শব্দরত্নাবলী ও সারসুন্দরী একই অব্দে যখন রচিত হয় নাই, তখন মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার যদি তাঁহার একখানি গ্রন্থে স্বীয় আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন অথবা তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজার নাম ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে বা পরে লিখিত অপর গ্রন্থখানিতে (যে কোনও কারণেই হউক) তাহা না করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার একখানি গ্রন্থের রচনার নিমিত্ত অপর একজন মথুরেশের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে কেন?

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বাহার-ই-স্তান' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি হইতে মুসার্খার যে ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাহাতে 'শব্দরত্নাবলী'র সম্পর্কে মুসার্খার ইতিহাসের কোনও সম্বন্ধ নাই, অতএব তাহা অপ্রাসঙ্গিক *।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই। উহা অতি উচ্চাঙ্গের। প্রবন্ধটি ভাল করিয়া না পড়িয়া এবং উহার মর্ম্মার্থ ভাল করিয়া অনুধাবন না করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া শোভন হয় নাই।

---

* সুখের বিষয়, ইশার্খার 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি অমর মাণিক্যের দান, এই মতবাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বিশ্বাস করেন নাই, করিলে দাসগুপ্ত মহাশয়ের ঐ বিষয়ে মতবাদের অবশ্যই প্রতিবাদ করিতেন। বস্তুতঃ শেষোক্ত মতবাদই ঐতিহাসিক সত্য।

জরীর নাগরা

মনোজ গুপ্ত

তেইশ বছর বয়সে পড়ে উমেশ মিল্‌টনের মত একটা সনেট কাগজে কলমে লেখে নি বটে, তবে তার মনে মনে যে ওরকম অনেক কবিতার খসড়া হচ্ছিল তা আমরা হলপ করে বলতে পারি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে মস্ত একটা কিছু করবার জন্য, মস্ত একজন হবার জন্য জন্মেছে। একটা জ্বলন্ত ধুমকেতুর মত জগতের বুকের উপর দিয়ে চলে গিয়েই হোক কিংবা ভয়ানক একটা ভূ-কম্পের মত ঝাঁকানি দিয়েই হোক, সে নিশ্চয় একদিন বিশ্ব-জগতকে তার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে। ছোট বেলায় কোন এক জ্যোতিষী নাকি তার হাত দেখে বলেছিলেন সে পরহিতব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করবে। বন্ধুরা বলত, উমেশ নিশ্চয় স্কুল মাষ্টার হবে—তার চেয়ে পরহিতব্রত আর কি হতে পারে? জাতি গঠনের পক্ষে স্কুলের মাষ্টার মশায়রা যত সাহায্য করেন আর কেউ তা পারে না। উমেশ শুনে খুব চটে যেত। মাষ্টারী! সে কি মানুষের কাজ? কোন জাতের নিয়ম আছে বার বৎসর মাষ্টারী করলে তার আর সাক্ষী দেবার অধিকার থাকে না—যেমন ছোট ছোট ছেলেদের নেই। চমৎকার নিয়ম। মাষ্টার মশায়দের চেয়ে "কৃষ্ণের জীব" আর কেউ থাকতে পারে না। জানোয়ারদের ওপর অত্যাচার নিবারণ করবার জন্য যেমন এস্, পি, সি,এ আছে, মাষ্টার মশায়দের জন্যও তেমনি এস্, পি, সি,টি থাকা উচিত। আর একটী জাতীয় জীবের প্রতি উমেশের ঐ শ্রেণীর শ্রদ্ধা ছিল, তারা কেরাণী—বিশেষ করে সওদাগরী অফিসের কেরাণী। উমেশ আর যাই হোক, কোনদিন যে মাষ্টার কি কেরাণী হবে না সে বিষয় আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

তেইশ বছরের জীবনে উমেশ অনেক কিছু হবার চেষ্টা করেছে—কবি, কথা-সাহিত্যিক, চিত্র-শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এমন কি সম্পাদক পর্য্যন্ত। একটার পর একটা ধরেছে আর তাতে সাফল্যলাভ করবার আগেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছে। ওটা নাকি মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্য! অস্বীকার করলে সে বলত জর্জ বার্নার্ড শ নিজে বলেছেন তিনি কথা-সাহিত্যিক হিসেবে নাম করবার আগেই নাট্যকার হয়েছেন। কবি হয়ে উমেশ এত বড় বড় চুল রেখেছিল যে তার বাবা ঠিক করলেন ঐ জন্য তার মাথা ধরা সারে না; তাই একদিন জোর করে তার চুলগুলো দিলেন ছেঁটে, আর কবিতার খাতাপত্র দিলেন পুড়িয়ে। আমরা অবশ্য সে সময় উপস্থিত ছিলাম না, যারা ছিল তারা বলে উমেশের সে সময়কার অবস্থাটা মোটেই লোভনীয় নয়। তারপর সে হল কথা-সাহিত্যিক। কবিতা ছাপাবার জন্য তাকে ছোট বড় সম্পাদকদের যত খোসামোদ করতে হয়েছিল, গল্প ছাপাবার জন্য তত করতে হয়নি বটে কিন্তু তার দুর্ভাগ্য সে বেশীদিন গল্প লিখতে পারলে না। গল্পের মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিজেকে খুঁজে পান। উমেশ তাঁকে চিনতও না কিন্তু তার বাবা শুনে মহা চটে যান। আর কখন গল্প লিখবে না—বাবার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে অব্যাহতি পায়। তারপর সে এক বড়লোক বন্ধুকে ধরে বায়স্কোপের এক সাপ্তাহিক বার করলে। এক শ্রেণীর পাঠকের অনুগ্রহে তার কাগজও চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু গোল করলে কাগজের মালিক। তার টাকায় উমেশ নাম করছে, অথচ তাকে কেউ চিনছেও না, এই দুঃখে সে কাগজ বন্ধ করে দিলে। এই রকম এক এক ঘটনা তার জীবনটাকে অন্ততঃ তার নিজের মতে মাটী করে দিয়েছে।

* * * *

উমেশ রোজ আড্ডায় আসে। তাকে বিরক্ত করতে পারলে কেউ ছাড়ে না। বন্ধুদের মধ্যে অনেকে তাকে সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে যে কেউ ঠাট্টা করতে পারে এ কথা সে বিশ্বাসই করে না। তার বন্ধুদের মধ্যে কা'রও নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, সে তাই বেশ চালের ওপর তাদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে কথা

ফইত। তার বিশ্বাস ছিল এ বিষয়ে তার একটা অধিকার আছে। আর আড্ডায় এমন দু'এক জন ছিল যারা তার এ দাবী বেশ সহজে মেনে নিত। মাঝে মাঝে তার নাম-জানা এবং না-জানা লেখকদের লেখা থেকে না বলে ধার করা লেখার জ্বালায় একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হ'ত। আমরা জন কতক প্রায়ই পার পেয়ে যেতাম, কারণ সাহিত্যের রস গ্রহণে আমরা একেবারে অক্ষম।

হঠাৎ এক সময় দেখা গেল উমেশ মেয়েদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ একটু সচেতন হয়ে উঠেছে—অবশ্য অচেতন সে কোনদিনই ছিল না। রীতিমত একঘেয়ে পৃথিবীর মধ্যেও সে একটু নতুন রংএর সন্ধান পেয়েছে বলে মনে হয়। সেটা সত্যিকার নতুন রং, না তার সবুজ মনের চোখে দেখা সবুজ রং—তা বলা শক্ত।

উমেশের এত বড় একটা পরিবর্ত্তন কা'রও চোখে ধরা পড়তেই বাকি রইল না। সাধারণতঃ লোকে যা ঠিক করে নেয় উমেশের বন্ধুরাও তাই করলে। উমেশের জীবনে নতুন আগমনী সুরু হয়েছে—এই হল সিদ্ধান্ত, সুতরাং তার বন্ধুরাও ঠিক করলে এ আগমনী কার উদ্দেশে তা বার করতেই হবে। উমেশকে জিগেস করতে কেউ বাদ যায় নি কিন্তু এই প্রথম সে নিজের কথা লুকিয়ে রাখলে। নিজের কথা বলে যার শেষ হ'ত না, তার পক্ষে এ বড় কম কথা নয়। কিন্তু এতেই গেল তার বন্ধুদের জেদ বেড়ে। ঢাকা দেওয়া জিনিষ দেখবার জন্যই তো লোকের ঔৎসুক্য বেশী।

*　　*　　*　　*

পর পর ক'দিন উমেশকে আড্ডায় দেখতে পাওয়া গেল না। কৌতুহল যখন আর সামলে রাখা যায় না তখন বন্ধুদের মধ্যে একজন একগাদা খবরের কাগজ এনে হাজির করলে। আমরা ভেবেছিলাম বোধ হয় তার কোন লেখা বেরিয়েছে, কিন্তু অতগুলো কাগজে একসঙ্গে কি করে বেরুতে পারে? দেখা গেল একটা বিজ্ঞাপন, বেশ নতুন ধরণের। অনেক কিছু হারানর জন্য বিজ্ঞাপন দেখা গিয়েছে, কিন্তু নাগরা জুতো হারানর জন্য বিজ্ঞাপন কখন দেখা যায় নি—তাও যার হারিয়েছে তার নয়—যে পেয়েছে তার। ব্যাপারটা উপভোগ্য স্বীকার করতে হবে, কিন্তু তার জন্য অত কাগজ সংগ্রহ করবার প্রয়োজন বুঝে উঠতে পারলাম না। শেষে শুনলাম বন্ধুটী অনেক দূর গিয়েছেন; বিজ্ঞাপন দেখে তিনি আরও কতকগুলো কাগজ কেনেন এবং তারপর একজন চেনা সম্পাদকের কাছে গিয়ে অদ্ভুত বিজ্ঞাপনদাতাটীর খবর নেন—সেটী আর কেউ নয়—আমাদের উমেশ।

*　　*　　*　　*

উমেশ কেন নাগরা হারানর বিজ্ঞাপন দিলে তা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। সে নাগরা পরে, কিন্তু নাগরা হারানর জন্য সে যে হৈ চৈ করবে না তা বেশ বলা যায়। সেটুকু চক্ষুলজ্জা ছিল; আর সে জন্য তার বন্ধুরা এ নিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। এর পেছনে এমন কিছু আছে, যা আমরা বেশ উপভোগ করব—আর যার জন্য উমেশের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না, এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু সে উপভোগ্য বস্তুটীর সন্ধান পাওয়াই হচ্ছে কঠিন। চেষ্টা করলে যে উমেশের কাছ থেকেই তার সন্ধান পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু তাতে বিপদ আছে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ হয় তো এমন কিছু বলে বসবে যাতে সে উঠবে ক্ষেপে—আর আমাদের আড্ডাটা একেবারে মাটী হয়ে যাবে। যে বন্ধুটী বিজ্ঞাপনদাতাটীকে আবিষ্কার করেছিলেন এ বিষয়ও তিনিই ভার নিলেন। তাঁর দুষ্টু বুদ্ধির সম্বন্ধে আমাদের কা'রও সন্দেহ ছিল না। তিনি কি কি করতে চান তা আমরা জানতে চাইলাম না—চাইলেও পেতাম কিনা সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ। শুধু এইটুকু জানা গেল যে আমাদের প্রত্যেকের কিছু করে খরচ করতে হবে, আর তার বদলে অনেকটা আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

আমাদের সামনে বসে বন্ধুটী শুধু একখানা চিঠি লিখলেন বিজ্ঞাপন দাতার পোষ্টবক্সে—অবশ্য চিঠির ডান দিকের ওপরের কোণে ঠিকানা তার নিজের নয়। অর্থাৎ তিনি নিজে একবার উমেশের কাছে যেতে চান না। সোজা-সুজি গেলে তো সে বিশ্বাস করবে না যে আমরা কিছু জানি না, আর সেইটা বিশ্বাস করানোর ওপর ভবিষ্যতের "প্ল্যান" নির্ভর করছে।

মেসের সকলেই যখন একমত তখন উমেশের দুর্য্যোগটা যে এবার বেশ বড় রকমের হবে সে বিষয় নিঃসন্দেহ।

এ ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বাধা দেওয়া যায় না—পেল্‌ম্যানই তো শিখিনি যে একা সকলের মতকে নিজের মতে টেনে নিয়ে আসব!

ক'দিন বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই কাটল। উমেশের তো কোন খবরই পাওয়া গেল না, বন্ধুটীও নিরুদ্দেশ। উৎসাহটা বেশ কমে এসেছে তখন একদিন সন্ধ্যেবেলা বন্ধুটী এসে হাজির। আমরা কিছু বলবার আগে বললেন, "আমাদের নাটকের আজ থেকে এবং এখানেই হবে সুরু।"

প্রশ্ন হল "নাটকটা বিয়োগান্ত, না মিলনান্ত হবে?"

"তা ঠিক করে বলা যায় না। সেটা শ্রীমান উমেশের সুবুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। এখনি এখানে আসবে।"

"এখানে কি করে আসতে রাজি করলে?"

"সে আর এমন শক্ত কি? কত লোক আসবে নাগরার সন্ধানে—ওর বাবা নিশ্চয় তাতে সন্তুষ্ট হবেন না; তাই বললাম এই মেসের ঠিকানায় চিঠিরগুলোর জবাব দিতে। দেখ তোমরা যেন ধরা দিও না; তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

বন্ধুটীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমেশ এসে ঘরে ঢুকল। বন্ধুটীর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, "হাঁ, সব বলেছি। যাদের আসতে বলেছ তারা সব কি রকম লোক হে? যত লোক চিঠি দিয়েছে, সকলের তো আর জুতো নয়, তাদের নিয়ে সময়টা ভালই কাটবে, কি বল?"

"কি করে জানব ভাই? কেউ তো বাদ নেই! বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, উড়ে আছে, মাদ্রাজী আছে, আরও কত কি।"

"বল কি? উড়েও আজকাল নাগরা পরছে না কি?"

"কি জানি চিঠি তো লিখেছে।"

"তুমি নাগরার একটা বিবরণ আর পায়ের মাপ চেয়ে পাঠাও নি কেন?"

"ভুল হয়ে গেছে। দেখ, একজন কিন্তু নিজে থেকেই মাপ আর বিবরণ দিয়েছে।"

"কে হে? ঠিক ঠিক মিলেছে না কি?"

"মিলেছে বলেই তো মনে হচ্ছে। কোন কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলে বোধ হয়।"

"অন্য কিছুও তো হতে পারে।"

"না, না, ছেলের নাম রয়েছে যে।"

"খুব বুদ্ধি তো? নিজের নামে বুঝি চিঠি দিতে পারে?"

"কি জানি ভাই! দেখাই যাক্‌।"

* * *

তখন ৭টা বেজে ক'মিনিট হয়েছে। মেসের চাকর এসে জানালে এক পাঞ্জাবী উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বন্ধুটী তাকে ওপরে নিয়ে আসতে বললেন—আর তার বিরক্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাকে চুপি চুপি কি বললেন। উৎকল-নন্দনকে দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা চাঁদার যৎকিঞ্চিৎ থেকে সে বঞ্চিত হবে না।

বাইশ হাত কাপড়ের প্রকাণ্ড এক পাগড়ী, পা পর্য্যন্ত আদ্দির পাঞ্জাবী, আর হাত দশেক লম্বা মোটা বেতের লাঠি দেখে প্রথমটা বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ঐ লাঠি তুলে যদি একবার দাঁড়ায় তাহলে তো আর এগুতে হবে না। কিন্তু সে বেশ নিরীহভাবেই বললে, "কোন বাবুজী হামারে সেলাম দেইয়েছেন?"

উমেশ বললে, "আমি আসতে বলেছিলাম সাহেব। নাগরা কি তোমার নিজের?"

"নে হি? কোন বোলতা?"

বন্ধুটী তাড়াতাড়ি বললেন, "না সাহেব তা নয়। আমরা যে নাগরা পেয়েছি সেটা ছোট কিনা তাই জিগেস করছি।"

"ওহি বাৎ বলিয়ে। হামারা জুতি মুল্লুকসে দোস্ত ভেজা রহা—কেয়া খাপ্‌সুরৎ। চোট্টা লে লিয়া, ঔর নেহি মিলে গা।"

সে চলে যাচ্ছে দেখে উমেশ বললে, "সেলাম সাহেব কিছু মনে কোর না।"

"নেহি হুজুর, নেহি।"

বললাম, "উমেশ তোমার বরাৎ ভাল। যা দিয়ে সুরু হয়েছে, এ যে কোথায় গিয়ে শেষ হয় বলা শক্ত। অত হাঙ্গাম না করে যার পায়ের মাপ ঠিক হয়েছে তাকে ডেকে দিয়ে দিলেই তো হ'ত।"

বন্ধুটী বাধা দিয়ে বললেন, "তা কি হয়? ও যখন বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তখন সকলের কথাই ওকে শুনতে হবে।"

তখন আমাদের দ্বিতীয় অতিথি আসার খবর এসেছে,
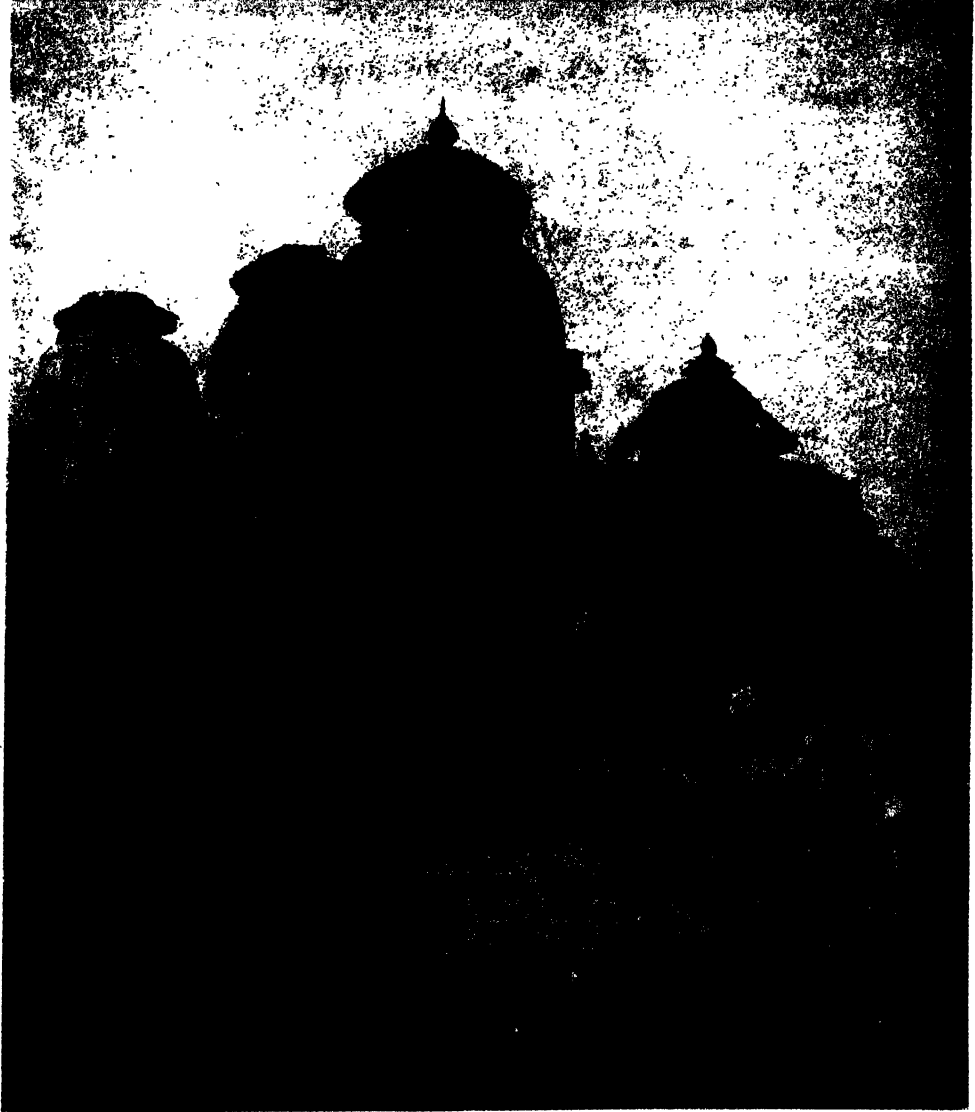
ভুবনেশ্বরের মন্দির

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তাই আর কথা চলল না। দ্বিতীয় অতিথিটী প্রথমটীর অতিরিক্ততার জন্ম যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরও পাগড়ীও নেই, আর লাঠিও নেই, আছে এক প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, আর এক বিশাল দাড়ী। সে দাড়ীর মধ্যে বেশ বৈশিষ্ট্য আছে; গোঁফের সঙ্গে মিশে তা বুক পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গোঁফে তা দেবার জন্ম তাকে আর কষ্ট করে হাত ওঠাতে হয় না। আদুরে গোপালের মত হাসতে হাসতে বললেন। "হামার নাগরা কোন বাবুর পাশ আছে জ্যান।"

রমেশ বললে, "তোমার নাগরা কি রকম বল।"

"উও দেখাইলে হামী পছনে লিব।"

"আগে তোমার জুতো তার প্রমাণ দাও, তারপর দেখাব।"

"এক জোড়া জুতার লিয়ে কি আপনার সাথে জুয়াচুরী করবে?"

"না তুমি যুধিষ্ঠিরের বরপুত্র। তোমার জুতো প্রমাণ দিতে না পারলে দেখতে দিতে পারি না।"

"কি প্রমাণ চাই বলিয়েন। হামার জুতার তলায় লোহেকা নাল আছে।"

"সে তো তোমাদের সকলের জুতোতেই আছে যাক্, এ তোমার জুতো নয়।"

"দিবেন না সেই বাৎ বলিয়েন। ঝুটমুট হামায় কেন বোলাইলেন? বাঙ্গালী বড় পাজী আছে…"

"গালাগালি কোর না—ভাল হবে না।"

"ভালা হোবে না! কেন্না খারাব হোবে? হামারা সেক্টারী উকিল আছে—হাম্ কেস কোরবে।"

বন্ধুটী বললেন, "তোমার যা ইচ্ছে হয় কোর—এখন যাও।"

দ্বিতীয় অতিথি চলে যেতেই উমেশ বললে, "না, আর পারা যায় না। জ্বালাতন করে মারলে। যে ঠিক ঠিক মাপ আর বিবরণ পাঠিয়েছে, সে এলে তো বেঁচে যাই।"

বললাম, "তাতেও কি এরা তোমায় জ্বালাতে ছাড়বে?"

"যে কেউ একজন নিয়ে গেলে তো তোমাদের মেসের চাকরকে বলে দি, কেউ এলে ভাগিয়ে দিতে।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন সুটপরা ভদ্রলোককে ঘরে নিয়ে মেসের চাকর হাজির হোল। ভদ্রলোককে দেখে উমেশ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে—হতাশ হওয়ার ও হতে পারে। অর্থাৎ এই ভদ্রলোকই জুতোর মালিক। টুপি খুলে ভদ্রলোকটী বললেন, "গুডেভেনিং জেন্‌ট্‌লেম্যান্।"

ও, মাদ্রাজী! আমি ভেবেছিলাম বাঙ্গালী! বন্ধুটী জিগেস করলেন, "সাহেব বাঙলা জান?"

"জানে না? কুব বালো জানে। চন্দর-গুপ্ত রেখে, ওবোতার পড়ে, বাঙ্‌লা জানে না। আপনাদের রবিবাবু আছে, শোরৎবাবু আছে—কত আছে……" তার আছের সংখ্যা শেষ হওয়ার আগেই ছুটতে ছুটতে এসে চাকর জানালে একটী মেয়ে উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। কথাটা শুনেই উমেশের যা ভাবান্তর হয়েছিল তা উপভোগ করবার মত। মদ্রর সাহেবী মেজাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি বললেন, "লেডিজ্ ফার্ষ্ট—মহিলার সম্মান দিতে হোবে—আমি চলে যাচ্ছে।" তারপর বন্ধুটীকে বললে, "আপনি একটু শুনবেন।" তাড়াতাড়ি বন্ধুটী তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে উঠে গেল।

দু'টী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন—একজন তরুণী, কিন্তু আর একজন কি তা বলা শক্ত। দু'জন মহিলাকে ঘরে আসতে দেখে আমরা একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম—যে কেউ বহুবাজারের কোন কেরাণীর মেসে একবার গিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এর কারণ বুঝতে দেরী হবে না। ভদ্রমহিলা কেন, যে কোন ভদ্রলোক এলেই আমাদের লজ্জা করে।

ঘরের মধ্যে একটা মাদুরের উপর বসে আড্ডা হচ্ছিল। মহিলারা আসতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। কে একজন ছুটে চেয়ার আনতে গেল। যে মহিলাটীর সম্বন্ধে আমরা ঠিক ধারণা করতে পারছিলাম না তিনি বললেন, "উমেশবাবু কে?"

উমেশ আবার একবার নমস্কার করে বললে, "আজ্ঞে আমার নাম উমেশ। আপনারা কি বিজ্ঞাপন…"

"হাঁ, হাঁ, আমরা তো পায়ের মাপ, জুতোর বিবরণ সব পাঠিয়েছিলাম।"

"ও, আপনারাই পাঠিয়েছিলেন? কিন্তু তাতে যে একজন ভদ্রলোকের নাম ছিল…"

"তাতে কি হয়েছে? ভদ্রমহিলার জিনিষ হারালে কি ভদ্রলোকের চিঠি লিখতে নেই?"

তরুণীটি বললে, "না।"

ও, তা হলে ইনি মা। ভাগ্য-চক্র দেখে সন্দেহ হয়েছিল মীরার মাকে বোধ হয় স্বাভাবিক করে দেখান হয় নি—কিন্তু এবার সে সন্দেহ মিটে গেল।

উমেশ বললে, "আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের জুতোর বিবরণ ও মাপ্ ঠিক মিলেছে…"

পাশ থেকে বন্ধুটী বললেন, "আমরা সেটা পাঠিয়ে দেব।" বন্ধুটী কখন এসেছেন কেউ লক্ষ্য করিনি। তরুণীর মা'টী বললেন, "ভারী তো এক জোড়া জুতো, তাই নিয়ে এত হাঙ্গাম। মেয়ের যে ঐ জুতোর ওপর কি ঝোঁক। বন্ধু তো আর কাউকে কিছু দেয় না। যে জিনিষের ওপর অত দরদ, সে জিনিষ হারালই বা কি করে?"

তরুণীটী বললে, "আমি কি করব? লীলা দুষ্টুমি করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে যে।"

বন্ধুটী বললে, "আচ্ছা, আপনাদের জুতো ঠিক সময়ে পৌছে দেব।"

ভদ্র-মহিলারা চলে যাচ্ছিলেন; বন্ধুটী উমেশকে সঙ্গে যেতে ইসারা করে দিলে।

তাঁরা ঘর থেকে যেতেই সবাই মিলে প্রশ্ন সুরু করলে। বন্ধুটী বললেন, "এখনি উমেশ এসে পড়বে। এখন সব বলার মত সময় হবে না।"

* * * *

এর পর কিছুদিন আর উমেশ আমাদের মেসে এল না। প্রথম দু' একদিন এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কিন্তু তারপর আপনা হতেই থেমে গেল। মেসের দৈনন্দিন জীবন আর আড্ডা—এর মধ্যে নাগরা জুতোর বিজ্ঞাপন যে কখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তা কেউ জানতেও পারলে না। উমেশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটীও ডুব দিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাবই ঐ রকম—কখন মেস ছেড়ে যেতেই চান না, আবার কখন দিনের পর দিন দেখা পাওয়া যায় না। নাগরা জুতোর বিজ্ঞাপনের রহস্য কিন্তু জানা গেল না।

সেদিন মেসে কিসের একটা বিশেষ ভোজ ছিল—ঠিক মনে পড়ে না, কোন কেরাণী-বন্ধুর মাইনে বাড়ার জন্যই হোক, কি কা'র চাকরী হওয়ার জন্যই হোক। ঐ রকম বিশেষ দিনগুলোকে মেসের এক ঘেঁয়ে জীবন থেকে পৃথক করে রাখবার জন্য সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে; তাই হৈ হৈ হয় খুব বেশী—চেঁচিয়েই অনেক অভাব পূরণ করে নিতে হয়। এই রকম একটা সন্ধ্যেবেলায় মূর্ত্তিমান বিস্ময়ের মত উমেশ এসে হাজির হল। তার সঙ্গে একটা হোল্ড-অল আর একটা সুট-কেস। সকলেই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার অভ্যর্থনার ক্রটী হল না। আমাদের আনন্দের ভাগ দেবার জন্য আমরা এত ব্যস্ত যে আর কার তাতে দরকার আছে কি না ভেবে দেখবার সময় পাই না। আমরা প্রায় ভুলেই যাই আমাদের মত সকলের আনন্দের দুর্ভিক্ষ পড়ে যায় নি।

কে একজন জিগেস করলে, "বিছানা পত্র কেন?"

উমেশ ততক্ষণে বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠেছে; বললে, "থাকতে হবে—বাড়ীর সবাই দেশে চলে গেছে। ঘর খালি আছে তো?"

"নিশ্চয়! বাইরে Wanted Members তো আমাদের বরাবরের জন্য টাঙানই আছে।"

"খুব দিনে এসে পড়েছি তো। কিন্তু প্রথম তোমাদের এতখানি আনন্দের আতিশয্যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"বাইরের যে কেউ ভয় পেতে পারে—না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক—কিন্তু তুমি তো এর সঙ্গে বেশ পরিচিত। ও সব কথা থাক্। চল বরং সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক্, কিংবা একটা সিনেমায়…"

উমেশ আপত্তি করে বললে, "না, তার চেয়ে মেসই ভাল। সিনেমায় গিয়ে ভাল না লাগলেও ছবি দেখতে হবে, কারণ পয়সা খরচ করে যেতে হবে—আর পথে বেরুলে জোর করে ভদ্রতার মুখোস পরে চলতে হবে—জোরে হাসবারও উপায় থাকবে না।"

কে একজন মাঝখান থেকে বলে উঠল, "হাঁ, হাঁ, এই ভাল। উমেশ বরং ওর নাগরা পাওয়ার ও ফেরৎ দেওয়ার ইতিহাস বলুক—আমরা শুনি।"

আমরা ভেবেছিলাম উমেশ কথাটাকে বেশ সহজ হাসি ঠাট্টার মতই নেবে কিন্তু সে বেশ বিব্রত হয়ে উঠল। তাকে এ রকম অবস্থায় কেউ কোন্ দিন দেখেছে বলে জানা নেই। সব কিছুকে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই তার স্বভাবসিদ্ধ। একবার বললাম, "না থাক্, ওর বোধ হয় আপত্তি আছে।" কিন্তু নিজেরও শোনবার ইচ্ছে কম ছিল না। উমেশ

ততক্ষণে সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললে, "না, আপত্তি আর কি থাকতে পারে। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। বালিগঞ্জ পার্কে একা একা বেড়াচ্ছিলাম—তখন রাত প্রায় ১১টা হবে। একটা বেঞ্চে বসতে গিয়ে দেখলাম এক জোড়া জরীর নাগরা। অদ্ভুৎ লাগল। নাগরা ছেড়ে রেখে বেড়াবার সখ হয়েছে না কি! লক্ষ্য করে দেখলাম কাছাকাছি কেউ আছে কি না, অনেকক্ষণ বসেও রইলাম, কিন্তু নাগরার খোঁজে কেউ এল না। শেষে পার্কে রইলাম আমি একা—অবশ্য মালীদের বাদ দিয়ে। তাদের কাছে জুতোটা দিতে ইচ্ছে হল না, তাই নিজেই নিয়ে এলাম। ফেরৎ দেবার উপায় এক বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না।"

রহস্যটা এতেও বেশ পরিস্কার হল না অথচ স্পষ্ট কিছু জিগেস করাও চলে না—তাই বললাম, "যাক্, ফেরৎ দিয়ে দিয়েছ তো ?"

"হাঁ, সেদিনকার সেই ভদ্র-মহিলারই জুতো।"

কে একজন বললে, "আচ্ছা মেয়ে তো! জুতো ফেলে চলে যায়, খেয়াল থাকে না? এই সব মেয়েরা আবার সংসারের ভার নেবে!"

উমেশ বললে, "একেবারে গিয়ে মোটরে উঠেছিল কিনা, তাই বোধ হয় খেয়াল হয় নি।"

"মোটর আছে? তুমি এত খবর জানলে কি করে?"

আর অগ্রসর হ'তে দেওয়া নিরাপদ নয় তাই বললাম, "ভারি শক্ত কাজ তো! মোটরেই যে এখানে এসেছিল।"

কথাটা সেদিন ঐখানেই চাপা পড়ে গেল কিন্তু আমাদের গল্পের এখানেই শেষ হল না।

* * * *

উমেশকে আমাদের আড্ডায় ঠিকই পাওয়া যেত, কিন্তু বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সে মেসে থাকত না। লোকের তো কত কাজ থাকতে পারে, তার জন্য নয়। তার এই বিকেলে বাইরে থাকাটা এত নিয়মিত ও ঘড়ি-ধরা হয়ে উঠল যে এক ঘরে থেকে আমার পক্ষে লক্ষ্য না করা অসম্ভব।

নিজেকে যত্ন করবার চেষ্টায় তার কোনদিন ত্রুটী দেখতে পাই নি, কিন্তু এখন যেন সে যত্নের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়েছিল। মেসের দু'চার জন তাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়েন নি। একজন তো একদিন বলেই বসলেন, "অকাল-বসন্ত ভাল নয়।" অকাল-বসন্ত কি করে হ'ল প্রশ্ন করে জবাব পাওয়া গিয়েছিল, "ও সব আজকাল স্কুলের ছেলেদের জন্য—তার চেয়ে বেশী বয়সে মানায় না।"

উমেশ এ সব কথার কোন জবাব দিত না। এটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ—কোন কথা মেনে নেবার মত ছেলে সে নয়। স্পষ্ট কোনদিন তাকে কিছু জিগেস করিনি—ততখানি ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে ছিল না।

* * * *

এই ভাবে চললে ব্যাপারটা বোধ হয় খুব বেশী দূর যেত না—অন্ততঃ ক'লকাতার অর্দ্ধেক লোক জানত না। কিন্তু তা হ'ল না। উমেশের অনেক পরিবর্ত্তন হ'তে লাগল—আর তা এত দ্রুত যে লোকের চোখে তা ধরা পড়বেই।

এর মধ্যে আমাদের সেই বন্ধুটী একদিন এসে জানিয়ে গিয়েছেন আমাদের ধারণা সর্বৈব মিথ্যে নয়। তখন থেকে উমেশকে কেউই আলোচনা থেকে বাদ দিতে চাইত না। আপনারা হয়ত মেসের ছেলেদের রুচির দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের দোষ নেই। মেসে যারা থাকে নি, তারা মেসের ছেলেদের অবস্থা—বিশেষ করে যে সব ছেলের কাজ কর্ম্ম নেই তাদের অবস্থা বুঝে উঠতে পারবেন না।

* * * *

সেদিন জন্মাষ্টমী। সারাদিনটা কোন রকমে কেটেছে কিন্তু সন্ধ্যেটা আর কাটতে চায় না। মেসের অনেকেই থিয়েটার কিংবা সিনেমায় গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচ হবে বলে প্রথমে যেতে চাই নি কিন্তু তার পর যখন আর টিকিট পাবার উপায় ছিল না তখন ভাবছিলাম গেলেই হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল যত রকম অসম্ভব কথা—যেমন হঠাৎ যদি ভূমিকম্প হয় কিংবা একটা টেলিগ্রাম আসে লটারীতে অনেক টাকা পেয়েছি, আমি অবশ্য টিকিট কিনি নি—অন্য কেউ তো আমার হয়ে কিনে থাকতে পারে—বরাতে লটারীর টাকা থাকলে এ আর আশ্চর্য্য কি?—এই রকম সব কথা। সেই সমস্ত ভেঙ্গে চুরে দিয়ে উমেশ ঘরে ঢুকল। তার চোখ-মুখের ভাব দেখে একটু আশ্চর্য্য লাগল, জিগেস করতে হল, "কি হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু না—মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। দেখ না একটা থিয়েটারের টিকিট কিনেছিলাম অথচ যেতে পারছি না। কিছু যদি মনে না কর তো এটাতে তোমায় যেতে বলি।"

"তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না?"

"না ভাই! কি করে যে এসে পৌছেছি তা আমিই জানি।"

"যেতে পারি—যদি পরের মাসে দামটা নাও।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

* * * *

থিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরছিলাম। সারা রাত যাঁরা কখন থিয়েটার দেখেছেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ তখনকার অবস্থা বুঝতে পারবেন না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, অথচ অনেকটা রাস্তা এসে তার পর শুতে পাওয়া যাবে। শোবার আগে কত রকমের বাধা আসতে পারে। সব কিছু জড়িয়ে মনটা একেবারে বেসুরো হয়ে থাকে। এই অবস্থায় মেসে ঢুকছিলাম। আমার বিরক্তিটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে একেবারে গায়ের ওপর দিয়ে এসে একটা মোটর আমাদেরই মেসের দরজায় থামল—আর সেই মোটর থেকে নামল নাগরা জুতোর সেই মেয়েটী ও তার মা। একবার মনে হল ঘুমুচ্ছি, আর না হয় থিয়েটারের মধ্যে বসে আছি; কিন্তু দু'টো ধারণাকেই মিথ্যে করে দিয়ে সেই মেয়েটীর মা আমায় জিগেস করলেন, "আপনাদের উমেশবাবু কোথায় বলতে পারেন?"

স্বপ্নই হয়তো দেখছি, তবু ভদ্রমহিলার প্রশ্ন—তাই জবাব দিতে হল; বললাম, "তাকে কি দরকার? সে এখন আমাদের মেসেই আছে।"

"এখানেই আছেন? চলুন চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন।"

"ব্যাপার কি? কিছু তো বুঝতে পারছি না।"

"এইটা পড়ে দেখুন তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। আমি কি ছাই এত জানি? মেয়ে বললে ছোটমামার বাড়ী যাব, আমি আর আপত্তি করলাম না। ও চলে যেতেই চিঠিখানা এসেছিল। কি করে জানব এমন সর্ব্বনেশে চিঠি রে বাবা। সকালে মেয়ে এসে চিঠি পড়ে…"

ততক্ষণে আমার অবস্থাও যা হয়ে উঠেছিল তা বেশ উপভোগ্য নয়। শেষে এ কি একটা ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। মাথার মধ্যে থানা, পুলিশ, উকিল, কোর্ট—সব একসঙ্গে ভিড় করে এল। কোন কথা না বলে সোজা নিজের ঘরের দিকে চললাম। ভদ্রতার খাতিরে যে মহিলাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া দরকার তাও মনে ছিল না। তাঁরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আসছিলেন।

মেসের সবাই আমার সঙ্গে ঐ মহিলাদের দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। তাদের সকলকে সঙ্গে আসতে বলে নিজের ঘরের কাছে এলাম। দরজা বন্ধ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। দরজায় ধাক্কা দিলাম কিন্তু দরজা খুলল না। চার ধার থেকে জিজ্ঞাসু চোখ আমার ওপর পড়েছিল। আরও দু' একবার দরজা ঠেলে বললাম, "ভাই, দরজাটা জোর করেই খুলতে হবে।"

কে একজন জিগেস করলে, "ঘরে উমেশ নেই?"

তার কথার জবাব দেবার আগেই একজন একটা ছুরী দিয়ে দরজার খিলটা খুলে ফেললে। বিশ্রী একটা আওয়াজ করে খিলটা পড়ল। এক সঙ্গে সবাই মিলে ঘরে ঢুকে দেখলাম উমেশ ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

এতক্ষণে মেয়েটীর মা বললেন, "তুমি তাহলে বিষ খাও নি? এ রকম করে কি ঠাট্টা করে?"

উমেশ বালিশের পাশ থেকে একটা চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে দেখালে। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে দেখলাম তাতে কাল মত কি খানিকটা রয়েছে—আর তার গন্ধটা আফিমের। যেটুকু ভরসা হয়েছিল এক নিঃশ্বাসে তা শেষ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকে, আর ঠিক ঐ বিশেষ দিনেই আমি কিনা সারারাত থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম! সবাই জিগেস করলে, "ওতে কি?"

"আফিম!"

"আফিম! খেয়েছ নাকি?"

উমেশ ঘাড় নেড়ে জানালে হাঁ, তার পর বললে, "অতখানি আফিম খেয়েও আমি মরি নি?"

"আফিম খেলে কেন?"

কোন কথা না বলে উমেশ মেয়েটীর দিকে চাইল। আহা, বেচারার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছিল।

তার মা তো চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বললাম, "দয়া করে একটু চুপ করুন। পুলিশ ডেকে কি লাভ হবে! আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।"

বন্ধুটী যে কখন এসেছিলেন তা দেখি নি। আমায় বাধা দিয়ে বললেন, "না, ডাক্তার ডাকতে হবে না। খেয়েছে তো একতাল খয়ের।"

"এ্যাঁ!"—আওয়াজটা এল উমেশের কাছ থেকে।

বন্ধুটী বললেন, "তুই এত বোকা! অতটা আফিম বুঝি চাইলেই দেয়? আর পাশ না হলে আজকাল আফিম পাওয়া যায় না—জান না?"

মেয়েটীর মা বললেন, "চল মা চল—এদের সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড।"

বন্ধুটী মেয়েটীর দিকে ফিরে বললেন, "যেদিন আপনার নাগরা হারায় সেদিন লীলা আপনার সঙ্গে ছিল না?"

"আপনি তাকে চেনেন?"

মেয়েটীর মা জিগেস করলেন, "লীলা তোমার কেউ হয় নাকি?"

"আজ্ঞে, এই ফাল্গুন থেকে হয়েছে।"

"তুমি কি শুকদেব?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

সকলে এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলাম। এবার আর চুপ করে থাকা অসম্ভব হল। বললাম, "কিন্তু এসব কি হল?"

বন্ধুটী বললেন, "বিশেষ কিছু নয়—উমেশকে আজ পর্য্যন্ত যত রকম ভূতে পেয়েছিল তার রোজা ঠিক করলাম। চলুন আপনারা বাড়ী চলুন" বলে শুকদেব মহিলাদুটিকে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

* * * *

উমেশকে তখন জিগেস করলে হয়তো স্বীকার করত—সে সামনের ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই তিনটে মাসকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

স্বপ্ন-সংহার

"বনফুল"

কদম্বেরি গন্ধ বহি বায়ু বহে রহি রহি
শ্যাম-শোভা উঠেছে মুঞ্জরি'
আকাশের ঘন নীল খুলিয়া প্রাণের খিল
বাহিরিলা কবিতা সুন্দরী।
তন্বী, গৌরী, নীলাম্বরী কি মাধুরী মরি মরি
পীন-বক্ষ, শ্রোণী-ভারাতুরা
কাজল নয়ন-কোলে অলকে যুথিকা দোলে
অচুম্বিতা, অধর-মধুরা।
দেহলতা থর থরে কাঁপিছে আবেগভরে
ঘন নীল নিচোল নিটোল

গুণীজন মন মোহি কেকা কলরব বহি
পূরবী পবন উতরোল!
বহে বায়ু তীব্রবেগে আকুলিয়া কালো মেঘে
ঘন ঘন চপলা চমকে
নয়নে লেগেছে রঙ্ —টং টং টং টং
স্বপ্ন টুটে ঘড়ির ধমকে!
কাচু মাচু মুখ করি কবি কহে, "হে সুন্দরি
দশটা বাজিল!—কর ক্ষমা!
হল বেলা আপিসের পাঁচটার পরে ফের
পারো ত আসিও মনোরমা!"

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

পৃথিবীতে এমন বহু লোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া যান, কিন্তু নিজের প্রচারের জন্য কখনও কোন প্রকার চেষ্টাই করেন না। তাঁহাদের নাম তাঁহাদের পরিচিতগণের মধ্যেই থাকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কৃত কার্য্যের ফল সকলেই ভোগ করিয়া থাকেন।

'নব্য-ভারত' নামক অধুনালুপ্ত মাসিকপত্রের সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় ঐ শ্রেণীর লোক ছিলেন। গত ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও কেহ তাঁহার স্মৃতি লইয়া কোন প্রকার হৈ চৈ না করায় তিনি ক্রমে সাধারণের স্মৃতি-পথ হইতে লুপ্ত হইতেছেন। কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেশবাসীর সে কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আমরা এবার তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হইলাম।

বাঙ্গালা ১২৬০ সালের ২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে দেবীপ্রসন্ন বরিশাল জেলার কালীপুর গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় উলপুর গ্রামে। বংশপরম্পরাক্রমে ইহাঁদের জমীদারী আছে; সেজন্য তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ বসু হইলেও মুসলমান রাজত্বকাল হইতে রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত। দেবীপ্রসন্ন বাল্যে স্বগ্রাম উলপুরের পাঠশালায়, পরে ৪ মাসকাল কলিকাতা চেতলায় মতি-মাষ্টারের স্কুলে, তাহার পর ভবানীপুর নন্দন ব্রাদার্স একাডেমী ও কালীঘাট ইউনিয়ন একাডেমীতে ও শেষে লণ্ডন মিশনারী কলেজে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ৪ বৎসর ডাক্তারী পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য তিনি কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী ও মাতার নাম চন্দ্রকলা। পিতামাতার আগ্রহে বাল্যেই তিনি পরিণীত হন। বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মাতা স্বর্গারোহণ করেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইয়াছিল। কলিকাতায় পঠদ্দশায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যে যোগ দিতে থাকেন। মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পটলডাঙ্গা ও তৎসন্নিহিত স্থানে ছাত্র-নিবাসে বাস করিতে হইত। সেই সময় তিনি সাহিত্য-সেবায় মনোযোগী হন। ঐ সময় ৺কালীপ্রসন্ন দত্ত ও শশিভূষণ গুহ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত তিনি 'ভারত-সুহৃদ' নামক এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। সে সময়ে তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস শরৎচন্দ্র প্রকাশ করেন।

সাহিত্য-সেবা দেবীপ্রসন্নের প্রধান ব্রত ছিল। 'শরৎচন্দ্র' হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি ৯খানি উপন্যাস, ১০খানি প্রবন্ধ পুস্তক ও একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৯০ সাল হইতে তিনি 'নব্য-ভারত' মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা উচিত মনে করিতেন, তাহা ব্যক্ত করিতে কোনরূপ ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সকল দোষ তাঁহার চক্ষে পতিত হইত, তাহা তিনি অকুতোভয়ে নব্য-ভারতে প্রকাশ করিতেন এবং সেইজন্য তিনি অনেক সময় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অপ্রিয় হইতেন।

দেবীপ্রসন্ন তাঁহার হিন্দু ও ব্রাহ্ম আত্মীয় ও বন্ধুগণকে অতিশয় ভালবাসিতেন; সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা তাঁহাদের সাহায্য করিতেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে নিজের বাটীতে স্থান দিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। ১৩২০ সালে কার্ত্তিক মাসে তাঁহার পত্নী কমলকামিনী পুরীধামে পরলোক গমন করিলেন।

দেবীপ্রসন্ন অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। এজন্য তিনি

নানারূপ সৎকার্য্যে ও কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুরীধামে দুইটি বড় বড় দোতালা বাটী ও চারিটি একতলা বাটী এবং বৈদ্যনাথধামে চারিটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নিকট ২টি এবং বরিশাল জেলার নারায়ণপুরেও তিনি একটি বাটী করিয়াছিলেন। দেবীবাবু স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী হইলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার ততদুর পক্ষপাতী ছিলেন না।

নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াও দেবীপ্রসন্ন প্রায় ৩৮ বৎসর কাল নব্য-ভারত চালাইয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্ন নব্য-ভারতকে গল্পোপন্যাস হইতে মুক্ত রাখিয়া এক শ্রেণীর পাঠক সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন। নব্য-ভারতে ব্যবসায়ের গন্ধমাত্র ছিল না। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা তত অধিক ছিল না। তথাপি যা তা বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিবেন না বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দৈন্যের দায় হইতে নব্য-ভারতকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

ফরিদপুরবাসীর উন্নতিসাধন কল্পে তিনি যে সুহৃদ্-সভা গঠন করিয়াছিলেন, তাহা ফরিদপুরের যে কত জলের অভাব, চিকিৎসার অভাব, যাতায়াতের সুবিধার অভাব ও জ্ঞানের অভাব দূর করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। অবরোধ-প্রথার বাধা অতিক্রম করিয়া অর্থসমস্যা সমাধান-পূর্ব্বক মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার যে কত দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ তাহা বুঝিয়া দেবীপ্রসন্ন স্ত্রীশিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

দেবীবাবুর লিখিত ২০খানি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল; এক সময়ে এই পুস্তকগুলি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল—শরৎচন্দ্র, বিরাজমোহন, সন্ন্যাসী, ভিখারী, যোগজীবন, সুরমা, অপরাজিতা, নবলীলা, পুণ্যপ্রভা, সোপান, বিবেকবাণী, প্রসাদ, সান্ত্বনা, বিবাহ-সংস্কার, দ্যুতি, দীপ্তি, জ্যোতিকণা, উৎকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রসূন ও প্রণব।

দেবীপ্রসন্ন কোন সঙ্কল্প করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন এবং কোন ব্যক্তি বা কোন অবস্থাই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিত না। প্রথমে তিনি তাঁহার বিধবা ভগ্নী বিরজাকে স্বীয় পরিবারবর্গের ও আত্মীয় বন্ধুগণের অমতে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করেন। এই সময় দেবীপ্রসন্নের পুত্র প্রভাতকুসুমের জন্ম হয়। তাঁহার পত্নী কমলকামিনী পিত্রালয়ে এই সন্তান প্রসব করেন। পরে কমলকামিনীর পিতামাতা প্রভৃতির অমতে তিনি স্বীয় পত্নী ও শিশুপুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত করেন এবং বিধবা ভগ্নী বিরজাকে—ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের ও হিন্দু সমাজস্থ অপর আত্মীয় বন্ধুগণের বিশেষ বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হন। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন তাঁহার উদার স্বভাব, স্বজনবৎসলতা ও পরোপকারিতা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই এই বিদ্বেষভাব অপনীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি অনেক ব্রাহ্ম বালকবালিকা, স্ত্রী ও পুরুষগণকে নিজ বাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং অনেক ব্রাহ্ম বালিকা ও যুবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ যেমন দেবীবাবুর দ্বারা উপকৃত হইতেন, তাঁহার হিন্দু আত্মীয়বন্ধুগণও তাঁহার দ্বারা সেইরূপ নানাভাবে উপকৃত হইতেন। অনেক বালক তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগের মধ্যে অনেককে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

নিজ জন্মস্থান উলপুর গ্রামে ১৩০৯ সালে তিনি নিজ ব্যয়ে পিতা রামচন্দ্রের নামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রভাতকুসুম বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন এবং কুমিল্লার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার কৈলাসচন্দ্র দত্তের কন্যা ফুল্লনলিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু বিপিনবিহারী রায়ের পুত্র বিলাত-প্রত্যাগত সুপ্রসন্নের সহিত তিনি তাঁহার কন্যা সান্ত্বনার বিবাহ দিয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিজাপ্রসন্নও পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনে দেবীবাবু বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংরাজের উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী সমর্থন করিতেন না। তাঁহার একটি ছাপাখানা ছিল, সেই প্রেসে 'নব্য-ভারত' মুদ্রিত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সেই প্রেসের নিকট গভর্ণমেণ্ট আমানত চাহিলে তিনি প্রেস বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি টাকা জমা দিয়া প্রেস চালান নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর নব্য-ভারতের প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি নব্য-ভারত পরিচালনা দ্বারা যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, দেশবাসী চিরদিন তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে, সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ জৈন নর-নারী

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি

জৈন সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে সকল নরনারী জৈন ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল।

পার্শ্বনাথ

অশ্বসেন নামে বারাণসীর একজন রাজা ছিলেন; তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল বামাদেবী। এক গভীর রজনীতে বামাদেবী যখন তাঁহার শয্যায় শুইয়াছিলেন তখন তিনি একটী কৃষ্ণবর্ণের সর্পকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। অন্ধকারে সর্পটীকে ভালরূপ দেখিতে না পাওয়ায় বামাদেবী ভীত হন নাই। তাহার পরদিন রাজা এই ঘটনাটী জানিতে পারিয়া একটী ভবিষ্যৎবাণী করেন যে তিনি একটী বীর পুত্র প্রসব করিবেন। বামাদেবী শীঘ্রই বহুগুণসমন্বিত এবং সুশ্রী পুত্র লাভ করেন এবং সে পার্শ্বকুমার নামে পরিচিত হইয়াছিল। বাল্যে বিলাসিতায় লালিত-পালিত হইয়া পরে সে তাহার বীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ কুশস্থল নামে একটী সুবিশাল নগরের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁহার কন্যা প্রভাবতীকে সুশিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পরে তাহার একটী যোগ্য স্বামীর অন্বেষণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজা তাঁহার কন্যার জন্য উপযুক্ত স্বামী পান নাই। এক দিবস যখন প্রভাবতী তাহার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল সে পার্শ্বকুমারের যশোগান শ্রবণ করে এবং পার্শ্বকুমারকে বিবাহ করিতে মনস্থ করে। পরে সে তাহার পিতামাতাকে মনোভাব জানায়। প্রসেনজিৎ প্রভাবতীকে পার্শ্বকুমারের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন। অনেকগুলি রাজা তাহাকে বিবাহ করিতে চান। কলিঙ্গ দেশের প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা যবন তাহাকে বিবাহ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিল। প্রভাবতী পার্শ্বকুমারকে বিবাহ করিতে যাইবেন এই সংবাদটী যবন পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবদ্দশায় প্রভাবতী পার্শ্বকুমারকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। যবন বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহার পিতার রাজধানী কুশস্থল আক্রমণ করিলেন। প্রসেনজিৎ রাজা অশ্বসেনের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পার্শ্বকুমার কুশস্থল নগরে গমন করিয়া রাজা যবনের নিকট দূত প্রেরণ করেন। রাজা যবন-দূতকে বলেন যে পার্শ্বকুমার যদি জীবনের আশা রাখেন তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিৎ। যবনের মন্ত্রী তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে পার্শ্বকুমারের সহিত সে যুদ্ধে পরাজিত হইবে। পরে রাজা যবন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া পার্শ্বকুমারের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; অশ্বসেন প্রভাবতীকে লইয়া পার্শ্বকুমারের শিবিরে যান এবং বলেন "তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিবে যদি তুমি আমার কন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ কর"। পার্শ্বকুমার উত্তরে বলেন যে "আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিতে নয়। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং আমি আমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" প্রভাবতীর পিতা রাজা প্রসেনজিৎ এবং রাজা অশ্বসেন প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে পার্শ্বকুমারকে বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন। পার্শ্বকুমার বলেন "বিবাহ-জীবন আমি পছন্দ করি না।" কিন্তু তাঁহার পিতার আদেশে তিনি প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। এই বিবাহে প্রভাবতী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কমঠ নামে একজন ভিক্ষু প্রখর রৌদ্রের তাপে পঞ্চাগ্নি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁহার আসনের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। মেধাবী পার্শ্বকুমার ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠের মধ্যে একটী সর্পকে পুড়িতে দেখিয়া বলিলেন "মনুষ্য দেহকে কষ্ট দিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া মূর্খের কর্ম্ম। ধ্যান ধর্ম্মের একটী অংশ বিশেষ। অহিংসা সর্ব্বগুণের শ্রেষ্ঠ গুণ।"

কমঠ উত্তরে বলেন "ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমি কি জান ? তুমি অশ্ব এবং হাতী চড়িতে জান। আমার মত ভিক্ষুই ধর্ম্মকে জানে।" ইহা শুনিয়া পার্শ্বকুমার ঐ কাষ্ঠ খণ্ডকে সোজা করিয়া কাটিতে অনুরোধ করেন এবং যখন কাষ্ঠখণ্ড এই ভাবে কাটা হইতেছিল তখন একটী অগ্নিদগ্ধ সর্পকে বহির্গত হইতে দেখা গেল। ঐ সর্প নবকার মন্ত্র শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করে। ইহা দেখিয়া কমঠ লজ্জিত ও রাগান্বিত হন কিন্তু তিনি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করেন নাই। ঐ ভিক্ষুটী শীঘ্রই মারা যান। বসন্তকালে একদিন পার্শ্বকুমার ও প্রভাবতী বনে বিচরণ করিয়া একটী প্রাসাদে আসিয়া বিশ্রামের জন্য বসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা নেমিনাথের বিবাহের ছবি দেখেন এবং আরও দেখেন যে নেমিনাথ প্রাণীদিগের চীৎকার শ্রবণ করিয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহার "রথ" প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই সকল ছবি দেখিয়া পার্শ্বকুমার ভাবিতে লাগিলেন যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা এবং তদনুসারী কর্ম্ম করা, বিলাসে দিন যাপন করা নহে। তাহার পর তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। দরিদ্রদিগকে তিনি আশ্রয় দিতেন, পতিতের উদ্ধার কর্ত্তা ছিলেন এবং কাহাকেও কষ্ট দিতেন না। পার্থিব সুখে তাঁহার ঘৃণা জন্মিল এবং পরে তিনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন, বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। পার্শ্বকুমার রাত্রে একটী পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষের পাদমূলে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। মেঘমালী পার্শ্বকুমারকে শত্রু বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার মনে ভীতি উৎপাদনের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে পার্শ্বকুমার মুক্তিজ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার উপদেশে বহু নরনারী পবিত্র জীবন যাপন করেন। পার্শ্বকুমার তীর্থস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলা হইত। পার্শ্বকুমারের পিতা মাতাও প্রভাবতী সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন। একশত বৎসর বয়সে পার্শ্বকুমার নির্ব্বাণ লাভ করেন।

নেমিনাথ

যমুনাতীরস্থিত সৌরীপুর নামে একটী বৃহৎ নগরে সমুদ্রবিজয় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষী শিবাদেবীর গর্ভে অরিষ্টনেমির জন্ম হয়। অরিষ্টনেমির আর একটী নাম ছিল নেমিনাথ। সমুদ্রবিজয়ের নয়টী ভ্রাতা ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম ছিল বসুদেব। বসুদেবের অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার রোহিণী ও দেবকী নামে দুইটী স্ত্রীর গর্ভে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। সৌরীপুরের নিকট মথুরা নামে একটী বৃহৎ নগর ছিল এবং ইহার অত্যাচারী রাজার নাম ছিল কংস। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব কংসের জীবন নাশ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করেন। জরাসন্ধ তাঁহার জামাতা কংসের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছিলেন। উগ্রসেন মথুরা ত্যাগ করিয়া কাথিয়ার গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সমুদ্রতটে দ্বারকা নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইয়াছিলেন। এক দিবস নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রশালায় উপস্থিত হইয়া একটী সুন্দর শঙ্খ দেখেন। যখন নেমিনাথ শঙ্খটী তুলিতে যাইতেছিলেন তখন তিনি শুনিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ইহা অন্য কেহ তুলিতে অসমর্থ। নেমিনাথ সহজে ইহাকে তুলিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নেমিনাথের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষার ফলে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে নেমিনাথের বল তাঁহার বল অপেক্ষা অধিকতর। নেমিনাথকে বিবাহ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং পরে নেমিনাথ

পার্শ্বনাথ

তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করেন। রাজা উগ্রসেনের কন্যা রাজমতীর সহিত নেমিনাথের বিবাহ স্থির হয়। নেমিনাথ উগ্রসেনের প্রাসাদে উপস্থিত হইবামাত্র জীবের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। নেমিনাথ রথ-চালককে এই ক্রন্দনধ্বনির অর্থ কি জিজ্ঞাসা করেন। রথচালক বলে যে সকল জীব এই বিবাহ দিনে তাহাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছে তাহারাই ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। জীবগুলিকে মুক্ত করিতে তিনি রথচালককে আদেশ দিলেন এবং রথচালকও তাঁহার আদেশ পালন করিল। তিনি রথ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। যখন রাজকন্যা শুনিলেন যে নেমিনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

সোমনাথ জৈন মন্দির

করিয়াছেন তখন তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি নেমিনাথের জন্য চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন যে নেমিনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। নেমিনাথ সাধুর জীবন গ্রহণ করিলেন। তিনি সামান্য খাদ্য খাইতেন, ভূমিতে শয়ন করিতেন, একটীমাত্র পরিধেয় পরিধান করিতেন। তিনি সকল লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শীঘ্রই নেমিনাথ মুক্তি-জ্ঞান লাভ করেন। মুক্তি-জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি লোকগুলিকে সদা সত্য কথা বলিতে, সকল লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে, প্রভুর বিনা অনুমতিতে কোন বস্তু না লইতে ও শীল পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনেক লোক তাঁহার পরামর্শানুযায়ী ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজমতী নেমিনাথকে অনুসরণ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করেন। নেমিনাথ দীর্ঘকাল পরে গির্‌ণার্‌ পর্ব্বতের চূড়ায় নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই গির্‌ণার্‌ পর্ব্বত জৈনদিগের একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিচিত।

কুমারপাল

সিদ্ধরাজ জয়সিংহ নামে গুজরাটে একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। একজন জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবিদের নিকট হইতে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে কুমারপাল তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। তখন তিনি কুমারপালকে বধ করিবার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দেথলীর নৃপতি ত্রিভুবনপালের পুত্রের নাম কুমারপাল। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল ভোপালদে। মহীপাল এবং কীতিপাল নামে তাঁহার দুইটী ভ্রাতা ছিল। প্রেমলদেবী এবং দেবলদেবী নামে তাঁহার দুইটী ভগ্নী ছিল। যখন কুমারপাল জানিতে পারিলেন যে সিদ্ধরাজ তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন, রাত্রিকালে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি পাঠন দেশে একটী দেবালয়ের পুরোহিতপদে নিযুক্ত হইলেন। সিদ্ধরাজ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদনের জন্য সকল পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কুমারপাল এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটী বনে আশ্রয় লইলেন। রাজা সিদ্ধরাজের সৈন্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। অতি প্রত্যূষে কুমারপাল তাঁহার ক্ষতদেহ লইয়া একটী বৃক্ষতলে আরাম

করিতে করিতে দেখিলেন যে একটী মুষিক ২১টী মুদ্রা একটীর পর একটী গহ্বর হইতে বাহির করিতেছে। মুষিককে একটী মুদ্রা রাখিবার নিমিত্ত গহ্বরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কুমারপাল অবশিষ্ট ২০টী মুদ্রা নিজে লইলেন। মুষিক অবশিষ্ট মুদ্রা দেখিতে না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দেখিয়া কুমারপাল অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে একটী মুষিকেরও মুদ্রার প্রতি মায়া আছে। সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কুমারপাল তিন দিবস ধরিয়া কোন আহারাদি না পাইয়া মৃতব্যক্তির ন্যায় পথে শুইয়াছিলেন। শ্রীদেবী শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কুমারপালকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দয়া করিয়া কিছু খাদ্য দিয়াছিলেন। কুমারপাল এই সামান্য খাদ্য পাইয়া বহু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পরে তাঁহার জন্মভূমি দেথলীতে যান। সিদ্ধরাজ যখন শুনিলেন যে কুমারপাল স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। সজ্জন নামে একজন কুম্ভকার কুমারপালকে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কুমার পাল আপন পরিবারবর্গকে মালব দেশে পাঠাইয়া দিয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন; বোসিরী নামে একজন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং বোসিরী তাঁহাকে খাদ্য দিয়া সাহায্য করিত। খুব শীঘ্রই কুমারপাল বোসিরীর স্থান ত্যাগ করিয়া খংভাত দেশে গমন করেন। সেই স্থানে হেমচন্দ্র নামে একজন জৈন শিক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই শিক্ষক ভবিষ্যৎ-বাণী করেন যে তিনি গুজরাটের নরপতি হইবেন। উদায়ন নামে একজন মন্ত্রী তাঁহাকে আশ্রয় দেন। সিদ্ধরাজ এই সংবাদ পাইয়া কুমারপালকে ধরিয়া লইয়া আসিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন কিন্তু সৈন্যগণ কুমারপালকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হেমচন্দ্র কুমারপালকে বলিলেন "তোমাকে আর বহুদিন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। তুমি শীঘ্রই গুজরাটের রাজা হইবে।" কুমারপাল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় তাহা হইলে তিনি জৈন-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক হইবেন। মালবদেশে আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে কুমারপাল আরও অনেক দেশ দেখিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ মরণাপন্ন জানিয়া তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া গুজরাটে আসিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ তাঁহার মন্ত্রীপুত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কুমারপাল পাঠনদেশে আসিয়া তাঁহার রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কুমারপাল সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের ঋণ ভুলিয়া যান নাই। ভোপালদেকে তিনি প্রধানা মহিষী করিয়াছিলেন এবং ভীমসিংহকে দেহরক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সজ্জন শত শত গ্রামের উপরাজা হইয়াছিল। লাটদেশের বিচারাধিপতি হইয়াছিল বোসিরী এবং উদায়ন তাঁহার
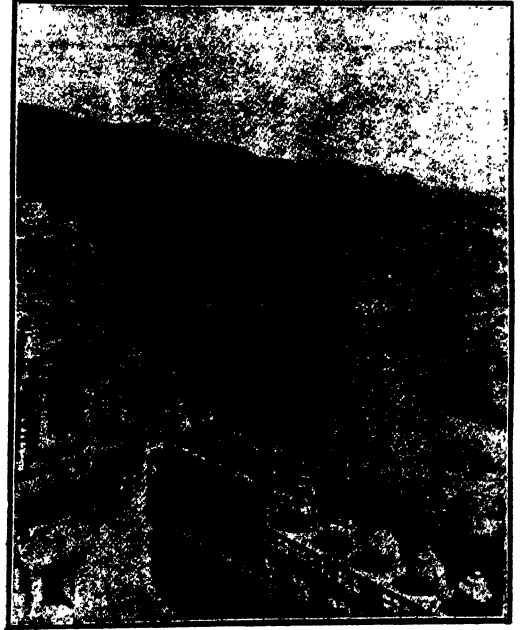
আবু পাহাড়ে জৈন মন্দির

প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিল। জৈন-শিক্ষক হেমচন্দ্রকে তাঁহার গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। কুমারপালের অধীনস্থ রাজারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। আজমীরের রাজা কুমারপালের বশ্যতা স্বীকার করে। কোঙ্কনদেশের রাজা মল্লিকার্জ্জুনকে তিনি পরাস্ত করেন। সুরাটের সমরসিংহ এবং আরও অনেক ছোট ছোট রাজাকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। কুমারপাল অষ্টাদশ দেশের নৃপতি ছিলেন। উত্তরে তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল পাঞ্জাব পর্য্যন্ত, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে গঙ্গা এবং পশ্চিমে

ইন্দাস নদী পর্য্যন্ত। হেমচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার রাজ্যে জীবননাশ বন্ধ করিয়া দেন। সোমনাথের জৈনমন্দির এবং আর বহুসংখ্যক জৈন-মন্দির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে লোকেরা সুখশান্তিতে বাস করিত। অহিংসাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। তিনি ১৪,০০০ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু দেশহিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি রাজত্ব করেন এবং জৈনগুরুর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। একাশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুমার পাল ও হেমচন্দ্র

বস্তুপাল ও তেজপাল

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সোলাংকীর রাজগণের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বীরধবল নামে একজন রাজা খুব বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরধবলের আশ্রজ নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। আশ্রজ বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া সুংহালক নামে একটী গ্রামে বাস করিতেন। আশ্রজের তিনটী পুত্র এবং সাতটী কন্যা ছিল। পুত্রদিগের মধ্যে বস্তুপাল এবং তেজপাল সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। বস্তুপাল এবং তেজপালের বিদ্যা-শিক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ললিতা এবং অনুপমা নাম্নী দুইটী বালিকার ইঁহারা পাণিগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা মাণ্ডবদেশে বাস করিতেন। ইঁহাদের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। মাতার মৃত্যুর পর তাঁহারা পুণ্যতীর্থ শক্রঞ্জয়ে যান। ঢোলকাগ্রামে সোমেশ্বরের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব হয়। গুজরাটে বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা বীরধবল একজন যোদ্ধার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সোমেশ্বর রাজার নিকট ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় করিয়া দিয়া বলেন যে ইঁহারা জৈনধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক এবং রাজকার্য্য পরিচালনে দক্ষ। রাজা তাঁহার রাজ্য পরিচালনের জন্য ইঁহাদের অনুরোধ করেন। বস্তুপাল বলেন, "আমি দেবতার আরাধনা শেষ করিয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।" তিনি আরও বলেন, "যদি আমাদের এই কার্য্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের নিকটে যে তিন লক্ষ মুদ্রা থাকিবে তাহা আমরা লইয়া যাইব।" রাজা ইহাতে সম্মত হন এবং বস্তুপালকে প্রধান মন্ত্রীপদ দেন ও তেজপালকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া দেন। বস্তুপাল রাজ্যের অনেক মন্দ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। বস্তুপাল রাজ্যের সমস্ত ভার তেজপালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং তাঁহার বলশালী সৈন্য লইয়া রাজার সহিত বহির্গত হন। যে সমস্ত জমিদার কর দেন নাই, সেই সমস্ত কর তিনি আদায় করেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। বস্তুপাল নিকটস্থ দেশগুলি জয় করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সংগান্ এবং চামণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করেন। বস্তুপাল সমগ্র কাথিয়াওয়ার দেশ জয় করেন। তাহার পর রাজার সহিত গিরণারে গমন করেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহু ধর্ম্মাচরণ করেন। ভদ্রেশ্বরের রাজা ভীমসিংহকে নিজের বশে আনেন। থংভাতের সিদ্দিক নামে একজন ধনী বণিক আর একজন বণিকের ধন লুণ্ঠন করে এবং তাহাকে হত্যা করে। বস্তুপাল ইহা শুনিয়া সিদ্দিকের উপর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান

করেন। তাহার পর তিনি খংভাত দেশে প্রবেশ করিয়া বহু মহামূল্য অলঙ্কার লাভ করেন। দিল্লীর সম্রাট মৌজদীনের গুজরাটদেশ আক্রমণের ফলে বস্তুপাল ও তেজপালের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হয় এবং সম্রাট পরাস্ত হন। এই ভ্রাতাদ্বয় মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। স্বধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাৎসরিক বহু অর্থ ইহাঁরা ব্যয় করিতেন। শত্রুঞ্জয়, গিরণার্ এবং আবু-পর্ব্বতে তাঁহারা জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং শত্রুঞ্জয় এবং গিরণার্ পর্ব্বতে সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেদারনাথ হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত এমন কোন জৈনতীর্থ ছিল না, যাহা তাঁহাদের সাহায্য পায় নাই। কাশী, দ্বারকা, সোমনাথ এবং পাটনদেশে প্রত্যেক বৎসরে তাঁহারা বহু অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। অনেক শিবমন্দির এবং মুসলমানদিগের মস্‌জিদ্ তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা বীরধবলের মৃত্যুর পর যুবরাজ বিশলদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বস্তুপাল শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়।

ক্ষেমা

ক্ষেমা দেদ্রাণীর পুত্র। ক্ষেমা তাহার জীবনের বহুদিন ধরিয়া দেশে দেশে ব্যবসা করিতেন। তিনশত ষাট দিন ধরিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগকে তিনি অন্ন দিয়াছিলেন। একটী গহ্বরের মধ্যে ক্ষেমার বহু সংখ্যক ধন নিহিত ছিল। বাদশা যখন ক্ষেমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার কয়টী গ্রাম আছে। উত্তরে ক্ষেমা বলেন যে দুইটী, একটী তুলাদণ্ড ও অপরটী পাত্র। এই তুলাদণ্ড লইয়া তিনি শাকশব্জী ক্রয় করেন এবং পাত্রের দ্বারা ঘৃত এবং তৈল বিক্রয় করেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ক্ষেমা এক বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক লোককে দান করিয়াছিলেন। তিনি সঞ্জয় পুণ্যতীর্থে বহুদিন জীবনযাপন করিয়া তথায় মারা যান।

পেথড়কুমার

পিতার মৃত্যুর পর পেথড়কুমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে সমস্ত হারাইয়া এতদূর দীন হইয়া পড়িল যে তাহার পক্ষে তাহার স্ত্রী পদ্মিনী ও তাহার একটীমাত্র পুত্র ঝাঝনের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। নিমার দেশের মধ্যস্থিত নামদুরী গ্রামে একটী বিহারে সে কালাতিপাত করিতেছিল, সেই সময় একটী সুশিক্ষিত জৈনমুনি দরিদ্র পেথড়কুমারকে দেখিতে পাইয়া অর্থোপার্জ্জনের ব্রত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পেথড়কুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যদি পুনর্ব্বার অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে সেই অর্থের কিয়দংশ সৎকার্য্যের জন্য ব্যয় করিবে; দিন দিন সে এত গরীব হইয়া পড়িল যে স্ত্রীপুত্র লইয়া সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিতে সে বাধ্য
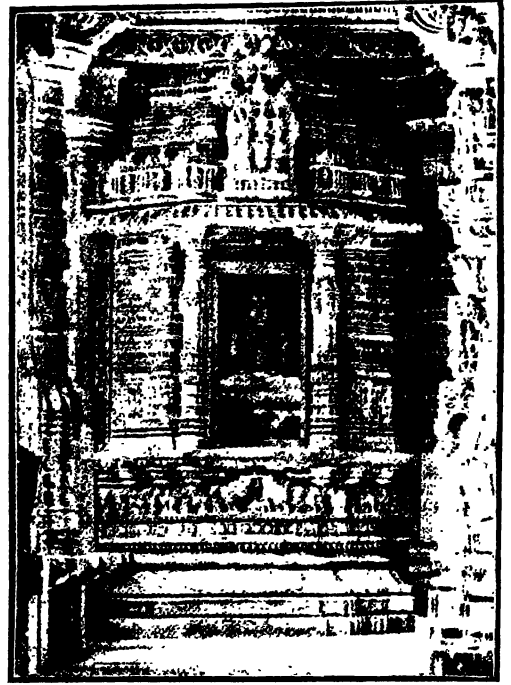
নেমিনাথ

হইয়াছিল। এই সময়ে মালবদেশে মাণ্ডবগড় নামে একটী সুন্দর নগর ছিল। এখানে বহু বণিকের বাস ছিল। পেথড়কুমার এই নগরে আসিয়া একটী দোকান খোলে। নিকটস্থ গ্রামের স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সে বিশুদ্ধ ঘৃত কিনিত এবং নির্দ্ধারিত দরে তাহা বিক্রয় করিত। তাহার সত্যবাদিতার জন্য ব্যবসায়ে সে উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং খুব অল্প সময় মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। ঐ দেশের রাজা জয়সিংহ তাহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তাহাকে

বড় ভালবাসিতেন এবং তাহার পুত্রকে সত্যবাদিতার জন্ম খুব স্নেহ করিতেন। রাজা পেথড়কুমারকে তাহার প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং তাহার পুত্র ঝাঝনকে পুলিশের নেতা করেন। পেথড়কুমারের নিকট একটী চিত্রাবলি ছিল যাহার বলে ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হইত না। পেথড়কুমার রাজার করের হার কম করিয়া দিয়াছিল এবং দেশবাসীর উন্নতির দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। পেথড়কুমার আবু পর্ব্বতে আসিয়া একটী জৈন-মন্দির দেখিয়াছিল। মান্দবগড় এবং দেবগিরিতে সুন্দর জৈন-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্ম সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। রাজা
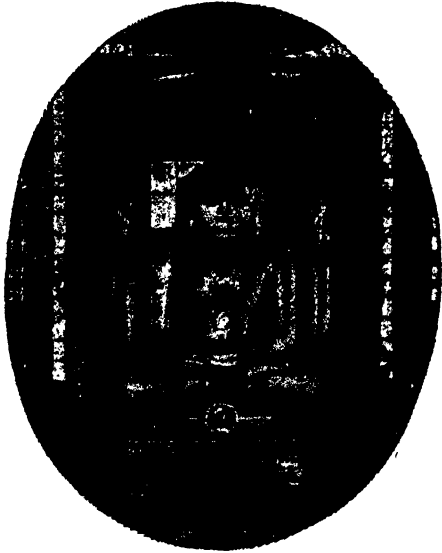
ঋষভদেব

জয়সিংহের মহিষী লীলাবতী এই সময়ে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার দাসী পেথড়কুমারের বস্ত্রদ্বারা তাঁহার শরীর আবৃত করে এবং ইহার ফলে রাজমহিষী সুস্থ হইয়া নিদ্রা যান। কোন একজন দুষ্ট লোক রাজাকে সংবাদ দেয় যে লীলাবতী প্রধান মন্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বস্ত্র শরীরে আবৃত করিয়া শয়ন করিতেছেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং প্রধান মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাণীকে হত্যা করিবার জন্ম অরণ্যে পাঠাইয়া দেন। ঘাতকেরা রাণীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। ঝাঝনকুমার রাজমহিষীকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যায়। এই সময়ে রাজার একটী প্রিয় হস্তী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর একটী দাসী পেথড়কুমারের বস্ত্র লইয়া আসিয়া হস্তীর শরীরটাকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহার ফলে জন্তুটী তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পায়। তখন ঐ দাসীটী রাজাকে বলে যে পেথড়কুমারের বস্ত্রদ্বারা রাজমহিষীর শরীর আবৃত করিবার ফলে তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হন। পেথড়কুমারকে কারামুক্ত করেন এবং তাঁহার দোষ তিনি স্বীকার করেন। যখন রাজা শুনিলেন যে রাণী জীবিতা, তিনি রাণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং রাণীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা দুইজনে সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পেথড়কুমার বৃদ্ধ বয়সে বহুলোক লইয়া শত্রুঞ্জয় তীর্থে আসিয়াছিল। এই তীর্থে সে আদিনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ও গিরণার দর্শন করিয়া সে মাণ্ডবে ফিরিয়া যায়। তাহার চেষ্টায় অনেকগুলি ভাল জৈন পুস্তক লেখা হইয়াছিল। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সে তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল।

অমরকুমার

রাজগৃহের রাজা শ্রেণিক বহু দেশ হইতে সুদক্ষ চিত্রকর আনয়ন করিয়া বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রশালার তোরণ-দ্বার দুইবার পড়িয়া যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া রাজা একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। বত্রিশটী চিহ্নযুক্ত একটী বালকের রাজার প্রয়োজন হয়—দেবতার উদ্দেশে তাহার প্রাণনাশের জন্ম। ঋষভদেবের চারিটী পুত্রের মধ্যে অমরকুমারের বত্রিশটী চিহ্ন ছিল। অমরকুমার নবকার মন্ত্র-শিক্ষা করিয়া দুঃখ কষ্ট নিবারণ করিতে পারিতেন। ঋষভদেব অমরকুমারকে রাজার নিকট বিক্রয় করেন এবং রাজা তাহাকে চিত্রশালায় আনয়ন করেন। গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করাইয়া মাল্য এবং চন্দনের দ্বারা তাহাকে অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল। হোমাগ্নির নিকটে সে দাঁড়াইয়াছিল। প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয় নাই। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং প্রচুর রক্ত তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হয়। অমরকুমারের সাহায্যে তিনি সুস্থ হন। রাজা

সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অর্থ প্রদান করিতে উদ্যত হন কিন্তু সে অর্থ লইতে অস্বীকার করিয়াছিল। অমরকুমার নিজেকে ধ্যানে নিমগ্ন করিবার জন্য একটী অরণ্যে প্রবেশ করেন। যখন তাঁহার পিতামাতা এই সংবাদ পাইলেন তাঁহার মাতা অরণ্যে পুত্রকে দেখিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে হত্যা করেন। অমরকুমার জানিতেন যে ইহা তাঁহার মাতার কার্য্য, কারণ তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন। শুভ-চিন্তা করিতে করিতে অমরকুমার ইহলোক ত্যাগ করেন।

নিরাপদ নহে, তিনি তাঁহার পুত্রকে. লইয়া পিতৃগৃহে বাস করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। বিমলশাহ তাহার মাতুলকে কৃষিকার্য্যে এবং পশুপালনকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। সে অশ্বারোহণে এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। শ্রীদত্ত নামে পাটনের একজন বণিক শ্রী নাম্নী তাঁহার কন্যাকে বিমলশাহের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। যখন বিমলশাহ শুনিল যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে এই বিবাহ সম্পন্ন হইবে না, সে অর্থোপার্জ্জনের জন্য একটী অরণ্যে গমন করে। অরণ্য
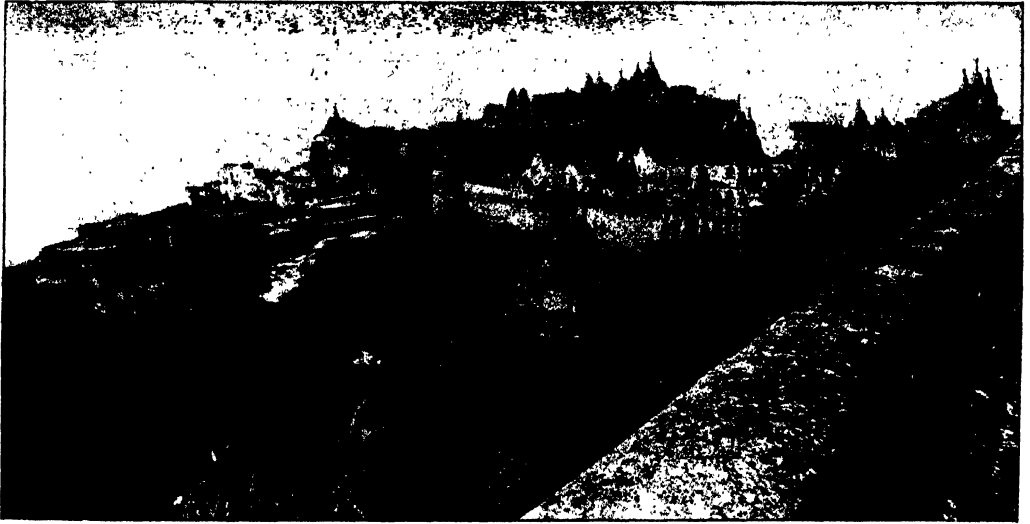
শত্রুঞ্জয়

বিমলশাহ

লাহির নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুক বনরাজ নামে গুজরাটের প্রধান নৃপতির সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। লাহির একজন ক্ষমতাশালী ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নাম ছিল বীর। বীরের পত্নী বীরমতীর গর্ভে বিমলশাহের জন্ম হয়। তাহার অঙ্গে ৩২টী চিহ্ন ছিল। বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া যখন বিমলশাহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন বীরমতী তাহাকে মহাবীরের উপদেশগুলি পালন করিতে উপদেশ দেন। বীরমতী যখন জানিতে পারিলেন যে বিমলশাহকে লইয়া সেখানে বাস করা

মধ্যে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া এই বিষয় চিন্তাকালে হঠাৎ সে তাহার যষ্টিটী একটী গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেখিল যে একটী পাত্র বহু মুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ঐ পাত্রটী সে গৃহে আনিল এবং মাতার সম্মুখে রাখিয়া দিল। খুব শীঘ্রই শ্রীদেবীর সহিত বিমলশাহের বিবাহ হইল। মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া মাতা এবং স্ত্রীর সমভিব্যাহারে পাটনে উপস্থিত হইল। তথায় সে একদিন দেখিল যে রাজসৈন্যের মধ্যে কেহই চিহ্নিত বস্তুকে ছেদ করিতে পারিতেছে না। ইহা দেখিয়া সে বলিল যে মহারাজ ভীমদেবের লুপ্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। সেই সময় মহারাজ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তিনিও

সেই চিহ্নিত বস্তুকে ছেদ করিতে পারিলেন না। বিমলশাহ হাস্যবদনে বলিল যে আপনারা সকলেই রাজ্যশাসনে অসমর্থ। ইহা শুনিয়া মহারাজ তাহাকে তাহার ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিমলশাহ বলিল একটী বালককে ১০৮টী পান পাতা লইয়া ভূমিতে শয়ন করাইয়া দিন এবং ঐ চিহ্নিত পাতাগুলি আমি ছেদ করিব এবং বালকটী কোনরূপে আঘাত পাইবে না। ইহাতে যদি আমি অসমর্থ হই আপনি আমাকে হত্যা করিবেন। রাজা বিমলশাহের ধনুর্বিদ্যায় পারদশিতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিমলশাহের অধীনে রাখিয়া দিলেন। খুব শীঘ্রই বিমলশাহ মন্ত্রীপদ পাইল। জীনেশ্বরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সে সৈন্যদলের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার ভোগের জন্য একটী সুবৃহৎ এবং সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রাজা এই সকল সংবাদ পাইয়া বিমলশাহের গৃহে গমন করিয়া সংবাদ সঠিক জানিয়া কিভাবে বিমলশাহকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। একজন মন্ত্রী বলিলেন যে আহারের সময় নগরে একটা ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং বিমলশাহকে ঐ ব্যাঘ্র ধরিবার আদেশ করা হউক। ব্যাঘ্রটী বিমলশাহকে বধ করিবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। রাজা তাহাই করিলেন কিন্তু বিমলশাহ অতিরিক্ত বলের দ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরিয়া তাহার আবাসস্থানে ছাড়িয়া দিল। দেশবাসীরা ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু রাজা এবং মন্ত্রীবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বিমলশাহ রাজমল্লকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল। তাহার প্রতি রাজার আচরণের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিমলশাহ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে তাহার পিতামহী যে কর্জ্জ লইয়াছিল সে কর্জ্জ পরিশোধ না করায় রাজা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যখন বিমলশাহ জানিতে পারিল যে তাহার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে তখন সে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং হস্তী ও রথ লইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল। সে আবু পর্ব্বতে গমন করিল। আবু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রাবতী নামে একটী নগরের রাজা যখন শুনিলেন যে বিমলশাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে তখন তিনি তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজা ভীমদেবের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া সে অনেক দেশ জয় করিয়াছিল। সিন্ধুদেশের অত্যাচারী রাজা পণ্ডিয়াকে সে পরাস্ত করে এবং পরমারের রাজা খুণ্ডদেবকে রাজা ভীমদেবের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে। তাহার পর সে চন্দ্রাবতীর সিংহাসনে অধিরোহণ করে। রাজা বিমলশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বহু সুন্দর মন্দির এবং পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন এবং বাজার বসাইয়াছিলেন। শ্রীধর্ম্ম ঘোষ নামে কোন একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পরামর্শ দেন। বিমলশাহ আবু পর্ব্বতে আসিয়া বহুসংখ্যক শিব-মন্দির দেখিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য খুব অধিক ছিল। বিমলশাহ একটী জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য সামান্য জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। আবু পর্ব্বতে এই সুন্দর জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে ভগবান ঋষভদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই মন্দির এখনও আবু পর্ব্বতে আছে।

শ্রীপাল

শ্রীপাল রাজা সিংহরথ এবং রাণী কমলপ্রভার পুত্র। তিনি অঙ্গদেশে চম্পার রাজা ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। শ্রীপালের খুল্লতাত অজিতসেন রাণী কমলপ্রভা এবং শ্রীপালকে বধ করিবার জন্য রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। রাণী এই সংবাদ পাইয়া গভীর রাত্রে শ্রীপালকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ অরণ্য মধ্যে ৭০০ কুষ্ঠরোগীদের সহিত তিনি বাস করিতেছিলেন। অজিতসেনের সৈন্যগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে ধরিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। শ্রীপাল কুষ্ঠরোগীর নিকট হইতে খাদ্য লইয়াছিল বলিয়া সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার দেহের চর্ম্ম উম্বর বৃক্ষের ছালের মত ছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল উম্বররাণা। কোন একটী লোকের নিকট কমলপ্রভা জানিয়াছিলেন যে কৌশাম্বীর একজন বৈদ্য কুষ্ঠব্যাধি সারাইতে পারে। তিনি কৌশাম্বীতে গমন

করিলেন এবং সমস্ত কুষ্ঠরোগীদিগকে উজ্জয়িনীতে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কুষ্ঠরোগীগণ তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল। এই সময়ে উজ্জয়িনীর প্রতিপাল নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সুরসুন্দরী ও ময়নাসুন্দরী নামে দুইটী শিক্ষিতা কন্যা ছিল। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য কোথায় তাহারা নির্ভর করে, নিজের অদৃষ্টের উপর—কিংবা পিতার উপর। সুরসুন্দরী উত্তর করিয়াছিল যে সে পিতার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ময়নাসুন্দরী বলিল যে সে তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কোন একটী যুবরাজের সহিত তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ দিলেন এবং দ্বিতীয়া কন্যা ময়নাসুন্দরীর বিবাহ উম্বরাণা নামে একজন কুষ্ঠরোগীর সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা ময়নাকে বলিলেন "এখন তুমি তোমার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যে ফল পাইলে তাহা ভোগ কর"। ময়না বলিল "যদি অদৃষ্ট আমাকে সুখ দেয় আমি নিশ্চয় পাইব।" ময়না এবং উম্বরাণা স্বামীনাথ নামে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া নয়বার অম্বিল ব্রত উদ্‌যাপন করিল। এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর উম্বরাণা কুষ্ঠরোগ হইতে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করিল এবং ৭০০ কুষ্ঠরোগীও এই উপায় অবলম্বনের ফলে রোগমুক্ত হইয়াছিল। কমলপ্রভা কৌশাম্বীর পথে এই সংবাদ পাইয়া উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেলেন। ময়নার মাতুল তাহার নব-নির্ম্মিত প্রাসাদে তাহাকে লইয়া আসিল। এক দিবস যখন শ্রীপাল অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামে গমন করিতেছিল তখন একজন আর একজনকে দেখাইল "ঐ রাজার জামাতা যাইতেছে।" শ্রীপাল এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'যে ব্যক্তি তাহার শ্বশুরের নামে পরিচিত হয় তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব আর কেহ নাই।' শ্রীপাল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল এবং সে তাহার মাতা ও স্ত্রীকে বলিল যে এক বৎসর পরে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যখন সে একটী পর্ব্বতে উপস্থিত হইল তখন সে দেখিল কোন একটী লোক কোন শাস্ত্রে সুদক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং ঐ লোকটী শ্রীপালকে তাহার সহিত কিছুকাল বাস করিতে অনুরোধ করিল। শ্রীপাল অনুরোধ রক্ষা করিল। ঐ লোকটী শ্রীপালের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটী বিদ্যা শিখাইল। একটীর বলে সে জলে ডুবিবে না এবং আর একটীর বলে কোন অস্ত্র তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। তাহার পর শ্রীপাল ঐ স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া ভগোচ বন্দরে উপস্থিত হইলে ধবলশেঠ নামে একজন ধনী বণিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ধবলশেঠ বাণিজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া ৫০০ জাহাজ যোগে বহুদেশে যাইতেছিলেন। শ্রীপাল তাঁহার একটী জাহাজে স্থান পাইল এবং বর্ব্বরকোট বন্দরে যখন জাহাজগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, বন্দরকর্ম্মচারীগণ তাঁহার নিকট হইতে কর চাহিল। ধবলশেঠ কর দিতে অস্বীকার করায় বন্দী হইলেন। শ্রীপাল ভাবিলেন যে ধবলশেঠের প্রাণনাশ হইবে এবং তাঁহার বাণিজ্যদ্রব্যগুলি ধৃত হইবে। শ্রীপালের একটী কৌশলের সাহায্যে ধবলশেঠ মুক্ত হইয়া শ্রীপালকে বাণিজ্যদ্রব্যের অর্দ্ধেকাংশ দিয়াছিলেন। শ্রীপাল বর্ব্বরকোটের রাজার কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করিয়াছিল। রত্নদ্বীপের রাজার কন্যাকে শ্রীপাল পরে বিবাহ করে। শ্রীপাল তাহার দুইটী স্ত্রী এবং ধবলশেঠকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ধবলশেঠ শ্রীপালের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহার প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধবলশেঠ শ্রীপালকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিলেন. কিন্তু শ্রীপাল 'জলতরণী' বিদ্যার প্রভাবে সন্তরণ দিয়া কঙ্কনে উপস্থিত হইল এবং তথাকার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিল। শ্রীপালকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া ধবলশেঠ শ্রীপালের দুই পত্নীর সতীত্ব নাশ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে ধবলশেঠ শ্রীপালকে কঙ্কনে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাল হীনবংশজাত ছিল ইহা প্রমাণ করিতে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধবলশেঠ ভাল লোক না হইলেও শ্রীপাল তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়াছিল। ধবলশেঠ রাত্রিকালে শ্রীপালের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পড়িয়া গিয়া মারা যান। কোন একজন রাজকন্যা ঘোষণা করিয়াছিল—যে তাহাকে বীণাবাদ্যে পরাস্ত করিতে পারিবে সে তাহার পাণিগ্রহণ করিবে। শ্রীপাল তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। শ্রীপাল বহু বিবাহ করিয়াছিল। তাহার পর আটটী স্ত্রী এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে শ্রীপাল উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হয়। কোন এক বলশালী রাজা তাহাকে আক্রমণ করিতে

আসিতেছে এই মনে করিয়া উজ্জয়িনীর রাজা শ্রীপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শ্রীপাল তাহার মাতা ও প্রথমা স্ত্রী ময়নাসুন্দরীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। তাহার পর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া চম্পায় উপস্থিত হয় এবং চম্পার রাজা অজিতসেনকে তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু অজিতসেন তাহার অনুরোধ রক্ষা না করায় তাহার সহিত যুদ্ধ হইল এবং ঐ যুদ্ধে অজিতসেন পরাস্ত হন। শ্রীপাল চম্পার সিংহাসনে অধিরোহণ করিল। অজিতসেন ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীপাল, তাহার মহিষী ময়নাসুন্দরী এবং অপর মহিষীগণ সকলেই পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পরে মোক্ষলাভ করিয়াছিল।

রাণী চেলনা।

চেটক নামে মহাবীরের এক মাতুল বৈশালীর রাজা ছিল; তাহার সাতটী কন্যা ছিল এবং ইহাদের মধ্যে দুইটী কুমারী সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ছিল—এই দুইটীর নাম সুজ্যেষ্ঠা এবং চেলনা। এই দুইটী কন্যা সুলিখিত পুস্তক পাঠে এবং ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিত। ইহারা পরমা সুন্দরী ছিল। মগধের প্রতাপান্বিত রাজা শ্রেণিক চেটককে জানাইলেন যে এই দুইটী কন্যার মধ্যে একটীকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। ইহার উত্তরে চেটক বলেন যে বংশে রাজা শ্রেণিকের জন্ম সে বংশ অপেক্ষা আমাদের বংশ উচ্চতর। ইহা শুনিয়া রাজা শ্রেণিক অত্যন্ত রাগান্বিত হন। সুজ্যেষ্ঠা রাজা শ্রেণিকের চিত্র দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মনস্থ করেন। সুজ্যেষ্ঠা প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ খনন করেন। একটী নির্দ্ধারিত দিনে সুজ্যেষ্ঠা চেলনাকে সঙ্গে লইয়া সেই সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন; কিছুদূর যাইয়া তাঁহার মনে পড়িল যে অলঙ্কারের বাক্স তিনি সঙ্গে আনেন নাই। তিনি চেলনাকে রথে বসিতে ও অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং বাক্স লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে রথটী খুব দ্রুত-গতিতে চলিয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে কেহ চেলনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজার সৈন্যগণ রথের পশ্চাতে ধাবিত হইল। সুজ্যেষ্ঠা ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহতা হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। চেলনা রাজা শ্রেণিকের অত্যন্ত প্রিয় সাম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। চেলনা মহাবীরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং রাজার নিকট মহাবীরের উপদেশ ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলে শ্রেণিক মহাবীরের একজন ভক্ত হইয়া উঠিলেন। যখন চেলনা গর্ভিণী হইলেন তখন তাঁহার স্বামীর হৃদয়ের মাংস খাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল এবং তিনি মনে মনে ভাবিলেন—যে সন্তান আমি প্রসব করিব সে নিশ্চয়ই স্বামীর শত্রু হইবে। যখন পুত্র জন্মিল তখন একজন দাসী ঐ পুত্রটীকে নগরের বাহিরে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। এই সময়ে রাজা শ্রেণিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কোথায় গিয়াছিল। ঐ দাসীটী সত্য ঘটনা রাজাকে বলিল এবং রাজা অরণ্যে যাইয়া সেই শিশুটীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে ভৎর্সনা করিলেন। রাজার আদেশে রাণী ঐ পুত্রটীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম হইল কৌলিক। এই পুত্র ব্যতীত রাণীর হল্ল এবং বিহল্ল নামে আরও দুইটী পুত্র হইল। একদিন রাত্রে চেলনা নিদ্রিতাবস্থায় বলিতেছিল "অত্যন্ত শীতে সাধুগণ কতই না কষ্ট পাইতেছে"। এই কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন যে রাণী বোধ হয় কোন লোককে ভালবাসিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে অভয়কুমারকে রাজঅন্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে নগরের বাহিরে মহাবীর অবস্থান করিতেছিলেন এবং শ্রেণিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। হস্তীশালার নিকটে কতকগুলি পর্ণকুটীরে অভয়-কুমার অগ্নিসংযোগ করিল। শ্রেণিক মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে চেলনার কয়টী স্বামী আছে। ইহার উত্তরে মহাবীর বলেন যে চেলনার একমাত্র স্বামী শ্রেণিক এবং সে সচ্চরিত্রা। ইহা শুনিয়া রাজা শ্রেণিক প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া অভয়কুমারকে রাজঅন্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। অভয়কুমার রাজাকে সত্যঘটনাগুলি বলিলেন এবং ইহার পর চেলনার প্রতি রাজার ভালবাসা অধিকতর হইয়াছিল। পিতার জীবদ্দশায় রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিবার জন্য কৌলিক অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিল। সে তাহার পিতাকে কারারুদ্ধ করে। চেলনা কারাগারের নিকট গমন করিয়া তাঁহার স্বামীর দর্শন পাইলেন এবং ইহা

শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন যে তাঁহার স্বামী যথাযথ খাদ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অনেক কৌশল করিয়া চেলনা তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। পরে কৌলিক তাহার পিতাকে কারামুক্ত করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া যখন কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য একটী লৌহদণ্ড সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতেছিলেন তখন কারাগৃহের রক্ষকগণ শ্রেণিককে বলিল যে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, কারণ কৌলিক নিজে লৌহদণ্ড লইয়া সেখানে আসিতেছেন। শ্রেণিক ভাবিলেন যে বৈজ্ঞানিকের হস্তে না মরিয়া নিজেই প্রাণনাশ করা বিধেয়। শ্রেণিক বিষ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কৌলিক কারাগৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতার মৃতাবস্থা দেখিলেন। স্বামীর প্রাণনাশে চেলনা অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইলেন। এই সময়ে মহাবীর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চেলনা অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পার্থিব জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিলেন। আত্মসংযম এবং ধ্যানের বলে তিনি তাহার জীবনকে পুণ্যময় করিয়াছিলেন ; পরে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

চন্দনবালা

চম্পার রাজা দধিবাহন এবং রাণী ধারিণী প্রজাবর্গের সুখের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের রাজ্যে সুখ শান্তি ছিল এবং অকালমৃত্যু কেহ জানিত না। রাজকুমারী বসুমতী বিদুষী ছিলেন এবং বীণা-বাদ্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার গভীর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল এবং প্রত্যহ প্রত্যুষে ভগবান জীনেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতেন। একদিবস যখন রাজা এবং রাণী বংশদেবতাকে পূজা করিতেছিলেন কতকগুলি প্রহরী আসিয়া রাজাকে খবর দিল যে কৌশাম্বীর রাজা শতানিকের সৈন্য তাঁহার রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছে। রাজা দধিবাহন যুদ্ধের জন্য সৈন্যকে সশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। এই যুদ্ধে রাজা শতানিকের জয় হইল। রাজা দধিবাহন রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। রাজমহিষী ধারিণী এবং কুমারী বসুমতী রাজঅন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিল। ধারিণী এবং বসুমতী শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইল। মহিষী ধারিণী নিজের জীবন নাশ করেন এবং কুমারী বসুমতীকে কৌশাম্বী নগরে আনয়ন করা হয়। ধনবাহ নামে একজন শ্রেষ্ঠী বসুমতীকে ক্রয় করিয়া নিজের বাটীতে আনয়ন করে। ঐ বণিকের মূলা নামে একটী পত্নী ছিল। বসুমতীর দিকে তাহার বিশেষ যত্ন ছিল। বসুমতী ঐ বণিক এবং বণিক-পত্নীকে পিতামাতার ন্যায় দেখিত! বসুমতী প্রত্যেক লোককে তাহার সুন্দর আচরণের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাহার অপর একটী নাম ছিল চন্দনবালা। মূলার ভয় হইল যে হয়ত যুবতী বসুমতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠী তাহাকে বিবাহ করিবে। একদিবস বণিক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন ভৃত্যকে দেখিতে পায় নাই। বসুমতী শ্রেষ্ঠীর জন্য জল আনয়ন করিল। যখন সে শ্রেষ্ঠীর পদদ্বয় পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল তখন তাহার কেশগুচ্ছ খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ধনবাহ তাহার কেশগুচ্ছ বাঁধিয়া দেয়। বাটীর দ্বিতল হইতে মূলা ইহা দেখিয়াছিল। যখন ধনবাহ গৃহ হইতে বহির্গত হয় মূলা বসুমতীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার পাদদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহাকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বন্ধ করিয়া রাখে। ধনবাহ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বসুমতীকে দেখিতে পান নাই! শ্রেষ্ঠী ভাবিলেন বসুমতী কোথাও খেলা করিতেছে। পরে বসুমতী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন যে যদি কেহ তাহার কোন সংবাদ না দেয় তাহা হইলে প্রত্যেক দাসদাসীকে তিনি বিশেষরূপে শাস্তি দিবেন। পরে একজন বৃদ্ধা নারী শ্রেষ্ঠীর নিকট সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং যে ঘরে বসুমতীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে সেই ঘরটী ধনবাহকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠী সেই গৃহে গিয়া বসুমতীকে নবকার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে এবং তাহার চক্ষু হইতে অনর্গল বারি বর্ষণ করিতে দেখিল। শ্রেষ্ঠী বসুমতীকে রন্ধনশালায় লইয়া গিয়া ভোজনের নিমিত্ত কিছু খাদ্য দিয়া লৌহশৃঙ্খল দূর করিবার জন্য কামার ডাকিতে গিয়াছিলেন। যদিও চন্দনবালা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল তথাপি শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত খাদ্য কোন অতিথিকে না দিয়া ভোজন করে নাই। একজন তাপস মনস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র একজন সতী রাজকুমারীর নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবেন। ঐ তাপস চন্দনবালার সম্মুখে উপস্থিত হইবার পর চন্দনবালা তাহাকে খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তাপস স্বয়ং ভগবান মহাবীর—তিনি

চন্দনবালার খাদ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ চন্দনবালার লৌহশৃঙ্খল উন্মুক্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং মস্তক সুন্দর কেশে আচ্ছাদিত হইল। শ্রেষ্ঠী চন্দনবালার লুপ্ত সৌন্দর্য্যের পুনরুদ্ধার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীর পত্নী মূলা তাহার কার্য্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। রাজা এবং রাজমহিষী চন্দনবালাকে দেখিবার জন্য শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজমহিষী চন্দনবালাকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যান। চন্দনবালা মহাবীরের প্রথম এবং প্রধান শিষ্যা বলিয়া পরিচিত। অনেক রাজা ও রাণী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দনবালা বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

কনেষ্টবল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাথায় প্যাগড়ী ঘোরতর লাল,
লাঠী প্রকাণ্ড ঘাড়ে,
মঙ্গলকোট থানায় থাকিত,
নাম রামদীন পাঁড়ে।
অতি চক্‌চকে চাপরাশ তার
ভাঙ্‌রাঙ্গা দুটা চোক্
ভীষণ ভ্রূকুটী ভয়েতে তাহার
ভড়কাত যত লোক।
রাত্রে যখন রোঁদে বাহিরিত
সঙ্গীরে তার নিয়া,
সুপ্ত পল্লী গুরু গর্জ্জনে
উঠিত যে চম্‌কিয়া।
আমরা গ্রাম্য বালকের দল
সদা শঙ্কিত ত্রাসে,
দেখিলেই তারে পলায়ে যেতাম
ছুটিয়া উর্দ্ধশ্বাসে।
কঠোর ভয়াল কর্কশ রূঢ়
যা কিছু এ সংসারে,
সব দিয়ে বিধি গড়েছিল যেন
সেই রামদীন পাঁড়ে।
দেখিলাম তারে একদিন আমি
থানার সে অঙ্গনে,
বেল তরুতলে বসিয়া কি বই
পড়িছে আপন মনে।

বিশাল বক্ষে সাদা উপবীত
কপালে ত্রিপুণ্ড্রক,
অমন করিয়া কেন সে রয়েছে
দেখিতে হইল সখ।
আঁখির জলেতে আঁখর হারায়
কোথায় উধাও মন,
সুমধুর স্বরে পড়িছে বসিয়া
'তুলসী'র রামায়ণ।
বাঁশের ভিতর বাঁশীর আওয়াজ
বুঝিনে কেমনে আসে,
রাম নামে আজ সুমুখে দেখিনু
সত্যই শিলা ভাসে।
কোথা তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধনা—
বুঝিতে পারিনে একি?
কেমনে মোদের সে রত্নাকর
হ'ল এই বাল্মিকী!
মন যে তাহার ঘুরিয়া বেড়ায়
গোদাবরী কিনারাতে,
পম্পা সরের শোভা দেখে কভু
রাম লক্ষ্মণ সাথে।
দীন নাহি আর রাম যে তাহার
ধনী করিয়াছে তারে—
পাষাণ কাটিয়া মানুষ জেগেছে
কোথা রামদীন পাঁড়ে!

দিব্য-প্রসঙ্গ

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

গত 'আষাঢ়' সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'কৈবর্ত্তরাজ দিব্য' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে দিব্য ও মহীপাল সংক্রান্ত প্রচলিত ইতিহাসের সহিত গুরুতর ভিন্নমত দৃষ্ট হয়। তিনি বলিয়াছেন —'দিব্য রাজলক্ষ্মীর অংশভোগী ছিলেন, ভৃত্য ছিলেন এবং উচ্চ অবস্থায় অধিরূঢ় ছিলেন। ৩য় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর ২য় মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সত্য ও ন্যায় রক্ষণে নিযুক্ত মহীপাল 'রামপাল আমার লক্ষ্মী হরণ করিবে'—এই অলীক সন্দেহে তাঁহাকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে অবরুদ্ধ করেন। পরে শঠতা প্রয়োগে তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। ফলে অসংখ্য সামন্ত নৃপতি বিদ্রোহী হন। দিব্য অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন এবং তলে তলে যোগ দিয়াছিলেন। অল্প-বুদ্ধি গোঁয়ার রাজা অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া সামন্তগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ষড়্‌গুণশালী মন্ত্রিগণ তাঁহাকে এইরূপ অনীতিক বা রাজনীতিবিরুদ্ধ * কার্য্য করিতে বার বার নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। মহীপাল যুদ্ধে নিহত হইলে রামপালের হিতাকাঙ্ক্ষী দিব্য ছলে ও কৌশলে রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন।" ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সম্পর্কে নলিনীবাবু কিছু বলেন নাই, সম্ভবতঃ প্রচলিত ইতিহাসের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ নাই।

বিগত দুই বৎসর দিব্য-স্মৃতি-উৎসবের সভাপতি রূপে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এবং সার যদুনাথ সরকার মহোদয় দিব্যের যে গৌরবময় চিত্র জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন ভট্টশালী মহাশয়ের এই চিত্র তাহার নিকট অতীব ম্লান। তাঁহার মতে দিব্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত রাজা ত ছিলেনই না, পরন্তু বীরও ছিলেন না! তিনি রামপালের জন্য সামন্তবর্গকে মহীপালের বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করেন কিন্তু নিজে প্রকাশ্যে বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন নাই। পরে স্বীয় উন্নত অবস্থার সুযোগে ধূর্ত্ততাবলম্বনপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। এই যদি দিব্যচরিত্র হয় তাহা হইলে দিব্য-স্মৃতি-উৎসবের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। এরূপ অবস্থায় ঐতিহাসিকগণ প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিবেন।

দিব্য সম্পর্কে নলিনীবাবুর বর্ত্তমান মত বিবৃত হইয়াছে। এখন অন্যান্য ঐতিহাসিক কি বলিয়াছেন দেখা যাউক। তবে দিব্যস্মৃতি-উৎসবের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিবৃত আলোচনা হয় নাই; প্রসঙ্গক্রমে যাহা হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত করিব। স্বর্গগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'রামচরিত' সম্পর্কিত আলোচনা দেশপ্রসিদ্ধ। তিনি 'গৌড়রাজ-মালার' ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"তৎকালের (রাষ্ট্র বিপ্লবের) প্রধান পাত্রগণের নাম অনীতিকারাস্তরত দ্বিতীয় মহীপালদেব, তাঁহার নিধনকারী বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক, তদীয় ভ্রাতা রুদক এবং 'রুদক' পুত্র ভীমরাজা" (।৵ পৃষ্ঠা) পুনরায় 'যে প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাল সাম্রাজ্য উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল সেই প্রজাশক্তির বিরাগই পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূল কারণ। এইরূপে (ভীমের নিধনে) দিব্বোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ধ্বংস হইল। কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য সহজে রামপালের করায়ত্ত হয় নাই। রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবল মাত্র ব্যক্তি-বিশেষের জয় পরাজয় নহে। ইহা একটী মহাব্রতের অবসান কাহিনী। দিব্বোক কর্ত্তৃক এই মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছিল। সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই রামপালের ক্রীতদাস সামন্তরাজগণ তাহার ধ্বংস সাধন করিলেন।" (সেনেট হলে বক্তৃতা, ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত)

পরলোকগত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন—

When Mohipal succeeded to the throne he imprisoned his brothers and misgoverned the realm. His evil deeds provoked a rebellion headed by Dibya or Dibyaka, chief of the Chasi Kaivortha tribe or Mahishya caste, which at that time was powerful in northern Bengal. (Early History of India 4th edi. Page 416.)

৺বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বৈশ্য জাতির ইতিহাসের' ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"২য় মহীপালের রাজত্ব কালে যখন গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন মাহিষ্য বংশীয় দিব্যোক ও ভীম প্রজাবর্গের হৃদয়ে যে রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন পরবর্ত্তী পাল-ভূপাল রামপাল গৌড়রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না।" রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য তাঁহার 'বাঙ্গালীর বল' গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"গৌড়জন যখন আর মহীপালকে সহ্য করিতে পারিল না তখন আবার সম্মিলিত হইল। বঙ্গের সেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান নায়ক কৈবর্ত্ত সেনাপতি দিব্বোক্ যুদ্ধে মহীপালকে নিধন করিলে পর বিদ্রোহিগণ জয় গর্ব্বে যে সমুন্নত স্তম্ভ উত্তোলিত করিয়াছিল আজিও তাহা উত্তর বঙ্গের একটি বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকার স্বচ্ছ সলিল মধ্যে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান।"

স্বয়ং নলিনীবাবু ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসীতে' বলিয়াছিলেন

* নলিনীবাবুর Interpretation অনুসারে ইহা রণনীতিবিরুদ্ধ হয়। [Interpretationটি আমার নহে, রামচরিতের টীকাকারের। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী]

—"ভোজবর্ম্মার সেলাবশাসনে জাত-বর্ম্মার গৌরব বর্ণনায় লিখিত আছে যে—তিনি দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা ৩য় বিগ্রহপালের সমসাময়িক এবং জাতবর্ম্মাকে যখন দিব্যের ভুজ নিন্দা করিয়া সার্ব্বভৌশ্রী বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল তখন জাতবর্ম্মার সময়েই দিব্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই দিব্য বিগ্রহপালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অর্থাৎ মহীপালের সময়ের।"

১ম বার্ষিক দিব্যস্মৃতি উৎসবের সভাপতিরূপে চন্দমহাশয় বলিয়াছিলেন—দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই, উপায়ান্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ১৩৪২ সালের 'আষাঢ়' সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' লিখিয়াছিলেন—"দিব্য বা দিব্যোক একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন এবং দুঃস্থ বাঙ্গালীকে এক মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া চিরকালের জন্য বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে—সমুদায় ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে দিব্যের বিদ্রোহ এবং দিব্য ও ভীমের রাজ্য শাসন বাঙ্গালার পক্ষে অনেক বিষয়ে কল্যাণকর হইয়াছিল।"

২য় বার্ষিক দিব্যস্মৃতি উৎসবের সভাপতিরূপে সার যদুনাথ সরকার মহোদয় বলিয়াছিলেন—"যখন মহীপালের শাসন প্রজাদের অসহ্য হইয়া উঠিল, যখন দিব্য দেখিলেন যে দেশ উদ্ধার ও লোকের মান সম্ভ্রম রক্ষা তাঁহারই কর্ত্তব্য তখন তিনি বিদ্রোহীদলে যোগ দিলেন এবং এই কলির দুষ্ট রাবণকে বধ করিয়া আমাদের বরেন্দ্রীমাতাস্বরূপা সীতাকে উদ্ধার করিলেন।"

আমি ঐতিহাসিক নহি। কিন্তু উল্লিখিত বিভিন্ন মতাবলম্বী ঐতিহাসিকগণের উদ্ধৃত উক্তিসমূহ পাঠ করিবার পর আমার সাধারণ-বুদ্ধিতেও নলিনীবাবু প্রদত্ত বিবরণে কিছু অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি বোধ হইতেছে।—দিব্য কি ছিলেন আলোচনা করিতে গিয়া লেখক রামচরিত অনুসারে (?) বলিয়াছেন—"দিব্যরাজ লক্ষ্মীর অংশভোগী ছিলেন, ভৃত্য ছিলেন এবং উচ্চ অবস্থায় অধিরূঢ় ছিলেন।" এবং ইহাতে মন্তব্য করিয়াছেন—'তিনি (দিব্য) মহারাজার অধীনে রাজ্যখণ্ডের মালিক ছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা অত্যুন্নত ছিল" পরে আবার বলিয়াছেন—'তিনি রাজার একজন বড় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং রাজ্য মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন।" দেখা যাইতেছে নলিনীবাবু কিছুই কৃত নিশ্চয় হইতে পারিতেছেন না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তিনি দিব্যকে মহাবীর প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন তাহা হইলে তাঁহার কথামত মহাবীর দিব্য হয় বড় সামন্ত, নতুবা সেনাপতিশ্রেষ্ঠ ছিলেন—প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বেলাব শাসন ও রামচরিত মিলাইয়া পাঠ করিলে দিব্যকে সেনাপতি শ্রেষ্ঠ ব্যতীত অন্য কিছু বোধ হয় না। (১)

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১)

[শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বিস্ময় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত ঐতিহাসিকই (মায় এই ক্ষুদ্র লেখকও)

'উপধিব্রতিন' শব্দ আলোচনা করিয়া নলিনীবাবু দিব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে তিনি (দিব্য) বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন এবং আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া তলে তলে তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।" পরে "রামপালের হিত করিবার ছলে দিব্য বিদ্রোহ ঘটাইয়া মহীপালের মৃত্যুর পরে রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।" ইহাতে বুঝা যায়—রামপালের হিত করাকে দিব্য অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তিনি বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য অধিকার করা—তাহা তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। পরে মহীপালের মৃত্যুতে তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়; তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

এক ভাবের কথা বলিয়াছেন; জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে এখন আমি অন্য ভাবের কথা বলি কেন? ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দিব্য সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধ ১৩৪২ সনের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, ছাপিতে পাঠাইবার পূর্ব্বে উহা ডাঃ মজুমদার আমাকে দেখাইয়াছিলেন এবং তখন আমিও উহাতে কোন ভুল লক্ষ্য করি নাই,—উহা সম্পূর্ণ অনুমোদনই করিয়াছিলাম। ইহার অল্প পরে রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ঢাকায় আসেন এবং ডাঃ মজুমদারের প্রবন্ধ আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাসিয়া আমাকে সটীক মূল রামচরিতখানি পুনরায় ভাল করিয়া পড়িতে উপদেশ দেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, চন্দ মহাশয়ের সেই উপদেশ আমার বড়ই উপকার করিয়াছিল। রামচরিত কঠিন গ্রন্থ, উহার টীকা পর্য্যন্ত সহজ-বোধ্য নহে। ইহার পূর্ব্বেও রামচরিত পড়িয়াছি বটে কিন্তু ভাসা ভাসা ভাবে। আমাদের সকলেরই মনের ভাব এই ছিল যে মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া তাঁহার ইংরেজী ভূমিকায় উহার যে সার সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে আর আমাদের কাহারও কিছু করিবার নাই, নূতন কোন তথ্যও আর বাহির করা অসম্ভব। এই মনের ভাববশতঃ রামচরিতের মূল এবং টীকা আমরা কেহই ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি নাই। একমাত্র পরলোকগত ঐতিহাসিক ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সিনেটহলের বক্তৃতায় রামচরিতের কিছু কিছু নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু দিব্য সম্বন্ধীয় ভুলগুলি তাহাতেও সংশোধিত হয় নাই। এইরূপে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল সার সঙ্কলনের ফলে আমরা বঙ্গের সমস্ত লেখক ভুলপথে পরিচালিত হইয়াছিলাম। চন্দ মহাশয়ের নির্দ্দেশে সটীক রামচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলাম। তাই দিব্য সম্বন্ধীয় রামচরিতের সমস্তগুলি শ্লোক ব্যাখ্যা সহ আমার আষাঢ় মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি। আমার ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছি, দিব্য সম্বন্ধে রামচরিত অতিক্রম করিয়া কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। আমার ব্যাখ্যায় যদি কোন ভুল থাকে, বঙ্গের লেখকগণ তাহার বিচার করুন এবং ভুল সংশোধন করিয়া প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করুন। কিন্তু রামচরিতের

এস্থলে দুইটী অসঙ্গতি দৃষ্ট হইতেছে।

১। 'রামপালের হিত'বা রামপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাঁহার পক্ষে 'অবশ্য কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাঁহার অন্তরে 'রাজ্যাধিকার'রূপ 'আসল উদ্দেশ্য' ছিল বলা হইতেছে। অবশ্য কর্ত্তব্য-জনিত উদ্দেশ্য এবং আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমারেখা কোথাও থাকে না কিন্তু এস্থানে উভয়কে পৃথক করা হইতেছে।

২। যিনি অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে বিদ্রোহ করেন তিনি তাহাতে 'তলে তলে' যোগদান করেন না—প্রকাশ্যে যোগদান করেন, আর যদি নিতান্ত তাহা সম্ভব হয় তাহা হইলে দিব্যকে ভীরু বলিতে হয়। কিন্তু নলিনীবাবুর প্রবন্ধান্তর হইতে উদ্ধৃত উক্তিতে দিব্যের সাহসের যে পরিচয় পাই এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—"দিব্বোক বাঁচিয়া থাকিতে রামপাল বরেন্দ্রী উদ্ধার করিতে পারেন নাই" তাহাতে দিব্যকে ভীরু বলিতে পারি না।

রামচরিতের 'দস্যুনোপধিব্রতিনা'—পদের অর্থ আমাদের নিকট অন্যরূপ প্রতিভাত হয়। এই স্থানের টীকা হইতেছে—'দস্যুনা শত্রুণা তদ্ভাবাপন্নত্বাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনিব্রতী।" দস্যু কে? যিনি বর্ত্তমানে শত্রু ভাবাপন্ন হইয়াছেন। উপধি শব্দের অর্থ-ভণ্ড, কপট বা ছলাবলম্বনকারী। (২)

ব্রতী কে? যিনি অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করেন তিনি ব্রতী। সুতরাং 'দস্যুনোপধিব্রতিনা' শব্দের অর্থ হইতেছে—শত্রুতা করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই, কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে যিনি শত্রুতারূপব্রত গ্রহণ করিয়াছেন সেই ভণ্ড শত্রু, কপট শত্রু বা ছল শত্রু।

টীকা অবলম্বন করিয়াই আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি, কাজেই উহাতে অর্থ-ভেদের সম্ভাবনা বড় অল্প।

রামচরিতে—লেখে দিব্য রাজলক্ষ্মীর অংশভোগী ছিলেন, উচ্চ দশাবস্থিত ছিলেন। টীকাকার অধিকন্তু বলিয়াছেন, তিনি ভৃত্য" ছিলেন। রাজলক্ষ্মীর অংশভোগী উচ্চদশাপন্ন ভৃত্য রাজকর্ম্মচারীও হইতে পারেন, সামন্তরাজও হইতে পারেন; এই ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা যদি কিছু থাকে তবে তাহা মূলের দোষ, আমার নহে।

বেলাব শাসনে সামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা সম্বন্ধে এই বলা হইয়াছে যে তিনি ফণির কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, কামরূপশ্রীকে পরাজিত করিয়া, দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া পৃথিবীতে সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন। এই উক্তি দ্বারা প্রতিবেশী রাজাদের সহিত জাতবর্ম্মার দ্বন্দ্বই সূচিত হইতেছে। ইহা হইতে কি করিয়া বুঝা যায় যে দিব্য সেনাপতিশ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমার তো তাহা বোধগম্য হইতেছে না! দিব্যের ভুজশ্রীর উল্লেখে বরং ইহাই বোধ হয় যে দিব্য তখন উত্তরবঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (২)

[বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া অভিধান খুলিয়া দেখুন, উপধি বিশেষ্য শব্দ, মানে ছল চাতুরী। উপধিব্রতী মানে ছলাবলম্বী। কাজেই তাহার ব্যাখ্যা খাটে না।]

কিসের প্রতি দিব্যের এই অবশ্য কর্ত্তব্যবোধ? দিব্য পালরাজের প্রধান অবলম্বন এবং বরেন্দ্রভূমির সুসন্তান। কিন্তু মহীপালের প্রতি কর্ত্তব্য অপেক্ষা দেশ-মাতৃকার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য অধিক। মাতৃভূমির প্রতি এই গুরু কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি মহীপালের শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন। এই কথা শ্লিষ্ট কাব্যে যত স্পষ্ট করিয়া বলা সম্ভব তত স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। আসল উদ্দেশ্য গোপন বা তলে তলে যোগদানের কোন সংস্রব ইহাতে নাই। (৩)

অনুষ্ঠিত বিদ্রোহের কারণস্বরূপ নলিনীবাবু বলিয়াছেন—'যত দূর বুঝিতেছি এই বিদ্রোহের কারণ জনপ্রিয় রামপাল ও শূরপালের উপর মহীপালকৃত অত্যাচার।" বাংলার এই সময়কালীন ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অবিসংবাদিত মত এই যে মহীপালকৃত প্রজাবর্গের উপর অত্যাচারই এই বিদ্রোহের মুখ্য কারণ এবং রামপালের কারাবরোধ গৌণ কারণ। স্বয়ং নলিনীবাবু ১৩২১ সালে মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'মহীপাল প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনায় বলিয়াছেন—"রামচরিতে লিখিত আছে যে ২য় মহীপালের অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজত্ব সময়ে কৈবর্ত্তগণ পালরাজ্য উল্টাইয়া দিয়াছিল।" পরে কমৌলি-লিপি ও মনহলি লিপি দ্বারা মহীপালের 'অত্যাচার' 'দুষ্কার্য্য' প্রভৃতি প্রমাণ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন যদি (রামপালের উপর অত্যাচার ব্যতীত) অন্য কোন কারণ কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন, দেখুন না?" (৪)

রাম চরিতের ১ম পরিচ্ছেদের ২২, ৩১ এবং ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে ও টীকায় প্রসঙ্গক্রমে মহীপালের অত্যাচার বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২ সংখ্যক শ্লোকের 'দুর্ণয়ভাজোঽগ্রজন্মনঃ' এবং ৩, সংখ্যক শ্লোকের 'অনীতিকারংভারতে' পদের 'দুর্ণয়' এবং 'অনীতিকার' শব্দকে নলিনীবাবু মহীপালের যুদ্ধকালীন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ( )

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৩)

[রাবণ কর্ত্তৃক ছলে সীতা হরণের সহিত যে দিব্যকর্ত্তৃক ছলে বরেন্দ্রী হরণ রাম-চরিতে উপমিত, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহা একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং দেশমাতৃকা ইত্যাদি বিংশ শতাব্দীর ভাব টানিয়া আনিয়াছেন।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৪)

[পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বে আমরা রামচরিত কেহই অনুধাবন করিয়া পড়ি নাই, শাস্ত্রী মহাশয়ের ভুলের অনুসরণ করিয়াছি।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৫)

[বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, তথা সরকার মহাশয় তাঁহার তথাকথিত-প্রবন্ধে, এই স্থানে আমার উপর বড়ই অবিচার করিতেছেন। অনীতিক আরম্ভে রত হওয়া যে রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত হওয়া, ইহা আমার ব্যাখ্যা নহে, রামচরিতের টীকাকারের ব্যাখ্যা। পুনঃ পুনঃ ইহা আমার কল্পনা বলিয়া তাঁহারা নিতান্ত নিরর্থক গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছেন।]

৩৬ সংখ্যক শ্লোকের "ভূতনয়াত্রাণযুক্ত দায়াদঃ" অংশের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। ৩৬ সংখ্যক শ্লোকটী হইতেছে—

"বিজনাবস্থান ব্যূহে ভূতনয়াত্রাণযুক্ত দায়াদে
বিদ্যুদ্বিলাসচঞ্চলমায়ামৃগতৃষ্ণয়ান্তরিতে।"

নলিনীবাবু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন— রামপাল বিজনে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সত্য এবং ন্যায়রক্ষণে নিযুক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী মহীপাল বিদ্যুদ্বিলাসচঞ্চল লক্ষ্মীর অলীক মায়ায় অর্থাৎ রামপাল আমার লক্ষ্মীহরণ করিবে এই অলীক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া রামপালকে অন্তরিত অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ কারাগারে গুপ্ত করিয়া ফেলিলেন।" এই ব্যাখ্যায় একটী বিশেষ অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। যিনি সত্য ও ন্যায় রক্ষণে নিযুক্ত তিনি অন্যায় সন্দেহে নির্দ্দোষ ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, হয় মহীপাল সত্য ও ন্যায় রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন না, নতুবা তিনি রামপালকে কারারুদ্ধ করেন নাই। ইহার কোনটী সত্য? মহীপাল যে রামপালকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং অন্য বিবৃতির বিচার করা যাউক। শ্লোকের যে অংশকে নলিনীবাবু সত্য ও ন্যায় রক্ষণে নিযুক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী মহীপাল বলিতেছেন—তাহা হইতেছে— "ভূতনয়াত্রাণযুক্ত দায়াদঃ" (শ্লোকে 'নয়' কথাটীর পর আকার দ্রষ্টব্য)। ইহার রামপক্ষের অর্থ হইতেছে—

ভূ তনয়া (পৃথ্বীকন্যা সীতা) ত্রাণযুক্ত (রক্ষণে নিযুক্ত) দায়াদঃ (ভ্রাতা লক্ষ্মণ) অর্থাৎ সীতার রক্ষণে নিযুক্ত লক্ষ্মণ

রামপাল পক্ষে—ভূত (সত্য) নয় (নীতি) অত্রাণযুক্ত (লঙ্ঘনকারী) দায়াদঃ (রাজ্যের উত্তরাধিকারী মহীপাল) অর্থাৎ সত্য ও নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী মহীপাল। এই অংশের টীকা (রামপাল পক্ষে)—ভূতং সত্যং নয়ো নীতং তয়োররক্ষণে যুক্তঃ প্রসক্তো দায়াদো মহীপাল—অর্থাৎ সত্য ও নীতি এই দুইটীর অরক্ষণে নিযুক্ত (অর্থাৎ লঙ্ঘনকারী) মহীপাল।

সুতরাং টীকানুযায়ী শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—"রামপাল নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী মহীপাল 'রামপাল আমার লক্ষ্মী হরণ করিবে' এই অলীক সন্দেহে ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গৃহে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন।" এই অর্থে কোন অসঙ্গতিও নাই। অতএব দেখিতেছি কবি এ স্থলে মহীপালকে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী বলিয়াছেন। যিনি সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী তাঁহার দুর্নীতি ও অনৈতিক আচরণ প্রজার উপর অত্যাচার ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। অবশ্য রামচরিতে মহীপালের গর্হিত আচরণ ইঙ্গিতে মাত্র বিবৃত হইয়াছে। নলিনীবাবু ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে এই সম্পর্কে অতি চমৎকার ভাবায় বলিয়াছিলেন—"রামচরিতে ও মহীপালের অত্যাচার কাহিনীর যেন অনিচ্ছাক্রমে নেহাৎই সত্যের গৌরব রাখিবার জন্য অপরিস্ফুট ভাবায় অল্প আভাস দেওয়া হইয়াছে।" (৬)

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৬)

[বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, এটা কি ভাল হইল? এযে একেবারে পুকুর চুরির চেষ্টা! ভূতনয়াত্রাণযুক্ত কথাটির ব্যাখ্যা ভূত এবং নয়ের আত্রাণে (অত্রাণে নহে) নিযুক্ত। আত্রাণ মানে সম্যকরূপে ত্রাণ। রামপক্ষে ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণ ভূতনয়ার (সীতার) ত্রাণে নিযুক্ত। রামপাল পক্ষে ব্যাখ্যায় কি তাহার বিপরীত হইবে? বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রামপাল পক্ষের টীকাটি উদ্ধৃত করেন নাই কেন? নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"অন্যত্র—বিজনে স্থানমবস্থানং তেন ব্যূহোবিগত উহো যস্য তস্মিন রামপালে ভূতং সত্যং নয়ো নীতং তয়োর (রর) ক্ষণে যুক্তঃ প্রসক্তো দায়াদো মহীপালো "

এইখানে বিচার্য্য এই যে মহীপাল সত্য এবং ন্যায়ের রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, না অরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। টীকার মূলে আছে "তয়োরক্ষণে। সম্পাদক ব্রাকেটের মধ্যে দুইটি র বসাইয়া করিলেন তয়োর (রর) ক্ষণে। ব্রাকেটের মধ্যস্থিত র দুইটি মূলে নাই, উহা সম্পাদক প্রদত্ত। উহার প্রথম র-টি হসন্ত হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ তয়োঃ + রক্ষণে = তয়োর্‌রক্ষণে হওয়া উচিত ছিল। সম্পাদক প্রথম র-তে হসন্ত চিহ্ন দিতে ভুল করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি র ফেলিয়া দিয়া এবং একদম উঠাইয়া দিয়া পুকুর চুরির চেষ্টা করিয়াছেন! ইতিহাস চর্চ্চা কি আদালতে মোকর্দ্দমা চালান যে যেন তেন প্রকারেণ জজকে ধোঁকা দিয়া মোকদ্দমা জিতিতে পারিলেই হইল?

সত্য ও ন্যায় রক্ষণে নিযুক্ত রাজা অলীক মায়ায় এবং কুলোকের কাল কথায় রামপালকে কারারুদ্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন, ইহাই রামচরিতের কবির আক্ষেপ ও নালিশ।]

প্রজাবর্গের উপর মহীপালকৃত অত্যাচার রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধানতম কারণ, রামপালের কারাবরোধ একমাত্র কারণ নহে। পরবর্ত্তী ইতিহাসও ইহা সমর্থন করিতেছে। দিব্য যখন বরেন্দ্রীর অধিপতি তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও সামন্তের একখানিও অস্ত্র উত্তোলিত হয় নাই। এমন কি বিপুল সৈন্যসমভিব্যাহারে রামপাল বরেন্দ্রী অধিকার করিতে আসিলে তাঁহাকে সসম্মানে বরণ করিয়া লওয়া দূরে থাকুক, দিব্যের বংশধরের জন্য অনন্ত সামন্তচক্র ও বীর প্রজাবৃন্দ অমিতবিক্রমে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরের বাঞ্ছিত শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বরেন্দ্রের প্রজাগণ যতদূর সাধ্য প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও অঙ্গ মগধাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে বরেন্দ্রের ক্ষুদ্র শক্তি জয়লাভ করিতে পারে নাই. —রামপাল বাহুবলের আতিশয্যে বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন।" বরেন্দ্র অধিকার করিতে রামপালকে তিনবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। দিব্যের করধৃত রাজশক্তি যদি প্রজাশক্তির রূপান্তর না হইত বা কেবল রামপালের জন্য রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিত তাহা হইলে প্রজাবর্গ দলে দলে পুনঃ পুনঃ রণক্ষেত্রে জীবনাহুতি দিত না। (৭)

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৭)

[দিব্য এবং তাহার পরবর্ত্তী কৈবর্ত্তরাজগণ রাজ্য মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিলেন ইহা তো সকলেরই স্বীকার্য্য। বরেন্দ্রী একবার তাঁহাদের

নলিনীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে আরও তিনটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—(ক) দিব্যস্মৃতি-উৎসব উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত্ত বা হালিক কৈবর্ত্তগণের সাম্প্রদায়িক উৎসব। (খ) উত্তরবঙ্গে ধীবর-দীঘি নামে ৪০।৫০ বিঘা পরিমিত একটি দীঘি আছে। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উহা দিব্যের খনিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। (গ) দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন, অতএব ধীবরদিগেরও উহাতে যোগদান করা উচিত।

দিব্যস্মৃতি উৎসবের উপর সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কারোপের কোন ভিত্তি নাই। ইহা বিশেষ কোন সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠিত বা সম্প্রদায়বিশেষের গৌরব ঘোষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশেষ বিপৎকালে দিব্য অনন্ত-সামন্ত-চক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের স্মৃতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সমগ্র বঙ্গের হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের উৎসব। (৮)

লেখক এখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিবর-দীঘিকে ধীবর-দীঘি বলিয়া তদনুকূলে বুকানন সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বুকানন তাঁহার জরীপ বিভাগের আমীনের কথামত দীঘির বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি নিজে উহা দেখেন নাই, দীঘির নাম যে দিবর তৎসম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

১। জমিদারের অতি প্রাচীন কাগজপত্রে উহা দিবর-দীঘি ও মৌজাটি তরফ দিবর নামে লিখিত রহিয়াছে। আকবরের রাজত্বকালে যখন এ দেশের জরীপ জমাবন্দী হয় তখন হইতে এই তরফ নাম প্রচলিত। কাজেই বলা যায় যে সে সময়ও ইহার নাম দিবর ছিল।

২। Survey of India-র পত্নীতলা থানার মানচিত্রে, রেনেলের মানচিত্রে ও শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মানচিত্রে দিবর নাম আছে।

৩। উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনের ১৩১৬ ও ১৩২০ সালের অধিবেশনে পঠিত ৪টি প্রবন্ধে উহা দিবর নামে অভিহিত হইয়াছে। লেখকেরা কেহই নলিনীবাবুর ইঙ্গিতানুযায়ী সম্প্রদায়-বিশেষের লোক নহেন।

৪। স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে দিবর নামে অভিহিত করে। তবে বুকাননকে যিনি ধীবর শুনাইয়াছেন তিনি মনে করিয়া থাকিবেন দিবর অশুদ্ধ, ধীবর শুদ্ধ। বিশেষতঃ তখন বর্ত্তমান ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। দিব্য নামে যে কোন রাজা ছিলেন রামচরিত আবিষ্কারের পূর্ব্বে কেহই তাহা জানিতেন না। এমন কি তৎপূর্ব্বে কেহই কমৌলি-লিপির চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

৫। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার গত বৎসরের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে উহাকে দিবর-দীঘি বলিয়াছেন।

৬। গবর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্বকার বিজ্ঞাপনে দিবর-দীঘি বলিয়াছেন।

৭। স্বয়ং নলিনীবাবু ১৩২১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসীতে' 'মহীপাল প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—২য় মহীপালের রাজত্বকালে যে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া পালরাজ্য উল্টাইয়া দিয়াছিল সেই কৈবর্ত্তরাজা দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি ধীবর-দীঘি বা দিবর-দীঘি এবং ভীম-জাঙ্গাল এই (কোটিবর্ষ) সীমার মধ্যে। (৯)

১৯১৩ অব্দে বালুরঘাট স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় নলিনীবাবু দীঘিটী দেখিয়াছেন বলেন (মানসী-মর্ম্মবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ)। অথচ বুকাননের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন উহা ৪০।৫০ বিঘা হইবে। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিনাজপুর অধিবেশনে (১৩২০ সাল) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি-এল 'বালুরঘাটের কয়েকটী প্রাচীন স্থানের পরিচয়' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি বলেন—"দিবর-দীঘি অনুমান অর্দ্ধমাইল লম্বা ও প্রস্থে কিছু ন্যূন হইবে।" বালুরঘাটের উকীল চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন দীঘিটিকে পাড়সমেত অর্দ্ধমাইল লম্বা বলিতেছিলেন ঠিক তখনই বালুরঘাটে বসিয়া ভট্টশালী মহাশয় বুকাননের কবলে পড়িলে তাঁহাদিগকে তাড়াইতে প্রবল চেষ্টার দরকার হইবে ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী যুদ্ধবিগ্রহে কৈবর্ত্তরাজগণ অনন্তসামন্তচক্রের সাহায্য কখনও পাইয়াছিলেন, এমন কথা রামচরিতে নাই।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৮)

[অনন্ত সামন্ত চক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের ফল ছল করিয়া দিব্য কেমন করিয়া হরণ করিয়াছিলেন তাহা অনেকবার বলিয়াছি।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৯)

[বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে কি এই সাধারণ কথাটা বুঝাইতে হইবে যে, হালে কে কি বলিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ১২৫ বছর আগে বুকানন যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক বেশী? অন্যত্র বলিয়াছি,—যে গ্রামে দীঘিটি অবস্থিত তাহার নাম **তরফ ধীবর** এবং তাহা হইতেই দীঘিটিকে বলা হয় **ধীবর-দীঘি**। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং তাঁহার পক্ষের সকলে বলিতে চাহেন, গ্রামের নাম **তরফ দিবর** এবং দীঘির নাম **দিবর-দীঘি**, অর্থাৎ দিব্যের দীঘি। কিন্তু ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দ গ্রামের নাম কি করিয়া হয়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন—**দিবর-দীঘি** হইতে গ্রামের নাম **দিবর** হইয়াছে। উহা যে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দ, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই যুক্তি যাঁহার গ্রহণ করিতে হয় করুন।

বরেন্দ্রী ভূমিতে কৈবর্ত্ত রাজত্বের মেয়াদ ২০।৩০ বছরের বেশী নহে। উহার নায়কগণের নাম লোকের ভুলিয়া যাইবারই কথা; বরেন্দ্রী ভূমিতে কতকগুলি উচ্চ রাস্তা ভীমের-জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কোন বড় বা উঁচু জিনিসকে পাণ্ডব ভীমের নামের সহিত যুক্ত করার পরিচয় আমাদের দেশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই কি ঐ সমস্ত কৈবর্ত্তরাজ ভীমের বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে? গুরব মিশ্রের প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভ বরেন্দ্রীর অভ্যন্তরেই স্থিত এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা ভীমের পান্টি নামে পরিচিত। ইহাও কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? বগুড়া জেলায় ভীমের জাঙ্গালের অংশ প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর মৃৎপ্রাকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রভাসবাবুর **Mahasthan and its Environs** দ্রষ্টব্য। উহাও কি কৈবর্ত্তরাজ ভীমের নির্ম্মাণ?]

কথামত উহাকে ৪০।৫০ বিঘা মাত্র দেখিতে পাইলেন ; আশ্চর্য্য বটে ! ইহাতে মনে হয় নলিনীবাবু হয় দীঘিটা দেখেন নাই, নতুবা দিব্যের কৃতকর্ম্মকে ইচ্ছা করিয়া ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদের সয়দাবাদ বাঙ্গালপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দীঘির মালিক। কয়েক বৎসর হইল তাঁহাদের প্রজা দীঘির অগ্নিকোণে পাড় কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতেছে বলিয়া দীঘির জলভাগ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি প্রথম বার্ষিক দিব্য-স্মৃতি উৎসবে অন্ততঃ ১৪টী জেলা হইতে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তি দেখিয়াছেন দীঘির কেবল জল ভাগের পরিমাণ এখনও ৩০০ বিঘার অধিক হইবে। ইহার মধ্যে ১৮০ বিঘা ধান্য চাষের জন্য জমিদার-সেরেস্তা হইতে বন্দোবস্ত হইয়াছে। আশঙ্কা হয় অচিরে জমিদারের লোভ ও কৃষকের ক্ষুধা মিলিত হইয়া শত শত বৎসরের এই কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। নলিনীবাবু কথিত ৪০ বিঘাও অবশিষ্ট থাকিবে না। (১০)

দিবর-দীঘি, ভীম-জাঙ্গাল যদি ঐতিহাসিক নামের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয়, উহা যদি দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার না করা হয়—তাহা হইলে দিনাজপুরের মহীপাল-দীঘি, মুন্সীগঞ্জের রামপাল-দীঘি, নবদ্বীপের বল্লাল-দীঘির প্রতিষ্ঠাতাও মহীপাল, রামপাল, বল্লাল হইতে পারেন না। কেবল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নহেন, স্বয়ং নলিনীবাবুও দিবর-দীঘি ভীম-জাঙ্গালকে দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি।

লেখক নওগাঁ মহকুমার প্রসিদ্ধ দীঘির ভীমসাগর নাম নূতন কি পুরাতন এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীম-জাঙ্গালের পার্শ্বস্থ এই ভীম-সাগরের অস্তিত্ব আমরা প্রথম জানিতে পারি 'আজমীর-পথে' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা নওগাঁর খাঁন্ সাহেব মহম্মদ আফজল মহোদয়ের লেখা হইতে। বগুড়া, নওগাঁ, বালুরঘাট মহকুমার অধিবাসিবৃন্দ ইহাকে পুরুষানুক্রমে ভীমসাগর বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। নলিনীবাবু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইলে তাহার আর প্রতীকার কি ? (১১)

লেখক দিব্যের চিত্র মসীময় করিয়াছেন, তাঁহার কৃতকর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়াছেন—ইহাতেও তাঁহার সমগ্র গৌরব বিনষ্ট হয় নাই মনে করিয়া তাঁহাকে জালিক জাতীয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তির জাতি নির্ণয় করিয়া তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। প্রবন্ধের 'কৈবর্ত্তরাজ দিব্য' নাম দেখিয়া এবং সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনে হয়—লেখকের নিকট দিব্যের ইতিহাস অপেক্ষা দিব্যের জাতি-নির্ণয় মহৎ ব্যাপার। চন্দ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—'মিলিত অনন্ত সামন্ত চক্র নির্ব্বাচিত গোপালও দিব্য জাতি-বর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন।' স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন—'দিব্য ও ভীম নামে যে জাতি হউন কেন আসে যায় না।' এবারের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—'তিনি (দিব্য) বরেন্দ্রবাসী ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন, ইহাই আমাদের শ্লাঘার বিষয়!' সুতরাং বলিতে পারি উৎসবের উদ্যোক্তৃবৃন্দ দিব্যের জাতি নির্ণয় সম্পর্কে আদৌ আগ্রহান্বিত নহেন। কিন্তু নলিনীবাবুর জন্যই আমাদিগকে এই অনভিপ্রেত বিষয়ের আলোচনা করিতে হইতেছে।

লেখক বৈজয়ন্তী ও অভিধান রত্নমালার সাহেবী সংস্করণ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—"দিব্যের সমকালে কৈবর্ত্ত বলিলে জালিক কৈবর্ত্ত বুঝাইত। অতএব কৈবর্ত্তরাজ দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন।" অভিধান-রত্নমালা কোন হলায়ুধ প্রণীত তাহা অফ্রেক্ট সাহেব নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক অভিধান দুইখানি যে অমরকোষ দৃষ্টে লিখিত তাহা—কৈবর্ত্তো দাশোধীবরৌ (অমর), কৈবর্ত্তো ধীবরোদাশো (বৈজয়ন্তী) কৈবর্ত্তো ধীবরোদাসো (রত্নমালা) উদ্ধৃত শ্লোকাংশেই বুঝা যায়। অমরকোষও একখানি অভিধান। অভিধান দেখিয়া কেহ জাতি বিচার করেন না। স্মৃতি, সংহিতাদি শাস্ত্র পারিপার্শ্বিক সংস্থান, সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিয়া জাতি বিচার হয়। মনুপ্রোক্ত মার্গব, পরাশর, স্মৃতিসিদ্ধ ভৃজ্জকণ্ঠ শব্দ অমরকোষে ধৃত হয় নাই বলিয়া বলা যায়না যে মার্গব জালিক নহে, পরাশর নিষাদ নহে বা ভৃজ্জকণ্ঠ অকণ্ঠ নহে ! না ইহারা ঐ সময় বিলুপ্ত হইয়াছিল, অমরকোষের ন্যায় অভিধান-রত্নমালায় যে শব্দের একার্থমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে অফ্রেক্ট সাহেবও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যেমন দ্বিবিধ বৈদ্য, দ্বিবিধ করণ ; তেমনই আচরণীয়

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১০)

[কোন বড় দীঘির আয়তন চোখে দেখিয়া অনুমানে ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। ১৯১৩ সনে আমি দীঘিটি দেখিয়াছি, সে আজ ২৩ বছরের কথা। তাই স্মৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বুকানন যাহা লিখিয়াছেন তদনুসারেই দীঘির আয়তন লিখিয়াছিলাম। Cunningham লিখিয়াছেন (Reports—Vol. XV. P. 123) দীঘিটি প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে সিকি মাইলেরও উপরে। দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার ১ ইঞ্চি=১ মাইল রঙ্গিন মানচিত্র Bengal Drawing office কর্ত্তৃক ১৯১২ সনের ৯ই জানুয়ারী প্রচারিত হইয়াছে ; উহাতে দীঘিটি দেখান আছে এবং উহা হইতে দীঘিটির মাপ পাইলাম লম্বায় ৬৬০ গজ, প্রস্থে ৫২৮ গজ। অথচ Cunninghamএর মত Surveyর মহারথীও অনুমান বশে দীঘিটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাত্র ৪০০ গজ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সরকারী মানচিত্র হইতে দীঘিটির এবার ঠিক মাপ দিলাম, আশা করি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইবার সন্তুষ্ট হইবেন !]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১১)

[ইতিহাস আলোচনাকারিগণের মন একটু সন্দেহপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভীমসাগর নামটি যদি পুরাণ নামই হইয়া থাকে, তবে আর কথা কি ?]

অনাচরণীয় ভেদে অমরকোষের পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রে ও ব্যবহারে দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত বিদ্যমান আছে। (১২)

নলিনীবাবু শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত একখানি পুঁথি অনুসারে বলিয়াছেন—"বৌদ্ধগণ মৎস্যঘাতী বলিয়া কৈবর্ত্তগণকে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় প্রদান করেন নাই এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ কৈবর্ত্তগণের কোন দিন উদ্ধার নাই এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।" দিব্য যদি এই কৈবর্ত্ত-জাতীয় হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন বৌদ্ধ নরপতি বিগ্রহপালও মহীপালের রাজত্বকালে রাজসভায় অত্যুচ্চপদ পাইতেন না। বৌদ্ধ কবি সন্ধ্যাকর দিব্যের জাতি বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও মৎস্যাঘাতসূচক বা ঐরূপ অবজ্ঞাব্যঞ্জক উক্তি প্রকাশ করেন নাই। দিব্য জালিক জাতীয় হইলে বৌদ্ধ কবি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক প্রভুর রাজ্যহারী ঘোর শত্রুর সম্পর্কে তাহা নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। সুতরাং সন্ধ্যাকরের উক্তি হইতে প্রমাণ হয় দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন না। (১৩)

নওগাঁ, বালুরঘাট, বগুড়া অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাচীন শক্তিপীঠের পূজক মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। অথচ ঐ সকল স্থানের জমিদার বারেন্দ্র বা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দিব্য ধীবরজাতীয় হইলে ধীবরের ব্রাহ্মণই শক্তিপীঠসমূহে পূজা দিতেন। সুতরাং ইহাতেও প্রমাণ হয় দিব্য মাহিষ্যাপর নামা কৈবর্ত্ত ছিলেন।

মাহিষ্য ও জালিক উভয় জাতির একই কৈবর্ত্ত নাম থাকিলেও যে স্থানে কৈবর্ত্ত বলিলে জালিককে বুঝায় সেস্থানে মাহিষ্যাপরনামা কৈবর্ত্ত কখনই নিজদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেন না। পূর্ব্ববঙ্গে কৈবর্ত্তাখ্য জালিক থাকায় ঐ স্থানের মাহিষ্যগণ পূর্ব্বে হালিক দাস, পরাশরদাস নামে পরিচিত ছিলেন, উড়িষ্যায় কেওট বা কৈবর্ত্তাখ্য মৎস্যজীবী থাকায় মেদিনীপুরের মাহিষ্যগণ চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচয় দিতেন। কিন্তু উত্তর মধ্য পশ্চিম বঙ্গে কৈবর্ত্তাখ্য ধীবর নাই বলিয়া ঐ সকল স্থানের মাহিষ্যরা পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত নামে পরিচয় দিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে বরেন্দ্রভূমে কৈবর্ত্ত বলিলে, মাহিষ্যকেই বুঝাইত। (১৪)

প্রবন্ধের প্রথমে নলিনীবাবু বলিয়াছেন—উত্তর বঙ্গের কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির স্মরণে উৎসব করিয়া আসিতেছেন। আবার ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—হালিককৈবর্ত্তগণ মহারাজ দিব্যকে নিজেদের জাতীয় বলিয়া দাবী করিয়া দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার স্মৃতি উৎসব করিতেছেন।—দেখা যাইতেছে নলিনীবাবু স্বীকার করিয়াছেন—উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত বলিলে হালিক কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য বুঝায়।

সন্ধ্যাকর ভীমের বর্ণনায় বলিয়াছেন—"রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল; সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন; পৃথিবী কল্যাণলাভ করিয়াছিল।" ২।২৪ এই 'সজ্জনগণের' মধ্যে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন! দিব্য যদি জালিক জাতীয় হন তাহা হইলে বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণাদি জালিকের দান গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছেন বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? (১৫)

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১২)

[রামচরিতে দিব্যের জাতির একমাত্র পরিচয়, তিনি কৈবর্ত্ত। সমসাময়িক অভিধানে এবং প্রাচীনতর অমরকোষে লিখে, কৈবর্ত্ত মানে ধীবর। অন্য কোন অর্থ এই আমলের কোন অভিধানে যদি থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখাইলেই তো তর্ক-বিতর্ক থামিয়া যায়! দুই জাতীয় কৈবর্ত্ত অমরকোষের পূর্ব্ব হইতেই আছে, ইহা বলিলেই তো কেহ মানিবে না, প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১৩)

[প্রমাণ হয় কিনা পাঠকগণের বিচার্য্য।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১৪)

[উত্তরে Dinajpur Gazetteer হইতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে কিঞ্চিৎ শুনাইতেছি:—"Kaivarttas are by far the most important of the pure Hindu cultivating castes ..The principal occupation of this caste appears originally to have been fishing, but this has been abandoned. P. 40]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১৫)

[জালিকগণের ব্রাহ্মণের মধ্যে কি তবে সজ্জন একেবারেই নাই?]

অনন্ত-সৃজন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু

পুরুষ বিলাপি' কহে "হে নিঠুর নারী!
তোমার বন্দনা গাহি দিবা বিভাবরী।
তোমার ছলনা তবু নাহি হ'ল সারা।
তোমার কবিতা লিখে হনু দিশেহারা
রমণী হাসিয়া কহে—"তাই আদি হ'তে
অনন্ত-সৃজন চলে তোমাতে আমাতে।"

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাহা বা প্রাগ্-নগরী

১৯শে জুন ১৯৩৫, বুধবার। আজ প্রাগ্ যাত্রা ক'রতে হবে; 'আবার কবে আস্‌বো', এই মনোভাব নিয়ে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নগরীশ্রেষ্ঠ বুদাপেশ্‌ৎ-এর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। ন্যাশনাল হোটেল—নেমজে‧তি সাল্লোদা Nemzeti Szalloda-তে এ কয়দিন বেশ আরামে ছিলুম।

প্রাচীন প্রাগ্—নগর চত্বর, বামে
পৌরসভার গৃহ টাউন-হল

এই হোটেলের পোর্টারটীকে ক'দিনে আমার বেশ ভালো লেগেছিল—বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা মানুষটী, চোখে পুরু চশমা—দেখে মনে হয় ইস্কুল-মাষ্টার কি অধ্যাপক; শিক্ষিত লোক—৫।৭টা ভাষা ব'লতে পারে, অনেক কিছুর খবর রাখে। সহানুভূতিশীল বিদেশী দেখে, পোর্টারটী আমায় একদিন কতকগুলো চটী বই আর অন্য কাগজ দিলে—ইংরেজীতে লেখা—তাতে গত মহাযুদ্ধের পরে ভেয়ার্সায়ি আর ত্রিআনঁ-র সন্ধিতে হঙ্গেরীর উপর যে অবিচার করা হ'য়েছে, তার সব কথা আছে। এদের স্বদেশ আর স্বজাতি-প্রীতি অদ্ভুত; হঙ্গেরীর সীমানাকে ছোট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, তাতে বহু হঙ্গেরীয় এখন অন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে প'ড়েছে—এটা এদের মনে ভীষণ অস্বস্তির কারণ হ'য়ে র'য়েছে; নিরপেক্ষ বিদেশীর সহানুভূতি জাগিয়ে' এরা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি ক'রতে ব্যস্ত—ত্রিআনঁ-সন্ধির ব্যবস্থা এরা উল্‌টে দিয়ে তবে ছাড়্‌বে। পোর্টারটী ভারতবাসীদের সুখ্যাতি ক'রলে; কবে এক ভারতীয় যাত্রী ঐ হোটেলে ছিলেন, তাঁর টাকা ফুরিয়ে যায়, পোর্টারের কাছে পাঁচ ছয় পাউণ্ড ধার ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ ত্যাগ করেন, আর পরে কথামত যথাসময়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু স্মারক উপহার—আর তার উপরে মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতাদ্যোতক কুশল-প্রশ্নময় পত্রাঘাত; এইতেই ভারতীয়েরা যে ভদ্র জাতি, এই বোধ এর হ'য়েছে। আমি বিল দেবার সময় যৎকিঞ্চিৎ বখশিশ দিলুম। হোটেলের অতিথিদের মন্তব্য লেখবার জন্য এক বই এল—তাতে দেখি নানা জাতীয় লোক নানা ভাষায় মন্তব্য লিখেছেন—মজর, জরমান, ইংরিজি, ফরাসী, ইটালীয়, সর্বীয়, রুষ, আরবী, ফারসী, চীনা, জাপানী; আরও কত। দেখি, ১৯৩০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বর্গ্ থেকে এম্-ই দাদাভাই ব'লে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, খুব সম্ভব পারসী—তিনি গুজরাটীতে পাঁচ ছত্রে নিজ সম্মতি প্রকট ক'রেছেন। তিন জন বাঙালীর নাম দেখে আনন্দ হ'ল—এঁদের দুজন লিখেছেন বাঙলায়, একজন ইংরিজিতে। আমি হিন্দী বাঙলা আর ইংরিজিতে হোটেলের এক সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি লিখে দিলুম।

সকাল সওয়া সাতটায় গাড়ী—যথাসময়ে পেশ্‌ৎ-এর

‘পশ্চিম-ষ্টেশনে’ গিয়ে গাড়ী ধরা গেল। একটী মাত্র ফেরি-ওয়ালা ঠেলা গাড়ী ক’রে ফল, কেক, মদ, লেমনেড এই সব বিক্রী ক’রছে। গাড়ীতে চার ভাষায় সব লেখা—চেখ, মজর, জরমান, ফরাসী। তৃতীয় শ্রেণীতে চ’লেছি ; আমাদের কামরায় সহযাত্রী পাওয়া গেল কতকগুলি ইহুদী। একটী মোটা-সোটা লোক, ইঞ্জিনিয়ার, বছর তিরিশ বয়সের যুবক, জরমানে তার সঙ্গেই বেশী কথা হ’ল ; তবে আমার জরমানের দৌড় বড় বেশী নয়, আর সে ফরাসী কিছু কিছু বুঝতে পারে, ব’ল্‌তে পারে না। সঙ্গে একটী মহিলা ছিল—বছর চল্লিশ বয়স হবে, মাথার চুল ছোট ক’রে ছাঁটা—মুখখানা লম্বা, ঘোড়ার মুখের মত—বেশীর ভাগ সময় কেক ফল আর চকলেট সেবাতেই কাটালে। ইহুদী পুরুষটীর বেশী কৌতূহল আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে—তারা বেশ ভাবপ্রবণ কিনা, প্রগল্‌ভ কিনা। নিজের সম্বন্ধে এক রাশ পরিচয় ব’ল্‌লে।

দানুব নদীকে বাঁয়ে রেখে আমাদের ট্রেণ চ’ল্‌ল। খানিকটা পথ বেশ পাহাড়ে’ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এক পশলা বৃষ্টি হ’য়ে গেল, মেঘে আর জলে দূর স্থলভাগ ঝাপসা। বাঁ হাতে এস্তেরগোম শহরের গির্জ্জার বিরাট গুম্বজ দেখা গেল। Szob, Bratislava, Brno, Praha—এই পথ দিয়ে আমাদের গাড়ী চ’ল্‌ল। Szobএর পরে চেখ্‌-রাষ্ট্র. পাসপোর্ট দেখার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

দুপুরে গাড়ীতেই খেয়ে নেওয়া গেল। শুনেছিলুম, চেখদের প্রিয় খাদ্য, তাদের বিশিষ্ট বা “জাতীয়” খাদ্য, হ’চ্ছে রাজহাঁসের রোস্‌ট্‌ ; হাঁস বা রাজহাঁসকে এদের ভাষায় বলে Hus ‘হুস্‌’—আর্য্যগোষ্ঠীর চেখভাষার এই শব্দটী আমাদের ‘হাঁস’ বা ‘হংস’ শব্দেরই জ্ঞাতি।

ট্রেনের রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে এই রোস্‌ট্‌ দিলে ; সুবিধের লাগ্‌ল না—ভীষণ চর্ব্বিওয়ালা মাংস। রুটী মাখন আলু-ভাজা আর কফিতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হ’ল। হঙ্গেরীয় টাকাই সঙ্গে ছিল—খাবার বিল শোধ হ’ল ঐ টাকায়। হিসাব মিলানো, সে এক কঠিন ব্যাপার ; হঙ্গেরীয় ২৬ পেঙ্গোতে এক ইংরিজি পাউণ্ড, আর এক পাউণ্ডে ১১৬ চেখ্‌ ক্রাউন ; এই ২৬ আর ১১৬-র অনুপাত কষা আমার শক্তির বাইরে। টাকার ফিরতী দিলে চেখ মুদ্রায় ; চেখ ক্রাউনগুলি নিকেলের, কিন্তু এই নগণ্য নিকেলের মুদ্রার উপর যে ছবি এরা অঙ্কিত ক’রেছে, তা দেখে চোখ জুড়িয়ে’ গেল।

প্রাগ্‌—নদী ও সেতুসমেত নগরের দৃশ্য

টাকা পয়সা তো বিনিময়ের হার হিসাবে স্থিরীকৃত

ধাতুখণ্ড মাত্র, কিন্তু তার উপর নানাবিধ লাঞ্ছন বা চিত্র অঙ্কিত ক'রে দেবার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই এসে যায়। ভারতবর্ষে, গ্রীসে—এই দুই দেশে বোধ হয় স্বাধীন ভাবে লাঞ্ছন বা চিত্রযুক্ত মুদ্রার রীতি বিভিন্ন কালে উদ্ভূত হয়। অন্যত্র সোনা রূপা তৌল ক'রেই বিনিময়ের কাজ চালানো হ'ত; গ্রীসে আর ভারতেও মুদ্রা তৌল করা হ'ত; লাঞ্ছন বা চিত্র দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধাতুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠি-সংঘের বা রাষ্ট্রনায়কগণের ঘোষণা প্রকাশ করা মাত্র। সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে, কেবল কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন ছাড়া, মুদ্রায় কোনও প্রতিকৃতি বা পুরা চিত্র অঙ্কিত হ'ত না। এই সমস্ত চিহ্ন, বিভিন্ন নগরের বা শ্রেষ্ঠীদের লাঞ্ছন মাত্র

পার্লামেণ্ট গৃহ—প্রাগ্

ছিল—ফুল, পাতা, চৈত্য, বেড়ার মধ্যে গাছ, হাতী, সিংহ বা ষাঁড়ের রেখাচিত্র, দুই চারিটা এই রকম ছোটো-খাটো চিহ্ন—এই সব; পাতলা চতুষ্কোণ তামা বা রূপায়, মোহরের ছাপের মতন মেরে দেওয়া হ'ত। এই সব "রূপ" বা চিহ্ন বা চিত্র টাকায় থাক্‌ত ব'লে, টাকার নাম ছিল "রূপ্য"—আর পরে "রূপ্য" বা "রূপ্যক" শব্দ টাকার ধাতুর নামবাচক শব্দ হ'য়ে দাঁড়ায়, আর তার ফলে রজত বা চাঁদী অর্থে আমাদের ভাষায় "রূপা" শব্দের উদ্ভব। বোধ হয়, ভারতের কিছু আগেই, গ্রীকজাতি তাদের মুদ্রায় এমন সব সুন্দর সুন্দর চিত্র দিতে আরম্ভ করে যে তার তুলনা হয় না। নানা দেবতার মাথা—পার্শ্ব দৃশ্যে বা সম্মুখ দৃশ্যে—অতি মহনীয় ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে এই মুদ্রাগুলিকে শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন ক'রে রেখেছে। জে·উস্, হেরা, আথেনা, দেমেতের্, আপোল্লোন্, হের্মেস্, আফ্রোদিতে প্রভৃতি দেবদেবী, অথবা আরেথুসা, এউবোইআ প্রভৃতি অপ্সরার অতি মনোহর প্রতিকৃতিময় চিত্র, কেবল মুণ্ড বা মুখমণ্ডল নিয়ে; কিংবা গ্রীক যোদ্ধা বা মল্লের পূর্ণ মূর্ত্তি; অথবা কোনও পশু বা পক্ষীর মূর্ত্তি; এইসবে, গ্রীক মুদ্রা শিল্প-সৌন্দর্য্যের চিরন্তন আধার-রূপে বিদ্যমান। গ্রীক মুদ্রারীতির পরোক্ষ অনুপ্রেরণার ফলেই আমাদের ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুন্দর চিত্রময় মুদ্রার প্রবর্ত্তন হয়। ওদিকে রোমের মুদ্রাও গ্রীসের সাক্ষাৎ অনুকরণে তৈয়ারী হয়। পরে খ্রীষ্টানী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হ'ল, মুদ্রার সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হ'ল। অধুনা ইউরোপ আবার এ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েছে। ফরাসী দেশের কোন প্রেসিডেণ্ট নাকি একবার ব'লেছিলেন, ফ্রান্সের মুদ্রা তার উপরে অঙ্কিত চিত্র-বিষয়ে এত সুন্দর হওয়া উচিত যে, যার কাছে দেশের সবচেয়ে নিম্ন মূল্যের মুদ্রা একটী থাকবে, ঐ মুদ্রার দ্বারায় একটী শিল্প-বস্তুর অধিকারী ব'লে যেন তাকে মনে করা যেতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ফরাসীরা তাদের মুদ্রায় চমৎকার কতকগুলি চিত্র দেয়। দেশের বড় বড় শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা নকশা চাওয়া হ'ত, বিশেষজ্ঞ শিল্পরসিকদের দ্বারা যাঁর নকশা শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করা হ'ত তাঁর নকশাই গ্রহণ করা হ'ত। সাধারণতঃ গ্রীক ভাবের অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি এই সব মুদ্রাচিত্রে দেখা যায়। ফ্রান্সের Oudiné উদিনে ব'লে শিল্পীর পরিকল্পিত Concord 'কনকর্দ' বা 'সংহত্যতা' (অথবা একতা) দেবীর মুখ বহু দিন ধ'রে ফ্রান্সের ফ্রাঁ আর মুদ্রাকে সৌন্দর্য্যের দিক্ থেকে এক শ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রেছিল। তার পরে Dupuis দ্যুপুই-অঙ্কিত ফ্রান্স-মাতার মূর্ত্তি, আর Roty রোতি-অঙ্কিত

Semeuse বা Sower অর্থাৎ শস্য-বপনকারিণী নারীর পূর্ণ মূর্ত্তি, ফ্রান্সের মুদ্রায় চিত্রিত হয়। এখন লড়াইয়ের পরে ফ্রান্সের মুদ্রায় ঐ ধরণের অন্য নূতন নূতন মূর্ত্তি অঙ্কিত হ'চ্ছে। ফ্রান্সের মতন, ইটালীর মুদ্রায়ও চমৎকার সব চিত্র পাওয়া যায়; কোনটীতে খালি যবের শীষ, কোনটীতে ফুলের উপরে মৌমাছি, কোনওটীতে দেবী ইতালিয়ার মুখ, হাতে যবের শীষ নিয়ে র'য়েছেন, কোনওটীতে বা চার ঘোড়ার রথে চ'ড়ে বিজয়া দেবী, কোথাও বা সিংহবাহিত রথের উপরে দেবী ইতালিয়া; কতকগুলিতে ইটালির রাজার মুখও থাকে। অবশ্য ইউরোপের সব দেশেরই মুদ্রা যে চিত্র বিষয়ে এত ভাল বা সুন্দর, তা নয়। হঙ্গেরীর মুদ্রায় বিশেষ সৌন্দর্য্য নেই—দেশের নাম, মুদ্রার নাম ও মূল্য, আর হঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা স্তেফানের মুকুট—ব্যস্। জরমানিতে মাত্র দুই একটা মুদ্রায় কলা-নৈপুণ্য দেখাবার চেষ্টা হ'য়েছে—বাকী সব মামুলী—বিশেষত্বহীন। স্বাধীন পোলাণ্ড, ফ্রান্সের দেখাদেখি কতকগুলি সুন্দর মুদ্রা বা'র ক'রেছে—পোলাণ্ড-মাতা দেবী পোলোনিয়ার মূর্ত্তি, পোলাণ্ডের পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট Pilsudski পিল্‌সুদ্‌স্কির মুখ, এইগুলি বাস্তবিকই মনোহর।

ট্রেণে চেখ্-দেশের নিকেলের মুদ্রা থেকে দেখলুম, চেখোস্লোবাকিয়ার লোকেরাও এ বিষয়ে খুবই অবহিত। ছোট্ট দেশটী, কিন্তু এই মুদ্রা থেকে বোধ হ'ল, এ দেশের শাসকদের মধ্যে শিল্পপ্রাণতা যথেষ্ট আছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব প্রবল না থাকলে, শাসকদের মধ্যে তার স্ফূর্ত্তি হ'তে পারে না। পরে প্রাগে পঁউছে, চেখ-জাতির শিল্পপ্রীতির বহু পরিচয় পাই।

চেখ্ মুদ্রা নিকেলের 'ক্রোন্' বা ক্রাউন

নিকেলের চেখ-ক্রাউন মুদ্রায় একদিকে আছে, কাটা শস্যের গোছা নিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে রমণী মূর্ত্তি—চেখ্ দেশলক্ষ্মীর প্রতীক-স্বরূপ। মূর্ত্তিটী বেশ জোরালো ভঙ্গীতে আঁকা। যে শিল্পীর পরিকল্পনা এই ছবিতে আকার পেয়েছে, তাঁর নাম তলায় লেখা—O. Spaniel "ও শ্‌পানিএল্"। মুদ্রাটীর অন্যদিকে আছে চেখো-শ্লোবাকিয়ার প্রাচীন রাজবংশের লাঞ্ছন—দ্বি-লাঙ্গুল সিংহ, অলঙ্করণের ভঙ্গীতে অঙ্কিত; এই সিংহ মূর্ত্তি, আর দেশের নাম Ceskoslovenska Republika: এই লেখের অক্ষরগুলির ছাঁদ ভারী সুন্দর,—ঋজু শক্তিমান্ পদ্ধতিতে রচিত। চেখোস্লোবাকিয়ার দশ ক্রাউনের মুদ্রাও এই ধরণের—একদিকে দেশে কৃষিজাত দ্রব্য, অন্যদিকে কলকারখানার নিশানা হিসাবে হাতুড়ী আর যন্ত্রের চাকা, এই নিয়ে চেখ-দেশমাতৃকার উপবিষ্ট মূর্ত্তি—তিনি বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন নিজ সন্তানগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করছেন। চল্লিশ-ক্রাউনের মুদ্রায় আছে তিনটী মূর্ত্তি—শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য—পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

মুদ্রা—রুশ 'ক্রোন্'

এই সব মুদ্রা উচ্চ কোটির শিল্পের নমুনা-স্বরূপ যত্ন ক'রে রেখে দেবার জিনিস। ব্রিটিশ জাতি এসব ব্যাপারে বড় একটা সৌন্দর্য্যের ধার ধারে না—তাই ইংরেজের মুদ্রায় কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল ব্রঞ্জের পেনি আর হাফ-পেনিতে একদিকে ত্রিশূলধারিণী ব্রিটানিয়া-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকে, সেটা মন্দ নয়। সোনার গিনির আর হাফগিনির পিছনে থাকে, এক ইটালীয় চিত্রকরের কৃতিত্ব—খ্রীষ্টান ইংলাণ্ডের জাতীয় দেবতা সেণ্ট জর্জের অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত মূর্ত্তি,—ঘোড়ার পায়ের তলায় ড্রাগন বা মহানাগ মরণাহত অবস্থায়; এই অশ্বারোহী মূর্ত্তি, প্রাচীন গ্রীসের আথেন্স্-নগরীর বিখ্যাত পারথেনন্-মন্দিরের ফলক-চিত্রের অশ্বারোহী মূর্ত্তির নকল মাত্র। আইরীশ-ফ্রী ষ্টেট-এর লোকেরা তাদের নোতুন মুদ্রা বানিয়েছে—একদিকে আয়র্লাণ্ডের লাঞ্ছন harp বা বীণা, অন্যদিকে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রায় আয়র্লাণ্ডের বিভিন্ন বিশিষ্ট পশুপক্ষীর চিত্র—ঘোড়া, ষাঁড়, শুওর, খরগোস, মুরগী, সামন-মাছ; জন্তু চিত্র হিসাবে এ মুদ্রার নক্‌শাগুলি ভারী সুন্দর, এবং এ ধরণের প্রাচীন গ্রীক মুদ্রার ভাবের অনুকারী।

আমাদের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের নামাঙ্কিত নূতন

মুদ্রা শীঘ্রই প্রচলিত হবে; আশা করা যায়, ব্রিটেনের আর বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মুদ্রায়, সৌন্দর্য্য আর বৈশিষ্ট্য দুইই বজায় রাখবার চেষ্টা হবে। ইংরেজ-প্রচলিত ভারতের মুদ্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছুই রাখা হয় নি। ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির টাকায় রাজা চতুর্থ উইলিয়মের ("খুড়ো-মুখো" টাকায়) আর রাণী ভিক্টোরিয়ার টাকায় ("ঝুঁটীওয়ালা" টাকায়) খালি ফারসীতে "য়ক্ রূপ্যহ্" এইটুকু লেখা থাকৃত। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুটমাথা মূর্ত্তিযুক্ত টাকায়, এই ফারসীটুকুও সরিয়ে দেওয়া হয়; এই টাকার পিছনদিকের নক্সাও ইউরোপীয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের টাকায় পিছনদিকে দুধারে মৃণাল-

প্রাগ্—জাতীয় সংগ্রহশালা

শুদ্ধ পদ্মের গোছা দিয়ে ভারতীয়ত্বের একটু চিহ্ন আনবার চেষ্টা হয়, আর ফারসীতে "য়ক্ রূপ্যহ্", "হশ্ৎ আনহ্" (বা আট আনা), "চহার আনহ্" (চার আনা) এই সব লেখা আবার বসানো হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুদ্রার পিছনদিকের চিত্রে ফারসীটুকু বজায় আছে, আর একটা নক্শা দেওয়া হ'য়েছে, তাতে আছে ভারতের প্রতীক স্বরূপ পদ্মফুল, ইংলাণ্ডের প্রতীক স্বরূপ গোলাপ ফুল, আর স্কটলাণ্ডের থিস্‌ল্ ফুল, আর আয়র্লাণ্ডের তেপাতা শ্যামরক। ভারতের মুদ্রায় স্কটলাণ্ডের আর আয়র্লাণ্ডের লাঞ্ছন আর কেন? সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের মুদ্রায় কেবল ভারতের প্রতীক পদ্ম ফুল বা আর কিছু থাকুক, আর দেবনাগরীতে "ভারতবর্ষ" আর মুদ্রার নাম বা মূল্য লেখা থাকুক, নক্শাটী খাঁটী ভারতীয় ভাবের হোক্,—আমরা এইটুকুতেই খুশী হবো। মুদ্রায় সামনের দিকে অবশ্য সম্রাটের মূর্ত্তি থাকৃবে—যখন রাজতন্ত্রের মুদ্রায় এইটেই হ'চ্ছে রেওয়াজ।

মুদ্রা-সম্বন্ধে কতকগুলো অবান্তর কথা ব'কে গেলুম। যাক্—চেখো-স্লোবাকিয়া দেশের মধ্য দিয়ে তো ট্রেনে ক'রে চ'ললুম। অনেকটা পথ বেশ পাহাড়ে' আর জঙ্গুলে'; দূরে-কাছে নাতি-উচ্চ পাহাড়, পাইন গাছে ঢাকা। মাঝে-মাঝে মাঠ আর শস্য-ক্ষেত্র। সব ক্ষেত সবুজ শস্যে ভরা; মাঝে-মাঝে লাল আর সাদা পপি বা পোস্ত ফুল—রঙের সমাবেশ বড় সুন্দর—ক্ষেতের শোভা নয়ন মন মুগ্ধ ক'রছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—ক্ষেতে যারা কাজ ক'রছে—তাদের বেশীর ভাগই মেয়ে। অনেকেরই খালি পা। এদের সুপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, হাত মুখ থেকে যেন রক্ত ফেটে প'ড়ছে। মাথা আর কান ঢেকে, থুঁতনির নীচে বাঁধা রুমাল। কোথাও বা ঘোড়ায় টানা মালগাড়ী ক'রে কাঠ-কাঠড়া নিয়ে যাচ্ছে—গাড়ী চালাচ্ছে স্ত্রীলোকে। মেয়েরাই ক্ষেত-খামারের কাজের ভার নিয়েছে যেন। চেখ ক্রাউন-মুদ্রার চিত্রটী তখন সার্থক ব'লে মনে হ'ল—মেয়েরাই ধান দাওয়া প্রভৃতি সব কাজ করে তাহ'লে। আমি সহযাত্রী ইহুদীটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—দেশের পুরুষেরা কোথায় গেল? ভদ্রলোক গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে একটু দেখ্‌লেন, সত্যিই তো, মেয়েইর ভাগ বেশী; তারপরে একটু ভেবে ব'ললেন—পুরুষেরা বেশীর ভাগ শহরে যায়, কলকারখানায় কাজ করে; মেয়েদের তাই ঘরে থেকে ক্ষেত-খামার দেখতে হয়, চাষবাসের কাজে তাদের খাটতে হয়।

যত পশ্চিমে প্রাগের দিকে যাচ্ছি, বসতি তত ঘন দেখা যাচ্ছে; বড়-বড় গ্রাম—বা ছোট-ছোট শহর বাড়ছে। নানারকম কারখানার সংখ্যাও বাড়ছে। শেষে বিকাল পাঁচটায় প্রাগ্ নগরে এসে পৌছনো গেল। প্রাগের এই ষ্টেশনটীর নাম, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনের নামে "উইলসন্-ষ্টেশন"। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেখ্ বিভাগের সংস্কৃত-ভাষা আর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভি লেস্‌নি V. Lesny মহাশয়ের সঙ্গে পূর্ব্বে থেকে পরিচয় আর হৃদ্যতা ছিল, আমি যে প্রাগে আস্‌ছি তাঁকে আগেই জানাই—তাতে তিনি বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন।

চেখো-শ্লোবাকিয়া দেশটী, বোহেমিয়া, মোরাবিয়া আর শ্লোবাকিয়া নামে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন জরমান-ভাষী অস্‌ট্রিয়ান জাতি ছিল রাজার জাতি; নিজেদের দেশেও চেখেরা বড় একটা পাত্তা পেত না। জরমানের সামনে তাদের মাতৃভাষা নিষ্প্রভ ছিল। কিন্তু চেখেরা এক সময়ে স্বাধীন ছিল। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজা কার্ল্ বা চার্লস্, প্রাগ্-শহরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। চেখ-জাতীয় রাজারা বোহেমিয়ার রাজা ব'লে খ্যাত ছিলেন, তাঁদের হাতে চেখ জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে। চেখেরা ভাষায় পোল আর রুষদের জ্ঞাতি—ভাষাটী আর্য্য-গোষ্ঠীর ভাষা বিধায়, ইংরিজি আর বাঙলা দুইয়েরই আত্মীয়। খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতক ছিল চেখ জাতের খুব উন্নতির সময়, তখন মধ্য-ইউরোপে প্রাগ সর্ব্বপ্রধান নগর হ'য়ে দাঁড়ায়। ক্রমে উত্তর, পশ্চিম, আর দক্ষিণের জরমানদের চাপে প'ড়ে, আর নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে, চেখদের দেশ জরমানদের হাতে আসে। ১৫২৬ সালে চেখদের প্রধানেরা অস্‌ট্রিয়ার Hapsburg হাপ্‌সবুর্গ বংশের জরমান-ভাষী রাজা আর রাজবংশকে নিজেদের রাজা আর রাজবংশ ব'লে মেনে নেয়। কাজেই এইভাবে চেখেরা শেষে অস্‌ট্রিয়ার অধীন হয়। পরে, মহাযুদ্ধের শেষে, তারা আবার স্বাধীন হয়। ইতিমধ্যে চেখদের দেশে, বিশেষ ক'রে পশ্চিম-অংশে, জরমানরা এসে খুব উপনিবেশ স্থাপন করে, পশ্চিম চেখো-শ্লোবাকিয়া যেন জরমানিরই অংশ হ'য়ে দাঁড়ায়। এখন চেখো-শ্লোবেকিয়া রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে চেখ আর শ্লোবাক জাতীয় লোক হ'চ্ছে পঁচাশী লাখ, আর জরমান হবে পঁয়ত্রিশ লাখের উপর। এই জরমানেরা এখন মহাযুদ্ধের পরে চেখদের শাসন মেনে নিয়েছে—তবে কতকগুলি শর্ত্তে। যদিও এরা দেশের প্রধান ভাষা ব'লে চেখ শিখ্‌বে, তথাপি এদের জন্য পৃথক্ জরমান ইস্কুল থাকবে, জরমান সংস্কৃতি-গত জীবন এরা ছাড়্‌বে না, এদেরকে পুরোপুরি ভাষায় আর অন্য বিষয়ে চেখ ক'রে নেবার কোনও চেষ্টা করা হবে না। প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ে জরমানদের প্রাধান্য আগে ছিল, সেটা এরা ছাড়্‌তে চায় না; অথচ চেখেরা চায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চেখ প্রাধান্যই হবে। তাই আপোষ হ'য়েছে—প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে—প্রাগের জরমান বিশ্ববিদ্যালয়, আর চেখ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে রাজা কার্লের নাম বিশেষ ভাবে এই চেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত করা হ'য়েছে। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভাষা যথাক্রমে জরমান আর

প্রাগ্—Narodni divadlo (জাতীয় নাট্যশালা)

চেখ। জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন জ্ঞানে প্রবীণ আর বয়সে বৃদ্ধ বিখ্যাত পণ্ডিত Winternitz ভিন্‌ট্যরনিট্‌স্। ইনি প্রথম ভারতে আসেন, বিশ্বভারতীতে, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে; বছর দুই ভারতে কাটিয়ে যান। ভিন্‌ট্যরনিট্‌সের তিন খণ্ডে লেখা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত আর পালি-প্রাকৃত সাহিত্যের সম্বন্ধে এক প্রামাণিক বই। এদেশে অবস্থানকালে এঁর সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প পরিচয় হ'য়েছিল; ইনি দেশে ফিরে যাবার পরে, বাঙলা-ভাষার ইতিহাস নিয়ে লেখা আমার বই বা'র হয়, সেই বই এঁর কাছে যায়, তখন ইনি আমার এই সামান্য কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। অধ্যাপক লেস্‌নি হ'চ্ছেন চেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, বাঙ্‌লা আর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। অধ্যাপক লেস্‌নিও ভারতবর্ষে আসেন, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করেন; ইনি দুবার ভারতে আসেন। লেস্‌নির সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হ'য়েছিল। লেস্‌নি শান্তি-নিকেতনে অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙলা পাঠ আর অনুবাদ শুনতেন, সংস্কৃত জানা থাকায় বাঙলা অনেকটা আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে, তিনি রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা"-র একটা চেখ অনুবাদ মূল বাঙলা থেকে ক'রে প্রকাশ করেন ("লিপিকা"-র ইংরেজী অনুবাদ বা'র হয় নি)। লেস্‌নি খুব উচ্চ বংশের ছেলে, আর সৌজন্যের অবতার। প্রাগে যে দুটো দিন ছিলুম, যেন লেস্‌নিরই অতিথি হ'য়ে ছিলুম—এমনিই যত্ন ক'রেছিলেন।

ট্রেন প্রাগে পঁউছুতে, ষ্টেশনে লেস্‌নিকে দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল—যেন কত প্রিয় বন্ধু, বহুদিন পরে দেখা হ'ল, এইভাবে আমায় গ্রহণ ক'রলেন। কুশল-পরিপৃচ্ছা আর শান্তিনিকেতনের বন্ধুদের, রবীন্দ্রনাথের, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমার জন্য হোটেল ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, সেখানে ট্যাক্সি ক'রে আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। Vaclavske Namesti" বাৎস্‌লাব্‌স্কে নামেস্তি" নামে বড় রাস্তায় এই হোটেলটা, নাম হোটেল য়ুলিশ্ Hotel Iulish; খুব দামী হোটেল নয়—দৈনন্দিন ঘরের ভাড়া ৪০ ক্রাউন, ইংরেজী প্রায় সাত শিলিং। খাওয়া দাওয়া ইচ্ছামত, হোটেলের রেস্তোরাঁয়, অথবা বাইরে।

প্রাগ্ শহর, চেখেরা ব'লে Praha প্রাহা; চেখ ভাষার সুপ্-তিঙ্ বা প্রত্যয় যোগে ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্তন হয়—'প্রাহাতে' বা 'প্রাগে'। (in Prague) হ'য়ে যায় V Prazhe. বিকালে পড়ন্ত রোদ্দুরে—আর সারাদিন রেলে ভ্রমণের ক্লান্তির জন্যও বোধ হয়,—প্রথম দর্শনে শহরটা তেমন সুন্দর লাগ্‌ল না—বুদা-পেশ্‌ৎ-এর পরে একটু নিষ্প্রভ, একটু মলিন ব'লে মনে হ'ল। তবে প্রাগের বাস্তু সৌন্দর্য্য সহজেই লক্ষণীয় ব'লে মনে হ'ল। নানা ধরণের বাড়ী—বিভিন্ন যুগের আর বিভিন্ন প্রকারের শিল্প-রীতি ধ'রে তৈরী; বাস্তু-বিষয়ক বৈচিত্র্য প্রাগে যেন ভিয়েনা আর বুদা-পেশৎ-এর চেয়ে বেশী ব'লে মনে হ'ল। গথিক, রেণেসাঁস, বারোক এই তিন রীতির পুরাতন বাড়ীর ছড়াছড়ি;—এ ছাড়া লক্ষণীয় হ'চ্ছে, আধুনিক পরিকল্পনার সব বাড়ী—কেবল কতকগুলি সরল রেখার আর প্রচুর কাচের সমাবেশই এই সকল বাড়ীর সৌন্দর্য্যের বোধ হয় মূল কথা।

অধ্যাপক লেস্‌নি হোটেলে পৌঁছে দিয়ে, একটু গোছগাছ ক'রে নিয়ে ব'স্‌তে আর ঘরে বিশ্রাম ক'রতে আমায় রেখে গেলেন। রাত্রে তিনি তাঁর ক্লাবে নিয়ে যাবেন—সেখানেই তাঁর অতিথি-স্বরূপ সায়মাশ হবে। চারতলায় ঘর, লিফ্‌টে উঠ্‌তে হয়। প্রতি ঘরের লাগাও পৃথক্ স্নানের ঘর। গরম জলে বেশ ক'রে স্নান ক'রে, সমস্ত দিনব্যাপী রেল-যাত্রার অবসাদ দূর ক'রে নেওয়া গেল। হোটেলের কামরা থেকে চারিদিকে কেবল বাড়ীর অরণ্য—বেশীর ভাগই হ'চ্ছে অষ্টাদশ শতকের বারোক্-রীতির বাড়ী।

হোটেলের পোর্টার একখানা ছোটো গাইড-বই দিলে, তাতে দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা আছে, আর আছে সব চেয়ে যেটা বেশী কাজের—শহরের একটা ম্যাপ। এইটি নিয়ে একটু টহল দিতে বেরিয়ে পড়া গেল। শহরের মধ্যভাগে, ব্যাঙ্ক আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে হোটেলটা। শহরটাতে জরমান সভ্যতার প্রভাব মজ্জায় মজ্জায় ঢুকেছে। ভিয়েনা আর বুদা-পেশ্‌ৎএর ভাব—সেই সাবেক ধরণের গির্জ্জা, রেনেসাঁস আর বারোক প্রাসাদ; উপরন্তু এখানে আধুনিক রীতিতে তৈরী, বাক্সর আকারের বহু বাড়ী—সরল রেখার মধ্যে কাচের চৌকো চৌকো জানালার বাহুল্য;—এই অভিনব
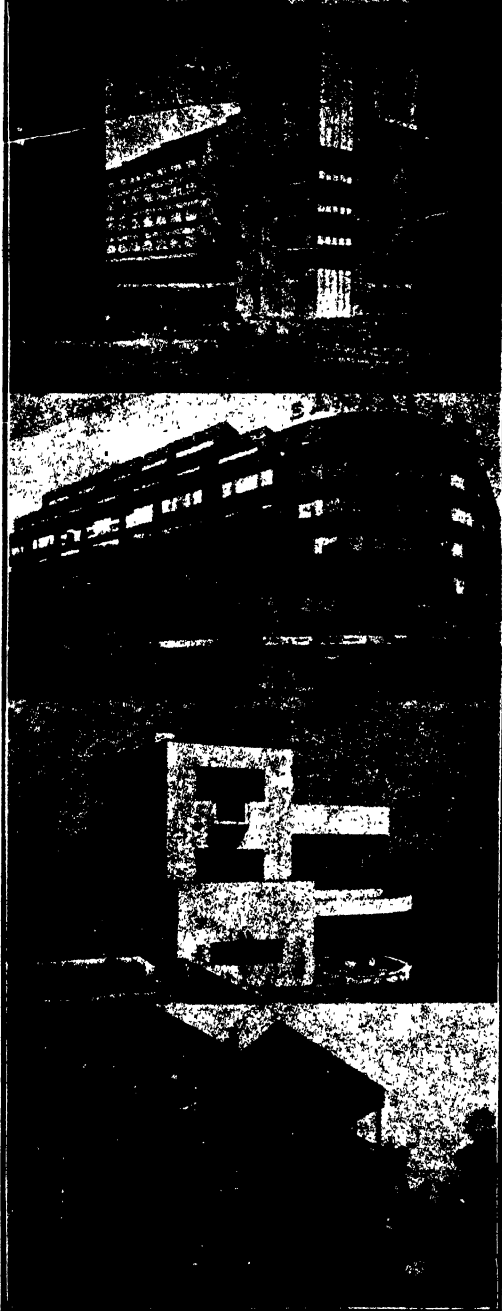
প্রাগ্—কতকগুলি আধুনিক বাড়ী

বাস্তু-রীতি, চেখোস্লোবাকিয়ার বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে হ'ল। আমাদের হোটেলের রাস্তাটী দোকানে ভরতি, বড় বড় বাড়ী, আপিস আর হোটেল; ট্রাম, মোটর; রাস্তাটী একদিকে শেষ হ'য়েছে একটী বিরাট গুম্বজওয়ালা ইমারতের সামনে; সেটী হ'চ্ছে চেখজাতির জাতীয় সংগ্রহশালা; বিরাট্ আকারের সুন্দর বাড়ীটী, তার সামনে রাস্তার তেমাথায় চেখেদের বিখ্যাত রাজা Vaclav বাৎস্লাব বা Wenceslas-এর অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি। দোকানের বড় বড় কাচের জানলার পিছনে যে সব জিনিসের পসার সাজানো র'য়েছে, তার মধ্যে চীনামাটি আর কাচের জিনিসের পসারই বেশী মনোহর লাগ্‌ল। চীনামাটির বাসন-কোসন তো আছেই; তা ছাড়া তর-বেতর পুঁতুল, মূর্ত্তি, মুখস। একটী চীনামাটির জিনিসের দোকানে, রঙীন চীনামাটিতে তৈরী মহাত্মা গান্ধীর এক অতি সুন্দর মূর্ত্তি দেখলুম—মাটির উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে মহাত্মাজী উপবিষ্ট,—মূর্ত্তিটী অতি সৌম্য, প্রশান্তভাব-ব্যঞ্জক; এটী চমৎকার লাগ্‌ল। চেখোস্লোবাকিয়া দেশের cut glass বা হাতে পল-তোলা নক্‌শা-কাটা মোটা কাচের জিনিস—নানা রকমের পাত্র, ঝাড়, ফানুস, ফুলদানী প্রভৃতি—বিশ্ব-বিখ্যাত। এক একটা নক্‌শাকাটা কাচের জিনিসের দোকানে যেন কাচ-শিল্প সংগ্রহশালা খুলে দিয়েছে,—রকমারি নক্‌শাওয়ালা কাচের উপর আর ভিতর থেকে আলো যেন ঠিকরে প'ড়ছে; প্রত্যেক জিনিসটী যেন একটী ক'রে বাছাই করা জিনিস। কাপড়-চোপড়, লেস, জরি, রকমারি বোতাম, আর জুতো—এইগুলির দোকানও খুব; এসব তৈরী করা হ'চ্ছে চেখজাতির অন্যতম কতকগুলি জাতীয় শিল্প। জুতো তৈরী করার ব্যাপারে চেখজাতীয় জুতার কারখানাওয়ালা Bat'a বা-ত্যা বা বাচার শস্তার জুতোর দোকান পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে প'ড়েছে—(নামটী ক'লকাতায় বিস্তর জুতার দোকানের উপর এখন দেখা যায়—মূল চেখ উচ্চারণ "বাটা" নয়) বাঙলা দেশেও এরা জুতোর কারখানা খুলেছে, এদেশ থেকে দু-চার জন বাঙালী ছেলেকে চেখোস্লোবাকিয়ায় ওদের বড় কারখানায় পাঠিয়ে দিয়ে, সেখানে চামড়া পাকানোর আর জুতো তৈরীর কাজ শিখিয়ে নিয়ে, কোন্নগরের এদের স্থাপিত কারখানায় তাদের কাজ দিচ্ছে; এই শিল্প-ব্যবসায়টীতে চেখজাতীয় লোকেরা খুব উন্নতি দেখিয়েছে

ঘুরতে ঘুরতে প্রাগ্-নগর যে নদীর ধারে অবস্থিত, সেই Vltava 'বল্তাবা' নদীর ধারে এসে পড়লুম। এই নদীকে জরমানরা বলে Moldau 'মোল্দাউ'। নদীটী Elb এল্ব্ নদীতে গিয়ে মিশেছে, প্রাগের উত্তরে। চেখভাষায় এখন সংস্কৃতের "ঋ, ৯" এই দুই স্বরবর্ণের মূল

প্রাগ—কার্ল-সাঁকোর একটী মূর্ত্তি-সমূহ
(শিল্পী মাথিয়াস্ ব্রাউন্ কর্ত্তৃক ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত)

ধ্বনি বিদ্যমান, এরা খালি r, l দিয়ে এই দুই ধ্বনি লেখে; Vltava এই নামে, ৯-র ধ্বনি শোনা যায়। Vltava নদী দেখলুম,—বর্ষার গঙ্গার মত, বাদামি ঘোলাটে জল, স্রোত বিশেষ নেই। কাছাকাছি অনেকগুলি সাঁকো। নদী খুব চওড়া নয়। নদীর ধারের সড়কে বড় বড় বাড়ী, বাগিচা, লোকের বসবার জায়গা। প্রাগের বিখ্যাত চেখজাতির জাতীয় নাট্যশালার বাড়ীটী নদীর ধারে, একটী সাঁকোর পাশে। নদীর ধারের রাস্তায় তেমন ভীড় দেখলুম না—যদিও তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

সন্ধ্যার পরে অধ্যাপক লেস্নি তাঁদের এক ক্লাবে নিয়ে গেলেন—এই ক্লাবটী আমাদের হোটেলের কাছেই। ক্লাবের নামটী ভুলে গিয়েছি—এটী হ'চ্ছে প্রাগের সামাজিকতার সবচেয়ে বড় আর প্রতিষ্ঠাপন্ন কেন্দ্র। সামাজিক জীবনে এই সব ক্লাবের প্রবর্ত্তন হ'চ্ছে ইংরেজ জাতের এক কৃতিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। সন্ধ্যার পরে, সারাদিন খেটে-খুটে মানুষ যখন বিশ্রাম আর বিনোদ চায়, তখন কোন একটা আড্ডায় গিয়ে সমধর্ম্মা বা সম-মনোভাবের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, গল্প করা, তাস-পাশা খেলা, খাওয়া-দাওয়া করা—মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা ইংরেজের তৈরী ক্লাবে যুগোপযোগী মূর্ত্তি ধ'রেছে। ক্লাব বা আড্ডাঘর অবশ্য সব দেশের সব জাতের লোকের মধ্যেই আছে; কিন্তু ইংরেজ সব বিষয়ে কায়দা-কানুন ক'রে একটা নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে চলে,—তাই আড্ডা দেওয়ার এই সাধারণ রীতি ইংরেজের হাতে একটা নোতুন রূপ নিয়েছে। আর এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ইংরেজ-মার্কা ক্লাবের চল্তি। খেলা গল্প গান বাজনা দ্বারা চিত্তবিনোদনের সঙ্গে-সঙ্গে, গভীর বিষয়ে আলাপ আলোচনা, একটু পড়াশুনা, প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের প্রণোদন বা প্রসাধনের চেষ্টাও থাকে; আর পান-ভোজনের দ্বারা দেহের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা থাকে। প্রাগে ক্লাব-জীবন ইংলাণ্ডের মত অতটা প্রসার লাভ করে নি; ইংলাণ্ডের উচ্চ শ্রেণীর লোক, আর উচ্চ আর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, প্রত্যেকেরই একটী ক'রে ক্লাব আছে। শিল্পী, লেখক, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক, ধর্ম্মজীবী, এদের সব ভিন্ন-ভিন্ন ক্লাব। বাঙলা দেশেও ক্লাব-জীবন তেমন প্রসার লাভ করে নি; চাঁদা দিয়ে ভালো ক্লাব বাঙলা দেশে চালানো যায় না। ঢালা চায়ের আর পান-তামাকের যোগাড় যেখানে আছে, এমন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বৈঠকখানাই আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের প্রধান আড্ডা বা ক্লাব। নাট্যাভিনয় আর পাঠাগারকে কেন্দ্র ক'রে কখনও কখনও ক্লাব-জীবনের আভাস বাঙলা-দেশে কোথাও কোথাও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত অর্থশালী ইংরেজের ক্লাবের মত

জিনিস আমাদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠা কঠিন। এই জিনিসটী বেশ রীতিমত ভাবে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা আমাদের দেশে অনেকেই ক'রেছেন, কিন্তু কোথাও তেমন জ'মে ওঠে নি। অর্থকষ্ট, অবসাদ, আলস্য, আর কুণো হ'য়ে থাকবার প্রবৃত্তি, এইগুলি এদেশে সব কাজের অন্তরায় ব'লে মনে হয়। প্রাগে ক্লাব-জীবন শিক্ষিত আর অভিজাত লোকেদের মধ্যে আস্তে-আস্তে একটা স্থান ক'রে নিচ্ছে। অধ্যাপক লেস্‌নিদের ক্লাবটী শুন্‌লুম প্রাগের অভিজাত আর উচ্চ-শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা স্থাপিত।

অধ্যাপক লেস্‌নিদের ক্লাবটী চমৎকার একটী প্রাসাদ নিয়ে অবস্থিত। মেয়েরাও এখানে আসেন। বড় বড় ঘর—লেস্‌নি আমাকে নিয়ে ঘুরে সব দেখালেন। সভা-সমিতির ঘর, নাচের ঘর, চিঠিপত্র লেখবার ঘর, পড়বার ঘর, বিলিয়ার্ড, তাস প্রভৃতি খেলবার ঘর, ভোজনাগার। বাদ্‌শাহী ব্যাপার। অধ্যাপক লেস্‌নি অনেকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে' দিলেন। ফরাসী আর ইংরেজীতে আলাপ হ'ল। পরে দেখলুম, চেখেদের মধ্যে জরমান ভাষার প্রতি বিশেষ একটা বিরোধিতা এসেছে—এটা মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনে ; শিক্ষা-দীক্ষার দিকে ততটা নয়, কারণ সেখানে জরমান না হ'লে চলে না। চেখেরা একটু অতিরিক্ত সামাজিক। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে, খুব ঘটা ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুশল-প্রশ্ন করা আর নানা রকমের বাঁধা শিষ্টাচার করা এদের মধ্যে দস্তর ব'লে মনে হ'ল। লেস্‌নির একটীমাত্র সন্তান—এক পুত্র। ছেলেটী বছর কুড়ি বয়সের হবে,—দীর্ঘকায় ছিপ্‌ছিপে চেহারার সুদর্শন যুবক, ডাক্তারি প'ড়ছে। এই ক্লাবের শান্ত আর উচ্চভাবের আব-হাওয়ার মধ্যে ব'সে অধ্যাপক লেস্‌নি আর তাঁর দু'চার জন বন্ধুর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করা গেল। অধ্যাপক লেস্‌নি তার পরে ক্লাবের রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। এইরূপে সন্ধ্যা আর প্রথম রাত্রি বেশ আনন্দে কাটিয়ে', প্রায় সাড়ে এগারোটায় হোটেলে ফিরলুম।

দু'দিন ছিলুম প্রাগে। তখন ইউনিভার্সিটি বন্ধ। শহরে রোমান-কাথলিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হবে, তার জন্য একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। প্রাগের লোক-সংখ্যা হ'চ্ছে প্রায় নয় লাখের কাছাকাছি। এর মধ্যে শতকরা ৬০-এর কাছাকাছি হ'চ্ছে রোমান কাথলিক ; শতকরা ৪ প্রটেস্‌টাণ্ট, শতকরা ১৬ চেখোস্লোবাক 'জাতীয়' সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, শতকরা ৪ ইহুদী, আর শতকরা প্রায় ১৫ নিজেদের ধর্ম্মহীন বা অসম্প্রদায়িক ব'লে ঘোষণা করে। আগে চেখেদের মধ্যে শতকরা ৯২ জন রোমান-কাথলিক ছিল। প্রাগ্‌-শহরে যেখানে সেখানে গির্জার ছড়াছড়ি। প্রাগে মিউজিয়ম অনেকগুলি আছে, সাধারণের দর্শনের জন্য অনেকগুলি প্রাসাদও উন্মুক্ত থাকে। আমি দুদিনে আর কত দেখবো ? এদের জাতীয় সংগ্রহশালা, আর শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহশালা, এই দুটো বেশ ক'রে দেখা গেল। জাতীয় সংগ্রহশালায় চেখজাতীয় কীর্ত্তিমান পুরুষদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে—আর প্রাচীন আর আধুনিক ঐতিহাসিক দ্রব্যসম্ভারে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, খুবই লক্ষণীয়। এই দুটী মিউজিয়ম দেখা ছাড়া, বাকী সময়টী ঘুরে ঘুরে শহর দেখে বেড়ানো গেল।

প্রাগ্‌-শহর খুব প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চেখজাতীয় শ্লাবেরা এখানে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়। দশম শতকে শহরের দুর্গ নির্ম্মিত হয়—ক্রমে ক্রমে শহরের বৃদ্ধি হ'তে থাকে। চতুর্দ্দশ শতক থেকে এর খুব ফাঁপাও হয়—বহু গির্জা আর প্রাসাদ ক্রমে এই নগরকে মধ্য-ইউরোপের প্রধান নগর ক'রে তোলে। এই সময়ের মধ্যে শহরটী জরমান ছাঁচে তৈরী হয়। Vltava নদীর বাঁ ধারে পাহাড়ে' অঞ্চলে Hradcany 'হ্রাদ্‌চানি' অঞ্চলের গড় আর রাজবাটী, দক্ষিণ ধারে Stare Mesto 'স্তারে মেস্তো' বা পুরাতন শহর—এ সবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগ্‌ছিল। এই শহরের গলিতে আর রাস্তায় আর প্রাসাদে, গত হাজার বছরের মধ্য-ইউরোপের ইতিহাস জড়িত। সে ইতিহাস খুঁটিনাটির সঙ্গে আমি পড়ি নি, তার মোটা কথা দু'চারটে জানি মাত্র—সুতরাং শহরের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু পুরাতন শহর, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, 'টাউন-হল', পার্লামেণ্ট, নানা প্রাসাদ,—বাস্তুরীতির সৌন্দর্য্য দেখে মনটা খুবই খুশী হ'চ্ছিল। Vitava নদীর ধারে দাঁড়িয়ে' বুদা-পেশ্‌ৎ-এর কথা মনে হয় ; কিন্তু প্রাগের ব্‌ল্‌তাবার, বুদা-পেশ্‌ৎ-এর দানুবের সে উদার বিস্তৃতি নেই। বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সৌধসৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সে অপূর্ব্ব সমাবেশ নেই। প্রাগে ব্‌ল্‌তাবার উপরে প্রাগে শুটী সাঁকো

সাঁকো আছে। কতকগুলি সাঁকো প্রাচীন পোল; এর মধ্যে একটীর নাম Most Karlov 'মোস্ত্ কার্লোভ' বা

Hlávka হ্লাব্কা-সাঁকোতে আধুনিক মূর্ত্তি
য়ান শ্তুর্সা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "শ্রম" ও "জীবন"

কার্ল-সাঁকো। এটীতে আল্সের ধারে ধারে কতকগুলি বারোক-রীতির খ্রীষ্টান মূর্ত্তি আছে। আর একটা নোতুন পোল—Most Hlavkuv-এর আল্সের গায়ে কতকগুলি সুন্দর আধুনিক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে। ব্ল্তাবা নদীর মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ আছে—পারিসের সেন-নদীর আর বুদাপেশ্ৎ-এর দানুবের দ্বীপের মত—এগুলিতে শহরের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বেড়েছে।

প্রাগের মত শহর ভাল ক'রে দেখতে অনেকদিন লাগে, আর মধ্য ইউরোপের ইতিহাস ভাল ক'রে জানতে হয়। তবুও, দুদিনে যতটা সম্ভব দেখেছি। আর অধ্যাপক লেস্নির সৌজন্যে তাঁর বাড়ীতে আর অন্যত্র দুই চারি জন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল, চেখেদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটু-আধটু চাক্ষুষ পরিচয়ও ঘটেছিল। সে সম্বন্ধে আগামীবারে লিখ্বো।

স্মৃতি

শ্রীঅমিয়া সরকার

স্মৃতিময়ী এ ধরণী তারে ভুলে গেছে জানি,
আমি যারে বেসেছিনু ভালো,
সাঁঝের তারকাটিরে হারালো জ্যোৎস্নার ভিড়ে,
দিবালোকে প্রদীপের আলো।

শতাব্দীর ইতিহাস একটি সুদীর্ঘ শ্বাস
জমা করে জনতার বুকে,
কে তারে রাখিবে মনে, গেলে মোর গৃহকোণে
যার খেলা নিমেষেই চুকে?

আমার মাধবীলতা ঝরায়েছে ফুলপাতা
অরণ্যের মত্ত বিস্মরণে,
মোর মরু-চেতনায় রিক্ততার বেদনায়
আমি শুধু রাখিয়াছি মনে।

পেয়েছি কি পাই নাই আজো তা জানিতে চাই,
ঘাঁটি তাই তপ্ত ধূলি-রেণু,
হয় তো আবার এই মরুতেই পাবো সেই
তৃণ যারে ভালোবেসেছিনু।

কয়েকটি ভারতীয় বীমা কোম্পানী

তত্ত্বসন্ধানী

আমরা যে কয়েকটি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর হিসাব-পত্র পাইয়াছি এই সংখ্যায় তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। আজ ভারতীয় বীমার অগ্রগতির দিনে ভারতীয় বীমার প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আলোচনা করা—তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করান—প্রত্যেক সাময়িকপত্রেরই অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

আশা করি ভবিষ্যতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রে অ-ভারতীয় কোম্পানীর সহিত প্রতি-যোগিতায় যে অযথা শক্তি ক্ষয় করিতেছেন তৎসম্পর্কে অবহিত হইয়া সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ের বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে আমাদের সহিত যোগাযোগ রাখিবেন। আমরা একমাত্র ভারতীয় কোম্পানীর প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য, তাহার দোষগুণের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিব স্থির করিয়া বীমা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। অতএব অন্যান্য বীমা কোম্পানীর সহযোগিতা পাইলে আমরা তাঁহাদের বিষয় বিশদ আলোচনা করিতে প্রস্তুত থাকিব।

সর্ব্বপুরাতন ভারতীয় কোম্পানী বোম্বে মিউচুয়াল (১৮৭১)

বর্ত্তমানে ভারতীয় বীমা কোম্পানী অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে "স্বদেশী" বীমা কোম্পানী বলিতে বোম্বে মিউচুয়ালকে (Bombay Mutual) বুঝায়। সন ১৮৭১ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়া দীর্ঘকাল ইহার কাজ-কর্ম্ম একই ভাবে চলিতে থাকে। এই কোম্পানীর প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে সন ১৯১৯ সাল হইতে এবং গত ১০।১২ বৎসর মধ্যে নূতন কাজের পরিমাণ খুবই বাড়িয়াছে। বোম্বাইএর এই কোম্পানীর বাঙ্গালাতে ঠিক এজেন্সি খোলা হয় ১৯১৮ সালে। এই চিফ-এজেন্সির স্বত্বাধিকারী এখন দস্তিদার এণ্ড সন্স।

বোম্বে মিউচুয়ালের যেরূপ নিম্ন চাঁদার হার, সেই অনুপাতে ঘোষিত 'বোনাস'এর হার কিছু বেশী। তবু 'বোনাস'এর প্রতি যাহাদের আকর্ষণ আছে এরূপ গ্রাহকের সংখ্যা আমাদের দেশে বেশী। সেই কারণেই বোধ হয় এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উচ্চহারে বোনাস ঘোষণার দিকে এই প্রকার মনোযোগ দিয়াছেন।

ভারতের সর্ব্ববৃহৎ কোম্পানী—ওরিয়েণ্টাল

ইহারই তিন বৎসর পরে অর্থাৎ সন ১৮৭৪ সালে খোলা হয়, বর্ত্তমানের সর্ব্ববৃহৎ ভারতীয় কোম্পানী—"ওরিয়েণ্টাল" গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি।

ইহাও বোম্বাই সহরেই স্থাপিত হয়। বিগত ৬২ বৎসর এই কোম্পানীর কার্য্য প্রসারের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইহার ক্রমোন্নতি সত্যই বিস্ময়কর। বর্ত্তমানে ভারতীয় কোম্পানী সমূহের আকার প্রকার বিচার করিতে গেলে—"ওরিয়েণ্টাল"কে এক দিকে—অন্য দিকে অপরাপর সমস্ত কোম্পানীগুলিকে ধরিতে হয়।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে—তাহাতে নূতন বীমা হইয়াছে ৮,৯০ লক্ষ টাকার, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে নূতন বীমার পরিমাণ ছিল ৭,৬২,৪২,৭৬১ টাকার। কোম্পানীর পক্ষে এই প্রকার কার্য্যবৃদ্ধি সত্যই অসামান্য সাফল্যের পরিচায়ক। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ওরিয়েণ্টাল ১০ম স্থান অধিকার করিয়া আছে, প্রথম ৯টি কোম্পানীর মধ্যে ৫টি বৃটিশ, ২ কানাডিয়ান এবং অপর দুটি অষ্ট্রেলিয়ান।

১৯৩৪ সালের প্রিমিয়ামের আয় ছিল—২৬১½ লক্ষ টাকা—এবার উহা আরো ২৬¾ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।—বাতিল বীমার হার খুবই কম আছে।

সুদ অর্জ্জনের পরিমাণও ৫½ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৭ লক্ষ টাকা এবং ইহার গড়পড়তা হার ৫% রক্ষিত হইয়াছে।

বীমার দায়ের পরিমাণ ৬½ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গত বৎসর ৫৫½ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে; ইহার জন্য কোয়েটার ভূমিকম্পজনিত আকস্মিক দুর্ঘটনাই দায়ী বলিয়া

কোম্পানীর সভাপতি স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কোম্পানীর ব্যয়ের হারও গত বৎসরের ২৩·১ স্থানে এবার কমিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে ২২·৪—ইহার মধ্যে কোম্পানীর হীরক-জয়ন্তীর ব্যয়ও ধরা আছে।

এই প্রকার সুচারুভাবে কার্য্য পরিচালনার ফলে—কোম্পানীর তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৭৭ কোটি টাকার। অর্থাৎ বিগত বর্ষ অপেক্ষা তহবিল ১½ কোটি টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে 'ওরিয়েণ্টাল'এর আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থার সারবত্তা ও স্বচ্ছলতা বাস্তবিকই অভাবনীয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বপুরাতন কোম্পানী—হিন্দু মিউচুয়াল

আরও ১৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সন ১৮৯১ সালে সিমলা শহরে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান হিন্দু মিউচুয়ালের জন্ম হয়। সমাজসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কোম্পানী দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল অতি নিম্নহারে চাঁদা গ্রহণ করিয়া পরিচালিত হইতে থাকে। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনও কার্য্যেরই কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার প্রকৃত উন্নতি অর্থাৎ কার্য্য-প্রসারের চেষ্টা আরম্ভ হয় সন ১৯১২ সাল হইতে। এই কোম্পানীর চাঁদার হার নিম্নতম এবং এখানে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও জাতির জীবনবীমা গ্রহণ করা হয় না। কার্য্য-বিস্তারের পক্ষে এই জাতিগত বাধা থাকিলেও কয়েক বৎসর হইতে বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের কার্য্য পরিচালনায়—এই কোম্পানীর কার্য্য বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকার উপরে হইতেছে। মিউচুয়াল কোম্পানীর সকল সুবিধা এখানে আছে। সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর উপর কোম্পানীর নিজের বাড়ী তৈয়ার হইতেছে—কয়েক মাস পরেই সেখানে অফিস স্থানান্তরিত হইবে।

১৯৩৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় যে উক্ত কোম্পানীর কার্য্য শতকরা ১৫ ভাগ গত বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানতঃ গুজরাট ও বিহারে এই বৃদ্ধি দেখা যায়।

চলিত বৎসরে ১০৪৪খানি প্রস্তাব আসে ও তাহার মূল্য ১২,৭১,৭,৫০৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ৯২১টি বীমার প্রস্তাব আসিয়াছিল ও তাহার মূল্য ১১,১১,০০০৲ টাকা ছিল। উক্ত বৎসরে ৮৯৭টা পলিসির মোট মূল্য ছিল ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ৩৮১১০৷৶১১ দাবীর টাকা বাকী ছিল ; ঐ বৎসরে ৭৪৭৫৫ টাকার দাবী হইয়াছিল সুতরাং মোট ১১২৮৬৫৷৶১১ টাকা চলিত বৎসরে দিতে হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ৩১এ ডিসেম্বর ৩০৮২৪।৴৫ দাবী দিতে বাকী ছিল। ঐ বৎসর ৭৪০৪১৷৷৶৮ দাবী দেওয়া হইয়াছে।

ঐ বৎসরে ৩৬১৬টি পলিসি চলিত ছিল ও তাহার মূল্য ছিল ৪৩৭৬৫৩৮৷৷৶৮ টাকা।

কোম্পানীর লগ্নী টাকার মধ্যে কারেন্সী কণ্ট্রোলারের নিকট ২ লক্ষ টাকা, বাঙ্গালার অফিসিয়াল ট্রাষ্টির নিকট ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১ শত টাকা ও আফিস কর্ত্তৃক নানা স্থানে বিশেষ নিরাপদভাবে লগ্নী আছে ৬ লক্ষ সাড়ে ৮০ হাজার টাকা।

চলতি বৎসরে বীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৭০৭৮০০৷৷৶১ টাকা।

হিন্দু মিউচুয়াল ৪৫ বৎসর কাল প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছে। এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সুপরিচালিত সুবৃহৎ কোম্পানী "এম্পায়ার অফ্ ইণ্ডিয়া" (বোম্বে—১৮৯৬)

সন ১৮৯২—১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত কয়েকটি ছোট ছোট কোম্পানী স্থাপিত হয়। কিন্তু সন ১৮৯৬ সালে বোম্বাই সহরে—বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সুবৃহৎ কোম্পানী 'এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া' (Empire of India) স্থাপিত হয়। ওরিয়েণ্টাল বিদেশী কোম্পানীর আদর্শে তাহার চাঁদার হার বেশী ধার্য্য করেন, কিন্তু এম্পায়ারএর পরিচালকবর্গ ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের উপযোগী নিম্ন হারে চাঁদা ধার্য্য করিয়া কাজ আরম্ভ করেন। এই কোম্পানীর ব্যয়ের প্রতি পরিচালকগণের বিচক্ষণ দৃষ্টি আছে।

এই কোম্পানীর প্রথম অবস্থা হইতেই প্রায় বাঙ্গালা
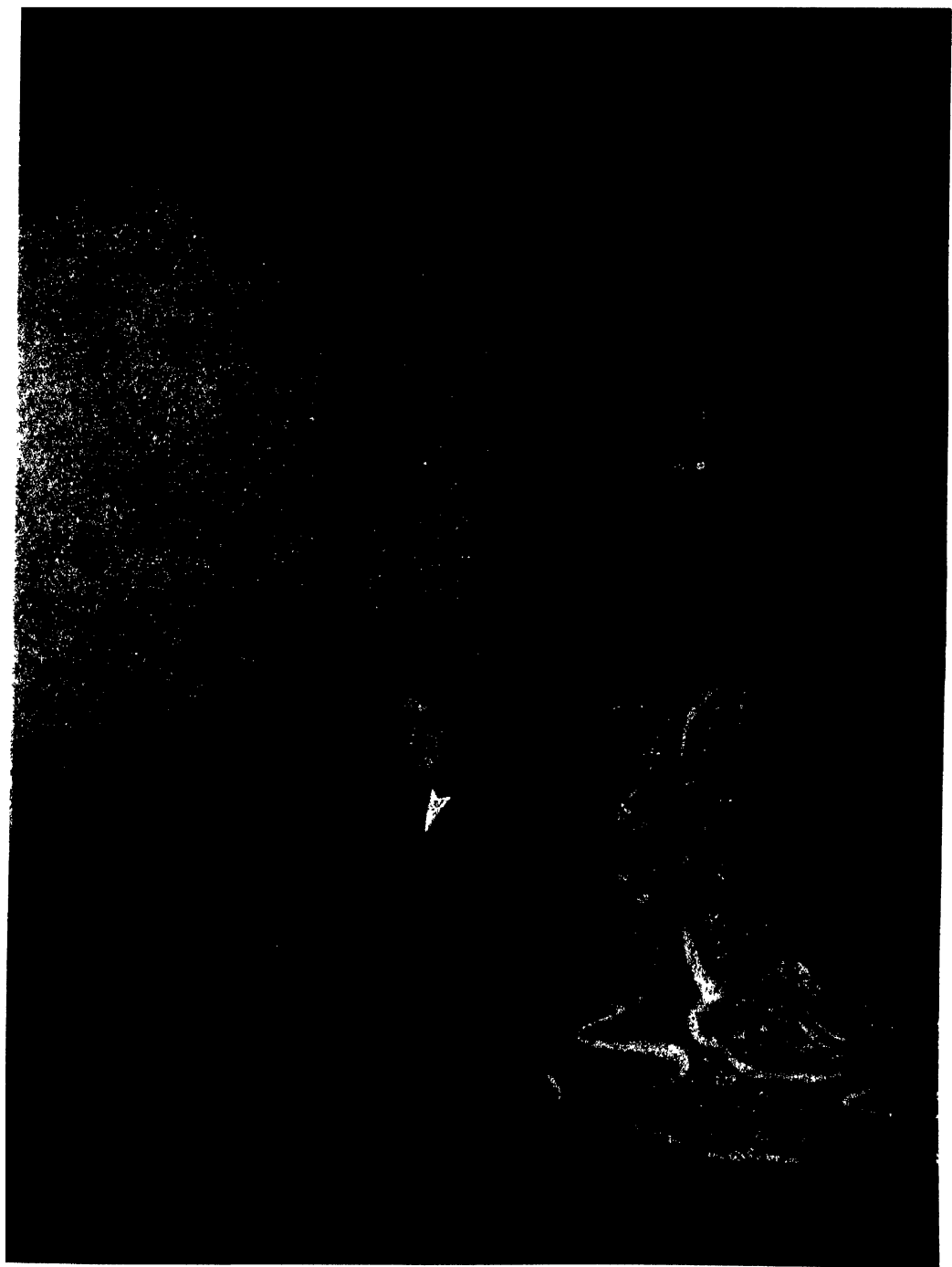
দেশের কাজের ভার ন্যস্ত হয় সুপ্রসিদ্ধ ডি, এম, দাস এণ্ড সন্সের উপর। বাঙ্গালাদেশের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিবার দায়িত্ব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ম্মকুশল বীমাবিদ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনের। তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেনের সাহচর্য্যে বাঙ্গালাদেশের ব্রাঞ্চ-অফিসকে হেড্ অফিসের সমান করিয়া তুলিয়াছেন।

সন ১৯৩৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর যে বৎসর শেষ হইয়াছে—তাহার বিবরণী হইতে দেখা যায় যে গত বৎসর কোম্পানীর পক্ষে নানা কারণে বিশেষ স্মরণীয়।

নূতন বীমার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৯,৫০,০০০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে—১,৫৭,০০,০০০৲ টাকা।

ইতিমধ্যে কোম্পানী ইন্‌টারিম বা মধ্যবর্ত্তী বোনাস হিসাবে হাজার করা বাৎসরিক লাভ সহিত বীমাপত্রের উপর আজীবন বীমায় ১৮৲ ও মেয়াদী বীমায় ১৬৲ ঘোষণা করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে কোম্পানীর "ভ্যালুয়েশন" হইবে তাহাতে বীমাকারিগণ যে বিশেষ সন্তোষজনক লাভের অধিকারী হইবেন তাহা কোম্পানীর আর্থিক সঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসেই বলা যায়। কোম্পানীর লগ্নী ব্যাপার নিরাপদ ও লাভজনক। অন্যান্য সংরক্ষিত (Reserve) ভাণ্ডার সমেত কোম্পানীর বীমা-তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৪,৪৪,৫০,০০০৲ টাকা এবং মোট সংস্থান দাঁড়াইয়াছে ৪,৬৪,০০,০০০৲ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুজনিত বীমার দাবী হইয়াছে—১৪,৩৬,০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে গত বৎসরের ৩১শে মে তারিখের কোয়েটার ভূমিকম্প সংক্রান্ত মৃত্যুর জন্যই দিতে হইয়াছে ২,৮৫,০০০৲ টাকা। জীবনবীমা যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় কতখানি সাহায্য করিতে পারে তাহা ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

বীমাকারিগণের সাময়িক অভাব নিবারণার্থ কোম্পানী বীমাপত্রের উপর ৬৫,০০,০০০৲ টাকা ধার দিয়াছেন। কোম্পানীর চাঁদার হারের ন্যায় সুদের হারও বীমাকারীর সুবিধার জন্য কম ধার্য্য আছে।

৩৯ বৎসর পূর্ব্বে যে কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল তাহার সতর্ক অভিযান যে ক্রমশঃ জয়যাত্রায় পরিণত হইতে চলিয়াছে ইহা খুবই আশার ও প্রশংসার কথা।

ভারত ইন্‌সিওরেন্স (লাহোর—১৮৯৬)

একই সময়ে সন ১৮৯৬ সালে লাহোরে অদ্ভুতকর্ম্মা লালা হরকিষণলালের উদ্যোগে "ভারত ইন্‌সিওরেন্স"এর প্রতিষ্ঠা হয়। হরকিষণলালের কর্ম্মকুশলতার গুণে "ভারত" অনতিকালমধ্যেই আকারে ও প্রভাবে ভারতের মধ্যে একটি সুবৃহৎ কোম্পানীতে পরিণত হয়। লালা হরকিষণলালের সহিত মামলার ফলে—কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ভারতের মত সুবৃহৎ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতির দায়িত্ব যাহাদের হাতে আসিল—শ্রীযুক্ত ডালমিয়া, দেবীপ্রসাদ খৈতান প্রমুখ ভারতের সেই কর্ম্মপরিচালকগণ সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত এবং সাধুতা ও কর্ম্মকুশলতার জন্য তাঁহারা ভারতবর্ষের ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

ভারতের বীমা তহবিলের পরিমাণ প্রায়—১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ইতিপূর্ব্বে ৪টি পঞ্চবার্ষিকী হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সালের হিসাব-নিকাশে দেখা যায় ১২,৩০,৬৯৩৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল—তাহা হইতে আজীবন বীমায় ২৫৲ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় ২০৲ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছিল এবং মধ্যবর্ত্তী Intermediate বোনাসও ১৭॥০ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। নব-সংগঠিত ব্যবস্থাপকের হাতে ভারতের উন্নতির পথ বিঘ্নহীন হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া—মাদ্রাজ ১৯০৬

এই বৎসর মাদ্রাজের এই সর্ব্ববৃহৎ বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার—মিঃ এম্, কে, শ্রীনিবাসম্ বীমাজগতে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে কলিকাতা অফিসের চিফ্ এজেণ্ট—মিঃ এম্, দত্ত অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। অল্প খরচে এই কোম্পানী যেভাবে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসা ও কৃতিত্বের বিষয়। কোম্পানীর বীমা তহবিলের পরিমাণ ৬০ লক্ষের উপর—সন ১৯৩১ সালে যে পঞ্চবার্ষিকী হিসাব-নিকাশ (Valuation) হয় তাহাতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৬,০৯,১৬৭৲

টাকা। এই টাকা হইতে উপযুক্ত "রিজার্ভ" (Reserve) ও অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়ার পর—বাৎসরিক আজীবন বীমার উপর ২২৷৷০ এবং মেয়াদীবীমার উপর—১৮৲ টাকা "বোনাস"—ঘোষণা করা হয়।

কোম্পানীর পরিচালন-নীতি বর্ত্তমানে বীমাকারিগণের অনুকূলে সুসংস্কৃত হইয়াছে বলা যায়। পরিচালকমণ্ডলী (Directors) নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ড (Trust fund) গঠিত হইয়াছে। এই সব কারণে কোম্পানীর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; তাহার ফলে—দেখিতে পাই কোম্পানীর চলতি বীমার পরিমাণ (১৯৩৩ ডিসেম্বর নাগাদ) ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৯২ হাজারের উপর।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর উপর এই কোম্পানীর কলিকাতা-অফিসের জন্ত প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর দান

কিন্তু সন ১৯০৬—১৯০৭ সালে "স্বদেশী আন্দোলনে" ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কার্য্যপ্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির নবযুগের সূচনা হয় বলা যায়। সেই হইতে ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীর চিন্তা ও ভাবুকতার পথে আত্ম-চৈতন্তের প্রবল উন্মেষ হয়। ভাব-বিলাসের—সুখনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সাতকোটি বাঙ্গালী সেদিন বাস্তবক্ষেত্রে আত্মপরীক্ষা দিবার জন্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। জাতির স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত দিল সেদিন বাহিরের শক্তি, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল সমগ্র জাতির মর্ম্মস্থলে। পরমুখাপেক্ষিতায় ব্যথিত, আত্ম-স্বাতন্ত্র্যহীন জাতির মর্ম্মস্থলে বিক্ষোভ জাগিল,—বাঙ্গালী "স্বদেশী ব্রত" গ্রহণ করিয়া বসিল। বাঙ্গালীর সেদিনকার প্রাণপণ প্রচেষ্টার শুভ ফল সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যবসায় ও ব্যণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নূতন সম্ভাবনার সৃষ্টি করিল। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল—চাই স্বদেশের শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুনরভ্যুত্থান—লুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধার—বিক্ষিপ্ত অর্থরাশির ঐক্যসাধন—জাতির আর্থিক-শক্তি সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্ত চাই—স্বদেশী শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সমবেত সহযোগ ও সহায়তা। বাঙ্গালা দেশের এ উন্মাদনার ঢেউ বাঙ্গালার বাহিরে সমগ্র ভারতবর্ষের নানা স্থানে গিয়া পৌছাইল। বিভিন্ন প্রদেশবাসীগণ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংঘবদ্ধভাবে সহযোগিতা করিবার সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। তাহার প্রভাব আমরা এখনও ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছি। আজ যে স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের দিকে সমগ্র দেশের জাগ্রত দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির স্বদেশী ব্রত গ্রহণ।

সুবৃহৎ বাঙ্গালী বীমা প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ১:০৭

সন ১৯০৭ সালে 'স্বদেশী' আন্দোলনের উন্মাদনায় সমস্ত বাঙ্গালাদেশের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই সময় স্বদেশী ব্রত পালন করিবার সুযোগ দিবার জন্য যে কয়টি স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল—তাহার মধ্যে ছিল বর্ত্তমান ভারতের দ্বিতীয়-স্থান-অধিকারী—সুবৃহৎ বাঙ্গালী বীমা প্রতিষ্ঠান—"হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ।"

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ উকীল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। সুদীর্ঘ ২৯ বৎসরের কর্ম্মকুশলতায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ যে প্রশংসা ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই প্রাপ্য।

নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালের ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হইল, সেই বৎসরেও "হিন্দুস্থান" ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আর্থিক দুর্বৎসর হইলেও ২ কোটি ৫২ লক্ষের উপর নূতন বীমা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানের উপর বীমাকারী জনসাধারণের অবিচলিত বিশ্বাস এবং আন্তরিক সহযোগিতাই সূচিত হইতেছে। গত বৎসর যেখানে প্রিমিয়াম আয় ছিল ৩৮,৬৭,৮২১৶০ টাকা—আলোচ্য বর্ষে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৬,৮২,৬০২৶০ টাকা। বীমা তহবিল, মোট সংস্থান প্রভৃতির দিক দিয়াও হিন্দুস্থানের অবস্থা এ বৎসর খুবই সন্তোষজনক বলিতে হইবে। গত

বৎসর বীমা তহবিল ছিল ১,৫০,৬৬,৮২৯৲, আলোচ্যবর্ষে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ১,৭৪,০৫,৮৮০৲ টাকায়, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা অধিক দেখা যায়। মোট সংস্থানও ৭৫ লক্ষ টাকার উপরে বর্দ্ধিত হইয়া ১,৯৮,৬১,৩৬৯৲ টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চল্‌তি বীমার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর ছিল ৮,৮৫,৭১,০৪০৲—আলোচ্যবর্ষে তাহা দাঁড়াইয়াছে ১০,৬৩,৪৯,৪৭৫৲।

খরচের হার পূর্ব্ব বৎসরের হারের তুলনায় শতকরা ২৲ টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং সোসাইটির কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় কালক্রমে ইহার পরিচালনব্যয় আরও কমিয়া আসিবে।

হিন্দুস্থানের বিশেষত্ব ইহার বন্ধকী দাদনের জন্য; সে সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক অন্যায় সমালোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির দাদন পদ্ধতি এবং হিন্দুস্থানের নিজেদের ২৯ বৎসরের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে উপযুক্ত জামানতে এবং দীর্ঘকাল মেয়াদে বন্ধকী-দাদন বীমা-কোম্পানীর পক্ষে যেমন নিরাপদ, তেমনি লাভজনক।

"বোম্বে লাইফ" ও "ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ড" (১৯০৮)

সন ১৯০৮ সালে বর্ত্তমানের সুবিখ্যাত কোম্পানী "বোম্বে লাইফ" (Bombay Life) বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর হইতেই এই কোম্পানী সুপরিচালনার গুণে ভারতবর্ষে বিশেষ সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কার্য্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের শাখা-কার্য্যালয়ের কাজের ভার ব্যবসায়ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ আই, বি, সেন মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। মিঃ সেন ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ড কোম্পানীর কর্ণধাররূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। এই দুইটি কোম্পানীর পরিচালন ব্যাপারে তিনি নিজ কর্ম্মদক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

যদিও আজকাল নিত্য নূতন বীমা কোম্পানীর প্রবর্ত্তন হইতেছে—দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণের সামান্য আয় হইতে সঞ্চয় করিবার পক্ষে ভাল বীমা কোম্পানী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই মহদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ড কোম্পানী সহস্র সহস্র দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদিগকে বীমা করিতে প্রকৃষ্ট সুযোগ দান করিয়াছে ও করিতেছে। ইহা আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ টাকার দাবী দিয়াছে। ইহার প্রিমিয়ামের হার অতি অল্প এবং ইহার নিয়মাবলী ও পরিচালনা-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত। মাসিক প্রিমিয়াম ছয় আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত। বিনা ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রস্তাবপত্র গৃহীত হয়।

প্রভিডেণ্ড কোম্পানী বলিতে অনেকে বণ্টন-নীতি বা Dividing Society অথবা Free Insurance মনে করেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ড কোং ঐরূপ অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। এই কোম্পানীর তহবিল এত টাকা দাবী দিয়াও বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্থানাভাবে আমরা নিম্নে পঞ্চবার্ষিক বিবরণ দিলাম।

সাল	মোট তহবিল
১৯১২	১,৯৩৭ টাকা
১৯১৭	২৭,২৩৫ টাকা
১৯২২	৪৩,৬১৭ „
১৯২৭	১,৬৮,৬৪৪ „
১৯৩২	৭,৩৩,৯৯৫ „
১৯৩৫	১১,৭০,৩৯৭ „

উপরোক্ত অঙ্ক হইতে দেখা যায় এই কোম্পানী কিরূপ জনপ্রিয় এবং দ্রুত বর্দ্ধমান। আমরা জানিতে পারিলাম যে এই বৎসর কোম্পানীর তহবিল প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর সুযশ ও কার্য্যকলাপ কেবল যে সমগ্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, সুদূর আফ্রিকা, আরব, পারস্য, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে।

এই কোম্পানী প্রভিডেণ্ড বীমা-জগতে প্রাচীনতম হইলেও অ্যাড্রিমা এম্‌বসিং ও অ্যাড্রিমা প্রিণ্টিং মেসিন্‌ প্রভৃতি আধুনিকতম উপকরণ ও সাজসজ্জায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোম্পানীর পরিচালনা ও উন্নতি দেখিয়া মনে হয় বীমাকারীর দায়িত্ব এই কোম্পানী সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্‌শিয়াল (বোম্বে – ১৯১৩)

২৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, বিখ্যাত অর্থশালী লোককে পরিচালকরূপে লইয়া ১৯১৩ সালে বোম্বাই সহরে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়। বীমাকারিগণের কোম্পানী না হইলেও বীমাকারীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য বীমাকারীর মধ্য হইতে ২ জন পরিচালক বা ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত করিবার রীতি আছে, ইহা কোম্পানীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নাই।

এই কোম্পানীর বর্ত্তমান চল্‌তি বীমার পরিমাণ তিন কোটি টাকারও উপর এবং এ যাবৎ ২৫ হাজারের অধিক বীমাপত্র বিক্রিত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসরে ১৩,০০,০০০৲ টাকারও অধিক বীমার দাবী (Claim) মিটান হইয়াছে।

গত ১৯৩২ সালের পঞ্চবার্ষিকী হিসাব নিকাশে (Valuation) কোম্পানীর ৭,৬৪,৫২৬৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল দেখা যায়। ইহা হইতে বাৎসরিক হাজার করা আজীবন বীমায় ২২৷৷০ এবং মেয়াদী বীমায় ১৮৲ টাকা হিসাবে বোনাস বা লভ্যাংশ বণ্টন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতের অনিশ্চিত দিনের সংস্থান স্বরূপ ১,২৮,৮০৩৲ রিজার্ভ-ফণ্ডে রক্ষিত আছে। বীমা কোম্পানীর আইন অনুসারে ভারত সরকারের নিকটও কোম্পানীর—২ লক্ষ টাকা গচ্ছিত আছে। ১৯৩৪ সালের শেষে বীমা তহবিল দাঁড়াইয়াছে—৪৪,৮০,৩৫২ হইতে ৫৩,৩৬,১৪৬ টাকা। বিশেষ ফণ্ডে মজুত আছে—১,০৪,০৯০৲ টাকা। সিকিউরিটির মূল্যও ৫১,০৬,৮২৭ হইতে ৫৬,৭৮,৪০৯ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর ব্যয়ের হার অপেক্ষাকৃত কম ; প্রিমিয়ামের হারও অনেক কোম্পানী অপেক্ষা কম। পলিসির সর্ত্ত (Policy condition) বেশ সন্তোষজনক।

কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ও নিরাপদ এবং টাকাকড়ি লগ্নী ব্যাপারেও কোম্পানীর সতর্কতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নব-সংগঠিত বাঙ্গালী কোম্পানী আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আইন-সচিব মাননীয় স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কে, টি কর্ত্তৃক আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর উদ্বোধন হয়। তদবধি আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।

এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাবমত দেখা যায় যে এই কোম্পানী প্রথম বর্ষেই ১১,০২,৫০০৲ টাকার প্রস্তাবপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে ৯,০২,৫০০৲ টাকার প্রস্তাব নূতন জীবন বীমায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই কোম্পানী জীবন বীমা সংগ্রহে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রথম বর্ষের জীবন-বীমার চাঁদার আয় ২৪,০৩৩৸৶০ হইয়াছিল (রি-ইন্‌সিওরেন্স্ প্রিমিয়ম বাদে) ; এবার দাঁড়াইয়াছে—৩৯,০১৪৷৶৫ এবং সুদ হইতে আয় হইয়াছিল ১২৮৯৷৷৵০ (ইন্‌কামট্যাক্স্ বাদে)। কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ২২,৩২০৷৷৵০ খরচ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রিমিয়ামের আয়ের শতকরা ৯৬৲ টাকার মধ্যেই ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এবার শতকরা ৮৫৲ টাকা হারে খরচ হইয়াছে। একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে প্রথম বর্ষেই শতকরা ৯৬৲ টাকার মধ্যে এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৮৫% টাকায় ব্যয় নির্ব্বাহ করা বিশেষ প্রশংসনীয়। কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল তন্মধ্যে ১৭০০৲ টাকা প্রথম বর্ষেই পরিশোধিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ১,১০৪। ১৫ মূল্যের একটি জীবন-বীমা তহবিল এবার দাঁড়াইয়াছে ৪,১২৯৷৶৪।

কোম্পানীর বিক্রীত মূলধন ১,৫০,৫০০ টাকা, তন্মধ্যে ৪৭,৫০৫৲ টাকা প্রথম বর্ষের মধ্যেই আদায় হইয়াছিল ; এবার হইয়াছে ৬৩,৮৩৫৲ টাকা। কণ্ট্রোলার অব্ কারেন্সীর নিকট প্রথম বর্ষে ২৫০০০৲ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছিল। ৫,৪১৭৸১০ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ১,৯৪৫৷৶ জমা দেওয়া হইয়াছিল।

কোম্পানীর মোট সংস্থান এ বৎসর দাঁড়াইয়াছে ৫৩,৮১৩৷৷৵৫ স্থানে ৭৬,৮৭৬৷৷৶১৫। এই আর্থিক দুর্দ্দশার

দিনে নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ আনন্দের কথা।

বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল বীমাজগতে সুপরিচিত এবং সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ও বীমার ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞ।

হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুইটি ফাণ্ড (সন ১৮৭২ সাল)

সন ১৮৭২ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশহিতৈষীগণের চিন্তা ও চেষ্টার ফলে কলিকাতায় হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুইটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের বিধবা স্ত্রী ও অভিভাবকহীন পুত্রকন্যার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার পেন্‌সন বা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ইহার তহবিলের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা।

এই প্রতিষ্ঠানে কোনও অংশীদার নাই; বীমাকারিরাই প্রতি বৎসর তাঁহাদের ডিরেক্টার নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমান ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান সানলাইফের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান "আর্য্যস্থান" ইন্‌সিওরেন্সের ম্যানেজার বীমাজগতে সুপরিচিত—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়।

এই কোম্পানী এ যাবৎ বাঙ্গালা দেশের বহু হিন্দু পরিবারকে অসময়ে আর্থিক সংস্থান করিয়া দিয়া সমূহ বিপদ ও বিড়ম্বনার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। অল্প-বিত্তসম্পন্ন বাঙ্গলা দেশে এই প্রকার বৃত্তিদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রসার বিস্তার হওয়া বিশেষ সুখের বিষয়।

ঊর্ণনাভের ছদ্মরূপ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রাণীজগতে এমন অনেক কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়, যারা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার কোনো না কোনো একটা কিছু স্বাভাবিক অস্ত্র অঙ্গে নিয়েই জন্মায়। যেমন, কেউ থাকে খুব পুরু ও শক্ত একটা খোলা ঢাকা, কারুর গায়ে হয়ত অসহ্য একটা দুর্গন্ধ, কারুর মাংসের আস্বাদ অত্যন্ত কটু বা তিক্ত, কারুর বা দেহ দীর্ঘ কঠিন অসংখ্য কণ্টকে আবৃত ইত্যাদি। অর্থাৎ এমন সব সহজাত প্রাকৃতিক উপায় তাদের থাকে, যাতে কীটভুক্ ও প্রাণীবিদ্বেষী পশুপক্ষীর কাছে তারা অখাদ্য বলে গণ্য হয়।

জীবজন্তুদের আমরা যতটা নির্ব্বোধ মনে করি, ঠিক ততটা নির্ব্বোধ তারা নয়। প্রথমটা দু'চার বার হয়ত অনভিজ্ঞতাবশতঃ তারা ঐ রকম অখাদ্য শ্রেণীর কীট-পতঙ্গকে আক্রমণ করে ঠকে যায়, কিন্তু তার পর ক্রমে তাদের এমন একটা গভীর অভিজ্ঞতা আপনিই জন্মায় যে ভবিষ্যতে আহার অনুসন্ধানে শিকারে বেরিয়ে তারা দেখবামাত্র চিনতে পারে যে এসব প্রাণী তাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব কেউ আর অকারণ তাদের আক্রমণ করতে চায় না। সুতরাং এ ব্যাপার থেকে একটা জিনিস বেশ বোঝা যায় এই যে খাদ্য হিসাবে যারা নিতান্ত সুস্বাদু তথা লোভনীয়, তাদের পক্ষে হয়ত সহজেই আত্মরক্ষা করা সম্ভব হ'তে পারে, যদি কোনো রকমে তারা ঐ অখাদ্য শ্রেণীর জীবস্বরূপ ছদ্মবেশে আত্মগোপন ক'রতে শেখে! কারণ এইভাবে শত্রুকে প্রতারিত করতে পারলে শুধু যে তাদের জীবন রক্ষা পায় তাই নয়, তারা বেশ নিশ্চিন্ত নিরাপদে ও নিঃসংশয় শান্তিতে বিচরণ করতে পারে। এই ধরণের নকল রূপ প্রকৃতির রাজ্যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীবিজ্ঞানে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'রূপানুকরণ' (mimicry)।

সকল রকম কীটের মধ্যে মাকড়সাদের প্রায় এক রকম নিরস্ত্র অর্থাৎ আত্মরক্ষা ব্যাপারে নিরুপায় বলা যেতে পারে। তার উপর প্রাণীজগতে মাকড়সা অতি সুস্বাদু খাদ্যরূপে
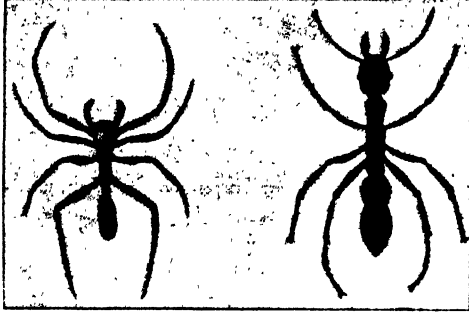
পিপীলিকার ছদ্মবেশে মাকড়সা—দক্ষিণ আমেরিকার এই মাকড়সারা (বামে) অবিকল সেখানকার এক জাতীয় ডাগর পিঁপড়ের (ডাইনে) রূপানুকরণ করে

পরিগণিত হওয়ায় ওরা সকল জীবেরই লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই ওদের আক্রমণ করবার জন্য যেন সর্ব্বদা
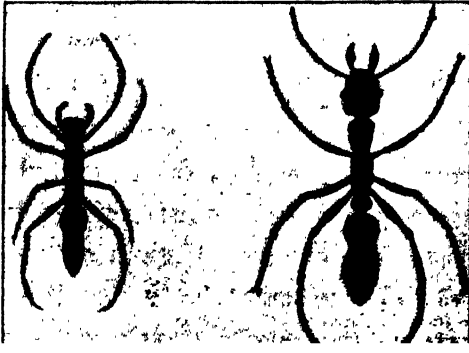
পিপীলিকার ছদ্মবেশে মাকড়সা—(আর এক জাতীয় মাকড়সাও ঐ একই শ্রেণীর পিপীলিকার রূপানুকরণ করেছে) (বামে—মাকড়সা, ডাইনে—পিঁপড়ে)

শিকার সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাকে। মাকড়সা আজ সকল প্রাণীর ভক্ষ্য হ'য়ে ওঠায় কারুর হাত থেকেই তাদের আর নিস্তার নেই। বিশেষ করে তাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে খনক বা কোষ্ঠাগারিক বর্ব্বলা (Digger or mason Wasps)। এরা নিজেরা যতগুলি পারে খায়, আবার বাচ্ছাদের খোরাক হবে বলে তাদের গর্ত্তের মধ্যে অর্থাৎ মাটি খনন করে এরা যে বিবর নির্ম্মাণ করে তার ভিতরে অসংখ্য মাকড়সা এনে জড়ো ক'রে রাখে। পাছে মৃত মাকড়সা রাখলে সেগুলি শুকিয়ে যায় বা পচে ওঠে এই আশঙ্কায় তারা মাকড়সাগুলোকে দংশন ক'রে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে দেয়। ফলে মাকড়সাগুলি এক রকম 'তাজা ভোজ্য' হ'য়েই থেকে যায়! বহু প্রাণী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার ফলে, বিশেষতঃ এই মেটে বোল্‌তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠার দরুণ মাকড়সার সহজাত বুদ্ধি ও আকৃতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নানা আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হ'চ্ছে তাদের
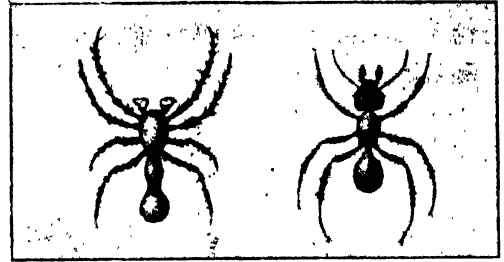
পিপীলিকার ছদ্মবেশে মাকড়সা—(আর এক জাতীয় মাকড়সা ভিন্ন এক শ্রেণীর পিপীলিকার রূপানুকরণ করেছে। বামে—মাকড়সা, ডাইনে—পিঁপড়ে)

এই রূপানুকরণ বা ছদ্মবেশ! তারা বেছে বেছে এমন দু'চার রকম পোকার আকৃতি নকল ক'রেছে যারা খাদ্য-তালিকার বহির্ভূত জীব এবং বিশেষ করে যাদের উপর ঐ মেটে বোল্‌তাদের একান্তই অরুচি। এমন কি, দু একটা ক্ষেত্রে তারা ছোট ছোট শামুকের ছদ্মবেশও ধারণ করেছে দেখা যায়! শামুক শক্ত এক খোলার মধ্যে থাকে বলে দুর্ব্বল শিশুর খাদ্যের সে মোটেই উপযোগী নয় এবং কীটভুক পক্ষীরাও ওদের পছন্দ করে না।

কোনো কোনো মাকড়সা আবার ঐ একই উদ্দেশ্যে কঠিন আবরণযুক্ত গুব্‌রে পোকা জাতীয় কীটের আকৃতি ও বর্ণ হুবহু নকল করে। আর এক রকম মাকড়সা আছে যাদের পা বেশী লম্বা হয় না। এদের বসবাস হচ্ছে বেশীর

ভাগ বনবাদাড়ে ঝোপে-ঝাড়ে। এরা বেছে নিয়েছে সেই নানা রংচং ও চিত্রবিচিত্র-করা খোলাসংযুক্ত দুর্গন্ধময় কীটের ছদ্মবেশ! কারণ ঐ জাতীয় কীটের অঙ্গ হ'তে এমন তীব্র দুর্গন্ধময় রস নির্গত হয়, যে কোনো প্রাণীই তাদের খাওয়া দূরে থাক, কাছেও ঘেঁসতে চায় না! কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী অবাক ক'রে দেয় আর এক জাতের মাকড়সা—যারা পিপীলিকার রূপানুকরণে ছদ্মবেশ ধারণ করে। এমন চমৎকার—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—এমন অবিকল নকল তারা করে যে পিঁপড়েদের নিজেদেরই অনেক সময় সে আকৃতি দেখে স্বজাতি বলেই ভুল হয়।

কাজেই, পিপীলিকার ছদ্মবেশটা মাকড়সাদের মধ্যে এত বেশী প্রচলিত হয়ে উঠেছে যে আরও অন্যান্য দু' একটি
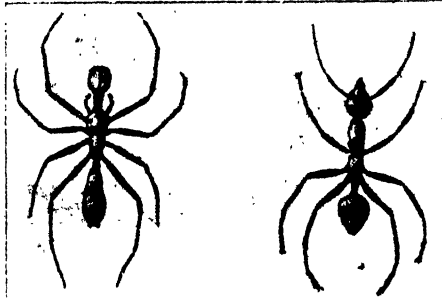
পিপীলিকার ছদ্মবেশে মাকড়সা—(আমাদের এ দেশীয় এক জাতের মাকড়সা যারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে—অবিকল কাঠ-পিঁপড়ের রূপানুকরণ করেছে) বামে—মাকড়সা, ডাইনে—পিঁপড়ে

পৃথক শ্রেণীর মাকড়সাও অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য পিপীলিকার রূপানুকরণ ক'রতে সুরু ক'রে দিয়েছে। কারণ ওদের পরস্পরের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌসাদৃশ্য অনেকখানি থাকায় ওদের পক্ষে পিপীলিকার রূপানুকরণ-টাই সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। পিপীলিকার মাথাটা যে তার দেহের তুলনায় বেশ একটু বড়, একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। এই মাথার সঙ্গে সংলগ্ন আছে এক জোড়া শুঁড় বা শোঁয়া, যার সাহায্যে তারা স্পর্শের দ্বারা অনেক কিছু অনুভব করে। এ ছাড়া সাঁড়াশির মত এক জোড়া দাড়াও তাদের মুখে সংলগ্ন থাকে। এই মাথাটা আবার দড়ীর মত শীর্ণ ঘাড়ের সাহায্যে তাদের দেহের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। মাথা ছাড়া এদের লম্বাটে দেহ আবার দুভাগে বিভক্ত, সামনের দিকেই দু'পাশে তিন খানি ক'রে
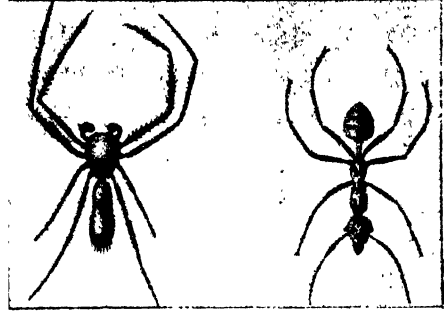
পিপীলিকার ছদ্মবেশে মাকড়সা—(আমাদের এ দেশীয় আর এক জাতের মাকড়সাও কাঠ-পিঁপড়ের রূপানু-করণ করেছে, কিন্তু বিপরীতদিক থেকে অর্থাৎ মাকড়সার পশ্চাৎদিক থেকে পিপীলিকার মুখের অনুকরণ সুরু হয়েছে।) বামে—মাকড়সা, ডাইনে—পিঁপড়ে

ছখানি পা আছে। তার পর আবার সুতোর মত সরু এক নমনীয় ও কমনীয় কটি ধ'রে আছে তাদের বাদামী নিটোল নিতম্বটুকু! অবশ্য মাকড়সার শুঁড় জাতীয় কোনো
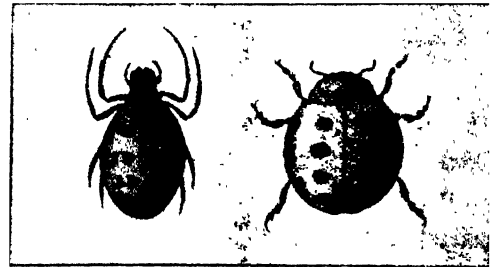
মাকড়সার ছদ্মবেশ—(আফ্রিকা দেশের এক জাতীয় মাকড়সা গুব্‌রে-পোকা জাতীয় একপ্রকার দুর্গন্ধময় কীটের রূপানুকরণ করেছে, বামে—মাকড়সা, ডাইনে—গন্ধকীট)

প্রত্যঙ্গ নেই এবং তাদের মাথাটাও শরীর থেকে কিছু বিভিন্ন আকারের নয়। তাদের পায়ের সংখ্যাও একজোড়া বেশী অর্থাৎ পিপীলিকার মত মাকড়সারা ষট্‌পদ নয়, অষ্টচরণ! এই

আটখানি পায়ের মধ্যে প্রথম চরণযুগলকে তারা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, শূন্যে উঁচু করে তুলে ধরে ঠিক পিঁপড়ের শুঁড়ের অনুকরণে কাঁপায়। বাকি ছ'খানি পায়ে ঠিক পিঁপড়ের মত হাঁটে। পিঁপড়ের মাথার পরই তার শীর্ণ ঘাড়ের অনুকরণে মাকড়সা তার কাঁধের নিম্নাংশ এমন প্রাণপণে কুঁচকে চেপে ধরে থাকে যে বেশ সুস্পষ্ট একটা খাঁজ পড়ে যায় চারদিকে, তার ওপর মাকড়সার গায়ের সাদা রোঁয়া এমনভাবে ঘিরে থাকে সেখানটা, যে দূর থেকে দেখে ঠিক মনে হয় যেন শরীর থেকে মাথাটা তফাৎ হ'য়ে আছে, মধ্যে শুধু সরু একটু গ্রীবার সংযোজক!

এইভাবে তারা পিপীলিকার মাথার অবিকল অনুকরণ

মাকড়সার ছদ্মবেশ—(আফ্রিকার আর এক জাতীয় মাকড়সা আর এক শ্রেণীর দুর্গন্ধময় কীটের রংচং ও চিত্র বিচিত্র করা রূপের অনুকরণ করেছে।)

করে এবং কটীদেশের ও অন্যান্য অঙ্গের কিছু কিছু অনুরূপ স্বাভাবিক সাদৃশ্যের সাহায্য পেয়ে হুবহু পিঁপড়ের আকার ধারণ করতে পারে। এমন কি পিপীলিকার যে চঞ্চল তীর্যক গতিভঙ্গী, মাকড়সা প্রাণভয়ে সেটুকুরও অনুকরণ না ক'রে পারে না, কাজেই তাদের ছদ্মবেশ একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে! জীবজন্তু ত দূরের কথা অনেক সময় প্রাণীতত্ত্ববিদেরাও চট্ করে দেখে ধরতে পারেন না যে কোনটা মাকড়সা আর কোনটা পিঁপড়ে! এদের এই রূপানুকরণ যথার্থ-ই বিস্ময়কর!

পিপীলিকার ছদ্মবেশ ধারণ করা এদের পক্ষে সহজসাধ্য বলেই যে এরা এই রূপানুকরণটা বেশী পছন্দ করে তা নয়; বিশেষ করে পিপীলিকার ছদ্মবেশ ধারণ করবার এদের প্রধান কারণ হ'চ্ছে কোনো জাতের বোলতাই পিঁপড়েকে খাদ্য বলে গণ্য করে না। মাকড়সাই তাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় ভোজ্য! পিঁপড়েকে আক্রমণ করা দূরে থাক্ বোলতারা ওদের দেখে ভীষণ ভয় পায়। কাজেই পিঁপড়ের রূপ ধারণ ক'রতে পারলে যে মাকড়সা সবচেয়ে বেশী নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হ'তে পারবে এ বুদ্ধি বিবেচনাটুকু তাদের আছে।

আফ্রিকায় এক জাতীয় মাকড়সা আছে, তাদের আকৃতি একেবারে সুডৌল গোল। এরা নাকি আবার সবচেয়ে বেশী সুস্বাদু! কাজেই এদের প্রতি লোভও সকলের অত্যধিক। কিন্তু, শরীরটি গোলাকার বলে এরা আর কোনো রকমেই পিপীলিকার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রতে

মাকড়সার ছদ্মবেশ—(আফ্রিকার অপর আর এক জাতীয় মাকড়সা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর গন্ধ কীটের রূপানুকরণ করেছে।)

পারে না, অথচ একটা কিছু অখাদ্য জাতীয় কীট পতঙ্গের রূপানুকরণ করতে না পারলে এদের প্রাণ বাঁচানো আরো দায়! কারণ এদের প্রধান শত্রু হল প্রাণীজগতের সবাই, শুধু যে বোল্তারাই এদের মারে তা নয়, কোনো পাখীই এদের দেখতে পেলে ছাড়ে না! কাজেই নির্ব্বংশ হবার ভয়ে এবং পৃথিবী থেকে অচিরে লুপ্ত হ'য়ে যাবার আশঙ্কায় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী!" এর চেয়ে সত্য বোধ করি আর কিছু নেই। এই গোল মাকড়সারা অনেক দেখে শুনে ভেবে-চিন্তে বেছে নিয়েছিল গুব্রে পোকা জাতীয় কঠিন আবরণযুক্ত একপ্রকার দুর্গন্ধময় কীটের ছদ্মবেশ! কারণ ওদের গায়ের ঐ তীব্র

দুর্গন্ধের জন্য কারু কাছেই ওরা খাদ্য হিসাবে রুচিকর বলে গণ্য হয় না।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে মাকড়সা যখন গুবরে পোকার ছদ্মবেশ ধারণ করে তখন তারা সেই নানা রংচং ও চিত্রবিচিত্র-করা গুব্‌রে পোকার শক্ত খোলাটা পিঠের ওপোর পরে কেমন ক'রে এবং পায়ই বা কোথায়? তবে কি তারা মৃত গুব্‌রে পোকার খোলাটা সংগ্রহ ক'রে এনে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করে, না জীবন্ত গুব্‌রে পোকাই ধরে এনে পৃষ্ঠে বহন করে বেড়ায়? কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, এর কোনোটাই তাদের ক'রতে হয় না! আর্শুলা যেমন প্রাণভয়ে কাঁচপোকা হ'য়ে যায়, তেমনিই প্রাণের দায়ে ঐকান্তিক কামনাবশে এদেরও রূপান্তর ঘটে! এদের বাঁচানো ও রক্ষা করা প্রকৃতিরও একটা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য, বিশেষ করে বাঁচবার একটা প্রবল আগ্রহ ও বাঁচবার জন্য যাদের একটা প্রাণপণ সাধনা থাকে প্রকৃতি তাদের সাহায্য না ক'রে পারে না। কাজেই, এ মাকড়সারা ক্রমে গুব্‌রে পোকার মত বর্ণ ও আকৃতিগত একটা রূপানুকরণ করতে সমর্থ হয় এবং শত্রুপক্ষকে সেই ছদ্মবেশে প্রতারিত করে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

কোষ্ঠীর জের

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এ

শীলার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা, তখন সে ছোট্টটি। ছুটে আসে, হাসে, খেলে, চেঁচিয়ে গান গায়, সে আমার সেজ-মাসিমার ননদের ছোট মেয়ে। তার বাবা সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে ক'লকাতায় শেষ জীবন কাটাতে ইচ্ছে ক'রেছিলেন এবং ক'লকাতায় এসে প্রথমে ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতেই শীলা ও তার মাকে নিয়ে উঠ্‌লেন। সঙ্গে ছিল তাঁদের একটি কুকুর—নাম জিম্‌। ইচ্ছে—একটা পছন্দমত বাড়ী কিনে তাতে উঠে যাবেন।

আমাদের বাড়ীটা ছিল মস্ত বড়, অথচ ফাঁকা। কারণ আমাদের লোকজনের মধ্যে আমি ও আমার মা, আর ঝি, চাকর। বাবা পশ্চিমে চাকরী করেন। আমার পড়ার জন্য এবং ক'লকাতার খালি বাড়ীটাকে ব্যবহারে রাখ্‌বার জন্য মাকে ও আমাকে ক'লকাতাতে থাকৃতে হয়।

এত বড় বাড়ী ফাঁকা পড়ে থাকে; তাই মা সেজ-মাসিমার এই ননদটিকে অনুরোধ ক'রে এ বাড়ীতে আনলেন। নানা কারণে তাঁরাও আপত্তি না ক'রে মায়ের অনুরোধ রক্ষা ক'রলেন। শীলার মা ছিলেন মায়ের বাল্যবন্ধু—আমি তাঁকে মাসিমা ব'লতে লাগ্‌লাম। শীলাও আমার মাকে 'মাছিমা' ব'লে পরে বড় হয়ে 'মাসিমা' বলত।

এঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর চেহারা ফিরে গেল—আমার সুবিধা অসুবিধা দেখ্‌বার জন্য কয়েক জোড়া চোখ যেন বেশী ব'লে মনে হ'তে লাগল—তার সঙ্গে সঙ্গে শাসনের মাপকাঠিও বাড়্‌ল—এমন কি শীলাও একটু বড় হ'লে সময় সময় বেশ গম্ভীর হ'য়ে চোখ ঘুরিয়ে ব'লত 'সমীরদার এত সন্ধ্যে ক'রে রোজ রোজ বাড়ী ফেরা দেখে যেন আমার গা কেমন করে' (আমার নাম সমীর)। আমিও কোনদিন যদি বা লুকিয়ে 'ম্যাটিনির' 'শো'তে বায়স্কোপ দেখে বাড়ী ফির্‌তাম—তাও ছাড়লাম। এই মিষ্টি শাসন, অনাত্মীয়ের গভীর আত্মীয়তা কেমন যেন লাগত—মনে মনে এই অনাস্বাদিত ভাব কত কি এলো-মেলো চিন্তায় টেনে নিয়ে যেত।

যাক্‌ যা বল্‌ছিলাম। শীলা কেবল আমাকে শাসন ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত না। সে আমার মাকেও যেন মুঠোর মধ্যে ক'রে ফেল্‌ল। আমার অমন রাশভারী গম্ভীর প্রকৃতির মা কোন্‌ মোহিনী শক্তিতে এইটুকু মেয়ের দিব্যি শাসনাধীন হ'য়ে যেতেন—তা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রেও থৈ পেলাম না।

তার পিতামাতার প্রতি তার অপ্রতিহত শাসন। তার বাবা আজ স্নান ক'রবেন কিনা, তার মায়ের আজ দোক্তা মুখে দেওয়া উচিত কি না—এসবেও ছোট্ট শীলার

অভিমতের দাম ছিল। তার বাপ মায়ের প্রথম কয়টি সন্তান শৈশবে মারা যাওয়ায় অনেক দিন পরে উপর্য্যুপরি ছুটি মেয়ে তাঁদের হয়। লীলা বড়—বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। শীলা লীলার চেয়ে চার বছরের ছোট। শীলা এ বাড়ীতে পাহাড়ের বুকে নির্ঝরিণীর ন্যায়—বাধাহীনভাবে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি কেবল সাম্‌লাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রছে আর ছুটছে। তাকে ডাকলে সে ব'লবেই 'আর বাপু আমার কি আর একটু সময় আছে? এটা ক'র্ত্তে হবে, ওটা ক'র্ত্তে হবে, ইত্যাদি।' তাতে যদি কেউ তাকে ঠাট্টা ক'রেছে তা হলেই কুরুক্ষেত্র।—সে অভিমান ভাঙ্গান যে কি দুরূহ ব্যাপার তা বোঝান শক্ত।

ভোরে কাক-পক্ষী ডাকবার আগে শীলার ঘুম ভাঙ্গবে। সেই থেকে রাত পর্য্যন্ত সে তার বাপ, মা, মাছিমা, সমীরদা, জিম্ প্রভৃতির দৈনন্দিন আবশ্যক অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে অনাড়ম্বরভাবে নিজেকে লিপ্ত করে রাখবে। তার বদলে সে কিছু না চেয়েও পায় প্রগাঢ় স্নেহ এবং মাসীর ও মায়ের অনন্ত ভালবাসার প্রস্রবণ। তার একদিনের কাজের ডায়েরী লিখ্‌ব ব'লে আমার বড় ডায়েরী ব'য়ের একটা পাতায় তার সেদিনের ক্রিয়া-কলাপগুলি লিখে যেতে লাগলাম। কিন্তু দুপুরের ঘটনা পর্য্যন্ত পৌছবার আগেই পাতাটা শেষ হ'য়ে যাওয়ায় রাগ ক'রে পাতাটা ছিঁড়ে দিলাম—আর চেষ্টা করিনি।

(২)

ক্রমে ক্রমে সেও বড় হ'ল। গম্ভীর হল। এখন সে বাড়ীর সকলের দরকার অদরকারগুলি আরও খুঁটিনাটি ভাবে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। চাঞ্চল্যগুলি বাদ দিয়ে সে শান্ত ও ধীরভাবে সংসারের সকলের খবরদারি করার ভার যেন ক্রমে ক্রমে নিজের হাতে স্বেচ্ছায় ও বিনা বাধায় বেশী ক'রেই নিতে লাগ্‌ল। তার বয়স ও স্বাস্থ্যের সক্ষমতা দেখে তার বাপমাও নিজেদের ভার তার হাতে ক্রমে ক্রমে সমর্পণ ক'রে যেতে দ্বিধা করেন না।

খাওয়া দাওয়ার পর যখন নিজের পছন্দমত সকলে একটু বিশ্রামসুখ নেয়, তখন শীলা 'টডের' রাজস্থান থেকে বাংলা অনুবাদ, চিঠি ও ঠিকানা লেখা অভ্যাস এবং চাকরদের বেতন, জিনিষের দাম, ধোবার কাপড়ের হিসাব প্রভৃতি কষা অভ্যাস করে। চাকরের বেতনের হিসাব প্রায়ই ভুল হ'ত। তার বাবা মন্তব্য করতেন, 'অত বড় বড় চুলের ভেতর দিয়ে 'মেয়েটার' মাথায় অঙ্ক আর যেন ঢুকতে চায় না।' অবশ্য আস্তে আস্তেই ব'লতেন। কারণ সে শুনতে পেলে তার বাবাকেই তাল সামলাতে হবে।

পাশের বাড়ীর মেয়ে আভা শীলার সমবয়সী ও বন্ধু; শীলা রোজ বিকেলে তার সঙ্গে ছাদে গিয়ে একটু পায়চারি ক'রে গল্প ক'রে। আভা রোজ এ বাড়ী আসে। তার মা বাপ দু'জনেই মারা গেছেন। এখানে মামার বাড়ীতে থেকে সে গোখেল মেমোরিয়াল হাই স্কুলে পড়ে। দু' বছর পরে ম্যাট্রিক দেবে। আভার মামা ডাক্তার, মামীমা নাই। মামার সন্তানের মধ্যে একটিমাত্র বিধবা মেয়ে নাম শোভা। তাঁর একটি ছোট ছেলে, তাকে নিয়ে তিনি পিতার কাছেই থাকেন। মা ও মাসিমা ছাদে গিয়ে আভার দিদির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আলাপ ক'রে আসেন। তিনি এ বাড়ী আসেন না, এঁরাও ও-বাড়ী যান না। পাশের বাড়ীর সঙ্গে যোগ-সূত্র আভা ও শীলার বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত। আভার মামার সঙ্গে শীলার বাবার বা আমার বড় একটা দেখা হয় না। তিনি বড় ডাক্তার, সর্ব্বদা রোগীর ভাবনাতেই ব্যস্ত। ভেতরের সংসারের সম্পূর্ণ ভার তাঁর মেয়ের হাতে, কেবল টাকা রোজগার ক'রে তিনি মেয়ের হাতে খরচ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। ভাগ্নী আভা একদিন তাঁকে একটা পড়া জিজ্ঞেস ক'রতে এসে তাঁর অর্থহীন চাহনি দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তত হ'য়ে গিয়েছিল এবং তার পরদিন সকালে প'ড়তে গিয়ে দেখে তার জন্য এক প্রৌঢ় অধ্যাপক মোটা বেতনে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হ'য়ে তার পড়ার ঘরে তার অপেক্ষায় ব'সে আছেন।

শীলা যখন সকালে স্নান ক'রে মায়ের পাশে বসে তাঁর দেখাদেখি শিবপূজা শেষ ক'রে তরকারী-কোটা রান্নার তদারক করা প্রভৃতিতে গভীর মনোযোগ দিয়েছে, তখন পাশের বাড়ীতে আভা ব্যাকরণের আর্ষপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছে। এই দুটি মেয়ের কর্ম্মক্ষেত্র এত তফাৎ কিন্তু এর জন্য কারও মনে কোনও অহঙ্কার নেই। উভয়েই একটু একটু জানছে যে এরা মেয়েমানুষ—এদের সত্তার বিকাশ যেদিকে হবে, তা ভগবান আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছেন।

শীলার বাবার খুব বেড়াবার সখ। তিনি ভোরে উঠে লেকে বেড়াতে চ'লে যান ; যখন ফেরেন কালে-ভদ্রে দেখেন আভার বাবা ডাক্তার মিত্র দুটি রোগী দেখে এসে তৃতীয় রোগীর বাড়ী-যাত্রার আয়োজন ক'রেছেন।

আমি তখন পড়ার ঘরে মনস্তত্ত্বের পাঠ্য পুস্তকে গভীরভাবে মগ্ন। শীলার বাবা বেড়িয়ে ফিরে এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন—কি মাষ্টার ঘোষ, আজ মনোজগতের কি নূতন তথ্য আবিষ্কার হ'ল ? 'এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি'তে 'অনার্স' নিয়ে আমি এখন বি-এস-সি প'ড়ছি—তাই একটু ঠাট্টা।

মা ও মাসীমা তখন রান্নাঘরে।

জিম্ ড্রয়িং-রুমে চুপ ক'রে ব'সে আছে—আগন্তুক কেহ এলে তার আগমনবার্ত্তা নিজের ভাষায় সেইখান থেকে ঘোষণা ক'রে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে।

(৩)

এইভাবে দিন কেটে যেতে লাগ্ল। মা তাঁর বাল্যবন্ধুকে এ বাড়ী থেকে যেতে দেন নি। ব'ললেন বাড়ী না কেনা পর্য্যন্ত তাঁদের অন্য বাড়ীতে যাওয়া হবে না। তাঁরা যদি এতে কোনও রকম কুণ্ঠা বোধ করেন তবে যেন সমীরের কাছে তাঁদের যে ঋণ হ'চ্ছে, তা যেন তার নাতির কাছে শোধ করেন এবং আর যেন এ বিষয় দ্বিতীয় বার তাঁরা বাক্যব্যয় না করেন। মাসীমা অমত করলেন না। এইভাবে দুটি বিভিন্ন সংসারের গতি মিলে একই স্রোতের প্রবাহে চ'লতে লাগ্ল।

আমার একটু সুবিধাই হ'ল। সময়ে সব কাজ আরও ভাল ক'রে হ'তে লাগ্ল। হাতের অতি নিকটে প্রয়োজনীয় সব জিনিষ আরও পেয়ে যেতে লাগ্লাম। ভাত খেয়ে উঠ্তে না উঠ্তে শীলা নিজে পান সেজে দেয়, বিকেলে ফিরে এলে নিজে ব'সে চা জলখাবার খাওয়ায়। কখনও বা আমার পড়ার ঘরে এসে একটু আধটু গল্প করে এবং আভা আমার ঘাড় নীচু ক'রে চলা মন্তব্য ক'রেছে, এম্নি সব কথা বলে। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরতে যদি পাঁচ মিনিট দেরী হয়, অম্নি সে নাকি ভেতর আর বার করে এবং মাসীমাকে আমার দেরীর কারণ সম্বন্ধে জেরা ক'রে ব্যস্ত ক'রে তোলে। আমি বন্ধ দরজা খুলে দেবার জন্য বাড়ী ফিরে সদর দরজার কড়া যেভাবে নাড়ি তার সুরটুকু শীলার মুখস্থ—আমি এসে কড়া নাড়া দিলেই সে ঠিক বলে দেও ওই সমীরদা দরজা ঠেল্‌ছেন এবং নিজে এসে দরজা খুলে দেয়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি যেন একটা দুশ্চিন্তা থেকে সদ্য নিষ্কৃতি পাওয়ার ছবি তার মুখে ফুটে উঠেছে। এই কড়ানাড়ার সুরের অনুমান তার নাকি শতকরা একশত ক্ষেত্রে ঠিক হয়। এ সকল কথা আমি মাসিমার কাছ থেকে শুনি। মাসিমা তাঁর মেয়ের সাম্‌নেই এ কথা আমাকে কতবার ব'লেছেন। কিন্তু মেয়ের তা' শুনে শুধু উৎফুল্লতা ও গর্ব্ব ছাড়া আর কিছুর উদয় হওয়া কখনও দেখি নি। মাসিমার কাছে এও শুনেছি, যে আমাকে চা না খাইয়ে সে আভার সঙ্গে ছাদে যায় না। আমার কোনদিন বাড়ী ফির্‌তে দেরী হ'লে আভাকে নাকি সেদিন ফিরে যেতে হ'য়েছে।

এম্নি ক'রে কায়মনোবাক্যে সে যে কেবল আমারই সচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখ্‌ত তা নয়, আমার মাকে সে এত যত্ন ও সেবা ক'রত, যে তিনি দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার প্রচার ক'রতেন, যে তাঁর নিজের মেয়ে নেই—কেউ থাক্‌লেও যে শীলার চেয়ে বেশী যত্ন ক'রতো না—তার কোনও ভুল নেই।

শীলার পঞ্চদশ জন্মতিথির দিন মাসিমা আমাকে কতকগুলি উপহারের জিনিষ কিনে আন্‌তে ব'ললেন। আমি নানাবিধ দ্রব্যের মধ্যে একটা জয়পুরী মিনে-করা সিঁদুরকৌটা নিয়ে ১১টার সময় বাড়ী ফিরলাম। কৌটোটার 'ছিরি' দেখ্‌বার মাত্র মা, মাসিমা, শীলা, আভা সকলের মুখে চোখে এমন একটা বিকট অপছন্দর ভাব একসঙ্গে ফুটে উঠ্‌ল। তাঁরা আমার পছন্দর রকম দেখে আমার প্রতি যেন একটু অনুকম্পার দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মা ব'ললেন, 'হ্যাঁরে জন্মতিথির উপহারে একটা ময়ূরের ছবি আঁকা কৌটো আন্‌লি, তোর কি আক্কেল ?' শীলা ব'ল্লে, "সমীরদা ময়ূর আন্‌লেন, কার্ত্তিক কই ?" আভা তার বন্ধুর জন্মতিথিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সে সমস্ত দিন এ বাড়ীতেই প্রায় ছিল। তখন সে শীলার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে শীলাকে চুপি চুপি ব'ললে, "কার্ত্তিক ত' সমীরদা নিজেই—সাম্‌নেই ত ময়ূরে চড়বার জন্য দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।" মাসীমা ব'ললেন, "বাবা

সমীর, তুমি ওদের কথায় কান দিও না, খাওয়া-দাওয়া ক'রে ওবেলা আর একটা কৌটো নিয়ে এসো, ওটা বাড়ীতে থাক্।" শীলা একথা শুনেই ওম্নি ফোঁস ক'রে উঠ্ল। ব'ললে, "মা তুমি কি গো, এই জষ্টি মাসের রোদে তুমি সমীরদাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেল্তে চাও না কি? সমীরদা যদি আর কৌটো আন্তে যায়, তবে আমি খাবও না, কিচ্ছু নেবোও না। ওই কৌটোই আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে, খুব ভাল পছন্দ হ'য়েছে।" কৌটো অধ্যায় এখানেই শেষ হ'লো।

কিন্তু আমি ভাব্তে লাগ্লাম এই স্নেহময়ী, মমতাময়ী বালিকার কথা। আমার পছন্দকে সকলে যখন কঠিনভাবে সমালোচনা ক'রছিলেন, শীলার তখন বোধহয় আমার অবস্থা দেখে সমবেদনায় প্রাণটা ভ'রে উঠ্ছিল। মাসিমা যখন আবার ওবেলা যেতে ব'ললেন, শীলার তাই সেটা একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠ্ল। আভা এর মধ্যে কখন সুড়ুৎ ক'রে বাড়ী চ'লে গে'ছল। শীলা তাকে ডাক্তে গেল। মা, মাসিমা আমাদের খাবার দেবার আয়োজন ক'রতে গেলেন। শীলা আভাকে নিয়ে বাড়ী ফির্ল। এসে তু'জনে একেবারে আমার বস্বার ঘরে ঢুকল। শীলা আজ আভাকে আমার কাছে 'ফর্ম্যালি ইন্‌ট্রডিউস্' ক'রে দিলে। আভাকে দেখিয়ে আমাকে ব'ল্লে 'এটি আমার বন্ধু,' আমাকে দেখিয়ে আভাকে ব'ল্লে 'ইনি আমার 'ইয়ে'—মানে সমীরদা'। আভা 'ইয়ে' শুনে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে হাসতে লাগল। শীলাকে যেন সে আর কিছু ব'লতে দেবে না। 'ইয়ে'তেই পূর্ণচ্ছেদ ক'রে দিতে চায়। সে যত প্রগল্‌ভতার সঙ্গে হাসে, ততই যেন শীলা সপ্রতিভ-ভাবে তাকে উড়িয়ে দিতে চায়—এইরকম ভাব দেখায়। আমি ব'ললাম, "আভারাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা কি তোমার আমাকে জন্মদিনের বক্‌শিস্ দেওয়া হ'ল।" শীলা ব'ল্লে 'ধ্যেৎ'। ভাবটা যেন—তোমাকে যে উপহার দিতে মন চায়, তার তুলনায় এটা কিছু না।

তু'একটা কথাবার্ত্তা হ'তেই আমাদের খাবার ডাক প'ড়ল। শীলাও তার সকল গুরুজনদের প্রণাম ক'রে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে ব'সল। আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রতে আস্তেই আমি স'রে এলাম। সে মুখ নীচু ক'রে জোর ক'রে প্রণাম ক'রলে। আমিও আশীর্ব্বাদ ক'রলাম। কিন্তু তাকিয়ে দেখি, তার চোখ ছলছল ক'রছে। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। আজ তার জন্মদিনে, কোন্ ব্যথায় তার আঁখিতে অশ্রু? আমি ভেবে কূল পেলাম না। শীলা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আভার পাশে খেতে ব'সল। আজকের দিনে মা ও মাসীমা তাকে হেঁসেলের দিকে মাড়াতে দেন নি। স্নান করে, কপালে সিঁদুরের একটি ফোঁটা নিয়ে, ভাল কাপড় প'রে সকাল থেকে সে আভার সঙ্গে গল্প ক'রছে এবং যা কখনও ঘটে না আমাদের—সে আমার পাশে আহারে বসে গেছে।

আমি খেতে ব'সে, প্রত্যহ খাবার আগে পঞ্চভূতকে অন্ন, ব্যঞ্জন ও জল ব্রাহ্মণদের মত দিই। শীলা আমার আজ সেরকম করা দেখে জিজ্ঞাসা ক'রল, আমি কেন ওরকম করি এবং সেও কারণ জেনে এরকম করতে চায়। আমি ব'ললাম, "আমি যা করি, তা তোমার করার দরকার কি?" সে ব'ললে, "ভাল লাগে" ব'লে চুপ ক'রে খেতে লাগ্ল।

(৪)

মাস কয়েক পরে। সকালে পড়ার ঘরে সবেমাত্র ব'সেছি—এমন সময় পাশের বাড়ী থেকে উচ্চৈঃস্বরে নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ কানে এল। খোঁজ ক'রে দেখি আভাদের বাড়ী লোকজন জড় হ'য়ে গেছে। আভার মামা ডাক্তার মিত্র প্রাতে বাহিরের ঘরে এসে ব'সেই হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। একটু আগে শীলার বাবা শান্তগম্ভীর যে বাড়ীর পাশ দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, সেই পাশের বাড়ীর সামনে হঠাৎ লোকের ভিড় দেখে শঙ্কিত ভাবে দ্রুতগতিতে এসে যা দেখ্লেন, তাতে তাঁর মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে গেল।

আভা ও শোভার বুকফাটা কান্না দেখে আমারও চোখে জল এলো। কিন্তু কর্ত্তব্য অতি কঠোর। আমরা রওয়ানা হ'লাম। শ্মশান থেকে যখন ফির্লাম তখন বেলা শেষ হ'তে বেশী দেরী নেই। মা ও মাসীমা, আভা ও শোভাকে এ বাড়ী নিয়ে এসেছেন। শোভা অচেতন হ'য়ে ভাঁড়ারের মেঝেয় প'ড়ে র'য়েছেন, আভা শীলার সঙ্গে অন্য ঘরে ব'সে নিজের অসহায় দুর্ভাগ্যের কথা ব'লছিল

আর চোখের জল মুছ্‌ছিল। শোভার কান্না শুনে, উঠে এসে তার দিদির গলা জড়িয়ে ধ'রে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। ডাক্তার মিত্রের অভাবে এই দু'টি মেয়ে আজ জগতের সকল প্রাণীর চেয়ে নিজেদের বেশী নিরাশ্রয় ভেবে কাতর হ'তে লাগ্‌ল। মা, মাসীমা ও শীলা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও এদের শান্ত ক'রতে পারলেন না।

শীলার বাবা পাশের বাড়ী গিয়ে ডাক্তার মিত্রের বাড়ীতে সমস্ত তৈজসপত্রাদির তালিকা ক'রে ঘরে চাবি দিয়ে এলেন। সে বাড়ীর সমস্ত চাকর-বাকর এবং এ বাড়ীর একজন চাকরকে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে এলেন। আভা ও শোভার তিন দিন এ বাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

চতুর্থ দিনে শোভা বাড়ী খুলে পিতার চতুর্থীশ্রাদ্ধ ষোড়শোপচারে ক'রলেন। কয়েকদিন পর শোভার শ্বশুরালয় থেকে তাঁর এক দেবর তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য এলেন; শোভা বুঝলেন, তাঁর কলিকাতায় আর থাকার প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি পিতার গৃহ ও তৈজসাদি চাবি দিয়ে শ্বশুরালয় পশ্চিমে এখনই যেতে পারতেন কিন্তু আভাকে তাহার মাতুল পিতৃমাতৃ-হীন অবস্থায় এনে পালন করিতে মনস্থ করেছিলেন তাই তার কোনও ব্যবস্থা না করে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা ছাড়া হ'ল না। শোভার দেবর কিছুদিনের জন্য কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হলেন। এলাহাবাদে তিনি আইন পড়েন, এখন পূজার জন্য কলেজ বন্ধ। শোভা এখন প্রায় এ বাড়ী আসেন। মাকে ও মাসীমাকে 'মাসীমা' বলেন।

একদিন শোভার দেবর শীলার বাবাকে বললেন, "মিঃ বসু, বউদিদির নিকট শুন্‌লাম্ আপনি বাড়ী কিনতে চান, যদি ডাঃ মিত্রের বাড়ী আপনার অপছন্দ না হয় তবে আপনিই কিনে বউদিদিকে দায়মুক্ত করুন। দামের জন্য আটকাবে না।" এতদিন এ কথাটা এ বাড়ীর কেউ ভেবে দেখেন নি। শোভা যাওয়া আসা করে মাসীমার কাছে তাঁর বাড়ী কেনার ইচ্ছার কথা জেনেছিলেন—কিন্তু বাপের এই বাড়ীখানি বিক্রয়ের কথা নিজে তাঁর কাছে বলতে মুখে ভাষা তাঁর যোগায় নি। শীলার বাবা এ বিষয় বাড়ীতে সকলের মত চাইলেন—মাসীমা রাজী হলেন না। শোভার দেবরের কলেজ খুলিবার সময় হ'ল। এদিকে আভার থাকার কোনও ব্যবস্থা বা বাড়ী ও ডাক্তার মিত্রের আসবাব প্রভৃতির কোনও বন্দোবস্ত হ'ল না। অতএব শোভার দেবর চলে গেলেন এবং জানিয়ে গেলেন যে ইতিমধ্যে এ-সবের কোনও ব্যবস্থা না হলে বড়দিনের ছুটীর কিছু আগেই তিনি কলিকাতায় আসবেন।

আভা ও শোভা এ বাড়ীর তত্ত্বাবধানে আরও কিছুদিনের জন্য থেকে গেলেন। আভা স্কুলে গেলে, শোভা ছেলেটিকে নিয়ে এ-বাড়ী চ'লে আসেন। লোকজন সকলেই পূর্ব্ববৎ বাহাল রহিল। (ক্রমশঃ)

গোবিন্দদাসের কড়চা-রহস্য *

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

স্বর্গগত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় যখন "গোবিন্দদাসের কড়চা" পুস্তক প্রকাশ করেন, তখনই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় পুস্তকখানিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সংবাদপত্রাদিতে এবং সভা-সমিতিতে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। এমন কি অনেকে পুস্তকখানিকে জাল বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

এই বিপুলা পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যেক মন্দ জিনিসই যেমন কাহারো না কাহারো প্রীতি আকর্ষণ করে, নিতান্ত দুরন্ত বালকও যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাপর ভাইভগিনী অপেক্ষা মাতার অধিকতর বাৎসল্য অধিকার করে, এই কড়চাখানিও তেমনই প্রথম হইতেই সুপণ্ডিত রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল। তিনি কারণে অকারণে, স্থানে অস্থানে, স্বরচিত পুস্তকেও নিবন্ধে কড়চা লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্তবিধ বিরুদ্ধ-সমালোচনা তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যে রায়বাহাদুরের সুসম্পাদনে কড়চার একটী রাজসংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই

* শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত। মূল্য ৷৹ আট আনা।

সংস্করণে রায় বাহাদুর লিখিত একটী সুবৃহৎ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকায় সুপণ্ডিত রায় বাহাদুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায়, বিবিধ বাগ্‌বৈদগ্ধে সুপ্রচুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা এবং প্রভূত সার্থক পরিশ্রম সহকারে নানা তথ্যের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক যুক্তিবলে সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে "গোবিন্দ কর্ম্মকার এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর পূর্ব্বসেবক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পুরী-প্রবাসের প্রিয় ভৃত্য শ্রীগোবিন্দ একই ব্যক্তি। এই কর্ম্মকার-পুত্রই প্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে শুভ বিজয় করিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ বৈষ্ণবকুলকে কৃতার্থ করিবার জন্য অবসর মত লেখনী ধরিয়াছিল। জয়গোপাল প্রভু যাহার দ্রষ্টা, সেই কড়চা গ্রন্থ কর্ম্মকার-পুত্রেরই পূত লেখনী প্রসূত। কর্ম্মকার-পত্নী দুর্ম্মুখী শশিমুখীর ভয়েই নাকি কড়চাখানি গুপ্ত ছিল, অধুনা চারি শত বৎসর পরে সে ভয়ের বিশেষ কারণ না থাকায় তাহা লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে এবং রায় বাহাদুর কবি-পরিচিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।" হায় মা শশিমুখী, তোমার জন্য আজ আমরা অকাতরে শোক করিতেছি। আজ তুমি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের মত অনেককেই এতাদৃশী ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত না! ভূমিকায় অনেক কথা আছে। আমরা তাহা বিমুগ্ধচিত্তে পাঠ করিয়াছি এবং রায় বাহাদুরকে শত ধন্যবাদ দিয়াছি। কারণ ভিখারী বাঙ্গালী বৈষ্ণবের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষিত রায় বাহাদুরের নাগালও ধরিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

সংসারে এমন এক একজন মানুষ থাকেন—অন্যায় যাঁহার সহ্য হয় না। দীনের উপর উৎপীড়ন যিনি দেখিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় সেই প্রকৃতির মানুষ। অবশ্য গোবিন্দদাসের কড়চা জালপ্রতাপচাঁদের কাহিনী কিম্বা ভাওয়াল-সন্ন্যাসীর মামলা অপেক্ষা কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। কিন্তু ভক্তিভূষণ মহাশয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই বর্দ্ধমানী বা ভাওয়ালী কাণ্ড উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারিলেন না। শত কাজ সত্ত্বেও অবসর দৈন্যে ক্লান্ত হইয়াও তাই তিনি "গোবিন্দ দাসের কড়চা রহস্য" প্রণয়ন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের আশীর্ভাজন হইলেন। এই রহস্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মনে হইল, বৈষ্ণব সাহিত্যে—বিশেষ চরিতগ্রন্থে এবং পদাবলী পর্য্যায়ে প্রণেতার প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা অনেকেরই ঈর্ষার সামগ্রী। প্রায় দেড়-শতাধিক পৃষ্ঠায় চৌত্রিশ দফায় তিনি ধীরে ধীরে কড়চা রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কড়চায় উল্লিখিত ও ভূমিকায় লিখিত অসামঞ্জস্যগুলি যেন ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নখদর্পণে রহিয়াছে, তিনি অতি সহজে তত্তৎ বিষয় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন মাত্র।

ভক্তিভূষণ মহাশয়ের যুক্তিগুলি যেমন অকাট্য, তেমনই জটিলতাহীন। ভাষা যেমন সাবলীল তেমনই প্রাঞ্জল। নানা কারণে বিরক্ত হইয়া কড়চার ভূমিকায় প্রবীণ রায় বাহাদুর একটু কঠোর স্বরে বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি মধ্যে মধ্যে যে কটূক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছেন ভক্তিভূষণ মহাশয়ের রহস্যে তাহার উপভোগ্য আস্বাদনে সেটুকু মনে রাখিবার আর কোন কারণ থাকে না।

কড়চা প্রকাশের প্রথম ইতিহাস, বিরুদ্ধ আন্দোলন, পুনঃপ্রকাশ, রায় বাহাদুরের সাক্ষী সংগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় ভক্তিভূষণ মহাশয় সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ কর্ম্মকার বলিয়া কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব বৈষ্ণব সাহিত্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন যে কড়চাখানি জয়গোপাল প্রভুরই "স্বরচিত"। স্বর্গীয় কালিদাস নাথ মহাশয়ের সঙ্গে সে কড়চার পুঁথি উদ্ধারের কোন সংস্রব ছিল না। কড়চার বিবরণ সত্য হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দাক্ষিণাত্যে গিয়া দিক্‌ভ্রমে পড়িয়া এই পশ্চিমে আবার পূর্ব্বে, এই উত্তরে এই দক্ষিণে ছুটাছুটীতে কিরূপ হয়রাণ হইতে হইত, প্রেমদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কিরূপে কড়চার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিপুণ ব্যবহারাজীবের ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তিভূষণ মহাশয় আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

যে গোবিন্দ দক্ষিণে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিল, সে পুরীতে ফিরিয়া বাঙ্গালায় গেল। সেখান হইতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের দলে ভিড়িয়া পুরীতে আসিল এবং ঈশ্বর পুরীর সেবক পরিচয়ে শ্রীমহাপ্রভুর চাকুরী গ্রহণ করিল। অথচ শ্রীমহাপ্রভু অথবা অপরাপর বৈষ্ণবগণ কেহই তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। রায় বাহাদুরের এই "লজিক" হজম করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম। রহস্য পাঠে আশ্বস্ত হইলাম যে বাস্তবিকই আমাদের এরূপ লজ্জার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

কড়চা-রহস্য পুস্তকখানি আমরা প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় অপরাপর প্রামাণ্য বৈষ্ণব গ্রন্থের মত এই রহস্য গ্রন্থখানিকে গৃহে স্থান দিলে উপকৃত হইবেন। আমরা কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এই রহস্য গ্রন্থখানি তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে।

আমাদের মনে হয় এই সমস্ত ভ্রম সংশোধিত হওয়ায় কড়চার ও ভূমিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যে আবির্ভাব ও তিরোভাব, —দুইটী গূঢ়ার্থব্যঞ্জক পারিভাষিক শব্দ। জয়গোপাল প্রভু অথবা রায় বাহাদুরের যত্নে আবির্ভাবের পর ভক্তিভূষণ মহাশয়ের হস্তে এতদিন পরে যদিই বা কর্ম্মকার তনয়ের তিরোভাব ঘটিয়া থাকে তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? জয়গোপালের রচিত হইলেও কড়চার কবিত্বের, রায় বাহাদুরের সম্পাদন গৌরবের এবং মৌলিক গবেষণার কোনরূপ অমর্য্যাদার কারণ দেখিতেছি না। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ রায় বাহাদুরের নিকট এক অপরিশোধ্য ঋণের গুরুভারে চিরতরে জর্জ্জরিত হইয়া রহিল।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বঙ্গদেশবাসীদিগের রোগ-নিবারণ ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের জন্য একটি বিভাগ আছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বিভাগ হইতে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা উক্ত বিভাগের ডিরেক্টার ডাক্তার আর, বি, খাম্বাটা তাঁহার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরের মে মাসে বাঙ্গালার বহু স্থানে ভীষণ ঝড়ের ফলে বহু ধন, জন ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আগষ্ট মাসে পদ্মার বন্যায় রাজসাহী জেলার বহু স্থান ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশ জলমগ্ন হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি-পাতের অভাবে শস্য নষ্ট হইয়া যায়। লোকের আর্থিক অবস্থার উপর স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে; সেজন্য আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কোথায়ই ভাল ছিল না—ইহাই গভর্ণমেণ্ট পক্ষের যুক্তি। ঐ বৎসর মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়ার কয়েকটি স্থানে অন্নকষ্ট দেখা গিয়াছিল—কাজেই সে অঞ্চলে রোগের প্রকোপও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে; দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীর সময় বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ১ হাজার ৮০ জন। উহা ১৯৩৩এ হইয়াছিল ৫ কোটি ৬ লক্ষ ২ হাজার ৮ শত ৪২ এবং ১৯৩৪এ হইয়াছে ৫ কোটি ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ১ শত ৭৮—। জন্ম-মৃত্যুর হিসাব হইতে দেখা যায়—জন্ম অপেক্ষা বাঙ্গালায় মৃত্যুর হার কম। ১৯৩৪এ বাঙ্গালায় ১৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫ শত ২০ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত ৮৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব কি সত্য? আমরা ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালাদেশ ক্রমেই জনহীন হইয়া পড়িতেছে।

গ্রামগুলি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ায় লোক এখন আর গ্রামে বাস করিতে চাহে না। ফলে গ্রামগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। আলোচ্য বর্ষে হাওড়া ও বাখরগঞ্জ জেলায় গ্রামগুলির অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামগুলি এখনও খুবই সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ দেখা যায় বটে, কিন্তু বীরভূম, যশোহর, বগুড়া ও ফরিদপুরের গ্রামগুলির অবস্থা দিন দিন অধিকতর ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। গ্রাম-গুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য নানাদিক দিয়া নানা প্রকার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও তাহা ফলদায়ক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সহরে বাস অপেক্ষা গ্রামে বাস করাই সুবিধাজনক—এই কথা যদি গ্রামের লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় ও তাহার ফলে ক্রমে লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহারা গ্রামে ফিরিয়া যাইবে তাহারা যাহাতে তথায় থাকিয়া জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয় গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য দান করেন, তবেই আবার গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হইতে পারে।

রোগের প্রকোপ

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের ৩ হাজার ১ শত ৯৬ জন কলেরা রোগে, ৮ হাজার ২ শত ৯৬ জন বসন্তরোগে ও ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪ শত ৯২ জন জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বন্যা বা অনাবৃষ্টির মত এদেশে কলেরা ও বসন্ত প্রায় বারমাসই হইতে দেখা যায়। টীকা দেওয়া ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাঙ্গালা কলেরা বা বসন্তের আক্রমণ হইতে মুক্ত হয় নাই। এখানে যে জ্বরের হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ১ শত ৯১ জন মারা গিয়াছে। এই রোগগুলি বাঙ্গালাদেশে একচেটিয়া ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়া আছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কোন কোন

দেশের গভর্ণমেণ্টের সুব্যবস্থার ফলে সে সকল দেশ ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইলেও আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট কুইনাইন বিতরণ ছাড়া তাহাদের অপর কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করেন না। আর একটি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কথা এখানে বলা বিশেষ প্রয়োজন। বাঙ্গালাদেশে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ হাজার ৮ শত ২ জন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ হাজার ৮ শত ৪৫ জন যক্ষা রোগে মারা গিয়াছে। এই রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে উক্ত রোগ এদেশে ছিল না বলিলেই চলে। অনিয়মিত-ভাবে ভেজাল খাদ্য গ্রহণই যে উহার একমাত্র কারণ, তাহা অনেকেই বলিতেছেন; সহরগুলির খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থার ত্রুটিও সেজন্য কম দায়ী নহে। কিন্তু যক্ষারোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিয়াও গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ঐ রোগ নিবারণের কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই কেন?

নারিকেল ছোবড়ার ব্যবহার

নারিকেলের ছোবড়া হইতে যে দড়ি, গদি প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার প্রস্তুত-প্রণালী বাঙ্গালা দেশের লোকদিগের জানা ছিল না। সিংহলদ্বীপে, দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি স্থানের লোক নারিকেল ছোবড়ার ব্যবহার জানে এবং তাহাদের প্রস্তুত দড়ি, ম্যাটিং, পাপোষ প্রভৃতি দ্রব্য শুধু ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয় না—প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের নারিকেল-ছোবড়া-জাত দ্রব্য প্রতি বৎসর ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু নারিকেলের ছোবড়াগুলি প্রায়ই জ্বালানি হিসাবে এখানে পোড়াইবার কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছোবড়াগুলিকে অপেক্ষাকৃত লাভজনক কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে একদিকে যেমন ছোবড়াগুলি বিক্রয় করিয়া গৃহস্থগণ লাভবান হইতে পারিবে, আর একদিকে নূতন শিল্প শিক্ষার ফলে বাঙ্গালার বহু লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া চারিটি কেন্দ্রে যুবকদিগকে ছোবড়া হইতে দ্রব্য-প্রস্তুত-শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারে, মেদিনীপুর জেলার তমলুকে, বাখরগঞ্জ জেলার বাটাজোড়ে এবং নোয়াখালি জেলার লক্ষ্মীপুরে ৬০টি যুবক বর্ত্তমানে উক্ত শিল্প শিক্ষা করিতেছে।

বাটাজোড়ে দুই জন যুবক দুইটি কারখানা স্থাপন করিয়া ছোবড়া হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরেও ছয়টি পরিবার ঐ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তমলুকে কেন্দ্রীয় সমবার ব্যাঙ্কের উদ্যোগে একটি বড় ছোবড়ার কারখানা খোলার আয়োজন হইয়াছে এবং তিনটি ছোট কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে সরিষা গ্রামেও একটি কারখানা ও শিক্ষাকেন্দ্র শীঘ্রই খোলা হইবে। ঐ সকল নূতন কারখানার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সেগুলিও স্থানীয় সূত্রধর ও কামারদের দিয়াই প্রস্তুত করান হইতেছে। ঐ সকল কারখানা হইতে বাজারে যে মাল বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি বিদেশজাত দ্রব্য অপেক্ষা কোন অংশেই খারাপ নহে। বাঙ্গালায় এমন অনেক কাঁচা মাল পাওয়া যায়, যাহার ব্যবসায়ের ফলে দেশ সত্যই সমৃদ্ধ হইতে পারে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেশবাসীদিগের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। এই ছোবড়া-শিল্পের মত কতকগুলি নূতন শিল্প যদি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের বেকার সমস্যা যে অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শিক্ষার গলদ কোথায়?—

আজকাল প্রতি বৎসরই বহু স্থানে শিক্ষকগণের বার্ষিক সম্মিলন হইয়া থাকে এবং তাহাতে শিক্ষকগণের অভাব-অভিযোগাদির কথা আলোচিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থানেই নির্ব্বাচিত সভাপতিরা শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে বড় বড় কথা শুনাইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। সম্প্রতি খ্যাতনামা অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বগুড়ায় জেলা শিক্ষক সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া মামুলী কথা না শুনাইয়া অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"শিক্ষকগণের বেতন কম বলিয়া শুধু যে তাঁহারা নিজেরা অসন্তুষ্ট থাকেন তাহা নহে, তাঁহাদের দারিদ্র্যের জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতেও তাঁহারা কিছুমাত্র মর্য্যাদা পান না। সেজন্য অনেক সময়

নলিনীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে আরও তিনটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন —(ক) দিব্যস্মৃতি-উৎসব উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত্ত বা হালিক কৈবর্ত্তগণের সাম্প্রদায়িক উৎসব। (খ) উত্তরবঙ্গে ধীবর-দীঘি নামে ৪০।৫০ বিঘা পরিমিত একটি দীঘি আছে। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উহা দিব্যের *খনিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। (গ) দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন, অতএব ধীবরদিগেরও উহাতে যোগদান করা উচিত।

দিব্যস্মৃতি উৎসবের উপর সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কারোপের কোন ভিত্তি নাই। ইহা বিশেষ কোন সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠিত বা সম্প্রদায়বিশেষের গৌরব ঘোষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশেষ বিপৎকালে দিব্য অনন্ত-সামন্ত-চক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সমগ্র বঙ্গের হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের উৎসব। (৮)

লেখক এখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিবর-দীঘিকে ধীবর-দীঘি বলিয়া তদনুকূলে বুকানন সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রায় ১৩২ বৎসর পূর্ব্বে বুকানন তাঁহার জরীপ বিভাগের আমীনের কথামত দীঘির বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি নিজে উহা দেখেন নাই, দীঘির নাম যে দিবর তৎসম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

১। জমিদারের অতি প্রাচীন কাগজপত্রে উহা দিবর দীঘি ও মৌজাটি তরফ দিবর নামে লিখিত রহিয়াছে। আকবরের রাজত্বকালে যখন এ দেশের জরীপ জমাবন্দী হয় তখন হইতে এই তরফ নাম প্রচলিত। কাজেই বলা যায় যে সে সময়ও ইহার নাম দিবর ছিল।

২। Survey of Indiaর পত্নীতলা থানার মানচিত্রে, রেনেলের মানচিত্রে ও শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মানচিত্রে দিবর নাম আছে।

৩। উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনের ১৩১৬ ও ১৩২০ সালের অধিবেশনে পঠিত ৪টি প্রবন্ধে উহা দিবর নামে অভিহিত হইয়াছে। লেখকেরা কেহই নলিনীবাবুর ইঙ্গিতানুযায়ী সম্প্রদায়-বিশেষের লোক নহেন।

৪। স্থানীয় জনসাধারণ উহাকে দিবর নামে অভিহিত করে। তবে বুকাননকে যিনি ধীবর শুনাইয়াছেন তিনি মনে করিয়া থাকিবেন দিবর অশুদ্ধ, ধীবর শুদ্ধ। বিশেষতঃ তখন বর্ত্তমান ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। দিব্য নামে যে কোন রাজা ছিলেন রামচরিত আবিষ্কারের পূর্ব্বে কেহই তাহা জানিতেন না। এমন কি তৎপূর্ব্বে কেহই কমৌলি-লিপির চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

৫। শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার গত বৎসরের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে উহাকে দিবর-দীঘি বলিয়াছেন।

৬। গবর্ণমেণ্ট স্তম্ভরক্ষার বিজ্ঞাপনে দিবর-দীঘি বলিয়াছেন।

৭। স্বয়ং নলিনীবাবু ১৩২১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসীতে' 'মহীপাল প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—২য় মহীপালের রাজত্বকালে যে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া পালরাজ্য উণ্টাইয়া দিয়াছিল সেই কৈবর্ত্তরাজা দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি ধীবর-দীঘি বা দিবর-দীঘি এবং ভীম-জাঙ্গাল এই (কোটিবর্ষ) সীমার মধ্যে। (৯)

১৯১৩ অব্দে বালুরঘাট স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় নলিনীবাবু দীঘিটী দেখিয়াছেন বলেন (মানসী-মর্ম্মবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ)। অথচ বুকাননের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন উহা ৪০।৫০ বিঘা হইবে। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিনাজপুর অধিবেশনে (১৩২০ সাল) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি-এল 'বালুরঘাটের কয়েকটী প্রাচীন স্থানের পরিচয়' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি বলেন—'দিবর-দীঘি অনুমান অর্দ্ধমাইল লম্বা ও প্রস্থে কিছু নূ্যন হইবে।" বালুরঘাটের উকীল চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন দীঘিটিকে পাড়সমেত অর্দ্ধমাইল লম্বা বলিতেছিলেন ঠিক তখনই বালুরঘাটে বসিয়া ভট্টশালী মহাশয় বুকাননের কবলে পড়িলে তাঁহাদিগকে তাড়াইতে প্রবল চেষ্টার দরকার হইবে ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু পরবর্ত্তী যুদ্ধবিগ্রহে কৈবর্ত্তরাজগণ অনন্তসামন্তচক্রের সাহায্য কখনও পাইয়াছিলেন, এমন কথা রামচরিতে নাই।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৮)

[অনন্ত সামন্ত চক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের ফল হল করিয়া দিব্য কেমন করিয়া হরণ করিয়াছিলেন তাহা অনেকবার বলিয়াছি।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (৯)

[বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে কি এই সাধারণ কথাটা বুঝাইতে হইবে যে, হালে কে কি বলিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ১২৫ বছর আগে বুকানন যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক বেশী? অন্যত্র বলিয়াছি,—যে গ্রামে দীঘিটি অবস্থিত তাহার নাম **তরফ ধীবর** এবং তাহা হইতেই দীঘিটিকে বলা হয় **ধীবর-দীঘি**। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এবং তাঁহার পক্ষের সকলে বলিতে চাহেন, গ্রামের নাম **তরফ দিবর** এবং দীঘির নাম **দিবর-দীঘি,** অর্থাৎ দিব্যের দীঘি। কিন্তু ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দে গ্রামের নাম কি করিয়া হয়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন—**দিবর-দীঘি** হইতে গ্রামের নাম **দিবর** হইয়াছে। উহা যে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দ, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই যুক্তি যাঁহার গ্রহণ করিতে হয় করুন।

বরেন্দ্রী ভূমিতে কৈবর্ত্ত রাজত্বের মেয়াদ ২০।৩০ বছরের বেশী নহে। উহার নায়কগণের নাম লোকের ভুলিয়া যাইবারই কথা; বরেন্দ্রী ভূমিতে কতকগুলি উচ্চ রাস্তা ভীমের-জাঙ্গাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কোন বড় বা উঁচু জিনিসকে পাণ্ডব ভীমের নামের সহিত যুক্ত করার পরিচয় আমাদের দেশে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই কি ঐ সমস্ত কৈবর্ত্তরাজ ভীমের বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে? গুরব মিশ্রের প্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভ বরেন্দ্রীর অভ্যন্তরেই স্থিত এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা ভীমের পান্টি নামে পরিচিত। ইহাও কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? বগুড়া জেলায় ভীমের জাঙ্গালের অংশ প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর বৃহৎপ্রাকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রভাসবাবুর Mahasthan and its Environs দ্রষ্টব্য। উহাও কি কৈবর্ত্তরাজ ভীমের নির্ম্মাণ?]

কথামত উহাকে ৪০।৫০ বিঘা মাত্র দেখিতে পাইলেন; আশ্চর্য্য বটে! ইহাতে মনে হয় নলিনীবাবু হয় দীঘিটী দেখেন নাই, নতুবা দিব্যের কৃতকর্ম্মকে ইচ্ছা করিয়া ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদের সয়দাবাদ বাঙ্গালপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দীঘির মালিক। কয়েক বৎসর হইল তাঁহাদের প্রজা দীঘির অগ্নিকোণে পাড় কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতেছে বলিয়া দীঘির জলভাগ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি প্রথম বার্ষিক দিব্য-স্মৃতি উৎসবে অন্ততঃ ১০টী জেলা হইতে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তি দেখিয়াছেন দীঘির কেবল জল ভাগের পরিমাণ এখনও ৩০০ বিঘার অধিক হইবে। ইহার মধ্যে ১৮০ বিঘা ধান্য চাষের জন্য জমিদার-সেরেস্তা হইতে বন্দোবস্ত হইয়াছে। আশঙ্কা হয় অচিরে জমিদারের লোভ ও কৃষকের ক্ষুধা মিলিত হইয়া শত শত বৎসরের এই কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। নলিনীবাবু কথিত ৪০ বিঘাও অবশিষ্ট থাকিবে না। (১০)

দিবর-দীঘি, ভীম-জাঙ্গাল যদি ঐতিহাসিক নামের সহিত সংস্কিত না হয়, উহা যদি দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার না করা হয়—তাহা হইলে দিনাজপুরের মহীপাল-দীঘি, মুন্সীগঞ্জের রামপাল-দীঘি, নবদ্বীপের বল্লাল-দীঘির প্রতিষ্ঠাতাও মহীপাল, রামপাল, বল্লাল হইতে পারেন না। কেবল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নহেন, স্বয়ং নলিনীবাবুও দিবর-দীঘি ভীম-জাঙ্গালকে দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি।

লেখক নওগাঁ মহকুমার প্রসিদ্ধ দীঘির ভীমসাগর নাম নূতন কি পুরাতন এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভীম-জাঙ্গালের পার্শ্বস্থ এই ভীম-সাগরের অস্তিত্ব আমরা প্রথম জানিতে পারি 'আজমীর-পথে' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা নওগাঁর খাঁন্ সাহেব মহম্মদ আফজল মহোদয়ের লেখা হইতে। বগুড়া, নওগাঁ, বালুরঘাট মহকুমার অধিবাসিবৃন্দ ইহাকে পুরুষানুক্রমে ভীমসাগর বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। নলিনীবাবু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইলে তাহার আজ প্রতীকার কি? (১১)

লেখক দিব্যের চিত্র মসীময় করিয়াছেন, তাঁহার কৃতকর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়াছেন—ইহাতেও তাঁহার সমগ্র গৌরব বিনষ্ট হয় নাই মনে করিয়া তাঁহাকে জালিক জাতীয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তির জাতি নির্ণয় করিয়া তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। প্রবন্ধের 'কৈবর্ত্তরাজ দিব্য' নাম দেখিয়া এবং সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনে হয়—লেখকের নিকট দিব্যের ইতিহাস অপেক্ষা দিব্যের জাতি-নির্ণয় মহৎ ব্যাপার। চন্দ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—'মিলিত অনন্ত সামন্ত চক্র নির্ব্বাচিত গোপালও দিব্য জাতি-বর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন।' স্যার যদুনাথ বলিয়াছেন—'দিব্য ও ভীম নামে যে জাতি হউন কেন আসে যায় না।' এবারের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—'তিনি (দিব্য) বরেন্দ্রবাসী ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন, ইহাই আমাদের শ্লাঘার বিষয়!' সুতরাং বলিতে পারি উৎসবের উদ্যোক্তৃবৃন্দ দিব্যের জাতি নির্ণয় সম্পর্কে আদৌ আগ্রহান্বিত নহেন। কিন্তু নলিনীবাবুর জন্যই আমাদিগকে এই অনভিপ্রেত বিষয়ের আলোচনা করিতে হইতেছে।

লেখক বৈজয়ন্তী ও অভিধান রত্নমালার সাহেবী সংস্করণ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—"দিব্যের সমকালে কৈবর্ত্ত বলিলে জালিক কৈবর্ত্ত বুঝাইত। অতএব কৈবর্ত্তরাজ দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন।" অভিধান-রত্নমালা কোন হলায়ুধ প্রণীত তাহা অফ্রেক্ট সাহেব নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক অভিধান দুইখানি যে অমরকোষ দৃষ্টে লিখিত তাহা—কৈবর্ত্তো দাশোধীবরৌ (অমর), কৈবর্ত্তো ধীবরোদাশো (বৈজয়ন্তী) কৈবর্ত্তো ধীবরোদাসো (রত্নমালা) - উদ্ধৃত শ্লোকাংশেই বুঝা যায়। অমরকোষও একখানি অভিধান। অভিধান দেখিয়া কেহ জাতি বিচার করেন না। স্মৃতি, সংহিতাদি শাস্ত্র পারিপার্শ্বিক সংস্থান, সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিয়া জাতি বিচার হয়। মনুপ্রোক্ত মার্গব, পরাশর, স্মৃতিসিদ্ধ ভূজ্জকণ্ঠ শব্দ অমরকোষে ধৃত হয় নাই বলিয়া বলা যায়না যে মার্গব জালিক নহে, পরাশর নিষাদ নহে বা ভূজ্জকণ্ঠ অকণ্ঠ নহে! বা ইহারা ঐ সময় বিলুপ্ত হইয়াছিল, অমরকোষের ন্যায় অভিধান-রত্নমালায় যে শব্দের একার্থমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে অফ্রেক্ট সাহেবও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যেমন দ্বিবিধ বৈশ্য, দ্বিবিধ করণ; তেমনই আচরণীয়

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১০)

[কোন বড় দীঘির আয়তন চোখে দেখিয়া অনুমানে ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। ১৯১৩ সনে আমি দীঘিটি দেখিয়াছি, সে আজ ২৩ বছরের কথা। তাই স্মৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বুকানন যাহা লিখিয়াছেন তদনুসারেই দীঘির আয়তন লিখিয়াছিলাম। Cunningham লিখিয়াছেন (Reports—Vol. XV. P. 123) দীঘিটি প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে সিকি মাইলেরও উপরে। দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার ১ ইঞ্চি=১ মাইল রঙ্গিন মানচিত্র Bengal Drawing office কর্ত্তৃক ১৯১২ সনের ৯ই জানুয়ারী প্রচারিত হইয়াছে; উহাতে দীঘিটি দেখান আছে এবং উহা হইতে দীঘিটির মাপ পাইলাম লম্বায় ৬৮০ গজ, প্রস্থে ৫২৮ গজ। অথচ Cunninghamএর মত Surveyর মহারথীও অনুমান বলে দীঘিটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাত্র ৪০০ গজ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সরকারী মানচিত্র হইতে দীঘিটির এবার ঠিক মাপ দিলাম, আশা করি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইবার সন্তুষ্ট হইবেন!]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১১)

[ইতিহাস আলোচনাকারিগণের মন একটু সন্দেহপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভীমসাগর নামটি যদি পুরাণ নামই হইয়া থাকে, তবে আর কথা কি?]

অনাচরণীয় ভেদে অমরকোষের পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রে ও ব্যবহারে দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত বিদ্যমান আছে। (১২)

নলিনীবাবু শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত একখানি পুঁথি অনুসারে বলিয়াছেন—"বৌদ্ধগণ মৎস্যঘাতী বলিয়া কৈবর্ত্তগণকে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় প্রদান করেন নাই এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণ কৈবর্ত্তগণের কোন দিন উদ্ধার নাই এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।" দিব্য যদি এই কৈবর্ত্ত-জাতীয় হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন বৌদ্ধ নরপতি বিগ্রহপালও মহীপালের রাজত্বকালে রাজসভায় অত্যুচ্চপদ পাইতেন না। বৌদ্ধ কবি সন্ধ্যাকর দিব্যোর জাতি বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও মৎস্যাঘাতসূচক বা ঐরূপ অবজ্ঞাব্যঞ্জক উক্তি প্রকাশ করেন নাই। দিব্য জালিক জাতীয় হইলে বৌদ্ধ কবি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক প্রভুর রাজ্যহারী ঘোর শত্রুর সম্পর্কে তাহা নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। সুতরাং সন্ধ্যাকরের উক্তি হইতে প্রমাণ হয় দিব্য জালিক জাতীয় ছিলেন না। (১৩)

নওগাঁ, বালুরঘাট, বগুড়া অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাচীন শক্তিপীঠের পূজক মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। অথচ ঐ সকল স্থানের জমিদার বারেন্দ্র বা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দিব্য ধীবরজাতীয় হইলে ধীবরের ব্রাহ্মণই শক্তিপীঠসমূহে পূজা দিতেন। সুতরাং ইহাতেও প্রমাণ হয় দিব্য মাহিষ্যাপর নামা কৈবর্ত্ত ছিলেন।

মাহিষ্য ও জালিক উভয় জাতির একই কৈবর্ত্ত নাম থাকিলেও যে স্থানে কৈবর্ত্ত বলিলে জালিককে বুঝায় সেস্থানে মাহিষ্যাপরনামা কৈবর্ত্ত কথনই নিজদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেন না। পূর্ব্ববঙ্গে কৈবর্ত্তাখ্য জালিক থাকায় ঐ স্থানের মাহিষ্যগণ পূর্ব্বে হালিক দাস, পরাশরদাস নামে পরিচিত ছিলেন, উড়িষ্যায় কেওট বা কৈবর্ত্তাখ্য মৎস্যজীবী থাকায় মেদিনীপুরের মাহিষ্যগণ চাষী কৈবর্ত্ত নামে পরিচয় দিতেন। কিন্তু উত্তর মধ্য পশ্চিম বঙ্গে কৈবর্ত্তাখ্য ধীবর নাই বলিয়া ঐ সকল স্থানের মাহিষ্যরা পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত নামে পরিচয় দিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে বরেন্দ্রভূমে কৈবর্ত্ত বলিলে, মাহিষ্যকেই বুঝাইত। (১৪)

প্রবন্ধের প্রথমে নলিনীবাবু বলিয়াছেন—উত্তর বঙ্গের কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় কৈবর্ত্তরাজ দিব্যোর সিংহাসনপ্রাপ্তির স্মরণে উৎসব করিয়া আসিতেছেন। আবার ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—হালিককৈবর্ত্তগণ মহারাজ দিব্যকে নিজেদের জাতীয় বলিয়া দাবী করিয়া দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার স্মৃতি উৎসব করিতেছেন।—দেখা যাইতেছে নলিনীবাবু স্বীকার করিয়াছেন—উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত বলিলে হালিক কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য বুঝায়।

সন্ধ্যাকর ভীমের বর্ণনায় বলিয়াছেন—"রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল; সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন; পৃথিবী কল্যাণলাভ করিয়াছিল।" ২।২৪ এই 'সজ্জনগণের' মধ্যে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন! দিব্য যদি জালিক জাতীয় হন তাহা হইলে বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণাদি জালিকের দান গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছেন বলিতে হয়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? (১৫)

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১২)

[রামচরিতে দিব্যোর জাতির একমাত্র পরিচয়, তিনি কৈবর্ত্ত। সমসাময়িক অভিধানে এবং প্রাচীনতর অমরকোষে লিখে, কৈবর্ত্ত মানে ধীবর। অন্য কোন অর্থ এই আমলের কোন অভিধানে যদি থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখাইলেই তো তর্ক-বিতর্ক থামিয়া যায়! দুই জাতীয় কৈবর্ত্ত অমরকোষের পূর্ব্ব হইতেই আছে, ইহা বলিলেই তো কেহ মানিবে না, প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১৩)

[প্রমাণ হয় কিনা পাঠকগণের বিচার্য্য।]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১৪)

[উত্তরে Dinajpur Gazetteer হইতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে কিঞ্চিৎ শুনাইতেছি:—"Kaivarttas are by far the most important of the pure Hindu cultivating castes ·· The principal occupation of this caste appears originally to have been fishing, but this has been abandoned. P. 40]

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য (১৫)

[জালিকগণের ব্রাহ্মণের মধ্যে কি তবে সজ্জন একেবারেই নাই?]

অনন্ত-সৃজন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু

পুরুষ বিলাপি' কহে "হে নিঠুর নারী!
তোমার বন্দনা গাহি দিবা বিভাবরী।
তোমার ছলনা তবু নাহি হ'ল সারা।
তোমার কবিতা লিখে হনু দিশেহারা।"
রমণী হাসিয়া কহে—"তাই আদি হ'তে
অনন্ত-সৃজন চলে তোমাতে আমাতে।"

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাহা বা প্রাগ্-নগরী

১৯শে জুন ১৯৩৫, বুধবার। আজ প্রাগ্ যাত্রা ক'রতে হবে; 'আবার কবে আসবো', এই মনোভাব নিয়ে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নগরীশ্রেষ্ঠ বুদাপেশ্‌ৎ-এর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। ন্যাশনাল হোটেল---নেমজেতি সাল্লোদা Nemzeti Szalloda-তে এ কয়দিন বেশ আরামে ছিলুম।

প্রাচীন প্রাগ্---নগর চত্বর, বামে পৌরসভার গৃহ টাউন-হল

এই হোটেলের পোর্টারটীকে ক'দিনে আমার বেশ ভালো লেগেছিল—বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা মানুষটী, চোখে পুরু চশমা—দেখে মনে হয় ইস্কুল-মাষ্টার কি অধ্যাপক; শিক্ষিত লোক—৫।৭টা ভাষা ব'লতে পারে, অনেক কিছুর খবর রাখে। সহানুভূতিশীল বিদেশী দেখে, পোর্টারটী আমায় একদিন কতকগুলো চটী বই আর অন্য কাগজ দিলে—ইংরেজীতে লেখা—তাতে গত মহাযুদ্ধের পরে ভের্সাইয়ি আর ত্রিআনঁ-র সন্ধিতে হঙ্গেরীর উপর যে অবিচার করা হ'য়েছে, তার সব কথা আছে। এদের স্বদেশ আর স্বজাতি-প্রীতি অদ্ভুত; হঙ্গেরীর সীমানাকে ছোট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, তাতে বহু হঙ্গেরীয় এখন অন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে প'ড়েছে—এটা এদের মনে ভীষণ অস্বস্তির কারণ হ'য়ে র'য়েছে; নিরপেক্ষ বিদেশীর সহানুভূতি জাগিয়ে' এরা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি ক'রতে ব্যস্ত—ত্রিআনঁ-সন্ধির ব্যবস্থা এরা উল্‌টে দিয়ে তবে ছাড়্‌বে। পোর্টারটী ভারতবাসীদের সুখ্যাতি ক'রলে; কবে এক ভারতীয় যাত্রী ঐ হোটেলে ছিলেন, তাঁর টাকা ফুরিয়ে যায়, পোর্টারের কাছে পাঁচ ছয় পাউণ্ড ধার ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ ত্যাগ করেন, আর পরে কথামত যথাসময়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু স্মারক উপহার—আর তার উপরে মাঝে মাঝে কৃতজ্ঞতাদ্যোতক কুশল-প্রশ্নময় পত্রাঘাত; এইতেই ভারতীয়েরা যে ভদ্র জাতি, এই বোধ এর হ'য়েছে। আমি বিল দেবার সময় যৎকিঞ্চিৎ বখশিশ দিলুম। হোটেলের অতিথিদের মন্তব্য লেখবার জন্য এক বই এল—তাতে দেখি নানা জাতীয় লোক নানা ভাষায় মন্তব্য লিখেছেন—মজর, জরমান, ইংরিজি, ফরাসী, ইটালীয়, সর্বীয়, রুষ, আরবী, ফারসী, চীনা, জাপানী; আরও কত। দেখি, ১৯৩০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বর্গ থেকে এম্-ই দাদাভাই ব'লে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, খুব সম্ভব পারসী—তিনি গুজরাটীতে পাঁচ ছত্রে নিজ সম্মতি প্রকট ক'রেছেন। তিন জন বাঙালীর নাম দেখে আনন্দ হ'ল—এঁদের দুজন লিখেছেন বাঙলায়, একজন ইংরিজিতে। আমি হিন্দী বাঙলা আর ইংরিজিতে হোটেলের এক সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি লিখে দিলুম।

সকাল সওয়া সাতটায় গাড়ী—যথাসময়ে পেশ্‌ৎ-এর

'পশ্চিম-ষ্টেশনে' গিয়ে গাড়ী ধরা গেল। একটী মাত্র ফেরিওয়ালা ঠেলা গাড়ী ক'রে ফল, কেক, মদ, লেমনেড এই সব বিক্রী ক'র্‌ছে। গাড়ীতে চার ভাষায় সব লেখা—চেখ, মজর, জরমান, ফরাসী। তৃতীয় শ্রেণীতে চ'লেছি; আমাদের কামরায় সহযাত্রী পাওয়া গেল কতকগুলি ইহুদী। একটী মোটা-সোটা লোক, ইঞ্জিনিয়ার, বছর তিরিশ বয়সের যুবক, জরমানে তার সঙ্গেই বেশী কথা হ'ল; তবে আমার জরমানের দৌড় বড় বেশী নয়, আর সে ফরাসী কিছু কিছু বুঝতে পারে, ব'ল্‌তে পারে না। সঙ্গে একটী মহিলা ছিল—বছর চল্লিশ বয়স হবে, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা—গেল। Szob, Bratislava, Brno, Praha—এই পথ দিয়ে আমাদের গাড়ী চ'ল্‌ল। Szob-এর পরে চেখ্‌-রাষ্ট্র; পাসপোর্ট দেখার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

দুপুরে গাড়ীতেই খেয়ে নেওয়া গেল। শুনেছিলুম, চেখদের প্রিয় খাদ্য, তাদের বিশিষ্ট বা "জাতীয়" খাদ্য, হ'চ্ছে রাজহাঁসের রোস্‌ট্; হাঁস বা রাজহাঁসকে এদের ভাষায় বলে Hus 'হুস্'—আর্য্যগোষ্ঠীর চেখভাষার এই শব্দটী আমাদের 'হাঁস' বা 'হংস' শব্দেরই জ্ঞাতি।

ট্রেনের রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে এই রোস্‌ট্ দিলে; সুবিধের লাগ্‌ল না—ভীষণ চর্ব্বিওয়ালা মাংস। রুটী মাখন আলু-

প্রাগ্—নদী ও সেতুসমেত নগরের দৃশ্য

মুখখানা লম্বা, ঘোড়ার মুখের মত—বেশীর ভাগ সময় কেক ফল আর চকলেট সেবাতেই কাটালে। ইহুদী পুরুষটীর বেশী কৌতূহল আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে—তারা বেশ ভাবপ্রবণ কিনা, প্রগল্‌ভ কিনা। নিজের সম্বন্ধে এক রাশ পরিচয় ব'ললে।

দানুব নদীকে বাঁয়ে রেখে আমাদের ট্রেণ চ'ল্‌ল। খানিকটা পথ বেশ পাহাড়ে' অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল, মেঘে আর জলে দূর স্থলভাগ ঝাপসা। বাঁ হাতে এসতেরগোম শহরের গির্জ্জার বিরাট গুম্বজ দেখা ভাজা আর কফিতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল। হঙ্গেরীয় টাকাই সঙ্গে ছিল—খাবার বিল শোধ হ'ল ঐ টাকায়। হিসাব মিলানো, সে এক কঠিন ব্যাপার; হঙ্গেরীয় ২৬ পেঙ্গ্যোতে এক ইংরিজি পাউণ্ড, আর এক পাউণ্ডে ১১৬ চেখ্‌ ক্রাউন; এই ২৬ আর ১১৬-র অনুপাত কষা আমার শক্তির বাইরে। টাকার ফিরতী দিলে চেখ মুদ্রায়; চেখ ক্রাউনগুলি নিকেলের, কিন্তু এই নগণ্য নিকেলের মুদ্রার উপর যে ছবি এরা অঙ্কিত ক'রেছে, তা দেখে চোখ জুড়িয়ে' গেল।

টাকা পয়সা তো বিনিময়ের হার হিসাবে স্থিরীকৃত

ধাতুখণ্ড মাত্র, কিন্তু তার উপর নানাবিধ লাঞ্ছন বা চিত্র অঙ্কিত ক'রে দেবার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই এসে যায়। ভারতবর্ষে, গ্রীসে—এই দুই দেশে বোধ হয় স্বাধীন ভাবে লাঞ্ছন বা চিত্রযুক্ত মুদ্রার রীতি বিভিন্ন কালে উদ্ভূত হয়। অন্যত্র সোনা রূপা তৌল ক'রেই বিনিময়ের কাজ চালানো হ'ত; গ্রীসে আর ভারতেও মুদ্রা তৌল করা হ'ত; লাঞ্ছন বা চিত্র দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধাতুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠি-সংঘের বা রাষ্ট্রনায়কগণের ঘোষণা প্রকাশ করা মাত্র। সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে, কেবল কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন ছাড়া, মুদ্রায় কোনও প্রতিকৃতি বা পূরা চিত্র অঙ্কিত হ'ত না। এই সমস্ত চিহ্ন, বিভিন্ন নগরের বা শ্রেষ্ঠীদের লাঞ্ছন মাত্র ছিল—ফুল, পাতা, চৈত্য, বেড়ার মধ্যে গাছ, হাতী, সিংহ বা ষাঁড়ের রেখাচিত্র, দুই চারিটা এই রকম ছোটো-খাটো চিহ্ন—এই সব; পাতলা চতুষ্কোণ তামা বা রূপায়, মোহরের ছাপের মতন মেরে দেওয়া হ'ত। এই সব "রূপ" বা চিহ্ন বা চিত্র টাকায় থাকত ব'লে, টাকার নাম ছিল "রূপ্য"—আর পরে "রূপ্য" বা "রূপ্যক" শব্দ টাকার ধাতুর নামবাচক শব্দ হ'য়ে দাঁড়ায়, আর তার ফলে রজত বা চাঁদী অর্থে আমাদের ভাষায় "রূপা" শব্দের উদ্ভব। বোধ হয়, ভারতের কিছু আগেই, গ্রীকজাতি তাদের মুদ্রায় এমন সব সুন্দর সুন্দর চিত্র দিতে আরম্ভ করে যে তার তুলনা হয় না। নানা দেবতার মাথা—পার্শ্ব দৃশ্যে বা সম্মুখ দৃশ্যে—অতি মহনীয় ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে এই মুদ্রাগুলিকে শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন ক'রে রেখেছে। জে·উস্, হেরা, আথেনা, দেমেতের, আপোল্লোন্, হের্মেস্, আফ্রোদিতে প্রভৃতি দেবদেবী, অথবা আরেথুসা, এউবোইআ প্রভৃতি অপ্সরার অতি মনোহর প্রতিকৃতিময় চিত্র, কেবল মুণ্ড বা মুখমণ্ডল নিয়ে; কিংবা গ্রীক যোদ্ধা বা মল্লের পূর্ণ মূর্ত্তি; অথবা কোনও পশু বা পক্ষীর মূর্ত্তি; এইসবে, গ্রীক মুদ্রা শিল্প-সৌন্দর্য্যের চিরন্তন আধার-রূপে বিদ্যমান। গ্রীক মুদ্রারীতির পরোক্ষ অনুপ্রেরণার ফলেই আমাদের ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুন্দর চিত্রময় মুদ্রার প্রবর্ত্তন হয়। ওদিকে রোমের মুদ্রাও গ্রীসের সাক্ষাৎ অনুকরণে তৈয়ারী হয়। পরে খ্রীষ্টানী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হ'ল, মুদ্রার সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হ'ল। অধুনা ইউরোপ আবার এ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েছে। ফরাসী দেশের কোন প্রেসিডেণ্ট নাকি একবার ব'লেছিলেন, ফ্রান্সের মুদ্রা তার উপরে অঙ্কিত চিত্র-বিষয়ে এত সুন্দর হওয়া উচিত যে, যার কাছে দেশের সবচেয়ে নিম্ন মূল্যের মুদ্রা একটী থাকবে, ঐ মুদ্রার দ্বারায় একটী শিল্প-বস্তুর অধিকারী ব'লে যেন তাকে মনে করা যেতে পারে।

পার্লামেণ্ট গৃহ—প্রাগ

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ফরাসীরা তাদের মুদ্রায় চমৎকার কতকগুলি চিত্র দেয়। দেশের বড় বড় শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা নকশা চাওয়া হ'ত, বিশেষজ্ঞ শিল্পরসিকদের দ্বারা যাঁর নকশা শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করা হ'ত তাঁর নকশাই গ্রহণ করা হ'ত। সাধারণতঃ গ্রীক ভাবের অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি এই সব মুদ্রাচিত্রে দেখা যায়। ফ্রান্সের Oudiné উদিনে ব'লে শিল্পীর পরিকল্পিত Concord 'কন্‌কর্দ্' বা 'সংহত্যতা' (অথবা একতা) দেবীর মুখ বহু দিন ধ'রে ফ্রান্সের ফ্রাঁ আর মুদ্রাকে সৌন্দর্য্যের দিক্ থেকে এক শ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রেছিল। তার পরে Dupuis দ্যুপ্যুই-অঙ্কিত ফ্রান্স-মাতার মূর্ত্তি, আর Roty রোতি-অঙ্কিত

Semeuse বা Sower অর্থাৎ শস্য-বপনকারিণী নারীর পূর্ণ মূর্ত্তি, ফ্রান্সের মুদ্রায় চিত্রিত হয়। এখন লড়াইয়ের পরে ফ্রান্সের মুদ্রায় ঐ ধরণের অন্য নূতন নূতন মূর্ত্তি অঙ্কিত হ'চ্ছে। ফ্রান্সের মতন, ইটালীর মুদ্রায়ও চমৎকার সব চিত্র পাওয়া যায়; কোনটীতে খালি যবের শীষ, কোনটীতে ফুলের উপরে মৌমাছি, কোনওটীতে দেবী ইতালিয়ার মুখ, হাতে যবের শীষ নিয়ে র'য়েছেন, কোনওটীতে বা চার ঘোড়ার রথে চ'ড়ে বিজয়া দেবী, কোথাও বা সিংহবাহিত রথের উপরে দেবী ইতালিয়া; কতকগুলিতে ইটালির রাজার মুখও থাকে। অবশ্য ইউরোপের সব দেশেরই মুদ্রা যে চিত্র বিষয়ে এত ভাল বা সুন্দর, তা নয়। হঙ্গেরীর মুদ্রায় বিশেষ সৌন্দর্য্য নেই—দেশের নাম, মুদ্রার নাম ও মূল্য, আর হঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা স্তেফানের মুকুট—ব্যস্। জরমানিতে মাত্র দুই একটী মুদ্রায় কলা-নৈপুণ্য দেখাবার চেষ্টা হ'য়েছে—বাকী সব মামুলী—বিশেষত্বহীন। স্বাধীন পোলাণ্ড, ফ্রান্সের দেখাদেখি কতকগুলি সুন্দর মুদ্রা বা'র ক'রেছে—পোলাণ্ড-মাতা দেবী পোলোনিয়ার মূর্ত্তি, পোলাণ্ডের পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট Pilsudski পিল্‌সুদ্‌স্কির মুখ, এইগুলি বাস্তবিকই মনোহর।

ট্রেণে চেখ্-দেশের নিকেলের মুদ্রা থেকে দেখলুম, চেখোস্লোবাকিয়ার লোকেরাও এ বিষয়ে খুবই অবহিত। ছোট্ট দেশটী, কিন্তু এই মুদ্রা থেকে বোধ হ'ল, এ দেশের শাসকদের মধ্যে শিল্পপ্রাণতা যথেষ্ট আছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব প্রবল না থাকলে, শাসকদের মধ্যে তার স্ফুর্ত্তি হ'তে পারে না। পরে প্রাগে পঁউছে, চেখ-জাতির শিল্পপ্রীতির বহু পরিচয় পাই।

চেখ্ মুদ্রা নিকেলের 'ক্রোন্' বা ক্রাউন

নিকেলের চেখ-ক্রাউন মুদ্রায় একদিকে আছে, কাটা শস্যের গোছা নিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে রমণী মূর্ত্তি—চেখ্ দেশলক্ষ্মীর প্রতীক-স্বরূপ। মূর্ত্তিটী বেশ জোরালো ভঙ্গীতে আঁকা। যে শিল্পীর পরিকল্পনা এই ছবিতে আকার পেয়েছে, তাঁর নাম তলায় লেখা—O. Spaniel "ও শ্‌পানিএল্"। মুদ্রাটীর অন্যদিকে আছে চেখো-স্লোবাকিয়ার প্রাচীন রাজবংশের লাঞ্ছন—দ্বি-লাঙ্গুল সিংহ, অলঙ্করণের ভঙ্গীতে অঙ্কিত; এই সিংহ মূর্ত্তি, আর দেশের নাম Ceskoslovenska Republika: এই লেখের অক্ষরগুলির ছাঁদ ভারী সুন্দর,—ঋজু শক্তিমান্ পদ্ধতিতে রচিত। চেখোস্লোবাকিয়ার দশ ক্রাউনের মুদ্রাও এই ধরণের—একদিকে দেশে কৃষিজাত দ্রব্য, অন্যদিকে কলকারখানার নিশানা হিসাবে হাতুড়ী আর যন্ত্রের চাকা, এই নিয়ে চেখ-দেশমাতৃকার উপবিষ্ট মূর্ত্তি—তিনি বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন নিজ সন্তানগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করছেন। চল্লিশ-ক্রাউনের মুদ্রায় আছে তিনটী মূর্ত্তি—শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য—পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

মুদ্রা—রুশ 'ক্রোন্'

এই সব মুদ্রা উচ্চ কোটির শিল্পের নমুনা-স্বরূপ যত্ন ক'রে রেখে দেবার জিনিস। ব্রিটিশ জাতি এসব ব্যাপারে বড় একটা সৌন্দর্য্যের ধার ধারে না—তাই ইংরেজের মুদ্রায় কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল ব্রঞ্জের পেনি আর হাফ-পেনিতে একদিকে ত্রিশূলধারিণী ব্রিটানিয়া-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকে, সেটী মন্দ নয়। সোনার গিনির আর হাফগিনির পিছনে থাকে, এক ইটালীয় চিত্রকরের কৃতিত্ব—খ্রীষ্টান ইংলাণ্ডের জাতীয় দেবতা সেণ্ট জর্জের অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত মূর্ত্তি,—ঘোড়ার পায়ের তলায় ড্রাগন বা মহানাগ মরণাহত অবস্থায়; এই অশ্বারোহী মূর্ত্তি, প্রাচীন গ্রীসের আথেন্স্-নগরীর বিখ্যাত পারথেনন্-মন্দিরের ফলক-চিত্রের অশ্বারোহী মূর্ত্তির নকল মাত্র। আইরীশ-ফ্রী-ষ্টেট-এর লোকেরা তাদের নোতুন মুদ্রা বানিয়েছে—একদিকে আয়র্লাণ্ডের লাঞ্ছন harp বা বীণা, অন্যদিকে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রায় আয়র্লাণ্ডের বিভিন্ন বিশিষ্ট পশুপক্ষীর চিত্র—ঘোড়া, ষাঁড়, শূওর, খরগোস, মুরগী, সামন-মাছ; জন্তুর চিত্র হিসাবে এ মুদ্রার নকশাগুলি ভারী সুন্দর, এবং এই ধরণের প্রাচীন গ্রীক মুদ্রার ভাবের অনুকারী।

আমাদের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের নামাঙ্কিত নূতন

মুদ্রা শীঘ্রই প্রচলিত হবে ; আশা করা যায়, ব্রিটেনের আর বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মুদ্রায়, সৌন্দর্য্য আর বৈশিষ্ট্য দুইই বজায় রাখবার চেষ্টা হবে। ইংরেজ-প্রচলিত ভারতের মুদ্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছুই রাখা হয় নি। ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির টাকায় রাজা চতুর্থ উইলিয়মের ("খুড়ো-মুখো" টাকায়) আর রাণী ভিক্টোরিয়ার টাকায় ("ঝুঁটীওয়ালা" টাকায়) খালি ফারসীতে "য়ক্ রূপ্‌য়হ্" এইটুকু লেখা থাকৃত। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুটমাথা মূর্ত্তিযুক্ত টাকায়, এই ফারসীটুকুও সরিয়ে দেওয়া হয় ; এই টাকার পিছনদিকের নক্সাও ইউরোপীয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের টাকায় পিছনদিকে দুধারে মৃণাল-

প্রাগ্—জাতীয় সংগ্রহশালা

শুদ্ধ পদ্মের গোছা দিয়ে ভারতীয়ত্বের একটু চিহ্ন আনবার চেষ্টা হয়, আর ফারসীতে "য়ক্ রূপ্‌য়হ্", "হশ্‌ৎ আনহ্" (বা আট আনা), "চহার আনহ্" (চার আনা) এই সব লেখা আবার বসানো হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুদ্রার পিছনদিকের চিত্রে ফারসীটুকু বজায় আছে, আর একটা নক্শা দেওয়া হ'য়েছে, তাতে আছে ভারতের প্রতীক স্বরূপ পদ্মফুল, ইংলাণ্ডের প্রতীক স্বরূপ গোলাপ ফুল, আর স্কটলাণ্ডের থিস্‌ল্ ফুল, আর আয়র্লাণ্ডের তেপাতা শ্যামরক। ভারতের মুদ্রায় স্কটলাণ্ডের আর আয়র্লাণ্ডের লাঞ্ছন আর কেন? সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের মুদ্রায় কেবল ভারতের প্রতীক পদ্ম ফুল বা আর কিছু থাকুক, আর দেবনাগরীতে "ভারতবর্ষ" আর মুদ্রার নাম বা মূল্য লেখা থাকুক, নক্শাটী খাঁটী ভারতীয় ভাবের হোক্,—আমরা এইটুকুতেই খুশী হবো। মুদ্রায় সামনের দিকে অবশ্য সম্রাটের মূর্ত্তি থাক্‌বে—যথন রাজতন্ত্রের মুদ্রায় এইটেই হ'চ্ছে রেওয়াজ।

মুদ্রা-সম্বন্ধে কতকগুলো অবান্তর কথা ব'কে গেলুম। যাক্—চেখো-স্লোবাকিয়া দেশের মধ্য দিয়ে তো ট্রেনে ক'রে চ'ললুম। অনেকটা পথ বেশ পাহাড়ে' আর জঙ্গুলে'; দূরে-কাছে নাতি-উচ্চ পাহাড়, পাইন গাছে ঢাকা। মাঝে-মাঝে মাঠ আর শস্য-ক্ষেত্র। সব ক্ষেত সবুজ শস্যে ভরা ; মাঝে-মাঝে লাল আর সাদা পপি বা পোস্ত ফুল—রঙের সমাবেশ বড় সুন্দর—ক্ষেতের শোভা নয়ন মন মুগ্ধ ক'রছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—ক্ষেতে যারা কাজ ক'র্‌ছে—তাদের বেশীর ভাগই মেয়ে। অনেকেরই খালি পা। এদের সুপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, হাত মুখ থেকে যেন রক্ত ফেটে প'ড়ছে। মাথা আর কান ঢেকে, থুঁতনির নীচে বাঁধা রুমাল। কোথাও বা ঘোড়ায় টানা মালগাড়ী ক'রে কাঠ-কাঠড়া নিয়ে যাচ্ছে—গাড়ী চালাচ্ছে স্ত্রীলোকে। মেয়েরাই ক্ষেত-খামারের কাজের ভার নিয়েছে যেন। চেখ ক্রাউন-মুদ্রার চিত্রটী তখন সার্থক ব'লে মনে হ'ল—মেয়েরাই ধান দাওয়া প্রভৃতি সব কাজ করে তাহ'লে। আমি সহযাত্রী ইহুদীটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—দেশের পুরুষেরা কোথায় গেল? ভদ্রলোক গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে একটু দেখ্‌লেন, সত্যিই তো, মেয়েরই ভাগ বেশী ; তারপরে একটু ভেবে ব'ললেন—পুরুষেরা বেশীর ভাগ শহরে যায়, কলকারখানায় কাজ করে ; মেয়েদের তাই ঘরে থেকে ক্ষেত-খামার দেখতে হয়, চাষবাসের কাজে তাদের খাটতে হয়।

তাঁহারা নীতি বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন।" কথাটা অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা। যাঁহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রগণকে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে হয়, তাঁহারা যদি হীন-দৃষ্টান্ত হইয়া পড়েন, তবে দেশের যে চরম দুর্গতি হইবে তাহাতে আর বিস্ময় কি? বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ের প্রতীকারের উপায় অবলম্বনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ডাক্তার রমেশচন্দ্র আরও একটি সত্য কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে—"গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হাই-স্কুলগুলির আর কোন প্রয়োজন নাই। ঐ সকল স্থানে যদি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে সেগুলি দেশের লোকের কাজে লাগিতে পারে।" যে সময়ে গভর্ণমেণ্ট ঐ হাই স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন দেশে অধিক সংখ্যক হাই স্কুল ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নাই, কাজেই অনর্থক শ্বেত-হস্তী না পুষিয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দিয়া ঐস্থানে কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতে চিনির ব্যবসা—

এমন এক সময় ছিল, যখন বিদেশ হইতে ভারতে চিনি আমদানী করা না হইলে ভারতের চিনির অভাব পূরণ করা যাইত না; মধ্যে মধ্যে সে জন্য চিনির দর অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত এবং সে জন্য ভারতবাসীদিগকে অসুবিধা কম ভোগ করিতে হইত না। অথচ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ আখের গুড়, খেজুরের গুড় ও তালের গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন ভারতের অনেক স্থানেই চিনির কল প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাতে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতের লোক বৎসরে ১০।১১ লক্ষ টন চিনি খাইয়া থাকেন। গত বৎসর ভারতের কলগুলিতেও সাড়ে ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই জাভা প্রভৃতি স্থানের বিদেশী চিনির আমদানী কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসরে ২ লক্ষ টন চিনি ভারতে আমদানী হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ বৎসর বোধ হয় ১ লক্ষ টনের অধিক চিনি আমদানী করা প্রয়োজন হইবে না। ভারতে আরও অধিক চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যে সকল কল আছে, তাহার অধিকাংশগুলিই ইংরাজের মূলধনে স্থাপিত এবং ইংরাজ কোম্পানীর পরিচালিত। দেশীয় পরিচালিত কলের সংখ্যা বাড়িলে চিনির দর কমিয়া যাইতে পারে। যে দেশে দুই টাকা মণ দরে প্রচুর গুড় কিনিতে পাওয়া যায়, সে দেশের লোককেই ১০ টাকা মণ দরে চিনি কিনিতে হয়—ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালা দেশে পাটের চাষ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুর চাষ বাড়িয়া যাইতেছে এবং ঐ সকল ইক্ষু ব্যবহারের জন্য কয়েকটি চিনির কলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইলে তাহা বিদেশেও রপ্তানী হইতে পারিবে।

সেচ-বিভাগের কার্য্য—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেচবিভাগ প্রজার হিতের জন্য কোনরূপ কার্য্য করেন না বলিয়া সকলেই অভিযোগ করিয়া থাকেন। সেই অভিযোগের উত্তরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া তাঁহাদের সেচ বিভাগের কার্য্যের এক ফিরিস্তী প্রচার করিয়াছেন। আমরা এই সঙ্গে সেই কার্য্য-তালিকা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু অভাবের তুলনায় এই কার্য্যের পরিমাণ এতই কম যে ইহাতে কেহই সন্তোষলাভ করিতে পারে না। এ বৎসরও বন্যায় বাঙ্গালার বহু স্থানে শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে—অথচ তাহার স্থায়ীভাবে প্রতীকারের কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। যে সকল খাল ও বিল মজিয়া গিয়াছে, সেগুলিকে পুনরায় কাটাইলে দেশে এত ঘন ঘন বন্যা হইবে না। ভারত গভর্ণমেণ্ট গ্রামোন্নতিকর কার্য্যের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে বার্ষিক যে অর্থ দান করিতেছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টাকা সেচের জন্য ব্যয় করিতেছেন—ইতিমধ্যে এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বাখরগঞ্জে ৪৮ হাজার ৮ শত ২৮ টাকা ব্যয়ে সাতলা বিল খাল, চৌফল দিপসা খাল ও বেতুয়া খাল সংস্কার করা হইয়াছে। ত্রিপুরায় প্রজাবর্গের উৎসাহে কুতুলিয়া খাল পুনরায় কাটা হইয়াছে; গভর্ণমেণ্ট তথায় ৩২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। নদীয়া জেলায় ইছামতী হইতে জল লইয়া টুঙ্গী ও ভাজনঘাট বিল প্লাবন, মেদিনীপুর জেলায় প্রতাপখালি খালের পলি পরিষ্কার এবং রাজসাহী জেলায় নেপালদিঘী—গোবিন্দপুর সেচের কাজ চলিতেছে; সেজন্য গভর্ণমেণ্ট যথাক্রমে ৩১৭১,৭৬৬৭ ও ১৮৭৫৮ টাকা

ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলায় গোমাই বিল সংস্কার, খুলনা সাতক্ষীরায় নাটখালি-চেতলায় ম্যালেরিয়া নিবারণ, ঢাকায় লখ্যা নদীর কাঁচীকাটা বিল, মৈমনসিংহে মগরজানি খাল ও মুর্শিদাবাদে ডোমকল বিলের কাটার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। যশোহরেও পুটরা বাকেয়া বিল ও চিংগা বিলের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর ধারের স্থানগুলি হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়নের জন্য রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জের নিকট করতোয়া ও কাটখালি নদী হইতে একটি খাল কাটিয়া দেওয়া হইবে। সেজন্যও গভর্ণমেণ্ট ৩৪ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছেন। ফরিদপুর জেলায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ঢেঁকিপাড়া খাল ও চন্দনা নদীর সংস্কারের ব্যবস্থা হইবে। এই সকলের দ্বারা যদি কৃষকগণের কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়, তবেই এই অর্থব্যয় সার্থক হইবে। এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে জনগণের প্রতিনিধিদিগের সহিত গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ করা উচিত।

বৃটীশ মিশরের সন্ধি—

গত ২৬শে আগষ্ট লণ্ডনে ৫ জন বৃটীশ রাষ্ট্রনীতিক ও মিশরদেশের ১৩ জন প্রতিনিধি সম্মিলিত হইয়া এক সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। গত ১৬ বৎসরকাল কতকগুলি রাজনীতিক ও বাণিজ্যবিষয়ক ব্যাপার লইয়া মিশরের সহিত বৃটীশের যে বিরোধ চলিতেছিল এই সন্ধির ফলে সে বিরোধ অন্তর্হিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মিশরের প্রধান সচিব নাহাস পাশা সন্ধির স্বাক্ষরের পর ঘোষণা করিয়াছেন—এই সন্ধি পৃথিবীকে জানাইবে যে বৃটীশ ও মিশর পরস্পরের সম-অধিকারসম্পন্ন মিত্ররাজ্য। প্রকাশ, মিশরের এই প্রতিনিধি-দলে সকল ভিন্নমতাবলম্বী দলের প্রতিনিধিই আছেন। সমগ্র ইউরোপ যখন রণ-সজ্জায় উন্মত্ত, তখন যদি মিশরে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা মিশরবাসীর পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

নরওয়ে ও ট্রট্স্কী—

রুশ-দেশের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ ট্রট্স্কী স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সম্প্রতি নরওয়ে দেশে বাস করিতেছেন। রুশের বর্ত্তমান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট শুধু ট্রট্স্কীকে নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা নরওয়ের গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন—ট্রট্স্কীকে যেন নরওয়ে হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ট্রট্সকী এক সময়ে রুশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক ছিলেন; তাঁহার সহিত বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কগণের মতভেদের ফলেই তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে বর্ত্তমান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কেন যে অপদস্থ করিতেছেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, নরওয়ের গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা ট্রট্স্কীকে তাড়াইয়া দিবেন না—ঐ দেশেই থাকিতে দিবেন। একটি বিদেশী জাতির পক্ষে অপর দেশের নির্য্যাতীত নেতাকে আশ্রয় দান বর্ত্তমান যুগে উদারতারই পরিচায়ক।

সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়—

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, প্রথিত-নামা প্রবাসী-বাঙ্গালী সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন—এই সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার বাহিরে যে সময়ে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, সেই সময়ে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ সম্মানজনক পদ লাভ সত্যই জাতির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। সার লালগোপাল যখন কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন, তখন যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিনয়, সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী এই প্রবাসী বাঙ্গালীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, খ্যাতনামা সমাজ-সেবক সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। হাইকোর্টের উকীল ও বিচারপতি হিসাবে যেমন তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, দেশের নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি ততোধিক যশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে কয়েকবার হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করিয়াও

গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মকুশলতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও দশের উন্নতিকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

নূতন ব্যবস্থা-পরিষদ ও কংগ্রেস—

নূতন ভারত-শাসন আইনে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন করিবার জন্য শীঘ্রই যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে, কংগ্রেস-পক্ষীয় প্রার্থীরা সেই নির্ব্বাচনে ভোটপ্রার্থী হইতে পারিবেন—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ সম্প্রতি বোম্বায়ে সমবেত হইয়া এইরূপ নির্দ্দেশ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত নির্ব্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত দেশবাসীকে জানাইবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে প্রচারপত্র বিতরণ করা হইবে, তাহার একটি খসড়াও বোম্বায়ে প্রস্তুত করা হইতেছে। উক্ত প্রচারপত্রে করাচী কংগ্রেসে গৃহীত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব ও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত কৃষক সমস্যা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে সমাজতন্ত্রী ও কৃষকদল পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। তাহার উপর প্রচারপত্রে সাম্প্রদায়িক-রোয়েদাদের তীব্রভাবে নিন্দার ব্যবস্থা থাকায় হিন্দুদিগেরও উহা অনুমোদনলাভ করিবে। প্রচারপত্রের মুখবন্ধে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জাতীয় আন্দোলনের ক্রমপরিণতি, কাউন্সিল প্রবেশের কার্য্যতালিকা, নূতন শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। যে উদ্দেশ্য লইয়াই কংগ্রেস আজ আইনসভায় প্রবেশকামী হইয়া থাকুন না কেন, কংগ্রেসের আদর্শ হইতে কর্ম্মীরা যদি বিচ্যুত না হন, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। অন্ততঃ নির্ব্বাচন সংগ্রামের ফলে দেশে যে রাজনীতিক শিক্ষা প্রসার লাভ করিবে, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সুমতি—

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যে হারে কলিকাতাবাসীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকেন তাহা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সে জন্য অনেক আন্দোলনের পর ইলেকট্রিকের মূল্য প্রতি ইউনিটে মাত্র এক পয়সা হ্রাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ যদি উক্ত কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে কোম্পানীর অংশীদার-দিগকে দেয় লাভের অংশ কমিয়া যাইবে এবং ফলে সহরবাসী অল্প মূল্যে বিদ্যুৎ পাইবে। সেজন্য সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে ইলেকট্রিক কোম্পানীকে এখনই নোটীশ দেওয়া হইবে এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর কোম্পানীর লাইসেন্সের কার্য্যকাল শেষ হইলে কোম্পানীটি কর্পোরেশন ক্রয় করিয়া লইবেন। আর একটি বিষয়েও কর্পোরেশনের কর্ত্তারা অবহিত হইয়াছেন ; কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া অন্যান্য সহরের ট্রামের ভাড়ার তুলনায় অধিক ; সেজন্য কলিকাতা কর্পোরেশন যাহাতে ট্রাম কোম্পানীটিও ক্রয় করিয়া লইতে পারেন, সেজন্য ট্রাম আইন পরিবর্ত্তন করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই দুইটি বড় বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের অধীন হইলে একদিকে যেমন বহু বেকার বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান হইবে, অন্যদিকে তেমনই বিদ্যুতের মূল্য কমিয়া ও ট্রামের ভাড়া কমিয়া যাইলে সহরবাসীরা উপকৃত হইবেন।

ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি পরিদর্শন—

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক অনুসন্ধিৎসু ছাত্র সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্রহ্ম-পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন,

তাহাতে ব্রহ্মের উপর বাঙ্গালার প্রভাবের কথাই অধিক বলিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস বাঙ্গালী শিল্পীদিগের দ্বারা ব্রহ্মের বিরাট স্থাপত্য ও চিত্রাঙ্কনাদি সম্পাদিত হইয়াছিল। উত্তর ব্রহ্মে যে এখনও প্রায় তিন শত ঘর বাঙ্গালী 'পোনা' আছে ও তাহাদের বাড়ীতে বাঙ্গালা পুঁথি আছে, অজিতকুমার তাহারও সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা এখানে বিভিন্ন মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিবেন। বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরবের কাহিনী সংগ্রহ কার্য্যে তাঁহার এই উৎসাহ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুর মামলার পুনর্বিচার—

রাজসাহী জেলার খোর্দ্দ গোবিন্দপুরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দু গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। ঐ অত্যাচারের ফলে ৪০জন মুসলমান ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রহিম ও মোহির মুক্তিলাভ করে ও অপর সকলের দণ্ড হয়। নিম্ন আদালতের বিচারক হিন্দু ছিলেন বলিয়া পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে আবেদন করা হয় এবং জলপাইগুড়ীতে মিঃ ম্যাকসার্প নামক এক বিচারকের নিকট মামলার পুনর্বিচার হয়। ২জন আসামী—খেতু ও ফয়জার বিচারাধীন অবস্থায় জেলের মধ্যেই মারা গিয়াছে। পুনর্বিচারে ৬জন আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে ও অবশিষ্ট ৩০জনের প্রত্যেকের ছয়মাস হইতে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্ব আদালত অপেক্ষা এ আদালতে আসামীদের দণ্ড হ্রাস করা হইয়াছে। যে সকল মুসলমান, কারণেই হউক—আর বিনা কারণেই হউক, গ্রামের মধ্যে পাশবিক অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের প্রতি প্রদত্ত দণ্ড অবশ্যই প্রথম আদালতের বিচারক অনেক বিবেচনা করিয়াই প্রদান করিয়াছিলেন। অত্যাচারের কাহিনীগুলি পাঠ করিলে তাহার নৃশংসতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। ভবিষ্যতে কোথায় যাহাতে এরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইতে না পারে, সেজন্য গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা—

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কথা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল, গত ২৪শে আগষ্ট তাহার একাঙ্কের যবনিকাপাত হইয়াছে। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া যে সন্ন্যাসী মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন বিচারে তাঁহার জয় হইয়াছে, তিনিই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এত বড় ও এত দীর্ঘদিনব্যাপী মামলা সচরাচর দেখা যায় না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর মামলার রীতিমত শুনানী আরম্ভ হইয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে
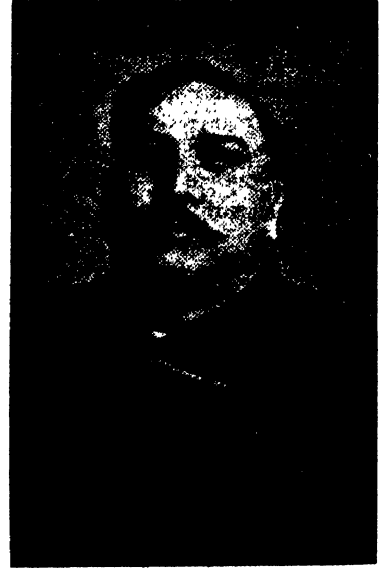
রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

তাহা শেষ হইয়াছিল। ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ, শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসুর আদালতে শুনানী হইয়াছিল এবং বাদীপক্ষে ১১শত ও প্রতিবাদী পক্ষে ৫শত মোট ১৬শতজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। মামলার বিবরণটি সর্ব্বজনবিদিত; কাজেই সে সুদীর্ঘ বিবরণ এখানে প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। তবে এই মামলায় সন্ন্যাসীর জয়লাভ সত্যই এক অপূর্ব্ব ঘটনা। মামলার শুনানীর সময় কুমারের মৃত্যু ও তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে

'জাল' বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। আদালতের রায়ে বহু লোক অপরাধী বলিয়া জানা গিয়াছে। কুমার কর্তৃক জমীদারী লাভের পর ঐ সকল দুষ্কৃতকারীর কি হয়, তাহা জানিবার জন্য সমস্ত দেশবাসী এখন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশনে বড়লাট-পত্নী—

কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীদিগের দ্বারা পরিচালিত যে সেবাশ্রম আছে, তাহা সর্ব্বজনপরিচিত। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এখানে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের শত শত দরিদ্র নরনারীর চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বহু বাঙ্গালী ধনীর অর্থানুকূল্যে সেবাশ্রমটি দিন দিন পুষ্ট হইতেছে এবং এখনও উহার বিস্তারের প্রয়োজন রহিয়াছে। সম্প্রতি ভারতের বড়লাট লর্ড লিংলিথ্‌গো সাহেবের পত্নী ঐ সেবাশ্রম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমের কার্য্য দেখিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং সকলকে উহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সঙ্গে আমরা কাশীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেবাশ্রমের সম্পাদক রায় গোবিনচন্দ্র এম-এ, এম-এল-সির সহিত বড়লাট-পত্নীর চিত্র প্রকাশ করিলাম।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশনে বড়লাট-পত্নী

উচ্চতর গণিত শিক্ষায় সাফল্য—

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পরলোকগত রায় বাহাদুর চন্দ্রনাথ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র উচ্চতর গণিত শিক্ষার জন্য ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি বি-এ ও এম-এ পরীক্ষাতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ হইতে ব্যবহারিক গণিত শিক্ষার পর তিনি পি-এচডি উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্যবহারিক গণিত বিষয়ে

কুমারকৃষ্ণ মিত্র

তাঁহার মত কৃতী ছাত্র খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই শিক্ষার অভিজ্ঞতা কার্য্যে নিয়োজিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

চিকিৎসকের প্রত্যাবর্ত্তন—

কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটের নেচার কিওর হোমের চিকিৎসক ডাক্তার অতুল রক্ষিত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি এডিনবরা ও গ্লাসগো সহরে এক্‌স রে ও বৈদ্যুতিক চিকিৎসা শিক্ষার পর ডাবলিন হইতে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এল-এম উপাধি লাভ করেন। পরে বিলাতের বহু স্থান পরিদর্শনের পর এক বৎসর কাল লণ্ডনে ক্যান্সার রোগের হাসপাতালে কার্য্য করিয়াছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং এ-পি-ডি-এম্-আর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী লণ্ডনের এই উপাধি লাভ করেন নাই। ডাক্তার রক্ষিত সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার গৌরবময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মাতৃভাষার দুর্গতি—

বিদ্যা বুদ্ধি ও যোগ্যতা নিরূপণই পরীক্ষার উদ্দেশ্য; কিন্তু এদেশের ছাত্রগণ যে পরীক্ষা দিয়া থাকে তাহাতে কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা আশী জন এক পৃষ্ঠা ইংরাজি বা বাঙ্গালা শুদ্ধরূপে লিখিতে পারে না। এই উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমাদের বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের মধ্যে কেহই একথার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। মে মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি বিদ্যায়তনসমূহের বিচিত্র বিজ্ঞাপনে পূর্ণ হইয়া উঠে। প্রত্যেকেরই ছাত্র আকর্ষণের বিপুল প্রয়াস এবং বিভিন্ন প্রণালী। কোন কলেজ হইতে তিন জন ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছে; কোথাও শতকরা ৮৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; কোন কলেজের ৫ জন অধ্যাপক গোল্ড মেডেলিষ্ট; কোথাও বা দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা; ইহা ছাড়া আরও অনেক চিত্তচাঞ্চল্যকর সুবিধার সংবাদ বিজ্ঞাপনে সন্নিবেশিত থাকে। বিজ্ঞাপন পড়িয়া প্রবেশার্থীরা ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়েন এবং অনেক ক্ষেত্রে সহজে সে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় যে কোন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া যান। নামজাদা যে কয়েকটি কলেজ আছে সেগুলির কথা একটু স্বতন্ত্র রকমের; কারণ তাহাদের পশ্চাতে গৌরী সেন আছে। সুতরাং বাছাই ছাত্র লইয়া তাহাদের চলিতে পারে। অন্যান্য কলেজে তাহা হইবার উপায় নাই। তাহাদের অদৃষ্টে যে সমস্ত ছাত্র পড়ে তাহাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্পই। এই বকশ্রেণীর মধ্যে এক একটি হংস কদাচিৎ রহিয়া যায়। তাহাদের ফল যদি ভাল হয় ত সে নিজগুণেই হইবে। অন্তত নিজগুণ কিছু থাকা চাই। আসল কথা, পরীক্ষার্থী সুযোগ্য না হইলে উত্তীর্ণ হইতে পারে না এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ফল খুব ভাল হয় না। যে ছাত্র তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে শুধু তাহার নিজের পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়, অধ্যাপকেরও তাহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাও সত্য যে, পাঁচ শত ছাত্রের প্রত্যেকের দিকে ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখা কোন অধ্যাপকের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে বাছাই কয়েকজনকে বাদ দিলে আর যাহারা থাকে তাহাদের বিদ্যার বহর দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

কি পরিমাণ বিদ্যা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালী ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করে, তাহাই প্রমাণ সহযোগে দেখাইবার চেষ্টা করিব। কোন কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় বাঙ্গালার প্রশ্নপত্রে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি দেওয়া হইয়াছিল।—

ব্যাখ্যা কর :—

(১) সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে।

[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—মহাকাব্যের লক্ষণ]

(২) নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা।
দেখ এ ত্রিশূল অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর বিরতি চিহ্ন কলঙ্ক গভীর।

[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃত্রসংহারকাব্য]

(৩) সেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মাগো! বিরাজিত তুমি
বসন্তে কি শীতে, দিবসে নিশীথে
বিকশিত তব বিভব গরিমা।

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রতিমা]

বলা বাহুল্য উল্লিখিত গদ্য ও পদ্যাংশগুলি পাঠ্যপুস্তক হইতেই প্রদত্ত।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখকের নাম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্থলে কি কি নাম লিখিত হইয়াছে দেখুন:— শ্যামসুন্দর ত্রিবেদী, রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদী, কবিবর রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেন্দ্রসুন্দর, দীনেশচন্দ্র মজুমদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত ত্রিবেদী শব্দটির সম্ভব অসম্ভব যতগুলি বানান হইতে পারে তাহাও আছে; যথা,—ত্রিবেদী, ত্রীবেদি, ত্রীবেদী। প্রবন্ধের নাম করিতে গিয়া অনেকেই 'মহাকাব্যের লক্ষণ' লিখিয়াছেন। অবশ্য "রামানুজ লক্ষণ" এরূপ বানানও একাধিক স্থলে লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে কবির নাম লিখিতে গিয়া কেহ কেহ হেমেন্দ্রচন্দ্র, হেমেন্দ্রলাল, হেমেন্দ্র রায় ইত্যাদি লিখিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দের বানানের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কোন্ কবিতা হইতে প্রশ্নটি দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া কেহ লিখিয়াছেন 'বৃত্রাশুর বধ', কেহ লিখিয়াছেন 'বৃত্রসংহার বধ', আবার কেহ লিখিয়াছেন 'বিত্রাসুর'। 'দ্বিজেন্দ্রলাল' অনেক খাতায় নিম্নলিখিতরূপে বানান করা হইয়াছে: দিজেন্দ্র, দীজেন্দ্র। কোথাও কোথাও নাম বদলাইয়া দিলীপকুমার, দিনেন্দ্র, দীনেন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথও দেওয়া হইয়াছে। "প্রতিমা"র বানান 'প্রতীমা'ও দেখিতে হইয়াছে। ভুলের দৃষ্টান্ত অধিক দিব না, আর কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিব :— "শরণাগত যুগ হইতে" "...প্রবন্ধ হইতে অনুগৃহীত", "...নামক শীর্ষক কবিতা", "ভারতবর্ষ্য", "ঘনিষ্ট" "কবিত্ত্ব, কবিত্ব", "অনুন্নত", "অধীকার", "পুংক্তি, পুংক্তী", "ব্যাস্ত", "ব্যতিত", "তদ্রুপ", "...নামক কবিতার শীর্ষক অংশ" "সশ্বস্থপ, সরীস্থপ", "শাষণ" ইত্যাদি। ভুল বানানগুলি একত্র করিলে একটি গ্রন্থ হইতে পারে। সুতরাং সে চেষ্টা হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়।

এইরূপ অমার্জ্জনীয় ভুল কেন হয়? দোষ কাহার? অধ্যাপকের না ছাত্রের, না আর কাহারও?

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিধানে এরকম ভুলের জন্য যে দণ্ডের বিধান আছে তাহা নাম মাত্র। মনে করুন, যে ব্যাখ্যার জন্য ১০ নম্বর নির্দ্দিষ্ট আছে, এরূপ ভুল করিয়াও বিষয়বস্তুটি মোটামুটি রকমে লিখিয়া দিলেই সে স্বচ্ছন্দে ৫ নম্বর অর্থাৎ প্রথম বিভাগে পাশ করিবার মত নম্বর পাইতে পারে, তাহার অধিক পাওয়াও বিচিত্র নয়। এই কারণেই ছাত্ররা উদাসীন এবং অনবহিত হইবার সুযোগ পায়। যাহাদের উচ্চাশা নাই, (উচ্চাশা অনেকেরই নাই) যাহারা কেবল পাশ নম্বর মাত্র পাইলেই সন্তুষ্ট, এরূপ ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ ছাত্রের মুখেই শোনা যায়—পাশ করিতে পারিলেই হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান না বদলাইলে তাহাদের সংশোধন করিবার সাধ্য

কাহারও নাই। ভুল যে শুধু অনবধানতাবশতই হয় তাহা নহে। অর্থহীন কথা, অবান্তর আলোচনা, আড়ষ্ট ভাষা, ভ্রমাত্মক উদ্ধৃতি—এসব ত প্রায় প্রত্যেক খাতারই অঙ্গের ভূষণ। আই-এ, বি-এ ক্লাসের ছাত্ররা অনেকে বাঙ্গালা যুক্তাক্ষর পর্য্যন্ত লিখিতে জানে না। উত্তর পত্রে এরূপ অজ্ঞতারও অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। অথচ এই সকল ছাত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিতান্ত সাধারণ জ্ঞানের অসদ্ভাব সত্ত্বেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই সব ছাত্রদের একপ্রকার প্রশ্রয় দেন। পরীক্ষা ভাল কি মন্দ সে আলোচনার স্থান ইহা নয়। কিন্তু পরীক্ষাই যখন বিদ্যা বিচারের মানদণ্ড, তখন সে পরীক্ষাটা নিতান্ত একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার না হয় ইহা দেখা কি আমাদের উচিত নয়?

রচনার ভঙ্গী (style) দেখিব কি, বাঙ্গালা ভাষাই যে অনেক ছাত্র জানে না। জিজ্ঞাসা করুন ত কোন কলেজের ছাত্রকে—বাঙ্গালা ভাষায় কয়টি কাল (tense) আছে? শতকরা একজনও উত্তর দিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। এজন্য অবশ্য ছাত্রদের দোষ দিতেছি না। শিক্ষাদানের প্রণালীই ইহার জন্য দায়ী। ম্যাট্রিক, ইণ্টার এবং বি-এ বাঙ্গালায় (ভার্ণাকুলার) কয়েক নম্বর করিয়া ব্যাকরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণ ম্যাট্রিকের উচ্চতম দুই শ্রেণীতে এবং কলেজের কোন শ্রেণীতে পড়ান হয় কিনা এবং হইলে কতটুকু হয় তাহা ত কাহারও অবিদিত নয়। কিছুমাত্র ব্যাকরণ না জানিয়া কোন ভাষা আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙ্গালী ছাত্রদের রচনার ভঙ্গী খারাপ হইলে কেমন করিয়া শুধু তাহাদেরই দোষ দিই?

ভারতে ধান্যের চাষ—

বাঙ্গালা দেশের বহু শিক্ষিত যুবক বর্ত্তমানে অন্য কাজ-কর্ম্ম না করিয়া কৃষি দ্বারা জীবিকার্জ্জনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং অনেক স্থলে তাঁহারা কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা একটি বিষয়ে তাঁহাদের ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে চাই। পৃথিবীর যে সকল দেশে ধানের চাষ হয়, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের জমীতেই জমীর পরিমাণ হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা কম ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে; স্পেন দেশে প্রতি একর জমীতে ৬৩ মণ, ইটালীতে ৪৯ মণ, জাপানে ৩৩ মণ, মিশরে ২৮ মণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৬ মণ ও ভারতে প্রতি একর জমীতে মাত্র ১৬ মণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট পক্ষের কৈফিয়ৎ এই যে অন্যান্য দেশে জমী পরীক্ষা করিয়া শুধু ধান চাষের উপযোগী জমীতেই কৃষকগণ ধানের চাষ করে—কিন্তু ভারতের কৃষকগণ জমী নির্ব্বাচন করে না—যে জমী পায় তাহাতেই ধান চাষ করে। সেজন্য এদেশের জমীতে এত কম পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়। এ কথা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য, আমরা তাহা মনে করি না। এ দেশে কৃষির ব্যবস্থা এখনও উন্নততর করা প্রয়োজন। জমী নির্ব্বাচন বিষয়ে ও গভর্ণমেণ্ট সাধারণ কৃষককে সাহায্য করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? বাঙ্গালা দেশে প্রতি একর জমীতে গড়ে ১৯ মণ আউস ধান, ২০ মণ আমন ধান ও ২৩ মণ বোরো ধান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রগুলিতে কোন কোন স্থানে প্রতি একরে ৫৪ মণ পর্য্যন্ত ধান হয়। ইহা বহুদিন পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রগুলিতে প্রমাণিত হইলেও সাধারণ কৃষকের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাহাদের জমির উন্নতি বিধানে গভর্ণমেণ্ট কি কোন চেষ্টা করিয়াছেন? তাহা করিলে কৃষকের দুর্দ্দশা অনেক কমিয়া যাইত। যতদিন পর্য্যন্ত জাতি-গঠন বিভাগ গুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট অধিক অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা না করিবেন, ততদিন কৃষকদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোনই সম্ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে জমীতে সার প্রদানের কথা ও আলোচনার বিষয়। পূর্ব্বে জমী-গুলিতে শুধু যে গোবরের সার দেওয়া হইত তাহা নহে, অন্যান্য পচা জিনিষও সাররূপে ব্যবহৃত হইত। এখন সার প্রদান ব্যবস্থা কমিয়া গিয়াছে; বিলাতী সারের মূল্য অধিক, তাহা ক্রয় করা দরিদ্র কৃষকদিগের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কৃষকগণ যাহাতে নিজ নিজ জমীর জন্য নিজেরাই সার প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, সে জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রগুলিতে জঞ্জাল, জঙ্গল প্রভৃতি পচাইয়া সার প্রস্তুত করা হয়; সার প্রস্তুতের আরও অনেক উপায় আছে; কৃষকগণ সে সকল বিষয়ে অবহিত হন না কেন?
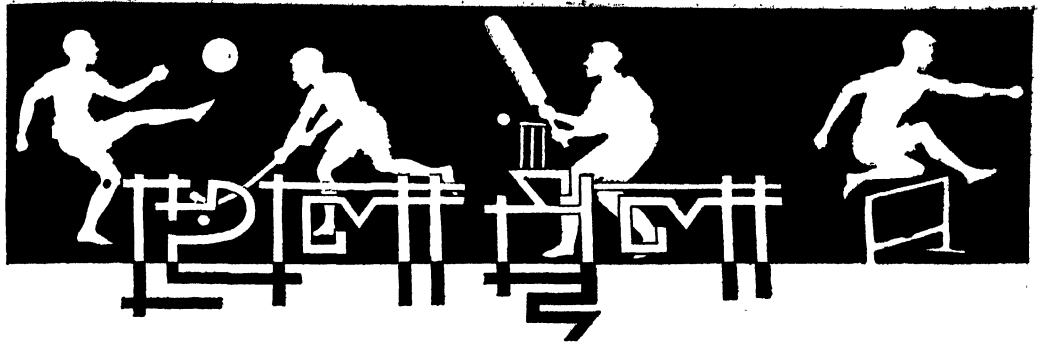
একাদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঃ ১৬ই আগষ্ট ১৯৩৬, রাত্রে বার্লিনে একাদশ অলিম্পিকের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছে। প্রায় লক্ষাধিক দর্শকের মধ্যে স্বয়ং হার হিট্‌লার উপস্থিত ছিলেন। অলিম্পিকের মঙ্গল দীপ, যেটি ১লা আগষ্ট থেকে পনেরো দিন ধরে সমানে প্রজ্বলিত ছিল, রাত্র ৯-১০ মিনিটে তাকে নির্ব্বাপিত করা হয়। উপস্থিত জনতা অভিবাদন দেবার পর অলিম্পিক পতাকা নমিত করা হলো। এক মিনিট কালব্যাপী পূর্ণ নীরবতার পর লাউড্ স্পিকারে ধ্বনিত হলো—"আমি বিশ্বের যুবজনকে টোকিও নগরীতে আহ্বান করছি।"

অলিম্পিক খেলার উদ্বোধনে শুভ্রবেশধারী জার্ম্মাণ এথ্‌লেট্‌গণ ষ্ট্যাডিয়মের সুমুখ দিয়ে 'মার্চ্চ পাষ্ট' করে যাচ্ছেন

অলিম্পিকে জার্ম্মানী প্রথম ঃ অলিম্পিকে প্রথম স্থান অধিকার নিয়ে জার্ম্মাণী ও আমেরিকার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশেষে জার্ম্মাণীই জয়ী হয়েছে। আমেরিকার নিগ্রোজাতিয় এথ্‌লেট্‌স্‌রা আমেরিকাকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে বিশেষ সহায়তা করেছে। নিগ্রো ক্রীড়াবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ানিয়া ওয়েন্স সর্ব্বজাতির প্রশংসা লাভ করেছেন। জার্ম্মাণী সর্ব্বসমেত ৫৮৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ৩৭৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান ও ইতালী ১৫৫ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ক্রীড়া জগতে ফিল্ড ও ট্র্যাক প্রতিযোগিতার সম্মান অধিক। ঐ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই ফিল্ড ও ট্রাকের ২৩টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়, তন্মধ্যে ১২টিতে মার্কিন যুক্তরাজ্য জয়লাভ
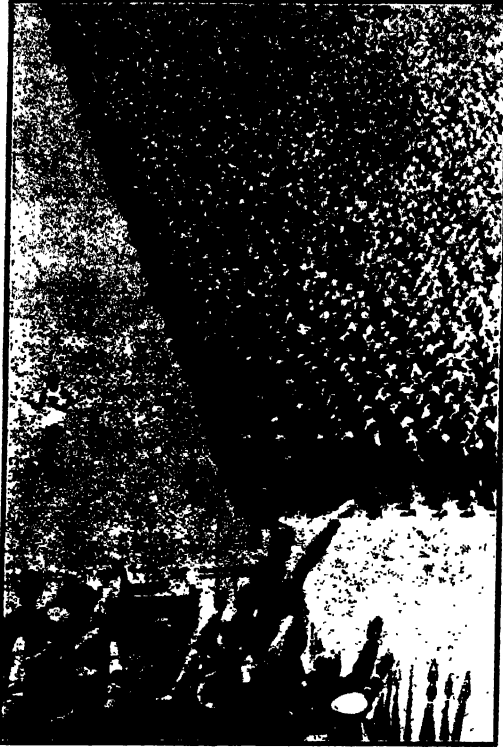
১৯৩৬ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধনে, গ্রীস থেকে আনীত অলিম্পিক মশাল বাহক বেদীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে—পাশে বিশাল অগণিত জার্ম্মাণ যুবকগণ দণ্ডায়মান

করেছে। জার্ম্মাণী ও ইতালী প্রত্যেকে তিনটিতে জয়লাভ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। নারী-দিগের ফিল্ড ও ট্র্যাক প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণী ও যুক্তরাজ্য দু'টি বিষয়ে প্রথম হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও জাপান সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনটি বিষয়ে প্রথম হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যুক্তরাজ্য দু'টি বিষয়ে প্রথম হয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। নারীদিগের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় হল্যাণ্ড প্রায় সমস্ত বিষয়েই প্রথম হয়েছে।

বাচ প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণী জয়লাভ করেছে।

বাস্কেট বল ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডাকে অতি সহজে হারিয়েছে।

অলিম্পিক ফুটবল ঃ

ফাইনাল খেলায় অতিরিক্ত সময়ে ইটালী ২-১ গোলে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে বিশ্ববিজয়ী হয়েছে। ইটালী দল বিশেষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলেছে। একঘণ্টা খেলে উভয় পক্ষেই একটি করে গোল হয় অতিরিক্ত সময় খেলায় ইটালী আর একটি গোল দিয়ে জয়ী হয়।

বিশ্ববিজয়ী ভারত ঃ

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণীকে ৮-১ গোলে হারিয়ে ভারতবর্ষ এবারও বিশ্ববিজয়ী হয়েছে। উপর্য্যুপরি তিনবার ভারতবর্ষ হকিতে বিশ্বজয়ী হলো। অলিম্পিকে একমাত্র হকি খেলা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিযোগিগণ কিছুই করতে পারেন নি। প্রথমে গুজব রটে যে জার্ম্মাণীর হকি দল এবার খুব দুর্দ্ধর্ষ। ইহা বিশ্বাস যোগ্য বলে বোধ হ'লো যখন প্র্যাকটিস খেলায় জার্ম্মাণী ভারতবর্ষকে হারিয়ে দিলে। ধ্যান চাঁদের সঙ্গে পা

রেখে রাইট-ইন্ খেলতে পারছেনা দেখে ভারতে 'কেব্‌ল্' এলে দারা বিমানযোগে রওনা হন। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত হকিদল দেশের সম্মান রক্ষা করতে পেরেছে। ক্রিকেটদলের মতন ভারতের মুখে কালি দেয় নি।

ভারতবর্ষ—৪-০ গোলে হাঙ্গারীকে, ৭-০ গোলে আমেরিকাকে, ৯-০ গোলে জাপানকে, ১০-০ গোলে ফ্রান্সকে পরে জাফরের সেণ্টার থেকে রূপসিং প্রথম গোল দেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ধ্যানচাঁদ আরো দু'বার বল গোলে ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু গোল বাতিল হয়েছিল অফ্-সাইড অভিযোগে, বিচার ঠিক হয় নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায়, ভারতবর্ষ জার্ম্মাণীকে বিপর্য্যস্ত করে তুললে। অষ্টম মিনিটে সর্ট কর্ণার থেকে ট্যাপ্‌সেল দ্বিতীয় গোল করেন। ক্যাপ্‌টেন একাকী নিজের চেষ্টায় তৃতীয় গোল করলেন

ভারতীয় হকিদল—জার্ম্মাণীকে অলিম্পিক হকি ফাইনাল খেলায় ৮-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বার বিশ্ববিজয়ী চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন

এবং ৮-১ গোলে জার্ম্মাণীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। জার্ম্মাণী ব্যতীত অন্য কোন জাতিই তাদের একটিও গোল দিতে পারে নি।

১৪ই আগষ্ট বৃষ্টির জন্য খেলা হ'লো না। পরদিন বেলা ১১টায় খেলা হয়। ষ্ট্যাডিয়মে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বহুলোককে ফিরে যেতে হয়েছিল। ৩২ মিনিট খেলার এবং সুন্দর আদান-প্রদান করে চতুর্থ গোলটি দিলেন। ইহার ৬ মিনিট পরে উইস্ জার্ম্মাণীর পক্ষের গোলটি দেয়। জাফর একাকী বল নিয়ে গিয়ে পঞ্চম গোল দিলে। এর পরে জার্ম্মাণীর গোল অবিরাম আক্রমিত হতে লাগলো।

সুন্দরভাবে কঠিন বল আটকাতে হয়। ধ্যানচাঁদ শেষ মুহূর্ত্তে অষ্টম গোলটি দিয়ে প্রমাণ করলে যে গোল দিতে ইচ্ছা করলে তাঁকে বাধা দিতে কেউ পারে না।

ভারতবর্ষ :—এলেন ; ট্যাপ্‌সেল, হুসেন ; নির্ম্মল, কুলেন, গ্যালিবর্ডি ; সাহাবুদ্দিন, দারা, ধ্যানচাঁদ, রূপসিং ও জাফর।

জার্ম্মাণী :—ড্রোস্‌ ; কেমার, জ্যাণ্ডার ; জার্ডেস্‌, কেলার, চ্যামলিক্‌, হাফ্‌ম্যান্‌, হামেল উইস্‌, চ্যার্‌বাট ও মেস্‌নার।

ব্যাভেরিয়ান ইলেভনের সঙ্গে খেলায় ভারতবর্ষ ৫-০ গোলে জিতেছে।

স্যাক্সনি ইলেভনকে ৮-১ গোলে হারিয়েছে।

বার্লিন ইলেভনের সঙ্গে খেলা ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছে। ধ্যানচাঁদ পেনালটি বুলি থেকে গোল করতে পারেন নি। শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ১ গোলে হারছিলো, শেষমুহূর্ত্তে ধ্যানচাঁদ গোল শোধ করে খেলা ড্র করে। খেলা খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। ভারতবর্ষই বেশী আক্রমণ করে এবং গোলের অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। বার্লিন ইলেভন প্রশংসনীয় খেলেছে।

অলিম্পিক হকি ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য—ভারতবর্ষ গোল দিতে যাচ্ছে

রেফারি :—ভন্‌'ট্‌লাম (হল্যাণ্ড) এবং লীজেসিস্‌ (বেলজিয়াম)।

পূর্ব্ব বিজয়ীগণ :—

১৯০৮ ও ১৯২০—গ্রেট্‌ ব্রিটেন,

১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬—ভারতবর্ষ।

ফ্রাঙ্কফুর্টে ভারতীয়দল হকি খেলায় ৫-২ গোলে জয়ী হয়েছেন।

লিয়োউটি ট্রফী ঃ

কন্‌সোলেসন্‌ হকি প্রতিযোগিতায় আফগানিস্থান ৩-০ গোলে আমেরিকাকে পরাস্ত করে এই ট্রফী পেয়েছে। আফগানিস্থান উৎকৃষ্ট খেলা দেখিয়েছে।

লণ্ডনে আফগান হকিদল অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির সঙ্গে খেলায় ২-১ গোলে জয়ী হয়েছে। রাক্‌সা ও সুলতান গোল দিয়েছে।
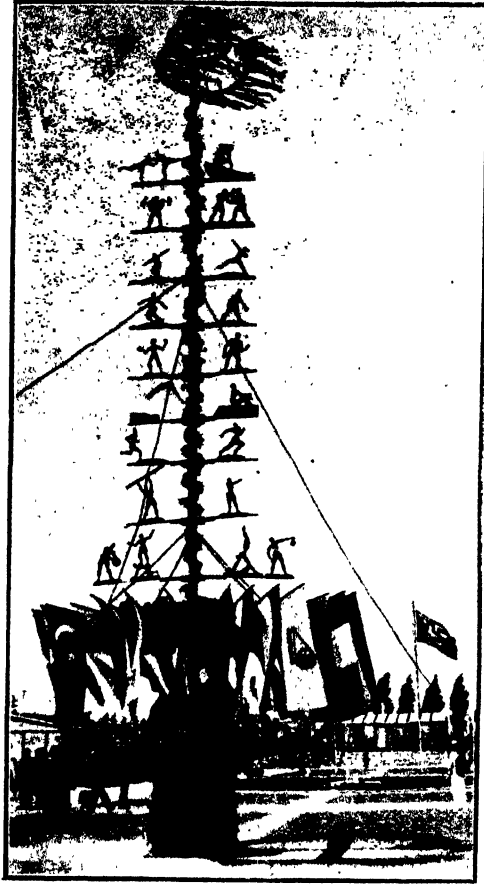
জার্ম্মাণ লেবার-সার্ভিসের মডেল ক্যাম্পের মধ্যে অলিম্পিয়া-গাছ—বিভিন্ন জাতির জাতীয় পতাকা ও খোদিত মূর্ত্তি শোভিত

রোভার্স কাপ ঃ

বোম্বাইএর রোভার্স কাপ্ প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী কিংস রেজিমেণ্ট ২-০ গোলে কিংস্ শ্রপ্‌সায়ার লাইট ইন্‌ফেন্ট্রিকে পরাজিত করে এবারও বিজয়ী হয়েছে। রোভার্সের বিশেষত্ব এবারও বজায় রইল। এ পর্য্যন্ত কোনও সিভিলিয়ান দল ইহা জয় করতে পারে নি। এবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং, বাঙ্গালোর মস্‌লিম, দিল্লী ইয়ং মেন্‌স্, আফগান ক্লাব ও কলিকাতার বাছাই দলের 'অল্ ব্লুজ' ইহাতে যোগদান করায় এই প্রতিযোগিতা জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষণ করেছিল। একমাত্র মহমেডানস্পোর্টিং সেমিফাইনালে পৌছাতেপেরেছিল। রোভার্সে মোহনবাগান দলও একবার সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল। তৃতীয় রাউণ্ডে অল ব্লুজের সঙ্গে মহমেডানদের খেলা হয়। প্রথম দিনের খেলায় অতিরিক্ত সময় খেলেও ১-১ গোলে ড্র হয়। দ্বিতীয় দিনে মহমেডানরা ৩-১ গোলে জয়ী হয়। কিন্তু প্রথম পনেরো মিনিট অল্ ব্লুজ মহমেডানদের যেরকম চেপে ধরেছিল, অবধারিত গোল যদি নষ্ট না করতো তবে তারা চার গোলে অগ্রগামী হ'তো। কে এস এল আইএর কাছে মহমেডানরা ২-১ গোলে হেরে গেছে, সেমিফাইনালে। এদিন মহমেডানদের খেলা মোটেই ভাল হয় নি। ওসমান না থাকলে এরা আরো বেশী গোলে হারতো। ফ্রি কিক্ থেকে নুরমহম্মদ একটি গোল দেয়। ফাউল খেলার জন্য সাফি ও আক্‌তারকে রেফারিকে সতর্ক করে দিতে হয়।

বাঙ্গালোর মস্‌লিমদল সুবিধা করতে পারে নি। তারা ট্রানজিট্ সেক্সনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে, লিন্‌কন্‌সের কাছে ৩-০ গোলে হেরে গেছে। আফগান ক্লাব ডারহামসের সঙ্গে দু' দিন ড্র করে জেতে, কিন্তু কে এস এল আইএর সঙ্গে ভালো খেলেও ২-১ গোলে হেরে যায়। গত বৎসরের বিজয়ী কিংস রেজিমেণ্ট বোম্বে জিমখানা, দিল্লী ইয়ং মেন্‌স্, রয়েল ওয়ারউইকসায়ার ও লিন্‌কন্‌স্‌কে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার ফাইনাল খেলা কিংস রেজিমেণ্ট ও কে এস এল আইএর মধ্যে হয়। গত বৎসরের বিজয়ী কিংস রেজিমেণ্ট ২-০ গোলে জয়ী হয়েছে। কিংস রেজিমেণ্ট চার বৎসরে তিন বার রোভার্স বিজয়ী হলো। বিজয়ীদের সেণ্টার হাফ্ কুইন্ চমৎকার খেলা দেখিয়েছে। হাফ ব্যাকের এরূপ সুন্দর খেলা বোম্বাইতে পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নি ব্যাকে হিগিন্‌বটম্ ও থমসনকে কোন ভুল করতে দেখা যায় নি; গোলে কার্টলেজ বেশ নির্ভরযোগ্য এবং সুন্দর বল আটকেছে। জ্যাকসন ফরওয়ার্ডদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, স' ও মুর বেশ ভালো খেলেছে।

বিজিতদের মধ্যে ব্যাকে রাউণ্ড ও ওয়েষ্টার্ণ বিপক্ষদের বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেছিল। হাফ ব্যাকে ক্রাইটে ভালো খেলতে পারে নি, বার বার মিস্ কিক্ করেছে। ফরওয়ার্ডে পোপ কয়েকটি সুন্দর সেণ্টার করে, কিন্তু ইন্

সাইডরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। বিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডেরিকও ভালো খেলতে পারে নি।

প্রথমার্দ্ধে কোন গোল হয় নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মুর প্রথম গোল দেয় এবং শেষ মুহূর্ত্তে মুরের সেণ্টার থেকে স' দ্বিতীয় গোল করে।

৺রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সাহায্য চ্যারিটি ঃ

৺রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ফণ্ডের সাহায্যার্থ মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংএর মধ্যে একজিবিশন চ্যারিটি খেলা হয়েছিল। মোহনবাগান মহমেডানদের ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। মোহনবাগান আরো একটি গোল দিয়েছিল কিন্তু অফ্‌সাইড বলে তা বাতিল হয়। এই অফ্‌সাইডটি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল। মোহনবাগানই ভালো খেলেছে, তাদের দলও পুষ্ট ছিল। মহমেডানদের সকল খেলোয়াড়রা খেলে নি। তারা এই খেলায় যোগদান করতেই প্রথমে রাজী হয় নি। পরে কোন অজ্ঞাত কারণে খেলতে সম্মত হয়। মোহনবাগান পক্ষে কে ভট্টাচার্য্য খেলেছিল। কাষ্টমস থেকে তার ছুটি হয়ে গেছে। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নি। মোহনবাগানই বেশী সময় আক্রমণ করেছিল।

মোহনবাগানের বিজয় ঃ

জুনিয়ার প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান নিম্নলিখিত ট্রফীগুলি জয় করেছে ;

কুচবিহার কাপ :—(১-০) গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে পেয়েছে।

গ্রিফিথ শীল্ড :—(২-১) গোলে এটাচ্‌ড সেক্সনকে পরাজিত করে লাভ করেছে।

উইলিয়াম ইয়ঙ্গার কাপ্ :—(২-০) গোলে ইষ্ট বেঙ্গলকে পরাভূত করে জয় করেছে। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় দল এই কাপ্ বিজয় করতে পারে নি।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণ :—ক্যালকাটা (১৯২৯-৩০-৩১) রেঞ্জার্স ক্লাব (১৯৩২), ডারহাম্‌স্ (১৯৩৩), ডালহৌসী (১৯৩৪), সেণ্টজোসেফ (১৯৩৫)।

জবাকুসুম কাপ :—মোহনবাগান ১-০ গোলে এরিয়ান-দের হারিয়ে জয়ী হয়েছে।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

স্কটিস চার্চ্চ কলেজ ১-০ গোলে রিপন কলেজকে হারিয়ে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। বি বোস গোলটি দেন।

অফিস ইণ্টার-ন্যাসনাল ঃ

এই বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল ১-০ গোলে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।

ইণ্টার-অফিস ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম ডিভিসনে বি জি প্রেস প্রথম হয়েছে। গত বৎসরও এরা প্রথম ছিল। দ্বিতীয় ডিভিসনে টার্ণার মরিসন ও তৃতীয় ডিভিসনে জি ম্যাকেঞ্জি এণ্ড কোং প্রথম হয়েছে।

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ—২২২ ও ৩১২

ইংলণ্ড—৫৭১ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৬৪ (১ উইকেট)

শেষ টেষ্ট খেলায় ওয়ার্দিংটন (ডার্ব্বি) বাকাজিলানীর একটা বল হাঁকড়েছেন। ইনি ১২৮ রান করেছেন

ভারতবর্ষ ৯ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। ইংলণ্ড ভারতের বিপক্ষে 'রবার' পেয়েছে। এবারের তিনটি টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দু'টিতে নয় উইকেটে জয়ী হয়েছে এবং একটি খেলা ড্র হয়েছে। ভারতের পরাজয়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাঁদের খারাপ ফিল্ডিং। ইংলণ্ডের স্কোর যখন মাত্র তিন, তখন যদি নাইডু হ্যামণ্ডের 'হাফভলি' (যদিও কঠিন ছিল) ধরতে পারতেন, ওয়াজির যদি হ্যামণ্ডের অতি সোজা ক্যাচ ফেলে না দিতেন ৯৬ রানের মাথায় এবং ওয়ার্দ্দিনটনের তিনটি ক্যাচ যদি ফসকানো না হতো, তা'হলে এই তৃতীয় টেষ্টের পরিণাম বোধহয় অন্য

দ্বিতীয় টেষ্টের দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাস্তাকআলি ওয়ার্দ্দিংটনের বল স্লিপের ভিতর দিয়ে চালিয়ে স্কোর করছেন

যদি ব্যানার্জ্জি ও সি এস নাইডুকে নেওয়া হতো, তা'হলেও ফল অপেক্ষাকৃত ভালো হতো। ব্যানার্জিকে একটা টেষ্টেও
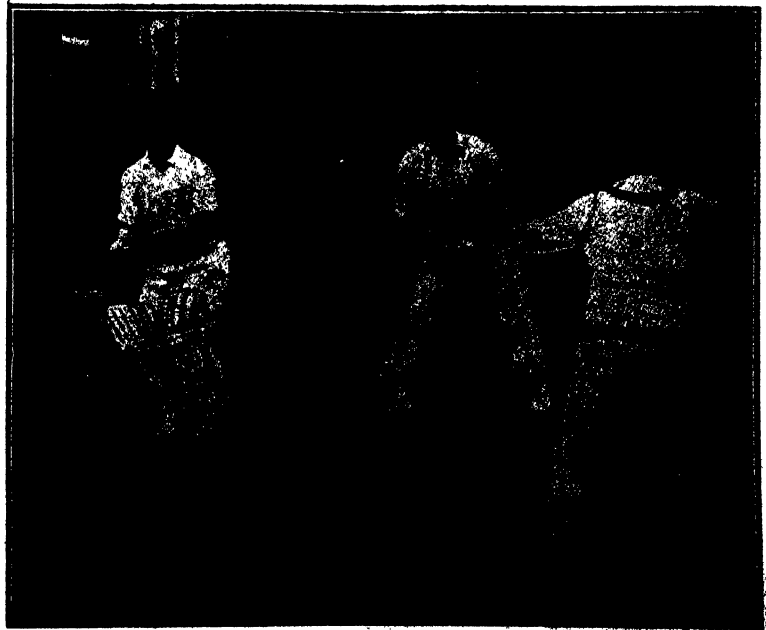
কেন যে মনোনীত করা হ'লো না, তা' একমাত্র ভগবান ও ভারতের নামকরা বিজ্ঞ ক্যাপটেনই বলতে পারেন। তৃতীয় টেষ্টে, মার্চ্চেন্টের ব্যাটিং বিলাতের দর্শকদের এত মোহিত

আলির ব্যাটিং প্রশংসনীয় হয়েছিল। ওয়াজির আলি এ অভিযানে নৈরাশ্যজনক খেলেছেন। জাহাঙ্গীর ও বাকাজিলানী কৃতকার্য্য হন নি।

দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ফিল্ড করতে ম্যানচেষ্টার মাঠে নামছেন

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ডের তৃতীয় বা শেষ টেষ্টে ওভাল মাঠে, হ্যামণ্ড (গ্লষ্টারস্) এগিয়ে সি কে নাইডুর বল হাঁকড়াচ্ছেন। এ খেলায় ইনি ২১৭ রান করেছেন

১৫ই আগষ্ট ১৯৩৬, কেনিংটন ওভাল মাঠে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের তৃতীয় বা শেষ টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়। আকাশ পরিষ্কার, আবহাওয়া উত্তপ্ত ও রবিকরোদ্ভাসিত সুন্দর নিখুঁত মাঠে মাত্র চার সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিল। এলেন টসে জিতে বার্ণেট ও ফ্যাগকে ব্যাট করতে পাঠালেন, অমর-সিং ও নিসার বল দিতে লাগলেন।

করেছিল যে তারা তাঁকে বিজয়ের' বদলে 'Joy' নাম দিয়েছিল। নাইড, দিলওয়ার, রামাস্বামী ও মান্তাক

প্রথমদিনের শেষে ইংলণ্ড ৪৭১ রান ৮ উইকেটে করলে। হ্যামণ্ড ২১৭, ওয়ার্দিংটন ১২৮ ও বার্ণেট ৪৩।

নিসার ব্যতীত কোন বোলারকে ইংলণ্ডের ব্যাটস্‌ম্যানরা গ্রাহ্য করেন নি। নিসার ১২০ রানে ৫ উইকেট, অমরসিং ১০২ রানে ২ উইকেট ও নাইডু ১৮২ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

ভারতীয়দলের ইনিংস আরম্ভ হলো মার্চ্চেন্ট ও মান্তাক আলিকে দিয়ে। উভয়ে মিলে রান সংখ্যা তুললেন ৮১। মান্তাক আলি ভেরিটির বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত ডাক্‌ওয়ার্থের হাতে ষ্টাম্পড হলো ৫২ রান করে। লাঞ্চের পর একটি রানও না করে মার্চ্চেন্ট ৫২ রানে এলেনের বলে বোল্‌ড হলেন, ১৫৫ মিনিট খেলবার পরে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য সুরু হলো, প্রথম উইকেট ৮১, দ্বিতীয় উইকেট ১২৫ ও তৃতীয় উইকেট ১৩০ রানে পতন হ'লো। নাইডু, অমরসিং ও ওয়াজির আলি কেহই টিকতে পারলেন না। দিলওয়ার ও রামাস্বামী মিলে ৫৫ রান ৫০ মিনিটে করেছে। রামাস্বামী ২৯ রানে সিমের বলে বোল্‌ড হলো। ওয়াজির আলি সিমের বলে এল্‌ বি ও অমরসিং ভেরিটির বলে বোল্‌ড হলো। দিলওয়ার ১৩৫ মিনিট ধৈর্য্য সহকারে খেলবার পরে ৩৫ রানে ভেরিটের বলে ষ্ট্যাম্পড হলেন। দু'শো রান উঠলো ২৪৫ মিনিটে। নিসার পিটিয়ে তিনবার চার করলে, তার পরে ১৪ করে ওয়ার্দ্দিংটনের হাতে আটকালে মোট ২২২ রানে ভারতীয়দের প্রথম ইনিংস ২৬৫ মিনিট খেলবার পরে বেলা ৪-১০ মিনিটে শেষ হলো।

সিম ৭৩ রানে ৫ উইকেট, ভেরিটি ৩০ রানে ৩ উইকেট, এলেন ৩৭ রানে ১ ও ভয়েস্‌ ৪৬ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ ২৪৯ রান পশ্চাতে থাকায়, 'ফলো-অন্‌' করতে বাধ্য হলো। দ্বিতীয় ইনিংসে মার্চ্চেন্ট বেশ পিটিয়ে রান তুলতে লাগলেন। ৫০ রান সংখ্যা উঠলো ৩৬ মিনিটে। স্কোর-বোর্ড যখন ৬১ রান নির্দ্দেশ করছে, তখন তাঁর রান সংখ্যা ৪১ ও মান্তাকের ১৭। বেলা শেষে ভারতবর্ষ ১৫৬ রান তুললে ৩ উইকেট খুইয়ে। মার্চ্চেন্ট ৪৮ রানে গেলেন, অমরসিং ২৬ মিনিটে ৪৪ রান করে আউট হলেন। মোট শত রান উঠ্‌লো ৭০ মিনিটে।

তৃতীয় দিনে, খেলার আরম্ভের সঙ্গেই বাকাজিলানী আউট হলে সি কে নাইডু দিলওয়ারের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং নির্ভীক হয়ে খেলতে লাগলেন। ১৭ রান করলে এই অভিযানে তাঁর সহস্র রান সম্পূর্ণ হলো। একমাত্র মার্চ্চেন্ট তাঁর পূর্ব্বে সহস্র রান সম্পূর্ণ করেছিলেন। দিলওয়ার নাইডু সহযোগিতা একঘণ্টা স্থায়ী হয়ে ৫৩ রান যুক্ত করলে। দিলওয়ার ৫৪ রানে এল-বি (নূতন নিয়মে) হলেন। ওয়াজির আলি মাত্র ১ করে

শেষ টেষ্টে দিলওয়ার হোসেন ভেরিটির বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েছেন

ডাক্‌ওয়ার্থের হাতে আটকালেন। রামাস্বামী যোগ দেবার পরে নাইডু তাঁর নিজস্ব ৫০ রান তুললে ৮৫ মিনিট খেলে। মোট ২৫০ রান উঠলো, লাঞ্চের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে। নাইডু ১৪৫ মিনিট খেলবার পরে ৮১ রান করে এলেনের বলে বোল্‌ড হলেন। তিনি ৮ বার চারের বাড়ী দিয়েছেন। এই ৮১ রান বিলাতের টেষ্টে নাইডুর সর্ব্বোচ্চ রান। [illegible]

তৃতীয় টেষ্টে বাকাজিলানী ভেরিটির বল পিটেছেন

নাইডু প্রথম ইনিংসে ৯১ রানে ৫ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৩ রানে ৪ উইকেট ও এস ব্যানার্জ্জি ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। যখন মাত্র ৯ রান হলে হ্যাম্প-সায়ারের জিত হবে, সি এস বল দিতে এলেন এবং মীডের রান তোলা বন্ধ করলেন ও লেসনকে নিজের বলে ক্যাচ ধরে আউট করে ২ রানে ভারতীয় দলকে জিতিয়ে দিলেন। নাইডু ৫৮ ও ব্যানার্জ্জি ৪৪ (নট আউট) করেছেন দ্বিতীয় ইনিংসে।

পরে নাইডু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর ষ্টাইলে পূর্ব্বের খেলার সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। নাইডু রামাস্বামী সহযোগিতায় ৭৫ রান ওঠে। রামাস্বামী শেষ পর্য্যন্ত চমৎকার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন, কিন্তু কেহ শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকতে না পারায় তিনি ৪১ রানে ১০৫ মিনিট খেলে নট আউট রয়ে গেলেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১০ মিনিট স্থায়ী ও মোট রান সংখ্যা ৩১২ হয়েছিল।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে বার্ণেট ও ফ্যাগকে দিয়ে। নিসারের বলে অমর সিং ফ্যাগকে লুফ্‌লে মোট ৪৮ রানের মাথায়, হ্যামণ্ড যোগ দিলেন। ইংলণ্ড আবশ্যকীয় ৬৪ রান করলে ৪১ মিনিটে। বার্ণেট ৩২ (নট আউট), হ্যামণ্ড ৫ (নট আউট) ও ফ্যাগ ২২, অতিরিক্ত ৫। ইংলণ্ড তৃতীয় টেষ্ট ৯ উইকেটে জয়ী হ'লো।

এলেন ৮০ রানে ৭, সিম ৯৫ রানে ২ ও ভেরিটি ৩২ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

বিলাতে ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ—১৯২ ও ১৯৯

হ্যাম্পসায়ার—২৩৮ ও ১৫১

ভারতবর্ষ ২ রানে বিজয়ী হয়েছে। সি এস নাইডু ও এস ব্যানার্জ্জির জন্যই এই জিত সম্ভব হয়েছে। সি এস

ফ্রলেনটিলি ফ্লেচার (জার্ম্মাণী) জাভেলিন ছোড়ায় প্রথম হয়ে জার্ম্মাণীর পক্ষে প্রথম গোল্ড মেডেল লাভ করেছেন

সি এস নাইডুকে বিমানযোগে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে টেষ্ট ম্যাচে খেলতে না দেওয়া ও এস ব্যানার্জ্জিকে একটিও টেষ্টে না নেওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। ক্যাপ্‌টেনের দল গঠনে অপারগতা এতে প্রমাণিত হয়।

১৯৩২ সালে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ১০৩ রানে পরাজিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষ—১৭৩ ও ১৪৮

কেণ্ট—৫২৩

কেণ্ট এক ইনিংস ও ২০২ রানে জয়ী হয়েছে। ভারতের এরূপ ভীষণ হার আর পূর্ব্বে হয় নি। বিশেষতঃ শুকনো মাঠে খেলে। এ্যাস্‌ ডাউন ১১৭, ফ্যাগ ১৭২ ও এইমস্‌ ১৪৫ রান করেছেন।

ভারতীয়দের প্রথম ইনিংসে দিলওয়ার হোসেনের ২৮ রানই সর্ব্বোচ্চ। তার পরেই এস ব্যানার্জ্জির ২৭, মার্চ্চেন্ট ৪, সি কে নাইডু ২। দ্বিতীয় ইনিংসে, ভিজিয়ানাগ্রাম ৩৯, দিলওয়ার (নট আউট) ৩৩, সি কে নাইডু ২৩, মার্চ্চেন্ট ২২।

টড ৩৪ রানে ৩, উলি ২২ রানে ৪, রাইট ৩১ রানে ২ ও ফ্রিম্যান ৩৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ—৩০৯ ও ২৩৯

সাসেক্স—৪৭৯ ও ৭১ (২ উইকেট)

সাসেক্স ৮ উইকেটে জয়ী হয়েছে।

প্রথম ইনিংসে দিলওয়ার ১২২, মার্চ্চেন্ট ৫২, ভিজিয়ানা ৪৬ রান করেছেন। ওয়াজির আলি শূন্য করেছেন। সাসেক্স পক্ষে, জন্‌ ল্যাংরিজ ও এলান মেল্‌ভিল ভারতীয় বোলারদের উপেক্ষা করে পিটিয়ে প্রথম ১৬৮, দ্বিতীয় ১৫২ ও জেমস্‌ ল্যাংরিজ ৫২ করেছেন। জাহাঙ্গীর খাঁ ১০৩ রানে ৪, আমীর ইলাহী ১১৩ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে, ওয়াজির আলির ৬৭ রান সর্ব্বোচ্চ স্কোর। রামাস্বামী ৬০, দিলওয়ার ৫০ ও মার্চ্চেন্ট ২৯। শেষের ব্যাটস্‌ম্যানদের দ্রুত পতনের জন্যই ভারতের হার হলো। জেমস্‌ ল্যাংরিজ ৪৭ রানে ৭ উইকেট, জন্‌ ল্যাংরিজ ৫৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ—৩৭২ ও ১৫২ (১ উইকেট)

ইংলণ্ড ইলেভন—৩৭৭ ও ২১২ (৩ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

খেলা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে।

জে সি ওয়েন্স (আমেরিকার নিগ্রো) সুন্দর ষ্টাইলে 'লং জাম্প' ৮·০৬ মিটার লাফিয়ে রেকর্ড স্থাপন করছেন—দ্বিতীয় স্বর্ণপদক পেয়েছেন। প্রথম স্বর্ণপদক পেয়েছেন ১০০ মিটার জিতে

ইংলণ্ড পক্ষে প্রথম ইনিংসে ভ্যালেণ্টাইনের সুন্দর সেঞ্চুরী ও টডের দুর্দ্দমনীয় ইনিংস, উভয়েই কেণ্ট খেলোয়াড়, এই খেলার বিশেষত্ব। ভ্যালেণ্টাইন দু' ঘণ্টা খেলে ১১৫ রান করেন, তিন বার ছয়ের ও পনেরো বার চারের বাড়ি

মেরেছেন এবং ৯০ মিনিটে শত রান তোলেন। টড ৭৯, রবিন্‌স্ ৪২।

এস ব্যানার্জ্জি ৯৪ রানে ৪ উইকেট, জাহাঙ্গীর খাঁ ৪১ রানে ২, সি কে নাইডু ৯২ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে, তিন উইকেটে ২১২ রান হ'লে ডিক্লেয়ার্ড করেন। উলি ৭৯, এইম্‌স্ ১০৭।

শেষ বেলা পর্য্যন্ত খেলে ভারতবর্ষ ১ উইকেট খুইয়ে ১৫২ রান করলে খেলা শেষ হয়। মার্চ্চেণ্ট (নট আউট) ৬৪, দিলওয়ার (নট আউট) ৬৯।

বি মিডোজ (আমেরিকা) পোলভল্টে ৪·৩৫ মিটার লাফিয়ে রেকর্ড স্থাপন করে স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন

১৫০০ মিটার দৌড়ে জ্যাক্ লাভ্‌লক্ (নিউজিল্যাণ্ড) ৩ মিঃ ৪৭$\frac{8}{10}$ সেকেণ্ডে প্রথম হয়ে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছেন,—দ্বিতীয়, জি কানিংহাম (আমেরিকা), তৃতীয়, এল বেসালি (ইটালী)

প্রথম ইনিংসে ওয়াজির আলি (নট আউট) ১৫৫, মার্চ্চেণ্ট ৬৮, রামাস্বামী ৪৩, জয় ২৭। ওয়াজির এতদিন পরে, এ-যাত্রার প্রায় শেষে, সেঞ্চুরি করে নিজের মান রেখেছেন। রবিন্‌স্ ১০৫ রানে ৮ উইকেট নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ—২৪২ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

স্যর জুলিয়ান ক্যানের একাদশ—১৩৮ (৬ উইকেট)

খেলাটি ড্র হয়েছে। মাস্তাকআলি ৮৩, রামাস্বামী ৪৮, জয় ৩৫, ওয়াজির আলি ২৫।

বোড্ডিক ৩২, ডেম্পষ্টার ২৪।

লরেন্স কাপ-বিজয়ী এইম্‌স্ ঃ

এইম্‌স্ ইংলণ্ড ইলেভনের হয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে খেলাতে এ বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সেঞ্চুরী করে লরেন্স-কাপ্ বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর শত রান করতে ৬৮ মিনিট লেগেছিল। ইতিপূর্ব্বে কিম্প্‌টনের (অক্সফোর্ড) ৭০ মিনিটে শত রানই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত ছিল। এইম্‌স্ শেষ তের রান ৪ মিনিটে করেছেন।

কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ন ঃ

বিলাতের কাউণ্টি ক্রিকেট খেলায় ডার্ব্বিসায়ার প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ন ইয়র্ক-সায়ার তৃতীয় হয়েছে। ইয়র্ক পূর্ব্ববার ৭১.৩৩ করেছিল।

১। ডার্ব্বিসায়ার—৫৬.৯০ শতকরা
২। মিডেলসেক্স—৫২.০৫ „
৩। ইয়র্ক সায়ার—৫১.১ „
৪। গ্লষ্টার্স—৪৫.১১ „
৫। নটিং হাম্‌সায়ার—৪৫.০০ „
৬। সারে—৪২.৪৪ „

ক্রিকেট খেলোয়াড় নিহত ও আহত ঃ

মোটর দুর্ঘটনায় আর পি নর্থওয়ে (নর্দ্দাম্পটন) নিহত হয়েছেন এবং এ এইচ বেকওয়েল (নর্দ্দাম্পটন) গুরুতর আহত হয়েছেন।

গ্লষ্টার্সের ক্রিকেট ক্যাপ্‌টেন ডি এ সি পেজ নটিংহাম্‌সায়ারের সঙ্গে খেলার শেষে গৃহাভিমুখে যাবার পথে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে মারা গিয়েছেন।

তৃতীয় টেষ্ট সম্বন্ধে মতামত ঃ

রান তোলবার পক্ষে অনুকূল মাঠে হামণ্ড ও ওয়ার্দ্দিংটনের প্রচণ্ড ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে নিসার ও অমর সিংয়ের সুন্দর বল দেওয়ায় বিলাতের সমালোচকগণ প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ভারতীয়দের ফিল্ডিং সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন।

ডেলি টেলিগ্রাফের মতে—"ভারতীয় ক্রিকেট এখনও টেষ্ট ম্যাচ খেলার পর্য্যায়ে ওঠে নি এবং ক্রিকেট এখনও প্রকৃতভাবে ভারতে দৃঢ়মূল হয় নাই।"

টাইমস্ বলেছেন—"ভারতীয় দলের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটেছে; তথাপি তাঁরা পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে মাঠ ত্যাগ করে দৃঢ় ও অপরাজেয় মনোভাব দেখিয়েছেন।"

নিউজ ক্রনিকেল বলেন,—"ভাগ্যদেবী ভারতের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু মার্চ্চেণ্ট, মাস্তাকআলি, নিসার ও অমর সিংয়ের মতন খেলোয়াড় যে-কোন দলের পক্ষেই গৌরবজনক।"

ডেলি মীরার বলেন,—"ভারতীয়দল শেষ দিনে দুর্দ্দমভাবে যুঝেছে এবং খেলেছেও ভালো।"

সন্তরণ ঃ

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের দ্বাদশ বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে।

১৫০০ মিটারে মদনমোহন সিং প্রথম হয়েছেন।

মদনমোহন সিংহ

সাধারণের ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে—(১) রাজারাম সাহু (হাটখোলা), (২) মদনমোহন সিংহ (আনন্দ স্পোর্টিং); (৩) শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় (তালতলা)। সময়—১ মিনিট ৭ৡ সেকেণ্ড।

দীর্ঘ ঝম্পপ্রদান প্রতিযোগিতায় ঃ—প্রথম, শচীন চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট্রাল) ৬৬ ফিট, ১১ ইঞ্চি।

দ্বিতীয়—প্রিয়দর্শন চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট্রাল)।

৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল ([illegible])—(১) [illegible]

কেশরবাণী, (২) হিমাংশু সিংহ, (৩) কে পি রক্ষিত। সময়, ৬ মিঃ ১৮⅘ সেকেণ্ড।

রাজারাম সাহু

৪০০ মিটার (সাধারণ)—(১) মদনমোহন সিংহ (আনন্দ স্পোর্টিং), (২) কে এল কেশরবাণী (সেণ্ট্রাল)। সময়—৫ মিনিট ২০⅘ সেকেণ্ড।

ডাইভিং (সাধারণ):—(১) আশু দত্ত (বৌবাজার), চুণীলাল মুখোপাধ্যায় (সেণ্ট্রাল), (৩) এস কে বন্দ্যোপাধ্যায় (তালতলা)।

আশু দত্ত

১০০ মিটার (কলেজ) ফ্রি ষ্টাইল: (১) বিমলেন্দু সিংহ (আশুতোষ), (২), চণ্ডীচরণ গোস্বামী (কলিঃ মেডিকেল ইনঃ), (৩) কালিদাস মুখোপাধ্যায় (অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ); সময়—১ মিনিট ১৩⅘ সেকেণ্ড।

বালিকাদের (১২ বৎসরের নিম্ন) ৫০ মিটার সাধারণ ফ্রি ষ্টাইল:—(১) মিস্ লীলা চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট্রাল), (২) মিস্ ছায়ারাণী দত্ত (সেণ্ট্রাল), (৩) মিস্ রমা সেনগুপ্ত (খেলাঘর); সময়—৪২ সেকেণ্ড।

মেয়েদের ১০০ মিটার সাধারণ:—(১) মিস্ লীলা চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট্রাল) (২) মিস্ বাণী ঘোষ; সময়—১ মিনিট, ৩৬⅕ সেকেণ্ড। গত বৎসর বাণী ঘোষ প্রথম হয়েছিল।

কুমারী ছায়ারাণী দত্ত

কুমারী রমা সেন গুপ্তা
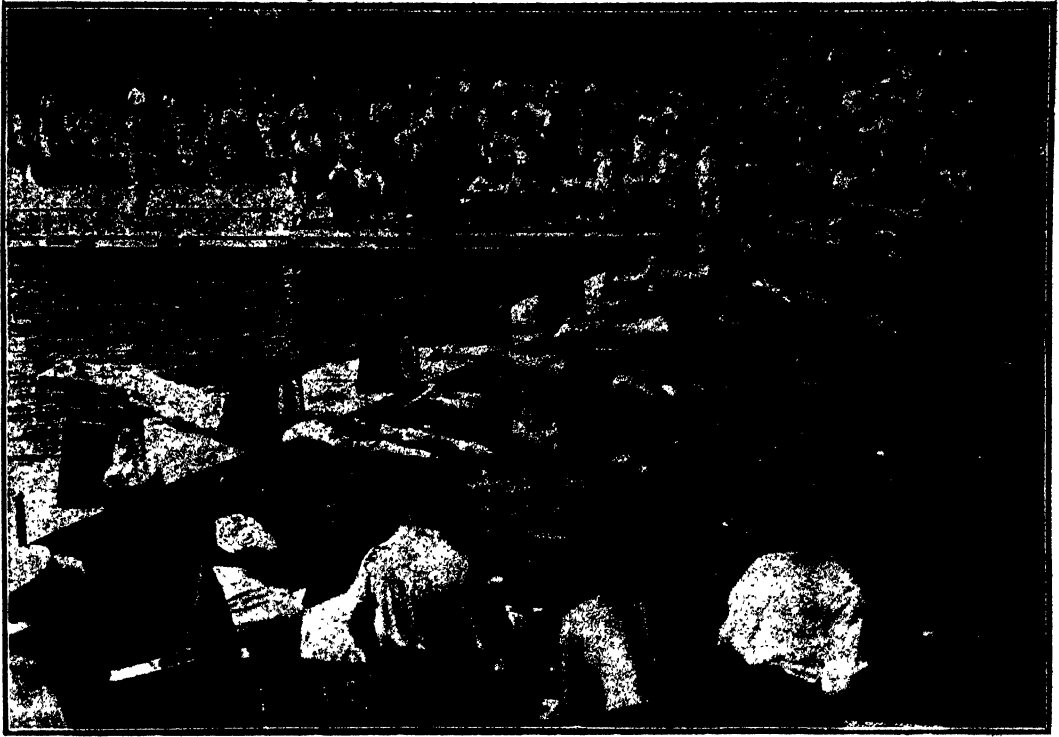
অলিম্পিকে পুরুষদের ১০০ মিটার সাঁতারের আরম্ভ

সন্তরণে রেকর্ড ঃ

লাহোরে রবীন চট্টোপাধ্যায় হস্তবদ্ধাবস্থায় ৭২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৫২ সেকেণ্ড অবিরাম সন্তরণ করে প্রফুল্ল ঘোষের ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট রেকর্ড ভঙ্গ করে পুনরায় নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। শোনা যায়, প্রফুল্লকুমার অক্টোবর মাসে শত ঘণ্টা সন্তরণ করবার মনস্থ করেছেন।

রবীন চট্টোপাধ্যায়

মীডের কৃতিত্ব ঃ

মীড (হাম্পসায়ার) ১৯শে আগষ্ট তারিখে ৪ রান করবার পরে গ্রেসের মোট সমষ্টি ৫৪, ৮৯৬ রানকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর বিভিন্ন প্রদেশের রানের তালিকা :—

ইংলণ্ডে : ৫২,০১১ ; অষ্ট্রেলিয়ায় : ৯৯০ ; সাউথ আফ্রিকায় : ১,৪৭৮ ; জামাইকা : ৪১৮; মোট—৫৪,৮৯৭।

মীড

হেনড্রেন ঃ

প্যাট্সী হেনড্রেন এবৎসর সর্ব্বপ্রথম সহস্র রান করেছিলেন। মিডলসেক্স বনাম ওয়ারউইকসায়ারের খেলায় ৫৭ রান হ'লে তাঁর দ্বিসহস্র রান পূর্ণ হয়। এবৎসর তিনিই প্রথম দ্বিসহস্র রান তুলতে পারলেন। ইঁহার বয়স

৪৭ বৎসর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এবার কোন টেষ্টে ইনি খেলতে পান নি বা অষ্ট্রেলিয়াদলেও খেলবার জন্ম মনোনীত হন নি।

নিউজিল্যাণ্ডগামী জাম-সাহেবের ক্রিকেট দল ঃ

নওনগরের জামসাহেবের একটি ক্রিকেট দল আগামী ৫ই নবেম্বর তারিখে নিউজিল্যাণ্ডাভিমুখে যাত্রা করবে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ দলভুক্ত হয়েছেন :—জামসাহেব, প্রিন্স দলীপসিং, মার্চ্চেন্ট, অমরসিং, মেহেরমজি, কোলা, ইন্দ্রবিজয় সিং, ওগাদ শঙ্কর। আরো পাঁচজন নবীন কাথিয়াড় খেলোয়াড়ও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

টেনিসে ভারতের সাফল্য ঃ

ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়রা কেনিয়াতে ইষ্ট আফ্রিকার ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের ৬-০ ম্যাচে হারিয়েছেন। কৃষ্ণস্বামী 'ষ্ট্রেট' সেটে হে-উড্‌কে হারিয়েছেন। গাউস্ মহমেদ তিনটি সেটেই ডান্‌কানকে পরাজিত করেছেন।

রাগবী ঃ

ক্যালকাটা রাগবী কাপের খেলায় ক্যালকাটাদল সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারস্‌কে ১১-০ পয়েণ্টে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। সেমিফাইনালে গত বৎসরের বিজয়ী বি এন আর ৩-০ পয়েণ্টে লিষ্টারস্‌কে হারিয়েছে। ক্যাল্‌কাটা ও বি এন আরের মধ্যে ফাইনাল খেলা হবে।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ্ ঃ

কালীঘাট ৩-২ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। একটি গোল পেনাল্‌টি থেকে হয়। কালীঘাট ভাল খেলে জয়ী হয়েছে। মোহনবাগানের ব্যাকদ্বয়, বিশেষ রাজেন ঘোষ ও সেণ্টার-হাফের নিকৃষ্ট খেলার জন্যই তাদের হার হয়েছে। গোলে আর ভট্টাচার্য্য কয়েকটি অবধারিত গোল রক্ষা করেছেন।

বেল কাপ ঃ

মোহনবাগান ও ব্লাকওয়াচের সঙ্গে ফাইনাল খেলা হয়। ব্লাকওয়াচ ১-০ গোলে জয়ী হয়েছে। অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য মাঠ বিশেষ খারাপ ছিল।

হনুমান ব্যায়াম মণ্ডল ঃ

সকল যোগদানকারী বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে মাত্র পাঁচটি জাতি একাদশ অলিম্পিকের উদ্বোধনে সঙ্গীত করবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়। হনুমান ব্যায়াম মণ্ডল নির্ব্বাচিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন। ইহারা ব্যায়াম ও খেলা-ধূলা দেখিয়ে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। ইহাদের প্রদর্শিত হাডু-ডু খেলা বিদেশীদের এত প্রীত করেছে যে অনেকে ঐ খেলার প্রচলন করেছেন। ইণ্টার-ন্যাশন্যাল স্পোর্টস্ ষ্টুডেণ্টস কংগ্রেস্ ইহাদের হিট্‌লার মেডেল নামে একটি স্পেশাল মেডেল দিয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীর ফিজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জন্য আরো একটি মেডেল ইণ্টার-ন্যাশন্যাল অলিম্পিক স্পোর্টস্ কমিটির নিকট থেকে পেয়েছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত গল্পপুস্তক "অকুরন্ত"—১৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "লক্ষ্মীর বিবাহ"—১॥৹
শ্রীঅমূল্যধন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অন্বয় সমন্বিত যৌগিক ব্যাখ্যা "যোগি গীতা" প্রথম খণ্ড—১৲, ২য় খণ্ড—২৲
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত দর্শন-গ্রন্থ "বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা"—১৲
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "চিরন্তনীর জয়"—১॥৹
৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শাস্ত্রালোচনা পুস্তক "শান্তি পথ"—২৲
আবদুল কাদের বি এ, বি-সি-এস প্রণীত ঐতিহাসিক "মুর-সভ্যতা"—২॥৹
হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "বিয়ের আগে"—১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত "বাঙ্গালী কোন্ পথে"—১।৹
শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী প্রণীত নাটক "নারীপ্রগতি"—।৹
অনিরুদ্ধ রায় প্রণীত উপন্যাস "আফিমের ফুল"—২৲
শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী প্রণীত সচিত্র কবিতা "সাধের বীণা"—১।৹
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প পুস্তক "বনফুলের গল্প"—১॥৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "হারাণো-স্মৃতি"—২৲
ভূ-পর্য্যটক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ইংরাজি ভ্রমণ কাহিনী "My Travels in the East"—২৲
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "অগ্রগামী"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত যৌনবিজ্ঞান "যৌবনের যাদুপুরী"—১৲
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার এম-এ সম্পাদিত গীতোক্ত সার সংগ্রহ "গীতা প্রাঞ্জলকরী" প্রথম খণ্ড—।৹
শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত ধর্ম্মমূলক নাটক "নদের নিমাই"—১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত "কাটা মুণ্ডুর কারসাজি"—॥৵৹
শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত এম-এ প্রণীত উপন্যাস "চাঁদে প্রথম মানুষ"—॥৵৹
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "লালদুষা"—১॥৹
শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় প্রণীত "নিদ নাহি আঁখিপাতে"—১॥৹
শ্রীযতীশচন্দ্র বাগচী প্রণীত "অষ্টবজ্র"—১।৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' ১৯শে আশ্বিন ৫ই অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপন ৮-ই আশ্বিনের মধ্যে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"ভারতবর্ষ"
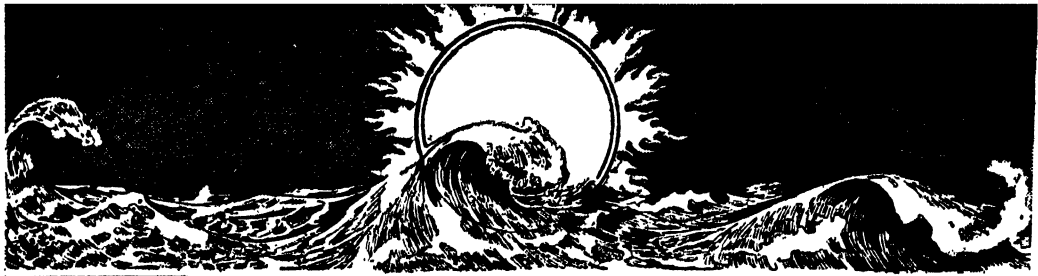
সাক্ষী-খবর

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

"এ চেতন, ওটা জড়; এর প্রাণ আছে, ওর নেই"—এ হিসাবটা আমরা সকলেই বিনা অডিটে মেনে নিয়েছি। এ হিসাব ধ'রে আমাদের সাধারণ কারবার চল্‌ছে সন্দেহ নেই। তবু এ হিসাব আসলে কাঁচা হিসাব। সত্যলোকের কাছারীতে "পাকা খাতায়" এ হিসাব ওঠ্‌বার যোগ্য নয়। স্বভাব, স্বরূপ, তত্ত্ব—এ কথা কয়টা আমরা ত কারবারেও খাটাচ্ছি। কিন্তু এ হচ্ছে কেমন ধারা—যেমন ধারা সোনার পাথর বাটি। আমাদের কারবারের মূল বন্দোবস্তের ফলেই স্বভাব ঠিক স্বভাবে, স্বরূপ ঠিক স্বরূপে, তত্ত্ব ঠিক তাই হ'য়ে এখানে খাটতে পারে না। সেই মূল বন্দোবস্তের জন্য আমাদের সর্ব্বদাই কাটা-ছাঁটা ক'রে, বাদ-সাদ দিয়ে নিয়ে, বাছাই ক'রে নিতে হচ্ছে। সমগ্র যেটা, আসল যেটা, সেটাতে আমাদের "প্রয়োজন" নেই। টুকরা যেটা, ভেজাল যেটা, সেইটেই আমরা চাই। সেইটে নৈলে আমাদের কারবারই চলে না যে! আমরা যে সকলে মিলে "ধাপার মাঠের" ইজারা নিয়েছি! যত ছেঁড়া, ফাটা, রদ্দি, নোংরা জিনিষ কোত্থেকে গাড়ী বোঝাই হ'য়ে মাঠে এসে পড়্‌ছে আমরা তাই সব নিয়ে কারবার কর্‌ছি; সময় সময় কামড়া কামড়িও কর্‌ছি। "ধাপার মাঠ"এর তুলনা দিচ্ছি ব'লে কেউ যেন মনে না ভাবেন—সংসারটা একটা বিতিকিচ্ছি নোংরা জিনিষ; সেখানে নাকে কাপড় দিয়েই আমাদে[র] কাটাতে হচ্ছে! তা নয়। অন্য "লোক" হ'তে কেউ [ ] হয়ত' এটাকে রাবিশের রাশরূপে দেখে থাকেন, আর এ[ ] দুর্গন্ধে নাকে কাপড়ও দিয়ে থাকেন। বৈরাগীর আখড়া গুলো থেকে নারী "নরকস্য দ্বারং", আর সংসারটা "সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং" এই ভাবে বোধ হ'[য়ে] আস্‌ছে, আসবেও। কিন্তু আমরা যারা এ কারবারে র'য়েছি, তাদের এতে রসবোধ, প্রেয়োবোধ, এমন কি শ্রেয়োবোধেরও অভাব নেই। এ বোধের মূলে কোন[ও] "বস্তু" নেই, এটা একদম ভূয়া, ফাঁকা—এমন না হ'তেও পারে। বেদের ঋষি যে "মধু"কে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বপ্রাণীতে ওতপ্রোত দেখে গেছেন, সে মধুক্ষরণ কি আমাদের এ

"ধাপার মাঠে" বাদ পড়্ছে? তা ত' নয়। মধু নৈলে যে কারবারই চলে না। ছেঁড়া নেকড়া, আর নোংরা রদ্দি মালের কারবার করি—আর যাই করি, আসলে এটা মধুর কারবার। আমাদের সকলেরই রসের পশরা; রসেরি বিকিকিনি। রস—Interest. জীব সত্যই "মধুকৃৎ-কুলায়ী"। ইন্দ্রিয়গ্রামকে, আর ইন্দ্রিয়গ্রামের রাজা যে মন তাকে সে এই মধু "ভাগ" ক'রে বেঁটে দিচ্ছে—"ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ"। অথবা তাদের কাছ থেকেই মধুর "ভাগ" আদায় ক'রে নিচ্ছে। সকল ইন্দ্রিয় মিলে অহরহ প্রাণের কাছে "বলি" আহরণ কর্‌ছে—এমন কথা শ্রুতিতে আছে। "মধুকর রাজানং মাক্ষিকবৎ"। তবে প্রাণই বেঁটে দিক্ ওদের, আর ওরাই প্রাণকে এনে দিক্—কথাটা দুদিক্ থেকেই ঠিক। কারবারের বন্দোবস্তে, অথবা বে-বন্দোবস্তে, সে মধু গেঁজেও উঠ্ছে, ঝাঁঝালো হ'য়েও উঠ্ছে, উগ্র, তীক্ষ্ণ, মাতাল-করা হ'য়েও উঠ্ছে। তবু ওটা মধুই। যে মধু বা রস স্বরূপে, স্বভাবে, তত্ত্বে "ভূমা," "সুখ," সে' মধু কৃপণ হ'য়ে গেছে, কুণ্ঠিত, বিকৃত—ভেজাল হ'য়ে গেছে। কারবারের ধারাই তাই। এ ধারা উল্টে নিতে হবে—স্বরূপে, স্বভাবে, তত্ত্বে, ভূমাতে, আনন্দে ফির্‌তে গেলে। ধারা উল্টালে কি হয়?—রাধা নয়? এখন বুঝে দেখ, যেবা হও মরম-সন্ধানী। আমি ভাটার টানেই এখন ভাস্‌তে চলেছি, আমার উজোন টান এখন ধরলে চলে না যে। "ধাপার মাঠেই" ফিরে আসি।

বিতিকিচ্ছি নোংরা ক'রে দেখাবার জন্য ধাপার মাঠে হাজির করি নি। ধাপার মাঠ কেন গো? ভাব না—রসের বাজার, মধুর হাট। এ বাজারে পশরা নিয়ে, এ হাটে হাটুরে হ'য়ে এসেছি তুমি, আমি। কিন্তু তুমি কে বট হে? আমিই বা কে? স্বভাবে, স্বরূপে, তত্ত্বে কি বা কে, তা জিজ্ঞেস কর্‌ছি না। এ হাটের হট্টগোলে সে কথা শুধায়ই বা কে, তাতে কানই বা দেয় কে? কারবারী তুমি, আমির বার্ত্তাই নিচ্ছি। এখন, বল দেখি, তুমি কে? তুমি নিজেই তা জান না, আমায় তা জানাবে কি ক'রে? ষ্টেশনে কুলি তার নম্বর দেখিয়ে মাথায় মাল তুলে নেয়। তোমারও একটা নম্বর বা "লেবেল" আছে বটে। সেই লেবেলেই তুমি কারবারে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু লেবেলের তলে, পোষাকের নীচে একটা মানুষের নাড়ীও স্পন্দিত হচ্ছে, নয়? সে মানুষটি তিন মহল, পাঁচ মহল, সাত মহল পুরীতে নাকি বাস করেন। শ্রুতি সে মহলগুলোকে কখনও বা শরীরত্রয়, কখনও বা পঞ্চকোষ, কখনও বা সপ্তলোক, সপ্তভূমি ইত্যাদি ক'রে ব'লেছেন। তিনি "মুঞ্জার অভ্যন্তর-স্থিত ঈষীকা"টির মতন সেই "পুরুষ" (যিনি নাকি পুরে শুয়ে আছেন) কে খুঁজে বের কর্‌তে ব'সেছেন। তিনি যে স্বরূপসন্ধানী, তত্ত্বান্বেষী! তাঁর কাছে মুখোস, লেবেল এসব চল্‌বে না। লুকোচুরি, ভাঁড়াভাঁড়ির কারবারও চল্‌বে না। কাজেই তিনি বুক ঠুকে, ডঙ্কা মেরে মহলের পর মহল পেরিয়ে একেবারে খোদ আসলটিকে চেপে ধর্‌বেন। "আত্মা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" তা তিনি ধরুন গে যদি পারেন। আমরা লুকোচুরির মহলগুলোতেই একবার উঁকিঝুঁকি মেরে আসি ততক্ষণ। ঐ যে—কে তুমি অমন ক'রে আপন-ভোলার সাজে সেজে বেড়াচ্ছ হে? তুমি পুরুষ কি প্রকৃতি, নর কি নারী—তাও ত' ঠিক পাই নে। তবে, যে সাজেই সাজ, আর যে চালেই চল—একটা সাজ, একটা চাল তোমার ভুল হবার যো নেই। তুমি "মধুকৃৎ কুলায়ী—ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ"। তুমি মধুকর, মাধুকরী ক'রে মধুচক্র তৈরি কর্‌ছ, আর যারা অনুগত, যারা "আপন," তাদের তাই বেঁটে দিচ্ছ। আবার তাদেরটাও বেঁটে নিচ্ছ। কীর্ত্তনের গানে সেকালে "আঁকর" দিত—শ্রীমতীর কিঙ্কিণী ব'লে কিং কিনি। এ রস-বাজারে আমি কিং কিনি—আমি কিন্‌বো কি হে? তোমারও নিতুই সেই দশা। এ রস-বাজারে (যেটাকে ধাপার মাঠ ব'লে একটু আগে ঘেন্না ধ'রিয়ে দিচ্ছিলাম) তোমার নিতুই নব আকুতি—কিং কিনি—আমি কিন্‌বো কি হে রসের ব্যাপারী? রস কি আবার একঘেয়ে, একই রকম? এর বৈচিত্র্যের বালাই ল'য়ে মরি। অলঙ্কারশাস্ত্র, আর ভক্তি-শাস্ত্র—তার কয়টারই বা খবর দিচ্ছেন! বিচিত্র রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে, আর অন্তরের অশেষ আস্বাদনে, সে অশেষ বিধায় লীলায়িত রসের অপূর্ব্ব পরিচয় উপভোগ হচ্ছে। তাতে অশ্রু আছে, হাসি আছে; ব্যথা আছে, সান্ত্বনা আছে; ভয় আছে; ভরসা আছে; বিরহ আছে, আশাও আছে; নেই কি? সেই শ্রুতির আজব গাছে দুটো সোনার পাখী; ভারি ভাব তাদের; ছাড়াছাড়ি নেই। একটা কত কি ফল খাচ্ছে; কখনও খুসী, কখনও

বেজার; কখনও রাজি, কখনও নারাজ। আর একটা? কিচ্ছু খায় না—শুধু চুপচাপ দেখ্‌ছে তার সখাটির সাধের আজব খেলাটি! মজা লুটছে কে বল ত? যে খেল্‌ছে, না যে না খেলে শুধুই দেখ্‌ছে? কেউ বল্‌বেন—ঐ ওপর ডালে আত্মারামটি। কেউ বা বল্‌বেন—তা হবে; কিন্তু খেলুড়ের খেলাটাই বা মন্দ কিসে? ঐ খেলার জন্যই ত' এই আজব গাছটা পয়দা হ'ল, তাতে কত ডালপালা হ'ল, তাতে আবার কত পাতা, ফুল ফল হ'ল! গীতা তাই না এটাকে "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং" বল্‌তে পেলেন; এর ডাল পাতা ফুল ফলের খবর দিলেন; এটাকে কাট্‌বার ফিকিরও ব'লে দিলেন! "অসঙ্গশস্ত্রেণ—"। নৈলে—কা কস্য পরিবেদনা!

ধাপার মাঠটাকে এই রকম ক'রে যদি কেউ বালীগঞ্জের লেক অঞ্চল বানিয়ে নিতে পার ত' মন্দ কি! তবে যাই কর না কেন, এটা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে—এটা অগুণ্‌তি মধুকরের এজমালি মধুচক্র; সকলকেই তিল তিল ক'রে মাধুকরীতে মধু আহরণ করতে হচ্ছে; কামাই নেই, ফুরসৎ নেই; আর সে মধু তিল তিল ক'রেই আবার বেঁটে নিতে হচ্ছে। বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত যে মধু বা রস—সেটা হচ্ছে ভূমা, সুখ, আনন্দ—সেটা তিল তিল হ'য়েই অল্প স্বল্প হ'য়েই আমাদের এই মধুর কারবারে খাট্‌ছে। ভূমাকে নিয়ে মাধুকরী হয় না; ভাগ-বাঁটোয়ারাও হয় না। এই গেল এক কথা। তার পর, কারবারে চল্‌ছে যে মধু—সেটাই কি আসল, খাঁটি বস্তু? সকলেই ত' উলার হ্রদের খাঁটি বিশুদ্ধ পদ্মমধুর বিজ্ঞাপন ছাড়্‌চি; কিন্তু আসলে সেটা কি? এ থেকে এক চুমুক, ও থেকে এক চুমুক—এই রকম ক'রে শুচি অশুচি কত যায়গায়, কত ভাল মন্দ "বিষয়ে" যে অহরহ সদর গোপন চুমুক মেরে আমার রসের থলিটি ভ'রে নিয়ে আস্‌ছি, তার ঠিকানা নেই! পাঁচমিশালী, শতমিশালী, শতসহস্র মিশালী আমার এই মানস গুলের ডগায় সংলগ্ন মধুরত্তি! তা ছাড়া, মনের নিজের "সরস", "মুখামৃত"ও একটা নেই কি? মন যেভাবে তার মাধুকরী কর্‌ছে, সেই ভাবের "ভাবনা" দিচ্ছে তার মধুসংগ্রহটুকুতে। কখনও গোবরের গাদায় ব'সেও তা থেকে পদ্মফুল ফোটাচ্ছে; কখনও বা দুধের কড়াইতে গোমূত্রের ছিটে হ'য়েও গিয়ে পড়ছে। মনের "পরশ"ই সোনার কাঠি, আবার রূপোর কাঠি। কাউকে জীয়াচ্ছে, কাউকে বা মার্‌ছে। তার মুখেই অমৃত, আবার মুখেই বিষ। তার মুখের বিষের ছোঁয়াচ লাগে ব'লেই না রস গেঁজে উঠ্‌ছে, মধু মাতাল-করা মদ হ'য়ে উঠ্‌ছে! এ বিষ সে পায় কোত্থেকে? কর্ম থেকে, আর কর্ম জন্য বাসনা বা সংস্কারগুলো থেকে (বাসনা আবার "শুভ" "অশুভ" দুই রকম)—একথা বল্লে গোড়ার কথাটি অবলাই র'য়ে গেল। কর্ম আসেই বা কোত্থেকে? বাসনা থেকে। আর বাসনা? কর্ম থেকে। দুটোরই মুড়ো খুঁজে পাওয়া যায় না—অনাদি। বীজাঙ্কুর-ন্যায়। এসব দর্শনশাস্ত্রের হেঁয়ালির কথা। নিজেই বুঝিনি, বোঝাব' কেমন ক'রে? যতই না বোঝার কসরৎ করি, শেষকালে সে বোঝার বোঝা এত বিষম ভারী হ'য়ে ওঠে যে, তাকে শেষ পর্য্যন্ত অ-বোঝার মধ্যে ফেলে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি! "তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ—"। "নৈষা মতিস্তর্কেণ—"। আসলে তবে যেটা তত্ত্ব আর তথ্য, সেটা বোঝারই নয়। হয়ত' বা পাবার বস্তু, নিজে হ'য়ে দেখা বা চোখে দেখার বস্তু। এটুকু বুঝে ছুটি নিতে পার্‌লেই সোয়াস্তি—তাই না? "যস্যা মতং তস্য মতং—"। মনেই বল, আর অন্য কিছুতেই বল, বিষ যে এল কোত্থেকে তার নিদেন বের কর্‌বে কে? সব কিছুতেই মধু বা আনন্দের "মাত্রা" র'য়েছে—একথা শ্রুতি নিজেই ব'লেছেন। কিন্তু সব কিছুতে বিষের "মাত্রা"ও র'য়েছে যে! অন্ততঃ আমরা যারা কারবারে নিজে খাট্‌ছি, আর যা কিছু সব খাটাচ্ছি, তারা আর সে সব কিছু, খাঁটি মধুর মাত্রা হ'য়েই ত' খাট্‌ছে, না! আমাদের সাগরের কারবার নেই; গোষ্পদেরই কারবার। যাঁরা সাগরের "কারবার" করেন, তাঁরাও দেখি সময় সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছেন—"অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!" তবে এ সায়র-ভরা অমিয়, আর সায়র-ভরা গরল আমাদের সাধারণ "ভূগোলের" বাইরে। "পীরিতি" বলিয়া তিনটি আঁখর—এই আঁখর তিনটির পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত ও সাগর-রা অমিয়-গরল বুঝ্‌বে কে? বুঝ্‌লে পরে ও অমিয়-গরল যে "মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌"! ও-কথা থাক্‌।

যেগুলো ব্যবহারে জীব আর জড় হ'য়েছে, তাদের গোড়ায়, বীজে ও মূলে যদি রস, মধু, আনন্দ, অমৃতই ছিল

বা থাকে, তবে তা থেকে "উল্টো উৎপত্তি" হ'ল কোত্থেকে —এর কৈফিয়ৎ সুষ্ঠুভাবে কেউ দিয়েছেন ব'লে ত' মনে হয় না। সাগরেই হোক্ আর গোষ্পদেই হোক্—অমিয় গরল হ'ল কেমন ক'রে? সমুদ্রমন্থনে অমৃতও ওঠে, আবার গরলও ওঠে কেন? সাগর না হয় সাধ ক'রে ("কাম", "সঙ্কল্প", "শিক্ষা" ক'রে) নিজে এতগুলো গোষ্পদ হ'য়েছেন ("বহু স্যাং—")। কিন্তু তাই হ'তে গিয়ে নিজেকে "উল্টে ফেলে আর একটা কিছু" (বিষ) ক'রে ফেলেছেন? তাই যদি ক'রে থাকেন ত'—এ কেরামতের কৈফিয়ৎ ও কসরৎটা আমরা মোটেই বুঝি না। শাস্ত্র বলেন—অনির্ব্বাচ্য। এ অ-বোকাটিকে বোঝ্‌বার ব্যর্থ কসরৎ ক'র্‌তে গিয়ে দেশ-বিদেশের "বেদ-বেদান্ত" সব নাজেহাল হ'য়েছেন দেখি। কিন্তু দর্শনে যার না পায় দর্শন, বেদ-বেদান্ত যার না পায় অন্ত—আগম নিগমেও যেটি রৈল দুর্গম—তাকে দণ্ডবৎ ক'রে চুপ মেরে যাওয়াই ভাল নয় কি?

কেমন ক'রে কি হ'ল তা ত বুঝি না। কিন্তু যেটা ঘটেছে, যেটা চল্‌ছে—সেটা ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ দেখা ভুল কি সাচ্চা, সে জেরা তুলে কাজ নেই। আমি "জীব" হ'য়েছি—কি ছিলাম, আর স্বভাবে, স্বরূপে কিই বা আছি, তাত জানি না। জানি না ব'লেই বুঝি জীব! "মায়া ঈশ ন আপু কহ জান কহে সে জীব"—মায়া, ঈশ্বর আর আপনাকে যে জানে না, সেই জীব। একটা লুকোচুরি কানামাছির খেলা যে চল্‌ছে তাও দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার যেটা অনুভূতির জগৎ (Universe of Experience) সেটা কোন কালেও ছোট, এতটুকু নয়। যেকালে একটা "তুচ্ছ" ধূলো নিয়েও আমি "মেতে" আছি, সে সময়ও আমার সমগ্র অনুভূতিটা ঐ ধূলোরত্তি নয়। সেটা বড়ই। সেটা আবার এত বড় যে একটা নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দিতে সেটাকে পূরে বল্‌তে পারি না—"ব্যস্, আমার জগৎ অথবা 'আমিই' এখন এই পর্য্যন্ত, এর ও দিকে শর্ম্মার আর নেই।" অবশ্য কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লে বলি—"এই ধূলোটাই দেখ্‌ছি; এর কথাই ভাব্‌ছি।" কিন্তু এটা আমার অনুভূতির পূরা বিবৃতি নয়; এটা আমার নিজের কাছে অথবা পরের কাছে দাখিল করা একটা কারবারি রিপোর্ট মাত্র। সে রিপোর্ট অনেক কিছুই ঢাকা প'ড়েছে; অনেক কিছু বাদসাদ দিয়ে বেছে নেয়া আছে তাতে। এই রকম ধারা রিপোর্ট তৈয়ারি কর্‌তেই আমরা অভ্যস্ত আছি। কারবারের, জীব ব্যবহারের গরজেই। যাতে ক'রে এই রকম নিজেকে (অর্থাৎ নিজের ব্যক্তাব্যক্ত চেতনার পূরো জগৎটাকে) ঢাকা দেয়া চল্‌ছে, তাতে বাছাই ছাঁটাই চল্‌ছে—সেইটের নাম "মায়া"। তার ভেতরে যাওয়া যায় না, ঢোকা যায় না ব'লে মায়া। আবার, তাই দিয়ে সব "মাপ" (measure) হচ্ছে ব'লেও মায়া। বস্তু—এমন কি, আমি আর আমার সমগ্র অনুভূতি (Experience) আসলে অপ্রমেয়। তার সীমা নেই, মাপ নেই, হিসাব নেই। শ্রুতির বচন আওড়াচ্ছি না। ঐ যে রিপোর্টের কথা বল্লাম ঐ রিপোর্ট থেকে চোখ সরিয়ে চেয়ে দেখলেই তাই। কিন্তু তার "মাপ" হচ্ছে; হিসেব হচ্ছে; তার ওপর রিপোর্ট লেখা হচ্ছে। আর, তাই নিয়ে কারবার চল্‌ছে। "আমি জীব, ওটা জড়"—এটা ঐ রিপোর্টেরই কথা। "এটা বড়, ওটা ছোট"—এও তাই। "এটা ধাপার মাঠ, ওটা নন্দনকানন—এও তাই।" রিপোর্টটা যে কেমন-ধারা "সাজানো" "তৈরি" রিপোর্ট, তা ত' আমরা কটাক্ষে দেখে নিয়েছি। অথচ সেই "জাল" কাগজখানা হাতে ক'রেই হামেশা "তিন সত্যি" করছি! ঐ মাটি, পাথরটা যে "জড়", তাতে আর আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নেই! এই ধূলোটা যে "ছোট", তাতেও নেই! গরজ বড় বালাই যে! থাক্‌লে চলে না যে ব্যাপারীর ব্যাপার করা! যাই হোক্—যে বিষের কথা আগে হচ্ছিল সে বিষের উদ্ভবও কি এইভাবেই হ'য়েছে? অনুভূতি বা চৈতন্যের সমুদ্র মন্থনে অহংরূপী জীব হ'য়েছেন মন্থনদণ্ড—মন্দর? স্বয়ং মায়া হ'য়েছেন মন্থনরজ্জু—বাসুকি? শুভাশুভ "অদৃষ্ট", বাসনা হ'য়েছে দেবাসুর? হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু আগেই কবুলজবাব ক'রে রেখেছি—এই সব রকমারি হবার, "উল্টো উৎপত্তি" হবার নিদেন বুঝি না। এসব মন্দর টন্দর, বাসুকি, দেবাসুর, আর তাদের টানাটানি কাড়াকাড়ি ব্যাপারটা "বাদ" দিতে পার্‌লে কি যে সাগর সেই সাগর? এই মন্থনের সারা ব্যাপারটাই একটা ভোজবাজী নয় ত'? কেউ বলেন—হাঁ, তাই বৈ কি! মায়ার দড়িতে মন্থন হচ্ছে —এই থেকে বুঝ্‌লে না? কেউ বা বলেন—ভেল্কি কেন গো? লীলা। আভাস নয়, বিলাস। মন্থনের মূলাধার

হ'য়ে র'য়েছেন কূর্ম্মরূপী ভগবান্। আমি কিন্তু তবু বুঝ্লাম না। দুজনেই দেখ্ছি নাকে চশমা লাগিয়ে তাঁদের "রিপোর্টে" কাগজখানায় তাকিয়ে র'য়েছেন! দেখে শুনে ত' আমার স্বস্তি হ'ল না! ওগো, চশমা খুলে রেখে, রিপোর্ট টিপোর্ট সরিয়ে ফেলে—একটিবার সাম্‌নাসাম্‌নি হও দিকিন সাগরের সাথে! কি?—এখন মুখে কথা ফোটে না যে! পরমহংসদেব ব'লেছিলেন—নুনের পুঁতুল একবার গিয়েছিল সাগর মাপ্‌তে। কূলে দাঁড়িয়ে কত লম্ফ ঝম্ফ? কিন্তু যাই গিয়ে সাগরের জলে নাব্‌ল, আর—! কে কার মাপ করে, কে কার বার্ত্তা নেয় দেয়!

চুপই যদি আচ্ছা, তবে নাহক্ এত ব'কে মরি কেন? ওসব স্বভাব, স্বরূপ, তত্ত্বের কথা ওঠেই বা কেন? আনন্দ, সুখ, রস, ভূমা—এসবই বা শুনি কেন, শ্রুতি শোনানই বা কেন? আমরা যারা হাটের হাটুরে, তারা হাটের হট্টগোলের মধ্যেই থাকি ভাল। গোল নৈলে বাঁচি নে। যা বল্‌বার নয়, শোন্‌বার নয়, তাও শুন্‌তে বায়না ক'রে থাকি, তা বল্‌তে উরুজিহ্ব হ'য়ে থাকি। বারণ করলে বেশী ক'রে করি। তাই শ্রুতি দায়ে প'ড়ে কি করেন, যা বলার শোনার নয়, তাও ব'লেছেন শুনিয়েছেন। যা অবাচ্য তা বলতে গেলে যা হয়, তাও হ'য়েছে। প্রায়ই "নেতি নেতি" করতে হ'য়েছে। "আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।" বলাও আশ্চর্য্য-করা, শোনাও তাই। শুধু কি আশ্চর্য্য-করা? গুলিয়ে-দেওয়াও বটে অর্থাৎ আমাদের কারবারি হিসাব-শাস্ত্রের (Logic) তলিয়ে যেতে হয় ওখানে। সকল প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের বাইরে যেটা, সেটা ধরতে ছুঁতে গেলে লজিককে হয় নিজের ঘাড়ে নিজে উঠ্‌তে হবে, নয় নিজের ছায়া নিজে ডিঙ্গাতে হবে। জিনিষটে আসলে Alogical (Illogical নয়)। এই জন্য ওখানে "গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানম্"। সে গুরুও আবার বাইরে থেকেও বাইরে নয়। কোথায়? খুঁজে দেখ। খুঁজ্‌তে বেরুলে অবাক্ হ'য়ে যাবে। যেটাকে "গোষ্পদ" বা বেঙের গর্ত্ত ভেবে কারবার করছ, তার ভেতরেই সাগরের সাড়া পাবে, সাগর বেরিয়ে পড়্‌বে। "ঘট সমুন্দর লখ না পড়ে উঠেঁ লহর অপার। দিল দরিয়া সমরথ বিনা কৌন উতারে পার॥" —ঘটের ভেতরেই সমুদ্র; কূল-কিনারা দেখি না; তাতে আবার দুস্তর লহরীমালা! গুরু হচ্ছেন "দিলদরিয়া সমরথ" (সমর্থ); তিনি বিনা কেবা করে পার? "দিলদরিয়া" বলার সঙ্কেত আছে। কিন্তু সেটা থাক্। এই সাগরে প'ড়ে অসমর্থ আমি (জীব) হাবুডুবু খাচ্ছি। সমর্থ একজন কেউ আছেন, তাই রক্ষে। তিনি নিয়ে যান কোথা? এক সাগর থেকে আর এক সাগরে। শেষেরটা "বিরজা বিমৃত্যুর্বিশোকঃ"। "অসতো মা সদ্ গময়—" ইত্যাদি। আচ্ছা, রাস্তা ধর্‌ব কেমন ক'রে? হাটের ব্যাপারীর যে কথাটা এতক্ষণ হচ্ছিল, সে কথাটা মহাজনের দোঁহাতেই পাই—"যো তু সাঁচ্চা বানিয়া সাঁচি হাট লাগায়। অন্দর ঝাড়ু দে কর কুড়া দূর বহায়॥" সাচ্চা হাটে, সাচ্চা বানিয়া হ'তে হবে; মনের ময়লা দূর করতে হবে। এই গেল প্রথম কল্প। মনের ময়লা (সেই "বিষ") দূর হ'লে আমাদের এই ধাপার মাঠই রসের বাজার, আনন্দবাজার (সাচ্চা হাট) হবে। তার পর? আরও সব কল্প আছে। শেষ পদবীটি কোথায়? নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পথে—নির্ব্বিশেষ সত্তায়—পরম ব্যোমে অলখ নিরঞ্জনে। প্রেম-ভক্তিতে—তারও "অতীত" অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে। কোন্‌টা চরম, তা নিয়ে লজিকের কচ্‌কচি ক'রে বা শুনে কি হবে? আসলে দুটোই আমাদের কারবারি লজিকের এলাকার বাইরে। লজিকের বোঝা-সোঝা সে "ভূমি" পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছোয় না। আমাদের কারবারি জানা-শোনা, বলা-কওয়া—এসবও সেখানে যাবার ছাড়পত্র পায় না। অথচ সত্য সত্য নিজে "পরখ" ক'রে দেখে নেবার, নিজে হবার ও পাবার বস্তু সেটি। সেই রকম ক'রে দেখে-নেয়া, হওয়া-পাওয়া বস্তুটাকে মুখে "উচ্ছিষ্ট" করবে কে বলত'? বলবে কে, শুনবেই বা কে? তবু আমরা বায়না ধ'রেছি—শুনবোই। তাই গুরু-শাস্ত্র-মহাজন বল্‌লেন—সেটি আত্মা, ব্রহ্ম, ভূমা, রস, পরমপুরুষ, আদ্যাশক্তি। শুন্‌লাম ঐ পর্য্যন্ত। বুঝলাম না কিছুই। হাল্কা হিসাবী মগজ লজিকের এক রাশ বোঝা নিয়ে এ ক্ষুরের ধার অতি সূক্ষ্ম "সূত্রসঞ্চার" পন্থা ধ'রে চলবে কি ক'রে?

আমাদের কারবারি বোঝাটাকেই একমাত্র বোঝা মনে ক'রেই ত' যত বোঝা! সেই বোঝাতেই ত' ওটা "জড়", ওটা "ছোট", ওটা "তুচ্ছ"! এ বোঝার বাইরে অন্য ধরণের বোঝা আছে। সে অন্য ধরণটা বিজ্ঞান কতকটা ধ'রেছেন। কাজেই, আমাদের অ-বোঝা অনেক কিছু তিনি

বোঝাচ্ছেন। যোগ আর প্রজ্ঞানের বোঝাটাও আলাদা। তাতে অনেক কিছুর চেহারা, ভোল, এলাকা বদ্‌লে যায়। এমন কি, সর্ব্ব ব্রহ্মময়ও হ'য়ে যায়; ঘটে ঘটে রাম বিরাজ করেন। প্রজ্ঞানেরও নানান্ ভূমি আছে। তা ছাড়া—এই বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানের বোঝা ছাড়া—আরও এক রকম বোঝা আছে। সেটা প্রেমের বোঝা। সেই "পীরিতি" বলিয়া তিনটি আঁখরের পরিচয় হ'লে তবে এ "বোধোদয়"টি সুরু। প্রেমের "চোখ", প্রেমের তন্ত্র, প্রেমের অনুভূতি, প্রেমের "ব্যবহার"—এ সব স্বতন্ত্র। কথাটা পাড়্‌লাম মাত্র। এইজন্য আমাদের এ ভবের দরিয়ায় "লজিক" হালে পাণি পেল না ব'লে, হাল ছেড়ে দেব কেন? দিলদরিয়া সমরথ মাঝির হাতে হাল তুলে দেও না! দরিয়া ত দরিয়া, সাগরেও পাড়ি মিল্‌বে। বক ডোবার ধারে ব'সে বেঙ ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে। বকটিকে হংস ("অহংসঃ") করার ফিকির বের করতে পার? তা হ লে দেখ্‌বে—"আব মন হনসা ভয়া মতি চুন চুন খাত।" মন হংস হ'য়ে স্বচ্ছন্দে মতি চুনে চুনে খাচ্ছে। মতি কি ডোবায় মেলে? তাকে সাগরসন্ধানী, সাগর-সঞ্চারী হ'তে হয় না?

তাই বল্‌ছিলাম—মনই বক, আবার মনই হংস। হংসের পর পরমহংস। কি ক'রে সে বক হ'ল, হংস হ'ল—তার পাকা কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। কেউ পেরেছেন কিনা তাও জানি না। মনে হয়—কর্ম্মই বল, আর অদৃষ্টই বল, আর নিয়তিই বল, আর ভগবদিচ্ছাই বল—পাকা কৈফিয়ৎ দেয়াই যায় না। না দেয়া যাক্; বকও ডোবার ধারে ব'সে খাসা বেঙ ধ'রে খাচ্ছে; হংসও স্বচ্ছন্দে সাগরে মুক্তা খেয়ে বেড়াচ্ছে। ধাপার মাঠও হ'য়েছে; বালীগঞ্জের লেক অঞ্চলও হ'য়েছে। দুটো আলাদা হ'য়ে র'য়েছে। আবার, একটার যায়গায় আর একটা ক'রে নিতেই বা কতক্ষণ! হ'য়েও যাচ্ছে হামেশা; নয় কি? কারবারে কিন্তু দুটোরি দরকার আছে। নেই কি? ধাপার মাঠ, বিদ্যেধরী না থাক্‌লে কি বালীগঞ্জ, চৌরঙ্গী, শ্যামবাজার, বাগবাজার, বহুবাজার, বড়বাজার খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে থাক্‌ত'?

ধাপার মাঠে মরা-পচা, রদ্দিময়লা মালের গাদি দেখে নাক সিট্‌কিয়ো না। তোমার এই "স্বর্ণ-লঙ্কার" হরিজন, শ্মশানবন্ধু ঐ ধাপার মাঠ। শ্মশানকে ছাইভস্মকে আদর ক'রে গেছেন, যাঁদেরি চোখ ফুটেছে তাঁরাই। সদাশিব শ্মশানবিলাসী। "ছাইভস্ম" আমরা আগেই চিনেছি। ধাপার মাঠ উপেক্ষার, অনাদরের, ঘৃণার নয়। তবে মনে রাখ্‌তে হবে—এটাও কারবারের হাট। এখানেও বাদ-সাদ চল্‌ছে; এককে আর বানিয়ে নেয়া হচ্ছে; মায় সাপ ব্যাঙের চর্ব্বিকে পর্য্যন্ত! সব যায়গাতেই তাই; কেন না, কারবার মানেই তাই। তবে ধাপার মাঠের কথাটা বিশেষ ক'রে বল্‌ছি এইজন্য যে, এখানে শুধু শবকেই দেখি, শিবকে দেখি না; ছাইভস্মই দেখি, "বিভূতিকে" দেখি না; ছেঁড়া আর নোংরাই দেখি, পূর্ণ ও শুদ্ধ যেটি তাকে দেখি না। দেখি না ব'লে তারা সত্য সত্যই কি "প'ড়ে" বাতিল হ'য়ে গেছে? যেটাকে শব বল্‌ছি, জড় বল্‌ছি, সেটা সত্য সত্যই কি জড়? যেটাকে ছেঁড়া বল্‌ছি, সেটা সত্য সত্যই কি ছেঁড়া? যেটাকে বল্‌ছি ছোট, তুচ্ছ, নোংরা, সেটা সত্য সত্যই কি তাই? কারবারের খাতায় কি ভাবে তারা লিষ্টিভুক্ত হ'য়েছে, তা জিজ্ঞেস করছি না। সাচ্চা খবর যদি কিছু থাকে ত' তাই। নেই—?

উপন্যাস

দ্বৈরথ

"বনফুল"

জমিদার উগ্রমোহন সিংহের বজ্‌রা বাহিনীনদীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। বাহিনী একটি অখ্যাতনাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। গঙ্গার সহিত ইহার যোগ থাকাতে বর্ষার গঙ্গাজলে ইহা পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। সেই সময় নদীটি যে জলসঞ্চয় করিয়া লয় তাহাতেই তাহার সারা বৎসর চলিয়া যায়। নদীটির বিশেষত্ব এই যে নদীটি একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিরাট জঙ্গল, নাম যম-জঙ্গল। সত্যই জঙ্গলে প্রবেশ করিলে মনে হয় যমালয় বোধহয় নিকটেই কোথাও আছে। দিনের বেলায় রৌদ্র প্রবেশ করে না চতুর্দ্দিকে এখন নিবিড় ঘন অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে অবশ্য ফাঁকা জায়গাও আছে। এরূপ একটি ফাঁকা জায়গায় ঘাট। বজরা ঘাটে ভিড়িতেই চারি জন বরকন্দাজ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বজরা হইতে নামিলেন উগ্রমোহন সিংহ, তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু এবং দুইটি সুন্দরী বালিকা। বালিকা দুইটির বয়ঃক্রম আট নয় বৎসর এবং তাহারা দেখিতে প্রায় একই প্রকার। নাম রুমনি ও ঝুমনি। ইহাদের সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। উগ্রমোহনবাবুর মৃতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর একমাত্র কন্যা কমলার বিবাহ হইয়াছিল গরীবের গৃহে। এই কমলা কিন্তু উগ্রমোহনবাবুর খুব প্রিয় ছিল। সুতরাং কমলার বিবাহের পর উগ্রমোহন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে কমলাকে লইয়া গঙ্গাগোবিন্দ গৃহজামাতারূপে থাকুন— উগ্রমোহন তাঁহাকে সমাদরে রাখিবেন। কমলার স্বামী গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র সাধারণ গরীব গৃহস্থ হইলেও এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহার প্রবল ছিল। উগ্রমোহন সিংহও প্রবল প্রকৃতির লোক। সুতরাং খিটিমিটি চলিতেছিল। কমলার মুখ চাহিয়া উগ্রমোহন গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ঝুম্‌নিকে প্রসব করিয়া কমলা ইহলোক ত্যাগ করিল। কমলার মৃত্যুকালে উগ্রমোহন উপস্থিত ছিলেন। কমলা তাঁহাকে যাইবার সময় বলিয়া গেল—"মামা—আমার মেয়ে দুটি তোমায় দিয়ে গেলাম। তাদের দেখো—"

ইহা প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। এই নয় বৎসর ধরিয়া উগ্রমোহন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে লইতে পারেন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আর বিবাহ করেন নাই—কন্যা দুইটিকে লইয়া সুখে দুঃখে তাহার দিন কাটিতেছিল। উগ্রমোহন বহুবার তাহাদের লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন সে কিন্তু দেয় নাই। বিনীতভাবে সে একই উত্তর চিরকাল দিয়া আসিয়াছে—"আপনার অনুগ্রহ-দৃষ্টি থাকলেই যথেষ্ট। রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে আমি দিয়ে দিতে পারব না।"

গতকল্য কিন্তু উগ্রমোহনের ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়াছে। এতদিন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে শ্বশুরোচিত ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু আর নয়। কাল তিনি রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাল্কী পাঠাইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের এত বড় স্পর্দ্ধা পাল্কী ফেরত পাঠাইয়া বিনীতভাবে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—"রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে কাল সকালে পাঠাইয়া দিব। রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহাদিগকে আর পাঠাইলাম না। আশা করি আপনি দুঃখিত হইবেন না।"

উগ্রমোহনের আপাদ মস্তক জলিয়া উঠিয়াছিল। সকালে রুম্‌নি ঝুম্‌নি আসিতেই তাহাদের লইয়া বজ্‌রাতে তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে ম্যানেজার বাবুকেও

লইয়াছেন। কেন, কেহ জানে না। আসিবার সময় বাজারের যত মিষ্টান্ন ছিল সমস্ত খরিদ করিয়া আনিয়াছেন। বাড়ীতে বলিয়া আসিয়াছেন—"বাথান দেখিতে যাইতেছি।" যম-জঙ্গলে উগ্রমোহন সিংহের বাথান ছিল সত্য কথা। প্রায় পাঁচশত মহিষ তাঁহার এই জঙ্গলে থাকিত।

উগ্রমোহন সিংহ নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—পাল্‌কী ঠিক আছে ত?

"হাঁ—হুজুর!"

সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। একটিতে উগ্রমোহন, একটিতে অঘোরবাবু এবং আর একটিতে রুম্‌নি ঝুম্‌নি আরোহণ করিলেন এবং ত্বরিত-গতিতে পালকি তিনখানি নিঃশব্দে বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নধরকায় কৃষ্ণকান্তি মহিষগুলিকে উগ্রমোহন সিংহ মিষ্টান্ন খাওয়াইতেছিলেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপি —যে যত খাইতে পারে। মহিষগুলির চিক্কণ মসৃণ গাত্র হইতে সূর্য্যকিরণ যেন পিছলাইয়া পড়িতেছিল।

অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে তাহারা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া চলিয়াছে। উগ্রমোহন স্বয়ং নিজে দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছেন। হঠাৎ তিনি পরিচারক গোয়ালাটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে—মহিষদের গায়ে, শিঙে, আজ ঘি মাখিয়েছিস ত?"

"একটু পরে মাখান হবে হুজুর—"

"একটু পরে কেন? সকালে মাখাবার কথা—"

"বড় বাথান থেকে আজ ঘি এসে পৌছয় নি এখনও—"

উগ্রমোহন সিংহ হাঁকিলেন—"মনকা পাঁড়ে!"

মনকা পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল!

"তুম্ আভি যা কর বড়া বাথান্ মে খবর লেও—ঘিউ কাহে নৈ য়ঁহা পৌছা—!"

মনকা পাঁড়ে চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে এখন কটা মোষ আছে—"

"পঞ্চাশটা। বাকী সব বড় বাথানে আছে।"

উগ্রমোহন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই বাথানে আসন্নপ্রসবা মহিষীগুলি এবং যে সব মহিষীর বাছুর বড় হইয়া দুধ বন্ধ হইয়াছে তাহারাই থাকে।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুষমণ্ কোথা?"

"নদীতে আছে"—বলিয়া গোয়ালাটি কণ্ঠ হইতে এক বিচিত্র শব্দ বাহির করিতে লাগিল—"আঁঃ—হা হা হা হা-হা! আঁঃ—হা হা হা হা" একটু পরে দেখা গেল মৃদু শব্দ করিতে করিতে কর্দ্দমাক্ত দেহ এক বিরাট মহিষ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া আসিতেছে।

দুষমণ্ বিরাটকায় পুরুষ মহিষ। উগ্রমোহনের বড় প্রিয়। উগ্রমোহন স্বহস্তে তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন।

খাওয়ান শেষ হইলে তিনি তাহার গলদেশে আদর করিয়া একটু হাত বুলাইয়া দিতে 'দুষমণ্' গলিয়া গিয়া আনন্দে গলা বাড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই উগ্রমোহনের সুসজ্জিত অশ্ব আসিল। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি গভীরতর জঙ্গলে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। মুখে গভীর চিন্তার রেখা। এই পথেই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ম্যানেজারবাবু রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে লইয়া গিয়াছেন।

... ...

জঙ্গলের ভিতর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মন্থরগতিতে আসিতে আসিতে উগ্রমোহনসিংহ রুম্‌নি ঝুম্‌নি সম্বন্ধে যাহা করিবেন ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুম্‌নি ঝুম্‌নি গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্রের নিকট আর ফিরিয়া যাইবে না। ইহা স্থির।

উগ্রমোহনের অশ্ব বনজঙ্গল ছাড়াইয়া একটি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই একজন সহিস ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। উগ্রমোহন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সহিসের হস্তে বল্গা, চাবুক প্রভৃতি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ম্যানেজারবাবু এসে পৌছেছেন?"

সহিস উত্তর দিল—"হাঁ হুজুর—"

"রুম্‌নি ঝুম্‌নি?"

"হাঁ হুজুর—"

"কোথায় তারা—"

"কাছারি বাড়ীতে আছেন—"

অল্প দূরেই একটি আটচালা ছিল। মাটির ঘর। কিন্তু আয়তনে প্রকাণ্ড। চতুর্দ্দিকে বারান্দা। ইহা উগ্রমোহন সিংহের 'জংলি কাছারি' নামে পরিচিত। উগ্রমোহন সেইদিকেই পদচালনা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে রুম্‌নি, ঝুম্‌নি, তাঁহার ম্যানেজার এবং প্রবীণ জমাদার ভিখন-তেওয়ারি সকলেই একটি সদ্য ধৃত বন্য শশককে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রুম্‌নি ঝুম্‌নির আগ্রহ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। উগ্রমোহন উপস্থিত হইতেই তাহারা উগ্রমোহনকে আসিয়া ধরিল—"দাদু—আমরা খরগোস্ পুষব!"

উগ্রমোহন বলিলেন—"তোরা ত সিংহ পুষেছিস্। খরগোসের সখ কেন? আমার গোঁফ জোড়া পছন্দ হয় না—?" বলিয়া তিনি নিজের পুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিলেন। ম্যানেজারবাবু ও ভিখন তেওয়ারি প্রভুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার তাঁহাকে রসিকতা প্রবণ দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া আড়ালে গেলেন। আড়ালে যাওয়াই নিরাপদ। কারণ উগ্রমোহনের সম্মুখে হাসিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই। একবার এক নায়েব হাসিয়া ফেলাতে উগ্রমোহন তাঁহার কর্ণ মর্দ্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। উগ্রমোহন রসিক লোক; তিনি তাঁহার নাতনী বা বয়স্য সকলের সঙ্গেই বেশ প্রাণ-খোলা রসিকতা করিতেন। কিন্তু ভৃত্য-স্থানীয় কেহ তাহাতে যোগ দিয়া হাসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শিক্ষা দিয়া দিতেন।

রুম্‌নি কহিল—"খরগোসের কান দুটি সুন্দর।"

ঝুম্‌নি কহিল—"চোখ দুটিও—"

উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি মোড়ায় উপবেশন করিয়া বলিলেন—"তোদের পছন্দ অতি বাজে দেখ্‌ছি! গোঁফ কই!"

"ওই ত রয়েছে—"

"আরে ওটা কি একটা গোঁফ! আমার দেখ্‌ত কেমন!"

রুম্‌নি কহিল—"আপনি যে এত পাখী পুষেছেন—গোঁফ আছে নাকি কারো? তবে পুষেছেন কেন?"

"পাখী কেমন গান গায়। কথা বলে। খরগোস পারবে?"

রুম্‌নি ঝুম্‌নি দেখিল তর্ক দ্বারা দাদুকে পরাজিত করা তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহারা উভয়ে তখন দাদুর কোলে চড়িয়া আবদারের সুর ধরিল—"না দাদু—আমরা পুষব।"

উগ্রমোহন বলিলেন—"আচ্ছা বেশ! আমারও কিন্তু একটা কথা রাখ্‌তে হবে। আমি এখন এইখানে একমাস থাকব। থাকৃতে পারবে ত আমার কাছে? বাবার কাছে যেতে চাইবে না!"

"বাবা যদি বকেন?"

"আমার কাছে থাকলে বক্‌বেন কেন?"

"তুমি এখানে থাক্‌বে একমাস? দিদি কার কাছে থাক্‌বে তাহলে!"

"আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দিদিকে দেখে আস্‌ব!"

"তখন আমরা কার কাছে থাক্‌বো?"

হাসিয়া উগ্রমোহন বলিলেন—"কেন, খরগোসের কাছে! অঘোরবাবুও থাকবেন!"

তখন রুম্‌নি ঝুম্‌নি সাগ্রহে বলিল—"অঘোরবাবু বেশ লোক দাদু—এই দেখ আমাদের হাতে কেমন মানুষ এঁকে দিয়েছে।"

উভয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সত্যই দুইটি মনুষ্য মুখ আঁকা আছে—উগ্রমোহন দেখিলেন।

রুম্‌নি ঝুম্‌নি আরও বলিল—"কাপড় দিয়ে ঘোমটা করে দিলে কেমন বউ হয়!" বলিয়া তাহারা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর অবগুণ্ঠন-রচনা করিয়া মহা খুসী হইয়া উঠিল! উগ্রমোহন বুঝিলেন, চতুর ম্যানেজার বালিকা দুইটিকে বশ করিয়াছে। তিনি খুসী হইলেন।

* * * * *

একঘণ্টা পরে তিনি ম্যানেজারবাবুকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "নিমাইনগরের মৃন্ময় ঠাকুরের নিকট একটি পাল্‌কি এবং একজন সিপাহী পাঠাও! অবিলম্বে তাঁর আমি সাক্ষাৎ চাই।"

ম্যানেজার অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

... ...

সম্মুখে সতরঞ্চের উপর মৃন্ময় ঠাকুর। রোগা গোছের লোকটি—বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হইবে। দক্ষিণগণ্ডের খানিকটা পুড়িয়া গিয়াছিল—তজ্জন্য মুখাবয়বের সেই অংশটি কুঞ্চিত এবং দক্ষিণ চক্ষুটি অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত। এই খুঁৎটুকু না থাকিলে মৃন্ময় ঠাকুরকে সুশ্রীই বলা চলিত। মৃন্ময় ঠাকুর নিমাইনগরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা। সহসা উগ্রমোহন সিংহ তাহাকে পাল্‌কি পাঠাইয়া আহ্বান করিলেন কেন তাহা মৃন্ময় ঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই এবং বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতেছিল। উগ্রমোহনকে তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন।

সহসা উগ্রমোহন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"দেখ মৃন্ময়, এক বিশেষ জরুরি ব্যাপারে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি!"

"অনুমতি করুন"

"আগামী ২৩শে মাঘ দেখ্‌চি বিবাহের ভাল দিন আছে।" বলিয়া তিনি পঞ্জিকাটি খুলিয়া আর একবার দেখিলেন। "হ্যাঁ—২৩শে মাঘ। আমি মনস্থ করেছি আমার নাত্‌নি ছুটির সঙ্গে তোমার ছেলে ছুটির উক্ত দিন বিবাহ দেব।"

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে বোধহয় মৃন্ময় ঠাকুর এতটা আশ্চর্য্য হইতেন না। উগ্রমোহনের কথা শুনিয়া মৃন্ময় ঠাকুর একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহার বিস্ফারিত দক্ষিণ চক্ষুটি আরও একটু বিস্ফারিত হইল মাত্র।

উগ্রমোহন মৃন্ময়ের এই ভাবান্তর গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া বলিয়া চলিলেন—"কুলে, শীলে তুমি গঙ্গাগোবিন্দের সমতুল্য ঘর। বরং তোমার অবস্থা ভাল। অবস্থার জন্য কিছু যায় আসে না—আমি আমার নাত্‌নিদের যথেষ্টই দেব! তবে একটা কথা আছে। আমার নাত্‌নি কিম্বা নাতজামাইদের আমি যখনই দেখ্‌তে চাইব—'না' বলতে পাবে না। আর দ্বিতীয় কথা এই যে গঙ্গাগোবিন্দের অমতে আমি এ বিয়ে দেব। আমি নিজেই সম্প্রদান করব। এ নিয়ে যদি মামলা হয় তার ভার আমার। বুঝলে? কথা বলছ না কেন?"

মৃন্ময় ঠাকুর সব কথা ঠিকভাবে বুঝিয়াছিল কিনা সেই জানে; কিন্তু সে উত্তর করিল—"হুজুর যখন ঠিক করেছেন—এতে আর আমার আপত্তি কি থাকতে পারে—এ ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে বাড়ীতে একটু জিজ্ঞাসা করলে হত না?"

উগ্রমোহন বলিলেন—"তাতে লাভ কি! ধর যদি তোমার গিন্নী আপত্তি করেন—তাহলে ত সত্যি সত্যি তুমি আর বিয়ে উল্টে দিতে পারবে না। তার চেয়ে বরং একেবারে খবর দাওগে যে উগ্রমোহনবাবুর নাত্‌নির সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করে এলাম। ধানদূর্ব্বা সব এখানেই আছে—আমার নাত্‌নিদের আশীর্ব্বাদ করে একেবারে বাড়ী যাও—"

একটু থামিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন—"আমিও আজই তোমার ছেলেদের আশীর্ব্বাদ করে তবে বাড়ী ফিরব।" নির্ব্বাক্ মৃন্ময় ঠাকুর আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না।

... ...

সেইদিনই সন্ধ্যার পর রুম্‌নি ঝুম্‌নি ঘুমাইলে উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিমাইনগরে পৌঁছিয়া মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মনে অসীম তৃপ্তি লইয়া যখন তিনি স্বগ্রামে ফিরিতেছেন তখন একপ্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—আকাশে নক্ষত্রের দীপালি—চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। সহসা পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্রোদয় হইল। উগ্রমোহন দেখিলেন স্বাতীনক্ষত্র চাঁদের কাছেই রহিয়াছেন। স্বাতী চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী। সহসা উগ্রমোহন ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেন—অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। উগ্রমোহন ভাবিতে লাগিলেন—বহ্নি না জানি এতক্ষণ কি করিতেছে।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার দেওয়ানজী কাতরমুখে বসিয়া আছেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি খবর, এখনও বাড়ী যাওনি?"

রাখালবাবু কেবল ভীতমুখে অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"হুজুর—"

তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

বিস্মিত উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

মরীয়া হইয়া রাখালবাবু বলিয়া ফেলিলেন—"বাহারকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তার মানে! চন্দনদাস কোথা?"

"তার শুদ্ধ খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না!"

উগ্রমোহন ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"চন্দ্রকান্ত আজ সন্ধ্যের সময় এসেছিল?"

"আপনি ফিরেছেন কিনা খোঁজ নেবার জন্ম একজন সিপাহী এসেছিল!"

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন বলিলেন—"পাল্‌কি তৈরী করতে বল। চন্দ্রকান্তের কাছে যাব।"

রাখালবাবু পাল্‌কির হুকুম দিতে বাহিরে গেলেন।

… … … …

উগ্রমোহনের পাল্‌কি আসিয়া চন্দ্রকান্তের খাসকামরার বারান্দার নীচে থামিল। চন্দ্রকান্ত ভিতরে বসিয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছিলেন। উগ্রমোহন আসিতেই তিনি বলিলেন —"আরে এস এস! ভারি ভাল একটা গান শিখেছি আজ। শুন্‌বে? ওরে ভজনা—তানপুরাটা আন্‌ত রে!—"

উগ্রমোহন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন—কিছু বলিলেন না।

তানপুরা আসিলে সহাস্যমুখে চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"শোন এবার। বাহার—চৌতাল। সদারঙ্গের গান। বিনা সঙ্গতেই শোন

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই—"

গান শেষ হইলে উগ্রমোহন বলিলেন—"আমার বাহারও চুরি গেছে আজ। চন্দনও সরেছে—"

ছদ্মবিস্ময়ে চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"তাই নাকি?"

খানিকক্ষণ চুপচাপ্। তাহার পর চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন "যাক্—গরুর শোকে অতটা উতলা হলে কি মানুষের চলে?"

বাহার নাম্নী গাভীকে পাঁচশত টাকা দিয়া উগ্রমোহন খরিদ করিয়াছিলেন। বাহারের বিশেষত্ব ছিল তাহার গায়ের রং।—ঠিক বাঘের মত। তাহার পরিচর্য্যার জন্ম উগ্রমোহন একটি পৃথক গোয়ালঘর এবং পৃথক পরিচারক চন্দনকে—নিয়োগ করিয়াছিলেন!

সহসা সেই বাহারের রহস্যময় অন্তর্ধানে উগ্রমোহন দমিয়া গিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু চন্দ্রকান্তের কথায় তিনি বলিলেন—"নাঃ—উতলা হই নি। তোমার বাহার শুনে মনে পড়ল। এস একদান দাবায় বসা যাক্—"

উভয়ে তখন দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিলেন। ভজনা খানসামা দুইটি গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া কপাটটা ধীরে ধীরে ভেজাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল!

… … … …

৬

গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র যখন শুনিলেন যে উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে লইয়া যমজঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়াছেন তখন তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি চন্দ্রকান্তের নিকট গেলেন। গঙ্গাগোবিন্দ এবং চন্দ্রকান্ত উভয়ে পরম বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ দারিদ্র্যের জন্ম বেশীদূর লেখাপড়া করিতে পারেন নাই—কিন্তু তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তির জন্যই বালক চন্দ্রকান্ত একদা যাচিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। সেই আলাপ কালক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং সেই বন্ধুত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধনী-লোকের সংস্পর্শ তিনি যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি উগ্রমোহনের অনুগ্রহমূলক প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই এবং এই জন্যই তিনি অকারণে চন্দ্রকান্তের নিকট বন্ধুত্বের দাবী লইয়া যখন তখন হাজির হইতেন না। তিনি নিজের স্বল্প-আয়ে ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইতেন এবং অবসর সময়ে স্থানীয় পাঠাগার হইতে পুস্তকাদি লইয়া তাহাতেই অবসর-বিনোদন করিতেন। সুতরাং যদিও দেবী সরস্বতী তাঁহাকে পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেখা দিবার সুযোগ পান নাই—কিন্তু এমন একজন ভক্তকে তিনি বেশীদিন অগ্রাহ্য করিয়াও থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃত শিক্ষার সত্য আলোকে গঙ্গাগোবিন্দ বাণীর বরলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই ইহা জানিতেন এবং মানিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের

বন্ধুত্বলাভ করিয়া চন্দ্রকান্তের মত মার্জ্জিতরুচি জমিদারও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মাঝে মাঝে দুঃখ হইত গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার নিকট আসেন না বলিয়া। এই জন্তই কিন্তু তিনি আবার গঙ্গাগোবিন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করিতেন। সেই গঙ্গাগোবিন্দ আজ অকস্মাৎ আসাতে চন্দ্রকান্ত যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তুমি বাণীর কাছে একটা খবর দিতে পার?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"চন্দ্রকান্ত, তুমি ত সব জান। কেন তবে আবার এ কথা বলছ?" একটু হাসিয়া চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে বলিলেন—"আচ্ছা থাক্ তবে। আজকের দিনটা দেখই না। আজ যদি খবর না পাও, কাল নাগাদ খবর পাবেই একটা! উগ্রমোহন তোমার মেয়েদের এতবেশী ভালবাসে যে তাদের কোন অনিষ্ট হবে না, এটা ঠিক!"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন—"তা জানি। কিন্তু আমার নিজের কষ্ট হচ্ছে যে। আচ্ছা—এ কি অত্যাচার বল ত!"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন—"উগ্রমোহন এখনও বালক আছে। স্কুলে মনে নেই—সামান্ত সামান্ত ব্যাপার নিয়ে কি রকম দাপাদাপি করত ও?"

চন্দ্রকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ এবং উগ্রমোহন সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু উগ্রমোহন অন্য স্কুলে পড়িতেন এবং নানা বিষয়ে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেন। সরস্বতী-পূজা, দোল, দুর্গোৎসব, স্কুলের খেলাধূলা সকল বিষয়েই উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কাহার প্রতিমা ভাল হইল—দোলের সময় কে কাহাকে কোন অভিনব উপায়ে রঙ্ দিয়া অপ্রস্তুত করিতে পারে—খেলায় কাহার দল জিতিবে, এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের রেষারেষির অন্ত ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দ যদিও চন্দ্রকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বাল্যকালে যদিও তাহার চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে অবাধ গতিবিধি ছিল—কিন্তু তিনি কখনও এই জমিদারপুত্রদ্বয়ের ক্রীড়া-কৌতুক-কলহের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন নাই। সসঙ্কোচে তিনি দূরেই সরিয়া থাকিতেন। এই বিনম্র স্বভাবের জন্তই উগ্রমোহনের পিতা বীরমোহনবাবু গঙ্গাগোবিন্দকে স্নেহ করিতেন এবং এত স্নেহ করিতেন যে অবশেষে তাহাকে নাতজামাই পদে বরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ শেষে যে তাহার ভাগনীজামাই হইয়া পড়িবেন ইহা উগ্রমোহন ভাবিতেও পারেন নাই। কিন্তু পৃথিবীতে অভাবনীয় ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। উগ্রমোহন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলেন যখন তিনি নিজে চন্দ্রকান্তের ভগ্নী বাণীকে বিবাহ করিলেন। চন্দ্রকান্তের পিতা সূর্য্যকান্ত রায় বীরমোহনবাবুর পরম মিত্র ছিলেন এবং বাণীর যেদিন জন্ম হয় সেইদিনই উগ্রমোহনের সহিত বাণীর বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। চন্দ্রকান্তও হয়ত উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ী কমলাকে বিবাহ করিতেন—কিন্তু কোষ্ঠীবিচার করিয়া দেখা গেল যে চন্দ্রকান্তের কোষ্ঠীতে এমন কয়েকটি গ্রহ পত্নীস্থানে বিরাজ করিতেছেন যাহাদের প্রভাব ও প্রতাপ কোন হিন্দুই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ কমলাকে বিবাহ করিলেন। বীরমোহন সিংহ মানুষ চিনিতেন। এই নম্র, সুশ্রী, মেধাবী যুবকের হাতে পড়িলে কমলা যে সুখী হইবেন সে বিষয়ে বীরমোহনের সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার বিচার যে নির্ভুল ছিল তাহা উগ্রমোহন সিংহ না বুঝুন—কমলা বুঝিয়াছিলেন।

বীরমোহন এবং সূর্য্যকান্ত সেকালের লোক হইলেও আধুনিক-মনা ছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে সূর্য্যকান্ত নিজ-কন্যা বাণীকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে জনৈকা শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। সেই শিক্ষয়িত্রী, বীরমোহন সিংহ এবং সূর্য্যকান্তকে জড়াইয়া এখনও স্থানীয় বৃদ্ধগণ নিম্নস্বরে যে সব আলোচনা করেন, তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও বিস্ময়ের বস্তু।

... ...

গঙ্গাগোবিন্দ কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"এখন কি করা উচিৎ তা হলে!"

"এখন কিছু ক'রো না। আমার মনে হয় কাল নাগাদ একটা খবর পাবেই। ব্যস্ত কি? রুমনি ঝুমনি তাদের দাদুর কাছে আছে এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? দাদুও যে সে লোক নয়—উগ্রমোহন সিংহ।"

গঙ্গাগোবিন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া যাইবার পর চন্দ্রকান্ত খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিত এবং দক্ষিণ করতলের উপর গণ্ড বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িত্ব অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে একটা মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া হাঁক দিলেন—"ওরে ভজনা—"

ভজ্‌না আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন—জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে অবিলম্বে ডাকিয়া আনিতে।

সীতারাম পাঁড়ে বৃদ্ধ জমাদার। চন্দ্রকান্তকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। চন্দ্রকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সুতরাং চন্দ্রকান্ত যখন সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উগ্রমোহনের সখের বাহার নাম্নী গাভী কোথায়, কিভাবে এবং কাহার জিম্মায় আছে—তখন সীতারাম ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছু বলিল না। চন্দ্রকান্ত যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বৃদ্ধ সীতারাম সহাস্যদৃষ্টিতে মিটিমিটি চন্দ্রকান্তের দিকে তাকাইতে লাগিল। ভাবটা যেন—"তোমার আবার একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়াছে! বুঝিয়াছি আমি!"

চন্দ্রকান্ত অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেরাজ হইতে দুই শত টাকার নোট বাহির করিয়া সীতারামের হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন—"যা লাগে খরচ ক'রো—আজ সন্ধ্যের আগে বাহারকে বেমালুম সরান চাই। আমি এর ভেতরে আছি তা কিছুতে যেন প্রকাশ না পায়।"

প্রত্যেক বারই চন্দ্রকান্ত এই জাতীয় ছোটখাটো কার্য্যে সীতারামের সহায়তা লন। ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সকলের নিকটই চন্দ্রকান্ত রায় গম্ভীরপ্রকৃতির বুদ্ধিমান জমিদার। কিন্তু সীতারামের নিকট চন্দ্রকান্ত এখনও বালক মাত্র। এই শ্যামকান্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের সহিত সীতারামের আরাধ্য দেবতা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামজী এক হইয়া গিয়াছিলেন এবং স্নেহ-ভক্তি-ভয়-মিশ্রিত আগ্রহে সে প্রভুর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত।

অর্থের লোভ দেখাইলে পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু খঞ্জ চন্দন গোয়ালা মাত্র একশত টাকার লোভে ছাপরা জেলায় চলিয়া যাইতে রাজী হইয়া গেল এবং ট্রেণ ধরিবার জন্য দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলোয়ে ষ্টেশনের অভিমুখে অবিলম্বে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রক্ষক-বিহীন 'বাহার' সীতারামের নিয়োজিত সাঁওতাল মজুর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া উগ্রমোহনের জমিদারী ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সীতারাম আসিয়া প্রভুকে নব্বুই টাকা ফেরৎ দিয়া কহিল যে চন্দনদাস ছাপরা জেলায় চলিয়া গিয়াছে। একশত টাকা লইয়া সেখানে সে নিজের খেত-খামার করিবে। বাহার গাভীকে "টাল" নামক জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসিবার জন্য দুইজন সাঁওতাল মজুরকে দশ টাকায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

"টাল" নামক বনকরটি চন্দ্রকান্ত রায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। যম-জঙ্গলের মত ইহাও একটি নিবিড় ও দুর্গম বনভূমি!

সীতারাম চলিয়া যাওয়ার পর গোমস্তা রাধিকামোহন আসিয়া প্রণাম করিল। রাধিকামোহন পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত গোলক সাহার নিকট টাকা আনিতে গিয়াছিল।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা পেয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!—"

"তহবিলে জমা করে দাও—"

"গোলক বলছিল যে পীরপুরের বাসাটা—"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। আমার কাছে হুকুম নিয়েছে। বাসার চাবি দিয়ে দাও ওকে—"

রাধিকামোহন চলিয়া গেলে পুলকিত চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন—"ওরে ভজনা—তামাক দে, আর মিশিরজিকে একবার ডেকে দে ত!"

মিশিরজি আসিলে চন্দ্রকান্ত বলিলেন—"ওস্তাদজি—বাহার একটা শোনান ত!"

"খালি বাহার—না, বসন্ত বাহার—!"

"খালি বাহার—"

ওস্তাদজী বাহার আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপ

করিবার পূর্ব্বে অবশ্য তিনি চন্দ্রকান্তকে বলিলেন যে বাহারের সম্পূর্ণ জাতি, নি কোমল লাগে এবং ইহাই তাহার ঠাটের বিশেষত্ব। বিবাদী কিছু নাই, 'মা' অর্থাৎ মধ্যম সম্বাদী।

চন্দ্রকান্ত যত্নসহকারে শিক্ষা করিলেন।

সব বন মে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই,
মন্দ মন্দ পবন বহত বহু বরণ হোয় সুমন।
কোয়েলা পাপিহাঁ বন মে, ধরত নেক নেক তান
ভ্রমর সব গুঞ্জরাত, কহন যা ত য়হ লগন।

গানের সুরে সুরে বসন্তের বর্ণনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এই গান লইয়াই চন্দ্রকান্ত রহিলেন। সন্ধ্যার পর উগ্রমোহন আসিলেই তাঁহাকে গানটা শুনাইয়া দিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে বাহার নাম্নী গাভী হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে কিন্তু বাহার সুর একবার আয়ত্ত করিলে সহজে পলাইয়া যাইবে না। উগ্রমোহন এতটা বুঝিলেন কি না ভগবানই জানেন, কিন্তু তিনি বাড়ী গিয়া যাহা করিলেন তাহাতে রাণী বহ্নিদেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

কৌশাম্বী-ভ্রমণ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বন্ধু বলিলেন—'এই সেই কৌশাম্বী, যেখানে একদিন মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের চরণস্পর্শে ভক্তির শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছিল।' আমি বলিলাম—"হাঁ, এই সে কৌশাম্বী যেখানে নৃপতি উদয়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী রাজপ্রাসাদ শিখরে উড্ডীন হইয়াছিল।' তখন মনে পড়িল রাজা উদয়নের প্রণয়কাহিনী, তাঁহার বীরত্ব, মনে পড়িল তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পুণ্য অবদান কাহিনী। আজ কোথায় রাজা উদয়ন! কোথায় গগনস্পর্শী তাঁহার প্রাসাদচূড়া, আর কোথায় বৌদ্ধ-বিহারে শ্রমণগণের পবিত্র আরাম। মুক্ত উদার মাঠের মাঝে উচ্চ স্তূপের নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া অতীতের কথাই মনে হইতেছিল।

তিনটি মুখ—কৌশাম্বী

আমরা যখন কোসাম আসিয়া পৌছিয়াছিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা হইবে। কৌশাম্বী আগমন আমার গোপন অভিসার কাহিনী। এলাহাবাদ আসিয়া অনেকের

মুখেই কৌশাম্বীর কথা শুনিয়াছি; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে যখন বন্ধুবর কিরণচন্দ্র সিংহের আবাস-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বসিয়া চায়ের পেয়ালা হাতে লইতাম এবং অধ্যাপক সিংহ মহাশয় যখন তাম্বুলরঞ্জিত মুখে স্মিতহাস্যে তাহার মাথার টাকটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনর্গল-ভাবে কৌশাম্বীর কথা বলিয়া যাইতেন তখন তাঁহার মুখের দিকে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে চাহিয়া থাকিতাম। আমার মন তখন কিরণবাবুর প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত না—সে চলিয়া যাইত দূর কৌশাম্বীর মাঠে। কত কথা মনে পড়িত! কত ইতিহাস ও কল্পনায় চিত্ত অনুরঞ্জিত হইত! আমি কিরণবাবুকে বহুবার কৌশাম্বীর কথা বলিয়াছি, চলুন না, একবার কৌশাম্বী বেড়াইয়া আসি! কিরণবাবুর বলিবার ক্ষমতা অসাধারণ, তিনি কখনও "না" বলিতে জানেন না, সর্ব্বদাই বলিতেন চলুন এই রবিবার! কখনও তাঁহার পরীক্ষার খাতার বোঝা, কখনও দাঁতের বেদনা, কখনও বা শ্বশুরবাড়ী যাত্রা—এই ভাবে দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে কত রবিবার আসিল গেল, কিরণবাবুর আর সুযোগ হইল না! এলাহাবাদের প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের কর্ম্মসচিব কিরণ বাবু আমাকে অনেকবার তাঁহাদের দুই একটি সাহিত্যসভার অধিবেশনে লইয়া যাইবেন বলিয়াও যেমন ভরসা দিয়াছেন, কিন্তু কোনদিন একটি সাহিত্য-সভারও অধিবেশন হইয়াছে বলিয়া জানি না, তেমনি আবার কৌশাম্বী ভ্রমণের সাথীও কোন বাঙ্গালী হইলেন না—কিরণবাবু ত নহেনই! আমাদের সকল বিষয়েই উৎসাহ জিনিষটা ক্ষণকালস্থায়ী হয়, শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকার অভ্যাস নাই বলিলেই চলে। এজন্যই এলাহাবাদের ন্যায় স্থানে—যেখানে সম্ভ্রান্ত ও ধনী বাঙ্গালীর অভাব নাই, সেখানে নিয়মিত সাহিত্য-সভার অধিবেশনও হয় না—আলোচনাও হয় না, মেলা-মেশাও হয় না। ইহা যে কত বড় পরিতাপের বিষয় তাহা না বলিলেও চলে। বাঙ্গালীর উৎসাহ ও উদ্যম দিন দিনই যেন অস্তাচলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

এলাহাবাদ মিউনিসিপাল মিউজিয়াম বা যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ব্রিজমোহন ব্যাস একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম অনুরাগ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। যাঁহারা প্রয়াগধামে বেড়াইতে যাইবেন তাঁহারা যদি একবার এলাহাবাদের মিউনিসিপাল যাদুঘরে যান, তাহা হইলে বিস্মিত হইবেন যে কেমন করিয়া একজন লোক নানা কার্য্যের অবসরে এমন করিয়া একটি যাদুঘর গড়িয়া তুলিলেন! রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই—ঝড় ঝঞ্ঝা গ্রাহ্য নাই, যদি সংবাদ পাইলেন কোথাও কোন মূর্ত্তি, মুদ্রা, শিলালেখ আছে তাহা হইলেই বন্ধুবর ব্যাস মহোদয় সেখানে ছুটিলেন। এখন এই যাদুঘরে এমন সব দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে যে এ বিষয়ে যদি কেহ অগ্রণী হন তাহা হইলে উত্তর-ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা তিনি জানিতে পারিবেন।

মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শকট—কৌশাম্বী, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী

বন্ধুবর ব্যাসের অনুগ্রহে আমার কৌশাম্বী দেখার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এলাহাবাদ হইতে কৌশাম্বীর দুরত্ব হইবে প্রায় ৩৮ মাইল। পথ—ভাল। অনেকটা পাকা রাস্তা। তার পর পাঁচ ছয় মাইল কাঁচা রাস্তা। পথের দুই দিকে বিস্তৃত মাঠ—মাঠে নানা শস্য ফলিয়াছে। আর মাটির দেয়াল-দেওয়া খোলার ছাউনিওয়ালা গ্রামের ঘরগুলি মন্দ লাগিতেছিল না। এখানকার মেয়েদের কূপ বা ইন্দারার ধারে আসিয়া জল তোলার দৃশ্যটী আমার বেশ ভাল লাগে। প্রত্যেক গ্রামেই দেবমন্দির আছে। মুসলমান-প্রধান গ্রামে মসজিদ ও দেখা যায়! আমাদের মোটর গাড়ী বেগে ছুটিয়া চলিয়া আমাদিগকে বেলা প্রায় এগারটার সময় কৌশাম্বী পৌছাইয়া দিয়াছিল। ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছিলাম। কৌশাম্বী এখন কোশাম বা কোশব নামে পরিচিত।

কোশাম সম্বন্ধে আমি এলাহাবাদের বন্ধুবান্ধবগণের কাছে অনেক কাহিনী শুনিয়াছি। অনেকে বলিয়াছেন যে কৃষকেরা এখানে চাষ করিতে যাইয়া নানা মূল্যবান দ্রব্য এমন কি বহু স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছেন। স্বর্ণমুদ্রার কথা জানি না, তবে বন্ধুবর ব্যাস আমাকে দুই তিন ছালা-ভরা তাম্রমুদ্রা দেখাইয়াছেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকেও কিছু উপহার দিয়াছেন। এ সমুদয় মুদ্রা তিনি কোশাম হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কৌশাম্বীতে এখনও অনেক কিছু দেখিবার আছে। তবে সে সবই ধ্বংসাবশেষ। কত যুগ, কত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কাজেই আজ যদি আমরা আশা করি যে—কৌশাম্বীর অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি দেখিতে পাইব, তবে সেইরূপ আশা দুরাশা মাত্র।

কৌশাম্বীর নাম ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই পরিচিত। জেনারেল কানিংহাম (General Cunningham) কোশাম গ্রামই যে প্রাচীন কৌশাম্বী নগরীর ধ্বংসাবশেষ এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের যথার্থতা সম্বন্ধে প্রথম অবস্থায় অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল এবং অনেকে অনেক বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখান হইতে নানারূপ পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় সে সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ ও নাটকাদিতে কৌশাম্বীর কথা আছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ড দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে কৌশাম্বীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—"সদ্‌ব্রতাম্বুচারী মহাতপস্বী

সেকালের খেলার জিনিস—কৌশাম্বী

মহাত্মা সজ্জনপূজক কুশ নামক একজন প্রধান ব্রহ্মনন্দন ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা ভার্য্যা বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসু নামক আত্মতুল্য মহাবলসম্পন্ন চারিটি পুত্র জন্মাইলেন। কুশ সেই দীপ্তিশালী সত্যবাদী মহোৎসাহসম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মের বৃদ্ধিকরণাভিলাষে কহিলেন—"তোমরা প্রজা পালন কর, তাহা করিলে তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে। তৎকালে সেই চারিজন লোকসত্তম নরপালেরা কুশের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই নগর সন্নিবেশ করিলেন—মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী নাম্নী নগরী সন্নিবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয় নামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন ; মহামতি অমূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য নামে নগর সন্নিবেশ করিলেন এবং বসুরাজা গিরিব্রজ নামে শ্রেষ্ঠপুর নির্ম্মাণ করিলেন।" মহাভারত এবং পুরাণেও কৌশাম্বীর উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডবেরা তাঁহাদের দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে কোশম গিরির অরণ্য প্রদেশে অতিবাহিত করেন এবং রাজা পরীক্ষিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ নিচক্ষুর সময়ে হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে তিনি কোশমগিরি বা কৌশাম্বীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কৌশাম্বী নামের সহিত রাজা উদয়নের স্মৃতি এমনভাবে বিজড়িত যে এখানে আমরা বিশেষ করিয়া বৌদ্ধযুগের কৌশাম্বীর কথাই বলিব।

মহাবীর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ লইয়া ষোড়শ মহাজনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মধ্যে বৎস ছিল একটি। বৎস-রাজ্য বর্ত্তমান এলাহাবাদ জেলা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর একটি ছিল অবন্তী। বৎসের রাজা উদয়ন সেকালের একজন মহাবিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। অবন্তীর রাজা পজ্জোত বা প্রদ্যোতও ছিলেন একজন প্রতাপশালী ভূপতি। এই দুই নৃপতির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ছিল না। অবন্তীর রাজা প্রদ্যোত মনে করিতেন, তাঁহার চেয়ে বড় রাজা আর কেহ নাই। তাঁহার অপেক্ষা কোন রাজার যশ বেশী নহে। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে কৌশাম্বীর রাজা উদয়নকে সকলে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে তখন তিনি উদয়নকে তাঁহার অপেক্ষা হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। যাঁহার যশের প্রভায় অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের যশজ্যোতি ম্লান হইয়াছিল, যাঁহার জগৎ জুড়িয়া যশোগাথা—তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য রাজা প্রদ্যোত নানারূপ সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে রাজা উদয়ন হাতী ধরিতে খুব ভালবাসেন এবং হস্তী বশ করিবার মন্ত্রও তিনি জানেন। কাজেই অবন্তীর রাজা একটি কৃত্রিম কাঠের হাতী তৈয়ার করিয়া বনের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

রাজা উদয়ন নানা লোকের কাছে এই অদ্ভুত হস্তীর কথা শুনিতে পাইয়া একদিন যেমন হাতী ধরিতে আসিলেন, অমনি সেই কাঠের হাতীর পেটের ভিতর হইতে একদল

ক্ষুদ্র দুইটি মূর্ত্তি—কৌশাম্বী

সশস্ত্র সৈন্য বাহির হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইল। রাজা হইলেন বন্দী। বন্দী রাজা উদয়নের নিকট অবন্তীর রাজা হাতী বশ করিবার মন্ত্রটি শিখিতে চাহিলেন। উদয়ন বলিলেন, "গুরু বলিয়া প্রণাম না করিলে, আমি আপনাকে এই মন্ত্র কিছুতেই শিখাইব না।" অহঙ্কারী অবন্তীর রাজা বলিলেন—"তোমার কাছে আমি মাথা নোয়াইয়া কখনও আপনাকে হীন করিব না।" উদয়ন বলিলেন, "বেশ কথা, তাহা না হইলে আমি তোমাকে কোন মতেই মন্ত্র শিখাইব না।" অবন্তীর রাজা উদয়নকে বলিলেন,—"যদি তুমি আমাকে মন্ত্র না শিখাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বধ করিব।

আর যদি শিখাও, তাহা হইলে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব।" ভয় কিংবা আশ্বাস কিছুতেই উদয়নের সঙ্কল্প টলিল না।

অবন্তীরাজ উদয়নের দৃঢ়তায় বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় উদয়নের নিকট প্রস্তাব করিলেন—'আমার পরিবর্ত্তে আর কেহ যদি তোমার শিষ্য হইতে চায়, তাহাকে কি মন্ত্র শিখাইতে পার?' 'পারি।' কিন্তু তাহার আমাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

একটি ভগ্ন মূর্ত্তি

অবন্তীনাথ কহিলেন—করিবে বই কি! তবে সে একজন স্ত্রীলোক, দেখিতে অতি কদাকার! কুঁজো আর কালো। তবে স্ত্রীলোক বলিয়া সে তোমার সাক্ষাতে আসিবে না। মাঝখানে একটা যবনিকা থাকিবে।

রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাশুলদত্তা ছিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী। রূপে গুণে তাঁর তুলনা মিলিত না। কি সঙ্গীতে, কি চিত্রলেখায়, কি আলাপনে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রদ্যোত কন্যাকে কহিলেন—"শোন বাশুলদত্তা, এক বামন তোমাকে আজ হইতে হাতী বশ করিবার মন্ত্র শিখাইবে। তুমি পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া মন্ত্র শিখিবে। কিন্তু সাবধান! কখনও পর্দ্দা সরাইয়া তাহাকে দেখা দিও না—তাহা হইলে কিন্তু মন্ত্রশক্তি থাকিবে না।" পিতার আদেশ কন্যা মাথা পাতিয়া লইল। সেদিন হইতে অবন্তীর রাজকুমারী কৌশাম্বীর বন্দী রাজা উদয়নের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

মাঝখানে যবনিকা। একদিকে বসিয়া উদয়ন, অপর দিকে রাজকুমারী। অথচ কেহই কাহাকে চক্ষে দেখেন না। রাজা উদয়ন জানেন তিনি একজন কুৎসিতা কুব্জাকে মন্ত্র শিখাইতেছেন, আর রাজকন্যা জানেন একজন কদাকার বামন তাঁহাকে মন্ত্র শিখাইতেছে!

একদিন উদয়ন একটি শ্লোক বলিতেছেন—বাশুলদত্তা কিছুতেই তাহা শিখিতে পারিতেছেন না! উদয়নের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল! তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন—"কুঁজীকে লইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছি! কুঁজীকে শিক্ষা দেওয়া বৃথা!" সুন্দরী রাজকন্যারও মনে অভিমান হইল, তাঁহারও সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনিও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কুঁজী কে রে বামন? বামন হইয়া আমাকে কুঁজী বলে, এত বড় দম্ভ!" রাজা উদয়ন পর্দ্দা সরাইয়া দেখিলেন—অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যা তাঁহার শিষ্যা! আর বাশুলদত্তা দেখিলেন—মদনের মত পরম সুন্দর ও তেজস্বী এক তরুণ রাজকুমার তাঁহার গুরু। সেদিন হইতেই উভয়ে উভয়কে ভালবাসিলেন। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, কি কৌশলে অবন্তীরাজ্য হইতে পলাইয়া যাইতে পারেন।

একদিন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, এই সুযোগে উদয়ন ও রাজকুমারী বন হইতে ঔষধ তুলিবার ভান করিয়া রাজপুরী হইতে হাতীর পিঠে করিয়া বাহির হইলেন। রাজা মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—রাজা উদয়নও নাই, বাশুলদত্তাও নাই! তখন তাঁহাদের খোঁজ পড়িল, ধরিবার জন্য লোক ছুটিল!

রাজকুমারী খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি পলায়ন করিবার সময় সঙ্গে প্রচুর সোনা ও মোহর লইয়াছিলেন।

যখন অবন্তীরাজের হাজার হাজার সৈন্য উদয়নের পাছে ছুটিল, তখন উদয়ন বলিলেন—"বাশুল! এখন উপায়!"

বাশুলদত্তা হাসিতে হাসিতে দুই হাতে স্বর্ণমুদ্রা পথের উপর ছড়াইয়া ফেলিলেন। প্রদ্যোতের সৈন্যগণ আসিয়া সোনা কুড়াইতে লাগিল! এইভাবে স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহারা দুইজনে নিরাপদে যাইয়া কৌশাম্বী পৌঁছিলেন। রাজাকে ফিরিয়া পাইয়া রাজ্যের লোকরা আনন্দ উৎসবে মত্ত হইল। মহাসমারোহে অবন্তীর রাজকুমারীর সহিত উদয়নের বিবাহ হইয়া গেল। অবন্তীরাজ কৌশলে পরাজিত হইলেন।

প্রাচীন কবি ভাসের নাম এখন সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই জানা আছে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই কবির গ্রন্থাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি কালিদাসেরও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাসের নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র নায়করূপে বৎসরাজ উদয়ন চিত্রিত হইয়াছেন।*

উদয়নের পূর্ব্বে কৌশাম্বীতে আরও অনেক রাজা রাজত্ব করেন, পুরাণে তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে—রাজা উদয়নের পূর্ব্বের কোন নৃপতির বিষয়ই তেমনভাবে জানা যায় না। উদয়ন সম্পর্কে আমরা যে ইতিহাস জানিতে পারি তাহাতে তাঁহার পিতার নাম সম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে। পুরাণের মতে তাঁহার পিতা শতানিক কৌশাম্বীর রাজা ছিলেন। বুদ্ধদেব ও উদয়ন একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

পালি সাহিত্য হইতে আমরা যে বিবরণ পাই—তাহা এইরূপ :—"একদিন রাজা পরন্তপ তাঁহার মহিষীর সহিত রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজ্ঞী ছিলেন গর্ভবতী। তাঁহার পরিধানে ছিল রক্তবর্ণের শাড়ী ও ওড়না। এমন সময় একটা 'হাতিলিঙ্গ' নামক বৃহদাকার পক্ষী রাজ্ঞীকে মাংসপিণ্ড মনে করিয়া পাখার ভীষণ ঝাপটে ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে রাণীকে লক্ষ্য করিয়া উদ্যানাভিমুখে বেগে অবতরণ করিতে লাগিল। রাজা পলাইয়া গেলেন—রাজ্ঞী পারিলেন না, কাজেই হাতিলিঙ্গ তাঁহাকে লইয়া হিমবন্ত (হিমালয়) পর্ব্বতের এক গভীর

মকর-মুখ—কৌশাম্বী

অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইল। এখানে উদয়নের জন্ম হয়। সে বনে থাকিতেন এক ঋষি, তিনি উদয়ন ও তাঁহার মাতাকে সযত্নে লালনপালন করেন এবং উদয়নকে বন্য হস্তী বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।"*

উদয়নের বাশুলদত্তা, শাখাবতী, পদ্মাবতী এবং মাগন্দী

* সুহৃদ্বর গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভাসের নাটকের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। ভাস-কবির নাটক আরও কেহ কেহ হয়ত অনুবাদ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু গুরুবন্ধুবাবু এই কার্য্যটি একান্ত নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

* Buddha ghosh's Parables ; a Commentary on the 'Dhammapada' or Path of virtue. Translated from the Burmese by Captain T. Rogers ; to which is prefixed a Translation of the Dhammapada by Professor F. Max Muller, with an Introduction.

নামে চার রাণী ছিলেন। কথিত আছে রাজা উদয়ন বৌদ্ধভিক্ষু পিণ্ডোলের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কয়েকবার কৌশাম্বী নগরীতে বর্ষাবাস করিয়া এই স্থানকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন।

উদয়ন ছিলেন সেকালের একজন সাহসী ও রণদক্ষ বীর নৃপতি। কৌশাম্বীর দুর্গে সর্ব্বদা রণসজ্জা সজ্জিত থাকিত। মগধ ও অবন্তীর রাজার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অবন্তীর রাজা ছিলেন তাঁহার শ্বশুর। উদয়নের রণদুর্ম্মদ হস্তী, অগণিত পদাতিক সৈন্য, সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য উদ্যত আয়ুধহস্তে দুর্গপ্রাকারে বিচরণ করিত।

মৌর্য্য-যুগের ক্রীড়নক—কৌশাম্বী

আজ যে 'মাঠের পর মাঠ' দেখিতেছি, স্তূপ দেখিতেছি, এইখানে রাজা উদয়ন অনেক রাজপ্রাসাদ, দীঘি, সরোবর ও উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া নাগরিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আমি কৌশাম্বীর সম্বন্ধে বা রাজা উদয়নের বিষয় লইয়া বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। সুধু কৌশাম্বী যে রাজা উদয়নের রাজত্বকালে কত বড় সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল সে কথা বুঝাইবার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যটুকু লিপিবদ্ধ করিলাম।

যমুনার তীরে কোশাম-ইমাম্ এবং কোশাম-খিরাজ নামে দুইটি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম দুইটি করারি পরগণার এবং মানঝনপুর তহশীলের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রাম দুইটির খ্যাতি সুধু প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষের জন্য। এই দুইটি গ্রামের পরিমাণ ফল ৩,১৫৯ একর ভূমি। এক সময়ে এ গ্রাম দুইটি সৈয়দ-বংশীয় প্রাচীন জমিদারদের হাতে ছিল। পূর্ব্বে এখানে মুসলমানের বাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কোশাম-ইমাম গ্রামে একটি খুব পুরাণো ধ্বংসপ্রায় মস্‌জিদ দেখা যায়। তাহার গায়ে যে শিলালেখ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে এই মস্‌জিদটি ইব্রাহিম শা যখন জৌনপুরের নবাব ছিলেন সে সময়ে অর্থাৎ ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন কোশাম-ইমাম ও কোশাম-খিরাজ গ্রাম দুইটি আর মুসলমান জমিদারদের হাতে নাই।

উদয়ন খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কৌশাম্বীতে রাজত্ব করিতেন। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যেও রাজা উদয়নের নাম আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান-চাঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতেও কৌশাম্বীর উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত

দুইটি মুখ—কৌশাম্বী

আরও অনেক গ্রন্থাদিতে কৌশাম্বীর সম্বন্ধে নানা কথা লিপিবদ্ধ আছে। এক সময়ে কৌশাম্বী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র-স্থান ছিল। কারার দুর্গে প্রাপ্ত একখানা খোদিত লিপিতে (১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) কৌশাম্ব মণ্ডল বা জিলার নাম রহিয়াছে। জেনারেল কানিংহাম কোশামই যে প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ কৌশাম্বী নগরী এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্য একান্ত ধন্যবাদভাজন।

কোশাম হইতে তিন মাইল পশ্চিমে পভোসা নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর একটি ক্ষুদ্র জৈন মন্দির রহিয়াছে। কথিত আছে এখানে জৈনদের চতুর্থ তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটিও নিকটবর্ত্তী দিগম্বরসম্প্রদায়ভুক্ত জৈনসম্প্রদায়ের নিকট মহাতীর্থস্থানরূপে পরিচিত। তাঁহারা এখনও এই স্থানকে

কৌশাম্বীনগরী নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। এক সময়ে পভোসা গ্রামটিও কৌশাম্বী নগরীর একটি 'মল্লো' ছিল বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত। সে সময়ে এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। কৌশাম্বীর এ অঞ্চল হইতে অনেক জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় জৈন সম্প্রদায়ের গৌরব করিবার কারণ আছে।

আমি পভোসা (প্রাচীনের প্রভাস-ক্ষেত্র) পাহাড়ের উপর উঠি নাই। যাঁহারা পভোসা গিয়াছেন তাঁহারা বলেন—পাহাড়ের গায়ে অনেক জৈনমূর্ত্তি খোদিত আছে। কৌশাম্বী যখন প্রাচীন গরিমায় ভূষিত ছিল, তখন এখানে নিশ্চয়ই অনেক জৈন গৃহস্থ ও শ্রমণেরা বাস করিতেন। পভোসায় যে সব মূর্ত্তি আছে তাহার সবগুলিই যে জৈনমূর্ত্তি তাহা বলা যায় না। পভোসাতে একটি একমুখ রুদ্রলিঙ্গ আছে। এখানে তাহার চিত্র দেওয়া হইল।

একমুখ রুদ্র—পভোসা ১নং

কোশামে কি দেখিলাম এইবার সেই কথা বলিতেছি। এখানকার মাঠে, আঁকা বাঁকা গ্রামের উঁচু-নীচু পথে ঘাটে—ইষ্টকরাশি, ভগ্ন ও অভগ্ন বহুবিধ মূর্ত্তি দেখা যায়। সব ইটই যে অতি পুরাতন এমন কথা বলা চলে না। কতকগুলি ইট যে মুসলমানি আমলের সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্থানীয় একজন কৃষক বলিল যে পালী ও সিংহবল প্রভৃতি গ্রামের অনেক বাড়ী ঘর এখানকার পুরাণো ইটের তৈয়ারী।

আমাদের—বিশেষ করিয়া আমার কৌশাম্বীর গড়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। নীল-সলিলা যমুনা তীরে প্রাচীন দুর্গের শেষ স্মৃতি দাঁড়াইয়া আছে। এই দুর্গের ধ্বংসচিহ্নের নাম গড়্‌বা। যেমন শঙ্কর-গড়ের গড়োয়া। গড়্‌বা বেশ বড় দুর্গ। এখন যাহা আছে, তাহা হইতেই অতীতের বৃহদাকার গঠনের অনুভূতি হয়। দুর্গপ্রাকার—সে অনেক দূর হইতেই দেখা যায়, দেখিলে মনে হয় যেন একটি ছোট পাহাড়ের সারি চলিয়া গিয়াছে। দুর্গের বেড় হইবে প্রায় সাড়ে চারি মাইল। প্রাকার মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। প্রাকারের উচ্চতা এখনও ত্রিশ ফিটের কম হইবে না। দুর্গের বুরুজগুলি খুব উচ্চ, স্থানে স্থানে পঞ্চাশ ষাট ফিটের কম হইবে না। যমুনার ধারে গড়্‌বার উপরে দুইটি ছোট গ্রাম আছে। গড়ের নাম অনুসারে গ্রাম দুইটির নাম হইয়াছে বড় গড়্‌বা এবং ছোট গড়্‌বা। আমরা গড়্‌বার ভিতরে যাইয়া দেখিলাম—সুধু ইট-পাথর ও মাটি ছাড়া কিছু নাই। বুরুজের ঊর্দ্ধাংশ বা ছাতটা ইট ও পাথরে গঠিত। দুর্গের ঢালু দিকে বা নিম্নভাগে এক সময়ে যে পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। দুর্গের দুই দিকে দুইটি প্রবেশ দ্বার ছিল বলিয়া মনে হয়।

গড়্‌বার কাছে একটি ক্ষুদ্র জৈনমন্দির। জৈনমন্দিরটি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গের মধ্যস্থিত একটা স্তূপের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। কানিংহাম সাহেব এ স্থান হইতে বৌদ্ধ যুগের অনেক মুদ্রা, মূর্ত্তি এবং অন্যান্য প্রত্ন চিহ্ন আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক আবিষ্কার হইতেছে—অশোক-স্তম্ভ। জৈনমন্দিরের অল্প দূরে অশোক-স্তম্ভ। কৌশাম্বীর এই স্তম্ভটির উপরের দিকটা ভগ্ন। এই স্তম্ভের সহিত এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই স্তম্ভটির খাড়াই হইবে প্রায় ১৫ ফিট এবং ইহার বেড় হইবে ৮ ফিট। এই স্তম্ভের গায়ে কোনরূপ খোদিত লিপি নাই। আছে সুধু—যুগে যুগে যে সব তীর্থ-যাত্রী এখানে আসিয়াছেন তাঁহাদের স্মারকলিপি। সেই গুপ্ত রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকালের যাত্রীরাও ইহাতে স্মারক-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে কুণ্ঠাবোধ

করেন নাই। একটি লিপিতে এই স্থানের নাম "কৌশাম্বী-পুর" এইরূপ লিখিত আছে।

ক্যানিংহাম ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৭৪ এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আসেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে এখানকার সর্ব্ব-বৃহৎ স্তূপটি রাজা অশোকের কীর্ত্তি এবং ইহার মধ্যেই বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ রক্ষিত আছে। এ সমুদয় তাঁহার অনুমান মাত্র। চতুর্থবার তিনি যখন এখানে আসেন,
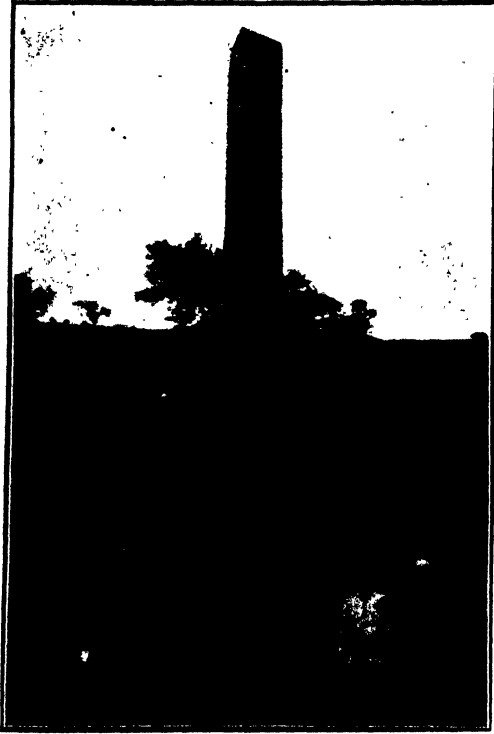
অশোক স্তম্ভ—সিত্র ২নং

তখন তাঁহার মনে হয় যে চৈনিক ভ্রমণকারীদের বর্ণিত কৌশাম্বী যে বর্ত্তমান কোশাম্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কৌশাম্বীর বিরাট স্তূপ আজ পর্য্যন্তও খননের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। গড়্বা দুর্গ সম্বন্ধে স্থানীয় জনপ্রবাদ এই—যে এই দুর্গ মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র পাণ্ডববংশীয় নৃপতি পরীক্ষিত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্রিজমোহন ব্যাস কৌশাম্বী হইতে একটি অতি প্রাচীন বুদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি এলাহাবাদ মিউনিসিপাল মিউজিয়ামের বারান্দায় আছে। লাল বেলে পাথরের তৈয়ারী। এই মূর্ত্তির নীচে একটি শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে "মহারাজা কনিষ্কের রাজত্বের। দ্বিতীয় বর্ষে বুদ্ধদেবের বহুবার কৌশাম্বী আগমনের স্মৃতি স্মরণীয় রাখিবার জন্য বুদ্ধমিত্রা নামক জনৈক মহিলা এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।"

এই কৌশাম্বীতে আর একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এম এ তাহার পাঠোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী আছেন। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার হইলে উত্তরভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা নবারুণলোকে উদ্ভাসিত হইবে।

কৌশাম্বীতে বৌদ্ধমূর্ত্তি, জৈনমূর্ত্তি, শুঙ্গ, কুশাণ ও গুপ্ত যুগের বহু প্রস্তর-মূর্ত্তি ও মৃণ্ময়-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সে সকলের মধ্যে একমুখ রুদ্র, চতুর্মুখ রুদ্র, তিন ফিট দীর্ঘ এবং দুই ফিট চওড়া চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মস্তক-বিহীন মূর্ত্তিগুলি একান্ত উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত যে কত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অবধি নাই। বন্ধুবর ব্যাস আমাকে প্রায় দুইশতের উপর ঐরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন; ঐ সকলের ফটোগ্রাফও প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার কতকগুলির চিত্র দিলাম।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। কোন্‌টি কোন্ যুগের তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে। সেকালের খোকা খুকিরা মৃত্তিকানির্ম্মিত শকট লইয়া খেলা করিত, অদ্ভুত আকারের পুতুল লইয়া খেলা করিত। মহিলারা অদ্ভুত আকারের কর্ণভূষা পরিতেন। মাথার চুলে ঢেউ তুলিতেন—এইরূপ কত কি? অই যে তিনটি মুখ, তাহার মধ্যবর্ত্তিনীর মত কেশ প্রসাধন করিতে কিংবা কর্ণভূষণ পরিতে কোনও বঙ্গনারী সম্মতা আছেন কি? যদি করেন তাহা হইলে একটা নূতন ফ্যাসান এবং প্রাচীনত্বের আদর্শ দেখাইতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমি কৌশাম্বী হইতে যে সকল মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে, সেকথা বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত ব্যাস গড়্বার মধ্য হইতেই তাঁহার সংগৃহীত মুদ্রাগুলি পাইয়াছেন।

কৃষকেরা বেণীর ভাগ ক্ষেত চষিবার সময় ঐগুলি পাইয়াছে। কৌশাম্বীর এই প্রাচীন মুদ্রাগুলির শ্রেণী-বিভাগ এখনও হয় নাই। কানিংহামের 'প্রাচীন ভারতের মুদ্রা' নামক গ্রন্থে এখানকার কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রার চিত্র আছে। কোন কোন মুদ্রাতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতের মতে অধিকাংশ মুদ্রাই গুপ্ত যুগের। গুপ্ত যুগের কিংবা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীনকালের মুদ্রা ব্যতীত কৌশাম্বীতে জৌনপুরের শার্কি রাজাদের এবং মুসলমান আমলের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের কৌশাম্বীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। আমি যে বন্ধুর সহযাত্রী হইয়া আসিয়াছিলাম তাঁহার কৃপায় চা ও জলযোগের সহিত পরম তৃপ্তিসহকারে উদরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিলাম।

এলাহাবাদ ফিরিবার পথে মনে পড়িতেছিল—হায় রে মানুষের কীর্ত্তি! এই তার পরিণাম। একদিন যেখানে কত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, রাজপথ, সরোবর, দুর্গ এবং ঘোষিতারাম, বদরিকারাম প্রভৃতি বৌদ্ধ আশ্রম ছিল, আজ তাহা কোথায়?

কৌশাম্বীর দুর্গ স্তূপ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি যদি কখনও খনন করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটি সমৃদ্ধিশালী বিরাট নগরীর বহু প্রাচীন কীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

এই প্রবন্ধে যে সমুদয় চিত্র প্রকাশিত হইল সেগুলি বন্ধুবর ব্যাস আমাকে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি এলাহাবাদ Ewing Christian Collegeএর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরাজীতে Early History of Kausambi নামে একখানা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৌশাম্বীর সম্বন্ধে যাঁহারা সব কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা এই গ্রন্থখানা পড়িলে উপকৃত হইবেন।

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

এবারে কলকাতায় ফিরে সুকুমার কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করতে লাগল। জীবনে এ অনুভূতি তার প্রথম। থেকে থেকে হঠাৎ তার খোকার জন্য মন কেমন করে। পথে চলতে চলতে কোনো খেলনা দেখলে কখনও বা কিনেই ফেলে, কখনও মনে মনে স্থির ক'রে রাখে—পূজোর সময় কিনে নিয়ে যেতে হবে। কাপড়ের দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে খোকার জন্য কি রঙের জামা কিনতে হবে। কোন্ রঙের জামা মানাবে ভালো। এমন তার কখনও হয় নি। পূজোর জন্য কাপড়-জামা যা কিছু কেনা হয়, সব তার বাবাই কেনেন। সে জন্য কখনও সে বিব্রত বোধ করেনি। এ সম্বন্ধে তার যে কোনো দায়িত্ব আছে তাও অনুভব করেনি। মণিমালাকেও মাঝে মাঝে তার স্মরণ হয়। কিন্তু এবারে আর একা নয়। কোলে খোকা। খোকাকে কোলে নিলে মণিমালার কেমন যেন রূপ বদলে যায়। তার সর্ব্ব দেহে কেমন যেন নতুনতর মাধুর্য্যের সঞ্চার হয়।

তবু নানা কাজের মধ্যে দিন তার আগের মতোই কাটে। আগের দুটো টুইশান সে ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে মাইনে বড় কম। তার বদলে তার নিজের স্কুলের দুটি বড়লোকের ছেলেকে পড়াচ্ছে। পঁচিশ টাকা ক'রে পঞ্চাশ টাকা পায়। আর একটা সুবিধা দুটি ছেলেই ভালো। তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করে। সে বড় কম সুবিধা নয়। প্রাইভেট মাষ্টারকে যেখানে কর্ম্মচারী ব'লে গণ্য করে, সেখানে পড়াতে আত্মসম্মানে যত ঘা লাগে এমন আর কোনো খানে নয়।

এই ঘটনায় সুকুমারের মনে আর একটা পরিবর্ত্তন

এল। শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে তার যে একটা ঔদাসীন্য এসেছিল সেটা গেল ঘুচে। তার মনে হ'ল, জ্যোতিষশাস্ত্র একেবারে মিথ্যা নয়। ফলত ভাদ্র মাস থেকে তার অর্থাগম যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ তো আর ভুল নয়। একথা যদি তার কোষ্ঠিতে থাকে তাহ'লে শাস্ত্র মিথ্যা বলা যায় কি ক'রে?

অন্নসমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হওয়ায় সুকুমার নিজের এবং ছাত্রদের পড়াশুনায় আরও বেশী মনোযোগ দিতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ভালো বই কেনবার সঙ্গতিও এখন তার হয়েছে। তবে পরিশ্রম বড় বেশী হয়। স্কুলে সে ফাঁকি দেয় না। সে খাটুনি আছে। তার উপর দুবেলা দুটি ভালো ছেলেকে পড়ান। সেও যথেষ্ট খাটুনি। ভালো ছেলেকে পড়াতে এমনিতেই তার একটা স্বাভাবিক লোভ আছে। এই সব ক'রে একমাত্র ছুটীর দিন ছাড়া অন্য সব দিনে রাত্রি দশটার পর নইলে আর বই খোলবার সময় পায় না। তাতেও বিঘ্ন আছে। বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বেলে পড়লে সে ঘরের অন্য বাবুদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। তারা বিরক্ত হয় এবং প্রকাশ্যে তা বলতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু সুকুমার তা কানে তোলে না, হেসে উড়িয়ে দেয়।

প্রবীণ শিক্ষকেরা তার এই উৎসাহের আধিক্য দেখে হাসেন। আর তার সঙ্গে নিজেদের প্রথম শিক্ষক জীবনের দিনগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন। তাঁরাও একদিন সুকুমারের মতো উৎসাহভরেই খেটেছেন। আর আজ?

যদুপতিবাবু সেই মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত একই অঙ্কের বই ছেলেদের পড়িয়ে আসছেন। ফলে অঙ্কের বই পর্য্যন্ত তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। বললেই হ'ল, সার, একাশীর উদাহরণমালার তেরোর অঙ্কটা বুঝতে পারিনি। সার আর অঙ্কের বইখানা দেখবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। মুখে মুখে ব'লে যান, আর ছেলেরা খাতায় লিখে নেয়। অঙ্কের মাষ্টারেরই যদি এই অবস্থা হয়, অন্য মাষ্টারদের তো কথাই নেই।

অশ্বিনীবাবু তো স্পষ্টই বলেন, একঘেয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে তাঁর এমন হয়েছে যে, ক্লাসে যাওয়ামাত্র ঘুম ধরে। প্রত্যেক ঘণ্টার অর্দ্ধেকটা তাঁর ঘুমিয়েই যায়। কিছুটা নিদ্রা অহিফেনের কল্যাণে হ'লেও কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

সুকুমার যে স্কুলে খারাপ দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে, এর ফল যে অন্য শিক্ষকদের পক্ষে খারাপ হ'তে পারে সেকথা ভেবে সকলের আশঙ্কাও হয়, তাঁরা প্রায়ই এজন্য তাকে পরিহাসছলে সতর্ক ক'রে দেন।

যদুপতিবাবু রুক্ষ মেজাজে বলেন, কি পড়ান মশায় অত ক'রে। অত পড়াবার আছে কি?

সুকুমার লজ্জিত হয়ে বলে, পড়ান আগেই হয়ে গিয়েছিল। মারাঠাদের সম্বন্ধে একখানা বড় ইতিহাস থেকে জায়গা জায়গা প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম।

অশ্বিনীবাবু চোখে বিলোল কটাক্ষ হেনে বলেন—ও, ছেলেগুলোকে আর পাশ করতে দেবেন না স্থির ক'রেছেন।

—কেন? কেন?

—আরে মশায়, আগে ওরা পাশ করুক। তারপরে বেঁচে যদি থাকে, ওসব সময় ঢের পাবে।

—তার মানে?

—মানেটা শিববাবু বুঝিয়ে দেন!

—মশায়, অমন ক'রে পড়ালে ওরা ছত্রিশ বছরেও পাশ করতে পারবে না। ওদের শুধু দাগ দিয়ে দিতে হবে—কোন্‌টা দরকারী, কোন্‌টা দরকারী নয়। আর যে সব প্রশ্নের উত্তর বইতে এক জায়গায় লেখা নেই, পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সেইগুলোর একটা নোট লিখে দিতে হবে। বুঝলেন? আপনি নিজেও তো পাশ ক'রেছেন। জানেন তো, কি ক'রে পাশ করতে হয়।

ব'লে সকলের দিকে গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হানলেন। অর্থাৎ সুকুমার যেন ইচ্ছা ক'রেই ছেলেদের ফেল করবার জন্য এমনি ক'রে পড়াচ্ছেন।

অশ্বিনীবাবু একটু মোলায়েম হেসে বললেন, আপনি যে রকম খাটতে পারেন মশায়, তাতে অন্য লাইনে গেলে এতদিনে অনেক উন্নতি ক'রে ফেলতেন। চেহারাখানা তো ভালো আছে, একটা দারোগাগিরির জন্য চেষ্টা করলেন না কেন?

এঁদের কথার ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন জ্বালা ছিল। সুকুমার মনে মনে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল। তবু এঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সে নিজে নতুন এসেছে। তাই মনের রাগ মনেই রেখে চুপ ক'রে রইল।

অশ্বিনী আবার তেমনি মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, তাহ'লে

এতদিনে উপরওয়ালার নজরে ঠিক পড়ে যেতেন। কাজেরও উন্নতি হ'ত। এখানে মুস্কিল কি জানেন, যতদিন আমরা না মরছি, ততদিন আর কারও আমাদের ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। কি বলেন?

ব'লে সকলের দিকে চেয়ে হাসলেন অর্থাৎ সুকুমারের অহেতুক এত বেশী পরিশ্রম করার গূঢ়ার্থ যে কি, তা আর কারও বুঝতে বাকি নেই।

সুকুমার অসহ্য ক্রোধে ও ঘৃণায় চুপ ক'রে রইল। যাঁরা অবলীলাক্রমে একজন ভদ্রলোকের কাজে এমন হীন উদ্দেশ্য আরোপ করতে পারেন তাঁদের কথার কি জবাবই বা দেওয়া যায়!

রমেশ সুকুমারের সমবয়সী, কি দু'এক বৎসরের ছোট-বড়। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ঘটবার অবকাশ না হ'লেও বয়সের সমতার জন্য একটা মিল আছে। বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলে সুকুমার তারই সঙ্গে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে।

এক সময় তাকেই সুকুমার নিভৃতে ডাকলে, রমেশবাবু শুনুন।

রমেশ কাছে এসে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, ছেলেদের জন্য আমি একটু মন দিয়ে খাটি, এটা ওঁরা ভালো চোখে দেখছেন না কেন বলতে পারেন?

উত্তরে রমেশ একটু হাসলে।

সুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করলে, এতে অপরাধটা কি?

এবারও রমেশ শুধু একটু হাসলে।

সুকুমার বললে, ওঁরা বোধ হয় ভেবেছেন আমি এই ক'রে হেড্ মাষ্টারের মন ভুলিয়ে ওঁদের ডিঙিয়ে যেতে চাই। কি হীন অপবাদ!

রমেশ পকেট থেকে একটা দেশলাই কাঠি বের ক'রে নিঃশব্দে কান খুঁটতে লাগল। এই স্কুলে তার কিছুকাল চাকরী করা হ'ল। স্কুলের আবহাওয়া অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে।

শান্তকণ্ঠে বললে, তাতে হয়েছে কি! যে যা খুশী বলুক না, আপনি নিজের কাজ ক'রে যান।

—তাই পারা যায়? মন ভেঙে যায় না?

রমেশ তার উত্তেজনা দেখে হেসে ফেললে। বললে, তাহ'লে এ লাইন আপনার পোষাবে না। আমারও অভিজ্ঞতা অবশ্য বেশী নয়, কিন্তু আপনার চেয়ে বেশী। অশ্বিনীবাবুর মতো আফিম খেতে না ধরলে এ কাজে মজা পাওয়া যাবে না। বেতন বৃদ্ধি নেই, কিছু নেই—এর রস আলসেমিতে। যে পেয়েছে, সেই মজেছে। তার আর নিষ্কৃতি নেই। কখনও দু'চার বছর মাষ্টারী করার পর কেউ মাষ্টারী ছেড়ে অন্য কিছু করলে? তার কার্য্য শেষ।

রমেশ হো হো করে হাসলে।

কিন্তু সুকুমারের তখন হাসবার মতো মনের অবস্থা নয়। বললে, সব মাষ্টারই কি অপদার্থ হয়?

রমেশ ঘাড় নেড়ে রায় দিলে, সব মাষ্টার। এক সাহিত্যিক হওয়া ছাড়া মাষ্টারের আর সব পথ বন্ধ। দুইই কুড়ের ব্যবসা। ও দুটোতে মিল খায় ভালো।

—কিন্তু...

রমেশ বাধা দিয়ে বললে, এই দেখুন না আমি এম-এস্-সি পাশ ক'রে মাষ্টারীতে ঢুকে হাইজিন পড়াচ্ছি। অনন্তকাল তাই পড়াব। আমার এম-এস-সি পড়ার সার্থকতা কোথায় বলুন? আপনি ইতিহাস পড়াচ্ছেন। নতুন নতুন খুব খাটছেনও। কিন্তু এই অল্প মাইনেয় ব্যাগার খাটতে আর কতদিন ভালো লাগবে? তখন আপনিই কুড়ে হয়ে যাবেন। আর খাটবার শক্তিও থাকবে না, উৎসাহও থাকবে না। বলুন বটে কি না!

সুকুমার আর জবাব দিলে না। ভাবতে ভাবতে নিজের ক্লাশে চ'লে গেল।

রমেশের কথাটা সুকুমারের মনে ঘা দিলে। কিন্তু সে দমল না। মনকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলে যে, যতদিন এই সম্মানিত পদে সে আছে, ততদিন ফাঁকি কিছুতে দেবে না। যখন নিতান্ত ফাঁকি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হবে, ছেলেদের মন দিয়ে পড়াতে কিছুতে আর ভালো লাগবে না, তখন মাষ্টারী ছেড়েই দেবে। সে আর এমন কি হাঙ্গামা! এমন নয় যে, মোটা মাইনের চাকরী, ছাড়তে কষ্ট হবে। ভারী তো মাইনে!

মাইনে যে বেশী নয় এ কথাটা সুকুমার কিছুতে ভুলতে পারে না। কেবলই মনকে প্রবোধ দেয় এই ব'লে যে, অর্থের লোভ যাদের বেশী তারা বড়বাজারে মুদির দোকান

করতে পারে, কিম্বা হাওড়ার পুলে ইটের ঠিকা নিতে পারে, নয় তো বিলেতে গরু-ভেড়া-ছাগল চালান দিতে পারে। অধ্যাপনা—অধ্যাপনা। তার গৌরব স্বতন্ত্র। তার সার্থকতার পরিমাপ অর্থে হয় না।

মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু নিজেই মনে মনে বিশ্বাস করতে পারে না এবং যত বিশ্বাস করতে পারে না তত বেশী ক'রে মনকে প্রবোধ দেয়। আরও বেশী সে দুর্ব্বল বোধ করে যখন তার পুরোণো চাকুরে-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়।

সেদিন চন্দ্রভূষণ এসেছিল।

চন্দ্রভূষণ তারই সঙ্গে একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল। বিধির বিপাকে উত্তীর্ণ হ'তে পারেনি। তখন মনে হয়েছিল বিধির বিপাকে। কিন্তু যদি পাশ করত, আর তার পরে আই-এ, বি-এ পড়ত তাহ'লে আর রেল আফিসে অমন চাকরী যোগাড় করতে হ'ত না। কারণ ১৯১৮ সালে আর ২২ সালে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল ক'রেও যে চাকরী ১৯১৮ সালে পেয়েছিল, সে সাধ্য কি বি-এ পাশ ক'রেও ১৯২২ সালে সেই চাকরী সে যোগাড় করে। আজ সে মাইনে পাচ্ছে একশো পনেরো।

চন্দ্রভূষণ এখন গ্রামে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। বছর বছর কিছু কিছু জমি কিনছে। পাঁচ জন লোকে ছেলের চাকরীর জন্য তার কাছে উমেদারী করছে। যে চন্দ্রভূষণকে সোজা ইকুয়েশন বোঝাতে মাষ্টারের এক গোছা ছড়ি ভেঙে কুচি কুচি হয়ে যেত, সে আজ একাউণ্ট্স্ ডিপার্ট্মেণ্টে বড় চাকরী করে। স্কুলে যে ছিল বিখ্যাত বোকা, আজ তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা লোকের মুখে ধরে না। জটিল কোনো গোলযোগে পড়লে মানুষ তার কাছে পরামর্শ নিতে আসে। তার চাল-চলনই বদলে গেছে।

আর সুকুমার—বেচারা বহু পরিশ্রমে ভালো ক'রে এম-এ পাশ ক'রে এখন ত্রিশ টাকার স্কুল-মাষ্টার। চন্দ্রভূষণ আর বছর পনেরো পরে যখন আড়াইশো টাকায় অবসর নেবে, তখনও ওর অবসর হবে না;—সংসার প্রতিপালনের জন্য ওই ত্রিশ টাকাতেই তখনও মাষ্টারী করতে হবে। এই বৈষম্যের জোরে সেদিনও চন্দ্রভূষণ এসে যথেষ্ট মুরুব্বিয়ানা ক'রে সুকুমারকে নানাপ্রকার হিতোপদেশ দিয়ে গেছে।

সুকুমারের নিজের মনেও কোথাও দুর্ব্বলতা আছে নিশ্চয়। সে নিঃশব্দে চন্দ্রভূষণের হিতকথা শ্রবণ করেছে। বিদ্যার আভিজাত্য দেখিয়ে অর্থের আভিজাত্য ম্লান করতে সাহস করেনি। চন্দ্রভূষণ চ'লে যাওয়ার পরে সে তার স্পর্দ্ধা দেখে মনে মনে হাসবার চেষ্টা করেছে, প্রকাশ্যে নয়।

সুকুমার মাঝে মাঝে ভাবে, কেন এমন হ'ল? বুনো রামনাথের দেশের আবহমানকালের ঐতিহ্য একেবারে বদলে গেল কি ক'রে? সেকালে অর্থে আভিজাত্য ছিল না, ছিল অর্থের সদ্ব্যয়ে। এই আভিজাত্য লাভ করবার জন্য রাজাকে রাজমুকুট ছেড়ে সকলের সঙ্গে পথের ধূলোর এসে দাঁড়াতে হয়েছে। আজ আভিজাত্যলাভ সহজ হয়েছে। তার জন্য আত্মবিসর্জ্জনের প্রয়োজন নেই। দেশের কল্যাণে সেই অর্থ নিয়োগ করার আবশ্যকতা নেই। শুধু পকেটে থাকলেই হ'ল। মধুলোভী মক্ষিকার মতো কাঙাল মানুষের দল দিবারাত্র স্তুতিগুঞ্জনে তাকে ঘিরে রাখবে। এর ওপর ধনী যদি দু' এক টুকরো উচ্ছিষ্ট মাঝে মাঝে এদের দিকে ছুঁড়ে দেন তাহ'লে তো আর কথাই নেই। সে তো দেখতে দেখতে ক'লকাতার মেয়র হবে—তা তার বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র যত নিকৃষ্টই হোক না কেন। মানুষের বাজার দর এই রকমই দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু মানুষের এত কাঙালপনা এল কোথা থেকে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপরও মানুষের লোভ যে নেই তা নয়, কিন্তু তার জন্য সহজে সে আত্মবিক্রয় করতে চায় না।

রমেশ বলে, মানুষের এই অবস্থা এসেছে নিতান্ত পেটের তাগিদে। দিন রাত্রি অভাবের মধ্যে থেকে তার এমন হয়েছে যে, দু'বেলা পেটপুরে খাওয়ার পরেও যার প্রচুর অবশিষ্ট থাকে তাকে ভাগ্যবান ব'লে ভাবতে শিখেছে।

সুকুমার বাধা দিয়ে বলে, তা শিখুক। অর্থভাগ্যে তারা যে ভাগ্যবান, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা যে অসাধারণ লোক এ কথা ভাবে কেন?

—কে বললে ভাবে? হয় তো ভাবে না। তাদের নিন্দা যে এরা কতখানি উপভোগ করে সে তো "দেশের কীর্ত্তির" বিক্রি দেখেই বুঝতে পারেন।

এ কথা সত্য। সুকুমার নিজের চোখেই তা দেখেছে।

রমেশ বলে, যেখানে একশো জনের মধ্যে আটানব্বুই

জন ভালো ক'রে খেতে প'রতে পায় না, সেখানে দু'জন যদি রোল্‌স্ রয়েস্ চ'ড়ে বেড়ায়—তারা যে অসাধারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষ তাতেও খানিকটা অভিভূত হয় বটে, কিন্তু লোকে সত্যিই তো আর ঘাস খায় না। এই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিরা কোথায় নিতান্ত সাধারণ, তারও পরিচয় পদে পদে পায়।

—তবু কেন তার দোরেই অহোরাত্র প'ড়ে থাকে?

—সেই প্রশ্নই আমারও। আমার মনে হয়, ওইটুকুই কাঙালের দুর্ব্বলতা। সে যাকে ঘৃণা করে, তারও পা না চেটে পারে না। লক্ষ্মীর প্রসাদ যারা পায় না অথচ লোভ আছে ষোলো আনা—তারা লক্ষ্মীর প্রসাদের সান্নিধ্য অনুভব করতে ভালোবাসে। ওইটেই তার রোগ।

কিন্তু এ সমস্ত বড় বড় কথা। দূর থেকে তর্ক ক'রে এ দুর্ব্বলতার সত্যকার পরিচয়ও পাওয়া যায় না, মীমাংসাও হয় না। কেবল দু'জনে মিলে টিফিনের সময়টা কাটানো হয়। এই মাত্র।

টিফিনের সময়টা ওদের দু'জনেই কাটে। প্রবীণ শিক্ষকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জ্বালায় সুকুমার সহজে কমন-রুমে যায় না। নিতান্ত একা সময় কাটান মুস্কিল ব'লে রমেশকেও সাধ্য-সাধনা ক'রে নিয়ে আসে। রমেশ কখনও ওখানে, কখনও এখানে—এমনি ক'রে টিফিনটা কাটিয়ে দেয়।

ইত্যবসরে আর একটা ঘটনা ঘটল যাতে প্রবীণ শিক্ষকদের সঙ্গে তার আপোষের আশা সুদূরপরাহত হয়ে গেল।

হেডমাষ্টার স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের নোট লিখে কিছু টাকা উপার্জ্জন করেন। যে কারণেই হোক, হয় তো অনেক দিন ধ'রে নোট লেখার জন্যই, তাঁর নামের একটা বাজার-দর হয়েছে। সেই কারণে ছাত্র-মহলে যেমন তাঁর নোটের চাহিদা বেশী, প্রকাশক-মহলেও তদনুরূপ। ফলে এমনও হয় যে, অন্য লোকের লেখা নোট তাঁকে একটা রয়ালটি দিয়ে তাঁর নামে চালান হয়। যে বেচারী কষ্ট ক'রে লিখেছেন তিনি সামান্যই পান। কিন্তু বই লেখার বিন্দুমাত্র পরিশ্রম স্বীকার না ক'রেও হেডমাষ্টার পান মোটা টাকা। কিছুকাল থেকে তাঁর মনে ছেলেদের জন্য একখানা ইতিহাসের বই লেখবার সঙ্কল্প জেগেছে। নিজের তাঁর সময় নেই, পরিশ্রম করার শক্তিও নেই। সেই জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারেন নি। সম্প্রতি সংসারানভিজ্ঞ সুকুমারকে দেখে আবার সে সঙ্কল্প জেগেছে।

এই উদ্দেশ্যে তাকে একদিন নিজের বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন এবং আস্তে আস্তে কথাটা ভাঙলেন।

বললেন, দেখুন আপনার পড়ানোর পদ্ধতি দেখে আমি খুশী হয়েছি। এমন কি সেক্রেটারীকে পর্য্যন্ত বলেছি যে···

বিনয়ে সুকুমার মুখ নত করল।

হেডমাষ্টার আরও একটু ভণিতা ক'রে হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, আপনি বই-টই লেখেন না কেন?—এই ছেলেদের টেক্সট্ বুক? কি নোট?

সুকুমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা কখনও ভাবেনি। কিন্তু অনেকের কাছে অনেক কথা শুনেছে তো। বললে, সে তো অনেক হাঙ্গাম।

—হাঙ্গাম অবশ্য আছে। কিন্তু একবার চালাতে পারলে লাভ আছে।

সুকুমার হাসলে। পাল্টা হেডমাষ্টারের স্তুতি করবার জন্য বললে, আমার বই তো আপনার মতো বিক্রি হবার আশা নেই।

হেডমাষ্টার এ প্রশংসায় খুশী হলেন। হেসে বললেন, হ'তেও পারে তো।

সুকুমার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয় না। বই তো অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু আপনার অর্দ্ধেক বিক্রি কারও তো হ'তে দেখলাম না।

—সে ঠিক।—হেডমাষ্টার বললেন,—তোমাদের পাঁচজনের দৌলতে আমার বই আর পাঁচজনের চেয়ে বেশীই বিক্রি হয়। কিন্তু ক'দিন থেকে তোমার সম্বন্ধেও একটা কথা ভাবছি।

ব'লেই তাড়াতাড়ি মোলায়েম সুরে বললেন, তোমাকে 'তুমি' বলছি ব'লে মনে কিছু করলে না তো? তোমাদের আজকালকার ভদ্রতাটা আমার ঠিক রপ্ত হয় নি। হাঃ হাঃ হাঃ। প্রায়ই ভুল হয়ে যায়।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, সে কি কথা। আপনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার বয়সী কত ছেলে আপনার হাত দিয়ে পাশ ক'রে গিয়েছে। আপনি যে 'আপনি' বলতেন তাতেই আমার লজ্জা করত।

হেডমাষ্টার খুব খুশী হয়ে বললেন, থাক্‌গে। তোমার সম্বন্ধে কি কথাটা ভাবছি শোন।

সুকুমার উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

হেডমাষ্টার গাঢ় নিম্ন স্বরে বলতে লাগলেন, দেখ, মাষ্টারী অনেকে করতে আসে। অনেক মাষ্টার দেখলাম। দেখে দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, তারা শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যে আসে না, আসে নিতান্ত পেটের দায়ে। স্পষ্ট কথাই বলি, তোমার সম্বন্ধেও প্রথমে সেই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু তোমার শিক্ষাদান প্রণালী, আর তোমার আন্তরিকতা দেখে সে ধারণা বদলে গেছে।

ব'লে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন।

সুকুমার নতমুখে তাঁর কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

হেডমাষ্টার বলতে লাগলেন, কিন্তু দেখ, যারা সত্যি সত্যি চিরজীবন শিক্ষকতা করতে চায় তাদের তো আর ত্রিশ টাকায় চলবে না। ওতে আর তার আন্তরিকতা কতদিন স্থায়ী হবে? দেখছি কিনা, সব ওড়বার ওপরেই আছে। কোথাও যা হোক কিছু পেলেই হ'ল, তখনই পালাবে—পনেরো দিনের নোটিশ পর্য্যন্ত দেবে না।

ভদ্রলোক আবার হাসলেন।

সুকুমার ঘাড় নেড়ে সায় দিল। সে নিজেও এই কথাটা ক'দিন ধ'রে ভাবছে।

হেডমাষ্টার বললেন, তা সে তাদের যা হবার তাই হোক, তোমার একটা ব্যবস্থা দরকার। ভাবছিলাম···

হেডমাষ্টার চুপ করলেন।

সুকুমার উৎসুক এবং উৎসাহিত হয়ে চাইলে।

হেডমাষ্টার বললেন, ভাবছিলাম. ওই বই লেখার কথাটাই। কিন্তু—একটু থেমে বললেন—দেখ স্পষ্ট কথাই ভালো। তুমি অবশ্য ছেলে ভালো, পড়াশুনোও কর, তোমার শিক্ষাদান প্রণালীও চমৎকার। তুমি যদি বই লেখ সে বই নিশ্চয়ই ভালো হবে, এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। তবু তোমার বই বাজারে চলবে না—

ব'লে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাইলেন।

একটু থেমে বললেন, যদি তোমার নামে চালাও।

সুকুমার দ'মে গেল। বললে, সেই কথাই তো বলছিলাম।

হেডমাষ্টার আর একটু দম ধ'রে থাকলেন। হঠাৎ আদর্শবাদের সুর বদলে কাজের কথায় এলেন। বললেন, দেখ বাপু, সংসারে টাকা নিয়ে কথা। তুমি যদি সেই জিনিসটাই পেতে যাও, নাম নাই বা রইল?

ব'লে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সুকুমার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না।

হেডমাষ্টার কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে বলবার চেষ্টা করলেন। দেওয়ালের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, এই রকমই দেশের অবস্থা হয়েছে। ভালো লোকের লেখা সত্যিকার ভালো বই চলে না, আর আমার নামে ছাই পাঁশ যে যা লিখে ছাপাচ্ছে তা আর পড়তে পাচ্ছে না, হু হু ক'রে কাটছে।

সুকুমার অগাধ জলে ভাসছিল। এতক্ষণে যেন মাটিতে পা ঠেকল। সংসারে টাকা নিয়েই কথা কি না সে বিষয়ে অনেক কথাই তার অবশ্য বলবার আছে, কিন্তু আপাতত কিছু টাকার তার বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। তাদের সাংসারিক অবস্থা ভিতরে ভিতরে যাই কেন না দাঁড়াক, বাইরের ভড়ং এখনও ঠিকই আছে। সেই ভড়ং পাড়াগাঁয়ে রাখতে বেশী বেগ পেতে হয় না। কিন্তু কোনো ক্রিয়া-কর্ম্ম পড়লেই মুস্কিল। এতদিন তাদের সে হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু এবারে ছেলের অন্নপ্রাশন এসে একেবারেই গলায় আটকেছে। অনেক কাল পরে বাড়ীতে কাজ এসেছে। প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। যে-সে পৌত্র নয়, অনেক সাধ্যসাধনার ধন। যেমন তেমন ক'রে সারা চলবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ একটু ধুমধাম না করলে সব গুমর ফাঁক হয়ে যাবে। ভিতরের সব কথা জানাজানি হ'তে আর বাকি থাকবে না। এই সব স্মরণ করিয়ে দিয়ে কর্ত্তাবাবু দিন কয়েক আগে সুকুমারকে পত্র দিয়েছেন যে, এক মাসের মধ্যে তাকে অন্তত একশো টাকা এই জন্য পাঠাতে হবে। বাকী টাকা তিনি নিজে যে প্রকারে হোক সংগ্রহ করবেন। একশো টাকা এককালীন দেওয়া সুকুমারের পক্ষে অসম্ভব। তার তো ওই আয়। তাও নিয়মিত পায় না। এই অবস্থায় হেডমাষ্টার-মশায়ের প্রস্তাব শুনে সে আর সংসারে টাকাই বড় কথা কিনা সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, ওতে কি রকম পাওয়া যায় ?

হেডমাষ্টার একটু হিসাব ক'রে বললেন, তা নিতান্ত মন্দ বলা চলে না। ফর্ম্মা পিছু টাকা পনেরো দেয় বোধ হয়। তা, সে তুমি রাজি হ'লে আমি একটু চাড় দিয়ে আরও এক-আধ টাকা বেশীও আদায় ক'রে দিতে পারব। সেজন্য আটকাবে না।

সুকুমার এর বেশী আর কিছু জানতে চাইলে না। কাকে ফর্ম্মা বলে, কত পৃষ্ঠা লিখলে পনেরো টাকা পাওয়া যাবে সে সব প্রশ্ন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করলে। তার মোট প্রয়োজন একশো টাকার।

সেই হিসাবে জিজ্ঞাসা করলে, কত বড় বই লিখতে হবে ?

—ফর্ম্মা দশেক।

সুকুমার মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলে দেড়শো টাকা। খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোন ক্লাসের বই ?

—এই ক্লাস ফাইভ-সিক্স।

কিন্তু সুকুমারের টাকাটা মাসখানেকের মধ্যে প্রয়োজন। তার মধ্যে কি বইখানা শেষ হবে ? কিছু টাকা অগ্রিম পাওয়া যায় না ?

হেডমাষ্টার তাতেও রাজি হলেন। সুকুমার তাঁর ঔদার্য্যে মুগ্ধ হয়ে খুশী মনে বাড়ী চলে এল।

৬

সুকুমারের টাকার কিছু ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু স্কুলে আর টেঁকবার পথ রইল না। মাষ্টাররা কি ক'রে টের পেয়ে গেলেন হেডমাষ্টার সুকুমারকে দিয়ে বই লিখিয়ে নিচ্ছেন। তাতে তার কিছু অর্থাগমও হবে। এর পরে আর কোনো মাষ্টারেরই সন্দেহ রইল না যে, হেডমাষ্টারকে খোসামোদ করা ছাড়া সুকুমারের এই প্রাণপাত পরিশ্রম করার আর কোনোই উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করলেন না। কেউ পরম ঔদাস্যসহকারে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলেন, কেউ বা বড় জোর মুখ টিপে একটু হাসলেন। সকলেই সর্ব্বপ্রকারে সুকুমারের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এমন কি বন্ধুবর রমেশচন্দ্রেরও তার সম্বন্ধে উৎসাহ ক'মে এল।

সুকুমার কি রকম একা বোধ করে। কেমন একটা লজ্জাও অনুভব করে। ইচ্ছা হয় রমেশের কাছে প্রকারান্তরে এই প্রসঙ্গ তুলে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। সে যে হেড-মাষ্টারের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে নি, তিনিই নিজে থেকে তার এই উপকার করেছেন এ কথাটা অন্তত রমেশকেও বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রমেশকে সে ডাকতে গিয়ে পিছিয়ে আসে। কেমন যেন সাহসে কুলোয় না। বহু লোকের ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে অকারণে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

কিন্তু টাকার প্রয়োজন তার অত্যন্ত বেশী। অভাবগ্রস্ত লোকের চক্ষুলজ্জা বেশী দিন থাকে না। থাকা ভালোও নয়। বিশেষ মনের মতো ক'রে একখানা ছেলেদের ইতিহাস লেখার নেশা তাকে যেন পেয়ে বসল। মনের মতো একখানা ইতিহাস। ঘটনার শুষ্ক বোঝায় তরলমতি ছেলেদের জীবন দুর্ব্বহ মনে হবে না। তারা গল্পের মতো আনন্দের সঙ্গে প'ড়ে যাবে—শুধু শুকনো ঘটনা নয়, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বও। তেমনি একখানা ইতিহাস কি ক'রে লিখতে হবে, কেমন ক'রে লিখলে ছেলেদের চিত্ত আকর্ষণ করবে সহজে, এই চিন্তাই তার মনের মধ্যে প্রবল হ'ল। অন্য দেশে ছেলেদের ইতিহাস কি ভাবে লেখা হয় তাই জানবার চেষ্টা তাকে পেয়ে বসল।

বাড়ীতে এ সুসংবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি দিলে। মণিমালা লিখলে, এ সবই তার খোকার কল্যাণে। আসবার সময় খোকার জন্য এক সেট রূপোর থালা বাসন যেন আনা হয়।

তাহ'লেই তো বিপদ! খোকার কল্যাণে তার এই উন্নতি কি না ভগবান জানেন। হ'তেও পারে। অন্তত কার্য্য-কারণ থেকে সে কথা যদি কেউ বলে, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই! আবার নাও হতে পারে, সমস্তই কাক-তালীয় বৎ। কাকটা তালের উপর থেকে চ'লে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তালটাও পড়ল, তার থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে কাকটাই তালের পতনের কারণ। তা হোক। তবু তার খোকা তার জন্য এই অভাবিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন বয়ে এনেছে একথা ভাবতে তার ভালো লাগে। খোকা নয়ন মেলার সঙ্গে সঙ্গে তার সংসারে এল আনন্দ, এর চেয়ে খুশীর খবর আর নেই। কিন্তু রূপোর থালা-বাসন? সে যে সুকুমারের পক্ষে অনেক বেশী টাকা? অত টাকা

সে পাবে কোথা ? মোট একশো টাকাই তো পাবে। তার সমস্তটাই বাপের হাতে দিতে হবে। এক মাইনে। কিন্তু তার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিছু নেই। স্কুলের যে অবস্থা, নিয়মিত মাইনে পাওয়া যায় না। হেডমাষ্টার তার সম্বন্ধে যথেষ্ট সদয় অবশ্য আছেন। কেঁদে-কেটে ধরলে কিছু টাকা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কত টাকা কে জানে। হয় তো পাঁচ টাকা, নয় তো বড় জোর দশ টাকা। কিছুই ঠিক নেই। এক ভরসা ট্যুইশানির। কিন্তু তাতে হাত দেওয়া চলবে না। গেল মাসে বাড়ীর চাহিদা মেটাতে গিয়ে মেসের পুরো টাকা দিতে পারেনি। কিছু বাকি আছে। এ মাসে সমস্ত মিটিয়ে না দিলে তার আর সম্মান থাকবে না।

অথচ রূপোর থালা-বাসন, তার খোকা শুভান্নপ্রাশনের দিন ব্যবহার করবে। খোকা কি খেতে শিখেছে ? সে নাকি বড় দুরন্ত হয়েছে। বাড়ীময় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুর্ ঘুর্ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্কর্ম্ম করে, আর অখাদ্য খায়। ভাবতেও সুকুমারের হাসি আসে! রূপোর থালা-বাসনে নানারকম খাবারের সামনে ব'সে সে যে কি করতে পারে তাই সুকুমার ভাবতে লাগল। তার মনে হ'ল সে বড় দুঃখী। নিজেকে এত বড় দুঃখী সে আর কখনও ভাবেনি।

তার মনের ভিতরটা যেন হু হু ক'রে কেঁদে উঠল। এত বড় অপদার্থ সে! এত অকর্ম্মণ্য! তার জীবনে ধিক!

(ক্রমশঃ)

"পথিক"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

আপনার যাহা কিছু নিঃশেষেতে ঢেলে দিয়ে গিয়ে
ক্ষুদ্র কিছু কুড়াইয়া অনুক্ষণ কেঁদে মরে মন;
যাহা গেছে সে শূন্যতা পূর্ণ আর করিবে কি দিয়ে,
সর্ব্বহারা—তবু তাই ভেবে মরে হায় সর্ব্বক্ষণ।
ওরে পান্থ, পথ তোর আজিও ফুরায়ে যায় নাই,
দীর্ঘ পথ পড়ে আছে—পার্শ্বে তার নাহিকো আশ্রয়,
শূন্য কুম্ভ—বারি নাই, কি করিবি ভাবিয়া না পাই!
পিপাসায় শুষ্ক হিয়া—পলে পলে বেড়ে ওঠে ভয়।
দীর্ঘেরে ভাবিয়া হ্রস্ব বোঝা তোর নামাইলি পথে,
পিপাসার বারি তোর পথপার্শ্বে দিলি যবে ফেলে,
ভাবিয়া দেখিস নাই এই পথ চলিবি কি মতে,
বৃথা বোস্ শূন্য কুম্ভ—তৃষ্ণার্ত্ত নয়ন থাক মেলে।

কোথায় আশ্রয় স্থান, দেখি পথ করিতেছে ধূ ধূ,
বন্ধু কোথা, সঙ্গী কই, দীর্ঘপথ রহিয়াছে পড়ে,
ক্লান্ত পদে চলিয়াছ সম্মুখেতে দৃষ্টি রাখি শুধু,—
ক্ষুদ্র তৃণ উড়ে যায় পৃথিবীর বক্ষোত্থিত ঝড়ে।
এখনও চলিতে হবে—থামিবার সময় কোথায়;
সম্মুখে ডাকিছে কাল, ভবিষ্যৎ যায় নি মিলায়ে,
বর্ত্তমান বয়ে চলে, কতটুকু চিহ্ন রেখে যায়,
নিঃস্ব তুমি চলিয়াছ আপনার সর্ব্বস্ব বিলায়ে।
শূন্য পথে চল পান্থ, ফেলে দাও শূন্য ও কলস,
শুধু চল,—দেখ যদি কোনদিন এ পথ ফুরায়,
যাক দিন, যাক মাস, কেটে যাক দীর্ঘ এ বরষ,—
অন্ধকার ভবিষ্যৎ ডাকে শুধু—আয় কাছে আয়।

থাকুক অতীত পিছে,—অতীত হউক বর্ত্তমান,
তবুও চলিতে হবে—চলার হবে না অবসান।

রসিক রায় নামটা একটু রসময় হইলেও তিনি নিজে সে বিষয়ের দৌর্ব্বল্যটুকু পোষাইয়া লইয়াছিলেন অর্থাৎ পাড়ায় একটু বেশী রকমের বিবেচক বলিয়া তাঁহার যে সুখ্যাতিটুকু আছে তাহাই দুষ্ট লোকেরা কার্পণ্য বলিয়া অভিহিত করে। সে যাহা হউক রসিকচন্দ্র আমাদের বিশেষ বন্ধু। তাই তাঁহার ঘরের ও মনের অনেক খবর আমাদের গোচরে আছে। তিনি বাড়ীতে থালার পরিবর্ত্তে সিমেণ্টের উপর আহার এখনও প্রবর্ত্তন করেন নাই। এমন কি মাসে একবার করিয়া অথবা দুই মাসে তিনবার করিয়া তিনি মাথার চুল ছাটেন। তাঁহার গৃহিণী বলেন, বেশী চুল রাখিলে তাঁহার নাকি মধ্যে মধ্যে মধ্যমনারায়ণ তৈলের দরকার হয়। তাই চুল ছাটাটা সেই ব্যয়ভার লাঘব করিবার উপায় কি না বলিতে পারিলাম না। তবে আর্য মতামতে পরম শ্রদ্ধাবান রসিকচন্দ্র বুক ভরিয়া দাড়ি রাখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই দাড়ি নাড়িয়া তাহার সুগন্ধ প্রকাশ করিতে করিতে দাড়ি মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

রসিকচন্দ্রের তেজারতি ব্যবসায় নাই, গচ্ছিত পৈতৃক ধনও নাই। তিনি যৌবনে উদারভাবে এক এক-মেয়ের-মা বিধবাকে কন্যাদায় মুক্ত করেন। সেই হইতেই লোকের বিষ চক্ষু তাঁহার উপর পড়িয়াছে। শোনা যায় বিধবার অনেক টাকা ছিল। প্রথম প্রথম তাই তিনি শ্বশুরালয়েই ছিলেন। পরে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর স্বর্গ গমন হইলে সেখানে যখন টেকা দায় হইল তখন বসতবাড়ী জমিজমা যাহা কিছু ছিল সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া যে হাজার পাঁচেক টাকা হইল তাহা লইয়া আজ এই উনিশ বৎসর ছ'মাস পঁচিশ দিন কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছেন। গৃহিণী আসিয়া প্রথম প্রথম বায়না ধরিয়াছিলেন—একখানা পাকা বাড়ী করিতে হইবে। রসিকচন্দ্র বুঝাইলেন—"আরে পাঁচ হাজার ছ হাজার আর কটা টাকা। এ দিয়ে এখুনি বাড়ী করলে খাবে কি? বাড়ী ধুয়ে জল খাবে? তারপর সহর মোকাম যায়গা, হিত আছে, বিপরীত আছে—তখন কি উপায় হবে ভাব দিকিন!" অগত্যা আর পাকা বাড়ী করা হয় নাই। অনেক ভাবিয়া, চিন্তিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া, শুঝিয়া শেষে কালীঘাটের কাছে এক পাড়ায় এক-খানা খোলার ঘর খরিদ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে সুখী দম্পতি সেখানেই বসবাস করিতেছেন। বলিতে ভুলিয়াছি রসিকচন্দ্র নিঃসন্তান। ছেলেমেয়ে হইয়া যে তাঁহাকে আবার দুশ্চিন্তা ও বিশেষ বিবেচনার মধ্যে ফেলে নাই এজন্য বোধহয় ঈশ্বর রোজ ধন্যবাদ পাইয়া থাকেন।

খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে রসিকচন্দ্রের শ্বশুরালয় ছিল। সেখান হইতে কেমন করিয়া তাঁহার সেই বিবেচক খ্যাতি এই শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল তাহা আমরা বলিতে পারিব না। তবে কালীঘাট অঞ্চলে তাঁহার সুখ্যাতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং শেষে এমন হইল যে, তিনি রাস্তায় চলিতে লাগিলে দুইধারে সকলে অঙ্গুলি ইঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইয়া কি সব বলাবলি করিতে

লাগিল। তাহাদের স্বর এত নীচু ছিল না যাহাতে তাহা আমাদের অথবা তাঁহার কর্ণে পৌছিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়। যাক্, সে সমস্ত দুষ্টলোকের প্রচার, তাহা আলোচনা নাই করিলাম।

রসিকচন্দ্র বর্ত্তমানে পাড়ায় এক পাঠশালায় শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য বিশেষ সুবিবেচনার সঙ্গে সম্পন্ন করিতেছিলেন। পাঠশালাতে পোড়োদের কাছ হইতে নগদ মাহিয়ানা কিছুই পাওয়া যাইত না। সরস্বতী পূজার সময় সকলে কিছু কিছু প্রণামী দিত। করপোরেশানের যে ক্ষুদ্র সাহায্য আসিত তাহা হইতে কোন প্রকারে স্কুলের খরচাদি নির্ব্বাহ হইত। তবুও সুবিবেচনার ফলে রসিকচন্দ্র মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপায় করিতেন এবং তাহা হইতে অনেক আলাপ-আলোচনা কথা-মাজার পর মাসিক সওয়া ছ'টাকা খরচ করিয়া বাকীটা ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য পূর্ব্বগচ্ছিত অর্থ সহিত যুক্ত হইত। এমনই করিয়া তাঁহাদের চলিতে লাগিল। ক্রমে আলাপ, পরিচয়, দেখা, শোনায় প্রতিবেশীরা জানিতে পারিল যে নেহাৎ সবিশেষ সুবিবেচনা ও সাবধানতার ফলে রসিকচন্দ্রের এই বিরাট সংসার এই ক্ষুদ্র উপায়ে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে।

... ...

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বীমা-বিষয়ক-গবেষণা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইবে তখন আমি একটি মৌলিক তত্ত্ব প্রচার করিব স্থির করিয়াছি। গবেষণাটি এই যে কলিকাতায় যত সংখ্যা বিদ্যুৎবাতি জ্বলে সারা সহরে বিভিন্ন কোম্পানীর এজেন্ট তাহা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক নয়। বিদ্যুৎবাতি অপেক্ষাও ইহাদের প্রাথমিক দ্যুতি উজ্জ্বলতর, বিদ্যুতালোক অপেক্ষাও ইহারা সর্ব্বত্র প্রসারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ণ উনিশ বৎসর ছয় মাস পঁচিশ দিবস সেই কলিকাতা সহরে বসবাস করিয়া এবং সাধারণ পাঠশালায় শিক্ষকরূপে পরম সুনাম অর্জ্জন করিয়াও রসিকচন্দ্র এই উপদ্রব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। খুব সম্ভব পাড়ায় যে সুখ্যাতি ছিল তাহাতেই কোন বীমা-প্রচারক তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে নাই। কিন্তু কাল বিপুল, প্রগতিবাদে মানুষ নিত্য চতুরতর ও নিপুণতর হইয়া বাঁচিয়া উঠিতেছে। তাই একদিন এই বাংলাদেশে এমন এক বীমা প্রচারকের জন্ম হইল যিনি বিনা দ্বিধায় রসিকচন্দ্রকে পাকড়াও করিলেন এবং এই বিবেচক দম্পতিকে ঝাড়া সাত ঘণ্টা ধরিয়া বীমাপূজন ও আশীর্ব্বাদরূপে কুবেরের ভাণ্ডার পাইবার লোভ দেখাইয়া মন স্থির করিতে এক সপ্তাহ সময় দিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—এতে আর আপত্তিরই বা কি আছে। মানুষের আপদ বিপদের কথা আর তো কিছু বলা যায় না। আর তা ছাড়া আমাদের এই স্কিম, পলিসি নাম্বার ফর্টিসিক্স্—একটু ভেবে দেখবেন। এতে আপনারও আপত্তি থাকবার কোন কারণ নেই, মিসেস্ রায়। বলিয়া উঠিয়া আবার বসিয়া মিসেস রায় অর্থাৎ রসিকচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া এক নূতন পলিসির সন্ধান দিলেন। বীমা-প্রচারক যখন বার বার বলিতেছিলেন—আপনার স্বামীর মৃত্যু হইলে এত টাকা পাইবেন, তখন 'স্বামীর মৃত্যু' কথাটা বার বার রাজলক্ষ্মী দেবীর কর্ণে বিঁধিতেছিল। তাই অবশেষে বলিয়া বসিলেন —দরকার নাই আমার অমন টাকা পাওয়ায়। উনি আমার বেঁচে থাকুন, আমাদের যা আছে·· বলিয়া জিব কামড়াইয়া থামিয়া গেলেন। ইহার কারণ রসিকচন্দ্র ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করিয়া টাকা আমানত রাখেন নাই, যাহা কিছু নগদ দু-এক পয়সা আছে সবই ঘরের মেঝেতে— যেখানে রাতে বিছানা পড়ে এবং দিনে একটা কাঠের বাক্স পড়িয়া থাকে সেখানে পোতা আছে। নিরাভরণা স্ত্রী, ঘর দ্বারের চেহারা বা রসিকচন্দ্রের নিজের চাল-চলনে তাঁর এই অর্থবত্তার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। এই টাকার কথা কাহারও কাছে উল্লেখ করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিয়মবিরুদ্ধ ছিল।

সে যাহা হউক, বীমা-প্রচারক আবার বুঝাইলেন— তাঁহাদের কোম্পানীর অন্যতম পলিসি এই যে, যে কেহ তাহার কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকের নামে বীমা করিয়া তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। সেরূপ ক্ষেত্রে রসিকচন্দ্র যদি পাড়ার বা যে কোন স্থানের কোন লোকের জীবন-বীমা করিয়া রাখেন তবে ছ'মাস পরে ঈশ্বরেচ্ছায় সে ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহারা উভয়ে ঐ টাকা ভোগ করিয়া আরও দশ বছর বেশী বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন। রসিকচন্দ্র কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন বলিলেন।

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে পাড়ায় হিরণ-

বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী এই বীমা সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে রসিকচন্দ্রের চক্ষু ফুটিয়াছে। হিরণের বাবার মৃত্যুতে হিরণ বীমা কোম্পানী হইতে নগদ দশ সহস্র মুদ্রা পাইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পরে বাড়ী আগাগোড়া চুণকাম করা হইয়াছে, একজন চাকর বেশী রাখা হইয়াছে, ইস্তক চালক সহিত একখানা আধুনিক গাড়ীও আসিয়া গাড়ীবারান্দার অঙ্গভূষণ হইয়াছে। দেখিয়া রসিকচন্দ্রও স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিয়াছেন।

তাই একদিন শনিবার পাঠশালার ছুটির পরে সারা কালীঘাট পায়ের তলে পিষিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে রসিকচন্দ্র বাড়ীতে ফিরিয়া হাসিমুখে গৃহিণীকে 'জয় মা তারা, শিব শঙ্করী' জানাইলেন। রসিকচন্দ্র আজ অনেক ঘোরা-ঘুরির পর এক যুবকের সন্ধান পাইয়াছেন, নিজে তাহাকে দেখিয়াও আসিয়াছেন। বয়স বাইশ তেইশ, দুরন্ত যক্ষারোগে চক্ষু কোটরগত, বক্ষপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; বাঁচিবার কিছুমাত্র আশা নাই। রসিকচন্দ্র ও তাহার সত্বর মৃত্যু-কামনা করেন, তবে যেন ছ'মাসের পূর্ব্বে না হয়।

ছেলেটি কালীঘাটে এক অন্ধকার কুটীর গহ্বরে কোন-প্রকারে মাথা গুঁজিয়া থাকে। একাকী, আত্মীয়-স্বজন কেহ সেখানে নাই, কোথাও কেহ নাই। সুতরাং এই উপযুক্ত ব্যক্তি। সকল রকমে নিরুপদ্রব অবস্থায় দশ দশ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। আরামে রসিকচন্দ্রের সে রাতে ঘুম হইল না।

পর দিবস বীমা-ডাক্তারকে নগদ ত্রিশটি টাকা উপঢৌকন দিয়া রসিকচন্দ্র তাহাকে সুপারিশ পত্রের জন্য রাজি করাইয়া আসিলেন। বীমা-প্রচারকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল এবং পরদিবস সোমবারে 'জয় মা তারা, শিবশঙ্করী' বলিয়া সেই অজ্ঞাতকুলশীল রুগ্ন নব-জীবনের জীবনবীমা করা হইল। বীমাপ্রচারকের বিশেষ ব্যবস্থায়, নব-জীবনের অজ্ঞাতেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন হইল। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—যদি ও ছয় মাসের ভিতর মারা যায়, তবে তোমার সব টাকাই যাইবে। তুমি বরং উহাকে বাড়ী আনিয়া একটু যত্ন করিয়া রাখ, যাহাতে অন্তত ছয় মাস বাঁচে। ডাক্তার সাহেব উচ্চ-মূল্যে কর্ত্তা ও গৃহিণীকে প্রতিশেধক ঔষধ সেবন করাইলেন এবং রসিকচন্দ্র সাধিয়া যাইয়া অনাত্মীয় নব-জীবনকে নেহাৎ উদারতা দেখাইয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন।

দিন চলিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী নব-জীবনের উপরে সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়াছেন যাহাতে অন্ততঃ ছ'টা মাস তাহার হাড় ক'খানার মধ্যে প্রাণ বাঁচিয়া থাকে—নতুবা ভর্ত্তি ফি সহিত এই প্রিমিয়ামের টাকাগুলি সব জলে যাইবে। তাই তিনি নব-জীবনের খাওয়া-দাওয়া এবং একটু আধটু ঔষধ-পত্রের চেষ্টা করিয়া ঘরে মাছ জীবন্ত রাখিবার মত তাহাকে বাঁচাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। নব-জীবন কিন্তু তাহাতেই খুব খুশী। খায়, না খায়, সে যে তাহার সেই বিষাক্ত পরিবেষ্টনী ত্যাগ করিতে পাইয়াছে ইহাতেই তাহার পরম পরিতৃপ্তি। পরন্তু তাহার আর কেহই ছিল না, এখন দুইজন অপরিচিত অনাত্মীয় আত্মীয়াধিক স্নেহ

—একটিকে আধ্‌লা বলিয়া স্থির করিলেন

ভালবাসা দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া তাহার অন্তরে যেন বল ফিরিয়া আসিল। সে আবার ক্রমে ক্রমে একটু একটু হাঁটিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। খোলা বাতাসের দিকে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাল্য-স্মৃতি জাগরুক হইয়া উঠিল, তখন আবার তাহার বাঁচিবার আশা হইতে লাগিল। কিন্তু সে বুঝিল বাঁচিলেও সে আর 'দীর্ঘায়ু' হইবে না। আয়ুষ্কাল তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে। তবে আর তাহার চিন্তা কি! যে কয়টা দিন এখন আর সে বাঁচিবে, সেই স্নেহশীল

পরিবারের মধ্যেই সে থাকিতে চায়। বাহিরের জগৎ স্নেহহীন, নারীর হৃদয় ভিন্ন দুস্থের সহায় আর কেহ নাই। কিন্তু আর যে কয়টি গণ্ডীবদ্ধ দিবস তাহার আয়ুরূপে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহা সে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া লইবে। চাদর গায়ে, গলায় ফ্লানেল জড়াইয়া অবিরত সে আর মৃত্যুভয় করিবে না, তাহাতে মৃত্যু যত সত্বরই আসুক সে তাহাকে বরণ করিতে প্রস্তুত। জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্যও তাহার ক্লীবতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে একটু স্মার্ট হইতে চায়।

তাহার বেড়াইবার রাস্তার পাশে একটা ব্যায়ামাগার। সেখান হইতে দলে দলে সুস্থ সুন্দর ছেলেরা তাহার সামনে বাহির হইয়া আসে। গায়ে তাহাদের ঘাম ঝরিতেছে,

"আমাদের এই স্কিম, পলিসি নাম্বার ফর্টিসিক্স—"

আকার আসুরিক। মানুষের গা হইতে যে কেমন করিয়া ঘাম ঝরে এবং তাহাতে সে যে কতখানি ক্লেশ বা শান্তি পায় তাহা নবজীবন ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু সে ছেলেগুলির মুখে তো হাসি লাগিয়াই আছে। টানা, সোজা অথচ পেশল চেহারা, এই শীতের সন্ধ্যাতেও গায়ে একটাও পুলোভার, কি র‍্যাপার, কি গলায় একটাও মাফলার নাই। দেখিয়া দেখিয়া নবজীবনের ভারী লোভ হইল; ভাবিল, এমন জীবন যদি একদিনের জন্য আস্বাদন করিয়া মরিতে হয়, সেও ভাল। পরদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আখড়ায় ভর্ত্তি হইয়া আসিল।

বাড়ী আসিয়া নবজীবন রাজলক্ষ্মীকে বলিল—ওই ওষুধের আর দরকার নেই মা, ওষুধ তো মেলাই খেলাম, এখন কিছুদিন ওষুধ বন্ধ থাক্।

রসিকচন্দ্র শুনিয়া বলিলেন—তিন মাস হয়ে এলো, শরীর তো একটু সেরেছে। ওতেই আর মাস তিনেক টিক্‌বে। না হয় দরকার হলে শেষের দিকে আর একটু ডাক্তার ডাকলে হবে।

ঔষধ বন্ধ হইল। কিন্তু ঘরে যে গরুটি ছিল তাহার ক্লেশকর পরিচর্য্যার ভার নবজীবন স্বয়ং নিয়াছে, তাই অপর্য্যাপ্ত দুধের অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে রাজলক্ষ্মীর মনে বাধে।

নবজীবন ব্যায়াম করে, হাটবাজার করে, গাভীর পরিচর্য্যাও করে; সময়ে অসময়ে ক্ষুধা পাইলে গাভীর আগার্য্য ভিজা ছোলা মুঠা মুঠা চুরি করে। সকালের দিকে একটু একটু করিয়া মাটি কোপাইয়া বাড়ীর সামনের অনেকখানি সে ধূলা ধূলা করিয়াছে। বাঁশের বেড়া দিয়া বেশ একখানি শাকসব্জীর ক্ষেত হইল। নবজীবন গায়ে পায়ে মাটি মাখিয়া ক্ষেতের কাজ করে, মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া হাসেন। নিজের মায়ের মত রাজলক্ষ্মীর কাছে আব্দার করিয়া নূতন নূতন শাকের বীজ আনিয়াছে। বারান্দার পাশে পাশে গুটিকয়েক সুগন্ধি ফুলের গাছ উঠিয়াছে।

একদিন রসিকচন্দ্র গৃহিণীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তুমিও কি ছেলেটার সঙ্গে পাগল হয়ে উঠলে নাকি? নিত্যি নতুন ফুলের বীজ, শাকের বীজ। এদিকে আজকাল সংসারে পনের ষোল টাকা মাসে খরচ হচ্ছে। ছেলেটার খাই খরচ, প্রিমিয়ামের টাকা……।

রাজলক্ষ্মী সহিতেছিলেন, পরে বললেন—পিরমিয়ামের খরচটাও কি নবর দরুণ, না সেটা আমাদের? আর বলছ শাকশব্জীর বীজ, কেন তাতে তোমার কোন সাশ্রয় হচ্ছে না? গেল সপ্তায় তো তেরসিকের শাক ব্যাপারীরা নিয়েছে…।

রসিকচন্দ্র মাথা চুলকাইলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটে, সে তো বটে—তবে কিনা—

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—তবে আবার কি? ছেলেটা এসে ইস্তক বাড়ীর যেন হাল ফিরে গেছে। গরুটার চেহারা ফিরেছে। ওই তো গোয়ালের পাশে যে গোবর গাদা

পড়ে পড়ে পচ্ছিল তাও তো নব নিজহাতে সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে সার দিয়েছে। বলি, একটা চাকর রাখলেও তো খরচ ছিল, আর তাকে দিয়ে এত কাজ হ'ত ?

রাজলক্ষ্মীর সাংসারিক বিবেচনাবুদ্ধি যে নিজের অপেক্ষা কম নয়, মৃদু মৃদু মাথা দুলাইয়া রসিকচন্দ্র তাহা স্বীকার করিলেন এবং চোখ মেলিয়া ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র নবর পারিপাট্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাখিতে প্রয়াস পাইত এখন তাহাই সংসারের প্রত্যেক বস্তুতে প্রযুক্ত হইয়াছে। নবজীবন এখন আর নিজের অসুস্থতা নিয়া বেশী মাথা ঘামায় না। গরম কাপড় বাক্সবন্দী করিয়াছে, বুকের ব্যাণ্ডেজ ও গলার মাফ্লার একদিন সাঁজালে পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। এখন সে আর ঠাণ্ডার ভয় না করিয়া প্রত্যূষে ক্ষেতের কাজ করে, বৈকালে বাচ্ খেলিতে যায়, ব্যায়াম করে, চাঁদনী রাতে বেড়াইতে বাহির

"প্রণামের বেলায় রাজলক্ষ্মী রসিকের সহধর্ম্মিণীর কাজ করিলেন না"

পাঁচ মাস হইয়া গিয়াছে নবজীবন এখানে আসিয়াছে। সে তাহার শেষের ক'টা দিনের জন্য রাজলক্ষ্মীকে মাতৃত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আবাস-ভবনখানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। যে মায়া তাহার আপনার দেহকে ঘিরিয়া বিরাজ করিত তাহাই এখন সারা বাড়ীখানি, গরুবাছুর ও শাকসব্জীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে সাবধানতায় পূর্ব্বে সে নিজেকে বাঁচাইয়া

হয় ; বহুদিন সে রাত্রির রূপ ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন আবার আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শরীর কি তবে তাহার সুস্থ হইতেছে ? তাই যেন মনে হয়। গায়ে যেন সে একটু বল পায়, এখন বিনা ক্লেশে সে কয়েক ঘণ্টা হাঁটিতে পারে, ট্রাম বাসের দিকে তাকাইতে হয় না। হাফসার্টের হাতা হইতে যে হাত দুখানি বাহির হইয়াছে তাহাকে সুডৌল বলা যায় কিনা

এক একবার ধরিয়া ধরিয়া ভাবে। কিন্তু তবুও তো সে বাঁচিবে না। মৃত্যু তাহার একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে, কবে কোন মুহূর্ত্তে সে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বসিবে কিছু স্থির নাই। কিন্তু সেজন্য তাহার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। এই যে শেষের কয়েক দিন সে একটু আরামে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছে ইহাই তো দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিতে হইবে।

ছয় মাস ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রিমিয়াম দিতে যাইয়া রসিকচন্দ্র ইদানিং মুস্কিলে পড়িয়াছেন। প্রায় একমাস তিনি অসুস্থাবস্থায় পড়িয়াছিলেন। নবজীবন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া সংসার দেখিয়া সব কিছুর সুবন্দোবস্ত করিয়া সংসার সুচারুভাবেই চালাইয়াছে। এই সমস্ত সারিয়া যেদিন সময় পাইয়াছে সেদিন পাঠশালায় যাইয়া তাঁহার চাকুরিও ঠিক রাখিয়াছে। কিন্তু একে ত পুরা তিনজনের ব্যয়, তাহাতে টানিয়া কসিয়া ঔষধপত্র ডাক্তার বাবদ অন্যূন সাতটাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাই এবারের আর গত মাসের বাকী—এই দুই মাসের প্রিমিয়ামের টাকা একত্রে শুধিতে যাইয়া তাঁহার গচ্ছিত টাকায় হাত পড়িয়াছে। কিন্তু ভরসা এই—এবার ছয়মাস পূর্ণ হইল, এর পর প্রিমিয়ামের হার কমিবে। আর যদি মা-তারা-শিবশঙ্করী মুখ তুলিয়া তাকান, তবে এই ছোঁড়াটার একটু এমন তেমন হইলে টাকা তো আর দিতেই হইবে না, বরং আরও পাওয়া যাইবে এতো এতো টাকা। কথাটা গৃহিণীর কাছে তুলিতে তিনি নীরব রহিলেন। সেখানে সমর্থনসূচক কোনও সাড়া মিলিল না।

দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আট মাস পুরিয়া গেল। নবজীবনের মৃত্যুর আর কোনও আভাস পাওয়া গেল না। প্রথম প্রথম তবু একটু কাশির আওয়াজ পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে তাহাও নির্দ্দয়ভাবে বন্ধ হইয়াছে। রসিকচন্দ্র চাহিয়া চাহিয়া দেখেন—কোদালি ধরিলে নবর হাতের পেশী যেন তাঁহাকে টিটকারী দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসে। তাহার বুকের ব্যাস অভদ্রভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাক্তার, ঔষধ, বায়ুপরিবর্ত্তন—কিছুর বালাই নাই, তবু রোগী মরা দূরে থাকুক, রোগ একটু বাড়িতেছেও না। সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রে ছেলেটা এই যে ঠাণ্ডা লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাতেও যখন যক্ষ্মাদেবীর আশীর্ব্বাদ তাহার উপর কার্য্যকরী হইতেছে না ইহাতে রসিকচন্দ্র দেবীর শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। পরে একদিন কালীঘাটে হত্যা দিয়া মায়ের কাছে নবর মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া আধখানি পাঁঠা দিবেন বলিয়া আসিলেন।

গৃহিণী আজকাল একথায় মোটেই গা মাখিতে অবসর পান না। ভাবিয়া ভাবিয়া একবার তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ হইল। কিন্তু আর একটু ভাবিতেই কেমন বিসদৃশ লাগিল। নবর বয়স বছর তেইশ, রাজলক্ষ্মীর পঁয়তাল্লিশ, চুলে পাক ধরিয়াছে। পরে ভাবিলেন, গৃহিণীর নবর প্রতি সত্য সত্যই অপত্য-স্নেহ জন্মে নাই তো? তবেই তো সর্ব্বনাশ। অনেক অনুসন্ধানের পর এক সত্য তাহার মনে উদিত হইতেই তিনি উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। নব আজকাল দৈনিক অন্যূন একসের খাঁটি দুধ পায়। ছোটবেলায় বাবার কাছে গব্যরসের গুণাবলী শোনা ছিল। সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। তখনই ছুটিয়া যাইয়া গৃহিণীকে নবকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। বুঝাইলেন দুগ্ধের দরুণই নব দিন দিন সুস্থ হইতেছে। সর্ব্বনাশ! একেবারে ধনে-প্রাণে মারিবে।

গৃহিণী কিন্তু বাঁকিয়া বসিলেন। যে দুধ হয় সব নবর পরিশ্রমে, আর তাকে না দিয়া নিজেরা সব খাইলে কি ধর্ম্মে সহিবে? তাহার চাইতে ভয়ঙ্কর কথা মনে মনে বলিলেন, নব সুস্থ হইতেছে ইহাতে এত সর্ব্বনাশের কি আছে? দুগ্ধের এরূপ কার্য্যকরী শক্তি জানিয়া রাজলক্ষ্মী নবর দুধের পরিমাণ এক সের ছাড়াইয়া দেড় সের করিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু নবর শরীর শশীকলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

গৃহিণীর মতিগতি ও সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর সুবিচার দেখিয়া রসিকচন্দ্র পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পরে পাড়ার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গোপনে সব কথা প্রকাশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভরসা দিয়া বলিলেন—এজন্য চিন্তা কি? এক সপ্তাহ আমায় নারায়ণকে তুলসী দিতে দাও না, দেখি বাছাধন কি শক্তিতে বাঁচেন। বলে, খুঁটোর জোরে ম্যাড়া কোঁদে। সব জীবের খুঁটোই তো ঐ এক, তা তো তুমি জানই, পণ্ডিত মানুষ তুমি। একবার সেই খুঁটো সরিয়ে

নিতে দাও না। তার পর একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেই তুমি তোমার প্রাপ্য টাকা পাবে।

ব্রাহ্মণের কথাগুলি অতি মধুর। সুতরাং এক সপ্তাহ নারায়ণকে তুলসী আর দুবেলা পাঁচ সিকা করিয়া আড়াই টাকার ভোগ দেওয়া হইল।

অবশেষে ডাক্তার কাজুড়ি এইচ, এম, বি, বিনামূল্যে উপদেশ দিলেন—বিষে বিষক্ষয়। ও যে পথ নিয়েছে সেই পথেই ওকে ধ্বংস করা শ্রেয়। ও যেমন সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রে ঠাণ্ডা লাগায়, তেমনি ঠাণ্ডাটা একটু বেশী পরিমাণে লাগালেই যক্ষ্মা না হ'ক, নিউমোনিয়ায় যাদুকে সারা হতেই হবে। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে মহামতি হানিম্যান ইত্যাদি···।

অতএব মিষ্ট কথায় নবকে ভুলাইয়া নিউমোনিয়া বাধাইবার জন্য দার্জ্জিলিং পাঠান হইল। সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্ত্র দেওয়া হইল না। রসিকচন্দ্র মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন এবার বাছাধনকে এই শীতে আর দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

মানুষের অলক্ষে ঈশ্বর অদৃশ্য জাল বুনেন।

নবজীবন দার্জ্জিলিং যাইয়া মার কাছে চিঠি লিখিল যে সে একরূপ ভাল আছে। কিন্তু হঠাৎ বেশী ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে, তবে ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। চিঠি শুনিয়া রাজলক্ষ্মী চিন্তিত হইলেন এবং রসিকচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বাজারে যাইয়া এক কুড়ি গলদা চিংড়ি, ফুলকপি, কমলালেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি কিনিয়া ডাক্তার কাজুড়ীর বাড়ী দিয়া আসিলেন। দরাজ হাতে পাঁচ সিকার ভোগ দিয়া কালীবাড়ী প্রার্থনা করিলেন,—'এই তো মা, মুখ তুলেছ। এবার মানসিক পাঁঠা খাবার ব্যবস্থা কর। আমি ছোট বাচ্চা পাঁঠা দেব না, মা! বেশ বড়, যত বড় বাজারে মেলে।' ফিরিবার পথে কত খরচ করিলে একটি দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠা মিলিবে ভাবিতে ভাবিতে এক জলের বাঁক কাঁধে উড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাইলেন।

সপ্তাহ পুরিয়া আসিল—তবু নবজীবনের আর কোনও সংবাদ আসিল না। রাজলক্ষ্মীর চিন্তা বাড়িল। তাঁহার মাতৃহৃদয় স্বভাবতঃই সন্তানস্বরূপ নবজীবনের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিল। তিনি নানা দেব-দেবীর নিকট মানসিক করিতে লাগিলেন। যথানিয়ম কাক নিমন্ত্রণ করিয়া আগ্-হাঁড়ির মাছ-ভাত দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। শনি মঙ্গলবার ৺মায়ের বাড়ী নিয়মিত ভোগ প্রেরণ করা হইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত হরি-সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদিতে যখন তখন কিছু কিছু যাইতে লাগিল।

"শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখে—দার্জ্জিলিং দেবী—"

রসিকচন্দ্র গৃহিণীর এরূপ ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার চোখের সামনেই গৃহিণী বিনালাভে কতকগুলি বাজে ব্যয় করিতেছেন, তবু তিনি তাহা সহিয়া যাইতেছেন—ইহার একটু গূঢ় কারণ আছে। স্ত্রীর ধর্ম্ম-প্রবণতায় সন্তুষ্ট হইয়া হরিকালী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বনের কাকপক্ষী পর্য্যন্ত সবাই যদি একজোটে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিয়া যায় তবে নবজীবনের মৃত্যু তো

কোন্ ছার্, রসিকচন্দ্র লাখোপতিও হইতে পারেন। তাঁহার চোখে এই কাল্পনিক চিত্র অবিরত ভাসিতেছে। কখনও ভাবেন চিঠি আসিযাছে—নব বাঁচিয়া নাই। কখনও ভাবেন পিওন টাকা নিতে ডাকিতেছে—দশ হাজার! তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আবার যাইয়া ধরিলেন এবং নারায়ণের জন্য আর এক সপ্তাহ তুলসীদান ও দু'বেলা আড়াই টাকা ভোগের বরাদ্দ করিয়া দিয়া আসিলেন। স্থির হইল আগামী পরশ্বের ভিতর যদি মৃত্যু সংবাদ আসে বা কোন সংবাদই না পাওয়া যায় তখন শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া পলিসি-হোল্ডারের মৃত্যু ঘোষণান্তর টাকার দাবী দাখিল করিতে হইবে। এইরূপে স্বামী-স্ত্রীর স্বতন্ত্র দেবার্চ্চনার ফলে দৈনিক চার পাঁচ টাকা খরচ হইতে লাগিল।

একদিন একদিন করিয়া সেই বাঞ্ছিত স্থিরীকৃত দিবস আসিয়া পড়িল। দার্জ্জিলিং হইতে কোনও সংবাদ আসিল না। নবজীবন আজ পঁচিশ দিন হইল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর নিকট সারা বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে। নবর হাতে লাগান পুঁইশাক মাচা বাহিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গোলাপগাছে কয়েকটি কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতেছে। নব সব ফেলিয়া দার্জ্জিলিং যাইয়া সকলকে ভুলিয়া গিয়াছে—এমন কি তার মাকেও। ভাবিতে ভাবিতে রাজলক্ষ্মীর চক্ষু বহিয়া অভিমানের অশ্রু নামে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে চিন্তা আসে—সেই যে এক চিঠি দিয়াছিল—একটু জ্বর হইয়াছে, আর তো কোনও পত্র নাই। তবে কি, তবে কি নব নাই? ভাবিতে ভাবিতে প্রবলবেগে অন্তর মথিত করিয়া অশ্রু জোয়ার বহিতে থাকে। স্বামীকে বলিয়া লাভ নাই, ঈশ্বরকে জানাইলে তিনিও নীরব রহিয়াছেন।

নবজীবনের বিষয়ে ইদানিং রাজলক্ষ্মীর নিকট কোন প্রকার সঙ্গত সাড়া মিলে না বলিয়া ও প্রসঙ্গ রাজলক্ষ্মীর নিকট আর রসিক উত্থাপন করেন না। যাহা কিছু নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় কুলায় তাহাই করিয়া যাইতেছিলেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের আয়োজনও সেইরূপ হইল। রাজলক্ষ্মীর মতামত চাওয়া হয় নাই। তিনিও এ বিষয়ে স্বামীর মত ভাবিবার অবসর পান নাই। বেশ কিছু খরচ হইয়া স্বস্ত্যয়ন সমাপন হইল। কিন্তু প্রণামের বেলায় রাজলক্ষ্মী রসিকের সহধর্ম্মিণীর কাজ করিলেন না। তিনি প্রণাম করিয়া অন্যরূপ প্রার্থনা করিলেন। অন্যায়ের পথে স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই একমত থাকে না।

এই স্বস্ত্যয়নের পরদিবস রবিবার বিধায় সোমবারে নবজীবনের জীবনবীমার টাকার দাবির কথা তুলিতে হইবে স্থির হইল। কিন্তু অঘটন এমনও বহু ঘটে। দার্জ্জিলিং হইতে একটা ভারি মোটা খামের চিঠি আসিয়া পড়িল। পিওনের কাছ হতে সেটা হাতে নিতে রসিকচন্দ্রের বুক কাঁপিতে লাগিল। লেফাফামধ্যে না জানি কোন সত্য, রূঢ় সংবাদ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পিওনের ডাকে রাজলক্ষ্মীও দোরগোড়ায় আসিয়া অনুরূপ অবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, পিওন চলিয়া গেলে বাহিরে আসিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিবর্ণ মুখ, সভয় কৌতূহলপূর্ণ চক্ষু রসিকচন্দ্রের হস্তস্থিত একখানি প্রকাণ্ড লেফাফার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। স্বামী ভাবিতেছেন যদি মৃত্যুসংবাদ না থাকে তবে কি উপায় হইবে, স্ত্রী ভাবিতেছেন ঠিক তাহার বিপরীত।

লেফাফা খোলা হইলে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল অনেকগুলি ছোট ছোট ফোটো, আর মায়ের কাছে নবর এক দীর্ঘ পত্র। সে তাহার কলেজ জীবনের বন্ধু বিমান মল্লিকের পাল্লায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া দার্জ্জিলিং ছাড়িয়া অনেক উপরে উঠিয়াছিল। সেখানে ডাকঘর নাই, লোক-জনের কোলাহল নাই, চারিদিক শুভ্র, শুদ্ধ, পবিত্র। নবর খুব ইচ্ছা হয় যে মাকে একবার সেই শ্বেত-রাজ্য দেখাইয়া আনে। পরে লিখিয়াছে—দার্জ্জিলিংএর কিছু উপরে একটি উপযুক্ত যায়গা তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, সেখানে তাহার বন্ধু একটি স্যানিটেরিয়াম খুলিবে। নবকে সেখানে থাকিতে হইবে। সে তার মা প্রভৃতিকেও সেখানে নিয়া দেখাইয়া আনিবে। শেষে লিখিয়াছে যে বর্ত্তমানে সে তাহার বন্ধুর কোম্পানীর মধ্যে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে—সুতরাং তাহাকে বাড়ী হইতে এখন আর টাকা না দিলে চলিবে।

পড়িতে পড়িতে রসিকচন্দ্রের শরীর রাগে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। হতভাগা, নচ্ছার, নেমক-হারাম—একজন সহৃদয় ভদ্রলোককে এমন বিপদে ফেলিতে একটু মায়াও হয় না। কিন্তু তখনও সমগ্র চিঠি পড়া হয় নাই। ইতির নীচে পুনশ্চ দিয়া যাহা লেখা তাহা সমধিক মারাত্মক।—

সে সুস্থ আছে। দার্জ্জিলিং যাইয়া সত্যই তাহার শরীরের খুব উন্নতি হইয়াছে। এই কুড়ি পঁচিশ দিনে প্রায় দেড় সের ওজন বাড়িয়াছে।—কি সাংঘাতিক। রসিকচন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। হাতের ফোটো, চিঠি সব গৃহিণীর দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজলক্ষ্মী নীরবে সেগুলি কুড়াইয়া লইলেন। যুগপৎ সুখ ও দুঃখের অশ্রুতে তাঁহার বক্ষাঞ্চল সিক্ত হইতে লাগিল।

ইহার পর শোনা গেল রসিকচন্দ্রের মাথার বিকার ঘটিয়াছে। তিনি পাড়াস্থ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাঁহার শালগ্রামশিলার কি জানি দুরবস্থা ঘটাইয়াছেন। বাটীস্থ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে রাজলক্ষ্মী তাহা লুকাইয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমানে কালীবাড়ীর দিক্ দিয়াও হাঁটা বন্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু এই এত অশান্তির মধ্যে শান্তি এই যে চিঠির এক সপ্তাহ পরে নবর কাছ হইতে এক ইন্‌সিওর আসিল। তাহাতে নব তাহার প্রথম মাসের আয় হইতে পঞ্চাশ টাকা মায়ের হাত খরচের জন্য পাঠাইয়াছে। রাজলক্ষ্মী গোপনে তাহার পাঁচ টাকা দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পূজা দিলেন। রসিকচন্দ্র বাহিরে গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেও ভিতরে ভিতরে একটু প্রসন্ন হইলেন। সুদ থাক, অন্তত আসলের পঞ্চাশটা টাকা আদায় হইল। পর মাসে একশত টাকা আসিল এবং তাহার সহিত রসিকচন্দ্রের কাছে এক পত্র। পত্রে নব লিখিয়াছে যে সে শীঘ্রই টাকার ব্যবস্থা করিতেছে, রসিকচন্দ্র যেন পাকা বাড়ী তুলিবার সব বন্দোবস্ত করেন। পত্র পড়িয়া রসিকচন্দ্র পুলকিত হইলেন। নবর কি আশ্চর্য্য মায়া! যে সর্ব্বদা তাহার মৃত্যুকামনা করিতেছে নব কিনা তাহাদের জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করিতেছে। চিঠিতে বাড়ীর গরু বাছুরটির নাম পর্য্যন্ত লিখিয়া তাহাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছে। রসিকচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, চিঠির কাগজের উপরে ছাপা—

Mr. Naba Jiban Roy, M. A.
Chief Organiser,
Gandhi Insurance Corporation.
Head office, Caltutta
Darjeeling 15. 7. 35.

গান্ধী ইন্‌সিওরেন্স? সে কি? এ তো সেই কোম্পানী —যাতে রসিকচন্দ্র নবজীবনের জীবন-বীমা করিয়াছেন। নব কি শেষে সেই কোম্পানীতে কাজ পাইয়াছে? তাহারই Chief Organiser? নব M. A.? কৈ আগে তো তাহার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। এমন কি মুখে দু'গৎ ইংরাজি কথা পর্য্যন্ত না! রসিকচন্দ্র শুনিয়াছিলেন বটে যে ছেলেটা লেখাপড়া করিত এবং পড়িতে পড়িতেই এই দুষ্টরোগে আক্রান্ত হয়। তিনি তার লেখাপড়ার কথা কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, কারণ প্রয়োজন-বোধ করেন নাই। সে মরিতে আসিয়াছিল, মরিয়াই যাইবে। সেই আশা ও প্রার্থনাই রসিকচন্দ্রের মনে প্রবল

"জীবন্ত জীবন বীমা"

ছিল। তাই নবর অন্যান্য দিকে চাহিবার তাহার অবকাশ ছিল না। কিন্তু ছেলেটির রুচি যে বিশেষ মার্জ্জিত, তাহার পরিচয় অনেকবারই পাইয়াছেন।

কর্ত্তা আজ অনেকদিন পরে শান্ত; অনেকদিন পরে স্বামী স্ত্রী উভয়েই একত্রে আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন।

* * * *

দার্জ্জিলিংয়ের পথে একদিন বিমানের সঙ্গে নবর দেখা হয়। দু'জনে ভাব ছিল না বিশেষ, তবে মৌখিক আলাপ ছিল। কলেজে অনেকের সাথে পরিচয় হয়, কিন্তু তাহ কচিৎ চিরস্থায়ী হয়। পরে কেহ হয় ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ হয়

তাহার অফিসের কেরাণী। কিন্তু নবজীবন ও বিমান কেহই উক্ত প্রকার বৈষম্যের মধ্যে তখনও পড়ে নাই। উভয়েই গতানুগতিক নিয়মে শিক্ষিত বেকার। তবে পার্থক্য এই যে, বিমান ধনীর সন্তান। নব যখন বি. এ. দিয়া এম. এ. পড়ে, বিমান তখন বি. এ. পাশ করিয়া দেশ-ভ্রমণে সাগরপারে গিয়াছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সুইজার্লাণ্ডে লেঁজা দেখিয়া ভারতে ঐরূপ কোনও যক্ষা চিকিৎসাগার ও স্যানিটেরিয়াম স্থাপন করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। তাহার পিতা এ বিষয়ে তাহাকে উৎসাহ দিয়াছেন।

নব বিমানের উদ্দেশ্য শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। সে নিজে যক্ষারোগী। আর দু'দিন পরে অবশ্যই তাহার ডাক আসিবে। তবে যে কটি দিন বাঁচিয়া যায় দেশীয় হতভাগ্য দুঃস্থ রোগীদের জন্য যদি কিছু করিয়া যাইতে পারে তাহাই তবে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হইবে। নব বিমানের কথায় তাহার সহিত কাজ করিতে রাজি হইয়া স্থান নির্দ্দেশের জন্য দার্জ্জিলিং হইতে আরও উপরে উঠিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে বিমানের অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতেই আছে। এই সময় বিমানের পিতৃবন্ধু কলিকাতা হইতে চিঠি দিলেন যে তাহাদের বীমা কোম্পানীর একজন চিফ্ অর্গানাইজার দরকার। প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা হইবে। যে প্রথম হইবে সেই কাজে বহাল হইবে। ছয় মাস চিফ্ অর্গানাইজার-এর কাজে বিশেষ সুফল দেখাইলে পরে জেনারেল ম্যানেজার পর্য্যন্ত হইতে পারে। অবশেষে বিমানকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লিখিয়াছেন।

চাকুরীটী বিশেষ লোভনীয়। কিন্তু বিমান চাকুরী করিবে না। তাহা হইলে তাহার স্যানিটেরিয়াম কল্পলোকেই রহিয়া যাইবে। সে নবকে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে স্বীকার করাইল। নব ইকনমিক্সে এম-এ।

নব প্রথমে রাজি হয় নাই—বিমান অনেক বুঝাইয়া রাজি করাইল। তাহারই ফলে নবজীবন পরীক্ষা দিয়া বীমা কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছে। এদিকে এত কিছু ঘটিলেও সে তাহার মাকে যে ভুলে নাই তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

* * * *

সেদিন শনিবার। রসিকচন্দ্র পরমশ্রদ্ধাভরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কিছুদূর হাঁটিয়া যাইয়া আবার কি বিড়্ বিড়্ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বার বার যোড়হস্তে উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। অদূরে একটি আলোকস্তম্ভের নীচে দাঁড়াইয়া আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় গাঁট হইতে গুটিকয়েক পয়সা বাহির করিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতেছিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পরখ করিয়া একটিকে আধলা বলিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন। তখন আলোক ছাড়িয়া একটু দূরে হাঁটিয়া যাইয়া সামনে একজন পথিক পাইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া আবার আলোকের নীচে আসিলেন। তাহাকে একেবারে আলোকের নিকট লইয়া যাইয়া বলিলেন—দেখতো বাবা, এটি আধলা কি না!

পথিক বলিল—হ্যাঁ।

এবার ব্রাহ্মণ হাসিয়া ফেলিলেন—বাবা, শুনি, এখানে মানুষেরা গরীব ভিক্ষুককে সিকি পয়সা, পাই পয়সা ভিক্ষা দেয়। আমি বাবা ঐটে পারিনে। গরীব মানুষ, তাই বলে অন্তর অত ছোট নয় যে সিকি পয়সা, পাই পয়সা বিলিয়ে পুণ্যি করবো। ঈশ্বর যে তেমন দিতে দেননি যে রোজ দেব। তাই প্রতি শনিবারে মঙ্গলবারে মাত্তর দশ টাকার আধলা বিলিয়ে, মানে—হাঃ হাঃ করিয়া তিনি কথা শেষ করিলেন।

বস্তুত প্রতি শনি মঙ্গলবারে গরীব ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দশ টাকার না হইলেও একটি করিয়া আধলা বিতরণার্থে ব্যয় করিয়া সহজে পুণ্যলাভ ও সশরীরে স্বর্গারোহণের ব্যবস্থা করেন। আজও তাহাই করিতে-ছিলেন। তিনি যখন একটি ভিক্ষুককে একদিকে ডাকিয়া তাঁহার আধলাটি ভিক্ষা দিলেন তখন রসিকচন্দ্র পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফিরিয়া দেখিলেন রসিকচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার কাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইতেছেন। প্রণাম জানাইয়া রসিকচন্দ্র যখন আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ডাক দিলেন—কি রকম ভায়া, আজ বড় খুশী দেখছি যে। সে ছেলেটার নিপাত হয়েছে বুঝি?

রসিকচন্দ্র জিব কাটিয়া একটা 'অ্যাঁ' উচ্চারণ করিলেন এবং আবার করযোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

চাঁদিনী রাতের স্বপ্ন
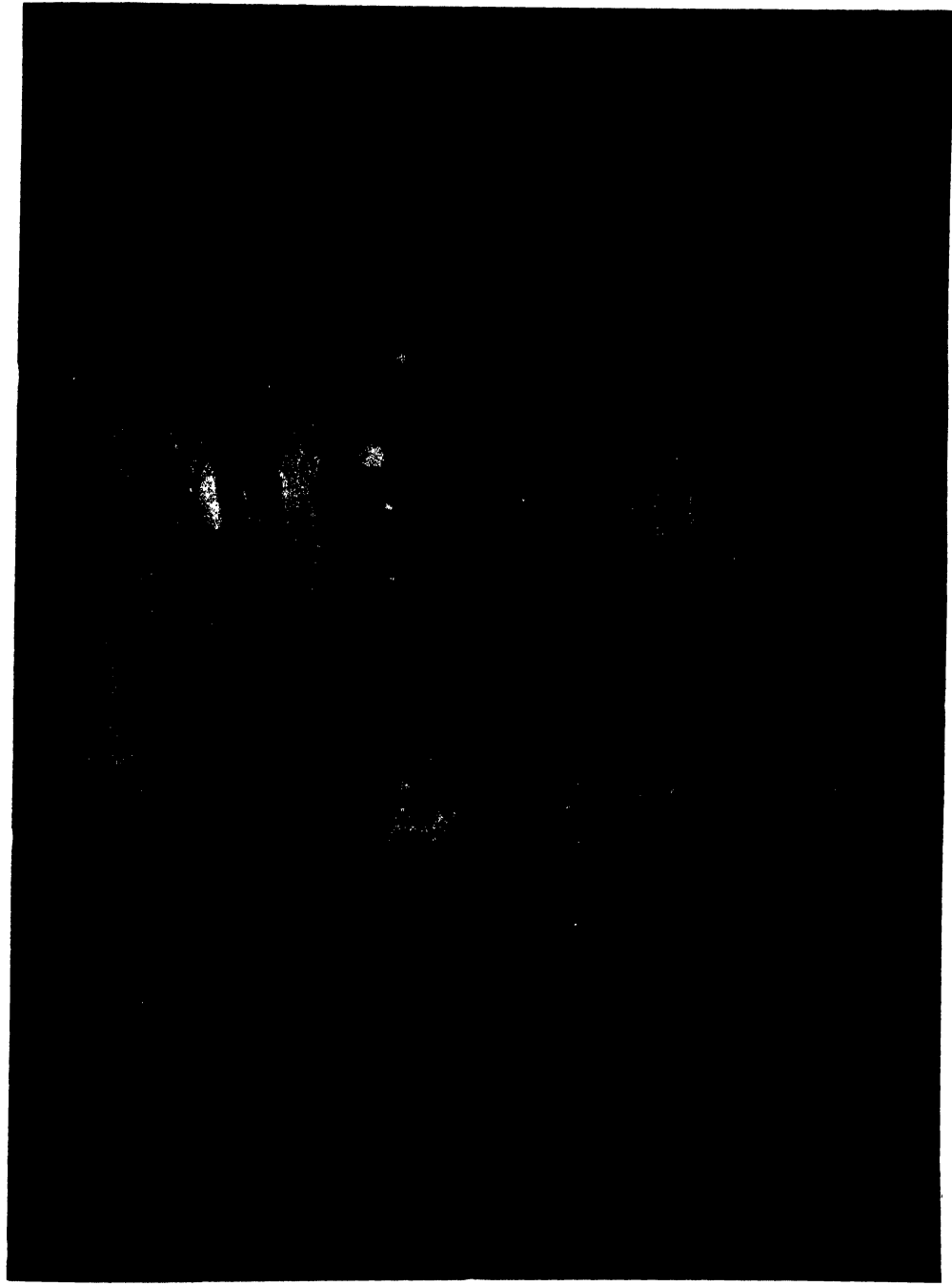
ভট্টাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, তা হবেই তো। এ কি না হয়ে যায় ? দেবতা যে সাক্ষাৎ, আর এ স্বরূপ ভট্চায্যির নাতি অক্ষয় ভট্চায্যির হাতের তুলসী। বলে গে' এ তুলসী দিয়ে ইন্দিরদেবের আয়ু কমাতে পারি, আর ও ছোঁড়াটাতো কোন ছার! তা' ভায়া, আমার পাওনাটা এবার বুঝে দাও। আর তোমার ঘরে ভাল করে আর একটা শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। তার দিন তারিখটে কালকেই দেখে—

এবার বাধা দিয়া রসিকচন্দ্র বলিলেন—ওরূপ বলবেন না। আপনার প্রণামী আমি অবশ্যই দেবো। নব আমার বেঁচে থাকুক, সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

সে কি হে, ও, তাই বল—ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা অবস্থা খানিকটা আঁচ করিয়া লইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—তা তো হবেই, তা তো হবেই। আমার দেয়া তুলসী, তার শতবর্ষ প্রেমায়ু হবে। এই দেখ না ২৭নংএর বিরূপাক্ষ পালিতকে। আমার দেয়া তুলসীর বলেই আজ পঁচিশ বছর মরতে মরতেও বেঁচে আছে। বাবা, সাচ্চা বামুনের পুত—এ বলটা এখনও আছে—তোমরা মানো, না মানো।

কিন্তু ডাক্তার কাজুড়ী শুনিয়া এক খট্কা বাঁধাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—মাষ্টার, নিজের ভালো পাগলও বোঝে। আজকাল যে রকম সস্তার বাজার, তা'তে পাকা বাড়ী করতে দু হাজার আড়াই হাজারই যথেষ্ট। নব তোমাকে তাই দিয়ে ফাঁকি দেবে বুঝচ না ? তুমি দশ হাজার পেতে, এখন আড়াই হাজার পাবার আশায় বগল বাজিয়ে ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছো। তুমি যে মাষ্টার এতো বোকা, তাতো আগে ভাবিনি!

প্রতিবেশীরা অপরের ভালো দেখিতে পারে না।

রসিকচন্দ্র এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, যে কোন জীবন-বীমায় দশ হাজার মিলে না। তাহার কেস মাত্র এক হাজারের। রসিকচন্দ্রের মনে খটকা বাঁধিয়া গেল। গৃহিণীকে খুলিয়া বলিতে পারিলেন না, একাই মুখ অন্ধকার করিয়া রহিলেন।

... ...

নবজীবন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। এখন তাহার হেড অফিসে কাজ। বিমানদের কলিকাতার বাড়ীতে সে যাইত। দার্জ্জিলিংএর বাড়ীতে বিমান একাই থাকিত। মাঝে একবার তার বোন বেড়াইতে গিয়াছিল, এখনও সে দার্জ্জিলিং রহিয়াছে।

নবজীবন অফিসে যায় আসে। একদিন ডাইরেক্টর অতীনবাবু তাহাকে ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—ল্যাপ্স্ পলিসি হোল্ডারদের লিষ্টে আপনার নামেও একটি কেস আছে দেখছি, এক হাজার টাকার।

নবজীবন বলিল—সে কি ? দেখি কৈ ?

সে দপ্তরখানায় যাইয়া দেখিল সত্য সত্যই তাহার জীবন-বীমা করা রহিয়াছে। তাহাতে দশ মাসের টাকা দিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। টাকার উত্তরাধিকারীর নামে রসিকচন্দ্রের নাম ঠিকানা মিলিল। আজ প্রথম নবজীবন রাজলক্ষ্মী ও রসিকচন্দ্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলের পরে মাথা রাখিয়া সে রাজলক্ষ্মী ও রসিকচন্দ্রের ব্যাপার বিচার করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর ব্যবহারে কোথাও সে স্বার্থ, কার্পণ্যের গন্ধও পাইল না। রাজলক্ষ্মীকে সে মা বলিয়া ডাকে, মায়ের মত ব্যবহারই তাহার কাছ হইতে পাইয়াছে। রসিকচন্দ্রের ব্যবহারে প্রথমে সে বিশেষ আন্তরিকতার আভাস না পাইলেও তিনিও তো তাহার উপর কোনদিন কোন অবিচার করেন নাই। বরং আজকাল তাঁহারও আন্তরিকতার মাত্রা রাজলক্ষ্মী অপেক্ষা কিছুমাত্র কম বলিয়া মনে হয় না। তবে তাহা কি কেবল তাহার নব-নির্ম্মিত অট্টালিকার জন্য, না বর্ত্তমান লম্বা আয়ের জন্য ? কিন্তু তাহাই যদি হইত তবে যেদিন তাহার এই অট্টালিকা বা চাকুরি কিছুই ছিল না সেদিন উহারা ওরূপ যত্ন করিতেন না। সে আর ভাবিতে পারিল না। স্থির করিল, যাহাকে একবার সে মাতার আসনে বসাইয়াছে তাঁহার বিষয়ে বিরুদ্ধ ভাবিয়া নিজেকে ও তাঁহাকে হেয় করিয়া তুলিবে না।

বিমানের পিতা জানিতেন না যে রাজলক্ষ্মী নবজীবনের আপনার মা নহেন। একদিন অফিসে কোন কহিয়া নবজীবনকে তাহার মাকে নিয়া অবশ্য অবশ্য আসিতে বলিলেন। পরদিন রবিবার। রবিবার সত্য সত্যই একটু দীর্ঘ। তবুও তাহা গড়াইয়া এক সময় সন্ধ্যার কোলে আশ্রয় লইল। নবজীবন তাহার মাকে লইয়া নিজের গাড়ীতে

বিমানদের বাড়ী রওনা হইল। গাড়ী গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলে একজন প্রৌঢ় আসিয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন। ইনিই বিমানের পিতা।

নবজীবন এবং বিমানের পিতা বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, রাজলক্ষ্মী উপরে উঠিলেন। এক ঘরের দরজায় আসিয়া তিনি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভিতরে একটি তরুণী বসিয়া কি লিখিতেছে—আশ্চর্য্য রকম সুন্দরী! রাজলক্ষ্মী মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মেয়েটি একমনে লিখিয়া চলিয়াছে। রাজলক্ষ্মী চোখ ফিরাইতে পারিলেন না।

তিনি সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় পিছন দিক্ হইতে একজন মহিলা স্নিগ্ধস্বরে তিরস্কারের তেজ আনিবার প্রয়াস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—বেশ তো বীমা, উনি এখানে দাঁড়িয়ে, আর তুই—খেয়ালই নেই—লিখেই চলেছিস্।

এই কথায় রাজলক্ষ্মী ও ঘরের ভিতরের বীমা নাম্নী সেই মেয়েটি উভয়েই সেই মহিলাটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রাজলক্ষ্মীকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সেই মহিলা বলিলেন—নমস্কার, আসুন, আপনিই তো নবর মা। উনি এইমাত্র এসে বলে গেলেন।

সেই ঘরেই দুই জনে প্রবেশ করিলেন, বীমা চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বীমার মা বীমাকে চায়ের ব্যবস্থা করিতে নীচে পাঠাইয়া দিলেন। বীমা যাইতে যাইতে শুনিয়া গেল, রাজলক্ষ্মী বলিতেছেন,—আমি ভাই কিন্তু চা-টা খাইনে। সেকালের মানুষ, পান—বড় জোর দোক্তা।

বীমা ত্বরিৎগতিতে নীচে নামিয়া আসিল। চাকরদের না ডাকিয়া স্বহস্তে ইলেকট্রিক ষ্টোভে জল চাপাইয়া দিয়া পান সাজিতে লাগিল। বারান্দায় ছোট ভাই পিণ্টু খেলিতেছিল, তাহাকে দিয়া উপরে পান পাঠাইয়া দিল। তার পর চা ও খাবার গুছাইয়া নিয়া বৈঠকখানার দরজায় হাজির হইল।

বিমানের বাবা নবজীবনকে একা বসাইয়া রাখিয়া সেই যে গিয়াছেন আর ফিরেন নাই। নবজীবন একাকী বসিয়া একটা কাগজ খুলিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। আর কেহ উপস্থিত নাই দেখিয়া বীমা হাসিয়া ফেলিল। নবজীবন হয়ত তখন দার্জ্জিলিংএর কথা ভাবিতেছিল। হঠাৎ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, দার্জ্জিলিং দেবী দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন।

—তুমি? কবে এলে? বলিয়া নবজীবন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বীমা সযত্নে টেবিলের উপর সব রাখিল।

হাসিমুখেই বীমা এবার উত্তর দিল—চিন্‌তে পারছ না? না, হেড্‌অফিসে এলে সাহেবদের মেজাজ একটু বিগড়ে যায়? আচ্ছা, একখানা চিঠিও কি দিতে নেই?

—চিঠি দিই নি? এসে সেই দিনই—জোর দিয়া জাঁকাইয়া টেবিল কাঁপাইয়া নবজীবন বলিতে লাগিল।

বীমা বলিল—ঐ একখানাই, কুশল পৌছান সংবাদ। ও তোমার কাছে কে চেয়েছিল শুনি?

নবজীবন বলিল—অফিসের কাজের ভীড়; সংসারের ছেলেমেয়ের টাল সামলানো। রহস্য করিতে পারিয়া নবজীবন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অনেকদিন পরে দুইজনে আবার দেখা, আবার কথার ফোয়ারা ছুটিতেছে। কতক্ষণ এমন কাটিত বলা যায় না, এমন সময় চতুর পিণ্টু বাহির হইতে বলিয়া গেল, দিদি, মা তোকে শিগ্‌গির উপরে ডাকছেন।

কাপ প্লেট গুছাইয়া দিয়া বীমা উঠিয়া বলিল, তোমার মা এসেছেন তা আমার মনে ছিল না। যাই, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা হয়নি। কাল কখন আসবে?

যাইবার সময় বীমা কাঁধের কাছে আসিয়া বলিয়া গেল—তুমি তো আবার যে ভোলা মানুষ—যাবার সময় মনে করে বাবা আর মাকে প্রণাম করে যেও।

... ...

ফিরিবার পথে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি বীমার মায়ের কাছে শুনিয়া আসিয়াছেন যে নবজীবন বীমাকে পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু বিমান তাহার নিকট বীমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করায় নবজীবন মতামত মায়ের উপর ফেলিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহাকে আজ বেড়াইতে আসিবার নিমন্ত্রণ করা।

বীমাকে পছন্দ করা যে-কোন ছেলের পক্ষেই সুসঙ্গত। তবুও নবর মন পরীক্ষার জন্য তিনি বলিলেন—ওবাড়ী এ মেয়ে দেখে এলাম নব।

নব নীরব।

আবার বলিলেন—চেয়ে চেয়ে দেখবার মত মেয়ে বটে—নাম বীমা।

তবুও নব নীরব রহিল। রাজলক্ষ্মী নবকে শুনাইয়া শুনাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—ওরা কত বড় লোক। ও-মেয়ে কি আর আমরা পাব। যা'র ঘরে নাচছে সে কত ভাগ্যবান।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। পরে নবজীবন উত্তর করিল—আচ্ছা মা, যদি ও মেয়ে পাওই, কি কর তবে ওকে নিয়ে? নিষ্কর্ম্মার ধাড়ি! বলিয়া ফেলিয়া, বিশেষতঃ শেষের মনোরম বিশেষণটি যোগ করায় নবজীবন বিষম লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—নিষ্কর্ম্মার ধাড়ি, তুই জানিস্ কিনা! ঘর-টরগুলি কেমন গুছিয়েছে। কেমন কর্ম্মঠ মেয়ে। আমায় কি সুন্দর পান বানিয়ে দিয়েছে।

নবজীবন মনে মনে হাসিল। প্রকাশ্যে বলিল—অত বড়লোকের মেয়ে তোমার পান সাজতে আসবে কেন?

রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ উল্টা সুর ধরিলেন—আছে আছে সে বড়লোকের মেয়ে আছে। আমি বা কোন্ গরীবের মা শুনি!

তিনি আর দেরী করিতে পারিলেন না, বলিয়া ফেলিলেন—আমি কিন্তু বাছা কথা দিয়ে এসেছি।

গাড়ী তখন গেটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * * *

কয়েক মাস পরের কথা। শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। একদিন নবজীবন ও রসিকচন্দ্র বসিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। জীবন-বীমা সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এমন সময় রাজলক্ষ্মীর মাথায় কি বুদ্ধি জাগিল। তিনি বীমাকে ডাক দিলেন—মা, এ ঘরে শীগ্‌গির একবার শোনো তো।

বীমা আসিলে রাজলক্ষ্মী তাহাকে নিয়া রসিকচন্দ্রের কাছে বসাইয়া বলিলেন—একবার জীবন-বীমা নিয়ে পাগল হ'তে বসেছিলে, এখনও শুনছি দুই জনে আবার তাই নিয়ে গল্প হচ্ছে। এবার এই নাও তোমার জীবন্ত জীবন-বীমা।

নবজীবন ও বীমা উঠিয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

বাদল

শ্রীনীরদবরণ

রাত্রি যখন গভীর হলো
থামল সকল কোলাহল,
অতল হতে একে একে ফুটল আলোর স্বপ্নদল।

দিগন্তের ওই নীল তোরণে
জ্বলল কিরণ স্বর্ণলেখা,
উদ্ভাসিল ইন্দ্রজালে
ধরণীর শ্যাম অঙ্গরেখা;
তার সে রূপের আঙিনাতে
দুলছে দোদুল বাসন্তিকা—
সঞ্চলিয়া উৎস ধারে
প্রাণ ভোলানো গন্ধশিখা।

কোথা হতে নামল বাদল
সারা ভুবন আঁধারিয়া,
কাঁপল মধু-মঞ্জরিকা,
কাঁপল কোমল পুষ্পহিয়া!
পড়ল তারা ধূলায় লুটি'
তার সে নিঠুর আঘাত লাগি',
বেদন-গলা অশ্রুরাশি
সিক্ত করে মুকুল-আঁখি!

মত্ত তুফান শান্ত হলো···
দেখি, আলোর সাগরে
ফুলের তরী চলছে ভেসে মুক্ত জীবন-জাগরে।

দিগ্বিজয়ী

(মিশ্র—দাদ্‌রা)

(দিলীপকুমার)

চাঁদের আলো · চাঁদের আলো· ·
চাঁদের আলো
উচ্ছলে।
নিশার কালো কাজল আঁখে
চঞ্চলে—
সোনার হাসি
রাশি রাশি
আশার বোলে
মন ভোলে···
শুক্লা কাঁপন
কৃষ্ণা বাঁধন
তাই খোলে ··
চাঁদের আলো···চাঁদের আলো ··
তাই এ-সাঁঝে
সঞ্চলে॥
স্বপ্ন-পাখি···স্বপ্ন-পাখি···
স্বপ্ন-পাখি
পায় আকাশ···
তাই নীলিমার গন্ধরাগের
ছায় দুরাশ :
অন্তরে ফুল
ফোটায় দোতুল
সুদূরিকার
সুর সুবাস···
জয়-জাগানো
রং-রাঙানো
বয় বাতাস···
স্বপ্ন-পাখি স্বপ্ন-পাখি
তাই জাগরে
চায় বিলাস॥

জীবন-সাথী···জীবন-সাথী
জীবন-সাথী
ঐ আসে—
সিন্ধু-বুকে আলোক-উলু-
উল্লাসে।
ঢেউ উথলে
রূপ উজলে
লক্ষ লীলার
বিন্যাসে—
বেদন-ভোলা
শরণ-দোলা-
দোল-রাসে
জীবন-সাথী···জীবন সাথী
তাই সুষমায়
সম্ভাষে॥
জয়ধ্বনি···জয়ধ্বনি
জয়ধ্বনি
কে ছন্দে—
অভয়-বাণীর অলখ-সুধা
সুগন্ধে!
মলয়-নেশায়
কে প্রেম বিলায়
নীল মায়াবী
বসন্তে!
গুঞ্জরে গান
ভ্রমর পরাণ
আনন্দে···
জয়ধ্বনি···জয়ধ্বনি
তাই করে চাঁদ
অনন্তে॥

সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার

II { সা গা -া | মা পা ধা | পা পগা পা | মা গা মা | রগা রা -া | গা পজ্ঞা ধপা |
চাঁ দে র আ লো - চাঁ দে র আ লো - চাঁ দে র আ লো -
জী ব ন সা থী - জী ব ন সা থী - জী ব ন সা থী -

[গা মা]
গপা মমা সা | সা সা রসন্া | } গমা ধা -া | ধা ধর্সা ণণা | ধা পা ক্ষপা | মা গা মা |
উ - চ্ছ লে আ জি নি শা র কা লো - কা জ ল আঁ খে -
ঐ - আ সে বু ঝি সি ন্ ধু বু কে - আ লো ক উ লু -

রগা রা রা | গা মা ধপা | গমা রগা সরা | ধসা সা ন্া | II সা মা -া | রা পা -া |
চন্ - চ লে হা সি চন্ - চ লে এ কি সো না র হা সি -
উল্ - লা সে উ লু উল্ - লা সে আ মার ঢে উ উ থ লে -

ধা পমা -া | পা রা র্সা | নর্সা ধা না | ধনা ধপা -া | গপা জ্ঞা না | ধা -া -া |
রা শি - রা শি - আ শা র বো লে - ম ন্ ভো লে - -
রূ প উ ছ লে - ল - ক্ষ লী লা র বি ন্যা সে - -

পজ্ঞা পা ধা | ক্ষপা গমা রগা | গমা পধা না | র্সর্া র্সণা র্সধা | ধা র্সণা পা | ধা -া -া |
শু ক্ লা কাঁ পন্ - ক্র -ন্ না বাঁ ধন্ - তা ই খো লে - -
বে দ ন্ ভো লা - শ র ণ্ দো লা - দো ল্ রা সে - -

গা পমা রা | গা -া -া | ন্া গরা গা | রসা -া -া | সা মা -া | রা পা -া |
তা ই খো লে - - তা ই খো লে - - চাঁ দে র আ লো -
দো ল্ রা সে - - দো ল্ রা সে - - জী ব ন্ সা থী -

গা ধা -া | জ্ঞা না -া | পা র্সা র্সর্গা | র্রা র্সা -া | সরা গরা সন্া | সা সা রসন্া | II
চাঁ দে র আ লো - তা ই এ সাঁ ঝে - সন্ - চ লে ও গো
জী ব ন সা থী - তা ই সু ষ মা য় সম্ - - ভা ষে আ মার

সা -া সা | রসা ন্া -া | প্া ন্া সা | গা রসা -া | রা গা রা | পা মা মগা |
স্ব প্ ন পা খি - স্ব প ন পা খি - স্ব প্ ন - পা খি

মজ্ঞা মজ্ঞা সরা | সা -া -া | সা মা মা | মা জ্ঞমা গা | মা ধা ধা | না র্সা -া |
পা য় আ কা - শ তা ই নী লি মা র গ ন্ ধ রা গে র

না র্রসা না | ধা পা -া | মা -া মা | জ্ঞমা গা -া | গা মগা রা | সা -া -া |
ছা য় তু রা - শ দী প তু রা - শ নী ল তু রা - শ

[র্সা -া ধা না -া
{সা -া রসা | নসা ধন্া -া | নসা পজ্ঞা ধপা | পমা গা -া | গা গমপা ধনর্সা | না ধনা পা |
অ ন্ ত রে ফু ল্ ফো টা য় দো দু ল সু দূ - রি কা র

র্সন ধা পা ধগা -া -া]
ধপা জ্ঞপা গমা | গা রা সা | } মা -া মা | মা জ্ঞমা গা | মা ধা ধা | না র্সা -া |
সু -র সু বা - স জ য় জা গা নো - র ঙ্ রা ঙা নো -

র্সা গর্রা র্গা | র্রসা -া -া | মা ধপা ধা | পমা -া -া | সা গরা গা | রসা -া -া |
ব য় বা তা - স ব য় বা তা - স ব য় বা তা - স

সা র্সা র্সা | র্সনা র্রসা নর্সা | ধনা পধা জ্ঞপা | গমা গা মা | রা গা ণা | ধা পধা মপা |
স্ব প্ ন পা খি - স্ব প্ ন পা খি - তা ই জা গ রে -

গমা পধা পা | সা -া -া | সা গা -া | পজ্ঞা ধপা -া | না ধপা -া | মা গা না |
চা -য় বি লা - স চাঁ দে র আ লো - চাঁ দে র আ লো য়

রগা রা -া | গা পজ্ঞা ধপা | গপা মমা সা | সা -া -া | ন্সা রগা মপা | ধনা র্সর্রা র্সা |
চাঁ দে র আ লো - উ - চ্ছ লে - - ও - - - - ই

\+ ° + ° + °
র্সা র্সা -া | না ধপা ক্ষা | পা নধা না | র্রসা না -া | র্সা পা -া | ধা গা -া |
জ য় - ধ্ব নি - জ য় - ধ্ব নি - জ য় - ধ্ব নি -

\+ ° + ° + °
পা রা -া | সরা গপা ধর্সা | র্সা ধা -া | র্গা র্রা -া | র্সর্রা র্সা ধা | পধা পা গা |
কে ছ ন্ দে - - অ ভ য় বা ণী র অ ল খ সু ধা -

\+ ° + ° + °
রগা র্গা -া | র্গর্রা র্সনা ধপা | ধনা র্সর্রা র্সনা | ধনা পধা ক্ষপা | র্সা র্সা -া | না ধপা ক্ষা |
সু গ ন্ ধে - - - - - - - - - জ য় - ধ্ব নি

\+ ° + ° + °
পা নধা না | র্রসা না -া | পা ধপা ক্ষপা | গা পা -া | গা গা -া | রসা -া -া |
জ য় - ধ্ব নি - বি লা -য় অ ভ য় অ ব ন্ ধে

\+ ° + ° + °
পক্ষা ধপা ক্ষপা | মা গা মা | গমা পা -া | ধনা পধা পা | গা মা পা | ধা না -া |
ম ল য় নে শা য় কে প্রে ম বি লা য় নী ল মা য়া বী -

\+ ° + ° + °
র্সনা ধনা পধা | র্সা -া -া | র্সা র্গা র্গা | র্গা র্সর্রা র্গর্মা | র্গা র্রর্গা র্রা | র্সনা র্সা -া |
ব সন্ · তে - - গু ন্ জ রে গা -ন ভ্র ম র প রা ণ

\+ ° + ° + ° +
না না র্রা | র্সা -া র্রর্সা | না ধনা র্সনা | ধপা -া -া | গা ধপা র্রর্সা | র্রসা -া -া | সা র্সা -া |
আ ন ন্ দে - - আ নন্ - দে - - আ ন ন্ দে - - জ য় -

° + ° + ° + °
না ধনা পা | পা নধা না | র্রা র্সা -া | র্সা -া পণা | পা গমপা গা | মা রগা -া | রসা -া -া |
ধ্ব নি - জ য় - ধ্ব নি - তা ই ক রে চাঁ দ অ ন ন্ তে - -

রাজারামের স্মৃতি-তপণ

আনন্দ জ্যোতিরত্ন

সন্ধ্যাবেলাটা কাজ বন্ধ রেখে আমি জ্যোতিষের অধ্যাপনা ক'রে থাকি। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ কাজই যেমন এমেচার-মার্কা, এখানে যে তার ব্যতিক্রম হয়েছে এমন সন্দেহ করবার কোন হেতু নেই। অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুই-ই চলে সখের দলের রিহারসালের ঢঙে।

দুপুর বেলা কেউ বা আফিসে লেজার হাতড়ান, কেউ বা স্কুলে বেত হাঁকড়ান, কেউ বা কোর্টে মক্কেল চরান, দু'একজন এমনও আছেন যাঁরা নির্ব্বিকারত্ব সাধনা করছেন—সকালে দুপুরে তাঁদের একই আসন, বিছানা ও বালিস। সন্ধ্যাবেলা তাঁরা জোটেন জ্যোতিষের আলোচনা করতে—নিয়মমত পড়াশুনা করতে কেউই বড় একটা রাজি ন'ন।

তাঁদের ধারণা পড়বার আগে দরকার গবেষণা এবং তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা সকলেই গবেষণা করছেন।

এই গবেষণাকারীদের অগ্রণী তাপসেন্দ্র গুপ্ত। মূল সংস্কৃত গ্রন্থের কথা দূরে থাক্, কোন সংগ্রহ-গ্রন্থের দু'চার পাতাও সে পড়েনি। তার কিন্তু অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তার মধ্যে একটা কথা এই যে, একখানা বইএর গোড়ার পাতা আর শেষের পাতা দেখে এবং সব পাতা-গুলো একবার ফর্ ফর্ ক'রে উল্টে গিয়ে, তার সম্বন্ধে সে জোরাল সমালোচনা করতে পারত। আর একটা ক্ষমতা—জ্যোতিষ সম্বন্ধে সে রোজ একটা ক'রে নূতন অকাট্য থিওরি বের ক'রত এবং পরের দিন সেটা একেবারে অচল ব'লে ত্যাগ ক'রত!

তাপসেন্দ্র ছিল কাজকর্ম্মের ব্যাপারে নির্ব্বিকার—উত্তরাধিকারসূত্রে নেমে এসেছিল খানকতক কোম্পানীর কাগজের সুদ আর বাড়ী ভাড়া—তাইতে সাহিত্য-চর্চ্চা আর জ্যোতিষের গবেষণা নির্ব্বিবাদে চলেছিল।

সাহিত্য সম্বন্ধেও তার মত ছিল কাটা-ছাটা এবং এবং নীরেট। তার মতে ঔপন্যাসিক এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মাত্র তিনজন জন্মেছেন—রুশিয়ার ডষ্টয়েভস্কি, নরওয়েতে যোহান বোয়ার এবং বাংলা দেশে শরৎ চাটুজ্জ্যে। এঁরা হলেন তার মতে প্রথম শ্রেণীর। তারপর কেউ চতুর্থ, কেউ পঞ্চম শ্রেণীর—কেউ বা অষ্টম শ্রেণীর।

রাজারাম যখন আসেন নি, তখন তাঁর কথা উঠলে তাপসেন্দ্র তাঁর জন্য অষ্টম শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ করত। কিন্তু তিনি যখন এই জ্যোতিষায়তনের নিয়মিত ছাত্র হলেন এবং তাপসেন্দ্রের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন তখন থেকে তাঁর প্রমোশন সুরু হ'ল। এখন তাপসেন্দ্রের খাতায় তিনি দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর মাঝামাঝি।

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী বলে—তাপসেন্দ্র পড়বার মধ্যে পড়েছে শরৎ চাটুজ্জ্যের "শ্রীকান্তের" পাঁচ পাতা, ডষ্টয়ভস্কির "ক্রাইম্ এণ্ড পানিষমেণ্টের" তিন পাতা এবং বোয়ারের "গ্রেট হাঙ্গা র" আড়াই পাতা—আর কোন লেখকের লেখা সে পড়েই নি।

কিন্তু দুর্গাচরণের কথা বিশ্বাস করা যায় না। দুর্গাচরণ আর তাপসেন্দ্র—আদা আর কাঁচকলা। বয়স দুজনেরই প্রায় এক। দুর্গাচরণের তিরিশ, তাপসেন্দ্রের তেত্রিশ। দুজনেই অবিবাহিত। ভাব কিন্তু একেবারে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। দুর্গাচরণ রাখে টিকি, কাটে ফোঁটা, তাপসেন্দ্র কাটে টিকি, রাখে গালপাট্টা। তাপসেন্দ্র পরে কোঁচানো নরুণ পাড় শান্তিপুরে, সিল্কের চুড়িদার আস্তিন—দুর্গাচরণ পরে খদ্দরের থান আর দড়িবাঁধা বেনিয়ান। তাপসেন্দ্রের পায়ে লপেঠা, সেলিম, পাম্প একখানি এক এক রকম—দুর্গাচরণের সনাতন তালতলা এক-মেবাদ্বিতীয়ম্।

দুর্গাচরণের ধারণা কিন্তু তাসসেন্দ্রের মতই কাটাছাটা। তার মতে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত একজনমাত্র কথাসাহিত্যিক জন্মেছেন, তিনি হচ্ছেন কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট। ইংরিজির কথা উঠিলে বলে ম্লেচ্ছ ভাষার আবার সাহিত্য! বাংলাভাষায় তারাশঙ্কর একমাত্র লেখক, বিদ্যাসাগর আর মাইকেল তবুও পড়া যায়। কিন্তু রবিঠাকুর

শরৎ চাটুয্যে! রাম! ছড়িয়ে দিলে গড়িয়ে যায়—ফুট কড়াই মুড়কী।

দুর্গাচরণ আর তাপসেন্দ্রের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। এরা দু'জন অধ্যাপনার আসর সরগরম রাখে।

সেদিন রাজারাম একখানা বোম্বে এডিশনের বৃহৎ পারাশরী কিনে এনেছেন। আগের দিন দুর্গাচরণ বলেছিল "কলৌ পারাশরী স্মৃতঃ"; কলিযুগে পরাশরীই গ্রাহ্য।

তাপসেন্দ্র বইখানার গোড়ার পাতা দেখেই একবার শেষের পাতাটা দেখে নিলে। তারপর বইখানা মুড়ে বললে "আমি যদি পরাশর হতাম—"

কথাটা শেষ হ'তে পেল না—দুর্গাচরণ তখন চটি জুতো ফট্ ফট্ ক'রে ঘরে ঢুকছে—সে বলে উঠল "তা হ'লে বেদব্যাস উদ্বন্ধনে তনুত্যাগ করতেন। বেদ-বিভাগ ও পুরাণ-প্রণয়ন দুইই স্থগিত থাকত।"

ব্যাসের সঙ্গে পরাশরের যে কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে তাপসেন্দ্রের একটা আবছায়া ধারণা মাত্র ছিল, সে দুর্গাচরণের কথা যেন শোনেই নি, এমনিভাবে পুনরাবৃত্তি করলে—"আমি যদি পরাশর হতাম—"

দুর্গাচরণ তখন আমায় প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিচ্ছিল। তার প্রবেশ ও প্রস্থানের সঙ্গে এটা নিত্যই জড়িত থাকত যদিও তাপসেন্দ্রের মতে এটা "অতি ভক্তি"। দুর্গাচরণ আবার বাধা দিলে, বললে "এ নিরর্থক বাক্যের কোন সার্থকতা নেই—"

তাপসেন্দ্র গরম হ'য়ে উঠল, বললে "অর্থ বোঝবার সামর্থ্য সকলের থাকে না—"

দুর্গাচরণ বললে "পরাশর ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি—এখন কলিযুগের দুর্ব্বল জীব যদি পরাশরত্ব কামনা ক'রে, তাকে উন্মাদ ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায়—"

দুর্গাচরণের কথায় তাপসেন্দ্রের টেম্পারেচার ফট্ ক'রে চড়ে গেল একেবারে ১০৫ ডিগ্রীতে। সে তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে "এরাই দেশটাকে রসাতলে দিলে। টিকি, ফোঁটা, ঘণ্টা-নাড়া আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্বাধীন চিন্তা আর স্বাধীন আচরণের পথ বন্ধ ক'রে—"

দুর্গাচরণের দেখলাম টিকির মধ্যে একটা শিহরণ সুরু হয়েছে—বুঝলাম যে এ বাগ্‌যুদ্ধ আর বেশী অগ্রসর হ'তে দিলে, নব্য এবং প্রাচীন এই উভয় ভারতের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকবে না—কাজেই দুর্গাচরণ মুখ খোলবার আগেই আমি তাপসেন্দ্রের দিকে ফিরে বললাম "যাক্ ও কথা যেতে দাও, কি বলছিলে বলত তাপস—তুমি যদি পরাশর হ'তে তাহ'লে কি করতে?"

তাপসেন্দ্রের টেম্পারেচার তখনও রেমিটেণ্ট জ্বরের মত ১০৪°।১০৫°এর মধ্যে খেলছে—সে বললে "না, দেখুন না—এঁরা কথায় কথায় নব্য এবং পাশ্চাত্য ভাবকে আক্রমণ করেন, অথচ পাশ্চাত্যের দেওয়া রেল, ট্রাম, বাস, লাইট, ফ্যান কিছুই ব্যবহার করতে আটকায় না—আমি যদি কামালপাশা হতাম—"

দুর্গাচরণ বললে "তাতে কেউ আপত্তি করত না—কিন্তু আহার-বিহারে স্বৈরাচারী যদি ঋষিত্ব কামনা করে—"

তর্ক আবার ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে নেমে আসে দেখে রাজারাম বললেন "থামো চক্রী ঠাকুর—তাপ্পির কথা শুনতে দাও—বল ত তাপ্পিভায়া—তোমার মতলব পরাশর ও কামালপাশা এই উভয়রূপে"

রাজারাম দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তীর নামকরণ করেছিলেন চক্রী ঠাকুর; কখনও বা বলতেন চক্ররাজ—আর তাপসেন্দ্র তাঁর কাছে ছিল সোজাসুজি তাপ্পি।

রাজারামের কথায় উৎসাহ পেয়ে তাপসেন্দ্র দুর্গাচরণের দিকে একটা বক্র কটাক্ষ সেরে নিয়ে সুরু করলে "আমি যদি পরাশর হতাম—"

দুর্গাচরণ এবার দাঁড়িয়ে উঠল, বললে "আমার আপত্তি আছে—এ কামনা শাস্ত্রবিগর্হিত। অভক্ষ্য-ভোজী, সাত্ত্বিকাচার-বিমুখ ব্যক্তির ঋষিত্ব কল্পনায় শাস্ত্রের অবমাননা হয়—"

তাপসেন্দ্রও ছাড়বার পাত্র নয়, সে বললে "আমি মানি না যে, মাছ মাংস খেলেই তামসিক হয়—আর কুলের পাতা, বেলের পাতা খেয়ে ফোঁটা কাটলেই সাত্ত্বিক হয়। সাত্ত্বিকতা মনের ধর্ম্ম, তার সঙ্গে খাওয়ার কোন সম্বন্ধ নেই।"

দুর্গাচরণ বললে "নিশ্চয় আছে—শুনুন শাস্ত্র বাক্য—

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

এই ব'লে কথকতার ভঙ্গীতে সুরু করলে "মাং আমাকে—স সে—ভক্ষয়িতা ভক্ষণ করবে—অমুত্র পরলোকে—যস্য যার—মাংসম্ মাংস—ইহ ইহলোকে—অদ্মি ভক্ষণ করি—

অহং আমি। অর্থাৎ ইহলোকে আমি যে জীবের মাংস ভক্ষণ করি পরলোকে সেই আমাকে ভক্ষণ করিবে। ইহাই মাংসের মাংসত্ব, মনীষী পণ্ডিতগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন।"

রাজারাম বিস্মিত হ'য়ে বললেন "করেন না কি ?"

দুর্গাচরণ বললে "নিশ্চয় করেন"

তাপসেন্দ্র বললে "তাঁরা দুর্গাঠাকুরের মতই পণ্ডিত—একবার ভেবেও দেখেন না, সম্ভব কিনা—মরবার পর দেহই রইল না—অথচ—"

রাজারাম একটু সংশয়ের সঙ্গে বললেন "মরবার পর কিন্তু দেহ থাকে বোধ হয়—"

দুর্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে বললে "নিশ্চয় থাকে—শাস্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা হওয়া অসম্ভব !"

নিতাই মজুমদার এতক্ষণ ঘরের কোনটিতে তার নোট বুক খুলে নিবিষ্টচিত্তে চুপ ক'রে বসেছিল। সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল—বললে "আমি জানি মশায়—মরবার পরও দেহ থাকে।"

নিতাই কদাচিৎ ঠোঁট খোলে। তার পকেটে ছোট একটি নোটবুক আছে, তাতে সে যত পেয়েছে বিচিত্র লোকের কোষ্ঠীর ছক সংগ্রহ ক'রে লিখে রেখেছে। তার নিজের জীবন নিতান্ত মামুলী ও একঘেয়ে—এক সওদাগরি অফিসে লেজার রাখে। কোনও দিক দিয়ে কোন রকম অসাধারণত্ব তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল—রোজ ঠিক সময়ে আপিসে যায়—ঠিক সময়ে আপিস থেকে ফেরে—সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে একবার নোটবুক খুলে বসে—তারপর ঠিক ৯টার সময় নোটবুক বন্ধ ক'রে পকেটে পুরে নমস্কার জানায়। এদের তর্ক-বিতর্কের কোলাহল তার কানে পৌছায় কিনা কেউ বলতে পারে না। তর্ক-বিতর্কে যোগ ত সে দেয়ই না—সাক্ষাতে অসাক্ষাতে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করে না। রাজারাম তার নাম দিয়েছেন মজগুল, কখনও বা মঞ্জুল, তিনি বলেন—"এখুনি যদি মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, মজগুল তার নোট বই ছেড়ে উঠবে না।"

নিতাই এতদিন জ্যোতিষের চর্চ্চা করছে কিন্তু নিজের কোষ্ঠী কখনও কাউকে দেখায় নি এবং যদিও তার নোট বই খুলে ছকের পর ছক দেখে যায়—কি দেখলে বা কি গবেষণা করলে সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলে না। তার বয়স কত কেউ জানে না। এখানে তিন জন নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধারের গবেষণা করেন—তাঁরা তিন জন তিন রকম বয়স বের করেছেন। একজন বলেন পঁয়ত্রিশ, আর একজন পঁয়তাল্লিশ, অপর একজন পঞ্চান্ন। চেহারা দেখে মনে হয়, কোনটাই অসম্ভব নয়।

মজগুলকে আজ হঠাৎ বাঙ্ময় দেখে সকলে অবাক্। এমন কি চক্রী-তাপ্পিও তাদের চিরন্তন বিরোধ ভুলে পরম বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল। সকল চোখ তারই ওপর নিবদ্ধ দেখে সে যে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করছে তা বুঝতে পারা গেল—যখন সে টেবিলের নীচে পেন্সিলটা ফেলে দিয়ে সেটা কুড়ুবার জন্য হেঁট হয়ে টেবিলের নীচে মুখ লুকালে। এই ছিল তার একমাত্র উপায়।

কিন্তু টেবিলের নীচে মাথা গুঁজে থাকা যায় কতক্ষণ ? তা ছাড়া, রাজারামও ছাড়বার পাত্র ন'ন। তিনি উঠে নিতাইএর কাছে গিয়ে বললেন "তা হচ্ছে না মজগুল, মুখ যখন খুলেছ, তখন বলতেই হবে কি করে জানলে যে মরবার পরও দেহ থাকে।"

মহা বিভ্রাট ! যেন কত অপরাধী এইভাবে মুখ কাচুমাচু ক'রে নিতাই বললে "শুনেছি !"

তাপসেন্দ্র মুখ বেঁকিয়ে বললে "ব-শ্ এণ্ড নন্ সেন্স !"

রাজারাম বললেন "শাট্ আপ্ তাপ্পি—না শুনে মতামত ব্যক্ত করা বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। বলত মজগুল, ব্যাপারটা কি।"

সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে, অথচ পৃথিবীরও দ্বিধা হবার কোনই লক্ষণ নেই—নিতাই বোধ হয় চাইছিল যে, কোনমতে যদি আরব দেশের হাজার এক রাত্রির হোসেনের মত একখানা গালচে পেত—যা মনে করবামাত্র তাকে নিজের শোবার ঘরের বিছানায় হাজির ক'রে দিত।—গ্রহ তার নিতান্ত প্রতিকূল ছিল না, কেন না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এসে উপস্থিত হ'ল লোহিতেন্দু ঘোষাল এবং নন্দদুলাল বাগচি।

লোহিতেন্দু বললে "ব্চু—ব্চু—জটলা কিসের ?"

লোহিতেন্দুর তোৎলামির একটা বিশেষ ধারা আছে। অন্য কোন জায়গায় তার তোৎলামি ধরা পড়ে না কিন্তু যে শব্দগুলো চবর্গের যে কোন বর্ণ দিয়ে সুরু—তার আগেই

একটা—ৎচু—ৎচু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাজারাম তার নাম দিয়েছেন "চুচুন্দর।"—লোহিতেন্দুর বিষয়কর্ম্ম হচ্ছে বাড়ীঘরের দালালি—অন্ততঃ লোকের কাছে সে তাই বলে, যদিও তাকে কোন দালালি করতে কেউ কখনো দেখেনি। তার শ্বশুরের একটিমাত্র কন্যা এবং শ্বশুর বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। তার শ্বশুরের কন্যা এবং শ্বশুরের কন্যার পাঁচটি পুত্র এবং ছটি কন্যা এই বারটি জীবকে শ্বশুরের ও শাশুড়ীর খবরদারীতে রেখে সে নিশ্চিন্ত-চিত্তে সারাদিন দালালি কর্ম্মে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে—ৎচু—ৎচু চা, ৎচু—ৎচু—চুরুট এবং ৎচু—ৎচু জ্যোতিষের ৎচু—ৎচু চর্চ্চা ক'রে থাকে।

নন্দদুলাল বাগ্‌চি তিন পুরুষে উকিল। বাড়ী-গাড়ীর মত ওকালতিও সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। আইনের মাথাটাও যে সেই সূত্রে পায়নি তার জন্য তার দুঃখ নেই। মক্কেল এবং তাদের আনুষঙ্গিক ঝামেলার হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। দুপুরবেলা বার লাইব্রেরীতে দাবা খেলা এবং সহযোগীদের কোষ্ঠীর বিচার—আর সন্ধ্যাবেলা এখানে জ্যোতিষের আলোচনা এই নিয়ে আছে মন্দ নয়। তার নধর গড়নের জন্য রাজারাম তার নাম দিয়েছেন "গুদুস্।"

নন্দদুলাল বললে "জটলা বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা জটলা।"

লোহিতেন্দু ব'লে উঠল "ঠিক্ ঠিক্! ৎচু-ৎচু-চা কই?

রাজারাম সভাপতির ধাঁজে টেবিলে টোকা দিয়ে বললেন "অর্ডার"। তারপর নিতাই মজুমদারের দিকে ফিরে বললেন "ছাড়চি না মজগুল—বলতেই হবে কি শুনেছ—কার কাছে শুনেছ?"

নন্দদুলাল বললে—"মকদ্দমাটা কিসের?"

রাজারাম বললেন "চক্রী ঠাকুর বলে, শাস্ত্রে আছে মরবার পরও দেহ থাকে। মজগুল বলে যে, সে জানে সত্যি সত্যিই তা থাকে।"

লোহিতেন্দু বললে "ব্যস্, ব্যস্—বাগচি তুমি উকিল, ৎচু-ৎচু জেরা সুরু কর। কি ক'রে—ৎচু-ৎচু জানলে?"

নিতাইএর কুগ্রহ এখনও ছাড়েনি—সে ঘেমে উঠে বললে "জানি না—শুনেছি।"

নন্দদুলাল বললে "শোনা কথা প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে না—"

রাজারাম বললেন "তবু শোনা যাক্—কার কাছে শুনেছ?"

নিতাই বললেন "আমার মাস-শাশুড়ীর পিসতুতো দেওরের মামাত সম্বন্ধীর গুরুদেব—"

নন্দদুলাল বললে "দাঁড়ান্—দাঁড়ান্—এ সম্পর্ক মনে রাখতে হ'লে নোট নেওয়া দরকার—পিস শাশুড়ীর মাসতুতো সম্বন্ধীর খুড়তুত দেওরের কি? আর একবার দয়া ক'রে বলবেন?"

রাজারাম বললেন "তার প্রয়োজন নেই—সম্বন্ধীর গুরুদেব এইটুকুই যথেষ্ট—হ্যাঁ বলত মজগুল, সম্বন্ধীর গুরুদেব কি বলেছিলেন—"

নিতাই গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললে "গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।"

তাপসেন্দ্র শ্লেষের সঙ্গে বললে "তিনি সোনাকে তামা করতেন?"

নিতাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে "আজ্ঞে না—তিনি দেহ রেখেছিলেন—কিন্তু—"

দুর্গাচরণ উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলো "কিন্তু তত্রাচ দেহ ধারণ ক'রে বিচরণ করতেন। শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা হবার জো নেই।"

নিতাই সেই রকম বিনীতভাবেই বললে "আজ্ঞে ঠিক বিচরণ করতেন না, তবে তাঁর শিষ্যদের কাছে মাঝে মাঝে আসতেন।"

নন্দদুলাল তার সিগার-কেস্ থেকে একটা মোটা চুরুট বের ক'রে দাঁত দিয়ে চুরুটের ডগাটা কেটে ফেলে বললে "এর আর আশ্চর্য্য কি?

তাপসেন্দ্র ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে "গঞ্জিকা।"

নন্দদুলাল চুরুটটা ধরিয়ে তাপসেন্দ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললে "গুপ্ত সাহেব কি জানেন, কেটি কিং কে ছিল?" ব'লে চুরুটে টান দিয়ে যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তাপসেন্দ্র বললে "তার সঙ্গে কি?"

নন্দদুলাল বললে "জানেন কি?" চুরুটে আর এক টান। তাপসেন্দ্র উত্তর দিলে না।

নন্দদুলাল চুরুটে আর এক টান দিয়ে বললে "তাহ'লে শুনুন কেটি কিং ছিল বিলাতের একটি মেয়ে—যে রাজার

তিন চার শ' বছর পর দেহ ধারণ ক'রে লোকের সঙ্গে গল্প ও মেলামেশা করেছে।"

ভাপসেন্দ্রের ঠোঁটের বক্রতা তখনও পূর্ব্ববৎ। সে বললে "হ'তে পারে।"

নন্দদুলাল বললে "হ'তে পারে নয়। তিনি আসতেন সার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্‌সের কাছে—যিনি বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। সার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা ক'রে শেষে স্বীকার করেছেন যে সে বাস্তবিকই পরপারের বিদেহ আত্মা।"

দুর্গাচরণ বললে "ওরা আর নতুন কথা কি বলবে—আমাদের শাস্ত্রে সবই আছে।"

আমি ঈষৎ হেসে বললাম "অতএব প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়মতেই প্রমাণিত হ'ল যে মরবার পরও দেহ থাকে।"

লোহিতেন্দু আমার দিকে ফিরে বললে "এ কথা ত মেয়েরা পর্য্যন্ত—ৎচু-ৎচু জানে। আমার পরিবার ত ঐ ভয়েই গলায় দড়ি দিতে—ৎচু-ৎচু-চায় না—"

রাজারাম স্মিতমুখে বললেন "ভয়টা কিসের ?"

লোহিতেন্দু বললে "তার ভয়, পাছে মরবার পর গলায় দড়ি নিয়ে ৎচু-ৎচু ছুটোছুটি করতে হয়।"

রাজারাম হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন "আমি জানতে চাই, পরলোক সম্বন্ধে কারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা।"

"আমার আছে মশায়"

কথাটা বললে পরিতোষ। সে তখন সবে ঘরে ঢুকেছে। প্রিয়দর্শন ছেলেটি—বয়স সাতাশ-আটাশ, গোঁপ দাড়ি কামানো, মুখে রমণীসুলভ কোমলতা মাখানো। পোষাক সাদাসিদে খদ্দরের কাপড়, খদ্দরের সার্ট, পায়ে এলবার্ট সু। পোষাকে পারিপাট্য নেই অথচ একটা আভিজাত্য আছে। দেখলেই বোঝা যায় বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে। এদিকে ডবল এম-এ, অর্থনীতি আর দর্শনে। আন্তরিকতার সঙ্গেই জ্যোতিষ অধ্যয়ন করছে। সে তর্ক করে, বাদ প্রতিবাদেও পেছপাও নয—কিন্তু তার শান্ত সমতা কেউ কখনও নষ্ট হ'তে দেখে নি। জীবনটা সে নিয়েছে সহজভাবেই। তার কমনীয় মুখের জন্য রাজারাম তার নাম দিয়েছেন—পরিচিতা।

নন্দলাল তার সামনে গিয়ে থিয়েটারি ঢঙে বললে "তবে শুনি হে পরিচিতে তব পরলোক-পরিচয়—"

এমন সময় বাহাদুর ট্রেতে ক'রে নিয়ে এল চা। লোহিতেন্দু একটা কাপ তুলে নিয়ে পরিতোষকে দিয়ে বললে "আগে—ৎচু-ৎচু চাটুকু খেয়ে নাও।"

চায়ের পালা শেষ হ'লে, পরিতোষ বললে "কোথা থেকে সুরু করব বুঝতে পারছি না।"

লোহিতেন্দু বললে "তাইত বলি ৎচু-ৎচু চুরোটটা ধর, মাথাটা খুলবে।"

পরিতোষ অ-ধূমপায়ী, সে হেসে পকেট থেকে মসলার কৌটো বের ক'রে একটা এলাচ মুখে দিয়ে বললে "আচ্ছা শুনুন—

মরে যে আমি গিয়েছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পরলোকের ধারণার সঙ্গে আসলটা কোনমতেই খাপ খাচ্ছিল না। বৈতরণী পার হওয়া নেই, যমদূতই হোক্, আর শিবদূতই হোক্—কারো কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দোলাও নেই, জ্যোতির্ম্ময় রথও নেই—এ কি ব্যাপার! এক সরু লম্বা দর-দালান, তার মধ্যে বসে আছি আসন-পীঁড়ি হ'য়ে, সামনে আমার জুতো জোড়া। জুতো কখন খুলেছি মনে পড়ে না। নেহাৎ সেকেলে দালান, জানালা ব'লে কোন পদার্থ নেই—দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে খুবরি কাটা, তাই দিয়ে আসছে আবছায়া গোছ আলো, তাইতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে। দেখবই বা কি ? সামনে যতদূর নজর চলে, কিছুই দ্রষ্টব্য নেই—না বস্তু, না প্রাণী। কেবল সামনে আমারই জুতো জোড়া মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মত একটু সান্ত্বনা ব'য়ে নিয়ে আসছে।

ভয় ?—না ভয় কিছুমাত্র হয়নি; বিরক্ত ধরছিল খুবই—ছিলাম উজ্জ্বল আলোকমালাসজ্জিত মহানগরীর রাজপথে দাঁড়িয়ে—চারিদিকে সমারোহ—আর এ কি! পাড়াগেঁয়ে বাড়ীর স্যাঁৎসেঁতে দালান!

মৃত্যুর কারণটা অনুমান না করতে পেরেও যেন একটা অস্বস্তি ধরছিল। কি হ'তে পারে ? ইলেক্‌ট্রিক তার ছিঁড়ে পড়ল ? মোটর ? ভূমিকম্প ?—কি ?

ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে, সামনে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না, এমন কোন সাড়াও পাচ্ছি না যাতে মনে হ'তে পারে বাড়ীতে কেউ কোথাও আছে।

জুতো পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলুম পাশে প্রকাণ্ড দরজা। সেকালে জমীদারদের

বাড়ীতে ডাকাতদের ভয়ে যেমন লোহার গুল-বসান দরজা থাকত অনেকটা সেই ধাঁজের। দেখলাম দোরে কড়া নেই —সামনে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দেব কিনা ভাবছি। এমন সময় হঠাৎ দোরটা খুলে গেল—দেখলুম সামনে দাঁড়িয়ে একজন—"

এইখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে দুর্গাচরণকে জিজ্ঞাসা করলে "আন্দাজ করুন দেখি চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর কি দেখলুম ?"

দুর্গাচরণ উত্তর দিলে "এখানে দেখা উচিত একজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, হাতে দণ্ড—"

পরিতোষ মৃদু হেসে বললে "তাই উচিত ছিল বটে—কিন্তু আমি দেখলুম সামনে দাঁড়িয়ে একজন বিধবা স্ত্রীলোক—"

দুর্গাচরণ খাপ্পা হ'য়ে বললে "এ অশাস্ত্রীয় কথা।"

পরিতোষ বললে "উপায় নেই। ইহলোকের মত পরলোকেও অনেক অশাস্ত্রীয় ব্যাপার চলে বোধ হয়। আব্-ছায়াতে স্ত্রীলোক দেখে আশান্বিত হ'য়ে উঠেছিলুম ; কিন্তু ভাল ক'রে দেখে হতাশই হ'তে হ'ল—

স্ত্রীলোকটার চুলগুলি অনেকটা আমাদের লাহিড়ী মশায়ের মতই ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, দেহটি তনিমার শেষ সীমায় পৌছেচে—চোখের দিকে চাইলুম তা পাথরের চোখের মত নিথর নিশ্চল—বুঝলুম মূর্ত্তিটি স্ত্রীমূর্ত্তি বটে কিন্তু উপবাস এবং সদাচরণের চাপে তাঁর স্ত্রীত্বটুকু নিংড়ে নিষ্কাশিত করা হ'য়েছে। বয়স ?—বয়স কুড়িও হ'তে পারে, সত্তরও হ'তে পারে ; তাকে দেখলে বয়সের কথা মনেই আসে না।

সে কথা কইলে না, হাতছানি দিয়ে ভেতরে যাবার নিমন্ত্রণ জানালে। প্রবেশ করতে যাচ্ছি এমন সময় তার মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরুল 'হি-স্-স্-স্'—মনে হ'ল কে যেন একটা বরফের শলা কানে গুঁজে দিলে—আওয়াজটা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি ঠাণ্ডা। থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম—দেখলুম তার ডান হাতের তর্জ্জনী আমার পায়ের জুতো লক্ষ্য ক'রে তর্জ্জন করছে। বুঝলুম জুতো প'রে প্রবেশ নিষেধ। জুতো খুলে ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ গোয়াল ঘরের কথা মনে পড়ে গেল—ঘরটা যে নেহাৎ ছোট তা নয়—হাত কুড়ি চৌক ঘর—কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা গোয়াল-গোয়াল গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

ঘরের এক কোণে একটি কুশাসনে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—মাথা কামানো—কেবল মাঝখানে মাদ্রাজি ফ্যাসানের একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর টিকি। পাকা ভ্রূ দুটি চোখের উপর ঝুলে পড়েছে—দেহটি যে বিধবাটির মতই অতিমাত্রায় সাত্ত্বিক তা দেখলেই বোঝা যায়, কেন না খুব নিরীক্ষণ করে দেখলেও তার মধ্যে রক্ত-মাংসের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া কঠিন। গায়ে তাঁর নামাবলী এবং নামাবলীর মধ্য থেকে সাদা ধবধবে পৈতের গোছা উঁকি মারছে।

আমি সামনে উপস্থিত হ'তেই ব্রাহ্মণ বললেন, 'হুঁ-'!

চমকে উঠলুম—কি আওয়াজ! ঠিক যেন মেগাফোনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আঁব কাঠের ঐ শুকনো তক্তার মধ্য থেকে যে এমন প্রচণ্ড আওয়াজের উৎপত্তি হ'তে পারে, তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

দেখলুম ব্রাহ্মণের সামনে কোশা-কুশী রয়েছে এবং তার ওপর তালপাতার পুঁথি। কি ব্যাপার! এখানেও চণ্ডী-পাঠ চলে নাকি ? ব্রাহ্মণের দু'পাশে দুটি পুঁটলিও রয়েছে দেখলুম। পার্শ্ববর্ত্তিনী স্ত্রী-মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করতে গেলুম 'বলতে পারেন—'

সে অমনি আগের মত শব্দ ক'রে উঠল 'হি-স্-স্-স্' সঙ্গে সঙ্গে খ্যাংরাকাটির মত তর্জ্জনী উঁচিয়ে আস্ফালন! কি মুস্কিল!

ব্রাহ্মণ বললেন 'আচমন!'

সঙ্গে সঙ্গে দুপাশের পুঁটলি দুটো নড়ে-চড়ে খাড়া হ'য়ে উঠলো। আশ্চর্য্য! পুঁটলি ত নয়, এও যে দুই স্ত্রী-মূর্ত্তি এবং বেশ-ভূষায় অবিকল প্রথম স্ত্রী-মূর্ত্তির মতই। তাদের একজন একঘটি জল নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

ব্রাহ্মণ আবার হাঁকলেন 'আচমন!'

বুঝলুম ব্রাহ্মণ আমাকে আচমন করতে বলছেন—আমি একটু হেসে বললুম 'মন্ত্র কিন্তু বিলকুল ভুলে গেছি—'

পার্শ্ববর্ত্তিনী কানের কাছে আবার করে উঠলেন 'হিস্-স্-স্-স্'—ব্রাহ্মণ আমার দিকে চাইলেন কটমট ক'রে, ভাবহীন চোখে যতখানি কটমটানি সম্ভব হয়।

বুঝলুম ব্রাহ্মণই এখানকার কর্ত্তা-ব্যক্তি—কাজেই তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললুম—'দয়া ক'রে এই মহিলাটিকে কানের কাছে হিস্ হিস্ করতে যদি বারণ করেন—শব্দটা একটু আপত্তিজনক—"

ব্রাহ্মণ তদ্রূপ-গম্ভীর স্বরে পুনরুক্তি করলেন 'আচমন।' বোধ হয় আগের চেয়েও একটু জোরে।

কি করি! আচমন করলুম—নমো বিষ্ণু ব'লে।

ব্রাহ্মণ আবার তোপ দাগলেন 'পবিত্র।'

সে আবার কি? পরমুহূর্ত্তেই পুঁটলি স্ত্রীলোক দুটি সাঁ করে সরে গেল। একটু পরেই তারা উপস্থিত হ'ল একটা ক'রে ঝাঁটা এবং এক বালতি ক'রে জল নিয়ে। এইবার আমার ধাঁধাঁ ঘুচল—ঘরে ঢুকেই যে গোয়াল-গোয়াল গন্ধ পেয়েছিলাম তার কারণ বুঝলুম—বালতির জল গোময় দিয়ে বিশুদ্ধতর করা হয়েছে।

স্ত্রী-মূর্ত্তি দুটি সাধা হাতে ঝাঁটা ও জল ব্যবহার ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরের মেঝেটি গোময়-সিক্ত ও হাওয়াটি গোময়-গন্ধ-পবিত্র ক'রে তুললে।

আমি রুমাল বের ক'রে নাকে ধরেছিলাম। ব্রাহ্মণ জলদমন্দ্রে বললেন 'হাত নামাও! কি নাম?'

বললুম।

ব্রাহ্মণ তেমনিভাবে বললেন—হুঁ—পরিতোষ চট্টো-পাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ সামনের তালপাতার পুঁথি খুলে পাতা ওলটাতে লাগলেন। বুঝলাম—এই খাতাতেই সকলের পাপের হিসাব লেখা হয়। কিন্তু একটু আশ্চর্য্যও লাগল যে এইটুকু খাতার মধ্যে বিশ্বশুদ্ধ লোকের পাপের হিসেব ধরে কি ক'রে। তার পর মনে হ'ল লোক বেশী হ'লেও পাপের ধরণটা প্রায় একই রকম, কাজেই দফে ঐ, দফে ঐ, লিখে সারা যেতে পারে।

ব্রাহ্মণ বললেন 'পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়—বয়স?'

'বয়েসটাও বলতে হবে? কোন্ বয়েস?'

ব্রাহ্মণ সেই রকম একঘেয়ে ভাবে বললেন 'বয়স—তোমার নিজের বয়স।'

আমি বললুম 'আজ্ঞে হ্যাঁ আমার নিজের বয়সের কথাই বলছি—কলেজে, ইন্‌সিওর্ কোম্পানীতে আর চাকরীর দরখাস্তে বয়েস একুশ।'

ব্রাহ্মণ বললেন 'এখানকার দপ্তরে তোমার বয়স ছাব্বিশ।'

আমি একটু হেসে বললুম 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐটেই আমার সত্যিকার বয়েস। কিন্তু ইনসিওর কোম্পানী জানতে পারলে আমার ক্লেম দেবে না। তা ছাড়া সরকারী চাকরীর আশাও বিসর্জ্জন দিতে হবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন 'বয়স ছাব্বিশ! আচ্ছা—জাতি?'

আমি বললুম 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বুদ্ধি চিরকালই একটু কম।'

পাশের থেকে পার্শ্ববর্ত্তিনী ক'রে উঠলেন 'হি-স্-স্-স্।'

ব্রাহ্মণ তাঁর বিশুষ্ক মুখের ভঙ্গী বিশুষ্কতর ক'রে বললেন 'সাবধান! ব্রাহ্মণের অবমাননা ক'রে নাস্তিক্য প্রকাশ ক'রো না।'

দেখলুম ইহলোকের মত পরলোকের বিচারপতিরাও আদালতের সম্মানের ব্যাপারে বেশ একটু সজাগ—কাজেই, একটু গম্ভীর হ'য়ে বললুম 'আজ্ঞে না, কথাটা এই চট্টোপাধ্যায় ত ব্রাহ্মণই হ'য়ে থাকে।'

ব্রাহ্মণ বললেন 'না, তা হয় না। কাল একজন চট্টোপাধ্যায় এসেছিল, সে মূর্দ্ধণ্য ণ লোপ ক'রে হয়েছে ব্রাহ্ম; পরশু একজন এসেছিল সে ম্লেচ্ছধর্ম্মী—তার আগের দিন এসেছিল একজন, সে বলে সে জাতি-বহিভূর্ত।'

স্কুল মাষ্টারের পড়ানোর চেয়েও একঘেয়ে এই আবৃত্তি আমার মধ্যে একটা দারুণ অবসাদ নিয়ে আসছিল, আমি তাড়াতাড়ি বললুম 'মাপ করবেন, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ।'

ব্রাহ্মণ খাতা দেখে আবার বললেন "হুঁ, হিন্দু ব্রাহ্মণ!—যজ্ঞোপবীত?'

গেঞ্জির ভেতর হাত ঢুকিয়েই হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তাই ত! পৈতে ত নেই। দিন দশেক হ'ল পৈতে ছিঁড়ে গেছে—রোজই মনে করি আজই পৈতেটায় গ্রন্থি দিয়ে ফেলব—কিন্তু কেমন একটা কুড়েমির জন্ত ঘটে ওঠে না?

আমার ইতস্তত: ভাব ব্রাহ্মণের নজর বোধ করি এড়ায় নি, তিনি হাঁকলেন 'যজ্ঞোপবীত!' এবার মনে হ'ল তাঁর মুখে যেন একটা হিংস্র আনন্দ ফুটে উঠেছে। বিপক্ষের সাক্ষীকে জেরার ফাঁদে ফেলে উকীলের যেমন হয় কতকটা সেই ধরণের।

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম 'আজ্ঞে পৈতেটা ছিঁড়ে গেছে—কাজের হিড়িকে নতুন পৈতে পরা হয়ে ওঠে নি।'

ব্রাহ্মণের মুখ ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—বললেন 'দশাহ যজ্ঞোপবীত-হীন—প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ।'

শুনেছিলাম চান্দ্রায়ণে মাথা মুড়োতে হয়—শুনেছি এবং

আয়নায় দেখেছি যে আমার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের মধ্যে মাথার চুলের একটা স্থান আছে—কাজেই আমার হাত আপনা-আপনি চ'লে গেল মাথায়। আমি বললুম 'আচ্ছা সাম্' ব'লেই জিভ্ কেটে বললুম 'অর্থাৎ ইয়ে ভট্টাচাজ্জি মোশাই—চান্দ্রায়ণে মাথার চুলের মূল্যও ত ধ'রে দেওয়া যেতে পারে—'

ততক্ষণে আমার পার্শ্ববর্তিনীর 'হি-স্-স্-স্-স্' সুরু হ'য়ে গিয়েছে—কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আমার বক্তব্য শেষ করবই ; কানের মধ্যে উত্তর মেরুর সমস্ত বরফের চাপ এসে যদি ঢোকে তা সত্বেও।

ব্রাহ্মণ আমার দিকে চেয়ে বললেন 'পরলোকেঽস্মিন্ অনুকল্পো নাস্তি' তারপর খাতার দিকে চোখ ফেরালেন ; দেখলুম ক্রমশঃ তাঁর মুখ গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হ'য়ে উঠছে। অবশেষে ব্রাহ্মণ বললেন 'পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়'—বয়স ছাব্বিশ, জাতি নামে হিন্দু ব্রাহ্মণ, কিন্তু কার্য্যতঃ বর্ণাশ্রম-ত্যাগী—বর্ণাশ্রমত্যাগী—ব'লেই গলা আরও ভারী ক'রে বললেন 'যুবন্, এই দফ্‌তরে তোমার নামের নীচে বহু গুরুতর দফার উল্লেখ আছে—শোন—'

আমি একটু হেসে বললুম 'আজ্ঞে শোনবার প্রয়োজন আছে কি? নিজের কীর্ত্তি-কাহিনী আমার ত কিছু অবিদিত নেই।'

কীর্ত্তি-কাহিনী শব্দটা উচ্চারণ হবামাত্র পার্শ্ববর্ত্তিনী সুরু করেছিলেন 'হি-স্-স্ স্।'

ব্রাহ্মণ নিষ্করুণভাবে সুরু করলেন 'শোন—বয়স চার বৎসর—ঘৃত-দুগ্ধে বিরাগ, মৎস্য-মাংসে রুচি—চার থেকে পাঁচ এই এক বৎসরের মধ্যে তোমার জন্য কত নিরীহ জলচর, স্থলচর ও খেচরের প্রাণনাশ করা হয় তা জান?

আমি একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বললুম 'আজ্ঞে তালপাতার ওই ঐটুকু পুঁথির মধ্যে তারও ষ্ট্যাটিসটিকস্ অর্থাৎ সুমারি দেওয়া আছে?'

পার্শ্ববর্ত্তিনী ক'রে উঠল 'হি-স্-স্-স্।' জ্বালাতন! একটা কথাও ভাল ক'রে বলবার জো নেই।

ব্রাহ্মণ বললেন 'এক বৎসরে তোমার জন্য চার হাজার একশো উনত্রিশটি প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে।'

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললুম 'বলেন কি! অত? বছরে ত মোটে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। তার মধ্যে—চা—র হা—জা—র—'

ব্রাহ্মণ বললেন 'হিসাব কড়ায়—গণ্ডায় নির্ভুল—প্রত্যহ দুই তিন বার ক'রে মেলান হয়েছে। জন্ম তোমার ১৫ই মাঘ—দেখ বয়স পুরো চার—১৫ই মাঘ তিনটি কই মৎস্য—

আমি বললুম 'বাবা তখন যশোর ছিলেন। যশোরের কই কিন্তু ভারি জবর—দুই দিয়ে পাকা কই মাছের ঝোল—খেতে কি চমৎকার বলুন দেখি—

পাশ থেকে আবার আওয়াজ হ'ল 'হি-স্-স্-স্-স্।'

ব্রাহ্মণ বললেন 'চাপল্য ত্যাগ কর—তোমার কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি কর।—শোন তারপর, ১৬ই মাঘ মৌরলা মাছ একুশটা, কুচো চিংড়ি আঠারটা, বড় চিংড়ি দুটো—তা ছাড়া ছাগল একটা—

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললুম 'আমার মনে নেই—কিন্তু আপনার হিসেব-নবীশ নিশ্চয় ভুল করেছে—কেন না, একটা গোটা পাঁটা খাবার মত উদর বা হজমশক্তি চার বছর বয়সে কেন, এখনও হয়নি—'

ব্রাহ্মণ বললেন 'আপত্তি অগ্রাহ্য। একখণ্ড খেলেও সেই জীবহত্যার পাতক তোমাকে স্পর্শ করবে। তারপর ১৭ই—'

আমি হাত জোড় করে বললুম 'মাপ করুন—আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।'

একটু প্রসন্ন হ'য়ে ব্রাহ্মণ বললেন 'হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে এ পর্য্যন্ত রসনার তৃপ্তির জন্য তুমি একলক্ষ একষট্টি হাজার তিনশো সাতান্নটি প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়েছ। তোমার কি বক্তব্য আছে?'

আমি বললুন 'সম্ভব'।

ব্রাহ্মণ বললেন 'তোমার দায়িত্ব স্বীকার করছ?'

আমি বললুম 'আজ্ঞে না, এর জন্য বেশী দায়ী আমাদের রাঁধুনী ঠাকুর। তার নিরিমিষ তরকারি মুখে তোলবার জো ছিল না, কিন্তু মাছ মাংসের যত রকম রান্নায় সে ছিল এক্‌স্‌পার্ট। কারি, কোর্ম্মা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা, ফ্রাই, একেবারে অমৃত। আপনি যদি তার হাতের কাটলেট্ খেতেন—'

পাশে আবার হি-স্-স্-স্-স্।

'কিম্বা গলদা চিংড়ির মালাইকারি, কি ইলিস্ মাছের

পাতুড়ি। তাই বলছিলুম, এর জন্যে দায়ী বামুন ঠাকুর—সে যদি অত ভাল না রাঁধত—তা'হ'লে—এত প্রাণীর প্রাণ-নাশ হ'ত না।'

মুখের ভাব ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তন হয় নি, কিন্তু তাঁকে নিশ্চুপ দেখে বুঝলুম আমার 'সওয়ালে' তিনি বিব্রত হ'য়ে উঠেছেন।"

এই সময় 'সুদুসের' আইন-প্রতিভা তাকে মুখর ক'রে তুললে। সে বলে উঠল 'That was the Psychological moment when you could press your point.' বলে নিজেই ব্যাখ্যা করলে 'সেইটে ছিল মনোবৈজ্ঞানিক মুহূর্ত্ত, যখন তুমি পারতে তোমার বিন্দুকে চাপ দিতে।' একটা হাসি পড়ে গেল। অন্য কাউকে কথা কইবার অবকাশ না দিয়ে পরিতোষ ব'লে চলল।

"আমি তা বুঝেছিলুম এবং আপনার কথামত আমার বিন্দুকে চাপ দিয়েছিলুম। আমি বললুম 'সকলের চেয়ে দোষ আপনাদের সেই দেবতার যিনি প্রথম রান্না আবিষ্কার করেছেন।—নইলে ত ফল মূল খেয়েই দিব্যি থাকা যেত।'

ব্রাহ্মণ নিজের পরাজয় এড়াবার জন্য পুঁথির দিকে ঝুঁকে বললেন—'তারপর তুমি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহে গৌরীদান প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছ।'

আমি বললুম 'অবশ্য।'

'বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সদারচারকে বলেছ ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠুরতা—'

আমি বললুম 'আমার তাই মনে হয়।'

পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠল 'হিস্-স্-স্-স্।'

ব্রাহ্মণ বললেন 'তুমি বিবাহ কর নি।'

আমি বললুম 'সত্যি-কথা'

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন 'তার অর্থ জান?'

আমি বললুম 'আপাততঃ একটা অর্থ মনে আসছে এই যে, একটি ব্রাহ্মণ কন্যা বৈধব্যের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।'

পাশ থেকে আবার 'হিস্-স্-স্-স্-স্।'

ব্রাহ্মণ এ উত্তরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না—ঠকে গেলে সবাই যা করে, তিনিও তাই করলেন অর্থাৎ উপদেষ্টার ভাব অবলম্বন ক'রে বললেন 'সাবধান যুবক। পুনরায় বলছি চাপল্য ত্যাগ কর।'

আমি ক্ষুব্ধভাবে বললুম 'আজ্ঞে আমি চাপল্য করছি না, আপনিই বিবেচনা ক'রে দেখুন, যদি আমি বিবাহ করতুম তাহ'লে আজ আমার স্ত্রীর অবস্থা কি হত!'

ব্রাহ্মণ সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন 'তুমি বিবাহ না ক'রে যে প্রজাবৃদ্ধিতে বাধা দিয়েছ সে সম্বন্ধে ত সন্দেহ নাই।'

আমি বললুম 'বিধবাদের বেলাতেও ত সে কথা খাটে—তাদেরও তা হ'লে বিবাহ করা উচিত।'

এবার পাশ থেকে হিস্-হিস্ শব্দ এলো না দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে পাশের দিকে চাইলুম—দেখলুম—পার্শ্ববর্ত্তিনী উন্মুখ হ'য়ে ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে আছে, তার পাথুরে চোখের মধ্যে একটা যেন তারল্যের পূর্ব্বাভাষ উঁকি মারছে।

ব্রাহ্মণ অতিমাত্রায় গম্ভীর হ'য়ে বললেন 'তুমি অত্যন্ত তার্কিক। এরূপ তার্কিকতা নাস্তিক্যের লক্ষণ।'

তারপর প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আসামীকে হাজতে পাঠাতে হ'লে হাকিম যেভাবে হুকুম দেন তেমনি ভাবে বললেন 'আগে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত, তারপর নিয়ে এস।'

অমনি তিনটি বিধবা স্ত্রী-মূর্ত্তি, দু'জন দু'পাশে এবং একজন পেছনে দাঁড়িয়ে সমস্বরে সুরু করলেন 'হিস-স্-স্-স।'

সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে আসতে লাগল। হাত তুলে যে কানে দেব সে শক্তিটুকুও যেন পাচ্ছিলুম না। কাজেই প্রাণপণে চোখ বুজে রইলুম।

যখন চোখ চাইলুম দেখলুম—নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি। হাতটা আপনা-আপনি মাথায় চলে গেল—সেখানে চুলের চিহ্নমাত্র নেই—একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে কামানো।"

এই পর্য্যন্ত শুনেই লোহিতেন্দু ব'লে উঠল—'তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত ৎচু-ৎচু চান্দ্রায়ণ না করিয়ে ৎচু-ৎচু ছাড়লে না—'

দুর্গাচরণ বললে 'না করলে নিস্তার ছিল।'

রাজারাম বললে 'কি হ'ত চক্রী ঠাকুর?'

দুর্গাচরণ বললে 'বুঝলেন না যস্য মাংসামিহাদ্ম্যহম্।'

আমি বললাম 'সেই এক লক্ষ একষট্টি হাজার ইত্যাদি জীব চারপাশে এসে ঠোকরাতে সুরু করত—কেমন কিনা?'

দুর্গাচরণ বললে 'এ্যাই! এ্যাই! শাস্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা হবার জো নেই—কেবল চান্দ্রায়ণেই পরিত্রাণ পেলেন। তারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে—যথা—'

লোহিতেন্দু বললে 'হিস্-হিসের ঠেলাতেই ঠাণ্ডা ক'রে ৎচু-ৎচু ছেড়েছে। এর ওপর শাস্ত্র বাক্য ৎচু-ৎচু ছাড়লে একেবারে বরফ।—দাও একটা ৎচু-ৎচু—টুরুট' শেষেরটা নন্দদুলালের দিকে হাত বাড়িয়ে।

রাজারাম বললেন, কিন্তু পরিচিতা আসল ব্যাপারটা কি?

পরিতোষ বললে, 'শুনলুম আঁবের খোলার ওপর পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম—মাথাটা ফুটপাতের পেটেন্ট ষ্টোনের ধাক্কা বরদাস্ত করতে পারে নি।'

নিতাই আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা তাহ'লেএই যে স্বর্গের অপ্সরী কিন্নরীদের কথা শোনা যায়, সে সব মিছে? —স্বর্গেও বুড়ো ভট্‌চাজ্জি আর ছুঁচিবেয়ে বুড়ীদেরই রাজত্ব?

তাপসেন্দ্র বললে, 'ব-স এণ্ড্ নন্ সেন্স্—বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল!'

নিতাই আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, 'খেয়াল কি মশায়? মাথা পর্য্যন্ত কামানো হয়েছে—'

দুর্গাচরণ বললে, নাস্তিকের কথা ছেড়ে দাও—

পরিতোষ ঈষৎ হেসে বললে "অবশ্য ডাক্তার মাথা কামিয়ে আইসব্যাগ্ দিতে বলেছিলেন।" তারপর একটু থেমে বললে "কিন্তু তারপর দিন বৌদি যখন ফিডিং কাপে ক'রে ব্রথ্ নিয়ে এলেন—তখন মুখ থেকে বেরিয়ে গেল এক লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশো আটায়—বৌদি বললেন কি বকচ ঠাকুর-পো?"

আমি বললুম—না শুনছি কতগুলো খুনের দায় এসে পড়বে। বৌদি বললেন 'আচ্ছা এইটুকু খেয়ে নাও দিকি'; তিনি ভাবলেন আমার তখনও ঘোর কাটেনি।

ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে নিতাই অবাক হ'য়ে চেয়ে রয়েছে দেখে, রাজারাম বললেন "বুঝছ না মজগুল, পরিচিতা স্বপ্ন দেখেছিল।"

নিতাই আশ্বস্ত হ'য়ে নিশ্বাস ছেড়ে বললে "ও তাই বলুন—স্বপ্ন! তাহ'লে অপ্সরী কিন্নরী মিছে নয়!"

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পূর্ব্বাভাষ

ভারতীয় সঙ্গীত-কলার পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ইতিহাস ও সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ বিবৃতিসম্বলিত কোন গ্রন্থ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয় নাই। বৈদেশিক গ্রন্থকার ক্যাপ্‌টেন্ উইলার্ড, ক্যাপ্‌টেন্ সি. আর. ডে, সার উইলিয়াম জোন্স, মিঃ এ. এইচ. ফক্স্ ষ্ট্রাঙ্গ্‌ওয়ে, মিঃ ই-ক্লিমেণ্ট্‌স্, মিঃ এইচ্ এ. পপ্‌লি প্রমুখ মনীষিগণ বহু চেষ্টা ও প্রয়াস স্বীকার করিয়া ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। তদ্বারা স্বদেশীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি, পুষ্টি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ভারতবাসীর পর্য্যাপ্ত ধারণা জন্মিতে পারে না। ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্বন্ধে এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর যে সকল গ্রন্থাদি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সঙ্গীত-বিশারদ রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, আচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রমুখ মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার সঙ্গীত-গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সহযোগে সঙ্গীত প্রণালী বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরিণত করিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা, উন্নত প্রণালীর স্বরলিপি গঠন ও প্রচলন, প্রসিদ্ধ কলাবিৎ সমাহরণ ও সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা যে বিশ্ববিশ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন উহা বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। বলা বাহুল্য, তজ্জন্য ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইঁহাদের আলোচনাপ্রসূত অমূল্য গ্রন্থরাজি সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে বহু বিষয়ে উপযোগী হইলেও স্থল-বিশেষে উহা অতিমাত্র সংক্ষিপ্ত। শেষোক্ত মহোদয়দ্বয়ের গ্রন্থে প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদ কোন অজ্ঞাত কারণে এরূপ

উপেক্ষিত যে তদ্দ্বারা একদিকে যেমন ভারতীয় সঙ্গীতের সম্যক্ জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গীতসূত্রসার" নামক গ্রন্থে "হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র" শীর্ষক প্রস্তাবের সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা প্রদর্শন এবং স্থান বিশেষে অযৌক্তিকতার আরোপ করিয়াছেন; আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে উক্ত গ্রন্থের নব সংস্করণে পরিশিষ্টকার শ্রীযুত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল মহাশয় গ্রন্থকারের ত্রুটিগুলির উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তৎকালে "সঙ্গীত রত্নাকর," "রাগ-বিরোধ" প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থের মুদ্রিত বিশুদ্ধ সংস্করণের সহায়তা লাভ করিতেন তবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের প্রতি তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ সম্ভবপর হইত না। আমাদেরও মনে হয়, বিচক্ষণ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশই স্বাভাবিক। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বি-এ, এল. এল. বি, মহাশয় সঙ্কলিত "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি" পাঠে জানা যায় যে তিনি ঐ গ্রন্থখানি কেবল উত্তর ভারতের সঙ্গীত-পদ্ধতি নির্ণয় ও বিধিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সঙ্কলন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি কর্ণাটকী সঙ্গীত প্রবর্ত্তক মনে করিয়া "রত্নাকর" প্রমুখ প্রবীণ গ্রন্থসমূহ বর্জ্জন করিয়া উত্তর-ভারত প্রচলিত সঙ্গীত-পদ্ধতির পোষক "অভিনব রাগমঞ্জরী", "রাগচন্দ্রিকা", "রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর" প্রভৃতি বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। পণ্ডিতজীর দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত শ্রম ও চেষ্টার ফলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে এবং ওস্তাদগণের ব্যূহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে—স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবু তাঁহার সঙ্কলন চেষ্টা উল্লেখযোগ্য-রূপে অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে। কারণ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অবিসংবাদিত অন্যতম আদিনায়ক তানসেনের পৌত্র ও দৌহিত্রের যে দুইটি বংশধারা অদ্যাপি ভারতের সমগ্র কলাবিদ্গণের নিকট শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের বংশপরম্পরা প্রচলিত (খান্দানী বা ঘরওয়ানা) পদ্ধতির সহিত পণ্ডিতজী সঙ্কলিত পদ্ধতির বহু স্থলেই সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হয়। তথাপি এই সকল গ্রন্থকারগণের নিকট সঙ্গীতানুরাগীমাত্রেই বিশেষ ঋণী ইহা মুক্তকণ্ঠেই বলিতে হইবে।

ভারতীয় সঙ্গীত একটি ব্যাপক বস্তু। তাহা শুধু বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নহে, কিংবা কেবল দাক্ষিণাত্যে আলোচিত কর্ণাটকী সঙ্গীত নহে, অথবা ইহা পুরাণবর্ণিত তথাকথিত কাহিনী নহে; ইহা সামবেদের উপবেদ। চতুর্ব্বেদেরই মত ইহার মার্গী * অংশ অপৌরুষেয়। "সঙ্গীত-রত্নাকর" বলেন—"অনাদি সম্প্রদায়ং যৎ গন্ধর্ব্বৈ সম্প্রযুজ্যতে।" "অনাদি সম্প্রদায়ং" এই পদের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বলেন—"বেদবৎ অপৌরুষেয়ং।" প্রাচীন ভারত বেদমন্ত্র বলে যাহা কিছু অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন সর্ব্বত্রই সেই মন্ত্রসমূহ আর্চিক, গাথিক বা সামিক তানে উচ্চারিত বা গীত হইত এবং তাহার ফলে রোগীর রোগাপনোদন, অনাবৃষ্টিতে ধারাসম্পাত, দুর্ভিক্ষে শস্য প্রজনন প্রভৃতি প্রত্যক্ষদৃশ্য নানা অসাধ্য সাধিত হইত। কালের প্রভাবে বেদের আলোচনা লুপ্ত হইয়াছে, বৈদিক সাধনায় অক্ষমতা ও অবিশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মার্গী সঙ্গীত নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ববিধ কার্য্য সাধনের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপকরণ স্বরূপ এই মার্গী সঙ্গীত লুপ্ত হইবার ফলে আধুনিক সঙ্গীত সাময়িক মনোরঞ্জন ব্যতীত জগতের আর কোনপ্রকার কল্যাণ সাধনেই সক্ষম নহে। ইহা মার্গী সঙ্গীতের প্রতি আমাদের অন্ধ অনুরাগ-প্রসূত অলীক কল্পনা মাত্র নহে—বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে ইহা যে সুপ্রতিষ্ঠিত যথাস্থানে আমরা তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে সুবিন্যস্ত শব্দসমূহ কাব্য আকারে পরিণত হইলে তাহা যেমন বিভিন্ন রস সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাকে মুগ্ধ করে, সুপ্রযুক্ত স্বরসমষ্টি তদপেক্ষাও ব্যাপকতর প্রভাবে রস সৃষ্টি করিয়া সমধিক আবেগে জাতি ও ব্যক্তিকে আবিষ্ট করিয়া তোলে। সঙ্গীতের এই অসামান্য মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই কবি বলিয়াছিলেন—

* মার্গী অর্থাৎ বৈদিক সঙ্গীত-পদ্ধতি। বিস্তারিত আলোচনা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

"কাব্যং গীতেন হন্যতে।" কাব্যের আদর ততক্ষণ, যতক্ষণ সঙ্গীতের ঝঙ্কার কানে না পৌঁছায়। সঙ্গীতের এই মোহিনী শক্তি ভোগের যেরূপ একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান, কল্যাণেরও সেইরূপই সহায়ক। কালক্রমে ভারতে সেই কল্যাণমুখী গতি রহিল না—আসিল ভোগস্পৃহা চরিতার্থতার উদ্দাম প্রচেষ্টা। তাহারই ফলে প্রাচীন সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্গীত পদ্ধতিতে চটুল পরিবর্ত্তন প্রবেশ করিল। বাদশাহী আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত তরল রুচির খেয়ালে এই পরিবর্ত্তন ক্রমেই নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে প্রধাবিত হইতেছে। সঙ্গীতের এই ক্রমপ্রবর্ত্তিত ধারাকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করিয়া যদি তাহারই পুষ্টিসাধন ও বহুল প্রচার দ্বারা জাতিকে ভোগপ্রমত্ত করিয়া রাখিতে হয় তবে তাহাকে জাতির শক্তির গুরুতর অপচয় ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সুধীগণ মনে করেন জাতীয় জীবনের অধঃপতিত অবস্থায় যে সকল রস উন্নতির সহায়ক, সঙ্গীতের সাহায্যে সেই সকল রসে জনসমাজকে অনুরক্ত করিয়া তুলিলে জাতি ও ব্যক্তির যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বহু প্রকার রুচিসম্পন্ন জনসঙ্ঘের সমবায়েই একটি জাতি গঠিত হয়। জাতির উচ্চতম স্তর হইতে সর্ব্বনিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে মুমুক্ষু বা জাতীয় কল্যাণকামী হইয়া সঙ্গীতের সাধনা করিতে পারিবে ইহা আশা করা যাইতে পারে না। আর সঙ্গীত বস্তুটিও শুধু উচ্চ সাধনারই উপকরণ নহে। শোকার্ত্ত ব্যক্তির দুঃসহ শোকাবেগ সঙ্গীতেই সহজে প্রশমিত হয়; আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেও সঙ্গীতের মত মধুর ও সহজ সাধন আর কিছু নাই; যোদ্ধা যখন যুদ্ধাভিযানে প্রস্তুত হয় তখন তাহাকে প্রাণের মমতা তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সঙ্গীত যেরূপ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তেমন আর কিছুতেই পারে না। * এরূপ প্রবল শক্তি সম্পন্ন নবরসাত্মক সঙ্গীতকে কেবলমাত্র দুই চারিটি জাতীয় কল্যাণকর রস-সৃষ্টির জন্যই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখারও আমরা পক্ষপাতী নহি। সুতরাং মুসলমান যুগ হইতে অদ্যাবধি এই কোমল কলার যেখানে যাহা কিছু উৎকর্ষ বা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে, কালাপাহাড়ের ন্যায় নির্ম্মমভাবে তাহা ধ্বংস করিলে চলিবে না—তাহাকেও আদরের সহিত সঙ্কলন ও গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্-গণের বৈচিত্র্যময় কারুকলার যেমন অবমাননা করা হইবে তেমনি আমাদের সঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও দীন মলিন হইয়া পড়িবে। দেশী সঙ্গীতে বিধি-নিয়ন্ত্রিত পথে গুণিগণ নানা রাগরাগিণীর সমবায়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলে তাহা প্রাচীন শাস্ত্র মতানুসারেও নিন্দনীয় হয় না, বরং সঙ্গীতের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছানুসারে যে কেহই সঙ্গীত স্রষ্টা হইতে পারে না; শুধু ভারতীয় সঙ্গীত কেন, ইয়ুরোপীয় সঙ্গীতেও বহুবিধ বিধি নিষেধের কঠোরতা মানিয়াই চলিতে হয়। দুই দশটি রাগরাগিণী কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া অথবা কোন যন্ত্রে পাঁচ সাতখানি গৎ 'আদায়' করিয়া কাহারও বিদ্যাবত্তার ভ্রান্ত আত্মম্ভরিতা পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু গুণীজনোচিত শাস্ত্রজ্ঞান, রসবোধ ও সৃষ্টিশক্তি আয়ত্ত হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষীণমস্তিষ্কপ্রসূত যদৃচ্ছ প্রণালীতে প্রচলিত রাগরাগিণীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিলে উৎকট কিছু একটা বস্তু গড়িয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু নূতন রাগরাগিণী গড়িয়া উঠে না; আর যথেচ্ছভাবে স্বরের পর স্বর সংযোগ করিতে পারিলেই সঙ্গীত সৃষ্টিও সম্ভবপর হয় না। অথচ এমনই কালের প্রবাহ চলিয়াছে যে সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা-গুলির কলেবর নিত্য নব নব কলাবিদের উদ্ভট কলাসৃষ্টির প্রভাবে বিকট হইয়া উঠিতেছে। ইহা কাহারো প্রতি ব্যঙ্গোক্তি নয়, প্রপীড়িত মর্ম্মের করুণ আর্ত্তনাদ। অবশ্য

* স্কট্‌ল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও কবি জন্ আর্মষ্ট্রং এম-ডি, মহোদয় লিখিয়া গিয়াছেন—

Music exalts each joy, allays each grief,
Expels diseases, softens every pain,
Subdues the rage of poison and the plague,
And hence the wise of ancient days adored
One power of physic, melody and song.

Armstrong.

আমাদের শাস্ত্রেও আছে—

আয়ুর্ধর্ম্মো যশঃ কীর্ত্তি বুদ্ধি সৌখ্য ধনানি চ
রাজ্যাভি বৃদ্ধিঃ সন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়তে ॥
সংগ্রামে বীরতা রূপম্ লাবণ্য গুণ কীর্ত্তনম্।
গানেষু ষাড়বাখ্যঞ্চ গদিতম্ পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥
ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয়শোকবিনাশনে।
ঔড়বাস্তু প্রগাতব্যা গ্রহশান্ত্যর্থ কর্ম্মণে ॥

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সমাজে রক্ষণশীলতার সহিত পরিবর্ত্তনশীলতার দ্বন্দ্ব চিরদিনই থাকিবে, কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমোন্নতির গতিপথ রুদ্ধ করাই রক্ষণশীলতা নহে, আবার প্রাচীন পন্থাকে পুরাতন বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে নূতন কিছু করাই যথার্থ পরিবর্ত্তনশীলতা নহে। দেশের এই দুর্দ্দিনে এখন প্রয়োজন হইয়াছে দ্বন্দ্ব নয়—মিলন। নবীনের সহিত প্রবীণের শ্রেয়স্কর সামঞ্জস্য; রক্ষণশীলের সহিত পরিবর্ত্তন-পন্থীর সর্ব্ববিধ জাতীয় কল্যাণে একপ্রাণতা, পরস্পরের সমবেত চেষ্টা।

এখন দেখিতে হইবে দেশের আজ কি প্রয়োজন, আমরা কি চাই। আমরা চাই ভারতীয় সঙ্গীত-মাতৃকার পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তিটি নিখুঁত করিয়া গড়িয়া তুলিতে এবং তাহাকে সত্যের বেদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা অসীম, যোগ্যতা তেমনি অকিঞ্চিৎকর। বিষয়ের গুরুত্ব ও নিজের দৈন্য স্মরণ করিলে, কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।" আমাদের আলোচনা পথ অতি দুর্গম। এই অপরিচিত বন্ধুর পথ যাহার প্রদর্শনে সুগম হইত সেই শাস্ত্রগ্রন্থ—"গান্ধর্ব বেদ" আজ লুপ্ত। যাঁহাদের উপদেশে এই দুরূহ বিষয়টি সরল সুস্পষ্ট হইতে পারিত, সঙ্গীতকলার সেই গুরুপরম্পরা আজ তিরোহিত। সুতরাং প্রতিপদেই আমাদের ভ্রম-প্রমাদ স্বাভাবিক। তথাপি আমাদের এই প্রয়াসের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, যদি আমাদের পুনঃপুনঃ পদস্খলন লক্ষ্য করিয়া কোন যোগ্যতম ব্যক্তি দয়ার্দ্র হইয়া এই গুরুভার বহনে অগ্রসর হন তাহা হইলে সুদীর্ঘ কালের উপেক্ষিত এই চিরন্তন সমস্যার অতি প্রয়োজনীয় সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

আমার জলে ঢেউ ছিল না

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার জলে ঢেউ ছিল না,—জোয়ার ভাঁটার খেলা
ভুলেই ছিলাম,—মোর আকাশের চন্দ্র সূর্য্য তারা
আসত কখন, যেত কখন, খেয়াল ছিল নাক
তুমি কখন চুপ্‌টি করে' দাঁড়ালে মোর পাশে।

জলে আমার ঢেউ উঠিল,—বইল পুবে হাওয়া
গহীন জলে চম্‌কে গেল মনের গভীরতা,
চল্‌কে চলে ঢেউ'এর সারি দুকুল গেল ভেসে
রাঙা কমল উঠ্‌ল ফুটে রাঙা আকাশ চেয়ে।

সাপ্‌লা ফুলে রঙ ধরিল—কলমী লতার বনে
নীল কমলের আলিঙ্গনে বদ্ধ প্রজাপতি,
আমার মনে ঢেউ দিল যে, ফিরিয়ে দিতে তারে
পাঁজর ভেঙ্গে কান্না আসে, বল্‌তে লাজে মরি।

ঢেউ উঠিল নিথর জলে, ফুট্‌ল থরে থরে
চাঁদের কিরণ ঝিক্‌মিকিয়ে ছড়িয়ে দিল সোনা
ভাঙ্গা কূলে লাগ্‌ল এসে তোমার সোনার তরী
নোতুন নেয়ে তোমায় পেয়ে উতোল হ'ল নদী।

আমার নদী পথ হারাল কখন নাহি জানি
ঢেউগুলি তার মিলিয়ে গেল মরুপথের হাওয়ায়
জলের ধারা বদ্ধ জলায় মিলিয়ে গেল কবে,
আজ মনে নাই,—ভাব্‌ছি—তুমি সেদিন ছিলে কোথা?

আজ এসেছ সন্ধ্যাবেলায় ঢেউ দিলে মোর জলে
উথ্‌লে ওঠে অগাধ জলের মৌন মুখরতা,
শাসন দাঁড়ায় সাম্‌নে রুখে ক্রুদ্ধ ফণা মেলি
বুকে তোমার লুকাতে চাই,—বাদ সাধে মোর ঘর।

ঘর ছেড়ে যার আশায় তুমি—বাহির হলে পথে
ঘর-ছাড়া সে অনেকদিনই—পাতান ঘর হেথা
সাঁঝ অতিথি তুমি আমার, নিশাপতির তরে
আকাশ জোড়া ফাঁদ পেতেছি, জান কিসের লোভে?

তোমায় আমি বল্‌ব না তা, বল্‌তে সরম লাগে
মন যারে চায়—তারেই আমি ফিরাই বারে বারে
আমার জলে ঢেউ ছিল না—ঢেউ দিলে যে জলে
আমার রাতের কান্না সেথা কল্লোলিয়া চলে।

শুন্‌তে তুমি পাও কি প্রিয়?—বুঝতে পার কিছু?
নারীর ব্যথা বুঝবে নাক'—পরাণ পুড়ে ছাই—
মুখের কথা—সেই কি বড়?—মনের কথা মিছে?
আমার জলে ঢেউ ছিল না—সেই ছিল মোর ভালো।

আগ্নেয়গিরি

প্রবোধকুমার সান্যাল

সোনাঝাঁ হইতে সাত ক্রোশ গোরুর গাড়ী। মাঝে মাঝে বাঁশ আর খেজুরের জঙ্গল, মাঝে মাঝে মাঠ—শীতের মাঝামাঝি এখনো ক্ষেত হইতে ধান উঠে নাই। সবেমাত্র ইতুপুজা ও নবান্ন শেষ হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে ছোট বড় উৎসব লাগিয়াই ছিল।

ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ী অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছে, পথে দুই একটা শুক্‌নো নদী পড়িয়াছিল, তাহারই কাছাকাছি পানীয় জল আমরা সবাই পাইয়াছিলাম। দুপুরের রৌদ্র, দিগন্তজোড়া মাঠ, শীতের স্নিগ্ধ হাওয়া, গাছে গাছে পাখীর কলরব,···ইহাদেরই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পথ আমাদের ফুরাইয়া আসিতেছিল।

ছয়খানা গোরুর গাড়ীতে আমরা সবশুদ্ধ ষোলটি মানুষ। আমার গাড়ীতে আমি ছিলাম একা। বড়বউ এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন আগের গাড়ীগুলিতে চলিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমরা সকলে আমাদের পথ-খরচ জমা রাখিয়াছি। তিনি আমাদের কর্ত্রী। তাঁহার উপর মাথা তুলিয়া কেহ কথা বলিতে পারিব না, এই নিয়ম-নীতি মানিতেই হইবে।

শেষের গাড়ীতে কুসুম তাহার বুড়ার বাপকে লইয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধের বাতের ব্যারাম, পক্ষাঘাতের লক্ষণ। বাবা যজ্ঞেশ্বরের মাদুলী লইলে বৃদ্ধ সারিয়া উঠিতে পারে এই আশায় কুসুম তাহাকে লইয়া তীর্থ করিতে চলিয়াছে। এতদিন সঙ্গী পাওয়া যায় নাই বলিয়া মনের প্রার্থনা মনেই ছিল। গাড়ীর ভিতরে বৃদ্ধ মড়ার মতো পড়িয়া আছে।

ছইয়ের ভিতর হইতে একসময় গলা বাড়াইয়া কুসুম কহিল, আমি ত কোনো দোষ করিনি। আমার অন্যাইটা কি হোলো ?

আমার ঠিক পিছনেই তাহার গাড়ী। গোরু দুইটা অভ্যাসমতো চলিতেছে, গাড়োয়ান কাৎ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাড়াইয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে চুপ করিতে বলিলাম। জানি তাহার প্রতিবাদে ফল হইবে না, অশান্তিই বাড়িবে।

কুসুম চুপ করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বিনীত কণ্ঠে কথা কহিল, টাকা ক'টা ওঁর কাছে রাখতে গেলাম, উনি দিলেন গালমন্দ। উনি ব্রাহ্মণ, উনি বড়, আমি ওঁর পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই।—তুমি বুঝি ওঁর আত্মীয় ?

বলিলাম, আমার এখানে কোনো আত্মীয় নেই। ওঁরা পথ চেনেন না, আমি তাই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

কুসুম কহিল, তখন উনি জল খেলেন না কেন ?

আবার ইঙ্গিত করিয়া কুসুমকে থামাইতে হইল। ছেলেমানুষ বলিয়া তাহার কৌতুহল বেশি, সকল কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলে সে বুঝিতে পারে না। রতনপুরে একটা কুয়া পাওয়া গিয়াছিল, সেই কুয়ার জল লইয়াই বিপত্তি। বাপের জন্য ঘটি নামাইয়া কুসুম জল লইয়াছিল, বড়বউ তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু নিজে তিনি তৃষ্ণা চাপিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর কঠিন মুখ দেখিয়া আমরা আর তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করি নাই।

কুসুম আবার যেন কি বলিতে গেল, আমি চটিয়া উঠিলাম। বলিলাম, সব কথা তুমি শুনবে এমন অধিকার তোমার নেই। ব্রাহ্মণের মেয়ে যদি যেখানে সেখানে জল না খেয়ে থাকেন তবে তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন কেন ?

কুসুম তিরস্কারে একটুও দমিল না। কেবল কহিল, আমি ছোটলোক, আমার বাপ ছোট জাত, মারলেও কথা বলা উচিৎ নয়।

এত যদি জানো তবে চুপ ক'রে থাকো। তুমি যে ওঁর সঙ্গে যেতে পাচ্ছো এও কি তোমার কম লাভ ?

কুসুম চুপ করিয়া গেল।

মোচাখোলা পার হইয়া আমাদের গাড়ীগুলি একটা রেলপথের লেবেল্-ক্রসিংয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী চলিয়া গেলে তবে ঠিকাদার লোহার গেট্ তুলিয়া ধরিবে। দূরে সিগ্‌নাল্ ডাউন্ হইয়াছে। শীতের বেলা। তিনটা বাজিতেই রৌদ্র আল্‌গা হইয়া আসিতেছিল।

ধূলা জড়াইয়া মাঠে মাঠে রুক্ষ ঠাণ্ডা হাওয়া এদিক ওদিক ফিরিতেছে। পিছনের গাড়ী হইতে কুসুম পুনরায় প্রশ্ন করিল, রাস্তা আর কতটা বাকি ?

সকাল হইতে সমস্ত পথটা তাহার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হায়রাণ হইয়াছি। মানুষের বিরক্তি সে বুঝিতে পারে না, সে মনে করে পৃথিবীর সবাই বুঝি তাহারই মতো কৌতূহলী, তাহারই মতো নিশ্চিন্ত। তাহার প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো কাজ নাই। অনেক কষ্টে সংযত কণ্ঠে কহিলাম, কোশ খানেক আর আছে। ছটফট করলে পথ ফুরায় না।

বাবা, এখনো এক কোশ ? পথ ভুল করোনি ত ? কুসুম কহিল।

তাহার দিকে তাকাইলাম। বলিলাম, সোজা পথটা তুমি দেখিয়ে দিলেই পারতে ?

কুসুম বুঝিতে পারিল, আমি রাগ করিয়াছি। তবু কহিল, ওমা, মেয়েমানুষ বুঝি আবার পথ চেনে ? কে জানে কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি ! আমি অত বুঝিনে।

—সুতরাং চুপ ক'রে থাকো।

কুসুম কহিল, বেলা গড়িয়ে এলো, পথে চোর ডাকাত নেই ত ?

বলিলাম, থাকলেই বা তোমার ভয় কি ?

কুসুম হাসিয়া কহিল, ওমা আমার আবার কি ভয়, পাহাড়ের আড়ালে আছি। তোমরা থাকতে আমার—

তবে চুপ ক'রে থাকো।

এমন সময় হুস হুস শব্দে ট্রেণ আসিয়া পার হইয়া গেল। ঠিকাদার আসিল, লোহার বেড়া তুলিয়া ধরিল, আমাদের গাড়ীগুলি একে একে পার হইয়া ওপারের গ্রামের পথ ধরিল।

পিছন ফিরিয়া একবার দেখিলাম, কুসুম তাহার বুড়া বাপের মুখে ঘটি হইতে জল খাওয়াইতেছে, আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতেছে। গোরুর গাড়ীতে চড়ার পরিশ্রম আর সে সহ্য করিতে পারে না। মাদুলি পরাইয়া যাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, পথের মাঝখানেই বুঝি তাহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। বৃদ্ধকে আনা উচিৎ হয় নাই।

বলিলাম, ভালো আছে ত ? তোমার বাবার কথা বলছি।

কুসুম কহিল, ভালো আর মন্দ ! প্রাণটা আছে এই যা।

পুরুষমানুষ একজনকে সঙ্গে আনতে পারলে না ? ধরো যদি পথে কোনো বিপদ ঘটে ? তুমি একা মেয়েমানুষ—

কে আর আছে !—বলিয়া কুসুম ছইয়ের বাহিরে মাঠের দিকে একবার তাকাইল; পুনরায় কহিল, আছেন ভগবান, দুঃখীর আশ্রয়।—বলিয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কুসুমের বয়স কম নয়, বাইশ চব্বিশ হইবে। অনেক কথাই তাহার সম্বন্ধে শুনিয়াছি, কিন্তু কোনো কথা বিশ্বাস করিবার মতো তাহার ভাবভঙ্গী দেখি নাই। নীতির মূল্য আমার জানা আছে সুতরাং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিব না। কুসুম সংসার করে নাই এই পর্য্যন্তই আমি জানি। কিন্তু বড় বউয়ের ধারণা অন্যরূপ, কোনো যুবতী স্ত্রীলোককেই তিনি বিশ্বাস করেন না, কুসুমের সম্পর্কে নানা কারণ দেখাইয়া তিনি তাহাকে এখানে আনিতে ঘোরতর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আমারই জন্য সে আসিতে পারিয়াছে। তাহার সকল ঝক্কি আমাকেই পোহাইতে হইবে। আমারই যত জ্বালা !

কুসুম কহিল, আর বোধ হয় দেরি নেই, কেমন ? গোরুর গাড়ীর ধকলে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল। ধন্যি তীর্থ ! আঃ অপরাধ নিয়ো না, বাবা যজ্ঞেশ্বর।—বলিয়া পথের দিকে সে একটা প্রণাম জানাইল।

বলিলাম, এত আরামপ্রিয় হ'লে পুণ্যি করা চলে না।

ম্লান হাসিয়া কুসুম কহিল, আমার পুণ্যি তোমাদের পায়ের তলায়। বাবার মাদুলির জন্যেই আসা, নৈলে,—

নৈলে কি ?

তুমি শুনলে রাগ করবে ঠাকুরমশাই, পুণ্যির লোভ আমার একটুও নেই, আমার দেবতা তোমরাই, তোমাদের সেবা করলেই আমি ধন্য। বাবা যজ্ঞেশ্বর আছেন আমার বুকের মধ্যে।

বলিলাম, তবে চুপ ক'রে থাকো।

কুসুম রাগ করিয়া কহিল, তোমার কেবল ওই এক কথা, আমি কি গোরু যে মুখ বুজে থাকব ? ঠাকুরমশাই, তোমার মেজাজ দেখছি ভারি গরম ! সঙ্গে এনে মাথা কিনেছ, কেমন ? বলে—'নিজের খাবো, নিজের নেবো,

কেবল মাস্তর সঙ্গে যাবো !' তোমার গায়ে বড়োমা'র হাওয়া লেগেছে !

হাসিয়া বলিলাম, বড়বউয়ের ওপর এত রাগ কেন তোমার? ব্রাহ্মণের মেয়ে ব'লে ?

কুসুম জিব কাটিল। বলিল, ওমা, শোনো কথা ! রাগ করব ঠাকুরের ওপর ? সাত জন্ম নরকবাস হবে যে ! বলছিলুম আমার বড্ড জ্বর হয়েছে, বোধ হয় আমারই মেজাজ ভালো নেই—গাড়ী থেকে নামলেই বাঁচি।

জ্বর হয়েছে ? কই, আগে বলোনি ত ?

পথে এসে জ্বর হোলো।

দুশ্চিন্তায় পড়িলাম। অসুখ বাড়িলে চিকিৎসা করিবার সুবিধা নাই, মহকুমা শহর এখান হইতে অনেক দূরে। যজ্ঞেশ্বরের গ্রামে আশ্রয় বলিতে কোথাও কিছু নাই, দুই একটা হোগলার চালা আছে তাহাতেই কোনো মতে তিন রাত্রি বাস করিতে হইবে। যদি আগে হইতে সেখানে যাত্রীর ভিড় হইয়া থাকে তবে হোগলার চালাও না মিলিতে পারে। সম্মুখে শীতের রাত্রি, মাঠের কন্‌কনে বাতাস, গ্রামের অন্ধকারে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহাও এক সমস্যা—ইহার ভিতরে রোগীর কোনো সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। কুসুমের উপর এইবার সত্যই রাগ হইল।

বলিলাম, বাপ অকর্ম্মণ্য, তার ওপর তোমার জ্বর, আমাদের কী বিপদে ফেললে বলো ত ? দেখবে কে তোমাদের ?

যজ্ঞেশ্বরের গ্রাম আসিয়া পড়িয়াছে, দূরে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল, দুই একটা টিম্‌টিমে আলো ইহারই মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেছে। শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সেইদিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কুসুম কহিল, দেখবেন তিনিই যিনি দেখবার মালিক !

রুষ্টকণ্ঠে কহিলাম, কে তিনি বলো ? আমি, না ভগবান ? কোন দুর্ভাগ্য ?

কুসুম কহিল, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমিই আমাদের ঠাকুর।

কথায় কথায় তাহার এই প্রগাঢ় ভক্তির আতিশয্য, ইহা তাহার বিদ্রূপ অথবা আন্তরিক বিশ্বাস, তাহা এখনও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ছোটজাতের ভিতরে আজকাল বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। নিকটে দুই চারিটি তালগাছ ঘেরা একটি জলাশয়। সম্মুখে প্রকাণ্ড মন্দির। এই মন্দিরের দেবতা বিশেষ জাগ্রত, ইহা বাংলার বিখ্যাত তীর্থ। কয়েকদিন আগে মেলা হইয়া গিয়াছে তাহার চিহ্ন এখানে ওখানে বর্ত্তমান। আমাদের সহিত এতগুলি যাত্রী দেখিয়া পাণ্ডা আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, তুমি সরো, যা বলতে হয় আমি বলছি। তিনি বেঁচে থাকতে আমার অনেক দেশ বেড়ানো আছে। আমাকে সাধারণ মনে ক'রো না।

আমি সরিয়া গেলাম। বড়বউয়ের গলার আওয়াজে যে দম্ভ প্রকাশ পাইল তাহা আমার পরিচিত। তাঁহার স্বামী ছিলেন রায় বাহাদুর, অনেক সম্পত্তির মালিক, তেজারতি ব্যবসায় ছিল তাঁহার—তিনি অনেক দেখিয়াছেন। পাণ্ডাঠাকুরের সহিত আলাপ করিয়া তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে আতপ চাল, জ্বালানি কাঠ ও কিছু সব্জি পাওয়া যাইবে এবং যে হোগলার চালাটা এখনো কাৎ হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে সেটি বড়বউ নিজে তাঁহার বোনপোকে লইয়া দখল করিবেন। আমরা সবাই এই ব্যবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া গেলাম, কারণ বড়বউয়ের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য না দেখিলে আমাদের উপায় নাই। প্রথমত তাঁহার স্বামী ছিলেন রায়বাহাদুর, তিনি ডেপুটি-গিন্নি ; দ্বিতীয়ত তিনি উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ কন্যা, বিত্তশালিনী ! তাঁহার বাড়ীতে মন্দির, ঠাকুরের গায়ে সোনা রূপার গহনা, তাঁহার গোয়ালে গরু, সিন্দুকে টাকা, কোম্পানীর কাগজ এবং পাটের কলে তাঁহার শেয়ার। বহু বহু তীর্থে তিনি গো-দান, ভূমি-দান, স্বর্ণ-দান করিয়া অপরিমেয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। জীবনে তাঁহার কেবল একটিমাত্র দুঃখ এই যে তাঁহার সন্তান নাই। যাহা হউক, আমরা চৌদ্দটি প্রাণী কেমন করিয়া কি ভাবে রাত্রিবাস করিব তাহা আহারাদির পরে ভাবিব, কিন্তু কুসুম ও তাহার বাপকে চালার ভিতরে না রাখিতে পারিলে বিপদ ঘটিবে এই মনে করিয়া আমি পুনরায় অগ্রসর হইয়া কহিলাম, দেখুন বড়মা, আপনি যদি পাণ্ডার বাড়ীতে জায়গা নেন্ তবে ভালো হয়। জায়গার বিশেষ অভাব ঘট্‌ছে।

বড়বউ কহিলেন, কেম ?

বলিলাম, কুসুম আর ওর বাপকে চালার মধ্যে জায়গা দিতে হবে, ওদের বড় অসুখ।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বড়বউ বলিলেন, হুঁ। আমি কানা নই, বোকা নই, সবই সচক্ষে দেখেছি। সমস্ত পথটা পাশাপাশি গাড়ীতে ব'সে হাসি তামাসা করতে করতে এসেছ। বুঝলুম তোমাকে, দেশে ফিরে গিয়ে সব বল্‌ব। নষ্ট-দুষ্টুকে আমি দেবো জায়গা ছেড়ে?

কী বলছেন আপনি?

বড়বউ চীৎকার করিলেন,—তুমি না বামুনের ছেলে? তুমি না ডাকসাইটে বিদ্বান? একটা ইতিজাতের মেয়ের সঙ্গে···এই তোমার রুচি? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

বলিলাম, এটা বিদেশ, আপনি চেঁচাবেন না।

কান ভারি ক'রে দিয়েছে, কেমন?—বড়বউ বলিতেছিলেন, ওকালতি করতে এসেছ ওই একটা ঢলানে ছুঁড়ির পক্ষ নিয়ে? আমার ত্রিসীমায় আসতে মানা ক'রে দিয়ো, জায়গা আমি দিতে পারব না।

জায়গা তিনি না দিন্ কিন্তু নিরপরাধ একটি মেয়ের চরিত্রের প্রতি এমন কদর্য্য কটাক্ষ, ইহা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই হজম করিতে হইল। তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠা, তাঁহার সম্মান আমাদেরই রাখিতে হইবে, তাঁহার দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া চলিব—এই কথা ভাবিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সংসারে আপোষ না করিয়া চলিলে উপায় নাই, অন্যায় ও অবিচারকে সহনযোগ্য না করিয়া লইলে অশান্তি বাড়িবে বৈ কমিবে না।

বুড়া বাপকে লইয়া কুসুম এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। সে কেবল পরিশ্রমী নয়, অত্যন্ত অস্থির আর চঞ্চল, এক জায়গায় তাহাকে কখনো বসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কিন্তু নূতন জায়গায় এমন ভাবে তাহাকে নিষ্ক্রিয় দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। কহিলাম, কুসুম, তোমার জ্বর বুঝি বেড়েছে?

বুড়া বাপ কম্পিত হাতখানা তুলিয়া কন্যার মাথায় রাখিল। কুসুম কহিল, বেড়েছে যেন। আঃ মাথায় বড় যন্ত্রণা!

আশ্চর্য্য মানুষের মন। কাল হইতে এই মেয়েটির প্রতি সকলের অবজ্ঞা আর দুর্ব্যবহারের অন্ত নাই, ইহাকে অশুচি হিসাবে দেখিবার কেমন একটা আপ্রাণ চেষ্টা সকলের—অথচ ভিতরে ভিতরে ইহারই প্রতি আমার একটা অকারণ স্নেহ জমিয়া উঠিয়াছে। সকলে ইহার বিপক্ষে গিয়াছে—তাই বোধ করি ইহাকে আমার মমতার আশ্রয় দিবার জন্য মন লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি? কেন তাহার প্রতি আমি এমন সহৃদয় হইতেছি? সে একজন যুবতী স্ত্রীলোক বলিয়াই কি আমার এই পক্ষপাতিত্ব? কই, নিজের ভিতরে ত এখনও আসক্তির আভাস খুঁজিয়া পাই নাই! সে অবনত জাতির মেয়ে, তাহার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া কি বর্ণহিন্দুর উদারতা দেখাইতেছি, আপন আভিজাত্য প্রকাশ করিতেছি? নয়ত কি পরোপকার করিয়া আত্মাভিমানকে তৃপ্ত করিতেছি? কিছুই বুঝিতে পারি না, কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, তাহার অথবা তাহার পিতার কোনো বিপদ ঘটিলে আমিই সেজন্য দায়ী হইব, সে কলঙ্ক আমাকেই স্পর্শ করিবে।

কাছে দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমাকে কিন্তু ওষুধ খেতে হবে কুসুম, জ্বরের ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে।

বাবার মন্দিরে এসে ওষুধ খাবো?—কুসুম দুর্ব্বল দেহে সরিয়া আসিয়া আমার পায়ের কাছে এক প্রণাম করিয়া কহিল, তোমাদের আশীর্ব্বাদেই সেরে উঠ্‌বো, ঠাকুরমশাই। ওষুধ আমি খাবো না।

অনুরোধ মানিল না, দেখিতেছি আমাকে ভোগাইবে। কিন্তু এখন আর এদিকে নজর দিবার সময় নাই। আমার হাতেই সকলের আহারের ব্যবস্থা। তাহাদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড়বউকে লুকাইয়া চিঁড়ে, মুড়কি ও দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। তাহাদের শুইবার জায়গা মন্দিরের ভিতর মিলিবে না, হোগলার চালাগুলি আমাদের দল পূর্ব্বেই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ময়রার দোকানে জায়গা নাই, গ্রামের ঘরে কে রাত্রে জায়গা দিবে—সাত পাঁচ ভাবিয়া এক কৌশল আবিষ্কার করিলাম। গাছের নীচে ঠেকো দিয়া দুইখানি গোরুর গাড়ী একত্র করিয়া এক অদ্ভুত উপায়ে আশ্রয় প্রস্তুত করা গেল। তিনটা রাত্রি কোনোরূপে তাহার ভিতরে পিতা ও কন্যার কাটিয়া যাইবে। সে-রাত্রে আমাকেও একখানা গাড়ীর ভিতরে

জায়গা লইতে হইল। শীতকাল বলিয়াই বিপদ, গ্রীষ্ম হইলে আরাম পাওয়া যাইত।

যাত্রীর-কলরবে সকালবেলা ঘুম ভাঙিল। মেয়েরা স্নান সারিয়া পূজার আয়োজন করিতেছে। বড়বউ ডালা সাজাইতেছিলেন। পাণ্ডা অদূরে দাঁড়াইয়া পূজা-বিধি নির্দ্দেশ করিতেছিল।

হঠাৎ বড়বউ পিছন দিকে দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কী আক্কেল তোর কুসুম, এই কি পেন্নাম করবার সময়? চোখ পড়লো তোর, ডালাটা যে নষ্ট হয়ে গেল! ভক্তিতে গদগদ, কে তোর পেন্নাম চেয়েছিল শুনি? পাণ্ডাঠাকুর, নতুন সাজ নিয়ে এসো, এ ডালা আমি যজ্ঞেশ্বরকে কিছুতেই দিতে পারব না, আমার অপরাধ হবে। বলি, এত ভক্তি কেন লা? কাল হাতে-নাতে ধরা পড়েছিলি কিনা, তাই ঘুষ দিয়ে খুশি করতে এলি, কেমন?

কুসুম অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বুঝতে পারিনি বড়মা, আমি মনে করেছিলুম—

পাশে রাঙাদিদি বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কি মনে করেছিলি কুস্মি? ওলো, বয়েস হয়েছে আমাদের, কিন্তু কানা হইনি। দেখতেই পেলুম, শকুনি আকাশে উঠলেও ভাগাড়ে নজর রাখে!

কুসুমের চোখে জল আসিয়াছিল, কহিল, আমি ওঁর আশীর্ব্বাদ চাইতে এসেছিলুম, উনি যে বড়!

মাসিমা কহিলেন, মুখখানা তোর মিষ্টি, তাই এযাত্রা বেঁচে গেলি বাছা। অনিষ্ট ত করলি, এখন স'রে যা এখান থেকে।

কুসুম সরিয়া যাইতেছিল, রাঙাদিদি কহিলেন, এই যেন মনে থাকে। আমাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ত এলি, মন্দিরে গিয়ে পুজোয় বসবো, তখন যেন দুম্ ক'রে গিয়ে হাজির হোসনে।

বড়বউ কহিলেন, সঙ্গে এনেছি, কাল থেকে হাড় জ্বালিয়ে খেলে। জাতধম্ম নিয়ে এখন ওর সংস্রব এড়াতে পারলে বাঁচি। বলি ও কি, আবার কোন্‌দিকে যাস লা?

কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, পুকুরে।

পুকুরে? ভারি তোর বুকের পাটা, না? পুকুরের জল ছুঁয়ে আসবি, আমরা সবাই খাবো কি? ধর্ম্মের ভয় নেই তোর? পায়ের জুতো মাথায় উঠ্‌তে চায়, কেমন? ওই ত, আর একটা ডোবা আছে ওদিকে, যেতে পারিসনে? গতর নেই?

কুসুম ভয়ে ভয়ে কহিল, ওটার জল নোংরা!

সবাই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল,—নোংরা? কত ঢঙই দেখালি, কুসুম! 'মোটে মা রাঁধে না, তায় পান্তা আর তপ্ত!' পেলি এই খুব, আবার নোংরা! তুই জাতটা কি শুনি? বল্ দিকি সবার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে?

কুসুম চলিয়া গেল। আমার মাথা হেঁট হইল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমি কহিলাম, ঠাকুর, পুজো কখন্ হবে?

বড়বউ কহিলেন, তোমার আর সেজন্য মাথা ব্যথা কী বলো, পুজো ত আমাদের। তুমি পুরুষমানুষ, জল-টল খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াওগে। খাবার সময় ডাক্‌বে এরা।

রাঙাদিদি কহিলেন, চুলের টিকিটি ত তোমার দেখবার জো নেই, এখন যে এলে খবর নিতে? মতলব কি?

বলিলাম, আমার নিজের কোনো কাজ নেই; পুজোর সময় কুসুম ওর বাপের মাদুলিটা যজ্ঞেশ্বরকে ছুঁইয়ে নেবে তাই বলছিলুম। আপনাদের পুজো কখন্?

বড়বউ হাতের কাজ ফেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। কহিলেন, কি বলচো? কা'র মাদুলি কা'কে ছোঁয়াবে?

বলিলাম, কুসুম ওর বাপের জন্য মাদুলিটা—

বড়বউ হুঙ্কার দিলেন। কহিলেন, পুজোটা ত কুসুমের বাপের পয়সায় হচ্ছে না, এক পোঁট্‌লা টাকা নিয়ে আমি এসেছি তীর্থে, পুজোটা আমার। যতক্ষণ আমার টাকায় পুজো ততক্ষণ আমার ঠাকুর—

পাণ্ডা কহিল, বটেই ত, মা আমার বড় উঁচু ঘরের মেয়ে!

আমার পুজোর সময় ওর মাদুলি ছোঁয়াতে দেবো?—বড়বউ চীৎকার করিতে লাগিলেন, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা, কেমন? বলোগে যাও তোমার পেয়ারের কুসুমকে, ভণ্ডামী করলে ঠাকুরের দয়া হয় না, মনের ময়লা তুলে ফেল্‌তে হয়। বাবা যজ্ঞেশ্বর ফাঁকি সইবেন না!

রাঙাদিদি আর মাসিমা আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, দেখলে পাণ্ডাঠাকুর, জাতসাপ এনেছি সঙ্গে, বড়বউ আমাদের ঘেঁদি-পেঁচির ঘরের মেয়ে নয়, দেখলে?

পাণ্ডা ঘাড় নাড়িয়া হাত কচ্‌লাইয়া কহিল, বটেই ত।

আমার দিকে ফিরিয়া ফস করিয়া পঞ্চুর মা কহিল,

তুমি ত দেখছি বাছা ঘরের শত্তুর বিভীষণ ! টাকা খরচ ক'রে বড়বউ তোমাকে নিয়ে এলেন, তুমি দলছাড়া হ'য়ে ছোট-জাতের দলে গিয়ে ভিড়লে ? এ তোমার কেমন রীত, বাবা ?

আমি জানি ইহারাও তিন চারজনে বড়বউয়ের টাকায় তীর্থ করিতে আসিয়াছে, চাটুবাক্য শোনানো ছাড়া ইহাদের আর কোনো লক্ষ্য নাই—ইহা জানিয়াও আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কী বলিব ? কী বলিয়া বুঝাইব, মনুষ্যত্বকে মারিয়া তীর্থধর্ম্ম হয় না !

কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মাসিমা পঞ্চুর মা'র কথার জবাব দিলেন—এই ক'রেই ত বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে গেল !

ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। চালার পাশ দিয়া আসিয়া ডোবাটা পার হইয়া অদূরে কুসুমকে দেখা গেল। গোরুর গাড়ীর একখানা চাকার গোড়ায় বুড়া বাপকে লইয়া সে ছোট একটা ঘরকন্না পাতিয়াছে। কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলাম সে কাঁপিতেছে, জ্বরে সে পুড়িয়া যাইতেছে, গলার আওয়াজে মনে হইল বুকে সর্দ্দি বসিয়াছে। কাছে আসিতেই সে মুখ তুলিল, দেখিলাম তাহার গাল বাহিয়া অশ্রু নামিয়া আসিয়াছে। বলিলাম, কুসুম, কাঁদো কেন ? কি হোলো ?

কুসুম অশ্রুজড়িত কণ্ঠে জানাইল, ডোবার জল লইয়া সে অতি কষ্টে ফিরিতেছে এমন সময় অসাবধানবশতঃ তাহার ছায়াটা মানদাদিদির গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল—মানদাদিদি অকথ্য অপমান করিয়া তাহাকে মারিতে আসিলেন। বড়মা'র বোনপো তাহার পিঠে খানিকটা কাদা ছুড়িয়া দিয়াছে।

তাহার বুড়া বাপ শীর্ণকণ্ঠে ম্লান হাসিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, ওর মনে থাকে না যে ও ছোটজাত। ছেলেমানুষ কিনা তাই অপমানটা এখনো গায়ে লাগে। থাম্ বাবা থাম্, হিসেব ক'রে চল্।

আমি হাত নাড়িয়া হাসিয়া কহিলাম, আরে এ আর কতটুকু ? শক্তিমান করেছে অত্যাচার দুর্ব্বলের ওপর। অতি সাধারণ কথা। বেশ, আমাকে বামুনের ছেলে ব'লে মানো ত ? এই আমি গলবস্ত্র হ'য়ে তোমার কাছে—বলি ও কুসুমসুন্দরী—

দুর্ব্বল দেহে কুসুম হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, কী করছ,

আমি কৌতুক অভিনয় করিয়া কহিলাম, হে কুসুম-সুন্দরী, দেবতা সাক্ষী করিয়া আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিই যে, পরজন্মে তুমি এক সনাতন হিন্দু-পরিবারে বড়বউ-রূপে জন্মগ্রহণ করিবে !

ওমা, ওকথা ভাবলেও যে আমার পাপ হবে, ঠাকুর-মশাই ?—বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা নোয়াইয়া আমাকে প্রণাম করিল। কহিল, সকলের পায়ের তলায় থাকব, সবাই আমাকে মাড়িয়ে যাবে, সেই আমার অক্ষয় পুণ্য ঠাকুর।

তোমার মুণ্ডু। বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কুসুমের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আমি প্রায় একঘরে হইয়া আছি। বাস্তবিক দলছাড়া হইয়া অন্য দলে গিয়া ভিড়িলে মানুষের একটু লাগে বৈ কি। পঞ্চুর মা ঠিকই বলিয়াছে। দলাদলি করিয়াই বাঙলা দেশের যত অধঃপতন ! আর যাহাই হউক, বড়বউ গাড়ী ভাড়া দিয়া আনিয়াছেন। নিজের অপরাধটা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি। কিন্তু এত করিয়াও কুসুমকে একপান্ ঔষধ খাওয়াইতে পারিলাম না। তীর্থস্থানে ঔষধ স্পর্শ করিতে নাই, দেবতার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়—এই বলিয়া যে কুসুম বাঁকিয়া বসিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার প্রতিজ্ঞা ভাঙে। আমি চিকিৎসক নই, অসুখ তাহার কতদূর বাড়িয়াছে, রোগ কতদূর গভীরে নামিয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ইহা দেখিতেছি সে যেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কেমন যেন হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল কথার অর্থ বোঝা যায় না। সকলকে লুকাইয়া তাহার মাথায় একবার হাত দিয়া দেখিলাম—তাহা এত গরম যে, আমার হাতখানা কিছুক্ষণ ধরিয়া জ্বালা করিতে লাগিল। নিজে সে কিছু খাইবে না, বুড়া বাপ তাহাকে কিছু খাওয়াইতে অক্ষম, আমি বাটি ধরিয়া তাহাকে অনুরোধ করিতে পারি কিন্তু যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইবার সাধ্য আমার নাই। তাহার সেবা করিবার জন্য নিকটের গ্রামে গিয়া একটি স্ত্রীলোককে খুঁজিয়া আনিয়াছিলাম কিন্তু মানদাদিদি তাহাকে কি যেন বলিল, সে আমাকে না বলিয়া পলাইয়া গেল। কুসুম আমাকে এখানকার বেশ জব্দ করিল দেখিতেছি। আশ্চর্য্য, নিজের মাথাব্যথা

দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া যাই। পরের জন্য ভাবা, পরের সেবা করিবার আগ্রহ আমার কোষ্ঠিতে লেখে নাই—কুসুম যেন আমাকে হঠাৎ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এক অদ্ভুত জারক রসে একটু একটু করিয়া পাকাইয়া লইয়াছে। এই নীচজাতির মেয়েটা যেন আমার উপর অকারণ অসহ্য উপদ্রব করিতে সুরু করিয়াছে; তাহার যত কিছু অভাব-অভিযোগ, যত কিছু তাহার ইহজগতের দেনা-পাওনা যেন আমার উপর দিয়াই সব মিটাইতে চায়। আজ তৃতীয় দিন, কাল সকালে দেশে যাত্রা করিবার পালা, কিন্তু পুনরায় গোরুর গাড়ীর ধকল কুসুম কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কথা ভাবিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম।

আমাদের কাজ আর কিছু বাকি নাই, পূজা-আর্চ্চা, মানৎ, দান-পুণ্য সবই শেষ হইয়া গেছে। কুসুমের বুড়া বাপ মাদুলি পাইয়াছে, পাণ্ডার মোটা দক্ষিণা মিলিয়াছে—এবার রাত্রি প্রভাত হইলেই আমরা গাড়ীতে উঠিব। বিছানা-পত্র বাদ দিয়া পুঁটুলি-পোঁট্‌লা বাঁধা হইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে পাণ্ডাঠাকুর মোটা মোটা কয়েকখানা বই লইয়া হাজির হইল। যাইবার আগে 'কথা' শুনিতে হয়, তারপর 'সুফল' করিতে হইবে, তারপর ঠাকুরের প্রসাদ মিলিবে। শালগ্রাম সঙ্গেই ছিল, পাণ্ডাঠাকুর নামাবলী পাতিয়া আসর প্রস্তুত করিল। আমরা সবাই মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম।

তিন চারিটা হারিকেন্-লণ্ঠন আমাদের সঙ্গে ছিল, সেগুলি জ্বালাইয়া মন্দিরের বহিঃচত্বরে সতরঞ্চি ও কম্বল পাতিয়া আসর বসিল। প্রধান শ্রোত্রী বড়বউ, তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকজন গ্রহ-উপগ্রহ। বড়বউ 'নামের' রসাস্বাদন করিতে পারিলেই হইল, আর যদি কেহ বুঝিতে না পারে তবে সে চুপ করিয়া থাকিবে, উচ্চবাচ্য করিবে না। তিনি এমন করিয়া বসিলেন যেন এই মন্দির তাঁহার স্বামী রায়বাহাদুরের সম্পত্তি, আমরা সবাই তাঁহার অনুগত প্রজা, পাণ্ডাঠাকুর তাঁহার ক্রীতদাস। বাবা যজ্ঞেশ্বর জাগ্রত দেবতা, তিনি যদি প্রসন্ন হন্ তবে বড়বউয়েরই প্রতি হইবেন, পুণ্য বলিয়া যদি কোনো বস্তু থাকে তবে তাহা বড়বউই লাভ করিবেন, একথা আমরা সবাই জানি। দেবলোকের সকল রহস্য যেন বড়বউয়ের করতলগত, তাঁহার মুখের চেহারা যেন অনেকটা এমনই।

গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা চত্বরের নীচে আসিয়া বসিয়াছে। তাহাদেরই একান্তে একটি হারিকেন্-লণ্ঠন মুখের কাছে রাখিয়া শ্রীমতী কুসুমসুন্দরী তাহার রোগজর্জ্জর দেহ লইয়া মরিতে মরিতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বসিবার সাধ্য তাহার নাই, মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তবু তাহার 'নামবন্দনা' শুনিয়া যাওয়া চাই। ছোটজাত, তাই পুণ্যের প্রতি তাহার এত লালসা, বোধহয় ভাবিতেছে এজন্মে ফাঁকি দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পরজন্মে সনাতন হিন্দু-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবে! পঞ্চুর মা তাহাকে দেখিয়া রাঙাদিদির গা টিপিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিলেন। মাসিমা চুপি চুপি কহিল, ছ্যাখ্ ভাই ছ্যাখ্ মানদা, ছুঁড়ির চোখ দুটো যেন বন-বেড়ালের মতন জ্বলছে। তবু ভালো যে ধর্ম্মে মতি হয়েছে এতক্ষণে।

পঞ্চুর মা কহিল, ও বড়বউ, ভাগ্যি তুমি এসেছিলে মা, তোমার পয়সায় অনেক পাপী উদ্ধার হোলো।

পাণ্ডা তখন বলিতেছিল, কবে কোন্ মুনি কি যেন অসাধ্য সাধন করিবার তপস্যায় এইখানে বসিয়াছিল, এমন সময় আকাশপথে যাইতেছিলেন ভোলা মহেশ্বর, মুনির তপস্যায় খুশি হইয়া তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। মুনি বর প্রার্থনা করিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা, তোমার পথ চাহিয়া ছিলাম, আমাকে উদ্ধার করো। পতিতপাবন মহেশ্বর তাহার প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বর দিলেন। মুনি দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গের পথে চলিয়া গেল! সেই হইতে নিকটের ওই পুষ্করিণীর নাম হইয়াছে 'পতিতপাবন কুণ্ড।' ওখানে স্নান ও পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদান করিলে সকল পাপক্ষালন হয়। এই মহাতীর্থে যে ভাগ্যবানের মৃত্যু ঘটে, সে গোলকধামে গিয়া মোক্ষলাভ করে!

বড়বউয়ের চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল, তাঁহার সঙ্গিনীরা আঁচলে চক্ষু মুছিতেছিল। কুসুমের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে মাটিতে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতেছে; প্রণাম আর তাহার শেষ হয় না। দেখিয়া আমার রাগ হইল। বিকালবেলা তাহাকে মানা করিয়াছিলাম সে যেন নড়াচড়া না করে, তবু সে কাঁথা মুড়ি দিয়া বাহিরের এই ঠাণ্ডায় দুই ঘণ্টা কাটাইতেছে। অবুঝ,

অবাধ্য, অশিক্ষিত ছোটজাত, তাহাকে আস্কারা দিয়া অন্যায় করিয়াছি, আর তাহাকে আমি সাধ্য-সাধনা করিতে পারিব না। সে গোল্লায় যাক্।

সকলে 'সুফল' করিল, পাণ্ডার আশীর্ব্বাদ লইল, প্রসাদ গ্রহণ করিল। বড়বউ অনেকগুলি টাকা পাণ্ডাকে প্রণামী দিলেন। একখানা মোটা খাতায় সকলের নাম, ঠিকানা ও বংশতালিকা লেখা হইল। আমার কিন্তু তখন নজর ছিল কুসুমের দিকে। ইহাদের সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি তাহাকে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করি তবে তাহা বিসদৃশ হইবে। তাহার প্রতি আমার দরদ বিন্দুমাত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে কানাকানি হাসাহাসির আর অন্ত থাকিবে না। তাহাতে আমার জ্বালা বাড়িবে, কুসুমের যন্ত্রণা বাড়িবে। মেয়েরাই মেয়েদের চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রকাশ করিবার যত চেষ্টা করে, এমন পুরুষে করে না। ইহাদের নিজেদের ভিতর সহমর্ম্মিতা নাই, সংসারে কোনো বড় কাজ তাই ইহারা করিতে পারে না।

চাহিয়া দেখিলাম, কুসুম কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এখনি হয়ত সে টাল্ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া যাইবে। ভাবিলাম, তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলি। কিন্তু পারিলাম না, ইহাদের সকলের দিকে একবার চাহিয়া নিজেকে সংযত করিলাম। কুসুম অগ্রসর হইয়া চত্বরের উপর মাথা ঠেকাইয়া উপস্থিত সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিল। আমাদের দেবতা যজ্ঞেশ্বর, কিন্তু কুসুমের দেবতা আমরা সকলে। আমাদের পায়ের কাছে পড়িয়া যদি তাহার এই মুহূর্ত্তে হার্ট্-ফেল্ করে, তবে সে গোলকধামে গিয়া মোক্ষলাভ করিবে। বড়বউ এবং আর সকলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গর্ব্বসুখে গদগদ হইয়া হাসিমুখে কহিলেন, সুমতি হোক বাছা তোর, সুমতি হোক। ধর্ম্মপথে থাকিস্, পরের জন্মে বামুনের পায়ের ধুলো তোর জুটবে। ও আবার কি লা? টাকা বা'র করিস্ কেন?

কুসুম কম্পিতকণ্ঠে কহিল, পাণ্ডাঠাকুরের প্রণামী বড়মা।

সকলের মুখের চেহারা তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। রাঙাদিদি কহিল, ধন্যি মেয়ে তুই। কিছুতেই হার মানবিনে, কেমন? এলি আমাদের ওপর টেক্কা দিতে, এই ত? কিন্তু তোর টাকা পাণ্ডাঠাকুর নেবে কেন? কত ন্যাকাপনাই দেখালি, কুসমি।

বড়বউ কহিলেন, পুণ্যিতে আর কাজ নেই, ওই টাকায় বাপের ওষুধ কিনে দিস। যা, পালা এখান থেকে।

টাকাটা মুঠোর মধ্যে রাখিয়া কুসুম হারিকেন্-লণ্ঠনটা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে ফিরিয়া গেল।

শীতের ঠাণ্ডায় আর বসা চলে না, সকলে একে একে উঠিয়া যাইবার পর আমি গ্রামের দিকে হাঁটা দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম গোরুর গাড়ীর ভিতরে কাঁথা মুড়ি দিয়া কুসুম শুইয়া আছে। অকর্ম্মণ্য বুড়া বাপ তাহার কোনো সাহায্যেই লাগে নাই, কম্বল মুড়ি দিয়া গাড়ীর চাকার পাশে শুইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। মাদুলি পাইয়া বুড়া বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে তাহাকে ভাত, ছানা আর বাদাম খাওয়াইয়াছি। কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কন্যার পিতাকে ঘুষ দিয়া খুশি রাখিতেছি—বুড়া এই কথা ভাবিতেছে কিনা কে জানে! অভিজাত সমাজের লেখাপড়া জানা লোক হইলে এতক্ষণ আমার 'সাইকোলজি' ঘাঁটিয়া আমাকে কুকুর বানাইয়া ছাড়িত।

মাথার কাছে গিয়া ডাকিলাম, কুসুম?

তাহার গলার ভিতর দিয়া একরূপ অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে। সে সাড়া দিল না। আবার ডাকিলাম, বলিলাম, কুসুমসুন্দরী, গরম দুধ এনেছি, খেয়ে ফেলো।

এইবার সে সাড়া দিল, কহিল, দুধ আমি খাবো না, ঠাকুরমশাই।

বিলক্ষণ! খাবে বৈ কি, অনেক দূর থেকে এনেছি, লক্ষ্মী দিদি আমার, এটুকু খাও। তুমি কাঁদচো বুঝি?

মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, কথা কহিল না। আমি একবার পিছনের অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাইলাম। তারপর পুনরায় কহিলাম, কুসুম, তোমার বয়সটা খারাপ, এখানে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ সাধাসাধি করাটা ভালো দেখাবে না, উঠে খেয়ে নাও।

এইবার সে উঠিল। কহিল, আচ্ছা খাবো, তুমি রেখে যাও, ঠাকুরমশাই। দাঁড়াও একটু, আর একটা কথা—বলিতে বলিতে অতিকষ্টে সে গাড়ী হইতে নামিল। তারপর একটা পুঁটুলি এলাইয়া একখানা বৃন্দাবনী সূতী শাল বাহির করিল। আমার পায়ের কাছে শালখানা রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, অনেক করেছ তুমি, বড় সাধ এইখানা তোমাকে প্রণামী দেবো। আমার সঙ্গে আর কিছু নেই, থাক্‌লে—

হাসিয়া কহিলাম, আমার যে জাত নষ্ট হবে, কুসুম ?

তোমার জাত ? তোমার কোনো জাত নেই, ঠাকুর মশাই ?—বলিতে বলিতেই কিন্তু কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে হারিকেনের আলোয় মুখ তুলিয়া পুনরায় কহিল, ঠাকুরমশাই, তোমাদের অপমানেই আমি উদ্ধার হবো। নীচজাতের ঘরে জন্ম, তাই সকলের নীচে প'ড়ে আছি। কিন্তু ···কিন্তু আর কোনো পাপ আমি এ-জীবনে এখনো করিনি !

শালখানা মাথায় জড়াইয়া লইলাম। মনের ভিতরে একটু আবেগ জমিয়া উঠিয়াছে, পাছে তাহা এই বালিকার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এজন্য তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু পা বাড়াইতেই অন্ধকারে পাণ্ডাঠাকুর সাড়া দিয়া কহিল, বাবুমশাই, একটা কথা—

বলিলাম, কি বলো ?

ওই মেয়েটি আমাকে প্রণামী দিতে চেয়েছিল। ওদের সামনে নিতে পারিনি তখন···হেঁ···হেঁ···যতই হোক আমরা গরীব। টাকাটা কি আপনি চেয়ে দেবেন ? দয়া ক'রে যদি—

কুসুম তৎক্ষণাৎ টলিতে টলিতে আসিয়া টাকা দিয়া তীর্থগুরুকে প্রণাম করিল। তিন দিন ধরিয়া দেখিলাম, এমন মানুষ নাই যাহার পায়ে কুসুম মাথা লুটাইল না। সে যেন মানুষের পায়ের ধূলার চেয়েও অধম ! পাণ্ডা আলগোছে তাহার হাতে একটু প্রসাদ দিল, কুসুম সেই প্রসাদ মাথায় লইল।

দুইজনে ফিরিতেছি, দেখি অন্ধকারে আমার অলক্ষে হাতের ঘটির জলে টাকাটা ধুইয়া লইয়া পাণ্ডা ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল। বেচারি বড় গরীব !

মাঠের উপরেই কম্বল চাপা দিয়া পড়িয়াছিলাম। সকালবেলা গাড়োয়ানদের কোলাহলে ঘুম ভাঙিল। তখন সবেমাত্র ভোর হইতেছে। অন্ধকারের সহিত শীতের কুয়াসা জড়াইয়া আছে। এই ভোরেই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

কিন্তু গাড়োয়ানগণের কোলাহলের সহিত রাঙাদিদি, মাসিমা, মানদা ও বড়বউয়ের চীৎকারে আমি যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। তাহাদের সহিত কুসুমের বুড়া বাপ তাহার বাত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ লইয়া হাত পা ছুড়িতেছে। কানে আসিল, কুসুমকে পাওয়া যাইতেছে না। রাত্রে উঠিয়া কুসুম গা ঢাকা দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুধের ঘটি তেমনই পড়িয়া আছে।

অবাক হইলাম। কুসুম কোথায় পলাইল ? অত অসুখ লইয়া পলাইল কেমন করিয়া ? তবে কি অসুখ তাহার মিথ্যা ছলনা ? তবে কি স্ত্রীলোকের চরিত্র সৃষ্টিকর্ত্তারও অজ্ঞাত ? ঘুমজড়ানো চোখে আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম।

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই জানা গেল, কুসুম পলাইয়াছে বটে, তবে তাহার দেহটা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, বেশি দূর সে আমাদের কল্পনাকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। সকলে গিয়া দেখিলাম, বাবা যজ্ঞেশ্বরের মূল মন্দিরের বন্ধ দরজার চৌকাটে মাথা রাখিয়া শ্রীমতী কুসুমসুন্দরী ঘুমাইয়া আছে। ঠাকুরের চরণতলে যেন একটি শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। কুসুম পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না ; কুসুম ঘুমাইয়াছে, সে ঘুম আর ভাঙিবে না !

মোক্ষলাভ হোলো রে তোর, কুস্‌মি !—একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

চমকিয়া চাহিলাম। কুসুমের দুইটি বিবর্ণ চক্ষু প্রভাতের শুকতারার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমিও সেইদিকে চাহিলাম, কোথায় মোক্ষ ? কোথায় গোলকধাম ? স্বর্গ কোন্ পথে ? কোন্ পথ দিয়া কুসুম আমাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবার জন্য ছুটিল ? কোন্ পতিতপাবন তাহাকে ডাকিল ?

আমার মাথায় বৃন্দাবনী শালখানা জড়ানো ছিল ; ভাবিলাম, আমার দেওয়া দুধটুকুও গ্রহণ করে নাই, আমি তাহার শাল লইব কেন ? তৎক্ষণাৎ সেখানা খুলিয়া কুসুমের দেহ ঢাকিয়া দিলাম। তারপর উহাদের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আপনারা যাত্রা করুন, আমি ওর শেষের কাজ ক'রে বুড়ো বাপকে নিয়ে দেশে ফিরবো।

এতক্ষণ বড়বউ একটি কথাও বলেন নাই। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাঁহার চোখ কুসুমের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সে চোখ যেন প্রলুব্ধা বাঘিনীর মতো জ্বলিতেছে। আমার কথায় তাঁহার জ্ঞান ফিরিল, একটা অদ্ভুত বেদনা-ব্যাকুল আওয়াজ তাঁহার গলা দিয়া বাহির হইল। কহিলেন, যাক্, শেষ হয়ে গেছে !

মানদা কহিল, হ্যাঁ বড়বউ, ছুঁড়ি আমাদের ওপর খুব টেক্কা দিয়ে গেল !

বিপ্রলব্ধা

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সেতার আমার মরচেতে ছিল ভরা,
তার বদলিয়ে সুর বাঁধা হ'ল শেষ,
বাকী ছিল শুধু পিয়ানোটা ঠিক করা,
তাও হয়ে গেছে—বাজছে এখন বেশ।
ড্রয়িং রুমের আস্‌বাবে ছিল ধূলো
আয়না ছবিতে গিয়েছিল ঝুল ভরে ;
শোবার ঘরের ক্ষীণ কার্টেন্‌গুলো
বদ্‌লে আবার দিয়েছি নতুন করে।

ধব্‌ধবে শাদা দুধের ফেণার মত
বিছানা পেতেছি জোড়া খাট জুড়ে আজ,
সার্থক হবে সেলাই করেছি যত
কুশনে কভারে পর্দাতে কারুকাজ।
বেড্‌শীটে দিছি ফুল তুলে কোণে কোণে,
কেলি-কদম্ব কমল-কলির সাথে,
ড্রন্‌থ্রেড্‌ টেনে চারপাশে জালি বুনে,
—এম্‌ব্রয়ডারী করেছি নিজের হাতে।
মাথার বালিশে মরালমিথুন আঁকা,
রেশমী-তোষকে বনবসন্ত ছবি ;
—তিনটি বছর এ'দিনের আশে থাকা,—
আজ চোখে তাই রঙীণ ঠেকছে সবি।

শাড়ীটি পরেছি যথাসম্ভব 'নীট্‌',
গলায় কেবল একটি সোণার হার !
'অ্যাশেস্‌ অফ্‌ রোজ্‌' বড়ো তাঁর 'ফেভারিট্‌'
আজকে মেখেছি সেই সেণ্ট্‌ পাউডার।
সিল্‌ভার-গ্রে'তে সোণালী জরীর ফুল
এ জামা কাপড়ে কে জানে মানালো কিনা ?
বহুদিন বাদে বেঁধেছি আবার চুল,—
ভালো লাগতোনা একটি মানুষ বিনা !

ওরিয়েণ্ট্যাল কাণবালা দিছি কাণে,
ইজিপ্‌সিয়ান্‌-আর্ম্‌লেট্‌ দু'টি হাতে,
মিহি রুলি বালা মিনে চুড়ি মাঝখানে,
ফিলিগিরি-ফুল এঁটেছি খোঁপার সাথে।

রাত্রে সে যদি 'তেষ্টা পেয়েছে' বলে,
দেবো জল এই রূপোর গেলাসে করে,
কেওড়া মিশিয়ে ঠাণ্ডা বরফ জলে
থার্ম্মফ্লাস্কে রাখিগে' এখ্‌নি ভরে।
মশারীতে দিছি বকুল এসেন্স্‌ ঢেলে,—
শিয়রে রেখেছি আধফোটা চাঁপাগুলি,
নীলাভ রঙের আলোর বাল্‌ব্‌টা জ্বেলে
সন্ধ্যা হতেই ফ্যান্‌টি রেখেছি খুলি।
কেয়াখয়েরেতে নিজে মিঠেপান সেজে
ডিবেয় ভরেছি ছিটিয়ে গোলাপ জল !—

—ট্রেণ লেট্‌ নাকি ?—গেল যে আটটা বেজে !!
—ষ্টেশন থেকে তো ফির্‌ছেনা সুবিমল !!
তিনটি বছর বিলেতে কাটিয়ে আজ
ঘরের মানুষ ফিরে আসছেন ঘরে !
এবারেতে তাঁর আসুক যতই কাজ
দূরে যেতে আর দিচ্ছিনে এর পরে।
যদিই বিদেশে যেতে হয় ওঁকে ফের,
বোলবো,—আমাকে হবেই সঙ্গে নিতে।
তিনটি বছরে হয়েছি জব্দ ঢের,
বেঁচে থেকে যেন মরে আছি পৃথিবীতে।

ওরা নিয়ে গেছে মার্কেট্‌ থেকে ডালা
কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ করবে ষ্টেশনে তাঁকে।
আপনার হাতে গাঁথছি জুঁইয়ের মালা
আমি চুপি চুপি আড়ালেতে এই ফাঁকে।

ও—ইতো—ওই যে—আমাদেরি 'ক্যাডিলাক্'
অতো ধীরে গাড়ী বাড়ীতে ফিরছে কেন ?
মালা গাঁথা পরে সারবো, এখন থাক্,
কাঁপছে শরীর,—লাগছে কেমন যেন !

এত আনন্দ লুকুবো কেমন কোরে ?
ব্লাউজ্ সেমিজ গেল সব ঘামে ভিজে।
—শোফারটা গাড়ী চালাতে পারেনা জোরে,—
—হয়তো তিনিই হাঁকিয়ে এলেন নিজে !!
ওই—এসে গেছে ! জয় ভগবান ! জয় !
এইবেলা আমি লুকুই নিজের ঘরে।
প্রথম দেখাটা সবার সামনে হয়
এটা চাইনাকো,—না হয় হবেই পরে।

*   *   *   *   *

ষ্টেশন থেকে কি একা এলো রবি, সুবি ?—
—কেও ? ঠাকুরপো ?—মুখটা শুকনো কেন ?
···আসেননি উনি ?···ব্যস্ত আছেন খুবি ?···
···তার করেছেন ভাবিনে আমরা যেন ?···
বোম্বায়ে তিনি থাকবেন দিন বারো ?—
···কবে আসবেন জানাবেন চিঠি লিখে ?—
—বলা যায়নাকো, দেরী হতে পারে আরও—
···যাচ্ছো ?—আচ্ছা। ডেকে দিয়ে যেয়ো ঝীকে।

—কে যায় ওখানে ?—মহাবীর সিং ?—শোনো,—
এখনো লাইট্ জ্বলে কেন সব দোরে ?—
হুঁস্ তোমাদের কারুর নেইকো কোনো,—
সব আলোগুলো দাও গিয়ে অফ্ কোরে।

কারেণ্ট্ খরচ দেখনাকো কেউ চেয়ে,
জরিমানা হলে তবে বুঝি পারে টের্ !
বাবু নেই বলে আস্‌কারা সব পেয়ে
বেজায় নবাবী বেড়ে গেছে তোমাদের।

*   *   *   *   *

দামী শাড়ী পরা মহা এক জ্বালাতন ;
গরমে ঘামেতে আড়ষ্ট হয়ে থাকা !
খুলে ফেলে বাঁচি কাণবালা কঙ্কণ
ফুলের মালাটা কেন যে খোঁপায় রাখা !
—কে রে ?—ওঃহ্ ! দাই ?—শোন্‌দিকি এইধারে,
ছাদেতে একটা মাদুর বিছিয়ে দে'তো !
এ' গরমে কেউ বিছানায় শুতে পারে ?
ঘরে শুলে আজ মরে যাবো গরমে তো !
কে বলেছে তোকে আনতে ও মিঠেপান ?—
এত রাতে পান কোনোদিন আমি খাই ?···
দূর্ করে ডিবে ফেলে দেবো মেরে টান্—
—যা, চলে যা'।—আমি নিরিবিলি শু'তে চাই।

পাশের বাড়ীর গ্রামোফোনে আসে কাণে
রবি ঠাকুরের গীতালির গানখানা !
এমন খারাপ সুর আর কথা,—গানে
রবিবাবু দেন্,—ছিলনা আগেতে জানা।
ছাদে শুয়ে থাকা এও দেখি ছাই দায়,
—ভালো লাগচেনা ভাবতেও কোনো কিছু,
সে যদি শীঘ্র ফিরে না আসতে চায়
আমার ভাবনা কেন ঘোরে তারই পিছু !!

সূর্য্য-শিখা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আদিত্যগ্রহ সূর্য্যদেবকে গ্রহ-ভীরু হিন্দু যদিও বলেন 'বিবস্বান্', কিন্তু রবিগোলকের মহাদ্যুতিই যে আমাদের সূর্য্যউপাসনায় প্ররোচিত ক'রেছিল এমন কথা বললে সৌরধর্ম্মীদের প্রতি অবিচার করা হবে। সূর্য্যের তেজ, সূর্য্যের দীপ্তি, সূর্য্যের কিরণ ও সূর্য্যালোকের সঙ্গে দিবাকরের আরও অসংখ্য ভুবনহিতকর ও বিশ্বপ্রকৃতির কল্যাণদায়ী শক্তি, বিভূতি ও মহিমার নিগূঢ় পরিচয় পেয়ে তবেই তাঁকে "ওঁ সবিতুর্বরেণ্য" ইত্যাদি বলে বন্দনা, পূজা ও প্রণাম করেছেন তাঁরা!

কিন্তু সে যাই হোক, সূর্য্যের দেবত্বকে প্রতিষ্ঠিত অথবা সৌর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে সমর্থন করবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়; এমন কি, সূর্য্য-লোকের

সূর্য্য-মণ্ডল বা করোণা (Corona)

আভ্যন্তরীণ রহস্যও কিছু উদ্ভেদ করা হয়নি এর মধ্যে। এবার শুধু সূর্য্যের বাহ্যিক বিকাশের একটা বিশেষত্ব নিয়ে শ্রীযুক্ত ই, ওয়াণ্টার ম্যণ্ডার এফ্-আর-এ-এস যে আলোচনা করেছিলেন তারই একটু পরিচয় দেবার প্রয়াস আছে মাত্র।

নিছক বিজ্ঞানের কথা নিতান্ত নীরস হ'লেও তার একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে—বড় চিত্তাকর্ষক! অবশ্য সেটা কেবলমাত্র তাদেরই কাছে, যাদের জগৎকে জানবার কৌতূহল আজও সজীব আছে প্রাণে! তারা সূর্য্যের পানে মুখ তুলে চেয়ে শুধু করজোড়ে প্রণাম করেই ক্ষান্ত হয়না সূর্য্যকে ভাল ক'রে জানতে চায়, চিনতে চায়! অধ্যাপক বার্ণাড, হেল, ট্রভেলট্ ফিনাই, ওয়াণ্টার ম্যণ্ডার প্রভৃতি

গ্রহ-বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যসাধনায় জীবনপাত করে গেছেন। সূর্য্যের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তাঁদের সে কঠোর তপস্যা ভারতের কোনো ঋষির অপেক্ষাই কম নয়।

এই সব বিশ্ববিখ্যাত গ্রহাচার্য্যের মতে সূর্য্য এক অগ্নিগর্ভ ও অগ্নিপৃষ্ঠ অনলোজ্জ্বল বিরাট গ্রহপিণ্ড মাত্র, যাঁর আদিম বহ্নি প্রকৃতি এখনো উদ্দাম হয়েই রয়েছে, যাঁর জাতক রূপের সাগ্নিকতা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয়নি আজও! একদিন আমাদের এই পৃথিবীও ছিল অমনিই এক তেজঃপুঞ্জকায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড! চন্দ্রকে প্রসব করবার পর থেকে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে অনেকটা শীতল হয়ে এসেছে। হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে কোনোদিন সূর্য্যও একেবারে চাঁদের মতই হিমাঙ্গ হয়ে যাবেন, এ সম্ভাবনারও আশঙ্কা আছে!

সূর্য্য হ'তে যদি কখনো কোনো নবগ্রহ ভূমিষ্ঠ হয় তাহ'লে হয়ত সূর্য্যও কালে তাঁর রুদ্রতেজ সম্বরণ করে ক্রমে পৃথিবীর ন্যায় শান্তভাব ধারণ করতে বাধ্য হবেন, তখন সূর্য্য-লোকও তরুলতা, পশুপক্ষী এবং মনুষ্যবাসের উপযোগী হ'য়ে উঠবে! কিন্তু এসব সুদূর সম্ভাবনার কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে একবার বর্ত্তমান সূর্য্যের দিকেই চোখ তুলে দেখা যাক!

দূরবীক্ষণের সাহায্যেই হোক্ বা এমনি চোখেই হোক, কিছুক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকালেই বেশ বোঝা যায় যে গ্রহ-বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটাকে তাঁদের অনুমান বলে অগ্রাহ্য করা চলে না। সূর্য্যের রূপরেখা (outline) আকাশের বুকে বেশ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। একটি নিখুঁত বৃত্তাকার চক্র, তার কোথাও একটুও বাঁকাচোরা নেই! এমন কি চন্দ্রের রূপরেখাও এতটা সুস্পষ্ট ও নির্দ্দোষ নয়।

সূর্য্যকে পরীক্ষা করবার সবচেয়ে সুযোগ পাওয়া যায় সূর্য্যগ্রহণের সময়। বিশেষ ক'রে যেদিন 'সর্ব্বগ্রাস' হয়। চাঁদের কালো অঙ্গ সেদিন পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে এসে প'ড়ে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখে। সেই সময় শুধু আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যা দেখি, সূর্য্যের রূপ ঠিক তা নয়। রবি-রূপ-রেখার যে বৃত্তাকার চক্র, তা মোটেই নিখুঁত বা নির্দ্দোষ গোলাকার নয়। সূর্য্যগ্রহের বৃত্তাকার চক্ররেখার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য সব অগ্নিপুচ্ছ বা অনলশিখা। অনেকটা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সেগুলি! তাদের আকারের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট রূপ নেই এবং প্রত্যেকটি অত্যন্ত আঁকাবাঁকা ও অস্পষ্ট।
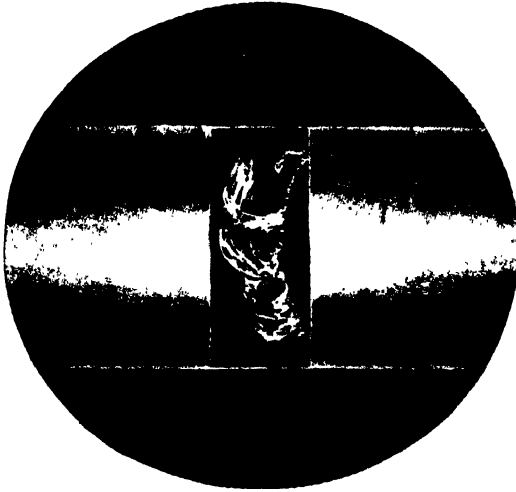
'উৎক্ষিপ্ত-প্রসরক' (স্পেক্‌ট্রোস্কোপের সাহায্যে গৃহীত সূর্য্য-শিখার চিত্র)

এই অগ্নিপুচ্ছ বা অনলশিখাগুলি দেখে বোঝা যায় সূর্য্যগ্রহ এখনো আদিম অবস্থায় রয়েছে। তার মধ্যে আজও প্রলয়াগ্নির ভীষণ তাণ্ডবলীলা চলেছে!

সূর্য্যশিখা বা ভানু-তনু বিচ্ছুরিত অগণিত অগ্নিপুচ্ছ-গুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'করোনা' ('Corona') বা 'সূর্য্যমণ্ডল' অর্থাৎ গজমুক্তা সদৃশ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল বর্ণের এক আলোকচ্ছটা—যা সূর্য্যের সকল প্রান্ত বেষ্টন ক'রে আছে। স্থানে স্থানে ঐ আলোকচ্ছটা রবি কেতনের ন্যায় দীর্ঘ পত্রাকারে প্রসারিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই 'করোনা'র বা রবিমণ্ডলের পটভূমিতে অর্থাৎ পৃষ্ঠচ্ছদের উপর আবার প্রায়ই উজ্জ্বল রক্তাভ কতকগুলি আলোকবিন্দু দেখতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন বড় বড় চুণীর টুকরো ঝলমল করছে! এইগুলিকে আগে সূর্য্যের 'রক্তশিখা' বলা হ'ত, কিন্তু এখন গ্রহ-বৈজ্ঞানিকেরা এগুলির নাম রেখেছেন 'প্রসরক' (Prominences)

সূর্য্য-শিখা (শান্ত)

সূর্য্যমণ্ডলের নীচের দিকের উজ্জ্বলতম অংশে এগুলিকে অতি সুন্দর দেখায়!

সূর্য্যমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ 'প্রসরক'গুলি আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় কেবলমাত্র সূর্য্যগ্রহণের সময়, অর্থাৎ ঠিক যে সময় 'চন্দ্র' ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে এসে পড়ে সূর্য্যকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখে। এইজন্য

সূর্য্য-শিখা (পূর্ব্ব চিত্রের পঁচিশ মিনিট পরে নেওয়া, সেই একই সূর্য্য শিখার রূপান্তর)

কিছুদিন ধ'রে গ্রহ-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই নিয়ে একটা তর্ক চলেছিল—ঐ 'জ্যোতির্মালা' বা 'আলোক-মণ্ডল' কি সূর্য্যেরই দেহ হ'তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, না ওটা চন্দ্রাঙ্গ উদ্ভূত? প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নেই। এ সংশয় জাগবারই কথা, কারণ পৃথিবী থেকে চন্দ্র যতটা দূরে, তদপেক্ষা চার

শত গুণ অধিক দূরে সূর্য্যগ্রহ বিরাজমান! সুতরাং আলোচ্য 'প্রসরক'গুলি যদি 'সৌর-জ্যোতি' বলে গৃহীত না হয়, তাহলে বল্‌তে হবে ওগুলি চন্দ্র-প্রভা, কিন্তু চন্দ্র-প্রভারূপে ওদের গণ্য হ'তে হ'লে ওদের আকার চারশত গুণ বড় হওয়া আবশ্যক! সে হিসাবে আবার বর্ত্তমান অবস্থায় ওগুলিতে চন্দ্রের স্বত্ব প্রমাণ হয় না!

কিন্তু সে যাই হোক, গ্রহ-বৈজ্ঞানিকদের তর্ক আজ মিটে গেছে এবং এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়েছে যে ওই জ্যোতির্বেষ্টনী সূর্য্যেরই নিজস্ব সম্পদ, চন্দ্রের ওতে কিছুমাত্র অধিকার নেই, কারণ চন্দ্রের মধ্যে আজ ত অগ্নি দূরের কথা, উত্তাপ পর্য্যন্ত কিছু নেই। চাঁদ শীতল ও অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকদিন পূর্ব্বে! সুতরাং সে এত জ্যোতি পাবে কোথায়? তাছাড়া, যে কারণে এই সংশয় জেগেছিল, অর্থাৎ গ্রহণের সময় ছাড়া সূর্য্যের এই 'প্রসরক' সমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না বলেই ওগুলি চন্দ্র গ্রহের অজ্ঞাতচ্ছটা হওয়াও সম্ভব বলে যে মনে হ'য়ে ছিল, 'স্পেক্‌ট্রোস্‌কোপ্' বা 'জ্যোতির্বীক্ষণ' যন্ত্র আবিষ্কার হবার পর থেকেই এ সন্দেহ একেবারে নির্ম্মূল হ'য়ে গেছে! কারণ, এই জ্যোতির্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের বৃত্তপ্রান্ত পরিবেষ্টিত যত কিছু আলোক-বিভা ও ছটা 'প্রসরক' তা' সূর্য্য গ্রহণের অপেক্ষা না রেখেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

"শান্ত প্রসরক" (লঘুশুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় সূর্য্যপৃষ্ঠের উপরে ভাসমান। এদের রূপান্তর ধীরে ধীরে ঘটে)

'উৎক্ষিপ্ত-প্রসরক' (ভীমবেগে এই সূর্য্য-শিখা সত্তর হাজার মাইল উর্দ্ধে উঠে গেছে)

'স্পেকট্রোস্‌কোপ্' বা জ্যোতির্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের এই 'প্রসরক' রহস্য আরও কিছু উদ্ঘাটিত হ'য়েছে। আদিত্য-চক্রের এই বৃত্ত-বিভা যে মোটেই আলোক ছটা নয়, এ সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে জানতে পারা গেছে। সূর্য্যরশ্মি আকাশে প্রতিফলিত হয়ে এমন একটা তীব্র দীপ্তি বিচ্ছুরিত করে যে মানুষ নগ্নচোখে বা দূরবীক্ষণের সাহায্যেও সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখতে পাবে না, চোখ ঝল্‌সে দেয় সে সুতীব্র সৌরদ্যুতি! কাজেই গ্রহ-বৈজ্ঞানিকদের সূর্য্য পরীক্ষার জন্য অপেক্ষায় বসে

থাকতে হ'ত সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের দিন গণনা করে। কারণ, সেদিন সে চোখ ধাঁধানো প্রখর জ্যোতি শান্ত স্নিগ্ধ প্রভায় পরিণত হয়! 'স্পেক্‌ট্রোস্‌কোপ' উদ্ভাবিত হওয়ায় ঠিক এই সুবিধাটুকুই এখন সুলভ হ'য়ে গেছে। উপস্থিত যেদিন যখন খুসি 'স্পেক্‌ট্রোসকোপ' বা জ্যোতির্বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা সহজ-সাধ্য হয়ে উঠেছে।

স্পেকট্রোসকোপ্ বা "জ্যোতির্বীক্ষণ" যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে ঐ 'প্রসরক'গুলি অন্য আর কিছুই নয়, সূর্য্যেরই অংশ বিশেষ। অবশ্য সূর্য্য গ্রহের জমাট অঙ্গ যে নয় এ কথা বলাই বাহুল্য; কারণ প্রকাশিত চিত্রগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে ওরা বাষ্প, গ্যাস বা দ্যুতিজাতীয় পদার্থ! কোনোটির আকৃতি লঘুশুভ্র মেঘখণ্ডের মত, কোনোটি বা মশালের উন্নত-শিখার মত, কোনোটি বা শূল-ফলকের মত!

সূর্য্যের এই 'প্রসরক'গুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা করে জানতে পারা গেছে যে ওগুলি সূর্য্যোত্থিত ভীষণ উত্তাপ-ঘন বাষ্পসমষ্টি। অতএব ওদের সর্ব্বরকমেই 'সূর্য্য-শিখা'ও বলা যেতে পারে। সূর্য্য-শিখান্তর্ভূত ঐ বাষ্পসমষ্টি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণে বোঝা গেছে যে ক'রে ওর মধ্যে 'হাইড্রোজেন' বা উদ্‌জান বাষ্পের সমত্ব লাভ ঘটেছে। কিন্তু, এই সূর্য্যশিখাগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে স্পেক্‌ট্রোস্‌কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করার একান্ত অসুবিধা দেখে অধ্যাপক হেল-প্রমুখ একাধিক গ্রহাচার্য্য এমন কোনো উন্নতধরণের একটি জ্যোতির্বীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেন, যার সাহায্যে ইচ্ছামত সূর্য্যশিখার যে কোনো অংশ অপরাংশ হ'তে পৃথক ক'রে নিয়ে দেখা ও বিচ্ছিন্নভাবে তার পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করা চলে! ফলে "স্পেক্‌ট্রোহেলিয়োগ্রাফ" বা 'সৌরালোকলেখ্য যন্ত্র' উদ্ভাবিত হ'য়েছিল।

সূর্য্যের পরিধিচক্র পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে সূর্য্যমণ্ডলের সারা বৃত্তটি পরিবেষ্টন করে আছে একটি ঘন উজ্জ্বল হাইড্রোজেন গ্যাসের অর্থাৎ উদ্‌জান বাষ্পের বিপুল স্তর! এই প্রদীপ্ত বাষ্পস্তরের ঘনত্ব প্রায় পাঁচ হাজার মাইলেরও বেশী। এই উজ্জ্বল ঘন পাঁচ হাজার মাইল পুরু বিরাট বাষ্পস্তরের শীর্ষদেশ করাতের দাঁতের মত বড় বড় শিখাচূড়া সংযুক্ত। এইজন্য কেউ কেউ একে 'সূর্য্য-শিখা'
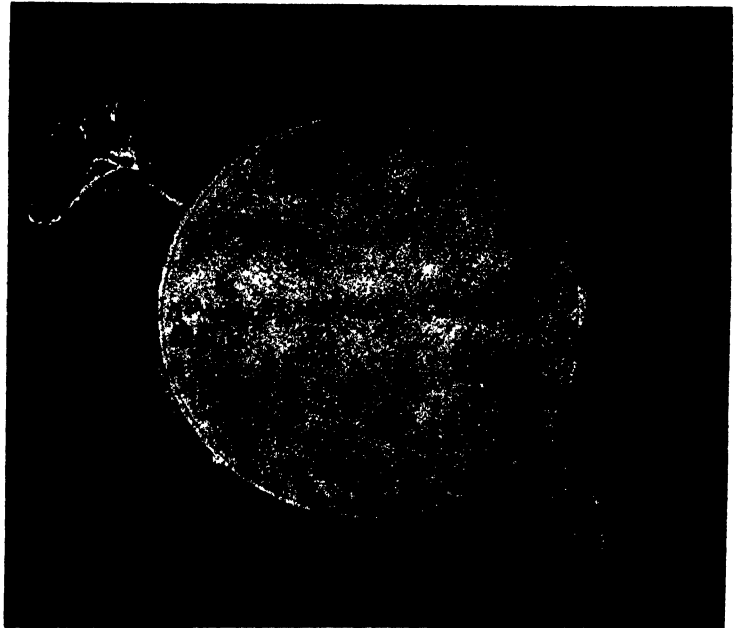
প্রচণ্ড সূর্য্যশিখা (সূর্য্যের দুপাশ থেকে এই দুই প্রচণ্ড উৎক্ষিপ্ত প্রসরক দুর্দ্দমবেগে তিন লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে উঠে পড়েছে!)

না বলে "ক্রকচ-তপন-গিরি" (Sierra) বলেন! কিন্তু সাধারণতঃ এটি এখন "বর্ণমণ্ডল" (Chromosphere) নামেই অধিক পরিচিত।

সূর্য্যবৃত্তের চতুর্দ্দিকে এই ক্রকচ-তপন-গিরি বা অসংখ্য শিখাচূড়াসংযুক্ত সমুজ্জ্বল বাষ্পস্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে গ্রহবৈজ্ঞানিকেরা জোর গলায় বলছেন—এ আর কিছুই নয়, ঐ প্রচণ্ড অগ্নি-গোলক মার্ত্তণ্ডের প্রজ্জ্বলিত সর্ব্বাঙ্গ হ'তে নিয়ত বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে যে লেলিহান অনল

শিখা—এ তারই রূপ! লক্ষ লক্ষ বিপুল বহ্নি জিহ্বা যেন লক্ লক্ ক'রে প্রসারিত হ'চ্ছে শূন্য লেহনে! কেউ দীর্ঘ বিস্তৃত, কেউ স্বল্প প্রসারিত; কারুর আকৃতি হস্তীশুণ্ডের মত স্থূল, কোনোটি বা তীরফলকের মত সূক্ষ্ম, কোনোটি ঝঞ্ঝাতাড়িত লঘুশুভ্র মেঘের মত চঞ্চল হয়ে উঠ্ছে, কোনোটি বা বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষের বিশাল তরঙ্গ-ভঙ্গের মত ঢেউ তুলে নাচছে! কোথাও আগুনের ফোয়ারার মত ফিন্‌কি দিয়ে ফুটছে, কোথাও পুষ্পিত-তরুকুঞ্জের মত স্তরে স্তরে ঝাড় বেঁধে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে! কারুর সঘন অস্থির কম্পন স্রোতোবেগে বেতসলতার মত বেপথু, কেউবা হোমশিখার মত ধীর গম্ভীর! এমনিতর নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে নানা অবস্থায় আদিত্য বর্ণমণ্ডলে সূর্য্য-শিখার বিভিন্ন বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহসন্ধানীদের 'সৌরালোকলেথ্য-যন্ত্রে' ধরা পড়েছে। গ্রহতত্ত্ববিদেরা সূর্য্য-শিখার প্রকৃতি অনুসরণ ক'রে সেগুলিকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন। একদলের নাম রেখেছেন 'শান্ত-প্রসরক' এবং অন্যদল নাম দিয়েছেন 'উৎক্ষিপ্ত-প্রসরক'।

'শান্তপ্রসরক'গুলি প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাসের অর্থাৎ উদজান বাষ্পের সমষ্টি। কিন্তু শান্ত হ'লেও এদের আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে এরা খুব ধীরে ধীরে রূপান্তর গ্রহণ করে। সূর্য্যক্ষেত্র হ'তে এদের উদ্ভব অনেকটা যেন ধোঁয়ার মালার মত কিম্বা ভাসমান মেঘখণ্ডের ন্যায় এরা ঊর্দ্ধগামী! কিন্তু সূর্য্যপৃষ্ঠ হ'তে এদের একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'তে দেখা যায় না; সরু একটি বোঁটার মত, অথবা মোটা একটি স্তম্ভের মত কোনো না কোনো যোগসূত্র সূর্য্যগ্রহের সঙ্গে এদের সংযোগ রক্ষা করে।

'উৎক্ষিপ্ত-প্রসরক'গুলির দ্যুতির মধ্যে বিবিধ ধাতব বিভার অন্তরাবরণ (Lines) দৃষ্টিগোচর হয়—যেমন অয়স্কান্তি (Iron), লবণক (Sodium), মগ্নক (Magnesium), ত্রিতক (Titanium) ইত্যাদি। এদের পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর এক ভয়ানক ব্যাপার! এমন প্রচণ্ডবেগে এদের পরিবর্ত্তন ও প্রসার ঘটে যে সে ভীষণ গতির কোনো ধারণাই হ'তে পারে না আমাদের!

শ্রীযুক্ত এম ফেনাই এদের রূপান্তর সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করে যা লিপিবদ্ধ ক'রেছেন তা' জেনে আমাদের বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'তে হয়! তিনি বলেন, এক একটি 'উৎক্ষিপ্ত প্রসরক' চক্ষের নিমেষে নাকি তিন লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে প্রসারিত হ'য়ে যাচ্ছে! অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাস যতটা বিশাল তার চেয়েও চল্লিশ গুণ বড় হয়ে বেড়ে চলেছে ঐ সূর্য্যাঙ্গ উৎক্ষিপ্ত প্রসরকগুলো চক্ষের পলক পড়বার আগেই! পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যতটা, তার চেয়েও বেশী দূরে ছুটে যাচ্ছে এক একটি সূর্য্য-শিখা, এক এক পল অনুপল বিপলের মধ্যে! যেটির সবচেয়ে ধীর গতি বলে মনে হয়েছিল তাঁর, সেটি প্রতি সেকেণ্ডে দু'শো আটাত্তর মাইল বেগে ছুটেছিল! অর্থাৎ মাত্র চার মিনিট সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই সেটি এক লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে উঠে পড়েছিল! কোনো গতিকে একদিন যদি এমনি একটা উৎক্ষিপ্ত সূর্য্যশিখা পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব অতিক্রম করে এসে একবার আমাদের এই বাস-গ্রহকে স্পর্শ করে—ব্যস্! আর কাউকে চোখে কাণে দেখতে হবে না! পৃথিবীশুদ্ধ লোক সেদিন এক মুহূর্ত্তে ঝল্‌সে পুড়ে মরে যাবে! তবে, একমাত্র আশার কথা এই যে আমরা সূর্য্যি-মামার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে আছি এখনও, আর তাঁর এই অনলজটার বহ্নিচ্ছটা যেমনি দ্রুতবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছুটছে তেমনিই সত্বর আবার অদৃশ্য হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! সুতরাং মাভৈঃ!

বিশেষ পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে এই সূর্য্যশিখা সূর্য্য হ'তে পৃথক একটা কিছু ব্যাপার নয়। সূর্য্যগ্রহের একান্ত অন্তরঙ্গ এরা! অর্থাৎ এরা সৌর দেহেরই একাঙ্গীভূত সহধর্ম্মী বস্তু, যার নিবিড় যোগ রয়েছে সূর্য্য ক্ষেত্রের প্রত্যেক বিন্দুটির সঙ্গে, প্রত্যেক অনুকণার সঙ্গে এবং সূর্য্যের চারিপার্শ্বের সবিতৃমণ্ডলের সঙ্গে। কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে যে একই সঙ্গে সূর্য্যের ব্যাসের উভয় প্রান্তে প্রচণ্ড অনলশিখা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে, পরস্পর বিপরীত দিকে তারা ছুটে চলেছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে! অবশ্য এরূপ অভাবনীয় বিপুল 'উৎক্ষিপ্ত প্রসরকের' উদ্ভব সচরাচর ঘটে না, তাহ'লেও এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে এরা মার্ত্তণ্ড গর্ভের প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে সংযুক্ত না হ'লে এমন ভীষণ বেগে ছুটে ঊর্দ্ধে ওঠা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না।

মহাবনে মহাবাণী *

শ্রীনিরুপমা দেবী

ঠিক বারো বৎসরের কথা। ১৩৩০ সালের শ্রাবণে ঝুলন দেখিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাসে মহাবন পরিক্রমার জন্য যাত্রীর দল সব বাহির হইতেছে শুনিয়া প্রাণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য, কিন্তু বাহির হইবার সাহস নাই। সঙ্গী মাত্র মাতা, তাঁহাকে লইয়া সেই যাত্রীর দলের সঙ্গে যাইতে ভরসা হয় না। ডুলী বা গো যানে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহাতেও রুচি নাই; অথচ সেই ভাদ্রে বৃন্দাবনের রৌদ্রে পদব্রজে ব্রজধাম পরিক্রমায় নিজেদের তো ভয় আছেই, যে কয়জন বান্ধব শ্রীধামে জুটিয়াছিলেন তাঁহারাও এক সুরে (বোধ হয় আমাদের ভয় দেখিয়াই) অসম্ভব অসম্ভব বলিয়া আরও ঘাব্‌ড়াইয়া দিলেন। ব্রজবাসী (বৃন্দাবনের পাণ্ডা) অভয় দিয়া শেষে হায়রাণ হইয়াই আমাদের আশা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু অক্ষম মনের লোভ তবুও কোথায় লুকাইয়া ছিল। 'রাধাষ্টমী' আগতপ্রায়। আমার সেবারের শ্রীবৃন্দাবনের আদত পাণ্ডা 'দেবীদিদি' বর্ষাণার এই উৎসবের গল্প বলেন! ইতিমধ্যে মহাবন পরিক্রমার যাত্রীদের 'মহাসংবাদ' আসিয়া বৃন্দাবনে পৌছিতে লাগিল। যাত্রীদের মধ্যে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হইয়াছে—একেবারে মড়কের ভাব। যাহারা পারিতেছে ফিরিয়া আসিতেছে, যাহাদের সন্ধান করিবার লোক বৃন্দাবনে আছে তাহাদের সন্ধানে লোক ছুটিতেছে! স্থান অনির্দ্দেশ, চৌরাশি ক্রোশ বনভূমির মধ্যে তাহাদের কোথায় গিয়া সন্ধান মিলিবে, তবু দল বৃহৎ, কিছু খবর মিলিবেই। মুখে মুখে যতটুকু খবর মিলিতেছে সেই ভাবেই অনুসন্ধানের চেষ্টা চলিল। বৃন্দাবনবাসী যে মহদাশয় বৈরাগ্য-পন্থী ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তিটি আমাদের কতকটা অভিভাবকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার পরিচিত এক বৈরাগী কোন এক বিজন স্থানে রোগগ্রস্ত হইয়া দল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া সেই অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়াছেন! এই খবর পাইয়া আমরাও বলিলাম "আমাদেরও পলাইবার এই সুযোগ! বাধা দিবার কেহ নাই। বন পরিক্রমায় মড়কের অনুসরণে নয়, রেলপথে ও যান-বাহনে যতটুকু যাওয়া যায় তিন জনে বৃন্দাবনের বনে বেড়াইয়া আসি।"

মাত্র তিন জন—মাতা, আমি ও দেবীদিদি—মথুরা হইতে দিল্লীগামী ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই কোশী নামে একটা ছোট ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। রেল-ষ্টেশন বটে, যাত্রী নামিল মুষ্টিমেয়। সেও সম্ভব, কিন্তু এইবার যে যাত্রাপথ তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। দেবীদিদি পূর্ব্বেই আমাদের কবুল করাইয়া বাহির করিয়াছেন যে যাত্রাটি সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট! চাই কি সামান্য পথ গিয়া ফিরিয়া আসিতেও পারি। যান-বাহনের কোন স্থিরতা নাই, পথেরও কোন ঠিকানা নাই (কেন না বহুদিন পূর্ব্বে একবার মাত্র গিয়া তিনি এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন)! কষ্ট অসুবিধারও কোন মাপ নাই, আর কোথায় পৌছিব তাও বলিতে পারি না। এতে যদি রাজী থাকেন তো চলুন। ব্যাপারটি একেবারে ঠিকঠাকই, প্রায় মিলিবার উপক্রম! ষ্টেশনের এক দিকে একটি ছোট্ট এঞ্জিনে খান দুই তিন গাড়ী জুড়িয়া সরু একটী রেল পথে দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! দিদি বলিলেন "হোলী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে এই পথে ঐ ট্রেণটি নন্দগ্রামের যাত্রী জুটিলে নিয়ে যায়, রাধাষ্টমীতেও আগে যেত; কিন্তু এখন গতিক তো তেমন বোধ হচ্চে না।" ব্যাপার জানিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। বৃন্দাবনের দুই একটী 'সাধু' বা বৈরাগীকে তিনি ঐ লোক কয়টির মধ্যে চিনিয়াছিলেন।

এইখানে এই 'দেবীদিদি'র কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন! তিনি সম্পন্ন বাঙ্গালী-ঘরের কন্যা ও বধু! কিন্তু বহুদিন উদাসিনীভাবে বৃন্দাবনে বাস করায় তাঁহাকে বৃন্দাবনের অনেকেই চেনে এবং বৈরাগিণী সম্পন্ন বাঙ্গালী-ঘরের কন্যা বলিয়া যথেষ্ট সম্মানও করে! আরও যে দুই

* ১৩৪২ সালে লিখিত।

একজন বাঙ্গালী উদাসিনীর সঙ্গে সেখানে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল সকলকেই বৃন্দাবনবাসীর সম্মানের পাত্রী ভাবে দেখিয়াছি। 'দেবীদিদি' জানিয়া আসিয়া বলিলেন "নিয়ম আছে পঁচিশটি যাত্রী হ'লেই ট্রেণ ছাড়ে, কিন্তু আজ মাত্র যাত্রী তেরটি! কাজেই ট্রেণ ছাড়া সন্দেহ।"

পঁচিশ জন যাত্রী জুটিবার আশায় তো এমন স্থানে পড়িয়া থাকা চলে না, "পঁচিশখানা টিকিট ইস্যু করিতে পারিলেই তো তারা খালাস!" এই পরামর্শ স্থির হইলে আবার দিদি ষ্টেশনের জমায়েত লোকগুলির দিকে চলিয়া গেলেন। মা ও আমি একটা শাখা-বিরল গাছতলায় ভাদ্র মাসের রোদ বাঁচাইয়া "নন্দ-কুল-চন্দ্র"কে স্মরণ করিতে লাগিলাম। দিদির কথা এইখানেই বুঝি ফলিয়া যায়—ফিরিতেই বা হয়!

'দিদি' হাসিমুখে সংবাদ দিলেন, ট্রেণও চলিবে, বারো জনের ভাড়াও 'গচ্ছা' লাগিবে একজন শেঠের, আমাদের নয়! তিনি এ পুণ্যের অংশ কাহাকেও দিবেন না, বাকি তের জনের ভাড়া তিনিই দিয়া নন্দগ্রামের ট্রেণ চালাইবেন! তথাস্তু!

অনেক দুঃখের পর ট্রেণ তো চলিল! প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ চিন্তায় পঞ্চাশ ক্রোশই দাঁড়াইয়াছিল। সম্পূর্ণ জনপদ-হীন মাঠে বনে চলিয়া বৈকালে তিনি একটি মাঠের মধ্যেই গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নন্দগ্রাম সেশান হইতে মাইল খানেক! ট্রেণ হইতে নামিয়াও চক্ষু স্থির! পোটলা বহিবে কে? দিদিঠাকুরাণী এই সুযোগে আমাদের একটু তিরস্কার করিয়া লইলেন (এই সৌভাগ্য আমাদের বরাবরই হইয়াছিল!) "মাল না লইয়া আপনারা এক পা চলিতে পারেন না, (অবশ্য কার্য্যকালে দেখা গিয়াছিল প্রয়োজন প্রত্যেকেরই সমান) এখন কে মাল বহিবে বহুক!" "যে অচল ট্রেণ চালাইয়া আনিয়াছে তাহারই নিশ্চয় দায়!" ঘটিলও তাই। এঞ্জিনের একটা কুলী স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে মাল ঘাড়ে তুলিয়া বলিল "ধরম্‌শালে মে যাও গে?" দিদি হ্যাঁ বলিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

নন্দগাঁওয়ের টিলার নীচেই ধরমশালাটি! শেঠের দল গিয়া ভাল ঘরগুলা প্রায়ই দখল করিতেছে! আমাদের একজন উদাসী আত্মীয় যিনি বহুদিন এই নন্দগাঁও কাম্য-বনে এবং বর্ষাণায় সস্ত্রীক বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম করিয়া অধ্যক্ষের নিকট খোঁজ করিতেই তিনি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন "উও মহাত্মা তো হামারি যজমান ভট্টবাবুকে শালগ্রাম আভ্‌তক্ হামারা ঘর মে রহা হ্যায়! তিনি একটি নির্জ্জন কুঠারি আমাদের তিন জনার জ[ন্য] ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তল্পী ফেলিয়া হাতে মুখে জ[ল] দিবারও দেরী সহিতেছিল না, বৈকাল অতিক্রান্ত হইতেছে নন্দগাঁও একটি ছোট-খাট পাহাড়ের গায়ে থাকে থা[কে] সজ্জিত, সর্ব্বের উপরে "নন্দবাবার" বাড়ী! ঘরে ফে[র] গরুদলের সঙ্গে আমরা সিঁড়ি বাহিয়া নন্দপুর দেখি[তে] উঠিতে লাগিলাম। সূর্য্যাস্ত হইতেছে—নীচে চারিদি[কে] ধূ ধূ মাঠ, স্থানে স্থানে বনানী, পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থা[নে] দরিদ্রতাসূচক পল্লীকুটীরের দৃশ্য! জয়পুরের রাজা (কি[ম্বা] ভরতপুরের ঠিক্ মনে পড়িতেছে না) এই সিঁড়ি এব[ং] নন্দরাজার বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, নীচে হই[তে] পুরের প্রাচীর দেখা যাইতেছিল। সহসা দেখি পথে[র] অপর দিকে একটী কুটীরের অঙ্গনে এক মলিনবেশ [বৃদ্ধ] ব্যক্তি সান্ধ্যগগনের দিকে চাহিয়া নমাজ করিতেছে দেখিতে অবশ্য ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু পাণ্ডার উক্তি "নন্দীকেশ্বর পর্ব্বত ইনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বর্ষাণার পাহাড় স্বয়[ং] মহেশ্বর এবং গোবর্দ্ধন গোবিন্দ নিজে!" তাই ব্রহ্মাদেবে[র] ঘাড়ে এই নমাজ পড়া দেখিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভাবে নন্দপুরে[র] পাণ্ডার পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন "মা, এরা কি অহি[ন্দু] ছিল? এরা সব হিন্দুই, কোন অখাদ্য এখানে খায় না তখনকার দিনে কোন ফেরে পড়ে মুসলমান হতে বাধ[্য] হয়েছে। এদেশে এদেরও এই ধরণের দল আছে, সমা[জ] আছে! এই গ্রামেই এরা পুরুষানুক্রমে বাস করছে, যা[বে] কোথায়?" কথাগুলি শুনিতেও ভাল লাগিল! উপ[রে] প্রস্তর ও ইষ্টকের নির্ম্মিত পুর্ব্বদ্বার মন্দির—পর্ব্বতের উপরে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, চারিদিকে দুর্গের মত প্রাচীর বেষ্টিত' মন্দি[র] মধ্যে নিকষ প্রস্তরের মানুষের মাপের মত বড় নন্দ মহারা[জ] ও যশোদা মাতার মূর্ত্তি, মাঝে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু! শ্রীচৈত[ন্য] চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুকে দর্শন করি[য়া] এইখানেরই বর্ণনা দিয়াছেন—

> "নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল।
> পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া
> লোকেরে পুছিলা পর্ব্বত উপরে যাইয়া
> কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে?"

লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোকার ভিতরে।
দুইদিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোকা উঘাড়িয়া।"

তখন শ্রীবৃন্দাবন লুপ্ততীর্থ। তেঁতুলতলা প্রভৃতি যে যে স্থানে মহাপ্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন তখন সবই অরণ্যে ঢাকা! অক্রূরতীর্থেই তবু অনেকটা লোকসমাগম ছিল। (এখন সেই অক্রূরতীর্থই লোক-সমাগমহীন প্রান্তর, অল্পস্বল্প বন-বেষ্টিত মাত্র।) সমস্ত বৃন্দাবনের মধ্যে বিগ্রহ আকারের কোন মূর্ত্তিই ছিল না—গোবর্দ্ধন গ্রামে কেবল হরিদেব এবং গোবর্দ্ধন শিরে গিরিধারী গোপাল মূর্ত্তি মাত্র অবস্থিত ছিলেন। আরিট গ্রামে রাধাকুণ্ড তখন ধান্যক্ষেত্র মাত্র, সেইকালে এই নন্দীগ্রাম ও নন্দীকেশ্বর পর্ব্বত মাত্র ছিলেন এবং তাহার গুফার ভিতরে শ্যামল সুন্দর এই শিশু মূর্ত্তিই মহাপ্রভু দর্শন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। সোপান বাহিয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়া সেই দুই তিনজনের ভ্রমণোপযোগী পরিসরপথে অগ্রসর হইয়া এক একটা 'চন্দ্র-শালিকায়' উপস্থিত হইতেছিলাম। এই 'চন্দ্র-শালিকা' এক একটি 'ছত্রি' মাত্র! তাহাতে বসিয়া চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ একটা লোভনীয় বস্তুই বটে। দূরে পাবনকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড প্রভৃতির অস্পষ্ট আভাষ, চারিদিকে শ্যাম বনানী—বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি একটি 'চন্দ্র-শালিকা' অধিকার করিয়া কয়েকটি মনুষ্য বিশ্রাম করিতেছে। কৌতূহলে নিকটে গিয়া দেখিলাম দর্শনীয় বস্তু বটে। তিনটি কষিত কাঞ্চনবর্ণ মূর্ত্তি! একটী আট দশ বৎসরের পুষ্ট সুন্দর বালক, অন্য দুইজন তাহার পিতামাতা—অনতিক্রান্তযৌবন সুন্দর সুঠাম দেহ। নিকটে একটি বেতের 'জালি' বোনা বড় গোছের বাসকেট বা পেটারি। তাহার ডালা তোলা, ভিতরে ছোট ছোট বিগ্রহ মূর্ত্তি, উজ্জ্বল বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। দেখিলাম—ইহারা নিজেরাই মাত্র এই সব স্থান ভ্রমণ ও দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন না। সঙ্গে নিজেদের সেবিত বস্তুকেও সমস্ত ভোগ করাইতে চান। পরিচয়ে জানিলাম তাহারা কাশ্মিরী! এইভাবে স্বামী-স্ত্রী পুত্রটিও সঙ্গে লইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এইভাবেই তাঁহাদের সংসার করা চলে। নন্দীশ্বরের ব্রজবাসী বা পাণ্ডা আমাদের অন্যদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন "মা ঐ মাঝখানে 'যাবট-টিলা'—যাবট গ্রামটি ওরই উপরে। আর দূরে ঐ বৃষভানুপুর বা বর্ষাণা গিরি! সন্ধ্যায় কৃষ্ণ মহারাজ এই চন্দ্র-শালিকায় উপবেশন করিতেন, আর ঐ বৃষভানুপুর পর্ব্বতে রাধাজী অবস্থান করিতেন—উভয়ের এই-ভাবে দর্শন হইত! যখন বর্ষাণা পাহাড়ে উঠিবেন তখন প্যারীজীর উপবেশনের পীঠ দেখিতে পাইবেন। এই রকম প্রদোষে প্রভাতে তাঁহাদের দর্শন হইত!" সন্ধ্যার ছায়ায় তখন জলস্থল ধূমায়মান, তাহার সেই ধূসর অঞ্চলের তলে দেশ কাল পাত্র সবই যেন লোকাতীতভাবে প্রতীয়মান হইতেছিল! ঐ তো বিস্তীর্ণ মাঠে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা রবে ফিরিতেছে, ঐ তো চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ। ঐ সেই বৃষভানুপুর গিরিশিখরের প্রাসাদ চূড়া—ঐ বুঝি "তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘন বিজরী সঞ্চরে মেঘরুচি-বসন-পরিধানা" মূর্ত্তি। নীচে গো-পালের দল! ধূসরালোক ক্রমে অন্ধকারে পরিণত হইয়া জল স্থল ঢাকিয়া গেল!

ধরমশালায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন সকালে দেবীদিদিঠাকুরাণী আমাদের দুইজনকে লইয়া এক অদ্ভুত ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বলিলেন "পথ ঘাট আমার কিছুই তেমন মনে নাই, যা দেখাব মনে করে বেরুচ্ছি সে স্থান খুঁজে না পেতেও পারি—এই কথা মনে রেখে এ যাত্রায়ও বেরুতে হবে।" মৌন সম্মতি দিয়া আমরা তাঁর অনুসরণ করিলাম। তিনি কি দেখাইবেন তাহাও অজ্ঞাত, সে বিষয়ে কোন ধারণাই আমাদের নাই! তিনিও ব্রজবাসীদের কাহাকেও কোন প্রশ্ন মাত্র করিলেন না। আমরা তাঁর সঙ্গে বোবার মত চলিবার প্রতিজ্ঞা লইয়াই বাহির হইয়াছি। কিছুক্ষণ সম্মুখের মাঠ ভাঙিয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। বন তত গভীর নয়, অথচ জনসমাগমহীন! মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষীণ জলধারা বনের মধ্যে বহিয়া যাইতেছে। বর্ষা-স্নাত বনের চিক্কণ শ্যামশ্রী প্রভাতরৌদ্রে ঝলমল—ঝোপের পাশে কোথাও দুই একটা খরগোস লোক দেখিয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইতেছে! জলধারার নিকটে এক একটা রক্তচঞ্চু বৃহৎকায় সারস নিঃশব্দে বসিয়া আছে! গাছের উপর বৃহৎকায় ময়ূর! আমাদের শব্দ পাইয়াও চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল না, অটল মৌনে যেন "নিদ্রিতা লিখিত-

চিত্রন্নিবাসন্” ভাবেই রহিল। বৃন্দাবনের বনে একভাবে অনুপ্রাণিত তিনটি মাত্র প্রাণী, তায় স্ত্রীলোক! ভাবের বাধক কোন দিকে কিছু নাই! কেবলই মহাকবি বেদ-ব্যাসের সেই “শরৎ স্বচ্ছ পদ্মাকর সুগন্ধি” বায়ুতে বৃন্দারণ্য প্রবেশোন্মুখ গো-গোপালক দলের বর্ণনা মনে আসিতেছিল! মনে হইতেছিল এখনি বুঝি সেই “সর্ব্বভূত মনোহর” বেণু রব বাজিয়া উঠিবে; আর সেই রব শুনিয়া আর একদিকে বেণু গীতের ভাষায় তাহার অনুভব বাজিতে থাকিবে।

> “প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
> কৃষ্ণেক্ষিতঃ তদুদিতং কলবেণু গীত;
> আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির প্রবালান্
> শৃণ্বন্ত্য মীলিতদৃশো বিগতান্য বাচঃ।”

দূরে কয়েকটি হরিণ শাবক চরিতে চরিতে বোধহয় আমাদের দেখিয়াই স্তব্ধনেত্রে ঊর্দ্ধকণ্ঠে চাহিয়া আমাদের ভাবের উত্তেজনা বাড়াইয়াই দিল!

ক্রমেই গভীর বনের গভীরতম স্থানে আসিয়া পড়িলাম! বৃক্ষে বৃক্ষে হাত ধরাধরি করিয়া সে যে কি মণ্ডল রচনা! গাছগুলি সমস্তই এক জাতীয়! বৃন্দাবনেই এই জাতীয় কদম্বের বৃক্ষ দেখা যায়, যার ছোট ফুলে মালা গাঁথা চলে. কেলি কদম্ব ইহারই নাম! বৃক্ষগুলি সুউচ্চ, বিস্তৃত শাখা বিস্তারে স্থূলকাণ্ডে বৃহৎ মহীরুহের রূপেই সারি সারি দাঁড়াইয়া। তাহাদের অপূর্ব্ব বিন্যাসে চারিদিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলগুলি একটি বৃহৎ মণ্ডলকে মাঝখানে রচনা করিয়াছে। স্থানটি দেখিয়াই তো আমরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম।

বর্ষার জল এখনো এই মণ্ডলের একদিকে সরোবরের বিভ্রম সৃষ্টি করিতেছে! এখানেও গাছের উপরে নীচে তৃণশষ্পে পুচ্ছ প্রসারিত ময়ূর! আমাদের দেখিয়া কেহ কেহ “কে-ও কে-ও” শব্দে গাছে উড়িয়া গেল। কীর্ত্তনে কোথায় শুনিয়াছিলাম বৃন্দাবনকুঞ্জের দ্বারে অনধিকারীর প্রবেশে দ্বারী ময়ূর এমনি করিয়া ডাকিয়া বলিয়াছিল “কে-ও?” কে এরা এমন স্থানে! দলে দলে সবুজ শুক-সারীর দল চারিদিকে, ভয়ের নাম নাই, গায়ের নিকট দিয়াই উড়িয়া যাইতেছে। মহাপ্রভু বুঝি এই স্থানেই আসিয়াছিলেন!

> “প্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলে মৃগপাল।
> মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে
> ভয় নাহি করে সব চলে বাটে বাটে।
> পিকভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চমেতে গায়
> শিখিগণ নৃত্য করি আগে আগে যায়!
> প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন
> বৃক্ষডালে শুকশারী দিল দরশন।”

দিদি ঠাকুরাণী ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে তাহার সাধক ভ্রাতার এ স্থান দর্শনে ভাবাবেশের বর্ণনা করিতে লাগিলেন, অ আমরা স্তব্ধভাবে কেবল শুনিতে লাগিলাম। কতকগু অলৌকিক কাহিনীও বলিলেন। যে কাহিনী কেবল এইখা বলিয়াই বলা চলে! তাঁহার সঙ্গে আমাদের এই অভিয় এই স্থানটি দেখিতে পাইয়াই সার্থক মনে হইতে লাগিল

একটা বহু পুরাতন বেদী—সেই মধ্যমণ্ডপের একদিকে মন নিজ কল্পনার অনুযায়ী সেটিরও কারণ নির্দ্দেশ করিল বাধা দিতে তো কেহ নাই, সঙ্গী যিনি তিনিও আমাদে দলের নিজেরাই তাই বনমণ্ডলগুলিকে মহারাসমণ্ডল না অভিহিত করা গেল। *

বনের অন্তরাল হইতে একটা সঙ্গীতের মত সুর- তিনজনে চমকিয়া উঠিলাম, ক্রমে তাহা মানব ভাষায় গম্ভী সুরে আত্মপ্রকাশ করিল।

> “নিশি বাসর বীতত ইহৈ মো গুণ
> গাতহি গাত
> কহো কহোঁ ইনকী অহো সখী
> সহজকী বাত!
> সখীরী কহো কহৌ ইনকী বাত
> নিশি বাসর ঐ সেহী বিতবত মো গুণ
> গাতহি গাত!
> নীরেহি রহত নিপট উর লাগে
> তউ অধীর অকুলাত।
> তউ অধীর অকুলাত, নীরেহি নিপট—”

* চৌদ্দ বৎসর পরে মোটরবাস বাহনে সেই নন্দগ্রাম বর্ষাণা গি আর তেমন দৃশ্য চোখে পড়িল না! সে বন বৃক্ষ বিরল, লো সমাগমময়—নামধাম সব ভুল, ‘উদ্ধব কেয়ারী’ এ বনের নাম! জানি এ বিসদৃশ নাম এখানে কে দিল! বর্ষার সে শোভা ও হেমন্তের উ দৃশ্যে অনেক খানি লুপ্ত।

"উন্মাদিনী কমলমুখী দেখলে দশা তোর
কুলটারাও হাসবে সখী আজ———" [হংসদূত কাব্য]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আর বুঝিতে পারা গেল না—ক্রমে সে স্বরও আর শুনিতে পাওয়া গেল না—ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া গেল। দুই তিনবার তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমরা ছুটিতে গিয়াছিলাম, মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ নিষেধে পারিয়া উঠি নাই, নিজেরাও অনেকটা মোহাবিষ্ট, যেন কারণ অনুসন্ধানে মন ও দেহ ততখানি ইচ্ছুক নয়, যা সে ভাবিতেছে তাহার সুখ-স্বপ্ন সে ভাঙিতে চাহে না।

বন হইতে বাহির হইয়াও এক বিস্ময়ে পড়া গেল, মনে হইয়াছিল কত দূরেই না আসিয়া পড়িয়াছি! নন্দীকেশ্বর পর্ব্বতের উপরই ব্রজবাসীর গৃহে মধ্যাহ্নে প্রসাদের নিমন্ত্রণ। সময়ে তাঁহাদের কাছে পৌঁছিতে পারি কিনা সন্দেহ ছিল কিন্তু মাঠে পড়িয়াই দেখি সেই আমাদের ধরমশালার নিকটস্থ সূর্য্যকুণ্ড এবং সম্মুখেই নন্দপুরের অবরোহণের সোপান চক্র।

যথাসময়ে প্রসাদ পাইলাম। তাহারা প্রসাদের কিছু অন্ন ছাড়া গৃহে আমাদের জন্য গমের রুটী তৈয়ারী করিয়াছেন! ব্যঞ্জন বলিয়া কোন বস্তু নাই, 'কঢ়ি' মাত্র সেস্থলে অভাব পূর্ণ করিতেছে। (ইনি বেসম গোলা ঈষদম্ল জলীয় পদার্থ!) আমাদের জন্য সে রুটী ঘৃতযুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা যাহা খান সেই জোয়ারীর রুটী একটু একটু চাহিয়া লইয়া বোঝা গেল ইঁহারা কি খান। এই বৃন্দাবন বনগ্রামবাসীরা কি দরিদ্র—অথচ কি নির্লোভ!

দ্বিপ্রহরের পর 'রথে' চড়িয়া (চারি চাকা বিশিষ্ট সেকালের পটে আঁকা রথের আকারেরই ঠিক এবং গো-বৃষ বাহিত!) বৃষভানুপুরের দিকে যাত্রা করিলাম। ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণজী স্নেহে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খানিক চলিলেন। তখন তাঁহাকে মহাবনের সেই সঙ্গীতের কথা না প্রশ্ন করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি শুনিয়া গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ থাকিয়া যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে 'কে গাহিয়াছে তা জানবার জন্য ব্যস্ত কেন হও মা! যা শুনেছ তার নাম মহাবাণী! শ্রীধ্রুবদাসজী শ্রীহরিবংশজী এঁদেরই রচনা ঐ সব মহাবাণী। যা এখনো ছাপায় ভাষায় ওঠেনি; সাধকদের নিকটে হস্তলিখিতভাবে এবং কণ্ঠে প্রকাশিত আছে। বৃন্দাবনের বনে চারিদিকে কত লুক্কায়িত সাধক এখনো আছেন মা, যাঁদের সন্ধানও আমরা জানি না! তাঁরাই কেউ গেয়েছেন হয়ত!"

মাঠে মাঠে গো-যান চলিতে লাগিল। ঘুরিয়া যাবটের পথে আর যাওয়া হইল না! সঙ্কেতে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া উড়িষ্যার সাক্ষীগোপালের কথা মনে পড়িল। ব্রজবাসীরা বাঙালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'পরকীয়া' তত্ত্বটি মানে না বা জানে না। তাহাদের এই 'রাজকুমারী' এবং রাখালটি শাশ্বত প্রেমের যুগল মূর্ত্তি! তবে লীলায় ইঁহাদের লৌকিক বিবাহও হইয়াছিল, এইখানে সেই বিবাহ বেদী, যজ্ঞ কুণ্ড, স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সাবিত্রী গায়ত্রী আগ্‌লাইয়া রহিয়াছেন। এই বিবাহ গোপনে হইয়াছিল তাই এ গ্রামের নাম 'সঙ্কেত'। বাঁধানো বিস্তৃত চত্বর, তাহাতে প্রকাণ্ড ঝুলন দণ্ডরূপে নির্ম্মিত স্তম্ভযুগল—কিছু কিছু ভাঙিয়া গেলেও এখনো দর্শনীয়ভাবে রহিয়াছে। জানি না, কোন রাজা এই স্থানকে এমন ভাবে একদিন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইঁহারাও কেহ সেকথা বলিতে পারিল না। ভরতপুরের মহারাজার বা রাজপুতানার কোন রাজারই এদিকের এই সমস্ত কীর্ত্তি। তাঁহারাই এদিকের সমস্ত কুণ্ড-বাঁধানো, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি করাইয়াছিলেন। এ সমস্তই মহাপ্রভুর অনেক পরে নির্ম্মিত! তাঁহার আদেশে ছয় গোস্বামী প্রভুরা শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের পরই এ সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দূরস্থ বর্ষাণা বা বৃষভানুপুর গিরি ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিলেন। আমরা অধীর আগ্রহে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। পার্শ্বে প্রেম-সরোবর নামে বিপুলদেহ প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকার পথ, কিন্তু তখন সেপথে নামা হইল না। এখানেও 'লীলা' হয়, পরে আসিয়া দর্শন করিতে হইবে, 'দিদিঠাকুরাণী' এই মত ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু 'প্রেম-সরোবর' নামটির ব্যাখ্যা যখন 'দিদি' করিলেন তখন সহসা যেন ব্রজভূমি-দর্শনের সব সুখ অন্তর্হিত হইয়া এক বিপুল বেদনায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। গোপীদের 'নয়ন জলে'ই এই সরোবরের উৎপত্তি। শত শত যুগ যুগান্তরের ব্যথা আজিও 'প্রেম-সরোবর' নামে এই ব্রজমণ্ডলে এইভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্‌ বাহাদুর

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর্‌-ই-এস্‌

ঐশ্বর্য্যে ও আভিজাত্যগৌরবে বর্দ্ধমানের অধিপতিগণ বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে অত্যুচ্চ পদ অধিকৃত করিয়া আসিতেছেন। যাঁহার অপূর্ব্ব রাজভক্তি ও দেশভক্তি সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী যুদ্ধের সঙ্কটময় কালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল, যাঁহার প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি কেবল তাঁহার ভূম্যধিকার বিস্তৃততর করে নাই পরন্তু তাঁহার প্রজাগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কল্যাণপ্রদ বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়া তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনপনেয়ভাবে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্বপ্রথম দেশীয় সদস্যরূপে নানা ব্যক্তিগত অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, যিনি কমলার বরপুত্র হইয়াও সারদার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, আজিও যাঁহার অসংখ্য প্রীতিগীতি ও ভক্তিগীতিগুলি দেশবাসীর প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের ঝঙ্কার তুলে, শিল্প ও সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ এই বর্দ্ধমানাধিপতিদের গৌরব, তথা বঙ্গদেশের গৌরব, যে কতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি যে উজ্জ্বল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তীরা যে দেশকে উত্তরোত্তর উচ্চতর গৌরবের অধিকারী করিতেছেন বা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি! আজ 'ভারতবর্ষ' সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাবে লাহোর নগরের কোটলি-মহল্লানিবাসী ক্ষত্রিয়-বংশজ কপূর উপাধিধারী সঙ্গম রায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন এবং জগন্নাথদর্শনান্তে দেশে প্রত্যাগমন না করিয়া বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বর্দ্ধমান নগরের অনতিদূরে বৈকুণ্ঠপুর নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার পৌত্র আবু রায়কে বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে একদা দিল্লীশ্বর সাহজাহানের একদল সৈন্য বর্দ্ধমান দিয়া ঢাকা গমনকালে তত্রত্য ফৌজদার সৈন্যদের খাদ্য ও যানবাহনাদি যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে পলায়ন করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘোষণা করেন যে, যদি কোন মহাজন তাঁহার সৈন্যগণের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও শকটাদি আহরণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত এবং সেই স্থানের কোতওয়াল ও চৌধুরীর পদ প্রদান করিবেন। আবু রায় তৎকালে তথায় প্রভূত অর্থশালী ও সম্ভ্রান্ত মহাজন ছিলেন, তিনি অসাধারণ কর্ম্মতৎপরতার সহিত অত্যল্পকাল মধ্যে প্রচুর খাদ্য বাহনাদি সংগ্রহ করিয়া দেন। ফলে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে আবু রায় বর্দ্ধমান প্রদেশের ফৌজদারের অধীনে চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহের রেকাবি বাজার ও মোগলটুলির কোতওয়াল ও চৌধুরী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা হইতেই বর্দ্ধমানরাজ্যের সূচনা হয়।

আবু রায়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম রায় প্রসিদ্ধ কৃষ্ণসাগর সরোবর খনন করেন। তাঁহার সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ, চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভাসিংহ এবং চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন এবং তাঁহার পত্নীগণ জহরব্রত পালন করিয়া সতীধামে গমন করেন। কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতী নরপিশাচ শোভা সিংহকে ছুরিকাঘাতে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আত্মঘাতিনী হন।

কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম কৃষ্ণসাগরে অবগাহনকালে গুপ্তঘাতক দ্বারা নিহত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্‌ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও সম্রাট মহম্মদশাহের নিকট হইতে এক একটি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে শোভাসিংহের জমিদারী বরদা ও চিতুয়া, রঘুনাথ সিংহের জমিদারী চন্দ্রকোণা ও বয়রা, কবিবর ভারতচন্দ্রের পিতার রাজ্য ভূরসুট ও মনোহরসাহী, বরদা জমিদারী, বেনযয়ের রাজার জমিদারী বলগড়ে প্রভৃতি অধিকার করিয়া স্বীয় আধিপত্য

বিস্তার করেন। যদিও তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক 'মহারাজা' বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, তথাপি জনসাধারণ তাঁহাকে মহারাজা বলিয়াই অভিহিত করিত। কবি ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে কীর্ত্তিচন্দ্রকে মহারাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজ্যোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।"

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা এই বলিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে তিনি দিল্লীর বাদসাহকে ২০,৪৭,৫০৬৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। ইনি তাঁহার জননী রাণী ব্রজকিশোরীর নামে রাণীসাগর নামক বিশাল সরোবর খনন করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্রসেন মণ্ডলঘাট, আশা ও চন্দ্রকোণার জমিদারী নিজ অধিকারভুক্ত করেন এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহজাহানের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে কীর্ত্তিচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র তিলকচন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি হন এবং দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর এবং অন্যান্য বহু সম্মান লাভের পর অবশেষে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চহাজারি জাত, তিন হাজার সওয়ার ও মহারাজাধিরাজ উপাধি লাভ করেন।

ইঁহার স্বর্গারোহণের পর ইঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক (ছয় বৎসর বয়স্ক) পুত্র তেজচন্দ্র সম্রাট শাহ আলম কর্ত্তৃক মহারাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হন। তেজচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার জননী মহারাণী অধিরাণী বিষণকুমারী রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্রের আট জন মহিষী ছিলেন, যথা, মহারাণী জয়কুমারী, প্রেমকুমারী, সেতাবকুমারী, তেজকুমারী, কমলকুমারী, নানকীকুমারী, উজ্জ্বলকুমারী ও বসন্তকুমারী। ইঁহাদের মধ্যে মহারাণী নানকীকুমারীই পুত্রবতী ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্রকে প্রসব করিবার তিন দিন পরেই নানকীকুমারী স্বর্গারোহণ করেন এবং প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পিতামহী মহারাণী বিষণকুমারী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন। প্রতাপচন্দ্রের ৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতামহী পরলোকগমন করেন।

মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্ মহারাণী কমলকুমারীর বিশেষ বশীভূত ছিলেন এবং ইঁহার রাজত্বকালে কমলকুমারীর ভ্রাতা পরাণচন্দ্ কপূর রাজ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পরাণচন্দ্র মহারাজার ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার সহিত একাদশবর্ষীয়া কন্যা বসন্তকুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের সহিত পরাণচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না। তিনি সাহসী ও স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পত্তনী সংক্রান্ত ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্রের তিরোধান ঘটে। ইহার ছয় বৎসর পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁহার শ্যালক পরাণবাবুর ৭ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র চুণীলালকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইনিই পরে মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চন্দ্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার জন্ম তারিখ—১৭ই নভেম্বর ১৮২০ খৃষ্টাব্দ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারি সরহিন্দ নিবাসী প্যারীলাল কপূরের কন্যা নয়নকুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে মহতাবচন্দ্রের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। মহারাণী কমলকুমারী ও তদীয় ভ্রাতা পরাণচন্দ্র কপূর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপ্রাপ্ত-বয়স্ক মহারাজার অভিভাবক ও বর্দ্ধমান রাজ্যের অছি নিযুক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহতাবচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ উপাধি সম্বলিত সনন্দ ও যথারীতি খেতাব প্রেরণ করেন।

মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্রকে যথোপযুক্ত বিদ্যা-শিক্ষাদানের জন্য মহারাণী কমলকুমারী সমুচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী চার্লস্ এডওয়ার্ড ট্রেভেলিয়ান বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার উন্নতি দেখিয়া

আনন্দ প্রকাশ করেন এবং কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক পারিতোষিক দেন।

প্রতাপচন্দের তিরোধানের ১৪ বৎসর পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের নিকটস্থ কেশবগঞ্জ নামক পান্থনিবাসে একজন সন্ন্যাসী দর্শন দিলেন। ইঁহার সহিত মহারাজ প্রতাপচন্দের আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। অনেকে তাঁহাকে 'ছোট মহারাজ' প্রতাপচন্দ বলিয়া স্থির করিল। সন্ন্যাসীও আপনাকে প্রতাপচন্দ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কোন মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য হঠযোগদ্বারা মৃত্যুর ভাণ করিয়া কিছুকালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পাঠকগণ অবগত আছেন এই ব্যাপার লইয়া কিরূপ তুমুল মোকদ্দমা বাধিয়াছিল এবং কিরূপে অবশেষে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দের সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে যথোপযুক্ত খেতাব প্রাপ্ত হন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন একটি কন্যা প্রসব করিয়া মহারাজের প্রথমা মহিষী নয়নকুমারী দেহত্যাগ করেন। মহারাজ সাবালক হইলেও পরাণচন্দ্‌ কপূর পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতায় রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই বৎসরেই তিনি বেরুচনিবাসী কেদারনাথ নন্দের কন্যা নারায়ণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসমারোহে রাজকুমারী ধনদেয়ী দেবীর বিবাহ দেন। পরবৎসরে তাঁহার মাতা মহারাণী কমলকুমারী কালকবলে পতিত হন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গস্থ তোপখানা হইতে ১০টী ৬ পাউণ্ড তোপ ক্রয় করেন। উক্ত তোপগুলি রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভীষণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কিরূপে ধীরে ধীরে দেশে শৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপন করিতে-ছিলেন তাহা দেখিয়া মহতাব্‌চন্দ্‌ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজভক্তি অতুলনীয় ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তখন রেলপথ মাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল এবং ঘটনাস্থলে সৈন্য, রসদ ও সামরিক দ্রব্যাদি প্রেরণ করা দুঃসাধ্য ছিল। মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ রসদ ও শকটাদি সংগ্রহে ও সংবাদাদির সহজ আদান-প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের সময়েও মহারাজ ঐরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন।

সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। ক্রমাগত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষ প্রায় কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিল এবং লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনকালের প্রথম কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক ব্যয় আয় অপেক্ষা এত অধিক হইয়াছিল যে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রভূত ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ড্যালহৌসী ২৭,৫০,০০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় ৮৩,৯০,৬৪২ পাউণ্ড ও পরবৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় ১,৪১,৮৭,৬১৭ পাউণ্ড অধিক হইয়াছিল। ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দেও যে আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ১,০২,৫০,০০০ পাউণ্ড বেশী হইবে এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌গণ ভারতবর্ষের এইরূপ আর্থনীতিক অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ডিসরেলী বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ যুদ্ধকার্য্যে ও শাসনকার্য্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন বটে কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত রাজস্ব বিভাগে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন এরূপ অর্থনীতিবিদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভারত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রাজস্ব বিভাগের সংস্কার-সাধন ও আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা যে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন তাহা দূরদর্শী সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যর চার্লস উডের নিকট সর্ব্বপ্রথম প্রতীয়মান হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন সদস্যের পদ শূন্য হইলে স্যর চার্লস উড বিখ্যাত আর্থনীতিক জেম্‌স্‌ উইলসনকে তৎস্থানে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। ইনিই ব্রিটিশ ভারতের প্রথম

রাজস্বসচিব। জেম্‌স্‌ উইলসন রাজস্ববিভাগের অনেক সংস্কার সাধিত করেন, বজেট করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত করেন, গবর্ণমেণ্ট পেপার-কারেন্সী স্থাপিত করেন এবং আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয়-সঙ্কোচ ও আয় বর্দ্ধনের নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ইনি সর্ব্বপ্রথমে এদেশে অস্থায়ীভাবে ইনকমট্যাক্স বা আয়কর-এর প্রবর্ত্তন করেন। এই কর আর্থনীতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া এবং দেশের লোক ঐ প্রকার কর প্রদানে অভ্যস্ত নহে বলিয়া চতুর্দ্দিকে প্রবল আপত্তি উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের সেই সঙ্কটকালে এরূপ করস্থাপন অত্যাবশ্যক ছিল। মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ দূরদর্শী রাজস্ব-সচিবের অবলম্বিত এই নীতির যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং উহার পোষকতাও করিয়াছিলেন। এজন্য বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রণা-পরিষদ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে একটি অবধারণে মহারাজকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজভক্তির এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গদেশ হইতে তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সদস্যরূপে মনোনীত হন। তিনি তিন বৎসরকাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার যে ত্রিশ সহস্র টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই তিনি আলিপুরস্থ পশুশালা নির্ম্মাণার্থ দান করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে মহারাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ নানাস্থানে অন্নসত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন, প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারী তথায় নানা ব্যঞ্জনসহ অন্ন ভক্ষণ করিতে পাইত, শিশুগণ দুগ্ধ পাইত। দুর্ভিক্ষের অবসান হইলে তাহাদিগকে গৃহে যাইবার পাথেয় ও বস্ত্র দিয়া বিদায় করা হয়। তাঁহার দানশীলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাইয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল স্যর জন লরেন্স ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল দিবসে স্বহস্তে ধন্যবাদপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মহারাজার কোনও পুত্রসন্তান না হওয়ায় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যালকের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া কুমার আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌ মহতাব্‌ নাম প্রদান করেন। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানাধিপতিদের নামের শেষে "কপূর" উপাধি সংযোজিত হইত, এই সময় হইতে মহারাজার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাদের নামের শেষে "মহতাব্‌" উপাধি সংযোজিত হইতেছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণরগণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। পঞ্জাবের তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর মহারাজকে সাদরে স্বীয় প্রদেশে নিমন্ত্রণ করেন এবং ভ্রমণের সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

এই বৎসরেই মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বাক্ষরিত মহোচ্চ সম্মানসূচক রাজচিহ্ন (Armorial Bearings) সংরক্ষণের একটি সনন্দ মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দকে প্রেরণ করা হয়। এই সম্মানচিহ্ন বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিবার ক্ষমতা সনন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজার প্রাসাদসমূহে এবং যাবতীয় মূল্যবান্‌ দ্রব্যে এই চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা প্রাইভেট এন্‌ট্রি অর্থাৎ বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তিগণ যে দ্বার দিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রবেশ করেন সেই দ্বার দিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হন।

এই বৎসরেই বর্দ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। মহারাজা নিজব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়া ও মুক্তহস্তে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ দানশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব বদান্যতার বিষয় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলে তিনি মহারাজাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

এই বৎসরেই মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজবংশীয় কোনও কুমার এদেশে আগমন করেন নাই এবং তাঁহার অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন হয়। গবর্ণর জেনারেলের আমন্ত্রণে মহারাজ মহতাবচন্দ এই অভ্যর্থনা-সভায় উৎসাহ-সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমনকালে ডিউক বাহাদুর মহারাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ-প্রাসাদে আগমন ও তথায় জলযোগ করিয়াছিলেন।

মহারাজার শিষ্টাচার ও আদর অভ্যর্থনায় ডিউক পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পুনরায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক এবং লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল মহারাজার অপূর্ব্ব দানশীলতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বলা বাহুল্য মহারাজা এবারেও প্রভূত অর্থব্যয়ে চুঁচুড়া, কালনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে অন্নসত্র, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শাসনকর্ত্তাদিগের ধন্যবাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ (পরে সম্রাট সপ্তম এডও) এদেশে আগমন করিলে মহারাজা উপযুক্ত উপঢৌকনসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিও পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তদীয় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত একটি পদক মহারাজাকে পরিধানার্থ প্রদান করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহারাজা দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে দশ সহস্র টাকা প্রদান করেন এবং তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর এসলি ইডেনের নিকট হইতে প্রশংসা ও ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র প্রাপ্ত হন।

এই বৎসরেই মহারাজা মহাসমারোহে মহারাজকুমার আফ্‌তাব্‌চন্দের বিবাহ দেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া "ভারত সম্রাজ্ঞী" উপাধি ধারণ করেন। এতদুপলক্ষে মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ মার্শাল উডের নিকট হইতে ভারত সম্রাজ্ঞীর একটি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি ক্রয় করিয়া সাধারণকে দান করেন। উক্ত মূর্ত্তিটি কলিকাতা মিউজিয়ামের সোপানাবলীর উপরে স্থাপিত হয়। উক্ত মূর্ত্তির আবরণ মহারাজার অনুরোধে লর্ড লিটন কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হয়।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে মহারাজা মহতাব্‌চন্দ্‌ সাদরে নিমন্ত্রিত হন কিন্তু অসুস্থতানিবন্ধন তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু এই দরবারে তিনি মহোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীন নৃপতিদিগের ন্যায় তিনি আজীবন "হিজ হাইনেস" উপাধি এবং সম্মান স্বরূপ ১৩ তোপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের কোনও মহারাজা এতাদৃশ উচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

এই সম্মানলাভের পর তিনি কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিবার সময় বঙ্গেশ্বর তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সামরিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মহারাজা রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে একটি মন্ত্রণা-পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য এক একজন সদস্য ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ এই মন্ত্রণাসভার সদস্য নিযুক্ত হইতেন।

দেশের কল্যাণের জন্য মহারাজা সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বর্দ্ধমান নগরে একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় বালকদিগের ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার অপূর্ব্ব সুযোগ করিয়া দেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে কলেজে পরিণত হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ও তাঁহারই প্রযত্নে স্থাপিত হয়। বর্দ্ধমানে চিকিৎসালয় স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কালনাতেও তিনি বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা পশুশালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বর্দ্ধমানেও পশুশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজাগণের সময়ে বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের তাদৃশ সৌন্দর্য্য ছিল না। তিনি বর্ত্তমান প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিলখোসবাগ নামক রমনীয় উদ্যান, পশুশালা, মনোহর সরোবর প্রভৃতি তাঁহারই কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। কৃষ্ণসাগর, শ্যামসাগর, রাণীসাগর প্রভৃতি সরোবরের পার্শ্বে বৃক্ষাবলী-শোভিত সুপ্রশস্ত পথ প্রভৃতি তাঁহারই আদেশে নির্ম্মিত হয়।

দার্জ্জিলিং নগর পত্তনের সময়ে মহারাজা দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় বহু সুদৃশ্য শৈলনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া নূতন নগর প্রতিষ্ঠায় ও উহার শোভা বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। এতদ্দারা রাজ্যের আয়ও যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মহারাজ মহতাবচন্দের এ সকল কীর্ত্তি তাঁহাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, সুদূর পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়-

বংশোদ্ভব মহারাজ মহতাবচন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় যে একাগ্র সাধনা ও নিষ্ঠার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীত-শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি সর্ব্বদা নানাশাস্ত্রবিশারদ দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ও সঙ্গীতজ্ঞগণ দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। ১২৬৫ সালে তিনি বহুব্যয়ে বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত মহাভারতের মূল ও বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১২৮৬ সালে শান্তিপর্ব্ব মুদ্রিত হইবার পরই তিনি পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাবচন্দ কর্তৃক উহা সম্পূর্ণ হয়। কথিত আছে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ একদা বর্দ্ধমানাধিপতি মহতাবচন্দকে জিজ্ঞাসা করেন কতদিনে মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইবে। মহতাবচন্দ বলেন উহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাঁহার জীবনকালে উহা শেষ হয় কিনা সন্দেহ। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কথা শুনিয়া বলেন তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন এবং বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহার মহাভারত বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশিত করেন। এই সকল কল্যাণকর বিষয়ে প্রতিযোগিতা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক' মহতাবচন্দের প্রতি কালীপ্রসন্নের অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁহার একখানি নাটক (বিক্রমোর্ব্বশী নাটক) মহারাজার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মহারাজা এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতেছি—"হাতেমতাই" নামক সুপ্রসিদ্ধ কথা গ্রন্থের একটি অনুবাদ মহারাজা প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু মহারাজার সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল—তাঁহার বিবিধতানলয়বিশুদ্ধ অসংখ্য প্রেম ও ভক্তি বিষয়ক গান।

তাঁহার প্রীতি-গীতিগুলিতে প্রেমের বিবিধ অবস্থা অতি মধুরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। সেগুলি এককালে নিধুবাবু, রামবাবু, মধুকান প্রভৃতির গানের ন্যায় সমাদৃত এবং সর্ব্বত্র গীত হইত। কিছুকাল পূর্ব্বে মদীয় পরমপূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিগণের রচিত প্রায় সার্দ্ধ দ্বি-সহস্র প্রেম-গীতি 'প্রীতি-গীতি' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, উহাতে মহারাজ মহতাবচন্দের অনেকগুলি গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। 'বঙ্গবাসী' অফিস হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালীর গান"-এও অনেকগুলি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৭৯৭ শকাব্দায় (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে) মহারাজা তাঁহার গানগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং উক্ত বৎসরে "সংগীত সুধাকর, প্রথম ভাগ" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি বর্দ্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। উহা ২০১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং উহাতে ৯৪৫টি প্রীতি-গীতি ছিল। আমরা যদৃচ্ছক্রমে এই গ্রন্থ হইতে দুইটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন উহা কিরূপ মধুর ও মনোহর ভাবপূর্ণ।—

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল ধিমাতেতালা

এত যে ভালবাসিয়ে মন তার পেলেম না।
তথাপি দেখিলে তারে ভুলে যাই সব যাতনা॥
মনে করি দেখিব না, সে ভাবনা ভাবিব না,
কোন কথা কহিব না, দেখে সে ভাব থাকে না।

রাগিণী ঝিঁজুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে সে যে আমায় ভালবাসে।
যায় যাবে কুলশীল থাকিব তাহারি আশে॥
মনের সুখেতে সুখ, মনেরি দুঃখেতে দুঃখ,
কেন হইব বিমুখ, গুরুজনের কটুভাষে॥

১২৮৬ সালে ৯ই কার্ত্তিক (ইং ২৬শে অক্টোবর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) ভাগলপুরে ভাগীরথীতীরে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ দেহরক্ষা করেন। কাল্‌নায় মহারাজারই নির্ম্মিত একটি সুন্দর ভবনে তাঁহার সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিপুল সমারোহে তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ আফ্‌তবচন্দ তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

মহারাজ মহতাবচন্দের অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাঁহার পুত্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ১২৮৭ সালে মহারাজাধিরাজ

মহতাবচন্দের অবশিষ্ট প্রীতি-গীতিগুলি 'সঙ্গীত-সুধাকর দ্বিতীয় ভাগ' নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার ভক্তিরসাত্মক-গীতিগুলি "ভক্তি-গানামৃত" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'সঙ্গীত-সুধাকর দ্বিতীয় ভাগে' ৩৫৭টি প্রীতি-গীতি এবং ৯৯টি হোরীর গান আছে। একটি প্রীতি-গীতি যদৃচ্ছক্রমে উদ্ধৃত করিতেছি।—

রাগিণী সিন্ধু। তাল জলদ্‌তেতালা।

পূর্ব্বমত এসো না, আর হেথা এস না।
যদি এসো বস না, আর হেথা বসো না॥
কথায় পারে মোহিতে, তব সম কে মহীতে,
অবলা বিমোহিতে, একি প্রাণ বাসনা॥

"ভক্তি-গানামৃত অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্গীত-সমূহ" নামক গ্রন্থে প্রায় ৩৫০টি ভক্তিরসাত্মক গান আছে। উহার কতকগুলি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, কতকগুলি শ্যামা-সঙ্গীত, কতকগুলি ভবানীবিষয়ক, কতকগুলি শিবমাহাত্ম্যসূচক, কতকগুলি রামবিষয়ক। এগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে মহারাজ মহতাবচন্দের ধর্ম্মমত অতি উদার ও সাম্প্রদায়িকতা-লেশশূন্য ছিল। যদৃচ্ছক্রমে একটি শ্যামা-সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। এই ভক্তি-বিষয়ক গানগুলি প্রকৃত সাধকের গান।

রাগিণী সিন্ধু। তাল পোস্তা।

আর কারে ডাকব শ্যামা, ছাওয়াল কেবল ডাকে মাকে।
এমন সন্তান নহি তোমার, ডাকব মাগো যাকে তাকে॥
শিশুতে মা বৈ বলে না, মা বৈ ত শিশু জানে না;
মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাক্‌বো দেখে কাকে।
পুত্র লাগি ত্যজি সুখ, মাতা কত পান দুঃখ,
দেখিয়ে অপত্য সুখ, কিছু দুঃখ নাহি থাকে॥
মা যদি শিশুকে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে না মা যত বকে।
জগত জননী হও, পুত্র ভার তবে লও,
মা গো আব্‌দার সও, এই জন্য চন্দ্র ডাকে॥

মহারাজ মহতাবচন্দের অধিকাংশ গানে "চন্দ্র" ভণিতা আছে। ইঁহার গীতিগ্রন্থগুলি এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এই সুন্দর সঙ্গীতগুলি রক্ষা করা প্রয়োজন। সেইজন্য উপসংহারে বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান সাহিত্য-রসিক অধিপতির নিকট আমরা বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি যেন তিনি অচিরে এই গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ করাইয়া আমাদিগের একটি বিশেষ অভাব মোচন করেন।

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

চার

'দেশ-মুকুরের' সামান্য দশটী টাকা তপেশের প্রেরণা দশগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। দুপুরবেলা এখন সে না ঘুমাইয়া কলম লইয়া মাতিয়া থাকে। কয়েক ঘণ্টার জন্য সকল দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যায়। খানিকক্ষণের জন্য তাহার মঞ্জুলীও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় বাস্তবের চৈতন্য হইতে। উর্দ্ধে উড়িয়া চলে চিন্তার অনন্ত আকাশে, ধাপে ধাপে নামিয়া আসে হৃদয়ের অতল গহ্বরে! সস্তা টিটাগড় ফুলস্কেপ্‌ আর মোটা এফ্‌-এন-গুপ্ত হ্যাণ্ডল!

ইতিমধ্যে সে চারটী গল্প ও একটী উপন্যাসের অর্দ্ধেক লিখিয়া ফেলিয়াছে। 'দেশ-মুকুরে' মাসে এখন একটী করিয়া গল্প দেয়। 'মর্ম্মবার্ত্তা' মাসিকের সম্পাদকের নিকট হইতে লেখার তাগিদ আসিয়াছে। আজকাল তপেশ টাকা না পাইলে লেখা ছাড়ে না।

তপেশ আজকাল তাহার সাহিত্য-সাধনায় এমনি নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘরে যে আর একজন আসিতেছে একথা সে আজ সকালে বাজারে যাইবার পথে সর্ব্বপ্রথম নরেনবাবুর মুখে শুনিল। এ কেমন ধারা লজ্জা! স্বামীর আগেই কথাটা জানিল মনোরমা, শুনিল তাহার স্বামী

নরেনবাবুও। তপেশ ভাবিল, সে একটা আস্ত ইডিয়ট। নরনারীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লইয়া রাতদিন মসগুল, আর চোখের সম্মুখে তাহারই জীবন-সঙ্গিনী মঞ্জুলী নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের দুর্গদুয়ারে বিজয়িনীর বেশে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল, এ খবরটুকু সে পরের কাছ হইতে কুড়াইয়া লইয়াছে!

মঞ্জুলী ঘরে ঢুকিতেই তপেশ একটা নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া কহিল, "Congratulations my Madona."

মঞ্জুলী সলজ্জ চোখে স্বামীর দিকে তাকাইল। একটী ইংরেজী বুলি বুঝিবার মত শিক্ষালাভের সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। কিন্তু কিসের এক স্বতঃ উৎসারিত অনুমান লইয়া সে স্বামীর উৎফুল্ল কথা কয়টার মর্ম্ম যেন বুঝিয়া লইয়াছে।

মঞ্জুলী চুপ করিয়া দেয়ালে-টাঙানো আয়নার কাছে বেণী খুলিতেছে। মুখে চোখে আত্মসমাহিত প্রসন্নতা। তপেশ আয়নার কাচে প্রতিফলিত মঞ্জুলীর আবক্ষ প্রতিচ্ছায়ার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখে চোখে চলিল কি কথার নীরব বিনিময়।

তপেশ পিছন হইতে মঞ্জুলীর মাথাটা নিজের কাঁধে টানিয়া নিয়া ডাকিল 'মঞ্জু!'

মঞ্জুলীর মুখে কথা নাই। আবেশে চোখ দুটী বুজিয়া স্বামীর কাঁধে মাথাটা তেমনি ন্যস্ত রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

"ভাবছ কি মঞ্জু?"

"আসার সময় তো তার এখনো হয় নি।"

তপেশ এবার বুঝিল—আজিকার এই গোলাপের কাঁটা কোথায়। কহিল "ভেবো না মঞ্জু! তুমিই না আমায় কতবার বলেছ—যে বিধাতা মুখ দেন, খাবারও তিনি জোগান। আর এই ছ্যাখো না, আমার গল্পগুলি আর নভেলগুলি প্রকাশ করলেই সব দুঃখ ঘুচে যাবে তখন। অনাগতের আগমনী আজ বিষণ্ণতার কালিমা লেপে ক্ষুণ্ণ করো না মঞ্জু।"

তপেশ মঞ্জুলীকে ছাড়িয়া দিয়া চৌকির উপর তাহার কাগজ কলমের কাছে গিয়া বসিল। সত্যই কি ভাবিবার কিছু নাই?

তপেশের হঠাৎ মনে হইল, আহা! নরেনবাবুর ছোট ছেলেটার আর সে চেহারা নাই। কচি ছেলেটা দেখিতে কি সুন্দর নাদুস-নুদুসই না ছিল! থাকিবে কেমন করিয়া! সে তো নিজের চোখেই দেখে, গয়লা জলমেশানো একপো দুধ দিয়া যায় রোজ সকালে। মঞ্জুলীর মুখেই তো তপেশ শুনিয়াছে? ছেলেটার বড় খাই-খাই দিশা। মায়ের বুকের মাইও গেছে মরিয়া। এক কড়া বার্লি জাল দিয়া রাখে। সারাদিন মাঝে মাঝে বার্লির রঙ্ দু' ছিনুক দুধ দিয়া একটু সাদা করিয়া নিয়া পিসিমা সুমতি খোকাকে ঢগ্ ঢগ্ করিয়া গিলাইয়া দেয়। মা রোজ সকালে একটু একটু ভাত ধরাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু কচি খোকন কিছুতেই ভাত খাইতে চায় না। এতদিনে তপেশের নজরে পড়িল—তাই তো! ওরা তো বড় কষ্টে আছে!

দূর ছাই! অত বাজে কথা ভাবিলে কি আর লেখা যায়। তপেশ কলমটা তুলিয়া নিয়া আবার লেখায় মনোনিবেশ করিল।

মঞ্জুলী স্নান করিয়া ঘরে আসিয়াছে। যেন টাটের উপর কোশার জলে ধোওয়া একটী পূত-শুদ্ধ পূজার ফুল। শুকনো গামছা দিয়া সে সুদীর্ঘ চুলের গোছা আর একবার ভাল করিয়া নিঙড়াইতেছিল।

তপেশ লেখা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "মঞ্জু! আমার মধ্যে একটা মস্ত বড়ো ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, আজকাল আমি যা লিখ্‌ছি, দান্তে থেকে পিরাণ্ডেলো পর্য্যন্ত কেউ তা লিখ্‌তে পারে নি। বুঝতে পাচ্ছ?"

মঞ্জুলী হাসিল। এসব বিদেশী সাহিত্য রথী-মহারথীদের নাম সে কোনকালেও শোনে নাই।

তপেশ বলিয়া চলিল, "বুঝলে তো? আমি আর সে আমি নেই। ছোট গল্প লিখতে বসে এটা আবার উপন্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছোট গল্পে কি ছাই রাশ্ আল্‌গা করা যায়। ও যেন ঠিক বাসের যাত্রী; আঁটসাঁট হয়ে বসতে হবে, দেখবে শুধু দুপাশের কাছের জিনিষ, দূরের দৃশ্য ঢাকা পড়ে গেছে ইমারতগুলোয়, আর ঘন ঘন তাকাতে হবে বাইরে, পাছে গন্তব্য স্থলের বেশী না চলে যায়। উপন্যাস যেন ফার্ষ্ট ক্লাসের রিজার্ভড্ বার্থে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে খোস-খেয়ালী ধনীর দুলাল, থেকে থেকে উঠে বসে জানালার বাইরে দেখছে, অবারিত আকাশ, দিগন্ত-প্রসারী

মাঠ, পাহাড়ের তরঙ্গায়িত শ্রেণী, কয়লার খনি, ইষ্টিশান, পাটের কলের চিমনি—আরো কতো কি! গন্তব্যস্থল পেরিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, মণি-ব্যাগে নোটের তাড়া।"

তপেশের উপমা-প্রয়োগে মঞ্জুলীর কান ছিল না, সে শুধু উপভোগ করিতেছিল স্বামীর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত উত্তাপটুকু।

তপেশ বলিয়া চলিল, "এবার থেকে সবই উপন্যাস লিখব ভেবেছি। অবশ্য একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌ছে। নতুন জুতোর মতো পরার সাধ থাক্‌লেও প্রথমে একটু লাগে। দুদিন পরে সয়ে যাবে, কি বলো? নিজের লেখা সম্বন্ধে আমার খুব বড় রকমের ধারণা জন্মে গেছে মঞ্জু! আমার মনে হচ্ছে, হয় এ আমার ঊর্দ্ধগতি, নয় তো দুর্ব্বল অধোগমন।"

মঞ্জুলী কহিল, "কেন, নিজের লেখা ভাল হ'লে নিজে বুঝি তা বুঝতে পার না?"

"না মঞ্জু। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে সবাই নিজেকে ভাল দেখে। এখানেই যত গোল বাধে কিনা! অথচ আলাদা করে যখন খুঁটিয়ে দেখি, তখন স্পষ্টই স্বীকার করব, আমার চোখটা রবীন্দ্রনাথের মতন তেমন সুন্দরায়ত, বুদ্ধিপ্রখর, স্নিগ্ধচঞ্চল নয় তো। নাকটা তেমন সুন্দর করে উন্নত কৈ! কপালটা রবি ঠাকুরের মত প্রশস্ত ও প্রশান্ত মোটেই নয়। তারপর মুখের আভা, গায়ের রঙ্—ফুঃ। অথচ দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, মাথা আঁচড়ে, একবার ভাল করে আয়নায় যখন মুখখানা দেখি, রবীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথ, তখন স্বয়ং cupid এসে সামনে দাঁড়ালেও আমার চেয়ে সুন্দর বলে তাকে স্বীকার করব না।"

মঞ্জুলী হাসিয়া কহিল, "অ্যাঃ, তোমার রবীন্দ্রনাথ আবার সুন্দর! গুচ্ছিত দাড়ি মুখে।"

হো হো করিয়া হাসিয়া তপেশ কহিল, "ঐ শুধু দাড়িতেই তো কেমন সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে।"

মঞ্জুলী দেয়ালে-টাঙানো রবীন্দ্রনাথের বাঁধান ছবিটায় একবার চোখ বুলাইয়া কহিল, "এখনকার কথা বলছি না গো। ভাবরাজ্য মাসিক পত্রিকায় সেবার তাঁর এক ছবির নীচে লেখা দেখেছি, ত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ। অ-কবির মত ঐ বয়স থেকেই দাড়ি রাখ্‌তে আরম্ভ করেছে।"

"বার্ণার্ড শ-ও দাড়ি রাখে গো"

"বঙ্কিমচন্দ্র রাখে নি মশাই"

"তা বটে!" বলিয়া তপেশ হাসিয়া লেখায় মন দিল।

মঞ্জুলী কহিল, "শরৎ চাটুজ্জ্যের-ও তো দাড়ি নেই।"

মুখ না তুলিয়াই তপেশ কহিল, "সান্ত্বনার কথা।"

তপেশ কলম লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, পথে অক্ষরের পর অক্ষর, লাইনের পর লাইন মাকড়সার জালের মত বুনিয়া। মঞ্জুলী তাহার বিমুগ্ধ চোখ দুটী খানিকক্ষণ স্বামীর উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সামনে উঠিয়া গেল।

"ওগো, একটীবার শোন।"

"বলো"—তপেশ মুখ তুলিল।

"শরৎ চাটুজ্জ্যে শুনেছি বর্ম্মায় কাজ করত। অনেক দুঃখকষ্ট না-কি—"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

"এমনি"—মঞ্জুলী একটু হাসিল।

তপেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বুঝেছি মঞ্জু। তুমি ভাবছ তোমার স্বামীও একদিন দুঃখকষ্টের মধ্য থেকে শরৎ চাটুজ্জ্যের মতো একটা দিকপাল হ'য়ে গজিয়ে উঠ্‌বে, না?"

"নয় বা কেন!" মঞ্জুলী গম্ভীর হইয়াই উত্তর দিল।

বক্তৃতার সুযোগ পাইয়া তপেশ অমনি সুরু করিল, "বড় প্রতিভাকে জাগতিক বাধা কিছুই করতে পারে না। আপনার অপ্রমেয় প্রাণ-শক্তিতে সে সব নিষেধ-বন্ধন তুচ্ছ করে্ জেগে ওঠে অপরিসীম বিস্ময় নিয়ে তৃণগুল্মের রাজ্যে। কিন্তু mediocre দের—মানে—মাঝারি অর্থাৎ চুনোপুঁটি যাঁরা তাদের বাইরের বাধা যত বেশী, তাদের পারিপার্শ্বিক—"

তপেশের বক্তৃতার স্রোতে বাধা পড়িল। বাহিরে দুয়ারের ও-পিঠে সুমতি ডাকিল, "দিদি, বৌদি একবার ডাকছে তোমায়।" 'যাই বোন' বলিয়া মঞ্জুলী উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর বক্তৃতার হাত হইতে আপাততঃ মঞ্জুলী রেহাই পাইল।

কলম রাখিয়া দিয়া তপেশ ভাবিতে বসিল—কথাটা কি সত্য? দুঃসহ পারিপার্শ্বিকের চাপ শ্রেষ্ঠ প্রতিভার কোন ক্ষতিই করে না? বট-অশ্বত্থ অবশ্য পাষাণপ্রাচীর ভেদ করিয়াও উঠিতে জানে। কিন্তু কঠিন শুষ্ক ইটের বুক-চিরিয়া-ওঠা দেহকাণ্ডের দু একটা অপুষ্ট ডালপালা

কি অপচয়ের এতটুকু পরিচয়ও দেয় না? শিল্পীর সাধনা অন্তরে, বাহিরে নয়। সুতরাং সে যখন প্রাণান্ত প্রাত্যহিকতার বাধা নিষেধ ঠেলিয়াও ফুঁড়িয়া ওঠে, মায়ের-বুকে-দুধ-না-পাওয়া লিক্‌লিকে শিশুর মত সে অনেকখানি আগেই খোয়াইয়া, অনেক কিছু হারাইয়া বসে বাহিরের সংগ্রামের অপচয়ে।

মঞ্জুলী ঘরে ফিরিয়া আসিতেই তপেশ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় মঞ্জু! জাগতিক প্রতিকূলতা বাণীর শ্রেষ্ঠ পূজারীদের বাড়তির পথে বাধা জন্মায় বৈ কি! বাঙ্গালী জাতি তথা বিশ্বের মহা সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ ধনীগৃহেই জন্মেছিলেন। নইলে, নোবেল প্রাইজ তিনি ১৯১৩তে না পেয়ে ১৯৩৩এ পেতেন কিনা তা নিয়ে রীতিমত একটা গবেষণা চল্‌তে পারে।"

মঞ্জুলী হাসিয়া কহিল, "গবেষণা একটু থেমে থাক্, এবার একটা কাজের কথা শোন।"

"এতক্ষণ বুঝি বাজে কথা বললাম?"

"ভাল রে ভাল! কি কথার কি মানে! আমি এসেছি কাজের কথা নিয়ে—তোমার কথা পূজোর। ভাঁড়ার আর ঠাকুরঘরের বুঝি এক-ই দাম?"

তপেশ হাসিয়া উঠিল, "বাঃ, এই তো চাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক তপেশ লাহিড়ীর যোগ্যা ঘরণী! এবার তোমার কাজের কথাটা শুনি?"

"হাতে আছে মোটে আট আনার পয়সা। 'ভ্যানগার্ড' তো গেল হপ্তায় কিছু দেয় নি।"

"কাগজের অবস্থা ক্রমেই খারাপ দাঁড়াচ্ছে। ভয় পেয়ো না। ভরাভাদ্রের অমাবস্যার রাত-ও প্রভাত হয় মঞ্জু! If winter comes, can the spring be far behind?"

"দিদির কাছে একটা টাকা হাওলাত চেয়ে রেখেছি। নরেনবাবু পরশু মাইনে পাবেন—"

তপেশ বাধা দিয়া কহিল, "আঃ, ও-সব কথা থাক্ এখন। দুঃখ কষ্ট সাহিত্য-সাধনার মস্ত বড় বাধা, একথা বুঝ্‌লে তো?"

মঞ্জুলী হাসিয়া কহিল, "না। তুমিই তো বলতে দুঃখবেদনা মানুষকে মহীয়ান করে তোলে।"

তপেশ উল্লসিত হইয়া উঠিল, "নিশ্চয়! কষ্টের নাড়ি ছিঁড়েই জন্ম নেয় সৃষ্টি। বেদনার বুক নিঙড়ে বের হ'য়ে আসে কত স্রষ্টা, কত সৃষ্টি—সুরে-রঙে রেখায়-আলোয় গীতে-শ্লোকে লাস্যে-লালিত্যে তাপে-উচ্ছ্বাসে আভাসে-ইঙ্গিতে কথনে-অকথনে···"

মঞ্জুলী উস্‌খুস্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তপেশ তাহাকে জোর করিয়া চৌকির উপর বসাইয়া দিল। তাহার উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার একজন শ্রোতা চাই। প্রয়োজন একটী উপস্থিতির—আয়না, আলনা ও কড়িকাঠের চেয়ে জীবন্ত শ্রোতার মূল্য বেশী। মঞ্জুলী লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। সেও হাসি গোপন করিয়া মনোযোগের ভাব দেখাইয়া বসিয়া আছে।

তপেশ আবার সুরু করিল, "কি বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ, কষ্টের মধ্যেই সৃষ্টির তাগিদ। বেদনাই মহত্ত্বের সোপান। এ কোন্ বেদনা? এ কি বাড়ীওয়ালার দু মাসের বাড়ী ভাড়া, আর ভ্যানগার্ডের দু' মাসের পাওনার মধ্যে টানা-হেঁচড়া দিন-চালানো?—না, এ অন্তরাত্মার প্রকাশ-যাতনা, আত্মপ্রকাশের ব্যর্থতায় বিপুল স্ফোটন-বেদনা? না, আপনার দীপশিখাটিকে আরও প্রোজ্জ্বল করে তুলতে মনের গোপন প্রকোষ্ঠে নিরন্তর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি? না, না, এ তো বেদনা নয়, যাতনা নয়, কষ্ট নয়, এ তো সুখও নয়, আনন্দও নয়, উল্লাসও নয়। এ যে বিষামৃত! বুঝলে মঞ্জু?"

"না।" মঞ্জুলীর অতিকষ্টে-চেপে-রাখা হাসি বুদ্বুদের মত ফাটিয়া গেল।

"হোপ্‌লেস্! এতক্ষণ তবে বোঝালাম কি?" উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তপেশ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

"আমার জন্য বলো নি তো। নইলে বুঝতাম নিশ্চয়ই," বলিয়া মঞ্জুলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

তপেশ আবার জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল, "এবার তোমায় জলের মত করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"রক্ষে কর! ··ভাত চাপিয়ে এসেছি। তরকারী কোটা সেরে রাখব না?"

"সে হবে'খন। শোন।" আবার তপেশের বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিল। মঞ্জুলী মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া স্বামীর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছে, বক্তৃতায় তাহার আদৌ কান নাই। অমনোযোগী ছাত্রী বটে, কিন্তু

প্রোফেসরের লেক্‌চার দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই বেঞ্চে বসিয়া ঝিমায় না সে।

"শোন মঞ্জু। বহির্জগতের সব রকম কষ্ট কৃচ্ছ্রের মধ্য দিয়ে ছোট থেকে বড় হওয়া, নীচু থেকে উর্দ্ধে ওঠা—সে সংগ্রাম বাইরের বলেই তাতে মিলে জড়-সাফল্য, সে নীতি জাগতিক চরিতার্থতার। একটা ঝুনঝুনওয়ালা লোটা-কম্বল সম্বল করেই সুরু করে, প্রয়োজন তার এক অনুকুল মাহেন্দ্রক্ষণের, একটা মোড় ফিরিবার ফলপ্রসূ আকস্মিকতার। ক্যালিফোর্ণিয়ার একটা অয়েল ম্যাগ্‌নেটের কাঞ্চনাভিযানের আরম্ভে প্রয়োজন হয় গোটা কয়েক এ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট। সাফল্য তাদের বাইরের, তাই বাইরের বাধাবিপত্তি তাদের এক একটা সোপান। শিল্পী, সাহিত্যিক, রূপস্রষ্টার তো সে ধর্ম্ম নয়। আচমকা অনুকূলতায় তার স্ফুরণের বীজ লুকিয়ে থাকে না মঞ্জু! বরং আকস্মিকতা তার বাড়তিকে ব্যাহত করে। ধর্ম্ম তার ক্রমবিকাশ, ফুল থেকে ফলে পরিণতি। সে যে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে হ'য়ে—উঠে বাইরে আসে। সে যে নিগূঢ় জীবনানন্দে ভাবঘনরসে বেড়ে ওঠে দিনে দিনে। মঞ্জু, ফুটপাত থেকে মেয়রের জীবনেতিহাস রূপপূজারীর নয়। সে যে জাগতিক সার্থকতার জড়োয়া দীপ্তি! বুঝ্‌লে এবার?"

"উহু," মঞ্জুলী হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা হ'লে নিশ্চয় তোমার য়্যাটেনসন্ ছিল না।"

"তোমারই বোঝাবার ক্ষমতা নেই। শুধু বইএর ভাষায় লেক্‌চার ঝাড়লে।"

"যাও, ছুটি।···বাঁচলে।···হাঁপিয়ে উঠেছ, না?"

"এতক্ষণে তা বুঝতে পেরেছ?" বলিয়া মঞ্জুলী হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তপেশ ভাবিল, সে তাহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মুখে কথাগুলি পূরিয়া দিবে।

আবার লিখিতে সুরু করিল। কিন্তু কলম কাঁপে, চলিতে চায় না।···না, আজ এই অধ্যায়টা শেষ করিতেই হইবে।···কলম কাঁপে, কাঁপিয়াই চলুক সে।······

ও-ঘরের ধীরেনবাবুর ছোট ছেলেটা আজ আবার ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে, নাঃ—কানের কাছে এমন ঘটিলে আর সাহিত্য-চর্চ্চা চলে! তপেশ রাগিল, ওর মা-পিশির আক্কেল নাই! খানিক দুধ খাওয়াইয়া দিক্ না, এখনই ঠাণ্ডা হইবে। দুধ না থাকে, একবাটী বার্লিই কেন ঢক ঢক করিয়া গিলাইয়া দেয় না!

মঞ্জুলী তেল নিতে ঘরে আসিয়াছে। তপেশ কহিল, "ওদের ছেলেটা কি চুপ করবে না!"

"ওঃ, ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। ঐ-টুকুন কচি ছেলে, শুধু ছট্‌ফট্ করছে।" মঞ্জুলী আবার গৃহকাজে বাহির হইয়া গেল।

তপেশ আবার লিখিতে সুরু করিল। কথোপকথনের ঘাত-প্রতিঘাতে আখ্যায়িকার চরিত্রগুলি সজীব হইয়া উঠিল কিনা বুঝিবার জন্য বার বার পড়িয়া দেখিতেছে।

ওদের ছেলেটা আবার কাঁদিতেছে। না, আজ আর লিখিতে দেবে না।

তপেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ আজ আবার পূবদিকের জানালা দিয়া দুর্গন্ধ আসিতেছে। বাড়ীওয়ালাকে এত বলিয়াও কোন ফল হইল না। দ্বিতল ও ত্রিতলের মা-লক্ষীদের খেয়ালও থাকে না, নীচের লোকগুলিও মানুষ! জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবে তাহারা কিছুই জানে না। মেয়েদের উপর পুলিশ কোর্টের মত জেরাও চলে না। প্রতিকারও হয় না।

জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তপেশ উত্তর দিকের জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিল। বাতাস আসে মন্দ না। কিন্তু রাস্তার ডাষ্ট্‌বিনটা কি তপেশদের জানালা বরাবর না থাকিলেই চলিত না! দক্ষিণে কোন ফাঁকের বালাই নাই, থাকিলে বাড়ী ভাড়া আরো দু টাকা বাড়িয়াই যাইত।

মঞ্জুলী ঘণ্টা খানেক বাদে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "এবার লেখা বন্ধ কর—নাইতে যাও।"

"আমার এখনো ক্ষিধে পায় নি।"

"তোমার না পেতে পারে, আমার তো ক্ষিধে পেয়েছে।"

"তা, তুমি খেয়ে নাও না—কি বাজে কন্‌ভেনসন্ তোমাদের—স্বামীর আগে খেতে নেই।"

মঞ্জুলী গম্ভীর হইয়া কহিল, "অনেকদিন অনেকবার বলে তো দেখেছ, ফল যখন হয় নি, তখন কথা না বলে স্নানটা সেরে এস দিকিন।"

"আচ্ছা, এ দু' লাইন লিখেই যাচ্ছি, তুমি যাও। তাহ'লেই পরিচ্ছেদটা শেষ হয়।"

মঞ্জুলী রান্নাঘরে গেল।

পরিচ্ছেদ আর শেষ হইল না। তপেশের মনে পড়িল, মঞ্জুলী এতদিনে জননী হইতে চলিয়াছে। আজ মহা-আনন্দের দিন। আজ সে অন্তরের গলিত স্বর্ণ অক্ষরের ছাঁচে ঢালিয়া স্তরে স্তরে হাজার রকমের ভাষার আবরণ সাজাইবে। মঞ্জুলী আজ রূপান্তরের পথে পা বাড়াইয়াছে। আজ শক্তি সে, শ্রদ্ধা সে, কল্যাণী সে!—আজ সে বসন্তের উদার দাক্ষিণ্য, শরতের শ্বেত শুচিস্মিতা, হেমন্তের সাফল্য-সঞ্চয়!……

দূর ছাই! এ-যে ধোঁয়াটে কবিত্ব! নিছক ভাবান্তরের। তপেশ ভাবিল, ওদের খোকার বোধ হয় জ্বরটা একটু কম্‌তির দিকে, আর কাঁদে না। আহা! ছেলেটার আর সে চেহারা নাই!

খাতাপত্র বন্ধ করিয়া তপেশ উঠিয়া পড়িল। তৈলের শিশিটা হাতে করিয়া আবার সেই চিন্তারই সূত্র। বড় বড় প্রতিভাই যদি ক্ষুণ্ণ হয় বাহিরের চাপে, মাঝারি শক্তি-গুলির তো কথাই নাই। মাঝারি! মিডিয়োকারস্‌! তপেশের মনে পড়িল, দিন কয়েক পূর্ব্বে তাহার এক বন্ধুর মেসে অতি-আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গেছে। তাহার সারাংশ এই:—রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চ্চা কিছুকাল থামিয়া থাকলেও দেশের কোন ক্ষতি হইবে না, বরং উপকার হইবে বিস্তর। এখন জাতির সম্মুখে বড় বড় সমস্যা। আর এসব ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যের পরমায়ুই বা কতদিন, দশ কি বড় জোর পনেরো বৎসর। পরে কে-ই বা পড়ে ওসব হাল্‌কা সাহিত্য।

লাজুক তপেশ এখন সেই যুক্তির জবাব দিতে চায়, সেদিন পারে নাই। জনসভায় উত্তেজিত বক্তার মত হাত নাড়িয়া কথার শেষে সুর টানিয়া তপেশ বলিতে লাগিল, অবশ্য মনে মনে—এসব মিডিওকাররা, এই মাঝারি শক্তিগুলি কিছুকালের জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে আসে, সুদূর ভবিষ্যতের বুকে জাগিয়া থাকিবার অভিমান তাহাদের নাই। এই স্বল্পায়ু তাহাদের বৈশিষ্ট্য, তাহাদের যত কিছু গর্ব্ব। তাই বলিয়া ভারতীয় তাল-তমাল-পিয়াল বনে তাহারা তো আগাছা নয়। পরগাছা-ও না। দুই কি তিন পুরুষ একাদিক্রমে শক্তিশালীর আবির্ভাবের পর বংশ-ধারায় কিছুকাল মন্দাই ঘটে। কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তীদের মধ্যেই যাপ্য থাকে অনাগত বংশোজ্জ্বলকারীর স্ফুরণ-বীজ, লাঞ্ছিত হয় প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যের অনুজ্জ্বল বনিয়াদ এই বর্ত্তমান। তাহারাই এই প্রাগুদয়ের যোগসূত্র। স্বর্ণশিখর উদয়াস্তের মধ্যবর্ত্তী অবিচ্ছেদ্য কৃষ্ণ শুক্লা রাত্রিগুলি। তাহারাই স্রষ্টাকে সৃষ্টি করে। তাহারাই অনন্যসাধারণের সম্ভাবনার আলো। জোয়ারের পর ভাটাই বটে, কিন্তু আসন্ন প্লাবনের আগমনী গায় অশ্রান্ত কলতানে। তাহারা অস্থায়ী, ঠুন্‌কো নহে; কাঙ্ক্ষণীয় নয়, বরণীয় নয়; অনিবার্য্য, অনুকরণীয় নয়। যুগে যুগে সাহিত্যের প্রাণধর্ম্ম তাহারাই রাখে জিয়াইয়া। এরা ইমারত নয়—ভিত্তিমূল। ফলভার নয়—উর্ব্বরতা। রক্ষক তাহারা, পালয়িতা। ধন্য! নমস্য!…

অলোক-সামান্য প্রতিভার ছায়াপুষ্ট তাহারা নূতন কিছু সামান্যই দিতে পারে। কিন্তু যাহা দেয় তাহা অনুকরণ নয়, অতিরঞ্জনও নয়—তাহা অনুরঞ্জন, অনুরণন। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার বিভিন্ন সুর ও ছবিগুলির ভাষ্যকাররা সহজ সরল সুন্দর করিয়া সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। তাহারা প্রতিভার ভূমিকা, স্রষ্টার পরিশিষ্ট। এরা ভুল করিলে, ভুল বুঝিলে, চীৎকার করিয়া, গালাগালি দিয়া গলা ভাঙ্গিলে, জিব ব্যথা করিলে, কোন লাভ নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমজদার কালের কষ্টি-পাথরেই তো এদের যাচাই হইবে—ধুইয়া মুছিয়া যাইবে দুর্ব্বল সুন্দর ভুলচুক যত কিছু আছে, আর জমা হইয়া রহিবে তাহাদের বুকের পরাগ, যদি কিছু থাকে, পলিমাটীর মত এখানে সেখানে।

ছাইয়া ফেলুক না সারা দেশ নাটক, নভেল, কবিতা, প্রহসন, প্রবন্ধ-নিবন্ধে। বিক্রি না হউক, না পড়ুক কেহ, আলমারীতে পোকায় কাটুক পাতার পর পাতা। তবু দেশের প্রাণধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টি যেন না হয়, স্ফুরণের অব্যাহত ধারাটী যেন শুকাইয়া মরিয়া না যায়।

মঞ্জুলী ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্বামী তাহার তেলের শিশিটা হাতে লইয়া উন্মাদের ন্যায় শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া জানালার কাছে বিড়বিড় করিয়া মনে মনে কি সব বলিতেছে! হাসিয়া কহিল, "তুমি পাগল হ'লে না-কি? তেলের শিশির মধ্যে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করছ বুঝি?"

"এই…হ্যাঁ,…আমি এখনি যাচ্ছি, তুমি ভাত বাড়তে বাড়তেই আমি চট্ করে নেয়ে আসব," বলিয়া তপেশ মাথায় খানিকটা তেল ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শারদীয়া

শ্রীরাধারাণী দেবী

—নীলাকাশ—

মেদুর মেঘের ম্লান-ধূসর গুণ্ঠনখানি খুলি
নির্ম্মল মাধুরী-মুগ্ধ আনন্দিত নীল আঁখি তুলি
কে তাকালো ধরা পানে এ' সুন্দর শারদ প্রভাতে?—
রবিকর-বিরহিনী অশ্রুম্লানা ধরিত্রীর সাথে
হলো দৃষ্টি-বিনিময় প্রেমপূর্ণ পুলক-ভঙ্গীতে।
মুহূর্ত্তে উঠিল রণি' প্রত্যাসন্ন আশার সঙ্গীতে
শোকাচ্ছন্ন বসুধার নৈরাশ্যের নিরুজ্জ্বল দিন;
শরতের শুভ স্পর্শে জ্যোতির্ম্ময় হ'ল সে নবীন।
স্বচ্ছ নভোনীলিমায় নবরৌদ্র ভাতিল উজ্জ্বল,
নীলাভ্র ভৃঙ্গারে যেন স্বর্ণসুরা করে টলমল।

—শিশিরকণা—

নিশান্তে পথের প্রান্তে শ্যামশষ্প তৃণশীর্ষে দুলি'
নিঃশঙ্ক উল্লাসে খেলে উতরোল কচি শিশুগুলি!
পল্লবিত শাখে শাখে সদ্য ফোটা ফুল্ল ফুলদলে
সপ্তবর্ণ রত্ন আভা বিকীর্ণিয়া—হাসে কুতূহলে।
ধরণীর শ্যামবক্ষে কে পরালো লক্ষ-মোতি-হার?
সুস্নিগ্ধ শীতল তনু খরোজ্জ্বল—তবু সুকুমার।
নিশার অলকচ্যুত অমরাবতীর জ্যোতিঃ কণা,
শিশির-নীহার-হারে মর্ত্ত্যে যেন দিল আলিপনা!

—শিউলী ফুল—

মূর্ত্তিমতী মায়া তুমি,—শরতের হে শেফালি ফুল!
স্নিগ্ধ-সকরুণ বাসে চিত্ত করো বিধুর ব্যাকুল।
হারানো-বন্ধুর লাগি হৃদয়ে আকুল-ব্যথা জাগে!
অকারণে সকরুণ বিরহবেদনা মর্ম্মে লাগে।
শীতল-শিশির-সিক্ত শুভ্রতনু তাই কিগো ঝরে
না-পাওয়া বঁধুর লাগি রাত্রিশেষে মৃত্তিকার 'পরে?
সলজ্জ-সৌরভে তব কৈশোরের সুখস্বপ্নাভাস,
উদাসীর চিত্তে যেন অতীত স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস।

—সোনালী রৌদ্র—

বারিসিক্ত বনানীর অশ্রুনেত্রে কে ফুটালো হাসি?
অদৃশ্য বীণায় কা'র হিরণ্ময় সুর আসে ভাসি?
ধনীর প্রাসাদচূড়ে দরিদ্রের জীর্ণ আঙিনায়
সমান দাক্ষিণ্যভরে স্বর্ণধারা কে আজি বিলায়?
মাঠে ঘাটে নদীস্রোতে তালিবনে নারিকেল-শিরে
ঝিকিমিকি নৃত্যে কেবা নব-রবি-বার্ত্তা লয়ে ফিরে?
সোনালী শারদ-রৌদ্রে মাধুর্য্যের মুক্ত সঞ্চরণ,—
কনক-কিরণ-রাগে ধরিত্রীর কান্তি-প্রসাধন।

—কাশবন—

বলাকার পক্ষ সম লঘু মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
তারি সনে শ্যামাঙ্গনে কে রচিল শ্বেত-অনুপ্রাস?
দুরন্ত প্রাবৃটে যেন প্রেমডোরে করিয়া বন্ধন
সবুজ মেদিনীতলে সহাস্য উচ্ছল-কাশবন।
কার্পাস-কেশর কোটী স্তবকে স্তবকে ওঠে দুলি,
যেন ঊর্ম্মি-ফেণারাশি মত্তহাসি উঠিতেছে ফুলি।
শান্তির পতাকা শুভ্র সহস্র-শিখায় মাঠে ওড়ে!
শরতের আগমনী উল্লাসে জানায় করজোড়ে।

—স্থলপদ্ম—

গোলাপেরো রূপগর্ব্ব টুটায়েছো কঠিন আঘাতে,
হে স্থলকমলরাণি ! তোমার সুন্দর নেত্রপাতে
কাননলক্ষ্মীর অঙ্গে উথলিল লাবণ্যের ধারা
ঈষদ্‌রক্তিম রাগে,—লজ্জালতা নবোঢ়ার পারা।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্পভারে আশ্বিনের অঙ্গরাগ করি
সবুজ বনের বক্ষে বর্ণ-বন্যা এনেছ সুন্দরি !
অরুণ অধরস্পর্শে তোমার কপোল হ'ল লাল,—
মৃত্তিকার পদ্ম নাম তাই তো পেয়েছ চিরকাল।

—কাঁচা ধান—

নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম অঙ্গবাস রঙ্গভঙ্গে মেলা—
বিরাট প্রান্তর জুড়ি কে কিশোরী করে মুগ্ধ-খেলা
রৌদ্র মেঘচ্ছায়া সনে সারাবেলা উল্লাস-হিল্লোলে ?—
চঞ্চল সমীরে তার অঞ্চলে সাগর উর্ম্মি-দোলে।
রাখালিয়া বেণু বাজে মেঠো সুরে গোচারণ-মাঠে,
অরণ্যের আঙিনায় হরিত হিরণ্য ঘেরা বাটে।
প্রসন্ন পল্লীর নেত্রে কে আঁকিছে সুখস্বপ্নচ্ছবি ?
ধরণী ঐশ্বর্য্যময়ী,—ইন্দিরার পাদস্পর্শ লভি'।

—হংস-বলাকা—

নীল চন্দ্রাতপ-তলে শ্বেত-শতদলে রচি মালা
কে দিলো দুলায়ে ? বুঝি,—অন্যমনা কোনও দেববালা
আপনার করধৃত পারিজাত-হার হতে খুলি
আনন্দবিহ্বল-মনে ফুল ছিঁড়ি ছড়াইল ভুলি।
হে হংস-বলাকাশ্রেণী ! শরতের হে সুন্দর দুত !
আকাশ-ধরণী মাঝে এ কি ছবি রচিলে অদ্ভুত !
তব পক্ষ-সঞ্চালনে গতির উন্মুক্ত রূপ হেরি'
লোকে লোকে যাত্রা লাগি কাঁদে চিত্ত—
আরো কত দেরি ?—

—রক্তকমল—

কূলপূর্ণ সরসীর স্ফটিক-দর্পণতলে তুমি
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হাস্যে খররৌদ্রে উঠিলে কুসুমি।
ব্যাকুল বাতাস বলে,—সুন্দরি ! সুরভিদ্বার খোলো !
পরাগ-বিহ্বল মুগ্ধ ভৃঙ্গদল মধুমত্ত হোলো।
বারিবক্ষে আছ, তবু—তোমারে স্পর্শিতে নারে বারি ;
বরতনু খানি ঘেরি দোলে তাই অশ্রুবিন্দু তারি।
শারদলক্ষ্মীর তুমি আসন সাজালে নিজ ফুলে !
সূর্য্যের সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে মগ্ন আছো সারা বিশ্ব ভুলে।

—দুর্গোৎসব—

বাজিছে বোধনবাদ্য। আনন্দ উৎসব প্রতি ঘরে,
মর্ম্মর-হর্ম্ম্যের মাঝে, জীর্ণ ভগ্ন কুটীর-চত্বরে !
নববস্ত্রে ভাগ্যবান,—ছিন্নবাসে মলিন ভিখারী
মায়ের মণ্ডপে সবে ফুল্ল মুখে আসে সারি সারি।
পথে পথে শিশুদের উল্লাসের উচ্ছল কল্লোল,
মিলিতেছে তারি সাথে আগমনী শঙ্খ ঢাক ঢোল।
সুদীর্ঘ বৎসর অন্তে গৃহপ্রান্তে ফিরিছে প্রবাসী !
ভুলি সর্ব্ব দুঃখ ক্ষতি, অধরে ফুটেছে শান্তহাসি।
বিজয়ার শুভলগ্নে মাতিবে যে মিলন-উৎসবে,
শত্রু-মিত্রে আত্ম-পরে—বক্ষে বক্ষে আলিঙ্গন হবে।
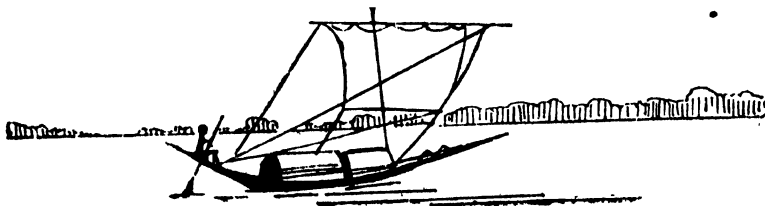
শান্তির রাজ্য

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

মানুষ বেঁচে থাকে আশা-আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে। একের পর এক করে সে সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছে নূতন অভাব, আর তাই পূর্ণ করবার আশায় নিয়োজিত ক'রছে তা'র সকল মন-প্রাণ। আমার বেলাও তাই হ'ল। পুঁথি-পুস্তকে, মাসিক-ত্রৈমাসিক-বাৎসরিক পত্রিকাতে, দৈনিক-সাপ্তাহিক কাগজে, যতই শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীর সাথে, গানের সাথে, তাঁর সাহিত্যের সাথে আমার পরিচয় হ'তে লাগলো ততই মন-প্রাণের ব্যাকুলতা বেড়ে যেতে লাগ্‌লো তাঁকে তাঁর আপন রাজত্বের ভেতর দর্শন হেতু। এই আকুল বাসনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন কর্ম্মের বোঝা ব'য়ে দিনের পরে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন একদিন বন্ধুপ্রবর পরিতোষ গাঙ্গুলীর সাথে হ'ল আমার পরিচয়। ক্রমে জান্‌তে পারলাম পরিতোষবাবুর জ্যেঠামশায় থাকেন শান্তিনিকেতনে—কবির সাহচর্য্যে শান্তি পাবার আশায়। ইনি শান্তিনিকেতনে গাঙ্গুলী মশাই নামে পরিচিত। বন্ধুবরকে জানালাম সযত্নে পোষিত আমার ইচ্ছা। তাঁর প্রচেষ্টা এবং আমার ঐকান্তিক ইচ্ছার সংযোগে শান্তিনিকেতনে যাবার অন্তরায়গুলিকে কাটিয়ে উঠ্‌তে সক্ষম হ'লাম।

তারপর ৬ই মার্চ্চ (১৯৩৬) পূর্ব্বাহ্ণে কয়েকখানা কাপড় ও জামা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশনে পৌছে দু'খানা রিটার্ণ টিকিট কেটে চেপে বসলাম' গাড়ীতে। তীব্রবেগে ছুটে চ'লেছে গাড়ী। মুহূর্ত্তের ভেতর সহরের আবহাওয়া ছাড়িয়ে চলে এসেছি অনেকদূর প্রকৃতির লীলাভূমিতে। গাড়ী ছুটে চ'লেছে নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত প্রকৃতির বক্ষ ভেদ করে। কতদিন পর আবার ফিরে পেলাম আমার হারিয়ে-যাওয়া সত্যিকারের দৃষ্টি। চারদিকে সবুজে সবুজ ছেয়ে আছে—মৃদু-শীতল বায়ু সঞ্চালনে অপূর্ব-ভাবের সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছে মনে। সহরের কায়া গড়ে উঠেছে পাষাণে—সেখানে কি ক'রে পৌছবে প্রকৃতির বাণী—প্রকৃতির মায়া! তাই কবি বলেছেন—

'ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা।'

সহরবাসী কি ক'রে জান্‌বে প্রকৃতির ভেতর কি গভীর আনন্দের খনি নিহিত আছে—কি ক'রে অনুভব ক'রবে প্রকৃতির সাথে তাদের নিগূঢ় আত্মীয়তা—কি ক'রে বুঝ্‌বে, 'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্‌'—এই সুর কি শিহরণ জাগায় পল্লীমেয়ের অন্তরে! হঠাৎ গাড়ীর ঘন ঘন বাঁশীর কর্কশ শব্দে আমার কল্পনার সূত্র গেল ছিন্ন হয়ে। জান্‌লা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখ্‌তে পেলাম 'সিগ্‌নাল ডাউন' হয়নি তখনো। যাকে ছুটে চলার নেশায় পেয়ে বসে তাকে বাধা দিতে গেলে বুঝি এম্‌নিভাবে উঠে ক্ষেপে—মন্মতে থাকে গুমরে নিষ্ফল আক্রোশে। 'সিগ্‌নাল ডাউন' হওয়ার সাথে সাথে আবার সে চ'লতে লাগ্‌লো হুস্‌হুস্ শব্দে—আসে পাশের সব কিছুকে কম্পিত ক'রে এসে দাঁড়াল বোলপুর ষ্টেশনে। কাপড়ের পুঁটুলি বগোলদাবা ক'রে দু'জনে নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুরূপ 'বাস'-চালক আমাদের খোঁজ ক'রে তুলে নিলে বিশ্বভারতীর 'বাসে'। চালককে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌তে পারলাম শান্তিনিকেতনে অতিথি থাকবার নির্দ্দিষ্ট জায়গা আছে তিনটি—একটি হ'ল বিদেশীয়দের জন্য, আর দুটি হ'ল সর্ব্বসাধারণের জন্য—শেষোক্ত দুটির ভেতর একটির নাম হচ্ছে 'পান্থনিবাস', আর একটির নাম 'গেষ্ট-হাউস'; আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল 'পান্থনিবাসে'।

এতক্ষণে শান্তিনিকেতন তার শান্ত-স্নিগ্ধ চেহারা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়াল। যেখানে একদিন অনুর্ব্বরতার শুষ্কমূর্ত্তি বিরাজমান ছিল—যেখানে চ'লতো দস্যুদলের নিষ্ঠুর লীলা—আজ সেখানে কুঞ্জবীথিকা দাঁড়িয়ে আছে সুশীতল ছায়া নিয়ে—সেখানে গড়ে উঠেছে প্রেমের রাজ্য। যাঁর পবিত্র ইচ্ছায় এই শান্তিময় রাজ্যের সৃষ্টি, তাঁকে আমরা কি ক'রে ভুল্‌বো! যিনিই শান্তিনিকেতনে যান না কেন, প্রথমেই মনে পড়বে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—আপনা হ'তেই মস্তক নুয়ে পড়বে শ্রদ্ধায়।

'বাস' এসে থাম্‌লো পান্থনিবাসের কোলঘেঁষে। গাড়ী থাম্‌তে না থাম্‌তেই কোথা হ'তে এক নাদুস্ নুদুস্ লোক এসে আমাদের পুঁটলী নিয়ে আরম্ভ ক'রলে টানাটানি। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'বাপু হে, তোমার নাম কি?'

উত্তরায়ণ (কবির পূর্ব্ব বসত-বাটী)

আর যাই কোথায়? এক নিশ্বাসে তার যতরকম পরিচয় আছে সব এনে হাজির ক'রে দিল আমাদের সম্মুখে। সব পরিচয় গোল পাকিয়ে গিয়ে শুধু একটি নামে তার পরিচয় রইল বেঁচে—নাম তার লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা এসে দাঁড়ালাম এক কুঠুরীতে।

পোট্‌লা-পুঁটলী যথাস্থানে রক্ষা ক'রে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাঙ্গুলী মশাইয়ের সন্ধানে। লক্ষ্মীকে সাথে নিলাম পথপ্রদর্শকরূপে। তার সাথে অবিরত কথা ক'য়ে পথ চল্‌ছি। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের লুব্ধতাকে আর কিছুতেই জয় ক'রতে সমর্থ হ'লাম না। তার লুব্ধদৃষ্টি দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষিতের মত এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়তে লাগ্‌লো—তার ফলে প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট্ খেতে লাগলাম। চ'লতে চ'লতে কবির বর্ত্তমান বাসস্থান শ্যামলী গৃহের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। অদূরে গৃহবারান্দায় গাঙ্গুলী মশাইয়ের দর্শন মিল্‌ল, তিনি ত্রস্তপদে আমাদের নিকটে এলেন। তাঁর সাথে অনেক কথা হওয়ার পর গুরুদেবের (কবির) সাথে দেখা করার ইচ্ছা জানালাম। ওবেলাকার মত তিনি আমাদের বিদায় দিয়ে বৈকাল পাঁচটার সময় শ্যামলীতে আসতে ব'লে দিলেন। এই অবসর সময়টুকুর সদ্ব্যবহারের ইচ্ছায় বন্ধুবরের সম্মতিক্রমে বেরিয়ে পড়লাম সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেখ্‌ব ব'লে।

প্রথমেই চলে এলাম কলাভবন দেখ্‌তে। কলাভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩২৫ সালে। শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কলাবিভাগের উন্নতি দ্রুতগতিতে চ'লেছে। এই দু'জন স্বনামধন্য চিত্রকর তাঁদের চিত্রের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌ছেন বহু পুরাতন ভারতীয় চিত্রকলাকে। আমি একজন যুবক—কল্পলোক-বিহারী, চোখে আছে আমার রঙীন্ নেশা—যা দেখ্‌ছি সবই সুন্দর—অসুন্দর ব'লে কিছুই মনে হয় না, তবুও বিশেষ ক'রে মনে গেঁথে রয়েছে তাঁদের করা Fresco Painting গুলি। আমার ভাষার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হ'তে তাদের যথার্থরূপ ফুটে উঠ্‌বে না। চিত্রকলা ভিন্ন ধাতব-পাত্রে রঙ্ করা (কলাই করা), মাটীর বাসন তৈরী করা, পুস্তক বাঁধাই ইত্যাদি কার্য্য কলাভবনে শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। কলাভবনের সংলগ্ন একটি পুস্তকাগার ও

গেষ্ট হাউস
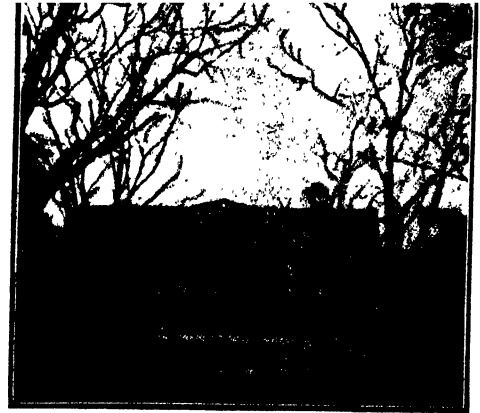
ছোট একটি যাদুঘর আছে। তারপর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে ঢুকে পড়লাম লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীটি কলাভবনের নিকটবর্ত্তী। এখানে জাভার একটি ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হ'ল। বিদেশীয়রা শান্তি-নিকেতনকে যে কি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তা' এ নবপরিচিত ভদ্রলোকের বাঙালীপ্রথায় হাতজোড় ক'রে নমস্কারের

চেষ্টা হ'তে বুঝতে পারলাম। কারণ তাঁরা জানেন, এ বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, বাঙালী ঋষির তপোবন—এখানে তাঁদের স্বদেশীয় আড়ম্বর নিয়ম-কানুন স্বচ্ছন্দে উৎসর্গ ক'রতে পারেন—এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন না। যিনি প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী তিনি এই পুস্তকাগার হ'তে যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারেন। ইংরেজী, জার্ম্মান, ইতালীয়, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি বিদেশীয় ভাষার বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তকাদি ব্যতীত ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার—এমন কি চীন ও তিব্বতীয় ভাষারও বহু পুস্তক রক্ষিত আছে। এতদ্‌ভিন্ন মুসোলিনীর গুরুদেবকে উপহারস্বরূপ দেওয়া অনেকগুলো বই দেখ্‌তে পেলাম।

পাঁচটা বাজার কিছু পূর্ব্বে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে সোজা শ্যামলীতে চলে এলাম। গাঙ্গুলী মশাই আমাদের গুরুদেবের 'পাঠাগারে' (Study Room) নিয়ে গেলেন। সেখানে গুরুদেবের সাথে আমাদের পরিচয় হ'ল। আমরা তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রলে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর বৈকালিক

একটি শিক্ষকের আবাসস্থল

জলযোগের সময় হওয়ায় 'আগামী কাল আসব' ব'লে বিদায় নিলাম।

শ্যামলী থেকে নেমে চলে এলাম ভোজনাগারে। জল-যোগের আশায় সেখানে গিয়ে ব'সেছি—সব প্রস্তুত। এমন সময় কে জান্‌তো এমনিভাবে আমার স্কীম পণ্ড হয়ে যাবে। হঠাৎ সেখানে আমার এক আত্মীয়া—সম্পর্কে মাসীমা, নাম রমা গুপ্তা—আবির্ভূ'তা হ'লেন। বৃথাই মনে করেছিলাম আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে আমার এ তীর্থভ্রমণটুকু সেরে নেবো। তারপর তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাসে আমাদের মৌনতার বাঁধ ভেঙে গেল। উভয়ে উভয়ের কুশলবার্ত্তা আদান-

রবীন্দ্রনাথ

প্রদানের পর তাঁর কলাবিদ্যা শিক্ষার দৌড়টুকু জেনে নিতে নিতেই জলযোগের পালা শেষ হয়ে গেল। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বেশীক্ষণ দুজনের ভেতর ভাবের আদানপ্রদান চ'লতে পারলো না। বন্ধুবরের তাগিদে সেস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হ'লাম। দুজনে নানাপ্রকার আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করতে করতে পথ বেয়ে অনেকদূর চলে এসেছি—সামনেই দেখ্‌তে পেলাম সেই ছাতিম গাছ, যার ছায়াতলে ব'সে মহর্ষি ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হ'তেন। স্থানটি বর্ত্তমানে বাঁধান আছে শ্বেত-প্রস্তরে, আর তা'তে লেখা আছে মহর্ষির অন্তরের বাণীটি—'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—কুলায়ের অন্তরালে পাখীর কল-গীতি ক্রমে থেমে এল—ঝির্ ঝির্ করে সান্ধ্য বায়ু প্রবাহিত হ'ল—নিদাঘের অবসাদটুকু কেটে গেল—আরও কতক্ষণ সেই বেদীর উপর ব'সে কাটিয়ে দিলাম।—কি শান্তি—এমন শান্তি পাওয়ার ভাগ্য ঘটে উঠেনি দশ বছরের ভেতরে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এলাম নির্দিষ্ট কুঠুরীতে, যেখানে

আমাদের রাত্রিবাসের আয়োজন হয়েছিল। শয্যা প্রস্তুত। সারাদিন হাঁটাহাঁটির পর একটুখানি আয়াস করার ইচ্ছায় বিছানাতে গা এলিয়ে দিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।—লক্ষ্মীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ডাক এল খেতে যাবার। উঠ্‌তে বাধ্য হলাম—রাত তখন

উপাসনা গৃহ

আটটা। ভোজনাগারে এসে দাঁড়ালাম। যথেষ্ট লোক খেতে ব'সেছেন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে।

পরদিন ৭ই মার্চ্চ—ভোরের আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত। শয্যা ত্যাগ ক'রে বন্ধুবর পরিতোষের সাথে বেরিয়ে পড়লাম; কারণ এমন সুখকর দৃশ্য মহানগরীর কোল হ'তে দেখার সুযোগ ঘটে ওঠে না। ঘণ্টাখানেকের ভেতর ফিরে এলাম সূর্য্যোদয় দেখে। প্রাতরাশ সমাপনান্তে সমবায়-সমিতি দেখতে গেলাম—সেখান থেকে সিংহসদন এবং সিংহসদন থেকে শ্রীনিকেতনের পথে। এইভাবে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত ঘুরে ফিরে গুরুদেবের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় চ'লে এলাম শ্যামলীতে। তিনিও ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়েছেন, ঠিক এম্‌নি সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আমরাও সেখানে পৌচেছি। তারপর তাঁর সম্মতিক্রমে একটি ফোটো তুলে নিলাম। ফোটো তোলার পর তাঁকে জানালাম যে কতকগুলো প্রশ্নের সমাধান করে নিতে চাই তাঁর কাছ থেকে। তিনি রাজী হলেন—আমার প্রশ্ন হ'ল সুরু—

—'Doll's Houseএর Norahর Characterএর সাথে যে তপতীর সুমিত্রার Characterএর striking resemblanceএর কথা Thompson সাহেব বলেন—তা কতদূর সত্য।'

কবি—'Doll's House কার লেখা?'

আমি বলিলাম,—'ইব্‌সেনের'—

কবি—'না, আমি কখনও পড়িনি। ওসব বই আমার পড়বার সময়ও নেই, ধৈর্য্যও নেই।'

আমি—'Thompson সাহেব আপনার সম্বন্ধে লিখেই তো London Universityর ডক্টরেট্ হয়েছেন।'

কবি—'সেই রকমই তো শুনেছিলুম বটে।'

আমি—'আপনাকে তাঁর থিসিসের কোন কপি পাঠিয়েছিলেন কি?'

কবি—'না। আমার সম্বন্ধে কত লোকই তো কত কথা বলে থাকেন—তাই সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।'

—'দেখ আসল কথা হচ্ছে আমরা যে রকম ভাবে ইংরেজিটা শিখি ওঁরা তেমনভাবে বাংলাটা শেখেন না এবং বুঝতেও পারেন না। ওঁরা ভাবেন অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির

গাঙ্গুলীমশায়ের সহিত লেখক

চেয়ার দু'বছর হোল্ড ক'রে বাংলায় মস্ত বড় একটা পণ্ডিত হয়ে গেছেন।'

—'আর আমাদের দেশের লোকরা আমাদের দেশীয় লোকদের সম্বন্ধে যেমন অম্লানবদনে কুৎসা গাইতে পারেন তেমন আর কোথাও নেই। করুক না কেন একটি বিদেশী

ফ্রান্স বা জার্ম্মানির একটি বিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধে নিন্দে—তবে ওঁরা এর সমাপ্তি করবে ঘুষোঘুষি করে।'

—'এই নিন্দে করা স্বভাবটা আমাদের এই বাঙালীর জাতিগত দোষ। আমরা বুঝি আর নাই বুঝি—বুঝবার ইচ্ছেও তেমন নেই—নিন্দে করতে আমরা খুব ওস্তাদ। তারপর যত ভাল প্রতিষ্ঠানই হোক্ না কেন, সেখানে গিয়ে তার আদর্শ কি, তার উদ্দেশ্য কি কিছুই জানতে চাইব না—হয়ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের প্রশ্ন হবে—'এই প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আয় ব্যয় কত?' এমনি materialistic আমরা—আমাদের cultureএর নেই

শ্যামলী (মাটীর তৈয়ারী কবির বর্ত্তমান বাসস্থান)

back ground—বিদেশীয়দের এ জিনিষটা আছে বলেই অন্তর্নিহিত তত্ত্বটা সহজে বুঝতে পারে।'

এর পর কবির কাছ থেকে বিদায় নিলাম আজই চলে যাব বলে। আস্‌তে পথে উপাসনাগার দেখে এলাম। সবচেয়ে ভাল লাগ্‌লো উন্মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে—মনে পড়ে অতীত যুগের কথা—তপোবনের কথা—গুরু-বাড়ীতে শিষ্যের শিক্ষার ব্যবস্থা—তাদের ব্রহ্মচর্য্য-কালের কথা।—আজ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদিম ভারতের লুপ্ত প্রথার পুনর্জ্জন্ম দিতে চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর এ চেষ্টা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছে। ইনি চান না বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাপে ফেলে ছেলেদের প্রতিভাকে সমূলে বিনষ্ট ক'রতে। একথা কি সত্যি নয় যে বহু ছেলে তাদের প্রতিভা বিসর্জ্জন ক'রেছে ডিগ্রীর বিনিময়ে। কিন্তু কালধর্ম্মের হাত থেকে কবিবরও রেহাই পাননি। শান্তি-নিকেতন থেকেও অনেক ছেলেমেয়েকে প্রস্তুত করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নেবার জন্য। প্রাথমিক শিক্ষা হ'তে উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রই বৃক্ষছায়ায় বেদীমূলে উপবিষ্ট গুরুর নিকট হ'তে শিক্ষা পাচ্ছে। ক্লাস বসে দু'বেলা - ভোর সাতটা হ'তে সাড়ে দশটা ও অপরাহ্নে দু'টো হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত। বর্ষাকালে ছেলেমেয়েদের ভেতর সাড়া পড়ে যায়। শুন্‌লাম, এসময় বর্ষার গান গেয়ে আর জলে ভিজেই নাকি সময় কাটিয়ে দেয়। কি অভিনব বিশ্বভারতীর ব্যবস্থা।

সময় হয়ে এল যাবার। ইচ্ছে করে না যেতে। অবশেষে শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'ল। শুধু সাথে নিয়ে এলাম কতগুলো স্মৃতির টুক্‌রো। মনে পড়ে যায় গুরুদেবের সাথে বইয়ের ভেতর দিয়ে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা - মনে পড়ে সাহচর্য্যলাভ দ্বিতীয় পরিচয়ের কথা। বিশ্ববিখ্যাত কবি হয়েও কত সহজভাবে মিশতে পারেন অতি সাধারণ লোকের সাথে। তাঁর সরলতায়, মধুর ব্যবহারে, তাঁর সহৃদয়তায় মুগ্ধ হ'তে হয়।

আমরা নব্য—রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সেবী—সেই জন্যই হোক্, আর সৌন্দর্য্যবোধ জ্ঞানেই থাকুক—শান্তিনিকেতনে গিয়ে সত্যিকারের শান্তিভোগ ক'রে এসেছি। বিদায়কালে যখন Visitor's Bookএ লিখতে হ'ল Purpose of Journey—লিখ্‌লাম—'To see Gurudev and to make a lasting link in my sweet memory' Remarkএর ঘরে লিখ্‌লাম—'An ideal abode of Peace. The true lovers' of nature may enjoy it heartily.'

পাখীর বাসা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তাহারা তিনটি ভাই—এককড়ি, দু'কড়ি আর তিনকড়ি।

যেমন মজার নাম, তেমনি বিচিত্র তাহাদের তিনটি ভাইএর জীবনের ইতিহাস।

মা তাহাদের আগেই মরিয়াছিল। বাবা আর বিবাহ করেন নাই। বেতন দিয়া বাড়ীতে এক বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়েকে রাখিয়াছিলেন। সে-ই তাহাদের দু'বেলা চারটি রাঁধিয়া দিত, আর ছেলে তিনটিকে মানুষ করিত।

কিন্তু মানুষের জীবন-মরণের কথা কিছুই বলিবার জো নাই। হঠাৎ একদিন তাহাদের বাবাও গেলেন মরিয়া।

সে কি নিদারুণ দৃশ্য! যে দেখিয়াছে সে-ই কাঁদিয়াছে।

বড় ছেলে এককড়ির বয়স তখন পনেরো বছরের বেশি নয়। মেজ দু'কড়ির বয়স বারো, আর ছোট তিনকড়ি তখন পাঁচ বছরের শিশু।

রাঁধুনী মেয়েটি ভাত রাঁধিয়া ছেলে তিনটিকে খাওয়াইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেছে। শীতকালের রাত্রি।

ছোট ওই পাঁচ বছরের তিনকড়িই প্রথমে তাহার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল 'বাবা! বাবা।'

বাবার কোনও সাড়া পাইল না।

তখন সে তাহার দাদাদের কাছে গিয়া বলিল, 'বাবা কথা বলছে না দাদা!'

বড় ও মেজ দু'জনে মিলিয়া কলতলায় বসিয়া বসিয়া এঁটো বাসনগুলা ধুইয়া রাখিতেছিল। এককড়ি বলিল, 'যা ত' দুকড়ি, দেখে আয় ত'!'

দু'কড়ি দেখিতে গেল।

ফিরিয়া আসিল কাঁদিতে কাঁদিতে। বলিল, 'তুমি দেখবে এসো। বোধ হয় হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেছে কি রে?' বলিয়া হাত ধুইয়া এককড়ি তাড়াতাড়ি ছুটিল।

গিয়া দেখিল, বাবা তাহার সত্যই মরিয়া গেছেন।

কলতলায় এঁটো বাসন রহিল পড়িয়া। তিন ভাই একসঙ্গে তাহাদের মৃত পিতার নিশ্চল নিস্পন্দ দেহটার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছোট ছেলেটা মরা কাহাকে বলে জানে না। দাদাদের কান্না দেখিয়া সেও কাঁদিতেছিল আর ভাবিতেছিল, যে বাবা তাহার আজ সকাল পর্য্যন্ত তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা বলিয়াছে সেই বাবা তাহার একেবারেই কথা বলিতেছে না কেন।

কিন্তু এমন করিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিলে এককড়ির চলিবে না। মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কাঁদিতে কাঁদিতে সে উঠিয়া বসিল। বলিল, 'দুকড়ি তুই থাক্ এইখানে। তিনকড়িকে ধর্। আমি লোকজন ডেকে আনি।"

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

কলিকাতা শহর। এ-পাড়ায় তাহারা অনেকদিন আছে সত্য, কিন্তু শহরে অনেকদিন বাস করিলেই কিছু ঘনিষ্ঠতা হয় না।

এককড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিল। হাত জোড় করিয়া বলিল, 'আপনারা একবারটি আসুন। আমার বাবা মরে গেছে।'

শুনিয়া সকলেই হায় হায় করিল বটে, কিন্তু শীতের রাত্রে মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল মাত্র চার জন।

অথচ চারজনে কিছুই হইবার নয়। আরও লোক চাই। যে-চারজন আসিয়াছিল তাহারাই আবার লোক ডাকিতে গেল।

অনেক অনুরোধ, অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর, লোকজন আসিয়া জুটিল রাত্রি প্রায় এগারোটার সময়।

কিন্তু শুধু লোক আসিলেই চলে না। শহরের শ্মশানে মৃতদেহ সৎকারের হাঙ্গামা অনেক। ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ চাই, টাকা চাই।

এককড়ি বলিল, 'ডাক্তার ত' দেখানো হয়নি, মধু-কোব্‌রেজ মাঝে-মাঝে আসতো।'

পাশের বাড়ীর বনমালীবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা সে না হয় আমি জোগাড় করে আনছি, কিন্তু টাকার কি হবে? টাকা আছে ত?'

টাকা আছে কিনা এককড়ি কিছুই জানে না। তাহার বাবার কাঠের যে হাত-বাক্সটি আছে যদি কিছু থাকে ত' তাইতেই থাকবে।'

তাহার বাবার বালিসের তলা হইতে চাবিটি লইয়া এককড়ি ঘরে গিয়া বাক্সটি খুলিল। দেখিল—মাত্র কুড়িটি টাকা ও কয়েক আনা পয়সা রহিয়াছে।

মুখাগ্নি করিতে এককড়িকে শ্মশানে যাইতে হইল। পাড়ারই এক বৃদ্ধা আসিল দু'কড়ি ও তিনকড়িকে আগলাইতে।

তিনকড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে বাবাকে তাহার শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় কি যে সে করিত কে জানে।

কলিকাতার মত শহরে নিরাশ্রয় নিরবলম্ব তিনটি বালক! না আছে আত্মীয়, না আছে স্বজন, না আছে নিরাপদে মাথা গুঁজিবার এতটুকু জায়গা, না আছে সংস্থান।

শ্মশান-বন্ধুদের কিছু না খাওয়াইলে চলে না। নিজেদেরও দুইবেলা খাইতে হয়। বাবার বাক্সের কুড়ি টাকা দশ আনা দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল।

কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, ভাইদের কেমন করিয়া মানুষ করিবে—এই হইল এককড়ির ভাবনা।

বাড়ীর মালিক বলিল, 'এক মাসের ভাড়া আমি ছেড়ে দিলাম।'

রাঁধুনী যে-মেয়েটি রাঁধিয়া দিত, সে একমাসের মাহিনা পায় নাই। শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত রান্না করিয়া দিয়া সে পলায়ন করিল। বলিল, 'একমাসের মাইনে পেলাম না, আমি গরীব মানুষ, আর আমি পারব না বাছা। তোমরা যা হয় কর।'

বাবার বন্ধু-বান্ধব যাঁহারা ছিলেন, বাবা বাঁচিয়া থাকিতে নিত্য যাঁহারা তাহাদের বাড়ী আসিতেন, তাঁহারাও আর আসেন না।

ভোলানাথবাবু সেদিন রাস্তা দিয়া আসিতেছিলেন। দূর হইতে এককড়ি তাঁহাকে দেখিতে পাইল। ভাবিল ভোলনাথবাবু বড়লোক, তাহাদের দুঃখের কথা শুনিলে হয় ত' কিছু উপকার করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় এককড়িকে এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, যেই দেখিতে পাওয়া তৎক্ষণাৎ উধাও! সুমুখে আসিতে আসিতে লোকজনের ভিড়ে কোথায় কেমন করিয়া যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন এককড়ি কিছুই বুঝিতে পারিল না!

ইহাই বুঝি তাহাদের অদৃষ্টের লিখন!

এককড়ি কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার বলিতে কেহ কোথাও নাই। ছোট ভাই দুটিকে সঙ্গে লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে! ভাবিয়া সে কিছু কূলকিনারা পাইল না। না খাইয়াই হয়ত-বা তাহাদের মরিয়া যাইতে হইবে।

পাড়া-পড়শী অনেকেই অনেক কথা বলিল।

কেহ বলিল, 'অনেক পাপ করেছিল হয়ত, নইলে এমন কখনও হয়!'

কেহ বলিল, 'ওদের সাহায্য করতে যাওয়াও ভুল। ভগবান যাদের এমন করে' মারলেন মানুষ তাদের আর কি করতে পারে!'

এমনি করিয়া ভগবানের উপর দোষ চড়াইয়া প্রতিবেশীরা তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিল।

শেষে একদিন দুরবস্থার একেবারে চরম! বাড়ীওলা বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। তিনটি ভাই পথে-পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনাহারে অনিদ্রায় একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর তিনকড়ির গা'টা গরম, জ্বর আসিবে কিনা তাই-বা কে জানে।

অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে শ্যামবাজারের প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর রকে তাহারা তিনটি ভাই একটুখানি আশ্রয় লইয়াছে। এককড়ি রাস্তায় একটি পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সেই পয়সাটি মাত্র সম্বল।

এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া ঠোঙ্গাটা এককড়ি দু'কড়ির হাতে দিয়া বলিল, 'খা।'

দু'কড়ি তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'তুমি খাও!'

'আমি খেয়েছি।'

কথাটা যে মিথ্যা এককড়ির মুখ দেখিয়া দু'কড়ির বুঝিতে আর বাকি রহিল না। ঠোঙ্গাটি তখন সে তিনকড়ির হাতে দিয়া বলিল, 'তুই আজ আর ভাত খেতে পাবি না তিনু, তোর গা'টা গরম, এই মুড়িগুলি খেয়ে ঘুমো।'

দু'চার গ্রাসের বেশি খাওয়া তাহার আর হইল না। হঠাৎ বমি করিয়া দু'কড়ির কোলের উপর সে শুইয়া পড়িল।

রাত্রে দেখা গেল, তিনকড়ির ভয়ানক জ্বর।

ঠাণ্ডা সেই রকের উপরই তাহাদের রাত্রি কাটিল। অনেক কষ্টে তিনকড়ি ঘুমাইলে পর এককড়ি বলিল, 'তিনে আর বোধ হয় বাঁচবে না।'

বলিতে বলিতে গলাটা তাহার ধরিয়া আসিল।

দু'কড়ি কোনও কথাই বলিল না। রকটা অন্ধকার না হইলে দেখা যাইত তাহার চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

পরদিন সকালে দেখা গেল, তিনকড়ির চোখ দুইটা লাল, জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকিতেছে। এককড়ির হঠাৎ হাসপাতালের কথা মনে পড়িল। বলিল, 'চল্ একে হাসপাতালে দিয়ে আসি।'

তাহার পর তাহারা দু'জনে অতিকষ্টে কোলে পিঠে করিয়া তিনকড়িকে হাসপাতালে লইয়া গেল। সেখানকার নিয়মকানুন কিছুই তাহারা জানে না। অনেকের হাতে-পায়ে ধরিয়া কি কষ্টে যে তাহাকে তাহারা সেখানে রাখিয়া আসিল সে-কষ্টের কথা জানিলেন একমাত্র অন্তর্য্যামী।

এমনি করিয়াই পথে পথে জীবন যে তাহাদের কি দুঃখে কাটিতেছিল সেকথা আর বলিয়া কাজ নাই। হঠাৎ একদিন ভগবানই তাহাদের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তিনকড়ি সারিয়া উঠিয়াছে। কলেজ-হাসপাতাল দাঁড়াইয়াছে, পথে বনমালীবাবুর সঙ্গে দেখা। বনমালীবাবু তাহাদের বাবার বন্ধু। এক আপিসে তাঁহারা চাকরি করিতেন।

বনমালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় আছিস্ তোরা?'

এককড়ি তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালীবাবু বলিলেন, 'আয় আমার সঙ্গে।'

যাক্, তবু একটা আশ্রয় মিলিল বলিয়া আমরা আর তাহাদের কোনও সংবাদ লইবার প্রয়োজন মনে করি নাই।

পুরা দশটি বৎসর পরে দেখা গেল, বিধাতা নিজের কাজ নিজেই করিয়াছেন। অনেক দুঃখ-কষ্টের পর এখন তাহারা তিনটি ভাই-ই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

পাঁচ বছরের তিনকড়ি হইয়াছে পনেরো বছরের। আজকাল সে স্কুলে পড়িতে যায়।

দুকড়ি বার-তিনেক্ ফেল্ করিয়া স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। স্কুল ছাড়িয়া সে এখন ঢুকিয়াছে একটা মোটর-মেরামতের কারখানায়। আর এককড়ি চাকরি করিতেছে তাহার বাবার আপিসে। বনমালীবাবুর সুপারিশে আপিসের সাহেব তাহাকে চাকরি দিয়াছে। বেতন ছিল প্রথমে তিরিশ টাকা। এখন হইয়াছে পঞ্চাশ।

তবে তাহার বেতনও যেমন বাড়িয়াছে, খরচও তেমনি বাড়িয়াছে। এককড়ি বিবাহ করিয়া একটি বৌ ঘরে আনিয়াছে। বাড়ী ভাড়া দেয় পনেরো টাকা। পুরাদস্তর সংসারী গৃহস্থ।

বৌএর বয়স চোদ্দ-পনেরো বছরের বেশি নয়। নিতান্ত গরীবের মেয়ে। নাম—সুরবালা।

সকালে উঠিয়াই তাহার প্রথম কাজ রান্না করা। সুরবালা রান্না করে, এককড়ি তখনও পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়, দুকড়ি বাজার যায়, আর তিনকড়ি পড়িতে বসে।

বাজারের থলিটা ধুপ্ করিয়া নামাইয়া দিয়া দুকড়ি বলে, 'হাত চালিয়ে চট্‌পট্ করে সেরে নাও বৌদি, আমাকে

সুরবালা বলে, 'পারব না। আমি তোমাদের মাইনে-করা রাঁধুনী নই। কই এসো এখানে, বাজারের হিসেব দাও, ক'পয়সা চুরি করলে আগে দেখি।'

পড়িতে পড়িতে তিনকড়ি ছুটিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'তুমি ঠিক বলেছ বৌদিদি, মেজদা ভারি চুরি করে। কাল একটা সাবান কিনে এনেছে।'

দু'কড়ি বলে, 'ছাখ্ তিনে না জেনে-শুনে কথা বলিস্‌নি বলছি, চড়িয়ে তোর দাঁত ভেঙ্গে দেবো এখুনি।'

তিনকড়ি তাহার বৌদিদির কাছে আগাইয়া গেল। বলিল, 'হ্যাঁ বৌদি, আমি জানি ও গায়ে মাখবার জন্য সাবান এনেছে। কাল আমি মাখতে চাইলুম, তা আমায় দিলে না একবারটি। তুমি হিসেব নাও, ছাখো ও ঠিক চুরি করেছে।'

'নাও না হিসেব!' বলিয়া দুকড়ি বলিতে লাগিল, 'দু পয়সার চিংড়ি মাছ, এক পয়সার বেগুন, সাত পয়সার আলু, এক পয়সার পেঁয়াজ—'

তিনকড়ি বলিল, 'এই বুঝি সাত পয়সার আলু? বৌদি হেঁ-হেঁ—এইখানেই মেরে দিয়েছে।'

ফট্ করিয়া তিনকড়ির মাথায় এক চড় মারিয়া দিয়া দু'কড়ি বলিল, 'তুই দেখতে গিয়েছিলি শূয়ার!'

তিনকড়ি বলিল, 'তুমি মারলে কেন মেজদা, বলে দেবো দাদাকে?'

তিনকড়িকে আর কষ্ট করিয়া বলিতে হইল না। বলিল সুরবালা। 'ছাখো গো ছাখো, এরা কেমন ঝগড়া-মারামারি লাগিয়েছে ছাখো।'

এককড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াই দুকড়ির কানে ধরিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া মাথায় দুই চড়!—'ওকে মারলি কেন ষ্টুপিড্? শুয়ে শুয়ে আমি সব দেখেছি।'

দু'কড়ি বলিল, 'না মারব না! ও আমাকে চোর বলবে আর আমি ওকে মারব না?'

এককড়ি বলিল, 'চুরি তুমি কর না নন্‌সেন্স্? বিড়ির পয়সাটা তাহ'লে আসে কোত্থেকে?'

'বিড়ি আমি খাই না। খেতে আমাকে দেখেছ কোনোদিন?'

সুরবালা বলিয়া উঠিল, 'ও মাগো! কাল যে আমার উনোন্ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে হে!'

এমন করিয়া সে যে হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া যাইবে তাহা সে ভাবে নাই। বলিল, 'বেশ করেছি।'

বলিয়া সে পলাইয়া গেল।

এইবার তিনকড়ির পালা।

এককড়ি তাহার কান ধরিয়া বলিল, 'তুমি কেন পড়তে পড়তে উঠে এলে শুনি?'

কানটা ছাড়াইয়া লইয়া তিনকড়ি ছুটিয়া গিয়া আবার পড়িতে বসিল।—'দে লভেড্ ইচ্-আদার এণ্ড লিভেড্ হ্যাপাইলি।—'হ্যাপাইলি' মানে কি দাদা?'

এককড়ি বলিল, 'মানে-বই কিনে দিয়েছি না? মিনিং-বই কি হলো?'

'সে বইটা পরশু থেকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'খুঁজে পাচ্ছ না কি রকম?'—এই বলিয়া এককড়ি আগাইয়া আসিল। বলিল, 'তাহ'লে হয় হারিয়েছ, নয় বেচে মেরে দিয়েছ!'

তিনকড়ি চুপ করিয়া রহিল।

এককড়ি বলিল, 'এবার যদি কোনও বই খুঁজে না পাবে ত' তোমার মুণ্ডুটি আমি ছিঁড়ে ফেলব বলে দিচ্ছি।'

তিনকড়ির মানে আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। এককড়িও আপনমনে বকিতে বকিতে কল-ঘরে গিয়া ঢুকিল।

এককড়িকে খাওয়াইয়া আপিসে বিদায় করিয়া দিয়া সুরবালা বলিল, 'এইবার তোমরা তৈরি হয়ে নাও না ছোটবাবু মেজবাবু, আমি চান্‌টা করে এসেই তোমাদের খেতে দেবো।'

স্নান করিয়া রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া সুরবালা দেখিল, তিনকড়ি দাঁড়াইয়া। জিজ্ঞাসা করিল, 'মেজবাবু কোথায় গেলেন? তাঁর আবার কি হ'লো?'

তিনকড়ি বলিল, 'মেজদা তোমার সঙ্গে কথা বলবে না বৌদি। তাই ও নিজেই ভাত বেড়ে নিয়ে খেয়ে চলে গেল।'

'বেশ। কথা বলবে না? বেশ।' বলিতে বলিতে হাসিতে হাসিতে সুরবালা ভাত বাড়িতে বসিল।

ভাত ডাল তরকারি দিয়া মাছ আনিতে গিয়া সুরবালা দেখিল, একটি মাছও নাই। বলিল, 'ও মা, দেখেছ মেজ-ঠাকুরপোর কাজ! মাছগুলো সব খেয়ে পালিয়েছে!

দাঁড়াও, আসুক্ তোমার দাদা, আজ যদি আমি ওকে মার না খাওয়াই—'

কি আর করিবে। মাছ আর সেদিন তাহাদের ভাগ্যে জুটিল না।

আপিস হইতে ফিরিতে এককড়ির রাত্রি হয়। কিন্তু দু'কড়ি ফেরে বৈকালে।

তিনকড়ি স্কুল হইতে আসিয়া মুড়ি খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় আসিল দু'কড়ি।

সুরবালা বলিল, 'বলি হাঁ হে মেজবাবু, ও বেলা মাছগুলো যে সব খেয়ে দিয়ে গেলে ?'

দু'কড়ি কথা কহিল না।

সুরবালা বলিল, 'এ ত বেশ মজা! দাঁড়াও, আসুক্।'

দু'কড়ি আপন মনেই বলিয়া উঠিল, 'মাছ বেড়ালে খেয়েছে।'

সুরবালা বলিল, 'না বেড়ালে খায় নি। তুমি খেয়েছ।'

দু'কড়ি বলিল, 'বেশ করেছি। তুমি আমার বিড়ি খাওয়ার কথা বলে দিলে কেন ?'

সুরবালা বলিল, 'আমি ভাই মিথ্যা কথা সহ্য করতে পারি না, সত্যি কথা বলে ফেলি।'

দু'কড়ি বলিল, 'বা-বে! নিজে মিছে কথা বল না বুঝি!'

সুরবালা বলিল, 'কখ্খনো না, জীবনে না, মাইরি না।'

দু'কড়ি তখন তাহার জামার পকেট হইতে কচি কচি দুইটি শশা বাহির করিয়া বলিল, 'কেউ যদি নুন একটু দেয়, ত এই দুটো খাই আমি।'

সুরবালা বুঝিল, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—কথা কহিবে না। বলিল, 'যে খাবে, নুনও সে-ই আনবে। আমার বয়ে গেছে নুন আনতে! আমি ত আর খাব না!'

তিনকড়ি শশা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।—'আমাকে একটু দাও না মেজ্দা!'

'হুঁ, দেবো বই-কি, না দিলেই নয়। আমি বাজার থেকে পয়সা চুরি করি, আমি সাবান মাখি···'

তিনকড়ি বলিল, 'আমি আর কখ্খনো কিছু বলব না মেজদা। তুমি দাও, ছাখো—'

এই অবসরে সুরবালা তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া শশা দুইটি কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

দু'কড়ি বলিল, 'ভাল কাজ হবে না বলে দিচ্ছি বৌদি, আচ্ছা বেশ'—বলিয়া সে তাহার পকেট হইতে আর-একটা শশা বাহির করিল।

সুরবালা বলিল, 'দাঁড়াও তবে নুন আনি, আর মুড়ি আনি।'

তাহার পর তাহারা তিনজনে মিলিয়া হাসিতে হাসিতে খাইতে বসিল।

সুরবালা বলিল, 'আচ্ছা ভাই, আমরা ত' বেশ খাচ্ছি, আর তোমার দাদা ?'

দুকড়ি তাহার পকেটটা দেখাইয়া বলিল, 'আমি অত বোকা নই মশাই! এই ছাখো।'

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া এককড়ি দেখিল, তাহারা তিনজনে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। বলিল, 'তিনুকে পড়তে দাও। ওর কাছে বসে তোমরা গল্প কেন করছ ?'

দু'কড়ি বলিল, 'এসো বৌদি, আমরা পালাই এখান থেকে।'

এককড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'মানে-বইটা খুঁজে পেয়েছিস ?'

তিনকড়ি বলিল, 'পেয়েছি দাদা, কিন্তু 'হাপাইলি'র মানেটা বের করতে পারছি না।'

'ছাখ্ ত দু'কড়ি, ও কি বের করতে পারছে না।'

'কই দেখি।' বলিয়া দু'কড়ি তাহার কাছে গিয়া বসিল।

তিনকড়ি বলিল, 'এই ছাখো— দে লভেড্ ইচ্ আদার এণ্ড লিভেড্ হাপাইলি।'

দু'কড়ি বলিল, 'ওরে শুয়ার, শোনো দাদা শোনো, লেখা আছে—They loved each other and lived happily, আর উনি পড়ছেন—দে লভেড্ ইচ্ আদার এণ্ড লিভেড্ হাপাইলি। এটাও ঠিক আমারই মতন তিনবার ফেল্ করে স্কুল ছেড়ে দেবে দেখো।'

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল, 'ওর মানে কি ঠাকুরপো ?'

দু'কড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'কার মানে ?'

'ওই যে ইংরেজিটা বললে—'

ছ'কড়ি বলিল, 'তারা পরস্পরকে ভালবেসে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতো।'

সুরবালা হাসিয়া বলিল, 'তোমাদের মতন।'

ছ'কড়ি বলিল, 'তোমার হাসি হচ্ছে, কিন্তু জানো না ত বাবা, আমাদের কি কষ্টের দিন গেছে। বাবা যেদিন মারা গেল—'

কলতলা হইতে এককড়ি চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চুপ কর্ বলছি ছ'কড়ি, সারাদিন খেটেখুটে এসেছি, এই সময় ওই কথা যদি বলিস্ ত তোর মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলবো বলে দিচ্ছি।'

এই বলিয়া বিগত দিনের দুঃখের ইতিহাস আজ আর সে তাহাকে বলিতেও দিল না।

সাহসী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এভারেষ্টের শৃঙ্গেতে নাচি
গঙ্গাসাগরে সন্তরি।
কুম্ভীর বাঘে ডাক দিয়ে যাই
ভ্রমি সুন্দর বন ধরি।
খনির তলেতে রোশনাই করি
কন্দুক করি প্রাণটাকে,
তুষারের চাপ, তুফানের দাপ,
ঠেলে চলি এট্‌লাণ্টিকে।
দুর্দ্দম মোরে বাধা দিতে নারে
মেরুর তুহিন অন্তহীন,
অক্ষরেখার কোলে টেনে আনি
পোলার ভালুক, পেঙ্গুইন।
সিংহ নখর হতে কেড়ে লই
রক্তিম গজ মুক্তা হে,
আল্‌প হইতে পিছলায়ে পড়ি
আমি জানি কত সুখ তাহে।
বিসুভিয়সের মত অশান্ত
হয় না এ বুক শান্ত রে,
গিরি গহ্বরের গভীরতা মাপি
ফিরি পম্পীর প্রান্তরে।

কাবেরী প্রপাত উজাইয়া চলি
ঝঞ্ঝা ঠেলি যে উৎসাহে
তাহারা আমারে নব বল দেয়
যারা করে মোর কুৎসা হে।
হরি রাখে যারে কে মারিবে তারে
আমি এ বাণীর বিশ্বাসী,
অর্জ্জুন বাঁধে সায়কে সাগর
বুকে পাই তার নিশ্বাসই।
ভগীরথ কিসে গঙ্গা আনিল
সেই কথা শুনি গঙ্গাতে,
সুধা আনিবারে গরুড় ডাকিছে
আকাশের সীমা লঙ্ঘাতে।
দধীচি ডাকেন নূতন করিয়া
গড়িতে নূতন দম্ভোলি,
ইন্দ্র ডাকিছে, পুষ্পক রথে
না থাকুক মোর সম্বলই।
কৈলাসে মোরে জননী ডাকিছে,
মৃত্যু ডাকিছে নিত্য হে,
বিপুল ভুবন মিতালি করিছে
চরাচর মোর মিত্র হে।

মত্ত হস্তী চরণে দলে না
সর্প বিরত দংশনে,
দেবতারা ডাকি বলিছে আমারে
যজ্ঞ চরুর অংশ নে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

হাজার বছর আগে সমস্ত দেশ যখন বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত তখন প্রত্যেক নরনারী তাদের প্রতি কাজে প্রতি কথায় ভগবান বুদ্ধের নাম স্মরণ ক'রে বলেছে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"। এই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বাংলার বৌদ্ধদের একমাত্র মন্ত্র ছিল যাহা স্মরণ ক'রে তাঁরা দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ছুটে গিয়েছিলেন।

আজ আবার হাজার বছর পরে তাঁদেরই সেই অমর-কীর্ত্তিকলাপের সন্ধানের আশায় ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ ক'রে

ফুঙ্গি—বৌদ্ধ ভিক্ষুক

ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম। অনুসন্ধিৎসু মন প্রাচীনের ভগ্নাবশেষ দেখেই ফিরে আসতে চাইল না; তাদের দেশ, তাদের আচারব্যবহার, এককথায় এই জীবন্ত মানুষগুলিকে যেভাবে দেখেছি সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা ক'রব।

শতাব্দীর পর শতাব্দী বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আজ ব্রহ্মবাসীরা তাদের যেরূপভাবে সম্মিলিত, সুচারু-সম্পন্ন ও সুন্দর ক'রে গড়ে তুলেছে উহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য-জনক এবং প্রায় প্রত্যেক জাতির পক্ষেই অনুকরণীয়।

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নীরস কঠোর রূপ নাই, এখানে

বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্যাগোডায় ব্রহ্মবাসীদের জনতা

স্যাগাইন পাহাড়ের উপর একটি বৌদ্ধ বিহার

আছে মহাযানের স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলগতি। তাই দেখি প্রত্যেক প্যাগোডার বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির অপরূপ সহাস ভঙ্গিমা, সেখানে ঘণ্টার তালে তা ল নরনারীর বন্দনা গান—উৎসব,

সান্ প্যাগোডা—রেঙ্গুন

আমোদ, আহ্লাদ। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে বুদ্ধের রূপ গ্রহণ ক'রতে পেরেছে—তাই তারা সমস্ত কাজের ফাঁকেও প্যাগোডায় যায়, বুদ্ধের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দিতে
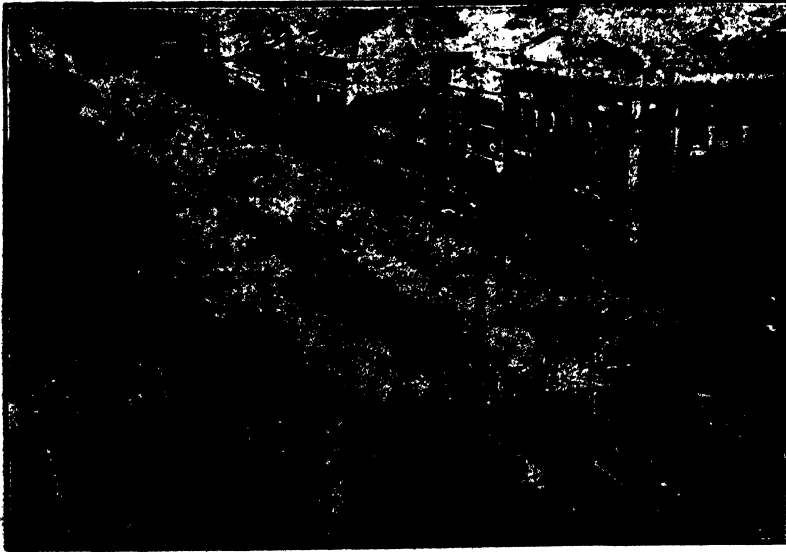
রেঙ্গুন সহরের একটি রাস্তা

পারে। বুদ্ধ যেন তাদের সংসারেরই কেউ একজন, তাঁকে না দিয়ে নিজেরা উপবাস ক'রে থাকবে, কিন্তু তাই বলে তাঁকে নিয়ে অনাসৃষ্টি ক'রবে না। হয়ত' নিজেরা আগে খেয়েই বুদ্ধকে পরে নৈবেদ্য উৎসর্গ ক'রবে, কানা (জুতা) নিয়ে বুদ্ধের কোলের পর রাখবে তাতেও তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। অথচ তারা বুদ্ধকে মনে প্রাণে ভালবাসে, 'প্রভু বুদ্ধ লাগি' তারা এমন কাজ নাই যা ক'রতে পারে না। এমন কি ইহাও দেখা যায় একটি চোর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি ক'রে ঠিক সেই সব জিনিষ আবার 'ফায়ার' বুদ্ধমূর্ত্তি) কাছে নিবেদন ক'রে এল।

তাই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যতটা সময় 'ফায়ার' কাছে থাকে তার চেয়ে বেশী সময় কাটায় মানুষের সাথে। দলে দলে মেয়েছেলেরা তাদের 'ফুঙ্গিচঙ্' এ (ভিক্ষুদের আশ্রম) এসে পড়াশুনা করে, ফুঙ্গিরাও অকাতরে, বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের জনসাধারণের কাজে বিলিয়ে দেয়। এই জন্যই আজ ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রহ্মদেশই সবচেয়ে প্রাইমারী শিক্ষায় অধিক অগ্রণী। ওদের প্রায় শতকরা ৩০জন মেয়েই লেখাপড়া জানে এবং দেশীয় ভাষায় হিসাব রাখা, খবরের কাগজ পড়া এবং ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ প্রায় প্রত্যেকেই করতে পারে।

এখানে কোন জাতিভেদ নাই; ধনী হোক, গরীব হোক্ সব একসঙ্গে পড়বে, একসঙ্গে আহার করবে, একসঙ্গে কাজ করবে। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মেয়েছেলে কিংবা ধনী ঘরের মেয়েছেলে—আর গরীব ঘরের মেয়েছেলের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায় না। সবাই রাস্তায় বেরোয় একসঙ্গে,দোকানে বসে খায় একসঙ্গে, একসঙ্গে মাঠে বসে গল্প করে। এমন কি গৃহকর্ত্রী আর ঝি চাকরের মধ্যে কোন পার্থক্যই সহজে বাইরে থেকে ধরা যায় না। সেইজন্য সমগ্র জাতির মধ্যে এক সহজ অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ফুটে উঠতে পেরেছে।

ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে এলেই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা যায়। যদিও ভারতবাসী দ্বারা ব্রহ্মদেশের সহরগুলি অনেকটা কলুষিত হ'য়েছে কিন্তু তার মধ্যেও ব্রহ্মদেশে এমন বাড়ী খুবই চোখে কম পড়ে—যে বাড়ীর সামনে ফুলবাগান অথবা বিভিন্ন ফুলের লতাপাতার টব নাই। বিশেষতঃ বর্ম্মী মেয়েরা ফুল খুব ভালবাসে বলেই
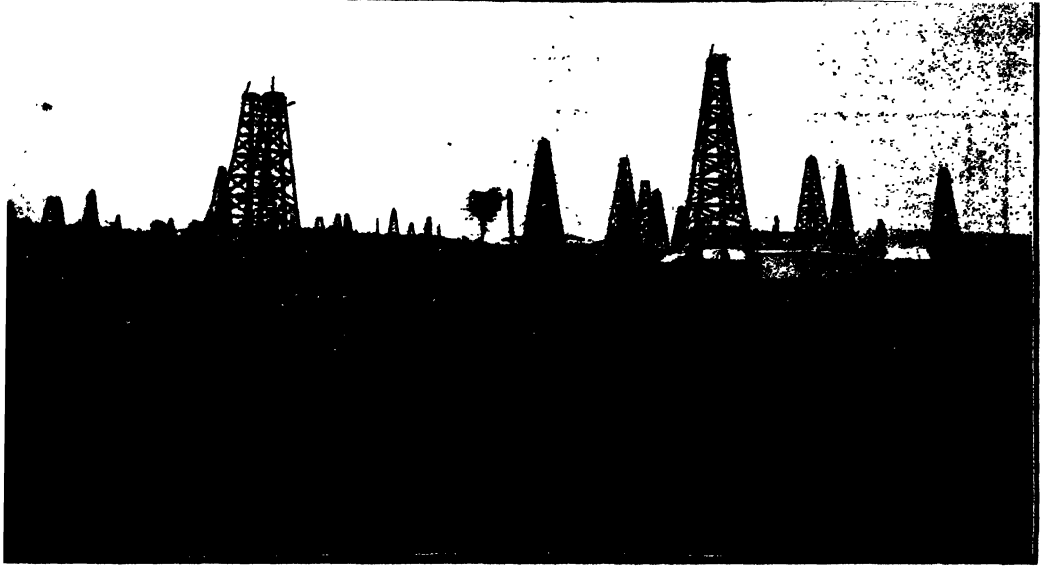
ব্রহ্মের পেট্রল কোম্পানী—ইনাঙ্‌জং

তারা সহরগুলিকে ফুলের বাগান, ছবির মত কাঠের বাড়ী দিয়ে সাজিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে থাকে।

ব্রহ্মদেশের প্রায় প্রত্যেকটি সহরের রাস্তাগুলি সরল, চওড়া ও দুধারে ফুটপাত-ওয়ালা; বিশেষত রেঙ্গুনের রাস্তার মত সর্ব্বত্র পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে রাস্তা ক'লকাতা সহরেও আছে ব'লে আমার জানা নাই। দেশী বস্তী নোংরা আর বিদেশী পল্লী পরিষ্কার রাখা হবে, এরূপ উদ্ভট তারতম্যতা ব্রহ্মদেশের কোন সহরে দেখা যায় না। কোন সহরকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপন মেরে নষ্ট ক'রতে দেওয়া হয় না এবং সমস্ত

বর্ম্মিণী মেয়েদের চুরুট প্রস্তুত

কি সহরের, কি গ্রামের—প্রত্যেক বাড়ীতেই ফুল পাওয়া যায়। ওদের আর একটা বিশেষ গুণ এই যে—সহরে বাস করে ওরা শহুরে হ'য়ে যায় না। সহরকে উপভোগ ক'রা

ব্রহ্মবাসীরা যেরূপ জানে সেরূপ ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতি জানে ব'লে আমার মনে হয় না। আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে সহরের সাথে লড়াই ক'রে জীবন যুদ্ধে চলতে হ'চ্ছে, কিন্তু ওরা সব সময়ই মনে করে সহর নিজেদের সুবিধায় গড়ে উঠেছে; তাই তারা সহরকে সাজিয়ে রাখতে গুছিয়ে রাখতে সমস্ত সময় চেষ্টা ক'রে থাকে। আমাদের মত

স্নানরতা বর্ম্মী মেয়ে

ওদের সহরের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ নাই। ছুটি পেলেই দলে দলে মেয়েছেলেরা সহর ছেড়ে দূরে চলে যায়। সেখানে চড়ুইভাতি, আমোদআহ্লাদ ক'রে আবার ফিরে আসে। সপ্তাহের এমন দিন নাই যেদিন ওদের পোয়ে নৃত্য বাদ যায়। প্রত্যেক উন্মুক্ত স্থানে আবালবৃদ্ধবনিতা একসঙ্গে মাটিতে বসে হয়ত'—সারারাত্রি পোয়ে দেখছে। নৃত্য যেন ওদের জীবনসঙ্গী, এক কথায় ওদেরই বলা যায়—"নৃত্য ছাড়া কৃত্য নাই"।

এই সহজ সৌন্দর্য্যজ্ঞানই ওদের পরিশ্রমপ্রিয় ক'রে তুলেছে। পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে ওরা কোনদিন জীবন কাটাতে ভালবাসে না। ব্রহ্মদেশে শ্রমের মর্য্যাদা বেশী আছে বলেই ওদেশে ভিক্ষুক নাই। কোন ব্রহ্মবাসীকে ভিক্ষা ক'রতে আমার চোখে পড়ে নাই—যা' দেখা যায় সে সব ভারতবাসী ভিক্ষুক। কলিকাতা সহরের ভিক্ষুকদের মত কতকগুলি বিকলাঙ্গ ব্যবসায়ী ভিক্ষুক ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। কিন্তু ব্রহ্মবাসীদের বিন্দুমাত্র স্নেহ ওরা আকর্ষণ ক'রতে পারে না। এরা নিজেরাও যেমন ভিক্ষা ক'রতে পারে না, তেমন ভিক্ষা দিতেও পারে না। কেবল ফুঙ্গিরা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এলে বিশেষভাবে তাদের জন্য খুব ভাল খাবার তৈরী ক'রে দেওয়া হয়। এই ফুঙ্গিদের অন্ন গ্রহণ করার মধ্যেও দেখা যায় এদের নিয়মানুবর্ত্তিতা। ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহস্বামীর বাড়ীর সামনে এসে একটু দাঁড়াবে, যদি কেউ অন্ন দেয় তবে নেবে, নতুবা তখনই চলে যাবে। আর যদি অন্ন গ্রহণের সময় প্রায় ১০০ শত ফুঙ্গি আসে তবে প্রত্যেকে নিয়মিতভাবে পর পর দাঁড়িয়ে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে, মারামারি কাড়াকাড়ি করার মত বীভৎসতা ওদের ধাতে সয় না।

পূর্ব্বেই ব'লেছি শ্রমের মর্য্যাদা ওরা খুব দিতে জানে বলেই গরীবের মুখেও হাসি লেগে আছে। সেও সমস্ত আনন্দোৎসবে সমানভাবে যোগদান ক'রতে পারে। আজ যদি কোন ম্যাজিষ্ট্রেট স্ত্রী ও সন্তানাদি রেখে মারা যান তবে সেই মুহূর্ত্তেই বর্ম্মিণী হয়ত' একটি সেলাইয়ের কল নিয়ে রাস্তায় জামা কাপড় ফেরী ক'রতে বসে যাবে, তাতে সমাজ কোন দিন বাধা দেয় না। কেন না এরা কোন জীবন-বীমা করার পক্ষপাতী নয়—বলে যে এই জীবনই সব। সেইজন্য ভবিষ্যৎ-এর জন্য কিছু জমিয়ে যেতে চায় না। অনেকটা এই কারণেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছোটবেলা থেকেই শ্রমের মর্য্যাদা দিতে শেখে। এদের প্রত্যেকেই বিশেষভাবে মেয়েরা খুবই আত্মনির্ভরশীল। পুরুষদের তবুও অনেকটা মেয়েদের উপর নির্ভর ক'রতে হয় কিন্তু মেয়েরা কোন দিনই কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। কি বাজারে, কি দোকানে, ঝাড়ু-মেথর-কুলিগিরি সমস্ত জায়গায় মেয়েরা কাজ ক'রছে।

কুমারী ও যুবতী মেয়েদের দোকান করা ব্রহ্মদেশে একটা জাতীয় রীতি। ব্রহ্মদেশের সমস্ত সহরে এই কুমারী ও যুবতী মেয়েদের দোকান আছে। কেহ সেলাইয়ের কল চালিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে, কেহ কাপড়ের দোকান করে, কেহ বা মনোহারী দোকান খুলে বসে আছে। যত প্রকার
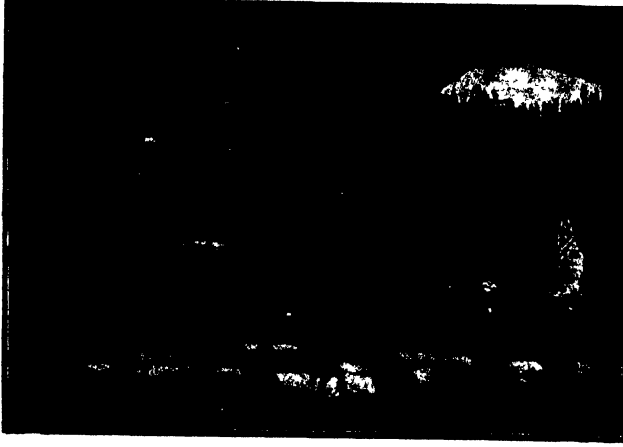
ব্রহ্মদেশের কাচের কাজ

বেচা-কেনা, তাতে বাজারে পুরুষ দোকানদার বিশেষ দেখা যায় না। আবার অন্য একদল মেয়ে আছে, যাদের বড় দোকান করার মূলধন নাই অথবা যাদের অর্থের বিশেষ অনাটন নাই, তারা দুই চারিটী ফলফুলারি ও চুরুট নিয়ে নিজের বাড়ীর সামনে সামান্য একটি দোকান খুলে বসে থাকে। যারা আবার দিনে সময় পায় না তাদের জন্য এদেশে নৈশ বাজারের (Night Market) বন্দোবস্ত আছে। বেলা ৪টা ৫টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বাজার হয়। এইরূপ দোকান করা স্ত্রীলোকদের একটি গুণের মধ্যে গণ্য হয়। এইরূপ আত্ম-নির্ভরতার সাথে সাথে আত্মমর্য্যাদাবোধও যথেষ্ট তাদের আছে। একটি কুলি, ঝি, চাকরকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি করার নিয়ম নাই। ব্রহ্মদেশে স্ত্রীবাচক তিনটি শব্দ আছে, তাহাই স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন "মে, মা এবং ড।" পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকলে একে অন্যকে ডাকতে হ'লে কিংবা তুচ্ছার্থে নামের পূর্ব্বে 'মে' শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'মা' শব্দ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভাবে চলে। আমাদের দেশে যেমন শ্রীমতী শব্দটী। কোন সম্মানিত স্ত্রীলোক কিংবা সাধারণতঃ বৃদ্ধাদের ডাকতে হ'লে তাদের নামের আগে 'ড' শব্দ ব্যবহার করা হয়। পুরুষদের নামের পূর্ব্বেও "ঙা, মং, কোং এবং উ শব্দ ব্যবহার করা হয়। "ঙা" শব্দ অতি তুচ্ছবোধক। কুলি বা জেলের কয়েদীদের ডাকতে হ'লে 'ঙা' শব্দ তাদের নামের আগে ব্যবহার করা হয়। মে শব্দটি সব সময়েই প্রায় ব্যবহার করা হয়। 'কো' শব্দ মেয়েদের নামের পূর্ব্বে 'মে' শব্দটীর ন্যায় পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকলে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ব্যক্তিদের বা অতি সম্মানিত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে 'উ' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

একবার আমি মেমিওতে একটি ফলওয়ালির নিকট কিছু ষ্ট্রবেরী ও আপেল কিন্‌ছি—ইতিমধ্যে মেয়েটিকে পোষাক বদলিয়ে মুখে 'তানাখা' মাখতে দেখে আমি যেই বলেছি—"এই তোমার পয়সা নাও"—অমনি মেয়েটি পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল "আমি কি পান বিক্রী করি যে তুমি আমাকে এই এই ব'লে ডাকছ। বাঙালীরা বুঝি এই ভাবেই বলে।" এর পর শত গুণে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল এই ভেবে যে 'এই' যদি আমাদের

কর্ম্মে রত একটি কুম্ভকার

দেশের লোক হ'ত, অপমানটা নীরবে হজম ক'রে ফেলতে দ্বিধাবোধ ক'রত না; অথচ ওরা তখনই প্রতিবাদ শুধু জানায় না—দরকার বোধ ক'রলে দস্তুরমত মেয়েরা লড়াই ক'রতেও পারে।

আবার এই মেয়েরাই বাড়ীতে ছেলেমেয়ে মানুষ করে; ঘর সাম্লায়, রান্না করে, বাজারে যায়, সমস্ত যাবতীয় কাজ নিজে হাতে করে। মেয়েরা খুবই অতিথিপরায়ণ। অতিথিকে ওরা দ্বার থেকে ফেরায় না, এমন কি বাসে ট্রামে জায়গা না থাকলে মেয়েরা আসন ছেড়ে দিয়ে পুরুষদের স্থান ক'রে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। মেয়েরা যে এত খাট্‌ছে তাতে তাদের মুখে একটুও ক্লান্তি নাই। যখন খাটবে তখন ভূতের মত খাটিবে, ঠিক পরক্ষণেই হয়ত' দেখা

সান মেয়েরা
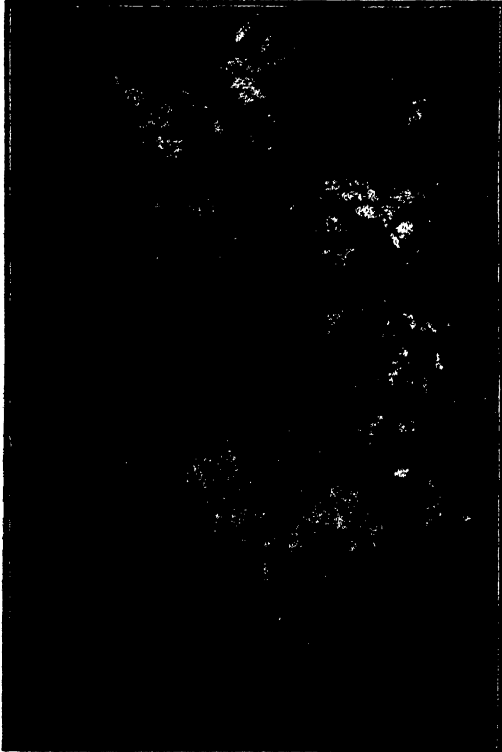
যাবে একখানি সিল্কের লুঙ্গি পরে মুখে তানাখা মেখে, মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজে বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। যে মেয়ে কুলী মেথরের কাজ করে, তারাও যখন সেজেগুজে বেড়াতে বেরোয় তখন তাদের কোন ধনী-গৃহিণী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মুখ ভার-করা লোক ব্রহ্মদেশে খুঁজে বের ক'রতে হয়। এতে মেয়েদের স্বাস্থ্যও গড়ে উঠেছে অটুটভাবে। প্রায় প্রত্যেকের স্বাস্থ্যই আমাদের দেশের পুরুষের স্বাস্থ্যকেও হার মানায়। এই আত্ম-নির্ভরতার জন্য তারা কি পোষাক পরিচ্ছদে, কি বাহ্যিক ব্যবহারে খরচ পত্রে সংযমী হ'তে শিক্ষা পেয়েছে। ব্রহ্মদেশী স্ত্রীলোকরা গায়ে একটি মাত্র জামা, পরিধানে

রামকৃষ্ণমিশন হাসপাতাল—রেঙ্গুন

একখানি থামেন কি লুঙ্গি, পায়ে ব্রহ্মদেশীয় ফাণা বা চটিজুতা এবং গলায় একখানা লম্বা পোষা বা রেশমী রুমাল ব্যবহার ক'রে থাকে। ব্রহ্মদেশে লোকে রেশমী কাপড় ছাড়া সুতার কাপড় বড় ব্যবহার করে না। থামেনগুলি কটিদেশে
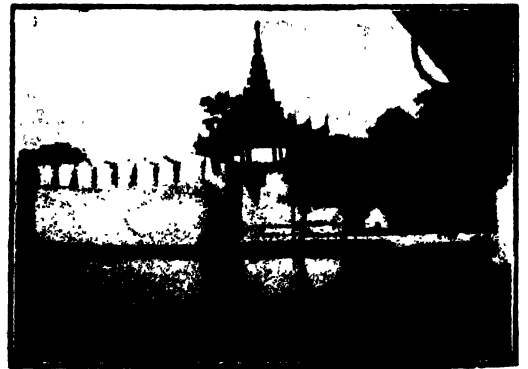
ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা থিবোর রাজপ্রাসাদ—মান্দালয়

বেড় দিতে যতটুকু লম্বা কাপড়ের প্রয়োজন হয় ততটুকু লম্বা একখণ্ড ডুরে বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করে। এরা নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ বাজার থেকে কিনে আনে না। এমন মেয়ে নেই যে নিজেদের লুঙ্গী ও বিশেষভাবে জ্যাকেট

সেলাই ক'রতে না পারে। প্রায় অধিকাংশ বাড়ীতেই ইস্ত্রি আছে। বাড়ীতে ছ'বেলা কাপড়গুলি কেচে ইস্ত্রি করা এদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। ধোপার প্রয়োজন এদের কোন বাড়ীতেই বড় একটা বেশী দেখা যায় না। সেইজন্য কোন ব্রহ্মদেশীয় মেয়েছেলেকে নোংরাভাবে দেখা যায় না। এমন কি নাপিতের কাজও এরা নিজেরা ঘরে ঘরে ক'রতে পারে। ভারতবর্ষের নাপিত ও ধোপা ছাড়া ওদের মধ্যে নাপিত ধোপা নাই, কেন না ওসব প্রত্যেকটি কাজই তাদের সাংসারিক একটা কাজ ব'লে গণ্য করা হয়।

কারও উপর বসে বসে খাওয়াকে এরা খুবই ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। কেন না কেউ না কেউ চুরুট তৈরী, বাক্স তৈরী, বেতের কাজ, ল্যাকার কাজ, কাঠির কাজ, ব্যাগ লুঙ্গি তৈরী, জ্যাকেট তৈরী—ফানা তৈরী সমস্ত কাজের মধ্যে একটা না একটা কাজ জানেই। তাই দিয়ে সে বেশ সংসার চালিয়ে নেয়। ব্রহ্মদেশে দৈনন্দিন কাজের এমন দেশীয় জিনিষ নাই যে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কাজে মেয়েরাই বিশেষভাবে অগ্রণী।

এইজন্য ব্রহ্মদেশীয় লোকরা প্রায়ই কন্যা সন্তান কামনা করে। এরা পুত্র সন্তানের জন্য বড় একটা লালায়িত নয়। কারণ এদের নিয়ম, পুত্র সন্তান যতদিন ছোট থাকে ততদিন তারা পিতামাতার লালনপালনাধীনে থাকে। যখন তারা বড় হয়, তখন দেশের প্রথানুসারে বিয়ে করার জন্য কুমারী (আপিয়) মেয়েদের অনুসন্ধান করে। বোধ করি সকলেই জানেন যে, ব্রহ্মদেশীয় কুমারী মেয়েরা ইচ্ছাবর গ্রহণ ক'রে থাকে। তারা নিজে দেখে, স্বামীর দোষগুণ ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় নিয়ে তবে তাকে বিয়ে করে থাকে। তারা যাকে ভালবাসে তাকে ডেকে আলাপ করে, ভাল না বাসলে তার সঙ্গে কথা বলা ত দূরের কথা, হয়ত' তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

ছেলেদের বেলায় এদের নিয়ম যে বিয়ে হ'লেই তারা শ্বশুর পরিবার মধ্যে গণ্য হয়। তাদের উপার্জ্জিত অর্থে শ্বশুর শাশুড়ীর দাবী, কিন্তু পিতামাতার বড় দাবী নাই। যদি ছেলে কোন কারণে পিতামাতাকে গোপনে সাহায্য করে আর তাহা যদি প্রকাশ পায় তবে তাকে স্ত্রী ও শাশুড়ীর যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হয়।

ব্রহ্মদেশে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার জিনিষ "জনতা"। জনতা বললেই আমরা বুঝি একটা গোলমাল হৈ-চৈ অনেক সময় মারামারি পর্য্যন্ত। কিন্তু ব্রহ্মদেশে বৈশাখী পূর্ণিমা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উৎসবে হাজার হাজার নরনারী প্যাগোডায় বুদ্ধের নিকট উপাসনা করে, আনন্দোৎসব করে, কোন জায়গায় একটু হৈ-চৈ, মারামারি, কাড়াকাড়ি নাই, যেন একটি বিরাট বাহিনী দলবদ্ধ হ'য়ে চলে যাচ্ছে।

সাধারণতঃ উত্তর ব্রহ্মেই ঠিক খাঁটি ব্রহ্মদেশীয় চিত্র দেখতে পাওয়া যায়—কেন না দক্ষিণ ব্রহ্ম নানা দেশের নানা মানুষের সংশ্রবে এসে ক্রমেই তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। বিশেষভাবে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ ভারতবাসীদের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত ও কলুষিত হ'য়ে আসছে বলেই আজ ব্রহ্মবাসীরা ভারত থেকে পৃথক হ'তে চায়।

মাদ্রাজি চেট্টিরা ব্রহ্মবাসীদের টাকা ধার দিয়ে যেভাবে শোষণ ক'রে আজ তাদের নিঃস্ব ক'রে এনেছে তাতে ব্রহ্মবাসী কেন, পৃথিবীর কোন জাত তা কোনদিন সহ্য ক'রতে পারে না। দিনের পর দিন এইভাবে অত্যাচারিত হবার ফলই ব্রহ্মদের ভারতবাসীর উপর এত রাগের কারণ। বাংলাকে যদিও বলা যায় haunted ground for other nations কিন্তু ব্রহ্মদেশের তুলনায় সিকি ভাগও বাংলাকে এইরূপে শোষণ করা হয় নাই।

অমন ফুলের মত দেশটাকে যে যার মত লুট ক'রে নিচ্ছে, অথচ মজা এই ঠিক ভারতবাসীরা যেন 'ইংরেজ প্রভু' হ'য়ে সে দেশে গেছেন। তারা ব্রহ্মবাসীদের সাথে মেশেন না, তাদের পট্টি আলাদা, সোসাইটি ক্লাব আলাদা, নিজেদের আলাদা স্কুল—আর কাজ সিদ্ধ হ'লেই দেশে ফিরে আসা।

বাঙালীরাও দেখাদেখি সেই পথই অবলম্বন ক'রেছেন দেখে খুবই দুঃখিত হ'লাম। কেননা আমি যতদূর ওদের সাথে মিশেছি তাতে মনে হ'ল ওরা বাঙালীদের এখনও প্রীতির চোখে দেখে—রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির অপূর্ব্ব কাজ প্রভৃতি। তারা আমাদের সাথে মিশতে চায় কিন্তু অনেক কালা বাঙালী কতকগুলি উদ্ভট কথা ব'লে তাদের নিকট হ'তে দূরে সরে থাকার ভাণ দেখান।

বর্ম্মারা ভারতবাসীকে 'কালা' ব'লে উল্লেখ করে ব'লে অনেকে ঈর্ষান্বিত হন কিন্তু তারা এত নির্লিপ্ত হ'য়ে থাকতে চান যে এই কথাটি পর্য্যন্ত তলিয়ে বুঝবারও তাদের ইচ্ছা নাই। ভারতবাসীর বর্ণ কাল বলে ব্রহ্মবাসীরা "কালা" শব্দ ব্যবহার করে না; বর্ম্মা ভাষায় "কালা" শব্দ লিখতে হ'লে 'কু-লা" লিখে থাকে। 'কু' শব্দের অর্থ সাঁতার দেওয়া এবং 'লা' শব্দের অর্থ আসে। কু-লা শব্দের অর্থ যে সাঁতরিয়ে আসে অর্থাৎ যারা কালাপানি পার হ'য়ে আসে তারাই কালা। আমাদের দেশে যে কালা আদমী কথাটি বলা হয় সে কেবল সাহেবদের 'কলার্ড' শব্দের অপভ্রংশ, ব্রহ্মবাসীর নিকট সাহেবও "কালা"।

দেশবাসীদের শুধু এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নিজেদের দেশের কথা মনে রেখে আমাদেরই মত পীড়িত একটি জাতির প্রতি যদি আমরাই 'শাসন ও শোষণ' নীতি-প্রথা অবলম্বন করি তবে তার বিষময় ফলে—যা আজ ব্রহ্মদেশের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে গেছে—নিজেদেরই

"অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

পূজার উপহার

শ্রীবীণা গুহ বি-এ

"কই মা সীতা এলে না?" সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া সত্যপ্রিয়বাবু ডাকিলেন। "এই যে যাই বাবা" বলিতে বলিতে একটী কৃশাঙ্গী তরুণী ধীরপদে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "এসো মা, এইখানে বোস।" সোফায় পিতার পাশে বসিয়া সীতা বলিল, "বিন্দির ছেলের অসুখ করেছে, ছেলেমানুষ কিছুতেই তেতো ওষুধ খেতে চায় না। তাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ওষুধ খাইয়ে আসতে একটু দেরী হোয়ে গেল বাবা।" "তাতে কিছু হয় নি মা। কিন্তু পঞ্চু আজ একটু ভাল আছে ত?" "হ্যাঁ, আজ ত জ্বরটাও কালের চাইতে অনেক কম উঠেছে। যাক্, অল্পের উপর দিয়ে কেটে গেল এও রক্ষা। আমি ত ভয়ই পেয়েছিলাম যে আবার একটা কিছু শক্ত টক্তে না দাঁড়ায়।" কথায় ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁর দুই চোখ কন্যার মুখের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পূর্ণিমার ভরা চাঁদের মত তার অসামান্য রূপ যেন দিনের পর দিন ম্লান হইয়া যাইতেছে। ক্রমেই যেন সে ক্ষীণ হইতেছে। কারণও হয়ত তিনি জানেন, কিন্তু আভিজাত্যগর্ব্বপূর্ণ উদ্ধত মন তাঁর একথা যেন কিছুতেই মানিতে চায় না। কন্যার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "তুই যেন দিনকে দিন রোগা হোয়ে যাচ্ছিস্ সীতা। তোর কোন অসুখ করে নি ত মা?" মুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া সীতা বলিল, "কি যে তুমি বল বাবা, তার কিছু ঠিক্ নেই। এর চাইতে আবার আমি মোটা ছিলাম কবে?" "কিন্তু চেহারাটা যে সত্যিই বড়—।" বাধা দিয়া সীতা বলিল, "চেহারা একটুও খারাপ হয় নি বাবা। তুমি মিছে ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না ত।" প্রত্যুত্তরে সত্যপ্রিয়বাবু মৌন হইয়া টেবিলের উপরের কাগজগুলি অন্যমনস্কভাবে নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন। সীতা তাঁকে মৃদু ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ বাবা?" চকিত হইয়া পিতা বলিলেন, "কই কিছুই ত না মা।" অতীতের কথাগুলি তাঁর মনে ভীড় করিয়া আসিতেছিল। এই ক্লেশকর চিন্তাগুলি তাঁর দিবারাত্রির সহচর, তবু সীতার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সেগুলি যেন তাঁকে আরো পীড়ন করিতে লাগিল। সীতা আব্দারের সুরে বলিল, "বেশ যা হোক্, আমাকে এত তাড়া দিয়ে ডেকে নিয়ে এসে দিব্যি চুপ করে বসে রইলে। কেন ডাক্‌ছিলে বলবে না বাবা?" "এই যে বলি মা।" কন্যার কথার প্রত্যুত্তর করিতে পাইয়া যেন তিনি বাঁচিয়া গেলেন। চিন্তার জ্বালা আর তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। সবলে দুশ্চিন্তাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ সীতা, পূজা ত এসে গেল। এখনো ত এবারে তোমার কি ফরমাশ্ জানালে না?" স্মিতমুখে সীতা বলিল, "পূজার ত এখনো অনেক দেরী আছে।" "কই আর দেরী

আছে? বল্‌তে গেলে ত পূজা প্রায় এসেই গেল। যদি কোন গয়নার ফরমাশ্‌ থাকে তবে ত এখনি গড়াতে দেওয়া দরকার।" আঁচলটা পাট করিতে করিতে সীতা বলিল, "আমার ত সব গয়নাই আছে! এবারে আর অনর্থক আমাকে গয়না দিও না বাবা।" ব্যস্ত হইয়া সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "কেন মা? অনাদিবাবুর মেয়ের গলার সেই মুক্তার মালাছড়ার যে সেদিন প্রশংসা করছিলে?" সীতা মৌন হইয়া রহিল। পিতা বলিতে লাগিলেন, "পূজায় এবারে ঐ রকম একছড়া মালা চাই। তোমাকে ওতে ভারী সুন্দর মানাবে।" মৃদু হাসিয়া সীতা বলিল, "তোমার যদি ভাল লাগে বাবা, তাই দিও।" সত্যপ্রিয়বাবু বালকের ন্যায় খুসী হইয়া উঠিলেন। সৌখিনতার প্রাচুর্য্য দিয়া তিনি যেন কন্যার মানসিক সুখের অভাব ঘুচাইতে চান। সাগ্রহে তিনি বলিতে লাগিলেন, "মুক্তাগুলি বেশ বড় বড় হবে। মাঝখানে লকেটটা একটা ষ্টার্, আর তাতে গোটাকত হীরা থাকবে। সেই বেশ হবে—কেমন মা?" পিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব কন্যার অবিদিত ছিল না। পূজার উপহার লইয়া তাঁর এই উৎসাহের হেতুও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে ধরা পড়িয়াছিল। তাই বাধা না দিয়া পিতার মুখের উপর স্নিগ্ধদৃষ্টি তুলিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ বাবা, সেই বেশ হবে।" উৎফুল্ল হইয়া সত্যপ্রিয়বাবু চশ্‌মাটা খুলিয়া কাঁচ দুটী ঘসিতে ঘসিতে বলিলেন, "তাহোলে মা সীতা, এবারে কাগজ-কলম নাও। দেশে আত্মীয়-স্বজনদের কি রকম কাপড়-চোপড় দিতে হবে তার একটা ফর্দ্দ করে ফেলা যাক্‌।" পিতার নির্দ্দেশমত একফালি কাগজ এবং কলম লইয়া সীতা কাজে মন দিল। এক সময়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবা, দাদা যে লিখেছিল সাম্‌নের মাসে আসবে, তাই আসবে ত? আর ত দেরী হবে না?" "শেষ চিঠি যা পেয়েছি, তাতেও ত ঐ লিখেছে। আর ত তার দেরী হবার কোন কারণ দেখিনে। পাশ করেই যদি চলে আস্‌ত তবে ত অনেক আগেই ফিরত। তার কন্টিনেণ্ট‌টা দেখে আসার বড় ইচ্ছা ছিল কিনা। তা সেখানে ঘোরাও ত শেষ হোয়েছে।" কলমটা দিয়া নোখে দাগ কাটিতে কাটিতে সীতা বলিল, "দাদা এলে বাঁচি। নইলে বাড়ী যেন অন্ধকার।" সস্নেহ-কণ্ঠে পিতা বলিলেন, "ঠিক্‌ই বলেছিস্‌ মা। এত বড় বাড়ীটাতে একা তুই ছেলেমানুষ, এই বুড়োটা ছাড়া একটা কথা বলবার লোক পর্য্যন্ত নেই, কাঁহাতক আর ভাল লাগে? সে এলে দুটো কথা বলে বাঁচিস্‌। তাকে ত শুধু দাদা বলেই জানিস্‌ না, সে যে তোর আবাল্যের সহচর।" সীতা পিতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "ফিরে এলেই কিন্তু দাদার বিয়ে দিতে হবে বাবা। দাদা ত ফিরে এসেই মক্কেল আর ব্রীফের বোঝা নিয়ে গুল্‌জার হয়ে থাকবে। আমার সঙ্গে কথা বলবারও হয়ত সময় পাবে না। আমার আর একা একা একটুও ভাল লাগে না। বউ এলে তবু গল্প করে কাজ করে সময় কাটবে। এখন থেকেই একটী পছন্দসই মেয়ে খুঁজতে থাকি।" সত্যপ্রিয়বাবুর নিশ্বাস পড়িল, সবিষাদে বলিলেন, "বিয়ে! একজনের বিয়ে দিয়ে ত কত সুখী করেছি, কত সুখ পেয়েছি। আর আমার কারুর বিয়েতে ইচ্ছা নেই।" সীতার মুখ ম্লান হইয়া গেল। হাসিয়া আনন্দ দেখাইয়া জোর করিয়া সে মনের ব্যথা চাপিয়া রাখিত। মুখের হাসি তার নিবিয়া গেল। বিষণ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "আমার অদৃষ্টে সুখ নেই, তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। কিন্তু তার জন্য দাদার বিয়েতে বাধা কি বাবা?" কন্যার কণ্ঠস্বরে পিতা চকিত হইলেন, অতর্কিতে তাকে ব্যথা দিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া তিনি নীরবে অধর দংশন করিলেন। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "থাক, ওকথা যেতে দাও মা। তুমি ঠিক্‌ই বলেছ প্রশান্তর বিয়ে দেওয়া দরকার, তোমার একজন সাথীর একান্ত প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে। তাই হবে মা, একটী পছন্দ মত মেয়ে খুঁজতে থাকা যাক্‌। সে ফিরে এলেই যত শিগগির হয় তার বিয়ে দেব।"

(২)

সত্যপ্রিয় চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গের একজন বড় জমিদার। তাঁর ন্যায় নিখুঁত চরিত্র, প্রজাবৎসল, স্নেহশীল লোক খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু এতগুণের মধ্যেও তাঁর একটী মহৎ দোষ আছে সেটী তাঁর আভিজাত্যাভিমান। আভিজাত্যগর্ব্বে ঘা লাগিলে এই কোমলচিত্ত লোকটী একমুহূর্ত্তে পাষাণের মত নির্ম্মম হইয়া উঠিতে পারেন। প্রাণাধিক্ পুত্র কন্যার প্রতি অগাধ স্নেহও এই আভিজাত্য বর্ম্মে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। এই তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব। গৃহে তাঁর অনাবিল শান্তি—সতী-সাধ্বী পত্নী, প্রস্ফুটিত

কমল-কলিকার ন্যায় দুইটী সন্তান। কিন্তু এ সুখ তাঁর ভাগ্যে বেশীদিন টিকিল না। প্রশান্তের বয়স যখন নয় এবং সীতার পাঁচ, তখন হঠাৎ চারিদিনের জ্বরে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। অন্তিম-শয্যায় স্বামীকে কাছে ডাকিয়া, তাঁর হাতে নাবালক পুত্রকন্যার হাত দুটী তুলিয়া দিয়া, সজল নয়নে তিনি বলিলেন, "এই সাজানো সংসার ফেলে ওদের ফেলে বড় অসময়েই আমাকে চলে যেতে হোল। ওদের তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, দেখো কখনো অযত্ন কোর না।" প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত রাখিয়া সত্যপ্রিয়বাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও শিবানী, আমি বেঁচে থাকতে এদের অনাদর হবে না।" পত্নীর মৃত্যু-শয্যায় তাঁর এই প্রতিশ্রুতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তাঁর যত্নে প্রশান্ত এবং সীতা একটী দিনের তরেও মায়ের অভাব বুঝিতে পারে নাই। মায়ের মৃত্যুর পর প্রায় বৎসরখানেক কাটিয়া গেল। প্রশান্ত স্থানীয় হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইল। স্কুলের বন্ধু অথবা অন্যান্য ছেলেদের সহিত প্রশান্ত বড় একটা খেলিতে ভালবাসিত না। সে তার অবসর সময় সীতার সহিত খেলিত। সীতারও দাদা ভিন্ন অপর কোন সাথী ছিল না। তাই কখনো দেখা যাইত সীতা মার্ব্বেলে ঠিক্‌মত 'তাক্' করিতে পারিতেছে না দেখিয়া প্রশান্ত হাত নাড়িয়া গম্ভীরভাবে তাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিতেছে, আবার কখনো বা দেখা যাইত—অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও শাড়ীর পাড়টা পুতুলের মাথার উপর ঘুরাইয়া না দিতে পারার দরুণ প্রশান্তকে সীতা নিপুণ ভাবে তাহা দেখাইয়া দিতেছে। ছোট বোন্‌টীকে প্রশান্ত ভালবাসিত অসম্ভব। তার গায়ে সে কোন আঁচ লাগিতে দিত না। ছোটবেলা হইতেই সীতার স্বভাব ছিল একটু চাপা ধরণের, কারুর কাছেই সে মুখ ফুটিয়া কিছু জানাইতে পারিত না। কিন্তু প্রশান্ত তার মুখের ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিয়াই তার মনের ইচ্ছা বুঝিতে পারিত। বোনটীর এতটুকু সাধ মিটাইতে ঐটুকু বয়সে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সীতাও দাদার কোন কষ্ট দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িত। প্রশান্তর এতটুকু মাথা ধরিলে পর্য্যন্ত তার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া যাইত। কতদিন যে সে প্রশান্তকে পিতার শাসন হইতে রক্ষা করিয়াছে তার আর ইয়ত্তা নাই। সীতা যেমনি ছিল শান্তপ্রকৃতির, প্রশান্ত তেমনি ছিল অতিরিক্ত চঞ্চল ও দুর্দ্দান্ত। তার মুখ অপেক্ষা হাতটাই অধিক চলিত। তাই কোন কারণে স্কুলে ছেলেদের সহিত ঝগড়া হইলে সে বেশীক্ষণ বৃথা বাক্যব্যয় করিত না এবং একবার হাত চালাইতে সুরু করিলে এই বলিষ্ঠ বালকের সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে সাহস পাইত না। সন্তানদিগকে অপর্য্যাপ্ত আদর দিলেও পিতা তাদের যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেন না। পুত্রের এই অশিষ্ট আচরণ তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করিত। কিন্তু যখনি তিনি তাকে শাসন করিতে উদ্যত হইতেন অমনি কোথা হইতে সীতা পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দুই কচি হাতে দাদাকে আড়াল করিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিত। সত্যপ্রিয়বাবুর আর শাসন করা হইত না। এই স্বর্গীয় দৃশ্যে তাঁর চোখ সজল হইয়া যাইত। অজস্র তিরস্কার প্রহার—কিছুই এই অশান্ত ছেলেটীকে বাগে আনিতে পারিত না; কিন্তু সে একেবারে শায়েস্তা থাকিত এই ছোট মেয়েটীর কাছে। সীতা যখন সজল নয়নে তার গলা জড়াইয়া বলিত, "দাদা-ভাই, এত দুষ্টুমি তুমি কেন কর? কেউ তোমাকে মন্দ বললে আমার যে বড় কষ্ট হয়।" অমনি এই পরম দুষ্টু ছেলেটীর চোখ দুটী চক্ চক্ করিয়া উঠিত, গাঢ়-স্বরে সে বলিত, "আর আমি দুষ্টুমি করব না ভাই। এবার থেকে সত্যিই আমি লক্ষ্মী হব।" এইরূপে এক বৃন্তে দুটী ফুলের মত পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া তারা পিতার সুকোমল স্নেহছায়ায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বৎসর কতক পরের কথা। প্রশান্ত এবারে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। এখন তাকে কলিকাতায় পড়িতে যাইতে হইবে। সত্যপ্রিয়বাবু মহা চিন্তায় পড়িয়াছেন। ছেলে-মেয়ে দুটী তাঁর প্রাণ। প্রশান্তকে একা কলিকাতায় পাঠাইয়া দেশে থাকা তাঁর পক্ষে অসাধ্য। অথচ সবশুদ্ধ কলিকাতায় চলিয়া গেলে পিতৃপুরুষের ভিটায় প্রদীপই বা দেয় কে? অনেক জল্পনার পর অবশেষে পিতৃ-স্নেহই জয়ী হইল। সরকারমশাই একটী পছন্দমত বাড়ী ভাড়া করিতে কলিকাতা গেলেন। জমিদারবাবু দেশের বসবাস উঠাইয়া কলিকাতা চলিয়াছেন শুনিয়া প্রজারা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তাদের বুঝাইয়া শুঝাইয়া আত্মীয়-পরিজনদের উপর বাড়ী দেখাশোনার ভার দিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে পুত্রকন্যাসহ সত্যপ্রিয়বাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

(৩)

"ওষুধটুকু খেয়ে ফেল মা।" বছর পোনর ষোল বয়সের একটী বালক পীড়িতা মায়ের মুখের উপর সাগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। পুত্রের হাতটী নিজের দুর্ব্বল হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষীণকণ্ঠে জননী বলিলেন, "আর ওষুধে দরকার নেই বাবা। তার চাইতে আমার কাছে একটু বোস্।" ব্যগ্রকণ্ঠে পুত্র বলিল, "ও রকম কোর না মা। ডাক্তারবাবু বলেছেন এই ওষুধেই তুমি সেরে উঠবে।" মায়ের রোগক্লিষ্ট মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য স্নিগ্ধ হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল; পুত্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "দে বাবা, ওষুধ খেলে যদি তুই খুসী হোস্ দে। কিন্তু তুই ত আমার বুদ্ধিমান্ ছেলে শঙ্কর, তুই কি বুঝছিস্ না, জীবনের মেয়াদ আমার ফুরিয়ে এসেছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত এ পৃথিবীর দেনাপাওনা আমাকে শেষ করতে হবে।" শঙ্কর তাহা বুঝিয়াছিল—খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াও সে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। মা ভিন্ন সংসারে আপন বলিতে তার যে আর কেউ নাই। একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশ্রয়স্থল সেই মা তাকে এ সংসারে একেবারে একা ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন—ইহাও কি সম্ভব! পিতাকে ভালোরূপে চিনিবার পূর্ব্বেই শঙ্কর তাঁকে হারায়। এই নাবালক সন্তান এবং ক্ষুদ্র জমিটুকু লইয়া সদ্য-বিধবা তখন বড় বিপদেই পড়িলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্ব সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি ঐ জমিটুকুর প্রতি। একটু সুপরামর্শ দিতে ভরসা দিতে কেহ নাই। তিনি চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। শোকের সময় এর পরেও হয়ত পাইবেন কিন্তু এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে জমিটুকু জ্ঞাতিদের করায়ত্ত হইবে। উহার আয়ের উপরই এখন একমাত্র নির্ভর। না হইলে কিসের দ্বারা অসহায় বিধবা শঙ্করকে মানুষ করিয়া তুলিবেন? শঙ্করকে মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা চাই—ঐ শিশু শঙ্করকে ঘেরিয়া স্বামী স্ত্রী তাঁরা কতই না আকাশ কুসুম রচনা করিয়াছিলেন! শঙ্করের অযত্ন হইলে তিনি যে বড় কষ্ট পাইবেন। পুত্রের মুখ চাহিয়া বিধবা সকল শোক ঝাড়িয়া ফেলিলেন। তাঁর প্রখর বুদ্ধির নিকট আত্মীয়-কুটুম্বদের ছলচাতুরী ব্যর্থ হইল। জমিটুকুর সামান্ত আয় দ্বারা তিনি শঙ্করকে অতি কষ্টে পালন করিতে লাগিলেন। মায়ের দুঃখকষ্ট, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য তাঁর দারুণ প্রচেষ্টা শঙ্কর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত। অন্য ছেলেরা যখন খেলায় গল্পে সময় নষ্ট করিত, সে তখন তার পড়িবার ঘরটীতে বসিয়া একমনে পাঠাভ্যাস করিত। অবসর সময়ে সে যথাশক্তি মাকে সাহায্য করিত। মা হয়ত বলিতেন. "যা না বাবা, আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে একটু খেল্‌গে। সব সময়েই কি ঘরের ভিতর—।" বাধা দিয়া শঙ্কর বলিত, "ভাল লাগে না মা আমার হৈ চৈ করে বেড়াতে।" বছরের শেষে প্রাইজের বইগুলি মায়ের পায়ের কাছে রাখিয়া সে যখন তাঁর পায়ের ধুলা নিত, মা তখন বড় আদরের সন্তানটীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অসীম আনন্দ ও অপার গর্ব্ব অনুভব করিতেন। স্বামীর কথা মনে পড়িয়া তাঁর চোখ জলে ভরিয়া আসিত। এমন সুখের দিনে তিনি কোথায়? কাতর হইয়া শঙ্কর বলিত, "এ আনন্দের দিনে তুমি কাঁদছ কেন মা?" শঙ্করের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিতেন, "তাঁর অভাবে এ আনন্দ যে আমি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারছিনে। তুই যে তাঁর বড় সাধের ছিলি বাবা।" সজলনয়নে শঙ্কর মাথা নত করিত। তার জন্য মায়ের এত যত্ন সার্থক করিয়া তোলাই ছিল শঙ্করের লক্ষ্য। তার জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল, মানুষের মত মানুষ হইয়া দুঃখিনী জননীর মুখে সে হাসি ফুটাইবে, তাঁকে সুখে রাখিবে। তার আকাঙ্ক্ষা সফল হইবার সূচনা দেখা গিয়াছিল। এবারে সে ম্যাট্রিক্ দিয়াছে। তার অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ণমেধার ফল ফলিয়াছে। সেই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এমন সংবাদই সেদিন হেড্‌মাষ্টার মশাই উৎফুল্লমুখে দিয়া গিয়াছেন। তারি মাঝে একি বিপদের সূত্রপাত। যে মাকে অবলম্বন করিয়াই তার জীবনের সব কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি তাকে এমন অসময়ে ফাঁকি দিয়া চলিলেন। তাঁকে হারাইয়া কোন্ কাজে সে আর উৎসাহ খুঁজিয়া পাইবে? জীবনে তার লক্ষ্যই বা কি থাকিবে?

পুত্রের মাথাটী ধীরে ধীরে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া জননী বলিলেন "মরণ বাঁচন ত মানুষের হাতে নয়। ওপারের ডাক যখন আসে তখন শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষকে এপারের মায়া কাটাতে হয়। নইলে তোকে কি এম্‌নি অবস্থায় ফেলে আজ আমার যেতে ইচ্ছে হয়? এইটুকু বয়সে একেবারে

অসুস্থায় তোকে রেখে যেতে আমার যে কি লাগছে তা জানেন শুধু অন্তর্যামী।" ক্ষণেক চোখ বুঝিয়া থাকিয়া আপন মনে তিনি বলিলেন, "আর কয়টা দিনও কি বাঁচিয়ে রাখতে পার না ভগবান্। আমার কাজ যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, শঙ্করকে যে আমি মনের মত করে গড়ে যেতে পারলাম না।" তাঁর শীর্ণগণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অধীর হইয়া শঙ্কর বলিল, "ওরকম করে বোল না মা, আমি যে আর সইতে পারি না।" স্নিগ্ধকণ্ঠে জননী বলিলেন "অমন কাতর হোয়ে পড়লে ত চলবে না বাবা। ধৈর্য্য দিয়ে সাহস দিয়ে বুক বেঁধে আমাদের অপূর্ণ সাধ যে তোকে সার্থক করে তুলতে হবে শঙ্কর।" মায়ের শীর্ণ হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "তোমাকে হারিয়ে কোথা থেকে আমি উদ্যম খুঁজে পাব? বড় ইচ্ছা ছিল তোমাকে সুখী করব, তোমার দুঃখ ঘুচাব। ভগবান্ তা হোতে দিলেন না। তোমাকেই যদি ধরে রাখতে না পারি তবে মানুষ হোয়ে ওঠার আর সার্থকতা কি?" ব্যগ্রকণ্ঠে জননী বলিলেন, "ও কথা বলিস্ না শঙ্কর। তোর জন্য অনেকদিন থেকে আমাদের সাধ ছিল তোকে এমনভাবে গড়ে তুলব যে তোর নামে পরিচয় দিতে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। এ নিয়ে আমরা কতদিন কত আলোচনা করেছি। কিন্তু অসময়ে তাঁকে চলে যেতে হোল। একমাত্র তোর মুখের দিকে চেয়েই অসহ্য শোকের বোঝা ঝেড়ে ফেলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।" নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার বলিলেন,—"ভরসা ছিল তাঁর ইচ্ছা আমি পূর্ণ করে যেতে পারব। কিন্তু ভগবান্ তাতেও বাদ সাধলেন।" ক্লান্তিতে তাঁর চোখ বুজিয়া আসিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া শঙ্কর বলিল, "আর কথা বোল না মা। তোমার কষ্ট হোচ্ছে।" —বাধা দিয়া জননী বলিলেন, "এম্‌নি করে তোকে কাছে বসিয়ে কথা কইতে আর হয়ত পাব না শঙ্কর। যে কয়টা কথা আমার বলবার আছে, আস্তে আস্তে বলতে দে।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "শোকে জড়িয়ে পড়ে যদি তুই কর্ত্তব্যকাজে অবহেলা করিস্ তবে সেখানে থেকে আমরা বড় কষ্ট পাব। প্রতিকার কিছু করতে পারব না। দুঃখ পাওয়াই আমাদের সার হবে।" দম লইয়া তিনি আবার বলিলেন, "একা ছেলে মানুষ তুই, তোর পথে অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হবে। কিন্তু বাবা আমার, সব কিছু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আমাদের কথা মনে করে তোকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। আমাদের একান্ত কামনা সার্থক করতে হবে। এই তোর দুঃখিনী মায়ের শেষ আদেশ, শেষ অনুরোধ।" উদ্বেল অশ্রুরাশি সংযত করিয়া আবেগের সহিত শঙ্কর উত্তর দিল, "তাই হবে মা। জীবনে তোমাদের সুখী করতে পেলাম না, মরণের পর তোমাদের অতৃপ্তির কারণ আমি হব না। সব কিছু বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে, মানুষের মত মানুষ হোয়ে আমি সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াব। তোমাদের সাধ পূর্ণ করব। সেখান থেকে তুমি আর বাবা আমাকে আশীর্ব্বাদ কোর যেন সফল হই।" জননীর মুখ উজ্জ্বল হইল, আনন্দাশ্রুতে চোখ দুটী আর্দ্র হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি শঙ্করের পানে চাহিলেন। মাতৃহৃদয়ের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ দৃষ্টির ভিতর দিয়া যেন স্নেহরূপে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হইল।

(৪)

মৃত্যুর দিন দুই পূর্ব্বে স্বামীর আপন খুল্লতাত পুত্র হরিশকে ডাকিয়া তাঁর হাতে শঙ্করের জননী পুত্রের ভার এবং তার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জমিটুকু সঁপিয়া দিলেন। ঐ জমিটুকুর উপর হরিশের বরাবর লোভ; কিন্তু ভ্রাতা বর্ত্তমানে তাঁর সহিত এবং পরে ভ্রাতৃজায়ার সহিত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁর কোটরপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র চোখ দুটি নিগূঢ় আনন্দে চক্ চক্ করিয়া উঠিল। আত্মীয়-স্বজনদের স্বভাবের সহিত শঙ্করের জননীর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। ইঁহার আশ্রয় যে পুত্রের পক্ষে কতখানি সুখকর হইবে তাহাও তাঁর অবিদিত ছিল না। কিন্তু আজ যে তিনি একান্ত নিরুপায়। তাঁর অবর্ত্তমানে শঙ্করকে এক মুষ্টি ভাত রাঁধিয়া দিতেও কেহ নাই। যে কোন একটা আশ্রয়ে তাকে না রাখিয়া তিনি যে চোখ বুঝিতে পারিতেছেন না।

মায়ের মৃত্যুর পর শঙ্কর প্রথমে বড় বেশী অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু তারপরে তাঁর শেষ আদেশ স্মরণে আসিতেই সে শোকের বেগ সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল। নিরাপদে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেল। দিনকতক পরে খুড়াকে নির্জ্জনে পাইয়া শঙ্কর বলিল, "এবারে আমার কলকাতা

যাবার বন্দোবস্ত করে দিন্ কাকাবাবু। সব কলেজই ত প্রায় খুলে গেল।" হরিশ প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "বলি বলি করেও কথাটা এ্যাদ্দিন বলা হয়নি। তুমিই যখন তুললে ভালই হোল। শোন বাপু, আর পড়াশোনা করা আমার ইচ্ছা নয়।" অসহ্য বিস্ময়ে শঙ্কর বলিল, "তার মানে?" "বল্‌ছি সবই, ব্যস্ত হোয়ো না। আমার সম্বন্ধী নেপালকে ত চেনো, সে কলকাতার সহরটা বলতে গেলে চষে খেয়েছে। সেই সেদিন বলছিল যে আজকাল আর পাশ-ফাশের কোন আদর নেই। তবে বাপু অনর্থক পয়সা নষ্ট করে লাভ?" খুড়ার মনোগত অভিপ্রায় শঙ্করের অজ্ঞাত রহিল না। জমিটুকু হাত করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে তিনি শঙ্করকে বিনা বেতনের ভৃত্য রাখিতে চান্। অধর দংশন করিয়া সে বলিল, "আমি পড়াশুনা এখানেই বন্ধ করতে পারব না কাকাবাবু। আমার—।" বাধা দিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া খুড়া বলিলেন, "তর্ক কোর না বাপু। আমিই এখন তোমার অভিভাবক, আমার মতেই তোমাকে চলতে হবে।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন, "কলকাতায় পড়ানর খরচই বা আমি চালাব কেমন করে? ঐ একখানি জমির কিই বা আয়? এত দস্তুর মত আমাকে পীড়ন করা।" শঙ্কর শান্তকণ্ঠে বলিল, "জমিটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিন্ কাকাবাবু, আমার খরচ আমিই চালিয়ে নেব।" "ছোঁড়া ত আচ্ছা ঝানু।" অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত খুড়া বলিলেন, "এ রকম কোন কথা ত তোমার মার সঙ্গে আমার হয়নি। বেশ ত, আগে সাবালক হও, তারপর বোঝা যাবে এখন।" ক্রোধে শঙ্করের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ইঁহার সহিত বাদানুবাদ নিষ্ফল। জমি যখন একবার হাতে পাইয়াছেন তখন কিছুতেই ছাড়িবেন না। অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে গেলে হয়ত তার স্বর্গগত পিতামাতার নামে অনেক কুকথা বলিয়া বসিবেন—তাহা শঙ্করের পক্ষে একান্তই অসহ্য। কঠিন মুখে সে বলিল, "ভাল, ঐ এক টুকরা জমির উপর যখন আপনার এতই লোভ, আপনি ও নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করুন। আমার পথ আমিই দেখে নেব এখন।"

(৫)

হোষ্টেলে নিজের রুমে বসিয়া শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল। ঘরটীর আবহাওয়া ভবিষ্যৎ ডাক্তারের উপযুক্ত। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ছোট ঘরটী—ধূলার লেশমাত্র নাই। একধারে স্প্রিংয়ের খাটের উপর খদ্দরের সুজনী দিয়া ঢাকা বিছানা। অপর ধারে একটী সাধারণ কাঠের টেবিল এবং তার সম্মুখে খান দুই চেয়ার। শেল্‌ফের উপর বইগুলি ফিট্‌ফাট্ সাজানো। দেয়ালে পানের অথবা কালির দাগ নাই। হোষ্টেলবাসী অন্যান্য ছেলেদের ঘর হইতে এই ঘরটী বেশ একটু স্বতন্ত্র ধরণের।

দম্‌কা হাওয়ার মত একটী ছেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পাঠ-নিরত শঙ্করের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; তারপর বইটী জোর করিয়া কাড়িয়া নিয়া বলিল, "আচ্ছা লোক যা হোক্ তুই শঙ্কর, দিব্যি বসে পড়ছিস্? বল্ দেখি জয়ন্ত কতবার ক'রে তার বাড়ীতে ম্যাজিক্ দেখতে যেতে বলেছিল।" বন্ধুর হাত হইতে বইটী উদ্ধার করিয়া শান্ত-কণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "জয়ন্তকে আমি বুঝিয়ে বলেছি যে আমার যাওয়া হবে না।" "কেন হবে না শুনি?" শঙ্করকে নিরুত্তর দেখিয়া রাগত মুখে বন্ধু বলিল, "পড়তে পড়তে তুই কি পাগল হবি শঙ্কর? এই বিকেলবেলা কি মানুষের পড়বার সময়?" মুখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, "তুইও কি একথা বল্‌বি প্রশান্ত? এখন যে পড়বার সময় নয় তা জানি; কিন্তু সকাল সন্ধ্যে টিউশানি, দুপুরে কলেজ করে বল্ দেখি আমি পড়বার সময় কতটুকু পাই? কি করে ছুটীর দিনগুলো নষ্ট করি? পরীক্ষাত একেবারেই আসন্ন হোয়ে এসেছে।" প্রত্যুত্তরে প্রশান্ত আর কিছু না বলিয়া শেল্‌ফ্ হইতে একটা ম্যাগাজিন্ টানিয়া লইয়া শঙ্করের শয্যার উপর সটান্ শুইয়া পড়িল। বন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শঙ্কর বলিল, "তোর কি হোল? তুই যাবি না?" গম্ভীরমুখে প্রশান্ত উত্তর দিল, "বাজে কথা না কয়ে নিজের কাজ কর্।" মৃদু হাসিয়া শঙ্কর পড়ায় মন দিল। খানিকবাদে দুইটী ছেলে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। রঞ্জিৎ আশ্চর্য্যে বলিল, "একি আপনারা জয়ন্তবাবুর ওখানে যাবেন না?" প্রশান্ত বলিল, "না, আমাদের যাওয়া হোল না।" শঙ্করের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অসিত বলিল, "শঙ্করবাবু যে যাবেন না সে ত জানা কথাই। উনি এসব অসার আমোদে সময় নষ্ট করলে কেই বা কলেজের প্রত্যেকটী মেডেল পাবে, আর কেই বা গভর্ণমেণ্টের কান মলে বছর বছর স্কলারশিপের টাকা আদায় করবে? কিন্তু

আপনি প্রশান্তবাবু—?" বন্ধুকে নিজে যা খুসী বলিলেও তার প্রতি অন্যের কটাক্ষপাত প্রশান্ত সহিতে পারিত না। বাধা দিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে বলিল, "আপনাদের বোধ হয় দেরী হোয়ে যাচ্ছে।" আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছেলেদুটী চলিয়া গেল। বেশ কিছুক্ষণ কাটিল। শঙ্কর যে অধ্যায়টী পড়িতেছিল তাহা সমাপ্ত হইল। সে উঠিয়া গিয়া প্রশান্তের পাশে বসিল। ম্যাগাজিন্ হইতে চোখ তুলিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "তোর পড়া হোয়ে গেল নাকি?" সস্মিত-মুখে শঙ্কর বলিল, "খানিকটা হোয়েছে। একসঙ্গে বেশীক্ষণ পড়তে পারি না।" তার পর বন্ধুর হাত হইতে ম্যাগাজিন্‌টা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আয়, এবারে একটু গল্প করি। আচ্ছা দাঁড়া, তার আগে তোকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে নি।" ছোট ষ্টোভ্‌টা জ্বালিয়া শঙ্কর দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা পান হইলে শঙ্করের ঘরের সম্মুখের বারান্দাটিতে দুইটী ইজি-চেয়ার টানিয়া দুইজন বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে চারিদিক ছাইয়া ফেলিতেছিল, আকাশের স্বচ্ছ বুকে গোটাকয়েক তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক সময়ে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষার পর তোর এখন কি করা ইচ্ছা?" "আপাততঃ ইচ্ছা প্র্যাক্‌টীস্ করা।" সাগ্রহে প্রশান্ত বলিল, "তুই যদি একবার বিলেত ঘুরে আসিস্ তবে কি তোর ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে না?" ম্লানমুখে শঙ্কর বলিল, "সে সম্বল আমার এখন কোথায় ভাই? আমার জীবনের উদ্দেশ্য তোর অজানা নয়। বাবা-মা'র একান্ত সাধ ছিল আমি দশের একজন হোয়ে উঠি। তাঁদের সে কামনা পূর্ণ করতে হোলে এখানেই থেমে পড়লে আমার চলবে না। তাই স্থির করেছি প্র্যাক্‌টীসে কিছু গুছিয়ে নিয়ে সাগর পাড়ি দেব।" বিষণ্ণ-কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "স্বাবলম্বন জিনিসটা খুবই ভাল স্বীকার করি। কিন্তু কেউ যখন ভালবেসে স্নেহের দাবীতে একটুখানি সাহায্য করতে চায় তখন তাকে অবহেলা করে যে তোর কোন সার্থকতা হয় না তা তুইই জানিস্।" বন্ধুর ব্যথা শঙ্কর জানিত। দেশের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া কলিকাতায় আসিয়া সে যখন কলেজে ভর্ত্তি হইল তখন হইতেই এই ছেলেটী তাকে কাছে টানিয়া নিয়াছে। তাদের কৈশোরের প্রীতি ধীরে ধীরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে উপনীত হইয়াছে। সব কিছু খরচ নিজে চালাইতে হয় বলিয়া শঙ্করের সারাদিনব্যাপী অক্লান্ত শ্রম প্রশান্তর বুকে বড় বাজিত। তার শ্রম লাঘব করিবার জন্য সে কতদিন কতপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সমস্তই শঙ্কর হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আজ আবার সেই কথার সূচনা দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "আমার জীবনের কোন কথাই ত তোর অজানা নয় ভাই। মাকে হারাবার পর একমাত্র সম্বল জমিটুকু হাত করে খুড়ো যেদিন পথে বসিয়ে দিলেন সেদিন থেকে শপথ করেছি আপন পর কারুর কাছ থেকেই জীবনে কোন সাহায্য নেব না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে মানুষ হোয়ে উঠব।" "তা আমি জানি শঙ্কর, সেজন্যই কোনদিন তোকে জোর করে কিছু গ্রহণ করাতে পারিনি, তখনি মনে হোয়েছে যে তাতে তোর মহত্ত্ব খর্ব্ব হবে। কিন্তু এও ঠিক্ তোর নানাবিধ প্রতিজ্ঞায় সত্যিই এক একসময় বড় কষ্ট পাই।" শঙ্করের জিজ্ঞাসু নেত্রের দিকে চাহিয়া আবার সে বলিল, "তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ কারুর বাড়ীতে যাবিনে—এতেও কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়? বাবা তোকে দেখ্‌তে চান্। সীতা তোর কথা শুনে বলতে গেলে তোকে বোধ হয় পূজা করে। তুই আমার মহাগর্ব্বের জিনিস। আমার কি ইচ্ছা করে না তোকে তাদের দেখাই?" ধীরে ধীরে শঙ্কর বলিল, "আমার সে প্রতিজ্ঞার কথাও ত তুই জানিস্—যেদিন মানুষের মত মানুষ হোতে পারব সেদিন সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করব।" "আমার পক্ষেও কি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই?" বন্ধুর কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস পাইয়া শঙ্করের মন ব্যথিত হইল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশান্তর একখানা হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "আমায় মাপ্ কর্ প্রশান্ত।" বন্ধুর বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া ভারী গলায় আবার সে বলিল, "তোর বন্ধুত্ব আমার কাছে যে কি অমূল্য জিনিস তা আমিই শুধু জানি। পৃথিবীতে আপন বলতে যখন আর আমার কেউ রইল না তখন তোকে পেয়েই সব-হারানোর ব্যথা আমি ভুলেছিলাম। তোর মনে ব্যথা দিয়ে আমি মহা অপরাধ করেছি। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর্ ভাই, আমার ফাইন্যালটা হোয়ে গেলে পর যদি তোর কাছে গেলে সত্যিই তুই খুশী হোস্ তবে যতদিন ইচ্ছা আমাকে নিয়ে যাস্।" আর কেহ কোন কথা কহিল না। পরস্পরের প্রতি তাদের অসীম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

বি

Bh Ha & P ıg Works
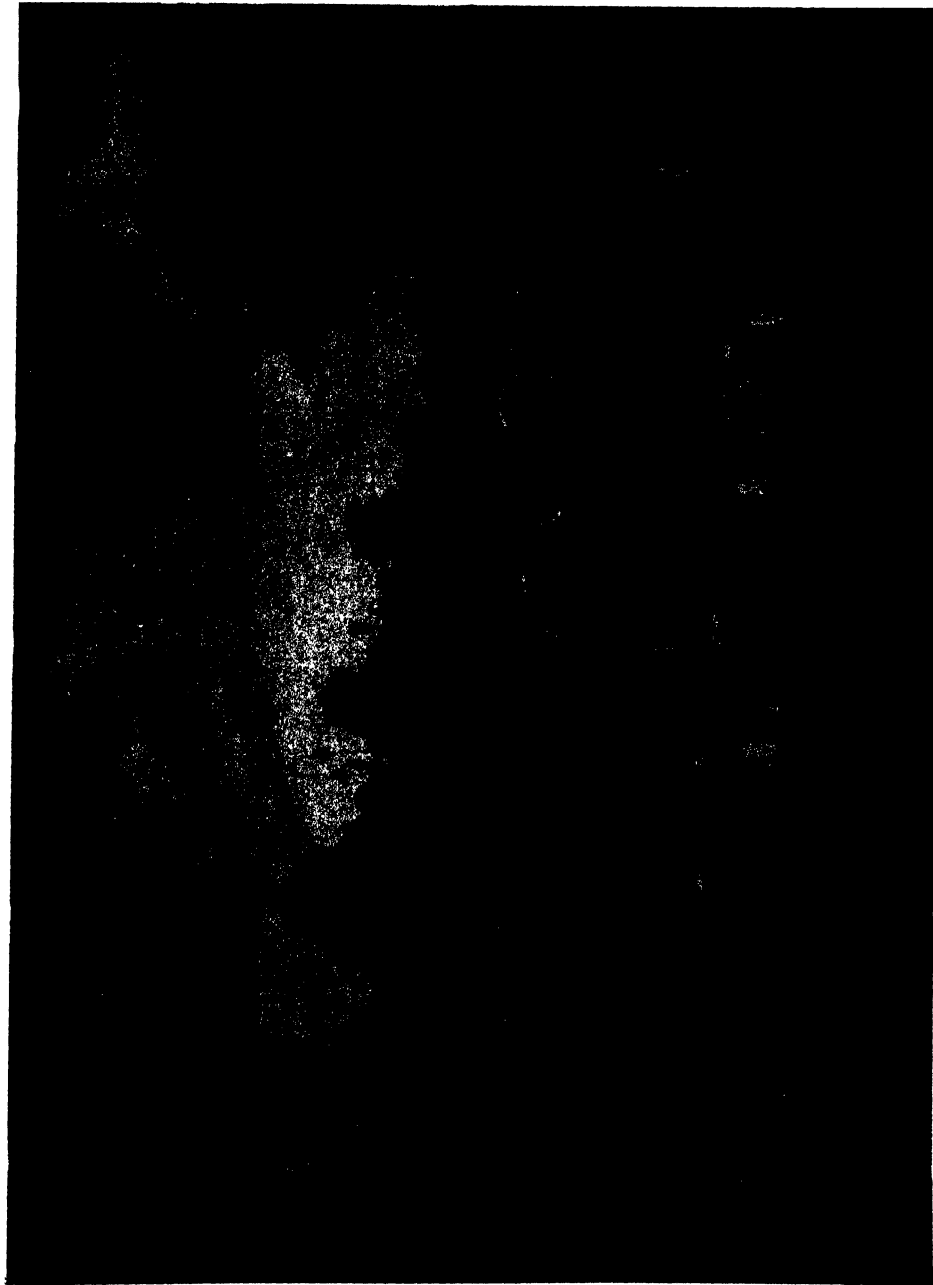
প্রীতি মৌনতার ভিতর দিয়া যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

(৬)

"সীতা, সীতা, শিগ্‌গির শুনে যা।" দাদার ডাকে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সীতা ত্বরিতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া ঢুকিতে গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। দাদার পাশে বসিয়া কে ঐ স্নিগ্ধকান্তি যুবক? নিজেরই অজ্ঞাতে সীতা রাঙিয়া উঠিল। দাদাটার যদি একফোঁটা কাণ্ডজ্ঞান থাকে! এমন হঠাৎ ডাকিয়াছে যে সে একটু ফিট্‌ফাট হইয়া আসিবার পর্য্যন্ত সময় পায় নাই। শঙ্কর দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নিজেকে সাম্‌লাইয়া প্রতি নমস্কার করিয়া সীতা আগাইয়া আসিতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিতে সুরু করিল, "এত দিনের সাধনার ফল আজ সার্থক হোয়েছে। আজ—।" বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, "থাম্, আর ফাজ্‌লামি করতে হবে না।" সীতা একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া সস্মিতমুখে বলিল, "বসুন্। আপনার কথা দাদার কাছে কত শুনি কিন্তু দেখার সৌভাগ্য এযাবৎ হয়নি।" শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আজকের আগে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও প্রশান্তর কল্যাণে আপনার নামের সঙ্গেও আমি অপরিচিত নই।" সে কথা চাপা দিয়া সীতা বলিল, "ফাইন্যাল্ ত আপনার হোয়ে গেল। কেমন দিয়েছেন জিজ্ঞাসা করা অনর্থক, কারণ ফার্ষ্ট প্লেস্ ত আপনার বাঁধা।" সলজ্জ হাস্যে শঙ্কর বলিল, "তা কি বলা যায় কিছু?" তার পর সীতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন কলেজ থেকে ফিরলেন?" "আজ ছুটী ছিল।" "আপনি ত ইংলিশে অনার্স নিয়েছেন।" স্মিত-মুখে সীতা বলিল, "হ্যাঁ, সে খবরও বুঝি দাদার আপনাকে দেওয়া হোয়ে গেছে।" "আচ্ছা আপনার সায়েন্স ভাল লাগে না?" মৃদু হাসিয়া সীতা বলিল, "মাপ্ করবেন শঙ্করবাবু, আপনারা যদিও ও জিনিসটার বেজায় ভক্ত, আমি কিন্তু ওর ভিতরে বিন্দুমাত্র রস খুঁজে পাই না।" প্রশান্ত গম্ভীরমুখে বলিল, "আমার মনে হয় মেয়েদের ধাতের সঙ্গে ও জিনিসটার একেবারেই খাপ্ খায় না।" "তা ঠিক, ও আমাদের মত বেরসিক কাটখোট্টা লোকেরই উপযুক্ত" বলিয়া শঙ্কর হাসিতে লাগিল। সকৌতুকে সীতা বলিল, "বাপ্‌রে, আপনাদের বেরসিক বলে কে? আপনারাই হোচ্ছেন প্রকৃত রসিক—যেহেতু ঐ শুক্‌নো জিনিসের ভিতর থেকে রস টেনে বের করেছেন।" প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বাড়ী নেই সীতা?" সীতা বলিল, "হ্যাঁ, তাঁর বসবার ঘরে আছেন।" তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা একটু বসুন্। বাবাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একটু বাদে আসছি।" খানিক বাদে ভৃত্যের হাতে ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এবং জলখাবার সাজাইয়া সীতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাঁহারা তিনজন গল্পে মত্ত। জলখাবারের পরিমাণ দেখিয়া শঙ্কর বলিল, "আমার ত বিকেলে এত খাওয়া অভ্যাস নেই।" স্নিগ্ধকণ্ঠে সীতা বলিল, "বেশী কিছু দিই নি। এটুকুও না খেলে খুব দুঃখিত হব।" অনেকক্ষণ গল্প করিয়া সীতার সুমিষ্ট গান শুনিয়া শঙ্কর বিদায় লইতে উদ্যত হইলে সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব সুখী হোলাম বাবা, আবার এসো।" স্নিগ্ধহাস্যে সীতা বলিল, "আপনার পণ যখন একবার ভঙ্গ হোয়েছে তখন আবার আসতে আপনার বোধ হয় আর কোন আপত্তি হবে না।"

(৭)

শঙ্করের আসার পর হইতে সীতার ভাবান্তর প্রশান্তর স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টিতে এড়াইল না। তার মত চাপা মেয়ের নিকট হইতে মুখ ফুটিয়া কিছু জানা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তার মুখের ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া তার মনের কথা বুঝিতে প্রশান্ত অতি শৈশব হইতেই শিখিয়াছিল। প্রশান্তর মুখে শঙ্করের চরিত্রের বিশেষত্বের কথা শুনিয়া, না দেখিয়াও সীতা মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা করিত। এখন তার সুঠাম সৌম্যকান্তি, কথা বলার সতেজ ভঙ্গী সেই শ্রদ্ধাকে আরো গভীরতর কিছুতে পরিণত করিয়াছে। মনের নিভৃত কন্দরে যে আশা প্রশান্ত এতদিন সঙ্গোপনে পোষণ করিয়াছে, তাহাই সফল হইবার সূচনা দেখিয়া সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল। পিতার নিকট একথা উত্থাপন করার পূর্ব্বে শঙ্করের মতটা একবার জানা আবশ্যক। শঙ্কর একখানা ম্যাগাজিন্ হাতে বারান্দায় ইজি-চেয়ারের উপর শুইয়াছিল। এমন সময় প্রশান্ত গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া তার পাশে বসিল। মুখ তুলিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা

করিল, "আজ না তোর কোন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা ছিল?" "না, আজ আর যাওয়া হোল না।" কথা বলিবার পূর্ব্বে ভূমিকা করা প্রশান্তের ধাতে ছিল না। সে সোজাসুজি বলিল, "তোকে একটা কথা আজ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি শঙ্কর।" বন্ধুর সপ্রশ্ন নেত্রের দিকে চাহিয়া সে বলিতে লাগিল, "বন্ধুত্বের বাঁধনে তোকে যদি আজীবন ধরে রাখতে না পারি তাই সুদৃঢ় আত্মীয়তার শৃঙ্খলে তোকে বাঁধতে চাই। তোর কি তাতে কোন আপত্তি আছে?" এ যে কোন প্রস্তাবের সূচনা শঙ্করের তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। এই জাতীয় কয়েকটা কথা দিনকতক যাবৎ তার মনে বড় বেশী তোলাপাড়া করিতেছিল। সেদিনের পর শঙ্কর আরো দিন দুই তিন প্রশান্তদের বাড়ীতে গিয়াছিল। সীতাকে দেখা পর্য্যন্ত তার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। যে মন তার জীবনে বিজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছু ভালবাসে নাই, কঠোর ব্রতাবলম্বীর ন্যায় যার শুধু উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই লক্ষ্য ছিল—তার মনে এ কি চাঞ্চল্য! বুদ্ধিতে উজ্জ্বল সীতার অপরূপ শ্রী, ধীর স্থির ভঙ্গী তাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তার নিঃসঙ্গ জীবনে সাথী হইতে এমনই একটী মেয়ে যদি সে পাইত তবে ইহার সহায়তায় তার জীবনের ব্রত হয়ত সার্থক হইয়া উঠিত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইয়াছে একি অসম্ভব পাগ্‌লামি! অভিজাত-বংশীয়া, লক্ষপতি জমিদারের আদরের দুহিতাকে পাইবার মত যোগ্যতা তার কোথায়? মনের এই বিক্ষোভে সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। অশান্ত চিত্তকে সংযত করিতে কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য বিদেশে যাইবার সে যোগাড় করিতেছিল। প্রশান্তের কথায় সে হঠাৎ ভয়ানক চম্‌কিয়া উঠিল? তার মনের ইচ্ছা কি তবে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে? প্রশান্ত কি তাই পরিহাস করিতেছে নাকি? না হইলে এমন প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াও কি সম্ভব। বিবর্ণমুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?" স্মিতহাস্যে প্রশান্ত বলিল, "সীতাকে তোর হাতে সঁপে দিয়ে চিরদিনের জন্য তোকে বেঁধে ফেল্‌তে চাই।" প্রত্যুত্তরে শঙ্করকে নীরব দেখিয়া সে আবার বলিল, "ছেলেবেলা থেকে পরস্পরকে অবলম্বন করে আমরা বড় হোয়ে উঠেছি। সীতার মনের প্রতিটী অলি-গলির খবর আমার জানা। তাকে নিয়ে তুই অসুখী হবি নে শঙ্কর।" নিজেকে সাম্‌লাইয়া শঙ্কর বলিল, "সে ভাবনা আমি করিনি প্রশান্ত। সীতাকে যে পাবে সে ভাগ্যবান। তাকে পাবার যোগ্যতা কি আমার আছে?" দীপ্তমুখে প্রশান্ত বলিল, "এক কাঁড়ি টাকা থাকাই কি যোগ্যতার যথার্থ পরিচয়? তোর মত স্বামী পাওয়া সীতার ভাগ্য।" "সীতা কি আমাকে তার উপযুক্ত মনে করতে পারবে?" ঈষৎ হাসিয়া প্রশান্ত উত্তর দিল, "সীতা মানুষ চিন্‌তে জানে।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া শঙ্কর বলিল, "আমার মনে হয় এ ইচ্ছা তোর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জানিস্ ত আমার স্বভাবের সঙ্গে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই মেলে না। ভয় হয়, আমাকে নিয়ে শেষে হয় ত তোরা অসুখী হবি।" প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সে চিন্তা তোকে করতে হবে না।"

সকালে পিতার বসিবার কক্ষে ঢুকিয়া প্রশান্ত দেখিল তিনি কাগজপত্র দেখিতেছেন। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখন ব্যস্ত বাবা?" কাগজগুলি পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া পিতা বলিলেন, "না, তেমন কিছু না। তোমার কি কিছু বলবার আছে?" একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া, পিতার সপ্রশ্ন নেত্রের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি বাবা, সীতার কি এখন বিয়ে দেবে?" সাগ্রহে সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই, উপযুক্ত পাত্র পেলেই দেব। তোমার বিলেত যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে—এর ভিতরেই ওর বিয়ে দেবার আমার ইচ্ছা। তোমার সন্ধানে কি তেমন কোন পাত্র আছে?" সোৎসুকে প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ। তুমি শঙ্করকে জান। ও সর্ব্বাংশে সীতার উপযুক্ত।" গম্ভীরমুখে সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ প্রশান্ত। তা হয় না!" আভিজাত্যাভিমানী পিতার দিক্ হইতে যে আপত্তির সুর উঠিবে প্রশান্ত তাহা জানিত—সেজন্য সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "কত বড় বনেদী বংশ আমাদের তা তুমি জান। এ রকম অসমান ঘরে কাজ করলে আমার মাথা হেঁট হবে।" দীপ্তমুখে প্রশান্ত বলিল, "শঙ্করের একমাত্র খুঁত সে গরীব। নইলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, স্বভাব চরিত্রে, বংশ হিসেবে এরকম অতুলনীয় ছেলে আমাদের জানাশোনা বনেদী ঘরের মধ্যে কয়টা পাওয়া যায় বলত বাবা?" পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে আবার

বলিতে লাগিল, "সীতা শঙ্করকে অত্যন্ত পছন্দ করে—তার প্রমাণও আমি পেয়েছি। তার মতটাও অবহেলা করা চলবে না বাবা।" শঙ্কর ছেলেটীকে সত্যপ্রিয়বাবু নিজেও খুব পছন্দ করিতেন। ঐরূপ তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ছেলে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু গণ্ডগোলই ত হইয়াছে এই বংশ-মর্য্যাদা লইয়া। আভিজাত্যগর্ব্ব যে তাঁর রক্তের অণু-পরমাণুর সহিত মিশানো, পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ্। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রশান্ত আবার বলিল, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্র শঙ্কর। এক নামে ওকে সকলে চেনে। ওকে জামাই বলে পরিচয় দিতে আমাদের ত হীনতা বোধ করবার কোন হেতু নেই বাবা।" সব কিছু বুঝিয়াও পিতা সর্ব্বান্তঃকরণে মত দিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভাল করে ভেবে তোমাকে সব জানাব।" তিনি মনকে যথেষ্ট বুঝাইলেন—কন্যা যদি সত্যই শঙ্করকে পাইয়া সুখী হইতে চায় তবে কি তিনি আভিজাত্য-গর্ব্বের মোহে সে পথে অন্তরায় হইবেন? অনেক চিন্তার পর প্রশান্তকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাক্‌লেও অবশেষে তোমাদের মতেই আমি মত দিলাম। কিন্তু এক সর্ত্ত।" পুত্রের জিজ্ঞাসু নেত্রের দিকে চাহিয়া তিনি আবার বলিলেন, "বিলেত পাঠিয়ে তাকে মনের মত করে আমি গড়ে আনতে চাই। সে যদি এতে রাজী থাকে তবেই সীতাকে তার হাতে দেব।" সাগ্রহে প্রশান্ত বলিল, "এতে তার আপত্তি হবার কোন কারণ নেই।" "বেশ, বিয়ের পর তোমরা দুজন একসঙ্গে বিলাত রওনা হবে।" এ সর্ত্তের কথা শঙ্করকে জানানো প্রশান্ত একেবারেই আবশ্যক বোধ করিল না। এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পর পিতৃস্থানীয় শ্বশুরের অর্থে বিলাত যাইতে তার আপত্তির ত কোন হেতুই নাই। তখন ত এই অর্থের উপর তার যথার্থ দাবী জন্মিবে।

(৮)

বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিবাহে শঙ্করের একমাত্র আপত্তির হেতুই ছিল, তার নিঃসম্বল অবস্থা। বিবাহের পর পত্নীকে পিতৃগৃহে রাখিলে তার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিবে। কিন্তু এখন আর অমতের কোনই কারণ নাই। ইতিমধ্যে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। তার সাফল্যে আনন্দিত হইয়া প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নিজে যাচিয়া তাকে তিনশত টাকা মাহিনার একটা পোষ্ট্ দিতে চাহিয়াছেন এবং ভরসা দিয়াছেন যে অতি সত্বরই তাকে আরো উঁচু গ্রেডে তুলিয়া দিবেন। সাগ্রহে শঙ্কর চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

মহাসমারোহে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল। ঘনিষ্ঠভাবে শঙ্করের নম্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া সত্যপ্রিয়বাবু ক্রমেই তার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। জামাতাকে তিনি তাঁর কাছে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু সবিনয়ে শঙ্কর তাহা কাটাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া থাকে। আর দুই মাস বাদে সে কাজে যোগ দিবে তখন একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সীতাকে লইয়া যাইবে।

বিলাত যাত্রার দিন আসিয়া গিয়াছে। জামাতার সহিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সত্যপ্রিয়বাবু তাঁর বসিবার কক্ষে শঙ্কর এবং প্রশান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে শঙ্করের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "রওনা হবার দিন ত এসে গেল বাবা।" বিস্মিতকণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "কোথায় যাবার কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না ত।" সাশ্চর্য্যে শ্বশুর বলিলেন, "কেন তুমি জান না? বিয়ের আগেই ত স্থির হোয়েছে যে বিয়ের পর তোমরা দুই বন্ধু একত্রে বিলাত রওনা হবে।" মহা বিস্ময়ে শঙ্কর উত্তর দিল, "আমি ত এ কথার বাষ্পও জানতাম না!" সপ্রশ্ন নেত্রে পিতা পুত্রের দিকে চাহিতে প্রশান্ত বলিল, "তোর যেতে কোন আপত্তি হবে না জেনেই এ কথা তোকে জানানো আমি আবশ্যক মনে করিনি শঙ্কর।" সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "তবে আমার কাছেই শোন। প্রশান্তের ল লেক্‌চারগুলি কম্‌প্লীট্ হোয়েছে। ও সেখানে যেয়ে বারে জয়েন্ করবে, তুমিও তোমার পড়াশোনা শেষ করে আসবে—এই আমার ইচ্ছা। জানই ত বিলিতি একটা ছাপ্ থাকলে প্র্যাক্‌টীসের বাজারে আদর অনেক বেড়ে যায়।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া মুখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, "আমার ত যাওয়া হবে না।" "সে কি কথা বাবা?" "আমি পণথ করেছিলাম যে জীবনে কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্য নেব না। প্রশান্ত একথা জানে।" উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "তা আমি

জানি। কিন্তু এখন যে সম্পর্কে আমরা আবদ্ধ হোয়েছি তাতেও কি তোর সে শপথ আমাদের পক্ষে অটুট থাকে? বাবা এখন তোর পিতৃস্থানীয়, তাঁর অর্থে তোর অধিকার আছে।" পুত্রকে সমর্থন করিয়া পিতা বলিলেন, "নিশ্চয়ই। পিতার সাহায্য নিতে শপথভঙ্গেরও কোন কারণ নেই শঙ্কর।" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "আর আমাকে অনুরোধ করবেন না। এ অনুরোধ রক্ষা করলে আমার জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।" ধীরে ধীরে সত্যপ্রিয়বাবুর ললাটের রেখা কুঞ্চিত হইল। আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁর মতের প্রতিকূলতা করিতে সাহস করে নাই। চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজী হওয়া কি তা হোলে তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব?" "নইলে অযথা আপনার মনে কষ্ট দিতাম না।" ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া আসিয়া সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "জান শঙ্কর, কি সর্ত্তে তোমার হাতে আমার মেয়েকে দিতে রাজী হোয়েছিলাম—যে তোমাকে বিলেত ঘুরে আমার মনের মত হোয়ে আসতে হবে।" শান্ত কঠিন স্বরে শঙ্কর বলিল, "আমি এ সর্ত্তের কথা জানতাম না। আগে জানলে এ বিয়েতে আমি সম্মত হোতাম না, এ অনর্থক গণ্ডগোলেরও সৃষ্টি হোত না।" শঙ্করের জেদী-স্বভাবের সহিত প্রশান্তের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। ব্যগ্র হইয়া সে বলিল, "আমি মিনতি করছি শঙ্কর, সীতার মুখ চেয়ে তুই রাজী হ। তোর জীবনের সঙ্গে তার শুভাশুভ জড়িত।" শ্বশুরের দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, "আপনাকে কথা দিচ্ছি বিলাত ঘুরে আপনার মনের মতই হোয়ে আসব। কিন্তু বছর তিনেক অপেক্ষা করুন্, এর ভিতরে আমি সঙ্গতি গুছিয়ে নি।" ক্রোধে সত্যপ্রিয়বাবুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, অধর দংশন করিয়া তিনি বলিলেন, "তার মানে আমার পয়সাতে তুমি কিছুতেই যাবে না?" শঙ্কর মৌন হইয়া রহিল। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে জামাতার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "শোন শঙ্কর, আমার যে কথা সেই কাজ। তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি আমার মতে চল ভাল, নয়ত আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই।" ব্যাপার যে এতদূর গড়াইবে প্রশান্ত তাহা কল্পনা করে নাই। সে পিতার কথার মাঝখানে বাধা দিতে উদ্যত হইলে, রুক্ষ-কণ্ঠে সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "থাম। তোমার মত চঞ্চলমতি ছেলের কথা শোনার যোগ্য প্রতিফলই আমি পেয়েছি। আর তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া সংযতকণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "আমার অবস্থা আপনি যখন কিছুতেই বুঝতে পারবেন না তখন তা নিয়ে বাক্যব্যয় বৃথা। ভাল তাই হবে, আজ এই মুহূর্ত্তেই আপনার বাড়ী ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি; কিন্তু সীতাকে আমি সঙ্গে নিতে চাই।" ভ্রূভঙ্গী করিয়া সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "তাকে নিয়ে যেয়ে খাওয়াবে কি শুনি?" "সেজন্য চিন্তা নেই। সম্প্রতি একটা তিনশো টাকা মাইনের চাকরী আমি পেয়েছি; এর পর আরো উন্নতির আশা আছে।" ব্যঙ্গভরা হাসি হাসিয়া সত্যপ্রিয়বাবু বলিলেন, "ও টাকাতে ত সীতার হাত-খরচই কুলাবে না। জান, তার মুখ থেকে একটা কথা খসতে না খসতে পাঁচটা দাস-দাসী তা তামিল করতে ছুটে আসে। পারবে সে ভাবে তাকে রাখ্‌তে?" "ও ভাবে চলা এখন আর তার চলবে না। তার স্বামীর অবস্থার সঙ্গে এখন তাকে মানিয়ে নিতে হবে।" তীব্রস্বরে সত্যপ্রিয়-বাবু বলিলেন, "অসম্ভব, কিছুতেই সে তোমার সঙ্গে যাবে না।" "স্বেচ্ছায় না গেলে আমি তাকে জোর করব না।" প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে বসিয়া সীতা কয়েকখানা দরকারী চিঠি লিখিতেছিল। এমন সময়ে শঙ্কর ঘরে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। স্বামীর সাড়া পাইয়া সীতা উঠিয়া দাঁড়াইল। কাছে আসিয়া শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার কি হোয়েছে?" গম্ভীর মুখে শঙ্কর বলিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে, স্থির হোয়ে শোন সীতা।" শঙ্করের মত সংযত লোকের এইরূপ বিচলিত ভাব দেখিয়া সীতা শঙ্কিত হইল। চেয়ারটা টানিয়া বলিল, "বোস, তোমাকে বড় বেশী খারাপ দেখাচ্ছে।" চেয়ারে বসিয়া শঙ্কর বলিল, "জান সীতা, তোমার বাবা আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন?" সীতা মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না।" "তিনি আমাকে বিলেত পাঠাতে চান্। আমাকে বিলেত যেয়ে তাঁর মনের মত হোয়ে আসতে হবে—এই সর্ত্তেই নাকি আমার হাতে

তোমাকে দিয়েছিলেন। আমি এ কথা জানতাম না, জানলে আজ এ অনর্থের সৃষ্টি হোত না।" একটা গুরুতর ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, সীতা তাহা বুঝিয়াছিল। সে নিস্পন্দ হৃদয়ে চাহিয়া রহিল। শঙ্কর বলিতে লাগিল, "আমি তাঁকে জানিয়ে এসেছি আমি যেতে পারব না। আমার জীবনের সঙ্কল্প ছিল মানুষ হবার পথে আপন পর কারুর কোন সাহায্যই আমি নেব না—অতি ছোট বয়সে বড় ব্যথা পেয়েই এ শপথ আমি করেছিলাম। এ শপথ ভঙ্গ করলে আমার জীবন উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হবে।" সীতার নিষ্পলক মুখের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল, "আপন বলতে, মুখের একটা কথা দিয়ে উৎসাহ পর্য্যন্ত দিতে আমার যেদিন কেউ ছিল না সেদিন এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করেই আমার পথ আমি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। আজ সেই উদ্দেশ্যকেই যদি আমাকে হারিয়ে ফেলতে হয় তবে জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে।" অধর দংশন করিয়া সে বলিল, "তোমার বাবা এসব কথা বুঝতে চান্ না। তিনি বলেছেন, তাঁর মত অনুসারে না চললে আজ থেকে তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। আমিও বলে এসেছি তাই হবে।" ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সীতার পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তোমারও কি এই মত সীতা? তুমিও কি চাও তোমার স্বামীকে লক্ষ্যহারা করতে?" কম্পিত-কণ্ঠে সীতা বলিল, "না না, আমি তা চাই না। যা তুমি সত্য বলে জেনেছ তা থেকে তুমি বিচ্যুত হোয়ো না।" তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, সীতার একখানা হাত সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কর বলিল, "তবে আমার সঙ্গে এই মুহূর্ত্তে, এক বস্ত্রে, এ বাড়ী ছেড়ে তুমি চলে এসো সীতা। গরীব জেনেই আমার গলায় তুমি মালা দিয়েছিলে, আজ স্বামীর সুখদুঃখের সমান ভাগ নেবার জন্য প্রস্তুত হও। চল, ছোট্ট সংসার পেতে আমাদের নূতন জীবনযাত্রা সুরু করিগে। তোমার সহায়তা পেলে আমার জীবন সার্থক হোয়ে উঠবে।" এই আকস্মিক ব্যাপারে সীতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। স্বামীর আহ্বানে সে সহসা সাড়া দিতে পারিল না। একদিকে স্নেহশীল পিতা, বড় আদরের ভাই—অপরদিকে নারীজীবনের পরমারাধ্য তার সর্ব্বস্ব স্বামী। সীতার নির্ব্বাক মুখের দিকে চাহিয়া শঙ্কর তার হাত ছাড়িয়া দিল। ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি গরীবের ঘরের অস্বচ্ছলতা তুমি বরণ করে নিতে পারবে না। তুমিও ত অভিজাত বংশেরই মেয়ে, তোমার কাছ থেকে অপর কিছু আশা করা আমার মূর্খতা হোয়েছে। ভাল, তাই হোক্। অসম্ভব প্রাচুর্য্য, অপর্য্যাপ্ত বিলাসিতা নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমি চললাম।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্কর দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া বিবর্ণ মুখে সীতা বলিয়া উঠিল, "আমাকে এক মুহূর্ত্ত ভাববার সময় দাও।" যে পিতা সংসারের সব কিছু ঝঞ্ঝা হইতে আড়াল করিয়া, অসীম স্নেহে মানুষ করিয়াছেন তাঁর মায়া একমুহূর্ত্তে কাটানো যে কতখানি কষ্টকর ঝোঁকের মাথায় শঙ্কর তাহা বুঝিল না। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে সে বলিল, "এতে ভাববার কিছুই নেই। আজন্ম ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হোয়ে আমার সঙ্গে আসার কষ্ট তুমি সইতে পারবে না। মূর্ত্তিমান্ ধূমকেতুর মত তোমাদের সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে এসে পড়ে আমি একটা অশান্তির ঝড় বইয়ে গেলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে ভুলে যাও।" বাধা দিবার পূর্ব্বেই শঙ্কর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কি যে হঠাৎ ঘটিয়া গেল, সীতা সহসা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সত্যই কি শঙ্কর তাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে! ত্বরিতপদে সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল—শঙ্কর নাই। ঘরে ফিরিয়া গিয়া মর্ম্মভেদী কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "ওগো, এমন করে আমাকে ভুল বুঝে তুমি চলে গেলে কেন? আমাকে কি তুমি কিছুতেই চিনতে পারলে না?" পরক্ষণেই অসহ্য দুঃখে চেতনা হারাইয়া যেখানে শঙ্কর দাঁড়াইয়াছিল সেই মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রশান্ত কলিকাতার সর্ব্বত্র খুঁজিল। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বলিলেন, শঙ্করের একটা কাজ নেওয়া স্থির হইয়া গিয়াছিল কিন্তু গতকাল দুপুরে সে জানাইয়া গিয়াছে ঐ কাজ নেওয়া তার হইবে না। হতাশমনে সে বাড়ী ফিরিল। মৌন কঠিন মুখে সত্যপ্রিয়বাবু সব শুনিলেন। শঙ্করের বজ্রাপেক্ষা নির্ম্মম চরিত্রের অন্তরালে একটা সুমহান স্নেহ-প্রবণ প্রাণ লুক্কায়িত ছিল। প্রশান্ত আশা করিয়াছিল সীতাকে ব্যথা দিয়া অধিক দিন সে থাকিতে পারিবে না, নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে আসিল না।

এদিকে প্রশান্তের বিলাত যাত্রার দিন আসিয়া

গিয়াছে। আর অপেক্ষা করা চলে না। যাত্রার পূর্ব্বদিন সীতাকে কাছে ডাকিয়া সে বলিল, "তোকে এ অবস্থায় রেখে কি মন নিয়ে যে আমি যাচ্ছি, সে শুধু আমিই জানি।" অসহ্য দুঃখেও যে মুখ ফুটিয়া কিছু জানাইত না, সেই সীতার অশ্রুর বাঁধ আজ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভগ্নস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি আর ফিরে আসবেন না দাদা?" দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া প্রশান্ত বলিল, "কি করে বল্‌ব বল? সে যে বড় বেশী অভিমানী। তুই যদি সেদিন তার সঙ্গে চলে যেতিস সীতা।" "তিনি যে আমাকে একমুহূর্ত্তও ভাববার সময় দিলেন না।" চোখের জল মুছিয়া সে আবার বলিল, "তুমিও চলে যাচ্ছ। আমি কি করে যে থাকব?" নিষ্ফল অভিমানে প্রশান্তের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। বড় সাধ করিয়া সে সীতাকে শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। অবশেষে সেই কি তার প্রাণাধিক প্রিয় ছোট বোনটীর চরম দুর্দ্দশার কারণ হইল? সীতার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "এ কয়টা বছর ধৈর্য্য ধরে থাক ভাই। যদি এর ভিতরেও সে ফিরে না আসে, তোকে কথা দিয়ে যাচ্ছি সীতা, পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যদি আমাকে যেতে হয় তবু সে হতভাগাকে যেখান থেকে হোক্ খুঁজে বের্ করে আবার তোর হাতে সঁপে দেব।"

(৯)

দীর্ঘ চারি বৎসর প্রবাস যাপনের পর প্রশান্ত আজ ফিরিবে। সীতার সদা-ম্লান মুখে আবার যেন একটু আনন্দের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহা উৎসাহে ঘর-বাড়ী ঝাড়িয়া মুছিয়া, দাদার ঘরখানি মনের মত করিয়া সে সাজাইয়াছে—দাদাত এখন যে সে ব্যক্তি নয়, সদ্য বিলাতপ্রত্যাগত ব্যারিষ্টার সাহেব। কিন্তু অধিক উত্তেজনা সীতার দুর্ব্বল শরীরে সহিল না। যেদিন প্রশান্ত আসিবে সেদিন সে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। অগত্যা সত্যপ্রিয়-বাবু একাই ষ্টেসনে গেলেন। ট্রেণ আসিয়া পড়িল। সাগ্রহে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইতেই প্ল্যাটফরমে দণ্ডায়মান পিতার স্নেহব্যাকুল মুখখানি প্রশান্ত দেখিতে পাইল কিন্তু তাঁর পাশে আরএকখানি স্নিগ্ধ মুখ কোথায়? অথচ সীতা শেষ চিঠিতেও লিখিয়াছে যে সে নিশ্চয়ই দাদাকে নিতে ষ্টেশনে আসিবে। আজ পর্য্যন্ত শঙ্করের কোন সন্ধান নাই, দিনের পর দিন সীতার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—তবে কি? প্রশান্তর বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ট্রেণ থামিবামাত্র একলাফে নামিয়া পড়িয়া বিবর্ণমুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, সীতা?" "তার শরীরটা একটু অসুস্থ হোয়ে পড়েছে, তাই সে ষ্টেশনে আসতে পারেনি বাবা।" প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন হইল। বাড়ীর কাছে আসিয়া গাড়ী যখন থামিল, তাঁরা দেখিলেন সীতা দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। উৎকণ্ঠিত মুখে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নেমে এলে কেন মা? তোমাকে না ডাক্তারবাবু একেবারে শুয়ে থাকতে বলেছেন?" স্মিতমুখে সীতা বলিল, "এতদিন বাদে দাদা আসছে, আমি কেমন করে শুয়ে থাকি?" স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে প্রশান্ত এতক্ষণ সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে-ছিল। এই কয় বৎসরে সীতার একি চেহারা হইয়াছে! এ যে একেবারে চেনা যায় না। উদ্যত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "এখন একটু ভাল লাগ্‌ছে ত সীতা? চল্ উপরে যাই।"

প্রশান্তর আশ্বাস অনুসারে এই কয় বৎসর যেন সীতা কোন গতিকে ধৈর্য্য ধরিয়াছিল। আর সে পারিল না, ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া মতপ্রকাশ করিলেন—হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অবিলম্বে বায়ু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সীতার পীড়ার হেতু প্রশান্তের অজানা ছিল না। পিতাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "শঙ্করের কোথায় কোথায় খোঁজ করেছ বাবা?" বিকৃত-মুখে পিতা বলিলেন, "সে রাস্কেলের কথা আমার কাছে আর তুল না প্রশান্ত। তার নাম শুনলেও আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে যায়।" তীব্র দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "সে রাস্কেলের হাতে কোন গতিকে মেয়েকে যখন একবার দিয়েই দেওয়া হোয়েছে তখন এক আধবার নাম না করলে চলবে কেন? তোমার আভিজাত্য জ্ঞানটা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেয়ে মেয়েটার দিকে একবার মুখ তুলে তাকাও বাবা। বাংলা দেশে, বাংলার বাহিরে—কত স্থানে প্রশান্ত সন্ধান করাইল—সবই বৃথা। পূজা আসিয়া গিয়াছে। দেওঘর যাওয়া স্থির হইল। বাহিরে যাইবার নামে সীতার অবসাদগ্রস্ত মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—কলিকাতার হাওয়া যেন তার কাছে বিষাইয়া উঠিয়াছে।

দেওঘরে আসিয়া পূজার দিনকতক সীতা মন্দির দেখিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। দেখিয়া শুনিয়া পিতা আনন্দিত হইলেন। আশা হইল, এখানকার জল-বাতাসের গুণে কন্যার শরীর হয় ত সারিবে। কিন্তু দিনকতক বাদেই সীতা আবার একটু অসুস্থ হইয়া পড়িল, সহসা সেই সামান্য অসুস্থতা বেশ একটু শক্ত গতি লইল। অজানা স্থান, এদিকে সীতার এমন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে যে তাকে নাড়াচাড়া করাও বিপজ্জনক। চিন্তিতমুখে সত্যপ্রিয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কল্‌কাতা থেকেই কি একজন ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা করব প্রশান্ত?" উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "আমি একবার ঘুরে দেখি ভাল ডাক্তার পাই কিনা, নইলে সেই বন্দোবস্তই করতে হবে।" সীতা প্রশান্তকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "মিছে ব্যস্ত হোয়ো না দাদা। তুমি ত জান, ডাক্তার আমার এ ব্যারামের কিছুই করতে পারবে না।" ক্ষণেক মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কাজ যদি করতে পারতে দাদা, তবে বড় তৃপ্তি পেতাম। আমার কেবলই মনে হোচ্ছে এই শোওয়াই হয়ত আমার শেষ শোওয়া। এসময় যদি একবার তাঁকে দেখতে পেতাম।" দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া প্রশান্ত বাহির হইয়া গেল। অচেনা স্থান, কোথায় ভাল ডাক্তারের সন্ধান মিলিবে জানা নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে প্রশান্ত অনেক দূরে যাইয়া পড়িল। হঠাৎ তার নজর পড়িল ডান্‌হাতি একটী ঝর্‌ঝরে সুন্দর ছোট বাংলোর উপর। কাছে গিয়া সে দেখিল শ্বেত-প্রস্তর-ফলকে উজ্জ্বল কালির অক্ষরে লেখা আছে 'ডাক্তার শঙ্কর বোস্।' একি? এই তার কাঙ্ক্ষিত ধন নয় ত? তাও কি সম্ভব? এত প্রসিদ্ধ স্থান থাকিতে দেওঘরে প্র্যাকটীশ্ করিবার তার কোন হেতুই নাই। তবু দেখা যাক। গেট্ দিয়া ভিতরে ঢুকিতেই বারান্দায় উপবিষ্ট ভৃত্য জানাইল ডাক্তারবাবু স্নান করিতে গিয়াছেন। প্রশান্ত বলিল, "আমি এখানে একটু ঘুরছি। তাঁর স্নান হোলে খবর দিও।" খানিক বাদে ভৃত্যের পশ্চাতে প্রশান্ত যখন ডাক্তারবাবুর বসিবার কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি মাথা নীচু করিয়া কি লিখিতেছিলেন। পদশব্দ শুনিয়া চোখ তুলিতেই কণ্ঠ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইল, "প্রশান্ত!" দ্রুতপদে নিকটে গিয়া শঙ্করের একখানা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া প্রশান্ত ডাকিল, "শঙ্কর, তুই এখানে!" এতদিন অদর্শনের পর বন্ধুকে দেখিয়া শঙ্করের মন চঞ্চল হইল, সীতার সংবাদ জানিবার জন্য তার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। নিজেকে সংযত করিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন এখানে এসেছিস্? সব ভাল?" সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া প্রশান্ত বলিল, "বিলেত থেকে ফিরে পর্য্যন্ত কত জায়গায় তোর খোঁজ করিয়েছি। আর তুই এখানে লুকিয়ে আছিস্?" শান্তকণ্ঠে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এত খোঁজ করার হেতু?" বন্ধুর নিরুদ্বেগ কণ্ঠস্বরে প্রশান্তের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে উত্তর দিল, "সীতার মুখ চেয়ে।" একটা ক্ষীণ হাসির আভাস পলকের জন্য শঙ্করের মুখে ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। ধীর কণ্ঠে সে বলিল, "তুইও তাহোলে তাকে ভুল বুঝেছিস্ প্রশান্ত। ভোগ-বিলাসই সে ভালবাসে। আমাকে সে চায় না। তাই যদি সে চাইত তবে সেদিন অমন ভাবে বিমুখ করে আমার জীবনটা ব্যর্থতায় ভরিয়ে দিতে পারত না। এই কয়বৎসরে কতটুকু উন্নতি আমি করতে পেরেছি? ছন্নছাড়ার মত এদিক্ সেদিক্ ঘুরে এই কিছুদিন হোল এখানে এসে বসেছি। অথচ তাকে পাশে পেলে আমি কি না করতে পারতাম?" শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসিয়া প্রশান্ত বলিল, "তুই একটা মূর্খ, তাই তার মত মেয়েকে চিন্‌তে পারিসনি!" শঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া সে বলিতে লাগিল, "কি পরীক্ষার মধ্যেই তাকে তুই ফেলেছিলি। আজন্মের স্নেহের নীড়ের মায়া কাটানো কি এক কথায় পারা যায়? দোটানার মধ্যে পড়ে যখন সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না, তখন এক মুহূর্ত্ত ভাববার সময় না দিয়ে তুই চলে গেলি।" শঙ্করের নির্ব্বাক মুখের দিকে চাহিয়া সে আবার বলিল, "তুই চলে যাবার পর থেকে হাসি আনন্দ তার কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়েছে। আমি ফিরে আসার পর থেকেই সে শয্যাশায়ী। এখন সম্প্রতি এত বেশী বাড়াবাড়িতে দাঁড়িয়েছে যে তাকে আর সারিয়ে তুল্‌তে পারব এমন ভরসা নেই।" আত্মগ্লানিতে শঙ্করের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, "আমি ত কিছুই জানতাম না।" সবিষাদে প্রশান্ত বলিল, "জানবার ইচ্ছাই যদি তোর থাকত তবে কি আজ তাকে এ দশায় এসে দাঁড়াতে হয়। তুই পাষাণের চাইতেও নির্ম্মম। তোর প্রচণ্ড অভিমানের আঘাতে, ফুলের থেকেও কোমল

সীতা অকালে শুকিয়ে যেতে বসেছে।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্কর বলিল, "আর অমন করে বলিস্ না প্রশান্ত। এখনো কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় আছে।" আবশ্যকীয় কয়েকটা ওষুধ একটা ছোট সুট্‌কেশে গুছাইয়া লইয়া শঙ্কর প্রশান্তের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ী পৌছিয়া প্রশান্ত বলিল, "পাশের বারান্দা দিয়ে সোজা চলে যা, সাম্‌নেই সীতার ঘর।" ওদিকের ঘর হইতে সত্যপ্রিয়বাবুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ডাক্তার পেলে বাবা?" তাঁর ঘরে ঢুকিয়া স্মিতকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "পেয়েছি বাবা। যাকে নিয়ে এসেছি তার মুখ দেখলে সীতা আপনিই সুস্থ হবে।"

ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া শঙ্কর দেখিল সীতা দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়া আছে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া খাটের ধারে গিয়া সে দাঁড়াইল। সীতার চোখ মুদিত। তার চেহারা দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেল। একি সেই সীতা, যার উজ্জ্বল রূপ তার সমাহিত চিত্তে চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল! এ যেন তার ছায়া। সংশয়ের নির্ম্মমতায় তাপিত হইয়া একগাছা বাসি ফুলের মালার মত সে শয্যার সহিত মিশিয়া আছে। অতর্কিতে তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। এই অসামান্য রূপ-লাবণ্যময়ী তরুণীর অকালে এই দশা করিবার জন্য দায়ী কে? নিশ্বাসের শব্দে সীতার হাল্কা তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "কই তিনি ত এলেন না। আমার সঙ্গে শেষ দেখা আর হোল না।" শঙ্কর আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি এসেছি সীতা।" সীতা চোখ মেলিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিল। বিস্ময়ের প্রথম বেগ কাটিয়া গেলে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "এ কি তুমি এসেছ? আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না ত? এ যে অসহ্য আনন্দ!" সীতার পাশে বসিয়া পড়িয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বলিল, "না সীতা, স্বপ্ন নয়; সম্পূর্ণ সত্য।" সীতার মুখে তৃপ্তির হাসি ভাসিয়া উঠিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার অপরাধ তাহোলে ক্ষমা করেছ?" সীতার শীর্ণ হাতখানি নিজের সবল হাতে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "অপরাধ ত তোমার কিছু হয়নি সীতা। নিদারুণ অভিমানের মোহে তোমাকে ভুল বুঝে আমিই ঘোর অন্যায় করে ফেলেছি; তার ফলে আজ তোমার এই দশা, আমাকেও কম শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। বল সীতা, আমাকে মার্জ্জনা করতে পারবে?" বাধা দিয়া সীতা বলিল, "না, না, ও কথা বোল না। তোমার মনে ব্যথা দিয়ে আমি মহা দোষ করেছি। সেদিন বুঝতে পারিনি নারীজীবনে স্বামী কি অমূল্য সম্পদ্। তার কাছে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভায়ের প্রতি প্রীতি সব কিছু তলিয়ে যায়। সেই শিক্ষাই আজ দীর্ঘ চার বৎসর ধরে, তিলে তিলে পেয়ে, আমি আজ এই অবস্থায় উপস্থিত হোয়েছি। এখনো কি তোমার দয়া হোচ্ছে না? এখনো কি তুমি রাগ্ করে আছ?" অধর দংশন করিয়া শঙ্কর বলিল, "ওকথা বলে আমার পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না সীতা।" সীতা সেকথা শুনিতে পাইল কিনা বোঝা গেল না। একটানা কথা বলার ক্লান্তিতে সে তখন চোখ বুজিয়াছিল। খানিক বাদে চোখ মেলিয়া সে বলিল, "আর এম্‌নি করে আমাকে ফেলে যাবে না ত?" "ভুল করার যথেষ্ট প্রতিফল পেয়েছি। জীবনে আর ভুল হবে না।" ধীরে ধীরে সীতা বলিল, "জীবনের উপর আমার অশ্রদ্ধা হোয়ে গিয়েছিল। তোমাকে ফিরে পেয়ে আজ আবার আমার বাঁচতে সাধ হোচ্ছে।" স্নিগ্ধকণ্ঠে শঙ্কর বলিল, "দারুণ মানসিক অশান্তির ফলেই তোমার এই অবস্থা। এখন তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি আবার আগের মত করে তুল্‌ব।" তারপর সীতার রুক্ষ কেশরাশির মধ্যে সস্নেহে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে গভীর আবেগভরে সে বলিল, "একবার যখন তোমাকে ফিরে পেয়েছি সীতা, তখন আর তোমাকে হারিয়ে ফেলব না। আর কোন কারণেই আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হব না।" অসীম প্রীতিভরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সীতা স্নিগ্ধ হাসি হাসিল।

এমন সময়ে জুতার শব্দের সহিত মিশিয়া বারান্দায় প্রশান্তর সস্নেহ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমার কথা রেখেছি ত সীতা।" পরক্ষণেই ঘরে ঢুকিয়া খাটের ধারে আসিয়া সীতার উদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিয়া সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। তারপর শঙ্করের হাতখানা সীতার দুর্ব্বল হাতের মধ্যে তুলিয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এই নে ভাই, তোর অমূল্য সম্পদ্। দেখিস্, আর যেন ফাঁকি দিয়ে পালায় না।"

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাগ—বের্লিন

অধ্যাপক লেস্‌নির সঙ্গে প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় দেখে এলুম। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতক থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকগুলি বাড়ীর সমাবেশে, অনেকটা জায়গা জুড়ে' এই বিশ্ববিদ্যালয়। কোনও বিশেষ প্লান ধ'রে তৈরী ব'লে মনে হ'ল না—যেমন যেমন আবশ্যক হ'য়েছে তেমনি তেমনি বাড়িয়েছে। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে সপ্তদশ শতকের একটী গ্রন্থাগার। নামটী ভুলে যাচ্ছি—একজন উচ্চ পদাভিষিক্ত ধর্মযাজক—রোমান কাথলিক মোহান্ত-বিশেষ—ঐ গ্রন্থাগারটী ক'রে যান। পালিশ-করা কাঠের পাটাতনওয়ালা মেঝে, দুধারে উঁচু আলমারী, সেকেলে সব বিরাট আকারের ছাপা বই, আকারে যেমন ভারিক্কে বিষয়ও তেম্‌নি দুষ্পাচ্য—খ্রীষ্টান মতবাদ সংক্রান্ত বিচারের বই, লাতিন ভাষায় লেখা। হাতে লেখা বই, পুরাতন ম্যাপ, গ্লোব, আর টুকিটাকি জিনিস—এসবও এই সংগ্রহে আছে। এরা সব কেমন চমৎকার ক'রে রাখতে জানে—জ্ঞান, রুচি, অর্থ,—তিনই এদের আছে। আর আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অমন চমৎকার সংগ্রহটী, যেটীকে বাঙালীর সংস্কৃতির এক প্রধান জাতীয় সংগ্রহ বলা যায়, সেটী পয়সা নেই ব'লে যত্নের অভাবে শ্রীহীন অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে—কত জিনিস নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী মহিলা কর্ত্রী আমাকে এই লাইব্রেরী দেখালেন। এই লাইব্রেরীটী যেন একটা মিউজিয়ম। ছেলেরা আর অধ্যাপকেরা যেখানে ব'সে পড়াশুনা করেন, সেই বৃহৎ পুস্তকাগার পরে দেখলুম। জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক্ পুস্তকাগার নেই, একই পুস্তকাগারে দুই বিভাগের ছেলেদের আর অধ্যাপকদের কাজ চালাতে হয়। চেখ্‌কে রাষ্ট্রভাষা ব'লে জরমানরা মেনে নিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেখানে চেখ আর জরমানরা অহরহঃ সমবেত হয়, সেখানে চেখ ভাষার ডঙ্কা সব সময়ে মারা হয় না; দেখলুম, গ্রন্থাগার আর অন্য অন্য সব বিভাগের নাম যথা-সম্ভব আন্তর্জাতিক ভাবে লেখা র'য়েছে—লাতিন ভাষায়; যেমন "গ্রন্থাগার" স্থলে, চেখ ভাষার Knihovna বা জরমানের Bibliothek না লিখে, আন্তর্জাতিক লাতিন রূপে গ্রীক শব্দটী দেওয়া হ'য়েছে—Bibliotheca.

১৮১৭ সালে Kralove Dvor বা "রাণীর মহল" নামক স্থানে N. Hanka হান্কা নামে এক চেখ সাহিত্য-রসিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একখানি পুরাতন পুঁথির উদ্ধার করেন। এই পুঁথিতে চেখ ভাষার অতি প্রাচীন কতকগুলি গাথা আর ছোট কবিতা আছে। পুঁথিটীর বয়স তেরর কি চোদ্দর শতক হবে। হান্কা জরমান আর আধুনিক চেখ অনুবাদের সঙ্গে এটী ১৮১৯ সালে প্রকাশিত করেন; প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই নিয়ে চারিদিকে একটা সাড়া প'ড়ে যায়—একটা জাতের প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন ব'লে সকলে আগ্রহান্বিত হ'য়ে এর চর্চ্চা শুরু করে। চেখ জাতির ইতিহাসে এই বইয়ের স্থান অতি উচ্চে; আর কোনও কোনও পণ্ডিত বইখানিকে জাল ব'ললেও, ইউরোপীয় সাহিত্যে এর একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে। ইংরিজি অনুবাদও হ'য়েছে, আমি সেই অনুবাদ বহু পূর্ব্বে প'ড়েছিলুম। তারপর হান্কার বইয়ের একটী পুরাতন সংস্করণ—১৮২৯-এ ছাপা—লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় পুরানো বইয়ের দোকানে কিনি। সব জাতের নিজস্ব, স্বাধীনভাবে উদ্ভূত প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক টান আছে—আর বিশেষ যখন এই সব চেখ গাথা আর কবিতা প'ড়ে আমার ভালই লেগেছিল। Josef Manes যোসেফ মানেশ্ ব'লে একজন চেখ চিত্রকর গত শতকের মাঝামাঝি জীবিত ছিলেন, আধুনিক চেখ জাতীয় শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ব'লে তাঁকে ধরা হয়; ইনি নিজের আঁকা ছবি দিয়ে এই বইয়ের একটী সুন্দর সংস্করণ বা'র ক'রেছিলেন—এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে চেয়ে নিয়ে দেখলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ভীড়

তেমন দেখলুম না ; বোধ হয় ছুটী আরম্ভ হ'য়েছে ব'লে। আর একটা জিনিস চোখে লাগ্‌ল—এবার ভিয়েনাতে, আর আগে লণ্ডনে পারিসে বের্লিনে, যেমন ছাত্র-মহলে যোড়-বাঁধা তরুণ-তরুণীর দল দেখেছি, প্রাগে সে রকম চোখে প'ড়্‌ল না। রাস্তায় রাস্তায় প্রেমিক-প্রেমিকার মেলা অন্য শহরগুলিতে একটু বেশী, একটু অধিক 'প্রগল্‌ভ' ব'লে মনে হ'য়েছিল ; প্রাগের তরুণমণ্ডলী কি এ বিষয়ে ভিয়েনা বের্লিনের চেয়ে বেশী সংযত ?

অধ্যাপক লেস্‌নি এঁদের Oriental Institute দেখতে নিয়ে গেলেন—লণ্ডনের Royal Asiatic Society, পারিসের Société Asiatique বা বের্লিনের Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft-এর মত। একটী চমৎকার পুরাতন প্রাসাদের খানিকটা অংশ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটী। সংস্কৃত, আর ভারতীয় আর অন্য প্রাচ্য দেশীয় বিদ্যার আলোচনা হয়, আর এঁরা চেখ ভাষায় একটী পত্রিকা বা'র করেন। অধ্যাপক লেস্‌নি বহু পূর্বে Modern Review পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে দেখান, ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতবিৎ ছিলেন একজন চেখ-ভাষী রোমান কাথলিক পাদ্রি। Institute-এ একজন ইংরিজি-বলিয়ে' সদস্য খুব শিষ্টালাপ ক'র্‌লেন। আমাদের ক'ল্‌কাতার 'রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটী-অভ-বেঙ্গল' পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচ্য-বিদ্যা-অনুসন্ধান-সমিতি—'এশিয়াটিক-সোসাইটী-অভ-বেঙ্গল' স্যর উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত করেন ১৭৮৪ সালে ; আর তার ছয় বৎসর আগে ১৭৭৮ সালে ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে বাতাভিয়ার তাদের 'বাতাভিয়া রাজকীয় সাহিত্য' 'কলা ও বিজ্ঞান আলোচনা সমিতি' স্থাপন করে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচ্য বিদ্যাকেন্দ্রে ক'লকাতার সোসাইটীর নামডাক খুব—ঐ সোসাইটীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আমি গৌরবের সঙ্গে এঁদের Visitor's Book-এ লিখে দিলুম।

লেস্‌নি তাঁর বাড়ীতে আমায় মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'রতে আনলেন। Vltava নদীর বাঁ-ধারে, Most Jiraskov য়িরাস্কোভ সাঁকোর কাছে একটা বাড়ীতে ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকেন। বাড়ীর সামনে একটী ছোট বাগিচা, তাতে একটী মূর্ত্তি আছে, সেটী ভারী সুন্দর লাগ্‌ল। মূর্ত্তিটী একটী বিবসনা স্ত্রীর, হাতে একরাশ ফুল, Jaro 'য়ারো' অর্থাৎ বসন্ত-দেবীর মূর্ত্তি ; মানুষের চেয়ে বৃহৎ আকারের। শিল্পীর নামটী—Lada Benes' লাদা বেনেশ—মূর্ত্তির পাদ-পীঠে খোদা ; মুখমণ্ডলে, শরীরের গঠনে, এমন একটী বৈশিষ্ট্যের—গ্রীক ও বেনেসাঁস যুগের শিল্পরীতিতে তৈরী এই ধরণের যত সব নারী মূর্ত্তির থেকে এমন একটা অদ্ভুত সুন্দর স্বাতন্ত্র্যের ভাব এই মূর্ত্তিতে আছে, যে তা শিল্প-রসিক মাত্রেরই চোখে লাগ্‌বে। এইরূপ মূর্ত্তিতে, নিছক সৌকুমার্য্যের আবাহন করা হয় নি ; আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ মূর্ত্তি অত্যন্ত crude বা মোটা ধরণে গড়া ব'লে মনে হয়, কিন্তু এতে ক'রে একটা সরল, সবল শক্তির দ্যোতনা দেখা যায়, এতে কোনও ভাণ বা গতানুগতিকতা নেই। আধুনিক চেখ শিল্পের একটী সুন্দর নিদর্শন হিসাবে মূর্ত্তিটীর তারিফ না ক'রে পারা যায় না। লেস্‌নির বাড়ীতে দু তিনবার গিয়েছিলুম, প্রত্যেকবার ঘুরে ফিরে মূর্ত্তিটী না দেখে পারিনি।

লেস্‌নি-গৃহিণীর' সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ইনি অভিজাত-বংশীয়া উচ্চ-শিক্ষিতা আধুনিক কালের ইউরোপীয় মহিলা। ইংরিজি জানেন, আমার সঙ্গে ইংরিজিতেই আলাপ ক'রলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে সেদিন এঁদের আরও দুজন অতিথি ছিলেন, সুইডেনের ঔপন্যাসিক Gunnar Serner গুন্নার সের্‌নর্‌ আর তাঁর স্ত্রী। এঁরাও ইংরিজি জানেন, আর বেশ সজ্জন। অধ্যাপক লেস্‌নির শ্বশুর অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরি সাম্রাজ্যের তরফ থেকে রাজদূত হ'য়ে ডেনমার্কে বহুদিন ছিলেন, লেস্‌নি-গৃহিণী বালিকা বয়সে পিতামাতার সঙ্গে ডেন্‌মার্কেই কাটান, তাই তিনি ডেনীয় আর অন্য স্কান্দিনেভীয় ভাষা বেশ শিখে নেন। সুইডেনের ঔপন্যাসিকটী Frank Heller এই ছদ্মনামে লেখেন। এঁর প্রায় ৪০খানা বই আছে (দুঃখের বিষয়, আমি এর একখানার সঙ্গেও পরিচিত নই)। লেস্‌নি-গৃহিণী তার খানকতক চেখ ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন। সের্‌নর্‌-দম্পতী প্রাগে বেড়াতে এসেছিলেন, এঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে লেস্‌নিরা এঁদের মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন।

লেস্‌নি তাঁর পড়বার ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে তাঁর বই আর সব টুকিটাকি জিনিস যা ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছেন আমায় দেখালেন। মামুলী হাতীর দাঁতের খেলনা, পিতলের মূর্ত্তি প্রভৃতি দু'চারটে। চেখ ভাষায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে, শান্তি-নিকেতনে

লেস্‌নির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব'লে, একখানি বেশ বড় বই লিখেছেন, আমায় দেখালেন। লেস্‌নি ভারতীয়দের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। এদেশে থাকবার সময়, ক'লকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপাথিক ডাক্তার স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে লেস্‌নির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। কোথায় ইউরোপের চেখদেশ, আর কোথায় ভারতের বাঙ্‌লা!—এই দূর দেশের দুইজন ভদ্রব্যক্তির এই অকৃত্রিম আর নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্য অতি সুন্দর জিনিস। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবু আর তাঁর ভাইয়েরা, আর এঁদের ভাগনে শ্রীযুক্ত দিলীপ-কুমার রায় (স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র—অধুনা পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ-আশ্রমের অধিবাসী)—এঁরা সকলেই আমার পরিচিত, একথা শুনে লেস্‌নি খুব খুশী হ'লেন। খগেনবাবুর নাম ক'রতে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ যেন ভারী হ'য়ে যায়—পরস্পরের মধ্যে মিত্রতার যোগসূত্রের এম্‌নি বাঁধন। পরে যেদিন লেস্‌নির কাছ থেকে বিদায় নিই, তাঁর কুশল আর প্রীতি-নমস্কার খগেনবাবুকে জানাবার জন্য লেস্‌নি আমায় বারবার অনুরোধ ক'রে দেন।

ঔপন্যাসিক Serner আর তাঁর স্ত্রী বেশ আলাপ ক'রলেন, তাঁদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোকের সৌজন্য বেশ পেলুম। তিনি লেখক, আমাদের গৃহস্বামিনী তাঁর বই কষ্ট ক'রে অনুবাদও করেছেন, অথচ আমি তার কিছুই জানি না—এতে আমার একটু অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছিল, যেন আমি লেখকের কাছে অপরাধী, সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞ। তবে এঁদের হৃদ্যতায় সে ভাবটা কাটিয়ে উঠ্‌লুম। মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হ'ল—সাধারণ ইউরোপীয় রীতি, চেখ বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। দু'জন কমবয়সী চেখ ঝী—এদের দেখে মনে হ'চ্ছিল এরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—পরিবেশন ক'রলে। নানা গল্প গুজবের মধ্যে আহার আর তদনন্তর কফি-পান হ'ল। লেস্‌নি-দম্পতীর একটী মাত্র সন্তান,—একটী ছেলে, এর সঙ্গে আগেই আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল; ছেলেটীর বসবার ঘরে আমরা খানিকক্ষণ ব'সেছিলুম। ইউরোপের অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে এই ঘর সাজানো।

দুপুরে ভুরিভোজন করিয়েই খুশী নন, লেস্‌নিরা ব্যবস্থা ক'রলেন, রাত্রে তাঁদের সঙ্গে অপেরা দেখ্‌তে যেতে হবে। Serner আর তৎপত্নীও আস্‌বেন—পাঁচজনের জন্য একটী বক্স নিলেন। সেদিন ছিল চেখ Composer বা সঙ্গীত-রচক Smetana স্মেতানা কর্ত্তৃক Hubicka 'হুবিচ্‌কা' বা 'চুমু' নামে চেখ পল্লীসমাজের একটী সুন্দর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্যের অভিনয়। অপেরার যা দস্তুর, সমস্ত অভিনয়টা গান গেয়ে গেয়ে হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে পূরা অর্কেস্‌ট্রার বাদ্য। এই গীতিনাট্যটীতে চেখ গ্রাম্য সঙ্গীতকে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়ে' নোতুন ভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছে। ইউরোপীয় Composer বা ওস্তাদ কালোয়াৎদের রচনা আমি জানি না, বুঝি না,—কিন্তু এদের যন্ত্র-সঙ্গীতের অনেক জিনিসই ভাল লাগে; 'হুবিচ্‌কা' গীতি-নাট্যটী ভালই লাগ্‌ল। অভিনীত গানগুলি সব চেখ ভাষায়, কিন্তু লেস্‌নি আর লেস্‌নি-গৃহিণী ইংরিজিতে আখ্যান-বস্তু আর কোথাও বা কথোপকথনের সারটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কাজেই রসগ্রহণে বাধা হয় নি।

ইউরোপের সংস্কৃতিতে অপেরা একটী বড় স্থান নিয়ে আছে। বিরাট যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন থাকে, তারই পট-ভূমিকার উপরে গান ক'রে পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় করে—কণ্ঠ-সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য, আর দৃশ্যপট, এই সমস্তের একত্র সমাবেশ থাকে। ইটালিতে এই জিনিসের উদ্ভব হয়, রেনেসাঁস যুগে; 'অপেরা' নামটীও ইটালীয়। তারপর ফ্রান্সে, আর জরমানিতে এর প্রসার হয়; এ জিনিস স্পেনেও যায়, আর ইংলাণ্ড, রুষ প্রভৃতি দেশেও এর প্রতিষ্ঠা হয়। জরমানদের দেখাদেখি জরমানদের দ্বারা শাসিত বা প্রভাবান্বিত নানা জাতির মধ্যেও ক্রমে অপেরা দেখা দেয়; ভিয়েনার আদর্শে বুদাপেশৎ-এ মজরদের মধ্যে আর প্রাগে চেখদের মধ্যে অপেরা স্থাপিত হয়, এই দুই জাতির নিজস্ব সঙ্গীত আর গানের সুরের আধারে নোতুন করে মজর আর চেখ "জাতীয়" অপেরা গঠিত হয়। নানা যন্ত্রে বিভিন্ন সুরের সমাবেশে যে Harmony বা ঐক্যতান সঙ্গীত ইউরোপীয় বাদ্যের প্রাণ তাহার আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত বা বাজনায় এখনও আসে নি। তবে আন্‌বার বিশেষ চেষ্টা হ'চ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতে Harmony এলে তবে সত্যকার ভারতীয় অপেরা ভারতবর্ষে গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হবে। Harmony সৃষ্টির যে চেষ্টা ভারতীয় সঙ্গীতে চ'লছে, আশা করা যায় ঝটিতি এদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি হবে।

বের্লিন—প্রাচীন মিসরীয় ভাস্কর্য্য—রাজা চতুর্থ আমেনোফিস্

র্লিন—প্রাচীন মিসরীয় ভাস্কর্য্য—রাণীর মূর্ত্তি

বেনিন—গ্রীক দেবীমূর্ত্তি

বেনিন—পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প—বেনিনের ব্রঞ্জ মূর্ত্তি]
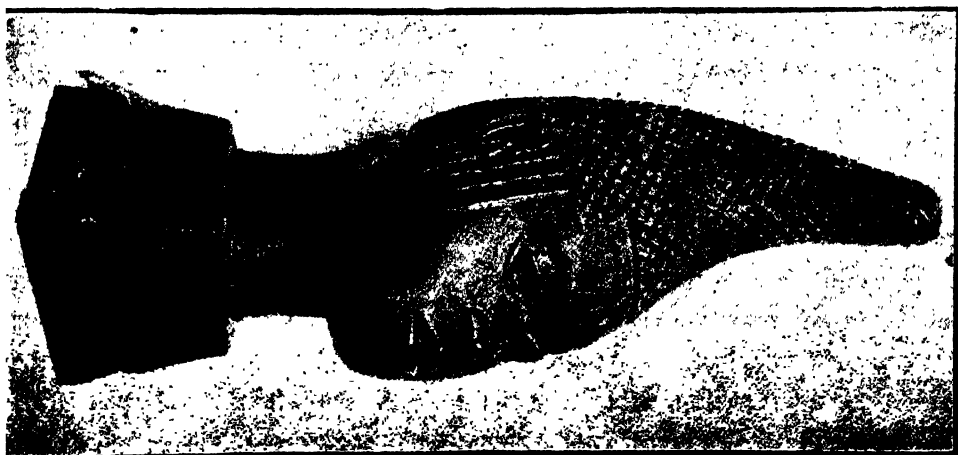
অধ্যাপক Winternitz ভিণ্টের্‌নিট্‌স্ তাঁর বাড়ীতে চা খাবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। লেস্‌নির সঙ্গে ট্রামে ক'রে তাঁর বাড়ীতে গেলুম। বৃদ্ধ অধ্যাপক বিনয়ের আর সৌজন্যের অবতার। তিনি এখন জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁর স্থানে Otto Stein অটো শ্‌টাইন্ ব'লে এক ভদ্রলোক নিযুক্ত হ'য়েছেন। ভিণ্টেরনিটস্-এর মতন ইনিও ইহুদী। ভিণ্টের্‌নিট্‌স্-এর ছেলের সঙ্গে পথে দেখা হ'ল, কতকগুলি শিশু নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, লেস্‌নি পরিচয় করিয়ে' দিলেন; ইনি বাপের মত-ই অধ্যাপক, প্রাগের জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা করেন। বৃদ্ধ ভিণ্টের্‌নিট্‌স্ এখন উঠে হেঁটে তেমন বেড়াতে পারেন না। তিনি স্মিতমুখে আমার স্বাগত ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, নন্দলাল বসু মহাশয়, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়—এঁদের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমার কাজ-কর্মের সম্বন্ধে, ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চার সম্বন্ধে আলাপ হ'ল। ঘণ্টাখানেক পরে বিদায় নিলুম। অধ্যাপক শ্‌টাইন্-এর সঙ্গে এই প্রথম আলাপ, তবে পরস্পরের নাম আমরা জান্‌তুম। শ্‌টাইন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে বেশ ভাল কাজ ক'রেছেন। ভিন্‌টের্‌নিট্‌স্-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্‌বো, শ্‌টাইন আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে চ'ল্‌লেন। লেস্‌নির কাজ থাকায় তিনি চ'লে গেলেন। শ্‌টাইন একটী ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। তাঁর লাইব্রেরীতে নিয়ে বসালেন। ব'ল্‌লেন যে তাঁর স্ত্রী সেদিন বাড়ী নেই, পিত্রালয়ে গিয়েছেন—তিনি নিজেই কফী ক'রে খাওয়ালেন। আমরা দুজনে ব'সে ঘণ্টাখানেক ধ'রে ভারতের ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাচীন সমাজ প্রভৃতি নিয়ে "কচ্চায়ন" ক'রলুম। বেশ আনন্দে সন্ধ্যাটুকু কাট্‌ল। পরে শ্‌টাইন আমাকে হোটেলে ফেরবার ট্রামে তুলে দিলেন।

প্রাগে ভারতবাসী দু'চার জন মাত্র আছেন। নাম্বিয়ার ব'লে একটী মালয়ালী ভদ্রলোক একরকম স্থায়ী বাশিন্দে হ'য়ে আছেন, তিনি নাকি journalist বা সাংবাদিক। ভিয়েনায় এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, প্রাগে আর হয় নি। কনুভাই পুরাণী ব'লে একটী গুজরাটী ছেলে আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রলেন। ইনি আমেদাবাদের গান্ধী-আশ্রমের সংশ্লিষ্ট "গুজরাত বিদ্যাপীঠ"-এর প্রাক্তন ছাত্র, লেস্‌নির কাছে আমার নাম আর পরিচয় পেয়ে দেখা ক'রতে আসেন।

২২শে জুন ১৯৩৫। আজ প্রাগ ত্যাগ ক'রবো, আড়াইটের দিকে। লেস্‌নির কাছে বিদায় নিতে গেলুম। এই কয়দিনে ভদ্রলোকের হৃদ্যতার আর সৌজন্যের অশেষ পরিচয় পেয়েছি। শেষদিনও ইনি আমার জন্য অনেকটা পরিশ্রম ক'রলেন। জরমান কন্‌সালের আপিসে নিয়ে গেলেন—ইংরিজি টাকা জরমান টাকায় ভাঙানো নিয়ে কতকগুলি নোতুন নিয়ম হ'য়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'তে। মনে হ'ল, চেখেরা আজকাল যতটা সম্ভব জরমানদের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চ'লতে চেষ্টা করে, খালি বিদেশী বন্ধুর খাতিরে লেস্‌নি কন্‌সালের আপিসে এলেন। সেখানে এ ব্যাপারের তয় না হওয়ায়, আমায় এক চেখ ব্যাঙ্কে নিয়ে গেলেন; ব্যাঙ্কের কর্ত্তাদের সঙ্গে লেস্‌নির খুব খাতির, সেখানে ঠিক সংবাদ যা চাচ্ছিলুম তা পাওয়া গেল। ব্যাঙ্কেই লেস্‌নির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অতি জটিল, আমার মগজে ও জিনিস ঢোকে নি, ঢুকবে না; এই বিনিময়ের মারপেঁচের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির পরস্পরের লেন-দেন দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ সব কি ভাবে চ'ল্‌ছে, সে এক আশ্চর্য্য গোরখধাঁধা। গত মহাযুদ্ধের পর সন্ধির শর্ত অনুসারে জরমানিকে ইংলাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতির কাছে ঋণী করা হয়। নানা উপায়ে জরমানি সে টাকা শোধ দিচ্ছে। জরমানি একটী ব্যবস্থা ক'রেছে, সেটাতে আমাদের কিছু সুবিধা হ'ল। ইংরিজি এক পাউণ্ডে জরমানির বারো রাইখ্-মার্ক—বিনিময়ের এই হার ধার্য্য হ'য়েছে। জরমানির মধ্যে কোনও শহরে ইংরিজি পাউণ্ড-নোট ভাঙাতে গেলে, কোনও ব্যাঙ্কে এক পাউণ্ডে বারো মার্কের বেশী দেবে না। কিন্তু জরমানিতে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে, ব্যাঙ্কের মারফৎ registered mark কিন্‌তে পাওয়া যায়। আমি জরমানিতে যাবো, সেখানে একমাসে পঁচিশ পাউণ্ড খরচ ক'রবো, জরমানিতে গিয়ে এই পঁচিশ পাউণ্ড ভাঙালে, মাত্র ২৫×১২=৩০০ মার্ক পাবো; কিন্তু জরমানিতে যাবার আগে, কোনও ব্যাঙ্কে এই পঁচিশ পাউণ্ড দিলে, তারা আমাকে ১৮ কি ২০ হিসাবে রেজিষ্টার্ড মার্ক দেবে—

৪৫০। ৫০০ মার্কের একটী ড্রাফ্‌ট্‌ আমাকে দেবে। জরমানিতে আবশ্যক-মত এই ড্রাফ্‌ট্‌ ভাঙিয়ে কাজ চালাতে পারা যাবে—তবে একটী নিয়ম ক'রে দিয়েছে, দিন পঞ্চাশ মার্কের বেশী জরমানির কোনও ব্যাঙ্ক একজন লোককে দেবে না। আগে-ভাগে জরমানিতে ঢোকবার পূর্বে এই ভাবে বিনিময় ক'রে নিলে, এতটা সুবিধা হয়। তারপরে জরমানিতে যদি আমার সব মার্ক খরচ না হয়, তা হ'লে জরমানির বাইরে এসে, আবার পুরাতন ব্যাঙ্কে ড্রাফ্‌ট্‌ পাঠিয়ে দিয়ে বাকী মার্ক জমা ক'রে দিলে, তারা সেদিনের registered mark-এর যে হার সেই হারে আমায় ইংরিজি টাকা দেবে। Registered mark-এর রহস্য কি জানি না। তারপরে, বিদেশীরা যাতে জরমানিতে বেশী ক'রে এসে খুব খরচ করে সেজন্য তাদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টায় জরমান সরকার রেলের ভাড়া খুব কমিয়ে' দিয়েছে। অন্যূন সাত দিন জরমানিতে থাকতে হবে, এইভাবে জরমানিতে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করবার একটা টিকিট জরমানির বাইরেই কোনও Travel Agency-র মারফৎ কিন্‌তে হবে; তাতে প্রায় শতকরা ৬০ ক'রে সাশ্রয় হয়। কিন্তু এই টিকিট আগেই কিন্‌তে হবে, কোথায় কোথায় যাবো তা আগেই ঠিক ক'রে নিতে হবে। আমি এক চেথ Travel Agency-র কাছ থেকে (বাঙলা কি হবে? 'যাত্রী সহায়ক সমিতি'?) টিকিট কিনলুম—২৩০ চেথ-ক্রাউনে (প্রায় দু পাউণ্ডে) সরাসরি প্রাগ থেকে বের্লিন, আর বের্লিন থেকে ব্র্যাসেল পর্য্যন্ত; এতে জরমান সরকার যে সুবিধাটুকু দিচ্ছে সেটুকু পাওয়া গেল।

প্রাগ থেকে বেলা দুটো আঠারোতে গাড়ী ছাড়লে, রাত্রি আটটা দশে বের্লিন পৌছানো গেল। প্রাগ থেকে বের্লিন সোজা উত্তর ধ'রে পথ। Vltava নদী, তার পরে Elb এল্‌ব নদীর পাশ ধ'রে রেলের লাইন। জরমানি আর চেখোস্লোবাকিয়ার সীমানায় একটী নাতি উচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে—Erzgebirge 'এৎস্‌গেবির্গে' পাহাড়। পাহাড়ের অঞ্চলটা পেরিয়েই জরমানি—আর ঘন বসতি, পর পর চষা ক্ষেত, গোচারণের মাঠ, ছোট বড় গ্রাম, গ্রামে মাঠের মধ্যে চিমনিওয়ালা বড় বড় কারখানা, আর ছোট বড় বহু শহর। প'ড়ো জমি বা বাগানের অভাব ব'লে মনে হ'ল। মাঠে গোরু চ'রছে—বেশীর ভাগ সাদা আর কালো মিশানো রঙ, গোরুর গা খানিকটা ক'রে মিশ কালো, আর খানিকটা ক'রে সাদা; ইংলাণ্ডে বোধ হয় লালরঙের গোরুর প্রাদুর্ভাব যেন বেশী। অনেক মাঠে বড় বড় বাছুর বা বকনা চ'রছে—এগুলির মোটা-সোটা চেহারা দেখে, এদেশের রীতিনীতি যারা জানে তাদের বুঝতে দেরী হয় না যে মাংসের জন্য এই জাতীয় গোরু পোষা হয়। দেশটীতে আবাদী খুব, খালি জায়গা বেশী নেই। ক্রমে দ্রেসদেন শহর এল; পূর্বে জরমানিতে ভ্রমণকালে দ্রেসদেন দেখা ছিল, খানিকটা পথ শহরের উপর দিয়ে টানা সাঁকো ধ'রে রেল লাইন চ'ল্‌ল। পথের ষ্টেশনগুলিতে লক্ষণীয় কিছু নেই, আর সহযাত্রীদেরও তেমন আলাপ-প্রবণ পাওয়া গেল না। তবে ভীড় খুব, আর সকলেই ভদ্র। দু'একজন জিজ্ঞাসাও ক'রলে, কোন্‌ দেশের লোক আমি।

এইরূপে যখন রাত আটটার পরে বের্লিনে পৌছুলুম, তখনও বেশ আলো আছে। ১৯২২ সালের অগস্ট্‌ মাসে বের্লিনে ছিলুম, আবার তের বছর পরে সেই বের্লিনে আসা গেল।

বের্লিন

শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত ব'লে একটী ভদ্রলোক বের্লিন-প্রবাসী হ'য়ে আছেন—বের্লিনে একটী জরমান মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন, তিনি ওখানে একটী হোটেল আর রেস্তোরাঁ খুলেছেন, তার নাম আর ঠিকানা হ'চ্ছে Hindustan Haus, 179 Uhlandstrasse, Charlottenburg. হোটেলটী কতকটা পাসিঅঁ-র ধরণের, ঠিক হাল-ফ্যাশানের হোটেল ব'ল্‌লে যা বোঝায় তা নয়; একটী বড় ফ্ল্যাট নিয়ে হোটেল, আর নীচের তলায় রেস্তোরাঁ। এই হোটেল আর রেস্তোরাঁকে আশ্রয় ক'রে বের্লিনের ভারতীয় ছাত্র আর অন্য প্রবাসীদের একটী আড্ডা বা কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে। আমি এই হিন্দুস্থান হাউসের ঠিকানা আগে পেয়েছিলুম, সরাসরি Anhalter Bahnhof বা আন্‌হাল্ট্‌ ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি ক'রে এখানেই এসে পৌছুলুম, আর এইখানেই স্থান ক'রে নেওয়া গেল। শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয় বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রে, থাকবার জন্য একটী বড় ঘর ঠিক ক'রে দিলেন। ছ'ঘণ্টার রেল-ভ্রমণের পরে খিদেও পেয়েছে খুব, মুখ-হাত ধুয়ে রেস্তোরাঁর 'সেবা' ক'রতে গেলুম—খুব তৃপ্তির

সঙ্গে চাপাটী, দাল, মাংসের কারি, কোর্মা, আর মোহনভোগ খাওয়া গেল। দেশ ছাড়বার সময়ে, অর্থাৎ ঠিক একমাস আগে সেই যা দেশী খাবার খাওয়া হ'য়েছিল। আহারের পরে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৃপ্ত হ'য়েছে বোধ হ'ল, তখন তাকিয়ে দেখা গেল—হিন্দুস্থান-হাউস ভারতীয়দের কেন্দ্রই বটে। ভারতবর্ষের সব প্রদেশেরই লোক আছে। দু'চারজন জরমান মেয়ে পুরুষও আছে। জাহাজের সহযাত্রীও জন কতককে পাওয়া গেল—তাঁরাও ঘুরতে ঘুরতে বের্লিনে এসেছেন। কতকগুলি ছাত্র জটলা ক'রছে, এঁরা বের্লিনে বিদ্যার্থী হ'য়ে আছেন; সপ্তাহখানেকের মধ্যে ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হ'বে বের্লিনে, এঁদের অতিথি হ'য়ে ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতীয় ছাত্রেরা সব আসবে, তারই তদ্‌বির আর ব্যবস্থা নিয়ে সকলে ব্যস্ত।

বের্লিন—ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের প্রাসাদ—অধুনা মিউজিয়ম্

বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতির সুবিখ্যাত অধ্যাপক H. Luedcrs হাইনরিখ্ লুডর্স্-এর সঙ্গে তের বছর আগে যখন বের্লিনে আসি তখন পরিচয় হ'য়েছিল।—পরে ল্যুডর্স আমার বই পেয়ে খুশী হন, আর ভারতবর্ষে যখন আসেন তখন তাঁর সঙ্গে পুনঃপরিচয় হয়। এবার তাঁর সঙ্গে পুনরালাপ হবে, এটা বের্লিনে আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তারপর, বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-ভাষা-বিভাগে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন শ্রীযুক্ত R. Wagner রাইন্‌হার্ট ভাগ্‌নর—তাঁর সঙ্গে পত্র-মারফৎ আলাপ হয়, পরে পত্রদ্বারাই তাঁর সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মায়। ভাগ্‌নরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ইচ্ছাও ছিল। বের্লিনে পুনরাগমনের মুখ্য ইচ্ছা অবশ্য এইজন্য ছিল যে আবার বের্লিনের বিচিত্র জীবনলীলা একটু দেখি, জরমান জাতির প্রাণের স্পন্দন একটু পাই, হিট্‌লরের আমলের জরমানির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় একটু ঘটে—আর বের্লিনের অপূর্ব্ব শিল্পদ্রব্য আর অন্য সংস্কৃতিময় বস্তুর সংগ্রহশালাগুলি দেখে আবার নয়ন মন সার্থক করি।

বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়

এবার বের্লিনে ছিলুম দিন চোদ্দ। পূর্ব-পরিচিত হ'লেও,

বের্লিনের মত শহরের পক্ষে একয়টী দিন কিছুই নয়। তবে আর একবার পূর্ব-পরিচয়কে ঝালিয়ে নেওয়া গেল, এই যা। আগেই ডক্টর ভাগনরকে জানিয়েছিলুম, আনুমানিক অমুক তারিখে বের্লিনে পৌঁছুবো। তিনি আমার আগমন-সংবাদ শুনে, বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যাবিভাগের তরফ থেকে আমার একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। Wisssentschaftliche Vortrag অর্থাৎ গবেষণাত্মক বা বিজ্ঞান-মূলক বক্তৃতা। প্রাগ থেকে তারে আমায় জানাতে হয়, কি বিষয়ে বক্তৃতাটী হবে। বের্লিনে পৌঁছুবার দুদিন পরে আমার এই বক্তৃতা হয়—২৫শে জুন তারিখে। ইংরিজিতে আমি ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করি। তার মধ্যে একটী বিষয় ছিল—ভারতীয় আর্য্য ভাষায় Polyglottism বা 'বহুভাষিত্ব'। আধুনিক আর্য্য ভাষায় একশ্রেণীর সমস্ত-পদ আছে, এগুলিতে সমার্থক দুইটী বিভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়; এই বিভিন্ন পদ দুইটী, কখনও কখনও বিদেশী ও ভারতীয় বিভিন্ন দুইটী ভাষা থেকে নেওয়া হয়; আবার কখনও বা আর্য্য অনার্য্য, সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীর অথচ সমার্থক শব্দ মিলিয়ে এইরূপ সমস্ত-পদ হয়। যেমন, "পাহাড়-পর্বত"—এখানে "পাহাড়" শব্দটী প্রাকৃত বাঙলার, আর "পর্বত" শব্দটী শুদ্ধ সংস্কৃত, দুই জড়িয়ে বাঙলার বহুল ব্যবহৃত সমস্ত-পদ হ'ল "পাহাড়-পর্বত", যার মানে সাধারণ ভাবে "পাহাড়, গিরি"; তেমনি, "ধন-দৌলৎ"—সংস্কৃত আর ফারসী; "রাজা-বাদশা"—সংস্কৃত আর ফারসী; তদ্রূপ "শাক-সবজী", "হাট-বাজার", "ঝাণ্ডা-নিশান", প্রভৃতি; "বাক্স-পেঁড়া"—ইংরিজি আর বাঙলা; "চা-খড়ি= "চাক্ বা chalk চক্+খড়ি"—ইংরিজি আর বাঙলা; "পাউ-রুটি"—পোর্তুগীস "পাউ"='রুটি', আর বাঙলা "রুটী"; "কাজঘর" (বোতামের ঘরকে "কাজঘর" বলে)—পোর্তুগীস casa "কাজা"='ঘর', আর বাঙলা "ঘর"; "নীল-মোহর"—ইংরিজি আর ফারসী; "ছেলে-পিলে"—"ছেলে"=ছাবিয়া+ছাবালিয়া বা ছাওয়ালিয়া=সংস্কৃত শাবক+আল+ইক+আকী (স্বার্থে), এবং "পিলে", তুলনীয় দ্রাবিড় (তামিল "পিল্লৈ"=সন্তান)—প্রাকৃত বাঙলা আর দেশী দ্রাবিড়ের [illegible] ; "ঘোড়া-পানি"— [illegible]

(সাঁওতালী প্রভৃতি) "হপন্"=ছেলে—প্রাকৃত বাঙলা আর দেশী কোল; ইত্যাদি। এই রকমের বহু বহু সমস্ত-পদ বাঙলায় আর অন্য ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এ থেকে, দেশের মধ্যে নানা ভাষার প্রচার বা প্রচলনের অবস্থা জানা যায়; আর্য্য ভাষা বাঙলা প্রভৃতির মধ্যে খাঁটী বাঙলা (প্রাকৃত-জ), সংস্কৃত, দেশী বা অনার্য্য, বিদেশী ফারসী পোর্তুগীস ইংরিজি প্রভৃতি শব্দ দেখে শব্দ-সম্ভার বিষয়ে আর্য্য জগতে বহুভাষিত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এখন, এ রকমটা সংস্কৃত আর প্রাকৃত যুগেও ছিল কিনা;—যদি "রাজা-বাদশা", "পাউ-রুটী", "বাক্স-পেঁড়া"-র মত সমস্ত-পদ, সংস্কৃত আর প্রাকৃতেও পাওয়া যায়, তাহ'লে প্রাচীন ভারতেও বহুভাষিত্ব বিদ্যমান ছিল, একথা ব'লতে হয়,—সংস্কৃতেও নানা অনার্য্য আর বিদেশী ভাষার প্রভাব মান্‌তে হয়, প্রাচীন ভারতের ভাষা-বিষয়ক সংস্থানকে নোতুন দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা যায়। আমি গুটী দশেক এইরূপ Translation Compounds "অনুবাদময়" বা "প্রতিশব্দময়" সমস্ত-পদ সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে পেয়েছি। যেমন—"কার্ষাপণ" (একপ্রকার মুদ্রা)—"কার্ষা"=প্রাচীন পারসীক "কর্ষ", মুদ্রা-বিশেষ, আর "পণ" =সংখ্যা-বিশেষ, ৪ বা ২০ বা ৮০—অনার্য্য কোল ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত; "শালি-হোত্র", অথ 'ঘোড়া'—"শালি"=* সাত, সাদি, (তুলনীয়, সাতবাহন=শালিবাহন, সাদি=অশ্বারোহী) প্রাচীন কোল ভাষার শব্দ, অর্থ 'অশ্ব', এবং "হোত্র"="ঘোত্র", 'ঘোট'-শব্দের পূর্ব্ব রূপ, অশ্ব-বাচক একটী অনার্য্য, খুব সম্ভব প্রাচীন দ্রাবিড় শব্দ (তামিল "কুতিরৈ", কন্নাডা "কুদুরে", তেলুগু "গুর্‌রমু" এই 'ঘোত্র' বা 'হোত্র' শব্দ হইতে উদ্ভূত): "শালি-হোত্র"= অনার্য্য কোল+অনার্য্য দ্রাবিড়—উভয়ের অর্থ, 'ঘোড়া'; বৌদ্ধ সংস্কৃতে "ইক্ষু-গণ্ড"='আখ'—"ইক্ষু"+"গণ্ড", "গণ্ড" শব্দ হিন্দী 'গণ্ডেরী', 'গন্না'তে বিদ্যমান; "[illegible]"= 'গাছ+পেড়' (হিন্দীতে "পেড়"="[illegible]"=গাছ); প্রাচীন বাঙলার প্রাকৃতে "জোগল"='জোড়' ([illegible]) +'পালা'; ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্য-অবস্থার ভারতীয়-আর্য্য ভাষাতে, [illegible] বা আধুনিক [illegible] আর্য্য [illegible] মত [illegible] বহুভাষিত্ব বিদ্যমান ছিল [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] কিছু ব'লে [illegible]

দন্ত্য ধ্বনির উচ্চারণ, ভারতের কতকগুলি ভাষায় দন্তমূলীয় ত, থ, দ, ধ-এর উচ্চারণের অস্তিত্ব, ও ইউরোপীয় ভাষায় দন্তমূলীয় ও দন্ত্য উচ্চারণ ভেদ। আমার এই বক্তৃতায় প্রায় জন চল্লিশ অধ্যাপক আর ছাত্র উপস্থিত ছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর Schaeder শেডের সভাপতি ছিলেন; তিনি, আর কতকগুলি বিশিষ্ট অধ্যাপক—ভাষাতত্ত্ববিৎ আর নৃতত্ত্ববিৎ—উপস্থিত থেকে, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত এই অধ্যাপককে তাঁদের সহধর্মী ও সহকর্মী ব'লে গ্রহণ ক'রে, তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও মিত্রতা দেখিয়েছিলেন।

অধ্যাপক ল্যুডর্স্ প্রাচীন-ভারত-বিদ্যার একজন অগ্রণী, একপত্রী পণ্ডিত। এরূপ বিদ্বান্ জরমানিতেও দুর্লভ। ভারতের ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান্ অনুসন্ধান আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আর বৌদ্ধ ধর্ম্ম আর সংস্কৃতির যে সমস্ত নিদর্শন মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে, সে-সকলের বিষয়ে অধ্যাপক ল্যুডর্স্-এর গবেষণা অনেক নোতুন তথ্য আবিষ্কার ক'রেছে। কতকগুলি তালপাতা চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় মধ্য-এশিয়া থেকে আসে, সেগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা পুঁথির; এই গুঁড়িয়ে-যাওয়া তালপাতার টুকরোর নষ্ট-কোষ্ঠি উদ্ধার ক'রে, ল্যুডর্স্ অশ্বঘোষ-রচিত কতকগুলি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব নাটকের সন্ধান করেন, তাতে কতকগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের নিদর্শন পান; এই সব প্রাকৃতের মূল্য ভারতের ভাষাতত্ত্বে খুবই বেশী। অধ্যাপক ল্যুডর্স্‌কে ফোন ক'রে আমার আগমন সংবাদ জানাই, কখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে পারে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাই। তিনি বের্লিনের কলা ও বিজ্ঞান পরিষদে উপস্থিত হ'তে ব'ল্‌লেন। সরকারী গ্রন্থাগারের এক অংশ এই পরিষদের কার্য্যালয়। অধ্যাপক Siegling জীগ্‌লিঙ্‌ মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত, অধুনা-লুপ্ত "তুষার" বা তোখারীয় নামে প্রাচীন আর্য্য ভাষা নিয়ে কাজ ক'রছেন, এই ভাষার নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে পাঠোদ্ধার ক'রে, তার এক বৃহৎ ব্যাকরণ Sieg জীগ্ ব'লে আর এক পণ্ডিতের সঙ্গে মিলে ইনি রচনা ক'রেছেন। ল্যুডর্স্ অধ্যাপক জীগ্‌লিঙ-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মধ্য-এশিয়ার পুঁথি-পাট্টা দুই চারখানা দেখালেন। ২৭শে জুন তারিখে ছিল পরিষদে Leibnitz লাইব্‌নিট্‌স্-এর স্মারক সভা, মনীষী লাইব্‌নিট্‌স্-এর কৃতিত্ব বিষয়ে বক্তৃতা হবে, পরিষদের প্রধান সভ্যেরা, সরকারী প্রতিনিধিরা, সবাই আসবেন—এই সভার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র আমায় দিলেন। পরে তিনি একদিন তাঁর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন ল্যুডর্স্-এর সঙ্গে একটু বেশ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছিল। ল্যুডর্স্ যেমন জ্ঞানে বিরাট্, দেহেও তেমন দীর্ঘায়তন, দেখেই ব'লতে হয়, হাঁ, মানুষের মত মানুষ বটে। ল্যুডর্স্ গৃহিণীও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন। আর দুটী ভদ্রলোক সেদিন নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, দুজনেই স্পেন দেশীয়, সংস্কৃতের বিদ্যার্থী, একজন আবার জেস্যুইট পাদ্রি, ভারতবর্ষে কিছুকাল কাটিয়ে এসেছেন। ল্যুডর্স্ আমার মুখে বলিদ্বীপে আমার অভিজ্ঞতার গল্প শুনে ভারী খুশী হ'লেন, বিশেষতঃ বেসাকৃকিক্ মন্দির দেখ্‌তে গিয়ে আমাদের যে বিপদ হ'য়েছিল সেকথা শুনে। এঁর সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিদ্যা সম্পর্কেও কিছু কথা হ'ল। ইনি এখন বেদের ব্যাখ্যা নিয়ে প'ড়েছেন—ভারতের ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পক্ষে এটা দুঃখের কথা, কারণ পালি প্রাকৃত আর ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আপাততঃ এর জন্য ল্যুডর্স্ মুলতুবি রেখেছেন। দুপুরে ঘণ্টা দুই আড়াই পরম আনন্দে এখানে কাট্‌ল। বিদায়ের সময় এঁর প্রবন্ধাবলীর একরাশ চটী বই আমায় উপহার দিলেন।

আমার কাছে বের্লিনের প্রধান আকর্ষণ—এর মিউজিয়মগুলি। বের্লিনের প্রাচীন শিল্পের সংগ্রহশালা; মধ্যযুগের আর আধুনিক কালের ভাস্কর্য্য আর চিত্রের সংগ্রহশালা; আমেরিকা ও আফ্রিকা এবং মধ্য-এশিয়া চীন জাপান তিব্বত প্রভৃতির প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পদ্রব্যের সমাবেশে অতুলনীয়, নৃতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহাবলী; বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাস্কর্য্যের সমস্ত নিদর্শনগুলির অনুকৃতির সংগ্রহ;—এই রকম গোটা দশেক মিউজিয়ম আছে, যেগুলি আধুনিক সভ্যজগতের অতি মূল্যবান সম্পদ্। ভূতপূর্ব্ব কাইসার ও তৎপুত্রের প্রাসাদ দুটী এখন শিল্পদ্রব্য আর প্রাচীন আসবাব-পত্রের মিউজিয়মে রূপান্তরিত হ'য়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম আর সাউথ-কেন্‌সিঙ্‌টন মিউজিয়ম; ফ্রান্সের লুভ্র্, চের্নুস্কি মিউজিয়ম, গীমে মিউজিয়ম, আর ল্যুক্সাঁবুর্গ মিউজিয়ম; আর সেই সঙ্গে বের্লিনের এই মিউজিয়মগুলি,—এদের আর তুলনা হয় না।

বের্লিনের সংগ্রহের বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রবো না। প্রাচীন মিসরের কতকগুলি অসাধারণ সুন্দর ভাস্কর্য্য এখানে আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে লক্ষণীয়, মিসরীয় শিল্পের চরম বিকাশ-স্বরূপ রাজা রাণী আর অভিজাতবর্গের কতকগুলি মুখ। মিসরীয়েরা পাথরের বড় বড় শবাধার তৈরী ক'র্‌ত, আর তার ঢাকনীতে নানা ছবি খুঁদে দিত। এই রকম একটী ঢাকনীর উপরে খোদাই ছবির ছাপ নিয়েছে, সেটী আমাকে খুবই মুগ্ধ করে। আকাশের দেবী Nut 'নূৎ', নক্ষত্র-খচিত আকাশ ব্যেপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—উর্দ্ধবাহু হ'য়ে; সুদীর্ঘ, সুঠাম, ঋজু ও তন্বু দেহ—শক্তিশালী রচনা। গ্রীক ভাস্কর্য্যের বিভাগে অনেকগুলি সুন্দর মূর্ত্তি আর প্রস্তর-ফলক আছে, তার মধ্যে লক্ষণীয় হ'চ্ছে কতকগুলি সমাধির উপরে প্রোথিত খোদিত ফলক। একটী নারী মূর্ত্তি আমার বড় চমৎকার লাগে, মূর্ত্তি মানে খালি মুণ্ড—মুণ্ডটী একটী পাথরের অসম্পূর্ণ দেহের উপরে বসানো—প্রাচীন গ্রীক যুগের শিল্পের ছাদে তৈরী, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের—ঈষৎ চিন্তাশীল মুখে অপূর্ব বিষাদ-মিশ্র স্নেহের ভাব মাখানো—দেবী-মূর্ত্তির মহনীয় কল্পনা বটে। প্রাচীন গ্রীক চিত্র-আঁকা মাটীর পাত্র, তানাগ্রা আর অন্য জায়গায় পোড়া মাটীর পুতুল আর অন্য মূর্ত্তি, ছোট ছোট ব্রঞ্জের মূর্ত্তি,—কত আর নাম করা যায়? বের্লিনের মিউজিয়মে পূরো বাড়ীকে-বাড়ী এনে জমা ক'রেছে; পের্গামসের গ্রীক মন্দির প্রায় সবটা, তার বিরাট ভাস্কর্য্য সহিত; বাবিলনের সিংহদ্বার; মশাত্তার আরব প্রাসাদ। ইটালী, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, জরমানি প্রভৃতি দেশের মধ্যযুগের আর রেনেসাঁস যুগের শিল্প,—চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি—এরও প্রচুর সংগ্রহ। নৃতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়মে মধ্য-এশিয়া আর চীন জাপানের সংগ্রহ লক্ষণীয়। প্রাচীন বা আধুনিক ভারতের জিনিস তেমন বেশী নেই। নৃতত্ত্ব-বিদ্যার মিউজিয়মের অন্যতম
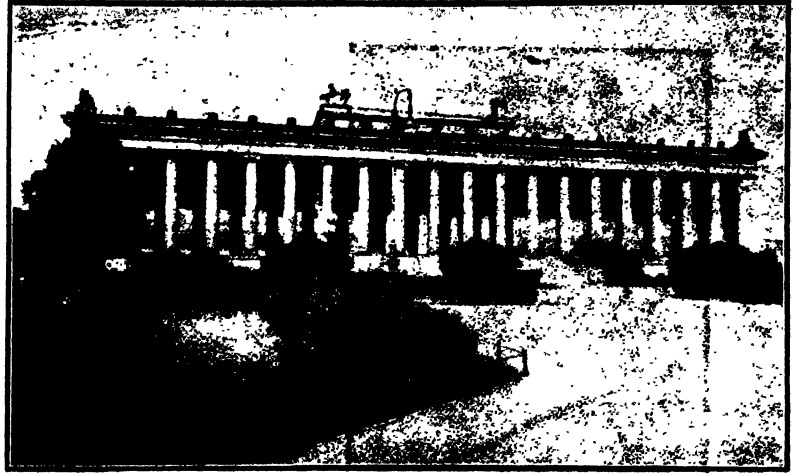
প্রাচীন শিল্পের সংগ্রহশালা—বের্লিন

আধুনিক শিল্পের সংগ্রহশালা—বের্লিন

কর্মচারী ডাক্তার Waldschmidt ভাল্ট্‌শ্‌মিট্‌ আর ডাক্তার Meinhard মাইন্‌হার্ট—এঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল; এঁরা খুবই সৌজন্য দেখান,—আর ডাক্তার ভাল্ট্‌শ্‌মিট আমায় মধ্য-এশিয়া আর ভারতের সংগ্রহ যা
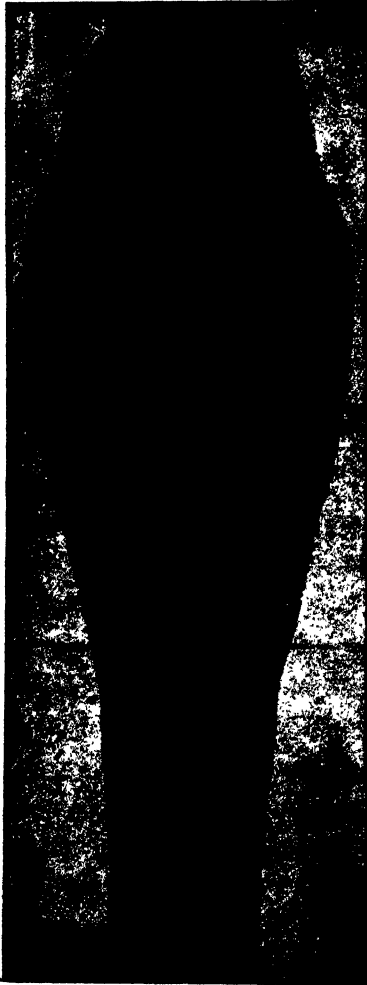
বের্লিন—মিসরীয় শবাধার—আকাশ-দেবী নূৎ

আছে তা বেশ ভাল ক'রে দেখান। আমেরিকা আর এশিয়ার সংগ্রহ ছাড়া, মেক্সিকোর প্রাচীন মূর্ত্তি, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির আর নিগ্রো শিল্পের খুব বড় আর সুন্দর সংগ্রহ আছে। এগুলিও আমার পূর্ব্ব-পরিচিত প্রিয় বস্তু, আবার দেখবার ঝোঁক অনেকদিন ধ'রে ছিল, এগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখলুম। পশ্চিম-আফ্রিকার সুবিখ্যাত বেনিন্‌ নগরের লোকেরা আফ্রিকার জগতে শিল্প বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল, এই নগরে তৈরী ব্রঞ্জের মূর্ত্তি আর ঢালাই-করা চিত্র-ফলক, আর হাতীর দাঁতের কাজ, বের্লিনে এসে ভাল ক'রে দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঠিক এই সংগ্রহটী থেকে প্রায় সব মূল্যবান্‌ বা শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সরিয়ে রাখা হ'য়েছে, কে এই সব নিয়ে আলোচনা ক'রছেন, তাঁর জন্য। লণ্ডনে বেনিন্‌ নগর থেকে প্রাপ্ত একটী নিগ্রো মেয়ের জীবন্ত আকারের ব্রঞ্জে ঢালা মুণ্ড আছে, সেটী ৩০০।৪০০ বছর আগেকার কীর্ত্তি, নিগ্রো শিল্পের এক চরম প্রকাশ হ'য়েছে এই কন্যা-মূর্ত্তিটীতে। লণ্ডনের এই মূর্ত্তিটীর ঠিক একটী জুড়িদার—অন্য ঢালাই করা অনুকৃতি—বের্লিনের বেনিন্‌-সংগ্রহে আছে জানতুম, তার ছবিও দেখেছি—এবার সেটী চাক্ষুষ দেখবো আশা ছিল, সে কিন্তু আশা পূর্ণ হ'ল না। এই মূর্ত্তির (অন্য পাঁচটী শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির সঙ্গে) ছাঁচে ঢালা প্লাস্তর-অফ-পারিসের ব্রঞ্জের রঙ্গে রঙ্গীন নকল, যন্ত্র-সাহায্যে তৈরী ক'রে মিউজিয়মেই বিক্রী হ'চ্ছে, যাঁরা এই নকল রাখতে চান তাঁরা কিনতে পারেন। দুধের সাধ ঘোলে মেটালুম,—ছাঁচে ঢালা রঙ করা এই নকলটীই দেখা গেল। নিগ্রো জাতির মেয়েদের মধ্যে যে কমনীয়তা, আমাদের চোখে অপ্রকটিত যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, নিগ্রো মুখের সত্যকার আদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই সৌন্দর্য্য আর কমনীয়তা-টুকু এই অখ্যাত অজ্ঞাত বেনিনের নিগ্রো শিল্পী ফুটিয়ে' তুলেছে। মেয়েটীর গলায় একরাশ পলার কণ্ঠী, মাথায় বেতের বা পলার মালার টুপী। জগতের ভাস্কর্য্য শিল্পের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থান দিতে হয় এই মূর্ত্তিটীকে।

এ ছাড়া আছে আধুনিক শিল্প—ছবি প্রভৃতির—সংগ্রহ। মাসখানেক ধ'রে এই সব মিউজিয়ম ঘুরলেও বোধ হয় আমার তৃপ্তি হয় না। যে চোদ্দ দিন ছিলুম, সময় পেলেই একটা না একটা মিউজিয়মে চ'লে যেতুম, আর যতক্ষণ পারা যেত খুব ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তুম।

বিজয়া

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পোড়ো বাড়ীটার ভিতরে সেদিন সহসা চরণ ফেলি'
শিহরি' উঠিল সারা দেহ-মন বিস্ময়ে চোখ মেলি' !
এধারে-ওধারে উৎসুক চোখে যতবার করে' চাই,
কেহ কোনো দিন বাস করেছিল, চিহ্নটি তার নাই।
পরে-পরে-পরে নীচে ও উপরে ঘরগুলো আছে পড়ে' ;
দরজা জানালা খোলা নয় শুধু, নিয়েছে কে চুরি করে'।
কত প্রকোষ্ঠ, নাটমন্দির, বারান্দা, গলি—সবই—
থাম-ভাঙা আর বালি-খসা গায়ে দেখায় অতীত ছবি !
—এ সকলে মন নয় উচাটন—নিজে যে নিঃস্ব আমি—
জন্মি' ত্রিতলে, ভাগ্যের ফলে রসাতলে গেছি নামি'।
তবু বাড়ীটার উঠানে সেদিন সহসা চরণ ফেলি'
শিহরি উঠিল সারা দেহ-মন, চমকিয়া চোখ মেলি' !

—ভূত-প্রেত নাকি ? শ্মশানগন্ধ ?—অশরীরী ক্রন্দন ?
নয় ক সে সব—যা' দেখি' লোকের থামে হৃৎস্পন্দন।
বরং উল্টা—উঠানের পরে দেখিলাম চোখ চেয়ে—
দল্‌মলে এক কুমড়োর লতা উঠেছে দালান বেয়ে !

—লক্‌লকে শীষ—যেন আশীবিষ বিস্তারি' শত মুখ
মানুষের গড়া সৃষ্টি গ্রাসিতে উদ্দাম উৎসুক !
—এমনই বিপুল, এমনই সতেজ, এমনই সবুজ দেহ,
সাধারণ হ'তে এমনই তফাৎ—মনে জাগে সন্দেহ !
কে ছড়াল' বীজ, কে-বা দিল জল, কে দিল তাহারে ঠাঁই,
ধ্বংসের মাঝে এ হেন অবুঝ সবুজের রোশনাই !
চারিধারে যেথা বিনাশের লীলা—অবাধ অনর্গল,
তারও বুকে হাসে প্রকৃতির রচা সবুজের শতদল !
দশ হাতে তা'র যতই মানুষ সাধুক্‌ না সংহার,
অসংখ্য করে আপন সৃষ্টি—করিবে সে তত বার !

—এই লতাপাতা, এই শ্যামলতা—ধ্বংস তাহার নাই ;
দম্ভী মানবে সেই শুনাইবে তারই শেষ কথাটাই !
মানুষের গড়া যা-কিছু কীর্ত্তি, ধ্বংস তো তারই মাঝে,
শ্যামা প্রকৃতির জয়-দুন্দুভি তারই বুক জুড়ে' বাজে !
প্রলয়-দেবতা—সেও জোড়-করে তারেই কি থাকে চেয়ে ?
দক্ষদুহিতা ত্যজে' তাই ভজে শৈলরাজের মেয়ে !

কোষ্ঠীর জের

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস-সি

(৫)

কালে সব সয়ে যায়। শোভার এ বাড়ীতে খুব ঘন ঘন আসার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমে এল। আভার বাৎসরিক পরীক্ষা হ'য়ে গেছে—সে আর এক ক্লাশ উপরে উঠেছে। শোভার দেবর এসেছেন। কচিৎ কোনও ক্রেতা নিয়ে এসে বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে যান। তার পর আর তার কোনও খবর পাওয়া যায় না। এঁদের প্রধান হ'চ্ছে বাড়ী যদি বা বিক্রী হয়, আভার থাকার কি হবে। আভা শীলাকে একদিন আমার ঘরে নির্জ্জনে ব'সে ব'লেছিল, 'আমাকে আশ্রয় দিয়ে মামার কি ঝঞ্ঝাটই হ'য়েছে'—শীলা ব'ললে 'তুই শোভাদির দেওরকে বিয়ে ক'রে ফেল্‌ না। তা হ'লেই ত' সব চিন্তা দূর হ'য়ে যায়।' আভা ব'ললে, 'না ভাই, আমি এখন বিয়ে ক'রব না, ম্যাট্রিক পাশ না ক'রে আমি আদৌ বিয়ে ক'রব কিনা, তা ঠিক ক'রতে পারব না। কিন্তু তোর ব্যবস্থা কি ঠিক হ'য়ে গেছে নাকি ? খবর দিবি ত ?'

এমন সময় আমি ঘরে ঢুকে প'ড়তে শীলা আভাকে একটা ঠেলা দিয়ে ব'ললে "কি যা তা বক্‌ছিস্? ব'স্, সমীরদার চা ও খাবার নিয়ে আসি।" এই ব'লে বেরিয়ে গেল। আমি ঘরে বই খাতা রেখে, আভাকে দু' একটা কুশল প্রশ্ন ক'রে মুখ হাত ধুতে গেলাম। শীলা মা ও মাসীমার কাছে আমার খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সংগ্রহ ক'রতে লাগ্‌ল। বাথরুমে যাবার সময় শুন্‌তে পেলাম মাসীমা শীলার সাম্‌নেই মাকে ব'ললেন, "দিদি, ছেলের বিয়ে দেবে না? আর কতদিন আইবুড়ো রাখ্‌ব? দুটিতে বেশ মানাবে।" কোন "দুটিতে" তা সকলের মনে মনেই রইল। শীলার মুখ লাল হ'য়ে গেল—সে সেখান থেকে খাবার নিয়ে চ'লে এল। ভাবতে লাগ্‌ল আজ সকালে গায়ে একটা প্রজাপতি ব'সেছিল—তারই ফলে বোধহয় আভার মুখে মাসীমায়ের মুখে—সেই এক কথা একই সুরে ধ্বনিত হ'চ্ছে। সে বোধ হয় আমাকে খাওয়াবার সময় আমার মুখের দিকে আজ একটু কম চেয়ে কথা ব'লেছিল। আভা কাছে ব'সেছিল—সে কি বুঝে মধ্যে মধ্যে ফিক্ ফিক্ ক'রে শীলার দিকে চেয়ে হাস্‌ছিল—তা সেই জানে।

এদিকে মাসীমার কথায় মা যা জবাব দিলেন, তাতে মাসীমায়ের মুখ যেন শুকিয়ে গেল। মা ব'ললেন, "সমীরের কোষ্ঠীতে তার আটাশ বছর বয়সে ফাঁড়া লেখা আছে, সে বয়স না পার হ'লে ওর বিয়ে ওর বাবা দেবেন না। অতএব আরও পাঁচ বছর ওর বিয়ে হবে না। আমার কি আর সাধ হয় না, ভাই। নিজের পেটের একটা মেয়ে নেই। চোখও ত' সব সময় বুজে থাকি না।"

চোখ না বুজে থেকে মা ও মাসীমা কি লক্ষ্য ক'রে থাকেন, তা জানি না—তবে মাসীমাকে সেই থেকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখ্‌লাম এবং পরদিনই শোভার দেবরের সঙ্গে শীলার বাবা ডাক্তার মিত্রের বাড়ীটি ক্রয় করবার মত দিয়ে পাকাপাকিভাবে কথা ক'য়ে ফেল্‌লেন। আমি, শীলা বা আভা হঠাৎ এইরূপ একটা কেন হ'ল তা বুঝতে পারলাম না। মা সাদাসিধে মানুষ, তিনি বুঝতে চেষ্টাও ক'রলেন না। শোভা ভাবলেন, ভালই হ'ল—এখন আভার একটা ব্যবস্থা হলেই হয়। শীলা জানালে আভাকে সে এত ভালবাসে—তার ভাগের দু'মুঠো ভাত একমুঠো ক'রে দু'জনে খেয়েও থাকবে। আভা যেন যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন তাদের কাছেই থাকে। শীলার মা বাবাও দেখ্‌লেন, তাঁদের মেয়ে নেহাৎ একলা প'ড়ে যাবে। এমন একটি সৎ সঙ্গীর সঙ্গে থাক্‌লে তার মন ভালই থাক্‌বে। আভা মেয়েটির স্বভাব বেশ মিষ্টি। দুটিতে বোনের মত, সখীর মত বাড়ীতে থাক্‌লে—সকল দিক থেকেই বাঞ্ছনীয়। অতএব বাড়ী ও সমস্ত আস্‌বাবপত্র শীলার বাবা নগদ মূল্য দিয়ে কিনে নিলেন। আভা শীলার বন্ধুর আসনে থেকে এঁদের দ্বারা তার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যার আদরে পালিতা হবে—এও স্থির হ'ল।

চারদিনের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ ক'রে শোভার দেবর তাঁর বৌদি ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে এলাহাবাদে রওয়ানা হয়ে গেলেন। শোভা ও আভার বিচ্ছেদ দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ ঠেকল। বহুকষ্টে চোখের জল মুছ্‌তে মুছতে পিতার বাসগৃহ থেকে শোভা বিদায় নিলেন। আভাকে ইষ্টারের ছুটিতে এলাহাবাদ নিয়ে যাবেন ব'লে গেলেন।

(৬)

মাসীমা অতি শীঘ্রই নূতন বাড়ীতে উঠে গিয়ে নিজের মনের মত ঘর দোর গুছিয়ে ফেল্‌লেন। 'জিমের' কিন্তু এ পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা মাথায় ঢুক্‌তে বেশ সময় লাগ্‌ল। শীলাই তার সকল রকম খাওয়ান-দাওয়ান ক'রে থাকে। কিন্তু সেই শীলা যে তাকে আর এক বাড়ীতে অন্য আস্‌বাবের মধ্যে ব'সিয়ে কেন খাওয়াচ্ছে—এটা 'জিমের' আর কিছুতেই আয়ত্ত হয় না। সে একগ্রাস খায় এবং ছুটে এ বাড়ী চ'লে আসে। বাধ্য হ'য়ে শীলাকে এ-বাড়ীতে আবার খাবার এনে তার পূর্ব্বস্থানে ব'সে খাওয়াতে হয়। আমি তখন 'এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল্ সাইকলজিতে' এম-এস-সি পড়ি। পশুদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে 'এ্যাসোসিয়েশানের' প্রভাব কতখানি তা এই সূত্রে শীলাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে আমার কথা যেন গিলে খায়। শীলার বাবা মিঃ বসুরও এতে 'ইণ্টারেষ্ট' দেখ্‌তে পাই। শীলা তাতে উৎসাহিত হ'য়ে আরও মন দিয়ে শোনে। বলে কোনও বাংলা বই এ বিষয়ে থাকে ত' এনে দেবেন—আমি পড়ব। মাসীমা ও বাড়ীর জান্‌লা দিয়ে একটু আধটু দৃশ্য দেখেন, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স'রে যান।

'জিম'কে ও বাড়ীতে খাওয়ান শোওয়ান প্রভৃতিতে শীলা ক্রমশঃ অভ্যস্ত ক'রে তুলেছে। আমার নির্দ্দেশ

অনুযায়ী কাজ ক'রে এ বিষয় আশাতীতরূপে সফল হ'য়ে শীলার আমার পাঠ্যবিষয়ের উপর খুব শ্রদ্ধা হ'য়ে গেছে। শীলার বাবারও 'ইন্টারেষ্ট' একটু বেড়েছে। তিনি 'লয়েড মর্গানের' 'এ্যানিমাল্ সাইকলজি' বইখানি আমার কাছ থেকে নিয়ে প'ড়ে ফেলেছেন। কিন্তু মাসীমা ক্রমেই উদাসীন হ'য়ে যাচ্ছেন। দুপুরবেলায় মায়ের কাছে আসেন, গল্প করেন ও চ'লে যান।

শীলার বাবাকে হঠাৎ একদিন প্রাতে খুব বিমর্ষ দেখ্‌লাম। মায়ের কাছে জান্‌লাম—শীলাকে না কি আর আইবুড়ো রাখা যায় না। শীলা কয়দিন ক্রমান্বয়ে বাড়ীর বাইরে বেরোল না। শীলার বাবার বাড়ী খোঁজা শেষ হ'য়ে গেছে—এবারে মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে লাগ্‌লেন। তিন চার দিন পরে শীলা আবার এ-বাড়ী যাওয়া আসা ক'রতে লাগ্‌ল। তিন চারদিন সে আমার ঘরে ঢুকতে পারলে না ব'লে ঘরে কত ময়লা হয়েছে—আলনায় কাপড় চোপড় অগোছাল হ'য়েছে, টেবিলে বই খাতাগুলো গাদা হয়ে র'য়েছে—এজন্য খুব অনুযোগ ক'রতে লাগ্‌ল এবং সব সংস্কারে মন দিল। বিড় বিড় ক'রে বোকতে লাগ্‌ল—তার দু'দিন যদি শরীর খারাপ হয়েছে ত' ঘরের এমন ছিরি হবে।

তার পর যখন শুন্‌লে যে চারদিনের মধ্যে তিনদিন আমি বামুনের তৈরী ঠাণ্ডা চা কলেজ থেকে ফিরে এসে খেয়েছি, তখন সে গালে হাত দিয়ে ব'ললে "বাবা, বাবা—এ বিঠলে বামুনের জন্য আমার মরারও যো নেই"। আমি বল্‌লাম, "তুমি যখন শ্বশুরবাড়ী যাবে, তখন আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ" ? সে ঝেঁকে বল্‌লে, "কে ব'লেছে আপনাকে, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব ? আমি কোত্থাও যাব না।" ব'লেই লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে পালাল।

একটু পরেই আবার এসে ঘরের গোছান কাজে মন দিল। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—শীলা ব'ল্লে "সমীরদা বেড়াতে যাবেন না, আমি এখনই চা ও খাবার এনে দিচ্ছি—মাসীমাকে যোগাড় ক'রতে ব'লে এসেছি। এখনি নিয়ে আস্‌ছি।" আমি ব'ললাম, "তুমি চা নিয়ে এস, পরে আভাকে ডেকে এনে দু'জনে মিলে গোছাগুছি ক'রো।"

আভাকে এ কাজটির ভার দিতে তার ভীষণ আপত্তি। সে ব'ল্লে "হ্যাঁ, আভাকে গোছাতে দিলেই হ'য়েছে, আপনার জুতো উঠ্‌বে কাপড়ের আলনায় ও জামা বাইরের টেবিলে। তা ছাড়া আপনার ঘর গুছিয়ে তার কি লাভ ?" আমি ব'ললাম, "তোমারই বা লাভ কি শীলা ?" সে যেন নিজের কথায় নিজে অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে ব'ললে "আপনি বড় সব কথায় জেরা করেন।" শীলা আমার চা এনে দিয়ে, ঘর সংস্কার ক'রে বাড়ী চ'লে গেল।

(৭)

ইষ্টারের ছুটীতে আভাকে তার শোভাদিদি এলাহাবাদ যেতে লিখলেন। আভা যাবার জন্য খুব ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। মাসীমার অনুরোধে এবং আভার দুঃখকাতর মুখ দেখে আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিনের জন্য তাকে এলাহাবাদে রেখে আস্‌তে রাজী হ'তে হ'ল। শীলা আভাকে ক্ষান্ত করবার অনেক চেষ্টা ক'রেছিল। সে ব'ললে 'সমীরদার এই কয়মাস পরে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা, এ সময় পড়াশোনায় ব্যাঘাত হ'লে ওঁর কত ক্ষতি হবে।' আভা ব'ল্লে "আমি কি তাঁকে সেদেশে বাস ক'রতে যেতে বল্‌ছি ? আজ আমাকে যদি নিয়ে রওয়ানা হন, পরশু তিনি আবার আমাকে সেখানে রেখে ক'লকাতা রওয়ানা হ'তে পারবেন। এতে কোনও ক্ষতি হবে না। সমীরদা যা ভাল ষ্টুডেণ্ট, ওঁর ফার্ষ্ট ক্লাশ মারে কে ?" আভার এই সার্টিফিকেটে খুসী হ'য়ে আমি তাকে নিয়ে যেতে রাজী হ'য়েছি—মাকে জানালাম। মা এতে খুসী হলেন। শীলার কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশ মনঃপুত হ'লো না। আমি মোটের ওপর আভাকে এলাহাবাদে রেখে এলাম। একদিন দেরীও হ'ল—কারণ একবার কাশীও গিয়েছিলাম—নিজের ভাগ্য গণনা করতে—বিশেষতঃ ফাঁড়াটা সম্বন্ধে। কাশীর জ্যোতিষীরাও আমার আটাশ বৎসরের ফাঁড়াটা সম্বন্ধে একমত। মুখ চুণ ক'রে ফিরে এলাম। মাকে কাশী যাওয়ার কথাটা আর জানালাম না।

দু'দিন পরে শীলার কাছে আভার চিঠি এল। সে লিখেছে আর ক'দিন পরে গরমের ছুটী হবে। তার দিদির ইচ্ছে ক'দিন স্কুল কামাই ক'রে একেবারে গরমের ছুটীর পর সে ক'লকাতায় ফির্‌বে। তাকে বাধ্য হ'য়ে এ প্রস্তাবে রাজী হ'তে হ'য়েছে—কারণ কলিকাতা যাবার মত সুবিধামত সঙ্গী এখন কেউ আস্‌বে না। শীলা এটুকু প'ড়েই নিজের মনে ব'লে উঠ্‌ল—"তা নয়ত' কি সমীরদাকে তোমাকে আবার আন্‌তে ছুট্‌তে হবে নাকি ?" আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম্—শীলাকে ব'ললাম "কার ওপর চ'ট্‌ছ ?" সে ব'ললে "ও, কিছু না"—তার পর তার খামের ভেতর আভা আমাকে যে পত্র দিয়েছিল—তা শীলা প'ড়ে "সেন্সর্ড" ও "পাস্‌ড্" ক'রে আমাকে দিলে। ক্ষুদ্র চিঠি। আমার যাতায়াতে অনেক কষ্ট হ'য়েছে—তার জন্য আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ ক'র্ত্তে হ'য়েছে—সেজন্য ছোটবোনের মত ক্ষমা কর্ত্তে লিখেছে। তারপর

কি একটা লিখে কেটে দিয়েছে। শীলা সেটা বিশেষ ক'রে দেখেও প'ড়তে পারে নি ব'ললে।

এরই মধ্যে একদিন শীলার দিদি লীলা তাঁর স্বামীর বদলী উপলক্ষে ২।৪ দিনের জন্য এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর স্বামী ডাক্তার—মধ্যপ্রদেশে চাকরী করেন। লীলা ২।৪ দিন শীলার বিবাহের জন্য মহা হৈ চৈ লাগিয়ে দিল। তারপর আমাকে লক্ষ্য করেই বোধহয় তার তাগাদা কমে এল। ঘটককুলও রেহাই পেল।

(৮)

শীলা অনেক কিছু মনে মনে ভাবে নিশ্চয়। আমিও ভাবি। ছেলেমানুষটী কেউই নই। আমি এক আধদিন এক আধটা কবিতাও হঠাৎ লিখে ফেলি—এ অবস্থায় অনেকেই লেখে। একদিন দেখি—সে সব পড়ার ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে। আভা ফিরে এসেছে।

শীলা একদিন তাকে দূত পাকড়ালে। সে জান্‌ত যে আমার আটাশ বৎসরে ফাঁড়া আছে তার আগে, ইত্যাদি। সে আভাকে দিয়ে মাসীমাকে বলালে যে সে এখন বিয়ে ক'রতে চায় না, আভার মতন স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়াশোনা ক'রতে বা নিদেনপক্ষে বাড়ীতে খুব ভাল ক'রে প'ড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আভার সঙ্গে দিতে চায়। মাসীমা ব্যাধির গোড়া ধরে ব্যবস্থায় মনোযোগী হ'লেন। বল্লেন স্কুলে আর বড় বয়সে নীচে ক্লাশে ভর্ত্তি হ'য়ে কাজ নেই, একেবারে আভার সঙ্গে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিলেই হবে। আর বিয়ে দেবো ব'ললেই ত' বিয়ে দেওয়া হয় না। এই এতদিন ত' চেষ্টা করিয়াও মনোমত পাত্র জুটল না। চেষ্টা যেমন চলিতেছে চলুক, ইত্যাদি। শীলা তাহার পর নিজে পরদিন থেকে আভার গৃহশিক্ষকের নিকট পড়িবার অনুমতি মাতার নিকট চাহিল। তার মা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু পড়িবার অনুমতি দিলেন। পরদিন হইতে গোপনে বিশেষ সতর্কভাবে দৃঢ়পণে ঘটকরা পাত্র অনুসন্ধানে লাগিয়া গেল। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে 'বক্সনম্বর' দিয়া পাত্র অন্বেষণে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। প্রজাপতি আফিস, বিবাহ ঘটক আফিস, সমাজপতির আফিস প্রভৃতির কিছু কিছু দক্ষিণালাভ হইল। আমাকেও মাসিমা বলিলেন, "বাবা সমীর, শীলা তোমার বোন, তোমার বন্ধুদের মধ্যে যদি ভাল ছেলে শীলার সঙ্গে বিবাহযোগ্য থাকে তবে একটু খোঁজ ক'রো।" তারপর তাঁর ভাগ্যকে দোষ দিয়া কি সব বলিলেন ঠিক বুঝিলাম না।

শীলার বাবা একটি পাত্রের সন্ধান পেয়ে একদিন হঠাৎ রাণাঘাট চ'লে গেলেন। সন্ধ্যেবেলা মুখ শুকনো ক'রে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর গমনোদ্দেশ্য শীলার কাছে লুকানো ছিল। কিন্তু আভা সেদিন বিকেলে তাকে ঠাট্টা ক'রতে গিয়ে আসল কথা বের ক'রে ফেলে। শীলা রাত্রে তার বাবার কাছে কেঁদে ব'ললে—তাকে মন দিয়ে প'ড়তে দিলে তার বাবা তাকে এ বাড়ী থেকে বিদেয় করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছেন। সে আর প'ড়বেও না, খাবেও না। তার বাবা ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের কথা বইএ প'ড়েছিলেন—চোখে দেখার সাহস হ'ল না। মেয়েকে তুলে বসালেন এবং কে কি ব'লেছে তাতে কান না দিয়ে তাকে পড়াতে বেশী ক'রে মন দিতে ব'ললেন। উপস্থিত 'রয়েলটি' স্বরূপ কালই তাকে একটি হারমোনিয়াম্ কিনে দেবেন প্রতিশ্রুত হলেন (রাণাঘাটের পাত্রপক্ষরা মেয়ে গান জানে না ব'লেই এ প্রস্তাব বাতিল ক'রেছিলেন—অন্যদিকে পাত্রটি বড়ই মনোমত ছিল)। এ ঘটনার পর আভাকেও আর এ সম্বন্ধে কোনও খবর দেওয়া হ'ত না।

আমার একজামীন শেষ হ'য়ে গেল। আমিও একটু ঘোরাঘুরি ক'রতে লাগ্‌লাম। কিন্তু ফল একই রকম হ'ল। আমার একজামীনের ফল বেরুল। ফাষ্টক্লাশ ফাষ্ট হ'য়েছি। মা মাসীমা পরম সুখী হ'লেন। বাবাকে টেলিগ্রাম ক'রলাম। শীলা আমাকে একটা তার হাতে বোনা ব্যাগ বক্‌শিস্ দিলে—আভা দিলে আমার নিজের চেহারা তার হাতে আঁকা একটি ড্রয়িং।

শীলার বাবা আমাকে একদিন চুপি চুপি ব'ললেন "তোমার ঠিকুজিটা আমাকে দাও ত', আমার একজন বন্ধু অ্যামেরিকা ফেরৎ, প্রাচ্যমতে জ্যোতিষ গণনা বেশ ভাল করেন। তাঁকে দিয়ে তোমার ভাগ্যটা বিচার করিয়ে দেবো।" আমি মাকে ব'লে কোষ্ঠী তাঁকে এনে দিলাম। তিনি তখনই সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন যখন মনটা ভার ভার, ব'ললেন "তার সঙ্গে দেখা হ'ল না, এটা রেখে দাও।"

শীলা আমাকে ঐকান্তিকভাবে আপনার ভাবে, এর জন্য আমি ভাবি তার আমি কি ক'রতে পারি। তাকে সুখী করার উপায় আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। মনে প'ড়ে গেল, আমার একটি ডাক্তার বন্ধুর কথা। সুপুরুষ সবল স্বাস্থ্যবান সচ্চরিত্র সে ছেলেটি। সম্প্রতি চাকরী হ'য়েছে। ক'লকাতাতেই আছে। বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। পাল্‌টি ঘর। মা ও মাসিমার নিকট প্রস্তাব ক'রতেই তাঁরা লাফিয়ে উঠ্‌লেন। আমি ছেলেটিকে নিয়ে এসে শীলাকে দেখিয়ে দিলাম। শীলাকে দেখান যখন হয়, তখন আভা ফক্কুড়ি ক'রতে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার বন্ধু আভার সরল ও সাবলীল ভাব ভঙ্গী দেখে এবং সে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে শুনে তাকেই পছন্দ করে চ'লে গেলেন। ব'লে গেলেন যে পাশকরা মেয়ে বিয়ে করবেন ঠিক ক'রে-ছিলেন—সেই জন্যই শীলার চেয়ে আভাকেই তিনি বেশী পছন্দ ক'রে ফেলেছেন। আভার বেচারীর অবস্থা যে কি হ'ল তা বলা যায় না। শীলা ত' তাকে ক্ষেপিয়ে তুললে—কত ঠাট্টাই যে ক'রলে, তার শেষ নেই। মোটের ওপর পনর দিনের মধ্যেই আভার সঙ্গে আমার বন্ধু ডাক্তার নির্ম্মল ঘোষের বিয়ে হ'য়ে গেল। (ক্রমশঃ)
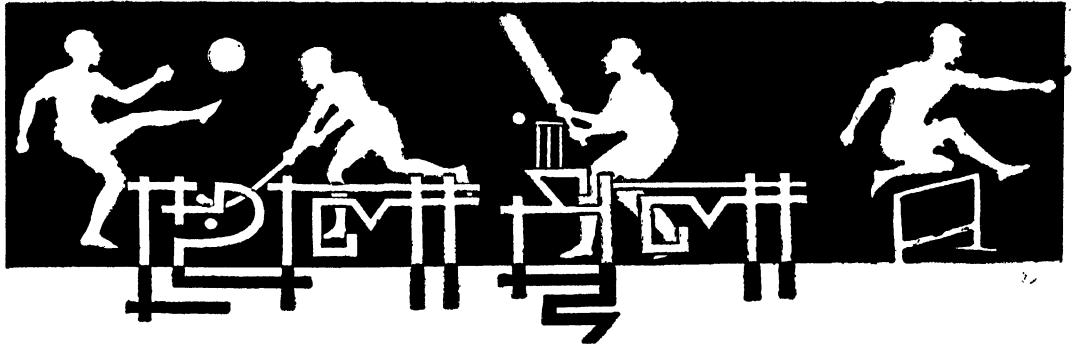
ভারতের বিলাত অভিযান ঃ

এই ভারতীয় অভিযানে মোটের উপর এক হাজার পাউণ্ড অর্থ ক্ষতি হয়েছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বনামধন্য (!) ক্যাপ্টেন মহারাজকুমার স্যর ভিজিয়ানা গ্রাম দল ছাড়া হয়ে বোম্বাইতে এসে পৌচেছেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও খেলার বিষয়ে কোন মতামত দিতে চান নি। দেবার আছেই বা কি? আর মতামত দেবার ক্ষমতাই বা তাঁর কোথায়। ভারতীয় দলের ইংরাজ ম্যানেজার মেজর বৃটেন জোন ব্যবহারে ও দম্ভের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি বিলাতেই রয়ে গেছেন, দলের সঙ্গে ফেরেন নি। বোধ হয় ফেরবার সময় খেলোয়াড়রা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন, তাঁদের আর 'ম্যানেজ' করবার দরকার নেই।

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ জিমখানা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন

বোর্ড কমিটি নিয়োগ ঃ

অমরনাথের ব্যাপার ও ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল আলোচনার পর,

ভূপালে ভারতীয় কণ্ট্রোল বোর্ডের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে :—

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড পর্য্যটন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার, বিশেষতঃ অমরনাথের সম্পর্কি গোলযোগের এবং যে সকল ব্যাপারের ফলে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে, তাহার তদন্তের জন্য বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি এবং বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার জন বোমণ্ট (চেয়ারম্যান), স্যার সিকান্দার হায়াত খাঁ (ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের

হর্লিকের কারখানায় ভারতীয় ক্রিকেট দল—এস ব্যানার্জ্জি, স্যর্ পিটার হর্লিক, বার্ট, এল অমরসিং, মেজর সি কে নাইডু, ডি ডি হিন্দেলকার ও ডব্লিউ আর বাউডেন (ক্যাপ্টেন, হর্লিক ক্রিকেট দল)

প্রাক্তন সভাপতি) এবং পি সুব্বারাওকে (মাদ্রাজ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি) লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক। বোম্বাইয়ে তদন্ত অপ্রকাশ্য ভাবে চলিবে। কমিটির সিদ্ধান্ত প্রেসিডেণ্টকে জানান হইবে এবং তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

দেখা যাক্, তদন্ত কমিটি কি সিদ্ধান্ত করেন। কমিটির তদন্ত 'ক্যামারায়' হবে ঠিক হয়েছে। ইহাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কণ্ট্রোল বোর্ড চান না অমরনাথের ব্যাপারে প্রকৃত দোষীদের স্বরূপ সাধারণে প্রকাশ হয়। গোপনতার প্রচেষ্টার জন্য সাধারণে এই তদন্ত কমিটির মীমাংসা অভ্রান্ত বলে না ধরতেও পারে। মোটের উপর ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়াই হবে। সাধারণের মনে নানা সন্দেহ ঘনিয়ে উঠেছে। এই গোপন তদন্তে সে সকল দূরীভূত হবে বলে মনে হয় না।

বিলাতে ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ—৩৩৩ ও ১৪৬ (৫ উইকেট)

লেভিসন-গাওয়ার দল—২২৫ ও ৩২৯

খেলাটি ড্র হয়েছে। মাস্তাকআলি দ্বিতীয় ইনিংসে প্রশংসনীয় ব্যাটিং করে ৭৮ রান করেছেন, অন্য কেহ সুবিধা করতে পারেন নি। সাট্‌ক্লিফ্ প্রথম ইনিংসে ৯৪, টাউন্‌সেণ্ড ৪০, হেন্‌ড্রেন ২৯। দ্বিতীয় ইনিংসে, ডেম্পার ৫৭, স্মিথ ৫২, সাট্‌ক্লিফ্ ৩৮।

ভারতবর্ষ—৩০৩

ভারতীয় জিমখানা—১৪৪ ও ৮৩।

ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৭৬ রানে বিজয়ী হয়েছে। এ'টা ভারতের বিলাতে শেষ খেলা ছিল।

জয় আউট না হয়ে ১০০ করেছেন, পালিয়া ৫৫, মাস্তাকআলি ৪৮। ভারতীয় জিমখানার প্রথম ইনিংসে দেশরামের ২৮ ও পুরীর ২৫ সর্ব্বোচ্চ। দ্বিতীয় ইনিংসে কেহ কুড়িও করতে পারেন নি।

প্রথম ইনিংসে—ব্যানার্জ্জি ৫৬ রানে ৩, সি এস নাইডু ২১ রানে ৪, জাহাঙ্গীর খাঁ ৩৮ রানে ২ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে—পালিয়া ২৬ রানে ২, গোপালন ১৩ রানে ২, আমীর ইলাহী ১৯ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

বিলাতে এইবারের অভিযানে ভারতবর্ষ মোট ৩৩টি খেলা খেলেছে। মাত্র ৫টি খেলায় জয়ী, ১০টি খেলায়

পরাজিত, ও ১৪টি খেলা অমীমাংসিত হয়ে শেষ এবং ১টি খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে।

সেঞ্চুরীর হিসাব ঃ

ভারতের পক্ষে :

মাস্তাকআলি (৪)

১৩৫ রান বিপক্ষে মাইনর কাউন্টি
১৪১ " " সারে
১১২ " " ইংলণ্ড (দ্বিতীয় টেষ্ট)
১৪০ " " লেভিসন গাওয়ার ইলেভন

অমরনাথ (৩)

১১৪ (নট্ আউট) বিপক্ষে নর্থদাম্পটন্স্
১৩০ ও ১০৭ „ এসেক্স

ভি এম মার্চ্চেন্ট (৩)

১৫১ বিপক্ষে সোমারসেট
১৩৫ (নট্ আউট) বিপক্ষে ল্যাঙ্কাসায়ার (দ্বিতীয় ম্যাচ)
১১৪ বিপক্ষে ইংলণ্ড (দ্বিতীয় টেষ্ট)।

এস ওয়াজির আলি (২)

১৩৯ (নট্ আউট) বিপক্ষে ডারহামস্
১৫৫ („) „ ইংলণ্ড ইলেভন

দিলওয়ার হোসেন (২)

১০১ (নট্ আউট) বিপক্ষে ওয়ারউইক্সায়ার
১২২ „ সাসেক্স

বাকাজিলানী (১)

১১৩ বিপক্ষে লিষ্টারস্

সি রামস্বামী (১)

১২৭ (নট্ আউট) বিপক্ষে ল্যাঙ্কাসায়ার

এল পি জয় (১)

১০০ (নট্ আউট) বিপক্ষে ভারতীয় জিমখানা

ভারতের বিপক্ষে :

হ্যামণ্ড (২)

১৬৭ বিপক্ষে ভারতবর্ষ (দ্বিতীয় টেষ্ট)
২১৭ বিপক্ষে ভারতবর্ষ (তৃতীয় টেষ্ট)

এইমস্ (২)

১৪৫ কেন্টের হ'য়ে
১০৭ ইংলণ্ড ইলেভনের হ'য়ে

ওয়ার্দ্দিংটন ১২৮ (তৃতীয় টেষ্টে)
গিমব্লেট (সোমারসেট) ১০৩
বেকওয়েল (নর্দ্দাম্পটন্স্) ১০০ (নট্ আউট)
হিউম্যান (এম সি সি) ১১৫
কাটমোর (এসেক্স) ১৩৭
জে স্মিথ (এসেক্স) ১০৫
ওয়াসব্রুক (ল্যাঙ্কাসায়ার) ১১৩
ওল্ডফিল্ড (ল্যাঙ্কাসায়ার) ১০৭
অ্যাস্‌ডাউন (কেন্ট) ১১৭
ফ্যাগ (কেন্ট) ১৭২
জন্ ল্যাংরিজ (সাসেক্স) ১৬৮
এ মেলভিল (সাসেক্স) ১৫২
বি এইচ্ ভ্যালেনটাইন (ইংলণ্ড ইলেভন) ১১৫

১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের খেলোয়াড় যাঁরা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন :—

ব্যাটিং ঃ

নাম	ইনিংস্	নট্ আউট	রান	শতরান সংখ্যা	গড়-পড়তা
১৯৩০					
এইচ্ সাট্‌ক্লিফ	৪৪	৮	২,৩১২	৬	৬৪·২২
কে এস দলীপ সিংজী	৪৮	৩	২,৫৬২	৯	৫৬·৯৩
১৯৩১					
এইচ্ সাট্‌ক্লিফ্	৪২	১১	৩,০০৬	১৩	৯৬·৯৬
নবাব পতৌদী	২৫	৪	১,৪৫৪	৬	৬৯·২৩

হ্যামণ্ড
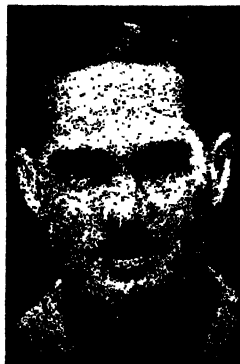
সাট্‌ক্লিফ

নাম	ইনিংস	নট্ আউট	রান	শতরান সংখ্যা	গড়-পড়তা
১৯৩২					
এইচ্ সাট্‌ক্লিফ্	৫২	৭	৩,৩৩৬	১৪	৭৪·১৩
ই টিলডেস্‌লে	৪৮	৭	২,৪২০	৮	৫৯·২০
১৯৩৩					
ডব্লিউ আর হ্যামণ্ড	৫৪	৫	৩,৩২৮	১৩	৬৭·৮২
সি পি মীড্	৪৪	৬	২,৫৭৬	১০	৫৭·৭৮
১৯৩৪					
নবাব পতৌদী	১৫	৩	৯৪৫	৩	৭৮·৭৫
হ্যামণ্ড	৩৫	৪	২,৩৬৬	৮	৭৬·৩২
১৯৩৫					
হ্যামণ্ড	৫৮	৫	২,৬১৬	৭	৪৯·৩৫
এইচ্ সাট্‌ক্লিফ্	৫৪	৩	২,৪৯৪	৮	৪৮·৩৯
১৯৩৬					
হ্যামণ্ড	৪২	৫	২১০৭	৩১৭ (সর্ব্বোচ্চ)	৫৬·৯৪
এড্‌রিচ	৯	১	৪৪০	১১৪ (,,)	৫৫·০০

বোলিং ঃ

নাম	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়-পড়তা
১৯৩০					
এইচ্ ভেরিটি	৪০৬·১	১৫৪	৭৯৫	৬৪	১২·৪২
সি পার্‌কার্	১,০১৬·৩	৩০১	২,২৯৯	১৭৯	১২·৮৪
১৯৩১					
এইচ্ লার্‌উড্	৬৫১·৩	১৪২	১,৫৫৩	১২৯	১২·০৩
এইচ্ ভেরিটি	১,১৩৭·৩	৩৫৬	২,৫৪২	১৮৮	১৩·৫২
১৯৩২					
এইচ্ লার্‌উড্	৮৬৬·৪	২০৩	২,০৮৪	১৬২	১২·৮৫
এইচ্ ভেরিটি	১,১১৭·৫	৪০১	২,২৫০	১৬২	১৩·৮৮
১৯৩৩					
এইচ্ ভেরেটি	১,১৯৫·৪	৪২৮	২,৫৫৩	১৯০	১৩·৪৮
এ পি ফ্রিম্যান	২,০৩৯	৬৫১	৪,৫৪৯	২৯৮	১৫·২৬
১৯৩৪					
জে ই পেন	১,২৮৫·৫	৪৬৩	২,৬৬৪	১৫৬	১৭·০৭
এইচ্ লার্‌উড্	৫১২·২	১০৩	১,৪১৫	৮২	১৭·২৫
১৯৩৫					
এইচ্ ভেরিটি	১,২৭৯·২	৪৫৩	৩,০৩২	২১১	১৪·৩৬
জে সি ক্লে	৪৫৫·৪	১২০	১,০১৭	৬৭	১৫·১৭
১৯৩৬					
লার্‌উড্	৬৭৯·১	১৬৫	১,৫৪৪	১১৯	১২·৯৭
ভেরিটি	১,২৮৯·৩	৪৬৩	২,৮৪৭	২১৬	১৩·১৮

ইংলণ্ডের টেষ্ট ক্রিকেট দল ঃ

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে অষ্ট্রেলিয়াভিমুখে ইংলণ্ডের ক্রিকেট দল যাত্রা করেছেন। ওয়াটারলু ষ্টেশনে তাঁদের বিপুল বিদায় সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছে। তাঁরা সাউদাম্পটন থেকে "ওরিয়ন" জাহাজ ধরেছেন।

দলে আছেন :—জি ও এলেন (ক্যাপ্‌টেন), ওয়্যাট, রবিন্স, কে ফার্‌নেস্, হ্যামণ্ড, বার্নেট, ডাকওয়ার্থ, হার্ডষ্টাফ্ ভয়েস, লেল্যাণ্ড, ভেরিটি, এইমস্, ওয়ার্দিংটন, কপ্‌সন্, ফ্যাগ, সিম্‌স্ ও ফিস্‌লক্।

খেলোয়াড়রা ১৩ই অক্টোবর তারিখে ফারম্যান্‌টেলে পৌছাবেন এবং ১৬ই তারিখে ওয়েষ্ট অষ্টেলিয়ার সঙ্গে প্রথম ম্যাচ খেলবেন। অষ্ট্রেলিয়ায় সর্ব্ব সমেত ২২টি খেলা হবে, তার মধ্যে ৫টি টেষ্ট ম্যাচ।

টেষ্ট খেলার তারিখ :—

প্রথম টেষ্ট, ব্রিস্‌বেনে,—৪ঠা থেকে ৯ই ডিসেম্বর, ৩৬ ;

দ্বিতীয় টেষ্ট, সিডনে,—১৮ই থেকে ২৩শে ডিসেম্বর, ৩৬ ;

তৃতীয় টেষ্ট, মেলবোর্ণে,—১লা থেকে ৬ জানুয়ারী, ৩৭ ;

চতুর্থ টেষ্ট, এডেলেডে,—২৯শে থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী, ৩৭ ;

পঞ্চম টেষ্ট, মেলবোর্ণে,—২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা মার্চ্চ, ৩৭ ;

ভেরিটি (ইয়র্কসায়ার বোলার)

বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির কৃতিত্ব ঃ

বোম্বাইয়ে কলিকাতার বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি ওয়াটার পোলো খেলায় ও সন্তরণে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রাজারাম সাহু ১১০ গজ সাঁতারে পি ভারুচাকে পরাজিত করেছেন। সময়—১ মিনিট ১০ সেকেণ্ড।

১০০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারও ৫৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে জয়ী হয়েছেন।

১০০ গজ ব্রেক ষ্ট্রোক ১ মিনিট ১৬$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে প্রফুল্ল মল্লিক বিজয়ী হয়েছেন।

প্রফুল্ল মল্লিক

বৌবাজার দল ওয়াটার পোলো খেলায় পার্শী 'বি' দলকে ৭-১ গোলে হারিয়েছেন। গৌরহরি একাই ৬টি গোল দিয়েছেন।

গোলভালা হিন্দু টীমকে ১০-১ গোলে হারিয়েছেন—গৌরহরি দাস ৪টি, নরেন ঘোষ ৩টি, যামিনী দাস ৩টি গোল করেছেন।

ইউরোপীয়ান পলো এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে খেলে তাঁরা ১০-২ গোলে জয়ী হয়েছেন। যামিনী দাস ৫টি, গৌরহরি ৩টি, রাজারাম সাহু ১টি ও নরেন ঘোষ ১টি গোল দেন।

চ্যারিটি ম্যাচ খেলায় তারা বোম্বাইদের বাছাই ওয়াটার পলো দলকে ৪ গোলে হারিয়ে তাদের কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল।

তাঁরা ১২-২ গোলে ক্যাথেড্রাল ওল্ড বয়েজদের হারিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। বোম্বাইয়ে মাত্র একটি খেলায় তাঁরা পরাজিত হয়েছেন, সেটি হিন্দু ও পার্শী মিলিত দলের নিকট ৫-২ গোলে। এই পরাজয়ের জন্য তাঁদের গোল রক্ষকই বিশেষ দায়ী। তা' ছাড়া বিপক্ষ দল ভয়ানক ফাউল করে খেলেছিলো।

সাত মাইল সন্তরণ ঃ

দুর্গাচরণ দাস (কলেজ স্কোয়ার) গত বৎসরের বিজয়ী মদনমোহন সিংকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে ৫৩ মিনিট ৫৩

দুর্গাচরণ দাস

সেকেণ্ডে। দ্বিতীয় মদনমোহন সিং (আনন্দ স্পোর্টিং) ২ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড পরে পৌছেছেন। ৩য়, মন্মথনাথ ঘোষ (আর্য্য মিশন)। ৪র্থ, তুথীরাম মল্লিক (শ্মশানেশ্বর) ৫ম, কাশীনাথ কেশরবালী (সেণ্ট্রাল)। ৬ষ্ঠ, মোহিত-মোহন দে (কলেজ স্কোয়ার)। ৭ম, চুণীলাল দাস (মুখার্জ্জিপাড়া ক্লাব)।

পূর্ব্ব বিজয়ীগণ :—১৯৩১ ; ডি এন দাস (শ্মশানেশ্বর)।

১৯৩২ ; এস কে দে (ন্যাসনাল), ১৯৩৩ ; ডি মল্লিক (শ্মশানেশ্বর)। ১৯৩৪ ; এন সি মল্লিক (ন্যাসনাল)। ১৯৩৫ ; মদনমোহন সিং (আনন্দ স্পোর্টিং)।

বালিকা সন্তরণকারিণীদের মধ্যে বাণী ঘোষ দ্বাদশ স্থান ও লীলা চট্টোপাধ্যায় সপ্তদশ স্থান এবং সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা সপ্তবিংশ স্থান অধিকার করেছে।

এগার বৎসর বয়স্ক বালক সন্তরণকারী শচীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় অনেক তরুণ বয়স্কদের হারিয়ে একাদশ স্থান অধিকার করে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে। দশম বৎসরের বালক রমেশ খাণ্ডেলওয়ালা ত্রয়োবিংশ হয়েছে। মোট আটাশ জন প্রতিযোগী যোগ দেয়, তার মধ্যে ৪ জন

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সন্তরণ প্রতিযোগিতার বালিকা সন্তরণকারিণীগণ

বালিকা ছিল। একজন ব্যতীত সকলে নির্দ্ধারিত পথ অতিক্রম করেছে। বেলা ৩-৩৮ মিনিটে সাঁতার আরম্ভ হয়।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন মদনমোহন সিংকে ১৯৩৭ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বেঙ্গল অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান হ'তে বিরত হবার আজ্ঞা দিয়েছেন। কারণ, মদনমোহন খিদিরপুর সুইমিং স্পোর্টসে যোগদান করেছিলেন। খিদিরপুর ক্লাব বেঙ্গল অলিম্পিক ভুক্ত নহে।

নবাগত মিলিটারী দল ঃ

আগামী নভেম্বরে কিংস্ ওন্ স্কটিস্ বর্ডারার্স লক্ষ্ণৌ থেকে ফোর্ট উইলিয়মে আসবে এবং ডিসেম্বরে ক্যামারোনিয়াস্ ল্যাণ্ডিকোটাল থেকে বারাকপুরে আসবে। উভয় মিলিটারী দলই স্কটল্যাণ্ডবাসী, এবং এই দুটি দলই ফুটবল খেলায় বিশেষ দক্ষ। আগামী বৎসর লীগ খেলা বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক হবে বলে মনে হয়, কিংস্ ওন্ লক্ষ্ণৌয়ের ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোয়েটার মসলিম ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ডেভনস্ লক্ষ্ণৌতে চলে যাবে এবং ব্ল্যাকওয়াচ ভারত ত্যাগ করবে।

আইরিস্ লীগ বনাম ইংলণ্ড লীগ ঃ

ইণ্টার লীগ খেলায় আইরিস্ লীগ ৩-২ গোলে ইংলিস লীগকে হারিয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড ঃ

বি জি প্রেস ২-১ গোলে কিলবার্ণকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। এ দেব দু'টি গোলই দিয়েছে।

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

দীর্ঘ দশ বৎসর পরে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ রিপণ কলেজকে হারিয়ে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। এই সফলতার জন্য ব্যক্তিগত দাবী সবচেয়ে বেশী তাদের গোলরক্ষক রবিন ভট্টাচার্য্যের। রবিন এই শীল্ডের সমস্ত খেলাগুলির মধ্যে মাত্র একটি গোল খেয়েছে, তাও পেনালটিতে। ফাইনাল খেলার দিন তার বিপক্ষদের উপর্য্যুপরি কঠিন সট রক্ষা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের টীম মনোনয়ন কমিটি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলরক্ষক মনোনয়ন

ক'রেছেন। সেদিন সে ছাড়া স্কটিশের পক্ষে ভাল খেলেছিলো তাদের রাইট আউট।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে

ফাইনালে উঠেছিল বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী কলেজ। এই দুই দল পূর্ব্বে বহুবার এই শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। খেলাটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হ'য়েছিল। প্রথম দিন খেলার ফল ১-১ গোলে হওয়ায় শেষ মীমাংসা হয় নি। দ্বিতীয় দিন খেলায় বিদ্যাসাগর প্রথমে খুব চাপিয়া ধরে ও একটি গোল দেয়। হাফ্-টাইমের একটু পরেই বঙ্গবাসী গোলটি শোধ দেয় ও বিশেষ আক্রমণ করেও ফরওয়ার্ডদের খারাপ সুটিংএর জন্য আর গোল ক'রতে পারে না। খেলা শেষের একটু আগে বিদ্যাসাগর আর একটি গোল দিয়ে বিজয়ী হয়। সেদিন বিদ্যাসাগরের পক্ষে চৌধুরী, এ মিত্র, ও এস্ সিংহ এবং বঙ্গবাসীর পক্ষে তালুকদার, বি ভট্টাচার্য্য, মিশ্র ও এ সাহা ভাল খেলেছে।
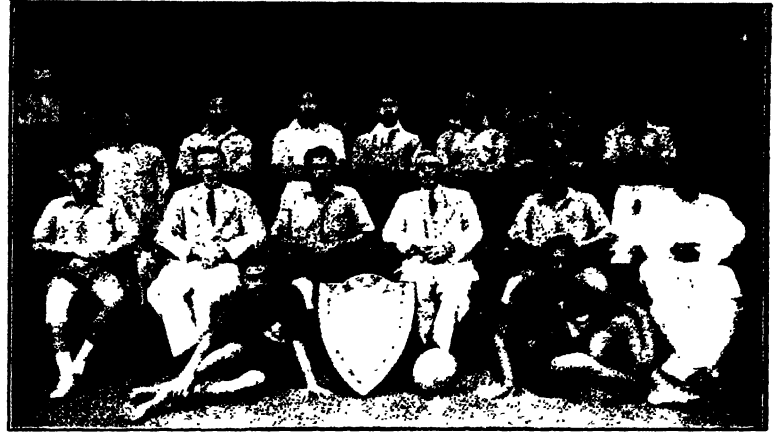
ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ

(বসিয়া)—এইচ ভট্টাচার্য্য, মিঃ এম ডি গ্রে, এ মিত্র, ডাঃ আর কুহার্ট (প্রিন্সিপাল), বি গুপ্ত, মিঃ জে মল্লিক ; (দাঁড়াইয়া)—মালি, এস দাসগুপ্ত, পি বোস, রবিন ভট্টাচার্য্য, এন সিংহ, এস ব্যানার্জ্জি, আর বাউল ; (মাটীতে)—বি ঘোষ ও বি বোস।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড বিজয়ী বিদ্যাসাগর কলেজ

(উপরে)—এস মুখার্জ্জি (ক্যাপ্টেন), (দাঁড়াইয়া)—এ দাস, বি বসু, এস সিংহ, এ মিত্র, বি ঘোষাল, (বসিয়া)—আর দে, এস চ্যাটার্জ্জি, প্রফেসর সুধাংশু বসু. এ দে ও অমর দেব, (মাটীতে)—এ বসু, টি চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান ফুটবল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ঃ

লক্ষ্ণৌয়ের এই শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড আর এ ২-০ গোলে ১০ম রয়েল হুসারকে হারিয়ে এবং আগ্রার ওয়েলচ্ রেজিমেণ্ট ১-০ গোলে দিল্লীর ইয়ং মেন্‌স্ এফ্ সিকে হারিয়ে পৌছিয়েছে।

ক্যালকাটা রাগবী কাপ ঃ

ফাইনালে ক্যালকাটা দল ৩ পয়েণ্টে বি এন আরকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। গত বৎসরে বি এন আর ৮-৬ পয়েণ্টে ক্যালকাটাকে হারিয়েছিল।

অল্ ইণ্ডিয়া রাগবী টুর্ণামেণ্ট ঃ

বোম্বায়ে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ১৬-৩ পয়েণ্টে বি এন আরকে ফাইনালে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। খেলাটি বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক হয় নি। ক্যালকাটা বি এন আরের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট খেলেছে।

আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ ঃ

ফ্রেড পেরী ২-৬, ৬-২, ৮-৬, ১-৬ ও ১০-৮ গেমে ডোনাল্ড বাজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

সাবুর ও মেটা

পেসিফিক্ সাউথ-ওয়েষ্ট টুর্ণামেণ্ট ঃ

লস্ এঞ্জেলেসে ফাইনাল খেলায় ডোনাল্ড বাজ ৬-২, ৪-৬, ৬-১, ৬-৩ গেমে পেরীকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

ডবল খেলাতেও বাজ ও মাকে ১৪-১২, ৬-৩, ৬-০ গেমে পেরী ও শিল্ডকে হারিয়েছেন।

হার্ড কোর্ট টেনিস ঃ

ওয়াই আর সাবুর ৬-০, ৩-৬ ও ৬-৩ গেমে মেটাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

সাউথ ক্লাবের হার্ড কোর্ট :

মিক্সড ডবলসে হজেস ও মিস এডনি ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে ব্রুক এডওয়ার্ডস্ ও মিস হার্ডে জনষ্টনকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।

হার্ডকোর্ট টেনিস ফাইনাল বিজিত ব্রুক এডওয়ার্ডস্ ও মিস্ হার্ডে জনষ্টন, বিজয়ী মিসেস এড্‌নে ও হজেস

বিলাতের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

প্রথম ডিভিসন লীগে ডার্ব্বি প্রথম এবং এভারটন, পোর্টস্‌মাউথ ও ষ্টোক্ এই তিনটি দল একযোগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

মেয়েদের সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

আনন্দমেলার উদ্যোগে মেয়েদের দ্বিতীয় বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করেছে।

'এ' বিভাগের ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে ও ৫০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোকে কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট্রাল) প্রথম হয়েছে। সময় ১ মিনিট ৪৮⅘ সেকেণ্ড ও ৫৪ সেকেণ্ড।

'বি' বিভাগের ৫০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল ও ৩৫ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোকে কুমারী রমা সেনগুপ্তা (খেলাঘর) প্রথম হয়েছে। সময়—৪৫⅗ সেকেণ্ড ও ২৫ সেকেণ্ড।

'সি' বিভাগের ৫০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে কুমারী সরস্বতী সাহা (সেণ্ট্রাল) প্রথম হয়েছে। সময়—৫৪⅖ সেকেণ্ড।

আই এফ এর গ্যালারীর ব্যবস্থা ঃ

আই এফ এ ষ্টাডিয়মের বদলে খেলার মাঠের টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিজ হাতে নিতে চেষ্টা করছেন। শোনা যায়, যে উপস্থিত কণ্ট্রাক্টররা ও কয়েকটি বিশিষ্ট ক্লাব ইহাতে আপত্তি করেছেন। কণ্ট্রাক্টারদের আপত্তির কারণ স্পষ্ট বোঝা যায়, ইহাতে তাদের এই ব্যবসাটি যায় ও আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু বিশিষ্ট কয়েকটি ক্লাবের আপত্তির কারণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। কোন্ কোন্ ক্লাব আপত্তি করেছেন ও কি কারণে করেছেন তাহা জানা যায় নাই। আমরাই পূর্ব্বে চৈনিক ফুটবল দলের খেলা উপলক্ষে আই এফ একে বলেছিলুম যে তাঁরা অন্ততঃ পক্ষে গ্যালারী ঘেরা নিজস্ব মাঠের বন্দোবস্ত করুন, তাহ'লে চৈনিকদের খেলার জন্ত ক্যালকাটা ক্লাবকে কন্‌সেসন বাবদ যে টাকাটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল সেটা বাঁচতো এবং ঐরকম ব্যবস্থায় আর্থিক আয় হলে ভবিষ্যতে ষ্টাডিয়ম নির্ম্মাণের ব্যয়ের জন্ত চিন্তার কারণ থাকবে না। যাতে খেলার মাঠে গ্যালারীর বন্দোবস্ত করবার ভার পান সে বিষয়ে আই এফ এর বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আশা করা যায় যে এ বিষয়ে বাঙ্গলার লাট ও কলিকাতার পুলিস কমিশনার আই এফ একে সাহায্য করবেন। কিন্তু আই এফ এও যেন মনে রাখেন যে এ ব্যবস্থা পেলে তাঁদের আরো উন্নতর বন্দোবস্ত করতে হবে যাতে জনসাধারণ অল্প খরচায় বেশী সুবিধায় ও আরামে খেলা দেখতে পায়। অবিচার অত্যাচারের লাঘব হয়।

মেয়েদের সিনিয়র বাস্কেট-বল লীগ চ্যাম্পিয়ন ওয়াণ্ডারার্স দল ছবি—জে কে সান্যাল

ভারতীয় দলের ব্যাটিং ঃ

নাম	ইনিংস সংখ্যা	রান	রান	নট্ আউট্	গড়পড়তা
বিজয় মার্চ্চেণ্ট	৪০	১৭৪৫	১৫১	৬	৫১·৩২
দিলওয়ার হোসেন	১৭	৬২০	১২২	৩	৪৪·২৮
অমরসিং	১১	৩৩৩	৭৭	১	৩৩·৩০
অমরনাথ	২০	৬১৩	১৩০	১	৩২·২৬
রামাস্বামী	২৮	৭৩৭	১২৭	৪	৩০·৭০
ওয়াজির আলি	২৮	৬৫৯	১৫৫	৫	২৮ ৬৫
সি কে নাইডু	৪২	১১০২	৮৩	০	২৬·২৩
মস্তাক আলি	৪৪	১০৭৮	১৪১	১	২৫·০৬

বোলিং ঃ

নাম	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়পড়তা
অমরনাথ	২৬৭·৩	৭১	৬৬৮	৩২	২০·৮৭
অমরসিং	২৯৩·৪	৯৪	৬১১	২৬	২৩·৫০
নিশার	৫৪৭·৫	১১২	১৬৫৯	৬৬	২৫·১৩
জাহাঙ্গীর খাঁ	৪২৫·৫	৯৮	১০৪৫	৪০	২৬·১২
সুটে ব্যানার্জ্জি	৩২৯·৩	৩৭	১১৭৭	৪০	২৯ ৪২
সি কে নাইডু	৪৯৯·৫	৬৬	১৬২১	৫১	৩১·৭৮
সি এস নাইডু	২৩৯·৩	১৭	১০৫৯	৩৩	৩২·০৯

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রত্যাবর্ত্তন ঃ ১লা অক্টোবর ক্রিকেট দলের ১২ জন খেলোয়াড় বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তাঁদের কোন বিবৃতি প্রদান না করতে বোর্ড অনুরোধ করেছেন। তদন্ত কমিটির সভাপতি স্যর জন বোমণ্টের অভিপ্রায়ে সেই দিনই সন্ধ্যায় দলের কয়েকটি খেলোয়াড় সাক্ষ্য দিতে গিয়েছেন। সি কে নাইডু আমেরিকা হয়ে ফিরবেন। সি এস নাইডু বিলাতে রয়ে গেছেন। মার্চ্চেণ্ট ও রামাস্বামী অন্যান্য দেশ ভ্রমণের পরে আসবেন।

বয়েজ স্কাউট দলের সাইকেলে প্রথম আউটিং—কলিকাতা থেকে গঙ্গা নগর। বার মাইল দূরে যশোর রোডে নৃপেন পার্কে গৃহীত আলোক চিত্র ছবি—তারকদাস
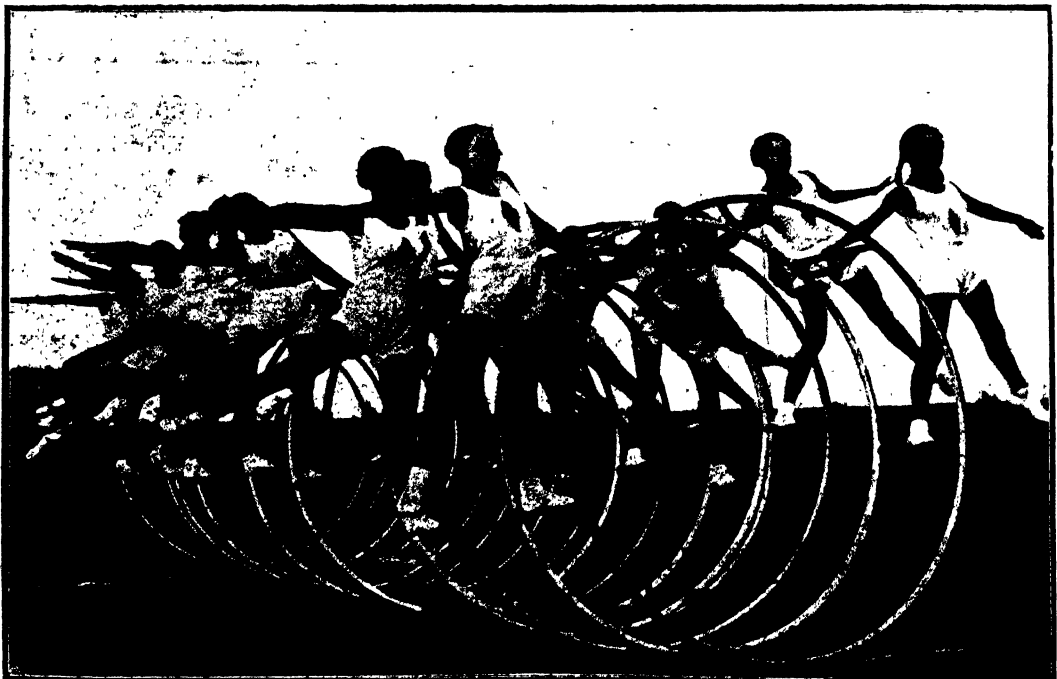
ইণ্টার-ন্যাসনাল রোন হুইল প্রতিযোগিতা—বার্লিনে ষ্টেট রেলওয়ে স্পোর্টিং ক্লাবের তরুণীদের বিশেষ প্রদর্শন

স্বাগতম্ বিজয়ী বীর ৪

২৯শে তারিখে বোম্বাইয়ে পৃথিবী বিজয়ী ভারতীয় হকিদল অবতরণ করেছেন। আমরা মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বোম্বাইয়ে বিজয়ী বীরদের মাতৃভূমির বিজয়ে উল্লসিত দেশবাসী কর্ত্তৃক বিপুল সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছে। ক্যাপ্‌টেন ধ্যানচাঁদ বলেছেন,—আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করেছি, অলিম্পিকে ভারতের জয়-পতাকা উড্ডীন রেখেছি। আমার দলের খেলোয়াড়রা প্রকৃত খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি নিয়ে খেলেছে এবং আমাদের মাতৃভূমির সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

হাই কমিশনার স্যর্ ফিরোজ খাঁ নুন ও ভারতীয় হকি খেলোয়াড়গণ। স্যর্ ফিরোজ অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয়দের সম্বর্দ্ধনা দিয়েছেন

সিমলা মিউনিসিপাল স্পোর্টসের গোলরক্ষক অর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ডের ফরওয়ার্ডের একটি দারুণ সট্ রক্ষা করছে

বোম্বাই কর্পোরেশন অলিম্পিক বিজয়ী হকিদলকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা দিয়েছেন। বোম্বাইয়ের মেয়র যমুনাদাস

যেটা তাঁর অভিভাষণে বলেছেন,—হকি খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কালে নূতন ভারত আইন (!) (সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা) অনুসারে করা হয় নি, কেবল খেলোয়াড়ের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছিল। এই কারণেই সফলতা অর্জ্জন হয়েছে। এই ব্যবস্থা যদি ভারতীয় অন্যান্য দলের মনোনয়ন সম্বন্ধে আরোপ করা হয়, তবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নত স্থান অধিকার অসম্ভব হবে না।

অভিনন্দনের উত্তরে ম্যানেজার জগন্নাথ বলেছেন,—তাঁর দলের খেলোয়াড়রা একই পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করেছে, তাদের একটি অন্যায়ের কথাও তিনি স্মরণ করতে পারেন না।

উম্বলডন জুনিয়র লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ন বিজয়িনী চৈনিক বালিকা মিস্ জেম হোয়িং, চ্যাম্পিয়নসিপ্ কাপ্ হস্তে

ক্যাপ্টেন ধ্যানচাঁদ বলেছেন,—খেলোয়াড়দের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য থাকার জন্যই তাঁরা জয়লাভে সমর্থ হয়েছেন।

ইউরোপের হকিখেলা সম্বন্ধে ম্যানেজার জগন্নাথ বলেছেন, ভারতীয় ও ইউরোপের খেলোয়াড়দের খেলার প্রধান পার্থক্য এই, ভারতীয়রা বলের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োয় কিন্তু ইউরোপীয়রা বলের পেছনে ছোটে। জার্ম্মাণী হকি খেলায় যেরূপ উন্নতি কর্‌ছে, তাতে পরবর্ত্তী অলিম্পিকে ভারতের শক্তিশালী বিপক্ষের সঙ্গে যুঝ্‌তে হ'বে। তাঁর মতে পৃথিবীর হকিদলের পর্য্যায় এইরকম—ভারতবর্ষ, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, আফ্‌গানিস্থান, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড।

এই সঙ্গে স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, কেন ভারতীয় ক্রিকেট দলে এইরূপ পূর্ণ ঐক্যতা সম্ভব হয় নি। কেন তাঁরা

ক্যালকাটা বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন মিস্ মেরী জ্যাকব

ভারতের অপর একটি বিভিন্ন প্রদেশের ও জাতির লোক নিয়ে গঠিত দলের মতন এক পরিবারভুক্ত হয়ে ভারতের সম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা করতে পারলেন না। কোথায় গলদ, যে জন্য শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসতে হলো, বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় সম্মান পেলেন না, পরস্পরে মিল রইল না, ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজার দলের লোকদের মান রাখলেন না এবং তাঁরাও তাঁদের প্রীতি পেলেন না। খেলায় উপর্য্যুপরি হার হতে লাগলো। ঐক্যতা ও team spiritএর অভাবই এরূপ দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ।

বোম্বাই কাষ্টমসের সঙ্গে অলিম্পিক প্রত্যাগত হকি দলের একটি খেলা হয়। অলিম্পিক দল ২-১ গোলে জয়ী হয়েছেন। জাফর দুটি গোলই দিয়াছেন।

অলিম্পিক হকিদল ৬—৪ গোলে বাঙ্গালোর দলকে হারিয়েছে। ধ্যানচাঁদ ২, রূপসিং ৩ ও এমেট ১ গোল দিয়েছেন।

অলিম্পিক হকিদল ৫-০ গোলে মাদ্রাজ দলকে হারিয়েছে।

ডুরাণ্ড ঃ

সিমলায় ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ হয়েছে। মোট ২৯টি দল যোগ দিয়েছে। এবারে ডুরাণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, চারটি ভারতীয় দল কলিকাতা থেকে যোগদান করেছিল—মোহন বাগান, এরিয়ান, ভবানীপুর ও সিটি এ সি। শেষোক্ত দলকে কেন যে আই এফ এ ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে অনুমতি দিলেন তা বোধ-গম্য হলো না। তারা প্রথম খেলাতে রয়েল স্কট দলের নিকট ৯-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। ভবানীপুর ৯-০ গোলে হিন্দু ও মসলিম ফুটবল ক্লাবকে চমৎকার খেলে হারিয়ে পরের খেলায় গ্রীণ হাওয়ার্ডসের কাছে ৪-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। গ্রীণ হাওয়ার্ডস্ ভাল খেললেও ভবানীপুরের চার গোলে হার হতো না, যদি না তাদের শ্রেষ্ঠ হাফব্যাক গুহ পায়ে আঘাত পেয়ে কিছুক্ষণ মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হতো। সেই সময়ে তাদের বিপক্ষে দু'টি গোল হয়।

ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায়—এরিয়ানের খেলোয়াড়গণ

ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায়—মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

মোহনবাগান প্রথম খেলায় রোভার্স ফুটবল ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দেয়। এ রায় চৌধুরী দু'টি ও কুমার একটি গোল করেন। রোভার্স'রা একটি পেনালটি পেয়েও গোল করতে পারে নি। মোহনবাগানের খেলা তাদের সুনামের অনুযায়ী হয় নি, সেদিন তাদের দু'জন ভালো খেলোয়াড় খেলে নি। এস চৌধুরী বেশ ভালই খেলেছিল। দ্বিতীয় খেলা হয় রাওলপিণ্ডি আগত রয়েল সিগ্‌নাল দলের সঙ্গে। মোহনবাগান ভাল খেলেও অতিরিক্ত সময়ে এক গোলে হেরেছে। এদিন অপরাহ্নে সিমলায় প্রবল বারিপাত হয়। তা সত্বেও মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্য বহু লোক মাঠে উপস্থিত ছিল। এবারের ডুরাণ্ডের আর একটি বিশেষত্ব যে খেলোয়াড়রা অত্যন্ত ফাউল
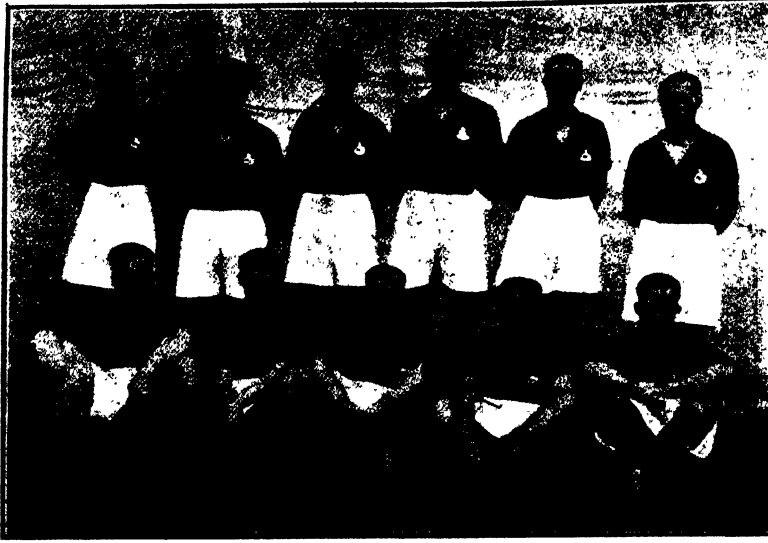
রোভার্স কাপ বিজয়ী মুলতানের কিংস রেজিমেণ্ট সৈনিক দল। ইহারা ডুরাণ্ডে আর্ম্মি হেড কোয়াটার্স স্পোর্টস্ ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে, আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ডের কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে

বিরুদ্ধে ১৩ বার। এরিয়ানের হ'য়ে বাঙ্গালোরের বিখ্যাত খেলোয়াড় রহমত ও তার ভাই হবিব খেলেছিল। রহমত তার পূর্ব্বের জায়গা লেফ্‌ট্‌-ইনে অতি সুন্দর খেলেছে, হবিব ব্যাকে খেলেছে। এই দু'জন বাইরের খেলোয়াড় খেলানর বিপক্ষে চেশায়ার অভিযোগ করেছিল, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হওয়ায় তাদের অভিযোগের সঙ্গে জমা দেওয়া ২০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আই এফ এ জানিয়েছেন যে ঐ দু'জনই এরিয়ানের পুরাতন মেম্বার। ডুরাণ্ডের নিয়মানুসারে খেলছে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ৬টি ও রয়েল সিগ্‌নালের বিরুদ্ধে ১২টি ফাউল হয়েছে। এস চৌধুরী বহুবার অফ্‌-সাইড হ'য়ে অনেক সুযোগ নষ্ট করে। হাফ্‌ব্যাকে সুশীল চ্যাটার্জ্জি চমকপ্রদ খেলেছে। ব্যাকরা সুন্দর খেলেছে, ফরওয়ার্ডরা বেশ আদান প্রদান করে খেলেছে—এ দেব ও নন্দ রায় চৌধুরীর খেলা উৎকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এ দেব ৪ গজ দূরে বল পেয়ে বিলম্ব করায় যে সুযোগ নষ্ট হ'লো তা অমার্জ্জনীয়। আর পেনালটি পেয়ে কে দত্ত গোল থেকে গিয়ে এমন খারাপ সট করলে যে গোলরক্ষক তা' অক্লেশে আট্‌কালে। গোরাদের লেফ্‌ট্‌ আউট ফষ্টারের এস দত্তের সঙ্গে ধাকাধাক্কিতে ওষ্ঠ কেটে ও দু'টি দাঁত ভেঙ্গে যায়। অতিরিক্ত সময়ের শেষার্দ্ধে জটলার মধ্য থেকে সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিন্‌লিসাইড একমাত্র গোলটি দিয়ে মোহন-বাগানকে পরাজিত করলে।

এরিয়ানরা সর্ব্বাপেক্ষা ভালো খেলছে। ছনে মজুমদারের খেলা খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছে। তারা ২-১ গোলে ডরসেটকে ও ২-১ গোলে চেশায়ারকে হারিয়েছে। এরিয়ানরা চমৎকার খেলছে। এ খেলাতেও মারামারি বেশী হয়েছে। মোট ২৩ বার ফাউল হয়েছে তার মধ্যে চেশায়ারের

ডুরাণ্ডের খেলায় হ্যাম্পসায়ার ৭ম লাইট ব্যাটারীর গোলে আক্রমণ করছে

খেলোয়াড়দের অন্ততঃ পক্ষে একমাস পূর্ব্বে সেই দলভুক্ত হওয়া চাই।

আর্গাইল ও কিংস রেজিমেণ্টের খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। এ খেলায় মাত্র দুটি ফাউল হয় অর্গাইলের বিপক্ষে। কিংস দল পাশিং ও বল আটকানোতে ত্রুটিহীন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খেলেছে, কিন্তু তাদের প্রধান ত্রুটির জন্য তারা হেরে গেছে—তারা বল গোলের একেবারে কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করায় বিপক্ষের ব্যাক ও গোলরক্ষক কর্ত্তৃক বারবার পরাভূত হয়েছে। ক্ষিপ্রতা হিসাবে অর্গাইল ফরওয়ার্ডরা বিপক্ষের অপেক্ষা তৎপর। তাদের রাইট উইংয়ের ফরওয়ার্ডরা দ্রুত আক্রমণ ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বল মারায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

এরিয়ান ও গ্রীণ হাওয়ার্ডের খেলা অপ্রীতিকর হয়ে শেষ হয়েছে। এরিয়ানরা এক গোলে জয়ী হচ্ছিল। তাদের ব্যাক হ্যাণ্ডবল করলে রেফারি পেনালটি দেয়। গোলরক্ষক ভট্টাচার্য্য সেই সট রক্ষা করে, কিন্তু সে নড়েছিল এই অভিযোগে রেফারি পুনরায় পেনালটি সট্ করতে দেয়। এবারও গোল বাঁচালে, রেফারি ঐ একই অভিযোগে আবার সট্ করতে বলে। তৃতীয় বারে গোল হয়। তখন রেফারি পূর্ণ সময় নির্দ্দেশ সূচক বাঁশী দেন এবং অতিরিক্ত সময় খলতে আজ্ঞা দিলে এরিয়ানরা খেলতে অসম্মত হয়ে মাঠ থেকে চলে যান। তখন ক্ষিপ্ত জনতা রেফারিকে ধিক্কার দিতে থাকে এবং বিশিষ্ট দর্শকদের আসন নষ্ট করে ও সামিয়ানায় অগ্নিপ্রদান করে।

অতঃপর শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ, ইংরাজ সৈনিকদল জনতার উপর লাঠি চালনা করায় অনেকেই আহত হয়। আব্দুল হালিম নামে এক ছাত্র বিশেষরূপে আহত হয়েছে।

এরিয়ানের ব্যায়াম শিক্ষক জে কে শীল বলেছেন যে, তাঁর ও অনেক দর্শকের ঘড়িতে প্রথম পেনালটি সটের সময়ই পূর্ণ সময় উত্তীর্ণ হয়ে ৪॥০ মিনিট হয়েছিল। এবং প্রথমবার পেনালটি সটের সময় গোলরক্ষক মোটেই নড়ে নি। এরিয়ানদল তারা জয়ী বলে ঘোষিত না হলে আর খেলায় যোগ দেবে না বলেছে। তাদের অভিযোগ এই—(১) তারা ঠিক গোল দিলেও অফ্‌সাইড দেওয়া হয়েছিল, (২) সময় উত্তীর্ণ হলেও খেলা শেষ করা হয় নি, (৩) গোলরক্ষক না নড়লেও পুনরায় পেনালটি সট করতে দেওয়া হয়েছিল।

ডুরাণ্ড কমিটি এরিয়ানের অভিযোগ অগ্রাহ্য করায় তার পুনরায় না খেলায় গ্রীণ হাওয়ার্ডসরা 'ওয়াক্' ওভার পেয়েছে

রেফারির বক্তব্য যে এরিয়ানদের খেলোয়াড়রা ইচ্ছা কে দু'বার বল বাইরে মারায় যে সময় নষ্ট হয়েছিল তিনি তাহ বাদ দেওয়ায় দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু বেশী সময় খেলাতে হয়েছে খেলার ভিতরে ইচ্ছা করে বা অনিচ্ছা করে বল আউ করলে কি সময় ধরে দেওয়ার নিয়ম আছে ?

ডুরাণ্ডের ফলাফল ঃ

চেশায়ার রেজিমেণ্ট ৬—সিমলা মিউনিসিপাল কমিটি ০
৫ম মিডিয়ম ব্রিগেড ১—রয়েল নরফোক রেজিমেণ্ট ০
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড ০—রয়েল এয়ার ফোর্স ০
গ্রীণ হাওয়ার্ডস্ ১—বেডফোর্ডস ও হার্টস্ ০
রয়েল কর্পস্ সিগ্‌নাল ৯—সিমলা ওরিয়েণ্টালস্ ০
১ম হ্যাম্পসায়ার রেজিমেণ্ট ৩—৭ম ব্যাটারী আর এ ০
১ম ডরসেট রেজিমেণ্ট ২—'ই' ব্যাটারী আর এ ১
মোহনবাগান ৩—রোভার্স ফুটবল ক্লাব (সোলান) ০
২য় ব্যাটালিয়ান রয়েল স্কটস্ ৯—সি টি এ সি (কলিকাতা)
কিংস রেজিমেণ্ট ৭—আর্ম্মি হেড কোয়াটার্স ০
এরিয়ান (কলিকাতা) ২—'এ' কোং ডর্‌সেট ০
ভবানীপুর (কলিকাতা) ৯—হিন্দু ও মস্‌লিম ফুটবল ক্লাব
ডরসেটস্ ৫—কলোজিয়ানস্ ১
বেডস্ ও হার্টস্—২—আর্ম্মি হেড কোয়াটার্স ০
আর এ এফ্ ১—'এ' কোং ডর্‌সেট ০
হাইল্যাণ্ড এল আই ৩—সিমলা কলোজিয়ানস্ ০
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড ৩—২৮ স্কোয়াড্রন্ আর,এ,এফ্ ০
২য় ব্যাটালিয়ন বর্ডার রেজিমেণ্ট ১—১ম ডরসেট ০
২৮ ফিল্ড ব্রিগেড ৪—১ম হ্যাম্পসায়ার রেজিমেণ্ট ০
গ্রীণ হাওয়ার্ডস্ ৪—ভবানীপুর (কলিকাতা) ০
রয়েল কর্পস্ সিগ্‌নালস্ ১—মোহনবাগান (কলিকাতা) ০
২য় রয়েল স্কটস্ ১—২য় এইচ্ এল আই ০
এরিয়ানস্ (কলিকাতা) ২—চেশায়ার ১
আরগাইল ও সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার্স ১—কিংস রেজিমেণ্ট ০
৫ম মিডিয়ম ব্রিগেড ৩—২য় বর্ডার রেজিমেণ্ট (গত বৎসরের বিজয়ী) ০
রয়েল স্কট ২—ফিল্ড ব্রিগেড ০
এরিয়ান ১—গ্রীণ হাওয়ার্ডস্ ১
অর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড ৩—রয়েল কর্পস্ সিগনালস ০
গ্রীণ হাওয়ার্ডস্ ১—৫ম মিডিয়ম ব্রিগেড ০
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড ২—রয়েল স্কটস্ ০

সেমি ফাইনালে আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড রয়েল স্কটকে ২-০ গোলে হারিয়ে এবং গ্রীণ হাওয়ার্ডস্ ১-০ গোলে ৫ম ব্রিগেডকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। সোমবার ফাইনাল খেলা হবে।

ডুরাণ্ড সাবসিডিয়ারী টুর্ণামেণ্ট ঃ

যে সকল দল প্রথম রাউণ্ডেই পরাজিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতাটি হয়।

ডুরাণ্ডের ইতিহাসে এই প্রথম একজন ভারতীয় রেফারি খেলা পরিচালনা করতে পেলেন। এই ভাগ্যবান পুরুষ এইচ্ কে গাজী, ইনি ছোট ডুরাণ্ডের ওরিয়েণ্টাল ও হিন্দু মসলিমের খেলাটি পরিচালনা করেছেন।

ফলাফল :

আর্মি হেড কোয়ার্টার্স ২—সিমলা মিউনিসিপাল কমিটি ১
বেডফোর্ডস্ ও হার্টস্ ১—৭ম লাইট ব্যাটারী ০
'এ' কোং ডরসেটস্ ৮—সিটি এ সি (কলিকাতা) ০
ওরিয়েণ্টাল ফুটবল ক্লাব ৩—হিন্দু ও মসলিম ফুটবল ক্লাব ১
বেডস্ ও হার্টস্ ২—নরফোক রেজিমেণ্ট ১
২৮ কোয়াড্রন আর এফ্ এ ৩—'ই' ব্যাটারী আর এ ০
আর্মি হেড কোয়াটার্স ১—ওরিয়েণ্টাল ফুটবল ক্লাব ০
ডরসেটস্ ৫—কলেজিয়ানস্ ১

কমিটির তদন্ত আরম্ভ ঃ

বোমণ্ট তদন্ত কমিটি বিলাত প্রত্যাগত খেলোয়াড়দের সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ করেছেন। ওয়াজির আলি ভূপালের নবাবের অনুমতি ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে চান নি। অমরনাথ সাক্ষ্য দেবার জন্ম বোম্বাই গিয়াছেন। প্রকাশ, হাদি ও জয়ের অভিমত, অহেতুক কঠোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহারাজ কুমারের দু'বার সাক্ষ্য লওয়া হ'য়েছে। সকল খেলোয়াড়দের সাক্ষ্যের শেষে আর একবার তাঁর সাক্ষ্য লওয়া হবে।

ভিজির বিবৃতি ঃ

এতদিন পরে মহারাজ কুমার বিবৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, ভারতীয়দের খেলার সাধারণ রেকর্ড নৈরাশ্যজনক। কিন্তু টেষ্ট ম্যাচ খেলায় পূর্ব্ববর্ত্তী টেষ্ট অপেক্ষা ভালো ফলই হয়েছে। দ্বিতীয় টেষ্টে মার্চেণ্ট ও মাস্তাক আলির ব্যাটিং নৈপুণ্যে খেলা ড্র হয়েছিল। অমরনাথের ঘটনার সম্বন্ধে বলেছেন, এ ব্যাপার অত্যন্ত দুঃখের। ক্যাপ্টেন হিসাবে অমরনাথের অভাব অন্যের চেয়ে তিনিই বেশী অনুভব করেছিলেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে এরূপ তদন্তের কথা দেখা যায় নাই। নীতির দিক দিয়া তিনি এই তদন্তের বিরোধী। দলের সুনাম রক্ষার জন্য তাকে এই চরমপন্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে বলেছেন, ১৯৩২ সালের অভিযানে পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা ঘাটতি হয়েছিল। এম সি সির নিউজিল্যাণ্ড পর্য্যটনের সময়ে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ছ' হাজার।

দলের সুনাম রক্ষাই বটে! অমরনাথকে বিতাড়িত করে তিনি সমগ্র জগতের সম্মুখে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করলেন, ঘরের কথা ঢাক বাজিয়ে জানালেন। দল শক্তিহীন হয়ে পড়লো, বারংবার হার হতে লাগলো। পূর্ব্ববর্ত্তী টেষ্ট অপেক্ষা এবারের টেষ্টের ফল যদি ভালই হয়ে থাকে—অবশ্য তাঁর মতে—তা'হলে অমরনাথ দলে থাকলে ফল যে আরো ভালো হতো সে বিষয়ে বোধ হয় তিনিও সন্দিহান নন!

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "মহাপ্রস্থানের পথে" (২য় সংস্করণ)—২৲
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "কাঁটা"—১।০
শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটক "নন্দরাণীর সংসার"—১।০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ"—১।০
শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "শ্রী-যুক্ত"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আলো-ছায়া"—২৲
শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সিরাজ-মহিষী"—২৲
মণিলাল শ্রীমানী অনূদিত জীবনীগ্রন্থ "লেনিনের সহিত ম্যাক্সিম গর্কি"—১৲
শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ "আনন্দগীতা"—২৲
শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "কামরূপ"—১৲
শ্রীসুধীরকুমার আচার্য্য ও শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা প্রণীত "নেপালের পথে"—৸০
কবিরাজ শ্রীগিরিজানাথ রায় সঙ্কলিত "স্বাস্থ্যবিধান ও পথ্যবিচার"—১৲
সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "ময়ূরাক্ষী"—১॥০
শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জীবনের জটিলতা"—১॥০
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "লালন ফকিরের ভিটে"—।৴০
হরপ্রসাদ মিত্র বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের "নতুন কবিতা"—।৴০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার "গল্পসঞ্চয়"—১॥৴০
শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "আকাশ পাতাল"—২৲
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক—"ঘরের বাহু"—॥০
"বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ"—১৲
শ্রীকুমুদেন্দু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত সচিত্র "শ্রীশ্রীচণ্ডী"—৸০
শ্রীঅশোকচন্দ্র দত্ত প্রণীত স্বরলিপি পুস্তক "ছায়া গীতিমাল্য"—১॥০

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

জয়গোবিন্দ লাহা সি-আই-ই

জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারী
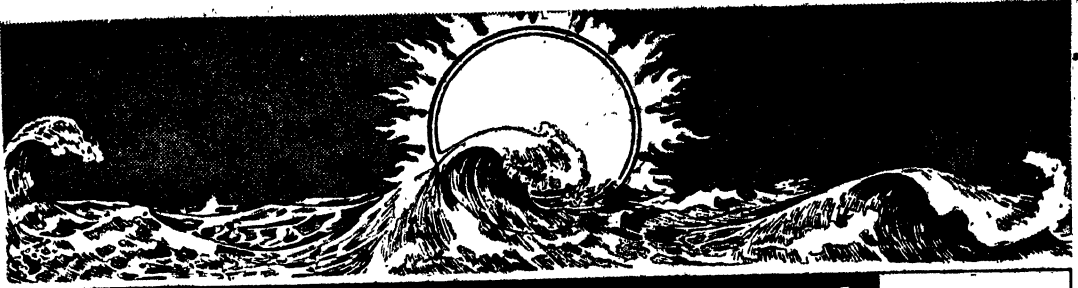
মৃত্যু—১৯০৫ খৃঃ ৪ই ডিসেম্বর

অগ্রহায়ণ—১৩৪৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্বিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালা বানান-সমস্যা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্-এ, বি-এল্, ডি-লিট্, ডিপ্লো-ফোন্ (প্যারী)

বর্ণগুলি আর কিছুই নয়, ভাষায় যে সকল ধ্বনি আছে, তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন ছাড়া। এক ভাষার বর্ণমালা অন্য ভাষায় ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে কয়েকটী বর্ণ এই দ্বিতীয় ভাষায় অনাবশ্যক, যেহেতু তাহাতে এই বর্ণগুলি দ্বারা সূচিত ধ্বনির অভাব। অন্য পক্ষে আবার তাহার কয়েকটী বিশেষ ধ্বনির জন্য বর্ণের অভাব লক্ষিত হয়। কাজেই কখন কখন শব্দের বানান শব্দের ধ্বনিগত হয় না। ইহাতে বানান-বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহাই। সংস্কৃতের বর্ণমালা বাঙ্গালায় চালাইতে গিয়া, আমরা সকল স্থানে ধ্বনিগত বানান রাখিতে পারি নাই এবং কোথায় কোথায় অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছি। বাঙ্গালার এক, কেন প্রভৃতি শব্দে একারের যে উচ্চারণ হয়, তাহা সংস্কৃতে নাই। আমরা একই একার দ্বারা দুই পৃথক্ ধ্বনি সূচিত করিতেছি—এক এবং এস, কেন এবং বেশ ইত্যাদি। অন্যদিকে জল, যম প্রভৃতি শব্দে জ য-এর, গণ, বন প্রভৃতি শব্দে ণ ন-এর এবং বিশ, মেষ, দাস প্রভৃতি শব্দে শ ষ স-এ একই ধ্বনি, অথচ আমরা সংস্কৃতের অনুসরণে বিভিন্ন দ্বারা এই শব্দগুলির বানান করি। অনেক সংস্কৃত শ বাঙ্গালায় উচ্চারণ বিকৃতি ঘটিয়াছে ; কিন্তু আমরা সং বানানের ফাঁকি দিয়া আমাদের ভ্রষ্ট উচ্চারণ ঢাকি রাখি। উদাহরণ স্বরূপে জ্ঞান, ক্ষার, লক্ষ্মণ, পদ্ম প্রভৃ বহু শব্দ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক অতি মাত্র সংস্কৃত শব্দের খাঁটি উচ্চারণ আমরা বাঙ্গালায় ব রাখিয়াছি। কিন্তু বানানে আমরা চোখ বুজিয়া সংস্কৃতে অনুসরণ করিতেছি। ইহাতে যে কেবল শিশুদের ম অনর্থক ভারাক্রান্ত হয়, তাহা নহে ; অনেক শি ব্যক্তিও তথাকথিত বর্ণাশুদ্ধি করিয়া ফেলেন, ছাত্রদে কথাই নাই।

যে সকল সংস্কৃতভব শব্দ বাঙ্গালায় আছে, তাহা বানান সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। লিখেন কাণ, কেহ কান ; কেহ সোণা, কেহ সো

কেহ কাজ, কেহ কায; ইত্যাদি। দেশী ও বিদেশী শব্দেও একরূপ বানান নাই। কেহ বানান করেন জিনিষ, কেহ জিনিস; কেহ সহর, কেহ শহর; কেহ খ্রিষ্ট, কেহ খ্রীষ্ট, আবার কেহ লিখেন খৃষ্ট।

আমরা উপরে বাঙ্গালা বানান-সমস্যার কেবল একটুকু নমুনা দিয়াছি। বাস্তবিক সমস্যা গুরুতর বটে। অনেক চিন্তাশীল লেখকই অনেক দিন হইতে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টা কদাচিৎ সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া অতি সমীচীন কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহারা "বাংলা বানানের নিয়ম" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয় বলিয়াছেন, "আবশ্যক হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে।" আমরা এস্থলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের বিষয়গুলি আলোচনা করিব।

ক। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

বাঙ্গালায় ব্যবহৃত সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে এইগুলি বাঙ্গালার উচ্চারণ মত লিখিত হওয়া উচিত। পালি, প্রাকৃত এবং অশোক অনুশাসনে এইরূপ ধ্বনিগত বানানই লক্ষিত হয়। বাঙ্গালায় বা কেন চলিবে না? কিন্তু এখন সাধারণ সংস্কৃত-ভক্ত পালি-প্রাকৃত-অনভিজ্ঞ, অবৈজ্ঞানিক বাঙ্গালী সমাজ এইরূপ বানান সংস্কার সহ্য করিতে পারিবে না। কাজেই আমাদের মতবিরুদ্ধ হইলেও কার্য্য করিবার দিক্ দিয়া আমরা এই সকল শব্দের সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সঙ্গত মূল বানানই সমর্থন করি।

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

তাঁহারা বলেন, রেফের পর দ্বিত্ব হইবে না, যথা—ঊর্ধ্ব, কার্য, কর্ম, সর্ব। তবে ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হইলে দ্বিত্ব হইবে, যথা—কার্ত্তিক, বার্ত্তা, বার্ত্তিক।

আমরা বলিব, যদিও সংস্কৃতে পাণিনির "অচো রহাভ্যাং দ্বে" (৮।৪।৪৬) এবং "শরোঽচি" (৮।৪।৪৯) এই সূত্রদ্বয় অনুযায়ী স্বরবর্ণের পর রেফ ও হকারের পরবর্ত্তী শ ষ স হ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়, বাঙ্গালায় দ্বিত্ব রহিত করিলে উচ্চারণের কোনই ব্যত্যয় হইবে না। সংস্কৃতেও শাকল্য সর্ব্বত্র দ্বিত্ব রহিত করিতে উপদেশ দেন ("সর্ব্বত্র শাকলস্য"। পাণিনি ৮।৪।৫১)। কিন্তু ব্যুৎপত্তির জন্য রেফের পর দ্বিত্ব হইবে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এরূপ কোন নিয়ম আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহাতে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং আমরা সর্ব্বত্রই দ্বিত্বলোপ প্রস্তাব করি। বস্তুতঃ অন্যত্র ব্যুৎপত্তির জন্য পত্র পুত্র অব্‌ভ্র এইরূপ বানান সঙ্গত হইলেও আমরা পত্র পুত্র অভ্র এইরূপ বানানই করিয়া আসিতেছি। তবে রেফের পর কেবল ব্যুৎপত্তির জন্য দ্বিত্ব করিবার কি বিশেষ কারণ আছে?

২। সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার

তাঁহারা বলেন, ঙ এবং অনুস্বার দুই-ই চলিতে পারে। আমরা বলিব, সরলতার জন্য বাঙ্গালায় কেবল অনুস্বার চালান উচিত। সুতরাং আমরা কেবল অহংকার, সংখ্যা ইত্যাদি বানান সমর্থন করি।

৩। বিসর্গান্ত পদ

তাঁহারা বলেন, বিসর্গান্ত সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জ্জিত হইবে; কিন্তু শব্দের মধ্যে বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে হইবে, যথা,—আয়ু, বক্ষ, মন, ইতস্তত, ক্রমশ, বিশেষত, সদ্য, পুনঃপুন, সদ্যোজাত।

আমরা কেবল তদ্ভব মন শব্দে উচ্চারণ-হেতু বিসর্গ লোপ সমর্থন করি। অন্যত্র বিসর্গের স্পষ্ট উচ্চারণ না হইলেও ব্যুৎপত্তি ও সন্ধির জন্য বিসর্গ রক্ষা করাই প্রয়োজন মনে করি। ক্রমশ, লোমশ এই দুই স্থানে দুই তদ্ধিত প্রত্যয় এবং দুই পৃথক্ উচ্চারণ আছে। কাজেই ক্রমশঃ, লোমশ এইরূপ লেখা আবশ্যক। মোট কথা, যখন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করিতে রাজি ন'ন, তখন কেবল বিসর্গ উঠাইয়া কি হইবে? তাঁহারা কি উচ্চারণের জন্য জদি, শাহশ, ভিক্থা, বিগ্‌গঁ, পক্ক, উর্ধ ইত্যাদি বানান সমর্থন করিবেন?

৪। হসন্ত পদ

তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত পদের (বা শব্দের) শেষে হস্‌ চিহ্ন রক্ষিত হইবে, যথা—দিক্, শ্রীমান্। আমরা ইহা সমর্থন করি।

খ। অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৫। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

তাঁহারা ইহা বর্জ্জনীয় মনে করেন, যথা—পর্দা, জর্মানি। আমরা ইহার সমর্থন করি।

৬। হস্ চিহ্ন

আমরা এই বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তবে তাঁহারা বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ প্রদর্শনের কোন নিয়মের দরকার মনে করেন নাই। কিন্তু ইহার আবশ্যকতা আছে। আমরা এস্থলে উর্ধ্ব কমা ব্যবহার করিতে চাই; যথা,—থিব', বাই-ল'।

৭। ই ঈ উ ঊ

তাঁহারা বলেন, যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে, তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—কুমীর, কুমির; শীষ, শিষ; রাণী, রাণি; পাখী, পাখি; শাড়ী, শাড়ি; ঊনিশ, উনিশ; চূণ, চুণ; পূব, পুব।

আমরা মনে করি এই বিকল্প বিধির কোন প্রয়োজন নাই। বানানের ঐক্য আবশ্যক। এই জন্য সর্ব্বত্রই ই বা উ লিখাই উচিত। তবে যদি কেহ মূল অনুযায়ী ঈ বা ঊ বানান রাখিতে যান, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি। কিন্তু একই শব্দের দুই রকম বানানের আমরা পক্ষপাতী নহি।

৮। ণ ন

তাঁহারা বলেন, অসংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা, —কান, সোনা, কোরান, করোনার। আমরা ইহার সমর্থন করি। ইহাই ধ্বনিসম্মত বানান।

৯। ও-কার ও উর্ধ্ব কমা প্রভৃতি

তাঁহারা "সুপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার, উর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়" মনে করেন; অথচ 'তো, হয়তো' এইরূপ বানান করেন।

আমরা এই পুরাতন-প্রীতি (Conservation) পছন্দ করি না। কাল (=কৃষ্ণ), কাল (=কল্য), কা̇ল (=সময়) এই তিনের উচ্চারণ পৃথক্। ইহাদের ভেদ দে'খান দরকার, যথা—কাল' (কিংবা কালো), কা'ল, কাল। এইরূপ মত, মত' (কিংবা মতো); চাল, চা'ল (=চাউল); ডাল, ডা'ল (ডাইল) ইত্যাদি। "তুমি এই ওষুধটা গেল," "সে ঘরে গেল"; "সে খেলে আমি খাব," "সে ভাল খেলে" ইত্যাদি স্থলে পার্থক্য দে'খান উচিত। এইরূপ স্থলে গ্যাল, খ্যালে, লিখা অপেক্ষা গে'ল, খে'লে অধিক সঙ্গত। এইরূপ দে'খা, এ'ক ইত্যাদিরূপ লেখা উচিত। মোট কথা আমরা সর্ব্বত্র একারের খাঁটি বাঙ্গালা উচ্চারণের জন্য এ' ে' লেখা চালাইবার প্রস্তাব করি। অবশ্য আমরা এখানে Standard বা শিষ্ট বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিব। প্রস্তাবিত এক-ঘরে, জলো অপেক্ষা আমরা এক-ঘ'রে জ'লো প্রভৃতি বানানের পক্ষপাতী। আমরা বিকল্পের বিরুদ্ধে।

১০। ং ঙ

আমরা প্রস্তাবিত বাঙালি, আঙুল, রঙের প্রভৃতি বানান সমর্থন করি। কিন্তু ইহা চলিত বাঙ্গালায়; সাধু বাঙ্গালায় আমরা বাঙ্গালি, অঙ্গুলি, রঙ্গের প্রভৃতি লিখিব।

চলিত বাঙ্গালায় রং রঙ, সং সঙ, বাংলা বাঙলা, প্রভৃতি দুই রকম বানানের মধ্যে প্রথমটিই অধিক সমীচীন। বিকল্প বানান পরিত্যাজ্য।

১১। শ ষ স

তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দে মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে শ, ষ বা স হইবে, যথা,—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য) প্রভৃতি।

আমরা স্থিতিস্থাপকতা-প্রীতি ভিন্ন এই প্রস্তাবের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যদি মূল অনুযায়ী বানান রাখিতে হয়, তবে কুমির, পাখি, চুন, পুব, এইরূপ বানান তাঁহারা কে'ন প্রস্তাব করিলেন? কে'নই বা তাঁহাদের মতে কান, সোনা প্রভৃতি বানান উচিত হইবে? আমি মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় সমস্ত তদ্ভব শব্দে শ প্রস্তাব করি। ইহাই বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিসম্মত বানান। ইহাতে যদি কেহ একেবারে বজ্রাহতবৎ হইয়া পড়েন, তবে অ-সংস্কৃত শব্দে

অন্ততঃ ণ এর ন্যায় ষ বর্জন করিতে বলি। আমাদের মনে রাখা উচিত পালির যুগ হইতে ষ কথ্য ভাষা হইতে লুপ্ত হইয়াছে। যদি উৎপত্তি অনুযায়ী বানান করিতে হয়, তবে আশে (=আবিশতি), বশে (উপবিশতি), সোয় (স্বপিতি) এইরূপ বানান করিতে হইবে। সর্ব্বত্র মতৈক্য থাকা চাই। অবশ্য বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে তাঁহাদের শ স সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই।

১২। চন্দ্রবিন্দু

এ সম্বন্ধে তাঁহারা কোন নিয়মই উল্লেখ করেন নাই, কেবল কয়েকটা উদাহণ দিয়াছেন। আমরা একটি নিয়ম স্থির করিতে পারি—মূল সংস্কৃত শব্দে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং থাকিলে তদ্ভব শব্দে অবশ্য চন্দ্রবিন্দু হইবে; যথা,—পাঁক, পাঁচ, কাঁটা, দাঁত, কাঁপ, হাঁস। অন্যত্র Standard বা শিষ্ট উচ্চারণ অনুযায়ী ঁ বসিবে। শিষ্ট উচ্চারণ বলিতে আমরা সেই উচ্চারণ বুঝি, যাহা বক্তৃতায়, অভিনয়ে, আবৃত্তিতে বা ভিন্ন স্থানের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয়।

১৩। ক্রিয়াপদ

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রস্তাব সমীচীন। তবে খাঁটি বাঙ্গালা একারের উচ্চারণের জন্য আমি উধর্ব-কমা বসাইতে প্রস্তাব করি, যথা, দে'য়, গে'ল, দে'খে।

১৪। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিতরূপ

এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রস্তাব আমাদের অনুমোদনীয়।

গ। নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দ

আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু z ধ্বনির জন্য নীচে ডটযুক্ত বা রেখাযুক্ত জ সকল ছাপাখানায় পাওয়া যাইবে না। এইজন্য বিদেশী শব্দে z ধ্বনির জন্য য ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রাচীন লিপিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়, যথা—Azes অযস, Kuzul কুযুল ইত্যাদি।

ঘ। পরিশিষ্ট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটী সমস্যার কোন সমাধান করেন নাই। আমরা সেইগুলি সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব নিবেদন করিতে চাই।

ক। তদ্ভব শব্দে সর্ব্বত্র ঐ ঔ বর্জন করিতে হইবে। খই, দই, বউ, মউমাছি এইরূপ বানান হওয়া উচিত।

খ। তদ্ভব শব্দে সর্ব্বত্র ক্ষ বর্জন করিতে হইবে। পাখি, রাখে, মাখন, এখন, প্রভৃতি শব্দে যদি খ হয়, তবে খুর, খেত, খে'পা, খুদ প্রভৃতি শব্দে আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

গ। তদ্ভব শব্দে সর্ব্বত্র জ হইবে, যথা—কাজ, জোত, জোয়াল, জোড়া, জাঁতা, জাওয়া, জা, জো, জাউ, জে, জিনি, জাহার, জে'ন, জুঁই ইত্যাদি। (রাজা রামমোহন রায়ের পুস্তকে জে, জাহার ইত্যাদি বানান দৃষ্ট হয়।)

ঘ। ভাইয়ের, বউয়ের এইরূপ বানান চালান উচিত।

ঙ। গণ-যোগে শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, যথা—গুণীগণ, মহাত্মাগণ, রাজাগণ, ভ্রাতাগণ। এইরূপ স্থলে সমাস হয় নাই; কিন্তু সব, সকল প্রভৃতি শব্দের ন্যায় গণ বহুবচনের চিহ্ন। ইহা না মানিলে, 'সুন্দরী বালিকাগণ' ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অবশ্য বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র খাটে না। বালকটী সন্, এই বৃক্ষ বৃহন্—কেহই এইরূপ লিখিবেন না। তবে মহাত্মাগণ প্রভৃতি লিখিবার কি প্রয়োজন?

অন্ত্যেষ্টি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

পাঁচ

তপেশ আজ রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছে অনেক কথা।···আর একজন আসিতেছে। এ কি সুখের, না শঙ্কার? তাহাদের দিনগুলি অবশ্য চলে না—চলে না করিয়াও চলে। তাহাদের না হয় গা-সওয়া হইয়া গেছে সব কিছু। নবাগত আসিয়া যদি সহিতে না পারে! অঙ্কুর যদি মাথা তুলিয়া না-চাহিতেই শুকাইতে থাকে! এই রুদ্রদাহনের মাঝে আবশ্যক জল না যদি তার জুটে!···

ক্রমে চিন্তার ধারা বর্ত্তমান ছাড়িয়া একবার ফিরিয়া গেল অদূর অতীতে।

এখানে আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকার একটু পূর্ব্ব-পরিচয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস একটা অবশ্যই আছে। এতক্ষণ বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই। ভয় ছিল, সেই বিগত রঙীন অধ্যায়গুলি বর্ণহীন বর্ত্তমানে আজ নিতান্তই বেসুর শুনাইবে।

তপেশের পিতা ভূপেশ লাহিড়ী ছিলেন স্বরূপগঞ্জের সুবিখ্যাত জমিদার বংশের পঞ্চম পুরুষ। লাহিড়ী পরিবারের দান-ধ্যান প্রতিপত্তির কথা পরগণা-মহকুমা ছাড়াইয়া সারা জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

লোকে বলিত, পিতা দীনেশ লাহিড়ী ছিল সমাজের মেরুদণ্ড, পুত্র যেন দুষ্টগ্রহ। পিতার হইল মৃত্যু। পুত্র গেল বিলাতে।

ভূপেশ লাহিড়ী বিদেশ হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া যখন দেশে ফিরিলেন স্বরূপগঞ্জের জাগ্রত সমাজ তখনো মরিয়া যায় নাই। বড়লোকের ছেলে। গ্রামের জমিদার। সুতরাং অযাচিত পাঁতিও জুটিল। কঠোর শাস্ত্রবিধি শিথিল হইয়া নামিয়া আসিল একটা নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তে। এই সামান্যকেও ভূপেশ লাহিড়ী করিল অমান্য। এত বড় দুঃসাহস! সহসা মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইল না। প্রথমে কানাঘুষার পালা; তার পর তোড়জোড়ের প্রথম পর্ব্ব; অবশেষে চণ্ডীমণ্ডপ পরিষদের শেষ অধিবেশনের পর আশে-পাশের পাঁচ পাঁচটা গ্রামের জাগ্রত সমাজ উঠিল হুঙ্কার দিয়া। রাগে টগবগ করিল সমাজনেতৃগণ। স্নানের পূর্ব্বে শিখাগ্রে মাখিল কলের ভেজাল সর্ষপ তেল। ময়লা উপবীত পরিষ্কার করিয়া লইল দেশী কোম্পানীর সস্তা সাবান ঘষিয়া। চরমপত্রও লেখা হইয়া গেল। সব ঠিকঠাক।

শুধু যুদ্ধের আয়োজনই হইল, যুদ্ধ আর বাধিল না। প্রতিপক্ষ সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করিয়া দিয়া দেশের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। কলিকাতায় বাড়ী উঠিল। ব্যাঙ্কে জমা রহিল টাকার অঙ্ক। সমাজকে রস্তা প্রদর্শন করিয়াছেন মনে করিয়া লাহিড়ী পরিবারের পঞ্চম পুরুষ গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিলেন।

ভূপেশ লাহিড়ী সাগর পার হইতে যতগুলি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছিলেন দেশে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোনটাই টিকিল না—শুধু একটী বাদে। কাচের পেয়ালায় ফরাসী দ্রাক্ষা-রসের তীব্রতা কতখানি সওয়া যায় তাহার মহলা দিতে দিতে তিনি বেসামাল হইয়া পড়িলেও বেহুঁস হইতেন না, মুখ দিয়া বেফাঁস কিছু বাহির হইয়া পড়িত না। মস্ত বড় গুণ। বন্ধুমহলে এজন্য মিঃ লাহিড়ীর সুখ্যাতিও প্রচুর।

ব্যারিষ্টারিতে বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া মিঃ লাহিড়ী গোসা করিয়া সেপথ ছাড়িয়া ছিলেন। তারপর একদিকে চলিল সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া মদ ও আনুষঙ্গিক চাট,

আর একদিকে শেয়ার মার্কেট ও লাক্ষার কারবারে অদৃষ্ট-পরীক্ষা। দেখিতে দেখিতে বছর দশেকের মধ্যে ব্যাঙ্কের অঙ্ক নিঃশেষ হইয়া ভবানীপুরের ত্রিতল বাটীখানির তৃতীয় মরগেজ হইয়া গেল। সংসারের অপরাপর লোক যদি সর্ব্বস্বান্তের শেষপ্রান্তে পৌছায় গরুর গাড়ী চাপিয়া, মিঃ লাহিড়ী গন্তব্যস্থলে মোটর হাকাইয়া চলিয়াছিলেন—ফুল্ স্পীডে!

এই সময় একমাত্র পুত্র তপেশ প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া পড়া ছাড়িয়া পিতার অবাধ্য সন্তান।

কিছুকাল বাদে আন্দোলনে ভাটা পড়িল। মিঃ লাহিড়ী সুযোগ বুঝিয়া মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর শরণাপন্ন হইলেন। মাতার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই নাকি পুত্র বিবাহ করিতে রাজী হইল। সকলে মিঃ লাহিড়ীর প্রশংসা করিল। বিপথগামী পুত্রের চঞ্চল মনকে ঘরমুখো করিবার সুষ্ঠু পন্থায় বন্ধুবান্ধব খুসী হইল। যাহারা ভিতরের খবর একটু টের পাইয়াছিল তাহারা কিন্তু কানাঘুষা করিতে ছাড়িল না, পুত্রের কাঁধে বোঝা চাপাইয়া বছরখানেক নিশ্চিন্তে মদের খরচ চলিয়া যাইবে। বিবাহে নগদ টাকাই পাঁচ হাজার ঘরে আসিয়াছে।

তপেশেরও যে বিবাহে তেমন আপত্তি ছিল তাহা নহে। সখের দেশোদ্ধার দুদিনেই মিটিয়া গেছে। বট-অশ্বত্থেরই যখন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তৃণ-গুল্ম ত ঘুমাইয়াই পড়িবে।

পিতৃ-পিতামহের জাঁকালো সম্পদে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহার কিছু কিছু আভাস সে পাইয়াছিল। একুশ বছরের ভাবজগতের প্রথম ব্রতী কেমন করিয়া বুঝিবে যে ভিতর একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়া বাহিরের ঠাটটুকু সুকৌশলে বজায় আছে মাত্র! প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে; পিতার মোটরে মাঝে মধ্যে প্লেজার ট্রিপ দেয়; বন্ধুর দল লইয়া বাড়ীতে সাহিত্য-আলোচনার নিয়মিত বৈঠকে চা সিগ্রেট ধ্বংশ করে; চাকর বেয়ারাদের উপর যখন তখন হুকুম চালায়।

খান তিনেক কবিতার খাতায় 'মানসী' 'প্রেয়সী', 'অন্তরলক্ষ্মীর' বন্দনা গাহিয়া ঐ বয়সেই তপেশের মনে হইল, এমনি করিয়া আর কত কাল-ই বা কাটিবে। বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে অভিনয়ের ভঙ্গীতে কণ্ঠে উদাসের সুর ফুটাইয়া রবীন্দ্রনাথ 'কোট' করিত—'বসে আছি ভরা মনে, দিতে চাই নিতে কেহ নাই।' বিস্তর উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অনুপ্রাসের ফুলঝুরি ছড়াইয়া সে বন্ধুদের সহিত তর্ক করিত—ফর্সা বাঙ্গালী মেয়েকে সে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করে না। পার্শী মেয়ের মত কমনীয়তাবর্জ্জিত গৌরবর্ণ মোহের সৃষ্টি করে, মুগ্ধ করে না। বাঙ্গালী মেয়ের গৌরব, তাহার বৈশিষ্ট্য—কালো ধবলের মোলায়েম মিতালি—আলো-ছায়া শ্যামবর্ণ। চক্ষু হইবে কালো ও চলচঞ্চল, বুদ্ধিস্নিগ্ধ, ভাসাভাসা। নিখুঁত নাকের ডগাটী মনে হইবে কুঁদে-কাটা। পাপড়ীপেলব পাতলা দুটী ঠোঁট। মেঘল চুলের দীঘল বিননী। মুখের বেড় যেন শিল্পীর তুলিরই শেষ টানটি। ছিপছিপে সুবলিত গড়নটা বেড়িয়া পরিধেয় শাড়ীখানি যেন মোহাবেশে লাগিয়া থাকিবে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া। নিটোল হাত দুখানির তর্জ্জনী, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্বচ্ছ নখ-নভে শুভ্র চাঁদের ফালি। আল্‌তা-পরা সুডৌল পা দুখানি পদ্ম বলিলে যদিও কবিত্ব করা হয়, কিন্তু তাহারা পদ্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে বৈ কি! কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাইবে বুদ্ধিমত্তার ধারাল দ্যুতি, কথনো রসাল প্রলাপী ঠমক, কথনো গীতিময় গোলাপী গমক। মানান-সই ঈষৎ দীর্ঘ দেহকান্ত! গা-ময় উষ্ণ নরম মমতা। এক কথায়, তাহার উজ্জ্বল-শ্যাম মুখ-শ্রীতে যেন এ-দেশের প্রকৃতিরই মায়া-মধুর আঁচলখানি পাতা। এই কালো মেয়েই তপেশের মতে বাঙ্গালী ঘরের আলো। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা' ও 'বলাকা' এবং শেলী ও কীট্‌সের দু' চারিটী কবিতা পড়া থাকা চাই-ই। এই ছিল তপেশের অনাগতা প্রিয়া।

মেয়ে তেমন শিক্ষিতা নয় শুনিয়া প্রথমে তপেশের বেশ একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু মঞ্জুলীর বড় সুন্দর ডাগর চোখ দুটী দেখিয়া তপেশের সকল আপত্তি এক নিমেষে উবিয়া গেল।

মঞ্জুলী শৈশবেই মা ও বাবাকে হারাইয়াছে। মানুষ হইয়াছে সে পিসিমার কাছে। পিসিমা জগত্তারিণী নিঃসন্তানা বলিয়া মঞ্জুলীর পিসেমশাই মোহিনীমোহন

পুত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। এখন তিনি তিনটী পুত্র সন্তানের পিতা।

সতীনের সঙ্গে বনিবনাও না থাকিলেও স্বামী মোহিনী-মোহন প্রথম স্ত্রীকে নাকি সমীহ করিয়া চলিতেন। জগত্তারিণী এই পত্নী প্রীতির কারণ স্পষ্টই বুঝিত। মঞ্জুলীর পিতা তাহার কন্যার বিবাহের জন্য দশ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। এখনকার সস্তার বাজারে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিলেই রাজপুত্র মিলিবে, স্বামীর এই পুনঃ পুনঃ আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও জগত্তারিণী ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে ভ্রাতার সেই দশ হাজার টাকা সমস্তই খরচ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পরে কতখানি সুমধুর ছিল সে খবর আমরা রাখি না।

মঞ্জুলী তখন ব্রাহ্ম গার্লসে ফোর্থ ক্লাসে প্রোমোসান পাইয়া উঠিয়াছিল। সবেমাত্র ষোলয় পা দিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর মেয়ের বিবাহের বয়সও হইয়াছিল।

বিবাহের এক মাসের মধ্যেই দুই দিকের দুই বৈবাহিকা পরলোকগমন করিলেন। পুত্রের বিবাহের টাকায় মিঃ লাহিড়ী ব্যবসাক্ষেত্রে নূতন করিয়া আর একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। এবার লক্ষ্মীদেবী একটু কৃপাদৃষ্টিই করিলেন।

তপেশ আবার কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। এবার স্কটিশ চার্চ্চে। কলেজের মেয়েদের মধ্যে মঞ্জুলীর কাছে দাঁড়াইতে পারে এমন একটী মেয়েও তাহার চোখে পড়ে না। কিন্তু মঞ্জুলী যে তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া কীটসের 'ওড্ টু' সাইকি' পড়িয়া শুনাইতে পারে না!

তপেশ ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতির পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া আনিল। মঞ্জুলীকে দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিল, "দু-বছরের মধ্যে তোমার ম্যাট্রিক দেওয়া চাই-ই।"

তার পর সুরু হইল শিক্ষক স্বামী ও ছাত্রী স্ত্রীর জ্ঞান-দেওয়া-নেওয়ার পালা। দুদিনেই উদ্যমে পড়িল মন্দা। ছাত্রী লাগিল পাঠ ভুলিতে, শিক্ষক ভুলিল পড়ান। রাতদিন যত্র-তত্র যখন তখন কেবলি মঞ্জু, মাঞ্জু, মিঞ্জু, মোঞ্জা, মঞ্জুলী, মঞ্জুলিকার ছড়াছড়ি। নামগুলি যেন পিয়ানোর এক একটা রীড, তপেশের এক এক ডাকে মঞ্জুলী এক এক রূপে সাড়া দেয়—ঝঙ্কার তোলে।

সকাল-সন্ধ্যা তপেশ মঞ্জুলীকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ পড়িতে বসে। কোন কোনদিন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কচিৎ কোনদিন সেলী, কীটস্, ব্রাউনিঙের ইংরাজী কবিতার বাঙলা অনুবাদ। জ্যামিতি ও বীজগণিত চাপা পড়িয়া গেল।

তপেশের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ। মঞ্জুলী বিদ্রূপ করে, সে রবিঠাকুরের অন্ধ ভক্ত। স্ত্রীর অভিযোগ ভারী মিষ্টি লাগে তপেশের। স্ত্রীকেও সে রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস গ্রহণ করাইতে ব্যগ্র, মঞ্জুলী নারাজ, অবশ্য মনে নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনিলেই রুখিয়া ওঠে। বিদ্রূপ করিয়া বলে, রবিঠাকুর তোমার মাথাটি খেয়েছে।

'বলাকা' মঞ্জুলীর ভাল লাগে না। কবিতাগুলি বাজে বলিয়া সে অপাঙক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে। তপেশ হাসিয়া সায় দেয়। 'পূরবী' ও 'মহুয়ার' ঐ একই দশা ঘটিল। 'মানসীর' সবগুলি কবিতাই মঞ্জুলীর ভাল লাগে। তাহার বড় দুঃখ সে স্বামীর মত অমন সুর করিয়া পড়িতে জানে না। 'পুরুষের উক্তি', 'নারীর উক্তি', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম', 'বধূ' ও 'নিষ্ফল কামনা' বার বার পড়িতে পড়িতে তপেশের ক্লান্তি আসে, মঞ্জুলীর আসে না।

মঞ্জুলীর মতে 'মানসী' ও 'ক্ষণিকা'ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ। 'মানস-সুন্দরী' বাদে 'সোণার-তরী'র অন্যান্য কবিতা মঞ্জুলী হাল্কা বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে। তপেশের আপ্রাণ ওকালতিতেও কোন ফল হয় নাই। তপেশ একদিন হাসিয়া কহিল, "'মানস-সুন্দরী'র তুমি কিছু বোঝ?"

"কেন, বেশ সহজ কবিতা তো!"

"কি বুঝেছ বলো না?"

"হ্যাঁ, আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এখন মানে করতে বসি।—আর তুমিই না বলেছ, মানে করতে বসলে কি আর কবিতা বোঝা যায়।"

তপেশ হাসিয়া চুপ করিল।

"স্বর্গ হইতে বিদায়" ও "পতিতা" মঞ্জুলীর মতে ভাল কবিতা। "উর্ব্বশী" মাঝারি ক্লাসের। "সাজাহান" শুনিয়া বলিয়াছে, "এমন কি! ওর চেয়ে ভাল কবিতা আমিও লিখ্তে পারি যদি লিখ্তে চেষ্টা করি।" 'বর্ষ শেষ' পড়িতে

যাইয়া তপেশ একদিন বিপদে পড়িয়াছিল। মঞ্জুলী বই কাড়িয়া নিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল।

'চিত্রাঙ্গদা' সে নিজে পড়িলে ভাল লাগিত না। তপেশের আবৃত্তি শুনিলে মঞ্জুলীর আনন্দ আর ধরে না। 'রাজা', 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' সে ট্র্যাস্ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে।

'ঘরে-বাইরে', 'গোরা', 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ' মঞ্জুলী ৩নং আলমারীতে বিদেশী বইয়ের একস্তরে দলে ফেলিয়া রাখিয়াছে। বইগুলির প্রথম দিকে শ' খানেক পৃষ্ঠা সে অবশ্য অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই তাহার যে অভিমত সে গঠন করিয়াছে তাহা না বলাই ভাল। তপেশের ওকালতির ব্যর্থ চেষ্টায় সে স্বামীর সাহিত্য জ্ঞানের সম্যক পরিপুষ্টি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস মঞ্জুলী পড়ে না। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের বড় ভক্ত সে। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে যে কবিতা তাহার ভাল লাগে স্বামীকে সুর করিয়া গাহিতে বলে। তপেশ হাসিয়া বলে, "আমি কি সব গানেরই সুর জানি নাকি?"

"আমি গাইতে জানলে আর তোমায় অনুরোধ করতাম না।" মঞ্জুলী মুখ ভার করে।

তপেশ অগত্যা যা হক একটা কীর্ত্তনের সুরে ফরমাস তামিল করিত। মঞ্জুলী গান শুনিতে শুনিতে কখনো বা স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া আবেশে চোখ দুটী বুজিয়া থাকিত। গান থামিলে কোনদিন চোখ মেলিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিত, কোনদিন বা চোখের কোনে টলমল করিত উদ্গত দু' ফোঁটা জল।

মঞ্জুলীকে পাঠ্য-পুস্তকের দুরূহ দুর্গে লইয়া যাইতে তপেশের আর সাহস হয় না, শঙ্কা জাগে যদি ভবিষ্যতে বেশী-জানার উদার বিস্তারে আজিকার অল্প-জানার অকপট গভীরতা ভরিয়া ওঠে! আলোর চেয়ে এই আবছায়াই ভাল।

তপেশ প্রায়ই কলেজ কামাই করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীর সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা করে। কাব্য পাঠ করে বইয়ের পাতায় ও চোখের পাতায়, উভয়তঃ। কবিতার লাইনে চুম্বন জাগে, চুম্বনে কবিতা কাঁপে।

সন্ধ্যার পর ময়দানে বেড়াইয়া আসিয়া তপেশ এস্রাজ লইয়া বসে। মঞ্জুলী গান গাহিতে জানে না, গান ভালবাসে। এস্রাজের পর্দ্দায় পর্দ্দায় তপেশের আঙুলগুলি দ্রুততালে নাচিয়া চলে। মঞ্জুলী থাকে চাহিয়া দুটী মুগ্ধ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া। বাজ্‌না শুনিয়া বলিয়া দেয়, কোন্ গানের সুর। মঞ্জুলী রবিবাবুর আগেকার গানগুলিই বেশী ভালবাসে।

তপেশ হয়ত এস্রাজে সুর তুলিয়াছে,—

আমার আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারি—তুমি আমারি…

মঞ্জুলী খাটের বাজুতে হাতের উপর মুখ রাখিয়া তন্ময় হইয়া দেখে স্বামীর ছড়ি-চালনা—আর কি যেন ভাবে মনে মনে।

তপেশ এস্রাজের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান ধরে—

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজল-বিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো।

মঞ্জুলী হাসিয়া আয়নার কাছে গিয়া খোঁপা ঠিক করিয়া লয়।

এক একদিন তপেশ অর্গানে গলা ছাড়িয়া গান ধরে—

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখী জাগো, সখী জাগো!
মেলি' রাগ-অলস আঁখি
সখী জাগো, সখী জাগো!

সখী শুধু জাগিয়া নয়, অর্গেনের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। বুকে তাহার যুগ-যুগান্তের বিজয়িনীর গর্ব্বোল্লাস। আঁখি তাহার বিজিতের মুখখানির উপর। তপেশ খানিকটা হাসিয়া খানিকটা কাশিয়া গাহিয়া চলে—

আজি নির্ম্মল নিশীথে
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে,
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে!
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি'।
সখী জাগো, সখী জাগো!

মঞ্জুলী অর্গানের উপর একখানা হাত রাখিয়া বাঁকানো ধনুকের মত নুইয়া পড়িয়া স্বামীর সুরের সুরা চুমুকে চুমুকে পান করে।

তপেশের কণ্ঠ নৃত্য করিয়া চলিয়াছে—

জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল সৌরভে,
মৃদু মলয় বীজনে
নিভৃতে নির্জ্জনে।
জাগো আকুল ফুলসাজে
মৃদু কম্পিত লাজে—

আঙ্-ওঙ্-গাঙ্ করিয়া অর্গানের রীডগুলি সহসা একসঙ্গে আনন্দে আর্ত্তনাদ করিয়া থামিয়া যায়। সখার বলিষ্ঠ বাহুর আকর্ষণে সখী একেবারে অর্গানের পর্দ্দাগুলির উপর পিছলাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে তাহার ভাল লাগিত 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে' গানখানি। এ গানখানি শুনিয়া সে যেন কেমন হইয়া যায়। হাজারবার শুনিলেও বুঝি তাহার পুরানো হইবে না। এই গানটীর অস্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারীর কখন কোন লাইন তপেশ বাজাইতেছে মঞ্জুলী তাহা নির্ভুল বলিয়া দিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথের এত ভাল ভাল গান থাকিতে এ গানখানির উপর তাহার পক্ষপাতিত্বের কারণ তপেশ জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিতে পারে নাই। মঞ্জুলী হাসিয়া কহিত, "কি জানি কেন—আমার বড় ভাল লাগে।"

গান শুনিলে মঞ্জুলী যেন কেমন হইয়া যায়। কি এক বিমুগ্ধ বিস্ময়। যেন সে আর এ জগতের নয়। মুহূর্ত্তে চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ যেন সে পথ হারাইয়া বসিয়াছে। প্রণয়-প্রলাপের আবেশ-মরণেও সব কিছু ভুলিতে একটু সময় নেয়। সঙ্গীতে যেন মঞ্জুলীর কাছে সে অবসরটুকুও লোপ পায়—নিমেষ মধ্যে অনাদি অনন্তের মর্ম্মকথা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। কান পাতিয়া বিস্ময়-তন্ময়া সে গান শোনে। তখন ঐ সুর-ঝঙ্কৃত নিমেষগুলির অন্তরালে আর যা-কিছু সবই গৌণ। কিছুক্ষণের জন্য স্বামীও আড়ালে পড়িয়া থাকে। তুচ্ছ হইয়া যায়—ঘরকন্না সমাজ-সংসার সবই।

তপেশ বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। মঞ্জুলী গান গাহিতে জানে না। কিন্তু সমস্ত অন্তরে যেন বিশ্বের নিখিল সুর-সায়র মন্থন করিয়া রাখিয়াছে। গান সে জানে। শোনাই তাহার গান-গাওয়া। সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া সে গাহিয়া ওঠে তন্ময়তার অগীত সুরে। অপ্রমেয় সঙ্গীতোচ্ছ্বাস বোবা হইয়া তাহার চোখের পাতায় জমিয়া ওঠে ভাবাবেশ ঘনিমায়। তনু-তীর্থে ওঠে তাহার অতনু ঝঙ্কার! সে যেন আদ্যন্ত একটী সুন্দর সেতার। নিজে বাজিতে জানে না, তাহাকে বাজাইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সে অর্থ বুঝিতে চায়, কতকগুলি না বুঝিয়া মানিয়া লয়, অধিকাংশই বাজে বলিয়া সে বাতিল করিয়া দেয়। কিন্তু গানে তাহার নিকট এই মানা না-মানার প্রশ্নই থাকে না। সবই নাকি সে বোঝে। সুরই তাহার কাছে সকল অর্থাতীত মহার্থ। তাহার সমগ্র সত্তাই যেন সঙ্গীতধর্ম্মী।

পাশের বাসায়, রেডিয়ো কি গ্রামোফোন বাজিয়া উঠিলে সে কথার মাঝখানেই থামিয়া পড়িয়া কান পাতিয়া থাকে। খালি গলায় দূরে কোথাও গান গাহিতেছে কে, মঞ্জুলী মুগ্ধ কুরঙ্গীর মত জানালার পাশে গিয়া দাঁড়ায়। তপেশ ডাকিলে রাগিয়া বলে, "আঃ বিরক্ত করো না। গানটা শুন্‌তে দাও।"

অথচ মঞ্জুলী গান জানে না। শিখিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই।

তপেশ তাহার এই গভীর তন্ময়তা মাপিয়া দেখিতে ভয় পায়। শুধু উপভোগ করে সৌরভটুকু—এই নাগালের বাহিরে চলিয়া যাওয়া অশরীরী একাকিত্ব।

গান মাত্রেই সে ভালবাসে। তবে রবীন্দ্রনাথ ও চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনে তাহার অতি বেশী পক্ষপাতিত্ব। আবার রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে 'একদা তুমি প্রিয়ে' তাহার কাছে সবচেয়ে সেরা।

এই 'একদা তুমি প্রিয়ে' তাহাদের অনেকদিনের অনেক ছোটখাটো মেঘ নিমেষে উড়াইয়া দিয়াছে। মঞ্জুলী আড়ি করিয়া কথা বলে না। তপেশও সাধিয়া আরম্ভ করিতে নারাজ। উভয় পক্ষেই কে-আগে কে-পরে এমনি ভাব।

তপেশ এস্রাজে সুর তুলিল—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে, সে কথা যে গেছ ভুলে।

মঞ্জুলী আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। কথা বলে না। রাগ কাটে নাই। তপেশ বাজায় আর আড়চোখে চায়—

সেথা যে বহে নদী
নিরবধি
সে ভোলে নি—
তারি যে স্রোতে আঁকা
বাঁকা বাঁকা
তব বেণী।
আজি কি সবই ফাঁকি ?
সে কথা কি গেছ ভুলে ?

তপেশ চট করিয়া অন্য একটা গানের সুর ধরে। মঞ্জুলী বাধা দেয়, "বাঃ, এটা শেষ না হতেই অন্য গান ধরলে যে।"

এই গানখানিতে তাহার মান-অভিমান সব কিছু ভাসিয়া যাইত। তপেশ সুযোগ পাইলেই তাহার এই দুর্ব্বলতায় মজা দেখিত। মঞ্জুলী হয় তো কোন গৃহকাজে ব্যস্ত। জানাইয়া রাখিয়াছে, এখন যেন দুষ্টুমি না করে। তপেশ অর্গানে সুর তুলিল—

গেঁথেছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে—

মঞ্জুলী ছুটিয়া আসে। এ যেন সাপুড়ের সাপ খেলানোর গান। সাপের মতই মঞ্জুলী তির্য্যক ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া অর্গানের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

তপেশ গান থামায়। মঞ্জুলী কহে, "থাম্‌লে যে। ওখানটা একবার গাও না—

গাঁথিতে যে আঁচলে
ছায়াতলে
ফুল মালা
তাহারি পরশন
হরষণ—
সুধা ঢালা
ফাগুন আজো যে রে ঘুরে ফিরে চাঁপা ফুলে।
আজি কি সব-ই ফাঁকি ?
সে কথা কি গেছ ভুলে ?"

তপেশ অনুরোধ শোনে না। মঞ্জুলী রাগিয়া চলিয়া যায়। তপেশ ভাবিয়া পায় না, রবীন্দ্রনাথের এত গান থাকিতে এ গানখানিতে সে এমন কি অপার্থিব সম্পদের সন্ধান পাইয়াছে!

কোনদিন বা মঞ্জুলী তপেশের কবিতার খাতাখানি বাহির করিয়া বলে, "আজ তোমার কবিতা শুনব।"

"ভাল লাগে তোমার ?"

"খুব ভাল লাগে। তোমার মুখ থেকে শুনতে আরো ভাল লাগে।"

তপেশ খাতা খুলিয়া আরম্ভ করে—

তুমি মাটির শিয়রে ঝরা-শিউলির
আশিস্ অঝোর।
তুমি বিগত নিশির বিদায়-লগনে
মুকুতা-লোর॥
তুমি সোনালী আলোর ভুবন-গলানো মায়া ;
তুমি নীলাভ নভের ননীনিভ মেঘ-ছায়া ;
তুমি জোছনা-জোয়ারে সাঁতারি' এসেছ
আবেশ-ভোর।
তুমি সারা শরতের দিবস রাতের
মরম-চোর॥

মঞ্জুলীর সারা দেহে লাগে কচি পাতার রোমাঞ্চ। হাসিয়া বলে, "অমন করে বুঝি তুমি ভাব ? যত সব ন্যাকামি! ও শুধু কবিতা লিখ্‌তে ব'সে।"

"কার কথা ভাবি ?"

"কার কথা তুমি আর জান না!"

"তোমাকে উদ্দেশ করে নিশ্চয়ই নয়।"

"বটে!"

মঞ্জুলী মুখ টিপিয়া হাসে। তপেশ আর একটা কবিতা পড়ে। মঞ্জুলী কান খাড়া করে। এ তো কবিতা নয়—এ যে নির্ম্মাল্য। পূজা করে চিরকালের নারীকে—তাহার চিরন্তন পূজারী পুরুষ।

তব এলোমেলো রূপরাগে
পূজার প্রদীপ জ্বালো…
ঐ দীঘল বিননীখানি
ঘন মেঘল বিথানে খোলো।
মোর নয়নে লাগে সে ভালো॥

মঞ্জুলী হাসিয়া উঠে, "সখ ছাখ না ! আমি তার জন্য এখন চুল খুল্‌তে বসি !"

তপেশ একটু হাসিয়া একটু কাশিয়া আর একটা আবৃত্তি করে—

তোমার কালো আঁখির পাতে
গান থামে যে অন্তরাতে,
বাকীটুকু গাইব ব'লে
আমার পরে ভার।
আধেক তুমি রাখ ঘরে
আধেক কর বার॥

মঞ্জুলী জবাব দেয়—

না গো, না গো, না গো, না।
বল্‌তে তুমি পারলে না।

তপেশও পাল্টা উত্তর দেয়—

স্বীকার যদি করলে না,
সত্য তবু মিথ্যা না।

উভয়ে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

মঞ্জুলী বলে, "তোমার চেয়ে আমার কবিতাটা-ই ভাল হয়েছে। হাস্‌ছ ! পাঠাও তোমাদের রবিঠাকুরের কাছে। আমাকেই ফার্ষ্ট্‌ প্রেস্‌ দেবে।"

তপেশ রাগ দেখায়। এমন হইলে কবিতা পড়া যায় না। মঞ্জুলী কথা দেয়, এবার চুপচাপ শুনিবে।

তপেশ এবার একটী দীর্ঘ কবিতা ধরে—

রাজধানী কলিকাতা নিষ্কম্প নিঝুম।
জোছনা-জোয়ারে ভাসে লঘু মেঘ-ভেলা।
চোখে নাহি ঘুম।
উঠে বস বালা !
আজ রাতে বল কে ঘুমায় !
রাতের স্তব্ধতা ভাঙ্গো চুমায় চুমায়॥

মঞ্জুলী হাসিয়া বাধা দেয়, "বাবাঃ ! কি রাক্ষস তুমি।"

তপেশ খাতা ছাড়িয়া তাহার হাত ধরে।

মঞ্জুলী হাত ছাড়াইয়া নিয়া দূরে সরিয়া যায়। হাসিয়া হাসিয়া মজা দেখে।

তপেশ আগাইয়া যায়। মঞ্জুলীও ছুটিয়া পালায়। কম্পমান মাদকতায় ঘরের বাতাস ওঠে অদৃশ্য নৃত্যে হেলিয়া দুলিয়া। নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের সুরেলা শূন্যতায় তপেশ আস্বাদ করে চলে-যাওয়া মঞ্জুলীর অতনু বিলাস।

এমনি করিয়া দুইটী তপেশ-মঞ্জুলীর—দিনের পর দিনগুলি কাটিতেছিল—হাল্‌কা হাওয়ায় ছিট্‌কানো পেঁজা তুলার মত লঘুতরল হাস্য-লাস্যে ক্রীড়া-কৌতুকে আলাপে-প্রলাপে।

এমনি সময় একদিন ভিতরের কথা বাহির হইয়া পড়িল। পিতা মদে টাকা ওড়ান সে-খবর তপেশ জানিত। মাঝে-মধ্যে বে-সামাল পিতাকে বাড়ীতেও সামলাইতে হইত। কিন্তু তিনি যে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বসিয়া আছেন চোরাবালির উপর, ঋণের পর ঋণ করিয়া মাথা গুঁজিবার আবাসখানিও পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, এতখানি তপেশ জানিত না।

আজ জানিল সর্ব্বনাশের প্রান্তে আসিয়া। এখন আর কোন উপায় নাই। ভিৎ-সুদ্ধ ইমারত পড়-পড়।

তারপর মাঝে মাঝে সুরু হইল পিতা পুত্রে কথা-কাটাকাটি। পরে বাগ-বিতণ্ডা। ক্রমে বচসা। শেষে কথা বন্ধ। চাকর-বাকররা দেখিয়া শুনিয়া থ ! মঞ্জুলী আড়ালে চোখের জল মোছে।

তপেশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মঞ্জুলীকে লইয়া আজ-বাদে-কাল সে দাঁড়াইবে কোথায় ? পিতৃশক্র আত্মীয়-স্বজনরা তাহার দুর্দ্দশায় মৌখিক করুণা প্রকাশ করিবে মাত্র। পিতার বন্ধুদের কাছে সে হাত পাতিবে না মরিয়া গেলে-ও। আর সে পথও পিতাই আগে-ভাগে মারিয়া রাখিয়াছে। মঞ্জুলী ! মঞ্জুলীকে লইয়া সে কোথায় যাইবে ?

তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে সারিলেই চলিবে।

ভূপেশ লাহিড়ী কিছুদিন পরে মদ খাইয়াই মারা গেল। ইতিমধ্যেই মঞ্জুলীর গলা ও হাত দু'খানি খালি হইয়াছে। তপেশ প্রথমে শ্যামবাজারে এক দোতলা ভাড়াটে বাসায় আশ্রয় লইল। মঞ্জুলী ভাবিল, দুঃখ-কষ্টে ভয় কি—সে তো সীতা-সাবিত্রীর দেশেরই মেয়ে। কিন্তু দুদিনেই সে বুঝিতে পারিল, কলিকাতা আর দণ্ডকারণ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তোলা-উনুনের ধোঁয়া পর্ণকুটীরের মুক্ত হাওয়া নয়। আহার্য্য জোগাইবার ভার প্রকৃতির উপর না—পকেটের উপর। ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া ১০টা ৫টা কলম পিশিতে হয়। তাহাও আবার জোটে না।

দুদিনেই হাতের টাকা ফুরাইয়া গেল। তার পর বড় সাধের এস্রাজ ও বক্স-হারমোনিয়মটাও গেল। ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের কবিদের poetical works-গুলি পুরানো বইয়ের দোকানে আশ্রয় পাইল। তপেশ বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া মঞ্জুলীর দামী শাড়ীগুলি একে একে বিক্রি করিয়া দিয়া আসিল।

অতি কষ্টে তপেশ দুইটী টিউসন্ জোগাড় করিল। কিন্তু এই ২৫৲ টাকায় দোতলায় থাকা চলে না!

অবশেষে তপেশরা রমানাথ কবিরাজ লেনের এক একতলা ভাড়াটে বাসায় উঠিয়া আসিল। 'দেখিতে দেখিতে বছরখানেক কাটিয়া গেছে। তার পরের অধ্যায়টিই আমাদের গল্পের প্রারম্ভ। (ক্রমশঃ)

কাম্য-জগৎ

শ্রী বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী এম-এ

মানুষের অন্তরের প্রেরণা হইতেছে জগতকে জীবনকে আরো সুন্দর, আরো ভাল করিয়া তোলা। শুধু বর্ত্তমানের সমস্যা লইয়া মানুষের মন কখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, ভবিষ্যৎকে বড় করিয়া তোলার স্বপ্ন তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে অনেকখানি টানিতেছে। সেই জন্য আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত একটি আদর্শ জগতের, কাম্য জগতের—ছবি যদি সম্মুখে ধরা যায়, বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সার্থক করিয়া তুলিবার পথে কি কি বাধা আছে এবং তাহা দূর করা যায় কিনা মোটামুটী আলোচনা করা যায়, তবে পথ সুগম হইবে এবং কর্ম্মধারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না করিয়া একটি মহিমময় আদর্শকে জগতের বুকে রূপ দিবার সুচিন্তিত পথে চালনা করাও সহজ হইবে। মনীষী অধ্যাপক সার রাধাকৃষ্ণণ যথার্থই বলিয়াছেন 'we need not leave the building of the new civilization to luck—it is a matter of cunning also (kalki)—অর্থাৎ "নূতন ভাবী সভ্যতা গঠনে দৈবের উপর ভার দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, এখানে বুদ্ধি খাটাইবার ক্ষেত্রও আছে।"

হউক না কেন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য এই স্বপ্ন, আমাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে যতদূর ভাল করা যায় তাহার একটি উজ্জ্বল চিত্র। মনের মত জগৎ হইতে হইলে কি কি দরকার! একটু ভাবিলেই মনে আসিবে—

(১) সকলেরই ভালভাবে খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যবস্থা চাই।

(২) কাহাকেও বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। কাজ বোঝার মত এবং দায়ে পড়িয়া করার ব্যাপার না হইয়া—হইবে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দকর ব্যাপার।

(৩) রোগ, অকালমৃত্যু ও জরা দূর করা চাই।

(৪) মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ হইবে ভালবাসার, মিলনের, শ্রদ্ধার ও প্রীতির।

(৫) মানুষের মনে যে উচ্চতর জ্ঞানের ঈষণা আছে, সৌন্দর্য্যবোধের, কাব্যকলা সঙ্গীতের, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের ধারা আছে তাহার পরিতৃপ্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা।

এখন দেখা যাউক এই পঞ্চসিদ্ধির সার্থকতার সম্ভাবনা কতদূর, কোথায় কি কি বাধা।

(১) (২) মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও অনুশীলন আজ মানুষের হাতে এমন সব শক্তি আনিয়া দিয়াছে যে আজ পরিমিত পরিশ্রমেই সকলের ভাল ভাবে খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব। জগতে যে এখনও খাওয়া-পরার কষ্ট, বাসের কষ্ট আছে, অনেক মানুষকে কদর্য্য অবস্থায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের খাওয়া-পরার সংস্থানটুকু হারাইবার এক অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা, একটা গোপনভীতি মানুষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, সে শুধু মানুষের অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে অব্যবস্থারই দোষে। ইহা শুধু আমাদের কথা নয়; যে সব মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সুযুক্তিপূর্ণ চিন্তার জন্য খ্যাত, তাঁহাদের সকলেরই এই মত। তাঁহাদের দুই একজনের নিজের কথা এস্থলে তুলিয়া দিলাম। সার

আর্থার সলটার বলেন "Even with known resources and known methods of exploiting them, the world could certainly maintain several times its present population at much more than its present standard" (Recovery)—অর্থাৎ "মানুষের জানার মধ্যে যে সব সম্পদের সন্ধান আছে, আর তাহাকে কাজে লাগানর যে সব উপায় মানুষের জানা আছে—তাহাতে এখনকার অপেক্ষা বহুগুণ লোক বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক ভালভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে।" আলডুস হাক্সলি বলেন যে জগতের এই দুরবস্থা শুধু আমাদেরই দোষে, প্রাকৃতিক্ বাধা বিপর্য্যয়ে নহে—"Our present troubles are not due to Nature. They are entirely artificial, genuinely home-made." (Science in the changing World.)

আমাদের যন্ত্রপাতির, কলকারখানার, কৃষি-বিজ্ঞানের যেমন উন্নতি হইয়াছে অর্থনীতিবিজ্ঞানের উন্নতি তেমন হয় নাই; তাই এত দুর্দ্দশা। এজন্য তিনি বলেন "We cannot buy what we produce and are therefore compelled to keep our factories idle and let our fields lie fallow. Millions are hungry, but wheat has to be thrown into sea." অর্থাৎ "আমরা যাহা উৎপন্ন করি তাহা কিনিতে পারি না—সেইজন্য কারখানাগুলিকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়, জমিগুলি পতিত রাখিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত্ত অথচ গম সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে হয়।" (বেশী গম উৎপন্ন হওয়ায় দাম পাছে পড়িয়া যায় বলিয়া আমেরিকায় সত্যই নাকি কখন কখন গম সমুদ্রে ফেলা হয়।)

বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন "Now a days the productivity of labour is such that given a wise international organisation of the worlds' productive efforts, it would be possible within a generation to secure tolerable comfort for every one without very long hours of labour. This possibility we owe to science. The fact that it is not realised we owe to stupidity and inertia," (Science in the changing world) অর্থাৎ "আজকাল শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা এমন বাড়িয়াছে যে জগতের উৎপাদন প্রচেষ্টাগুলির একটি সুচিন্তিত অভিজ্ঞ আন্তর্জ্জাতিক পরিচালনা নীতি থাকিলে একপুরুষের মধ্যেই বেশী ঘণ্টা পরিশ্রম ব্যতিরেকেও প্রত্যেকের জন্য যথাসম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বন্দোবস্ত করা সম্ভব। বিজ্ঞানের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহা যে এখনও কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই তাহা শুধু আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ও ঔদাস্যের জন্য।" এইচ, জি, ওয়েলস প্রমুখ সকল চিন্তাবীরই এই কথা বলেন। বেশী কথার দরকার নাই—বেহিসাবী ব্যবস্থায় ও অনিয়ন্ত্রণের ফলে এক পাটই আমাদের কি দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছে! দরকার হয়তো এক কোটী মণের, উৎপন্ন করিলাম দুই কোটী মণ। ইহাতে বাড়তি এক কোটী মণ উৎপন্ন করার যে পরিশ্রম যে জমী তাহা বৃথাই গেল, আর জগৎ ততখানি অন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের লাভ হইতে বঞ্চিত হইল। সেই পরিশ্রম, সেই সব—অথচ ফল দাঁড়াইল উল্টো—দারিদ্র্য ও কষ্ট। এভাবে 'চলচে চলুক' করিয়া ফেলিয়া রাখার জন্য মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভার সৃষ্টি নয়।

দেখা গেল বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে পরিমিত পরিশ্রমে জগতের সকলের খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যবস্থা সম্ভব। এইজন্য প্রথমেই চাই—সকল দেশের অভিজ্ঞ উপযুক্ত লোক দ্বারা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতি—যাহা জগতের সকল দেশের উৎপাদন জগতের প্রয়োজন বুঝিয়া এবং যে দেশ যে বিষয়ে যোগ্য তাহা বুঝিয়া সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। জগতের সমস্ত দেশ সমস্ত লোক এই মহান উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতে পারে, সব কাজ সেই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এমন একটি পরিচালক সমিতি চাই। আর মানুষের দিক হইতেও চাই এইদিকে একটা ঐকান্তিক সম্মতি। এইচ, জি, ওয়েলসের ভাষায় "The world has to become a world of men and women working to serve and not to own (Work, Wealth and Happiness of Mankind) —"জগতকে হইয়া উঠিতে হইবে সেই সব নরনারীর জগৎ—যারা সেবার জন্য কাজ করিবে, নিজে পাবার লোভে করিবে না।" কিন্তু বর্ত্তমানে ঠিক ইহার উল্টোটিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই পথের প্রধান বাধা। 'At present this world is a world of getting'—'এখন এই জগৎ

হইতেছে প্রাপ্তির বা লাভের লোভের ক্ষেত্র।" তাহাতে দাঁড়াইয়াছে বিষম প্রতিযোগিতা—যাহাতে সম্ভার সৃষ্টি করিতে গিয়া শ্রমিকের জীবন হইয়াছে কদর্য্যময়, আর দেশে দেশে রক্ষণশুল্কের প্রাচীর তুলিয়া মানুষের প্রতিভা ও শ্রমকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া এই মহান উদ্দেশ্য সফল করিতে দারুণ বাধা জন্মাইতেছে। অর্থনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—"মানুষ আজ নিজেকে বড় মনে করিলেও মনে বড় হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করিয়া পৃথিবীব্যাপী যে বিশাল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ বিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতার চাপে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি আজ ঘোরতর জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিয়াছে।" (অর্থ ও ঐশ্বর্য্য)

লাভের লোভ মানুষকে—জগতকে সমৃদ্ধ করিবার কাজ হইতে বিচ্যুত করিয়া অনেক সময় নানা অপচয়ের কাজে প্রবৃত্ত করায়। জগতের কাম্য অবস্থা সার্থক করিতে হইলে আমাদের সে সব দূর করিতে হইবে। "There would no longer be unproductive labour spent on armaments, national defence, advertisements, costly luxuries for the very rich or any of the other futilities incidental to competitive system." – Roads to Freedom (Bertrand Russell) অর্থাৎ "প্রতিযোগিতার নীতির সহিত অপরিহার্য্যভাবে যুক্ত যে সব অনুৎপাদক শ্রম, অস্ত্রশস্ত্র, জাতীয় আত্মরক্ষা, আড়ম্বর, খুব বড় লোকের জন্য কল্পিত ব্যয়সাধ্য সৌখিন দ্রব্য বা ঐ রকমের নিরর্থক ব্যাপারে পর্য্যবসিত তাহা আর মোটেই রাখা চলিবে না।" কর্ম্মস্রোতকে বৃথা কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া যেমন সম্পদসৃষ্টির পথে চালিত করিতে হইবে সেইরূপ আবার সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত জগতের প্রয়োজনমত সে সব নিয়ন্ত্রিত করিতেও হইবে। জগতজোড়া একটি শৃঙ্খলা-স্থাপনই হইতেছে গোড়ার কথা। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেন "If our scientific civilization is to to stable, it is imparative that it should be much more organised than at present." —"যদি আমাদের বিজ্ঞানলব্ধ সভ্যতাকে স্থায়ী করিতে হয় তবে একান্ত আবশ্যক—ইহাকে বর্ত্তমান অপেক্ষা সুশৃঙ্খলে চালিত করিতে হইবে।" এই শৃঙ্খলা না থাকায় "The various parts of the world have become economically interdependent but there is no international organization either of production or banking...each nation wishes to produce everything itself with the result that the industrial plant in the world is producing much more than the world is able to consume. —"জগতের সব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইতে চাহিতেছে; সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা না থাকায় সবাই সব জিনিষ নিজের দেশেই করিতে চাহিতেছে; ফলে এমন উৎপাদন হইতেছে যে তাহা কাজে লাগানর উপায় হইতেছে না। উৎপাদক কেন্দ্রগুলিকে বেকার হইতে হইতেছে।"

দেখা গেল মানুষের বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা এত বাড়াইয়াছে যে এখন আর জগতের প্রত্যেকের জন্য পরিমিত পরিশ্রমে ভালভাবে খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যবস্থা অসম্ভব নয়। শৃঙ্খলার অভাবে—লোভ, প্রতিযোগিতা ও অব্যবস্থার দোষেই মানুষের কষ্ট হইতেছে। এ বিষয় জগতজোড়া আন্দোলন হওয়া দরকার।

(৩) রোগ, অকালমৃত্যু ও জরা দূর করা এখনও সম্পূর্ণ সম্ভব না হইলেও মানুষের সাধনা এদিকেও তাহার পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখন প্রায় সমস্ত রোগের প্রকৃতি ও প্রতীকারের উপায় বাহির করিয়াছেন এবং অধিকাংশ রোগের পরিচয় এবং চিকিৎসা মানুষের জ্ঞানের গোচর করিয়াছে। এখানেও দেখি যতখানি জ্ঞান মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে তাহা দেশময় যে প্রয়োগ করা যাইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ—মানুষকে লোভের ও হিংসার বশে এমন সব বাজে কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে এদিকে তাহার যথোচিত সামর্থ্য ও চেষ্টা একনিষ্ঠভাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। উপযুক্ত প্রচারের অভাবে এবং দেশময় স্বাস্থ্যরক্ষকের ব্যবস্থার অভাবেই মানুষ এত কষ্ট পাইতেছে। সকল মানুষের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য একটি সুগঠিত পরিচালক সমিতি সর্ব্বাগ্রে সকল দেশের ভাল ভাল লোক লইয়া গড়িতে হইবে। মানুষ অব্যবস্থা ও অবিবেচনার জন্য তাহার বর্ত্তমান

জ্ঞানকে ভাল করিয়া কাজে লাগাইতে না পারায় দুঃখ পাইতেছে। এতদিন দুঃখ পাইয়াছে বলিয়া চিরদিন দুঃখ পাইতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। তাহা ছাড়া প্রথম দুই দফারই সুব্যবস্থার যদি সকলেরই পরিমিত পরিশ্রমে ভাল খাওয়া-পরা ও ভাল বাসের ব্যবস্থা করা যায়—রোগ অকাল-মৃত্যু ও জরা দূর করা অনেক সহজ হইবে। অনেক রোগ অনাহার অর্দ্ধাহার হইতে হয়। অনেক রোগ ভাল বাস-গৃহের অভাবে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রচার দ্বারা এবং সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থায় অবস্থাকে আয়ত্বে আনা যাইতে পারে। ঈর্ষা ও লোভের বশে প্রতিবেশী মানুষকে শত্রু কল্পনা করিয়া যুদ্ধে ও যুদ্ধের আয়োজনে যে বিপুল শ্রমশক্তি ও প্রতিভা মানুষ অপব্যয় করিতেছে তাহা যদি সমস্তই মানুষের যথার্থ শত্রু—এই রোগ, অকালমৃত্যু, জরা, দারিদ্র্য দূর করার জন্য নিয়োগ করা যায় তবে এ আর শুধু কবির কল্পনা থাকে না।

(৪) মানুষ যতবার তাহার সভ্যতা, তাহার উন্নতির ধারা একটি সীমাবদ্ধ দেশের মত করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছে ততবারই তাহা ব্যর্থতায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঈর্ষা বা লোভপ্রসূত সমরানলে। যেন সৃষ্টির ভিতরের উদ্দেশ্য হইতেছে সমগ্র মানবজাতির মিলিত রাষ্ট্র, সমস্ত মানবসমাজের জড়িত কল্যাণ। উহার প্রকাশ ব্যতিরেকে কিছুই সার্থক হইতেছে না। অতীতে যাঁহাদের বীরত্বে ও অতিমানুষিক কর্ম্মে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট, তাঁহাদের ভিতর দেখি এই অদৃশ্য প্রেরণা কাজ করিতেছে জগতজোড়া সাম্রাজ্য স্থাপনের এক আকুল আগ্রহে। অলিকসন্দার (Alexander), জুলিয়াস সিজার, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—এক বিশালতার প্রেরণা পাইয়াছিলেন; কিন্তু লোভ ও অহঙ্কারের মানবীয় দুর্ব্বলতায় মিশিয়া তাহা জগতে অকল্যাণেরই সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যতদিন মানুষের মাঝে দুর্ব্বলতা থাকিবে ততদিন যুদ্ধও ঘটিতে থাকিবে। সৃষ্টি যেন ভীষণ সমরানলে দুর্ব্বলকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছে। সমরের সার্থকতা ততদিন, যতদিন মানুষের মাঝে দুর্ব্বলতা না দূর হইবে। জগতজোড়া বলের কি প্রতিযোগিতা!

মানুষের স্বভাবের পরিবর্ত্তন বড় একটা ঘটে নাই। লেখাপড়া ও বিজ্ঞানের উন্নতি এত হইলে কি হয়, এখনও মানুষের মন আদিম যুগের বর্ব্বরতায় ভরা। মনীষী এইচ, জি, ওয়েলস্ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত বই "The outline of History"তে যথার্থই লিখিয়াছেন "we are beginning to understand something of what our race might become, were it not for our still raw humanity.…Make men and women only sufficiently jealous or fearful or drunken or angry and the hot red eyes of the cavemen will glare out at us today."—অর্থাৎ "আমরা সবে মাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে আমাদের স্বভাব যদি বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত হইতে পারিত তবে আমাদের মনুষ্য-সমাজ কি না হইতে পারিত, পৃথিবীতে কি সম্ভাবনীয়তাই না ফুটিত।…মানুষকে রাগাইয়া দাও, ভয় পাওয়াইয়া দাও, তাহার ঈর্ষা জাগাও বা তাহাকে মাতাল করিয়া তোল, তখনি আদিম গুহাবাসী মানুষের রক্তচক্ষু ফুটিয়া উঠিবে।"

মানুষের স্বভাবে এখনও আছে দারুণ বাধা, যাহা এই চতুর্থ সিদ্ধিকে—মানুষের কাম্য সম্বন্ধকে—ভালবাসার মিলনের শ্রদ্ধার ও প্রীতির গৌরবে ভরাইয়া সার্থক হইতে দিতেছে না। মানবের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে মাঝে মাঝে এমন সব মহাপুরুষ জগতে আসিয়াছিলেন যাঁহারা মানুষকে বারবার তাহার এই দুর্ব্বলতা মুক্ত করিয়া জগতে 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার বাণী আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় মানুষ 'ধর্ম্ম' গড়িল বটে, কিন্তু স্বভাব তাহার কিছুতেই বদলাইতে চাহিতেছে না। পরন্তু ধর্ম্মের নামে রক্তপাত বারবার জগতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে।

ইউরোপে ধর্ম্মগুরু পোপকে কেন্দ্র করিয়া এক সময় এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এবং প্রায় সমস্ত ইয়োরোপীয় রাজ্যগুলির উপর পোপের এরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল যে মনে হইত ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হইবে, জগতের এক বিরাট অংশে শান্তির রাজ্য হইবে। কিন্তু পোপ নিজেই তাঁহার সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন। যীশুখৃষ্টের মহান পবিত্র আদর্শকে রূপ না দিয়া খুঁজিলেন নিজের স্বার্থপরতার ও চক্রান্তের সিদ্ধি। ফলে কুটিলতায়, স্বার্থপরতায় ও ক্ষমতার গর্ব্বে ইউরোপ মজিল; খৃষ্টের 'স্বর্গরাজ্যের' স্থানে বসাইল ম্যাকিয়াভেলীর (Machiavelli) কূটনীতি। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রাশিয়া,

অষ্ট্রিয়া, স্পেন, ইংলণ্ড সর্ব্বত্র জাঁকজমকশীল রাজাদের (Grand monarchies) সৃষ্টি হইল। তাঁহারা পরস্পর হিংসা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন, বিলাসে আর অনর্থক যুদ্ধে দেশের সম্পদ নষ্ট করিতে লাগিলেন। আর সাধারণ লোক তাহার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা লইয়া ক্ষুদ্র আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। কোন কিছু না ভাবিয়া এই অবস্থাকে স্বীকার করিয়াই চলিত। শুধু ইউরোপে নয় সমস্ত জগতে সভ্যতা এই ধারা ধরিয়াই চলিয়াছে। ওয়েলস্ বলেন "Civilization, as this 'Outline' has shown, arose as a community of obedience and was essentially a community of obedience. But generation after generation this spirit was abused by priests and rulers"—অর্থাৎ "রাষ্ট্রের ও ধর্ম্মের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মানুষ গড়িয়া চলিয়াছে সভ্যতা—আর যুগের পর যুগ ধরিয়া পুরোহিত ও রাজারা সেই সুযোগের অপব্যবহার করিয়া চলিয়াছেন।"

অবশেষে মানুষের অন্তরাত্মা বিরক্ত হইয়া এই নির্ব্বিবাদে বশ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার স্থলে বসাইতে চাহিতেছে স্বেচ্ছায় মিলনের দ্বারা গড়া এক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ফরাসীবিপ্লবের ভিতর দিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণতন্ত্র গঠনের ভিতর দিয়া, রাশিয়ায় বলশেভিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া মানুষ খুঁজিতেছে এক নূতন রাষ্ট্রীয় সার্থকতা, যেখানে প্রত্যেক মানুষ পাইবে তাহার নিজস্ব গৌরব (should be treated as a sovereign of himself), আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাহার স্বেচ্ছাকৃত সম্মতিতে গড়া রাষ্ট্র হইয়া উঠিবে সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতীক (Community of will)।

কিন্তু ইতিহাসের গতি কখন সোজা একটানা উন্নতির পথে চলে নাই—"History has never gone simply forward" (The outline of History)। বিগত মহাযুদ্ধ—যাহাকে বলা হয় বর্ত্তমান রাজতন্ত্রের বধময় পরিণাম (Catastrophe of modern imperialism) তাহা মানুষের মনে যে এক উচ্চ প্রেরণা আনিয়াছিল, সমগ্ররাষ্ট্রের মিলনের দ্বারা (League of Nations) জগতের সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা আনিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর সার্থকতার পথে না গিয়া আবার সেই পুরাতন পথেই জাতীয়তাবাদের উগ্রধারায় চলিল, পরস্পরের সম্বন্ধ প্রীতির ও শ্রদ্ধার না হইয়া সংশয় ও স্বার্থের কুটিলপ্রবাহে আবার চলিল। ফলে আর এক মহাসমরের কৃষ্ণবর্ণ মসীরেখা আজ জগতের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উভয়দিকেই প্রসারিত। প্রখর রাজনৈতিক কল্পনালোকে লিখিত—"The shape of things to come" পুস্তকে মনীষী ওয়েলস ভাবী এক মহাসমরের যে ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার সূচনা বুঝি দেখা যায়! ভাবী বিপদের আশঙ্কায় 'ষ্টেটসম্যান' আজ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে—"It is for it to discover in every country just how many men are prepared to fight for the League in an international force at a war-crisis and would prefer to do this rather than to be called to the colours by a purely national government. The result will, we think, astonish the world. With this material the basis of an international air force should be laid" (The Statesman June 11, 1936)—অর্থাৎ "প্রত্যেক দেশে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে আসন্ন-যুদ্ধের সময় নিজ নিজ জাতীয় দলে যোগ না দিয়া কত লোক বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের কল্যাণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। ফলে এত লোক পাওয়া যাইবে যে সকলে আশ্চর্য্য হইবে। এই দল লইয়া একটি আন্তর্জ্জাতিক বিমানবহর গড়িতে হইবে।"

মহামতি ওয়েল্‌সের আদর্শে নিম্নলিখিত ধারামত একটি বিশ্বরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(ক) "এক সাধারণ ধর্ম্মের বনিয়াদে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ইসলাম বা বিশিষ্ট কোন মতবাদের উপর ইহার স্থিতি হইবে না। সকল ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উচ্চতম উপদেশের সমষ্টি লইয়া,যেমন নিঃস্বার্থতা,ভ্রাতৃত্ব, মানবের একত্ব, সেবা—ইহার পরিকল্পনা গড়িতে হইবে।

(খ) সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু কোন এক সম্প্রদায়ের জন্য নয়, সমগ্র মানবকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জগতের শতকরা দশজন লোককে পরিণত বয়সে জীবনের কতক সময় এই শিক্ষাদান কাজে কাটাইতে হইবে।

(গ) সৈন্য থাকিবে না, সমরপোত থাকিবে না, ধনী হউক দরিদ্র হউক—কোন কর্ম্মহীন বেকারও থাকিবে না।

(ঘ) বিশ্বরাষ্ট্র বিজ্ঞান-অনুশীলনের এমন ব্যবস্থা করিবে যে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অনুশীলন ছেলেখেলার মত বোধ হইবে।

(ঙ) সমালোচনা ও নানা বিষয়ের আলোচনায় এক বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হইবে।

(চ) পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলি সাধারণতন্ত্রের ধারামত হইবে। সমস্ত শিক্ষিত লোকসমাজের সাধারণ চিন্তার ধারাও নির্দ্দেশমত হইবে।

(ছ) অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা এমন হইবে যে জগতের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে এবং বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে যে সব সম্ভাবনীয়তা আসিবে সমস্তই কাজে লাগান যাইবে। সমস্ত মানবের সাধারণ কল্যাণের জন্য সাধারণ রাষ্ট্রকেন্দ্র হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইবে। ব্যক্তিগত চেষ্টা—প্রভু ও অপহারক না হইয়া সেবকের মত এসব ক্ষেত্রে চালিত হইবে এবং সেবক তাহার যোগ্য পুরস্কার বা লাভও পাইবে।

(জ) ভোটের ব্যাপার এবং মুদ্রানীতি রাষ্ট্র পরিচালনার এই দুইটি অপরিহার্য্য অঙ্গ অবশ্য রাখিতে হইবে। তবে দেখিতে হইবে অসাধু প্রকৃতির ও চতুর লোকের হাতে ইহার অপব্যবহার না ঘটে।

এইরূপ একটি উচ্চ-আদর্শ অবস্থা-জগতে সার্থক হইয়া উঠার পথে পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাকৃতিক বাধা ছিল, বিজ্ঞানের অনুশীলনে সে সকল বাহিরের বাধা সমস্তই প্রায় দূর হইয়াছে। রেল, জাহাজ, এরোপ্লেন, বেতারবার্ত্তা আজ সমস্ত জগতকে প্রায় একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছে। এই সব সুবিধা ও সুযোগ আগেকার দিনে ছিল না। বাহিরের বাধা তখনকার দিনে বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাবনীয়তাকে রূপ পাইতে দেয় নাই। মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধকে এক সখ্যসূত্রে গাঁথিবার পক্ষে বাহিরের বাধা আজ ঘুচিয়াছে। এই পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য মানুষকে করিতে হইবে তাহার অন্তরের পরিবর্ত্তন। তাহাকে সাহসের সঙ্গে গতানুগতিক চিন্তার ধারা বদলাইয়া নূতনভাবে সমস্ত বুঝিতে ও দেখিতে শিখিতে হইবে। এতদিন শুধু ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণ দেখিলেই চলিয়াছে কিন্তু ইহাতে সত্যকার এবং স্থায়ী কল্যাণ লাভ হয় নাই। সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণব্রতে মিলিয়া সমগ্রের কল্যাণের মধ্যে নিজ নিজ স্থায়ী কল্যাণ পাইতে পারেন। শুধু গোঁড়ামী আর গতানুগতিক চিন্তার ধারা ছাড়িয়া নূতন চোখে জগৎ দেখিতে শিখিতে হইবে। ভূমার মধ্যে, বৃহতের মধ্যেই সত্যকার কল্যাণ আছে। আজও যারা আসুরিক বলকে আঁকড়াইয়া সীমাবদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদ ও রাজতন্ত্রের ক্ষুদ্র স্বার্থ খুঁজিতেছে তাহাদের ধ্বংস আসন্ন। মুসলিনী হইতেই ধ্বংসের 'মুষল' উদ্ভূত হইবে কি না কে জানে ?

(৫) এমন মনে হইতে পারে যে যদিই এইরূপ একটি শান্তিময় আদর্শ-বিশ্বরাষ্ট্র জগতের বুকে সত্যই সার্থক হয় তবে মানুষের বীরত্বের, প্রতিভার, উদ্ভাবনী-শক্তির তেমন বিকাশ ঘটিবে না—যেমন এখন পরস্পরের প্রতিযোগিতায় বাধ্য হইয়া ফুটিতেছে। যাঁহারা এমন মনে করেন তাঁহারা মানুষকে এখনও ঠিকমত চিনেন নাই। মানুষের মনে আছে এক উচ্চতর জ্ঞানের ঈষণা। এই জ্ঞানের প্রেরণা, সৌন্দর্য্যবোধ, কাব্যকলা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাহাকে টানিতেছে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশের পথে! অবসর ও অনুকূল অবস্থা পাইলেই সে গড়িয়াছে পীরামিড, তাজমহল, এলোরা, অজন্তা। দুর্গমকে জয় করার, নূতনকে আবিষ্কার করার নেশা তাহার প্রতি রক্তবিন্দুতে আছে। আফ্রিকার জঙ্গল, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর বরফের সমুদ্র—সর্ব্বত্র চলিয়াছে বীর মানবের বিজয় অভিযান। তাহা ছাড়া অতীতকালে ভারতের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, মধ্যযুগে ইয়োরোপে নাইটদের মধ্যে, এমন কি বিগত শতাব্দী অবধি রাজপুত ও শিখবীরগণের মধ্যে—যুদ্ধের ভিতর দিয়া মানব চরিত্রের যে বীরত্ব ও মহত্ত্ব ফুটিত আজ আর তাহা হইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ভূষিত—যুদ্ধ আজ এক সর্ব্বধ্বংসী বর্ব্বরতার লীলামাত্র। মানুষের বীরত্ব ও প্রতিভাকে আজ নিয়োজিত করিতে হইবে এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে। বৃথা শক্তিক্ষয়ে নষ্ট না করিয়া তাহার প্রতিভা, বীরত্ব, কর্ম্মশক্তি ও কুশলতা লইয়া দাঁড়াইতে হইবে জগতের সকল অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে। জগতের প্রত্যেক লোককে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে জ্ঞানের অনুশীলনে নব নব শক্তিকে আরব্ধ

করিয়া সকল প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করিয়া জগত হইতে রোগ, অকালমৃত্যু, দারিদ্র্য দূর করিতে বীরত্ব, প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি খাটাইবার ক্ষেত্র অপরিসীম। ভ্রান্ত ধারণা আজ ছাড়িতে হইবে যে পরস্পরের ধ্বংস ছাড়া বীরত্ব প্রকাশ বুঝি সম্ভব নয়।

সকল প্রাকৃতিক বাধা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ যখন প্রচুর অবসর ও সুযোগ পাইবে তাহার অন্তরের আনন্দে ও প্রেরণায় সে সৃষ্টি করিবে এক উচ্চতর সাহিত্য, কাব্য ও কলা, সুরম্য সৌধ হর্ম্ম্য। দলে দলে লোক জগতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাগর শৈল কান্তারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবাধে ভোগ করিয়া বেড়াইবে। মানুষের উচ্চতর সম্ভাবনীয়তা ও অন্তরের বিকাশ বিশ্বরাষ্ট্রের কল্যাণে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সফল হইতে পারে। কিন্তু সকলের গোড়ার কথা হইতেছে সকলের মধ্যে সমগ্র মানবের কল্যাণবোধ, কাম্য জগত প্রতিষ্ঠার মহতী প্রেরণা সর্ব্বাগ্রে জাগাইতে হইবে। ভাবী জগতকে খেয়ালের হাতে ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে আমরা আর দুঃখ না পাই এ শিক্ষা সকলকেই দিতে হইবে। মনীষী সার রাধাকৃষ্ণণের এই কথাটি মনে করিয়া চলিতে হইবে "Progress *happened* in the subhuman world; it is *willed* in the human" (kalki)—"মানুষের নীচের স্তরে সৃষ্টি বিকাশে উন্নতি আপনা হইতেই ঘটিয়াছে, কিন্তু মানুষের স্তরে ইহাকে ইচ্ছা দ্বারা ঘটাইতে হয়।"

হংস-বলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

(৫)

কর্ত্তাবাবুর ইচ্ছা ছিল অন্নপ্রাশনে বিশেষ একটু ধুম করেন। তিনি নিজে দু'শো টাকা সংগ্রহ ক'রেছেন। সুকুমার একশো টাকা দেবে। এই তিনশো টাকায় গ্রাম ষোলো আনা বেশ ভালো ক'রেই খাওয়ান হবে। এর মধ্যে লৌকিকতা বাবদ কিছু টাকা আসবে, প্রায় শতখানেক। সুতরাং কর্ত্তাবাবুর খরচ দুশো টাকার মধ্যেই।

স্থির হয়েছিল ফটকে নহবৎ বসান হবে। আর থাকবে একদল ব্যাণ্ড। আর দেশের মুচির বাজনা তো আছেই। আর লোক খাওয়ান হবে প্রায় হাজারখানেক। বেশী কিছু নয়—ভাত, দুটো ডাল, পটলভাজা, বড়া, কুমড়োর তরকারী, কপির তরকারী, মণ কয়েক মাছ, দই, ক্ষীর, পায়েস আর তিন রকমের মিষ্টি।

কিন্তু বাধা পড়ল।

প্রথম, মাস ছয়েক পূর্ব্বে মুখুয্যেদের কয়েকটি ছোকরা গোপনে মুরগী খেয়েছিল। রন্ধন এবং আহার গোপনেই হয়েছিল, কিন্তু পরে এই কুখাদ্য ভক্ষণের কথাটা তারা আর গোপন রাখেনি, প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছিল। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হয়। কিন্তু তাতে কিছুতে সম্মত হয়নি। এখন চাটুয্যেদের এবং তাঁদের অনুগত ব্যক্তিদের বক্তব্য এই, যে অন্নপ্রাশনের ভোজে মুখুয্যেদের নিমন্ত্রণ হ'লে তাঁরা খেতে আসবেন না।

দ্বিতীয় গোলযোগ হালদারপাড়ায়।

সুরেশ্বর হালদারের কনিষ্ঠা কন্যা কিছুকাল পূর্ব্বে গৃহত্যাগ ক'রেছে। একে তো তারই শোকে, লজ্জায় ও ঘৃণায় সুরেশ্বর বাড়ীর বাহির হয় না। কর্ত্তাবাবু পৌত্রের অন্নপ্রাশনে সানন্দে যোগ দেবার মতো অবস্থা এমনিতেই তাহার নেই। তার উপর এই উপলক্ষেই তাকে জব্দ করবার জন্য ওর পাড়ার আত্মীয়-স্বজনরা উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা এসে কর্ত্তাবাবুকে স্পষ্টই জানালে, সুরেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করলে তারা এ কাজে নেই।

সুকুমার বললে, সুরেশ্বরের দোষ কি?

—তার কন্যা…

—তাঁর কন্যা। তিনি নিজে তো যাননি। কন্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি তাঁকে করতে হবে?

—নিশ্চয়ই। সেই রকমই শাস্ত্রের বিধান।

—শাস্ত্র!

সুকুমার কি একটা কঠোর মন্তব্য করতে গিয়ে থেমে গেল।

কর্ত্তাবাবু বিরক্তভাবে সমাগত সকলকে বললেন, বাপু, আমার নাতির ভাতে গ্রাম-ষোলো-আনা খাওয়াব সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা পরিত্যাগ করলাম।

তা ছাড়া উপায়ও ছিল না। চাটুয্যেরা তাঁর শত্রু নয়, মুখুয্যেরাও তাঁর কাছে কোনো অপরাধ করেন নি। এক-জনকে চটিয়ে আর একজনকে খুশী ক'রে তাঁর কোনোই ইহলৌকিক উপকার নেই। সুরেশ্বর হালদারের সামাজিক অপরাধ সম্বন্ধে যদিচ তিনি সুকুমারের সঙ্গে একমত নন তবু তার শাস্তিবিধানের উপলক্ষ হ'তেও মন স'রল না। সেজন্য নিমন্ত্রণ করলেন বেছে বেছে, অর্থাৎ নিতান্ত যাদের না ক'রলে নয় তাদেরই। ফলে আড়ম্বরও খাটো হ'ল, ব্যয়ও সঙ্ক্ষেপ হ'ল। কেবল সঙ্ক্ষেপ হ'ল না সামাজিক গোলযোগ। অন্নপ্রাশনের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, গোলযোগের সূত্রও তত বেড়ে যেতে লাগল। অবস্থা ক্রমেই অধিকতর জটিল হ'তে লাগল। মুখুয্যেরা চাটুয্যেদের সন্তানদের বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি অভিযোগ আনলেন যার সামাজিক গুরুত্ব মুরগী খাওয়ার মতো অতখানি না হ'লেও নিতান্ত কম নয়।

চাটুয্যেদের সন্তানদের মধ্যে মদ্যপান কেউ না করলেও তাড়ি খান। দু'তিন ঘরের অবস্থা কিঞ্চিৎ মলিন হওয়ায় তাঁরা বাড়ীর সংলগ্ন জায়গায় শাক-সব্জীর চাষ করেছেন। সেই শাক-সব্জী তাঁরা নিজেরা মাথায় ক'রে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। আরও একটা কথা বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, প্রাণগোপাল বিদেশে কতকগুলি বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ ক'রেছে। তাদের গৃহে নিশ্চয়ই সে আহারও ক'রেছে। প্রাণগোপাল অবশ্য চাটুয্যেদের কেউ নয়, কিন্তু তাদেরই দলভুক্ত। অপর দিকে সুরেশ্বর তার আরও কয়েকঘর স্বজাতির গৃহের এমন কতকগুলি সর্ব্বজনবিদিত গোপনীয় কেলেঙ্কারী সর্ব্বসমক্ষে ডাক পেড়ে বলতে লাগল যে, একটা বড় রকম ফৌজদারী মামলা বাধতে বাধতে আটকে গেল।

এই গোলযোগের নিবৃত্তি হ'ল অন্নপ্রাশনের দিন—যখন দেখা গেল কর্ত্তাবাবু এই গোলযোগের পাণ্ডাদের সকলকেই বাদ দিয়ে বেছে বেছে মাত্র কয়েকজন নির্ব্বিরোধী লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। নিবৃত্তি হ'ল তখনই। হঠাৎ। তখন এতবড় একটা নিমন্ত্রণ ফাঁক পড়ার জন্য কারও মনে আক্ষেপ হয়েছিল কি না, সে প্রসঙ্গের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। তবে এতে পাড়ার ঘোঁটও কম্‌ল না, দলাদলিও বন্ধ হ'ল না। শুধু ধামাচাপা রইল, আবার কারও বাড়ী ক্রিয়া-কর্ম্ম হ'লে নতুন ক'রে উঠবে।

মণিমালা বললে, রূপোর বাসন খুব তো আনলে!

সুকুমার কাঁচুমাচু ক'রে বললে, সুবিধে হ'ল না।

—তা হবে না তো। আমার ফরমাস কি না, তাই আর গ্রাহ্যই হ'ল না। আমার বলাই ভুল হয়েছিল।

সুকুমার অপ্রস্তুতভাবে শুধু একটু হাসলে।

—আমি নিতান্ত বেহায়া তাই চাই।

সুকুমার কর্ম্মান্তরের অভাবে খোকাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল।

মণিমালা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, কখনও কিছু চাই না কিনা তাই। পড়তে অন্য মেয়ের পাল্লায় তো বুঝতে।

তার পরে চোখ মুছে বললে, সাত নয়, পাঁচ নয়, এই প্রথম ছেলে। তোমার প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ ব'লেও কিছুই নেই?

সুকুমার বলতে পারলে না, খোকার জন্য রূপোর বাসন কেনার সে দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখেছে। বলতে পারলে না, দোকানের শো-কেস সে দিনের পর দিন দেখে দেখে বেড়িয়েছে, আর কেমনটি হ'লে খোকার জন্য বেশ মানায় তাই কল্পনা ক'রেছে। কেমন ক'রে তার অন্তরে এই প্রথম দারিদ্র্যের গ্লানি জমল, তাও মণিমালাকে বুঝিয়ে বলতে পারলে না।

শুধু মাথা হেঁট ক'রে বললে, টাকায় কুলোতে পারলাম না।

মণিমালা ছিটকে উঠে বললে, দেখ, মিথ্যে কথা বোলো না। ও-বাড়ীর মেজ বট্‌ঠাকুর তোমার চেয়ে অনেক কম রোজগার করেন। তিনি কি ক'রে এনেছিলেন?

তা তিনিই জানেন। সুকুমার এ কৌশলের কিছুমাত্র অবগত নয়। সে চুপ ক'রে রইল।

তিথিটা বোধ হয় শুক্লা-পঞ্চমী ছিল। আর তার সঙ্গে ছিল স্বপ্নের মতো চমৎকার কুয়াশা। ধীরে ধীরে চাঁদ মেঘে ঢেকে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। একটু থামে, আবার নামে। মেঘ আর কিছুতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না। সকালে উঠে সুকুমার দেখলে যতখানি মনে ক'রেছিল তেমন বৃষ্টি হয়নি। রাস্তায় যেখানটা খাল, সেখানে হয়তো একটু কাদা হয়েছে। বাকি পথে মাত্র ধুলোটাই গেছে। তবে মেঘ এখনও কাটেনি। অল্প কুয়াশাও রয়েছে—গাছের পাতায় পাতায়, বনফুলের ঝোপে ঝোপে, দূর দিগন্তের কোলে কোলে মাকড়সার জালের মতো কুয়াশা রয়েছে। ধানের পালা বেয়ে, খড়ের চাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলও থেকে থেকে পড়ছে। হয়তো আবার বৃষ্টি পড়বে।

শীত আছে। তার সঙ্গে জোলো হাওয়ার জন্য ঠাণ্ডাও আছে। সুকুমার র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে কোন দিকে বেরুবে ভাবতে লাগল।

তার ও-বাড়ীর ভাইপো মিণ্টু এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কুকুরের বাচ্ছাটা দেখেছ সুকুকাকা?

মিণ্টুর বয়স পাঁচ বৎসরও পোরেনি। কিন্তু অনর্গল কথা বলতে পারে।

সুকুমার তাকে কোলে তুলে নিলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি রঙের কুকুরের বাচ্ছা?

মিণ্টু বুড়ো আঙুলটা মুখে দিয়ে একটুক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা ক'রে উত্তর দিল, লাল রঙের।

অর্থাৎ মিণ্টু ওই একটা মাত্র রঙেরই নাম জানে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিল তোমার কুকুরের বাচ্ছা?

—গোয়াল ঘরে। ওর মায়ের কাছে শুয়ে ছিল।

একটু পরে বিষণ্ণভাবে বললে, পিসিমা বললে শেয়ালে নিয়ে গেছে।

মিণ্টুকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সুকুমার বললে, তোমার পিসিমা জানে না।

মিণ্টু মাথা নেড়ে বললে, না, শেয়ালে নেয় যে! আরও কত বাচ্ছা নিয়ে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তিনটে চারটে বাচ্ছা নিয়ে গেছে। কত সুন্দর সুন্দর বাচ্ছা। শেয়াল ভারী দুষ্টু। না কাকা?

—আজ শেয়ালটাকে মারব। কেমন?

মিণ্টু মাথা নেড়ে শেয়াল মারার অনুমতি দিলে। বললে, রোজ কুলগাছে কুল খেতে আসে।

সুকুমার তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা। আজ কুল খেতে এলে তার দেখাব মজা।

মিণ্টু খুশী হ'য়ে বাড়ী চ'লে গেল।

সুকুমার ভবতোষের আড্ডায় যাবার জন্য বেরুল। পথে ব্রজ স্বর্ণকারের দোকানে প্রাণগোপালের সঙ্গে দেখা। একটা থেলো হুঁকোয় সে নিবিষ্টমনে তামাক খাচ্ছে, আর বোধ হয় গোরাঙ্গর জন্য অপেক্ষা করছে। মুখ কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

প্রাণগোপাল সমাদরে তাকে একখানা চাটাই এগিয়ে দিলে। সহাস্যে বললে, সামান্য ব্যাপার। হাজার দশেক টাকার।

—সামান্যই বটে। কি হবে ওতে?

প্রাণগোপাল হাত উঁচিয়ে বললে, গাঁয়ের ক'ব্যাটার মাথা আগে কাটি। তারপরে যা হবার তাই হোক।

সুকুমার হেসে বললে, আমার মাথাটা কেট না ভাই। আর যার কাটবার কেট।

—আচ্ছা, তোমাকে রেহাই দিলাম।—ব'লে গম্ভীরভাবে ধূমপান করতে লাগল। একটু পরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পার? জিনিস বন্ধক রাখব।

সুকুমার হো হো ক'রে হেসে বললে, দশ হাজার থেকে দশ!

প্রাণগোপাল অপ্রস্তুত হয়ে বললে, যা বলেছ! দশ হাজার টাকা আমার নিতান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, মুক্তি চাই না, শুধু হাজার দশেক টাকা। ব্যস্!

—আর তোমার তিলক-মালা-টিকি-নামাবলি?

—ওটাও ছাড়া হবে না, বুঝেছ? ওর মধ্যেও অনেক গুহ্য তত্ত্ব আছে। সে তোমরা বুঝতে পারবে না। ওটাও থাকবে, তার সঙ্গে হাজার দশেক টাকা।

—তা মন্দ হবে না। কিন্তু তোমার গৌরাঙ্গ কই? এখনও দাবা পড়েনি যে!

—আর বোলো না। সে চা'ল সংগ্রহে বেরিয়েছে।

—চা'ল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা সিদ্ধ ক'রে ভাত হয়। আর বড়লোকে মাছের ঝোল দিয়ে, আর আমরা নুন দিয়ে খাই।

—ও।

—তবে আর দশ হাজার টাকা চাইছি কেন?

—চা'ল কেনবার জন্য?

—হ্যাঁ। আর কিনব একটা রূপোর গড়গড়া, আর একটা রিষ্টওয়াচ। ব্যস্।

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে প্রাণগোপাল বললে, তোমার কি বল! দিব্যি ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ মারছ, চা'লের দর জানবার দরকার হয় না। এবার কি আর ধান কারও হয়েছে? সব কেনা চা'লের ভাত খাচ্ছে। দেখছ কি, সব শহর হয়ে উঠল। বেলা বারোটার পর কোনো গেরস্তর হাঁড়িতে এক মুঠো ভাত প'ড়ে থাকে না। হুঁ, হুঁ!

হঠাৎ দূরে গৌরাঙ্গকে আসতে দেখে প্রাণগোপাল উল্লসিত হয়ে উঠল। চীৎকার ক'রে বললে; এই যে, জননী! চা'ল মিলেছে? ধারে দিলে তো? না, দিলে না?

গৌরাঙ্গ এক মুখ হেসে বললে, দিয়েছে।

—এত দেরী হ'ল যে?

—কত পট্টি দিতে হ'ল ভাই। সহজে কি দেয়?

ব'লে প্রাণগোপালের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে ক্ষুধার্ত্তের মতো টানতে লাগল।

তারপর সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে, ছুটি আর ক'দিন?

—রবিবার রাত্রে যেতে হবে।

—বেশ, বেশ! প্রাণগোপাল দাবার ছকটা পাত? গোটা কতক ভালো চা'ল শিখে নাও?

প্রাণগোপাল হো হো ক'রে হেসে বললে, তবেই হয়েছে! তোমার সঙ্গে খেলাই মিথ্যে, নিতান্ত সঙ্গীর অভাবে খেলি। তা যখন বলছ, ওরে বেজা, ছকটা নামা। দু'বাজি দিয়ে দিই।

সুকুমার উঠল।

প্রাণগোপাল বাধা দিয়ে বললে, কোথায় যাও? গৌরাঙ্গর দুর্দ্দশাটা একবার দেখে যাও।

সুকুমার হেসে বললে, নাঃ, খেল তোমরা। আমি একবার ভবতোষের ওখানে একটা ঢুঁ দিয়ে আসি।

প্রাণগোপাল তাড়াতাড়ি তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, ওরে বাবা, হাই সার্কেলে! যাও, যাও।

সুকুমার ওদের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

মনে মনে ভাবলে, বেশ আছে এরা। তার হংস-বলাকার এরাও একটি জোড়া। কোথায় মানস সরোবর, আর কোথায় বেজা স্যাকরার দোকান! কিন্তু বেশ আছে। সমস্তক্ষণ দুটি শাকান্নের জন্য অশেষবিধ দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি ভোগ করছে, হয়তো সমস্ত জীবনভোরই করবে। তারই মধ্যে এই কটি মুহূর্ত্ত দাবার কল্যাণে সব ভুলে থাকে। এইটুকুই ওদের জীবনের পরম মুহূর্ত্ত। এ সংসারে ওদের কিছুমাত্র কামনা নেই, কামনা মাত্র দশটি হাজার টাকার। তাই নিয়ে ওরা চা'ল কিনবে, ডা'ল কিনবে, আর কিনবে একটা রূপোর আলবোলা—আর নিকেলের রিষ্টওয়াচ, আর গোটা কয়েক লোকের মাথা কাটিবে। ব্যাস্। ওরা স্বর্গ চায় না, মোক্ষ চায় না, মুক্তি চায় না, কিছু চায় না।

সুকুমার আপন মনে হাসলে।

ভবতোষের ওখানে দারুণ তর্ক লেগে গেছে। একে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তর্ক, তার সঙ্গে জুটেছে চা এবং সিগারেট। সুতরাং তর্ক যে নিফাঁক হ'য়ে জমেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্নটা উঠেছে নিবারণ মণ্ডলের অকাল-মৃত্যুতে। নিবারণ জোয়ান পুরুষ। যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়। শরীরেও যথেষ্ট সামর্থ্য। সমস্ত দিন ধান কেটেছে। সন্ধ্যার সময় শরীর একটু খারাপ করছিল। কিন্তু সে কিছুই নয়। তার উপর সে গরু-বাছুরকে খেতে দিয়েছে, নিজে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে। অকস্মাৎ তার শরীরটা কি রকম ক'রে উঠেছে এবং আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তার আনবার সময় পর্য্যন্ত পায়নি।

এই একটা আকস্মিক ঘটনায় ভবতোষের চিত্তে বৈরাগ্য এসেছে। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, সুখ কি, দুঃখই বা কি? এসব এলই বা কোথা থেকে?

মন্মথ বললে, সমস্তই এসেছে সেই সচ্চিদানন্দ পরব্র-

পুরুষের কাছ থেকে। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তিনিই সৎ। সুতরাং ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, সুন্দর-কুৎসিত সবই তাঁর থেকে উৎপন্ন।

এ কথা প্রভাময় মানে না। তার মতে যিনি সৎ তাঁর মধ্যে অসতের স্থান নেই, যিনি আনন্দময় তাঁর মধ্যে শোকের স্থান নেই, যিনি সুন্দর তাঁর মধ্যে কুৎসিতের অস্তিত্ব অসম্ভব।

তাহ'লে ব্যাপারটা কি?

প্রভাময় বললে, বিকৃতি। দুঃখ ব'লে কিছু নেই, আছে আনন্দ। আনন্দের অভাবই দুঃখ। কুৎসিত ব'লে কিছু নেই, আছে সুন্দর। সুন্দরের বিকৃতিই কুৎসিত।

—সে কি রকম?

—আলো আর অন্ধকারের মধ্যে যে বস্তুটা আছে, সে আলো। সেই আলোর অসদ্ভাব ঘটার নাম অন্ধকার।

—ঠিক বোঝা গেল না। স্পষ্ট দেখছি অন্ধকার আছে। অথচ ··

তুমুল তর্ক বেধে গেল। বাটি বাটি চা, আর তার সঙ্গে চলতে লাগল বাক্স বাক্স সিগারেট। মন্মথ এবং প্রভাময় হিন্দু শাস্ত্র থেকে, আর ভবতোষ বাইবেল থেকে শ্লোক ঝাড়তে লাগল। কিন্তু মীমাংসা ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরতে লাগল। সুকুমার যখন এল তখন তর্কটা এসে পৌঁছেচে এই জায়গায়—ভক্তিমার্গ বড়, কি জ্ঞানমার্গ বড়? তর্কটা ওখান থেকে কি ক'রে এইখানে এল কেউ জানে না।

মন্মথের মতে ভক্তিমার্গ বড়। শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না।

প্রভাময়ের মতে মূঢ় অন্ধ ভক্তির কোনো মানেই হয় না। জ্ঞানমার্গে না গেলে পরাভক্তি আসতে পারে না। ভবতোষ এখানে পৌঁছে তার মতেই সায় দিলে।

এমন সময় সুকুমার এল।

তর্ক ক'রে ওরা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুকুমারকে পেয়ে সবাই নিজের নিজের দলে টানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি মত?

সুকুমার সমস্ত কথা শুনে সবিনয়ে বললে, আমি ভক্ত নই, জ্ঞানীও নই। আমি কি বলব বল?

—সে তো আমরা কেউই নই। তবু?

অর্থাৎ চা এল, সিগারেট এল, পান এল এবং জ্ঞানী অথবা ভক্ত এর একটাও না হওয়া সত্ত্বেও সুকুমারকে তর্কে নামতে হল। সে প্রথমে বললে, যার যেরকম প্রকৃতি তার তাই পথ। জ্ঞানীর পথ জ্ঞানমার্গ, ভক্তের ভক্তি-মার্গ। সব পথই ভালো।

কথাটা কারও মনঃপূত হ'ল না।

মন্মথ বললে, কিন্তু মুক্তি কোন্ পথে আসবে?

সুকুমার হেসে বললে, কোনো পথেই না। মুক্তি নেই।

মুক্তি নেই? সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।

সুকুমার সুর ক'রে বললে,

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন ডোরে।

বুঝলে? মুক্তি কোথাও নেই।

—অর্থাৎ তুমি মুক্তি মান না?

সকলেই সুকুমারের উপর চ'টে গেল। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, এরা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মানে এই যে, মুক্তির একটা সম্ভাবনা থাকা ভালো। বাইরে থেকে এদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে ব'লে বোধ না হ'লেও ভিতরে ভিতরে স্ব স্ব অবস্থায় খুশী কোনো মানুষই নয়, এরাও নয়। স্কুল-মাষ্টার চায় জমিদার হ'তে, জমিদার চায় মার্চেণ্ট আফিসের কেরাণী হ'তে। কেরাণীর ইচ্ছা ছিল হাইকোর্টের জজ হবার, আর জজের ইচ্ছা সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হন। বিচিত্র মানুষের মন, অহেতুক তার ইচ্ছা। সুতরাং মুক্তির তার বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর অবস্থায় মুক্তি এবং তাতেও না পোষালে চরম একটা মুক্তি। অতএব তারা সুকুমারের উপরেই চ'টে গেল।

চোখ পাকিয়ে বললে, তুমি মুক্তি মান না?

সুকুমার হাসলে। বললে, আমার মানামানির তো কথা নয়। মুক্তিই নেই। স্বয়ং ভগবান সৃষ্টি বাঁধনে বাঁধা।

মন্মথ চোখ লাল ক'রে বললে, তুমি তাহ'লে নাস্তিক!

—না।

—আর না! নাস্তিক আর কাকে বলে!—ব'লে একটা বড় কথা বলার গর্ব্বে সকলের দিকে চাইলে। প্রভাময় তার সঙ্গে একমত। কিন্তু ভবতোষ এখনও মত স্থির করতে না পেরে নির্ব্বাক রইল। সে প্রভাময় কিম্বা

মন্মথর মতো ন্যাংটা নয়। তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকে বিলেত-ফেরৎ। যারা নয় তারা আবার আরও সাহেব। সুতরাং তাকে মত স্থির করতে গেলে অনেক দিক ভেবে করতে হবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান ফ্যাশানটা কি তা জানা প্রয়োজন। সুতরাং সে নীরব রইল এবং মনোযোগের সঙ্গে সুকুমারের কথা শুনতে লাগল। সুকুমার শিক্ষিত এবং ক'লকাতায় থাকে। তার মতের উপর ক'লকাতার আধুনিকতম ফ্যাশানের প্রভাব থাকাই সম্ভব।

সুকুমার বললে, তোমরা তো বৈষ্ণব। বৈষ্ণবরাও সাযুজ্য মানেন না। জানো?

—সাযুজ্য আর মুক্তি কি এক?

সুকুমার উত্তর দিলে, চরম মুক্তিই সাযুজ্য। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি-ফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তার সনে॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে—যেই করে ভক্তি॥"

আবার বলছেন—

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥"

আবার স্পষ্ট ক'রে একথাও আছে—

"মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥"

আরও শুনতে চাও?

এর পরে আর তর্ক চলে না। সুকুমার একেবারে মূল ধ'রে টেনেছে। ওদের কারও একখানিও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়া নেই। সুতরাং এদিক দিয়ে তর্ক করা সুবিধা বিবেচনা করলে না।

ভবতোষ বললে, তাহ'লে মুক্তি নেই এ কথা বলছ কেন?

সুকুমার স্বীকার ক'রে নিলে, বৈষ্ণবের মতে মুক্তি আছে বটে, কিন্তু তা কাম্য নয়। তার চেয়ে নরকও ভালো।

ভবতোষ আর একটু চেপে ধরলে সুকুমারকে কোণ-ঠাসা করতে পারত। কারণ সুকুমারেরও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌতূহলও কম, পড়াশুনাও কম। চৈতন্যচরিতামৃত একবার পড়েছে। আর তার মধ্য থেকে তর্ক করার উপযোগী কয়েকটা স্থান মুখস্থ ক'রেছে। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি তারই উদ্গার। কিন্তু ভবতোষরা তা ধরতে পারলে না। সুকুমার যা হোক গোটাকতক শ্লোকও তো বললে, ওরা তাও পারে না। ওরা কোনো ধর্ম্মগ্রন্থের মলাট পর্য্যন্ত দেখেনি। সুতরাং এ সম্বন্ধে সুকুমারের সঙ্গে অধিক তর্ক করতে সাহসে কুলোল না।

প্রভাময় ক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আরে বাপু, তুমি স্বর্গ নরক মানো তো?

সুকুমার হেসে বললে, মানি। কিন্তু তোমাদের মতো ক'রে নয়।

মন্মথ হতাশভাবে বললে, এই দেখ, সেই মানবে তবু একটু রকম-ফের ক'রে।

ভবতোষ সুকুমারের পিঠ চাপড়ে বললে, নিশ্চয়। তা নইলে আর অত পয়সা খরচ ক'রে এম-এ পাশ ক'রেছে কি করতে! আমার রাঙাদা বলেন—রাঙাদাকে তোমরা জান না—হার্ভার্ড থেকে গেল বার ডক্টরেট নিয়ে ফিরেছেন। তিনি বলেন—

সুকুমার গম্ভীরভাবে বললে, আমার নরকে যন্ত্রণা নেই। স্বর্গও সকলের পক্ষে সমান সুখের আকর নয়। সে হ'চ্ছে—

ব'লে এ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র মতামত যা সে বুঝেছে তাই ওদের বুঝিয়ে দিতে লাগল।

ভবতোষ বার্ণার্ড শ'র নাম শুনে খুব ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে সুকুমারের বক্তৃতা শ্রবণ করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগল। মন্মথ ও প্রভাময় আপত্তি করতে সাহস না করলেও তেমন মন দিয়ে মেনে নিতে পারলে না। ঠাকুরমার রূপকথায়, জ্ঞানী-গুণীর উপদেশে তাদের কল্পনায় স্বর্গ-নরক অগ্নিরূপে জ্বল জ্বল করছে। সে রূপ তাদের সংস্কারে দৃঢ় হয়ে বসেছে। তাদের ধমনীর রক্তস্রোতে রয়েছে নরকের ভয়, আর স্বর্গের কামনা। অত সহজে সে ভয় ঘুচবে এ আশা করাও ভুল। সুকুমারেরই কি ঘুচেছে? কিন্তু একটা অজ্ঞাত মতের অভিনবত্ব তাকে মুগ্ধ করেছে। তার বুদ্ধিকে দিয়েছে আনন্দ। বার্ণার্ড শ'র মত মেনে নিয়েছে তার বুদ্ধি, চিত্ত নয়। সেখানে এখনও কিছু কিন্তু আছে।

তা হোক। সুকুমার এই নতুন মত বুদ্ধি দিয়ে যতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল। বলতে বলতে অনেকখানি নতুন উপলব্ধিও হচ্ছিল, মনে বেশ আত্মপ্রসাদও অনুভব করছিল। এমন সময় দৈবজ্ঞ মুখুয্যে মশাই এসে উপস্থিত হলেন।

—এই যে বাবাসকল। ভালো তো?

—আসুন, আসুন।

চায়ের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি তখনও ফরাশের উপর প'ড়ে ছিল। অপাঙ্গে সেদিকে চেয়ে ব্রাহ্মণ একটা পৃথক কম্বলাসনে উপবেশন করলেন। ভবতোষ তাঁর জন্য চাকরটাকে তামাক সাজতে বললে।

আর জিজ্ঞাসা করলে, এদিকে কোথায় আসা হয়েছিল?

পার্শ্বে রক্ষিত চালের পুঁটুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুখুয্যে মশাই বললেন, একটা স্বস্ত্যয়ন ছিল বাবা।

সুকুমার খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, স্বস্ত্যয়নের ফল কি?

মুখুয্যে মশাই উৎসাহিত হ'য়ে বললেন, স্বস্ত্যয়ন? বল কি বাবা। মনে শান্তি আসবে, গৃহে শান্তি আসবে···

—দারিদ্র্য?

—দারিদ্র্যও নাশ হবে। নইলে শান্তি আসবে কি ক'রে?

সুকুমার চুপ ক'রে রইল। মুখুয্যে মশায়ের গৃহের খবর সকলেরই জানা। কোনো দিন অন্ন জোটে, কোনো দিন জোটে না। যিনি পরের দারিদ্র্য নাশ ক'রে বেড়াচ্ছেন তাঁর নিজের দারিদ্র্য দূর হয় না কেন? তাঁর তো সর্ব্বাগ্রে নিজের গৃহেই স্বস্ত্যয়ন করা উচিত।

জিজ্ঞাসা করলে, দারিদ্র্য কি নাশ হচ্ছে দেখছেন?

মুখুয্যে মশায় থতমত খেয়ে গেলেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে শান্তি হয় এই কথাই সকলে জানে। তাই তাঁকে ডাকে। স্বস্ত্যয়নের পর শান্তি এল কি এল না—এ খবর নিজের হ'লেও ক'জন রাখে?

মুখুয্যে মশাই বললেন, তা কিছু কিছু হয় বই কি! নইলে আর মানুষ স্বস্ত্যয়ন করবে কেন?

ভবতোষ হেসে বললে, ও সব কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করা ভুল সুকুমার। হোক না হোক, ওই ওঁর জীবিকা।

মুখুয্যে মশাই সরল লোক। উল্লসিত হয়ে বললেন, যা বলেছ বাবাজি। সবারই কি হয়? যার হবার তারই শুধু হয়। নইলে নিয়তি কেন বাধ্যতে? তবে হ্যাঁ কিছু কিছু···

ভবতোষ বললে, যাকগে ও কথা। বেলা অনেক হ'ল। এইখানে স্নানাহার ক'রে তবে যেতে পাবেন।

মুখুয্যে মশাই তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, না, না, বাবা। তোমাদের খেয়েই তো আছি। খাওয়ার জন্য কি! বাড়ীতে বিশেষ কাজ আছে, যেতেই হবে। কেবল বাবা-সকলের গলার সাড়া পেয়ে এদিকে এলাম। আচ্ছা বাবা।

মুখুয্যেমশাই আর দাঁড়ালেন না। সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে পথে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও উঠে দাঁড়াল।

বাড়ীতে জনমনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই। মা খোকাকে কোলে ক'রে পাশের বাড়ী বেড়াতে গেছেন। কর্ত্তাবাবু স্নান ক'রতে গেছেন। তাঁর ফেরবার দেরী নেই। মণিমালা একখানা চওড়া লালপাড় মটকার শাড়ী প'রে তাঁর আহ্নিকের জায়গা করছিল। মাথায় আধ-ঘোমটা আঁচলটি গলায় বেড় দেওয়া। সম্মুখের জানালা দিয়ে খানিকটা আলো এসে তার মুখে ললাটে পড়েছে। নির্জ্জন বাড়ী। সুকুমার আর লোভ সামলাতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তার জুতোর শব্দে চমকে মুখ তুলে চেয়েই মণিমালা বলে উঠল, ওকি, ওকি!

সুকুমার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কি?

—জুতো প'রে পূজোর ঘরে ঢুকছ কি?

—ও বাবা!—সুকুমার হেসে উপরে চ'লে গেল।

গায়ের কাপড় জামা আলনায় খুলে রেখে সুকুমার খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। শীতের বেলা। এমনিতে বোঝা যায় না, কিন্তু বেলা অনেক হয়েছে। মণিমালাকে দেখে বোধ হ'ল রান্না হয়ে গেছে। সকালবেলায় ভবতোষের ওখানে কয়েক পেয়ালা চা খেয়ে তার ক্ষুধা ছিল না। তবু রান্না যখন হয়ে গেছে তখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের হাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমার স্নানের জন্য উঠছিল। এমন সময় মণিমালা এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মুখ টিপে হেসে বললে, কি! একেবারে সাহেব হয়ে গেছ নাকি?

—কি রকম?

—জুতো প'রে বাবার পুজোর ঘরে ঢুকছিলে যে বড়!

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বললে, অপরাধ হয়ে গেছে সুমধ্যমে, তোমার বদনকমলের লোভে আকৃষ্ট হয়ে আমি আশ্রমপীড়ার কারণ ঘটিয়েছিলাম।

লজ্জায় মণিমালার কানের ডগা পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠল। বললে, আহা, মিথ্যে কথা বলতে সাহেবের বাধে না।

বাঁ হাতটা বুকে রেখে আর ডান হাতটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত ক'রে বক্তৃতার ঢঙে সুকুমার বললে, মিথ্যা নয় বরাননে, এ সত্য।

মণিমালা ধমক দিয়ে বললে, থাম। এতটা বেলা হ'ল একটু জল পর্য্যন্ত মুখে দাও নি। কোথায় ঘুরছিলে?

সুকুমার সগর্ব্বে বললে, ভবতোষের ওখানে। তিন পেয়ালা চা, আর তুমুল তর্ক!

—কি নিয়ে তর্ক?

—সে কি একটা বিষয়? জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ নরক, শান্তি স্বস্ত্যয়ন—কত কি।

—কি মীমাংসা হ'ল?

সুকুমার হেসে বললে, মীমাংসা আবার কি! তর্কের কি মীমাংসা হয়? না মীমাংসার জন্য লোক তর্ক করে? বিরোধে আরম্ভ, বিরোধেই শেষ।

মণিমালা বললে, বল মুখোমুখিতে আরম্ভ, হাতাহাতিতে শেষ।

—প্রায় তাই।

—তবে কেন তর্ক কর?

সুকুমার বললে, রোগে।

তারপর বললে, কি জান, তর্কটা জীবনের লক্ষণ। মানুষের মনে জিজ্ঞাসা যখন আসে তখনই তর্ক করে। তার মানে তার মনে জানবার ইচ্ছা এসেছে। তর্ক করে না কে? এক, যে সমস্ত তত্ত্ব জেনেছে, যার জানবার শেষ হয়েছে—আর যে পাথর হয়ে গেছে, যার কোনো তত্ত্ব জানবার কৌতূহল নেই, যার মনে জিজ্ঞাসা ওঠেই না।

মণিমালা হেসে বললে, আর আমি। যে জেনেছে কিছুই শেষ পর্য্যন্ত জানা যায় না। কি বল? কিন্তু যে তর্কে মীমাংসা হয় না, কেবল বিরোধ বাধে, সে তর্কে লাভ কি?

হাতের কাছে ভালো মতে একটা উত্তর না পেয়ে সুকুমার বললে, কিছু লাভ হয় বই কি?

—ছাই হয়। বিরুদ্ধ মন নিয়ে কি জ্ঞান লাভ হয়। তার জন্য শ্রদ্ধা চাই।

মণিমালার মুখে এসব কথা শুনে সুকুমার অবাক হয় না। মণিমালার বাবা প্রকাণ্ড বড় পণ্ডিত। তাঁর কাছে সে বই পড়েছে অনেক। কিন্তু আসল বস্তু পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। বাবা সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং অনভিজ্ঞ। রাত্রিদিন তিনি পুঁথিপত্র নিয়েই থাকেন। আর এ মহিয়সী মহিলা নিঃশব্দে হাসিমুখে সংসারের সকল বোঝা ব'য়ে চ'লেছেন। তাঁর মনের কচি পাতায় কোথাও স্বামীর শুষ্ক জ্ঞানের আঁচ লাগেনি। ইতু-পূজো, ষষ্ঠী-পুজো থেকে আরম্ভ ক'রে বার-ব্রত, নিয়ম-আচার কোনোটি তাঁর বাদ দেবার উপায় নেই। অথচ স্বামী যখনই প্রশ্ন করেন, ওতে কি হয়? সুলজ্জিত ক্ষীণ হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তরই তিনি দিতে পারেন না। স্বামীর সমস্ত শাস্ত্রকথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন! কিন্তু কি বুঝলেন আর কি বুঝলেন না, তা বোঝা যায় না।

মণিমালা বললে, আমার মা বলেন জ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়। ছট্‌ফট ক'রে বেড়ালে কিছু পাওয়া যায় না।

সুকুমার একটুক্ষণ চুপ ক'রে কি যেন ভাবলে। তার পর বললে, শ্রদ্ধার সঙ্গে অপেক্ষা করার মানে কি? কত কাল অপেক্ষা করতে হবে?

মণিমালা হেসে বললে, তা জিজ্ঞাসা করিনি।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বার-ব্রত, জটার জল, মাদুলি-কবচ এসব তো তুমিও মানো?

—মানি বই কি।

—ওর কিছু ফল বুঝতে পার?

—নিশ্চয়।

সুকুমার আর কিছু বললে না, শুধু অবিশ্বাসের সঙ্গে একটু হাসলে।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, শ্বশুর মশাই কি জামা-জুতো একেবারে ছেড়েই দিলেন ?

মণিমালা হেসে বললে, একেবারে। মায় সাবান পর্য্যন্ত। অথচ তেল গায়ে ছোঁয়াতে পারতেন না। একটা দিন সাবান নইলে চলত না।

—মাছ-মাংসও ছেড়ে দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ। হবিষ্যি করেন।

সুকুমার হাসলে। বললে, হঠাৎ ?

—কি জানি।

তারপর বললে, বাবা বলেন চাকরীর খাতিরে অনেক কিছু ক'রেছেন। অনেক পেয়েছেন, আবার অনেক হারিয়েছেনও। মূলে লাভ জমেনি কিছুই। এবারে সত্যিকার কিছু পেতে চান।

—তার মানে ?

মণিমালা ভালো ক'রে মেঝের উপর ব'সে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তাঁর সব কথা আমি বুঝতে পারি না। মনে হয়, তাঁর ধারণা জন্মেছে পাঁচ ফলে ঠুকরে বেড়ালে আসল বস্তু পাওয়া যায় না। কিছুটা যাজ্ঞবল্ক্য, পাতঞ্জলি-মনু-পরাশর-ব্যাস, আর কিছুটা কান্ট-হেগেল-মিল-শোপেনহার, এ চলবে না।

—কি চলবে ?

—তিনি বলেন, এঁরা সকলেই সত্যদ্রষ্টা। কিন্তু সত্যোপলব্ধি পাঁচ ফুলে সাজি ভরিয়ে হয় না। তিনি বলেন, যাকে হোক একজনকে অনুসরণ করতে হবে। আর নিজেকে অন্তরে-বাইরে তাঁরই অনুযায়ী করতে হবে। ভাবে চিন্তায় কর্ম্মে যারা ফিরিঙ্গি হয়ে গেছে, না এদিক না ওদিক—তাদের কোনো আশাই নেই।

—তাই তিনি অন্তরে-বাইরে খাঁটি বাঙালী হবার সাধনায় লেগেছেন।

—হ্যাঁ।

সুকুমার চুপ ক'রে রইল। ভালো মন্দ কোনো মতামতই প্রকাশ করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, আর কি ব'লে গেছেন ?

—আর একটি শ্লোক দিয়ে গেছেন, তোমাকে দেখাই দাঁড়াও।

মণিমালা দেরাজ থেকে একটা কাগজে লেখা শ্লোক এনে সুকুমারের হাতে দিলে। তাতে লেখা আছে,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, এর মানে ব'লে দিয়ে গেছেন ?

মণিমালা হেসে বললে, না। তোমার কাছ থেকে বুঝিয়ে নিতে ব'লে গেছেন। ওর উল্টো পিঠে আরও একটা শ্লোক লিখে দিয়ে গেছেন। সেটাও দেখ।

সুকুমার উল্টো পিঠ পড়লে—

স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরম্।
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

মণিমালা সকৌতুকে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, ওটারও মানে বুঝিয়ে দিতে হবে—বিশেষ ক'রে ওই 'অবিতর্কং' কথাটার।

সুকুমার খোঁচাটা বুঝলে। শুধু বললে, হুঁ।

তারপর কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এই কাগজ-খানা ঝাড়লে একসেট রূপোর বাসন বেরুতে পারে ?

—চেষ্টা ক'রে দেখিনি।

—ওখানা লক্ষবার মাথায় ঠেকালে আমার মাইনে বাড়তে পারে ?

—চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।

—রান্না হয়ে গেছে ?

—অনেকক্ষণ।

—তেল কি নীচে আছে ?

—আনব ওপরে।

—না, থাক। আমিই নীচে যাচ্ছি।

সুকুমার মৃদু হেসে পাশ কাটিয়ে নীচে চলে গেল।

ক্রমশঃ

বঙ্গসাহিত্যের বাণী

অধ্যাপক রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

চৈতন্যের স্বভাব আপনাকে প্রকাশ করা ; চৈতন্য আলোকের ন্যায় স্বয়ম্প্রকাশ। প্রকাশ-শীলতাই ইহার ধর্ম্ম। যে চৈতন্য তাহার আধারের মধ্যে আবদ্ধ, তাহা জড়েরই নামান্তর। আহার-বিহার জৈবধর্ম্ম। মানুষ এ সকল ব্যাপারে ইতর জীবের সহিত প্রায় সমভাবাপন্ন। কিন্তু মানুষের মধ্যে চৈতন্য নামক যে পদার্থ আছে, তাহা আঁচলের সোনার ন্যায় ঝলক দেয়। সকলকে জানাইয়া দেয়, আমি আছি। সূর্য্য প্রত্যুষে জাগিয়া যেমন সকলকে জাগাইয়া দেয়, মানবের চৈতন্য তেমনি সমস্ত জগৎকে না জাগাইয়া তৃপ্তিলাভ করে না। সূর্য্যের প্রকাশে নূতন সৃষ্টি হয়, আত্মার প্রকাশেও সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির নাম সাহিত্য। সাহিত্য সমগ্রভাবে মানবজাতির বিকাশ-চেষ্টা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মানুষ আপনাকে যেমন ভাবে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে তেমনি ভাবে তাহার সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সে সমস্ত বিশ্বে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া সৃষ্টির পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কারণ প্রকাশের নামই সৃষ্টি। যাহা অব্যক্ত, তাহাকে ব্যক্ত করা, যাহা অসম্পূর্ণ, তাহাকে সম্পূর্ণ করা, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহাকে বর্ণে বৈচিত্র্যে মুকুলিত করার নামই সৃষ্টি। সাহিত্য জগৎকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে, অভিনবরূপে প্রকাশ করে। ইহাই বিশ্বের পক্ষে পরম মঙ্গল। সাহিত্যের মঙ্গলময় প্রকাশই মানব জাতির ইতিহাসের গতি। যে সকল জাতি লোকবিধ্বংসী মহামারীর ন্যায় বিশ্বের পীড়া উৎপাদন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের শোণিত-প্লাবিত-অকীর্ত্তি-কাহিনী ইতিহাসের অতলতলে কোন কালে তলাইয়া গিয়াছে। মানবের মঙ্গলময় স্বরূপটি সাহিত্যের মণিমন্দিরে রত্নসিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

সেইজন্যই আমাদের দেশে সাহিত্যের নাম সাহিত্য। হিতের সহিত মঙ্গলের সহিত যাহা বর্ত্তমান, তাহার নাম স-হিত। সহিতের ভাবই সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য ঠিক বিদেশীয় literature নহে। যাহা পাঠ্য, তাহাই literature। আমাদের দেশে পাঠ্য হইলেই সাহিত্য হয় না। সংস্কৃতি বলিয়া যে নূতন কথাটির আমদানী হইতেছে, উহা বিদেশীয় cultureএর অনুবাদ। culture বলিতে উহাদের দেশে অনেক কিছু বুঝায়। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা, উন্নতি ও সামাজিকতা—সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে সাহিত্য বলিতে ইহার প্রায় সবগুলিই বুঝাইত। ‘কাব্য’ আমাদের দেশে শুধু অবসর-বিনোদনের সহায় ছিল না, উদাসী কল্পনার অবাধ্য সন্তান ছিল না, কাব্য ছিল ‘সত্যশ্রুতঃ’। কাব্যের মধ্য দিয়া পরমহিতের সন্ধান পাওয়া যাইত। সেইজন্যই রামায়ণ মহাভারত আমাদের দেশের মহাকাব্য। এমন কাব্য জগতে আর কোথাও হয় নাই, হইবেও না।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের আদর্শ কি, তাহা বলা কঠিন। যাহা কিছু বলা যায় বা লেখা যায় তাহাই যে সাহিত্য নহে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু সাহিত্য হইতে হইলে কি কি উপাদান সমুচ্চয় চাই, সে সম্বন্ধে কোনও পরিস্ফুট ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। নদীর উপর দিয়া নৌকা চলিয়া যায় স্রোতের বেগে, তেমনিভাবে সাহিত্যের গতি এক অলস স্বচ্ছন্দতায় চলিয়াছে। যাহার যেমন রুচি সে তেমনই লেখে বা তেমনই লেখার আদর করে। [illegible] হিসাবে ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া না[illegible] জনের সম্ভব-অসম্ভব আত্ম-কাহিনী সাহিত্যের নামে বিকাইতেছে। বিকাইতেছে যে—ইহা অতি সত্য কথা। অবশ্য যাহা বিকায় না তাহাও যে সাহিত্য—এ কথাও জোর করিয়া বলা চলে না।

শিশুরা খেলাঘরে রাজা বা বাদশা সাজে, যুদ্ধবিগ্রহ করে ; তাহাতে বাহিরের জগতের কিছু আসিয়া যায় না। সাহিত্যেও এমনি একটি খেলাঘর আছে। সেখানে আমরা যাহা খুসি করি, কত কি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার গড়ি। কিন্তু তাহাতে আমাদের বা আমাদের প্রতিবাসীদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

বাহিরের সঙ্গে মানুষের যে পরিচয়, তাহা সাহিত্যের ভিতর দিয়া। সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানুষ মানুষের সত্য

পরিচয় লাভ করে। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি নিদ্রার ঘোরে নিমগ্ন। তাহার চৈতন্য নাই, পরিচয়ও নাই।

আমি আমাদের প্রাচীন গৌরবের কথা তুলিয়া জগতের দরবারে মর্য্যাদা পাইবার অধিকার ঘোষণা করিবার জন্য এই ভূমিকা করিতেছি না। কারণ সে মর্য্যাদা বেশী দিন পাওয়া যায় না। আমি যাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র তিনি একজন ক্রোড়পতি ছিলেন, ইহা জানিলেই যে লোকে আমাকে অভিজাত-সভায় প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবে তাহা ত মনে হয় না।

তবে অতীত গৌরবের আলোচনায় লাভ আছে এই—যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তাহার মধ্যে নিহিত থাকিলেও থাকিতে পারে। আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি সে যুগের সমস্যা, সে যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা—অন্য যুগের সমস্যা বা আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন যুগ পৃথিবীতে আর কখনও আসিয়াছিল কিনা, সে প্রাণহীন তত্ত্ব ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা যে জীবন্ত সত্যের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আশু চিন্তা করা এবং গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। সাহিত্য সেই চিন্তার বাহন হইবে, দিগ্‌দিগন্তে তাহার বার্ত্তা প্রচার করিবে, সর্ব্বকালের জন্য তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিবে।

বিজ্ঞানও সাহিত্যের একটি অংশ বলিয়া আমি মনে করি। কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত মানবীয় চিন্তাধারার প্রকাশসমষ্টিই সাহিত্য। বিজ্ঞান যে সকল নব নব আবিষ্কারের দ্বারা মানবের অতি উন্মাদ আকাঙ্ক্ষাকেও পরাভূত করিয়াছে, তাহার জন্য আমাদের যুগ একান্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের সেই সকল সত্য লইয়া যখন মানবের কল্যাণে নয়—অকল্যাণে খাটানো হইতেছে, তখনও তাহা বিস্ময়ের সীমাকে অতিক্রম করে। মনে হয় আমরা নিজের কবর নয়—প্রলয়-পয়োধি নিজেরাই খনন করিতেছি।

বর্ত্তমান যুগের প্রধান সমস্যা ক্ষুধা। এ ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোক মাথা খুঁড়িয়া অন্ন পাইতেছে না। অন্ন যে নাই তাহা নহে। অন্ন আছে প্রচুর, পরিবেষণের উপায়ও যথেষ্ট, কিন্তু অর্থ নাই।

যৌন-সমস্যাও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে অন্ন ছিল, একটির স্থানে পাঁচটি বিবাহ করিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন নিজেরা অন্ন পাই না, বিবাহ করিয়া খাওয়াইব কি? এই সমস্যায় বহু নারীকে অবিবাহিত থাকিতে হইতেছে, অন্নের জন্য তাহারাও হাহাকার করিতেছে, বেকার সমস্যা বাড়াইতেছে। সাহিত্যকে এখন আর পুষ্প-সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নববধূর নূপুরধ্বনির আশায় জাগিয়া থাকিলে চলিবে না।

কেহ হয়ত বলিবেন, এ সকল সাময়িক বিক্ষোভ—সাহিত্য এই সকল অল্পস্থায়ী, অনিত্য বিষয় লইয়া কেন মাথা ঘামাইবে? সাহিত্য প্রকটন করিবে সত্যের চিরন্তন শাশ্বত রূপ। তাহা সত্য, কিন্তু সাহিত্যের সে শাশ্বত বস্তু কি? মানুষ। মানুষই সত্য। মানুষের মনের প্রতিটি তরঙ্গ সাহিত্যের মানস সরোবরের উপকূলে আছড়িয়া পড়িতেছে। কখনও সেখানে পদ্মফুল ফোটে, কখনও বা কচুরিপানায় ভরিয়া স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। যে জাতির মানস সরোবরে অজস্র কুমুদকহ্লার-শতদল ফোটে, সে জাতি ধন্য হয়; সে জাতির সাহিত্য কালজয়ী হয়; প্রতিকূল সাংসারিক বা রাষ্ট্রিক অবস্থা-নিচয়ের ঝঞ্ঝাবাতে তাহাকে উৎখাত করিতে পারে না। আমাদের দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। পুরাকালের গ্রীক-বিজয় আমাদের সাহিত্যের উপর বিশেষ কিছু প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা যে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানের অধীন ছিলাম, তাহাতেও আমাদের সাহিত্যের রূপ বিশেষ বদলায় নাই। আমরা শীরণী দিয়াছি বটে, কিন্তু সে আমাদেরই সত্য-নারায়ণের।

এই মুসলমান জাতির বিশাল পতাকাতলে আমরা বসিয়া বসিয়া রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছি, দেশে দেশে রাধাকৃষ্ণলীলা—নয়ত চণ্ডীমঙ্গল মনসা-মঙ্গল গান করিয়া বেড়াইয়াছি, কখনও ভিক্ষা মিলিয়াছে, কখনও বা খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের গতি সেই একইভাবে চলিয়াছে বলিয়াই ত মনে হয়। নহিলে এমন সুন্দর, সরস, প্রাণবন্ত সাহিত্য কোথায় পাইতাম?

তখন কেহ ভাবে নাই যে হিন্দুর এই সাহিত্য বা

সংস্কৃতির ছুঁৎ লাগিলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর চিত্র অশুচি হইবে। দেশের যাহা আবহাওয়া, মনের যাহা স্বচ্ছন্দ বিকাশ—তাহাকে রোধ করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। আমার প্রতিবেশী যদি আমার পূজা-পার্ব্বণে যোগদান না করেন, তবে আমার পূজা-পার্ব্বণ বন্ধ হইবে না। কেবল প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে বিলম্ব পড়িয়া যাইবে। এমন একদিন ছিল যে ইংরেজ উচ্চ রাজপুরুষরা হিন্দু ভদ্রলোকের গৃহে পূজা, অর্চ্চনা, উৎসবে নিমন্ত্রিত হইতেন, বাইনাচ দেখিতেন, গড়গড়ায় তামাক খাইতেন, পান খাইতেন এবং যাইবার সময় কোনও কোনও স্থলে প্রণামী দিয়া যাইতেন। তাঁহারা খৃষ্টান এ বোধ তখনকার দিনে ছিল না। এখন সে বোধ হইয়াছে, প্রীতিও সরিয়া গিয়াছে যোজনান্তরে। আমার একজন মুসলমান বন্ধু পাণিপথ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার পরিবারে এই রীতি এখনও চলিতেছে। হিন্দুদের বাড়ীতে বিবাহে পৈতায় নিমন্ত্রিত হইলে যৌতুক দিতে হয়। এমন না হইলে ভালবাসা কিসের? আইন করিয়া শান্তিস্থাপনও হয় না, মনের কালিমাও ঘোচে না।

ভারতের এমন অবস্থা যেদিন ছিল না, তখনকার সাহিত্য যেমন হইয়াছিল এখন তেমন হয় না। বঙ্কিমবাবুর সীতারাম আর হয় না, দুর্গেশনন্দিনী হয় না, পদ্মিনীর কাহিনী লইয়া আর কাব্য লেখা চলে না। কালের প্রভাব দুর্ল্লঘ্য।

কালের প্রভাববশে আমরা যাত্রাপথের সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে পথ-নির্দ্দেশক অঙ্গুলি সংকেত নাই। সেইজন্য অগ্রসর হইতেও বাধা, কিন্তু অগ্রসর না হইয়াও উপায় নাই। দ্বিধায় পড়িয়া কেহ কেহ ফিরিয়া যাইবার কথা ভাবিতেছেন, পুরাতনের অনুকরণ শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে আখ্যান বস্তু এবং আদর্শ, কথা ও সুর, সমস্ত সেকালের সামগ্রী আনাইয়া একালে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু এ উদ্যম প্রশংসনীয় হইলেও ইহার মূলে রহিয়াছে 'সেন্টিমেণ্ট'—অভিমান। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের গৌরব, বনিয়াদী ঘরের গৌরব—এই সকল অভিমান আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা চলিয়া গিয়াছে—তাহার নূতনত্ব লইয়া, চমৎকারিত্ব লইয়া তাহাকে পৌনঃপুনিক ভাবে টানিয়া আনিলে তাহার মৌলিকতা থাকে কোথায়? অতীত স্মৃতি যতই মনোমুগ্ধকর হউক, তাহা সৃষ্টি নহে। সৃষ্টির বিপুল আনন্দ তাহাতে নাই। নকল করার মত তাহা নির্জীব অভ্যাসের কার্য্য।

নকল করা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্ভবপরও নহে। কারণ সে অবস্থা-সংঘট্ট কোথায়? সে আবেষ্টনী কোথায়? যে নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বেষ্টনী হইলে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির জন্ম হয় তাহার যে সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে। এখন আর ঐ মহাকাব্য পুরাণ হইতে পারে না। অজন্তা এলোরাও হইতে পারে না। ভারতবর্ষের যে রূপ অতীতের ঋষি-মনীষিগণ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যে রূপ দেখিয়া এখনও জগৎ মুগ্ধ হয়, সে রূপ আর হয় না। জীর্ণ মন্দিরে চূণকাম করিলেই তাহাকে দেবস্থলীতে পরিণত করা যায় না।

এই প্রাচীন পন্থা বিঘ্ন-সঙ্কুল দেখিয়া কেহ কেহ সে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ইঁহারা ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকে তাকাইয়া তাহার মোহে পড়িয়া গেলেন; তাই তাঁহারা বিলাতী কথা-সাহিত্য ও কাব্য নকল করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের একটি মহৎ গুণ এই যে ইহা স্বাধীন। ঐ দেশের জাতিগুলি যেমন স্বাধীনতাকামী, উহাদের সাহিত্যও সেইরূপ স্বাধীন-তান্ত্রিক। নরনারীদের অবাধ মিলন যেখানে, সেখানে নারীর রূপ-লাবণ্য বর্ণনা করিবার আগ্রহ সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের দেশের রমণীর ঘোমটায় ঢাকা মুখ, পাতায় ঢাকা ফুলের মত, তাহাকে দেখিতে হয় চেষ্টা করিয়া এবং দেখাইতে হয় আবরণ তুলিয়া। তাই কবিগণের কাব্যে নারীচিত্র কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের স্বরূপও সেখানে বদলাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে প্রেমই সব, তাই কাব্য সর্ব্বত্র আদিরস প্রধান। উহাদের দেশেও প্রেম মধুর, কিন্তু তা বলিয়া জীবনের অন্য সব values উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? যুবক-যুবতীর বিবাহ আগে প্রেম হইয়াই হয়; কিন্তু সে প্রেমের পশ্চাতে উঁকি দেয় পাউণ্ড শিলিং পেন্স। এমনি করিয়া যাহাদের প্রকৃতি তিক্ত এবং প্রবৃত্তি রিক্ত হইয়াছে, আমরা তাহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টিত হইলাম। এমনি করিয়া আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য বিদেশীয় রুচির, বিদেশীয় সংস্কৃতির নিকট

আত্মবিক্রয় করিয়াছে। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে পড়িতে যতই ভাল লাগুক, বাস্তবের সঙ্গে তাহা কোথায়ও মিলে না। যে সব প্রেমচিত্র আমাদের দেশের তরুণ তরুণীগণ নিশীথের স্বপ্ন এবং দিবসের ধ্যান করিয়া লইয়াছেন, তাহারা সেই কল্পনার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া নামিয়া আসে না। ফলে আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। আরও সর্ব্বনাশ করিতেছে সিনেমায়। বিদেশী সাহিত্যে যাহা মলাটের অবগুণ্ঠনে থাকে, পর্দায় তাহা আলোকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলে বন্ধু, আর কি চাই? শ্লীল অশ্লীল বিচার লইয়া যাঁহারা থাকিতে চাহেন, তাঁহারা ইচ্ছা হইলে আরও কিছুদিন হাবার নন্দনকাননে বাস করিতে থাকুন। কিন্তু আমি বলিব এপথে ইহাই গন্তব্য স্থল। এ ব্রতের এই কথা।

কিন্তু এ সাহিত্য আমাদের বলিয়া বলা যায় কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্য চৈতন্যের বিকাশ। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি সুপ্ত। আমাদের যে রূপ বিভিন্ন জাতির চক্ষে প্রতিভাত হইয়া আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়, তাহাই আমাদের সাহিত্য। আমরা আমাদিগকে চিনিতে না পারিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু মানব সমাজের নিকট অপরিচিত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত থাকিব? বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে সুখ, কিন্তু সকলের চিহ্নিত হইয়া বাঁচিয়া থাকায় গৌরব আছে। যখন রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, তখন আমাদের সাহিত্যের লোভে নানা দেশ হইতে ছাত্র আসিত। হইতে পারে যে এখন সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তেমন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফুলবনে তেমন করিয়া ফুল ফুটাইতে পারিলে আবার মৌমাছির মত ছাত্রের দল জুটিবে। এখন সে আশা স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু স্বপ্নও অনেক সময়ে ফলিতে দেখা যায়।

এই স্বপ্নের মূলে হয়ত কিছু সত্য আছে। সে সত্য এই যে আমাদের দেশের আকাশে বাতাসে এখনও একটু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব আছে। স্বাধীন চিন্তা ভাল, আমাদের দেশেও চার্ব্বাক, লোকায়ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের সাহিত্যের ধারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যে সাহিত্য-সেবায় কল্যাণ, সে সাহিত্য আমাদের গঙ্গা যমুনার মত পাবনশীলা। কল্যাণের কথা আজকাল কেহই ভাবে না। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যে গীতা হইতে বিবেকানন্দের বাণী পর্য্যন্ত, বাল্মীকি ব্যাস হইতে মাইকেল নবীন পর্য্যন্ত, শকুন্তলা হইতে গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত সেই কল্যাণের বাণী শুনা যায়। বিশ্ব তাহা কান পাতিয়া শুনে। তাই মনে হয়, আবার এমন দিন আসিবে যখন বিশ্বের সাহিত্য-সাধনায় ভারতবর্ষের তপোবনের ছায়া পড়িবে।

সে দিন হয়ত বহু দূরে। কিন্তু আদর্শের কল্পনায় কাল শুদ্ধ হয়। দৈনন্দিন ব্যাপারই ঘড়ি দেখিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। কল্যাণের পথে, শ্রেয়ের পথে কাল গণনার বাহিরে চলিয়া যায়। সভ্যতার রক্ত-চক্ষু যখন কামানের অগ্নিশিখা বর্ষণ করিতে উদ্যত, যখন ক্ষুধার অন্ন যুদ্ধের বিশাল জঠরে টানিয়া লইতেছে, যখন ভগবান অন্তর্হিত হইয়াছেন অথবা কাপুরুষের মস্তিষ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন পরিণতি আর কত দূরে? যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাও বলিতেছেন যে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছি, এ অবস্থা বেশী দিন টিকিতে পারে না। প্রলয় অনিবার্য্য। তাঁহারা মনে করেন সেই প্রলয়ের মধ্য হইতে আবার নূতন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হইবে। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সাহিত্য বিশ্বের হিতে নিয়োজিত হইবে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সেই অশুভ বা শুভক্ষণের (?) প্রতীক্ষায় আমাদিগকে থাকিতে হইবে। কিন্তু দ্বিধা সমস্যার এই সন্ধিস্থলে কে আমাদিগকে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে? যাহা গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিব না ইহা যেমন সত্য, নূতনত্বের মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে, ইহা তেমনই সত্য। মাঝ-দরিয়ায় যখন ঢেউ উঠিয়াছে, তরণী যখন ঢেউয়ের আঘাতে টলমল, তখন কূলে ফিরিতে চাহিলেও কি কূলে ফেরা যায়? কিন্তু কূলে ফিরিতে না পারিলেও নৌকা পারে পাড়ি জমাইতে পারে—যদি মাঝি তাহার হাল ঠিক ধরিয়া থাকে। নদীতে যখন ঝড় তুফান উঠে, তখন মাঝি তাহার নৌকাখানিকে ঢেউয়ের দয়ার উপর নিক্ষেপ করিয়া নদীতে ঝাঁপ দেয় না। আমাদের সাহিত্যের আদর্শ বা ধারা যদি ঠিক থাকে, তবে আমরা কোনওরূপে আমাদের অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারিব, এ আশা অমূলক নহে।

এত বাধা-বিপত্তিতেও যে সাহিত্য বিশেষ টলে নাই তাহার ধারাটি লক্ষ্য করিতে হয়। কবীর, নানক, তুলসী-দাসের মধ্য দিয়া লালন-ফকীরের এক-তারাতে যে সুর বাজিয়াছে; সে সুরটি লক্ষ্য করিতে হয়। যে আদর্শ রাজকুমারকে বনবাসী ভিখারী করিয়াছে, সে কথা ভাবিতে হয়। যে জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উপদেষ্টা নিবৃত্তিমার্গের পথিকগণ, সে জাতির মানসিক গতি লক্ষ্য করা উচিত। আমরা এখনও বাউল গান ভালবাসি। আধুনিক সঙ্গীতের মধ্যে যাহা বাউল কীর্ত্তনের অনুসারী, তাহারই আদর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে দেখিতে পাই। আমাদের মহাজন তাঁহারাই, যাঁহারা শুধু কবিতার জন্য কবিতা রচনা করেন নাই, যাঁহাদের কবিতা ইহকাল এবং পরকালকে এক সোনার শিকলে বাঁধিয়াছে। তাঁহাদের কথা না ভাবিলে চলিবে কেন?

সাহিত্যের পরিণতি কোন দিকে, তাহার উত্তর দিতে হইলে ভাবিতে হয় মানবজাতির পরিণতি কোন দিকে; এ প্রশ্ন শুধু দার্শনিকের নহে, সকলেরই। অন্ধকারের দিকে, না আলোর দিকে? প্রবৃত্তির দিকে, না নিবৃত্তির দিকে? এই প্রশ্নের উত্তর যে দিকের ইঙ্গিত করিবে, সাহিত্যও সেই দিকের বার্ত্তা বহন করিবে। ইহাই স্বাভাবিক। একদিকে কোলাহল, অপর দিকে শান্তি। প্রবৃত্তিকে অপরিমিত স্বাধীনতা দিয়া কেহ কখনও সুখী হইতে পারিয়াছে কি? প্রবৃত্তি যে মন্দ তাহা বলিতেছি না। প্রবৃত্তি কর্ম্মের উৎস, প্রবৃত্তি অনুরাগের রঙে অরুণ। কিন্তু তাহার পরিণতি নিবৃত্তিতে, সংযমে, ত্যাগে। আমাদের সাহিত্যের ধারা যদি যুগে যুগে এই বাণী প্রচার করিয়া থাকে, তবে এখনও তাহাকে উপেক্ষা করিতে নাই।

সিংহল

শ্রীসিতিকণ্ঠ দাঁ

বাঙলাদেশের পরিব্রাজক, এলাম আমি সিংহলে
খ্যাতি যাহার নীলসাগর আর আকাশ জোড়া-পিঙ্গলে
বিশ্বমাঝে বরণীয়া ভারতমায়ের কন্যাটি,
তোমায় দেখে মোর হৃদয়ে জাগ্‌ল পুলক বন্যা কি!

লাগ্‌ল ভাল এই মনোহর দ্বীপটি আমার অন্তরে
চক্ষে ভাসে অতুল ছবি—সূর্য্য ডোবে বন্দরে।
দেবদারুবন যেথায় সেথায় ছায়া ফেলে পশ্চাতে
বন-ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে সকাল সন্ধ্যাতে।

দেশ বিদেশের কত জাহাজ উড়ায় নিশান মাস্তলে
মৎস্য-লোভে ধীবর চলে নৌকাতে তার পাল তুলে।
উর্ম্মি গড়ে—উর্ম্মি ভাঙে অগাধ জলের মাঝখানে
কোন কারিগর খেলছে সেথায় ফুলঝারিতে সেই জানে।

ডুবারিরা মতির মালায় বাড়ায় তোমার সম্পদে
স্বাস্থ্যে উজল অঙ্গ তোমার নদনদীতে আর হ্রদে।
উথ্‌লে পড়ে শ্রী যে তোমার নারিকেলের কুঞ্জেতে,
শ্যামলবনে দোলা লাগা কিশলয়ের পুঞ্জেতে।

বুদ্ধদেবের চরণরেণু স্বপ্ন জাগায় চক্ষেতে
পুরাকালের কত কথাই ঘনায় আমার বক্ষেতে।
আজও বোধি বৃক্ষশাখা স্মরণ করায় গৌরবে
সারা জগৎ ধন্য হোল বুদ্ধবাণীর সৌরভে।

সাগর-ঘেরা লতায় ভরা ঐতিহাসিক বন্দরে
যে বাঙালী আস্‌বে—আবেশ জাগ্‌বে প্রাণে অন্তরে।
শান্তি লাগি বিলাপ জাগে, জগৎ ভরে ক্রন্দনে
মিল্‌বে গো তার স্মরণ হেথায়, এই দ্বীপেরি নন্দনে।

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরণের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। আফিসে যারা তার সহকর্ম্মী, শেষ পর্য্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকুরী ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশী কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু একটা কথাই কারো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু কি কজ!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এত দিন হয়েও যেতো কিন্তু রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকেরা এ বিষয়ে তাকে বিশেষ উৎসাহ দেন নি; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে সুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। ষ্টেশন থেকে দশ বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখ্‌ছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জান্‌তো যে তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মত বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পূজো করতে যেতেন, আগড়ুম বাগড়ুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো। বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হোত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক ছিল এই যে তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হোত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক্ না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারৎ গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বক্‌তে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল!

দু একজন বলেছিল—এবার আমসত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েচেন, কাক চিলের উৎপাৎ বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারতো না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকদের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটে নি। গ্রাম নিঝুম হয় নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্ল্লভ বাক্-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিল্-খিল্ হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দুজনের দেখা হোল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বল্লেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা

যে তৎপর হোল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেবো তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসি দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসি দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটী কিশোরী একঘটি দুধ হাতে বাড়ীর পেয়ারা-গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো।

পিসিমা বল্লেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের করে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসি-মুখে বল্লে—শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েচে জানো?—হি—হি—

পিসি বল্লেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটী হাত পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত বাড়ীতে ছাগল ঢুকে নাপিত বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এই মাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হোল, চা ভিজোনো হোল, হালুয়া তৈরী হোল, চা হয়ে গেল, পেয়ালায় ঢালা হোল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বল্লেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চাটা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি?…

কুমী বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কে পিসি?

—তুই চিনিস নে, আমার বড় জেঠ্‌তুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেচে—তবে চা তৈরী করবার আর এত তাড়া দিচ্চি কি আমার জন্য? তুই কি কারো কথা শুন্‌তে পাস্, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তত নয়। সে কুমীর নাপিত বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবানোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েচে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বল্লে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বল্লে—এই গাঁয়েই বাড়ী তোমাদের বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পারো—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালালো।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হোল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল। দুজন দুজনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। দুজনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখিনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ায় খুঁটী হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বক্‌চে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ দিন পিসিমার বাড়ী থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময়ে দেখা করলে না বলে হীরেন খুব দুঃখিত হোল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দুতিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠ্‌ল; যে হীরেন দুবছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র সত্ত্বেও এদিক বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে সুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই, তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাবো জমার খাজনার দরুণ। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দুদিন পিসিমার বাড়ী বেড়িয়ে আম খেতে স্ফূর্ত্তি করতে। সে জষ্টি মাসের দুপুর রোদ্রে খাজানার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসে নি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদিন

বল্লে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকী খাজনার কিছু হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম্ম নেই, তাই ভাবচি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসীমা খুব খুসী।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ী ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ী থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয়তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পৈঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বল্লে—চল্লুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস্ আর একটু—

উঠোনের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বল্লে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হলে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবেন দাদা—হি-হি-হি-হি; তারপর সে লাফালাফি করে নালাটা বার কতক এপার ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ারমুখী মেয়ে, এই ভরা সন্ধেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করি! ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে। হীরু ভাল মানুষের মত মুখখানি করে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিহত হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরীটা গেল, আপিসের অবস্থা ভাল নয় বলে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ী আরও অন্ততঃ শতবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মত মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্ত্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজি হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বল্লে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে এ অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করবো না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকবো। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বল্লে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্নিসি হবে তা আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিন পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। এবার তার কাকা ও মা একসঙ্গে বলতে সুরু করলেন—সে যেন একটা চাকুরীর সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরী পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটা হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্ম্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেণ যাচ্চে আসচে। শাণ্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ করে পাহাড়ের নীচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়চে। কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত আকাশ বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটীর ফাঁকে সে—আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে—মণি মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি বেশ ছেলেটী, পাটনা ইউনিভার্সিটী থেকে বি-এস-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু

ইউনিভার্সিটীতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতায় সায়েন্স্ কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স্ পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনান্তর চলচে। হীরু জানতো এসব কথা।

বৈকাল বেলাটা। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে। নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূব-দিকের শৈলসানুতে, একটা বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মত ফুল ফুটেচে, খুব নীচে কুলীমেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্চে—পূবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ, ডিমসিদ্ধ, রুটী এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্ম-ফ্লাস্ক খুলে চা বার করে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বল্লে—এসো হীরুদা—

দেখলে হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হোল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগলো। সারা বৈকালটা যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্য। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বল্লে—মণি, একটা মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই?

মণি হো হো করে হেসে উঠে বল্লে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি? একটা গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে দায় উদ্ধার করো না? তোমার মত ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হোলেও বোনের মতই। বেশ মেয়েটা দেখতে, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। এক তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেছি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটাতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তা'হলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জ্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব শুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মত তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটার স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি···সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে, সবাই জানে মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্ত্তব্য।

সাহসে ভর করে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন; তাঁরা বল্লেন,—মেয়ে যদি ভাল হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকুরী উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভাল মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটাকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মত দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পূজোর ছুটীতে সত্যিই মণির এক জাঠতুত দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বল্লে—ভাল আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকুরী করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত আট মাস পরে তো দেশে ফিরেচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার করে বল্লে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে—ইয়ে—এম্‌নি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমায় আর ঢোক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করচ হীরুদা?

হীরু বল্লে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভাল লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি! আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভাল হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজি করে তার চুল বাঁধা হোল। কুমী একবার কেবল বল্লে—ওদের বাড়ী তোমার বাসা থেকে কতদূর হীরুদা?

—কাছেই, রসি দুই—অতও হবে না।

মেয়ে দেখানো হোল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা করে গেল হীরু। কুমী পঞ্জাব প্রদেশ কোন্ দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরী করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বল্লে—যদিও সে ভালই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভাল।

সঙ্গের ভদ্রলোকটী মেয়ে দেখা শেষ করেই ফিরতি নৌকোতে রেল ষ্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেণেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বল্লে—কি বলে বল্লে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ এ কি ছেলেমানুষি, ওরা সহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুসী হয়ে যেতো। এম্‌নি তো ঘরের কোনে খুব গান বেরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ করে বল্লে—ঘরের কোনে গান গাইবে না তো কি আসরে বসে গাইতে যাবে? পারবো না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বল্লে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গি হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলায় দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভাল হয় নি।

বলাবাহুল্য ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটী অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ ছ মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচি···হাতপা নেড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করচে···কত চৈত্র দুপুরের—নিমফুলের গন্ধভরা অলস দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্ত্তমান কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলি···ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হ'য়ে গেল। নতুন এম-বি পাশ করে জামালপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভাল, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকুরী করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোক্‌রা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে যেতে রাজী করলে। মেয়ে দেখাও হোল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হোল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমীদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হোল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বল্লে—হীরু বড় ভাল ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এসেও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হোলেই বা অত টাকা দিতে পারবে কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে দেখা। কুমী বল্লে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল ত? বিয়ে আমি করবো না, তোমার দুট পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বল্লে—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভাল লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বল্লে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্য তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুল্লে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সাম্‌নে আসতে রাজী গেল না। সে দস্তরমত বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বল্লে—পিসিমা, আপনারা দেরী করচেন কেন?

কুমীর মা বল্লেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা। আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বল্লে—পড়ে থাকবো না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক্ ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বল্লে—কুমী ওঠ্, কথা শোন—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ্—দিন দিন ইয়ে হলেন—না? ওঠ বল্‌চি—

কুমী দ্বিরুক্তি না করে বিছানা ছেড়ে উঠে দালানে চুল বাঁধতে বসে গেল, সাজানো গোজানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হোল, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবো বলে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে অন্যমনস্ক। কুমীর জন্য এত চেষ্টা করেও কিছু দাঁড়ালো না শেষ পর্য্যন্ত। কি করা যায়? এদিকে কুমীদের বাড়ীও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েচে। হারাবারই কথা। এবার সেখানে ও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড় বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভাল ঘর বর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে বড়তে ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিলে।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকুরীতে খুব উন্নতি করে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ এঞ্জিনিয়ারের অপিসে বদলি হোল দেড়শো টাকায় মার্চ্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর তিলে তিলে মানুষের দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন হচ্চে—অবশেষে পরিবর্ত্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হোলে আগের মানুষটীকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প করে সে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্ত্তমানে। এর মূলে একটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার-ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন, তাঁর বাড়ী হুগলী জেলায়, রুড়কীর পাশ এঞ্জিনীয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর দু'টী মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েচে। এখনও একটী মেয়ে বাকী।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা বলে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গান শোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হোল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটী—পরেই ভাবলে—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অম্‌নি হঠাৎ মনে হোল—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। না, এ কি ভাবনা এসব. মন থেকে এখন জোর করে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হোলে আজ গেরুয়াধারী স্বামীজীদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্ত্তি হয়ে যেতো। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি, শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে অমল তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েচে আলো ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা

বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়ীকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্য; প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ শত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটী নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর ওপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করলে। চাকুরী প্রথম ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেলের কারখানায় কয়লার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভাল ভাবেই নাম্‌ল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কণ্ট্রাক্টার হয়ে পড়লো। শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলনও বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়াটার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করেনি—তবে বলতে সুরু করেচে যে মোটর না রাখ্‌লে আর চলে না; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্য নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশীদিন বাচবেন না; বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে এসে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বল্লে—আস্‌তে যখন চাইচেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখি নি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন এখানেই গঙ্গাতীরে থাকুন।

বাসায় আর কেউ এমন ছিল না, যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেই হীরুই দেশে রওনা হোল।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদ্‌লা নদীতে নৌকায় করে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়ালবাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে নৌকোর বুড়ো মাঝি বল্লে সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিনাঙ্গপুর গ্রাম দুখানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নীচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুণ নৌকো চললো মাঠের মধ্যে দিয়ে, বড় বাব্‌লা বোনের পাশ কাটিয়ে, ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড় কড় করে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকা ভিড়তে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উঁচু বলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠে নি; দু-পাড়েই বন, একদিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্য পারে খররৌদ্র।··এই বনের গন্ধ···নদীকূলের ছল ছল শব্দ··বাঁশবনে সোনার সড়কীর মত নতুন বাঁশের দীর্ঘ কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেচে··এই শরত দুপুরের ছায়া··এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটীমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়...অনেকদিন আগের মুখ··হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো মনের মধ্যে···এক ধরণের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি!·· জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না অনেক দূরের কোন্ অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তার একছত্র অধিকার এখানে—সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখী সুরমাকে চেনে না।

হীরু নিজেই অবাক হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করিলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশী বুড়ী হয়ে গিয়েচেন, তবে এখনও অথর্ব্ব হন নি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর জন্য ভাত চড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বল্লে—তোমার কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে খাবো। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি বলি করেও কুমীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস্ করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম করে বেলা পড়লে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসলো। মধু ডাক্তারের চুল দাড়িতে

পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে—সেই গল্প করতে লাগলো। গ্রামের মক্তবের সেই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে; এখনও সেই রকম নিজের অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টর মহিমবাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব-ইন্‌স্পেক্টারী করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোন বার মক্তব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভঙ্করীর সারাপালির একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কসে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্ব্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠ্‌ল। মধু ডাক্তার বল্লে—বসো হে হীরু, সন্ধেটা জ্বালি—তারপর দু-একহাত খেলা যাক্। এখন না হয় বড়ই হয়েচ, পুরোণো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে হে!

হীরু পথশ্রমের ওজুহাত দেখিয়ে ওঠে পড়লো; তার শরীর ভাল নয়, পুরোণো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভাল করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস্ করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ী। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে কুমীর জ্যেঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ীর সামনেই এসে পড়েচে। সেই জিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ায় গাছে পালায়, ঘাসের পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁকের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ী বসে সে কত গল্প করেচে কুমীর সঙ্গে!

চুপ করে সে জিউলি তলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের একটী মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসচে। কুমীদের বাড়ীর কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল...আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইল...সত্যই কুমী? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই বটে, কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েছে সে!

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বল্লে—কুমী, কেমন আছ? চিনতে পারো?

কুমী চমকে উঠল অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না, বল্লে—কে?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হোল না। তারপর এসে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কবে এলে হীরুদা? কোথায় ছিলে এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। কে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা. পরণে একখানা আধময়লা শাড়ী—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতুহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, কিন্তু মুখশ্রী আগের মতই সুন্দর। এত দিনেও মুখের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি।

কুমী বল্লে—এসো আমাদের বাড়ী হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক বছরে কত কথা জমানো রয়েচে, তোমায় বলবো বলবো করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে এলে না।

হয়েছে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরাণো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেছে; হীরু ভাবলে, আহা. ওর বকুনির শ্রোতা এতদিন পাইনি তাই ওর মুখখানা ম্লান।

—তুই আগে চল্ কুমী।

—তুমি আগে চলো, হীরুদা।

চার পাঁচ বছরের একটী ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বল্লে—ওই মা এসেচে!

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই। মা বাড়ী নেই,

ওপাড়ায় গিয়েচে রায়বাড়ী, কাল ওদের লক্ষ্মীপুজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দিঘীর-পাড় থেকে। উঃ—কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো, বসো। কি খাবে বলো তো? তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালবাসতে। বসো, সন্ধেটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে। দাঁড়াও, আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটীর ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্চে পুরোণো দিনের মত, যখন সে কত রাত পর্য্যন্ত ওদের বাড়ী বসে গল্প করতো। তবুও কত—কত পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে চা'ল ভাজতে বসলো। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসলো সেই পুরোণো দিনের মতই গল্প করতে। সেই হাত পা নাড়া, সেই বকুনি—সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বল্লে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হোল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বল্লে—সামটা।

—তা বেশ।

তার পর কুমী বল্লে—ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার যো নেই, কাজ ফেলে এসেছি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না না হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দুদিন। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটী ছেলে, একটী মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে এখন এমন মনে পড়েচে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে। বড়লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মত সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক থেকে মেলে—খাপ খায়—এই কুমীর অথচ সুরমার জন্য দামী মাদ্রাজী শাড়ী কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেচে, যাচ্ছ যখন দেশে ফিরবার সময় কলকাতা থেকে একেবারে পুজোর কাপড়-চোপড় কিনে এনো। এখানে ভাল জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশী।

আর কুমীর পরণে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

না—দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেচে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েচে—নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্ম্মের মধ্যে। বালিকাবয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরোণো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন করে ফিরেচে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বল্লেন—এই যে, জুটেচ দুটীতে? আমি শুনলুম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপুজো, তাই রায়েদের বাড়ী রান্না করে দিয়ে এলাম। তা ভালো আছিস্ বাপ হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে। তোর কথা লেগেই আছে ওর মুখে; এই আজও দুপুরবেলা বলছিল, মা, হীরুদা নদীতে জল বাড়তে দেখলে খুসি হোত; এবার তো বন্যে এসেচে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুসি হোত—না মা? তা, আমি তুই এসেছিস্ শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ী নেই দেখে ভাবলাম সে ঠিক আমাদের ওখানে গিয়েচে। তা বস বাবা, চট্ করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী? খোকার জন্য তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েচি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনের খাতাপত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্য্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে। এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটী নেই, বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা, মেয়েটার পরণে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি করে চালাই? তা সবাই জানে। নইলে—

অগ্নি স্বাহা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
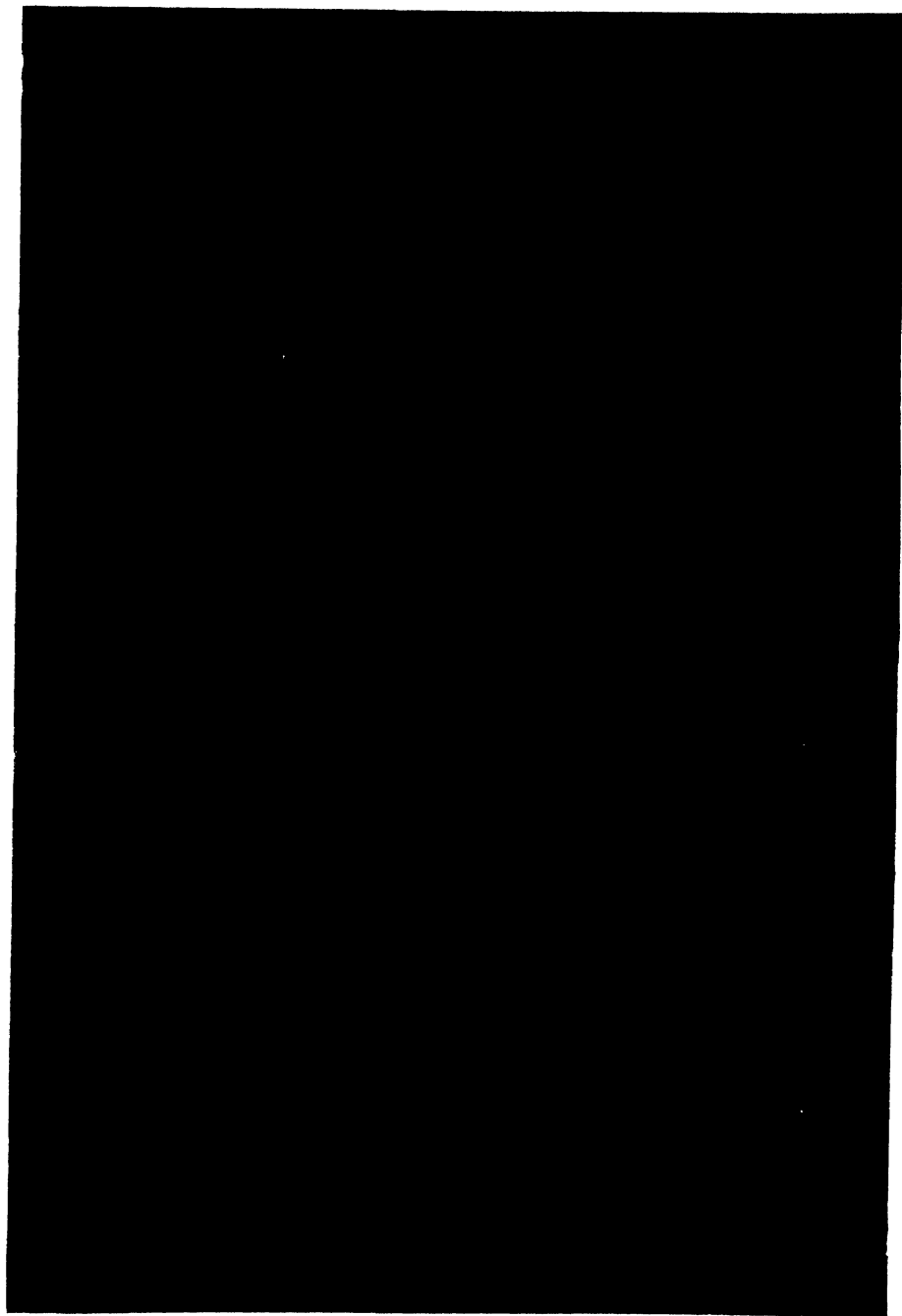
Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

কুমী ঝাঁঝালো সুরে বল্লে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বক্‌বক্ সুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই বটে। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্য্যন্ত। বল্লে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটী জ্বেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ী এসে ডাক দিলে—কি হচ্চে ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজো অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ী। মা বল্লেন—যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বল্লে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ী গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমী বল্লে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো?... উঁহু...তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বল্লেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্ম নারিকেল-কুমড়ো রাঁধতে বসলো। বল্লে হীরুদা বড় ভালবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলবো রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ী পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভাল কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হোল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়। তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুমীকে সে দেখচে তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।...

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুমী। ওর যেটুকু ওর মধ্যে থেকে বার হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি! হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা...এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুমীকে সে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুসি করবার জন্ম।

কুমী কত কি বকচে বসে বসে...পুরোণো দিনের কথা তুলচে কেবল কেবল।

—মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে...সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস কেন পোড়ারমুখী, ভূত ধরে খাবে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস্! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো একরকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠে? শুনবে বলবো...অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তাহা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ্ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ...বলে ভয়ে মরছি—

পরক্ষণেই কুমী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বল্লে হীরুদা, ভয়ে মরছো? হি হি—হি হি—এত ভয়

তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয় থাকতো না···চারুপাঠ তো আর পড় নি?

সেই সব পুরোণো গল্প। আলেয়া···আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়েচে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুল্লে। আগে এসব কথা কুমী বলতো না। এখন সে পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুয্যে বাড়ীর বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবা নাৎনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জ্জনে নিজের স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দরদ দিয়ে বলে গেল। সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদ্‌লে দিয়েচে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বল্লে—অই দেখো হীরুদা বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বল্লে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচ্‌বে তো মুখে? নেবু কেটে দেবো এখন অনেক করে, নারকোল-কুমড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা যা সে খেতে ভালবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য্য হয়ে গেল এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বল্লে—কুমী ছেলেবেলা ভাল লাগে, না এখন ভাল লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে একদিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভাল—নয় কি?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব?

—কে বল্লে একথা? মা বলছিল সেই তো কাল রাত্তিরে? ও বাজে কথা, জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব্ আল্‌গা হয়ে গেছে।

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বল্‌বিনে?

—ঐ, তুমিও পাগলামি সুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও —যত বাজে বক্‌তে পারো—মা গো!···দাঁড়াও পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি?···না সে হবে না—

—দ্যাখ্ কুমী, আমার কাছে বেশী চালাকি করিস নে। তোকে আর আমি জানি নে? কোদ্‌লার ঘাটে পায়ে খেজুর কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস্ নি, জানতে দিস্ নি কাউকে—

—আবার?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি বলে সে ভাল করে নি, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বার করে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন? ছিঃ—

কুমী বল্লে—আবার কবে আসবে হীরুদা?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস্, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বক্‌তে সুরু করেচ হীরুদা। তোমার যা কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হলে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বক্‌তে? আমি ইচ্ছে করলে আসতে পারি নে ভেবেচিস্?

—হাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না?

—আচ্ছা সে যাক্, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি তুই খুসি হোস্?

—উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি? কি বাজে বক্‌তেই পারো?

হীরু দুঃখিতভাবে বল্লে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী? তুই এত বদলে গিয়েছিস্ আমি এ ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা, বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বল্লে—তোমার কি একটুও বদলায় নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা, বেশ' বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ করা। আচ্ছা, কি বলবো বলো দিকি? ওকথার কি উত্তর দেবো? মুখে আমার উত্তর শুনে তোমার লাভটা কি হবে শুনি? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর আমি দিতে পারি? ভেবে দ্যাখো তা হোলে আমি বদ্‌লাই নি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা।

—আচ্ছা, কুমী এতটা না বকে সামান্য দু কথায় শাদা উত্তর একটা দে না কেন? বকুনিতে কি আমি তোর সঙ্গে পারবো?

—না, তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না। হাঁ, হই।

—মন থেকে বলচিস্?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না। তুমি না নিজের বুদ্ধির বড় অহঙ্কার করতে?

—কুমী, রাগ করিস নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যাক্, বাঁচলুম কুমী।

—পায়েসটা খাও তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত রাখো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্য।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্য্যন্ত এসে ওদের নৌকোতে উঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েছে তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে।

দুপারের নদীচর নির্জ্জন। দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরণের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরিপানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঝোপের তলার ছায়ায় ডাহুক চরছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থর থর কাঁপছে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েচেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ণ। বাইরে নৌকোয় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারতো! মধু ডাক্তারের মত হাটতলায় ওষুধের ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে? ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পূজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে···অন্ততঃ দেড়-শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ্দ করে নিয়ে এসেছে···

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো। জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবছে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমন্তন্ন খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই।··

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা? ··

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে ··ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মত!···আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা বলে অত আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়···কই···

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই ষ্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েছে। সিগ্‌ন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেণটা আসবার দেরী নেই···
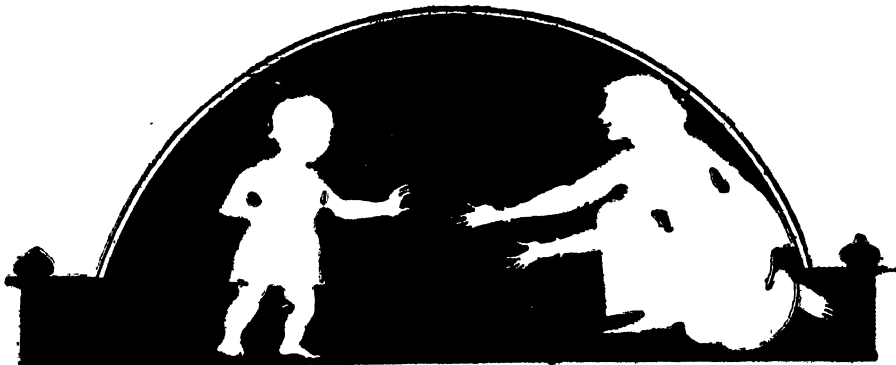
মাহিষ্য বিদ্বেষের প্রতিবাদ

রায় সাহেব শ্রীকুমুদনাথ দাস

গত আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় 'কৈবর্ত্তরাজ দিব্য' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিত' অনুসারে দিব্য সম্পর্কীয় ইতিহাস-তত্ত্ব বিচার করাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহারাজ দিব্যের জাতি নির্ণয় করিতে গিয়া লেখক মাহিষ্য ও জালিক কৈবর্ত্তগণের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, "বল্লাল সেনের পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত সমাজে হালিক জালিক ভেদ ছিল না, বল্লাল সেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে Divide and Rule Policy অনুসারে কৈবর্ত্ত সমাজে এই ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করেন।"

ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার মতের স্বপক্ষে কেবল মাত্র একটী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বল্লাল সেন কৈবর্ত্ত জাতির এক অংশকে জল-চল করিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—এই প্রবাদ বহুদিন হইতে দেশে চলিয়া আসিতেছে। ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যে এই প্রবাদ বিদ্যমান ছিল তাহা বুকাননের লেখা হইতে প্রমাণ হয়। এই প্রবাদ বুকানন সাহেবের বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রবাদের সত্যতা এক জিনিষ, আর প্রবাদের বিষয়ীভূত ঘটনার সত্যতা আর এক জিনিষ। যতদিন না সেই ঘটনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বাহির হইতেছে ততদিন কেবলমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় কি?

বল্লাল সেনের সমাজসংস্কার সম্বন্ধে প্রবাদ একটী গল্প মাত্র। ইহা বল্লালের পরে কোনও সময়ে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধের অবলম্বনরূপে বিদ্বেষবশতঃ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। বল্লাল সেন তাঁহার স্বল্পকাল রাজ্যশাসনের মধ্যে কৌলিন্য স্থাপনাদি সমাজ সংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।¶ বল্লাল সেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। অথচ বৈদ্যজাতির কুলীন ঘর বল্লালের দ্বারা সৃষ্ট নহে। কৌলিন্যপ্রথা সৃষ্টি করিয়া ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিলে বল্লালের কীর্ত্তি (১) নিশ্চয়ই কোনও শিলালিপি বা তাম্রশাসন ও তৎকালীন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত হইত। কৈবর্ত্ত জাতি পূর্ব্বে এক ছিল, বল্লাল সেন ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন—ইহা প্রমাণ করিতে হইলে বল্লালসেনী প্রবাদ ছাড়া অন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক। যুক্তি Petitio principi দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে অর্থাৎ যাহা প্রমাতব্য তাহাই তর্কে মানিয়া লওয়া হয়।

প্রবাদটী আরও একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাউক। প্রবাদটী দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁহার শ্রীহট্টের ইতিহাসের ৩য় খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে ২৪ পৃষ্ঠায় কৈবর্ত্তের জল-চলনের গল্প জগন্নাথপুরের রাজা বিজয়সিংহের নামে প্রচলিত আছে লিখিয়াছেন। আবার পশ্চিম বঙ্গে ভবানন্দ উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে ভবানন্দই কৈবর্ত্তগণকে জলচল করিয়া গিয়াছেন। ভট্টশালী মহাশয় প্রবাদটীর যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে পরাক্রান্ত কৈবর্ত্তজাতিকে দুর্ব্বল করিবার জন্যই বল্লাল তার এক অংশকে জলচল করিলেন। সাধারণে প্রচলিত প্রবাদ আবার অন্যরূপ। লক্ষ্মণ সেন রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় পতিবিয়োগবিধুরা পত্নীর কষ্ট দেখিয়া সূর্য্যমাঝী নামে এক সুদক্ষ নাবিককে বল্লালসেন পুত্রকে ত্বরায় ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দেন। অতি ক্ষিপ্রগতিতে সূর্য্যমাঝী সে কার্য্য সম্পন্ন করিলে রাজা খুসী হইয়া পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে জমি দান করেন এবং তাহার স্বজাতিগণকে জলচল বলিয়া আদেশ দেন। এত প্রবাদ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ভিত্তির সন্ধান করা সহজ নহে।

এবারে আমরা ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত প্রবাদটীর সম্ভাব্যতা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। স্বতন্ত্র সাক্ষ্য বা প্রমাণের অভাবে প্রবাদ বাক্যে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে তাহার সম্ভাব্যতা (probability) দেখা দরকার। সেন রাজাদের পূর্ব্বে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বলবান ছিল। তখন বৌদ্ধশাস্ত্রকার, বৌদ্ধরাজা এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু গণ্যমান্য সম্প্রদায় জালিক কৈবর্ত্তগণকে নিশ্চয়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বৌদ্ধেরা ত স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিল যে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তের পাপমুক্ত হইবার কোনও আশা নাই। এ হেন অস্মরণীয় কাল হইতে ঘৃণ্য কৈবর্ত্তকে রাজা বল্লালসেন এক শুভ মুহূর্ত্তে জলচল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন—আর কৈবর্ত্তেরা দলে দলে জাল ছাড়িয়া চাষ ধরিল এবং দেশের সব লোক তাহা বিনা বাধায় মানিয়া লইল (২)। হিন্দু সমাজের মূলসূত্র যিনি জানেন তিনি বুঝিবেন ইহা সম্ভব নহে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের বিশ্বাসের উপর গ্রথিত। বেদ পন্থী হিন্দু জাতি বিভেদকে সমাজের মূলভিত্তি বলিয়া বিবেচনা

¶ চোখের উপর সমাজে অদ্যাপি প্রবল-প্রতাপে কৌলিন্য প্রথা বিদ্যমান; ধ্রুবানন্দের মহাবংশে উহার জন্মদিন হইতে ঠিকুজি দেওয়া আছে, বল্লাল কাহাকে কাহাকে কুলীন করিলেন তাহার তালিকা দেওয়া আছে। তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজিও সমাজে কৌলিন্য মর্য্যাদা ভোগ করিতেছেন। আর কি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ চাই? শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

(১) কৌলিন্য প্রথা বল্লালের কীর্ত্তি নহে, কুকীর্ত্তি—বাঙ্গালার সমাজকে মুষ্টিগত পদানত রাখিবার ফন্দি মাত্র। ন-কা-ভ।

(২) সমান মর্য্যাদার একই কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণে কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় করা যে রাজশক্তি বলে হইয়াছিল, কৈবর্ত্ত সমাজে ভেদ সৃষ্টিও সেই রাজশক্তি বলেই সম্ভব হইয়াছিল। ন-কা-ভ।

করে। হিন্দুর কাছে রাজ-শাসনের তুলনায় শাস্ত্র-শাসন চিরকালই বলবত্তর। শুনিয়াছি বল্লালসেন বৌদ্ধ শাসনের পর হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধারে উৎসাহী কতকগুলি ব্রাহ্মণের পরামর্শমত সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা এবং নব আভিজাত্য বা কৌলিন্য গৌরবে গর্ব্বিত হিন্দু সমাজের উচ্চ-জাতিসকল কি প্রবল উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া বিনাবাধায় একদিনে ঘৃণ্য অন্ত্যজের জল গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। তাহার উপর মনে রাখা প্রয়োজন যে তখনকার সমাজ গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুদূর গ্রামের মধ্যে রাজ অনুশাসন ও তাহা মান্য না করিলে রাজদণ্ড, এখনকার মত সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না। সে রকম অবস্থায় মাহিষ্যগণের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির একদিনে জলচল হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি?

অপর পক্ষে সূর্য্যমাঝিকে জলচল করার প্রবাদের সম্ভাব্যতা অনেক বেশী। দারুণ চিত্তচাঞ্চল্যের সময় রাজার সেবা করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টিসাধন করিলে যে জায়গীর ও উচ্চপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা স্বাভাবিক। কৈবর্ত্ত নামে যে অপর জাতি পূর্ব্ব হইতেই জলচল হইয়া দেশে বিদ্যমান ছিল—কোনও গণ্যমান্য জালিক বংশকে তাহাদের সমপদস্থ বলিয়া গণ্য হইতে বলা রাজার পক্ষে সম্ভব। বল্লালসেনের রাজত্বের অল্পদিন পরে লিখিত এড়ু মিশ্রের কারিকা ও নুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠী কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বল্লালের সময় জালিক ও হালিক উভয় জাতি স্বতন্ত্র-ভাবে বর্ত্তমান ছিল। এড়ু মিশ্রের কারিকায় লেখা আছে যে সূর্য্যদ্বীপের এক অংশ সূর্য্যমাঝী পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত হয় এবং লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ নামে অপর দুই অংশ হালিক কৈবর্ত্তগণের অধিকারে ছিল (৩)। কুল-কালিমা গ্রন্থে এই হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যশোহর অধিবেশনে শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ইতিহাসে অসত্য প্রচার" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে যশোহর জেলায় হালদা মহেশপুরে রাজা সূর্য্যমাঝির প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান এবং সেই সময়ে তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষ সুলতান মাঝির শালিকাপতির বংশধর জীবিত ছিল। রাজাদেশ সত্ত্বেও এখনও ইঁহারা জালিক কৈবর্ত্তই রহিয়া গিয়াছেন। নব্যভারতে সুদর্শন বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশের পর খুলনার ইতিহাস লেখক স্বর্গীয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র নিজে অনুসন্ধান করিয়া উহার সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার যশোহরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বলিখিত বল্লাল কর্ত্তৃক কৈবর্ত্তের জল চলনের গল্প প্রত্যাহার করেন। সম্বন্ধ-নির্ণয়কার পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধিও তাঁহার পূর্ব্বলিখিত বল্লালী গল্পটী পরে প্রত্যাহার করিয়া-ছিলেন।

মাছ মারার জন্য যে জালিক কৈবর্ত্তগণ বৌদ্ধশাস্ত্র মতে নিন্দনীয় হইবে তাহা সহজেই বোধগম্য। সেই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজাদের সময়ে জালিকগণের যে সমধিক সামাজিক গৌরব ও প্রতিপত্তি ছিল তাহা কল্পনা করা যায় না। দিব্য ও তাহার স্বজাতিগণ জালিক কৈবর্ত্ত হইলে তাহাদের দেশব্যাপী প্রতিপত্তি সম্ভব হইত না; সন্ধ্যাকর নন্দী নিজে হিন্দু ব্রাহ্মণ (৪)। মৎস্যঘাতী—জালিক কৈবর্ত্তের প্রতি ব্রাহ্মণের অশ্রদ্ধা খুই স্বাভাবিক। সন্ধ্যাকর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রভুর তুষ্টির জন্য দিব্য ও ভীমের নিন্দা করিবার সময়ে দিব্যের জাতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক কথা ব্যবহার না করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন ইহা বিস্ময়ের বিষয়। বর্ত্তমানে উত্তর বঙ্গে কৈবর্ত্ত বলিলে হালিক কৈবর্ত্তকেই বুঝায় (৫)। যদি আমরা অনুমান করি যে পাল নৃপতিগণের সময়েও বরেন্দ্র ভূমিতে কৈবর্ত্ত কথার দ্বারা কেবল হালিক কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যকেই বুঝাইত তাহা হইলে এই বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। দিব্য ও তাঁহার স্বজাতিগণ সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে তাঁহারা কি বঙ্গের সমগ্র হিন্দু সমাজের মনোনীত নেতারূপে গৃহীত হইতেন না ভীমকে রাজারূপে পাইয়া বিশ্ব ধন্য হইত? (৬)

বল্লালসেনের পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত এক অভিন্ন জালিক জাতি ছিল, ভট্টশালী মহাশয়ের এই মত কিছুতেই পোষণ করা যায় না। উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত্তও অভিধানে লিখিত 'কৈবর্ত্ত' এখনকার ন্যায় দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি ছিল। একই কৈবর্ত্ত কথা যে দুই বিভিন্ন জাতির নামে প্রচলিত ছিল তাহা পাল রাজাদের পূর্ব্বে এবং পরে লিখিত পুস্তকাদি হইতে জানা যায় (৭)। ভট্টশালী মহাশয় অভিধান হইতে কৈবর্ত্ত কথার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। জাতি বিচারে অভিধান অপেক্ষা স্মৃতি-সংহিতার মত বেশী প্রবল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ধীবর হইতে ভিন্ন অন্য জাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত কৈবর্ত্ত শব্দের উদাহরণ :—

ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।(৮)

পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

---

(৩) এই কথার মূল বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে উদ্ধৃত এড়ু মিশ্র। যথা—

সূর্য্যদ্বীপস্ত্রিভির্ভাগৈঃ সম্বিদ্দাত্যা বিভাজ্যতে।
তে লাট কঙ্কযোগীন্দ্রো ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ॥
যোগীন্দ্রো ধীবরপ্রাপ্তো লাটো দাসস্য রাজ্যকম্।
কঙ্কস্ত পূর্ব্ব সীমায়াং চিত্রা যত্র বিরাজতে॥

এই দুইটি শ্লোক হইতে রায় সাহেব কৃত অর্থ আসে কিনা পাঠকগণের বিচার্য্য। ন-কা-ভ।

(৪) সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কারণ-কায়স্থ ছিলেন। ন-কা-ভ।

(৫) উত্তরবঙ্গে জালিক কৈবর্ত্তও অনেক আছে। ন-কা-ভ।

(৬) ভারতসম্রাট প্রবলপ্রতাপশালী নন্দরাজগণ শূদ্র ছিলেন বলিয়া পুরাণে লিখে। ন-কা-ভ।

(৭) প্রমাণ তো কিছু দিতেছেন না! ন-কা-ভ।

(৮) এই শ্লোকের পরের ছত্র উদ্ধৃত করেন নাই কেন? "কলৌ-তীবর সংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি।" এই শ্লোকে যে কৈবর্ত্ত ও ধীবরকে অভিন্ন বলা হইয়াছে, রায় সাহেব কি তাহা বুঝেন না? ন-কা-ভ।

এই কৈবর্ত্ত জাতি এক সময়ে মাহিষ্য নামেও পরিচিত ছিল। সেই জন্য বর্ত্তমান হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) বৈশ্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ পুত্রো মাহিষ্যঃ। ঔষণস

(২) কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়ো

পাণিনী ব্যাকরণের টীকাকার শ্রীহরি মিশ্র। ইনি অমরকোষের পূর্ব্ববর্ত্তী।

(৩) "গৌড় বাঙ্গালায় কৈবর্ত্ত মাহিষ্য
বিক্রমে যেমতি হয় সমুদ্রের অশ্ব।"

উড়িয়া ভাষায় শ্রীশ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্যং প্রণেতা প্রচীন মাধবদাস কবিভট্ট।

(৪) পুরীর ৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রক্ষিত মাদলা পঞ্জিকায় হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শাস্ত্রালোচনা করিলে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে কৈবর্ত্ত কথা অস্মরণীয় কাল হইতে হিন্দু সমাজের দুইটি বিভিন্ন জাতির নামরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাতেই যত ভুল ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে (৯)। কেন যে এই একই কথা দুই বিভিন্ন জাতির পরিচায়ক হইল তাহা বিশদভাবে জানা নাই। মনে হয় আদৌ কৈবর্ত্ত কথাটি বিশেষণরূপে ব্যবহার হইয়া থাকিবে। জলের সংস্পর্শে থাকিয়া জীবন ধারণ করে বলিয়া ধীবরকে কৈবর্ত্ত বলা হইত। হয়ত কৈবর্ত্ত কথাটীর অন্য অর্থ করিয়া এক সময়ে মাহিষ্যগণকেও কৈবর্ত্ত বলা হইত। 'ক' অর্থে কেবল জল বুঝায় না। জার্ম্মাণ পণ্ডিত Lass n সাহেব বলেন যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জল অর্থে ক শব্দের প্রয়োগ বিরল (১০)। 'ক' অর্থে জল ছাড়া বিষ্ণু, সুখ ও ধন বুঝায়। আদৌ যে সময়ে কৃষিজীবী মাহিষ্যগণকে কৈবর্ত্ত বলা হয় তখন হয়ত দেশের মধ্যে অন্য জাতির তুলনায় তাঁহারা অবস্থাপন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবেন। হিন্দু সমাজের এক অবস্থায় কৃষি কার্য্যই প্রধান অবলম্বন ছিল এবং যাঁহারা এই কৃষিকার্য্য করিয়া সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করিতেন তাঁহাদের যে দেশের লোক ভাগ্যবান বিবেচনা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, কালক্রমে কৈবর্ত্ত কথাটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুইটীর পার্থক্য লোপ পাইয়া থাকিবে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইটী বিভিন্ন জাতি একই কৈবর্ত্ত কথার দ্বারা পরিচিত হইতে থাকিবে। এ যুক্তি অবশ্য অনুমান মাত্র তবে ইহাতে সব factএর সামঞ্জস্য হয়। সে যাহাই হউক এই দুইটী স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে যে আচার-ব্যবহারগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য (১১)। অস্মরণীয় কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা শুধু মাত্র একটী কথার অত্যাচারে উড়িয়া যাইতে পারে না। তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আবশ্যক।

ভট্টশালী মহাশয় ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সমাজতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। পরিশেষে সমাজ সংস্কারকের ভঙ্গিতে উপদেশ দিতেও ছাড়েন নাই। "মাহিষ্য আন্দোলন যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা আত্মহত্যা করিতেছেন।" বল্লাল সেনের কাঁদে পা দিয়া' জালিক কৈবর্ত্ত হইতে একেবারে ভিন্ন হইবার চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে দুর্ব্বল করিতেছেন। এটি ভট্টশালী মহাশয়ের মাহিষ্য-প্রীতি (?), না আরও কিছু? আমাদের মনে হয় ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ইঙ্গিত স্পষ্ট বিদ্যমান। ভট্টশালী মহাশয় মাহিষ্যকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ দিব্যকেও জালিক প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি বুকানন ও ওয়াইজ সাহেবের লেখা হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে সব উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে এমন কিছু মূল্যবান যুক্তি নাই, তবে তাহার ফলে চাষী কৈবর্ত্তগণের প্রতি সাধারণ পাঠকের অশ্রদ্ধা জন্মায়। সাহেবদিগকে পণ্ডিতে যেরূপ বুঝাইয়াছে তাঁহারা সেইরূপই লিখিয়াছেন। ইঁহারা সমাজ-তত্ত্বের দিক হইতে বিশেষ গবেষণা করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিচারপূর্ব্বক লিখেন নাই।

জেমস ওয়াইজের যে গ্রন্থটীকে নলিনীবাবু অমূল্য বলিতেছেন তাহা সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। আলোচনার দিক হইতে সেরূপ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত উক্তির মূল্য নাই। সেই গ্রন্থটীর নামকরণ নলিনী-বাবু স্বয়ং দুই স্থলে দুই রকম করিয়াছেন। মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উহার নাম দিয়াছেন Notes on Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal, ভারতবর্ষের প্রবন্ধে এই 'অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য' পুস্তকের নাম লিখিলেন Tribes and Castes of Eastern Bengal. শুধু তাহাই নহে। ঐ পুস্তকের ২৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি দুই রকম উক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। মানসী ও মর্ম্মবাণীর প্রবন্ধে তিনি ওয়াইজ সাহেবের পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :—

"In Bengal again there was a handful Tribe called Kewat, whom Ballal Sen, in after years raised to the grade of pure Sudras conferring on them the Title Kaivartha as a return for their leaving off their family trade." ভট্টশালী মহাশয় ভারতবর্ষের প্রবন্ধে লিখিলেন "ওয়াইজ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"In Bengal, again, there was a *powerful* Tribe called Kewat, whom Ballal Sen in after years raised to the grade of pure Sudras. p 298."

'Handful'এর স্থানে 'powerful', পড়িবার ভুলে যে হইয়া‌ছে

(৯) প্রমাণ উল্লেখ করিবার ইহা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি নহে। কোন্ মুদ্রিত বা অমুদ্রিত পুস্তকের কোন্ সংস্করণের কোন্ পৃষ্ঠায় প্রমাণটি প্রাপ্তব্য, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। অমুদ্রিত পুস্তক হইলে গ্রন্থাগার এবং নম্বরও উল্লেখ করা আবশ্যক। রায় সাহেব দুই জাতীয় কৈবর্ত্ত থাকার যে নিঃসন্দেহ প্রমাণগুলি দাখিল করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী পাঠকের সন্দেহ দূর হইলে সুখী হইব। ন-কা-ভ।

(১০) কলমী শাকের মত সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য শাকের নামেও ক মানে জল। ন-কা-ভ।

(১১) এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত পর উদ্ধৃত করিতেছি তাঁহারা কিন্তু বিশেষ কোন পার্থক্যই দেখেন নাই। ন-কা-ভ।

তাহা মনে হয় না। Handfulএর স্থানে powerful হইলে বল্লাল সেনের দ্বারা জল চলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত মতটা পুষ্ট হইয়া উঠে সেই জন্যই মনে হয় তিনি ইচ্ছা করিয়াই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। Handful কথা থাকিলে বল্লাল সেন দ্বারা মাত্র কয়েকজন জালিকের জল চলনের প্রবাদ সমর্থিত হয়। ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার লেখার মধ্যে ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্যের বড়াই করিয়া থাকেন; এটা কি সেই কর্ত্তব্য পালনের নমুনা ?(১২)

যে সব কেবট মুসলমান হইয়া গিয়াছে তাহাদের দুঃখ বুঝিবার দরদী আজও হিন্দু সমাজে মিলিল না—এই বলিয়া ভট্টশালী মহাশয় দরদ দেখাইয়াছেন। কাহারও মুসলমান হওয়ার জন্য মাহিষ্যগণ দায়ী নহে। মাহিষ্যগণ স্বাবলম্বী কৃষিজাতি। তাঁহারাও বাঙ্গালা দেশে অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী অনেক স্থলে বিকৃত হইয়াছে কিংবা অনাদরের অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে। তাঁহাদের জন্যও এ পর্য্যন্ত কেহ দরদ দেখায় নাই। যে বিদ্বেষবিষ সমাজদেহকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা মাহিষ্যগণের নিকট হইতে সংক্রামিত হয় নাই। তাহার উৎস ভট্টশালী মহাশয়ের ন্যায় উচ্চবর্ণের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রতিবাদ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য

রায় সাহেবের প্রবন্ধ মধ্যে পাদটীকায় দুই চারিটী কথার উত্তরের চেষ্টা করিয়াছি। পাদটীকা বেশী কথা বলিবার স্থান নহে। কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি নির্ণয়ে যাঁহারা আজিও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্লোক আওড়ান অথবা মাহিষ্য বিবৃতির মত অক্ষম ওকালতীপূর্ণ জ্ঞানকৃত অপব্যাখ্যায় ভরা পুস্তক বিদ্বজ্জনসমাজে প্রচার করিয়া আশা করেন যে কোলাহলের জোরেই তাঁহারা মোকদ্দমা জিতিয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে আমি কি বলিব ?

১৯৩১ সনের সেন্‌সাস্ মতে বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর সংখ্যা ২১১১৫৯৭১, পাহাড়ী জাতির হিন্দুর ১০৫৩০৯৮ লইয়া মোট ২২২১২০৬৯। ইহার মধ্যে চাষী কৈবর্ত্তের সংখ্যা ২৩৮১২৬৬, জালিক কৈবর্ত্তের সংখ্যা ৩১২০৭২। কাজেই কৈবর্ত্তগণ বাঙ্গালা দেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুজাতি, জালিক ধরিয়া সমগ্র হিন্দু সংখ্যার অষ্টমাংশ। রায় সাহেব প্রমুখ মনস্বীগণ কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, যে বাঙ্গালাদেশে ক্ষত্রিয়ের চিহ্নও পাওয়া যায় না, তথায় ক্ষত্রিয় বীর্য্যে বৈশ্যায় জাত কৈবর্ত্তে দেশ ছাইয়া গিয়াছে ? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদি শাস্ত্রে মিশ্রজাতির উৎপত্তিসূচক যে শ্লোকগুলি পাওয়া যায়, মূল চতুর্ব্বর্ণ হইতে সমগ্র হিন্দু জাতির উৎপত্তি বুঝাইবার ইহা যে নিতান্ত মনগড়া ছেলেমানুষী চেষ্টা তাহা কি রায় সাহেব বুঝিতে পারেন না ? শূদ্রবীর্য্যে ব্রাহ্মণী গর্ভে চণ্ডালের জন্মও ঠিক অমনি একটি fiction। এই fiction লক্ষ্য করিয়াই পরলোকগত মনস্বী ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহাস করিয়া গিয়াছেন :—

"As the number of Brahmans in South-Eastern Bengal was never very large in olden times and does not even in the present day come to even a quarter of a million in the five districts named above, it is difficult to account for the presence of a million Chandalas in those districts on Manu's theory. Shall we suppose that the fair-skinned Brahman Desdimonas habitually bestowed their hands on swarthy Sudra swains ? ..We have only to state such superstitions to show their utter absurdity and with these suppositions, Manu's theory of mixed castes is brushed aside to the region of myths and nursery tales. Ancient India. Book IV. ch. IX

মনস্বী দত্ত মহাশয়ের মত :—"The Kaivarttas of Bengal form a solid body of two million people making nearly one eighth of the entire Hindu population of Bengal. Is there any one among our readers who is so simple as to believe with Manu... ..common sense brushes aside such nursery tales and recognises in the millions of hard-working and simple Kaivarttas one of those aboriginal races who inhabited Bengal, before the Aryans came to the land and who submitted themselves to the civilisation, the language and the religion of the conquering Hindus and learnt from them to till the land, where they had previously lived by fishing and hunting.

Common sense will tell every reader who knows anything of the Chandalas of Bengal that they were the primæval dwellers of South-Eastern Bengal and lived by fishing in its numerous Creeks and Channels, and they naturally adopted the religion, the language and the civilisation of the Hindus, when the Aryans came and colonized Bengal. Ancient India. Book IV, ch, IX.

(১২) এই অংশটি পড়িয়া সামান্য একটু বেদনা অনুভব করিলাম। রায় সাহেব প্রতিপক্ষের উপর এমন নির্দ্দয় কেন ? তিনি অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারিলেন, handfulকে আমি নিজের মতপোষণের জন্য powerfulএ পরিণত করিতে পারি ? বিরাট কৈবর্ত্ত জাতি যে আদৌ এক ও অভিন্ন ছিল, ইহা প্রমাণ করিয়া আমার কোন্ স্বার্থসিদ্ধি হইবে ? নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস চর্চ্চার রায় সাহেব প্রদত্ত এই নাম মাথা পাতিয়া লইলাম। মানসীর প্রবন্ধ আমার কাছে নাই, উহাতে handful ছাপিয়া থাকিলে ভুল ছাপিয়াছে। মূলে কথাটি powerfulই আছে। Wiseএর বই দুষ্প্রাপ্য বটে তবে কলিকাতার Imperial Libraryতে অথবা ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহের নিকট খোঁজ করিলে মিলিতে পারে। Risleyর বই তো দুষ্প্রাপ্য নহে! উহার ১৮৯. সনে প্রকাশিত সরকারী সংস্করণের প্রথম ভাগের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারায় Wiseএর কথাগুলি powerful কথাটি সমেত উদ্ধৃত আছে। নঃ-কাঃ-ভঃ

*কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, রাজবংশী ইত্যাদি বাঙ্গালার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-জাতিগুলি যে বাঙ্গালায় আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার অধিবাসী, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রবই নাই জাতি-তত্ত্ববিৎ মাত্রেই এই কথা মানেন। আর্য্য আগমনের পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার অধিকারিত্বে কি কোন লজ্জার কথা আছে? বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের মধ্যেই আর্য্যরক্ত কতটুকু আছে সেই সম্বন্ধে জাতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ সন্দিহান। এই অবস্থায় কোন জাতি আদৌ আর্য্যজাতির অন্তর্গত নহে, ইহা শুনিয়া চমকাইয়া যাইবার কিছু নাই। অন্ধভাবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ না আওড়াইয়া প্রকৃত সত্য চিনিবার এবং তাহাতে মোটেই কুণ্ঠিত না হইবার দিন আসিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাবলম্বী কৈবর্ত্তগণের সমবেত শক্তি প্রতিহত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালা দেশে কাহারও নাই। হাল-চষাকে মাছ-মারার চেয়ে পবিত্রতর উন্নততর কল্পনা করিয়া নিজেরা দুইভাগ হইয়া সেই শক্তি কমাইয়া আত্মহত্যা করিতে চাহেন করুন, আমার আপত্তি কি? শিবমস্তুতে পন্থানঃ। নিম্নে আমি বিভিন্ন মনস্বীগণের মত উদ্ধৃত করিয়া অতি সংক্ষেপে দেখাইতে চাহি যে আদৌ মাছ-মারাই কৈবর্ত্তসমাজের প্রধান পেশা ছিল—হাল অবলম্বন করিয়া ভিন্ন হইয়া যাইবার চেষ্টা পরবর্ত্তীকালের ঘটনা। যাঁহারা এই বিষয়ে আরও জানিতে চাহেন, তাঁহারা মূল পুঁথিগুলি পড়িবেন।

বুকানন (১৮০৯) এবং ওয়াইজএর মত (১৮৮৩) আমার মূল প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে অন্য মতগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

Hunter's Orissa, P. 3'0—312. (1872)

'The seagoing castes placed a line of fisher kings (Kaivarttas in footnote) on the throne (of Tomluk.) and in spite of the remarkable fewness of Brahmans in the neighbourhood, of the over-whelming population of low caste fishermen and its long subjection to Fisher-kings, Tomluk has become a place of pilgrimage."

Risley's Tribes and Castes of Bengal, Official Edition—1891, p, 375 ff.

"There seems to be good grounds for the belief that the Kaivarttas were among the earliest inhabitants of Bengal and occupied a commanding position. ...The divisions of the caste in Bakarganj are curious and interesting and de erve somewhat fuller examination by the light they throw upon the process by which endogamous classes are formed There the Kaivarttas are divided into two groups a cultivating group known as *Halia Das*, *Parasara Das* or *Chasi Kaivartta* and of fishing group known simply as *Kaivartta* Clearly the latter group represents the main body of the caste, while the former comprises those Kaivarttas who have abandoned their original occupation and betaken themselves to the more respectable profession of Agriculture.

ইহার পরে দুই ভাগের কৈবর্ত্তের মধ্যে যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ নহে, বিবাহাদি কি করিয়া হয় গ্রন্থকার তাহার বিবরণ দিয়াছেন।

Bengal Census Report 1931. vol, 1.

এই Reportএর ৪৫৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, জেলে কৈবর্ত্তদিগকে আদি কৈবর্ত্ত বলা হইয়াছে। তাহাদের অনেকে মাছ মারা ছাড়িয়া চাষ অবলম্বন করিয়া মাহিষ্য বলিয়া নাম লেখামতে তাহাদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে এবং মাহিষ্যদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। ১৯২১—১৯৩১এর মধ্যে জালিকদের সংখ্যা প্রায় ৩২০০০ কমিয়াছে এবং হালিকদের সংখ্যা ১৭০৫০০ বাড়িয়াছে। এইরূপ চলিলে শীঘ্রই জালিক জাতি লোপ পাইবে এবং সমস্ত কৈবর্ত্তই মাহিষ্য হইয়া যাইবে!

৪৭৭ পৃষ্ঠায় মাহিষ্য শব্দে :—

It is unnecessary to recapitulate the history of this caste which is of the same origin and derivation as the Jaliya Kaivarttas.

৫৩৩ পৃষ্ঠায় কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্বন্ধে ডক্টর নৃপেন্দ্রকুমার দত্তের বিস্তৃত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে :—

"The Chashi Kaivarttas now a days call themselves by the name of Mahishya and claim that they have always been different from the Jaliya Kaivarttas with whom they had nothing in common except the name. Facts however do not seem to support this claim.

এই বলিয়া তিনি ছয় দফার বিস্তৃত বিচার করিয়া মাহিষ্যদের এই দাবী একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বুকানন, ওয়াইজ, হাণ্টার, রিজলী, রমেশদত্ত এবং নৃপেন দত্ত আর এই ক্ষুদ্র লেখক, আমরা কেহই চাষী-কৈবর্ত্তগণের শত্রু নহি, রায় সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কথাটা বিশ্বাস করিবেন। আমরা আমাদের নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে শুধু সত্য কথাটা বলিতে চাই। *

* এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবে না। ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

গিধ্নীতে সেণ্ট্ জন অ্যাম্বুলেন্স শিবিরে কয়েকদিন

শ্রীঅজিতকুমার সিংহ

বুধবার ৮ই এপ্রিল ; দুপুরবেলা বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ব'সে আছি এমন সময় দূত এসে হাজির—হাতে নোটিশ—Receive Divisional orders to join Easter Training Camp at Gidni (10th to 14th April 1936, both days inclusive), issued by Divisional Superintendent T. P. Chatterji, Officer Commanding, No 5 (Salkia) Division, St. John Ambulance Brigade. দিবানিদ্রা উঠল মাথায়। বোনেদের ব'ললাম "পরশু সকালের ট্রেণে গিধনী যাচ্ছি···সব গোছগাছ করে রাখ।"

শুক্রবার সকাল ৯টার সময় সালিখা থেকে যাত্রা করলাম। একটা বাস রিজার্ভ করা ছিল (অবশ্য owner বাবু নন্দকুমার সিংহের অনুগ্রহে) এবং হাওড়া থেকে একখানা কম্পার্টমেণ্ট্ ও রিজার্ভ করা ছিল কাজেই যাওয়ার কোন অসুবিধে হয় নি। গাড়ীর গার্ডটীও চমৎকার লোক ; বলে দিলেন যে যদি রিজার্ভ গাড়ীতে জায়গার অসুবিধে মনে হয় তাহ'লে কয়েকজন অন্য গাড়ীতে যেতে পারি। তবে তার প্রয়োজন হ'ল না কারণ অফিসার দু'জন এবং ডিভিসন্যাল সেক্রেটারী ইত্যাদি বড়রা অন্য গাড়ীতে ছিলেন। গাড়ী চ'লেছে ত চ'লেইছে—সকাল ৯টায় খেয়ে বেরিয়েছিলাম—বেলা ১২টা নাগাদ মনে হ'তে লাগল যে তিনদিন যেন উপবাসী আছি। সুবিধের কথা এই যে বাড়ী থেকে জনকুড়ি লোকের খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, কারণ জানি যে সঙ্গীরাও আছেন ত। যাই হোক খাওয়া-দাওয়া ত সেরে নিলাম এবং তদুপরি খড়্গপুরে চা ও কেক যোগও হ'ল।

রেলের টাইম-টেব্লে লেখা আছে যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার গিধ্নী পৌঁছয় বেলা সওয়া একটার সময়—কিন্তু বৃহৎ কর্ম্মে একটু আধটু ভুলচুক হয়ই। কাজেই আমাদের গাড়ী গিধ্নী পৌঁছুল বেলা তিনটের কিছু পরে। একজন সঙ্গী ব'ললেন—"দেখ এ B. N. R. অর্থাৎ Be Never Regular. অতএব দু'এক ঘণ্টা এদিক ওদিক ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।" (এখানে ব'লে রাখা ভাল যে Time Tableটী issue হ'য়েছে ইংরাজী ১লা এপ্রিল, কাজেই রেল কোম্পানী আমাদের এপ্রিল ফুল বানিয়েও থাকতে পারে)। যাই হোক এখানে গাড়ী থামে ১৫ মিনিট, কাজেই মালপত্র নামাতে কোন অসুবিধে হয় নি। আগে থেকে চিঠি দেওয়া ছিল ; ওখানকার জমীদার বাবু রাজেন্দ্রনাথ সৎপথী মহাশয় লোকজন নিয়ে স্বয়ং ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। একটা গরুর গাড়ী ক'রে মালপত্র সব আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হ'ল। একটা কথা

লেখক—শ্রীঅজিতকুমার সিংহ

এখানে ব'লে রাখি—বাংলো নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে, তবে আমরা সঙ্গে তাঁবু নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তাঁবুও খাটিয়েছিলাম। সব লোক তাঁবুতে ধরত না ব'লে বাংলো ঠিক করা হ'য়েছিল এবং তাঁবুতেও জনকতক থাকতেন, বাংলোতেও জনকতক থাকতেন। তাঁবু ফেলা হ'য়েছিল বাংলোর কম্পাউণ্ডেরই মাঠে।

Campএ গিয়ে দেখি যে রাজেনবাবু আমাদের জন্য কয়েক জালা খাবার জল তুলিয়ে রেখেছেন এবং খান পনের

চেয়ার ও পেতে বসবার জন্য একটা বিরাট সতরঞ্চিও আনিয়ে রেখেছেন। এখন আমাদের প্রথম কাজ হ'ল Tent pitch করা। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে কাজ সেরে ধড়াচূড়া ছাড়বার অনুমতি পেলাম। আর সে কি সোজা ব্যাপার—একেবারে full uniform অর্থাৎ বুট, পটি, প্যাণ্ট, সার্ট, টিউনিক, হেল্‌মেট, বেল্ট, পাউচ, ওয়াটার বট্‌ল্ ইত্যাদি। অর্ডার হ'ল—সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে ভাঁজ ক'রে রাখতে হবে এবং দিনেরবেলায় শুধু নিজের নিজের কম্বল মেজেয় পাতা থাকবে এবং তারই মাথার দিকে থাকবে সুটকেশ ও unifrom, কোন জিনিষ বাইরে প'ড়ে থাকবে না। তথাস্তু; লেগে যাওয়া গেল। কিন্তু ধন্য অফিসারদের—তাঁরা সেই প্রচণ্ড গরমেও তখুনি uniform ছাড়লেন না। আগে সব কদিনের duty sheet তৈরী

ডিভিসন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (ছড়ি হাতে), অ্যাম্বুলেন্স অফিসার ও মেম্বরগণ (চিলকীগড়ের পথে)

ক'রে নোটিশ এবং Camp Orders টাঙিয়ে দিয়ে তারপর তাঁরা বেশ পরিবর্ত্তন ক'রতে গেলেন। Noticeএ দেখলাম যে প্রথম দিন কোন Drill বা Parade নেই, কেবল রাতে চারজনের sentry duty এবং দু'জনের kitchen. আমরা একজন ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিলাম—যাদের kitchen duty প'ড়ত তারা শুধু ঠাকুরকে সাহায্য ক'রত—সেটা খুব শক্ত কাজ নয়, কেবল কুটনো কোটা এবং দরকার হ'লে দোকান থেকে কোন জিনিষপত্তর আনা। বাটনা বাটা এবং ষ্টেশনের কূয়ো থেকে জল আনার জন্য একজন চাকর রেখেছিলাম।

প্রথমদিন বিকেলবেলা কারুর কোন duty ছিল না; একটু বেড়াতে বেরোলাম। জায়গাটী বেশ লাগল; উঁচু নীচু পাথুরে জমি, চারিদিকেই শালবন। বড় রাস্তা একটী চিলকীগড়ের দিকে গিয়েছে—সে রাস্তাটীও সুন্দর, দু পাশে শালগাছ—আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা চ'লে গিয়েছে ঠিক ছবির মত; রাস্তার ধারে দু-একটী বাংলা—কোনটায় বা ফুলের গাছ ও লতা ফুলে লাল হ'য়ে গিয়েছে। যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই বাড়ীর সংখ্যা কমে এসে দু-পাশে কেবল জঙ্গল—আর মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তাটী কোথাও বা চড়াইএর মত উঁচুতে উঠেছে—কোথাও বা slope হ'য়ে নেমেছে। সন্ধ্যাবেলা ক্যাম্পে ফিরলাম।

প্রথমে একবার রোজকার Routineটা দেখে নিলাম এবং সেটা এখানে দিচ্ছি; কারণ তা থেকে শিবির-জীবনের একটা ধারণা পাওয়া যাবে। যদিও এ সময়টা দারুণ গ্রীষ্ম ব'লে দিনের খাটুনির পরিমাণটা কিছু কম ছিল।

Revellie—4-30 A. M.
Early Morning Parade—5-15 to 6 A. M.
Big Morning Parade—6-15 to 7-30 A. M.
Morning Tea and Tiffin—7-30 to 8 A. M.
Stretcher Drill—8 to 8-30 A. M.
First-aid Class—8-30 to 9-30 A. M.
Shaving Bathing etc—9.30 to 11 A. M.
Meal—11-30 A. M.
Rest—12 noon to 5 P. M.
Afternoon Tea and Tiffin—5 to 5-30 P. M.
Afternoon Parade—5 30 to 7 P. M.
Amusements—7 to 8-30 P. M.
Meal—9 P. M.
Lights out—10 P. M.

রাতে ১০টা থেকে ১টা ২ জন এবং ১টা থেকে ৪টা ২ জন sentry থাকত। শেষরাত্রে যাদের sentry duty থাকত তাদের আর morning parade join ক'রতে হ'ত না—তারা পরদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে kitchen duty ক'রত।

প্রথম রাত্রে রাত ১০টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত sentry duty ছিল শ্যামাপদ দাস ও নির্ম্মল ঘোষের। রাত ১২টা আন্দাজ সময় নির্ম্মল দেখলে যে একটী লোক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ হাঁক দিলে "Who comes there?" উত্তর এলো না; তখন হিন্দীতে "কোন্ হায়?" এবার উত্তর এলো "চৌকিদার হ্যায়।" নির্ম্মলের হিন্দীতে অসাধারণ দখল, সে ব'ললে

"অতি উত্তম হায়, কিন্তু তোম্ যদি চৌকিদার হায়—তবে হাঁক না দেকে অমন অন্ধকারমে খাড়া হায় কাহে ?" তখন চৌকিদার সাহেব বাংলা ধ'রলেন "আজ্ঞে এদিকে রোঁদে বেরিয়েছিলাম—আজ্ঞা।" এগিয়ে দেখা গেল লোকটা চৌকিদারই বটে। সেও চ'লে গেল sentry change এরও সময় হ'ল।

নদী, গিধনী

দ্বিতীয় দিন; যথারীতি Parade এবং Duty, উপরন্তু দুপুরবেলা camp songএর মহলা দেওয়া চ'লল। গানটী আমাদের Divisional Superintendent মহাশয়ের লেখা :—

আর্ত্তসেবকদল !
মৃত্যু যেখানে ঘনায় শিয়রে চল রে সেথায় চল।
আহত নরের মৃত্যু যাতনা
চিত্তে তোদের জাগাল চেতনা
মরণের সাথে যুদ্ধে মাতিতে চল রে ছুটিয়া চল।
আর্ত্তসেবকদল !
আসিছে যেথায় করাল মৃত্যু কৃষ্ণচরণ পাতে—
সেথায় তোদের পড়িয়াছে ডাক যুঝিতে তাহার সাথে।
তোদের আশার বাণীর সে রবে
মৃত্যু আজিকে পরাজিত হবে—
ফিরিয়া আসিবি জয় গৌরবে
চল্ রে ছুটিয়া চল্।
আর্ত্তসেবকদল !

বিকেলে খানিকক্ষণ parade করার পর খানিকটা route march করা হ'ল নদীর দিকে। নদীর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে disperse অর্ডার হ'ল। কিন্তু হুকুম রইল যে bugle প'ড়লেই fall in ক'রতে হবে। আমরা চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়লাম। কয়েকখানা ফটোও তুললাম। নদীতে জল সব জায়গায় নেই। তবে দেখেই বোঝা গেল যে বর্ষাকালে বেশ জল হয়, কারণ river bedটী গভীরও বটে চওড়াও বটে। পাড় খুব উঁচু। রাস্তাটা নদীটাকে আড়াআড়ি cross ক'রে গিয়েছে। কাজেই বোঝা গেল যে বর্ষায় নৌকা নইলে পার হওয়া কঠিন। নদীর দিকে দূরে কয়েকটা পাহাড় আছে; দেখলেই সঞ্জীববাবুর 'পালামৌ' মনে পড়ে অর্থাৎ মনে হয় কাছেই, কিন্তু কম সে কম ৭।৮ মাইল হবে। নদীর পাড়ের ওপর বড় বড় পাথরের চাঙড়াও রয়েছে। নদীটী খুব এঁকে-বেঁকে গিয়েছে—বড় সুন্দর দেখতে; সন্ধ্যা হ'য়ে আসছিল তবু খানতিনেক ফটো তুললাম। সুন্দর দৃশ্যটী দেখছি এমন সময়ে ভেঁপুর আওয়াজ—Bugler ভেঁপু ফুঁকছেন; কাব্যি-করা উঠল মাথায়—দে দৌড়ি—fall in ক'রলাম—তার পর to the camp—Quick March.

সন্ধ্যের সময় গানবাজনার আসর। অফিসাররাও চেয়ার নিয়ে বসলেন এবং বাহবা দিতে লাগলেন। এখন আমাদের দেখলে কে ব'লবে যে একঘণ্টা আগে আমরা

ক্যাম্প, গিধ্নী

তিন মাইল রাস্তা forced march ক'রে এসেছি এবং সারাটা দিন আমাদের ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা routine মাফিক চ'লতে হয়। গিধনীর অনেক ভদ্রলোকও প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের ক্যাম্পে আসতেন, কারণ এ সময়টা আমরা free থাকতাম।

পরদিন সকালে early morning paradeএর পর

route march ক'রলাম চিলকীগড়ের দিকে—এ রাস্তার বর্ণনা পূর্ব্বেই দিয়েছি। সুন্দর রাস্তা, march ক'রতে একটুও কষ্ট হয় না। মাইল দুই আড়াই যাওয়ার পর break up order পেলাম। দুদিকে দিগন্তপ্রসারী শালবন, ছোট ছোট ঝোপ, আর তার মাঝ দিয়ে চ'লে গিয়েছে রাস্তাটা। শালগাছগুলিতে নতুন পাতা গজিয়েছে, তার সবুজ রঙের বাহার কি! একটা সোঁদা গন্ধ আসছে কচি পাতার। আমাদের প্রায় সবাই চিরকাল সহরে আছি, আমাদের চোখে যে সে দৃশ্য কি সুন্দর লাগল তা ব'লে বোঝান যায় না। এক একটা দল বেঁধে জঙ্গলে ঢুকে প'ড়লাম—অর্ডার রইল সেই fall in at Bugle call.

জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চ'লেছি; কত রকমের গাছ, কত রকমের ফুল, কত রকমের পাখী। এ যেন এক নূতন

শালবন, গিধ্নী

রাজ্য; এর সঙ্গে হয়ত আমাদের ভাল পরিচয় নেই কিন্তু সেই জন্যই বোধ হয় এত ভাল লাগছিল। আশ্চর্য্য হ'লাম—লাল কাঁকুরে মাটী—পাথর ব'ললেই হয়, তার মাঝে এত রস কোথায় পেলে এই নবদম্পতির দল। থাক Bugle প'ড়তেই ফের রাস্তায় এসে fall in করলাম। Officerএর অর্ডার নিয়ে আমাদের জনকতককে দাঁড় করিয়ে একটা ফটোও তুললাম। তারপর ফের মার্চ্চ ক'রে ফেরা। তখন বেশ রোদ উঠেছে। ষ্টেশনের কাছ বরাবর এসে ডিভিসন্তাল সেক্রেটারী মশায় দুটো কুমড়ো কিনলেন—আমাদেরই ভোগের জন্য। ক্যাম্পে পৌছে দেখি যে মাংসওয়ালা মাংস দিয়ে গিয়েছে; কাজেই কুষ্মাণ্ডযুগল পরের দিনের জন্য তোলা রইল। আমরা সকলে চিলকীগড়ের রাজা বাহাদুরকে (ইনি ধলভূমগড়েরও রাজা) একখানি পত্র দিয়েছিলাম; তারই উত্তর নিয়ে একজন লোক এসেছিল। তিনি লিখেছেন যে তিনি একদিন আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন ক'রতে আসবেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মশায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একখানি চিঠি দিলেন। এখানে রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার। এঁর পুরো নাম রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র ধবলদেব। ইনি চিলকিগড় এবং ধলভূমগড় উভয় রাজ্যেরই রাজা। রাজা বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং জনপ্রিয়। যে কোন লোককেই জিজ্ঞাসা ক'রেছি তিনি ব'লেছেন "রাজা বাহাদুর অতি সজ্জন—এরকম লোক অতি অল্পই দেখা যায়।"

দিনের বেলা সেই Routine; সন্ধ্যাবেলা amusementএর আসর। আমাদের সঙ্গে ছিলেন জিতেনবাবু (শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)—কমিক গান, ক্যারিকেচার ইত্যাদিতে অদ্বিতীয় আর্টিষ্ট। শুধু তাঁর কমিক শোনবার জন্য গিধনির যত ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলা আসতেন আমাদের ক্যাম্পে। এ প্রসঙ্গে গিধ্নীর একজন ভদ্রলোকের কথা লিখব; তিনি হ'চ্ছেন Captain Kar I. M. S. হিজলী ডেটিনিউ ক্যাম্পের মেডিক্যাল অফিসার। ইনি প্রায়ই আমাদের ক্যাম্পে আসতেন এবং তাঁর শিবির জীবনের ঘটনা ব'লতেন। গিধনীতে এঁর নিজের বাড়ী আছে এবং ছুটী পেলেই এখানে চ'লে আসেন। কাজেই এঁকে গিধ্নীর স্থায়ী বাসিন্দাই বলা চলে।

চতুর্থ দিন—আজ বাংলা বছরের শেষদিন; সকালের প্যারেড্ থেকে একটু শীগ্গির ছুটী পেলাম এবং permission নিয়ে শীকারে যাওয়া গেল। গিধনীর দু একজন ভদ্রলোকও বন্দুক নিয়ে সঙ্গে চ'ললেন। কিন্তু কোন পশুপক্ষীই শীকার হ'তে স্বীকৃত হ'ল না—কাজেই গোটা কয়েক ঘুঘু স্নাইপ এবং বক ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। শীকার থেকে ফিরলাম বেলা ১১টায়। তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত; প্রত্যেকেরই সঙ্গে ওয়াটার বট্ল্ ছিল কিন্তু রোদে সে hot water bottle হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—খায় কার সাধ্য—সে জলে চা করা যেতে পারে বটে। যাই হোক ফিরে এসে জিরিয়ে নিয়ে যথাপূর্ব্বং routine, কেবল রাত্রি ১১টার সময় বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে একবার gun fire করা হোল এবং Bugle দেওয়া হ'ল।

পঞ্চম দিন; সকালে Bengali New Years Day

Parade, Flag Saluting ইত্যাদি হ'ল। আজকে রাজা বাহাদুরের আসবার কথা ছিল; কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি পেরে উঠলেন না। আজ আমাদের ক্যাম্পের শেষ দিন। ফেরার কথা মনে হ'তেই যেন কষ্টবোধ হ'তে লাগল। হায়রে মানুষের মন—দুদিনের পান্থশালাকেই মনে করে ঘর—দুদিনের পরিচয়েই জেগে ওঠে আত্মীয়তা। আজ দুপুরে ক্যাম্পের সামনের মাঠের দিকে চেয়ে মনটা যেন উদাস হ'য়ে গেল। আমাদের পিছনে শালবন, সামনে ধূধূ ক'রছে মাঠ। ধরিত্রী যেন বৈরাগীর উত্তরীয় গায়ে দিয়েছে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে পৃথিবীর এই রুক্ষমূর্ত্তি মনের ওপর একটা গভীর রেখাপাত ক'রলে।

বিদায় নেবার আগে কয়েকটা কথা বলি। এই ক্যাম্পের একটা বিশেষ উপকারিতা আছে। এতে মানুষ স্বাবলম্বী, সময়ানুবর্ত্তী এবং সবচেয়ে বড় কথা নিয়মানুবর্ত্তী হয়। এইত ক্যাম্পে অনেকেই ছিলেন যাঁরা বাড়ীতে নিজের জুতোর ফিতে বেঁধে নেন না, তাঁদেরও নিজেদের বাসন মাজতে, বিছানা করে নিতে এবং জুতো ঝেড়ে নিতে দেখেছি। বাড়ীতে যার যখন খাওয়া বা শোওয়া অভ্যাস হোক না কেন, ক্যাম্পে এসে সকলকেই ক্যাম্পের নিয়মমাফিক চ'লতে হ'য়েছে। আমাদের সঙ্গে অফিসার ছিলেন দুজন—Divisional Superintedent Mr. T. P. Chatterji এবং First Ambulance Officer Mr. R, K. Sinha. আর N. C. O ছিলেন Mr. B. B. Chatterji, Divisional Secretary. এঁরা discipline বজায় রাখতে খুব কড়া ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সুখ সুবিধার দিকে এঁদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল; এঁরাও নিজেদের কাজ সমস্তই নিজ হাতে ক'রতেন এবং আমাদের আরামের দিকে সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। আর গিধ্নীর জমীদার রাজেনবাবুর কথা গোড়াতেই ব'লেছি। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাই না—এত করেছেন তিনি আমাদের জন্যে।

স্নানের ঘাট, গিধনী

যাই হোক আজও যথাসময়ে Afternoon Parade হ'ল এবং রাতের ট্রেণে যেতে হবে ব'লে সবাই packing সুরু ক'রে দিলাম। ফেরবার সময়ও গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল—কষ্ট কিছুই হয়নি। Bugleএ last post বাজিয়ে গাড়ীতে উঠলাম এবং সমস্বরে ব'ললাম—Good Bye Gidni.

দ্বৈরথ

"বনফুল"

৭

সেদিন উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে যখন ফিরিলেন তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চন্দ্রকান্তের বাগার আলাপ শুনিয়া অবধি তাঁহার সর্ব্বশরীরে আগুন ছুটিতেছিল। দাবা-খেলায় যদিও তিনি জিতিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্রোধ কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার সাধের গাভীকে যে চন্দ্রকান্তই চক্রান্ত করিয়া সরাইয়াছেন তাহাতে উগ্রমোহনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাগার গাভীকে অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বাহার রাগের আলাপ শুনাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল তাহা উগ্রমোহনের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর তিনি যখন পালকি হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার সমস্ত মন তিক্ত।

মৃন্ময়-ঠাকুরের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় আকাশপটে চন্দ্রের পার্শ্বে স্বাতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে যে কোমলতার সঞ্চার হইয়াছিল এবং যাহার ফলে তিনি চাবুক চালনা করিয়া অশ্বের গতিবেগ বাড়াইয়াছিলেন চন্দ্রকান্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা লোপ পাইয়াছে। দারুণ ক্রোধে তখন তাঁহার সমস্ত অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল। চন্দ্রকান্ত এবং চন্দ্রকান্তের সম্পর্কে যে কেহ আছে সকলকে আঘাত করিলে তবে যেন তিনি কতকটা শান্তি পাইবেন—মনের এই অবস্থা।

তিনি বাড়ী ফিরিতেই তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ আসিয়া নিবেদন করিল যে অন্দরমহল হইতে রাণী-মা তাঁহার সম্বন্ধে বারম্বার খোঁজ করিয়াছেন।

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন রাণী বহ্নিকুমারী তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়া এস্রাজ আলাপ করিতেছেন—সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে। এস্রাজ দেখিয়া উগ্রমোহনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না—শুধু ভ্রূকুটি করিলেন। বহ্নিকুমারী এস্রাজ সরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আজ ঋতু-সংহার-এর কথা মনে হচ্ছিল—প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ—। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া পাগড়িটা নামাইয়া রাখিলেন এবং বহ্নিকুমারীর সম্মুখে বসিলেন। এস্রাজটার দিকে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া বহ্নিকুমারী বলিলেন—"একখানা দেশের গান বাজাচ্ছিলাম অনেক দিন পরে। শুনবে? গানটা হচ্ছে—

বৈরন কোয়লিয়া কুহুক ঘরি ঘরি কুহুক"

বলিয়া তিনি বাজাইতে উদ্যত হইলে উগ্রমোহন বলিলেন—"দেখি তোমার যন্তরটা—"

এস্রাজটা বহ্নিকুমারী উগ্রমোহনের হাতে দিতেই উগ্রমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া সেটা বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সংক্ষেপে বলিলেন—"আমি আজ নীচের ঘরে শোব। কোন দরকার আছে কি?"

বহ্নিকুমারী কিছু বলিলেন না। কিন্তু শুধু চাহিয়া রহিলেন।

উগ্রমোহন কিন্তু আবার কথা কহিলেন। বলিলেন—"গান গায় পাখীতে—মানুষে নয়।"

বহ্নিকুমারী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন—"তোমার গায়ে বেশ জোর আছে ত!"—তাঁহার চক্ষু দুইটিতে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন।

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন—নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু শয়ন করিলেন না। শয়নকক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি পদচারণা

করিতে লাগিলেন—তাঁহার মনে এক চিন্তা—চন্দ্রকান্তকে সমুচিত একটা জবাব দিতে হইবে।

•

একা অন্ধকার রজনীতে নির্জ্জন শয়নকক্ষে উগ্রমোহন সিংহ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কত কথা মনে হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়া দেওয়া কি এতই শক্ত ব্যাপার? সেদিন চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনের একটা জলকর লুণ্ঠন করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত কি মনে করেন যে উগ্রমোহন তাহা পারেন না? মাছগুলা আবার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইদিনই উগ্রমোহনের ইচ্ছা হইয়াছিল যে চন্দ্রকান্তের সমস্ত জলকরগুলা নির্ম্মমভাবে বিধ্বস্ত করেন—কিন্তু কেন জানি না তাঁহার সে প্রবৃত্তি বেশীক্ষণ থাকে নাই। তাহার কারণ বোধহয় রাত্রে লুকাইয়া লুঠ করা তিনি চৌর্য্যবৃত্তি মনে করিতেন। উগ্রমোহন সিংহ আর যাই হউক তস্কর নহেন। যদি কাহারও কোন জিনিস কাড়িয়া আনিতেই হয় তাহা অন্ধকারে লুকাইয়া লইয়া আসাটা পুরুষোচিত নহে। যদি লইতেই হয় দিবালোকে ছিনাইয়া লইতে হইবে—তাহাতে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে। ইহাই তিনি চন্দ্রকান্তকে দেখাইয়া দিতেন—কিন্তু রুম্‌নি ঝুম্‌নি-ব্যাপারে তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে তিনি এদিকে আর মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই। কিন্তু আজ এই বাহার-অপহরণের ব্যাপারটা—বিশেষ করিয়া বাহারের আলাপটা তাঁহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। ইহার একটা রীতিমত প্রতিবিধান না করিলে উগ্রমোহন সিংহ পাগল হইয়া যাইবেন!

কি করা যায়!—উগ্রমোহন গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। কিন্তু কোন কিছুই মনোমত উপায় মনে আসিতেছে না। আস্তাবল হইতে চন্দ্রকান্তের ঘোড়াগুলি সরাইয়া দিবেন? প্রস্তাবটা মনে হইতেই উগ্রমোহনের সমস্ত অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ছি, ছি, ঘোড়া চুরি! চন্দ্রকান্ত গরু-চুরি করিতে পারে—কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

পায়চারি করিতে করিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সহসা উগ্রমোহন দাঁড়াইয়া পড়িলেন! ঠিক ত! এ কথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একগোছা চাবি বাহির করিলেন। আলোর নিকট লইয়া গিয়া সেই চাবির গোছা হইতে মরিচা-পড়া একটা চাবি বাছিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর যাইতেই একজন দীর্ঘকায় আসাসোটাধারী লোক আসিয়া উগ্রমোহনকে আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিল। হাবেলীর নৈশ-প্রহরী। উগ্রমোহন তাহাকে লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সিধা অন্দর মহলের দেউড়ী পার হইয়া খাজাঞ্চিখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। খাজাঞ্চিখানার তোরণেও একজন বন্দুকধারী পাহারা ছিল। এই অসময়ে প্রভুকে দেখিয়া সে সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! উগ্রমোহন খাজাঞ্চিখানার দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। তিনি বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে একটা আলো আনিতে বলিলেন। আলো আসিলে উগ্রমোহন ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। বিস্মিত প্রহরী প্রভুর এই অদ্ভুত আচরণে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ঘণ্টাঘরে টং করিয়া একটা বাজিল।

উগ্রমোহন ভিতরে গিয়া বড় লোহার সিন্দুকটা খুলিলেন। সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা বড় গোছের ক্যাশ-বাক্স বাহির করিয়া নিকটস্থ তক্তাপোষের উপর রাখিলেন। তৎপরে ক্যাশ-বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা রূপার ছোট বাক্স বাহির করিলেন। রূপার বাক্সটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উগ্রমোহন সিংহ সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। গোলাপী রঙের একখানি কাগজ। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মন নিমেষের মধ্যে দশ বৎসর পার হইয়া অতীতে ফিরিয়া গেল। তখন চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের সবে যৌবন-উন্মেষ হইয়াছে। চিঠি পড়িতে পড়িতে উগ্রমোহন যেন রেশমকে দেখিতে পাইলেন। আজ উগ্রমোহন সিংহ রেশমকে ভুলিয়াছেন বটে কিন্তু একদিন এই রেশমের স্বপ্ন উগ্রমোহনের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া উগ্রমোহনের সমস্ত মুখ-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পত্রখানি সযত্নে মেরজায়ের পকেটে রক্ষা করিয়া তিনি রূপার বাক্স ক্যাশবাক্সের মধ্যে এবং ক্যাশ বাক্সটি লৌহ সিন্দুকে পুনরায় রাখিয়া সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং খাজাঞ্চিখানার দ্বারদেশে যথারীতি

তালা লাগাইয়া আবার নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। অজানা ফুলের গন্ধ বহিয়া তীব্র শীতের বাতাস তখন অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়ার শাখা প্রশাখায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন শয়ন-কক্ষে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ভিন্ন-মূর্ত্তিতে! তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রিয়া রেশমও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের বাসন্তী-কুঞ্জে আবার পিক কুহরিয়া উঠিল।

এই গভীর নিশীথে উগ্রমোহনের মানস-পটে ছায়া-ছবির মত কত কি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কে বলে অতীত মৃত? অতীত চিরঞ্জীব। অতীতের প্রাণ-রসের অমৃত ধারা পান করিয়া নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বর্ত্তমান বাঁচিয়া আছে। পরিবর্ত্তনের দাবী মিটাইতে গিয়া বর্ত্তমান মুমূর্ষু। স্মৃতির সুধা পান করিয়া অতীত অমরত্ব লাভ করিয়াছে—তাহার মৃত্যু নাই।

উগ্রমোহন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রেশম কি আজও বাঁচিয়া আছে? বর্ত্তমানে রেশম বলিয়া হয়ত কেহ বাঁচিয়া নাই—কিন্তু অতীতের রেশম যে জীবন্ত। হাসিতে গেলে তাহার গালে যে টোল খাইয়া যাইত—সেটুকু পর্য্যন্ত এখনও বাঁচিয়া আছে। চলিয়া যাইবার দিন রেশম যে কাঁদিয়াছিল তাহার সেই অশ্রুধারা এখনও ত শুকায় নাই। তাহার সাবলীল নৃত্যভঙ্গীর নূপুর-গুঞ্জন এখনও যে উগ্র-মোহনের অন্তরলোকে গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে। সবিস্ময়ে উগ্রমোহন দেখিলেন নানা বেশে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে রেশম বাইজি আজিও তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন লোকে বিরাজ করিতেছিল—সহসা কোন যাদুমন্ত্রে বর্ত্তমানের যবনিকা সরিয়া গেল—রেশম বাইজি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে সেই মৃদু হাসি, সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া সেই সবুজ ওড়না, সুর্মা মাখান ডাগর চোখ দুটিতে সেই রহস্যাভাস, অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যচটুল সেই লীলাভঙ্গী। মুগ্ধ উগ্রমোহন তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। মনে পড়িল গভীর রাত্রে অশ্বারোহণে সেই উন্মুখ অভিসার! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সুগোপন প্রত্যাবর্ত্তন।

কিন্তু রেশম থাকে নাই। ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল—উগ্রমোহনের সমস্ত কল্পনা ও স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া। বহুকাল পরে আজ আবার সে ফিরিয়াছে। উগ্রমোহন একদৃষ্টে গোলাপী কাগজটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা মৃদু হাস্য তাঁহার অধরে ফুটিয়া উঠিল। সচ্চরিত্র চন্দ্রকান্তের চরিত্র-সৌরভে আজিও সকলে পুলকিত!

রেশম যেদিন চলিয়া যায় সেদিন এই পত্রখানি উগ্র-মোহনকে দিয়া গিয়াছিল। তাহার হাতের স্পর্শ এখনও যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। রেশমের মিনতিভরা চোখ দুটি মনে পড়িল—"ইহা লইয়া তোমরা দুজনে ঝগড়া করিও না। আমার অনুরোধ—"বলিয়া সে এই পত্র উগ্রমোহনের হস্তে দিয়াছিল। উর্দ্দুতে লেখা চন্দ্রকান্তের পত্র। প্রেম-পত্র। একটি আতর-সুগন্ধী গোলাপী কাগজে কবিত্বময় ভাবে ও ভাষায় চন্দ্রকান্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রেশমকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে। পত্রের মধ্যে একটি ফার্সি বয়েৎও রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছে—"হে সুন্দরি, কাননে গোলাপ ফোটে—সে কি কেবল একটি ভ্রমরের জন্য? পূর্ণিমার অপরূপ জ্যোৎস্না কি একটি চকোরের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাহা যদি হইত তাহা হইলে বিরহী অলিগণের উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে গোলাপ শুকাইয়া যাইত—হতাশ চকোরদের বিরহের কৃষ্ণ মেঘে উন্মনা অবলুপ্ত হইত। যাহা অনবদ্য, যাহা অসাধারণ—তাহা সকলের জন্য। আমার অন্তর পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ অন্তরের সমস্তটা উজাড় করিয়া না দিলে তৃপ্তি পাইতেছি না। তুমি এস। সর্ব্বদা তোমার জন্য উন্মুখ আগ্রহে বসিয়া আছি। সম্রাট শাহজাহানের রচিত একটি বয়েৎ মনে পড়িতেছে—

আগর বে-খবর-ম্ জুদ্ দর আয়ি, চে শাওয়াদ?
মানন্দ্-এ-নছীম্ এ সহর আয়ি, চে শাওয়াদ?
হর-চন্দ কে বু-এ-গুল জে গুল্ আয়েদ পেশ
আর গুল্ তু জে-বু পেশতর, আয়ি, চে শাওয়াদ্?

প্রভাত সমীরণের মত তুমি কোন খবর না দিয়াই এস। ফুলের গন্ধ ফুলের আগে আগে যায় বটে—কিন্তু ফুলই যদি আগে আসে তাহাতে ক্ষতি কি?"

বিদায়কালে রেশমের চক্ষে যে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতে-ছিল তাহা যেন উগ্রমোহন এখনও দেখিতে পাইতেছেন।

চন্দ্রকান্তের পত্র পাইয়াই রেশম চলিয়া গিয়াছিল—আর সে ফিরিয়া আসে নাই। রেশমের বিরহে উগ্রমোহন দশ দিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। এই চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তখন কলহ করার প্রবৃত্তি তাহার হয় নাই। তাহার পর দশ বৎসর ধরিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে—কত ঘূর্ণাবর্ত্ত কত কি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—উগ্রমোহন রেশমকে ভুলিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের এই পত্র এতদিন উগ্রমোহনের কাছেই সযত্নে রক্ষিত ছিল। আজ সহসা উগ্রমোহনের এই পত্রখানার কথা মনে পড়িয়াছে। ঠিক করিয়াছেন পত্রখানাকে এইবার কাজে লাগাইবেন। পত্রখানা প্রকাশ করিয়া দিলে চন্দ্রকান্তের সম্মানের প্রভূত ক্ষতি উগ্রমোহন করিতে পারেন। কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ সিংহই—শৃগাল নহেন। তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

তুমি একদা রেশমকে যে প্রণয় লিপি লিখিয়াছিলে তাহা এতদিন আমার কাছেই ছিল। পুরাতন বাক্স খুলিয়া অদ্য তাহা বাহির করিলাম। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা লইয়া আমি ও রেশম বহু হাসাহাসি করিয়াছি। এখন আর ইহাতে হাসিবার কিছু নাই। তাহা ছাড়া তোমার উচ্ছ্বাস তোমার বাক্সে থাকাই শোভন বিবেচনা করি।

উগ্রমোহন—

শিলমোহর করিয়া পত্রটি নৈশপ্রহরীর হস্তে দিয়া আদেশ করিলেন—"খুব ভোরেই চিঠিখানি চন্দ্রকান্তবাবুকে দিয়া আসা চাই।"

তাহার পর উগ্রমোহন খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সামনের বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রেশমের কথা, রেশমের মুখ, রেশমের ভঙ্গিমা বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। কত কথাই না মনে হইল! রেশমের খোঁজ পান নাই। কলিকাতার সেই একমাস প্রবাসের কথা মনে করিয়া উগ্রমোহনের সর্ব্বদেহ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল! এলোমেলো নানা চিন্তা মনে আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ একাকী পদচারণা করিয়া যখন তিনি শুইতে যাইবেন তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া আছে—রেশম নয়, রাণী বহ্নিকুমারী। উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিতে সহাস্য কৌতুক-দীপ্তি।

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—চাঁদ অস্ত যাইতেছে। স্বাতী পাশটিতেই আছে।

পরদিন প্রভাতে ভৃত্য ব্রজলাল প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিয়া দেখিল যে উগ্রমোহন অঘোরে ঘুমাইতেছেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একটি ভাঙা এস্রাজ রহিয়াছে।

সে আর ঘুম ভাঙাইতে সাহস করিল না।

৮

বেলা প্রায় দশটার সময় উগ্রমোহন সিংহ বহির্ব্বাটিতে আসিয়া বসিলেন। মন বেশ প্রসন্ন। দুইজন প্রজার খাজনা মাপ করিয়াছেন। আর একজন প্রজা তাহার করুণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিয়াছে—তিনি সহানুভূতির সহিতই তাহা শুনিতেছেন। প্রজাটি বলিতেছিল যে শীঘ্রই তাহার কন্যার বিবাহ হইবে। হাতে টাকা কম—ফসলও যে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে তাহা নয়। তাহা ছাড়া সম্প্রতি বাজার এমন মন্দা পড়িয়া গিয়াছে যে ষোল-আনা ফসল হইলেও কোন-ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিতে পারে। এ অবস্থায় হুজুর দয়া না করিলে উপায় নাই।

উগ্রমোহন সট্কায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া বলিলেন, "কবে তোর মেয়ের বিয়ে?"

"আর দিন কই হুজুর—!"

"আমাকে নেমন্তন্ন করবি না!"

দরিদ্র প্রজা একটু থতমত খাইয়া গেল। "না" বলিতেও তাহার সাহসে কুলায় না—অথচ উগ্রমোহন সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে কি খাইতে দিবে—কোথায় বসিতে দিবে তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল—"গরীবের কুঁড়ে ঘরে হুজুরের পায়ের ধূলো যদি পড়ে—সে ত আমাদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য! নিমন্ত্রণ নিশ্চয় কোরব! করব কেন—করলাম, যাবেন দয়া করে।"

"কবে তোর মেয়ের বিয়ে? কোন তারিখে?"

"২৩শে মাঘ—"

তারিখটা শুনিয়াই তাঁহার ঝুমনি ঝুম্‌নির কথা স্মরণ হইল।

দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেওয়ানজি—গঙ্গা-গোবিন্দ বাড়ীতে আছে কিনা—একবার খবর নিন্ ত!"

তাহার পর প্রজাটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা,—তোর খাজনা কিছু মাপ করে দিলাম। বকেয়া বাকী যা আছে তা আর দিতে হবে না। হালের বা বাকী পড়েছে—তাই দিলেই ফারক্ পাবি। ওহে অক্ষয়—"

অক্ষয় নামক গোমস্তাটি আসিয়া দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন—"এর মেয়ের বিয়ের দিন আধমণ দই—আর আধমণ মাছ এর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। তার সঙ্গে একজোড়া ভাল শাঁখা, রূপার সিঁদুর কৌটা—ভাল একখানা সাড়ী, কিছু ধান আর দুর্ব্বা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিও। নানাকাজে আমি ভুলে যেতে পারি।"

এমন সময় একজন সিপাহী আসিল। চন্দ্রকান্তের সিপাহী। সেলাম করিয়া একখানি পত্র সে উগ্রমোহনের হস্তে দিল।

পত্র খুলিয়া উগ্রমোহন পড়িলেন—

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া পরম সুখী হইলাম। তোমার যে এমন সূক্ষ্ম রসবোধ এখনও আছে তা বুঝিতে পারিয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি। কিছুদিন পরে সেতারী মীর সাহেবের আসিবার কথা আছে। লক্ষ্নৌ হইতে একজন ভাল নর্ত্তকীও আনাইব মনঃস্থ করিয়াছি। পুরাতন প্রসঙ্গ আবার আলোচনা করিবে না কি? ভাল কথা—সেবার কলিকাতায় গিয়া রক্তদুষ্টির জন্য চিকিৎসাদি করিয়াছিলে বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার ব্যবস্থাপত্রগুলি কি করিয়া আমার বাক্সে স্থান পাইয়াছে। এগুলি তোমারই কাছে থাকা সঙ্গত মনে করিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম—

—চন্দ্রকান্ত।"

পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যদিও তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যমুখে সিপাহীটিকে বলিলেন—"আচ্ছা যাও—বাবুজীকো হামারা সেলাম কহ না—" কিন্তু তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আত্মসংবরণ করিয়া সেখানে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি খাস-কামরার মধ্যে চলিয়া গেলেন। ক্রোধে ক্ষোভে আবার তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল! কলিকাতা প্রবাসের কথা তাঁহার মনে পড়িল। যৌবনের উন্মাদনায়, রেশমের বিরহে—হয়ত বা—নাঃ—এতদিন পরে কার্য্যকারণের পারম্পর্য্য ঠিকমত আলোচনা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপিয়া কলিকাতার একটা বীভৎস স্মৃতি পচা পাঁকের মত ভট্‌ভট্‌ করিতে লাগিল। তাহা কেবল পাঁকই—পঙ্কজ সেখানে নাই। দুঃসহ গ্লানিকর পাঁক! উন্মত্ত আবেগে উগ্রমোহন একদা সেই পঙ্কস্নান করিয়াছিলেন। তাহার ফলভোগও করিয়াছিলেন—অত্যন্ত মোটা রকম দক্ষিণা দিয়া প্রায়শ্চিত্তও তিনি করিয়া আসিয়াছেন। এতদিন সেজন্য তাহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। দুর্দ্দান্ত যৌবনের ক্ষুধিত কামনা মিটাইতে গিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন—তাহাতে অপুরুষোচিত বা কাপুরুষোচিত কিছু ছিল না। প্রথমে যখন ঘোড়া চড়া শিখিতে যান—তখনও ত পড়িয়া গিয়া কতবার কত আঘাত পাইয়াছেন। শূকর শিকার করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে একটা মানুষকেই তিনি একবার গুলি করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা প্রবাসের দুষ্কৃতিগুলিও অনুরূপ ঘটনা।

কিন্তু আজ সহসা এই ব্যবস্থাপত্রগুলি চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে পাইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিল। তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা-পত্র চন্দ্রকান্ত পাইল কি করিয়া! নিষ্ফল আক্রোশে উগ্রমোহন ফুলিতে লাগিলেন। এমন সময় গলার মৃদু আওয়াজ করিয়া কে যেন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল মনে হইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল—কে?

"আজ্ঞে হুজুর আমি"—বলিয়া একটি খর্ব্বাকৃতি লোক দ্বারদেশে দেখা দিল এবং অতিশয় ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

"ও, মাণিক মণ্ডল! কি, খবর? এস, ভিতরে এস।"

মাণিক মণ্ডল লোকটিকে উগ্রমোহন একটু অনুগ্রহ করেন। তাহার কারণ মাণিক মণ্ডল তাঁহার গুপ্তচর। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'স্পাই'। এ খবর অবশ্য বাহিরের লোকে জানে না।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন নূতন খবর আছে না কি?" মাণিক মণ্ডলের সহিত যদি কোন পশুর সাদৃশ্য থাকে তবে তাহা মুষিকের। ক্ষুদ্র সূচালো মুখ। নাকটি ছোট—কিন্তু তীক্ষ্ণ। চক্ষু দুটিও অত্যন্ত

ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত চঞ্চল। উগ্রমোহনের কথায় সে পীতাভ একপাটি দাঁত বাহির করিয়া কহিল—"নূতন খবরটা কি হুজুরের এখনও কর্ণগোচর হয় নি? আমি কয়দিন একটু অসুস্থ ছিলাম বলে—"

অধীরভাবে উগ্রমোহন বলিলেন—"ভনিতা রাখো—। খবরটা কি তাই সোজা করে বল।"

"গোলক সা চন্দ্রকান্তবাবুর জমিদারীতে উঠে গিয়ে বাস করছে।"

"তাই না কি? চন্দ্রকান্তকে টাকা ধার দিয়েছে, জানো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—জানি বৈ কি। রাধিকামোহন এসে টাকা নিয়ে গেছে সে খবরও আমি পেয়েছি।"

"গোলক সা—কোথায় আছে এখন?"

"পীরপুরে। চন্দ্রকান্ত বাবুরই একটা বাসা ছিল—"

"রাখালবাবু—" উগ্রমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

গতিক খারাপ দেখিয়া মাণিক মণ্ডল কথা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়াই ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালবাবু আসিতেই উগ্রমোহন বলিলেন—"যম-জঙ্গলে এখন কত সিপাহী মোতায়েন আছে?"

"পঞ্চাশ জন—"

"এখানে এখন কতজন আছে—"

"এখানেও জনা পঞ্চাশেক হবে।"

"ঢুধনাথ পাঁড়েকে ডেকে দিন।"

রাখালবাবু চলিয়া গেলেন। উগ্রমোহন চক্ষু বুজিয়া খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। ঢুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন হুকুম দিলেন—"কাল সকালে—বিশ-পঁচিশ জন সিপাহী নিয়ে চন্দ্রকান্তবাবুর জলকর বাঘাড় বিল—লুট করা চাই। খুন জখম যা হয় কুছ পরোয়া নেই! গায়ে পড়ে ঝগড়া করে ফৌজদারী দাঙ্গা হাঙ্গামা করবে। মোট কথা—বাঘাড় বিলে কাল রক্তের স্রোত বয়ে যাওয়া চাই!"

"যো হুকুম—" বলিয়া ঢুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেল। ঢুধনাথ পাঁড়ের একখানি হাত নাই। জমিদারী ব্যাপারে কিছুদিন পূর্ব্বে চন্দ্রকান্ত রায়ের সহিত উগ্রমোহনের ভীষণ দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় ঢুধনাথ পাঁড়ের দক্ষিণ হস্তটি কাটা যায় এবং সেই দাঙ্গাতেই স্বয়ং উগ্রমোহন একটি দাঁতাল হাতীর দাঁতে বড় বড় দুইটি বাঁশ বাঁধিয়া ডাণ্ডস্ মারিতে মারিতে সেই বিপুলকায় হস্তীকে চন্দ্রকান্তের বাহিনীর বিরুদ্ধে চালিত করিয়া যুদ্ধজয় করেন। ঢুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দিয়া অন্দর মহলের দিকে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

ভগ্ন দেউল

শ্রীসতী দেবী

ভগ্ন দেউল দেবতা বিহীন, রয়েছি দাঁড়ায়ে একা,
কতকাল গেছে পড়েনি নয়নে, সন্ধ্যা-দীপের শিখা,
একাকী র'য়েছি, ভাঙ্গা এ দেউল,
বেদনার সাথী, কাননের ফুল,
লতার আড়ালে দেহখানি মোর, বুকের বেদনা ঢাকা,
কতকাল হায়, দুয়ারে জ্বলেনি, সন্ধ্যা-দীপের শিখা।

একদা যখন দেবতা ছিলেন, বক্ষ করিয়া আলো,
সাঁঝের দীপেতে আঙ্গিনা ভরা, ছিল না কোথাও কালো,
বধূরা আসিত, নূপুর বাজায়ে,
পূজার ফুলেতে, থালাটী সাজায়ে,
শঙ্খ বাজিত শঙ্কা-হরণ, দেবতারও চোখে আলো,
চির-পূর্ণিমা অঙ্গনে মোর, ছিল না কোথাও কালো।

ভাগ্য বিধানে পূজা অবহেলে, দেবতা হ'লেন ক্রুদ্ধ,
ইষ্ট-বিহীন দেউলের দ্বার, সেই হ'তে হ'ল রুদ্ধ,
জড়ের বেদনা বোঝে না দেবতা,
একা ভাবি আজো, অতীতের গাথা,
জাহ্নবী জলে কলুষ নাশিয়া, কে করিবে পুনঃ শুদ্ধ?
তারি পথ-চেয়ে ভগ্ন দেউল দুয়ার র'য়েছে রুদ্ধ।

গান

শিবমত ভৈরব—ঢিমে-তেতালা *

আঁধার-ভীত-এ চিত যাচে মাগো আলো আলো।
বিশ্ব-বিধাত্রী আলোক-দাত্রী নিরাশ-পরাণে আশার সবিতা
জ্বালো জ্বালো ॥
হারায়েছি পথ গভীর তিমিরে,
লহ হাত ধ'রে প্রভাতের তীরে,
পাপ-তাপ মুছি কর মাগো শুচি,
আশিষ-অমৃত ঢালো ঢালো ॥
দশ-প্রহরণ-ধারিণী দুর্গতি-হারিণী দুর্গে
অগতির গতি,
সিদ্ধি-বিধায়িনী দনুজ-দলনী।
বাহুতে দাও মা শকতি।
তন্দ্রা ভুলিয়া যেন মোরা জাগি—
এবার প্রবল মৃত্যুর লাগি',
রুদ্র-দাহনে ক্ষুদ্রতা দহ,
বিনাশ গ্লানির কালো ॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম **স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক**

\+
[সণা]
৩
II দণা দা দা -া দা -া দণা পা | পা -া পা -া পদা মা মা -া |
আঁ॰ ॰ ধা ॰ র ॰ ভী॰ ॰ ত ॰ এ ॰ চি॰ ॰ ত •
০ ১
| জ্ঞা -া মা -া মঋা -া সা -া | সঋা -জ্ঞমা মসা -া সঋা -জ্ঞমা মসা -া I
যা ॰ চে ॰ মা ॰ গো ॰ আ॰ ॰ ॰ লো ॰ আ॰ ॰ ॰ লো ॰

* গান খানি ধ্রুপদাঙ্গ—ঢিমা চালে গাহিতে হইবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীগণের সুবিধার জন্য ১৬ মাত্রার তালকে ৩২টি অর্দ্ধ-মাত্রা-তালে ভাগ করা হইল। উপরে প্রদত্ত প্রত্যেক দুই-দুইটি মাত্রার উপর একমাত্রার ঝোঁক রাখিয়া স্বরলিপি অনুসরণ করিয়া গাহিয়া গেলেই ঢিমে তেতালায় গাওয়া হইবে।—স্বরলিপিকার।

২´ ৩
I সা -া -ন্দা -া ন্া -া সা জ্ঞা | জ্ঞা -া জ্ঞা -া জ্ঞা সা সা দা |
বি ০ ০০ ০ শ্ব ০ বি ০ ধা ০ ত্রী ০ আ ০ লো ০

০ ১
দা -া দা -া ণা পা পা -া | দা -া দা -া দা র্সা র্সা -া I
ক ০ দা ০ ০ ০ ত্রী ০ নি ০ রা ০ শ ০ প ০

২´ ৩
I র্সা -া র্সা -া র্সনা -র্সনা দা -া | দর্সা র্সনদা দা -া দা ণা পা -া |
রা ০ গে ০ আ০ ০০ শা ০ র০ ০০ স ০ বি ০ তা ০

| মপা -দা পদা -ণা দণা -র্সা দণা -র্সা | সঋা -জ্ঞমা মসা -া সঋা -জ্ঞমা মসা -া II [ ]
আ০ ০ লো০ ০ আ০ ০ লো০ ০ আ০ ০০ লো ০ আ০ ০০ লো ০

২´ ৩
II দা দা দা দা দা মা মা -া | মা মা না না র্সা -া র্সা -া |
হা রা য়ে ছি প ০ থ ০ গ ভী র তি মি ০ রে ০

১
দা দা দা দা দা ণা পা -া | পমা মা মা ঋা ঋর্জ্ঞা -র্মা র্সা -া I
ল হ হা ত ধ' ০ রে ০ প্র ভা তে র তী০ ০ রে ০

২´ ৩
I র্সা র্সা নর্ঋা র্সা র্সদা ণা পা -া | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞপা মা মঋা জ্ঞা জ্ঞসা -া
পা প তা প মু ০ ছি ০ ক র মা০ গো শু ০ চি ০

১
| সঋা -গমা মা মা গমা -পা পা পা | মপা -দা পদা -ণা র্সনা -দপা মগা -ঋসা II [ ]
আ০ ০০ নী ষ অ০ ০ মৃ ত ঢা০ ০ লো০ ০ ঢা০ ০০ লো০ ০০

২´ ৩
II সা সা সা ন্দা ন্া সা সা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা সা দা পা মা মঋা -া |
দ শ প্র হ র ণ ধা ০ রি ণী দু র্গ তি হা ০

| সা সা সঋা -জ্ঞা জ্ঞসা -া সা মা | -া -া -া -া মা মা মা -া I

রি ণী ছু০ র্ গে ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ অ গ তি ০

I গা মা পদা -া দা র্সা র্সা র্সা | র্সা নদা দা দা দা দা ণা পা |

র গ তি০ ০ সি ০ দ্ধি বি ধা ০ য়ি ণী দ মু ০ জ

| পা পা পা -া পা পণা দা পা | মা মা জ্ঞা মা মসা -া -া -া I

দ ল নী ০ বা হু০ তে দা ও মা শ ক তি ০ ০ ০

I পা ঋর্া র্সা র্সা র্সা নদা মা -া | মা মদা দা দণা ণা -া ণা -া |

ত ন্ দ্রা ভু লি ০ য়া ০ যে ন০ মো রা০ জা ০ গি ০

| র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা র্মা র্সা -া | র্সা -া র্সদা -মা দা ঋর্া র্সা -া I

এ ০ বা র্ প্র ০ ব ল্ মৃ ০ ত্যু র লা ০ গি ০

I র্সা -নদা দা দা দণা -া পা -া | জ্ঞা -া জ্ঞপা মা মঋা -া সা -া |

রু ০০ দ্র দা হ০ ০ নে ০ ক্ষু ০ দ্র তা দ ০ হি ০

| সঋা -গমা মা মা গমা -পা পা -া | মপা -দা পদা র্সা র্সনা -দপা -মগা -ঋসা II II [ ]

বি০ ০০ না শো গ্লা০ ০ নি র্ কা০ ০ লো০ ০ মা০ ০০ ০০ ০০

মৃত্যুর পরপারে

শ্রীআদিত্যপ্রভ নন্দ কাব্যতীর্থ

পরলোক সম্বন্ধে সেই অনাদিকাল হইতে কত তথ্য, কত আখ্যায়িকা, কত কল্পনা যে মানুষ গড়িয়া আসিতেছে তাহার আর সীমা নাই। মৃত্যুর সময় মানুষের অসহ্য যন্ত্রণা হয়; মৃত্যুর পর ইহলোকের পাপের জন্য তাহাকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর নরকে পচিয়া থাকিতে হয় —অবশেষে তাহাকে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; নয় ত শেষের বিচারের দিনের প্রতীক্ষায় পড়িয়া থাকিতে হয়—এইগুলি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের নির্দ্দিষ্ট বিধান। তাহার পর নরক-যন্ত্রণা-সমূহের জ্বলন্ত বর্ণনা—কখনও পাপীকে তপ্ততৈলে ভাজিতেছে কখনও লোহার ডাঙ্গস দিয়া তাহার মাথায় মারিতেছে—কখনও তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে ও পাপী প্রাণান্তকর তৃষ্ণায় উৎপীড়িত হইয়া ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে ইত্যাদি আরও কত রকম শাস্তির কথা আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই।

স্বর্গের উজ্জ্বলতম চিত্রও পুরাণাদিতে আছে। কোন কোন কবি ও কল্পনা-প্রিয় ব্যক্তি 'এই পৃথিবীতেই পাপপুণ্যের যথোপযুক্ত ফলভোগ করিতে হয়' ইত্যাদি বলিতেও ত্রুটী করেন নাই।

যদি কোনও পরলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে 'পুরাণাদিতে বর্ণিত কথাগুলির সবটুকুই সত্য নয়' তবে হয়ত আমরা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া অর্ব্বাচীন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে ইতস্ততঃ করিব না; কোন জাতির পুরাণের মধ্যে কতটা সত্য আছে বা নাই তাহার বিচার করিতে না যাইয়া আমরা আপাততঃ পাশ্চাত্য পরলোকাভিজ্ঞ (Theosophist) ব্যক্তিবর্গের মতামত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

'Theosophist" সম্প্রদায় বলেন যে স্বর্গ বা নরক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান কিছুই নাই। মৃত্যুর পর মানুষের জীবাত্মার ক্রমোন্নতির পর পর ৭টী স্তর আছে। অবশ্য পৃথিবীকে প্রথমস্তর ধরিয়াই ৭টী।

হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত এই বিষয়ে তাহাদের মতের মিল থাকায় সেই নামগুলির আমরা ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিতরূপে নামকরণ করিব; যথা:— ভু, ভুব, স্ব, জন, মহ, তপ ও সত্য।

মুণি, ঋষি ও যে সমস্ত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অত্যন্ত সৎভাবে জীবন যাপন করেন—কেবল তাঁহারাই এই ৭টী স্তরের শেষ পর্য্যন্ত যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। সর্ব্ব শেষ স্তর—সত্যলোক অবশ্যই পুরাণ বর্ণিত আনন্দময়ধাম—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা মতভেদ নাই। আমাদের মত সাধারণ লোকের—পাপে পুণ্যে জড়িত সাধারণ মানব জীবাত্মার—অর্থাৎ এই পৃথিবীর শতকরা প্রায় একশত জনেরই কিন্তু অত শ্রেষ্ঠস্তর পর্য্যন্ত যাইতে হয় না। তাহাদিগকে পৃথিবীসহ মাত্র ৩টী স্তর যথা—ভু, ভুব, স্ব পর্য্যন্ত উঠিতে হয় এবং তৎপরে আবার এই মাটীর পৃথিবীতেই মাতৃগর্ভে মানবরূপে জন্মলাভ করিয়া শোক দুঃখ জরা মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই তিনটী স্তর অতিক্রম করিতে জীবাত্মার খুব বেশী বৎসর যে লাগে তাহা নহে। জীবাত্মা কিন্তু এইরূপ প্রতিজন্মেই কিছু কিছু উন্নতিলাভ করিতে পারে এবং অবশেষে হয়ত সে সত্যলোক পর্য্যন্তও যাইতে পারে। এই ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া সত্যলোক লাভ করিতে তাহার হয়ত হাজার হাজার বৎসরও কাটিয়া যাইতে পারে। অতএব আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে সমস্ত মানবজাতি পরলোকের মাগেও ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে।

পুরাণ প্রভৃতিতে নরকের যন্ত্রণা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা তত কঠোর না হইলেও—কিছুই যে নাই তাহা নহে। এই পৃথিবীতে জড়দেহে থাকিয়া জীবাত্মা কাম ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল রিপুর অত্যন্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছিল—সেই সকল বিষয়ের আকাঙ্খা ও ইন্দ্রিয় লালসা, তাহাকে মৃত্যুর পরেও ত্যাগ করে না।

তাহার তখন উপভোগের প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায়ই থাকে। ভুবলোকে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সূক্ষ্মদেহে তাহার কোনওরূপ উপভোগের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা না থাকায় সে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত ধন-লিপ্সা, ঈর্ষ্যা, প্রতিহিংসা ও মায়া মমতা প্রভৃতির জন্যও তাহাকে এই পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যদি সে পূর্ব্বে আগত জীবাত্মাদিগের সৎপরামর্শে ধীরে ধীরে নিজেকে কামনা-শূন্য না করিতে পারে তবে তাহাকে অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষার জন্য সতৃষ্ণভাবে ভুবলোকেই অনেককাল কাটাইতে হয়। ইহা ব্যতীত ভীষণতম পাপেরও ব্যবস্থা আর একটু ভীষণ হইতে পারে—কিন্তু তাহা কেবল আত্মশুদ্ধির জন্যই প্রয়োজন।

মৃত্যু বলিতেই আমরা ভয়ে আত্মহারা হই। মনে করি ইহজগতের স্নেহ প্রেম সম্পর্ক ত ভুলিতে হইবেই, অধিকন্ত কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা পাইয়াই না প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে! সত্যই কিন্তু ব্যাপারটী অত কষ্টকর নয়। নিদ্রার সময় আমাদের জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেও—দেহের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে; আর সে সময় জীবাত্মা খুব নিকটে নিকটেই থাকে। তখন সে ভুবলোকবাসী জীবাত্মাগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে ও কথাবার্ত্তা কয়। সেই সময় কেহ নিদ্রিত ব্যক্তিকে ডাকিলে—জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত ব্যক্তির দেহের ভিতর প্রবেশ করে।

মহানিদ্রা বা মৃত্যুর সময় জীবাত্মা জড়দেহের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মৃত্যু হইলে আমাদের মন, আত্মা, ইন্দ্রিয়শক্তি, পূর্ণ স্মৃতিশক্তি—এমন কি শুধু দেহ ব্যতীত আর সমস্তই—পৃথিবীর জীবগণের দর্শনের অতীত একটা সূক্ষ্মদেহ—লিঙ্গদেহ—আতিবাহিকদেহ

ধারণ করিয়া আমাদেরই চতুর্দ্দিকে ভুবন্তরে ভ্রমণ করিতে থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মানুষের মূর্চ্ছার মত একরকম অজ্ঞান অবস্থা আসে—আর তাহার পরই সে—সূক্ষ্মদেহধারী সে—দেহ ব্যতীত বাকী মন,প্রাণ ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি সহ সে—সানন্দে স্বচ্ছন্দে ভুবলোকে নিজেকে জাগরিত দেখে। প্রথম প্রথম অনেক জীবাত্মাই—সে যে পৃথিবীতে জড়দেহে নাই—ইহা বুঝিতে পারে না ; কারণ চতুর্দ্দিকে আত্মীয়-স্বজনকে সে পূর্ব্বের মতই দেখিতে পায়। নিজে যে গৃহে ছিল তাহাও চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলি তাহার চোখে পূর্ব্বের মতই প্রতিভাত হয়। সে আত্মীয় স্বজনের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে চেষ্টা করে এবং পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ২।১ বার ব্যর্থ চেষ্টার পর তাহার ধারণা হয়—'তাই ত! কেহ আমার কথা শুনিতেছে না! কেহ আমার দিকে চাহিতেছে না! আমি যে এখানে আছি তাহাও কেহ বুঝিতেছে না—ইহার কারণ কি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?' এইরূপ ভাবিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন ভুবলোকবাসী—তাহার কিছুপূর্ব্বে আগত অন্যান্য জীবাত্মাগণ আসিয়া তাহাকে তাহার অবস্থা বুঝাইয়া দেয় ও এই নূতন স্থানে কিরূপ ভাবে চলিতে হইবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। অবশ্যই সব জীবাত্মা যে মৃত্যু বুঝিতে পারে না—তাহা নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভুবলোকে জাগরণের সময়েই সে অত্যন্ত আনন্দ ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। তাহার কারণ এই যে সে তখন আর এত বড় জড় দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। স্থূল জড় দেহটাকে তাহার আর বহিয়া বেড়াইতে হয় না। সে অত্যন্ত লঘু, সূক্ষ্ম ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া—যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে।

আর যে দেহে সে ছিল, সে দেহটী হয়ত অসুখে বিসুখে অথবা জরায় আক্রান্ত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছিল, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারায় তাহার আনন্দ।

প্রকৃত অবস্থা বুঝিলে তখন তাহার 'ইহলোকের আত্মীয় স্বজনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই'—এই ভাবিয়া হয়ত কিঞ্চিৎ দুঃখ হইতে পারে ; কিন্তু অন্যান্য জীবাত্মাগণের সান্ত্বনাতে ও আত্মীয়স্বজন তাহাকে দেখিতে না পাইলেও নিজে তাহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিয়া ও তাহাদের নিকটে নিকটে থাকিয়া ক্রমশঃ তাহার দুঃখ দূর হয়।

সে আত্মীয় স্বজনের জন্য দুঃখিত হইলেও আত্মীয়গণ যে তাহার জন্য দুঃখিত হইবে অথবা সর্ব্বদা অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে—ইহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের। কারণ তাহাদের মনের কষ্ট দূর করিবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে—সান্ত্বনা দিবার কোন উপায়ই বাহির করিতে পারে না। কখনও কখনও জীবিত আত্মীয়দের নিদ্রাবস্থায় সে তাহাদের জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন কোন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জীবিত ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারে যে, সে মৃত ব্যক্তির সহিত কথা বলিতেছে—তখন এই সব পরলোকের বৃত্তান্ত না জানা থাকায়—সুপ্ত অথবা সুপ্তোত্থিত হইয়াও তাহার ভয় করিতে থাকে।

আর যদি মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা কোনও জীবদেহ হইতে কিঞ্চিৎ জড় পরমাণু সংগ্রহ করিয়া কথঞ্চিৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আত্মীয়দিগকে সান্ত্বনা দিতে কখনও দেখা দেয়—তখন অন্যলোক ত দূরের কথা—অতি বড় পরমাত্মীয়ও ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। একে ত ভুবলোকবাসী জীবাত্মার জড় পরমাণু বিশিষ্ট দেহ ধারণ করা কষ্টকর ও তাহার উন্নতির বিঘ্নকারক—তাহার উপর যাহাদের সুখের জন্য সে তাহাও করে—তাহারাও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না—ইহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত দুঃখ পায়।

জড় পরমাণু সংগ্রহের কথা এই জন্য বলিতেছি যে ভুবলোকগত জীবাত্মা তাহার আয়ত্বের যোগ্য কোনও ব্যক্তির দেহ হইতে জড় পরমাণু সংগ্রহ করিয়া নিজের পূর্ব্বমূর্ত্তি অথবা যে কোনও মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। এইজন্য কিন্তু তাহাকে কতকটা কষ্ট স্বীকার ও চেষ্টা করিতে হয় ; যাহার দেহ হইতে সে জড় পরমাণু সংগ্রহ করে নিজ কার্য্যের শেষে আবার তাহা তাহার দেহে ফিরাইয়া দেয়।

ভুবলোকবাসী জীবাত্মা অবাধ অনন্ত স্বাধীনতা পাইয়া প্রথম কিছু দিন খুবই বেড়াইয়া বেড়ায় ও ভুবলোকের দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য জিনিষসমূহ দেখে ও শোনে। ভুবলোকেও দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার অনন্ত বিষয় আছে—কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিতেছি না। জীবাত্মার হাতে তখন অনন্ত অবসর। তাহার নিজের সূক্ষ্মদেহের ভরণ পোষণের প্রয়োজন নাই—আর অন্য কাহারও পোষণও তাহাকে করিতে হয় না। তখন তাহার একমাত্র কার্য্য হইতেছে—পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন। পরোপকার অর্থে ভুবলোকে নবাগত আত্মাদিগকে উপদেশ দেওয়া ও উন্নতির পথ দেখান ; আর এই পৃথিবীর লোকদিগকে অশেষবিধ উপায়ে সাহায্য করা।

এই পৃথিবীর লোকরা পরলোকের অবস্থা জানে না বলিয়া শোক দুঃখে আকুল হয় ; ভুবলোকবাসী জীবাত্মাগণ তাহাদিগকে নিজেদের অবস্থা জানাইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে। সাধারণতঃ বৈঠকে মিডিয়ামের উপর ভর করিয়া তাহারা আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। কখনও কখনও মূর্ত্তি ধরিয়াও জানাইতে চেষ্টা করে।

এইরূপভাবে কিছুকাল ভুবলোকে থাকিয়া আত্মোন্নতি করিলে ভুবলোকেও তাহাদের মৃত্যু হয়। তখন তাহারা স্বর্লোকে নিজেদিগকে জাগরিত দেখে। তখন তাহাদের আরও সূক্ষ্মতর অবস্থা হয়। স্বর্লোকেও ভুবলোকের মত জানিবার শুনিবার ও দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। স্বর্লোক আনন্দময়ও বটে। তৎপরে আবার তাহাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জন্মমৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

পরলোকের যতটুকু রহস্য জানিতে পারা গিয়াছে তাহা শুধু বৈঠকের কল্যাণেই। কয়েকজন মিলিয়া সন্ধ্যাকালে মৃদু আলোকে একটী নির্জ্জন ঘরে পবিত্র ভাবে একটী টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিয়া অল্পদিন পূর্ব্বে মৃত একটী জীবাত্মাকে মনে মনে চিন্তা করিতে হয়। ঠিক

ভাবে চিন্তা করিতে পারিলে—হয় জীবাত্মা কাহারও উপর ভর করিয়া কাগজে লিখিয়া বা বলিয়া অথবা টেবিলের ঠক্ ঠকাঠক্ শব্দে প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে; যাহার উপর ভর করে তাহাকে মিডিয়াম্ বলা হয়। ইহা ব্যতীত প্ল্যাঙ্কেটের দ্বারাও জীবাত্মা উত্তর জানাইতে পারে।

এই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে জানা যাইতে পারে। বৈঠকের কথা বিশেষভাবে জানিতে হইলে "পরলোকের কথা" পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে জানিতে পারা যাইতে পারে।

ইংরাজী পুস্তক

By. C. W. Led Bidd r.

1. The other side of death.
2. Astral Plane.
3. Devachanic Plane.
4. The hidden side of things.
5. Science of the Sacraments.
6. Clairvoyance.
7. Human Personality—2 vol—Frederic Myres.
8. Spiritualism—Sir William Crooks.
9. Survival of man—Sir Oliver Lodge.

The other side of deathএর অনুবাদ—"পরলোক"। অনুবাদক শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ - বসুমতী।
পরলোকের কথা—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ।

তপস্বী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হে একাকী,
আঁধার কন্দর মাঝে সঙ্গোপনে থাকি
তমিস্রার জরায়ু শয়নে
ভ্রূণ সম প্রাণ বহ শত ফের নাড়ীর বন্ধনে
কি রহস্য শূন্য হ'তে অনুক্ষণ লতেছ যে টানি'
ওগো ধ্যানী,
বুঝিতে পারি না মোরা কুক্ষিজ সে স্বয়ম্ভু জীবন।
আপনারে করিছ সৃজন
আত্মবীজে আঁধার জঠরে,
নবজন্মে আর বার ফিরিবে কি এই পৃথ্বী পরে?
এ আলোক বায়ু
দিবে তব চক্ষে বক্ষে জ্যোতির্ম্ময় নব পরমায়ু?
ভোগাতুর দেহে মরি' অমরতা লভিছ অন্তরে
তিমির কবরে?
ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি যে বৈদ্যুতি এতকাল ধরি
সর্ব্বাঙ্গ শিহরি
পশেছিল অন্তস্তলে তব
বজ্র দেহ দিয়া অভিনব
ভূমিষ্ঠ করিবে তারে ধরণী ধূলায়?
গুহায়িত কায়
চিন্ময় বিজলি তনু পায় বুঝি ধীরে অতি ধীরে
সে নিথর গহন তিমিরে?
নিঃসঙ্গ তাপস,
সবারে করিবে তুমি বশ
অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যে প্রাণে প্রাণে পশিবে সবার,
তপশ্চর্য্যা তাই এ দুর্ব্বার?
তাই তব অন্ধকূপে চুপে চুপে চিন্তা তন্তু জালে
আপনারে নিঃশেষে জড়ালে
গুটি কীট সম ক্ষৌম কোষে
জীবন প্রদোষে?
কোন্ সুপ্রভাতে তব কৃষ্ণানিশি হবে অবসান
চিত্রবর্ণ পক্ষে জ্যোতিষ্মান্
ঝাপটিয়া উদ্ঘাটিবে তন্তু কারাগার,
অব্যাহত গতিভরে বিহরিবে গগনে উদার?
রূপে রসে পূর্ণ বসুন্ধরা
দিকে দিকে রাখিবে ভরিয়া,
পরাণের পুষ্পদলে উড়িয়া ঘুরিয়া
লীলা পরিক্রমাভরে প্রাণ স্পন্দ পরাগে পরাগে
বিতরিবে স্বৈর অনুরাগে,
সযতনে অতি
হে রেণুকণাদ প্রজাপতি!
অভিনব সৃষ্টির প্রাক্কালে
লুকায়েছ নিজেরে আড়ালে।
আপনারে দগ্ধ করি করিতেছ বিভূতি সংগ্রহ
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে অহরহ
প্রজনিতে প্রজাপুঞ্জ স্বরচিত অতীন্দ্রিয় লোকে?
বিস্ময় বিহ্বল এই চোখে
দেয় দেখা ছায়ালোক, মোরে যেন টানে
কি অমোঘ মাধ্যাকর্ষে ধূমল যে নীহারিকা পানে;
খধূপের পারা
আলোকের রেখা ধরি শূন্যপথে ছুটি দিশাহারা
তোমার ভুবনে,
দেহ মোর পড়ে খসি' ধরা পানে, যজ্ঞধূমে তব
মুক্ত প্রাণবায়ু মোর পুনর্জন্ম লভে অভিনব।

রায়-বাড়ী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্ত একটুকরা কাগজ, কোন ক্রিয়াকর্ম্মের ফর্দ্দের ছিন্নাংশ। সুধাংশুর বাড়ী হইতে কাগজখানা পাওয়া গেল। বহুজনের অনুরোধে অতি-মিতব্যয়ী সুধাংশু তাহার মেটে-ঘরের মেঝে বাঁধাইতে রাজী হইল। ইঁট চুন সিমেণ্ট সব আসিয়া উপস্থিত হইলে ঘরের বাক্স পেঁটরা জিনিষপত্র বাহির করিতে করিতে সুধাংশুর বৃদ্ধা পিতামহীর একটা সে-আমলের বেতের পেঁটরা হইতে ঐ কাগজখানা বাহির হইয়া পড়িল। কাগজখানা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল সকলেরই।

পুরাণো আমলের মোটা কাগজে ছাপান ফর্দ্দ, ফর্দ্দখানার উপরের অংশ নাই—নীচের অংশটায় যেন সিন্দুর মোড়া ছিল বলিয়া মনে হয়। ফর্দ্দখানায় লম্বাভাবে জিনিষপত্রের নাম দুই সারিতে ছাপান, জিনিষের নামের পাশে পরিমাণের অঙ্ক হাতে লেখা। প্রথম সারিতে ২২ দফা হইতে ৩৭ দফা দ্রব্যের নাম শেষ হইয়াছে; উপরের ২১ দফা জিনিষের নাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় সারিতে ৫৭ দফা হইতে ৭৪ দফা পর্য্যন্ত জিনিষের নাম পাওয়া যায়। ফর্দ্দখানা এইরূপ—

২২।	সৈন্ধব লবণ	⁄০	৫৭।	মোটা তামাক	১দফা
২৩।	করকচ লবণ	⁄৫০	৫৮।	মিহি তামাক	১দফা
২৪।	সর্ষপ তৈল	⁄১	৫৯।	টিকে	১দফা
২৫।	কাটা সুপারী	৵০	৬০।	খড়কে	১ „
২৬।	খদির	১গুটী	৬১।	কোশাকুশী	১ „
২৭।	পান মশলা	১দফা	৬২।	গঙ্গাজল	১ „
			৬৩।	কুশাসন	১ „
			৬৪।	গঙ্গা-মৃত্তিকা	১ „

ইত্যাদি। ফুল-বিল্বপত্র, যব, তিল, হোমের ঘৃত, হোম কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষটার নাম তাহাতে আছে। সকলে অনুমান করিল কোন সমারোহের ক্রিয়া কর্ম্মে—বোধ হয় কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দিবার সিধার ফর্দ্দের নিম্নাংশ এটা। অনুমান সত্য—সুধাংশুর পিতামহী আজও জীবিতা—তিনিই এ ইতিহাস আমাকে বলিলেন।

*   *   *   *

১২৭০ সাল—ইংরাজী ১৮৬৩ সালের ঘটনা। সিপাহী-যুদ্ধ সবে শেষ হইয়াছে—অগ্নি নিভিয়াছে কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিকীরিত হয় নাই। দেশের লোকের অসি গিয়াছে—কিন্তু বাঁশের লাঠী তখনও বাঁশীতে পরিণত হয় নাই। তখন লোকে বাবরী চুল রাখিত কিন্তু বব ছাঁটে নাই। জমিদার তখনও ভূস্বামী এবং তাঁহাদের সে স্বামীত্বের সত্যকার অর্থ তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাজারামপুরের রায়-বাড়ীর তখন অসীম প্রতাপ। এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে—রায়-বাড়ীর রাজ্যের মধ্যে বাঘে বলদে একঘাটে জলপান করিত, দুর্দ্দান্ত বাঘকেও নাকি হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রায়-বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় তখন রায়-বাড়ীর একক উত্তরাধিকারী। ১০৯২ নম্বর লাট হুদা শ্যামপুরের মাতব্বর প্রজারা আসিয়া সদরে কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, হুজুর রক্ষা করুন।

হুদা শ্যামপুর দুর্দ্দান্ত মুসলমান, বাগ্দী ও হাড়ি লাঠীয়ালের বাস এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা কূট-কৌশলী, পাকা ষড়যন্ত্রী। আজ দুই পুরুষ তাহারা বিনা খাজনায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর কোন জমিদার এখানে পুণ্যাহ করিতে পারেন নাই। চার পাঁচ ঘর জমিদারের হাত-ফের হইয়া অবশেষে হুদা শ্যামপুর রাবণেশ্বর রায়ের হাতে আসিল। শেষ জমিদার আক্রোশভরে রাবণেশ্বর রায়কে ডাকিয়া পত্তনী বিলি করিলেন। রায় তাঁহার ইষ্টদেবী কালীমাতার সেবাইত স্বরূপে সম্পত্তি পত্তনী গ্রহণ করিলেন। আজ পূর্ণ একবৎসর বিরোধ চালাইয়া বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াই প্রজারা আসিয়া রায় দরবারে গড়াইয়া পড়িল।

প্রজারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশ জন। লাট শ্যামপুরের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা ছত্রিশখানি, ছত্রিশখানি গ্রামের ছত্রিশজন মণ্ডল-প্রজা আসিয়াছিল ; তাহার উপর সঙ্গে ছিল শ্যামপুরের কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জোতদার রাধানাথ দাস, আর ছিল ঘাঁটীতোড় গ্রামের মুসলমান প্রজাদের মুখপাত্র ওবেদার রহমন ও তিনু মিয়া। বেলা তখন অপরাহ্নেরও শেষ ভাগ, সন্ধ্যা হইতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না। রায় সরকারের কাছারী তখন আবার দ্বিতীয় দফায় আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে তকমা-আঁটা হরকরা চাপরাশীদের যাওয়া আসার বিরাম নাই, লোকজনে কাছারী গিস্ গিস্ করিতেছে। শ্যামপুরের প্রজারা ইহার পূর্ব্বে কয়েক ঘর জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়াছে এবং তাহাদের ঘায়েল করিয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহারা ছিলেন মধ্য-শ্রেণীর জমিদার, এত বড় জমিদার শ্যামপুরের প্রজারা দেখে নাই। কাছারীর পরিধি ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল।

কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত রসিক লোক, সে উঁকি মারিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনাবশ্যকভাবে কাছাটা আর একটু সাঁটিয়া বলিল—

কাছারীই বটে রে বাবা, কাছার অরি! কিন্তু হুজুর কই? শ্যামপুরের নির্দ্দিষ্ট গমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, হুজুর বসেন দোতালায়। সকলের দৃষ্টি আপনা হইতেই উপরে দোতালার জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ অট্টালিকার দ্বিতলে সারি সারি জানালা, প্রজারা সভয় বিস্ময়ে প্রত্যেক জানালার দিকে চাহিয়া তাহাদের কল্পনার মানুষটীকে খুঁজিতেছিল।

গমস্তা বলিল, এ দোতালায় হ'ল সব নায়েব সেরেস্তা, নায়েব বাবুরা বসেন এখানে। হুজুরের কাছারী এখান থেকে দেখা যায় না, ওপাশে ফুলবাগানের সামনে—।

ঠিক এই সময় একজন হরকরা আসিয়া কথায় বাধা দিল—গমস্তাকে বলিল, নায়েব বাবু ডাকছেন আপনাকে।

গমস্তা চলিয়া গেল।

গুপ্ত হাসিয়া বলিল, দাসজী, দেশে বর্গী এসেছে, দুষ্ট ছেলেদের ঘুমপাড়াও। গোলমাল করলেই বিপদ!

রাধানাথ দাস চিন্তাকুলমুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই দেখছি

গুপ্ত এবার ওবেদার রহমনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোবা তোবা বল চাচা, মুখে যে মাছি ঢুকছে! বলি হাঁ ক'রে দেখছ কি?

পিছন হইতে রতন মণ্ডল বলিল, বাহারের লক্কা কেটেছে কিন্তু দালানে—গুপ্তমশায়!

অপর একজন বলিয়া উঠিল, এ যে গোলকধাঁধারে বাপু, ইদিকে দালান, উ-দিকে দালান—আড়ে দীঘে ওর নাইরে বাবা—হ-হ!

—আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

একজন সরকার আসিয়া তাহাদের সকলকে আহ্বান করিল।

গুপ্ত বলিল, আমাদিগে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের ভার আমার ওপর, আমি কালীমায়ের দেবোত্তরের সরকার। সরকার অগ্রসর হইল।

গুপ্ত কৃত্রিম ভয়ে বিহ্বলতার ভাণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ও দাসজী, কোথায় নিয়ে যাবে হে বাপু! গারদে না একেবারে—।

বিরক্তিভরে বাধা দিয়া রাধানাথ দাস কহিল, চুপ কর গুপ্ত, সব সময়েই তোমার ইয়ে, হ্যাঁ!

ওবেদার রহমন হাসিয়া বলিল, ভয় কি চাচা, আমাদের বাড়ীও ঘাঁটীতোড়, লাঠীর ডগায় ঘাঁটী তোড়াই হ'ল আমাদের ব্যবসা! ভয় কি—ঘাঁটী ভেঙে তোমাকে পিঠে করে নিয়ে পালাব।

* * * *

কাছারী পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির—তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ী, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায় চৌধুরীদের কালী-বাড়ী। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া ওঠে তখন কালী-বাড়ীর বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চত্বরের গায়ে গঙ্গার জল ছল ছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দির; নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি সারি একতলা ঘর। দক্ষিণ দিকের বারান্দার কোলে পাশাপাশি দুইখানা ঘরের দরজা খোলা ছিল, খোলা দরজা দিয়া দেখা যাইতেছিল ঘরের সতরঞ্চির উপর সাদা চাদর

ধপ্ ধপ্ করিতেছে, একদিকে সারি সারি বালিশ পড়িয়া আছে। ঘরের দরজার সম্মুখেই প্রকাণ্ড দুইটা জালায় জল ও বড় বড় ঘটী রাখিয়া দুইজন চাকর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সরকার বলিল—এইখানে আপনারা বিশ্রাম করুন। মুসলমান যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য ওপাশে ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরে জিনিষপত্র রেখে দিন।

আগন্তুকদের কেহ কোন উত্তর দিল না, সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেছিল ঠাকুরবাড়ী। হাত মুখ ধুইয়া নাটমন্দিরে উঠিয়া তাহাদের বিস্ময় বিপুল হইয়া উঠিল—শুধু বিস্ময় নয়—শ্যামপুরের দুর্দ্দান্ত অধিবাসীদলের শরীর কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরের অসাধারণ উচ্চতা সত্যই মানুষকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহার উপর এতবড় নাটমন্দিরটার অভ্যন্তর ভাগ তখন আধ-আলো আধ-ছায়ায় যেন থম থম করিতেছিল। চোখের সম্মুখের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া পরিবেষ্টনীর সম্পূর্ণ রূপ তাহাদের দৃষ্টিতে ধরা দিতেই তাহারা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নাটমন্দিরের চারিপাশে থামের গায়ে নানা আকারের বলির খড়্গ আলোকের অভাবে প্রভাহীন শানিত রূপ লইয়া ঝুলিতেছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাষ্ঠ।

দেবীমন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। রুদ্ধদ্বারের সম্মুখেই প্রণাম সারিয়া তাহারা আসিয়া বসার ঘরে আশ্রয় লইল। দুর্দ্দান্ত ভয়ে ও আকুল চিন্তায় আচ্ছন্ন নির্ব্বাক হইয়া সব বসিয়া রহিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধানাথ দাস বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, কে রে বাপু, ফোঁস্-ফোঁস্ করছিস কে?

কেহ উত্তর দিল না। এই সময় একজন চাকর আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, সেই আলোয় দেখা গেল, এক কোণে বালিশে মুখ গুঁজিয়া প্রৌঢ় বিপিন মোড়ল ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতেছে। দাস দাঁত কিস্ কিস্ করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই চাকরটা বলিয়া উঠিল, হুজুর আসছেন! বলিতে বলিতেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ছাদের উপর রাবণেশ্বর রায়ের খড়মের শব্দ খট্ খট্ করিয়া কঠোর শব্দে বাজিতেছিল, সমস্ত ছাদটা সঞ্চারিত করিয়া একটা কম্পন অনুভূত হইতেছিল।

দাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওঠ্ ওঠ্ সব নজরের টাকা বার কর! গুপ্ত, গুপ্ত—সেখজীদের সব ডাক হে! আঃ সব মাটী করলে!

বাহিরে নাটমন্দিরে তখন দেওয়াল-গিরিতে ঝাড়-লণ্ঠনে সারি সারি বাতি জ্বালিয়া উঠিয়াছে। প্রজারা সকলে সারি দিয়া নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির মুখে রায়-হুজুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতালার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোক-মালার ছটার প্রাচুর্য্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয় বিস্ময়ে দেখিল। দীর্ঘাকার পুরুষ, খড়্গের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই, কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটী! বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে পরণে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগায় একটী মোটা রুদ্রাক্ষ, হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটী আংটী।

হিন্দু প্রজারা ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল, মুসলমান প্রজারা আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠুং ঠাং শব্দ উঠিতেছিল নজরের টাকার।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার প্রজা?

কর্ত্তার পিছনে ছিল দেবোত্তরের নায়েব, সে উত্তর দিল, আজ্ঞে হুদা শ্যামপুর, কালীমায়ের নতুন মহাল।

—হুদা শ্যামপুর?

রাবণেশ্বর রায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কাঁধের নামাবলীখানা স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। নায়েব তাড়াতাড়ি সেখানা উঠাইয়া লইল। রায় গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তারা—তারা!

তারপর ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে নাটমন্দিরের উপরে উঠিয়া গেলেন, সে পদক্ষেপের তাড়নায় নজরের টাকাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নায়েব দেখিয়া শুনিয়া নজরের টাকাগুলি গুণিয়া গাঁথিয়া তুলিয়া লইলেন। ওদিকে তখন দেবী-মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে—প্রকাণ্ড কাঁসরখানায় ঘন্ ঘন্ শব্দে ঘা পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-কাঁসি-শিঙা

বাজিতেছিল। পবিত্র ষোড়শাঙ্গ ধূপের গন্ধে নাটমন্দির আমোদিত।

আরতি শেষ হইতেই প্রজারা নীরবে প্রণাম সারিয়া আবার আসিয়া ঘরে আশ্রয় লইল। সরকার আসিয়া আহ্বান করিল, আসুন—আপনারা মায়ের শীতলের প্রসাদ নিয়ে জল খাবেন আসুন।

নাটমন্দির হইতে ডাক আসিল, সরকার

একজন খানসামাকে ও দেবীমন্দিরের পরিচারককে জলযোগের ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিয়া সরকার তাড়াতাড়ি কর্ত্তার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতেই প্রজারা শুনিল কর্ত্তা প্রশ্ন করিতেছেন—প্রজারা কতজন এসেছেন?

—আজ্ঞে চল্লিশ জন।

—খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মাছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে।

—কত?

—আজ্ঞে দশসের।

—হুঁ—দুধ?

সরকার এবার চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্তা আবার প্রশ্ন করিলেন—দুধের ব্যবস্থা হয়েছে?

—আজ্ঞে—অবেলায়। সরকার আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কর্ত্তা বলিলেন, অতিথি—তিথি মেনে আসে না, বেলা দেখে আসে না। যাও—বাড়ীর দুধ নিয়ে এস।

সরকার যেন বাঁচিল—সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। কর্ত্তা আবার বলিলেন, গিন্নীর কাছে খবর নাও, লক্ষ্মী-নারায়ণজীর দরবারে—মা জগদ্ধাত্রীর দরবারে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা!

সরকার চলিয়া গেল। রায়কর্ত্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তন্ত্রমতে সন্ধ্যা তর্পণ জপ করিবেন।

নিস্তব্ধ নাটমন্দির। পরিচারক পূজারীর দল নিস্তব্ধ-ভাবেই আনাগোনা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মন্দির অভ্যন্তর হইতে মোটা ভরাট গলায় রায়কর্ত্তা ডাকিতে-ছিলেন—তারা—তারা!

সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটী অকৃত্রিম আবেগ রণ্‌ রণ্‌ করিয়া বাজিতেছিল।

*　　*　　*　　*

অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরকার ও শ্যামপুরের গমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী আসিয়া ডাকিল, উঠুন সব, খাবারের ঠাঁই হয়েছে।

গুপ্ত নিজে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, মরেছে রে—বেটা চাষারা সব মরেছে। নরম বালিশ মাথায় দিয়েছে কি মরণ ঘুমে—

গমস্তা চক্রবর্ত্তী মৃদুস্বরে বলিল, চুপ, চুপ—বাইরে হুজুর আছেন।

প্রজারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, রায়কর্ত্তা নিজে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরণে এখন কোঁচান মিহি থান ধুতি—গায়ে গিলা করা পাঞ্জাবী—পায়ে চটী। সকলে মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিল।

কর্ত্তা বলিলেন, কি-হে—হুদ্দা শ্যামপুরের সব বড় বড় বীরের কথা শুনেছি। কিন্তু কই আহার কই সব? খাচ্ছ কই তোমরা?

কর্ত্তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, কিন্তু একটা অনাবিল প্রসন্নতায় হৃদ্য। গুপ্ত অভয় পাইয়া বলিল—আজ্ঞে হুজুর—মা-লক্ষ্মী বড় কাহিল কাহিল ঠেকছেন, আমারা ভাল খেতে পারছিনা হুজুর!

কর্ত্তা বলিলেন—ভেঙে বল ত' বাপু—কি হয়েছে!

—আজ্ঞে এই সরুচালের অন্ন আমাদের কেমন জল জল লাগছে। এই মোটা আকাঁড়া চালের ভাত ভিন্ন আমাদের মিষ্টি লাগে না হুজুর!

কর্ত্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর হুকুম করিলেন, ঠাকুর মোটা চালের ভাত নিয়ে এস।

সুযোগ বুঝিয়া রাধাচরণ দাস বলিয়া উঠিল—হুজুর যদি অভয় দেন ত একটী নিবেদন পাই!

হৃদ্য কণ্ঠস্বরে কর্ত্তা বলিলেন—বল, বল!

—হুজুর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ হ'ল বাপ আর বেটা।

কর্ত্তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল—বলিলেন—শুনে ত আসছি তাই চিরকাল। কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?

রাধাচরণের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সকলের আহার শেষ হইলে সমস্ত ঠাকুরবাড়ীগুলি ঘুরিয়া রায়কর্ত্তা দ্বিতলে উঠিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রজাদের কাছারীতে তলব হইল। মিট-মাটের কথাবার্ত্তা সমস্ত সুশেষ করিয়া প্রজারা বিদায় লইল। প্রত্যেকের বিদায় মিলিল ধুতি ও চাদর এবং ফিরিবার গাড়ীভাড়া প্রত্যেককে দেওয়া হইল। গুপ্তকে চিকিৎসক জানিয়া সম্মানী স্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমির সনন্দ রায়-কর্ত্তা সহি করিয়া দিলেন।

* * * *

মাস খানেক পর।

রাবণেশ্বর রায় আহারান্তে দ্বিপ্রহরে অন্দরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রায়-গিন্নী পাশে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। ঝি আসিয়া খবর দিল, কোন গমস্তার পরিবার এসেছে—খুব কান্নাকাটী করছে।

কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন—উঠে যাও গিন্নী, দেখ—কার কি হ'ল!

রায়-গিন্নী উঠিয়া গিয়া একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটীর কাপড়খানা জীর্ণ নয় কিন্তু কাদার ধুলায় মালিন্যের আর তাহাতে শেষ নাই, তাহার কোলে একটী শিশু।

শিশুটীকে রায়কর্ত্তার পায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েটী মূর্ত্তিমতী বিষণ্ণতার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী সজল চক্ষে কহিলেন—হুদাশ্যামপুরের গমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী। মেয়েটী এবার হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কর্ত্তার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কর্ত্তা শশব্যস্তে বলিলেন, ওঠ মা, ওঠ—কি হয়েছে বল।

গিন্নি বলিলেন, প্রজারা চক্রবর্ত্তীকে পুড়িয়ে মেরেছে। নগদী কোন রকমে এদের নিয়ে এখানে এসে -।

রায় গিন্নীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দরদরধারে চোখের জলে বক্ষবাস সিক্ত হইয়া উঠিল।

কর্ত্তা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, যুগ্‌লা!

যুগল খানসামা দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা বলিলেন, দেখ, কাছারীতে কোথায় হুদাশ্যামপুরের নগদী এসেছে—তাকে নিয়ে আয়।

সবিস্ময়ে যুগল প্রশ্ন করিল—এখানে?

কর্ত্তা যুগলার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন শুধু। যুগ্‌লা আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কর্ত্তা ধীরপদক্ষেপে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, মৃত্যুর ওপরে হাত নাই মা, কি করব বল? তবে নিশ্চিন্ত থাক তুমি, আমার ছেলে বিশ্বেশ্বর যদি খেতে পায়—তা'হলে তোমার ছেলেও পাবে। যাও গিন্নী, ওঁকে স্নান করিয়ে কিছু খেতে দাও। যাও মা, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

মেয়েটী ধীরে ধীরে গিন্নীর সহিত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই যুগ্‌লা নগদীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যাহা বলিল তাহা এই—প্রজারা এখানে মৌখিক মিটমাটের কথা শেষ করিয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছিল। হুজুর নাকি এখানে তাহাদের বাপ তুলিয়া কি গালিগালাজ্ দিয়াছিলেন। জমিদারপক্ষীয় কেহ কিন্তু তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারে নাই। ঘটনার দিন গমস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া গুড় তৈয়ারী করা উনানের মধ্যে পুড়াইয়া মারিয়াছে। সঙ্গের চাপরাসী দুইজনও জখম হইয়া এখনও সেখানে যে কি অবস্থায় আছে তাহা সে বলিতে পারে না। তাহার পরই উন্মত্ত প্রজারা আসিয়া কাছারী ঘরে আগুন দেয়। নগদী কোন রকমে গমস্তার স্ত্রী পুত্রকে লইয়া সদরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রায়-কর্ত্তা একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ।

তারপর পাশের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বরের হার খুলিয়া লইয়া নগদীর হাতে দিয়া বলিলেন—নিয়ে যা। যুগ্‌লা—গিন্নীর কাছে একে নিয়ে যা, বলবি বিশ্বেশ্বর যা খায় তাই যেন একে খেতে দেওয়া হয়। নিজে পাশে ব'সে যেন তিনি খাওয়ান। আর কেলে বাগ্দীকে ডেকে নিয়ে আয়—এখুনি—এইখানে।

কিছুক্ষণ পরে যুগলার পিছন পিছন দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতের মত এক মূর্ত্তি অন্দরে একেবারে কর্ত্তার শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়া প্রবেশ করিল। কালী বাগ্দীর পদশব্দ নাকি বিড়াল কি বাঘের মত শোনা যায় না। কিন্তু কালী বাগ্দীর অন্দর প্রবেশে অন্দরবাসিনীরা সচকিত হইয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা অভিনব, রায় অন্দরে খানসামা

ও কদাচিৎ নায়েব ব্যতীত অপর কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই। অন্দরের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন গুঞ্জিত হইয়া উঠিল।

রায়-গিন্নী কথাটা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কালী বাগ্দীর পরিচয় তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ মুখেই তিনি শুনিলেন, রায়-কর্ত্তা বলিতেছেন, ছত্রিশ মৌজা কালো ক'রে দিয়ে আসতে হবে। একখানা চালা বাঁচলে তোর মাথা বাঁচবে না, বুঝলি। কেউ যেন এক ফোঁটা জল আগুনে দিতে না পারে।

কালী অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলিল, এই বেলাতেই বেরিয়ে পড়ছি আমরা।

রায়-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—না - তা হবে না, আমি হতে দোব না।

কর্ত্তা বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—কি হবে না?

—গ্রাম পোড়াতে আমি দোব না। প্রজাশাসন—

রায়-কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, যা বোঝ না গিন্নী—সে বিষয়ে হাত দিতে যেয়ো না।

গিন্নী এবার বলিলেন—কালী তুই যদি যাবি—।

কালীর দিকে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন—কই কালী? কালী কখন নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে!

গিন্নী বলিলেন—ফিরিয়ে আন—ডাক ওকে।

—গিন্নী, মাটী বাপের নয়—মাটী দাপের। শ্যামপুরের প্রজা আমার মাথায় পা দিয়েছে।

—কেন—আমার বাবাও ত জমিদারী শাসন করেন—,

হাসিয়া রায়-কর্ত্তা বলিলেন—বৈষ্ণবী মতে। কিন্তু আমরা শাক্ত গিন্ন —তোমার বাপেদের সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না। দেখলে ত সেপাই-হাঙ্গামা—কোম্পানী কেমন ক'রে শাসন করলে।

রায়-গিন্নীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল—বলিলেন, দেখ প্রজা না হয় দোষ ক'রেছে—কিন্তু তাদের স্ত্রী পুত্র—

রায়-কর্ত্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—অসময়েই আজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া কাছারীতে চলিয়া গেলেন।

দিন পাঁচেক পর, রায় কর্ত্তা কালী-মন্দিরে সন্ধ্যা-তর্পণ করিয়া নাটমন্দির হইতে নীচে নামিতেছেন, এমন সময় [illegible] থামের সুদীর্ঘ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়াছিল কালী বাগ্দী—সে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—কালী?

শান্ত মৃদুস্বরে কালী কহিল—কাজ হ'য়ে গিয়েছে হুজুর।

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—তারা! তারা!

তারপর ডাকিলেন—অক্ষয়! অক্ষয় কালী-মন্দিরের পরিচারক। সে আসিলে বলিলেন - কালীকে মায়ের প্রসাদী কারণ দাও গিয়ে।

আবার বলিলেন -- কিছুদিন পর আবার একবার।

কালী নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

রায়-গিন্নীর কাছে সংবাদটা কিন্তু গোপন রহিল না। তিনি কাঁদিয়া কহিলেন, উঃ—এই বোশেখ মাস—কাল বোশেখীর দুর্য্যোগ—ছেলেমেয়ে নিয়ে—উঃ। রায়-কর্ত্তা গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিলেন।

রায়-গিন্নী আবার বলিলেন—লোকের দীর্ঘশ্বাসকে তুমি ভয় কর না, আমার ওই একটী সন্তান—।

বাধা দিয়া রায়-কর্ত্তা বলিলেন - রায় বংশে [illegible] নিয়ে চার পুরুষ - বিশ্বেশ্বর পঞ্চম পুরুষ—[illegible] হয়ে আসছে ব্রজরাণী, আর দুর্দ্দান্ত প্রজা শাসনও এই ধারায় আমাদের হয়ে আসছে। তুমি ওই ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী পুত্রের দিকে তাকিয়ে কথা বল। জান—দ্রৌপদীর বেণী দুঃশাসনের রক্তেই বাঁধা হয়েছিল। কৌরববংশে বিধবার আর সংখ্যা ছিল না।

ব্রজরাণী বলিলেন—কিন্তু গান্ধারীর অভিশাপে—প্রভাসের কথাও স্মরণ ক'র।

কর্ত্তা স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজরাণী বলিলেন—জান - আজ ক'দিন থেকেই আমি স্বপ্ন দেখি—

এবার হা হা করিয়া হাসিয়া কর্ত্তা বলিলেন, ছেড়ে দাও স্বপ্নের কথা। আর ভবিষ্যতই যদি স্বপ্নে তুমি দেখে থাক—তবে ত সে ভবিতব্য—মা তারার—আনন্দময়ীর ইচ্ছা!

তারপর গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—তারা—তারা!

রায়-গিন্নী কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যুগ্‌লা খানসামা সাড়া দিয়া সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দরদালান হইতে হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন—রায়-কর্ত্তার শ্যালক বীজনগড়ের জমিদার হরিনারায়ণ সরকার। আহ্বানের পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—রাধারাণীর হঠাৎ বিয়ের স্থির হয়ে গেল রায় মশায়! আপনাদের নিতে এলাম।

কর্ত্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, ভগ্নী ভাগ্নেকে নিয়ে যাও ভাই, আমায় নিয়ে যেয়ো না!

চকিত হইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, কেন—আমাদের কি অপরাধ হ'ল?

ব্রজরাণীও উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাবণেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, তোমাকে যে আমি ছাড়া অপরে শালা বলবে এ আমার সহ্য হবে না। আমার সম্মানে সরীক—

কথা সমাপ্ত না হইতেই হরিনারায়ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রজরাণীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, এখনও সখ আছে না কি? বল ত সত্যভামার মত আমিই না হয় রাধারাণীকে তোমার রথে তুলে দি।

কর্ত্তা শ্যালকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, বেশ ত গো সত্যভামা দেবী—তার আগে তোমার নারায়ণ কর্ত্তার মতটা নাও!

ব্রজরাণী চোখ মুখ লাল করিয়া বলিলেন—যাও!

* * * *

মাস দেড়েক পর। আষাঢ় মাস, সেদিন রথযাত্রার পূর্ব্বদিন।

রাধারাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তা কয়েক দিন পরেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু গিন্নী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর এখনও ফেরেন নাই। কর্ত্তার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন—বাবা, ব্রজর ত আসা বড় একটা ঘটে না, যখন এসেছে তখন মাসখানেক মায়ের মুখ চেয়ে রেখে যাও।

রাবণেশ্বর সে অনুরোধ ঠেলিতে পারেন নাই, যুগ্‌লা খানসামা, কালী বাগ্‌দী প্রমুখ কয়েকজনকে সেখানে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আগামী কল্য রথযাত্রার দিন রায়-বাড়ীর সদর পুণ্যাহ হইবে। এই দিনটী পুণ্যাহের জন্য বরাবর নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। পুণ্যাহের দিন দান-ধ্যান—কাঙালী ভোজন, নাচগান, জলসা ইত্যাদি সমারোহের বিপুল আয়োজন হইতেছে। সমস্ত রায়-বাড়ীর এই সময় রং ফিরান' হইয়া থাকে। লতায় পাতায় ঠাকুরবাড়ী সাজান হইতেছে। কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ ও যন্ত্রী আসিয়াছেন, সন্ধ্যায় জলসা-ঘরে জলসা হইবে।

আজ ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বর ফিরিবেন। আগামী কল্য রায়-গিন্নী উপস্থিত না থাকিলেই নয়। রায়-কর্ত্তা কালী-বাড়ী হইতে পুণ্যাহের রৌপ্য-কলস মাথায় করিয়া রাধা-গোবিন্দজীর দরবারে আনিয়া স্থাপন করিবেন, গোবিন্দ-মন্দিরে সে কলসী কাঁখে তুলিবেন রায়-গিন্নী। অন্দরে লক্ষ্মীর সিংহাসনে লইয়া গিয়া সে কলসী তিনি স্থাপন করিবেন—রাত্রে লক্ষ্মীপূজা করিবেন।

রায় সরকারের ভূ-সম্পত্তি বহু-বিস্তৃত, সারা বাংলাময়ই ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মৌজায় নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়াছে, পুণ্যাহপাত্র মণ্ডল প্রজারা সব—পুণ্যাহের টাকা লইয়া উপস্থিত হইবে। হুদ্দা-শ্যামপুরেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে—কিন্তু এখনও কেহ উপস্থিত হয় নাই।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে নায়েব আসিয়া বলিল—কই গিন্নী-মায়ের বজ্‌রা ত এখনও এসে পৌছুল না!

রায়-কর্ত্তা একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সময় এখনও যায় নি! কিন্তু হুদ্দা-শ্যামপুরের—। কথা শেষ না করিয়াই তিনি নীরব হইলেন।

নায়েব বলিল—কই, এখনও ত কেউ আসে নি।

এ কথার কোন জবাব না দিয়া কর্ত্তা বলিলেন, জলসা-ঘরে বাতি বল, আসর বসবে।

নায়েব বলিল—যে আজ্ঞে। তার পর আবার বলিল, গিন্নীমায়ের বজরা দেখবার ছিপ দু'খানা—আজকাল ভরা নদী—;

সচকিত হইয়া কর্ত্তা বলিলেন—দাও—পাঠিয়ে দাও!

* * * *

জলসা-ঘরে মজলিস চলিতেছিল। প্রকাণ্ড বড় একখানি হল-ঘর; এক শত লোকের স্বচ্ছন্দে স্থান সংস্থান হইতে পারে; একদিকে বড় বড় জানালা ও বারান্দার দিকে বড়

বড় দরজা। সেই ঘরের মেঝে জুড়িয়া বহুমূল্য গালিচা পাতিয়া তাহার উপর আসর বসিয়াছে। দেওয়াল ঘেঁসিয়া বড় বড় তাকিয়া দেওয়া আছে। মাথার উপরে সারি সারি বেলোয়ারী ঝাড় ও দেওয়ালে দেওয়াল-গিরির বাতির আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল। আতর গোলাপজলের গন্ধে ঘর আমোদিত। বারান্দার উপর দরজার মুখে মুখে দাঁড়াইয়া চাকরেরা বড় বড় তাল-পাখার মৃদু আন্দোলনে ঘরে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছিল। শ্রোতার দল নিস্তব্ধ, বাহিরে পরিচারকের দল সন্তর্পিত পদক্ষেপে মূকের মত চলা-ফেরা করিতেছে। একজন সেতারী সেতার লইয়া রাগিণী আলাপ করিতেছেন। তবল্‌চী তবলায় সঙ্গত করিয়া চলিয়াছে। যন্ত্র-ঝঙ্কারে বাতাসে যেন মৃদু তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—ঝাড়ের বাতির শিখা মৃদু মৃদু কম্পিত—ঘরের সমস্ত ধাতব-পাত্রের মধ্যে সে ঝঙ্কারে রেশ সঞ্চারিত—করস্পর্শে বেশ অনুভব করা যায়। সঙ্গীতে যেন ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ জলসা-ঘরের বারান্দায় আর্ত্তনাদ করিয়া কে আছাড় খাইয়া পড়িল। সে আর্ত্তনাদ যত মর্ম্মভেদী—সে কণ্ঠস্বরও তেমনি ভয়াবহ কর্কশ। মুহূর্ত্তে রাক্ষসের মত সে আর্ত্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।

বীজনগর হইতে আসিবার পথে আকস্মিক একটা ঝড়ের তাড়নায় ময়রাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজ্‌রাডুবী হইয়াছে। রায় গিন্নী, বিশ্বেশ্বর—কেহ ফেরেন নাই। ফিরিয়াছে একা কালী বাগ্‌দী। বারান্দার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল কর্দ্দমলিপ্ত দীর্ঘাকৃতি প্রেত-মূর্ত্তির মত কালী।

রায় গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা, তারা!

তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়-বাড়ী। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল—তারা—তারা!

নাটমন্দিরে পদচারণা করিতে করিতে রাবণেশ্বর সহসা স্তব্ধ অন্ধকার পুরীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন—আর জলসা-ঘরে আলো জ্বলবে না। রায় বংশ আজ নির্ব্বংশ! রায়-বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ভুবনেশ্বর রায় যেদিন গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন—সেইদিন ওই ঘরে জলসার বাতি জ্বলিয়াছিল। আজ চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল!

* * * *

কোন মতে পুণ্যাহ সমাপ্ত হইল। পুণ্যাহের পরদিন রায়-কর্ত্তা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন—শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ কর। পুরোণো ফর্দ্দে হবে না, নতুন ফর্দ্দ কর। রায়-বাড়ীতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না ক'রে থাকে। দশ দিনের মধ্যেই আমি কাজ শেষ করব।

রায়-কর্ত্তা নিজে অন্দরের মধ্যে বসিয়া মুসুবিদা আরম্ভ করিলেন দানপত্রের। সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। এ অন্ধকার পুরীতে—আর নয়। মা আনন্দময়ীর প্রজা তিনি—নিরানন্দ রাজ্যে থাকিতে তিনি পারিবেন না। বার বার ব্রজরাণীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন—তুমি জানতে পেরেছিলে, ঐশ্বর্য্য তোমায় মত্ত ক'রতে পারে নি। তারা—তারা!

ধন ও জনের অভাব রায়-বাড়ীর ছিল না, কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। সময় সংক্ষেপের জন্য সমস্ত ফর্দ্দ শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া আসিল।

দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে রায়-বাড়ী শোকের সমারোহে মুখর হইয়া উঠিল। হাজারে হাজারে সমাগত কাঙালীতে রাজারামপুর ভরিয়া গেল। মহলে মহলে নিমন্ত্রণ গিয়াছিল—মাতব্বর মণ্ডল প্রজাও সকলে আসিয়াছিল। পুণ্যাহে না আসিলেও ভুদাশ্যামপুরের প্রজারা এবার না আসিয়া পারিল না।

রায় বলিলেন—এসেছ তোমরা ভালই হয়েছে। গিন্নীর একটা অনুরোধ ছিল তোমাদের কাছে—আমিই সেটা জানাই। তোমরা দুঃখ পেয়েছ—তোমাদের সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে সেটা তোমরা গ্রহণ কর।

প্রজারা এবার সত্যই রাজার পায়ে গড়াইয়া পড়িল।

রায়-কর্ত্তা অবিচলিত অশ্রুহীনচক্ষে পত্নীপুত্রের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ করিলেন। একে একে সমাগত ব্যক্তিরা বিদায় লইলেন। হরিনারায়ণও আসিয়াছিলেন, তিনি অপরাধীর

মত বলিলেন, আমার অপরাধ আমি ভুলতে পারছি না রায়মশায়। আমিই নিমিত্ত হলাম।

রায় হাসিয়া বলিলেন—নিমিত্ত মানে হ'ল কারণ। আনন্দময়ীর প্রসাদী কারণ একটু খাবে হরিনারাণ, তাহ'লে বুঝবে কারণের মালিক কে?

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবা মা একটা কথা আপনাকে জানিয়েছেন।

—বল।

ইতস্তত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন—বলেছেন ব্রজরাণীর অভাবে এত বড় রায়বংশ যেন ভেসে না যায়।

—তারা—তারা!

কর্ত্তা ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন—রায়বংশ শেষের কথা এই মুহূর্ত্তে হরিনারায়ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে। বহুক্ষণ পরে হরিনারায়ণ আবার বলিলেন—আমার কথা এখনও শেষ হয় নি রায়মশাই।

রায় বলিলেন—বল তুমি হরিনারাণ, মাকে ডাকার ত সময় অসময় নাই! ডাকলাম একবার এমনি। বল, কি বলবে বল।

—বাবার মায়ের অনুরোধ, আমারও প্রার্থনা আপনার কাছে—নন্দরাণীকে আপনি—।

—অর্থাৎ আমার শালা ডাক তোমার বড়ই মিষ্ট লাগে—কেমন? বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নন্দরাণী হরিনারায়ণের সর্ব্বকনিষ্ঠা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী। হরিনারায়ণ কিন্তু এ হাসিতে মাথা নত করিয়া রহিলেন আর তিনি অনুরোধ করিতে পারিলেন না। সর্ব্বশেষ বিদায় লইলেন তিনি।

রায় এবার নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত এবার চুকিয়ে দাও, আর বাকী কি?

—আজ্ঞে হিসেব নিকেশ হ'তে এখনও কিছুদিন লাগবে। তা ছাড়া ভাণ্ডারই এখনও ভাঙ্গা হয় নি। সব জিনিষই দেখছি—অনেক উদ্বৃত্ত হয়েছে—কোন জিনিষ ছ-আনা, কোন জিনিষ সিকি—।

বাধা দিয়া বিরক্তিভরে রায় বলিলেন—থাক—ভাণ্ডার যেমন আছে তেমনি থাক। তুমি এই কাগজগুলো একবার দেখে দলিলে চড়িয়ে নিয়ে এস। এক গোছা কাগজ তিনি নায়েবের হাতে তুলিয়া দিলেন। কাগজ গোছার একখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নায়েব সকাতরে প্রভুর পানে চাহিল। রায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অদূরবর্ত্তী ভরা গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

* * * *

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই দলিল দস্তাবেজ প্রস্তুত হইয়া গেল। রায় সেদিন ভাবিতেছিলেন—এগুলি সদরে লইয়া গিয়া পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দারুণ বর্ষা নামিয়াছে—বর্ষণের আর বিরাম নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। এই দুর্য্যোগের মধ্যে।

সহসা তাহার হাসি আসিল—দুর্য্যোগ! এখনও দুর্য্যোগের ভয়!

আবার মনে হইল—আর পাকা করিবারই বা প্রয়োজন কি? যে বস্তু ত্যাগই করিবেন—তাহার জন্য আবার মায়া কেন—বন্দোবস্ত করিয়া ত্যাগের কি কোন অর্থ আছে? খোলা সিন্দুকের সম্মুখেই দলিলগুলি পড়িয়া রহিল—সিন্দুকের চাবী পড়িয়া রহিল শয্যার উপর। রায় গঙ্গার দিকের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির ঝাটে বাতাসে ঘরখানা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। তাঁহার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না—সবিস্ময়ে তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দুই কুল ভাসাইয়া গঙ্গা পাথার হইয়া উঠিয়াছে! আর কি গর্জ্জন! কিন্তু এত ফেণা কেন? রাশি রাশি পদ্মপুষ্পের মত ফেণা ভাসিয়া চলিয়াছে। বহুকাল গঙ্গার এমন ভৈরবী মূর্ত্তি তিনি দেখেন নাই! থাকিতে থাকিতে সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া ওই গঙ্গার সলিলরাশির মধ্য হইতে ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বরের মুখ ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গার রাক্ষসী রূপ দেখিয়া তাহাদের কথাই মনে জাগিয়া উঠিল।

হুজুর!

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নায়েব আসিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাকিল, কিন্তু সে ডাক রায়কর্ত্তার কানে পৌছিল না। সাহস করিয়া নায়েব ঘরে প্রবেশ করিল।

—সর্ব্বনাশ হয়েছে হুজুর—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে। বানের জল ছুটে আসছে তালগাছের মত উঁচু হয়ে।

রায়ের কানে গেল না। তিনি ভাবিতেছিলেন ওই যে

গঙ্গার কল-কল্লোল—ও কি তাঁহার ব্রজরাণীর ডাক! ব্রজরাণী এত মুখরা হইল কি করিয়া!

নায়েব আর একবার ডাকিল—কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া অগত্যা চলিয়া গেল।

এতক্ষণ পর রায় হঠাৎ ডাকিলেন—কে রয়েছিস?

একজন খানসামা আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন, কেলে বাগ্দীকে পাঠিয়ে দে! সে চলিয়া গেল, রায় তেমনি-ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালীচরণ আসিয়া নত মুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

রায় বলিলেন—সন্ধ্যের সময় কালীবাড়ীর ঘাটে একখানা ডিঙ্গি নিয়ে তৈরী থাকবি। সঙ্গে কাউকে দরকার নাই। আমি ধরব বোটে।

নিঃশব্দে কালীচরণ চলিয়া গেল। ভৃত্যটা এবার সাহস করিয়া বলিল, হুজুর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল!

পরম প্রসন্নকণ্ঠে রায় বলিলেন—হ্যাঁ রে, নিয়ে আয় আমার কাপড় নিয়ে আয়—স্নান সেরে মন্দিরে যাব। তারা—তারা!—ও কি গোলমাল কিসের রে নীচে?

—আজ্ঞে গাঁয়ে বান ঢুকেছে তাই লোকে চীৎকার করছে।

রায় দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। কালীবাড়ী গোবিন্দবাড়ীর সম্মুখ তখন দরিদ্র নরনারীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সামান্য সম্বল পোঁটলায় বাঁধিয়া মাথায় করিয়া শিশু নারীর হাত ধরিয়া রায়-বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুধাতুর শিশু বালকের চীৎকারে চারিদিক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

রায় প্রথমেই বলিলেন—ফটক খুলে দাও—ফটক খুলে দাও।

নায়েব বলিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ছুটেছে।

রায় শিহরিয়া উঠিলেন—সর্ব্বনাশ—তাহ'লে গ্রাম যে ডুবে যাবে! মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—এখুনি তুমি বেরিয়ে পড়। গ্রামের সমস্ত ভদ্র পরিবারকে জোড়-হাত ক'রে আহ্বান জানিয়ে এখানে নিয়ে এস। অন্দর সদর সমস্ত মহল খুলে দাও।

ওদিকে ক্ষুধার্ত্তের দল চীৎকার করিতেছিল—রাজাবাবু খেতে দাও। হুজুর, রক্ষে কর।

রায় নায়েবের দিকে চাহিলেন—নায়েব বলিল, কোন ভাবনা নাই—গিন্নী-মায়ের শ্রাদ্ধের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ।

রায় ঊর্দ্ধমুখে ব্রজরাণীকেই স্মরণ করিলেন। এ কি—কে—কে?

নায়েব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, উঠুন—উঠুন—গাঙ্গুলী মশাই! কি হ'ল কি?

বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলী আসিয়া রায়-কর্ত্তার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে।

রায় তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া প্রতি-প্রণাম করিয়া কহিলেন—বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

গাঙ্গুলী বলিল, রক্ষে করুন রায় মশাই, আমার মান ইজ্জত সব গেল। আমার কন্যার আজ বিবাহ। পাত্র পক্ষ এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বন্যাতে আমার সব পণ্ড হ'ল। তৈরী রান্নার ওপর রান্নাঘর ভেঙে পড়েছে।

রায় নিজেই অগ্রসর হইযা বলিলেন—আপনার নয়—আমার কন্যার বিবাহ। ভয় কি আসুন, বিবাহ হবে রায়-বাড়ীতে। চলুন আমি পাত্র নিয়ে আসি।

নায়েব হাঁক দিয়া কহিল—ছাতা—ছাতা।

* * * *

সমস্ত রায়-বাড়ী সদরঅন্দর গ্রামের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীৎকারে কলরবে গঙ্গার গর্জ্জনও ঢাকা পড়িয়াছে। বন্ধ আছে শুধু রায় কর্ত্তার শয়নকক্ষ লক্ষ্মীর ঘর ও জলসা ঘর।

রায়-কর্ত্তা ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, আর মুহুর্মুহুঃ বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন।

নায়েব আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, বিবাহের আসর কোথায় হবে—নাটমন্দির সব ভরে গেছে।

হুকুম হ'লে জলসা ঘরে—কথা সে সমাপ্ত করিতে পারিল না। রায়ের কানে কিন্তু কোন কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি অন্যমনস্কভাবেই বলিলেন—হুঁ।

নায়েব চলিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। পরিধানে একমাত্র বস্ত্র—নগ্ন পদ—কপর্দ্দক পর্য্যন্ত সম্বল নাই—হাতে শুধু

এক লাঠী লইয়া রায় অন্দরের খিড়কীর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গভীর অন্ধকার—ভীষণ দুর্য্যোগ।

রায় ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন—কেলে!

অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকারের মত কালীচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। রায় একবার রায়-বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ কি, জলসা-ঘর আলোয় আলোময় হইয়া উঠিয়াছে যে! উন্মুক্ত সুবৃহৎ জানালার মধ্য দিয়া রায় দেখিলেন জলসা ঘরে বিবাহের মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। একদিকে দাঁড়াইয়া বর—কন্যা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘন ঘন হুলু ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে জলসা-ঘর উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছে! রায় দেখিলেন—বাতিদানের বাতিগুলি সমস্তই ছোট ছোট, প্রায় অর্দ্ধেক। ওঃ—সে দিনের নির্ব্বাপিত অর্দ্ধদগ্ধ বাতিগুলি আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

রায় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, একি পনের দিন পূর্ব্বে—নির্ব্বংশ রায়-বাড়ীতে আজ এই ঘনায়মান দুর্য্যোগের মধ্যে—পৃথিবী যখন আর্ত্ত চীৎকারে ভরিয়া উঠিয়াছে—তখন কেমন করিয়া সেখানে বিবাহের বাসর সাজিয়া উঠিল! অকালে নির্ব্বাপিত দীপমালা—এই দুর্য্যোগের অন্ধকারে এই পরম মুহূর্ত্তটীতে কে জ্বালাইয়া দিল। তাঁহার চোখ দিয়া জল আসিল—তিনি সজলচক্ষে সেই অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যুবর্ষণ মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাশে নির্ব্বাক কালীচরণ।

এদিকে নাটমন্দিরে ঘন ঘন আহার-তৃপ্ত ক্ষুধার্ত্তেরা জয়-ধ্বনি তুলিতেছিল—অক্ষয় হোক রায় হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক। আমরা সুখে বেঁচে থাকি। রায় আবার জলসা ঘরের দিকে চাহিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতিকৃতিগুলি সজল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। এ-কি—ভুবনেশ্বর রায়—ত্রিপুরেশ্বর রায় কি তাঁহাকে ডাকিতেছেন? তিনি গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—তারা—তারা—আনন্দময়ী তারা!

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন—ফিরে আয় কেলে।

কালীচরণ—নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া কালী-বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত করিল।

* * * *

ছিন্ন ফর্দ্দখানায় এই ইতিহাস, শুধু শ্রাদ্ধই নয়—ওই ফর্দ্দে বিবাহও হইয়াছে। সুধাংশুর পিতামহী রায়-বাড়ীতে বিবাহিতা—সেই গাঙ্গুলীর কন্যা।

বালির ইতিহাস

শ্রী প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

বালি হাওড়া জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত—হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন সমাজ-স্থান ও বর্দ্ধিষ্ণু সহর। উত্তরে বালিখাল, দক্ষিণে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা, পূর্ব্বে হুগলী নদী এবং পশ্চিমে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল লাইন—এই চৌহদ্দী মধ্যস্থিত; লিলুয়া, ঘুসুড়ির কতক অংশ এবং পুরা বেলুড় ও বারাকপুর লইয়া বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল বালি। কিন্তু পূর্ব্বে—উত্তরপাড়া বালির উত্তরে অবস্থিত উত্তর পাড়া মাত্র ছিল এবং তিনশত বৎসরের প্রাচীন স্থানীয় কুলগ্রন্থে "কোতরঙ্গ বালী" এই ডাক নাম পাওয়া গিয়াছে*—ইহাতে এককালে বালি যে কত বড় ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমান বালির আয়তন ৩.১ বর্গ মাইল। ১৯৩১ খৃঃ সেন্সাস্ অনুযায়ী বালির জন সংখ্যা ৩০৩৪৭, ১৮৮১ অব্দে ছিল ১৪৮১৫।

* 'কোতরঙ্গ বালী আর কোট মৌড়েশ্বর
ডাক পাক নবকুল ইহার ভিতর"
[গ্রহবিপ্রকুলবিচার]
"দশ গোত্র ছাপান্ন ঘর কোতরঙ্গ বালী কোট মৌড়েশ্বর
কুটুম্বিতায় সংখ্যা এই স্থান নির্ণয়।"
[কুলানন্দকারিকা]

বালির নাম-উৎপত্তি সম্বন্ধে মিঃ সি-এন-ব্যানার্জ্জি "Howrah Past and Present 1872" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"the river in the process of silting deposited a very large heap of sand, the gradual accumulation of years, hence when it came to be inhabited it got the name Bali from the first settlers." আর মগধাধিপ বৈজলরাজের সভাপণ্ডিত কবিরাজ "দিগ্বিজয়-প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগলিক গ্রন্থ "কিলকিলা বিবরণে" লিখিয়াছেন;—

হিবার্স জার্ন্যালোক্ত মন্দির

"শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাপদঃ
শ্রীরামাদিপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্থ সন্নিধৌ ॥ ৬৬৯"

—শ্লোকে বালিগ্রামের সংস্কৃত নাম বালুকঃ বা বালুকা—বাংলা বালি নামের সহিত চরের বালি এই অনুমান সমর্থন করিতেছে। বালির বহু স্থানে মৃত্তিকা খননকালে নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে—তাহাতেও চরের বালি হইতে. বালি নামের উৎপত্তির মত সমর্থিত হয়।

বহু প্রাচীন পুঁথিতে বালির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম প্রণীত "সত্যনারায়ণের পুঁথিতে" আছে—

"ভদ্রখালি বালি বামে বরাহনগর
ডিহি কলিকাতা বাহি চলে সদাগর ॥"

বিজয়রাম সেন রচিত "তীর্থ-মঙ্গল" ও দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" প্রভৃতিপুঁথিতে বালির উল্লেখ আছে। কিন্তু "গেজেটিয়ার" প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে "কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে" বালির উল্লেখ আছে; চণ্ডীকাব্যে বালির উল্লেখ পাই নাই।

বালি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থের একটী প্রাচীন সমাজ স্থান। তন্মধ্যে বালির দত্ত ও বালির ঘোষ লোকপ্রসিদ্ধ।

দাঁয়েদের রাস মন্দির

গৌড়াধিপ বিজয়সেনের অভ্যুদয়কালে (১০৭২ খৃঃ) পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সহিত যে পঞ্চ-কায়স্থ আসিয়াছিলেন—দত্ত বংশের ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম তাহাদের অন্যতম। তিনি এই পঞ্চ-কায়স্থের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন—তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আগমন করিয়াছিলেন—তাহাতে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়

ব্রাহ্মণা শকটে ঘোষ বসু মিত্রা হয়ে ত্রয়
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠ নবযানে গুহস্তথা।

দত্ত বংশমালা

রাজসভায় ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় না দেওয়ায় পুরুষোত্তম নিষ্কুলীন হন—এই জন্যই

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি।

দ্বিজঘটকচূড়ামণির কারিকা

ভট্টনারায়ণের সহিত আগত মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ নিশাপতি বালিতে আসিয়া বাস করেন। ইহা হইতেই "বালির ঘোষ" সামাজিকদিগের উৎপত্তি।

১৪৮০ খৃঃ দেবীবর মেল-বন্ধনকালে বালি মেলের প্রবর্ত্তন করেন—

বালির বাসুদেব মূর্ত্তি

"ফুলিয়া খড়দো দেহাটা বাঙ্গালো বালি সংজ্ঞকাঃ
নড়িয়া যড়িকে মেলাঃ প্রকৃতি গ্রাম নামতঃ ॥"

বালি মেল বন্ধন সম্বন্ধে রাঢ়ীয় বিখ্যাত কুলাচার্য্য শ্যাম চতুরানন লিখিয়াছেন—

"বিষ্ণুদাস ঘোষলী ছিল।
ঘটকে কীর্ত্তি করি ঘোষাল করিল ॥
এই বিষ্ণু কন্যা চট্ট বিষ্ণু বিয়া কৈলা।
তৎপশ্চার্ৎ লথাই বন্দ্যো কন্যা আনি দিলা ॥
এই দোষে লথাই পুত্র বালি গ্রামে বৈসে।
লথাই স্থগিত কথোকালে কেশরকুনী-দোষে ॥"

রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রসমাজের মধ্যে বালির আচার্য্য সমাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমাজের অধ্যুৎ পঞ্চানন তৎকালে একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে শনিগ্রহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি বালির পঞ্জিকা সম্পাদনা করিতেন—বালির পঞ্জিকা তৎকালীন পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল। শ্রীচরণ বিদ্যানিধি বালির সর্ব্বশেষ পঞ্জিকাকারক।

বালি ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজ—এই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ সি এন ব্যানার্জ্জি লিখিয়াছেন Bali has always been the seat of ancient and respectful Rari Brahmanical families, second only to Krishnanagor" ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৪৫এ আছে "Bally however is still one of the most orthodox and holy town in the neighbourhood of Calcutta. It is said to contain no fewer than a thousand families of Brahmans. বালি গোঁড়াব্রাহ্মণদের সমাজ বলিয়া ভোলানাথচন্দ্র লিখিয়াছেন "It is a very old and orthodox place" বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল"এ পাই—"বালীতে অনেক ভদ্রলোকের বসতি—প্রায় অনেকের বাটীতে শালগ্রাম আছেন—এজন্য শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনির ন্যূনতা ছিল না।" নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান বলিয়া নন্দকুমারের ফাঁসির পর বহু ব্রাহ্মণ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বালিতে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

বালির পুষ্করিণীতে দুইটী প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গুপ্তরাজগণের (৩২০-৪২০ খৃঃ) ও তৎপরবর্ত্তী যুগে হিন্দু ভাস্কর্য্য চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মনুষ্যাকৃতি গরুড়বাহনবিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি খৃঃ চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত। বালিতে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণু মূর্ত্তির আলোক-চিত্র প্রকাশিত হইল।

এই মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে গদা, দ্বিতীয় হস্তে পদ্ম, বামদিকের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে

শঙ্খ। বিকশিত শতদলোপরি বিষ্ণু দণ্ডায়মান, মুখখানি প্রসন্ন গম্ভীর। পাদপীঠস্থ শতদলের উভয়দিকে দুইটী মৃণাল উত্থিত হইয়াছে। তাহার বৃন্তে দুইটী অর্দ্ধস্ফুট কোরক। তদুপরি বিষ্ণুর নিম্ন হস্তযুগল সংন্যস্ত। পশ্চাৎদিক হইতে জানু পর্য্যন্ত মনোহর বনমালা বিলম্বিত। মূর্ত্তির শিরে বিচিত্র কারুকার্য্য-মণ্ডিত সুশোভন কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, হস্তে বলয়, কণ্ঠে মাল্য ও রত্নখচিত হার, বক্ষে কৌস্তভমণি। বামস্কন্ধ হইতে নাভির উপরিভাগ পর্য্যন্ত মাল্যাকারে লম্বিত উপবীত। কটিদেশে কৌপীন, তদুপরি মনোহর বহির্ব্বাস। পদদ্বয়ে নূপুর। বিষ্ণুর দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। চামরহস্তা শ্রী ও বীণাপাণি সরস্বতী ত্রিভঙ্গাকৃতি হইয়া কমলাসনে দণ্ডায়মানা। উভয় মূর্ত্তিই সাভরণা। মূর্ত্তির নিম্নদেশে বামে পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি গরুড় ও দক্ষিণে পূজোপকরণ হস্তে রমণী উপবিষ্টা।

মধ্যভাগের উভয়পার্শ্বে অশ্ব করীপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, তদুপরি মকরমুখ, মকরপৃষ্ঠে হংস। সর্ব্বোপরি মাল্যহস্তে উড্ডীয়মানা অপ্সরাযুগল এবং শীর্ষদেশে কীর্ত্তিমুখচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ, একখণ্ড মসৃণ শ্লেট প্রস্তরে নির্ম্মিত। দৈর্ঘ্যে আড়াই ফুট, প্রস্থে এক ফুট দুই ইঞ্চি। স্পষ্টই অনুভূত হয় ইহা কোন স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন ছিল। স্তম্ভটী পাওয়া যায় নাই।

সুবিখ্যাত বেলুড় মঠ ও ঘুসুড়ির বৌদ্ধ-মন্দির ভোট-বাগান ব্যতীত বালির সর্ব্বত্র বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত—তন্মধ্যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়।

বালির ধর্ম্মপূজা কত প্রাচীন তাহার সঠিক হিসাব আজ পাওয়া সহজ নহে—জনশ্রুতি বিশ্বাস করিলে ইহাকে বালির প্রাচীনতম অনুষ্ঠান বলা চলে। কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, তোয়ের, পোদ, কেওড়া প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীই বালির আদিম অধিবাসী এবং এই নিম্নজাতিরাই ধর্ম্মের উপাসক। এই স্থানে কচ্ছপের আকৃতি একটি ধর্ম্মঠাকুর আছেন—এই কচ্ছপ স্তূপের অনুকরণ ও ইহা বৌদ্ধযুগের পূজা বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত।

বালিখালের সন্নিকটে ১২০৯ সালে শোভাবাজার রাজ-বাড়ীর কৃষ্ণচরণ দে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে অত্যন্ত সুন্দর ছিল। হিবার্স জার্ণালে ইহার উল্লেখ আছে। তাহারই নিকট একটি জৈন মন্দির ও রত্নাপাখী নামক দুর্দ্দান্ত ডাকাইত প্রতিষ্ঠিত "ডাকাতে কালী"র মন্দির আছে।

দয়ারাম বসু প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত প্রাচীন কল্যাণেশ্বর মন্দিরে বৈশাখী মেলায় বহুদূর হইতে যাত্রী সমাগম হয়। এই মন্দির এক রাত্রে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী "দেওয়ান-গাজী" পীরের আস্তানা—হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পুণ্য তীর্থ স্থান।

বালি-বারাকপুরের "দাঁয়েদের" রাসের নাম বহুবিস্তৃত। ১২৯৭ সালে পূর্ণচন্দ্র দাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসের সময় এই স্থানে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে।
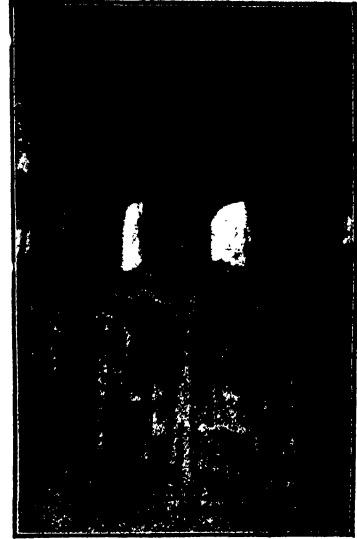
প্রাচীন নহবৎখানা

এতদ্ব্যতীত ১২৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত জোড়ামন্দির, সেনপাড়া কোঙারদের জোড়ামন্দির, ওঙ্কারমল জেটিয়া প্রতিষ্ঠিত পাথরের মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এককালে বালিতে একচল্লিশ বা ততোধিক চতুষ্পাঠী ছিল এবং অনেক সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিকের বাস ছিল। বহুপূর্ব্বে গঙ্গানন্দ বাচস্পতি মহাশয় সম্পাদিত "শুভকরী পত্রিকা" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। পত্রার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সুসাহিত্যিক বালির অধিবাসী ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়

শেষ জীবনে বালিতে একটি রমণীয় উত্থান করাইয়া বাস করিতেন। এই উত্থান ও তৎসংলগ্নবাটী এত বৈজ্ঞানিক সংগ্রহে পূর্ণ ছিল সে তৎকালীন সাহিত্যিকগণ ইহাকে "চারুপাঠ চতুর্থভাগ" আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বালিতে পর্ত্তুগীজদের বৃহৎ মদের ভাটি ছিল। এই স্থানে এক পাদরী সাহেব বাস করিতেন, স্থানীয় বহুগ্রাম্যলোককে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; সাহেব বাগানে তাঁহার স্মৃতি ফলকে লিখা আছে—

মান্ধবর শ্রীল শ্রীযুক্ত জন স্পেনশর মেকলিয়ন সাহেবের স্মরণার্থে এই উত্থান তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ১৭৮৫ সালে ৬ এপ্রেল জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৯ বৎসর ১০ মাস ১৬ দিবস জীবন ধারণ করিয ১৮৪৮ সালের ২২ ফিব্রুয়ারীতে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

মারাঠা দস্যুগণ বালির উত্তরে অবস্থিত উত্তরপাড়ায় ছাউনি গাড়িয়াছিল—তাহাদের অত্যাচারের বহু কাহিনী বালিতে শোনা যায়।

বালিখাল গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া সেওড়াফুলি খালে মিশিয়াছে; খালটি স্বাভাবিক। সেওড়াফুলি জমিদারীর সীমা নির্দ্দেশ কল্পে খালটী সংস্কারের সময় খননকালে কয়েকটী মাস্তল প্রভৃতি পাওয়া যায়; মুসলমান রাজত্বকালে বর্দ্ধমানের কানুনগো রাজা বালিতে বাস করিতেন—ইহা তাঁহারই ব্যবহৃত বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে খালে কোন সেতু ছিল না—খেয়া নৌকাযোগে অতিক্রম করিতে হইত—এই স্থানকে সদরঘাট বলিত। খেয়া ঘাটে বৎসরে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় হইত। ক্যাপ্টেন গুডউইল এর তত্ত্বাবধানে ১৮৩৫-৪৫ অব্দে একটি ঝুলান ব্রিজ নির্ম্মিত হইয়াছিল—ঝুলান ব্রীজটী তৎকালে বাংলার দেখিবার জিনিষ ছিল। ইহারই নিকট নূনের ঘাঁটি—চৌকিঘাটা ছিল।

১৮৩৫ খৃঃ এইস্থানে ব্যেগ স্ব কোংর চিনির কারখানা ছিল। এই কোম্পানী বহু কোম্পানীর হস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া ১৮৬১ খৃঃ বোর্ণিয়ো কোং কতৃক ক্রীত হয় ও শ্রীরামপুরের কাগজের কল উঠিয়া যাইলে তাহা ক্রয় করিয়া এই স্থানে বিখ্যাত "রয়েল পেপার মিল" প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত বালির কাগজ এই মিল হইতে প্রস্তুত হইত। পরে ১৯০৯ সালে এই স্থানে জুট মিল স্থাপিত হইয়াছে।

কোষ্ঠীর জের

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস-সি

(৯)

বিয়ে বাড়ী খালি হ'য়ে যাবার পর—শীলা একদিন আমাকে ব'ললে "সমীরদা, আপনিও এই দলে ভিড়ে গেলেন? আমাকে বাড়ী থেকে না তাড়ালে কি আপনাদের ঘুম হয় না? বাবা মা ত' মেয়েকে আজ পেলে কাল বিদেয় ক'রতে চান না। আমার দুঃখ কি কেউ বুঝবে না? আমাকে কি বিষ খেয়ে মরতে হবে?" এই ব'লে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত ক'রে বাড়ী পাঠালাম। তাকে পাঠিয়ে নিজে উদাস হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রতে লাগ্‌লাম—কাতরভাবে—হে ভগবান, শীলার কোন অমঙ্গল যেন না হয়, তাকে সুখী করো।

দিনকয়েক পরে আভা এল। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত এখানেই থাকিবে—স্থির হইয়াছে। শীলাকে আভা মহা গর্ব্বভরে বলল, আমি তোর বর কেড়ে নিয়েছি ব'লে আমাকে গাল দিস্ না। তোর ব্যবস্থা আমি শীগ্‌গীরই কর্‌ছি। শীলা বলে "না ভাই, আমি তোকে নিজে হাতে খুশী হ'য়ে তুলে দিয়েছি—বছর না পেরোতে কোলে ছেলে নিয়ে ঘরে ঢোক্—এই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—আমার ব্যবস্থা গলায় দড়ি কিম্বা বিষের—আমি নিজেই ক'রব।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষার আর তিন মাস বাকী। দু'জনেই প্রাইভেট দেবে। নানা গোলমালে প'ড়ে আভা স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছে—কারণ তারা তাকে টেষ্ট্ দিতে এবারে অনুমতি দিতে রাজী নয়। তার অনেক নাকি কামাই
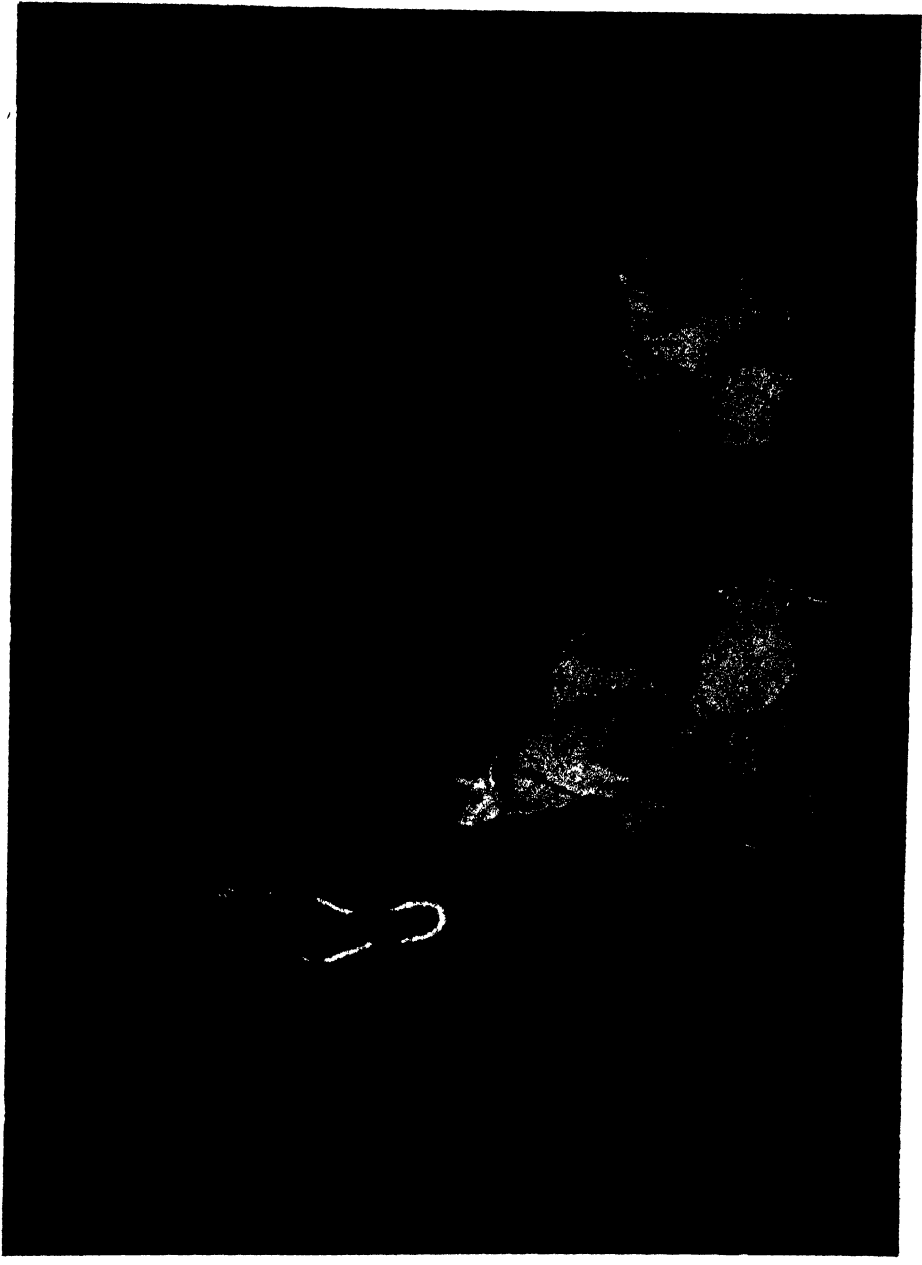
গোষ্ঠ বিহার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সন্তোসকুমার সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

হ'য়ে গেছে। মহাসমারোহে দু'জনে প'ড়তে লেগে গেল। মাসিমা শীলার কাণ্ড দেখে গালে হাত দিয়ে প'ড়লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরীক্ষা এসে গেল। দু'জনে মহা উৎসাহে পরীক্ষা দিয়ে এল এবং দু'জনেই ভাল ক'রে পাশ ক'রে ফেল্লে। আভা চ'লে গেল—শীলার কোনও ব্যবস্থা না ক'রেই। নির্ম্মল তার মা'দের দেশ থেকে নিয়ে এসে বাসা ক'রল—আভা সেইখানে গেল। মধ্যে মধ্যে শীলার সঙ্গে এসে দেখা ক'রে যায়। শীলার যা দরকার সে আজকাল আমাকেই এসে আগে বলে। আমি তার বাবা মাকে যেটা বল্‌বার সেটা বলি, যেটা নিজে পারি করি। আভার মত সঙ্গীর অভাব শীলা আমাকে দিয়ে পূরণ ক'রছে।

একদিন দু'পুরে আমি একটা গান রচনা ক'রেছি। সেটা খাতাতেই লিখে রেখে একটা কাজে বেরিয়েছি। বিকেলে ফের্‌বার সময় রাস্তা থেকে শুন্‌তে পাচ্ছি, শীলা হার্ম্মোনিয়মের সুরের সঙ্গে সেই গানটি গাইছে। এর মধ্যে কখন সে এসে আমার শেষের রচনাটি নকল ক'রে নিয়ে গিয়ে তাকে সুর দিয়ে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে ভেবে আমি আশ্চর্য্য হ'লাম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শীলা সপ্তদশ বৎসর উত্তীর্ণ হ'ল। মাসীমার ভেবে ভেবে আহার নিদ্রা ত্যাগ করবার অবস্থা হ'ল। শীলার এইভাবে দিন কাটিয়ে যেতে মহা আনন্দ লাগ্‌ছে। আভার একটি হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে হ'য়েছে—তুলোর মত নরম তার গা, আর দুধের মত সাদা তার গায়ের রঙ্‌। আভা ছেলেকে দেখিয়ে নিয়ে গেল। শীলার মহা ফুর্ত্তি—তার আশীর্ব্বাদ আভার ওপর ফ'লে গেছে। উভয়ে উভয়কে চিমটি কেটে নিজেদের আন্তরিকতা দেখালে। শীলা মাসীর দাবীতে ছেলের নাম রাখলে 'টুলু'।

(১০)

মাসীমা একদিন দুপুর বেলায় একটি খাম হাতে ক'রে চুপি চুপি মাকে এসে ব'ল্লেন, "শোভা লিখেছে একটি ছেলের কথা। বাড়ীঘর খুব ভাল। ছেলে সেখানকার কলেজের প্রফেসার। শীলা ম্যাট্রিক পাশ শুনে তাকে দেখতে রাজী হ'য়ে পাত্র ক'লকাতায় আসছে। যদি পছন্দ হয়, আর মা জগদম্বা যদি দয়া করেন, তবে হয়ত আটকাবে না। মেয়েকে এখনও জানান হয় নাই। জান্‌লে হয়ত কেঁদে ভাসাবেন।" নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতে একটি অরুণ-কান্তি যুবক শীলার বাবার বাহিরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হ'লেন। অতি সমারোহে মিঃ বসু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে এলোচুলে প্রাতঃস্নাতা শীলাকে একটি অছিলাতে তাহার মা বাহিরে তাহার পিতার সঙ্গে কল্পিত প্রয়োজনে কিছু বাক্যব্যয় করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আগে থেকে সব বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। নবাগত যুবক শীলাকে পছন্দ ক'রে ফেল্‌লেন।

এক কথায় বিবাহের দিন ঠিক হ'য়ে গেল। মাঘ মাসের দশ তারিখে আশীর্ব্বাদ, বার তারিখে বিয়ে। মধ্যে সময় খুব অল্প। মাসীমার আজ কতদিন পরে আরামের নিশ্বাস পড়ল। তিনি যেন চ'লতে চ'লতেই আজ ঘুমোচ্ছেন। শীলা সব জান্‌ল। সে চুপ হ'য়ে গেল—কোনও কথা এ বিষয়ে কাকেও ব'লল না। আমার সঙ্গে আর কচিৎ তার দেখা হয়। হ'লেও একটা নির্লিপ্ততার প্রলেপ তার গায়ে মাখান আছে—এম্‌নি ভাব। পাত্রের পিতা আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন। আভা এখানেই ছিলো। ক'দিন শীলাদের বাড়ীতেই থেকে গেল। শোভাও এলেন। খুব ধুমধামের সঙ্গে শীলাকে সরোজকুমার রায় (প্রফেসার, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি)—বিয়ে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন। শীলা একবার যাবার সময় আমার দিকে চেয়েছিল—আমার প্রাণ বুঝেছিল সে নীরব নয়নের ভাষা।

সকলের পায়ের ধুলো নিয়ে সে গিয়ে মটরে সরোজের পাশে ব'সল—নিশ্চল পাথরের মত স্থির তার সম্মুখে দৃষ্টি। তার মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে। মাসীমা ও মা চোখের জল মুছতে মুছতে তাকে শান্ত ক'রলেন। জিমের কাছে এ বিদায় দৃশ্য অসহ্য হ'ল। সে নিজের ভাষায় জানিয়ে দিলে যে সে শীলার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ী না যেতে পেলে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রবে। জিমের ব্যবস্থার কথা ভেবে শীলা অসহায়ভাবে তার পশু-মনস্তত্ত্ববিৎ সমীরদার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি ব'ললাম "ওর ব্যবস্থা আমি ক'রব—তুমি ভেবো না। ও এখন দরজার আড়ালে শেকল বাঁধা থাক্‌।" একটা চাকর তার সেই ব্যবস্থা ক'রলে।

(১১)

আটদিন পরে শীলা সরোজের সঙ্গে ফিরে এল। আভাকে খবর দিয়ে আনান হ'ল। দু'জনে পরস্পরের তত্ত্বতাল্লাস নিতে লাগল। সরোজ, নির্ম্মল ও আমি বাইরে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলাম। সরোজ ছেলেটি অতিশয় নম্র, নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির লোক। তার দিকে তাকালে চোখ যেন জুড়ায়। যেমন গুণ, তেম্‌নি মিষ্টি চেহারা—তেম্‌নি ব্যবহার। আমি তার সঙ্গে আলাপ ক'রে—বড় তৃপ্ত হলাম। কয়েক ঘণ্টাতেই আমরা তিনজনে এক আত্মা হ'য়ে গেলাম। শীলা কখন এসে আড়াল থেকে এ দৃশ্য দেখে গেছে—সে খবর পরে জানি।

আভা টুলুকে শীলার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরোজের সঙ্গে কিসের বেন বোঝাপড়া ক'রতে এল। আমি উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গেই শীলাও ঘরে এসে এদের দলে ভিড়্‌ল। কিছুক্ষণ উদাসভাবে পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি শীলা আমাকেই যেন লক্ষ্য ক'রছে। চারচোখ মিল্‌তেই সে চোখ নামিয়ে নিলে।

সরোজ দু'তিনদিন থেকে শীলাকে নিয়ে গেল। নির্ম্মলের অনুমতিক্রমে আভাও তাদের সঙ্গে দিনকতকের জন্য এলাহাবাদ বেড়াতে গেল। সরোজ বলে গেল—পূজার ছুটীতে শীলাকে নিয়ে আস্‌বে। নির্ম্মল দিন পনের পরে গিয়ে আভাকে নিয়ে এল। আভা মাসীমাকে ব'লে গেল, শীলা খুব মনের আনন্দে আছে। খুব বড় বাড়ী—লোকজন। মেয়ের সুখের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে ব'লে মাসীমা ছত্রিশ কোটি দেবতার নিকট করযোড়ে প্রণাম ক'রলেন।

পূজার সময় শীলার শ্বাশুড়ী মাসিমাকে লিখে জানালেন "এখন তার কলিকাতা যাওয়া হবে না। বড়দিনে যাবে।" বড়দিনেও হ'ল না। পরের ইষ্টারের ছুটীতে সরোজ শীলাকে নিয়ে এল। কোলে তার একটি মোমের পুতুলের মত ধব্‌ধবে ছেলে। মাসীমা ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগলেন। শীলার শ্রী যেন দেহে আর ধরে না। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ছেলেকে আমার কোলে দিয়ে ব'ললে, "এর কি নাম রেখেছি বলুন ত সমীরদা?" আমি ব'ললাম "এর নাম হওয়া উচিত পুতুল।" সে বলিল "ধ্যেৎ, এর নাম সমীরণ রায়।" আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। শীলা যেন কথাটা আমার মুখে ছুড়ে দিলে, আর তার ফলাফল দেখার জন্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমার মুখ এদিকে ফ্যাকাশে হ'য়ে যাওয়া দেখে সে যেন একটা পরিতৃপ্তি লাভ ক'রল।

আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে একটা লেক্‌চারারের কাজ যোগাড় ক'রেছি। শীলা ব'ললে, "সমীরদা চাকরী হ'ল—এবার একটা বিয়ে কর।" আমি বললাম্‌—"থাম—আটাশ বছরের পর ভূত হয়ে থাকি, না মানুষ হ'য়ে থাকি—তা দেখ।" কথাটা শুনে সে যেন বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উঠে এল। চুপ ক'রে গেল। ছেলে কেঁদে উঠ্‌ল দেখে আমার কোল থেকে নিয়ে সে ভেতরে মায়ের কাছে গেল। আভা ইতিমধ্যে এসে হাজির হ'য়েছে। সে ছোঁ মেরে তার কোল থেকে ছেলেকে তুলে নিয়ে চুমুর বন্যায় তাকে ভাসিয়ে দিলে। ছেলের নাম শুনে সে গালে হাত দিয়ে ব'ল্লে "তোরা দুটোতে ভূভারতে আর নাম খুঁজে পেলি না—ওকি দাঁত-ভাঙ্গা নাম ছেলের রেখেছিস্‌?" সরোজের কাছে এ বিষয়ে অনুযোগ ক'রতে সে বেচারী সোজা ব'লে দিলে, "আমার এতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। আপনার বন্ধু নিজে ভেবে এ নাম রেখেছেন। আমার আপত্তি টেঁকে নি।"

দু'চারদিন আনন্দের পর সরোজ চ'লে গেল। শীলা থেকে গেল। আভা প্রায়ই আসে, গল্পগুজব ক'রে চ'লে যায়। নির্ম্মলের মা এসে একদিন মা ও মাসীমার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেলেন এবং শীলাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। সন্ধ্যায় তিনি নিজে শীলাকে নির্ম্মলের সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সকালে নির্ম্মল ও আভা এসে নিয়ে গিয়েছিল।

শীলা এখন পূজা পর্য্যন্ত থাকবে! পূজার পর ছুটীর শেষের দিকে সরোজ এসে নিয়ে যাবে—এই রকম ঠিক আছে।

আমি কলেজ যাই, চাকরীর শেষে গৃহে ফিরি। মা যেন আমার মুখের দিকে আর তাকাতে পারেন না। বলেন আমি যদি পূজা পর্য্যন্ত ছুটী নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি তবে আমার মুখের হাড় ক'খানা ঢাকা পড়ে। কলেজেই দুপুরে টিফিন্‌ খাই, বৈকালে চা খাওয়ার পাঠ সে জন্য আর নেই। শীলা দুপুরে মায়ের কাছে মাসীমার সঙ্গে এসে গল্প ক'রে চ'লে যায়।

এম্‌নি ক'রে পূজা এল। বাঙ্গালীর ঘরে মা দুর্গা তাঁর

আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিলেন। আবার দশমীর দিন গিরিরাণী সকলকে 'আবার আসিব' ব'লে গিরিরাজ্যে চ'লে গেলেন।

একাদশীর দিন দুপুরে শীলার বাবার হঠাৎ রক্তের চাপ ভীষণ বেড়ে উঠ্‌ল। একঘণ্টার মধ্যে—তাঁর বাড়ীর সাম্‌নে কল্‌কাতার বড় বড় ডাক্তারের মটরে পূর্ণ হয়ে গেল। লীলা—তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা টেলিগ্রাম পেয়ে স্বামী, মেয়ে ও কোলের ছেলেটিকে নিয়ে চ'লে এল। ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে চতুর্থ দিনে অচেতন অবস্থায় মিঃ বসু ইহলোক ত্যাগ ক'রলেন। শীলা ও লীলার কান্নায় বাড়ীর দেওয়াল-গুলোরও যেন কান্না এল। মাসীমা সংজ্ঞাহীন হ'য়ে প'ড়ে গেলেন। দু'দিন পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গল। তারপর গগনভেদী করুণ কান্না। তাঁর ও মেয়েদের অবস্থা দেখে আমাদের বড় ভাবনা হ'ল। সরোজ খবর পেয়ে এসেছিল। লীলা ও শীলা পাষাণ হ'য়ে মাসীমার চ'খের সাম্‌নে চতুর্থীশ্রাদ্ধ সমাপন ক'রলে। লীলার স্বামীর ছুটী কম—তিনি লীলাকে নিয়ে চ'লে গেলেন। সরোজ পূজোর ছুটির শেষ হওয়া পর্য্যন্ত থেকে চ'লে গেল।

সময় কারো অপেক্ষায় থাকে না। দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। সরোজ এল ও শীলাকে নিয়ে চ'লে গেল। মাসীমাকে একটু বেড়িয়ে দেশ ঘুরিয়ে আন্‌তে তার সঙ্গে যেতে সরোজ অনেক অনুরোধ ক'রলে। মাসীমা কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি ব'ললেন, এ ভিটে ছেড়ে তিনি এক পাও কোথা যাবেন না। মা তাঁর সঙ্গে থেকে যতটা পারলেন তাঁকে—ভগবানের দান মাথায় পেতে নেওয়া ছাড়া মানুষের কোনও উপায় নেই—এই কথা বুঝিয়ে মনে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বাড়ীর শূন্যতা ও নিস্তব্ধতা প্রত্যেকটি প্রাণীর কাছে অসহ্য বোধ হ'তে লাগল।

আভার একটি মেয়ে হ'য়েছে। তার নাম রেখেছে বুলবুল। ছেলের শীলার রাখা নাম টুলুই বাহাল আছে। টুলু ও বুলবুলকে নিয়ে সে প্রায় রোজ দুপুরে মাসীমার বাড়ী আসে। তাদের দু'জনকে মাসীমার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে সে মাসীমার মনের কষ্ট নিবারণ ক'রতে চেষ্টা করে। শীলার অন্তরঙ্গ সখীভাবে সে মাসীমার মেয়ের মতই তাঁর কাছে ছিল। তার স্নেহে যত্নে এবং টুলু ও বুলবুলের দুষ্টামির চোটে মাসীমার মনের ক্ষতে মধ্যে মধ্যে প্রলেপের কাজ ক'রত। ছুটির দিন আমার সঙ্গে আভার দেখা হ'লে সে আমার মতলবখানা কি জানবার জন্য ব্যস্ত হ'ত এবং মধ্যে মধ্যে তার রিপোর্ট শীলাকে লিখে জানাত। ব'লত "ছোটমাসীমার এই বিপদ—বড় মাসীমার সেবার জন্যও অন্ততঃ আপনার এখনই একটা বিয়ে না ক'রলেই নয়। এ বাড়ী দুটোর প্রতি নচেৎ আর তাকান যায় না।" তার মামার মৃত্যুর কথাও তার মনে প'ড়ে যায়। তার চোখের পাতা ভিজে আস্‌তে দেখে আমি বলি, "এখনই বিয়ে ক'রতে হবে? ঘণ্টাখানেক্ পরে ক'রলে হয় না?" সে আমার কথা শুনে বলে "আপনার সবেতে কেবল ঠাট্টা"—ব'লেই পালায়।

নির্ম্মলকে বিয়ে ক'রে আভা মনে মনে যারপর নাই সুখী এবং এর জন্য সে আমার কাছে যেন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত। শীলাকে সে একটা চিঠিতে লিখেছিল—"যদি তোকে দেখাতে পার্‌তুম কি ভালই উনি আমাকে বাসেন"—নির্ম্মলের সম্বন্ধে। শীলা সে চিঠিটা 'ওরিজিন্যাল' (আসল) নির্ম্মলের ঠিকানায় একটা খামে পাঠিয়ে দিয়েছিল। নির্ম্মল আবার আমাকে সেটা দেখায় এবং আভাকেও তার সম্বন্ধে এ রকম 'রিপোর্ট' করার জন্য তার কৈফিয়ৎ তলব করে। তারপর এর জন্য আভার বোধ হয় নির্ম্মলের সাথে আপোষ হ'য়ে কি একটা লঘুদণ্ডও হয়।

(১২)

একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে বাবার চিঠিতে জান্‌লাম তিনি লম্বা ছুটি নিয়ে ক'লকাতা আসছেন। ছুটির শেষে রিটায়ার্ ক'রবেন এবং ক'লকাতায় থাক্‌বেন। পশ্চিমের বাসা তুলে দিয়ে আস্‌বেন। তিনি লিখেছেন, তিনি ক'লকাতায় এলে আমি যদি ইচ্ছা করি তবে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে 'সাইকলজি' পড়বার বাসনাটা পূরণ ক'রে আস্‌তে পারি। আরও লিখেছেন, যদি আমি যাওয়া স্থির করি—তবে যেন এই বৎসরই যাই—কারণ আমার আটাশ বৎসরটা তাঁরা আমাকে চোখের বাহিরে যেতে দিতে রাজী নন।

একমাসের মধ্যেই বাবা এসে প'ড়লেন। এর আগে তিনি মধ্যে মধ্যে ছুটিতে কখনও কখনও আস্‌তেন এবং

শীলাদের বাড়ীর ঘটনাগুলি সামান্যতঃ জানতেন। আমার তখন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল। সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যাবার প্রাথমিক আয়োজন কিছু কিছু করছি। বর্ষার আরম্ভেই সে বৎসর ক'লকাতায় দারুণভাবে বেরিবেরি হ'ল। মার বেরিবেরি খুব বেশী হ'ল। প্রায় ছয়মাস শয্যাগত থেকে মা রোগমুক্ত হ'লেন। ডাক্তারেরা মাকে চেঞ্জে নিয়ে যেতে ব'ললেন। আমি আমেরিকা যাওয়ার বদলে মার সঙ্গে ছুটী নিয়ে হাজারীবাগ গেলাম। সেখানে দু'মাস থাকার পর মা বেশ সেরে উঠ্লেন এবং আমরা ক'লকাতায় ফিরলাম। মা ব'ললেন, হাজারীবাগ এত ভাল যায়গা—এখানে একটা ছোটবাড়ী হ'লে বছরে ছ'মাস ক'রে এসে থেকে যাওয়া যায়।

ক'লকাতায় ফিরে এসে দেখি, শীলা মাসীমার কাছে এসেছে। তার একটি মেয়ে মৃত অবস্থায় জন্ম নেওয়ার পর তার শরীর একেবারে ভেঙ্গে যায়। চেহারা একেবারে কঙ্কালসার হ'য়ে গেছে—লম্বায় তালগাছ ছাড়িয়ে গেছে। এই সেই লাবণ্যময়ী শীলা, আমার দেখে বড় কষ্ট হ'ল। সে ঠোঁটের ফাঁকে ক্ষীণ হেসে আমাকে ব'ললে "মেয়েমানুষের জীবনের কি কোনও দাম আছে সমীরদা, আপনি আমাকে দেখে এত আশ্চর্য্য হ'য়েছেন ; আমার জানা অনেক মেয়ে আছে তাদের দশাও এই রকম।" মনে হ'ল, তার মনের বেদনার কোন্ তন্ত্রী কিসের আঘাত পেয়ে আজ এ ভাবে ঝঙ্কৃত হ'ল কে জানে। শীলাকে দেখে মনে হ'ল, সে আর বেশীদিন বাঁচবে না। সরোজ একদিন তাকে দেখ্তে এল। সেই সরোজ ঠিক তেমনই আছে। তেমনই মধুর তার স্বভাব, তেমনই তার ব্যবহার। বাবার সঙ্গে তার আলাপ হ'ল। বাবা ব'ললেন, হীরের টুক্‌রো ছেলে। সরোজকে দেখে মনে হ'ল শীলাকে যদি না বাঁচাতে পারে তবে সে আত্মহত্যা ক'রবে।

মাসীমার শরীরও একেবারে ভেঙ্গে গেছে দেখ্লাম। মা তাঁকে সঙ্গে ক'রে চেঞ্জে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

সরোজ শীলার ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ক'লকাতায় এসেছিল। দু' একজন বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, সরোজ তাকে একজন বড় হোমিওপ্যাথের চিকিৎসাধীন রেখে এলাহাবাদ ফিরে গেল। পনরদিন ঔষধ ব্যবহারে শীলার অদ্ভুত উপকার দেখা গেল। মাসীমা মানসিক শোধ দিয়ে এলেন কালীঘাটে—মহা ঘটা ক'রে। আরও একমাস পরে শীলার স্বাস্থ্যের এত উন্নতি হ'ল যে তা'র এত ভাল চেহারা কোনওদিন ছিল কিনা কেউ মনে ক'রতে পারল না। সরোজ এসে শীলাকে নিয়ে গেল।

আমার আমেরিকা যাওয়া স্থগিত র'য়ে গেল। বাবা আর যেতে দিলেন না, কারণ আমার আটাশ বৎসর বয়স প'ড়ে গেল। তবে কলেজে কয় বৎসর ভালভাবে চাকরী করার ফলে এবং আমার অনুসন্ধিৎসা ও শিক্ষার্থীভাবে শাস্ত্রানুশীলনস্পৃহা দেখে আমাকে একটি এ্যাসিষ্টাণ্ট প্রফেসরের পদ খালি হওয়ায় সেই পদ কর্ত্তৃপক্ষ দিলেন। আমার এই উন্নতি কোষ্ঠীর ফলাফলে লেখা ছিল ; মিলে যাওয়াতে বাবা-মার মনের উদ্বেগ আটাশ বৎসরের ফাঁড়ার অবশ্যম্ভাবিতা ভেবে যেন আরও বেড়ে গেল।

(৩)

মাসীমার এখন নিঃসঙ্গতার অবস্থা চরম-সীমায় পৌচেছে। আভা তার শাশুড়ীর সঙ্গে তাদের দেশের বাড়ীতে কি একটা ক্রিয়া উপলক্ষে গেছে। শীলার ও লীলার খবর তাদের লেখা পত্রে সপ্তাহে একদিন পান। দুপুরে মায়ের কাছে এসে একটু ব'সে চ'লে যান। এম্নি ক'রে কোনও রকমে দিনগত পাপক্ষয় যেন কোনও গতিকে ক'রে যাচ্ছেন। পূজা-পার্ব্বণের মাত্রা বাড়িয়েছেন—উপোস কথায় কথায়। এরকম আত্মকৃচ্ছ্রতা না ক'রতে মা ব'লে ব'লে হায়রাণ হয়ে গেছেন—কোনও ফল হয় নি।

এই ভাবে যখন তাঁর দিন কাটছে তখন একদিন দুপুর বেলায় মায়ের কাছে ব'সে গল্প ক'রতে ক'রতে শরীরটা ভাল লাগ্ছে না ব'লে উঠে গেলেন। একটু পরে তাঁর বাড়ীর চাকর এসে মাকে জানালে, মাসীমার খুব অসুখ—মাকে ডাকছেন। মা গিয়ে দেখেন, মাসীমার ভেদবমি হ'চ্ছে—সমস্ত শরীর নীলাভ হ'য়ে গেছে, তিনি খুব কাৎরাচ্ছেন—আর মেয়েদের খবর দিতে ব'লছেন। শীলাকে ও লীলাকে টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া হ'ল। লীলা অন্তঃস্বত্বা ব'লে আস্তে পারে নি। মাসীমার সংবাদ জানতে চেয়ে উত্তরে প্রিপেড্ টেলিগ্রাম ক'রেছে। লীলা

যখন তার স্বামী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল —তখন মাসীমার মৃতদেহ সৎকার ক'রে শববাহকরা সবে ফিরেছে। লীলা এসে শূন্য বাড়ীতে আছড়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। বাড়ীর দেওয়ালগুলোও যেন প্রতিধ্বনি ক'রে তার সঙ্গে কান্নায় যোগ দিল। লীলার স্বামী পরদিন লীলাকে নিয়ে ফিরে গেলেন, কারণ লীলার এ বাড়ীতে কান্না থামাবার কোনও উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। শীলাকে লীলাই পত্র লিখে দেবে ঠিক ছিল—কিন্তু তারা চ'লে যাবার পর দেখা গেল—লীলা লিখতে ব'সে সে চিঠি শেষ ক'রতে পারে নাই। তৃতীয় দিনে বাবা শীলাকে সংবাদ জানাবার জন্য সরোজকেই টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন—যেন চতুর্থী শ্রাদ্ধ বাদ না পড়ে।

মাসীমার মৃত্যুতে মায়ের বড় কষ্ট হ'ল। তিনি মায়ের বাল্যের বন্ধু—বয়সে পরমাত্মীয় হ'য়েছিলেন। মায়ের নিজের মেয়ে ছিল না—শীলা ও লীলাকে তিনি কন্যার মতন দেখতেন। এইটুকু মেয়ে দুটি আজ মাতৃহীন হ'য়ে সংসারে কত অসহায় নিজেদের বোধ কর্চ্ছে—তারা মায়ের মুখ চেয়ে পিতার মৃত্যুশোক ভুলেছিল। আজ কাকে দেখে তারা নিজেদের শোক ভুলবে?—এই সকল ভেবে মা একেবারে মুহ্যমান হয়ে গেলেন। এর ফলে মায়ের শরীরেরও বিশেষ ক্ষতি হ'তে লাগল। দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য বিকৃত হ'তে লাগল। তিনি কিছুতেই যেন সাম্‌লে উঠতে পারলেন না। বাবা এজন্য বড় চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। মাকে সকলে চেঞ্জে নিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে সুবিধা অসুবিধার আলোচনা চ'লতে লাগল। শেষে স্থির হ'ল, বাবা মাকে নিয়ে এখন হাজারীবাগে চেঞ্জে যাবেন—কারণ এর আগের বছর হাজারিবাগে মায়ের স্বাস্থ্য খুব শীঘ্র সেরে গিয়েছিল। আমি পূজোর ছুটীতে কলেজ বন্ধ হলে পরে যাব স্থির হ'ল।

মায়ের শরীর দিন দিন খারাপ হ'য়ে আসছিল। একদিনও দেরী না ক'রে—অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে বাবা মাকে নিয়ে হাজারীবাগ রওনা হলেন। প্রায় এক মাস থাকার পর সেখানে আশ্বিনের হাওয়া প'ড়তে মায়ের শরীর সেরে আসতে লাগল। বাবার প্রত্যেকটি পত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে উৎসুক হয়ে মায়ের স্বাস্থ্য-সংবাদের আশায় ডাকের অপেক্ষা ক'রতাম। আমার কলেজ বন্ধ হবার দিন গুণে যাচ্ছি এবং মায়ের শরীরের খবর জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে র'য়েছি। প্রত্যেক পত্রেই ক্রমশঃ মায়ের স্বাস্থ্যলাভ হ'চ্ছে সংবাদ পাচ্ছি। মা এখন নিজে আমাকে চিঠি লেখেন। একদিন মায়ের পত্রে জানলাম, শীলা সরোজের সঙ্গে পরেশনাথ পাহাড় দেখতে এসেছিল—মা হাজারীবাগে আছেন জেনে উশ্রি থেকে মটরে এসে এক ঘণ্টার জন্য হাজারীবাগে নেমে মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। সে মায়ের কাছে মাসীমার মৃত্যুর জন্য খুব কেঁদে গেছে এবং মাকে ব'লে গেছে 'আপনি এখন আমাদের মা।' সে নাকি আমার বিয়ে দেবার জন্য মাকে খুব তাগিদ দিয়ে গেছে এবং আমার বিয়েতে তাকে যেন নিমন্ত্রণ ক'রতে ভুল না হয় সে বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে—কোডারমা দিয়ে অভ্রের খনি দেখে এলাহাবাদে ফিরে গেছে। মায়ের মনে তখন কি বিভীষিকার ছবি ভাসছে তা তিনিই জানতেন। আমার তখন আটাশ বছর বয়স চ'লছে।

আমার কলেজ বন্ধ হবার আর পনের দিন মাত্র বাকী আছে—এমন সময় সন্ধেবেলায় একদিন বেড়িয়ে ফিরছি—আর পথে একটা দো'তলা বাস্ উল্টোমুখী আর একটা বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফুটপাথের ওপর সমস্ত আরোহী নিয়ে কাৎ হ'য়ে পড়ে।—আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—ধাক্কাটা আমার মাথাতেও প্রচণ্ডভাবে এসে লাগে। আমি ফাটা মাথা নিয়ে রক্তস্রোতের মধ্যে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলাম।

তার দুই দিন পরে জ্ঞান হ'ল। মেডিকেল কলেজে অসংখ্য রোগীর যন্ত্রণা-বিহ্বল ক্রন্দনের মধ্যে নিজের কাতরোক্তি মিশিয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। এই ভাবে দুই দিন আরও কেটে যাবার পর হাসপাতাল থেকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বেরিয়ে বাড়ী এসে দেখলাম—বাবা ও মার পত্র ক'খানি প'ড়ে র'য়েছে—আমার কোন সংবাদ না পেয়ে—টেলিগ্রামের জবাব না পেয়ে—বাবা আশঙ্কায় দারুণ মানসিক আঘাত পেয়ে শয্যা নিয়েছেন। খবরের কাগজে বাস-দুর্ঘটনার কথা এবং আমার নাম আহতদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংবাদ পূর্ব্বদিনকার কলিকাতার সংখ্যার কাগজে ছাপা হ'য়েছে দেখলাম। হিসাব ক'রে দেখলাম—সেইদিনকার মফঃস্বল সংখ্যার কাগজে এতক্ষণ বাবা এই দুঃসংবাদ জেনেছেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়

হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভাবছি—এমন সময় দুপুরে টেলিগ্রাম পেলাম—বাবা হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে তার পেয়েই যেন হাজারীবাগ রওনা হই। আমি একলা স্বজনবিহীন হ'য়ে এই নির্ম্মম দুঃসংবাদ পেয়ে শোকে পাগলের মতন হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল—আমার মৃত্যু হইয়াছে—এই আশঙ্কায় পিতৃদেবের মনে যে আঘাত লেগেছে, তারই ফলে হঠাৎ তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হ'য়েছে। চোখের জলে সারা বুক ভাসিয়ে মায়ের কাছে ছুটে গেলাম। ভোর রাত্রে হাজারীবাগ পৌছে মায়ের চেহারা দেখে আমি আছাড় খেয়ে প'ড়লাম। বাবা এসেছিলেন মাকে সারিয়ে নিয়ে যেতে—না নিজের শেষ নিঃশ্বাস এখানে ত্যাগ ক'রতে! আমি শেষ সময় তাঁর কাছে থাক্‌তে পারলাম না, তাঁর শেষ-দিনে কোনও সেবা ক'রতে পারলাম না—এ ব্যথা আমার মনে দারুণ ক্লেশকর হ'ল। এ আফ্‌শোষ জীবনে আমার ঘুচ্‌বে না। বিদেশে স্বজন ও বন্ধু বর্জ্জিত স্থানে আমি ও মা এ বিপদে কি রকম দিশেহারা হ'য়ে গেলাম তা ব'লে শেষ করা যায় না। মানুষ কত রকম আশা করে, কত রকম ব্যবস্থা করে, ভগবান আড়ালে থেকে তার কত বদ্‌লে দেন। আর গোণা চার পাঁচ দিন পরে আমি ছুটিতে হাজারীবাগ আস্‌তাম কি রকম মনের অবস্থায়—আমি ঠিক ক'রেছিলাম। আর আজ তার কতটুকু ফ'লল। ভগবানের নিয়মের কঠোরতম ব্যবস্থা শির পেতে নিতে হ'ল। আমি পূজোর ছুটিতে বেড়াতে আসতাম যেখানে ঠিক ছিল, সেখানে এসে আমি অশৌচের নিয়ম পালন ক'রতে লাগলাম। দু' একজন ক'রে বাঙ্গালী পড়শীরা এসে খোঁজ খবর নিতে লাগ্‌লেন এবং তাঁদের বাড়ীর স্ত্রীলোকরা মাকে জোর ক'রে স্নান আহার করানর ব্যবস্থা ক'রতে লাগ্‌লেন। তাঁদের সাহায্যে একমাস পরে যথারীতি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হ'ল। আমি ক'লকাতায় গিয়ে গম্ভীরভাবে বাবার আদ্যকৃত্য করে এলাম। মা আর ক'লকাতা যেতে চাইলেন না। যেখানে বাবা এমন ক'রে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছেন, সে স্থান ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। আমি এমন অবস্থায় মাকে ফেলে রেখে কি ক'রে ক'লকাতা ফিরে যাই? পূজোর ছুটীর পর তিন মাসের ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে থাক্‌লাম। ইচ্ছা যদি এদেশেই কোন কাজ কর্ম্ম জোটাতে পারি, তবে ক'লকাতা ফিরে যাব না। আনন্দময়ী মা এবার পুজোর সময় সব লোকের ঘরে ঘরে শানাই ও বাঁশীর সঙ্গে আনন্দ-গীতি দিয়ে গেছেন—আমার জন্যই তিনি গভীর নিরানন্দ ও অজস্র অশ্রু এবার এনেছিলেন। তার পরিণতি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তা' ভেবে আমি সর্ব্বদা মুহ্যমান হয়ে রইলাম।

(১৪)

লীলার শ্বশুর এতদিন তাঁর ছেলের কর্ম্মস্থলেই ছিলেন। এখন তাঁর ক'লকাতায় বাড়ী কেনবার ইচ্ছে হ'ল। মাসীমা মারা যাওয়ার পর তাঁর সম্পত্তির দুই মেয়ে শীলা ও লীলা উত্তরাধিকারিণী। লীলার শাশুড়ী ছিলেন না। তার শ্বশুর লীলাকে দিয়ে শীলাকে লেখালেন, সে যদি তার অংশ লীলার শ্বশুরকে বিক্রী করে তা হ'লে তিনি সেই বাড়ীরই অর্দ্ধাংশ কিনে নিয়ে কলিকাতায় বাস করবেন। শীলা এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। সে উত্তরে লিখ্‌লে "দিদি, তোমরা বাড়ীতে এসে যতদিন ইচ্ছে থাক, আমার সমীরণ বা যূথি (শীলার মেয়ের নাম) তার জন্য কোন দাবী ক'রবে না—তবে অংশ বিক্রী ক'রতে পারব না।"

লীলার শ্বশুর দেখ্‌লেন অবস্থা সুবিধের নয়। তিনি আমার মত জান্‌তে চাইলেন; আমি যখন ক'লকাতার বাস তুলে দেব মনস্থ করছি তখন আমি ক'লকাতার বাড়ীটি তাঁকে বিক্রী ক'রতে প্রস্তুত কিনা। শীলা লীলার পত্রে এ সংবাদ পেলে। হঠাৎ সে লীলাকে তার মায়ের বাড়ীর—তার অংশ খরিদ ক'রে নিতে অত্যন্ত অনুনয় ক'রে পত্র লিখ্‌লে। লীলার শ্বশুর ব'লেছিলেন, "বউমার বোনটির মাথা খারাপ"। যাই হ'ক তিনি সে বাড়ীরও অর্দ্ধেক অংশ কিনে নিলেন। শীলার এ-রকম হঠাৎ বাড়ীর অংশ বিক্রয় ক'রে ক'লকাতার স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা—সাধারণের কাছে একটা বিচিত্র ব্যাপার। আমার এখন ঊনত্রিশ বৎসর বয়স চ'লছে। গত আটাশ বৎসরটা আমার জীবনে কি হ'ল, আর কি হয় নি—তাই ভাবি। মা হয়ত জননীর কর্ত্তব্য হিসাবে আটাশ বৎসরের মধ্যে আমাকে একদিনও বিবাহের কথা বলেন নি। এখন তিনি ধ'রে ব'সলেন এবার বিয়ে না করে থাকা চলে না—অতএব

কালাশৌচের বৎসর পার হ'লেই আমি যেন আর অমত না করি। আমি নানা অজুহাতে কেবল সোজা উত্তর এড়াইয়া যাই। মা হয়ত' সব বোঝেনও—বেশী জোর ক'রতেও বুঝি তাঁর বুক ফেটে যায়। কয় বৎসর ত' তিনি চোখ বুঝিয়া দিন কাটান নাই। কি করিবেন, সব ভগবানের হাত। একদিন ব'ললেন, "ওরে শীলা লিখেছে—সমীরদার বিয়ে কি দেবেন না? আমি কি জবাব লিখ্‌ব তাকে—বল্‌?" আমি ব'ললাম, "ভেবে পরে ব'লব।" মা বুঝলেন এটাও সোজা উত্তর এড়িয়ে যাবার মতলব। এমনি ক'রে ত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। পাড়ার সবাই বলতে লাগলেন আমার এ রকম একা একা থাকা ভাল দেখায় না; বিশেষতঃ মায়ের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা ক'রেও আমার বিয়ে করা একান্ত উচিত। তাঁদের মধ্যে একটু বেশী উৎসাহী কেউ কেউ একেবারে মেয়ে শুদ্ধ এসে মার কাছে হাজির হ'লেন। তার মধ্যে বেলা ব'লে একটি মেয়েকে পছন্দ ক'রে মা একেবারে হাফ্‌-কথা পর্য্যন্ত দিয়ে ফেল্‌লেন। মা এও ব'ললেন, সাম্‌নের শ্রাবণ মাসে মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা ক'রবেন ব'লে তার মাকে কথাও দিয়েছেন। শুনলাম তারা বড় গরীব। তেইশ বছর বয়স হলেও তাই বেলার আজও বিয়ে হয়নি। অনেক সম্বন্ধ হয়েছে আর তার মায়ের চিন্তার ভার বাড়িয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।

আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম। এদিকে মা আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও এক ধাপ ব্যবস্থা বাড়িয়ে তুললেন। নানা ছলে বেলাকে আমার সাম্‌নে বের করবার আয়োজন ক'রতে লাগ্‌লেন, মনে হ'ল বেলা নাম তার ঠিকই রাখা হ'য়েছে—ফুটন্ত বেল ফুলের রাশির মত সাদা ধব্‌ধবে তার রঙ—একরাশ কালো চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে সে যেন নামের সৌন্দর্য্যের সার্থকতা ক'রে চ'লে বেড়ায়। আমার সাম্‌নে মায়ের তাড়নায় তাকে বেরোতে হয়—কিন্তু সে কথা বলে না। দরকারী জিনিষ রেখে বা নিয়ে চ'লে যায়। খুব শান্ত এবং গম্ভীর মেয়েটি—দেখ্‌লেই বোঝা যায়। আমি কিন্তু এ অযাচিত করুণায় বড় বিপর্য্যস্ত বোধ ক'রতে লাগ্‌লাম।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে একটু মনটা হাল্কাভাবে মাকে ব'ললাম 'মা তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে —আমি বড় নিশ্চিন্ত হ'য়েছি।' আমার সাম্‌নে একটা আয়না ছিল—সেটার দিকে চোখ প'ড়তেই দেখি বেলা আমার পেছনে ব'সে আছে—তার চেহারা আমার সাম্‌নের আয়নাটায় প'ড়েছে—সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আমার কথা শুনছে। আয়নার দিকে আমি তাকাতেই, তার আয়নার চেহারার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'ল—সে লজ্জায় ঘাড় নামিয়ে নিয়ে সেখানে ব'সেই নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগ্‌ল। মা আমার ও তার আয়নার মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ব'লে যেতে লাগ্‌লাম "আমারের স্কুলে একজন নূতন মাষ্টার এসেছেন। কয়েকমাস হ'ল অন্য জায়গায় এক স্কুলে হেড-মাষ্টার ছিলেন, এখানে বেশী বেতনে দ্বিতীয় মাষ্টার হ'য়ে এসেছেন। এম-এ পাশ, দেখ্‌তে শুনতে এবং পাত্র হিসাবে সকল দিক থেকে খুব বাঞ্ছনীয়। আমি তাঁকে অনুরোধ করাতে তিনি বেলাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হ'য়েছেন। শ্রাবণেই বিয়ে ক'রতে সে পারবে।" বেলা সবটা শোনবার আগেই তার মুখ কালিয়ে গেল—সে ব'সে ব'সে ঘাম্‌তে লাগ্‌ল। মা তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

বেড়িয়ে বাড়ী এসে দেখি মা খুব গম্ভীর। ঘট্‌কালীর পারিশ্রমিক যা দিলেন তাতে আমার অবস্থা হল অবর্ণনীয়; সারা রাত দুশ্চিন্তায় কাটলো।

ভোরে ঘুমিয়ে পড়ে একটু বেলায় ঘুম ভাঙ্গল। ভাবছি আজ দ্বিতীয় শিক্ষকটীকে এনে বেলাকে দেখিয়ে দেব।

হঠাৎ মা ছুটে এলেন—বেলা পালিয়েছে, তার মা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছেন। ছুটে গেলাম—দেখলাম মৃতদেহ নিয়ে তার মা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। গলায় কাপড় বেঁধে ঘরের চালে ঝুলে সে সবারি সকল চিন্তার অবসান করে চলে গেছে।

তদন্তের পর সৎকার। চিতা নিভল। আমি বাড়ী ফিরলাম। মনে মনে বুঝলাম চিতা নিভেনি, নিভবেও না। মা আর কখন বিয়ের কথা বলেন নি—কি জানি ফাঁড়ার জের কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

নামাবলী

দিলীপকুমার

Dilip,

Earth is a feeble clay for the spiritual planting, but all the same it buds eventually and the bud, once there, will blossom…….

Sri Aurobindo.

পঙ্ক রহে ঘেরিয়া কুসুমিকা ;
কুসুম রহে আকাশ-ব্রত যাপি' ;
তারকা-নামাবলী জপিয়া শিখা
মাটির দ্বীপে জলে-যে কাঁপি' কাঁপি' ।

ঝটিকা কাঁদে সঘনে : "হায় হায় !"
তুফানে দুলে ওঠে তরণীখানি ;
নিকষ কালো ঢেউ গ্রাসিতে চায় :
নেয়ের হৃদে তবু অমলা-বাণী

আয়ুষ্মতী, বলে সে : "আছে আশা,
আঁধার-ফণী চক্রে মণিদিশা ;
"পাংশু-পারে অংশুমালী-ভায়া ;
নিরাশা-বুকে ভরসা অনিমিষা

"রহে যে চেয়ে : ঝলিবে আলো তার ;
গরল-পারে উছল নিধি-সুধা ;
"কাঁটার বনে কমলা-করুণার
মলয়-অনুপানে মিটিবে ক্ষুধা ।"

দুঃখ-জাগরণের সীমা তরি'
স্বপন-মালা গাঁথিছে সুদূরিকা ;
আরতি-সখী প্রণতি-হিয়া—মরি,
উজনে প্রেম-ছন্দে—নূপুরিকা ।

ধরণীতলে কোটি মরণ মাঝে
নয়ন মেলে অজেয় কী কাঁপন ?
গহন অন্তরের কোলে বাজে
এ-কোন্ গূঢ় নবীন আবাহন ?

র'বে কি তবে বেদনা চিরজয়ী ?
দুরভিসারী পাবে না বন্দর ?
শঙ্কা-প্রাণ র'বে কি সঞ্চয়ী
অল্প-সুখ-কাঙাল—জর্জ্জর ?

উছসি' গায় উদার সুরছনে
কে গুণী ঐ : "বিপুলে বাঁধো বুক,
"দুরাশী নহে ধিকৃত জীবনে
কৃপণ দীন ক্লান্ত অধোমুখ ।

"উধাও হোক অজর ভালোবাসা
মহান্ মোহানায় উজান তানে ।
"অমৃত-মতি ! অপূর্ণ পিপাসা
পূরিবে—যদি চলো গগন-গানে ।

"বীণার তার প্রখরে বাঁধো আজি,
ক্লৈব্যজয়ী ঝঙ্কারিণী সুরে ;
"ক্ষুদ্র খেয়া অভয়ে বাও মাঝি,
পারের রশি খসায়ে ধাও দূরে ।

"পথ-পাথেয় মিলিবে গতি-পথে—
নীলিমা-নতি [illegible] পূজা-প্রাণে :
"জিনিলে নিশা আরোহি' উষা-রথে
উদিবে রবি সফল-সন্ধানে ।"

পঙ্ক তাই ঘেরিল কুসুমিকা
কুসুমে আজো আকাশ-ব্রত জলে ;
মাটির দীপে জাগে অমরী শিখা—
তারকা-নাম নিতি সে জপে ব'লে ।

অলিম্পিয়ায় বার্লিন

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

লণ্ডন—সাতাশে জুলাই সকাল বেলা—বেশ নিশ্চিন্তমনে ঘুমুচ্ছি, এমন সময় দরজায় ঠুক্ ঠুক্ করে ঘা পড়ল। ভেতরে আসতে বলে পাশ ফিরে শুয়েছি, দেখি আমাদের গৃহকর্ত্রী মিসেস্ এডাম্‌স্ হাজির। বললেন, ওঃ! এই বুঝি তোমাদের কন্টিনেণ্টে যাওয়া? কটার সময় ট্রেণ খেয়াল আছে? -তাই ত! তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। দেখি মিষ্টি রোদ এসে ঘরের ভেতর পড়েছে, মনটা ভারী খুসী হয়ে উঠল। এমন দিনে বাইরে যেতে পারলে খুসী হবারই কথা—বিশেষ করে এদেশে এমন দিন পাওয়া নেহাৎ ভাগ্যের কথা।

তৈরি হয়ে নেবার আগেই অশোক সরকার এসে

বার্লিনস্থ রাইস ক্রীড়াক্ষেত্র—প্রবেশপথ ও অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম

তাহলেও একটা কামরায় কয়েকজন ভদ্রলোকের সৌজন্যে জায়গা পাওয়া গেল। ১০-৫৫তে ট্রেণ চলল।···লণ্ডনের বিরাটত্ব ছাড়াতেই ত অনেকটা সময় কেটে গেল। তার পর যদি বা গ্রাম পাওয়া গেল, কিন্তু ফাঁকা জায়গা খুব কমই নজরে পড়ে। বিলাতে আমাদের দেশের মত সবুজের ছড়াছড়ি ত নেইই, বরং কলকারখানায় ভর্ত্তি জায়গাগুলো দেখলে মনটা বিরক্ত হয়ে ওঠে—মনটা সে সময় খানিকটে খোলা জায়গার আলো বাতাস পেতে চায়।···আমার দেখা জায়গাগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের ভেতরটা আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে। তার পরেই "বনি স্কটলণ্ড"···

দূর থেকে 'ডোভারে'র পাড়টা ভারী চমৎকার দেখাল;

যে আমি অত নম্বরের অমুক ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। নইলে ফিরে আসবার সময়ে ধরবে 'ডিউটি'র জন্য, কাজটা সেরে ওঠা গেল প্রিন্স চার্লস বলে যে ষ্টীমারটা আমাদের জন্যে দাঁড়িয়েছিল তাতে।

শান্ত নীল জলের মধ্য দিয়ে ষ্টীমার চলল অস্টেণ্ডের উদ্দেশে। ষ্টীমার বোঝাই লোক। কত ছেলেমেয়ে চলেছে ছুটীতে। ওদের পিঠে রুকস্যাকে বোঝাই জিনিস-পত্তর। দরকার হলে ওইটেই মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়বে। কজন চলেছে সাইকেল নিয়ে। কন্টিনেণ্টে সাইকেল করবার রাস্তা প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে। কি সুন্দর শান্ত গভীর নীল জল। আনন্দের প্রাচুর্য্য ষ্টীমারের ডেকে।……

ঘণ্টা তিনেক পরে 'অস্টেণ্ডে'র পাড় দেখা গেল! ষ্টীমার ভিড়তে আরও ঘণ্টাখানেক লাগল। অস্টেণ্ডের 'বীচ্' খুব সুন্দর। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্নান করছে দেখা গেল। ষ্টীমার ভিড়তে তীরে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েরা হাত নেড়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানাল।

অস্টেণ্ডে কাষ্টম্‌সের হাঙ্গামা বেশী ভোগ করতে হয় নি। বৃটীশ পাস্‌পোর্টের একটু খাতির এরা সবাই করে দেখলাম। ট্রেণ দাঁড়িয়েছিল। কন্টিনেণ্টের ট্রেণে এই প্রথম থার্ডক্লাশে

রাইস ক্রীড়াকেন্দ্র
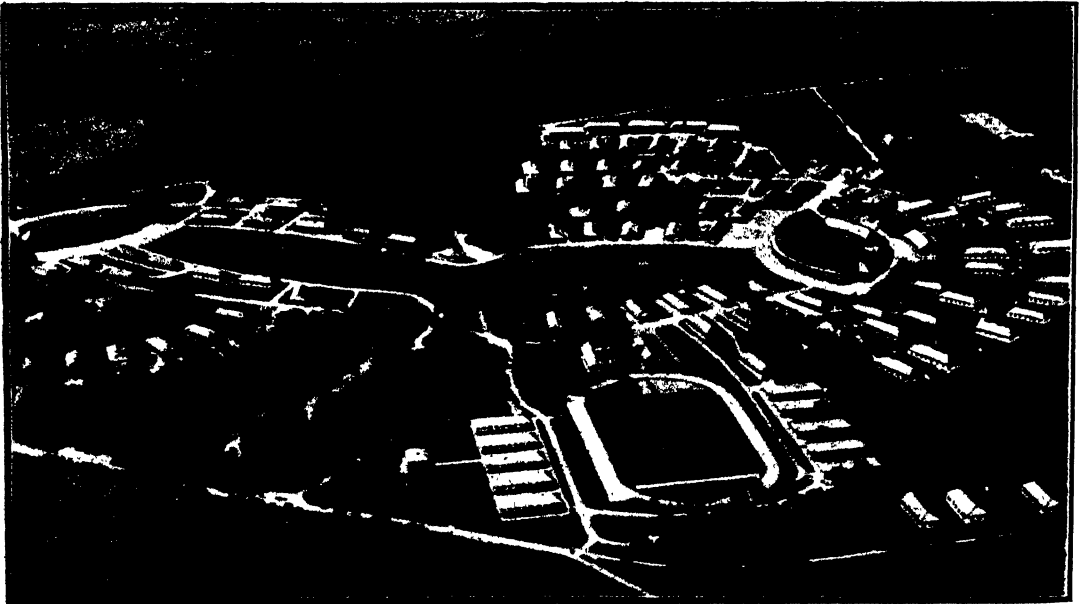
হাসিমুখ সবারই। তিনটে ছোট্ট ছোট্ট ছেলের সঙ্গে আলাপ করছিলাম, ওরা চলেছে জার্ম্মাণীতে। সঙ্গে বড় কেউ নেই। সবার বড় যে ছেলেটি তার বয়স দশ। বেশ নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছে ওরা। ষ্টীমার চলেছে বেশ জোরে। …এ জায়গাটা বেশ চওড়া। ভারী হাসি পেল ভেবে যে, এই চ্যানেল কি খেয়ালী। মনে পড়ল আগের বার যখন এই চ্যানেল পার হই, কি ভীষণ ছিল এর অবস্থা, দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না কারও। আর আজ—২০।২৫ 'নট্' বেগে ষ্টীমার চলেছে। দোলা নেই একটুও। সোনালী রোদ… ওঠা গেল। থার্ডক্লাশে আমাদের দেশের মতই কাঠের বেঞ্চের ব্যবস্থা। কিন্তু যাত্রী বেশ ভদ্র ও কামরাগুলো খুব পরিচ্ছন্ন। ভীড় বেশী ছিল না। ট্রেণ চলল।

আমাদের কামরায় দুজন ভদ্রলোক ও দুটি ভদ্র মহিলা ছিলেন। আমাদের কিছু কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ফরাসীতে। আমাদের ফরাসী ভাষার পাণ্ডিত্যে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ। কাজেই অন্যকে আশ্চর্য্য করবার ইচ্ছে আর ছিল না। দু একটা কথার 'হাঁ' 'না' উত্তর পেয়ে ওঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। আমরাও বাইরের সৌন্দর্য্য

দেখতে মন দিলাম।…ঘণ্টা দেড়েক বাদে ট্রেণ এসে ব্রাসেল্‌স নর্থ ষ্টেশনে দাঁড়াল। ব্রাসেল্‌সে এই একটাই ষ্টেশন। নর্থও যা, সাউথও তাই। আমরা এখানে নেমে পড়লাম। বেশী রাত্তিরের ট্রেণে বার্লিনে গেলে কলোনে বদলাতে হবে না এই রকম একটা আভাস টমাস কুকের লোকেরা দিয়েছিল লণ্ডনে। কয়েকটা ঘণ্টা ষ্টেশনেই কাটানো হবে
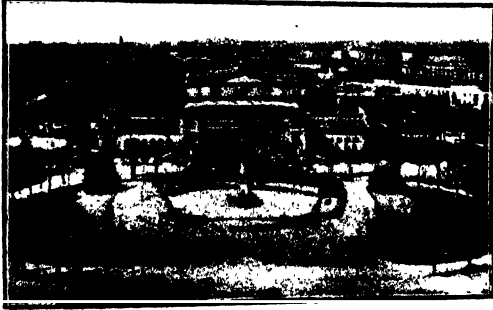
কিং-প্লেস্—ক্রোল অপেরা ও মল্ট্‌কে মনুমেণ্ট

ঠিক হল। টাকা ভাঙ্গিয়ে ১৪৫ বেলজিয়ান ফ্রাঁ হিসেবে পাওয়া গেল। ষ্টেশনের রেঁস্তোরায় খেতে গেলাম। প্রথমে ত ফরাসী ভাষায় লেখা Menu দেখে একটু দমে গেলাম। অনেক বুদ্ধি খরচ করে একটা খাবাবের অর্ডার দেওয়া গেল। বরাত ছিল ভাল—মাংস ও তরকারি পাওয়া গেল। মিষ্টি খেয়ে আমাদের মনটা খুব খুসী হয়ে ওঠলেও অশোকের মনে বেদনা লাগল পরে। এই মিষ্টিটা অশোকের খুব প্রিয়। ওর স্বর্গতা দিদিমা এটা ওকে প্রায়ই তৈরি করে খাওয়াতেন।…

খাওয়া-দাওয়া সেরে ষ্টেশনে খোঁজ করে জানা গেল যে আমরা যে ট্রেণেই বার্লিন যাই না কেন, কলোনে আমাদের গাড়ী বদলাতে হবেই। যেটা এড়াবার জন্য এত তোড়-জোড় সেইটেই দাঁড়াল পথে। ভয়ের কারণ হচ্ছে আমাকে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক বলেছিলেন—ভাষা না জানলে জার্ম্মাণীতে গাড়ী বদলানো ভারী অসুবিধের ব্যাপার। তিনি নাকি একবার উল্টো দিকের গাড়ীতে উঠে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলেন—ইত্যাদি।…যাক্ ট্রেণে ত ওঠা গেল, যা হবে হক্ ভেবে। একটা ভারী সুবিধে ছিল আমাদের। সেটা হচ্ছে সঙ্গে কোন টাইম টেবিলের বালাই ছিল না। কাজেই কখন যে কলোন পৌছব, তার কোন ধারণাও ছিল না আমাদের। ছাড়িয়ে যাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক।…

যাত্রার প্রথমেই রূঢ় আঘাত লাগল ট্রেণে অতি অন্যায় রকম ভীড় দেখে। কোন রকমে করাইডোরে আমাদের সুটকেস্ চেপে আরাম (?) করে বসা গেল। গাড়ী চলল…অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। এঞ্জিনের বিরাট চেহারাটা না দেখা থাকলে গাড়ীর স্পীড্ একটু আশ্চর্য্য করত। সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত।…ঘণ্টাখানেক বাদে একটা কামরায় জায়গা পাওয়া গেল, তার খানিকটে পরেই জার্ম্মাণ সীমান্তের ষ্টেশন এসে হাজির।…

লাউড-স্পীকারে এখানে জার্ম্মাণ, ইংরেজী ও ফরাসী এই তিন ভাষায় অনুরোধ করা হল যে পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখাতে হবে ও সঙ্গে অন্য দেশের যে সমস্ত টাকা পয়সা আছে তা লিখিয়ে নিতে হবে। এ সমস্ত শেষ করতে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম তার কিছুই লাগল না। কারণ এদের তৎপরতা। একটা পরিচ্ছন্ন ঘরের ভেতরে আমরা দল বেঁধে দাঁড়ালাম। ঘরের এক দিকে একখানা হিটলারের ছবি ও অন্যদিকে স্বর্গীয় ফন্ হিণ্ডেনবুর্গের ছবি। কর্ম্মচারীরা খুব ভাল ব্যবহার করলেন ও চট্‌পট্ কার্য্য শেষ করলেন। তার পর আবার ট্রেণে ওঠবার জন্য তিনটি
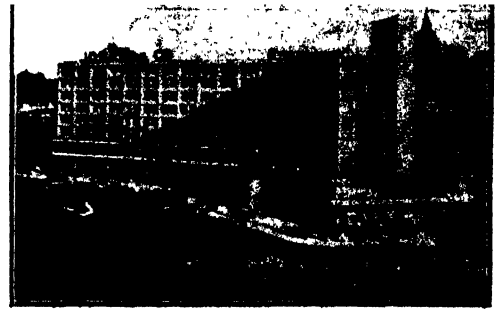
আলেকজাণ্ডার-স্কোয়ার ও বারোলিনা

বিভিন্ন ভাষায় অনুরোধ করা হল। সবাই ট্রেণে উঠলে ট্রেণ ছেড়ে দিল। এবার আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কামরার দিকে নজর দিলাম। ট্রেণে ভাষাবিদদের সুবিধে হবার কথা। দু'টী মেয়ে ছিলেন তাঁরা ফরাসী বলেন, আমরা জানি বাঙ্গালা ও দায়ে পড়ে একটু আধটু ইংরেজি বলি, অন্য একটী ছেলে ছিলেন তিনি জার্ম্মাণ বলেন। জার্ম্মাণটি

তাঁর নিজের ভাষার জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট, মেয়েরা অন্য ভাষা একটুকুও জানেন না ও আমরা ত সব ভাষাতেই সমান পণ্ডিত। এহেন অবস্থায় চকোলেট খাওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? জার্ম্মাণ ছেলেটি সরকারের পাশে বসেছিলেন। একবার অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বলে গেলেন তার শেষের দিকে একটা কথা ছিল লণ্ডন। সরকার খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ। আর যায় কোথায়! ছেলেটি গল্প ফেঁদে বসলেন। সরকার বেচারীর অবস্থা দেখে তাঁকে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘুমের চেষ্টা করলাম। ওদিকে তাকিয়ে দেখি মেয়ে দু'টি মুখ টিপে হাসছেন।···

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না, সরকারের ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সরকার বল্লে এইটেই "কলোন" ও আমাদের এখানেই নামতে হবে। আমি উঠে ঘুমের ঘোরে বাইরে তাকিয়ে লেখা দেখলাম "বাহনষ্টাইগ্"। বল্লাম "এটা কি করে "কলোন" হতে পারে? অন্য কিছু লেখা রয়েছে যে?" সরকার বল্লেন "ওটা বুঝলেন না? বাহন্-ষ্টাইগ্ হচ্ছে "কলোন"এর আর একটা নাম।" ব্যাপারটা অবিশ্যি তখনি হিং টিং ছটের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল।

টেম্পেল হোফার ফেল্ডে সেণ্ট্রাল এরোড্রোম

নেমে দেখি এদিকে বাহনষ্টাইগ্ (১), ওদিকে বাহনষ্টাইগ্ (২) (৩) ইত্যাদি লেখা রয়েছে। তখন অবিশ্যি বুঝলাম যে এটা মানে প্ল্যাটফরম্। বরাতক্রমে ষ্টেশনটা সত্যিকারই "কলোন" ছিল। কাজেই কোন অসুবিধে হয় নি। এখানে আমাদের চার ঘণ্টা বসতে হবে। ষ্টেশনটা দেখি [illegible] বোঝাই। বিরাট বিরাট এক একটি স্বস্তিক মার্কা [illegible]।

জার্ম্মাণদের এই পতাকাপ্রীতির কারণ কিছু আছে কিনা বলা দুষ্কর কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে সংখ্যাতীত পতাকা দেখা আমাদের ভাগ্যে রয়েছে বার্লিনে। ভোরবেলা ষ্টেশনের রেঁস্তোরায় বসে কিছু খাবার চেষ্টা করা হল। চাকরটি ইংরেজি জানে বলে মনে হল। তাকে চা ও বড় দেখে দু' পিস্ কেক্ আনতে বল্লাম। কেক এলে তার চেহারা

রাজপ্রাসাদ ও ন্যাশানাল মনুমেণ্ট

দেখে ত চক্ষুই স্থির। প্রকাণ্ড দু' প্যাকেট বিস্কুট। অন্ততঃ ২৫খানা করে একটাতে। এই নাকি এদের কেক্। দুজনে মিলে কোন রকমে একটার খানিকটে শেষ করা হল। আবার সময় হয়ে এল ট্রেণে ওঠবার। ট্রেণের এঞ্জিনেও দু'খানা স্বস্তিকা মার্কা পতাকা। ট্রেণ আমাদের নিয়ে বার্লিনের দিকে চলল।···

গাড়ী চলেছে ত চলেইছে। "কলোন" থেকে বার্লিন কতটা দূরে ও ক-ঘণ্টার রাস্তা তা খোঁজ করা আমাদের হয়ে ওঠে নি, জানাও নেই। নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে চা খাওয়া ও গল্প হচ্ছে। ভাবলাম বার্লিনে গিয়েই ত লাঞ্চ খাব, চিন্তা কি? বেলা বেড়ে গেল। পথে হানোভার বলে একটা বেশ বড় ষ্টেশন পাওয়া গেল তখন বেলা বারোটা এই রকম হবে। সরকার বল্লেন, "আর কি, বার্লিন ত খুব কাছেই আধঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাব"। ওঁর ভূগোলের জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন কারণ আমার ছিল না। কাজেই আসন্ন লাঞ্চের আশায় মনটা খুব খুসী হয়ে উঠল। আধঘণ্টা, একঘণ্টা, এমন কি দুঘণ্টা চলে গেল, তবু বার্লিন যে সুদূরে সেই সুদূরে।···আমাদের কামরায় তখন আরও কয়েকজন এসেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসাই বা করি কাকে! সবাই বিজাতীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলছিলেন। শেষকালে

বরাতের ওপর নির্ভর করে সামনের ভদ্রমহিলাটীকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম ইংরেজিতে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। মহিলাটী ইংরেজ মহিলা (সেটা অবিশ্যি পরে জানতে পেরেছি)—বললেন যে চারটা নাগাদ আমরা বার্লিনে পৌছব। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে রেস্তোঁরাকারের দিকে চল্লাম দুজনে।

বার্লিন সহরের মধ্যে চার পাঁচটা ষ্টেশনে গাড়ী থামে। আমরা কারলোটেনবার্গ ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। ৪৮এ লিটজেনবার্গায় ষ্ট্রাসা হিন্দুস্থান হাউস। সেখানে যেতে হলে এর পরের ষ্টেশন "জু"টাই সব চাইতে কাছে। তখন সেটা জানাছিল না। হিন্দুস্থান হাউসে যেতে দুজন আগের পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। যাঁর বোর্ডিং হাউস—হের গুপ্ত (বাঙ্গালী অবিশ্যি) খুব যত্ন করে ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরের চার্জ্জ একটু বেশী বলে মনে হল,

অনারারী মনুমেণ্টে পাহারা-বদল

ব্রেক্‌ফাষ্টশুদ্ধ প্রায় আট-মার্ক পড়ে। এর কারণ অবিশ্যি অলিম্পিয়া।

স্নান-টান সেরে প্রস্তুত হতে ফ্রয়লাইন্ হানাব্যুর্গা এসে হাজির হলেন। এই মেয়েটীর সঙ্গে কয়েকমাস আগে এডিনবরাতে আলাপ হয়েছিল আমাদের হোষ্টেলে। সেখানে বার্লিন ইউনিভার্সিটি থেকে ওদের সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের একটা দল ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিল। তখন ও আমাকে কথা দেয়, যে বার্লিনে এলে আমাকে বার্লিন দেখাবে।

আমরা যেদিন বার্লিনে গেলাম, সেদিন এক ভদ্রলোকের দেশে ফেরা উপলক্ষে বিদায়-ভোজ ছিল। খুব আমোদ করে সবাই মিলে খাওয়া গেল—গুপ্ত সাহেবের রান্নার প্রশংসা সবাই—এমন কি কুমারী ব্যুর্গাও করলেন। কথা হল সে পরের দিন সকালে এসে গাইড হয়ে আমাদের নিয়ে বেরুবে।

পরের দিন সকালে যখন হানা এসে হাজির হল তখন আমরা ভারী আরাম করে বিশুদ্ধ ভারতীয় ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছি; দেশ ছাড়বার বহুদিন পরে লুচি, আলু পেঁয়াজ ভাজা ইত্যাদি দিয়ে ব্রেক্‌ফাষ্ট যে কি চমৎকার লাগছিল! তারপর চা; দেশ ছেড়ে অবধি অমন সুন্দর চা খাইনি। বিলেতে মাসের পর মাস সেই একঘেয়ে ব্রেক্‌ফাষ্ট খাবার পর আজকের এই দিশী ব্রেক্‌ফাষ্ট ভয়ানক ভাল লাগল।
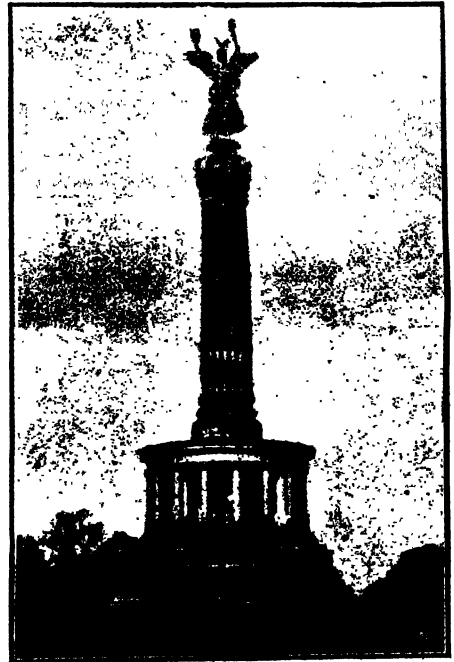
বিজয় স্তম্ভ

শ্রীমতী গাইড আমাদের তাড়া না দিলে আমরা খাওয়ার কাজে আরও কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। হানার সঙ্গে গিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেণে করে ফ্রিল্‌ড্রিক্ ষ্ট্রাসা ষ্টেশনে গিয়ে নামলাম। বার্লিনে ট্রাম, বাস, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেল ইত্যাদি ছাড়া এই যে ইলেকট্রিক ট্রেণের ব্যবস্থা, চমৎকার লাগল এটা; ইলেকট্রিক ট্রেণেই সব চাইতে বেশী লোক যাতায়াত করে। একে সংক্ষেপে এস—বাহন্ বলা হয়। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বার্লিনের সব চাইতে বড় ও প্রসিদ্ধ

রাস্তা অন্টারডেন লিন্‌ডেন দিয়ে উপস্থিত হলাম ভূতপূর্ব্ব কাইজারের প্রাসাদ—শ্লোস্‌-এ।

এখানে অবিশ্যি শ্রীমতী গাইড ছাড়াও আর একটি শ্রীযুত গাইড নিতে হল ভেতরটা বুঝিয়ে দেবার জন্য। গাইডটী ভেতরে গিয়ে প্রথম যে কথাটি বলল সেটি হচ্ছে কাইজার মন্দ লোক ছিলেন না—মন্দ রাজনীতিক ছিলেন।
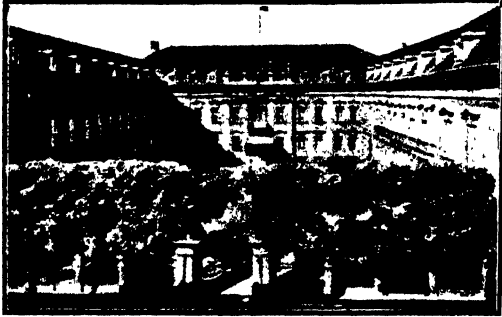
প্রেসিডেন্টের প্রধান আদালত গৃহ

ভাবলাম কথাটা হয়ত সত্যি, আজ সবাই বুঝেচেন, কিন্তু ক'বছর আগে?···যাক্ সে কথা।

ঘরের মেঝে যাতে নষ্ট না হয়ে যায়—তার জন্য বিরাট বিরাট চটির ব্যবস্থা আছে। তাই পায়ে দিয়ে ঢুকতে হয়। এই প্রাসাদ যখন তৈরি হয় তখন ব্যবস্থা ছিল যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় যাঁরা প্রাসাদে আসবেন তাঁরা যেন একেবারে ঘোড়ার পিঠে চড়েই ওপরে উঠতে পারেন, তাই বিরাট রাস্তা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে গেছে। সে রাস্তা এখনও তেমনি আছে। গাইড বড় দল থেকে আমাদের আলাদা করে নিয়ে গিয়েছিল। কাইজারের মন্ত্রণা ঘরে গিয়ে বলল 'যার যেখানে খুসী বসে পড়'; আমি যে চেয়ারটায় বসলাম সেটায় নাকি স্বয়ং কাইজার বসতেন। সুতরাং আমি খুব গম্ভীর হ'য়ে সেটায় বসে—গম্ভীরতর একটা ঘোষণা করে দিলাম; খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম সমস্তই সাজানো রয়েছে কেবল লোকেরই অভাব। রূপকথার সেই ঘুমন্ত রাজপুরীর মত। খাবার টেবিলে প্রজাদের উপহার দেওয়া অনেক রূপোর বাসন সাজানো রয়েছে। যে জানালায় দাঁড়িয়ে কাইজার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সেটা এখন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভূতপূর্ব্ব কাইজার যাবার সময় কয়েক মিলিয়ন মার্ক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন; সেটা পুরণের জন্য সাধারণকে যথেষ্ট ট্যাক্স এখনও দিতে হয়।

ভেতরে ঢোকবার ও গাইডের দক্ষিণা ছাত্র বলে আমাদের অনেক কম লেগেছিল। এখানে ছাত্রদের যথেষ্ট সুবিধে দেওয়া হয়। পাসপোর্ট সব সময়েই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়, টাকা ভাঙ্গাতে গেলেও পাশপোর্টে মিল দিয়ে দেয়, আমরা (ভ্রমণকারীরা) রেজিষ্টার্ড মার্ক পাই। এক পাউণ্ডে বাইশের ওপর এমন কি তেইশ মার্কও আমরা পেয়েছি। অথচ জার্ম্মাণীর ভেতর এক পাউণ্ড ভাঙ্গালে মাত্র ২০ মার্ক পাওয়া যায়। গরমের সময় জার্ম্মাণীর ভেতরে সাত দিন থাকলে রেল ভাড়ার শতকরা ৬০ মুদ্রা বাদ দেয়। এতটা সুবিধে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

আবার এসে বড় রাস্তায় পড়লাম। চমৎকার এই রাস্তাটি। লণ্ডনে কেন, বার্লিনেও এ ধরণের বড় রাস্তা একটাও নেই। অলিম্পিয়া উপলক্ষে একে পতাকায় একেবারে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর কি বিরাট এক একটা পতাকা—না দেখলে ধারণা করা যায়
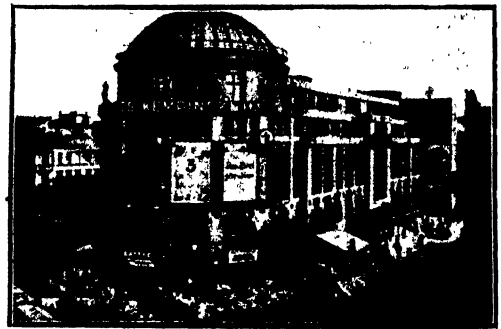
পট্‌সডাম্ প্লেসে ওয়ারল্যাণ্ড হাউস

না। প্রত্যেকটি পতাকার নীচে এক একটি ছবি জার্ম্মাণীর এক একটি সহরের প্রতীক। এইভাবে মাইলের পর মাইল চলে গেছে পতাকা—জার্ম্মাণীর সমস্ত সহরের প্রতীক হিসেবে।······

এর পরে এসে এদের মহাযুদ্ধের স্মৃতিসৌধের সামনে পাহারাবদল দেখলাম—চমৎকার। কোনদিন নৌ-সেনা,

কোনদিন বিমান-সেনা, কোনদিন পদাতিক দল থেকে আসে সৈন্যেরা। দু'জন সৈনিক দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন পাথরে খোদাই মূর্ত্তি। কি সুন্দর মানায় এদের পোষাকে—আর কি সুন্দর এদের ইউনিফর্ম্ম। সব চাইতে চমৎকার লাগল এদের বিমান-সৈন্যের পোষাক। লণ্ডনে স্মৃতি-স্তম্ভ দেখেছি—তেমন যেন মনোহর নয়। রাস্তার মাঝখানে কিরকম যেন একটা। এখানে ভেতরে গিয়ে দেখলাম—খুব সাধাসিধে ব্যবস্থা, একটা ক্রস ও একটা মস্ত বড় মালা পাথরের তৈরি, আবছা অন্ধকারে ছোট্ট একটি দীপশিখা। তরুণ জার্ম্মাণীর বুকের রক্ত ঢালার পরিচয় দিচ্ছে এর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য,···মনটা ভারী হয়ে ওঠে খানিকটে সময় দাঁড়ালে।······

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা একটা রেঁস্তোরায় কিছু

পট্‌স্‌ডাম্ প্লেস্—ট্রাফিক টাওয়ার ও লাইপ্‌জিগ্ ষ্ট্রীট

খেয়ে নিলাম। এদের রান্না অনেক ভাল লাগল বিলিতি রান্নার চাইতে। বিশেষতঃ মাংসটা এরা অনেকটা আমাদের ধরণের রান্না করে। ইউরোপে নাকি সুইডেনের রান্নাই সব চাইতে ভাল। অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনেছি। এর পরে আমরা উইলহেলেন ষ্ট্রাসাতে গিয়ে স্বর্গীয় ভন্ হিণ্ডেনবুর্গ যে বাড়ীতে থাকতেন সেটা দেখলাম। তার পরে গেলাম হিট্‌লার যে বাড়ীতে থাকতেন সেটা দেখতে। ছোট্ট বাড়ী, বিশেষত্ব তেমন কিছু নেই, শুধু একজন রাইফেলধারী গার্ড ও একজন S. S.এর লোক ছাড়া। সেখান থেকে ফেরবার সময় বড় রাস্তাতে জার্ম্মাণীর প্রচার-বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ গিবেল্‌স্‌কে দেখলাম। ছোট্ট মানুষটি, বেশ সপ্রতিভ দৃষ্টি। এর পরে আমরা গেলাম 'রাইস্‌ট্যাগ্' বা পার্লামেন্টে। এটা আর এখন ব্যবহার হয় না পার্লামেণ্ট হিসেবে। সেটায় এখন একটা বড় অপেরা বসে। 'রাইস্‌ট্যাগে' ঢোকবার সময় কর্ম্মচারীরা হাত তুলে 'হাইল্ হিট্‌লার' বলে নমস্কার করলেন ও আমরাও প্রতিদান দিলাম। সরকার বেচারী একটু অন্যমনস্ক ভাবে ছিলেন। হঠাৎ নাকের সামনে হাত উঠতে দেখে চম্‌কে উঠে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটা বোঝাবার আগেই।······

এই 'রাইস্‌ট্যাগের' সামনে জার্ম্মাণদের রাষ্ট্রগুরু বিসমার্কের একটা বিরাট প্রতিমূর্ত্তি আছে ও দালানের

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মনুমেণ্ট

গায়ে "জার্ম্মাণ জাতির জন্য" কয়টি কথা খোদাই করা আছে। ভেতরে গিয়ে সবাইকে একটা দল করে আগে যে হলে পার্লামেণ্ট বসত সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। এই বিরাট হলটি ১৯৩৩ সালে 'ভ্যানডারলুব' পুড়িয়ে দিয়েছিল ও তার ফলে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল সেকথা সবাই জানেন। কারণ সেই চাঞ্চল্যকর মামলার খবর পৃথিবীর সব দেশেই সু অথবা কু পরিচিত। বেচারী ভ্যানডারলুব নাকি আগুন ধরিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বাইরে যেতে পারেনি। ফলে তারের

কাঁটায় মাথাটি খোয়াতে হয়েছে। এই হলটা আর নতুন করে তৈরি করা হয়নি; তার কারণ প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, বড় হলের দরকার। এর পরে আমরা রাইস্ট্যাগের সামনে বিজয়-স্তম্ভের ওপরে উঠলাম। ছবির মতন দেখায় নীচেটা। এ সবটাই টিয়ার গার্টেন বলে একটা বিরাট পার্কের মধ্যে অবস্থিত। এই বাগানকে

পার্লামেণ্ট গৃহের নিকট বিসমার্ক মনুমেণ্ট

বার্লিনের হাইড পার্ক বলা হয়। যেখান থেকে বড় রাস্তা আরম্ভ হয়েছে সেখানে একটা বড় স্তম্ভ আছে—নাম হচ্ছে ব্রাণ্ডেনবার্গার স্তম্ভ। পরদিন ওয়েষ্টক্রুজ বলে একটা ষ্টেশনে হানার কথা মত তার সঙ্গে দেখা হল। সেখান থেকে আমরা পট্‌স্‌ড্যামের দিকে চললাম ইলেকট্রিক ট্রেণে। এই পট্‌স্‌ড্যাম জায়গাটি ফ্রেডরিক দি গ্রেটের সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। তিনি এখানে সুন্দর সুন্দর বাগান ও বহু প্রাসাদ তৈরি করেন। পটস্‌ডামে পৌছে প্রথমে এখানকার সবচাইতে বিখ্যাত প্রাসাদ সান্স-সসি দেখতে গেলাম। এই প্রাসাদটি সুবিখ্যাত ভার্সাই প্রাসাদের অনুকরণে তৈরি। তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভেতরে ঢুকে 'ফ্রেডরিক দি গ্রেটে'র ফরাসী-প্রীতির বহু নিদর্শন পাওয়া গেল। তিনি শুধু ফরাসী ভাষার বই পড়তেন। অধিকাংশ সময় ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক, দার্শনিক ও ফরাসী-বিপ্লবের হোতা ভল্‌টেয়ার। ভল্‌টেয়ার অনেকবার এসে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের সঙ্গে এখানে বাস করেছেন ও তাঁর পাখীর ওপর ঝোঁক ও পাণ্ডিত্যকে ঠাট্টা করবার জন্যই ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট্ ভল্‌টেয়ারের থাকবার ঘরে বহুসংখ্যক পাখীর মূর্ত্তি তৈরি করিয়েছিলেন। ফ্রেডরিক্ দি গ্রেটের সঙ্গীতের ওপর ঝোঁক যথেষ্ট ছিল। তাঁর ব্যবহৃত বাঁশী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এখনও এখানে রক্ষিত আছে।

এখান থেকে বেরিয়ে একদল হিট্‌লার-বালকদের সঙ্গে দেখা ও হানার মধ্যস্থতায় আলাপ হল, এরা সবাই বার্লিনের বাইরের ছেলে। অলিম্পিয়া উপলক্ষে এদেরও হিট্‌লার-বালিকাদের একটা বিরাট সম্মেলন হবে সেইজন্য ওরা এসেছে। ভারী সুন্দর লাগল ছেলেদের ব্যবহার। আসবার সময় 'হাইল হিটলার' বলে অভিনন্দন জানাল।

পট্‌স্‌ড্যামে এত বেশী বাগান ও প্রাসাদ আছে যে সবগুলি দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অনেকগুলি দেখে ও অনেকখানি হেঁটে ভীষণ ক্ষিদে পাওয়ায়—একটা বাগানের মধ্যে রেঁস্তোরায় ঢোকা গেলো। বেশ লাগল অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে লেবু দিয়ে চা।···

পরের দিন কুমারী গাইডকে একটু বিশ্রাম দিয়ে নিজেরাই খানিকটে দেখা ঠিক করা হল। যদিও বিকেলে হানাদের বাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। সকালে উঠেই সরকার গেলেন দু একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আমি চললাম আর্ট-গ্যালারীর দিকে, যখন ক্যাইতরিস্ ষ্ট্রাসে ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম তখন দেখি একটা অলিম্পিক টিম যাচ্ছে। তাদের ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল—প্রথমে

ব্রাণ্ডেনবার্গ স্তম্ভ

এদের গার্ড-অফ্-অনার দেয়া হল, ব্যাণ্ডে বাজল জার্ম্মাণ জাতীয় সঙ্গীত—পরে বিপুল 'হাইল হিটলার' ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ ছেড়ে দিল। জার্ম্মাণীর এই যে ব্যবস্থা এর তুলনা নেই। কি যে এদের ডিসিপ্লিন, কি চমৎকার যে এদের সংঘ-গঠন—চোখে না দেখলে ঠিক ধারণা করা যাবে না।

ন্যাশানাল গ্যালারীতে গিয়ে একজন গাইড দরকার

হল বুঝিয়ে দেবার জন্য। গাইড হলেন একটি তরুণী। মেয়েটী ইউনির্ভাসিটিতে পড়েন। অলিম্পিয়ার জন্য এদের ছাত্রসমিতি থেকে নিয়ম করা হয়েছে যে যাঁরা ইংরেজি বলতে পারেন তাঁরা দ্রষ্টব্য জায়গাগুলির এক একটাতে এক একদিন থাকবেন। খুব সঙ্গত বলে মনে হল এই ব্যবস্থা; আর্ট গ্যালারীর ছবির সম্পদ খুব বেশী না থাকলেও মন্দ নেই। ফরাসী প্রভাব ছবির ওপরে এক সময় যে বেশীই ছিল তার নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর্ট গ্যালারীর পাশেই এদের কত বড় মিউজিয়াম, আমার কিন্তু পুরোনো

চ্যানেল পার হবার সময়

অস্ত্র শস্ত্র রাখবার মিউজিয়ামটাই ভাল লেগেছে। মিউজিয়ামেরও সংখ্যা অনেক। সব দেখা সম্ভব নয়।

বৈকালে সরকার ও আমি স্থর ষ্ট্রাসাতে হানাদের বাড়ী চায়ের নেমতন্ন রাখতে গেলাম। হানার মা ও অন্য একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল—নাম হের পিল্‌জ—হানার একটি দাদা। বেচারী আপাততঃ টামেনবার্গে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা লাভ কচ্ছেন ইউনির্ভাসিটির ডিগ্রি নেবার পর। হানার মা বেশ ভাল ইংরেজি বলতে পারেন ও আমাদের দেশের অনেক খবর রাখেন। মহাত্মাজীর লবণ সত্যাগ্রহ পর্য্যন্ত। অনেক গল্প করলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হল না এজন্য দুঃখ করলেন। হানার বাবা ছিলেন পি-এচডি ও অনেক ভাষা জানতেন। তাঁরই চেষ্টায় এঁরা অনেক বিষয় জানেন। চা-টা খাওয়ার পর কিছু বাজনা শোনা গেল। কুমারী গাইড বেহালা ও হের পিল্‌জ পিয়ানো বাজালেন; প্রথমে এদের জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার পর অন্য কয়েকটি নামকরা সুর বাজানো হল। সঙ্গীতে কোন দখল আছে বলে কোন শত্রু আজ পর্য্যন্ত আমাকে অপবাদ দেয় নি। তবুও ভারী ভাল লাগল এদের বাজনা। পরে জানতে পেরেছি যে শ্রীমতী হানার সঙ্গে পিল্‌জের মধুর একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠ্‌ছে।…ওরা দুজনে একসঙ্গেই পড়ে। ছেলেটি ভারী লাজুক। বড় মিষ্টি চেহারা। শ্রীমতী গাইডের পছন্দের প্রশংসা করি। এখনও ওদের অনেক
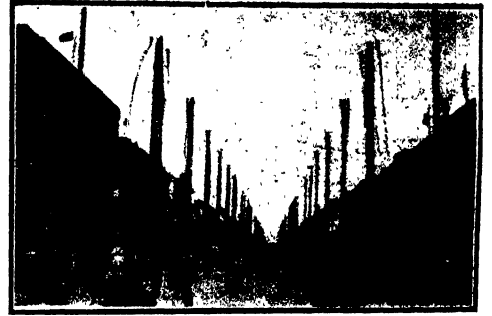
পতাকা সমেত আণ্টারডেন্ লিনডেন্

চিঠি পাই।…ঝগড়া…অভিমান ।…না, এসব বলা উচিত নয়।

রাত্রে খাওয়ার পরে সরকার, আমি ও দত্ত তিনজনে হাউস-ফাদারল্যাণ্ড বলে একটা নাইট-ক্লাব দেখতে গেলাম। খুব ভাল লাগল এর ব্যবস্থা। বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর এক একটা হল এক একটা দেশ কিম্বা প্রদেশের অনুকরণে তৈরি। রাইনল্যাণ্ডের ঘরটা চমৎকার। প্রকাণ্ড হলের এক কোণায় কাঁচ দিয়ে ঘেরা জায়গায় রাইনল্যাণ্ডের দৃশ্য। পাহাড়-নদী-বন, ট্রেণ চলেছে। ঝড় এল, গাছের মাথাগুলো দুলে উঠল। ষ্টীমার চলেছে নদী দিয়ে।…চমৎকার।

টার্কির ঘরে ঢুকলে মনে হয় যেন সুলতানের হারেমে এসে পড়েছি। আলবোলা পর্য্যন্ত সাজানো রয়েছে। জাপানের ঘরে জাপানী পোষাকপরা মেয়েরা খাবার দিচ্ছে।

একটা ঘরে ব্যাভেরিয়ান্ নৃত্য হচ্ছে। বেঁটে মোটা লোক চলেছে—এমন হাসি পায় ওদের নাচ দেখলে। এখানে বিয়ার বা কগ্‌নাগ্ জলের মতন ব্যবহার হয়। আমরা অরেঞ্জেড্ খাচ্ছিলাম বলে প্রায় দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আর কি। বার্লিনে আরও অনেক বড় বড় নাইট-ক্লাব আছে। কিন্তু হাউস-ফাদারল্যাণ্ড আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে।

১লা আগষ্ট অলিম্পিয়ার উদ্বোধনের দিন। হানা এল সকালে আমাদের ওখানে। আমরা তিনজনে বিসমার্ক-ষ্ট্রাসাতে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম হিট্‌লার ও অন্যান্য নেতাদের দেখবার জন্য। হাজারে হাজারে ব্রাউন সার্ট রাস্তার দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে কি একটা আনন্দ ও উদ্দীপনার চিহ্ন। এদের নেতা যে এদের একান্ত প্রিয়—তাঁকে দেখবার জন্য এদের সহিষ্ণুতা দেখলে বেশ বোঝা যায়। আমাদের পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। বেচারী সকাল থেকে কিছুই খায় নি, তবুও কি উৎসাহ তার। হাসির সঙ্গে সবাইকে কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করছিল সব সময়।

পট্‌সডামে আমরা—(বাঁ দিক থেকে)—
সরকার, হানা, আমি

বেলা আড়াইটে, এরকম সময় জার্ম্মাণীর গর্ব্ব, পৃথিবীর বিস্ময়, বৃহত্তম জেপিলিন "হিণ্ডেনবুর্গ" আমাদের ওপরে ভেসে এল। কি বিরাট এর দৈর্ঘ্য—কি চমৎকার এর গঠন ও কি সাবলিল এর গতি—যেন একটা প্রকাণ্ড রূপোর চুরুট হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে, সামনে দুটো তিন এঞ্জিন-শুদ্ধ এরোপ্লেন একে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; তাদের ঠিক খেলনার মতন দেখাচ্ছে, বার চারেক খুব নীচ দিয়ে উড়ে আবার ফিরে গেল এর আস্তানা ফিল্ডরিক্ স্যাফেনের দিকে। এবার আসতে লাগলেন এক এক দেশের প্রতিনিধিরা, ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের নীল পাগড়ি পরা বেশে সুন্দর দেখাচ্ছিল। একটু পরে নেতাদের গাড়ী আসতে লাগল—শেষে এল হিট্‌লারের গাড়ী। প্রথমে একখানা কালো রঙের মার্সেডেস্-বেঞ্জ গাড়ী, ড্রাইভারের পাশে হিট্‌লার দাঁড়িয়ে আছেন অভিবাদনের ভঙ্গিতে হাত তুলে। কতকটা যেন অভয় দেবার ভাবে। মুখে স্মিত হাসি। বহু ছবি দেখে এঁর চেহারার রুক্ষতা সম্বন্ধে যে একটা ভুল ধারণা হয়েছিল, সেটা দূর হতে একটুও সময় লাগল না। এক কথায় অমন সুন্দর চেহারা খুব কমই দেখা যায়। শান্ত, সুগম্ভীর, সৌম্য মুখশ্রী।

একটু পরে অলিম্পিক অগ্নি এসে পড়ল। পাঁচজন করে একটা দলে আগুনটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! মাঝের লোকটির হাতে টর্চ্চ। কত দেশ পার হয়ে গ্রীসের ক্ষুদ্র অলিম্পিয়া গ্রাম থেকে এই আগুন অনির্ব্বাণভাবে চলে এসেছে। দলে দলে যুবক একে তাদের দেশ পার করে দিয়েছেন। পবিত্র হোমাগ্নির মতন প্রভাব আছে এর। জগতের তারুণ্যের নির্ব্বিরোধ সংঘর্ষের উদ্বোধন করবে এর উপস্থিতি। যাতে হঠাৎ নিভে না যায় তার জন্য ম্যাগনেসিয়া দিয়ে জ্বালানো হয়েছে।

এর পরে আমরা রাইস্ স্পোর্ট্‌স ফিল্ডের কাছে একটা রেঁস্তোরাতে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। হানার মা সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। খানিকটা পরে নেতারা সবাই এক এক করে ফিরে এলেন। এবার সবার আগে হিট্‌লার স্বয়ং। আবার সেই বিপুল জয়ধ্বনি। আবার সেই গোয়েরিংএর ইউনিফর্ম্ম-পরা বিশাল বপু, ডাক্তার গ্রেবেলের চতুর দৃষ্টি, হেকটের উৎসাহ ভরা মুখ—একে একে আমাদের সুমুখ দিয়ে চলে গেল।

আমাদের দৈনিন্দিন ভ্রমণের বিষয় থেকে এবার একটু অলিম্পিয়ার বিষয়ে যাওয়া যাক। অলিম্পিক গেমস্‌এর ফলাফল সম্বন্ধে বহু কাগজে বহুভাবে লেখা হয়েছে; কে কি রকমে কোন রেকর্ড ভাঙ্গল, প্রথম হ'লে কেন হাততালি পড়ল না—ইত্যাদি। সে সব বিষয়ে কিছু লিখব না; কেবল নিজের দেশের বিষয় কিছু বলব। ভারতবর্ষ থেকে যে সকল দল পাঠানো হয়, তার মধ্যে এক হকিদল ছাড়া অন্য কোন দল পাঠাইবার কিছু সার্থকতা আছে বলে আমাদের মনে হয় নি। লাইট্‌ এথলেটিক্স্‌এ ভারতবর্ষের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের শোচনীয় অবস্থা দেখে সত্যি দুঃখ হয়। ম্যারাথন্‌ রেসে আমাদের চ্যাম্পিয়ন্‌ এথলেট-হলেন ৩৭—শুধু তাই নয় তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল সুস্থ করবার জন্য। আমাদের দেশে পোল্‌ভল্টের রেকর্ড এগার ফিটের নিচে—আর অলিম্পিকে সর্ব্বনিম্ন ক্ষমতা ১২ ফিট। অবিশ্যি প্রতিযোগিতায় এঁদের উৎকর্ষ বাড়বে সত্যি। কিন্তু কিছুকাল পর্য্যন্ত এই ধরণের খেলা কি দেশে করলে সুবিধে হয় না? তাতে আমাদের গরীব দেশের কিছু টাকা বাঁচবে এবং বিদেশে ভারতবর্ষের মান নষ্ট হবে না। বিলেতের প্রেসগুলি খুব প্রপাগাণ্ডা করছে যে অলিম্পিকের উপযুক্ত এথলেট এদেশে তৈরি না হলে এদেশ থেকে টীম পাঠানো হবে না। এ বিষয়ে আমাদের দেশের কর্ত্তাদের একটু নজর পড়া দরকার।

যাক্‌—যা বলছিলাম। ৩রা আগষ্ট সকালবেলা হানার সঙ্গে দেখা হল উইজ-লেবেন ষ্টেশনে। সেখান থেকে আমরা গেলাম অলিম্পিয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটা একজিবিসন দেখতে। এখানে ঢোকবার দক্ষিণা ছাত্র বলে অর্দ্ধেক লাগল। বিরাট এই একজিবিসনের ব্যবস্থা—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দশটা হলে সাজানো। প্রধানতঃ এতে জার্ম্মাণীর সমস্ত জিনিসপত্তর সাজানো রয়েছে। নূতন ধরণের মোটর থেকে নতুনতম ধরণের সম্পূর্ণ এরোপ্লেন পর্য্যন্ত। প্রথম হলে ঢুকতেই বিরাট একখানা ছবি নজরে পড়ে। সম্মুখে হিট্‌লার দাঁড়িয়ে আছেন অভয় দেবার ভাবে হাত তুলে। পেছনে অগণিত লোক জীবনযাত্রার সব অবস্থা থেকেই। কুলী মজুর থেকে আরম্ভ করে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় সবাই তাঁকে অনুসরণ করলে।

একজিবিসনের ভেতরে সব চাইতে ভাল লাগল টেলিভিসনের ব্যবস্থা। এখানে টেলিভিসনে অলিম্পিক গেম থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই বিনা পয়সায় দেখান হচ্ছে। সাধারণের জন্য এই ব্যবস্থা ইংলণ্ডে হতে এখনও অনেক দেরী।

এদের তৈরি ক্যামেরা ইত্যাদি এত সস্তা ইংলণ্ডের তুলনায় যে দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। অর্দ্ধেকেরও কম দাম। বার্লিনের অটোম্যাটিক দোকান একটা দেখবার জিনিস। এখানে শ্লটে পয়সা ফেললে কেক্‌, স্যাণ্ডউইচ্‌ থেকে আরম্ভ করে দুধ, রান্না-করা মাংস, মদ—সবই পাওয়া যায়।

একজিবিসনের পাশে হিট্‌লার লেবার সার্ভিসদের একটা ক্যাম্প করা হয়েছে। সেইটে দেখতে গেলাম। একজন লেবার সার্ভিসের ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেটি স্কুলে

রাত্রিকালে বার্লিনের দৃশ্য—প্যারিস প্লেস ও ব্রাণ্ডেনবার্গার স্তম্ভ

পড়ে, কিন্তু বিরাট চেহারা দেখলে পূর্ণ যুবক বলে মনে হয়। ছেলেটি এরই মধ্যে বেশ ভাল ইংরেজি ও ফরাসী বলতে পারে। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে সব বুঝিয়ে দিল। কি অমানুষিক পরিশ্রম এদের করতে হয় ও কি সুন্দর হাসি-মুখে ওরা এসব করে। ভাবলে অবাক হতে হয়, কত জমি যে এরা চাষ করেছে, কত রাস্তা যে তৈরি করেছে ও খাল কেটেছে তার ইয়ত্তা নেই। দীর্ঘ ছয়মাসকাল এই কাজ করবার সময় খাওয়া-পরা বাদ মাত্র ২৫ ফিনিস্‌ করে হাত খরচের জন্য পায়। তারপর এক বছর—আজকাল ত দুবছর—বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা আছেই। এসব দেখলে সত্যি বোঝা যায় যে কিসের জোরে পরাজিত

জর্জ্জরিত এই জাত আবার পৃথিবীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। কি করে এরা এগিয়ে যাচ্ছে হুহু করে!

পরের দিন সকালে আমরা দল বেঁধে অর্থাৎ আমি, সরকার, শ্রীযুক্ত রায় পি-আর-এস, ডাক্তার নিয়োগী, ডাক্তার বসাক ও কুমারী দত্ত সবাই মিলে এখানকার এরোড্রাম দেখতে গেলাম। সেখানকার লোকরা আমাদের ভীষণ রকম যত্ন ত করলেনই, তার ওপরে আমাদের এখানে আসার স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে অতি সুন্দর ছবি শুদ্ধ সুশ্রী বাঁধানো অলিম্পিয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি জার্ম্মাণি সম্বন্ধে একখানা বই উপহার দিলেন। যতক্ষণ আমরা এরোড্রামে ছিলাম ততক্ষণ আমাদের কত ছবি ও কত অটোগ্রাফ নেয়া হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কুমারী দত্তর
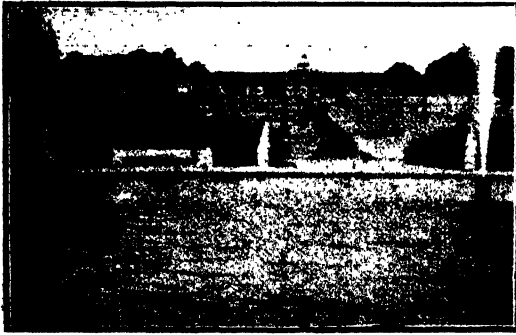
সান্স-সসি প্রাসাদ

সাড়ী পরাটা এর একটা বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাড়ী সম্বন্ধে এরা সত্যি উৎসুক।

তারপরে সবাই মিলে একবার উড়োজাহাজে ঘুরে বেড়ান গেল। আমাদের বিশেষভাবে অর্থাৎ অনেকেরই আগে প্রকাণ্ড একখানা ২২ সিটার প্লেনে বসিয়ে দিল। সমস্ত বার্লিন সহরের ওপর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরা হল। বিলেতে থাকতেও এরোপ্লেনে উঠেছি কিন্তু এমন সুন্দর পরিচালন ও অবতরণ দেখিনি। এরোড্রামের স্মৃতি অনেকদিন মনে থাকবে। ভাড়াও খুব সস্তা, মাত্র ৫ মার্ক। অলিম্পিয়ার জন্য বিদেশীদের উপর যে সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা সবারই অনুকরণযোগ্য; যখনই কোন রকম ভীড়ে পড়তে হয়েছে—যেমন ডিউস ব্যাঙ্কে টিকিট কেনবার জন্য, পাশপোর্ট দেখালে অমনি সঙ্গে করে নিয়ে টিকিট কেনবার জানলায় পৌছে দিয়ে এসেছে। অধিকাংশ পুলিশ ইংরেজি ও ফরাসী এ-দুটো ভাষা শিখেছিল অলিম্পিয়ার জন্য। তা ছাড়া হাজার হাজার ব্রাউন্-সার্টকে স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হয়েছিল—যাতে বিদেশীদের কোন অসুবিধে না হয়। এদের সংঘ-গঠনের ক্ষমতা পৃথিবীর সব দেশই স্বীকার করেছে বা করবে। জার্ম্মাণী অলিম্পিয়ার জন্য শুধু আশী মিলিয়ন মার্কই খরচ করে নি; খরচ করেছে অনেক বুদ্ধি, অনেক ধৈর্য্য, অনেক উৎসাহ। যা সবাই পারে না।······

৫ই আগষ্ট জাপানের সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ও ভারতবর্ষের সঙ্গে হাঙ্গারীর হকি খেলা দেখলাম। গত অলিম্পিকে ভারতবর্ষ যে মার্কিণকে ২৪-১ গোলে হারিয়েছে তাতে তখন আশ্চর্য্য হয়েছিলাম কিন্তু এখন হইনি। মার্কিণ যে শুধু খারাপ খেলে তা নয়—খেলতে জানে না বললেই চলে। আমাদের দেশের যে কোন স্কুল বা কলেজ টীম ওদের অনায়াসে হারিয়ে দেবে। ভারতবর্ষের খেলার সময়ে বৃষ্টিতে খুব ভিজলাম। খেলার মধ্যে ভারতের লেফ্ট হাফের হঠাৎ ক্রোধের কারণ কি তা বোঝা গেল না। দুজনে পড়ে যাবার পর তিনি উঠে হাঙ্গারীর খেলোয়াড়টীর ওপর ষ্টিক্ তুললেন মারবার ভঙ্গীতে। রেফারী অবিশ্যি তখনই এসে তাকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু অলিম্পিক প্রতিশ্রুতি নেবার পর এর চাইতে লজ্জাকর বিষয় আর কি হতে পারে? ভাবলাম, ভাগ্যে এই খেলোয়াড়টি ক্রিকেট দলে আসেন নি। সেখানে শাস্তির যা ব্যবস্থা।···

গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে চীনের খেলা দেখলাম। চীন টীম মন্দ খেলে না সেটা কলকাতায় অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনের টীম ভাল ছিল না কারণ ওদের নাম-করা খেলোয়াড়রা সবাই প্রফেশনাল্। চীনের টীমের ক্যাপ্টেন বেশ ভাল খেলেছেন।

রাত্রে ফিরে সরকারের জিনিস-পত্তর গোছানো হল। ওঁর লণ্ডনে হঠাৎ একটু দরকার পড়েছে। ওঁকে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসবার পথে খানিকটে বেড়িয়ে ফিরলাম। মনটা খারাপ ছিল। এ কদিন সব সময়ে একসঙ্গে কি আমোদে কাটিয়েছি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা শুনলাম টেলিফোনে কে ডাকছে। ফোন ধরতেই বলে উঠল "হ্যালো নির্ম্মল!"—ঘুমের ভাবটা তখনও

কাটে নি। ভাবলাম কে আবার এখানে আমার নাম ধরে ডাকে? ও-দিকে খিল খিল করে হাসির শব্দে অবিশ্যি বুঝতে দেরী হল না যে কাজটা শ্রীমতী হানারই বটে—বললাম "কি আদেশ দেবী?" ও বলল "এখনি রাইস্ স্পোর্টস্ফীল্ডে চলে এস। আমার ও তোমার জন্য টিকিট কিনে রেখেছি—নটার মধ্যে আসা চাই।" 'তথাস্তু' বলে বুঝলাম কাজটা নেহাৎ সহজ নয়। তখনই আটটা কুড়ি। খাওয়াটা বাদ দিয়ে কোন রকমে ত গিয়ে হাজির হলাম। শ্রীমতী বললে—সাঁতারের জন্য টিকিট কিনেছি।

অনেক বিখ্যাত সাঁতারুদের সাঁতার ও অনেক বিখ্যাত ডুবুরীদের ডুব দেখে আনন্দ পেলাম। কিন্তু বেলা যতই বাড়তে লাগল খিদের চোটে আনন্দ ততই কমতে লাগল। হানার সঙ্গে যা কিছু খাবার ছিল তা অনেকক্ষণ শেষ করা হয়েছে। আরও কিছু সময় অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে কাটিয়ে শেষে চলে এলাম দুজনে। ষ্টেডিয়ামের বাইরে বিরাট একটা রেঁস্তোরা তৈরি করা হয়েছে; সেখানকার খাবারই তখন খুব ভাল খুব মিষ্টি লাগলো। তারপরে গেলাম গরীবদের জন্য একটা গ্রাম তৈরি করা হয়েছে তাই দেখতে। বিপুল ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। গ্রাম থেকে যে সব গরীব লোকরা অলিম্পিয়া দেখতে আসবে—তারা যাতে খুব সস্তায় খেতে পারে ও দিনটা কাটাতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। সম্পূর্ণ গ্রামটা কাঠের তৈরি ও এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা হয়েছে। এখানে পোষ্ট অফিস, টেলিফোন, অর্কেষ্ট্রাশুদ্ধ বিরাট বিরাট রেঁস্তোরা—এমন কি বিনামূল্যে সিনেমারও ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা।—

বিকেলের দিকে খেলা দেখতে যাবার কথা ছিল। তখনও খানিকটে সময় হাতে ছিল। হানা বলল "চল আমাদের বাড়ী গিয়ে এ সময়টা কাটানো যাক।" দুজনে ওদের বাড়ী গিয়ে দেখলাম হানার মা বাড়ী নেই। হানা বলল "চল, একটা মজা করা যাক্।" দুজনে ওদের রান্না ঘরে ঢুকে ওর মার তৈরি সমস্ত খাবার নির্ব্বিবাদে শেষ করে দেওয়া হল। চা বানিয়ে দেখা গেল দুধ নেই। তাতে কি আর আট্কায়। খুব আমোদ করে সব খাওয়া হল। হানা হেসে বলল "মা এসে যা চেঁচাবেন, দেখবার মতন।" বল্লাম "তা তোমার মতন দুষ্টু মেয়ে বাড়ীতে থাকলে মাদের অবস্থা কাহিল হবারই কথা।"

প্রথম খেলাটি ছিল জার্ম্মাণির সঙ্গে আফগানিস্থানের হকি খেলা। ভারতবর্ষ ছাড়া একমাত্র জার্ম্মাণীই দেখলাম একটু খেলতে জানে। খুব খেটে খেলেও প্রচুর উৎসাহ আছে। পরের খেলাটি অর্দ্ধেক হলে হানা বলল "আমি চল্লাম একটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।" চোখ মুখের রঙ্গীণ ভাব দেখে অবিশ্যি বুঝতে দেরী হল না বন্ধুটী কে। বললাম—আশা করি খুব আমোদ পাবে; হাসি মুখে ও চলে গেল। আমি খেলা দেখায় মন দিলাম।—

এইখানে অলিম্পিক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাক।

এবারের একাদশ অলিম্পিয়াডে পৃথিবীর ৩৫ বিভিন্ন দেশের বহু সংখ্যক খেলোযাড় যোগ দিয়েছিলেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়

আমেরিকা অনেক বিষয়ে খুব ভাল করেও জার্ম্মাণীর সঙ্গে পারে নি। প্রাচ্যের নাম রেখেছে জাপান। তারা প্রায় সাড়ে তিনশ খেলোয়াড় পাঠিয়েছিল। ভারতবর্ষের হকি চ্যাম্পিয়ন হওয়া খুব গৌরবের বিষয়। বাধাও তারা পায়নি তেমন কিছু। বিভিন্ন দেশের পতাকা যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে ভারতবর্ষের অলিম্পিক পতাকা "ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" কেন রাখা হয়নি সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। অলিম্পিয়া উপলক্ষে যে বিরাট ষ্টেডিয়ামটি তৈরি হয়েছিল সেটা দেখবার মতন। পরে এটাকে military school মতন করা হয়েছে। অলিম্পিক ঘণ্টাটি একটা বিরাট টাওয়ারে ঠাঙ্গানো ছিল। এর গুরু গম্ভীর শব্দে জায়গাটির একটা গাম্ভীর্য্য বাড়িয়ে দিত। রাত্রে চতুর্দ্দিক

থেকে সার্চ্চ লাইট ষ্টেডিয়ামের ওপর পড়লে এর সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পেতো। Olympia Sorf বা অলিম্পিক গ্রামে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছিল, গ্রামটি বার্লিন থেকে দশ মাইল দূরে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার জন্য ছেলেরা দল করে গত দু' বছর যাবত এক একজন এক একটা ভাষা শিখেছে—অলিম্পিয়ার সময়ে যাতে অনর্গল ভাবে বলতে পারে। প্রত্যেক দেশের খেলোয়াড়দের জন্য সেই ভাষায় অভিজ্ঞ একটি ছেলে থাকতো গাইড হিসেবে। প্রধান ষ্টেডিয়ামের পাশেই এরা অলিম্পিয়া উপলক্ষে একটা বিরাট উন্মুক্ত স্থানে থিয়েটার করেছে—তাতে ২৫ হাজার লোকের বসবার জায়গা আছে। আগাগোড়া কংক্রিটে তৈরি। যে ষ্টেশনে নেমে ষ্টেডিয়ামগুলোতে যেতে হয়, সেই রাইস স্পোর্টসফিল্ড ষ্টেশনটি আগে নাকি ছোট্ট একটি ষ্টেশন ছিল। এখন সেটাকে ১২টি প্ল্যাটফরম্ শুদ্ধ প্রকাণ্ড একটি পরিচ্ছন্ন ষ্টেশনে পরিণত করা হয়েছে। ষ্টেশনে নামা মাত্র লাউড্ স্পীকারে জানা যায় কোন দিকে বাইরে যাইবার পথ। এই লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা বার্লিনের প্রত্যেক বড় রাস্তাতে আছে। যে কোন দরকারী বক্তৃতা অথবা সংবাদ যে কোন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় শোনা যায়—অবিশ্যি বুঝতে হলে ভাষা জানা দরকার। তার ওপর ডাঃ গেবেল্‌স্ নিয়ম করে দিয়েছেন যে যে-কোন দরকারী বক্তৃতার সময় প্রত্যেকের বাড়ীর রেডিয়ো খোলা রাখতে হবে ও কেউ শুনতে চাইলে তাকে ডেকে এনে শোনাতে হবে। কি রকম প্রপাগাণ্ডা!

আমার বার্লিন ছাড়বার সময় ঘনিয়ে এল। যাবার দিন বিকেলে হানাদের বাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। হানার মা হেসে বললেন "সেদিন তোমরা চুরী করে খেয়ে গেছ, সামনের বার কিন্তু আসতে হবে ভাল করে খাবার জন্য।" বিশেষ চেষ্টা করব বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সত্যি বিদেশে এ কয়দিনের স্নেহের স্পর্শে বাড়ীর কথা মনে পড়ায় মনটা ভারী হয়ে উঠল।...হানা আমার সঙ্গে এল ষ্টেশনে তুলে দেবে বলে। পথে বলল, "চল, আজ অনেক দিনের মত একবার রাত্রে বড় রাস্তা দেখে আসি।" হাসি পেল এদের এই রাত্রে দেখার বিষয়ে। রাত্রে এদের দিনের চাইতেও বেশী ভীড়। কখন যে ভীড়ের শেষ হয় বলা মুস্কিল। রাত দু'টো পর্য্যন্ত রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি, ঠিক সন্ধ্যেবেলার মত ভীড়। পেভ্‌মেণ্টের ওপরে ঠিক তেমনই ভীড়। কাফেগুলোতেও সমান আমোদ চলছে। রাত্রির ক্লাবগুলোর ত কথাই নেই। অলিম্পিয়ার জন্য ভীড়ের চাপে রাস্তা হাঁটাই মুস্কিল।

বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হানা বলল "জান নির্ম্মল! সেদিন সন্ধ্যেটা আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।" বললাম "ব্যাপার কি?" ও বলল "কি জানি কি হ'ল, খালি ঝগড়া করলাম। সারারাত ঘুমুতে পারিনি।"—শুনে আমার খুব হাসি পেল। আমাকে হাসতে দেখে ও অভিমান করে বলল "হ্যাঁ, তুমি ত হাসবেই। তোমার কি, ছেলেমানুষ কি না, এসব এখনও বোঝ না! আচ্ছা তোমার যখন এ রকম অবস্থা হবে তখন আমিও হাসব।" আমি বললাম "হাসিটা আমার একটা রোগ। ছেলেমেয়েদের প্রেমে পড়তে দেখলে আমার হাসি পায়।" ও চটে-মটে বলল, "হ্যাঁ, তা ত পাবেই। আচ্ছা বোঝা যাবে" ইত্যাদি।

অনেকটা বেড়ান হল। রাতের বার্লিন—ভূতপূর্ব্ব কাইজারের প্রাসাদ, তার কাছে রাখা অলিম্পিক অগ্নি—ইউনিভার্সিটি—এসব দেখে বাড়ী এলাম তখন এগারটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। এগারটা পনেরতে আমার গাড়ী। খাওয়া গেল চুলোয়। কুমারী দত্তদের গাইড ষ্টান্‌কে দেখি সেখানে হাজির। ওকে বলতে এক দৌড়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। একটা সুবিধে এখানে স্পীড্ লিমিট্ নেই। ভীষণ জোরে গাড়ী চলল। একটা কথায় আমরা এমন হাসাহাসি করছিলাম, পথের লোকরা যদি আমাদের পাগল ভেবে থাকে তবে তাদের অন্যায় হবে না।

ষ্টেশনে সাংঘাতিক রকম ভীড়। কোন রকমে দুটো গাড়ীর মাঝখানের রাস্তায় সুটকেশ চেপে বসে পড়লাম। ট্রেণ ছাড়ল। মিলিয়ে গেল সামনে থেকে হানা ও ষ্টান্‌কের রুমাল।...কত সুখস্মৃতি জড়ানো বার্লিন ক্রমেই পেছনে পড়তে লাগল। টুকরো টুকরো ভাবে মনে ভেসে আসতে লাগল কত কথা—রাতের বার্লিন—অলিম্পিকের খেলাধূলা—বিদেশিনী তরুণী হানার প্রেমের গল্প—প্রেমের কলহ—মিষ্টি সুরে ভেসে বেড়াতে লাগলো...বার্লিনের দিনগুলো যেন স্বপ্নভরা মায়াময়।

হু হু করে ট্রেণ চলছে। আমার সামনের তরুণ সৈনিকটী কি ভাবছে কে জানে। ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসছে।...

ষ্টুডেণ্টস্ ইণ্টারন্যাশানাল হোটেল, এডিনবরা, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

অনুকূলের অনুরাগ

শ্রীপ্রভাতকুমার দেব সরকার

বিচার হইতেছিল রায়বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে।...বিচারক ছোট-কর্ত্তা স্বয়ং—যেহেতু বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়পক্ষই এলাকাধীন প্রজা।...ইহাকে গ্রাম্য-সালিসী বলা চলে না, কেন না গ্রামের পাঁচজনের মতামত না-পাইলে ইহার কিছু যায় আসে না।...ছোটকর্ত্তার মতামতই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি;... হ্যাঁ, তবে তিনি যদি আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে রায়-দান কালে উপস্থিত সকলকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন: কি, এই বিচার-ই ঠিক?—সম্মতি-অসম্মতির কথা একেবারে অবান্তর, অতএব তাহাদের মাথা নাড়িয়া সায় দেওয়া ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য নাই...দর্শকের আবার ভাল মন্দ জ্ঞান!...এইরূপ বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আসিবেও—কি বড়কর্ত্তা, কি ছোটকর্ত্তার বেলায়!...

বিচারের বিষয়টী অত্যন্ত জটিল এবং যুক্তিতর্ক-সাক্ষী-সাবুদের বহির্ভূত...বিবাহ-বিচ্ছেদ বউ পালান লইয়া ব্যাপার।...তবুও সাক্ষী-সাবুদ তলব করা হইল। বাদী অনুকূল এজাহার কালে যাহা বলিয়া গেল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—

...তাহার স্ত্রী, বাবুদের প্রজা মতিলাল সামন্তের কন্যা শ্রীমতী বিভারাণী (নামটী বাবুদের কন্যার নাম অনুসারে রাখা) প্রায় ই কোন দিন রাত্রে—সে যখন ঘুমাইয়া পড়ে, কোন দিন দুপুরে—সে যখন কাজে বাহির হইয়া যায়, বাপের বাড়ী পলাইয়া আসে।..ইতিমধ্যে সে বারকয়েক শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরিয়া স্ত্রীটীকে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ প্রায় মাসখানেক হইল সে পলাইয়া আসিয়াছে.. শ্বশুরকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে পাঠান নাই...উপরন্তু শাসাইয়াছেন যে পুনর্ব্বার এ গাঁয়ে পা-দিলে তাহার পদদ্বয় খোঁড়া হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তিনি শ্বশুর হ'ন, অতএব এ কার্য্য তাঁহার দ্বারা না হইয়া বিভার-ই বাল্যসাথী ষণ্ডামার্ক কানাই হালদারের দ্বারা হইবে। সে ইহাও অবগত হউক, কানাই যখন এ কার্য্যে হাত দিয়াছে, তখন তাহার এ গাঁয়ে হাঁটাহাঁটি না-করাই ভাল।...ইচ্ছা করিলে সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে—শ্বশুর মহাশয়ের কোন আপত্তি নাই।...

মতিলাল সামন্তের ডাক পড়িল। ডাক পড়িবার পূর্ব্ব হইতে-ই সে মুখাইয়া ছিল। অনুকূলের এজাহার দানকালে বার-কয়েক প্রতিবাদকল্পে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। সে যাহা কহিল, তাহা এইরূপ:—

শাসান'র কথা সব অনুকূলের মনগড়া...ইহার মধ্যে কানাই বলিয়া কেহ নাই...উপরন্ত সে-ই তাহাকে গালাগালি করিয়া শাসাইয়া গিয়াছে. তবে সে আর তাহার কন্যা বিভারাণীকে ঐ ঠেঙাড়ে জামাই-এর ঘরে পাঠাইতে রাজী নয়; মেয়েটাকে প্রহার করিয়া তাহার আর কিছু রাখে নাই...কোন দিন বা খুন করিয়া ফেলিবে!...বলিলে যদি প্রত্যয় না-হয়, বিভাকে আনিয়া তাহার পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখিলে সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারবেন।...

অনুকূল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না হুজুর! ও-শালাই মিথ্যে বল্‌ছে...ডাকুন আমাদের গাঁয়ের হরিহরকে—সে সেখানে ছিল.. কি আমি বলেছি আর ও-ই বা কি বলেছে, তার মীমাংসা হ'য়ে যা'ক ...ববরঞ্চ ওই শালা-ই আমার পিঠে ঘা দুই কীল মেরেছে... আর যখন একটা আস্ত বাঁশ নিয়ে তেড়ে এসেছিল, তখন হরিহর না-ধরলে রক্তারক্তি হ'য়ে যেত...ডাকুন হরিহরকে—

বলা বাহুল্য হরিহর কাজ ফেলিয়া এমন মুখরোচক সালিসীতে যোগদান করে নাই।

মতিলাল লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, শুন্‌লেন ত হুজুর শালার আক্কেল বিবেচনাটা—শ্বশুরকে শালা!...তা' হ'লে বুঝ্‌তেই পারছেন ও মেয়েকে আমার কি অবস্থায় রাখে।

বিভার ডাক পড়িল। তাহাকে ডাকিতে পেয়াদার

বেশী দূর যাইতে হইল না। সে ছোটবাবুরই বাসনমাজা কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহার পিঠের কাপড় তুলিতে মোটা মোটা কালশিরা দাগ সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল। অনুকূল দোষী সাব্যস্ত হইয়া গেল।—আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। পীড়ন সে করে, আর তাহাও পশুর মত।···বিভারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে পেটে অর্দ্ধেক এবং মুখে অর্দ্ধেক করিয়া অনুকূলের বিরুদ্ধে যাহা বলিল, তাহা এইরূপ :—

··তাহার আজ তিন বৎসর বিবাহ হইয়াছে···এই তিন বৎসরের মধ্যে অনুকূল একদিনও তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই···উঠিতে বসিতে তাহাকে শিয়াল-কুকুরের মত প্রহার করিয়াছে···পান হইতে চুণ খসিবার উপায় ছিল না।···সে সে সকল নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়াছিল··· কিন্তু একমাস আগে অনুকূল হঠাৎ কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, এই মাগী শুয়ে আছিস্ কেন? ···নিত্যি অসুখ নবাব কন্যের···উঠে তেল-টেল দিবি কিনা বল! বিভা কহিয়াছিল, ওঘরের তাকে আছে দেখে নাও; ব্যস্, এই কথাতে-ই সে তাহার চুলের মুটী ধরিয়া প্রহার করে এবং তলপেটে লাথি মারে।···স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিভাকে তখন শুইয়া থাকিতে দেখিয়া অনুকূলের রাগ আরও চড়িয়া যায়,স্ত্রীকে একটু আগে প্রহার করিয়া তাহার মন শান্ত হন নাই। কহিল, এই এখনও শুয়ে আছিস্! ভাত-টাত বাড়বি না—! বিভার পিঠ ও তলপেট তখন ব্যথা করিতেছিল, তাই উঠিতে না-পারিয়া কহিল, পারবো না—বেড়ে খাওগে। অনুকূল খিঁচাইয়া কহিল, কানাইটে এলে পার্‌তিস্ না!—ছোটলোক, যেমন বাপমা তেমনি হ'বে ত! বিভারাণী এই কথার শুধুমাত্র প্রতিবাদ করিয়াছিল···তাহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাহার পিঠে লেখা আছে।···অমন স্বামীর সহিত ঘর করার চেয়ে জন্ম জন্ম বিধবা হইয়া জন্মান ভাল ইত্যাদি।···

ছোটকর্ত্তা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। বিভার পিঠের দাগ চোখের জল তাঁহার করুণা আকর্ষণ করিল। তাঁহার চারিপাশে জনকয়েক যুবক বসিয়াছিল। তাহারা এতক্ষণ বিভার জবানবন্দী হাঁ করিয়া গিলিতেছিল এবং মনে মনে বোধ করি কিসের গবেষণা করিতেছিল।··· হঠাৎ যেন কিসের সন্ধান পাইয়া লাফাইয়া উঠিল : ছোটবাবু, এই এদের জন্যই আমাদের দেশে এত নারী-নির্য্যাতন!···এরাই স্ত্রীকে মারধোর করে' তাড়িয়ে দেয়, আর তার ফলে সমাজের মেয়েগুলো কত না অপকর্ম্ম করে···দোষ এদের-ই—বলিতে বলিতে তাহাদের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল এবং সেই সজল চোখের ভিতর দিয়া অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল,···হুকুম পাইলে তাহারা অনুকূলকে ছিঁড়িয়া অণু বানাইয়া সমাজের সর্ব্বনাশের মূল উৎপাটন করিতে পারে।···

অনুকূল প্রতিবাদকল্পে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, পিছন হইতে ছোটবাবুর পেয়াদা কান ধরিয়া বসাইয়া দিল। বিভার পিঠের দাগই যথেষ্ট—তাহার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ টিকিতে পারে না।—চোখের জল, রক্ত, কালশিরা দাগ এসকল বরাবরই মানুষের করুণার উদ্রেক করে···এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না—অনুকূলের সকল অভিযোগ ভাসিয়া লেল।

ছোটকর্ত্তা রায় দিলেন অতি সংক্ষেপে: অনুকূল সর্ব্বসমক্ষে মতিলালের পায়ে হাত দিয়া ক্ষমা চাইবে···আর তাহার যে অন্যায় হইয়াছে একথা বিভার হাত ধরিয়া স্বীকার করিবে; যতদিন না তাহার স্বভাব ভাল হয় ততদিন বিভারাণী বাপের বাড়ী থাকিবে।··

এ বিচার অনুকূলের মনঃপূত হয় নাই—অস্ফুট অভিযোগ করিতে লাগিল। তাহার পর সে যে সকল কথা বলিল, তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিল না। গত্যন্তর হইয়া অনুকূল ছোটকর্ত্তার রায়-এর প্রথম দুইটী সর্ত্ত পালন করিল; কিন্তু শেষ সর্ত্তটী পালন করিবার মত ধৈর্য্য তাহার ছিল না—বউ তাহার আজ মাসখানেক পলাইয়া আসিয়াছে—সংসার অচল—শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার কাজে উৎসাহ থাকে না।

অনেক অনুনয় বিনয় সত্বেও ছোটকর্ত্তার রায়-এর এক তিলও নড়চড় হইল না। উপরন্তু তিনি কহিলেন, ব্যাটার ন্যাকামি দেখ—কাজ করতে পারিনে—ঘরদোর খাঁ-খাঁ করে! বউকে ঠ্যাঙাবার সময় মনে থাকে না, চামার। এই ফমেল—কান ধরে বেটাকে বার করে দে তো রে!

ফমেল আগাইয়া আসিবার পুর্ব্বেই যুবক দলের দু' একজন তাহাকে প্রায় মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দিল। যাইতে যাইতে অনুকূলের সজল চক্ষু যেন ইহাই

বলিয়া গেল : মারামারি করিয়া তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে···মনোমালিন্ত তাহাদের মিটিয়ে দিলে ভাল করতেন বাবু।···

[এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার।···বিভা স্বামীর ঘর হইতে পলাইয়া আসিয়াই ছোটবাবুর অষ্টপ্রহরের ঝি-এর কাজে নিযুক্তা হইয়াছিল—মতিলাল সামন্ত নিঃস্ব বলিয়া নয়, ছোটবাবুর একটী ঝি-এর নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়া। সুতরাং স্বামীত্যাগ করা বিভার নির্ব্বিঘ্নে-ই সম্পন্ন হইয়াছিল। ঘাড়ের উপর বসিয়া খাইলে বোধ করি, মতিলাল বুঝাইয়া সুঝাইয়া কন্যাকে পাঠাইতে পারিত, কিন্তু ছোটকর্ত্তার দয়ায় তাহা হইল না—বরং এই টানাটানির বাজারে প্রত্যহ তাহার ঘরে একজনের আহার্য্য আসিতে লাগিল। এ সুবিধা ছাড়িবার পাত্র সে নহে; তাই কীল এবং আস্ত বাঁশের দ্বারা-ই জামাইকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, স্ত্রীকে প্রহার করে কত বড় পশু সে!···কিন্তু মতিলাল ভুলিয়া গেল যে, তাড়ির ঝোঁক বাপপিতামহের অভ্যাসটা বজায় রাখে]

(২)

বিভারাণী হাসিতে হাসিতে বাবুদের অন্দর-মহলের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই গিন্নী এবং কন্যা মহলের যে যেখানে ছিল ভিড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। বিচার যে খাঁটি হইয়াছে, তাহা তাহারা সমস্বরে স্বীকার করিল। ছোটকর্ত্তার গৃহিণী হাতমুখ নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, বাবুর দয়ার শরীর তাই পিঠ নিয়ে ফিরে গেল—না হ'লে ছাল্‌টা এখানে রেখে যেতে হ'ত!

একজন অল্পবয়সী এয়োস্ত্রী কহিল, আর কেমন হ্যাংলা দেখ্‌লে না দিদি! ছোট—বড়ঠাকুর যেই বিভার হাত-ধরে ক্ষমা চাইতে বল্‌লেন, অমনি সুড় সুড় করে—কি ঘেন্না! মাগো, আমি তো মুখে কাপড় দিয়ে আর বাঁচিনে!

বিভা এই প্রসঙ্গে অনুকূলের হ্যাংলামীর এমন দু' একটী খবর জানাইয়া দিল যে তাহা শুনিয়া উপস্থিত মহিলা-মণ্ডলীর মধ্যে মুখে কাপড় দিয়া চাপাহাসির অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল।···

বড়কর্ত্তার মেয়ে আশার বোধ কয়ি, ছোট কাকার বিচার মনঃপুত হয় নাই। বিভাকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, তুই তো আচ্ছা বিভা! স্বামীকে নিয়ে তামাসা করছিস্—লজ্জা নেই তোর···আচ্ছা বেহায়া তুই!

অল্পবয়সী এয়োস্ত্রীটী মুখাইয়া কহিল, লজ্জা আবার থাক্‌বে কোত্থেকে···মিন্‌সে লজ্জা রাখলে কই?···যে স্বামী চামার তার নিন্দেতে কি যায় আসে!

ছোট গিন্নী কহিলেন, আমি হ'লে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তুম্—স্বামী না হাতী!··কিন্তু ছোট গিন্নী ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অনুকূলের মত প্রহার না করিলেও প্রহারের বদলে যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে বিষ-পান করাইতে না-পারিলেও রাগ করিয়া তাঁহার এতদিন বাপের বাড়ী চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। তাই ছোটকর্ত্তাকে যাহারা চেনে, তাহারা ছোটগিন্নীর কথায় বিশেষ কান দিল না।···

আশা কহিল, তা হ'লেও মন্ত্র পড়ে স্বামী হ'য়েছিল তো ···স্বামী বজ্জাত হ'লেও তাকে ফেলা যায় না · মেয়েমানুষ। এই তো ছোটকাকা তোমায় সেদিন—···কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পাইল না।

ছোটগিন্নী স্বর সপ্তমে তুলিয়া কহিলেন, কি সেদিন তাই বল্ না···তোর যে বড় চেটাং চেটাং কথা হ'য়েচে রে আশা!···কেন, বড়মানুষের বউ হ'য়েছিস্ ব'লে? · অমন বড়মানুষ আমরা ঢের দেখেছি—বলিয়া তিনি বিভাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া দপ্ দপ্ করিয়া পা-ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

কোথা হইতে কি আসিয়া গেল! উপস্থিত দাঁড়ান-মজলিসের অনেকেই আশার বেয়াদপিতে ক্ষুণ্ণ হইল···এমন মুখরোচক সমালোচনাটা তাহার জন্যই—···আশাও ভাবী কলহের আশঙ্কায় আপন ঘরে চলিয়া গেল।

(৩)

দিন পাঁচ ছয় পরে। বিভারাণী ডান হাতে ভাতের থালা, বাঁ হাতে ছোট্ট একটী কেরোসিনের 'কুপি' লইয়া বাবুদের বাড়ী হইতে ঘরে ফিরিতেছিল। রাত তখন দশটা। একে পাড়াগাঁ, তায় এত রাত—সমস্ত গাঁ-খানি নিশুতী হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে পেচক, বক-শাবক, কুক্কুর এবং ভেকের ডাক এবং একটানা ঝিঁঝির স্বর মিলিয়া

নিশুতীকে আরো ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছে।···বিভার রক্ষক হিসাবে একটা অর্দ্ধ-ঘিএ ভাজা কুকুর আছে।—প্রভু-কন্যাকে রক্ষা করিবার অপেক্ষা তাহার হস্তস্থিত আহার্য্যের প্রতি তাহার অধিক লোভ। বাবুদের ফটক পার হইয়া সে আসিয়া সুমুখের ময়দানে পড়িল। ময়দানের আশেপাশে খোট্টা দ্বারবানদের আস্তানা···সেখানে তাহাদের নাসিকাধ্বনিতে বেশ মালুম হয় যে, তাহারা সারাদিনের পরিশ্রমে গভীর নিদ্রামগ্ন। বিভা ময়দান পার হইয়া সম্মুখস্থ বড় সানের পুকুরের পাড় ধরিয়া চলিল।—রাস্তার দুই ধারেই প্রায় টিনের বেড়া-ওয়ালা গো-শালা।—বিরাট রাজার মত ব্যবস্থা থাকিলেও তত্রস্থ ধেনুগুলির আপন স্বভাব-ধাতের জন্যই হউক বা অনাহারবশতঃ হউক—সব কটির প্রায় হাড্ডি সার।—তবু গোধন! ছোটকর্ত্তার গোশালাটী সর্ব্বাগ্রেই পড়ে। বিভা যেই তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, অস্পষ্ট আলোয় দেখিতে পাইল কে যেন দাঁত বার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিভার হস্তস্থিত থালাটী কাঁপিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল।—পিছনের কুকুরটী কিছুমাত্র ভূমিকা না-করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল।···বিভা ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। অস্ফুটে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—কে-ও-ও—কে-গা-তুমি-মি-মি। মূর্ত্তিটী আগাইয়া তাহার কোলের কাছে আসিয়া হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমি রে—আমি, ভয় পেয়েছিস্? বিভা এতক্ষণে ধাতস্থ হইয়াছে। ঝট্‌কা মারিয়া হাত ছাড়াইয়া রোষ-কণ্ঠে কহিল, তুই মরতে আবার কেন? পথ ছাড় বল্‌ছি···আমি চেঁচাব! ঠ্যাঙাড়ে অনুকুল অনুনয়ের স্বরে কহিল, মাইরী বল্‌চি, আমি কিছু করবো না—চুপ কর;··· আচ্ছা তোর তো ভাত পড়ে গেল—কি থাবি আজ?—আয় না আমার বাড়ীতে রান্না আছে দু'জনে খাব'খন। বিভা প্রায় চেঁচাইয়া কহিল, তোর মাথা খাব রে! সরে যা বল্‌চি—বলিয়া হাঁ করিতেই অনুকুল তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া নরম করিয়া বলিল, তুই একবারটী চল্ না মাইরী, ঘর-দোরগুলো দেখে আস্‌বি!—আমি কি জানিনি রে তুই অভিমান করে'ছিস্!—আর কেন—ঢের হ'য়েছে, ঘাট মান্‌চি—এখন তুই নরম হ! নরম হওয়া দূরের কথা, বিভা সবেগে তাহার মুখ খুলিয়া লইয়া সে যে অভিমান রিয়াছে এইকথা 'ওগো, বাপ-সকল রা! মেরে ফেল্‌লে গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া জানাইয়া দিল। গো-শালার নিকটবর্ত্তী বিরাট দেশের কাছাকাছি দেশের জনকয়েক পাল্কী-বেহারা সাড়া পাইয়া 'কে?—কে?' করিয়া ছুটিয়া আসিতেই অনুরাগী অনুকুল সুড় সুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। * * *

পরদিন বাবুদের খিড়কীর ঘাটে বিভাকে লইয়া একটা মস্ত মজলিস্ বসিয়া গেল। সেই এয়োস্ত্রীটী এক বুক জলে দাঁড়াইয়া কহিল, তুই দরোয়ান ডাকলি নে কেন, তারা তো সামনে ছিল? ছোটঠাকুরকে বলে'চিস্—তোর বাবাকে? বিভা দুই জনের কাহাকেও বলা কেন যে আবশ্যক বোধ করে নাই তাহা জানি না। তবে যে স্বামীকে 'কলা' দেখাইয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে যে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতেছে এবং তাহাতে যে প্রচ্ছন্ন ভালবাসার ইঙ্গিত আছে—যাহা বিভার রূপ-যৌবনের প্রভাবেই সম্ভব—তাহা জানাইতে ঘটনাটী বিবৃত করিল—একটু গর্ব্বও যে অনুভব না করিল, তাহাও নয়।

ছোটগিন্নী মুখে একরাশ ছাই পুরিয়া মুচকী হাসিয়া কহিলেন, সে তোকে কি বল্‌লে রে?

বিভা বোধ করি লজ্জা পাইল। মুখ হেট করিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে বলিল—চল না—তোর দিব্যি, আর তোকে কখন মারবো না—ঘাট্ হ'য়েচে—বলিতে বলিতে হাসিয়া যেন বাসনগুলির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। এয়োস্ত্রীটীর ভাল লাগিতেছিল না, কহিল তোর আস্কারাতেই ত—কি যে আদিখ্যেতা করিস্!—বনের বাঘ জব্দ হয় আর স্বামী জব্দ হয় না?—মগের মুল্লুক, মারলেই হলো আর কি!

বিভার কেমন যেন নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। তিন বৎসর যে স্বামীর ব্যবহারে সে প্রহার ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সন্ধান পায় নাই—কল্যকার রাতে তাহার ব্যবহার যেন তাহাকে সোহাগের সন্ধান দিয়া গিয়াছে। তাই আজ মুখ নিচু করিয়া তাহার প্রতি অনুকুলের অনুকূল ব্যবহারের কথাই কহিয়া যাইতে লাগিল। শ্রোতাদের কাহারও ভাল লাগিতেছিল না—না ছোটগিন্নীর, না এয়োস্ত্রীটীর। তাঁহারা মাঝে মাঝে তাহার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—বিভার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি!···

ইতিমধ্যে বিভা ওপাড়ের দিকে মুখ করিয়া বাসনগুলি

ধুইতে যাইতেই ঝোপের আড়ালে স্থিত অনুকূলের চোখে চোখ পড়িল। কিছু না বলিয়া শ্রোতৃদ্বয়কে দেখাইয়া দিল। এয়োস্ত্রীটী চেঁচাইয়া উঠিল: কে-ও? অনুকূল এক-গাল হাসিয়া: না, মাঠাকরুণ—এই হিঙ্‌চে শাক—

—হিঙ্‌চে তো, খিড়কীর ঘাটে কিরে পাজী! দাঁড়া ছোটবাবুকে ডেকে দিচ্ছি—হিঙ্‌চে খাওয়াচ্ছি তোমায়—

অনুকূল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সরিয়া পড়িল।··· উভয়েই হাসিয়া কুটিপাটি।

* *
*

দিন কয়েক হইল বিভারাণীর অসুখ করিয়াছে—সামান্য জ্বর। অনুকূল খবর পাইয়া দুই তিন বার শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ী ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মতিলালের উঠানে দূর হইতে কানাইকে দেখিয়া সাহস করে নাই। রাতে বিভার ঘরের জানালা দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিয়াছে।—সেই কানাই! ··তাড়া খাইয়া ছুটিবার উপায় নাই—কুকুরগুলি পিছু লয়·· ঝোপঝাড় দেখিয়া আশ্রয় লইতে হয়···সাপের কথা যে মনে না-পড়ে তা' নয়;··· কিন্তু শ্বশুরের প্রহার অপেক্ষা সাপের কামড় বাঞ্ছনীয়!···

অনুকূল গম্ভীর হইয়া রাস্তা চলে—যেন তাহার ভয়ানক কাজ।···মতিলালের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পদদ্বয়ের গতি লঘু হইয়া আসে।—সেই কানাই! কানাই এর এত কুটুম্বিতা তাহার ভাল লাগে না—চাষার ঘরের ছেলে এত বয়েস পর্য্যন্ত অবিবাহিত কেন?···কানাইটের উপর তাহার ক্রোধ-বিদ্বেষ শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।···মনে মনে বলে, শালাকে একবার বাগে পেলে হয়!

পথে বিভার দূরসম্পর্কের বিধবা পিসির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়।···অনুকূল মাথা নীচু করিয়া হাত দুইটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলে।· পিসি চোখ দুটী তুলে—অনুকূল না? অনুকূলের খেয়াল নাই···পিসি কাছে আসিয়া পড়েন, অনুকূলের খেয়াল হয়—হ্যাঁ পিসি; এই ন'পাড়ায় একটু—সব ভাল তো?

—চল না বাবা! একটু বসবে।

—না আজ আর সময় নেই—অনেক কাজ।···হ্যাঁ, ওর নাকি ভারি অসুখ—বাড়াবাড়ি!—

—না না, এমনি বাতিক—তা চল না দেখে আসবে'খন।—

—না পিসি, ফুরসত নেই—।

ব্যাপারটা পিসি বুঝিয়া ল'ন ··চোখ ছল ছল করিয়া উঠে। বলেন, চাষার ঘরে অমন হয় বাবা—ওতে কি আর রাগ করতে আছে ··বিভা তো তোমার জন্য সারা।·

অনুকূল অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে।

—মতির কথায় রাগ ক'রো না বাবা! ওটা অমন—

দূর হইতে কানাইকে দেখিতে পাওয়া যায়।—বিভার ঘরের দোরগোড়ায় বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে।

মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব মেজাজটা ফিরিয়া আসে। '—না পিসি, আর একদিন আস্‌বো।' বলিয়া হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া যায়।

পিসি তাহার দিকে চাহিয়া অঞ্চলে চোখ মোছেন ও বিভাকে মনে মনে শতেক গালাগালি দিতে থাকেন। কি মনে করিয়া অনুকূল আবার ফিরিয়া আসে। বলে, ওষুধ-টষুধ কিছু?

পিসি চোখ কপালে তুলিয়া: চাষার ঘরে আবার ওষুধ?—অসুখ তো বেয়াড়া নয়।

—না, এই বলছিলুম্—তাড়াতাড়ি সেরে যেতু।

পিসি আবার অনুরোধ করেন: চল না, এতখানি যখন এলে—দেখেই যাবে।

সেই কানাই-এর হাসি! "—না থাকগে, আর এক দিন না-হয়"—

* * * *

ইহার কিছুদিন পরে অনুকূলকে আর গ্রামে দেখা যায় না। তাহার একটু কারণ—যাহা স্থূলদৃষ্টিতে পড়ে তাহা এইরূপ:—ছোট কর্ত্তা ছোট গিন্নীর অনুরোধে, পেয়াদা দিয়া অনুকূলকে ধরাইয়া আনিয়া উত্তম মধ্যম দিয়াছেন—অবশ্য উপানৎ সংযোগে। অভিযোগ অনেক: বিভার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ান—খিড়কীর ঘাটে গিয়া ওৎপাতা এবং ঘাটের মেয়েদের দেখিয়া অভদ্রভাবে হাসি তামাসা করা ইত্যাদি।

অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহার সন্দেহ নাই—অতএব পাওনা-দণ্ড ভোগ করিয়া অনুকূল সরিয়া পড়িয়াছে।···

এদিকে বিভাকে কেন্দ্র করিয়া মহিলা মজলিস্ আর তত জমিয়া ওঠে না। গাঁয়ে অনুকূলের অনুপস্থিতিই ইহার একমাত্র কারণ।···মজলিসের আকর্ষণ কমিলেও, বিভা প্রাত্যহিক স্বামী টীট-করণের (বশীকরণ নয়!) উপদেশ পায়: মেয়েরা শক্ত না হইলে পুরুষরা পাইয়া বসে!—বিভা আর দিন কতক পেটে খিদে লইয়া মুখে লজ্জা-রাগ দেখাক দেখি, কেমন অনুকূল জব্দ না-হয়! - এখন যদি বিভা স্বামীর ঘরে যায়, তাহার পূর্ব্বের মত অবস্থা না হয় ত ছোট গিন্নীর নাম মিথ্যা!··বিয়ে করবে? করুক না দেখি!···গাঁয়ে বাস করতে হবে না তা'হ'লে, ইত্যাদি আর অনেক। · বিভা স্বামীর ঘর করিতে চাহিলেও ইঁহারা দিবে না। ইহাতে স্ত্রীজাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় কিনা জানি না, কিন্তু একজনের ঘর ভাঙিয়া মজা-দেখা ইঁহাদের ষোল আনাই হয়।...এরূপ মজা তাঁহাদের দিক দিয়া হইবার উপায় নাই—তাঁহারা ভদ্র, স্বামী তাঁহাদের অভদ্র আচরণ কখন করেন না। তাই বিভাও স্বামীর ঘরে যাইতে পারিতেছে না।

···অনুকূলের খোঁজ নাই—ইহাতে চাষাপাড়ায় যতটা উদ্বেগের সৃষ্টি না-হইয়াছে তার অধিক হইয়াছে এই কায়েত পাড়ায়—বিশেষ করিয়া মেয়ে মহলে। দুপুরে সংসারের কাজ সারিয়া নিত্যনৈমিত্তিক যে কাজটী (ঘুম!) তাহা আর হইয়া উঠে না। কেহ বলে পালান টালান বাজে—মুখপোড়া এখানেই কোথাও আছে। সেই এয়োস্ত্রীটী বলে, বলি মুখপোড়া আর যাবে কোন চুলোয়—যে হেংলা! বিভা ছোটগিন্নীর চুলের জট ছাড়াইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, তোর আর ভাবনা কি!—আমি-ই তোর আবার বিয়ে দিয়ে দেব—তোদের সমাজে তো চলে রে—!···বিভা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে।···

(৪)

মাস কয়েক নিখোঁজ থাকিবার পর অনুকূল ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।—এক মুখ দাড়ি···এক মাথা চুল···রুক্ষ ভাব—মাথায় যেন একটু ছিটও আছে···ঠিক নাগা সন্ন্যিসির ভাব।···স্বামী থাকিতেও বুঝি বা বিভারাণী স্বামীহারা হইল!···কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়—রাত্রে সেই গোশালার পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে—ঠিক দুপুরে সেই খিড়কীর ওপাড়ে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে বিভা তাহাকে দেখিয়াছে।—অবশ্য কথাটা মেয়ে মহলে, কেন জানি না, গোপন করিয়াছে।···

হঠাৎ কোথাও কিছু নাই—অনুকূল একদিন সন্ধ্যাবেলায় বড়বাবুর পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহার ফাই-ফরমাজ-খাটা চাকর হইয়া গেল। বড়বাবু বলিলেন, সে কি তুই তো কলের ভাল চাক্‌রী করিস—এখানে আর ক'টাকা পাবি?

সে শুধু কহিল, ওতেই চলে যাবে কর্ত্তা···একলা প্রাণী বই তো নয়!

বড়বাবু আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই।—অনুকূলের মত জোয়ান মদ্দকে হাতছাড়া করা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।—তা হ'লেই বা একটু পাগলা!

কিন্তু অনুকূলের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। বোধ করি, বিভাকে রাত্রিদিন দেখিবার নিমিত্ত তাহার এই চাকুরী গ্রহণ।··বড়বাবুর চাকর; সুতরাং ছোটবাবু কিছু বলিতে পারিবেন না · এখন সে অবাধে হুকা ফিরাইবার অজুহাতে পঞ্চাশ বার খিড়কী ঘাটে যাওয়া-আসা করে। তাহার পাগ্‌লাটে ভাব মেয়েদের বেশ উপভোগ্য—তাহাদের কাছে সে এখন পাগলা অনুকূল, ঠেঙাড়ে বিভার স্বামী অনুকূল নয়—তাই সে খিড়কী ঘাটে আসিয়া হাসিলেও ছোটকর্ত্তার উপানৎ ছোটগিন্নীর অনুরোধে অনুকূলের পিঠে আশ্রয় লয় না।···বিভাকে দেখিয়া কিংবা শুনাইয়া সে যদি গান করে—মেয়েরা ফরমাজ করে আর একটা।···অনুকূল নির্ব্বিবাদে গান গায়, বিভাকে দেখে আর কাজ করে।···পুনর্ব্বার বিভার পতিত্বে অধিরূঢ় হইবার মত আর তাহার অবস্থা নাই—তাই মেয়ে মহলেরও কোন আশঙ্কা নাই।··

এইরূপভাবে কিছুদিন যায়। বিভার মনে বোধ করি পাপ ছিল। একদিন ছোট গিন্নীর চোখে পড়িল যে—খিড়কীর ঘাটের উত্তর দিকে যে গোলাবাড়ী আছে, সেখানে বিভা উপু হইয়া বসিয়া অনুকূলের পিঠের ঘামাচি মারিয়া দিতেছে—আর অনুকূল দিব্য আরামে বড়কর্ত্তার হুকায় তামাক খাইতেছে। দুপুর রোদে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড হইবে, ছোট গিন্নী কল্পনাও করেন নাই। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর সপ্তমে তুলিয়া (—যেন বিভাকে বেজায় দরকার এই ভাব করিয়া) হাঁকিয়া উঠিলেন,—বিভা! বিভা!! বিভা!!!

দু'জনেরই নজর পড়িল। অনুকূল মাথা হেঁট করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল—বিভা আস্তে আস্তে ছোট গিন্নীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

…এ হেন আদিখ্যেতার জন্য বিভার বরাতে কি ঘটিয়াছিল সে সকল না বলাই ভাল—কেননা পুনরুল্লেখ মাত্র। তবে অনুকূলকে আর উপানৎ উপহার পাইতে হয় নাই—সে বড়বাবুর চাকর!

* * * *

এই ঘটনার দিন তিন চার পরে খবর পাওয়া গেল, বিভা এবং অনুকূলকে পাওয়া যাইতেছে না।…অনুকূলের ঘরে একটীও পিতল কাঁসার পাত্র নাই, আর মতিলালের গৃহে বিভার কোন বস্ত্রাদি নাই।…মোটকথা তাহারা যুক্তি করিয়া দিনক্ষণ দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে।…

খবরটা শুনিয়া ছোটকর্ত্তার, ছোটগিন্নীর এবং সেই এয়োস্ত্রীটীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। না-থাকিবারও কথা! যাঁহারা স্বামী-স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া নিরুপদ্রব জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের নিকট ত্যাগ-করা স্বামী বিভার পুনর্গ্রহণ এবং পালান-বউ অনুকূলের পুনর্লাভ আশ্চর্য্যের বই কি!

বরষার বিদায়

শ্রীশোভা দেবী

অশ্রুর বীণা গাহিছে বন্ধু
কোন সুদূরের তান
আকাশের কোলে ম্লান ছায়া তলে
গুমরিছে অভিমান।
বন্ধু গো মোর উদ্বেল হিয়া
গগনে গগনে উঠেছে রণিয়া
নীরদোৎসব শেষ হয়ে গেছে
শেষ হয়ে গেছে গান
শেষ বিদায়ের সুরে বাজে মোর
বিদায়ের অভিযান।
মৌন বেদনা রাখিব বন্ধু
তোমার কাশের বনে
আমার মিলনে করেছি শীতল
তোমার বিরহী মনে
আর বুঝি তাই নাহি প্রয়োজন
রজনীগন্ধা হেরিছে স্বপন
শেফালী বালারা উঁকি দেয় ঐ
আজি তব অঙ্গনে
তাই ঝুলনের মিলনোৎসব
এখন পড়ে না মনে।
বরিল যক্ষ এসেছিনু যবে
নীল অম্বর পথে
রামগিরি শিরে কুটজ কুসুমে
নবীন অভ্যাগতে
সেই ফুলদল বহি তরঙ্গে
নদীধারা নামে কত না রঙ্গে
শত নির্ঝর উচ্ছ্বসি ওঠে
পর্ব্বতে পর্ব্বতে
বিস্ময়ে মোরে হেরিল বিশ্ব
অঞ্জন ঘন-রথে।
নবীন অতিথি এসেছিনু যবে
সিক্ত চপল পায়ে
কদমের রেণু পথিকের গায়ে
মাখানু উতল বায়ে
গাহি মল্লার বনের বেণুতে
শুষ্ক পথের রেণুতে রেণুতে
করেছি শীতল ধরেছি ছত্র
মেঘের স্নিগ্ধ ছায়ে
নব গৌরবে যবে এসেছিনু
শ্যাম উত্তরী গায়ে।
যাই গো বন্ধু বিদায় বিদায়
শেষ গান গেয়ে যাই
প্রকৃতির নব উৎসবে আজি
কিছু অপূর্ণ নাই—
আমারি ফোটানো কেয়ার গন্ধে
নব দেবতায় বর আনন্দে
আমারি গঠিত সংসার দ্বারে
বিদায়ের গীতি গাই—
শ্যাম সুষমায় রাখি মম স্মৃতি
যাই গো বন্ধু যাই!

জ্যোতির্বিৎ চন্দ্রশেখর সিংহ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

এক শত বৎসর হইল ১৭৫৭ শকে পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইং ১৮৩৬ সালের ১১ জানুয়ারি তারিখে শ্রীমৎ চন্দ্রশেখর সিংহ-সামন্ত ওড়িষ্যার খণ্ডপাড়া রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন রাজার পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। তখন কে জানিত, তিনি আজীবন জ্যোতিষ-চর্চা করিবেন এবং পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তীক্ষ্মবুদ্ধি, গ্রহবেধ ও গণিত-নৈপুণ্যদ্বারা যশস্বী হইবেন। দেশে শত শত রাজভ্রাতা ছিলেন; তাঁহাদের তুল্য আচরণ করিলে চন্দ্রশেখর নিন্দিত হইতেন না। পরন্তু তিনি জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা হেতু খণ্ডপাড়া রাজ্যে অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহার কর্মের মহত্ব বুঝিত না; মনে করিত তিনি বাতিক গ্রস্ত হইয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি গ্রহ-নক্ষত্র-দৃষ্টি-কর্মে বৃথা কালক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার সেই তদগত-চিত্ততার জন্যই আমরা আজি তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছি। তিনি দাতা; বহু কষ্টার্জিত "সিদ্ধান্ত" দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই দাতাকে নমস্কার করি।

সিদ্ধান্ত-দর্পণ গ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁহার গুণপনা কিছু কিছু প্রচারিত হয়। কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ং গ্রহ-ভগণাদি নির্ণয় করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্য না লইয়া গ্রহ-গতিসংস্কার স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব এতই অসাধারণ। কিন্তু তাঁহাদের সংশয় অমূলক। তিনি সে সাহায্য পাইলে শনিগ্রহের ভগণকালে অর্দ্ধ দিবসের ভুল রাখিতেন না। তিনি সংস্কৃত ও ওড়িয়া ব্যতীত অন্য ভাষা জানিতেন না। পাশ্চাত্য জ্যোতির্গণিতের ধ্রুবাঙ্ক জানিতে হইলে তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞের নিকট শুনিতে হইত। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-প্রকাশের দুই বৎসর পরে ইং ১৯০০ সালে গ্রীষ্মকালে তিনি কটক আসিয়াছিলেন। সে সময় তিনি আমার নিকট পাশ্চাত্য জ্যোতির্গণিতের গ্রহ-ভগণাদি যত্নপূর্বক লিখিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয় তাঁহার জানা থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে ও গ্রন্থ-প্রকাশের পর আবার লিখিয়া লইতেন না। সেই বৎসরের "ব্রিটিশ-নাবিক-পঞ্জিকা" দেখিয়া আমি তাঁহাকে গ্রহভুক্তি-আদি বলিয়াছিলাম, মিলাইয়া দেখিবার নিমিত্ত তিনি লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহার বহু বৎসর পূর্বে মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কটকে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি সংস্কৃত-জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়া পরে কলিকাতা হইতে "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" নামে পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি চন্দ্রশেখরের নাম শুনিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন। পুরাতন "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা"র ভূমিকায় সপক্ষ সমর্থনার্থ সিদ্ধান্ত-দর্পণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তিনি সে শ্লোক নিশ্চয়ই চন্দ্রশেখরের পত্রে পাইয়াছিলেন। একদিন চন্দ্রশেখর আমাকে বলিয়াছিলেন, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অয়নাংশ গণনার সহিত তাঁহার গণনার পনর কলা অন্তর পড়ে, কেন পড়ে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার গণনার মূল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু উত্তর পান নাই। না পাইবারই কথা। কারণ, "বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" ব্রিটিশ-নাবিক-পঞ্জিকার আধারে গণিত হইত। ইহাতে প্রেক্ষণের প্রয়োজন ছিল না। এই হেতু এই যৎসামান্য বিষয়েও চন্দ্রশেখরের কৌতূহল তৃপ্ত হয় নাই।

বাস্তবিক চন্দ্রশেখরের কৃতিত্বে বিস্মিত হইবার প্রচুর কারণ ছিল। আটশত বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশে ভাস্করাচার্য জ্যোতির্গগনে ভাস্কর-সদৃশ উদিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর বহু টীকা-গ্রন্থ ও পঞ্জিকা গণনার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন গ্রহ-বেধ-কুশল গাণিতিক জন্মগ্রহণ করেন নাই, গ্রহ-গণিতের পুরাতন ধ্রুবাঙ্কের ভ্রংশতা নির্ণয় করেন নাই। দুইশত বৎসর পূর্বে অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ পঞ্জিকা-সংস্কারে মনোযোগী হইয়া পর্যাপ্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। ইয়ুরোপ হইতে গ্রহ গণনার সারণী আনাইয়াছিলেন। কিন্তু সে আয়োজন বৃথা হইয়াছিল। তৎকালে রাষ্ট্রীয় অশান্তির অবস্থায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই।

কিন্তু চন্দ্রশেখরের সে আয়োজনের সহস্রাংশও ছিল না। তিনি "নৃপালকুল-প্রসূত" হইলেও গ্রামবাসী ছিলেন, পাশ্চাত্য-আলোক-বর্জ্জিত পার্বত জাঙ্গাল দেশে জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তিনি সাতান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে কটক নগর প্রথম দর্শন করেন। তাঁহার যন্ত্রও দক্ষ কর্মকার দ্বারা নির্মিত নয়। তিনি গুরুর উপদেশ পান নাই, টীকা পড়িয়া বুদ্ধিবলে কঠিন গণিত ও বেধক্রম শিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গন্তব্য পথের যাবতীয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমাদের আদর্শ হইয়া চিরকাল বরেণ্য হইয়া থাকিবেন।

চর্মচক্ষু কভু কাচচক্ষু-সমদৃষ্টি হইতে পারে না। এই কারণে তাঁহার আবিষ্কার পাশ্চাত্য জ্যোতির্গণিতের তুল্য সূক্ষ্ম হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা যন্ত্রের প্রভেদ, যন্ত্রীর প্রভেদ নয়। চর্মচক্ষু দ্বারা তাঁহার দেশে ও কালে তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

তিনি পঞ্জিকা-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং সে ব্রত সম্যক্ উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ধর্মকৃত্য যত আছে অন্য কোন জাতির তত নাই। প্রত্যেক কৃত্যেরই কালাকাল বিচার আছে এবং সেই কালাকাল নির্ণয় নিমিত্তই পঞ্জিকার প্রয়োজন। সে পঞ্জিকায় তিথিনক্ষত্রে ভুল থাকিলে ধর্ম কর্ম পণ্ড হয়। বহু কালান্তর হেতু পূর্বাচার্যগণের গ্রহ-গণিত শ্লথ হইয়াছে। ভারতের সর্বত্র সংশোধনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু কিরূপ সংস্কার ধর্মের অবিরোধী. তাহা সর্ববাদিসম্মত হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশে দ্বিবিধ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। গৃহস্থ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

চন্দ্রশেখর ওড়িষ্যাকে সংশয়মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধান্ত-দর্শন রচনা করেন। তাহার কিছু পর হইতেই সে সিদ্ধান্তমতে গণিত পঞ্জিকা দ্বারা পুরী মন্দিরের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এই পঞ্জিকায় যে যৎসামান্য ত্রুটি আছে, তাহা অক্লেশে সংশোধিত হইতে পারে। তাঁহার এই কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইতেছে।

এককালে ভারতী প্রজ্ঞা. জ্ঞান-গরিমায় উন্নত ছিলেন। আমরা দায়াদ; আমাদের গর্ববোধ স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিম দেশের কোন কোন পণ্ডিত আমাদের পূর্বপুরুষগণের কৃতিত্ব স্বীকার করেন না। কেহ তাঁহাদিগকে জ্যোতির্বিদ্যার জন্য যবনের দ্বারস্থ করিয়াছেন; কেহ বা তাঁহাদের নিষ্পত্তি ও সাধনের উপহাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের পিতামহগণের উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না। কি কারণে তাঁহাদের প্রতিকূলমতি জন্মিয়াছে, তাহা স্পষ্ট। তর্ক দ্বারা এই দুরাগ্রহ দূরীভূত হয় না। এই অবস্থায় চন্দ্রশেখরের আবির্ভাবে আমাদের গৌরব উজ্জ্বলতর হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার কীর্তি বারম্বার স্মরণ করিতেছি।

বত্রিশ বৎসর হইল ১৮২৬ শকের জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ-দ্বাদশীতে ইং ১৯০৪ সালের ১০ জুন তারিখে চন্দ্রশেখর নীলাচলে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার দুর্বল রুগ্ন কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া থাকিবেন এবং সে দেহে বৈষ্ণবোচিত কৃচ্ছ্র ধর্মপালনে অবিচলিত শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার বালকসুলভ সারল্য, অমানিতা, ধীরতা ও নম্রতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কথাবার্তায় কিছুই প্রকাশ হইত না। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার কল্পনাতেও আসে নাই। তিনি ষাটি বৎসর বয়সেও জানিতেন না, তাঁহার গ্রন্থ কভু মুদ্রিত ও সুধীসমাজে আদৃত হইবে। তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম কর্মযোগী চিরদিন নমস্য হইয়া থাকিবেন।

গোধূলি-আকাশ

রাজবন্দী শ্রীনলিনীকুমার বসু

এই গল্পের যিনি কেন্দ্র প্রথমেই তাঁ'র একটা বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়ত উচিৎ; কিন্তু সে ঔচিত্যের মূল্য এত সামান্য যে তাকে এড়িয়ে গেলেও দোষ কিছু হ'বে না। অর্থাৎ পরিচয় একটা থাকলেও সে পরিচয়টা অকিঞ্চিৎকর, যা'কে বলা চলে 'মামুলী'। যে কোন লোক হ'তে পারত আমার এ গল্পের কেন্দ্র। অতএব তা'র নামকরণেও কোন মুস্‌কিল নেই। নাম ননীমাধব চৌধুরী। পরিচয়ের যে অংশে যৎসামান্য একটু নূতনত্ব আছে তা' হ'ল তা'র বয়স, যা' ষাটের কোঠা পেরিয়ে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে তা'কে আবার নির্দ্দিষ্ট কোন কোঠাভুক্ত কর্‌তে হ'লে নিছক অঙ্কের হিসাব মেনে চল্‌তে হয়। বিয়ে একটা সে করেছিল নিশ্চয়, না ক'রে থাক্‌লেও কোন ক্ষতি ছিল না, কেননা ও ঝঞ্ঝাট যে কবে খসে পড়েছে—ননীবাবুও হয়ত ভাল করে মনে কর্‌তে পারেন না। পেন্‌সন্‌ভোগী বল্‌তে যা' বোঝায় ননীবাবুর অবস্থার সঙ্গে তা' আশ্চর্য্য রকমে থাপে থাপে মিশে যায়। দিন তার কেটে যাচ্ছে কর্ম্মহীনতায়—সঞ্চিত মূলধন নেড়ে চেড়ে। যে দিনটিকে কলমের ডগায় বিঁধে ডাঙ্গায় তুল্‌তে সচেষ্ট হ'য়েছি তা' আর ষাট বছরের অন্যান্য দিনগুলি থেকে আল্‌গা হ'য়ে নেই—অর্থাৎ টান পড়্‌লে তা'রা সকলেই অল্প বিস্তর ন'ড়ে চ'ড়ে উঠ্‌তে বাধ্য। এই দিনটা ছাড়া আর দিনগুলিও যে ননীমাধবের ছিল—প্রতি বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি ক'রে ষাট বছরের এতগুলি দিন—ভাব্‌তে হয়ত একটু আলস্য বোধ হয়, তবু তা'রা যে ছিল—এই দিনটিরই বুকের উপর দাঁড়িয়ে তারা অনায়াসে বল্‌তে পারে—'আমরা যে ছিলেম তা'র প্রমাণ আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে আছি'—তা'রা যে ছিল তা' নিতান্ত আমরা মানতে বাধ্য। অতিমাত্র জীবন্ত কোল্‌কাতার ভিড় ঠেলে এসে যেখানে এই গল্পের যবনিকা উত্তোলিত দেখছি সে স্থানের আলাদা কোন পরিচয় নেই—কোলাহল-মুখর মহানগরীর দম-ফাটান 'আমি আছি' চিৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানজোরে নিজের অস্তিত্বও প্রতি মুহূর্ত্তে জানিয়ে দিচ্ছে—সে হ'ল উত্তর কোল্‌কাতার গঙ্গার পাড়ের শ্মশান নিমতলাঘাট। কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়—মটর ট্রামের ভিড়ের পাশে। এ জায়গাটায় অবস্থিতি যেমন বেমানান্, তেমন-ই।

ননীমাধব চৌধুরী এসেছিল বেড়াতে। নিমতলাঘাটে নয়, রাস্তা দিয়ে চলেছিল—আরও হয়ত এগিয়ে যেত—যতদূর খুসী; শ্মশানের ভিতরে আসবার কোন সঙ্কল্পই ছিল না—এসে পড়েছে কিছু না ভেবে, হয়ত বা বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়েছিল—অম্‌নিও হ'তে পারে। অকারণ ঘুরে বেড়ানো তা'র নেশা। গত দিনগুলির ভিতর তা'র বিবিধ ইতিহাসের জাল-বোনা। 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' লিখ্‌বার মত মন নিয়ে—ভ্রমণটাকে উপভোগ কর্‌বার মত অবস্থা নিয়ে—তা'র ঘু'রে বেড়ানো নয়। এ তা'র নেশা। ফিকে নেশায় যে সুখ ভোগ, অনর্গল কথা বলে তা' জানিয়ে দেওয়া—এ তা' নয়, বেশী নেশায় বুঁদ্ হ'য়ে যাওয়া—যখন নেশা আর নেশা বলে ধরা পড়ে না। এমনটা সম্ভব কিনা সে তর্ক আলাদা। ননীমাধব চৌধুরীর যেটুকু আসল পরিচয় তা' এই। এত করে বলার কারণ তা'র এই নিমতলাঘাটে বেড়াতে আসা কি রকম অবিশ্বাস্য মনে হয়। অবিশ্বাস্য মনে হয় তা'র ফুরিয়ে আসা বয়সটার জন্য; অন্য বয়সে এখানে আসার ভিতর অসম্ভবের কিছু নেই, কিন্তু তার বয়সে—যখন স্থানটা অম্‌নিই নিতান্ত কাছে এসে পড়ে, অনিবার্য্যের ভয় যখন ক্রমেই মানুষকে আচ্ছন্ন করে আনে—তখন তারই সাথে ছোঁয়াছুয়িতে মন সঙ্কুচিত হয়ে আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিমতলাঘাটে যে আজ ননীমাধবের জন্য অভাবনীয় কিছু অপেক্ষা করেছিল তা' দেয়ালের মোড় ঘুর্‌বার আগের মুহূর্ত্তেও কল্পনা করার কোন কারণ ঘটেনি। এমন আচম্‌কা সে ঘটনা চোখের সাম্‌নে পড়ে গেল যে তা' বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। তা' ছাড়া বিশ্বাস না করার আরো কারণ ছিল। শ্মশানের ভিতরে এসে ডান দিকে মোড় ঘুর্‌তে চোখে পড়্‌ল একটী নতুন সজ্জিত চিতা, আগুন তখনও দেওয়া হয়নি। শব এইমাত্র স্নান করিয়ে লালপেড়ে শাড়ী পরিয়ে

দেওয়া হয়েছে। অনাবৃত মুখের দিকে চেয়ে ননীমাধব থমকে দাঁড়াল। পাশেই যে এক পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধা কান্নারোধের চেষ্টায় বারে বারে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ছিল, তা ননীমাধবের চোখে পড়েনি। সে চেয়েছিল মৃতার মুখের দিকে। কেননা ও যে সাহানার মুখ—দৃষ্টির দিক্ থেকে সংশয়ের অবকাশ নেই, সংশয় এসে পড়ে শুধু সময়ের দীর্ঘব্যবধানের হিসাব কর্‌তে গিয়ে। মৃতার চোখ বন্ধ থাকায় বয়স আরও কম মনে হয়—কুড়ি বছরের বেশী কোনমতেই হয় না। সাহানার সঙ্গে শেষ দেখা এই বয়সেরই কাছাকাছি, কিন্তু মাঝের ব্যবধানটা বড়ই বেশী—চল্লিশের কম হয়ত হ'বে না। বুদ্ধির দিক্ দিয়ে কোন সমর্থন নেই, তবু চেয়ে চেয়ে মনে হয়—ও সাহানাই। অসম্ভব কি—এতদূর যখন সম্ভব হয়েছে! হয়ত চোখ খুলে ও বল্‌বে, "ওমা! তুমি কখন এলে?" আর সে-ও হেসে বল্‌বে, "কি ঘুম তোমার! একেবারে—একেবারে যেন Rip-van-winkle!"—Rip-van winkle—গল্পটা ইস্কুলে পড়া হত—Rip-van-winkle ঘুমিয়েছিল বিশ না ত্রিশ বছর—পড়াত Asst. Head Master, হাতে থাক্‌তো একখানা লিক্‌লিকে বেত—। কিন্তু এমন ভাবে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। আবার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে গেল গঙ্গার দিকে। মনে হওয়ার মুখটা বন্ধ ক'রে সে মনে মনে ভাব্‌লে—ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, 'এত অল্প বয়সে তোমরা আমাদের প্রাপ্য জায়গায় আগে এসে স্থান দখল ক'রে বসে আছ!'

একটা ময়লা ভাঙ্গা সিঁড়ির কোনে যখন এসে সে বস্‌লো তখন ওপারে আর গঙ্গার উপরের বহু নৌকোয় ষ্টীমারে আস্তে আস্তে একটী দুটী ক'রে আলো জ্বলে উঠ্‌ছিল। পেছনের সেই নতুন চিতায় আগুন ধরিয়ে হিন্দুপ্রথানুযায়ী সঙ্গের লোকজন কয়েকবার চেঁচাল। শব্দ এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায় না, তবে জানা আছে বলেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে, শব্দ দুটো 'বল হরি'।—শব্দ দুটো ত' শুন্‌তে খারাপ নয়, কিন্তু দেয়ালে বাধা পেয়ে শোনাচ্ছিল আর্ত্তনাদের মত।—association of ideaর জন্যই ও রকম অদ্ভুত শোনায়—একদিন কলেজে এক প্রফেসর, নামটা মনে পড়্‌ছে না, বলেছিল 'হরি বোল' নাকি শুন্‌তে ভয়ঙ্কর। একটা ফেরী ষ্টীমার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ছুটে চলেছে, চাকার আঘাতে ঢেউগুলি ওলট-পালট খেতে খেতে এপারে এসে আছড়ে পড়্‌ছে। ননীমাধবের হঠাৎ মনে পড়্‌ল, ঐ মৃতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়নি।—কিন্তু মৃতের আবার পরিচয় কি? একজন ছিল, সে এখন নেই। তবে, পরিচয়টা জান্‌তে চাওয়াও অস্বাভাবিক হ'ত না—কেননা এত যখন চেনা মনে হচ্ছিল একটা কৌতূহল হ'তেই পারে। তা'র একরকম নিশ্চিত মনে হচ্ছিল—ও সাহানার মুখ, যে মুখ ভুলে যাওয়াই তা'র পক্ষে স্বাভাবিক নয়! এত বয়সের মধ্যে আরও বহু মুখ বহু ভাবে দেখেছে, কিন্তু মনে হ'চ্ছে—আজ যেন মনে হচ্ছে—সাহানাই আলাদা আলাদা হ'য়ে সাম্‌নে এসেছিল। কথাটা বিশ্বাস কর্‌বার মত নয়—তবু এখন মান্‌তে হচ্ছে, জীবনের ঐ প্রথম সম্পর্কের জের সে নিজেই টেনে চলেছিল পাত্র থেকে পাত্রান্তরে। আজ হয়ত তাই ধরা পড়েছে, মূল উৎসের মুখ বন্ধ হয়নি—কোনদিনই হয়ত তা বন্ধ ছিল না। প্রায় অসম্ভব মনে হয় যে সাহানাকে সে এখনও ভোলে নি।

মনে পড়ে একদিন সাহানা বলেছিল, "তোমার যেমন ভবঘুরে স্বভাব, একদিন কোথায় বেরুবে আর এখানের কথা মনেও পড়বে না।" তা'র ও কথার ভিতর যে বর্ত্তমান মনোভাব যাচাই করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিল না—ননীমাধব তা' বুঝেছিল। তা-ই পিঠ-পিঠ উত্তর দিয়েছিল, "মৌচাকে মধু না থাক্‌লেই মাছি এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ায়, পেয়ে গেলে ত তারই আশে পাশে ঘুরতে থাকে।" উত্তরটা যেন কিছু ভাল্‌গার শোনাচ্ছিল, কিন্তু প্রথম নেশার ঝোঁকে সাহানার কানে তা' হয়ত ঐ মৌমাছির গুঞ্জনের মতই শুনিয়েছিল। এর চেয়েও স্পষ্ট মনে পড়ে একটা পূজোর ছুটিতে সাহানাদের দেশে যাওয়ার কথা। দুই পরিবারের ভিতর বন্ধুত্ব থাকায় ননীমাধব তাদের ট্রেণে তুলে দিতে শেয়ালদা' ষ্টেসনে যাওয়ার ভিতর অসঙ্গতি কারো চোখে পড়েনি। একজনের ক্রমে দূরে চলে যাওয়ার দৃশ্য যে আরেকজনের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করে দিতে পারে—তা শূন্য প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ননীমাধব সেদিন প্রথম বুঝ্‌তে পেরেছিল। এই চলে যাওয়ার অল্প ক'দিন পরেই সাহানার এক চিঠি এসে পড়ে। চিঠি এসেছিল—গাঁয়ে আর থাকতে ভাল লাগে না। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি কোল্‌কাতা কবে যাবো; বলে এইত এলাম, মোটেত সাতদিনও হয়নি।

আমি বলি, তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তোমার ত থাক্‌তে ভাল লাগ্‌বেই। মা মুখ ফিরিয়ে হাসে, তা-ই আর জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হয়নি—কি জানি কি ভাব্‌বে আবার। কিন্তু তোমায় ঠিক্ বলে রাখ্‌তে পারি, যাবো আর দু'সপ্তাহের ভেতর নিশ্চয়। এখন ত খুব মজা করে থিয়েটার সিনেমা দেখ্‌ছ। একটা কথা বলি, কোথাও আবার ঘুর্‌তে বেরিও না। পৌছেই কিন্তু তোমায় ডেকে পাঠাব পল্টুকে দিয়ে, সে যদি না পেয়ে ফিরে আসে সে কি রকম বিশ্রী হ'বে ভাব ত!—" পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক তা'কে যে কিছু বল্‌ছিল তা এতক্ষণ ননীমাধব খেয়াল করেনি। ফিরে চাইতে শুন্‌ল সে বল্‌ছে, "আপনাকে ডাক্‌চেন।" ননীমাধব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল না যে কে ডেকেছে—কেন ডেকেছে—কিছু ত সে বুঝ্‌তে পারেনি। হয়ত পুরাতন দিনগুলির ভিতর পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ কোন ভুল হ'য়েছিল, অথবা কোন কিছু মনে হয়নি—ত'াও হ'তে পারে।

ভদ্রলোক নিয়ে এল তা'কে সে-ই বৃদ্ধার কাছে, যা'কে ননীমাধব আগে লক্ষ্য করেনি। "জেঠাইমা, এই যে ইনি এসেছেন।" চোখ মুছে বৃদ্ধা বল্‌ল, "এতদিন পরে যে এমন-ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে—" সহজ ভাবেই বল্‌ল। ননীমাধব ভাব্‌ল এ ত তা'কেই বল্‌ছে, আর কেউ ত নেই আশে পাশে—অথচ কি বল্‌ছে। বৃদ্ধা এবার মাথার কাপড়টা একটু ঠিক ক'রে—দু'পাশ দিয়ে সাদা-কালো কয়েকটা চুল বেরিয়েছিল—স্বাভাবিক স্বরে বল্লে, "চিন্‌তে পার নি বোধহয়"—ঠিক্ মুখের দিকে চেয়ে নয়, "আমি সাহানা।" এত স্পষ্ট ক'রে যখন বলেছে তখন শুন্‌তে অবশ্য পেয়েছে। ননীমাধব একবার ফিরে চাইল প্রায় নিবে-আসা চিতার দিকে, যেখানে পুড়ে এখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে যা'কে সে ভুল ক'রেছিল সাহানা ব'লে। ওদিকে চেয়েই বল্‌ল, "আপন্—তোমার মেয়ে!" কাপড়ের কোনে নাক মুছে উত্তর কর্‌ল, "হাঁ। মেয়ে ঐ একটা ছিল। আস্‌চে বোশেখে বিয়ের—" একটু থেমে আবার বল্ল, "ছেলে এলাহাবাদে চাকরী করে, এ খবর এখন পর্য্যন্ত পায়নি—।" ননীমাধব ভাবছিল তা'কে কি জন্য ডাকা হ'য়েছে তা'ত এখনও বলেনি। বৃদ্ধা বল্ল, "কাল ভোরে একবার আমার বাড়ী যেও" ঠিকানা বলে আরেকবার চোখ মুছ্‌ল। ননীমাধব মাথা নেড়ে জানাল সে যাবে এবং জ্বলন্ত চিতাটার দিকে একবার চেয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। চিতা তখন পুড়ে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, মুঠো মুঠো ধুপ ছুঁড়ে মার্‌তে নিবু নিবু অংশ এক একবার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ছে।

রাত প্রায় ন'টা হয়েছে। গঙ্গার পাড়ের লোক চলাচল অনেক কমেছে। কিন্তু নানাবিধ আলোর সমারোহে অন্ধকার তেমন জমাট্ বাঁধ্‌তে পারেনি। দেখ্‌তে বেশ সুন্দর মনে হচ্ছে। একটা বিরাট্ নদীর বুকে অগুন্‌তি ফেনাময় ঢেউ—কোথাও ছেদ নেই। পাড় দোল খায়না তবু খাব্‌লা খাব্‌লা আলোছায়া চোখের সাম্‌নে বেশীক্ষণ দেখ্‌লে মাথা একটু যেন ঘুর্‌তে থাকে। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক-স্থান বেছে ননীমাধব বসে পড়্‌ল। এখান থেকে হাওড়া পুল বেশ দেখা যায়। পুলটা একটা তাজ্জব ব্যাপার বল্‌তে হবে—কিন্তু শোন ব্রিজ লম্বা আরো বড়—রাতে তার উপর দিয়ে ট্রেণে যেতে কেমন অদ্ভুত রকম ভাল লাগে—প্রকাণ্ড শোন ব্রিজ—ননীমাধব ঘড়ি খুলে দেখ্‌লে রাত সাড়ে ন'টা বেজেছে! কিন্তু বাড়ী ফেরার কোন তাড়া নেই। বাড়ী বল্‌তে যা' বোঝায় সে সব উপসর্গ ত তা'র কিছুই নেই। এ আর আক্ষেপের কথা নয়। সব জিনিষই সবার থাক্‌তে হ'বে তার কোন মানে নেই। এই যে সাহানার এত গর্ব্ব 'আমার ছেলে—আমার মেয়ে', ঐত তা'র 'আমার মেয়ে' ছাইয়ে এসে পৌচেছে। এমন কত হয়—ঐ হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যে এত লোক, এত গাড়ী-ঘোড়া চল্‌ছে—হঠাৎ যদি ওটা ভেঙে পড়ে, পড়্‌তেও ত পারে—অসম্ভব কি, পরিবর্ত্তনের মধ্যে হবে শুধু কতগুলি লোক যা'রা এখন আছে, তা'রা আর থাকবে না; আর হয়ত অনেকে মিলে হল্লা করে জলমগ্ন বেচারীদের নিয়ে যমের সঙ্গে কিছুকাল টানাটানি খেলবে।—কিন্তু রাত যেন বেড়ে চলেছে, এখন বাড়ী ফেরা উচিৎ। কাল ভোরে আবার সাহানা দেবীর বাড়ী যেতে হ'বে। ঠিকানা দিয়েছে 'অখিল মিস্ত্রীর লেন'; আগে ত বাড়ী ছিল সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাদের বাড়ীরই পাশে। প্রথম যেদিন তা'দের সঙ্গে পরিচয় হয় সেদিনের কথা ননীমাধবের এখনও বেশ মনে পড়ে—অতি পরিষ্কার ভাবেই মনে পড়ে।

—জানুয়ারীতে ন'র শেষ পরীক্ষা দিয়ে সেবার

বেড়াতে গিয়েছিল হিন্দুস্থানের বেছে বেছে কয়েকটা পুরাণো সহর দেখ্‌তে। বাড়ী ফিরে এসে নতুন যে ব্যাপার চোখে পড়ে তা' হচ্ছে, পাশের বাড়ীর নবাগত ভাড়াটেদের সঙ্গে তা'দের বাড়ীর ইতিমধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য স্থাপন। শশীবাবু প্রথম দিনই সে ভূমিকা ক'রে রেখেছিলেন। ননীমাধবের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে তিনি তা'র বাবাকে বল্লেন, "এই বুঝি আপনার ননী।" ননীর বাবা ঈষৎ মাথা নেড়ে জানালেন যে তাঁর অনুমান ভুল হয় নি। এবার সঠিক বুঝতে পেরে শশীবাবু পরিষ্কার গলায় হাঁক্‌লেন—হাঁক্‌লেনই বল্‌তে হয় কেননা ইতিমধ্যেই কণ্ঠে গুরুজনোচিত খবর্দ্দারির আভাস এসে পড়েছিল—হাঁক্‌লেন, "আর ঘুরে বেড়ালে চল্‌বে না, ল-ট পাশ করেছ এখন থেকে বাবার সঙ্গে রীতিমত কোর্টে যেতে আরম্ভ কর।" গুরু কর্ত্তব্যভার মাথায় চাপিয়ে এবার তিনি আরেকটা অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা কাজ হাতে হাতেই গছিয়ে দিলেন, "সাহানা এবার পরীক্ষা দিচ্ছে, তা'কে মাঝে মাঝে গিয়ে পড়িও।" বুঝ্‌তে পারা গেল সাহানা তাঁর মেয়ে। নারী-প্রগতির তখন সবেমাত্র প্রথম যুগ, সুতরাং কথাটা একটু আকস্মিক মনে হয়েছিল; কিন্তু আসল কারণ তা'র ত্রিসীমানায় ছিল না, সে হ'ল দুই পরিবারের অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা নবাগতকে বুঝিয়ে দেওয়া। ননীমাধবও সবিনয়ে সম্মতি জানাল—বাবার সঙ্গে কোর্টে যেতে নয়, সাহানাকে পড়াতে।—এই ত পরিচয়ের গোড়ার ইতিহাস। ক্রমে সে পরিচয় যে তার ও সাহানার মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে' তুল্‌ছিল তা' কিন্তু সম্ভব হচ্ছিল শশীবাবু, বাবা, মা, মাসীমা সকলের চোখের আড়ালে। তবে ওটা হয়ত ননীমাধব সাহানার ভুল; পরস্পরের প্রতি নবোদ্ভূত মনোভাব অন্যের দৃষ্টির বাইরে রাখ্‌তে তা'দের অবশ্য যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, ফলে সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে, অবস্থাটা হয় ত সকলে সহজেই বুঝ্‌তে পেরেছিল। কিন্তু সাহানার বাবা মা'র কোন ভাবান্তর লক্ষ্য হয় নি; তাঁরা সমান আদরই করতেন ননীমাধবকে—হয়ত বা ভবিষ্যতের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ইচ্ছাই তাঁদের মনে মনে ছিল। সাহানাও একদিন ননীমাধবকে তা'র আভাস দিয়েছিল।

সেদিন চলেছিল তা'রা ট্যাক্সি ক'রে কোথায় বেড়াতে—হয়ত সিনেমায়, জু গার্ডেনেও হ'তে পারে—ঠিক মনে পড়ে না। সঙ্গে ছিল সাহানার ছোট ভাই পণ্টু। সাহানা একটু হেসে বল্‌ল, "কাল রাতে মা বাবাকে কি বল্‌ছিল জানো!" সে উত্তর কর্‌ল, "হাঁ।"

"হাঁ মানে! কি বল্‌ছিল বলতো?"

"না বল্লে জান্‌বো কি করে?"

"এই যে বল্লে 'হাঁ'।" "ও—হাঁ মনে পড়েছে। বলেছে, ননী একটা ভেগাবণ্ড্।" "বেশ করেছে—ভেগাবণ্ড-ই তো।"

"মিছে কথা, তা বল্‌তেই পারে না। এখন সত্যি ক'রে বল কি বলেছে।"

"আমি জানি না।" সাহানা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বস্‌ল। ননীমাধব একটু চেয়ে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, সাহানাকে নয়, "পণ্টু তুই জানিস্?" পণ্টু প্রশ্নটা শুন্‌তে পায়নি, "কি?" "ভেগাবণ্ড বানান কর্‌তে?" পণ্টুর মুখ শুকিয়ে গেল; বেড়াতে এসে ননীদা যে তা'কে একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করতে পারে তা সে ভাব্‌তে পারে না। কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'ল ননীদার উত্তর শুন্‌বার আগ্রহ নেই দেখে। সাহানা হেসে উঠেছিল, "থাক্ বাপু, আমি বল্‌ছি—তোমায় বিশ্বাস নেই—।" একটা হ্যাংলা কুকুর নিশ্চল ভাবে একটা লোককে এতক্ষণ বসে থাক্‌তে দেখে শুঁকে হয়ত বুঝতে চেষ্টা কর্‌ছিল অবোধ্য কারণটা। ননীমাধব ফিরে তাকিয়ে হাত দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল। একটু দূরে গিয়ে কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল, সেখান থেকে মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল।

হাওড়া-পুলের উপরের লোক চলাচলও ক'মে এসেছে। ডানদিকে শ্মশানের ভিতর থেকে দু' একটা চিতার অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। বহুদূরে কোথাও আগুন লেগে গেলে অম্‌নিই দেখায়।—আগুন সেবার লেগেছিল দেওয়ানপুরের হাটে—উঃ—বলাই দাস জোয়ান বটে বুড়ো বয়সেও—। এতক্ষণে সাহানা দেবী নিশ্চয় বাড়ী ফিরেছে। সাহানা দেবীর ভাই পণ্টুরও বয়স এখন কম হয়নি। ছোটবেলা ওকে বেশ দেখাত, অম্‌নি ত ছিল ছেলেমানুষ, কিন্তু ওর ভাব দেখ্‌লে সত্যই হাসি পাবার কথা। একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে।

সেদিন ছিল বেজায় বাদ্‌লার দিন। পথে জল

দাঁড়িয়েছে কোমর সমান। ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ননীমাধব এসে উপস্থিত সাহানাদের বাড়ী। প্রথমেই মাসীমাকে ডেকে চেঁচিয়ে বল্‌ল, "মাসীমা, আপনার মেয়ে পাশ ক'রেছে।" সাহানা তা'র পড়ার কোঠা থেকে কথাটা নিশ্চয় শুন্‌তে পেয়েছিল। পন্টু এসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ল, "দিদি ডাক্‌ছে।" পন্টু বোধ হয় অনেক কিছু বোঝে, না হ'লে যে ছেলে সারাদিন হৈ-হল্লায় পাড়া মাৎ করে রাখে সে যখনই বল্‌তে আসে 'দিদি ডাক্‌ছে' তখনই অমন লজ্জা পাওয়ার মত মুখ চোখ হয় কেন! সাহানার খুসীর মাত্রা একটু উঁচু ডিগ্রিতে ওঠা আশ্চর্য্য নয়; খুসীর কারণ অবশ্য শুধুই পাশের সংবাদ নয়, সংবাদ বাহকের ব্যক্ত আগ্রহের পরিচয়ই হয়ত মুখ্য কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাবের আতিশয্যে অনেক সময় ছেলেমানুষী কর্‌তে ঝোঁক হয়—সাহানার বোধ হয় ইচ্ছা হচ্ছিল একটা প্রণাম কর্‌তে; বাইরের বৃষ্টির শব্দ আর কক্ষের কমে-আসা আলো বোধ হয় সাহায্য কর্‌ছিল সহজ দৃষ্টি ঘোলাটে হ'য়ে যেতে। কিন্তু কিছুই সম্ভব হ'ল না—দোরের পাশে পন্টু দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন অবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিল।

অবশ্য অন্য একজনও পর্য্যবেক্ষণ করত, সে পন্টুর মত নির্ব্বাক দর্শক নয়, সে বেশী করে স-বাক, তবে দর্শক হওয়ার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত। সে ননীমাধবের বন্ধু বিজন। বন্ধু বান্ধবের আড্ডা থেকে ননীমাধবের হাজিরার সংখ্যা ক্রমে কমে আস্‌ছিল। ব্যাপার লক্ষ্য করে বিজন অযাচিতভাবে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করত। অর্থাৎ এদিকে সকলকে বুঝিয়ে দিত ননীমাধবের স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু নিজে সে সচেষ্ট হ'ল আসল তথ্য সংগ্রহ করতে। বেগ পেতে হ'ল না মোটে। ননীমাধবই সবিস্তারে বিবৃত করল—প্রথম নেশার দিনে যেমন হয়, বেশী কথা বলে' ভিতরের আনন্দ চাঞ্চল্য জানাতে না পারলে যেন উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না। শুনে বিজনের যা মানসিক অবস্থা হল সহজ বাংলায় তার কোন প্রতিশব্দ নেই; উপন্যাস যে সব সঙ্ঘটনের একমাত্র মাতৃভূমি সে সব যে এমন অভাবনীয় রূপে হাতের কাছে সম্ভব হ'তে পারে, তা'ও অতি পরিচিত তা'দের এই ননীমাধবকে আশ্রয় করে'—এত বড় সংবাদের আনন্দ বিজনের কাছে প্রায় অসহ্য। আর ননীমাধব শুনে উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল যে তা'র ও সাহানার কত তুচ্ছ কথায় কাজে এত যে সব গভীর তথ্য আত্মগোপন করে'ছিল তা' সে ভাবতেও পারেনি। সে মনে মনে ঠিক্ কর্‌লে বিজনের সঙ্গে সাহানার পরিচয় করিয়ে দেবে। তা' সহজেই সম্ভব হ'ল একদিন বেড়াতে বেরিয়ে। ননীমাধব হেসে বল্‌লে, "এই হচ্ছে আমার বন্ধু বিজন—যা'র কথা তুমি আমার কাছে শুনেছ।" আর বিজনের দিকে ফিরে বল্‌ল, "ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী সাহানা দেবী, বাকী পরিচয়—আশা করি বাহুল্য।" বিজন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার ননীমাধবের দিকে চেয়ে সাড়ম্বরে দু'হাত ঈষৎ কপালে ঠেকিয়ে সাহানা দেবীকে বল্‌ল, "নমস্কার।" এমন আকস্মিক অভিবাদনের জন্য সাহানা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, তাড়াতাড়ি হাত তুলে আনাড়ী-ভাবে প্রতিনমস্কার কর্‌ল। কিন্তু কথা কি বল্‌বে বিজন ঠিক্ করে উঠতে পারল না। অবশ্য পূর্ব্বে যে অনেক ভাল ভাল কথার তালিম্ দিয়ে না রেখেছিল তা' নয়; তবে বাস্তব সাহানা আর তার সলজ্জ বিব্রত দৃষ্টির সাম্‌নে তা'রা কিছুতেই বের হ'তে ভরসা পাচ্ছিল না। অতএব আলাপের শব্দ সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় র'য়ে গেল।

বাড়ী ফেরার পথে সাহানা বল্‌ল, "তোমার বন্ধু তোমার মত বাক্যবাগীশ নয়।" ননীমাধব নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌ছিল। যে বিজনের মুখে কথার তুবড়ি ছুট্‌তে থাকে, তাকেই বরং বলা যায় সাহানার 'বাক্যবাগীশ'—যা'র কথা ফুরিয়ে যাওয়া মানে নিজে শুদ্ধ ফুরিয়ে যাওয়া—তা'র একি অভাবনীয় ভাবান্তর! বিজন যে আজ সাহানার সাম্‌নে এমন ভালমানুষী চেহারা দেখিয়ে যেতে পারে তা সত্যই ননীমাধবকে অবাক্ করে ফেলেছিল। এই গেল ননীমাধবের অবাক্ হওয়ার পালা, কিন্তু ঘুরে এল বিজনের অবাক্ হওয়ার দিন। সে হ'য়েছিল অবাক্ এবং সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মাহত—যেদিন শুন্‌ল সাহানার বিয়ের সংবাদে ননীমাধব কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি।

সাহানার বিয়ের সংবাদ ননীমাধব জান্‌তে পারে তা'র মামাদের গাঁয়ে বসে। সেখানে গিয়েছিল অম্‌নি বেড়াতে, যেমন যেত মাঝে মাঝে বিশেষ কিছু না ভেবে। অবশ্য সাধারণ একটু কারণ যে না ছিল তা নয়। সাহানাদের বাড়ী এসেছিল সাহানার এক মাস্‌তুতো ভাই তা'র এক বোনের বিয়েতে ওদের নিয়ে যেতে। ননীমাধব তাই পূর্ব্বেই

বেরিয়ে পড়ল কল্‌কাতা ছেড়ে। এই তা'র মাতুলালয়ে আসার অপ্রকাশ্য কারণ। ইতিমধ্যে ঐ দু'চার দিনের মধ্যেই ধরা পড়ল যে সাহানার মাস্‌তুতো ভাই ননীমাধবকে ঠিক্ প্রীতির চোখে দেখছে না। এমন কি সে তা'র মাসীকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ল যে ঐ ভেগাবণ্ডটার সঙ্গে সাহানাকে মিশতে দেওয়াতে গুরুজনের গুরু দায়িত্বকে অবহেলা করা হচ্ছে। আর ননীমাধব ভাব্‌ল, নেহাৎ সাহানার মাস্‌তুতো ভাই না হ'লে—। তবে এতবড় কল্পনা সে কখন করেনি, এই মাস্‌তুতো ভাইর এক বড়লোক বন্ধু বসে ছিল মাসীর বাড়ী তার কত বড় শত্রুতা করতে।

গাঁয়ের কয়েকজন ছেলের সঙ্গে সেদিন বেরিয়েছিল নদীতে বাচ্ খেল্‌তে। অপটু হাতে বৈঠা ধরে নৌকো কিছুতেই সোজা চালাতে পার্‌ছিল না। একটা গাছের শিকড়ে ধাক্কা খেয়ে যখন নৌকো সমস্ত চেষ্টা উপেক্ষা করে সোজা কসাড় ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুক্‌ল তখন তা'র মামাত ভাই নরেন হেসে বল্‌ল, "থাক্ ননীদা, আর বৈঠা ধরে কাজ নেই—এদিকে দাও"। ননীমাধব প্রাণপণ চেষ্টায় সদ্য বনবাস থেকে নৌকো উদ্ধার করে বিজয়োল্লাসে বলে উঠল, "একবার দেখ্‌না কেমন চালিয়ে নিচ্ছি।" পাড়ের দিকে চেয়ে নরেন বল্‌ল, "আর চালাতে হ'বে না, ঐ ছোটকাকা ডাক্‌চেন।" সেদিকে চেয়ে ননীমাধব বল্‌ল, "দেখুন ছোটমামা, কেমন ধাঁ করে পারে এসে যাব, নরেনটা আবার বলে আমি বৈঠা ধর্‌তে জানি না।" নৌকো পাড়ে এসে লাগ্‌তে ননীমাধবের ছোটমামা একখানা কার্ডের চিঠি হাতে দিয়ে বল্‌ল, "দিদি লিখেছে। তোদের পাড়ার সাহানা না কি নাম—তা'র বিয়ে হয়ে গেছে।" চিঠিখানা হাতে নিতে নিতে ননীমাধব বল্‌ল, "আমাদের পাশের বাড়ীর এক মেয়ে"। নানা কথার মধ্যে মা লিখেছে, —শশীবাবুর মেয়ে সাহানার বেশ ভাল ঘরে বিয়ে হ'য়েছে। জামাই দেখে সকলে খুব খুসী। সে বিয়েতে উপস্থিত না থাকায় সাহানার বাবা মা খুব দুঃখ করেছে ইত্যাদি। চিঠিখানা পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে নরেনের হাতে বৈঠা দিয়ে বল্‌ল, "এই নে, তোর ওস্তাদি এবার দেখা যাক্"। নরেনের সুপটু চালনায় নৌকো একটানা কল্‌কল্ শব্দ করে জোরে ছুটতে লাগ্‌ল। উবু হয়ে ঐ ঢেউএর মধ্যে একখানা হাত ডুবিয়ে ননীমাধব ভাব্‌ছিল, সাহানার বিয়ে হয়ে গেছে—ব্যাপারটা যেন কি রকম অদ্ভুত মনে হয়। ভাব্‌ল তা'হলে সাহানার উপর আর তার কোন অধিকার নেই! আগে কি ছিল? হয়ত ছিল, না হ'লে আর ওকথা মনে হচ্ছে কেন। কেমন যেন হ'ল! অথচ সেদিন পর্য্যন্ত সে বা সাহানা তাদের ভালবাসার এমন অদ্ভুত পরিণতি কল্পনা কর্‌তে পারেনি।—ভালবাসা? ভালবেসেছিল সে সাহানাকে? ভালবাসার ধারণাই যে তার অন্য রকম ছিল —ঠিক্ সাহানার উল্টো। সাহানা এর মূল্য দিত অসম্ভব রকম বাড়িয়ে, কিন্তু সে বল্‌ত, 'ভালবাসা আর কিছুই নয়'। বেশ গম্ভীর ভাবেই বল্‌ত, প্রায় বক্তৃতার ভঙ্গীতে 'বহুদিন সাহচর্য্যের ফলে উভয়ের উভয়ের উপর যে অধিকার-বোধ জন্মায় তা'কেই বলে ভালবাসা'। শুনে সাহানা রেগে যেত। ও বিশ্বাস করত না যে এ দেশের বিবাহিত জীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের এই একমাত্র ব্যাখ্যা। এখন নিশ্চয় স্বামীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের গভীর তত্ত্ব নিয়ে আরো বেশী আলোচনা হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়েরা নাকি এক একটি এনিগ্‌মা-সাহানাও তাই ভাব্‌ত। অথচ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ওরা যে পুরুষের চেয়ে কত সহজ হ'য়ে পড়ে তা' খেয়াল কর্‌তে পারে না। তবু ভাবে—এখন আরো বেশী করে ভাব্‌তে হ'বে। ওকথার যে কি মূল্য হ'তে পারে—এনিগ্‌মা! কিন্তু বড় সহজ এনিগ্‌মা— —'সন্দেশ' 'শিশু'র ধাঁধার মত!—

"এই ননীদা! হাত তোল, নৌকো ভাল ছুট্‌ছে না।"

"বাহাদুরী বোঝা গেছে, দে এবার আমার হাতে"। নরেন একটু হাস্‌ল। কিন্তু ননীমাধব উঠে বস্‌তে নৌকো সত্যই খুব জোরে চল্‌ছিল—দু'পাশের খেজুর গাছের সারি আর বুনোলতার ঝোপ ক্রমাগত সরে' সরে' যাচ্ছিল। ননীমাধব পাড়ের দিকে চেয়ে বল্‌ল, "তাই ত, নৌকো খুব জোর ছুট্‌ছে।" দূরের একসার সুপুরি গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল, অনেক দিন ত বেড়ান হ'ল এবার কল্‌কাতা ফেরা যাক্। সাহানাদের বাসা বোধ হয় তা'দের পাড়ায় আর নেই। না থাকাই ত সম্ভব। সম্ভব? খুবই সম্ভব— অথবা না থাকাই বোধ হয় ভাল।—কিন্তু সেদিনও নতুন বাড়ীর খুব ছোট—কেবল দু'তিন জনের উপযুক্ত, এমন বাড়ী তৈরীর কত না কল্পনা দু'জনে করেছিল। তা'দের

ভবিষ্যত জীবনের সমস্ত আশা কল্পনার জালবোনা হ'ত দুজনের মিলিত জীবনকে কেন্দ্র করে। এক দিনের কথা এমন ভাবে ঘুরে ঘুরে মনে আস্‌তে চায় যেন পুরাতন হওয়ার স্বভাবিক সীমানা সে এড়িয়ে চল্‌তে পার্‌বে।—

কিছুক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা হ'য়েছে। টেব্‌ল্ ল্যাম্প্ জ্বেলে সাহানা বসে পড়্‌ছিল একখানা রোমান্‌টিক্ যুগের নভেল। ননীমাধব ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বল্‌ল, "পণ্টুকে কি বলে' পাঠিয়েছিলে?"

হাতের বইখানা দেখিয়ে সাহানা বল্‌ল, "এইখানা চেয়ে নিয়ে আস্‌তে"। "সে বুঝেছি, কিন্তু বলেছিলে কি?"

"কি আবার বল্‌ব! বলেছি, বইখানা নিয়ে আয়।"

"উঁহুঁ—কা'র কাছ থেকে নিয়ে আস্‌তে বলেছিলে?"

"কি বক্‌চ!"

"বক্‌চি? বলেছ কিনা, ননীদার কাছ থেকে বইখানা নিয়ে আয়।"

কথার ঈঙ্গিতে মুখ লাল করে সাহানা ঝাঁঝাল স্বরে বল্‌ল, "বেশ করেছি—বলেছি।"

"অবশ্য, অবশ্য! লেখাপড়া শিখে মডার্ণ হয়েছ!"

কথার ভঙ্গীতে সাহানা একেবারে ছেলেমানুষের মত জোরে হেসে উঠ্‌ল।—কিন্তু ও ত দেখ্‌তে পাচ্ছিল না সেই মুহূর্ত্তে ওকে দেখাচ্ছিল কেমন! এ মুহূর্ত্তের হয়ত আসল কোন মূল্য ছিল না, সাহানা যেমন দেখাত হয়ত তেমনই দেখাচ্ছিল, হ'তে পারে আলোর সাম্‌নে তা'র হাস্যোজ্জ্বল মুখ কিছু বেশী সুন্দর, কিন্তু সে এমন কিছু নয়। মুহূর্ত্ত আসলে আসে—বিনা সংবাদে নিতান্ত আকস্মিকভাবে এসে পড়ে, তার আবাহনের আয়োজনের দরকার হয় না—সে নিজেই আসে। সাহানা এবার ঈষৎ হেসে বল্‌লে "বোসো—চা নিয়ে আস্‌চি।" নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া কথা—কোন মূল্য নেই! আরেকবার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ল। ননীমাধব এই মাত্র মনে মনে ভাব্‌ছিল, দুজনেই যদি একসঙ্গে সহজ ভাবে হেসে উঠ্‌তে পার্‌ত, সহজ হ'য়ে হয়ত সমস্ত ব্যাপার সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হ'তে পার্‌ত। সাহানা বেরিয়ে চল্‌ল চা নিয়ে আস্‌তে; তাইত সে বলেছিল, চা বা আর কিছু হোক্, একটু সময়ের হয়ত প্রয়োজন। তা'র চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে ননীমাধব ভাব্‌ল, ওর চলা সত্যই সুন্দর—ঠিক যেন গাঁয়ের ছোট নদীটি। কিন্তু মুস্‌কিল হয় ওকে নিয়ে পথ চল্‌তে, একটুও জোরে হাঁট্‌তে পারে না। একদিন তা নিয়ে ঠাট্টা করে ওকে ফেলেছিল মুস্কিলে; রাস্তার ভিতর দাঁড়িয়ে কিছু জবাবও দিতে পার্‌ছিল না, কেবল চাপা গলায় বলেছিল, "তোমার মত ধিঙ্গী কিনা, লাফ মেরে মেরে চল্‌তে হবে!" একদিন তার এই আস্তে চলার জন্য ত এক বিপদের সম্ভাবনাই হ'য়ে পড়েছিল।

চলেছিল থিওসফিকাল্ সোসাইটিতে বক্তৃতা শুন্‌তে। কলেজ ষ্ট্রীটের কাটিংএর কাছে হ্যারিসন্ রোড ক্রশ কর্‌তে গিয়ে সাহানা পড়ে গেল একটা দ্রুতগামী বুইক্ গাড়ীর সাম্‌নে। ননীমাধব ছিল একটু সাম্‌নে। ড্রাইভার ব্রেক্ কসার প্রয়োজন, কি জানি, হয়ত মনে করেনি। আশেপাশে বহুলোক নিশ্চেষ্ট হ'য়ে একসঙ্গে 'হৈ-হৈ' করে উঠ্‌ল। ননীমাধবের ভাব্‌বার অবকাশ ছিল না, ক্ষিপ্রহাতে সাহানাকে এক রকম বুকের ভিতর নিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচুর গোড়ায়। এখানে এসে দাঁড়াবার পর দুজনে দু'জনের দিকে একসঙ্গে ফিরে তাকিয়ে একটু হাস্‌ল। কিন্তু বুকের ভিতরটা তখনও ঢিব্ ঢিব্ কর্‌ছিল। মড্-গার্ডে আঘাত লেগে হাঁটুর খানিকটা যে কেটে গিয়েছিল তা' অনুভব কর্‌তে পার্‌লেও সেদিকে ননীমাধব ইচ্ছা ক'রেই ফিরে তাকাল না। আশে-পাশে অনেকে যে তা'দের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল তা' না চেয়েও বেশ বুঝতে পাচ্ছিল। আরো বুঝ্‌তে পাচ্ছিল, তা'র বয়সের যে সব যুবক ঘটনাটা চোখের সাম্‌নে দেখেছে তা'রা কিছুতেই তা'র উপর খুসী হ'তে পারেনি; এত বড় একটা ইন্‌টারেষ্টিং সিভল্‌রি দেখাবার সুযোগ যে তা'দের হাতের কাছে এসেও ফস্‌কে গেল এ জন্য দায়ী একমাত্র ননীমাধব। অবস্থাটা ভেবে সে মনে মনে হাস্‌ল এবং যতদূর সম্ভব নির্ব্বিকার একটা ভাব দেখিয়ে সাহানাকে নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল। অবশ্য অসংখ্য গাড়ী-ঘোড়া আর জনতার গোলমাল তখন পর্য্যন্ত কানে স্বাভাবিক শোনাচ্ছিল না। তবু যে অহঙ্কার সোজা হয়ে চল্‌তে বল্‌ছে সেটা হ'ল বয়সের।

—ফেরী ষ্টিমার একখানা বেলুড়ের দিক্ থেকে জগন্নাথ ঘাটের দিকে এগিয়ে আস্‌ছিল। তার তীব্র বাঁশীর শব্দ কানে আসতেই ননীমাধব উঠে দাঁড়াল। শীর্ণ কুকুরটা দাঁড়িয়ে উঠে আবার শুয়ে পড়ল। রাত নিশ্চয় খুব বেশী হয়েছে। ননীমাধব তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর উঠ্‌তে গিয়ে

হঠাৎ একটা হোঁচট্ খেয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল। নিকটেই জন দুই ঝাঁকামুটে বসে বিড়ি ফুঁক্‌ছিল, একজন এগিয়ে এসে ননীমাধবকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। আরামে বাধা দেওয়ায় হোক্ বা আলাদা কোন কারণে হোক্, সে রীতিমত ধম্‌কে ননীমাধবকে বুঝিয়ে দিল, "বুঢ্‌ঢা আদ্‌মী এত্‌না রাত্‌মে বাহার নেহি চল্‌না।" জন দুই স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, একজন স্ত্রীলোক সহানুভূতির স্বরে বল্‌তে বল্‌তে গেল, "আহা! বুড়োমানুষ, রাতের বেলা চোখেও দেখ্‌তে পায় না"—বাকিটুকু আর শোনা গেল না। আঘাত বিশেষ কিছু লাগেনি, একটা পুরাণো কাটার দাগের উপর খানিকটা ছড়ে গিয়েছে। তবু ননীমাধব মাথা নীচু করে তার উপরই হাত বুলাতে বুলাতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। ঐ অবস্থা থেকে চেয়ে যখন বুঝ্‌তে পারল ঝাঁকামুটে চলে গিয়েছে তখন আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাঁয়ে নিমতলাঘাটে তখনও দু'তিনটা চিতা জ্বল্‌ছিল, একেবারে খালি থাক্‌বার রীতি হয়ত তার নেই। সাম্‌নের প্রায় শূন্য রাস্তাটাকে দেখাচ্ছিল একটা মুমূর্ষু অতিকায় সরীসৃপের মত, তার উপর পা দিতে সারা দেহ কেমন শির্ শির্ করে ওঠে।

মনে পড়্‌ল, কালভোরে সাহানা দেবী বাড়ী যেতে বলে দিয়েছে। আর বেশী রাত হয়ে গেলে কাল ঘুম থেকে উঠতে ভয়ানক কষ্ট হবে। দূরে এক রিক্‌সা দেখ্‌তে পেয়ে ডাক্‌ল, "রিক্‌সাওয়ালা—" কিন্তু তা'র নিজেরই সন্দেহ হ'ল আওয়াজটা যেন পরিষ্কার হয়নি—বোধহয় শুন্‌তে পেলনা। এবার একটু চেঁচিয়ে—কেমন যেন বেশী তীক্ষ্ণ শোনাল—চেঁচিয়ে ডাক্‌ল, "রিক্‌সাওয়ালা ইধার আও—।"

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার উদ্ভব-কাল নির্ণয়ের আবশ্যকতা একান্তভাবেই পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশানুরাগী স্বাধীন বৈদেশিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাদের চির-উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনাজাল রচিয়া গ্রীস, মিশর বা অন্য যে কোন দেশকেই সঙ্গীতের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করুন না কেন, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুগণ তাহা স্বীকার করিবার কোন সদ্‌যুক্তি দেখিতে পান না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদ যে কারণে অপৌরুষেয়, বেদের উচ্চারণ ও গীতির বিধিবদ্ধ প্রণালীটিও সেই কারণেই অপৌরুষেয়; বায়ুর সাহায্যে নিবিড় মেঘের আবরণ অপসারিত হইলে লোকচক্ষু যেমন স্বাভাবিক রশ্মিচ্ছটার সহিত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করে, সেইরূপ বেদদ্রষ্টা ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা গাঢ় রজ ও তম বিদূরিত করিয়া সহজাত স্বর ও ছন্দে মণ্ডিত এই বেদরূপ শাশ্বত সম্পদ প্রত্যক্ষ করেন। কোন একটি কবিতা চিত্তের বিক্ষোভে ভুলিয়া যাইবার পরে উহা যখন পুনরায় আমাদের স্মৃতিপটে অভিব্যক্ত হয়, তখন ঐ কবিতার শব্দসমূহ যেমন ছন্দোবদ্ধভাবেই হৃদয়ে জাগরূক হইয়া থাকে, সেইরূপ সামমন্ত্রসমূহও স্বীয় ছন্দ ও স্বরলহরীর সহিত ঋষিগণের তপোমার্জ্জিত হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই জন্যই প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইহাকে "অনাদি সম্প্রদায় [১] বা অপৌরুষেয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপৌরুষেয় [২] শব্দের অর্থ—যাহার বর্ণ পদ বা স্বরের পৌর্ব্বাপর্য্য কোন পুরুষ—এমন কি পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানেরও স্বেচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নাই। কেহ যথেচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তন করিলে উহা বেদপদবাচ্য হইতে পারে না এবং পরিবর্ত্তিত গীতিও ঐরূপ মার্গী সঙ্গীত বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে

[১] অনাদি সম্প্রদায়ং যৎ গন্ধর্ব্বৈঃ সম্প্রযুজ্যতে। নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্ গান্ধর্ব্বং জগুর্ব্বুধাঃ॥ (অনাদি সম্প্রদায়ং বেদবৎ অপৌরুষেয়ং ইতি কল্লিনাথ, সঙ্গীত রত্নাকর, প্রবন্ধাধ্যায়)

[২] স্বজাতীয়োচ্চারণ সাপেক্ষোচ্চারণ বিষয়ত্বং অপৌরুষেয়ত্বং (বেদান্ত পরিভাষা, আগম পরিচ্ছেদ)

না। একটু প্রণিধান করিলেই সুধীগণ দেখিতে পাইবেন যে গীত একটি যৌগিক বস্তু। একাধিক স্বর বিবিধ সংযোগনৈপুণ্যে বিন্যস্ত হইলেই মাত্র উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে। সর্ব্বক্ষেত্রেই যৌগিক বস্তুর যোগপদ্ধতিটি অপরিবর্ত্তনীয়। অম্লজান জলজানের সহিত যথাবিধি সংযোজিত হইলেই জল উৎপন্ন হয়। অযথা সংযোগে অর্থাৎ বিধি লঙ্ঘন করিলে হয় না। সেইরূপ স্বরসংযোগের বিধিবদ্ধ প্রণালী লঙ্ঘন করিলে মার্গী গীতিও উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্যই প্রাচীনগণ মার্গী গীতিকে অপৌরুষেয় বা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াছেন। বেদান্ত বলেন [৩] অপৌরুষেয় বেদ জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেই উৎপন্ন এবং প্রলয়কালে তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মার্গী সঙ্গীত বেদের সহজাত বলিয়া ইহা অনাদি সিদ্ধ। ইহাই হইল সঙ্গীতের কাল সম্বন্ধে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর নিজস্ব অভিমত।

এইবার আমরা ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টিকাল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বৈদেশিক গ্রন্থকারগণের অভিমত আলোচনা করিব। Herbert A. Popley, B. A. মহোদয়ের "The Music of India" নামক গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। তাঁহার পুস্তক পাঠে জানা যায় যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বৈদেশিক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াই এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও বহু সার তথ্যে ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণের মত সঙ্কলনে পরিপূর্ণ। Mr. Popley বলেন স্বনামধন্য গ্রীক পণ্ডিত Pythagoras (৫১০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ) গ্রীক সঙ্গীতপদ্ধতির সমাধান করেন। অন্যত্র পপ্‌লি মহোদয় বলিতেছেন যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে সামগানের উল্লেখ রহিয়াছে। অধিকন্তু বৃহদারণ্যকে কতকগুলি বাদ্য যন্ত্রেরও উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই উপনিষদদ্বয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তর্কচ্ছলে পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ দুইখানির উৎপত্তি কাল মিঃ পপ্‌লির মতানুসারে স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায় গ্রীসীয় সঙ্গীত ধারা নিয়ন্ত্রিত হইবার বহু বর্ষ পূর্ব্বেই ভারতে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্গীতকলা ও সুগঠিত নানা বাদ্যযন্ত্র বিদ্যমান ছিল। আবার গ্রন্থান্তরে দেখা যায় "পিথা গোরাস্ ৫৫৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং এদেশ হইতে জ্যোতিষ, দর্শন ও সঙ্গীত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৬০-৭০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মতাবলম্বন করিয়া য়্যানাক্সা গোরাস্ Anaxagoras নামক জনৈক সঙ্গীতবিদ্ গ্রীক স্বরলিপি পদ্ধতি গঠন করেন।"

Lieut. Col. Todd তাঁহার "Annals and antiquities of Rajasthan" নামক গ্রন্থে গ্রীস দেশীয় অতি প্রাচীন ভৌগোলিক Straboর (খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৬০-১৯ অব্দ) নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"Strabo says, the Greeks consider music as originating from Thrace and Asia, * * * * * * * * * * and that others who regard all Asia, as far as India, as a country sacred to Dionysius (Bacchus) attribute to that country the invention of nearly all the Science of music."

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে গ্রীক পণ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীক সঙ্গীত থ্রেস ও এসিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে * * * এবং অন্যান্য তৎকালীন বিদ্বগ্নণ্ডলী মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র এসিয়া ডায়োনিসিয়াসের লীলাভূমি ছিল এবং এই স্থান হইতেই সঙ্গীতের প্রায় সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

A. C. Wilson তাঁহার "A short account of the Hindu System of Music" নামক গ্রন্থের নবম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :—"It must therefore be a sacred source of pride to them to know that their system of Music as a written Science is the oldest in the world."

অর্থাৎ :—ইহা তাহাদের (হিন্দুগণের) আভ্যন্তরীণ গর্ব্বের বিষয় যে তাহাদের সঙ্গীত পদ্ধতির লিপিবদ্ধ বিজ্ঞান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

Lieut. Col. Todd রাজস্থানের অন্য একস্থলে বলিয়াছেন :—"An account of the state of

[৩] তথাচ বর্ণপদবাক্য সমুদায়স্য বেদস্য বিয়দাদিবৎ সৃষ্টি কালীনোৎপত্তিমত্ত্বং, প্রলয়কালীন ধ্বংস প্রতিযোগিত্বঞ্চ। (বেদান্ত-পরিভাষা, আগম পরিচ্ছেদ)

সীবন-রতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিশীথকুমার রায়চৌধুরী
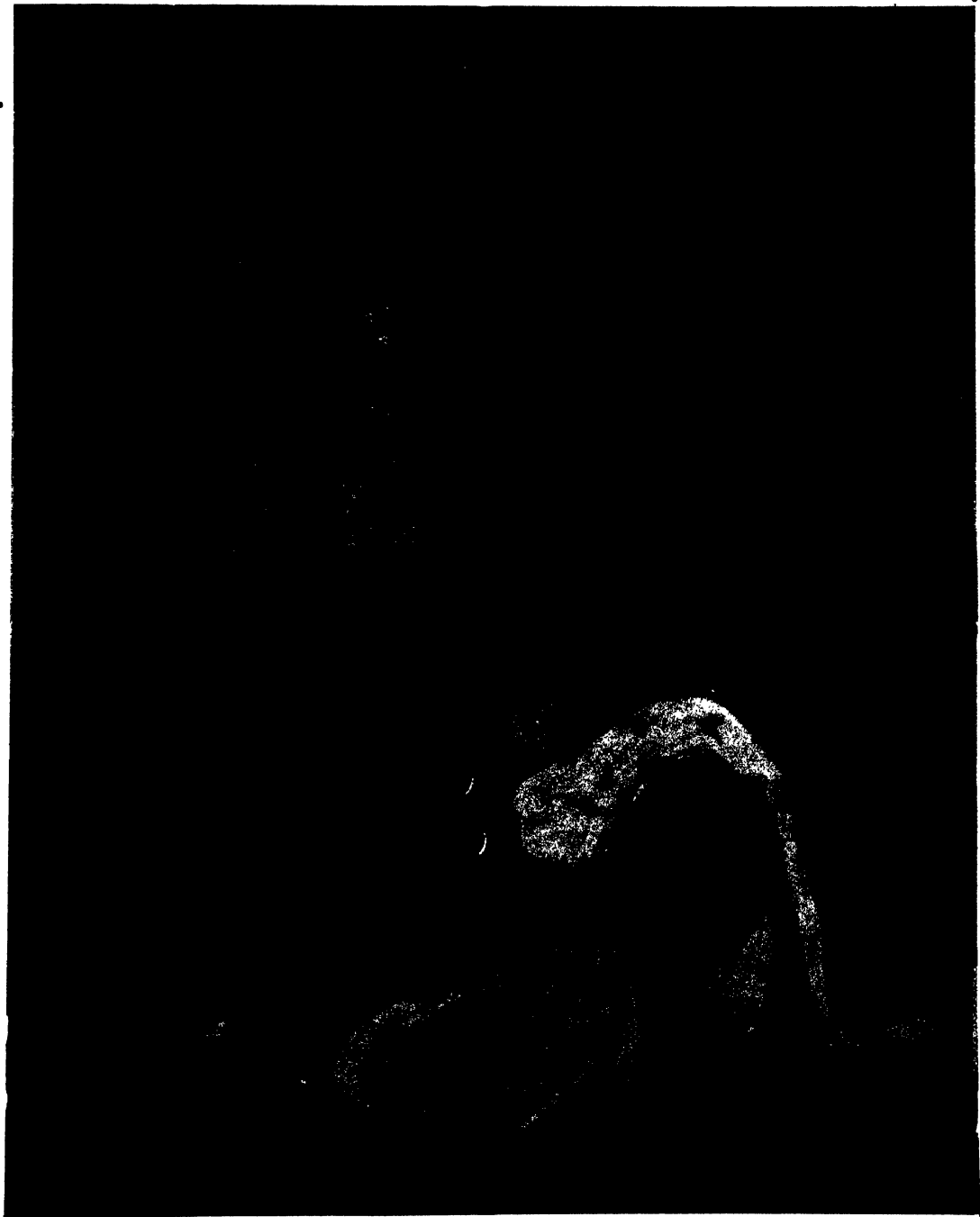
musical science amongst the Hindus of early ages and a comparison between it and that of Europe is yet a desideratum in Oriental literature. From what we already know of the Science, it appears to have attained theoretical precision yet unknown to Europe and that at a period when even Greece was little removed from barbarism.

অর্থাৎ:—আজও প্রাচ্য সাহিত্যে প্রাচীন হিন্দুদের সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অবস্থাজ্ঞাপক বর্ণনা ও তাহার সহিত ইয়ুরোপীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যতদুর জানি তাহাতে এরূপ সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ উপপত্তি আজও ইয়ুরোপে অজ্ঞাত এবং উহা এমনই এক প্রাচীন যুগের কথা যখন গ্রীস দেশও বর্ব্বরতার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত গোরেসীয়ার মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামায়ণ রচিত হয়। Jones সাহেবের মতে রামায়ণের রচনাকাল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২০২৯ অব্দ। Col. Toddএর মতে শ্রীরামচন্দ্র ও মহর্ষি বাল্মীকির স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব একাদশ শতাব্দী। যাহা হউক বাল্মীকির আদেশে শ্রীরামচন্দ্রের আত্মজ লবকুশ এই রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রেরই রাজসভায় বীণাযন্ত্রসহযোগে গান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-কথিত যে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত স্বীকার করিয়া লইলেও আমরা দেখিতে পাই বীণার মত একটি পূর্ণাবয়ব যন্ত্র এবং লোকবিমোহন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-পদ্ধতি অন্যান্য দেশে সভ্যতা বিকাশের বহু পূর্ব্বেই এদেশে বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত রামায়ণে আমরা 'জাতি' এই শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রাচীন কালের ব্যবহৃত 'জাতি' শব্দটি তৎপরবর্ত্তীকালে প্রচলিত কতকটা রাগ শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হইত। মধ্যযুগে শার্ঙ্গদেব তাঁহার সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থে মার্গী সঙ্গীত বর্ণনাকালে এই জাতি শব্দের বিবৃতিও প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণের যুগে সাতটি স্বর অবলম্বনে গঠিত সাতটি জাতি বা রাগের অস্তিত্বের অনুমানও করা হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কথিত বীণা ব্যতীত আমরা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখও রামায়ণে দেখিতে পাই। যথা—ভেরী, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, ঘট, পটহ, পণভ, ডিণ্ডিম প্রভৃতি চর্ম্মাচ্ছাদিত ঢক্কা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং মুদ্দুক নামক পিতল নির্ম্মিত তুরি ও আদম্বড় নামক বাঁশী। সেই কালে তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র মাত্রকেই বীণা বলিয়া কথিত হইত। ইহাদের কতকগুলি ছড়ি ও কতকগুলি সিঙ্গরাপ সাহায্যে বাদিত হইত। ইহা হইতেই পাঠকগণ তদানীন্তন সঙ্গীতের অসাধারণ উন্নত অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

বেদের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য মনীষিগণের নানারূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিত Maxmuller বলেন খ্রীষ্ট জন্মের পনর শত বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়। Dr. Hangএর মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার হইতে চব্বিশ শত বৎসর পর্য্যন্ত কাল মধ্যে বেদ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাঁহার Orion or Researches into the antiquity of the Vedas গ্রন্থে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গতি ও স্থিতি গণনার সুদৃঢ় ভিত্তিতে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছেন যে বেদ খ্রীষ্ট জন্মের অন্যূন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। অপৌরুষেয়ত্ব উপেক্ষা করিয়া বেদের উদ্ভবকাল লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের মতানুসারে স্বীকার করিলেও বেদ সহ জাত ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তিকাল গ্রীস মিশর প্রভৃতি দেশে সঙ্গীত প্রচলনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ মনীষিগণের সুযুক্তিপূর্ণ মত-পরম্পরার প্রতি সম্যক অভিনিবেশ না করিয়া যাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতকে গ্রীস, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতের আদর্শে গঠিত অথবা পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন তাঁহাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ধারণাপ্রসূত ঐরূপ সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিবার আমরা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। আজকাল নিত্য-নূতন পুরাতত্ত্বাবিষ্কারের সংবাদও যেরূপ অহরহ আমরা পাইয়া থাকি, তেমনি অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার তীব্র প্রতিবাদের বার্ত্তাও আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কাজেই সর্ব্বক্ষেত্রে ঐ সকল পুরাতত্ত্বের উপর নির্ভর করা কতদুর সমীচীন তাহা সুধীগণের বিশেষ বিবেচ্য। (ক্রমশঃ)।

জলাশয়ের যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্য্য বস্তু দেখা যায় তার মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর হ'চ্ছে খানা ডোবা ও পুকুরের জলে যে সমস্ত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের অদ্ভুত উদ্ভব দৃষ্টি গোচর হয়। কেবল যে বাঁধাজলেই এরা জন্মায় তা নয়, স্রোতের জলেও অনেক সময় এদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। এঁদোপড়া পচাপুকুরের জলের চেয়ে বরং নির্ম্মল জলাশয় ও স্রোতস্বিনীতেই এই সব অদ্ভুত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর উদ্ভব অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

এই রকম কোনো জলাশয় বা স্রোতস্বিনীর জল খানিকটা তুলে এনে যদি অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজবর্ণ মণ্ডলাকার পদার্থ ঘূর্ণাত অবস্থায় চলে বেড়াচ্ছে। ওগুলোর তাই নাম দেওয়া হয়েছে "ঘূর্ণ্যমান গোলক" (Revolving Globes)। কিন্তু মজা হ'চ্ছে এই যে উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা সকলে এই "ঘূর্ণ্যমান গোলক"কে উদ্ভিদ-জাতীয় বলে দাবী করেন, আবার প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এই "ঘূর্ণ্যমান গোলক"কে জীব-জগতের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ঘোষণা করেন।

এই 'ঘূর্ণ্যমান গোলক' সম্প্রদায় যখন সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন বহু অণুবীক্ষণ-দক্ষেরা এদের পরীক্ষা ক'রে বলেছিলেন যে এগুলি 'একাবয়বী' জীব। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের সযত্ন পরীক্ষায় সপ্রমাণিত হয়েছে যে অসংখ্য পেয়ারাকৃতি জীবকোষ একত্র আবদ্ধ হ'য়ে চক্রাকার ধারণ করেছে। এইসব জীবকোষের প্রত্যেকটি থেকে অতি ক্ষুদ্রাকার এক এক জোড়া শুঁয়া নির্গত হয়েছে। এই শুঁয়া দুটিকে নৌকার দাঁড়ের মত তালে তালে নাড়তে নাড়তে এরা জলকেটে ভেসে বেড়ায়।

এই চক্রাকার জীবকোষের গোলকাভ্যন্তরে আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের চক্রাকার গোলক বিদ্যমান রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এরা মুক্তি পায়, যখন এই ঘূর্ণ্যমান গোলকের বহির্মণ্ডল অর্থাৎ বৃহত্তর চক্রটির অন্তর্ভুক্ত জীবকোষগুলি পরস্পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ইতস্তত বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে। তখন সেই আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলকের মধ্যে আবার তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের আরও প্রায় আটটি চক্রমণ্ডল চোখে পড়ে! অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে, এই ঘূর্ণ্যমান গোলক সম্প্রদায়ের এক একটি চক্রমণ্ডলের মধ্যেই একত্রে একাধিক বংশ পরম্পরার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই বংশ-পরম্পরায় একত্র আলিঙ্গনাবদ্ধ জীবকোষগুলির এক একটি মণ্ডলের পরিমাপ এক ইঞ্চির বিশ ভাগের একভাগ মাত্র! অর্থাৎ এই রকম কুড়িটি ঘূর্ণ্যমান গোলক একত্রে সাজালে মাত্র এক ইঞ্চি স্থান অধিকার করবে!

সেই পুকুর থেকেই একগাছি জঙলি ঘাস তুলে নিয়ে যদি পরীক্ষা করে দেখা যায়—তাহলে সেই ঘাসের গায়ে একটি ধূসরবর্ণ কাঠির মত আকৃতি জীব দেখতে পাওয়া যাবে। এরও দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির বিশ ভাগের একভাগ মাত্র! এরা সেই জঙলী সবুজ ঘাসের গায়ে কাঁটার মত খাড়া হয়ে লেগে থাকে। জঙ্‌লী ঘাসের পাতার গায়েই তাদের বনেদি বাসস্থান। এই ক্ষুদ্রকায় অদ্ভুত জীবগুলির নাম "বাচ্ছা ইট-গড়ুনে" (Little Brick-maker)। এরা ডিম ফুটে বেরুবার পর থেকেই যে কোনও একগাছি জলজ তৃণের গায়ে নিজেকে সংলগ্ন ক'রে নেয় এবং নিজেকে ঘিরে চারপাশে একটি খোল তৈরি করতে লেগে যায়—যার মধ্যে সে নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

এ বাসচ্ছদ বা নিরাপদে থাকবার খোলটি যাতে সে তৈরি ক'রে নিতে সক্ষম হয় এজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা এদের চারখানি ক'রে চমৎকার পাখ্‌নার মত কান্‌কো দিয়েছেন। এই কান্‌কোগুলি তার দেহের কেন্দ্রস্থিত মুখ গহ্বর থেকে নির্গত হয়েছে। এই কান্‌কোর প্রান্তভাগ আবার অতি সূক্ষ্মপেলব রোমরাজির ঝালর সংযুক্ত। প্রত্যেক কান্‌কোটিকেই তারা খুব দ্রুত সঞ্চালনে সক্ষম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা গেছে একসঙ্গে চারখানি কান্‌কো তারা

নাড়ে না। একটি একটি করে পরের পর নাড়ে। তবে এত বেশী দ্রুত সঞ্চালিত হয় সেগুলি অর্থাৎ এত অল্পক্ষণের মধ্যে ও এমন বেগে একটির পর আর একটি কান্‌কো ওঠে পড়ে যে সেই গতিবেগে মনে হয় যেন চারখানি চাকা ক্রমাগত ঘুরছে! এই ঘুর্ণী পাকের ফলে জলের মধ্যে যে আবর্ত্ত সৃষ্টি হয় তারই কেন্দ্রে থাকে এই জীবের প্রসারিত বুভুক্ষু মুখ। ঘুর্ণাবর্ত্তের স্রোতে যা কিছু ভোজ্য বস্তু তলিয়ে গিয়ে পড়ে সেই পাকের মধ্যে, উক্ত প্রাণীটি সাগ্রহে তাই গ্রাস করে।

এই বাচ্ছা ইট-গড়ুনে জীবগুলির খাদ্যাখাদ্য বিচার করবার শক্তি অদ্ভুত! ঘুর্ণাবর্ত্তের পাকে জলে ভাসমান অনেক রকম বস্তুকণাই তার মুখের কাছে গিয়ে পড়ে, কিন্তু, কেবলমাত্র যা তার খাদ্য তাই সে গ্রহণ করে এবং যা তার খাদ্য নয় তা সে বর্জ্জন করে। অনেক সময় সেই পরিত্যক্ত বস্তুকণা —যা খাদ্য নয় বলে সে একবার বর্জ্জন করেছিল—তা' পুনরায় স্রোতের বেগে আবর্ত্তের মধ্যে ফিরে আসে এবং ইট-গড়ুনে সেগুলিকে ইট গড়বার জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখে। এ সমস্ত সঞ্চয় ক'রে রাখবার জন্য তাদের কান্‌কোর মূলে বাইরে দিকে একটি আধার বা থলি আছে। উক্ত অভক্ষ্য বস্তুকণা কান্‌কো সংলগ্ন থলির মধ্যে সঞ্চিত হবার পরমুহুর্ত্ত থেকেই কান্‌কোর দ্রুত সঞ্চালন বেগের সঙ্গে অবিরাম ঘুর্ণিত হতে থাকে। এই ঘুর্ণাবর্ত্তের ঘুর্ণীপাকে পড়ে উক্ত বস্তুকণা যখন ক্রমে নীরেট ও কঠিন হ'য়ে ওঠে তখন ইট-গড়ুনে বুঝতে পারে যে এইবার এটাকে কাজে লাগানো চলবে। তখন সে শরীরটাকে দুলিয়ে একপাশে এমনভাবে ঝাঁকুনি দেয় যে থলির ভিতর থেকে সেই কাঠিন্য প্রাপ্ত বস্তুকণা বেরিয়ে পড়ে ঠিক তার খোলের

জলাশয়ের যাদুঘর

মুখের কিনারায় গিয়ে জড় হয়। সেখানে এমনভাবে সেটিকে ইটের মত গেঁথে ফেলে এই ইট-গড়ুনেরা—যে আর নড়ে-চড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। তারপর আবার একখানি ইটগড়া সুরু হয়। এমনি ক'রে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে একটির পর একটি ইট তারা গড়ে ও খোলের গায়ে

গাঁথতে থাকে যে পর্য্যন্ত তাদের খোলটির প্রাকার বেশ নিরাপদে থাকবার উপযুক্ত দীর্ঘ না হয়ে ওঠে!

এরা নিজেরা বাচ্ছা অবস্থা থেকে ক্রমে যত পরিণত হ'তে থাকে এদের শরীরের দৈর্ঘ্যও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। কাজেই ঠিক তদনুপাতে এরা নিজেদের আবাস-স্থল সেই খোলটির দৈর্ঘ্য ও ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে থাকে! ভয় পেলে বা শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝলে এরা তৎক্ষণাৎ খোলটির মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মগোপন করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ঈষৎ কম্পনেই এরা এত ভীত হ'য়ে পড়ে যে তৎক্ষণাৎ খোলের মধ্যে ঢুকে যায়! ভয় দূর হ'তে এদের বেশ একটু সময় লাগে। যতক্ষণ না নিঃসংশয়ে
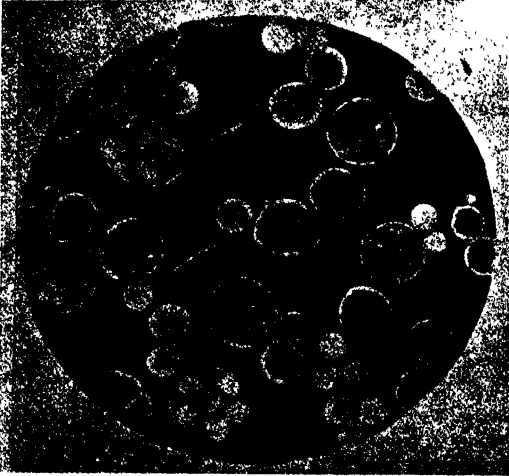
ঘূর্ণ্যমান গোলক

বিশ্বাস ক'রতে পারে যে বাইরে বেরুনো এইবার নিরাপদ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা খোল থেকে বেরুতে সাহস করে না।

ইট-গজুনেদের বাসার উপযুক্ত এই ক্ষুদ্র ইট এক একখানি গড়তে তাদের মাত্র তিন মিনিট সময় লাগে! তা' ব'লে, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে—তা হ'লেত এদের খোলটি অবিলম্বেই গড়ে ওঠে! সব সময় তা ওঠে না। কারণ, ইট তৈরি করবার উপযুক্ত উপকরণ. সর্ব্বদা জলের মধ্যে পাওয়া যায় না। কাজেই অনেক সময় উপকরণের অভাবে এদের দীর্ঘ প্রহর অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। আবার উপকরণ যদি এমন নরম জাতীয় হয় যে সহজে তা' কঠিন হ'য়ে দানা বেঁধে উঠে না, তাহ'লে ইট একখানি তৈরি করতে তিন মিনিটের ঢের বেশী সময় লেগে যায়।

প্রকৃতিবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উইলিয়ম ওয়েষ্ট এল্-ডি-এস্ বলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের কার্য্য-কলাপ যদি সুস্পষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছা করেন কেউ, তা হলে জলে একটু রংয়ের গুঁড়ো ফেলে দিয়ে যেন দেখেন। কারণ তাহ'লে তিনি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে অবিলম্বে ইট-গজুনেরা তাদের খোলের গায়ে রঙিন ইটের ইমারত গাঁথছে! তিনি নিজে একবার এ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে অত্যন্ত সুন্দর ফল পেয়েছিলেন। প্রথমটা জলের মধ্যে
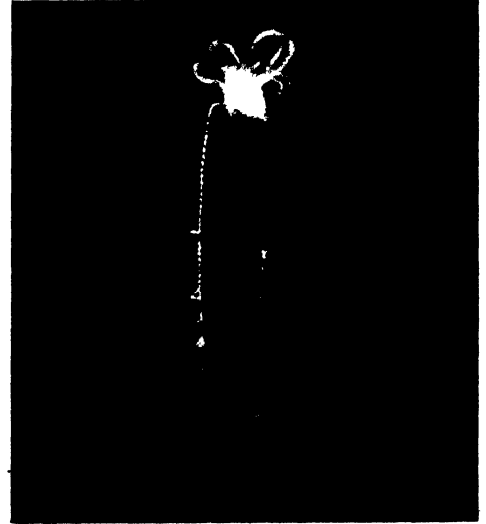
বাচ্ছা ইট-গজুনে

কিছু লাল রংয়ের গুঁড়ো ছেড়ে দিয়ে তিনি যখন অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পান যে এরা বেশ টপ টপ করে লাল রঙের ইট গড়তে সুরু করেছে, তখন কিছুদূর পর্য্যন্ত লাল ইটের গাঁথনি অগ্রসর হয়েছে দেখে তিনি সাদা চক খড়ির গুঁড়ো ফেলেছিলেন জলে। দেখতে দেখতে সাদা ইটের দেয়াল গড়ে উঠলো খানিকটা, তখন তিনি জলে দিলেন নীলের গুঁড়ো। তখন বাকী অংশ তৈরি হ'ল নীল ইটে। লাল নীল ও সাদা রংয়ের ইটে-গড়া খোলটি চমৎকার দেখতে হয়েছিল।

পুকুরের জলে ঐ জংলী ঘাসের গায়েই আর একরকম জীবও অবস্থান ক'রছে দেখা যায়। এদের বলে 'সুন্দরী-

পুষ্পিকা।' কিন্তু পুষ্প এরা নয়। এরা এক সুদর্শন জীব। আকারে একটি বড় কল্‌কে ফুল বা ফুঁদেলের মত দেখতে!
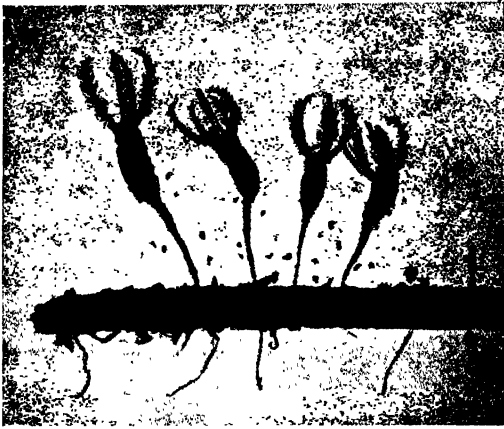
কিরীটী শৃঙ্গ

ফুঁদেলের তলার চোঙার মত নলটির শেষপ্রান্ত ঘাসের গায়ে এঁটে লেগে থাকে। মনে হয় যেন ঘাসের বুকে ফুল ফুটে রয়েছে!

বিহঙ্গ লতা

এরাও আত্মরক্ষার জন্য একটি খোলোস তৈরি ক'রে রাখে। ভয় পেলেই সেই খোলের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু সেই খোলসটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ব'লে এই জীবের জীবন-যাত্রার সমস্ত ব্যাপারই বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিছুক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে সেই খোলের মুখ থেকে অতি সূক্ষ্ম ঝাঁটার মত দীর্ঘ কেশ গুচ্ছ নির্গত হ'য়ে রয়েছে। খোলের ভিতর থেকে আর খানিকটা বেরিয়ে এলে তখন বেশ স্পষ্ট চ'খে পড়ে যে এই প্রাণীর মুকুটাকৃতি মস্তকের কিনারায় পঞ্চচূড়ার মত পাঁচটি এই সূক্ষ্ম কেশগুচ্ছ সংযুক্ত রয়েছে। এর মাথাটি মুকুটাকৃতি বলছি এই জন্য যে এর আকার ঠিক যেন একটি ফুলদানীর চাঁদকাটা কিনারার মত! অথবা পাঁচপাপড়ি

স্ফটিক শিখী

একটি ফুলের মত! সেই ফুলের প্রত্যেক পাপড়ির শিখরদেশে একটি ক'রে গাঁট আছে এবং সেই গাঁটের সঙ্গে এই চূড়াকৃতি সূক্ষ্ম কেশগুচ্ছ সংযুক্ত। এই সূক্ষ্মকেশগুচ্ছের ঈষৎ কম্পন তরঙ্গে ক্ষুদ্রতর প্রাণীরা আকৃষ্ট হয়ে আসবামাত্র 'সুন্দরী-পুষ্পিকা' তাদের রাক্ষসীর মত গ্রাস করেন। কারণ এদের জীবন ধারণের এই একমাত্র উপায়। 'সুন্দরী-পুষ্পিকা'দের এই কুসুম তনুও এমনিই স্বচ্ছ ও পেলব যে বাইরে থেকে তাদের আহার্য্য জীর্ণ করার প্রণালীটি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

এঁরা ডিম্ব প্রসব করেন। পরে সেই ডিম ফুটে এঁদের

বাচ্ছা পৃথিবীর আলোতে অবিভূ‍র্ত হয়। এঁরা একসঙ্গে একেবারে নয়টি ডিম পরের পর প্রসব করেন। ডিমগুলিকে বাচ্ছাফুটে না বেরুনো পর্য্যন্ত তাঁরা বসবাসের জন্য নির্ম্মিত সেই স্ফটিকস্বচ্ছ খোলের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করেন এবং যথোপযুক্ত তাপ দিয়ে প্রত্যেকটিকে ফুটিয়ে তোলেন।

জলাশয়ের জংলী আগাছার গায়ে আরও একরকম
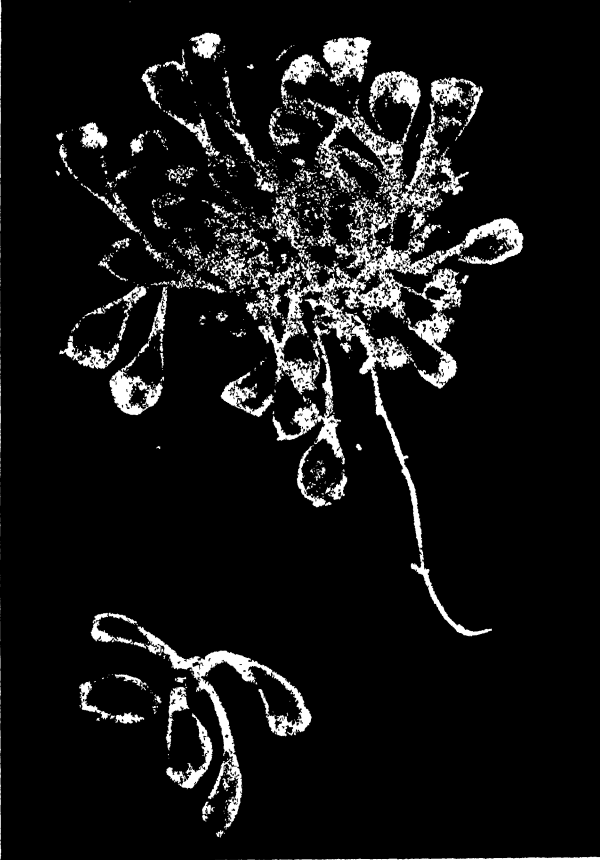
সজী ভেরী

সুদর্শন জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরাও একটা ক'রে স্ফটিকস্বচ্ছ খোল তৈরি ক'রে তার মধ্যে বাস করে। খোলটি সেই আগাছার পত্র পৃষ্ঠেই সংযুক্ত থাকে। এদের নাম "কিরীটী শৃঙ্গ" (Crowned Horn) খোলটি এদের গলা পর্য্যন্ত ঢেকে রাখে। কেবল মুখটি বেরিয়ে থাকে। প্রয়োজন হ'লে এরা শরীর কুঞ্চিত ক'রে নিয়ে মাথাশুদ্ধ খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং খোলের মুখটি টাকার থলের মুখের মত আপনিই বন্ধ হ'য়ে যায়। শত্রুপক্ষের কেউ আর তার মধ্যে প্রবেশ ক'রতে পারেনা। কিন্তু এদের খোলটির গড়ন সুন্দরী-পুষ্পিকাদের স্ফটিকাবাসের মত মসৃণ সরল ও সুদৃশ্য নয়। অত্যন্ত কোঁচকানো তোবড়ানো ও টেরাবাঁকা। দেখলে মনে হয় যেন আধেয় অপেক্ষা আধার অনেক বড়!

কিরীটী শৃঙ্গের স্ফটিকস্বচ্ছ আধারটি এমনি খাঁজপড়া ও কোঁচকানো হওয়ার ফলেই বিপদের আশঙ্কায় ও ভয় ডর পেলে এরা এই খোলের মধ্যে সহজেই ঢুকে প'ড়ে এটিকে গুটিয়ে ছোট ক'রে নিয়ে এর মুখটি বন্ধ করে ফেলতে পারে। এই প্রাণীর প্রত্যেকের শীর্ষদেশ পঞ্চশৃঙ্গে অলঙ্কৃত! অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের একজোড়ার পরিবর্ত্তে পাঁচপাঁচটা করে শিং! আবার প্রত্যেক শিংয়ের গায়ে ছোট ছোট কেশগুচ্ছ এমন ভাবে সারি-বন্দি লাগানো আছে যে মনে হয় শিংগুলি যেন ঝালর দিয়ে সাজানে রয়েছে! প্রত্যেক শিংয়ের মাথাটি বেঁকে ভিতর দিকে এমনভাবে গুটিয়ে থাকে যে দেখতে লাগে অবিকল রাজমুকুটের মত! এইজন্যই এদের নাম হয়েছে 'কিরীটী শৃঙ্গ!'

ডোবার জলের এই জংলী আগাছার গায়ে লেগে আছে দেখা যায় আর এক রকম জীব, যাদের একেবারে সৃষ্টির আদিম ক্ষণের প্রাণী বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এদের চেয়ে নিকৃষ্টতর জীব প্রাণীজগতে এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি! এদের বলে "অনির্দ্দিষ্ট-রূপা"* (Amœba) অর্থাৎ এদের কোনো নির্দ্দিষ্ট আকার নেই। আঠার মত চটচটে দ্রব শিরীশ বা গঁদের পিণ্ডবৎ দেহ এদের ক্ষণে ক্ষণে জলের ধাক্কায় ও নড়াচড়ার বেগে রকম রকম আকারে নিয়ত পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে। এরা নিজেদের সেই পিণ্ডবৎ শরীরের যে কোনো অংশ প্রসারিত করে দিয়ে খাদ্যদ্রব্য আহরণ ক'রে এবং শরীরের দ্বারাই সেই ভোজ্যবস্তু আবৃত করে নিয়ে যে কোনো অঙ্গের মধ্যে গ্রাস করে। মুখ বলে

এদের কোনো পৃথক অঙ্গ নেই। এরা শরীরের যে কোন অংশের দ্বারাই আহার্য্য গ্রহণ করতে সক্ষম!

আর একরকম এই শ্রেণীরই নিকৃষ্ট জীব জলাশয়ের যাদুঘরে জন্মায়—তাদের বলে "ভানু-কীটাণু" (Sun-Animalcule)। এরাও "অনির্দ্দিষ্টরূপা"দের মত শরীরের যে কোন অংশের সাহায্যে আহার্য্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আহার্য্য সংগ্রহ করবার উপায় এদের অন্যপ্রকার। এদের শরীরের সমস্ত বহিঃপ্রান্ত অসংখ্য দীর্ঘ সূক্ষ্ম অঙ্গুলীর মত প্রসারিত। মনে হয় যেন ক্ষুদ্র ভানুর কিরণজাল বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এহেন সহস্র করে তারা বিবিধ খাদ্য সংগ্রহ করে মহানন্দে ভোজন করে। এরা পরিণত বয়সে অর্থাৎ পূর্ণ যৌবন অবস্থায় ক্রমাগত নিজেদের শরীর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত ক'রতে ক'রতে একদা মাঝামাঝি দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে যায়। এইভাবে এরা একজন থেকে দু'জন হয় এবং দু'জন ক্রমে চার জন হয়। এই উপায়েই ধীরে ধীরে এদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে!

পুকুর পাড়ের যে সব গাছের শিকড় মাটি ভেদ ক'রে ক্রমে জলের ভিতর প্রবেশ করেছে এবং জলাশয়ের গর্ভে যে সব গাছ-গাছড়া জন্মেছে ও বরাবর জলের মধ্যেই ডুবে আছে, তাদের গায়ে একরকম শ্যাওলার মত পদার্থ পুঞ্জ পুঞ্জ লেগে আছে দেখা যায়। সেগুলি আর অন্য কিছুই নয় পূর্ব্বোক্ত 'অনির্দ্দিষ্টরূপা' অথবা "ভানু কীটাণু" অপেক্ষা আরও একটু উন্নত ও উচ্চশ্রেণীর জীবের সমষ্টি। তারা ঐ সব স্থানেই উপনিবেশ স্থাপন ক'রে বসবাস করছে; এদের নাম 'বিহঙ্গলতা' (Creeping Plumes)—এদের মাথার উপর থেকে অসংখ্য শুঁয়া নির্গত হয়। শুঁয়াগুলি ঠিক অশ্বখুরের আকারে তাদের মাথাটি ঘিরে এমনভাবে সাজানো থাকে যে দেখে মনে হয় যেন আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের অনুকরণে এরা মাথার উপর পালকের শিরপ্যাচ পরেছে! প্রত্যেক শুঁয়াটির দুপাশে আবার ঝালরের মত সূক্ষ্ম পক্ষরাজি সন্নিবেশিত! এগুলি যখন কাঁপে তখন ভারি সুন্দর দেখায়। কারণ এর একপাশের রোঁয়াগুলি কম্পন তরঙ্গে উপরদিকে মুখ করে নড়ে এবং অপর পাশের রোঁয়াগুলি কম্পনতরঙ্গে নীচেদিকে মুখ ক'রে নড়ে! ফলে ওরা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়! আমরা দেখি যেন একটা চঞ্চল গতিবেগ ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে উপর দিকে উঠেই নীচে দিকে নেমে যাচ্ছে! এদের দেহও এমন স্ফটিকস্বচ্ছ যে এদের শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। অনেকটা ঠিক এদেরই মত দেখতে আর একদল কীটাণু আছে তাদের নাম স্ফটিকশিখী (Crystal Crest-bearer)।

জলাশয়ের যাদুঘরে আর একটি জীবের সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম "ঘণ্টা তনু" (Bell-animalcule)। ঘণ্টার মত এর আকার বটে কিন্তু ঘণ্টার ডাঁটির চেয়ে এর লাঙ্গুলটি দ্বিগুণ লম্বা এবং সেটিকে সে অনবরত একবার পাকাচ্ছে একবার সিধে করছে দেখা যায়! এই ঘণ্টার প্রান্তভাগ বা কিনারাটিও ঘিরে ঝালরের মত দীর্ঘ পক্ষ-শ্রেণী আছে। এগুলি অবিশ্রান্ত তালে তালে উঠছে পড়ছে। দেখে মনে হয় যেন ঘণ্টাটি লাট্টুর মত বন্ বন্ করে ঘুরছে! ঝালরগুলির এই অবিরাম তালে তালে ওঠা পড়ার ফলে জলে একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি হয় ঠিক যেমন 'ইট গড়ুনেদের' বেলা হ'তে দেখা গেছে। এই আবর্ত্তের আকর্ষণে প'ড়ে জলে ভাসমান বিবিধ খাদ্যকণা এদের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এরা তাই খেয়ে জীবনধারণ ক'রে থাকে।

জলাশয়ের এই সব অসংখ্য জীবের খাদ্য সংগ্রহ প্রণালীও অসংখ্য রকমের। একদল আছে তাদের বলে "সজীভেরী" (Green Trumpets); এদের আকৃতি অবিকল ফুলের মত! কারণ 'ঘণ্টার' আকার এখানে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে দেখা যায়। সরু বোঁটার দিক থেকে ক্রমশঃ একটু একটু করে এরা প্রসারিত বা বিস্তৃত হ'য়ে পড়ায় 'ঘণ্টা'র সঙ্গে 'সজীভেরীর' সাদৃশ্য সত্ত্বেও মিল নেই। 'ঘণ্টা' এখানে যেন ভেরী হ'য়ে উঠেছে!

জয়গোবিন্দ লাহা সি-আই-ই

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

আমরা বর্ত্তমান মাসে যে মহাপুরুষের ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিতেছি, তাঁহাদের বংশ কলিকাতা সমাজে বহুদিন হইতে নানা কারণে উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। কলিকাতার লাহা পরিবারের নাম আজ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও নিকট অপরিচিত নহে। এই বংশের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের চিত্র ও জীবনী আমরা ১৩৪১ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এবার তাঁহার অনুজ জয়গোবিন্দ লাহা মহোদয়ের কথা আলোচিত হইল।

জয়গোবিন্দ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন বাঙ্গালী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রাণকিষণ লাহা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকিষণের কনিষ্ঠ পুত্র। এই বংশে মহারাজা দুর্গাচরণ ছাড়াও শ্যামাচরণ, ভগবতীচরণ, রামচরণ, চণ্ডী-চরণ, রাজা কৃষ্ণদাস, রাজা হৃষিকেশ, অম্বিকাচরণ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বহুবিধ সৎকার্য্যের দ্বারা বংশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। জয়গোবিন্দের একমাত্র পুত্র অম্বিকাচরণ গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অম্বিকাচরণের পুত্রদ্বয় ডাক্তার সত্যচরণ ও ডাক্তার বিমলাচরণ লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ের বরপুত্ররূপে বাঙ্গালা দেশের সুধী সমাজে সুপরিচিত। "ভারতবর্ষে" উভয় ভ্রাতারই লেখনীপ্রসূত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ডাক্তার সত্যচরণ লাহা পক্ষীতত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; তাঁহার পক্ষী বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটস্থ আগড়পাড়ায় তিনি যে বিরাট পক্ষী-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিতে আসিয়া থাকেন। সমগ্র ভারতের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের মধ্যে উক্ত পক্ষী-নিবাস অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বংশের অন্যান্য উজ্জ্বল রত্ন সমূহের মধ্যে রাজা হৃষীকেশ লাহা বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ ও খ্যাতনামা শিল্পী ভবানীচরণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জয়গোবিন্দ লাহা ইংরাজি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রাণকিষণের হুগলী জেলাস্থ চুঁচুড়ার বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি অন্যান্য ভ্রাতাদের মতই নিজেদের ব্যবসা "প্রাণকিষণ লাহা এণ্ড কোম্পানী"র কার্য্যে যোগদান করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তথায় বাণিজ্য-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন এবং ক্রমে উক্ত প্রকাণ্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই সমান বুদ্ধিমান ছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, মিলন, ভালবাসা প্রভৃতি ব্যবসা ক্ষেত্রেও তাঁহাদের দিন দিন উন্নতির প্রধান কারণ ছিল। জয়গোবিন্দের চেষ্টায় লাহা পরিবারের বিশেষ ধনবৃদ্ধি হয় এবং সেই অর্থে সে সময়ে তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে বড় বড় জমিদারী ক্রয় করেন। তাঁহার সময়ে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যেও যোগদান করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা দ্বারা ক্রমে তাঁহারা রাজপুরুষগণেরও সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে থাকেন।

অর্থ উপার্জ্জন করাও যেমন সহজ কার্য্য নহে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থাও তেমনই দুরূহ কার্য্য। লাহা পরিবার শুধু উপার্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না তাহার সদ্ব্যবহারও করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দান, দাক্ষিণ্য ও সদাশয়তা তাঁহাদিগকে অতি শীঘ্রই দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বহু সম্মানের আসন প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নিজেদের অফিসে তাঁহারা যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কার্য্যপরিচালনদক্ষতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশের পর সেই সকল গুণের দ্বারা তাঁহারা উন্নতি ও যশের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

জয়গোবিন্দ লাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল কলিকাতা

কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন এবং কর্পোরেশনের কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইত। বহুদিন তিনি ২৪ পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণা জেলায় তাঁহারা প্রভূত জমীদারী ক্রয় করায় উক্ত জেলার সহিত লাহা পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। জয়গোবিন্দ ২।৩ বার কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের কমিশনারও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কলিকাতার সেরিফের পদ লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান বলিয়া বিবেচিত হইত—জয়গোবিন্দ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সেরিফ হইয়াছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছিলেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জনহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দানে ভূষিত করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মেয়ো হাসপাতালের গভর্ণর, প্রেসিডেন্সি জেলের পরিদর্শক ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের পরামর্শ কমিটীর সদস্য নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স নামক সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বণিক-সমিতির সদস্য ছিলেন এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স নামক ভারতীয় বণিক-সমিতির কয়েক বৎসর সভাপতি ছিলেন। বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তৎকালে একাধারে জমীদার-গণের স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি চর্চ্চাও করিতেন। জয়গোবিন্দ ১৬ বৎসর কাল বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য থাকিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি উহার পরিচালক কমিটীর সদস্য ও সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ এক প্রস্তাবে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরূপে জয়গোবিন্দ লাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই দেশের জনসাধারণের স্বার্থ-রক্ষার জন্য জয়গোবিন্দ লাহা গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন প্রণয়নের সময় তিনি উহার একটি ধারা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের অবিচারের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ বড়লাটের কাউন্সিল সভায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সম্পর্কেও তিনি গভর্ণমেণ্টকে অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইতে পশ্চাদপদ হন নাই। ঐ আইনে দেশের লোকের অভিমত পদদলিত করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অত্যধিক ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল; জয়গোবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন তেজস্বী সদস্যের তীব্র প্রতিবাদের ফলে গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কিত আইনের সময়েও তিনি সরল ও সত্য কথা প্রচার করিয়াছিলেন। মক্কার তীর্থযাত্রীদের দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত হইত বলিয়া তিনি মক্কায় তীর্থযাত্রী প্রেরণ বন্ধ করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

জয়গোবিন্দ দেশের অবস্থা, দেশের লোকের রীতি-নীতি ও দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত সংবাদ বিশেষভাবে সংগ্রহ করিতেন। তিনি অল্প কথা বলিতেন এবং কখনও অতিশয়োক্তি বা বাচনিকতার দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেন—জনপ্রিয়তা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেন না। শুধু অর্থ উপার্জ্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনেই তাঁহার সকল সময় ব্যয় না করিয়া তিনি আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নে রত ছিলেন। তিনি গৃহে বসিয়া রসায়ন ও জ্যোতিষ বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং সেজন্য তাঁহার একটি নিজস্ব গবেষণাগারও ছিল। ফুলের চাষ তাঁহাদের পরিবারের প্রায় সকলেরই বিশেষ প্রিয় বস্তু। তিনি তাঁহার সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে এমন ফুলের বাগান করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিবার জন্য কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার গৃহে সমবেত হইতেন। কলিকাতায় যে বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে ফুল প্রেরণ করিয়া জয়গোবিন্দ কয়েকবার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্রগণ এখনও নিজ নিজ গৃহে ও উদ্যানে বিবিধ ফুলের চাষ করিয়া থাকেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে জয়গোবিন্দ লাহা পরলোকগমন করিয়াছেন। বন্যা প্রভৃতিতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসীদিগকে সাহায্য দানের জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন; তাহা ছাড়া আলিপুর পশুশালায় একটি গবেষণাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া এবং সর্প-বিষের ঔষধ সম্বন্ধে গবেণার জন্য অর্থদান করিয়া তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সুবর্ণ বণিক দাতব্য সমিতির সভাপতিরূপে দরিদ্র স্বজাতীয়গণের দুঃখ দূর করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বের্লিন

ইউরোপের যে-সব বড় বড় শহরে নানা শিল্প দ্রব্য তৈরী হয় কিংবা নানা স্থান থেকে শিল্প দ্রব্য এনে যেখানে বিক্রী করা হয়, সে-সব শহরের দোকানগুলির রাস্তার ধারের জানালা আজকাল যেভাবে সাজিয়ে রাখে, তাতে ক'রে মনে হয় অনেক স্থলে যেন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিনা, বিরাট সংগ্রহশালার ভিতর দিয়েই চ'লেছি! পারিস, ভেনিস, ভিয়েনা—এই সব শহরের মতন বের্লিনের দোকানের বাহারও খুব। দোকানগুলির বড় বড় জানালা, তাতে দেয়াল-জোড়া প্লেট-গ্লাস, তার পিছনে রকমারি জিনিসের পসরা দেওয়া র'য়েছে। বের্লিনে একটী জিনিসের কাজ খুব হয়—সেটী হ'চ্ছে amber আম্বার। উত্তর-ইউরোপে—বাল্টিক সাগরের আশপাশের দেশে—এই জিনিস খুব পাওয়া যায়; এটী হ'চ্ছে pine বা সরল-জাতীয় গাছের fossilised বা অশ্মীভূত নির্যাস, রজন বা গঁদ জাতীয় জিনিস অশ্মীভূত রঙটা হ'চ্ছে ফিকে হ'লদে; জিনিসটা স্বচ্ছ, কঠিন; ডেলা-ডেলা অবস্থায় পাওয়া যায়; প্রবাল, হাতীর দাঁত, কচ্ছপের-খোলা, ঝিনুক—আর নানা রঙের পাথরের মত আম্বার ব্যবহৃত হয়; আম্বার কেটে মালার দানা, মূর্ত্তি, কৌটা, নল, নানা টুকিটাকি জিনিস তৈরী হয়; রত্ন-হিসাবে আম্বার ব্যবহৃত হয়। এক সময়ে দক্ষিণ-ইউরোপের গ্রীস-রোমের লোকেরা উত্তর ইউরোপের দেশে এই আম্বারেরই খোঁজে যেত। চীন জাপানেও আম্বারের চাহিদা আছে, সেখানেও শিল্পীরা মূর্ত্তি আর নানা মণিগরী জিনিস আম্বার দিয়ে তৈরী করে। বের্লিনের রাস্তায় এই রকম আম্বারের কতকগুলি দোকান দেখি—স্বচ্ছ পীতবর্ণ আম্বার বেশ নয়নপ্রীতিকর লাগত। কখনও কখনও আম্বারের টুক্‌রোর মধ্যে একটা মাছি র'য়ে গিয়েছে দেখা যায়; এই রকম ছোট টুক্‌রো, ভিতরে কালো মাছি স্বচ্ছ আম্বারের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে—এরা লকেট হিসাবে ব্যবহার করে।
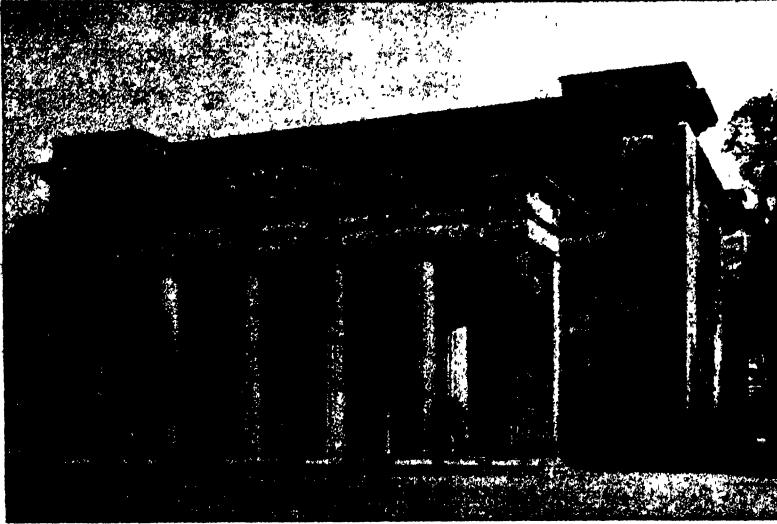
বের্লিন—Ehrenmal বা জাতীয় গৌরব-স্মারক মন্দির—শুদ্ধ গ্রীক দোরীয় রীতির মন্দির

বের্লিনে হাতীর-দাঁতের কারিগর আছে দেখলুম—তবে মনে হ'ল, চীন, জাপান আর আমাদের ভারতবর্ষের (বিশেষ ক'রে ত্রিবাঙ্কুরের) কারিগরদের মতন হাতীর-দাঁত কাটায় পাকা হাত এদের নয়। চীনামাটীর মূর্ত্তি-শিল্প মধ্য-ইউরোপে—শুধু মধ্য-ইউরোপে কেন, ফ্রান্সে, ডেনমার্কে আর ইংলাণ্ডেও—খুব লোকপ্রিয় ব্যাপার—চীনামাটীর জিনিসের, মূর্ত্তি প্রভৃতির দোকানও খুব।

ব্রঞ্জ আর অন্য ধাতুর মেডাল এবং চতুষ্কোণ পদকের দোকান; দুএকটী গহনা আর মীনার দোকান; আর এ ছাড়া, সাবেক কালের জিনিসের দোকান;—এ সবের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েও আমার অনেক সময় কাটত।

পারিসের সৌধ-সৌন্দর্য্য, আর পারিসের বাগান-বাগিচায় রাস্তার ধারে যেখানে-সেখানে সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি আর ভাস্কর্য্যের প্রাচুর্য্য বের্লিনে নেই, তবুও বের্লিন এত বড়ো জরমান জাতের রাজধানী ব'লে বের্লিনের লোকেরা মূর্ত্তি ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের নগরকে সাজাতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সব জায়গায় সৌন্দর্য্য আন্‌তে এরা পারে নি। Schloss "শ্লস্" বা কাইসারদের প্রাসাদের সামনে, সম্রাট্ প্রথম ভিল্‌হেল্‌ম বা উইলিয়ামের স্মারক যে বিরাট মূর্ত্তি-সমূহ খাড়া করা হ'য়েছে, সেগুলিতে সৌন্দর্য্যের চেয়ে চমকপ্রদতাই বেশী বিদ্যমান; গ্রানাইট্ পাথরের খুব উঁচু একবেদির উপরে, ঘোড়ায়-চড়া সম্রাটের ৩০ ফুট উঁচু বিশালাকার ব্রঞ্জে তৈরী মূর্ত্তি, ঘোড়ার মুখ ধ'রে চ'লেছেন শান্তি দেবী; বেদির চার কোণে চারটী জয়া-দেবীর মূর্ত্তি; আর দুই দিকে দুটী বিরাট মূর্ত্তি—একটী যুদ্ধের, অন্যটী শান্তির। বিশালাকার সব কয়টা মূর্ত্তি ব্রঞ্জে ঢালা, এক বিরাট ব্যাপার—কিন্তু খুব ভালো লাগেনা।

ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে গ্রীসের বাস্তুরীতি এবং গ্রীক আর রোমান ভাস্কর্য্যের প্রভাবে প'ড়ে, ইউরোপীয় শিল্পীরা মধ্যযুগের বিজাতীয় ও গথিক শিল্পধারাকে বর্জ্জন ক'রে পঞ্চদশ শতকে যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন ক'রলে, অষ্টাদশ শতকের baroque "বারক" আর rococo "রোকোকো"-তে সেই রেনেসাঁস শিল্প-ধারার পর্য্যবসান হ'ল। সুপ্রাচীন আর শ্রেষ্ঠ যুগের গ্রীক ভাস্কর্য্য হ'চ্ছে নিছক ধ্রুপদ; সে ধ্রুপদকে রেনেসাঁস যুগের ইউরোপ ঠিক আয়ত্ত ক'রতে পারলে না—শিল্পীরা রেনেসাঁসের শিল্পীদের হাতে হ'য়ে দাঁড়াল খেয়াল; অলঙ্করণ-বাহুল্যে এই খেয়াল অষ্টাদশ শতকের শিল্পে বারক আর রোকোকোর টপ্পা-ঠুংরী হ'য়ে প'ড়ল। তখন ইউরোপীয় শিল্পে আবার চেষ্টা হ'ল গ্রীকের গুরুগম্ভীর ধ্রুপদকে নোতুন ক'রে আনা যায় কিনা। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আর উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে—বিশেষ ক'রে ফরাসী সম্রাট নাপোলেওন-এর আমলে শুদ্ধ গ্রীক শিল্পের রূপটুকু আবার ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা হয়। আরও গভীরভাবে গ্রীক আর লাতীন সংস্কৃতির রসধারার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে যাবার একটা আকাঙ্ক্ষা ইউরোপের—বিশেষ ক'রে জরমানির—পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা দেয়; তারই ফলে এটা হয়। জারমানিতে গ্রীক আর লাতীন ভাষা আর সাহিত্যের চর্চ্চা আগের চেয়ে অন্তরঙ্গ-ভাবে আরম্ভ হয়। গ্রীক-লাতীন-প্রেমী অনেক জরমান এমন কি নিজেদের বংশ-পদবীও গ্রীকে বা লাতীনে অনুবাদ ক'রে নেন—Neumann হ'য়ে যান Neander, Holtmann হন Xylander বা Dryander, Goldnagel
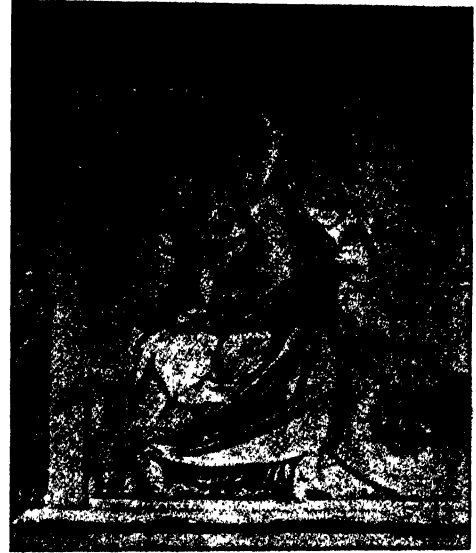
বের্লিন—মূর্ত্তিপাদপীঠেভাস্কর্য্য—সিংহবাহিনী অরিসূদনী দেশমাতৃকা

হ'লেন Chryselius, Hering হ'লেন Alexis; এগুলি জরমান পদবীর গ্রীক অনুবাদ—আরও গুটিকতক এরকম অনুবাদ আছে; আবার লাতীনও ক'রে নেওয়া হয়—Schmidt হন Faber, Goldschmidt হ'লেন Aurifaber, Weber হ'লেন Textor, Fuchs হ'লেন Vulpius, Schneider হ'লেন Sartorius, Baur হ'লেন Agricola. নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে যারা এইভাবে গ্রীক-রোমান জগতের স্পর্শ পাবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, তাদের বাহ্য জীবনেও যে গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির ছাপ আবার গভীরভাবে

প'ড়বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ফ্রান্সের মতন, ইংলাণ্ডের মতন, জরমানিতেও শুদ্ধ গ্রীক বাস্তরীতি আর শুদ্ধ গ্রীক ভাস্কর্য্য দেখা দিলে, নোতুন ভাবে এসে লোকের শিল্পচেতনাকে জয় ক'রলে। দোরীয়, ইওনীয়, কোরিন্থীয় রীতির ইমারত চারিদিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ইটালীর ভাস্কর Canova কানোভা, ডেনমার্কের Thorvaldsen টর্‌ভালড্‌সেন, ইংলাণ্ডের Flaxman ফ্লাক্সমান, আর ফ্রান্সের চিত্রকর David দাভিদ—এদের মত নামী শিল্পী জরমানিতে কেউ উদ্ভূত না হ'লেও, বহু সুযোগ্য শিল্পী এসে জরমানির বাস্তু রীতিতে আর ভাস্কর্য্যে গ্রীক দেবলোকের হাওয়া বহালে।

বের্লিন—মূর্ত্তিপাদপীঠে ভাস্কর্য্য—নাগদলনী জয়া দেবী

পারিসের Madelaine মাদ্‌লেন গির্জ্জা আর Arc de Triomphe আর্ক-দ্য-ত্রিঅঁফ-এর তোরণ—এগুলির মত বিরাট ব্যাপার (পারিসের এই দুটী ইমারত রোমান ধাঁজে তৈরী) বের্লিনে ওঠেনি; তবে বের্লিনের Unter den Linden উন্‌টের-দেন-লিন্দেন সড়কে শুদ্ধ গ্রীক রীতির দুটী জিনিস দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়—একটী হ'চ্ছে এই রাস্তার পশ্চিমের মোড়ে বিখ্যাত Brandenburger Tor বা ব্রান্দেনবুর্গ তোরণ—এটী আথেন্স-এর আক্রোপলিস্‌-গড়ের তোরণের নকলে তৈরী; আর অন্যটী হ'চ্ছে এই রাস্তার পূব-মোড়ে একটী ছোট বাড়ী—আগে সেটী রাজার পাহারাদার সেপাইদের আড্ডা ছিল (Koenigswache), এখন বাড়ীটাকে জরমান জাতীয়তার বা Germania গেরমানিয়া-মাতার মন্দির রূপে ব্যবহার করা হয়; এই বাড়ীটী ছোট, আর শুদ্ধ দোরীয় রীতির বাস্তুর একটী অতি চমৎকার নিদর্শন। আরও পূবে গিয়ে প্রাচীন সংগ্রহশালার বাড়ীটীও গ্রীক রীতিতে তৈরী দেখা যায়; এছাড়া বের্লিনের এখানে-ওখানে-সেখানে এই পুনরুজ্জীবিত গ্রীক বাস্তু-রীতির নিদর্শন আরও কতকগুলি আছে। বিগত মহাযুদ্ধের পরে ইংলাণ্ডে, ফ্রান্সে, ইটালিতে আর অন্যত্র, জাতীয়তা-বোধকে জনসাধারণের মধ্যে সুদৃঢ় ক'রে রাখবার জন্য নানা রকমে চেষ্টা হ'চ্ছে; তার মধ্যে একটা হ'চ্ছে Cult of the Unknown Soldier অজ্ঞাত মৃত সৈনিকের পূজা: সমগ্র জাতির মধ্য থেকে উদ্ভূত দেশ-রক্ষা আর জাতির গৌরব-বর্দ্ধনের স্পৃহায় যারা প্রাণ দিয়েছে আর দেবে, তাদের প্রতীক-স্বরূপ এক অজ্ঞাতনামা অজ্ঞাত-পরিচয় মৃত সৈনিকের দেহ এনে কোনও বিশেষ স্থানে সমাহিত করা হয়, আর বছর বছর তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ যারা দেশের জন্য আর জাতের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতির উদ্দেশে—এই সমাধিতে ফুলের মালা আর তোড়া দেওয়া হয়, দেশাত্ম-বোধের আগুন এই ভাবে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে সাহায্য করা হয়। কোনও নামী বিদেশী এলে, তাঁকে তাঁর রাষ্ট্রের তরফ থেকে একদিন গিয়ে এই অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধিতে ফুল চড়িয়ে আসতে হয়, এই রকম একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। জরমানিতে দেশাত্মবোধ আর জরমান জাতির গৌরব-বোধকে সদাজাগ্রত ক'রে রাখবার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। Unknown Soldier-এর দেহ এনে সমাধিস্থ করা হয় নি; জরমানির অন্য কোথাও এই "অজ্ঞাত-পরিচয় মৃত যোদ্ধা"র পূজা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে কি জানি না; তবে Unknown Soldier-এর গোরস্থানের পরিবর্ত্তে দেশমাতৃকার একটী বেদি প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে পুরাতন Kœnigswache-র বাড়ী এই সুন্দর গ্রীক মন্দিরটীতে। মন্দিরের ভিতরকার বেদির উপরে জরমান জাতির স্বার্থত্যাগ আর জরমান জাতির মহত্ত্ব আর গৌরবের উদ্দেশ্যে বড় বড় মালা সকলে দিয়ে যাচ্ছে—স্বদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে, আর বিদেশের বিশিষ্ট

আর প্রতিভূস্বরূপ ব্যক্তিরা কেউ বের্লিনে এলে (আমাদের ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা বের্লিনে তাদের সাংবৎসরিক সভা করবার জন্য জমা হ'য়েছিল, তারাও একদিন দলবদ্ধ হ'য়ে এসে একটা মালা দিয়ে যায়)। লোকে—জরমান আর বিদেশী মেয়ে পুরুষ, ছেলে-বুড়ো—এই মন্দিরে ঢুকে দেখে যাচ্ছে; দেশমাতৃকার Germania গেরমানিয়াদেবীর মন্দির, কোনও মূর্ত্তি নেই, খালি বেদি—মহান্ জরমান জনগণের অশরীরী আত্মা যেন এই মন্দিরের মধ্যে বিদ্যমান; বেদির দুপাশে আর দুটী সু-উচ্চ স্তম্ভাকার বেদি, তার উপরে একটী ক'রে ব্রঞ্জের অগ্ন্যাধার, তাতে সারাক্ষণ অগ্নিশিখা জ্ব'ল্ছে—বোধ হয় গ্যাসের শিখা জালিয়ে রাখা হ'য়েছে। সমস্তটা আমার বেশ লাগ্‌ল, বেশ একটা গাম্ভীর্য্য আছে; কাল্‌চে ধূসর বর্ণের পাথরে সরল নিরাভরণ দোরীয় রীতির বাড়ীর থাম আর দেয়ালের ঋজু রেখা-সুষমা, মন্দির-ঘরে ভিতরের আলো-আঁধারের মধ্যে শূন্য বেদি, আর বেদির পাদপীঠে রাশি রাশি ফুল—বেশির ভাগই সাদা ফুল, আর সবুজ পাতা, আর মালার গায়ে জড়ানো রঙীন রেশম বা সাটিনের ফিতে; বেদির দুধারে ধ্বকধ্বকায়মান দুই অগ্নি-শিখা; সারা ব্যাপারটীতে বেশ একটা সম্ভ্রম জাগে। বাইরে থামওয়ালা মন্দির-পুরোভাগে, প্রবেশদ্বারের দুধারে, দুজন সিপাহী বন্দুক কাঁধে চড়িয়ে দাঁড়িয়ে—বেছে বেছে দীর্ঘাকার প্রিয়দর্শন দুজন ক'রে যুবককে এখানে খাড়া রাখা হয়; এরা দশটা-পাঁচটা সারা দিন ধ'রে, রাজার বাড়ীর বা আমাদের দেশে গভর্ণরের বাড়ীর পাহারার মতন খাড়া থাকে; যতক্ষণ ধ'রে এদের পাহারায় খাড়া থাকবার পালা, ততক্ষণ এরা দাঁড়িয়ে থাকে যেন পাথরের মূর্ত্তি—একটুও নড়ে না—প্রচণ্ড শক্তির দ্যোতনা নিয়ে, জরমান যুবশক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ এরা বিরাজমান থাকে। দেশাত্মবোধের বা জাতীয় গৌরবের মন্দিরে পরিণত হ'য়ে, রাজার প্রহরী-নিবাস এই দোরীয় মন্দিরের নোতুন নাম হ'য়েছে Ehrenmal বা "গৌরব-স্মারক মন্দির"।

Unter den Linden-এর এইখানটা কতকগুলি অতি-চমৎকার বাড়ীতে আর কতকগুলি মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব সুন্দর। জাতীয় পুস্তকাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রহরীনিবাস (অধুনা দেশাত্মবোধ-মন্দির), তারপরে অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালা (Zenghaus), এগুলি রাস্তার উত্তর দিকে; রাস্তার দক্ষিণ দিকে পর পর সম্রাট্ প্রথম ভিল্‌হেল্‌ম্-এর প্রাসাদ, জাতীয় অপেরা বা নাট্যমন্দির, আর তার পিছনে সিন্ধা-হেড্‌ভিগ্-এর গির্জ্জা, তার পরে ভূতপূর্ব্ব যুবরাজের প্রাসাদ—এগুলি রাস্তার দক্ষিণ দিকে; তার পর কতকগুলি গ্রীক ধরণের মূর্ত্তি সম্বলিত একটী পোল দিয়ে Kupfergraben-এর ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পেরিয়ে, আরও কতকগুলি বিরাট প্রাসাদের সমাবেশ—প্রাচীন আর নবীন সংগ্রহশালা, জাতীয় চিত্রাগার, সম্রাটের কৌলিক গির্জ্জা, আর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের প্রাসাদ। ভেনিসের সান-মার্কো গির্জ্জার সামনেটা, ব্র্যাসেল্‌স্-এর গ্রাঁ-প্লাস্ বা প্রাচীন পৌরজন-সভাগৃহের নগর-চত্বর, দিল্লী আগ্‌রার

বের্লিন—মূর্ত্তিপাদপীঠে ভাস্কর্য্য—গরুড়বাহিনী জয়া দেবী

কেল্লা, ফতেপুর-সিক্‌রী, কাশীর ঘাটের শ্রেণী, নেপালের ভাতগাঁওয়ের দরবার-চত্বর—সৌধশ্রীমণ্ডিত এই রকম সব জায়গার কথা এখানে এলে স্বতঃ মনে হয়। এখানটায় আবার মূর্ত্তি অনেকগুলি আছে—Unter den Linden রাস্তার মাঝখানেই প্রুসিয়ার গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহান্ ফ্রীড্‌রিখ-এর অশ্বসাদী মূর্ত্তি, নানা অন্য মূর্ত্তি আর ফলক-চিত্রের সমাবেশে এটী বের্লিনের বিশেষ লক্ষণীয় একটী স্মারক-বস্তু; তার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীর সামনের বাগানে কতকগুলি বিশ্ববিখ্যাত জরমান মনস্বী আর পণ্ডিতের মূর্ত্তি আছে; আর তা ছাড়া আছে কতকগুলি সেনাপতির

মূর্ত্তি। প্রহরীনিবাস (দেশাত্মবোধ মন্দির)-এর দুপাশে Buelow বূলভ্ আর Scharnhorst শার্ন্হর্স্ট—এ দুই সেনাপতির মূর্ত্তি আছে, Rauch রাউখ্ ব'লে এক জরমান্ ভাস্কর এগুলি রচনা করেন। মূর্ত্তিদুটী ১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই মূর্ত্তির পাদপীঠে তিনটী তিনটী ছয়টী মার্বল পাথরে খোদাই-করা চিত্রফলক আছে—এগুলি জরমানির অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে পুনরুজ্জীবিত গ্রীক-ধাঁজের ভাস্কর্য্যের অতি সুন্দর নিদর্শন। চিত্রের বিষয়গুলি রূপকাত্মক—সর্বত্রই দেশের গৌরব, দেশমাতৃকা বা দেশের

বের্লিন—মূর্ত্তিপাদপীঠে ভাস্কর্য্য—
আথেনা দেবী—বিদ্যাদায়িনী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেশের বিজয়িনী দেবী—এঁদের নিয়ে—কেমন ভাবে এঁরা দেশ রক্ষা করছেন, তরুণদের মানুষ ক'রে তুল্ছেন বিদ্যায় শ্রমে আর শৌর্য্যে, কেমন ক'রে সদাজাগ্রত ভাবে দেশের লোকের প্রাণে উৎসাহ জীইয়ে রাখ্ছেন। এই ফলকচিত্রগুলি গতবার যখন বের্লিনে আসি তখনই আমায় মুগ্ধ ক'রেছিল ; এক যুগের স্মৃতি মুছে যায় নি। তখন এর ছবি সংগ্রহ ক'রতে পারি নি। এবার কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাইন্হার্ট্ ভাগ্নর্ আর প্রীতিভাজন বের্লিন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুধীর সেন—এঁরা এই মূর্তিদুটীর পাদপীঠের ফলক কয়খানির ছবি আমায় তুলিয়ে পাঠিয়ে দেন, এঁদের এই সৌজন্যপূর্ণ অনুগ্রহে এই ছয়খানি ফলকচিত্র বাঙালী পাঠকদের সামনে ভেট দিতে পারা গেল।

বের্লিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, তের বছরের স্মৃতি আবার জেগে উঠ্তে লাগ্ল—বহু স্থানের সঙ্গে যে পূর্ব্বপরিচয় হ'য়েছিল তা স্মরণপথে আবার আস্তে লাগ্ল। মনে হ'ল, কই না, বের্লিন বেশী তো বদলায় নি। কিন্তু বাহ্যতঃ এই শহরের রূপে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না ক'রলেও, কতকগুলি বিষয়ে এর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন—বের্লিনের লোকদের মনোভাবের আর অংশতঃ রীতিনীতির পরিবর্ত্তন খুবই লক্ষণীয়।

হিন্দুস্থান-হাউস এ থাক্তে হয় স্বদেশীয়দের সঙ্গে, দিন-রাত একত্র অবস্থান খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা বাঙালী পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী আর মাদ্রাজীদের সঙ্গে। এতে ক'রে জরমান ভাষার ব্যবহার সারাদিনে হয় তো একবারও ক'রতে হ'ল না। বের্লিনে আসবার অন্যতম উদ্দেশ্য, যতটা পারা যায় জরমানদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে জরমান ভাষাটা একটু ষড়গত ক'রে দেওয়া। হিন্দুস্থান-হাউসে ৩।৪ দিন থাকবার পরে আমি বাসা বদলে একটী পাসিওঁতে উঠ্লুম। বাড়ীউলী এক বৃদ্ধা জরমান মহিলা, বাড়ীর ঝি-চাকর জরমান ছাড়া আর কিছু জানে না।

এইবার বের্লিনে এসে অধ্যাপক রাইনহার্ট্ ভাগ্নর্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ক'রে বিশেষ প্রীত হ'লুম—এবারকার ইউরোপ-ভ্রমণে এই বন্ধুত্ব একটী পরম লাভ। অধ্যাপক ভাগ্নর্-এর বয়স পঞ্চাশের উপর হবে—চেহারাখানা একেবারে নিছক জরমান-পণ্ডিত-মার্কা ; একটু হৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, ধীরগতিতে চলাফেরা, ধীরভাবে কথাবার্ত্তা, সদা একটু অন্যমনস্ক ভাব—ভদ্রলোক যেন বাস্তব রাজ্য ছেড়ে মানসিক জগতেরই অধিবাসী ; আর ব্যবহার অসাধারণ হৃদ্যতা আর সৌজন্যে ভরা, সরল নিষ্কপট ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে। ইনি একটী সরকারী ইস্কুলে জরমান ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। মাতৃভাষা আর তার সাহিত্যে আজীবন চর্চ্চা ক'রে এসেছেন—আর এই চর্চ্চার আনুষঙ্গিক আলোচনা হিসেবে এঁকে ভাষাতত্ত্ব আর তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংস্কৃত ভাষাও প'ড়তে হয়। তিনি লাতীন গ্রীক

তো জানেনই। পঠদ্দশায় সংস্কৃত আর ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন; মনে মনে এই আগ্রহ নিয়ে ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির চর্চায় আত্মনিয়োজিত হন যে, বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত আর আধুনিক আর্য্য-ভাষার লেখা ভারতের সমগ্র সাহিত্য—যেন মূল ভাষায় প'ড়ে তার রসগ্রহণে সমর্থ হন। এই আগ্রহ জীবনে অনেকখানি ফলিয়ে তুলেছেন; বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত বেশ শিখে নিয়েছেন, আর জরমানিতে ব'সে-ব'সেই বিশেষ ক'রে বাঙলা ভাষার পণ্ডিত হ'য়েছেন। বাঙলা ভাষা ইনি যে অবস্থায় প'ড়ে দখল ক'রেছেন, তাতে তড়বড় ক'রে বাঙলা ব'লে যেতে পারেন না—কোনও ভাষা ভাল ক'রে ব'লতে শিখ্‌তে হ'লে, সেই ভাষা যারা সহজ ভাবে বলে বা ব'লতে শিখেছে এমন কতকগুলি লোকের মধ্যে বাস করা আবশ্যক। অধ্যাপক ভাগ্‌নর্ দুঃখ ক'রে আমায় চিঠি লিখেছিলেন, আর মুখেও আমায় ব'লেছিলেন, বের্লিনে বাঙালী অনেকেই আসেন বটে, বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে অনেকে খুশীও হন আর তাঁকে সাহায্য ক'রবেন স্বীকারও করেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁদের ধৈর্য্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না, তাঁরাও পাঁচ কাজে ফেরেন —ফলে, বঙ্গভাষীর সাহচর্য্য বের্লিনে ব'সে ব'সে তাঁর ভাগ্যে আশা বা ইচ্ছার অনুরূপ ঘটে না। তবে শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপকুমার রায় আর অন্য কয়েকজন বাঙালীর সাহায্য আর সাহচর্য্য তাঁর বাঙলা সাহিত্য আর ভাষা আলোচনায় যে বিশেষ কার্য্যকর হ'য়েছিল, তা' তিনি খুবই স্বীকার করেন। কিন্তু ভাগ্‌নর্ বাঙলা ভাষার নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে ঘরে ব'সে ব'সে সুপরিচিত হ'য়ে নিয়েছেন—বাঙলা ব্যাকরণ আর বাঙলা ভাষাতত্ত্বের কিছুই তাঁর কাছে অজ্ঞাত বা অপরিচিত নেই। ঘরে ব'সে ব'সে বিস্তর মূল বাঙলা বই প'ড়ে নিয়েছেন, জরমান ভাষায় অনেক অনুবাদও ক'রেছেন; বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে বাঙলা ছোট গল্পের একটী সঙ্কলন ক'রে, সেটীকে জরমানে অনুবাদ ক'রেছেন; এইভাবে জরমান-ভাষী জগতের সমক্ষে বাঙলা ছোট গল্পের একটু পরিচয় দিয়েছেন। এই রকম ছোট গল্পের একটী সংগ্রহ মূল বাঙলা অক্ষরে আর রোমান বর্ণান্তরীকরণে, বাঙলা প'ড়তে চায় এমন জরমান ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত ক'রেছেন; বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-ভাষা-বিভাগ থেকে এই বই বেরিয়েছে। এঁর বাড়ীতে গিয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে ক'দিন এঁদের সঙ্গে আমি মিশি। এঁর বাঙলা ভাষার দখল আর খুঁটিনাটির জ্ঞান দেখে সাধুবাদ না দিয়ে পারিনি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের "ঠাকুরমার ঝুলি"-র এক জরমান অনুবাদ ক'রেছেন। দক্ষিণাবাবুর গল্পগুলি পূর্ব্বঙ্গে সংগৃহীত, তার মূল ভাষাকে মোটামুটি ক'লকাতার ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে দেবার চেষ্টা হ'য়েছে; কিন্তু ক'লকাতার ভাষার উচ্চারণ-অনুসারী বানান আর শব্দ আর ধাতুরূপের

বের্লিন—মূর্ত্তিপাদপীঠে ভাস্কর্য্য—
আথেনা দেবী—রণসজ্জাকারিণী

অন্তরালে বহু স্থলে মূল পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষার রূপগুলি উঁকি মারছে। আমি ভদ্রলোকের অভিনিবেশ আর ভাষা বিষয়ে কুশাগ্র বোধ বা বিচারশক্তি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম—পশ্চিম আর পূর্ব্বঙ্গের ভাষার যে সব ছোটখাট পার্থক্য ক'লকাতার তিন পুরুষের বাসিন্দে আমরা মাত্র ঠিকমত ধ'রতে পারি, সেগুলি তিনিও বহু স্থলে ধ'রে ফেলেছেন। এই বইখানির অনুবাদের কাজে যে সব জায়গার অর্থ তাঁর কাছে কঠিন, দুরূহ বা অসাধ্য ঠেকেছিল, তার একটা তালিকা তিনি ক'রে রেখেছিলেন, আর আমাকে

ক'দিন ধ'রে তাঁর সঙ্গে একত্র বসিয়ে তার যথাসম্ভব সমাধান ক'রে নিলেন। কতকগুলি জায়গা আবার আমার কাছেও ব্যাসকূট র'য়ে গেল—ক'লকাতায় ফিরে এসে দক্ষিণাবাবুর শরণাপন্ন হ'য়ে, সেগুলির সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'রে, পরে ভাগ্‌নরকে পাঠিয়ে দিই—আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাবাবুর সঙ্গে ভাগ্‌নরের পত্রযোগে আলাপের বন্দোবস্ত ক'রে দিই। "সুতার পরণ সিলি-সিলি, কোন্ ফোঁড়ন দি ?"—"সিলি-সিলি" এই পদের অর্থ কি, আর বাক্যের মধ্যে এর অন্বয়ই বা কি ? "নাতী-নাত কুড়"—"কুড়" শব্দের অর্থ কি ?

বের্লিন—মূর্তিপাদপীঠে ভাস্কর্য্য—
আথেনা দেবী—সমরনেত্রী

"সার-সার করিয়া"—এই পদাংশ নৌকার পাল তুলিয়া দেবার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে, আবার রোগ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইতেছে—ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি ? "নাগন-দাসী কাঁকণ-মালার চোখ-মুখটী"—"হাতের কাঁকণের নাগন-দাসী"—অর্থ কি ? "পিট-কুড়ুলীর ব্রত"—"পিট-কুড়ুলী" শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ? ইত্যাদি ইত্যাদি। বিদেশী হ'য়েও আর আমাদের বাঙলা ভাষার বাক্যরীতিতে অভ্যস্ত না হ'য়েও ইনি আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলীর সূক্ষ্ম দ্যোতনা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকম সচেতন হ'য়েছেন।

ভাগ্‌নর এইভাবে বাঙলা ভাষা শিখেছেন। একখানা বাঙলা বই পেলে, তিনি তার অনুবাদ ক'রে তার নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু সন্ধান দিতে পারেন। সাবেক কালে যেমন গভীর আর অন্তরঙ্গ ভাবে কোনও বইয়ের অধ্যয়ন হ'ত, এ যেন সেই ভাবের পড়া। ভাষাতত্ত্ব, উচ্চারণ তত্ত্ব, বাঙলা ভাষার ইতিহাস—এ সব তাঁর করায়ত্ত; বাঙলা বই অনেক প'ড়েছেন, ভাষাটাও বেশ দখল ক'রেছেন; এখন যদি ইনি বাঙালীদের মধ্যে মাস কতক থেকে বাঙলা ভাষায় কথাবার্তা চালান, চল্‌তি বাঙলা তাড়াতাড়ি ব'ল্‌তে শেখেন, তা হ'লে ইনি অবাঙালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় বাঙলার পণ্ডিত হবেন। যা হ'ক্, বাঙলা ভাষায় ভাগনরের পাণ্ডিত্য বের্লিনের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে স্বীকৃত হ'য়েছে; তাঁকে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিভাগে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপক করা হ'য়েছে। ছাত্র-ছাত্রী অবশ্য বেশী হয় না—বের্লিনে কেই বা সখ ক'রে বাঙলা প'ড়বে! তবে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন এত বড় একটা জ্ঞানের কেন্দ্রে, ভাগ্‌নরের প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, তাঁর গুণের কতকটা মর্য্যাদা দেওয়া হ'য়েছে।

ভাগ্‌নরের প্রতি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার একটী বিশেষ কারণ আছে। আমার বাঙলা ভাষার উৎপত্তি আর বিকাশ বিষয়ক বড় বইখানির যত সমালোচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে ভাগনরের সমালোচনাটী হ'চ্ছে সব চেয়ে বড়, আর সব চেয়ে খুঁটিয়ে লেখা।

খালি বাঙলা-ভাষা-তত্ত্ব-ঘটিত "কচ্চায়ন" নয়, অন্য নানা সদালাপে ভাগনরের সঙ্গে কয় সন্ধ্যা সানন্দে কাটিয়ে এসেছি। ভাগনর বের্লিনের দক্ষিণ অঞ্চলে Tempelhof পল্লীতে ফ্লাট নিয়ে থাকেন। স্বামী স্ত্রী দুজনে থাকেন; যখন আমি বের্লিনে ছিলুম, তখন ভাগ্‌নরের বৃদ্ধা মাতা সপ্তাহ কয়েকের জন্য ছেলে-বৌয়ের কাছে এসেছিলেন। ভাগনরের মা সাধারণতঃ দেশে ওঁদের পৈতৃক বাড়ীতে থাকেন। ইউরোপে বুড়ো হ'লেও বাপ-মায়ের সংসার বা ঘর আলাদা থাকে; খুব কম ক্ষেত্রেই ছেলের অন্নে এক বাড়ীতে বুড়ো বাপ-মা বাস করেন। ভাগ্‌নরের মায়ের মনে ছেলের জন্য বেশ একটু গর্ব্ব আছে—আর ছেলের বিদেশী বন্ধু

ব'লে একেবারে ঘরের ছেলের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার ক'রতেন। তিনি আমার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, বাড়ীতে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এদেরও খবর নিতেন। আমার জরমানের দৌড় তেমন নেই, অধ্যাপক ভাগ্‌নর দোভাষীর কাজ ক'রতেন। ভাগ্‌নরের স্ত্রীকে দেখে প্রতি পদে আমাদের বাঙালী গৃহস্থ ঘরের গৃহিণীর কথা মনে হ'ত। এঁরা নিঃসন্তান—ভাগ্‌নর-গৃহিণী স্বামীর আর শাশুড়ীর যত্ন নিয়েই আছেন। এই সরল অমায়িক দম্পতীকে আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। ভাগ্‌নর-গৃহিণী দুই একটী ইংরেজী কথা বুঝতেন, তবে তিনি ধীরে ধীরে জরমানেই আমার সঙ্গে কথা কইতেন—আর বেশীর ভাগ তাঁর স্বামীকে দোভাষী হ'তে হ'ত। সাধারণতঃ চা-খাবার সময়ে উপস্থিত হ'য়ে রাত্রের আহারও ওঁদের বাড়ীতে সেরে আস্‌তে হ'ত। কখনও বা খালি ভাগ্‌নর কিংবা ভাগ্‌নর-দম্পতীর সঙ্গে সন্ধ্যের দিকে পাড়ায় একটু বেড়িয়ে আসা যেত। এই মধ্যবিত্ত জরমান পরিবারে দেখতুম, রাত্রের খাবারটা একটু হালকা রকমের হ'ত—হালকা ব'ল্‌লুম, দুপুরের লাঞ্চ্‌-এর তুলনায়; আমাদের দেশে এই 'হাল্‌কা' সান্ধ্য আহারও গুরুপাক বিবেচিত হবে। রকমারি সসেজ—"বরাহ"-মাংসময়; ডিম-সিদ্ধ; পনীর; কাঁচা মূলো আর অন্য শবজী; আর তদুপরি প্রচুর রুটি মাখন, চা। দেশভেদে আহারের বিভিন্ন ব্যবস্থা; স্কটলাণ্ডে দেখেছি, ৪॥০টে-৫টার সময় স্কচ গৃহস্থ ভর-পেট High Tea খেয়ে নেয়, এই High Tea হ'চ্ছে পেটভরা জলখাবার শ্রেণীর—তার পর রাত্রে রুচি-মত সামান্য একটু কফি আর দু-খানা বিস্কুট কেউ হয় তো খেলে।

এইরূপে সারা বিকাল আর সন্ধ্যা জুড়ে ভাগ্‌নরের জিজ্ঞাস্যের আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে হিটলরীয় জরমানির পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক খবর পেতুম। ভাগ্‌নর্‌-দম্পতী প্রাণে মনে হিটলরের অনুরাগী। ভাগ্‌নর্‌ বলেন—"Der Fuehrer ("আমাদের রাষ্ট্রনেতা" এই ব'লেই হিটলরের অনুরক্ত জনগণ তাঁর উল্লেখ ক'রে থাকেন—আমাদের মধ্যে যেমন গান্ধীজীর নাম না ব'লে অনেকে কেবল "মহাত্মাজী" বলেন) জরমান জা'তের এক দেবদত্ত নেতা, এঁর মত মহান্‌ নেতা জরমানি নিতান্ত সৌভাগ্য বলে পেয়েছে। আমরা জরমান জাতির লোকেরা চিন্তায় আর কর্মে যা চাই, আমরা তাই পেয়েছি। ইনি তো মানুষ-হিসাবে উপস্থিত সকলের চেয়ে বড় জরমান, আর জরমান জা'তের ইতিহাসে এঁর জোড়া নেতা বোধ হয় আর কখনও হয় নি। ভাগ্‌নর একজন সাধারণ অধ্যাপক—ইস্কুল-মাষ্টার; কিন্তু হিট্‌লরের ব্যক্তিত্ব দ্বারা যেভাবে এঁর মন নাড়া পেয়েছে, তা দেখে আমি একটু বিস্মিত হ'লুম। ভাগ্‌নর-পত্নীও হিটলরের কার্য্য-কলাপ যে জরমান জা'তের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। এঁরা বিশ্বাসী; আমি তাই সব সময় এঁদের বিশ্বাসের কারণ টেনে বিচার করি নি। তবে মোটামুটি ভাবে এঁদের সঙ্গে আলাপে এইটুকু বুঝলুম যে, হিট্‌লর এসে জরমান জা'তকে তার বহুদিন-পোষিত রক্ষণশীলতার প্রতিষ্ঠায় আবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে বিভ্রান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় জরমান জা'ত একটা দিশা পেয়েছে। লড়াইয়ের পরে পরাজিত জরমানি, বাইরের অপমানে আর ভিতরকার অভাব-অনাটনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ে ছিল। সব চেয়ে জরমানির পক্ষে দরকার ছিল আভ্যন্তরীণ একতা, আর জাতীয় আদর্শ ঠিক ক'রে নিয়ে স্থির অবিচলিত ভাবে আভ্যন্তরীণ সংগঠন। কিন্তু আন্তর্জাতিকতার নামে নানা ভাব-সম্ভার এসে জরমান জাতিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিতে আরম্ভ ক'রলে। এর মধ্যে ইহুদীদেরও হাত ছিল অনেকটা। ইহুদীরা নানা দেশে বাস করে, কিন্তু কোনও দেশকে পুরোপুরি নিজের ক'রে নিতে পারে নি, সর্বত্রই নিজের পৃথক্‌ সত্তা, পৃথক্‌ ঐতিহ্য আর জাতীয়তা-বোধ নিয়ে র'য়েছে। জরমানদের একটা বিশেষ সংস্কৃতি আছে, একটা বিশেষ মনোভাব আছে—একটা জাতীয়তা আছে; ইহুদীরা সে জিনিসকে নিজের ব'লে নিতে পারে না; তাদের মনে এ সকলের উর্ধ্বে ইহুদী সত্তা, ইহুদী আন্তর্জাতিকতা বিদ্যমান। আবার এদিকে ধীরে ধীরে ইহুদীরা জরমানির বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপনা কার্য্য, আর পুস্তক-প্রকাশ, সংবাদপত্র-পরিচালন প্রভৃতি লোকমত-গঠনকারী ব্যবসায় একচেটে ক'রে নিয়েছে; সুতরাং সাহিত্যে আর পত্র-পত্রিকায় তারা আন্তর্জাতিকতারই প্রচার ক'রে আসছে—জরমান জাতীয়তার লাঘবই তাদের হাতে হ'য়েছে। এই সব কারণে আদর্শ-বিপর্য্যয় বা জীর্ণ-

বিভ্রাটে জরমান জাতি দিশাহারা হ'য়ে পড়ে। এমন সময়ে এলেন হিটলর। তিনি বিদেশীদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ালেন—বাইরে পাঁচটা জাতির সভায় জরমানির লুপ্ত মান ফিরে এল। ঘরে তিনি জোর-জবরদস্তি ক'রে ঐক্য আনলেন। ইহুদীদের উপরে দেশবাসীদের নানা কারণে রাগ ছিল। একটা জিনিস সাধারণতঃ অনেক জরমানের চোখে লাগত যে, যদিও বহু ক্ষেত্রে ইহুদীরা জরমানির হ'য়ে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে, যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার ক'রেছে, খ্রীষ্টান জরমানদের মতই বহু কষ্ট স্বীকার ক'রেছে, তবুও সাধারণতঃ ইহুদীরা লড়াইয়ের বাজারে নানা দিক দিয়ে বেশ গুছিয়েই নিয়েছে। ইহুদীরা টাকা পয়সা ক'রছিল এতদিন ধ'রে, তাতে কেউ আপত্তি করে নি; কিন্তু তারা জরমান জা'তের চিত্তের আর রাজনীতিবিষয়ক গতি নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত দেওয়াতেই লোকে চ'টে উঠেছে। হিট্‌লর দেখলেন, এই ইহুদীরা জরমানির লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা একের বেশী নয়, কিন্তু জীবনের নানা বিভাগে ওদের প্রভাব শতকরা ৫০ থেকে ৮০-র কাছাকাছি। ইহুদীদের প্রভাব জাতির discipline বা রীতিনীতি-সংরক্ষণের পক্ষে, জাতির চরিত্র বা চর্য্যা বজায় রাখার পক্ষে হানিকর হ'য়েছে—অতএব ইহুদীদের হটাও; আর তার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটী জরমান হও। এই দুই ধারায় এখন জরমানদের জাতীয় জীবনের গতির প্রবাহকে চালানো হ'য়েছে, তাতে জরমান জাতি এখন আগের চেয়ে আত্মসমাহিত হ'য়েছে, তারা নিজেদের কৌলিক প্রবৃত্তি বা মৌলিক প্রকৃতি অনুসারে নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন গ'ড়ে নিতে পারবে।

ইহুদীদের উপরে বহুস্থলে অত্যন্ত বেশী অত্যাচার করা হ'য়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জরমানির ইহুদীদের উপর দেশবাসীর রাগের কারণ কিছু না কিছু যে আছে তা বোঝা যায়। হিট্‌লরের রাজ্যে জরমানরা আগেকার মত "কোথায় ভেসে চ'ললুম তার ঠিকানা নেই", এভাবে এখন আর চলছে না; তারা সামনে জাতির উন্নতির আদর্শকে রেখে, সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে অগ্রসর হ'চ্ছে। জীবনের সব দিকেই এখন একটা সামাজিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য রেখে এরা চ'লছে। আমি নিজে একটা জিনিস যা ১৩ বছর আগে দেখেছিলুম, এবার জরমানিতে তার অস্তিত্বের অভাব দেখে প্রীত হ'লুম। ১৯২২ সালে বের্লিনে আর অন্য শহরে বইয়ের দোকানে, খবরের কাগজের দোকানে, সর্বত্র উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের ছবির ছড়াছড়ি দেখ্‌তুম—কোনও লজ্জা-সঙ্কোচ না ক'রে এই সব ছবি—ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি—সকলের চোখের সামনে বিক্রীর জন্য খুলে রাখা হ'ত। জরমানিতে তখন স্বাস্থ্যের আর শরীরের উৎকর্ষ-বিধানের দোহাই পেড়ে, চারিদিকে Nudist বা নগ্নতাবাদীদের সমিতি আর ক্লাবের ধূম লেগে গিয়েছে। একটু পল্লীগ্রামে কোনও একটা ঘেরা বাগান নিয়ে এইসব Nudist Club এর মেয়ে পুরুষ সদস্যেরা একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে একত্র বাস ক'রত, চলাফেরা ক'রত। Nudism বা নগ্নতাবাদের প্রচারের জন্য সচিত্র পত্রিকা বা'র হ'ত—তাতে নগ্নদেহ মেয়ে পুরুষের প্রচুর ছবি থাকত। আমি তখন ভাব্‌তুম—তাইতো, জরমানির হ'ল কি? এই নগ্নতাবাদ কতক্ষণ স্বাস্থ্যরক্ষা আর দেহের উৎকর্ষ সাধনের উচ্চ আদর্শের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে? ছেলে মেয়েরা চোখের সামনে এই সব ছবি দেখ্‌ছে, তাদের মনে এর কি প্রভাব প'ড়ছে? নগ্নতাবাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, নগ্ন নারী চিত্রের প্রচার দেশময় বেড়ে যায়, এই সব ছবি আর এগুলিকে বড় ক'রে দেখাবার যন্ত্রপাতির চাহিদাও বেড়ে যায়—জরমানি থেকে আবার বিদেশেও এই সব ছবি রপ্তানী হ'তে থাকে। আমি এই Nudist পত্রিকা দু'চার-খানা তখন প'ড়ে দেখি—সম্পাদকীয় লেখায় বা প্রবন্ধ মুখে বড় বড় কথা প্রচার করা হ'লেও, এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত বহু বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দেখে বুঝতে দেরী হয় না যে এগুলি সামাজিক দুর্নীতি আর অবাধ মেলামেশার সহায়ক মাত্র। জরমানির তরুণদের মনে এই প্রকার সমিতি আর নগ্নতাবাদী পত্রিকা আর ছবির প্রভাব একটা এসেইছে। এবার কিন্তু বের্লিনে পৌঁছে দেখলুম—এ জাতীয় সাহিত্য আর ছবি কোথাও আর নেই, আর Nudism এখন জরমানিতে অজ্ঞাত। আমি অধ্যাপক ভাগ্‌নরকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—ব্যাপারটা কি। ভাগ্‌নর ব'ললেন, "দেখুন, আমরা জরমানরা একটু ঘর-মুখো রুচি-বাগীশ জাতি, Nudism জাতীয় জিনিস আমাদের ধাতে সয় না। ও-সব ছিল ইহুদীদের কারোয়াই। বড় বড় আদর্শের কথা, প্রাচীন গ্রীক্ জীবনে নগ্নতার কথা, দেহের সম্পূর্ণ উন্নতির

জন্য নগ্ন হ'য়ে চলাফেরা করার আবশ্যকতা—এই সব ব'লে, আমাদের সামাজিক জীবনের শ্লীলতার বিরুদ্ধে ওরা চড়াও হয়; তারপরে হ'ল সব Nudist Club; আর ওদের হাতে খবরের কাগজ আর ছাপাখানার সংখ্যা বেশী, নগ্নতার জয়গান ক'রে ছবি ছাপানো আর ছবি ছড়ানো ওদের পক্ষে কঠিন হয় নি। এসব বিক্রী হ'চ্ছিল বেশ, ওরা তো তাই চায়—ছেলেমেয়েরা সহজেই এই সব ভাবের মোহে প'ড়েছিল। আমরা চ'ট্‌ছিলুম—আমাদের জাতীয় জীবনে এতে ক'রে ঘুণ ধ'রছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু উপায় কি? আইন-মোতাবেক কোনও কিছু করবার উপায় ছিল না। কিন্তু হিট্‌লরের আগমনে এসব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে—আমরাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।"

ইংলণ্ডেও ইহুদীদের সম্বন্ধে অনুরূপ অভিযোগ শুনেছি।

হিট্‌লর রাষ্ট্রনেতা হওয়ার পর থেকে, জরমানি-ময় একটা মনোভাব সর্বত্র প্রকট হ'য়েছে দেখা যাচ্ছে—আত্ম-সমাহিত হও, ঘরমুখো হও, জাতির মঙ্গলের জন্য আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত থাকো। হিট্‌লরের মন্ত্র—Du bist nichts, dein Volk ist alles "তুই কিছুই নয়, তোর জা'তই সব"—জরমান তরুণেরা মেনে নিয়েছে। জরমান জাতি তার জাতীয় আত্মাকে খুঁজে বা'র ক'রে পুনরায় জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছে। জরমানির জাতীয় আত্মার স্বরূপ কি? জরমান মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য কি? তার কল্পনা, তার বিচারশক্তি, তার দেহশক্তি কি ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে? অতি প্রাচীনকাল থেকে জরমান ভাষাকে অবলম্বন ক'রে কি প্রকারের ভাবধারা গ'ড়ে উঠেছে? বাইরের জগতের প্রভাব—রোমান সভ্যতা, মধ্যযুগের রোমান খ্রীষ্টানী, রেনেসাঁসের গ্রীক প্রভাব, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাব এবং প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা—এসবে কেমন ক'রে—কতটা ভাল আর কতটা মন্দর দিকে জরমানদের এগিয়ে দিয়েছে? এরা এখন এই সব বিষয় নিয়ে speculation বা আলোচনা ক'রছে। আর একটা কথা আমি ব'লতে বাধ্য—race বা মৌলিক বর্ণ বিষয়ে কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রচার নিজেদের মধ্যে এরা ক'রে তুলছে। জগতে কোনও জাতি অবিমিশ্র নেই। পাঁচটা বিভিন্ন মৌলিক জাতির মিশ্রণ তেমনি জরমানদের মধ্যেও দেখা যায়। বহু জরমান রক্তে স্লাব বা কেল্‌ট্ জাতীয়, আসলে জরমানই নয়। কিন্তু এই সত্য কথাটার দিকে চোখ বুজে, এরা অর্থাৎ এদের শাসকবর্গ আর তাদের অনুগৃহীত একদল পণ্ডিত নিজেদের বোঝাতে চাচ্ছে যে এরা শুদ্ধ Nordic জাতীয়; অর্থাৎ দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কপাল, সরল-নাসিক, নীল-চক্ষু, হিরণ্য-কেশ উত্তর-ইউরোপের অধিবাসী আদি আর্য্য জাতিই হ'চ্ছে সমস্ত জরমানদের পূর্বপুরুষ। অথচ জরমানদের মধ্যে খর্বদেহ হ্রস্ব-কপাল আল্পীয় জাতির লোক প্রচুর আছে; অন্য জাত, এমন কি মোঙ্গোল হূণ জাতিরও আমেজ এদের মধ্যে আছে। আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যেমন এই বিশ্বাস পোষণ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে তাঁরা হ'চ্ছেন আরব, পারস্য ও তুর্কীস্থানের লোকেদের বংশধর। যা হ'ক, জরমান জাতির মধ্যে এখন নোতুন রকমের একটা রক্তের আভিজাত্য বোধ এসে গিয়েছে; এটা অনৈতিহাসিক, এটা অসত্য, আর এ থেকে জরমান জাতি যে শক্তি পাচ্ছে বা পাবার প্রয়াস ক'রছে, তার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়।

এই জরমান বা Nordic আভিজাত্য বোধের একটা সদ্য ফল দেখা যাচ্ছে—ধর্ম-বিষয়েও জরমানেরা আবার পূরো স্বদেশী বা Nordic হ'তে চাচ্ছে; খ্রীষ্টান ধর্ম, যীশুর আদর্শ জরমানদের মত রাজ-প্রকৃতির জাতির পক্ষে উপযোগী নয়, একথা জরমান দার্শনিক Nietzsche (নীচে) খুব জোরের সঙ্গে শুনিয়ে এসেছেন। এখন জরমানদের অনেকের মধ্যে এই ধারণা এসেছে—ইহুদী জাতীয় ধর্মনেতা যীশুর ধর্ম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ জাতির মানুষ জরমানরা নিয়ে ভাল ক'রে নি—নিজেদের পুরাণ আর দেবতাবাদ, নিজেদের নৈতিক আদর্শ আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা বিচার—প্রাচীন জরমানদের যা ছিল তা ছেড়ে দিয়ে—ইহুদীদের পুরাণ হিব্রু বাইবেলের গল্প, যীশুর জীবনচরিত আর মধ্যযুগের ইটালীয় জগতে উদ্ভূত খ্রীষ্টান দেবতাবাদ, ইহুদী-গ্রীক-ইটালীয় মিশ্র নৈতিক আদর্শ—আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি—এসব নিয়ে জরমানরা ভুল ক'রেছে। তাই এখন জরমানদের মধ্যে খুব জোরের সঙ্গে একটা খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিরোধী আন্দোলন চ'লেছে। অধ্যাপক ভাগ্‌নরের সঙ্গে কথা ক'য়ে আর তাঁর সৌজন্যে লব্ধ দু চারখানা বই আর প্রবন্ধ দেখে এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা গেল।

উৎসর্গ

দিলীপকুমার

৺সঙ্গীত-সন্ন্যাসী গীতবন্ধু
পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ
ভাতখণ্ডে—

তোমার সাথে গীতবন্ধু, কদিনের বা পরিচয় ?—
তবু আজও তোমার সৌম্য কান্তিখানি মনে হয় :
মনে পড়ে—হাসি তোমার,
গঙ্গা-উদার রঙ্গ-বিথার ;
মনে পড়ে—তোমার অপার
গানের আলাপ জল্পনা :
সূক্ষ্ম পেলব রাগবিচার, ভাব-রস-রূপ-ব্যঞ্জনা।

চির-জীবন নিজের কথা বলতে ছিলে কুণ্ঠিত ;
হে অক্লান্তকর্ম্মী, তুমি রাখতে নিত্য গুণ্ঠিত
কীর্ত্তি তোমার কতই ছলে !—
ফিরিয়ে দিতে—তোমার গলে
দিত যবে ভক্তদলে
শ্রদ্ধা-পূত মালিকা :
প্রীতি তোমার ছিল শুদ্ধ গানের পরিচারিকা।

বাল্য হ'তে ছিলে তুমি কেমন গানের পাগল-যে—
কয়জনা বা জানে ? কত রুদ্ধ-পুরীর আগল-যে
খুলল তোমার আবাহনে
সর্ব্বহারা আরাধনে—
ক'জনা কল্পনা করে ?
ক'জন জানে তোমার সুর-
নিষ্ঠা ত্যাগের তপে তাপস, নামল কত রাগ মধুর ?

হারিয়েছিল ভারত-যে তার বিশাল গমক-কল্লোলে,
তাই মন তার দুলত চপল ক্ষণদ্যুতি সুর দোলে।
গহন রাগের গোপন গাথা
তার আনন্দ, অতল ব্যথা—
ছিল বুঝি কথার কথা :
তুমিই জীবন-সাধনে
আনলে হারাধনে আবার ফিরিয়ে নিয়ম-বাঁধনে।

রাগরাগিণী কানে কানে প্রাণের কথা তোমারে
বলত তাদের—অশ্রু-পুলক-অন্তরঙ্গ বিহারে :
কোথায় তাদের কোমল আশা,
স্বপ্ন কোথায়, কোথায় ভাষা,
কোন্ ছন্দের অভিসারে
ধায় তারা কোন্ সাগরে :
কোন্ বাঁশিতে রং-যমুনা ঢেউ তোলে প্রেম-জাগরে।

ভাবঘন নিষ্ঠাঘন ধেয়ানঘন হে গুণী,
মিথ্যা-মাতন হুহুঙ্কারী অ-সুরলোকেও ফাল্গুনী
ছিলে তুমি চিরজীবন—
গানই করি অশন বসন ;
সুখ-বিরাগী হে বৈরাগী,
মনটি তোমার রচিল
কোন্ মিড়ে কোন্ মায়াময়ী—যার ডাকে দেশ মজিল।

মূর্ছনা-বোধনে তোমার ! বাসলে ভালো সঙ্গীতে,
তাই তোমারে বীণাপাণি দিলেন বীণা ঝঙ্কতে :
দীক্ষা দিতে সুর সাধকে,
জ্বালতে ধূলির মর্ত্ত্যলোকে
অন্তরালের ইন্দ্রজালে
অলোক-আলো অনির্বাণ :
প্রণাম 'দীপক'-দুলাল ! সুরের সন্ন্যাসী হে বিবস্বান্ !

৺বিজয়াদশমী
১৩৪৩

ভক্তি-নত
দিলীপ

* নিশিকান্ত ও দিলীপকুমারের (যন্ত্রস্থ) "গীতশ্রী" গান-স্বরলিপির।

পুদনগর, পুণ্ড্রনগর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও পাণ্ডুনগর এবং পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো

শ্রীহরিদাস পালিত

'পুণ্ড্রনগর' সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সবিশেষ মতভেদ বিদ্যমান ছিল। কেহ বলিতেন মালদহের পাণ্ডুয়াই (বড় পেঁড়ো) প্রাচীন পুণ্ড্রনগর; এই মতটিকে খণ্ডন করিয়া চীন পরিব্রাজকের হিসাব ধরিয়া কেহ প্রমাণ করিলেন—মহাস্থানগড়ই পুণ্ড্রনগর বা পৌণ্ড্রনগর—এই সিদ্ধান্তই এখন চলিতেছে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর পৌণ্ড্রনগর গঙ্গাতীরে ছিল। মহাস্থানগড় গংগাতীরে নয়।

মহাস্থান খনন ব্যপদেশে একখণ্ড শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে—উক্ত টুকরাতে বংভী অক্ষরে কিছু লেখা আছে; শ্রীযুক্ত ডি আর ভাণ্ডারকর উক্ত পটের নাম দিয়াছেন—'মহাস্থানের মৌর্যব্রাহ্মী-লেখমালা'*—উহাতে যাহা লেখা আছে তাহাতে বুঝায় যে মহাস্থানগড়ের তথাকালের নাম ছিল—'পুদনগর'। মৌর্যদের সময়েই হউক বা কিছু পূর্ব্বে বা পরেই হউক, মহাস্থানগড়ের নাম তখন ছিল—পুদনগর। তখন 'মহাস্থান' নাম ছিল না।

কুলজিগ্রন্থের আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তিই হউন বা নাই হউন, তাঁহার সময় নির্দ্দেশও করা হইয়াছে। পুদনগর নাম খোদিত পাথরের টুকরাটি যে আদিশূরের অনেক পূর্ব্বের ইহা অস্বীকার করা যায় না।

পুণ্ড্রনগর নাম অনেক প্রাচীন মহাভারতের হরিবংশে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব রাজার উপাখ্যান আছে। যে সময়ে মহাস্থান—পুদনগর নামে পরিচিত ছিল সেকাল খুব সম্ভব অশোকের পরের, শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকারের মতে মৌর্য কালের। সুতরাং কুষাণদের আগেকার সময়ের কাজেই মগধে মৌর্য অবসান কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৮৪ বৎসরের মধ্যের। যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রভাবিত কুষাণকালেরই হয়, তাহা হইলে—গুপ্তদের পূর্ব্বের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের ভিতরের। মোট কথা 'পুদনগর' বলিলে যে স্থানটিকে বুঝাইত উহা খ্রীষ্ট অব্দের তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেও উক্ত নামে প্রখ্যাত ছিল (?)।

কান্যকুব্জ বা কনৌজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময় চৈনিক পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। হর্ষের মৃত্যু হয় খ্রীঃ ৬৪৮ অব্দে। হর্ষের সময়ে তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গিয়াছিলেন। মালদহের পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রনগর তখন হীনপ্রভ হইয়াছিল ইহা অনুমান করা চলে। কণৌজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের সময়ে মহাস্থানের নাম পুদনগর বদলাইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম পাইয়াছিল কিনা ইহার বিশেষ প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। কাশ্মীরী কহ্লনের ঐতিহাসিক উপাখ্যান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ স্বীকার করিতে হয়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল গংগার তীরে।

হর্ষবর্দ্ধন কাশ্মীর হইতে অসমসীমান্তদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াছিলেন, ইতিহাসে দেখা যায়। পূর্ব্ব সীমান্ত দেশে করতোয়া তীরে তিনি একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সেই দুর্গপ্রতিষ্ঠিত স্থানের নাম—গড় বা দুর্গই ছিল, পরে বৌদ্ধ-হিন্দুতীর্থ বলিয়া মহাস্থান নাম পাইয়া থাকিবে। ইহা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গতই ছিল।

প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন সেই সময়ে হীনপ্রভ হইয়াছিল। জয়ন্তই হউন বা আর কেহই হউন, তথায় হয়ত রাজা ছিলেন। খুব বড় রাজা ছিলেন বলিয়া বোধ হয়না হর্ষের অনুগতই ছিলেন। শ্রীহর্ষের সীমান্ত শাসন কেন্দ্র পুণ্ড্রনগরে ছিলনা, ছিল যে নামেই হউক 'মহাস্থানগড়ে।' চৈনিক ভ্রমণকারী হর্ষের সাহায্যে—মহাস্থানগড়ে, তাঁহার সীমান্ত শাসন কেন্দ্রে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মালদহের বর্ত্তমান পাণ্ডুনগরে প্রবেশ করেন নাই, বোধহয় তথায় বৌদ্ধপ্রভাব বড় একটা তখন ছিলনা। হিন্দুপ্রভাবই সমধিক ছিল। পুণ্ড্রনগরের সুনাম খুবই ছিল, এই হেতু তিনি শিলাদিত্যের—পুদনগর দুর্গ শোভিত নগরকেই অর্থাৎ পুদনগরকেই—পুণ্ড্রনগর মনে করিয়া থাকিবেন, অথবা পুদনগরকেই পুণ্ড্রনগর (পুদফতেন্না ?) ভাবিয়াছেন কিম্বা 'পুদনগর' নামটিকে পুদফতেন্না বা ঐ রকমে বানান করিয়াছিলেন কিনা কে বলিবে। হিউএনথসংগ 'পুদনগর'কেই যে বানান করিয়াছিলেন—তাহাই পুণ্ড্রনগর আন্দাজি পাঠধৃত হওয়া বিচিত্র নয়। চৈনিক ভ্রমণকারী প্রকৃত গংগাতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান মালদহের পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেখেন নাই—দেখিয়াছিলেন হর্ষের দুর্গ-শোভিত—পুদনগর। ভগ্ন পাষাণলিপির অংশে পুদনগরই আছে। পোদনগর—পুঁড়ানগর বা পুষ্পনগর—চীনে উচ্চারণে পুণ্ড্রনগর বলিয়া ধারণা হইয়া থাকিবে। গংগাতীরের পুণ্ড্রনগর বা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন নগর, পুদনগর নয়। এখন যদি পুদনগরকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে—পুদনগরকেই গংগাতীরের পৌণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রনগর স্বীকার না করিয়া উপায় কি?

কবি কহ্লন কাব্যিক ভাষায় সিংহবধের উপাখ্যান ও কার্ত্তিকের মন্দিরের দেব-নর্ত্তকীর উপাখ্যানের মধ্যদিয়া, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্তের কন্যার সহিত কাশ্মীররাজ কহ্লটের বিবাহ দিয়াছেন। তারপরে—শ্বশুর জয়ন্তের জন্যই হয়ত কনৌজরাজ শ্রীহর্ষকে পরাজিত করিয়া—শ্বশুরকে গৌড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্বাধীন রাজা করিয়া দেয়। কাজেই মনে হয়, জয়ন্ত একজন ক্ষুদ্র রাজাই ছিলেন। শ্রীহর্ষের প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী উৎসবে, প্রাগজ্যোতীষ রাজার শুভাগমন হইয়াছিল, তখন পৌণ্ড্ররাজার নিমন্ত্রণের খবর চৈনিক পর্য্যটক দেন নাই। কাজেই হিউএনথসংগ—পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের প্রকৃত রাজাকে অবগতই হন নাই। যদি পরিচয় পাইতেন, তাহা হইলে পুদনগরে যাইবার পথে গংগাতীরের পুণ্ড্রনগর দেখিয়া যাইতেন। তিনি জল পথেই গিয়া থাকিবেন; যদি তাহাই হয় তবে

* Es, xxi, pt ii, 83ff.

পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা বর্ত্তমান পাণ্ডুনগর, মুসলমান আমলে পাণ্ডুয়ার (পৌঁড়া) নিকট দিয়াই গিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষ কাশ্মীর রাজার নিকট পরাজিত হন নাই বা পুদনগর হস্তচ্যুতও হয় নাই। সুতরাং খ্রীঃ ৬৪৮ অব্দের কিছু আগে—জয়ন্ত পঞ্চগৌড়েশ্বর জামাতার কৃপায় হন নাই। চৈনিক ভ্রমণকারী খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের মধ্যেই—হর্ষের উৎসব এবং পুদনগর দেখিয়াছিলেন। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাশ্মীররাজ ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের বৎসর কয়েক আগে শ্রীহর্ষকে পরাজিত করিয়া থাকিবেন। তখন চৈনিক পণ্ডিত এ দেশে ছিলেন না। থাকিলে সে কথা লিখিয়া যাইতেন। আর যদিই বা জামাতা কহ্লটের বাহুবলে পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি পাইয়া থাকেন, ইহাতে আদিশূর খেতাব পাইবার বিশেষ হেতুও নাই। গৌড়ে ব্রাহ্মণ লেখক—আদিনা রাজসভায় পঞ্চব্রাহ্মণগণের আগমন কথা বলিয়াছেন, সংস্কৃত শ্লোকও দিয়াছেন। শ্লোক কোথা হইতে তুলিয়াছেন, সে সব কিছুই উল্লেখ করেন নাই। 'আদিনায়ামুপস্থিতে'—হইতে আদিনা নামক সভা এবং আদিনা সভার মালিক আদিশূর হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অমূল-মূলের মতই ব্যাপার।

রাঢ়ের শূরভূমের নাম এখন পাওয়া যায়। কোলাঞ্চল হইতে দ্বিজ-পঞ্চক রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন, আদি গাঞি' প্রায় সবই রাঢীয়। সেকালে রাঢ়-বংশ সবই গৌড়মণ্ডল নামে খ্যাত ছিল। শূরভূমি—শূররাজগণের নামে হয়নাই ত? জয়ন্তকে আদিশূর করিয়া একটা ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

'শূর'—উপাধিক কায়স্থ, অদ্যাপি মৌলিক-কায়স্থ সামাজিক মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেনেদের পূর্ব্বে হরিবর্ম্মদেবের সময়ে—ঘোষ, বসু ইত্যাদি উপাধির লোক ছিলেন তাঁহাদের জাতিতত্ত্ব লইয়া কেহ কেহ একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। অশোকের সময় হইতে চন্দ্রগুপ্তাদির কালেও 'পালিত' উপাধির প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং রাজাত্মীয়দের নাম পাওয়া যায়। কান্যকুব্জও যেমন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাবিত জনস্থল ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড়-রাঢ়-বংগও তদ্রূপই ছিল। এ দেশেও ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ এবং জৈন অধিবাসী ছিল। বিবিধ রাজনৈতিক ব্যাপারে পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেকেই পূর্ব্বদেশে আসিয়া বাস করিত; কাশ্মীরী আদিত্য উপাধির লোকও বংগে রহিয়াছেন। পৌণ্ড্ররাজ জয়ন্তের পূর্ব্বেও এ দেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস ছিল; পাল, সেন উপাধিক পরিবার এখন বাংলায় বাস করিতেছেন। সেন রাজবংশ, কর্ণাটীয় ক্ষত্রিয়। কুলপঞ্জিকায় পাওয়া যায়—যদিও বহুপরবর্ত্তীকালে রচিত—শূরবংশীয়দের সহিত সেন রাজাদের বৈবাহিক সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'শূরভূম' নাম যাঁহার সময় হয়, তিনি 'শূর' উপাধিক—ক্ষত্রিয় সামাজিকই ছিলেন। আদিশূর শূরভূমের কেহ হইবেন। *

* রাঢ়দেশও গৌড়নামে খ্যাত ছিল। সম্ভব কুলপঞ্জিকার গৌড় এই শূরভূম। পালেদের সময়ের গৌড়নগর বর্ত্তমান সামসী রেল ষ্টেশনের নিকট—গৌড়হণ্ডে ছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মালদহী পাণ্ডুয়ার একটী সুপ্রাচীন সাঁকোর অভ্যন্তরে গুপ্তদের গজসিংহ মূর্ত্তিখোদিত আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—কুল বা কৌলিন্য প্রবর্ত্তক, গৌড়েশ্বর শূর এবং সেনগণ কেহই কৌলিন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। ইহাতেই ধারণা হয়, কুলীন মৌলিকাদি সামাজিক প্রথার প্রবর্ত্তন তাঁহারা করেন নাই, অথবা কোন গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। দেখা যায় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার—মালাধর বসুর বংশে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দত্ত-কুলে দেওয়া হইয়াছিল। কৌলিন্য মর্য্যাদার উপর তথাকথিত সম্ভ্রান্ত বংশে বিশেষ আগ্রহই ছিল না।

দ্বিতীয় ঐতিহাসিক রহস্য এই যে—গৌড়েশ্বর বল্লালসেন নাকি ব্রাহ্মণও কায়স্থের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা পরমশৈব হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তকদের মধ্যে একজন হিন্দুরাজা বলিয়া খ্যাত আছেন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-প্রভাব দূরীকরণার্থে উক্তরাজার সাহায্যে অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তথাকথিত ব্যাপারের মধ্যে, সত্যাংশ কত ইহা পূর্ণরূপে বলা যায় না। বল্লালসেন শৈব-ধর্ম্মী ছিলেন, ইহা তাঁহার প্রদত্ত তাম্রপটে, যে শাসনখানি সীতাহাটী প্রশস্তি" নামে পরিচিত, উহাতেই প্রথমে খোদিত রহিয়াছে— ওঁ নমো শিবায়"। এই লেখমালার দ্বিতীয় ছত্রে— সাতু বোধিশত্তবঃ" সুস্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে। 'নির্মর্য্যাদ'—শব্দের পরেই উদ্ধৃত পাঠ পাওয়া যায়। 'বোধিসত্ত্ব' অর্থে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ বুঝায়। তাম্রপটের বানানটি অন্য প্রকার হইলেও বোধিসত্ত্বই বিজ্ঞাপক বটে। যদি 'বোধিশত্তবঃ' বুদ্ধকেই বুঝায়, তাহা হইলে তথাকালে বল্লালসেন বুদ্ধপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন বলিতে হয়। আধা বৌদ্ধ আধা হিন্দু পাল রাজাদের মধ্যে, পুরাণ শ্রবণের দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণকে বুদ্ধপ্রীত্যর্থে ভূমিদান যেমন চলিত বল্লালীপটে তদ্রূপই হইয়া থাকিবে! ধর্ম্মপালের সময়েও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে (খালিমপুর শাসন) তখন সেটি 'পুদনগর' সীমা বুঝায় নাই।

তবে বল্লালসেনকে কৌলিন্য প্রবর্ত্তক হিন্দুরাজারূপে ব্রাহ্মণেরা পান নাই। তিনি বৈদিক ও বৌদ্ধদের সমান প্রিয়ই ছিলেন। সমাজ বাঁধিয়াছিলেন—সেটি হিন্দুসমাজ, যিনি বুদ্ধভক্ত তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। কুলপঞ্জীতে তাঁর বুদ্ধভক্তির নাম গন্ধ নাই। থাকিবার কথাও না—কেননা বল্লাল ও লক্ষ্মণের অনেক পরে—হয়ত বা ১৬শ খ্রীষ্টাব্দের পরেও অনেক কুলপঞ্জিকা রচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমনের আদ্য উপাখ্যান, ঘটকদের একেবারে পরিকল্পিত 'সুবিধাবাদ' লইয়াই রচিত হইয়া থাকিবে। আদিশূরের প্রকৃত নাম না জানায়—কেবল 'আদিশূর' পরিচয়টি লিখিত হইয়াছে। কুলপ্রবর্ত্তক আদিরাজার নামও উক্ত হয় নাই। আর তিনি যে মহাবীর ছিলেন, তাহা জয়াপীড়ের সিংহবধ উপাখ্যানেই কবিকহ্লন পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কনোজরাজ শ্রীহর্ষদেব এবং চৈনিক ভ্রমণকারীর সময় সকলেই অবগত আছেন; সেকালের একজন সামান্য রাজাকে পাকড়াও করিয়া কুলপঞ্জিকার গোড়াপত্তনে যে ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, সে সবই কুলপঞ্জিকায় আছে।

জয়ন্তশূর—যদিও পুণ্ড্রনগরের রাজা থাকা সম্ভব হয়—তখন

গৌড়েশ্বর ছিলেন না। পঞ্চগৌড়েশ্বর ইহাও একটি অসম্ভব ব্যাপার। এসব উক্তি-পরিকল্পিত, পঞ্চ-গৌড় বিভিন্ন জনপদ—এত বড় রাজা আদিশূর ছিলেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ এখন পাওয়া যায় নাই। তাঁহার নামের কোন তাম্র বা শিলা উৎকীর্ণ কিছুই মিলে নাই।

বর্ত্তমান মালদহী পাণ্ডুয়া (বড় পেঁড়ো) নগরের একটি প্রস্তর সেতুর অভ্যন্তরে গুপ্তদের কালের 'গজসিংহ' চিহ্ন বিদ্যমান আছে, সেটি কুতুব মসজেদের উত্তরে আদিনায় যাইবার মধ্যে পড়ে। সে সেতু গুপ্তদের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। আদিনা রাজসভা (আদিনাথ দেবালয়) যে হিন্দুদের, বিশেষ বিষ্ণুভক্তদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রধান প্রবেশ দ্বারের (রয়েল এন্‌ট্রেন্স) উপরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি থাকার বিকৃত চিহ্ন এখন বিদ্যমান! প্রত্যেক দ্বারদেশের 'কপালী'তে গণেশমূর্ত্তি এখন অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। কষ্টিপাথরের যে সিংহাসন এখন বিদ্যমান উহা হিন্দুদের আমলের, উহাতে নরমূর্ত্তি বিশেষ বিদ্যমান। এই সিংহাসনের পশ্চাৎ দেয়ালের ঠিক উপরে (উচ্চে) যে শিবলিঙ্গ ভিত্তি-গাত্রে গাঁথা আছে, সম্ভবতঃ উহাই 'আদিনাথ-শিবলিঙ্গ'। একাধিক স্থানে চুণবালীর অন্তরে ঢাকা—দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। কর্জনী আমলের পূর্ব্বে একাধিক মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম অন্তর উন্মুক্ত করিয়া। ইহাতে বৌদ্ধদের হাতের চিহ্নও আছে। ছাদের জল বাহিবার মকর মুখটি পোর্ট সাহেব যখন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন হেডক্লার্ক হীরালাল হাটী মহাশয় আনিয়াছিলেন। সেটি এখন কলিকাতা যাদুঘরে রহিয়াছে। উক্ত হাটী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি সেই সময়ের একটি মকরবাহিনী গঙ্গামূর্ত্তি লণ্ডনের যাদুঘরে পাঠান হইয়াছিল। উঠানের জল বাহির হইবার একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের মকরমুখ এখন যথাস্থানেই রহিয়াছে। সুতরাং আদিনাথ দেবশোভিত সভাগৃহ যে হিন্দু আমলের ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সেই আদিনাথ মন্দিরটিই মসজেদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মন্দিরের বয়স গুপ্ত আমলের বলিয়াই ধারণা হয়। সুতরাং উহা খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম অব্দের নির্ম্মিত। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামেই প্রখ্যাত ছিল। পরে পুণ্ড্রনগর পাণ্ডুনগর, শেষে পাণ্ডুয়া ও পেঁড়ো নাম পাইয়াছে। শ্রীহর্ষের 'পুদনগর' গড় প্রতিষ্ঠার আগেকার এই পুণ্ড্রনগর (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) বৰ্দ্ধন রাজাদের নামও হয়ত ইহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকিবে। পুণ্ড্রনগর নামাঙ্কিত রজতমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। উহা চণ্ডীচরণ পরায়ণ পরবর্ত্তী রাজার। পুদনগর শ্রীহর্ষের সময়ের 'গড়নগরী,' পুণ্ড্রনগর অনেক পূর্ব্বের। চৈনিক পর্য্যটক দেখিয়া ছিলেন—'পুদনগর'। পুণ্ড্রনগর দেখেন নাই। পুদনগরই তাঁহার লেখায় পঠিত হইয়াছে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বর্ত্তমান মালদহ পাণ্ডুয়া, একসময়ে বড় গঙ্গার নিকটেই ছিল প্রমাণ আছে।

অব্যক্ত

শ্রীঅজিতকুমার সেন এম্‌-এ

জানি আমি যত কথা চেয়েছিনু বলিতে প্রকাশি—
সাধ তার থেমে গেছে অন্তরের দ্বারপ্রান্তে আসি—
পঙ্গুর প্রয়াস সম ; শুধু ক্ষুব্ধ মূক বেদনাতে—
চাহিয়াছি শূন্য পানে দিশা-হারা দীন নেত্রপাতে।
জানি বন্ধু গেছ সবে সকৌতুকে ফিরায়ে আনন
অকৃতীজনের হেরি যত কিছু রিক্ত আয়োজন!
ছন্দে সুরে গানে প্রাণে উচ্ছ্বসিত মুখর ধরায়—
আমারে মেলেনি কথা!—আমারি যে দিন চলে যায়—
ভাষাহীন সুর সাধি,—অশরীরী মানসীর ধ্যানে—
—তৃষাবারি ভ্রমে শুধু দূর মৃগ-তৃষ্ণিকা-সন্ধানে!
নীরবে নয়ন হানি' করে গেছে কে কবে উন্মনা—
বুকে মোর কেঁদে ফিরে আজো তার নিবিড় মূর্চ্ছনা!
—আভাস ইঙ্গিত তারি—তারি ক্ষীণ ম্লান স্মৃতিখানি—
হৃদয় জাগায়ে তোলে—প্রকাশের নাহি শুধু বাণী!

প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

শ্রীললিতমোহন হাজরা

ভারতবর্ষের অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে এই দেশেই গণতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। পৃথিবী যখন বর্ব্বরতায় পরিপূর্ণ ছিল তখন ভারতবর্ষই সভ্যতার বর্ত্তিকা হস্তে সমস্ত বর্ব্বর জাতিগুলিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই যুগের একটী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইতিহাস বর্ণনা করিব। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে "বাজ্জী" নামে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এবং তাহার রাজধানী ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরী।

বৈশালী নগরী ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জেনারেল্ কানিংহাম স্থির করিয়াছেন বিহার প্রদেশের মজঃফরপুর জেলার তিরহুতের নিকটবর্ত্তী বাসার গ্রাম যেস্থানে অবস্থিত সেই স্থানে লিচ্ছবিদিগের(১) রাজধানী বৈশালী নগরী অবস্থিত ছিল। অন্য একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে ছাপরা জেলার চেরান্দ গ্রামে বৈশালী নগরী অবস্থিত ছিল। যাহা হউক জেনারেল্ কানিংহামের মত সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ব্লোচ্ (Dr. Bloch) বাসার গ্রামে খননকার্য্য করিয়া বৈশালী নগরীর অস্তিত্বের প্রমাণ করিয়াছেন। ডাঃ ব্লোচ্ বাসার গ্রামের একটী মৃত্তিকাস্তূপ খনন করিয়া "রাজা বিশাল কা গড়" এবং যৎসামান্য বহুমূল্য দ্রব্য উদ্ধার করিয়াছেন।

বৈশালীর অর্থ বৃহৎ নগরী। এই নগরীতে ৭৭২৭টী সাততলা এবং ৭৭২৭টী একতলা সৌধ ছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের বৃহৎ নগরী বলিয়া ইহা বৈশালী নামে অভিহিত হইত। রামায়ণের মহাকবি বাল্মীকির মতে বাজ্জী রাষ্ট্র পূর্ব্বে বিদেহ নামে কথিত ছিল এবং সূর্য্যবংশের নৃপতি ইক্ষাকুর বিশাল নামে এক পুত্র এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই ইহার নাম বৈশালী হইয়াছে। পুরাণে লিখিত আছে যে ইক্ষাকুবংশে ত্রাণবিন্দু নামে একজন নৃপতি ছিলেন। তাঁহার অন্যতমা মহিষী আলমোষার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুত্রই এই মহানগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র মুনির সহিত গঙ্গানদী অতিক্রম করিবার প্রাক্কালে এই মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই নগরী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী এবং তথাগত মহাপুরুষ ও বর্দ্ধমান মহাবীরের স্মৃতি বক্ষে লইয়া ধন্য হইয়াছে। খৃষ্টের জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর এই বৈশালী নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর এখানে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথাগত মহাপুরুষের পদধূলি পাইয়া এই নগরী ধন্যা হইয়াছে। বুদ্ধদেব বৈশালীর লিচ্ছবিদিগের ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বৃদ্ধ বয়সে পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর অভয় নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার মাতা বৈশালীর কন্যা ছিলেন। তখনকার দিনে লিচ্ছবিগণ অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। অজাতশত্রু চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে যদি লিচ্ছবিগণ অভয়ের পক্ষ লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহা হইলে তিনি বেশীদিন সিংহাসন ভোগ করিতে পারিবেন না। সেইজন্য তিনি লিচ্ছবিদিগকে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বস্সকারকে বুদ্ধদেবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে পাঠাইলেন। বুদ্ধদেব বস্সকারকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত লিচ্ছবিগণ তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করিবে ততদিন তাহারা অজেয়, যদি তাহাদের মধ্য হইতে ঐক্যভাব বিদূরিত হয় তাহা হইলেই তাহারা পরাজিত হইবে।" বৈশালীতে বৌদ্ধগণের দ্বিতীয় "সঙ্গীতি" আহূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব যতবার এই স্থানে পদার্পণ করিয়া-

(১) বৈশালীতে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদিগকে লিচ্ছবি বলা হইত।

ছিলেন ততবারই লিচ্ছবি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ণ সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

এই বিশাল নগরী তিনটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রত্যেকটী অপরটী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত এবং যাতায়াতের অনেকগুলি ফটক ছিল। প্রাচীরের গাত্রে সামান্য ব্যবধানের মধ্যে অনেকগুলি দুর্গ ছিল এবং ঐগুলি সদাসর্ব্বদা সশস্ত্র লিচ্ছবি সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিত। নগরীর শেষ প্রান্তরে মহাবন নামে একটি অরণ্য বিদ্যমান ছিল এবং ঐ মহাবন হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে নগরের উত্তর প্রান্তে একটী সুন্দর উদ্যান ছিল এবং এই উদ্যানের একটী বিহারে বুদ্ধদেব প্রায়ই আসিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েঙ্-সান্ এই নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন; নগরী সম্বন্ধে ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে তিনি এমন সুন্দর নগরী ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে দেখিতে পান নাই। নগরীর চতুর্দ্দিকে আম্র, পেয়ারা, কদলী এবং নানাবিধ সুমিষ্ট ফলের উদ্যান ছিল। তাঁহার মতে নগরবাসীগণ সাধু-প্রকৃতি সম্পন্ন, সৎকার্য্যে অনুরক্ত ও গুণগ্রাহী ছিলেন।

প্রত্যেক লিচ্ছবির প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ ছিল। তাঁহাদের সাজসজ্জার প্রত্যেক দ্রব্যটী স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত করা হইত। তাঁহারা যে ছত্র ব্যবহার করিতেন তাহাতে স্বর্ণের কারুকার্য্য থাকিত এবং হাতীর হাওদাগুলিও স্বর্ণদ্বারা খচিত। শিবিকা এবং রথে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ব্যবহার করিতেন। এমন কি নগরীর অট্টালিকাগুলির চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণ-খচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তথাগত মহাপুরুষ লিচ্ছবিদিগের উদারহৃদয় এবং দরদ-মাখানো ব্যবহারে সবিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিদিগের ব্যবহার সত্যই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। একজনের বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কেহ পীড়াগ্রস্ত হইলে তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য সকলেই তাহার নিকট আসিতেন। সমস্ত প্রকার সামাজিক ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। কোন বৈদেশিক বৈশালী নগরে আগমন করিলে নগরবাসীগণ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। এই ঐক্যভাব এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্য লিচ্ছবিগণ তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

নগরবাসীগণ সকলেই উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। যুদ্ধে যেমন তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রবল ছিল। ধর্ম্মই তাঁহাদের প্রাণ—প্রাণ কেন—আত্মা অপেক্ষা প্রিয়। লিচ্ছবিগণ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। এই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে লিচ্ছবিদিগের দেশ "বাজ্জী" বিদেহ নামে পরিচিত ছিল এবং রামায়ণ প্রসিদ্ধ জনকরাজা তথায় প্রতিপত্তি খাটাইয়াছিলেন। এই স্থানে যাজ্ঞবল্ক মুনি যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। পরে অনেক লিচ্ছবিই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অম্বাপালি, ভাদ্দিয়া, সিহা, নন্দক প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লিচ্ছবিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে লিচ্ছবিগণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি বিরাট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

লিচ্ছবিগণের নৈতিক চরিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। অন্যায় কর্ম্ম করিলে কৃতকর্ম্মের জন্য শাস্তি শির পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। নারীহরণ এবং নারীর সম্মানের অমর্য্যাদা করার তুল্য জঘন্য পাপ পৃথিবীতে নাই বলিয়া জানিতেন। সেই জন্য রাষ্ট্রে কদাচিত এই বীভৎস কাণ্ড দৃষ্ট হইত। শিক্ষার প্রতি তাহাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ—বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ কলায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য তৎকালীন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশীলায় গমন করিতেন। দর্জ্জি, স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পীগণ দেশের চারুশিল্প এবং কারুশিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। স্থাপত্য-শিল্পও উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল। প্রত্যেকেই আপন আপন অট্টালিকায় নানাবিধ কারুকার্য্য করিতেন। দেবদেবীর জন্য বেদিকা নির্ম্মাণ, মহাপুরুষদিগের স্মৃতি রক্ষার্থে স্তূপ নির্ম্মাণ এবং মঠ, বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। বিবাহ প্রথা অদ্ভুত রকমের ছিল। বৈশালী নগরীকে কতকগুলি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হইত এবং তিনটী ওয়ার্ড লইয়া একটি জেলা হইত। প্রথম ওয়ার্ডে যদি কোন কন্যা জন্মগ্রহণ করিত তাহাকে প্রথম

ওয়ার্ডেরই কোন পুরুষের পাণিগ্রহণ করিতে হইত। দ্বিতীয় ওয়ার্ডের যুবকযুবতীদিগকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ওয়ার্ডে বিবাহ কার্য্য সমাধা করিতে হইত। তৃতীয় ওয়ার্ডের যুবক যুবতীরা তিন ওয়ার্ডেই বিবাহ করিতে পারিত। নাগরিকগণের বিবাহ নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন নারী বিবাহ প্রথা ভঙ্গ করিলে উপযুক্ত শাস্তি পাইতেন। এমন কি স্বামী স্ত্রীর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। নারীর সতীত্ব নাশ করিলে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত। লিচ্ছবীগণ নারীর সতীত্ব রক্ষার্থ আত্মত্যাগ করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। গৃহের নানা প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান-কালীন পুরনারীগণ নৃত্য গীতাদি দ্বারা উৎসব মুখরিত করিতেন। নৃত্য তৎকালীন সমাজের সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ ছিল। সুতরাং প্রত্যেক নারীকেই নৃত্য-গীত শিক্ষা করিতে হইত। তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে কোন অতিথি গৃহে আগমন করিলে গৃহস্থ যুবতীগণ সঙ্গীত এবং নৃত্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে বসাইত। মৃতদেহের প্রভৃতি তাঁহারা অদ্ভুত আচরণ করিতেন। মৃতদেহ কখন কখন দাহ করা হইত এবং কখন কখন বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখা হইত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ভেষজ দ্বারা সযত্নে মৃতদেহ রক্ষিত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাজ্জী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এইবার এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি কেমন ছিল তাহা বর্ণনা করিব। প্রত্যেক লিচ্ছবিই আপনাকে রাজা নামে অভিহিত করিবেন। ইহার কারণ রাষ্ট্রে কোন একাধিপত্যের প্রচলন না থাকায় রাষ্ট্রের সমস্ত শাসন কার্য্যই তাঁহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। সেইজন্য সকলেই আপনাকে রাজা নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে "সঙ্ঘ" (Corporation) গঠন করিতেন। এই সঙ্ঘের প্রতি ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যভাব এত সুদৃঢ় ছিল যে কোন সঙ্ঘই কাহাকেও সহসা পরাজিত করিতে পারিত না। লিচ্ছবিদিগের এত বেশী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা ছিল যে যাহা বর্ত্তমান যুগের সভ্য রাষ্ট্রসমূহে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যে সভা-গৃহে বসিয়া তাঁহারা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন তাহার নাম ছিল সন্থাগার। প্রত্যেকের আসন রক্ষা এবং নির্দ্দেশ করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। সন্থাগারে কোন আইন পাশ করাইতে হইলে তিনবার প্রস্তাব করিতে হইত। যিনি প্রস্তাব করিতেন তিনি প্রস্তাবের শেষে ঘোষণা করিয়া বলিতেন, "যাঁহারা এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিস্তব্ধ থাকিবেন।" মতদ্বৈত হইলে "ব্যালট" প্রথা দ্বারা সমস্ত বিষয়টার মীমাংসা হইত। "Disputes were settled by the votes of the majority and voting was by the ballot. Voting tickets were served out to the voters and an officer of approved honesty and impartiality was elected to collect these voting papers. (*) অর্থাৎ "অনেক সময়ে যখন কোন বিষয় লইয়া মতের খুব গরমিল হইত তখন প্রত্যেক লোকে গোপনে তাহাদের মত ছোট একটা কাঠের টুকরায় লিখিয়া একজন বিশ্বাসী প্রবীণ লোকের হাতে দিতেন; তিনি সেগুলি গুণিয়া কোন পক্ষে বেশী এবং কোন্ পক্ষে কম মত তাহাই ঠিক করিয়া দিতেন। অবশ্য এই লোকটিকে সভা হইতে নির্ব্বাচন করা হইত।" (†) যদি কোন সভ্য বিশেষ কার্য্যবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষম হইতেন তাহা হইলে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁহার মতামত শুনিবার জন্য অনুরূপ একটি নিয়ম ছিল। সভার "কোরাম্" ছিল; সভার সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের নথিপত্র রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। বিচার-পদ্ধতি অসাধারণ ছিল। যদি কেহ অপরাধ করিত তাহা হইলে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে বিনিশ্চয় মহাপাত্র নামে কর্ম্মচারীগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিত। অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ব্যবহারিকের নিকট বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইত। ব্যবহারিকগণ অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করিলে সুত্রাধারের নিকট প্রেরণ করিত। সুত্রাধারগণ তাহার অপরাধের পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া অষ্টকুলকের নিকট প্রেরণ করিতেন। এই অষ্টকুলকগুলি লিচ্ছবিদিগের আটটী

---

* Dr. Bimala Charan Law M. A., B., L., Ph. D—Ancient Republic of India.

অধ্যাপক অরুণ চন্দ্র সেন ও অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার—সোনার বাংলা

(†) Dr. Bimala Charan Law M. A., B. L., Ph. D—Ancient Republic of India.

জাতির প্রতিনিধি। অষ্টকুলকদিগের বিচারই শেষ বিচার। বিচারের পর অপরাধীকে সেনাপতির নিকট প্রেরণ করা হইত এবং তিনিই অপরাধীর শেষ বিচার করিয়া দিতেন। অষ্টকুলকগুলিকে ডাঃ লাহা "রাজা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহারাই দেশের দণ্ডবিধির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। "It appears that the Raja was the highest authority in the administration of criminal justice and it should de noticed that he was different from rhe ordinary Rajas who constitutes the assembly."

সর্ব্বশেষে লিচ্ছবিদিগের রাজনৈতিক ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করিব। লিচ্ছবিদিগের মগধ, বিদেহ, কোশল, মৌর্য্য, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ ছিল। শাক্যদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায় যে মগধসম্রাট বিম্বিসারের সহিত এক লিচ্ছবি কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের জননী সেলেনা লিচ্ছবি-কন্যা ছিলেন। বিম্বিসারের সহিত লিচ্ছবিদিগের যুদ্ধে লিচ্ছবিগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পরাজয়ে মগধ এবং বৈশালীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অজাতশত্রুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অভয়ের মাতা লিচ্ছবি-কন্যা ছিলেন। লিচ্ছবিগণ বিম্বিসারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিম্বিসারের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং বাসবী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত বিম্বিসারের বিবাহ দিলেন। বাসবীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং এই পুত্রই ইতিহাসে অভয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন প্রসার লাভ করিতে লাগিল তখন লিচ্ছবিগণ উপযুক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করিতেছিল। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় দিন দিনই রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। গুপ্তসম্রাটদিগের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবি-দৌহিত্র নামে অত্যন্ত গৌরবের সহিত ঘোষণা করিতেন। ইহাই হইল প্রাচীন যুগের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাহিনী।

"প্রতিভা"

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

১

"নিবিড় কালো গভীর রাতে
বিদায় দিলে পুরব ভাতি,
তোমার যে গো জনম হ'ল ;
পরাণ পেলো বিমল জ্যোতিঃ।

২

জনম তব মধুর ক্ষণে,
মরণ তব কেউ না জানে,
স্বপন-হারা মনের মাঝে
পরাণ আলো প্রতিভা তুমি।

৩

আঁধার পথে, কালোর বুকে,
সোনার তুমি বিদ্যুৎ লেখা ;
আবাস তব অসীম মাঝে,
বিভায় তব অমিয় মাখা।

৪

জীবন যবে মরণ তীরে
হতাশ ভরে ডুবিয়া মরে,
স্মরণ। তুমি তূর্য্যস্বরে
অভয়-বাণী প্রচার কর।

মরণ নদীর ওপার হ'তে
সোনার খেয়া প্রেরণ কর॥"

সম্রাটের ভারতাগমন—

গত ৩রা নভেম্বর আমাদের নূতন সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দুইটি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা চিরদিন তাঁহার ভারতবাসী প্রজাবৃন্দের মনে জাগরূক থাকিবে। কথাগুলি বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে বিশেষ উৎসাহ ও উত্তেজনার কারণ হইয়াছে। তিনি তাঁহার অভিষেক উৎসবের পর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত পরিদর্শনে আগমন করিবেন এবং ভারতবাসী সকলের সহিত নিজেকে পরিচিত করিবেন। ভারতবাসী রাজাকে "অষ্টাভিস্ত সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" বলিয়াই জানে—রাজদর্শন তাঁহাদের পক্ষে পুণ্যজনক, কাজেই সম্রাটের এই ঘোষণা তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ প্রীতিপ্রদ তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। দ্বিতীয় কথা—সম্রাট ঐ ঘোষণা বাণীর সময় ভারতকে ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ান বা ভারতীয় রাষ্ট্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে ভারতের স্বাধীনতাই স্বীকার করা হইয়াছে। ভারত যে সত্বরই অষ্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডার মতই বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়াই বৃটীশ জাতির নিকট স্বীকৃত হইবে, সম্রাটের মুখে উচ্চারিত এই বাণী তাহার পূর্ব্বাভাষ সূচনা করিতেছে। সম্রাটের এই উদারতা ও সদাশয়তা তাঁহাকে তাঁহার ভারতবাসী প্রজাবৃন্দের নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী বড়দিনের ছুটিতে রাঁচী সহরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। উক্ত সম্মিলনের মূল সভাপতি ও সাহিত্য শাখার সভাপতি হইবেন—প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিক শাখার শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিবেন। রামানন্দবাবু প্রবাসী বাঙ্গালীর চিরহিতৈষী—তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা ও মানপত্র প্রদান করা হইবে। সম্মিলনের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগে ডাক্তার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত বিভাগে শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ বসু (কাশীবাসী), ইতিহাস, বৃহত্তর-বঙ্গ ও নৃতত্ত্ব বিভাগে ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং মহিলা বিভাগে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। অবশিষ্ট কয়েকটি বিভাগের সভাপতিগণ পরে নির্ব্বাচিত হইবেন। বড়দিনে অন্যান্য বহু সভাসমিতির অধিবেশন থাকিলেও প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের এই বার্ষিক উৎসবে সকলেরই যোগদান করা উচিত। রাঁচী কলিকাতা হইতে অধিক দূর নহে—কাজেই আমাদের বিশ্বাস রাঁচীতে কলিকাতাবাসী বহু সাহিত্যিককে আমরা সমবেত দেখিতে পাইব।

জার্ম্মাণ যুদ্ধ ও ভারতের ব্যয়—

এদেশে একদল লোক বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ভারতকে কোনরূপ বিপন্ন হইতে হয় নাই। তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি ব্যবস্থাপরিষদে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ঐ প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে—গত জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভারতকে নিম্নলিখিত রূপ অর্থ দিতে হইয়াছে—(ক) ভারতের রাজস্ব হইতে ১৭০ কোটি টাকা। (খ) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যদের জন্য প্রদত্ত ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তাহার উপর জার্ম্মাণ যুদ্ধে ৬২ হাজার ভারতবাসী নিহত ও ৬৭ হাজার ভারতবাসী আহত হইয়াছিল। বৃটীশের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনেই সে সময়ে ভারতকে এই ধন ও জনবল ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে ভারতকে যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসী অদ্যাবধিও লাভ করে নাই।

খাদ্যাভাবের আশঙ্কা—

গত ৩১শে অক্টোবর দিল্লীতে সেচবিভাগের বার্ষিক সভার উদ্বোধন করিতে যাইয়া আমাদের বড়লাট লর্ড লিংলিথ্‌গো জানাইয়াছেন—ভারতে যদি খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অচিরে কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই দেশে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিবে। ইহা যে সকল ভারতবাসীর নিকটই আশঙ্কার কথা, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বড়লাট যখন একথা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তখন ভারত-গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অচিরে কৃষির উন্নতিবিধায়ক কার্য্যসমূহে হস্তক্ষেপ করেন সে ব্যবস্থা হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু মজার কথা এই যে—এতদিন দেশে যে খাদ্যাভাব ছিল না, এ কথা বড়লাট বাহাদুরকে কে জানাইল? আমরা ত প্রতি বৎসরই নানা কারণে বহু দেশবাসীকে খাদ্যাভাবে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে দেখিতে পাই। ইহার প্রতিকারের কি কোন ব্যবস্থা হয়? এখন বড়লাট উহা যখন বলিয়াছেন, তখন আর আশঙ্কার কারণ নাই। দেখা যাউক—লর্ড লিংলিথ্‌গোর চেষ্টায় খাদ্যাভাব দূর করিবার চেষ্টা কিরূপ ফলবতী হয়।

কাশীধামে নূতন মন্দির—

গত পূজার ছুটীতে ৺ বিজয়া দিবসে মহাত্মা গান্ধী কাশীধামে একটি নূতন মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই—তৎপরিবর্ত্তে মন্দিরের গাত্রে ভারতবর্ষের একখানি প্রকাণ্ড মানচিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। মানচিত্রখানি দৈর্ঘ্যে ৩১ ফিট ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩০ ফিট। কাশীর খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত এই মন্দির ও মানচিত্র নির্ম্মাণের সকল ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। ভারতবাসী সকলে—জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে উক্ত মন্দিরে গমন করিয়া দেশমাতৃকার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানে সমর্থ হইবে। ইহা নূতন ধরণেরই জিনিষ—এই মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে যদি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে শিবপ্রসাদবাবুর অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার—

গত ৮ই অক্টোবর বিলাতে গ্লাসগো সহরে আন্তর্জাতিক হোমিওপাথিক লীগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার এস্ সেন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুত

ডাক্তার জে, এন, মজুমদার

জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় লীগের ভারতবর্ষের জন্য জাতীয় "সহ-সভাপতি" নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিন সহরে উক্ত লীগের অধিবেশন হইবে। ডাক্তার মজুমদারের এই সম্মান লাভে তাঁহার দেশবাসী সকলেই আহ্লাদিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিবেদন—

আচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে "বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেডে"র প্রতিষ্ঠাতা, তাহার অংশীদারদিগকে তিনি তাঁহার শেষ নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতি সামান্য মূলধন লইয়া বেঙ্গল কেমিকেলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজ ঐ প্রতিষ্ঠান বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। সেজন্য আচার্য্য রায় দেশের

নানা উন্নতিজনক বিষয়ে গবেষণার সাহায্যকল্পে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর উক্ত গবেষণা-ব্যবস্থার ভার প্রদান করা হইলে ঐ কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আচার্য্য রায় ইচ্ছা করিলে গত ১৫ বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ১৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বেঙ্গল কেমিকেলের সকল কাজই করিয়া দিয়াছেন। আচার্য্য রায়ের এই নিবেদন যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য চেষ্টার অভাব হইবে কি ?

বোম্বায়ে দুর্গোৎসব—

বোম্বাই সহরের প্যারেল অঞ্চলের অধিবাসীদের যত্নে ও উৎসাহে এবার সেখানে সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় মহাশয় ভারতীয় শিল্প-কলা-পদ্ধতি অনুসারে একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া উক্ত দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তাদিগকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। আমরা এই সঙ্গে শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ও তাঁহার নির্ম্মিত দেবী মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম।

বোম্বায়ে প্যারেল অঞ্চলে পূজিত দুর্গামূর্ত্তি।
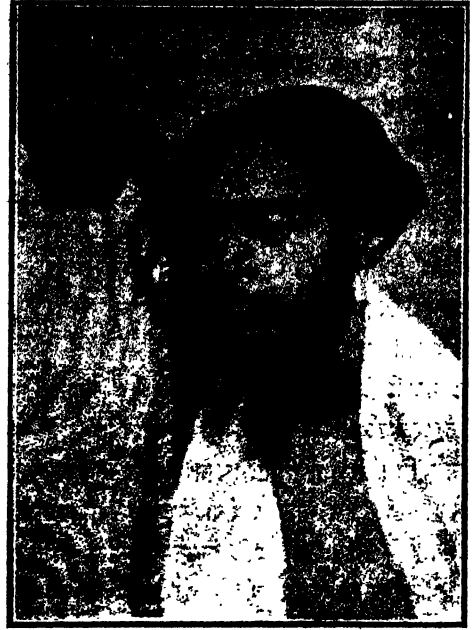
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়, আর্টিষ্ট—বোম্বায়ে পূজিত দুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাতা

বীমা আইন কমিটী—

ভারতগভর্ণমেণ্ট যে নূতন বীমা-আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার খসড়া সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহারা ভারতের খ্যাতনামা কয়েকজন বীমাকর্ম্মীকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। বাঙ্গালা হইতে ঐ কমিটীতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্সের ম্যানেজাররূপে এবং ইন্দুভূষণ ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ড কোম্পানীর কর্ণধাররূপে বাঙ্গালার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত। সুরেশচন্দ্রের তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যও সুনাম আছে। তাঁহাদের দ্বারা নূতন আইনে বাঙ্গালীর বীমা কোম্পানীগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু—

স্বাগতম্! প্রায় তিন বৎসর পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেস-সভাপতিরূপে এবার কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসরে তাঁহার জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কলিকাতাবাসী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

ফটো—এ, এন, দাস এণ্ড কোং

অসীম উৎসাহ ও উত্তেজনা সহকারে পণ্ডিতজীর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। তিনি যে ৫ দিন কলিকাতায় ছিলেন, তাহার একটি মুহূর্ত্তও তিনি বসিয়া থাকেন নাই—দেশের নানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, নানা বিভাগের দেশকর্ম্মীদের সহিত আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা আজ বিবিধ

জহরলাল ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ফটো—এ, এন, দাস এণ্ড কোং

দুর্দ্দৈবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত—তাঁহার শুভ-আগমনে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস পবিত্র হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

হেগ কনফারেন্সে বাঙ্গালী প্রতিনিধি—

আগামী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইউরোপের হেগ সহরে তুলনামূলক আইনের আলোচনার জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কলিকাতার খ্যাতনামা এডভোকেট ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল ভারতের প্রতিনিধিরূপে উক্ত কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে হেগ সহরে যখন উক্ত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন তাহাতে কোন ভারতীয় নিমন্ত্রিত হন নাই। ভারতের জন্য উক্ত কংগ্রেসের যে ন্যাশানাল কমিটী গঠিত হইবে ডাক্তার পাল তাহারও সাধারণ সম্পাদক হইবেন। ডাক্তার পালের এই সম্মানলাভ তাঁহার দেশবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী—

গত ৩রা হইতে ৮ই অক্টোবর রাজপুতানার আজমীর সহরে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা-সঙ্গীত-সম্মিলনীর সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রমোদা । সম্মিলনীর ৩০জন ছাত্রছাত্রী সঙ্গে লইয়া উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গৌরবের কথা এই যে সম্মিলনীর প্রদত্ত অধিকাংশ স্বর্ণপদক ও রৌপ্য পাত্র বাঙ্গালার প্রতিনিধিরাই জয় করিয়া আনিয়াছেন। কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর গীতশ্রী গীতা দাস, আরতি
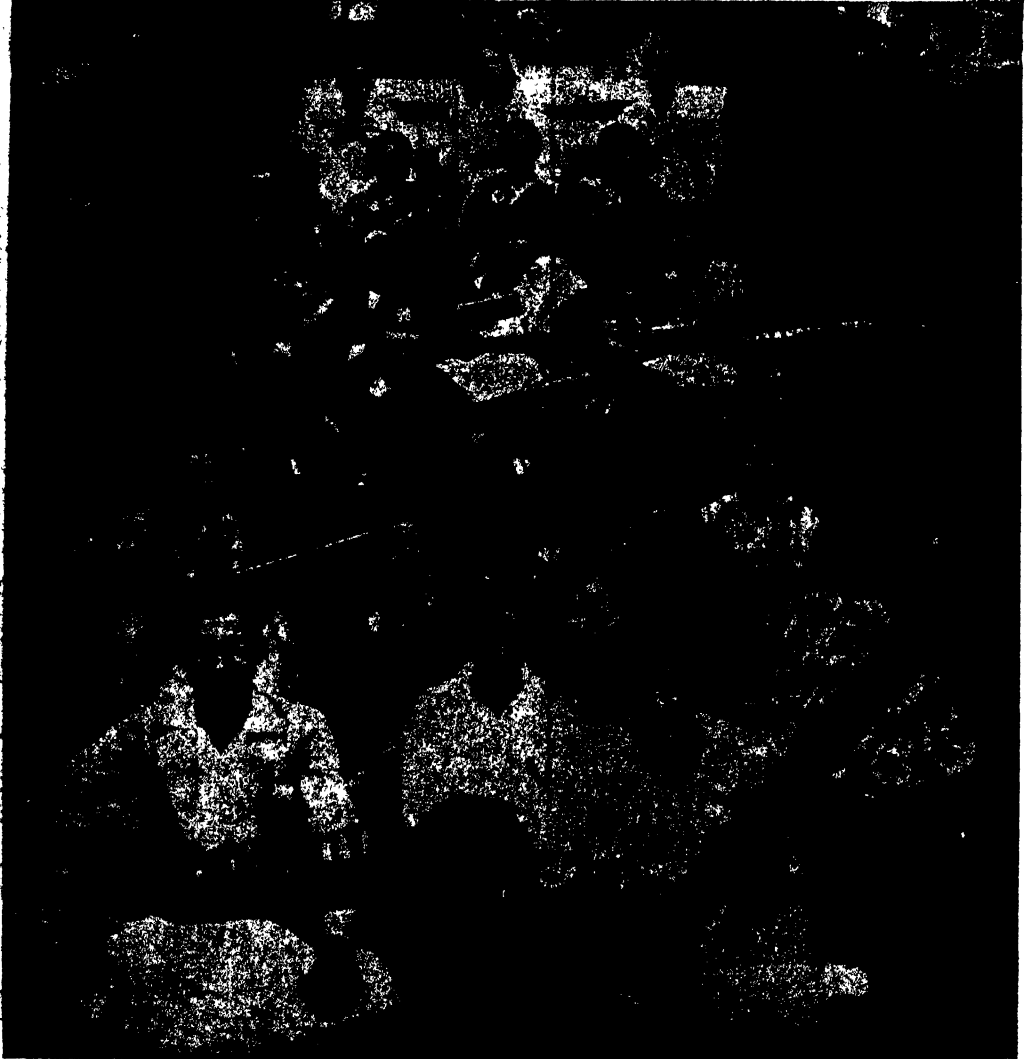
পশ্চাতের সারি - বি, এন্‌, শর্ম, মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য, রাখাল মজুমদার। দ্বিতীয় সারি—অসীমা দাস, অরূণা সেন, অমিয়া ঘোস, বুলবুল রায়
তৃতীয় সারি—অন্নপূর্ণা সেন, বন্দিরা গুপ্ত, বেলা দাস। চতুর্থ সারি—গীতশ্রী গীতা দাস, গীতশ্রী ইভা গুহ।
পঞ্চম সারি—আরতি দাস, রেণুকা মোদক। ষষ্ঠ সারি—কণিকা মিত্র, মাধবী দাস, অরুন্ধতী সেন।
সম্মুখের সারি—অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য, সুধীর চক্রবর্ত্তী, ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী।

দাস ও মালা দাস কণ্ঠ সঙ্গীতের কৃতিত্বের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীমান অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য তাঁহার অসাধারণ সেতার বাদনের জন্য শ্রেষ্ঠ পদক লাভ করিয়াছেন। নৃত্যকলায় কুমারী অমলা নন্দী ছাড়া ও কুমারী রেণুকা মোদক পুরস্কৃতা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ঐক্যতান-বাদন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছে

কুমারী অমলা নন্দী (নৃত্যপরায়ণা)

এবং মিহিরকিরণের দলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাপ ও অন্যান্য ১৯টি ছোট কাপ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন-ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করিয়া কলিকাতার খ্যাতনামা নর্ত্তকী কুমারী অমলা নন্দী সাতখানি সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সম্মিলনে সমাগত প্রতাপগড়ের মহারাজা তাঁহাকে একটি রৌপ্য কাপ ও আজমীরের বেঙ্গল ক্লাব একটি রৌপ্য কাপ দিয়াছেন। সম্মিলনের পর অমলা উদয়পুরের মহারাজার নিমন্ত্রণে তথায় যাইয়া নৃত্য প্রদর্শন করিলে মহারাণী তাঁহাকে প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের একটি পরিচ্ছদ (ঘাগরা, ব্লাউজ ও ওড়না) উপহার দিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু—

"দৈনিক বসুমতী" ও "মাসিক বসুমতী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় গত ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রিতে ৬১ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবন যাইবার জন্য সন্ধ্যায় কলিকাতায় ট্রেণে চড়িয়াছিলেন, সেই ট্রেণেই গয়া ষ্টেশনের পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শব তখনই ডেহরী

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

ষ্টেশনে নামাইয়া লওয়া হয় ও বৃহস্পতিবারে তাঁহার পুত্র তথায় পৌছিলে শোননদের তীরে দাহ করা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রকুমার বি-এ পাশ করিয়া কিছুদিন এলাহাবাদে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন; তাহার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কাল তিনি সংবাদপত্রসেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ কর্ম্মী সাধারণতঃ দেখা যায় না। যৌবনে তিনি "বঙ্গবাসী"র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; পরে বঙ্গবাসী

অফিস হইতে প্রকাশিত টেলিগ্রাফ নামক ইংরাজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ১৬ বৎসর তিনি বসুমতী পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। বঙ্গবাসীতে কার্য্য করার সময়ে তাঁহার রচিত "মহাযুদ্ধের ইতিহাস" ও "ভারতভ্রমণ" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে তিনি কয়েকখানি উপন্যাস ও বহু ছোট গল্প রচনা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি পত্নীহীন হইয়া আর বিবাহ করেন নাই—শিশু পুত্র-কন্যাদিগকে তিনি পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র মিহিরকুমার বসু এম-বিকে তাঁহাদের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। ভগবান সত্যেন্দ্রকুমারের আত্মার কল্যাণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—

জেমসেদপুরস্থ টাটা আয়রণ ওয়ার্কসের ভূতপূর্ব্ব চিফ ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১৭ই জুলাই মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার পিতা যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ কাশীধামে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। ১৯০৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যাইয়া নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা ইলেকট্রিকের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৪ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত টাটার কারখানায় চিফ ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী উক্ত উচ্চপদ লাভ করেন নাই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় পি, মিত্রের কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও পত্নী বর্ত্তমান।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে—

ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সম্প্রতি পরলোকগমন করায় ভারতের সঙ্গীত চর্চ্চা জগতের ইন্দ্রপাত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আজীবন সুরের সাধক ছিলেন এবং তাঁহার দান ভারতীয় সঙ্গীতকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে।

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (জন্ম ১৮৬০, মৃত্যু ১৯৩৬)

তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বরোদায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় এবং পর পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে, ১৯২৫ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে উক্ত সম্মিলনী হইয়াছিল। তিনি ঐ সকল সম্মিলনীতে শুধু নিজে উপস্থিত হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না, ভারতের সকল খ্যাতনামা সুরশিল্পীকে একত্র করিতেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সেগুলির প্রকাশ ও প্রচার যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায়, সেজন্য একটি ট্রাষ্ট গঠন করিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ জ্যোতি শাস্ত্রী

হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান হিন্দুদিগের প্রাত্যহিক ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও এই শাস্ত্র সম্বন্ধে দেশের ধনী মহোদয়গণ এবং পণ্ডিতমহাশয়গণ কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যতীত হিন্দুদিগের ঐহিক কিম্বা পারত্রিক কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। তথাপি এই শাস্ত্রের জন্য এদেশে বহু ব্যয় সম্পন্ন কোন কার্য্য করা হয় না এবং অবশ্য করণীয় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডেও পণ্ডিত বিদায় সম্পর্কে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের বিশেষ কোন সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করেন না। এইরূপ কারণবশতঃ অনেকেই জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে চাহেন না। আবার যাঁহারা অধ্যয়ন করেন তাঁহারাও যৎ সংক্ষেপে পারেন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা রাঘবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত সিদ্ধান্তরহস্য হইতে গ্রহস্ফুট এবং দিনচন্দ্রিকা হইতে পঞ্চাঙ্গ গণনা শিক্ষা করিয়া ফলিতজ্যোতিষ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং তদ্দ্বারাই অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দেশের এইরূপ দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে দেশান্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশের তিথিনক্ষত্রাদির মান ও ভিন্ন হইবে তাহা বিষয়ী লোকত দূরের কথা অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতও জানেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিষয়ী লোক জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা করেন দেখিয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে সাহসী হইলাম। যে শাস্ত্র দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি বিশুদ্ধভাবে গণনা করা যায় তাহার নাম গণিত জ্যোতিষ এবং উহাকে বেদাঙ্গ বলে। যথা "বেদাস্তাবদ্ যজ্ঞ-কর্ম্মপ্রবৃত্তা যজ্ঞাঃ প্রোক্তাস্তেতু কালাশ্রয়েন। শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যাদ বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ॥" যথা শিখামযূরাণাং নাগানাং মনয়ো যথা। তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রানাং গণিতং মূর্দ্ধনি সংস্থিতম॥" অপরঞ্চ "বেদাঙ্গ মগ্র্যামখিলং জ্যোতিষাং গতিকারণম আরাধয়ন বিবস্বন্তং তপস্তেপে সুদুশ্চরম্॥" ইত্যাদি বহু প্রমাণ উক্ত আছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে সিদ্ধান্তবেত্তা জ্যোতির্ব্বিদকে দর্শন করিলে দশদিন কৃত পাপ বিনাশ হইয়া থাকে, যথা দশদিন কৃত পাপং হন্তি সিদ্ধান্তবেত্তা ত্রিদিন জনিত দোষং তন্ত্রবিদ দৃষ্ট এব।" ইত্যাদি গ্রহনক্ষত্রাদির গণিত অবস্থান দ্বারা যজ্ঞ কাল নির্ণয় এবং হিন্দুদিগের প্রাত্যহিক ব্রতাদি পূজা পাঠ, দশবিধ সংস্কার, পারত্রিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য এবং অদৃষ্ট গণনা প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পন্ন হইয়া থাকে। জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যতীত হিন্দুদিগের কোন প্রকারেই চলিতে পারে না। অতএব এই শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে আস্থাবান হিন্দুদিগের সতত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। •

• প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছিল বটে কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের অভাব হইলেও বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ জনগণের পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ হয় না। চিরকালই স্মৃতিশাস্ত্র জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সাপেক্ষ; জ্যোতিঃ শাস্ত্র ব্যতীত স্মৃতি শাস্ত্রের কোন ব্যবস্থাই চলিতে পারে না। জ্যোতিঃ শাস্ত্র ব্রহ্মা সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ, গর্গ বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ এবং আর্য্যভট্ট, বরাহ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে জ্যোতিঃ শাস্ত্র বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত" এবং ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি" গ্রন্থই প্রামাণ্য হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়া বরাহ মিহির "জাতকার্ণব" মথুরানাথ দৈবজ্ঞ "গ্রহার্ণব" এবং রাঘবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রহস্ফুট গণনা করিবার জন্য "সিদ্ধান্ত-রহস্য" এবং তিথি নক্ষত্রাদি গণনার জন্য "দিন-চন্দ্রিকা" নামক সারণী গ্রন্থ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের গণনার সৌকার্য্যার্থে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত সারণী সিদ্ধান্ত রহস্যের খণ্ডা দেখিয়া যিনি গ্রহস্ফুট গণনা করিতে পারেন তিনি এই দেশে ভাল জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক গ্রহস্ফুট গণনা জ্যোতিঃ শাস্ত্রের বহু উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ মাত্র। ইহা শিক্ষা করিলেই জ্যোতিঃ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে না। নিয়মিতরূপে গণিত শিক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় এবং উহার উপপত্তি দেখিতে হয়। সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই তাহা দেব বাক্য কিম্বা ঋষি বাক্য বলিয়া মনে করা অন্ততঃ জ্যোতিঃ শাস্ত্র সম্পর্কে নিতান্তই অকর্ত্তব্য। যেহেতু "অন্যান্য শাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং ন তেষু কিঞ্চিদ্ ভুবি দৃষ্টমস্তি। চিকিৎসিত জ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥" অপরঞ্চ "অপ্রত্যক্ষাণি শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্। প্রত্যক্ষং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।" অর্থাৎ গণিতাগত চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয় বলিয়াই জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রত্যক্ষ এবং ফলপ্রদ। সে যাহাই হউক সে বিষয় আলোচনা আমার অভিপ্রেত নহে, বর্ত্তমান প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে আমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পঞ্জিকার স্ফুটাদি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। রাঘবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত সিদ্ধান্ত রহস্যের শ্লোকানুসারে এবং খণ্ডা দেখিয়া গ্রহস্ফুট গণনা করা ও বর্ত্তমান সময়ে অনেকের পক্ষে সময় সাপেক্ষ হওয়ায়—আমি সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতানুসরণ করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতাবলম্বনে সিদ্ধান্ত রহস্যের খণ্ডা গ্রহণে এবং নূতন খণ্ডা প্রস্তুত করতঃ দেশান্তর যোজন আনয়ন প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপপত্তির সহিত অতি সরলভাবে দৃগগণিতৈক্য গ্রহস্ফুটাদি গণনা করিবার নিমিত্ত "স্ফুট চন্দ্রিকা" নামক একখানি সারণী গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত রহস্যের মধ্যক্ষেপ এবং মন্দোচ্চ রাহ্বাদি মূল তথ্য অনুসন্ধান করি, তাহাতে দেখিতে পাই রাঘবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "সিদ্ধান্ত রহস্যে" মন্দোচ্চ বিষয়ে "মন্দোচ্চ মর্কস্যযমৌনগেন্দু রসেন্দবো রামশরৌ গৃহাস্থা" ইত্যাদি যে প্রমাণটী দিয়াছেন তাহাতে ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের মন্দোচ্চ রাহ্বাদি সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারে কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। ঐ ভ্রান্ত মন্দোচ্চরাহ্বাদি লইয়া প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা গণনাকারক পণ্ডিতমহোদয় গ্রহস্ফুট গণনা করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদের গণিত পঞ্জিকায় ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের স্ফুট রাহ্বাদি ভ্রান্ত হইবে না কেন? স্ফুটাংশের প্রভেদ হওয়ায় উদয়াস্ত বক্র, বক্রত্যাগ অতিচার প্রভৃতি ভ্রান্ত হয় এবং তাহাতে কাল শুদ্ধি বিষয়ে ভ্রান্ত হইবে। অদ্যাপি বঙ্গদেশে সিদ্ধান্তবেত্তা বহু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন. উক্ত ভ্রান্ত মন্দোচ্চ বিষয়ে যদি কোন পণ্ডিত ভূসৃষ্টি হইতে সিদ্ধান্ত-রহস্য প্রণয়ন কাল অর্থাৎ গত ১৫১৩ শকাব্দা পর্য্যন্ত ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের মন্দোচ্চ রাহ্বাদি সূর্য্য সিদ্ধান্তানুসারে নিরূপণ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন তাহা হইলে এই গুরুতর সমস্যা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। যদিচ অন্য কোন পণ্ডিত উক্ত বিষয়ের স্থির মীমাংসা করিয়া না জানান তাহা হইলেও আশা করি পঞ্জিকা গণনাকারক পণ্ডিতমহোদয়গণ এই বিষয়ের স্থির মীমাংসা করিতে কখনও ত্রুটী করিবেন না।

অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়ায় এম সি সি দল টেষ্ট খেলতে গিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত যে কয়টি খেলা তাঁরা খেলেছেন তার একটিতেও পরাজিত হন নি।

এলেন
(ক্যাপ্টেন, ইংলণ্ড)

এম সি সি—৪৬৯ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ওয়েষ্টার্ণ অষ্ট্রেলিয়া—১৪২ ও ১৪৭

অষ্ট্রেলিয়ার পার্থে তাঁদের প্রথম ম্যাচ ওয়েষ্টার্ণ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলা হয়। এম সি সি দল এক ইনিংস ও ১৮০ রানে জয়ী হয়েছেন। এম সি সি প্রথম ইনিংসে ৪৬৯ রান ৪ উইকেট তুলে ডিক্লেয়ার্ড করেন। ওয়াট ১০৬, বার্ণেট ৫৪, হ্যামণ্ড ১৪১, হার্ডষ্টাফ্ (নট আউট) ৮৭, ফিসলক্ ৩০, ওয়ার্দ্দিংটন্ (নট আউট) ৩৯।

ওয়েষ্টার্ণ অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—উইলবারফোর্স (নট আউট) ৩৩, নিউম্যান ২৮, লাভলক্ ২৫। বোলিং:—ফারনেস্ ৩৫ রানে ৩; এলেন ৩২ রানে ৩; সিম্স্২২ রানে ২; রবিন্স ২৩ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংস—ব্রায়েণ্ট ৪৩, আলেকজাণ্ডার ৩২। বোলিং:—সিম্স্ ৩৭ রানে ৫; রবিন্স ২৩ রানে ২; ফারনেস্ ২৬ রানে ২; এলেন ২১ রানে ০; হ্যামণ্ড ১০ রানে ০ উইকেট নিয়েছেন।

ব্রাডম্যান

হার্ডষ্টাফ্
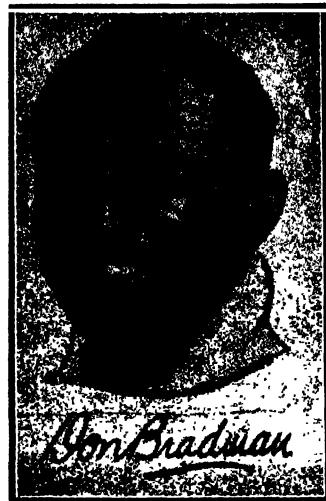
ফিস্লক্

এম্ সি সি—৪৯৭ ও ১২০ (৪ উইকেট)

সম্মিলিত পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া—৪৩৬

খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে হ্যামণ্ড ১০৭, ফিস্লক্ ৯১, ওয়ার্দ্দিংটন ৮৭, এলেন ৬৫। বোলিং:—হল্কম্ব ১২৪ রানে ৪, গ্রিমেট ১৩৭ রানে ১, উইলবারফোর্স ৬০

রানে ২, জিম্বুলিস্ ১০৭ রানে ২ ও ম্যাক্‌কেব্ ৩৩ রানে ১ উইকেট পেয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে, বার্ণেট ৩৭, হার্ডষ্টাফ্ ৩০, ওয়ার্দ্দিংটন ২৫।

ওয়ার্দিংটন

অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংসে, ব্যাড্‌কক্ ১৬৭, হরক্স ১৪০, গ্রিমেট (নট আউট) ৩০। বোলিং :—কপ্‌সন্ ৮২ রানে ৪, হ্যামণ্ড ৩৮ রানে ২, ভেরিটি ৬৪ রানে ২, এলেন ৫৭ রানে ১ এবং ভয়েস ১২৫ রানে ১ উইকেট পেয়েছে।

এম সি সি—১৪১ (৬ উইকেট)

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া (গ্রামা) ৭২ (৪ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

খেলাটি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়। হ্যামণ্ড ৪০। ওয়াট বাঁ হাতের কব্জিতে আঘাত পেয়ে চলে যান এবং বোধ হয় মাসাধিককাল খেলতে পারবেন না।

এম সি সি—২৩৩ ও ২৩৬

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১৬২ ও ২০২

এম সি সি ১০৫ রানে বিজয়ী হয়েছে। প্রথম ইনিংস—হ্যামণ্ড ১০৪, ভেরিটি ৩১, ওয়ার্দ্দিংটন ২৫। ওয়ার্ড ৭৯ রানে ৫ ও গ্রিমেট ৬২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংস—হ্যামণ্ড ১৩৬, ওয়ার্দ্দিংটন ২৯, ভেরিটি ২৩। কটন ৩৮ রানে ৪, ওয়ার্ড ৯৮ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

সাউথ অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—কটন (নট আউট) ৩৭, গ্রিমেট ৩৫, রিচার্ডসন ২৯। এলেন ৫৩ রানে ৬, সিম্‌স ৩৬ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংস—রিচার্ডসন ৫৫, ময়েল ৩২, পার্কার ২৪, রায়েন ২৪, ব্যাড্‌কক্ ২৩। এলেন ৩২ রানে ৩, ভেরিটি ৩৫ রানে ৪, সিম্‌স্ ৭৬ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ব্রাডম্যানের শিশু মারা যাওয়ায় তিনি অধিনায়কতা করতে পারেন নি। রিচার্ডসন করেছেন। দ্বিতীয় দিনে ব্রাডম্যান উপস্থিত ছিলেন। ব্যাড্‌কক্ দ্বিতীয় বার অকৃতকার্য্য হলেন। ওয়ার্ড ১৭৭ রানে ১০টি উইকেট নিয়েছেন।

হ্যামণ্ড ও ব্রাড্‌ম্যানের সম-রেকর্ড :

হ্যামণ্ড

১৯৩১-৩২এ (অষ্ট্রেলিয়ার সিজন) ব্রাডম্যান পর পর চারটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় সেঞ্চুরী করেছিলেন। এবার হ্যামণ্ডও উপর্য্যুপরি চারটি খেলায় সেঞ্চুরী করে তাঁর সমান রেকর্ড করলেন। হ্যামণ্ড—১৪১ (পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে), ১০৭ (সম্মিলিত পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া) ও ১০৪, ১৩৬ (দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া)।

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট :

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ফাইনাল অমীমাংসিতভা[বে] শেষ হয়েছে।

হিন্দুদল—৩৩২ ও ১২৩ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

মস্‌লিম দল—২৮৬ ও ২৩ (২ উইকেট)

আবদুল্লা ১৬ রানে ৩ ও নাওমল ৬৫ রানে ৫ উইকে[ট] নিয়েছেন।

নিখিল ভারত ত্রিশ মাইল সন্তরণ :

আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গাব[ক্ষে] ত্রয়োদশ বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় নলিন চন্দ্র মালি[ক] জয়ী হয়েছেন। নলিনচন্দ্র ১৯২৯ ও ৩০ সালে বিজ[য়ী] হয়েছিলেন। গত বৎসর সন্তরণকালে তিনি প্রথম যাচ্ছিলে[ন] কিন্তু পেটে ব্যথা ধরায় ও বমি হওয়ায় জল ত্যাগ কর[তে] বাধ্য হন। এবারকার সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ সাঁতা[রু] পি সি বিশ্বাস এক সময়ে মালিককে অতিক্রম করে প্র[ায়] ৩০০ গজ এগিয়ে গিয়েছিলেন। মালিক ও বিশ্বাসের ম[ধ্যে] ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় প্রায় দু' মাইল ধরে। অবশে[ষে] মালিক বিশ্বাসকে অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং শে[ষ] পর্য্যন্ত প্রথম থেকে তিনি বিজয়ী হন।

১ম—নলিনচন্দ্র মালিক (ন্যাসনাল সুইমিং এসো-সিয়েশন), সময়—৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট।

২য়—প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস (আহেরি-টোলা ক্লাব), সময়—চার ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট।

৩য়—এম এম দে (কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব), সময়—৪ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩০ সেঃ।

৪র্থ—বি এন ডুবে (কলেজ স্কোয়ার), সময়—৪ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড।

নলিনচন্দ্র মালিক (ত্রিশ মাইল সন্তরণ ও শত মিটার চিত-সাঁতার বিজয়ী)

৫ম—ডি সি দাস (আহেরিটোলা ক্লাব), সময়—৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট।

ইণ্টার-কলেজ বাচ্ লীগ প্রতিযোগিতা ঃ

ইউনিভারসিটি রোয়িং ক্লাবের উদ্যোগে ইণ্টার-কলেজিয়েট বাচ্ খেলা প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে।

অলিম্পিক স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন কেশববাণী (সেণ্টাল সুইমিং) কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে অলিম্পিক স্পোর্টসে ইনডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নসিপে জয়ী হয়েছেন

আশুতোষ কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা ১০ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিদ্যাসাগর কলেজ একটি পয়েণ্টও পায় নি, সকল খেলাতেই তাদের পরাজয় হয়েছে। আশুতোষ ও ল' কলেজের সমান সমান পয়েণ্ট হয়। শেষ দিনে এই উভয় দলের বাচ-খেলাটি বেশ প্রতিযোগিতা ও উত্তেজনা-

ইণ্টার কলেজ বাচ্ লীগ খেলায় চ্যাম্পিয়ন (দক্ষিণে) আশুতোষ কলেজ, (বামে) রানার্স আপ—ল কলেজ

ছবি—জে, কে, সান্যাল

ইণ্টার কলেজ বাচ লীগ চ্যাম্পিয়ন আশুতোষ কলেজ (বাচ খেলিতেছেন)

মূলক হয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ কলেজ ঃ লেংথে ৩ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে ল' কলেজকে হারিয়ে লীগ-বিজয়ী হয়।

ফলাফল ঃ—

	খেলা	জয়	পরাজয়	পয়েণ্ট
আশুতোষ	৫	৫	০	১০
ল' কলেজ	৫	৪	১	৮
প্রেসিডেন্সী	৫	৩	২	৬
পোষ্ট গ্রাজুয়েট	৫	২	৩	৪
সেণ্ট জেভিয়ার্স	৫	১	৪	২
বিদ্যাসাগর	৫	০	৫	০

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কোচ্ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ব্রোম্লে ও স্কেফ্ বোম্বাই এসে পৌছে বোম্বাই জিমখানার হয়ে হিন্দু জিমখানার বিরুদ্ধে অর্দ্ধ দিনের ম্যাচ খেলেছেন। ব্রোম্লে ৩৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। স্কেফ একটা উইকেটও পান নি। ব্রোম্লে ৫ ও স্কেফ্ ৪ রান করেছিলেন।

মহারাজা পাতিয়ালা তাঁর দলের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার জন্য এঁদের ভারতে আনিয়েছেন।

বিলাতের ফুটবল ষ্ট্যাণ্ড ঃ

২৪শে অক্টোবর তারিখে এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্ম্মিত আর্সেনালের নূতন পূর্ব্ব-দিকের ষ্ট্যাণ্ড প্রথম খোলা হয়েছে। ইহাতে পাঁচটি খাবার ঘর ও ড্রেসিংরুম আছে। ঐদিন গ্রিম্স্বীর সঙ্গে খেলায় আর্সেনাল গোলশূন্য ড্র করেছে। পঞ্চান্ন হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল।

বিলাতের এক একটি ক্লাবের নিজেদের ষ্ট্যাণ্ড নির্ম্মাণে লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়। আর কলিকাতা মহানগরীতে একটি ষ্ট্যাডিয়মের জন্য টাকা সংগ্রহ হয় না,—হলেও নানা দিক থেকে বহু বিঘ্ন এসে জোটে।

কোসের নূতন চাকরী ঃ

স্পোর্টস্ ও লিজারের ফরাসী মিনিষ্ট্রি কর্ত্তৃক কোসে লন্ টেনিস বিষয়ে প্রোপাগ্যাণ্ডা করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর প্রধান কার্য্য হবে, ফরাসী দেশে ভ্রমণ করে নবীন খেলোয়াড়দের উপদেশ দেওয়া, টেনিস খেলার উৎকর্ষতা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া এবং চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় খুঁজে বার করা। কোসের ভারতে আসবার কথা ছিল, কিন্তু জানা গিয়াছে যে তিনি শীঘ্র আসতে পারবেন না।

লারউডের ভারত আগমন ঃ

নটিংহামের বিখ্যাত বোলার পি' লারউড ক্রিকেট শিক্ষক হিসাবে ভারতে আসবার চক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ১৫ই অক্টোবর থেকে ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। মাত্র বর্ত্তমানে একজন শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছে অতএব লিলে তাঁর সঙ্গে আসবেন না।

লারউড

ব্রাডম্যানের শোক ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার আগামী টেষ্ট খেলার ক্যাপ্‌টেন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্রাড্‌ম্যানের শিশু সন্তান ২৯শে অক্টোবর তারিখে জন্মলাভ করে। পরদিন তার মৃত্যু হয়েছে। এম সি সির সঙ্গে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় ঐ কারণে ব্রাড্‌ম্যান যোগ দিতে পারেন নি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ঃ

ধ্যানচাঁদের মতে জগতের শ্রেষ্ঠ হকিদল নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হতে পারে :—

গোল :—এলেন (বাংলা) বা মরিস্ (নিউজিল্যাণ্ড) ;

ব্যাক :—ট্যাপ্‌সেল (বাংলা), মহম্মদ হোসেন (মানভাদার) ;

হাফ্‌ ব্যাক :—ম্যাকলয়েড (নিউজিল্যাণ্ড), পেনিজ্ঞার (পাঞ্জাব), গ্যালিবর্ডি (বাংলা) ;

ফরওয়ার্ড :—হাউফ্‌ম্যান (জার্ম্মাণী), দারা (পাঞ্জাব), ধ্যানচাঁদ (ঝাঁসি), রূপসিং (ঝাঁসি) ও জাফর (পাঞ্জাব)।

ধ্যানচাঁদের মতে হকি খেলোয়াড়দের পক্ষে অতিরিক্ত ডন্ বৈঠক প্রভৃতি ব্যায়াম করা হানিকর। ইহাতে তাঁদের দৌড়বার ক্ষমতা হ্রাস হয়।

আনন্দ মেলা স্পোর্টসে বালিকা সন্তরণকারিণীগণ ছবি—জে, কে, সান্যাল

সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতার আরম্ভ। ডানদিক থেকে চতুর্থ ব্যক্তি বিজয়ী দুর্গাচরণ দাস ছবি—জে, কে, সান্যাল

হিমালয়ান চ্যাম্পিয়নসিপ ঃ

দারজিলিংয়ে এই টেনিস প্রতিযোগিতায় নিম্নরূপ ফলাফল হয়েছে ঃ—

পুরুষদের সিঙ্গল্‌স্ ফাইনাল ঃ

মেটা ৩-৬, ৬-২, ৬-৩, ও ৮-৬ গেমে হাবার্ডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গল্‌স্ ফাইনাল ঃ

মিসেস ম্যাক্‌কেনা বেকার ৬-৩, ৬-১ গেমে মিসেস ট্রেনরকে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছেন।

বৌবাজার সুইমিং ক্লাবের সভ্যগণ—বোম্বাইয়ের ওয়াটার পলো খেলায় ও সন্তরণে ইহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সেখানে ওয়াটার পলোর মাত্র একটি খেলাতে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন

হিমালয়ান্ প্লেট ফাইনাল ঃ

মেজর চেম্বারলেন ৬-৪, ৬-৩ গেমে নাউরোজিকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের (হ্যাণ্ডিকাপ্) সিঙ্গল্‌স্ ফাইনাল ঃ

হাবার্ড (—৩০) ৬-৩, ১-৬ ও ৬-৪ গেমে এ স্মলকে (+১৫) হারিয়েছেন।

মেয়েদের (হ্যাণ্ডিকাপ্) সিঙ্গল্‌স্ ফাইনাল ঃ

মিস্ হাটন্ (+৩) ৬-২, ৬-৪ গেমে মিসেস এণ্ডারসনকে (-[illegible]) হারিয়েছেন।

ডুরাণ্ড বিজয়ী আপাইন্স ঃ

ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায়

ফাইনালে অর্গাইল্ হাইল্যাণ্ডার্স ২-১ গোলে গ্রীণ হাওয়ার্ডসকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। শেষ সময়ের মাত্র দশ সেকেণ্ড পূর্ব্বে অর্গাইল দল দ্বিতীয় গোলটি দিয়ে জয়লাভ করে। এবারকার ডুরাণ্ড খেলা নিম্নলিখিত কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যথা, (১) এসেম্বলীতে এ সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা (২) খেলার মাঠে দর্শকদের ও সৈনিকদের মারামারি। (৩) ভারতীয় দলের রেফারির মীমাংসার বিরুদ্ধে খেলতে অমত ও খেলা থেকে প্রত্যাহার। (৪) অন্য দলের খেলোয়াড় নেওয়ার বিপক্ষে আবেদন ও কমিটি কর্ত্তৃক তা' প্রত্যাহৃত। (৫) চারবার একটি পেনালটি কিক্ করা। (৬) মোহনবাগান গোলরক্ষক কর্ত্তৃক পেনালটি কিক্ করা ও বিপক্ষের গোলকিপারকে চার্জ্জ করা। (৭) গত বৎসরের বিজয়ী ও বিজিতদলের প্রথম খেলাতেই পরাজয়। (৮) ভারতীয় দর্শকদের বয়কটের ফলে অতি অল্পসংখ্যক দর্শকের ফাইনাল খেলা দেখতে উপস্থিতি। (৯) ছোট ডুরাণ্ড খেলার প্রথম প্রচলন।

কুমারী রাণী চট্টোপাধ্যায়
আনন্দ মেলার ১০০ মিটার
সাঁতারে দ্বিতীয় হয়েছে
ছবি—জে, কে, সান্যাল

কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়
আনন্দ মেলার ১০০ মিটার
সন্তরণ বিজয়িনী
ছবি—জে, কে, সান্যাল

ছোট ডুরাণ্ড ঃ

প্রথম দিন ১-১ গোলে ড্র হবার পরে ব্রেডফোর্ডস্ ও হার্টস্ একটি পেনালটি গোলে আর এ এফ দলকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।

বিজয়ী অলিম্পিক হকিদল ঃ

অলিম্পিক হকিদল ৪-১ গোলে দিল্লীর সম্মিলিত দলকে পরাজিত করে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

তাঁরা লাহোরে পাঞ্জাব দলকে ২-০ গোলে হারিয়েছেন। এইটি ভারতে তাঁদের শেষ খেলা। ইহার পর খেলোয়াড়রা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছেন।

ইণ্টার-ভার্সিটি ফুটবল ঃ

এবার ইণ্টার-ভার্সিটি ফুটবল প্রতিযোগিতা পাটনায় হয়েছে। কলিকাতা প্রথম খেলায় ২-০ গোলে বেনারসকে হারায়। ডি, ভট্টাচার্য্য ও এন, মুখার্জ্জি গোল দিয়েছে।

লাহোরে অলিম্পিক হকি দল পাঞ্জাবকে গোল দিচ্ছে

ঢাকা প্রথম দিন গোল শূন্য ড্র করে, দ্বিতীয় দিনে পাটনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে।

ফাইনাল খেলা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হয়। কলিকাতা ১-০ গোলে ঢাকাকে হারিয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার এই প্রতিযোগিতা বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো।

পদ্মপুকুর ইনষ্টিটিউসনের ফুটবল দল। রেঞ্জার্স জুবিলী কাপ (ভারতীয় স্কুলের মধ্যে), মনোরমা চ্যালেঞ্জ কাপ (ভারতীয় ও য়ুরোপীয় স্কুলের মধ্যে), যোগীন কাপ ও সৌদামিনী শীল্ড বিজয়ী। লীগে সকল খেলায় জয়ী হয়েছে, মাত্র একটি খেলায় ড্র করেছে

মহিলা টেনিস্ খেলোয়াড়ের ক্রমপর্য্যায় ঃ

১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল খেলা হয়েছে তার ফলাফলের উপর বিচার করে নিখিল ভারত লন্ টেনিস এসোসিয়েশন নিম্নোক্ত পর্য্যায় নির্দ্দেশ করেছেন:—

(১) মিসেস বোলাণ্ড (মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন)
(২) মিসেস আর ম্যাক্ইন্‌স্ (মিস্ ওল্‌গা ওয়েব)
(৩) মিস্ লীলা রাও
(৪) মিস্ এইচ্ হার্ভি জনষ্টন
(৫) মিস্ এম্ উড্ কক্
(৬) মিস্ রোজি গিব্‌সন্
(৭) মিস্ লোরা উড্‌ব্রীজ্

প্রথম ও দ্বিতীয় মহিলা টেনিস খেলোয়াড় (মধ্যে) মিসেস বোলাণ্ড ও মিসেস আর ম্যাক্ইন্‌স্

মিস্ লীলা রাওকে তৃতীয় স্থান দেওয়ায় বোম্বাইয়ের টেনিস মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, যে গত ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের সভায় এই ক্রমপর্য্যায় সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে স্থির হয়েছিল যে, নিখিল ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব্ব ভারত, পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ক্রমপর্য্যায় প্রস্তুত হবে। কুমারী লীলা রাও নিখিল ভারত ও পাঞ্জাব প্রতিযোগিতায় তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত করেছেন, মিসেস্ বোলাণ্ড পূর্ব্ব ভারত ও পশ্চিম ভারত

প্রতি-যোগিতায় সাফল্য লাভ করেছেন। মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌স্ বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপে মিসেস বোলাণ্ডকে পরাজিত করেন এবং পূর্ব্ব-ভারত প্রতিযোগিতায় মিসেস বোলাণ্ডের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু বেঙ্গল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ ক্রম-পর্য্যায় নির্ণয়ের প্রতিযোগিতার তালিকাভুক্ত নহে। সে জন্ম মিসেস ম্যাক্‌ইন্‌সের ঐ সাফল্য ক্রমপর্য্যায়ের বিবেচনার মধ্যে ধরা চলে না। সুতরাং তিনি কোনরূপেই কুমারী লীলা রাওয়ের উপরে স্থান লাভ করতে পারেন না।

বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি ক্লাবের বার্ষিক জলক্রীড়ার ৫৫ গজ ফ্রি ষ্টাইল প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতে বালিকা সন্তরণকারিণীগণ নৌকাযোগে পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে যাত্রা করছে ছবি—জে, কে, সান্যাল

পুরুষ খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় ঃ

নিখিল ভারত লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের ক্রমপর্য্যায় কমিটি (ডি এন ভালা, এ সি গুপ্ত, ই সি রোজ, আর ভি ভি প্রসাদ ও এল ব্রুক্ এডওয়ার্ডস) ১৯৩৫-৩৬ সালের খেলার উপর নির্ভর করে প্রথম দশজন খেলোয়াড়ের ক্রম-পর্য্যায় প্রকাশ করেছেন।

(১) এস এল আর সোহনে
(২) সোহনলাল
(৩) গাউস মহম্মদ
(৪) বি ব্লেক
(৫) ই ভি বব্
(৬) জে কাউল
(৭) এন কৃষ্ণস্বামী ও এইচ এল সোনি
(৯) ওয়াই সিং
(১০) এস এ আজিম, ডি এ হজেস ও ডবলিউ মিচেলমোর

গঙ্গা পারাবার সন্তরণ ঃ

গঙ্গাবক্ষে দশম বার্ষিক গঙ্গা পারাবার প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। আনন্দ স্পোর্টিংয়ের মদনমোহন সিং ২৯ মিনিট ২৩ সেকেণ্ডে পারাবার করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় হয়েছে, সীতেশকুমার চক্রবর্ত্তী (হাটখোলা), সময়—৩৫ মিঃ ৫৬ সেঃ। তৃতীয়—সুকুমার ঘোষ (হাটখোলা),

গঙ্গা পারাবার বিজয়ী মদনমোহন সিং

সময়—৩৬ মিঃ ১৫ সেঃ। মদনমোহন ১৫০০, ৪০০ ও ১০০ মিটার সন্তরণে বিজয়ী হয়েছেন। ১৫০০ মিটার ২০ মিনিট ৫৭½ সেকেণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

মহেন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্ণামেণ্ট ঃ

চেশায়ার রেজিমেণ্ট শেষ মিনিটে এক গোল দিয়ে ৫ম রয়াল ট্যাঙ্ক কর্পকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে সেমিফাইনালে স্যাণ্ডিমোনিয়নরা দিল্লীর ইয়ং মেন ফুটবল ক্লাবকে দু' গোলে হারায়।

কলিকাতা রোয়িং ক্লাবের বার্ষিক রিগেটা—হাজার গজ রেস ডুমায়ন ট্রফী প্রতিযোগিতার ফাইনালে ফুচের ক্রু অর্দ্ধ লেংথে স্কিনারের ক্রুদের ৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে হারিয়েছে ছবি—জে, কে, সান্যাল

ফাইনালে প্রথম দিন ১-১ গোলে ড্র হয়। স্যাণ্ডিমোনিয়নরা পাঁচ মিনিট খেলার পরই প্রথম গোল দেয়। চেশায়ার দ্বিতীয়ার্দ্ধে গোল শোধ দেয়। দ্বিতীয় দিন খেলায় স্যাণ্ডিমোনিয়নরা মোটেই খেলতে পারে নি। প্রথমার্দ্ধের শেষে তারা একটি গোল খায়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে চেশায়ার আরো তিনটি গোল দিয়ে ৪-০ গোলে বিজয়ী হয়েছে।
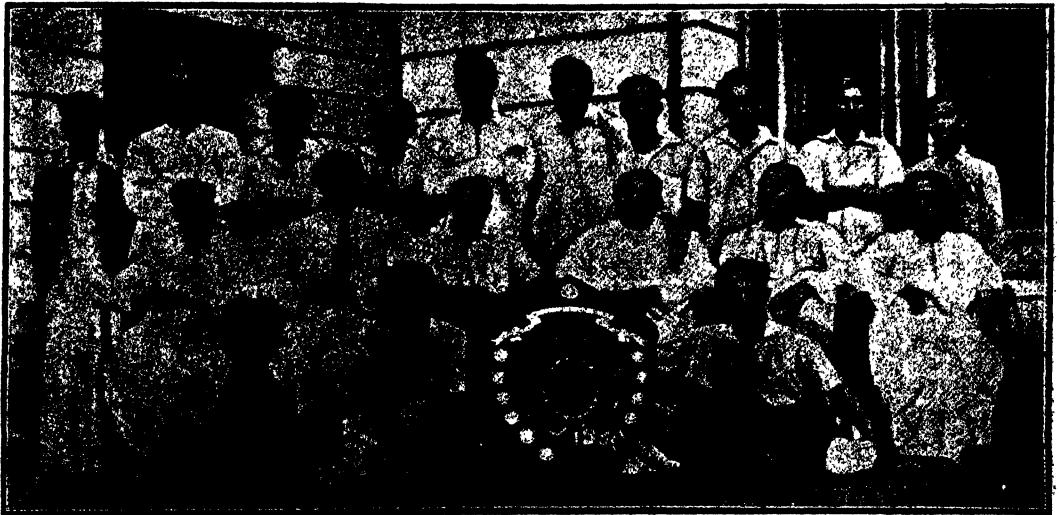
ইন্টার কলেজ লীগ বিজয়ী পোষ্ট গ্রাজুয়েট দল

ভারতে ক্রিকেট ঃ

জামনগর ও ওয়াদিয়ার দলের দু'দিনের খেলা ড্র হয়েছে। জামনগর ১০ উইকেটে ২৭২ করে ডিক্লেয়ার্ড করে। ভিনু (নট আউট) ৭৭, জয়েন্দ্র সিংজি ৭৩। ওয়াদিয়ার দল ৮ উইকেটে ২৩৬ করে। জে পেটেল (নট আউট) ১০৪।

জামনগর ও হিন্দু জিমখানার খেলা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে। হিন্দু জিমখানা—২২৩ ও ১১৫। জামনগর—১৯৪ ও ৮৬ (৪ উইকেট)।

জামনগরের মোবারক আলি ২৭ রানে ৬ ...

ডানদিকে—নবদুর্গা চ্যালেঞ্জ শীল্ড বিজয়ী বয়েজ ইষ্টবেঙ্গল। বামে—বিজিত ব্যায়াম সমিতি। মধ্যে—গোষ্ঠ পাল (রেফারী)। বয়েজ ইষ্টবেঙ্গল বালকদের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল—ইহারা বহু কাপ্ ও শীল্ড বিজয়ী হয়েছে

ছবি—জে, কে, সান্যাল

কলিকাতা স্কাউট্স্ সাইকেল ক্লাবের সভ্যগণ, (মধ্যে বি বি শর্ম্মা পৃথিবীর সাইকেল টুরিষ্টের সভ্য) সাইকেলযোগে চন্দননগর ভ্রমণে যাত্রা

ছবি—জে, কে, সা[illegible]

ও ভিনু ৬৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে বোলিংএ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

জামনগর ও ডাঃ কাঙ্গার পার্শীদলের খেলাটিও ড্র হয়েছে। পার্শীদল—৩০৩ ও ২২ (০ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

জামনগর—২১৯ ও ১১৩ (১ উইকেট)

পার্শীদলের জামসেটজী ৮২ রানে ৭ উইকেট পেয়েছেন। মোবারক আলি (জামনগর) ৫৪ রানে ৩, ওয়েন্সলি ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

জামনগর ও ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়ার খেলাও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। সময়াভাবে ক্রিকেট ক্লাব পরাজয় থেকে বেঁচে গেছেন।

জামনগর—২৩৭ ও ১৬৬ (২ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ক্রিকেট ক্লাব—১৫০ ও ৭২ (৬ উইকেট)

জামনগর—প্রথম ইনিংস, কোলা ১০০, মার্চ্চেণ্ট ২৯। দ্বিতীয় ইনিংস—মার্চ্চেণ্ট (নট আউট) ১০১, কোলা ৩৪। প্রথম ইনিংসে—নওমল ৬৬ রানে ৩, অমরনাথ ৫৪ রানে ২, মাস্তাক আলি ৩৮ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ক্রিকেট ক্লাব—প্রথম ইনিংস—মাস্তাক আলি ৭৯। দ্বিতীয় ইনিংস—কাদ্রি (নট আউট) ২২। অমরনাথ ১ ও ০ করেছেন। মোবারক আলি ৪২ রানে ৩, অমর সিং ৫৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে, অমর সিং ৩২ রানে ৩ ও মোবারক আলি ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

মাণিকতলা ক্রিকেট ক্লাব (কলিকাতা) দিল্লীতে ফ্রেণ্ডস স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে একদিনের খেলায় ৪০ রানে হেরে গেছে। ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব ১৬৫, মাণিকতলা ১২৫। ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের রামচাঁদ (নট আউট) ৭৭ রান করেছেন।

এম্ সি সির সম্বন্ধে

ম্যাকার্টনের মন্তব্য

পার্থে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার ফলাফলের উপর বিখ্যাত খেলোয়াড় ম্যাকার্টনে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—হ্যামণ্ডের রান তুলবার কৌশল প্রশংসনীয়। যে পর্য্যন্ত না তিনি ব্যাটিং করতে বেশ স্বচ্ছন্দতা বোধ করেন ততক্ষণ ধীরভাবে খেলেন। খেলার শেষ দিকে যেরূপ দ্রুত রান তুলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর ব্যাটিং-শক্তি কোনরূপ হ্রাস পায় নি। হার্ডষ্টাফ্ সম্বন্ধে বলেছেন—যদিও ইনি একজন নূতন খেলোয়াড়, কিন্তু পার্থে যেরূপ স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে খেলেছেন তাতে মনে হয় যে তিনি হ্যামণ্ডকে রান তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। লেল্যাণ্ড সুস্থ হলে হ্যামণ্ড, হার্ডষ্টাফ ও লেল্যাণ্ড—এই তিন জন খেলোয়াড় যে অষ্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিশেষ বেগ দেবে তা' জোর করে বলা চলে।

ম্যাকার্টনে

বোলার সম্বন্ধে বলেছেন—এলেন ও ফারনেস্ দু'জনেই ফাষ্ট বোলার, এলেন অধিকতর দ্রুত। তাঁর সাফল্য দেখে মনে হয় তিনি আরো ভাল ফল প্রদর্শন করতে পারবেন। সুতরাং তাঁর বোলিং সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

স্লো বোলার হিসাবে সিম্স্ ও রবিন্সের খেলা বেশ ভাল হয়েছে। বিশেষ করে সিম্সের জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয়

ইনিংস দ্রুত পড়ে গেছে। হোম্‌সও যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারবেন সে আশা করা যায়। রবিন্স আহত হওয়ায় তিনি অনেক খেলায় খেলতে পাবেন।

ভেরিটি একজন মিডিয়ম স্লো বোলার, ভোসও তাই, তবে তিনি ফাষ্ট বোলিংও করতে পারেন।

ফিল্ডিং সম্বন্ধে বলেছেন—এম্‌-সি-সি দলের ফিল্ডিং ভালই হয়েছে। তবে রবিন্সের অভাব সত্যই বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

এর পর যে কয়টি খেলা এম্‌-সি-সি খেলেছেন, তাতে উত্তরোত্তর ভাল ফলই দেখিয়েছেন। দলের কয়েকজন খেলোয়াড়—রবিন্স, ডাকওয়ার্থ ও ওয়াট—আহত হওয়ায়, তাঁদের যদিও অসুবিধা হয়েছে, তথাপি মনে হয় এবার টেষ্টে এম সি সি দল অষ্ট্রেলিয়াকে বিশেষ বেগ দেবে। 'এ্যাসেস' যে কোন দল পাবে তা' এখন নিশ্চয় করে বলা দুরুহ।

মহিলা ক্রিকেট ঃ

১লা নভেম্বর এলাহাবাদে একটি অভিনব ক্রিকেট খেলা হয়েছে। ইহাতে ভারতীয় মহিলারা পুরুষদের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলেছেন। মহিলারা প্রথম ব্যাট করেন ও মোট ৮৮ রান তুলতে সক্ষম হন। কুমারী অমরু মেটা ২৫ ও কুমারী রত্না গুপ্তার ১৫ রান উল্লেখযোগ্য। পুরুষদের বাঁ হাতে খেলতে ও বল দিতে হয়েছিল। ৪ উইকেটে পুরুষরা ৩০ রান করলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে। ইহাই বোধ হয় ভারতীয় মহিলাদের প্রথম ক্রিকেট খেলা।

মহিলা দলে ছিলেন—কুমারী অমরু মেটা, কুমারী পূর্ণিমা মেটা, কুমারী হেমলতা মেটা, কুমারী নসি মেটা, কুমারী রত্না গুপ্তা, চন্দ্রকুমারী মাথুর, ওয়াঞ্চু, আগা, সুমিত্রা পাণ্ডে, শ্রীযুক্তা কিচলু ও শ্রীযুক্তা জোহারী।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীহীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রূপগোস্বামীর প্রেমকাব্য "হংসদূত"—২৲
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "মনোমুকুর"—১৲
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ভুলের ফসল"—২৲
শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায় প্রণীত কুমারসম্ভবের বাঙ্গালা উপাখ্যান "হরগৌরী"—৷৷৵৹
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য গল্প পুস্তক "জীবন্ত কঙ্কাল"—৸৹
মঈমুদ্দীন প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থ "মুসলিম বীরাঙ্গনা"—১৷৹
শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত কবিতা পুস্তক 'রূপসী"—১৷৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত 'জালিয়াতের জটিল জাল"—৷৷৵৹
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অাংকে উঠেই দাঁত কপাটি"—৷৷৵৹
শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা লিখিত "ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস মহারাজের জীবন স্মৃতি"—৷৷৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প পুস্তক "শিক্ষয়িত্রী"—১৷৹, ছেলেমেয়েদের জন্য নাটিকা "সতী"—৷৹
শ্রীমৎ সত্যচৈতন্য ও শক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী সম্পাদিত "শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী"—২৲
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পপুস্তক 'মা ফলেষু"—১৷৷৹
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস 'তেজস্বতী'—১৷৷৹
শ্রীপ্রনাদ বসু প্রণীত স্বরলিপি গ্রন্থ "সঙ্গীত সরণি" প্রথম ভাগ—৵১৹
শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য 'শয়তানের ফাঁদ"—৸৹
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত শিশু উপন্যাস "অজানার উদ্ধানে"—১৲
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "সোনার পাহাড়"—৷৷৵৹
শ্রীঅখিলনিয়োগী প্রণীত শিশু-উপন্যাস "দুর্বিপাকে"—১৲
স্বামী যোগানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব ও সাধন-রহস্য" মধ্যমখণ্ড—১৲
শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক 'শ্রীপাদপদ্ম" (গয়াসুর)—১৷৷৹
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত শিশুপাঠ্য "জাতকের গল্পমঞ্জুষা"—৷৵৹
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত "শিশু-গল্পিকা"—১৷৷৹
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত শিশুপাঠ্য "হুল্লোড়"—৷৵৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "ঝরাফুলের সৌরভ"—২৲
শ্রীসুপ্রিয় সোম প্রণীত ছোট উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষুধা"—৷৵৹
সুকোমল বসু প্রণীত উপন্যাস "অনাবিষ্কৃত"—১৷৷৹
শ্রীসুধীরকুমার দাস এম-এ প্রণীত অলঙ্কারশাস্ত্র "কাব্য প্রদীপ"—৸৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৩৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩৷৷০। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.